টু-টোন
গভীর ভাবে ডাই করার চমৎকার গুণের জন্যেই টু-টোন
বরাবরই ভারতে পয়লা নম্বরের হেয়ার ডাই।

যখন দুঃসহ গরম
আপনার শক্তি নিঃশেষ
করে দেয়....
আপনাদের
আস্থাভাজন
গ্ল্যাক্সোজ-ডি'র
নতুন নাম।
তখন নিন গ্লুকন-ডি
বাড়তি শক্তির জন্যে—
যখনই আপনার দরকার।
অসহ্য গরম আপনাকে যতটা ক্লান্ত করে দিতে পারে, অন্য কিছুতেই তা পারে না। আর সেই গরমে, পরিশ্রমে আপনার সারা শক্তি যেন নিঃশেষ করে দেয়। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আপনার চাই ঠাণ্ডা, তরতাজা করা গ্লুকন-ডি। এটি আপনাকে বাড়তি শক্তি যোগাবে—ঠিক যখনই আপনার দরকার।
গ্লুকন-ডি হ'ল গ্ল্যাক্সোজ-ডি'র নতুন নাম, যার ওপর ৩০ বছর ধরে লক্ষ—কোটি ক্রেতার অগাধ বিশ্বাস। যেকোনো পানীয়ের সঙ্গেই মিশিয়ে খান—ফলের রস, দুধ, চা, কফি, জল—বা শুধু এমন-ই। আর দেখুন, কত তাড়াতাড়ি এটি আপনাকে চনমনে চাঙ্গা করে।
গ্লুকন-ডি সারা পরিবারেরই অপরিহার্য। এটি নিয়েমে শক্তি যোগানোর ফলে, ওরা নতুন উদ্যমে কাজে বা খেলায় মেতে ওঠে। গ্লুকন-ডি—সেই একই পরিচিত সবুজ প্যাকে পাবেন।
Glucon-D
Glucose D
HTB-GLL-4591-BN
গ্ল্যাক্সোর তৈরী আসল গ্লুকোজ পাউডার,
যা ভিটামিন-ডি ও ক্যালসিয়াম ফসফেটের গুণে ভরপুর।

বিয়ের যে উপহার জানায় বাবার উজাড় করা ভালবাসা
চন্দন
স্টীল আলমারি
বাবার বিশাল
হৃদয়ের মতই প্রশস্ত
আপনার চন্দন ডীলারের দোকানে দারুণ সব আলমারী যথা: হোমেকার, টুইনলক, ইউনিভার্সাল. ইউনিহোম, ইউনিস্টার, সিলেক্টা, ব্যান্টাম প্রভৃতি দেখবার জন্যে নিশ্চয়ই চলে আসুন। লকার. ড্রয়ার, শেল্ফ, আয়না, হ্যাংগিং-রড, টাই বার এইরকম ডজনের বেশী সরঞ্জামের সাথে, এই আলমারি আপনার মনপছন্দ ৪ রকম সুন্দর আকর্ষণীয় রঙে পাবেন।
চন্দন মেটাল প্রোডাক্টস
প্রাইভেট লিমিটেড
গোরওয়া রোড. বড়োদ্রা, ৩৯০ ০১৬, গুজরাত
উৎকৃষ্ট স্টীল ফার্নিচার আর
নিরাপত্তার সামগ্রী
Chandan
যাতে জানায় আপনার বিচক্ষণতার পরিচয়!
সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে ডীলার রয়েছে। প্রতিনিধিহীন অঞ্চল থেকে ডীলার চাওয়া হচ্ছে।
everest/78/CMP/417 Bn
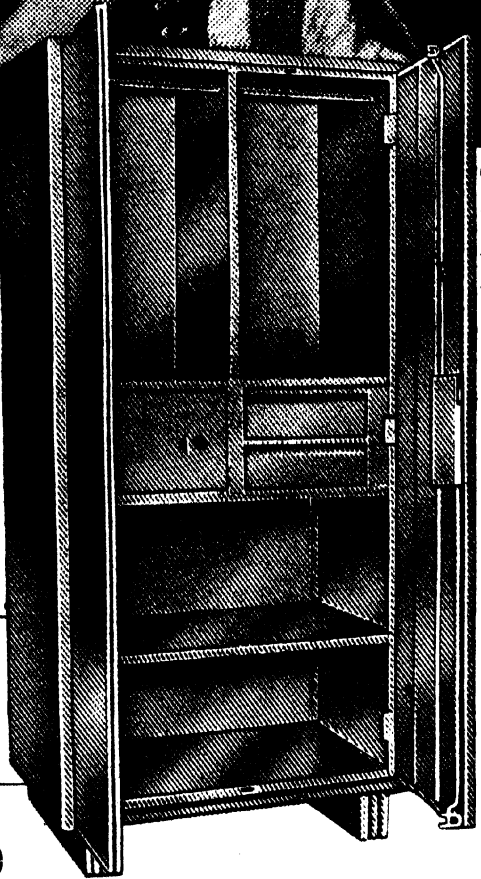
নরম-নরম,
রসালো, নিউট্রেলা
চাংক্‌স-এর
কতো অশেষ
গুণ জানেন?
গুণের ফিরিস্তি : আগে থেকেই
রান্না করে রাখার সুবিধে
বাছাই করা সেরা জাতের সয়াবীন থেকে
বানানো নিউট্রেলা চাংক্‌স একেবারে
রেডিমেড প্যাকে পাবেন, যা স্বাদ ও
পুষ্টিতে ভরপুর। চাংক্‌স শুধু
২০ মিনিটের মত নুন-জলে ভিজিয়ে
রাখুন (মিষ্টি খাবারের জন্যে নুন-জল
ব্যবহার করবেন না)। এবারে জল নিংড়ে
নিন এবং আবার ধুয়ে সাফ করে জল
সম্পূর্ণ নিংড়ে নিন। এবার যে খাবার
রাঁধবেন, তাতে মিশিয়ে রান্না পুষ্টিকর,
আরো মুখরোচক করে তুলুন। খোসা
ছাড়ানো, কাটাকুটি করার কোনো
ঝামেলাই নেই।
সেরাজাতের প্রোটিনে ভরা
সহজ-পাচ্য নিউট্রেলার ২৫০ গ্রামের
প্যাকে কতো প্রোটিন গুণ থাকে জানেন?
২৪টা ডিম বা ১ কেজি মাংস বা ৩ ১/২
লিটার দুধের সমান প্রোটিন গুণ। আপনার
পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য গড়তে, এর
চেয়ে স্বাস্থ্যকর ও সাশ্রয়কর উপায়, আর
কিছু আছে কি?
খরচে এতো সাশ্রয়
যে মনে হয়
নিখরচায় পাচ্ছি
২০০ গ্রাম নিউট্রেলা চাংক্‌স জলে ভিজিয়ে
নিংড়ে নিয়ে রাঁধার পর পরিমাণে কতো
দাঁড়ায় জানেন?
...১ কেজি। কতো
সাশ্রয় ভাবুন তো।
এবার অন্যান্য প্রোটিন
যুক্ত খাদ্যের সঙ্গে
নিউট্রেলার খরচের
তুলনা করে দেখুন তো, কথাটা ভুল
বলেছি কি-না...খরচ, যেন নিখরচায়!
আবার আপনার সংসারের জন্যে যতটা
মাংস দরকার, তার অর্ধেক কিনে, এবার
নিউট্রেলা মেশান। দেখবেন পরিমাণেও
একই পাচ্ছেন আর স্বাদেও চমৎকার।
১০০'রও বেশী রকমারি
সুস্বাদু ডিশ
নিরামিষ, ওয়েস্টার্ন, চাইনীজ,
আমিষ... আপনার খানে-খাবনার
যত রকমের রান্নার ইচ্ছে আছে, তার
সবকিছুই এদিয়ে বানাতে পারেন। আর
দেখবেন, আপনার রাঁধা ডিশও কতো
চমৎকার খেতে হয়েছে...কারণ নিউট্রেলার
চাংক্‌স যে যেমন নরম-সরম, তেমন-ই
রসালো, আর অন্যান্য রাঁধা খাবারের সঙ্গে
কেমন চমৎকার
মিশে যায়।
২৫০ গ্রাম এবং ১০০ গ্রামের প্যাকে পাওয়া যায়।
Nutrela
Nutrela
100% নিরামিষ
নিউট্রেলা সয়া আহার
সুস্বাদু করা...সহজাত গুণে ভরা!
রুচি প্রাইভেট লিমিটেডের
এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন।
everest/81/RPL/166-b

প্রকাশিত হয়েছে

বিমল কর-এর

অবিশ্বাস্য ঘটনাবহুল উপন্যাস

# অলৌকিক

দাম ১০.০০

অবিশ্বাস্য, তবু অবাস্তব বলা যাবে না, এমনই এক ঘটনাবহুল পটভূমিতে বিমল কর-এর এই নতুন রোমাঞ্চকর উপন্যাস। আমরা অনেকেই পড়েছি বিদেশী সেই অদ্ভুত ক্ষমতাবান লোকটির কথা, যে কিনা শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়ে বাঁকিয়ে দিতে পারে কাঁটা, চামচ কিংবা ছুরি। মানুষের এই ধরনের নানান অস্বাভাবিক মানসিক ও শারীরিক শক্তি নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা করছেন যে-ভদ্রলোক তিনি নিজেও যেন কিছুটা অস্বাভাবিক ক্ষমতার অধিকারী। নইলে সিনেমার সিটে তাঁকে দেখে মৃত বলে ভুল হবে কেন বরদার? অথচ সিনেমা ভাঙার পর সেই লোকটিকেই আবার জলজ্যান্ত অবস্থায় চোখের সামনে দেখে বরদা অবাক। ভদ্রলোকের নাম সিদ্ধেশ্বর। ভদ্র, মার্জিত, বুদ্ধিমান মানুষ। ভেলকিঅলা বা ভড়ংবাজ নন। দুমকার কাছে একটা রিসার্চ সেন্টার খুলেছেন মানুষের অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে গবেষণা করার জন্য।

আলাপ হবার পর বরদাকে সেখানে টেনে নিয়ে গেলেন সিদ্ধেশ্বর। নানা ধরনের অবিশ্বাস্য শক্তিধর মানুষ সেই গবেষণাকেন্দ্রে, এ-ছাড়াও রয়েছে এমন একজন, যাকে হুবহু বরদার মতোই দেখতে। এই বিচিত্র পরিবেশে বরদা শেষ পর্যন্ত রক্ত-হিম-করা যে-অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হল, তাই নিয়েই এই দুরন্ত স্বাদের উপন্যাসটি লিখেছেন বিমল কর। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তীব্র উৎকণ্ঠা-উত্তেজনা ভরা। প্রচ্ছদ ও ছবি:

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে

শ্রীপান্থের

তিন কন্যার কাহিনী

# দেবদাসী

দাম ১০.০০

দেবদাসী, সতী আর বিষকন্যা—এই তিন ভারত-কন্যার অন্তরঙ্গ জীবনকাহিনী নিয়ে 'দেবদাসী'। দেবদাসী নাম, কেননা তিনজনই মূলত তা-ই—দেবতাদের দাসী। সে-দেবতা কখনও স্বর্গের, কখনও মর্ত্যের—এই যা।
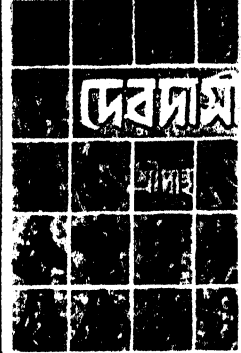
বিষকন্যা যদি উপকথার নায়িকা, সতী আর দেবদাসী তবে এই সেদিনের কথা।' ইতিহাসের পাতায়-পাতায় তাদের নিয়ে নানা গৌরবময় উপাখ্যান। কিন্তু সত্যিই কি এই ইতিবৃত্ত গৌরবের? প্রশ্ন তুলেছেন লেখক। এবং সে-প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে উদ্‌ঘাটন করেছেন অনেক জটিল রহস্য, অনেক অজানা তথ্য। যেমন, আমরা কি জানতাম যে, সতীদাহ প্রথায়—শুধু ভারতে নয়—প্রাচীন পৃথিবীর সর্বত্রই কম-বেশি চল ছিল? একই রকম ভাবে, বিশ্বের প্রায় সর্বত্র নানা রূপে দেবমন্দির ছিল বারাঙ্গনাগৃহ, ভিন্ন নামে ছড়িয়ে ছিল দেবদাসী-প্রথা? জানতাম কি যে, য়ুরোপ আমাদের কাছ থেকেই একদা এক রহস্যঘন রাতে ঘরে তুলে নিয়েছিল ভারতললনা বিষকন্যাকে? বিষকন্যার আপন অস্তিত্বের মতোই কৌতূহলোদ্দীপক তার সেই পশ্চিম-অভিসারের কাহিনী। শ্রীপান্থ সেই সব কাহিনীই শুনিয়েছেন। বহু তথ্য ঘেঁটে, পুঁথি হাতড়ে, ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুঁজে। বিশ্লেষণে নির্মম, সত্যে অবিচল, অথচ উপন্যাসের মতোই স্বাদু এবং সুখপাঠ্য এই কাহিনী।

এই লেখকের আরেকটি গ্রন্থ

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

জমজমাট রহস্য-উপন্যাস

# কস্তুরীগন্ধ

দাম ৭.০০

হীরামঞ্জিল-এর জলসাঘরে এক পুরনো পাপ নতুন অভিশাপ হয়ে দেখা দিল। ফুলের মতো এক নবপরিণীতা বধূ খুন হল নৃশংসভাবে। কে খুন করল তাকে? রহস্যভেদী কিরীটী রায়ের অনুসন্ধানকে ঘিরে জমজমাট রহস্য উপন্যাস 'কস্তুরীগন্ধ'।

পার্থসারথি চক্রবর্তীর

কৌতূহল মেটানো কিশোর গ্রন্থ

# চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা

দাম ৫.০০

বিজ্ঞানভিত্তিক কিশোরপাঠ্য বাংলা বইয়ের অভাব মেটাতেই কলম ধরেছেন পার্থসারথি চক্রবর্তী। গল্পের মতো স্বাদু তাঁর রচনা, আবার একই সঙ্গে শিক্ষাপ্রদও বটে। বহু কৌতূহল-মেটানো তথ্যে সমৃদ্ধ 'চিকিৎসা বিজ্ঞানের আজব কথা।'

# রাজনৈতিক বই

ডঃ শিশিরকুমার বসু ও বীরেন্দ্রনাথ সিংহ-এর

**Netaji : A Pictorial Biography**

দাম ৫০.০০

সুভাষচন্দ্র বসুর

**তরুণের স্বপ্ন**

দাম ১০.০০

**সমগ্র রচনাবলী (১ম খণ্ড)**

দাম ৩৫.০০

মৈত্রেয়ী দেবীর

**অচেনা চীন**

দাম ১৫.০০

প্রকাশিত হয়েছে

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

বহু-প্রতীক্ষিত গ্রন্থ

# সমগ্র কিশোরসাহিত্য

দ্বিতীয় খণ্ড

সংকর্ষণ রায়ের

বিজ্ঞানভিত্তিক রহস্যোপন্যাস

# গভীর গহন

দাম ৭.০০

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস কম লেখা হয়, এ-কথা সত্যি। কিন্তু প্রথম

শ্রেণীর রহস্য উপন্যাসও কি বেশি বেরোয়? সংকর্ষণ যার একাধারে দুটি অভাবই পূরণ করলেন। প্রখ্যাত ভূবিজ্ঞানী এই লেখকের 'গভীর গহন' কৌতূহলে-রোমাঞ্চে-উত্তেজনায় ভরা দারুণ স্বাদু এক রহস্য-উপন্যাস, অথচ সম্পূর্ণভাবেই বিজ্ঞানভিত্তিক এই কাহিনী।

বিমল মিত্রের

অনুপ্রাণিত-করা উপন্যাস

# দাশরথির বাহাদুরি

দাম ৮.০০

কাহিনী-বর্ণনার মধ্য দিয়ে পাঠককে কীভাবে উন্মুখ ও কৌতূহলী করে তুলতে হয়, বিমল মিত্র জানেন। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর নতুন উপন্যাস 'দাশরথির বাহাদুরি'তে বয়স-নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণীর পাঠককেই তিনি কাছে টেনে নিতে পেরেছেন। লেখক হিসেবে এখানে তাঁরও আসল বাহাদুরি। নিতান্ত মামুলী উপন্যাস নয়, বড়োরা এই কাহিনী পড়ে হবেন রোমাঞ্চিত, আর ছোটরা হবে অনুপ্রাণিত।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯

প্রকাশিত হয়েছে

শৈলেন ঘোষের

এ-যুগের রূপকথা

# জাদুর দেশে জগন্নাথ

দাম ৮.০০

এক মস্ত বীর, বুকভরা সাহস, মুঠিভরা তাঁর শৌর্য শত্রুকে তিনি বুঝে দেন হারিয়ে, নিরীহ মানুষকে বাঁচান নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে। সেই বীরেরই ছেলে জগন্নাথ। ছোট্ট হলে হবে কী, সেও বেশ সাহসী, মাথাভরা বুদ্ধি, বুকভরা ভালবাসা। আর তাই তো, কোয়া নামের রাস্তার কুকুরটি জগন্নাথকে ছাড়তেই চায় না। জগন্নাথ চলেছে, কোয়াও চলেছে। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। কিন্তু কোথায় চলেছে জগন্নাথ?

চলেছে বাবাকে খুঁজতে। একদল লুঠেরা চুরি করে এনেছিল জগন্নাথকে। সেখান থেকে পালিয়ে জগন্নাথ ফিরে চলেছে বাবার খোঁজে সেই খোঁজার পথেই জগন্নাথ গিয়ে পড়ল এক জাদুর দেশে। সেখানে থা বাঁদর আর তালফুলুড়ি মামা, দানোর মতো পাখি, কৌটোজন্ম, এক ময়ূরকণ্ঠ রঙের দেবতা, সোনার ঘুঙুর, বেড়াল হয়ে যাওয়া মানুষ, গর্জন দৈত্য— আরও কত কী। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। এরা করল, আর জগন্নাথ কী করল, তাই নিয়েই এই দু জাদুকরী রূপকথা— 'জাদুর দেশে জগন্নাথ।' শৈলেন ঘোষের ঝকঝকে তাজা কলমে ছোটদের জ দারুণ আকর্ষণীয় উপহা মন-মাতানো বিস্তর ছবি আর রঙীন মলাট এঁকে আরেক শিল্পী-জাদুকর দেবাশিস দেব!

দেশ ৪৮ বর্ষ ১৪ সংখ্যা
২৮ চৈত্র ১৩৮৭

সম্পাদকীয়

সূচীপত্র





সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে
বামাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮
সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪
থেকে মুদ্রিত।
দাম দেড় টাকা
বিমান মাসুল : ১৫ পয়সা
[illegible]বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

# রেল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

ভারতীয় রেলের জন্ম হয়েছিল গত শতাব্দীর মাঝামাঝি, ১৮৫৩ সালে। তারপর সোয়া শ' বছরেরও বেশি কেটে গেল। এই সোয়া শ' বছরে ভারতীয় রেলের খ্যাতি কিছু কম জোটেনি। বলা হয়, এশিয়ার মধ্যে ভারতীয় রেল-ব্যবস্থাই দীর্ঘতম এবং পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ। বর্তমানে প্রায় একষট্টি হাজার কিলোমিটার রেলপথ দেশের মধ্যে ছড়ানো। নিত্য ট্রেন চলে এগারো হাজারের মতন। ব্রিটিশ আমলে রেলের যতটা উন্নতি ঘটেছিল, পরিকল্পিত রেলপথ উন্নয়নের কাজ হাতে নেবার পর, ১৯৫১ সাল থেকে, তার চেয়ে বেশি বই কম ঘটেনি। কিন্তু এই উন্নতি রেলপথ প্রসার এবং অন্যান্য ব্যাপারে ঘটলেও প্রশাসন ও যাত্রীদের সুবিধে অসুবিধের ব্যাপারে বিশেষ ঘটেছে বলে মনে হয় না। বরং তার অবনতি ঘটেছে বলেই অনেকে মনে করেন।

ভারতের মতন বিশাল দেশে যোগাযোগ-ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ করে তোলা নিশ্চয় কঠিন। তবু একথা বোধ হয় ঠিক যে, রেল ব্যবস্থাই এদিক থেকে সবচেয়ে সুবিধেজনক। অন্যান্য ব্যবস্থা বলতে যা বোঝায়—যেমন বাস-লরিতে বা নদীপথে যোগাযোগ—তার সুবিধে আমাদের দেশে কম। কাজেই প্রধানত রেলের প্রতি ভরসা করে এই ব্যবস্থা গড়ে তোলা ছাড়া উপায় নেই।

দেশের জনসংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে প্রয়োজন। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার তাগিদও নানা কারণে বেড়ে চলেছে। শুধুমাত্র যাত্রী চলাচলের কথা ধরলেই চলবে না, মালপত্র চলাচলের কথাও ধরতে হবে। যদি সবরকম প্রয়োজনকে একত্রে ধরা হয়—তাহলে দেখা যাবে, আমাদের যা প্রয়োজন রেল তার কিছুটা পূরণ করছে নিশ্চয়, কিন্তু মোটামুটি আট আনাও নয়। এর জন্য কোনো হিসেবের প্রয়োজন নেই, যে-কোনো ট্রেনযাত্রীই আজ বুঝতে পারেন, কাছেই হোক অথবা দূরে—কোথাও যেতে হলে কী দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়। এর কারণ মাত্র একটি—প্রয়োজনের তুলনায় ব্যবস্থা কম।

গত তিরিশ বছরে ভারতীয় রেলের প্রসার যতই ঘটুক, এখনও দেশের বহু অঞ্চলেই রেল-যোগাযোগ নেই। আবার কোনো কোনো এলাকার সঙ্গে রেল-যোগাযোগ নামমাত্র। অর্থাৎ কোনো রকমে সংযোগ রক্ষা করা আছে। পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরা যাক। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র রেল ব্যবস্থা নেই, এমন কি যেখানে রেল-যোগাযোগ একান্তই প্রয়োজন সেখানেও না। এদিক থেকে উত্তরবঙ্গ উদাহরণ হতে পারে। উত্তরবঙ্গের কতটুকু রেলপথে আসা-যাওয়া সম্ভব! আবার কোথাও কোথাও এমনও দেখা যায়, ব্রিটিশ আমলে যতটুকু রেলপথ তৈরি হয়েছিল ঠিক ততটুকুই এখনও থেকে গিয়েছে।

রেল কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রেলপথ খোলার দাবি তাঁদের কানে পৌঁছয়, কিন্তু দাবি পূরণের সামর্থ্য তাঁদের নেই। তারও মধ্যে যতটা পারেন করতে চান।

একথা মনে রাখা দরকার, রেলের আয় আজ তিরিশ বছরে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ১৯৫০-৫১ সালে যেখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কাছ থেকে রেলের আয় ছিল চুরাশি কোটি টাকার কিছু ওপরে, সেখানে ৭৬-৭৭ সালে তার আয় দাঁড়িয়েছিল ৪৫৬ কোটি টাকা। মালপত্র বহনের থেকেও রেলের আয় ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এ-সব সত্ত্বেও যদি রেল আরও দ্রুতগতিতে কাজ করতে না চান তবে সেটা দেশের মানুষের পক্ষে মন্দভাগ্য ছাড়া আর কি হতে পারে ?

রেলের প্রসার ঘটেছে—আরও ঘটবে একথা মনে করা গেলেও এমন মনে করার কারণ নেই যে রেলের প্রশাসন ত্রুটিহীন। বরং জনসাধারণ নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে জানেন, রেলের প্রশাসন ক্রমশই শিথিল ও বিশৃঙ্খল হয়ে উঠছে। আজকাল কোনো গাড়িই প্রায় সময়মত চলে না, দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়েই চলেছে, রেলে ভ্রমণ যে খুব নিরাপদ থাকছে তাও নয়। উপরন্তু বিনি টিকিটে রেল-ভ্রমণ একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের নিত্য যা ভরসা—তার প্রশাসন কেন এমন বিশৃঙ্খল হবে আমরা বুঝি না। প্রসঙ্গত একটা কথা বলতে হয়, কয়েক বছর আগে রেলের এক কর্তৃপক্ষ মন্তব্য করেছিলেন, কলকাতা বোম্বাইয়ের মতন বড় বড় শহরে যেসব সুবারবন ট্রেন চলাচল করে সেগুলি আর যাত্রীদের চাপ সহ্য করতে পারছে না। অসহ্য হয়ে উঠেছে এই চাপ। কথাটা, কোনো সন্দেহ নেই, সত্য। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষ তার জন্যে নতুন কোনো ব্যবস্থা কি করেছেন ? কলকাতার কথাই যদি ধরা যায়, সকলেই স্বীকার করবেন, লোকাল ট্রেন-গুলি যেভাবে ও যে-অবস্থায় চলে তা বর্ণনাতীত। যাত্রীদের নিত্যই নানা দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়।

প্রসঙ্গত বলা দরকার ভারতীয় রেল স্টেশনের রক্ষণাবেক্ষণও প্রশংসা করার মতন নয়। বিশেষ করে অধিকাংশ স্টেশনেই যাত্রীদের বিরামাগার নেই। বড় বড় স্টেশনের বুকিং অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটাও এক চরম দুর্ভোগ। রেল যে-হারে অর্থ-উপার্জন করে, সেই অনু-

# দেশ

## সাহিত্য সংখ্যা

॥ ১৩৮৮ ॥

এ বছরের সাহিত্য সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত এমন একগুচ্ছ চিঠি প্রকাশিত হচ্ছে সাহিত্যপাঠকের কাছে যার আকর্ষণ অপরিসীম। এই চিঠিগুলি কবি লিখেছিলেন তাঁর কবিতার একান্ত ভক্ত-পাঠক ও ব্যাখ্যাকার অজিতকুমার চক্রবর্তীকে। 'রবীন্দ্রনাথ' এবং 'কাব্যপরিক্রমা' নামক দুটি বইয়ের জন্য অজিতকুমার বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় আর উজ্জ্বল হয়ে আছেন। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষক রূপে একদা যোগদান করেন। কবি তাঁকে বলেছেন 'আদর্শ শিক্ষক'। এবারের অসামান্য চিঠিগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে ইংলণ্ডের বিগতকালের বিদগ্ধ সমাজের ছবি। অজিতকুমারের পারিবারিক জীবনের সমস্যা সম্পর্কে কবির আগ্রহ, উদ্বেগ, শুভ-পরামর্শ ইত্যাদি। এ-ছাড়া ইংলণ্ডে থাকাকালীন কবির জীবনের নানা ঘটনা, নানাবিধ সাহিত্যিক কর্মব্যস্ততার স্মৃতি।

১৩৭৬ সালের সাহিত্য সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা অজিতকুমার চক্রবর্তীর পত্রাবলী। সেগুলির সংকলক ছিলেন পুলিনবিহারী সেন। এবারের চিঠিপত্র সংকলন করেছেন এবং পত্র-পরিচিতি দিয়েছেন পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

আধুনিক মানুষের জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞান ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে। বিজ্ঞান-সচেতনতাও একান্ত প্রয়োজন আধুনিক মানুষের জীবনে এবং সমাজে। এ-বছর সাহিত্য সংখ্যাটিকে একটি মূল্যবান বিজ্ঞান-সংখ্যা হিসাবে প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিশিষ্ট বাঙালী বিজ্ঞান-সাধকদের কাছে তাঁদের সমকালীন চিন্তার এবং ভাবনার প্রতিফলন আছে এমন কিছু রচনার জন্য দেশ পত্রিকার তরফ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ বছরের সাহিত্য সংখ্যায় সেইসব খ্যাতিমান বিজ্ঞানীদেরই ভাবনার ফসল সংগ্রহ করার কাজ চলছে। যদিও বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনা তবু লেখাগুলি সুলিখিত এবং সুখপাঠ্য, কিন্তু দুর্বোধ্য নয়। যাঁরা এবারের সংখ্যায়আমন্ত্রিত তাঁরা যথাক্রমে :

বাসন্তীদুলাল নাগচৌধুরী
সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় শশাঙ্ক ভট্টাচার্য অসীমা চট্টোপাধ্যায়
শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়
অনাদিনাথ দাঁ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ প্রসাদকুমার দাস
সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র
জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য
মৃণালকুমার দাশগুপ্ত
শ্রীকুমার রায় জয়ন্ত বসু
তারকমোহন দাস
জগদীন্দ্র মণ্ডল দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় নিশীথরঞ্জন কর
এবং আরও অনেকে।

এ-ছাড়াও এই সংখ্যায় সমরজিৎ কর লিখবেন একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বিজ্ঞাননির্ভর কল্পকাহিনী।

এক বছরের বাংলা বইয়ের একটি সুনির্বাচিত গ্রন্থতালিকা এই সংখ্যার আরও একটি বাড়তি আকর্ষণ।

আগাগোড়া অফসেটে ছাপা। বিজ্ঞানীদের প্রতিকৃতি সহ তাঁদের রচনার সঙ্গে নাতিদীর্ঘ পরিচিতি। ২৫শে বৈশাখেই এই সংখ্যাটি প্রকাশিত হবে। দাম—দশ টাকা।

দ্রষ্টব্য : সংখ্যাটি নিশ্চিতে পাবার জন্য পূর্বাহ্ণেই সার্কুলেশন কন্ট্রোলারকে জানিয়ে রাখুন।

॥ তের ॥

[ ৩৩ ]

বালিগঞ্জ
পোস্টমার্ক ২।৪।১৯২২

বিবি,

এখানে গরম দিনের পর দিন যেরকম বেড়ে চলেছে তাতে আশা করা যাচ্ছে যে বাঙলা অতঃপর পাঞ্জাব হয়ে উঠবে। এখন বেলা দশটা, এর মধ্যেই রদ্দুর এতটা চড়েছে যে বাইরে যাওয়া ত দূরের কথা, ঘরের ভিতরই টিঁকে থাকা কঠিন হয়ে উঠেছে। Englishman আশা দিয়েছিল যে ৪৮ ঘন্টার ভিতর গরম কমে যাবে—এখন দেখা যাচ্ছে খবরের কাগজের আর সব কথার মত এ কথাটাও মিথ্যে। ভাগ্যিস পরীক্ষার কাগজ খতম করেছি, নইলে এই দারুণ গ্রীষ্মে কাগজ দেখতে হলে মাথা একেবারেই খারাপ হয়ে যেত। এমনিই যে মাথা খুব ভাল আছে তা নয়। সবুজপত্রের জন্যে লিখিনে কেন জানো। আজ লিখতে বসলে মাথার ভিতর থেকে সেই জিনিষ বেরবে যার দ্বারা শুধু সাহিত্যের খদ্দর বোনা যায়, কেননা—মাথা এখন চরকার মত ঘুরছে। এর ভিতর অবশ্য একটু অত্যুক্তি আছে—কিন্তু আলঙ্কারিকের মতে সেটা দোষের নয়, গুণের। যদি বলতুম যে কলের চরকার মত ঘুরছে তা হলে সেটা আলঙ্কারিক হিসেবেও অমার্জনীয় হত। কলের চরকা এক সেকেন্ডে ১৮০ বার পাক খায়—সুতরাং ও উপমাটি লাগালে প্রকারান্তরে স্বীকার করা হয় যে আমার মাথার সবগুলো স্ক্রুপ ঢিলে হয়ে গেছে। তা যে হয়নি তার প্রমাণ ঐ স্ক্রুপের দোহাই দিয়ে আমার মোটরের একটা ফাঁড়া কাটিয়ে নিয়েছি। মেজদা বামড়া যাবার জন্য আমার গাড়ী চেয়েছিলেন—যুগপৎ ডাক ও তার যোগে। তার উত্তর গেল এই যে আমার গাড়ীর স্ক্রুপ ঢিলে। এখন প্রকাশ তার রথ নিয়ে বামড়া যাচ্ছে।

আমার কলেজ ৭ই হয়ে বন্ধ হবে। তোমরা যদি তার মধ্যে এসো ত অমির সঙ্গে দ্বার্জিলিং যাই। এবার ইস্টারের বারো দিন ছুটি আছে—তাই পারলে আগুনের কাছ থেকে পালিয়ে, বরফের কাছে যাই। তবে তুমি রাঁচিতে থাকলে সেখানেই যাব, যদিচ সম্ভবত রাঁচির তাত কলকাতার চাইতে বেশি। আমি Salamanderএর বংশধর নই। এইটেই হয়েছে এদেশে জন্মাবার মুস্কিল। সে যাই হোক, গরমে বোধ হয় লেখকের হাতের খিল খুলে গিয়েছে। বোলপুর থেকে অমিয় লিখছে যে আমার হালের চিঠি সব সাহিত্য। এর পর চিঠি লেখা বন্ধ করতে হবে, শেষটা কি Madam de Sevigne হয়ে উঠবো? এরকম হচ্ছে কেন জানো? কাজের কথা কিছু বলবার নেই—তাই দেদার বাজে কথা বকছি—আর বাজে কথা গুছিয়ে বললেই তা কাব্য হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে আমার একটা বক্তৃতা করবার ইচ্ছে আছে। কোথায় সে প্রবন্ধটি পড়ব তাই ঠিক করতে পারছি নে। তিনটি জায়গা আছে যেখানে এ বক্তৃতা চলবে—প্রথম শান্তিনিকেতন, ২য় Theosophical Hall, ৩য় Art Society। এখন মুস্কিল হয়েছে এই যে এর একটিকে ছেড়ে আর একটিকে ধরতে পারিনে। ধর যদি Art Societyতে বক্তৃতা করি তা হলে সে বক্তৃতা না শুনে theosophistsরা মনে করতে পারে যে "মাদাম মানজিআনি" আমার চেয়ে বেশি বাজে বকতে পারে। অপর পক্ষে যদি Theosophical Hallয়ে বক্তৃতা করি তা হলে আর্টিষ্টরা মনে করতে পারে যে "ম্যাণ্ডলিন-গ্রাম-রিণ" এ বিষয়ে আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আমার ইচ্ছে এই দুটি পাখীকেই এক বাণে মারি—নইলে আমার আর মান থাকে না। ভাল কথা, যে স্ত্রীলোক জন্মেছে রাশিয়ানের ঘরে আর বিয়ে করেছে ফরাসিকে—সে রাশিয়ান ফরাসীর মধ্যে না হয়ে পারীস ও জারীনার সমান হল কেন? দেখতে পাচ্ছ বড় বড় সমস্যা নিয়ে এখন মাথা ঘোরাচ্ছি। আর সকালটা একটু ফাঁক পেয়েছি তাই কাগজের উপর কলম দৌড়দৌড় করছে। তবে এখন তার রাশ টানা দরকার। আজ থেকে দুখানি চিঠির মাশুল ডবল দিতে হবে। আর বেশি কাগজ খরচ করলে তদনুরূপ টিকিটও খরচ করতে হবে।

এইমাত্র তোমার চিঠি এল। এখানে তোমার যাবার থাকার কোনই অসুবিধে হবে না। কালই ত লিখেছি যে শুরমারা হয়ত জলপাইগুড়ি যাবে। মেটো দ্বার্জিলিং। নুরুদ বলছে—সেও বহুকাল কলকাতা থেকে বেরয়নি, তারও একটা change বিশেষ দরকার—সুতরাং ধরে নিতে পারো সেও অমির সঙ্গে দ্বার্জিলিং যাবে। সকলেরও একটা Change বিশেষ দরকার, শুধু দরকার নেই তোমার আর আমার। কাজেই যেরকম কথাবার্তা শুনছি—অবশ্য কানাঘুষোয়—তাও মনে হচ্ছে ইস্টারের ছুটিতে বাড়ী এক রকম খালি হয়ে যাবে। ও বাড়ীতে নলিনী ও মা থাকবেন, কেননা তাঁদের কোনও Changeএর দরকার নেই, আর এ বাড়ীতে তুমি আর আমি, আর বুবু একসঙ্গে দু বাড়ীতেই থাকবে। এখন বুঝলে ত! তোমার চিঠির শেষ খবরটা শুনে অবাক হয়েছি বললেও মিথ্যে কথা বলা হয়, আর হইনে বললেও মিথ্যে কথা বলা হয়। অবস্থা যেরকম দাঁড়াচ্ছে তাতে এইমাত্র বলা যায় যে, তোমার "আত্মীয়স্বজনদের সব হয়, অর্থাৎ বিয়ে না হইতে সম্বন্ধ যাওয়াও হয়।" যাক ও কথা। রাঁচি দেখছি অবশেষে রানীগঞ্জ হয়ে উঠল। আমার জানত ব্রাহ্মণ সিংহ এক সুষঙ্গেই আছে, ব্রাহ্মণ রায় আছে অবশ্য বারেন্দ্রের দলে—রাজশাহীতে। কিন্তু রংপুরেও যে ও জাত আছে তা জানতুম না। বলিহারের হালরানীর সঙ্গে আমাদের অনেক রকম সম্পর্ক আছে। প্রথমত, ওর বাবা চৌগাছির রাজা সুশীলের মাসতুতো ভাই—তারপর মেয়েটি শ্রীনাথ দাদার ছোট বোয়ের বোনঝি। এ বিয়ের প্রথম ঘটকালি আমিই করি। মেয়ের চোখ কটা বলে বলিহারদের তরফ থেকে প্রথম আপত্তি। তারপর আমি বারেন্দ্রের মধ্যে ঐ কটা চোখের অনেক নজির দেখিয়ে সে আপত্তি কাটিয়ে দেই। অবশ্য এ ক্ষেত্রে "রূপেশ্ব খুণ্ড রূপোর কাটে।

তোমাদের ওখানে যেরকম সরগরম এখানেও তাই—শুধু তার "সর" বাদ দিয়ে। নিতান্ত কাজে বাধ্য না হলে আজকাল আর কেউ ঘর থেকে বেরয় না। আমি কাল সবে প্রথম—৪॥টা বেরই ল কলেজে যাবার জন্য। আজ বাড়ীতেই থাকব। তবে যদি দেখি যে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত কেউ এলো না তা হলে একবার বেরিয়ে পড়ব। আর কেউ যে এ গরমে এত দূর আসবে, সে বিষয়েও আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। কালীবাবু আজ তিন দিন থেকে দুপুরে আসছে না, সুতরাং সমস্ত দিনটা একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকতে হয়। তবে বই আছে, তাই নিয়ে সময় কাটিয়ে দিই। এখানকার খবর সব ভাল। সকালে দেখলুম এ পাড়ার চৌধুরীদের সব ছেলেমেয়ে পুকুরধারে হুটোপাটি করছে—সুরমা থেকে সুরু করে পুষু পর্যন্ত সবাই ছিল—তারপর এখন সব চুপচাপ। লিখতে লিখতে দেখো কত বড় চিঠি লিখে ফেললুম। এর পর ভরসা হয়েছে প্রবন্ধও লিখতে পারব। কাল থেকে সবুজপত্রের জন্য লেখা সুরু করব—এলা বেলা স্টেলা প্রভৃতি পঞ্চকন্যা স্মরণ করে। আমি ভাল আছি—এই লম্বা চিঠিই তার প্রমাণ। ইতি

তোমার বাবু।

Srimatee
Indira Debi
C/o S. N. Tagore Esqr
Morabadi Ranchi

[ ৩৪ ]

ঐ

বালিগঞ্জ
৬।৪।২২

বিবি,

কাল সকালে যে চিঠি লিখেছি আর বিকেলে যা পেয়েছি, সে দুটির ভিতর একটি বিশেষ মিল আছে। ইকনমিকস যে জীবনের গোড়ার কথা এ আমারও মত, দেখছি তোমারও মত। তবে যে লোকে এতে এত আপত্তি করে তার কারণ—মানুষে প্রায়ই ভুলে যায় যে এ সত্যটা মানবজীবনের একটা নীচ সত্য। সব জিনিষেরই গোড়া যে তার নীচে থাকে সে ত সবাই জানে। এই নীচের সত্যের উপরেই অবশ্য সব উপরের সত্য প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তাই বলে উপরের জিনিষকে বাদ দিলে মানবজীবনের কোনই সার্থকতা থাকে না—মানুষ পশুর সামিল হয়ে যায়। যাঁরা ইকনমিকসকে অস্বীকার করে morality প্রচার করেন, আর যাঁরা morality অস্বীকার করে ইকনমিকস প্রচার করেন, এঁরা দুজনে যে যমজ ভ্রাতা Benedetto Croce এ সত্য

পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছে। ঘোর Spiritualism যে ঘোর materialism-এর সদর পিঠ—আজকালকার দার্শনিকদের কাছে সেটা ধরা পড়েছে। আজকালকার দর্শনশাস্ত্র এই দুইকেই এক কোঠায় ফেলে, একটিকে বলে utilitarianism, আর একটিকে বলে Theological utilitarianism। এমন কথা শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে। যাক, এ সব তত্ত্ব বিচার করবার কোনই আবশ্যক নেই, কেননা পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকের স্বার্থ ও পরার্থ জ্ঞান দুই আছে, তা যদি না থাকত তা হলে সমাজ টিঁকে থাকা দূরে থাক—কখন জন্মাতেই পারত না। আমরা সবাই যদি শ্বেতাম্বর চোর কিম্বা "দিগম্বর" সাধু হতুম তা হলে সমাজের অবস্থা কি হত ভেবে দেখ। সত্য কথা এই যে শ্বেতাম্বর হলেই চোর হতে হয় না, আর সাধু হতে হলেই দিগম্বর হতে হয় না। মানুষের কাজ চলছে আত্মার ঐ দুই শক্তির মিলনে ও সংঘর্ষে, শুধু কথার রূপে ঐ দুইকে আলাদা করে নিয়ে আমরা, হয় ইকনমিকসের পেটের ভিতর থেকে morals বার করি, নয় morals এর মুখের ভিতর থেকে morals বার করি। এ যুগে দেখতে পাওয়া যায় যে ইউরোপে যারা মানুষের মত মানুষ তারা প্রায়ই morals এর উপর এক হাত নিতে ছাড়ে না। এর কারণ নয় যে তারা morals এর বিরোধী, এর কারণ এই যে অধিকাংশ লোকের মুখে ও নাম হচ্ছে ভূতের মুখে রাম নাম। থেকে থেকে morality প্রচার করে তখন তারা এই বলে যে—"তোমরা সকলে ভাল হও ও আমার ভাল হোক"। বক্তৃতা করবার ফুরসত পেলে আমি ছাড়ি নে—তাই এক পাতা ধরে বকলুম।

আমার কিন্তু ক্রমে প্রধান সমস্যা হয়েছে ইকনমিকস সমস্যা। অবস্থা যা তা আগেই জানিয়েছি। নতুন বাড়ী করার দেখছি অনেক লেঠা আছে। কাল চব্বিশ পরগনার কালেকটর সাহেব বাহাদুরের কাছ থেকে এক তোমার ও আমার নামে এক জরুরী সমন এসে উপস্থিত। আমরা যদি ১৮ই এপ্রিলের পূর্বে পূর্ব মালিকের নাম বদলে আমাদের নামে এই জমিটে না রেজিস্টারি করিয়ে নিই তা হলে আমাদের জরিমানা হবে। নামজারি করতে অবশ্য আমরা সম্পূর্ণ রাজী। সুরেন একটা জমিতে তার নিজের নামজারি করে নেয়নি বলে তাকে চারু হ্যাজাররা কি ভোগটাই ভুগিয়েছিল তা ত জানো! তবে অত তাড়াহুড়ি নামজারি করার মুস্কিল হয়েছে এই যে দরখাস্ত ও ওকালতনামায় তোমাকেও সই করতে হবে। দেখি কত দূর কি হয়ে ওঠে। তুমি যদি সকাল সকাল ফিরে এসো ত কোন কথাই নেই—নইলে অনেক ভজঘটের ভিতর পড়ে যেতে হবে।

এইমাত্র টেলিফোনে খবর নিলুম, সুরেনরা ফিরে এসেছে। সুরেন মনীকে বলেছে যে সে আজ বিকেলে হয় আমার এখানে আসবে, নয় আমাকে টেলিফোন করবে। তোমার কালকের চিঠি পড়ে আমার মনে হচ্ছে যে তুমি যা বলেছ তাই ঠিক। তোমার বাবাকে এখানে নিয়ে এলে তাঁর সমস্ত ঝুঁকি অবশ্য আমাদেরই নিতে হবে। আমার ত স্বভাব জানই, আত্মীয়স্বজনের কারও বিপদের কথা শুনলে প্রথমেই মনে হয়...আমরা যা পারি তার জন্য ত করি। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরে দেখা যায় যে তার জন্য সব করার শক্তি আমাদের নেই। মিস্টার ঠাকুরের সুরেনের কাছে থাকাই ভাল। বিশেষত আমাদের বর্তমান আর্থিক অবস্থায়। তা ছাড়া চিকিৎসা সম্বন্ধেও আমার মতের সঙ্গে সুরেনদের মতের মিল হয় না। "বায়োকেমি", "আনকেমি", প্রভৃতির রহস্য আমার কাছে অদ্যাবধি রহস্যই রয়ে গেছে। ছেলেবেলা থেকেই আমার মন জ্ঞানরাজ্যের অন্ধকার গলিঘুঁচিতে যেতে নারাজ। একটা মাতাল একটা চোরাগলিতে ঢুকে শেষটা যখন দেখলে যে সে আর এগুতে পারে না তখন মনের দুঃখে বলেছিল যে "বাবা গলি, তুমিও নিরেট হয়ে গেলে?" শেষটা ঐ কথার আর না পুনরাবৃত্তি করতে হয় এই ভয়েই আমি জ্ঞানের রাজপথ ছাড়তে চাইনে, সে পথের প্রধান গুণ এই যে যুগ যুগের লোকের গায়ে পায়ে তা গড়ে উঠেছে—উপরন্তু সেখানে আকাশের আলো হাওয়া অবাধভাবে চলাফেরা করছে। ছেলেবেলায় কৃষ্ণনগরে একটি মুসলমান আমাকে বলেছিল যে সে পৃথিবীর সবরকম অসাধ্যসাধন করতে পারে—একমাত্র "বুজরুকি তেলেসামের" সাহায্যে। তাই শুনে অবধি আমার ধারণা হয়েছে যে "তেলেসাম" মাত্রই "বুজরুকি"। তেলেসাম বোধ হয় talisman—আর "বুজরুক" মানে জ্ঞানী।

এইমাত্র বৌ টেলিফোন করলে। সুরেন কবে যাবে তার আজও ঠিক নেই। সম্ভবত চার পাঁচ দিন পরে। এঁদের দেখছি ছোটখাটো জিনিষ নিয়ে ব্যস্ত হওয়া যেমন স্বাভাবিক—বড় জিনিষ নিয়ে ব্যস্ত না হওয়াটাও তেমনি স্বাভাবিক। সে যাই হোক, ফলে দাঁড়াল এই যে তোমার ঘরে ফেরাটা আরও পিছিয়ে গেল আর সেই সঙ্গে আমার Solitary Confinement এর মেয়াদও বেড়ে গেল। সুরেন বিকেলে এখানে আর আসছে না। তারা তোমার বাবার খবর কিছু দিন পায়নি, তাই জানবার জন্য আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিল। যখন কানে কানে কথা হয়ে গেল তখন চোখে চোখে দেখা করবার আর কোনও প্রয়োজন নেই। বৌরা সব ভাল আছে, শুধু খোকা ও মিহিরের জ্বর এখনও আছে। একেই বলে change। হাওয়া বদলালে এক দিকে যেমন অসুস্থ শরীর সুস্থ হয়—অপর দিকে তেমনি সুস্থ শরীর অসুস্থ হয়। ছেলেদের গাছপোঁতা কখনো লক্ষ করে দেখেছ—তারা নিত্য তার ঠাঁই বদলায়। এ অভ্যেস এখন দেখছি বড় হলেও অনেকের যায় না।

এখন এখানকার দুটো একটা খবর দেওয়া যাক। কিরণশঙ্কর কাল বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তার মুরগে-বসন্তের দাগ এখনও মিলিয়ে যায়নি। তার মুখে শুনলুম আমি চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে জেলে দেখা করতে যাওয়ায় চিত্ত ভারি খুসি হয়েছে আর কিরণের কাছে দুঃখ করে বলেছে যে আমি ছাড়া তার অপর কোনও বন্ধু তার মোটেই খোঁজ নেয়নি। আর একটা মজার কথা শুনলুম। চিত্ত নাকি বলেছে যে আমার এক brain ছাড়া আর কিছু নেই।—আর সে brainও নাকি monstrously developed—এতে দুঃখ করবার কিছু নেই। কিরণ বললে যে সে জেলে পরিচয় পেয়েছে যে আমার উপর চিত্তর নাকি যথেষ্ট respect আছে। যদিচ আমাদে[র] দুজনের মতের মিল হয় না। আমি কিরণকে meet করবার জন্য আসছে[ ] শনিবারে সবুজদলকে আসতে বলব। কিরণ গান শুনতে চায়। এখন দ[ু] দিনে গাইয়ে জোগাড় করি কোত্থেকে। শেষটা নিজেই তম্বুরা নিয়ে ব[সে] যাব। কলকাতায় গরম গরমতর হচ্ছে। থার্মোমিটার এখন এক শ'র নীচে কথাই কয় না। তার উপরও পাঁচ ছয় সাত হাঁকে। কালীবাবু কাল দিনে আমার কাছেই ছিল। দিব্যি ঠান্ডা হয়ে থাকে, কোনও উৎপাত করেনি। পড়ে গল্প শোনে, ঘুমোয় আর বিকেল পাঁচটায় বাড়ী ফিরে যায়। বাদবাকী স[ব] যেমন চলে, তেমনি চলছে—খালি দিন চলছে না একমাত্র এই পত্রলেখকের। সেদিন একটা মাসিক পত্রিকায় দেখলুম "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে"—এখন বুঝ[লে] আমি গৃহস্থ হয়েও কেন গৃহহীন। ইতি

বা[ ]

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী
C/o S. N. Tagore Esqr
Morabadi
Ranchi



পোস্ট মার্ক ৭।৪।১৯[ ]

যাক ওসব কথা। কালীবাবুকে আমি পড়াচ্ছি আর গল্প শোনাচ্ছি[ ]

সে এখানিক নেহাত ভালমানুষ হয়েছে, কোনও গোলমাল করে না আর সমস্ত দিনই আমার কাছে থাকে। English Fairy Tales টা দেখছি নেহাত খেলো বই। Maurice Boncher বলেছে যে এসিয়ার রূপকথার ভিতর moral-sense নেই একমাত্র বৌদ্ধগল্প ছাড়া। কথাটা আমাদের শুনতে যতই খারাপ লাগুক, কথাটা কিন্তু সত্য। Grimms-এর গল্পের সঙ্গে এদেশের গল্পের তুলনা করলেই দুয়ের moral তফাতটা ধরা পড়ে। এখন দেখছি English Fairy Tales moral হিসেবে খুব উঁচু দরের গল্প নয়, তারপর যথেষ্ট brutal। সেই গাধা, টেবিল ও লাঠির গল্পটা মনে করে দেখো না কেন! টম যখন বাড়ী ফিরে এল তখন সে প্রথম কাজ করলে, গাঁয়ের মেয়েগুলোকে বিয়ে করব বলে ডেকে এনে তার লাঠি দিয়ে বেজায় প্রহার দিলে। মেয়েগুলোর কি অপরাধ যে এই শাস্তি হল তা ত বুঝতে পারলুম না। তারপর মার খেয়ে মেয়েগুলো যখন মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল তখন Tom তাদের আঁচল থেকে টাকাকড়ি সব চুরি করে নিয়ে যে মেয়েটাকে বিয়ে করবে তাকে দিলে। এর বীরত্বটাই বা কোথায় আর মনুষ্যত্বটাই বা কোথায়। তা ছাড়া প্রায় প্রতি গল্পেই দেখছি রাক্ষসরা শুধু ছোট ছেলে ধরে রেঁধে খাচ্ছে আর নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। এর বাইরে দেখছি ইংরেজদের আর কল্পনা খেলে না। কাল Mally Whupple-এর গল্প পড়ে কালীবাবুকে শোনাচ্ছিলুম। সে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করেছিল।

মলির বাপ-মা ছিল গরিব আর তাদের ছেলেমেয়ে ছিল ঢের। শেষটা খেতে না দিতে পেরে তারা ছোট তিনটিকে জঙ্গলে ফেলে এল। এই পর্যন্ত শুনে কালীবাবু জিজ্ঞেস করলে বড়দের বনে না দিয়ে ছোটদের দিলে কেন? আমি তার উত্তর করতে পারলুম না। শেষটা কালীপ্রসাদ বললে যে বাপ-মারা বুঝি ছোটদের চাইতে বড় ছেলেমেয়েদের বেশি ভালবাসে। আমি বল্লুম, না, সকলকেই সমান ভালবাসে। এর পর সে অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকলে —বেশ স্পষ্ট মুষড়ে গেল। আমি তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে অন্য কথা পাড়লুম। কিন্তু দেখলুম গল্পের ঐ কথাটা তার মনে লেগেছে। ছোট ছেলের মনে একটা কথা অনেকক্ষণ থাকে না—তাই পরে এটা সে ভুলে গেল।

আমি এই গল্প ক্লাবে কচ্ছিলুম, তাতে মৃগেন মিত্র বললে, দেখেছ ছোট ছেলে instinctively কেমন সত্যটা ধরে। আমি বললুম, তুমি বাপের মত কথা কচ্ছ—মা হলে অমন কথা বলতে না। তাতে সে চুপ করে গেল। ভাল কথা—ও গল্পের ঐ তিনটিই ছিল মেয়ে—এই কথা শুনে কালীবাবু নিশ্চিন্ত হল। বুঝলে যে বাপ-মার ভালবাসা তার জন্য ঠিক মজুত আছে। সুরেন ত রাঁচি যাবার কথা কিছু বলে না। আজ সকালে আমার এখানে আসবার কথা ছিল তাও ত এল না—টেলিফোনও করলে না। সুতরাং তোমাদের কলকাতা আসা কবে ঘটবে জানিনে। ইস্টারের ছুটি ১২ই সুরু হবে।

শুনেছি সুহৃদ সঞ্জীব ও বেটো দাদার সঙ্গে পুরি যাবে। তাদের change-এর দরকার। আমি কোথাও যাব না। না দার্জিলিং, না চট্টগ্রাম। তুমি যদি ইতিমধ্যে না ফেরো ত অগত্যা রাঁচিই যেতে হবে—তবে সে change-য়ে আমার শরীর যে খুব চাঙ্গা হবে এমন আশা করিনে। Hot fomentation-য়ে আমার কোনও উপকার হয় না। তবে এই ছুটিতে এখানে একা বসে থাকাও যে খুব সুখের হবে তা নয়। এরা সব চলে গেলে ও বাড়ীতে থাকবেন মা আর নলিনী- আর এ বাড়ীতে একা আমি। বাঙলায় যাকে বলে "আকণ্ঠবন্ধেয়" পড়া, আমার হয়েছে তাই। দেখা যাক সুরেনরা কলকাতা থেকে নড়েন কিনা, তারপর যা হয় তা ঠিক করব।

আজ আমার কলেজ আছে। দুপুরে পড়া তয়ের করতে হবে। এখন বেলা কটা জানিনে—কেননা ঘরে ঘড়ি নেই—তবে রোদ দেখে যদি অনুমান করতে হয় ত বলব—সাড়ে এগারটা। বোধ হয় দিন অন্তঃপ্রবৃদ্ধ হয়নি। এখানকার খুঁটিনাটি কথা যে লিখিনে, তার কারণ সে সব কথা pleasant হবে না। দিবারাত্র একটা অভাব-অভিযোগের atmosphere-য়ে থাকাটা আমার nerve-এর পক্ষে ভাল নয়। দাদা কি করলেন, অমি কি বললে, কে কোথায় চললে—এইসব নিয়েই অবশ্য আমাদের দৈনিক জীবন—কিন্তু প্রতি কথা, প্রতি ঘটনা যদি অপ্রীতিকর হয় তা হলে টেঁকা মুস্কিল। ভাগ্যিস ভগবান আমাকে অন্য interest দিয়েছিলেন, তবেই এইসব ক্ষুদ্রতার ভিতরও নির্লিপ্ত হয়ে থাকতে পারি—আর তা পারি বলেই ওসবকে উপেক্ষা করতে পারি। আমরা এক দল আছি—যারা মানুষ মানুষ spirit spirit করেই অস্থির হই—কিন্তু spirit জিনিষটে মানুষের ভিতর এতই চাপা পড়ে যাচ্ছে যে তার দোহাই দেওয়া আর চলে না—অথচ ও দোহাই না দিলেও এই জড়-বিশ্বে আত্মার দাঁড়াবার স্থান থাকে না। আমি হতাশ হয়ে Shelly পড়ছি। Adonais যদি কবিতার চরমে না উঠে থাকে ত আমি জানিনে আর কোন কবিতা তার উপরে উঠেছে। Hellas পড়েছি—তার lyric-গুলোর তুলনা বোধ হয় কোন ভাষাতেই নেই। Shelly পড়তে হলে মনের তার বিশ্বের সুরে বাঁধতে হয়—তা যে না পারে তার পক্ষে ওসব শব্দাড়ম্বর মাত্র। আরম্ভ করেছিলুম শিক্ষা দিয়ে, শেষ করলুম সাহিত্যে, কেননা দেখছি—এক সাহিত্য ছাড়া আর কিছুতেই শিক্ষা নেই—অপর পক্ষে যার শিক্ষা নেই তার কাছে সাহিত্যও নেই। আজ এই তক্। বাবু।

**শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী**
**C/o S. N. Tagore Esq.**
**Morabadi**
**Ranchi**

---

## পত্র পরিচিত

**পত্রসংখ্যা ৩৩ ॥**

Madam de Sevigne : Marie de Rabutin-Chantal (১৬২৬—৯৬) ফরাসী পত্রলেখিকা। সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলার আত্মীয় বন্ধুদের কাছে লেখা ১৫০০ খানির মতো চিঠিতে ফরাসী সমাজ ও পারিবারিক জীবনের উৎকৃষ্ট ধারাবিবরণীর মতো ছবি পাওয়া যায়। কিন্তু চিঠিগুলি লিখনশৈলীর দিক থেকে বিশেষ উঁচু মানের নয়।

অমি : দুর্গাদাস চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র অমিয়নাথ। স্বনামধন্য ব্যারিস্টার। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা প্রমীলা দেবীকে বিবাহ করেন।

তোমার বাবা : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুরমা : সুহৃদ্‌নাথ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা।

সুহৃদ্ : সুহৃদ্‌নাথ চৌধুরী—দুর্গাদাস চৌধুরীর ষষ্ঠ পুত্র। বিলেত থেকে ডাক্তারি পাস করে আসেন। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধে ডাক্তার হিসাবে যোগ দেন। বিবাহ করেন মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের কন্যা নলিনী দেবীকে।

সঞ্জীব : সুহৃদ্‌নাথ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

নলিনী : দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। সুহৃদ্‌নাথ চৌধুরীর স্ত্রী।

মা : জ্ঞানদানন্দিনী দেবী।

বুবু : পূর্ণিমা ঠাকুর। সুহৃদ্‌নাথ চৌধুরীর কন্যা। সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী।

কালীবাবু : প্রমথ চৌধুরীর ভ্রাতা কুমুদনাথ চৌধুরীর পুত্র কালীপ্রসাদ চৌধুরী। ইনি প্রমথ চৌধুরীর পুত্রপ্রতিম স্নেহভাজন ছিলেন। ১৯৪১ সালে ১৭ জুন বিমানযুদ্ধে নিহত হন। কালীপ্রসাদের বয়স যখন আড়াই বছর তখন "ছোটো কালীবাবু" শিরোনামে প্রমথ চৌধুরী একটি Triolet রচনা করেন :

"লোকে বলে আঁকা ছেলে ছোটো কালীবাবু,
অপিচ বয়েস তার আড়াই বছর।
কোঁচা ধরে চলে যবে, সেজে ফুলবাবু,
লোকে বলে বাঁকা ছেলে ছোটো কালীবাবু।
দিনমান বকে যায়, হয় নাকো কাবু,
সুরে গায় তালে নাচে, হাসে চরাচর।
লোকে বলে পাকা ছেলে ছোটো কালীবাবু,
যদিচ বয়েস তার আড়াই বছর।"

১৮ জুন ১৯১৮
বালিগঞ্জ

**পত্রসংখ্যা ৩৪ ॥**

Benedetto Croce : (১৮৬৬—১৯৫২) ইতালীয় দার্শনিক। চার খণ্ডের দর্শনশাস্ত্রের La Filosofia dello spirits গ্রন্থে তার মানবতাবাদী চিন্তাধারার প্রকাশ।

খোকা : সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিহির : মিহিরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কিরণ : কিরণশংকর রায়

চিত্তরঞ্জন : চিত্তরঞ্জন দাশ

**পত্রসংখ্যা ৩৫ ॥** কালীবাবু : পূর্বোক্ত পত্রের কালীপ্রসাদ। প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'গল্প সংগ্রহ' গ্রন্থ কালীপ্রসাদ চৌধুরীকে উৎসর্গ করে লেখেন :

"তোমার বয়স যখন আড়াই বৎসর, তখন
তোমার নামে এই triolet-টি লিখি—"

আর আজ?

"প্রিয়রো হি বিষয়ঃ শুচাম্। তথাপি কিং করোমি।
স্বভাবস্য বেরং কাপুরুষতা বা স্নেহং বা মদেবমাপদং
পুত্রশোকহুতভুজো জাতোঽস্মি!"

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১

তোমার ন-কাকা
প্রমথ চৌধুরী"

বেটো : রাজীব চৌধুরী। সুহৃদ্ চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র।

Adonais, Hellas : শেলীর বিখ্যাত দুই কাব্য। গ্রীক পুরাণের চরিত্র অবলম্বনে লিখিত। Adonais (১৮২১) এলেজিতে শেলী বলেন যে, কীট্‌সের কাব্যের কঠোর সমালোচনার জন্যই তাঁর অকালমৃত্যু হয়েছিল। Hellas কাব্যনাট্য (১৮২২) গ্রীসের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অনুপ্রেরণায় লিখিত।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

গ্লোকীন-ডি
শক্তির মান
মুখখানিতেই বিদ্যমান!
গ্লোকীন-ডি প্রত্যেকের উপযোগী দ্রুত বলদায়ক ও শক্তির পরিপূরক। এটি ক্লান্তি কাটায়, কর্মশক্তি বাড়ায়। গ্লোকীন-ডি গ্লুকোজের সমস্ত সংগুণে বিভূষিত। তার সঙ্গে সঙ্গে এটি অধিক ক্যালসিয়াম, ফসফেট্‌স্‌ ও ভিটামিন-ডি সমৃদ্ধও—আর তার মানেই হ'ল প্রতিটি সময়ে, প্রতিটি ক্ষণে স্ফুর্তি আর শক্তি!
গ্লোকীন-ডি-কে, প্রতিদিনের অভ্যেস ক'রে তুলুন।
গ্লোকীন-ডি
দ্রুত শক্তিদায়ক গ্লুকোজ-ডি
GLOKEEN D
VOLTAS
ULKA-GD-19 BEN
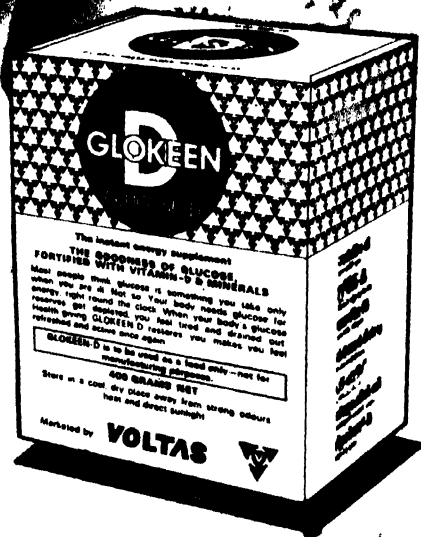
# চরণরেখা তব

## কৃষ্ণা বসু

(৮)

নেতাজীর দ্বিতীয়বার জাপান সফরের সময় অর্থাৎ '৪৩ সালের নভেম্বরে বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া সম্মেলন নিঃসন্দেহে প্রধান ঘটনা। বিশেষভাবে এই কনফারেন্স-এ যোগ দেবার জন্যই তো উনি জাপানে এলেন। এর গুরুত্ব সম্পর্কে উনি খুবই সচেতন ছিলেন। এই আলোচনা বৈঠক থেকেই হয়ত একদিন নূতন এশিয়া জন্ম নেবে—এইরকম একটা স্বপ্ন এঁদের মনে ছিল। হায়াশিদার কাছে শুনেছি টোকিওর পথে নেতাজী আর অন্য এশীয় নেতারাও ফুকুওকাতে যাত্রাবিরতি করেছিলেন। সে সময় এঁদের এক পুরোপুরি জাপানী কায়দায় সরাইখানায় তোলা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ওঁরা জাপানী আচার-ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত হবেন।

এই জাপানী সরাইখানার মালিক ভ্রমণার্থী তার ভিজিটরদের খাতায় সব নেতাদের দিয়ে বাণী লিখিয়ে নিয়েছিলেন। বার্মার প্রধানমন্ত্রী বা ম একটু নাটকীয়ভাবে লিখে দেন—'One blood, one voice, one leader'। নেতাজী কিন্তু ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে যা খুবই বাস্তবসম্মত কথা তাই লেখেন। উনি লিখলেন—

"The world is in the throes of a revolutionary change. Now is the golden opportunity for the peoples of Asia to build a new Asia."

হায়াশিদা বলেন সরাইখানার মালিক খুব গর্ব করেন যে এইসব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁর অতিথি হয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে আমরা বান্দুং সম্মেলনে 'পঞ্চশীল'-এর কথা শুনলাম। এই গ্রেটার ইস্ট এশিয়া কনফারেন্স যে যুক্ত বিবৃতি প্রচার করেছিল তাতেও কিন্তু আমরা পঞ্চশীল-এর দেখা পাই। যে পাঁচটি নীতি গৃহীত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল—

(১) এশিয়ার দেশগুলি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সকল দেশের সমৃদ্ধি ও শান্তির জন্য কাজ করবে।

(২) এই সব দেশ পরস্পরের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না।

(৩) নিজস্ব ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখে এরা এশিয়ার সামগ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধির জন্য কাজ করবে।

(৪) এশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করার জন্য এই সব দেশ ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে কাজ করবে।

(৫) পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে এশিয়ার দেশগুলি অবশ্যই যোগাযোগ রাখবে ও সাংস্কৃতিক বিনিময় করবে। পৃথিবীর কোথাও যাতে জাতি ও বর্ণবৈষম্য না থাকে তার জন্যও এরা সচেষ্ট হবে।

নেতাজী বলেছিলেন আমরা একটা নতুন ধরনের সম্মেলনে মিলিত হয়েছি। কারণ সাধারণত বিভিন্ন দেশ মিলিত হয় কখন? একটা বড় যুদ্ধের শেষে বিজেতা দেশগুলি মিলিত হয় যুদ্ধে জিতে নেওয়া ধনসম্পত্তি ভাগবাঁটোয়ারা করার উদ্দেশ্যে। এই এশীয় সম্মেলনের চরিত্র কিন্তু একেবারে আলাদা।

যে কথা বলছিলাম, এশিয়া সম্মেলন নিশ্চয় নেতাজীর সফরের প্রধান ঘটনা। কিন্তু তার চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ছোটখাট আরো কত বিচিত্র, টুকরো কাহিনী। যত বিভিন্ন মানুষজনের সঙ্গে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছিল ততই নেতাজীর সেই সব দিনগুলির অনেক অজানা দিক আমাদের কাছে ধীরে ধীরে স্পষ্টতর হয়ে ফুটে উঠছিল। যেমন ধরা যাক শিবুসাওয়া পরিবারের সঙ্গে নেতাজীর অন্তরঙ্গতার কথা।

সেবার যে সব এশীয় নেতারা টোকিওতে জড়ো হন তাঁদের এক জায়গায় বা একটা বড় হোটেলে না রেখে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রাখা হয়েছিল। বিশিষ্ট সব জাপানী পরিবার এক একজন বিদেশী নেতাকে তাঁদের পরিবারের অতিথি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে জাপানের পারিবারিক জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় পাবার সুযোগ এঁদের হয়েছিল।

এই জাপানী পরিবারের সঙ্গে থাকার ব্যাপারটা কিন্তু খুবই বিশেষ ঘটনা। কারণ আজো পর্যন্ত জাপানীরা সহজে কোন বিদেশীকে নিজের পরিবারের মধ্যে গ্রহণ করে না। এরা খুবই বন্ধুবৎসল জাতি, বিদেশী বন্ধুকে খুবই দেখাশুনো করবে, খাওয়াবে দাওয়াবে কিন্তু সহজে বাড়িতে নেবে না। যেদিন কোন বিদেশীকে এরা বাড়িতে নিয়ে নিজেদের সঙ্গে খেতে বসাবে সেদিন বুঝতে হবে এরা তাকে একেবারে আপন করে গ্রহণ করেছে। তাই এশীয় নেতাদের জাপানী পরিবারে রাখার এই ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে এদের আন্তরিকতার পরিচয়।

শিবুসাওয়া পরিবারের অতিথি হয়েছিলেন নেতাজী। শিবুসাওয়ারা জাপানের খুব অভিজাত পরিবার। মিঃ শিবুসাওয়া সে সময় জাপানের রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর। জাপানের অর্থনীতিতে শিবুসাওয়া পরিবারের বরাবরই বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

একদিন ইণ্টারন্যাশনাল হাউজের লাউঞ্জে বসে গল্প করছি সকালে মিলে—হায়াশিদা আছেন, ইয়োকোবরি আছেন, হাচিয়া পরিবারের অনেকে এসেছেন—এমন সময় এক জাপানী ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন। দেখি তিনি আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছেন। ইয়োকোবরি উঠে গিয়ে ওঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন।

'তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই ইনি মিঃ শিবুসাওয়া'—শুনে প্রথমে চমকে গিয়েছিলাম। এঁর তো বয়স বেশী মনে হচ্ছে না। অবশ্য জাপানীদের বয়স বোঝা বেশ মুশকিল। তবুও নেতাজী যদি এঁর অতিথি হয়ে থাকেন—। ইয়োকোবরি তখনি বুঝিয়ে দিলেন ইনি শিবুসাওয়া জুনিয়র। এঁর বাবা শাকুরো কো শিবুসাওয়া ছিলেন রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর। এঁদের বাড়িতেই নেতাজী অতিথি হন। শিবুসাওয়া জুনিয়র তখন ছেলেমানুষ। ওঁর ঠাকুর্দাও ছিলেন জাপানী ফিনান্সের ব্যাপারে প্রতিপত্তিশালী। এমন কি এক সময় জাপানের কোন একটি কারেন্সি নোটে ওঁর মুখের ছবি ছাপার প্রস্তাবও উঠেছিল। আর শাকুরো শিবুসাওয়া যুদ্ধের পর জাপানী ক্যাবিনেটে অর্থমন্ত্রী ছিলেন কিছুদিন।

ছোট শিবুসাওয়া বেশ হাসিখুসি, মিশুকে। আমাদের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল।

খাঃ, নেতাজীর কথা মনে নেই? কী যে বলো! সেটা তো আমাদের পরিবারের একটি স্মরণীয় ঘটনা—উনি বললেন।

'একটু হঠাৎ করেই জানতে পারা গেল আজাদ হিন্দ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান নেতাজী চন্দ্র বোস উঠবেন আমাদের বাড়ি। বেশ সাজ সাজ রব পড়ে গেল। আমাদের পরিবারে থাকলেও উনি তো রাষ্ট্রীয় অতিথি। একটুও যেন ত্রুটি না হয় আয়োজনে। কার্পেট, খাট, সোফা অনেক নতুন ফার্নিচার এল। আমার বাবা মা তাঁদের শোবার ঘর ছেড়ে দিলেন অতিথির জন্য। সেই ঘর সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে নেওয়া হল। আমরা ছোটরা খুব উত্তেজিত। সারা বাড়িতেই নানারকম ওলট পালট হল। আমার বয়স বছর ষোলো হবে।

দেখতে দেখতে সেই বিশেষ দিন এসে পড়ল। নেতাজী এসে পৌঁছলেন। বাড়ির কর্তা, গিন্নী ছেলেমেয়ে পরিচারক-পরিচারিকার দল, মায় সিকিউরিটি গার্ড-এর লোকজন পর্যন্ত সকলের হৃদয় তিনি নিমেষে জয় করে নিলেন। যেন কোন যাদুবলে মোহিত করে ফেললেন সকলকে। আমার তো ষোলো বছর, তার পর আমার পরের বোন। আর একটি ছোট বোন ছিল। সে এমনিতে অপরিচিত লোকের কাছে সহজে ঘেঁষতে চাইত না। কিন্তু নেতাজী যতদিন রইলেন নেতাজীর কোলের কাছে বসে থাকত সর্বক্ষণ। নেতাজী গাড়িতে করে বাইরে যাবেন, সেও গাড়িতে চড়ে সঙ্গে যাবে বায়না ধরত।'

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, মিঃ শিবুসাওয়া, আপনি তো চমৎকার ইংরেজি বলেন। জাপানীদের মধ্যে এত ঝরঝরে ইংরেজি বলা সহজে শুনতে পাওয়া যায় না। যাঁরা জানেন তাঁরাও ঠেকে ঠেকে আর অস্পষ্ট উচ্চারণে বলেন।

উনি বললেন, 'ইংরাজি তো প্রথম বলতে শিখি সেই '৪৩ সালের নভেম্বরে। মিঃ হাসানের কাছে হাতেখড়ি। আচ্ছা, কেমন আছেন মিঃ হাসান?'

মিঃ হাসান! তিনি কে? ওহো, আবিদ হাসানের কথা বলছেন উনি, একটু পরে বুঝতে পারলাম।

টোকিওর শিবুসাওয়া পরিবারে অতিথি হলেন নেতাজী

ল্যাভেণ্ডারের সৌরভ। যেমনি সূক্ষ্ম, তেমনি
স্বতন্ত্র। যে-সব সৌরভ সর্বকালের সেরা
বলে গণ্য, তারই একটি।
ল্যাভেণ্ডারও আছে বিবিধ রকমের। তার
মধ্যে সূক্ষ্মতম যেটি, সেটি জন্মায় সৌরভের
পীঠস্থান ফ্রান্সে। নাম তার লাইন্যাক
ল্যাভেণ্ডার। স্পর্শে-গন্ধে ভূমধ্যসাগরের সজল
বাতাসের আমেজ। ফ্রান্স বলতেই যে অভিজাত রুচি
আর প্রাণোচ্ছ্বাসের কথা মনে আসে, তারই সার যেন
এই ল্যাভেণ্ডার।
ফরাসী ল্যাভেণ্ডারের নির্যাস দিয়েই তৈরী এদেশের
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রসাধন সামগ্রী—ল্যাভেণ্ডার ডিউ।
আজও এই ল্যাভেণ্ডার আসে ফ্রান্স থেকে, আর
দরাজ হাতে সেই সুরভি ঢেলে তৈরী হয়
ল্যাভেণ্ডার ডিউ সাবান আর ট্যালক।
নিজেকে আবৃত করুন ল্যাভেণ্ডার
ডিউ-এর সৌরভে। বিশ্বের সেরা
সৌরভের মায়াজালে।
ফরাসী সুরভির
অভিজাত স্পর্শ
ল্যাভেণ্ডার-ডিউ সাবান আর ট্যালক—ভারতের বিলাস প্রসাধন সামগ্রী
ক্যালকেমিকোর সামগ্রী, সেরা জিনিষের সমঝদারদের জন্য
HTC-CCC-4062
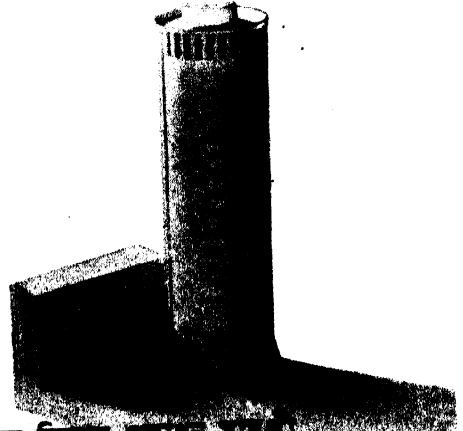
"মিঃ হাসান তো নেতাজীর সেক্রেটারি। উনিও নেতাজীর সঙ্গে আমাদের বাড়িতে ছিলেন। উনি প্রথম ইংরেজি শেখালেন, পরে অবশ্য আমি চর্চা রেখেছি। মিঃ হাসানের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছিল। ওঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছি সব জায়গায়। তখন আমি ইস্কুলের পড়া শেষ করেছি। মিলিটারি একাডেমিতে ভরতি হব তার তোড়জোড় চলছে। আমি নেভিতে ট্রেনিং নেব অনেক দিন থেকে মন স্থির করে রেখেছি। কিন্তু মিঃ হাসান সব গোলমাল করে দিলেন। উনি বললেন, তুমি ইনফ্যানট্রিতে ট্রেনিং নাও। আমার ওপর ওঁর খুব প্রভাব তখন। উনি নিজে তো জার্মানীতে আর্মিতে ট্রেনিং নিয়েছেন। এমন বোঝালেন যে আমি বুঝে গেলাম এবং নেভিতে না গিয়ে আর্মি ট্রেনিং-এ ভরতি হলাম।"

শিবুসাওয়ার বাড়ির এই দিনগুলোতে নেতাজী স্বাভাবিকভাবেই খুব ব্যস্ত থাকতেন। কনফারেন্স-এর কাজ ছাড়াও আরো অনেক কাজ থাকত। হিবিয়া পার্কে সেই বিশাল সমাবেশে ভাষণ দিলেন। রেডিও বক্তৃতা করলেন, সাংবাদিক বৈঠক ডাকলেন। শিবুসাওয়া ছেলেমেয়েরা দেখত ওঁর ব্যস্ত আনাগোনা।

সন্ধ্যাবেলার দিকে কোন-না-কোন রিসেপশন, ডিনার এসব লেগেই থাকত। অবশ্যই পানাহার করা এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। গুরুত্বপূর্ণ ডিপ্লোমেটিক আলোচনা এই সব ডিনার টেবিলে হত। কনফারেনস প্রতিনিধিদের সঙ্গে ছাড়াও জাপানের পররাষ্ট্র দপ্তর, এয়ারফোর্স, নেভির অফিসারবৃন্দ এঁদের সঙ্গে নেতাজীর এই ধরনের আলাদা আলাদা রিসেপশন, ডিনার, বৈঠক ইত্যাদি হয়েছিল। নেতাজীর সব সময় চিন্তা ছিল কীভাবে আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য সব রকম সুযোগ সুবিধা আদায় করে নেওয়া যায়। জাপানী অফিসাররা বলছেন নেতাজী বেশ ভাল 'বারগেন' করতে পারতেন। সে সময় উনি আজাদ হিন্দ ফৌজকে আরো বাড়িয়ে তোলার কথা ভাবছিলেন। জাপান বলছে, তিরিশ হাজারের বেশী সৈন্যকে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া ওদের পক্ষে কষ্টকর। নেতাজী বলছেন, না, পঞ্চাশ হাজার রেগুলার আর্মিতে থাকবে, তা ছাড়া সিভিলিয়ানদের মধ্যে থেকে কুড়ি হাজার থাকবে ভলান্টিয়ার বাহিনীতে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, আই এন এর 'এক্সপ্যানশন' বা বড় করা নিয়ে যখন আলোচনা করছেন তখন উনি নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর কথাও তুলছেন। আমরা তো জানি আজাদ হিন্দ ফৌজের এয়ারফোর্স বা নেভি ছিল না। কিন্তু করতে যে হবে সে বিষয়ে তখনি নেতাজী গুরুত্বপূর্ণ নেগোসিয়েশন করছিলেন। এই সব ডিপ্লোমেটিক ডিনার ও রিসেপশন তাই ছিল নিতান্ত জরুরী।

ইতিমধ্যেই নেতাজী টোকিওর মিলিটারি একাডেমিতে শিক্ষালাভ করতে পাঠিয়ে দিয়েছেন বাছাই করা কিছু ছেলে। তাদের মধ্যে দশজন এয়ারফোর্স ট্রেনিং-এ আছে। পঁয়ত্রিশজন আর্মির ট্রেনিং-এ। এই সব ছেলেরা নেতাজীর প্রাণাধিক প্রিয়। জাপানী ডকুমেন্ট বলছে, নেতাজী ছিলেন ওদের কাছে 'লাইক এ মাদার' মায়ের মত।

নানা কাজের ফাঁকে ফাঁকে অনেকে দেখা করতে আসতেন নেতাজীর সঙ্গে। কত লোকে আনতেন কত রকম উপহার। শিবুসাওয়ার বাড়িতে উপহার স্তূপ হতে লাগল। নানা রকম উপহারের মধ্যে একটি ছিল তরবারি। এক দিকে নাম খোদাই করা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, অন্য দিকে কাঠের বাক্সে লেখা 'দুষ্টের দমন করো, শিষ্টের পালন করো।' এই কথাগুলো জাপানী ভাষায় লেখা 'হাজা কেনশো'। হাতের লেখা জাপানের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা মিতসুরু তোয়ামার। জাপান-ভারত বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে তোয়ামা এই তরবারি আনুষ্ঠানিকভাবে উপহার দিয়েছিলেন। ফুকুওকার দুই কারুশিল্পী এই তরবারি বানিয়েছিলেন। শুনেছি সব চাইতে ভাল তরবারি নাকি বানানো হয় ফুকুওকাতে।

**ডিপ্লোমেটিক ডিনারে ভাষণ দিচ্ছেন নেতাজী (টোকিও ১৯৪৩)**

দুই শিল্পীর নামও লেখা আছে। আরো লেখা আছে ফুকুওকার শিচিহেই ইসোনো এটি দিলেন। যোদ্ধার তরবারিকে জাপানীরা বিশেষ সম্মানের চোখে দেখে।

দেখতে দেখতে নেতাজীর বিদায়ের দিন এসে পড়ল। শিবুসাওয়া পরিবারের সকলকে ডেকে নেতাজী বিদায় চাইলেন। ওঁর যা কিছু উপহার-সামগ্রী বিশেষ করে এই তরবারি নেতাজী বললেন শিবুসাওয়া পরিবারের কাছেই থাকবে। নেতাজী বললেন, 'আমি আবার আসব। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে আমি আবার তোমাদের কাছে আসব, তখন আমি এই সব গ্রহণ করতে পারব। ততদিন এ সব তোমাদের কাছেই থাকবে।' শিবুসাওয়ার বাড়ির সকলে নেতাজীকে বিদায় জানাতে গিয়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। উনি ওঁদের একান্ত আপনজন হয়ে পড়েছিলেন। যাবার আগের দিন নেতাজী নিজের একটি ছবিতে সই করে বাড়ির কাউকে কাউকে দিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু উনি কাকে ফেলে কাকে দেবেন। ছোট শিবুসাওয়া গল্প করলেন ওদের বাড়ির রাঁধুনী, বেয়ারা, মালি, যে যেখানে আছে সবাই চায় ওঁর একটা ছবি। সিকিউরিটি গার্ডদের লাইন পড়ে গেল, তাদেরও একই দাবি। অনেক ভি আই পিকে তো ওরা দেখাশুনো করেছে কিন্তু এ রকম চমৎকার মানুষ ওরা আর দেখেনি। শিবুসাওয়ার মনে আছে আরো অনেক ছবি আনাতে হলো আর চলে আসার আগের রাতে ল্যাম্প জ্বালিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত বসে নেতাজী কেবলই ছবিতে সই করে চললেন।

'দেশ স্বাধীন হলে আবার আসব' বলেছিলেন নেতাজী। তখনি নিয়ে যাবেন তরবারি ও অন্যান্য উপহার। সে সুযোগ তো আর হল না। এদিকে জাপানের পরাজয়ের পর সারা দেশে একটা বিপর্যয়ের ছায়া নেমে এল, শিবুসাওয়া পরিবারও বাদ গেলেন না। কে কোথায় ছিটকে পড়ল, কোথায় চলে গেল নেতাজীর ফেলে আসা সব জিনিস।

প্রায় কুড়ি বছর পর একদিন এক জাপানী হঠাৎ দেখতে পেলেন টোকিওর এক কিউরিওর দোকানে এক তরবারি। তার গায়ে লেখা জাপানী ভাষায়—হিজ একসেলেন্সি সুভাষচন্দ্র বোস। তখনি তিনি জাপানের ওয়ার ভেটেরান বা যুদ্ধ-ফেরত অফিসারদের খবর দিলেন। খবর পেয়ে এসে হাজির হলেন প্রবীণ জাপানী অফিসাররা। যোদ্ধার তরবারি ওঁদের কাছে পরম শ্রদ্ধার জিনিস। একে তো হেলাফেলা করা যায় না। অফিসাররা নিজেরা পরামর্শ করে দোকান থেকে প্রথমে সেই তরবারি সংগ্রহ করলেন। ওঁরা অনেকেই এই তরবারির কথা জানতেন। অনেক সময় ভেবেছেন গেল কোথায় সেটা। তরবারি উদ্ধার করার পর ওঁরা জাপানে ভারতের তখনকার রাষ্ট্রদূত বদরুদ্দিন তায়েবজীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন ও দূতাবাসের মাধ্যমে নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোকে খবর দেন।

এর পর জেনারেল ফুজিয়ারা টোকিও থেকে কলকাতা নিয়ে এলেন সেই তরবারি। নেতাজী ভবনে তরবারি অনুষ্ঠান নামে এক অভূতপূর্ব উৎসব হল। কয়েক হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিলেন সেদিন। তখনকার মুখ্যমন্ত্রী, গভর্নর, বেঙ্গল এরিয়া কম্যানডার সকলের উপস্থিতিতে জেনারেল ফুজিয়ারা ফিরিয়ে দিলেন নেতাজীর তরবারি। মিলিটারি ব্যানডে এক দিকে তখন মার্চিং টিউন বাজছিল অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথের গান 'বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও' গাইছিল ছেলেমেয়ের দল। কিছুকাল পরে দিল্লীর লাল কেল্লায় ভারতের রাষ্ট্রপতি আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মান জানিয়েছিলেন এই তরবারিকে।

টোকিও থেকে সেবার নেতাজী কিন্তু সোজা সিঙ্গাপুরে ফিরে যাননি। উনি চীন সফরে গেলেন। এশিয়া সম্মেলনের সময় চীনের প্রধানমন্ত্রী নেতাজীর সঙ্গে আলাপ করে বিশেষভাবে মুগ্ধ হন। নানকিং সরকারের পক্ষ থেকে উনি নেতাজীকে চীনে আমন্ত্রণ জানান। ওঁর নিজের দল থেকে উনি প্রচারমন্ত্রীকে আগে থাকতে নানকিং পাঠিয়ে দিলেন। কারণ, নেতাজীর অভ্যর্থনার প্রস্তুতি প্রয়োজন।

নেতাজীর এই চীন সফর নানা কারণে বিশেষ কৌতূহলজনক। কলকাতায় থাকার সময় ১৯৩৯-এ উনি একবার চীন যাবার আয়োজন করেছিলেন কিন্তু যেতে পারেননি। ব্রিটিশ সরকার ওঁকে চীন যাবার অনুমতি দিতে অস্বীকৃত হন। অথচ তার অল্প দিন আগেই পণ্ডিত নেহরু যখন চীনে গেলেন তখন কোন আপত্তি কর্তৃপক্ষ তোলেননি।

সে সময় কলকাতায় চীনের কনসাল জেনারেল ছিলেন মিঃ হুয়াং। উনি বলেন, নেতাজী ওঁকে একদিন ফোনে এলগিন রোডের বাড়িতে ডেকে পাঠান। দুজনে নিভৃতে কথা হয়। নেতাজী বলেন, ব্রিটিশ সরকার ওঁকে যে-কোন মুহূর্তে অ্যারেস্ট করে জেলে পুরে দেবে। উনি ধরা পড়তে চান না। যদি উনি চীনে বেড়াতে গিয়ে সেখানে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন তবে চীনের চুংকিং সরকার তা দেবেন কি? মিঃ হুয়াং বলেন, যদি সুভাষচন্দ্র বেড়াতে যেতে চান তবে এখনি সাদরে অভ্যর্থনা করা হবে এ বিষয়ে উনি নিশ্চিত। তবে

পলিটিক্যাল আশ্রয়দান অনিশ্চিত। ব্রিটিশ সরকারের সংগে চুংকিং সরকারের যে রকম বন্ধুত্ব তাতে এটা সম্ভব হবে বলেও মনে হয় না।

এদিকে সুভাষচন্দ্র চীন যাবার খোলাখুলি অনুমতি চেয়েছেন। বাংলা সরকারের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু দিল্লী থেকে ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর বড়কর্তা তুমুল আপত্তি জানালেন। ওঁর মতে সুভাষ বোস জার্মান সাহায্য চাইবেন। চীন যাবার নাম করে পথে যখন ব্যাংককে থামবে সেখানেই নানা রকম ষড়যন্ত্র হওয়া সম্ভব। তার চাইতে ওঁকে দেশেই রাখো। প্রয়োজনমত ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্টে আটক করা যাবে।

আর একজন নোট দিলেন, বেংগলকে তা হলে বলো ওঁকে 'না' বলে দিক। অবশ্য আমাদের এই সিদ্ধান্তের খুবই সমালোচনা হবে, কারণ নেহরুকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

হোম ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি এর ওপর নোট দিলেন—আমার মনে হয় জার্মানী নয়, ও রাশিয়ার সংগে যোগাযোগ করতে চায়, তা হলে ওঁর লেফট কনসলিডেশন কমিটির বন্ধুরা খুশী হবে। এই সময় ঐ রকম একজন বিপজ্জনক বিপ্লবীকে সেন্ট্রাল এশিয়াতে ছেড়ে দেওয়া খুব ভুল হবে। ইণ্ডিয়াতেই থাক, দরকার পড়লেই 'নেট' করা যাবে। এই প্রসংগে উনি মন্তব্য করছেন—'নেহরুর আর যা-ই দোষ থাক, সুভাষচন্দ্র বোসের চাইতে একেবারে অন্য ধরনের মানুষ। আমার মনে হয় না ওঁকে যেতে দেওয়া হয়েছিল বলে অন্যজনকেও দিতে হবে এমন কোন কথা আছে। তা ছাড়া নেহরু যখন গিয়েছিলেন তার চাইতে পরিস্থিতি এখন একেবারে পালটে গেছে।'

চুংকিং সরকারের কাছে তাই আর নেতাজীর যাওয়া হয়নি। এখন ভিন্ন পরিস্থিতিতে নানকিং সরকারের আমন্ত্রণে এলেন। খুবই সাদর অভ্যর্থনা পেলেন উনি। ওঁকে রাখা হল রাষ্ট্রীয় অতিথি-

মিতসুরু তোয়ামার দেওয়া তরবারি হাতে নেতাজী

শালায়। ওঁদের জাতীয় এসেম্বলির বিশেষ অধিবেশন ডাকা হল। উনি আই এন এর সুপ্রিম কম্যাণ্ডার। ওঁকে ওদের মিলিটারি একাডেমিতে নিয়ে যাওয়া হল। আদর-আপ্যায়নের জবাবে নেতাজী মিলিটারি ডিনার দিলেন। সেখানে জার্মান রাষ্ট্রদূত ওয়েরম্যান, জাপানী সেনাপতি হাতা সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

চুংকিং সরকারের উদ্দেশ্যে নেতাজী পর পর দুটি বেতার-বক্তৃতা করেছিলেন। প্রথমটি খুবই বন্ধুত্ব-পূর্ণ। উনি বারবার সান ইয়াৎ-সেনের প্রতি ওঁর গভীর শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করলেন। এ কথাও মনে করিয়ে দিলেন যে উনি যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি তখন উনিই চীনে একটি মেডিক্যাল মিশন পাঠিয়েছিলেন। উনি আবেদন করেন যে, এশিয়ার বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে চীন-জাপান বোঝাপড়া হওয়া দরকার ও চীনের নিজেদের অনৈক্য দূর করা প্রয়োজন। সান ইয়াৎ-সেনের স্বপ্ন সফল করতে হলে চাই এশিয়ার মুক্তি, এশিয়ার ঐক্য।

দ্বিতীয় বেতার-বক্তৃতার সুর একটু ভিন্ন। ভারত-বর্মা সীমান্তে চীনা সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে এতে নেতাজী বিরক্ত ও দুঃখিত। এইভাবে ব্রিটিশদের সাহায্য করলে কোন জাতীয়তাবাদী বা দেশপ্রেমিক ভারতবাসী চিয়াং কাইশেককে ক্ষমা করতে পারবে না।

নানকিং থেকে নেতাজী সাংহাই গেলেন। সেখানে অনেক ভারতীয়ের বসতি। তারপর এলেন ম্যানিলা। প্রেসিডেন্ট জোসে লরেলের সংগে আবার দেখা হল। সিংগাপুরে ফিরে এসেই আবার উনি বেরিয়ে পড়লেন। এবার জাকার্তা, সুমাত্রা ও বোর্নিও। পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি কোনায় উনি পৌঁছে দিলেন ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামের বার্তা আর পূর্ব এশিয়ার যত প্রবাসী ভারতীয় ওঁকে মনে প্রাণে গ্রহণ করল তাদের 'নেতাজী' রূপে। (ক্রমশ

# সামাজিক ঋণ

## শেখর মুখোপাধ্যায়

কবীরদাস বলেছিলেন, 'মুঠঠি বনাকে আয়ে থে, হাথ পসারে জায়োগে'। তুমি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলে হাত মুঠো করে, যখন এই ধরাধাম থেকে বিদায় নেবে, হাত থাকবে খালি। সঙ্গে কিছুই যাবে না।

তুলসীদাসের দোহা, 'রোতে হুয়ে তুম আয়ে, ওর জগ নে হঁসা থা। য়্যায়সা জীবন জীও তুলসী, কি তুম হঁসতে হুয়ে জায়ো, অওর দুনিয়া রোয়ে।' জন্মমুহূর্তে তুমি ক্রন্দন করেছিলে আর শুনে পৃথিবী উঠেছিল হেসে। এমন করম কর যেন তুমি হাসতে হাসতে নেবে বিদায় আর বিশ্বজগৎ ওঠে কেঁদে।

বিবেকানন্দের সতর্কবাণী, 'পরার্থে বাঁচাই বাঁচা। তুমি শুধু সেই মুহূর্তগুলিতেই বেঁচে আছ যখন পরার্থে বাঁচছ। কেবলমাত্র নিজের জন্য বেঁচে থাকা পশুতুল্য জীবন'।

বিশ্বকবির আহ্বান, 'চলো যাই কাজে মানবসমাজে, চলো বাহিরিয়া জগতের মাঝে, থেকো না অলস শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে।'

এঁরা সকলে পরার্থে বাঁচার কথাই বলছেন। আদেশ, ঋণমুক্ত হও। প্রতিক্ষণে ঋণমুক্ত হও। যাবার বাঁশী বাজার আগে করো তামাম ঋণশোধ।

আমরা সকলেই ঋণী। ধনী ঋণী নির্ধনের কাছে। শিক্ষিত ঋণী অশিক্ষিতের নিকট। শহর ঋণী গ্রামের কাছে। শোষণকারী ঋণী শোষিতের নিকট। ধণিক দেশগুলি ঋণী তৃতীয় বিশ্বের কাছে। যিনি যত বেশী শিক্ষা-দীক্ষা-ধনসম্পত্তি-পদমর্যাদা-সুযোগ পেয়েছেন, তিনি তত বেশী ঋণী অশিক্ষিত-নিরন্ন-বঞ্চিত মানুষের নিকট।

কি ভাবে ঋণগ্রস্ত? এর স্বরূপ কি? ব্যাখ্যা কি? সংক্ষেপে নিম্নরূপ।

দেশের সরকার প্রতি বছর যে পরিমাণ রাজস্ব জনগণের নিকট থেকে বিবিধ করের মাধ্যমে সংগ্রহ করেন, তার মাত্র দুই শতাংশ আসে আয়কর থেকে, আনুমানিক ২৮ শতাংশ আসে নানারূপ আমদানী-রপ্তানীতে শুল্ককর ইত্যাদির দ্বারা, আর বৃহদংশ ৭০ শতাংশই আদায় হয় অসংখ্য 'পরোক্ষ করের' মাধ্যমে।

এই সকল পরোক্ষ কর সব সময় দৃশ্যমান নয়। বিক্রয় কর, শিল্পবস্তু প্রভৃতির প্রতি পদক্ষেপে কর, ইত্যাদি এর বিভিন্ন রূপ। ধনী-নির্ধন সকল ব্যক্তিকেই এই সকল পরোক্ষ কর সমপরিমাণেই দিতে হয়, প্রতিটি বস্তু ক্রয়কালে, বা উপভোগের সময়। দুই-একটি দৃষ্টান্তে হয়তো বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

এক কাপ চায়ের দাম, ধরা যাক, ত্রিশ পয়সা। এর মধ্যে চা-পাতা, চিনি, দুধ, ইত্যাদি বস্তুগুলির সম্মিলিত মূল্য কিন্তু মাত্র আট পয়সা, আর পরোক্ষ কর লুকিয়ে আছে বাইশ পয়সা। এই করগুলি অদৃশ্যমান। চা-বাগিচায় চা প্রস্তুত হচ্ছে, সেখানে কর। প্যাকিং বাক্সে চা-পাতা ভরা হচ্ছে, প্লাইউডের উপর কর। লরীতে চেপে শহরে আসছে, টায়ার ও ডিজেলের উপর কর। ইত্যাদি ইত্যাদি। একইভাবে চিনি দুধ কেরোসিনের ওপর। ঐ সব অদৃশ্য করের সম্মিলিত মূল্য হল ঐ বাইশ পয়সা।

একটি দেশলাই-এর বাক্সের দাম ১৮ বা ২০ পয়সা, তার মধ্যে কিন্তু লুকোনো আছে ১০ পয়সা পরোক্ষ কর। নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি বস্তুতে, যা ধনী-নির্ধন সকলকেই ক্রয় করতে হয়, ঐরূপ বহুল পরিমাণ কর দিতে হয়।

এবং যেহেতু ভারতের সত্তর কোটি জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই দারিদ্র্যসীমার নীচে (আবার বৃহদংশই সেই সীমার থেকে অনেক নীচের অতল গহ্বরে), এই পঞ্চাশ কোটি গরীব দেশবাসীর প্রদত্ত পরোক্ষ করের পরিমাণ, মুষ্টিমেয় ধনী বা মধ্যবিত্ত লোকেদের দেয় আয়কর এবং পরোক্ষ করের মোট পরিমাণের থেকে অনেক অনেক গুণ বেশী। আয়করের আওতায় ক'জন আসে? আসলেও মোট রাজস্বের মাত্র দুই শতাংশ তার দ্বারা সংগৃহীত হয়। পঞ্চাশ কোটি নিরন্ন, হতদরিদ্র অশিক্ষিত (গ্রামীণ ও শহুরে বস্তির) মানুষের নিকট থেকে পরোক্ষ করের মাধ্যমে আদায়ীকৃত প্রভূত পরিমাণ অর্থেই বস্তুত দেশের সরকারের খরচ চলে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির হয় রূপায়ণ। কিন্তু রূপায়ণের মাধ্যমে অতি নগণ্য অংশই গরীব মানুষজনের কাছে ফিরে আসে।

শোষণকারী ঋণী শোষিতের কাছে

সেজন্যই পরোক্ষ করের হার বৃদ্ধি হলে ও দ্রুত মুদ্রাস্ফীতির ফলে এই হতদরিদ্ররাই হন আরো কঠোরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত। চরম দুর্দশাগ্রস্ত।

এই পদ্ধতিতে ধনীর নিকট থেকে অর্থ ও সম্পদ সংগ্রহ করে দরিদ্রদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পরিবর্তে করা হয়ে থাকে ঠিক বিপরীত কার্য।

এটা গেল শুধুমাত্র রাজস্ব সংগ্রহের দিকটা। এখনও সরকারী ব্যয়ের হিসাব আলোচিত হয় নি, যে কথার স্পষ্টিকরণ ছাড়া সামাজিক ঋণের ব্যাখ্যা থেকে যাবে অসম্পূর্ণ।

এই রাজস্বের একটি বৃহৎ অংশ ব্যয়িত হয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনা খাতে, বাকীটা সাধারণ উন্নয়ন প্রচেষ্টায় ও শাসনযন্ত্র চালু রাখায়। ঐ সকল যোজনা ও সাধারণ উন্নয়নকর্মে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে আকাশস্পর্শী বাঁধ, রেলপথ-সড়ক, বৃহৎ শিল্পোদ্যোগের জন্য প্রয়োজনীয় ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা কাঠামো, ব্যাংক, কারিগরী ও গবেষণা কেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি ইত্যাদি গড়ে তোলা হয়।

কিন্তু এ সবের দ্বারা ভারতের অগণিত অশিক্ষিত গরীব মানুষেরা যত না উপকৃত হন, তার থেকে শত শত গুণ বেশী লাভবান হন মুষ্টিমেয় ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়, ব্যবসায়ী ও স্বত্বভোগীরা। তৈলাক্তরাই হন আরো চিক্কণ। শিক্ষিতরা সুযোগ পান আরো শিক্ষিত, আরো দক্ষ এবং আরো উপার্জনশীল হতে। ব্যবসায়ীরা সুযোগ পান দেশের গরীব অধিবাসীদের টাকায় গড়ে তোলা ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সাহায্যে আরো মুনাফার পাহাড়ের চূড়োয় বসতে। আর অশিক্ষিত ও দরিদ্ররা? তাঁরা দিনে দিনে ক্রমে ক্রমে হন আরো দরিদ্রতর, আরো ম্লান, আরো বিশুষ্ক; মূক ভারবাহী পশুর গত চাহনি হয় আরো করুণ, বোবা, মৃত মাছের চোখের মত; ভেজা ভেজা কোটরগত চোখের মধ্যে জীবনের কিছুমাত্র স্পন্দন আর ধ্বনিত হতে চায় না। জানু পেতে বসে কালো আকাশের দিকে দুবাহু বাড়িয়ে তাদের শুধুমাত্র নীরব আক্ষেপ।

এখানে যোজনা কার্যক্রম, বা উন্নয়ন প্রচেষ্টা, বা শিল্পোদ্যোগের জন্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ কাঠামো গড়ে তোলার বিরুদ্ধে কোনরূপ সোচ্চার মন্তব্য করা হচ্ছে না। শুধু এইটুকু সত্য উন্মোচিত হচ্ছে যে বর্তমান ব্যবস্থায় ঐ বাঁধ, ব্যাঙ্ক, শিল্পোদ্যোগ, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরী সংস্থা, যানবাহনের উন্নতি এবং সমগ্র উন্নয়ন-প্রচেষ্টাটির যেভাবে উপযোগ ও ব্যবহার চলে আসছে তাতে দেশের জনগণের সুবৃহৎ অংশ, দরিদ্র মানুষেরা, (যাদের অর্থে মুখ্যত ঐ সকল গড়ে তোলা হয়) তারা পড়ে থাকছে সেই প্রগাঢ় তিমিরেই, বৈপরীত্যে মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীরাই ক্রমবর্ধমান সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। দেশের অল্পগুলিমেয় অংশ যখন ক্রমপ্রসারমাণ ক্ষমতা, সুবিধা ও ঐশ্বর্যের মদে মত্ত, তখন সমাজের সিংহভাগটাই প্রক্ষিপ্ত হচ্ছে গভীরতর হতাশার বৃত্তে।

এই ক্রমিক পরিণতির সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

জলসেচের জন্য বৃহৎ বৃহৎ বহুমুখী প্রকল্প ও বিশাল বিশাল বাঁধ গড়ে তোলাকে সুকর্মই বলতে হবে। কিন্তু তাতে প্রধানত কারা লাভবান হচ্ছে, সেটাই বিচার্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যে ১৯৭২-৭৩ সালের এক অর্থনৈতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ভাখরা-নাঙ্গাল প্রকল্পের সেচজল উপভোগ করতে পারছে বিশেষত বড় ভূমধ্যকারী ও বড় কৃষকেরা, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষীরা শুধুই অসহায় চোখে তাদের ক্ষেতের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বিপুল জলরাশিকে নির্ণিমেষে দেখছে। সেচ জলকর দেবার সামান্য অর্থ-সঙ্গতিটুকুও নেই তাদের। সেই জলসেচের উপযোগে যখন বড় চাষীরা সুপ্রচুর ফসল তুলছে গুদামে, বাজারে বাড়ছে শস্যের দাম, আর সরকারের উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে শস্যের দাম বাড়ানোর, তখন জলসেচের অভাবে
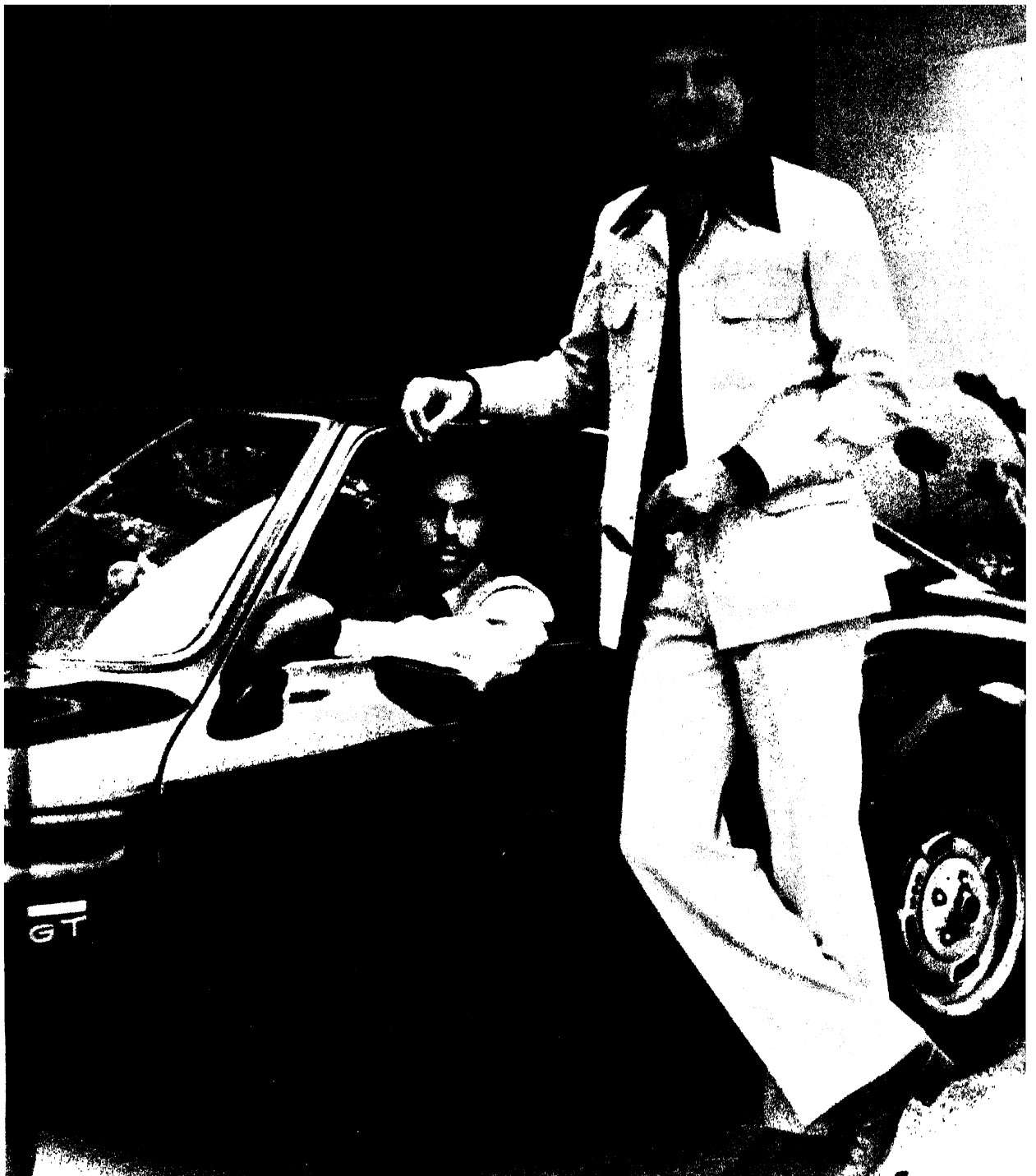
ভারতে স্যুটিং
গোয়ালিয়র বানালো ...

GT

খেয়ে যাচ্ছে। ধনী চাষী হচ্ছে আরো ধনী, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর ক্রমাগত পিছু সরতে সরতে আজ দেয়ালে পিঠ।

এহ বাহ্য।

যেহেতু কৃষিজাত উপজের ওপর কর এখনও অসমানাই এবং যেহেতু মুষ্টিমেয় বড় চাষীরা সেচ-জলকর দিচ্ছে সামান্য হারেই, সেজন্য পাঁচশো-সাতশো-বারোশো কোটি টাকার বহুমুখী প্রকল্পগুলিতে ব্যয়িত অর্থটা আর রাজস্বরূপে সরকারের কাছে ফিরে আসছে না। ফল? লোকসান আর লোকসান। সেই লোকসান ঠেকাতে উপর্যুপরি পরিকল্পনায় আরো বিনিয়োগ করা হচ্ছে, ফলত অপচয়ের মাত্রাও বৃদ্ধি জ্যামিতিক হারে। অন্যান্য প্রকল্পগুলিরও ঐ একই কাহিনী।

সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে শুধু ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠছে ব্যাঙ্ক। অজস্র অঢেল ব্যাঙ্ক। সৎকর্মই বলা চলে। কিন্তু ক্ষুদ্র চাষীরা বা নিরন্ন মানুষেরা ঋণ পায় না, পায় যারা আগে থেকেই তৈলাক্ত, যারা প্রচুর পেয়েছে। ধনীগোষ্ঠীর ভোগ্যপণ্য-শিল্পগুলির খুব বৃদ্ধি হচ্ছে, হচ্ছে না মোটা কাপড় তৈরী ও নিত্য-ব্যবহার্য বস্তুর শিল্পগুলি। ব্যাঙ্কের প্রদত্ত ঋণে চোরাকারবার হোর্ডিং ইত্যাদি বাড়ছে। দায়ভাগটা পদদলিত জনসমাজের ওপর ন্যস্ত।

রেলপথ-সড়ক নির্মাণ ইত্যাদিও খুবই কাম্য। কিন্তু নগর থেকে গ্রামে যে পথ যাচ্ছে, তার মাধ্যমে গ্রামের উপজই সুলভমূল্যে নগরে চলে আসছে। গ্রামের অধিবাসীরা সত্যিই কি লাভবান হচ্ছেন, না শহরের সামান্যসংখ্যক শক্তিশালী ব্যবসায়ীরাই। আরো মুনাফা লোটার পর্যাপ্ত সুযোগ পাচ্ছেন, সেটাই বিবেচ্য। সড়কটার নিজস্ব কোন চরিত্র নেই, সেটা না সৎ, না অসৎ। সড়ক-নির্মাণের বিরুদ্ধে আমার বিন্দুমাত্র বক্তব্য নেই। বক্তব্য শুধু এইটুকু যে সঙ্গে সঙ্গে এমন পরিকল্পিত ও রূপায়িত ব্যবস্থাও প্রয়োজন যাতে গ্রামীণ কৃষকেরা তাঁদের স্বেদরক্তে প্রস্তুত সামগ্রীর ন্যায্য মূল্যটা অন্তত পান, লাভের গুড় শুধু দালালেরাই না খেয়ে ফেলে।

এরূপ হাজারো দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। যথেষ্ট। স্মর্তব্য শুধু এইটুকু যে ঐ সব প্রচেষ্টার রূপায়ণ সম্ভব হচ্ছে যাদের প্রদত্ত অনুদানে, সেইসব পিছনে পড়ে থাকা মানুষদের দিকে চাইবার লোক নেই, উন্নয়ন প্রকল্পসকল তাদের সমস্যার দূরীকরণ না করে বরঞ্চ দ্রুতগতিতে তাদের ঠেলে দিচ্ছে চরম প্রান্তসীমায়।

ভ্রান্ত 'ডাউনওয়ার্ড ফিল্‌ট্রেশন' তত্ত্ব অনুযায়ী এই মূঢ় আশা করা হয়ে থাকে যে এভাবেই বুঝি অর্থ-নৈতিক সামাজিক উন্নতির লভ্যাংশটা সমাজের ওপরতলা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে দারিদ্র্যসীমার নীচের অগণিত মানুষের কাছে পৌঁছবে, এবং শেষমেশ তারাও একদিন হয়ে উঠবে মধ্যবিত্ত। সেটা আকাশকুসুমই থেকে যায়। দারিদ্র্যমোচনের জন্য সোজাসুজি সবিশেষ ও সুষ্ঠু উন্নয়নপ্রচেষ্টা না করা হলে ঐ লক্ষ্যভেদ থাকবে সুদূরপরাহত। অলীক কল্পনা।

এ ভাবেই বড় চাষী ঋণী ক্ষুদ্র চাষীর নিকট, নাগরিক ঋণী গ্রামীণ মানুষের কাছে। যাদের কিছুমাত্র আছে, তারা সকলেই ঋণী যাদের কিছুই নেই।

সমগ্র শিক্ষিত সম্প্রদায় ঋণী অশিক্ষিত জনতার কাছে কারণ এই সমাজ ব্যবস্থায় তাঁরাই হন লাভ-বান। অবস্থার পরিবর্তন সেজন্য তাদের কাছে কাম্য মনে হয় না।

কারণ?

ভারতের বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাকেন্দ্রসকল চলে প্রধানত সরকারী অনুদানে। ছাত্র-ছাত্রীদের বেতনে যা হয় তা অতি যৎসামান্য।

এই অনুদানের উৎস হল, পূর্বে উল্লিখিত রাজস্ব যা মূলত পরোক্ষ কর, যার উৎস হল, আবার দেশের অসংখ্য দরিদ্র ও অশিক্ষিত মানুষের প্রদত্ত কর।

বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকেন্দ্রের সর্বস্তরেই বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জাম, গৃহ, গৃহাবাস, ল্যাবরেটরী, লাইব্রেরী, জল-বিদ্যুৎ-পাখা, চেয়ার-টেবিল-প্রদত্ত অনুদানে।

এই সকল শিক্ষায়তনে দরিদ্রের সন্ততিরা খুব অল্পই শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পায়। সমীক্ষায় প্রকাশ যে ভারতবর্ষের দরিদ্র বালক-বালিকাদের মধ্যে মাত্র চল্লিশ শতাংশ প্রাথমিক স্কুলে যেতে পায়, দশম শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছয় মাত্র ষোল ভাগ, উচ্চমাধ্যমিক ও মহা-বিদ্যালয় স্তরে পাঁচ শতাংশেরও কম। বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্গুলিমেয়।

যারা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য অর্থ যোগান তাদের সন্তানরাই থেকে যায় শিক্ষা হতে বঞ্চিত।

যতদূর স্মরণ আছে, সেটা হয়ত ১৯৭৪ সাল, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এক তথ্য পেশ করেন যে, ভারতে প্রতিটি স্নাতক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা-দানের আয়োজনে সরকারী ব্যয় হয় প্রতিবছর প্রায় ৬০,০০০ টাকা (তিনবছরে ১৮০,০০০ টাকা)। স্নাতকোত্তর স্তরে প্রয়োজন প্রতিজনের জন্য প্রতিবছর আনুমানিক ৯৫,০০০ টাকা (দুই বছরে ১৯০,০০ টাকা)। এক একটি ডাক্তার বা ইঞ্জীনিয়ার গড়তে প্রতি

**শিক্ষাব্যবস্থায় অর্থ যাঁরা যোগান তাঁদের সন্তানরাই অন্ধকারে।**

বছর খরচ হয় প্রায় ১৬০,০০০ টাকা (পাঁচ বছরে মোট ৮ লাখ টাকা)। ১৯৮১ সালে ঐ সকল হার নিশ্চয়ই অনেক বৃদ্ধি লাভ করেছে।

এক একটি শিক্ষিত জন গড়ে উঠছে যে অসংখ্য অগণিত অশিক্ষিত দীনদরিদ্র মনুষ্যের স্বেদরক্ত ও অশ্রুজলে, সে কথা ভুলেও কজনেরই বা মনে পড়ে?

কজনই বা ঋণ স্বীকার করেন?

কজনই বা ঋণ পরিশোধে ঐকান্তিক হন?

কজনই বা সারা জীবনের উপান্তে এসেও নম্র কৃতজ্ঞচিত্তে ঋণ স্মরণ করে এই পাপস্খালনে প্রার্থনারত হন?

বহু লোকের মনে এই ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল যে, 'আমি শিক্ষিত হয়েছি, আপন মেধায়। ওরা অশিক্ষিত রয়ে গেল ওদেরই অলসতায় মূঢ়তায় মেধাহীনতায়'। তাঁরা ভুলে যান যে ঐ নিরন্ন মনুষ্যেরাও সমপরিমাণ সুযোগ-সুবিধা পেলে যে তাঁদের থেকেও আরো বেশী শিক্ষিত ও আরো বেশী দক্ষ হয়ে উঠতে পারতেন না, তা কি প্রমাণিত সত্য? পরাধীন ভারতে ঔপনিবেশিকরা তো ঐ কথাই বলে ভারতীয়দের পদানত রেখেছিল? পুষ্টিকর খাদ্য, পর্যাপ্ত বাসস্থান অবকাশ, বইপত্র শিক্ষিত হয়ে গড়ে তোলা। ... কথাটিই হয় মিথ্যা প্রমাণিত।

মনস্তত্ত্ববিদরা বহুকাল পূর্বেই পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, যে কোনো দেশের সর্বসাধারণ লোকসংখ্যার মাত্র ০.০৬ অংশই সুবুদ্ধিমান ও প্রতিভাবান, আর মাত্র ০.০৬ অংশই মূঢ়মতি ও শিক্ষালাভের অযোগ্য। বৃহদংশ ৯৮.৮ ভাগ মাঝামাঝি মাপের মেধাযুক্ত। পার্থক্যটা উনিশ-বিশের সমান সুযোগ প্রাপ্তিতে সকলেই প্রায় সমমানে শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারেন। সকলেই যে উচ্চ স্তরের কবি বা বিজ্ঞানী হয়ে উঠবেন, তা না তবে, এই উচ্চমানের শিক্ষা পর্যন্ত অনায়াসে পৌঁছতে পারেন। হয়ে উঠতে পারেন এক সফল চিত্রকর, আনন্দদায়ী গায়ক, পরিশ্রম কর্মী এক ভাল সংগঠক। বা অন্য কিছু।

দরিদ্ররা অশিক্ষিত থেকে যান মেধার অভাবে ন যথেষ্ট সুযোগের অভাবে। পর্যাপ্ত ও সমান সুযোগে অভাবে।

বিধিদত্ত জল, বায়ু, আলোকের মত শিক্ষালাভে সকলের জন্মগত অধিকার। সেই অধিকার থে জনগণের বহুলাংশই বঞ্চিত।

শিক্ষা ব্যবস্থার এই মূল ত্রুটির ফলে যারা দে শিক্ষার খরচ যোগান তাঁরাই থেকে যান অশি এবং শিক্ষিত মানুষেরা ঐ অশিক্ষিত মানুষদের কা যে বিপুল ভাবে ঋণগ্রস্ত সে চেতনায় আর পৌ না। বিদ্যালয়ের প্রথম পাঠেই হওয়া বাঞ্ছনীয় চেতনার জাগরণ। এই চেতনার অভাবে বিদ্যা অবিদ থেকে যায়।

সেজন্যই আজ ভারতবর্ষের চতুর্দিকে দেখা যা অবিদ্যার পরাকাষ্ঠা। অচেতন মানুষের তা আস্ফালন। শোষণের উলঙ্গ প্রকাশ। মূঢ় অজ্ঞনতা আর অশুভশক্তির জয়জয়কার।

সেজন্যই ডাক্তার-ইঞ্জীনিয়াররা গ্রামে যেতে চান বিদেশে পাড়ি জমান। শিক্ষিতজনে এই গ দূরীকরণে সচেষ্ট হন না। নিরক্ষরতা দূরে অভি থেকে অকরায়ত্ত।

তাই, আজো বিদ্যাচর্চায়, শিক্ষায়, শি গবেষণায় এখনও, এই সংক্রান্তির ক্ষণেও, সক সমবেতভাবে, পরম ঐকান্তিকতায় দেশের দারিদ্র্যমোচ জন্য ব্রতী হয় না। বুদ্ধিজীবী সমাজ এক অহং-মাত্রায় মগ্ন। ইঁদুরদের পাগলা রেসে কে ঠেলে আগে এগিয়ে যেতে পারে তারই জন্য যেন মরণপণ ক্ষুদে লড়াই। আর যে ভগ্নতরীতে শিক্ষিতদের এই যাত্রা সেটার ভরা ডুবন্ত দশা। সম্প্রদায় যদি দেশের দারিদ্র্যমোচনে আজো আন্তরিক নিবেদিত হয়, তা হলে কিছুটা হবে ঋণশোধ।

তাই, আজো পরিকল্পনা 'পুওরদের জন্য হয় না, বারে বারে সেই সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের গড়ার ধুয়োটি শুধু গেয়ে রেখেই চলে গোষ্ঠ দীয়তাম ভুজ্যতাম।

দিনে দিনে ক্রমে ক্রমে আমাদের এই ঋণ বাড়ছে বাড়ছে। জমছে আকাশস্পর্শী পর্বতের ঋণশোধে এখনও যদি আ নিঃস্বার্থভাবে সঙ্ঘব একত্রভাবে পরম কৃতজ্ঞচিত্তে সতত নিরন্তর সচে হই, তা হলে অচিরেই একদিন অগ্নিগর্ভ বিস্ফো আশঙ্কা। মহাকাল তাঁর হিসেব মিলিয়ে নেবেনই!

বহুকাল আগে পণ্ডিচেরীর পরমা মাতা জ উদ্দেশ্যে এক বাণীতে চেতাবনী দিয়েছিলেন—

"The only hope for future lies in a ch
of man's conciousness and the chan
bound to come. But it is left to the
to decide if they will collaborate for
change or if it will have to be enf
upon them by the power of crushing
cumstances.
So wake up and collaborate !"

[ Message of the Mother, "The Adven
quarterly journal, Sri Aurobindo As
Pondicherry, April 1974, p.2 ]

# সেই সময়

## সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৭৭ ॥

ইব্রাহিমপুরের প্রাক্তন কুঠীবাড়িটির পাশেই নির্মিত হয়েছে নতুন এক ইমারৎ। পুরোনো কুঠীবাড়িটির ধ্বংসস্তূপে এখনো বিদ্যমান। প্রকৃতির যা নিয়ম, ধ্বংসস্তূপের ওপরেও আবার প্রাণের আবির্ভাব হয়, সেখানে জন্মে গেছে অনেক গাছ-পালা।

সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ভুজঙ্গধর বললো, ঐ দ্যাখেন, ঐ ছিল আসল কুঠীবাড়ি, নীলকর সাহেবগো পাইরদারা এক রাইতে আগুন লাগাইয়া দিছিল। বউ-ছাওয়াল-মাইয়া লইয়া আমি সেই রাইতেই নিরাশ্রয়। তাড়া-খাওয়া ইন্দুরের মতন আমি প্রাণের ডরে সকলডিরে লইয়া পলাইছি।

নবীনকুমার সেদিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

ভুজঙ্গধর পুনরায় বললো, আপনে যেখানে খাড়াইয়া আছেন, ঠিক ঐখানেই একদিন আপনের অগ্রজ গঙ্গানারায়ণ সিংহ অকস্মাৎ একদিন আইসে খাড়াইয়াছিলেন। মুখ ভরতি দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। আমি তেনারে চেনবো ক্যামনে আমি ঠাওরাইছিলাম বুঝি এ আর এক জাল প্রতাপচন্দ্র। পরে নরসুন্দর ডাকাইয়া ক্ষৌরি করাইতেই, তেনার আসল রূপ বাইর হইল....।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, নীলকর সাহেবরা এখন প্রজাদের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করে?

ভুজঙ্গধর বললো, কমু, সব আপনেরে খুইলা কমু। আগে মুখ-হাত ধোন, বিশ্রাম করেন। পাঁচ-জনে কয় যে আমারে ব্রাহ্মণীর রান্ধার হাত নাকি সরেশ, যদি আজ্ঞা হয় তবে আইজ আমার ঘরেই আপনের আহারাদির ব্যবস্থা করি।

নদীকূলে বজরা থেকে নেমে বেশ খানিকটা হেঁটে আসতে হয় এই কুঠীবাড়িতে। ভুজঙ্গধর পালকির ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল, কিন্তু নবীন-কুমার তাকে নিরস্ত করে পদব্রজেই এসেছে। গ্রামের কোনো প্রজাই তাকে চেনে না। অনেকে তার মুণ্ডিত মস্তক দিব্যকান্তির দিকে বিস্ময়ভরা চোখে চেয়ে থেকেছে। কিন্তু জমিদার জেনে সসম্ভ্রমে মাথা নুইয়ে পড়েনি।

ভুজঙ্গধর তাকে নিয়ে এলো নতুন গৃহে। তার মধ্যে একটি কক্ষের দ্বারের তালা খুলে ভুজঙ্গধর বললো, এই দ্যাখেন, ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি রাখি নাই। এ-ঘরের খাট-আলমারি, তোশক বালিশ বিছানা সবই নতুন। জমিদারবাড়ির কেউ যদি কোনোদিন আসেন সেই লাইগ্যা সাজাইয়া রাখছি। কিন্তু গত নয় বৎসরের মধ্যে কেউ আসে নাই।

নবীনকুমার কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, ভুজঙ্গধরের ঈষৎ বাঁকা সুরের কথায় সে ঠিক উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না। এই বিষয়টি নিয়ে সে আগে বিশেষ কোনো চিন্তাই করেনি। বাংলা ও উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের জমিদারি আছে, সে এই কথাটি শুধু জানে, সেই জমিদারি পরিচালনা বিষয়ে তার কোনো জ্ঞান নেই। প্রায় কৈশোর বয়স থেকেই সে নিজস্ব নানান পরিকল্পনায় মত্ত থেকেছে। অর্থের প্রয়োজন হলেই সে তলব করেছে খাজাঞ্চিকে। এস্টেটের তহবিল থেকে সে চাহিদা মতন পর্যাপ্ত অর্থ না পেলে এক একবার বিক্রয় করেছে কলকাতার এক একটি সম্পত্তি। বিষয়-তদারকির ভার গঙ্গানারায়ণের ওপরে। অবশ্য একা গঙ্গানারায়ণই বা কতদিকে সামলাতে পারবে। কিন্তু সেকথা নবীনকুমার এতদিন ভাবেনি।

দুজন ভৃত্য অবিলম্বে কক্ষটি ঝাড়-পোঁছ করে দেবার পর নবীনকুমার সে-কক্ষে প্রবেশ করলো। সেটি আয়তনে বেশ বড়, আসবাবগুলি রুচিসম্মত, কোনো জমিদারের সাময়িক বসবাসের অনুপযুক্ত নয়। গ্রীষ্মে টানা পাখার ব্যবস্থা আছে। পালঙ্ক ছাড়াও রয়েছে একটি আরামকেদারা। ভুজঙ্গধরের অনুরোধে নবীনকুমার সেটিতে বসলো।

ভুজঙ্গধর ভূমিতে আসন গ্রহণ করে আবার সেই বিদ্রূপ ও কৌতুক মিশ্রিত সুরে বললো, আমি আপনেগো জমিদারি গ্রাস কইরা লইছি বটে, কিন্তু আমারে একেবারে নিমকহারাম কইতে পারবেন না। তাইলে আর জমিদারের লাইগা এমন ঘর সাজাইয়া রাখছি ক্যান? এই ঘরে কিন্তু আইজ পর্যন্ত কেউ শোয় নাই। আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বাবু গঙ্গানারায়ণ সিংহ মশায় অন্তত একবার আসবেন এমন আশা কইরাছিলাম। তিনি আইলে নিজেও খুব খুশী হইতেন। তিনি প্রজাগো পক্ষ লইয়া নীলকর সাহেবগো বিরুদ্ধে জবর লড়াই দিছিলেন, এবার আইলে তিনি স্বয়ং সেই লড়াইয়ের ফলাফল স্বচক্ষে দ্যাখতে পারতেন।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে ফলাফল?

—যে ম্যাকগ্রেগর সাহেবের নাম শোনলে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খাইতো, এমনকি আমাগো বুকের মইধ্যেও গুড়গুড়াইতো, সেই ম্যাকগ্রেগর সাহেব আত্মহত্যা করেছে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিসট্রেটের লেডীর সাথে তার যেন কী সব চইলছিল। যাউক সেকথা। সে বেটা পাইছে তার পাপের শাস্তি। তারপর একদিন নীলকুঠীতেও আগুন লাগে। সাহেবরা সব পিঠটান দিছে, এহনে আর নীলকুঠী নাই। আমাগো কুঠী যারা পুড়াইয়া দিছিল, তারা নিজেরাও নিস্তার পায় নাই। এখন আর এই এলাকার জমিতে নীলচাষ হয় না আবার সোনার ধান ফলে।

—শুনে আমিও খুশী হলুম যে আমার দাদা যে কারণের জন্য প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছিলেন, তা সার্থক হয়েছে।

—কিন্তু তিনিও শহরে গিয়া অইন্যাগো মতন ফুলবাবু জমিদার হইলেন। আর গ্রামে আইলেন না।

—আমার দাদা অনেক রকম কাজ নিয়ে ব্যস্ত। না আসতে পারা তাঁর পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কলকাতা থেকে আমাদের এস্টেটের আর কোনো কেউ কখনো আসেনি বলতে চান? তা হতেই পারে না।

—আইছে, আইছে। গোড়ার গোড়ার প্রত্যেক বছরেই একবার দুইবার আমলা-গোমস্তারা আইছে। আমি তাগো খ্যাদাইয়া দিছি। ঐ দিবাকরই তো ফের এদিকে আইলে ক্ষুর দিয়া মাথা কাটাইয়া দিমু।

—আমাদের প্রতিনিধিকে কেন আপনি হাঁকিয়ে দিয়েছেন, তা জানতে পারি কি?

—নিশ্চয় জানতে পারেন। দিছি আমার খুশী। শোনেন, শোনেন, অমন উত্তেজিত হন ক্যান। স্পষ্ট কথা শোনার অভ্যাস আপনাগো নাই। তাই মাথা গরম হইয়া যায়। শোনেন, আমি যদি হই শিয়াল, তাইলে আপনেগো ঐ আমলা-গোমস্তারা হইলো, কুমোইর, অর্থাৎ আপনেরা যারে কন কুমীর। পরের ধনে পোদ্দারি করতে গ্যালেও আমারে তবু খাটতে হয়। আর অরা আইস্যা লুটের বখরা চায়। অগো হাতে আমি টাকা দিমু ক্যান! জমিদার আইলেও না হয় হিস্যা বুঝাইয়া দিতাম, অগো হাতে টাকা দিলে সে টাকা আপনেগো এস্টেটের তবিলে জমা পড়বে কইতে চান? কোনোদিন না। অন্তত তিন ভাগের দুই ভাগ অরা নিজেরা হজম করবে। তাই আমি ঠিক করলাম অগো দিমু ক্যান, পুরাপুরি আমি নিজেই খাই। আমারও পরিপাক শক্তি কম নয়। দিব্যি হজম হইয়া যায়।

—অর্থাৎ যে-কোনো কৌশলে জমিদারকে ঠকানোই আপনার মূল উদ্দেশ্য।

—তাইলে ছোটবাবু, এই কথার জবাব দ্যান তো! নীলকরের অত্যাচারে আমি যখন বউ-ছাওয়াল মাইয়া লইয়া নিরাশ্রয় হইছিলাম, তখন জমিদার আমারে দেখছিলেন? জমিদার একবারও কি চিন্তা করছিলেন যে আমি কোথায় থাকুম কী খামু? আমি মরলাম না বাঁচলাম, হ্যার কেউ খোঁজ নিছে? এই যে কী সাঙ্ঘাতিক আকাইল গ্যাল, গেরামের প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে হাহাকার তখন প্রজাগো একটুও কি সাহায্য করছে জমিদার? সে সব যদি না করে, তবুও আমি জমিদারের গোমস্তা আইলেই তার পা ধোওয়নের জল দিয়া খাতির করুম আর তার হাতে টাকার থলি তুইল্যা দিমু?

—অন্য সব জমিদাররা মহালে নিয়মিত আসে বলতে চান?

—যারা আসে না, তাগো জমিদারি আইজ না হউক কাইল লাটে ওঠবেই। আপনের পিতামহ নিয়মিত আসতেন, আপনের পিতাঠাকুরও যৌবনে আসছেন বেশ কয়েকবার। তারপর আপনার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতারে পাঠাইতেন। তাইরপর যেই আসা বন্ধ হইল, আপনেগো জমিদারির দশাও জল-শুকনা নদীর মতন হইল। আর বেশী দিন নাই—।

—আমরা যদি এ জমিদারির অংশ বিক্রি করে দিতে চাই?

—তা পারবেন। কিন্তু দাম পাইবেন না? এই ফোঁপরা জমিদারি কেনবে কেডা?

—আপনিই ফোঁপরা করে রেখেছেন, বোঝা যাচ্ছে।

—বোঝা অত সহজ না, ছোটবাবু। আগে গেরামের অবস্থা ভালো কইরা নিজের চইক্ষে দ্যাখেন, তারপর বোঝবেন।

—জমিদারির অবস্থা যে খারাপ হয়ে যাচ্ছে, সে কতা আপনি আমাদের চিঠি লিকেও জাননি কো!

—আমার বিপদের সময় অন্তত সাতখান পত্র পাঠাইছিলাম আপনেগো কাছে, একখানেরও কোনো জবাব পাই নাই। মানলাম, আপনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা তখন জেল খাটতে আছিলেন কিন্তু আপনেও তখন নিতান্ত অবোধ বালকটি তো না, আপনের কুড়ি-একুইশ বৎসর বয়স, কিন্তু আপনে তখন একটুও নজর দ্যান নাই। আপনে তখন মহাভারত রচনার মতন মহৎ কর্মে ব্যস্ত আছিলেন। আপনে নমইস্য ব্যক্তি, আমি ব্রাহ্মণ না হইলে আপনের পায় হাত দিয়া প্রণাম করতাম। কিন্তু আপনে জমিদার হিসাবে অপদার্থ। আপনে বিধবা বিবাহের জন্য লক্ষ টাকা ব্যয় করছেন শুনছি, কিন্তু আপনে আমার গ্রাম-গুলার অনাহারী মানুষগো জইন্যে এক মুঠা অন্নও দ্যান নাই।

—আমি বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য অর্থ

আদর্শের কাম করছেন। কিন্তু এদিগে যে আপনেগো অবিবেচনার ফলে গেরামের কত গেরস্থ বাড়ির বউ অকালে বিধবা হইল, সে খবর রাখেন নাই।

নবীনকুমারকে নিরুত্তর অবস্থায় গুম হয়ে যেতে দেখে ভুজঙ্গধর উঠে দাঁড়িয়ে কণ্ঠস্বর বদলে বললো, আরে রাম রাম. আমি শুধু বকবকই করতে আছি আপনের খাওন-শোওনের কোনো বন্দোবস্ত হইল না এহনও....আপনে বিশ্রাম করেন, ছোটবাবু, আমি একটু ভিতরে যাই—।

দিন তিনেক ভুজঙ্গধরের কুঠীবাড়িতে কাটিয়ে দিল নবীনকুমার। লোকটির সঙ্গে দু' বেলাই তার কথা কাটাকাটি হয়। ভুজঙ্গধর ইংরেজিতে নিরক্ষর হলেও বাংলা ও সংস্কৃতে যথেষ্ট পড়াশুনো করেছে, এই পরগনার বাইরের জগৎ সম্পর্কেও খবরাখবর রাখে। স্তাবক বা খোসামুদেদের বদলে স্পষ্টবাদীদের সে বরং বেশি পছন্দ করে। কিন্তু এই লোকটির কথা-বার্তা সে পুরোপুরি সহ্যও করতে পারছে না, আবার অগ্রাহ্য করতেও পারছে না।

একদিন প্রত্যুষকালে নবীনকুমারের নিদ্রা ভঙ্গ হলো একটি গান শুনে। অতি সুমিষ্ট সুর, গানের কথাগুলিও সুমধুর। নবীনকুমার ঘুম-জড়িত চক্ষে উঠে এসে দেখলো বাইরের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে একজন বৈষ্ণব গায়ক গুপীযন্ত্র বাজিয়ে গান গাইছে, আর সামনে একটি জলচৌকিতে বসে মুগ্ধভাবে শুনছে ভুজঙ্গধর।

নবীনকুমারকে দেখে ভুজঙ্গধর শশব্যস্তে উঠে এসে জিজ্ঞেস করলো, আপনার নিদ্রায় ব্যাঘাত হইল নাকি ছোটবাবু?

নবীনকুমার বললো, না। ভটচাজমশাই, ঐ গায়কটিকে এদিকে ডাকুন তো, গানটি ভালো করে শুনি।

গায়কটি নবীনকুমারের পরিচয় আগে থেকেই শুনে থাকবে নিশ্চয়। কাছে এসে সে ভূমিতে মস্তক ঠেকিয়ে প্রণাম জানিয়ে বললো দণ্ডবৎ, হুজুর। আপনার পিতারে আমি গান শুনাইছি। তিনি গান বড় ভালো বাসতেন।

নবীনকুমার বললো, ঐ গানটি আর একবার গান তো। কথাগুলো সব বুঝতে পারিনি।

গায়কটি আবার শুরু করলো :

হৃদিবৃন্দাবনে বাস, যদি কর কমলাপতি।
ওহে ভক্তপ্রিয়! আমার ভক্তি হবে রাধা সতী॥
মুক্তি-কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী,
দেহ হবে নন্দেরপুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী॥
আমায় ধর ধর জনার্দন! পাপ-ভার গোবর্ধন
কামাদি ছয় কংসচরে ধ্বংস কর সম্প্রতি॥
বাজায়ে কৃপা-বংশরী, মন-ধেনুকে বশ করি,
তিষ্ঠ হৃদিগোষ্ঠে, পুরাও ইষ্ট, এই মিনতি....

নবীনকুমার সহর্ষে তারিফ করে বললো, বাঃ, বাঃ! বড় খাসা বাঁধুনী! এমন সুন্দর রূপক-গান বহুদিন শুনিনি। এ গান কে রচেচে? এতো রামপ্রসাদেরও নয়, তিনি কালীভক্ত, আর এ গান বৈষ্ণবদের।

গায়কটি বললো, আজ্ঞে, এ গান দাসু রায় মশাইয়ের।

নবীনকুমার সবিস্ময়ে বললো, দাশু রায়?

ভুজঙ্গধর বললো, সে কি ছোটবাবু, আপনি দাসু রায়ের নাম শোনেন নাই? বর্ধমান-কাটোয়ার দাসু রায়ের গান বাংলায় কে না শোনছে? আমাগো এই দিকে কাশীমবাজারে গাওনা করতে আইসাই তো তিনি দেহরক্ষা করলেন। সে বোধকরি সেই সেপাই যুদ্ধের বছরে।

নবীনকুমার বললো, দাসু রায়ের নাম কেন ইতিপূর্বে শুনিনি। তার মুখ দিয়ে এমন গান বেরিয়েচে, বিশ্বাস হয় না!

ভুজঙ্গধর বললো ঐ তো মজা, দেখেই পছন্দ হয়। একেবারে মধুর কন্ঠে না কাইলে? আর হাসিয়ে কি সুখ দেবে পশ্যতি এ গানখান ক্ষেপেছে দ্বিতীয়বারে মনে হয়। এ গানও দাসু রায়ের। এমনকি নবদ্বীপের পণ্ডিতরাও দাস রায়কে সম্মান দিছে শাস্ত্র পর্যন্ত। আইচ্ছা এইডা শুইনা কন্ তো, কার?' নেতাই, সেইডা গা তো, দোষ কারো নয়গো, মা—।

নিতাই আবার ধরল :

দোষ কারো নয় গো, মা
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।
ষড়রিপু হলো কোদণ্ড স্বরূপ
পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ
সে কূপ ব্যাপিল, কালরূপ জল
কালমনোরমা।
আমার কী হবে তারিণি
ত্রিগুণ ধারিনি
বিগুণ করেছি স্বগুণে....

নিতাইয়ের গান মধ্যপথে থামিয়ে দিয়ে ভুজঙ্গধর জিজ্ঞেস করলো, এ গান আগে শুনেছেন কখনো ছোটবাবু? কন তো, কার?

নবীনকুমার বললো, এটি শ্যামাসঙ্গীত, অতি উচ্চাঙ্গের। এ গান নিশ্চয়ই রামপ্রসাদ কিংবা কমলাকান্তের।

ভুজঙ্গধর বললো, হইল না। এই গানও ঐ দাসু রায়েরই। একই মানুষ এই শ্যামাসঙ্গীত আর আগের বৈষ্ণব গান ল্যাখছে।

—আমরা তাকে অশ্লীল পাঁচালীকার হিসেবেই মানি। এই দুটি গানে তো একটাও নোংরা কথা নেই!

—তাহলেই বোঝেন আপনেরা কত কিছু ভুল জানেন শহরে বইস্যা। শোনেন তয় একটা গল্প কই। এই গানে ঐ যে একখান কথা আছে না, 'ষড়রিপু হল কোদণ্ড স্বরূপ'—ঐ কোদণ্ড শব্দটার ঠিক অর্থ দাসু রায় মশায় জানতেন না। তিনি ভাবছিলেন কোদণ্ড মানে কোদাল, তাই তো কোদণ্ড দিয়া কূপ খুড়াইছেন। কিন্তু আপনে সংস্কৃত অতি উত্তম জানেন, আপনের জানা আছে নিশ্চয়ই যে কোদণ্ড মানে হইল ধনুক। শুধু ধনুক, তীরও না, সুতরাং কোদণ্ড দিয়া কূপ কাটা যায় না, দাসু রায় মশায় ভুলই করছেন। এই লইয়া এক টোলের পণ্ডিতের ছাত্তররা দাসু রায় মশাইরে উপহাস করছিল। লেখাপড়া তেমন শেখেন নাই দাসু রায়, এক আধটা কথার ভুল হইতে পারেই, কিন্তু এমন গান বান্ধতে পারে কয়জন? টোলের ছাত্রগো সেই মস্করার কথা শুইন্যা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় রাম শিরোমণি ছাত্রগুলারে ডাইক্যা কইছিলেন, দাসু রায় যখন লেখছেন, তখন ওডা হইলো আর্ষ প্রয়োগ। আজ থিকা কোদণ্ডের অর্থ ধনুকও হবে কোদালও হবে।

নবীনকুমার বললো, বাঃ বেড়ে গল্পটি বে! দাসু রায়ের যে এসব দিকে এত সম্মান হয়েছিল, আমি জানতুম না। তবে গল্প শোনার চেয়ে গান শোনা ভালো। আরও গান গাইতে বলুন ওকে।

আরও তিন চারখানি গান শুনে উত্তরোত্তর মুগ্ধ হয়ে নবীনকুমার এক সময় বললো, একে আমি কলকাতায় নিয়ে যাবো। এমন চমৎকার এর সুরেলা কণ্ঠস্বর, শহরে গেলে এর যোগ্য সমাদর হবে। গান শুনে দাসু রায় সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভুল ভাঙবে।

ভুজঙ্গধর বললো, ওকে আপনি কলকাতায় নিয়া যাবেন?

—হ্যাঁ। আমি যখন ফিরবো, ও আমার সঙ্গে যাবে।

—বাঃ! অতি উত্তম প্রস্তাব। নিতাইচাঁদের কপাল খুইল্যা গেল। কী রে, নেতাই, ছোটবাবুর সাথে কইলকাতায় যাবি?

নিতাইচাঁদ গান থামিয়ে হাত জোড়

দাঁড়িয়ে আছে। লোকটির বয়স অন্তত ষাট হবে। কেশবিরল মস্তক, মুখখানি খুব সরু। তার আকৃতিতে কেমন যেন একটা শালিক পাখির ভাব আছে। গায়ে একটি নামাবলী।

ভুজঙ্গধরের প্রশ্ন শুনে সঙ্গে সঙ্গে সে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লো। তারপর বললো, তেমন লোভাইচ কি আমার হবে?

ভুজঙ্গধর বললো, তুই ছোটবাবুর নেকনজরে পইড়া গেছস, তোর আর চিন্তা কি? অ.ইজ বাইতে কইলে আইজই যাবি?

নিতাইচাঁদ বললো, নিশ্চয়। আমার তো পিছুটান নাই। কোনো দিন র্যালগাড়িতে উঠি নাই, বড় শখ একবার র্যালগাড়িতে যাই। আর কইলকাতায় গিয়া একদিন বরফ খামু। বরফের কথা অনেক শুনছি, কেনোকালে চইক্ষে দেখি নাই, জীবনে যদি এই সাধটা মেটে।

ভুজঙ্গধর হাসতে হাসতে বললো, দ্যাখলেন, দ্যাখলেন ছোটবাবু। ও এক কথায় রাজি। একেবারে এক পায়ে খাড়া। এই নেতাই বোষ্টমরে আমি চিরকাল ইস্তক দেখতে আছি, কেনোকালে এই দুই জনখান গেরামের বাহিরায় যায় নাই, আর আইজ আপনার কথা শুইন্যা অমনেই কইলকাতায় যাইতে চায়।

নবীনকুমার বললো, আমি কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ওর গান সবাইকে শোনাবো। এমন সুকণ্ঠের অধিকারী হয়ে শুধু শুধু গাঁয়ে পড়ে থাকবে কেন?

ভুজঙ্গধর এবার বিচিত্র মুখভঙ্গি করে বললো, গেরাম থিকা সব ভালো ভালো জিনিস যদি আপনেরা শহরে লইয়া যান তাইলে আমরা কী লইয়া থাকুম? শহর থিকা কিছু ভালো জিনিস ছিটে-ফোঁটা গ্রামে পাঠাইতে পারেন না?

নবীনকুমার বললো, এটাই এ যুগের রীতি। গড়চাজমশাই, সুযোগ পেলে সব গুণী জ্ঞানীরা শহরে যাবেই। কারণ শহরে টাকা আছে। টাকাই তো মধু। টাকা যে কতবড় মধু, তা আমি জানি। কিন্তু ছোটবাবু, শহরের সেই টাকার যোগান দেয় কে? এইসব গেরামের টাকাই শহরে যায় না? গ্রামই হইল গিয়া দেহ, এই দেহের সব রক্ত যায় শহর নামের মস্তিষ্কে। কি, ভুল কইতাছি? তবে, আপনেরাও এই কথাডা ভোলবেন না যে মানুষের হৃৎপিণ্ডটা থাকে দেহের মইধ্যেই, মস্তিষ্কে না। গ্রামই দ্যাশের প্রাণ।

নবীনকুমার নিজ গাত্র থেকে শালটি খুলে নিতাইচাঁদকে শিরোপা দিল। তারপর তার গুপী-যন্ত্রটি নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলো মনোযোগ দিয়ে।

সেইদিন থেকেই নবীনকুমার নিতাইচাঁদের কাছ থেকে সঙ্গীত শিক্ষা নিতে শুরু করলো। তার নিজের কণ্ঠেও বেশ সুর আছে, গান তুলতে পারে সহজে। এই শিল্পকলাটি সম্পর্কে তার মনের মধ্যে একটা টান রয়ে গেছে অনেক দিন থেকেই। হরিশ মুখুজ্যের সঙ্গে সে মুলুকচাঁদের আখড়ায় যেত প্রধানত নৃত্য-গীতের আকর্ষণেই। মনে মনে সে সঙ্কল্প নিয়ে ফেললো, এবার ফিরে গিয়ে সে বাড়িতে নিয়মিত গান বাজনার আসর বসাবে। গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে আরও ভালো ভালো গায়কের সন্ধান পেলে সে তাদেরও নিয়ে যাবে শহরে।

দিন দুয়েক পরে সে ভুজঙ্গধরের পেড়া-পিড়িতে একপ্রকার বাধ্য হয়েই গ্রাম পরিদর্শনে বেরুলো। এবার অবশ্য পদব্রজে নয়, পালকিতে। সঙ্গে দুলালচন্দ্র এবং অন্য কয়েকজন সহচরও রইলো। ঘোরা হলো প্রায় চার-পাঁচটি গ্রাম। মধ্যে মধ্যে পালকি থামিয়ে নবীনকুমারকে বিশ্রাম দেওয়া হয়, সেই অবসরে গ্রামের কিছু মানুষজনের সঙ্গেও দেখা হয়। অধিকাংশেরই রুগ্ন, শীর্ণ চেহারা। নবীনকুমার বিস্ময় বোধ করে। এখন নীলকর সাহেবদের অত্যাচার আর নেই, তবু গ্রামের মানুষদের এ দশা কেন?

এক স্থানে সম্ভবত আগে থেকেই কোনো ব্যবস্থা করা ছিল। নবীনকুমার একটি বড় আট-চালাসমেত কাছারি বাড়িতে এসে পৌঁছোলো মধ্যাহ্নে।

ভুজঙ্গধর জানলো যে এখানেই নবীনকুমার আহার সেরে কয়েক ঘণ্টা জিরিয়ে নেবে। তবে তার আগে স্থানীয় প্রজাদের একবার সাক্ষাৎ দিলে ভালো হয়।

নবীনকুমার কাছারি থেকে আটচালার প্রান্তে এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেল, সেখানে জমায়েত হয়েছে প্রায় হাজার খানেক মানুষ। ভুজঙ্গধর তাদের উদ্দেশে সাধু বাংলায় বললো, শুন, প্রজাগণ। আমাদের পরম পূজ্য জমিদার শ্রীল যুক্ত নবীনকুমার সিংহ মহাশয় তোমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত। কার্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায় তিনি এতদিন আমাদিগের এ অঞ্চলে আসিতে পারেন নাই। তোমরা ইঁহার অগ্রজ বাবু গঙ্গানারায়ণ সিংহ মহাশয়ের পরিচয় একক.লে জানিয়াছ। তিনি তোমাদের মঙ্গলের জন্য নিজের রক্তপাত পর্যন্ত করিয়াছিলেন, কারাগারের অন্ধকারে দুঃসহ ক্লেশের সহিত দিন কাটাইয়াছেন। ইনি তাঁহারই সুযোগ্য ভ্রাতা, আমাদের পূজনীয়, মহানুভব ঈশ্বর রামকমল সিংহের পুত্র। এতকাল পরে তিনি এতদঞ্চলে আসিয়া, তোমাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া এবং পর পর দুই বৎসরের আকালের কথা বিবেচনা করিয়া, তিনি দয়াপূর্বক তোমাদের এই দুই বৎসরের খাজনা মকুব করিয়া দিলেন।

প্রজারা প্রথমে একেবারে নীরব থেকে মুল

সভাটি হৃদয়ঙ্গম করে চিৎকার-চ্যাঁচামেচিতে একেবারে ফেটে পড়লো।

ভুজঙ্গধর নবীনকুমারের দিকে চেয়ে বললো, হুজুর, এবার আপনি ঘোষণাটি একবার নিজের মুখে উচ্চারণ করুন।

নবীনকুমারের কাছে ঘোষণাটি যেমনই অপ্রত্যাশিত, তেমনই অদ্ভুত। সে কড়া গলায় বললো, এই প্রহসনের মানে কী? এখেনকার আদায়-তহশিল আপনি করেন, আমি নামেই শুধু জমিদার। আপনি নিজের মুখে স্বীকার করেচেন যে এখেন থেকে একটা আধলাও আমরা পাই না। তবে আর আমার এ খাজনা মকুব করা না-করায় কী আসে যায়?

ভুজঙ্গধর বললো, ছোটবাবু, আমি আপনেগো টাকা কড়ি দেই বা না দেই সেটা ভিন্ন কথা। সেটা আমার-আপনেগো ব্যাপার। আমি জানি এই লোকগুলার এহন খাজনা দেওয়ার ক্ষামতা নাই। আমি হয়তো খাজনার জইন্যে অগো উপর চাপ দিতাম না, কিন্তু খাজনা না দিয়া জমিদারকে ঠকাইলে অগো মনের মইধ্যে একটা পাপের ভাব থাকে। অরা ভাবে, খাজনা না দিলে জমি পয়মন্ত হয় না। সুতরাং, আপনে জমিদার হইয়া যদি নিজের মুখে খাজনা মকুব কইরা দ্যান অরা স্বস্তি পায়।

দু' হাত তুলে প্রজাদের উদ্দেশ করে ভুজঙ্গধর আবার বললো, এই চুপ! চুপ! ছোটবাবু কথা কবেন. তোরা মন দিয়া শোন।

সকলে থেমে যেতে নবীনকুমার বললো তোমাদের খাজনা মকুব।

ভুজঙ্গধর বললো দুই বৎসরের জন্য।

নবীনকুমার বললো, না। চিরকালের জন্য। আজ থেকে আমার এলাকার সব জমি নিষ্কর হয়ে গেল।

নবীনকুমার এইটুকু বলে থেমে যেতেই এমন কোলাহল শুরু হয়ে গেল যে কান পাতা দুষ্কর। কারুর কোনো কথা বোঝা যায় না। প্রজারা অনেকে আত্মহারা হয়ে গেছে। জমিদার আছে, অথচ জমির খাজনা লাগবে না, এ আবার কেমন কথা! কয়েকজন লোক অতশত না বুঝেও ছুটে এলো নবীনকুমারের পায়ে পড়ে প্রণাম জানাবার জন্য। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে নিরাপত্তার জন্য নবীনকুমারের পক্ষে আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। ভুজঙ্গধর নবীনকুমারকে টেনে নিয়ে এলো কাছারি ঘরের মধ্যে।

এবার নবীনকুমারের মুখে মৃদু হাস্যের রেখা। ভুজঙ্গধরের চোখে স্থির দৃষ্টি রেখে সে কৌতুকের সুরে বললো কেমন জব্দ করলুম আপনাকে?

ভুজঙ্গধর বিমূঢ় ভাবে বললো, এ আপনে কী কইলেন ছোটবাবু? চিরকালের জন্য খাজনা মকুব? তাও কখনো হয় না কি? এ তো পোলাপানগো মতন কথা!

নবীনকুমার বললো, আপনি ভেবেচিলেন, আপনি নিজে চিরকাল আমাদের জমিদারির রোজগার হজম করবেন! সে পথ মেরে দিলুম কি না?

ভুজঙ্গধর বললো কিন্তু সরকারের ঘরে তো আপনাগো বৎসর বৎসর ট্যাকসো জমা দিতে হইবে ঠিকই—যদি কোনো আয় না থাকে, তাইলে...

—সে দেখা যাবেখন।

নবীনকুমারের ঘোষণায় বিরাট এক বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো। ইব্রাহিমপুর পরগনায় অনেকগুলি গ্রাম, সেইসব গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে কার কার খাজনা মকুব হলো, কার হলো না তা বোঝাই গেল না। যে-সব প্রজা সেদিন উপস্থিত ছিল জমিদারের সামনে, শুধু তারাই কি এই সুবিধে পেল? এর মধ্যে আবার কিছু এলাকা ছিল নীলকরদের কাছে ইজারা দেওয়া, সাহেবরা চলে যাবার পর চাষীরা আপনমনে চাষ করে চলেছে বটে কিন্তু জমি ইজারা মুক্ত হয়েছে কি না তাই বা কে জানে!

নবীনকুমারের পক্ষে আর ইব্রাহিমপুরের কুঠীবাড়িতে টেঁকাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। দলে দলে লোক ধেয়ে আসছে, তারা প্রত্যেকে নিজের জমির খাজনা বিষয়ে জমিদারের মুখ থেকে আশ্বাসবাণী শুনতে চায়। সে এক অসম্ভব ব্যাপার. নবীনকুমারের স্নানাহার করারও সময় নেই, কারণ এই সব অবোধ মানুষগুলি এক কথা বারবার বুঝিয়ে বললেও বোঝে না। গ্রামে-গঞ্জে ঢাক পিটিয়ে জমিদারের বার্তা জানাবার জন্য ঘোষক পাঠানো হলো। কুঠীবাড়ি ছেড়ে নবীনকুমার আশ্রয় নিল বজরায় সেখানেও তার সংগী রইলো ভুজঙ্গধর।

বজরা ভেসে চললো কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য ছাড়াই দিনে মাত্র একবার কোনো জনবিরল স্থানে থামে। ভুজঙ্গধরের কাছে প্রায় সর্বক্ষণ সে-গ্রামের জীবন যাত্রার খুঁটিনাটি বিষয় শোনে। এ যাত্রার প্রারম্ভে সে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল প্রকৃতি প্রেমে, এখন তার আগ্রহ জীবন্ত মানুষ সম্পর্কে। ইতিমধ্যেই নবীনকুমার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ইব্রাহিমপুর থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত একটানা পাকা সড়ক সে নিজব্যয়ে নির্মাণ করে দেবে। পথের যোগাযোগের অভাবে গ্রাম্য পণ্য মার খায়।

একদিন মধ্যাহ্নে নদীর দক্ষিণ তীরের একটি গ্রামে বহু লোকের বিপন্ন হাহাকার শোনা গেল। মানুষজন ঘর বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে। নবীনকুমার সেদিকে বজরা ভেড়াতে বলতেই ভুজঙ্গধর নিষেধ করলো। ঐ পারে সুখচরের জমিদারের এলাকা।

ভুজঙ্গধর বললো, আপনের পক্ষে ওখানে পদার্পণ করা মোটেই উচিত হয় না। ঐ হাথেন আর এক লাহায়ের জমিদার। ওনার নায়েব পাঁচখানা হাতি লইয়া গেরামে আসে। যে-সব দুষ্ট প্রজা খাজনা দেয় না, তাগো বাড়ি হাতির পায়ের গুতায় গুড়াইয়া দ্যায়। সেইজন্যই সুখচরের জমিদারের বাড়িতে সব সময় টাকা ঝমর ঝমর করে। সেই টাকায় বাবুরা কইলকাতায় বাঈজী নাচায় আর পায়রা উড়ায়। মন্দিরও বানাইছে দুই তিন খান!

একটু হেসে ভুজঙ্গধর জিজ্ঞেস করে, ছোটবাবু, আপনে কইলকাতায় মন্দির বানান নাই?

নবীনকুমার সে প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ না করে অন্যমনস্ক ভাবে বলে, সরকারের চোকে আমরা এখনো ইব্রাহিমপুরের জমিদার। আপনি আমাদের নায়েব। এখন থেকে আপনি নিয়মিত মাস মাইনে পাবেন। আপনার ওপর অনেক কাজের ভার দোবো। প্রতি দুখানা গাঁ অন্তর ইস্কুল বানাতে হবে, আকালের বচরে বিনা সুদে চাষীদের বীজ ধান আর খোরাকি ধান দিতে হবে। আর....

ভুজঙ্গধর বললো, কইলকাতায় ফিরা গ্যালেই সব ভুইল্যা যাবেন জানি। কিংবা, বিধু মুখুইজ্জা এখনো বাঁইচ্যা আছেন না? তিনিই সব ঘুরাইয়া দিবেন।

নবীনকুমারের বজরার হাল ভেঙে পড়ায় মেরামতির জন্য এক স্থানে থামতে হলো। টানা প্রায় পাঁচ দিন বজরায় বসে থেকে হাত পায়েরও খিল ধরে গেছে। নবীনকুমার নেমে একটু ঘোরাঘুরি করতে চায়। স্থানটি ইব্রাহিমপুর সদর থেকে অনেক দূরে, সম্ভবত নবীনকুমারের আগমনবার্তা এতদূর এসে পৌঁছোয় নি।

তিনকুড়ি আর ধানকুড়ি নামে পাশাপাশি দুটি গ্রাম। গত কাল এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে বলে গাছপালা আরও বেশী সবুজ। বাতাস খুব সুখপ্রদ। দুলাল ও ভুজঙ্গধর সমভিব্যাহারে নবীনকুমার হাঁটতে হাঁটতে চলে এলো অনেকখানি। তাদের পশ্চাতে ছোট একটি কৌতূহলী দলের ভিড় জমেছে। সেদিকে মন না দিয়ে নবীনকুমার সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলেছে।

একটি তাল গাছের নিচে বহুকাল আগে অগ্নিদগ্ধ এক কুটিরকে ঘিরে আগাছার এক জঙ্গল জন্মে গেছে। সেখান দিয়ে যেতে যেতে অকস্মাৎ মনুষ্য কণ্ঠের ঘড় ঘড় শব্দ শুনে নবীনকুমার থমকে দাঁড়ালো।

সেই জঙ্গল ভেদ করে বেরিয়ে এলো একজন অনেকটা মনুষ্যাকৃতি হলেও সে মানুষ না বনপ্রাণী তা সহজে বোঝা যায় না। তার পরণে কোনো সুতির বস্ত্র নেই, কয়েকটি গাছের ডাল তার কোমরের ঘুনসীর সঙ্গে বাঁধা। বুকে মুখে মাটি মাখা। অন্তত পঁচিশ-তিরিশ বছর সে কোনো ক্ষৌরকারের সংস্পর্শে যায় নি। লোকটি এগিয়ে এসে এই দলটির দিকে স্থির চেয়ে তাকিয়ে রইলো।

গ্রামবাসীদের কয়েকজন বলে উঠলো, সাবধান বাবুরা, ওর কাছে যাবেন না।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, কে এই লোকটি?

গ্রামবাসীরা জানালো যে, এই লোকটির না[ম] ত্রিলোচন দাস। এক সময় অনেক বৎসরের খাজন বাকি পড়ায় জমিদারের লোক-লস্কর এসে ওর বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। সব কিছু এখনো সেই অবস্থাতেই আছে।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, এখানে কাদে[র] জমিদারি?

ভুজঙ্গধর তাড়াতাড়ি বলে উঠলো যে, এটা[ও] ইব্রাহিমপুরের মধ্যেই বটে, কিন্তু এই ঘটনা তা[র] আমলে নয়। এ ঘটনার কথা সে জানে। ভুজঙ্গধ[র] নায়েবী করছে গত বিশ বৎসর। তার আগেকা[র] নায়েব উদ্ধবনারায়ণের নাম শুনলে এখনো অনেকে ভয়ে কাঁপে। প্রজাদের ঘর বাড়িতে অগ্নি সংযো[গ] করা ছিল তার শখের ক্রীড়া।

নবীনকুমার বললো, এতকাল ধরে এই বাড়ি সেই অবস্থায় আছে। আপনার আমলেও আপনি কিছু সুবন্দোবস্ত করেন নি?

ভুজঙ্গধর জানালো যে, চেষ্টা করলেও করবা[র] উপায় নেই। ও কারুকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

গ্রামবাসীরা আরও তথ্য জানালো যে, নায়েবে[র] অত্যাচারে লোকটি স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে নিয়ে দে[শ] ছেড়ে চলে যায়। অনেক দিন ওর কোনো সংবাদ ছিল না, ওর ভিটে এই পোড়ো অবস্থাতেই ছিল। তার পর বেশ কিছু বছর পর ও একা ফিরে আসে ঘো[র] উন্মাদ হয়ে। নিজের ভিটেটুকু শুধু চেনে। আ[র] কোনো মানুষ চেনে না।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, ও এই ভিটের মা[টি] কামড়ে কামড়ে খায়। আর কোনো খাদ্য ওকে কে[উ] গ্রহণ করতে দেখেনি কখনো। এমন কি অন্য কে[উ] কিছু খাদ্য ছুঁড়ে দিলেও ও তা স্পর্শ করে না শুধু মাটি খেয়েই ও বেঁচে আছে।

এই সময় ত্রিলোচন দাস ধীর স্বরে বললে[া] বাবু, একটু জল দেবেন, চিঁড়ে ভিজায়ে খাবো!

নবীনকুমার বললো ঐ তো লোকটি জ[ল] চাইছে, চিঁড়ে চাইছে!

গ্রামবাসীরা চেঁচিয়ে বলে উঠলো, না, শুনবেন না, ওটা ওর কথা। কিন্তু নবীনকুমার সব অগ্রাহ্য করে দু' এক পা এগিয়ে গিয়ে বললে[া] হ্যাঁ, তোমাকে চিঁড়ে দোবো, অন্য খাদ্য দোবো তোমার চিকিৎসা করাবো তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

ত্রিলোচন দাস সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বাঘের ম[ত] এক লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো নবীনকুমা[রের] ওপরে। কেউ কিছু বোঝবার আগেই দেখা গে[ল] নবীনকুমার ভূতলশায়ী, আর ত্রিলোচন তার বক্ষ[দেশ] কামড়ে ধরেছে।

সকলে মিলে হুড়োহুড়ি করে যখন ত্রিলো[চন] দাসকে টেনে তোলা হলো, তখন দেখা গেল মুখে নবীনকুমারের পোশাকের একটি টুকরো স[হ] এক খাবলা মাংস।

তার প্রভুর এই দশা করেছে দেখে দুলাল [র]অধীর হয়ে তৎক্ষণাৎ লোকটির চুলের মুঠি ফেলে দিল মাটিতে এবং তারপর তার হাত [ও] সমানে চালাতে লাগলো। অন্যরাও যোগ দিল সঙ্গে। অল্পক্ষণের মধ্যেই উন্মাদ ত্রিলোচন দুলালের প্রহারে খুন হয়ে গেল।

ভুজঙ্গধরের ক্রোড়ে শায়িত নবীনকুমার সংজ্ঞাশূন্য। তার ক্ষতস্থান দিয়ে ভলকে ভলকে বেরিয়ে আসছে।

বাহার তখনই
আসবে যখন কাপড়ের
বুনিয়াদ ভাল
মোরারজী ফ্যাব্রিকস
আপনাকে যা দেয়
তা সুন্দর রঙ আর
ডিজাইনের চেয়েও
বিশেষ কিছু
কোয়ালিটি।
যে কোয়ালিটি আমরা অতি
যত্নে কাপড়ের প্রতিটি সুতোয়
গেঁথে রাখি আর যা এক শ'
বছরের অভিজ্ঞতায় আজ হয়ে
উঠেছে এক নিখুঁত শিল্প।
এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে
ডিজাইনের বাহার তখনই আসবে
যখন কাপড়ের বুনিয়াদ হয় ভাল।
স্যুটিং • শার্টিং • শাড়ী
• ড্রেস মেটিরিয়াল
MORARJEE MILLS
মোরারজী মিলস্

## সাহিত্য

# এক হিন্দু মৌলবীর আত্মকথা : গিরিশ সেন

আজকের পাঠকের কাছে গিরিশচন্দ্র সেন হয়তো সম্পূর্ণ অপরিচিত। তার 'আত্মজীবন'-এর নামই বা কে শুনেছে একালে। অথচ এই নামটি ভুলে যাবার মতন নয়। গিরিশচন্দ্র সেন আরবী, পারসিক, উর্দু, সংস্কৃত ও বাংলায় সমানভাবে পারদর্শী ছিলেন—এ কথা বললে তাঁর পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায়; কিন্তু মানুষটিকে চেনা যায় না। মূল আরবী কোরান শরিফের বাংলা ভাষায় প্রথম অনুবাদক গিরিশচন্দ্র। আবার বিগত শতকে তিনিই কয়েকটি অসাধারণ জীবনী উপহার দিয়েছিলেন বাংলা ভাষায়। আজকের পাঠকের কাছে তাঁর কোন বই সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে তাঁকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার অপেক্ষা রাখে। সেই পরিচয়ের উদ্দেশ্যে তাঁর অর্ধশতাধিক গ্রন্থ থেকে বেছে নিয়েছি—'আত্মজীবন' গ্রন্থটিকে। পরিশুদ্ধ সহজ বঙ্গ ভাষায় সম্পূর্ণ গ্রন্থটি লিখিত। ব্যতিক্রম শুধু গ্রন্থের নামকরণে আর নামপত্রে একটি সংস্কৃত শ্লোকে। প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতা থেকে—সেই একবারই **১৯১৩ সালের ২২ পৌষ (ইংরাজী ১৯০৬) ছাপিয়েছিলেন** গুপ্ত মুখারজি অ্যান্ড কোং। নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য ১ টাকা মাত্র।

সং জীবনী সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র সেন অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। মৃত ব্যক্তির জীবনচরিত রচনা করতে গিয়ে জীবনীকার জীবন সম্বন্ধীয় প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে অনেক সত্যকে প্রচ্ছন্ন করেন কিংবা অনেক অসত্য সত্যরূপে ব্যক্ত হয়। আবার কখনও বা অযোগ্য লোককে কল্পনাবলে স্বর্গে তোলেন, আবার একজন সুযোগ্য লোককে রসাতলে পাঠান। নিজের জীবনের বৃত্তান্ত প্রত্যেকে নিজে যেরূপ জানেন এবং যথার্থ বলতে পারেন, অপর লোকে কখনও সেরূপ জানতে পারেন না। সুতরাং, ঠিক বলতে ও লিখতে পারেন না। আর ঠিক উল্লিখিত কারণগুলির জন্যই গিরিশ সেন তাঁর আত্মজীবনী লিখতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। জীবনের ক্লান্তিকালে সত্তর বছরের অভিজ্ঞতা দিয়ে সুখ-দুঃখ, ধর্মাধর্ম, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আলোক-অন্ধকারাদির আলপনা আঁকলেন লেখক।

বিস্ময়কর গ্রন্থ এটি। আত্মজীবনী রচনা বাংলা সাহিত্যে অভিনব নয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী সব ব্রাহ্ম নেতারাই তাঁদের আত্মজীবন কথা লিখে রেখে গেছেন। অব্রাহ্মরাও লিখেছেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, নবীনচন্দ্র সেন, কৃষ্ণকুমার মিত্র—এই ধরনের আত্মজীবনীগুলিতে কোন ক্ষেত্রে তাঁদের অন্তর্জীবনের ছায়া পড়েছে, কোথাও বা শিল্পের তাগিদে শিল্প সৃষ্টি হয়েছে। আবার কোথাও বা প্রচুর তথ্যগুণে উনিশ শতকের জীবন্ত দলিল হয়ে উঠেছে। গিরিশচন্দ্র সেনের 'আত্মজীবন' দ্বিতীয় পর্যায়ের। পাঠান্তে বইটির স্বতন্ত্র মূল্য ধরা পড়ে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি তথ্য জানা দরকার। যেমন গিরিশ সেন ব্রাহ্ম ছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের প্রবর্তিত নববিধান ধর্মের একান্ত অনুগত ভক্ত প্রচারক তিনি। কেশবচন্দ্র সেনের সর্বধর্ম সমন্বয়ী দর্শনে গিরিশচন্দ্র সেন ইসলাম ধর্ম ও শাস্ত্র আলোচনার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

গিরিশ সেন কিশোর বয়সেই ইংরেজী ত্যাগ করে পারসিক ভাষা শিখতে শুরু করেছিলেন। কৃষ্ণ রায়ের কাছেই লেখক তওয়ারিখ জাহাঁগির, মাদনোল্জওয়াহের, মহব্বতনামা, বহরদানেশ, সেকন্দরনামা, রোক্কাতে ইয়ার মহম্মদ গোলেস্তান ইত্যাদি গ্রন্থের অধ্যয়ন করেন। পরে অবশ্য ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি লখনৌ নগরীতে এই ভাষা অধ্যয়নের পূর্ণ সুযোগ পান। তিনি ইসলামী সাহিত্যের চর্চা করেছিলেন বলে বাঙালীর কাছে তিনি মৌলবী গিরিশ নামে প্রসিদ্ধ। ধর্মসাধন নীতি পুস্তকের সমালোচনায় শ্রীমতী আর এস হোসেন তাঁকে 'মোসলমান ব্রাহ্ম' বলে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন খাঁটি স্বদেশী। ইংরেজী কিংবা ইসলামী কোন প্রভাবই তাঁর ব্যক্তি জীবনকে স্পর্শ করেনি। "আমি একজন সভ্যজগতের বহির্ভূত লোক। আমি কখনও ইংরেজী জুতা পাদস্পর্শ করি নাই কোনরূপ বিলাতী পোশাক পরি নাই। পরে আমি বিশেষভাবে মুসলমান শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছি, মোসলমান সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে সম্বদ্ধ হইয়াছি, কিন্তু মোসলমানদিগের ন্যায় জীবনে কখনও শ্মশ্রু ধারণ করি নাই, ইজার চাপকান পরি নাই, এবং মস্তকে টুপি ধারণ করি নাই, ভক্ত হই নাই। নববৃন্দাবন নাটকের ট্যাবলোতে একদিন মাত্র আমি মৌলবী সাজিয়াছিলাম, তখন কিয়ংক্ষণের জন্য কৃত্রিম শ্মশ্রু ধারণ এবং মৌলবীর পোশাক, টুপি ও ইজার চাপকান পরিয়াছিলাম।" আর একবার পরেছিলেন হায়দ্রাবাদে। সরোজিনী নাইডুর মা, ডঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী হায়দ্রাবাদে মোসলমানদের এক সভায় উর্দু বক্তৃতা দিতে যাওয়ার আগে টুপি, ইজার ও চাপকান পরবার অনুরোধ করেন। বাস, এই পর্যন্ত আর কোনদিনও মুসলমানী পরিচ্ছদ তিনি পরেন নি। তিনি বিয়াল্লিশ বছর বয়স থেকে নিয়মিতভাবে নিষ্ঠাভরে আরব্য ব্যাকরণ ও পারস্য দেওয়ান হাফেজের চর্চা করেছিলেন। কিন্তু কোরানের অনুবাদ কয়েক খণ্ড প্রকাশিত হলেও কিছু মোসলমানেরা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন—"আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ একজন কাফের করিয়াছে, তাহাকে পাইলে তাহার শিরচ্ছেদন করিব।" এমন ভীতিও তাঁকে দেখান হয়েছিল। তা ছাড়া, 'হদিস' গ্রন্থটি ক্রয় করতে

গিয়েও তিনি অপদস্থ হয়েছিলেন। মোসলমান বিক্রেতা দূর থেকে কেতাবখানা প্রদর্শন করেছিলেন মাত্র, তাঁকে স্পর্শ করতে দেননি। এক মুসলমান দপ্তরীকে দিয়ে তিনি গ্রন্থটি কিনে আনেন, আর একজন মোসলমান ব্রাহ্ম তাঁকে কোরান খরিদ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর অনূদিত কোরান ও হদিস অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে বাঙালী মুসলমান সমাজ গ্রহণ করেছেন। এবং অনেক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত মৌলবী তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানান—"আমরা বিশ্বাসে ও জাতিতে মোসলমান আপনি নিঃস্বার্থভাবে জনহিত সাধনের জন্য যে, এতাদৃশ চেষ্টা ও কষ্ট সহকারে আমাদিগের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরানের গভীর অর্থ প্রচারে সাধারণের উপকার সাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন, এ জন্য আমাদের অত্যুত্তম ও আন্তরিক বহু কৃতজ্ঞতা আপনার প্রতি দেয়।" আত্মজীবনের পাতায় মৌলবী গিরিশ সম্পৃক্ত বিবরণগুলি মানুষ গিরিশ সেনকে রহস্যাবৃত করতে সাহায্য করে।

নব বিধান সমাজে অনেক ভক্তের আত্মচরিতের বেলায় যেমনটি ঘটেছিল—গিরিশ সেনের 'আত্মজীবন' গ্রন্থটিও এতকাল পুরোটাই 'বেক্ষ ব্যাপার' বলে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু 'আত্মজীবন' উনিশ শতকের অনেক ঘটনার সাক্ষী। রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল ও একাল' কিংবা শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' ও 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ'-এর মতই বহুবিধ ঘটনায় ঠাসা এই গ্রন্থ। শাস্ত্রী মশাই-এর লেখায় যেমন তৎকালীন কলকাতার সমাজ জীবন্ত, গিরিশ সেনের আত্মজীবনে পূর্ব বঙ্গের সমাজ ঢাকা ও ময়মনসিংহকে কেন্দ্র করে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটেছিল তারই বিশ্বস্ত ছবি ফুটে উঠেছে।

দেওয়ান বংশের ছেলে পিতামহ রামমোহন রায়ের পৌত্র গ্রামজীবনে ছিলেন গোঁড়া হিন্দু পৌত্তলিক। বারো/তেরো বছরের সময় কুলগুরুর কাছে শিব মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন। জাতিভেদ প্রথা ছিল পূর্ববঙ্গে প্রবল। সেই সংস্কার নিয়ে বালক গিরিশ বিশ্বাস করতেন মোসলমানের ছায়া মাড়ালে অপবিত্র হতে হয়। "তখন জাতিভেদের বড় আঁটাআঁটি ছিল, এখন মোসলমানে রাঁধিলেও কোন হিন্দুর চলে, তখন শূদ্র চাকরে রাঁধিলেও খাওয়া হইত না। পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মণ পাচক সুলভ ছিল না, এখনও নয়।" নয়/দশ বছরের ছেলে আহারে বসেছে এক শূদ্রজাতীয় স্ত্রীলোকের আঁচলটি পাশ কাটিয়ে যাবার সময় বালকের গায়ে লাগে বলে তার আহার করা আর হল না। কে জানত এহেন বালক উত্তরকালে মুসলমানী ধর্ম ও সাহিত্য আলোচনা করে 'মৌলবী' হবেন।

পূর্ববঙ্গের গ্রামগুলিতে কবিগানের দলের মত 'সখী সংবাদ গানের দল' ছিল। শিবচন্দ্র সিংহ এই দলের নেতৃত্ব করতেন। শিব সিংহের সখী সংবাদ দলটি ঢাকা ও ময়মনসিংহে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ঢাকায় ছিল ইংরেজী স্কুল 'পোগোজ স্কুল'। ময়মনসিংহ শহরে ছিল একটি সংস্কৃত পাঠশালা। প্রধান শিক্ষক ছিলেন ভগবানচন্দ্র বসু আর পার্বতীচরণ তর্করত্নের কাছ থেকে ঐ সংস্কৃত পাঠশালায় গিরিশ সেন সংস্কৃত ভাষার পাঠ গ্রহণ করেন। শিক্ষা ও শিক্ষার্থী উভয়ের গুণে অল্পদিনের মধ্যেই গিরিশ সেন সংস্কৃত কবিতা রচনায় সক্ষম হন। এ ছাড়া, গিরিশ সেনই বোধ হয় একমাত্র যিনি "বনিতা বিনোদ" কবিতা পুস্তকে পদ্যবন্ধে নারী শিক্ষার বিধান দিয়েছিলেন। পাঁচদোন গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে কিংবা পরে কলকাতায় ভারতাশ্রমে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করে তিনি স্ত্রী শিক্ষার অনেক প্রসার ঘটিয়েছিলেন।

আজকের সমাজে দুর্নীতির কালো ছায়া আমরা সর্বত্র দেখি কিন্তু বিগত শতাব্দীতে সমাজনীতির মানটি কেমন ছিল? আমাদের কৌতূহল মেটাতে 'আত্মজীবনে'র কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। "আমি বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদির কিছু কিছু আলোচনা করিয়া নর্মাল শ্রেণীতে প্রবেশের পরীক্ষা দান করি। আমি গণিত জানিতাম না, কোন সহাধ্যায়ী গণিতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পক্ষে আমার সহায়তা করিয়াছিলেন। তখন এরূপ কার্য অনীতি ও অন্যায় বলিয়া বড় বোধ ছিল না, অনেককে এরূপ অনীতির পথ অবলম্বন করিতে দেখা গিয়াছে। গিরিশচন্দ্র সেন মুনশী কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বাড়িতে থেকে পারস্য ভাষার চর্চা করেন। তখন তাঁর চোখে পড়ে "কৃষ্ণ রায় মদ্যপায়ী ছিলেন, প্রত্যহ মদ্যপান করিতেন ভদ্র পরিবারের একটি বিধবা নারী তাঁহার গৃহে স্থিতি করিয়া তাঁহাকে দুই বেলা রাঁধিয়া দিত, এবং তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিত। সেই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে তাঁহার অপবিত্র যোগও ছিল। তিনি আমার পার্শ্বে বসিয়া মদ্যপান করিতেন, মদ না খাইলে বুদ্ধির স্ফূর্তি হয় না, ভাল শিক্ষা হয় না—এরূপ বলিয়া কখন কখন আমাকে সুরাপানে প্রবৃত্তিদান করিয়াছেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি তাঁহার আশীর্বাদে ওস্তাদজীর সে উপদেশ গ্রহণ করিয়া কারণ স্পর্শ করি নাই।" সে সময়েও চাকুরিস্থলে স্বজনপোষণ নীতি চলত। ... স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র সেই স্কুলেরই পণ্ডিত পদে চাকুরি পেয়েছিলেন, কারণ যুবকটি নিঃস্ব, নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণ। এই চাকরিটি যুবকটিকে পাইয়ে দেবার ... আমলাতান্ত্রিক কৌশল অবলম্বন করাটাকে স্বয়ং গিরিশ সেনও দুর্নীতি মনে করেন নি। লেখক আত্মজীবনে ক্ষুদ্র, নীচ ঘটনাগুলিকেও সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে ব... করে গেছেন—যেমন গান্ধীজী করেছেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ধর্ম প্রচার উদ্দেশ্যে ভ্রমণে বার হন। সঙ্গে ছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, অঘোরনাথ গুপ্ত, দীন...

মজুমদার, উমানাথ গুপ্ত, [illegible]চন্দ্র সিংহ, বঙ্গচন্দ্র রায় দুর্গানাথ রায়, মহেন্দ্রনাথ ন[illegible]ন। এই প্রচারযাত্রী দলে গিরিশ সেনও একজন যাত্রী [illegible]লেন। এই প্রচার সুদূর সিন্ধু দেশ ও বুন্দেলখণ্ড এবং দক্ষিণে মাদ্রাজ পর্যন্ত হয়েছিল—তার পূর্ণ বিবরণ এবং কোথায় কোথায় কিভাবে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করা হয়েছিল—কোথাও সংকীর্তনের সাহায্যে কোথাও উর্দু, কোথাও হিন্দী ভাষায় বক্তৃতার দ্বারা তার পূর্ণ মনোজ্ঞ বিবরণ তিনি দিয়েছেন। পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম প্রচারকেরা খুব নিগৃহীত হয়েছিলেন। কোনও গৃহস্থের বাড়িতে তাঁদের আতিথ্য দেওয়া হয়নি। ঢাকার নববিধান সমাজের উপাচার্য ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের (যাঁকে সবাই পূর্ববঙ্গের কেশব সেন বলতেন) নেতৃত্বে বরিশাল অঞ্চলে ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে জয় সিংহের খালে পথ হারিয়ে সারারাত্রিব্যাপী কতকগুলি তরুণ ব্রাহ্ম যুবকের যে ভীতিকর অভিজ্ঞতা, কিংবা বনগ্রাম থেকে যশোহরে প্রচার যাত্রা ইত্যাদি বর্ণনায় যেন ইতিহাসের এক রোমাঞ্চকর আস্বাদ পাওয়া যায়।

ভ্রমণবিলাসীদের জন্যও কিছু কৌতূহল উদ্দীপক বিবরণ রেখে গেছেন তিনি। কেশবচন্দ্র সেন স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যখন সপরিবারে গাজীপুরে গিয়েছিলেন সেই সঙ্গে গিরিশ সেনও ছিলেন। "তখন দেলদার নগর হইতে গাজীপুরে গমনের ব্রাঞ্চ লাইন হয় নাই। জমানিয়া স্টেশন হইতে যাত্রিকদিগকে উটের গাড়ি বা ডাকযোগে ১৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে হইত। আমরা রাত্রিতে জমানিয়াতে পেঁীছিয়া ছিলাম। পরদিন প্রাতে আচার্য ডাকগাড়িতে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন, আমরা সকলে একখানা দ্বিতল উটের গাড়িতে চড়িয়া যাত্রা করিয়াছিলাম।" গাজীপুরেই ব্রহ্মানন্দ ও তাঁর সব সঙ্গীরা দর্শন করলেন হিন্দু যোগী পওহরী বাবাকে। তাঁহার মধ্যম বয়স উজ্জ্বল গৌরকান্তি, সৌম্য প্রশান্ত মূর্তি ছিল তিনি বিনয়ের অবতার ছিলেন, আচার্যকে উপস্থিত দেখিয়া বিনত মস্তকে প্রণাম করলেন।" এই বিখ্যাত সন্ন্যাসীর সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ হয়েছিল। স্বামী অভেদানন্দও অলৌকিক যোগশক্তিসম্পন্ন এই পবন-ভক্ষ মহাপুরুষকে গাজীপুরে দর্শন করেছিলেন। ঈশ্বর প্রসঙ্গে আলাপ আলোচনাও হয়েছিল। এঁরা সকলে প্রায় কাছাকাছি সময়ে এসেছিলেন গাজীপুরে। স্বামী অভেদানন্দের 'আমার জীবনকথায়' ও গিরিশ সেনের 'আত্মজীবন'-এ পওহরী বাবার মহত্ত্ব বোঝাবার জন্য 'চোরের প্রতি বাবার সাধু ব্যবহারের' সেই একই গল্পটি উভয়ের গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দেও বাঙালীরা দেরাদুন, মুসৌরি, হরিদ্বারে ভ্রমণে যেতেন। কিন্তু যেতে হত বিভিন্ন যানে—ট্রেনে, এক্কাগাড়িতে, গোযানে, অশ্বারোহণে কিংবা কখনও বা পদব্রজে। গিরিশ সেন ৪২ মাইল পার্বত্য দুর্গম পথ দিয়ে এক্কা গাড়িতে চড়ে দেরাদুনে পেঁৗছেছিলেন। রাজপুর থেকে ৭ মাইল পথ অশ্বারোহণে অতিক্রম করে মুসৌরিতে পেঁৗছান। আর দেরাদুন থেকে ৩৫ মাইল নিবিড় অরণ্যময় পথ পদব্রজে অতিক্রম করে হরিদ্বারে আসেন। আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন তিনি এক্কা গাড়িতে ভ্রমণ করেন। সীতাকুণ্ড, বিঠোর ও কুতুব তিনি গিয়েছিলেন গরুর গাড়িতে চড়ে।

পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম আন্দোলন ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচার, ঢাকায় বিভিন্ন জেলায় ব্রহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্ম যুবকদের মধ্যে মতানৈক্য ও বিরোধ, কুচবিহার বিবাহের প্রতিবাদে পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মসমাজে ভাঙন, সকল বিষয়ের বিস্তৃত প্রতিবেদন এই গ্রন্থটি। কলকাতায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজে কুচবিহার বিবাহের ফলাফল যে জঘন্য দলাদলির সৃষ্টি করেছিল তার বর্ণনা শিবনাথ শাস্ত্রী দিয়েছেন। পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম সমাজে এই বিবাহের ফলশ্রুতিস্বরূপ বিবাদ ও একই জাতীয় দলাদলির চিত্র উদ্ঘাটিত করেছেন গিরিশ সেন।

গ্রন্থটি প্রকাশের কাল ছিল ১৯০৬। পূর্ব বছর বঙ্গভঙ্গের বছর। বাংলার ইতিহাসের এক চরমক্ষণ। [illegible] সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইংরেজের এই কু-ইচ্ছা নিবারিত হল। কিন্তু গিরিশ সেন পোশাকে, আচারে, আহারে সম্পূর্ণ স্বদেশী হয়েও এই ব্যাপারে বিদেশী ইংরাজকে সমর্থন করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন তা স্কুলের অল্পবয়সী ছেলেদের যেভাবে উত্তেজিত করেছিল আর ছাত্ররা নিয়মবিধি অগ্রাহ্য করে সারা দেশময় যে উৎপাত শুরু করেছিল—সেটাই তাঁর আপত্তির কারণ ছিল। লেখক রাজনৈতিক আন্দোলন-বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ইংরেজ জাতি ও লর্ড কার্জনকে সমর্থন করেছেন ও উচ্চ ভাষায় তা তিনি জানাতে সঙ্কোচ বোধ করেননি।

বহুবিধ তথ্যের ক্রমাগত বর্ণনায় গ্রন্থটিতে অতিরিক্ত বোঝার ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। গিরিশ সেন বাংলা সাহিত্যের শুধুই অনুবাদক কিংবা জীবনীকার নন, তিনি সাহিত্যিক। প্রতিটি ঘটনাই বর্ণনার সহজ মাধুর্যে রসযুক্ত হয়েছে। তাঁর ঘূর্ণায়মান জীবনের দুটি দুর্ঘটনার ছবি সকল যুগের সকল পাঠককুল উপভোগ করবেন। একটি তাঁর স্ত্রী ব্রহ্মময়ীর মৃত্যু, অপরটি তাঁর মার মৃত্যু। মৃত্যু মানুষের জীবনে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, করুণ সত্য। কোন বিবিক্ত ঘটনা মাত্র নয়। জীবনকে নিয়ে, পারিপার্শ্বিককে ঘিরে পরিজনকে জড়িয়ে ধরে মৃত্যু কত সহজ, সুন্দর ও প্রেমসিক্ত হয়ে ওঠে, ভয়ঙ্করও কেমন শ্যাম সমান হয়ে ওঠে গিরিশ সেনের লেখায় তাই আমি পেয়েছি। সমগ্রভাবে এই বইটি পড়ে আমি উপন্যাসের স্বাদ পাই। বিচিত্র গতিময় একটি জীবন, সমাজ, ধর্ম, জাতি, পরিবেশ, দেশ ও দেশের মানুষের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে নতুন করে সৃষ্টি করে চলেছে নিজেকে। পটভূমি উনিশ শতক নায়ক লেখক নিজে। হৃদয় আলোকে উদ্ভাসিত এক গভীরতর সত্যানুভূতি সমগ্র গ্রন্থখানি সংগ্রথিত করেছে।

মায়া বসু

লাবণ্যময়ী রূপে রমণীয় টিপটি পরুন।
ভারতীয় সৌন্দর্যের
সুন্দরতম সাজ
DELUXE KUMKUM

# বিজ্ঞান

## বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার : ১৯৮০

**রসায়নে**

রসায়নে উল্লেখযোগ্য গবেষণার দরুন যে তিন বিজ্ঞানীকে ১৯৮০ সালের নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে তাঁদের অন্যতম হলেন পল বার্গ। পুরস্কার-অর্থের অর্ধেক পেয়েছেন তিনি। অবশিষ্ট অংশ সমান দুই ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়াল্টার গিলবার্ট এবং ইংলন্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফ্রেডারিক স্যাংগারের মধ্যে।

'তিনি এমন একটি ব্যাপার নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত যা কার্যেই পরিণত হয় নি।' নোবেল পুরস্কারের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর পল বার্গ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন জনৈক বিশেষজ্ঞ।

নোবেল কমিটির বক্তব্য, পল বার্গের গবেষণা-বিষয়ক প্রকল্প নিয়ে গোড়ায় প্রচুর ঝড় বয়ে গেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু যে আশংকার উপর ভিত্তি করে এই ঝড়, সেটা কিছুটা বাড়াবাড়ি বলেই মনে হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জিন প্রযুক্তি বিজ্ঞানে গবেষণার ব্যাপারে বিভিন্ন বিধি-নিষেধ রচনায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণও বটে। একথা বিবেচনা করেই পুরস্কারের অর্ধেক সম্মানমূল্য অধ্যাপক পল বার্গকে অর্পণ করা হয়েছে।

জীবজগতের বংশগতির ধারক এবং বাহক এক ধরনের জটিল রাসায়নিক যৌগ—যার নাম ডিঅক্সি-রাইবোনিউক্লেয়িক অ্যাসিড বা সংক্ষেপে ডি এন এ—বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে ১৯৬০এর দশকেই স্থির নিশ্চয় হয়েছিলেন। ওই একই সময়ে আবিষ্কৃত হল ডি এন এর গঠন বৈচিত্র্যের ছক। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, ভাইরাসই হোক অথবা অতিকায় নীল তিমি—তাদের সবার ডি এন এরই মূল উপাদান একই। কীভাবে সেই সব উপাদান পরস্পরবিন্যস্ত এবং এক এক বিন্যাসে তাদের সংখ্যা কত তারই উপর নির্ভর করে কোন প্রাণী ভাইরাস হিসেবে বিরাজ করবে, কিংবা রূপ পরিগ্রহ করবে তিমি, পাখি বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং মানুষের অবয়বে।

প্রশ্ন উঠল কোন প্রাণী এবং উদ্ভিদের পরিপূর্ণ রূপ এবং শারীরবৃত্তীয় কাজ-কর্ম যদি তার 'ডি এন এ' বা জিনের উপর নির্ভর করে, তা হলে সেই 'ডি এন এ' বা জিনের রাসায়নিক গঠনের কিছুটা হেরফের ঘটিয়ে অনেক কিছুই তো করা যায়। যেমন ধরুন, খাদ্য-সমস্যা। পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে। প্রয়োজন আরও অধিক পরিমাণ খাদ্য। উৎপাদন বাড়াতে হবে গম, ধান ইত্যাদির। এ সব করতে গেলে দরকার প্রচুর নাইট্রোজেনঘটিত সার। অতিরিক্ত সার তৈরি করতে খরচ বাড়ে। অতএব যদি এমন করা যায়, ডি এন এর হেরফের ঘটিয়ে তৈরি করা হল এমন প্রজাতির গম অথবা ধানের বীজ, যারা উদ্ভিদে পরিণত হওয়ার পর প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন নিজেরাই সরাসরি বাতাস থেকে সংগ্রহ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে নাইট্রোজেন সারের আর প্রয়োজনই হবে না। কিংবা ধরুন, ডায়াবেটিক রোগ। শরীরে ইনসুলিন নামে এক ধরনের হরমোনের অভাব ঘটলে এই রোগ হয়। এমনও তো হতে পারে, বিশেষ কোন ব্যাকটেরিয়ার 'জিন'এ হেরফের ঘটিয়ে এমন প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া হয়ত তৈরি করা গেল যারা এবং যাদের বংশধর মূল্যবান এই হরমোনটির উৎপাদনে সাহায্য করতে পারে। হয়ত এই একই পদ্ধতিতে ক্যানসার নিরাময়ও সম্ভব!

১৯৬০ এবং ১৯৭০ দশকের গোড়ায় এই ধরনের চিন্তাভাবনার উপর নির্ভর করেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একক এবং সম্মিলিত উদ্যোগে গড়ে উঠল এক ধরনের জৈবিক পদ্ধতি। যার নাম রাখা হল 'রিকমবিনান্ট ডি এন এ', 'জিন স্প্লাইসিং' 'জিন গ্রাফটিং', 'জিন ম্যানিপুলেশন' অথবা 'নিক-অ্যান্ড-প্যাচ জিনস'। 'রিকমবিনান্ট ডি এন এ' বা পুনর্সংযোজী ডি এন এ বলতে বোঝায় দুটি পৃথক প্রজাতি থেকে সংগৃহীত জিনের পারস্পরিক মিলন। এ ধরনের পরীক্ষা চালাতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা কিছু কিছু সামগ্রীও আবিষ্কার করলেন। আবিষ্কৃত হল দুই শ্রেণীর 'এনজাইম' বা জৈবিক অনুঘটক। 'লাইগেজ' এবং 'নিউক্লিয়েজ'। নিজেদের আত্মরক্ষার জন্যে প্রাকৃতিক নিয়মেই এই এনজাইমগুলি ব্যাকটেরিয়ার দেহে উৎপাদিত হয়। লাইগেজ ব্যাকটেরিয়ার 'ডি এন এ'র মেরামতি করে। আর নিউক্লিয়েজের কাজ অজ্ঞাত-কুলশীল কোন ডি এন এ ব্যাকটেরিয়ার সান্নিধ্যে এলে তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ধ্বংস করা। অর্থাৎ সাধারণভাবে ব্যাপারটা দাঁড়াল, 'লাইগেজ' যেন আঠা, যার কাজ জোড়াতালি দেওয়া, এবং নিউক্লিয়েজ হল কাঁচি শত্রুকে ধ্বংস করার দায়িত্ব যার উপর ন্যস্ত।

কিন্তু কাঁচি দিয়ে কেটে দুই প্রজাতির দুটি জিনকে আঠা দিয়ে জুড়ে না হয় নতুন একটি জিন তৈরি করা গেল, কিন্তু সেই সঙ্গে আরও একটি সমস্যাও তো রয়েছে। এবার দরকার সেই জিনকে কোন ব্যাকটেরিয়ার কোষের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া, যেখানে গিয়ে সেই জিন প্রজননের মাধ্যমে এক ধিক অনুরূপ জিন তৈরি করতে পারে। ব্যাকটেরিয়ার এই নতুন জিন বহন করবে কে? অবশেষে সেই পরিবাহকও আবিষ্কৃত হল। যাদের বলা হয় 'প্লাসমিডস'। কোন কোন ব্যাকটেরিয়ার কোষে কিছু কিছু অতিরিক্ত ডি এন এ থাকে। অতিরিক্ত সেই ডি এন এর ছোট ছোট আংটির মত বলয়কেই বলা হয় 'প্লাসমিডস'। এই প্লাসমিডস সহজেই ক্রোমোজোম থেকে পৃথক করা যায়। এর ফলে পুনর্সংযোজী ডি এন এ নিয়ে পরীক্ষা চালানর জন্যে যা যা দরকার সবই পাওয়া গেল। পাওয়া গেল 'আঠা' জিন কাটার 'কাঁচি' এবং সংযোজিত জিনকে কারখানারূপী ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে পরিবহণ করার মাধ্যম 'প্লাসমিড'। ব্যাকটেরিয়া বলতে এখানে মুখ্যত 'এসচেরিশিয়া কোলি' বা সংক্ষেপে ই·কোলির কথাই ধরা হচ্ছে। বিশেষ ধরনের এই ব্যাকটেরিয়া আমাদের পৌষ্টিক নালী বা অন্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যেও পাওয়া যায় এই ব্যাকটেরিয়া। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, প্লাসমিডসে থাকে খুব কম সংখ্যক জিন। কোন ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে প্রবেশ করার পর তারা তাদের জিন ওই ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমোজোমে প্রোথিত করতে পারে। আবার ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমোজোমের সঙ্গে নিজের জিনের বিনিময়ও করতে পারে। কোন ব্যাকটেরিয়ায় হয়ত প্লাসমিড ডি এন এ প্রবেশ করান হল। সেখানে ঘটল তার বংশ বিস্তার। বংশ বিস্তারের পর তাদের সংগ্রহ করে তাদের সঙ্গে সংযুক্ত ডি এন এ'র কে পরিচিত, কে পরিচিত নয়, তাও বলে দেওয়া যায়। যদি দেখা যায়, প্লাসমিড ডি এন এর বংশধরদের মধ্যে কোন অজ্ঞাত পরিচয় ডি এন এ রয়েছে, বুঝতে হবে, সেই ডি এন এ ই কোলি নয়, অন্য কোন জিন থেকে এসেছে। এই-ভাবে অজ্ঞাত পরিচয় 'ডি এন এ' সনাক্ত করা যেতে পারে। সেই সঙ্গে জানা যেতে পারে তাদের জৈবিক ধর্ম।

সেটা ১৯৭১। অধ্যাপক পল বার্গ তখন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের একটি পরীক্ষা চালানর ব্যাপারে পরিকল্পনা করছেন। তাঁর লক্ষ্য তখন প্রাণীর ক্যানসার-ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করা। উল্লেখ্য, বিজ্ঞানীরা অনেক আগেই কিছু কিছু ভাইরাসের সন্ধান পেয়েছিলেন। গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এই সব ভাইরাস ইঁদুর, মুরগী, প্রভৃতি প্রাণীর দেহে ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে। মানুষের দেহে ক্যানসার ঘটনর মত কোন ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া না গেলেও দেখা গেল, ঐ সব ভাইরাস মনুষ্যেতর প্রাণীর দেহে ক্যানসারের সংক্রমণ ঘটায় এবং কখনও কখনও পরীক্ষা-নলের মধ্যে কালচার করা মানুষের দেহ-কোষে ক্যানসারের মত প্রতিক্রিয়া ঘটায়। এতে করে কেউ কেউ মনে করলেন, মানুষের ক্যানসার রোগেরও হয়ত কারণ

ওয়াল্টার গিলবার্ট

পল বার্গ

ফ্রেডারিক স্যাংগার

বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলী ও রচনাসংগ্রহ

## মানিক গ্রন্থাবলী

সাহিত্যে সমাজ জীবনের নবমূল্যায়নে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর সমগ্র রচনা ১৩ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তথ্যপঞ্জীসহ প্রতিখণ্ডের মূল্য ২৫৲

## বনফুল রচনাবলী

বনফুল ডঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের অসামান্য সাহিত্য-অবদান। এ-যাবৎ ১৪ খণ্ড প্রকাশিত। বাংলাসাহিত্যে বিচিত্র এবং অমূল্য অবদানের জন্য রবীন্দ্রনাথের পরেই বনফুলের স্থান অনস্বীকার্য। প্রতিখণ্ডের বর্তমান মূল্য ২৫৲

## বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ

এ-কালের অগ্রণী কবি, কথা-সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার হিসেবে তাঁর সাহিত্য পথপ্রদর্শক। এ পর্যন্ত ৮ খণ্ড প্রকাশিত। ৭ম ও ৮ম খণ্ড ৩০৲ অন্যান্য প্রতিখণ্ড ২৫৲

## অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

কবি, কথা-সাহিত্যিক ও অসামান্য জীবনীকার অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ৯ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। ৮ম ৩০৲ ৯ম (কিশোর সাহিত্য) ১৬৲ ও অন্যান্য প্রতিখণ্ড ২৫৲

## প্রেমেন্দ্র মিত্র রচনাবলী

কবি, কথা-সাহিত্যিক, শিশু ও কিশোর সাহিত্যিক হিসেবে তিনি অগ্রণী, এ-কথা সর্বজন স্বীকৃত। ২ খণ্ড প্রকাশিত। প্রতিখণ্ড ২৫৲

## নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী

কথা-সাহিত্যের ভিতর দিয়ে মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, অভাব অভিযোগ তাঁর মধুর ও অনবদ্য লেখনীতে প্রদীপ্ত। একজন যুগন্ধর সাহিত্যিক। ২ খণ্ড প্রকাশিত। প্রতিখণ্ড ২৫৲

## জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী

আধুনিক বাংলা গল্প ও উপন্যাসের নিঃসন্দেহে প্রথম পূজারী। নিভৃতে অসামান্য সাহিত্যিক কি হতে পারে তার নিদর্শন। ১ম খণ্ড প্রকাশিত। মূল্য ২৫৲

বি. দ্র.—যাঁরা প্রতি সাহিত্যিকের প্রকাশিত সকল খণ্ড একসঙ্গে ক্রয় করবেন তাঁদের ২০% কমিশন দেওয়া হবে। মফঃস্বলের ক্রেতাগণ প্রতিখণ্ডের নির্ধারিত মূল্য পাঠালে ডাক মাশুল আমরা বহন করে রেঃ বুক পোস্টে বই পাঠানো হবে। ক্রমবর্দ্ধমান কাগজের মূল্য এবং মুদ্রণ ও অন্যান্য খরচ বৃদ্ধির জন্য গ্রন্থাবলীর ভবিষ্যৎ মূল্যবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। আপনার ঈপ্সিত খণ্ডগুলি এক্ষুনি সংগ্রহ করুন।

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

## প্রথম পলি শেষ পাথর

**অরুণ মিত্র**

বহু কবি বহু ভাবে কাব্যচর্চা করেন। কেউ সরবে, কেউ নীরবে। কেউ আত্মঘোষণায় নিজেকে তুলে ধরেন দশের সামনে। আবার কেউ নিজেকে জানাতে সঙ্কুচিত হয়ে থান আত্মমগ্নতায়। কবি অরুণ মিত্র শেষোক্ত ধর্মের কবি। কী আশ্চর্য সুন্দর কবিতা তিনি লেখেন অথচ যেন নিজেকে আড়াল করে রাখতে চান সমস্ত প্রশংসা ও স্তুতির সামনে থেকে। কবিতা যেন তার নিজের সঙ্গী শুধু। প্রথম পলি শেষ পাথর তার অতি সাম্প্রতিকতম লেখার অনন্য সংকলন। পরিণত জীবন জিজ্ঞাসায় উপস্থিত রহস্যময়তার অপূর্ব এক স্বাদ। যা ইদানীং-এর কাব্য জগতে দুর্লভ। দাম ৬·০০

## জিপসী মেয়ে

**মণীন্দ্র রায়**

মণীন্দ্র রায়ের সর্বাধুনিক কাব্যগ্রন্থ। এই ছোট সংকলনে তিনি নিজেকে তুলে ধরেছেন বিরাট এক ব্যাপ্তিতে। আসলে এই ব্যাপ্তি তার যাদু-কলমের স্বচ্ছতার ও মায়াময়তার প্রসাদগুণ। ব্যঞ্জনায় শব্দচয়নে ও প্রতীকী রচনায় তিনি যে অনবদ্য স্বাভাবিকতাকে হাজির করেছেন তা গ্রন্থখানির প্রতিটি কবিতা পড়লেই ধরা পড়ে। ক্রমশঃ উপলব্ধির মহৎ এক উত্তরণের সন্ধিক্ষণে পৌঁছে গেছেন শ্রী রায়, যা পাঠককে বিস্মিত ও মুগ্ধ করবে নিঃসন্দেহে। দাম ৫·০০

অন্যান্য কবিতার বই

শক্তি চট্টোপাধ্যায়
**ভালোবেসে ধুলোয় নেমেছি** ৪.০০

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
**মানুষের দিকে** ৫·০০

কবিরুল ইসলাম
**বিকল্প বাতাস** ৫·০০

রাম বসু
**সময়ের কাছে সমুদ্রের কাছে** ৬·০০

দাউদ হায়দার
**আপন মুদ্ধ দেশে একা** ৫·০০

অমিতাভ দাশগুপ্ত
**মৃত্যুর অধিক খেলা** ৫·০০

বিজয়া মুখোপাধ্যায়
**উড়ন্ত নামাবলী** ৫·০০

সুরজিৎ ঘোষ
**নিষ্ঠুর কাঁচ** ৫·০০

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
**ভিন্ন যতি-চিহ্ন** ৫·০০

করুণা প্রকাশনী
১৮এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯, ফোন: ৩৪-৬২৬৮

কোন না কোন ভাইরাস।

এক ধরনের টিউমার ভাইরাস নিয়েই পরীক্ষার পরিকল্পনা করেন বার্গ। ভাইরাসটির নাম 'সিমিয়ান ভাইরাস—৪০' বা সংক্ষেপে এস ভি—৪০ ভাইরাস। বিজ্ঞানীরা এই ভাইরাসটি প্রথম বানরের দেহে আবিষ্কার করেন। অত্যন্ত ক্ষুদ্র এই ভাইরাসে থাকে তিনটি মাত্র জিন। অদ্ভুত ব্যাপার এই, বিজ্ঞানীরা দেখলেন, এই ভাইরাস বানরের দেহে টিউমার সৃষ্টি না করলেও, ইঁদুর বা অন্যান্য প্রাণীর দেহে এদের ইনজেকসনের সাহায্যে ঢুকিয়ে দিলে শেষোক্ত প্রাণীরা ক্যানসারে আক্রান্ত হয়।

বার্গ ঠিক করলেন, একটি প্লাসমিডের সঙ্গে তিনি 'এস ভি—৪০' ভাইরাসের তিনটি জিন প্রথমে জুড়ে দেবেন, তারপর সেই প্লাসমিডটিকে ঢুকিয়ে দেবেন ই. কোলির দেহে। ধরে নিলেন, অল্পক্ষণের মধ্যেই জিন তিনটি তিনি পৃথক করে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখবেন ওদের মধ্যে কোন জিনটি ক্যানসার সৃষ্টির মূলে কাজ করে এবং কেন করে।

পরীক্ষায় বাধা পড়ল। ১৯৭১ সালের কোন এক দিনে যখন তিনি খুবই ব্যস্ত, এমন সময় তাঁর কানের কাছে বেজে উঠল টেলিফোন। সুদূর নিউ ইয়র্কের লং আইল্যান্ডস্থিত কোল্ড স্প্রিং হারবার ল্যাবরেটরি থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে টেলিফোনে শোনা গেল বিশিষ্ট জিন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক রবার্ট পোলাকের কণ্ঠস্বর। তিনি জানালেন, 'অধ্যাপক বার্গ, খবর পেলাম আপনি ই. কোলির মধ্যে প্লাসমিডের সাহায্যে 'এস ভি—৪০' ভাইরাসের জিন ঢুকিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করার আয়োজন করছেন। এ খবরে আমি খুবই চিন্তিত। আমার আশঙ্কা, এ ধরনের পরীক্ষা চালাতে গিয়ে এমনও হতে পারে 'এস ভি—৪০'এর টিউমার সৃষ্টিকারী জিন হয়ত ই. কোলির জিনের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে বিশেষ প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টি হল। সেই ব্যাকটেরিয়া একবার যদি

জিন দলে
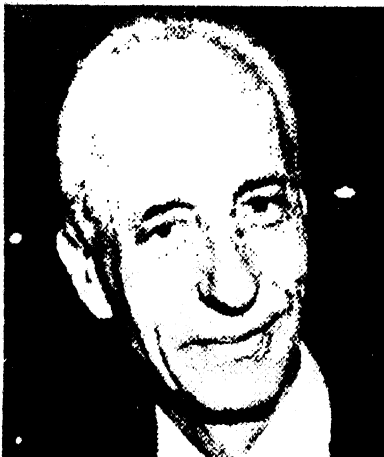
গবেষণাগারের বাইরে ছাড়া পায়, তারা এবং তাদের বংশধর ব্যাপকভাবে মানুষের শরীরে ক্যানসার সংক্রমণে সহায়তা করতে পারে। হয়ত আমার এই আশঙ্কা সুদূরপরাহত। তবু ভয় একটি কারণে। ই. কোলি এমন এক শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়া যারা জৈবিক বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের দেহে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। ভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া শরীরে সংক্রামিত হলে শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তাদের সাবাড় করে। কিন্তু ই কোলির ক্ষেত্রে তার সম্ভাবনা কম। অতএব টিউমার জিনবাহী ই. কোলি সম্পর্কে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত। তাই আমার অনুরোধ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে যতক্ষণ না সবাই নিশ্চিত হচ্ছেন, আপনার এই পরীক্ষা আপনি বন্ধ রাখুন।'

শুরু হল বিতর্কের ঝড়। বার্গ দেখলেন, পোলাক যা আশঙ্কা করছেন, তেমন কোন ঘটনা তখনও পর্যন্ত ঘটেনি। তবে তাঁর আশঙ্কা উড়িয়েও দেওয়া যায় না। ফলে, তিনি তাঁর পরীক্ষার কাজ আপাতত বন্ধ রাখলেন।

এরপর 'রিকমবিনান্ট ডি এন এ' নিয়ে একাধিক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। এ ধরনের আলোচনাসভায় বিশিষ্টতম উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন বার্গ এবং ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডঃ ম্যাক্সিন সিংগার। তৈরী হল ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অভ হেলথ কমিটি (এন আই এইচ)। কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন পল বার্গ। এর পর ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাসিলমার কনফারেন্স সেন্টারে বসল 'রিকমবিনান্ট ডি এন এ' অণুর উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউ কে, ফ্রান্স, জার্মানি, হল্যান্ড, জাপান, সোভিয়েত দেশ এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রায় দেড়শ জন বিশেষজ্ঞ অংশ গ্রহণ করে। সম্মেলনে বার্গের ভূমিকা ছিল অন্যতম। 'রিকমবিনান্ট ডি এন এ' সংক্রান্ত গবেষণায় কী কী ধরনের নিরাপত্তা নেওয়া দরকার সম্মেলনে তা স্থির হয়। বলা বাহুল্য মানুষের নিরাপত্তার কথা ভেবে কোন গবেষণা শুরু হওয়ার আগে এমন ধরনের উদ্যোগ পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম।

ওয়ালটার গিলবার্ট এবং ফ্রেডারিক স্যাংগারের কৃতিত্ব 'রিকমবিনান্ট ডি এন এ' সংক্রান্ত পরীক্ষার ব্যাপারে তাঁরা আবিষ্কার করেছেন অনেক নতুন পদ্ধতি। ওঁরা একশ্রেণীর প্রোটিন অণু আবিষ্কার করেছেন, যাদের বলা হয় 'কেমিক্যাল রিপ্রেসর'। জিনের জোড়াতালি দেওয়ার ব্যাপারে এদের ভূমিকা অনন্য। গিলবার্ট এবং তাঁর এক সতীর্থ অ্যালান ম্যাকসাম এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ আবিষ্কার করেছেন। এই যৌগগুলির সাহায্যে 'ডি এন এ'

অণুর বিভিন্ন অংশকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। স্যাংগার আবিষ্কার করেছেন এক ধরনের 'এনজাইম'। এই এনজাইম জিনের অনুকৃতি তৈরীর ব্যাপারে সাহায্য করে। এই পদ্ধতির সাহায্যে তিনি ব্যাক্টেরিয়াকে 'ইনটারফেরন' নামে এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ উৎপাদনে সক্ষম করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। 'ইনটারফেরন' ভাইরাসের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে।

জিন প্রযুক্তিবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ এবং অর্থবহ করে গড়ে তোলার ব্যাপারে বার্গ, গিলবার্ট এবং স্যাংগারের অবদান এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

**চিকিৎসা বিজ্ঞানে**

প্রায়শই অনেকে মন্তব্য করে থাকেন, মৌল-গবেষণা থাক, প্রায়োগিক গবেষণার উপর বরং বেশি মন দিন। কারণ প্রয়োগিক গবেষণালব্ধ ফল সরাসরি মানুষের উপকারে লাগে। কথাটা যে আংশিক সত্য, ১৯৮০ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে যাঁরা নোবেল পুরস্কার পেলেন, তাঁদের অবদান সেটাই প্রমাণ করেছে। তাঁদের গবেষণার বিষয় 'ইমুনলজি' বা রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক বিজ্ঞান। বিভিন্ন রোগের নিরাময় এবং প্রতিরোধের ব্যাপারে তাঁদের আবিষ্কার এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

পুরস্কার পেয়েছেন সম্মিলিতভাবে তিন জন। বারুজ বেনেসেরাফ, জর্জ স্নেল এবং জিন দসে।

বেনেসেরাফের কর্মস্থল হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়। জন্মস্থান ভেনেজুয়েলার কারাকাস। শিক্ষা প্রথম দিকে প্যারি শহরে। পরে মার্কিন দেশে এসে প্রথমে নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং অবশেষে চিকিৎসাবিজ্ঞানে গবেষণা শুরু করেন ভার্জিনিয়ার মেডিকেল কলেজে। ১৯৪৩ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।

পরবর্তীকালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে গবেষণার জন্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তিনি কাজ করেছেন। এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম কলাম্বিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুল, প্যারির ব্রোসা হাস-পাতাল, নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুল, ওয়াশিংটনের নিকটস্থ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেল্থ এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৭০ সাল থেকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাথলজি বিভাগের তিনি চেয়ারম্যান। সম্প্রতি তিনি বস্টনের সিডনি ফারবার ক্যানসার ইনস্টিটিউটের সভাপতি হয়েছেন।

স্নেল-এর জন্ম ম্যাসাচুসেটসের হ্যাভারহিল শহরে। শিক্ষা ডার্টমাউথ কলেজে। ১৯৩০ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ ডি। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'জেনেটিক্স'। ১৯৩৫ সালে তিনি বার হার্বারের জ্যাকসন ল্যাবোরেটারিতে যোগ দেন এবং শেষ পর্যন্ত তিন বছর আগে ওই প্রতিষ্ঠান থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এর সদস্যরূপে মনোনীত হন। ১৯৭৮ সালে মনোনীত হন ফ্রেনঞ্চ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেসের সদস্য। এর আগে উল্লেখযোগ্য গবেষণার জন্যে চেকোশ্লোভ অ্যাকাডেমি অব সায়ান্সেস তাঁকে 'গ্রেগর মেনডেল' পদক দিয়ে সম্মানিত করেন। যে কাজের জন্যে তিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন, তার সূচনা ১৯৪২ সালে।

"খুবই মৌলিক গবেষণা।" সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেছেন স্নেল। "ব্যাপারটা যে খুব হঠাৎ করেই ঘটেছে, সে কথা বলব না। বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে দীর্ঘদিন।....এক প্রাণীর দেহে অপর প্রাণীর ত্বক অথবা কোন প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন করতে গিয়ে আমরা দেখলাম, প্রতিস্থাপনের পর সেই ত্বক অথবা প্রত্যঙ্গ কখনও গৃহীত হচ্ছে, কখনও পরিত্যক্ত হচ্ছে। আমরা জানতাম এই গ্রহণ এবং বর্জনের কাজটি চালিয়ে থাকে 'জিন'। এই 'জিন'ই স্থির করে একের পক্ষে অপরের ত্বক বা প্রত্যঙ্গ কখন গ্রহণীয় অথবা বর্জনীয় হবে। কীভাবে সেটা ঘটে সেই রহস্য উদ্ধারের জন্যে আমরা গবেষণায় হাত দিলাম।"

**বারুজ বেনাসেরাফ**

এই গবেষণা চালাতে গিয়ে স্নেল তাঁর গবেষণাগারে বিভিন্ন প্রজাতির ইঁদুর তৈরি করেন এবং তাদের নিয়ে পরীক্ষা চালান। এই পরীক্ষা ত্বক এবং প্রত্যঙ্গের প্রতিস্থাপনের ব্যাপারে 'জিনের' প্রত্যক্ষ ভূমিকা সম্পর্কে প্রচুর নাটকীয় তথ্য যোগাতে সমর্থ হয়েছে। পরে দসে প্রমাণ করেন, ইঁদুরের অনুরূপ জিন মানুষের দেহেও রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে একটি নতুন কথাও শুনিয়েছেন স্নেল: 'হিসটোকমপ্যাটিবিলিটি কমপ্লেকস।' জীব-

**জর্জ স্নেল**

দেহে এক শ্রেণীর রাসায়নিক যৌগ অত্যন্ত সক্রিয় এদের বলা হয় 'অ্যান্টিজেনস'। এরা মূলত প্রোটি শ্রেণীর যৌগ। প্রতিটি জীবকোষেই 'অ্যান্টিজে থাকে। তবে তাদের গঠন এবং বৈশিষ্ট্য কোষ বিশেষে ভিন্নতর হয়। ত্বক অথবা প্রত্যঙ্গের প্রতি স্থাপন সম্ভব, কি সম্ভব নয়, এই অ্যান্টিজেনই ও স্থির করে। যে সব অ্যান্টিজেন এ ধরনের কাজে জন্যে দায়ী তাদের বলা হয় 'হিসটোকমপ্যাটিবিলি অ্যান্টিজেনস'। আর যে সব জিন এই অ্যান্টি জেনদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে তাদের বলা হ 'হিসটোকমপ্যাটিবিলিটি জিনস'। স্নেল দেখিয়েছেন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিস্থাপনই শুধু নয়, শরীরে ক্ষতিকর কোন ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া অথবা কোন বস্তু প্রবেশ করলে এই সব জিনই তাদের প্রতিরো করে রোগের হাত থেকে প্রাণীদের রক্ষা করে।

বেনাসেরাফ প্রমাণ করেছেন, কোন ব্যক্তি ভাইরাস প্রভৃতির আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার ক্ষমতা তার বংশগত সূত্রে পাওয়া নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। গিনিপিগের দেহে নিজের তৈরী এক ধরনের সংশ্লেষিত বস্তু ঢুকিয়ে দিয়ে এই সত্যে তিনি উপনীত হন।

বেনাসেরাফ এক ধরনের জিন আবিষ্কার করেছেন। এই জিন শরীরের বাইরে থেকে আগত রোগসৃষ্টিকারী ভাইরাস বা বস্তুকণাকে প্রতিহত করতে পারে। তিনি দেখিয়েছেন, এই 'রোগপ্রতি-রোধী জিন' প্রাণী তার নিজস্ব দেহের মধ্যেই বংশগত সূত্রে লাভ করে। তিনি দেখিয়েছেন, কোন আক্রমণ-কারী ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং অন্যের দেহের প্রতিস্থাপনযোগ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোন প্রাণীর দেহে সংস্থাপিত হয়, তখন ওই জিন দু ধরনের কাজ করে থাকে। প্রথমত তারা তৈরি করে এক ধরনের বস্তু। এই বস্তুটি আক্রমণকারী ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং প্রতিস্থাপিত প্রত্যঙ্গের কোষ-তলের (সেলস সারফেস) অঙ্গরূপে পরিণত হয়। এ যেন দাগ কেটে ওই কোষগুলি চিহ্নিত করে দেওয়া। পরিষ্কার করে বোঝান যায় দেহের নিজস্ব কোষ থেকে তারা পৃথক। এটা করা হয়, যাতে করে রক্তের শ্বেত কণারা এদের চিনে নিতে পারে। এর পর ওই জিন বিভিন্ন ধরনের শ্বেত কণার (লিমফোসাইটস্) মধ্যে বার্তা পাঠিয়ে কী ভাবে ওই সব আক্রমণকারীদের সাবাড় করতে হবে তা জানিয়ে দেয়। "এই কাজ মানুষকে নীরোগ করে তুলতে সাহায্য করবে।" বেনাসেরাফের মন্তব্য।

দসে তাঁর গবেষণায় স্নেলের 'কোষকলার প্রতি-স্থাপন' পদ্ধতিটিই কাজে লাগিয়েছেন। পরীক্ষাগারে ইঁদুরের কোষ তিনি মানুষের কোষ-কলায় প্রতি-স্থাপন করতে সমর্থ হন। এবং সেটা করতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন কোষের চিহ্নিতকরণের কাজটিও করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন রক্তের যেমন 'এ', 'বি', 'ও' প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ আছে, প্রাণীর কোষকলারও রয়েছে তেমনি শ্রেণীবিভাগ। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'টিস্যু টাইপিং'। একজনের রক্ত অপরের শরীরে দেওয়ার সময় দেখে নিতে হয় উভয় রক্তের মধ্যে মিল আছে কি-না। কারোর শরীরে 'এ' শ্রেণীর রক্ত থাকলে তাকে 'এ' শ্রেণীর রক্তই দিতে হয়, 'বি' শ্রেণীর রক্ত সে গ্রহণ করতে পারে না। ঠিক তেমনি কোন প্রাণীর প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন করার আগে দেখা দরকার, সেই প্রত্যঙ্গের কোষকলা কোন শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। যদি দাতা এবং গ্রহীতার কোষ-কলা একই শ্রেণীভুক্ত হয় একমাত্র সে ক্ষেত্রেই প্রতি-স্থাপনের পর বর্জনের সম্ভাবনা থাকে না। এই আবিষ্কার একের কিডনি প্রভৃতি প্রত্যঙ্গ অপরের দেহে প্রতিস্থাপনের কাজে সাহায্য করবে।

নোবেল পুরস্কারের সংবাদ ঘোষিত হওয়ার পর দসে মন্তব্য করেছেন, "আমরা তিনজনই পরস্পরের নিকটতম বন্ধু। স্নেল এবং বেনাসেরাফের গবেষণাগারে গিয়ে বহুবার আমি কাজ করেছি। আবার ওঁরাও বহুবার প্যারীতে আমার গবেষণা-গারে এসে কাজ করেছেন। আমরা একই পথের পথিক।"

সমরজিৎ কর

এই চিহ্নেই [illegible]

GEM

GEM

GEM
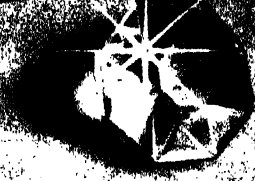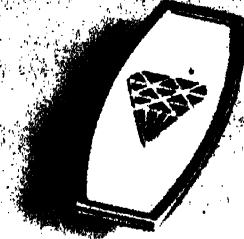
GEM

# GEM

## রেফ্রিজারেটর

রেফ্রিজারেটরের গায়ে জেমের চিহ্ন মানেই সেরা জিনিষের প্রতিশ্রুতি।

প্রতিটি জেম রেফ্রিজারেটরের পেছনে আছে ব্যাপক অভিজ্ঞতার ফসল, একাগ্র চেষ্টা ও উচুমানের কারিগরী এবং তার ওপরে সারাদেশ জুড়ে ছড়ানো বিক্রীর পর অক্লান্ত সেবার ব্যবস্থা। এ সবের জন্যই জেম রেফ্রিজারেটর অতুলনীয়।

জেম রেফ্রিজারেটরের কম্প্রেশর ভের মজবুত এবং এর বিকল হওয়ার হার পৃথিবীতে সবচেয়ে কম। এ বিশেষভাবে তৈরী বলে ২৭% কম বিজলী খরচে দ্রুত ঠাণ্ডা করে। ফলে ভেতরের তাপমান সব-চেয়ে কম হওয়ায় ঢের বেশী বরফ তৈরী করে। এর ফ্রিজারে অনেক বেশী জিনিষ-পত্র রাখা যায়। এর ক্রিস্পারে মাত্রার বেশী সেঁতসেঁতে ভাব বজায় রাখার জন্য শাকসব্জী ফল বেশীদিন তাজা থাকে। এ বিদ্যুতের ব্যাপক ওঠানামা সহ্য করতে পারে এবং বছরের পর বছর কম খরচে বিশ্বস্ত ও ঝামেলাহীন কাজ করে যায়। এর স্বয়ংক্রিয় বরফ গলানোর বন্দোবস্ত ভেতরের খাবারদাবার না গলিয়ে শুধু জমা বরফই গলায়।

জেম রেফ্রিজারেটর সব পরিবারের মাপেই পাওয়া যায়। যেমন, ২৮৬, ১৬৫ (স্বয়ংক্রিয় বরফ গলানোর বন্দোবস্তযুক্ত), ১৩৫, ৯০ এবং ৬৫ লিটার মাপের।

জেম ডিপ ফ্রিজার ৪২৫, ২৭৫ এবং ৮৫ লিটার মাপে পাওয়া যায়। পুরো রেফ্রিজারেটরের জন্য একবছর এবং সিল করা অংশের জন্য পাঁচ বছর।

অতএব, রেফ্রিজারেটর কিনতে হলে, জেমের এই চিহ্নের, ওপরই নির্ভর করুন। আপনি ঠকবেন না।

**জেম রেফ্রিজারেটর—চিরকালের জন্য শুধু আপনারই!**

GEM

INDIA LTD.

রেজিঃ ও হেড অফিস:
২/৯০ কনট সার্কাস, নিউ দিল্লী-১১০০০১
দিল্লী, বম্বে, কলকাতা, মাদ্রাজ, আমেদাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, ভূপাল, বোকারো ষ্টীল সিটি, চণ্ডীগড়, কোচিন, কটক, ধানবাদ, জয়পুর এবং লক্ষ্ণৌ
কারখানা: পরওয়ানু (হিমাচল প্রদেশ)

## বেশি বাঁচলে

**সন্তোষকুমার ঘোষ**

পদ্য গদ্য পদ্য

চেনা ছবি, আপনা-আপনি যেন ফ্রেমে এ'টে
যায়। পালঙ্ক বিস্তারিত, বিমর্ষ ধূপ যথোচিত
আর তার রোগা রোগা জিকজিকে ধোঁয়া।
ফুল ফুল, স্তূপ স্তূপ, শিয়রে, পায়েও।
চাপা কান্না, কান্না নয় বাঁধ-ভাঙা চুল
ঢাক-ঢাক গুড়গুড় চাদরটা সংবৃত, সম্পূর্ণ
ছেয়ে। তুলসীপাতার চোখ
নির্নিমেষ চেয়ে। শোকার্ত অগুরু, তবে
অতিশয় ভদ্র আর যথোচিত মৃদু।
দরজা ঠেলি, সরে আসি, একদম
রিফ্লেকস-বশত।
মৃত্যু। চিনি। হিম, শক্ত। কত না দেখলাম।
এই চিত্র-পরিচিত ?
মনে মনে চট করে লিখে ফেলি "দেখতে হয়ঃ
বেশি বাঁচলে ঢের মরা। নিরুপায়।"

✻

আসবে ভেবেছিলাম, বলেও ছিল আসবে,
ফিরবে। আসেনি তো! এল না।
অবশ্য নিঘুম যে জেগে আছি, সেটাই তার ফেরা
বলে অহরহ নিজেকে যদি না জপাই, যদি না।

চিঠি ? পাই। লা-জবাব, বেবাক হজম।
লিখিও। উত্তর মেলে না। মরা ?
কত কতভাবে, কত দিন অনেক দেখলাম।

✻

কলিং বেল বাজে। কিংবা কপাটে
টকটক, টকাটক, লোডশেডিং যখন।
সাড়া - উহুঁ, আর না। চোখ হাত চেপে কানা,
বিছানায় সটান। সিঁড়িতে তরতর,
এল, না গেল ? নাকি নেমে যেতে যেতে
ক্রমাগত আসতেই থাকল ?
জানি না, যেমন আছি তেমনটি থাকি,
এবার কানেও দুটি-হাত। পাথর, নিথর।
থাকতে হয়, এই নিয়ম
নিত্য-কৃত্য এই।
এই চিত্রটার পরিচিতি ?—লিখে নিন, বলে দিচ্ছি
"ঢের বাঁচলে ঢের মারা। মারতেই হয়।"

## দিনযাপন

**তুলসী মুখোপাধ্যায়**

জন্মের ঘোরে কেটে যায় সারাদিন
খুব নিচু মাপের লোককে কুর্নিশ করতে হয়
খুব উঁচু করে
হাতের মুঠোয়
দুপাশচটা খুনের ইচ্ছে মা-মরা ছেলের মতো কাঁদে।

সন্ধ্যায় নিবু নিবু সূর্য যখন ডুবে যেতে থাকে
আমি জেগে উঠি হুড়মুড় করে
দশ হাজার রমণীর প্রাকৃতিক দুন্যে মজে যাই
অতঃপর ঝাঁপ মারি কারণ-সাগরে
ধুতু কফ বমির স্বর্গে আবছা ছায়ার মতো
বাল্যের মায়াবী আকাশ, কৈশোর-আকৃতি
এবং জীবনে প্রথম প্রেম হাঃ হাঃ প্রথম প্রতিমা
নিদারুণ ফুর্তিতে বেয়ারাকে ডেকে বলি—
ওহে দুঃখহরণ, আর একটা লাইন।

## উপবাস শেষে

**কৃষ্ণা বসু**

এই চোখ তার তৃষ্ণা নিয়ে জেগেছিল খুব দীর্ঘ উপবাসে,
সংসারের ভাঙাচোরা, লোকাল ট্রেনের পথে রোজ এক মুখ,
চেনা স্থাপত্যের কাছে ক্ষয়ে গিয়ে মরা চোখ, যেন মৃত
মাছের কংকাল, জেগেছিল, তার কোনো বিস্ময় ছিল না;
আজ দীর্ঘ উপবাস শেষে সে জেগেছে এই পাহাড়তলির দেশে,
চারিদিকে অজস্র ফুলের মধ্যে দূর বনস্থলির সীমানায়
এই বনবিশ্রামের বাড়ী,—এইখানে ক্ষুধার্তের ভোজ,
আজন্ম তৃষ্ণার দাহে পুড়ে গেছে তার অস্থিচর্মসার,
এই নীল শুশ্রূষার দেশে সে পেয়েছে তার খাদ্য।
এই গন্ধঘন সকাল বেলায়, অলস মাছির শব্দে,
কাঠঠোকার চিপ চিপ ডাকে, কান বিশ্রামের অবকাশে
সংগীতের আর এক নাম জেনেছে নীরবতা !
চোখ তার খাদ্য পেল, কান তার নিজস্ব বিশ্রাম,
দেহ শুধু পড়ে আছে এই ঘন ক্ষীরের মতন রোদে
সারাবেলা, শীত নামে বিদেশী রঙিন অতিথি ঋতু এসে
এই বনবাংলোর চারিপাশে নিবিড় জেগেছে;
আমি এই বিদেশী ঋতুর কাছে
ঠাণ্ডা হাত উষ্ণ করে নেব বলে
তার সখ্যের মতন রোদে কররেখা সমেত মেলেছি।

# অরণ্যদেব

চললুম!
কিট দ্রুত বিদায় নিচ্ছে...

জলদস্যুরাজ লাফিত ও তার বোন জিনেত.....
আর কখনো ওর সাথে তোমার দেখা হবে না।
উঃ, মা গো!

মাতামহের বাড়িতে ফিরে কিট দেখে, অরণ্য থেকে এক অপ্রত্যাশিত অতিথি সেখানে এসেছে!
কে সে?
?
ত্রয়োদশ যুগ- অরণ্যদেবের কাহিনী। ১৮-১২ খ্রীষ্টাব্দ.....

আরে, গোলো যে!
তোমার বাবা মৃত্যুশয্যায়। তিনি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

ভোরের জোয়ারে জাহাজ ছাড়বে। চলো, জাহাজেই আজ রাত কাটাই।
তার আগে এক বন্ধুর কাছে বিদায় নিতে হবে, গোলো!

জিনেতের সঙ্গে দেখা করে যাব।
3/23

তারা চলে গেছে? কোথায়?
বারাটারিয়ায়.....

বারাটারিয়ার জলাভূমিই হল লাফিতের রাজ্য.....
ক্রমশ●১৫

# দক্ষিণপূর্বাচলের পথে

মানসা দাশগুপ্ত

ইন্দোনেশিয়ায় নামি হয়েছেই তখনি যোগেযোগে, প্রাণ্বাদান কি জিনেছ পেলো খুঁজে ছুটোছুটি না করে জাকার্তায় যদি স্থির হয়ে কিছুকাল বসা যায়, তাহলে যার দৃষ্টিবাহি চোখে পড়বে সে হচ্ছে 'দিনের চোখ' অর্থাৎ 'মাতাহারি' সূর্য। অবশ্য ঘোর বর্ষা উঠে পড়ে লেগে গিয়ে থাকলে মার্তণ্ডদর্শনে একটু বাধা পড়া অসম্ভব নয়। তবে, বৃষ্টি একেবারে নেই এমন দিন যেমন কমই যায় জাকার্তায় তেমনি আবার সারাদিনমান ঝরঝরধারা এরকম অবিরাম বর্ষণধারাতেও খুব অভ্যস্ত নয় ওদেশের মানুষজন। ওরা দিব্যি সে রাখে দিনের ভিতরে একবার না একবার দেখা দেবেনই মাতাহারি। এমনকি, ঘোর বর্ষাকালে সন্ধ্যে থেকে আকাশভাঙা বৃষ্টি হলেও আমাদের মুসলিম বাইরে যাবার খাবার জন্যে বদ্ধপরিকর। "এই বাদলায় বেরিয়ে কোথায়, যাবে কী করে?" এরকম বেতারিকবং প্রশ্নে সে ধীর বিনীত উত্তর দেবে, "একটু সবুর করে যাবো।" অর্থাৎ মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়—' এই সারকথা যদি প্রকৃত কেউ শিখে থাকে তা সে আমাদের ওই জাভাবালিদ্বীপসুলাবেসির প্রতিবেশীবৃন্দ। এমনকি, মুসলিম যে যোগজার গায়ে গায়ে লাগ থেকে এসেছে, সেও নির্ভয়। অথচ যোগজাকার্তা বিষয়েই সেখানে অধ্যাপক রাম্বুলিঙ্গম বলেছিলেন 'ভগো সেপ্টেম্বরে ঘুরে যাচ্ছ যোগজাতে। এর পরে বৃষ্টি নামলে তো আর থামবে না।' ক্যালেন্ডারের হিসেবমত মুসলিম হুজান বা বাদলার কাল ওদেশে অক্টোবর থেকে এপ্রিল। কার্যক্ষেত্রে মে পর্যন্ত হুজানের দৌড়। কিন্তু এত মেঘেও সূর্য এদিকেও হেলেন ওদিকেও হেলে না। যেমনকার তেমনি প্রত্যহ একই সময়ে ঠিক করে উঠে পড়ে ফস করে অদৃশ্য হয় মাতাহারি। প্রত্যুষ বা গোধূলির বর্ণচ্ছটা নেই, দিন বড় হয়ে ওঠা ছোট হয়ে যাওয়ার কোনো হেরফের নেই বছর জুড়ে। সূর্যের বন্দনা গায় না কেউ ওখানে। আমাদের ছটপুজোর মতো ঘরোয়া ব্রতের কথা ছেড়েই দিলাম, যত যে প্রাচীন হিন্দু দেবদেবীর নানা রূপ একদিন ওখানে ছড়িয়ে গিয়েছিল তার ভিতরে সপ্তাশ্ববাহী সূর্যের সাকিন মেলে না। সূর্য দিনমণি, কিন্তু কখনো সর্বপাপঘ্ন হিসেবে ওদের আস্থাভাজন হয়েছিলেন এমন প্রমাণ নেই। তাই বলে সূর্যের মূল্য কি একটুও কম? মোটেই না। ঘাম-স্যাঁতস্যাঁতে ভিজে হাওয়া শুকোতে আছে তো ঐ সূর্য। আর, পাহাড়ী অঞ্চলে ঠাণ্ডায় সঙ্গ দিতে? জাকার্তায় কখনো শীত না দেখা দিলে কী হবে ইন্দোনেশিয়া জানে ঠাণ্ডা কাকে বলে। জাকার্তার কাছাকাছিই একটু উঁচু, পুঙ্কক,—শীতার্ত নয়, কিন্তু মনোরম। আরও জাভাতেই আছে পাহাড় চমৎকার সব জায়গা যেমন মালাং, সুরাপান। বিশেষত সারাঙ্গানে সূর্যোদয় দেখা প্রায় টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখার মতো পর্যটনপত্র বিজ্ঞাপিত। যদিও সাধারণভাবে সারাঙ্গানে ঘুরতে ফিরতে আমাদের কোডাই কানালের কথা যেমন করে মনে পড়ে যায়, দার্জিলিংয়ের কথা ঠিক তেমন করে মনে পড়ে না। কিংবা হয়ত আমাদের দেশের তুলনা ঠিক ঠিক খাটেই না। জাভার ঐসব ঠাণ্ডা, পাহাড় অঞ্চলগুলির কেমন এক বিশিষ্ট রূপ রয়েছে। সে কি তার মানুষজনের জন্যে? সে কি তার আশ্চর্য অরণ্যসম্পদের জন্যে? ঠিক কী বানা কর বলা শক্ত।

এক যাত্রায় বারোদিন ধরে ঐ পথে পথে একটা বাসে করে ঘুরে আমরা জাভা ছেড়ে বেরিয়ে আবার ফিরে এসেছি। একটিমাত্র চালকের হাতে গাড়ি। মিইং রোং নামে হাসিমুখ এক তরুণী ছিলেন যাত্রীদের বন্ধু দার্শনিক ও পথ-পরিচায়ক। এই তরুণীটির মতোই যাত্রীদের ভিতরে অধিকাংশই ছিলেন চীনা-ইন্দোনেশীয়। আমাদের চলন্ত গৃহস্থালির রক্ষক এবং বার্তাবহ ছিলো এক স্ফূর্তিবাজ জাভানী যুবক তাকে মিইং মিষ্টি করে ডাকতেন, "মাস্ মিডি"। এই রসিকতার আহ্লাদই ওর নাম হিসেবে চালু হয়ে যায় সকলের মধ্যে। চলতে চলতে আমরা অচেনা দেশে অজানা ভাষীর বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম, চলতি গাড়িতে গলায় গলায় গান কিংবা যান্ত্রিক গানের সঙ্গে হাতে হাতে যন্ত্রের অভাবে জলপানের কি আপন হাতে হাতে চালিয়ে একরকম মিউজিক চেয়ারের বিকল্প খেলা। এইসব ব্যাপারে মিইংকে সহায়তা করতো অক্লান্ত 'মাস মিডি'। গলায় খুলে গান গাইবে? —'এই যে পাটক' ধরে নাও ধরে নাও, হাততালি দেই।' আর ঐ কমলালেবু-আপেল চালিয়ে চালিয়ে খেলা,—যান্ত্রিক গান বন্ধ থাকবে মিইংয়ের হাতে, আম্পায়ারের কাজ হচ্ছে 'মাস মিডি'র। আমাদের দুই ভারতীয়ের ভাষা ছাড়া চলতো কী করে এ প্রশ্ন করেছেন অনেক বন্ধু।

ঐ যে কথা আছে : যদি হয় সুজন [illegible] সুজন হলে কেবল তেঁতুলপাতায় নজন বসতে পারে তাই নয়, ভাষা বিনে কাজও চলে।

তাই বলে কি অন্য একটুও অসুবিধে হয়নি প্রথম প্রথম? হয়েছে বই কী! পর্যটনসংস্থার ওভারপার পড়ে তো বোঝা যায়নি যে চলা শুরু হলে বিন্দুমাত্র বাহাসা ইন্দোনেশিয়াতেই সব কথাবলি চলবে। সবে দশ এগারো সপ্তাহ তখন কাটিয়েছি জাকার্তায় বাসা বাহাসা ইন্দোনেশিয়ার সম্বল সামান্য। বলতে তো বেধে যায় বটেই দ্রুত বলে গেলে বুঝিও না। কামুস ইন্দোনেশিয়া কিচিল [ সংক্ষিপ্ত ইংরেজী অভিধান ] নিত্যসঙ্গী। তাতে কি আর সকল শব্দ সংকুলান হয়? এই যেমন, সব যাত্রী মিলে সেমারাঙ নামে সুন্দর ছোট শহরটিতে গেছি রাত্রিবাসের হোটেলে। রাতের বিশ্রামের পরে সকলে কখন উঠতে হবে কখন আবার যাত্রা হবে শুরু, এ সবই হাসি মিশিয়ে-মিশিয়ে দ্রুত বলে যাচ্ছিলেন মিইং। নির্দেশ ধরা সহজ নয়। কিকি নামে সহযাত্রী যে-ছেলেটির মুখে দুদশটি ইংরেজি শব্দ যোগায় তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে অধ্যাপককে বলে গেল "হাফ পাস্ট ফাইভে তৈরি হতে হবে কিন্তু!"—শুনে ভাবলাম এ তো অতি আনন্দের কথা। ঐ গরম মুলুকে সাড়ে পাঁচটা কী আর সকাল! উঠবো তার আগেই। ভুল ভেঙে গেল রাত্রি ভোর হওয়ার ঢের আগেই। আসলে সময় নির্দিষ্ট ছিলো যাকে ইংরেজিতে বলবে হাফ পাস্ট ফোর। রওনাই সকাল পাঁচটায়। বাহাসা ইন্দোনেশিয়ায় সেতেঙ্গা লিমা [ অর্ধ পাঁচ ] মানে হচ্ছে সাড়ে চার, আদৌ সাড়ে পাঁচ নয়। কিকির বলতে গিয়ে এটা খেয়াল হয়নি যে হাফপাস্ট ফাইভ কিন্তু সাড়ে পাঁচ। তা তো বোঝা গেল কিন্তু হুড়োহুড়ি মুশকিল কম হলো না তো! এর চেয়েও ঢের বেশি মুশকিল হয়েছিল বোনাসারির কবি পাহাড়ে, ঐ বাহাসার জন্যে। [ এখানে বলে রাখা দরকার 'বোনে' কিংবা 'কাবি'র 'ব' হচ্ছে হর মতো বাংলাতে আমরা পেটকাটা 'ব' এবং এমনি 'ব'কে ভিন্ন রাখার ব্যবস্থা

পার হয়ে বালিদ্বীপ

অক্ষরমালা থেকে সরিয়ে মুশকিলে পড়ি এইসব হুবহু উচ্চারিত 'ব' নিয়ে।] বোনোসারিতে পৌঁছনোর আগেই এই প্রত্যাশায় অভ্যস্ত হয়েছি যে, দিনমান চলবে পথপরিক্রমা আর রাত্রি নেমে এলে কোনো ছোট শহরের মুসাফিরখানায় জুটবে রাত্রিকালীন বিশ্রাম। মাস কয়েকবতার বিশ্রাম তবু সেইটুকুই অবসর নিজেদের মন হাত-পা মেলে দেবার, দুজনে কে কোনটা বিশেষ করে লক্ষ করলাম টুকে রাখতে পারলাম তাই বলাবলি করে মিলিয়ে নেবার। এই ছোট প্রত্যাশায় ছন্দ পতন ঘটলো কাবি পাহাড়ের সান্নিধ্যে। ওইখানে গিয়ে পৌঁছনোর আগে কথা ছিলো সুকার্নোর জন্মস্থান ব্লিতারে দুদণ্ড থামবে। পুরাপুরি তখনো দেখার মতো হয়ে ওঠেনি ওটি কিন্তু একেবারে আনন্দ সে-প্রদর্শনী যা সুহার্তো খুলেছেন দু-দর্শকের পরেই। কাগজে কাগজে খুব কার্নোর কথা। তা ব্লিতারে দেখবো কি সোনোর মতিক কেন্দ্রে গিয়ে সহযাত্রী-যাত্রিণীরা যা কেনাকাটায় মত্ত হলেন, দিনের সিকভাগ কেটে গেল সেখানেই। ব্লিতারের বাকপথ দিয়ে এলাম দেখাশোনা কিছুই হলো না। তবুও টিভিতে অধ্যাপকটির মনে খেদ রয়ে গেছে। তারপরে পাহাড়ে পথ বেয়ে যখন উঠে যাচ্ছি নজরে এলো মিইং কোনো এক মিষ্টি রসিকতা বাক্যস্বর উচ্চারণ করে সকলকে হাসাচ্ছেন আর দক্ষিণ বাহু প্রসারিত করে অর্থ সংগ্রহ করছেন।

ব্যাপারটা কী?

সেম্বায়াং। দেবস্থানে চলেছি শুচিশুদ্ধ থেকে সেম্বায়াং দিলে মনোবাসনা পূর্ণ হবে। অবিবাহিত পাবে মনের মতো বর কিংবা কনে। বিবাহিতরা পাবে সুখ। সুচিশুদ্ধতা কথাটা নিয়ে হাসহাসি চলছে। শুচিশুদ্ধতার প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে স্ত্রী এবং পুরুষেরা তারাও পৃথক পৃথক ঘুমোবে এই দেব-রক্ষিত 'মোটেল'টিতে। এখন সেম্বায়াং দিতে চাও তো প্রণামী রাখো এইখানে। রাঙ্গা সেম্বায়াং-এর দক্ষিণ দেড়শ রুপ আর হলুদ সেম্বায়া পঁচাত্তর রুপ।

'সেম্বয়াং' কী, বোঝাতে মিইং হিমসিম খেতে লাগলেন। আমাদের কিচিল অভিধানে সেকেলে ঢংয়ে বানান লেখা। খুঁজতে খুঁজতে তার দেখা পেলে বুঝলাম সেম্বয়াং হচ্ছে সাদা বাংলায় যাকে বলবো পুজো দেওয়া। কিন্তু 'মোটেল' বলতে কী বোঝায়? দেবস্থানে কী করে হতে পারে মোটেলের মতো বিদেশী বিহারস্থানের আমদানী? যদি বা হয়, সেখানে স্ত্রীলোক এবং পুরুষের পৃথক তালাবিছানার ব্যবস্থা ঠিক কেমনতর? এই 'মোটেল' এবং পৃথকবাস নিয়ে অধ্যাপক দারুণ উত্তেজিত হয়ে ইংরেজিতে মিইংকে বলতে লাগলেন 'আমাদের দুজনের জামা, চটি দাঁতের মাজন, সাবান সবই তো একটি করে একই সুটকেস এবং একটি কাঁধের ঝুলিতে নিয়ে এসেছি। মাঝপথে দুজনকে দুই ঘরে থাকতে হবে আগে বললেন না কেন?' মিইং একবর্ণ বুঝতে পারেন না তিনি কী বলেন, আর মিইং ব্যাকুল হয়ে কী বলছেন তা তিনি বোঝেন না। পরস্পর বিপরীত আবেগ বয়ে যেতে থাকে। এরই মাঝখানে চেপে পাহাড়ী বৃষ্টি নামলো। বাসের সব দরজা জানলা বন্ধ। বাইরে দশদিক জুড়ে অন্ধকার থমথম করছে। সবাই যে যার শীতবস্ত্র বের করে গায়ে মুড়ে বসলো। আমরা শীতের জন্য তেমন তৈরি হয়ে বেরোইনি মোটে। কে জানত জাকার্তার বাইরে এমন ঠাণ্ডা হবে। জাকার্তাতে তো শীত বলে কিছু নেই। তবু গরম জামা কেনাবেচা চলে দেখে হেসেছি। এখন পথের হাওয়ার বিরুদ্ধে সম্বল দুটি ওজনদার চাদর কাঁধব্যাগ থেকে বের করে নেওয়া গেল। নববিবাহিত দুটি জুটি গায়ে-গায়ে ঘেঁষে বসেছে। আমাদের ওরকম উষ্ণতা সন্ধান আর মানায় না। মিইং কী বলবেন? আমরা দুজনে যে যার ছাতা চেপে ধরে বসে রইলাম। বলতেই হবে, সত্যি কাজে লাগার মতো জিনিস আমরা সঙ্গে এনেছি।

গন্তব্যে পৌঁছে অবশ্য দেখা গেল ছাতার বিকল্প ব্যবস্থা ওখানে মজুদ। আতিথ্য প্রসারক ছাতা নয়। ঐ পাহাড়ের গায়ে গায়ে কত খুচরো

ডিয়েং প্লেটোর বিমা (ভীম) মন্দির

দোকান তার ছোট ছোট ছেলেকে দিয়ে পশরা হিসেবে এই উন্মুক্ত ছাতার সাহায্য বিক্রি করে যাত্রীদের কাছে। ন্যায্য বিনিময় মূল্যে যে কোনো যাত্রী ছাতার তলে মাথা বাঁচাতে পারে তবে আমাদের দলে যত যাত্রী ছিলো সে তুলনায় ছাতার সংখ্যা মনে হলো কম। ভাবলাম আমরা তো ছাতার বিত্তে বিত্তবান. চটপট এগিয়ে উঠে গিয়ে কোথাও মাথা বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে পাঠাতে পারি ছাতা কারো হাতে যাত্রীদের সাহায্যে। আমাদের সে দাম্ভিক ভাবনা শুনে ঐ পাহাড়ের জঙ্গো দেবতা নিশ্চয় মুখ টিপে হাসছিলেন। সিঁড়ির পরে সিঁড়ি বেয়ে উঠি, স্রোতের মতো জল ঝরছে. পথ আর ফুরোয় না। উঠছি তো উঠছি ক্রমে বেগ কমে আসে আমাদের চলার কিন্তু বৃষ্টির বেগ কমে না। পিচ্ছল পাহাড়ে পথ দুর্গম মনে হয়।

এর ভিতরেই বোঝা গেল রাত্রিবাস নিয়ে যে ভাবনা ছিলো মনে তার অনেকটাই বৃথা। নিজেদের বেশ পরিবর্তনের প্রশ্নই নেই কোনো কেননা সুটকেস রয়ে গেছে আমাদের বাসের খোলের ভিতরেই, পাহাড়ের নীচের ধাপে যেখানে বাস থেমেছে সেইখানে। এই দুর্যোগে এত পথ বেয়ে কে আনবে মালপত্র এক রাতের জন্য? কেনই বা আনবে? অন্য সকলে এত জামাকাপড় কিনেছে সোলোয়, সে সব পলিথিন ব্যাগ রয়ে গেছে তাদের সঙ্গে, নিরাপদ. পাতলা কাগজে মুড়ে রাখা নানা পরিধেয় বগলের তলে চেপে নিয়ে ওঠে আসছে তারা. জানতে ব্যগ্র : সেম্বায়াঙের সময় পেরিয়ে যায়নি তো?

অধ্যাপক তখনো জানতে উৎসুক 'মোটেল' ব্যাপারটা কী? অপ্রত্যাশিত শীত, অবিশ্রান্ত বর্ষা এবং মানবিক বেবন্দোবস্তের গ্রহস্পর্শে আমার ভাষা চমৎকার গুলিয়ে গিয়েছিল। রাত্রির আবাসে পৌঁছে ঢালাও সারিবাঁধা চৌকির ওপরে চাটাই পাতা দেখে বললাম 'ধর্মশালা টাইপ অফ থিং, বুঝলে?' নিজের বাক্যছটায় নিজেরই হাসি পেয়ে যাওয়ায় দুজনে মন খুলে হাসলাম বটে কিন্তু ভাষাজ্ঞানের অভাবে যে খানিকটা ভিজে কাপড় পাল্টানোর ব্যবস্থাটুকুও সঙ্গে রাখিনি এই খেদ তাতে পুরো চলে গেল তা নয়। আর শীত! মাঠের মতো হা-হা করা ঘর। ধর্মরক্ষার্থে তারই একসারির চাটাইয়ে সমস্ত নারী এবং অন্য সারির চাটাইয়ে সমস্ত পুরুষের পরস্পরের দিকে পায়ের তেলো দেখিয়ে শুয়ে থাকতে হবে। মিইং ব্যাকুলভাবে পুনরায় কী যেন বলতে চাইলেন। এতক্ষণ পরে তাঁর সাহায্যার্থে দলের ভিতরে মেডানের যে দুজন মেয়ে ছিলো তাদের ভিতরে ইংরেজিনবীশ দেবীশ্রী এগিয়ে এসে সরল মার্কিন ইংরেজিতে জানতে চাইল. তোমরা কি আগে রাত্রের খাবার খেতে যাবে না আগে প্রার্থনা করতে যাবে? খেতে যাবো বাইরে আবার? এই বৃষ্টিতে অধ্যাপক ভারিক্কিভাবে বললেন. 'আমরা পুজোপাঠ করি না বুঝলেন? তবে দেবস্থানে আবার আমাদের খেতে নেই কিনা ঠিক তাই আজ রাত্রিকালটা অন্তত আমরা স্বামী-স্ত্রী উপবাসই করবো ভেবেছি।'— দেবীশ্রী তার বড়ো বড়ো চোখ আরো গোল করে ফেলে ফিরে গেল।

সকালে অবশ্য কাসি পাহাড়ের রূপ দেখেছি। বৃষ্টি ধোয়া পথ সকালের আলোতে এক উজ্জ্বল আমন্ত্রণ জানাচ্ছে যেন। আরো অনেকখানি উঠে গেলে জুঙ্গো মন্দির। এটি জাভানী বৌদ্ধ মন্দির। মন্দিরের মাথায় ত্রিশূল রয়েছে। মনে হয় আগে এটি ছিলো শিব মন্দির। বর্তমান অবয়ব আঠারোশ একাত্তরে তৈরী, এইরকম লেখা রয়েছে বাইরে। সকলে সেম্বায়াং হতে বিলম্বে. মন্দিরের দরজা তাই এখন বন্ধ। চারপাশে স্থানীয় দর্শনার্থী এবং পান্ডারা বসে আছে এদিকে ওদিকে। অতটা উঁচুতে ওঠার আগেই মাঝামাঝি এক খাঁজে চত্বরের মতো এক ভিতে একটি মুসলিম প্রার্থনাস্থান বিদ্যমান। এটির গায়েও লেখা বহু ধর্মকথা। প্রার্থনার কথা। ওপরের মন্দিরের পিছনে এবং পাশে ধাপে ধাপে বহু স্নানাগার। ঝরনার বহমান জলে এবং জমে ওঠা তীর্থজলে স্নান করলে পুণ্য হয়। পান্ডারা ডেকে বলে গেল। স্নানাগারের ভিতরে উষ্ণ জল পাওয়াও সম্ভব। রাতের বৃষ্টির শেষে সকালের সেই রোদে শীত আর ছিল না একটুও। কিন্তু কাপড় জামা বন্ধ রয়েছে বাসের গহ্বরে। স্নানের ভাবনাকে আমল না দিয়ে কবি ছেড়ে গেলাম মালাং মুলুকে। ততক্ষণে ভুলে গেছি ভাষার গোলের বাধা। ভুলে গেছি রাতের স্যাঁতসেঁতে ঠান্ডা আর চাটাইয়ের কথা। দেবীশ্রীর কাছে জানা হয়েছে কী করে বেল টেলিফোনস-এ চাকরির সূত্রে সে সিংগাপুরে গিয়ে যত্ন করে ইংরেজি শিখে এসেছে। 'এদের তো উচিত ছিলো ঐভাবে কাউকে শিখিয়ে আনা আন্তর্জাতিক পর্যটনের বাস চালাবে, ইংরেজি বলবে না কেন?' —দেবীশ্রী বলেছে। উত্তর আমরা হেসেছি।

যতদিনে সারাঙ্গানের পাহাড় চূড়ায় উঠেছি ততদিনে শুধু দেবীশ্রী নয়, আরো অনেকের সঙ্গে দুটি একটি কথায়,—তার চেয়েও বেশি হাসি ও গানে,—বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। সূর্যোদয় দেখবো বলেই বিশেষ করে উঁচু চূড়ায় 'লাজ' আবাসে গিয়ে থাকা। একটানা বাসে বাসে [illegible] থেকে বালিদ্বীপে, বালিদ্বীপ থেকে ফিরে জাভাতে এসে এই ক্লান্ত তীর্থযাত্রীর দল যেন সূর্যের প্রসাদের আশাতেই থমলো সারাঙ্গানে। পরিবর্তে মাতাহারি চক্ষু বুজে রইলেন। কুয়াশায় ঢেকে রইল পাহাড়, হ্রদ, পথ। এ অবস্থায় লোকে কী করে? ঘরে বসে বসে এটা সেটা খাবার খায় না? এরা কিন্তু সব দলে দলে বেরিয়ে পড়লে সাহসের ভরসায় অশ্বারোহণে আমাদের কী ডাকাডাকি সঙ্গে যাবার জন্যে! মিইং তো একাই এক ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ঐ কুয়াশার মাঝখানে। তিনি নাকি বারবার এসে এসে এই পাহাড়ে পথ এমন ভালো চেনেন আর ঘোড়া চালাতেও এত দক্ষ হয়ে গেছেন যে, মেঘ, কুয়াশা কিছুতেই তাঁর ভাবনা নেই। ফিরলেন অবশ্য সে-ই গাড়িতে চেপে। সকলে মিলে তখন নিয়ে এসেছে তাঁকে। কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে ঘোড়া ফেলে দিয়েছিল মিইংকে কী ভাগ্য যে পাহাড়ে গড়িয়ে পড়ে যাননি বেচারী। আরো ভাগ্য যে ঐ ঘন কুয়াশা পর্দার ফাঁক দিয়েও কিকি দেখতে পেয়ে গেছে [illegible]

জাকার্তার বাজার (পাসার জায়া)

মিইং পড়ে কাতরাচ্ছেন। পায়ে, হাতে, মুখে নানা লাঞ্ছন ছুঁদন দিয়ে ডাক্তারবাবু শুইয়ে দিয়ে গেলেন তাঁকে। কিন্তু মিইং কি শুয়ে থাকার মতো মহিলা? মাতাহারি সূর্য কুয়াশার ভয়ে না উঠলে না-ও উঠতে পারে কিন্তু মিইং উঠবেনই। ওষুধ আর জলীয় পথ্যের বল নিয়েই। সূর্যকেও দেখা গেল ভরদুপুরে মিটমিটিয়ে বেরোচ্ছে। তখন সবাই যে যার গামছা পেতে দিতে লাগলো হোটেল লাবুর দাওয়ায়। না, সূর্যকে বসতে দেবার উদ্দেশ্যে নয়, যার-যার তোয়ালে গামছা শুকিয়ে নিতে। ঐ পাহাড়ের ওপরেও তো হাওয়া তেমন শুকনো নয় যে সূর্যবিহীন দাওয়াতে মেলে দিলে হাওয়ায় ভিজে তোয়ালে শুকোবে। তাই সূর্য দেখলেই আপ্যায়ন। সারাংগানের এই পাহাড়ে শীত ছেড়ে নীচে নামতে নামতে জাকার্তায় এসে ফিরে দাঁড়ালে মনে হয় যেন ভিনদেশের হাওয়া লাগছে গায়ে। গুমোট গরম কি এমনি গুমোট আর এর গরম হয়? বাপ রে!

তবু জাকার্তা হচ্ছে জাকার্তা। ঐ যে বেড়ানোর পথে পথে মাদিউন থেকে কেদিরি হয়ে জাভার কতো গ্রামে গঞ্জে দেখা গেল বাড়ির গায়ে। বাড়িতে ঢোকার প্রধান দুয়োরের এপাশে ওপাশে গেঁথে তোলা কিংবা এঁকে লেখা 1945, তারপরেই 17 কোথাও বা তাকে উল্টে দিয়ে তোরণের এদিকে ‹17› ওদিকে 71 খোদাই করা, সেই উনিশশো পঁয়তাল্লিশ খ্রীষ্টাব্দের সতেরোই অগস্ট কেউ ভোলেনি তো। সেই স্বাধীনতা ঘোষণার শপথের প্রকাশ আর প্রমাণস্বরূপে নতুন করে গড়ে উঠেছে, ভরে উঠেছে জাকার্তা। নতুন বিশাল চওড়া রাজপথ যে কোনো একটির মোড়ে দাঁড়ালে মনে হবে প্রাগ্রসর অতি আধুনিক এ কোন নতুন দেশে এলাম। যেমন সে রাস্তার ঋজু গড়ন তেমনি সে সব পথে যানবাহনের দ্রুত চলাচল। এক পলকে সবুর সইবে না কোনো গাড়ির। সব জেনারেলদের নামে নাম-পাতানো প্রশস্ত রাস্তায় গাড়ির চালকদের মেজাজ মিলিটারী; চেঁচামেচি নেই, আছে চক্ষের পলকে হুশ করে বেরিয়ে যাওয়ার প্রচণ্ড তাড়া, দেখলে আলোর বাধানিষেধ না মেনে রাস্তা পার হওয়ার কলকাতাই ভাবনা মন থেকে পালাবে আপনা-আপনিই।

রাস্তার নিয়মের ফাঁদ কেবল পথচারীর জন্য নয়, গাড়ির চালকের জন্যও বটে। একবার যদি ঐ বিশাল পথে ভুল গলিতে ঢুকে পড়েছে কোনো চালক বাস, উদ্দিষ্ট পথে ফেরার জন্য তার আর এদিক-ওদিক বেঁকার কোনো প্রশ্নই নেই। তাকে চলতেই হবে সোজা নাক বরাবর ঐ ভুল গলি ধরেই যতক্ষণ না কোথাও বাঁক নেওয়ার বিধিসম্মত অনুমতিচিহ্ন চোখে পড়ে। 'দেখতে পাচ্ছ কি? দেখা যাচ্ছে? চলো, চলো, এগিয়ে চলো। হয়েছে আজ আর ফেরা!'—এমনিতরো বিদঘুটে নিয়মমানার ঝুঁকি নিয়েও যে শয়ে শয়ে ব্যক্তিগত নানা ছাঁদের গাড়ি সারাদিন জাকার্তার পথে পথে ছোটে তার কারণ ইন্দোনেশিয়ানদের রয়েছে তেলের জোর। ঐটি এক মস্তো জোর। ওপেক-আসরে বসে পড়তে যে-দেশ পেরেছে আজকের দিনে তাকে আর পায় কে? ওখানে সব মানুষজনের তাই তেল পুড়িয়ে চলার দিকে ঝোঁক। গোটা একটা গাড়ি যদি না হলো তো মোটর-বাইকই সই। জাকার্তাতে তো বটেই যোগজাকার্তাতেও কাজের ঘণ্টা আর ছুটির ঘণ্টা যেই বাজে, প্রত্যহ মোটরবাইকের এক চলন্ত মেলা দেখা যায়। আর যখন সপ্তাহ শেষের ছুটি? সবাই তখন ছুটবে কাছাকাছি সব সুন্দর সুন্দর জায়গায় যার যার গাড়ি নিয়ে। গাড়ি যার নেহাত নেই সে গিয়ে ধরবে রেলগাড়ি। জাকার্তার ভিতর দিয়েই ঘুরে ঘুরে গেছে খেলাঘরের ট্রেনের মতো এদের নিজস্ব মাপের রেলগাড়ি আর রেলপথ। শহরের এদিকে ওদিকে স্টেশন আছে একখানি ঘর কিংবা একটি ছাউনি, তাতেই যথেষ্ট। সেইসব স্টেশন ভরে দাঁড়িয়ে থাকে স্কুলের ছেলেমেয়ে, পসারী ব্যাপারীর মতো সাধারণ যাত্রীরা। ট্রেন আসি-আসি হলেই পথের ওপরে গড়ানো দরজা সড়াক করে সেঁটে গিয়ে রেললাইন আর সড়কপথের মাঝখানে বাধা সৃষ্টি করে দেয়, ট্রেন চলে যাওয়া মাত্র

মুরগী বিক্রি হচ্ছে

তড়াক করে সরে গিয়ে পথ খুলে যায়। দীর্ঘ প্রতীক্ষায় এদিকে ওদিকে সারিবদ্ধ যানবাহনের কম্পমান দশা দৈনন্দিন দেখা যায় না জাকার্তায়। হয়ত শহরের আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা এখনো কম বলে। সেইজন্যেই হয়ত ব্যবস্থাপনার গুণ এখনো কাজ করছে। সহজ তো নয় জাকার্তার ব্যবস্থাপনা। জাকার্তা এমন মস্ত একটা জায়গা মনে হয় যেন একটা গোটা প্রদেশকে শহরের ভিতরে পুরে ফেলা হয়েছে। সমস্ত অঞ্চলেই সমান শহুরেয়ানার ছাপ পড়েছে তা নয়, কিন্তু নাগরিকতার বিস্তার ঘটানোর চেষ্টা চলছে দ্রুত। যত না রাস্তা তত আলো আর প্রতিটি পাড়ায় মহল্লায় নতুন নতুন বাজার। এসব বাজারের ভিতরে অনেকগুলির ভিড় কমতেই চায় না তেমনি আবার কতকগুলি দারুণ সাজসজ্জা নিয়ে শূন্য প্রহর গোনে। এতে কিন্তু দোকানপাটের বিকিকিনি বালিকা-বালকদের তাপ-উত্তাপ নেই একটুও। হাসি হাসি মুখে তারা নিজের নিজের সাজানো দোকান নিয়ে মেতে আছে। কেউবা গান বাজিয়ে শোনাচ্ছে, কেউ গল্প-গুজব করছে নিজেদের মনে। ক্রেতা দেখলেই এগিয়ে আসতে তৈরী, কিন্তু খদ্দের যদি কিছু না কিনে কেবল দেখে দেখে চলে যায় একজনও পিছু ডেকে বলবে না "এই যে দিদি/মাসীমা, দেখুন না, ভালো শাড়ির কলস্, কিংবা, ভালো জিনিস আছে।' না ও-রকম হাঁকডাকে অনভ্যস্ত ও দেশে ঐ নম্র সুন্দর মানুষগুলি। খুব ভিড়ের বাজারেও তাই ঠেলাঠেলি চলে কিন্তু চেঁচমেচি নয়। একটুও নয়। এমন কি, বাসের কণ্ডাক্টর যখন জানান দেবার জন্যে সাড়া তুলে ডাকে "লিয়া" এমন লাজুক শোনায় সে স্বর যে উৎকর্ণ হয়ে না থাকলে শুনতে ভুল হয়ে যেতে পারে। একই লাইনের এক বাস থেকে অন্য বাসে সহকর্মীকে হেঁকে কথা বলা কিংবা খেপিয়ে হাসা [এই তো পার হয়ে গেলাম কি রে ওস্তাদ, চালা চালা'] মাত্র একদিন শুনতে পেয়েছি প্রায় এক বছর ধরে জাকার্তার পথে পথে বাসে ঘোরাঘুরি করে। যে ঐ রকম খেপাচ্ছিল সে কণ্ডাক্টরটি

সারাংগানের পাহাড় চূড়ায় 'লাবু' বিশ্রামাগার

নিশ্চয়ই অনেকে সমাত্রার লোক কেন না, শুনেছি, সুমাত্রানরা এসব ব্যাপারে জাভানীদের ঠিক উল্টো। জাভানীদের বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না, অথচ সুমাত্রানরা ধার ধারে না। ইদানীং অবশ্য জাভানীরাও একটু একটু করে পাল্টে যাচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় নতুন শ্রেণীভেদের যে সাধনা পরিব্যাপ্ত ছিলো ভাষায়, ভঙ্গিতে, ভাবে—এই সেদিন পর্যন্ত, তা ক্রমে চেহারা পাল্টে ফেলছে। তবু জাভার মানুষজনের নিচু গলায় এবং নরম কথার ভঙ্গিতে চেনা যায় তাদের সেই পুরোনো সম্ভ্রমের আদর্শ।

এই প্রাচীন ভব্যতাজ্ঞানের প্রভাবে আজও এখানকার ধোপা মিস্ত্রি কিংবা চাকরের আবির্ভাব হবে খিড়কির দরজা দিয়ে, সামনাসামনি নয়। সামনে চমৎকার দরজা রয়েছে সেইখানে বসেই রয়েছেন দরজার কাছেই বৈঠকের আরাম কেদারায় বাড়ির তুয়ান [ প্রভু ]। কিন্তু এরা সে দুয়োর এবং ঘর পেরিয়ে পিছন দিক দিয়ে এসে জানান দেবে নিজেদের অস্তিত্ব। ভাবখানা যেন, বড়ো দরজা হচ্ছে ভদ্রলোকদের জন্যে। অথচ এইসব মানুষগুলির পরনের পোশাক এখন হয়ে গেছে পশ্চিমী। চমৎকার আধুনিক ছাঁদের স্কার্ট সজ্জিত হয়ে এসে একেবারে হাঁটু গেড়ে যখন চুমি নামে দাসীটি আপনাকে পানীয় জল এগিয়ে দেয়, আপনার একটু অস্বস্তি হতে পারে বই কি। পূর্ব-পশ্চিমের সংস্কৃতির মিলন আমাদের দেশে ঠিক এমন চেহারা নেয়নি তো। ঐ হাঁটুগাড়া ব্যাপারটা দেখে ততখানিই চমক লাগে যতখানি লাগে সহায়ক-সহায়িকার স্বচ্ছন্দবিহারী সাজ-সজ্জায় চুলছাঁটার বাহারে, সুগন্ধি সাবান ক্রীমের নির্বাধ ব্যবহারে। হতে পারে এসব শহর জাকার্তার বৈশিষ্ট্য, খুব সম্ভব তা-ই। কিন্তু শহরে যে ফেরিওয়ালা কিংবা বেচাওয়ালা আসে এবং দিন ফুরোলে নিজের নিজের পসরা এবং গাড়ি নিয়ে সরে যায় শহরের পথ থেকে, তাদের দারিদ্র্যও তো দীনদর্শন করে না সেই সব মানুষগুলিকে,—এ বড়ো কম কথা নয়। এরা একভাবে বাঁচতে শিখেছে যাতে এদের সমাজে গরীব থাকলেও গরীবিয়ানা দৃষ্টিকটু হয়ে প্রত্যহ চোখে বিঁধতে থাকে না। সকাল থেকে সন্ধ্যা ঘামে ভিজেও এরা জানে দেহকে দুর্গন্ধমুক্ত রাখার সহজ নিয়ম। গন্ধে, শব্দে, প্রতিক্রিয়ায় অনুক্ষণ টেনে রাখা সভ্যতার ছোট একটি সূত্র তো এই? যা অপ্রকাশ্য, প্রতিকূল, বিরূপ সেই সব কিছুকেই আড়াল করে ফেলার সেই সূত্র কোনো এক সময়ে ইন্দোনেশিয়াতে জাভানীরা আয়ত্ত করেছিল এখনো সে সুতো তাদের হাত থেকে পুরো এড়িয়ে যায় নি। পশ্চিমী মুলুকে বহু সভ্যতা যেমন সমস্ত অভিজ্ঞতাকেই ব্যানান করে বলতে শিখিয়েছে, বলে বলে, দেখিয়ে দেখিয়ে বলা এবং নিরাহত করা তাদের ফুরোয় না। দক্ষিণ-পূর্ব মুলুকে এ মানুষগুলি তেমনি শিখেছে হাসতে আর চুপ করে থাকতে। এ কেবল ঘরের ভিতরে সজ্জন সঙ্গে মাপা হাসি, মৃদু বাক্যালাপ কিংবা বাক্যহীন সম্ভ্রমের ব্যাপার নয়, বেশ গোলমেলে ঠেলাঠেলিতেও এমনি মুখেতো রঙ তাদের। এ রকম একটি দৃষ্টান্ত নিত্য দেখা যেত বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ডাকঘরের সামনে। প্রয়োজনের তুলনায় ওখানে ডাকঘর তো বেশি নেই কাজেই বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন হলেও ওখানে পাড়াশুদ্ধ লোক জড়ো হয়ে যেত। বিশেষ করে পরব-উৎসবের দিন এলে তো লোক থই-থই। অত লোক জমে গেছে বলে যে সারি বেঁধে ডাক টিকিট কিনবার জন্যে একের পিছনে অন্যজন দাঁড়াবে তেমন রীতি নেই ওখানে। আপনি যদি কলকাতার লাইন লাগানোর অভ্যাসে ও রকম দাঁড়াতে গেলেন তো দেখবেন আপনার এ কাঁধের পাশ ঘেঁষে, ও কাঁধের ওপর দিয়ে নানা রকমের হাত এবং মুন্ডু ঠেলে ঠেলে আসছে, পয়সা গলে যাচ্ছে খুব মৃদু অনুরোধসহ ঠিক কোকরাউতে : "একটা স্ট্যাম্প।" "চিঠিটার টিকিট ঠিক আছে?" দেখবেন, ডাক কর্মচারী দিব্য হাসি হাসি মুখে যেমন যা পারছে দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ধীরে সুস্থে। এই যে ধাক্কাধাক্কি, পিছন থেকে উজিয়ে আসা, এ সবই

বালিদ্বীপের বেসাকি (বৈশাখী) মন্দিরের তোরণ

চলছে খুবে খোশমেজাজে। ধাক্কা যে দিচ্ছে এবং যে খাচ্ছে দু তরফেরই ভাব যেন ব্যাপারটা বেশ মজার। কোনো রাগদুঃখ নেই। এইসব ভাষা গলাগলির ভিতরে তখন আপনিও গলতে শুরু করবেন গত্যন্তর নেই। ঐ রকম ওরা! সময় বাবদে একেবারে হালছাড়া। কী হবে রীতি-নীতির কড়া ছাঁদ নিয়ে? অথচ কতো রকম রীতি-নীতি যে কাগজেপত্রে দলিল দস্তাবেজে জমিয়ে তুলেছে ওদেশে ওরাই, সেও এক আশ্চর্য কান্ড। তাতেও সাধারণ মানুষের কোনো তাপ-উত্তাপ টের পাওয়া যায় না। কোথাও এক পা নড়তে হলে একশো রকম ছোট-বড় মেজ-সেজ রশিদ যোগাড় করে আনতে হবে? ঠিক আছে, তাই হবে।

এই যে আপাত শান্ত স্বীকৃতি, এর পিছনে ঠিক কী আছে ভেবে ইন্দোনেশিয়ার বাইরের সজ্জন মানুষজন একটুখানি অশান্তি বোধ করেন : "খুব ভদ্র এরা কিন্তু দেখবেন কেউ আপনার যথার্থ বন্ধু হবে না। কক্ষনো না।" কিংবা "কক্ষনো মন খোলে না এরা। বছরের পর বছর আপনি এদের সঙ্গে একত্র উঠুন, বসুন, কাজ করুন, হাসুন, দেখবেন এরা যেমন দূরে তেমনি দূরে একটা আড়াল থাকছেই।"

এই রকম অজস্র কথা শুনেছি—বাঙালী-অবাঙালী ভারতীয় অভারতীয় আগন্তুকের কাছে। স্পষ্ট বলেছিলেন একদিন অস্ট্রেলিয়ার মানুষ টোনি,—রাষ্ট্রপুঞ্জের কাজে গেছেন ওদেশে। ঘুরে ঘুরেই সারা দেশ জুড়ে কাজ তাঁর। স্থানীয় সহকর্মীদের আন্তরিক উৎসাহ এবং সহযোগিতা ছাড়া তাঁর কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ নেই। সেই সমস্ত সহযোগীরা সকলেই হাসিমুখ, অতিশয় ভদ্র কিন্তু টোনি কিছুতেই বুঝতে পারেন না কাজ বিষয়ে তাঁদের ধারণা কেমন। তাঁদের আন্তরিক মত কী? এই প্রকল্পগুলি দাঁড়াবে, ফল দেবে? টোনি বলেছিলেন, এর চেয়ে সোজাসুজি যদি ওঁরা বলতেন, এগুলো চাই না কিংবা, ওইগুলো চাই, তা হলে শুনতে কঠিন হতো সে সব কথা, হয়ত বা উত্তেজনা জমতো সভায়। কিন্তু কোথাও তো এগোলো কথাটা, কিছু তো ধরা যেত? এ যে সবটাই নম্র হাসি দিয়ে ঢাকা—মত অমত সবই। দিনের পর দিন জুড়ে শুধু সৌজন্যসজ্জা,—মুশকিল হয় এতে সৎ আন্তরিক আগন্তুক কর্মীদের। এই একই মুশকিল কি কোনো জাভানী অনুভব করেন না কখনো?

আমার কেমন দেখে-দেখে মনে হয়েছে যে এর উত্তর হবে : হ্যাঁ, সম্ভবত করেন। কিন্তু সে অনুভূতি তো সুখের নয়, আর যা সুখের নয় তাকে কিভাবে খোলাখুলি নিতে হয় অথবা প্রকাশ করে বলতে হয় তা বোধ হয় ঠিকমত শেখার সুযোগ তেমনি তাঁদের সমাজে। তাই খুব নম্র প্রশ্রয় দিয়ে অভয় পেয়েই যে-সমাজে সকলের চলবার কথা, সেখানেই এলে সেই অভিজ্ঞতা যার নাম ইংরেজীতে 'রানিং অ্যামাক'। নরম হাসির রেখা ছাড়া আর কোনো রেখায় যাদের মুখ এঁকে তোলার কথা ভাবা যায় না তারা খেপে হতাহতজ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটবে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। অথচ এমন হয় তার প্রমাণ এই বাক্যবন্ধে। একে শুধু ইংরেজী ভাষার কিংবা ইংরেজীভাষী পরিব্রাজকের বিকৃত কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। 'আমুক' এদের নিজস্ব শব্দ এদেরই অভিজ্ঞতায়। এরা পেয়েছে 'মেঙামক', 'রানিং অ্যামক' তারই রূপান্তর মাত্র। ভেবে দেখলে এতে আশ্চর্য হওয়ার তেমন কিছু নেইও। বলা যায়, এটাই প্রত্যাশিত। কাঁদা বারণ, রাগা বারণ, চেঁচানো বারণ —এত বারণ চিরকাল কি সকলে সইতে পারে? যখন আর একেবারে সয় না তখন স্বভাবিক প্রকাশের পথ না থাকলে অস্বভাবিক দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য আবেগের কে ঠেকাবে কে? মরীয়া মানুষের সেই চেহারা ধরা পড়ে রানিং অ্যামাকে।

এই রকম উন্মাদ ক্রোধের চেহারা, ওখানে একদিনও দেখিনি। ওর কাছাকাছি একটিমাত্র দৃশ্য দেখেছিলাম সালেম্বার রাস্তায়। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও দেখেছিলাম মারমুখো মানুষটিকে আশেপাশে মারা ঠেকাবার জন্য দাঁড়িয়ে গেছে তাদের। সামাল দেওয়ার ধরন কত ধীরস্থির, তাদের মুখে কথা কত নরম। যে-অবস্থায় আমাদের দেশের মানুষ অক্লেশে দু-হাজার শব্দ বলে যাবে সেখানে সকলের মুখে জাকার্তার কুড়িটার বেশি শব্দ শোনা গেল না।

শব্দের ব্যবহারে যেমন। ওদের কুণ্ঠা স্পর্শের কুণ্ঠা কিন্তু তেমনি আবার ওদের ততটা নেই। আমাদের দেশের সঙ্গে এ তফাতও খানিকটা নজরে পড়ে। বিশেষ করে বাসের ভিড়ে। একজন দাঁড়িয়ে থাকা সহযাত্রীকে নিজে। নেমে যাওয়ার সময়ে আসনটি কেউ দিয়ে যেতে চান, তিনি কোনো রকম 'এই যে আপনি বসুন' এ ধরনের বলাবলির ভিতরে না গিয়ে বিনা সঙ্কোচে দণ্ডায়মান সহযাত্রীকে স্পর্শ করে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন। এ ব্যাপারে বয়স কিংবা স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নিয়ে কোনো রকম বিব্রত ভাব দেখা যায় না। খুব সহজেই যে কারো হাত অথবা পৃষ্ঠ স্পর্শ করে একজন সহযাত্রী নিজের আসনটি দেখিয়ে দিয়ে যান। এতে কেউ চমকে ওঠে না কিংবা ভ্রূ কুঁচকে বলে না। বসতে দিতে চাওয়া ছাড়াও এমনি কথা বলে ওঠার প্রয়োজনেও ওরা এইভাবেই অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করে। আমার এ অভিজ্ঞতা একদিন হলো একটু বিচিত্রভাবে। যতদিন আমি মনে মনে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পানে তাকাবো ততদিন আমার মনে ফিরে ফিরে আসবে এই অভিজ্ঞতা।

বসে উঠেই দেখেছিলাম এই ছাত্র দুটি লক্ষ করছে আমাকে। ওদেরই কাছাকাছি আসন পেয়ে বসে যাওয়ায় শুনতে পেলাম ওরা নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করছে। একটি ছেলে বলছে অন্য জনকে যে, আমি নিশ্চয়ই বাংলাদেশের মেয়ে। অন্য জন খুব মৃদু স্বরে কিছু একটা প্রতিবাদ করছে। সম্ভবত সে বন্ধুকে খোঁচা দিয়ে থাকবে 'তুমি সব জানো' গোছের কিছু বলে। এর পরেই যে ছেলেটির নিশ্চিত ধারণা হয়েছিল যে আমি বাঙালী সে একটু ঝুঁকে পড়ে আমার হাতে টোকা দিলো : 'একটু শুনুন, আপনি বাংলাদেশের, তাই না?'

এখন এ প্রশ্নের কী উত্তর?

ঐ তরুণ ছাত্রটি একেবারেই ঠিক ধরেছে অথচ ঠিক তো নয়। তবে কি এর উত্তর হবে 'হ্যাঁ' এবং 'না'? কিন্তু সে উত্তর বুঝিয়ে বলা যায় কী করে? কম কথা বেশি কথা, কোন কথায় প্রকাশ করে বলা যায় এই বিদেশী ছাত্রটির সহজ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর? যেমন করে যতবার সাজাই নানা ভাষা, প্রশ্নটা ফিরে ফিরে আসতে থাকে। সামান্য ঐ কয়েকটি শব্দ কী কঠিন ধাঁধার মতো শোনায়। —আমি কি বাংলাদেশের? আমি কি বাংলাদেশের নই?

আমার নামার জায়গা এসে গিয়েছিল। আমার ইচ্ছে হয়েছিল ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করি : কী করে সে অনুমান করলো। আমার বাঙালীয়ানা। সে সব কিছুই না করে আমি বিনীতভাবে ছাত্র দুটির দিকে চেয়ে হাসলাম। বললাম, 'আমি ভারত থেকে আসছি।'

# বাতাবরণ সোমনাথ ভট্টাচার্য

জায়গাটা সত্যিই খুব ভাল লাগছিল। নিবিড় ঝাউবন, প্রহরে প্রহরে বহুরূপীর মত সমুদ্রের রঙ বদলানো, বসবাসের স্বাচ্ছন্দ্য—সব মিলিয়ে ক্ষোভ উদ্রেকের কোনো কারণই ছিল না। নতুন জায়গায় আসার প্রথম উত্তেজনা কেটে যাবার পর ছেলেমেয়ের উৎসাহ যে ঝিমিয়ে এসেছে খানিক, বিকাশ বুঝতে পারছিল। সেটা এখানকার নির্জনতার জন্যে। রেবার নিজের কোনো পছন্দ-অপছন্দ নেই। বসবাসের মোটামুটি ব্যবস্থা, বিশেষ করে পরিচ্ছন্ন বাথরুম এবং নিরাপত্তার দিকটা বেশ শক্তপোক্ত বুঝে নিতে পারলেই স্বামী এবং ছেলেমেয়েদের পছন্দ—তারও পছন্দ। ছেলেমেয়েদের একঘেয়েমি কাটাবার জন্যে বিকাশ সামনের ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি চালানো শেখাতে শুরু করে দিয়েছিল। মিলি, মোটামুটি গাড়ি চালাতে জানে। বিকাশ ওর হাতে স্টিয়ারিং ছেড়ে পাশে শুধু সতর্ক হয়ে বসে থাকে। জয়ের বয়েস এগারো। দিদির দেখাদেখি সে নাছোড়। প্রায় কোলে বসিয়ে মাঝে মাঝে তার হাতে স্টিয়ারিং দিতে হয়। পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়নি। মিলি, জয় এই নতুন খেলায় বেশ মেতে উঠেছে। বিকাশ বুঝেছিল, সামনের শনিবার পর্যন্ত দিব্য কাটিয়ে দেওয়া যাবে। কলকাতায় ফিরে রবিবারটা বিশ্রাম। সোমবার থেকে আবার কাঁধে জোয়াল।

ট্যুরিস্ট লজটা সুন্দর। অন্য রকম। কাঠের বাড়ি। অ্যাসবেসটাসের চারচালা ছাদ। মোটা মোটা খুঁটির ওপর মাটি থেকে প্রায় চার ফুট উঁচুতে তিনটে ছ বিছানার ঘর। চার ধার দিয়ে এঁকেবেঁকে চওড়া বারান্দা। সবুজ রঙ। একটু দূরে জলের ট্যাংক। নীচে পাম্পের ঘর। এখনও বিদ্যুৎ এসে পৌঁছয়নি এখানে। জেনারেটার চালিয়ে ট্যাংকে জল তোলা এবং রাত্রে লজে আলোর ব্যবস্থা। সব কিছুতেই একটা সাময়িক ব্যবস্থার ছাপ। লজের সামনে, রাস্তার ওধারে ডানদিক চেপে অনেকখানি জায়গা সাফ-সুতরো, মাটি ফেলে সমান করে রাখা। বছর কয়েক আগে, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী নতুন ট্যুরিস্টলজের শিলান্যাস করে গেছেন। মেটাল রোড, পেছন থেকে এসে ট্যুরিস্ট লজ বেড় দিয়ে আবার প্রধান রাস্তায় গিয়ে মিশেছে। সামনে, রাস্তার ওপারে বালিয়াড়ির ওপর ঘন ঝাউবন। তারপর সমুদ্র—আদিগন্ত।

দিনটাও মিঠে। কাল গভীর রাতে আশ্বিনের আকাশ ভেঙে হঠাৎ ঝরঝর বৃষ্টি। রাত্রের মধ্যেই বালি সব জল শুষে নিয়েছে। রোদের তেজ গায়ে বিঁধছে না। বাতাস বইছে সতেজ। ঝাউবনে হাওয়ার সন সন।

বিকাশের দুঃখ লাগছিল, অথচ এ সব ছেড়ে আজই তাদের চলে যেতে হবে। আজ বুধবার। শনিবার এখনও অনেক দূরে। ছেলেমেয়েদের এখনও জানান হয়নি। রেবা এবং সে, দুজনে ঠিক করে রেখেছে, দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর জানানো হবে ওদের। বলা হবে, বিকাশের একটা জরুরী কাজের কথা মনে পড়ে গেছে। আজই ফিরে যেতে হবে। খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে চারটে নাগাদ বেরিয়ে পড়বে। নটা নাগাদ বাড়ি। সৈকত হোটেলে এখন জানানো হবে না। তিনটের সময় যখন ওদের লোক বিকেলের চা দিতে আসবে, তখন তাকে কদিনের যা বিল হয়েছে, আনতে বলা হবে। ট্যুরিস্ট লজ নিয়ে ভাবনা নেই। শনিবার পর্যন্ত তাদের বুকিং। পয়সাকড়ি মেটানোই আছে। বেরুবার ঘণ্টাখানেক আগে জানিয়ে দিলেই হবে, তারা ঘর ছেড়ে দিচ্ছে। জায়গাটা আর ভালো লাগছে না। বোর করছে।

রেবা এবং বিকাশ অত্যন্ত গোপনে প্রায় রণকৌশল ঠিক করার মত করে সমস্ত পরিকল্পনা করেছিল। প্রচ্ছন্ন কারণ একটিই, তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত। তারা এখানে থাকা আর স্বস্তিদায়ক মনে করতে পারছে না। তাদের মনে হচ্ছে, ব্যক্তিবিশেষ বা তাদের সমগ্র পরিবারের ওপর যে কোনো দিক থেকে হামলা আসতে পারে।

লজের সামনে বিকাশের মার্ক ফোর অ্যামব্যাসেডার চার পায়ে দাঁড়িয়ে রোদে গা সেঁকছে। খোলা আকাশের তলায় কাল রাতের বৃষ্টি, সমুদ্র-হাওয়ার ঝাপটা সবটাই ওপর দিয়ে গেছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই বিকাশ গাড়িতে উঠে বসেছিল। ভেতরে ভেতরে বেশ নার্ভাস। আজই কলকাতায় ফেরার ঠিক। সব ঠিক আছে তো? বিপদের সময় অনেক মূল্যহীন আশংকাই তো মনে হয়। অ্যাকসেলারেটারের ওপর পায়ের চাপ, দু আঙুলের মধ্যে চাবি। দুবারের বেশি তিনবার চেষ্টা করতে হল না। সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে জেগে উঠল।

বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে ভাবছিল বিকাশ। ভ্রূ কোঁচকালো, আঙুলের ফাঁকে সিগারেটের মুখে অনেকখানি ছাই জমে। দৃষ্টি ঝাউবনের ওপরে, আকাশের দিকে। হাইওয়ে পর্যন্ত প্রায় একশ কিলোমিটার রাস্তা নিয়েই ভাবনা। সরু রাস্তা। যদিও বেশি দিন আগে তৈরি নয় কিন্তু এর মধ্যেই অনেক জায়গায় বসে গেছে। পিচ উঠে খোয়া, ইটের পরত বেরিয়ে পড়েছে। রাস্তা সারানোর তোড়জোড় চলেছে। আসার সময় রাস্তার ধারে অনেক জায়গায় ইটের থাক, খোয়ার চৌ-বন্দী, তার-বয়লার, খোয়ায় পিচ মেশানোর মেশিন পড়ে রয়েছে দেখেছে। হাইওয়েতে রাস্তাটা মেশার আগে বেশ চওড়া স্প্যানের একটা ব্রিজ। নীচে, খাল। ব্রিজের ওপর থেকে হাইওয়ে দেখা যায়। ভাবনা হচ্ছিল, গাড়ি বেশ আস্তে চালাতে হবে। এই রাস্তাটুকু পেরুতেই সময় খেয়ে যাবে। আসার সময় দিনের আলো ছিল। বরাবর রাস্তাটা বেশ খুঁটিয়ে দেখে এসেছে বিকাশ। হাইওয়েতে উঠে পড়তে পারলে আর দেরি লাগবে না বাড়ি পৌঁছতে।

স্নান সেরে চুলে লম্বা করে চিরুনী টানতে টানতে রেবা বারান্দায় বেরিয়ে এল, 'হাইওয়ে পর্যন্ত যেতেই বেশ সময় লাগবে, না গো?'

'ঘণ্টা আড়াই তিন তো বটেই—যা রাস্তা', বিকাশ জবাব দিল ঠিকমতই। কিন্তু ভাবছিল অন্য কথা।...রেবা কি করে বুঝতে পারে? তার চিন্তা ঠিক এই

মুহূর্তে কোন খাত দিয়ে বইছে, অবলীলায় হদিশ করে কি করে? অনেকটা চিন্তা-গঠন গোছের ব্যাপার। এটা কি গত আঠারো বছরের দাম্পত্যজীবন নির্বাহের নীট ফল। যা হর্ষদায়ক, সুখপ্রদ, পরম নির্ভরযোগ্য। বিকাশ ভাবল, সেও কি পারে না? পারে না রেবাকে পড়তে? রেবার মত অনায়াস এবং তীব্রভাবে না হলেও, —পারে। অনেকটাই পারে। মার্কেটে ঘুরতে ঘুরতে কোন্ শাড়িটা রেবার নজর কাড়বে, আগে থেকেই আঁচ করতে পারে। বন্ধুপত্নীদের মধ্যে কার প্রসঙ্গ বা প্রশংসা রেবার কাছে না-করাই সর্বাত্মকভাবে সমীচীন, সে কয়গুণে বলে দিতে পারে। এমনকি, ছেলেমেয়ে বড় হয়ে যাবার পরও দুবার নার্সিং হোম ঘুরে এসে, কদাচিৎ নীল চাঁদের দিনে রেবার সম্বরিত মিলনেচ্ছা,—বিকাশ অনায়াসে পড়ে ফেলতে পারে!

'কি ব্যাপার বল তো', বিকাশ জিজ্ঞেস করল, 'সকাল থেকে আজ দেখছি না ওদের! চলে গেল না কি?'

'হ্যাঁ যাচ্ছে—', রেবা ভেতো গলায় বলল, 'ওই তো বসে রয়েছে।'

মুহূর্তে বিকাশ সজাগ হয়ে উঠল, 'কোথায়?'

রেবা চিরুনি থেকে ঝরো চুল বার করতে করতে বলল, 'কালভার্টের ওপর। আমি পেছনের বারান্দায় কাপড় শুকোতে দিতে গেছিলাম। ড্যাবড্যাব করে তাকাল।'

'মিলি, জয়...ওরা কোথায়?'

বিকাশ উদ্বেগ নিয়ে সোজা হয়ে বসে এদিক-ওদিক খুঁজল।

'গান শুনছে। একটু আগেই তো টেপ-রেকর্ডার আর একটা গ্রাউন্ডসিট নিয়ে ঝাউবনে ঢুকল দুজনে। —কাছেই আছে কোথাও।'

বিকাশ শোনার চেষ্টা করল। ঝাউবনে বেশ হাওয়া। হাওয়ার মধ্যে দিয়ে শুনতে পেল। —ঝাউবনে শুয়ে শুয়ে ভাই-বোনে মেহেদি হাসানের গজল শুনছে। উদ্বেগ কাটল।

রেবার পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকল বিকাশ। পেছনের বারান্দায় বেরুতে যাচ্ছিল। থমকে গেল। ঘরের ভেতর থেকে জানলা দিয়ে দেখল। রেবা ঠিকই দেখেছে। কালভার্টের ওপরে বসে আছে দুজনে। এদিকেই ফিরে রয়েছে। ভাল করে দেখার জন্য বিকাশ টেবিলের ওপর থেকে জয়ের দূরবীণটা তুলে নিল। ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল। বিকাশ ঘরের ভেতর অন্ধকারে। ওরা দেখতে পাচ্ছে না। দূরবীনের ভেতর দিয়ে ওরা এখন বিকাশের মুখোমুখি। দুজনের পরনেই প্রিন্টেড লুঙ্গি, স্যান্ডো গেঞ্জি। লম্বা লম্বা চুল হাওয়ায় বেসামাল। গালের প্রায় শেষ পর্যন্ত নেমে আসা জুলফি। ঝুলে পড়া গোঁফ। হাতে স্টিলের বালায় রোদ ঠিকরোচ্ছে। বেশ লম্বা শরীর দুজনেরই। এক সময় হয়তো ভালই চেহারা ছিল। শরীরের ওপর অবিরাম অত্যাচার, অমিতাচারের জন্যে এখন রুক্ষ, চোয়াড়ে। দুজনেরই সন্ধানী দৃষ্টি বারবারই টুরিস্টলজের এই ঘরটি, সংলগ্ন বারান্দার ওপর ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে।

বিকাশ বুঝতে পারল না, এই মুহূর্তে ওদের খর দৃষ্টি কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। মিলিকে—? মিলির নবীন উদ্ভিন্ন যৌবনকে? না, তাকে—? আদালতে প্রধানত যার সাক্ষ্যে ওদের দু বছর জেলের ঘানি ঘোরাতে হয়েছিল?

বছর পাঁচেক আগের ঘটনা।

কল্যাণীর টি বি হাসপাতালের একটা টেন্ডার ছিল। লাখ দশেক টাকার কাজ। দুর্গাপুর উন্নয়ন প্রকল্পে তখন সব মিলিয়ে প্রায় ত্রিশ লাখ টাকার কাজ চলছে বিকাশের। বেশ দমবন্ধ অবস্থা। তবু, কল্যাণীর কাজটার ওপর বিকাশ ঝুঁকেছিল অন্য কারণে। আগেই, কল্যাণীর এ ব্লকে চল্লিশ ফুট রাস্তার ধারে, ছ' কাঠার কর্নার প্লট কেনা ছিল। ভেবেছিল, কাজটা হাতাতে পারলে, সিমেন্ট, রড কিনতে হবে না। ঝড়তি-পড়তি মাল দিয়ে দিব্য একটা বাড়ি ফাঁদতে পারবে। রিটায়ার্ড লাইফে সেন্ট্রাল ক্যালকাটার হাইরাইজ ফ্ল্যাট থেকে মাঝে মাঝে কল্যাণীতে এসে ক'দিন বসবাস করে একঘেয়েমি কাটিয়ে যাবে। পাকা একটা বন্দোবস্ত হয়ে রইল।

টেন্ডারটা অবশ্য বিকাশ পায়নি। অনেক বিলো রেট পড়েছে। তার নীচে আরও চারজন। সফল টেন্ডারার মডান কনস্ট্রাকসানের, হরিহর হোড়। বিকাশের পূর্ব-পরিচিত। হোড় ছাড়ল না। আরও কয়েকজনকে সঙ্গী করে নিজের গাড়িতে বাড়ি নিয়ে তুলল। একটা পার্টি মতন হল। কিছু পান এবং ভোজন। বিকাশের তাড়া ছিল। কলকাতা ফিরতে হবে। নিজের গাড়ি নেই। সারাই করতে গ্যারেজে। ট্রেনে ফিরবে। পেটে বোতল দুয়েক হিমশীতল ভদ্রুক হজমের আমেজ। মাঝে মাঝে সফেন উদ্গার। কল্যাণীর প্রশস্ত ফাঁকা রাস্তায় মধ্যগ্রীষ্মের সান্ধ্যকালীন বাতাসের হা-হা। স্টেশন পর্যন্ত হেঁটেই যাবে স্থির করে বিকাশ পা চালাল। এ ব্লকের কাছাকাছি এসে মনে বড় মায়া জন্মাল। —কতদিন আগে জমিটা কিনেছে। দূরদেশে বোর্ডিং-এ রাখা ছেলের মত জমিটা। উদোম আকাশের তলায় পড়ে পড়ে রোদজল খাচ্ছে! শেষবার এসে দেখে গেছে, তাও দু বছর হল। দু' বছর বাদে একবার বাপের মুখটা অন্তত দেখুক। সন্ধ্যে ঘোর হয়ে এসেছে। জমির কাছে যাবার আগেই দু পাশ থেকে দুজনে এসে বন্ধুর মত কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়াল।

'ভদ্রভাবে বলছি, যা আছে বার করুন। ঝামেলা করলে ঝাড় দেবো।'

যা দেখবার বিকাশ তার মধ্যে দেখে নিয়েছিল। বালাপরা হাতে ঝকঝকে ছোরা। একটা উদ্গার আসছিল। কষ্টে চাপল। বিনা বাক্যব্যয়ে পকেট থেকে পার্স বার করে দিল, সিকো রিস্টওয়াচ।

'আংটি খুলুন।'

এইখানে এসে বিকাশ একটু ইতস্তত করেছিল। সোনার জন্যে নয়, পাথরটার জন্যে। —রক্তমুখী নীলা। শনি নীচস্থ বলে জ্যোতিষীর পরামর্শে ধারণ করেছিল। কাজ দিচ্ছিল অসাধারণ।

'খুলুন তাড়াতাড়ি', স্বর বেশ কর্কশ।

বিকাশ আংটি খুলে দিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে মাঠের মধ্যে মিলিয়ে গেল ওরা।

স্টেশনে এসে শুনল, বেলা দুটো নাগাদ নৈহাটির কাছে ডাউন লাইনে মালগাড়ি পা হড়কেছে। ডাউন লাইন বন্ধ। মালগাড়ি তোলার কাজ শুরু। গাড়ি ছাড়তে এখনও ঘণ্টা তিনেক। প্ল্যাটফর্মে বেশ ভিড়। দুপুরের ডাউন লোকাল প্ল্যাটফর্ম জুড়ে দাঁড়িয়ে। একটা ফাঁকা কামরা দেখে বিকাশ উঠে ব আংটিটার জন্যে কষ্ট হচ্ছিল। বিশেষভাবে পাথরটার কথা মনে পড়ে। রি পার্স-এ শতখানেক টাকার কথা প্রায় ভুলেই গেছিল। কিন্তু পাথরটা! অন্য নীলা যদি কাজ না দেয়! দারুণ সুট করেছিল।

ঝিমুনি মতন এসেছিল। হাতে হাত পড়াতে ধড়মড় করে উঠে বসল।

'আরে, আপনি এখানে? আর আমি তিনবার আপনাকে এখান দিয়ে গেছি—' মডান কনস্ট্রাকশনের হোড়, 'আপনার নাকি ছিনতাই হয়েছে?'

বিকাশ অবাক, 'আপনি জানলেন কি করে?'

'আরে মশাই, থানার ওসি ফোন করেছিলেন। আপনার নাম করে করলেন—চিনি নাকি। মাস্তান দুটো ধরা পড়েছে। ওদের কাছ থেকে জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। মানিব্যাগে আপনার ভিজিটিং কারড থেকে প্রফেসান জেনে বার্ডস অব দি সেম ফেদার হিসাবে আমার বাড়িতে ফোন পেয়ে একটা চান্স নিলাম—যদি আপনাকে স্টেশনে ধরতে পারি। চলুন এ ছেলে দুটোকে আইডেন্টিফাই করবেন, জিনিসপত্র দেখে লিস্ট করে দেবেন। গাড়ি রয়েছে।'

বিকাশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। রক্তমুখী নীলা—লিভিং স্টোন।

তা নইলে এমন কেউ কখনো শুনেছে যে, ছিনতাই ধরা পড়েছে এব পুলিসের হাতে? পুলিসই খবর করে খুঁজেপেতে তাকে স্টেশন থেকে যাবার ব্যবস্থা করেছে! আর, ট্রেনের গোলমাল ঠিক আজই, এই সময়! এ তার তো শেয়ালদায় পৌঁছে যাবার কথা।...আংটিটা একবার হাতে নেবা বিকাশ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। —এ তার পাথর! একমাত্র তারই! তার এই বিশেষ পাথরটা সৃষ্টি করে টুপ করে আকাশ থেকে পৃথিবীর বুকে দিয়েছেন অলমাইটি!

গাড়িতে যেতে যেতে খানিকটা হোড়ের মুখে আর খানিকটা থানার ও মুখে শুনেছিল বিকাশ। বেশ কিছুদিন ধরে জাল পেতে রেখেছিল প অনেক দিন ধরেই অভিযোগ আসছিল ছেলে দুটোর নামে। সারাদিন মোটরস দাবড়ে বেড়ায়। এ অঞ্চলে নতুন মুখ দেখলে ভয় দেখিয়ে ছিনতাই। মেয়েদের সামনে অশালীন আচরণ। মদের দোকানে ধারে মদ দেবার জন্য ওয়াগন ব্রেকিং। এমনকি, কল্যাণীর মাঠে ঘাস কাটতে আসা ঘেসুড়ে মুখ চেপে পাশের ফাঁকা বাড়িতে টেনে তোলার কানাঘুষো পর্যন্ত। প্রভা লোকের ছেলে দুজনেই। একজনের বাবার কাঁড়াপাড়ায় মোটর গ্যারেজ, পাম্প, আটখানা লরি এবং বাস। ছেলেটাও আই টি আই থেকে পাশ করে বে আর একজনের বাবা তো নামকরা ডাক্তার এ অঞ্চলে। ফ্যামিলিতে দুজন ম্যা নিজেও গ্র্যাজুয়েট ছেলেটা। পুলিস সব জেনেও চুপচাপ ছিল। এখন এম এল এ মিনিস্ট্রি লেভেল থেকে চাপ দেওয়াচ্ছেন।

'আপনি কি মনে করেন এরা অভাব থেকে এ সব করছে?' ও সি কড়া ধাতের, 'আসলে এরা যে ঠিক কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। এক মেন্ট খুঁজছে...।'

বিকাশ আমতা আমতা করে পুঁথিপড়া বিদ্যে জাহির করার মত করে গেল, নিউ জেনারেশন, জেনারেশন গ্যাপ...

'ও সব বুঝিটুঝি না মশাই', ও সি যেন বিকাশকেই ধমকে উঠলে থার্ড ডিগ্রির কেস—। হাতপায়ের জয়েন্টগুলো খুলে দাও। সারা জীবন পরে চায়ের দোকানে বসে খবরের কাগজ পড়ে যাবে। —চেনেন এদের?'

লক-আপ থেকে এনে দাঁড় করাল দুজনকে।

বিকাশ শিউরে উঠল। ইতিমধ্যে পুলিস বানিয়ে দেখেছে। সারা মুখ কালসিটের দাগ। একজনের শার্ট ছিঁড়ে ফালাফালা। পাঁজড়ে পিঠে দাগড় দাগ।

বাড়িতে রেবার কাছে ব্যাপারটা চেপে যাবার চেষ্টা করেছিল বিকাশ খাবার টেবিলে ধরা পড়ে গেল। অবাক হয়ে রেবা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার

'বলতেই হল।'

রেবা ধমক-ধামক শুরু করে দিল, 'কি দরকার ছিল অজানা জায়গায় সময় যাওয়ার? যদি ছুরিটুরি মারত? ও অলক্ষুণে জমি আমি বেচে দে

তারপর কয়েকবার রাণাঘাট কোর্ট পর্যন্ত দৌড়ঝাঁপ। সরকারী সনাক্তকরণ। যথেষ্ট বেগার দেওয়া। একমাত্র সুফল, রক্তমুখী নীলার পু শনিবার দেখে কালীঘাটের মন্দিরে শোধনান্তে, শাস্ত্রাচারে অনামিকায় ধা

স্নানের পোশাক পরে মাথায় টুপি বাঁধতে বাঁধতে মিলি বাথরুম থেকে এল, 'চল বাপি।'

'চল।'

সামনের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে রেবা উল বুনছে। সমুদ্রের নে স্নান করলে ওর শরীর জ্বালা করে। এখানে এসে একদিনও সমুদ্রের ডোবায় নি। বারান্দা থেকে গলা তুলে বলল, 'চটি পরে নাও। বা উঠেছে।'

জয় আগেই নেমে গেছিল। ওদের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে অ উঠেছিল। পরনে লাল রঙের শর্টস্। খালি গা। বিকাশের পেছন পে বারান্দায় বেরিয়ে এল। রেবা বেশ খুঁটিয়ে মেয়েকে দেখল। মিলির গা সঙ্গে ঘি রঙের সাঁতারের পোশাক দারুণ ম্যাচ করেছে। ছেলেমেয়ে

ভাগাভাগি করে বাবা এবং মার চেহারার আদল পেয়েছে। মিলি পেয়েছে মা'র গায়ের রঙ, আর বাবার লম্বা শরীরের কাঠামো—কাটাকাটা চোখমুখ। পনেরো বছর বয়েস। অনায়াসে দু বছর বাড়িয়ে বলা যায়। জয়ের বয়স এগারো। ময়লা রঙ। মা'র মত বড় বড় চোখ।

'বেশি ঝাঁপাঝাঁপি করবে না। উঠে আসবে তাড়াতাড়ি।'

ই—স্', নীচে থেকে মিলি মার দিকে তাকাল, 'পাক্কা দু ঘণ্টা চান করব আজ।'

'দু' ঘণ্টা, দু ঘণ্টা' জয় একটা পাতাসুদ্ধ ঝাউগাছের ডাল মাথার ওপর তুলে নাচাতে নাচাতে মাকে রাগাতে লাগল।

'না—' রেবা কড়া ধমক দিল।

বিকাশ মাথার তালুতে সুগন্ধী তেল থাবড়াতে থাবড়াতে ব্যাপারটা উপভোগ করছিল। রেবাকে ঠাণ্ডা করতে বলল, 'আমি তো সঙ্গেই যাচ্ছি। তুমি অত হৈ রে করছ কেন?'

সকলে যখন আগেপিছে রাস্তা ডিঙিয়ে ঝাউবনে ঢুকছে, পেছন থেকে রেবা বলল, 'একটু নজর রেখো। আমি এদিকটা দেখছি।'

ইঙ্গিতপূর্ণ কথা। বিকাশের সঙ্গে চোখে চোখে কথাও হয়ে গেল। বিকাশ বুঝল, রেবা বলছে, স্নান করতে গিয়ে বিকাশ যদি দেখে ছেলে দুটো স্নান করছে, যেন ছেলেমেয়ের একদম কাছাকাছি থাকে। রেবা এদিকটায় নজর রাখছে, ইতিমধ্যে স্নান করতে না গেলে, ছেলে দুটোর গতিবিধির ওপর।

বিচ-এ বিশেষ লোকজন নেই। জনা কয়েক রয়েছে, সবাই স্থানীয়। জেলেদের ছেলেরা জলে হুটোপাটি করছে। দূরে ক'টা নৌকা। তিন চারজন মাটিতে পাতা জাল মেরামত করছে ঘাড় গুঁজে। সতর্ক দৃষ্টি চারিদিকে বুলাল বিকাশ। সমুদ্রের তীর বা পাড়ের ঝাউবন। গতকাল যেখানে বসে ওদের গাঁজার কল্কে টানতে দেখেছে। —দেখতে পেল না। আজ বেশ ঢেউ। হাওয়া দিচ্ছে ঝাপটা দিয়ে। বিকাশ হাওয়ার ভেতর দিয়ে গলা তুলে সাবধান করল, বেশি দূরে যেও না।

দুজনে ততক্ষণে কোমর জলে নেমে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, হাত ধরাধরি করে ঢেউয়ের তালে তালে ঝাপান শুরু করেছে।

বিকাশ খানিকক্ষণ স্নানটান করে ঢেউছুঁই তীরে এসে বসেছে। এভাবে বসে থাকতে খুব ভাল লাগছিল বিকাশের। মাঝে মাঝে এক-একটা ঢেউ সামনে ছড়ানো পায়ের ওপর দিয়ে প্রায় গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। আবার নামার সময় হুড়হুড় করে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। হাতের আঙুল, গোড়ালী নোঙরের মত বালিতে গিঁথে বিকাশ সামলাচ্ছে নিজেকে। তাড়া দিল ছেলেমেয়েদের, 'আর নয়। ওঠো এবার।'

'আর পাঁচ মিনিট বাপি।'

এর আগে অন্তত বার দুয়েক পাঁচ মিনিট করে সময় দিয়েছে বিকাশ। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে নিজেই পাড়ে উঠে দাঁড়াল, 'উঠে পড়। মা রাগ করবে।'

ওরা উঠে এল। মিলির তোয়ালে দিয়ে জয় হাত-পা মুছছে। মিলি মাথার টুপি খুলে ফেলেছে। এক ঢাল রেশমের মত চুল ঘাড় কাত করে ঝুলিয়ে আঙুল চালিয়ে ঝাড়ছে। বিকাশ হঠাৎ দেখল, মিলি অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছে। জয়ের কাছ থেকে তোয়ালে ছিনিয়ে নিয়ে শরীর ঢাকছে। মাথার মধ্যে কোথায় একটা ক্লিক্ শব্দ হল। পাড়ের দিকে তাকাল বিকাশ। —পাড়ের ওপর রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে ওরা দুজন। নিনিমেষ, নির্লজ্জ দৃষ্টিতে সোজা তাকিয়ে রয়েছে এদিকে।

একটু থমথমে সময়। বিকাশ সহজ হবার চেষ্টা করে বলল, 'চল চল, রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থাকে না।'

আগে বিকাশ। পেছনে মিলি। ডান হাত দিয়ে জয়কে গায়ের সঙ্গে প্রায় লেপটে নিয়েছে। মাথা নীচু। সারা মুখে রক্ত এসে জমেছে। ওরা একইভাবে দাঁড়িয়ে। রাস্তা ছেড়ে দাঁড়াবার ব্যস্ততা নেই কোনো।

যখন মাত্র হাত কয়েক দূরত্বের মধ্যে এসে পড়েছে একজন বলল, 'এই, রাস্তা ছেড়ে দাঁড়া না শালা। তোর বাপের রাস্তা পেয়েচিস। পাবলিক যাবে কি করে?'

সামান্য সরে যেন অনুগ্রহ করে জায়গা ছেড়ে দিল। কোনো রকমে প্রায় গলে বেরিয়ে যাবার মত জায়গা। পায়ের তলায় বালির মত সমস্ত রক্ত তেতে উঠেছে, টের পেল বিকাশ। দুপাশে দুজন থামের মত দাঁড়িয়ে। যে কোনো মুহূর্তে হাত বাড়িয়ে হাত টেনে ধরতে পারে। বিকাশ নিঃশব্দে ফাঁকটুকু দিয়ে মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেল। পেছনে পেছনে গায়ের সঙ্গে লেপটে মিলি আর জয়।

'এর মধ্যেই চান হয়ে গেল আজ—?'

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বিকাশ শুনতে পেল কথাটা। ইঙ্গিত বুঝতে দেরি হল না, মিলির উদ্দেশে বলা।

'তাতে কি—' একজন বাজার-চালু গানের সুর নকল করে গেয়ে উঠল, 'দেখা হবে ঝাউবনে ত্যা...এ্যা...এ্যা...

কানটান গরম হয়ে উঠেছে। বিকাশ জানে, তার দিক থেকে সামান্যতম প্রতিবাদ, ওরা বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর। জয় দিদির হাত থেকে ছাড়া পেয়ে চলতে চলতে বারবার পেছন ফিরে ছেলে দুটোকে দেখছে। বিকাশ নিষ্ফল আক্রোশে বালির ওপর লাথি মারার ভঙ্গিতে চলতে চলতে ধমক দিল, 'কি দেখছ কি? এগিয়ে যেতে পারছ না?'

রেবা টেবিলে খাবার সাজিয়ে বসে। সৈকত হোটেল থেকে যে ছেলেটা খাবার নিয়ে আসে, বাসনপত্র নিয়ে যাবার জন্যে বারান্দায় অপেক্ষা করছে। রান্নাবান্না ভালই হোটেলটার। বুঝে নিয়েছে বিকাশের ফ্যামেলির রুচি, পছন্দ। জেনেছে, পয়সার ব্যাপারটা কোনো সমস্যাই নয়। আজ নোনা এবং মিঠে জলের মাছের পদই দিয়েছে তিন রকম। বেশ তৃপ্তি করে খেতে খেতে জানলা দিয়ে বিকাশ দেখল, ছেলে দুটো স্নান সেরে সৈকত হোটেলে ফিরে যাচ্ছে। দুজনের দৃষ্টিই সটান এ-ঘরের দিকে।

'স্কাউন্ড্রেল্', বিকাশ মাছের কাঁটা চুষতে চুষতে হিসহিস করে উঠল, 'চাবকে পিঠের চামড়া তুলে দিতে হয়।'

রেবা জানলার দিকে পিছন ফিরে বসেছে। ফিরে তাকাল না। মাথা নীচু করে মুখে গ্রাস তুলতে গিয়ে থামল। সেই অবস্থাতেই ভ্রূ তুলে বিকাশের চোখে চোখ রাখল। মিলি, একবার জানলার বাইরে তাকিয়ে খাবারের প্লেটে দৃষ্টি নামাল। জয়, বিকাশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কার চামড়া বাপি?'

তারপর বিকাশের দৃষ্টি অনুসরণ করে চেয়ার ছেড়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখে বলল, 'কেন বাপি?'

'তুমি খাও তো—। বক্‌বক্ করতে হবে না', রেবা ধমক লাগাল, 'আর একটা মাছ নাও।'

গত শনিবার বিকাশ যখন সপরিবারে এখানে এসে পৌঁছল, তখন রাজকীয় আড়ম্বরে সূর্যাস্তের আয়োজন সারা আকাশজুড়ে। আকাশে ছিটেফোঁটা মেঘ ছিল। শেষ শরতের আকাশে থাকে যেমন। হাওয়া নেই। নিস্তব্ধ ঝাউবন। নিথর প্রশান্তি চারিদিকে।

জয় জিজ্ঞেস করেছিল, 'সমুদ্রটা কোন দিকে বাপি?'

'ফ্যান্—টা—স—টিক্', চারিদিক মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে মিলির গলা বুজে এল।

রেবা হেসে উঠেছিল। 'কালই তো বলবে কলকাতা ফিরে চলো। জায়গাটা কি নির্জন।'

'কি রে মিলি?' টুরিস্ট লজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কৃত্রিম মুখে মিলির দিকে তাকিয়ে বিকাশ বলেছিল, 'সাতদিন থাকতে পারবি তো?'

'মস্ত লাইক্—'

বিকাশ, রেবা দুজনেই হেসে উঠেছিল।

টুরিস্টলজের ম্যানেজার বিকাশের দিকে মোটা খাতা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'একেবারে সাতদিনের বুকিং নিয়ে এসেছেন?'

'কেন বলুন তো', বিকাশ লিখতে লিখতে বলল, 'কিছু ভয়টয় আছে নাকি মশাই?'

'না...না, তা নয়। খুব নির্জন তো? ভাল লাগবে? এখন তো সিজিন নয়! আপনারাই শুধু থাকছেন লজে। গার্ড থাকে রাত্রে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কয়েকজনও রাত্রে বারান্দায় শোয়। —আমিও থাকি।'

টুরিস্টলজের সব কিছুই ভাল লাগল সকলের। ধপধপে সাদা বিছানার চাদর থেকে চমৎকার কাচের গেলাসটা পর্যন্ত। বাথরুম দেখে এসে রেবা ফাইনাল মত জানাল, 'চলবে।'

অসুবিধা দুটো। —গ্যারেজ নেই। মার্ক ফারকে আকাশের তলায় কাটাতে হবে। আর, টুরিস্টলজে খাবার ব্যবস্থা নেই। খাবারের ব্যবস্থা এখানকার একমাত্র স্থায়ী হোটেল—সৈকত। সিজিন টাইমে অনেক হোটেল গজিয়ে ওঠে। মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল। আলকাতরা মাখানো দরজা-জানলা। সার সার চৌকি, নড়তে চড়তে বাজনা বাজে। এখন সব বন্ধ। মালিকরা মাঠে চাষের কাজ করছে। লজের ম্যানেজার জানালেন, অসুবিধা নেই। সৈকত হোটেলে মোটামুটি সবই পাওয়া যাবে। বললে, খাবার-দাবার সবই ওরা লজে পৌঁছে দিয়ে যাবে।

সপরিবারে বেড়াতে বেড়াতে সৈকত হোটেল দেখে এল বিকাশ। যতটা খারাপ হবে ভেবেছিল, তার থেকে বহুগুণ ভাল। হোটেলের মালিক অমায়িক।

বিকাশ রেবার সঙ্গে আলোচনা করে নিল, ব্রেকফাস্ট আর প্রয়োজনমত চা কোল্ড ড্রিংকস্ পাঠিয়ে দিলেই চলবে। সকাল এবং রাত্রের খাবার হোটেলে এসেই খেয়ে যাবে। এইটুকু তো পথ। কালভার্টের ওধারেই টুরিস্টলজ। খানিকটা হাঁটা-হাঁটি হবে।

ফেরার পথে রেবা বলল, 'দেখেছ, সব ঘর বন্ধ। একজনও বোর্ডার নেই।'

'শুনলে না, এখন অফ-সিজিন', বিকাশ বলল, 'ভালই হল। সকলের পুরো সেবাটাই তুমি একলা ভোগ করবে।'

পরদিন দুপুরে বাইরে আশ্বিনের চড়া রোদ। বেশ খানিকক্ষণ বিছানায় ঘুমবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বিকাশ উঠে পড়ল। আলোর মধ্যে তার ঘুম হয় না। টুরিস্টলজের জানলায় কাঁচের শার্সি। পর্দা নেই। ওপাশের খাটে রেবা ঘুমুচ্ছে। সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখল, মিলি বেতের চেয়ারে পা তুলে বসে সিনেমার পত্রিকা পড়ছে। ওদিকের বারান্দা থেকে ক্রিকেটের ধারাবিবরণী ভেসে আসছে।

মিলি উঠে গেল। চেয়ারে জুত করে বসে বিকাশ পত্রিকাটা তুলে নিল। পাতা উল্টে দেখতে লাগল। চশমা নেই। পড়তে অসুবিধা হচ্ছে। বাইরে দুপুর ম্লান হয়ে এসেছে।

ওদিকের বারান্দায় রেলিংয়ের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে মিলি উদাস চোখে ঝাউবনের ওপরের আকাশের দিকে তাকিয়ে।

বিকাশ উঠে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল, 'এখানে ভাল লাগছে না,—না রে?'

মিলি চমকে উঠল, 'কেন বাপি?'

'এই লোকজন নেই। নির্জন...।'

'না না, তা কেন। —তোমার ভাল লাগছে তো?'

বিকাশ বুঝল, মিলি নিজেকে লুকোচ্ছে। জানে, ব্যবসার জন্যে তাদের বাবাকে কি পরিশ্রম করতে হয়। নাওয়া-খাওয়ার ঠিক নেই। কলকাতার বাইরে দৌড়দৌড়ি। একটা ছুটির দিন পর্যন্ত নেই। সুযোগ পেয়ে ক'টা দিন নিরিবিলিতে বিশ্রাম

নিতে এসেছে। আসলে, বিকাশের যদি ভাল লাগে মিলি নিজের ভাল-না-লাগাকে নীরবে সহ্য করতে প্রস্তুত—করেও যাবে।

'আমারও ভাল লাগছে', জয় ধারাভাষ্য দিতে দিতে ক্লান্ত। পাশে এসে দাঁড়াল, আমি ঢেউ এলেই এমনি করে লাফিয়ে উঠব।'

বিকাশ ভাবল, আর কি চাই! আর কি চাই লাইফে! ঘরে সমমর্মী স্ত্রী। ফুটফুটে ছেলেমেয়ে। তারা, তার সুখের জন্যে নিজের সুখ বিসর্জন দিতে পারে অনায়াসে। ফ্লারিশিং বিজনেস। চারটে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট। লকারে গহনা ইত্যাদির সঙ্গে বন্ড, সার্টিফিকেট, বেশ কিছু ভাল শেয়ার। সেন্ট্রাল কলকাতার হাইরাইজ ফ্ল্যাট বাড়িতে তিন কামরার ফ্ল্যাট আটতলায়। বিকাশের স্বয়ংসম্পূর্ণ পৃথিবী। আর কি চাওয়ার থাকতে পারে!

ঠিক এই সময়, লজের পেছন থেকে ঝড়ের বেগে ছুটে আসা মোটরসাইকেলের গর্জন শুনেছিল বিকাশ। মোড় নিয়ে যখন টুরিস্টলজের কাছে এসেছে তখন শব্দে লজের কাঠের বাড়ি কেঁপে উঠল। জানালার কাচের শার্শিতে ঝনঝন শব্দ বাজল। ঝাউবনে ঢোকার রাস্তার সামনেই চোখে পড়ার মত সাইনবোর্ড—কোনো প্রকার যানবাহন ঢোকার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা। মোটরসাইকেল নোটিশ বোর্ডের সামনে থামল। ইনজিন চালু রয়েছে। নতুন বুলেট। আরোহী দুজন। পরনে উপযোগী পোশাক। —পায়ে অ্যাংকেল বুট, জ্যাকেট, চোখে স্ট্র্যাপবাঁধা চশমা থেকে হেলমেট পর্যন্ত। পেছনের জনের পরনে কালো জ্যাকেট, হলুদ হেলমেট। যে চালাচ্ছে তার টকটকে লাল জ্যাকেট, সাদা হেলমেট। নোটিশ পড়া হল। বিকাশ, মিলি, জয় সকলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছে। ম্যানেজার, কোনো টুরিস্ট এসেছে ভেবে নিজের অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন। বিকাশ যথেষ্ট কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছিল, ওরা কি করে দেখার জন্যে। নোটিশ বোর্ডটাকে দারুণ তাচ্ছিল্য দেখিয়ে মোটর-সাইকেল আবার গর্জন করে উঠল। মোড় নিয়ে ঝাউবনে ঢুকল। বিকাশ ভাবল, এই এক অদ্ভুত প্রবণতা এসেছে ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে। আইন ভাঙার মধ্যেই যেন উল্লাস। —সমস্ত সুখ, সমস্ত আনন্দের সারাৎসার লুকিয়ে আছে!

'ওরা যে ভেতরে ঢুকলো—?' বিকাশ বেশ ক্ষোভ নিয়েই ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করল।

'একটু দাঁড়িয়ে থাকুন', ম্যানেজার ঠোঁটে রহস্যময় হাসি এনে বললেন, 'মজা দেখতে পাবেন।'

জয় এসে গা ঘেঁষে দাঁড়াল, 'কি মজা হবে বাপি? ঝাউবনে পুলিস লুকিয়ে আছে? —ধরবে ওদের?'

বিকাশও বুঝে উঠতে পারছে না। এটুকু বুঝেছে, মোটরসাইকেলের শব্দ অন্য রকম শোনাচ্ছে। অনেকটা গোঙানির মত। তারপর, শব্দ একেবারেই থেমে গেল। আবার ঝাউবনে হাওয়ার স্বনন। বিকাশ বুঝল এবার। —নিজেকে রক্ষার ব্যবস্থা প্রকৃতি নিজেই করে রেখেছে। বালির দাঁতে ওদের মোটরসাইকেলের চাকা কামড়ে ধরেছে। ওদের তাচ্ছিল্যের এমন সমুচিত শাস্তি পেতে দেখে স্বস্তি বোধ করল বিকাশ।

একটু পরেই ঝাউবন থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। মোটরসাইকেলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে ঠেলতে ঠেলতে। মাথার হেলমেট, চোখের চশমা—সব খোলা। পিচের রাস্তার ওপর মোটরসাইকেল তুলে দাঁড় করিয়ে দু হাতের ঝাপটায় পোশাকের বালি ঝাড়তে লাগল। মুখে অশ্রাব্য ভাষা। বিকাশ স্পষ্ট দেখতে পেল ওদের এবার। ভ্রূ কুঁচকে উঠল—চেনাচেনা মনে হচ্ছে!

'বাব্—বা, কি শব্দ—', রেবা এসে পাশে দাঁড়াল। বিকাশের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'চেনো নাকি?'

'চেনা লাগছে। ঠিক ধরতে পারছি না।' বিকাশ অন্যমনস্কের মত বলল।

'চা দিতে বল', আলস্যের ভঙ্গিতে রেবা চেয়ারে গিয়ে বসল।

কি একটা বলেছে বা করেছে ওরা—মিলি বেশ শব্দ করে হেসে উঠল।

ওরা এদিকে তাকাল। বিকাশ দেখল, নিষ্পলক চোখে দেখছে তাদের। খুঁটিয়ে দেখছে। বিকাশ বুঝতে পারছিল না, কাকে দেখছে ওরা' মিলিকে, তাকে না তাদের সকলকে? মিলি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। বিকাশের আবারও মনে হল, খুব চেনা মুখ। অথচ, মনে পড়ছে না।

পরাজয়ের লজ্জা এড়াবার জন্যেই যেন ওরা হঠাৎ খুব তৎপর হয়ে উঠল। হিন্দী সিনেমার হিরোর মত লাফিয়ে মোটরসাইকেলের সিটে উঠে বসল। এক স্ট্রোকেই নতুন বুলেট ভরাট গলায় হেসে উঠল। অ্যাকসেলারেটরের মোচড়ে হাসি অট্টহাসি হয়ে চারিদিক কাঁপিয়ে তুলল। মোটরসাইকেল গতি নিল। জয়ের চোখে মুগ্ধতা। মিলি বোধ হয় ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের দিকে তাকিয়েছিল। পেছনের জন পেছনে তাকিয়ে মোটরসাইকেলের শব্দের ওপর গলা তুলে গান গেয়ে উঠল, মুড় মুড়কে না দেখ, মুড় মুড় কে...

বিকাশ দাঁতে দাঁত চাপল, রাসকেল।

বিকাশ আর রেবা বেশ মন্থরভাবে বিচ-এ হাঁটছিল। ভাইবোনে অনেকটা এগিয়ে। তখন ভাঁটা। সমুদ্রের জল অনেক নেমে গেছে। সন্ধ্যা হয়ে এল প্রায়। রেবা তার চিন্তা পঠনের অবিশ্বাস্য দক্ষতায় নাজর রাখল আবারও, 'কি গো? ছেলে দুটোকে চিনে উঠতে পারলে?'

হাঁটতে হাঁটতে বিকাশ সামান্য হাসল, 'মনে হচ্ছে পেরেছি।'

'তা হলে আর অত দুশ্চিন্তার কি আছে!'

বিকাশ ভাবল, বলবে রেবাকে? ছেলে দুটোর পরিচয় জানিয়ে দেবে? ঠিক হবে ব্যাপারটা! রেবা ভয় পেয়ে যাবে না তো? বিকাশ নিজে এখনও নিঃসংশয় নয়। ভুল হতে পারে। আরও কাছ থেকে দেখা দরকার। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে বলে ফেলল।

রেবা থমকে দাঁড়াল। দু চোখে ভয় মেশানো বিস্ময় নিয়ে বলল, 'যাঃ—!'

'না হওয়ারই বা কি আছে', বিকাশ বলল, 'ওরাও হয়তো আমাদের মত বেড়াতে এসেছে। দেখা হয়ে যাওয়াটা একটা কোইনসিডেন্স।'

রেবা গম্ভীর হয়ে উঠেছে হঠাৎ। চিন্তান্বিতভাবে বলল, 'কোথায় উঠেছে বল তো?'

বিকাশ ভেবে বলল, 'লজে যখন ওঠেনি তখন সৈকত হোটেলে। আর জায়গা কোথায়?'

'ও বাবা—', রেবা বলল, 'তা হলে রাত্রে ওখানে খেতে যাব না। লজে খাবার পাঠিয়ে দিতে বলো।'

'ধুস্—। তোমার কি মাথা খারাপ হল নাকি? ওরা ওদের মত রয়েছে—আমরা আমাদের মত। মিটে গেল।' বিকাশ রেবাকে অভয় দিতে চাইল, 'তা ছাড়া, এখনও আমি সিওর নই। যাদের মনে করছি, তারা নাও হতে পারে।'

পাঞ্জাবির পকেটে দু হাত দিয়ে বিকাশ হাঁটছিল অভ্যাসমত। অনুভব করল, রেবা সজোরে তার বাহু আঁকড়ে ধরল। বিকাশ রেবার মুখের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনে তাকাল।

ছেলে দুটো। বিচ ধরে এদিকেই হেঁটে আসছে।

এমন কিছু আলো মরে যায়নি যে, চিনতে অসুবিধা হবে। একটা আশংকায় বুকের ভেতরটা গুরগুর করে উঠল। —মিলি, জয় অনেকটা এগিয়ে গেছে। ওদের প্রায় সামনেই। দেখল মিলি হঠাৎ জয়কে নিয়ে খানিকটা জলের দিকে নেমে গেল। বুকের ভেতর থেকে বুকচাপা প্রশ্বাস বেরিয়ে এল বিকাশের।

ওরা এদিকেই এগিয়ে আসছে। প্রতি পদক্ষেপে নিকটতর হচ্ছে। রেবা বিকাশের কাছে ঘেঁষে এল। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেছে। ঠিক সামনে এসে ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। শরীর হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠেছে, স্নায়ু টানটান বিকাশ টের পেল।

'ম্যাচ আছে', একজন সটান বিকাশের চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল। দুর্বিনীত ভঙ্গি।

বিকাশ নিঃশব্দে পকেট থেকে লাইটার বার করে দিল। একজন সিগারেট ধরাচ্ছে। আর একজন স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে। বিকাশ অনুভব করল, তাকেও যেন চিনে নিতে চাইছে।

'লাট্টু মাল তো—', যে সিগারেট ধরাচ্ছিল, লাইটারটা কয়েকবার জ্বেলে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে ফেরত দিল। সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল, চলবে—। কি দেখছিস শালা? লাইফে জেন্টেলম্যান দেখিসনি?'

ওরা চলে গেল।

রেবা খানিকক্ষণ বাদে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল 'চিনতে পারলে?'

বিকাশ কথা বলল না। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

'ছিনতাইকরা ছেলে দুটো?'

বিকাশ আবারও ঘাড় নাড়ল।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে পথ হাঁটা। ঝাউবনের ভেতর দিয়ে লজে যাবার রাস্তার মোড় প্রায় এসে গেছে। ছেলেমেয়ে ওদের জন্যে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। রেবা বলল, 'ছেলে দুটো তোমায় তো নাও চিনতে পারে?'

'সম্ভাবনা কম' বিকাশ মনের বোঝা হালকা করার জন্য হেসে বলল, 'এই পাঁচ বছরে আমার চেহারায় এতটা পরিবর্তন হয়নি যে, চিনতে অসুবিধা হবে। ভুঁড়িবাড়া আর চুল পাকার ব্যাপারটা যদি না ধরা যায়।'

তারপর গত দু দিনে বিকাশ এবং রেবার স্নায়ুর ওপর চাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ওরাও যেন ক্রমশই বে-পরোয়া হয়ে উঠছে। যখন-তখন মোটরসাইকেলের বিকট গর্জন তুলে টুরিস্টলজটাকে বেড় দিয়ে ঘোরা। ঠিক বিকাশরা যখন সমুদ্রে স্নানে যাবে, তখনই ওদেরও স্নানের সময় হয়। রাস্তায়, বিচ-এ বেড়াবার সময় নানা মন্তব্য। বেশির ভাগই মিলিকে উদ্দেশ করে। অনেক সময় বিকাশকে তাচ্ছিল্য করে। রেবা, জয়ও বাদ নেই। সৈকত হোটেলে খেতে যাওয়া বন্ধ করবার পর যেন ব্যাপারটা আরও বেড়েছে। ছেলেমেয়েদের সামনে উপেক্ষা দেখিয়ে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করে বিকাশ—রেবা। বিকাশ জানে, ভেতরের ব্যাপার না জানলেও মিলি বেশ অস্বস্তি অনুভব করছে। বাবা, মার উৎকণ্ঠা বুঝতে পারছে। জয়ের হাজার প্রশ্ন, ওরা এটা বলল কেন? ও রকম করছে কেন? ওটা কি খারাপ কথা?

বিকাশ, রেবা একান্তে আলোচনা করে দেখেছে বেশ কয়েকবার। —কেন এ ধরনের আচরণ করছে ওরা? উদ্দেশ্য কি? বিকাশের ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়? বিকাশ ভাবে, প্রতিশোধের প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে? তোমরা পুলিসের হাতে ধরা পড়েছ, মার খেয়েছ, জেল খেটেছ, তোমাদেরই কৃতকর্মের জন্যে। ছিনতাই না-করলে বিকাশ কিছু সাক্ষী বা সনাক্তকরণের দায়িত্ব নিত না! আইন বহির্ভূত কাজ করেছ, আইন মোতাবেক তোমাদের শাস্তি হয়েছে। এখানে বিকাশের ভূমিকা কি? তারপর ভেবেছে, কি ধরনের প্রতিশোধ ওরা নিতে পারে। তাকে শারীরিক ভাবে আক্রমণ? মিলিকে জড়িয়ে কোনো গণ্ডগোল পাকিয়ে তোলা? বা, রেবাকে নিয়ে? নাকি, এখানে বসবাসের দিনগুলো স্নায়ুচাপ এবং উৎকণ্ঠায় নষ্ট করাতেই ওদের প্রতিশোধ স্পৃহা সীমাবদ্ধ।

'জয়কে যদি ওরা কিছু করে?' রেবার গলা কেঁপে উঠেছিল।

'ইয়ার্কি নাকি।' বিকাশ গলায় জোর আনার চেষ্টা করে বলেছিল, জঙ্গলের রাজত্বে আছি নাকি? আইন নেই?'

'কিছু হয়ে যাবার পর আইন নিয়ে কি ধুয়ে খাব! খুব বেড়ানো হয়েছে, কলকাতা ফিরে চল।'
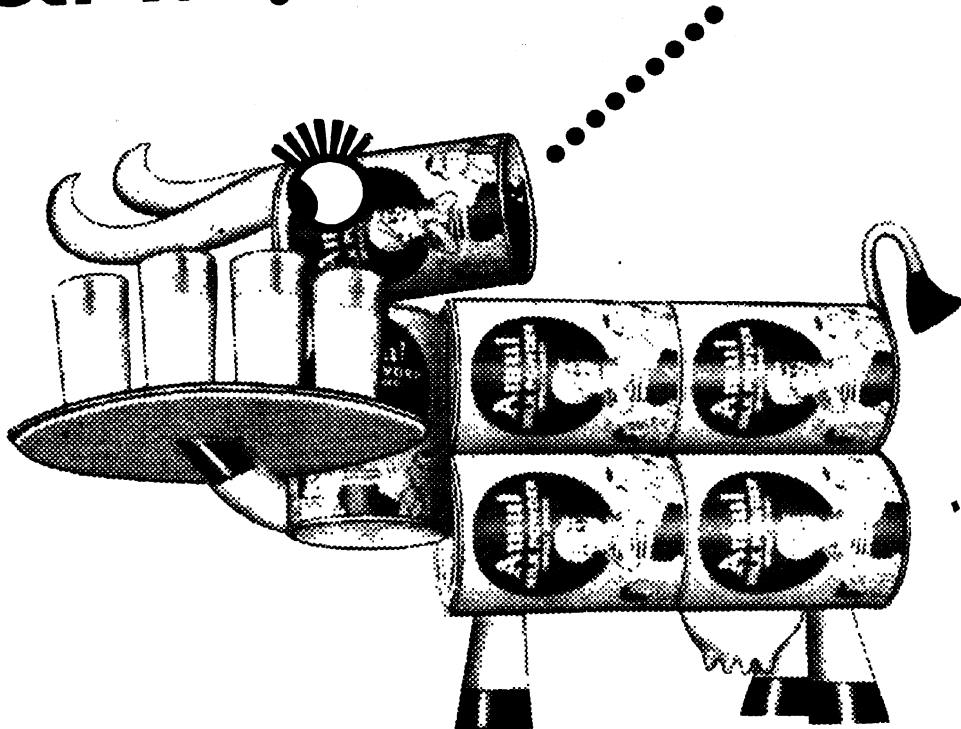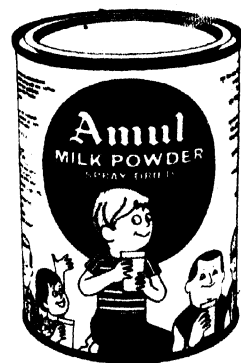
পুলিসের সাহায্যের কথাও ভেবেছে বিকাশ। মাইল দুয়েক দূরে একটা ছোট ন পুলিস ফাঁড়ি আছে। তাদের খবর দেবে? —কি লাভ! পুলিস নিশ্চয় কাশের পরিবারকে রক্ষা করবার জন্য সশস্ত্র রক্ষী পাঠাবে না। এসে সরাসরি লেদুটোকে হাতকড়া পরিয়েও নিয়ে যাবে না। খুব জোর, ওদের গতিবিধির র একটু নজর রাখবে কি একবার এসে শাসিয়ে টাসিয়ে যাবে। তারপর—। লিস চলে গেলে হয় ওরা ভয় পাবে। নয়তো আরও বেপরোয়া, উন্দাম হয়ে বে। ওদের মত চোট খাওয়া দাগীরা দ্বিতীয় রাস্তাটাই ধরবে বলে বিকাশের শ্বাস। হোটেলে খেতে যাওয়া বন্ধ করাতে ইতিমধ্যে ওরা বুঝে নিয়েছে রিবারে বিকাশ ভীত, সন্ত্রস্ত। তবু, রেবার কথামত এখান থেকে চলে বার ব্যাপারটা বিকাশ মেনে নিতে পারছিল না মন থেকে। ভয়ে পালানোর মত ড়ার ব্যাপারটা।—পৌরুষে লাগছিল।

কিন্তু গতকাল সন্ধ্যায় সমস্ত আবহাওয়া চরমে উঠল।

গতকাল বিকেল থেকে ওরা প্রায় আঠার মত পেছনে লেগে রইল। বিকাশের নে হল, বেশ নেশাগ্রস্ত অবস্থা দুজনেরই। অশ্লীল মন্তব্য। কুৎসিত অঙ্গ- ভঙ্গি। বিচ-এ বেড়াতে বেড়াতে পেছন থেকে ছোটছোট মাটির টুকরো গায়ে সে পড়ল। যেখানেই যায়—সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে ওরা সেখানেই। বেড়ানো লতুবি রেখে বিকাশরা লজের আপাত নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে এল। সৈকত হোটেল থেকে চা এল। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। জেনারেটারে কি গণ্ডগোল য়েছে। ম্যানেজার সেখানে। আলো নেই লজে। সন্ধ্যার ভারি অন্ধকার নেমে াসছে। চরাচর জুড়ে নিথর শান্তি।

ওরা ঝাউবন থেকে বেরিয়ে এল। সদম্ভে পা ফেলে উঠে এল বারান্দার দাঁড়িতে। ওদের এদিকে আসতে দেখে রেবা ছেলেমেয়েকে ঘরে পাঠিয়ে দিল। ন্দ করে পা ফেলে লজের চারিদিকের বারান্দায় ঘুরে বেড়াতে লাগল ওরা। রেবা, কাশ বেতের চেয়ারে কাঠের মত বসে। নিঃশব্দে ভীষণ কিছু একটা ঘটনা টার জন্যে যেন অপেক্ষা করছে।

'গবরমেণ্ট শালা ঘ্যাম জিনিস বানিয়েছে তো!'

লজের গার্ড বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। ওরা গ্রাহ্য করল না।

'আমার চার নম্বর পাগলীটাকে এখানে এনে শালা রাত কাটিয়ে যেতে হবে।'

খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ওরা প্রায় নিঃশব্দে বসে থাকা বিকাশের গা-ছুঁয়ে মে গেল।

রাতে খাবার টেবিলে জয় জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা বাপি—? ওরা এখানে পাগলী য়ে এসে কি করবে?'

ওরা চলে যাবার পর থেকে রেবা বিকাশের সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। য়ের কথা শেষ হতেই কান্না চাপতে চাপতে টেবিল ছেড়ে উঠে গেল। জয় বাক। তারপর হাওয়া গরম ভেবে খাওয়ায় মন দিল। মিলি মাথা নীচু করে লট্ ঠোক্রাচ্ছে। বিকাশেরও উঠে যেতে ইচ্ছে করছিল। অত্যন্ত নাটকীয় য় যাবে ভেবে উঠল না।

ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে। নাইট গার্ড, ঠক্ঠক্ করে রাস্তায় লাঠি তে ঠুকতে পাহারা দিচ্ছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কয়েকজন শ্রমিক আপাদ- তক চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে ওদিকের বারান্দায়। বিকাশ পায়চারি থামিয়ে বার পাশের চেয়ারটায় এসে বসল, 'চলে যাওয়াই যাক। কাল বিলটিল দিয়ে ত বলি—।'

রেবা খুব ক্লান্তভাবে বিকাশের কাঁধে মাথা রাখল। পেছনে ছড়ান হাত তুলে র মাথায় রাখতে বিকাশ অনুভব করল জ্বরো রুগীর মত উত্তপ্ত।

বেরুতে প্রায় পাঁচটা হয়ে গেল।

তিনটে নাগাদ বিলটিল মিটিয়ে তৈরি হয়েছিল বিকাশ। রেবারও গোছগাছ । ছেলেমেয়েদের যে-রকম ঠিক করে রাখা হয়েছিল—বলা হল। বিকাশ ন, মিলি বিশ্বাস করেনি। ছেলেদুটোর কুৎসিত, অভব্য আচরণই যে এখান কে চলে যাবার কারণ—বুঝে নিয়েছে। আকাশে দুপুর থেকে মেঘ। চারটে াদ গলে নামতে শুরু করল। মাথার ওপর ঝমঝমে বৃষ্টি নিয়ে বেরোনো কাশ, রেবা কেউই পছন্দ করছিল না। আধঘণ্টা বাদে বৃষ্টি থামল। আকাশ য়মুছে আয়নার মত। গাড়িতে ওঠার সময় ভাইবোনে প্রবল ঝগড়া। জয়, নে বিকাশের পাশে বসবে, এবং একাই। এ-ব্যাপারে দিদির সঙ্গে তার কোনো ঝোতা নেই। মিলিরও জেদ,—আসার সময় ও সামনে বসে এসেছে। এবার র টার্ন। জয় কেঁদে জিতে গেল। রেবার ধমক খেয়ে মিলি গজ্গজ্ করতে তে মা'র পাশে গিয়ে বসল পেছনের সিটে।

প্রথম কুড়ি কিলোমিটার রাস্তা খুবই খারাপ। খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে ছল। পনেরো থেকে কুড়ি কিলোমিটারের ওপর গতি তোলা যাচ্ছিল না। নকদূর পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে, তারপর আর হয়নি। আকাশে মেঘ জমে ঝুলে ছে। বেশ অন্ধকার মতন। বিকাশ হেড্-লাইটের আলো রাস্তার ওপর লে রাস্তা দেখে গাড়ি চালাচ্ছে। গ্রাম মাঝে মাঝে। রাস্তায় লোকজন কম। টা গরুর গাড়িকে পাশ দিয়ে রাস্তায় উঠে বিকাশের মনে হল, দূরে রাস্তার খানে কিছু যেন দেখল। হেড্-লাইটের আলো সামনে ফেলে কাছে আসতে ল, তিনটে বোতল রাস্তার ঠিক মাঝখানে খাড়া করে দাঁড় করানো দেখে ল, খালি বিয়ারের বোতল। অনেকটা ক্রিকেটের পিচ-এর ওপর উইকেটের দায় সাজান। এখানে রাস্তার মাঝখানে কে বিয়ারের বোতল সাজিয়ে রাখল— তুকে ভাবতে ভাবতে নি[illegible] হচ্ছে বিকাশ—হঠাৎ মোটর সাইকেলের চড়া শব্দ। তার আলোয় চোখ ঝল্সে গেল। —ওরা! রাস্তার ধারে রাখা [illegible] গ্রামের পাশে লুকিয়ে অপেক্ষা করছিল—হেড-লাইটের আলো ফেলে বিকাশকে অন্ধ করে দিতে চাইছে।

রেবা চীৎকার করে উঠল। মিলি, চীৎকার করে উঠল। বিকাশ কোনরকমে অ্যাকসেলারেটারের ওপর চাপ কমিয়ে, স্টিয়ারিং চেপে টালমাটাল গাড়ি ঠিক করল।

ওরা পেছনে।

ওদের এভাবে দেখতে পেয়ে বিকাশ প্রথমে বেশ বিমূঢ় হয়ে গেছিল। সামনের আয়নায় দেখল, ওদের জলন্ত হেড-লাইট বেশ পেছনে। এ-ধরনের রাস্তায় যে-গতিতে গাড়ি চালান উচিত, বিকাশ এখন তার থেকে বেশি জোরে গাড়ি চালাচ্ছে। হাতের মুঠোয় স্টিয়ারিং ধরে রাখা বেশ অসুবিধাজনক হয়ে উঠেছে।

'ওরা কি করে জানলো বল তো যে, আমরা আজই চলে যাচ্ছি?' রেবা জিজ্ঞেস করল।

'কি জানি। বুঝতে পারছি না।'

'জানো বাপি, ওরা বোধহয় সৈকত হোটেলের বয়টাকে জিজ্ঞেস করে জেনেছে' মিলি বলে উঠল, 'আমরা সব বিল পেমেণ্ট করে দিলাম। বখশিশ দিলাম।'

এখন আর গোপন রাখা বৃথা। এতদিন চেপে থেকে মিলি আলোচনায় যোগ দিল। জয় কথা বলছে না। ঘুরে ঘুরে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন কথা গিলছে।

বাঁক ঘুরে এসেছে বিকাশ। আয়নায় পেছনে কোনো হেড-লাইটের প্রতিচ্ছবি নেই। বিকাশ আয়নায় চোখ রাখছে। মিলিও ঘুরে দেখছে কখনো কখনো। জয় ছট্ফট্ করছে। সিটের ওপর হাঁটু গেড়ে উঠে বসে ফিরে পেছনে তাকাচ্ছে। রেবা ধমক দিল, 'আঃ কি ছটফট করছো? ঠিক করে বসতে পারছো না?'

ঘুমন্ত একটা গ্রাম পেরিয়ে গেল। রাস্তা একটু ভাল হয়েছে। বিকাশ আয়নায় একটা আলোর বিন্দু দেখতে পেল। কাউকে কিছু জানাল না। গতি বাড়াতে সাহস হল না। স্টিয়ারিং বেশ কাঁপছে।

'বাপি—, ওরা আসছে,' মিলি উঁচু গলায় বলে উঠল।

জয় মা'র নিষেধ ভুলে সিটের ওপর হাঁটুগেড়ে উল্টে বসে পেছনে তাকাল। রেবাও সোজা হয়ে বসল।

আলোয় গাড়ির ভেতর ভেসে গেল। মটরসাইকেলের গর্জন। হর্ণ দিচ্ছে। বিকাশ গাড়ি ঠিক রাস্তার মাঝখানে রেখে এগুচ্ছে।

'ওদের রাস্তা দিচ্ছো না কেন?' রেবা অসহিষ্ণু, বিরক্ত ভাবে বলল।

বিকাশ বাঁদিকে চেপে এল। গতি কমাল। ওরা ঝড়ের মত পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সামনে ওরা এখন। ওদের টেল-ল্যাম্পের আলো বিকাশের সামনে নড়েচড়ে চলেছে। মার্কফোরের জোরাল আলোর সামনে ওরা। লাল জ্যাকেট, সাদা হেলমেট্ পেছনে বসে। ওরা মটরসাইকেলের গতি কমিয়ে এনেছে। চলেছে রাস্তার ঠিক মাঝ বরাবর। পথ আটকে। কুড়ি কিলোমিটার গতিতে বিকাশ গাড়ি চালাচ্ছে। রেবা, মিলি হেলান ছেড়ে সোজা হয়ে বসেছে। দৃষ্টি সামনে, রাস্তায়। কুড়ি থেকে পনেরো। পনেরো থেকে দশ কিলোমিটারে গতি নামিয়ে এনেছে ওরা। বিকাশকে বাধ্য করছে গতি কমাতে। বিকাশ জানে, হর্ণ দেওয়া বৃথা। ওরা পথ দেবে না। মটরসাইকেল, মার্কফোরের হেড-লাইটের মিলিত আলোয় সামনের রাস্তা দিনের মত পরিষ্কার।

'হর্ণ দাও—। এরকম করে গেলে তো রাতভোর হয়ে যাবে!'

বিকাশ অনিচ্ছাসত্ত্বেও হর্ণ দিল। সাদা হেলমেট পেছন ফিরে অশ্লীল ভঙ্গি করে দাঁত দেখিয়ে হাসল। বিকাশ অপমানিত ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, দেখলে তো—। ওরা রাস্তা ছাড়বে না।

সামনে একজন সাইকেল চালিয়ে আসছে। আলোয় এমনিতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। ওরা মোটর সাইকেল নিয়ে এমনভাবে সাইকেলের দিকে ধেয়ে গেল, যেন ধাক্কা মারবে। আরোহী পড়িমড়ি সাইকেল থেকে নেমে সাইকেল ফেলে রাস্তার ধারে বাবলাগাছের আড়ালে সরে দাঁড়াল। হা...হা...করে হাসল দুজনে। বিকাশের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল।

ওরা হঠাৎ গতি বাড়াল। হুহু করে বেরিয়ে গেল। টেল-ল্যাম্পের আলো ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। রেবার দিক থেকে স্বস্তির প্রশ্বাস ফেলার শব্দ শুনতে পেল বিকাশ। মিলি হেলান দিয়ে বসেছে ফের। জয় পা ঝুলিয়ে বসল। রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বিকাশ সিগারেট ধরাল।

আকাশ তারায় ভরা। দু পাশে ধান ক্ষেত। রাস্তার পাশে নয়নজুলি জলে টইটম্বুর। মাঝে মাঝে কাশফুলের ওপর আলো পড়ে, সাদা ফুল রুপোর মত ঝকঝক করে উঠছে। বিকাশ ভাল গতিতেই চালাচ্ছে এখন।

'আমাদের ফাই-ফরমাশ্ খাটতো যে ছেলেটা—' রেবা বলল, 'তাকে বখশিশ দিয়েছো তো? আহা, ছেলেটাকে জয়ের একটা জামা দেব বলেছিলাম। তাড়া- হুড়োয় ভুলে গেছি।'

মিলি উঠে দাঁড়িয়ে সামনের সিটে ঝুঁকে দেখে বলল, 'মা, ভাই ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'জয়—,' রেবা ডাকল, 'ঘুমিও না। হুমড়ি খেয়ে পড়বে। যা রাস্তা—।'

'না—,' জয় ঘুমন্ত গলায় অর্ধস্ফুট জবাব দিল।

সামনে টিমটিম করে একটা আলো জ্বলছে। দোকান একটা। রাস্তার ধারে যেমন ছোটছোট দোকান থাকে। কাছে আসতে বিকাশ দেখল, মোটরসাইকেল থামিয়ে ওরা দাঁড়িয়ে। সিটে বসে, তাকে দেখিয়েই যেন মুখের ওপর বিয়ারের বোতল উপুড় করে ধরল। চালকের আসনে এবার কালো জ্যাকেট, হলুদ

ওদের দিকে তাকাতে মনে হল, ওরা যেন বিদ্রূপের হাসি হাসল।

মিলি বলল, 'ওরা চলে যায়নি মা—।'

'তোমায় দেখতে হবে না। লোক আছে দেখার।'

রাস্তায় কাজ হচ্ছে। সারানোর সঙ্গে সঙ্গে চওড়াও করা হচ্ছে। মাঝে মা কশান বোর্ড। জয়কে জাগিয়ে রাখা যাবে না। বিকাশ বাঁ হাতে জয়ের গোটা পা ঝুলিয়ে দিল। একটা খড় বোঝাই গরুর গাড়ি আসছে। আলো প গরুর চোখ কাচপোকার মত জ্বলজ্বল করছে। বিকাশ হেড্-লাইটের আ রাস্তায় ফেলল। গাড়ির ভেতর আলোর বন্যা। আয়নায় আলো ঠিক্‌রোচ্ছে মোটরসাইকেলের গর্জন। হর্ণের শব্দ। আয়নায় চোখ রেখে বিকাশ বাঁ পাশে গা সরিয়ে রাস্তা ছেড়ে দিল।

গাড়ির ভেতর থেকে আলো সরে গেল। বিকাশের ডানপাশে আলোর বন্য সেই ভাবেই রয়েছে। ছাড়িয়ে যাচ্ছে না। কানের পাশে মোটরসাইকেলের বিরক্তিক শব্দ।

'মা—আ—আ,' মিলির আর্ত চীৎকার ভেসে এল 'ওরা জানলার পাশে ঝাঁপি...ঝাঁপি...?'

'কাচ তুলে দে মিলি, কাচ তুলে দে—.' রেবা চীৎকার করে উঠল।

'আমি পারব না। পারব না।'

আয়নায় বিকাশ দেখল মিলি ব্যাক্‌রেস্টে সিঁটিয়ে বসে। সামনে হাত দ জড়ো করা। রেবা, মিলির কোলের ওপর দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাচ তুলে জয়ের ঘুম ভেঙ্গে গেছে। বড় বড় চোখে অবাক দৃষ্টি। সামনে-পেছনের দ চাকা রাস্তার একেবারে ধারে। এই অবস্থায় ব্রেক করলে বিকাশের মনে হ গাড়ি সামলাতে পারবে না। গাড়ি থামাবে? এই সুযোগে ওরা যদি ঝাঁপি পড়ে? এখানে, চীৎকার করে গলার রক্ত তুললেও কেউ শুনতে পাবে ন বিকাশের হাত-পা কাঁপছে। ঘামের ফোঁটা গড়িয়ে থুতনির তলায় ঝুলছে। বিকা মনে হল, হাইওয়ে আর কতদূর? আলো, গাড়ির মিছিল, লোকজন?

ওরা পেছিয়ে গেল। গাড়ির ভেতর আলো মরে এসেছে। সকলেই চু জয়, ঘুম ভেঙ্গে সামনে তাকিয়ে। রাস্তার ধারে অনেকখানি জায়গা জুড়ে এব হাটতলা পেরিয়ে গেল। দু-পাশে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা গরুর গাড়ির সা দুটো কুকুর ডাকতে ডাকতে তাড়া করল কিছু দূর। সামনের রাস্তা ন সারান। চওড়া। মসৃণ। বিকাশ গতি বাড়াল।...ওরা আবার এগিয়ে আসে আয়নায় আলো পড়ল। হর্ণ দিচ্ছে ওরা। বিকাশ চোয়াল শক্ত করল। তোলপাড়।

হর্ণের তীক্ষ্ণ শব্দ।

মার্কফোর, একা সমস্ত রাস্তা জুড়ে চলেছে এবার। স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে বিক এখন সমস্ত রাস্তাটার দখলদার। ডানপাশ, বাঁদিক দুদিকই মাঝেমাঝে আ উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। ওরা বেরিয়ে যাবার ফাঁক খুঁজছে। গাড়ির তলায় রা খোয়া ছিটকে লাগার শব্দ। স্পিডোমিটারে কাঁটা প্রায় স্থির রেখেছে বিক আস্তে আস্তে রাস্তা চড়াই-এ উঠছে। কিছুদূরে ব্রিজ। ব্রিজে উঠলে হাই দেখা যায়। ধানের মাঠ, জলভর্তি নয়নজুলি ক্রমশ নীচে পড়ছে। ওরা অ হর্ণ বাজাচ্ছে সমানে।

'কি করছো কি তুমি? অতো জোর গাড়ি চালাচ্ছো কেন,' রেবা বিকা কাঁধ খাম্‌চে ধরল পেছন থেকে, 'ওদের যেতে দিচ্ছো না কেন?'

'বাপি-ই,' মিলি ডাকল, 'ওদের রাস্তা ছেড়ে দাও।'

জয় বড় বড় চোখে বিকাশকে দেখছে।

দু পাশে খালি পিচের ড্রাম। খোয়ার স্ট্যাগ্। বিকাশ সামান্য গতি কম ওরা অনেকখানি এগিয়ে এল। মার্কফোর থেকে মোটরসাইকেলের দূরত্ব আসছে।—সত্তর ফুট্। পঞ্চাশ ফুট্। স্টিয়ারিং শক্ত হাতে চেপে বিকাশ শরী সমস্ত শক্তি পায়ে ঢেলে ব্রেক্ টিপল।

মেটাল রোডের ওপর চারটে চাকার আর্তনাদের রেশ [illegible]লিয়ে যাবার আ খালি ড্রাম ছিটকে পড়ার শব্দ। হুড়মুড় করে খোয়া [illegible] যাওয়ার শব্দ। হে লাইটের তীব্র আলো নীচে ধানক্ষেতের ওপর এলোঝাড়ু চাবুকের মত প পড়তে মিলিয়ে গেল।

'এ কি করলে গো তুমি,' রেবার খাম্‌চে ধরা হাতের মুঠি শিথিল হয়ে গেল বিকাশের কাঁধের ওপর থেকে। মিলির গলায় উচ্চকিত কান্নার আওয় জানলা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে জয় বিকাশের দিকে রাখল, 'বাপি?' 'ওদের মেরে ফেললে?'

প্রশস্ত হাইওয়ের ওপর দিয়ে মসৃণ গতিতে বিকাশ গাড়ি নিয়ে এগিয়ে চ সামনে-পেছনে গাড়ির সারি। মহকুমা শহরের রাস্তায় গাড়ি যাচ্ছে। দু- দোকান। নিয়নের উদ্ভাস। বাজারে মানুষের ভিড়। অ্যাম্‌প্লিফায়ারে একটা সিনেমা হল পেরিয়ে গেল। মাথার ওপর আয়নায় বিকাশ রেবাকে দে হেলান দিয়ে বসে রেবা। একটা হাত কনুই ভেঙ্গে চোখের ওপর আড়া রাখা। মিলি, বাইরে তাকিয়ে। হাতের মুঠোয় সাদা রুমাল মুখের সামনে রয়েছে। মাঝে মাঝে জোরে শরীর ঝাঁকিয়ে শ্বাস টানছে। জয়, দরজা। জড়সড়। দৃষ্টি সোজা সামনে।

যুদ্ধক্ষেত্র প্রত্যাগত অ্যাম্বুলেন্সের মত চলছিল মার্কফোর। ভেতরে, নি যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছিল রক্তাক্ত সম্পর্কগুলি।
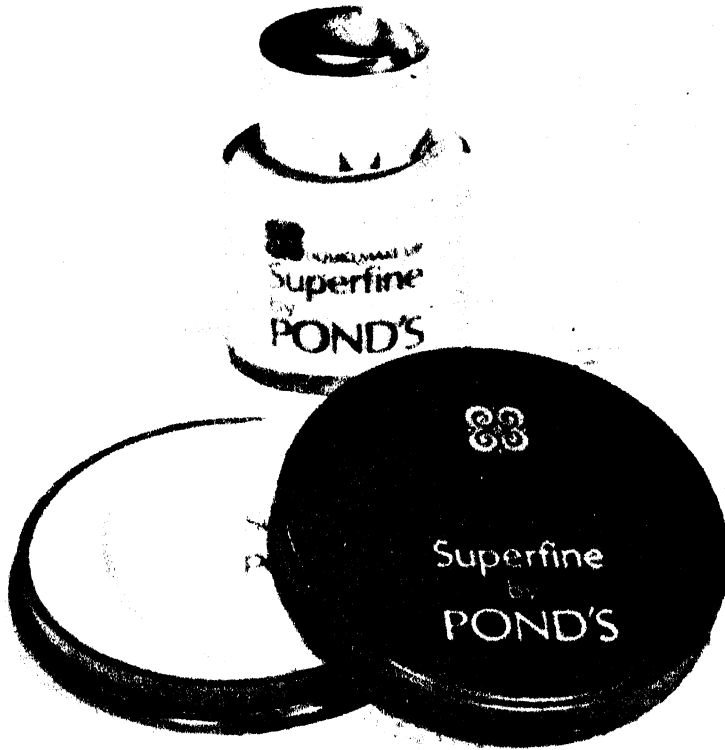
ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

প্রাথমিক অবস্থায়
অর্শের
জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে আরাম
পেতে বিশ্বস্ত
হ্যাডেনসা
মলম
ব্যবহার করুন-
অস্ত্রোপচার না
করলেও চলে !
HADENSA®
13651R BEN

অবাঞ্ছিত লোমের সমস্যাকে
গোড়া থেকে দূর করুন
• এতে শুধু নিরাপদ জৈব উপাদান আছে। এমন কোনো ক্ষতিকর রসায়ন নেই যাতে ত্বক জ্বালা জ্বালা করে অথবা চুলকায়।
• ত্বক কর্কশ হবার বা কেটে যাবারও কোনো ভয় নেই।
• সঙ্গে সঙ্গে, এবং অতি সহজে লোমকে গোড়া থেকে দূর করে।
• দ্রুত ব্যবহারের সুবিধা। 'গামকে' গরম করার দরকার হয় না। নতুন লোমের উদ্‌গমনকে মন্থর করে।
বিউটি সেলুনের নির্ভরযোগ্য
MY FAIR LADY
COLD WAX
নতুন
মাই ফেয়ার লেডী
কোল্ড ওয়াক্স হেয়ার রিমুভার
MY FAIR LADY
SAA/MLC/926/B
বাজাজ ইন্টারন্যাশানাল প্রাইভেট লিমিটেড।
বোম্বাই, কোলকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী
কস্‌মেটিক্স-এর তৈরী।

# মানবজমিন

## শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

( পঞ্চাশ )

একটি আন্তর্জাতিক এয়ারওয়েজের জাম্বো জেট বিধ্বস্ত হওয়ায় শ' তিনেক যাত্রী মারা গেছেন, খবরটা বিশাল করে বেরোলো কাগজে। রেডিওতে সকাল দুপুর রাত্রে বারবার ঘোষণা করা হল। বোম্বাই থেকে ছেড়ে ইউরোপ যাওয়ার পথে ভারত মহাসাগরের ওপর হতভাগ্য বিমানটি ভেঙে পড়ে। তাতে বহু ভারতীয় যাত্রী ছিলেন। নিহতদের নামের তালিকা এখনো পাওয়া যায়নি।

সকালে খবরের কাগজটা সামনের বারান্দায় ছুঁড়ে দিয়ে যায় কাগজওয়ালা। অনেক বেলা পর্যন্ত সেটা ওইভাবেই পড়ে থাকে। শুধু অফিসে যাওয়ার আগে ব্রেকফাস্টের সময় কখনো কখনো খুব আনমনে কাগজে একটু চোখ বুলিয়ে নেয় বোস সাহেব।

আজ বোস সাহেব তার আধসেদ্ধ ডিম ভাঙতে ভাঙতে খবরের কাগজটা চাইল।

ডিমের থলথলে কুসুমটা হঠাৎ পিছলে টেবিলের ওপর পড়ে ফেটে গেল। গাঢ় হলুদ কাথ গড়িয়ে পড়ল দুধসাদা টেরিনের প্যান্টেও। বোস তা ততটা খেয়াল করল না। আপনমনে বলল, স্ট্রেঞ্জ!

মণিদীপা বাথরুমে। বোস কাগজটা সন্তর্পণে ভাঁজ করে টেবিলের এক কোণে সরিয়ে রাখল। দীপনাথ কত নম্বর ফ্লাইটে উঠেছে তা তার জানা নেই। তবে সময়টা প্রায় মিলে যাচ্ছে।

বোস টোস্টের প্লেটটা সরিয়ে রাখল। ডিমের কুসুমটার থ্যাতলানো চেহারার দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর উঠে ঘরে গিয়ে ট্রাউজার্স পাল্টে নিল। খুব অদ্ভুত একটা ভারহীন অবস্থা টের পাচ্ছে নিজের ভিতরে। একদা লোকটা ছিল ননএনটিটি। তারপর হি বিকেম এ ফ্রেন্ড। দেন এ রাইভ্যাল। বাট অলওয়েজ এ ফ্রেন্ড।

নিজস্ব ঘরে একটা ইজিচেয়ারে বসে বোস একটা সিগারেট ধরায়। বহুকাল সিগারেট খায় না। ডাক্তারের পরামর্শে ছাড়তে হয়েছে। পুরোনো কেনা প্যাকেট-গুলো সাজিয়ে রেখেছে টেবিলে। এখন খেল। কারণ, ডাক্তারের হুকুম মানার যথেষ্ট যুক্তি আর নেই। মৃত্যুর দরজা তো হাজারো দিক দিয়ে খোলা। মৃত্যু হল হাজারদুয়ারী।

বোস লক্ষ করল, তার হাত কাঁপছে। সিগারেটটাকে আঙুলের ফাঁকে ধরে রাখা যাচ্ছে না। ঠোঁটেও ঠিকমত তুলতে পারছে না। কিন্তু সিগারেটটার খুব প্রয়োজন এখন তার। বুকে একটা ব্যথা টের পাচ্ছে সে। না, মানসিক ব্যথা নয়। সম্পূর্ণ শারীরিক।

বোস উঠল। ক্যাবিনেট খুলে ব্র্যান্ডির বোতল বের করে গেলাসে ঢেলে নিল অনেকটা। স্টেডি! স্টেডি! ইউ হ্যাভ টু বি স্টেডি! বিড়বিড় করতে করতে গপ্ করে খেয়ে নিল। প্রায় খালি পেটে গিয়ে তার নাচা-নাচি লাগিয়ে দিল ব্র্যান্ডি।

বোস আবার ইজিচেয়ারে বসে। অ্যাসট্রে থেকে আধ-খাওয়া সিগারেট তুলে নেয় এবং ব্র্যান্ডিটা ধীরে ধীরে শেষ করে। কাজটা হয়তো ঠিক হল না। তবে আপাতত হাতের কাঁপুনি কমল। বুকের ব্যথাটা না কমলেও বেড়েও গেল না আর।

মণিদীপা বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঘরে গেল। বোস উঠে আবার বড় মাপের ব্র্যান্ডি নিয়ে এসে বসে। আস্তে আস্তে সময় নিয়ে সেটা শেষ করে। কতক্ষণ লাগল তা বুঝতে পারে না। সময়ের বোধ খানিকটা গুলিয়ে গেছে। তবে বুঝতে পারছে, অফিসে বেরোতে আর দেরি করা উচিত হবে না।

ধীরে ধীরে বোস একসময়ে ওঠে। গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখে। তারপর রুমালে মুখটা ভাল করে মুছে বেরিয়ে আসে।

অনভ্যাসের দরুন এবং অসময়ে খাওয়ার দরুন মাথাটা টলছে। শরীর ঝিমঝিম করছে।

ডাইনিং হল-এ মণিদীপা এসে ব্রেকফাস্টে বসেছে। পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। বোস মণিদীপার দিকে চেয়ে আবার সময়ের হিসেব গুলিয়ে ফেলে। দেওয়ালে ভর রেখে দাঁড়িয়েই থাকে গাড়লের মতো।

একটু বাদে মণিদীপা হঠাৎ তাকে দেখতে পায়। চমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, এ কি বুন্‌দু? শরীর খারাপ লাগছে নাকি?

বলতে বলতেই প্রায় উড়ে কাছে আসে মণিদীপা, কী হয়েছে? ড্রিংক করলে নাকি?

বোস সামান্য স্খলিত স্বরে বলে, শরীরটা ভাল লাগছে না।

তবে শুয়ে থাক। আমি ডাক্তারকে রিং করি।

না। তেমন কিছু নয়। দেয়ার ইজ পারহ্যাপস এ ব্যাড নিউজ ফর আস। কাগজটা দেখ।

কিসের নিউজ? বলতে বলতে মণিদীপা গিয়ে কাগজটা তুলে নেয়। কিন্তু কোন খবরের কথা বোস বলছে তা বুঝতে না পেরে ভ্রূ কুঁচকে খুঁজতে থাকে।

বোস বলে, লীড, গো থ্রু দি লীড নিউজ। প্লেন ক্র্যাশ।

মণিদীপা দেখে এবং পড়ে। এবং তারপর বুঝতে পারে। হঠাৎ সে আস্তে আস্তে চেয়ারে বসে। মুখ ফিরিয়ে বোসের দিকে চেয়ে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করে, এই প্লেনে কি দীপনাথবাবু ছিলেন?

আই অ্যাম নট সিওর। তবে সময়টা খুব কাছা-কাছি।

এই এয়ারওয়েজেই উনি যাচ্ছিলেন?

বোধ হয়।

মণিদীপার চোখের দৃষ্টি খুব শূন্য হয়ে যায়। বোসের দিকে চেয়ে থাকে শুধু। কথা বলে না।

মণিদীপাকে বহুকাল বাদে খুব হিউম্যান বলে মনে হয় বোসের। ভেরী হিউম্যান, ভেরী সফট। অলমোস্ট টাচেবল। ইভন লাভেবল।

বোস দেওয়ালের ভর তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে বাইরের দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে। আজ অনেক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে। মেক ইওরসেলফ বিজি। ওভার বারডেনড। গেট টায়ার্ড। গেট ব্ল্যাঙ্ক। এনিথিং বাট ব্রুডিং।

গাড়িতে বসে আবার সিগারেট ধরায় বোস। আরে! দীপনাথ খুব পাহাড় ভালবাসত না? টল মাউন্টেনস! হাইটস! চুক চুক! হি ক্লাইমবড হাই দিস টাইম। দি ফল ওয়াজ অলসো গ্রেট।

বোস চোখ বুজে থাকে। ভিতরে ভিতরে কী যেন ধিকি ধিকি পুড়ে যাচ্ছে। বড় জ্বালা।

*

দ্বিতীয়বার খবরটা পড়ে কাগজটা সরিয়ে রাখে মণিদীপা। তারপর উঠে দাঁড়ায়। তার পা টলছে না, বুক কাঁপছে না। কিন্তু বুকটা বড় শূন্য। মনে হচ্ছে আর এক পাও হেঁটে যাওয়ার কোনো মানে হয় না।

শোওয়ার ঘরের আলমারি থেকে সে তার মস্ত [illegible]
চপ্পল গলিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

অফিস টাইমে রাস্তায় ট্যাক্সি পাওয়া মুশকিল। তবে ভাগ্যক্রমে পাশের ফ্ল্যাটের বুড়ো মাদ্রাজী ভদ্রলোক তাঁর গাড়ি বের করছিলেন।

মণিদীপা সোজা তার কাছে গিয়ে বলে, একটা লিফ্‌ট দেবেন?

প্ল্যাজলি। কদ্দুর?

যতক্ষণ না একটা ফাঁকা ট্যাক্সি পাওয়া যায়।

উঠে পড়ুন।

চিড়িয়াখানার কাছাকাছি ফাঁকা ট্যাক্সি পেল মণিদীপা। রতনপুর পৌঁছে দেখল, হাতঘড়িতে মাত্র সোয়া দশটা। কি করে পৌঁছোলো, এই সময়ের মধ্যে কী কী ঘটনা ঘটেছে, কোন দৃশ্য চোখে পড়েছে তা তার কিছুই মনে পড়ল না। রিকশায় বসে সে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করল খুব। পারল না। বার বার আনমনা হয়ে যাচ্ছে সে। খুব পাহাড়ের কথা বলত দীপনাথ, সমুদ্রের কথা নয়। তাই কি দীপনাথকে পেয়ে হিংস্র সমুদ্র তাকে টেনে নামাল অথৈ জলের গভীরতায়? যাতে আর তার পাহাড়ে ওঠার সাধ না জাগে?

রিকশাওলা জিজ্ঞেস করল, ফটক দিয়ে ঢুকতে হবে দিদিমণি?

না, ছেড়ে দাও। বলে পয়সা দিয়ে নেমে গেল মণিদীপা।

চাটুজ্জে বাড়ির সবই স্বাভাবিক আছে। নতুন দোতলা বাড়ির ছায়ায় একটা মোড়ায় হিসেবের খাতা দেখতে দেখতে এক কাপ চা খাচ্ছিল তৃষা। মণি-দীপাকে দেখে খুব অবাক আর খুশি হয়ে বলল, আরে এসো! কতদিন পর!

কিছু বলতে হল না, নতুন একটা ছোকরা চাকর কাছাকাছি কোথাও হুকুমের অপেক্ষায় ছিল, সে দৌড়ে আর একটা মোড়া নিয়ে এল।

গরমে তেতেপুড়ে এসেছ। চা খাবে?

মণিদীপা মাথা নেড়ে বলে, না।

আমার নতুন বাড়ি দেখ। কেমন হয়েছে?

চমৎকার।

আমার নিজের দেওয়া ডিজাইনে তৈরি। দেখতে যেমনই হোক, থাকতে ভারী আরাম। ক'দিন এসে আমার কাছে থাকবে? সাহেব বরটিকেও সঙ্গে এনো, জায়গার অভাব নেই। আমার অভাব কথা বলবার মত লোকের।

তৃষার এক আধটা চুল পেকেছে, লক্ষ করল মণিদীপা। চেহারাটা একটু ভারভাত্তিক। বয়সের ছাপ নয়। তবে অভিজ্ঞতার একটা পক্বতা এসেছে মুখে। কিন্তু যা খুঁজছে মণিদীপা তা নেই। উদ্বেগ নেই, শোক নেই।

চায়ের কথা বলতে হল না তৃষাকে, যন্ত্রচালিতের মত এসে গেল।

মণিদীপার সত্যিকারের কোনো নেশা নেই। মাঝে মাঝে শখ করে সিগারেট বা মদও খেয়েছে সে। কিন্তু কোনোটাই তাকে বেঁধে রাখেনি। চাও নয়। কিন্তু এখন এক কাপ গরম চা পেয়ে তার খুব ভাল লাগল। তার আগে এক গ্লাস জল চেয়ে খেল সে। তলানী পর্যন্ত চা শেষ করল। তারপর বলল, দীপনাথবাবু কোন এয়ারওয়েজে গেলেন তা কি জানা আছে আপনার?

এয়ারওয়েজ! ও বাবা, সে সব কি আমাকে বলে গেছে নাকি! এই তো গতকাল রাতের গাড়িতে গেল! বললেও মনে রাখতে পারতাম না। কেন বলো তো?

কখনো বলেননি?

আমাকে বলেনি। তবে আমার ছেলে ওসব খবর রাখে। বড় কাকা তার প্রাণ।

সজল কোথায়?

পরীক্ষার পর দিদির বাড়ি এলাহাবাদ বেড়াতে গেছে। তুমি কী নিয়ে এত ভাবছ বলো তো? অমন দেখাচ্ছে কেন?

বলবে কিনা তা বারেক ভেবে নিল মণিদীপা। কিন্তু ভেবে লাভ নেই। সে না বললেও জানতে পারবে তৃষা। কিন্তু তৃষা শক্ত মেয়ে, ভেঙে পড়বে না। হয়তো

ভেঙে পড়ার কিছু নেইও। আজকাল তো মা-বাপ মরলেও অনেকে কাঁদে না। এ তো দেওর মাত্র।

আজকের কাগজে একটা প্লেন ক্র্যাশের খবর ছেপেছে। দেখেছেন?

না। আমি খবরের কাগজ পড়ি দুপুরে। ওই সময়েই আসে কাগজটা।

তৃষা হিসেবের খাতাটা নামিয়ে রাখল। মুখটা হঠাৎ গম্ভীর থমথমে দেখাচ্ছিল তার। নিজের হাতের আঙুলগুলোর দিকে চেয়ে থেকে এক পর্দা নীচু স্বরে বলল, কোথায় ক্র্যাশটা হয়েছে?

ইনডিয়ান ওসেনে।

দীপুর প্লেন? ঠিক জানো?

ঠিক জানি না। কোন্ এয়ারওয়েজের কোন্ ফ্লাইটে গেছেন তার ডিটেলস না জানলে বলা মুশকিল। তবে আমার হাজব্যান্ড বলছিলেন—

তৃষা চেয়ে ছিল। একটু মাথা নেড়ে বলল, আর বলো না। তুমি কাঁপছ। ভিতরে চলো।

তৃষা উঠে এসে প্রায় বুকে তুলে ঘরে নিয়ে এল মণিদীপাকে। বিছানায় বসিয়ে খাটের বাজুতে বালিশে ঠেস দেওয়াল। তারপর বলল, সকালে কিছু খাওনি?

অগাধ অতলান্ত ক্লান্তিটাকে টের পেয়ে মণিদীপা চোখ বুজল। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, না বোধ হয়। ব্রেক-ফাস্টে বসেছিলাম মনে আছে। ঠিক সেই সময়ে আমার হাজব্যান্ড বেরিয়ে এলেন। টোটালি ব্রোকেন ডাউন। উনি বললেন, দেয়ার ওয়াজ এ ব্যাড নিউজ ফর আস।

এত ভাল ইংরিজি শিখলে কোথা থেকে? ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তে নাকি?

প্রশ্নটার আকস্মিকতায় অবাক হয় মণিদীপা। তাকায়। বলে, হ্যাঁ।

তৃষা মণিদীপার পায়ের দিকটায় বসে। পায়ের পাতাটা ছুঁয়ে বলে, তুমি ভীষণ নার্ভাস। হাত পা হিম ঠান্ডা দেখছি।

মণিদীপা পা টেনে নেয়। হাসবার একটু ক্ষীণ চেষ্টা করে বলে, নার্ভাস লাগছে। এমনিতে আমি খুব শক্ত ধাতের। আজ কী যে হল।

কী হল বলো তো?

আপনি ভীষণ হার্ডেনড। এত শক্ত হলেন কি করে?

মানুষ আমার মত শক্ত হয় কখন জানো? যখন সে টের পায় যে, সংসারে তাকে ভালবাসার কেউ নেই।

আমারও নেই।

তৃষা একটু হাসল। তারপর বলল, না থাকলে কোথায় কোন্ প্লেন ক্র্যাশ করেছে সে খবর নিতে কেউ ছুটে আসে?

এইভাবে রতনপুর পর্যন্ত ছুটে আসার মধ্যে যে একটা লজ্জার ব্যাপারও আছে তা এতক্ষণ উদ্বেগবশে টের পায়নি মণিদীপা। এখন পেল। কিন্তু লজ্জার বদলে গম্ভীর মুখ করে সে বলে আমরা হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ দীপনাথবাবুর ওয়েল উইশার। আমার হাজব্যান্ড খবরটা পেয়ে আজ সকালেই ট্রাংক করেছেন। হি ওয়াজ সো আপসেট।

তৃষা আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে বসে। হঠাৎ এখন তাকে ভারী গম্ভীর আর করুণ দেখায়। হাত তুলে নিজের চুলগুলো পাট করতে থাকে। তারপর খুব আনমনা গলায় বলে, আমি দীপুর চেয়ে তিন চার বছরের বড়। যখন বিয়ে হয়ে আসি তখন ও ছেলে-মানুষ। আমাদের কাছে থাকত না। থাকত শিলিগুড়িতে। বেশী দেখাও হয়নি। তবু বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে এসে ওকেই সবচেয়ে ভাল লাগত। পরে বুঝতাম, ওর ভিতর একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। কিসের আকর্ষণ জানো?

মণিদীপা কথা বলে না। তবে উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

তৃষা ধীর স্বরে বলে, ও কখনো ভুলেও কারো খারাপ চায় না, মহাশত্রুরও নয়। দীপু নিজে ঠকে। কাউকে ঠকায় না।

একটু ফাঁক দিয়ে তৃষা বলে, তুমি জানো যে, ও তোমাকেও ঠকায়নি।

মণিদীপার মুখচোখ [illegible] জ্বালা করে উঠল। ঠকায়নি! ঠকায়নি! কোনটা ঠকানো, কোনটা নয়, তা এই সেকেলে বুড়ী কী বুঝবে? বাস্তবিক এখন তার তৃষাকে বুড়ী বলেই মনে হচ্ছিল। বিশাল সংসারে বটগাছের মত ঝুরি নামিয়ে অচলায়তন বসে আছে। কোনো সূক্ষ্ম বোধ নেই, অনুভূতি নেই, আদর্শ নেই, স্বার্থপর, আত্মসর্বস্ব।

এসব ভাবতে ভাবতে উত্তেজিত মণিদীপা সোজা হয়ে বসে খাট থেকে পা নামাল। বলল, আমি তা হলে এখন চলি।

দূর বোকা। কী কথা থেকে কী কথা! চট করে রেগে গেলে কি হয়? আমি মুখ্যসুখ্যু মানুষ, তার ওপর গেঁয়ো, কথা সাজিয়ে বলতে পারি না। কিন্তু তা বলে রাগ করার মতও কিছু বলিনি।

রাগ করিনি।

করেছ বাপু। মুখ দেখলেই বোঝা যায়। বলছিলাম কি, দীপু আর তোমাতে যা ভাব ছিল তাতে দীপু ইচ্ছে করলে তো তোমার সর্বনাশও করতে পারত। কিন্তু করেনি। বলো, সত্যি কথা কিনা!

মণিদীপা হাসে। ওষ্ঠ ফুলে। দীপনাথ কেন সেই সর্বনাশটুকু করল না মণিদীপার তো সেইটেই জিজ্ঞাসা। সংস্কারাচ্ছন্ন, কাপুরুষ, গণ্ডীবদ্ধ, স্বার্থপর ওই লোকটা সবনাশ করল না বলেই তো মণিদীপার সবচেয়ে বড় সবনাশ হল। কিন্তু সে কথা এই বটবৃক্ষ বুঝবে কি করে?

মণিদীপা হাসিটুকু মুখে ধরে রেখেই বলল, দীপনাথ আর আমার সম্পর্ক নিয়ে আপনি অনেক ভেবেছেন, না?

তৃষা হাসিমুখে বলে, একটু আধটু। কিন্তু বিশ্বাস কর, দীপু নিজে কিন্তু কখনো কোনো কথা বলেনি।

বলার মত কিছু ছিলও না যে। উই ওয়্যার জাস্ট গুড ফ্রেন্ডস।

তাই হবে। কিন্তু তোমাকে তা বলে রাগ করে চলে যেতে দিচ্ছি না। আজ এখানেই সারাদিন থাকতে হবে।

মণিদীপার একবার রাগ করতে ইচ্ছে হল। ইচ্ছে হল, চলে যেতে। কিন্তু বসার পরই সে টের পাচ্ছিল তার হাত পা বশে নেই। বহুকাল ধরেই তার শরীর কিছু দুর্বল লাগে। আজ আরো দুর্বল লাগছে। এত দূর পথ এখুনি ফিরে যাওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া, তৃষা মুখে যাই বলুক, তার মুখে একটা মায়া জড়ানো গভীর মমতাও উপচে পড়ছে। কলকাতায় ফিরে গেলে সে এ রকম ভালবাসায় মাখা মুখ তো একটাও দেখতে পাবে না। সারাদিন দুঃসহ একা আজ তার কাটবে কি করে? মণিদীপা কিছুক্ষণ মুখ নীচু করে বসে থেকে হঠাৎ বলল, এখান থেকে টেলিফোন করা যায়?

কেন যাবে না? কাকে ফোন করতে চাও?

আমার হাজব্যান্ডকে। উনি নিশ্চয়ই অফিসে গিয়ে সব খোঁজ খবর নিয়েছেন। এখন ফোন করলে পাকা খবরটা জানা যায়।

তৃষা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থেকে ধীর গলায় বলে, জানতেই চাও? না জানলে ক্ষতি কি? পাকা খবর যতক্ষণ না পাওয়া যায় ততক্ষণই আশা, ততক্ষণই ভরসা।

মণিদীপা এ কথায় আবার হাসে। মানুষ কতই না দুর্বল? সে মাথা নেড়ে বলে, ট্রুথ ইজ অলওয়েজ বেটার দ্যান ফিকশন। আপনি নিজে তো ভীষণ প্র্যাকটিক্যাল, তবু কেন এড়িয়ে থাকতে চান?

এড়িয়ে থাকতে চাই না। আমি চাই, খবরটা তার নিজের সময় মত আমার কাছে এসে পৌঁছোক। আমার আগ বাড়িয়ে যাওয়ার তো কিছু নেই। তুমি মুখে চোখে একটু জল দিয়ে এস। তোমাকে ভীষণ শুকনো দেখাচ্ছে। স্নানও করতে পারো।

আমার আগে খবরটা জানা দরকার।

জানবে। আগে একটু ফ্রেশ হয়ে নাও।

অগত্যা মণিদীপা বাথরুমে গেল। জল ছোঁওয়ার আগে সে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বাথ-রুমটায় কোনো আয়না নেই। থাকলে সে নিজের মুখটা একটু দেখত।

লাল প্লাস্টিকের বালতি ভরা নিস্তরঙ্গ জল। একটু ঝুঁকে জলে নিজের মুখটা দেখার চেষ্টা করল মণিদীপা। আবছা দেখল নিজেকে। অর্ধেক মুখে ক্ষীণ আলো, অর্ধেক গাঢ় ছায়ায় ঢাকা। চুলগুলো ঝেঁপে ঢেকে ফেলেছে মুখের অনেকখানি। জলের তলায় দীপনাথ কি শুয়ে আছে এখন? গভীর জলের নীচে অনেকগুলো মৃতদেহের একটি?

একটু কেঁপে ওঠে মণিদীপা। কাঁদার অভ্যাস নেই তার। কিন্তু এখন বিনা আয়াসে কান্না এল। গলায় একটা শুকনো গরাস আটকে আছে যেন। অপ্রতিরোধ্য হেঁচকি উঠে আসছে বুক থেকে।

বাথরুমে অনেক সময় নিল মণিদীপা। সকালে একবার স্নান করেছে, তবু আবার ঠান্ডা জলে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল সে।

বাথরুমের দরজা খুলেই দেখতে পেল, দরজায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তৃষা। চোখে চোখ হতেই একটু হেসে বলল, তুমি বাথরুমের দরজা দিতেই কেমন যেন ভয় হল। বাথরুম জায়গাটা তো ভাল নয়। অনেক রকম অঘটন ঘটে।

কি রকম অঘটন? একটু অবাক হয়ে মণিদীপা জিজ্ঞেস করে।

আমার জানা দুজন বাথরুমে সুইসাইড করেছিল।

মণিদীপা মিষ্টি করে একটু হেসে বলে, তাই দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন? আমার তো সুইসাইডের কথা মাথাতে আসেনি। কেনই বা তা করব?

শোনো, এখন থেকে তুমি আমাকে দিদি বলে ডেক। আর আপনি আজ্ঞে করার দরকার নেই।

অতি ঘনিষ্ঠতা মণিদীপার পছন্দ নয়। কিন্তু এই মহিলাটির মধ্যে কৃত্রিমতা এতই কম এবং আন্তরিকতা এতই বেশী যে, সে কথাটাকে মেনে নিল। বলল, আচ্ছা।

খুব কাঁদছিলে বাথরুমে। কাঁদা ভাল। আমার ছা সব শুকনো। কাঁদতে চাইলেও পারি না। কোনো অবস্থাতেই নয়।

একটু লজ্জা পেয়ে মণিদীপা বলে, আমারও সহজে কান্না আসে না। আজ হঠাৎ কী যে হল।

ঠান্ডা ঘোলের সরবত দিয়ে রেখেছে। চলো তো।

কণ্ঠা থেকে পেট পর্যন্ত একটা শুখো মরুর খাত খাঁ খাঁ করছিল এতক্ষণ। ঠিক মিষ্টি ঠান্ডা ঘোলের সরবত সেই শুকনো খাতে ছলছল করে নেমে গেল। গ্লাস নামিয়ে রেখে সে বলল, এবার তা হলে খবরটা নিতে হয়।

নেবেই?

নেবোই। বলে একটু হাসে মণিদীপা।

তার আগে বল আমেরিকা যাওয়ার পথে লন্ডন আগে না ইন্ডিয়ান ওসেন আগে? আমি ভূগোল কিছুই জানি না।

ইন্ডিয়ান ওসেন আগে। তারপর ইউরোপ হয়ে লন্ডন। কেন বলুন তো?

যাক বাবা, বাঁচা গেল।

কী হয়েছে বউদি?

আবার বউদি আর আপনি আজ্ঞে? ঠিক আছে, এবার থেকে আমি তোকে তুই-তোকারি করব। এখন দিদি বলে ডাক তো ছুঁড়ি।

দিদি।

বল, তুমি আমার দিদি।

তুমি আমার দিদি। উঃ, এবার কথাটা বুঝিয়ে বল তো।

তৃষা খুব হাসল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, এতক্ষণ ধরে লোক হাসালি তো!

তার মানে কি?

গতকাল দীপু লন্ডন থেকে তার মেজদার অফিসে ট্রাঙ্ককল করেছিল।

সেটা এতক্ষণ বলেনি!

আমি কি ছাই ভূগোল জানি?

মণিদীপা হঠাৎ পাগল হয়ে দু হাতে খিমচে ধর[illegible] তৃষাকে। তারপর তার বুকে দুম দুম করে দুটো কি[illegible] মেরে শ্বাসরুদ্ধ গলায় বলল, খুব জানো, খুব জ[illegible] এতক্ষণ ধরে ইয়ার্কি করছিলে। আমিও তাই [illegible] কেন এতবড় দুঃসংবাদ পেয়েও মানুষটা ঘাবড়াচ্ছে না।

ক্যালসিয়ামের অভাব হলে হাড় দুর্বল হয় ও সহজে ভাঙ্গে!

# ক্যালসিয়াম-স্যাণ্ডোজ হাড়ের কাঠামো মজবুত করে!

কমুক। চাকে বলের খবরটা সত্যি তো? বানিয়ে বলোনি?

তোর যা অবস্থা দেখছি, বানিয়ে বললে কি পরে আমার রক্ষে রাখবি।

দুজনে পাশাপাশি বিছানায় বসে। মণিদীপা এখন গভীর এক লজ্জায় মাথা হেঁট করে থাকে। কি করে মুখ তুলবে তা বুঝতে পারে না।

তৃষা আস্তে করে বলে, লজ্জার কিছু নেই। আমার কথা তো তোকে কখনো বলিনি। আমিও তোর মতোই পাপী। একজনের ঘর করি, মন আর একজনের কাছে। তোর আর একজন তবু বেঁচে বর্তে আছে। আমার জন কেবল স্মৃতি।

সে কে?

তোকে বলছি আর কি? তা জেনে তোর অত দরকার কি রে? তুই কচুর শিল্পারি কখনো খেয়েছিস?

প্রসঙ্গ এত দ্রুত পাল্টে যাওয়ায় অবাক মণিদীপা বলে, না তো।

রান্না কিছু জানিস, না বিবি সেজে ঘুরে বেড়াস খালি?

একটু একটু জানি।

ছাই জানিস। শিল্পারি কেমন করে রাঁধে জানিস না তো।

নামই শুনিনি।

আজ খেয়ে দেখ। যদি ভাল লাগে তবে শিখিয়ে দেবো। কত লোককে রেঁধে খাওয়ালাম।

নতুন বাড়ির একটি মনোরম কাচে ঢাকা বারান্দায় মস্ত খাওয়ার টেবিলে দুজনে খেতে বসল। তৃষা বলল, এই মস্ত বাড়িতে আমি একা থাকি, জানিস?

একদম একা?

আমার একজন খাস দাসী আছে, বৃন্দা। সে থাকে। তুই থাকতে পারবি একা? ভূতের ভয়ে মরে যাবি।

আমার ভূতের ভয় নেই।

কেন নেই রে?

বিশ্বাসই করি না।

দূর বোকা! ভূতের ভয়টা একটা ভারী মজার জিনিস। ওটা না থাকলে জীবনটা আলুনি হয়ে যায়। আমারও ভূতের ভয় নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে চেষ্টা করে একটু আধটু ভয় তৈরি করি।

তোমার সেই কথাটা বললে না কিন্তু। সেই আর একজনের কথা। খুব চেপে যাচ্ছো।

যাঃ।

বলো না।

তৃষা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বলতে শুরু করলে ফুরোবে না। আমাদের আমল ছিল অন্যরকম। তখন আমরা ছিলাম সব শরৎচন্দ্রের নায়ক নায়িকার মতো। প্রেম মানেই বুক-ভাঙা ঘটনা। তোদের আমল তো সেরকম নয়। এখন তো শুনি ছেলে মেয়েরা দিব্যি খোলামেলা করে, শোয়া বসা হয়, আবার হাসিমুখে ছাড়াছাড়ি হয়ে চলে যায়।

খানিকটা তাই।

তবে তুই হঠাৎ কী বলে দীপুর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লি?

পড়িনি তো। মণিদীপা হাসল। রেগে গেল না।

মারব থাপ্পড়। মেয়েমানুষের চোখে কিছু এড়ায় না।

উই আর ফ্রেন্ডস।

শিল্পারি কেমন খাচ্ছিস?

মার্ভেলাস। কিন্তু কচুটা কি করে কেটেছো বলো তো! ঠিক স্প্রিং-এর মতো।

শিল্পারির আসল কারিকুরিই তো ওখানে। কাটাকুটিটাই আসল। খুব খাটনি।

অত খাটতে যাও কেন? সময় নষ্ট। রান্না হবে প্লেন অ্যান্ড কুইক।

আমি তো তোদের জেট-যুগের মানুষ নই। আর সব কিছুই কি প্লেন অ্যান্ড কুইক করা যায়? কারিকুরি না থাকলে গোটা জীবনটাই হবে শিল্প-হীন।

তোমাকে আমাদের কিছু শেখানোর নেই।

আছে রে, আছে। আমার খুব ইচ্ছে করে আজকালকার মেয়েদের কাছে স্বামী বশ করার ফুস মন্তরটা শিখে নিই।

কেন, তোমার স্বামী তোমার বশ নয়?

একটুও না।

আদৌ বশে রাখার চেষ্টা করোনি?

করিনি আবার।

মণিদীপা মাথা নেড়ে বলে, বিশ্বাস করি না। তোমার স্বামীটি তো ভারী ভালমানুষ অ্যান্ড এ ভেরি হ্যান্ডসাম পারসন। কোয়াইট অ্যাডোরেবল। তোমার আর একজন কি আরো হ্যান্ডসাম?

তোকে বলব কেন?

সে মারা গেছে নাকি?

হ্যাঁ। কিন্তু মরেও কি আর মরেছে? ভূত হয়ে ঘাড়ে চেপে আছে। এ জন্মে আর কোনো ওঝা-বদ্যির সাধ্য নেই যে, তাকে তাড়ায়।

সে তোমার বশে ছিল?

না। বরং আমিই তার বশে ছিলাম। সে মেয়েদের খুব ভাল পোষ মানাতে পারত। তোর আর একজনের মতো মিনমিনে নয়।

আমার আর একজন কেউ নেই।

নেই তো চোখদুটো নামালি কেন? ঢং রাখ। সব জানি।

তুমি এত বাংলা স্ল্যাং বলো কেন? ঢং। ছুঁড়ি! আর একজন!

গাঁয়ে থাকি যে। তবে এসব শহুরেরাও জানে।

জানে, কিন্তু কথায় কথায় ইউজ করে না। তুমি ভীষণ গেঁয়ো।

গেঁয়ো হই আর যাই হই, তোকে একটা কথা বলছি। আজ গিয়ে বরের সঙ্গে শুবি।

যাঃ।

যাঃ নয়। এই বয়েস থেকে যদি পায়ের তলার মাটি আলগা হতে থাকে তবে বেশী বয়সে সম্পর্কের বিষটা গাড়িয়ে যাবে। আমার অবস্থা দেখছিস না?

তোমার আবার কী অবস্থা? বেশ তো আছো।

কী দেখে বেশ আছি বুঝলি? এই বাড়ি, সম্পত্তি, টাকা? জানিস, বরকে পাত্তা দিই নি বলে আজ এই সংসারের কেউ আমাকে আপন ভাবে না?

আমার বর তো আমাকে ডিভোর্স করার জন্য মুখিয়ে আছে।

কেন, খুব কট কট করে কথা শোনাস নাকি?

না না। কথাই হয় না প্রায়।

সেও তাহলে তোরই দোষ। নিশ্চয়ই বর তোর পছন্দের নয়।

বড্ড মানি সেন্ট্রিক, সেলফিশ, অ্যাম্বিশাস।

সে যেমনই হোক ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে কিন্তু একদম ডুবজলে পড়বি। যা পেয়েছিস সেটাকেই ঠিকঠাক করে নে। পুরুষ মানুষ হচ্ছে একদম ব্যোমভোলা মহাদেব। হাত করা শক্ত কাজ নয়। তার ওপর তোর তো ছুঁড়ি জিনিসপত্তর খারাপ নয়। ছুকরিও আছিস। আজ ফিরে গিয়ে একটু সাজগোজ করে থাকবি। বর এলে একটু ঢলাঢলি করিস।

কী যে সব বাজে বাজে কথা বলো না।

শুনতে খারাপ। কিন্তু যা বলছি সব নিজের জীবন থেকে।

আমি যে বরের সঙ্গে শুইনা তা জানলে কি করে? কেউ বলেছে?

তোর মুখ দেখেই তো বোঝা যায়।

কী আছে মুখে?

তোর মুখ চোখ খাই-খাই করছে।

যাঃ। ইয়ার্কি মেরো না।

মাইরি বলছি। ভেতরে খাই-খাই না থাকলে তুই আর একজনের দিকে ঢলে পড়তি না।

মণিদীপা খুব অভিমানভরে বলে, সেটাও বুঝি সেক্স?

তোমারও কি তাই?

তৃষা একটু ম্লান হয়ে মাথা নেড়ে বলে, না রে। আমার একটু অন্য রকম। ইংরিজিতে কী বলে যেন? ফ্রিজিড না কী! আমি হচ্ছি তাই।

সত্যি?

সত্যি, আমাকে দেখলে কেমন রাক্ষসী মনে হয় তা আসলে নই রে।

রাক্ষসী কেন বলছ? বাট ইউ লুক সেক্সি এনাফ।

তৃষা একটু হেসে বলে, তাই তো বলছিলাম, বাইরে থেকে যাকে যা মনে হয় সে হয়তো তা নয় আসলে।

দীপনাথবাবুর সঙ্গে তুমি আমাকে জড়িয়ে ভীষণ বিশ্রী ইংগীত করলে কিন্তু।

মরি মরি! কী বললাম, কী বুঝলি। বললাম সেক্স স্যাটিসফ্যাকশন না থাকলে মাথায় নানান পাগলামি আসে। তোরও হয়তো তাই।

আমি পাগল!

নাঃ, তোকে নিয়ে পারি না। সব কথা অমন ধরছিস কেন?

তোমার কথাগুলো তা হলে ধর্তব্যের মধ্যে নয়?

তৃষা হেসে ফেলে। বলে, এইটুকু করে খাস নাকি রোজ? এই খোরাক হলে বাঁচবি কি করে? আর স্লিম হওয়ার দরকার নেই, এবার একটু গায়ে গতরে হয়ে ওঠ।

ইস, কী যে সব গেঁয়ো স্ল্যাং বলছ না!

দীপু খুব চাইত তোর ভাল হোক। কিন্তু কিসে ভাল হবে তা বুঝতে পারত না। দীপুর হয়ে আমি তোকে বলে দিচ্ছি। স্বামীটাকে হাতছাড়া করিস না। একটাকে যদি আঁচলে বাঁধতে না পারিস তবে বোঝা গেল, আর কাউকেও পারবি না।

এমনভাবে বলছ যেন তুমি আমার বরকে চেনো।

চিনি না। তবে জানি পুরুষরা খুব কথা কইতে ভালবাসে। আর পছন্দ করে বউয়ের তোষামোদ।

তবে নিজেরটাকে বশ মানাতে পারছ না কেন?

তৃষা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, বড্ড দেরী করে ফেলেছি রে। বয়স তো কখনো উজানে যায় না। এখন আমার আর ওর মধ্যে অনেক নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। ছেলে মেয়ে অবিশ্বাস ভয় জেদ। বড্ড দেরী হয়ে গেছে।

আর সেই আর একজনের কথা বললে না?

তৃষা মাথা নেড়ে বলল, না। সে আমাদের বাধা নয়। আমি তাকে গোপনে হৃদয়ে রেখেছি। কাউকে জানতে দিই না। কেমন জানিস? যেমন ভগবান। তাকে ভালবেসেও অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যায়। অসুবিধে হয় না।

গেঁয়ো স্ট্যানডার্ডে সেটাও কিন্তু পাপ।

জানি। রাধারও কি পাপ ছিল না? চল আঁচাই। হাত শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে এল। এরপর একটু ঘুমিয়ে নে।

মণিদীপা উঠল। বেসিনে মুখ ধুতে ধুতে বলল, আজ আর থাকব না দিদি। তবে মাঝে মাঝে আসব।

থাকবি না কেন?

দুপুরে ঘরে থাকতে আমার ভাল লাগে না।

এই রোদে রোদে ঘুরবি? রোজ মাথায় করে ঘুরিস বলেই শুকিয়ে গেছিস।

একে শুকনো বলে না। তোমার ভাষায় যাকে স্লিম বলে তাই।

তৃষা মুগ্ধ চোখে মণিদীপার দিকে চেয়ে একটু হাসল। বলল, তুই বড় মায়া জানিস।

তার মানে?

কী জানি ছাই। তবে কেবল ভাবতে ইচ্ছে করছে, তুই আমার আর একটা মেয়ে।

ফিরেজি! বলে একটু অপ্রস্তুত হাসি হেসে মণিদীপা বলে, তুমি সত্যিই গেঁয়ো। মেয়ে আবার কি? উই আর ফ্রেন্ডস।

চুপ কর মুখপুড়ি। তোর ইংরিজি-বলা মুখ আমি

ক্যাং বলেছো তয় হচ্ছে ফিরে যাওয়ার পর আমিও মাঝে মাঝে ওসব বলে ফেলব বুঝি।

না ঘুমোলেও সামান্য সময় একটু শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে হল মণিদীপাকে, তৃষার হুকুমে। তারপর বাইরে রিকসার হর্ন বাজল। তৃষা এসে ডাকল, ওঠ ছুঁড়ি, রিকসা এসে গেছে। প্রতি রবিবারে চলে আসবি বরকে নিয়ে। মনে থাকবে?

থাকবে।

ট্রেনে জানালার ধারে বসে গোটা দিনটার কথা ভাবতে ভাবতে মাঝে মাঝে মণিদীপা গম্ভীর হচ্ছিল, আপনমনে হেসে উঠছিল। মনে থাকবে না আবার! খুব থাকবে। আজ ফিরে গিয়ে কী করবে মণিদীপা? সত্যিই বুনুর সঙ্গে শোবে? ভাবতেই আবার হাসি পাচ্ছিল তার। খুব অবাক হবে বুনু। খুব বোকা হয়ে যাবে। তৃষা কি সত্যিই ফ্রিজিড? না গুল মারল? সে নিজে ফ্রিজিড নয় ঠিকই, কিন্তু খুব সেকসিও নয়। তৃষার মতো বয়সে সেও কি ফ্রিজিড হয়ে যাবে? বুনুর সঙ্গে কত কাল সম্পর্ক নেই, তবু তো সে শরীরের জন্য পাগল হয় না? ধুৎ, বুড়িটা একদম বাজে একটা একসপ্লানেশন দিল। দীপনাথকে জড়িয়ে ওঠে। পৃথিবীর সুন্দর যা কিছু তা সব খুব ভাল লাগতে থাকে। বাঁচতে ইচ্ছে করে। এই কি প্রেম? যে প্রেম সে আগে কখনো টের পায়নি?

বুড়িটাকে বিশ্বাস হয়নি মণিদীপার। তবু বাড়ি ফিরে এসে সে আজ সেজে রইল। চমৎকার একটা বড় বড় কালো কলকার পাড়ওলা ছাইরঙা তাঁতের শাড়ি পরল। মুখে সামান্য পাউডার। কপালে মস্ত কুমকুমের টিপ। সামান্য রাঙা করল ঠোঁট। একটু সুগন্ধী স্প্রে করল গায়ে।

সন্ধের অনেক পর বোস ফিরল। টলাটল মাতাল। টলছে, হেঁচকি তুলছে, নাল গড়াচ্ছে কষ বেয়ে। মুখ লাল, চোখ লাল, চুল উড়োখুড়ো। ঘরে ঢুকেই ফ্যাস-ফ্যাসে গলায় বলল, হি ইজ ডেড।

মণিদীপা বিরক্ত হয়েছিল। তবু গিয়ে ধরল বোসকে। সোফায় বসিয়ে পাখাটা চালিয়ে দিয়ে এল। তারপর মুখোমুখি বসে বলল, তুমি খবর নিয়েছো?

নিইনি মানে? খবর তো কাগজেই ছিল।

বাট ইউ ওয়্যার নট সিওর।

আই অ্যাম সিওর। হি ইজ ডেড লাইক এ লগ।

আমি খবর নিয়েছি। হি ইজ নট ডেড।

কে? কার কথা বলছ?

দীপনাথবাবু কাল লন্ডন থেকে তাঁর দাদাকে ট্রাংক কল করেছিলেন।

বোস ঝিম হয়ে বসে গরুর মতো ভাবহীন চোখে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর খুব অবাক হয়ে বলে, তা হলে হু ইজ ডেড? সামওয়ান মাস্ট হ্যাভ ডায়েড।

দীপনাথ নয়।

বাট সামওয়ান মাস্ট বি ডেড! কে বলো তো?

তুমি শোবে চলো বুনু।

শোবো? এখন কি শোওয়ার সময়? অতগুলো

আলবাত পেয়েছে। ওপেন দি ফার্স্ট পেজ অফ দি নিউসপেপার। ওপেন ইট।

চেঁচিও না।

কেন চেঁচাব না? আই হ্যাভ লস্ট মাই ব্রাদার্স। কেন চেঁচাব না?

মণিদীপা দু হাতে কান ঢাকা দেয়।

বোস উঠে আসে কাছে। হাঁটু গেড়ে মণিদীপার সামনে বসে দু হাতে তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, সামওয়ান মাস্ট বি ডেড! মাস্ট বি ডেড! হু ইজ হি?

আমি জানি না বুনু।

জানো না? স্ট্রেঞ্জ। বলে বেকুবের মতো মণিদীপার দিকে চেয়ে থাকে বোস। তার চোখ দিয়ে টস টস করে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। ফিস ফিস করে সে বলে, জানো না। তারা মরে গেছে। সে মরে গেছে! জানো না? সত্যিই জানো না?

দীপা দু হাত বাড়িয়ে এই স্বার্থপর, উচ্চাকাঙ্ক্ষা-সম্পন্ন, প্রতিক্রিয়াশীল একজিকিউটিভের মাথাটা ধরে থাকে। তার ঘেন্না আসে না আজ। শোক মানুষকে তো শুদ্ধই করে। কিন্তু এ লোকটার কিসের শোক তা সে বুঝতে পারে না।

বোস স্খলিত গলায় জিজ্ঞেস করে, সত্যিই জানো না?

মণিদীপা হঠাৎ মাথা নেড়ে বলে, জানি বুনু।

হু ইজ ডেড? বলো!

ব্রাদার্স। ফ্রেন্ডস।

দ্যাটস এ গুড গার্ল। কেন কাঁদছো না তবে?

কে বলে কাঁদছি না বুনু। বলতে বলতে এক রাশ চোখের জল কোত্থেকে এলো। নদেয় এল বান। ঠোঁট কেঁপে গেল থরথর করে। স্খলিত গলায় মণিদীপা বলল, এই তো কাঁদছি।
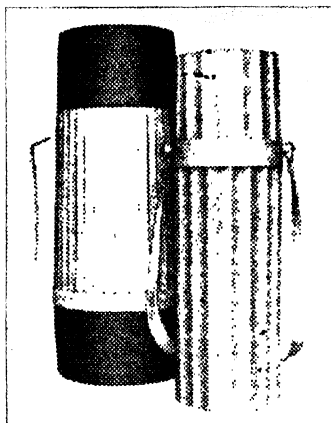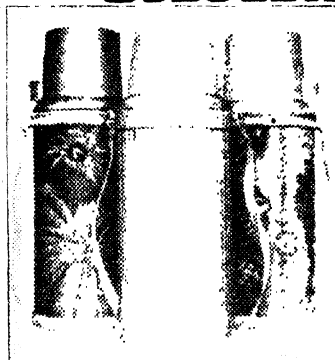
সমাপ্ত

যে বস্ত্রে ওর সৌন্দর্য
হয় মনোলোভা
সেই আমার ব্যক্তিত্বে
জাগায় শোভা
সেঞ্চুরী
কটনস
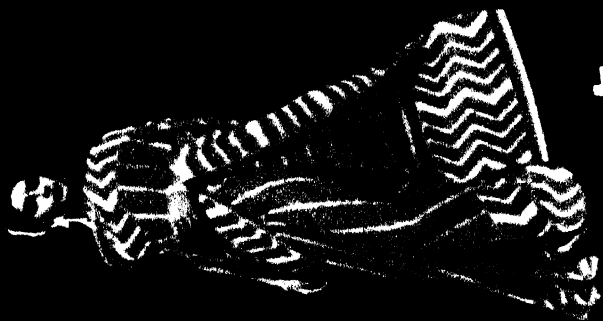
"আমি হলুম
সবচেয়ে রসালো,
ঝাঁঝালো আদা...
প্রিয়ারই
স্বাদে স্বাদ
মেলানো।"

" প্রিয়ার জন্য নির্বাচিত হতে গেলে প্রত্যেক আদার
আমার মত পুষ্ট আর ভাল জাতের হওয়া ছাড়া
গতি নেই।
তবেই পাওয়া যাবে বাছাই করা উপকরণের সাহচর্য।
যেমন কিনা, সবচেয়ে ভাল মসলাপাতি···
অথবা একদম খাঁটি তেল···
তারপর সবকিছু জারানো, মজানো হবে অন্ধ্রপ্রদেশের
বিখ্যাত ঐতিহ্য অনুযায়ী বিশেষ পদ্ধতিতে···
স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরী, আকর্ষক শিশিতে ভরা
সে এক অতীব লোভনীয় ব্যাপার···
একী? জিভে জল এসে গেল যে! তবে এখানেই থামি?"

**দুই সাইজে (৩০০ গ্রাম
এবং ৬৫০ গ্রাম) পাবেন—
রসুনযুক্ত অথবা রসুন ছাড়া।**

**• আম • লেবু • গোংগুরা • আদা • টমেটো**

**প্রিয়া ফুডস**
**প্রাইভেট লিমিটেড**

বাজারে ছাড়ছেন:
**মার্গদর্শী মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড,**
**ইনাডু কম্পাউন্ড, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০০৪**

# জিভে জল আনা আচার–প্রিয়া

Kiron/PF/9016 BEN

# ফুটবলে হলুদ ও লাল কার্ড নিয়ে সমস্যা

হলুদ এবং লাল—দুটি রঙ সব ক্ষেত্রে দৃষ্টি-সুখকর নয়। ফুটবলারদের কাছে তো এখন মোটেই নয়। হলুদ ন্যাবার লক্ষণ, লাল ভয়ের। ফুটবল খেলায় লাল ও হলুদ কার্ডের ব্যবহার চালু হবার পর থেকে খেলোয়াড়দের মধ্যেও দারুণ ভীতির সঞ্চার হয়েছে। সকলেই জানেন খেলার সময় খেলোয়াড়কে হলুদ কার্ড দেখানোর অর্থ তাকে সতর্ক করে দেওয়া। লাল কার্ড দেখানো মানে খেলার অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা। অর্থাৎ মার্চিং অর্ডার দিয়ে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া।

ফুটবল খেলায় অশোভন আচরণ, নিয়মবহির্ভূত ফাউল বা অন্য কোনো অপরাধের জন্য খেলোয়াড়কে হলুদ কার্ড দেখানো এবং হলুদ কার্ড দেখা খেলোয়াড়ের পরের ম্যাচে সাসপেন্ড থাকার ব্যাপার নিয়ে সম্প্রতি যথেষ্ট সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন ইচ্ছে করেই এ সমস্যা ডেকে এনেছেন। এখন পরিস্থিতির সামাল দিতে নিজেরা যেমন হিমসিম খাচ্ছেন, খেলোয়াড়দের তেমন বিপদে ফেলছেন। আবার শাস্তিপ্রাপ্ত খেলোয়াড়দের খেলানো নিয়ে ক্লাবও অসুবিধায় পড়ে মামলা করার হুমকি দিচ্ছে।

ঘটনাগুলি খতিয়ে দেখা যাক। কলকাতায় ফুটবল লীগের খেলা চলার সময় মজিদের সাসপেনশনকে কেন্দ্র করে প্রথম এই সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। ফেডারেশন কাপের খেলায় মজিদকে একবার হলুদ কার্ড দেখানো হয়েছিল। পরে লীগের একটি ম্যাচেও তাকে হলুদ কার্ড দেখানো হয়। ফলে মজিদ পরের ম্যাচটি খেলার অধিকার হারায়। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব যদিও একটি ম্যাচে মজিদকে বসিয়ে রাখে কিন্তু আইনের ব্যাখ্যা চেয়ে চিঠি দেয় আই এফ একে। তাদের যুক্তি ছিল ফেডারেশন কাপের খেলা এবং ক্যালকাটা ফুটবল লীগ দুটি পৃথক প্রতিযোগিতা। সুতরাং দুটি প্রতিযোগিতায় একবার করে কোনো খেলোয়াড়কে হলুদ কার্ড দেখানো হলে সেই খেলোয়াড় একটি ম্যাচের জন্য সাসপেন্ড থাকতে পারে না। ফুটবল ফেডারেশনের আইন তুলে আই এফ এ জানায়, অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সার্কুলার অনুযায়ী ভারতের যে-কোনো রেজিস্টার্ড প্রতিযোগিতায় কোনো খেলোয়াড়কে দুবার হলুদ কার্ড দেখানো হলে একটি ম্যাচের জন্য সে সাসপেন্ড থাকবে। ব্যাপারটি তখন ধামা চাপা পড়ে যায়। কিন্তু প্রশ্নটি আবার ওঠে বোম্বাইয়ে রোভার্স কাপের খেলার সময়। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের স্টপার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য যেহেতু ফেডারেশন কাপে এবং ডি সি এম ফুটবল টুর্নামেণ্টে হলুদ কার্ড দেখেছিল সেহেতু রোভার্স কাপের প্রথম ম্যাচে বসে থাকে। অর্থাৎ সাসপেন্ড হওয়ার জন্য ওই ম্যাচে খেলতে পারে না। তারপর এরিয়ান ক্লাবের সঙ্গে কোয়ার্টার ফাইন্যালে খেলার দিন মতি সিং-কে অবৈধভাবে জোরালো ফাউল করার অপরাধে মনোরঞ্জনকে আবার হলুদ কার্ড দেখানো হয়। সার্কুলার অনুযায়ী এবার দুটি ম্যাচে মনোরঞ্জনের সাসপেন্ড থাকার কথা। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পরের ম্যাচ ছিল মোহনবাগানের সঙ্গে। গুরুত্বপূর্ণ সেমিফাইনাল খেলা। তাই ইস্টবেঙ্গল ক্লাব জানাল মনোরঞ্জনকে তারা মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলাবেই। তাকে যদি খেলতে দেওয়া না হয় কিংবা খেলানোর জন্য দলকে স্ক্র্যাচ করা হয় তবে কোর্ট-কাছারি করবে। পশ্চিম ভারত ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক এবং নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কে জিয়াউদ্দিন পড়লেন মহামুশকিলে। নতুন করে সার্কুলারের ব্যাখ্যা খোঁজা হল। তাতে দেখা গেল সার্কুলারে কোনো গোলমাল নেই। দুটি ম্যাচে হলুদ কার্ড দেখলে একটি ম্যাচে বসে থাকতে হবে। তৃতীয়বার হলুদ কার্ড দেখলে বসে থা[illegible] দুটি ম্যাচে। এক দিকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হুমকি, অপর দিকে নিজের ফেডারেশনের পরিষ্কার সার্কুলার। জনাব জিয়াউদ্দিন সাহেব তখন ফতোয়া দিলেন মনোরঞ্জন যে ফেডারেশন কাপে এবং ডি সি এম টুর্নামেণ্টে খেলার সময় হলুদ কার্ড দেখেছিল তার কোনো রিপোর্ট তাঁদের কাছে নেই। সংবাদপত্রের রিপোর্ট তাঁদের কাছে গ্রাহ্য নয়। সুতরাং, মোহনবাগানের বিরুদ্ধে মনোরঞ্জনের খেলার ব্যাপারে কোনো বাধা নেই। সেই ফতোয়া অনুযায়ী মনোরঞ্জন খেলল। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল জয়ী হল এবং শেষ পর্যন্ত মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে যুগ্মভাবে জয়ী হল রোভার্স কাপের ফাইনালে।

মনোরঞ্জন দুটি ম্যাচে বসে থাকলেও ইস্টবেঙ্গল হয়তো রোভার্স কাপে যুগ্মজয়ী হতে পারত। মনোরঞ্জনকে খেলার অধিকার দেওয়া হয়েছে বলেও আমি এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছি না। এই জন্যই আলোচনা করছি যে, ফেডারেশন অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে শাস্তি সম্পর্কে যে সার্কুলার দিয়েছেন সেই সার্কুলার বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনকে এবং খেলোয়াড়দের রীতিমত মুশকিলে ফেলেছে।

হলুদ কার্ড এবং লাল কার্ড দেখানোর ব্যাপারটি আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন (ফিফা) মেনে নেবার ফলে একরকম আইনে পরিণত হয়েছে যদিও ফুটবল খেলার আইনের ধারায় এখনো যুক্ত হয়নি। তবে ফিফার স্বীকৃতিতেই কীভাবে অপরাধী খেলোয়াড়কে কাড দেখাতে হবে তার চিত্র আইন-বইয়ে দেওয়া আছে। সুতরাং কার্ড দেখানো এখন আইনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুখে খেলোয়াড়কে সতর্ক না করে কেন কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করার প্রথা চালু হয়েছে এর আগে দেশ পত্রিকায় সে বিষয়ে আলোচনা করেছি। এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, কার্ড-দেখা খেলোয়াড়ের সাসপেন্ডের বিধি কি একটি দেশের একাধিক প্রতিযোগিতায় প্রযোজ্য?

আমি যত দূর জানি, একাধিক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ক্ষেত্রেই শাস্তির বিধান আছে। "টুর্নামেণ্ট টু কাম" কথাটিও আন্তর্জাতিক টুর্নামেণ্ট সম্পর্কে বলা হয়েছে। অর্থাৎ দুটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় একজন খেলোয়াড় যদি একবার করে হলুদ কার্ড দেখে তবে একটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ সে খেলতে পারবে না। তারপর আবার হলুদ কার্ড দেখলে তাকে বসে থাকতে হবে দুটি আন্তর্জাতিক ম্যাচে। ফিফা'র এই ফতোয়াই আমাদের ফেডারেশন ঘরোয়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সার্কুলার দিয়ে বসে আছেন।

ইচ্ছে করলে ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় অবশ্যই এই বিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। কিন্তু তার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থাও নিখুঁত থাকার প্রয়োজন। আমাদের [illegible] এখন প্রচুর ঘরোয়া প্রতিযোগিতা। সর্ব ভারতীয় নক-আউট বড় প্রতিযোগিতাগুলি ছাড়াও প্রচুর মাঝারি প্রতিযোগিতা আছে। প্রতি রাজ্যে আছে লীগের খেলা। এই সব খেলায় কে কাকে হলুদ কার্ড লাল কার্ড দেখাচ্ছে, কে কতবার কার্ড দেখছে তার হিসাব কে রাখে! সমস্ত প্রতিযোগিতার রিপোর্ট ফেডারেশনের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা আছে? ফেডারেশন থেকেও কি ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রতি রাজ্যে রিপোর্ট পাঠাবার? সে সব ব্যবস্থা না করে শাস্তির ফতোয়া জারি করা অর্থহীন। ঘরোয়া প্রতিযোগিতা বলতে আমি একটি দেশের সমস্ত প্রতিযোগিতার কথাই বলছি। অন্যান্য দেশে এই ব্যবস্থা যদি চালু থাকেও আমাদের এই বিরাট দেশে চালু রাখার অনেক অসুবিধা আছে। আন্তর্জাতিক খেলার রেকর্ড রাখা হয় নিখুঁতভাবে। প্রতি প্রতিযোগিতার রিপোর্ট ফিফার কাছে পাঠাতে হয়। প্রতি মাসে বুলেটিন মারফত ফিফা সেই সব রিপোর্ট প্রকাশ করে এবং পাঠিয়ে দেয় সদস্য দেশগুলির কাছে। তাই আন্তর্জাতিক একাধিক প্রতিযোগিতার ব্যাপারে শাস্তির ব্যবস্থা কার্যকরী হয়ে থাকে। কোনো দেশ যদি সেই ব্যবস্থা চালু করতে চায় তবে তার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থাও প্রয়োজন। তা না করে শুধু ফিফার ফতোয়া অনুযায়ী শাস্তি বিধানের সার্কুলার প্রচার করে—আমার মনে হয়—নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন একটা বড় ভুল করে বসে আছেন।

আগেই লিখেছি, হলুদ ও লাল রঙ এখন ফুটবলারদের কাছে ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একাধিক নামী খেলোয়াড় আমার কাছে অভিযোগ করেছেন, সবসময় তাদের খেলতে [illegible] একটা মানসিক চাপের মধ্যে। ভয় থাকে তুচ্ছ কারণে কখন কোন্ রেফারী পকেট থেকে হলুদ কার্ড বের করে দেখিয়ে দেবেন। একবার বা দুইবার হলুদ কার্ড দেখা খেলোয়াড় কিছুতেই তার স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারে না।

অন্য দিকে অনেক রেফারীও তুচ্ছ কারণে অনেক সময় হলুদ কার্ড দেখিয়ে বসেন। দিল্লিতে ডুরান্ড কাপের খেলাতে দেখেছি দিল্লির রেফারী বাজাজ এক রকম বিনা কারণেই মোহনবাগানের প্রসূন ব্যানার্জীকে হলুদ কার্ড দেখালেন। পরে বোধ হয় নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন বলে রিপোর্ট দেননি। আরও কয়েকটি ক্ষেত্রেও দেখেছি যুক্তিযুক্ত কারণে যেখানে লাল কার্ড দেখানো প্রয়োজন সেখানে হলুদ কার্ডও বের করলেন না, তুচ্ছ কারণে বের করে বসলেন। যাই হোক, এই কার্ডের ব্যবহার সম্পর্কে নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের নতুনভাবে সার্কুলার জারি করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। দরকার হলে ফিফার কাছ থেকে নির্দেশ নিয়ে।

মুকুল

# বাল্মীকির রামায়ণ। অযোধ্যা কোথায়?

## সীতারাম বেহানী

রামের জন্মভূমি পবিত্র অযোধ্যা নগরী উত্তরপ্রদেশের তিনটি মুখ্য শহরের মাঝে অবস্থিত। এখান থেকে বারাণসী একশ' তিরানব্বই, লখনৌ একশ' আটাশ ও এলাহাবাদ একশ' আট কিলোমিটার দূরে। রামের এই পুণ্য জন্মভূমিতে রাম হলেন ভগবান বিষ্ণুর সপ্তম অবতার এবং স্বভাবতই অযোধ্যা হিন্দুদের একটি সার্বজনীন প্রাচীন ধর্মীয় তীর্থক্ষেত্র। রামচন্দ্র হলেন ভারতবর্ষের প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণের মুখ্য নায়ক, যে মহাকাব্যের সঙ্গে গ্রীকদের প্রাচীন গ্রন্থ ইলিয়াড ও ওডিসির কিছুটা তুলনা করা যেতে পারে। রামায়ণ ভারতীয় মানুষের ধর্মশাস্ত্র, নীতি-তত্ত্ব, কৃষ্টি ও সভ্যতার উপর বিশেষভাবে রেখাপাত করেছে। এতে তৎকালীন সমাজ এবং সামাজিক সম্পর্ক ও মানুষের মূল্যবোধের চমৎকার প্রতিফলন হয়েছে। রামায়ণ-কাহিনী বোধ করি আজও প্রাচ্যের কোষাগারের উৎকৃষ্টতম গ্রন্থ। পৃথিবীর বিভিন্ন মানুষ সম্প্রদায় বর্ণ নির্বিশেষে আজ থেকে দু' হাজারেরও বেশী বছর আগে রচিত মহাকবি বাল্মীকির রামায়ণের ভাবধারায় বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত ও সে-জন্যই এই গ্রন্থ পৃথিবীর বহু দেশে আজ বিশেষভাবে সমাদৃত ও জনপ্রিয়। এ-সমস্ত আলোচনায় পরে আসছি। রামায়ণের রচয়িতা কবি বাল্মীকিকে আধুনিক কালের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'কবিকুল-পতি' বলে আখ্যাত করেছেন।

অযোধ্যা ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ ঈক্ষাকুবংশীয় রাজাদের বহুকাল ধরে রাজধানী ছিল। ভারতীয় ইতিহাসে মহারাজ ঈক্ষাকু ছিলেন তখনকার প্রথম রাজা এবং পরবর্তীকালে রামচন্দ্র এখানকার রাজা হয়েছেন। কোশালায় সূর্যবংশের উৎপত্তি এই স্থানেই। সূর্যবংশীয় রাজাদের শ্রীরামচন্দ্র সহ এটাই ছিল রাজধানী। এখান থেকেই রাজা হরিশচন্দ্র স্বর্গারোহন করেন। আধুনিক হিন্দী কবি মৈথিলীশরণ গুপ্ত "সাকেত" নামে মহাকাব্য রচনা করেন এই তীর্থক্ষেত্র নিয়ে। বাল্মীকি রামায়ণের বালকাণ্ডে ঈক্ষাকুদের রাজধানী অযোধ্যার সুন্দর বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে, অযোধ্যার স্থাপনা হয় মানবেন্দ্র মনু দ্বারা (অযোধ্যা নাম নগরী তত্র সিল্লোকবিশ্রুতা। মনুনা মানবেন্দ্রেন যা পুরী নির্মিতা স্বয়ম্ ॥)। আবার অথর্ব-বেদ অনুসারে অযোধ্যা নগরীর স্থাপনা হয় দেবতাদের দ্বারা। এ-সমস্ত সময়ের বহুকাল বাদে এই শহর জীর্ণ ও ভগ্নদশা প্রাপ্ত হলে উজ্জয়িনীর মহারাজা বিক্রমাদিত্য এখানে সবকিছু সংস্কার করে প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানগুলিতে রাজমহল, সরোবর, দেবমন্দির ইত্যাদি নতুনভাবে তৈরি করান ও অযোধ্যার নতুন রূপদান করেন যা আজও তাঁর পুণ্যস্মৃতি বহন করছে। আবার 'রামায়ণকালীন সংস্কৃতি' বইতে উল্লেখ আছে যে, রামের আবির্ভাবের বহুকাল আগেই এখানে প্রচুর সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। তখন এখানে পুণ্যসলিলা সরযূ নদীর তীরে দশ যোজন লম্বা ও দুই যোজন চওড়া "শ্রীমতী মহাপুরী" নামে বিশাল এক সমতলক্ষেত্র ছিল। শত্রুদের আক্রমণ রুখতে এর চতুর্দিকে ছিল অগাধ জলে ভরা বিরাট পরিখা। শহরের একদিকে বিশাল তোরণযুক্ত দরজায় বিরাট লম্বা ও মজবুত কপাট ছিল। শহরের নিজস্ব সেনানী, হাতী ঘোড়া ও যুদ্ধের নানা সাজ-সরঞ্জাম থাকত অস্ত্রাগারে। আর নগরের সুন্দর বিস্তৃত রাস্তাঘাটের দু ধারে ছিল সুরম্য অট্টালিকা ও বাহারি দোকানপাট। তখনকার রাস্তা ও গলিকে বলা হত "রথ্যা" এবং রাজপ্রাসাদে যাওয়ার পথকে বলা হত "রাজমার্গ"। শহরের সমস্ত রাস্তাঘাট প্রতিদিন পরিষ্কার করে জলসিঞ্চন করা হত ও নানা বর্ণের সুগন্ধিযুক্ত ফুল ছড়ানর বিধি ছিল। রাতে বৃক্ষসমূহে প্রদীপ জ্বালিয়ে শহর আলোকিত রাখবারও ব্যবস্থা ছিল।

এই অযোধ্যাকে কেন্দ্র করে আজ নানা ধরনের প্রশ্ন উঠেছে। ঐতিহাসিকদের এ-নিয়ে তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই। এ-ছাড়া মহাভারতের মত রামায়ণকে কেন্দ্র করেও গত কয়েক দশক ধরে নানা বাদ-বিবাদ চলছে। অনেকের মতে রামায়ণের প্রতিটি ঘটনাই আক্ষরিকভাবে সত্যি এবং এঁরা রামায়ণের জন্মকাল ধরেছেন আজ থেকে প্রায় এক লক্ষ বছর আগে। এঁদের মতে রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য রচিত হয়েছে মূল ঘটনার বহু পরে। পরবর্তীকালে এই মহাকাব্যে কিছু পরিবর্তন ও পরিশোধন করা হয়েছে মাত্র। উদাহরণস্বরূপ এঁরা বলেন, মূল মহাভারতে মোট আট হাজার আটশ' শ্লোক ছিল। কিন্তু আজকের মহাভারতে রয়েছে প্রায় এক লক্ষ শ্লোক। এই পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁরা বলছেন রামায়ণের সাত কাণ্ডের মধ্যে প্রথম ও শেষের কাণ্ডটি পরে সংযোজিত হয়ে থাকতে পারে। আবার অন্য একটি মতবাদ হল, রামায়ণের ঘটনা আদৌ কোন ঘটনাই নয়। এহল মনগড়া এক বিরাট কাহিনী। অতএব এই মহাকাব্য নিয়ে যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ আছে, সন্দেহ নেই। আবার অযোধ্যা নিয়েও নানা ভুল বোঝাবুঝি চলছে বহুকাল ধরে। অনেকের মতে আজকের অযোধ্যা মোটেই ত্রেতার রামের অযোধ্যা নয়। তা ছিল অন্য কোথাও। আবার অনেকের ধারণা আজকের অযোধ্যাই হল রামের আসল অযোধ্যা। অতএব এ-নিয়েও সাধারণ মানসমনে নানা প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি মারবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আবার বিদেশে যে-সমস্ত জায়গায় রাম ও রামায়ণের কদর আছে সেখানকার মতে রামের অযোধ্যা তাদের দেশেই কোথাও ছিল। থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের কাছে শ্রীআয়ুথিয়া বলে ত একটা জায়গাই আছে। এটা হল থাইল্যান্ডের পুরনো রাজধানী। দশরথের রাজধানী অযোধ্যা অনুসারেই যে এই নামকরণ হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। যাই হোক, দুবছর কয়েক আগে সিমলায় ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ

ভিক্টোরিয়া পার্কে তুলসীদাসের মর্মর মূর্তি

এডভান্সড স্টাডিজ এবং আর্কেয়োলজিকল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া বার একটি প্রজেক্টের নাম আর্কেয়োলজি অফ রামায়ণ সাইট্‌স-এর যৌথ উদ্যোগে একটি প্রত্নতত্ত্ববিদের দল বিভিন্ন স্থানে খননকার্য চালিয়ে আমাদের অনেক সন্দেহের নিরসন করেছেন ও বহু নতুন তথ্যের হদিশ দিতে পেরেছেন। ভবিষ্যতে এই সংস্থাগুলির নতুন খননকার্য চালিয়ে আরও নানা সন্ধান দিতে পারবেন বলে আশা করছেন। আপাতত খোঁড়াখুঁড়ি করে বিভিন্ন সূত্র ধরে এই দলের বক্তব্য হল, রামের জন্মভূমি আজকের অযোধ্যাতেই এবং এই অযোধ্যাই নিশ্চিতভাবে ছিল রাজা দশরথের রাজধানী। অতএব রামায়ণে বর্ণিত ঘটনারও সত্যতা রয়েছে যদিও কবির লেখনীতে এই মহাকাব্যকে অলংকরণ করতে কিছু কিছু অংশে কাল্পনিক সংযোজন হয়েছে মাত্র। অধ্যাপক ব্রজবাসী লালের নেতৃত্বে এই খননকার্যের পরি-প্রেক্ষিতে তাঁর অভিমত হল রামায়ণের জন্ম দু' হাজার আটশ' বছর আগে। অবশ্য অযোধ্যার পণ্ডিত ও সাধুসন্তদের মতে রামায়ণের ঘটনা ন' লক্ষ বছর পূর্বের। সেটা এঁরা ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের বয়স হিসেবানুযায়ী দাবি করেন। আবার অনেকের মতে রামের আবির্ভাব দু' লক্ষ বছর আগে। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে, রামায়ণের আবির্ভাব দু হাজার বছর পূর্বে। তাই রামায়ণ কবে রচিত হয়, তা সঠিকভাবে আজও নির্ণিত হয়নি। তবে যাই হোক না কেন, দু হাজার বছরের কম ত কিছুতেই নয়। এই দীর্ঘ সময়ে অজস্র পরিবর্তন ঘটেছে পৃথিবীর বুকে। নানা সভ্যতা ও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। কত কিছুই না ভেঙেছে, কতই না গড়া হয়েছে। ভারতবর্ষের উপর বহু বিদেশী প্রভাব পড়েছে এই দীর্ঘ সময়ে। কিন্তু একটি কথা ধ্রুবসত্য হয়ে রয়েছে। তা হল, রামায়ণের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা কিন্তু কোন দিনই এতটুকু হ্রাস পায়নি।

যাই হোক, রামায়ণের উৎস সন্ধানে খননকার্য পরিচালিত হয় অযোধ্যার কিছু স্থান, এলাহাবাদে ভরদ্বাজ আশ্রম, চিত্রকূট, নন্দীগ্রাম ও শ্রীশৃঙ্গবেরপুরে। অযোধ্যায় প্রায় সতেরটি স্থানে খোঁড়াখুঁড়ি চালান হয়। প্রাপ্ত সামগ্রী দেখে প্রমাণিত হয় যে, তৎকালে অযোধ্যাবাসীরা লোহার ব্যবহার জানতেন। বিখ্যাত সিন্ধু সভ্যতাতেও লোহার প্রচলন ছিল বলে কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত মেলেনি। তাই প্রত্নতাত্ত্বিকেরা একথা খণ্ডন করেছেন যে, রামায়ণ কয়েক লক্ষ বছর আগে রচিত হয়েছিল কারণ সারা বিশ্বে লৌহপ্রচলন পনেরো শ' খ্রীষ্টপূর্বের আগে ছিল বলে কোথাও কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অন্যান্য প্রাপ্ত জিনিসপত্র দেখে মনে হয় তখনকার অযোধ্যার নাগরিকরা নানা বর্ণের সুন্দর সুন্দর বাসন-পত্র ব্যবহার করতেন। সবচাইতে মজার কথা হল, খনন কার্যের মাধ্যমে অন্যান্য স্থানগুলি থেকেও প্রায় একই ধরনের সামগ্রী পাওয়া গিয়েছে। তাই মনে হয়, অযোধ্যা ও পারিপার্শ্বিক স্থানগুলির ঘটনা বা সভ্যতা একই সময়ের। শ্রীশৃঙ্গবেরপুরে খনন কার্য চালিয়ে গঙ্গার ধারে দশ মিটারের মত উঁচু একটি সুন্দর ঢিবির সন্ধান পাওয়া যায়। এই স্থানেই সম্ভবত শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে বনবাস যাত্রার প্রাক্কালে নিষাদরাজের আতিথ্যে রাত্রিযাপন করেন। পরদিন নিষাদরাজ এঁদের গঙ্গা নদী পার করে দিলে

রাম, সীতা ও লক্ষণ সমভিব্যাহারে ভরদ্বাজ আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করেন। শ্রীঙ্গ-বেরপুরে আরও খননে এ-সূত্র মেলে যার উপর ভিত্তি করে বলা যায়, এ-স্থানে ঘোটখাট নিষাদদের বসতী ছিল। আরও যে-সমস্ত ধ্বংসাবশেষ মিলেছে তার সঙ্গে ভরদ্বাজ আশ্রমের জিনিসপত্রের প্রভূত মিল রয়েছে। এলাহাবাদে বর্তমান ভরদ্বাজ আশ্রমের আশেপাশে খোঁড়াখুঁড়ি চালিয়েও খৃষ্টপূর্ব সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী এবং গুপ্ত সমকালীন চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর বহু জিনিসের সন্ধান খননকারীরা পান। রাম যমুনা নদী পেরিয়ে চিত্রকূট, নন্দীগ্রাম, পানিহার ও আরও দক্ষিণে নির্বাসনে প্রস্থান করবার আগে ঋষি ভরদ্বাজের আশ্রমে কিছুটা সময় অতিবাহিত করেন। পানিহারের কথা বাল্মীকি রামায়ণে উল্লেখ আছে। এই পানিহারেই রামের আদেশে সীতা লক্ষণ কর্তৃক পরিত্যক্তা হন। আর নন্দীগ্রাম হল সেই স্থান যেখানে রামের অনুপস্থিতিতে ভরত সন্ন্যাস জীবনযাপন করেন ও শত্রুঘ্নকে রাজকার্য পরিচালনা করতে সাহায্য করেন। এ-সমস্ত স্থানগুলির সঙ্গে বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণিত স্থানের যথেষ্ট ভৌগোলিক সামঞ্জস্যও রয়েছে। সেজন্যই হয়ত প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সন্ধানকার্য চালাতে এই জায়গাগুলি বেছে নিয়েছেন। আবার শ্রীঙ্গবেরপুরে অনেকগুলি দ্রব্যসামগ্রীর সূত্র ধরে নাকি একথা অনায়াসেই বলা যেতে পারে যে, রামায়ণের ভিত্তি এই স্থানেই। আরও ঘটনাবলী থেকে এ-কথাও প্রতীত হয় যে, রামায়ণের ঘটনার এক হাজার বছর বাদে রামায়ণ বাল্মীকি দ্বারা রচিত হয়েছিল। ধ্বংসাবশেষ থেকে এমনও অনেক প্রমাণ ও সূত্র মিলেছে যে, এই স্থান বহু শতাব্দী ধরে মৌর্য শুংগ, কুশান, গুপ্ত, রাজপুত ও পরবর্তীকালে মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল।

শ্রীঙ্গবেরপুরে একটি অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ থেকে মনে হয়, এই অট্টালিকায় অনেকগুলি কামরা ছিল। ছিল জলনিষ্কাশনের সুন্দর ড্রেনের ব্যবস্থা ও জল শোধনের চার মিটার গভীর একটি গর্ত। বাসস্থান এলাকায় মিলেছে বেশ কিছু প্রাচীন সামগ্রী যার মধ্যে রয়েছে সূক্ষ্ম কারুকার্যভরা টেরাকোটার কাজ, নানা মুদ্রায় বিভিন্ন মূর্তি, সেকালের মুদ্রা ও বেশ কিছু মালা। এখানে বোধ হয় সবচাইতে উল্লেখ্য আবিষ্কার হল তামার নলযুক্ত সুন্দর একটি কমণ্ডলু এবং এর কাছেই রক্ষিত একটি লম্বা হাতলযুক্ত চামচ যা মনে হয় খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী সময়কালের। এগুলি কোন ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করা হত বলে খুব সহজেই মনে করা যেতে পারে। আবার একশ' মিটার লম্বা ও পঞ্চাশ মিটার গভীর একটি পুষ্করিণীরও এখানে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। পুষ্করিণীটি প্রাকৃতিক উপায়েই খোদাই করা এবং এর চার ধার শক্ত ইঁটের গাঁথুনী দিয়ে বাঁধাই করা। পুষ্করিণীটি মাটির নীচ দিয়ে গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত ছিল যার ফলে বর্ষাকালে এখানে গঙ্গার জল প্রবেশ করত। গঙ্গার উপচে পড়া জল প্রথমে সাত মিটার ব্যাসের একটি কুয়োতে এসে জমা হত এবং তারপর সেই জল দু' মিটার চওড়া একটি সরু নালার মাধ্যমে পুষ্করিণীতে ঢুকত। জলের স্রোতে ও ঝাপটায় যাতে জলাশয়ের দেওয়ালের কোন ক্ষতি না হয় সে জন্য থরে থরে ইঁট সাজান থাকত এবং নালা ও পুষ্করিণীর সংযোগস্থলে জল নিয়ন্ত্রণের জন্য খুব শক্ত করে ইঁটের গাঁথনী করা হয়েছিল। পুষ্করিণীটি আবার দু ভাগে ভাগ করে দুই অংশের সংযোগস্থাপন করা হয় একটি শক্ত সরু নালার মাধ্যমে। প্রথম অংশটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টি পরিধিতে অপেক্ষাকৃত বড়। জলাশয়ে স্নানার্থীদের নামবার জন্য সুন্দর ও মজবুত সিঁড়িরও ব্যবস্থা ছিল। এই পুষ্করিণী প্রায় দু হাজার বছর আগে নির্মিত বলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা।

যাক, এ ত গেল প্রাচীন অযোধ্যার খবরাখবর। আজকের অযোধ্যা নিয়ে বিশদ আলোচনায় পরে আসছি। এবারে রামচন্দ্র ও রামায়ণ প্রসঙ্গে আসি।

রামচন্দ্র ও রামায়ণ থাইল্যান্ড, কামপুচিয়া, লাওস, ইন্দোনেশিয়া, বার্মা, মংগোলিয়া, মালয়েশিয়া, জাপান, ফিলিপিন, শ্রীলঙ্কা ও আরও অনেক দেশে বিশেষভাবে সমাদৃত। এ সমস্ত দেশে মহাভারতেরও যথেষ্ট প্রভাব আছে। মহাভারত রামায়ণের চাইতে আরও বেশী রোমাঞ্চকর এবং মহাভারতের নায়ক শ্রীকৃষ্ণও ছিলেন বিষ্ণুর অবতার। সাহসিক ও প্রাণবন্ত মহাকাব্য হিসাবে যদিও মহাভারতের স্থান অনেক উর্দ্ধে কিন্তু কোমল ভাবপ্রবণতার দিক দিয়ে রামায়ণ মানুষের মন বেশী স্পর্শ করে ও গভীরে প্রবেশ করে। তাই জনপ্রিয়তার দিক থেকে দেশে ও বিদেশে রামায়ণের পক্ষে ভোটদাতা অনেক বেশী। রামায়ণের কাহিনী হিন্দুদের যেমন মোটামুটিভাবে পুরো জানা, ঐ সমস্ত দেশেরও বহু লোকই রামায়ণ কাহিনী বেশ ভাল রকমই জানেন যদিও কিছু কিছু স্থানে আমাদের রামায়ণের ঘটনার সঙ্গে এদের অমিল আছে। সে আলোচনা পরে করব। রামায়ণ এমন কি উজবেক ভাষাতেও অনবাদ করা হয়েছে। বিখ্যাত উজবেক কবি মুহামদ আলি অনুবাদ করেছেন। অনুদিত রামায়ণ এই প্রজাতন্ত্রের সাংস্কৃতিক জীবনে এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পঞ্চদশ শতাব্দীর উজবেক মহাকবি আলিশের নভয়ের কবিতায় রামায়ণের প্রভাব ও গুরুত্ব ভীষণভাবে পরিলক্ষিত হয়। উজবেকিস্তানের সাংস্কৃতিক উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে "দ্য এনথোলজি অফ ওয়ার্ল্ড লিটারেচার" নামের একটি নতুন পুস্তিকায় রামায়ণের কিছু অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। আবার রামায়ণের কিছু অনুচ্ছেদ বিশ্ব সাহিত্য সংকলনেরও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ভারতীয় রামায়ণের আদর্শে প্রভাবিত রামায়ণের বেশ কিছু অংশের ঘটনা নিয়ে একজন বিশিষ্ট সোভিয়েত মানবজাতি-তত্ত্বজ্ঞ নাটালিয়া গুসেভা দ্বারা লিখিত ও সংকলিত কাহিনীকে প্রায় তিন শ' নাটকীয় রূপ দেওয়া হয়েছে। এই নাটক গত তিরিশ বছর ধরে দ্য সেন্ট্রাল চিলড্রেন্স থিয়েটারের শিল্পিবৃন্দ দ্বারা অভিনীত হচ্ছে সোভিয়েত রাশিয়াতে। তা ছাড়া লক্ষ লক্ষ সোভিয়েতবাসীও সোভিয়েত সেন্ট্রাল টেলিভিশন দ্বারা প্রচারিত এই নাটক প্রত্যক্ষ করেছেন। এমন কি দক্ষিণ আমেরিকার সুদূর সুরিনাম দেশেও রাম ও রামায়ণের প্রভাব ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট। ১৮৭৩

অযোধ্যার মন্দিরে সীতা-রাম-লক্ষ্মণের শ্বেতপাথরের মূর্তি

সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চৌত্রিশটি জাহাজে করে কলকাতা থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার মজুরকে শর্তাধীনে ভাঁওতা দিয়ে ও লোভ দেখিয়ে ওদেশে নিয়ে যাওয়া হয়। যাত্রার আগে তাদের বলা হয়েছিল যে ভারতের খুব নিকটেই শ্রীরাম দ্বীপে তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যেখানে তারা ক্ষেতে খামারে মনের আনন্দে কাজ করে অর্থ উপার্জন করতে পারবে। শ্রীরামের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা থাকবার দরুন সেদিন সেই মজুরের দল কোন আপত্তি না জানিয়েই অনেক আশা নিয়ে এক অজানা অচেনা স্থানের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান। এঁরা সমুদ্রপথে সাড়ে তিন মাস পর সুরিনাম পৌঁছন। কিন্তু পরে প্রবল আপত্তি ও কুণ্ঠা থাকা সত্ত্বেও এঁরা দেশে ফিরে আসতে পারেননি। আজ এঁদের অনেকেই ওদেশে বংশপরম্পরাক্রমে বাসিন্দা। সুরিনাম নামটিও মনে হয় শ্রীরাম বা সূর্যনাম থেকে নেওয়া।

থাইল্যান্ডের আয়ুথিয়া নামক স্থানটির কথা আগেই বলেছি। এখানে বিরাট এক মন্দিরে রামচন্দ্রের মূর্তি আজও বহু বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা প্রবল শ্রদ্ধাভরে পূজিত হয়। নামের এত মিলের জন্য এই আয়ুথিয়া আমাদের অযোধ্যাকে মনে করিয়ে দেয়। থাইদের রামায়ণের নাম হল 'রামকিয়েন' এবং রামকিয়েনের কাহিনীও আমাদের রামায়ণের মতই। ব্যাংককে পরম্পরাগত থাই নাচ ও গ্রামীণ নৃত্য চলাকালীন লক্ষ করেছি, এদের বেশীর ভাগ নাচই নানারকম লড়াইকে কেন্দ্র করে। আবার কিছু নাচ সংস্কৃত পৌরাণিক কাহিনীর উপর ভিত্তি করে রচিত। অনেক নাচ আবার রামায়ণের নানা অংশের ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রস্তুত করা হয়। ওদের এক ধরনের নাচের নাম 'লা-কোণ' অর্থাৎ নৃত্যনাট্য। এটি বিশেষ করে রামকিয়েনকে ভিত্তি করে মঞ্চে উপস্থাপিত করা হয়। থাই রামলীলাও আজকাল ব্যবসায়িক দিক দিয়ে সফল ও জনপ্রিয় হচ্ছে। পর্যটকের মন মাতাতে অবশ্য কিছুটা উগ্রতার আমদানী করা হয়েছে। আমাদের দেশেও কথকলি নাচে রামায়ণের কাহিনীর প্রভাব অনেকখানি। এদেশের আরও নানা গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, ছায়ানৃত্য গ্রামীণ নৃত্য রামায়ণের উপর ভিত্তি করে প্রদর্শিত হয়। এ-ছাড়া আরও অনেক দেশ তাদের রামায়ণ মঞ্চে উপস্থাপিত করে নানা চেহারার মাধ্যমে। ব্যাংককের বহু মন্দিরের দেওয়ালে পুরো রামায়ণ কাহিনী খোদিত ও চিত্রিত দেখে আনন্দে অভিভূত হয়েছি। আরও লক্ষণীয় বিষয় হল বহু শতাব্দী থেকেই থাইল্যান্ডের রাজারা নিজেদের 'রামা' বলে উপাধি দিয়ে থাকেন। সে-প্রথা আজও প্রচলিত। সে-যুগে বিশ্বাস করা হত শ্রীরামা বালি থেকে আগমন করেছিলেন যা পরবর্তীকালে ম্যাজাপাহিত সাম্রাজ্য দ্বারা জাভার অন্তর্ভুক্ত হয়। লাওসের দু'রকমের রামায়ণের নাম হল 'ফ্রালাক ফ্রালাম' ও 'ফোম চক'। মালয়েশিয়ার রামায়ণ 'হিকায়েত সেরিরামা' বলে পরিচিত। মালয়েশিয়ার অধ্যাপক ইসমাইল হুসেনের মতে মালয়েশিয়ায় প্রবল ঐস্লামিক প্রভাবকালে কুড়ি হাজার আরবী কবিতার পঙ্‌ক্তি রচিত হয়। এই পঙ্‌ক্তির অনেকগুলিতেই রামায়ণের বর্ণনা আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মালয়েশিয়াতে রামায়ণের পঁচিশটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার মত দেশে যেখানে নব্বই শতাংশ মুসলমান সেখানে রামায়ণের পরিচিতি 'রামায়ণ কাকবীন' নামে এবং এ-দেশে হিন্দুদের এই মহাকাব্য সযত্নে রাখা হয়েছে। বালি এবং মধ্য ও পূর্ব জাভার রামায়ণ আজও জনপ্রিয়তার শীর্ষে। এমনকি সুকর্ণর মত লোক প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রকাশ্যে প্রথম আন্তর্জাতিক রামায়ণ উৎসব ১৯৬২ সালে ইন্দোনেশিয়ার মধ্য জাভার অন্তর্গত শহর প্রামবানানে করতে অনুমতি দেন। এই প্রথম এখানে রামায়ণ উৎসব বিরাট এক মন্দিরে শুরু হয়। প্রামবানানের এই মন্দিরে পাথরের উপর খোদাই করা রামায়ণের গল্পের প্রচুর বিবরণ আছে। আমাদের দেশেও চিদাম্বরম মন্দিরের গায়ে রামায়ণের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে ভরতনাট্যমের একশ' আটটি মুদ্রায় রামায়ণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য ভারতবর্ষে বহু মন্দিরেই রামায়ণের প্রভাব রয়েছে। এ-ছাড়া ইন্দোনেশিয়াতে বেশ কয়েকটি বাল্মীকির মন্দিরও রয়েছে। রামায়ণের বিশেষত্ব হৃদয়স্পর্শী আবেদন, জনপ্রিয়তা ও তার অসামান্য সহজ ও সরলতায় জন্যই সুকর্ণ সেদিন এই রামায়ণ উৎসবকে উপেক্ষা

করতে পারেন নি। বর্মায় দু' ধরনের রামায়ণের সন্ধান মেলে। এর একটি অনুবাদ লাওসের রাজপ্রাসাদে সংরক্ষিত রয়েছে। বছর দশেক আগে অন্য অনুবাদটির সন্ধান মেলে ফিলিপিন-এর 'মারানাও' নামক এক শ্রেণীর উপজাতির হাতে। এই গোষ্ঠীর লোকেরা পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। তাই এই রামায়ণ কাহিনীতে ঐস্লামিক ধর্মের অনেক আভাস ও স্পর্শ মেলে।

কোন সন্দেহ নেই, দেশে ও বিদেশে বর্তমানকালে রামায়ণ সম্পর্কীয় গবেষণার সাহিত্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তুলসীদাস রচিত রামচরিত মানসের পাঁচ শ' বছর পূর্ণ হওয়ার জয়ন্তী উৎসবের একটি আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান হিসাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সাহিত্য একাডেমির সম্মিলিত উদ্যোগে রামায়ণের ঐতিহ্য সম্পর্কে আহূত একটি আলোচনাসভায় এশিয়ার বিভিন্ন দেশের চল্লিশজন বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ অংশগ্রহণ করেন। ভৌগোলিক পরিচয়ে যে বিশাল আয়তনের দেশটি অংশত এশীয় সেই সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিনিধিও এই আলোচনায় যোগদান করেন। এশিয়াতে রামায়ণ ঐতিহ্য এশীয়দের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে একটি বাস্তব ও জ্বলন্ত সত্য। তাই বলা যেতে পারে এ-হেন আলোচনাসভা রামায়ণ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আগ্রহসম্বলিত একটি সাধু উদ্যোগ। রামায়ণের উপর এই ধরনের সম্মিলিত আলোচনা এর আগে আর কোনদিন হয়েছে বলে অন্ততপক্ষে আমার জানা নেই। মোট তিরিশ ঘণ্টার মুখর এই আলোচনার প্রসঙ্গ ছিল রামায়ণের সাহিত্য ঘটিত ও আদর্শ বিষয়ক আলোচনা, দেশভিত্তিক প্রকারান্তর ও বৈচিত্র্য এবং নাটকে ভাবান্তরকরণ।

এই আলোচনাসভায় মংগোলিয়ার অধ্যাপক ড্যামাডিনসুরেন-এর মতে 'জিওয়াকার' (আমাদের রাজা দশরথের নামান্তরকরণ) কাহিনী মংগোলিয়ায় বহু শতাব্দী আগেই তিব্বত ও চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মাধ্যমে পৌঁছেছিল। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান ডঃ মিনোজু হারার মতে জাপানে দু ধরনের রামায়ণ আছে। এই দুটিরই ভিত্তি বাল্মীকির মূল রামায়ণের উপর। এর মধ্যে একটি দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত। অন্যটি পরবর্তীকালে ডঃ গোদাকুমবুরার মতে শ্রীলংকায় রামায়ণ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কুমারদানার সংস্কৃতে প্রকাশিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ "জানকীহরণ" রচিত হওয়ার পর প্রসার লাভ করে ও জনপ্রিয় হতে থাকে। এই রামায়ণের সংগেও বাল্মীকির মহাকাব্যের যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। মোট কথা, কিছু কিছু অমিল থাকা সত্ত্বেও বাল্মীকির মূল রামায়ণের প্রভাব সর্বক্ষেত্রেই অনুভব করা যায়। ভারতবর্ষেও অবশ্য বাল্মীকির রামায়ণ ছাড়াও অন্য আরও কিছু রামায়ণের সন্ধান মেলে। এর মধ্যে একটি ওড়িয়া ভাষায় অনূদিত রামায়ণ আবিষ্কৃত হয়েছে। ওড়িয়া ভাষায় 'বিচিত্র রামায়ণ'ও প্রসিদ্ধ। অষ্টম শতাব্দীতে ভবভূতি একটি নাটক লেখেন যার নাম 'উত্তর রামচরিত'। এতে রামের পরবর্তী-কালের ঘটনাবলীও বিবৃত হয়েছে ও এই গ্রন্থে লেখক শেষকালে রাম ও সীতার মিলন ঘটিয়েছেন। এ ছাড়া তামিল ভাষায় নবম শতাব্দীর কম্বনের রামায়ণ, পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ, ষোড়শ শতাব্দীর তেলেগু ভাষায় রঙ্গনাথের রামায়ণ, মালয়ালমে তুনচানের রামায়ণ, মারাঠীতে একনাথের রামায়ণ এবং ওই একই শতাব্দীতে উত্তর ভারতে হিন্দী তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' পরিচিত। এর মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে হল তুলসীদাস রচিত রামচরিত মানস।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভট্টি 'রাবণবধ' নামে ও সমসাময়িককালে কুমারদাস 'জানকী-হরণ' নামে মহাকাব্য রচনা করেন। এগুলি বাল্মীকির রামায়ণকে ভিত্তি করেই লিখিত হয়। আধুনিককালে মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' ত আমাদের সবারই অতি পরিচিত। কবি কালিদাসের রচনাতেও রামায়ণের প্রভাব বিদ্যমান। তাঁর 'মেঘদূত' কাব্যে যক্ষকে নির্বাসনে পাঠান হলে যক্ষ তার বার্তা পত্নীর কাছে পৌঁছে দিতে মেঘের কাছে বিলাপ করেছে। 'রঘুবংশে' কালিদাস শুধু রামের কাহিনীই বলেন নি, তাঁর পূর্বপুরুষ ও বংশধরদের কথাও উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালেও বহু কবিই বাল্মীকির পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাঁর কাছাকাছিও কেউ পৌঁছতে সমর্থ হননি। তাঁর সেই মৌলিকত্ব ও সতেজতা কারুর মধ্যে আসে নি। কেবলমাত্র কালিদাসই হয়ত বা কিছুটা বাল্মীকির কাছাকাছি গিয়েছেন। তাই বলা চলে, বাল্মীকির কাছে কালিদাস যতখানি শেকসপিয়রের কাছে কিট্‌স ততখানি। যাই হোক, দ্বাদশ শতাব্দীর সংস্কৃতে লেখা ভুষুণ্ডি রামায়ণের কথা অনেকেরই জানা। একটি অতি প্রাচীন রামায়ণের পাণ্ডুলিপি কিছুকাল আগে চিত্রকূটে আবিষ্কৃত হয়। এটি চারশ' বছরেরও অধিক পুরনো বলে প্রতীত হয়। এর মধ্যে রয়েছে সংক্ষিপ্ত আকারে রামায়ণের বহু সর্গ। উদয়পুরের জাতীয় গ্রন্থাগারে আজও বহু প্রাচীন এক রামায়ণের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত। ভারতের আরও নানা স্থানে যদিও আরও বিভিন্ন রামায়ণের সন্ধান মেলে, উচিত সংরক্ষণের অভাবে এ-সমস্ত গ্রন্থ বহু জায়গাতেই আজ ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে। মজার কথা হল, রামায়ণের তার নিজের দেশ ভারতে যত না প্রচার ও প্রসার তার চাইতে বিদেশেই আজ রামায়ণের গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান।

রামায়ণ কাহিনী এশীয় দেশগুলিতে যদিও খুব শ্রদ্ধাসহকারে স্বীকৃত ও সমাদৃত কিন্তু রামায়ণের কাহিনীতে স্থান বিশেষে নানা অমিল দেখা যায়। আবার বহু পরিবর্তনও বেশ চিত্তাকর্ষক ও লক্ষ করবার মত। বিশেষ করে বিদেশের রামায়ণের অমিল খুব বেশী। তবে একটি কথা ঠিক যে, দেশ-বিদেশ সর্বত্রই রামায়ণের কাঠামো বাল্মীকির মূল রামায়ণ থেকে খুব বেশী পৃথক হয়নি। ভারতবর্ষেও রামায়ণের কাহিনীর কোন কোন স্থানে পরিবর্তন ঘটিয়ে চরিত্রগুলিও বিভিন্নভাবে অঙ্কিত হয়েছে। খাজুরাহো ও মধ্য ভারতের বহু প্রাচীন মন্দিরে রামায়ণ কাহিনীর [illegible] আবার পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে যেমন রামের স্থান

কনক ভবন—যেখানে সীতা অবসর বিনোদন করতেন

সর্বোচ্চ, দক্ষিণ ভারতে রামের চাইতে রাবণকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। রাবণকে সেখানে অনেক বেশী শক্তিশালী ও আকর্ষণীয় চরিত্র বলে গণ্য করা হয়েছে। রাবণের মৃত্যুও রামের হাতে দেখান হয়নি। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বহু স্থানেও রাবণ চরিত্রকে বিশেষ গুরুত্ব ও শ্রদ্ধা দেখান হয়েছে। এদের এখানেও রাবণের মৃত্যু দেখান হয়নি। এদের বিশ্বাস মঞ্চে রাবণের মৃত্যু ঘটালে দুঃখ ও দুর্বিপাকে পড়তে হবে। লাওসের রামায়ণ বিশেষভাবে দশরথ ও রাম এই দুটি চরিত্র নিয়ে বহুলভাবে প্রচলিত। বর্মাতে রামায়ণের পরিচিতি বিশেষ করে সেই সোনার হরিণ ও সঞ্জীবনী গুল্ম সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে। এখানকার রামায়ণের বহু জায়গায় সীতাকে রাবণের কন্যা বলে দেখানো হয়েছে। এবং নির্বাসনে তার শাস্তি পাওয়ার পরই রাবণ সীতাকে বাড়ি ফিরিয়ে নেবার জন্য হরণ করেছেন। আবার সীতার মাতা হলেন মন্দোদরী। এখানকার রামায়ণের আর এক ব্যাখ্যানে মন্দোদরীকে রাজা দশরথের পত্নীরূপে দেখানো হয়েছে। অন্য আর এক কাহিনী মতে দশরথ তাঁর পত্নী মন্দোদরীকে রাবণের হাতে দান করেছিলেন। থাই রামায়ণ অনুসারে রাবণ হনুমানকে লঙ্কা অভিমুখে উড়ে আসতে দেখে তাঁর কন্যার সাহায্যে হনুমানকে বাধা প্রদান করেন। সেই কন্যা হনুমানকে মোহজালে আবদ্ধ করে বিয়ে করেন ও পরে তাঁদের সন্তান হয়। থাই রামলীলায় মারীচবধ, বালিবধ, রাবণ-জটায়ু যুদ্ধ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, পুষ্পবাটিকায় হনুমানের সীতাদর্শন, সীতাহরণ, রাম-লক্ষ্মণ-সীতা চরিত্র সবই আছে। রাম-লক্ষ্মণ আমাদের যতটা ওদেরও ততটা। পুষ্পবাটিকার দৃশ্যে কিছু কিছু রূপান্তর করা হয়েছে বটে, তবে রাম-রাবণের যুদ্ধ আমাদের মতই। থাইরা রাবণকে বলে 'তোতশাকন' বা 'তোষাকণ্ঠ'। শব্দটি মনে হয়, দশকণ্ঠ থেকে গৃহীত। বর্মার বহু জায়গার নামকরণ হয়েছে রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে। আজকের একটি শহর মুলমেন-এর নাম কোনকালে ছিল রামপুরা। আবার আজকের টাংডিগ্যি কোন এক সময় পরিচিত ছিল রামাবতী নামে। এখানে রামলীলাকে বলা হয় 'থম পাও'। রাবণের নাম 'দত্তগিরি'। এই শব্দ সম্ভবত ভারতীয় দশগ্রীবা শব্দের রূপান্তর। আমাদের রামায়ণানুসারে লক্ষ্মণ শক্তিশেল বাণে ঘায়েল হলে হনুমান সঞ্জীবনী বুটি বিশল্যকরণী আনতে ছোটেন হিমালয়ের গন্ধমাদন পর্বতে। কিন্তু বর্মীয় মতে, হনুমান এই বুটি আনতে যান আপার বর্মার মাউন্ট পোপাতে। একটি মালবী বর্ণনায় রামের স্ত্রী অঞ্জনা গর্ভবতী হলে হনুমানের জন্ম হয়। তাই হনুমান হলেন রামচন্দ্রের পুত্র। ইন্দোনেশিয়াতে সীতা হলেন সীন্তা। রাবণ দশমুখ নামেই পরিচিত। কিন্তু লংকার নাম হল 'আলেঙ্খা'। এদের রামায়ণ মতে রাবণ সাধুবেশে সীতা হরণ করেননি, করেছেন বয়সের ভারে ন্যুব্জ বৃদ্ধ সেজে। এই সীতাহরণের রাত্রিটি ছিল ভীষণ ঝটিকাসংকুল। অতএব সীতা দয়াপরবশ হয়ে ঘরের দরজা খুলে বৃদ্ধকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়ার পরই রাবণ তার আসল রূপধারণ করেন ও সীতাহরণের বিপত্তি ঘটে। এ ছাড়া, আরও নানা রকম কাহিনী শ্রীলংকার সাহিত্য ও ঐতিহ্যানুসারে রামকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। এ দেশের পরমশিব আইয়ার-এর মতানুযায়ী লংকা মধ্যপ্রদেশের কোন এক স্থানে অবস্থিত। ১৯৪০ সালে সে স্থানেরও তিনি মোটামুটিভাবে নিরূপণ করে দেন। জাভা ও বালির নৃত্যে হনুমানের রঙ ধবধবে ফর্সা। এমনকি তাঁর বেশভূষাও শুভ্র। এ ছাড়া, হনুমানের লম্ফঝম্প, লংকার উদ্যানে বৃক্ষে বৃক্ষে দাপাদাপি ও বৃক্ষ উৎপাটন, রাবণের অনুচরদের আছাড় ও নানা দাপটের দৃশ্য থাকে এ সমস্ত মঞ্চ অভিনয়ে। তাই এখানকার মঞ্চ খুব মজবুত করে তৈরি হয় যেন হনুমানের দাপটে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে যায়। তবে একটা জিনিস সবাইর ক্ষেত্রে মোটামুটি এক। সবাই রামচন্দ্রের নির্বাসনকে মেনে নিয়েছেন। আর চরিত্র হিসাবে সব চাইতে জ্বলন্ত, প্রাণবন্ত ও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হল হনুমান তারপর রাবণ ও অতঃপর রামচন্দ্র।

যাই হোক না কেন, ভারতীয় জনতা ও জাতির বৃহত্তর অংশের হৃদয়ে রামায়ণ

অম্লানভাবে আশ্রিত হয়ে রয়েছে। রামায়ণ নেহাতই একটি এপিক কাব্য নয়, রামায়ণ হল শাশ্বত ও সার্বজনীন একটি গ্রন্থ। রামায়ণের কয়েক সহস্র বছরের প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা নিঃসন্দেহে এই সত্য প্রমাণ করে যে, রামায়ণ মানবিক প্রীতি ও সভ্যতার এক তুলনাহীন মহাভাবের জাগ্রত ও মনোরম প্রেরণাস্বরূপ। রামায়ণ নিয়ে কবিরা প্রেম, প্রণয়, বিরহ, কর্ম যোগ বন্ধুত্ব ভালবাসা প্রীতি আদর্শ ক্ষমা পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃবাৎসল্যের সুন্দর আলেখ্য নানাভাবে বিচিত্রিত করেছেন। রামায়ণ তাঁদের লেখনীতে রস ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। এ ছাড়া, পুত্রের কর্তব্য, স্ত্রীর ত্যাগ, বন্ধুপ্রীতি, উচ্চ ও নীচের নিকটত্ব, নিঃস্বার্থ কর্ম রাজার কর্তব্য ও নিষ্ঠা —এ সবই রামায়ণে আছে। এ সমস্তই আমাদের মনে গভীরভাবে প্রবেশ করে বিবেককে আন্দোলিত করে।

জনজীবনের আনন্দ, প্রেরণা, শান্তি ও সান্ত্বনার আধারও এই রামায়ণ মহাকাব্য। সাহস যোগাবারও এক বিরাট শক্তি আছে এই গ্রন্থে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বহুক্ষেত্রেই রামায়ণ হল পথপ্রদর্শক। জাতীয় প্রতিভারও বিরাট এক সম্বল হল রামায়ণ যা ভারতীয় আত্মার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে গেঁথে রয়েছে। রামায়ণের মাধ্যমে জৈন ও বৌদ্ধরা অহিংস নীতি প্রচার করেছেন। নেপালে রামায়ণের মাধ্যমে প্রচার হয়েছে নির্গুণ ও জ্ঞাননীতি। পাঞ্জাবের গুরু গোবিন্দ সিং রামচন্দ্রকে এক বিরাট যোদ্ধা বলে আখ্যাত করেছেন। তুলসী রামায়ণের উপর বিভিন্ন ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে ফাদার কামিল বুলেক-এর কাজ প্রশংসনীয়। এঁর হিন্দীতে বইটির নাম হল "রামকথাকা উদ্ভব ও বিকাশ"। এ দেশে প্রতিদিন কোটি কোটি হিন্দু রামায়ণ পাঠ করেন। অবশ্য সংস্কৃতে পাঠকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। অনেকে আবার তর্জমা করে পড়িয়ে নেন। অনেকে মন্দির বা সৎসঙ্গে গিয়ে শোনেন। মাসাধিককাল হলেও তাঁরা শ্রবণে ছেদ পড়তে দেন না। বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনাকালে তাঁদের অনেকেই কেঁদে বুক ভাসান। তবুও রামায়ণ প্রতিবারই নতুন করে হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে। বহু চিত্রকর রামায়ণ থেকে প্রেরণা পেয়েছেন। এঁদের চিত্রে রামায়ণ কাহিনীর ছড়াছড়ি। বিহারের মধুবনী, ওড়িষ্যার পট, থাইল্যান্ডের পাইথান ও রাজস্থানী চিত্রে রামায়ণের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া, ভাস্কর্য শিল্পেও রামায়ণের দানের শেষ নেই। সোনা, রুপো, ব্রোঞ্জ হাতীর দাঁত, মাটি ও কাঠের দ্বারা রামায়ণের বহু চরিত্র ও কাহিনী প্রস্তুতভাবে দর্শনীয়। বহু মন্দিরের চূড়াও রামায়ণের অনেক দৃশ্য মনে করিয়ে দেয়।

এ তো গেল রাম-রামায়ণ-বাল্মীকি—প্রাচীন অযোধ্যার আলোচনা। এবারে বর্তমান অযোধ্যার আলোচনায় আসি। অযোধ্যার ভৌগোলিক পরিচয় লেখার গোড়াতেই দিয়েছি।

পুরাণ মতে অযোধ্যা সপ্তমহাপুরীর মধ্যে সর্বোত্তম। অথর্ববেদে অযোধ্যাকে দেবনগরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে (অষ্টাচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পুরয়োধ্যা)। অযোধ্যা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল মিলিয়ে এ স্থান অবধপুরী বলেও পরিচিত। অবধপুরীর পরিধি হল ছিয়ানব্বই বর্গমাইল। আবার অযোধ্যা স্বর্গদ্বার বলেও পরিচিত কারণ এখান থেকেই রাম তাঁর প্রজাকে সঙ্গে করে স্বর্গে আরোহণ করেন। স্কন্দপুরাণে অযোধ্যার প্রশস্ত প্রশংসা করা হয়েছে। অযোধ্যার সরযূ নদীর তীরে এসে অজস্র ভক্ত পুজার্চনা করে পরম তৃপ্তি লাভ করেন। এই পুণ্যসলিলাতে স্নান করলে শাস্ত্র মতে প্রাণী পুনর্জন্মের যন্ত্রণা ও পার্থিব জ্বালাযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়। তা ছাড়া, এই নদী শাস্ত্রানুসারে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালকে পবিত্র করেছে।

হিন্দুদের বিশ্বাসে অযোধ্যা হল, ভগবান বিষ্ণুর মস্তক। এ ছাড়া, যথাক্রমে অবন্তিকাপুরী হল, বিষ্ণুর পদযুগল, শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী দুই জংঘা, দ্বারকা নাভি, হরিদ্বার হৃদয়, মথুরা কণ্ঠ ও বারাণসী নাসিকা।

ভ্রমণার্থী ও তীর্থযাত্রীদের বিরাট আকর্ষণস্থল হল এই অযোধ্যা। ফি বছর ধরে এখানে অজস্র লোকের আনাগোনা থাকে। তবে অযোধ্যায় যাওয়ার সবচাইতে রমণীয় সময় হল সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত। এর পর প্রচণ্ড গ্রীষ্মে ভ্রমণার্থীদের সংখ্যা খুবই কমে যায়। অযোধ্যায় নামবার সঙ্গে সঙ্গে স্টেশন থেকেই বিরাট বিরাট খাতা হাতে পাণ্ডারা ঘিরে ধরে। খাতা খুঁজে চটপট তারা তীর্থযাত্রীর পূর্বপুরুষদের নামধাম নিমেষেই বের করে দেয় যদিও মাঝেমধ্যে পাণ্ডারা ভীষণ বিরক্তির কারণও হয়ে দাঁড়ায়। এখানকার ভাষা মুখ্যত হিন্দী ও মৈথিলি। এ তীর্থে প্রচুর ধর্মশালা ও মন্দিরেও থাকবার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানকার লোকেদের আতিথেয়তা, বন্ধুত্ব ও সরল ব্যবহারের জন্য যে কোন ভ্রমণার্থীই মুগ্ধ হবেন। বাসিন্দারা প্রায় সবাই নিরামিশাশী। আর এখানকার জলে জানি না কি ক্ষমতা আছে, প্রচণ্ড খিদে বৃদ্ধি পায় ও কিছুদিন এখানে থাকলে শরীরের ওজন বেশ বেড়ে যায়।

অযোধ্যাতে মন্দিরের সংখ্যা প্রায় আট হাজারের মত। তাই এই শহরকে 'মন্দির নগরী'ও বলা চলে। সব মন্দিরই সেই কাকভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত এবং এর পর কয়েক ঘণ্টা বিরতির পর বিকেল থেকে অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে। সারাক্ষণই মন্দিরগুলো দর্শনার্থীর ভিড়ে গমগম করতে থাকে। সকাল সন্ধ্যায় পুজোর ঘণ্টাধ্বনিতে ও ফুলের গন্ধে যে কোন পুণ্যার্থীর হৃদয় অন্য জগতে পৌঁছে যায়।

অযোধ্যায় সারা বছর ধরে উৎসবেরও শেষ নেই। প্রতি মাসেই কিছু-না-কিছু উৎসব এ স্থানকে মাতিয়ে রাখে। তাই একে 'উৎসব নগরী' বললেও অত্যুক্তি হবে না। রামরাজ্যের পূর্বে এখানে দক্ষিণায়নে কোন উৎসব অনুষ্ঠিত হত না কারণ এই সময়ে দেবতারা নিদ্রায় থাকেন বলে বিশ্বাস করা হত। উৎসব ও পুজোপার্বণ সবই অনুষ্ঠিত হত উত্তরায়ণে কারণ একমাত্র এই সময়েই দেবতারা জাগ্রত থাকেন। বর্তমানে এখানে দশেরা উৎসব খুবই ধুমধামের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। দশেরার পনেরো দিন আগে থেকে নানা জায়গায় নাটক ও নাচের মাধ্যমে রামলীলা উদ্‌যাপিত

হনুমানগড়ীতে শ্রীহনুমান মন্দির-এর প্রবেশদ্বার

হয়। সঙ্গে সঙ্গে বহু জায়গায় রামায়ণ পাঠও হয় খুব ঘটা করে। বেনারসের কাছে রামনগর রামলীলা উৎসবের জন্য প্রসিদ্ধ। নবরাত্রিতে রামলীলার শেষ দিনে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও মেঘনাদের প্রতিকৃতি তৈরি করা হয়। এর পর রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও হনুমানরূপী কিছু চরিত্র সেই প্রতিকৃতিতে তীর ছুঁড়তে থাকে। কুশপুত্তলিকায় ভরা থাকে প্রচুর দাহ্য পদার্থ ও পটকা। অতঃপর সূর্যাস্তের সময় প্রচুর বাজি ও পটকা ফাটিয়ে কুশপুত্তলিকা জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। ভারতবর্ষের নানা প্রান্তেও এই উৎসব প্রচুর উল্লাসের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। এর পর অনেকে সেই ছাই সংগ্রহ করে শরীরে ধারণ করেন। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী এই ছাই ধারণ করলে নাকি কোন দুষ্টপ্রভাব পড়তে পারে না। এত উল্লাসের মাধ্যমে রাবণের মত চরিত্রকে যুগ যুগ ধরে এত নির্দয়ভাবে বধ করা হয় বলে আমারও ভীষণ কষ্ট হয়। প্রচলিত একটি মতানুযায়ী রাম রাবণকে বধ করতে বা রাবণের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য দুর্গার সাহায্য প্রার্থনা করতে পুজো করেন বলেই এই দশেরা উৎসব। অথচ মজার কথা, এই পুজোতে রাম রাবণকে আমন্ত্রণ জানান পৌরোহিত্য করতে। অকুতোভয় রাবণ এই পুজার বিধিসম্মতভাবে পৌরোহিত্যও করেন বাল্মীকি রামায়ণ মতে। এতে তাঁর চরিত্রের উদারতা ও বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে বহু গুণ বেড়ে গিয়েছে। অন্য আর এক মতে, দশেরা উৎসব পালিত হয় রম্ভাসুর-এর পুত্র মহিষাসুর-এর বিরুদ্ধে দুর্গার বিজয়ের দরুন। এ বিশ্বাস বামন, বরাহ ও স্কন্দপুরাণ অনুসারে—যার বিকশিত রূপ রয়েছে মার্কণ্ডেয় পুরাণে। দেশের পশ্চিমাঞ্চলে প্রথমটি ও পূর্বাঞ্চলে দ্বিতীয়টির প্রচার, প্রসার ও মান্যতা বেশী।

দশেরার পর পরই ভরত মিলাপের উৎসব। এই দিনেই রাম ও ভরতের মিলন হয়েছিল। দেশের বহু প্রান্তে এই দিনটিকে পারিবারিক মিলনের দিন বলে গণ্য করা হয়। এর পর সপ্তাহ তিনেক বাদেই দেওয়ালী উৎসব। সব চাইতে জনপ্রিয় প্রবাদ হল, রামের সঙ্গে চৌদ্দ বৎসর বনবাসের পর ও রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসবার পর অযোধ্যাবাসীরা শহরে প্রদীপ জ্বালিয়ে শ্রীরামচন্দ্র ও সঙ্গীদের স্বাগত জানান। এ ছাড়া, আরও নানা প্রবাদ আছে দেওয়ালী উৎসব ঘিরে। তবে উল্লিখিত ঘটনাই সব চাইতে জনপ্রিয়। অযোধ্যা এই দিন প্রদীপের সাজে স্বপ্ননগরীর রূপ নেয়। প্রচুর পটকা ফাটিয়েও উল্লাস প্রকাশ করা হয়। মিষ্টি বিতরণ ও পরস্পরে অভিনন্দন জানিয়ে এ উৎসবের সমাপ্তি হয়। এ ছাড়া দেশের সর্বত্রই এই উৎসব খুব জাঁকজমক সহকারে উদ্‌যাপিত হয়।

চৈত্র মাসে আসে রামনবমী মেলা। এদিন হল রামচন্দ্রের জন্মদিন। নানা নাটকের মাধ্যমে ও দশ দিন ধরে নিয়ম মতে রামায়ণ পাঠ করে এই উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে বিরাট মেলা হয় অযোধ্যাতে। সে মেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মায় বিদেশ থেকে জড় হন। মন্দিরগুলি নবরূপে সাজানো হয়। মন্দিরে দোলনাতে একটি নারকেল রাখা হয়। তারপর পুরোহিত দুপুরে রামের জন্ম ঘোষণা করেন। এই সময়েই রামের জন্ম হয় বলে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। এই উৎসবে অজস্র লোক সরযূ নদীতে স্নান করেন। পুণ্যসলিলা সরযূর উৎপত্তি নাকি ভগবান বিষ্ণুর প্রেমাশ্রু থেকে। তাই এর আর এক নাম নেত্রজা। যাই হোক, অনেক পুরুষ ও মেয়েরা সরযূ নদীতে মাথার চুল দান করেন। এ ছাড়া, কার্তিক মাসে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে অজস্র লোক অবধপুরী পরিক্রমা করেন। প্রচুর গ্রাম ও সারা রাস্তা ধরে পেয়ারা, আমকাঁঠাল ও আমলকির বাগানের মধ্য দিয়ে হাঁটতে খুব ভাল লাগে। অযোধ্যার আমলকি ও পেয়ারা খুব প্রসিদ্ধ। এই পরিক্রমায় রাস্তায় মেলে সরযূর কিনারে যমরাজের মন্দির। এই স্থানে সরযূতে স্নান করে যমরাজের মন্দিরে পুজো করলে নাকি সেই প্রাণীর মৃত্যুকালে কিছুতেই যমের দূতেরা ধারেকাছে আসতে পারে না। অতএব এই ভয় থেকে অন্ততপক্ষে আমি নিশ্চিন্ত।

অযোধ্যা হোলিতেও রঙীন রূপ নেয়। তা ছাড়া মহাশিবরাত্রিও এখানে খুব

ধূমধামের সঙ্গে নানা রাম কীর্তন করে উদ্‌যাপন করা হয়। আর বিরাট আড়ম্বরের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয় কার্তিক মাসে রামচন্দ্রের জন্মদিন ও সরযূ নদীর জন্মদিন। এ ছাড়াও আরও রোজই একটা উৎসব কি বছর ধরে লেগেই আছে অযোধ্যায়।

আগেই বলেছি, রামচন্দ্রের স্বর্গে প্রস্থানের পর অযোধ্যা উজাড় হয়ে গেলে রামের পুত্র লব ও কুশ এখানে নতুন করে বসতি স্থাপন করেন। প্রথমে এখানে নাগেশ্বরনাথ মহাদেব মন্দিরের স্থাপনা হয়। পরবর্তীকালে অবশ্য অযোধ্যা আবার ধীরে ধীরে বনজঙ্গলে ভরে যায়। ইতিহাস মতে রাজা বিক্রমাদিত্য দেশ পর্যটনে বেরিয়ে সরযূর তীরে শিবির করেন ও এখানকার কিছু নিদর্শন দেখে সাধুসন্তদের কাছে জানতে পারেন, এটাই সেই পবিত্র অবধভূমি। অতএব তিনি নানা সংস্কারের কাজে হাত দিয়ে এই শহরে নতুনভাবে প্রাণসঞ্চার করেন। অনেকের মতে নাগেশ্বরনাথ মন্দিরের সূত্র ধরেই তিনি এই পবিত্র স্থানের হদিশ পান। যাই হোক নাগেশ্বর মন্দির অযোধ্যার মুখ্য মন্দিরগুলির অন্যতম। চমৎকার শিবলিঙ্গ স্থাপিত রয়েছে মন্দিরের মাঝখানে। প্রতি সোমবার ও শিবের বিশেষ উৎসবের দিনে এখানে অজস্র লোকের ভিড় হয়। শিবের মাথায় জল ঢালতে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। এখানে সকালে ও সন্ধ্যায় আরতি দেখবার মত। এই মন্দিরের পাশেই রয়েছে কালেরাম মন্দির। একটি মাত্র কাল পাথরে চার ভাই ও সীতার মূর্তি দেখতে অপূর্ব লাগে। মোগল বাদশাহ বাবর দ্বারা রামের জন্মভূমি আক্রান্ত হওয়ার পর নাকি এই মূর্তি পূজারীরা রামের জন্মভূমি থেকে তুলে এনে এই মন্দিরে স্থাপনা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মথুরার মত অযোধ্যাও বিদেশী রাজা-বাদশাহ দ্বারা বহুবার আক্রান্ত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

কালেরাম মন্দির থেকে সরযূর কিনারে কিনারে কিছু দূর হেঁটে গেলেই লক্ষ্মণকিলা। এর পাশেই লক্ষ্মণঘাটে মন্দিরে লক্ষ্মণের পাঁচ ফুট উঁচু ভব্য মূর্তি। এই মূর্তিটির সামনেই একটা কুণ্ডে পাওয়া গিয়েছিল। কথিত আছে, এ-স্থান থেকেই লক্ষ্মণ রামের আদেশে শেষনাগের রূপ ধরে পরমধামে যাত্রা করেন। এখানে সন্ধ্যায় অসংখ্য প্রদীপ জ্বালিয়ে সরযূর আরতি হয়। সে-দৃশ্য অপূর্ব। এ-স্থান থেকে বেশ কিছুটা দূরে কনক ভবন বা স্বর্ণ মন্দির। বিশাল এলাকা নিয়ে এ-মন্দির তৈরি করান ওড়ছা-নরেশ। এটাকে রামের অন্তঃপুর বা সীতার মহল বলা হয়। এখানে সীতা অবসর বিনোদন করতেন। এখানে খুব দামী পাথরে সীতা ও রামের মূর্তিতে প্রচুর সোনার অলংকার। মূর্তির গায়ে মূল্যবান অনেক পাথরও লাগান রয়েছে। মন্দিরের দরজা সোনায় মোড়া। মুখ্য মন্দিরে সামনে সর্বদা বন্দুক হাতে সান্ত্রীর ব্যবস্থা আছে। আমি এই মন্দিরে সোনাদানার পরিমাণ ও অন্যান্য হিসেবনিকেশ জানতে কৌতূহলী হওয়ায় বেশ একপ্রস্থ ঝামেলায় পড়েছিলাম। থাক্ সে-সমস্ত কথা। কনক ভবন থেকে কিছুটা দূরেই রাম জন্মভূমি। এটা তীর্থযাত্রীদের পক্ষে বিরাট এক পবিত্র স্থান। ইতিহাস মতে কথিত আছে, ১৫২৮ সালে বাবর এইস্থানে মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরি করান। এই জন্মভূমির পাশেই নাকি একটি পুকুর ছিল। সেই পুকুরে স্নান করলে বহু দুরারোগ্য ব্যাধি সেরে যেত। তাই মোগল রাজত্বে এই স্থানের প্রতি আকর্ষিত হয়ে বাবর মসজিদ তৈরি করিয়েছিলেন। এখনও এই স্থান হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিরোধগ্রস্ত। এই মামলা নিষ্পত্তির জন্য এখনও অযোধ্যার জেলা ফৈজাবাদে আদালতাধীন। এই পুণ্য ভূমি উদ্ধারের জন্য ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ সাল থেকে এর পাশেই ছোট একটা পর্ণকুটিরে অখণ্ড কীর্তন চলছে। এই কীর্তনের হোতা রাম জন্মভূমি সেবা সমিতির পরিচালক বাবা রামলক্ষ্মণ শরণ। প্রায় কুড়ি জন কীর্তনীয়া পালা করে এখানে সমানে কীর্তন চালাচ্ছেন। উদ্দেশ্য হল যতদিন এই স্থান না পুরোপুরি মুক্ত হবে কীর্তন চলতেই থাকবে। এর জন্য মাসে প্রায় খরচ হয় দু হাজার টাকার মত। এই পুরো টাকাই তোলা হয় পুণ্যার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া দানের মাধ্যমে। হিন্দুদের এই সার্বজনীন ধার্মিক স্থান থেকে কিছুটা দূরে মত্তগজেন্দ্র মন্দির। ইনি বিভীষণের পুত্র ও অযোধ্যার প্রহরী। এই মন্দিরের পাশেই সপ্তসাগর তীর্থ। রামাভিষেকের সময় এখানে সাত সমুদ্রের জল সঞ্চিত হয়।

অযোধ্যার বোধ করি সবচাইতে মুখ্য মন্দির হল হনুমানগড়ী। গড়ের মত উঁচু জায়গায় এই মন্দির। এখানে হনুমানের মূর্তি অজস্র ফুলে ঢাকা থাকে। ষাটটি সিঁড়ি বেয়ে মুখ্য মন্দিরে প্রবেশের পথ। মন্দিরের চারদিকে বহু সাধু ও ভক্তরা সর্বদা ধ্যানধারণা করছেন। এই ঠাকুরকে খুবই জাগ্রত ঠাকুর বলে মান্য করা হয়। বহু তীর্থযাত্রী নানা মনস্কামনা নিয়েও এ-মন্দিরে পুজো দিতে আসেন। শনি ও মঙ্গলবার বিশেষভাবে ভক্তের ভীড় হয়। লাড্ডুর প্রসাদের প্রচলনই বেশী। রামায়ণ মতে হনুমান মিষ্টি—বিশেষ করে লাড্ডু খুব পছন্দ করেন। পুরাণ মতে শ্রীরামচন্দ্র স্বর্গে যাওয়ার আগে হনুমানের হাতে অযোধ্যার শাসনভার তুলে দেন। তাই কলিযুগে অযোধ্যার প্রধান ও মুখ্য দেবতা হলেন হনুমান বা অবাঙ্গালী মতে বজরংবলী। হনুমানগড়ীর কিছুটা দক্ষিণে সুগ্রীবটিলা ও অঙ্গদটিলা। এখানে সুগ্রীব ও অঙ্গদের মন্দির আছে। এ-ছাড়া রাজমহলের দক্ষিণপ্রান্তে তুলসীচৌরা। এখানেই নাকি গোস্বামী তুলসীদাস রামচরিত মানস রচনা শুরু করেন। এ-ছাড়া ত্রেতারামের মন্দির, সীতারসুই, বশিষ্ঠকুণ্ড, বিদ্যাকুণ্ড, শ্রীরামকোট, মণিপর্বত, সূর্যকুণ্ড, দুর্গাকুণ্ড, নির্মলাকুণ্ড, মনোরমা তীর্থ উল্লেখযোগ্য। এর প্রতিটির আলাদা আলাদা ইতিহাস রয়েছে। অযোধ্যা থেকে কিছু দূরে নন্দীগ্রাম যেখানে ভরত রামের চৌদ্দ বছর বনবাসকালে তপস্বীর জীবনযাপন করেন ও শত্রুঘ্নকে রাজকার্য পরিচালনা করতে সাহায্য করেন। এখানে ভরতের মন্দির, ভরতকুণ্ড, পিশাচমোচনকুণ্ড ও গয়াকুণ্ড উল্লেখ্য। অযোধ্যার কেন্দ্রস্থলেই রয়েছে অযোধ্যা নরেশের প্রাচীন রাজপ্রাসাদ বিশাল এলাকা জুড়ে। রাজপ্রাসাদ চত্বরে সুন্দর শিবের মন্দির [illegible] লোকের সমাগম হয়। অযোধ্যায় আর রয়েছে ফুলে ভরা

মকরসংক্রান্তি স্নানের প্রাক্কালে সরযূর তীরে জনস্রোত

ভিক্টোরিয়া পার্ক। পার্কের মাঝখানে শ্বেতপাথরে তৈরি তুলসীদাসের আবক্ষমূর্তি যা যে-কোন ভ্রমণার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। অযোধ্যায় চক্রহরি, বিষ্ণুহরি ধর্মহরি, নিরহরি, পুণ্যহরি, চন্দ্রহরি ও গুপ্তহরি নামে সাতটি হরির মন্দির আছে। এর মধ্যে শেষেরটি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। এই মন্দিরের পাশেই গুপ্তার ঘাট। ভক্তদের বিশ্বাস, এই ঘাটে সরযূ নদীতে ডুব দিয়ে রামচন্দ্র [illegible] স্বর্গ আরোহণ করেন।

একটি ঘোড়াগাড়ি অর্থাৎ স্থানীয় ভাষায় এক্কা করে দ্রষ্টব্য স্থানগুলিতে ঘোরাটাই যে-কোন ভ্রমণার্থীর পক্ষে সবচাইতে সুবিধেজনক। অবশ্য এখানে রিকশারও অভাব নেই। অযোধ্যা বিরাট এক আকর্ষণকেন্দ্র হতে পারত যদি এ-শহর নিয়ে দেশে সুচারুরূপে প্রচার করা হত। আশ্চর্যের কথা দেশের বেশীর ভাগ ট্যুরিস্ট ব্যুরোতেই অযোধ্যা সম্পর্কে কোন সন্তোষজনক খবর মেলে না। তা ছাড়া বেশীর ভাগ ট্যুরিস্ট ম্যাপে অযোধ্যার কোন উল্লেখই নেই। অনেক ট্যুরিস্টদের ত এমন হাবভাব দেখি যেন এঁরা অযোধ্যার নামই শোনেন নি। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। উত্তরপ্রদেশ সরকার অন্যান্য আকর্ষণ কেন্দ্রগুলির যতখানি প্রচার করেন অযোধ্যার ব্যাপারে তাঁরা এত নিস্পৃহ কেন এটা আমার কিছুতেই মাথায় আসে না। কেন্দ্রীয় সরকারও এ ব্যাপারে নির্বিকার। হিন্দুদের এত বড় মুখ্য তীর্থস্থানে ধর্মশালা ও থাকবার জায়গা খুবই অপ্রচুর। তা ছাড়া খাওয়া-দাওয়ার জন্য খুব ভাল হোটেল বা রেস্তোরাঁ নেই এই শহরে। শহরের যত্রতত্র আবর্জনা ও শহরটির খুবই দৈন্যদশা। বহু মন্দির যুগ যুগ ধরে জরাজীর্ণ অবস্থায় ধুঁকছে। এখানে কোন মেরামত বা সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয় বলে মনে হয় না।

তবও প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিকদের পক্ষে অযোধ্যা হল এক আকর্ষণীয় স্থান। শহরের লোহালক্কড় ও ইঁট পাথরের জীবন থেকে কিছুটা সময় এখানে কাটালে যে-কোন ভ্রমণার্থীরই খুব ভাল লাগবে। এখানে এলে এক নতুন জীবনের স্বাদ মিলবে। শহরের যত্রতত্র দেখা যাবে প্রচুর হস্তরেখাবিদ ও ভাগ্যগণনাকারী। গায়ে তাদের চন্দনে লেখা রামনাম। ছোট ছোট বাচ্চাদের বিরাট টিকি মাথায় দৌড়ঝাঁপ করতে দেখে সুন্দর লাগে। সরযূর কিনারে দাঁড়ালে দেখা যাবে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ ও কচ্ছপ। খাবার ছড়ালে ত সব সিঁড়ি পর্যন্ত উঠে আসে। এ-সব জলচর প্রাণীদের ধরা একদম বারণ। তবুও চুপিসারে এদের ধরে বাইরে চালান করা হয় বলে আগের তুলনায় সংখ্যা বিলীয়মান। এখানকার পিতল ও তামার মূর্তি প্রসিদ্ধ। পুজোর আরও বহুবিধ সামগ্রীও প্রচুর দেখা যাবে দোকানে দোকানে। এ-সমস্ত কাজে নিয়োজিত লোকেরা বংশপরম্পরায় এ ব্যবসায়ে লিপ্ত। এ ছাড়া পাথরে খোদাই করা মূর্তি ও মৃৎশিল্পের জন্য অযোধ্যা প্রসিদ্ধ। অযোধ্যা স্টেশনে নামবার পর থেকেই যা সবচাইতে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে তা হল এখানকার বিশাল বানর বাহিনী। মনে হয় শ্রীরামচন্দ্র স্বর্গে যাওয়ার সময় তাঁর লঙ্কার সেনাবাহিনী এখানেই ছেড়ে যান। এদের ভয়ে শহরের সব দোকান জাল দিয়ে ঘেরা। প্রায় সব মন্দিরের চূড়া ও শহরের সব বাতিস্তম্ভগুলি বেঁকানো। সবই এদের বাঁদরামোর ফল। এদের বুদ্ধিও প্রখর। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে এদের বিরোধ খুবই সীমিত। কিন্তু ভ্রমণার্থীদের এদের থেকে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করতে হয়। কারণ খাবার জিনিসপত্র লুঠ করা এদের খুব প্রিয় কাজ। তবে এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে, দেশে-বিদেশে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অযোধ্যার আকর্ষণ এই বানর বাহিনীও ক্রমাগত কমে যাচ্ছে।

যাই হোক, অযোধ্যা থেকে বিদায়কালে আপনি অযোধ্যা ছেড়ে আসবেন, কিন্তু অযোধ্যা সহজে আপনাকে ছাড়বে না। মনের এক কোণে অযোধ্যার স্মৃতি আপনাকে মাঝে মধ্যেই নাড়া দেবে। আর কবি ও শায়েরের কল্পনায় 'বনারসকী সুবহ আউর অবধকী শাম' আপনার শহুরে জীবনেও অজান্তে আপনাকে আনমনা করতে থাকবে।

## এক নতুন রান্না শিখে—

# সুস্বাদু খাবার পরিমাণে বাড়িয়ে ফেলুন আর পুষ্টিগুণে ভরপুরও করুন!

### রান্নায় মিলমেকার মেশান—প্রত্যেকটি সুস্বাদু খাবার পরিমাণে বেড়ে যাবে আর প্রোটিনের পুষ্টিগুণে ভরপুর হবে। অথচ, এতে বাড়তি খরচও নেই!

**প্রত্যেকের পাতে পর্য্যাপ্ত ঃ**
আপনার রান্নার মধ্যে বড় বা ছোট দানার মিলমেকার মেশালে সুস্বাদু খাবার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাতে পাতে পরিবেশন করতে পারবেন!

**মিলমেকার—প্রত্যেকেরই পছন্দ ঃ**
মিলমেকার মিশিয়ে নিরামিষ বা আমিষ দুই-ই রান্না করা চলে। এটি রান্নার ভেতর থেকে মশলার ঝাঁঝ শুষে নিয়ে আপনার খাবারের স্বাদে চমৎকার মিশে যায়!

**প্রোটিনের পুষ্টিগুণে ভরপুর—অথচ খরচে কম ঃ**
মিলমেকার প্রতিটি খাবার পুষ্টিগুণে ভরপুর করে। ২৫০ গ্রাম মিলমেকার-এ ২৪টি ডিম বা ১ কিলো মাটন কিংবা ৪ লিটার দুধের প্রোটিন পুষ্টিগুণ রয়েছে। অথচ মাটন, ডিম অথবা পনীরের দামের তুলনায় এর দাম অনেকাংশে কম।

**১০০% নিরামিষ ঃ**
মিলমেকার প্রোটিনে ভরপুর এক নিরামিষ আহার। সয়াবিন এবং গ্রাউণ্ডনাট থেকে তৈরী ব'লে এই বাদামী রং-এর মিলমেকার পুষ্টিগুণে ভরপুর

**রান্না করা-ও বেশ সহজ**

- অল্প গরম নুনজলে... ২০ মিনিট ভিজতে দিন...
- জল ছেঁকে ফেলে মিলমেকার-কে ঝরঝরে করুন...
- এবার সুস্বাদু রান্নার সঙ্গে মিশিয়ে রাঁধুন...

এখন এক রঙ-বেরঙের নতুন প্যাকে—রান্না-প্রণালীর চমৎকার পুস্তিকা আছে।

মিলমেকার মিশিয়ে রান্না করুন।

# মিলমেকার

এটি সয়া প্রোটিনের পুষ্টিগুণে ভরপুর

উৎপাদক: **মাইসোর স্ন্যাক ফুডস লিমিটেড,** ১৯, প্ল্যাটফর্ম রোড, বাঙ্গালোর ৫৬০০২৩

maa VL 38 BEN

# আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি

## আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি বই

**A DICTIONARY OF KATHAKALI—K. P. S. Warrier. Orient Longman. Price Rs. 45/-.**

কথাকলি কেরালার বিখ্যাত ধ্রুপদী নৃত্যকলা। নৃত্য, অভিনয়, নাটক এই তিন উপাদানের সমন্বয় এই শিল্পকে ভারতীয় নৃত্যকলাশৈলীগুলির মধ্যে এক অনন্য স্থান প্রদান করেছে। যদিও এই নৃত্যের রসিক সমাজ সীমিত। কারণ এই নৃত্যের বিশেষ শিক্ষণ প্রকরণ। সেই কারণেই কথাকলি যতটা সমাদৃত হওয়ার কথা ঠিক ততটা সমাদর পায় না। যদিও মহাকবি ভল্লাত্তোল আজ কথাকলিকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়ে এর মর্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়েছেন।

প্রশ্ন আসে কেন কথাকলি উচ্চমানের নৃত্যশৈলীর অধিকারী হয়েও রসিক সমাজ বাড়াতে সক্ষম হয়নি? কেন এই অনুষ্ঠানের পরিবেশনায় পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ কমই দেখা যায়?

তার কারণ প্রথমত, এই নৃত্যে, লাস্যের অভাব।

দ্বিতীয়ত, এর হস্তমুদ্রা— যার জ্ঞান ভিন্ন এ নৃত্য সম্পূর্ণ রূপে উপলব্ধি সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত, কথাকলি নৃত্য ও অভিনয়ের সমন্বিত রূপ। তার নির্দিষ্ট বেশভূষা যেমন পাচ্চা (সবুজ) যা নায়ককে নির্দিষ্ট করে অথবা কাত্তি (ছুরি) যা খলনায়কের ভূষণ তার জ্ঞান ভিন্নও এ নৃত্য সম্যক হৃদয়ংগম হয় না। যদিও এই নৃত্যের বিষয়বস্তু পৌরাণিক কাহিনী হওয়ায় ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজে এর আঙ্গিক নৃত্যরস হৃদয়ংগম না হলেও মোটামুটিভাবে কাহিনীর মাধ্যমে এর নৃত্যরস উপলব্ধির পথে বিশেষ বাধা নেই।

কথাকলি নৃত্যের সম্পূর্ণ রস আস্বাদনের বাধা শ্রীকে পি এস মেনন রচিত "এ ডিকসনারী অব কথাকলি" বহুল পরিমাণে দূর করেছে।

সচিত্র এ গ্রন্থখানি রচনাকালে শ্রীমেনন হস্তলক্ষণ, দীপিকা ছাড়াও প্রয়োজনমত নাট্যশাস্ত্রকেও কাজে লাগিয়েছেন।

পুস্তকটির আরও বৈশিষ্ট্য এই যে, উত্তর কেরালা ও দক্ষিণ কেরালায় আঞ্চলিক ভাষায় এই নৃত্যের রীতি প্রকরণের নামকরণ ছাড়াও অধুনা ব্যবহৃত কথাকলি নৃত্যের পরিভাষাও বইটিতে পাওয়া যায়। কথাকলি নৃত্যের মুদ্রা ও প্রকরণের ব্যাখ্যাগুলি এখানে সহজবোধ্য ও চিত্রিত। এই চিত্রীকরণ রসিক সমাজকে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট সহায়তা করবে।

গ্রন্থকার কে পি এস মেনন এবং প্রকাশক ওরিয়েন্ট লংম্যান এই পুস্তকটি প্রকাশনায় দ্বারা ভারতীয় নৃত্যামোদী সমাজকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করলেন। তাঁদের কাছে আমাদের আশা ভারতীয় অন্যান্য ধ্রুপদী নৃত্যের—যেমন কত্থক, ওড়িশী ইত্যাদির—এই ধরনের সাহায্যকারী পুস্তক রচনা করে ভারতের নৃত্যামোদী সমাজকে আরও উপকৃত করবেন।

**বিক্রম নন্দার**

**সোনার বিস্কুট।** শেখর বসু। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯। মূল্য ৮·০০

শেখর বসুর কলমের যে গুণটি আমাদের ইতিমধ্যেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেই সরল স্বাভাবিকতার চমক আর বিনাটকীয় গল্পচ্ছকের যোজনা তাঁর ছোটদের জন্য লেখায় যেন আরও উপভোগ্য ও বিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে। ছোটদের গল্পের সংগে তাল রেখে তাদের মনের আবহাওয়াকে যথাযথ ছুঁতে পারা কম কথা নয়। 'সোনার বিস্কুট' একটি খাঁটি লঘু-পাক অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী—বালকবৃন্দ নির্বিশেষে সমভাবে সেব্য। বাংলায় ছোটদের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী আজকাল সোনার বিস্কুটের চেয়েও দুর্লভ এবং দামী। কারণ এই ধরনের লেখার বিপুল চাহিদা থাকলেও ইদানীং যোগান অতি অল্প। আর ছোটদের মন নিয়ে ছোটদের মত করে মন-মজানো লেখা তো বলতে গেলে বিরলই হয়ে এসেছে। এক্ষেত্রে আলোচ্য বইটি এক নতুন ধরনের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর সংযোজন।

তিব্বতী জাদু দেখার লোভে রংটুং-এ যাত্রা শুরু করে নেপালযাত্রী তিন বাঙালী কিশোর কি করে চোরাই সোনা চালানকারীদের দুষ্টচক্রের জালে জড়িয়ে পড়ে এবং কি করে নিজেদের দুঃসাহসী বুদ্ধি খাটিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে পালিয়ে এসে দুষ্টচক্রটিকে পুলিসের হাতে ধরিয়ে দেয় তারই উত্তেজক কাহিনী এই গ্রন্থের উপজীব্য। গল্পের সুতো ছাড়া এবং সুতো গুটোনোর মধ্যে লেখক বসু মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন। এটি একই সংগে ছোটদের গোয়েন্দা অ্যাডভেঞ্চার ও ভ্রমণ-কাহিনী হয়ে উঠেছে।

**আনন্দ বাগচী**

## আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি চিত্রকলা

### প্রথম ধরেছে কলি

শুভাপ্রসন্নের ছাত্র আঁকার কলেজ অব ভিজুয়াল আর্টস থেকে যাঁরা বার হলেন, তাঁদের প্রদর্শনী হলো ডেকন সার্ভিসে। দলটির নাম "গ্রুপ ওয়ান"। অনুমান করা যায় এবার পর পর "টু" "থ্রি" চলবে। সুন্দর স্মারকপত্র ছেপে তাতে উৎকীর্ণ হয়েছে আচার্যদেবের মত শুভাপ্রসন্নের আশীর্বচন। দলের পাঁচ জনের ছবি ছাপা হয়েছে (১২—২১শে জানুয়ারি)। এঁদের মধ্যে শুভার স্ত্রী শম্পাও আছেন।

মদন মণ্ডলের তৈলচিত্র

প্রদর্শনী খুবই ছিমছাম। ছবি বাঁধাইয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। নান্দনিক ব্যাপারের সঙ্গে বাইরের দেখনসুখ চাকচিক্যের যোগ আছে হয়তো, এটা বোঝা ভাল। স্পষ্টই বোঝা যায় শিল্পকলা যে বিক্রয়যোগ্য পণ্য সেটা এঁরা সকলে বেশ ধরতে পেরেছেন।

প্রত্যেকের কাজ খুবই যত্ন নিয়ে করা। জার্মান অভিব্যক্তিবাদ, সমবাস্তববাদ প্রভৃতি নানা বিদেশী ধারার প্রভাব পড়লেও কোথায় যেন নিজস্ব ঢঙ তৈরি করার চেষ্টা চলেছে, যদিও অভিব্যক্তিবাদীর চড়া রঙ আর কড়া রেখার মধ্যে দিয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালী রোমান্টিক উচ্ছ্বাস উঁকি মেরেছে, কয়েকটি ছবি এত পরিচ্ছন্ন এবং মাপা যে, পোস্টার বলে মনে হয়। আমি এঁদের নৈপুণ্য মেনে নিয়েও বলব চারুকলা এবং বিজ্ঞাপন চিত্রের পার্থক্য সম্বন্ধে এই ছাত্রজীবন থেকে সচেতন হওয়া দরকার ছবি গৃহসজ্জা নয়।

অশোক মৌলিকের "বার্ধক্য" পর্যায়ের অভিব্যক্তিমূলক কাজগুলিতে পার্কের বুড়োদের অসহায়তা ধরার জন্য উষ্ণ এবং শীতল রঙের ব্যবহার ভাল। বিশেষত রচনা সম্বন্ধে এঁর ভাবনা আছে, রানা রায়ের মধ্যে শুভাপ্রসন্নের শিশুসাহিত্যের গ্রন্থের সাজসজ্জার মিল বেশি। শম্পা ভট্টাচার্যর কাজে কলকাতার ধোপা এবং ভিখারী সবই এসেছে সমতল পট বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে। দেবাশীষ সেনগুপ্তর ডুপ্লো ধাঁচের চিত্রকল্প মন্দ লাগে না। ওঁর রেখাচিত্র কিন্তু সদাবাস্তবতা ঘেঁষে গেছে। মদন মণ্ডল-এর "নীল বালক" পর্যায়ের ছবি খুব পরিচ্ছন্ন। বাস্তব এবং মায়ার মধ্যে সীমারেখা নিয়ে কিছু খেলা আছে। সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা এসেছে প্রত্যেকের কাজে। প্রত্যেকের কাজে নিষ্ঠা আছে। প্রতিশ্রুতিও। কিন্তু ছবি সুন্দর করার দিকে একটু বেশি ঝোঁক দেখিয়েছেন।

**সন্দীপ সরকার**

## আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি চলচ্চিত্র

### অ্যালবার্ট পিনটো কো গুসসা কিঁউ আতা হ্যায়?

নাম দেখলেই আন্দাজ করা যায় সয়ীদ মির্জার ছবি। এটি দ্বিতীয় ছবি। প্রথম ছবির নাম ছিল অরবিন্দ দেশাই কি আজীব দস্তান। প্রথম ছবি, কিন্তু বার্লিন ও কান ফেস্টিভ্যালে গৃহীত হয়েছিল। তুলনায় অ্যালবার্ট পিনটো বিষয় ও বিন্যাসে আরো অভিনব ও তাৎপর্যপূর্ণ মনে হল। চলচ্চিত্রে কাহিনী পরিবেশনের ভঙ্গি নিয়ে তাঁর দুটি ছবিতেই কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন সয়ীদ মির্জা। অ্যালবার্ট পিনটোর একাধিক দৃশ্য বা সিকোয়েন্সকে বিচ্ছিন্ন মনে হয়। জাম্পকাটের ব্যবহার হয়েছে একাধিক। ফলে, কাহিনীবিন্যাসের সহজ, পরিচিত ভঙ্গির পরিবর্তে এসেছে

শবানা আজমি ও নাসিরুদ্দিন

অপরিচয়ের ঠোক্কর। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাবার পিছনে সব সময় প্রত্যাশিত লজিক কাজ করছে না। আসলে এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এ ছবিতে প্রচলিত অর্থে কোনো কাহিনীই নেই। কোনো বিশেষ ঘটনাই ঘটছে না এখানে।

পিনটোর জন্মস্থান গোয়া। সে ধর্মে রোমান ক্যাথলিক। মোটরগাড়ির মেকানিকের কাজে সে নানা রকম গাড়ি চালানোর সুযোগ পায়। এসব গাড়িগুলির মাধ্যমে সে এমন এক জীবনের স্বাদ পায় যা তার আয়ত্তের অতীত। এমন কি কোনো কোনো চিকন বর্ণময় বিদেশি গাড়ির প্রতি সে এমনি মমতাবান যে মনে হয় গাড়ি তার কাছে নারী বা প্রেমের প্রতীক। পিনটোর ভাই অসুস্থ পায়ে সেলসগার্ল-এর চাকরি করে। এবং ছোটো ভাই ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে জেলে যায়। পিনটোর মা ধর্মের আশ্রয়ে মানসিক শান্তি খোঁজেন। বাবা এক টেকসটাইল ফ্যাক্টরির পুরনো কর্মচারী। ট্রেডইউনিয়ন-এর কথায় ফ্যাক্টরিতে ধর্মঘট হলে ফ্যাক্টরি লকআউট হয়ে যায়। এদিকে পিনটোর প্রেমিকাও তার পরিবারের সঙ্গে বিদেশে চলে যাবার কথা ভাবে—যেখানে জীবন অনেক স্বচ্ছল এবং অনেক প্রাত্যহিক সমস্যার সহজ সমাধান পাওয়া যাবে। এমনি এক দুঃসহ, মর্যাদাহীন, অসহায় অবস্থায় হঠাৎ অ্যালবার্ট পিনটোর মনে জন্ম নেয় কিছু বিদ্রোহী প্রশ্ন—কিসের জন্যে বেঁচে থাকবে মানুষ? কোথায় শেষ পর্যন্ত আশ্রয় আমাদের? কোন মূল্যবোধের মধ্যে আমরা পেতে পারি স্থিতি শান্তি? এবং এ সব প্রশ্নের কোনো উত্তর সে পায় না বলেই এক রাগের ক্ষোভ তাকে গ্রাস করে।

ছবিটির মধ্যে রয়েছে বক্তব্যের একাধিক পরত। পিনটো রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে রেখে শুধু নিজের কাজ করে বেঁচে চেয়ে ছিল। মির্জা দেখাতে চেয়েছেন যে, সামাজিক সচেতনতার অভাব যে-কোনো মানুষের পক্ষেই ক্ষতিকর। পিনটো ছবির একেবারে অন্তিম দৃশ্যে রাজনৈতিক প্রটেস্টকে আধুনিক জীবনের মূল অস্ত্র হিসেবে উপলব্ধি করছে। এ-ছবির আর এক পরতে দেখানো হয়েছে, ভারতীয় সমাজে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় শেষ পর্যন্ত কোন পথে, কিভাবে সমাজের বৃহত্তর গোষ্ঠীগুলির

# ঘামাচির চুলকানি আর জ্বালাযন্ত্রনা ভুলে যান!

...শেষ মিলিত হতে পারে। উদ্দেশ্য রাজনৈতিক চেতনার মধ্যেই এই মিলন সম্ভব। কিন্তু এই বক্তব্যের পরি-কল্পনা বড় বেশি এলোমেলো এবং অস্পষ্ট। কোনো ক্লাইম্যাক্স দানা বেঁধে ওঠে না। একটি সিকোয়েন্সকে ফুটিয়ে তোলার আগেই, অন্য সিকোয়েন্স-এ সরে যান মির্জা। ফলে সমগ্র ছবিটাই কেমন যেন অসংলগ্ন ছাড়াছাড়া। বোঝা যায়, সয়ীদ মির্জা আগাগোড়া চেষ্টা করেছেন নিজস্ব একটা ভঙ্গি, ভাষা বা স্টাইলে পৌঁছ-য়ের। অনেক জায়গায় সফলও হয়েছেন। কিন্তু এখনো তাঁর অভিনবত্বের অনেকটাই নড়বড় করছে। এ-ছবির কাহিনী তাঁর। চিত্রনাট্য তাঁর এবং কুন্দন শা'র। অভিনয়ে রয়েছেন নাসিরুদ্দিন শা (অ্যালবার্ট পিনটো), স্মিতা পাতিল (পিনটোর বোন), দিলীপ ধাওয়ান (পিনটোর ভাই) এবং শাবানা আজমি (পিনটোর প্রেমিকা)। এই সমন্বয় যে-কোনো ছবির পক্ষে ঈর্ষণীয় সম্পদ।

## আক্রোশ

ছবির প্রথম দৃশ্যেই বোঝা যায় ভিন্নজাতের চলচ্চিত্র। পর্দা জুড়ে অন্ধকারের মধ্যে জ্বলে ওঠে আগুনের সোনালি শিখা। ক্রমে সে-আগুন ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত পর্দায়। আগুনের মধ্য দিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে পর্দা জুড়ে দেখা যায় লাহানিয়া ভিখুর মুখ (অভিনয়ে ওম পুরি)। লাহানিয়ার পিছনে পুলিসের প্রহরা। স্ত্রী নাগিকে খুন করার অপরাধে লাহানিয়া ধৃত ও বিচারাধীন। ছবির প্রথম দৃশ্যে নাগির জ্বলন্ত চিতার সামনে লাহানিয়াকে আমরা দেখতে পাই। একে-একে ক্যামেরার সামনে আরো কয়েকটি বিহ্বল, শোকাচ্ছন্ন মুখ ভেসে ওঠে। আমরা পরিচিত হই লাহানিয়ার বোন ও বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে। বোনের কোলে রয়েছে লাহানিয়ার মাতৃহীন শিশু। লাহা-নিয়ার মুখে কোনো কথা নেই। সারা ছবিতেই সে কথা বলে না। শুধু তার চোখে জ্বলে আক্রোশের আগুন লাহানিয়া গরীব আদিবাসী! একেবারে নিরক্ষর। স্ত্রী হত্যার অপরাধে বিচারাধীন হয়েও সে কোনো কথা বলে না। সরকারী কৌঁসুলী কুলকারনির (অভিনয় : নাসিরুদ্দিন শা) কাছে লাহানিয়ার এই নীরবতা গভীর কোনো সত্যের ইঙ্গিতবহ। কুলকারনি এই রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করে। এবং শেষ পর্যন্ত সে বুঝতে পারে যে, লাহানিয়ার স্ত্রীকে প্রথমে ধর্ষণ ও পরে হত্যা করে সমাজের এমন কিছু ক্ষমতাশালী মানুষ যারা আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে। এই উন্মোচনের প্রেক্ষিতে লাহানিয়ার মূক আক্রোশের তাৎপর্য কুলকারনির কাছে প্রথম স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবং যে-দৃশ্যে লাহানিয়া তার বোনকে খুন করছে সে-দৃশ্যের ভয়াবহতা সত্ত্বেও আমরা বুঝতে পারি যে, লাহানিয়া অপরাধী নয়। নাগির মতো লাহানিয়ার বোনকেও ধর্ষিত হতে হতো . সেই একই মানুষগুলোর দ্বারা যাদের কাছে আইনের লম্বা হাত কখনই পৌঁছয় না। লাহানিয়ার

ওম পুরি ও স্মিতা পাতিল

হাতে প্রাণ দিয়ে তার বোন অন্তত অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে বেঁচে গেল।

আক্রোশ গোবিন্দ নিহালানির প্রথম ছবি নিহালানি শ্যাম বেনেগাল এর ক্যামেরাম্যান ছিলেন। রিচার্ড অ্যাটেনবরোর মহাত্মা গান্ধী ছবিতেও তিনি ক্যামেরার কাজ করেছেন। আক্রোশ তৈরি হয়েছে বিজয় টেন্ডুল-কার-এর কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে। আক্রোশ ছবির মধ্যে এমন কিছু গুণ রয়েছে যা সাধারণ দর্শক-কেও আকৃষ্ট করবে। প্রথম গুণ হল, নিহালানি তাঁর প্রথম চলচ্চিত্রেই সহজভাবে একটি কাহিনীর মাধ্যমে তাঁর বক্তব্যকে তুলে ধরতে পেরেছেন। দ্বিতীয় গুণ, ধীরে ধীরে সাসপেন্স তৈরি করে সেটিকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখা হয়েছে। কাহিনীর কোনো জটিলতা নেই, অথচ একটা ঘটনার সূত্র ধরে ক্রমশ একটা রহস্যের মধ্যে এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে—এই বৈশিষ্ট্য দর্শকদের আকৃষ্ট করবে। অর্থাৎ নিহালানি সহজভাবে ঋজু ভাষায় সুঠাম ভঙ্গিতে একটি কাহিনীর বিন্যাসে সক্ষম। কোনো নবাগত চলচ্চিত্র পরিচালকের পক্ষে এটি অতি মহৎ গুণ। এছাড়া নিহালানি তাঁর অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাছ থেকে ছেঁকে বার করে এনেছেন তাঁদের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদান। শোধ-এর প্রধান চরিত্র ওম পুরি এ-ছবিরও কেন্দ্রীয় চরিত্রে রয়েছেন। এবং এই মূকাভিনয়ের চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি। অসামান্য অভিনয় করেছেন ওম পুরি। নাসিরুদ্দিনের অভিনয়ও আক্রোশ-এর আকর্ষণকে বাড়িয়েছে নিঃসন্দেহে। অ্যালবার্ট পিনটোতে নাসিরুদ্দিন ভিন্ন মাপের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন—কিন্তু সমান-ভাবে সফল। লাহানিয়ার স্ত্রী নাগির সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় অভিনয় করেছেন স্মিতা পাতিল। কিন্তু স্মিতার ক্ষমতার বিস্ময়কর প্রকাশ আমরা দেখতে পাই এখানে। বিশেষ করে একটি উন্মত্ত প্রেম-দৃশ্যে স্মিতা অবিস্মরণীয়। ভারতীয় ছবিতে এমনি স্বাভাবিক প্রেমের দৃশ্য খুব বেশি দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তবু আক্রোশ একাধিক দুর্বলতার শোচনীয় শিকার। প্রায় আড়াই ঘণ্টার এই ছবিকে সহজেই দু ঘণ্টার মধ্যে নিয়ে আসা যেত। ছবির প্রায় প্রারম্ভেই গানের ব্যবহার খুবই দুর্বল। সমুদ্রের ধারে জজ সাহেবের প্রাতঃভ্রমণ অপ্রয়োজনীয়ভাবে দুর্বল এবং কমার্শিয়াল হিন্দি ছবির ফরমুলায় আক্রান্ত। গ্রামের গণ্যমান্যরা যে-দৃশ্যে তাস খেলতে মিলিত হয় সেটিও অনাবশ্যক সাজানো বলে মনে হয়। রেডিওতে গানের ব্যবহারে এবং আবহসংগীতেও সনাতন বাণিজ্যিক ছবির প্রভাব দেখতে পাই। ছবির সামগ্রিক পরিচালনায় আরো বেশি মননশীলতার প্রয়োজন ছিল। আক্রোশ এ-বছরে আমাদের অষ্টম আন্ত-র্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রথম হয়েছে।

## শোধ

প্রায় একই সঙ্গে তিনটি অভিনব, অ-বাণিজ্যিক হিন্দি ছবির মুক্তি কল-কাতার সাংস্কৃতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সীতাকান্ত মিশ্র প্রযোজিত শোধ-এর পরিচালনা করেছেন বিপ্লব রায়-চৌধুরী। 'অ্যালবার্ট পিনটো কো গুস্সা কিঁউ আতা হ্যায়' ছবিটির প্রযোজনা করেছেন পরিচালক সয়ীদ আখতার মির্জা নিজেই। এবং দেবী দত্ত ও নারায়ণ কেনি প্রযোজিত 'আক্রোশ'-এর পরিচালনা করেছেন গোবিন্দ নিহালানি। তিনটি ছবিই ইস্টম্যানকালারে তৈরি।

শোধ শুধু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোট গল্প 'গরম ভাত' অবলম্বনে তৈরিই নয়, এ-ছবির চিত্রনাট্যেও বিপ্লবের সঙ্গে সুনীল অংশগ্রহণ করেছেন। ফলে, মূল কাহিনীর মেজাজ, কিছু কিছু বর্জন ও পরিবর্ধন সত্ত্বেও, অব্যাহত রয়েছে। সুনীলের ছোট গল্পে যে তীব্র শ্লেষ ও বিদ্রূপের চোরা ইঙ্গিত পাঠককে ক্ষতবিক্ষত করে, তা যখন মাধ্যমের রূপান্তর পেরিয়েও আমাদের অবিকলভাবে ধাক্কা দেয়, তখন প্রশংসা না করে উপায় থাকে না। "গরম ভাত" ছোটগল্প হিসেবে যে-পর্যায়ের নিটোল শিল্পকীর্তি, "শোধ" ঠিক সেই মাপের নির্ভাঁজ, ত্রুটিহীন শিল্পকর্ম নয়। মূল কাহিনীর জমাট বুনন এবং প্রচেষ্ট সংহতির অভাব শোধ-এর সবচেয়ে বড় দোষ। কিন্তু তবু এ-ছবির পরিচালক এই বিশেষ মাধ্যমটি বোঝেন—এবং বোঝেন বলেই, শোধ সুনীল গঙ্গো-পাধ্যায়ের ছোটগল্পের অনুবাদ, কিংবা ভাবানুবাদ নয়—প্রবল রূপান্তর।

যে দারিদ্র্য-পীড়িত, মুমূর্ষু গ্রামে কাহিনীর শুরু ও সমাপ্তি তাকে সমস্ত ভারতবর্ষের প্রতিরূপ বলে ধরে নেওয়া যায়। ছবির প্রথম থেকেই এক ক্রমশ ঘনিয়ে আসা যন্ত্রণার জগতে আমরা প্রবেশ করছি। গ্রামের অন্ধকার পথে লণ্ঠন হাতে কতিপয় যুবক বেরিয়ে পড়েছে ভূতের সন্ধানে—ভূতের খরিদ্দার তারা, নগদমূল্যে কিনতে চায় ভূত। গ্রামের যে-কোনো দরিদ্র মানুষ মাত্র একটি ভূত ধরে দিতে পারলেই পাবে টাকা। এবং ভূতের মূল্য প্রতি রাত্রে বাড়তেই থাকে—দশ, বিশ, একশো—একটি ভূতের বিনিময়ে একশো টাকা অর্থাৎ দীর্ঘ উপবাস, নিরন্তর ক্ষুধার যন্ত্রণা ও নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার পথ। শহর থেকে গ্রামে ছুটি কাটাতে এসেছে সুরেন্দ্র। সেই হচ্ছে ভূতের প্রধান ক্রেতা—গ্রামের ভূত শহরে চালান দেবে সে। প্রতিরাত্রে সে ভূতের মূল্য বাড়িয়ে দেয়—আর সেই সঙ্গে মুমূর্ষু গ্রামবাসীদের মধ্যে জেগে ওঠে লোভ, আকাঙ্ক্ষা, একটি ভূতের বিনিময়ে ভূতের মতো জীবন থেকে মুক্তির প্রবল বাসনা। পরিচালক

ওম পুরি

এক অবিস্মরণীয় ফ্ল্যাশব্যাক-এ আমাদের সুরেন্দ্রর অতীত জীবনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সুরেন্দ্র তখন এক জমিদার-গৃহে বালকভৃত্য। যে-দৃশ্যে জমিদার বাড়ির বিশাল প্রাঙ্গণে তাকে কাঠ দিতে দেখি কিংবা যে-দৃশ্যে জমিদার তার খাটে বসে একা ধরে হাতপাখায় বাতাস করছেন—এ-সব দৃশ্যের অভিঘাত দূর-প্রসারী। এই জমিদার বাড়ির সিকোয়েন্স শোধ-এর সবচেয়ে জোরালো অংশের একটি। সুরেন্দ্রর পিতাকে কে যেন হত্যা করে। গ্রামের মোড়লস্থানীয় লোকেরা বলে, সুরেন্দ্রর বাপকে ভূতে মেরেছে। কিন্তু সুরেন্দ্রর বাবার কাছে যে টাকা পয়সা ছিল, সেগুলোও কি ভূতে নিল? সেই ভূতের সন্ধানেই সুরেন্দ্রর গ্রামে আগমন। গ্রামের মানুষরাই তো আজ অভাবের তাড়নায় ভূতের জীবন যাপন করছে। পরিচালক বিপ্লব রায়চৌধুরী টুকরো-টুকরো ইঙ্গিতের মাধ্যমে এই পীড়িত, অসুস্থ, যন্ত্রণাকাতর জীবনের কিছু ছবি তুলে ধরেছেন। শান্তি সদানন্দর পুত্রবধূ। গৃহে পুত্রের অনুপ-স্থিতির সুযোগ নিয়ে সদানন্দ দু-মুঠো গরম ভাতের বিনিময়ে পুত্রবধূকে ভোগ করে। এবং শান্তি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে হিসটিরিয়া রোগে আক্রান্ত হলে সদানন্দ রটিয়ে দেয় তাকে ভূতে পেয়েছে। গ্রামে আর এক ভূতের দেখা পাই আমরা বৃদ্ধ পবনের মধ্যে। যে-দৃশ্যে ক্ষুধার্ত পবন এক মুঠো ভিটামিন ট্যাবলেট চিবিয়ে খেয়ে ফেলে তা ভুলতে পারব না অনেক দিন। ছবির নৈশ দৃশ্যগুলি বিষয়ের গাম্ভীর্যকে বর্ধিত করেছে অনেকদূর পর্যন্ত। রাজন কিনাগির ক্যামেরার কাজ—বিশেষ করে নৈশদৃশ্যের যথাযথ মেজাজ সৃষ্টির ব্যাপারে—প্রশংসনীয়। পরিচালক বিপ্লব চৌধুরী নিজেই এ-ছবির এডিটিং করেছেন। ফিল্ম-এডিটর হিসেবেই তিনি প্রথমে চলচ্চিত্রের জগতে এসেছেন। কিন্তু শোধ ছবির বিশেষ দুর্বলতাগুলি এসেছে দুর্বল এডিটিং থেকে। নিজের ছবির প্রতি আরো একটু নির্দয় হলে শোধ-এর দৈর্ঘ্য হ্রাস পেত, অনেক এক-ঘেয়েমি থেকে পরিত্রাণ পেতাম আমরা—শোধ আরো টানটান ছবি হতে পারত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৭০-এ নির্মিত বিপ্লবের লেটেন্ট নামের তথ্যচিত্র জাতীয় পুরস্কার পায়। ১৯৭৫-এ তৈরি তাঁর প্রথম ফিচার-ফিল্ম "কর্ণবিবর্ণ" বহু

আলোচিত ছবি। ওড়িয়া ভাষায় তৈরি তাঁর চিলকা তীরে ছবিটিও জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল। শোধ ১৯৭৯-র ভারতীয় প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদ্ম পেয়েছে। এ-ছবিতে সুরেন্দ্র ভূমিকায় শ্রম পুরি ও পবনের ভূমিকায় কানু বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

## অলঙ্কারের বার্ষিক অনুষ্ঠান

'অলঙ্কার' আয়োজিত তোম্বল দাস ও সন্দীপ মিত্রের নিবেদন 'অনবদ্য রবীন্দ্রসংগীত সন্ধ্যা' উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। বর্ণাঢ্য মঞ্চ অথবা দর্শক আসনে নামী নক্ষত্রের সমাবেশ নয়, নয় শিল্পী নির্বাচনের কোলাহল এই সংগীত-সন্ধ্যা যে যথার্থই অভিজাত হয়ে উঠেছিল, এ কথা মানতেই হয়।

অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানের সূচনায় কানাড়া রাগের ধ্রুপদাঙ্গের 'হে মহা প্রবল বলী' গানে যে সাংগীতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা তাঁর সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে বজায় থাকেনি। একমাত্র ব্যতিক্রম 'প্রলয় নাচন নাচলে যখন'—যা এদিনের আসরে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নিবেদন। প্রয়াত পঙ্কজকুমার মল্লিকের কণ্ঠে অনাদৃত এই গানটি যে অসামান্য দক্ষতায় তিনি পরিবেশন করলেন তাতেই স্পষ্ট উপলব্ধি করা গেল গানে রূপসৃষ্টি তাঁর ইচ্ছাধীন। কিন্তু তার নির্বাচনপদ্ধতি সম্পর্কে কৌতূহল থেকেই যায়। জানতে ইচ্ছা করে কেন তিনি 'প্রলয় নাচন' গানটির পূর্ব ও পরবর্তী গান নির্বাচন করেন যথাক্রমে 'বধূ মিছে রাগ কোরো না' এবং 'সহে না যাতনা'। এই সব গান সংগীত পরিবেশনকালে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এসে পড়ে অথবা এর পিছনে অন্য কোনো চিন্তা কাজ করে? প্রয়োজনের তাগিদে গানগুলিকে দু-তিনটি ভাগে ভাগ করে এক এক গুচ্ছে এক-এক ধরনের গান পরিবেশন করা যায় না? এই শিল্পীর ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য কারণ, যে অল্প কয়েকজন প্রকৃত শিক্ষিত শিল্পী আছেন ইনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

ঋতু গুহ মোট আটখানি গান পরিবেশন করেন। একালের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠিত শিল্পী তাঁর কাছে প্রত্যাশাও তাই অনেক। তিনি অনুষ্ঠান শুরু করেন পূরবীর সুরে 'বীণা বাজাও হে' গানটি দিয়ে। মুক্তকণ্ঠ শিল্পী তিনি, তাঁর লয়-জ্ঞান সুন্দর তাই তিনি এই গানে আকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী গান নির্বাচন করেন প্রভাতী মিশ্র গুণকেলীর সুরে 'জননী তোমার করুণ চরণখানি'—কেন এই নির্বাচন? অন্য গানগুলির মধ্যে 'শ্রাবণের ধারার মতো', 'চির সখা হে' সার্থক পরিবেশন। প্রসঙ্গত একটি কথা : প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চগ্রামে সুর বাঁধেন তিনি তাতে কখনো কখনো গানের তীক্ষ্ণতা বাড়ে অথচ তাঁর কণ্ঠের মন্দ্র সুরের গম্ভীরতায় যে

সুচিত্রা মিত্র

আবেদন তা আশ্চর্য সুন্দর।

পরবর্তী শিল্পী ছিলেন সুবিনয় রায়। তাঁর কণ্ঠে বহুশ্রুত 'সংসারে কোনো ভয় নাহি' 'আজি রাজ আসনে' 'ডেকে বার বার ডাকে' 'জগতে তুমি রাজা' 'নিত্য সত্যে চিন্তন' 'মনে মনে আছি জড়ায়ে হায়' প্রভৃতি গানগুলি পরিবেশন করলেন। অধিকাংশই ছিল ভাঙা গান। গানগুলির সঠিক রাবীন্দ্রিক রূপ তাঁর কণ্ঠে আদর্শ স্বরূপ ধৃত তিনি এইসব গান অধিকাংশ গায়ক গায়িকার মতো কোনোক্রমে উচ্চারণ করেন না। সনিষ্ঠ শিক্ষা ও সাধনায় অত্যন্ত সাবলীল এই পরিবেশন তাই অনায়াসে সুরের মোহজাল ছড়িয়ে দিতে পারে। স্বরস্থিতি, পরিচ্ছন্ন সাংগীতিক অলঙ্করণ প্রয়োগ অর্থাৎ সামগ্রিক বিচারে ক্রিয়াপরতা তাঁর গানগুলিকে অনন্য মর্যাদা দান করে কিন্তু কেন তিনি এই একগুচ্ছ গানের মধ্যে ঘুরে ফিরবেন? তিনি এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী তাই তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ধরনের গান শোনা একান্ত অপরিহার্য এই কথাটি সবিনয়ে তাঁকে স্মরণ করাতে চাই।

সবশেষ শিল্পী ছিলেন সুচিত্রা মিত্র। গান নির্বাচনে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারেন অনায়াসেই। এই নির্বাচনকে উপলক্ষ করে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তিনি রবীন্দ্রনাথের গানের মূল সুরটির প্রতি অনেক বেশী মনোযোগী। 'কান্নাহাসির দোল দোলানো' 'সন্ধ্যা হল গো' 'আমার বিচার কর তুমি' 'আঘাত করে নিলে জিনে' 'আরো আরো প্রভু' 'দিন যায় রে বিষাদে' প্রভৃতি গানও তার ক্রম নির্বাচনে এই বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। তাই যখন তাঁর কণ্ঠে 'তোমার রাতে মিলাক আমার জীবন সাঁঝের রশ্মিরেখা' 'তুফান দেখে ঝড়ের রাতে/ছেড়েছি হাল তোমার হাতে' অথবা 'দিন যায়রে বিষাদে/স্বার্থ কোলাহলে ছলনার বিফল বাসনায়' শুনি তখন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে এখানে শিল্প ও শিল্পীর সার্থকতা।

শুভাষ চৌধুরী

ফটো : সুবীর চট্টোপাধ্যায়

## প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

### সত্যেন ঘোষাল (১৯২১—)

তিন "ক্যালকাটা গ্রুপের" গ্রুপ যে-সব শিল্পী নতুনতর পরীক্ষায় মেতে উঠেছিলেন কলকাতায় তাঁদের মধ্যে সত্যেন ঘোষাল, আদিনাথ মুখোপাধ্যায় বিমল দাশগুপ্তের নাম করতে হয়। এঁদের মধ্যে আদিনাথ মারা গেলেন। বিমল দাশগুপ্ত সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করলেন। সত্যেন ঘোষালকে লোকে দেখল সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র এবং সাধারণ ছাত্রদের অন্তরঙ্গ বন্ধু অধ্যক্ষ হিসেবে। পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীদের কাছে সত্যেনবাবুর নাম অধ্যক্ষ হিসাবে নয়, (কারণ তিনি জবরদস্ত ছিলেন না, ছিলেন স্নেহশীল), কিন্তু চিত্রকলা বিভাগের প্রধান হিসাবে। তিনি নিজস্ব শৈলী কোন ছাত্রর উপর কখনো চাপিয়ে দেন নি। বরং প্রত্যেক ছাত্রের নিজস্ব চিত্রাঙ্কন রীতিকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন। চিত্রকলার প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক হিসাবে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

অধ্যক্ষ হিসাবে অবসর গ্রহণের পর তিনি সব ক্ষণ ছবি আঁকছেন। বিশেষত ইদানীং অভিযাত্রিকের মত হিমালয় ভ্রমণ করে ছবি এঁকেছেন। প্রতিকৃতি আঁকায় ওঁর খ্যাতি প্রচুর। ভারত সরকারের অনুরোধ পেয়ে তিনি রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রীদের প্রতিকৃতি এঁকেছেন। তাঁর আঁকা নেহরু-কেনেডীর যুগ্ম প্রতিকৃতি মার্কিন দেশে আছে। প্রতিকৃতিতে তাঁর হাত পরিষ্কার সৃজনশীল। সত্যেন ঘোষালের অজ্ঞাতবাসের পর প্রত্যাবর্তন সমকালীন ভারতীয় চিত্রকলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক (১৯৪৩) এবং স্নাতকোত্তর পাঠ গ্রহণ (১৯৪৫)। ১৯৪৮, ৪৯, ৫০—দিল্লীতে তিনটে একক প্রদর্শনী। ১৯৫১ সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের চিত্রকলার প্রধান অধ্যাপক হিসাবে যোগদান। ১৯৫৪-৫৫ লণ্ডনের স্লেড স্কুলে উচ্চতর শিক্ষালাভ। ১৯৫৫, ৫৬ একক প্রদর্শনী, দিল্লী। রাষ্ট্রপতি ভবনের অনুরোধ পেয়ে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জহরলালের শপথ গ্রহণের বিরাট তৈলচিত্র আঁকলেন (১৯৫৭)। ১৯৬১—৬৫ দিল্লীতে ৩টি কলকাতায় দুটি একক প্রদর্শনী। আন্ত-এশিয়া প্রদর্শনী টোকিও, ম্যানিলা, ব্যাংকক, হংকং-এ হল। প্রথম পুরস্কার পেলেন সত্যেন (১৯৬৫)। জাপানের ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব প্লাস্টিক আর্টস টোকিওতে তাঁর একক প্রদর্শনী করল। তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে গেলেন (১৯৬৬)। সেই সময় দূরপ্রাচ্য ভ্রমণ করলেন। ১৯৬৮-৭১ দিল্লী-কলকাতায় দুটো প্রদর্শনী। ১৯৬৯-এ সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ হলেন। ১৯৭৩ অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত হলেন। ভারত সরকারের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে ২৩তম ওয়ার্ল্ড আর্ট কংগ্রেসে যোগদান করতে গেলেন এডিলেডে (১৯৭৮)। সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে অবসর গ্রহণ করলেন ১৯৭৯তে। তাছাড়া তিনি লোকসভার সেক্রেটেরিয়েট শিল্প সমিতির সদস্য ছিলেন ১৯৫৭। ললিত কলা আকাদেমির জেনারেল কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন ১৯৬৯। দিল্লীর আর্ট ফ্যাকল্টির ভাইস প্রেসিডেণ্ট ছিলেন ১৯৬৮-৬৯। রবীন্দ্রভারতী কার্যকরী সমিতির সদস্য। শিল্পী হিসাবে এইসব কাজে ব্যস্ততা ক্ষতি করেছে।

সত্যেন ঘোষালের জেদ অসাধারণ ... সকালের হাওয়ার মতো ভেতরে ... তিনি মেঘপালকের মত দিকেদিকে ঘু ... ঘুরে ঘুরে তুলতে চাইছেন। অনুপ্রা ... হয়ে তিনি ছবি আঁকছেন। শেষবেলা ... ছবি তাই তাতে দুর্দান্তের আবে ... রঙিন শান্ত বৈভব। রংএর তুলির টা ... টোনের যে ঐশ্বর্যের সন্ধান ... যৌবনের কাজের সম্পর্ক তা তি ... গুরুত্বপূর্ণ সাধ্যাতীত মত ত্যাগ ... এসেছেন। সর্বেশ্বরবাদী (প্যান ... ইস্টের) মত তিনি প্রকৃতিকে দেখেছেন ... পিপাসায়, ওয়ার্ডসওয়ার্থের ... পেয়ে বসেছে তাঁকে। কিন্তু ... উপনিবাসিক অন্বেষণের প্রতি ... আকর্ষণ বোধ করেননি। ১৯৭৯-৮ ...

সালে আঁকা চিত্রমালার নাম "ধ্যানমগ্ন নিসর্গ"—দেবতাত্মা হিমালয়ের ছবি। তিনি এর উদাসীনতা, বিস্তার, পাথরের ওপর আবহাওয়ার কারুকর্ম, মে... তুষার থেকে ঋতুরং পর্যন্ত ধরতে চেয়েছেন। এসেছে কুয়াশা। নিঃশব্দতা প্রতিধ্বনি শূন্যে ... ওঁর চোখে চো... রেখে গুহায়, গিরিসংকটে। শুধু ম... রয়েছে ছবি অতিরিক্ত মিষ্ট করেছেন প্রকৃতির ক্রোধী দুর্বিনীত মেজাজটা ধর... পড়েনি। এখন সর্বভারতীয় বাজারে ... চলছে না ভেবে দুরন্ত অশ্বারোহী মত তুলি চালাতে হবে তাঁকে।

"ধ্যানমগ্ন প্রকৃতি" চিত্রমালা... অন্যতম তৈলচিত্র (৪৮″×৫৬″)... দিগন্তলীন নীলের মধ্যে তুষা... আচ্ছাদিত পর্বত। মাঝখানের সারি... রূপমালার মত বেষ্টন করে আছে দ... দিক দিয়ে পার্বতী নদী। রংএর কা... কুরি। বুনোটে মরি মরি রূপ... সাংসারিক নানা ঝামেলায় মানুষ... তাঁর স্বপ্নের কাছে দূরে ঠেলে দে... সত্যেন ঘোষালের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে... কিন্তু একরোখা তিনি। সামা... পশ্চাদপসরণ জয়লাভের জন্যই। ত... প্রত্যাবর্তন রাজোচিত।
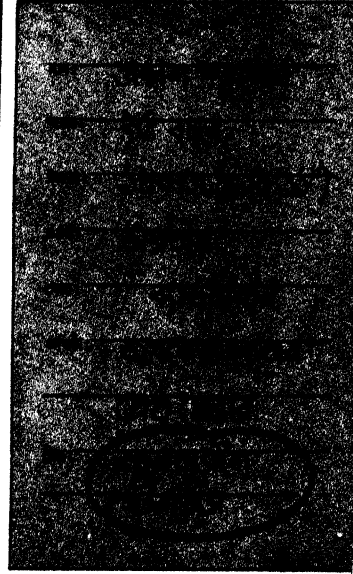
প্যারাগন
ELPAR
এক নতুন ফ্যাশনের ছন্দ—রাজ-দৃপ্ত ও স্বচ্ছন্দ
প্যারাগন টেক্সটাইল মিল্‌স প্রাঃ লিমিটেড, বম্বে-৪০০ ০১৩,

# ঘামাচির চুলকানি আর জ্বালা–যন্ত্রনা ভুলে যান!

## চিঠিপত্র

### রবীন্দ্রসংগীত কি লাইট মিউজিক ?

শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য ১২ই এপ্রিল দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর চিঠিতে ('রবীন্দ্রসংগীত কি লাইট মিউজিক ?') আকাশবাণীর এক্তিয়ারে রবীন্দ্রসংগীতকে 'লাইট মিউজিক' হিসেবে গণ্য করা হয় বলে প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং রবীন্দ্রসংগীতকে 'বিশেষ মর্যাদায়' প্রতিষ্ঠা করার জন্য 'প্রত্যক্ষ আন্দোলন' ও 'জনমত গঠনের' ডাক দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, 'লোকাল অডিশন কমিটির' সদস্য হিসেবে রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি আকাশবাণীর মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে উক্ত কমিটি থেকে পদত্যাগ করার উদ্দেশ্যে যে চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন, সেই চিঠির অংশবিশেষও তিনি উদ্ধৃত করেছেন। তা থেকে আমরা জানতে পারছি যে শ্রীভট্টাচার্য মনে করেন, আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে স্থিরসংকল্পভাবে আধুনিক গানের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে চলেছেন। শ্রীভট্টাচার্যের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

রবীন্দ্রসংগীত কি লঘুসংগীত ?—এ প্রশ্ন অত্যন্ত সঙ্গত। কারণ, 'লঘুসংগীত' বললেই যে ধরনের সংগীতের কথা আমাদের মনে আসে, সে ধরনের সংগীত রবীন্দ্রনাথ কমই সৃষ্টি করেছেন। আমি জানি এইটুকু লেখার জন্যেই রবীন্দ্রসংগীতের অনেক অনুরাগী ও আমাদের দেশের রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের ধারক-বাহক কুপিত হবেন। কারণ, জন্মাবধি আমরা রবীন্দ্রনাথের নাম শুনলেই দুহাত পিছিয়ে এসে কুর্নিশ করতে শিখেছি। বিশেষত রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পীদের এ নিমন্ত্রিত শ্রোতাদের বেশির ভাগের মনেই এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে রবীন্দ্রসংগীত মানেই এক মহা গুরুতর ব্যাপার, যা যাবতীয় বিচার-বিবেচনার ঊর্ধ্বে। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের স্থান বাংলার সংগীতজীবনে যে কোথায়, সেই সংগীতের স্রষ্টাটির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যে কতো নিবিড় একথা যদি আমরা রক্তমাংসের মানুষের মতো ভাবতে ও বুঝতে শিখতাম তা হলে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার দূরত্বে গিয়ে কুর্নিশ না করে তাঁকে সুজন-সখা জ্ঞানে এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাত ধরতাম। এবং তা হলেই আমরা টের পেতাম যে, যে-কোনো সংগীতস্রষ্টার কাজে গুরুর পাশাপাশি লঘুও থাকে, গভীর ভাবনার পাশাপাশি তাৎক্ষণিক আনন্দের বা মজার লহর থাকে। সংগীত এমনই এক শিল্পমাধ্যম যা সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে অবগাহনের আনন্দও দেয়, নিস্তরঙ্গ দীঘিতে পরম নিশ্চিন্তে গা ডোবানোর সুখ দেয় আবার পাহাড়ের কোনো ফাটল থেকে নেচে-আসা ঝর্নার জলে পা ভেজানোর তাৎক্ষণিক মজাও দেয়। 'এ মোহ আবরণ খোলো' 'কে গো অন্তরতর সে'-র পাশাপাশি 'হা রে রে রে রে রে রে আমায় ছেড়ে দে রে দেরে'-র অপেক্ষাকৃত লঘুত্ব সৃষ্টি করার হক ও মনুষ্যত্ব রবীন্দ্রনাথ রাখতেন বলেই তিনি রবীন্দ্রনাথ। এবং পৃথিবীর সকল সার্থক সংগীত-স্রষ্টার কাজ বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে তাঁদের গুরুভার কাজগুলোর মতো তাঁদের লঘুভার কাজগুলোও লঘুত্বের হিসেবে সার্থক।

রবীন্দ্রনাথের সব গানকে লঘু সংগীতের পর্যায়ে ফেলে দেওয়ার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর সময় যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ধরনের গানগুলোকে সাংগীতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত করা যায় কিনা তা নিয়ে ভাবার সময়। কারণ অমুকে রবীন্দ্রসংগীত ভালো গায় বললে কিছুই বলা হয় না। কারুর গায়কীতে এবং স্বাভাবিক সাংগীতিক প্রবণতার গুণে তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদাঙ্গের গান বাউলাঙ্গের গানের চেয়ে বেশী ভালো আসে। এমন গায়ক বা গায়িকা খুব কমই আছেন যিনি রবীন্দ্রনাথের সব ধরনের গান গেয়ে শ্রোতাদের মনে সমমাত্রিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেন। এই বিষয় ভাবার সময় সংস্কার ও ব্যক্তিপূজার সংকীর্ণতা ছেড়ে বেরিয়ে এসে নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণের শরণ নিতে হবে আমাদের।

শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্যের চিঠিতে তাঁর পদত্যাগপত্রের উদ্ধৃতি পড়ে যে-কোনো সজাগ পাঠকের মনে হবে যে, রবীন্দ্রসংগীতকে লঘু সংগীত বলায় তিনি সংগত কারণেই বিক্ষুব্ধ হলেও "আধুনিক" গানকে তিনি দিব্যি লঘু সংগীত বলে স্বীকার করেন। এবং রবীন্দ্রসংগীতকে আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ আধুনিক গানের সমগোত্রীয় মনে করেন বলে তাঁর বিশ্বাস। এখানে আমার প্রশ্ন : "আধুনিক" গান বলতে তিনি কোন্ ধরনের গানের কথা বলছেন ? রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে আমরা আধুনিক সাহিত্য বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথের গানও কি আধুনিক গান নয় ? গত এক শো বছর ধরে বাংলা আধুনিক গানের যে ধারা চলে আসছে, রবীন্দ্রনাথ কি তার উৎসে নেই ? আর "আধুনিক গানের" প্রতি এমন কটাক্ষ কেন ? আজকের দিনে সংগীত প্রায় সামগ্রিকভাবে ভোগ্যপণ্যে পরিণত হবার জন্য এবং তার ওপর ব্যবসায়িক স্বার্থ চাপ সৃষ্টি করার জন্য গ্রামোফোন কম্পানী, আকাশবাণী ও চলচ্চিত্রের মিলিত চক্রে কাপড়ের নতুন নতুন ছিটের মতো যে সব গান তৈরী হচ্ছে ও বাজারে বিক্রী হচ্ছে তাদের মূল্যায়নের মাপকাঠিতে যদি "আধুনিক বাংলা গান" নামে এক শিল্পরূপকে মাপা হয়, তা হলে উত্তীর্ণ অসংখ্য গানের প্রতি অবিচার করা হয় না কি ? "আধুনিক বাংলা গান" তো এক বিরাট ব্যাপার। আকাশবাণীর হয়ে ওকালতি না করেও বলা যায় যে "আধুনিক বাংলা

... [illegible] দৃষ্টান্ত প্রস্তাব হয়েছে এবং এখনও মাঝে মধ্যে হচ্ছে যে রবীন্দ্রসংগীতকে "আধুনিক বাংলা গানের" পর্যায়ভুক্ত করলে রবীন্দ্রসংগীতের জাত যাবে না। শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য যদি "আধুনিক বাংলা গানকে" তাঁর লেখায় অবহেলা না করে, রবীন্দ্রসংগীতের মর্যাদা-রক্ষার দায়িত্ব সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করার সংগে সংগে "আধুনিক বাংলা গানের" প্রতি আমাদের সমাজ ও সেই সমাজের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎপাদন-ব্যবস্থা গ্রামোফোন কম্পানী, আকাশ-বাণী ইত্যাদির মুড়ি-মিছরি এক করে দেওয়ার মনোভাব ও চক্রান্তের ব্যাপারেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন তা হলে বোধ হয় অনেক কাজের কাজ হতো। কারণ, যে কারণে সব রবীন্দ্রসংগীত "লাইট মিউজিক" নয় ঠিক সেই কারণেই সব তথা-কথিত "আধুনিক গান" তথাকথিত অর্থে "লাইট মিউজিক" নয়। এমন কি আকাশবাণীর "লাইট মিউজিক ইউনিটের" তৎপরতায় এককালে যেসব "আধুনিক" গান তৈরী হয়েছিলো সেগুলির মধ্যে অনেক গানই "লাইট" নয়।

রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরী হিসেবে তাঁর গানগুলোকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া যেমন আমাদের কর্তব্য, তেমনি রবীন্দ্রোত্তর যুগের বিভিন্ন মহান সংগীতস্রষ্টার গানগুলিকেও কখনও আলাদাভাবে, কখনও বা আধুনিক বাংলা গানের বহমান ধারায় তাঁদের অবস্থান অনুসারে, তাঁদের অবদান অনুযায়ী মর্যাদা-প্রদর্শনও আমাদের কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছিলেন "আধুনিক বাংলা গানের" এক অন্যতম পথিকৃৎ। বহুকাল ধরে বঙ্গসংস্কৃতির অনেক ধারক-বাহক "আধুনিক বাংলা গান"-এর বিষয়ে উন্নাসিকসুলভ মনোভাব পোষণ করে এই শিল্প-রূপকে ব্রাত্য করে রেখে খোদ রবীন্দ্রনাথের প্রতিই তেমন কোনো ঐতিহাসিক সুবিচার করেন নি। তাঁদের ঔদাসীন্য, তাঁদের অসহিষ্ণুতার, তাঁদের আলস্যের সুযোগ নিয়েছেন সেই শ্রেণীর "ব্যবসায়ীরা" যাঁরা অর্থনীতির ক্ষেত্রে অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ দিয়ে সৎ উপায়ে অর্জিত অর্থকে উৎখাত করে থাকেন। শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য রবীন্দ্রসংগীতকে তার "বিশেষ মর্যাদায়" প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। তাঁর পাশাপাশি আমি "আধুনিক বাংলা গান" নিয়ে নতুন করে ভাবনাচিন্তা করার "আধুনিক বাংলা গানের" বিভিন্ন সার্থক স্রষ্টার গানগুলিকে "বিশেষ মর্যাদা" দেওয়ার জন্য আন্দোলন করতে অনুরোধ করছি "আধুনিক বাংলার" শিল্পী ও শ্রোতাদের।

সুমন চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা-৪৭

॥ ২ ॥

১২ই এপ্রিল ১৯৮০ সংখ্যার দেশে অরুণ ভট্টাচার্য "রবীন্দ্রসংগীত কি লাইট মিউজিক?" এই শিরোনামে যে চিঠিখানি লিখেছেন, সে ব্যাপারে আমার কিছু বলার আছে। রেডিও কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রসংগীতকে 'লাইট মিউজিক' আখ্যা দিয়েছেন। এই 'লাইট মিউজিক' কথাটা আচমকা ক্ষোভের কারণ হতে পারে। তবে রবীন্দ্রসংগীত যে কালোয়াতী গান নয় সেটা আমরা সকলেই মেনে নিতে পারি। মূলত রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যই ছিল প্রাচীন কালোয়াতী গানকে (সুর, সুরবিন্যাস) সহজ করে অর্থাৎ 'লাইট' করে কথার গভীরতা দিয়ে সকলের মনে পৌঁছে দেওয়া। যার ফলে রবীন্দ্রসংগীতকে শুধু সংগীত না বলে সাহিত্য-সংগীতও বলা যেতে পারে। এখন কালোয়াতী গানের পাশাপাশি রবীন্দ্রসংগীতকে বিচার করতে হলে রবীন্দ্রসংগীতকে স্বাভাবিকভাবেই 'লাইট মিউজিক' আখ্যা দেওয়া যায়। এতে অন্যায়ের কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না।

অরুণবাবু ১৯৭৯ সালের জানুয়ারী মাস থেকে কলকাতা আকাশবাণীর অডিশন বোর্ডের রবীন্দ্রসংগীতের অন্যতম বিচারক অথচ ১৯৭৯ সাল থেকে এমন অনেক শিল্পীর রবীন্দ্রসংগীত বেতারে প্রচারিত হয়েছে (এর আগে যে হয়নি তা বলছি না) যা প্রচারিত হবার অযোগ্য। সেখানে রবীন্দ্র-সংগীত আর রবীন্দ্রসংগীত থাকে নি। অথচ সেইসব শিল্পীরা অরুণবাবুর বিচারে উত্তীর্ণ হয়েছেন। ভাবতে অবাক লাগে যে অরুণবাবু বেতার কর্তৃপক্ষের 'লাইট মিউজিক' আখ্যার প্রতিবাদে বিচারকের পদ ছেড়ে দেবার আবেদন করেছেন, তিনি একবারও ভাবেননি যে তাঁর অডিশন বোর্ডের বিচারের শিথিলতা রবীন্দ্রসংগীতকে কত বেশী 'লাইট' করে দিচ্ছে। আসল ব্যাপারেই অরুণবাবুর কোন প্রতিবাদ নেই। সবশেষে অরুণবাবু লিখেছেন প্রত্যক্ষ আন্দোলন ও জনমত গঠন করতে—"যতদিন না রবীন্দ্রসংগীতকে বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা যায় ততদিন।" আমি মনে করি রবীন্দ্র-সংগীত বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিতই। এ ব্যাপারে কারো সন্দেহ থাকতে পারে কি?

বনপাপিয়া [illegible]
কলকাতা-৪৭

॥ ৩ ॥

গত ১২ই এপ্রিল ১৯৮০ তারিখে 'দেশ' পত্রিকায় চিঠিপত্র বিভাগে শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য আকাশ-বাণীতে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে 'লাইট মিউজিক' স্তর থেকে বিশেষ মর্যাদার স্তরে উন্নীত করার জন্য যে প্রত্যক্ষ আন্দোলন এবং জনমত গঠন করার আহ্বান জানিয়েছেন তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। তবে নীতি এবং আদর্শের বিচারে এই দাবীর যথার্থতা থাকলেও মঞ্চে সম্মানমূল্যের বিনিময়ে সংগীত পরিবেশন করে জনপ্রিয় হবার প্রচেষ্টা ছাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রভাবশালী প্রথম সারির শিল্পীদের অন্য কোন বিষয়ে সময় দেবার মতো যথেষ্ট সময় আছে কিনা সে বিষয়ে বিতর্কে

অবকাশ আছে। তা ছাড়া রবীন্দ্র-সংগীতকে 'বিশেষ মর্যাদায়' প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনে সামিল হবার সঙ্গে সঙ্গে এটাও বিচার করে দেখা উচিত যে আকাশবাণীতে সচরাচর যে মানের রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন হয়ে থাকে তা 'বিশেষ মর্যাদার' যোগ্য কিনা। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, রাজাসনে বসলেই রাজা হয় না। বর্তমানে আকাশবাণীতে যে সব নবীন ও প্রবীণ শিল্পীরা নিয়মিত রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন, আদর্শ রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনের বিচারে তাঁদের কজন 'বিশেষ মর্যাদায়' প্রতিষ্ঠিত হবার যোগ্য তা বিচার সাপেক্ষ। ক্লান্ত কণ্ঠ, অস্পষ্ট ও সানুনাসিক উচ্চারণ, অসংযত ছন্দ, কম্পিত ও স্থানভ্রষ্ট স্বরক্ষেপণ, সীমায়িত স্বর-বিস্তৃতি, বৈচিত্র্যহীন গানের গন্ডী, বিচ্যুত স্বরলিপি প্রভৃতি এক বা একাধিক নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে যখন কয়েক জন শিল্পীকে আকাশবাণীতে নিয়মিত রবীন্দ্রসংগীত করতে দেখি তখন মনে প্রশ্ন জাগে এটা কি রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার মাধ্যম না শিল্পীদের প্রচার মাধ্যম? শ্রদ্ধেয় অরুণবাবু তো কিছু-দিন অডিশন বোর্ডের সদস্য ছিলেন, অরুণবাবু কি মনে করেন এই অডিশন নেওয়ার পদ্ধতিটা সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন? তা না হলে আকাশবাণীতে প্রায় নিম্নমানের রবীন্দ্রসংগীত শোনা যায় কেন? রবীন্দ্রসংগীতকে 'বিশেষ মর্যাদায়' প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনের আগে রবীন্দ্রসংগীতের অডিশন পদ্ধতিটা ত্রুটিমুক্ত করার জন্য আন্দোলন করার প্রয়োজন আছে, ন হলে গোড়া কেটে শুধু আগাতেই জল দেওয়া হবে। শুধু মাত্র অডিশন-পদ্ধতির পরিশোধন করলেই হবে না, যে সব শিল্পীর পরিবেশনে রবীন্দ্রসংগীতের 'বিশেষ মর্যাদার' পরিচয় পাওয়া যায় না তাঁদের অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য করা উচিত। কারণ শিল্পের চেয়ে শিল্পী কখন বড় হতে পারে না।

[…]ুব বিশ্বাস

[…]লকাতা—২৯

## [স]ংগীত ও ভাবনা

৮ই মার্চের দেশে শ্রীসুমন চট্টোপাধ্যায়ের 'সংগীত ও ভাবনা' শীর্ষক রচনাটি পড়লাম। ভারতীয় সমাজে সংগীতের ক্ষেত্রে ভাবনা-চিন্তার দৈন্য সম্পর্কে দ্বিমতের কোনো অবকাশই নেই। অতএব আমাদের এই অবহেলিত সাংস্কৃতিক দিকটিতে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের অভিনিবেশ নিশ্চিতরূপে সময়োচিত এবং সাধুবাদ-যোগ্য। কিন্তু এই প্রসঙ্গে শ্রীচট্টো-পাধ্যায়ের মতামতের সঙ্গে একটি মৌলপার্থক্য অনুভব করছি।

তাঁর মতে সংগীতের টেকনি-ক্যালিটিজ সম্বন্ধে অজ্ঞতা ('সংগীতের অ আ ক খ না জানা') ব্যাপক সংগীত-আলোচনার অনুপস্থিতির সংগত কারণ হওয়া উচিত নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর ধারণা সংগীতের ফর্মাল জ্ঞান-বিবর্জিত 'ল-মান'রাও গান-বাজনা নিয়ে প্রচুর আলোচনা করুন, তাতে দেশের সংগীত-সংস্কৃতির বিকাশই ঘটবে এবং ভারতীয় সংগীত ক্রমশ একটি মননশীল বা ইনটেলেকচুয়াল আর্ট হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। কিন্তু আমি বলব সিনেমা সাহিত্য অথবা ক্রিকেটের মতো সংগীতের পরি-প্রেক্ষিতেও যথার্থ, সৃজনশীল আলো-চনার জন্য একটা ন্যূনতম টেকনিকাল জ্ঞান অপরিহার্য। নচেৎ ঐসব অনায়াস-সম্ভব আলোচনা নিছক চা-কফির আসরে সময়-তাড়ানোর আড্ডাতেই পর্যবসিত হবে। বস্তুত গান-বাজনার ক্ষেত্রেও ঐ ধরনের আসর আড্ডা এবং লঘু চিন্তার খুব একটা অভাব আছে বলে মনে হয় না। আবার অন্যদিকে সংগীতের প্রাথমিক কলাকৌশলেও অজ্ঞ, অথচ অন্যথা 'ইনটেলেকচুয়াল' কারু কারুর আমাদের সংগীত (বিশেষত রাগ-সংগীত) সম্পর্কে আপাতগম্ভীর (এবং প্রায়শ উন্নাসিক) আলোচনা ইদানীং পড়েছি বা শুনেছি যেগুলি যে-কোনো প্রকৃত সংগীতবেত্তার পক্ষে একান্ত বিরক্তি ও বেদনার কারণ। ঐ ধরনের খেলো অসংস্কৃত বা ভুয়ো কেতাবী সংগীত সমালোচনা মৌলিক কলা-প্রগতির সহায়ক হতে পারে না।

অতএব, সংগীতশিল্পী, সংগীতজ্ঞ শ্রোতা এবং বিদগ্ধ সংগীত-সমালোচকরা এগিয়ে আসুন, পত্র-পত্রিকা, আলোচনাচক্র, বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে সুগভীর (in-depth) ও উচ্চমানের সঙ্গীতা-লোচনার প্রসার হোক, এবং ভারতীয় সংগীতের ব্যাকরণ, সুষমা ও নন্দন-তত্ত্ব, ইতিহাস ও অপরিসীম সম্ভাবনা নিয়ে মনোচর্চা চলুক, তথা সাধারণের মধ্যে সংগীত-জিজ্ঞাসার প্রেরণা জাগুক। কিন্তু যাঁরা গান-বাজনার অ আ ক খ না জেনে ভারতীয় সংগীতের ভাবনাচিন্তা বা রসবিচারে লিপ্ত হতে চান তাঁদের উৎসাহ যোগালে তার ফল হিতে বিপরীত হবে। তা ছাড়া বেশ খানিকটা গান-বাজনা শেখার আগে সংগীতের তত্ত্বালোচনা করতে না চওয়াটাই সমীচীন এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে নিরাপদ।

ডঃ গৌতমকুমার সরকার

বর্ধমান

## সরোজিনী নাইডু

৮ই মার্চ ১৯৮০ তারিখের সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের 'শান্তি-নিকেতনে সরোজিনী নাইডু' প্রবন্ধে লেখক শ্রীমতী নাইডুর চরিত্রের মধুরতম দিকটির চমৎকার আভাস দিয়াছেন। তাঁর জীবনের সুবিস্তৃত পটভূমিকায় কাব্য ও রাজনীতি যথা-সময়ে প্রাধান্য লাভ করিলেও জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ছিল তাঁর অবাধ অধিকার এবং স্বাচ্ছন্দ বিচরণ।

মনে পড়ে, ১৯২৪ সালের মে মাসে নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত ঢাকা জেলা ছাত্র সম্মেলনের কথা। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, স্থানীয় জমিদার কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সুদর্শন,

লভার মূল সভাপতি ভুজগচন্দ্র গোস্বামী। প্রিয় দর্শন, শুভ্র খদ্দর মণ্ডিত। বিশুদ্ধ অক্সফোর্ডীয় উচ্চারণে তার ইংরাজী ভাষণ শুনিয়া আমরা ছাত্রগণ স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। বিস্ময়ের যে তখনও বাকি ছিল বুঝি নাই। বুঝিলাম তখন যখন প্রধান অতিথি শ্রীমতী নাইডু তার ভাষণ আরম্ভ করিলেন। বাংলা ভাষায় প্রদত্ত মানপত্রে তাঁর কাব্য-প্রতিভা প্রসঙ্গে বাংলার পাপিয়া বুলবুলের প্রতি তাঁর মমতার কথা উল্লেখ করা হইয়াছিল। তখন মহাত্মাজীর আন্দোলনের জোয়ার সারা দেশে প্রবল উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছে। শ্রীমতী নাইডু তরুণ সমাজকে অলস ভাবপ্রবণতা পরিত্যাগ করিয়া দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে উদাত্ত আহ্বান জানাইলেন। আজও তার ভাষণের দুই একটি কথা মনে পড়ে— 'the days of Papias and Bulbuls are gone by' এবং 'why, in this land of Chaitanya, are we all a-Chaitanyas?"

তার মৃণালবাহুর স্বচ্ছন্দ-সঞ্চালনে এবং সুধাকণ্ঠের উদাত্ত মূর্চ্ছনায় আমরা কয়েক সহস্র শ্রোতা সম্মোহিত হইয়া গেলাম। সে মোহ বহুদিন পর্যন্ত কাটে নাই; সে মূর্চ্ছনা বহুদিন পর্যন্ত কানে বাজিয়াছে; আজও তার রেশ আছে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় শান্তিনিকেতনের যে সমাবর্তন উৎসবের সরস প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ সভায় উপস্থিত থাকিয়া শ্রীমতী নাইডু এবং শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর সাত্ত্বিক কলহ শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। প্রবন্ধ-লেখক অতি সুনিপুণভাবে তার বিবরণ দিয়াছেন। শুধু একটি রসাত্মক কথা যেন তাঁর বিবরণ হইতে বাদ পড়িয়াছে মনে হয়। শ্রীমতী নাইডু যখন রাজাজীকে কেবলই তীক্ষ্ণ কৌতুক বাণে বিদ্ধ করিতেছিলেন তখন সুচতুর রাজাজী কটাক্ষে হাসিয়া বলিলেন—আপনাদের আচার্যের এ ব্যাপারে বিশেষ অধিকার আছে, কারণ আমরা উভয়ে অতীতে অনেক কুচক্রের সহচক্রী।
(We were co-conspirators in many an evil thing in the past.) সভাপ্রাঙ্গণে হাসির রোল বহিয়া গেল।

শ্রীমতী নাইডুর মহান ব্যক্তিত্বের আর একটি দিকের আভাস ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে দিতে দ্বিধা হইলেও অতিশয় কুণ্ঠার সহিত উল্লেখ করিতেছি। শ্রীমতী নাইডু ঐ উৎসবের শেষে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। আমি বোলপুর স্টেশনে তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থার তদারকিতে ব্যস্ত। ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা হইয়া গেলেও ট্রেন ছাড়িতেছে না। এমন সময় তাঁর মিলিটারী সেক্রেটারী (যতদূর মনে পড়ে বীরভূমনিবাসী লেঃ কর্নেল ডাঃ চাটার্জী) ছুটিয়া আসিয়া আমাকে পাকড়াও করিয়া গবর্নরের গাড়ির সম্মুখে উপস্থিত করাইয়া বলিলেন—"আসামী হাজির"। শ্রীমতী নাইডু স্মিত হাস্যে প্ল্যাটফর্মের সকলে মধুর করাঘাতে বদনাম জানাইলেন। কর্নেল চ্যাটার্জীর সংকেতে ট্রেন ছাড়িয়া দিল। মহত্বে, সৌজন্যে মাধুর্যে অভিভূত হইয়া চলন্ত ট্রেনের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে চিত্র যেন আজও চোখে ভাসে।

অমূল্যরতন সমাজদার
কলকাতা-৩৪

## রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিম

দেশ পত্রিকা ২২শে মার্চ ১৯৮০ সংখ্যায় শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের লেখা 'বঙ্গরঙ্গমঞ্চে বঙ্কিম' প্রসঙ্গে কিছু ভুল তথ্য পরিবেশিত হওয়ার জন্য কৃষ্ণনগর নদীয়া হইতে শ্রীনীরদ হাজরা সেই ভুলগুলি সংশোধনের জন্য যাহা লিখিয়াছেন সেই লেখার মধ্যেও ভুল তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে। শ্রীহাজরা লিখিয়াছেন, "পরবর্তীকালের প্রধান নট শিশিরকুমার বোধ করি বাংলা রঙ্গালয়ের ব্যতিক্রম পুরুষ। তিনি বঙ্কিম-উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রযোজনা ও অভিনয়ের প্রেরণা বোধ করেননি। সম্ভবত একবার তিনি চন্দ্রশেখরে চন্দ্রশেখর চরিত্রে রূপ দেন। সঙ্গে প্রতাপরূপে ছিলেন দুর্গাদাস।" এই দুটি তথ্যই ভুল।

আমি নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের সহিত অভিনেতা হিসাবে একাদিক্রমে কুড়ি বৎসর যুক্ত ছিলাম। তাঁর জীবনের শেষ অভিনয়ের দিনটিতে পর্যন্ত তাঁর পাশে ছিলাম। তিনি নাট্যমন্দিরে অমর দত্ত কর্তৃক নাটকাকারে গ্রথিত 'ভ্রমর' (কৃষ্ণকান্তের উইল) ১৯২৭ সালে অভিনয় করিয়াছিলেন। তাঁর ভূমিকা ছিল গোবিন্দলাল। তারপর ১৯৫৫ সালে শ্রীরঙ্গম মঞ্চে হাস্য-কৌতুক অভিনেতা রঞ্জিৎ রায় একদিন মাত্র সম্মিলিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন 'চন্দ্রশেখর'। বহু অনুরোধ উপরোধ করাতে শিশিরকুমার গঞ্জালিস (লরেন্স ফস্টার)-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, চন্দ্রশেখরের ভূমিকায় নয়। সঙ্গে প্রতাপরূপে ছিলেন ছবি বিশ্বাস—দুর্গাদাস নন।

গণেশ শর্মা
কলকাতা-২

## এভারেস্ট অভিযান

১৯শে এপ্রিল 'দেশ'-এ প্রাণেশবাবুর ম্যালোরি ও আরভিনের এভারেস্ট অভিযান সম্বন্ধে প্রবন্ধ খুবই চিত্তাকর্ষক। তবে এতে একটি তথ্যগত ভুল আছে বলে মনে হয়। কারণ আর্ল ডেনম্যান এভারেস্ট অভিযানে মারা যান নি, বরং ঐ অভিযান থেকে ফিরে এসে Alone to Everest বইটি লেখেন এবং ঐ অভিযানে তাঁর সঙ্গী ছিলেন বিখ্যাত তেনজিং নরগে। সম্ভবত প্রাণেশবাবু মরিস উইলসন অথবা কে বি লারসেনের কথা বলতে গিয়ে ডেনম্যানের নাম উল্লেখ করেছেন। উপরিউক্ত দুই অভিযাত্রী পৃথকভাবে নর্থ কলের পথে উঠেছিলেন এবং সেখানেই তাঁরা নিখোঁজ হন।

শিশিরকুমার রায়
শান্তিনিকেতন।

## বিমল কর-এর

দম-ফাটা হাসির নাটক

**ঘুঘু** দাম ৬·০০

বিমল কর-এর সাহিত্য-জীবনের শুরু যে শৌখিন নাট্যরচনা দিয়েই—এ-খবর ক'জন রাখেন জানা নেই, কিন্তু যাঁরা তাঁর পূর্ণাঙ্গ 'কর্ণকুন্তী সংলাপ' কিংবা একাঙ্ক 'ঘাতক' পড়েছেন তাঁরা নিশ্চিত জানেন যে, নাটকের যাবতীয় চাহিদা মিটিয়েও তাঁর নাটক কীভাবে হয়ে ওঠে বিশুদ্ধ সাহিত্য-কর্ম, গল্প উপন্যাসের মতোই তাঁর নাটক আলাদাভাবে কতটা সুখপাঠ্য।
যেমন এই নতুন নাটক 'ঘুঘু'। কৌতূহলকে কীভাবে তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত টানটান করে ধরে রেখেছেন. সংলাপকে করে তুলেছেন . জীবন্ত, চরিত্রগুলিকে করে তুলেছেন সবল এবং স্বতঃস্ফূর্ত, কীভাবে সঞ্চারিত করেছেন তীব্র এক গতিবেগ—ভাবলে বিস্ময় জাগে। তার থেকেও বড়ো আকর্ষণ, 'ঘুঘু' নাটকে রয়েছে এক দমফাটা হাসির কাহিনী। এর গড়নে হাসি. বিন্যাসে হাসি, ঘটনায় হাসি সংলাপে হাসি. চরিত্রে হাসি. হাসি রয়েছে সাসপেন্সেও।

বলা বাহুল্য, এ-হাসির চরিত্র আলাদা। কোথাও ন্যাকামি নেই, নেই ভাঁড়ামি কিংবা স্থূলতা। স্বাভাবিক তবু বর্ণময় এক কাহিনীর ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এই নাটক। প্রবল প্রতাপান্বিত এক জজবাবুকে কীভাবে ঘায়েল করল সামান্য এক ভাড়াটে—তাই নিয়ে লেখা এই নাটক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভাসিয়ে নিয়ে যায় দারুণ জমজমাট হাসির তোড়ে।

## সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের

ধ্রুপদী উপন্যাস

## কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি দাম ১২·০০

কী নগর, কী গ্রাম—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের লেখনীতে একইরকম জীবন্ত। জটিল নাগরিক মানসিকতার বৃত্ত থেকে শুরু করে গ্রামীণ ও প্রকৃতির করতলে ধৃত আদিম মানসিকতার প্রায়ান্ধকার সীমা পর্যন্ত প্রসারিত তাঁর অন্বেষণ। সাম্প্রতিক সময়ের বাস্তব যেসব সমস্যার ব্যূহে মানুষ বন্দী, নিপুণ শল্য-চিকিৎসকের মতো সেইসব সমস্যাকে বিশ্লেষণ করে দেখান তিনি।
'কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি' উপন্যাসেও তাঁর এই দক্ষতার পরিচয়। আপাতনির্লিপ্ত, উদাসীন, সন্ন্যাসীর মতো অন্তর্মগ্ন মানুষ তরুণ স্কুলশিক্ষক ননী। তার আদরের বোন কৃষ্ণা বাড়ি ফিরল না, ফিরবে না কোনোদিন। সময়ের পাপ তাকে গ্রাস করে নিল এবং এই ভয়ঙ্কর শোকাবহ চেতনায় জর্জরিত হতে-হতে ননীর কাছে মানুষের জীবনটাই হয়ে উঠল অর্থহীন। কিন্তু দ্বন্দ্বে ও বেদনায় ক্ষতবিক্ষত ননী চরম মুহূর্তে আবিষ্কার করল, তবু কিছু থেকে যায়। তবু কিছু আছে। তা হল প্রেম। সেই প্রেমই মানুষকে বাঁচায়।
মধ্যরাতের ধ্রুপদী সঙ্গীতের সুর যেন এই রচনা। পাঠককে একটি অমোঘ প্রত্যয়ে উত্তীর্ণ করে দেন সিরাজ তাঁর এই শিল্পনিপুণ উপন্যাসে।

সৌরীন্দ্র মিত্রের

## খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে দাম ৪০·০০

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের

## রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্মচেতনা দাম ৮·০০

শান্তিদেব ঘোষের

## রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা

দাম ১৬·০০

## রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদর্শে সঙ্গীত ও নৃত্য দাম ৫·০০

গোপালদাস চট্টোপাধ্যায়ের

## রবীন্দ্রনাথকে যেকথা বলা হইল না দাম ৬·০০

## শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের

চিত্রময় কাব্যগ্রন্থ

## ছিন্ন বিচ্ছিন্ন

দাম ৩·০০

অসংখ্য স্মরণীয় ছোট কবিতা লিখেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় বিগত কয়েক বছরে। 'ছিন্ন বিচ্ছিন্ন' সেইসব কবিতার একত্র সংকলন। চিত্রময় কবিতার এই বইতে অজস্র ছবি এঁকেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী.

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

কুম্ভক এর

মজাদার বই

## শব্দ নিয়ে খেলা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪ ৪৫৬২

বহু-প্রতীক্ষিত গ্রন্থ

রবিশঙ্করের আত্মজীবনী

## রাগ-অনুরাগ

দাম ৫০·০০

রাগ-অনুরাগ রবিশঙ্করের আত্মজীবনী, এবং তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু। অকপট ভাষায়, সাবলীল ছন্দে এত বড় একজন গুণী মানুষ প্রাণস্পর্শী যে-আত্মনিবেদন রেখেছেন তার তুলনা হয়ত কেবল রবিশঙ্করেরই মরমিয়া সেতারবাদন।
'রাগ-অনুরাগ'-এ রবিশঙ্করের পরিবার-পরিজনের কথা আছে। স্ত্রী অন্নপূর্ণার প্রসঙ্গে সৎ স্বীকারোক্তি আছে। তাঁর গুরু ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব, গুরুভাই ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ, সমসাময়িক

মহান সেতারশিল্পী ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ, অমর গুণী ওস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ ওস্তাদ আমীর খাঁ, ওস্তাদ গোলাম আলি খাঁ, সিদ্ধেশ্বরী দেবী, বেগম আখতার প্রায় সবারই কথা আছে।
অত্যন্ত সরস, মনোরমভাবে, পুঙ্খানুপুঙ্খ ডিটেল সমেত। পড়তে পড়তে পাঠকের সামনে একটা আশ্চর্য যুগের ছবি ফুটে ওঠে।
গোটা দেড় বছর ধরে ভারতের বিভিন্ন শহরে এবং লন্ডনে বসে লেখা 'রাগ-অনুরাগ'। বহুদিনের, বহু ঘণ্টার টেপ-রেকর্ডারে বিভিন্ন মেজাজে, বিচিত্র পরিবেশে, কখনো আবেগে-উচ্ছ্বাসে, কখনো চিন্তার প্রাখর্যে যে-সব কথা বলেছেন রবিশঙ্কর, তারই নিটোল, সৎ অনুলিখন এই গ্রন্থ। এক জীবন্ত রবিশঙ্করকে স্পর্শ করা যায় তাই এই বইতে। মনে হয় যেন, রক্তমাংসের রবিশঙ্কর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন।
শুধু বাংলা কেন, কোন ভারতীয় ভাষাতেই এমন সৎ ও মহৎ আত্মকথন বেশি প্রকাশিত হয়নি।

## চিত্রা দেব-এর

উপন্যাসপ্রতিম রচনা

## ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল দাম ২০·০
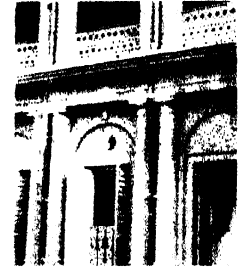
যখন বেহারারা ঘেরাটোপ ঢাকা পালকি করে বনেদি বাড়ির মেয়েবৌদের নিয়ে গঙ্গায় ডুবিয়ে আনত, সেই সময়েই জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ির এক বধূ স্বামীর সঙ্গে ঘোড়ার চড়ে ময়দানে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলেন. আর রক্ষণশীল সমাজ তাই দেখে ছি-ছি করে উঠেছিল লজ্জায়, ধিক্কারে। বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে নারীজাগরণের অধ্যায়টিও পরম কৌতূহলকর। আর সেই জাগরণে ঠাকুরবাড়ির অন্দর-মহলের দান সবচেয়ে বেশি। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে, অভিনয়ে, সঙ্গীতে, বেশভূষায়, রুচিতে, শিল্প-চর্চায় এই বাড়ির মহিলাদের ভূমিকা যেমন চমকপ্রদ, তেমনই গৌরবের। কিশোর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রতিভার বিকাশে শিল্প-সঙ্গীত-অভিনয়কলার অনুশীলনে তাঁর দিদি-বৌদিদিদের কল-কণ্ঠ প্রেরণা যে কতখানি, তার নেপথ্য-বৃত্তান্ত অনেকেই অজানা। অ[illegible] পরিণত বয়সেও [illegible]গীতে-অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ বারবার ডেকেছেন বাড়ির মেয়েদের। সেজন্যও ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরিকারা স্মরণীয়।
এমনই কয়েকজন স্বনামধন্যা ও কয়েকজন অনাম্নীর পরিচয় উপস্থাপিত করে চিত্রা দেব শুধু ঠাকুরবাড়ির নারীদেরই নয়, বাংলার নারীজাগরণের একটি ছিন্ন-সূত্র নতুন করে গাঁথলেন। এমন অন্তরঙ্গ, চোখ ভোলানো বিবরণ আগে লেখা হয়নি।
প্রচ্ছদে, পুস্তানিতে দুর্ধর্ষ ছবি। সেই সঙ্গে আলাদা ভাবে ঠাকুরবাড়ির বংশলতিকা এ-বইয়ের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ।

দেশ ৪৭ বর্ষ ২৮ সংখ্যা
২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭

## সূচীপত্র



### পরবর্তী আকর্ষণ

অশোক রুদ্রের প্রবন্ধ
রামচরিত্র
অশোক দাসের প্রবন্ধ
বই, বাঙালী ও বইপাড়া
গীতা বিশ্বাসের স্মৃতিচিত্র
পরমাত্মীয় দিলীপকুমার
অরূপ দাসের প্রবন্ধ
আই ব্যাংক ও তার সমস্যা
রমানাথ রায়ের গল্প
রাখাল বসুর ইচ্ছাপূরণ
আশিস ঘোষের গল্প ওদের সঙ্গে আমি

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ত্রিপুরা ১৭ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা



# পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও সংস্কৃতি

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার আপাতত নানা দিক থেকে বিব্রত, হয়ত বিপর্যস্ত। কিন্তু আলস্য তাঁদের ধাতে নেই। অন্তত তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কাজকর্মে তেমন কথাই বলে। সম্প্রতি এই দপ্তরের মন্ত্রী একটি বিল আনার চেষ্টা করেছিলেন, যে-বিল গ্রহণ করা হলে পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার সরাসরি সরকারের হাতে পড়ত। বিলটি প্রথম দফায় গ্রহণ করা হয়নি, অনুমান করা যাচ্ছে দ্বিতীয় দফায় হয়ে যেতে পারে। ওই দপ্তরের মন্ত্রী বলেছেন, এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সদরে, রবীন্দ্রনাথের নামে যে-সব সদন ও মঞ্চ সরকারী অর্থানুকূল্যে তৈরী হয়েছে, ১৯৬১ সাল—অর্থাৎ রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর সময় থেকে, সেগুলির পরিচালন ভার সরকার নিজের হাতে নিয়ে নিতে চান এইমাত্র, এছাড়া সরকারের অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই।

তথ্যমন্ত্রী যে-বিলটি এনেছিলেন কতকগুলি কারণে তা গ্রহণ করা যায়নি। অবশ্য যেসব খুঁটিনাটি ব্যাপারের জন্যে তা প্রথমদিন গৃহীত হয়নি, অনুমান করা যাচ্ছে, দ্বিতীয় দিনে গৃহীত হয়ে যাবে, বিরোধীদের আপত্তি সত্ত্বেও।

বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর থেকে সব ব্যাপারেই ত্রুটি ও বেনিয়ম কাজকর্ম দেখতে পাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন আগে যেখানে যত সরকারী, বেসরকারী পরিচালনা ব্যবস্থা ছিল তা গলদে ভরা। স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁরা এই গলদ দেখেছেন, দেখেছেন অন্যত্রও। কাজেই সরকারী সাহায্যে যেসব সংস্থা রবীন্দ্রনাথের নামে গড়ে উঠেছে তার মধ্যে যে ত্রুটি থাকবে না—এমন তো হতেই পারে না। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিতে এই বিল আনার সঙ্গত কারণ রয়েছে। অতঃপর, আশা করা যায়, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রবীন্দ্রসদন ও মঞ্চ সরকারী তত্ত্বাবধানে অতি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হবে, যেমন আরও কোনো কোনো সংস্থা হচ্ছে।

সবচেয়ে মজার কথা হল, এই বিলটির সাধু উদ্দেশ্য বোঝাতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন এর দ্বারা সংস্কৃতির উন্নতি করা যাবে, অর্থাৎ যে বঙ্গ সংস্কৃতি এখন ক্ষয়িষ্ণু ও মুমূর্ষু, তার অধঃপতন রোধ করা যাবে। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে এই জেহাদ অবশ্য বামফ্রন্ট সরকারের নৈতিক কর্তব্য বলেই বিবেচিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির কতটা অধঃপতন ঘটেছে তার আলোচনা এখানে অবান্তর। প্রশ্ন হল, সরকারী পরিচালনা কি কোনো অধঃপতনই রোধ করতে পারে? তা যদি পারত, তা হলে না হয় বলা যেত, ব্যবস্থাটি উত্তম। দুঃখের বিষয়, সরকারী পরিচালনায় কী ঘটে তা সাধারণের অবিদিত নয়।

বিরোধীদের কেউ কেউ এই বিলটি আনার পিছনে সরকারী উদ্দেশ্য অনুমান করেছেন। এঁদের আশঙ্কা, বামফ্রন্ট সরকার এইভাবে একে একে অনেক কিছুই নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে নেবেন, তার মধ্যে লাইব্রেরীও থাকবে, থাকবে গ্রাম বাংলার অন্যান্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক এমন আশ্বাসবাণী যদিও তথ্যমন্ত্রী দিয়েছেন, তবু বিরোধীরা আশ্বস্ত হননি। বলা বাহুল্য, হবার কথাও নয়। কেননা দেখা গিয়েছে, সে শিক্ষার ক্ষেত্রেই হোক অথবা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও পরিচালনা সরকারী পরিচালনার অপেক্ষা সবসময় নিকৃষ্ট হয় না; বরং সরকারী পরিচালনায় দায়িত্বহীনতা বেশী করেই চোখে পড়ে। তা ছাড়া ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চেষ্টায় মানুষ কিছু গড়ে তুলুক, তার পরিচালনা করুক—এটাও তো সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং আত্মবিকাশের পরিচয় হতে পারে, সমস্ত বিষয়ে সরকারের নাক গলাবার প্রয়োজন কি? যেখানে গাফিলতি চোখে পড়বে, কিংবা মনে হবে পরিচালনায় ত্রুটি ঘটছে সরকার সেখানে নজর দিতে পারেন। সব কিছু ত্রুটিপূর্ণ, সবাই অযোগ্য—একমাত্র সরকারই যোগ্য এবং ন্যায়পরায়ণ এমন মনে করার কী কারণ থাকতে পারে? একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, সরকারী অর্থানুকূল্যে পাঠাগারের জন্যে বই কেনার যে ব্যবস্থা রয়েছে, সরকার সেখানে একটি লিখিত পুস্তক-তালিকা দিয়ে দেন, অর্থাৎ ওই বইগুলি কেনার জন্যে সুপারিশ করেন। সেই তালিকায় যে সমস্ত বই স্থান পায় তার সবই কি উৎকৃষ্ট? নাকি সরকার প্রকারান্তরে তাঁদের মনোনীতদের বাজারে কাটিয়ে দিতে চান? সরকারই যে সর্ববোদ্ধা এমন অভিমান না থাকাই ভাল।

বামফ্রন্ট সরকারের অনেক প্রচেষ্টাই প্রশংসার যোগ্য: যেমন, বাংলা সিনেমার উন্নতির জন্যে অর্থ সাহায্য। বাঙালী লেখকদের গ্রন্থ প্রকাশের জন্যেও সরকার অর্থ সাহায্য করার কথা ভাবছেন। কোনো সন্দেহ নেই, এই উদ্দেশ্যগুলি প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু এ-কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে, সরকার যেখানেই অর্থ সাহায্য করবেন সেখানে তাঁদের পক্ষ থেকে পালটা কিছু প্রত্যাশা থাকতে পারে। এই প্রত্যাশা কী? সম্ভবত তা অনুমান করা চলে। যে-বিলটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করতে চলেছেন তার মধ্যেও প্রচ্ছন্ন সরকারী উদ্দেশ্য না থাকলেই ভাল, তবে আশঙ্কা একেবারেই অকারণ এমন মনে করার কারণ নেই।

ব্যঙ্গচিত্র

# মেলাবেন, তিনি মেলাবেন

শংকর ঘোষ
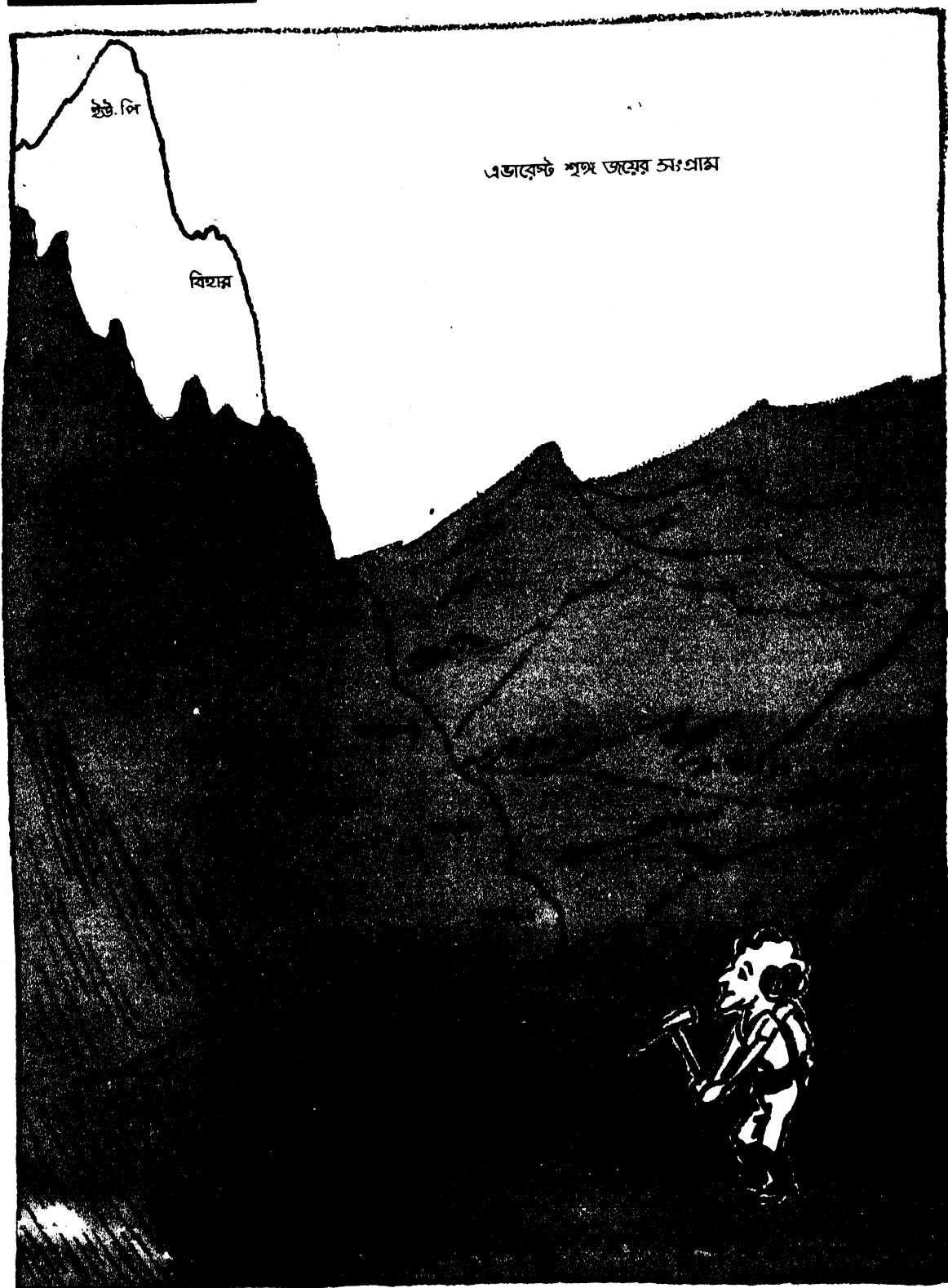
নিকসনের চীনসফরসূচী পাকা করবার জন্য কিসিঞ্জার যখন হঠাৎ একদিন পিকিং-এ ভেসে উঠেছিলেন তখন সারা পৃথিবী তার আকস্মিকতায় বিস্মিত হয়েছিল। কিসিঞ্জার ডুব দিয়েছিলেন আমাদের পাশের ইসলামাবাদে, সেই সূত্রে একাধিক পাকিস্তানী নায়ক দাবি করেছিলেন, এই অভাবিত মিলনের কৃতিত্ব তাঁর। আয়ুব খান এই দাবি করেছিলেন, করেছিলেন ইয়াহিয়া খান আর জুলফিকর আলি ভুট্টোও। তারও বেশ কয়েক বছর আগে ভুট্টো প্রতিবেদককে বলেছিলেন, ভারত সরকার যদি চান তাহলে তিনি চীন-ভারত সীমান্তবিরোধে মধ্যস্থতা করতে পারেন। যেন আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তি এত সহজ—একজন মুরুব্বি বলে-দেওয়ার লোক পাকড়াতে পারলেই হল। একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের পিছনে থাকে অনেকজনের অনেক দিনের প্রচেষ্টা। অস্ট্রিয়ার নিরপেক্ষতা আজ সর্বজনস্বীকৃত, পূর্ব-পশ্চিম দ্বন্দ্ব তাকে স্পর্শ করে না। অস্ট্রিয়া নিরপেক্ষ থাকবে, এই শর্তে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর চার মিত্রশক্তি আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েট ইউনিয়ন অস্ট্রিয়া ছাড়তে অস্ট্রিয়াকে স্বাধীনতা দিতে রাজী হয়েছিল। দখল-করা কোন দেশ সোভিয়েট ইউনিয়নের ছেড়ে যাওয়ার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নেই। নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে অস্ট্রিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়ার এই প্রস্তাব সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে প্রথম করেছিলেন জওহরলাল নেহরু। সে-প্রস্তাব রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। একক চেষ্টায় বা একবারের চেষ্টায় কোন দুরূহ আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের নজির যদিও বা থাকে তাহলে তা অতি বিরল।

এখন আর কারও অজানা নেই, নিকসনের চীন সফরে যে-সমঝোতার প্রকাশ্য সূচনা তার পিছনে ছিল দীর্ঘ, অনলস প্রস্তুতি। কিসিঞ্জারের সফর যা নিয়ে এত হইচই হয়েছিল, সে তো ওস্তাদের শেষ রাত্রের মার মাত্র। ১৯৫৩ সালে কোরিয়া যুদ্ধ-বিরতির পর থেকে চীন-মার্কিন গোপন আলোচনার সূত্রপাত, বিভিন্ন স্তরে এই আলোচনা চলে প্রায় দুই দশক ধরে, আলোচনার ক্ষেত্র বদলেছে আলোচনাকারীরাও বদলেছেন, কিন্তু আলোচনা কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। একমাত্র অ্যামবাসাডর স্তরেই বৈঠক হয়েছিল ১৩০টি, একথা বললে ভুল হবে না এই সময়ে অত বৈঠক, অত আলোচনা আমেরিকা কোন অকমিউনিস্ট দেশের অর্থাৎ তার মিত্র দেশের সঙ্গেও করেনি। এসবই হয়েছিল গোপনে। এই আলোচনার আংশিক বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু অনেক কিছু এখনও অজানা, ক্লাসিফায়েড ইনফরমেশন। নিকসন সফরের আকস্মিকতার মূলে এই গোপনীয়তা। ক্রুদ্ধ, বিহ্বল সোভিয়েটপন্থীরা অবশ্য বলেছিলেন, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, মাও সে-তুং তো ইয়েনানের যুগ থেকে আমেরিকার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে এসেছেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রধান সহযোগী এডগার স্নো।

কিসিঞ্জারের চীন সফরের আগে চীন-মার্কিন মিত্রতা সম্পর্কিত সব জল্পনা যেমন অবাস্তব মনে হত সোভিয়েট-চীন মিত্রতার সম্ভাবনাকেও আজ ততখানি অবাস্তব মনে হতে পারে। সরকারীভাবে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ অর্থাৎ সোভিয়েট ইউনিয়ন এখনও চীনের এক নম্বর শত্রু। চীন-মার্কিন ঘনিষ্ঠতা এখনও চীনের রণকৌশল। চীন এখনও এই মাও তত্ত্বে বিশ্বাস করে যে, বর্তমান কালের সবচেয়ে বড় বিবাদ সাম্রাজ্যবাদ ও মুক্তিকামী দেশগুলির মধ্যে। এই বিবাদে চীনের সমর্থন স্বভাবতই মুক্তিকামী, সংগ্রামী দেশগুলির পক্ষে, নীতিগতভাবে চীন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে। এবং এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে এক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আর এক সাম্রাজ্যবাদকে কাবু করা পরিচিত কমিউ-

মাও-সে-তুং

নিস্ট রণকৌশল। সোভিয়েট ইউনিয়নে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সূচনা ক্রুশচেভের কালে, পঞ্চাশের দশকের শেষার্ধে। সোভিয়েট কমিউনিজমে প্রথম ভেজাল দেন ক্রুশচভ, তিনিই প্রবর্তন করেন সেই কমিউনিজমের যার নাম দিয়েছিলেন মাও সেতুং "গুলাশ কমিউনিজম"। অথচ পঞ্চাশের দশকে ও ষাটের দশকের প্রথম কয়েক বছরে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চীনের মিত্রতা বজায় ছিল। তারপর এল মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাল। সে-কালে চীন হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সমান বিরোধী। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অবসান ও ১৯৭২ সালে নিকসনের চীন সফরের পর চীনা কৌশলের আর একবার পরিবর্তন হল। সত্তরের দশকে সোভিয়েট ইউনিয়ন ঘোষিত হল চীনের ও তৃতীয় বিশ্বের প্রধান শত্রু হিসাবে: আশির দশকে যে আবার কৌশলের পরিবর্তন হবে না সেকথা জোর করে কে বলবে?

অবশ্য, শুধু এ বিষয়ে নয় সব বিষয়েই অনেকখানি নির্ভর করবে, চীনে ক্ষমতা কোন গোষ্ঠীর করায়ত্ত হবে তার উপর। চীনা কমিউনিস্ট পারটির মধ্যে ক্ষমতা দখলের গোষ্ঠী লড়াই এখনও চলছে, আরও কিছুদিন চলবে। এই লড়াই মাও-এর মৃত্যুর পর শুরু হয়েছে মনে করলে ভুল হবে। মাও যখন সত্তরে পদার্পণ করলেন, অর্থাৎ ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকেই এই লড়াইয়ের সূত্রপাত। সাংস্কৃতিক বিপ্লবও এই লড়াইয়ের অঙ্গ। যদিও লিউ শাও-চির বুর্জোয়া সদর দপ্তরের বিরুদ্ধে কামান দাগার আহ্বান জানিয়ে মাও স্বয়ং বড় হরফের পোস্টার লিখেছিলেন, তবু সেই ১৯৬৬ সালেই পত্নী চিয়াং চিং-কে তিনি জানিয়েছিলেন, বাড়াবাড়ি তাঁর পছন্দ হচ্ছে না, লিন পিয়াও তাঁর নাম নিচ্ছেন, অথচ লিন পিয়াও-এর সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য রয়েছে। তিনি বলেছিলেন, দেশে ও দলে দক্ষিণপন্থীদের ষোল আনা ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব হবে না, কাজেই তাঁর উদ্দেশ্য তাঁদের আংশিক ক্ষমতাচ্যুত করা। সেজন্য তিনি এমন কিছু বলতে চান না যাতে বামপন্থীদের ক্ষতি হয় ও দক্ষিণপন্থীদের সুবিধা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর দক্ষিণপন্থীদের ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনাকে মাও উড়িয়ে দেননি। তিনি মনে করতেন, দক্ষিণপন্থীরা তাঁর নাম নিয়ে কিছুদিন ক্ষমতাসীন থাকতে সক্ষম হবেন। কিন্তু বামপন্থীরা তাঁর অন্য উক্তি ও নির্দেশ অনুসারে নিজেদের সংগঠিত করবেন ও দক্ষিণপন্থীদের ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবেন।

এই চিঠি লেখার সময় মাও নিশ্চয় বুঝতে পারেননি, ঠিক দশ বছর পরে তাঁর মৃত্যুর কয়েকমাসের মধ্যে এই চিয়াং-চিং-এর কী হাল হবে, তিনি এবং তাঁর তিন সঙ্গী, যাঁরা নিজেদের প্রকৃত মাওবাদী বলে দাবি করতেন, রাষ্ট্রবিরোধিতার জন্য গ্রেফতার হবেন। এখন শোনা যাচ্ছে, তাঁদের বিনা বিচারে আটক থাকার কাল শেষ হতে চলেছে। পারটি থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, শীঘ্রই আদালতে তাঁদের বিচার হবে, এবং এও স্থির হয়ে গেছে যে চিয়াং-চিং-এর শাস্তি হবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। মাও বুঝতে পারেননি, যে-সাংহাই-গোষ্ঠীর সহযোগিতায় তিনি সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু করেছিলেন সেই গোষ্ঠীর চার নেতা অতিকায় চার মস্তান হিসাবে চিহ্নিত হবেন এবং যে-তেং সিয়াও-পিংকে তিনি দুবার ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন সেই তেং রাজনীতির কেন্দ্রে তৃতীয়বার আবির্ভাবের পর স্পর্ধাভরে ঘোষণা করবেন, "আজ-বামরা যদি তোমাকে ধনতন্ত্রপন্থী বলে তাহলে ধরে নেবে তুমি ভালো কাজ করছ।" মাও-এর মৃত্যুর পর দক্ষিণপন্থী, মধ্যপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে অনেক গোষ্ঠী বদল হয়েছে, কিন্তু ক্ষমতাদখলের জন্য গোষ্ঠীলড়াইয়ের অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়নি।

তাঁর জীবনের শেষ দুই দশকে মাও এই বিষয়ে এতই চিন্তিত ছিলেন যে স্বতঃই তাঁর নেতৃত্বের উত্তরাধিকারী হিসাবে গণ্য হতে পারেন এমন কাউকে তিনি বরদাস্ত করতে পারেননি। একথা অনস্বীকার্য যে চীনা বিপ্লবের নেতৃত্ব তাঁর নিজস্ব, এবং এই নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা ও তাকে রক্ষা করবার জন্য তাঁকে আজীবন সংগ্রাম করতে হয়েছিল। শুনেছি, খাস চীনে স্তালিন ভক্তির প্রাবল্য তেমন নেই, এবং মাও যে বলেছিলেন, স্তালিনের সত্তর শতাংশ ভাল, তিরিশ শতাংশ খারাপ তার উদ্দেশ্য প্রধানত ছিল প্রচারমূলক। মাও-এর তথাকথিত স্তালিন প্রীতির মূলে ছিল স্তালিনোত্তর সোভিয়েট নেতৃত্বের প্রতি বিদ্বেষ। মস্কোর নির্দেশ মেনে নেওয়ার সপক্ষে যাঁরা ছিলেন তাঁরা যদি নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে মাওকে পরাস্ত করতে পারতেন তাহলে চীনের বিপ্লব সংঘটিত হতে পারত কিনা সন্দেহ। মাও যে একেবারে কোনদিন পরাস্ত হননি তা নয়। তিনি নেতৃত্ব থেকে অপসারিত হয়েছেন, কিন্তু সাময়িকভাবে। বিপ্লবের শেষ পর্যায়ে তাঁর নেতৃত্ব ছিল একক ও অবিসংবাদিত। এবং সে কারণে পুরোপুরি মস্কোর নির্দেশের পরিপন্থী। এমন কি, বিপ্লবের চরম মুহূর্তে যখন গণমুক্তি ফৌজের বিজয় অভিযান অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে তখনও স্তালিনের পরামর্শ ছিল কুয়োমিনটাং-এর সঙ্গে, চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গে সমঝোতার। স্তালিন যদিও স্বীকার করতেন, চীনা বিপ্লবের গতিপ্রকৃতি বাইরের কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় তাহলেও তিনি ভুলতে পারেননি, চীনের বিপ্লব, মাও সে-তুংয়ের বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল তাঁর নির্দেশ অমান্য করার মধ্য দিয়ে। তাই সেই বিপ্লবের বিজয়ী বীর যখন অগ্রজ বিপ্লবীর সঙ্গে দেখা করতে মস্কো গেলেন—চীনের বাইরে মাও সে-তুংয়ের সেই প্রথম পদার্পণ—তখন স্তালিন তাঁকে দশদিন বসিয়ে রেখেছিলেন।

চীনের কমিউনিস্ট পারটিতে দুই লাইনের লড়াই প্রকৃতপক্ষে মাওপন্থা ও সোভিয়েটপন্থার লড়াই। চীনা পারটির একাদশ কংগ্রেসে হুয়া কুয়ো ফেং যে রাজনৈতিক রিপোর্ট পেশ করেন তাতে বলা হয়েছিল যে গ্যাং অব ফোর-এর (চার-ইয়ারি) বিদ্রোহ চীনা কমিউনিস্ট পারটিতে দুই লাইনের একাদশতম বৃহৎ লড়াই। তথাকথিত চার-ইয়ারি

জীবদ্দশায় এই লড়াই সংঘটিত হয়েছিল দশবার, এবং প্রায় প্রতিবারই পরাজিত গোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত চিহ্নিত হয়েছিল মস্কোপন্থী হিসাবে। এই মস্কোপন্থীদের মধ্যে কেবল মাও-এর প্রতিদ্বন্দ্বী-রাই ছিলেন না তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামী, লং মারচে তাঁর সহযাত্রীরাও ছিলেন। লিউ শাও-চি ও লিন পিয়াও-এর বিপথগামিতা সকলেরই জানা। কিন্তু চু এন লাই ও চু তে-র মতো প্রথম সারির নেতা যাঁরা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মাও-এর একনিষ্ঠ সহকর্মী বলে পরিচিত ছিলেন তাঁরাও সময়বিশেষে মাওপন্থার বিরোধিতা করেছেন, সোভিয়েট লাইনকে সমর্থন জানিয়েছেন।

কাজেই মাও-এর পক্ষে তাঁর অবর্তমানে দেশ, দল ও বিপ্লবের কী অবস্থা হবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা স্বাভাবিক ছিল। তিনি জানিতেন, তাঁর জুতো অন্য কোন নেতার মাপসই হবে না। জেনেশুনে তিনি দুজন তাঁর তুলনায় ছোটমাপের নেতাকে দুবার তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেছিলেন। কিন্তু তিনি দুজনের উপরই ক্রমে বিরূপ হন এবং দুজনেই কেবল পদচ্যুত হন না, চরম অসম্মানের মধ্যে তাঁদের মৃত্যুও ঘটে। লিউ-শাও-চি যখন চীনের প্রেসি-ডেন্ট মনোনীত হলেন এবং কমিউনিস্ট পারটিতে তাঁর স্থান মাও-এর পরেই নির্দিষ্ট হল তখন সকলেই ধরে নিয়েছিলেন মাও-এর পরে দেশ ও দলের নেতৃত্ব তাঁর উপরেই বর্তাবে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবে এত তোড়জোড় শেষ পর্যন্ত এই লিউকে হঠানোর জন্য। লিউ শুধু হঠলেন না, তিনি দল থেকে বিতাড়িত হলেন, তাঁর মৃত্যু ঘটল বন্দীদশায়। দলের দুই নম্বর হিসাবে লিউ-এর শূন্য স্থানটি নিয়েছিলেন লিন পিয়াও। ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে চীনা কমিউনিস্ট পারটির নবম কংগ্রেসে যে লিন পিয়াও মাও-এর উত্তরাধিকারী হিসাবে সরকারী স্বীকৃতি পান এবং মাওবাদে তাঁর নির্ভেজাল ১৯৭১ সালে মাওকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন এবং সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় সোভিয়েট ইউনিয়নে পালানোর সময় এক বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। লিন পিয়াও-এর মৃত্যুর পর মাও আরও পাঁচ বছর বেঁচে ছিলেন, কিন্তু আর কাউকে তিনি উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন বলে জানা যায়নি।

অবশ্য চু এন-লাইয়ের মৃত্যুর পর হুয়া কুয়ো ফেংকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করায় তাঁর সম্মতি ছিল। ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হুয়ার নাম যখন অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ঘোষিত হয় তখন কেউ ভাবতে পারেননি যে, কিছুদিনের মধ্যে তিনি কেবল পাকাপাকি প্রধানমন্ত্রীর পদ নয় মাও-এর শূন্য পদটিও অধিকার করবেন। সরকারীভাবে এত ক্ষমতা ইতিপূর্বে কোন নেতার করায়ত্ত হয়নি। হুয়া কুয়ো-ফেং এই তিনটি চীনা অক্ষরের ইংরেজী অর্থ 'স্পীয়ার হেড অব দি ব্রিলিয়ান্ট কিংডম'। চীন ব্রিলিয়ান্ট কিংডম হলেও হতে পারে কিন্তু হুয়া তার বর্শাফলক হবেন এমন কোন লক্ষণ তাঁর জীবনের প্রথম পঞ্চাশ বছরে দেখা যায়নি। বস্তুত, হুয়ার সব চেয়ে বড় যোগ্যতা ছিল, তিনি অসাধারণ নন, তিনি অতি সাধারণ তিনি বিতর্কিত দক্ষিণ বা বামপন্থী নন, তিনি মধ্যপন্থী, তিনি বিপ্লবের নেতা ও প্রবীণ রাজনীতিক নন, আবার তেং সিয়াও-পিং যে সব নেতাদের হঠাৎ উত্থানের প্রতি কটাক্ষ করে 'হেলিকপটার' নেতা বলে বর্ণনা করেন তাদের মতো নবীনও নন। তিনি মধ্যবয়সী, মধ্যপন্থী ১৯৭৩ সালে চীনা কমিউনিস্ট পারটির দশম কংগ্রেসে তিনি পলিটব্যুরোর সদস্য মনোনীত হন এবং ১৯৭৫ সালে হন জন-নিরাপত্তা, আমাদের পরিচিত ভাষায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কাং শেং-এর মৃত্যুর পর নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দা বিভাগের উপর হুয়ার কর্তৃত্ব পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্যাং অব ফোর-কে গ্রেপ্তার করে পিকিং শহরের সেরা এই বাহিনী কাং শেং-এর নিজস্ব কর্তৃত্বাধ ছিল, এবং ধরে নেওয়া যেতে পারে কাং-এর ম না হলে হুয়ার পক্ষে এই ইউনিটের সাহায্যে অব ফোর-কে ধরা সম্ভব হত না।

হুয়া অবশ্য বরাবরের মাও ভক্ত। খানিকটা সেজন্য ও খানিকটা তাঁর নির্বি রাজনীতির জন্য সম্ভবত মাও তা অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলে কিন্তু হুয়ার পরবর্তী পদোন্নতি সবই মাও-লেখা তথাকথিত একটি চিরকুটের জোরে। মৃ পাঁচ মাস আগে, তেং সিয়াও-পিংয়ের দ্বিতীয় পতনের অব্যবহিত পরে মাও নিজের হাতে হুয়া একটি সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। চীনা ভাষায় ছয় অক্ষরের (ক্যারেকটার) ইংরেজী তর্জমা—উ ইয়ু, ইন চারজ, আই হ্যাভ নাথিং টু ওয়ারি। 'তু যখন কর্তৃত্বে তখন আমার ভাবনার কিছু নেই হস্তাক্ষর যে মাও-এর তাতে কোন সন্দেহ নে এবং এই হেঁয়ালি ভরা সার্টিফিকেটটি যে তি হুয়াকে দিয়েছিলেন সে বিষয়েও চীনা বিশেষজ্ঞ সন্দেহ প্রকাশের কোন কারণ দেখেন না। সংশয় কিছু, তা ওই সার্টিফিকেটের প্রকৃত অর্থ ও প্রয়োগ ক্ষেত্র নিয়ে। মাও কী বলতে চেয়েছিলেন ? তিনি বলতে চেয়েছিলেন সারা চীন দেশের কর্তৃত্ব হু হাতে থাকলে তিনি নিশ্চিন্ত ? অথবা কে একটি বিশেষ প্রকল্পের ভার হুয়ার হাতে না হওয়ার সন্তোষ প্রকাশ করে তিনি ওই মন্তব্য লিখে দিয়েছিলেন ? এই বিতর্কের অবসান হয় হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। আমেরিকার একজন চ বিশেষজ্ঞ রহস্য করে বলেছেন পিরানডেলোর বিখ্য নাটক 'সিকস ক্যারেকটারস ইন সারচ অব আ অথর' এর অনুকরণে চীনের এই বিতর্কটির ন দেওয়া যায়—সিকস ক্যারেকটারস ইন সারচ অব মীনিং।

মাও-এর মৃত্যুর [illegible]
এই সার্টিফিকেটটাই বার করেননি, চিয়াং চিং ও তাঁর তিন সঙ্গীর প্রতি মাও-এর বিরূপতা সম্পর্কে অনেক তথ্যও প্রকাশ করেছেন। 'গ্যাং অব ফোর' এই আখ্যাটিও নাকি মাও-এরই সৃষ্টি, তিনি 'হেলিকপটার' নেতা ওয়াং হুং-ওয়েনকে বলেছিলেন—স্টপ ক্যারিয়িং অন উইথ ইওর গ্যাং অব ফোর, চিয়াং চিংকে বলেছিলেন, ডোনট ইউ টার্ন ইনটু এ স্মল ফ্র্যাকসন অব ফোর। ১৯৭৫ সালে পলিটব্যুরোর একটি সভায় 'চার ইয়ার'কে তিনটি কাজ করতে ও তিনটি কাজ না করতে উপদেশ দিয়েছিলেন, সেগুলিই হচ্ছে মাও-এর বিখ্যাত 'থ্রি ডুজ ও থ্রি ডোনটস'। মাও বলেছিলেন, মারকসিজম-লেনিনিজম মেনে চলো। সংশোধনবাদ মেনো না, ঐক্যবদ্ধ হও, বিভেদ সৃষ্টি কোরো না, খোলাখুলি চল, ষড়যন্ত্র ও দলাদলি কোরো না। এই প্রসঙ্গেই নাকি মাও চিয়াং চিং ও তাঁর তিন সঙ্গীদের বলেছিলেন, 'ডোনট ফাংশন অ্যাজ এ গ্যাং অব ফোর। স্টপ ডুইং দ্যাট এনি মোর।'

মাও-এর মৃত্যুর কম-বেশি একমাস পরে পলিটব্যুরোর একটি সভায় হুয়া এই সব তথ্য পেশ করেন। চিয়াং চিং পেশ করলেন বিপরীত তথ্য। দাবি করলেন তাঁরাই মাও-এর মনোনীত উত্তরাধিকারী। কার সার্টিফিকেট খাঁটি, কার সার্টিফিকেট মেকী তাই নিয়ে পলিটব্যুরো দ্বিধাবিভক্ত হল। শেষ পর্যন্ত হুয়া জিতলেন পলিটব্যুরোতে সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিদের সমর্থনে। সেইদিন রাত্রেই 'চার ইয়ার' গ্রেপ্তার হলেন, পিকিং শহরেই তাঁদের আটক রাখা হল। মাও-এর আশীর্বাদধন্য হুয়া মাও-এর নির্দেশ ইউনাইট, ডোনট সপ্লিট আওড়াতে আওড়াতে পারটিকে দুভাগ করে ফেললেন। মধ্যপন্থী হিসাবে তিনি সকলকে একসঙ্গে রাখতে পারলেন না, বা রাখলেন না। এমন কি মাও-এর সহযোগী হিসাবে পরিচিত বামপন্থীদের সঙ্গেও তিনি থাকলেন না। তিনি বেছে নিলেন মাও-এর সঙ্গে যাঁদের চিরকালের বিবাদ ও মতভেদ তাঁদের। কেন হুয়া এত সহজে, এত তাড়াতাড়ি দক্ষিণে হেললেন বলা শক্ত। হয়ত সেদিনের পলিটব্যুরো আলোচনায় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বামপন্থীদের ছত্রভঙ্গ না করলে মাও-এর সার্টিফিকেট সত্ত্বেও তিনি বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না। এখন স্পষ্ট যে মাও হুয়াচরিত্র ঠিক বোঝেন নি, তাঁর বলা উচিত ছিল, উইথ ইয়ু ইন চারজ, আই অ্যাম ওয়ারিড।

সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিরা কেন হুয়ার সঙ্গে অর্থাৎ বামপন্থীদের বিরুদ্ধে গেলেন তা বোঝা শক্ত নয়। বিপ্লবের আগে যাই হোক, বিপ্লবের পরে আর চীনের সেনাবাহিনী কমিউনিস্ট পারটির সার্বভৌমত্ব, 'পারটি কনট্রোলস দি গান' মাও-এর এই তত্ত্ব মানতে রাজী হচ্ছিল না। মাও কেবল বিপ্লবের তাত্ত্বিক ছিলেন না, তিনি সামরিক তত্ত্ব-বিশারদও ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর গুরু ছিলেন সানজু, আজ থেকে প্রায় দু হাজার তিনশ বছর আগে লেখা যাঁর বই 'দি আর্ট অব ওয়ার' এখনও সমরশাস্ত্রের উপর প্রামাণ্য বই বলে স্বীকৃত। গেরিলা রণনীতি ও কৌশল সম্পর্কে মূল কথাগুলি সানজু লিখে গিয়েছিলেন। মাও যেমন সেগুলি গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি গ্রহণ করেছিলেন সানজুর আর একটি তত্ত্ব, যুদ্ধে জেতবার জন্য সব চেয়ে প্রয়োজনীয় নীতি ও আদর্শে একনিষ্ঠতা। পশ্চিমী রণনীতি যেখানে বলে, সেনাবাহিনী পেটে ভর দিয়ে হাঁটে, মাও সেখানে মনে করতেন সেনাবাহিনী হাঁটে আদর্শে ভর করে। মাও-এর সামরিক তত্ত্বে রাজনীতি ও সশস্ত্র সংগ্রাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। গেরিলা যুদ্ধের সাফল্য নির্ভর করে ব্যাপক জনসাধারণের সমর্থনের উপর, তাই মাও-এর সেনাবাহিনীর উপর নির্দেশ ছিল জনতার সঙ্গে পূর্ণ মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপনের। মাও-এর তিনটি নিয়ম ও আটটি মন্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল সেনাবাহিনী ও জনসাধারণের এই একাত্ম জলে থাকে গেরিলা তেমনি থাকবে জনগণের মধ্যে। এই সাধারণ লোক যাতে সেনাবাহিনীর প্রতি বিরূপ না হয় তার জন্য এমন সব খুঁটিনাটি নির্দেশ দিয়েছিলেন যা মাও-এর মতো নেতার পক্ষেই সম্ভব। যেমন ঘুম থেকে উঠে নিজে বিছানা গুটিয়ে রাখবে, মেয়েদের সামনে স্নান করবে না, কিংবা পরোয়ানা না থাকলে কারও দেহতল্লাসী করবে না। এ সব নির্দেশের মূল্য কী তা চীন বিপ্লবের সাফল্য থেকে বোঝা যায়।

সেনাবাহিনীর উপর পারটির কর্তৃত্ব, সেনানায়কদের উপর পলিটিক্যাল কমিশারদের কর্তৃত্ব সামরিক বাহিনীর অনেক নেতাই মেনে নিতে পারেননি। এই অসন্তোষ আরও বাড়ল যখন বিপ্লবের পর মাও বললেন, গণমুক্তি ফৌজ শুধু জাতীয় প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত থাকবে না, উৎপাদন বাড়ানোতেও সাহায্য করবে। কোন দেশের সামরিক বাহিনীই অসামরিক দায়িত্ব পালনে ইচ্ছুক নয়, চীনেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। কোরিয়া যুদ্ধের পর চীনা সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণের ভার যখন সোভিয়েট বিশেষজ্ঞ ও পরামর্শদাতাদের ওপর ন্যস্ত হল তখন তাঁরা মুক্তিফৌজের আদি চরিত্র সংশোধনে প্রবৃত্ত হলেন, তাঁরা অফিসার ও সাধারণ সৈন্যের বেতনের বৈষম্য অনেক বাড়িয়ে দিলেন, পোশাকে পার্থক্য আনলেন, উৎপাদনের কাজে সেনাবাহিনীকে লাগানোর বিরোধিতা করলেন। সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের এই সব প্রস্তাবে চীনের তখনকার প্রতিরক্ষামন্ত্রী পেং তে-হুয়াইয়ের পূর্ণ সমর্থন ছিল। মুক্তিফৌজের এই চরিত্র পরিবর্তন মাও-এর পছন্দ হয়নি। 'চার ইয়ারের' অন্যতম চ্যাং চুন-চিয়াও এই সময় পিপলস ডেলিতে একটি প্রবন্ধে বলেন, সেনাবাহিনীতে বেতন প্রথা বুর্জোয়া শ্রেণীবিভাগের পরিচায়ক আর বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সব কিছু সরবরাহের যে ব্যবস্থা আগে চালু ছিল তা বৈপ্লবিক। সেনানায়করা বিনা কারণে 'চার ইয়ারের' উৎখাতে হুয়া কুয়ো-ফেংকে সাহায্য করেন নি। মোক্ষম আঘাত অবশ্য মাও হেনেছিলেন। সেনাবাহিনীর নতুন প্রবণতা, সৈন্যাধ্যক্ষদের ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী পেং-এর বিরোধিতা উপেক্ষা করে তিনি বললেন, 'গ্রেট লীপ ফরোয়ার্ড' আন্দোলনকে সফল করবার জন্য সেনাবাহিনীকে উৎপাদনের কাজে লাগতে হবে। তারপর নির্দেশ এল, অফিসারদের কায়িক পরিশ্রম করতে হবে। ১৯৫৯ সালের এক হিসাবে দেখা যায়, একশ ষাট জন জেনারেল সহ দেড় লক্ষ অফিসারকে সাধারণ সৈন্যের কাজ করতে হয়েছিল, তাঁরা ঝাড়ু দিয়েছেন, রান্না করেছেন, ময়লা পরিষ্কার করেছেন। পেং তে-হুয়াং তাঁর বিরোধিতা গোপন রাখেননি, তিনি গ্রেট লীপ ফরোয়ার্ড আন্দোলন, কমিউন ব্যবস্থা ও সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণে হস্তক্ষেপের সমান নিন্দা করেন। ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে পারটির কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত অধিবেশনে মাও তীব্র সমালোচনা করলেন পেং ও তাঁর চীফ অব স্টাফ হুয়াং চো-চেংকে। পেং পদচ্যুত হলেন, নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী হলেন লিন পিয়াও, নতুন চীফ অব স্টাফ লো জুই-চিং। সেনাবাহিনীর উপর পারটির কর্তৃত্ব আবার প্রতিষ্ঠিত হল। অল্পদিনের মধ্যেই লিন পিয়াও ঘোষণা করলেন, সেনাবাহিনীতে আধুনিকীকরণের প্রবক্তারা তাঁদের ভুল বুঝতে পেরেছেন, তাঁরা স্বীকার করেছেন, সেনাবাহিনীতে মানবিক উপাদানের স্থান সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সমরোপকরণ ও যুদ্ধশাস্ত্রের স্থান তার পরে। তিনি বললেন, রাজনৈতিক [illegible] সেনাবাহিনীর পক্ষে ভীষণ প্রয়োজনীয়। মানসিক অ্যাটম বোমা (স্পিরিচুয়াল অ্যাটম বম্ব) অর্থাৎ আদর্শগত সচেতনতা ও সাহস বাস্তব অ্যাটম বোমার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী ও প্রয়োজনীয়। তিনি ঘোষণা করলেন, অস্ত্র ও মানুষের মধ্যে মানুষের স্থান, অন্য কাজ ও রাজনৈতিক কাজের মধ্যে রাজনৈতিক কাজের রাজনৈতিক কাজের দিকের ও কেতাবী চিন্তা ও গতিশীল চিন্তার মধ্যে গতিশীল চিন্তার স্থান, প্রথমে, লিন পিয়াও-এর এই অনুশাসন 'চারটি প্রথম' নামে খ্যাত। 'দি হিউম্যান ফ্যাকটর ফারসট, পলিটিক্যাল ওয়ারক ফারসট, আইডিওলজিক্যাল ওয়ারক ফারসট, অ্যানড ডাইন্যামিক থট ফারসট।'

মাও-এর প্রতি লিন পিয়াও-এর আনুগত্য অনেক দিনের। যদিও তিনি চীন-সোভিয়েট মৈত্রী সঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন, এবং বিপ্লবের পরও এক-নাগাড়ে প্রায় চার বছর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য মস্কোতে ছিলেন তবু মাওবাদে তাঁর বিশ্বাস অটল ছিল ধরে নেওয়া যেতে পারে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবে তিনিই সেনাবাহিনীকে সামিল করেছিলেন, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তিনিই ছিলেন এক নম্বর নেতা। এই নিবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে, মাওবাদে লিন পিয়াও-এর আস্থা সম্পর্কে স্বয়ং মাও-এর সন্দেহ ছিল। তা সত্ত্বেও নবম কংগ্রেসে লিন মাও-এর উত্তরাধিকারী ঘোষিত হন। লিন-এর বিদ্রোহ ও মৃত্যুর কারণ এখনও রহস্যাবৃত। তবে এ বিষয়ে সকলেই একমত, সোভিয়েট ইউনিয়ানে পালানোর সময় তিনি বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। কাজেই এ অনুমান স্বাভাবিক, তিনিও সেনাবাহিনীর উপর পারটির তদারকিতে বিরক্ত হয়ে সোভিয়েট পন্থায় আধুনিকীকরণের দিকে ঝুঁকেছিলেন। লিন পিয়াও-এর পতনের পর পারটি কর্তৃত্বকে অমান্য করবার মতো কোন সামরিক নেতা থাকলেন না। চিয়াং চিং ও তাঁর তিন সঙ্গী গোঁড়া মাওবাদী হিসাবে পারটির সার্বভৌম ও সার্বিক কর্তৃত্বে বিশ্বাস করতেন। তাই হুয়া যখন চার ইয়ারের সঙ্গে ক্ষমতার লড়াই-এ প্রবৃত্ত হলেন তখন সামরিক নেতারা হুয়াকে সমর্থন করলেন। এই সমর্থনের উদ্দেশ্য ছিল মাওবাদকে খর্ব করা যাতে সেনাবাহিনীর উপর পারটির খবরদারি বন্ধ হয় ও সোভিয়েট পদ্ধতিতে গণফৌজকে একটি আধুনিক বাহিনীতে পরিণত করা যায়।

১৯৭৭ সালে অবশ্য হুয়ার মাওবাদকে অস্বীকার করবার সাহস হয়নি। তিনি মাও-এর নাম নিয়ে খাঁটি মাওবাদীদের আঘাত করলেন, একাদশ কংগ্রেসে ঘোষণা করলেন লিউ শাও-চি ও লিন পিয়াও-এর মতোই চার ইয়ার চেয়েছিলেন ধনতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ তাঁদের মাওভক্তির আড়ালেও ছিল সোভিয়েটপ্রীতি। অবশ্য যখন ঘোষিত হয়েছিল যে মাও-এর রচনাবলীর নতুন সংস্করণ প্রকাশ করা হবে এবং এই সংস্করণের প্রধান সম্পাদক হবেন স্বয়ং হুয়া কুয়ো-ফেং তখনই সন্দেহ করবার কারণ ঘটেছিল যে মাওবাদের সংশোধনের উদ্যোগ হচ্ছে, মাও-এর মৃত্যুর পর মাওবাদের মৃত্যু ঘটতে চলেছে।

মধ্যপন্থী হুয়া যখন বামবিরোধী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেন তখন তাঁর সেনাবাহিনীর, অন্ততপক্ষে সেনাবাহিনীর মস্কোপন্থী অংশের সমর্থন মিলল। পারটির বামবিরোধী দক্ষিণ ও মধ্যপন্থীরাও তাঁর সঙ্গে রইলেন। বামপন্থী, গোঁড়া মাওবাদী সকলেই যে তাঁর বিরুদ্ধে গেলেন তাও নয়। পিকিং-এর মেয়র উ তে বা মাও-এর দেহরক্ষী ওয়াং তুং-শিং হুয়াকে সমর্থন করলেন। একাদশ কংগ্রেসে দুজনেই পলিটব্যুরোর সদস্য মনোনীত হন। ওয়াং তুং শিং তার উপর হন পারটির চারজন ভাইস-প্রেসিডেন্টের অন্যতম ও একই সঙ্গে পারটির সেক্রেটারী জেনারেল। পিকিং-এর যে নিরাপত্তাবাহিনী ৮৩৪১ ইউনিটের সাহায্যে হুয়া চিয়াং চিং ও তাঁর সঙ্গীদের গ্রেপ্তার করেছিলেন সেই ৮৩৪১ ইউনিটের ভারও হুয়া ওয়াং তুং শিংকে দিয়েছিলেন। এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে পলিটব্যুরোর যে চারজন সদস্যের পারটি ও সরকারি সব পদ থেকে 'পদত্যাগপত্র' গৃহীত হল তাঁদের মধ্যে এই দুজন আছেন। অন্য দুজন হলেন চি তেং-কুয়েই ও চেন সি-লিয়েন। চি বামপন্থী বলেই পরিচিত, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় তিনি নেতৃত্ব অর্জন করেন, তবে চেন আগে পরি-

চিত ছিলেন নরমপন্থী। চু এন-লাইয়ের অনুগামী বলে।

সামরিক বাহিনী ও দলের একাংশের সমর্থন সত্ত্বেও হুয়া নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। নিজের নেতৃত্বের ভিত শক্ত করার জন্য তিনি চাইলেন পারটি ও গভর্নমেণ্ট ব্যুরোক্রাসীর সমর্থন। পারটি আরমি ও ব্যুরোক্রাসী—চীনের নয়া শাসনব্যবস্থায় এই তিন স্তম্ভের আনুগত্য মাও পেয়েছিলেন। হুয়া চাইলেন দ্বিতীয় মাও হতে। তাই তিনি ডেকে আনলেন ব্যুরোক্রাসীর অবিসংবাদী নেতা তেং সিয়াও-পিংকে যাঁকে মাও স্বয়ং দুবার ধনতন্ত্র-পন্থী ও মাওবাদবিরোধী এই অভিযোগে পদচ্যুত করেছিলেন। অবশ্য লিউ শাও-চির মতো তেং কোনদিন পারটির সাধারণ সদস্য পদ হারাননি। মাও-এর গ্রেট লীপ ফরোয়ার্ড আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য যেমন ছিল সেনাবাহিনী থেকে সোভিয়েট প্রভাব দূর করা, তেমনি তাঁর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ব্যুরোক্রাসীকে সোভিয়েট প্রভাব মুক্ত করা, ব্যুরোক্রাসী যাতে এক নতুন শাসক-শ্রেণীতে পরিণত না হয়—যা সোভিয়েট ইউনিয়নে হয়েছে বলে তিনি মনে করতেন—তার জন্য তাকে এক বিষম নাড়া দেওয়া। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর ব্যুরোক্রাসী আবার নিজেকে সংগঠিত করতে শুরু করে চু এন-লাইয়ের নেতৃত্বে। এ কাজে সাহায্য করবার জন্য চু এন-লাই তেং শিয়াও-পিংকে তাঁর প্রথম রাজনৈতিক নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে আনেন। চু-র মৃত্যুর পর মাও তেংকে দ্বিতীয়বার নির্বাসন দন্ড দেন। মাওয়ের মৃত্যুর পর তেংকে আবার ফিরিয়ে আনলেন হুয়া। তেং হুয়ার চেয়ে অনেক দক্ষ ও বয়সে অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও অনেক বেশী কর্মঠ। তেং নিশ্চয়ই ভোলেননি যে তাঁর দ্বিতীয়বার পতনের সময় যাঁরা তাকে ধনতন্ত্র-পন্থী, ক্যাপিটালিস্ট রোডার বলে ধিক্কার দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হুয়াও ছিলেন। বামপন্থীদের অন্তর্বিরোধের সুযোগ নিয়ে বামশক্তিকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে তেং হুয়াকে সমর্থন করেছিলেন। সেই উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পর হুয়া আজ তাঁর কাছে অপ্রয়োজনীয়। লক্ষণীয় যে দ্বিতীয় পুনর্বাসনের পর তেং যে চারটি আধুনিকীকরণের শ্লোগান তুলেছিলেন, তার মধ্যে সেনাবাহিনীরও স্থান ছিল। সেনাবাহিনীর মস্কোপন্থীদের সমর্থন তিনি সহজেই পেয়েছেন, চু এন-লাইয়ের জীবিতকালেই ব্যুরোক্রাসী তাঁর করায়ত্ত হয়েছিল। ফেব্রুয়ারী মাসে পারটির কেন্দ্রীয় কমিটি যেভাবে বামপন্থীদের বরখাস্ত করে তেং-অনুগতদের তাঁদের স্থলাভিষিক্ত করল তাতে মনে হয় পারটিতেও আজ তেং-এর প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই। শোনা যাচ্ছে, এই বছরের শেষে চীনা কমিউনিস্ট পারটির অকাল কংগ্রেস হবে। এই কংগ্রেসেই সম্ভবত তেং ও হুয়ার চূড়ান্ত শক্তিপরীক্ষা হয়ে যাবে। এ বিষয়ে এখন আর কোনও সন্দেহ নেই যে পাঁচ বছর আগে যিনি চীনের নয়া দ্বিতীয় ক্রুশ্চভ বলে ধিককৃত হয়েছিলেন সেই তেং শিয়াও-পিং এখন চীনের এক নম্বর নেতা।

যদিও তেং-এর সাম্প্রতিক পরিচিতি চু এন-লাইয়ের সমর্থক ও বাস্তববাদী বলে, প্রকৃতপক্ষে তাঁর নেতা লিউ শাও-চি। লিউ শাও-চিকে তিনি মরণোত্তর পুনর্বাসন করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি ঘোষণা করেছেন নেতা হিসাবে লিউ-এর স্থান দ্বিতীয়—মাও-এর ঠিক পরে ও চুর-এর উপরে। যদিও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় লিউ সংশোধনবাদী ও চীনের ক্রুশ্চভ বলে নিন্দিত হয়েছিলেন তা হলেও তাঁকে ঠিক গোঁড়া সোভিয়েটপন্থী ও মাওবাদ-বিরোধী বলা চলে না। তবে একথাও ঠিক যে তিনি মাও-এর উগ্র সোভিয়েট বিরোধিতায় সায় দেননি, সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্তভাবে আমেরিকার বিরুদ্ধে ভিয়েতনামকে সাহায্য করার প্রস্তাব তিনি দিয়েছিলেন। চীনা কমিউনিস্ট পারটির আর একজন প্রথম সারির নেতা যাঁকে তেং মরণোত্তর পুনর্বাসিত করেছেন তিনি লি লি-সান। লি লি-সানের মস্কো লাইনের প্রতি আনুগত্য সম্পর্কে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। তিনি খাঁটি মস্কোপন্থী।

তেং নিজে কোনদিন সোভিয়েটপন্থী বলে পরিচিত ছিলেন না। পারটির আভ্যন্তরিক লড়াইয়ে মাওকে নিজের লাইন প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে বার জন নেতাকে পরাস্ত করতে হয়েছিল তাঁদের মধ্যে লিউ শাও-চি, লিন পিয়াও, লি লি-সান, ওয়াং মিং আছেন কিন্তু তেং নেই। তা সত্ত্বেও তেং মাও-বিরোধী। মাও-এর সমর্থক হওয়ার বিশেষ কোন কারণও তাঁর নেই। মাওয়ের সক্রিয় বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি আজ চীনের এক নম্বর নেতা। তাঁর আধুনিকীকরণ কর্মসূচী মাওবাদের বিরোধী। আভ্যন্তরিক নীতিতে তিনি মাওবাদকে বর্জন করেছেন কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তিনি এখনও মাও প্রবর্তিত নীতি মেনে চলেছেন। এই বৈপরীত্য বেশি দিন চলা সম্ভব নয়। বর্তমানের উগ্র সোভিয়েট বিরোধিতা তাঁর আধুনিকীকরণ কর্মসূচীকেই ব্যাহত করবে। সোভিয়েট ও চীনের বিরোধে উস্কানি দিতে আমেরিকা ও পশ্চিমী শক্তিবর্গের যতই আগ্রহ থাকুক না কেন, তারা কোন দিনই একটি সমাজতান্ত্রিক দেশকে সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সত্যিকারের শক্তিশালী, স্বনির্ভর হতে সাহায্য করবে না। এক সোভিয়েট ইউনিয়নে রক্ষা নেই, তারা চীনকে কখনই সুগ্রীব দোসর বানাবে না। আমেরিকা ও পশ্চিম জার্মানী তো স্পষ্টই জানিয়েছে চীনকে তারা আধুনিক অস্ত্র বিক্রয় করবে না, ব্রিটেন ও ফ্রান্স করতে পারে। তবে তাদের কী ক্ষমতা যে চীনকে তারা সোভিয়েট ইউনিয়নের সমকক্ষ সামরিক শক্তি হিসাবে গড়ে ওঠায় সাহায্য করবে? তার উপর আছে বৈদেশিক মুদ্রার প্রশ্ন যা চীনের অপরিমিত নয়। এসব ছাড়াও আছে সমাজ ব্যবস্থার প্রশ্ন। মাওবিরোধীরা কেউই সমাজতন্ত্রবিরোধী, সংসদীয় গণতন্ত্র অনুরাগী নন। যাঁরা ভেবেছিলেন সোভিয়েট বিরোধিতা ও আমেরিকা-প্রীতির বশে চীনের নেতারা তাঁদের দেশে পশ্চিমী গণতন্ত্রের অবাধ অনুপ্রবেশে বাধা দেবেন না তাঁরা আজ আশাহত, "ডেমোক্রাসী ওয়াল"-এ পোস্টার আঁটা বন্ধ হয়ে গেছে। স্বয়ং তেং ঘোষণা করেছেন "চার মহৎ"-এর কোনও প্রয়োজন নেই। এই চার মহৎ হচ্ছে বাক স্বাধীনতা, আলোচনার স্বাধীনতা, জমায়েতে স্বাধীনতা আর প্রাচীরপত্র লেখবার স্বাধীনতা। সংবিধান থেকে এই চার মহৎকে ছেঁটে দেওয়া হয়েছে।

চীনের বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য, চীনের আধুনিকীকরণ কর্মসূচী সফল করার জন্য চীনের নেতাদের সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে একটি সমঝোতায় আসতে হবে। যে-কারণে মাওয়ের মস্কো সম্পর্কে দ্বিধা ও সংশয় ছিল, চীনের বর্তমান নেতাদের তা নেই। বরং তেং সিয়াও-পিংয়ের মাও-বাদকে মাওনীতিকে বর্জন করার অনেক কারণ আছে। যে-গভীর আদর্শনিষ্ঠা ও বিশ্বাস থাকলে মাওনীতি অনুসরণ করে চীন সোভিয়েট ইউনিয়নের সমকক্ষ হওয়ার আশা করতে পারত মাও-উত্তর চীনে সেই নিষ্ঠা ও বিশ্বাসেরও অভাব ঘটেছে। চীনা নেতারা যদি মাওবাদ থেকে সরে আসেন তা হলে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে ও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে সোভিয়েট ইউনিয়নেরও আপত্তি থাকবে না; ব্রেজনেভের যদি থাকে তাঁর উত্তরাধিকারীরা থাকবে না। চীনের বর্তমান অদলবদল এই দিক পরিবর্তনের প্রস্তুতিপর্ব। সত্যিই যদি এই সমঝোতা হয় তা হলে তার ফল হবে সুদূরপ্রসারী। আমেরিকা ও অন্য অনেকের আপেল গাড়ি ওলটাবে, আবার আমাদের দেশের পক্ষে তা হয়ত হবে মঙ্গলকর। চীনা নেতাদের থেকে থেকে সোভিয়েট-বিরোধী হুংকার—যদিও কিছুদিন হল কমে এসেছে—শুনে মনে হতে পারে এই সমঝোতার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ভুললে চলবে না চীনা রণনীতির আদি গুরু সান জু-র প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের শিক্ষা—আপয়োর ইস্ট, স্ট্রাইক ওয়েস্ট; পূবে শোর তোল, পশ্চিমে আঘাত হানো। প্রকাশ্য সোভিয়েট বিরোধিতা গোপন সোভিয়েট প্রীতির ঢাকনা হতে পারে।

# কণ্টকল্পিত

## অতুল্য ঘোষ

(নব পর্যায়)

॥ ২৮ ॥

সংবাদপত্রে যা পড়লুম তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না ; কিন্তু নাম-ধাম দিয়ে যা বেরিয়েছে তা সত্য এবং এই সত্য ঘটনা গভীর উদ্বেগ ও চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। আসামের ঘটনার সকল দায়িত্বশীল মানুষই উদ্বিগ্ন। বোঝা যায়, ঘটনা জটিল হয়েছে তৎকালীন তদারকী সরকার ও রাজ্য সরকারের দায়িত্বহীনতার জন্য এবং ঘটনার জট ছাড়াতে কিছু দিন সময় লাগবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের যে খবর বেরিয়েছে, তাতে সত্যিই স্তম্ভিত হয়ে গেছি। এই বাম ফ্রন্ট সরকার যখন অনেক সংখ্যাধিক্য নিয়ে এসে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করে, তখন তাকে স্বাগত জানিয়েছিলাম। এবং সত্যিই মনে মনে চেয়েছিলাম যে, স্থায়ী সরকার এখানে পাঁচ বছর বিরাজ করুক। তখন অবশ্য বাম ফ্রন্ট সরকার মানে যে মন্ত্রীরা কিছুই নন, বাম ফ্রন্ট দলই যে সব এটা বোঝা যায়নি। মন্ত্রিসভার কোন মর্যাদা বা দায়িত্ব যে নেই, এত পরিষ্কারভাবে এর আগে কখনও প্রকাশিত হয়নি। বিষয়টা অতি সাধারণ এবং প্রশাসনিক। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং মেডিকেল কলেজে ঢোকবার আগে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে কাগজে বেরিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী,—যাঁর এ বিষয়ে কথা বলার পূর্ণ অধিকার আছে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী,—যাঁর এ বিষয়ে দায়িত্ব অপরিসীম,—আর মুখ্যমন্ত্রী,—যাঁর দায়িত্ব সর্বাধিক,—এইসব কলেজে এন্ট্রান্স পরীক্ষা নিয়ে মত দিয়েছেন এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাও হয়েছে। এই প্রশ্নে বাম ফ্রন্ট দল দল হিসাবে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছে এবং বাম ফ্রন্ট দলের চেয়ারম্যান অতি কঠিন ভাষায় তাঁর মত প্রকাশ করেছেন যে, এই তিনজন মন্ত্রীর ফ্রন্টের নির্দেশের বাইরে যাবার কোন অধিকার নেই। গণতান্ত্রিক দেশে এ অবস্থা বোঝা খুব শক্ত। দল হিসাবে ফ্রন্টের নিশ্চয়ই পরামর্শ দেবার অধিকার আছে। বাজেট যখন হবে, রিলিফের ব্যবস্থা কিভাবে হবে, খরার সাহায্য কিভাবে করা উচিত—সাধারণভাবে এসব বিষয়ে পরামর্শ দেবার অধিকার দলের নিশ্চয়ই আছে। রাজ্যের বিভিন্ন উন্নতিকল্পে পরামর্শ দেবার অধিকার আছে, জমির বিলিব্যবস্থা এবং জমিতে যারা চাষ করে তাদের সম্বন্ধেও পরামর্শ দেবার অধিকার আছে। সাধারণভাবে নীতি প্রকাশ করাই দলের কাজ। কিন্তু দল যদি প্রশাসনিক খুঁটিনাটি নিয়ে নির্দেশ দিতে থাকে, তা হলে তাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলা একটা বড় রকমের পরিহাস।

ছোটখাট অনেক ব্যাপার নিয়ে আমরা শুনেছি এর আগে—যেমন, স্কুল ইন্সপেকশনের সময়ে অধিকার নেই এমন লোকও দলের পক্ষ থেকে ইন্সপেকশনে গেছে। মাঝে মাঝে একান্ত প্রশাসনিক কাজেও দলের হস্তক্ষেপের কথা শোনা যায়। এরকম সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা সব দলের সম্বন্ধেই মাঝে মাঝে শোনা যায়। কিন্তু স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী যেখানে একদম প্রশাসনিক ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন, সেখানে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে হচ্ছে যে, 'যা হবার হয়ে গেছে, ভবিষ্যতে আর হবে না'—এ কি কোন গণতান্ত্রিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কথা? এইভাবে যদি এখানে শাসনতন্ত্র চলে, তবে স্বৈরাচারের সঙ্গে তার তফাত কি? বাম ফ্রন্ট নাকি তাঁর দলকে গণতান্ত্রিক বলেন এবং ইন্দিরা ও তাঁর দল নাকি স্বৈরাচারী। অতীতের কথা ছেড়ে দিই।

কারণ, পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটলে সব দলেরই অনেক গুপ্ত কথা বের হয়ে পড়বে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কেন স্বৈরাচারী এবং বাম ফ্রন্ট সরকার কেন গণতান্ত্রিক তা বিশ্লেষণ করার সময় এসেছে। যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর দায়িত্ব এবং অধিকার অনুযায়ী কাজ করলে দলের কাছে ত্রুটিস্বীকার করতে হয়, সে রাজ্যে আর যাই থাক, গণতন্ত্র আছে—এ কথা বলা চলবে না। আইনসভায় নির্বাচিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে দলের প্রতি আনুগত্য ভুলে যেতে হবে—এ কথা কেউ বলছে না। কিন্তু যেদিন
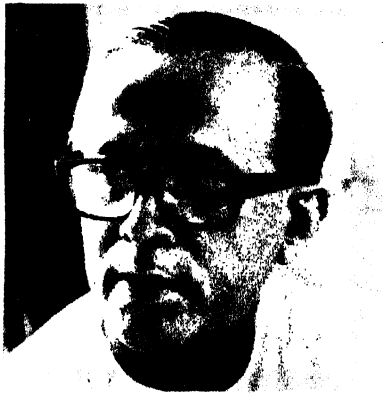
তিনি মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ নিলেন, সেদিন থেকেই তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, কেবলমাত্র দলের মুখ্যমন্ত্রী নন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রশাসনিক কাজ করবার জন্য আরও কয়েকজন মন্ত্রী আছেন। দলের নির্দেশ তাঁরা মনে রাখতে পারেন, কিন্তু তাঁরা তো সারা পশ্চিম বাংলারই মন্ত্রী! বন্যায় সাহায্য যখন দেওয়া হবে, তা কি কেবল দলীয় পরিবারদেরই দেওয়া হবে? আমি বিশ্বাস করি না বর্তমান মন্ত্রিসভার কোন মন্ত্রী বা সমষ্টিগতভাবে সব মন্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে এ কথা ঘোষণা করবেন। কারণ, মন্ত্রী হবার পর দলের সঙ্গে তাঁদের যে সম্পর্ক তা একেবারে নিজস্ব! মন্ত্রী তাঁরা সমগ্র রাজ্যের অধিবাসীর, যারা তাঁদের ভোট দিয়েছে তাদেরও, যারা ভোট দেয়নি তাদেরও। খরা, বন্যায় যেমন সমগ্র অধিবাসী তাঁদের কাছে সমান, তেমনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সব বিষয়েই তাঁরা সব অধিবাসীদের কাছেই দায়িত্বশীল। প্রশাসনিক পদ্ধতির মাধ্যমেই এইসব দায়িত্ব পালন করা হয়। এখানে দলীয় নির্দেশ আসার কোন স্থান নেই। যখন দলীয় নির্দেশে প্রশাসন পরিচালিত হবে, তখন তাকে আর গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বলা চলবে না। কেবলমাত্র ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর দল স্বৈরতন্ত্রী এবং নিজেরা গণতন্ত্রী—এ কথা বললেই গণতান্ত্রিক নীতিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

যেখানে গণতান্ত্রিক সংবিধান অনুযায়ী প্রশাসন পরিচালিত হচ্ছে, সেখানে ব্যক্তিগত নির্দেশ বা দলগত নির্দেশ—দুই-ই অন্যায়, অনুচিত ও অবান্তর।

ভাবতেও আশ্চর্য লাগে যে, একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তা হলে কি মন্ত্রীদের প্রশাসনিক নিত্য-নৈমিত্তিক কাজগুলি দলের অঙ্গুলিহেলনে চলবে? যেমন সরকারী কর্মচারীদের উপর দলীয় প্রভাব থাকা অনুচিত, ঠিক সেইরকম মন্ত্রীদের প্রশাসনিক কাজের দৈনন্দিন খুঁটিনাটির উপর দলীয় নির্দেশ থাকা অনুচিত। দলের বৈঠকে তাঁরা যা-ইচ্ছা নীতি নির্ধারণ করতে পারেন, কিন্তু সরকারের প্রাত্যহিক কাজ বা নীতি নির্ধারণে দল যদি হস্তক্ষেপ করে, তবে তাকেই স্বৈরতন্ত্র বলে। একান্ত বিস্ময়ের বিষয়, যে বাম ফ্রন্ট দল এনট্রান্স পরীক্ষা নিয়ে এত উদ্বিগ্ন, কিন্তু পরীক্ষা যারা দিতে বসবে, তারা বিদ্যুৎ পাবে কিনা তা নিয়ে তাঁদের কোন উদ্বেগ নেই। তা হলে কি দল রাজ্যের কোন ব্যাপার নিয়ে কোন উদ্বেগ অনুভব করেন না? পরীক্ষার ফল সময়ে বেরুক বা না-বেরুক, তা দিয়ে দলের কোন উদ্বেগ নেই। পরীক্ষার সময়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে না পাবার জন্য তাঁদের কোন উদ্বেগ নেই। ট্রেনে রাহাজানি নিয়েও তাঁদের কোন উদ্বেগ নেই। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট, সরকার, এল আই সি প্রভৃতি অনেকেই হাজার হাজার চারতলা ফ্ল্যাট তৈরি করেছেন। সবেতেই পাম্পে জল ওঠার কথা। কিন্তু বিদ্যুৎ নেই—পাম্প অচল, নিজেদের জল তুলতে হয়। এর জন্য ফ্রণ্টের কোন মাথাব্যথা নেই। কলকাতার বহু বড় রাস্তা জঞ্জালে প্রায় যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। তার জন্য ফ্রণ্টের কোন চিন্তা নেই। এরকম ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যায়, যার জন্য ফ্রণ্টের মাথাব্যথা হওয়া উচিত ; কারণ, তাঁদের দলীয়

নির্বাচিত হয়েছেন, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁরা উদাসী। তা হলে কি ধরে নিতে হবে যে, পশ্চিমবঙ্গের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য যে সব মন্ত্রী আছেন তাঁরা দলের হাতে ক্রীড়নক মাত্র? আমাদের সংবিধানে তো এরকম কোন নীতি বিধিবদ্ধ করা নেই। সংবিধানের নীতি যাঁরা অমান্য করেন, তাঁরাই তো স্বৈরাচারী। যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজের সহযোগীদের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দলের কাছে ভর্ৎসিত হন, তাঁদের কি গণতান্ত্রিক আখ্যা পাওয়া সাজে? তাঁরা যখন শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর দলকে স্বৈরতন্ত্রী বলেন, তখন সেটা যেমন অসংগত, তেমনি অশোভন হয়। দলের এ ক্ষমতা আছে মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বলার, কিন্তু যতদিন তিনি মুখ্যমন্ত্রী আছেন, ততদিন তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার দলের নেই। এই পার্থক্য যাঁরা বোঝেন না, তাঁরাই স্বৈরতন্ত্রের ধারক ও বাহক।

বর্তমানে ভারতবর্ষে যেভাবে দল ভাঙাভাঙি ও দলে দলে মিতালি হচ্ছে, তাতে নীতির কথা না তোলাই ভাল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তো সে অবস্থা নয়। এখানে বাম ফ্রন্ট দলভুক্তদের তো দল ভাঙাভাঙির প্রশ্নই নেই, আর মিতালি তো সর্বাত্মক। কিন্তু এঁদের কাজের পেছনে যদি এই মনোভাব ফুটে বেরোয়, যা প্রচ্ছন্ন ডিক্টেটরশিপের অনুরূপ, তা হলে কি এটাই প্রমাণ হয় না যে, পশ্চিমবঙ্গের যাঁরা দলের নেতা থাকে আমরা ডিক্টেটারশিপ বলি সেই পথে যাবার চেষ্টা করছেন! বড় বড় বিষয় সম্পর্কে দল নীতি নির্দেশক হতে পারে, কিন্তু মনে রাখতে হবে সেটা পরামর্শ মাত্র। নীতিকে কার্যে রূপ দেবার সম্পূর্ণ অধিকার মন্ত্রীদের এবং সেটা প্রশাসনযন্ত্রের মাধ্যমে। হতে পারে কোথাও ভুল হয়, বা কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো দলীয় নির্দেশ অনুযায়ী হয় না, তার সমাধান তো ক্রোধের দ্বারা হতে পারে না। আলোচনার পথ তো খোলাই থাকে! যেখানে মুখ্যমন্ত্রীকে অবধি ভয় পেতে হয় দলের কাছে, তা হলে তিনি প্রাশাসনিক কাজ কিভাবে ত্বরান্বিত করবেন? এটা মনে রাখতে হবে যে, দল যখনই প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করবে, তখনই যে কেবল মন্ত্রীদের মর্যাদা নষ্ট হবে, তা নয়—কর্মক্ষমতাও অনেক কমে যাবে। জনসাধারণ কৈফিয়ত চাইবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, দলের কাছে নয়। সেই মুখ্যমন্ত্রীকে যদি হেয় করা হয়, তা হলে তাঁর পক্ষে প্রশাসনিক কাজকর্ম চালানো তো অসম্ভব! দলের মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বলার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, কিন্তু যতদিন তিনি মুখ্যমন্ত্রী আছেন তিনি সারা পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, দলের নন। দলের এই মনোভাবকেই স্বৈরতন্ত্র বলে। এই প্রসঙ্গে একটা পুরাতন কাহিনী মনে পড়ছে।

বোধহয় সালটা ১৯৪৯। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় তখন আমেরিকায়। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এবং কংগ্রেস দলের দলপতি জওহরলাল ডাঃ রায়ের অবর্তমানে কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি কিছু অভিযোগ শুনে সঙ্গে সঙ্গে তদন্তের নির্দেশ দিয়ে যান। এ খবর আমেরিকায় ডাঃ রায়ের কাছে পৌঁছয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় ফিরে এলেন। তিনি কলকাতায় আসার পরই দিল্লি থেকে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক কলা ভেঙ্কটরাও তাঁকে দিল্লি যেতে অনুরোধ জানালেন। ডাঃ রায়ের উত্তর গেল যে, ওয়ারকিং কমিটির মিটিং ডাকা হোক, তিনি যাবেন। দিল্লিতে ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং। জওহরলাল আছেন, বল্লভভাই আছেন, আর আরও সব স্বনামধন্য নেতারাও আছেন। ডাঃ রায় একটি ছোট্ট বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার বিষয়—তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর রাজ্যে কোন তদন্তের আদেশ দেবার কি অধিকার দলপতি জওহরলালের আছে? জওহরলাল তাঁকে পদত্যাগ করতে বলতে পারেন, তিনি অবনত মস্তকে মেনে নেবেন। কিন্তু তিনি যতদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আছেন, ততদিন প্রশাসনিক সব নির্দেশ তাঁর মারফত পাঠাতে হবে। এরই নাম গণতান্ত্রিক অধিকার। অবশ্য জওহরলাল তদন্তের আদেশ প্রত্যাহার করে নেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যাঁদের হাতে শাসন ক্ষমতা আছে, তাঁদের এটি মনে রাখা উচিত, তাঁরা দলীয় সদস্য হিসাবে দলের কাছে দায়ী, কিন্তু মন্ত্রী হিসাবে দায়ী রাজ্যের কাছে। মুখ্যমন্ত্রীর অমর্যাদায় প্রশাসনযন্ত্র কখনও সচল হতে পারে না।

ফটো : অলক মিত্র

# হিমাদ্রির ফিরে আসা

সমীর মুখোপাধ্যায়

সকাল সকাল গঙ্গায় হিমাদ্রির চান করা অভ্যেস। আজ তার খুব তাড়া। সেইজন্যে বেশ একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলেছে। খালি গায়ে তেল চপচপে করে মাথা, কাঁধে তোয়ালে, মুখে ফেনাযুক্ত ব্রাশ, তার এখন অন্য রকম চেহারা। সেই সন্ধ্যে ছটায় এনগেজমেন্ট 'স্টার' থিয়েটারে। তার অবশ্য এখন অনেক দেরি। তবু হাতে কোন জরুরী কাজ থাকলে, কাজটা যতো দেরিতেই থাক, হিমাদ্রির স্বভাব, ও সমস্ত মন সেই এনগেজমেন্টের দিকে একাগ্র রাখে। প্রত্যেকটা মিনিট তখন সে হিসেব করে খরচ করে। সব সময়, এমন কি খেতে খেতে কিংবা পথচলতি বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেও, এমন কি অনুরাগের স্ত্রী স্বভার সঙ্গে (যার নাম অতি নিঃশব্দে তা। মনে বহুকাল মুদ্রিত হয়ে গেছে) স্পষ্টতর, গাঢ়তর কোন প্রসঙ্গে এলেও হিমাদ্রি তখনো তার ইন্দ্রিয়কে সচেতন রাখে। তখনো এনগেজমেন্টের সময় একটুও ভোলে না। কিন্তু মজা এই, কখনো ঠিকমত সে কোনদিন কথা রাখতে পারে না, যতো তুচ্ছ আর যতো অহংকারী এনগেজমেন্টই হোক কোথাও না কোথাও একটু খুঁত থেকে যায়ই। আর একটুও নিরাশ বা বিষণ্ণ না হয়ে হিমাদ্রি পরবর্তী এনগেজমেন্টের ব্যাপারটায় আরো সিরিয়াস হয়ে ওঠে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে এটা অন্যগুলোর মত কিছুতেই 'ফেল' হতে দেবে না। যেমন আজ, আজ সন্ধ্যে ছটায় 'স্টার' থিয়েটারে যাবার প্রোগ্রাম যাতে ভেস্তে না যায় তার জন্যে সে অনেক আগে থেকে মানে এই ভোরবেলা থেকেই প্রস্তুত, যদিও হাস্যকর, অর্থহীন এবং কিছুতেই 'ফেল' হবার নয়, তবুও। সে এক রকম ছুটেছে গলি দিয়ে, পেছন দিক থেকে সাইকেলে করে এসে দুর্লভ তার সঙ্গে যেতে যেতে বললে, 'কিরে, চান করতে চললি!' আ খেলে যা! দাঁতগুলো সব বার করে ফেললে! দেখছে চান করতেই যাচ্ছে তবু 'চান করতে চললি', এক নম্বরের একটি...। কিন্তু মেজাজ খারাপ করলো না হিমাদ্রি, সে জানে এ সময় মেজাজ ঠিক রাখতে হয়, তারপর এনগেজমেন্ট ঠিক ঠিক রাখার প তখন সে মেজাজকে বলবে, আয় শালা, কতো খারাপ হবি হ'। তখন সে মেজাজের বাপ মা তুলে মেজাজকে ওসকাবে। কিন্তু তার আগে ......

'মেয়েটার কাল থেকে জ্বর। আমার ডাক্তারীতে কুলোচ্ছে না। দেখি একবার ডাঃ চৌধুরীকে। তাকে পেতে গেলেও তো আবার অনেক ল্যাঠা। ভোর পাঁচটায় এসো। লাইন লাগাও। লিস্টিতে নাম লেখাও। উনি আবার করোটার বেশি দেখেন না। এ শালা মহা হেঁপো। উনি ছাড়া শহরে একটা ভালো ডাক্তারও নেই। বাকি সব তো হাতুড়ে হাফ ডাক্তার। কি যে করি'—

এই সেরেছে। আজ আমার এনগেজমেন্ট, আজই আমায় এসব শোনানো কেন? পাছে আমাকে বলে বসে তুমি ভাই ওদিকে তো যাবেই, ডাক্তার চৌধুরীর ডিসপেন্সারীতে গিয়ে লিস্টিতে আমার মেয়ের নামটা যদি চড়িয়ে দাও তো খুব ভালো হয়। খুব যে ভালো হয় আমি তা জানি ব্রাদার। কিন্তু আমারও যে খুব খারাপ হয় তা কি তুমি জানো? আজ আমায় মাপ করো রাজা। যদিও একটা বিশেষ কাজে ডাঃ চৌধুরীর ডিসপেন্সারীর কাছাকাছিই একবার যাবো কিন্তু লিস্টিতে নাম দিতে গেলে অনেকটা সময় বৃথা চলে যাবে, আমি আজ পারছি না। মনে মনে কথাগুলি আউড়ে নিয়ে, একটু শক্তি সঞ্চয় করে নিয়ে হিমাদ্রি দুর্লভকে বললে, 'এদিকে তোমার মেয়ে অসুখ। ওদিকে আমার বাড়ীতেও বিপদ। বাবার আবার হার্টের অবস্থাটা কাল থেকে' চোখে মুখে নিখুঁতভাবে হিমাদ্রি উৎকণ্ঠা ফুটিয়ে তুলল।

যা বোঝবার ব্যাটা দুর্লভ ঠিকই বুঝলো। মনে মনে নিশ্চয়ই বলছে, শালা একখানি মাল। মেয়ের অসুখের কথা বলেছি কিনা অমনি বাপের অসুখের কথা এনে মুখ বন্ধ করে দিলো। ঢের ঢের বস্তু দেখেছি কিন্তু এমন একখানি ফক্কর ...

বি টি কলেজের কাছাকাছি এসে গেছে হিমাদ্রি, এইবার ঢালু পাড় বেয়ে গঙ্গায় নামবে, আপদটা তবু যায় না, আজ তার জরুরী একটা এনগেজমেন্ট, না গেলেই নয়, অথচ সকাল না হতেই দ্যাখো এইসব বখেড়া। 'তাহলে'—

একটু বিষহাসি হেসে দুর্লভ সাইকেলের প্যাডেল ঘোরালো।

'হ্যাঁ। বাবার হার্টটার দিকে একটু নজর রেখো। কখন কি হয় বলা তো যায় না।' বলে হুশ করে বেরিয়ে গেল। দেখলে? যাবার সময় কেমন অলুক্ষণে কথাটি ছেড়ে গেল! আর মুখের ওই হাসিটা! উঃ, হাড়-পিত্তি জ্বলে যায়। কিন্তু এনগেজমেন্টের কথাটা আবার মনে পড়ে গেল হিমাদ্রির। না সে কিছুতেই এখন মেজাজ খারাপ করবে না। মনটা তাজা রাখা, সজীব রাখা এখন খুব জরুরী। কিছুতেই মেজাজকে খানাখন্দে হিমাদ্রি এখন পড়তে দিতে রাজী

নয়। চান করে বাড়ী ঢুকতেই প্রভা হাঁকলো, চা দিয়ে যাও।' ওই এক হয়েছে কোন কাজই প্রভা পুরোটা করতে পারে না। সব কাজই হিমাদ্রির জন্যে আধখানা ফেলে রাখে। এই যে চা-টা তৈরি করলো, এইবার চা-টা তো তারই উচিত হিমাদ্রি আর বাবোর সামনে রাখা, সে সব বালাই নেই, উল্টে হিমাদ্রিকেই যেতে হবে চা-টা আনতে, তবে বাপ ছেলে চা খেতে পাবে। শুধু চা নয়। ধরা যাক খেতে বসেছে প্রভা। সেও খেতে বসেছে। প্রভা একটু মোটা মানুষ, অবশ্য বেশ মানানসই মোটা. কি বলা যাবে এই মোটাকে? ওহো, মনে পড়েছে লক্ষ্মী মোটা। মুখে, শরীরে এখনো বেশ 'জল' আছে। ওই চমক ঠমক বেশ একটা ওই যে, কি বলে ছলাং ছলাং ভাব, হ্যাঁ হ্যাঁ নদী নদী ('তুমি হইয়ো গহীন গাং আমি ডুবা মরি।' বছর পনেরো আগে চিঠিতে এসব খুব ঘটা করে লিখতো।) তা সে মরুক গে যাক, খাবার টেবিলে সব সাজিয়ে ওর হুকুম করা চাই 'জলটা আনো তো, নুনটা নিয়ে এসো অথবা গোলমরিচের শিশিটা'—মানে ওই একটা কোন কাজটাই প্রভা একা সম্পূর্ণ করতে পারে না, অর্ধেকটা হিমাদ্রির জন্যে রেখে দেয়। এই নিয়ে খিটখিট প্রায়ই হয়। কিন্তু আজ হিমাদ্রি এসব আমলেই মনে আনবে না! একদম এইসব ছোটখাটো ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না। মাথা ঘামালেই কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যাবে, এখন থাক সাপ যেখানে থাকার। সাপ বেরোলেই কোন খান দিয়ে যে কি হবে, ধুন্ধুমার ঝগড়া লেগে যাবে, ওতো বেশী কথা বলতে পারে না, অন্তরটিপনী দেবে একটা আর হিমাদ্রি জ্বলে যাবে ও আরেকটা অন্তরটিপনী দেবে, হিমাদ্রি অস্থির হয়ে মাথার চুল ছিঁড়বে, রাগে দাঁত কড়মড় করে। হিমাদ্রি যতো জোরে চেঁচাবে প্রভা ততো শান্ত গলায় বলবে, এই তো চাই। আরো চেঁচাও। আরো চেঁচাও পাড়া-প্রতিবেশী কিছু বাকি রেখো না। সবাই শুনুক। মুখে মুখে চা, জল খাবার তৈরি করে দিলাম। খেয়ে দেয়ে গায়ে জোর হয়েছে। এইবার লাগাও আহা রে, পুরুষ বটে হিমাদ্রিবাবু, গোটা পাড়াটা জেনে গেল। মেয়ে-মানুষের আঁচলের তলায় মেনি বেড়ালের মত বসে থাকেন না। মেয়েমানুষকে বুটের ঠোক্করে রাখেন। ইতিমধ্যেই ধন্য ধন্য পড়ে গেছে।'

—অতএব ওদিকে নয়, ওপথ আজ হিমাদ্রি মাড়াবে না, যাতে কোন কারণে ঝগড়া-বিবাদ বাধে এমন যে কোন জিনিস সে এড়িয়ে চলবেই।

এই দ্যাখো। রান্নাঘরটা অতো করে শুকনো রেখেছি, দিলে তো পায়ের বড় বড় ছাপ!' অন্য দিন হলে হিমাদ্রি চুপ করে থাকতো না। বলতই, 'তোমার খালি পায়ের বড় বড় ছাপ'—বললেই ধুমধাড়াক্কা লেগে যেতো। বাবো উঠে আসতো, দশ বছর বয়েস হলে কি হয়, একখানি বিচ্ছু, আঠারো বছরের ছেলের মত ফোড়ন কেটে বলবে 'মা বাবা আবার তোমার পেছনে লাগছে। তোমার নাকি বর্তিক পা ধোওয়ার কথা বলা। মা, বাবা কাল রাত্তিরে তোমাকে আড়ালে বলছিলো মোটা, বলছিলো মোটার খালি জল জল আর পায়ের বড় বড় ছাপ—বলে বাবোর কি খিল খিল হাসি! এক অদম্য হাসতে ও হেসে কুটি পাটি হয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি দেবে। আর প্রভা তারপর যা আরম্ভ করবে না.....

না বাবা। প্রভাকে ঘাটানো আজ আর ঠিক হবে না। সুতরাং হিমাদ্রি মুখ বুজে শুনে গেল প্রভার অভিযোগ। একবার কি বলতেও গেল। পা বাড়িয়েই কিন্তু সামলে নিলো। আজ না তার এনগেজমেন্ট। এটা সে ভোলে কেমন করে? 'স্টার'-এ 'রজনী' নাটক সন্ধ্যে ছটায়। তাকে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় হাজির হতেই হবে। না হলে বেইজ্জতের একশেষ। এনগেজমেন্ট ব্রেক করাই তার যেন রীতি। কথা দিয়ে কথা রাখা তার যেন কুষ্ঠিতে নেই। কিন্তু আজ ও মরীয়া এনগেজমেন্ট ও কিছুতেই 'ফেল' করবে না। ঠিক চারদিন আগে সোনালিকা কাগজের অফিসে ঘটনাচক্রে ও ঘুরতে ঘুরতে গিয়েছিলো। এই কাগজখানি সিনেমা সংক্রান্ত ব্যাপার স্যাপার নিয়ে থাকে। ছোটখাটো কাগজ। বেশী হাঁক-ডাক নেই তবু চলছে মন্দ নানা কেচ্ছা-কাহিনী ছাপিয়ে। কিভাবে যে মালিক-কাম সম্পাদক ভদ্রলোক টেকো অমূল্যবাবুর সংগে যোগাযোগ হয়েছিলো সে আজ আর হিমাদ্রির মনে নেই। উনি ওঁর কাগজে হিমাদ্রিকে একটু-আধটু লিখতে বলেন। লেখা আর কি, এই দু-একটা হিন্দী বাংলা সিনেমা. তা ছাড়া আজকাল যাত্রা-টাত্রা লোকের খুব বাই হয়েছে না, সেই সব সম্বন্ধে বা কাচিৎ কখনো ভালো কোন ইংরেজী বই সম্বন্ধে দু-চার ছত্র লেখা। সেই কবে কোন কালে বাংলায় এম এ পাস করেছে। তারপর থেকে তো লেখাপড়ার সংগে সম্পর্ক অষ্টরম্ভা, এই চোদ্দ-পনেরো বছর ধরে তো খালি লেজার আর ফাইলের ঘানি ঘুরোনো। অবশ্য আজ থেকে অতো বছর আগে 'চোতা' চলতো না। তখন একটু গায়ে গতরে খেটে পরীক্ষা বৈতরণী পার হতে হত। একটু-আধটু পড়তেও হত। পরীক্ষার বেঞ্চতে ছুরি গেঁথে মাস্টারকে ভড়কে দিয়ে পার পাওয়া যেতো না। অমূল্যবাবুই একদিন ভরসা দেন, 'কেন পারবেন না মশাই? আমার কাগজ কি খানদানী কাগজ নাকি! এটা তো একটা, যাক গে, কি কাগজ নাই বললাম নিজে থেকে। এ কাগজে লেখা তো যেদো মেদো পারে। সিনেমা, যাত্রা থিয়েটারের ফ্রি-পাস পাবেন। দয়া করে একটু দেখে আসবেন। এ কাজের আপনিই উপযুক্ত ব্যক্তি। অফিসে আসেন এই পর্যন্ত। কাজ দেখে নেই তো অফিসে থাকবে? অফিসে আসা মানে তো এর-ওর নামে চুকলি খাওয়া, পার্টি করা, ফুক ফুক করে সিগারেট টানা আর অফিসের টেলিফোনে অন্য অফিসের লাভারের সংগে পিরীত করা। আপনি পারবেন মশাই। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ যে লাইনখানি অনেকদিন আগে পেতে দিয়ে গেছেন, দেখবেন সেই লাইন ধরে আপনার ভাবনুটি ইনজিনটা ভোঁস ভোঁস করে ঠিকই হাওড়া-ব্যান্ডেল করছে। পঞ্চান্ন বছর পর্যন্ত চলবে ঠিক হেসে খেলে। তারপর অবশ্য কনডেমড,

ডিক্লেয়ার করা হবে আপনার ইনাজিনকে। তা আপনার পঁয়তাল্লিশ আসতে তো এখনো বেশ দেরি। চালিয়ে যান। আমার কাগজেই হাতেখড়ি হোক।'

ওরই ভরসাতে হিমাদ্রি একটু-আধটু লেখা আরম্ভ করলে। দু-চার বছর যাবার পর হিমাদ্রি দেখলো, আরে, এতো মন্দ নয়। দু-চার টাকা হচ্ছেও, ওই আর কি বারে-টারে গেলাসের খরচ আর সব চেয়ে বড় কথা এটা একটা খোলা জানালা, এই লেখাটা। এই খোলা জানলাটা আছে বলেই হিমাদ্রি এক রকম বেঁচে গেছে, বন্ধুবান্ধবদের তো দেখে। তারা কেমন অল্প বয়সেই বুড়িয়ে যায়। বুড়ো শুধু হয়েই গেছে তা নয়। ছেলের হায়ার এডুকেশান আর মেয়ের বিয়ে নিয়ে চুল পাকিয়ে ফেলেছে অকালে, বুড়ো বুড়ো ভাব, কথাবার্তাগুলো পর্যন্ত বুড়োটে মার্কা, চোখে পাগলের দৃষ্টি। অরূপের স্ত্রী শ্বেতা বলে, তোমায় যে পনেরো বছর বিয়ে হয়েছে তা কে বলবে। বয়েসের ছাপ পড়েছে ঠিকই। সে আর যাবে কোথায়। কিন্তু তবু এখনো বেশ ছেলেমানুষ আছো।' ছেলেমানুষ আছে এখনো? সত্যি? যাঃ, শ্বেতা মিথ্যে বলছে। কিন্তু যদি ছেলেমানুষি একটু তার মধ্যে থাকেই তার মূলে কিন্তু হিমাদ্রি বেশ জানে ওই খোলা জানলাটা, ওই একটু লেখা খেলাটা, ভারি মজার খেলা হে, যেটাকে হিমাদ্রির প্রভা বলে, 'থ্রি-ফোর্থ অশ্লীলতা আর ওয়ানফোর্থ ভাঁড়ামি, সব মিলিয়ে ভড়কি, পাবলিককে ভড়কি', তা সে যাই হোক হিমাদ্রি কিন্তু বেঁচে গেছে, ওই জানলাখানিই তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। আজ থেকে চারদিন আগে অফিস থেকে বেরিয়ে লালবাজারের দিকে একটু 'রোঁদে' বেরিয়েছিলো। ঘুরতে ঘুরতে মার্কেন্টাইল বিল্ডিংসের কাছে এসে ভীড়ে যায়। এসেই মনে হল হিমাদ্রির লিফটে করে একবার চারতলায় যাই না, 'মোনালিসা' অফিসে। অমূল্যবাবু কেমন আছেন একটু খোঁজ নি। অনেকদিন ওদিকে তো মাড়াইনি। জীর্ণ লিফট আর ততোধিক জীর্ণ লিফটম্যানকে দেখে হিমাদ্রির দুঃখু হল। শালা, বলা যায় না, যদি লিফট উঠতে উঠতে মাঝখান পর্যন্ত এসে ছিঁড়ে পড়ে। তা হলেই তো 'কেলো'। দরকার নেই বাবা। ভাঙো সিঁড়ি। এখনো তো হার্টের অসুখ ধরে নি। হলে দেখা যাবে। সিঁড়ির পর সিঁড়ি, এ স্বর্গের সিঁড়ি নাকি রে, ফুরোয় আর না, ফুরোয় আর না, হিমাদ্রি সিঁড়ি ভেঙেই চলেছে, তারপর লম্বা একটা আধো অন্ধকার করিডর, দু পাশে পায়রার খোপের মত নানাজাতের অফিস, উঃ, কি দুর্গন্ধ, ইউরিন্যাল, মানুষের এই সব জিনিস যদি একেবারে বন্ধ হয়ে যেতো, ঈশ্বরের এই সৃষ্টির ব্যাপারটায় খুব একটা উল্লাস করার কিছু নেই, এখানে অনেক কিছুই আছে যাতে ভদ্রলোক সম্বন্ধে খুব একটা উঁচু ধারণা থাকে না, উঃ বাপরে বাপ, অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসছে, নরক, নরক একখানা, আবার একটা ছোট করিডর তারপর লোহার একটা বড় প্লেট, তারপর একটা ছোট মত ঘেরা জায়গা, সেখানে রাশি রাশি পত্রিকার বান্ডিল, বান্ডিল পেরিয়ে কাঁচের মোড়া-জানলা ঠেলতেই হিমাদ্রির চোখ ঠেকো অমূল্যবাবুর অসমান দাঁতে এসে আটকে গেল।

যে কথা অমূল্যবাবু সকলকেই বলেন, বলে বলে অভ্যেস করেছেন তাই বললেন হিমাদ্রিকে দেখামাত্র।

'এই যে হিমাদ্রিবাবু, আপনাকেই খুঁজছিলাম।'

হিমাদ্রির মুখে এসে গিয়েছিলো, 'কেন মাইরি প্রাণ', সেটা অতি কষ্টে দমন করলো। 'আপনার তো খুব টাকার দরকার।'

কি আশ্চর্য! কি করে জানলো। ব্যাটা নিশ্চয়ই গণৎকার। ঠিক ধরেছে তো।

হিমাদ্রি জীবনে এই প্রথম অমূল্যবাবুর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালো।

এতোদিন হিমাদ্রি জানতো লোকটা এই বাজারে ভালোই কামাই করছে বটে কিন্তু আসলে একটা পাঁঠা, এখন কিন্তু কথাটা উইথড্র করে নিতে হচ্ছে না, এতোদিন যা ভেবেছি, অমূল্যবাবু তা নয়, বুদ্ধিসুদ্ধি আছে, না হলে হিমাদ্রির টাকার দরকার আর সব সময়েই দরকার এই খুবই জরুরী কথাটা অমূল্যধন কি করে টের পেল। হিমাদ্রি অমূল্যবাবুর পায়ে পড়বে? 'মাইরি অমূল্য তুই একটা জিনিয়াস।' বলে অমূল্যবাবুর গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খাবে? দূর তাও আবার হয় নাকি? বয়েসে অনেক বড়। অবশ্য বয়েস আজকাল আর কোন বাধা নয়। আজকাল তো শুনি ওসব কেউ মানে না, অনেক হাঁটুর বয়সী ছেলেও তো হিমাদ্রি দেখেছে প্রবীণ ব্যক্তিদের কাঁধে হাত রেখে নাম ধরে কথা বলছে। প্রবীণ ব্যক্তিটিও ইয়াং সাজার বাতিকে সেসব ফাস্টনাস্টও বেশ অ্যালাও করছেন। তা করুন। হিমাদ্রি ওসব পারবে না। ওই মনে হওয়া পর্যন্ত তার দৌড়।

'আপনি এক কাজ করুন না। এখনো তো দেরি আছে। আজ সোমবার। ঠিক চারদিন পর 'স্টার'এ 'রজনী' হচ্ছে। এ জি বেঙ্গল অফিস কর্মীরা ওটা করছে। আপনি ছটার সময় গিয়ে নাটকটা দেখে এসে তারপর দিন অফিসে যখন আসবেন তখন ফেরার পথে লেখাটা জমা দিয়ে যাবেন এখানে। ব্যাপারটা বুঝলেন?'

'হ্যাঁ। তা আমি খুব পারি।'

'পারেন না। সেই কবে এসেছিলেন। তারপর মাসখানেক আপনার কোন পাত্তা নেই। আপনার কথার কোন ঠিক থাকে না।' বলে অমূল্যবাবু হিমাদ্রির দিকে স্থির চোখে তাকালেন।

অ্যাঁ, এও জেনে গেছে! বন্ধুরা এমনকি প্রভা এমনকি অতোটুকু ছেলে বাকো—সেও বলে 'বাবা তুমি কথা দিয়ে কথা রাখো না। ঘড়ি কিনে দেবে বলেছিলে, দশখানা অঙ্ক করলে। দশখানা করলাম। তুমি ঘড়ি দিলে না। তোমার কথার কোন—'

এখন অমূল্যবাবুও সেই কথা রিপিট করছেন।

'এক আধবার হয়তো কথার খেলাপ হয়েছে, তাতেই অতো বড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন?'

'এক আধবার? অন্তত বারো তেরো বার তো বটেই। আপনাকে নিয়ে মুশকিল তো এই। বললেন যাবো নিশ্চয়ই যাবো, কার্ডও নিয়ে নিলেন সঙ্গে তারপর কোন গার্লফ্রেন্ডকে দিয়ে দিলেন। আপনার তো এ সব মেলাই তারপর তাদের মুখ থেকে শুনে তাহা মিথ্যে কথা তাহা সত্যি বলে চালিয়ে দিলেন। এই অভ্যাসটা ভালো নয়।'

ব্যাটা কি করে জানলো? হিমাদ্রি আহাম্মক বনে গেল। আজ অমলবাবু যা বলছে তাই নির্ঘাৎ লেগে যাচ্ছে। সত্যি এ রকম সে দু-চারবার করেছে। তবে ওটা ঠিক নয়, তার কোন গার্লফ্রেন্ড ফ্রেন্ড নেই। অরূপের স্ত্রী শ্বেতা কলকাতায় আসে দক্ষিণীতে গান শিখতে। ওকেই বার কতক কার্ড দিয়েছে।

'আপনাকে নিয়ে অসুবিধে তো ওই। আপনার কথার—'

বলে অমূল্যবাবু বাক্য অর্ধসমাপ্ত রাখলেন। বাকিটা ভরাট করবার জন্যে বার কতক চুলহীন মাথাটা নেড়ে গেলেন। হিমাদ্রি গেস্ট কার্ডটা চেয়ে নিলো। তারপর ওঁর চোখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটু ঝাঁঝালো গলায় বলল, 'এবার ফেল হবে না।'

'না হলেই ভালো।'

অমূল্যবাবু হিমাদ্রির দিকে আর তাকাবেন না। টেবিলের ওপর পাতা প্রকান্ড ব্লটিং পেপারটার ওপর পেন দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে একাগ্র মনোযোগে মেয়েমানুষের প্রসিদ্ধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি আঁকতে লাগলেন। হিমাদ্রি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। এ অফিসের সবাই জানে। ওই মেয়েমানুষের শরীরের বিভিন্ন পার্টস আঁকা মানেই হচ্ছে সম্মতির লক্ষণ, উনি অনুমোদন করলেন।

....আজ সেই শুক্রবার, আজ সন্ধ্যায় 'স্টার'-এ 'রজনী'। যদিও অনেক অনেক দেরি তবু সাবধানের মার নেই। তা ছাড়া অমূল্যবাবু যে রকম ধরেই নিয়েছেন.... অতএব এবারটা অন্তত যেন কথার ঠিক থাকে। বেশ একটু সকাল সকাল মানে ওই ধরা যাক এগারোটা পাঁচের ব্যান্ডেল লোকাল ধরে হিমাদ্রি হাওড়া যাবে, সেখান থেকে এসপ্ল্যানেড, এসপ্ল্যানেড থেকে লালবাজারের কাছে 'মোনালিসা' অফিসে, আগেভাগে গিয়ে অমূল্যবাবুকে চেহারাটা একবার দেখাতেই হবে, উদ্দেশ্য বলা বিফোর টাইমেই এসে গেছি মশাই, আর এমনি এমনি আসিনি। থিয়েটার দেখতেই এলাম। না হলে কোলকাতা ঠ্যাঙাতে সাধ করে কে আর আসে এই গরমে। আজ তো আমার অফিস বন্ধ, ফাউন্ডেশন ডে। মাড়োয়ারীরা এ সব খুব মানে। দেবদ্বিজে ভক্তি আর হচ্ছেও তার ফল ভগবান ছপ্পর ফুঁড়কে দিচ্ছেন। দেবদ্বিজ মানে বলে ফাউন্ডেশান দিনও মানে আর তার জন্যেই আমার একটা নীট ছুটি পাওয়া, যেন নীট একটা বোতল মেরে দেওয়া, হা—হা—হা।

এই বোতল টোতল নিয়েও হিমাদ্রির বেশ একটা নিজস্ব ধরন আছে। না, সে হালেকালে ধর্মতলা বা পার্ক স্ট্রীটের কোন বারে হানা দিলেও ওসব বহুকাল ও ছেড়ে দিয়েছে। ওখানে মেলাই ভীড় সত্যিকারের মাতাল একটাও যায় না, অথচ মাতালামোর ঠ্যালায় অন্ধকার, মাতলামো আর আঁতলামো, রাবিশ। তার চেয়ে হিমাদ্রিকুমার সোনাছেলেটি হয়ে শুঁড়ির দোকান থেকে (হুগলীতে কলা থেকে খুব ভালোজাতের একটা জিনিস তৈরি হয়।) মালটি বগলদাবা ক'রে, সঙ্গে মচমচে মাছভাজা, হ্যাঁ, একা বইকি, দোকা আর এই বয়েসে—, যাই হোক সে সব নিয়ে সোজা কোন গ্রামের ধারে, খোলা মাঠের মধ্যে, গাছপালা। ছায়ার মধ্যে মাথাটি কাৎ ক'রে আর গোটা শরীরটা শীতকালের জমকালো রোদ্দুরে। যেন রাজা হিমাদ্রি (তখন রাজা ছাড়া আর কি!) বেশ এক এক টুকরো মাছ ভাজা দাঁতে কাটছে আর মদের বোতলে মুখ দিয়ে চুক চুক করে টেনে যাচ্ছে, আহা ভাবা যায় না, স্বপ্ন স্বপ্ন!

......চা পান হিমাদ্রি শেষ ক'রে উঠছে, বাকোকে একবার রাঙা স্কুলে দিয়ে আসতে হবে, এখন থেকে শুরু হল হুড়োতাড়ার পালা, নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাওয়া যায় না, খালি একটার পর একটা কাজ যেন ব্যান্ডেল স্টেশনে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন ইন করতে না করতেই আর একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন নিয়ে আগে যাবার জন্যে পড়ি কি মরি হয়ে তৈরী হওয়া। এই সব সময় মনে হয়, জ্বালারে তোর সংসার। তোর কাঁথায় আগুন। সকলের মূলে তো ওই কথাই, লোভ, মেয়েমানুষের পাশে দুদণ্ড শোবার লোভ, আর তার ফলেই তো যতো ঝখেড়া আর ঝঞ্ঝাট, ঠিক কিনা! মেয়েমানুষ পৃথিবীতে যদি না থাকতো তবে তো তাকে নিয়ে শোবার লোভও থাকতো না, না ঈশ্বর। নামক ভদ্রলোককে এমন অনেক ব্যাপার আছে যার জন্যে ঠিক প্রশংসা করা যায় না।

'শোন, বাজারে যাচ্ছো তো; ওই সঙ্গে দু কেজি চাল এনো।'

আজও হিমাদ্রি লক্ষ করলো প্রভা বাজারের কথা, চালের কথা বললে বটে কিন্তু থলি দুটো হাতে দিয়ে গেল না। প্রভা কোন কাজ পুরোটা করতে পারে না, বাকিটা সে হিমাদ্রির জন্য রেখে দেয়। কথা না বাড়িয়ে হিমাদ্রি হুক থেকে থলে নিয়ে বলল, 'পয়সা?'

'হ্যাঁ গো। ওই ড্রেসিং টেবিলের সামনে আছে। বেশী পয়সা মেরো না। গোনা আছে।' গোনা যে থাকে, আছে হিমাদ্রি তা জানে। সে পয়সা মারবে কি, তারই পয়সা। সে পয়সা মারবে! কিন্তু এই সোজা কথাটা প্রভাকে বোঝানো বৃথা। বাড়ীতে যে ঝিটি কাজ করে তাকে আগাধ বিশ্বাস, ও চুরি করতেই পারে না, আর যতো অনাসৃষ্টি কান্ড নাকি একমাত্র হিমাদ্রিই করতে পারে। তারই পয়সা সে মারবে, উদ্ভট যতো চিন্তা! বাকো সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। 'বাবা, আমি দেখছি, তুমি কতো পয়সা নাও।' বলে ফিক ফিক

বাকো হাসছে। মনে হয় হিমাদ্রির, বাকোর গালে ঠাস ঠাস করে চড় মারে। ও ও কিন্তু তাই চায়। চড় খেয়ে এমন কান্ড জুড়ে দেবে যে ইস্কুল যাবার টাইম পার করে দেবে। চড়ে ওরই সুবিধে কেননা তারপরেই ও সোজা চলে যাবে গুলি নিয়ে মাঠে, সেখানে গিয়ে 'ফুক' আর 'পাই', কাস চল্লে, কান্টের গায়ে—এই-সব করবে।

মিনিট তিনেকের মধ্যে তৈরি হয়ে বাকোকে সাইকেলে। রডে বসিয়ে গলি পার হয়ে বাজারের কাছে এসে পড়েছে হিমাদ্রি, যাক বাবা, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। আজ আর কালকের মত কোয়াপরেটিভের সামনে কেরোসিনের লাইন নেই।

কাল ভোরে হিমাদ্রি যখন গঙ্গায় চান করতে যাচ্ছে, হঠাৎ দেখে অতো ভোরে কোয়াপরেটিভের সামনে প্রায় দুশো তিনশো ছোটবড় ইঁট আর টিন আর বোতল পাতা, তারও পেছনে এ পাড়া ও পাড়ার বেশ কিছু ছেলে। কি ব্যাপার অ্যাতো ভোরে না, ডানলপ থেকে যারা নাইট ডিউটি করে ফেরে রাত দুটোর সময় তারা বাড়ীতে এসে বলে, 'ওরে দৌড়ো। এই মাত্তর দেখে এলাম কোয়াপরেটিভের সামনে তেলের একটা গাড়ি। দেরি করলে লাইন জাম্প হয়ে যাবে। যা, যা। অনেক ঘুমিয়েছিস। এখন লাইন মারগা যা, লাইন। দৌড়ো। বলে ঠেলে তুলে দিয়েছে ছেলেগুলোকে। ওদেরই মুখ থেকে শোনা তাড়াতাড়ি করে আসতে গিয়ে ওদেরি একজন নাকি কেরোসিন তেল নেবার জন্যে আস্ত একটা মাটির কুঁজো নিয়ে চলে এসেছে। না, আজ আর সে ঝঞ্ঝাট নেই। কোয়াপরেটিভ এখন ফায়ার ফ্লপ করে ডেড ইঞ্জিন হয়ে গেছে। না, কপাল ভালো, একটা ঝঞ্ঝাট ফেস করতে হল না। কিন্তু ওই যা, ভুলে মেরে দিয়েছে হিমাদ্রি। বাজার করতে এসে দুধের বোতলটা রোজই আনে সংগে, আজ কাজের তাড়া কিনা, এগারোটা পাঁচের গাড়ি ধরতেই হবে, অতএব কপালগুণে দুধে। বোতল আনতে ভুলে গেছে। ওদিকে হরিণঘাটার দুধ আসার দিন আজ মিল্ক বার-এ। এর মধ্যেই লাইন পড়ে গেছে। বাহবা, বাহবা। দেশটা বিউটিফুল চলছে। খালি লাইন আর লাইন। গোটা দেশ জুড়ে এ-সব হচ্ছে কি? মানুষকে খালি ব্যস্ত রাখার ধান্দা! খালি পাগল করে দেবার মতলব। মানুষ যে একটু বসে। কথা বলবে, তেমন তেমন চোখের দিকে তাকিয়ে একটু রস খাবে, তার আর উপায় রাখলো না হারামজাদারা, হুঁ, দেশ চালাচ্ছে, সরকার চালাচ্ছে, খালি 'পুকা' আর 'পুকার' খালি আওয়াজ, খালি আওয়াজ, খালি পরের কাঁধে বন্দুক রেখে—

যাঃ, এ কি হল! স্কুলের সামনে হিমাদ্রি এসেছে আর ভুস ভুস করে সাইকেলের চাকার পাম্প বেরিয়ে গেল। বাবা জব্দ হয়েছে দেখে বাকো খুব খুশি। ড্যাম প্ল্যাড যাকে বলে। খিল খিল করে শয়তানের হাসি হেসে বলল, 'যেমন আমায় সাইকেল দাও না আর মাকে মোটা বল।' হিমাদ্রি ডান হাতটা তুলেছিলো মারবার জন্যে। বাকো হাসতে হাসতে ছুটে পালালো। কি আর করবে ও, ও সাইকেলটা হাঁটাতে হাঁটাতে মদনের দোকানের সামনে নিয়ে এলো। মদন মাথা নীচু করে ঝাঁট দিচ্ছিলো। মুখ না তুলেই ওর নিজস্ব ল্যাংগুয়েজ আরম্ভ করলো।

'এই সাত সকালে এই সব আরম্ভ করলেন তো! অনেকবার আপনাদে বলি লিক টিক হলে একটু বেলায় আসবেন। এসব ভারি ঝঞ্ঝাটের কাজ। এখন শালা খালি টায়ার খোলো, টিউব খোলো। তারপর সলিউশন মারো। খালি খোলো আর মারো। ওই দেখুন, বলতে না বলতে ওই আর একজন, উঁহু, বলতে হবে না, খুব বুঝেছি, তোমারও লিক। বাস, আমার আজ আর করে খেতে হবে না। অন্ন উঠলো।'

মদনের কথা শুনে হিমাদ্রির হাড়পিত্তি জ্বলে গেল। কিন্তু কোন উপায় তো নেই। ও সাইকেলটা ঠেলে ঠেলে ওর সামনে এনে দাঁড় করালো যাতে নিতান্ত করুণা করেও মদন যদি একবার নজর দেয়। মদন ও জহুরীর চোখ দিয়ে একবার তাকিয়েই বলল, 'এঃ, এ তো মেরে এনেছেন। এর আর আছে কি। বারোটা বাজিয়ে এখন আমার কাছে নিয়ে আসতে হয়।' অনেকটা ডাক্তার চৌধুরীর মত। ডাক্তারবাবুর কাছে গেলাম। উনি একটু পেট টিপে অম্লান বদনে বললেন, এঃ, করেছেন কি! এখন আসতে হয়! এতো শেষ করে এনেছেন! শরীরে তো কিছু নেই। শরীরটা তো মশাই রোগে। হারেম বানিয়ে ফেলেছেন!' তা মদন কিসে কমতি যায়। সাইকেলের লাইনে মদন আমাদের ডাক্তার চৌধুরী। হিমাদ্রি হন্ হন্ করে বাজারের দিকে গেল। খুব স্পষ্টভাবে না হোক, আবছাভাবে তার খেলা সে শুরু করে দিয়েছেন, হিমাদ্রি যেন পরিষ্কার বুঝতে পারলো। কোন সন্দেহ নেই, অ্যাপয়েন্টমেন্টটা যাতে রাখতে না পারে তার জন্যে চোটটা এখন থেকে আরম্ভ হয়েছে। নইলে কাল রাতে হিমাদ্রি যখন বাড়ি এলো রাত দশটায় (প্রভা বলে রাত চারে!) তখনো সাইকেলের দুটো টায়ারে পাম্প টাইট ছিল। আর আজ সকালে, কোথাও যায়নি, রাস্তা পরিষ্কার পিচের, খানা খন্দ নেই, একটু আগে রাস্তায় ঝাঁট পড়েছে, স্কুল গেটের সামনে বলা নেই কওয়া নেই অমনি ভুস করে পাম্প চলে গেল! এসব এমনি এমনি! কোন উদ্দেশ্য নেই? কোন চক্রান্ত নয়? অবশ্য এখনো অনেক দেরি। সেই সন্ধ্যে ছটায়। এতো তাড়াতাড়ি ছটফট করাটা ঠিক নয়, কিন্তু সাইকেলটা এতো তাড়াতাড়ি লিক না হলেই তো পারতো। লিক হতিস হতিস এগারোটা পাঁচের ডাউন ট্রেনে ওঠার পর হতিস। তাও তো হতে পারতো। কিন্তু তা হলো না। একি এমনি এমনি।

অবশ্য আজ কিছুটা সুবিধেও আছে। বাজার থেকে ফিরলেই অন্য অন্য দিন প্রভা বলে, ওমা। এ কি এনেছো গো? তোমার মত শ টকে কোন আর মোচা। যাও যাও, ফেরৎ দিয়ে এসো গে যাও।' অথবা ঠিক যেটি আনেনি সেটি বাজারের থলিব ... এ ব্যাপারে প্রভার প্রায় ঈশ্বরের মত অলৌকিক ক্ষমতা দুর্বলভাবে হিমাদ্রি বলার চেষ্টা করে, 'কিন্তু আলু, বেগুন, উচ্ছে ঢ্যাড়শ— কিন্তু প্রভা, ওসবে কানই দেবে না। তেমন কানই তার নয়। সে 'পটল'তে লেগে থাকবে।

'আলু, বেগুন, উচ্ছে, ঢ্যাড়শ এগুলো পটল নয়। যাও দিক কোরো না। পটল নিয়ে এসো।'

'পটল কি না আনলেই নয়?'

'না। পটল না আনলে পোস্তর পিন্ডি আমি কি দিয়ে চটকাবো।'

ওরে বাপরে! এর পর আর কি করে অবিশ্বাস করে হিমাদ্রি যে যদি এ পট না আনে তা হলে প্রভা হিমাদ্রির পিন্ডিই চটকে দেবে। হ্যাঁ, সে প্রতিভা প্রভা বিলক্ষণ আছে, কোন সন্দেহ নেই।

না আজ আর এ দুশ্চিন্তা ফিরে। আসছে না। সে গুড়ে বালি। কাল সন্ধ্যের সময় হাফ বাজার হিমাদ্রি সেরে রেখেছে। ব্যান্ডেল থেকে ফেরার প রেল বাজারে নেমে মাল গস্ত করেছে। কেবল মাছটা আজ সকালের জন্যে রে দিয়েছে। মাছের থলিটা হাতে হিমাদ্রি তাড়াতাড়ি বাজারের দিকে যেতে লাগলে

রাস্তার দক্ষিণ দিক থেকে চুঁচুড়াগামী চার নম্বর বাসটা হর্ন বাজা বাজাতে আসছে। রাস্তার উত্তর মুখ থেকে এসে হরিণঘাটার দুধে। গাড়িটাও প্র ঘাড়ের কাছে এসে হর্ন বাজাচ্ছে। মাঝখানে ঢুকে গেছে কয়েকখানি রিক্সা রিকশা ভ্যান। আর সংকীর্ণ, খোয়া ওঠা পীচের রাস্তাটাকে দুদিক থেকে সাঁড়া আক্রমণ করেছে যতো রাজ্যের ব্যাপারীরা। এখানে ঝাঁকা, ওখানে থলি কেউ আর পেঁয়াজ-রসুন-আদা, কেউ আপেল-কলা-আঙুর সাজিয়ে বেশ জম্পেশ ক বসে গেছে। এরই ফাঁকে ফাঁকে মাছের চার চারটি আড়ত। একটা কাঁটা, এব গুমটি, একটা বেঞ্চি, বেঞ্চির ওপর একটা হাতবাক্স। বেশ হয়ে গেল এক এক আড়ত সেখানে অনারত (অনবরত) মাছ থউকো কেনা বেচা হচ্ছে। ফলে যেটু রাস্তা জেগে আছে সেটুকুও জলে থই থই করে নাচছে। জল কাদা মাড়িয়ে হিমা বাজারে ঢুকলো। বাজারের ভেতর একেবারে সামনে টিনের চাল দিয়ে ঘেরা জা নিকিরিরা বঁটি পেতে, মাছের গায়ে ধুপকাঠি বিঁধিয়ে বসে গেছে, তাদের এ পাশে মাছ রাখার ডালা খোলানো প্রকান্ড প্যাকিং বাক্স, অন্য পাশে ভিজে নে আর খাচরো বোঝাই ছোট চুপড়ি। ওরা খদ্দেরদের দেখেই এক একটা মাছ ঘচ করে কেটে ফেলছে। কেটে ফেলা। পরে তার থেকে রক্ত দিয়ে আর আর যেসব ম টি কয়ো টুকরো করে কাটা আছে তাদের গায়ে রক্ত ছিটিয়ে দিচ্ছে। বঁটিতেও লে আছে রক্তের দাগ। প্রথমে হিমাদ্রির গোষ্ঠ নিকিরির দিকে নজর পড়লো। গো হেসে 'আসুন বাবু' বলে আপ্যায়ন করলো। হিমাদ্রির মনে হল প্রভার মত গোষ্ঠ ঠিক বোঝে এই লোকটা, বাজারে যতো লোক মাছ কিনতে আসে তার মা সবচেয়ে বোকা। এর গলা সবচেয় সহজে কাটা যায়। এমনকি বোকার হদ্দ লোক নিজেই গলাটা বাড়িয়ে দেয় কাটবার সুবিধের জন্যে।

ও 'আসুন বাবু' আর কিছুই নয় হিমাদ্রি যেন স্পষ্ট শুনলো, আসুন ন গলা কাটবেন তো? ওই তো রয়েছে বঁটি। এমন ফাসক্লাশ কাটবো যে টেরটি পাবে না।' এই মাছ কেনা নিয়েই প্রভা কমপক্ষে দু দুবার রোজ গুণে গুণে তা বাজারে পাঠায়। আজ হিমাদ্রি ওর সন্ধ্যে ছটার এনগেজমেন্টের কথা ভেবে গো থেকেই বেশ সতর্ক হয়ে গেল। কেননা একটু আগেই ও টের পেয়েছে, এক খেলা, খুব গোপনে হলেও, শুরু হয়ে গেছে।

সাইকেল লিকের কথাটা হিমাদ্রি ভুলতে পারছিলো না। যাই হোক, যা সময় আর বাজে ভাবে নষ্ট না হয় সেই জন্যে ও তাড়াতাড়ি গোষ্ঠর কাছে গি বলল, 'দ্যাখো গোষ্ঠ। একটা কথা বলছি। বোঝবার চেষ্টা কর। খামোকা চো না।'

'এই দ্যাখো!' গোষ্ঠ হেসেই সারা, 'আপনি হচ্ছেন বাবু। তার উপরি আপ হচ্ছেন খদ্দের। খদ্দের মানে লক্ষ্মী। খদ্দেরের কথায় রাগ যে করবে সে জ নিকিরির ব্যাটাই নয়, বুঝলেন কিনা!'

'না, না। ব্যাপারটা আগে শোন। তোমরা তো ... খদ্দেরের গ চোপাও।'

গোষ্ঠ মুখটা হাঁ হয়ে গেল। সাতসকালে লোকটা বলে কি দ্যাখো। আবার কি ধরনের কথাবার্তা!

'তোমরা ওজনে মারো, দামে মারো, মাছে মারো, ঠিক কিনা!' অন্যদিন কর তা কর। আজ ভাই তুমি বেছে নাও, তিনটের মধ্যে কোন দুটোতে তু আমায় মারবে। একবারে তিন তিনটেতেই মেরো না। ঠিক আছে!'

গোষ্ঠ হাঁ হাঁ করে কি বলতে গেল। কিন্তু হিমাদ্রি আজ মরীয়া। তাকে স সংক্ষেপ করতেই হবে। সে আজ কিছুতেই দু দুবার বাজার আসবে না। হাত তুলে বলল, 'আমার বলা এখনো শেষ হয়নি। তুমি যখন আমায় শত রাজী তখন আমার একটা অনুরোধ রাখো। তুমি ওজনে মারো, দামেও মা কিন্তু মাছে মেরো না। আজ যেন অন্যদিনের মত পচা মাছ নিয়ে বাড়ি যে না হয়। বল আমার কথাটা বেশ ভালো করে বুঝেছো ত'!' গোষ্ঠ মুখ মা করে বলল, 'এ সব কথা কি বলছেন গো বাবু! মাইরি, এই বঁটি আর ছুঁয়ে বলছি, আল্লার কিরে—'

'থাক, থাক। ও সব কিরে ফিরে থাক। আমি তো তোমার কাছে সারেন্ডার করছি, তার ওপর—'

'ওসব সালেন্ডার মালেন্ডা। গুলি মারুন। আপনি এই মাছ নিয়ে যা একবারে চমচম মাছ, খেয়ে বলবেন যে গোষ্ঠ মিছে বলেনি। তা বাবু কত পাঁচশো?'

— ... ... দিয়ে ফেলল। খুব

পাঁচশো মাল নিয়ে যাবার মানুষ হিমাদ্রি নয়, বড় জোর কাটা পোনা দশো কি আড়াই শো নিয়ে যায় তবু পাঁচটা লোকের সামনে বেইজ্জত করছে গোষ্ঠ, তাকে টাইট খাওয়াচ্ছে। আর লোকগুলোও মাইরি তেমনি। অপরের হেনস্থা দেখতে পেলে আর কিছু চায় না। ব্যাণ্ডেল লোকাল ফেল হয় হোক, কিন্তু পয়সার এই এন্টারটা যেন পুরো হয়, একটি ফোঁটাও যেন বাদ না যায়। হিমাদ্রি বলতেও পাচ্ছে না যে, না হে অতোটা নেব না।' আবার নেবে কে রেস্তর সে জোরও নেই। ব্যাটা নিকিরি, সেও কিনা তাকে মাছের মত কুটছে।

কিন্তু হিমাদ্রিও কম যায় না। সেও যে গোষ্ঠ। বকাজুটোর বোকা বনে গিয়ে দশ দশটা কড়কড়ে নোট ওকে দিয়ে দেবে সে বান্দা ও নয়।

ও বেশ ধীর স্থির হয়ে বলল, 'কতোটা মাছ নি, তা তো তুমি জানো। রোজ যা নি তাই দেবে। উঁহু, ওখান থেকে নয়, বরাবরই ল্যাজের দিক থেকে মাল গছাবার তাল তোমার। তা তো আজ হচ্ছে না। মাঝখান থেকে কাটো। মাঝখান থেকে।'

হিমাদ্রি মালটা থলিতে ঢুকিয়ে মদনের সাইকেলের দোকানে এসে ডাকলো, 'মদন!'

মদন দোকান থেকে বেরিয়ে এলো হাতে হাতুড়ি নিয়ে, বোধ হয় সাইকেলের টাল ফাল সারাচ্ছিলো, বললে, 'একটু ঘুরে আসুন। কাজ-টাজগুলো সেরে নিন না। ততক্ষণে আপনার সাইকেল রেডি হয়ে যাবে।'

দেখেছো কাণ্ড। এখনো সারায়নি! না, নির্ঘাত এগোরোটা পাঁচ ফেল করিয়ে ছাড়বে। অবশ্য এখনো অনেক দেরি। এখন কটা? হাতে ঘড়ি রাখার অভ্যেস হিমাদ্রির নেই। পনেরো বছর আগে একটা ভুল করে ফেলেছে, এখন আর শোধরাবার উপায় নেই। প্রভাকে হিমাদ্রি বিয়ে করে তখন ও কম্যুনিস্ট ছিলো। একটা ভালো কিছু করবার জন্যে টগবগ করে ফুটতো। মাথায় তখন ওই এক 'ক্যারা' ঢুকেছিলো, পণ নোব না, ঘড়ি, আংটি, সাইকেল কিচ্ছুটি নোব না। ওই ক্যারাই সর্বনাশটি করলো। তা না হলে প্রভার বাবা তো সবই দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখন হিমাদ্রি কাঁচাখেগো কম্যুনিস্ট, হেঁকে বসলো, কোন কিছু নোব না। ঘড়ি নেওয়াও তো কিছু নেওয়া হল। তাই বা নোব কেন? আপনার মেয়েকে কোরা শাড়ি পরিয়ে পাঠিয়ে দিন। তাহলেই হবে। —বাপরে, কি ভয়ানক আদর্শবাদী। কি একখানা 'পুকার'। যেন দুনিয়ার মজদুর এক হো।' এ সব 'ক্যারা' না ঢুকলে তো ঘড়ির টাইম জানবার জন্যে অন্য লোকের কব্জির দিকে তাকাতে হয় না। পাশ দিয়ে পাড়ার রামরতন ভুজাওয়ালা ফেরি নিয়ে যাচ্ছে স্কুলে, এখন টিফিন টাইম, তাই বোধ হয়। হিমাদ্রির হাত ফাঁকা কিন্তু ভুজাওয়ালার হাতে ঘড়ি, ও লজ্জার মাথা খেয়ে জিগ্যেস করলো, 'হ্যারে রামরতন, কতো তোর ঘড়িতে।' রামরতন ভুজাওয়ালা ডানলপের অপসরের মত কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে গম্ভীরসে বলল, 'আপনা। কেতো দরকার।' ব্যাটা, ছুটিস তো এ ইস্কুল। বেচিস তো 'চিট' কারেন্ট আর তেঁতুলের গোলা, তার আবার সাজের কি ঘটা। জামা প্যান্টেরই বা কি বাহার। কিনেছিস তো রিডাকসানের মাল, তার আবার ফুটানি কতো? পকেটে গন্ধ-রুমাল, হাতে ঘড়ি, ব্যাটা 'সর্বহারা' এখন 'সর্বলোটা' হয়েছে। এদের নিয়েই না এক সময় হিমাদ্রি ধিতাং ধিতাং বোলে কতো মাদলে তাল তুলেছিল।

'আটটা হবে?'

'হাঁ। অটটা বেজে পাঁচ মিনাট।'

না। বেলা অবশ্য খুব একটা হয়নি। অঘটন না ঘটলে এগারোটা পাঁচের লোকাল না ধরার কিছু নেই, তবু হিমাদ্রি মদনকে ফের জিগ্যেস করলো, 'ঠিক কতোক্ষণ লাগবে, মদন?' হাতে তেলমবিল লাগিয়ে মদন যেন ঝগড়ার জন্যে তৈরিই ছিলো। পাড়ার ছেলে তাই রোখও বেশী। বললে প্রায় মুখ খিঁচিয়ে, 'আমি কি আপনার হুকুমের চাকর যে মুখের কথা খসাতে না খসাতেই করে দিতে হবে? মদন, মদন। মদন কি ফন্তর! এ যে দেখছি ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে করে ছাড়লেন?'

দ্যাখো কাণ্ড: বোঝ ঠ্যালা। কোন কথা থেকে কোন কথা। ও যেন পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করতে চায়। মদনের কথার জবাব হিমাদ্রির ঠোঁটের আগায় এসেছিলো, বললেই বলতে পারতো, 'মদনকুমার, নেহাতই আমি তাই। তাই ঝালটা আমার ওপর ঝাড়লে। কিন্তু হ'ত যদি কোন স্ট্যাটাসঅলা লোক, যে যদি হুকুম করতো দেখতাম তার হুকুমের চাকর হতে কিনা! তার থুতু মাটিতে পড়বার আগেই মদনকুমার, সেই থুতু তুমি চেটে নিতে।' কিন্তু হিমাদ্রি আজ কোন প্ররোচনার ফাঁদে পা দেবে না। যে যতো ইচ্ছে বাজে কথা বলুক, হিমাদ্রি পিঠে বেঁধেছে কুলো, কানে দিয়েছে তুলো। কেননা ও ইতিমধ্যেই টের পেয়ে গেছে গোপন খেলা। চোরা-মার যে শুরু হয়ে গেছে তা ও বুঝে ফেলেছে। ও অতএব কথা না বাড়িয়ে বাড়ি-মুখো হ'ল। আজ মনে হচ্ছে প্রভা মাছ নিয়ে মজুরা জুড়তে পারবে না। গোষ্ঠ নিকিরিকে তো বোঝানো হল, মারে। অনেক রাস্তা মারো না আমাকে, মেরে বড়লোক হও, কেবল আজ মেহেরবানি করে মাছে মেরো না। কিন্তু হিমাদ্রি বেশ একটু চিন্তিত হল। প্রতি পদক্ষেপে ও যেন অনুভব করতে লাগলো এক অদৃশ্য শক্তি তাকে এখন সোজাসুজি না ঠকিয়ে, একটু ঘোরাপথে, একটু চোখ ইশারায় কাত করে দিতে চায় যেন। মাছটা প্রভা ভালো মনে নেবে কিনা ভেবে হয়তো যখন হিমাদ্রি ব্যাকুল এবং সেইজন্যে সম্ভাব্য জবাবগুলো শানিয়ে রাখছে (না হ'লে তো গোষ্ঠ নিকিরির মত প্রভা তাকে আঁশবটিতে কুটবে।) ঠিক তখনই, প্রভা হয়তো মাছের রাস্তাই মাড়ালো না, হিমাদ্রি বাড়িতে গিয়ে দেখলো প্রভা জানলার আব্রুর জন্যে পর্দা টাঙাচ্ছে, (পাশের বাড়িতে তেমন চোখলো পুরুষ কেউ নেই বলেই বোধহয় আব্রু টাঙানোর এতো ধুম!) এবং বলছে, 'দাও তো হাতুড়িটা।' প্রভা তার প্রকৃতমত এরকমই বলে, কেননা ও কখনও কোন কাজ পুরোটা নিজে করতে পারে না, আধখানা হিমাদ্রির জন্যে রেখে দেবেই, অনায়াসেই নীচু হয়ে খাটের তলা থেকে হাতুড়িটা নিতে পারে, তবু পুরোটা করা অভ্যেস নেই বলে বাকিটুকুর জন্যে অর্ডার করবে। আহা, তা' করুক। ওতে হিমাদ্রি অভ্যস্ত। কিন্তু হিমাদ্রি হাতুড়িটা এগিয়ে দিতেই হয়তো প্রভা বেমক্কাভাবে বলে বসলো, 'যাও তো চকের বাজার থেকে চারটে মুখ খোলা পেরেক নিয়ে এসো তো। এদিকে তাকাও, ওদিকে আবার হাঁ করে কি দেখছো। ও তো একটা বাচ্চা মেয়ে!' প্রভাকে বলা খুব রিস্কি, নারীর তৃষ্ণা এ জীবনে যাওয়ার নয়। সুতরাং মুখটা প্রভার দিকে ঘুরিয়ে বেশ সামলে সুমলে হিমাদ্রি বলবে, 'বাচ্চা বলেই তো দেখছি। বড় হলো—'

'আ থাক। বাচ্চা আর ধাড়ি মেয়ে নিয়ে গবেষণায় তোমার যতো আনন্দ আমার ততো নয়। যাও, চকের বাজার থেকে—'

তার মানে আধঘণ্টার ফেরে প্রভা হিমাদ্রিকে ফেলে দেবে। চকবাজার অবশ্য তেমন দূরে নয়। কিন্তু আজকাল কোন জিনিসটা পাওয়া যাবে আর কোনটা পাওয়া যাবে না, বলা খুব মুশকিল। কোনটা যে কখন আউট অফ মার্কেট হয়ে যায়, কিছুই বোঝা যায় না। সবেতেই লোডশেডিং। তা ছাড়া ইনজিনের পিস্টনের মত না-হক ছোটাছুটি তো আছেই। তেল যদি বা দোকানে পাওয়া গেল, দেখা গেল এক কেজি বা দু কেজি। টিন দোকানে নেই, তার জন্যে ছোট শালা চুঁচড়োয়। চিনি নিখোঁজ, চিনিতে লোডশেডিং এখানে। কিন্তু কে একটা উড়ো খবর দিলো, ব্যাণ্ডেলে চিনির পাহাড় পাওয়া যাচ্ছে। —ব্যস। ছোটার রেস শুরু হয়ে গেল। এই করে লাইফটা একদম হেল হয়ে গেল। কারা যে সরকার চালায়, কি খেয়ে বা টেনে যে সরকার চালায়, কেনই বা চালায় বোঝা মুশকিল।

হাঁ, হাঁ। খালি পুকার, খালি পুকার। খালি আওয়াজ আর ভড়কি, এইভাবে পাবলিকের কাঁধে বন্দুক রেখে কতোদিন আর...

...বাড়ির পিছু দিয়ে ঘরে ঢুকতেই হিমাদ্রি দেখলো চওড়া সিমেন্টের রোয়াকের ওপর একটা কুকুর মরে পড়ে আছে। যখন ও বাজারে গিয়েছিলো তখন সদর দরজা দিয়ে গিয়েছিলো, পেছনের দরজা দিয়ে তো নয়, তাই চোখে পড়েনি. এখন বোঝ ঠ্যালা! এগারোটা পাঁচের গাড়ি ধরবে ধরবে ক'রে নাচছিলে হিমাদ্রি-কুমার। এবার কুকুর নিয়ে নাকানিচুবানি খাও। সম্ভাব্য অনেক কিছুর কথাই ভেবেছিলো হিমাদ্রি, কিন্তু সে কি কুকুরের কথাও ভেবে রেখেছিলো? এরকম অস্বাভাবিক ঘটনা শুধু শুধুই ঘটলো? এর পেছনে কোন উদ্দেশ্য নেই? কোন দৃঢ় সংকল্প নেই? যাতে সে এগারোটা পাঁচের গাড়ি ধরতে কিছুতেই না পারে তার জন্যে এটা কি একটা মরীয়া চেষ্টা নয়? সবই হতে পারে কিন্তু হতে পারা আর হওয়া এক জিনিস নয়। হিমাদ্রির হাতে এখনো প্রচুর সময়। সন্ধ্যে ছটা, সে কি সোজা সময়? এগারোটা পাঁচ যদি কুকুরের কারণে ফেলই হয় তব সন্ধ্যে ছটার অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করার জন্যে মাঝখানে অনেক গাড়ি রয়েছে। এতো ঘাবড়াবার কি হল? হিমাদ্রি নাইলনের থলি হাতে ওপরে গেল। না, প্রভা মাছ সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলো না। সে তখন শাড়ির আঁচলটা কোমরে প্যাঁক দিয়ে ঘুরিয়ে তন্ময় হ'য়ে ঝুলকাঠি দিয়ে সিলিং-এর ঝুল ঝাড়ছে। বোধহয় প্রভা কুকুরের ব্যাপারটা জানে না। ও ওপর দিকে মুখ ক'রেই বলল, 'গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির শান্তা এসেছিলো। ওই যে গো, যার ওপর তোমার একসময় খুব দুর্বলতা ছিল।' হিমাদ্রি শান্তা-প্রসঙ্গ বেশ সচেতনভাবে এড়িয়ে গেল, বলল, 'গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি! সেটা আবার কেডা? ওহো বুঝেছি। তা' তোমার তো মেয়ে নেই।'

প্রভা কিছু বুঝতে না পেরে বলল, 'মেয়ে নেই তো কি হয়েছে?'

'মেয়ে যাদের থাকে তারা মহিলা সমিতি করে। করলে আখেরে কাজ হয়।'

'আখের?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। মহিলা সমিতিতে থাকলে মেয়ের পাত্তর জুটতে অসুবিধে হয় না। তখন ক্যাডার পাত্তর পাওয়া যায়।'

'মাগো!' মুখখানাকে যতোটা সম্ভব কুঞ্চিত করে প্রভা বলল, 'ঝ্যাঁটা মারো ওইসব ক্যাডার পাত্তরদের। যদি আমার মেয়ে থাকতো তাকে বরং বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতাম তবু ক্যাডারকে পাত্তর করতাম না। মাগো! কি সব এক একজনের ছিরি! যতো সব... চোয়াল ঢুকে গেছে, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গেছে, চোখ ঢুকে গেছে খন্তালে, তার ওপর আবার উঁচপাল দন্তর কায়দায় চিবুকে এক চিলতে উড়ন্ত দাড়ি, মাগো!'

'সে যাক। কিছুতেই তো খোঁজ রাখো না। বাড়ির পেছনের দরজায় একটা কুকুর অনেকক্ষণ মরে পড়ে আছে। হারামজাদা কুকুরটা আর মরবার জায়গা খুঁজে পেল না। মরবি তো মর আমারি দরজার সামনে। এসব জেনেশুনে শত্রুতা নয়?'

'ওমা, কুকুর! পা ধুয়েছো? জামাকাপড় ছেড়েছো?' প্রভা ঝুলকাঠিটা দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে একেবারে হাঁ হাঁ ক'রে উঠলো।

'যাও। দু'পা এক করো। পা ধোও। পা ধোও। বেশ রগড়ে রগড়ে। ওমা, আগে বলবে তো! এতোখানি পথ মাড়িয়ে এলে? ছিঃ ছিঃ।'

ব্যাজার মুখে পা ধুতে ধুতে হিমাদ্রি বলল, 'কুকুর রইলো পড়ে, তোমার খালি পা ধোওয়া। বেশ একখানা কাজ পেয়ে গেলে। এখন মরা কুকুরকে নিয়ে আমি কি করি?'

পঁচ আবার করবে? এর চাইতে কাছে না গিয়ে গোপাল সা'র দোকান থেকে সওয়া ইঞ্চি কাতার দড়ি কিনে নিয়ে এসো। নিয়ে এসে কুকুরটার মরা ঠ্যাঙে বেঁধে টানতে টানতে ড্যাং ড্যাং করে ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে এসো।' বলে প্রভার মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কি হাসি! রাগে জ্বলে উঠে কিছু একটা বলবার জন্যে মুখিয়ে উঠেছিলো হিমাদ্রি, বলল না কিছু, বৃথা সময় আর মেজাজ নষ্ট করে কি লাভ? এগারোটা পাঁচ তো ধরতেই পারবে না, সে কেন বোম্বাই ধরেছে, এখন বারোটা পঁয়ত্রিশও যদি ধরতে না পারে তবে তো সবদিক দিয়েই গেলো। ও আর এক মুহূর্ত নষ্ট না করে দীনবন্ধু পার্কে এসে দাঁড়ালো। পার্কের গোল ছাতার নীচে এরকম সময় কান্তিদা বসে থাকে, কান্তিদা হচ্ছে মিউনিসিপ্যালিটির জমাদার, আর ওকে ঘিরে উচ্চিংড়ের মত কিছু মেথরানী আর ঝাড়ুদারনী; দু' একটা ডাগরডে নিয়ে কখনো গাড়ি টাড়িও বি-টি কলেজের ধার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকে। গাড়োয়ানরা এই সময় চালু গাড়ি থেকে নেমে এসে ঘাটোয়াল পিওমের ডেরায় বসে একটু শুখা নেশা টেপে। কিন্তু কপাল গুণে আজ সব ভোঁ ভোঁ। গেল কোথায় কান্তিদা আর তার লোকজন? এ তো হয়েছে। হিমাদ্রি বুঝলো, এবার আর চোরা-মার নয়, এবার বেশ স্পষ্ট একটা বাচ্চা ছেলেও তা বুঝতে পারে, এবার একেবারে সোজাসুজি তাকে ফেলে দেবার চেষ্টা কিছুতেই হিমাদ্রি যাতে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা রাখতে না পারে তার জন্যে খুব জোরালো না হলেও স্পষ্ট একটা ধাক্কা! না হলে কোথা থেকে জুটে গেল একটা মরা কুকুর, আর জুটবি তো জোট তারই বাড়ির দরজায়, তাও সদর দরজায় মরে পড়ে থাকলে সকালেই হিমাদ্রির নজর পড়তো আর এতোক্ষণে একটা ব্যবস্থা ঠিক হয়েই যেতো! এখন কি করবে হিমাদ্রি? শেষ পর্যন্ত কি প্রভার কথাই ফলে যাবে? সে কি যাবে গোপাল সা'র দোকানে কাতার দড়ি কিনতে? সে কি দড়ি দিয়ে কুকুরটার মরা ঠ্যাঙে বেঁধে তাকে টানতে টানতে—

হ্যাঁ। শুধু ওটাই করাই বাকি, ওই মুদ্দোফরাসের কাজটা। হিমাদ্রি কল্পনা চক্ষে দেখতে পেলো, পাড়ার ছোকরারা মুখে আঙুল পুরে সিটি দিচ্ছে, পলেস্তরা-খসা দু'পাশের বাড়ির গরাদ-দেওয়া জানলা ফটাফট খুলে যাচ্ছে, সেখানে নানা বয়েসের মেয়ে, তারা যেন তাদের আরাধ্য দেবতা উত্তমকুমারকে নিরীক্ষণ করছে এমন উগ্র কৌতূহলে সঙ্গে হিমাদ্রির দিকে তাকিয়ে আর হিমাদ্রি নির্বিকার মুখে, দাঁতে বিড়ি চেপে, কুকুরের মরা ঠ্যাঙে কাতার দড়িটি কষে বেঁধে মুদ্দোফরাসের মত টানতে টানতে ভাগাড়ের দিকে যাচ্ছে। অহো, এর চেয়ে সুখকর অবস্থা আর কি হতে পারে? কিন্তু কান্তিদা বেপাত্তা হয়ে গেল নাকি? ওর আর একটা আস্তানা আছে না? বিশু রায়ের থাপিতে বসে ওখানকার ধাঙড় ধাঙড়ানীদের ও চরায়। আহা, কতোরকমের রানী আছে সংসারে! মেয়েদের অনেকেই রানী। ছেলেদের সে সুবিধে নেই। মেথরদের যে কাজ করে সেও রানী, মেথরানী। এইভাবেই চাকরানী, বৌরানী সবাই এক একজন রানী। তা টিও একটি রানী, প্রভারানী। ধুর, এসব সাহিত্যচর্চা কি এখন ভালো লাগে? হাঁটতে হাঁটতে হিমাদ্রি চার্চের কাছে বিশু রায়ের বাড়ির নীচের কাছে এসে গেল। কান্তিদা এইখানেও খানিকটা সময় কাটিয়ে যায়। হিমাদ্রি শুনেছে বিশু রায়ের বউয়ের সঙ্গে কান্তিদার নাকি কিরকম যেন লটর-পটর আছে। থাকগে যাক লটরপটর। কান্তিদা যদি বিশু রায়ের বাড়ের ঘাস কাটে তবে কার কি!

আরে, ওই তো, মেঘ না চাইতেই জল। কান্তিদা স্বয়ং দেবতার মত দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ধারে। হিমাদ্রি ওর অসুবিধের কথা বলা তখনো শেষ করেনি, পেছন থেকে গাঁক গাঁক করে চারনম্বর বাসটা আসছে রাশিকৃত ধুলো ওড়াতে ওড়াতে ওড়াতে, কান্তিদা হাক শুনে পুরোটা আন্দাজ করে নিয়ে বলল, 'আজ তো আমি নাচার। কিছুই করতে পারছি না। আমার মেয়েকে নৈহাটির মিস্তির-পাড়া থেকে দেখতে আসছে। তা জোগাড় যন্তর, তাছাড়া [illegible] বউদিকে তো জানিস'—

নিজের বউকেই জানি না তো কান্তির বউকে। হরি হরি, কান্তির বউকে চক্ষেও দেখিনি, অমনি বউদি হয়ে গেল! যাঃ কলা। এরকম যখন ভাবছে হিমাদ্রি, চার নম্বর বাসটা সামনে এসে গেল হুড়মুড় করে, কান্তিদা প্রায় চলন্ত বাসটার ফুটবোর্ডে পা দিয়ে বেশ চেঁচিয়ে বলল, 'আজ আর কোন উপায় দেখছি না। আজ বরং তুই মরা আগলা। কাল যা' হয়'—

উঃ, মাল একখানি! বয়েসটা হিমাদ্রির যদি বছর দশেক কমে যেতো তাহলে এ কথার উত্তর এক্ষুনি হিমাদ্রি রাস্তা থেকে আধলা তুলে কান্তিদাকে ছুঁড়ে দিত। 'তুই এখন মরা আগলা'—ইয়ারকির আর টাইম পেলে না! আঃ খেলে যা! ঠিক আছে, ধম্মের কল বাতাসে নড়ে—ওই মেয়ে দেখাই আর ওই তো বাপ, সিঁড়িঙ্গে মার্কা তাতে আবার জেড ব্ল্যাক বেশ পাকা রং, ঝামা দিয়ে ঘষলেও উঠবে না, ওই তো মেয়ে, কথায় বলে হাতি। বাচ্চা হাতি, মশার বাচ্চা মশা। কান্তিদার মেয়ে তো কান্তিময়ী ছাড়া আর কি হবে! নৈহাটির মিস্তির পাড়ার লোকেরা এক পেট খেয়ে লবঙ্গের কুচি দাঁতে আটকে গা জ্বলে করে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলবে, 'পরে জানাবো'। তার মানে খট্ খট্ লবডংকা। বিয়ের গুড়ে বালি। আহা, বেশ বলেছে তো সে. বিয়ের গুড়ে বালি, কথাখানি রিপিট করলো হিমাদ্রি। কিন্তু তা না হয় হ'ল। এখন মরা কুকুরের কি হবে? সৌভাগ্যবশত ভাঁড়ির দোকানের সামনে, রাস্তার ওপর বেঞ্চে বসা রামগহনকে পাওয়া গেল। সব শুনে রামগহন অকপটে স্বীকার। কয়লা বাবুদের দেখামাত্র তার খুব [illegible]

[illegible] লাগবে। আর দশ [illegible]

জানাবে কুকুরের মত ঠাণ্ডা ছোট্ট ব্যাপারকে জন্যে। হিমাদ্রি সঙ্গে সঙ্গে রাজ। হয়ে গেল। তাই বলে যাক, নিয়ে একটা আমার পো জানো। উদ্ধার করে যে হারামজাদা। কলরে, সারাটা যেতে গেল। এ কি! ও অফারটা পারতাজিদের ভাউন ট্রেনটাও মিস করবে নাকি! রামলছনকে তাড়া লাগিয়ে সে হন্তদন্ত হয়ে গাড়ি চড়লো। কোনক্রমে নাকে চোখে মুখে গুঁজে সাইকেল করে সোজা চলে গেল ব্যান্ডেল স্টেশনে। ট্রেনটা তখনো ছাড়েনি, ইনজিনটা বাহার লাইন থেকে বেরিয়ে ট্রাফিক লাইন দিয়ে এখন আসছে লোক'এ হুক লাগাবার জন্যে, তার মানে এখনো মিনিট দশেক হাতে আছে। হিমাদ্রির এখন বেশ খুশিমন, ও একটা সিগারেট ধরালো, গোল গোল করে ধোঁয়া ছাড়লো, শিস দিয়ে একটু গান গাইবার চেষ্টাও করলে। ভাবখানা এই, ওহে, এতো করেও তো কিছু করতে পারলে না। অনেক চেষ্টা করলে 'ফাঁদ'এ ফেলবার জন্যে, কিন্তু হিমাদ্রি প্রত্যেকটা ফাঁদই টপকে টপকে পার হয়ে গেছে। আসল কথাটা হল টেকনিক। তুমি তোমার টেকনিকে চলো। হিমাদ্রিও চলে তা নিজস্ব টেকনিকে। এখনো পর্যন্ত, হে অদৃশ্য শক্তি, তুমি এমন একটা কিছু করতে পারোনি যার জন্যে তোমাকে বাহবা দেওয়া যায়।

হঠাৎ ওর মনে হ'ল এতো তাড়াতাড়ি এতো বেশি খুশি হওয়া বোধহয় ঠিক নয়। যদি ধরো ট্রেনটা বারোটা পঁয়তাল্লিশে না ছাড়ে। ধরো যদি যেতে যেতে সিগন্যাল না পেয়ে ট্রেন মাঝপথে ঝুলে রইলো, তাহ'লে? মনের মধ্যে আবার একটু একটু মেঘ জমতে লাগলো। আজকাল তো নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন ছাড়ার তেমন নিয়ম নেই। যখন হোক ছাড়লেই হ'ল, না ছাড়লেই বা আটকাচ্ছে কে? গণ্ডগোল তো লেগেই আছে। সেদিন তো বাকারের কাছে লোকোর ফোরম্যানকে প্যাসেঞ্জাররা ঘেরাও করেছিল। দেখা গেল ফোরম্যান এসব ঘেরাও তেমন মাইন্ড করেন না। উনি এতে বেশ অভ্যস্থ হয়ে গেছেন। এমনকি ওঁকে বেশ একটু খুশি খুশিই দেখায়। ওঁ অফিসের চারদিকে প্যাসেঞ্জার 'হল্লাগুল্লা' করছে, উনি নির্বিকার চুপচাপ প্যাকেটের পর প্যাকেট সিগারেট টেনে যাচ্ছেন, প্যাসেঞ্জার যতো উগ্রতার সঙ্গে ওঁর বাপ মা তুলে ওঁকে উদ্ধার ক'রে দিচ্ছেন উনি ঠিক ততো শান্তভাবে ওদের বোঝাবার যেন দায়িত্ব নিয়েছেন, খুব মৃদু স্বরে বলছেন কি করবো বলুন। পঁয়তাল্লিশটা ইনজিনের মধ্যে পাঁচিশটা অ্যাকটিভ। তার মধ্যেও আবার গোটা কতকের কনডেমড খাতায় নাম লেখানো। ড্রাইভাররা মশাই এইসব লঝঝড় ইনজিন নিয়ে যেতেই চায় না। অনেক কষ্টে, বুঝিয়ে টুঝিয়ে—

'চুরি করেন কেন মশাই?' ওদিক দিয়ে সুবিধে হ'ল না দেখে প্যাসেঞ্জারদে মধ্যে কেউ হঠাৎ অন্যদিক দিয়ে হুমকে ওঠে। 'খাচ্ছেন থান আবার ভলারটার দিকে নজর কেন? যতোসব চোর চোট্টা চিটিংবাজ।'

এ কথাতেও ফোরম্যানের প্রশান্তি একটুও চিড় খায় না। উনি তখনো কি এক অলৌকিক কৌশলে শান্ত ভাবটি বজায় রাখেন। খুব মৃদু অনুযোগের সুরে উনি তখনো প্যাসেঞ্জারদের বুঝিয়ে চলেছেন, 'দেখুন চুরি কোথায় হচ্ছে না বলতে পারেন? গোটা ভারতবর্ষটাই তো চুরি হয়ে গেছে। সেই পুরোন ভারতবর্ষ কি আর আছে? চোর মশাই আমরা সবাই। আমি আপনি—

'মুখ সামলে কথা বলবেন। আমি একজন অধ্যাপক, বুঝলেন?'

ফোরম্যান তাতেও দমবার পাত্র নন। উনি তখনো হাসেন, বলেন 'হ্যাঁ মশাই তাতে কি হ'ল। এই তো সেদিন একটা কাণ্ড হল। আপনি মশাই বলবেন ফোরম্যান গল্প জুড়ছে। অধ্যাপক তাঁর ছাত্রীটিকে নিয়ে, যাক গে, যাকগে, আসলে কি জানেন, আমরা সবাই মানুষ, কেউ অধ্যাপক, কেউ ফোরম্যান, সে যাকগে। একটু হাসুন মশাই, হেসে ফেলুন। এতো কাণ্ডের মধ্যেও আমি হাসছি। বেশ লাগে না হাসতে! আমার তো বেশ লাগে। এই যে সিগারেট নিন।'

যাক। ড্রাইভার গার্ডের সঙ্গে ঘড়ি মিলিয়ে নিলো। ছোকরাটা ফায়ার-ম্যান সেকেন্ড ফায়ারম্যান ড্রাইভারের জন্যে কেটলী হাতে চা আনতে গেল। ট্রেন ছাড়তে আর দেরি নেই। হিমাদ্রি গাড়িতে উঠে পড়লো। এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই গাড়ি প্ল্যাটফর্মে 'ইন' করলো। শুধু তাই নয়। ট্রামটাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হিমাদ্রি পেয়ে গেল। মিনিট কুড়ির মধ্যে এসপ্ল্যানেডে সে পৌঁছে গেল।

তার 'মোনালিসা' অফিস এখান থেকে ট্রামে মিনিট দশেকের পথ। একবার যাওয়া দরকার। মালিক কাম সম্পাদককে একবার চেহারাটা দেখানো খুব দরকার। উনি বুঝবেন, হিমাদ্রির যে কথা সেই কাজ। ও যখন কথা দিয়েছে তখন কথা যেরকম করেই হোক রক্ষা করবেই। অফিসে মিনিট দশেকে বাস, ওখান থেকে একেবারে শ্যামবাজারে। শ্যামবাজারে 'জলযোগ' মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কাছাকাছি ট্রাম লাইনের উল্টোদিকে, সরু গলির ভেতর তার এক বন্ধুর বাড়ি। অবশ্য বন্ধুকে এ সময় ও কোথায় পাবে, সে তো এখন তার অফিসে। অবশ্য তার জন্য তার আতিথ্যের কোন ত্রুটি ঘটবে না। বন্ধুপত্নী আছেন। বন্ধুপত্নীর সঙ্গে তার সম্পর্ক মধুর, বড় স্বচ্ছন্দ। যে কোন মুহূর্তে সব কিছুই ঘটে যেতে পারে, কোন বাধাই নেই, সেই জন্যেই বোধ হয় কোনদিন কোনকিছু ঘটলো না, ঘটবেও না কোনদিন। তা ছাড়া দুটিতে জুটি হিসেবে চমৎকার, ঠিক যেন সখাসখী। ও রকম মেয়ের সঙ্গে দৈহিক কোন আকর্ষণের কথা যেন ভাবাই যায় না। কিন্তু প্রভা প্রায় কিসের কারণেই রীতার ওপর জেলাস। রীতা হিমাদ্রিকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এতে ওর কোন ঢাকাচাপা নেই। প্রভার সামনেই রীতা বন্ধুর মত হিমাদ্রির হাত ধরে টানাটানি করে। কৃত্রিম কোপে কতদিন হিমাদ্রির পিঠে দুম দুম করে কিল মেরেছে। হিমাদ্রিও অবলীলায় রীতার নাক মলে দেয়, চুলের বিনুনী ধরে টানে। অর্থাৎ

অবশ্যম্ভাবী সহজ, মধুর... [illegible]। ... আলো নাবা যায় না, কেননা সে রীতাকে জানে তার প্রাণের সখা হিমাদ্রিকেও খুব জানে। দিলীপ প্রভার ব্যাপার স্যাপার দেখে হিমাদ্রিকে বলে, 'যাঃ তোর বউ কিন্তু তোকে ভীষণ ভালোবাসে। না বাবা, তুমি যতোই আমার বউকে নিয়ে খুন-সুটি করো তোমা। বউয়ের সঙ্গে খুনসুটি করা—দাম কহো। ও ধাতই আলাদা। ভেবেছিলাম তোর অজান্তে একদিন তোর বউকে নিয়ে সিনেমায় যাবো, তার বাবা— তা হয় না।' বলে হিমাদ্রি খুব হাসে। দিলীপ বলে, 'না ভাই। দেখে রাজপথে তোমার বেটার হাফ রাস্তায় চেঁচিয়ে লোকজড়ো করে ফেলবে বলবে, এই লোকটা আমাকে ফুসলে নিয়ে পালাচ্ছে। বাস, একে মহিলা, তাতে অমন সুন্দরী, রক্ষাকর্তারা সংখ্যায় দেখতে দেখতে চতুর্গুণ হয়ে যাবে।'

হ্যাঁ। একেবারেই বাড়ি যাবে হিমাদ্রি 'মোনালিসা'য় মিনিট দশেক কাটাবার পর। ওইখানেই বিশ্রাম নেবে। দু তিন মিনিট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হিমাদ্রি ওলকজার মুখী টিকেট জন্যে অপেক্ষা করেছে কি করেনি এমন সময় কলকাতা যা। দিব্যজ্ঞান করে বেড়ায়, এমন তার তিন তিনজন বন্ধু, মনোরম, পীযূষ, অজিত কোথা থেকে কে জানে বোধ হয় মাটি ফুঁড়ে আবির্ভূত হ'ল। তারপর ওকে প্যারাবোলার আকারে ঘিরে ফেলে বলল, 'এই যে মার্ট। অনেক দিন পর তোমাকে পাওয়া গেছে। অনেকবার শালা এটা ওটা বলে এড়িয়ে গেছ। আজ আর ছাড়ছি না। পীযূষ শেয়ার মার্কেট থেকে মোটা টাকা কামিয়েছে। আজ আমরা সেলিব্রেট করবো।'

হিমাদ্রি আঁতকে উঠলো। মদে পাঁপে তার এই তিনজন বন্ধুকে সে বিলক্ষণ জানে। মদ পেলে ওদের সকাল আটটা রাত আটটার কোন বোধ থাকে না। শুরু হয় একটা সময় আছে শেষ যে কখন হবে কেউ তা জানে না। সুতরাং হিমাদ্রির ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। ও বলল 'আজ আমি কিছুতেই পারবো না। আজ তোরা আমাকে ছেড়ে দে। অন্য যে কোনদিন বলবি, আপন গড, মাইরি বলছি, কোন শালার'—

ওরা খুব মজা করে ওর দিকে তাকালো। একজন বলল 'জানিস মনোরম, এক একটা মেয়ে আছে না, সেই যে রে হেনা, সব কথাতেই তার খালি প্রথম না, না, না। শেষকালে একটু জোর করলেই সর্বস্ব দেবার জন্যে সে একবারে পাগল। হেনার এই ছলনাটাই হেনার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।'

মনোরম কিন্তু ওরকম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বলা পছন্দ করে না। সে খুব সোজাসুজি মানুষ। তার অ্যাপ্রোচও খুব সোজাসুজি।

সেই এক পট্টি। সেই একই কায়দায় টুপি পরানো। একটা না একটা অজুহাত। এসব কি ভালো হিমাদ্রি? আমাদের বয়েস হচ্ছে না, চল।'

'না মাইরি। বিশ্বাস কর, আজ আমার একটা বিশেষ এনগেজমেন্ট'—

'তোর এনগেজমেন্ট কটায়'—

'ছটায়।'

'কি বললি? ছটায়? ওরে পীযূষ। ওর কথাটা একবার শোন। এখন মোটে সওয়া দুটো। ছটা কি সোজা জিনিস। কে জানে আজ চোখেই ছটা দেখবো কিনা। ঠিক আছে ছটার অনেক আগে আচ্ছা পাঁচটাতেই তোকে মুক্তি দোব। ঠিক আছে? ও কে?'

কি বলবে হিমাদ্রি? মুখ ফসকে কেন যে ছটার কথা বলল! বলতে পারতো তিনটে কি চারটে তা না বলে বলল একবারে ছটা। সে কি তার এইসব কাণ্ডজ্ঞান মাতাল বন্ধুদের চেনে না? তাহলে কেন সে ওরকম বলতে গেল? কে তাকে বলালো? নিজের ভেতরের ব্যাপার স্যাপার দেখে মাঝে মাঝে সত্যিই অবাক হতে হয়।

'ঠিক পাঁচটায় ছাড়বি তো!'

'হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ। হ্যারে, কিসের এনগেজমেন্ট? সে সব নয় তো?'

বলে মনোরম পীযূষের দিকে তাকিয়ে খুব হাসতে লাগলো। পীযূষ চোখ সরু করে হিমাদ্রিকে নিরীক্ষণ করতে লাগলো।

'এখনো?'

'এখনো।' গভীর বিজ্ঞতার সঙ্গে হিমাদ্রি শুধু পীযূষের কথা। প্রতিধ্বনি করলো।

...বার-এ মদে বোতলে অনেক ঢলাঢলির পর সত্যি সত্যি পাঁচটার সময় ওরা ঢুলুঢুলু চোখে সামনের ফুটপাত থেকে যে যার রুমাল পতাকার মত নেড়ে নেড়ে ওকে মুক্তি দিলে। 'যে তোর জন্যে অপেক্ষা করছে এখন তুই তার কাছে যেতে পারিস। আমাদের কোন অপেক্ষা নেই, আমাদের শুধু যাওয়া। এক শুঁড়ির দোকান থেকে আর এক শুঁড়ির দোকানে। যাও ভাই যাও। দেখেছো তো, আমরা কথা রেখেছি। তোমাকে দেরি করিয়ে দিইনি। এ কথাটি তাকে কিন্তু বোলো।'

'বলবো।'

হিমাদ্রি তাড়াহুড়ি আবার এসপ্ল্যানেডের মোড়ে এসে দাঁড়ালো। না, এনগেজমেন্টটা ফেল হবার এখনো কোন কারণ নেই। হ'য়ে যাবে।

এখন নিজেকে বেশ চনমনে চনমনে লাগছে। ওদের মত দেড়েমুষে তো পান করেনি। চোখমুখ একটু লালচে হয়েছে। তা হোক। আর চোখ দুটো একটু টান টান ক'রে খুলতে হচ্ছে। বাদ বাকি সব ঠিক আছে। ভালোই হ'ল বহুদিন পর। এসব মাঝেমধ্যে একটু আধটু না হ'লে সংসারে যে বেঁচে আছে এটা বোঝা যায় না। এরা সব এক একজন শেয়ার মার্কেটের ঘুঘু। এদের সঙ্গে এটুকু সামাজিকতা বজায় রাখাও দরকার। আসছে মাসে প্রভা বায়না ধরেছে তাকে একটা ফ্রিজ কিনে দিতে হবে। তা' দোব, যখন ধরেছো প্রভা

[illegible], হিমাদ্রি মনে মনে বলল, তখন খুব করে তোমাকে একটা কিছু কিনে দোব। ওটা হবে তোমার আর একটা গয়না। তা হোক, তোমাকে সুখী করবার জন্যে আমি পারি না কি। সব পারি প্রভাময়ী, সব। মন উদার আর প্রসন্ন থাকলে কত কিছু দেওয়া যায়। পয়সা তো আর লাগে না। পেটটি মদে টইটুম্বুর থাকলে প্রভাকে খুশি করতে মনে মনে হিমাদ্রি অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলে। মদের ঝোঁক কেটে গেলে অবশ্য হিমাদ্রির সে সব কথা একদম মনে থাকে না।

কিন্তু একি। ট্রাম আসছে না কেন? কতোক্ষণ সে দাঁড়িয়ে আছে? ক'টা বাজে? পথচারী একজনকে ও জিগ্যেস করলো। সাড়ে পাঁচটা? সব্বোনাশ! এতোক্ষণ হ'য়ে গেল তবু ট্রাম আসছে না কেন? হিমাদ্রি ভীষণ ঘাবড়ে গেল। ও দরদর করে ঘামতে লাগলো। একজন ট্রাম কর্মচারী গুমটির দিকে যাচ্ছে। তাকে ও জিগ্যেস করলো। লোকটা বলল, লাইন এখন জ্যাম। একটা গাড়ি ডিরেল হয়ে লাইনের ওপর পড়ে আছে। আপনি অন্যকিছু ধরুন।' অন্যকিছু ধরবে? এখন ত পিক আওয়ার্স। অন্যকিছু ধরা কি সম্ভব? হিমাদ্রির বুকের ভেতরটা গুরগুর ক'রে উঠলো। দেখলে? খেলাটা কেমন খেলল? যেখানে ছুরি মারলে একটা স্ট্রোকেই কাজ হয় সেখানেই ছুরিটা আমূল বিদ্ধ করেছে। তার এনগেজমেন্টটা কি তাহলে নষ্ট হল? কি এখন করবে হিমাদ্রি? সে তো চেষ্টার ত্রুটি করেনি সকাল থেকে। কিন্তু পদে পদে একটা না একটা বাধা, ছোটখাটো অথবা প্রবল, কখনো বিনা নোটিশে, কখনো নোটিশ দিয়ে, কখনো সংগোপনে কখনো খোলাখুলি, তাকে মাটিতে ফেলে দেবার জন্যে মরীয়া আক্রমণ চালিয়েছে। সে খুব সতর্ক ছিলো গোড়া থেকেই, তাই প্রথম বা দ্বিতীয় চোটে তাকে কায়দা করতে পারেনি। কিন্তু যেই একটু অসতর্ক হয়েছে ঠিক তখুনি সেই অদৃশ্য কিরাত তাকে একটুও সচেতন হবার সুযোগ না দিয়ে বিষ-মাখা তীরের সুতীক্ষ্ণ ফলা তার শরীরের রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দিলো। কিন্তু তবুও হাতে আছে এখনো আধঘণ্টা সময়। সে কি এই আধঘণ্টা সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দেবে? একবার শেষ চেষ্টা করবে না? একবার দেখবে না? ভেতর থেকে তীব্র একটা বাসনা যেন তাকে মন্ত্রবলে লোক-বোঝাই একটা চলন্ত বাসের দিকে ঠেলে দিলো। হিমাদ্রি পড়ি কি মরি হয়ে বাসে উঠে পড়লো। বাসের লোকগুলো এই অকম্মার যা ক'রে অর্থাৎ খুব খানিকটা উপদেশ দেবার ছলে গালমন্দ করা, তাই করে নিলো আশ মিটিয়ে। খানিকটা যাবার পর, শ্যাম-বাজারের কাছাকাছি এসে কিন্তু বাসটা থমকে দাঁড়ালো। ওদিক থেকে রাস্তা জুড়ে মিছিল আসছে গগনভেদী চীৎকার করতে করতে। সব্বোনাশ! এ মিছিল তো অন্তত মিনিট বিশেকের আগে পথ ছাড়ছে না। আর এখান থেকে 'স্টার' মিনিট পনেরোর পথ। তাহলে? হিমাদ্রি আর চিন্তা করতে পারছে না। মিনিট কুড়ি সময় পার হয়ে গেছে। হয় এখন ছটা না হয় ছ'টার কাছাকাছি।

এখনো যদি চেষ্টা করে তাহলে সওয়া ছ'টা নাগাদ ও 'স্টার'-এ ঢুকতে পারে। না হয় মিনিট পনেরো দেরিতে ঢুকবে। তাতে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। হিমাদ্রি আর ভাবতে পারলো না। ও ঝপ ক'রে নেমে পড়লো। তারপর, কোলকাতায় কে কাকে চেনে, না হয় ভাবলোই লোকটার মাথা খারাপ, ও রাস্তায় নেমেই চোঁ চাঁ দৌড় লাগালো। কিন্তু বেশ ক' মিনিট ছোটার পর ওর চটির স্ট্র্যাপটা ফস্‌ করে ছিঁড়ে গেল। দেখলে? জুতোর আক্কেলটা একবার দেখলে? পায়ের তলার জুতো সেও এই একই ষড়যন্ত্রে? না হ'লে আগে থেকে একটা ওয়ার্নিং দিতে পা তো। মাইরী, মাইরী, কি একখানা কপাল ক'রে ও আজ ওর এনগেজমেন্ট রক্ষা করতে বেরিয়েছিলো? ভীষণ রোখে ও ওর ছেঁড়া চটি জুতোটা হাতে নিলো, তারপর ওর শরীরে যতোখানি শক্তি ধরে, সমস্ত একত্রিত ক'রে ও প্রাণপণে ছুটতে লাগলো পাগলের মত। যেভাবেই হোক এনগেজমেন্টটা তাকে রাখতেই হবে। হিমাদ্রি ছুটছে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে, কোনদিকে দৃকপাত করার টাইম নেই, পায়ে লাগছে, সে রকম ছোটার অভ্যেস অনেকদিনই নেই, বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে, তবু ছুট ছুট ছুট, হিমাদ্রি ছুটছে, তার হাতে ছেঁড়া চটি, চোখে পাগলের দৃষ্টি, সে ছুটছে বন বন ক'রে কিন্তু কিছু একটা যেন গড়বড় লাগছে, তার যেন কিরকম সন্দেহ লাগলো, সে কি কাউকে জিগ্যেস করবে? কিন্তু জিগ্যেস করলেও তো থামতে হবে একটু। তাতে আধ মিনিটও সময় যদি চলে যায়? একে তো যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে, তাতে এই আধ মিনিটে। অপচয়! না, না। থামা যায় না। হিমাদ্রি আবার রি-ডবল স্পীডে ছুটতে লাগলো, কিন্তু মনের মধ্যে কাঁটাটা এবার দারুণ জোরে খচ্‌ খচ্‌ ক'রে উঠলো, হিমাদ্রির কেমন যেন আবার মনে হল, সে কি ভুল পথে ছুটছে? হঠাৎ সে থেমে পড়লো। বুকের ভেতরটা অজানা আশংকায় গুরু গুরু করে উঠলো। উঁহু, হিমাদ্রি 'স্টার' পার হয়ে যায়নি, ও স্টারএর দিকেই আসেনি। 'স্টার' যেদিকে এতোক্ষণ ঠিক তার বিপরীত দিকে সে ছুটে গেছে। পাশেই একটা পানবিড়ির দোকান। দোকানের ঘড়িতে হিমাদ্রি দেখলো এখন সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে। সে স্পষ্টই বুঝলো তা প্রতিপক্ষ তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ শক্তিশালী। শুধু শক্তিশালী নয় সে রসিকও বটে। হিমাদ্রি যতো তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে, সে ততোই আড়ালে বসে হেসেছে। আর ছোটখাটো বাধা তার সামনে এগিয়ে দিয়েছে যা' সে সহজেই টপ্‌কে যেতে পারে। এটা যে তার ছলনা, চতুর রমণীর মত তা' সে বুঝতে দেয়নি। এইভাবে 'ফাঁদ' তৈরি করেছে, প্রলোভন দেখিয়েছে, একের পর এক বাধা আর। একের পর এক বাধা অতিক্রম করার লোভ। তারপর ঠিক যে মুহূর্তে সে বুঝেছে তাকে [illegible] সেই খেলাটাই. সেই বিপরীত দিকে, আর যখন সে বেরোবে তখন আর। তার বিয়ে এসে নতুন করে স্টার্ট নেবার সমস্ত উদ্যম শেষ হয়ে গেছে। তাহলে? হিমাদ্রি, তুমি এখন কি করবে? গভীর শ্রান্তিতে, বিপুল হতাশায় হিমাদ্রি নিজেকে এই প্রশ্ন করলো। এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলো। বাড়িই ফেরা যাক বরং। কিন্তু ফেরাটাও কি সহজ হবে?

সন্ধ্যা হয়েছে অনেক। গাঢ় অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে কোলকাতার আকাশে আকাশে। রাস্তার আলো কখন জ্বলে গেছে। বাড়িই ফেরা যাক বরং। আঃ, কি গভীর ক্লান্তি। পা দুটো যেন বিশ্রামের জন্যে মরে যাচ্ছে। ঐ তো একটা আলোকিত, ধাবমান ডবল ডেকার কিন্তু কি সাংঘাতিক ভীড়। উঠবে কেমন করে? ঠিক আছে, লাইটপোস্টের সামনে হিমাদ্রি আর একটা লাইটপোস্টের মত দাঁড়িয়ে থাকে। তার তো এখন তেমন আর কাজ রইলো না। আর তার কোন তাড়া নেই। তার সকল কাজ এখন শেষ হয়ে গেছে। আর তার কোন এনগেজমেন্ট নেই। এখন সে অনন্তকাল লাইটপোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য, মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়েছে কি দাঁড়ায়নি একটা ভীড়ে বোঝাই ডবল ডেকারের পর ঠিক তার পেছনেরটা, ম্যাজিক কিনা কে জানে, সেটা প্রায় খালি, অন্তত ওঠা যায়। হিমাদ্রি দিব্যি অক্লেশে উঠে গেল। আশ্চর্যের কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। দু-তিনটে স্টপ পার হবার পর একজন বেশ সপ্রতিভ এবং নিঃসন্দেহে সুন্দরী মহিলা তাকে অবাক করে দিয়ে মধুর হেসে বললেন, 'এইবার আমি নেমে যাবো। আপনি বসে পড়ুন।' ভদ্রমহিলা নেমে গেলেন এবং আশাতীত সৌভাগ্য হিমাদ্রি বসতেও পেল। কে জানে কেন, ও খুব মনে মনে হাসতে লাগলো। রাস্তার কোথাও বাসটাকে থামতে হল না। অদ্ভুত ব্যাপার, কোথাও কোন জ্যাম নেই, একবারে ফুরফুরে, মসৃণ এই যাত্রা। ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে গিয়ে হাওড়া ব্রিজে নামতেই গায়ে লাগলো ভারি মিঠে, ভারি সুন্দর হাওয়া, শরীর মন একেবারে জুড়িয়ে গেল। হিমাদ্রি হাওড়া স্টেশনে এসে বুকিং অফিসের কাছে এসে দেখলো, যেমন অন্যদিন হয়, আজ তার চেয়েও প্রকাণ্ড লাইন। এই লাইনে দাঁড়িয়ে তাকে টিকিট কাটতে হবে? ভাবতেই আবার সেই আগেকার বিরক্তি, ক্রোধ যেন ফিরে এলো, একটা মারা-মারি, ফাটাফাটি অসম্ভব একটা গালমন্দ করার জন্যে তার শরীরটা যেন হঠাৎ আবার তেজী হয়ে উঠলো। কিন্তু সেসব কিছুই করতে হল না। তাকে বাঁচিয়ে দিলো একটি লোক। দেবতার মত তার সামনে আবির্ভূত হয়ে সে বলল, 'টিকিট নেবেন ব্যান্ডেলের?' ভালো করে দেখে নিন। টিকিটটা জেনুইন। আমি ভেবেছিলাম ব্যান্ডেলে যাবো। নানা কারণেই আজ আর যাওয়া হবে না।' হিমাদ্রি কিন্তু এতো বলা সত্ত্বেও মোটেও টিকিটটা দেখে নিলো না। কেননা সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গেছে, সুতরাং টিকিট দেখাটা হিমাদ্রি বাহুল্য বিবেচনা করলো। ও খুব বুঝেছে, এ টিকিট জেনুইন না হয়েই যায় না। শুধু তাই নয় তার ফেরার বেলা পথে তার জন্যে আরো এক বিস্ময়, আরো এক আনন্দ অপেক্ষা করছিলো। দু নম্বর প্ল্যাটফর্মে পা দিয়ে গার্ডের গাড়ি অতিক্রম করে খানিকটা হিমাদ্রি এগিয়ে গেছে এমন সময় তাকে ভীষণ খুশি করে দিয়ে মেয়েলি গলায় উজ্জ্বল ভঙ্গিতে কে যেন তাকে বড় গভীর করে ডাকলো, 'হিমাদ্রিদা, হিমাদ্রিদা।

হিমাদ্রি হাসি মুখে তার কাছে এগিয়ে গেল।

'ঋতা, তুমি?'

'দেখ, কি যোগাযোগ! মনে মনে তোমাকে কতো খুঁজি। আজ ভালো-দিনেই তোমার সঙ্গ পেলুম।

'ভালো দিন?'

'হ্যাঁ। আজই রেডিওতে গানে চান্স পেলাম। ভালো দিন না?'

'সুন্দর দিন।'

'এমন ভালো দিনে এই ভালো খবরটা একজন খুব ভালো কাউকে জানাতে ইচ্ছে করে।'

'সে তো ঠিক।'

'হিমাদ্রিদা, তুমি ঠাট্টা করছো!' ঋতা গলায় অনুযোগ আর আবদার নিয়ে বলল, 'অরুণ বলছিলো তোমার হিমাদ্রির খবর কি? কতোদিন আসেনি তোমার কাছে। হিমাদ্রিদা, তুমি কি বলবে কেন তুমি আমার কাছে আর আসো না। অরুণ তো কোন আপত্তি করে না, তাছাড়া তার আপত্তিই বা শুনছে কে?'

একথার কি জবাব দেবে হিমাদ্রি? যে গোটা দিনটা একটু আগে সে কাটিয়ে এলো এখন সেই দিনটা একখানা খোলা বই-এর মতন তার সামনে পড়ে আছে। তার অবশ্য আর কোন দ্বিধা নেই, কি সে করবে আর কি সে করবে না। তবু এই বিশেষ দিনটির চমক, এর অসামান্য কুহক এখনো তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। হিমাদ্রি তাই এক ঘোরের মধ্যে জবাব দিলো, যদিও এ জবাব অস্পষ্ট, যদিও এ জবাব যেন নিজের কাছে নিজের, তথাপি হিমাদ্রি যেন অপরকে বলছে, এমন ভঙ্গিতে বলল, 'ঋতা, তুমিও আর কোথাও কখনো যেও না। গিয়ে কিছু হয় না। বরং ফেরো। ফিরে এসো।'

ঋতা হতবুদ্ধির মত তার দিকে তাকালো। ও কিছুই বুঝতে পারলো না। ওর চোখে দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মত কিছু যেন ফুটে উঠলো। হিমাদ্রি যেন বালিকাকে ভোলাচ্ছে তেমনিভাবে তার পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে আপন মনে হেসে উঠলো। তার আর ইচ্ছে হল না আজকের এই অদ্ভুত দিনটার কথা সে ঋতাকে জানায়। কি হবে জানিয়ে? একদিন সবাই জানতে পারে। কেন এই যাওয়া, কেনই বা ফেরা, ফিরে আসা। কেউ আগে, কেউ পরে। বরং এখন

# সেই সময়

## সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৪৪ ॥

কুসুমকুমারীর পিত্রালয়ে প্রায়ই নানা উপলক্ষে খুব ধুমধাম হয়। এ গৃহে সুখ ও সমৃদ্ধি যেন পরস্পরের হাত ধরে আছে॥

কুসুমকুমারীর পিতারা পাঁচ ভাই, তাঁরা সকলেই একান্নবর্তী। তাঁদের পুত্র কন্যার সংখ্যাও বর্তমানে সব মিলিয়ে সাতাশ, কুসুমকুমারীর নিজের সহোদর সহোদরার সংখ্যাই নয়। সুতরাং এতবড় পরিবারের একেবারে এক কোণে বিধবা কুসুমকুমারীর হারিয়ে যাবার কথা ছিল। কিন্তু তা হলো না॥ বিধবা বলেই কুসুমকুমারীকে ঠেলে দেওয়া হলো না ঠাকুরঘরে। তার পিতা-মাতা ভালো করে খোঁজ খবর না নিয়েই যে এক উন্মাদের সঙ্গে তার বিবাহ দিয়েছিলেন, সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তাঁরা কুসুমকুমারীর প্রতি আদরের বন্যা বইয়ে দিলেন। তার জন্য নির্ধারিত হলো এ গৃহের একটি সুসজ্জিত কক্ষ, দুটি দাসী নিযুক্ত করা হলো তার সেবার জন্য॥

কুসুমকুমারীর পিতা কৃষ্ণনাথ রায়ের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজ পরিবারের কিছু ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে। কিছুদিনের মধ্যেই কৃষ্ণনাথকে কার্যোপলক্ষে ত্রিপুরায় যেতে হলো, তিনি কুসুমকুমারীকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবতী বিধবার পক্ষে দেশ ভ্রমণ প্রায় অকল্পনীয় ব্যাপার, কিন্তু কৃষ্ণনাথ নিছক আচারবদ্ধ মানুষ নন, তিনি তেজস্বী পুরুষ, নিজের বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করেন, পাঁচজনের কথা অগ্রাহ্য করার সাহস রাখেন। বদ্ধ জীবন ছেড়ে কিছুদিন বাইরে ঘুরে এলে শোকসন্তপ্তা কন্যাটির যে যথেষ্ট উপকার হবে, সে কথা ভেবেই তিনি কুসুমকুমারীকে নিয়ে গেলেন ত্রিপুরায়॥

কুসুমকুমারীর অবশ্য সন্তাপ ছিল, কিন্তু শোক ছিল না। যে-স্বামীর সঙ্গে তার কোনো দিন একটিও স্বাভাবিক বাক্য বিনিময় হলো না, হৃদয় বিনিময় তো দূরের কথা, যাকে দেখে সে শুধু ভয়ই পেয়েছে, তার মৃত্যুতে আবার শোক কী? শুধু বুকের ওপর সর্বক্ষণ যেন পাষাণভার চেপে থাকে॥

ত্রিপুরার পথে পাহাড় ও অরণ্যানীর মধ্য দিয়ে যেতে যেতে আস্তে আস্তে তার হৃদয় উন্মোচিত হয়। শত শত কাঠের গুঁড়ি ভেসে যেতে দেখলে একই সঙ্গে সে বিস্মিত ও উল্লসিত হয়ে ওঠে। এই ভাবে এক দেশ থেকে অন্য দেশে কাঠ চালান যায়, বাঃ ভারি বুদ্ধির ব্যাপার তো! মধ্যে মধ্যে চোখে পড়ে শিশুর মতন দুষ্টুমিভরা দৃষ্টি নিয়ে ছুটে যাওয়া ধূসর রঙের বন-খরগোশ। কুসুমকুমারীর ইচ্ছে হয় ছুটে গিয়ে ওদের ধরতে।

যাত্রীদলটির সঙ্গে প্রহরা দিয়ে চলেছে ত্রিপুরার রাজবাহিনীর কয়েকজন সৈনিক। সুতরাং বিপদের কোনো ভয় নেই॥ কৃষ্ণনাথ বাইরে এসে কন্যার আব্রুর ব্যাপারেও বিশেষ কড়াকড়ি করেন নি, জঙ্গলের বাইরে দিয়ে যাবার সময় কুসুমকুমারীর পালকির দু' পাশ খোলা থাকে। কখনো ইচ্ছে হলে সে তার পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে বনের মধ্যে হেঁটেও আসতে পারে॥

ত্রিপুরায় ধর্মনগর নামে এক স্থানে এক রাত্রি-বেলা ওদের তাঁবু পড়েছে। কাছেই একটি জলাশয়ের ওপারে খানিকটা জঙ্গল॥ পূর্ণিমার রাত, আকাশ ধুয়ে যাচ্ছে জ্যোৎস্নায়। কুসুমকুমারী সেই জলাশয়ের ধারে এসে বসেছে॥ এক একবার সে জল দেখছে, এক একবার দেখছে আকাশ। আজ চন্দ্রকিরণের এত জোর যে পাতলা মেঘ ভেদ করেও দেখা যায় পূর্ণ চাঁদ॥ মেঘগুলি শন্ শন্ করে ছুটছে, অথবা এক এক সময় কুসুমকুমারীর ভ্রম হয় মেঘগুলিই বুঝি থেমে আছে আর চাঁদ ছুটছে অমন করে।

হঠাৎ অদূরে চক্ চক্ শব্দ হতেই কুসুমকুমারী চমকে তাকালো॥ তার পর সে যেন নিজের চক্ষুকেই বিশ্বাস করতে পারলো না। সেই সরোবরে জলপান করতে এসেছে দুটি চিত্রল হরিণ॥ কুসুমকুমারী এর আগে কখনো জীবন্ত হরিণ দেখে নি। সমস্ত হৃদয়টাকে দু' চক্ষে এনে সে দেখতে লাগলো হরিণ দুটিকে এবং তাকে সাহায্য করার জন্যই যেন সেই সময় মেঘ সরে গিয়ে বেশী করে আলো পড়লো সেখানে। হরিণ দুটি এত কাছাকাছি মানুষের উপস্থিতি টের পায় নি আগে, একটু পরে সজাগ হতেই তারা এক সঙ্গে লাফিয়ে উঠলো। তাদের সেই ছন্দময় লম্ফ এবং সমস্ত শরীরে ঢেউ খেলিয়ে ছুটে যাওয়ার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কুসুমকুমারী, তার সর্ব শরীরে রোমাঞ্চ হলো। পৃথিবীটা এত সুন্দর!

সেইখানে আচ্ছন্নের মতই বসে ছিল কুসুমকুমারী, একটু পরেই একসঙ্গে অনেক মানুষের চিৎকারে সজাগ হলো সে। রক্ষীর দল হরিণ দুটিকে দেখতে পেয়েছে. ওদের বধ করার জন্য তারা পিছু ধাওয়া করেছে॥ কুসুমকুমারী তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো। তার পিতাকে বলে সে ওদের নিবৃত্ত করবে। এমন স্নিগ্ধ, সুষমাময় রাত্রেও কি মানুষের মনে হিংসার কথা মনে আসে! কুসুমকুমারীর মনে পড়ে গেল শকুন্তলার গল্পের কথা॥ এই স্থানটি যেন তপোবন, এখানে জীব হত্যা নিষেধ। তারপর তার মনে হলো, এমন জ্যোৎস্নাময় রাত্রে, সমস্ত পৃথিবীটাই তপোবন, কোথাও কারুর মনে এখন হিংসা থাকা উচিত নয়॥

কুসুমকুমারী এগিয়ে যেতে লাগলো তাঁবুর দিকে। লোকগুলি হরিণ দুটিকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পায়নি শুনে সে নিশ্চিন্ত হলো॥ আবার ফিরে এলো সেই জলাশয়ের কাছে। জলের ওপর ভাসছে চাঁদ, আকাশেও চাঁদ, এই দুই চাঁদ দেখতে দেখতে মগ্ন হয়ে রইলো সে, যেন তার শরীরের প্রতিটি রন্ধ্রে সুখানুভূতি হচ্ছে। তার সতেরো বছরের জীবনে এমন আনন্দ সে যেন আর কখনো পায় নি।

তবু, চতুর্দিকে এত সুন্দরের মধ্যে বসে থেকেও কুসুমকুমারীর এক সময় মনে হলো, চিত্রল হরিণ দুটি কেন সে দেখলো? শকুন্তলার গল্পটা না মনে পড়লেই ভালো হতো এ সময়॥ সে কিছুতেই দমন করতে পারলো না একটা দীর্ঘশ্বাস। শকুন্তলা তার মতন বিধবা ছিল না!

ত্রিপুরা থেকে প্রায় তিন মাস পরে কুসুমকুমারী ফিরেছে।

এই পরিবারের পুরুষরা কেউ প্রকাশ্যে মদ-মেয়েমানুষের চর্চা করে না॥ গোপনে কার কোন্ দিকে যাতায়াত আছে, তা কে জানে, কিন্তু বাড়িতে ও সবের কোনো স্থান নেই। কুসুমকুমারীর পিতা কৃষ্ণনাথ অবশ্য প্রকৃতই সচ্চরিত্র পুরুষ, তাঁর ঝোঁক আছে ধ্রুপদী সঙ্গীতের প্রতি॥ এ গৃহের বালকদের স্কুল-কলেজে পড়া বাধ্যতামূলক। যুবকরা পায়রা ও ঘুড়ি ওড়ানোর মতন নির্দোষ আনন্দে মত্ত থাকে। দোল-দুর্গোৎসবে যাত্রা ও পালাগান হয়। এবার তারা নিজেরাই নাটক করবে॥ নির্দেশক, অভিনেতা, গায়ক-বাদক প্রায় সকলেই এ বাড়ির ছেলে। বাড়ির মেয়েদের অংশ গ্রহণ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, তবে নাট-মহলে মহড়ার সময় মেয়েদের উপস্থিত থাকায় কোনো দোষ নেই॥ নাটকের নাম বিক্রমোর্বশী। জোড়াসাঁকোর সিংহবাড়িতে নবীনকুমার সিংহের এই নাটকের অভিনয় দেখে বাগবাজারের ছেলেরা মুগ্ধ হয়েছিল, তাই তারা সেই নাটকই মঞ্চস্থ করতে চেয়েছে। কুসুমকুমারী আগাগোড়া বসে বসে মহড়া দেখে, এক একবার সে তার মেজদা, ছোড়দা, ফুলদাদের কিছু কিছু নির্দেশও দেয়।

একদিন দুর্গামণি একটি পত্র পাঠালো তাকে।

"আমার পরম স্নেহের ধন কুসুম সোনা, আজ ছয় মাস হইল তোরে দর্শন করি নাই। দিবারাত্র যায় ২ মনে পড়ে তব ফুল্ল কুসুমিত মুখখানি। ঐ নীল নয়নমণি দুইটি কী কহিব সর্বদা আমার সংগে ২ ফেরে॥ তুই এই পাপের গৃহে আর কোনোদিন পদস্পর্শ করিবি না জানি কেনই বা করিবি, তোর উদ্ধার হইয়া গিয়াছে। আমি হতভাগিনী আর কোথায় যাইব এই পাপ পুরীতেই পচিয়া মরিবে আর কোনো গতি নাই॥ শ্রীমান সত্যপ্রসাদ মধ্যে ২ তোমার কথা বলে। বেচারি বড় মুষড়াইয়া পড়িয়াছে, উহার বোধহয় এস্থান হইতে বাস উঠিল॥ উহার মাতা বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন সে পাশ না দিয়া বিবাহ করিতে চাহে না। আর খেলা জমে না॥

ওরে কুসোম, তুই বড় বাঁচা বাঁচিয়া গিয়াছিস॥ বাক্স পাগোল স্বামীর সহিত সারা জীবন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরার চাহিতে স্বাধীন বৈধব্য শতগুণে ভালো। স্বাধীন বৈধব্য এমন কথা সত্যপ্রসাদ একবার তোর সম্পর্কে বলিয়াছিল, আমার বড় মনে ধরিয়াছে॥ আহা আমি যদি এমত স্বাধীন বৈধব্য পাইতাম! তুই বিধবা থাকিবি কেন আমার মতন তোর বয়স তো তিনকাল গিয়া এককালে ঠেকে নাই—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অবলাদিগে। সুরাহা করিয়াছেন। তোর কাঁচা বয়স, তোর পুনরায় বিবাহ হইবে, হইবেই হইবে, এমন যার রূপ সেই যে বৃন্দাবন গোস্বামী ঠাকুর একবার গান শুনাইয়াছিলেন 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি' তুই যেন সেই॥ বলিব কি কুসোম, আমি যদি পুরুষ মানুষ হইতাম তবে বলপূর্বক তোরে হরণ করি লইয়া যাইতাম কোনো দূর দেশে॥ আমার এই জীবনটা বৃথাই গেল, তুমি ভাগ্যবতী হও, কোনো রূপবান গুণবান পুরুষ তোমারে গ্রহণ করিয়া ধন্য হউন। সত্যপ্রসাদ এই পত্র পাঠ করিবার জন্য আকুতি করিতেছে তাহাকে দেখাইব না সুতরাং আর লিখিব না॥ আর অধিক কী। ইতি আং তোমার খুড়ী ঠাকুরানী দুর্গামণি।"

পত্রখানি অন্তত দশবার পাঠ করলো কুসুম-কুমারী। পড়তে পড়তে সে হাসলো, কাঁদলো, তার পর সেখানি কুটিকুটি করে ছিঁড়ে সে উড়িয়ে দিল বাতাসে। এই পত্র অন্য কেউ দেখে ফেললে কতখানি লজ্জার ব্যাপার হবে। দুর্গামণির মুখের কোনো বাঁধন নেই। আবার বিবাহ? ছিঃ!

কুসুমকুমারী অবশ্য জানে না যে তার পুনর্বিবাহ নিয়ে ইতিমধ্যেই খানিকটা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে। কুসুমকুমারীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা নৃপেন্দ্রনাথের দুটি শিশু-পুত্রের গৃহশিক্ষক যদুপতি গাঙ্গুলী, তার সঙ্গে নৃপেন্দ্রনাথের মাঝে মধ্যে দেশ ও সমাজ বিষয়ে

SAA/FSL/C/1043 BN

# আপনার বাচ্চাকে দেখুন

## সেরেল্যাক -এর সাহায্যে

### বাচ্চাদের জন্য পুষ্টিগুণে ভরপুর সিরিয়েল ফুড। দুধ, চিনি...আর আদরে ভালবাসায় ভরপুর।

আপনার বাচ্চার বয়স কি ৪ মাস হয়ে গেছে? তাহলে এখন ওর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য দরকার সঠিক মাত্রায় সুষম দানা শস্যের শক্ত আহার।

সেরেল্যাক শিশুদের জন্য পুষ্টিগুণে ভরপুর শস্য আহার দানা শস্য, মালাইদার দুধ আর চিনির এক সুস্বাদু মিশ্রণ, যা আপনার বাচ্চার বাড়ের জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম পুষ্টিগুণ যোগায়।

- সঠিক সুষমমাত্রায় ফ্যাট আর কার্বোহাইড্রেট থাকার দরুন আপনার বাচ্চা চলতে পারে।
- যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন থাকার দরুন আপনার বাচ্চা বাড়তে পারে।
- অতিরিক্ত পরিমাণে ভিটামিন ও আয়রণ থাকার দরুন আপনার বাচ্চা খেলতে পারে।

এটি বানানো কত সহজ
শুধু এটি জলের সাথে মিশিয়ে নিন।

সেরেল্যাক—কৌটান জলে ঢালুন

মিশিয়ে গুলে নিন

এবার খেতে দিন

NESTLÉ

সভার সদস্য এবং বিদ্যাসাগরের চ্যালা। নৃপেন্দ্রনাথ এ যদুপতির প্রযোজনায় অন্ততঃ কয়েকটি দুঃস্থ বিধবার বিবাহের সময় কিছু আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। কুসুমকুমারী এ বাড়িতে বিধবা হয়ে ফিরে আসার কিছুদিন পর যদুপতি একদিন নৃপেন্দ্রনাথকে বললেন, আপনি বিধবা বিবাহের সমর্থক, আপনি আপনার এই ভগিনীর আবার বিবাহ দিন না কেন! প্রস্তাব শুনে নৃপেন্দ্রনাথ আমতা আমতা করতে লাগলেন। তৎক্ষণাৎ সায় দিতেও পারেন না আবার গৃহশিক্ষকের কাছে প্রাচীনপন্থী সাজতেও চান না। তিনি বললেন, আমার অমত না থাকলেও আমার বাবা এ পরিবারের কর্তা, তাঁর সম্মতি বিনা তো কিছু হতে পারে না। যদুপতি তখন বললেন, আপনার বাবার কাছে এ প্রস্তাব পেশ করুন তবে। শুনেছি আপনার বাবা রামতনু লাহিড়ী মশায়ের একজন সুহৃদ। আপনি জানেন নিশ্চয় যে রামতনু লাহিড়ী, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ বিধবা বিবাহ কার্যে মহোৎসাহী?

আচ্ছা দেখি বলে নৃপেন্দ্রনাথ তখনকার মতন এড়িয়ে যান। রাশভারী কৃষ্ণনাথের কাছে এরকম কথা বলতে নৃপেন্দ্রনাথের সাহস হয় না। কৃষ্ণনাথ যদি রাজি হন তো তখুনি এমন সুপরামর্শের জন্য পুত্রকে স্নেহ-সম্ভাষণ করবেন, আর যদি রাজি না হন তো অমনি একেবারে ক্রোধে অগ্নিশর্মা!

নাছোড়বান্দা যদুপতি কিছুদিন অন্তর অন্তরই বিষয়টা মনে করিয়ে দেয় নৃপেন্দ্রনাথকে। নৃপেন্দ্রনাথ এখন গৃহশিক্ষকটিকে দূর থেকে দেখলেই সোজা একেবারে শয়ন ঘরে ঢুকে দ্বার রুদ্ধ করে বসে থাকেন। তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ দুই ভাইকে একটু বাজিয়ে দেখেছেন নৃপেন্দ্রনাথ। সেই ভাই দুটির কোনো আপত্তি নেই কুসুমকুমারীর পুনর্বিবাহে, কিন্তু তারাও কেউ কৃষ্ণনাথের কাছে গিয়ে এই প্রসঙ্গ তোলার সাহস পায় না।

মনোভাব ব্যাসহ করার সাহস যখন তাদের নেই, তখন অন্য একটা পন্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে গিয়ে যদি অনুরোধ করা যায়, তিনি কৃষ্ণনাথকে কুসুমকুমারীর পুনর্বিবাহের কথা বলুন। কৃষ্ণনাথ রাজি না হলেও রামতনু লাহিড়ীর মতন মান্য বন্ধুর ওপর তো রাগ করতে পারবেন না। সেই অনুযায়ী রামতনু লাহিড়ীর খোঁজ নেওয়া হলো। কিন্তু দুঃখের বিষয় লাহিড়ী মহাশয় এখন কৃষ্ণনগরে। তাঁর কলকাতায় আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই।

কুসুমকুমারীর ফুলদাদা হেমেন্দ্রনাথ সাজছে ঊর্বশী। সে বেচারির দু পা চাটলেই শাড়ী খুলে যায়। তা দেখে নাটমণ্ডপের সিঁড়িতে বসা বাড়ির মেয়েরা একেবারে হেসে গড়িয়ে পড়ে। সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ হেমেন্দ্র রাগ করে বলে, দিদিরা থাকলে আমি পার্ট বলবো না। মহড়ার সময় ওদের থাকা চলবে না!

তখন মেয়েরা কলকল করে ওঠে। কুসুমকুমারীর সেজদিদি বলেন, ওরে হেমু, আসল থ্যাটারের দিনে অ্যাক্টো করার সময় তোর যদি শাড়ী খুলে যায়, তখন ভালো হবে?

কুসুমকুমারী বলে, অ সেজদি, হেমু বলেচে, ঊর্বশী মালকোঁচা মেরে শাড়ী পরবে!

এক হাতে তলোয়ার ধরা পুরূরবা পর্যন্ত হেসে ওঠে!

নাট্য নির্দেশক পিসতুতো দাদা নগেন্দ্রনাথ গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে বলে, অ্যাই, কী হচ্ছে! এটা হ্যাজলামোর জায়গা? ইন্দু, শশী, কুসী, ক্ষেমী তোরা এবার ভাগ্‌ এখেন থেকে!

সেজদিদি ইন্দুমতী বলেন, তো। থ্যাটারের সময় লোক হাসালে আমাদের বাড়ির নাম খারাপ হবে না?

[illegible]

যাও, যাও, তোমাদের আর গিন্নিপনা কর্তে হবে না। এখুনি ইদিকে বড়োদাদা এসে পড়লে দেকাবে মজা!

—ওমা, ওমা, নন্তু ওর শাড়িতে বেল্ট বেঁধেচে দ্যাক! অ নন্তু, সখীরা বেল্ট বেঁধে এস্টেজে নামবে নাকি রে? হি-হি-হি মেয়েদের শৃঙ্গারস অবশ্য অকস্মাৎ থেমে গেল। এই সময় সেখানে এসে পড়লো স্বয়ং নাট্যকার নবীনকুমার সিংহ। ঠিক পাশের গৃহেই তার শ্বশুরালয়। এ বাড়ির যুবকরা তাকে অনুরোধ জানিয়েছিল একবার এসে মহড়া দেখে যেতে এবং কিছু পরামর্শ দিতে।

সরোজিনীদের সঙ্গে এ বাড়ির কিছুটা আত্মীয়তা আছে, সেই হিসেবে নবীনকুমার এ বাড়ির কুটুম্বের মতন। তাকে দেখে মহিলারা ঘোমটা দিয়ে মুখ ফেরালো, কেউ কেউ আড়ালে সরে গেল, কয়েকজন একই জায়গায় বসে রইলো, তাদের সঙ্গে নবীনকুমারের রসিকতার সম্পর্ক।

কোঁচানো ধুতি ও নীল মখমলের বেনিয়ান পরা নবীনকুমার চত্বরের মাঝখানে গম্ভীর মুখে দাঁড়ালো, তার হাতে একটি রুপো বাঁধানো ছড়ি। তার চেয়েও বেশী বয়েসী যুবকদের উদ্দেশ করে ভারিক্কী গলায় সে বললো, তা কেমন হচ্ছে টচ্ছে শুনি! সুরেন্দ্রবাবু বুঝি পুরূরবা সেজেছেন?

কুসুমকুমারী সিঁড়ির আসন ছেড়ে উঠে অবনত-মুখে চলে গেল অন্দর মহলে। যাবার সময় নবীন-কুমারের সামনে দিয়ে আসতে হলো তাকে। সে মুখ তুললো না একবারও। এই নবীনকুমারের ব্যাধির সময় সে একবার দেখতে গিয়েছিল, তখন নবীনকুমার একটিও কথা বলেনি তার সঙ্গে। সে কথা তার মনে আছে। নবীনকুমার এবারেও অবশ্য থান কাপড় পরা

[illegible] সরোজিনী এলো এ বাড়িতে। সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ সেরে একেবারে শেষ কালে সে এলো কুসুমকুমারীর কাছে। সরোজিনী এর আগেও কুসুমকুমারীর সঙ্গে দেখা করে গেছে কয়েকবার। যখনই সে পিত্রালয়ে আসে, এ বাড়িতেও একবার ঘুরে যায়। আজ এসে সরোজিনী কুসুমকুমারীর হাত জড়িয়ে ধরে বললো, অ কুসোমদিদি, তুমি একবার আমাদের বাড়িতে চলো! এখুনি চলো।

কুসুমকুমারী বললো, কেন রে, তোদের বাড়িতে যাবো কেন?

সরোজিনী তাকে টেনে তোলার চেষ্টা করে বললো, চলো না! একবারটি চলো! আমার আজ্জপুত্র তোমার সঙ্গে কতা কইতে চেয়েচেন।

—কী বললি! কী পুত্র!

আজ্জপুত্র! আমি সব সময় অন্যদের কাচে আমার বর, আমার বর বলি তো, তাই উনি বলেচেন, বর বর বলো কেন? বর তো শুধু বিয়ের দিন হয়। তোমাকে কি এখুনো আমি আমার কনে, আমার কনে বলবো? তুমি আমায় আজ্জপুত্র বলবে!

*কুসুমকুমারী হেসে বললো, ও, আর্যপুত্র! বরে বললে আর্যপুত্র! এ যে কেমন যাত্রা যাত্রা শোনায়!*

—*কী করি বলো দিদি! ওনার যে খেয়াল! কত রকম খেয়াল যে ও'র হয়!*

—তা তোর বরের সঙ্গে আমি কী কতা কইবো!

—একবার চলোই না! তুমি যে বেধবা হয়েচো, সে কতা তো উনি জানতেনই না, আমি কাল রাত্তে বেলায় বললুম! তা শুনে উনি বললেন, আহা, কোন্ মেয়েটি গো? সেই যার সঙ্গে আমাদের পুতুলের বে হয়েছেল? তাকে একবার ডাকো না?

—সরো, তুই যেমন পাগল, তোর বরও তেমনি পাগল! সেই পুতুল খেলা, সে সব কবে কার কতা!

—আমরা তোমার পর? আমাদের বাড়ি তোমার হলো গে পরের বাড়ি?

সরোজিনীর স্বভাবটি এখনো ছেলেমানুষীতে ভরা। কুসুমকুমারীর চেয়ে সে বয়েসেও কিছুটা ছোট। একটু অমনোমত কথা শুনলেই সে অভিমানে ওষ্ঠ ফোলায়। তা সরোজিনীর অভিমানের কারণ আছে। দুই পরিবারের প্রাসাদ একেবারেই সংলগ্ন বলা যায়, এ ছাদে ও ছাদে কথা হয়, অন্দর মহলের পিছন দিকে দুই বাড়িরই বাগান এবং ঝিল। এ বাড়ি ও বাড়ির মেয়েরা সব সময়ই যাতায়াত করে।

তবু কুসুমকুমারীর যেতে লজ্জা করে। সরোজিনীও কিছুতেই ছাড়বে না। শেষ পর্যন্ত কুসুমকুমারী গেল তার মায়ের কাছে অনুমতি চাইতে। তার মা পুণ্যপ্রভা বললেন, ওমা, তুই বোনেদের বাড়ি যাবি, তাতে আবার কতা কী! তিনি সরোজিনীর চিবুক ছুঁয়ে অনেক আদর করলেন।

নবীনকুমার পালঙ্কে শুয়ে একখানি বই পড়ছিল, সরোজিনী ঘরে ঢুকে বললো, এই যে, কাকে এনিচি, দেকুন!

নবীনকুমার দেখলো, একগলা ঘোমটা টানা এক থান পরা মূর্তি ঈষৎ পাশ ফিরে দাঁড়ানো। মুখখানা দেখবার কোনো উপায় নেই।

*নবীনকুমার বললো, এই যে মিতেনী, আমায় চিনতে পারো?*

কুসুমকুমারী কোনো উত্তর দিল না।

নবীনকুমার বললো, সরোজ, তোমার মিতেনী কি অমন উল্টো দিকে ফিরে থাকবে?

সরোজিনী বললো, আপনি ভুলে গ্যাচেন, ও আমার মিতেনী কেন হবে। কুসোমদিদি তো ছেল

নবীনকুমার বললো, তা না হয় হলো। উনি কি আমার সঙ্গে কতা কইবেন না?

সরোজিনী বললো, ও কুসোমদিদি, তুমি অ্যাত লজ্জা পাচ্চো কেন গো? তুমি তো আগে আমার বরের....অ্যাই! থুড়ি....আমার আজ্জপুত্রের সঙ্গে কতা কইতে।

কুসুমকুমারী ফিসফিস করে কী যেন বললো তাকে।

সরোজিনী বললো, তুমি ওরকম করো না তো! বিধবা হলে বুঝি কতা কইতেও নেই। শান্তি মাসী কি চন্দননগরের পিসেমশাইয়ের সঙ্গে কতা বলেন না?

নবীনকুমার হাত জোড় করে ছদ্মকৌতুকে বললো, হে দেবী, একবার আমায় দর্শন দান করে ধন্য করুন। আপনি কি জানেন না, বিধবা কুন্তী তাঁর দেবর বিদুরের সঙ্গে কতা কইতেন।

সরোজিনী জোর করে সরিয়ে দিল কুসুমকুমারীর মুখের ঘোমটা। তবু সে এদিকে তাকাবে না। আবার মুখখানা জোর করে স্বামীর দিকে ফিরিয়ে দিল সরোজিনী। কুসুমকুমারীর চক্ষু দুটি বোজা। তার ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হচ্ছে লজ্জায়।

কুসুমকুমারীকে দেখে চমকে উঠলো নবীনকুমার। ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা পার হয়ে এসেছে বলে এই মেয়েটির মুখখানি সে ভুলেই গিয়েছিল। এখন মনে পড়লো। অস্ফুট কণ্ঠে সে বললো, তুমি...তুমি সেই বনজ্যোৎস্না!

এবার নীল রঙের চক্ষু দুটি মেলে কুসুমকুমারী তাকালো নবীনকুমারের দিকে। (ক্রমশ)

---

# স্মৃতি সততই সুখের

প্রতিভা বসু

### দ্বিতীয় পর্ব

॥ ৬২ ॥

খাবারটা কিন্তু খুব ভালো দিয়েছিলো। ধোঁয়া-ওঠা চমৎকার স্বাদের স্যুপ, উৎকৃষ্ট মাংস, গরম গরম রোল রুটি, ফ্রেন্চ ড্রেসিং মাখা রোল ভরতি স্যালাড, এক ধরনের মিষ্টি—সবই উপাদেয়। সেই সঙ্গে ওয়াইনের স্বাদও অতুলনীয় এবং দামও তুলনাহীন। দুখানে। ফরাসীদের এই পানীয়টি আমার মতো অরসিকের জিবেও সুখের সঞ্চার করে।

হোটেলে ফিরতে ফিরতে অনেক বেলা হলো। একটু শুয়ে নিচ্ছিলাম হাত-পা ছড়িয়ে, দরজায় টোকা। চারটে বেজে তিরিশ মিনিট, চা নিয়ে এসেছে একটি মেয়ে। সকালে বিকেলে চায়ের ব্যবস্থা আছে এখানে। সংগে সূক্ষ্ম কাজ করা বেতের ডালায় রুটি কেক বিস্কুট। ফলও আছে। কলা আর আঙুর। বেতের এই ডালাগুলো সুন্দর। রুটি, রোল ইত্যাদি এরকম ডালাতেই দেয় দেখছি। হোটেলেও ডালাতেই দিয়েছিলো।

চা পেয়ে বুদ্ধদেব খুব খুশী। ভোজ্য বস্তু সব অবশ্য অস্পৃশ্যই রইলো, কিন্তু পট-ভরতি চায়ের একবিন্দুও ফেলা গেল না।

চা শেষ হতে হতেই নিচে থেকে ফোন এলো কোনো অতিথি এসেছেন দেখা করতে। অনুমান করছিলাম কে হতে পারে। কিন্তু নেমে এসে যাঁকে দেখলাম তিনি নিতান্তই এক অচেনা ব্যক্তি। যুবকই বলা যায়, খুব সুস্থ সবল সপ্রতিভ। হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালাম। পরিচয় হলো। নাম দিলীপ মালাকার, বেশ কিছুকাল যাবৎ ঐ দেশেরই বাসিন্দা। বলাই বাহুল্য বাংলাভাষা শুনে আমি পরম আনন্দিত। ভাষার জন্যই না, ভদ্রলোকটিও চমৎকার। বিদেশে থেকেও দেশের খবরাখবর রাখেন। সাহিত্য বিষয়ে কৌতূহল এবং অনুরাগ দুই-ই যথেষ্ট, ওয়াকিবহালও খুব।

অনেকক্ষণ রইলেন, অনেক ধরনের কথাবার্তার মধ্যে দোকানবাজারের কথাও উঠে পড়লো। আমি আমার একটি গোপন শখ সসংকোচে নিবেদন করলাম। শুনে বুদ্ধদেব তো প্রায় হায় হায় করে উঠলেন, 'কী কাণ্ড, সোনার টাকা কেনার বুদ্ধি তোমাকে কে দিল?'

বস্তুতই দিয়েছিলো একজন। আমার আমেরিকার বন্ধু শার্লি ক্লাই। আমার হাতের চুড়ি, গলার হার, কানের ফুল—সবই যে সোনার এ নিয়ে সে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলো, 'ভারতবর্ষের মেয়েরা এখনো খাঁটি সোনা ছাড়া অলঙ্কার ব্যবহার করে না দেখে আমাদের বড়ো অবাক লাগে। সারা আমেরিকা চষে ফেললেও তুমি চোদ্দ ক্যারেটের উপরে সোনা পাবে না। সেটাই এখানে যথেষ্ট। সেই গয়নাই বলতে গেলে কোনো মেয়ে পরে না। পরলে বেশ গৌরবের সংগে বলে। অথচ তোমরা কতো সহজেই এসব নিয়ে ঘোরো-ফেরো ব্যবহার করো। খাঁটি সোনা কেন, খাঁটি রুপোও আমরা চোখে দেখি না এখন। যা রুপোর বাসন বলে বিক্রি হয় সবই প্লেট করা। তারই বা কী দাম! কেনার লোক কোথায়?'

আমিও অবাক হয়ে বলেছিলাম 'এতো বড়লোকের দেশ, আর বলছো কেনার লোক কোথায়?'

'আসলে কি জানো, এভাবে ঘরে ঘরে সোনা হোর্ড করে রাখাটা কোনো কাজের কথা নয়। সোনা থাকবে দেশের নৈবিদ্যের চূড়ো হয়ে। কার তোষা-খানায় কতো সোনা জমা আছে সেটাই হবে তার দেশের ধনদৌলতের মাপকাঠি। ঐ জন্য চোদ্দর উপরে কখনো এনকারেজ করে না। নাই-ই, তার উপরে গয়না!'

কথার সত্যতা আমি অবশ্য যাচাই করার অবকাশ পেয়েছিলাম। আমার ছোটো কন্যা যখন ঐ দেশেই বিবাহিত হয়েছিলো, আমরা তার দু মাসের মধ্যেই সেখানে গিয়ে সেই বিবাহ উপলক্ষে তাদের কিছু উপহার দিতে চেয়ে-ছিলাম: বই, টাইপ-রাইটার, রেকর্ড, কাপড়চোপড় ইত্যাদির সংগে কিছু সোনাও দিতে চেয়েছিলাম। আমরা কথাটা অবশ্য গৌরবে বহুবচন হলো, কেননা সোনা দেবার ব্যাপারটা বুদ্ধদেবের চিন্তায় কোথাও ছিলো না। ওটা একা আমার ইচ্ছে।

মেয়েকে নিয়েই আমি সব জুয়েলারী দোকানে ঘুরে বেড়িয়েছি, ঐ চোদ্দ ক্যারেট ছাড়া কোথাও কিছু পাইনি।

'সোনা এখন কোথায় সস্তা জানো? ফ্রান্সে।' শার্লিই সংবাদটি পরি-বেশন করেছিলো। বলেছিলো, 'আমি যদি সেখানে যাই, বেশ কয়েকটা সোনার টাকা কিনবো ভেবেছি।'

'সোনার টাকা?'

'জানো তো ডলারের কী সমাদর এখন সারা জগতে! ডলার দিয়ে কিনলে সস্তাও পাবে।'

'সত্যি! আমরা তো কয়েক মাসের মধ্যেই ফ্রান্সে যাবো। বল তো কোথায় কিনতে পাওয়া যায় সোনার টাকা!'

'কিনবে?'

'হ্যাঁ।'

'কিনো রানু, কিনো। তুমি কিনলে আমি খুশী হবো।'

'সুখ? কী জানি! সুন্দর হতো অবশ্যই। [illegible] কিনলে যে [illegible], তাই [illegible] না।'

'শার্লি, আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে একটা সোনার টাকা উপহার দিতে। যদি কিনি, যদি ওখানে তোমার দেশের এমন কাউকে পাই যার হাত দিয়ে সেটা পাঠানো যায়, আমি নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবো।'

'ও আমার লক্ষ্মীসোনা, দিও, তাই দিও।' হাসতে হাসতে খুব পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলো।

কিন্তু ঠাট্টা নয়, আমি সত্যই ভেবেছিলাম। অবশ্য ভুলে যেতেও দেরি হয় নি। নানা প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেছে।

দিলীপ মালাকার বললেন, 'সোনার টাকা কোথায় পাওয়া যায় আমি কিন্তু জানি না। তবে খাঁটি সোনার দোকানে যেতে চান তো নিয়ে যেতে পারি। হয় তো সেখানেই পাওয়া যেতে পারে। সোনার টাকা নিয়ে আপনি দেশে যেতে পারবেন কিনা সন্দেহ।'

আমি বললাম, 'নমুনা হিসেবে একটা-দুটো নিলেও কি আপত্তি করবে?'

'ঠিক আছে, কখন যেতে চান বলুন, আমি দোকানে নিয়ে যাবো আপনাকে। ওসব ওখানেই পাওয়া যাবে।'

যথাসম্ভব তাড়াতাড়িই দিনক্ষণ ঠিক করে গিয়েছিলাম দিলীপ মালা-কারের সংগে সোনার দোকানে। ঝকঝকে শো-কেসে চোখ ঠিকরোনো সেটিংয়ের গয়না দেখে মোহিতও হয়েছিলাম, নেবো মন স্থির করে দামও জিজ্ঞেস করে-ছিলাম। তারপর সেই দামটি কানে যেতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকেও উঠে-ছিলাম। সোনার দাম নয়, মজুরির দাম। সে যে কী ভয়ানক বলা যায় না। সোনার চেয়ে তার হার অনেক বেশী। বুঝতে পারলাম কেন মেয়েরা আর সোনার গয়না পরে না। কস্টিউম জুয়েলারী অনেক ভালো। অবশ্য তারও কম দাম নয়।

হতাশ হৃদয়ে বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে। সোনার টাকা বিষয়েও দিলীপ মালাকার খবর নিয়েছিলেন ওদের কাছ থেকে। ব্যাংকের মধ্যস্থতায় পাওয়া যায়, কিন্তু তার হাঙ্গামাও অনেক, দামও তেমনি। সুতরাং ফরাসী দেশে সোনা সস্তা এই প্রবচনটা আর আমার বিষয়ে খাটলো না। শেষ পর্যন্ত একটি ক্রেপ-ব্যান্ডেজ কিনে ঘরে ফিরলাম।

ব্যান্ডেজটি বুদ্ধদেবের জন্য। পায়ের ব্যথাটা ক্রমেই বেশ বেড়ে উঠে-ছিলো। প্রায় চলতেই পারছিলেন না। ভাবলাম ব্যান্ডেজটা দিয়ে টাইট করে বেঁধে রাখলে চলতেও আরাম হবে, ব্যথাটাও কমবে। আমার কাছে ফরাসী পয়সা ছিলো না, দামটা দিলীপ মালাকারই দিলেন। মন্দ দাম নয়। আমি অদ্যাবধি সেজন্য কৃতজ্ঞ আছি তাঁর কাছে, কেননা ঐ ব্যান্ডেজ বেঁধে বুদ্ধদেব আরামও পেয়েছিলেন, নিরাময়ও হয়েছিলেন। অবশ্য প্রায় এক মাসের উপর রাখতে হয়েছিলো সেই বাঁধন।

পরের দিন এক পাঞ্জাবীদম্পতি এলেন। এঁদের সংগেও নতুন পরিচয় ঘটলো। শ্রী এবং শ্রীমতী ডিংরা, তাঁরাও ওখানে বেশ কিছু দিন আছেন। ডিংরা চাকরিসূত্রে এসেছেন, আরো কিছু দিন থাকবেন। এই দুজন মানুষের সংগে আমরা শেষ পর্যন্ত অনেকটাই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলাম। যে কদিন প্যারিসে ছিলাম, প্রায় প্রত্যহই কোনো না কোনো সময় বেছে নিয়ে তাঁরা আসতেন। সঙ্গ দিয়ে, বন্ধুতা দিয়ে, পরিশ্রম দিয়ে সমস্ত কাজেই আমাদের সহায় হতেন। কতো মাইল দূরে পাসপোর্ট অপিসে যেতে হবে বুদ্ধদেবের, সেখানেও মিস্টার ডিংরা তাঁর সাহায্যে অগ্রণী।

বিদেশে কতো সহজেই কতো মানুষ কেমন আপন হয়ে ওঠে। পরে আর তার স্মৃতি ছাড়া কিছুই থাকে না। তাঁরা যে এখন কে কোথায়, কিছুই জানি না। আর কখনো দেখা হয়নি তাঁদের সংগে। অথচ আশা করেছিলাম। মনে হয়েছিলো এঁরা তো বিদেশী নয়, ভারতীয়। নিশ্চয়ই মাতৃভূমিতে কখনো না কখনো আবার মিলিত হতে পারবো। হইনি।

আর যাকে প্রায় সকল সময়কার সঙ্গী, সকল কাজের বুদ্ধিদাতা এবং সকল বিষয়ে একান্ত সচিব বলে জেনেছিলাম, সেই অপরূপ সুন্দর ফরাসী যুবক ইভান কার্টস—তাকেও বা আর দেখলাম কই! অথচ তার সংগে দেখা হওয়া প্রায় অবধারিত ছিলো। কর্মসূত্রে ইভানের পরের বছরই ভারতে আসা স্থির ছিলো। সেই কর্মসূত্রের সংগে বুদ্ধদেবও জড়িত ছিলেন। বুদ্ধদেবের সম্পাদনায় একটি অ্যান্থলজি বার করবার পরিকল্পনা ছিলো কোনো প্রকাশকের, ইভান তার মধ্যস্থ। সেই কারণেই ভারতে আসা নিশ্চিত ছিলো। শেষ পর্যন্ত পত্রালাপেই যজ্ঞ সম্পন্ন হলো।

প্যারিসে থাকাকালীন এই ইভান আমার সব ইচ্ছে নির্বিচারে পূরণ করতো। কিছু কিনতে চাওয়া, দেখতে চাওয়া, অকারণ শখ—সব কিছুর জন্যই ইভান হাজির। ঐ ঐতিহাসিক শহরের আনাচেকানাচে পথে-প্রান্তরে যতো কিছু দ্রষ্টব্য সম্ভব সবেরই প্রদর্শন সঙ্গী ইভান কার্টস।

যেদিন আমাদের লুভারে নিয়ে গেল, মনে-প্রাণে অনুভব করেছিলাম এই ধরনের শিক্ষিত মার্জিত সুসভ্য একটি বন্ধুর গাইডেন্স না পেলে অনেক কিছু থেকেই আমরা বঞ্চিত হতাম। কোনো মানুষের পক্ষেই এই সব মহান কীর্তি দেখা মাত্রই উপলব্ধি করা সম্ভাবনার পরপারে। 'দেখেছি' বলার জন্য যাওয়া আর উপভোগ করার জন্য যাওয়া—দুটোতে কোনো মিল নেই। বিশাল চিত্রশালাটিতে ঢুকেই তার ধুধু লম্বা করাইডোরটির এ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ঐ প্রান্তে তাকিয়ে রীতিমতো বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। এই অলৌকিক জগতের প্রত্যক্ষ অনুভূতি

পারছিলাম না। অভিজ্ঞ যাত্রী যাঁরা আসেন তাঁদেরও একটা পদ্ধতি আছে।

ইভান বললো, 'প্রথম দিন এসে আমারও ঠিক এই অভিজ্ঞতাই হয়েছিলো। এখন বলতে পারো এখানে আমি একটা নেপ্রো। কিছু করার না থাকলেই চলে আসি, মন খারাপ হলেই চলে আসি, ফর্তি হলেও চলে আসি। এখন আমি জানি কীভাবে শুরু করতে হয় আর কীভাবে সারা করতে হয়। কিন্তু দু'দিন আসতে হবে।'

'তাই আসবো।'

শুরু হলো প্রথম দিনের পরিক্রমা। ঘুরে ঘুরে বেশ সুস্থিরভাবেই দেখা হতে লাগলো সব। সব শোনা হতে লাগলো। মাঝখানে আমাদের কোনো বিশ্রামস্থলে বসিয়ে ইভান গিয়ে বাইরে থেকে স্যান্ডুইচ কিনে নিয়ে এসে বললো, 'যতোটা সময় পারো থেকে যাও. খাবার জন্য বেরুবার দরকার নেই।'

শেষ পর্যন্ত মোনালিসার বহুশ্রুত ছবিটির কাছে এসেও দাঁড়ালাম। হঠাৎ আমার চোখে জল এসে গেল। চিত্রকরের শিল্পনৈপুণ্যের জন্য নয়, আমি যে সত্যিই এই পৃথিবীবিখ্যাত আসল ছবিটির কাছে এসে দাঁড়াতে পেরেছি এই সুখের গৌরবই আমাকে সজল করে তুললো। তা নইলে আসল ছবিটি দেখে খুব অবাক লাগে না। এই রহস্যময় হাসিমাখা মুখখানা দিয়ে ক্যালেন্ডারও ছাপা হয় আমাদের দেশে। কতো প্রিন্ট দেখেছি তার ঠিক নেই। হুবহু প্রতিকৃতি। কিন্তু তারা নকল। নকল আর আসলের দৃষ্টিগত ভেদাভেদের প্রশ্ন নয়, মনোগত উপলব্ধিই মানুষের আবেগকে সঞ্চালিত করে।

শার্ত্ ক্যাথিড্রেলেও ইভানের সঙ্গেই গিয়েছিলাম আমরা। কোন দিন কখন কী করবো, কোথায় যাবো, কী দেখবো—সব লিস্ট করাই ছিলো। ওখানে বুদ্ধদেবের সর্বন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া আর বিশেষ কোনো কাজের বাধ্যবাধকতা না থাকায় সময় অঢেল ছিলো। তার উপরে ফরাসী সরকার গাড়ি-খানা দেওয়াতে ঘোরাফেরার সুবিধেও হয়েছিলো খুব। প্রকৃতির আবহাওয়াও তখন অতি মনোরম। বলা যায়, একান্তই বসন্তকাল, ঠিক আমাদের ফাল্গুন মাসের মতো। প্যারিসের চওড়া চওড়া রাস্তা এবং বাড়ি-ঘর কোথাও আকাশকে আড়াল করে না। ধোঁয়া নেই, ঘিঞ্জ নেই, গগনচুম্বী বাসগৃহের ভিড় নেই, মনে হয় সর্বত্রই মুক্তির হাওয়া অবারিত। এ অবস্থায় ঘুরে বেড়ানোর মতো সুখ আর কোথায়!

প্যারিস থেকে শার্ত্ ক্যাথিড্রেলের দূরত্ব খুবই কম। গাড়িতে মাত্রই দেড় ঘন্টার রাস্তা। প্রাতরাশ সেরেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। ভাবা ছিলো এই দেবালয়টি দেখে ভার্সাইতে চতুর্দশ লুইয়ের 'কানট্রি হাউসটি'ও দেখতে যাবো।

শার্ত্ ক্যাথিড্রেলে গিয়ে যখন পৌঁছুলাম, সকালের রোদ তখনো তাপহীন। বাইরে বাগানে গাছের ফাঁকে আলোছায়ার খেলা। খিলেনের গায়ে গায়ে সব সাধুসন্তের মূর্তি, যীশুর জীবনগাথা। সেই সব মূর্তিও সূর্যের নরম রোদের স্পর্শে উজ্জ্বল কোমল, চোখ-ধাঁধানো নয়। চোখ ধাঁধানো চূড়ার দিকে তাকিয়ে। দৃষ্টি চলে না এতোটাই উঁচু। সেই উঁচুতে তাকাতে হলে ঘাড় ব্যথা করে সূর্যের সঙ্গেও চোখাচোখি হয়ে যায়। আর সেই সঙ্গে শ্বেতপাথরের কারুকার্য-খচিত কোনারকের সূর্যমন্দিরের কথাও মনে পড়ে যায়।

বাইরে দাঁড়িয়েই অনেকক্ষণ কেটে গেল। সম্মুখে প্রাচীন গম্ভীর দেবালয়টি ঈশ্বরের মহিমায় উপস্থিত। পবিত্রতার প্রতীক। মন আপনিই অবনত হয়। সহসা সারা মাঠ ভরে যেন সহস্র ফুল ফুটে উঠলো। সাদা সাদা কুন্দ ফুল। দুটি বাস ভরতি গলা থেকে পা পর্যন্ত ফ্রীল তোলা ধবধবে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র পোশাকে বালিকারা নামলো এসে সেখানে। সেই সব সুন্দর বালিকাদের নিয়ে, তাদের পোশাক নিয়ে উদ্ভাসিত আকাশের দিগন্তব্যাপী আলো নিয়ে মন্দিরের পাদদেশে একটি পরম স্বর্গীয় দৃশ্যের অবতারণা হলো। আমার মুগ্ধ স্তম্ভিত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাস্যে ইভান বললো, 'এরা আজ ব্যাপটাইসড হতে এসেছে। দেখছো না ক্যাথিড্রেলের ভিতরে পুরোহিতরা কেমন দাঁড়িয়ে আছেন শান্তভাবে? আমার তখন থেকেই মনে হচ্ছিলো সম্ভবত কোনো বিশেষ আয়োজন আছে।'

বালিকারা নিয়মিত লয়ে সারিবদ্ধভাবে উঠতে লাগলো সিঁড়ি বেয়ে। সাদা ঢেউ। পরিচালনাকারিণীরা নিয়ন্ত্রিত করছেন তাদের, পরনে সন্ন্যাসিনীদের পোশাক। চত্বরে উঠে আবক্ষ আনত হলেন, ক্রস কাটলেন, মন্দিরে ঢুকে প্রণত হয়ে মঞ্চের তলায় দাঁড়ালেন। পুরোহিতরা গ্রহণ করলেন তাঁদের, আয়োজনে-অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন।

কোথাও কোনো গোলমাল নেই চাঞ্চল্য নেই, বিশৃঙ্খলা নেই। উত্থান-পতন, ক্রিয়াকর্ম, মন্ত্রোচ্চারণ—সবই সুরে বাঁধা।

কিছুক্ষণ এই অনুষ্ঠান দেখে, সমস্ত দেবালয়টি প্রদক্ষিণ করে খৃষ্টান স্ত্রী-পুরুষ যেখানে পাদ্রীর কাছে তাদের অকপট স্বীকৃতির দ্বারা পাপস্খালন করে সেখানে এসে উপস্থিত হলাম। এই দেবালয়ের এটিও একটি দ্রষ্টব্যস্থল। এখন বোধ হয় কার্যকরী নয় ইভান তাই বলেছিলো। ঘরের শ্রীহীনতাও সেই সাক্ষীই দিচ্ছিলো। বড়ো একটা লম্বাচওড়া ঢাকা বারান্দার মতো জায়গা। টানা দেয়ালের গা ঘেঁষে খোপ খোপ কাটা। একটি খোপ পাদ্রীদের অবস্থানের জন্য, পাশের খোপে 'তাপিত তৃষিত চিত নাথ হে' বলে পাপিষ্ঠদের দণ্ডায়মান

একটি ছোট্টো গ্রানীটা, একটি ছোট্টো কুলুঙ্গীর মতো। পাতলা জাল লাগানো আছে। নিজের খোপে বসে পুরোহিত ঐ ফোকরটি দিয়ে অনুতপ্তের স্বীকৃতি শ্রবণ করেন। কিন্তু যে বলে তার মুখ দেখতে পান না।

পাপমোচনের কতো সহজ উপায়ই না বার করে ফেলেছে বুদ্ধিমান মানুষেরা। সারা বিশ্বময়ই এ সব বুদ্ধিতে এ সব মানুষ দারুণ দক্ষ। কেউ গঙ্গায় ডুব দিচ্ছে, কেউ ঈশ্বরের প্রতিভূ হিসেবে পুরোহিতদের কাছে বলে বুক হালকা করছে। দেখা যাচ্ছে অপরাধবোধের ভার বড়ো কম গুরু নয়। আপন কারাগারেই মানুষ আপনি বন্দী।

ক্যাথিড্রাল থেকে আর ভার্সাই প্রাসাদে যেতে বুদ্ধদেব রাজী হচ্ছিলেন না। বললেন, 'দূর, ও সব রাজবাড়ি দেখে মিছিমিছি সময় নষ্ট। আজ বোদলেয়ারের সমাধিতেই চলো। মন কতো অন্য রকম হয়ে যাবে।'

তা যাবো। কিন্তু রাজরানী রাজপুরী শুনলেও আমার মনে হাজার বছরের অতীত ভিড় করে আসে, ইতিহাসের গন্ধে আমি উতলা হয়ে উঠি। আমার কল্পনা আকাশে পাখা মেলে। বোদলেয়ার, ভের্লেন, মালার্মে, ক্লোদেল, র‍্যাবো, দেলাক্রোয়া, সেজান, মাতীস, রুসো মদিগলিয়ানী রদা—এইসব পুণ্যাত্মাদের নামের পাশে পাশে সেই সব দুরাচারী বিলাসী একাধারে মহৎ ও ক্লেদাক্ত, নির্দয় ও দয়ালু, দাতা ও কৃপণ, গুণগ্রাহী ও মূর্খ, ত্যাগী ও ভোগী রাজন্যবর্গও আমাকে কম আকর্ষণ করে না। চতুর্দশ লুইয়ের এই প্রাসাদটি দেখার ইচ্ছে আমার প্রবল ছিলো। কিন্তু বুদ্ধদেবের অনিচ্ছা প্রবল হওয়াতে নিরস্ত হতে হলো।

অপ্রত্যাশিতভাবে ইভান বলে উঠলো, 'চলো, চলো, ভার্সাইটা ঘুরেই আসি। কতোক্ষণ আর লাগবে। তারপর ওখানে গেলেই হবে।'

সর্বত্রই দেখেছি ভাষাটা গৌণ, ভঙ্গিটাই মুখ্য। ইভান ঠিক ধরতে পেরেছে আমাদের কথোপকথন। বললো, 'ভার্সাই শহরটির সমস্তটাই জুড়েই এই প্রাসাদ আর উদ্যান। দেখার অযোগ্য নয়, আর দেখলেই বুঝতে পারবে সত্যি সত্যিই কী একখানা কাণ্ড। স্থাপত্য হিসেবে যদি ধরো, সেটাও একটা কীর্তি। বিলাসিতার বাহুল্য কাকে বলে তারও একটি উৎকৃষ্ট নমুনা।'

অতএব গাড়ি ঘুরলো ভার্সাইয়ের দিকে। যথেষ্ট দূর। যথেষ্ট সময় লেগেছিলো। পথে ইভান আমাদের একটা গ্রামও দেখালো। যাকে বলে গন্ডগ্রাম। একটা ক্ষেতের ধার দিয়ে চলতে চলতে বললো, 'দ্যাখো।'

এই মাঠের মধ্যে দেখার কী আছে ভাবতে ভাবতে দৃশ্যটা চোখে পড়লো। বলদের দ্বারা নয়, মানুষে টানা হাল-লাঙল। মানুষ হাল-লাঙ্গল টানছে—এ দৃশ্য ফরাসী দেশের নিবিড় গ্রামেও আমরা কল্পনা করিনি। একটু চমকেই গিয়েছিলাম। অগ্নিবর্ণ কৃষক ঘর্মাক্ত মুখে টোনার মতো টুপি খুলে তাকালো আমাদের দিকে। হাসি ছুঁড়ে দিল। আবার মন দিল কাজে।

মৃদু হেসে ইভান বললো, 'এইবার একটু চা খাওয়া যাক, কী বলো?'

এই প্রান্তরে কোথায় সে চা খাওয়াবে কে জানে। আমরা চারদিকে দেখছিলাম। গাড়ি এসে একটি বাখারির বেড়া ঘেরা কাননের দরজায় থামলো। সেই কাননে কোনো দামী ফুল বা দামী লতা ছিলো না। তবু অনেকটা জমি ভর্তি বাজে ফুলের রঙিন ফোয়ারা। পেরিয়ে ছোট্টো একটি কুটির, সামনে দাওয়ার মতো প্রশস্ত বারান্দা। সেই বারান্দায় মস্ত মস্ত দুটি গাছের ছায়া। চার-পাঁচটি সমান বয়সী শিশু ফুলের বাগানের শ্রেষ্ঠ ফুলের চেহারা নিয়ে খেলা করছিলো। সব থামিয়ে হাঁ করে চেয়ে রইলো আমার দিকে। একটি শিশু পাখির গলায় কী যেন বললো আমাকে। ইভান দোভাষীর কাজ করে বুঝিয়ে দিল শিশুটি জিজ্ঞেস করছে, 'তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ?'

আমার গাঢ় রঙের সিল্কের লম্বা অচেনা পোশাক দেখছি সকলকে হতভম্ব করে।

দরজার সামনে এসে ইভান গৃহস্বামীর নাম ধরে ডাকলো, বোঝা গেল চেনে। স্বামী এবং স্ত্রী দুজনেই বেরিয়ে এলেন। স্ত্রীর কোলে আরো একটি শিশু। ইভানকে দেখে দারুণ খুশী। হেসে হেসে কী সব বলছিলো। আমাদের দিকে তাকিয়েও হাসতে লাগলো। মাথা নেড়ে বলতে লাগলো, খুব খুশী হয়েছে এইরকম অতিথি দেখে। এখানেও ইভান দোভাষী।

কোল থেকে বাচ্চা নামিয়ে ছুটে ছুটে মোটা গিন্নী মোটা বুনোটের মোড়া এনে দিল বসতে। কর্তাও মোটা, সে ভিতরের দিকে চলে গেল। দেখতে পেলাম মাটির উঠোন পেরিয়ে ও-পাশে রান্নাঘরে ঢুকলো। একটু পরেই ফিরে এলো আবার। ততোক্ষণে বাচ্চারা এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। দু বছর দেড় বছরের আড়াআড়ি ছটি বাচ্চা তাদের। ছটিরই পাথরের মতো স্বাস্থ্য। আর মা-বাবার তো কথাই নেই।

বাবা ফিরে আসতে মা গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলো। কিছুক্ষণের মধ্যে কালো কফি এসে গেল মগে করে, সঙ্গে ঘরে তৈরী বিস্কুট।

অতিথি পেয়ে কতো যে আদর করতে লাগলো। আমরাও সেই মাটির ঘরের মাটির দাওয়ায় বসে সেই আদরের সঙ্গে কালো কফি আর ঘরে তৈরী বিস্কুটের আস্বাদ গ্রহণ করতে করতে স্বর্গসুখ অনুভব করতে লাগলুম। গিন্নী আমার শাড়ী ছুঁয়ে দেখছিলো, জিজ্ঞেস করছিলো খোঁপার সব চুলই আমার নিজের অথবা নকল। আমি খোঁপা খুলে তার কৌতূহল নিবারণ করলাম। লম্বা চুলের বহর দেখে প্রায় সাপ দেখার মতোই গোল গোল চোখে আঁতকে উঠলো। (ক্রমশ)

# ’৮০ অলিম্পিকের আগে রুশ দেশ

চিরঞ্জীব

॥ ৮ ॥

আরমেন বললেন, সকালে দেখেছেন সোভিয়েটের খেলাধূলোর সেরা সংস্থাটি। বিকালে দেখুন ছোটদের একটি স্কুল। বিকালে ঠান্ডাটা আরও জেঁকে বসেছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাসেও নাকি জানানো হয়েছে সন্ধ্যার দিকে ঠান্ডা বেশী হবে। যত ঠান্ডাই হোক, ভয় কিসের। আমরা তো বাইরে বেরোচ্ছি না। দু-তিন মিনিটের জন্য যা বাইরে থাকি।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করছিলাম গাড়ির ভিতর হিটারের কাছে বসে। এবার জব্দ হলাম। স্কুলের গেটের কাছে গাড়ি যাবে না। দুটি রাস্তাই বরফে ঢেকে আছে। বরফের উপর দিয়ে যাওয়ার। চেষ্টা করলাম। কিন্তু উপায় নেই। যেখান দিয়েই যাই, চাকা ঢুকে যাচ্ছে নরম বরফের ভিতরে, গাড়ি এগোতে পারছে না। আমাদের মত অনেকেই তাই গাড়ি দূরে রেখে হাঁটছেন।

গাড়ি থেকে নামব কি নামব না ভাবছি। আরমেন বললেন, ওরা সবাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। সরকারী প্রোগ্রাম। না গেলে কি মনে করবেন! আমার সামনে অনেকগুলো মুখ ভেসে উঠল। 'সব কিছু ভাল করে দেখে এস'—বলেছিলেন সাগরময় ঘোষ। মতি নন্দী আর মুকুল দত্ত বলেন, আসার সময়, 'সুযোগ মানুষের জীবনে কমই আসে।' মনে পড়ছিল দিল্লিতে 'বান্দ' মন্ত্রকে অফিসারদের কথা, 'আপনি গোটা ভারতের প্রতিনিধি।'

নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। পুরো জুতোই বরফে ডুবে গেল। আরমেনের সুবিধা ছিল, ওঁর জুতো হাঁটু অবধি। অনেকটা গামবুটের মত। বরফে আমার জুতো ডুবে গেলেও মোজার ভিতরে বরফ ঢোকেনি। মিনিট পাঁচেক হেঁটে স্কুলে ঢুকলাম। ওয়েটিং হলে অনেকেই বসে। ওরা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করছেন। কেউ কারুর বাবা, কারুর মা। ক্লাস শেষে ছেলেমেয়ে নিয়ে যাবেন। আরমেনের কথাগুলোয় বেশী কান না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—টুপি, ওভার কোট কোথায় রাখতে হবে? হলের ডান দিকে যেতেই ওগুলি রাখার ঘরটি মিলল। ওখানে গিয়েই তাড়াতাড়ি জুতো খুললাম। যা আশংকা করেছিলাম। সোল ভেদ করে উঠেছে মোজা ভিজে গেছে তুষারে। ঠান্ডায় আঙুলগুলো অসাড়। আরমেন ইতস্তত না করে হিটারের সামনে নিয়ে বসালেন। কিন্তু মোজা, জুতো তাড়াতাড়ি শুকোবে কি? আঙুলগুলো গরম পেয়ে একটু সজীব হল।

'ঠান্ডা থেকে সাবধান।' কথাগুলো আবার মনে পড়ল। দীর্ঘকাল আগে কলকাতা থেকে এক সাহিত্যিক এখানে এসে হঠাৎ ঠান্ডা জল মুখে দিয়ে নাকি দাঁতগুলো খুইয়েছিলেন। আরমেন আমার হাবভাব লক্ষ করছেন। ডায়েরির পাতা খুলে কিছু লিখতে গিয়ে দুয়ারেই গেটের কয়েকটি কথা চোখে পড়ল, 'কান্ট্রি অন ইওর স্টাডি উইথআউট রেস্ট, উইথআউট হেস্ট।'

আমাদের উপস্থিতির খবরটা স্কুলের অধ্যক্ষ

অলিম্পিক প্রস্তুতি : ভল্টিং হর্স মহড়ার আগে কুমারী ইলিনা

জিমন্যাস্টিকস স্কুলে উঁচু নিচু বিমের উপরে মেয়েরা অনুশীলন করছে। কেউ কেউ কোচ আনা কিরেনকোর উপদেশ শুনছে
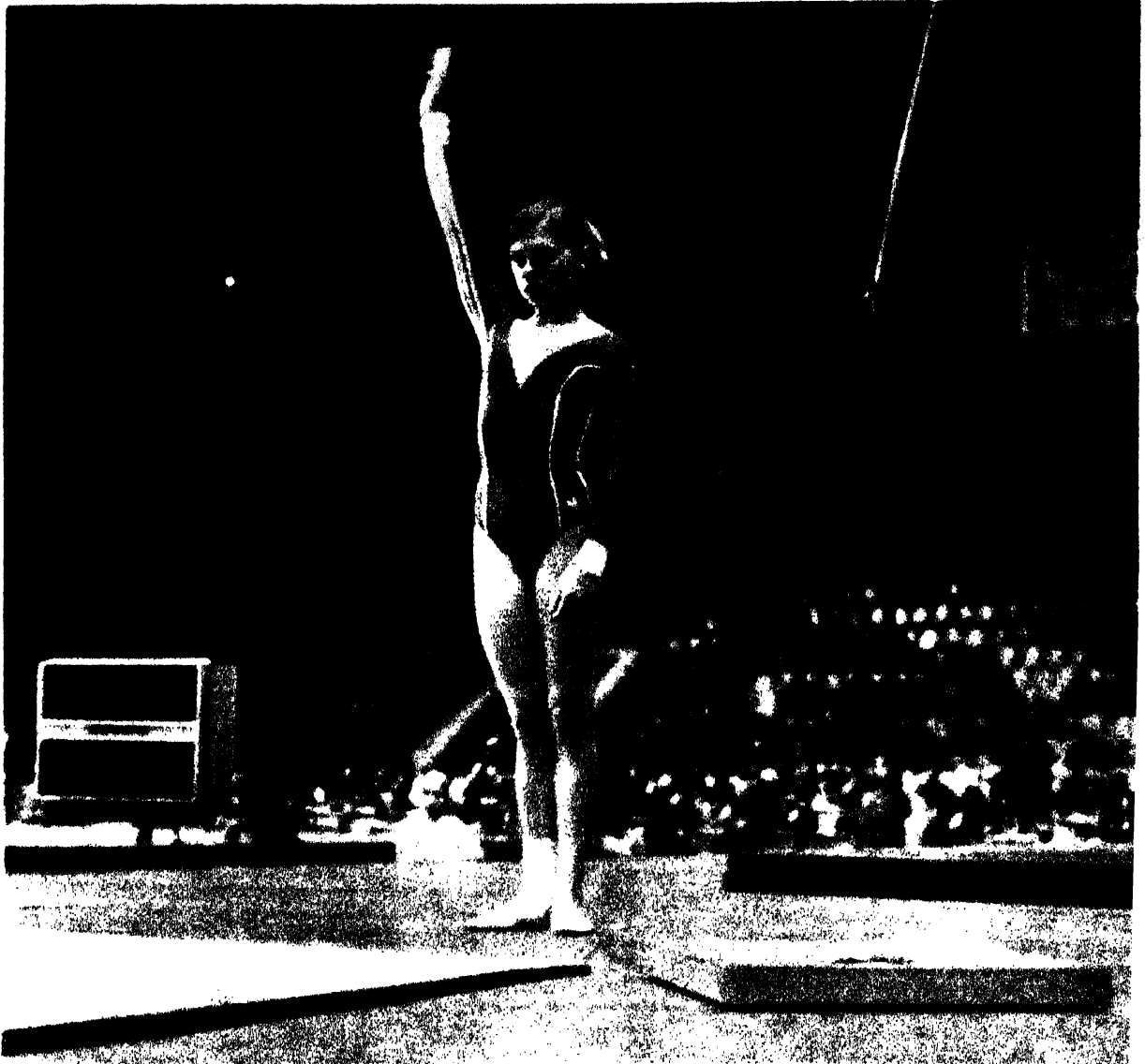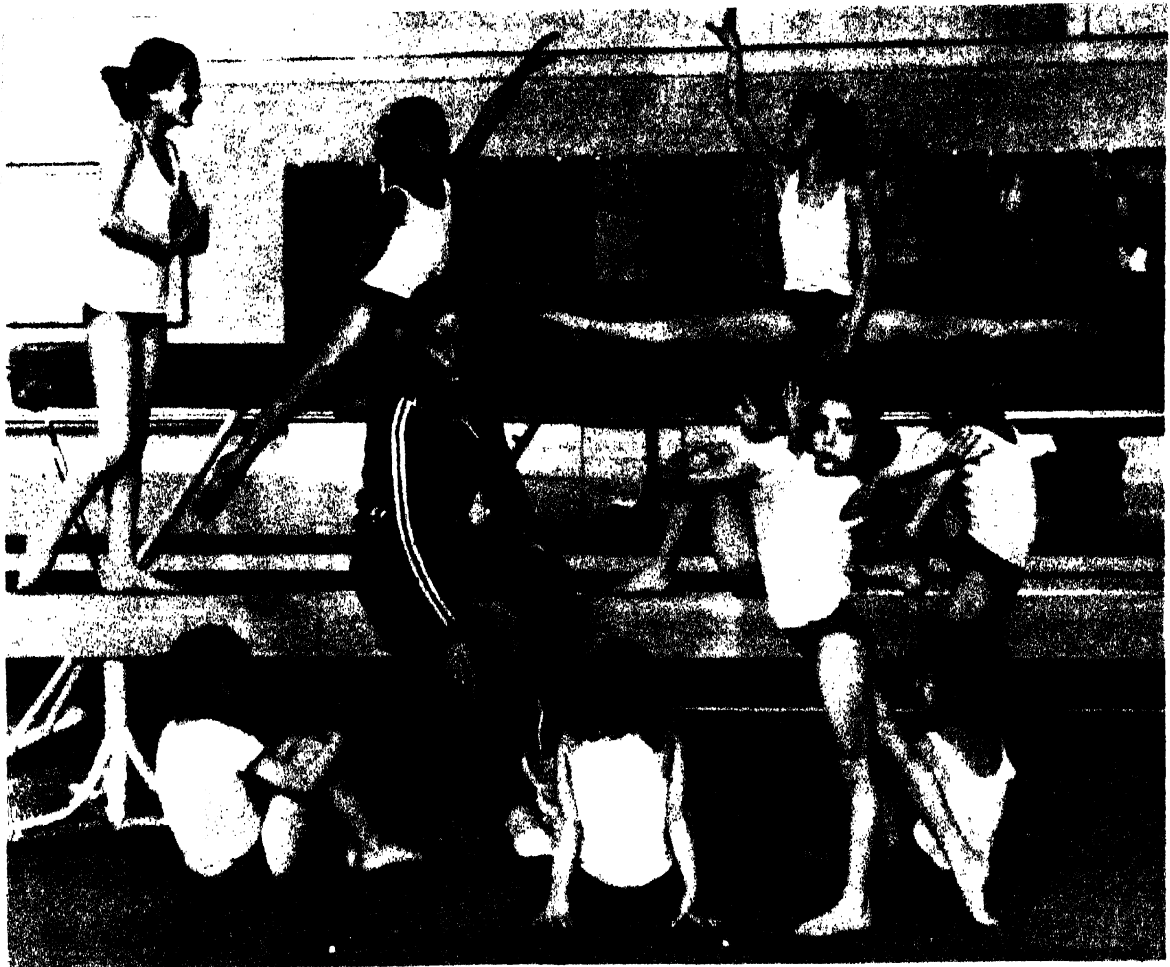
রানজকভ পেরেছেন আমার সঙ্গে সঙ্গেই। তাঁর ঘরে ঢুকেই না দেখে খোঁজ নিলেন—আমরা কি করছি। আমাকে জানালেন, ঢোকার অসুবিধাটা কোথায়। খালি পায়ে প্রবেশটা অশোভন। রানজকভ আমাকে কীভাবে সাহায্য করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। হিটারের সামনে জুতো, মোজা রেখে অবশেষে খালি পায়েই ঢুকলাম। এখানেও কাঠের ফ্লোর, তার উপর মোটা কার্পেট। সুতরাং ভেজা জুতো মোজার চাইতে খালি পায়ে অনেক আরাম। অধ্যক্ষের ঘরটি চমৎকার সাজানো। এ ঘরটিও অলিম্পিকময়। ছোট্ট আলমারিতে ডজন দুয়েক ছোট সাইজের ভাল্লুকছানা—মিশা। পাশেই টিভি। টেবিলে একধারে নানা কাগজপত্র, ফাইল। এসব রেখেছেন প্রয়োজনে আমাকে দেখাবার জন্য।

এটি স্পোর্টস স্কুল হলেও এখানে জিমন্যাস্টিকস ছাড়া অন্য কিছু শেখানো হয় না। এটিই মস্কোর প্রাচীনতম স্পোর্টস স্কুল। স্থাপিত ১৯৩৩এ। অধ্যক্ষ রানজকভ জিমন্যাস্টিকসে বিশেষজ্ঞ নিঃসন্দেহে। বয়স পঞ্চাশের মধ্যে। কথাবার্তায় মনে হল এই স্কুল ও এর ছেলেমেয়েরা ওঁর প্রাণ। বিশ্বের জিমন্যাস্টিকসের অ আ থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত তাঁর নখদর্পণে। মস্কো আসার কয়েক দিন আগে বিশ্ব জিমন্যাস্টিকস শেষ হয়। তাতে সোভিয়েটের ফল খুব ভাল হয়নি। আর রোমানিয়ার সেই কিশোর বালিকা নাদিয়া কোমানেচি আহত থাকা সত্ত্বেও চমৎকার ফল দেখায়। নাদিয়ার কথা তুলতেই বললেন, ওর তুলনা হয় না। জানালেন সে চিকিৎসার জন্য রাশিয়ায় এসেছিল। ওর হাতের তালুতে ফোড়া বড় ভোগাচ্ছে। বড় গলায় বললেন, 'নাদিয়ার কোচ কিন্তু আমাদের দেশেরই।'

ওই কথার মাঝে রানজকভ আমাদের জিমন্যাস্টিকস প্রসঙ্গে এলেন। নেতাজী স্টেডিয়ামে কেমন জিমন্যাস্টিকস হচ্ছে। ত্রিপুরা আর পঞ্জাব জিমন্যাস্টিকসে ভাল কেন? অন্য রাজ্যগুলির চাইতে ওখানে কি সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি? ইত্যাদি।

রানজকভকে গর্বিত মনে হচ্ছিল—তিনি এমন একটি খেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাকে বাদ দিয়ে আজকাল খেলাধুলোর কথা ভাবাই যায় না। বললাম। আমরাও ভাবছি সব খেলার আগে যাতে জিমন্যাস্টিকসে ছেলেমেয়েদের রপ্ত করা যায়। অধ্যক্ষ বললেন না শুধু জিমন্যাস্টিকস নয়। দরকার অ্যাথলেটিকসেরও। অ্যাথলেটিকস হল কিং অব স্পোর্টস, আর জিমন্যাস্টিকস কুইন অব স্পোর্টস। এই দুই খেলার দ্বারা যাদের শরীর তৈরী, তারা অন্য যে-কোনো খেলায় গেলে প্রথমেই সাফল্য পেয়ে যাবে।

বললেন, খেলাধুলোয় উন্নত যে-কোনো দেশে যান, দেখবেন সকলেই জিমন্যাস্টিকস আর অ্যাথলেটিকসে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন।

সাত বছর বয়সের যে-কোনো ছেলেমেয়ে এই স্কুলে ভর্তি হতে পারে। কারও মাইনে লাগে না। সাধারণ স্কুলে তো খেলার ব্যবস্থা আছে। সেখানে যারা ভাল ফল করে খেলায়, বা যাদের দেখে মনে হয় বিশেষ ট্রেনিং প্রয়োজন তাদেরই স্পোর্টস স্কুলে পাঠানো হয়। কিন্তু লেখাপড়া বাদ রেখে নয়। খেলার জন্য লেখাপড়ায় ঘাটতি দেখা দিলে ছুটি চলে যায় বাড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়ার দিকে বেশি নজর দেওয়া হয়। অর্থাৎ একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটি কিছুতেই নয়। জেনারেল স্কুল ছুটির পরে এই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা চলে আসে স্পোর্টস স্কুলে বিশেষ ট্রেনিং নিতে। নিয়মিত প্রতিদিন দুই থেকে চার ঘণ্টা এখানকার ক্লাস।

ক্লাসগুলি দেখার আগে অধ্যক্ষ জানালেন, আগে এই স্কুলে বিভিন্ন রকম খেলা শেখানো হত। ১৯৬৮ থেকে হচ্ছে শুধু জিমন্যাস্টিকস। সাত থেকে বারো বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য এই ধরনের স্পোর্টস স্কুল মস্কোতে ৫৯টি। তবে একই স্কুলে আগের মত নানা-রকম খেলা শেখানোর ব্যবস্থা নেই। বিভিন্ন খেলার পৃথক পৃথক স্কুল। এতে প্রশাসনিক সুবিধা যেমন আছে, তেমনি ওদের ট্রেনিং-এও অনেক সুবিধা হচ্ছে। তবে ছেলেমেয়েদের এমনই ভিড় যে ৫৪টি স্কুল প্রয়োজনের তুলনায় বেশ কম।

আমি ভাবছিলাম কলকাতার কথা। ক্রীড়া অনুশীলন কেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া পরিষদ যে চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন এন আই এস কোচ রেখে সেখানে আধ ডজন ছেলেমেয়েও যায় না। বেঙ্গল টেবল টেনিস সংস্থা ভারতে প্রথম টেবল টেনিস স্কুল করেন কয়েক বছর আগে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে। তারপর অভাবে সেটি বি টি টি এ বাধ্য হয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন।

আর এখানে? একদম বিপরীত চিত্র। আমরা দুই তিন সপ্তাহের কোচিং—যার কোনো মানেই হয় না। আর এখানে পাঁচ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ট্রেনিং নিয়ে এই

এডুকেশনের সেন্টারে, স্কুলে বা কলেজে। তবে তার জন্য ভাল ফল দেখাতে হয় এই খেলায় স্কুলে যেমন, তেমনি পড়ায় স্কুলেও। আলমারির ছোট মিনারগুলিকে দেখিয়ে অধ্যক্ষ বললেন, প্রতি সপ্তাহেই এই স্কুলে জিমন্যাস্টিকসের কম্পিটিশন হয় নিজেদের মধ্যে। প্রতি মাসে অন্য স্কুলের সঙ্গে একবার বা দু'বার হয় ইন্টার স্কুল কম্পিটিশন; এগুলি তার প্রাইজ।

অধ্যক্ষকে চঞ্চল মনে হচ্ছিল স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপারে চিন্তে। বারে বারে অনুরোধ করেছিলেন, চলুন জিমন্যাসিয়াম দেখে আসি। এর মাঝে মোজা শুরু করেছে. জুতোও অনেকটা। হলে প্রবেশের আগে দেখালেন ছেলেমেয়েদের পোশাক বদলের পৃথক পৃথক অসংখ্য ঘর। স্নানের জায়গা, টয়লেট ইত্যাদি। অপেক্ষমান মা, বাবাদের দেখিয়ে বললেন, এঁরা মাঝে মাঝেই অভিযোগ নিয়ে আসেন আমার কাছে—ছেলেমেয়েরা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে চায় না বলে। বলেন, 'আমরা অফিস কাছারি করে ক্লান্ত, কতক্ষণ অপেক্ষা করব। বাড়ির কাজও তো কিছু কিছু আছে।'

আসলে এমন পরিবেশে এলে কার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে? ছেলেদের পৃথক হলে ঢুকে দেখি আলোয় ঝলমল হল। জিমন্যাস্টিকসের কী সব সরঞ্জাম! সারা ভারত খুঁজলে কোথাও মিলবে না। আমাদের সবার উপরে যে পাতিয়ালা, সেখানকার জিমন্যাস্টিকসে সরঞ্জাম ইত্যাদি অপেক্ষা এই ছোটদের স্কুলটি অন্তত দশগুণ উন্নত পর্যায়ের। ভিতটা শক্ত হওয়া দরকার—একথায় এরা খুব বিশ্বাসী। আর সেই মত কাজ করছেন

যেমন স্বাস্থ্য এই ছেলেদের, তেমনি চোখ ধাঁধানো পোশাক। এক-একটি ইভেন্টের সরঞ্জাম হাফ ডজন করে। প্রতিটি ইভেন্টের জন্য চার-পাঁচ জন করে কোচ। প্রতিটি ইভেন্টে আবার একজন করে চিফ কোচ। প্রতিটি ছেলেই কী সিরিয়াস। অ্যাটেন্ডান্স রেজিস্টারে কাউকে অ্যাবসেন্ট পাওয়া যায় না। প্রতিটি ব্যায়াম নিখুঁত না হলে কেউ অনুশীলন ত্যাগ করে না। হরাইজন্টাল বার-এ কেউ কেউ উঠেছে? অন্যরা তখন প্যারালাল বার নিয়ে ব্যস্ত। সেখানে ভিড়? চলে গেল পমেলড হর্সে। তা না হলে হয়তো ফ্লোর এক্সারসাইজে। একদম উত্তর প্রান্তে যেন গালিচা বিছিয়ে দেওয়া। বিরাট জায়গা জুড়ে ফ্লোর এক্সারসাইজের ম্যাট। ওখানে পুরো দেয়াল জুড়ে আয়না। চমৎকার বাজনার সঙ্গে সঙ্গে ওরা ফ্লোর এক্সারসাইজ করছিল। মাঝে মাঝে ওই ইভেন্টের অনুশীলন বন্ধ থাকলেও চমৎকার সুর ভেসে বেড়াচ্ছিল সারা হলে। সেই সুরের সঙ্গে সব মিলিয়ে যেন একটা মোহময় পরিবেশ।

মনে হল অধ্যক্ষের দুর্বলতা আছে পাশের হলে—যেখানে মেয়েরা অনুশীলন করছে। উনি গর্ব করে বললেন, প্রেসিডেন্ট নিক্সনের স্ত্রী এখানেও এসেছিলেন। এসেছিলেন জর্ডানের রাজাও। অধ্যক্ষের দুর্বলতার কারণও অনেক। মেয়েদের এই হলে তখন ফ্লোরের নানা রকম ভঙ্গিমা শেখাচ্ছিলেন মহিলা কোচ। আর একজন পিয়ানো বাজাচ্ছেন। ছেলেদের দেখে এতক্ষণ মুগ্ধ ছিলাম। এবার ডবল মুগ্ধ মেয়েদের দেখে। এদেরও বয়স সাত থেকে এগারো। মেয়ে নয় এরা। বরং

আছে মনে হল না। মানুষের দেহ এত নমনীয় হতে পারে?

এখানেও একই রকম বন্দোবস্ত। একই ইভেন্টে একাধিক সরঞ্জাম। ফ্লোর এক্সারসাইজে এই স্কুলের মেয়েদের এমন নিয়ম; তা হলে ন্যাশনাল চাম্পিয়ন বা অলিম্পিক স্বর্ণ-বিজয়িনী কিংবা বিশ্ব চাম্পিয়নরা কেমন! আহ্! যদি শক্তি থাকত, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের জন্য তুলে নিতাম। তুলে নিতাম টেপে পিয়ানোর সাউন্ডও।

বছর আটেকের একটি মেয়ে ভল্টিং হর্সে অনুশীলন করছিল। সাদা পোশাক। স্টার্টিং পয়েন্টে গিয়ে কনসেনট্রেট করে দৌড় শুরু করছে। কি সিরিয়াস। আট বছর বয়সেই এই রকম? ও এবার জাতীয় চাম্পিয়ন ওর বয়সের গ্রুপে। বুঝলাম, নাদিয়ার মত ১৪ বছরে এও যদি থরহরি আনে বিশ্ব বা অলিম্পিক জিমন্যাস্টিকসে অবাক হবার কি আছে। সারা সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘুরলে এমন খুদে নাদিয়া শয়ে শয়ে মিলবে। শুনলাম ভল্টিং হর্সের একটি কৌশল নিখুঁত হচ্ছে না তাই বারে বারে সে ওটি চেষ্টা করছে। নিখুঁত করল আমাদের উপস্থিতিতেই। তখন ওই-ই বুঝতে পেরেছিল। ২৭তম বারে নিখুঁত হলে কোচ ওর পিঠ চাপড়ে দিলেন। অধ্যক্ষ ওকে ডাকতেই সে আমাদের কাছে এল। ওর জিমন্যাস্টিকসের জুতোয় হাত দিয়ে দেখছিলাম। দেখছিলাম কিসের তৈরী। বড়দের বোধ হয় ছোটদের পায়ে হাত দেওয়া গর্হিত ব্যাপার। ফুটফুটে মেয়েটি পা সরিয়ে নিল। যেন ও-ই খুব অন্যায় কর

ছেলেদের হলে জিমন্যাস্টিকের বিভিন্ন উন্নতর সরঞ্জাম—রিং, প্যারালাল বার, পমেল্ড হর্স। শেষ প্রান্তে ফ্লোর এক্সারসাইজের জায়গা

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন লারিসা, আনাতোলি কারপভ
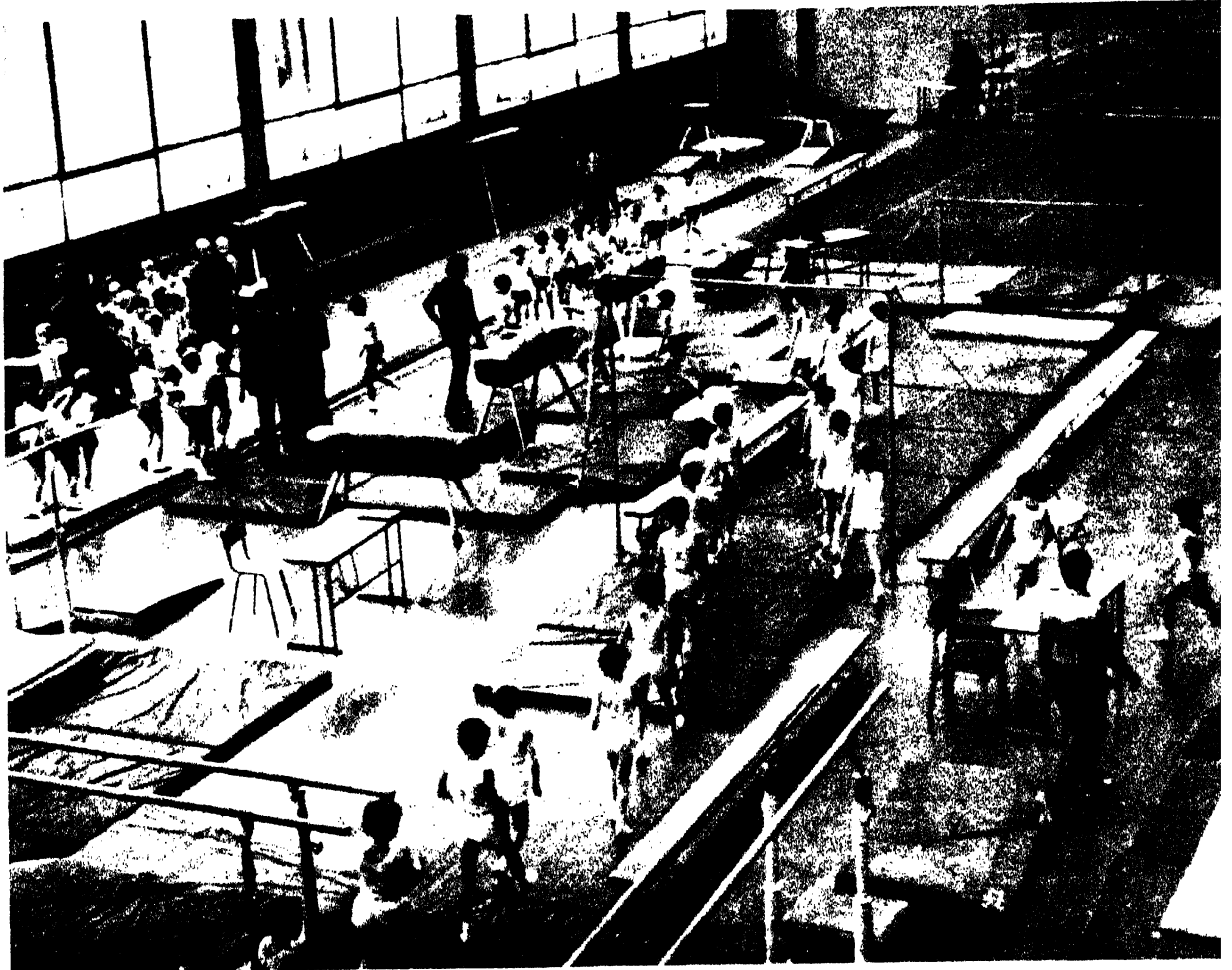
ফেলেছে। অধ্যক্ষ ওকে বোঝালেন, আমি কেন হাত দিতে চাই। তারপর ও কাছে এল অত্যন্ত সংকোচ নিয়ে। অধ্যক্ষকে বললাম, ওকে একটা সুভেনির দিতে চাই। দিলাম আমাদের কয়েকটি মুদ্রা। সে তো কিছুতেই নেবে না। অধ্যক্ষ বললে, সে হাত বাড়াল, 'পাসিবা' বলে ছুটে গেল বন্ধুদের কাছে দেখাতে। অন্য মেয়েরা তখন আমার দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু কিছু চেয়ে নেওয়া ওদের ভদ্রতার বাইরে। নিজেকে ছোট মনে হচ্ছিল—ওদের সকলকে কিছু দিতে পারলাম না।

মেয়েদের হলে আটটি বিম বিভিন্ন উচ্চতায়। কেন? বুঝলাম একটু পরে। বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন উচ্চতা। মেয়েরা পৃথক পৃথক বিমে অনুশীলন করছে। আন ইভন বারও বিভিন্ন উচ্চতা। জিমন্যাস্টিকসে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নানা ইভেন্টে। তাই বিভিন্ন ইভেন্ট করতে গেলে বেশ সাহস চাই। দক্ষিণ প্রান্তে দেখি দুটি ফোমের ছোট পুকুর। টুকরো টুকরো ফোমে পুকুর দুটি ভর্তি করা। কোচরা একদম নবিশ মেয়েদের হাতে তুলে ওখানে ছুঁড়ে ফেলছেন। ওরা ফোমের উপর পড়ে স্প্রিং-এর মত লাফিয়ে উঠছে। ছেলেদের ওখানে বিভিন্ন উচ্চতার হরাইজন্টাল বার ও প্যারালাল বার দেখেছি, মেয়েদের এখানে দেখছি তেমনি বিভিন্ন মাপের আন ইভেন বার। মেয়েদের এখানে চারটি স্ট্যান্ডার্ড আর চারটি নিচু বিম। আন ইভন বার চারটি। দুটি হর্স।

এই জিমন্যাস্টিকস স্কুলে মোট ছাত্রছাত্রী ৪৩০। দেয়াল ঘেঁষে ছোট একফালি বিশ্রামের জায়গা ওদের। আমরা যেতেই এই পুতুলগুলি উঠে দাঁড়াল। ইতস্তত করছে—কোথায় আমাদের বসতে দেবে। সবচেয়ে অস্বস্তি বোধ করছিলেন ওখানকার কোচরা। অধ্যক্ষ

মস্কোর ইয়ং পাইওনিয়ার স্কুলে ছোটদের দাবা স্কুলে চলে নিত্য অনুশীলন
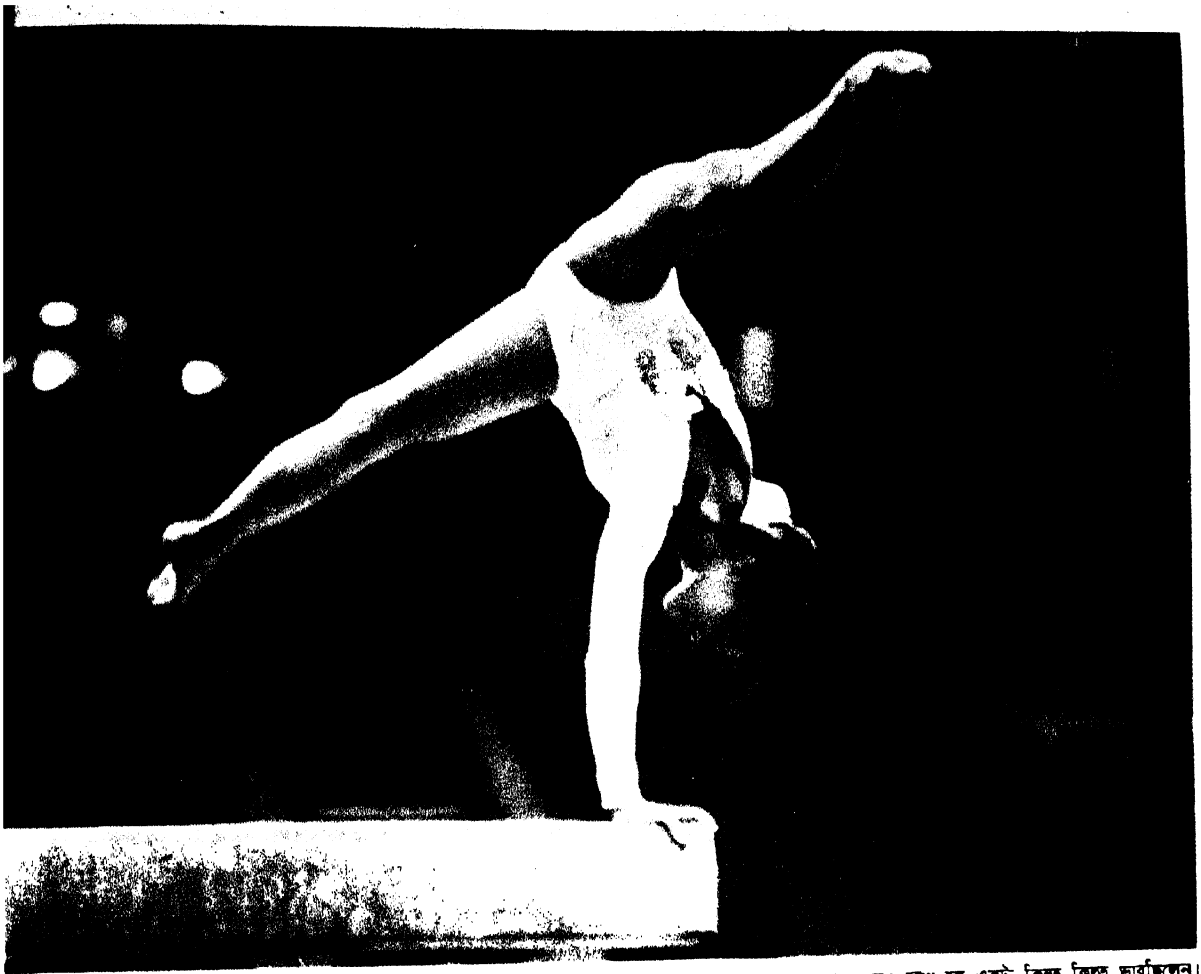
লেনিন স্টেডিয়ামের জিমন্যাস্টিকস হলে বিম ব্যালান্স দেখাচ্ছেন নাতালিয়া আপোশনিকোভা

ক্যালিস্থেনিক্সে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইরিনা দেরুগিনা

মানুজকতও বোধ হয় একটু কিন্তু কিন্তু ভাবছিলেন। আরমেন ও আমি ছোট জায়গাটুকুতে বসলাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অধ্যক্ষ বোঝাতে লাগলেন সব। বললেন, স্কুল, জাতীয় স্কুল, এজ গ্রুপ ও ওদের বয়সী জাতীয় প্রতিযোগিতায় আমার স্কুলের অনেকেই অংশ নিচ্ছে। এখন ডিসেম্বর, এদের কয়েক জনের যা পারফরম্যান্স তাতে মনে হয় সিনিয়র জাতীয় দলে মস্কো ওলিম্পিকসে। ট্রায়ালের জন্য আসতে পারে। হয়তো নির্বাচিত হবে দু-একজন। কিন্তু আমার লক্ষ্য ১৯৮৪। সারা দেশের নানা স্কুলে অসংখ্য জিমনাস্ট রয়েছে। কম্পিটিশন ভীষণ। তবুও আমার বিশ্বাস ১৯৮৪-র আগে এই স্কুলের আধ ডজন ছেলেমেয়ে থাকবে সিনিয়র জাতীয় দলে।

কথা ছিল আধ ঘণ্টা + আধ ঘণ্টা = এক ঘণ্টা থাকব। কিন্তু চার ঘণ্টা কেটে গেল। 'প্রতিযোগিতা নয়, অনুশীলনে এতক্ষণ কাটালে চলবে কেমনে।' আরমেনের কথার জবাব দেব কিনা ভাবছিলাম। অধ্যক্ষ মশাই চাই ছলেন—আমি আরও থাকি, আরও দেখি, আরও জেনে নিই। তা ছাড়া শুরুতেই ওঁকে বলেছিলাম বিনা দ্বিধায়, 'আমরা খেলাধুলায় পিছিয়ে, আমাকে জানান, কোথায় যাতে এগিয়ে যেতে পারি, যেন কলকাতায় ফিরে। খেলোয়াড় ভাইবোনদের বলতে পারি, বোঝাতে পারি সোভিয়েটের ছেলেমেয়েরা এগিয়ে কেন, যেন আমাদের ক্রীড়া কর্তাদের জানাতে পারি। সোভিয়েটের এগিয়ে যাওয়ার ম্যাজিকটা কোথায়। আরমেনের কথার জবাবটা দিলাম অধ্যক্ষকে। এক ঘণ্টার জায়গায় আপনি চার ঘণ্টা সময় দিলেন। যদি চারদিন শুধু এই জিমন্যাস্টিকস স্কুলে থাকার অনুমতি দেন, আমি থেকে যাবো। বড় ইচ্ছে ছিল এই

**পমেল্ড হর্স-এ এই সময়ে পা ঠিক এরাজি রাখতে হয়—বোঝাচ্ছেন কোচ**

পড়ুল ছেলেমেয়েদের সারা দিনটা স্টাডি করার ওদে। সকালে ঘুম ভাঙা থেকে রাতে শুতে যাওয়া অবধি জানার ইচ্ছে ছিল। জানতে চাই ওদের বাবা মাদের, জানতে চাই জেনারেল স্কুলে ওদের লেখা-পড়ার ধরনটা। জানতে চাই ওদের মানসিকতা, ওরা কি খায় ইত্যাদি সব। জানতে চাই আপনাকে, আপনার পুরুষ ও মেয়ে কোচদেরও।

আ যেন সব কথা রুশ ভাষায় অধ্যক্ষকে বুঝিয়ে বলা পর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি তা হলে খেলাধুলার রানীর (জিমন্যাস্টিকস) প্রেমে পড়ে গেছেন।'

স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নই—এমন একটি স্কুল পেলে আমাদের হুগলি, ২৪ পরগনা, ওয়েলিংটন, চেতলা বা পাঞ্জাব ত্রিপুরার জিমন্যাস্ট ছেলেমেয়েরাও খাওয়া ঘুম ভুলে যাবে।

স্বপ্নে দেখা জিমন্যাস্টিকস বা স্পোর্টস স্কুলও বোধ হয় এমন হয় না। জিমন্যাসিয়াম হলের বাইরে ওয়েটিং হলে তখন ভিড় বেড়েছে বাবা মা-দের। প্রত্যেকে অপেক্ষা করছেন ছেলেমেয়ের জন্য। কারুর কারুর ছুটি হয়েছে। জিমন্যাস্টিকসের পোশাক বদল করে দ্রুত সাধারণ পোশাক পরছে নিজেরাই। কারুর সাহায্য দরকার নেই। কিটব্যাগে সব গুছিয়ে রাখছে। সংগে আরও একটি ব্যাগ। তাতে স্কুলের বই খাতা। ওই নিয়ে কেউ ছুটে মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, কেউ বা বাবার আদর নিচ্ছে। ওরা কেউ দিচ্ছেন আইসক্রিম, কেউবা চকোলেট। খাওয়া শেষে কোচকে অভিবাদন জানিয়ে বাড়ি যাচ্ছে। আমাদের স্কুল ছুটি হলে যেমন হইচই, ধুন্দুমার বাধে তেমন নয়। সবই হচ্ছে নিয়মকে, সব কিছুর মধ্যে একটা ডিসিপ্লিন, অথচ প্রাণের স্পর্শ সর্বত্র। সব কিছুর মধ্যে অদ্ভুত নিষ্ঠা, অদ্ভুত ভালোবাসা। স্কুলের পড়া শেষে খেলার স্কুলে আসতে হবে, পরম আগ্রহে অনুশীলন করতে হবে, আবার বাড়ি যেতে হবে। কোনো কিছুর মধ্যে ফাঁকি নেই। বড়রাও কখনও বলেন না—এটা রেখে সেটা করো। একটা জাতিকে বড় হতে গেলে, একটি জাতিকে উঠতে হলে ছোটবেলা থেকেই এরকম বোধ হয় ট্রেনিং দরকার। সোভিয়েটের প্রতিটি মানুষই সম্ভবত এমনিভাবে ট্রেনিং পেয়েছিলেন তাদের বাল্যে ও কৈশোরে।

স্কুলে রেওয়াজ আছে ভি আই পি-রা ভিজিট করতে এলে ভিজিটার্স খাতায় মন্তব্য লিখতে হয়। আমি তো অমন কেউ নই। বললাম, যা লেখার বা বলার দেশে ফিরে লিখব: লিখব আমাদের ছোটদের পত্রিকা আনন্দমেলায়। এখানে আসার আগে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও বলেছিলেন, আনন্দমেলার জন্যে কিছু মেটেরিয়ালস আনিস।

অধ্যক্ষ নাছোড়বান্দা। লিখতেই হবে খাতায় কিছু। বাংলাতেই লিখলাম কয়েকটি লাইন। তা ইংরাজিতে বোঝালাম আরমেনকে। প্রথম তিনটি শব্দ 'আমার স্বপ্ন সার্থক।' অধ্যক্ষ শুনে বললেন, পরে কখনও সোভিয়েটে এলে অবশ্যই এখানে আসবেন। উনি একগাদা ছবি দিলেন ওঁর স্কুলের। সবগুলিই স্কুলের ছেলেমেয়েদের ট্রেনিং-এর। বললেন, এগুলি আমাদের দীর্ঘকালের বন্ধু ভারতের ছোট ভাই-বোনদের জন্য। ছবি দেখে ওরা প্রেরণা পেলে, উপকৃত হলে—আমরা খুশি হবো।

দেওয়ার মত তেমন কিছুই ছিল না আমার কাছে। কিছু মুদ্রা দিলাম স্যুভেনির হিসাবে বললাম, স্কুল লাইব্রেরির মিউজিয়ামে রেখে দেবেন।

আর দেরী করার উপায় নেই। বাড়েই রওনা হতে হবে লেনিনগ্রাডের দিকে। অধ্যক্ষ স্কুলের প্রধান কটক পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন।

বাইরে তখন অন্ধকার [illegible]। বৃষ্টির মত তুষার পড়ছে। স্কুলে ঢোকার সময় দেখেছিলাম অনেক জায়গা বরফহীন। কিন্তু এই চার ঘন্টায় যেন কে ব কারা সাদা পেঁজা তুলো দিয়ে সব ঢেকে দিয়ে গেছেন। গাঁয়ে যেমন ধান ক্ষেতে। মধ্যে সরু আ থাকে, এখানেও বরফের মধ্যে কোনোক্রমে দুটি প ফেলার মত সরু রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে অতি সন্তর্পণে হাঁটতে লাগলাম। গাড়ির হদিশ মিলল কে কিছুক্ষণ হাঁটার পরে। বরফে ফেঁসেও যেতে পারে আশঙ্কায় ড্রাইভার একটু পরিষ্কার জায়গায় নিয়ে গেছলেন।

ঠান্ডায় আমি একটু তেই কাবু হয়ে পড়েছিলাম কিন্তু ওই ছেলেমেয়েরা দেখি দ্রুত হেঁটে চলেছে দূরে ট্রাম বা বাস রাস্তার দিকে, কিংবা মেট্রো ধরতে ওদের মধ্যে একটুও ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই আসলে জন্ম থেকেই ওরা এইভাবে তৈরী। মনে হচ্ছিল লড়াই করে বাঁচতে হবে কথা কটি এদেশের মানুষেরই বলা মানায়, আমাদের দেশের মানুষের জন্য হয়তো নয়।

(ক্রমশ

## ছবি আঁকে, ছিঁড়ে ফ্যালে

**শক্তি চট্টোপাধ্যায়**

বহুবার হারিয়েছে ব'লে আজ কেউ
লোকটিকে খোঁজে না আর, সুতো ছাড়তে থাকে।
যতো দূর যেতে চায়, যাক, বেঁচে থাক।
অমৃত্যু মাথার 'পরে মুকুট দিয়েছে—
অনেকেই চেনে তাকে, অনেকে চেনে না।
বোঝে কিছু, বোঝে মিছু কোনো কোনো লোক,
কিছুই লাগে-না-ভালো এমন অসুখে
লোকটি উজ্জ্বল আজ, বেঁচে-বর্তে আছে
কোনো মতে। বেঁচে থাক, দুঃখী হয়ে থাক।
কিন্তু, কী যে দুঃখ তার নিজেই জানে না,
লোকটি কবি, ছবি আঁকে, ছিঁড়ে ফেলে দেয়!

## কাছেদূরে

**বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত**

খুব দূরে নয়,
একটি গাছতলায় ছায়া প'ড়ে আছে।
খুব কাছেও নয়,
একেকটি মানুষের রোদ-মাথায় অমন হাঁটাচলা
আর হা-পিত্যেশ করা
আর নিজ-নিজ দূরত্বে গলদঘর্ম-হওয়া।

কী এসে যায় বললে—
মানুষ-নামক একটি বিন্দু ফুটে ওঠে মাঠে ;
যে-মাঠ একটি নিশ্বাস শুধু ;
দীর্ঘ, আর সবকিছু থেকেই অনেক দূরে।

কাছের বলতে—এই চারদিকের ঘুম ভাঙা বড়ো,
অনেক বড়ো।
তার প্রকাণ্ড হাত-পা আর নখের সম্মুখে
যে-নৈবেদ্য,
যে তার খোড়োচালসমেত
নিখিলে—
পাঠায় ধোঁয়াটে গন্ধ।
জ্বলতে থাকে চোখ আর চোখের ভিতরকার
পুরনো চিহ্নগুলি।

কাছেদূরে
ওই চিহ্নের সুতোয়,
হাই-তোলা শেষ ক'রে, এই সবে—
মানুষ হয়েছে মানুষের মুখোমুখি।
এখন কার কতো শতধার দুঃখ
পাথর হয়ে গলবে,
তার বড়ো গলায় বলুক মাইক্রোফোন।
আর বলুক সেই গাছতলাটি,
যেখানে মানুষ নেই, আছে শুধু ছায়া।

## মোহচোহ

**প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়**

নতুন দুঃখকে পুরনো ছন্দে ধরতে যাওয়াটাই যে ভুল
সেটা টের পেলাম যখন
ততক্ষণে সেটা দু-নম্বর ভুল।

এক নম্বর ছিল, দুঃখ পাওয়াতেই।

দুঃখ পাওয়াটাও কিছুটা পুরনো অভ্যাস।
অনেকটা সাবেকী ছন্দে ফিরে যাবার মতোই
অসতর্ক, মোহময় একটা ব্যাপার।

অথচ এমনই বয়েস যে, অসতর্ক হলে চলে না।
প্রশ্নই ওঠে না, মোহকে প্রশ্রয় দেবার।
পারলে বরং পাশে একটা 'চোহ' লাগিয়ে
আরও সপ্রতিভ সাজার চেষ্টা করা উচিত।

হাতে নেওয়া উচিত একটা লাঠি,
বেশ কয়েকবার সজোরে সেটাকে মাটিতে ঠুকে,
হারমোনিয়াম বেলো করার কায়দায়
হাত নাড়তে-নাড়তে বলা উচিত—

ও-সব দুঃখটুঃখ আমার আসেটাসে না হে,
মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কেটম্পর্কে
ভালোবাসাটালোবাসায়
বিশ্বাসটিশ্বাস নেই আমার

দেখা উচিত
কাঁধের অলীক পুচ্ছটাই যেন ছাড়িয়ে পড়ে তখন
যেন বেরিয়ে না পড়ে
ভেতরের চেহারাটা।

## বিচ্ছেদ

**আলোক সরকার**

সন্ধে হবার ঠিক আগে আবার দেখতে পেলুম
এক দৌড়ে পালিয়ে গেল
সবুজ একটা বিদ্যুৎ—হাঁক দিয়ে বললুম
গল্প করবে না? বসবে না এসে পাশাপাশি?

একদিন খুব গল্প হতো। ঠিক কবে মনেই পড়ে না
একটা ঝর্না ছিল, হিজলগাছ।
অনেক অনেক দিন আগে। এখন দেখা হলেই পালিয়ে যায়।
আমি কিছুই বুঝতে পারি না! তার সঙ্গে ঝগড়া হলো কখন?

আমার আর তেমন কান্না আসে না। ভাব ক'রে নিতেই তো চেয়েছিলুম।
কত স্পষ্ট সব মনে পড়ে
ঘুম থেকে জেগে উঠছে আঁধার এদিক ওদিক কথা বলছে জোনাকি।
চিকচিক করছে রুপোলী জল পাতা নৌকোর মতো ভাসছে।

আসলে গল্প ফুরিয়ে গেছে আমার নাকি তার গল্পই ফুরিয়ে গেছে সব!
গল্প ফুরিয়ে গেলেই তো একা একা।
সে কি ভুলে গেছে গজমোতির মালা? আর আমার মনেই পড়ে না
বাঁশবনের ভিতর দিকের অন্ধকার। একা মানুষকে কে আর ভালোবাসবে!

এইবার হাইজাম্প,
পোল ভল্ট
আর বর্শা ছোঁড়া.....
OFFICIAL

এবারে
ব্রড
জাম্প।
হিস্‌স্
হিস্‌স্
হিস্‌স্

অরণ্যের অলিম্পিক.....
অরণ্যদেব বলেছেন,
হারানো রত্ন তিনি উদ্ধার
করে দেবেন। খেলা চালিয়ে
যাও!
নিশ্চয়..!

সাপে-ভর্তি চৌবাচ্চার উপর দিয়ে লাফ.....
বাপ্‌স...!
হিস্‌স্

জুম্বার পায়ের ছাপ।
সে কি ওদের
পিছু নিয়েছিল.....?
7/15

হাতিটা ছুটে আসছে!
তাড়াতাড়ি গাড়ি চালাও!
পাথুরে পথে
আর কত
তাড়াতাড়ি চালাব?

গুলি
করব?
না! জুম্বা, এগোস
না!

?

# মানবজমিন

## শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

(উনপঞ্চাশ)
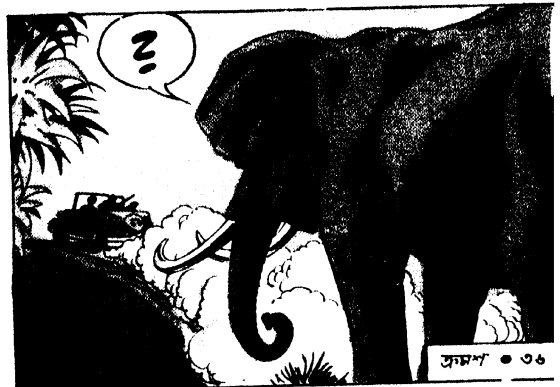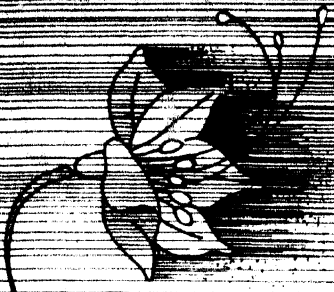
ঝোপড়ার দরজায় দীপনাথ উঁকি দিতেই মণিদীপা মুখ তুলে চাইল। একটু হেসে ইঙ্গিতে নিতাইকে দেখিয়ে বলল, হি ইজ এ কমপ্লিট ফ্রড।

সো অ্যাম আই অ্যান্ড সো ইউ অল আর। এখন চলুন তো, বউদি আপনাকে ভীষণ খুঁজছেন। দীপনাথ কথা বলতে বলতেই ঝোপড়ার ভেতরকার চিমসে কটু বদখত একটা গন্ধ পেয়ে নাক কুঁচকে বলে, এই বিকট গন্ধের মধ্যে বসে আছেন কি করে?

মণিদীপা উঠে আসছিল। বাইরে এসে মিষ্টি হেসে বলল, আমি এক সময়ে কলকাতায় বস্তিতে বস্তিতে সোশ্যাল ওয়ার্ক করেছি। নোংরা, বদগন্ধ, আব্রুর অভাব, পভার্টি যদি সহ্য করতে পারেন তবে দেখবেন লোকগুলো খারাপ নয়। দে আর অল লাইক ইউ অ্যান্ড মি।

অভিজ্ঞতাবলে দীপনাথ জানে, কথাটা সত্যি নয়। তবে সে তর্কে না গিয়ে বলল, আপনি অনেক কিছু পারেন দেখছি। আমি খ্যাপা নিতাইয়ের ঝোপড়ায় এর আগেও বার কয়েক হানা দিয়েছি। ভিতরে ঢুকতেই গা ঘিনঘিন করেছে।

মণিদীপা দীপনাথের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলে, বেচারার একটা বউ ছিল, আপনি জানেন?

কে না জানে? বউ পালানোতেই তো নিতাই পাগল হল।

হাসছেন? লোকটা যে বউকে অতটা ভালবাসত তার জন্য কষ্ট হয় না আপনার?

হয়। আই অ্যাম অলওয়েজ উইথ দা হাজব্যান্ডস।

জানি। ব্যাখ্যা করতে হবে না।

এতক্ষণ পালিয়ে পালিয়ে আর কি কি করলেন?

ঐ যাঃ! বলে থমকে দাঁড়ায় মণিদীপা। আমার টেপ রেকর্ডারটা পড়ে আছে জঙ্গলের মধ্যে।

কী সর্বনাশ! টেপ রেকর্ডারও সঙ্গে এনেছেন নাকি?

আনবো না তো কি? কলকাতায় বসে মৌমাছির শব্দ শুনব বলে...দাঁড়ান দেখে আসি—

বলে মণিদীপা কুঞ্জবনের দিকে প্রায় দৌড়তে থাকে। পিছনে দীপনাথ।

ঘাস জঙ্গলের ওপর ক্যাসেট শেষ হওয়া টেপরেকর্ডারটা পড়েই ছিল। স্পিকারের ওপর পাখি নোংরা ফেলে গেছে। মণিদীপা রি-উইনড করে একটু শুনল শব্দটা। মুখ গোমড়া করে বলল, একদম ভাল সাউন্ড আসেনি।

দীপনাথ হেসে বলে, টেপ রেকর্ডারটা যে চুরি হয়নি সেটাই ভাগ্য বলে জানবেন।

আপনার সঙ্গে আমার তফাৎ কোথায় জানেন?

কোথায়?

বেশী জরুরী হল মৌমাছির শব্দ, পাখির ডাক। আপনার কাছে তার চেয়ে ঢের বেশী দামী জিনিস এই যন্ত্রটা। আপনি এত অ্যান্টি রোমান্টিক কেন বলুন তো!

তার মানে আমি আপনার চেয়ে অনেক বেশী বাস্তববাদী।

আমি যে বাস্তববাদীদেরই সবসময়ে পছন্দ করি তা কিন্তু নয়।

তা জানি। সেই জন্যই বোধহয় আপনি আমাকে কোনদিনই পছন্দ করেননি।

মণিদীপা মৃদু একটু হাসল। তারপর বলল, আপনি বাস্তববাদী একথা কিন্তু আমি স্বীকার করিনি। আপনি রোমান্টিকও নন তা বলে।

তাহলে আমি কি?

আপনি ভীষণ হাঁদারাম।

দীপনাথ হাসল বটে, কিন্তু এই খুকি চেহারার এঁচোড়ে পাকা মেয়েটাকে একটা গাট্টা মারবার জন্য তার হাত একটু নিসপিসও করছিল। ঘাসজঙ্গলে মিষ্টি ছায়ায় দুজন মুখোমুখি হাঁটু গেড়ে বসে। মুখ নীচু করে মণিদীপা ক্যাসেটটা যন্ত্র থেকে খুলে আনল। নিজের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে আর একটা নতুন দামী ক্যাসেট বের করে ভরল টেপ রেকর্ডারে।

আবার টেপ করবেন নাকি?

আগেরটা যে ভাল হল না। এই ক্যাসেটটা দিয়ে দেখি। যন্ত্রটা গাছের ডালে বসালে বোধহয় ভাল হয়, তাই না? ঐ নীচু মৌচাকটার কাছাকাছি টেপ রেকর্ডারটাকে একটু সেট করে দেবেন?

আমাকে গাছে উঠতে বলছেন?

গাছে ওঠেননি কোনদিন?

বিস্তর। তবে সে ছেলেবেলায়। এই বুড়োবয়সে পড়ে গিয়ে মাজা ভাঙলে আপনি দায়ী।

আপনি হাঁদারাম হলেও পড়ে যাওয়ার লোক নন। ক্যারিয়ারের গাছটিতে তো দিব্যি তরতরিয়ে উঠে যাচ্ছেন। আর এ তো সামান্য গাছ।

মুখ শুকনো করে দীপনাথ বলে, দুনিয়ার যত খারাপ কি কেবল আমি?

আপনি ভীষণ খারাপ। এখন জুতো খুলুন তো। নীচু গাছ, উঠতে কোনো অসুবিধে হবে না।

উঠছি বাবা। ক্যারিয়ারিস্ট হওয়াও যে কী কষ্টের তা যদি বুঝতেন! জুতো খুলতে খুলতে দীপনাথ বলে, বসকে তেল দিতে হয়, বসের বউকে তেল দিতে হয়। আর তেল দেওয়ার ছিরিটাও দেখুক লোকে। বসের ছিটিয়াল বউ মৌমাছির গান টেপ করবে বলে এই বারবেলায় মধ্যবয়সে গাছেও উঠতে হচ্ছে।

ক্যারিয়ারিস্ট দুরকমের আছে। হাঁদারাম আর বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমানদের খাটতে হয় না, কিন্তু হাঁদারামদের খাটা ছাড়া তো উপায় নেই।

দীপনাথ জুতো খুলে গাছে উঠল। খুবই সহজ গাছ। নীচুতেই অজস্র ডালপালা। দুটো ডাল ডিঙিয়ে একটু উপরে উঠতেই মণিদীপা বলল, বাঃ, বেশ পারেন তো। কিন্তু আরো ওপরে উঠে গেলে আমি টেপ রেকর্ডারটা দেবো কি করে? নাগাল পাবো না যে! এইবেলা এটা ধরুন। বলে দুহাতে টেপ রেকর্ডারটা উঁচু করে তুলে ধরল মণিদীপা।

ঝুঁকে যখন টেপ রেকর্ডারটা নিতে হাত বাড়াল দীপনাথ তখনই সন্দেহবাতিকগ্রস্ত একটা মৌমাছি ধেয়ে এল কোত্থেকে। বাঁ চোখের কোলে তার বিষাক্ত হুল কুট করে বাঁধল, টের পায় দীপনাথ। কিন্তু এ সময়ে নড়লে বা অসাবধান হলে দামী যন্ত্রটা পড়ে যেতে পারে। তাই সে একটুও শব্দ করল না। নীরবে টেপ রেকর্ডার তুলে নিল।

মৌচাকটা খুব ওপরে নয়। আর দুটো ডাল উঠতেই সে প্রায় হাতের নাগালে পেয়ে গেল মৌমাছিতে কিড়বিড় করা চাকটাকে। বাঁ চোখের কোল মুহূর্তে ফুলে উঠেছে। তীব্র জ্বালা। কিন্তু দীপনাথ শব্দ করল না। কিন্তু ঢাকনা দেওয়ার মতো কিছু নেই হাতের কাছে।

একটা ঘন পাতার চাপ ভেদ করে মাথা তুলতে না তুলতেই তার চুলের মধ্যে জেট প্লেনের মতো দুটো মৌমাছি এসে ঢুকল আর একটা হুল দিল কলারের নীচে, ঘাড়ে। প্রতিটি হুলই ইলেকট্রিক শকের মতো। দীপনাথ স্থির হয়ে রইল। নড়লে আবার কামড়াবে। খুব ধীরে ধীরে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে টেপ রেকর্ডারটা ঝোলানোর অবলম্বন খুঁজে দেখল। পেয়েও গেল হাতের কাছে। একটা ভারবহনক্ষম ডাল বেরিয়ে আছে কান্ড থেকে। সে হাতলটা গলিয়ে দিল গাছের ডালে। তারপর সাবধানে রেকর্ডিং চালু করে দিল। টেপ ঘুরছে কিনা তাও দেখে নিল ভাল করে। এখানে মৌমাছির শব্দ খুব ঝাঁঝালো। আশা করা যায় রেকর্ডিং ভালই হবে।

সাবধানে আবার নেমে আসে দীপনাথ। ভাগ্য ভাল প্যান্টের পকেটে একটা রোদচশমা ছিল। কালো চশমা পরতে তার ভাল লাগে না। সবকিছু মেঘলা দেখায় বলে। তবু রোদের কথা ভেবে সঙ্গে এনেছিল। এতক্ষণ পরেনি। গাছ থেকে নেমেই সে মণিদীপার দিকে পিছন ফিরে চশমাটা পরে নিল।

মণিদীপা গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে। একটা ধন্যবাদ না, কোনো কথাও না।

দীপনাথ হাতটা ঝেড়ে নিয়ে হাসি মুখে বলল, চলুন। বউদি বসে আছে।

মণিদীপার ভ্রু কোঁচকানো, নতমুখ। শুধু বলল, হুঁ।

দীপনাথের বাঁ চোখ ক্রমে আরো ফুলে উঠেছে, চশমার ফ্রেমের তলা দিয়েও সেটা দেখতে পাওয়ার কথা। কিন্তু মণিদীপা তাকাচ্ছে না তার দিকে। মৃদু পায়ে হাঁটছে আগে আগে, ভিতর বাড়ির দিকে। দীপনাথের ঘাড়ে মাথায় আরো গোটা তিনেক জায়গা ফুলে উঠেছে। পাগল-পাগল জ্বালা। তবু সে পিছন থেকে হাসিমুখে বলল, ম্যাডাম এই কুঞ্জবনটা খুঁজে বের করলেন কি ভাবে?

মণিদীপা জবাব দিল না।

দীপনাথ অবাক হল না। মণিদীপা একটু মুডি। কখন ভাল থাকে বা কখন খারাপ থাকে তার তো কোনো ঠিক নেই। তাই সে আর কথা বলে উত্যক্ত করল না। জ্বালাভরা চুলকোনি সামাল দিতে একবার চশমাটা তুলে হুলের জায়গাটা কচলায় সে। নরম জায়গাটা তাতে ফেঁড়ে আরো ফুলে উঠতে থাকে। চশমাটা আর রাখাই যাচ্ছে না। তবু সেই জ্বালাধরা জায়গার ওপর চশমাটা জোর করে বসিয়ে রাখল সে। মৌমাছির হুল, তার চেয়ে বেশী কিছু তো নয়। মানুষ এর চেয়ে ঢের বেশী যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে। প্রীতম করেনি? মুমূর্ষু পঙ্গু ঐ প্রীতম তাকে জীবনে অনেক বেশী প্রেরণা দেয়। চাঙ্গা করে তোলে।

ঘরে পৌঁছতে পৌঁছতেই শরীরের জ্বালা যন্ত্রণা প্রায় ভুলেই গেল দীপনাথ।

বউদি, এই যে ধরে এনেছি। উনি মৌমাছির টেপ রেকর্ডিং করছিলেন, ক্ষ্যাপা নিতাইয়ের ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন।

তৃষা তার ঘরের টেবিলে খাবার সাজাচ্ছিল। লুচি, ডিমের ডালনা, মিষ্টি আরো কী কী যেন। ফিরে না তাকিয়েই বলল, খুব ভাল। এ জায়গা যাদের কাছে ভাল লাগে আমি তাদের খুব পছন্দ করি।

মণিদীপা তৃষার কাছ বরাবর এগিয়ে গিয়ে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল, মৌমাছি কামড়ালে কি লাগাতে হয় জানেন?

তৃষা চট করে মুখ তুলে বলে, তোমাকে কামড়েছে নাকি?

না। মণিদীপা ইঙ্গিতে দীপনাথকে দেখিয়ে দিয়ে বলে ওঁকে। দেখুন চোখ কেমন ফুলে আছে।

তৃষা দীপনাথের দিকে চেয়ে দেখল। তার মুখে কোনো উদ্বেগ ফুটল না। শুধু বলল, মধু। বলে

[illegible] দেওয়া পাথরের বাটি থেকে করে আনল। তাতে [illegible] করছে টাটকা মধু।

ফুলের জায়গাগুলোতে আঙুল দিয়ে মধু ঘষে দিতে দিতে প্রায় কানে কানে তৃষা জিজ্ঞেস করে, কী করে কামড়াল?

গোপনে জিজ্ঞেস করার মতো ব্যাপার নয়। তবু দীপনাথও মৃদুস্বরে বলল, গাছে উঠতে হল যে।

কেন?

টেপ রেকর্ডার ঝোলাতে।

তৃষাকে বেশী বলতে হয় না। প্রখর বুদ্ধিবলে সে সব বুঝে নেয়। বলল, বসের বউ, তার ওপর আবার প্রেমেও পড়েছে, এটুকু জ্বালা যন্ত্রণা কিছু নয়।

তোমাকে একদিন এমন গাঁট্টা দেবো না।

মণিদীপা বিছানার ধারে বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছে। কিছু দেখছে না, শুধু চোখটা সরিয়ে রাখছে মাত্র।

দীপনাথ বলল, টেপ রেকর্ডারটা আবার নামাতে হবে কিছুক্ষণ বাদে। কিন্তু সেটা আর আমার কম্মো নয়।

তৃষা বলল, কম্মোটায় যাওয়ার দরকার কি ছিল? বাড়ি ভর্তি কাজের লোক রয়েছে, যে কেউ ওটুকু করে আসতে পারত। তোমাকে ভাবতে হবে না, আমি লোক পাঠিয়ে নামিয়ে আনাবোখন।

মধু লাগানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্বালাযন্ত্রণা অনেক কমে গেল। শুধু ফোলাটা রইল। কিছু ক্ষণ থাকবে। সে জিজ্ঞেস করে, মেজদা খেয়েছে বউদি?

না অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

ঘুমোতে দাও। যত ঘুমোবে তত টেনশন কেটে যাবে।

তৃষা হাসল, বোমা মারল আমাকে আর টেনশন হল তোমার মেজদার। এসব পুরুষকে নিয়ে চলা যে কী মুশকিল।

তৃষা মৃদু হেসে চাপা গলায় বলে, এখানকার লোকেরাও সেই কথা বলে। আহা, আমার কী গৌরবের ব্যাপার!

তুমিই আমাদের গৌরব।

যাঃ। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও তো। মেয়েরা মণিদীপার সঙ্গে গল্প করবে বলে বসে আছে। কেউ খেলতে পর্যন্ত যায়নি।

খাওয়ার সময়েও দীপনাথ লক্ষ করল মণিদীপা তার দিকে তাকাচ্ছে না, কথা বলছে না। দীপনাথ ঘাটাল না। নিঃশব্দে খেয়ে নিল দুজন। বোস সাহেব দিল্লি থেকে আমেদাবাদ গেছেন। কবে ফিরবেন ঠিক নেই। মণিদীপা রোজ অফিসে ফোন করে দীপনাথকে জ্বালাচ্ছিল, কবে রতনপুর যাচ্ছেন বলুন! আমার যে কলকাতায় পাগল-পাগল লাগছে। দীপনাথ ঠিক করেছিল, এবার বোস সাহেবের অনুমতি ছাড়া মণিদীপাকে কোথাও নিয়ে যাবে না। বোস সাহেব অবশ্য প্রায়ই অফিসে ট্রাংক কল করে তার সংগে কথা-বার্তা বলেছে। কিন্তু কোনোবারেই দীপনাথ কথাটা তুলতে পারেনি সংকোচের বশে। কিন্তু মণিদীপার তাড়ায় পরশুদিন সে কাজের কথা হয়ে যাওয়ার পর বোস সাহেবকে খুব বিনীতভাবে বলল, মিসেস বোস একটু রতনপুরে যেতে চাইছেন।

কোথায়?

রতনপুর। কাছেই। সেখানে আমার মেজদার বাড়ি।

ওঃ, অফ কোর্স। যাক না, কে আটকাচ্ছে?

আপনার একটা পারমিশান—

বোস সাহেব খুব হাসল। বলল, আজ পর্যন্ত কটা ব্যাপারে দীপা আমার পারমিশান নিয়েছে তা তো আমি জানি।

উনি না নিলেও আমাকে তো নিতেই হয়। আপনার পারমিশান ছাড়া আমি ওঁকে কোথাও নিয়ে যেতে পারি না।

[illegible] এনিয়েজার [illegible] লাইফস।

ধীর স্বরে তখন দীপনাথ বলল, ওভাবে বললে আমি সেটাকে পারমিশান বলে ধরতে পারি না মিস্টার বোস।

বোস সাহেব মেজাজ খারাপ করতে পারত। কিন্তু কোম্পানির বিজনেস খুব ভাল হওয়ায় বোসের মেজাজ শরীফ ছিল। খুব উদার গলায় বলল, এমনিতেও দীপা একাই বহু জায়গায় যাচ্ছে। এ তো আপনার মতো একজন চমৎকার গাইডের সঙ্গে যাবে। যাক না।

আমরা সকালে বা দুপুরে গিয়ে সন্ধেবেলাই ফিরে আসব।

ওঃ, আমি ভেবেছিলাম বুঝি উইক এন্ড কাটাতে। তাহলে তো পারমিশানের দরকারই ছিল না চ্যাটার্জি। আপনি এত বেশী সংস্কার মেনে চলেন কেন বলুন তো! আচ্ছা ভদ্রলোক মশাই আপনি। শুনলে দীপাও হাসবে।

আসার সময় হাওড়া স্টেশনে মণিদীপা বলেছিল, আমার যদি ভাল লাগে তাহলে আমি রতনপুরে দুদিন থেকে যেতে পারি কিন্তু।

স্বচ্ছন্দে। কিন্তু আপনার ফ্ল্যাট পাহারা দেবে কে?

পাহারা দেওয়ার কিছু নেই। জোয়ারা বাবুর্চি আছে। আমি মানুষকে বিশ্বাস করতে ভালবাসি। আপনার দুশ্চিন্তা থাকলে আপনি গিয়ে পাহারা দিতে পারেন।

এখানে মণিদীপার কেমন লাগছে কিংবা সে থাকবে কিনা তা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলেও মুখের ভাব দেখে সাহস পেল না দীপনাথ। খেয়ে উঠে সে দীননাথের সঙ্গে দেখা করতে গেল। মঞ্জু আর স্বপ্ন এসে ধরে নিয়ে গেল মণিদীপাকে।

দেখা হতেই দীননাথ বললেন, তোমরা কেউ বুলুর খবর নাও না। সে কেমন আছে, বউমার কী হল কেউ আমাকে বলে না।

[illegible] লজ্জা পেয়ে বলে, খুব কাজ পড়েছে।

ভাইয়ের খবর নেওয়াটাও কাজ।

আপনি একটা চিঠি দিলেও তো পারেন।

চিঠি স্বপনকে দিয়ে বার দুই লেখালাম। আজকাল ডাকের পিওনরা ঠিকমতো চিঠি দেয় না। বোধহয় পায়নি, তাই জবাবও দেয়নি।

আচ্ছা, আমি এবার গিয়ে খোঁজ নেবো।

নিও। বোলো, এখানে আমার ভাল লাগছে না।

কেন বাবা? এ জায়গা তো খুব ভাল।

ভাল আর কি? শ্রীনাথ খবরও নেয় না। তার কী সব খারাপ অভ্যাস হয়েছে শুনি। আমাদের বংশে এসব তো ছিল না। তার ওপর কাল রাত্তে নাকি ডাকাত পড়েছিল—এ ভারী গন্ডগোলের জায়গা।

শীত পড়লে কলকাতায় যাবেন। এখন কিছুদিন থাকুন।

তুমি বিয়ে করলে আমার একটা আস্তানা হত। তিন ছেলের কাছে ঘুরেফিরে থাকতে পারতাম। বিলুও খোঁজ করে না। প্রীতম আছে কেমন?

ভাল। বিলু তো চাকরি করে।

শুনেছি। প্রীতম ভাল হয়ে গিয়ে থাকলে একবার যেন আসে। তার মুখটা তো ভুলতে বসেছি।

আসবে। এখানে আপনার আর কোনো অসুবিধে আছে?

এ আমার জাতের জায়গা নয়। কেমন সবই অচেনা অপরিচিত ঠেকছে। নিজের জায়গা বলে মনে হয় না।

দীননাথের সঙ্গে আর বেশীক্ষণ কথা বলল না দীপনাথ। মানিব্যাগ থেকে একটা একশ টাকার নোট বের করে হাতে দিয়ে বলল, ইচ্ছেমতো খরচ করবেন।

[illegible]

না, আপনি রাখুন। কাউকে কিছু দিতে ইচ্ছে হলে দেবেন।

দীননাথ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, এই বিবেচনাটুকু অন্য ছেলেদের যদি থাকত!

দীপনাথ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। ডাক্তারের গিয়ে মুন্সার কাছে খবর নিয়ে জানল, কিছুক্ষণ আগে ডাক্তার এসে শ্রীনাথকে দেখে গেছে। আবার বোধহয় ঘুমের ইনজেকশন দিয়েছে। অঘোরে ঘুমোচ্ছে শ্রীনাথ।

দীপনাথ শ্রীনাথের সুন্দর বাগানটার ভিতরে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল। শরৎকাল আসতে না আসতেই শ্রীনাথের বাগানে শিউলি এসে গেছে। অনাদরে মাটিতে ঝরে পড়া অজস্র শিউলি বাসি হচ্ছে। একটা স্থলপদ্ম গাছে ঝোপে পদ্ম ফুটেছে। মৌমাছিরা গুঞ্জন তুলে উড়ছে। বউদি কি জানে শ্রীনাথের নিজের হাতে তৈরি করা ফুল থেকেই মৌমাছি কুঞ্জবনে গিয়ে চাক বাঁধে, আর সেই মধুই টলটল করছে তার পাথরের বাটিতে? কথাটা বউদিকে বললে কেমন হবে? ভেবে আপনমনেই মাথা নাড়ল দীপনাথ, লাভ নেই। কোনো কোনো স্বামী স্ত্রী বোধহয় তাদের সম্পর্কের বিষকেই বেশী উপভোগ করে। মধুর কথা তারা কানে নেবে না।

বেলা ঢলে পড়ল গাছগাছালির আড়ালে। চিকড়ি মিকড়ি রোদ খেলছে বাগান জুড়ে।

দীপনাথ উঠে ভিতর বাড়িতে আসে।

বউদি, এবার যেতে হয়।

এক্ষুনি কি? আর একটু থাকো। তোমার সঙ্গে কথাই তো হল না।

সঙ্গে বসের বউ, ফিরতে রাত হওয়া ঠিক নয়।

দীপু, তুমি কবে বুঝবে যে, আমি কত একা?

নিঃসঙ্গ হয়। তোমাকেও বলি বউদি, মহীয়সীরা চিরকাল একা। তাদের সঙ্গী হওয়ার মতো যোগ্যতা কজনের থাকে বলো?

আমি মহীয়সী? অবাক করলে দীপু!

কেন, লোকে বলে না?

তোমার মতো চাটুকার তো সবাই নয়! মহীয়সী হলে আমাকে লোকে মারতে চাইবে কেন বলো! কেনই বা আমার আপনজন বাজারে হাটে আমার কলঙ্ক রটিয়ে বেড়াবে?

লোকের কথা দিয়ে কী হবে বউদি! আমি যা মনে করি তা তো পাল্টে ফেলব না।

তৃষা একটু হাসল। মুখের বিষণ্ণতা তাতে কাটল না। খুব গম্ভীর গলায় বলল, কোনোদিন যেন আর না শুনি তোমার মুখে যে, আমি খারাপ, আমি ভাল নই।

শুনবো না বউদি।

তোমার কাছে যেন আমি চিরকাল ভাল থাকি।

থাকবে। যে ছেলে দুটো কাল বোমা মেরেছিল তারা ধরা পড়েছে?

না। তবে নাম জানা গেছে। দুজনেই ভাড়াটে গুন্ডা। কাছাকাছি মাধবগঞ্জে থাকে।

কারা তাদের পাঠিয়েছিল? তোমার কাউকে সন্দেহ হয়?

কি করে বলব? তবে হয়তো একদিন এইভাবে আমার মরণ হবে দীপু। তখন খুব কম লোকই কাঁদবে আমার জন্য। আর কেউ না কাঁদুক, তুমি একটু কেঁদো। কান্না এমনিতে না এলে নিজেকে চিমটি কেটো। (ক্রমশ)

# উনিশ শতকের বাংলা ...

প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনা ও বিভিন্ন অনু-ষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্প্রতি আন্তর্জাতিক 'শিশু-বর্ষ' শেষ হলো। বছরটিতে সরকার এবং সমাজের বিশেষ দৃষ্টি ছিল শিশুদের ওপর। শিশুরাই দেশের ও জাতির ভবিষ্যৎ কথাটা চিরসত্য হলেও গত বছরটিতেই যেন কথাটির সত্যতা বিশেষ করে উপলব্ধি করতে পেরেছি। এই উপলক্ষে নানা রং-এর বৈচিত্র্যপূর্ণ ছবিতে পরিপূর্ণ বই প্রকাশিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে শিশুদের জন্যে পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছে অনেক। এক্ষেত্রে বাংলা শিশু পত্রিকার কথাই বলছি। সন্দেশ, শিশু, মৌচাক, শিশুসাথী, খোকাখুকু, আনন্দমেলা, পক্ষীরাজ, রংমশাল, রামধনু, শুকতারা, মাসপয়লা ইত্যাদি নামকরা পত্রিকা ছাড়াও আরো অনেক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। যদিও সবকটিই যে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে এমন নয়। বিংশ শতকের মত ঊনবিংশ শতকেও শিশুদের জন্যে পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, যার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ঊনিশ শতকে শিশু এবং বালকদের জন্য রচিত প্রধান কয়েকটি (যেগুলো দেখার সুযোগ হয়েছে) সাময়িক পত্রিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

শিশুসাহিত্য গড়ে ওঠার পেছনে সাময়িক-পত্রের দান অপরিসীম। প্রকৃতপক্ষে সাময়িক পত্রের মাধ্যমেই শিশুসাহিত্য চর্চার সূত্রপাত। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারিদের চেষ্টায় এবং জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িকপত্র 'দিগদর্শন' প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির আখ্যাপত্রে 'যুবলোকের শিক্ষার্থে সংগৃহীত নানা উপদেশ' এবং 'বালকদের শিক্ষার্থে সংগৃহীত নানা উপদেশ' দুই রকমের পাঠই লক্ষ করা যায়। এতে বিভিন্ন দেশের বিষয়, ব্যক্তির বিবরণ, জীবজন্তু, জ্যোতিষ ও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটি যে তখনকার দিনে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তার প্রমাণ পত্রিকাটির বিভিন্ন ভাষায় এবং একাধিক সংস্করণের প্রকাশ। কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির কার্য-বিবরণী থেকে জানা যায় যে 'দিগদর্শন' সে যুগের স্কুলপাঠ্যের উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় উক্ত সোসাইটি পত্রিকাটির বহু খণ্ড ক্রয় করেছিলেন।

শিশুগ্রন্থপঞ্জী সংকলয়িতা শ্রীমতী বাণী বসু তাঁর বাংলা শিশুসাহিত্য গ্রন্থপঞ্জীর (১৩৭২) ভূমিকাতে ১৮১৮ সালের পর ১৮৭৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত ছোটদের উপযোগী কোন পত্রিকার সন্ধান পাননি বলেছেন। এবং সেযুগে শিশুদের জন্য অন্য কোন পত্রিকা না থাকায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১), 'রহস্য সন্দর্ভ' (১৮৬৩) এবং 'জ্যোতিরিঙ্গন' (১৮৬৯) এই পত্রিকা তিনটিতে শিশুদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি পৃষ্ঠা থাকত বলে শিশু গ্রন্থপঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে আরো দুটি পত্রিকার সন্ধান আমরা পাচ্ছি। পত্রিকা দুটি 'উপদেশক' (১৮৪৭), 'সত্যপ্রদীপ' (১৮৬০)। প্রথমটিতে বড়দের বিষয়ের সংগে ছোটদের জন্যেও একটি বিভাগ ছিল। কিন্তু দ্বিতীয়টি শুধুমাত্র শিশু এবং বালকদের জন্যই রচিত হয়েছিল।

'দিগদর্শনে'র পর বালকদের জন্যে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'পশ্বাবলী'র উল্লেখ করা যেতে পারে। যদিও কেহ কেহ 'পশ্বাবলী'কে সাময়িক পত্র না বলে পুস্তক বলেছেন। তবে প্রতি মাসে প্রকাশিত হবার জন্যে 'পশ্বাবলী'র নাম সাময়িক পত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। পত্রিকাটির প্রত্যেক সংখ্যায় একটি করে জন্তুর বিবরণ এবং প্রথম পৃষ্ঠায় সেই জন্তুর কাঠখোদাই চিত্র থাকত। এর প্রথম পর্যায় পাদ্রী লসন কর্তৃক সংগৃহীত। বঙ্গানুবাদ করেন ডবলিউ এইচ পীয়ার্স। পত্রিকা-টির দ্বিতীয় পর্যায় পরিচালনা করতেন হিন্দু কলেজের শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র। 'পশ্বাবলী'র প্রথম ছ' সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর স্কুলের ছাত্রদের পারিতোষিক পুস্তক হিসেবে গ্রহণীয় হবে বিবেচনা করে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটি এই ছ' সংখ্যা একসঙ্গে পশ্বাবলী নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছিলেন।

এর পর ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কৃষ্ণধন মিত্রের পরিচালনায় মাসিক 'জ্ঞানোদয়' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি প্রধানত বালক-বালিকাদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল। এতে নীতিকথা, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা এবং জীবজন্তুর বিবরণ প্রকাশিত হ'য়েছিল। তবে অধিকাংশ প্রবন্ধই ছিল উপদেশমূলক। কোথাও এই উপদেশ গল্পের ছলে পরিবেশিত হয়েছে। আবার কোথাও প্রবন্ধের শেষে নীতিকথা প্রকাশ পেয়েছে। স্কুলের মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে বিতরণের জন্য স্কুল বুক সোসাইটি পত্রিকাটির বেশ কয়েক খণ্ড ক্রয় করেছিলেন। 'জ্ঞানোদয়'কে দেশীয় এবং বাঙালী পরিচালিত প্রথম শিশুপাঠ্য পত্রিকা বলা যেতে পারে।

'জ্ঞানোদয়ে'র পর দীর্ঘ কয়েক বছর বাংলায় একান্তভাবে শিশুদের জন্যে কোন পত্রিকা রচিত হয়নি। তবে কয়েকটি পত্রিকায় বড়দের বিষয়ের সঙ্গে ছোটদের জন্যেও কয়েকটি নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা বরাদ্দ ছিল। এক্ষেত্রে জে ওয়েঙ্গার সম্পাদিত

মুকুল

বৈশাখ।

২য় ভাগ। ১৩০৩। ১ম সংখ্যা।

নববর্ষের সম্ভাষণ।

ওগো মুকুলের পাঠক পাঠিকা, তোমরা কি মুকুলকে ভাল বাস? কেন বল দেখি ভাল বাস? মুকুল তোমাদের মনের মত কথা বলে বলিয়া? না, না, মুকুল যে তোমাদিগকে ভাল বাসে। তোমাদের কথা শুনিতে ভাল বাসে, তোমাদের কথা বলিতে ভাল বাসে, তোমাদের কাছে বসিয়া গল্প করিতে ও হেঁয়ালি বলিতে ভাল বাসে। মুকুল তোমাদের বন্ধু, মুকুল তোমাদের আপনার লোক। নববর্ষে নূতন পোষাক পরিয়া মুকুল আবার তোমাদের নিকট যাইতেছে। দেখ, আমরা

'মুকুল' পত্রিকার প্রারম্ভ পৃষ্ঠা

(১৮৬০) এবং 'জ্যোতিরিঙ্গণে' (১৮৬১) উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে রেভারেন্ড জে ওয়েঙ্গারের সম্পাদনায় 'উপদেশক' 'The Instruction' নামক খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এতে খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে 'শিশুবোধক নিদর্শন' বিভাগে পাঠশালাতে প্রকৃত মনোযোগ রাখবার বিষয় শিশুর প্রার্থনা, অগ্নি, ঘড়ি, দূরবীন প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। শিশুরা যাতে পাঠশালাতে পুরোপুরি মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনো করে তার জন্যে উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে—

> "তোমরা কি মনে কর ওহে শিশুগণ।
> বিদ্যালয়ে করে থাক বৃথা আগমন॥
> যে সকল পাঠ কর প্রত্যহ অভ্যাস।
> অবশ্য বুঝিতে হবে তাহার আভাষ॥
> নতুবা তাহাতে অল্প জ্ঞান হওয়া ভার।
> যদ্যপি আবৃত্তি তাহা কর বারবার॥
> পড়িবা যে পাঠ যত স্পষ্ট আর ধীরে।
> যেন অর্থ হয় তোমার অন্তরে॥"

'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকাটি সম্পর্কে সম্পাদকের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে পত্রিকা প্রচারের অন্যান্য উদ্দেশ্যের সংগে 'বালক-বালিকারা ক্রীড়া-চ্ছলে পত্রিকা পাঠ করে যাতে আপন আপন জ্ঞানের বিস্তার করে' এটাও ছিল সম্পাদকের অন্যতম লক্ষ্য। 'রহস্য সন্দর্ভে'ও তেমনি ছোটদের জন্যে কয়েকটি পৃষ্ঠা বরাদ্দ ছিল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কোলকাতা ট্রাকট সোসাইটির প্রচেষ্টায় 'জ্যোতি-রিঙ্গণ' মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। বালক-বালিকা এবং স্ত্রীগণের এককালীন আমোদ ও নীতিশিক্ষা প্রদানই ছিল পত্রিকাটির উদ্দেশ্য। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখের সংবাদ প্রভাকর পাঠে জানা যায় যে ঐ বছরের ২৬শে এপ্রিল প্রিয়মাধব বসু ও যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'বিদ্যাদর্পণ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটিতে নীতি ইতিহাস, কবিতা এবং বালকদের পাঠোপযোগী বিষয় থাকত। 'বিদ্যাদর্পণে'র বিশেষত্ব হল যে এটি ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের প্রথম দুই কিশোর পরিচালিত পত্রিকা। এর পূর্বে শিশু এবং কিশোরদের জন্যে বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশিত হলেও কোনটিই কেবলমাত্র বালকদের উদ্যমে প্রকাশিত হয়নি।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে খ্রীষ্টান ভার্নাকুলার এডুকেশন সোসাইটির বঙ্গীয় শাখা কর্তৃক 'সত্যপ্রদীপ' নামক শিশুপাঠ্য খ্রীষ্টীয় মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। প্রধানত শিশু এবং বালক-বালিকাদের মধ্যে জ্ঞানবিকাশের উদ্দেশ্যে সহজ ভাষায় এবং স্বল্পমূল্যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটির ইংরাজী নাম ছিল 'The lamp of truth'। ভূমিকা অংশ থেকে পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা যায়—"হে প্রিয় বালক-বালিকাগণ, তোমাদের নিমিত্তেই এই পত্রিকা প্রস্তুত হইতেছে। তাহা অল্প মূল্যে বিক্রীত হইবে। সুতরাং তোমরা দরিদ্র হইলেও অনায়াসে এই পত্রিকা ক্রয় করিতে পারিবা এবং তোমরা যেন বুঝিতে পার এই জন্যে সরল বাক্য প্রয়োগ করিব ও মনোরম্য পাঠে ইহা পরিপূরিত থাকিবে। ইহাতে সুন্দর২ গল্প লিখা যাইবে।........আর যে সকল বৃত্তান্ত আজ পর্যন্ত উত্তমরূপে বুঝিতে পার নাই, অর্থাৎ বাষ্পীয় পোত, বৈদ্যুৎ যন্ত্র........সকলি লিখিব।"

প্রধানত বালক-বালিকাদের উদ্দেশ্যে রচিত পত্রিকাটিতে বিভিন্ন বিষয়ে—যেমন, পশুপাখী, জীবজন্তু, বিজ্ঞান, নীতিকথা, ইংরেজী প্রবাদবাক্য, জীবনচরিত খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ে বিভিন্ন মূলক তাদের বৃত্তান্ত জাতীয় রচনাও প্রকাশি[ত] হয়েছিল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৬। পত্রিকাটি[তে] শিক্ষা প্রদায়িনী, সুখকরী ও সুন্দরীরূপে বালক[-বালিকা]দের সামনে তুলে ধরাই ছিল সম্পাদকের উদ্দেশ্য[।] এতে বিভিন্ন বিষয় চিত্রসহ আলোচিত হয়েছে[।] 'সত্যপ্রদীপ'কেই প্রথম সচিত্র শিশু পত্রিকা ব[লা] যেতে পারে। মার্ডকের তালিকা থেকে পত্রিকা[টি] ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে ব[লে] জানা যায়।

'সত্যপ্রদীপে'র দীর্ঘ সতেরো বছর [পরে] ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় বাংলায় প্র[থম] শিশু পত্রিকা 'বালকবন্ধু' (১৮৭৮) প্রকাশ ল[াভ] করে। এটিই প্রথম বালক পাঠ্য পাক্ষিক পত্রিকা[।] পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮। আনন্দদানের সংগে শিশুম[নে] জানার আগ্রহ বা স্পৃহা জাগিয়ে তোলা প্রথ[ম] শিশুসাহিত্যিকদেরই লক্ষ্য। কাজেই জ্ঞান বিজ্ঞা[নের] বিভিন্ন বিষয় যাতে শিশুরা মনের মতো করে গ্র[হণ] করতে পারে তার প্রতি সম্পাদকের সজাগ দৃ[ষ্টি] ছিল। ফলে শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্যে পত্রিক[া]টিকে ছড়া ও ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছিল। এ[তে] নানারকমের কবিতা, গল্প, ছড়া, উপদেশ, হেঁয়া[লি] নীতিমূলক সংস্কৃত শ্লোক ও তার বাংলা অ[নুবাদ] ছড়ার মাধ্যমে গণিতের সূত্র ইত্যাদি বিভিন্ন বি[ষয়] প্রকাশিত হয়েছিল। বালকবন্ধুর বিশেষত্ব হলো এতেই প্রথম দেশ-বিদেশের সংবাদ (২০ সং[খ্যা] থেকে) এবং বালকদের নিজেদের লেখা প্রকা[শিত] হয়েছিল। 'বালকবন্ধু'কেই প্রথম আদর্শ শি[শু] পত্রিকা বলা যেতে পারে যার বৈশিষ্ট্যগুলো আ[জও] অনুসৃত হয়ে আসছে।

'বালকবন্ধু'র পর ১৮৮৩ খ্রীষ্টা[ব্দের] জানুয়ারী মাসে প্রমদাচরণ সেনের সম্পাদ[নায়] প্রকাশিত হলো 'সখা'। পত্রিকাটি সম্পর্কে সম্পাদ[কের] বক্তব্য—"এতদিন পরে 'সখা' প্রকাশিত হইতে চলি[ল।] এইরূপ পত্রিকা আমাদিগের দেশে নাই ব[লি]য়া আমরা এই পত্রিকাখানি প্রকাশ করিবার [সংকল্প] করিয়াছিলাম। আমাদিগের হতভাগ্য দেশে বা[লক] বালিকাদের জ্ঞানের ও চরিত্রের উন্নতির জন্য অ[ধিক] লোক চিন্তা করেন না, অথবা করিবার অব[সর] হয় না, এই জন্যই 'সখা'র জন্ম হইল। সখা পি[তা] মাতার উপদেশ এবং শিক্ষকের শিক্ষা দুইই [দান] করিবে। যাহাতে বালক-বালিকারা বাস্তবিক [মানুষ] হইতে পারেন, এজন্য সখার লেখক ও লেখি[কাগণ] প্রাণপনে চেষ্টা করিবেন।" পত্রিকাটিতে কবিতা, [গল্প,] জীবনী, জীবজন্তুর বিবরণ, আখ্যান ও নী[তি]মূলক এবং স্বাস্থ্যসম্পর্কিত প্রবন্ধাদি প্রক[াশিত] হোত। 'সখা'তে বালিকাদের জন্য কয়েকটি নি[র্দিষ্ট] পৃষ্ঠা ছিল, তাতে বিভিন্ন ধরনের রান্না, [বিভিন্ন] খাবার তৈরী করার নিয়ম, পোশাক পরিচ্ছদ [ও] বালিকাদের প্রধান গুণ লজ্জা নম্রতা ইত্যাদি [বিষয়ে] রচনাদি প্রকাশিত হ[োত।] উপেন্দ্রকিশোর [রায়চৌধুরী], বিপিনচন্দ্র পাল, হেমলতা দেবী, বিপিনবি[হারী] সেন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছিলেন ['সখা'র] নিয়মিত লেখক। এতেই বিপিনচন্দ্র [পালের] শিশুদের জন্য রচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ 'সু[রেন] বাবুর কারাকস' প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটি সচিত্র এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬। 'সখা' আপন বৈ[শিষ্ট্যে] সে যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা প্র[শংসিত] হয়েছিল। 'সখা' সম্পর্কে সাহিত্যসম্রাট ব[ঙ্কিমচন্দ্র] লিখেছেন—"সখা পড়িয়াছি সকল পড়ি নাই, যতদূর পড়িয়াছি তাহাতে বিশেষ প্রী[ত] হইয়াছি। সখা প্রধানত বালক-বালিকাদের [জন্য] বটে, কিন্তু এ সখার সাহায্য অনেক পরি[ণত] বয়স্কের পক্ষেও অনবলম্বনীয় নহে। [বালক-] বালিকাদের এমন সম্বন্ধু অতি দুর্লভ। এই রচনা অতি সরল, বিষয়বস্তুগুলি জ্ঞানগর্ভ মার্জিত। এই সখার সংগে তরুণ বয়স্ক [দিগের] সখীত্ব করা উচিত। সখার জন্য যাহার [যত] বালক-বালিকা আছে সেই আপনার নিকট

'সখা' সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে চন্দ্রনাথ বসু লিখেছিলেন—

"I have looked through the first volume of the Sakha with very great pleasure. As a periodical for the instruction and amusement of children it is an excellant publication".

পত্রিকাটি যে তখনকার দিনে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল তার প্রমাণ দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশে।

এর পর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত হয় 'বালক'। এটিই মহিলা সম্পাদিত প্রথম শিশু পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সরলাদেবী, জ্ঞানদাদেবী প্রমুখ ঠাকুর পরিবারের লেখক গোষ্ঠী ছাড়াও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ভুবনমোহন মিত্র, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শরৎচন্দ্র দে, [illegible] প্রমুখ 'বালকে'র লেখক ছিলেন। এতে কবিতা, গল্প, নাটক এবং ভ্রমণ, শরীরচর্চা, বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ রচিত 'হেঁয়ালী' নাটকটি 'বালকে'ই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। শিশুসাহিত্যে এই প্রথম নাটকের আবির্ভাব। বালক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-স্মৃতিতে লিখেছেন—"ছবি ও গান এবং কড়ি ও কোমল এর মাঝখানে বালক নামক একখানি মাসিক-পত্র এক বৎসরের ওষধির মতো ফসল ফলাইয়া লীলা সম্বরণ করিল। বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করিবার জন্য মেজোবৌঠাকুরাণীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল সুধীন্দ্র, বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু [illegible] জানিয়া তিনি সম্পাদক হইয়া আমাকেও রচনার ভার গ্রহণ করিতে বলেন।"

'বালকে'র দু-এক সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর রবীন্দ্রনাথ কদিনের জন্যে রাজনারায়ণ বসুকে দেখতে দেওঘর যান। দেওঘর থেকে কোলকাতা ফিরবার পথে গাড়ির ভিড়ে কবির চোখে ঘুম আসছিল না, কাজেই তিনি বালকের জন্যে একটা গল্প লেখার কথা ভাবছিলেন। এরই মধ্যে কবির চোখে ঘুম এসে পড়ে এবং তিনি স্বপ্ন দেখেন। এই স্বপ্নলব্ধ কাহিনীর সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুরাবৃত্তকে মিলিয়ে রাজর্ষি রচিত হয় এবং মাসে মাসে 'বালকে' প্রকাশিত হতে থাকে। পরে ১২৯৩ সালে রাজর্ষি বই আকারে প্রকাশিত হয়।

'বালকে'র প্রথম সংখ্যায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবী রচিত 'ব্যায়াম' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটির বিরোধিতা করে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'লাঠির উপর লাঠি' লিখলে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁর সম্পাদকের নিবেদনে কৌতুক করে লিখছিলেন—"লাঠির পরে লাঠির লেখক আমারি লাঠি ঘুরাইয়া আমাকেই বিলক্ষণ শিক্ষা দিয়াছেন।" অবশেষে সম্পাদক হিসেবে তাঁর বক্তব্য "তোমাদের এই সকল কথা বলিবার তোমাদের অনুরোধ করিবার সুযোগ পাইব বলিয়া এই 'বালক' পত্র প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি—তোমাদের মঙ্গলই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য।" এক বছর প্রকাশিত হবার পর ১২৯২ সালের চৈত্র মাসে 'বালকে'র প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকাটি তখন থেকে 'ভারতী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বড়দের কাগজরূপে 'ভারতী ও বালক' নামে প্রকাশিত হতে থাকে।

'বালকে'র পর ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ভুবনমোহন রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'সাথী'। বালক বালিকাদের সর্বাঙ্গীন শিক্ষাদানই ছিল সাথীর মূল উদ্দেশ্য। এতে কবিতা, গল্প, আদর্শ জীবনচরিত, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের কথা প্রকাশিত হতো। 'সাথী'র প্রথম সংখ্যায় বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার শিশুদেরকে 'সাথী'র গ্রাহক হতে আহ্বান জানিয়ে লিখেছিলেন—

"কোথায় আছ ভাইটি আমার
কোথায় আছ বোন,
আয় ছুটে আয় শোনরে
এসে সাথীর আবাহন।
উপদেষ্টা নয় যে ভাই,
হাতে নাইকো ছড়ি
নাইকো তাহার উচ্চ ধমক
দন্তের কড়মড়ি।"

নিছক আনন্দ ও কৌতুকের ওপরই শিশু মনের ঝোঁক। কাজেই উপদেশ ও ছড়ির ব্যাপারটি না থাকায় 'সাথী'র এই আহ্বান শিশুদের কাছে নিশ্চয়ই সাদরে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল।

'সখা'র সম্পাদক প্রমদাচরণের মৃত্যুর পর সখা ও সাথী যুক্ত হয় এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ভুবনমোহন রায়ের সম্পাদনায় পত্রিকাটি 'সখা ও সাথী' নামে প্রকাশিত হতে থাকে। এতে বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হলো 'মুকুল'। সম্পাদক ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পাদকের বক্তব্য—"জ্ঞানের মুকুল, প্রেমের মুকুল, সকল ভাল বিষয়েরই মুকুল আছে। এই পত্রিকা যাহাদের জন্য তাহারাও মুকুল, মানব মুকুল।....মানব মুকুলদিগকে ফুটাইবার পক্ষে সাহায্য করাই মুকুলের উদ্দেশ্য।" 'মুকুলে'র নববর্ষে আরো বলেছেন—"শিশুদের পরিচর্য্যা করা বড় কঠিন কাজ। মুকুল শিশুদের সঙ্গী হইতে চায়, হাসি ও খেলার মধ্যে তাহাদিগকে দু'একটি ভাল কথা শুনাইতে চেষ্টা করে। তাই মুকুল পাইয়া, তাহারা একগাল হাসিলেই মুকুল চরিতার্থ।" এতে কবিতা, গল্প, ছড়া, অঙ্ক শেখার পদ্ধতি, বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ক

১ নং সত্যপ্রদীপ। ২ খণ্ড

THE LAMP OF TRUTH.

No. 1. JANUARY, 1861.



CALCUTTA:

BENGAL BRANCH OF THE CHRISTIAN VERNACULAR EDUCATION SOCIETY FOR INDIA.

1861.

সত্যপ্রদীপ পত্রিকার আখ্যা পত্র। বৃটিশ গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক গ্রাহাম শ-র সৌজন্যে প্রাপ্ত

বাঙলার নবাবী আমল যখন শেষ ইংরেজ কোম্পানীর আমল তখন শুরু। শাসনের মুঠি সবে কড়া হচ্ছে। চারিদিকে বনবাদাড়। পথ চলতে পথিকের ভয়। গেরস্থের চোখে ঘুম নেই। কখন বুঝি হানা দেয় ডাকাত! সত্যিকথা বলতে কি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত শান্তিতে বাস করা দূরে থাক, পথ চলাচলও নিরাপদ ছিল না। আর আশ্চর্য্যের বিষয় সেই সময়ে বাঙলা দেশের অনেক ইতিহাস প্রসিদ্ধ জমিদাররাই ছিলেন ডাকাত।

বঙ্কিম চন্দ্রের কথায় বলা যায়—'আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে অনেক জমিদারই দস্যু ছিলেন। ডারউইন বলেন, মানবজাতি বানর দিগের প্রপৌত্র। এ কথায় যদি কেহ রাগ করিয়া না থাকেন তবে পূর্বপুরুষগণের এই অখ্যাতি শুনিয়া বোধ হয় কোন জমিদার আমাদের উপরে রাগ করিবেন না।'

সেই সময়েই মহিম ডাকাতের অবির্ভাব। মহিমের নামে শুধু পূব বাঙলাই নয়, গোটা বাঙলা দেশেই ত্রাস ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। দুর্ধর্ষ মহিমের ক্রিয়াকলাপও বিচিত্র। বীরত্বে, সাহসিকতায়, চাতুরীতে মহিম ডাকাতের জুড়ি নেই। কখনও ফেরিওলা সেজে ঘোরাফেরা করে, কখনও আবার মাঝি সেজে ইংরেজ পুলিস অফিসার-কেই নদী পার করে দেয়। কিন্তু মহিমকে কেউ ধরতে পারে না। তার পায়ে যেন বিদ্যুতের গতি।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত অনেক দালল-পত্র সরকারী গেজেটিয়ার ও কিংবদন্তী ঘেঁটে 'কৈশোরক' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে 'মহিম ডাকাত' লিখে হৈচৈ ফেলে দিয়েছিলেন। ছোট বড় সবাই তখন গোগ্রাসে গিলেছিল। লেখক নিজেই ভূমিকায় বলেছেন—'মহিম ডাকাত উপন্যাসখানি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর নাম কিছু কিছু পরিবর্তন করিলেও ইংরেজ সরকারের অধীন গোয়েন্দা কালীকান্ত চক্রবর্তীর নাম পরিবর্তন করি নাই।' সেই বই আবারবেরুল



'বালক বন্ধু' পত্রিকার প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা

প্রবন্ধ, নানা দেশের এবং জন্তুর বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৬। এমন সমস্ত চমৎকার ছবি দিয়ে পত্রিকাটিকে আকর্ষণীয় করা হয়েছিল যার সঙ্গে বিংশ শতকের শেষার্ধের ছবির অনায়াসে তুলনা করা চলে। এখনকার মতো মুকুলে ছবি দিয়ে সেই ছবির পরিপ্রেক্ষিতে গল্প কবিতা লেখার আহ্বান থাকতো এবং তার জন্যে পুরস্কারও ঘোষণা করা হোত। মুকুলের চতুর্থ বর্ষের আষাঢ় সংখ্যায় এই ধরনের ছবির ওপর কবিতা লিখে পুরস্কার পেয়েছিলেন বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। বিপিনচন্দ্র পাল, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, অবলা বসু, জগদীশচন্দ্র বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র বসু, অতুলপ্রসাদ সেন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রমুখ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ মুকুলের লেখক ছিলেন। একালের বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'মজার মুলুক' কবিতাটি মুকুলের পাতাতেই প্রকাশিত হয়েছিল—

'এক যে আছে মজার দেশ
সব রকমে ভালো,
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ
দিনে চাঁদের আলো।"

কবিতাটির সঙ্গে শিশুদের বুলিফোটার সঙ্গে সঙ্গেই যেন পরিচয় ঘটে। আট বছরের ছোট্ট শিশু সুকুমার রায়ের প্রথম রচনা 'নদী' কবিতাটি মুকুলেই (২য় বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা) প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এতে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, রামতনু লাহিড়ী, গ্লাডস্টোন, জর্জ মুলার, লর্ড এলগিন প্রভৃতি দেশী বিদেশী বিখ্যাত মনীষীদের জীবনী চিত্রসহ প্রকাশিত হয়েছিল।

শিশুমনের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলোকে বিকশিত করে তোলা এবং ভালো কিছু শেখানো অর্থাৎ নীতি উপদেশ শিক্ষা দেওয়া সব শিশু পত্রিকারই উদ্দেশ্য। তাই মুকুলে সবরকমের মজাদার গল্প, ছড়া, কবিতা, ধাঁধা, ছাড়াও কোন কোন রচনার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। উপেন্দ্রকিশোর তাঁর 'স্যান্ডো' নামক সচিত্র প্রবন্ধটির শেষে বালকদের স্যান্ডোর ন্যায় বলশালী হবার জন্যে উপদেশ দিয়ে বলেছেন—"প্রার্থনা করি, তোমরা স্যান্ডোর ন্যায় বলশালী হও, আর স্যান্ডোর চাইতে সেই বলের অধিকতর সদ্ব্যবহার কর।"

১৩০৭ বঙ্গাব্দ থেকে মুকুলে বালি[...] জন্যে একটি বিশেষ পৃষ্ঠা প্রকাশিত হয়েছিল [...] বালিকাদের জন্যে সহজ সেলাই, সহজ রান্না, [...] ধরনের খেলার নিয়ম ও হারমোনিয়ামের সহজ [...] স্বরলিপি থাকতো।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রা[...] গুপ্তের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে 'অঞ্জলি' [...] পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য স[...] সম্পাদক লিখেছেন—"এইখানি শিক্ষা বিষয়ক [...] পত্রিকা, বালক বালিকাদিগকে সুশিক্ষিত [...] ইহার প্রাণ। এই শিক্ষাদান কার্যে পিতামাতা [...] অভিভাবকদিগকে বিশেষত শিক্ষক ও ছাত্র[...] সাহায্য করা ইহার উদ্দেশ্য।" পৃষ্ঠা সংখ্যা [...] ২৫। এতে শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় [...] বর্ণশুদ্ধি, ইতিহাস, এটলাস শিক্ষা স[...] সদ্ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় ছাড়াও সমসাময়িক [...] সম্পর্কিত সংবাদও থাকতো এতে। ১[...] খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাঠ্য তা[...] প্রকাশিত হয়েছিল, কবে কোন পরীক্ষা গৃহীত [...] তারও সংবাদ থাকতো।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে স্কু[...] সোসাইটির পাঠ্যপুস্তক রচনা[...] মধ্য দিয়ে যে [...] সাহিত্যের সূচনা তা উনি[...] শতকের শেষার্ধে [...] পুস্তক এবং সাময়িক পত্রের মাধ্যমে বিকা[...] করে। বিংশ শতকে এই শিশুসাহিত্য তথা [...] পত্রের ধারা নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধতর হয়েছে। [...] শতকের শিশুমনও হয়ে উঠেছে অধিক [...] সন্ধিৎসু। তাদের মনে আজ নানা প্রশ্ন—[...] শিশুমনের এই জ্ঞানতৃষ্ণা অনুসন্ধিৎসার [...] যোগাতে বিংশ শতকের শিশু সাহিত্যিকরাও [...] সচেতন। ফলে পত্রিকাও বৈচিত্র্যসম্ভারে সমৃদ্ধ [...] উঠেছে। তবে বিংশ শতকের শিশুপত্রিকার [...] সমৃদ্ধির পেছনে উনবিংশ শতকের শিশু স[...] পত্রের দান অনস্বীকার্য।

গ্রন্থঋণ :—


(১) খগেন্দ্রনাথ মিত্র—শতাব্দীর শিশুসাহি[...] ১৯৫৮।

(২) বাণী বসু—বাংলা শিশুসাহিত্য গ্রন্থ[...] ১৩৭২।

(৩) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সা[...] পত্র—২য় খণ্ড ১৩৫১।

# বিজ্ঞান

## স্থানিক জ্যোতির্বিজ্ঞান কেন্দ্র কলকাতায়

**২৬ এপ্রিল ভারতের প্রথম স্থানিক জ্যোতির্বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্বোধন হলো কলকাতায়। উদ্বোধন করলেন বিশিষ্ট আবহাওয়া-বিজ্ঞানী এবং ভারত সরকারের আবহাওয়া দপ্তরের ডাইরেক্টর জেনারেল ডঃ পি কে দাস। এই উদ্যোগ ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা এবং তার প্রায়োগিক ক্ষেত্রকে যে সম্প্রসারিত করতে সাহায্য করবে, বলাই বাহুল্য।**

**প্রতিষ্ঠানটির ইংরাজী নাম দেওয়া হয়েছে 'পজিসনাল অ্যাসট্রোনমি সেণ্টার'। বাংলা পরিভাষা করলে যা দাঁড়ায় স্থানিক জ্যোতির্বিজ্ঞান কেন্দ্র। কেন্দ্রটির মূল লক্ষ্য হবে আধুনিক পদ্ধতিতে সূর্য, চন্দ্র, বিভিন্ন গ্রহ এবং নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয়। বছরের বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে দেখলে আকাশের সঠিক কোন কোন অঞ্চলে তাদের দেখা যাবে তার সঠিক বিবরণ নির্ধারণ করে পুস্তক হিসেবে প্রকাশ করা। এই বিবরণের মধ্যে সূর্যগ্রহণ, ধূমকেতুর আবির্ভাব এবং তার সঞ্চারপথ, বুধ, শুক্র প্রভৃতি গ্রহের স্থানিক অবস্থান—এমন অনেক কিছুই থাকবে। এই সব তথ্য জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় যেমন সাহায্য করবে, সেই সংগে নানা রকম বৈষয়িক ব্যাপারেও সাহায্য করবে যথেষ্ট। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নৌ-চালনা এবং বিমান-চালনা।**

বিমান-চালনার কথাই ধরা যাক। ইদানীং অবশ্য ভূপৃষ্ঠে অবস্থানরত বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে বেতার সংকেত পাঠিয়ে অথবা রেডারের সাহায্যে বৈমানিকরা তাঁদের গন্তব্য পথটি স্থির করে নেন। বোয়িং-৭৪৭-এর মত আধুনিক বিমানে আবার থাকে যন্ত্রগণক বা কম্পিউটার। স্বনিয়ন্ত্রিত এই যন্ত্রগণক নিজেই বিমানকে তার নিজস্ব গতিপথে চালনা করে। কিন্তু কখনও কখনও এমন অবস্থাও দাঁড়ায় যখন যন্ত্রগণক হয়ত ঠিক মত কাজ করলো না। অথবা রেডার বা ভূপৃষ্ঠে অবস্থানরত নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রের সংগে বেতার সংযোগকারী ব্যবস্থা বিকল হয়ে গেল। এমন অবস্থায় বৈমানিককে তার অবস্থান জানার জন্যে নির্ভর করতে হয় জ্যোতির্মণ্ডলের উপর। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ বা বিশেষ বিশেষ নক্ষত্রের অবস্থান জানতে হয় তখন। বিশেষ কোন নক্ষত্র, গ্রহ, সূর্য অথবা চন্দ্রের অবস্থান জেনে নিয়ে তাঁকে বুঝে নিতে হয় বিমান ঠিক কোন অঞ্চলের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে, কোন দিকে যাচ্ছে। অথবা যদি অবতরণ করার প্রয়োজন হয়, ঠিক কোন দিকে গেলে কাছাকাছি বিমান বন্দরে পৌঁছনো যাবে এ সব সম্পর্কে নানান তথ্য। এই তথ্যাবলী জানার ব্যাপারে সাহায্য করে স্থানিক জ্যোতির্বিজ্ঞান।

**যেমন ধরুন, কলকাতায় যখন রাত আটটা, ওই সময় বছরের কোন নির্দিষ্ট দিনে একটি আন্তর্জাতিক বিমান লণ্ডনের পথে যাত্রা করলো। চাঁদনী রাত। পরিষ্কার আকাশ। আটটার সময় কলকাতার বিমান বন্দর থেকে দেখা গেল, চাঁদ আকাশের একটি বিশেষ জায়গায় অবস্থান করছে। ওই সময় পাটনার আকাশে চাঁদের অবস্থান হবে ভিন্নতর। কলকাতা থেকে যাত্রা করার কিছুক্ষণ পর বিমানটি যদি পাটনার উপর দিয়ে উড়ে যায়, তখন সেখানকার আকাশে চাঁদের অবস্থান হবে অন্যরকম। ধরা যাক ওই সময় পাটনার আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে রয়েছে। জেট প্লেন। অতএব উড়ছে মেঘের উপর দিয়ে। মেঘের আবরণের দরুন বিমান বন্দরের আলোক সংকেত দেখা বৈমানিকের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ওদিকে ঝড়ের দরুন বিমান বন্দরের বেতার-সংকেত স্তম্ভ**

**পাচ্ছেন না। এমন অবস্থায় ইঞ্জিনে গোলযোগ দেখা দিল। পাটনা বিমান বন্দরে তাঁর নামা দরকার। কিন্তু কী করে বৈমানিক বুঝবেন কোথায় বিমান বন্দর? তখন একমাত্র অবলম্বন চাঁদ, কোন গ্রহ অথবা নক্ষত্র। বৈমানিক তাঁর চার্ট দেখে বুঝে নেবেন, ঠিক ওই সময় চাঁদ বা নির্দিষ্ট গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান কোথায়। সেই অবস্থান জানা থাকলে তিনি বুঝতে পারবেন, ঠিক কোন ভৌগোলিক অঞ্চল দিয়ে তিনি উড়ে চলেছেন। চাঁদ বা গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান দেখে পাটনা বিমান বন্দরের অবস্থানও তিনি বুঝে উঠতে পারবেন। এবং সেই মত নির্বিঘ্নে নামিয়ে আনতে পারবেন তাঁর বিমান পাটনা বিমান বন্দরে।**

শুধু বিমানই নয়, প্রতিদিন বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের আকাশে সূর্য, চন্দ্র এবং বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র কখন কোথায় অবস্থান করছে সে সব জানা গেলে জাহাজীরাও জানতে পারেন সাগর এবং মহাসাগরের কোথায় তাঁরা অবস্থান করছেন। বলা বাহুল্য, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান যত সূক্ষ্মভাবে জানা যাবে বিমান এবং জাহাজের অবস্থান জানাও তত নির্ভুল হবে। জানা যায় জোয়ার-ভাটার সময় এবং সেই জোয়ার-ভাটা কোন জায়গায় কতক্ষণ চলবে তার হিসেব। জানা যায় বিভিন্ন অঞ্চলে সূর্য এবং চন্দ্রের উদয়-অস্তের সময়। কোথাও গরমের সময় হয়ত ফুটবল খেলা হবে। ওই সময় সেখানে সূর্যের আলো কোন বরাবর বেশি বা প্রত্যক্ষভাবে পড়বে জানা যায়। এ তথ্য স্টেডিয়ামের পরিকল্পনা করতে সাহায্য করে।
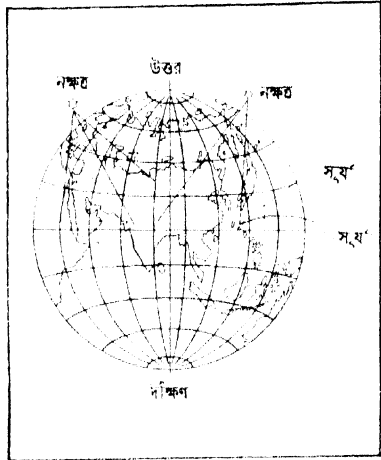
রকেট উৎক্ষেপণ এবং মহাকাশযানের সঞ্চারপথ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান জানা দরকার। আমরা যখন পথ চলি, তখন আমাদের চোখের সামনে থাকে নানা রকম নিশানা। দিনের দিকে সূর্যের অবস্থান দেখে বুঝতে পারি কোন দিকটা উত্তর, দক্ষিণই বা কোন দিকে। অথবা পথের পাশে আছে ঘরবাড়ি, আলোক স্তম্ভ অথবা গাছপালা। এদের নিশানা ধরে আমরা গন্তব্য পথকে চিনে নিই। কিন্তু রকেট এবং মহাকাশযানের কথা ভাবুন। পৃথিবী উর্দ্ধাকাশে ওঠার পর কীভাবে তারা গন্তব্য পথ ধরে এগিয়ে যাবে?

এক্ষেত্রেও স্থানিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভূমিকা অনিবার্য। রকেট বা মহাকাশযানে থাকে যান্ত্রিক চোখ। মহাকাশে উৎক্ষেপণের পর পৃথিবী থেকে সংকেত পাঠিয়ে চলমান রকেট এবং মহাকাশযানকে এমনভাবে পাশ ফিরিয়ে দেওয়া হয় যাতে সেই যান্ত্রিক চোখগুলি মহাকাশে নির্দিষ্ট কয়েকটি (কম করে তিনটি) নক্ষত্র এবং গ্রহের দিকে চেয়ে সঞ্চারপথ ধরে এগিয়ে যায়। ওই নক্ষত্র এবং গ্রহরাই তখন নিশানা হিসেবে কাজ করে। নক্ষত্র অথবা গ্রহের পারস্পরিক অবস্থান যদি নিখুঁতভাবে জানা থাকে

**এন সি লাহিড়ী। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার ছিল পরিকল্পনা। এন সি লাহিড়ী প্রায় একক ব্যক্তি হিসেবে সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করেছেন। অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল এফিমেরিস এবং নটিক্যাল এফিমেরিসের উপর তাঁর দীর্ঘ এবং অনলস উদ্যম পজিসনাল অ্যাসট্রোনমি সেণ্টার স্থাপনে সাহায্য করেছে**

তা হলে রকেট বা মহাকাশযান নির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করা যায়।

বছরের বিভিন্ন সময়ে সূর্য, চন্দ্র এবং বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র আকাশে কখন কোথায় অবস্থান করে এমন তথ্য আবহাওয়াবিজ্ঞানীদের কাছেও মূল্যবান। পৃথিবীর বুকে ঋতুর পরিবর্তন হয়। এক এক ঋতুতে অঞ্চল বিশেষে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানও পালটায়। প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাঁদের দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের সাহায্যে এটা যে সত্যি, তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা জানতেন, আকাশের কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে কোন নির্দিষ্ট নক্ষত্র যখন দেখা যায়, পৃথিবীর বুকে তখন আসে বর্ষা। আকাশের নির্দিষ্ট অঞ্চলে অপর কোন নির্দিষ্ট গ্রহ বা নক্ষত্র দেখা দিলে আসে শীত। এর অর্থ এই নয়, বিশেষ বিশেষ নক্ষত্র আকাশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে থেকে পৃথিবীর বুকে ঋতুর পরিবর্তন ঘটায়। ব্যাপারটা আসলে সময়ের মত। যে যে সময়ে তারা বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে আবির্ভূত হয়, ওই ওই সময় আগমন ঘটে এক-একটি ঋতুর। অতএব আকাশে নক্ষত্রাবলীর অবস্থান যদি সূক্ষ্মভাবে জানা যায়, কোন সময়ে কী ধরনের আবহাওয়া হবে সে সম্পর্কে অনুমান করা যেতে পারে (পরিবেশ দূষণের দরুন কিছু কিছু ব্যতিক্রম অবশ্য ঘটে)।

এ ছাড়া আরও একটি বিষয়ের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। সামাজিক এবং ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের জন্যেও মানুষ সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রের উপর নির্ভর করে। তারা আকাশে কখন, কোথায় এবং কী পর্যায়ে অবস্থান করছে তার উপর নির্ভর করে তৈরী হয় পঞ্জিকা। পঞ্জিকায় দিন ক্ষণ, তিথি প্রভৃতি উল্লিখিত হয়। মুশকিল এই, ধর্মীয় এবং প্রথাগত ভিন্নতার দরুন এইসব তিথি এবং দিনক্ষণ গণনার ব্যাপারে দেশ এবং সম্প্রদায় বিশেষে নানা রকম পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। এক সময় আমাদের দেশেও ছিল নানা রকম পঞ্জিকা। এখনও আছে। এইসব পঞ্জিকার মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করা দরকার। এক্ষেত্রেও স্থানিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

নাম অ্যাগিপ্টোপিথেকাস। দাঁতালো এই বানর জাতীয় প্রাণী আজ থেকে প্রায় তিন কোটি বছর আগে পৃথিবীর বুকে বিরাজ করত। সম্প্রতি মিশরের কাছাকাছি সাহারা মরুভূমির একটি অঞ্চলে ওই প্রাণীর চোয়ালের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। সেই জীবাশ্মের উপর নির্ভর করে নর্থ ক্যারোলিনার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা ওই প্রাণীর একটি পূর্ণাবয়ব ছবি এঁকেছেন। ছবিটি উপরে দেখান হলো। নিচে বাঁ দিকে পুরুষ বানরের দাঁত। ডান দিকে স্ত্রী বানরের দাঁত। পুরুষের দাঁত মেয়েদের চেয়ে বড়। পুরুষ এবং স্ত্রীদের দাঁতের এই পার্থক্য দেখে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন, ওই প্রাণীদের পুরুষরাই হয়ত শত্রুর হাত থেকে নিজেদের সমাজকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছিল। এবং বানর জাতীয় ওই প্রাণী মানুষের পূর্বপুরুষ।

শেষোক্ত ব্যাপারটি নিয়ে এ দেশে যাঁরা গভীরভাবে চিন্তা করেন এবং পঞ্জিকা সংশোধনের জন্যে পুরোধা হিসেবে কাজ করছেন বা করেছেন, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা তাঁদের মধ্যে অন্যতম। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস এবং নৃতত্ত্ব সম্পর্কে অধ্যাপক সাহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। তিনি দেখেছিলেন, এদেশে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সময় নির্ধারণ একটা বড় রকমের সমস্যা। কারণ, এক এক সময়ে এবং অঞ্চল বিশেষে একাধিক পঞ্জিকার চল ছিল। তাদের সাল তারিখ এক-এক ক্ষেত্রে এক-এক রকম। অধ্যাপক সাহা চেয়েছিলেন, এদেশে এমন একটি পঞ্জিকা তৈরি হোক যার সাহায্যে প্রাচীন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনার সন-তারিখ সেই অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

অধ্যাপক সাহার উদ্যোগে ভারত সরকার ১৯৪৫ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক পঞ্জিকা বা অ্যাসট্রোনমিক্যাল অ্যালমানাক এবং নৌ-পঞ্জিকা বা নটিকাল অ্যালমানাক তৈরির জন্যে একটি কমিটি তৈরি করেন। উদ্দেশ্য, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জ্যোতিপদার্থ-বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় সাহায্য করা। পরে ১৯৫২ সালে তৈরী হলো 'ক্যালেন্ডার রিফর্ম' কমিটি বা পঞ্জিকা পুনর্গঠন কমিটি। এই কমিটির সভাপতি হন অধ্যাপক সাহা স্বয়ং। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। কারণ তিনিও বুঝেছিলেন, দেশে এমন একটি পঞ্জিকা থাকা দরকার যা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ধর্মীয় এবং সামাজিক প্রয়োজনে কার্যকর হয়।

তাঁরই উদ্যোগে তৈরী হলো নতুন জাতীয় পঞ্জিকা। ১৯৫৪-৫৫ ইংরাজী বছর থেকে। শুরু হলো শকাব্দ গণনা। ওই বছরকে ধরা হলো ১৮৭৬ শকাব্দ। ধরা হলো চৈত্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ পৌষ, মাঘ এবং ফাল্গুন—এরা প্রত্যেকটি হবে ৩০ দিনের মাস। বৈশাখ, জ্যেষ্ঠ, আষাঢ় শ্রাবণ এবং ভাদ্রের প্রত্যেকটি মাস ৩১ দিনের হবে। সূর্য যেদিন মহাবিষুব অতিক্রম করবে তার পরদিন থেকে শুরু হবে নতুন বছর। ইংরাজী সাল ধরলে এই দিনটি হবে ২০ মার্চ। এছাড়া এই কমিটি ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে জাতীয় পঞ্জিকা এবং নৌ-পঞ্জিকা প্রকাশের কথাও অনুমোদন করেন।

প্রথমে এই প্রকাশনার কাজ শুরু হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অভ নিউক্লিয়ার ফিজিকস-এ। এ কাজে অধ্যাপক সাহার প্রধান সহকারী হিসেবে এগিয়ে এলেন স্বর্গত এন সি লাহিড়ী। ক্যালেন্ডার রিফর্ম কমিটির সদস্য এবং সেক্রেটারি হিসেবে তিনি যোগ দেন। পরে এই কমিটি ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের একটি শাখা হিসেবে কাজ করতে শুরু করে। এন সি লাহিড়ী এই শাখাটির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

১৯৫৮ সালের পঞ্জিকা এবং নৌ-পঞ্জিকা প্রকাশিত হলো। তারপর থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এন সি লাহিড়ী ঘনিষ্ঠভাবে এ কাজে লিপ্ত ছিলেন। ১৯৭০ সালে সরকারী চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর এ কাজের ভার নিলেন শ্রীঅমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। পজিসন্যাল অ্যাসট্রোনমি সেন্টারের এখন তিনি ডিরেক্টর। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৭৬ সালে ডঃ রাজা রামান্না কমিটি তৈরী হয়। এই কমিটি স্থানিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সিদ্ধান্তে আসেন : এই শাখাটির একটি পরিপূর্ণ বিভাগ হিসেবে কাজ করা উচিত। সেই সিদ্ধান্ত এখন কাজে পরিণত হলো।

পঞ্জিকা এবং নৌ-পঞ্জিকা তৈরির ব্যাপারে সারা পৃথিবীতে কাজ করছে মোট সাতটি দেশ। ভারত, যুক্তরাজ্য (ইউ কে), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত দেশ, ফ্রান্স, স্পেন এবং জাপান। জাপান ছাড়া সারা এশিয়ায় ভারতই একমাত্র দেশ যেখানে তার নিজস্ব ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্জিকা তৈরির কাজ হচ্ছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক এবং নৌ-পঞ্জিকা। এই পঞ্জিকার উপর বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, ইরান ইরাক, সৌদি আরব, তাইল্যান্ড, বার্মা, পাকিস্তান এবং আফ্রিকার কয়েকটি দেশ সহ এবং আরও কয়েকটি দেশের আবহাওয়া দপ্তর নির্ভর করে। এ ছাড়া আমাদের দেশের যে যে সংস্থা এই পঞ্জিকার সাহায্য নিয়ে থাকে তাদের মধ্যে আছে ভারতীয় সামরিক বিমান বহর, ভারতীয় সমর বিভাগ, ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জ্যোতিপদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক মানমন্দির, জনসাধারণের জন্যে যাঁরা পঞ্জিকা তৈরি করেন তাঁরা, জাতীয় ভৌত গবেষণাগার, ইনডিয়ান এয়ার লাইনস, এয়ার ইনডিয়া, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার, পর্যটন দপ্তর, রেল, পোস্ট এব টেলিগ্রাফের মাইক্রোওয়েভ বিভাগ প্রভৃতি।

এই প্রতিষ্ঠান ভারতের বিভিন্ন শহরের মাসিব আকাশ-চিত্রও তৈরি করে থাকেন। এই আকাশ-চিে ওই শহরের আকাশে সূর্য, চন্দ্র, বিভিন্ন গ্রহ এব উল্লেখযোগ্য নক্ষত্রাবলীর অবস্থান দেখানো হয়ে থাকে।

*

পজিসনাল অ্যাস্ট্রোনমি সেন্টার উদ্বোধন করতে গিয়ে ভারতের আবহাওয়া দপ্তরের ডিরেকটা জেনারেল ডঃ পি কে দাস বললেন, গত পঁচিশ বছ ধরে আমরা যে পঞ্জিকা প্রকাশ করেছি তার তথ্যা বলীর জন্যে প্রায় পুরোপুরিই আমাদের নির্ভ করতে হয়েছে ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের তথ্যের উপর আমাদের দেশে এখন কমপিউটারের সুযোগ এসেছে এবার দেখতে হবে এ ক্ষেত্রে আমরা যেন আত্মনির্ভ হতে পারি। কোন কারণে বিদেশী তথ্যাবলীর অভা ঘটলে আমাদের কাজ যাতে না বাধা পায়, সে দেখা দরকার।

ডঃ দাস বলেন, 'গাণিতিক মডেল দাঁড় করি বহু ক্ষেত্রে আমরা স্থানিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয় সিদ্ধান্ত নিই। ওই সব সিদ্ধান্ত নিয়মিত পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে যাতে প্রমাণিত হয়, তার ব্যবস্থা আমাদের করা দরকার।' এর জন্যে যেসব আধুনি যন্ত্রপাতি এবং কমপিউটার দরকার ডঃ দাস সে পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করবেন বলেও প্রতিশ্রু দেন।

"কিন্তু যেটা সবচেয়ে [illegible] প্রয়োজন", দাস বলেন, "এ ধরনের উদ্যো[illegible] অর্থবহ করতে গে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিজ্ঞানীদের সমবেত সহযোগি দরকার। তবেই একটি বড় রকম উত্তরণ ঘটা সম্ভ এই সহযোগিতা শুধু কাগজে-কলমে হলে চল না। এর জন্য দরকার প্রত্যক্ষভাবে মেলামেশা এ মতামত বিনিময়। আলোচনাচক্র, ওয়ার্কশ বিভিন্ন গবেষণাগারের বিশেষজ্ঞদের মাঝে মা অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে এই কাজটি করা যেতে পারে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলে সাহা ইনসটিটিউট অভ নিউক্লিয়ার ফিজিক অধ্যাপক অজিতকুমার সাহা। অধ্যাপক সাহা বলে পঞ্জিকা এবং নৌ-পঞ্জিকা তৈরির ব্যাপারে বিদে তথ্যাবলীর উপর নির্ভর না করে আমাদের নিজ পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে।

এই কেন্দ্র বিমানচালকদের জন্যে বিমা পঞ্জিকা তৈরির কাজেও সম্প্রতি হাত দিয়েছে বিমান চলার সময় প্রতি দশ মিনিট অন্তর যাত্রাপা আকাশে কখন কোথায় সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র অবস করবে এই পঞ্জিকায় তা দেখান হবে।

সমরজিৎ কর

# রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের অজ্ঞাত তথ্য

প্রশান্তকুমার পাল

'জীবনস্মৃতি'র সূচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে—তাহা কোন-এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা।.... ইহাকে জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার চেষ্টা হিসাবে গণ্য করিলে ভুল করা হইবে।' অথচ রবীন্দ্রজীবনী রচনা করতে গিয়ে এতাবৎকাল আমরা সেই ভুলই করে এসেছি। 'জীবনস্মৃতি'কে স্মৃতিচিত্র ও সাহিত্যের সামগ্রীরূপে স্বীকার করেও তার মধ্যে জীবনবৃত্তান্ত হিসেবে যে তথ্যগুলি পরিবেশিত হয়েছে, সেগুলিকে আমরা নির্বিচারে গ্রহণ করে নিয়েছি এবং নানা পণ্ডিতজনের পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা সেই পথেই অগ্রসর হয়ে এসেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা অতিরিক্ত তথ্য যোজনা করেই ক্ষান্ত হয়েছে; রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত তথ্যগুলির যাথার্থ্য নিরূপণ করতে অগ্রসর হয়নি। আর যেটা সবচেয়ে বেশি অবহেলিত হয়েছে, সেটি হচ্ছে ঘটনাগুলির যথার্থ কাল-নিরূপণের দিকটা—যার ফলে রবীন্দ্রনাথের চিত্তবিকাশের স্তর-পরম্পরাটি ঠিকমতো অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির হিসাবের খাতাগুলি আমাদের খুবই সাহায্য করতে পারে।

ঠাকুরবাড়ির সেরেস্তায় জমিদারী-সংক্রান্ত হিসাবপত্রের সঙ্গে পারিবারিক হিসাবপত্রও নিখুঁতভাবে রক্ষিত হত 'নিজ হিসাবের ক্যাশবহি' নামে খাতায়। প্রতি বাংলা নববর্ষে একটি করে নতুন খাতার সূচনা করা হত এবং প্রায় প্রত্যেক দিন বাংলা তারিখ, বার ও ইংরেজি তারিখ পাতার উপরে লিখে সেদিনের আয়ব্যয় পাই পয়সার হিসাবে রক্ষিত হত। আমাদের সৌভাগ্যবশত এই খাতাগুলির অধিকাংশ মহাকালের ভ্রূকুটি এড়িয়ে অত্যন্ত যত্নে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনের সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত হতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের অনেকের জীবনী রচনার ক্ষেত্রে খাতাগুলির মূল্য অপরিসীম। এ থেকে যেসব তথ্য সংগ্রহ করা যায় তাতে এই সব জীবনীর অনেক জ্ঞাত তথ্য যাচাই করে নেওয়া যায়, অনেক তথ্য সংশোধন করা যায়, এবং অনেক অজ্ঞাত তথ্য যোজিত হতে পারে। 'দেশ'-এর পাঠক-পাঠিকারা 'কবিপত্নী মৃণালিনী' ও 'ভারতীর ক্যাশবই ও গ্রাহকতালিকা' প্রবন্ধে যেসব হিসাবের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, সেগুলি এই জাতীয় হিসাব খাতা থেকেই সংগৃহীত।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন শিশুবয়সে তাঁদের দেখাশোনার জন্য যে চাকর নিযুক্ত ছিল, তার নাম শ্যাম। 'জীবনস্মৃতি'তে তার একটি নিখুঁত বর্ণনাও পাওয়া যায়—'শ্যামবর্ণ দোহারা বালক মাথায় লম্বা চুল, খুলনা জেলায় তাহার বাড়ি' ['ছেলেবেলা'র বর্ণনায় তার বাড়ি যশোর]। এই চাকরটিই রবীন্দ্রনাথকে গণ্ডিবন্ধনে আবদ্ধ করে রাখত। এমন কথা আমরা তাঁর কাছ থেকেই জেনেছি। কিন্তু হিসেবের খাতায় এই চাকরটির প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ১৩ শ্রাবণ ১২৭৬ [২৭ জুন ১৮৬৯ খৃঃ] তারিখে 'দ্বিপেন্দ্র ও অরুণেন্দ্রবাবুর চাকর' রূপে, 'সেই সময় সোমেন্দ্র ও রবীন্দ্রবাবুর চাকর ঈশ্বর দাস।' অবশ্য একথা মনে করা সঙ্গত হবে না যে চাকরদের পরিচিতি সর্বদা এইরকম বিশেষ বিশেষ বাবুর সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকত। হিসাব খাতায় দেখা যায় অনেকেরই বদলি হয়েছে এক বাবুর দায়িত্ব থেকে অন্য বাবুর দায়িত্বে, কিন্তু শ্যাম দাসকে কখনোই রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত দেখা যায় না, কেবল কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁর স্কুলের বেতন শ্যামের মারফৎ জমা হওয়া ছাড়া। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তাকে 'ছোট কর্তা' বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় আট বছরের ছেলেকে সীতাহরণের ভয়

চাকরকে আমরা 'জীবনস্মৃতি'র মাধ্যমে অবশ্য বিস্তারিতভাবেই জানি ['ছেলেবেলা'য় তার নাম ব্রজেশ্বর, ক্যাশবহিতে এ নামের কাউকে পাওয়া যায় না] তার অহিফেন-সেবনের অনুপান হিসেবে দুগ্ধপিপাসায়, বালকদের আহারাদির ব্যাপারে তার যৎপরোনাস্তি কৃপণতায়, তার ছুৎমার্গী আচার আচরণে এবং গ্রাম্য পাঠশালার ভূতপূর্ব গুরুমহাশয় হওয়ার সুবাদে মর্যাদা-গম্ভীর চালচলনে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-কথিত এই ঈশ্বর দাস ছাড়াও আরও বহু চাকরবাকরের অধীনে তাঁর বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়েছে। ১২৭১ বঙ্গাব্দের [১৮৬৪-৬৫ খৃঃ] হিসাবের খাতায় ২২ জ্যৈষ্ঠ [৩ জুন ১৮৬৪] তারিখে—রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সবে তিন বছর পূর্ণ হয়েছে—তাঁর প্রথম চাকরের সন্ধান পাওয়া যায়, যে-তারিখে 'সোমেন্দ্রনাথ/রবীন্দ্রনাথবাবুর/চাকর/কালিদাস' মাসিক সাড়ে তিন টাকা হিসেবে সাত টাকা বেতন পেয়েছে। [এর আগের তিন বছরের 'নিজ হিসাবের ক্যাশবহি' নামের খাতাগুলি পাওয়া যায়নি]। এছাড়া ৪ ভাদ্র ১২৭২ 'নন্দের চাঁদ', ৭ শ্রাবণ ১২৭৫ 'দ্বারি দাস', ১২ বৈশাখ ১২৭৬ 'গোবিন্দ দাস', ৭ বৈশাখ ১২৭৭ 'হরিদাস' ও ১০ ফাল্গুন ১২৭৮ 'নবীনদাস' সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের চাকর হিসেবে বেতন পেয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এদের মধ্যে গোবিন্দ দাসের কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন 'ছেলেবেলা'-য় —'বেঁটে কালো গোবিন্দ কাঁধে হলদে রঙের ময়লা গামছা ঝুলিয়ে আমাকে নিয়ে যায় স্নান করাতে।' খুব বেশি দিন কাজ করা অবশ্য তার ভাগ্যে ঘটেনি —১২৭৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাস ও চৈত্র মাসের ২৫ দিন কাজ করার পরই তার জবাব হয়েছে—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখনীর স্পর্শ পেয়ে সে চিরকালের মানুষ হয়ে গেছে, তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল কাজ করেও অনেকেরই সে সৌভাগ্য ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথ-কথিত অন্যান্য দাসদাসীর মধ্যে প্যারীদাসী বা 'পিয়ারী'-র সাক্ষাৎ আমরা হিসাব-খাতায় পাই—সেখানে সে কর্ত্রীঠাকুরাণী অর্থাৎ সারদাদেবীর খাস চাকরানী—বেতন মাসিক দু'টাকা। বালকদের জামায় পকেট যোজনা করা অনাবশ্যক গণ্য করত যে 'নেয়ামত খলিফা'—সেও নিয়মিত কর্মচারীদের মধ্যেই গণ্য হত—রবীন্দ্রনাথের শৈশবে এই কাজ করত যে, তার নাম 'মোজাফর খলিফা'।

'জীবনস্মৃতি', 'ছেলেবেলা' প্রভৃতি স্মৃতিকথামূলক রচনায় পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির ব্যাপারে তাঁদের দৈন্যদশার কথা রবীন্দ্রনাথ বহুবার বহুভাবে লিখেছেন। কিন্তু 'নিজ হিসাবের ক্যাশবহি'র সাক্ষ্য ভিন্ন ধরনের। সেখানে দেখা যায়, ২৪ পৌষ ১২৭১ [৬ জানুয়ারি ১৮৬৫] 'রবিবিন্দ্রবাবুর ইজের ১২টা' বারো আনাতে যেমন কেনা হয়েছে তেমনি ১৪ অগ্রহায়ণ [২৮ নভেম্বর ১৮৬৪] 'রবিন্দ্রনাথবাবুর ১২টা ইজের তৈয়ারি' করতে তিন টাকা পনেরো আনাও খরচ করা হয়েছে। আবার ৮ বৈশাখ ১২৭২ [১৯ এপ্রিল ১৮৬৫] 'রবীন্দ্রবাবুর পিরান ১২টা'-খাতে দু'টাকা দশ আনা ব্যয় হলেও ১৮ চৈত্র ১২৭১ [৩০ মার্চ ১৮৬৫] 'রবিইন্দ্রনাথবাবুর ১২টা পীরান'-খাতে খরচের পরিমাণ পাঁচ টাকা সাড়ে পাঁচ আনা। জামা এবং প্যান্টের কাপড়ের গুণগত মান ও সেগুলিতে পকেট ছিল কি-না সে-সম্পর্কে আমাদের পক্ষে কিছু বলা সম্ভব না হলেও একই সংখ্যক ইজের ও পিরানের দামের পার্থক্যটুকু বুঝিয়ে দেয় আটপৌরে ও পোশাকী দু'রকমের জামাকাপড়ের আয়োজন তাঁর জন্যে ছিল এবং যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। সূক্ষ্মদর্শী পাঠককে তারিখগুলিও লক্ষ করতে বলি; এত কম সময়ের ব্যবধানে এত বেশী সংখ্যক জামাপ্যান্টের আয়োজন কী 'এতই যৎসামান্য ছিল যে এখনকার ছেলের চক্ষে তাহার তালিকা ধরিলে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে?' তা ছাড়া ২১ চৈত্র ১২৭২ [২ এপ্রিল ১৮৬৬] 'কামিজ তৈয়ারি'র জন্য 'নয়ানসুক' কাপড়ও কেনা হয়েছে; বারো আনা দিয়ে 'রবিন্দ্রনাথবাবুর ১ জোড়া' 'বিনামা' [জুতো] খরিদও করা হয়েছে ১৪ অগ্রহায়ণ [২৮ নভেম্বর ১৮৬৪] তারিখে। পাঠকদের বিরক্তির ভয়ে কেবল ১২৭১ ও ১২৭২ বঙ্গাব্দের খাতা থেকে উপরোক্ত হিসাবগুলি সংকলন করে দেওয়া হল। কিন্তু পরবর্তী সময়ের খাতাগুলির সাক্ষ্যও ভিন্নতর নয়। শুধু আশ্চর্য লাগে—এবং সে কথা রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—তাঁদের জন্য শীতবস্ত্রের কোনো আয়োজন নেই দেখে।

'জীবনস্মৃতি'র আর একটি মন্তব্যেরও—'বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোনোদিন কোনো কারণেই মোজা পরি নাই' ['অনেক সময় লেগেছিল পায়ে মোজা উঠতে'—'ছেলেবেলা'] —বিরোধিতা করে এই ক্যাশবহিগুলি। ২৪ পৌষ ১২৭১ [৬ জানুয়ারি ১৮৬৫] তারিখের হিসাবে স্পষ্ট লেখা আছে—'মোজা খরিদ/রবিন্দ্রনাথবাবুর/১ ডজন,' দাম লেগেছে সাড়ে তিন টাকা। সেই যুগের মূল্যমানের কথা স্মরণে রাখলে অনুমান করা যায় সেগুলির গুণগত মানও খুব খারাপ ছিল না, যে-যুগে বড়োবাবু দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্যও দু' জোড়া ধুতি কেনা হয় মাত্র ন'টাকায়। রবীন্দ্রনাথের বয়স এই সময়ে তিন বছর সাত মাস। এই খাতে পরবর্তী

ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমি—রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্কুল

যে বাচ্চারা পরে তাদের চেয়েও
দুর্দান্ত কাপড়!
বাচ্চার ইউনিফর্ম তৈরীর সময়
প্রত্যেক মায়েরই মনে পড়ে বিন্নীর
কথা! তা তো পড়বেই! এক শতাব্দীরও
বেশী হয়ে গেল বিন্নী তৈরী করে
চলেছে—দুর্দান্ত মজবুত কাপড়—ড্রিল,
কেসমেণ্ট, লংক্লথ, সেলুলার শার্টিং।
প্রত্যেকটিই তাঁর বাচ্চার মতই দুর্দান্ত!
মাঝে মাঝে তার চেয়েও দুর্দান্ত!
বিন্নী
ইউনিফর্ম তৈরীর কাপড়
CAS BC 22/79 B

ক্যাশবহীতেও [illegible] পাওয়া যায়। ৬ আশ্বিন ১২৭৪ তারিখে 'স্বর্ণকুমারীর জন্য ক্রয় ও সোমেন্দ্র রবীন্দ্র বাবুদিগের/মোজা ক্রয় করতে খরচ হয়েছে উনিশ টাকা দু' আনা, ২৪ পৌষ ১২৭৫ তারিখে 'সোমেন্দ্র রবীন্দ্র বাবুদিগের মোজা ২ ডজন' ক্রয় করা হয়েছে এগারো টাকা আট আনায়, ১১ ভাদ্র ১২৭৬ তারিখে 'সোমেন্দ্র ও রবীন্দ্রবাবু-দিগের মোজা ২ ডজন' বাবদ তেরো টাকা এবং ঐ বৎসরেরই ১৫ ফাল্গুন 'রবী ও সোমবাবুদিগের মোজা ক্রয় এক ডজন' বাবদ সাড়ে পাঁচ টাকা খরচ দেখা যায় এবং ২০ পৌষ ১২৭৭ তারিখে দশ টাকা ছ' আনা খরচ করা হয় 'সোম রবীবাবুদিগের মোজা ২ ডজন' কেনবার জন্য। এই তারিখগুলির কোনোটিতেই রবীন্দ্রনাথ দশের কোঠা পার হননি।

দুই বিবরণের সম্মুখীন হয়ে যে প্রশ্ন মনে জাগতে বাধ্য তা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ এই সব আয়োজন সত্ত্বেও কেন অন্যরূপ লিখেছেন। এমন নয় যে, পোশাক-পরিচ্ছদের—বিশেষ করে মোজার—যথাযথ যোগান তাঁর শৈশবের ব্যাপার, পরবর্তীকালে যা স্বভাবতই তাঁর স্মৃতি থেকে স্খলিত হয়ে পড়েছে। একই ধরনের আয়োজন তাঁর সমগ্র বাল্যজীবনেই অনুসৃত হয়েছে, 'ক্যাশবহি'র সাক্ষ্যই তার প্রমাণ। জমিদার পরিবারের সন্তান হয়েও তাঁদের জীবনযাত্রা কত সাদাসিধে ছিল, সাধারণের কাছে সেটি প্রতিপন্ন করার জন্যই রবীন্দ্রনাথ এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন, এমন অনুমান অগ্রাহ্য। আমাদের অনুমান, অন্তঃপুরের স্নেহপ্রীতির শ্যামল জগত থেকে চাকরদের শাসনদগ্ধ মরুপ্রান্তরে নির্বাসিত সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল এই বালকের আন্তরিক ক্ষোভ তাঁর মনে এক সর্বব্যাপী বঞ্চনার ধারণা বদ্ধমূল করে দিয়েছিল, যে ধারণার কাছে বাস্তব প্রাপ্তিগুলিও তুচ্ছ বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। এরূপ মনে হওয়ার আরও কিছু কারণ থাকতে পারে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রথম পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মাত্র এক বছর দু' মাসের ছোটো ছিলেন। সত্যপ্রসাদ-সোমেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ এই ত্রয়ীর পাশাপাশি দ্বিপেন্দ্রনাথের জন্যও পোশাক-পরিচ্ছদ ও জুতো-মোজা কেনা হয়েছে, কিন্তু তাদের পরিমাণে ও গুণমানে পার্থক্য যথেষ্ট। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ৪ শ্রাবণ ১২৭৫ [১৮ জুলাই ১৮৬৮] তারিখের হিসাবে দেখি—'সোমেন্দ্র ও রবিন্দ্রবাবুদিগের বিনামা ২ জোড়া দং ১৫ আষাঢ় আনা হয়' দু' টাকা এগারো আনা তিন পয়সা দিয়ে, কয়েকদিন বাদে ৭ শ্রাবণ [২১ জুলাই] তারিখে দেখা যায়—'দ্বিপেন্দ্রবাবুর বিনামা ক্রয় (সাহেবের দোকান হইতে)' দাম সাত টাকা চার আনা। পার্থক্যটি খুবই দৃষ্টিকটু, এবং সেটির সমর্থন পাওয়া যায় দ্বিতীয় হিসাবটির পাশে পেন্সিলে লেখা একটি মন্তব্য থেকে—'এত মূল্য দেওয়া কর্তামহাশয়ের অভিপ্রেত কিনা জানি না'। এই সব কারণেই বালক রবীন্দ্রনাথের নিজেকে অবহেলিত ও বঞ্চিত মনে করা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। 'জীবনস্মৃতি' লেখবার সময় এই অবহেলা ও বঞ্চনা-টুকুই তাঁর মনে ছিল, বাস্তব তথ্যগুলি স্মৃতির চালুনির বড়ো বড়ো ফাঁক দিয়ে গলে পড়ে গেছে, তাই এই বিভ্রান্তি।

রবীন্দ্রজীবনের প্রথম পর্বে সর্বাপেক্ষা প্রশ্ন-সংকুল অংশ তাঁর বিদ্যাশিক্ষা সংক্রান্ত প্রসঙ্গ-সমূহ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "তখন 'কর' 'খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, 'জল পড়ে পাতা নড়ে।'.........ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।" অনেক পণ্ডিতব্যক্তি এই 'জল পড়ে পাতা নড়ে'র উৎস খুঁজে বের করার জন্য বহু চিন্তা ও পরিশ্রম ব্যয় করেছেন, কেন-না ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রণীত 'বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ'-এ শব্দগুলিকে 'জল পড়িতেছে।/পাতা নড়িতেছে।'—এই সাদামাঠা গদ্যরূপেই পাওয়া যায়, মিল ও ছন্দে একে 'আদি-[illegible]

কোনো কারণ নেই। এই দুটি গ্রন্থের ব্যবহার ক্যাশবহিতে সহজেই লক্ষ্য করা যায়। কারণ ২৪ পৌষ ১২৭১ [শুক্রবার ৬ জানুয়ারি ১৮৬৫] তারিখের হিসাবে 'ছেলেবাবুদীগের বহিখরিদ' খাতে দু'খানা বর্ণপরিচয়ের জন্য দু' আনা ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা'র জন্য তিন আনা খরচ করা হয়েছে, অর্থাৎ এই দুটি গ্রন্থের মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাশিক্ষার সূচনা হয়েছিল। 'বর্ণ-পরিচয়'-এর 'জল পড়িতেছে।/পাতা নড়িতেছে' পাঠই তিনি আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু ভাবী মহাকবির 'সমস্ত চৈতন্য' গদ্যের এই সাদাসিধে রূপেরই অন্তরে নিহিত ছন্দটুকু আবিষ্কার করে নিয়ে গদ্যের ঘটমান বর্তমানকে কবিতায় নিত্য বর্তমানে পরিণত করেছে।

এর পরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'তাহার পরে যে-কথাটা মনে পড়িতেছে তাহা ইস্কুলে যাওয়ার সূচনা। একদিন দেখিলাম, দাদা এবং আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় সত্য ইস্কুলে গেলেন, কিন্তু আমি ইস্কুলে যাইবার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইলাম না।....ইহার পূর্বে কোনোদিন গাড়িও চড়ি নাই, বাড়ির বাহিরও হই নাই, তাই সত্য যখন ইস্কুল-পথের ভ্রমণ-বৃত্তান্তটিকে অতিশয়োক্তি-অলংকারে প্রত্যহই অত্যুজ্জ্বল করিয়া তুলিতে লাগিল তখন ঘরে আর মন কিছুতেই টিঁকিতে চাহিল না।.... কান্নার জোরে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে অকালে ভর্তি হইলাম।' 'ক্যাশবহি'র প্রদত্ত সাক্ষ্য কিন্তু অন্য কথা বলে। এমন হতে পারে সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদকে স্কুলে ভর্তি করার প্রস্তাব ও গাড়িতে চড়ে প্রত্যহ তাঁদের বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনার সৌভাগ্য শিশু রবীন্দ্রনাথের মনে ঈর্ষা-জনিত ক্রন্দনের বেগ উপস্থিত করেছিল, কিন্তু তাঁরা স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন এক সঙ্গে একই তারিখে। আর স্কুলটির নামও 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি' নয়,—'কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমি। 'ক্যাশবহি'তে ২৬ চৈত্র ১২৭১ [শুক্রবার ৭ এপ্রিল ১৮৬৫] লেখা হয়েছে—

'পড়িবার খরচ খাতে/খরচ—৬,
বঃ কলিকাতা ট্রেণিং একাডিমী
দঃ রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরের/মার্চ্চ মাহার/১ বিল০
—১ ডিপোজিট—১
সোমেরিন্দ্রনাথ ঠক/মার্চ্চ মাহার/১ বিল—১/
ডিপোজিট—১
বাবু: সত্যপ্রসাদ গঙ্গাপাধ্যায়/মর্চ্চ মাহার/
১ বিল০—১ /ডিপাজিট—১'

—তিনজনের ক্ষেত্রেই ডিপোজিটের উল্লেখ প্রমাণ করে যে তিনজনে এক সঙ্গেই স্কুলে ভর্তি হন। লক্ষণীয়, মার্চ মাসের বেতন জমা দেওয়া হয়েছে ৭ এপ্রিল তারিখে; এর থেকে অনুমান করা যায়—মার্চ মাস থেকে নয়—এপ্রিল মাস থেকেই তাঁরা স্কুলে যাওয়া শুরু করেন। এর স্বপক্ষে অন্য প্রমাণ এই যে আগের দিনের হিসাবেই দেখা যায় 'ছেলে-বাবুদীগের ৩ জোনের জন্য ইস্কুলের কেতাপ খরিদ ৩ খানা' খাতে ছ' আনা ব্যয় করা হয়েছে। রবীন্দ্র-নাথের বয়স তখন তিন বছর এগারো মাস। [এই তথ্য সর্বপ্রথম লোকসমক্ষে প্রকাশ করেন শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব 'পক্ষিরাজ' পত্রিকার ১৩৮৫ বঙ্গাব্দের শারদ-সংকলনে।]

কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমিতে স্কুলের পড়া শুরু হলেও এখানে অবস্থান-কাল খুব দীর্ঘ নয়। এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই ও আগস্ট মাসের বেতন যথাযথ পরিশোধ করা হয়েছে—'ক্যাশবহি'তে তার উল্লেখ আছে। ১৭ কার্তিক ১২৭২ [বুধবার ১ নভেম্বর ১৮৬৫] 'সত্যপ্রসাদবাবুর সোমবাবু ও রবিবাবুর মাহিনা' তিন টাকা শোধ করা হয়েছে [কোন মাসের উল্লেখ করা হয়নি, সম্ভবত সেপ্টেম্বর মাসের, 'বঃ কলিকাতা কলেজ' লেখা হয়েছে—স্পষ্টতই তা ভুল], কিন্তু একই তারিখে আর একটি খরচও লেখা হয়েছে—

'পড়িবার খরচ খাতে/খরচ—২।
বঃ গোবিন্দচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়
গবর্নমেণ্ট পাঠশালা
[দঃ] সত্যপ্রসাদবাবু,
সোমেন্দ্রবাবু ও রবিন্দ্রবাবুর
তিনজানার ইস্কুলের
অক্টবরমাহার
৩ বিল—২।'

[প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত গোবিন্দচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ছিলেন গবর্মেণ্ট পাঠশালা বা নর্মাল স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, যিনি রবীন্দ্রনাথকে 'উচ্চ অঙ্গের সুনীতি সম্বন্ধে' কবিতা লিখে আনতে আদেশ করেছিলেন।]

—এই হিসাব থেকে অনুমান করা যায়, সেপ্টেম্বর মাসে পুজোর ছুটির পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাজীবনে কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমি-পর্ব সমাপ্ত হয়েছিল এবং ছুটি শেষ হবার পর গবর্মেন্ট পাঠশালা বা কলিকাতা নর্মাল স্কুল-পর্ব আরম্ভ হয়েছিল ১২৭২ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাস বা নভেম্বর ১৮৬৫ থেকে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন চার বছর ছ' মাস মাত্র।

উপরে প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, রবীন্দ্র-নাথের প্রথম শিক্ষাক্ষেত্র হিসেবে 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি' এতদিন পর্যন্ত যে গৌরব লাভ করে এসেছে এখন থেকে সে গৌরবের অধিকারী হবে 'কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমি', যার তৎকালীন ঠিকানা ছিল ১৩নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট এবং বর্তমানে স্কুলটি ১৩নং ডাঃ নারায়ণ রায় সরণি [সিমলা স্ট্রীট] ঠিকানায় শ্রীমানী বাজারের ঠিক পিছনে অবস্থিত। স্কুল পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে এই-টুকু অনুমান করতে পারি যে, ছোটো ছোটো শিশুদের পক্ষে জোড়াসাঁকো থেকে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের দূরত্ব সম্ভবত খুবই বেশি মনে করা হয়েছিল, যেখানে নর্মাল স্কুল ছিল প্রায় বাড়ির পাশেই, যদিও যাতায়াতের জন্য 'ইস্কুল গাড়ী'র বন্দোবস্ত ছিল, যার '৪টা ইস্পীরিং মেরামতি'র জন্য তিন টাকা খরচ করা হয়েছে ৪ পৌষ ১২৭২ [১ জানুয়ারি ১৮৬৬] তারিখে।

প্রসঙ্গত, কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমির ইতিহাস একটু অনুসন্ধান করা যেতে পারে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, মাধবচন্দ্র ধাড়া [ধর ?] পতিতপাবন সেন, গঙ্গাচরণ সেন, যাদবচন্দ্র পালিত এবং বৈষ্ণবচরণ [বৈষ্ণবদাস ?] আঢ্য প্রসিদ্ধ ধনী শ্যামাচরণ মল্লিকের সহায়তায় 'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজের দক্ষিণে তখন বিখ্যাত ধনী শংকর ঘোষের একটি বৃহৎ জরাজীর্ণ বাড়ি ছিল। বাড়িটির তৎকালীন মালিক খেলাতচন্দ্র ঘোষের কাছ থেকে মাসিক ৫০ টাকা ভাড়ায় বাড়িটি নিয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুলটির নাম প্রথমে ছিল 'মেট্রোপলিটান ট্রেনিং স্কুল', পরে নাম পরিবর্তন করে 'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল' রাখা হয়। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস থেকে স্কুলটিতে শিশু বিভাগ খোলা হয়, বেতন ধার্য হয় মাসিক এক টাকা। এই বছরের ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাসাগরকে সভাপতি, ঠাকুরদাস চক্রবর্তীকে সম্পাদক, মাধবচন্দ্র ধাড়াকে কোষাধ্যক্ষ এবং পূর্বতন সভ্যদের সঙ্গে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি কয়েকজন নূতন সভ্য নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। কিছুদিন পরে একটি অপ্রীতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে কমিটির সদস্যদের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হলে ঠাকুরদাস চক্রবর্তী পদত্যাগ করে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমি' নামে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অল্পদিন পরে মাধবচন্দ্র ধাড়াও তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। ট্রেনিং স্কুল নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে 'মেট্রোপলিটান স্কুল' নাম গ্রহণ করে। [তথ্যগুলি 'বিদ্যাসাগর কলেজ শতবর্ষ

সারদিকা গ্রন্থ'-এর অন্তর্ভুক্ত শ্রীসুরেশপ্রসাদ নিয়োগী লিখিত মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউসনের ইতিহাস/আদিপর্ব' প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত। ]

'ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমি' প্রতিষ্ঠার তিন বছর পরে রবীন্দ্রনাথ এই বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণীতে ভর্তি হন। কয়েক মাসের মধ্যেই এই স্কুলে তাঁর ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলেও, অন্যভাবে ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে স্কুলটির যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির আনুকূল্যে ও নবগোপাল মিত্রের প্রবর্তনায় প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেলা বা জাতীয় মেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাতীয় সভা বা ন্যাশনাল সোসাইটির বহু অধিবেশন এই ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সেখানে দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেক ভাষণ প্রদান করেছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানগুলির প্রত্যক্ষ কোনো যোগ ছিল না।

নর্মাল স্কুল বা গবর্নমেণ্ট পাঠশালা-পর্বই রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনের দীর্ঘতম পর্ব। এখানে তিনি কার্তিক ১২৭২ [ নভেম্বর ১৮৬৫ ] থেকে মাঘ ১২৭৮ [ ফেব্রুয়ারি ১৮৭১ ] পর্যন্ত পড়েছিলেন অর্থাৎ ছবছরেরও বেশি চার বছর ছমাস বয়স থেকে দশ বছর নমাস বয়স পর্যন্ত। নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে ১৭ জুলাই ১৮৫৫ তারিখে। এর উদ্দেশ্য ছিল বাংলা স্কুলের জন্য শিক্ষক-শিক্ষণের আয়োজন করা। প্রথমে সংস্কৃত কলেজের একাংশেই স্কুলটি বসত। পরে এটি উঠে আসে জোড়াসাঁকোতে চিৎপুর রোডের উপর শ্যামলাল মল্লিকের বাড়িতে। অবনীন্দ্রনাথ স্কুলটির একটি বর্ণনা দিয়েছেন 'জোড়াসাঁকোর ধারে' গ্রন্থে—নর্মাল স্কুলের বাড়িটিও ছিল কেমন রহস্যময়। প্রকাণ্ড রাজবাড়ি; তাতে কত অলিগলি, অন্দিসন্দি, এখানে ঘর, ওখানে খিলেন দেওয়া বারান্দা, মোটা মোটা থাম; তারই গায়ে দিনের আলো পড়ে চক্‌চক করত।'

নর্মাল স্কুলেও রবীন্দ্রনাথ শিশুশ্রেণীতেই ভর্তি হয়েছিলেন মাসিক বেতন ছিল বারো আনা। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে বেতন বেড়ে হয় মাসিক এক টাকা। স্কুলের পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা ক্যাশবহি থেকে করা সম্ভব হয় না, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কেবল 'পুস্তক খরিদ' শিরোনামায় খরচ দেখানো হয়েছে বলে। ২৩ শ্রাবণ ১২৭৬ [ ৬ আগস্ট ১৮৬৯ ] 'সোমেন্দ্র ও রবীন্দ্রবাবুর ফাস্ট বুক অফ রিডিং' [ প্যারীচরণ সরকার-প্রণীত ] ক্রয় ও বাঁধাই করা হয় আট আনা দু'পয়সা খরচে, ৩ পৌষ [ ১৭ ডিসেম্বর ১৮৬৯ ] 'পদার্থ বিদ্যা [ অক্ষয়কুমার দত্ত-প্রণীত ] ৩ খানা ও ওয়ানস এরিথমেটিক একসেট' এবং ১৯ মাঘ [ ৩১ জানুয়ারি ১৮৭০ ] 'বালকদিগের গ্রামার তিনখানা ও নিতীবোধ [ নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত ] তিনখানা' কেনা হয়—পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ এর বেশি পাওয়া যায় না।

গৃহশিক্ষক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'নর্মাল স্কুলের একটি শিক্ষক শ্রীযুক্ত নীলকমল ঘোষাল মহাশয়'-এর উল্লেখ ক্যাশবহিতে প্রথম পাওয়া যায় ১৫ অগ্রহায়ণ ১২৭৩ [ ২৯ নভেম্বর ১৮৬৬ ] তারিখে—'বাঃ নিলকমল ঘোষাল (বালকদিগের পণ্ডিত)/দং কার্তিক মাহার বেতন শোধ/ বিঃ এক ভাউচার ১০ টাকা'। এর থেকে বোঝা যায়, ১২৭৩ বঙ্গাব্দে কার্তিক মাস থেকে তিনি পড়াতে শুরু করেন এবং মাঘ ১২৭৮-এ যখন আকস্মিকভাবে রবীন্দ্রনাথদের বাংলাশিক্ষার অবসান তথা নর্মাল স্কুল পর্বের সমাপ্তি ঘটে, তখন পর্যন্ত তিনি এই কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। এমনকি তার পরেও দ্বিপেন্দ্রনাথ ও অরুণেন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক হিসেবে তিনি কাজ করেছেন। বৈশাখ ১২৭৫ থেকে তাঁর বেতন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় মাসিক বারো টাকা।

[illegible] নিযুক্ত হন ২৩ ফাল্গুন ১২৭৫ [ ৫ মার্চ ১৮৬৯ ] তারিখে; ১২ বৈশাখ ১২৭৬ তারিখের হিসাবে দেখা যায়—'ক অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়/ইং ২৩ ফাল্গুন না ৩০ চৈত্র/১।৮ রোজের ১০ টাকা হিং' বারো টাকা সাড়ে দশ আনা বেতন পেয়েছেন। মাসিক দশ টাকা বেতন মাঘ ১২৭৭ থেকে বেড়ে হয় পনেরো টাকা। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি', 'ছেলেবেলা' ও "অসম্ভব কথা" গল্পে এই শিক্ষকটিকে অমর করে রাখলেও আর-একজন শিক্ষক তাঁর স্মৃতিতে উপেক্ষিত থেকে গেছেন। ক্যাশবহিতে ২২ আশ্বিন ১২৭৫ [ ৭ অক্টোবর ১৮৬৮ ] তারিখের হিসাবে দেখা যায়—'খং রাখালদাস দত্ত/বালকদিগের ঘরে ইংরাজি পড়াইবার মাস্টার/দং উহার শ্রাবণ ভাদ দুই মাহার/বেতন শোধ ৬ টাকা হিঃ—/বিঃ এক বিল গঃ খোদ/রোক ১২ টাকা' অর্থাৎ এই রাখাল দত্তের কাছেই শ্রাবণ ১২৭৫ থেকে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী শিক্ষার সূচনা হয়েছিল। এর কার্যকাল অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি; ১২ বৈশাখ ১২৮৬-এর হিসাবে দেখি—'খং রাখালদাস দত্ত/দং পৌষ মাঘ ও ফাল্গুনে মাহার দুই রোজ ২/২ রোজে ' মাসিক ছ টাকা হিসেবে বারো টাকা ছ আনা তিন পাই বেতন শোধ করা হয়েছে অর্থাৎ ২ ফাল্গুন ১২৭৫ তারিখে যে কোনো কারণেই হোক তিনি কর্মচ্যুত হন এবং এর ঠিক একুশ দিন পরে এই কাজের দায়িত্ব নেন উক্ত অঘোরবাবু।

অঘোরবাবু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এই মেডিকেল কলেজের ছাত্রমহাশয়ের স্বাস্থ্য এমন অন্যায়রূপে ভালো ছিল যে, তাঁহার তিন ছাত্রের একান্ত মনের কামনা সত্ত্বেও একদিনও তাঁহাকে কামাই করিতে হয় নাই। কেবল একবার যখন মেডিকেল কলেজের ফিরিঙ্গি ছাত্রদের সঙ্গে বাঙালি ছাত্রদের লড়াই হইয়াছিল, সেই সময় শত্রু দল চৌকি ছুঁড়িয়া তাঁহার মাথা ভাঙিয়া ছিল। ঘটনাটি শোচনীয় কিন্তু সে-সময়টাতে মাস্টার মহাশয়ের ভাঙা কপালকে আমাদেরই কপালের দোষ বলিয়া গণ্য করিতে পারি নাই, এবং তাঁহার আরোগ্যলাভকে অনাবশ্যক দ্রুত বলিয়া বোধ হইয়াছিল।' ঘটনাটি ঘটেছিল ৭ শ্রাবণ ১২৮০ সোমবার [ ২১ জুলাই ১৮৭৩ ] তারিখে, [ দ্রঃ সোমপ্রকাশ, ১৫ খণ্ড ৩৭ সংখ্যা, ১৪ শ্রাবণ; বেঙ্গলী ১২ খণ্ড ৩০ সংখ্যা, ২৬ জুলাই ] রবীন্দ্রনাথ তখন বেঙ্গল একাডেমির ছাত্র। কিন্তু ক্যাশবহি আমাদের জানিয়ে দেয়, তাঁরা আরও একবার পনেরো দিন অঘোরবাবুর হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন ১২৭৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে, কারণ ৩ আষাঢ় ১২৭৭ [ ১৬ জুন ১৮৭০ ] তারিখের হিসাবে দেখা যায়—'অঘোর চট্টোপাধ্যায়/জ্যৈষ্ঠ মাহার ১৫ দিন কামাই/বাদে/১৫ দিনের বেতন শোধ—৫' টাকা; অবশ্য কি কারণে ছাত্রদের 'একান্ত মনের কামনা' সফল হয়েছিল সে-বিষয়ে ক্যাশবহি সম্পূর্ণ নীরব।

ক্যাশবহি থেকে আরও কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ধারণা করা যেতে পারে। 'নানা বিদ্যার আয়োজন' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, 'স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিলেই ড্রয়িং এবং জিমনাস্টিকের মাস্টার আমাদিগকে লইয়া পড়িতেন।' ৯ আশ্বিন ১২৭৬ [ ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৬৯ ] তারিখের হিসাবে দেখা যায়—'দং ছেলেবাবুদিগের জিমনাসটীক শিক্ষার কাষ্ঠ তৈয়ারির ব্যয়' মেটানো হয়েছে তিন টাকা দুআনা দুপয়সা। ১২ অগ্রহায়ণ [ ২৬ নভেম্বর ]-এর হিসাব 'দং বালকদিগের জিমনেসটিক শিক্ষার জন্য মাস্টারের বেতন আশ্বিন কার্ত্তিক দুই মাসের শোধ দিবার জন্য দেওয়া হইল—১২' টাকা। শিক্ষকের নাম এখানে না পেলেও বোঝা যায় ১২৭৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাস থেকে তাঁদের জিমনেস্টিক শেখা বা 'কাঠের ডাণ্ডার উপর ঘণ্টাখানেক ধরে শরীরটাকে উলটপালট' [ ছেলেবেলা ] করা শুরু। শ্যামচরণ ঘোষ অন্তত অগ্রহায়ণ মাস থেকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন, সে-কথা আমরা জানতে পারি ১৯ ভাদ্র ১২৭৭ [ ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭০ ] তারিখের হিসাব থেকে—'ক শ্যামচরণ ঘোষ/বং বালকদিগের জিমনেসটিক/শিক্ষার জন্য উহার বেতন/ইং মাহার শোধ...৫৪' টাকা। [ ইনি সেই সময়ে একজন নামকরা ব্যায়ামবীর হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। যোগেশচন্দ্র বাগল 'হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে লিখেছেন, 'মেলার আরম্ভ অবধি শ্যামচরণ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি কুস্তি-কসরৎ আদির জন্য প্রতি বারই পদক পুরস্কার পান। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের তৎকালীন ছোটলাট সর উইলিয়ম গ্রে শরীর-চর্চায় উৎকর্ষের জন্য মেলার পক্ষ হইতে তাঁহাকে একটি পদক প্রদান করিয়াছিলেন।' ] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কথিত উক্ত ড্রয়িং শিক্ষকের কোনো সন্ধান আমরা ক্যাশবহিতে পাই নি, যদিও তাঁর মেজ দাদা বীরেন্দ্রনাথকে ড্রয়িং শিক্ষা দেবার জন্য পেনসিল ও কাগজ ক্রয় এবং জনৈক ভবানীচরণ সেনকে শিক্ষক নিয়োগ করার সংবাদ আমরা এ থেকে লাভ করি।

১৬ পৌষ ১২৭৮ [ ৩০ ডিসেম্বর ১৮৭১ ] তারিখের একটি হিসাবে দেখা যায়, 'ছেলেবাবুদিগের ডাক্তারি শিখিবার জন্য/হাড় খরিদ' করতে খরচ হয়েছে ছটাকা দুআনা। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের একটি ছাত্রের কাছে কোনো এক সময়ে অস্থিবিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করিলাম। তা[illegible] দিয়া জোড়া একটি নরকঙ্কাল কিনিয়া আনিয়া আমাদের ইস্কুলঘরে লটকাইয়া দেওয়া হইল।' এই অভিজ্ঞতা 'কঙ্কাল' গল্পে সাহিত্যরূপ লাভ করেছে। কিন্তু বর্ণনাটিতে একটু ত্রুটি আছে। ক্যাম্বেল মেডিকে[illegible] স্কুল স্থাপিত হয় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে অথচ উপরের সংবাদ থেকে জানতে পারি অস্থিবিদ্যা শিক্ষা ১৮৭১-৭২ খৃষ্টাব্দের ব্যাপার। সুতরাং এক্ষেত্রে 'ছেলেবেলা'র বর্ণনা—'মেডিক্যাল কলেজের এক ছা[illegible] বসে আছেন মানুষের হাড় চেনাবার বিদ্যে শেখাবা[র] জন্যে'—অধিকতর নির্ভরযোগ্য। কিন্তু এই ছাত্রটিকে ক্যাশবহিতে সনাক্ত করা যায় নি।

উপরোক্ত সমস্ত বিবরণই রবীন্দ্রনাথের নর্মা[ল] স্কুল-পর্বের অন্তর্ভুক্ত। এই পর্ব কি কারণে আকস্মিক ভাবে সমাপ্ত হয়েছিল জীবনস্মৃতিতে প্রদত্ত ত[া] কৌতুকাবহ বর্ণনা আমাদের পরিচিত। ক্যাশবহির তা[illegible] বিশ্লেষণ করে আমাদের ধারণা, ঘটনাটি ঘটেছি[ল] ১২৭৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি [ ১৮৭[২] খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারির শেষে ]। ২৭ মাঘ (৮ ফেব্রুয়ারি) তারিখের হিসাবে দেখা যায়—'ছেলেবাবুদিগে[র] বিদ্যালয়ের ফেবরুয়ারি মাহার/ফি শোধ'—রবীন্দ্রনা[থ] সোমেন্দ্রনাথ, সত্যপ্রসাদ ও দ্বিপেন্দ্রনাথের এক টা[কা] করে ও অরুণেন্দ্রনাথের বারো আনা নিয়ে মোট চ[ার] টাকা বারো আনা খরচ করা হয়েছে, কিন্তু ৩০ ফাল্গু[ন] [ ১২ মার্চ ]। শুধু দ্বিপেন্দ্র অরুণেন্দ্রবাবুদিগে[র] বিদ্যালয়ের মার্চ মাহার ফি শোধ' বাবদে খরচ এক টা[কা] বারো আনা—রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ তিনজনের কো[নো] উল্লেখ নেই। এই বছর ফাল্গুন মাসের প্রথম দি[কে] মহর্ষি হিমালয়-ভ্রমণ শেষে কলকাতায় ফিরে আসে[ন] আর এর কিছুদিন আগে ঠাকুরবাড়িরই আথি[ক] সাহায্যে কিশোরীচাঁদ মিত্র-লিখিত দ্বারকানাথ ঠাকুর[ের] ইংরেজি জীবনী প্রকাশিত হয়। তার পরেই ২ বৈশা[খ] ১২৭৯ [ শনিবার ১৩ এপ্রিল ১৮৭২ ] তারিখে ক্যা[শ] বাহির হিসাব—'বিদ্যাভ্যাস খাতে/খরচ—১৫ু/বং Be[n]gal Academy দং সোম রবী ও সত্যপ্রসাদ/বাবুদিগে[র] মার্চ মাহার ফি শোধ/বিঃ ৩ বিল—৫ু হিঃ/গঃ ঈশ্বর দাস—১৫' রবীন্দ্রনাথদের স্কুল-জীবনের নূতন প[র্ব] শুরু হয়। যদিও মার্চ মাসের বেতন দেওয়া হয়ে[ছে] তবু মনে হয় এপ্রিল মাস থেকেই তাঁরা বেঙ্গ[ল] একাডেমিতে যেতে আরম্ভ করেছিলেন। লক্ষণ[ীয়] তাঁদের কোনো ভর্তি ফি দিতে হয় নি, হয়তো সে[-] রূপ কোনো নিয়ম ছিল না। কিন্তু একই তারি[খে] আর একটি হিসাবে দেখা যায়—'বং ডিকরুজ সা[হেব] Bengal Academy দং উহার জন্মতিথি উপলক্ষে ছোটবাবু মহাশয়ের [ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ] অনুমতিক্রমে সবস্কৃপসণ দেওয়া যায়/গঃ ঈশ্বর দাস—৬ু'। ভ[র্তি] ফি নেওয়ার নিয়ম না-ই থাকল, ডিকরুজ সা[হেব] অন্যভাবে তা পুষিয়ে নিতে জানতেন—রবীন্দ্র[নাথ] স্কুলের অধ্যক্ষ সম্পর্কে জীবনস্মৃতিতে যে ব[র্ণনা] দিয়েছেন এই হিসাবটি তার সঙ্গে যথেষ্ট সংগতিপ[ূর্ণ]।

# সাহিত্য

## 'বসন্তক' : ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যঙ্গপত্রিকা

তখন বয়স কম, সবেমাত্র স্কুল ছেড়ে কলেজে ভর্তি হয়েছি, অপরিণত, ভাগ্যবশে সামান্য একটা চাকরি পেয়ে গিয়েছিলাম বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে। যে টেবিলে আমাকে বসতে দেওয়া হয়েছিল ঠিক তার পাশেই স্তূপীকৃত ছিল ঊনিশ শতকের বহু বিখ্যাত সাময়িকপত্র। যেমন, ভারতী, বঙ্গদর্শন, বিবিধার্থ সংগ্রহ, সমাচার দর্পণ ইত্যাদি। হাতের কাছে অত পত্রিকা পেয়ে বাঁশ বনে ডোম কানার মতন অবস্থা। মড়মড়ে পাতা, খুব সাবধানে ওলটাতে হয়। এই স্তূপ থেকেই খুঁজে পেয়েছিলাম 'বসন্তক'-কে। বসন্তক বাংলা ভাষার ব্যঙ্গ পত্রিকা। ইংরেজী 'পাঞ্চ' পত্রিকার মতন। পাতা জোড়া সব কার্টুন—রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা কিছুই বাদ যায়নি বিষয় হিসাবে।

বসন্তকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটল বাংলা মুদ্রণের দুশ বছরের সময়। অবশ্য ইতিমধ্যেই জেনে নিয়েছি বসন্তকের অনেক ইতিহাস। 'বসন্তক' পত্রিকা মানে সেদিনের কলকাতার সমাজ চিত্র : পাল্কি ফিটন, মেম-সাহেবের হাত ধরাধরি চলন, ভাঙ্গারথ, মদ্যপানরত বাবু ইত্যাদি। পত্রিকার মলাটের কথাই ধরা যাক—তিলক কাটা মাথায় পাগড়ি বাঁধা টিকিওয়ালা পেটমোটা বামুন বসে আছে খালি গায়ে, একহাতে মোটা পৈতের গোছা ধরে, অন্য হাতে পুঁথি, মুখে বাঁকা হাসি। বামুনের বাঁ-দিকে কাক ডাকছে কা-কা। বামুনের অনেক পিছনে যেন আকাশের গায়ে ছাড়া ছাড়া ভাবে লেখা রয়েছে 'বসন্তক'। এটা শুরুর মলাট। শেষ মলাটেও ওই একই বামুন ঠিক যেন নাচের ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে। সামনে সুবেশা তরুণী অভিমানে মুখ ফিরিয়ে বসে। তলায় লেখা 'যদি দোষী হয়ে থাকি ক্ষম লো প্রিয়ে।' মলাটের পরিচয় থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না বসন্তক কি চরিত্রের পত্রিকা। চরিত্র সম্পর্কে আরও পরিষ্কার হওয়া যায় প্রতি সংখ্যার আরম্ভ-পৃষ্ঠার শিরোভূষণে সংস্কৃত শ্লোকটি দেখে—'নবপরিণয় যোগ্যাং স্বীয় হাস্যাক্ত যভুং মদ বিলাসিতনেত্রং চারুচন্দ্রার্ধ মৌলিং। বিগলিত ফণি বন্ধং মুক্ত বেশং শিবেশং প্রনমতি দীন হীন, কালকুটাভকণ্ঠং।'

'বসন্তক' প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮০ সালের বসন্ত পঞ্চমীর পর। চলেছিল দু বছর। প্রকাশের তারিখ, সম্পাদকের নাম ও সূচীপত্র কিছুই ছিল না। তবে বসন্তক নিজেই বলেছে, 'প্রতি ইংরাজি মাসের শেষে প্রকাশিত হইবে।'

'বিবিধার্থ সংগ্রহ'কে আমরা পেয়েছি পরিচ্ছন্ন ছাপা প্রথম সচিত্র পত্রিকা হিসেবে। বঙ্গদর্শন সাময়িক পত্রের ইতিহাসে রুচিশীল সাহিত্য পত্রিকা। জ্ঞানাঙ্কুর, সাধারণী ও মধ্যস্থ তখন বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে বিলাতী 'পাঞ্চ' পত্রিকার অনুকরণে সবেমাত্র জন্ম নিয়েছে 'হরবোলা ভাঁড়।' ১৮৫০ সালে 'ভেঁপো স্কেচ বুক' ভারতবর্ষে প্রথম প্রকাশিত ব্যঙ্গ-পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করলো জন ও'ব্রায়েন সন্ডার্স-এর পরিকল্পনায়। পর পর বাংলায় প্রকাশিত হতে শুরু হল, রহস্য সন্দর্ভ (১৮৬৫), বিদূষক (১২৭০), রসতরঙ্গ (১২৭৮) হরবোলা ভাঁড় (১৮৭৪) প্রভৃতি রঙ্গ-ব্যঙ্গের পত্রিকা। উল্লিখিত পত্রিকাগুলির মধ্যে কেবল মাত্র হরবোলা ভাঁড় ব্যঙ্গচিত্র সহ প্রকাশিত হয়। স্বল্পায়ু হরবোলা ভাঁড়ের ঠিক পরেই রঙ্গক্ষেত্রে আবির্ভাব হল বসন্তকের। রেখা ও লেখায় ঠিক যেন হরবোলা ভাঁড়ের কার্বন কপি। এদের মধ্যে কেবল মাত্র বসন্তকই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা সচিত্র ব্যঙ্গাত্মক মাসিক পত্রিকা।

সমসাময়িক কালের দর্পণ বসন্তক। বিশেষ ভাবে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কার্যকলাপ সম্পর্কে নানাবিধ সংবাদ ব্যঙ্গাকারে যেভাবে পরিবেশিত হত এমন অন্য অনত্র হয়নি, হবে না। ইংরাজ অপশাসনে জর্জরিত সমাজ ব্যবস্থা এবং তখনকার অসামাজিক কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনাও করেছে বসন্তক। ইংরেজের ধামাধরা বিশিষ্ট বাঙালী সমাজকে বসন্তক তার ব্যঙ্গচিত্র ও লেখার কশাঘাতে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। যে প্রচ্ছন্ন শক্তি বসন্তককে পরিচালিত করত তিনি হলেন প্রাণনাথ দত্ত। হাটখোলার দত্তবংশের সন্তান। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় তাঁর সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত। ১৮৭২ সালে প্রাণনাথ 'রহস্য সন্দর্ভ' পত্রিকার সম্পাদক হন। বেশি দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারেননি তিনি পত্রিকাটিকে। সেই বেদনার ফসল তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত সাচারু যন্ত্রালয় থেকে প্রকাশিত বসন্তক। অবশ্য পত্রিকাটি প্রকাশের পূর্বে তিনি হাইকোর্টে অনুবাদকের পদে নির্বাচিত হন। ইংরাজের দাসত্ব করাকে সম্মান-হানিকর মনে করে ওই পদ প্রত্যাখ্যান করেন। দু বছর প্রকাশিত বসন্তকে প্রাণনাথ নিজের নাম কোথাও ব্যবহার করেননি। তাঁর জমাদার হরি সিং-এর নামেই বসন্তকের কাজকর্ম চলত। প্রতি সংখ্যার জন্য মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল আট আনা।

প্রাণনাথ দত্ত

আমরা যে পেটমোটা বামুন ও সুবেশা তরুণীর কথা বলেছি এঁরা হলেন বসন্তক ঠাকুর ও তাঁর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী বাসন্তিকা। বসন্তক ঠাকুর তাঁর স্ত্রীর কাছে বসন্তক সম্পর্কে পরামর্শ চেয়ে এক জায়গায় বলেছেন, 'প্রিয়ে! ভাল কথাটা মনে করে দেখো! সহজেই আমাকে বিলাতী পাঞ্চের অনুকরণ বলা যায়, তাতে আবার বিলাতী চাল চেলে অনুকরণপ্রিয় বাঙালীদের পাছে ক্ষেপিয়ে তুলি এই ভয়েই চেষ্টা করে দেখছি যদি দেশীয় ভারগ্রস্ত—বাঙালীর মলিন মুখে মাসান্তেও একবার হাসি বার করতে পারি। তা, প্রিয়ে! তুমি দু-চারটা পরামর্শ দেও।' বাসন্তিকা স্মিত হেসে পরামর্শ দিলেন—'হো হো কোরে ভণ্ডামী না কোরে দেশের রীতি নীতির নকল দেখানো, কোন বিশেষ ব্যক্তির অপরাধ দেখিলেই ঢাক কাঁধে কোরো না, লোকের গুপ্ত কথায় কর্ণপাত করো না, সেটা ভদ্রলোকের কার্য নয় যে সকল বিষয়ে সাধারণের সম্বন্ধ আছে, তাহাই তোমার আলোচ্য তবে যদি সাধারণ বিষয়ের আলোচনায় কোন বিশেষ লোকের নিন্দা বা কটু উক্তি করিয়ো না, তাহা হইলে সকলেই রুষ্ট হইবেন ও ঘৃণা করিবেন।'

বসন্তক বাসন্তিকার কথায় কর্ণপাত না করে প্রথম সংখ্যায় '৬০০,০০০ মিউনিসিপেল ভোজবাজি' কার্টুনে কৃষ্ণদাস পালকে কালোরঙে এঁকেছিলেন। সাধারণী পত্রিকায় ক্ষোভের সঙ্গে এর প্রতিবাদ করে লেখা হয়—'মিউনিসিপাল বাজার বাজীতে বাজীকরের বাম পার্শ্বে কৃষ্ণকায় জাস্টিশকে ও-রূপ ঘৃণিত আকারে স্থাপিত করা ভাল হয় নাই।'

বসন্তকের প্রধান চিত্রশিল্পী ছিলেন প্রাণনাথ নিজেই। এছাড়া গিরীন্দ্রকুমার দত্ত ও গোপালচন্দ্র দত্ত মাঝে মাঝে ছবি আঁকতেন। কার্টুনগুলি ছিল অত্যন্ত শ্লেষাত্মক এবং শিল্পগুণসমন্বিত যার জন্য পাঠক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সহজেই। অনেক পাঠকের পত্রের উত্তরে বসন্তকে প্রকাশিত ছবির মাথা বড় কেন সে সম্পর্কে লেখা হয়—'...পত্র-প্রেরক মাথা বড় দেখে চটবেন না এর একটু কারণ আছে। যেমন শ্রীপঞ্চমীর সময় সাধারণ লোকে বোলে থাকে 'যদি বাঙালী না থাকতো এদেশে তবে তিল গজা গুড় শুটি কড়াই কোথায় খেতে পেতে।' সেই রকম আমরাও বলি 'যদি হেঁড়ে মাথা ছেড়ে দিয়ে ছবি লিখতে যাই তবে যশুরে কৈ মাছের মত চিনবে কিসে ভাই।' কশাঘাতের মত উদ্ধৃত ছিল বসন্তকের রচনারীতি। প্রশংসা এবং নিন্দা দুই জুটেছে বসন্তকের কপালে। যেমন মধ্যস্থ বিরূপ হয়ে লিখেছিল—বসন্তক ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া ইতরের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন দেখিয়া আক্ষেপ হয়। বিশেষ আমরা বসন্তকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, বসন্তক এ রূপে ইতরের উপাসনা না

হাইকোর্টে নতুন জজসাহেব

করিয়া বাসন্তিকা শ্রুশ্রুপাদের সেবা করুন, জীবিকা-নির্বাহ না হয় মহন্তের উপাসনা করুন, তাহতে না হয় উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করুন।' বসন্তককে সহ্য করা দায়। তার উদ্ধত লেখনি থেকে কেউ রেহাই পায়নি। খুব যত্ন সহকারে পত্রিকাটি দেখলে বোঝা যায় তখনকার সমাজব্যবস্থার কোনো ত্রুটিই বসন্তকের চোখ এড়ায়নি। তার তীক্ষ্ম দৃষ্টির নমুনা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি থেকে জানা যায়।

১। বঙ্গীয় কবিরাজের আসন মাইকেল মধুসূদন দত্তের মরণে শূন্য হওয়াতে আধুনিক বিধাতা বঙ্গদর্শন তাহাতে হেমচন্দ্রকে অভিষিক্ত কোরেছেন।

২। রায় দীনবন্ধু মিত্রের পরলোকগমনে দুই-চারজন ধামাধরা বিদ্যামোদী তাঁর নাটকগুলিকে পোড়াবার লায়েক বোলে বেড়াচ্ছেন ও বঙ্গ-রঙ্গভূমি হস্তিপণ্ডাননের নাটকাভিনয়ে রগরগে হয়েছে।

৩। নূতন ফৌজদারী আইন শুনে ম্যাজিস্টেট-গণ চতুর্ভুজ হয়ে 'হা মা কা' (হাতে মাথা কাটা) হুকুম জারী কোরেছেন।

৪। অনাবৃষ্টি বশত অজন্মা হওয়াতে গরীব প্রজাদের পক্ষে ১২৮০ সাল চোকর শাল কাষ্ঠের কার্য্য করিয়াছে ও কতকগুলি কনট্রাক্টরের পক্ষে কাশ্মীরী শালের যোড়া হয়েছে।

৫। ইংরাজ ও আসান্টিগণের সহিত সংগ্রামে কাঁচা ও বন্দুকের মধ্যে কাহার শক্তি অধিক তাহা অপ্রমাণিত হয়েছে।

৬। অশ্লীলতা নিবারণী সভার সংস্থাপন হয়ে অশ্ব গর্দ্দভ শৃগাল চড়াই পাখী প্রভৃতি বেয়াদবী করণে নিবৃত্ত হয়েছে।

৭। বন্ধ্যা বধূ সকলের পুত্রোৎপাদনার্থ হিন্দু ধর্মানুসারে নানা ভোগে প্রতিপালিত পবিত্র স্বভাব ধার্মিকবর রাজা মাধবচন্দ্র গিরি নামক তারকেশ্বরের মোহন্তকে বিনাপরাধে পুরাতন বদমাইস বোলে তিন বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ ও ঘানিটানার হুকুম হইয়াছে ও তাঁর বাবা তারকেশ্বর রাঙা মুখ ইংরাজ দেখে ভয়ে চুপ করে আছেন। ইত্যাদি।

সামাজিক, রাজনৈতিক উভয় বিষয় অবলম্বনে বসন্তকে নিয়মিত ব্যঙ্গ রচনা ও চিত্র প্রকাশ হত।
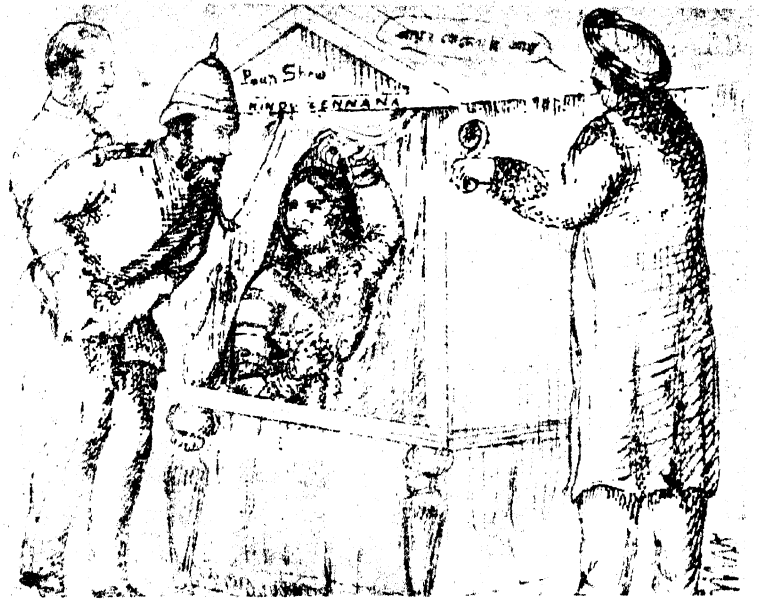
এ পিপ শো

একবার কৃষ্ণদাস পাল সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করে-ছিলেন—'হাঁ হে, তোমাদের দোয়াতে যত কালি ছিল সবই কি আমার গায়েতে ঢেলেচ।' —জিজ্ঞাসা করবার কারণ হল, কৃষ্ণদাস তখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সম্পাদক, অনেক সময় দেখা যেত কৃষ্ণদাস প্রজা-সাধারণের পক্ষ গ্রহণ না করে গবর্নমেন্টের পক্ষ সমর্থন করতেন। বসন্তক কৃষ্ণদাস পালকে নিয়ে একাধিক কার্টুন প্রকাশ করে। একটি ছবিতে দেখা যায় কৃষ্ণদাস স্যার রিচার্ড টেম্পলের পালিত কুকুর। কৃষ্ণদাস এই নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই হয় তো তার দেহকে কাল করে আঁক হত। তবে কৃষ্ণদাসকে চিনতে অসুবিধ হয় না—আড়াআড়িভাবে কুঞ্চিত চাদরখানি সর্বদা তাঁর কাঁধে থাকতো। বিভিন্ন চিত্রে কৃষ্ণদাসকে বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা যায়। মনে হয় দু বছর বসন্তকে সব চেয়ে বেশি লাঞ্ছিত হয়েছেন কৃষ্ণদাস। জানা যায় কৃষ্ণদাসের সঙ্গে প্রাণনাথের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল।

বসন্তকের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল তখনকার সমাজব্যবস্থা। তবে সরাসরি আক্রান্ত হয়েছে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি ব্রাহ্মসমাজ এবং অশ্লীলতা নিবারণী সভা। ব্যঙ্গ রচনা ও চিত্রে স্যার স্টুয়ার্ট হগ, কৃষ্ণদাস পাল, রিচার্ড কৌচ, বঙ্কিম-চন্দ্র ও বিদ্যাসাগর প্রমুখ ব্যক্তিরা আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মিঃ হগকে দেখান হয়েছে বরাহ অবতাররূপে। কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ার-ম্যান মিঃ হগ (বরাহ)-এর দুটি দাঁতের উপর কল-কাতার উন্নতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যথা—ট্রাম-ওয়েজ, ড্রেনেজ, বাজার ও ট্যাক্স। কলকাতা কর্পোরেশনকে নিয়ে একটি চমৎকার কার্টুন 'ড্রেনেজ হওয়াতে ছাতার নূতন ব্যবহার।' এই কার্টুনে দেখান হয়েছে, একটি ঘোড়ার গাড়ি ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে চলেছে, রাস্তা কাদাজলে পরিপূর্ণ, ঘোড়ার পায়ের কাদাজল ছিটকে পথিকের গায়ে লাগছে। এদিকে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি ঝরছে এ অবস্থায় পথিক বৃষ্টির জলে মাথা না বাঁচিয়ে ছাতা দিয়ে কাদাজল আটকাচ্ছেন।

'হাইকোর্টের নূতন আসবাব' কার্টুনে স্যার রিচার্ড কৌচ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হলে, বসন্তক তখনকার বিচার-ব্যবস্থার সুন্দর প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছে এই ব্যঙ্গচিত্রে। একটি চার-পায়া কৌচের যদি দুটি পায়া ভেঙে যায় তা হলে কৌচের যেমন অবস্থা হয় তেমনি ইংরেজ শাসনকালের বিচার ব্যবস্থাও মুখ থুবড়ে পড়েছিল। এই কার্টুনে তৎকালীন ইংরাজ রাজত্বের বিচার প্রহসনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বসন্তকের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গচিত্র হল 'দি বুল অ্যান্ড দি ফ্রগ', হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙা এবং এ পিপ শো। তবে ভোট ভিক্ষা, অশ্লীলতা নিবারণী সভা, ৬০০.০০০ মিউনিসিপেল ভোজবাজি যাজে সাত লাক ২ ইত্যাদি কার্টুনগুলিও ছিল উল্লেখমানের।

দি বুল অ্যান্ড দি ফ্রগ কার্টুনে বিদ্যাসাগরকে ষাঁড় এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে (বঙ্গদর্শন) ব্যাঙ এভাবে আঁকা হয়। এই কার্টুনটি প্রকাশের কারণ হিসাবে জানা যায় যে ১২৮০ সালের আষাঢ় মাসের বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র 'বহু বিবাহ' প্রবন্ধে
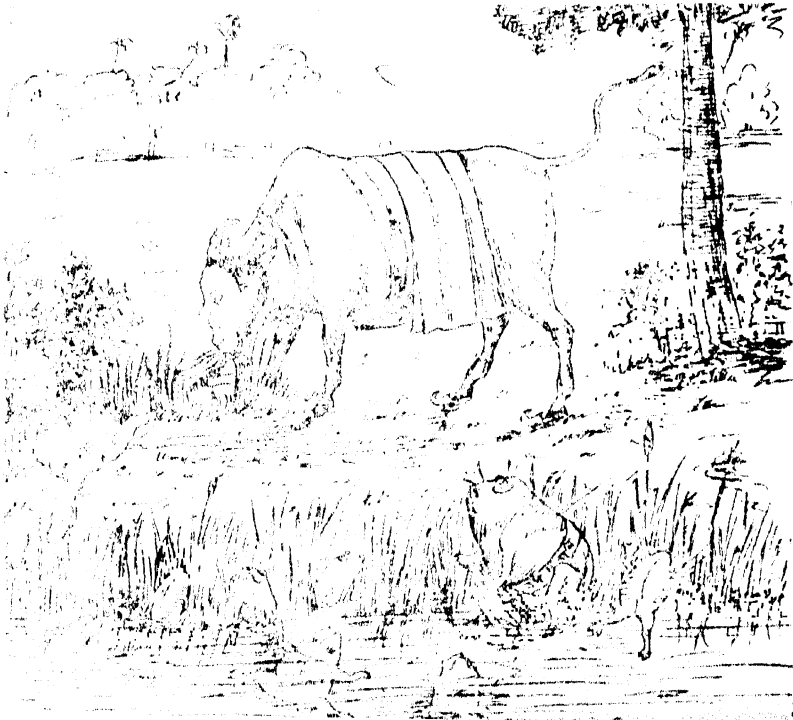
না এতদ্বিষয়ক বিচার—দ্বিতীয় পুস্তক'-এর কঠোর সমালোচনা করেন। এই সমালোচনা তখন বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। অসংখ্য বিদ্যাসাগর ভক্তদের ব্যথিত করেছিল বঙ্কিমের এই সমালোচনা। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং উত্তরকালে তাঁর প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণের সময় সমালোচনার আপত্তিকর অংশ বিশেষ বর্জন করেছিলেন। বঙ্গদর্শনের সমালোচনায় সে সময় মধ্যস্থ, হালিসহর পত্রিকা মুখর হয়ে ওঠে।

কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত ভারত-আশ্রমের একটি লজ্জাজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙা' ব্যঙ্গচিত্রটি ছাপা হয়। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' থেকে জানা যায় হরনাথ বসু সপরিবারে ভারত আশ্রমে বসবাস করতেন। তাঁর আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি ফলে দেনাদার হয়ে পড়েন। আশ্রমের অধ্যক্ষ বার বার তাগাদা দিয়েও পাওনা আদায় করতে পারেননি। অগত্যা হরনাথ বসু স্ত্রী-পুত্রকে শ্বশুর-বাড়িতে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। পত্নী বিনোদিনী একদিন আশ্রম ত্যাগের সময় আশ্রমের অধ্যক্ষের আদেশে চাকরেরা তাঁর গাড়ি আটক করে। পাওনা টাকা না দিয়ে তাঁকে আশ্রম ছেড়ে যেতে দেওয়া হবে না। বিনোদিনী নিজেকে অপমানিত বোধ করলেন এবং নিজের গা থেকে গয়না খুলে দেন। তারপর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় হরনাথ বসু উত্তেজিত হয়ে ব্রাহ্ম-বিরোধী পত্রিকায় বিনোদিনীর নাম সহ ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করেন। এই সুযোগে অন্যান্য পত্রিকাগুলি ব্রাহ্ম সমাজ তথা কেশবচন্দ্রকে নাস্তানাবুদ করে তোলে। কেশবচন্দ্র সাপ্তাহিক সমাচারের বিরুদ্ধে মামলা করেন। পরে অবশ্য এই মামলা আপোসে নিষ্পত্তি হয়। এই ঘটনায় ভারত আশ্রমের ভিতরের ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়।

প্রিন্স অব ওয়েলস (সপ্তম এডওয়ার্ড) ১৮৭৫ সালের তেইশ ডিসেম্বর কলকাতায় এলে তাঁকে কলকাতাবাসী বিপুল সম্বর্ধনা জানায়। এই সময় ভবানীপুরের মুখার্জী পরিবারের মেয়েরা বাড়ির বাইরে বকুলতলায় এসে প্রিন্সকে-মালা চন্দনে চর্চিত

কলকাতার বড়দিন

করেন। এই ঘটনায় তখনকার সব কাগজ মুখার্জী পরিবারের সমালোচনায় মেতে উঠেছিল। বসন্তকও বাদ যায়নি।

অশ্লীলতা নিবারণী সভাকে ব্যঙ্গ করে একাধিক ব্যঙ্গচিত্র, ব্যঙ্গ কবিতা ও রচনা বসন্তকে প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৭৩ সালে Society for the suppre-ssion of Public obseinity in India স্থাপিত হয়। কেশবচন্দ্র সেন কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তি এর উৎসাহী সভ্য ছিলেন। বাংলায় অনেক বিখ্যাত কাব্য ও গদ্য গ্রন্থকে অশ্লীল বলে বর্জন করার পক্ষে জনমত গঠন করাই অশ্লীলতা নিবারণী সভার অন্যতম কাজ। এই সভাকে ব্যঙ্গ করে বসন্তকে প্রকাশিত কার্টুনে ছাগল, বানর, গাধা, এমনকি শিব-কালীকেও বস্ত্রাবৃত করা হয়েছে। ছবির নীচে লেখা—'অশ্লীলতা নিবারণী সভার একজন সভ্যের বাটির কালী। কলিকাতায় অশ্লীলতা নিবারণী সভা হওয়াতে কি কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে।'

আর একটি ব্যঙ্গচিত্রে 'ভোট ভিক্ষা'র ঘটনাটিও চমৎকার। স্যর রিচার্ড টেম্পলের শাসনকালে নূতন নূতন মিউনিসিপাল বিলে করদাতাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এই প্রসঙ্গে কার্টুন সহ হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গ কবিতাটি প্রকাশিত হয়। কবিতার কিছু অংশ উদ্ধৃত দেওয়া যেতে পারে :—

সেলাম টেম্পল চাচা আচ্ছা মজা নিলে,  
ভোজং দিয়ে ভোটিং খুলে মিউনিসিপাল বিলে॥

ফ্যাক্ট বলি, সহর জুড়ে ভারী আড়ম্বর।  
অ্যাকট জারি হবে নূতন পয়লা সেপ্টেম্বর॥  
ইত্যাদি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর এই দুষ্প্রাপ্য ব্যঙ্গ-পত্রিকায় যে সব ব্যঙ্গ রচনা ও চিত্র প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সে সময়ের উপযোগী করেই লেখা ও আঁকা। কিন্তু সেই কার্টুন, সেই রচনা আজকের সমাজের জন্যও প্রযোজ্য। 'ক্রেনেজ হওয়াতে জাতার নূতন ব্যবহার' এখনকার কলকাতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যবহার করা যায়। একশ বছর পূর্বে আমরা যে তিমিরে ছিলাম আজও সেই তিমিরে। নির্ভীক সাংবাদিকতার দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে বসন্তককে। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার চোখরাঙানি সর্বোপরি বৃটিশ রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে বসন্তক তার নীতিতে ছিল অবিচল। কিন্তু দু বছরেই বসন্তকের মৃত্যু ঘটলো, এই স্বল্পায়ু জীবনে বসন্তক যেন বাংলা সাময়িক জগতকে একটি হাসি-খুশি দামাল ছেলের মত মাতিয়ে রেখেছিল। এই মরণশীল সাময়িক জগতে বসন্তক নিজের গৌরবে ভাস্বর হয়ে আছে। পত্রিকাটির বর্তমান অবস্থা যা তাকে রক্ষা করতে না পারলে আমাদের ভবিষ্যত বংশধরেরা একবার চোখের দেখাও দেখতে পাবে না।

সুনীল দাস

পরের ধনে পোদ্দার নাচ

# ফেডারেশন কাপের খেলা আতঙ্ক জাগিয়ে রাখল

গত ১৮ এপ্রিল ইডেনে ফেডারেশন কাপের উদ্বোধন দিনের খেলার শেষে দর্শকদের হাতে হাতে মশাল দেখে যারা ভেবেছিলেন ওটা অহিংস আনন্দ উৎসবের অঙ্গ তাদের ভুল ভাঙতে দেরি হয়নি। আসলে প্রথম দিনেই জ্বলে উঠেছিল বিদ্বেষের আগুন।

যে খেলাটিকে কেন্দ্র করে গ্যালারিতে গ্যালারিতে খবরের কাগজের মশাল জ্বালানো হয়েছিল সে খেলাটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং এবং গোয়ার ভাসকো স্পোর্টিং ক্লাব। ভাসকো অবশ্যই উন্নত ধরনের ফুটবলে এবং গতির চমকে দর্শকদের কিছু আনন্দ দিয়ে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কাছ থেকে একটি পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়েছিল। খেলাটি শেষ হয়েছিল ২—২ গোলে এবং সবাই জানেন শেষ মুহূর্তে একটি গোল করে মহমেডান স্পোর্টিং সেদিন হার বাঁচিয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি, যে মহমেডান স্পোর্টিং ঢাকঢোল পিটিয়ে এবার যথেষ্ট শক্তিশালী করে দল গড়েছে প্রথম খেলায় তাদের ভাবমূর্তিও একটু ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

গোয়ার একটি দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্টার খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া কলকাতার একটি দলের প্রত্যাশা পূরনের ব্যর্থতা ফুটবল-শহর কলকাতার লজ্জারই কারণ হওয়া উচিত। কিন্তু উল্টে দেখা গেল সারা মাঠে আনন্দের জোয়ার। বুঝে নিতে কষ্ট হয় না ওই আনন্দ বিদ্বেষেরই বহিঃপ্রকাশ।

ঘরের ছেলেদের বিরুদ্ধে বাইরের খেলোয়াড়দের ক্রীড়া-দক্ষতার প্রশংসা জানানোর ব্যাপারে কলকাতার দর্শকদের অবশ্যই সুনাম আছে। কিন্তু সেদিন সত্যিই কি গোয়ার খেলোয়াড়দের গুণপনার তারিফের জন্য মশাল জ্বলেছিল? নাকি রাজ্যের দল মহমেডান স্পোর্টিংকে কিছুটা হেনস্থার জন্য? যদি খোলাখুলি বলি, মহমেডান স্পোর্টিং ওই ম্যাচ জিততে না পারায় মুখ্যত সেই ক্লাবের সমর্থকরাই আনন্দ প্রকাশ করেছেন, যে ক্লাবের নামী সাতজন খেলোয়াড়কে মহমেডান স্পোর্টিং এবার দলে টেনে নিয়ে নিয়েছে তা হলে আমার ধারণাকে কি কেউ ভুল বলবেন?

এই বিদ্বেষ এবং পারস্পরিক রেষারেষি এবারের ফেডারেশন কাপের খেলায় কুৎসিতভাবে ফুটে উঠেছে। অবশ্য সব খেলায় নয়, কলকাতার তিন প্রধানের পারস্পরিক খেলায়। মহমেডান স্পোর্টিং এবং মোহনবাগান ক্লাবের দ্বিতীয় দফার সেমিফাইনালে মাঠে ও মাঠের বাইরে কম করে আহত হয়েছে পঞ্চাশ জন। ময়দানের বিস্তীর্ণ এলাকায় এবং রাজপথে হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের ফাইনাল খেলায় আহতের সংখ্যা একশোর উপর। ইডেনেও যেমন, ইডেন মাঠের বাইরেও তেমন ছোরা-ছুরি, ক্ষুর, ব্লেড ইট, বোমা লাঠি লাথির যথেচ্ছ ব্যবহার হয়েছে। আর ফাইনাল খেলাটি যা হয়েছে তাকে ফুটবল খেলা না বলে হাতাহাতি মারামারির এক খন্ড লড়াই বলা যেতে পারে। মোহনবাগানের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের রেষারেষি প্রায় জন্মলগ্ন থেকে। অতীতের কিছু কিছু খেলায় অবশ্যই শালীনতার বাঁধ ভেঙেছে, সমর্থকদের মধ্যেও মারামারি হয়েছে কিন্তু মাঠে নেমে দুই দলের খেলোয়াড়দের এমন বিশ্রীভাবে ফাউল কর খেলতে আগে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। গুরুত্বপূর্ণ কোনো ফুটবল ম্যাচে রেফারীর এমন দুর্বল পরিচালনাও আগে দেখিনি। ব্যক্তিত্বহীন পরিচালনার একটি কুনজির সৃষ্টি করে গেছেন বোম্বাইয়ের রেফারী পি পি কুটিনহো।

ফাইনাল খেলাটির মধ্যে কী না ঘটেছে? প্রথম দশ মিনিটের মধ্যে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা ষোল বার ফাউল করেছে। আর পুরো নব্বই মিনিটে তো হয়েছে আকছার বে-আইনী খেলা। ইস্টবেঙ্গলের যাবাজি মশকরা করার ভঙ্গিতে মোহনবাগানের গৌতম সরকারের মুখ ধরে নাড়া দিতেই গৌতম তার মুখে এক চাপড় বসিয়ে দেয়। একটি ফাউলের পর ইস্টবেঙ্গলের তপন দাসকে চড় কষায় মোহনবাগানের শ্যামল ঘোষ। একটি জটলার মধ্যে রেফারী কুটিনহোকে একটি লাথি মারে ইস্টবেঙ্গলের জামসেদ নাসিরি। মোহনবাগানের শ্যাম থাপা রেফারী কুটিনহোর উপর লাফিয়ে পড়ে তাঁর গলা টিপে ধরতে উদ্যত হয়। আর রেফারীর প্রায় প্রতিটি সিদ্ধান্তে চ্যালেঞ্জ জানাতে থাকে দুই দলের খেলোয়াড়। যেন ফুটবল খেলা নয়, অগ্নিগর্ভ বিস্ফোরক অবস্থার মধ্যে হাতাহাতি লাথালাথি।

আমরা জানি, মাঠে রেফারীর সীমাহীন কর্তৃত্ব। আইন প্রয়োগ করা এবং উদ্ধত ও দুর্বিনীত খেলোয়াড়দের গর্হিত আচরণে তাদের শাস্তি দেওয়ার সমস্ত অধিকার রেফারীর হাতে ন্যস্ত। কিন্তু স্নায়ু দৌর্বল্যে আক্রান্ত হয়ে এবং ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে রেফারী কী করেছিলেন? রামের দোষ শ্যামের ঘাড়ে এবং শ্যামের দোষ রামের ঘাড়ে চাপিয়ে প্রতিনিয়ত বাঁশি বাজাচ্ছিলেন এবং মাঝে মাঝে হলুদ কার্ড দেখিয়ে খেলোয়াড়দের সতর্ক করছিলেন। খেলোয়াড়রা বুঝে গিয়েছিল মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। কোনো খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দেবার মতো মনোবল রেফারীর নেই। তাই লাগামহীন গালাগালি এবং যথেচ্ছ ফাউল করা থেকে কখনো বিরত হয়নি। খেলাটিও পরিণত হয়েছে কদর্য ধরনের রেষারেষি ও হানাহানির খেলায়। মাঠের বাইরে রক্ত ঝরেছে বহু দর্শক সমর্থকের দেহ থেকে।

আর যে ঘটনাটি অনেককেই পীড়া দিয়েছে তা হচ্ছে মাঠে ঢুকে পড়া একটি ছেলের উপর বীরত্ব-ব্যঞ্জক ভঙ্গিতে সুব্রত ভট্টাচার্যের স-বুট লাথি কষানো। এমন লাথি যাতে ছেলেটির খেলা দেখার শখ চিরজীবনের মত শেষ হয়ে যেতে পারত।

ক্লাবপ্রীতি এবং ক্লাব-বিশেষের নামের মোহে মাতাল আবেগপ্রবণ যে সব ছেলে বীরপুজার বাহাদুরি দেখাতে মাঠে ঢুকে পড়ে প্রিয় খেলোয়াড়দের গলায় মালা পরিয়ে 'গুরু গুরু' করে তাদের আচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয়। বোধ ও বিবেচনাশক্তি নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা নেই বলেই তারা আবেগ ও উচ্ছ্বাসপ্রবণ হয়ে ওঠে। ফাইনাল খেলার দিন যে ছেলেটি ইস্টবেঙ্গল ক্লাব গোল করার পর মালা নিয়ে মাঠে ঢুকে পড়েছিল, পুলিসের চোখ ফাঁকি দিয়ে, ধরে নেওয়া যেতে পারে সে ছেলেটি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অর্বাচীন সমর্থক। তার অঙ্গভঙ্গি বা মুখনিসৃত শ্লেষবাক্যে সুব্রতর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সুব্রতর মনে রাখা উচিত ছিল, সে সুব্রত ভট্টাচার্য—মোহনবাগানের প্রাক্তন অধিনায়ক এবং ভারতের যশস্বী ফুটবলার। আর ছেলেটি চপলমতির আবেগপ্রবণ এক ক্লাব সমর্থক।

শহরে গুজব রটেছিল সুব্রতর লাথির ঘায়ে ছেলেটি পরে মারা গেছে। ভাগ্যিস গুজবটা গুজবই —নানা মুখের রটনা। কিন্তু সত্যিই যদি ছেলেটি মারা যেত সুব্রতকে সারা জীবন অনুতাপে দগ্ধ হতে হত। কলঙ্কের বোঝাও চাপত। এমনিতেই যে কলঙ্কভাগী হতে হয়েছে সেটাও উপেক্ষার নয়।

খেলে আনন্দ পাওয়া এবং অপরকে আনন্দ দেওয়া খেলাধুলার মূল লক্ষ্য। তার সঙ্গে এখন যোগ হয়েছে স্বার্থ সম্মান এবং রুজি-রোজগারের প্রশ্ন। তবু সদাচার, নিয়মনিষ্ঠা খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব প্রভৃতি খেলোয়াড়দের গুণাবলী বলেই স্বীকৃত। সেই খেলোয়াড়রাই যদি মাঠে নেমে অশালীন আচরণ করে তবে সমাজের উপরও তার প্রভাব পড়ে। খেলোয়াড়দের আচরণই দর্শক সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনার খোরাক জোগায়। ফেডারেশন কাপের খেলায় যে ঘটনাগুলি ঘটে গেছে এ সব ঘটনা কলকাতার লীগ ও শীল্ডের খেলাতেও ঘটতে পারে। তাই শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে ফুটবল সমাজজীবনকে কী দিচ্ছে? অবক্ষয়ের পথ প্রশস্ত করছে কিনা?

গুরুদায়িত্ব এসে পড়ছে ক্লাব কর্মকর্তা এবং ফুটবল প্রশাসনের উপরেও। দুর্বিনীত এবং আইনভঙ্গকারী খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে তাঁরা যদি

ফাইনালের দিন মারমুখী সমর্থক ও পুলিশ

কলকাতায় ফুটবলে শৃংখলা বজায় রাখা কণ্টকর হয়ে উঠবে। শহরের শান্তি-শৃংখলাও বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা।

ফেডারেশন কাপের খেলার পর্যালোচনায় বলব দুই তিনটি খেলা বাদে সামগ্রিকভাবে উনত্রিশটি খেলার এই আসর ভাল জমেনি। না জমার একটি প্রধান কারণ বাইরের সব দলকে দুটি করে ম্যাচ খেলতে হয়েছে দুপুর দুটো বা আড়াইটে থেকে প্রচণ্ড গ্রীষ্মতাপের মধ্যে। এত গরমের মধ্যে নব্বই মিনিট খেলতে খেলোয়াড়রা হিমসিম খেয়ে উঠেছে। বেশির ভাগ খেলোয়াড়ই যোগ্যতা অনুযায়ী দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেনি।

কলকাতার তিন প্রধান দল মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং বাইরের দলগুলির বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত প্রাধান্য নিয়ে খেলে জিতে গেলেও রক্ষণ ও আক্রমণের মধ্যে সমন্বয় গড়ে সে খেলা দেখাতে পারেনি, যে খেলা দেখার জন্য তিনটি ক্লাবের অগণিত সমর্থক উন্মুখ হয়ে ছিল। উন্নত ধরনের ফুটবলের পক্ষে ইডেনের মাঠও অনুকূল নয়। জলেভেজা ইডেনে ফুটবল প্রায় অচল। প্রমাণ হয়ে গেল রোদে তাতা ইডেনেও ফুটবল খেলা শক্ত। মাঠের মাটি ছিল এত কঠিন যে, দৌড়তে গিয়ে অনেকেরই পায়ের বা উরুর পেশীতে টান ধরেছে। প্রতি দলের দুই-তিনজন করে খেলোয়াড় আহত হচ্ছে। দুই দলের দুজন নামী খেলোয়াড় পেয়েছে বড় ধরনের চোট। জে সি টি দলের ইন্দার সিংয়ের হাত ভেঙেছে, মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সুরজিৎ সেনগুপ্তের হাঁটু মচকে যাবার পর কার্টিলেজ অপারেশন করতে হয়েছে।

ইডেনে খেলার ব্যবস্থা না করেও উপায় ছিল না। কারণ কলকাতায় এই প্রথম ফেডারেশন কাপের খেলা হল। ভারতের প্রথম সারির ষোলটি দলের খেলা দেখতে আগ্রহী ছিল প্রচুর দর্শক। তাদের জনাই ইডেনে খেলার ব্যবস্থা করতে হয় এবং প্রতিদিন দুটি করে ম্যাচের ব্যবস্থা রাখতে হয় তিন সপ্তাহ সময়-সীমার মধ্যে প্রতিযোগিতা শেষ করার জন্য। তার ফলেই প্রথম খেলাটি হয় গ্রীষ্মের দাবদাহের মধ্যে। দ্বিতীয়টি হয় সূর্যতেজ কিছুটা স্তিমিত হবার পর। গ্রীষ্মতাপ শুধু খেলোয়াড়দেরই কাহিল করেনি, দর্শকদেরও প্রচুর গায়ের ঘাম ঝরিয়েছে। সর্দিগর্মির শিকার হয়ে প্রতিদিন ইডেনের মিনি হাসপাতালে চিকিৎসিত হয়েছে পনেরো কুড়ি জন করে দর্শক। ফুটবল খেলা বাঙালীর কত প্রিয় এটা তারই প্রমাণ। প্রিয় বলেই প্রচণ্ড গ্রীষ্মতাপ উপেক্ষা করে মাঠে গিয়েছে। টিকিট বিক্রি হয়েছে প্রায় একত্রিশ লাখ টাকার। কলকাতার ফুটবল ইতিহাসে এটা এক রেকর্ড।

এই ফেডারেশন কাপের খেলা তো আরও তিনবার হয়েছে। সাতাত্তরে এর্ণাকুলামে বসেছিল প্রথম আসর। লাভ নাকি কিছুই হয়নি। পরের বছর কোয়েম্বাটোরে উদ্যোক্তারা সামান্য লাভের মুখ দেখেছিলেন। গত বছর গৌহাটির প্রতিযোগিতায় হয়েছে বড় রকমের লোকসান। ফেডারেশন কাপ যে ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা কলকাতাতেই তার প্রমাণ মিলল। কিন্তু আগেই লিখেছি, কলকাতার তিনটি ক্লাবের রেষারেষির ফলেই সে খেলা কলকাতায় আগামী মরসুমের জন্য ফুটবল অনুরাগীদের মনে আতঙ্ক জাগিয়ে রাখল।

ফুটবলের টেকনিক ট্যাকটিকস সম্পর্কে অনেক কথাই শোনা যায়। পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং গবেষণারও অন্ত নেই। গোয়ার ডেমপো স্পোর্টস ক্লাবের ইংলিশ কোচ বব বুটল্যান্ডও কিছু নতুন কথা শুনিয়ে গেছেন ফেডারেশন কাপের খেলার সময়। তাঁর মতে ভারতীয়দের খেলার ছক এখন সেকেলে হয়ে গেছে। নতুনভাবে বিন্যাস শুরু হয়নি। বুটল্যান্ড সাহেব তিন বছর ধরে ডেমপোর প্রশিক্ষণে আছেন। তাঁর শিক্ষগুণে ডেমপো ভারতীয় ফুটবলে একটি খেলাতেও জিততে পেরেছে?

টেকনিক ট্যাকটিকসই বলুন আর মেথ বলুন, অবশ্যই তার প্রয়োজনীয়তা আছে। শিং গুণও অনস্বীকার্য। কিন্তু ফুটবল খেলোয়া আসল গুণ ট্যালেন্ট, স্কিল, স্পিড, স্ট্যামিনা ও শুটিং এবিলিটি।

ডেমপো, ভাসকো, টাটা মফৎলাল, আই আই, হ্যাল, জে সি টি, পাঞ্জাব পুলিস কত দলে তো খেলা দেখলাম। জমির উপর বল দেওয়া নেওয়া করে আক্রমণ রচনার সুন্দর ছ চোখে পড়েছে। কিন্তু সারা মাঠ ছড়িয়ে খেলা গোলের মুখে গুটিয়ে এসে খেলার মধ্যে অ পার্থক্য আছে। মাঠের গতিমুখ যখন ছোট আসে এবং প্রতিবন্ধকতার দুর্গ হয়ে ওঠে জের তখন খেলোয়াড়দের বাড়তি গতি স্কিলের জাদু শুটিং ক্ষমতাই দলকে জয়ের পথ দেখায়। মঙ্গ স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে ভাসকো স্পোর্টস ক্ল ফরোয়াডরা ছাড়া বাইরের কোনো ক্লাবের খেলে শেষ মুখে গতির চমক দেখাতে পারেনি। কলব তিন প্রধানের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ কে দুই নম্বর কে তৃতীয় তারও সঠিক হদিস মেলেনি। ফাইনালে মহমেডান স্পোর্টিং টাই-ব্রেকারে পে কিকে হেরেছে মোহনবাগানের কাছে। লিব প্রশান্ত ব্যানার্জি এবং সুরজিৎ সেনগুপ্ত দলে থ মহমেডান স্পোর্টিংকে টাই-ব্রেকারে যেতে হত কি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। মোহনবাগান ও বেঙ্গল ক্লাবের ফাইনাল খেলা তো নব্বই মি ১—১ গোলে অসমাপ্ত রইল। অতিরিক্ত মিনিট খেলার ব্যবস্থা থাকলেও আমার ধারণা গোলমালের জনাই রেফারীর পক্ষে খেলানো সম্ভব হয়নি। ফলে দুই দলকে ফেড কাপের যুগ্ম জয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। এট রকমের গোঁজামিল। কারণ অতিরিক্ত যে পনের খেলার কথা ছিল সে পনের মিনিট খেলা না অর্থ খেলাটি অসমাপ্ত। এই অসমাপ্ত খেলা পুরো সময় খেলানোই আইনের বিধান।

যাই হোক এবার নিয়ে মোহনবাগান ফি ফেডারেশন কাপে খেলে তিনবারই ফাইনালে ছিল। তার মধ্যে দুবার হল যুগ্মজয়ী। ইস্ট ক্লাবও দুবার যুগ্মজয়ী হল দুবার খেলে। বেঙ্গল প্রথমবার ও তৃতীয়বার খেলেনি। বাগানও খেলেনি তৃতীয়বারের প্রতিযোগিতায়।

ব্যক্তিগত ক্রীড়াভূমিকায় বাইরের খেলোয়াড়ই নজর কেড়েছে। তাদের কথা গেলে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে। কল খেলোয়াড়দের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে ভাল মহমেডান স্পোর্টিংয়ের অধিনায়ক ও লি অমলরাজ এবং ইস্টবেঙ্গলের স্টপার সমর ভ প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের পুরস্কার সমরের পক্ষে সেটা পাওয়ার সম্ভাবনা মোহনবাগানের স্টপার সুব্রত ভট্টাচার্য হয়ে উঠেছে দুটি ম্যাচে। মহমেডান (দ্বিতীয় দফার সেমিফাইনাল) ও ইস্টবে বিরুদ্ধে। দুই লিংকম্যান গৌতম ও প্রসূন ম্যাচে স্বকীয় দীপ্তিতে ফুটে উঠেছে, কো বাঁধা থেকেছে মাঝারিয়ানার মধ্যে। আক অমলরাজের টাই-ব্রেকার পেনাল্টি কিক আট সেমিফাইনালে মোহনবাগানের জয়ের নায়ক শিবাজী ব্যানার্জী, যে আগে আরও তিনবার বাগানকে তিন প্রতিযোগিতার ফাইনালে পেনাল্টি কিক আটকে দিয়ে।

বাইরের যে তিনজন এ বছর কলকাতায় তাদের মধ্যে দুই ইরানী মজিদ বাসকর ও নাসিরী ইস্টবেঙ্গলের অত্যন্ত মূল্যবান মোহনবাগানের স্ট্রাইকার ফ্রান্সিস ডিসুজা প্রমাণ দিতে পারেনি বেশি ম্যাচে বাইরে বসে

মুকুল

আলোকচিত্র : নীলু

## আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি বই

**সুরের আগুন।** সন্ধ্যা সেন। দেজ পাবলিশিং। ৩১।১বি মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা-৯। ১৬ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের গান যাঁদের প্রাণে সুরের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে এমন একুশজন ব্যক্তির ইন্টার-ভ্যু ভিত্তিক পরিচয় ও বক্তব্য প্রস্তুত বইয়ে আছে। আরো আটাশ জনের নামের তালিকা দিয়ে সন্ধ্যা সেন জানিয়েছেন এই বইয়ের পরবর্তী খন্ড প্রস্তুয়মান। আপাতত আলোচ্য বইয়ে আমরা যে একুশজনকে পাই তাঁদের দুই পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া যায়। এক, রবীন্দ্র-সংগীতের যশস্বী শিক্ষক, দুই, রবীন্দ্রসংগীতের প্রবীণ ও নবীন শিল্পী। শিক্ষকদের মধ্যে আছেন অনাদিকুমার, শৈলজারঞ্জন, শুভ গুহঠাকুরতা, নীহারবিন্দু সেন ইত্যাদি। শিল্পীদের মধ্যে আছেন অমিয়া ঠাকুর, সতী দেবী, সাহানা দেবী থেকে শুরু করে পংকজ মল্লিক, কানন দেবী, শান্তিদেব হয়ে অর্ঘ্য সেন, ঋতু গুহ (সন্ধ্যা সেন লিখেছেন, গুহঠাকুরতা) পর্যন্ত। কারুরই জন্ম সাল উল্লেখ নেই বলে কালক্রমিকভাবে এই তালিকা আমাদের কাছে পৌঁছায়নি।

লেখিকার বক্তব্য অনুসারে জানা যায় 'আজ থেকে (অর্থাৎ ১৯৭৯ সালের নভেম্বর) প্রায় পাঁচ বছর আগে পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লেখাগুলি বেরিয়েছিল। অর্থাৎ রচনাগুলির মূল রূপ ও বক্তব্য সাময়িকপত্রের সীমাবদ্ধতায় নিষ্পন্ন হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় রচনাগুলির বাঞ্ছিত পরিমার্জন ঘটেনি। অতিকথন ও পুনরুক্তিদোষ ছাড়াও ছোটখাট ভুল অনেক আছে যা মর্মভেদী। যেমন, শান্তিনিকেতনের প্রখ্যাত সংগীত শিক্ষক সম্পর্কে তিন রকম উচ্চারণ ও বানান (ভি ভি ওয়াঝেলওয়ার, বি ভি ওয়াজেলওয়ার বি বি ওয়াজেল্লা) সহজেই এক রকম তথ্য সঠিক করা যেত। প্রখ্যাত রবীন্দ্রানুরাগী বিদেশী পন্ডিত আর্নল্ড বাকে সন্ধ্যা সেনের কলমে হয়েছেন মিঃ বার্ক। শোচনীয় ভুল। আসলে গ্রন্থাকারে রচনাগুলি সন্নিবিষ্ট করার সময় লেখিকা খুব মনোযোগ দেননি। ফলে, বইটি হয়েছে ছাড়া-ছাড়া, কেন্দ্রীয় ভাবনাবিহীন এবং খানিকটা লঘু মেজাজের। 'একবার আমার চোখে ইনফেকশন লেগে চোখ দুটি প্রায় হারাবার অবস্থা হয়েছিল। সেই সময় একদিন স্বপ্ন দেখেছিলাম..'

বাধা দিয়ে সতী দেবীর মেয়ে রমা গুহঠাকুরতা বললেন, 'এ সব স্বপ্ন-টপ্নর কথা থাক মা, গানের কথা বল। বাবা তোমার গান শুনে তোমায় বিয়ে করতে চাইলেন—সন্ধ্যাদি এই সব কথাতেই ইনটারেস্টেড।'

যে কোন সতর্ক লেখক এই সংলাপ উহ্য রাখতেন। সন্ধ্যা সেন অশোধিত তেলের মত সব কিছুই পরিবেশন করেছেন। তার বদলে যদি থাকতো সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন ও শিল্পী-দের নির্ভরযোগ্য বায়ো-ডাটা তবে লেখিকার প্রচন্ড শ্রম সকলের পক্ষে তৃপ্তিদায়ক হত।

এত কথা বলতে হল এই জন্য যে, সন্ধ্যা সেন এই রচনাগুলি লিখতে প্রচুর অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার পরিচয় রেখেছেন এবং এই বইয়ের দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশের জন্য চেষ্টিত আছেন। বহু বিচিত্র ও অজানা তথ্য রচনাগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছে যা রবীন্দ্রসংগীত রসিকদের পক্ষে আকর্ষণীয়। যেমন সাহানা দেবীর জবানীতে জানা যায় তিনি দিনেন্দ্র-নাথের কাছ থেকে একদিনে চোদ্দটি গান শিখেছিলেন টেলিফোনে।

বইটির পাঠযোগ্যতার আরেকটি কারণ, রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষকদের মূল্যবান মতামত ও বিশ্লেষণ এবং জ্যেষ্ঠ শিল্পীদের স্মৃতিকথার মেদুর ছায়াময়তা।

**সুধীর চক্রবর্তী**

**হট্টমালার দেশে।** অন্নদাশঙ্কর রায়। শৈব্যা পুস্তকালয়, কলকাতা ৭৩। দাম পাঁচ টাকা।

এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছড়াকার অন্নদাশঙ্কর রায়ের বিভিন্ন ছড়ার বই থেকে বেছে নেওয়া ছড়ার সংকলন এটি। সেদিক থেকে এই সংকলনটি ছোটদের কাছে খুবই আদরের জিনিস। তবে অন্নদাশঙ্করের ছড়া শুধু শিশুদের জন্যে নয়, বালক-বালিকা এবং কিশোরদেরও উপভোগ্য। বড়দের কাছেও কিছু কম উপভোগ্য নয়। ছোটদের লেখা অন্নদাশঙ্করের চারটি ছড়ার বই আছে। তাদের নাম রাঙা ধানের খৈ, ডালিম গাছে মৌ, আতা গাছে তোতা এবং হৈ রে বাবুই হৈ। আরো একটি বই প্রকাশের অপেক্ষায় : রাঙা মাথায় চিরুনি। প্রত্যেকটি বই থেকে দশটি করে ছড়া বেছে নিয়ে মোট পঞ্চাশটি ছড়ার এই চয়নিকা 'হট্টমালার দেশে' ছোটদের কাছে খুবই প্রিয় হবে। ছড়াগুলি সবই যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার নিয়ে এই সংকলনে এসেছে তা নয়। বৈচিত্র্যের দিকে তাকিয়েই লেখক এই ছড়াগুলি নির্বাচন করেছেন। কবিতা, গান, ব্যালাড, লিমেরিক আছে। কিছু ছড়ায় নাটকের মতো সংলাপও আছে।

ছোটদের নির্ভয়ে খেলবার প্রার্থনা ভগবানকে জানিয়ে সংকলনটি শুরু। বয়স্ক মানুষ আজকের পৃথিবীতে যেমন ভগবানের কাছে অভয়-বর চায়, সেই অভয়-বর চাইতে হয় না যদি শিশু ছোটবেলা থেকেই ভয়ের সংকার-মুক্ত হয়ে বাঁচতে পারে। তাই শিশু যখন প্রার্থনা করে একমনে ভগবানকে বলছে : জগৎ জুড়ে ভয়ের মেলা/ ভয় লাগে যে সারা বেলা/কেমন করে করব খেলা/ভয় ভেঙে দাও, প্রভু।' তখন এই বিপন্ন সংসারে বয়স্ক মানুষের প্রার্থনাও যেন একই সঙ্গে সুর মিলিয়ে বেরিয়ে আসে। তাই শিশুর পক্ষে নির্ভীক হওয়া যেমন

যুগল
মিলন
ভারতের একমাত্র শারীরিক দুর্গন্ধনাশক
সাবান ও ট্যাল্‌ক
দু'ভাবে দুর্গন্ধ প্রতিরোধের জন্য একেবারে সঠিক
যুগল মিলন...সিন্থল সাবান মেখে পরিষ্কার স্নান...
আর তারপর সুগন্ধ পাউডার মাখা...
যার ফলে আপনি ঝরঝরে তাজা
বোধ করবেন।
গোদরেজ্‌-এর নিবেদন—সিন্থল
CINTHOL
DEODORANT
LUXURY
TOILET POWDER
BY
Godrej
CINTHOL
Godrej
CINTHOL
DEODORANT AND COMPLEXION SOAP
Interpub/CTS/I/80

তার প্রাথমিক প্রয়োজন, তেমনি সব বয়সের মানুষেরই কাছে তা মৌলিক প্রয়োজন। শিশুর প্রার্থনা মানুষেরই প্রার্থনা। ছোটদের ছড়ায় এইরকম বয়স্কদের মাথা জুড়ে দেন অন্নদাশঙ্কর অনায়াসেই। সেই বিখ্যাত ছড়াটি : 'তেলের শিশি ভাঙল বলে—' এই প্রসঙ্গে সকলেরই মনে আসবে। এটিকেও সংকলনে রাখা হয়েছে। কিংবা সেই কেশনগরের মশার যুগযুগান্তর-ব্যাপী সমান কুশলতার কাহিনী। ছোটরা শুধু বিচিত্র যুদ্ধে মশার ভূমিকা এবং মশার কামড় নিজের চাপড়ে' ব্যতিব্যস্ত মানুষটিকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। কিন্তু পুনশ্চ মনের দোর খুলে দেয় 'পঞ্চম বাহিনী' কিংবা 'একাই জনযুদ্ধ করি/এ হাতে ও হাতে', কিংবা ডানকার্ক, পার্লাশির যুদ্ধ এবং জাপানি আক্রমণের রেফারেনস বড়দেরই উপভোগের মাত্রাকে স্পর্শ করে। যাই হোক, এই মাত্রান্তরের স্পর্শের সম্ভাবনা সব সময়েই থেকে যায়, কিন্তু সেই পার্বতী-ফার্বতী-নাবতীর বেড়ালটার জন্যে একই সঙ্গে অভিমান ও উগ্র কৌতূহল, বেড়ালের হিমালয় ভ্রমণ, আশ্চর্য ছন্দের দোলায় রাজার বাঘ শিকারের কাহিনী, পক্ষিরাজের স্বর্গ ছেড়ে ঘাস-খাওয়ার গল্প, শুদ্ধোদন দাশগুপ্ত-এর পোড়া কপ-এর গল্প কিংবা 'কিস্‌সা কাঠবেড়ালীর' কিংবা বালির ব্যারিকেড করে কেষ্টবাবুর অকথ্য সমুদ্রস্নানের মজা পেতে গেলে ছোট-বড় সকলকেই হট্টমালার দেশে হন্যে হয়ে ঘুরতে হবে। তবেই তো আসল মজা। আর মজার মজার ছবি দিয়ে ভাবভঙ্গিগুলোকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে প্রকাশকের চেষ্টাকেও তারিফ করতে হবে।

**উজ্জ্বলকুমার মজুমদার**

---

আলোচনা শিল্প সংক্রান্ত **চিত্রকলা**

## ভ্রষ্ট আদমের মতো আর্তনাদ

বিশের কম বয়সী শিল্পীদের গত দু তিন বছর ঘন ঘন প্রদর্শনী করতে দেখা যাচ্ছে। প্রায় নিঃসন্দেহ হয়ে বলা

তাপস সরকারের অঙ্কন

যায় যে নিজের এবং অন্যের কাছে, নিজের থেকে বেশি অন্যের কাছে, প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে অনেক কাজ করেন তাঁরা। অথচ এঁরা খেয়াল করছেন না প্রচুর প্রসব "সূতিকা জরকাণের" (কামাক্ষীপ্রসাদ) সম্ভাবনা বাড়ে। সন্তানও দুর্বল হয়। রবীন্দ্রনাথ যা যৌবনীর মতো শস্যশ্যামল সকলে নন।

তাপস সরকারের প্রদর্শনীতে এবার অনেকগুলি সাদা কালো অঙ্কন ছিল (২১—২৭ জানুয়ারী আকাদমী অব ফাইন আর্টস)। মূলত ভাস্কর তিনি এবং গত কিছুকাল প্রতি চার-ছ মাসে প্রদর্শনী করছেন। তাঁর ভাস্কর্যে প্রচুর স্ফুলিঙ্গ দেখা গেছে যদিও আঁচ পুরো ওঠেনি।

এবারে প্রদর্শনীতে বহু সাদা কালো অঙ্কন ছিল। তবে সব ছবিগুলোই মোট দশটা ছকের রকমফের বলা যেতে পারে। অধিকাংশ কাজেই পুনরাবৃত্তি। তাপসের অঙ্কনে মানুষ বা জৈবিক রূপবন্ধ পাশাপাশি রাখা এবং আটপাশে বাঁধা। পরস্পরের সংস্পর্শে উভয়ই বিপন্ন এবং বিকারগ্রস্ত। পরিবেশটা যেন অবিবেকী এবং মতিচ্ছন্ন। কিছু কাল হলো প্রথাসিদ্ধ বাস্তবকে সামান্য বিকৃত করে পটে হাজির করা শুরু হয়েছে। এক সময় ডালি, মাকস আর্নেস্ট, রেনে মাগ্রিটের চেলারা এদেশে সদ্‌বাস্তব ছবি এঁকেছেন, আঁকছেন। তেমনি আজকাল মিরো থেকে আর্শিল গোর্কি এবং ক্লস ওলডেনবার্গ পর্যন্ত শিল্পীদের ভারতীয় শাগরেদরা আসর জমাতে চাইছেন। সাধারণত নল, নলবাঁক (পাইপ বেন্ড), নাড়িভুঁড়ি চচ্চড়ির মতো করে মানুষ মেয়েমানুষ জন্তু-জানোয়ারেরা রূপারোপিত হয়ে পটে হাজির হয়। মান পারেখ থেকে এই ধারার সূত্রপাত। অশোক ভৌমিক, আদিত্য বসাক থেকে রেখাঙ্কনে তাপস সরকার এদেশে এই পশ্চিমী ধারার ভগীরথ হতে চাইছেন।

তাপস খুব মোটা আর সরু রেখার কাটাকুটি, কারিকুরি রেখার কারকুরি এবং হ্যারিকেন দিয়ে পটে ষড়যন্ত্রের জাল পেতেছেন। মোটামুটি মাঝ বরাবর অবয়বটি রেখেছেন। এই টুটাফাটা মানুষ, জন্তু, অ্যামিবাসদৃশ হয়ে যন্ত্রের সঙ্গে দুমড়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি জায়গাগুলো সাদা। মাঝখানে বস্তু বা জীবের সমাবেশ। কিন্তু প্রথমত নির্মিতির কোন সমস্যা এতে নেই। কারণ মাঝ থেকে অবয়বকে সরিয়ে পাশে রেখে রচনাকে জমাবার চেষ্টা করেননি। ফলে রচনার ছকটার মধ্যে একঘেয়েমি এসেছে। দ্বিতীয়ত যে কোন ছবি মূলত খাড়া এবং সরলরেখা। সমষ্টি এবং বক্র রেখার আমদানি হলে সেক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আনাবার জন্য অন্য বঙ্কিম রেখা এনে ভারসাম্য আনতে হয়। রঙীন হোক বা এক রঙাই হোক ছবির ধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখা দড়ির খেলার মতো শক্তই, তিনি যেখানে দুটি রেখা সংযোগে কোণ তৈরি করেছেন সেখানে ভারসাম্য রাখার জন্য অন্যত্র অনুরূপ কিছু করেননি। ফলে খোঁচ তৈরী হয়েছে। এই সামঞ্জস্য না রাখার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে ছবির রচনার আত্যন্তিক ক্ষতি হয়েছে। তৃতীয়ত তাঁর ছবি। আবেদন আমাদের নন্দনচেতনার কাছে নয়। বরং অবচেতনের গহন গুহার দিকে হাত বাড়িয়ে দেন তিনি।

অথচ তাপস সরকারের কাজের প্রতি নিষ্ঠা এবং প্রেম আছে। ভাস্কর্যের মাঝামাঝি দুর্মূল্য কালে হাত গুটিয়ে বসে না থেকে রেখাচিত্র আঁকতে শুরু করে দেন। পর পর প্রদর্শনী করে রাতারাতি নাম করার চেষ্টা না করে তার

প্রতিটি মুহূর্তই
খুশী আনন্দে ভরা
পিকনিক, পার্টি, জন্মদিন, ছুটিতে ভ্রমণ, সবেরই আনন্দঘন মুহূর্তগুলি আগ্‌ফা-ক্লিক ক্যামেরায় ধরে রাখুন। এত কম দামে এত অপার আনন্দ, আপনি কল্পনা করতেও পারবেন না।
এই আনন্দদায়ক সুবিধেজনক 'ক্লিক' সর্বদা সঙ্গে রাখুন। আপনার নিকটতম আগফা-গেভার্ট ডীলারের কাছে এখনই চলে আসুন।
পরিবেশক:
আগ্‌ফা-গেভার্ট ইণ্ডিয়া লিমিটেড,
রেজিস্টার্ড অফিস:
মার্চেন্ট চেম্বার,
৩১, নিউ মেরিন লাইন্‌স,
বম্বে ৪০০ ০২০
CLICK III
CLICK IV
লেখামাত্রই ছবি তোলা যায়
ক্লিক III আর ক্লিক IV
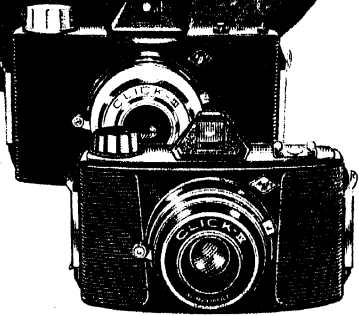
এবং রচনা আর নির্মিতি সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত খোঁজ খবর। করা।

**সন্দীপ সরকার**

আলোচনা . শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

## জি টি রোড

**১৯৭৯**-র ফিলম্ ফেস্টিভ্যালে দিল্লিতে "কনভয়" নামের একটি মার্কিনী ছবি দেখে ভেবেছিলাম, এই বিষয় নিয়ে কোনো দিন না কোনো দিন একটি ভারতীয় চলচ্চিত্র তৈরি হবে, সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক কাঠামোতে এবং সম্ভবত হিন্দি ভাষাতে। সে-ছবিটির বিষয়বস্তু ছিলো আমেরিকান হাই-ওয়েতে ট্রাক ড্রাইভারদের জীবন এবং শেষ পর্যন্ত একসপ্লয়টেশনের বিরুদ্ধে তাদের রুখে দাঁড়াবার সংকল্প। ভালো লেগেছিলো কনভয় ছবিটির আগাগোড়া রুক্ষতা, এবং কেন্দ্রীয় চরিত্রটির বলিষ্ঠ অভিনয়। আমেরিকান হাইওয়েও হয়ে উঠেছিলো একটি অন্যতম চরিত্র। এবং ছবিটিকে পুষ্টি জুগিয়েছিলো ফটোগ্রাফি এবং ট্রিটমেন্ট-এর বাস্তবধর্মিতা। জি টি রোড ছবিটির কাহিনীতে এবং চিত্র-নাট্যে এই বাস্তববোধের অভাবই সবচেয়ে বেশী ছবিটি বিষয়ে বিমুখ করে তোলে আমাদের।

রূমকি রায়

কলকাতা-রাণীগঞ্জ রুটে ট্রাক-ড্রাইভার যোগীন্দর সিং হঠাৎ একদিন সোহাগীর দেখা পায় জি টি রোডে। প্রতিদিনের পথই এই ট্রাক ড্রাইভার-এর প্রেমিকা হতে পারতো। এবং হাইওয়ে ড্রাইভিং-এর বিভিন্ন সমস্যা এবং অভিজ্ঞতা থাকতে পারতো ছবিটির সবটুকু জুড়ে। যদি তাই হতো, তা হলে জি টি রোড নিঃসন্দেহে অন্তত বিষয়ের বিচারে একেবারে ঝকঝকে নতুন বলে গৃহীত হতো। কিন্তু বাংলা ছবির ফরমুলো থেকে অত সহজে মুক্তি কোথায়? সুতরাং জি টি রোডের ওপর ছাপিয়ে উঠলো সোহাগী। এবং চিরন্তন ফরমুলাকে আরো একটু জোরদার করার জন্যে সোহাগীকে হতে হলো সমস্যা নিতান্তভাবে যোগীন্দরের একার সমস্যা। সে ট্রাকড্রাইভার না হলেও এই সমস্যা তার জীবনে আসতে পারতো। এবং এর পর কাহিনী যতই এগুতে থাকে ততোই আমরা ছবিটির চূড়ান্ত সম্ভাবনা থেকে সরে যেতে থাকি। ক্রমশই আমরা বুঝতে পারি হাইওয়েতে ট্রাকড্রাইভিং-এর সঙ্গে মূল বিষয়ের কোনো গভীর সংযোগ নেই। এবং ফলে ছবিটি ধীরে ধীরে হাইওয়ের গতি হারিয়ে ফেলে কষ্টদায়কভাবে মন্থর হয়ে ওঠে। ফরমুলার চাপে কাহিনী বিন্যাসও আড়ষ্ট হয়ে যায়। এবং যোগীন্দর একটি শিশু সন্তানও কুড়িয়ে পায় জি টি রোড থেকে। এই পর্ব থেকে শুরু হয় জি টি রোডের রূপকথা। যোগীন্দর বারবনিতা সোহাগী ও কুড়িয়ে পাওয়া সন্তানটিকে নিয়ে সংসার পাতে। এতেও বিশেষ কোনো সমস্যা দেখা যায় না, যতক্ষণ না যোগীন্দর তার পুত্রের অন্নপ্রাশনের আয়োজন করে। পুনম চাঁদ-এর প্ররোচনায় যোগীন্দরকে অন্যান্য ট্রাক-ড্রাইভাররা একঘরে করে। পরে আবার যোগীন্দরের চাকরি গেলে এই সব ট্রাকড্রাইভাররা তাদের ভুল বুঝতে পেরে যোগীন্দরকে মদত দেয়। অর্থাৎ ছবিটি তার মূল কেন্দ্র থেকে সরে এসে একটি বানিয়ে-তোলা টেনশনকে মূল উপজীব্য করে নেয়। এবং ছবিটির শেষ পর্যায়ের বক্তব্যটি তাই বিশ্বাস্য হয়ে উঠতে পারে না। ছবি এডিটিং আরো ছিমছাম হলে হয়তো ছবিটির গতি আর একটু বাড়তো। এ ছবিতে ভজন গানের কোনো প্রয়োজনই ছিলো না। এবং হাইওয়েতে ট্রাকড্রাইভিং-এর মতো একটি দুর্ধর্ষ বিষয় নিয়ে ছবি করতে সাহস না পেয়ে পরিচালক কেন ক্রমশ একটি একঘেয়ে গল্পের মধ্যে সেঁধে গেলেন বুঝতে পারলাম না। ট্রাকড্রাইভার-এর ভূমিকায় শ্যামল ঘোষাল এবং সোহাগীর ভূমিকায় রূমকি রায় যত্নবান অভিনয় করেছেন।

**রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়**

## শাওন কো আনে দো

ঠুনকো আভিজাত্য শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকতে পারে না—এই বক্তব্যকে তুলে ধরার জন্য এক গ্রাম্য গায়ককে নায়ক করা হয়েছে। সাধারণ হিন্দী ছবির প্যাটার্নে পরিকল্পিত এই কাহিনীতে (রচয়িতা: রাহি মাসুম রেজা) দেখা যায় ব্রিজমোহন (অনিল গোভিল) সহজাত সুকণ্ঠ গায়ক। জমিদার কন্যা চন্দ্রমুখী (জরিনা ওয়াহব) লখনৌতে বিদ্যার্জন শেষে ন' বছর পরে গ্রামে ফিরে বাল্যবন্ধু ব্রিজমোহনের গান শুনেই তার প্রেমে পড়ে। চন্দ্রমুখী ব্রিজমোহনকে গানের মারফত দেশজোড়া খ্যাতির স্বপ্ন দেখায়। উল্লসিত ব্রিজমোহন চন্দ্রমুখীর পিতার (অমরিশ পুরি) কাছে ওদের বিবাহের প্রস্তাব করলো। মামলার দায়ে এখন জমিদারী তথা অর্থমর্যাদা যেতে বসলেও চন্দ্রমুখীর পিতা বংশের আভিজাত্যের কথা শুনিয়ে ব্রিজমোহনকে প্রত্যাখ্যান করলো। সহপাঠিনী লখনৌ-

# নতুন স্টেফ্রী বেল্টবিহীন ন্যাপকিন!

## ফাঁস নেই, বেল্ট নেই, পিন বা অন্য কোনরকম ঝঞ্ঝাট নেই।
## যতখানি নির্ঝঞ্ঝাট হতে চান ততখানিই হবেন,
## যতখানি সুরক্ষার প্রয়োজন ততখানিই পাবেন।

আপনি যদি এমন মহিলা হন, যিনি জীবনের প্রতিটি দিনের আনন্দ উপভোগ করতে চান তাহলে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি একটি অসাধারণ জিনিষের: **স্টেফ্রী** বেল্টবিহীন স্যানিটারী ন্যাপকিন।

**যতখানি নির্ঝঞ্ঝাট হতে চান ততখানিই হবেন**

ফাঁস বা বেল্ট, পিন বা দড়ির ঝঞ্ঝাট পোয়াবার দিন আর নেই।
ন্যাপকিন সঠিক জায়গায় রাখার জন্যে **স্টেফ্রী**তে তার নিজস্ব একটি অ্যাঢেসিভ স্ট্রীপ আছে। আপনাকে শুধু আপনার আটসাঁট প্যান্টির ভেতরে ওটি আটকে নিতে হবে। আর তারপর দেখুন যতক্ষণ না আপনি নিজে ওটি সরাচ্ছেন কেমন খাপেখাপে সুরক্ষিতভাবে আটকে থাকে!

**স্টেফ্রী** ন্যাপকিন ব্যবহার করে আপনি যেমন খুশী পোশাক পরুন—যা খুশী করুন ওটি তার যথাস্থানে থাকবে।

**যতখানি সুরক্ষার প্রয়োজন ততখানিই পাবেন**

নিশ্চিতভাবে আপনার প্রয়োজনীয় সুরক্ষা দেওয়ার জন্যেই **স্টেফ্রী** বিশেষভাবে ডিজাইন করা। অধিক শোষণ ক্ষমতাযুক্ত ভেতরের স্তর ভেতরের আর্দ্রতা শুষে নেয়, আর ন্যাপকিনের তলা ও ধার ঘিরে যে ৩-মুখী প্লাস্টিকের শীল্ড তা দাগ লাগা নিবারণ করে। আজই এক প্যাকেট কিনুন আর আবিষ্কার করুন বেল্টবিহীন স্বাধীনতা! একবার ব্যবহার করলে আর কখনও ফাঁস বা বেল্ট, পিন বা দড়ির ঝঞ্ঝাটে যেতে চাইবেন না।

ভারতের নির্মাতা: Johnson & Johnson LIMITED BOMBAY 400 036 লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবহারকারী। স্টেফ্রী, জনসন এণ্ড জনসন ইউ.এস.এ-র ট্রেডমার্ক © জে এণ্ড জে '৭১

OBM 1638 R-B

বাসী গীতাঞ্জলি (রোজা আদভা) সঙ্গে যোগাযোগ করে চন্দ্রমুখী অন্যতম সুকণ্ঠ গায়ক ব্রিজমোহনের কথা জানায়। এই সূত্রেই ব্রিজমোহন আকাশবাণীতে গাইবার সুযোগ পায়। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজমোহন বিভিন্ন ওস্তাদের কাছে উচ্চাংগ সংগীতের চর্চায় রত হয়। ক্রমে দেশব্যাপি তার খ্যাতি এবং প্রভূত অর্থ লাভ এবং এর পর হৃতসর্বস্ব জমিদারের ব্রিজমোহনকে জামাতা রূপে বরণ করায় আপত্তি কিসের!
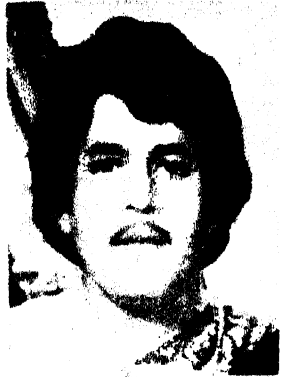
অনিল গোভিল

কাহিনীর বিন্যাসে পরিচালক কনক মিশ্র মৌলিক কোন শিল্পচিন্তার পরিচয় দিতে পারেন নি কোন সূত্রেই। বরং ব্রিজমোহন ও চন্দ্রমুখীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মানসিক সংঘাত ব্যক্ত করতে বারে বারে স্বপ্নের দৃশ্যের উপস্থাপন চিন্তার ক্ষেত্রে স্থূলরুচির পরিচায়ক। অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে যে পরিচালক আর যাই হোক ছবিখানি পরিচ্ছন্ন রাখতে পেরেছেন, সচরাচর যা হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে চোখে পড়ে না। এ ছাড়া ছবিখানির বিশেষ সম্পদ রাজকমলের সুরযোজনায় যেসুদাস, যশপাল সিং, আনন্দকুমার ও সুলক্ষণা পণ্ডিতের গাওয়া গানগুলি। পপ এবং চটুল ছন্দের গানের বাজারে রাগাশ্রিত এ-ছবির সংগীত গানগুলি দর্শকদের অবশ্যই ভাল লাগবে। ভাল লাগবে অনিল গোভিল জরিনা ওয়াহবের অভিনয়। রামচন্দ্রের ক্যামেরা দৃষ্টিকে তৃপ্ত করার মত দৃশ্য পরিবেশনেও সক্ষম হয়েছে।

পঙ্কজ দত্ত

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি সংগীত

## ডোভার লেন সংগীত সম্মেলন

এ বছর ডোভার লেন সংগীত সম্মেলনের (সিংহী প্যালেস, জানুয়ারি ২৪-২৬) তিন প্রধান শিল্পী ছিলেন পণ্ডিত রবিশংকর, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমজাদ আলী খাঁ। এছাড়া ছিলেন পণ্ডিত যসরাজ, হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া, অশীষ খাঁ, পরভিন সুলতানা ও সমরেশ চৌধুরী। দ্বিতীয় ও শেষ অনুষ্ঠান ছিল রাত্রিব্যাপী।

পণ্ডিত রবিশংকর প্রথম রাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠানের শেষ শিল্পী ছিলেন এবং রাত তিনটে বেজে দশ মিনিট নাগাদ তাঁর প্রথম নিবেদন স্বরচিত রাগ [illegible] করেন। নিজস্ব ঢঙে প্রধানত খড়্জ স্বরের মাধ্যমে তিনি রাগটির একটি সরল ও সুপরিকল্পিত পরিক্রমা করে জোড় ধরেন তের মিনিট পর। জোড়টি প্রথমার্ধের চেয়ে দ্বিতীয়ার্ধই শুনতে ভাল হয়েছিল এবং জোড়ের শেষে ঝালা বাজানো হয়নি। একই রাগে রূপক তালে নিবন্ধ গৎকারি শুরু হয় তেহাই দিয়ে শেষ হওয়া দুনি ছন্দের কাজ দিয়ে এবং তবলা-বাদক জাকির হুসেন এগুলির দক্ষ জবাব দেন। এরপর শোনা যায় কিছু চৌগুণী লয়কারি ও চক্রদর তেহাই। অসাধারণ শিল্পবোধপূর্ণ লম্বা সাথ-সংগত দিয়ে গৎকারি শেষ হয়—দুই শিল্পী এ রকম বোঝাপড়ার সংগে বাজাচ্ছিলেন যে মনে হচ্ছিল যেন পাশ্চাত্ত্য সংগীতের 'স্কোর' পড়া বাজনা!

তারপর শোনা যায় ভাটিয়ার রাগে বিলম্বিত তিনতাল ও দ্রুত একতাল গৎকারি। বিলম্বিত গতের প্রথমার্ধে শিল্পীর চরিত্রগত বাংলা লোকসংগীতের স্বাদ মেশানো বিস্তারের কাজ (স্বাদটি কিন্তু ভাটিয়ারের কোন কাঠামোগত পরিবর্তন না করেই আনা হয়) এবং সুরে ভরপুর ছন্দের কাজ ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে ছিল দক্ষ বোল-অংগের তান-তোড়া। দ্রুত গতে ছিল একই শ্রেণীর বোল-পরণ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ঝালার কাজ। মিশ্র ভৈরবীতে আওচার এবং জমজমাট দ্রুত ও অতি দ্রুত গৎকারি দিয়ে রবিশংকর বৈঠক শেষ করেন সকাল সাতটা নাগাদ।

এই রাতের অনুষ্ঠান শুরু হয় আলী আকবর খাঁর জেষ্ঠ পুত্র আশীষ খাঁর সরোদ বাদন দিয়ে। ইনি বাজান বাগেশ্রী রাগে আলাপ ও জোড় এবং ঝিঁঝোটি রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত তিনতাল গৎ। এঁর বাজনা অনেক দিন পরে শুনলাম এবং সব দিক থেকেই খানিকটা উন্নতি দেখলাম। ভাল লেগেছে বিশেষ করে ছন্দের কাজ তেহাই-এর কাজ সাথ-সংগত এবং বিস্তার অংগে সরোদের আওয়াজ। ভাল লাগেনি ঝিঁঝোটিতে রাগশ্রীর গ ম র ণ (এক জায়গায় গ ম র ণ্‌ র স ণ্‌ দ্‌) প্রয়োগ, বোল-অংগের কাজে কর্কশতা, কিছু কিছু তানে বেসুরে পদার্পণ ও একবার অতিতার সপ্তকেরও উপরে যাওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা (খোল বা চর্মাচ্ছাদনের উপর আঙুল লাগিয়ে।) জাকির হুসেনের তবলা সংগত অনবদ্য হয়েছিল। তাঁর শিল্পবোধপূর্ণ কায়দা বেলা জবাব, সাথ সংগত এবং ঝালার ছন্দ-মাফিক ঠেকা ও সুর অনুযায়ী বাঁয়ার আওয়াজ—ধ ণ ও স এই তিনটি স্বর তিনি বাঁয়া থেকে পরিষ্কারভাবে বার করছিলেন—প্রমাণ করে দিল যে তিনি তরুণ বয়সেই একজন প্রথম শ্রেণীর সংগতকার।

এরপর শোনা যায় তরুণ গায়ক সমরেশ চৌধুরীর দরবারী কানাড়া রাগে বিলম্বিত ঝুমরা দ্রুত তিনতাল ও দ্রুত একতাল খেয়াল। আমীর খাঁ ও বড়ে গুলাম আলীর গায়নশৈলী

# ত্বকের অধিক সযত্ন পরিচর্যা...
# অধিক স্বাস্থ্যোজ্জ্বলতার জন্যে—
# নিকো ঔষধিযুক্ত সাবান

® — Regd. Trade Mark — Regd. Users — Parke Davis (India) Limited, Saki Naka, Bombay 400072.

JAISONS PD 180 BEN

লিয়ে এক টাটকা ঢঙে শিল্পী রাগের
ষ্ঠ বিস্তার করলেন। ঢিমে সরগম,
ক সপগম সগগম তান ও আকার
নগুলি উচ্চাংগের হয়েছিল।

যেখানে বেশির ভাগ গায়ক
বিশেষ করে কয়েকজন গায়িকা)
তিতর সপ্তকের ষড়্‌জ অনেক পায়
ড়া কষে কেবল হাততালি পাওয়ার
ন্যই কয়েকবার লাগান, সেখানে এই
ল্পীর কাছে তার সপ্তকের পঞ্চম ও
তিতার ষড়্‌জ তিন সপ্তকব্যাপী তানের
য়মিত ও স্বাভাবিক অংশ।
নকারি ভংগে উঠেছিল দ্রুত তিন-
ল খেয়ালটিতে। দ্রুত একতাল
য়ালটিতে পাতিয়ালার অতিদ্রুত
মজমা ও নজাকৎ-সলামৎ ঢঙের
পন তানই ছিল বেশি। স্বর্গীয়
স্তাদ আমীর খাঁ জীবনের শেষে যে
গটি রচনা করেছিলেন কিন্তু নাম-
রণের সময় পাননি (স গ ক্ষ প ণ)
বং যেটিকে আজকাল আমীরখানি
না হয় সেই রাগে একটি খেয়াল
য়ে শিল্পী তাঁর আসর শেষ করেন।
রপর ছিল বাণী কারনার নাচ।

রবিশংকর

সম্মেলনের প্রথম সন্ধ্যায় ছিল
নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতার বাদন
বং সুধা পান্ডের নৃত্য। নিখিল
ন্দ্যোপাধ্যায় শ্যামকল্যাণ রাগে আলাপ,
োড় ও ঝালা বাজিয়ে তাঁর বৈঠক
রু করেন। নায়কিতারের মন্দ্র সপ্তকে
নিট দুয়েক কল্যাণ অংগের কাজ ও
বতের উপযুক্ত ব্যবহার করে রাগের
রংগটিকে শুদ্ধ সারং-এর উত্তরংগ
কে কিভাবে পৃথক করতে হয় তা
খিয়ে দিয়ে শিল্পী খাদের তারে নেমে
লেন। খাদের তারে শোনা গেল
ক্ষ প, নি ধ প অংশের বিদগ্ধ ও
ল্পবোধপূর্ণ বিশ্লেষণ। নায়কি
রে পূর্বাংশের বিস্তারের কাজকে
লিষ্ঠ করে তুলেছিল। নিম্নগামী
রপ্রগতি এবং অন্তরায় যাওয়ার
গে ছিল কিছু আশ্চর্য ন-গ
গতিযুক্ত কাজ। দীর্ঘ রেশের,
মেজে ও লম্বা মীড়ে ভরপুর ছিল
লাপটি।

কুড়ি মিনিট আলাপের পর
ল্পী ধরলেন মধ্যলয় জোড় এবং
অংশের লাড়, হলক ও ছুটের ফুলঝুরি
ছুটলো ঘন মীড়-লপেট সমৃদ্ধ
স্বরপ্রগতির পটভূমিকা থেকে। এরপর
ওস্তাদী কায়দায় বহু গান্ধারহীন
নকশা বাজানোর পর ন-প সমষ্টির
মাধ্যমে গান্ধারটি লাগিয়ে শ্রোতার মনে
একই সংগে তৃপ্তি ও বিস্ময় জাগানো
হয়েছিল। আর বক্র স্বরসংগতির মধ্যে
কি আশ্চর্য শিল্পবোধ : প ন ক্ষ ক্ষ
প ন গ। একজন শিল্পীর কথা বার
বার মনে পড়ছিল—স্বর্গীয় ওস্তাদ
আমীর খাঁ। এঁর গানে এ রকম
জিনিস পাওয়া যেত।

দ্রুত জোড়ের অতি সুপরি-
কল্পিত গমক, লাড় ও বোল-অংগের
তানেও ছিল এই ধরনের স্বর-
সংগতির প্রয়োগ এবং শেষের উল্টো
ঝালার কাজে ছিল অসাধারণ বোল
ও ছন্দ-বৈচিত্র্য।

বিলম্বিত তিনতাল গৎটি ছিল
খেয়াল অংগের শুদ্ধ কল্যাণ অর্থাৎ
যাতে নিষাদ ও তীব্র মধ্যমের বহুল
প্রয়োগ হয়। তবে যদিও সাধারণত এই
ধরনের শুদ্ধ কল্যাণকে খেয়ালঅঙ্গীয়
বলা হয় কিছু ধ্রুপদের জায়গা বিশেষে
নিষাদ ও মধ্যমের উপর যথেষ্ট জোর
দেখা যায়। যেমন তানসেনের 'আনন্দি
ত্রিপুরসুন্দরী মাতা' (স্বর্গীয়
বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী এটি তাঁর
'রাগসংগীত' নামক পুস্তকে প্রকাশ
করেছেন) গানটির আভোগে দুই
জায়গায় নিষাদকে পুরো (ঢিমে)
একমাত্রা ধরে রাখা হয়েছে। কাজেই
নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিষাদের
ব্যবহারকে খেয়ালঅংগীয় বলাও বোধ
হয় ঠিক নয়।

যা হোক শিল্পী অপেক্ষাকৃত
প্রবল নিষাদযুক্ত কাজ, নিষাদ-মধ্যম
বর্জিত কাজ (যেমন গ প র) এবং মীড়,
কন বা কৃন্তনের মাধ্যমে এই দুই
স্বরালংকৃত কাজের এমন এক সমাবেশ
ঘটালেন বিস্তারের কাজে যে তাঁর
রাগরূপায়ণে একটি অসাধারণ
সম্পূর্ণতা তো এলই একটি নিজস্ব
ব্যক্তিত্বও ফুটে উঠলো। গমক ও ছন্দ-
পূর্ণ জোড়া অতি নিপুণভাবে বুনে
দেওয়া হয়েছিল বিস্তারের কাজের
মধ্যে। বক্র ছন্দের কাজ ছন্দপূর্ণ তান,
জোড় অংগের কাজ তেহাই ও তান-
তেহাই সবের প্রয়োগ হয়েছিল অতি
শিল্প সমৃদ্ধ এবং ফলোৎপাদক।
জাকির হুসেনের তবলাসংগত ছিল
সংযমী এবং সমঝদারী। ছোট করে
বাজান দ্রুত তিনতাল গৎকারিতে
তানের কাজও ভাল হয়েছিল।

তানের ধারার অবশ্য সম্পূর্ণ-
ভাবে থমকালো আমান আলীর 'লাগি
লগন' গানটির ঢঙে রচিত হংসধ্বনি
রাগে দ্রুত তিনতাল গৎ বাজানোর
সময়। সপাট মীড়খন্ডি ও গায়কী
অংগের (মীড়ের কায়দায় টেনে
বাজানো) তানগুলির যেমন ছিল
কাঠামোগত উৎকর্ষতা তেমন ছিল
পরিবেশনশৈলী। দু-একটি তান
বাজাতে গিয়ে শিল্পীর হাত ফসকে
গিয়েছিল বলে মনে পড়ে তবে এ
রকম বাজনা যিনি বাজান তাঁর দুবার
একন চারবার হাত ফসকালেও কিছু
যায় আসে না। বলিষ্ঠ অতিদ্রুত

ছিল বৈচিত্র্য।

বিরতির পর শোনা যায় মিশ্র মধ্যমাসে গাওয়া মিঠে আওকার ও মজায় ভরপুর রূপক তালে গৎ এবং আভোগি কানড়া রাগে উচ্চাঙ্গের তান-তোড়া ও ঝালা সমৃদ্ধ দ্রুত তিনতাল গৎ। শ্রোতাদের অনুরোধে মিশ্র ভৈরবীতে আওচার ও দাদরা গৎ বাজিয়ে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বৈঠক শেষ করেন রাত সাড়ে বারোটার পর। ঝালাপর্বে জাকির হুসেন আশ্চর্য শিল্পবোধ ও দক্ষতার (যে বিষয় আগেও আলোচনা করা হয়েছে) পরিচয় দিয়েছিলেন।

সরোদ শিল্পী আমজাদ আলী খাঁ ছিলেন দ্বিতীয় এবং শেষ রাত্রিব্যাপী আসরের শেষ শিল্পী। তিনি প্রথমে বাজিয়ে ছিলেন রামকেলি রাগে আলাপ জোড়, ঝালা ও তিনটি গৎ। বড়া করে বাজানো আলাপটির (সাতাশ মিনিট) প্রথম কয়েক মুহূর্তে নিষাদের উপর বেশি জোর দিয়ে ফেলা ছাড়া শিল্পীর রাগ রূপায়ণে কোন খুঁত ছিল না। ধৈবৎ ও গান্ধারের শ্রুতি চমৎকারভাবে লেগেছিল সব সময় গ্রহস্বর শুদ্ধ মধ্যমের উপর সব সময় যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং তীব্র মধ্যম ও কোমল নিষাদের প্রয়োগ ছিল সঠিক ও শিল্পবোধপূর্ণ। এই রাগের কয়েকটি পদে একটি চরিত্রগত দোলন আছে। আমজাদ আলী এই জিনিসটিও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে ছিলেন।

জোড়ের প্রথমার্ধে লপেট-গমকের পেঁচান পথ থেকে কয়েকটি মীড় বড় সুন্দরভাবে বেরিয়ে আসছিল। দ্বিতীয়ার্ধে উচ্চাঙ্গের লড়ি ও দ্রুত গমকের কাজ ছিল। শেষের বোল-অঙ্গের ঝালা ও উল্টো ঝালা জমজমাট হয়েছিল।

যেহেতু সুর ও ছন্দের দিক থেকে রাগটিতে যা কিছু করা সম্ভব তা আলাপ ও জোড়েই হয়ে গিয়েছিল। তাই আমজাদ আলী তাঁর সংক্ষিপ্ত বিলম্বিত তিনতাল গৎকারিতে জোর দিয়েছিলেন তানকারির উপর। কাজেই গৎকারি মুহূর্তের জন্যেও একঘেয়ে হয়নি—রামকেলির ক্ষেত্রে যে-কোন শিল্পীর পক্ষেই এটি একটি বিরাট কৃতিত্ব। বোল-অঙ্গের তান, গমকতান এবং একহারা তান প্রত্যেকটিই উচ্চাঙ্গের হয়েছিল।

দ্রুত তিনতাল বন্দেশটি 'উন সংগ লাগি' খেয়াল গানটির ঢঙে রচিত হয়েছিল (ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর রেকর্ড এই গানটিকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে) এবং শিল্পী যথাক্রমে ভালো দুন তান, বোল-অঙ্গের কাজ এবং সাথ-সঙ্গত পরিবেশন করেন। শেষের লম্বা সুখের কাজটি, দুঃখের বিষয়, সমে না পড়ে খালিতে (নয় মাত্রায়) পড়েছিল। লয়ের ক্ষেত্রে শিল্পীর এটিই বোধ হয় প্রথম পদস্খলন।

অতি দ্রুত তিনতাল গৎটি ছিল শিল্পীর পিতামহ ওস্তাদ নান্নে খাঁর রচনা এবং এতে ভাল বোলকারি ও ঝালা শোনা যায়। মাইক্রোফোনের গলদ

আমজাদ

সত্ত্বেও কুমার বসু তাঁর নিজস্ব ... তবলা সংগত করেন—তাঁর বা... কিষাণ মহারাজ ও শান্তাপ্রসাদের ভাল জিনিস এবং খাশ বেন... আগুন ছিল।

আমজাদ আলীর দ্বিতীয় নি... ছিল ভূপাল-টোড়ী রাগে কি... আওচার ও দুই গৎ। আও... সুরেলা হয়েছিল এবং ঝাঁপতাল গ... প্রথমার্ধ একটু নিষ্প্রাণ হ... দ্বিতীয়ার্ধে আনন্দদায়ক তানকারি বোল-অঙ্গের ছন্দের কাজ ছিল। একতাল গৎকারিতে শিল্পী উচ্চা... তান-তোড়া ও ঝালা বাজিয়ে ছি... স্বরচিত 'ভাটিয়ালি' বাজিয়ে ... সম্মেলনের যবনিকা টেনে দেন। অংশে রাগমালা ঢঙে বৈরাগী ভৈরবীর কাজও বাজান হয়।

সমরেশ চৌধুরী

শেষ রাতের অন্য তিন ... ছিলেন পণ্ডিত যসরাজ, হরি... চৌরাসিয়া ও পরভিন সুল... যসরাজ ছিলেন আসরের প্রথম ... এবং তাঁর বেহাগ-রাগে খেয়াল মসৃণ মুড়কি ও সরগম বিস্তারের কাজ, ছন্দোময় সরগম গমক তানকারি ছিল। হংসধ্বনি আড়ানায় দুটি রচনা গেয়ে তিনি বৈঠক শেষ করেন।

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়

বংশীবাদক চৌরাসিয়ার কর্ণাটক রাগ হেমাবতীতে আওচার, জোড় ও রূপকতাল গৎ বেশ সুপরিকল্পিত ও আনন্দদায়ক হয়েছিল। জোড়টিতে তাঁর তন্ত্রকারী বোল-অঙ্গের কাজ ফোটানোর আশ্চর্য ক্ষমতা লক্ষ করলাম। দেশরাগে আওচারটি একটু একঘেয়ে এবং নাটকীয় লেগেছে। এই রাগে মধ্য-দ্রুত তিনতাল ও অতিদ্রুত তিনতাল গৎগুলিও বিশেষ ভাল হয় নি। তিনি প্রায়ই প ম র স ন্ পদ ব্যবহার করে সারং-এর ভাব এনে ফেলছিলেন। কয়েকবার তিলক কামোদের র প ম গ র গ স ন্ পদও শোনা গিয়েছিল। এই ত্রুটিগুলি তান ও বিস্তার দুয়েই ছিল। অতি দ্রুত ধ প ধ-গ-স র—এ রকম ত্রুটি দেশ রাগের গতে থাকা বিস্ময়কর।

পরভিন সুলতানার বৈঠকের প্রথম অংশ (বাগেশ্রী রাগে খেয়াল) অনিবার্য কারণে শুনতে পারিনি। দ্বিতীয় অংশব কৌশি-কানাড়া রাগে খেয়ালে বিস্তারের কাজ প্রাথমিক শ্রেণীর বলে মনে হয়েছে এবং তানে প্রায়ই সুর কম লেগেছে। একটি গজল ঢঙের ঠুংরী গেয়ে তিনি শেষে 'ভবানী দয়ানী' ভৈরবী সাদরাটি গজল, ভজন ও রাগমালার ঢঙে গাইলেন।

নীলাক্ষ গুপ্ত

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

## পড়ার খেলা : খেলার পড়া

কল্পিনী একবার ছোটদের নিয়ে আসরে এলেন। নির্দেশক অসিত চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব তিনি বয়েসটাকে কমিয়ে এনে শিশুদের সাথে মিশে যেতে পেরেছেন। রবীন্দ্র সদনে সেদিন শিশুরা নিজেদের খেয়াল খুশীতে মেতে উঠেছিল। কিশলয়ের তিনটি ভাগের তিনটি আখ্যান অবলম্বনে তিনটি ছোট নৃত্যনাট্যে রূপ ও সুর দিয়েছেন জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। কয়েক দিন আগেই হয়ত পাঁচকে অল্পপরীক্ষার পরীক্ষা দিয়েছে। তারা কি তখন ভেবেছে পড়ার মধ্যে এত মজা ছিল, মজার সঙ্গে এত খেলা ছিল?

'সামিয়ানা' নৃত্যনাট্যে চলচ্চিত্রের

মত বর-বউ-এর আসা, বাত্রায় আসর রচনায় পালাকারের যে বিদগ্ধ ভাবনা ছিল, শিশুশিল্পীরা সেটা সহজ করে নেয় অবলীলায়। বড়রা করতে গেলে নানা রকম আয়োজনের কথা ভাবা হত—কারিগরি হত, কিন্তু শিশুরা যেন 'আয় ভাই খানিকটা খেলোনি' এই ভাব নিয়ে অভিনয় করতে আসায় সহজে জমে গেল। গরিব মুটের সার্কাসের দৃশ্য কত সহজে হুল্লোড় তুলে গেল—হিংসে করার মত অনায়াসে। তুলনায় 'বুড়ীর কৌটো' কম নাম করছে না, তবে বাচ্চা প্রাপণা সেন ও রেশমী দত্তকে মাঝে মাঝে সজীব পুতুল মনে হচ্ছিল। অন্য সকলের মন কেড়ে নিয়েছে। আর বুড়ীর কৌটোর তমাল পাতিতুণ্ড তো পাকা অভিনেতা। গানের সুর খুব জমাটি। জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ও শিশুদের মত করে গান বাঁধতে পেরেছেন। তবে হইচই-এর সময় গানগুলো যত জমাটি, দুঃখের গানগুলি তত গম্ভীরভাবে শিশুদের মনে দাগ ফেলে না। অথচ জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় যখন বড়দের গান লেখেন বা সুর করেন তখন দুঃখের কথা এত গভীর থেকে বেরিয়ে আসে যার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী। তুলনায় বড়দের জন্য লেখা আনন্দের গান কম এবং ক্ষণপ্রভ। হয়ত তিনি সেই গভীর বেদনায় শিশুদের সংক্রামিত হতে দিতে চান না। শিশু মনের কল্যাণ ভাবনায়।

গানের শিল্পীদের মধ্যে চমকিত করেছে ভাস্বতী মুখোপাধ্যায়। যাত্রা আসরে "এ যাতনা সহে না" গানটি নাটকীয়তার দিক দিয়ে অনবদ্য। অর্থাৎ সীতা বুক চাপড়ে কাঁদছে, শিশু দর্শকরা হেসে লুটোপুটি দিচ্ছে—দুই তরফেই সম্পূর্ণ সিরিয়াস। দীনেশ চন্দর অংকে সৃজনে শিশুদের জন্যে আলাদাভাবে কিছু ভাবা হয়নি। এই প্রসাদ সকালে একমাত্র বিরক্তার হেতু ছিল সাউন্ড রেকর্ডিং।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

## রথীন মৈত্র (১৯১৩—)

অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে নব্য ভারতীয় কলমে পাশাপাশি তৈলচিত্র আঁকা হচ্ছিল। স্বদেশিকতার জন্যই অনেকে যদিও সেটা সুনজরে দেখেন নি। শশী হেস, হেমেন মজুমদার, অতুল বসু থেকে প্রহ্লাদ কর্মকার, শক্তিধর এবং নৈষ্ঠিক শিল্পী। যামিনী রায় এই দলে ছিলেন। এলেন তিনি ইম্প্রেনিস্ট এবং ফভবাদীর জগতে এবং লোকায়নের পথে। ত্রিশের দশকে অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলালের ছবি লৌকিক হল। কিন্তু যামিনী রায়ের ছবিতে বর্ণের মুক্তি এবং রূপারোপের নতুন ইঙ্গিত এল। শেরগিল, রামকিঙ্কর এবং বিনোদবিহারী ভিন্নতর গভীরতা খুঁজলেন।

বেজে উঠল যুদ্ধের তূর্য। বিশ শতকী আধুনিক ঐতিহ্য চেতনা যেমন কল্লোলোত্তর বাংলা সাহিত্যকে তেমনি শিল্পকলায় "ক্যালকাটা গ্রুপকে" আলোড়িত করেছিল। যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ, ইভাকুয়েসন, ব্লাক আউট, বেশ্যা এবং দালাল, সৈনিক সহসা মধ্যবিত্ত নিরাপত্তাবোধের দুর্গের দরজা ভেঙে দিল। বেদনা আতঙ্ক নতুন চেতনার জন্ম দিল। নতুন রূপবন্ধ এবং রচনারীতির প্রয়োজন হল। শম্ভো ঠাকুর, নীরদ মজুমদার, গোপাল ঘোষ, অবনী সেন, প্রদোষ দাশগুপ্ত, প্রাণকৃষ্ণ পাল, পরিতোষ সেন এলেন। এবং রথীন মৈত্রও। এঁরা বর্তমানকাল এবং ইম্প্রেসেনইজম থেকে পরবর্তী সকল শিল্প আন্দোলনের ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকার দাবী করলেন। আশা এবং নৈরাশ্যের প্রতিক্রিয়ায় এঁদের ছবি হল তীব্র, তির্যক এবং নাগরিক। যদিও সব সময় সার্থক নয়। পরবর্তীকালে দল ভাঙলো এবং অধিকাংশ নিষ্ক্রিয় হলেন।

'রথীন মৈত্র এই দলের অন্যতম নায়ক। বহুকাল (১৯৫২ থেকে অদ্যাবধি) তিনি আকাদমী অব ফাইন আর্টসের যুগ্ম সম্পাদক গোপাল ঘোষের সঙ্গে। যদিও আকাদমীর প্রশাসন প্রশিক্ষণে জড়ালেন এবং সাংবাৎসরিক দুটি ছবি ক্রমশ আঁকা শুরু করলেন। এখন এঁদের মধ্যে সক্রিয় নীরদ মজুমদার, পরিতোষ সেন এবং প্রদোষ দাশগুপ্ত।

রথীন মৈত্রের জন্ম পাবনায় বিদগ্ধ জমিদার বংশে। সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা চলেছে বাড়িতে। দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং নিজে তিনি এঁরই উত্তরসূরী। তাঁর নিজের আগ্রহ ছিল ছবিতে। এলেন কলকাতায়। ভর্তি হলেন গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে (১৯৩২-৩৮)। '৪২ ক্যালকাটা গ্রুপের প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। দলীয় প্রদর্শনী নিয়ে অন্যত্র যান। ললিতকলা আকাদমীর প্রতিষ্ঠার আগে ভারত সরকার, আকাদমী অব ফাইন আর্টস এবং বোম্বে আর্ট সোসাইটির যৌথ ভাবে সমকালীন ভারতীয় চিত্রকলার প্রদর্শনী মার্কিন দেশে যায়। তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে যান

...মেন্ট আর্ট ... যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁকে ... গেছেন। না ইয়র্কে মাদ্রি ইন্ডিয়া হাউসের জন্য দুটো বড় মুরাল করেন। তখনই মেন্টর যুকসের জন্য প্রজ্ঞানন্দ ইসারউড অনূদিত ভগবদগীতায় অনো প্রচ্ছ আঁকেন রথীন, ভূমিকা লেখেন অলডাস হাক্সলি। সেই অথে ইউরোপ ভ্রমণ। সোনালী, সিঁদু এবং ফিকে নীলে আঁকা রথাসী বিষয় অর্জুন এবং প্রাজ্ঞ কৃষ্ণ শিল্পীকে সুনাম দিয়েছিল।

রথীন মৈত্রের ছবি একস বোদ্ধা ও বিদগ্ধের দৃষ্টিতে পড়ে ছিল। "ক্যালকাটা গ্রুপের" আমে তাঁর ছবি পালটে যায় দ্রুত। নিস থেকে এলেন শ্রমিক এবং গ্রামগঞ্জে মানুষের জগতে। নিলেন পট থে রূপারোপের ধরন, সরলীকরণ। এ উজ্জ্বল ক্রান্তীয় বলয়ের রঙ। এ সময় প্রাণকৃষ্ণ এবং রথীনের আ মানুষজনের পা গুঁড়ির মতো হ মোটা। এল মৎসজীবী। সমুদ্র উ কূলে নুলিয়া। স্থাপত্যর মতো হলে পট দ্বিমাত্রিক। আবার জন্তু জানোয় পাখির জগৎ। ঝোপের মধ্যে শিকা বহুরূপী গিরগিট। শব ভোজ শকুন। বন্য কুকুর। যামিনী রায়ে কাছাকাছি রথীনের জগৎ। কিন্তু নগ মনস্কতায় এবং আতঙ্কে নৈরাশ্যে ভি অস্বচ্ছ জলরঙ এবং তৈলচি মাধ্যমটাও ভিন্ন। দাঙ্গার সম রথীনের চাঁদের মতো বাঁকা সৌম কান্তি মুসলমানের "নামাজ" পড় দৃশ্য সাম্প্রদা... সম্প্রীতির উদা আহ্বান।

"শোক" (২২"×৩০" তৈল চিত্র) ছবিটা দ্বিমাত্রিক। পটের মাঝ মাঝি একটি যুবক। তার মু নৈরাশ্যের ছাপ। পুরো ছবির অং বিশেষ প্রচ্ছদে দেখানো হয়েছে নীলে, ধূসরে, খয়েরী হলুদে বিধ ছবি। যুবকের মুখে গলায় ঈ সবুজ, কানে, গালে লালের ছাপ বিষাদের রূপ। বেকার কি বিচ্ছিন্ন।

রথীন মৈত্রের ছবির জগৎ-ছিল নানারকম বিস্তার এবং বিকাশে সম্ভাবনা। রূপবন্ধ এবং রচনা সম্বে পরীক্ষা। বৈদগ্ধ্য। উষ্ণতা। কি প্রথম যৌবন এবং উত্তরত্রিশের যে প্রতিশ্রুতি তিনি কম কাজ করার দরু রক্ষা করেননি।

গ্লোকীন-ডি
শক্তির মান
মুখখানিতেই বিদ্যমান
GLOKEEN
GLUCOSE-D
VOLTAS
গ্লোকীন-ডি প্রত্যেকের উপযোগী দ্রুত বলদায়ক ও শক্তির পরিপূরক। এটি ক্লান্তি কাটায়, কর্মশক্তি বাড়ায়। গ্লোকীন-ডি গ্লুকোজের সমস্ত সংগুণে বিভূষিত। তার সঙ্গে সঙ্গে এটি অধিক ক্যালসিয়াম, ফসফেট্‌স্‌ ও ভিটামিন-ডি সমৃদ্ধও—আর তার মানেই হ'ল প্রতিটি সময়ে, প্রতিটি ক্ষণে স্ফূর্তি আর শক্তি!
গ্লোকীন-ডি-কে, প্রতিদিনের অভ্যেস ক'রে তুলুন।
গ্লোকীন-ডি
দ্রুত শক্তিদায়ক নতুন গ্লুকোজ-ডি
ULKA-GD-21-BEN

# নিশ্চিতভাবে টেঁকসই

বিনীর
সূতী কাপড়
স্বভাবতই ...
আপনার বাড়ির সবার জন্যে সূতী
কাপড় কেনার সময়ে আপনি নিশ্চয়ই
টেঁকসই, সরেস আর নির্ভরযোগ্য
জিনিসটিই খোঁজেন।
বিনীর সূতী কাপড় কিনলে এই
তিনটি গুণই পাওয়া যায়।
বিনীর সূতী কাপড়ের শক্ত
সুতো সহজে
ছেঁড়ে না—বহুদিন চলে।
তাছাড়া এখন ফ্যাশনেরও
ছোঁয়া লেগেছে।
বিনীর সূতী কাপড় কিনলে
আপনি নিশ্চিন্ত।
বিনী
CAS/BC34 A/80/BEN

## চিঠিপত্র

### একচল্লিশ নং হেয়ারফিল্ডস অকসফোর্ড

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক শ্রীনীরদ সি চৌধুরী পত্রিকাপত্রের অপেক্ষা রাখেন না। তাঁর আজীবন ইংরেজী সাধনার ফলশ্রুতি পাশ্চাত্য জগতে তাঁর অকুণ্ঠ স্বীকৃতি ও বহু-বিধ আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্তি। শুনলাম তাঁর ইংরেজী রচনাশৈলীর জন্য নোবেল প্রাইজ পাওয়ারও সম্ভাবনা আছে। বাঙালীর অপচিকীর্ষা ও সঙ্কীর্ণচিত্ততা সত্ত্বেও আমরা অকুণ্ঠচিত্তে প্রার্থনা জানাই যেন এই অশীতিপর জ্ঞানবৃদ্ধ সফলতা লাভ করেন। তবে শ্রীসুখরঞ্জন ঘোষ দস্তিদারের শ্রীচৌধুরীকে সমর্থন করে দীর্ঘ চিঠির সিদ্ধান্তগুলি মানতে পারলাম না। ডঃ আশিস বসু মল্লিককে তিনি যেভাবে আক্রমণ করেছেন তাতে তিনি নিজেকে ও নিজের বিষয়-বস্তুকে দুর্বল করে ফেলেছেন। ভাষাসর্বস্বতা ও চমকপ্রদ তথ্য সরবরাহ করে মনকে ভোলানো যায় না।

শ্রীনীরদ সি চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও কোনো কোনো বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত নাও হওয়া যেতে পারে।

নীরদবাবু স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে বাঙালীর 'ল্যান্ডস্কেপপ্রীতি ইংরেজী সাহিত্য থেকে এসেছে।' কিন্তু এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যায় না। ভারতীয় সাহিত্যে, বিশেষত বাংলা সাহিত্যে, নিসর্গচেতনা বস্তুটি 'ইমপোর্টেড' নয়। চন্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণবপদকর্তার অন্তরস্পর্শী কবিতার নিসর্গতন্ময়তা একটা স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার। সংস্কৃত কবি জয়দেব ও কালিদাসের ভিতর শ্রীচৌধুরীর ভাষায় ল্যান্ডস্কেপ প্রীতি দেখা যায়। চালের বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ দাসের কবিতার ভিতর এই ল্যান্ডস্কেপ প্রীতি সুন্দর রূপ নিয়েছে। তবে এটা সবটাই সচেতন—পাশ্চাত্য সাহিত্য-চর্চার ফলে নয়। মেঘমেদুর শ্যামলিমমধুর নদীমাতৃক গ্রামবাংলা বিহ্বল, স্বতঃ উৎসারিত কবি সত্তাকে মর্মস্পর্শী কবিতায় উদ্বুদ্ধ করেছে।' বর্তমান যুগের 'নাইন্ত' প্রকৃতিপাগল পথের পাঁচালীর লেখক শ্রীবিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফরাসী সাহিত্যিক 'গতাদাল' এর সঙ্গে তুলনা করলেও তাঁর উপন্যাসে গ্রাম বাংলার মাটির গন্ধ পাওয়া যায়। তাঁর সৃষ্ট গাছ-গাছড়া ঝোপঝাড়, পশুপাখী সবই বাংলার মাটির কাছাকাছি। বাংলার ল্যান্ডস্কেপ প্রীতির উৎস সন্ধানে পাশ্চাত্যসাহিত্যের আনাচে কানাচে ঘুরে না বেড়িয়ে নিজের দেশের প্রশান্ত আঙিনায় এই খোঁজাকে সীমাবদ্ধ রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সে রকম বাংলা গানেও অতুল-

...সংগীত জগতের সমঝদার শ্রীচৌধুরীর মন হয়ত অতুলপ্রসাদের ব্রাত্য (?) সংগীতের ভিতর তেমন কিছুই খুঁজে পান না। তবে সাধারণ বাঙালীর কান ও মন শ্রীচৌধুরীর মতন অত উচ্চ গ্রামে উঠতে পারেনি। এবং তাঁদের নাক সিটকানোর মনোবৃত্তিও নেই।

পরিশেষে শ্রীচৌধুরীর আদুরে নাতনীর মাখন না পাওয়ার জন্য আলাপ-চারী বিলাসী দাদুর সকরুণ খেদোক্তি সত্যই আমাদের ফরাসী সম্রাজ্ঞী মারি আঁতোয়ানেৎ-এর প্রসিদ্ধ নিষ্ঠুর উক্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। শ্রীচৌধুরীর এই খেদোক্তি জীবন সংগ্রাম জর্জর সমস্যাসংকুল বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে বড়ই anachronistic বলে মনে হয়। বাংলাদেশের বাবা-মায়েরা সন্তানদের দুমুঠো অন্নসংস্থানের সঙ্গতি হারিয়ে দু ফোঁটা চোখের জল ফেলারও ফুরসৎ পান না।

পরিশেষে শ্রীচৌধুরীর অভিজাত বংশাবতংস শিশু নাতির অশীতিপর-বৃদ্ধ দাদুর ট্রাউজার্স উন্মোচন করে শিশ্ন দর্শনের অভীপ্সা আমাদের কাছে অকল্পনেয়। বর্তমানে আমাদের ঘরের ছেলে-মেয়েরা রামনাম বা 'হরিনাম' করে না। তবে এ জাতীয় অবাঞ্ছিত ঔৎসুক্যেরও কখনও পরিচয় দেয় না।

দেবলকুমার চক্রবর্তী
কলকাতা-৪৫

১২ই এপ্রিল তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীসুধীর চক্রবর্তী মহাশয়ের লেখা 'ললিত বাঁড়ুজ্যের ফোয়ারা' শীর্ষক রচনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং কৌতূহলোদ্দীপক। ললিত বাঁড়ুজ্যে মশায়ের মধ্যে নদীয়া জেলার নির্মল শুভ্র হাস্যরসের যে ফল্গু-ধারাটি বহমান ছিল, লেখক সুন্দর-ভাবে তা তুলে ধরেছেন।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি তথ্য সম্পর্কিত সন্দেহের কথা বলি। ললিতবাবু 'মুড়াগাছা হাইস্কুলের' ছাত্র ছিলেন এবং এই বিদ্যালয় থেকেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পান বলেই আমার জানা আছে। কাঁচকুলি গ্রাম, যেখানে ললিতবাবুর জন্ম, তারই পার্শ্ববর্তী গ্রাম মুড়াগাছা এবং তৎকালে ঐ অঞ্চলে ঐ একটিমাত্রই বিদ্যালয় থাকায় আশপাশের সকল ছাত্রই সেখানে পড়তে যেতেন, কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল অবধি যাবার সুযোগ তেমন হত না।

কাঁচকুলি গ্রামের লোকেদের অন্তরে আত্যন্তিক রসিকতার অন্তঃসলিলা ধারা বিশেষ লক্ষনীয়।

ললিতবাবুও তো সেই গ্রামেরই লোক। একবার তীর্থভ্রমণের পরিকল্পনার সব বন্দোবস্ত পাকা করে জেনারেল পোস্ট অফিসের সেভিংস একাউন্টে রাখা টাকা তুলতে গিয়ে মহা ফ্যাসাদে পড়েছিলেন। তাঁর সই নাকি মিলছে না। যাই হোক ওভার-

এলো তার বাড়ি থেকে। কিন্তু তাদের যে ললিত বাঁড়ুজ্যে কে তার সাক্ষ্য দেবে? জি পি ও-র ভেতরে কর্মরত বহু লোকের মধ্যে কেউ কি তাঁর ছাত্র নেই? অনেক বোঝানো শোনানোর পর যখন টাকা তোলার অনুমতি মিলল, তখন তিনি সেই একাউন্টের সমস্ত টাকা তুলে নিয়ে লিখছেন—

'আজ এই কলিকাতা জেনারেল পোস্ট-অফিসের পূর্বদিকের বারান্দায় দাঁড়াইয়া তেত্রিশ কোটি দেবতার নামে শপথ করিতেছি যে আমার যাবতীয় সঞ্চিত অর্থ আমার পূর্বপুরুষের যে বেতের প্যাঁটরা আছে তাহার মধ্যে রাখিয়া মাটিতে পুঁতিয়া রাখিব—চোরে লয় পরোপকার হইবে—তথাপি পোস্টাপিসে আর কখনও টাকা রাখিব না।'

ভারতীয় ডক কৃতাক কি আজও ললিতবাবুর এই রসিকতা মাখানো সত্য কথাটি শর্করাচ্ছাদিত তিক্ত বটিকার ন্যায় অম্লানবদনে গলধঃকরণ করিতে থাকিবেন।

শুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়
মুড়াগাছা, নদীয়া।

॥ ২ ॥

৪৭ বর্ষ ২৪ সংখ্যা (১২ এপ্রিল ১৯৮০) দেশে 'সাহিত্য' পর্যায়ে প্রকাশিত 'ললিত বাঁড়ুজ্জের ফোয়ারা' শীর্ষক আমার লেখা নিবন্ধে মুদ্রণঘটিত একটি তথ্যগত অসম্পূর্ণতা শিক্ষাগত পরিচয় পর্বে ছাপা হয়েছে 'মেট্রোপলিটন কলেজ থেকে বিএ পরীক্ষায় ইংরেজি অনার্সে প্রথম স্থান পান।' এই তথ্য অসম্পূর্ণ ও ভুল। বস্তুতপক্ষে তখন ডবল অনার্স ব্যবস্থা চালু ছিল। তিনি ১৮৮৭ সালে উক্ত কলেজ থেকে ইংরাজি অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে অষ্টম স্থান এবং সংস্কৃত অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন।

১৯২৯ সালের ২৯ নভেম্বর তাঁর মৃত্যুর পরে অমৃতবাজার পত্রিকায় ললিতকুমার সম্পর্কে যে বিশেষ রচনা বেরোয় সেখানে তাঁকে 'ঈশান স্কলারও' বলা হয়েছে। অবশ্য অন্য কোথাও এ তথ্যের সমর্থন পাইনি। ১৮৮৮ সালে তিনি এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র হিসাবে।

সুধীর চক্রবর্তী
কৃষ্ণনগর

## বিজ্ঞান প্রসঙ্গে

গত ১২ই এপ্রিল ১৯৮০ দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীসমরজিৎ কর মহাশয়ের বিজ্ঞান প্রসঙ্গে লেখাটি নিঃসন্দেহে খুবই তথ্যপূর্ণ, কিন্তু তার লেখার একটি ভুল সম্বন্ধে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

লেখক দশ নম্বর প্যারাগ্রাফ-এর শেষাংশে (পৃষ্ঠা-৩২) লিখে-

হেন "বস্তুর স্থিতিশক্তি তার ভরের বর্গের সমানুপাতিক এবং তা ছড়ানো ব্যাসার্ধের ব্যাস্তানুপাতিক, অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই ভর যত বাড়বে; স্থিতিশক্তিও তত বাড়বে। এবং তার ব্যাসার্ধ যত কমবে, স্থিতি-শক্তিও সেই অনুপাতে কমবে।" এখন আমরা জানি একটি বস্তু অন্য একটি বস্তুর সহিত universe variation এ থাকলে, দ্বিতীয় বস্তুর মান কমলে প্রথম বস্তুর মান বাড়বে; আবার দ্বিতীয় বস্তুর মান বাড়লে প্রথম বস্তুর মান কমবে। সুতরাং এক্ষেত্রে পূর্বে উল্লিখিত লাইনের শেষাংশটি হইবে—ভর যত বাড়বে; স্থিতিশক্তিও তত বাড়বে। এবং তার ব্যাসার্ধ যত কমবে স্থিতিশক্তিও সেই অনুপাতে বাড়বে।

বিমল দাশ
শ্রীরামপুর

॥২॥

গত ৮ই মার্চ ১৯৮০ 'দেশ'-এর বিজ্ঞান বিভাগে সমরজিৎ কর লিখিত 'ক্যানসার বিষয়ক' আলোচনায় কিছু তথ্যগত ভুল রয়েছে। বেহালার ঠাকুরপুকুরে মহাত্মা গান্ধী রোডে যে 'ক্যানসার সেণ্টার অ্যাণ্ড ওয়েল-ফেয়ার হোম' গড়ে উঠেছে সেটিতে আজ পর্যন্ত কোন সরকারী সাহায্য আসে নি। ঐ হোমের সম্পাদক ডাঃ সরোজ গুপ্তের (উনি দাশগুপ্ত নন) উদ্যোগ উদ্ধৃতিতেই এই ভুলটি রয়েছে। ঐ 'হোম' সম্পূর্ণরূপে জন-সাধারণের দানেই গড়ে উঠেছে এমন কি স্কুলের বাচ্চাদের টিফিনের পয়সা জমানো 'দান' পর্যন্ত রয়েছে কিন্তু সরকারী সাহায্য একটি পয়সাও পাওয়া যায় নি। আমি ঐ হোমের আজীবন সদস্য (পরিচালন কমিটির) হিসাবে বলতে পারি ডাঃ গুপ্ত কখনই এমন ভুল তথ্য সরবরাহ করতে পারেন না কেননা ঐ 'হোমের' সম্পাদক হিসাবে ওঁর ওপর রয়েছে বিরাট দায়িত্বভার। আশা করি ঐ ভুলটি সংশোধিত হবে।

মণিকা বসু কলকাতা-৫০

## চণ্ডী বরাহদন্তিকা

২৬শে এপ্রিল সংখ্যায় অজী দাসের "চণ্ডী বরাহচণ্ডিকা" শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়লাম। এর সম্বন্ধে দু-এক কথা বলার আছে। লেখক বলেছেন জহরা মন্দিরের আশেপাশে কোনও বসতি নেই। একথা ঠিক সত্য নয়। মন্দিরের ডানদিকে একটি বড় পুকুর আছে। এই পুকুরের পাড়ে কয়েকঘর বসতি আছে। এরপর পুকুরের পাড় থেকে দক্ষিণ পশ্চিমদিকে কয়েকশো গজ গেলে জনবসতি লক্ষ করা যায়। আর এক জায়গায় বলেছেন, জঙ্গলের মধ্যে জহরার মন্দির। কিন্তু জঙ্গল কি করে বলা যায়? মন্দিরের সামনে খোলামেলা মাঠ, পিছনে আমের ক্ষেত, মন্দির যে স্থানটিতে অবস্থিত সেখানে শুধু সম্ভবত দুটি বটগাছ, দু-একটা জোলাছ সহ আরো কয়েকটি নাম-না-জানা গাছ আছে, তাছাড়া মন্দির প্রাঙ্গণ এবং আশপাশ ছায়াচ্ছন্ন। এছেদ

অবস্থাকে জঙ্গল মোটেই বলা যাবে না। জহুরা মন্দির নিয়ে আরো দু-এক কথা আলোচনা করা যাক। মালদহ শহরের কোর্ট থেকে জহুরাতলা মোটামুটি তিন মাইলের কিছু বেশী। এই স্থানটি মালদহ শহরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। এই তিন মাইল রাস্তার মধ্যে এক মাইলের মতো রাস্তা পাকা, বাকীটা রাস্তা কাঁচা। ধুলো-বালি মেশানো রাস্তায় ইঁট-কুচি মেশানো রয়েছে। ফলে বৃষ্টিতে কাদা হয় না। এর উপর দিয়ে মেলার ক'দিন সকাল থেকে বিকেল অবধি ঘোড়ার গাড়ি, রিক্শা, ট্যাক্সি যাত্রীদের নিয়ে ছুটছে। কেউবা হেঁটে চলেছে মন্দিরের দিকে। অনেকে ভোর ভোর পৌঁছে যায় মন্দির প্রাঙ্গণে, সকাল থেকে দুপুর অবধি বেশ ভিড় লক্ষ করা যায়। এই পুজো উপলক্ষেই মেলা বসে ছোটখাট। এই মন্দিরে শুধু হিন্দুরাই পুজো দেন না। অনেক মুসলমানও মায়ের কাছে মানত করেন। মানসিক শুধতে আসেন, মায়ের মন্দিরে পুজোও দিয়ে যান। লেখক এক জায়গায় জহুরা মন্দির ছাড়াও গৌড়েশ্বরী এবং দ্বারবাসিনীর কথা উল্লেখ করেছেন। এই তিনটি মূর্তি ছাড়াও গৌড়ের মধ্যে আরো একটি মূর্তি ছিল। এর নাম ছিল পাতালচণ্ডী। এটি নাকি বর্তমান মধু-ঘাটের কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত ছিল। এই চারটি মূর্তির মধ্যে একমাত্র জহুরা মূর্তি বর্তমান। জহুরা মন্দিরের সংস্কার অন্ততপক্ষে দুবার হয়েছে। একবার হয়েছিল ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে এবং আরেকবার হয় ১৩৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। এটিই শেষ সংস্কার।

যাত্রীদের থাকার জন্য মন্দিরের দুপাশে দুটি টিনের ছাউনির কথা এবং নলকূপের কথা লেখক উল্লেখ করেছেন, কিন্তু মাঠের মাঝে রাত্রিবেলা থাকার জন্য এই ধরনের খোলামেলা টিনের ছাউনি মোটেই নিরাপদ নয়। যদি এই দুটি ছাউনিকে ঘিরে দিয়ে দরজা জানালা বসিয়ে দেওয়া হয় তাহলে যাত্রীদের পক্ষে থাকা নিরাপদ হবে, মন্দিরের কাছাকাছি মাত্র একটি কি দুটি টিউবওয়েল আছে, এই দুটি টিউবওয়েল দিয়ে কি এতশত যাত্রীদের পানীয় জলের চাহিদা মেটানো যায়? কর্তৃপক্ষ যদি থাকার সাথে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে দূর-দূরান্তের যাত্রীসমাগম আরো বেশী হবে।

অসিতবরণ মণ্ডল
মালদহ

### ভ্রম সংশোধন

গত ৩মে ১৯৮০ সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সহচর' গল্পের লেখকের নাম : অশোকরঞ্জন সেনগুপ্ত। ভুলবশত অশোককুমার সেনগুপ্ত ছাপা হওয়ায় আমরা দুঃখিত।

*

১৯ এপ্রিল সংখ্যার 'ওলিম্পিকের আগে রুশ দেশে' রচনাটির একবিংশতম লাইনে ব্যারোমিটারের বদলে থার্মো-মিটার পড়তে হবে। ভুলক্রমে ব্যারো-মিটার লেখা হয়ে গেছে। —লেখক

# বিধান সিংহের

বিচিত্র অপরাধ কাহিনী

## আদালত আঙিনায় দাম ৭·০০

যে-জীবন উপন্যাসের থেকেও বৈচিত্র্যময়, সেই জীবন থেকেই অলহার আটটি মেয়ের বিচিত্র কাহিনী তুলে এনেছেন সাংবাদিক বিধান সিংহ। এই আটটি মেয়ের জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে নৃশংসভাবে। খুন করা হয়েছে তাদের। খুন করেছে স্বামী অথবা প্রেমিক, নিতান্তই কাছের কিছু মানুষ। বাইরের দস্যু-গুণ্ডা নয়।

ডিটেকটিভ গল্প-উপন্যাসের যেখানে শেষ, জীবনের সত্য ঘটনায় সেখানেই শুরু। গল্পের মৃত্যুঞ্জয় গোয়েন্দা অবিশ্বাস্য কায়দায় খুনীকে ধরলেন, গল্পের নটেগাছ সেখানেই মুড়োল। কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে খুনীকে ধরার পরই অপরাধ প্রমাণের দায়িত্ব এসে পড়ে। পুলিশের গ্রেপ্তারে খুনের কিনারা হয় না, হয় আদালতের বিচারে। বিধান সিংহ তাই ছুটে গিয়েছেন আদালত আঙিনায়।
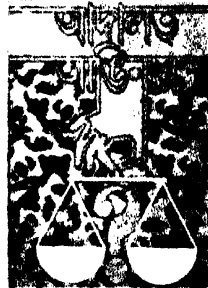
রহস্যময় খুনের নথিপত্র হাতড়েছেন, ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দৌড়েছেন উকিলের বাড়ি, কখনো বিচারকের কাছে, কখনো সাক্ষীর ডেরায়, কখনো আসামীর সন্ধানে। তারপর সাজিয়েছেন এই কাহিনীগুলি। কীভাবে খুন সংঘটিত হল, কীভাবে ধরা পড়ল খুনী, কীভাবে রায় দিলেন আদালত—প্রতিটি পর্বের বিস্তৃত, পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় কখনো চক্ষু হয়ে ওঠে অশ্রু-সজল, কখনো ঘৃণায় আরক্ত, কখনো উৎকণ্ঠায় উদ্বেল, কখনো সমবেদনায় আচ্ছন্ন। এমন হৃদয়স্পর্শী

চারটি খণ্ডই পাওয়া যাচ্ছে

# শিবকালী ভট্টাচার্যের

রবীন্দ্র পুরস্কার-প্রাপ্ত ভারতীয় ভেষজবিষয়ক গ্রন্থ

## চিরঞ্জীব বনৌষধি

চার খণ্ডে প্রকাশিত।

প্রতি খণ্ড ২৫·০০

ভারতীয় বনৌষধি সম্বন্ধে সাড়ে তিন হাজার বছরের সমীক্ষা তুলে ধরা হয়েছে এই গ্রন্থের খণ্ডে-খণ্ডে। ওষধিগুলির পরিবার, গণ ও প্রজাতির পরিচয়, বোটানিক্যাল নাম, প্রকারভেদ, প্রয়োগবিধি ছাড়াও প্রত্যেকটির রাসায়নিক উপাদান, তিথিভেদে বিভিন্ন খাদ্যের নিষিদ্ধতার বৈজ্ঞানিক কারণ এবং কোন্ রোগে কী পথ্য—তার তালিকা এতে উল্লিখিত।

মানুষের শারীরিক গঠন দেখে তার প্রকৃতি বিচার ও সম্ভাব্য রোগ নির্ধারণ সম্পর্কে আলোচনা যেমন দ্বিতীয় খণ্ডের আকর্ষণ, তেমনই তৃতীয় খণ্ডের অমূল্য সংযোজন হল 'নিদেন হাঁকা' নিয়ে বিস্তারিত ও প্রাঞ্জল আলোচনা। সদ্য-প্রকাশিত চতুর্থ খণ্ডের উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, কিছু মারক রোগ সম্পর্কে আলোকপাত। সব রোগেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী নয়, আবার এমন রোগও হয় যা মারক হয়েই আত্মপ্রকাশ করে। এই খণ্ডে তারই দিগ্দর্শন। ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিক থেকে প্রতিটি খণ্ডই স্বতন্ত্রভাবে মূল্যবান ও অপরিহার্য।

এই বইটির চারটি খণ্ড একত্রে ডাকযোগে যাঁরা নিতে আগ্রহী, তাঁরা ১০০ টাকা পাঠালে ডাকমাশুল ছাড়াই চার খণ্ড বই পাবেন।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

# রাধারাণী দেবীর

অপরিহার্য আলোচনাগ্রন্থ

## শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প

দাম ১৫·০০
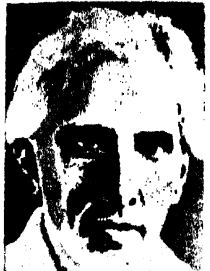
বহু ব্যক্তিসত্তার সমাহারে মানুষ শরৎচন্দ্রের জীবনের দৈনন্দিন চেহারাটি কেমন ছিল তা যেমন জানা যায় এই গ্রন্থে, তেমনই স্পষ্ট হয় তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্য-দৃষ্টির মূল প্রেরণার কথাও। খোদ শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে জানা বহু জরুরী, অজ্ঞাতপূর্ব, চাঞ্চল্যকর তথ্যে ভরা এই বই শরৎচন্দ্রকে নতুন করে জানাবে আর চেনাবে।

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

# জয়প্রকাশ নারায়ণের

জরুরী অবস্থায় লেখা দিনলিপি

## কারাবাসের কাহিনী দাম ৫·০০

জরুরী অবস্থায় বেশ কয়েকমাস জেলে আটক ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। সেই সময়ে রচিত এই দিনলিপি। সমকালীন ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষীর চিন্তাধারা, মেজাজ এবং নৈতিক চেতনাবোধ যেমন এতে

প্রতিফলিত তেমনই জনআন্দোলন, সামগ্রিক বিপ্লব প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর ধ্যানধারণারও এক

# সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার

গোয়েন্দা ফেলুদা—এই নামটির সঙ্গে পরিচয় খুব বেশিদিনের নয়। মাত্রই দশ-বারো বছর। এক আংটি-চুরির রহস্য ভেদ করতে বাংলা সাহিত্যে নতুন এক গোয়েন্দাকে আমদানি করলেন সত্যজিৎ রায়। সেই গোয়েন্দার নাম ফেলুদা, ওরফে প্রদোষ মিত্তির। তিনি এলেন, থেকে গেলেন। বাদশাহী আংটির রহস্য উদ্ঘাটনের পর একের-পর-এক কত-না রহস্যের জট খুললেন ফেলুদা, কত-না নতুন নতুন পটভূমিতে। সঙ্গে তোপসে।

ইতিমধ্যে আরেকজন এসে জুটেছেন ফেলুদা আর তোপ্সের নিত্য সহচর হয়ে। তাঁর নাম জটায়ু। জটায়ু এসে জুটে যাওয়ায় রহস্যের সঙ্গে কৌতুকের এক মোহন মিশ্রণ ঘটেছে।

অসমবয়সী এই তিনজনের নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার গল্প শুনতে শুনতে একেবারে উন্মুখ হয়ে থাকেন সব-বয়সী পাঠককুল।

গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য-উপন্যাস

বাদশাহী আংটি ৬·০০ গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৬.০০ সোনার কেল্লা ৬.০০ বাক্স-রহস্য ৬.০০ কৈলাসে কেলেংকারি ৬·০০ রয়েল বেংগল রহস্য ৫.০০ জয় বাবা ফেলুনাথ ৬·০০ ফেলুদা এন্ড কোং ১০.০০ গোরস্থানে সাবধান ৮.০০

প্রকাশিত হল

# কুন্তক-এর

মজাদার বই

## শব্দ নিয়ে খেলা

দাম ১০·০০

অনেকে মনে করেন, বাংলা বানান সবরকমই হয়। সব রকম যদি নাও হয়, অনেক রকম সিদ্ধ তো হয়।
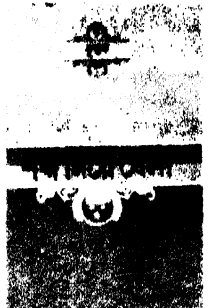
রবীন্দ্রনাথই নাকি করে দিয়েছেন এইসব। তারপর থেকেই বাংলা বানান নাকি সোজা হয়ে গেছে খুব। যেমন ইচ্ছে লিখলেই চলে। আবার অনেকে ভাবেন যে, বাংলা বানান খুব খটমট ব্যাপার। এমনসব নিয়মে বাঁধা যা জানতে গেলে পণ্ডিত হতে হয়। ণত্ব বিধান, ষত্ব বিধান, প্রত্যয়—এসব নিয়মে দাঁত ফোটানোই কঠিন, জানা তো দূরের কথা।

কুন্তক তাঁর এই বইতে প্রমাণ করলেন, এই দুই ধারণার কোনটিই সর্বাংশে সত্য নয়। বাংলা বানান সহজেই যে শেখা যায়, শব্দের গঠনে যে দারুণ রকমের মজা লুকনো রয়েছে, খেলাচ্ছলেই যে জানা যায় [illegible]রকমের নিয়মকানুন- [illegible] জানাবার জন্যই গল্পের মতো সরস পাঠকের মতো হালকা এই রচনা। এমন মজাদার খেলা খেলা লেখা বড়ো একটা চোখেই পড়ে না। শুধু ছোটরা নয়, বড়োরাও সমান আগ্রহ নিয়ে পড়বেন এই বই, এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

# বুদ্ধদেব গুহর

নতুন উপন্যাস

## বিন্যাস

দেশ ৪৭ বর্ষ ৩০ সংখ্যা
১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭

## সূচীপত্র



### পরবর্তী আকর্ষণ

শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের নিবন্ধ
কান্ ফিলম ফেস্টিভ্যাল : ১৯৮০
শতদল ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ
রূপবতী বাডোদারা ও নগতীর্থ পাওয়াগড়
গৌতম গুপ্তের প্রবন্ধ
বার্লিন : কলোনী ও কলঙ্ক
সমর মিত্রের গল্প
সেই আলো

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদলচন্দ্র বসু কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা



# পুরাকীর্তি গ্রন্থমালা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ বেশ কয়েক বছর আগে একটি গ্রন্থমালা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনাটির মোটামুটি উদ্দেশ্য ছিল, এই রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলা এবং কলকাতার যাবতীয় 'পুরাকীর্তির ও পুরাবস্তুর' বিশদ বিবরণ সংকলন করে এক একটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্রাকার পুস্তক প্রকাশ। রমেশচন্দ্র মজুমদার মশাই মনে করতেন, এই পরিকল্পনা সরকারী অর্থে হলেও তা প্রয়োজনীয়, 'জনশিক্ষা ও কৃষ্টিমূলক'। লোকশিক্ষামূলক এই গ্রন্থমালা প্রকাশ শুরু হয়েছিল ভালভাবেই, বীরভূম, বাঁকুড়া, কোচবিহার, নদীয়া, হাওড়া—এই পাঁচটি মাত্র জেলার পুরাকীর্তি বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশের পর অকস্মাৎ এ-বিষয়ে ছেদ পড়ে। ১৯৭২ সালে বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি প্রকাশের পর ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত—অল্প সময়ে পাঁচটি গ্রন্থ ছাপা হয়। তারপর গত চার বছর আর কোনো গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়নি। হবে যে তারও কোনো ইঙ্গিত নেই।

এই গ্রন্থমালা প্রকাশ স্থগিত রাখার কারণ কী? সরকারের অর্থাভাব? নাকি অন্য কিছু? অর্থাভাব যে নয় তা বোঝা যায় কয়েকটি কারণে। যেমন, উক্ত গ্রন্থমালা প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়েই পুরাতত্ত্ব ডিরেক্টোরেট একটি উপদেষ্টা কমিটি এবং সম্পাদকীয় বোর্ড গঠন করে রেখেছেন। গত এক বছরে এই কমিটি কমপক্ষে দশবার বৈঠক করতে বসেছেন। কিন্তু বসাই সার, কাজের কাজ কিছুই এগোয়নি, মতান্তর মনান্তর যথেষ্ট হয়েছে এইমাত্র, পুস্তক প্রকাশ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে চাননি।

মতান্তরের কারণ কি? কমিটির সভ্যদের কি গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য নিয়ে মতভেদ আছে? নাকি এক একজন এক এক রকম চাইছেন, অথবা যোগ্য সম্পাদক খুঁজে পাচ্ছেন না? শোনা যাচ্ছে, কেউ কেউ নাকি বলেছেন, কমিটি নামেই কমিটি—তার কাজ করার কোনো ক্ষমতাই নেই, কমিটির বেশীর ভাগ নির্দেশই পুরাতত্ত্ব বিভাগ মানতে রাজী নয়। কেউ বা জানিয়েছেন, কমিটির সিদ্ধান্তগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে অস্পষ্ট করে রাখা হয়েছে। কেউ বা বুঝতেই পারছেন না, একই কাজ করার জন্যে একাধিক ব্যক্তিকে কিভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। এইসব গণ্ডগোলের ফল হয়েছে এই যে, কেউ কেউ কমিটি থেকে ইস্তফা দিয়েছেন, কেউ বা ইস্তফা দিয়েও আবার ফিরে আসছেন কমিটিতে। মোটামুটি এখন যা অবস্থা, তাতে কমিটি আছে কিন্তু কাজ করার কোনো চেষ্টাই নেই।

প্রকাশিত পুরাকীর্তি গ্রন্থমালার সম্পাদনা ও উপস্থাপনা নিয়েও নানা মহলে প্রশ্ন আছে। কেউ কেউ মনে করেন, গ্রন্থগুলি যেমন হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি, কারুর বা ধারণা, এই জাতীয় গ্রন্থ বেশী পাণ্ডিত্যপূর্ণ, গবেষণা জাতীয় জটিল পুস্তক করার কোনো কারণ নেই, বরং গ্রন্থগুলিকে মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির সাংস্কৃতিক পরিচয় হিসেবে পরিবেশন করাই সঙ্গত। এই ধরনের মতান্তর অবশ্যই রয়েছে।

পুরাকীর্তি গ্রন্থমালা কেমন করে রচিত হবে তা কমিটির সভ্য এবং সম্পাদক বোর্ডের বিবেচ্য। তবে এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ যে, নানা মুনির নানা মত যদি শুনতে হয় তবে পুরাকীর্তি গ্রন্থমালা আর রচিত হবে না। বলা বাহুল্য, পুরাকীর্তি গ্রন্থমালার এমন কোনো উদ্দেশ্য থাকা উচিত নয় যা নিতান্তই পণ্ডিতদের প্রয়োজনে লাগবে। এই গ্রন্থমালার আংশিক উদ্দেশ্য অবশ্যই জনপ্রিয়তা। সেদিক থেকে পূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থগুলি জনসমাদর লাভ করেছিল। সরকারী দপ্তরখানায় লাট হয়ে পড়ে থাকে নি। কোনো কোনো গ্রন্থমালা পুনর্মুদ্রণেরও প্রয়োজন হয়েছে। কাজেই এ রকম মনে করার কোনো কারণ নেই যে, গ্রন্থগুলির প্রকাশ অসার্থক হয়েছিল।

পুরাতত্ত্ব বিভাগ যে ঠিক কি কারণে গ্রন্থমালা প্রকাশ স্থগিত রাখছেন তা জানি না। পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই কিছু কিছু গবেষক রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ স্বনামখ্যাত, কেউ বা অধ্যবসায়ী, পারদর্শী। এঁদের সাহায্যে কেন যে পুরাকীর্তি গ্রন্থমালার মতন সংক্ষিপ্ত অথচ সর্বজনপাঠ্য গ্রন্থ রচিত হবে না—তা আমরা বুঝতে অক্ষম।

আমাদের সব সৎ প্রচেষ্টাই নানাভাবে বানচাল হয়, কিংবা করা হয়। একদা যিনি চার বছরে পাঁচটি গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনিও ১৯৭৬ সালে দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি নিয়ে বলেছিলেন, রাজনীতি ও ব্যক্তিস্বার্থের অনুপ্রবেশের জন্য তিনি পদত্যাগ করছেন। আসলে সবে মিলি করি কাজ—আমাদের জন্যে নয়। প্রতি পদেই আপত্তি, বাধা, মতান্তর। আর এই মতান্তরও যে সব সময় যুক্তিগ্রাহ্য তাও নয়; অনেক সময় ব্যক্তিগত রেষারেষিও কাজ করে। সাধারণ এবং তুচ্ছ কারণে পুরাকীর্তি গ্রন্থমালার প্রকাশ যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের মর্যাদা তাতে বাড়বে না। বরং এই বিভাগ এমন চেষ্টাই করুন যাতে উক্ত গ্রন্থমালা প্রকাশ করা সম্ভব হয়। কমিটি যখন তাঁরা গঠনই করেছেন তখন কমবেশী মতভেদ থাকলেও কমিটির সুপারিশ গ্রহণ না করারই বা কি কারণ থাকতে পারে? আজ চার বছরে আলোচ্য গ্রন্থমালার একটি গ্রন্থও প্রকাশ করা গেল না—এটা কোনো কৃতিত্বের কথা নয়।
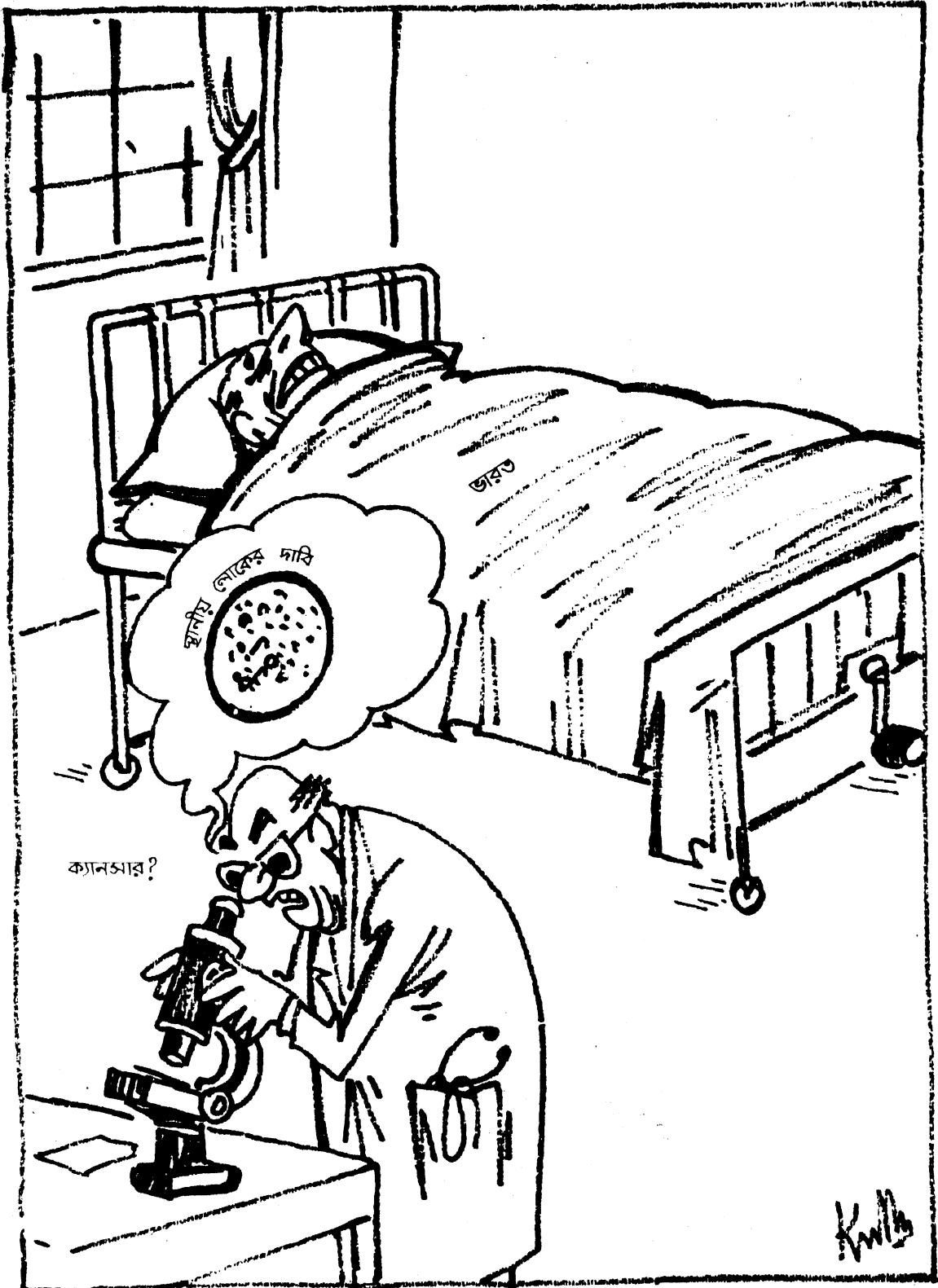
ভারত
স্থানীয় লোকের দাবি
ক্যানসার?

# সংগীতপ্রাঙ্গণের তুলসী হীরাবাই

বসন্ত পোতদার

পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর বড় ছেলে জয়ন্ত সেদিন হঠাৎ বলল, "বসন্ত, মে মাসের শেষের দিকে আসছ তো পুনায় ?"

"কেন ? তোমার বাসায় বিশেষ মেহেফিল ?"

"সে তো আছেই", হীরাবাই-এর জন্য বড় অনুষ্ঠান হচ্ছে।"

"হীরাবাই-এর জন্য ? কেন ?"

"তুমি জানো না ? তিনি ৭৫ বছর বয়েস পুরো করছেন। ২৯শে মে তাঁর ৭৬তম জন্মদিন।

"দাঁড়াও, আমি টেলিফোন করি" ছুটে গেলুম ফোনের দিকে।

"আরে বুকো, চম্পুতাই এখন হাসপাতালে! চিন্তা করো না, ছোট একটা অপারেশন। আজ সন্ধ্যায় ফিরে আসবেন।"—জয়ন্ত।

তবুও ফোন করি। চম্পুতাই-এর (হীরাবাই-এর ডাক নাম) বৌমা বললেন, "তাই এখন ভালো আছেন। আগামীকাল সকালে আসুন।"

হীরাবাই ৭৫ ? তাঁর অপারেশন ? কত বছর দেখতে এসেছি তাঁকে! আমার জন্মের আগে থেকে গান করছেন।

হীরাবাই। সংগীতপ্রাঙ্গণের তুলসী। যুবা বয়েস থেকে ষাট বছর পার করেও হীরাবাই-এর চেহারায় প্রায় কোনো বদল ঘটেনি।

তুলসীর মতনই শ্যামল বর্ণ, কানে মুক্তোর দুল ও হাতে চুড়ি, গলায় মুক্তোর মালা, সেই মুক্তোর দ্যুতি নেওয়া ভাবপূর্ণ চোখ, সাদাসিধে যে কোনো রং-এর শাড়ি। মঞ্চে প্রবেশ করার সময় কোনো অহংকারী অভিনিবেশ নেই। তানপুরা নিয়ে কুলীন বৈঠকভঙ্গী। শ্রোতাদের প্রণাম, তাতে না অতি নম্রতা না দাম্ভিকতা। গায়নের সময় বাঁ হাতের তর্জনী ও মধ্যমা জুড়ে সুর দেখানোর আদত। কারুকে মাত করার ক্লেম নেই, না তান-পালটার ফালতু সার্কাস না তানের বাজি ফাটানো। সঙ্গতিয়াদের দিকে কখনও চোখ রাঙিয়ে দেখাবেন না। স্ত্রী স্বভাবের অসংগত কোনো হাবভাব নেই। থাকত শুধু একটি মোহময়ী, স্নেহার্দ্র, শীতল স্বর এবং আদুরে আদুরে লয়।

পরদিন তাঁর বাড়িতে যেতেই আমি উত্তেজিত হয়ে বললুম, "অভিনন্দন চম্পুতাই, শতবার, সহস্রবার অভিনন্দন। আমার একারই নয়, দেশ পত্রিকার সমস্ত পাঠকদের তরফ থেকে আপনার ৭৬তম জন্মদিনের জন্য হার্দিক অভিনন্দন!"

শান্তভাবে বললেন, "জন্মদিনের তারিখ ২৯শে মে, তুমি মাসখানেক আগেই অভিনন্দন জানাতে এসেছো ?"

আমি বললুম, "মৌখিক শুভেচ্ছা আজ জানাচ্ছি তবু সেটা প্রকাশিত হবে মে মাসের শেষ সপ্তাহেই। কাজেই...."

"ও মা, তুমি আমার জীবনী লিখতে এসেছো কী ?"

"না না", আমি এবার প্রথমেই চম্পুতাইকে ভালো করে দেখি। শরীর একটু দুর্বল, গলার সুর ক্ষীণ। তবু চেহারায় শান্তির ভাব আগের মতনই। "আপনার ইন্টারভিউ নিতে আসিনি। আজ আপনার ৭৫ বছরের বৈভবশালী জীবন। সেই অতীতের কোন কোন ঘটনা আজও আপনার স্মৃতিপটে জাগ্রত হয়ে আছে ? সেগুলো শুধু বলুন। কানপুরে ডাঃ মিস্তিরদের বাড়িতে সমানে আট দিন নিজের সংগীত জীবনের অনেক বাহারদার কিস্সাগুলি আপনি আমাদের শুনিয়েছিলেন। সেরকম নয়। শুধু অই ঘটনাগুলি যে আপনি কখনও ভুলতে পারেননি, পারবেন না। ২৯শে মে পুনায় আপনার জন্য বড় অনুষ্ঠান হবে। বালগন্ধর্ব রঙ্গমঞ্চে ফুলমালায় শরীর প্রায় আচ্ছাদিত অবস্থায় আপনি সংগীত গুণিজনদের মধ্যে বসে থাকবেন তখন জীবনের কোন কোন প্রসঙ্গ আপনার চোখের সামনে ছবির মতন আসবে ? আস্তে আস্তে বলুন। আমি কোনো প্রশ্ন করব না।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'তে বর্ষাকাল নিয়ে যেমন বর্ণনা আছে অবিকল সেই রকম সুরের বর্ষার কথাটা শুরু করলেন হীরাবাই।

"বসন্ত, বাল্যকালের দিকে যখন তাকিয়ে দেখি সবার আগে মনে পড়ে আমার বাবার মধুর মতন মিষ্টি গলা। সেই স্বরলহরী আজও কানে গুঞ্জন করছে। বাবা রাতদিন রেয়াজ করতেন। আমাকে অথবা আমার দুজন বোনকে কখনও শেখান নি তিনি। তাঁর ধারণা গান-বিদ্যা মেয়েদের জন্য নয়। যদিও হয়, নিজের মেয়েদের জন্য একদম বারণ। বাড়িতে আমার মুখ থেকে তিনি সকৌতুকে গোহরজান ও মলকাজানের গানের নকল শুনতেন, হাত-তালি ও শাবাসকী দিতেন কিন্তু শেখানোর নাম নেই। আমরা তিনজন বোন গানের টানে ব্যাকুল আর বাবা ভর্তি করে দিলেন হুজুরপাগা কন্যাশালায়।

[ স্বগত ]

মরহুম উস্তাদ আবদুল করীম খাঁ সাহেবের পাঁচজন ছেলেমেয়ে। বড় ছেলে সুরেশবাবু মানে (জন্ম ১৯০২) তারপর হীরাবাই জন্ম (১৯০৫)। স্বভাবের অসীম শান্তি এবং মর্যাদা জন্ম থেকেই নিয়ে এসেছেন হীরাবাই। কান্নাকাটি না করে তিনি এই পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হলেন। মৃতজাত মনে করে দাই তাঁকে কাপড়ে বেঁধে একদিকে রেখে দেয়। হঠাৎ একজন ডাক্তারবাবু 'দেখি দেখি' বলে সেই পুঁটুলিটা খুলে দেখে। তারপর তাড়াহুড়ো। নবজাত মেয়ে বেঁচে আছে শুনে খাঁ সাহেব খুব খুশী। চুপচাপ জন্মেছিলেন তিনি এবং সংগীত-মহল থেকে রসজ্ঞ শ্রোতাদের বুক পর্যন্ত চুপচাপ পৌঁছেছিলেন।

খাঁ সাহেব মেয়েদের গান শিক্ষার বিরুদ্ধে ছিলেন বটে, হীরাবাই-এর গান ও কীর্তি শুনে পরে নিজের ভুল শুধরে নেন।

হীরাবাই : বাবার পর মনে পড়ে দাদার গান। তিনিই আমার প্রথম গুরু। ১২ বছর বয়েস থেকে ওঁর কাছে শিখতে শুরু করেছি। ১৫ বছর বয়সে আলাদিয়া খাঁর শিষ্যা লক্ষ্মীবাই জাধও-এর গান শুনে অবাক অভিভূত হয়ে গেছি। লক্ষ্মী বাই-ই তখন আমার আদর্শ। তাঁর মতন গায়ন শেখার জ্বালা প্রজ্বলিত হয়। তারপর রাতদিন নিয়মিত রেয়াজ। দাদা শেখাতেন, মা উৎসাহ দিতেন। মা নিজে বাবার শিষ্যা, খুব ভালো গায়িকা। আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষী। ছেলেমেয়েদের শিল্পী করার জন্য কত খেটেছেন। আজ সবার কথা মনে পড়ে। দাদা যে অকালে মারা যান।

[ স্বগত ]

হীরাবাই-এর মায়ের নাম তারাবাই। দাদা সুরেশবাবু 'মানে' পদবী লাগাতেন। অসাধারণ গায়ক। ঠুংরীর বাদশা। হুবহু বাবার মতন গায়ন কিন্তু কি দুর্ভাগ্য দেখুন, বড় মেহেফিলে জমাতে পারতেন না। হীরাবাই ছাড়া মাণিক বর্মা ও প্রভা অত্রে এ দুজন গায়িকা সুরেশবাবুরই প্রধান শিষ্যা। পণ্ডিত ভীমসেন এবং বসন্তরাও দেশপাণ্ডেও সুরেশবাবুর কাছ থেকে কিছু শিখেছিলেন বটে কিন্তু তাঁর গায়কীর নজাকত তাঁর সঙ্গেই গেল। তাঁর মৃত্যু ঘটে ১৯৫৩ সালে।

হীরাবাই : তারপর ১৯২২ না ২৩ সাল, ঠিক মনে নেই। তোমার ইন্দোর শহরের দোল দেখতে গিয়েছিলাম মায়ের সঙ্গে। বড় অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে উস্তাদ ওয়াহিদ খাঁ এসেছিলেন। তিনি আমার বাবার ভাগ্নে, আমার পিসতুতো ভাই। নাম-করা গায়ক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গান-শিক্ষক। মা জিগোস করলেন, "আমার মেয়েকে শেখাবেন কি ?" তিনি বললেন, "আগে গান শুনি, পরে ঠিক করবো।" আমি খুব বোকা, লাজুক মেয়ে। তানপুরার আকারের মধ্যেও হারিয়ে যাবার মতন দেহযষ্টি। মা ও বোনেরা উৎসাহ দিলেন, দাদা হারমোনিয়াম নিয়ে সঙ্গত করতে বসলেন। কি গেয়েছি আজ মনে নেই আমার। কিন্তু গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাকে বললেন, "মামী, আমিই শেখাবো মেয়েটিকে। আর কারুর কাছে পাঠাবেন না।" বম্বে ফিরে এসে নাড়া বন্ধনের অনুষ্ঠান হয়।

[ স্বগত ]

ওয়াহিদ খাঁ সমানে পাঁচ বছর শেখালেন। মুক্ত হস্তে, মুক্ত কর্ণে বিদ্যা দিলেন। আবার বাড়িতে রেয়াজ করিয়ে নিতেন মা ও দাদা। হীরাবাই-এর দাদা স্বতঃস্ফূর্ত এক খামখেয়ালী প্রতিভাধর শিল্পী। আজ এক গাইবেন, আগামীকাল আর কিছু। পরে হীরাবাই গোহরজানের কাছে ঠুংরী, বালগন্ধর্বের কাছে নাট্য সংগীত এবং ওয়াঝেবুয়ার কাছেও কিছুটা শিখলেন। কিন্তু তাঁর গায়নে ওয়াহিদ খাঁরই ছাপ। ওয়াহিদ খাঁ সাহেবের জ্ঞান খুব গভীর তবু আসর জমানোর জন্য গলাটা খুব একটা অনুকূল ছিল না। তাঁর তিনজন শিষ্যা তিনটি নগরে। বম্বেতে হীরাবাই, দিল্লীতে মুন্নিবাই এবং লখনউ শহরে আখ্‌তরীবাই। ঘুরে বেড়াতেন তিনটি জায়গায়। আমীর খাঁ সাহেব নাড়া বাঁধেননি তাঁর, তবু আমীর খাঁর বিলম্বিত গায়কীর গুরু ওয়াহিদ খাঁই।

পণ্ডিত ভীমসেন ওয়াহিদ খাঁ সম্পর্কে একটি কথা জানালেন। ভেবেছিলাম, যখন বড়ে গুলাম আলির জীবনী লিখব তখন সে কথাটি দেব কিন্তু এখন সেই লোভ আর সম্বরণ করতে পারছি না।

পণ্ডিতজী জানালেন, বড়ে গোলাম আলি একবার ওয়াহিদ খাঁর কাছে শেখার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তিনি 'না' করে দিলেন। একজন শিষ্য জিগোস করল, "উস্তাদজী বড়ে গোলাম এমন মহান গায়ক শিষ্য হতে চাইছেন তাতে আপনারও তো গৌরব। আপনি কেন প্রত্যাখ্যান করলেন ?" তখন ওয়াহিদ খাঁ সাহেব ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলেন, "বড়ে গোলামের গলায় পাহাড়ি মউমাছিরা মধু সংগ্রহ করে রেখেছেন। খুব মিষ্টি এবং তৈরী গায়ক। তাঁর গায়নে শুধু এক আধটা দোষ আছে। আমার কাছে শিখলে সেটাও সরে যাবে। কিন্তু তারপর আর

রেশমী কোমল, উজ্জ্বল কেশভার। সানসিল্ক শুধু শ্যাম্পুই নয়—আপনার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় প্রসাধনী। কারণ, একমাত্র সানসিল্ক শ্যাম্পুর যত্নই আপনাকে দিতে পারে সেরা সৌন্দর্য, আর সৌন্দর্য সাধনে তৃপ্ত এক অভিনব অনুভূতি।
আর এখন, 'নতুন-রূপের' সানসিল্ক শ্যাম্পুতে পাবেন আরো কিছু প্রাকৃতিক উপাদান—যা চুলের জন্যে উপকারী বলে আপনার জানা আছে।
যতই সাজগোজ করুন না কেন, সানসিল্ক ব্যবহার করলে তবেই আপনার রূপ সত্যিসত্যি ফুটে উঠবে। এখনই ব্যবহার করতে শুরু করুন।
সান সিল্ক*
মেয়েদের একান্ত প্রয়োজনীয় প্রসাধনী
'নতুন—রূপের' সানসিল্কের ভাণ্ডারে পাবেন প্রত্যেক রকমের চুলের উপযুক্ত রকমারি শ্যাম্পু।
স্বাভাবিক চুলের জন্যে আমণ্ড। তেলা চুলের জন্যে লেমন।

সমস্ত গায়ক ভুখা রয়ে যাবে, তার কি? শ্রোতারা আর কাউকে শুনবেই না।

**হীরাবাই :** ১৯২৩ সালের আর একটি ঘটনা, যেটা, জানো, চাইলেও ভুলতে পারব না। উস্তাদজীর কাছে সবে শিখতে শুরু করেছিলাম তবুও তিনি ইজাজত দেন। কিসের ইজাজত জানো? থিয়েটারে গান করার, আর মা পুনার আর্যভূষণ থিয়েটারে আমার প্রথম জলসা করান। কি সব মজা! তখন কেশরবাই মোগুবাইরা বয়সে আমার চেয়ে বড় হলেও কখনও আসর করেননি। মেয়েদের গান শুনতে যাওয়াও যখন বারণ গান গাইবে কে? তখন শুধু তমাশার তবায়েফরা থিয়েটারে নাচ করতেন। নাচের সঙ্গে হাল্কাফুল্কা গান। সেই সময়ে আমি তিন ঘণ্টায় উচ্চাঙ্গ সংগীতের মেহেফিল করলুম। যারা এসেছিলেন, ভয়ে ভয়ে, ঘেমে গিয়ে গান শুনছিলেন। গানের চেয়ে দরজার দিকে তাঁদের কান। মারপিট হবার আশঙ্কা ছিল। আমি ভয়ে থরথর কাঁপছিলুম। হারমোনিয়ামে দাদা এবং তবলায় ছিলেন বলবন্তরাও রুকড়ীকর। টিকিট ছিল আট আনা থেকে তিন টাকা। ভাগ্যিস, কোনো হাঙ্গামা হয়নি। কিন্তু পুনা বম্বের নামকরা গায়করা খুব রেগে গেলেন। 'এই বজ্জাত মেয়ে উচ্চাঙ্গ সংগীত আট আনায় বিকি বিক্রি করে দিল"—তাদের ক্ষোভ। ঠিকই জমল জলসা। গায়নের জন্য ডাক আসতে শুরু হল। বেশি করে বিয়ের বাড়িতে ঘরোয়া আসর। ৩৫ টাকা পেতুম। ১০ টাকা সঙ্গতীয়াদের। ২৫ আমার। মনে পড়ছে তার আগেকার কথা : বাড়িতে কেউ বড় লোক এলে গাইতুম। তারা খুশি হয়ে রুপোর মেডেল দিতেন—তখন সেই মেডেলের দাম থাকত মাত্র এক টাকা। সেই ক্ষুদ্র মেডেলের জন্য আমরা বোনেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা, গেয়ে থাকতুম। মেডেল পেলে যেন স্বর্গের ছাতাকে স্পর্শ করেছি এমন আনন্দ। আর হঠাৎ মাত্র আঠারো বছর বয়সে আমি একটা আসরে ২৫ টাকা পেতে লাগলুম। অঘটনও ঘটে!

[ স্বগত ]

আর্যভূষণ থিয়েটারের জলসা ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত জগতে রীতিমতন বিপ্লব ঘটিয়ে এনেছে। কুলীন বাড়ির মেয়ে মঞ্চে বসে গান করছে?—অব্রহ্মণাম, লাহোল বিলা কুওয়াত, নিষিদ্ধ! এটা হীরাবাই-এর সবচেয়ে বড় অবদান! এজন্য তাঁর কাছে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এবং সমস্ত মহিলা শিল্পীরা চিরকাল উপকৃত। কয়েক বছর হীরাবাইকে খুব অপমানিত অবস্থায় আসর করতে হল। বিশেষত ছোট শহরে। তিনি একটি চিজ গাইছেন, হঠাৎ শ্রোতাদের মধ্যে থেকে শিস্ আসছে, সস্তা গানের ফারমাইশ হচ্ছে, 'দাঁড়িয়ে গান না' এরকম চিৎকার। তাঁর চরিত্র নিয়ে কানাঘুষো। তবু হীরাবাই নির্ভয়ে বসে বৈঠক জমাতেন। অতুলনীয় তাঁর মনের জোর। হীরাবাই-এর আগের হাজার পাঁচশ বছরের ভারতীয় দেবসঙ্গীতের ইতিহাসে কোনো মহিলা গায়কের নাম পর্যন্ত নেই। আজ সেই ইতিহাসে হীরাবাই-এর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়েছে।

আর যখনই মহিলা গায়কদের আসর শুনি, মেয়েদের রেয়াজ করতে দেখি, ওদের জানাতে ব্যাকুল হয়ে উঠি, "জানো তোমাদের গুরু যে কেউ হোক, গায়নের স্বাধীনতা দিয়েছেন হীরাবাই। তাঁর অদৃশ্য আঙুল ধরেই তোমরা মঞ্চে উঠেছো।

**হীরাবাই :** পরের বছরই, মানে ১৯২৪-এ নাগপুরে অনুষ্ঠান হয়। আজও সেই মেহফিলের প্রত্যেকটি মুহূর্ত মনে পড়ে। একটি মেয়ে হিন্দুস্থানী সংগীত গাইবে? নাগপুরবাসীদের জন্য যেন পৃথিবীর অষ্টম চমৎকার। কঙ্কটেশ থিয়েটার একেবারে ফুল। পরদা উপরে যায়। আমার দুর্বল গঠন দেখে লোকেরা চিৎকার করে, 'এ গন্ধচর্মযুক্ত মেয়ে গাইতে পারবে কি?" আমি ভয়ে ব্যাকুল। গান শুরু করি এবং অস্তাই অন্তরা ভয়ে ভয়ে আসতেই হাততেই পর পর ১৩টি অনুষ্ঠান ঠিক হয়। নাগপুর আজও আমাকে সেইরকম ভালোবাসে।

[ স্বগত ]

হীরাবাই সমে আসার যে কথা বললেন সেটা শুনেই তাঁর গায়কীর হীরের টুকরোগুলি আমার স্মৃতিতে চমকে উঠল। সুরেলা টেনে তোলা স্বরকাজ এবং অস্তাই অন্তরার পর সর্পিলগতিতে বিলম্বতে বিহার করা তাঁর বিশেষত্ব। তবু তাঁর স্বরজালের মোহিনী থাকত শুধু একটা সুরে—উপরের ষড়জ। তাঁর অভিজ্ঞ ষড়জ লাগলেই সমস্ত কোলাহল, কথাবার্তা, গুনগুন শেষ! কত কি ঘটে গেছে গত ৫০ বছরের মধ্যে। মহাযুদ্ধ, আণবিক, সংশোধন, পপসঙ্গীত, ফ্যাশানে নানান বদল, হরেক রকমের রুচি-পালট। তবু হীরাবাইর অসংমিশ্র তার ষড়জের স্বাভাবিকতা সেই রকম টাটকা, রুচিকর। হীরাবাইর সমস্ত গায়কীর গঠন দোলনার মতন। শ্রোতারা প্রায় ৫৫ বছর পর্যন্ত সেই দোলনায় বসে ঝুলেছে, ঘুমেছে। কখনও দোলনার দড়ি ছিঁড়ে যায়নি, থামেনি। ৫৫ বছর! এত দীর্ঘকাল কোনো গায়ক বা গায়িকা গেয়েছে মনে হয় না। যদি গেয়েছে, হীরাবাই যত আসর করেছেন তত নিশ্চয়ই করেনি। সভা-সম্মিলনী, আকাশবাণী এবং ঘরোয়া আবার ৫ বছর নাটকের নায়িকা হিসেবে হীরাবাই হাজার হাজার অনুষ্ঠান করেছেন। গানের সময় হীরাবাইর ভাবভঙ্গী দেখে মনে হত তিনি প্রত্যেকটি সুর চোখে পরিষ্কার দেখছেন। সত্যিই দেখেন তিনি। সেই বরদান তিনি দাদা ও বাবা থেকে পেয়েছেন। আর হীরাবাই যে স্বরপুঞ্জ দেখেন সেগুলো মধ্যযুগীয় সন্ত কবিদের পদ্যের মতন প্রসাদিক পবিত্র! তিনি সাধুসুলভ গায়কীর প্রবক্তা। কাজেই যদিও তিনি নূতন রাগ রচনা করেন নি, চিজ-বন্দিশ বাঁধেন নি, তিনি তাঁর সময়ের সবচেয়ে লোকপ্রিয় গায়িকা। অভিজাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে রস জাগাবার অভিলাষী শ্রোতাদের জন্য প্রথম পাঠ হচ্ছে হীরাবাইর গায়কী। প্রকৃতির শীতল জলের মতনই প্রবাহিত গানশৈলী।

হীরাবাই : তোমাদের কলকাতায় কতবার যে গেছি কিন্তু মনে পড়ে ১৯৪০-এর আসর। কোনো নাহারবাবু ডেকে ছিলেন। কে এল সহগল সেক্রেটারী। আমার আগে রোশনআরা বেগম গাইতে বসে। গানের শেষে সে 'জমুনাকে তীর' গায়। সেটা ভৈরবী যেন তার গায়নের সঙ্গে অনুষ্ঠান শেষ। আয়োজকরা চিন্তিত, এবার আমার কি হবে? আমি বসে মারুবিহাগ এবং 'হোরী খেলো মোসে নন্দলালা' গাই। শ্রোতাদের প্রচণ্ড হাততালি। ১২টি স্বর্ণপদক পেলুম। সহগল মঞ্চে উঠে যাঁরা পদক দিয়েছিলেন তাঁদের নাম পড়ে শোনান।

[ স্বগত ]

কলকাতায় হীরাবাই প্রথম গান ভূপেনবাবুর অল বেঙ্গল কনফারান্স-এ ১৯৩৭ সালে। সেই লাজুক কৃষ্ণকলিকে হাত ধরে মঞ্চে নিয়ে এলেন সুরশ্রী কেশরবাই। তিনি শ্রোতাদের জানান, "হীরাবাইর পলকাভঙ্গুর শরীর সুরের গুরুত্ব বহন করতে কত সমর্থ সেটা আপনাদের দেখানোর জন্য আমি নিজে ওকে নিয়ে এসেছি। শুনুন।" আর শ্রোতারা হীরাবাইর স্বরস্রোতে ভাসতে লাগলেন।

হীরাবাই : আর শুধু একটি ঘটনা। অবিস্মরণীয়। ১৯৪৪ সালের। বম্বেতে বার্ষিক নাট্য সম্মেলনে 'সৌভদ্র' নাটক করা ঠিক হল। সম্মেলনের সভাপতি বালগন্ধর্ব ছিলেন এজন্যই। কিন্তু তিনি সুভদ্রার ভূমিকা করতে কিছুতেই রাজী হননি। বললেন, বয়েস হয়ে গেছে, স্ত্রী-ভূমিকা আমাকে আর মানায় না। তোমরা যদি চাও অর্জুনের ভূমিকা করতে পারি। তখন সমিতির সদস্যরা সুভদ্রার ভূমিকার জন্য আমাকে অনুরোধ [illegible] অপূর্ব ঘটনা। ব্ল্যাক-এ টিকিট বিক্রি হয়, এক লক্ষ টাকার চেয়ে বেশী টিকিট সেল। আমাদের দুজনের প্রত্যেকটি গানকে এনকোর দিচ্ছে শ্রোতারা। রাত দশটায় শুরু হয় নাটক এবং শেষ হয় সকাল ৬টা।

[ স্বগত ]

বালগন্ধর্ব পরম প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী। মহারাষ্ট্রের মানুষদের তিন ব্যক্তির প্রতি প্রধান দুর্বলতা—যোদ্ধা শিবাজী সন্ত কবি জ্ঞানেশ্বর এবং গায়ক বালগন্ধর্ব। তাঁর নাম শ্রীনারায়ণরাও রাজহংস।

ছোট নারায়ণের নাম শুনে লোকমান্য টিলক নাম দিলেন বালগন্ধর্ব। তিনি মারাঠি সঙ্গীত নাটকে স্ত্রী-ভূমিকা করতেন। তাঁর রূপ, কাপড় পরা ও খোঁপার ধরন তখনকার মহিলাদের ফ্যাশান হত। মেয়েরা বালগন্ধর্বের পোশাকের অনুকরণ করতেন, পুরুষরা বাড়ির রান্নাঘরের বাসন বিক্রি করে তাঁর নাটক দেখতেন। আলাদিয়া খাঁ, আবদুল করীম, ফৈয়াজ খাঁ, ওয়াজেবুয়া যে কোনো নাম নিন, বালগন্ধর্বের গায়নের চাহিদা। মরহুম তবলা-নওয়াজ উস্তাদ অহমেদজান থিরাকুয়া যেই বালগন্ধর্বের গান শুনলেন তাঁর সঙ্গত করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। অনেক বছর থিরাকুয়াসাহেব গন্ধর্ব নাটক কোম্পানির সঙ্গে ঘুরে বেড়ালেন। শুধু বালগন্ধর্বের সঙ্গে সঙ্গত অন্য গায়ক-অভিনেতাদের জন্য অন্য তবলিয়া।

বালগন্ধর্ব গানের আসর করেন নি কিন্তু নাট্যসংগীতে সমস্ত রাগগুলি পরিপূর্ণ ও পরিষ্কারভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। হীরাবাইর আসর এবং কোম্পানির নাটক একই শহরে যখন হতো, নাটক শেষ হতেই বালগন্ধর্ব হীরাবাইর মেহেফিলে পৌঁছে যেতেন। তিনি বলতেন, "আমার গানগুলি সহী সহী গায় শুধু হীরাবাই।"

এমন আমাদের হীরাবাই বড়োদেকর। যত মিষ্টি গায়ন তত মিষ্টি স্বভাব। সঙ্গীতমহলের সব চেয়ে নিরহংকারী অজাতশত্রু। ভারতের একমাত্র শিল্পী যার বিষয়ে অন্য সমস্ত শিল্পীরা ভালো বলেন।

"শুধু শিল্পীরাই কেন, জনসাধারণও যারা চম্পুতাইর সংস্পর্শে একবারও এসেছেন খুব ভালো মত প্রকাশ করেন" জানালেন সুরেশবাবুর শিষ্যা এবং পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর স্ত্রী বৎসলাবাই। একবার প্রভা অত্রে ও আমি চম্পুতাইর সঙ্গে আবদুল করীম খাঁ সাহেবের পুণ্যতিথির জন্য মীরজ গিয়েছিলাম। কত যে খেয়াল রাখলেন আমাদের। আমি গান করতে মঞ্চে ওঠার আগে জোর করে আমার হাতে নিজের সোনার চুড়ি পরিয়ে দিলেন। আমারই কেন, সবার খেয়াল রাখেন। সুরেশবাবু অকালে মারা যান। তাঁর ৪-৫ মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা, বিয়ে সব কিছুর ব্যবস্থা করেছেন। বুড়ো গরিব গায়কদের জন্য সরকারী অনুদান যোগাড় করেন, নবশিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেন। আজ ৭৫ বছর বয়সেও সেই উৎসাহ, লোককল্যাণে যেন প্রমত্ত।"

ওঠার সময় আমি প্রথমবারই জিগ্যেস করলুম, "চম্পুতাই, এখন ভারতীয় সঙ্গীতের অবস্থা কী?" তিনি বললেন, "আঁধার ভাই, আমি তো সব আঁধারেই আঁধার দেখছি। আজকের যুবাবয়সী আসলে বেশী সতেজ ও বুদ্ধিমান। কিন্তু খুব চঞ্চল। আমি কি বলি এদের জানো? আমি অবশ্য মনে মনে বলি, দেখো, গানবাজনার জন্য হয়তো সময় না দিতে পারো তোমরা। জীবনটা ফাস্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে। ভদ্রভাবে ভালো ব্যবহার তো করো কমসে কম।' এদের গলায় যত ধন নেই তার চেয়ে বেশি দম্ভ এদের নাকের ডগায় চমকে ওঠে। কি করা যায়, বলো?'

আমি আর কি বলতে পারি। তাঁর ৭৫তম জন্মদিনের জন্য তিনি যে সদ্ব্যবহারের সন্দেশ দিয়েছেন সেটা শিল্পী এবং সাধারণজনদের কাছে [illegible] পৌঁছিয়ে দিতে পারি।

# কষ্টকল্পিত

## অতুল্য ঘোষ

**(নবপর্যায়)**

॥ ৩০ ॥

**'৭৭ সালে ভারতীয় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে যে জনতা পার্টির আবির্ভাব হয়েছিল, যার পুরোধা ছিলেন জয়প্রকাশ, তাদের পরের কার্যক্রমে ধীরে ধীরে এটাই প্রকাশ হয়ে পড়েছিল যে, তাদের কাছে ভারতবর্ষের শাসনকার্য ছিল গৌণ, ইন্দিরা গান্ধী ও কংগ্রেসকে হঠানোই ছিল মূল লক্ষ্য।** নির্বাচনে **সে কাজ হাসিল হবার পরই তখন থেকেই সব যেন এলোমেলো হয়ে যেতে লাগল।** কিছু দিন **দরবে কাজ চলল** বটে, **কিন্তু দলকে** দীর্ঘস্থায়ী **করার কোন** প্রচেষ্টা শুরু থেকেই দেখতে **পাওয়া যায়নি।** জনতা **দল** বিভিন্ন রাজ্যে **শাখাও গড়ল—কিন্তু** সেটা নামে মাত্র। দলীয় **নির্বাচন ক্রমাগতই** পেছিয়ে গেল এবং কোন **দিনই হল না। মন্ত্রিত্বে যাঁরা** আসীন হলেন, তাঁদের মধ্যে যোগ্য লোকও অনেক ছিলেন, **কিন্তু রেষারেষিও ছিল। প্রথমে** তা প্রকট হয়নি, **পরে প্রকাশ** পেল। শুরু থেকেই নির্বাচনকে এ'রা এড়িয়ে চলেছেন। প্রধানমন্ত্রী হলেন মনোনীত—সেখানেও নির্বাচন এড়ানো হল। তারপর কি পার্লামেন্টারী শাখা, কি সংগঠন শাখা—কোথাও নির্বাচনের উপর জোর দেওয়া হল না। বাইরে থেকে কেন্দ্রকে খুব শক্তিশালী মনে হলেও সত্যিকারের কোন শক্তি ছিল না। যে ক'টি দল নিজেদের অস্তিত্ব লোপ করে দিয়ে একত্রিত হয়ে নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী ও কংগ্রেসকে হারিয়েছিল, শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর দেখা গেল ভিতরে ভিতরে দলগুলি আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করছে। দলে যে শুধু শাসনকার্যই অবহেলিত হল তা নয়; জনতা দল নামক দলটির অস্তিত্ব লোপ পাবার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেইজন্য ভাঙ্গন যখন শুরু হল, সাধারণের কাছে তা অপ্রত্যাশিত হলেও দলীয় নেতারা খুব একটা বিচলিত হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। যে কটি দল একত্রিত হয়েছিল—লোক দল, জনসঙ্ঘ, সংগঠন কংগ্রেস, সোস্যালিস্ট পার্টি, এবং শেষে যুক্ত হয়েছিল সি এফ ডি বলে এক পার্টি, যার এই যুক্ত হবার জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল, আগে কোন অস্তিত্ব ছিল না। চন্দ্রশেখর হলেন দলের সভাপতি—সেও মনোনীত। যে দল ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, সে দলের সভাপতির যে মর্যাদা পাওয়া উচিত, প্রশাসনে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা কোন দিনই তাঁকে সে মর্যাদা দেননি। সমস্ত নজরটাই ছিল প্রশাসনিক দায়িত্বে যাঁরা আছেন তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য। দলের মর্যাদা বা দলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য কোন চেষ্টাই তাঁরা করেননি।

প্রথম থেকেই লোক দলের ভাবভঙ্গী ভাল ছিল না। প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়ে তো দ্বন্দ্ব ছিলই, তারপর মন্ত্রিসভায় কে দু' নম্বর এবং কে তিন নম্বর হবেন, তাই নিয়ে চরণ সিং এবং জগজীবন

**রাজঘাটে জনতা দলের সদস্যরা শপথ নিচ্ছেন**

রামের মধ্যে দ্বন্দ্ব। সোস্যালিস্ট পার্টির যাঁরা তাঁদের একাংশের খুঁতখুঁতানি লেগেই ছিল। আর সত্য সত্যই ফার্নাণ্ডেজ-মধু লিমায়ের পক্ষে যাঁদের বরাবর তাঁরা প্রতিক্রিয়াপন্থী বলে এসেছেন তাঁদের মন থেকে মেনে নেওয়াও শক্ত **ছিল।** আর নতুন সৃষ্ট সি এফ ডি—তাঁদের মধ্যে মতান্তর মনান্তরে পরিণত **হয়েছিল।** সংগঠন কংগ্রেসের দু-একজন **যাঁরা প্রথমেই** বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের বাদ দিলে সামগ্রিকভাবে সংগঠন কংগ্রেস ও জনসঙ্ঘীরা শৃঙ্খলা মেনে নিতে চেষ্টা করতেন। এর মধ্যেও গোলমাল **ছিল।** সংগঠন কংগ্রেসের নেতা মোরারজীভাই প্রধানমন্ত্রী হয়ে চড়চড় করে এত উপরে উঠে গিয়েছিলেন যে, সংগঠন সম্বন্ধে তাঁর নিস্পৃহতা ঔদাসীন্যে পরিণত **হয়েছিল।** আর কংগ্রেস থেকে যাঁরা এসেছিলেন—চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্ত, রামধন প্রভৃতি—এ'রা খানিকটা নিজেদের জনতা দলের বলেই মনে করতেন। সোস্যালিস্ট পার্টিরও এক দল—যেমন, সুরেন্দ্রমোহন, মধু দণ্ডবতে—এ'রাও খানিকটা খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তারই মধ্যে এমন একটা বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, দল আর কোনরকমেই টিকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। চরণ সিং এবং রাজনারায়ণ প্রভৃতি ঠিকই করে রেখেছিলেন যে, চরণ সিং প্রধানমন্ত্রী হবেন—না হওয়ায় তাঁরা ক্ষুব্ধ। তাই প্রথম থেকেই তাঁরা চেষ্টা করতে লাগলেন জনতা দলের মধ্যে ভাঙ্গন এবং বাইরে যাঁদের সঙ্গে সম্ভব মিতালি করে লোক দলের প্রধান চরণ সিং যাতে প্রধানমন্ত্রী হন। যে সঞ্জয় গান্ধী সম্বন্ধে বিভিন্ন কটূক্তিতে রাজনারায়ণ খ্যাতি (?) লাভ করেছিলেন সেই সঞ্জয় গান্ধীর সঙ্গে মিতালি করবার জন্য তিনি উঠেপড়ে লাগলেন। ইন্দিরা কংগ্রেস বিরোধী দলও সুগঠিত দল। তারা কোন সুযোগের অপব্যবহার করল না। তারা চরণ সিংকে সমর্থন করল এবং চরণ সিং জনতা (এস) নামে দল গঠন করে সেই দলের প্রধান হিসাবে হলেন প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতি ও তাঁর পরামর্শদাতারা অনর্থক তাড়াহুড়ো করে চরণ সিং ও তাঁর সমর্থকদের

**মন্ত্রিসভা গঠন করতে বললেন;** যেন তাঁরা দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছিলেন যে, তাতেই **দেশের মঙ্গল হবে। ইন্দিরা কংগ্রেস তৈরীই ছিলেন—তাঁরা** জনতা **(এস)-এর পক্ষ থেকে সমর্থন** প্রত্যাহার করে নিলেন। রাজনৈতিক **দল হিসাবে ইন্দিরা কংগ্রেস যা করেছিল,** তার বিরুদ্ধে কারো কিছু বলার নেই। **মনে রাখতে** হবে, বর্তমানে পৃথিবীতে **যে রাজনীতি চলছে, তা ম্যাকিয়াভেলী ও চাণক্যের অনুসরণে। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ই এই মতেই পলিটিক্যাল সায়েন্স-এর শিক্ষা** দেয়। **কাজে-কাজেই এ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করবার অবকাশ নেই।** জনতা দলে **যাঁরা অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁরা ক্ষেপে উঠলেন। এমন কি, তাঁরা রাষ্ট্রপতিকে ইমপিচ করার ভয়ও দেখালেন। আর, দলের দলপতি হলেন জগজীবন রাম। অনেকে ভাবলেন এখানেই বুঝি শেষ, কিন্তু** সেটা **ভুল।** জনতা **দলের কোথাও কোথাও একটু সুনাম হয়েছিল, কিন্তু তদারকী সরকারের পাঁচ মাসের রাজত্বে প্রমাণ করে দিল যে, ইন্দিরা গান্ধী এবং তার দলকে সরানোয় ভারতবর্ষের** বিরাট সর্বনাশ সাধিত **হয়েছে। লোকসভার** মধ্যবর্তী নির্বাচনে **জনসাধারণ প্রমাণ করে দিল যে,** ভারতবর্ষে **জনতা দল বলে এসেছিল, তার অস্তিত্ব রাখবার কোন প্রয়োজন নেই।** নির্বাচনে দেখা গেল **জনতা দল ভেঙ্গে যেসব দল সৃষ্টি হয়েছিল, তারা সকলের সঙ্গেই মিতালি করতে প্রস্তুত।** জনতা দলের বাইরে যেসব **দল ছিল** তাদেরও **তাই অবস্থা। একমাত্র** ব্যতিক্রম **ইন্দিরা কংগ্রেস দল।** নির্বাচনেও তাই প্রমাণিত **হল** যে, **শ্রীমতী** গান্ধী ও তাঁর **দল** ভারতবর্ষকে জানেন এবং ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষের শ্রদ্ধাভাজন এবং আস্থাভাজন। নির্বাচনের আগেই সি এফ ডি গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা বহুগুণা তাঁর **সঙ্গীদের নিয়ে** দল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। নির্বাচনের পরে ছবিটা আরও পরিষ্কার হল। **চরণ সিং-এর** যিনি ডান হাত, যিনি অসংযত আচরণের জন্য খ্যাতি (?) লাভ করেছিলেন, এমন কি, শপথ গ্রহণের দিন **অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির** মুখে প্যাঁড়া

হাস্যকর করে তুলেছিলেন, সেই রাজনারায়ণ ও চরণ সিং-এর মধ্যে বিভেদ ঘটে গেল। সেখানেই শেষ নয়। জনতা দল যাঁকে নেতা করে সারা ভারতবর্ষে নির্বাচন পরিচালনা করল, তিনি আছি কি নেই করতে করতে গিয়ে যোগদান করলেন কংগ্রেস (ইউ) দলে। কংগ্রেস-ইউ দল অবশ্য যে-কোন সময়েই ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে ভিড়ে যেতে রাজী, কিন্তু ইন্দিরা কংগ্রেস বোধ হয় এখনও তাদের স্পৃশ্য বলে ভাবে না। সি এফ ডি-র আর এক মাতব্বর বহুগুণা তো নির্বাচনের আগেই সি এফ ডি ত্যাগ করেছিলেন। এদিকে আবার জনতা দলের কিছু কিছু নেতার হঠাৎ দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল। তাঁরা আবিষ্কার করলেন যে, প্রাক্তন জনসঙ্ঘীরা এখনও জনসঙ্ঘীই আছেন—তাদের সঙ্গে একত্রে ওঠা-বসা করা যায় না। তাঁদের জনতা দলের মধ্যে উপস্থিতি দলকে কলুষিত করছে। '৭৭-এর নির্বাচনের সময় মনে হয়নি, মন্ত্রিসভা গঠনের সময় মনে হয়নি যে, রাতারাতি রঙ বদলানো যায় না—তাতে সময় লাগে। যখন জনতা দল বিপর্যস্ত, তখন তো বাইরে কোন কাজ করবার নেই, তাই যাঁরা বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করে এসেছেন, তাঁদেরই দল থেকে বেরিয়ে যাবার পথ পরিষ্কার করে দেওয়া হল এবং জানিয়ে দেওয়া হল যে, না গেলে গলাধাক্কা দেওয়া হবে। ব্যস। প্রাক্তন জনসঙ্ঘীরা বেরিয়ে গেলেন এবং সঙ্গে করে জনতা দলের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাকেও নিয়ে গেলেন। ভারতীয় জনতা দল তৈরী হল। অর্থাৎ ১৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনকে উপলক্ষ করে জনতা দল নামক যে দলটির সৃষ্টি হয়েছিল, তার সামান্য অস্তিত্ব থাকলেও আড়াই বছরের মধ্যে তার যে অবস্থা হল, সে যে ইতিহাস রচনা করল, তা বহু দিন ভারতবর্ষের রাজনীতির ছাত্রদের অনেক শিক্ষা দেবে। প্রমাণ হল যে, আগুপিছু বিবেচনা না করে যে-কোন কাজই করতে যাওয়া হয়, তা হয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত।

জনতা দলের সৃষ্টিকর্তা বললেও চলে—জয়প্রকাশ, যিনি গান্ধীভক্ত এবং আমরা যাঁকে সকলেই শ্রদ্ধা করি, তাঁর শরীর ছিল রোগদীর্ণ এবং মনের উপরেও রোগ প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। তিনি সমস্যা সমাধানের সহজ পথ নিলেন। জনতা দল কতগুলি পরস্পরবিরোধী দলের সমষ্টি, এ কথা তিনি ভুলে গেলেন এবং তাড়াতাড়ি কার্যসিদ্ধির জন্য মনোনীত প্রধানমন্ত্রী নবগঠিত জনতা দলের উপরে চাপিয়ে দিলেন। তাঁর শরীর ভেঙ্গে গেছে, সময় কম। সেজন্য এই পরম সত্য বিস্মৃত হয়েছিলেন যে, সস্তায় কাজ হাসিল করা যায় না। পরস্পরবিরোধী শক্তি যখন একত্রিত হয়, কেবলমাত্র অপর একটি দলকে পরাজিত করবার জন্য—তখন কাজ হাসিল হয়ে গেলে সে দল আর টিঁকতে পারে না। কারণ, তাদের পেছনে কোন আদর্শ বা নীতি নেই। নীতি বা আদর্শ অনেকের কাছেই বাজে কথা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু জয়প্রকাশের কাছে তো তা ছিল না। কিন্তু তাঁর ছিল ব্যস্ততা· তাই তিনি এই ...ভুল করে ফেললেন। একটা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে দল সংগঠিত হয়। হয় নীতি ও আদর্শ, অথবা এমন ব্যক্তিত্ব যাঁর প্রতি শ্রদ্ধা আছে, অথবা সর্বোচ্চ শাসনক্ষমতা থেকে অস্থিরতা দূর করবার জন্য আগ্রহ। জনতা দল নির্বাচনে কংগ্রেসকে হারাবার পর এই তিনটির একটিও তাদের মধ্যে ছিল না। যেমনি কংগ্রেস দল হেরে গেল, অমনি তারা আর একত্রে থাকার কারণ খুঁজে পেল না। কংগ্রেস দলকে হঠানোর তীব্র ইচ্ছায় সহযোগী দলগুলির যেসব ছোটখাট খুঁত চাপা পড়ে গেছিল, কংগ্রেস দলের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সহযোগী দলগুলির সেইসব বাস্তব এবং অবাস্তব খুঁতগুলি প্রকট হয়ে উঠল। কারণ অতি সুস্পষ্ট। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রোশ এঁদের যত প্রবল হয়েছে, ভারতবর্ষের ছবি এঁদের সামনে থেকে তত ম্লান হয়ে গেছে। কংগ্রেস দলের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রিত্বের মসনদ চোখের সামনে ফুটে উঠল এবং সেখানে কিভাবে কায়েম হওয়া যায়, তারই জন্য চেষ্টা হতে লাগল নিরন্তর। এঁরা যে শুধু কংগ্রেস দলকে হঠানোর জন্য যাননি, জয়প্রকাশের কথামত ভারতবর্ষে একটা শুদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রশাসনের জন্য গিয়েছিলেন, তখন আর সে কথা কারো মনে ছিল না। প্রশাসনে কে থাকবেন এবং কত দিন থাকবেন সেটাই একমাত্র চিন্তা। কেন প্রশাসনে এসেছেন, সে কথা সকলেই ভুলে গিয়েছিলেন। '৭৭-এর নির্বাচনের ঢের আগে থাকতেই জয়প্রকাশ বলে আসছিলেন যে, তৎকালীন প্রশাসন ঘোর দুর্নীতিপরায়ণ—এর অবসান চাই। নির্বাচনের পর জনতা দলের কারো সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকলে জনতা দলের সব নেতারা প্রশাসক হবার জন্য ছুটে যেতেন না; ভারতবর্ষকে একটা সুস্থ, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন দেবার জন্য সকলেই দলকে শক্তিশালী করবার চেষ্টা করতেন। এঁরা মনে করেছিলেন যে, এঁরা নিজেদের শক্তিতে নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। সেটা যে ভুল, সে কথা একবারও মনে হয়নি। নির্বাচনের আগে এঁদের কথা এবং আচরণে ভারতবাসীর মন একেবারে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। তারা আশা করেছিল যে, গান্ধীভক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ যে দল সৃষ্টি করেছেন তার কাজে ও প্রশাসনে অন্তত খানিকটা আদর্শের ছাপ থাকবে। নির্বাচনের পর যখন দেখল যে, যাঁরা এসেছেন তাঁরা স্থায়িত্ব চান না। আগের দিনে 'বারবারিক ইনভেসন'গুলো যেমন হত, স্থায়িত্বের জন্য নয়, যে দেশে 'ইনভেসন' হত তার সমৃদ্ধির জন্য নয়, লুটপাটের জন্য, জনতা দলও সেইরকম কেবলমাত্র ক্ষমতার অধিকারী হতে চায় বলে ক্ষমতায় এসেছিল, সে ক্ষমতায় দেশের সমৃদ্ধি বা দেশের স্থিতিশীলতার কোন আভাস ছিল না। যা অবশ্যম্ভাবী, তাই ঘটল। অনেকে বলেন, জনতা দলের বিপর্যয় ঘটেছে। কিন্তু বিপর্যয় কেন? তাঁরা তো আর কিছু চাননি। ভারত-ইতিহাসের এক অধ্যায় সৃষ্টি হল—যে অধ্যায় সৃষ্টি না হলে ভারতবর্ষের কোন ক্ষতি হত না এবং ইতিহাসও কলঙ্কিত হত না।

# নজরুল ইসলাম প্রতিভা বসু

থাকি ঢাকা শহরে, বয়েস তখন তেরো, এই সময়ে একবার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ এবং সাহিত্যিক দিলীপকুমার রায় এলেন সেখানে। উঠেছেন তাঁর বন্ধু বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ি রমনায়। ঢাকা গান পাগল দেশ। গায়কেরও অভাব নেই, সমঝদারেরও অভাব নেই। সেই সময়ে সারা বাংলা যে তিনটি নামের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছিলো তার একজন এই সংগীতজ্ঞ দিলীপকুমার রায়, আর একজন রাজনীতিবিদ সুভাষচন্দ্র বসু, অন্যজন কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

দিলীপকুমার রায়কে নিয়ে মেতে উঠলো শহর। নানা জায়গায় তাঁর গানের আসর বসতে লাগলো, আমারও ডাক পড়তে লাগলো ঘন ঘন। যেহেতু আমার কিছু গানের রেকর্ড বেরিয়ে গেছে ততোদিনে, দিলীপকুমার আমার নামটা জানতেন, রেকর্ডও শুনেছেন, সহজেই তাঁর সঙ্গে আমার গুরুশিষ্যার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল। তিনিই আমাকে নজরুলের গানে হাতেখড়ি দিলেন। এবং সেই গান শুনে শ্রোতারা পাগলের মতো মোহিত হতে লাগলো। নজরুল ইসলামের গানের যাদু সকল যুবকযুবতীর হৃদয়ে তো বটেই, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের হৃদয়তন্ত্রীতেও যথেষ্ট জোরে ঘা দিল। নজরুল ইসলাম শুধু গানের অভিনবত্বের জন্যই বা কম্পোজার হিসেবেই বিখ্যাত নয়, তিনি এক যুগান্তকারী বিদ্রোহী নেতাও, তাঁর কবিতা পরাধীন ভারতের প্রতিটি বাঙালী হৃদয়কে স্বাধীনতার স্পৃহায় উদ্বুদ্ধ করে প্রজ্বলিত করে। দলে দলে ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে আসে সেই কবিতার ডাকে। একটা উল্কার মতো মানুষ। সেই মানুষ বিষয়ে আমাকে দীক্ষিত করে কিছুকাল বাদে দিলীপকুমার চলে গেলেন। তাঁর চলে যাওয়া আমার উজ্জ্বল দিনরাত্রিকে অনেকখানিই নিষ্প্রভ করে দিয়েছিলো।

কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই কোনো এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ির দরজায় এসে একটি ঘোড়ার গাড়ি থামলো। ঢাকাতে ঘোড়ার গাড়ি করে কেউ আসা মানেই পরিবার নিয়ে বেড়াতে আসা। নইলে ঢাকার পুরুষেরা সকলেই পদাতিক অথবা সাইকেল আরোহী। মহিলা হলেই গাড়ির প্রশ্ন। মফস্বল শহরের সব সন্ধ্যাই বড়ো বিরস। সেই বিরস সন্ধ্যায় বিরস মুখে আমি আমাদের পোতলা বাড়ির রাস্তার ধারের ঝোলানো বারান্দায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছিলাম। দূরে দূরে টিমটিমে গ্যাসের আলোর পথও বিরস। তারই মধ্যে একটি গাড়ি থেমে কোনো অতিথির আগমন ঘোষণা করে আমাকে যথেষ্ট খুশী করলো। আমি দৌড়ে নিচে এলাম।

মা বললেন, 'ছুটছিস কেন? কী ব্যাপার?' তেমনি দৌড়েই সিঁড়ি নামতে নামতে বললাম, 'কারা যেন ঘোড়ার গাড়ি করে বেড়াতে এলো আমাদের বাড়ি।'

'তা একটা আলো নিয়ে যা, পুনার মাকে (আমাদের পরিচারিকা) ডেকে বল লণ্ঠনটা দিতে।'

পুনার মাকে ডাকতে হলো না, একতলায় আসতে সে নিজে থেকেই লণ্ঠনটা হাতে দিল। আমি সেটা টেবিলে রেখে দরজা খুলে দিলাম। খুলে দিয়েই দেখলাম বাঙালীর তুলনায় অতিশয় সুস্থ এবং সুশ্রী এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়। এঁকে আমি বারান্দা থেকেই নামতে দেখেছিলাম। একমুখ হেসে আমাকে প্রায় ঠেলেই ঢুকে এলেন ঘরে। আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'এই তো, এই তো তুমি। তুমিই রানু, ঠিক তো? তুমিই মণ্টুর ছাত্রী।' মণ্টু দিলীপকুমার রায়ের ডাকনাম।

আমার বুকটা ধক করে কেঁপে উঠলো, মনে মনে বললাম, 'তবে কি ইনিই তিনি?'

আমি নজরুল ইসলামকে কখনো দেখিনি, কখনো তাঁর চেহারার কোনো বর্ণনাও শুনিনি, তবু খুব আশ্চর্যভাবেই মনে হলো এঁর নামই নজরুল ইসলাম। ...

কবি, যাঁর বিপ্লবাত্মক, দেশাত্মবোধক এবং গজলের মিষ্টি সুর সংবলিত প্রেমের গান গেয়ে আমি রাতারাতি ঢাকা শহরে একটা নাম হয়ে উঠেছি।

আমি রোমাঞ্চিত বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে বললাম, 'আপনি—আপনি কি—'

'আমি নজরুল ইসলাম।' বড়ো বড়ো গলায় হাসলেন।

নজরুল ইসলামের বয়েস তখন তিরিশ-বত্রিশ অথবা তারও কিছু বেশী কিনা আমি জানি না। যৌবন তাঁর চোখে মুখে সমস্ত শরীরে নদীর স্রোতের মতো বহমান এবং বেগবান। সেই বয়সে তাঁকে যাঁরা দেখেছেন শুধু তাঁদেরই বোঝানো যাবে কী দুকূলপ্লাবী আনন্দধারা দিয়ে গড়া তাঁর চরিত্র। আমার মতো একটা নগণ্য সদ্য কিশোরীর জীবনে এই বিরাট ব্যক্তির উপস্থিতি সেদিন যে প্রচণ্ড সুখ এবং সম্মান এনে দিয়েছিলো তার কোনো তুলনা নেই।

উনিই যে নজরুল ইসলাম সেটা যে দেখা মাত্রই বুঝেছিলাম তার সবটাই আমার ইনটুইশন, তা নয়। দিন দুই আগে জনরব শুনেছি তিনি ঢাকা এসেছেন, ছাত্ররা নাকি ভেঙে পড়ছে তাঁর দরবারে। কেবলমাত্র গানেই নয়, ঢাকার মানুষ বিশেষত ছাত্রছাত্রীরা রাজনীতিতেও প্রবল উৎসাহী। এই ব্যক্তিটি নানা কারণেই তাই নানা মানুষের কাছে এক কল্পনার নায়ক। বস্তুতই এমন একজন নায়ক কোনো দেশে কোনো কালেই অবিরল নয়। মস্ত বড়ো বড়ো টানা কালো চোখ, এলোমেলো ঘন চুলের বাবরি, তীক্ষ্ম নাসিকা, ঘষা তামার মতো রং, লাবণ্য, সহজ সরল অদাম্ভিক ব্যবহার, উদ্দাম হাসি, উচ্ছ্বাস-প্রবণতা—সবটা মিলিয়ে একটা ব্যক্তি বটে। আর তার ধুলোয় লুটিয়ে পড়া গেরুয়া চাদর।

ঢাকা আসার গল্পটাও ঠিক তার চরিত্র উপযোগীই ছিলো। ফুটবল খেলা দেখতে গিয়েছিলেন গড়ের মাঠে। ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান নিয়ে তুমুল তর্ক করতে করতে কোনো বন্ধুর পাল্লায় পড়ে শিয়ালদ স্টেশনে এসে হাজির। দেখলেন ঢাকা মেইল দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ মনে হলো একবার গিয়ে বেড়িয়ে এলে কেমন হয়? এই তো মণ্টু কেমন ঘুরে এলো। মনে হওয়া আর টিকিট কাটা। ব্যস, উঠে বসলেন।

আমি বিহ্বলতা কাটিয়ে দেখলাম মা এসে দাঁড়িয়েছেন, বাবাও নেমে এসেছেন ছাদ থেকে, নজরুল ইসলামই নিজে বসে আপ্যায়ন করছেন তাঁদের, 'আসুন, আসুন আপনাদের কথা আমি সব শুনেছি মণ্টুর কাছে। এসে থেকে বলছি সেই পাখির গলা মেয়েটির কাছে নিয়ে যাও আমাকে, কেবল এদিক ওদিক নিয়ে যায় আর ভিড় করে। তাই আজ ঠিকানা খুঁজে নিজেই চলে এলাম।'

এই মানুষের আগমনে আমার মা-বাবাও কম বিহ্বল হননি। তাতে কি? নজরুল তো একাই একশো। মুহূর্তের মধ্যে সকলের সব সংকোচ ধুয়ে-মুছে হাসিতে গানেতে পানেতে জমজমাট করে তুললেন আসর। বসার ঘর থেকে উঠে এলাম দোতলায়। নজরুল ইসলামের স্মৃতি মানেই হচ্ছে হারমোনিয়ম, বাটা-ভরা পান, আর ঘন ঘন চা। সেই হারমোনিয়ম নেমে এলো বাক্স থেকে বাটাভরা পানও এলো, চা-ও এলো পট ভরতি। তারপর গান, গান আর গান। আমাকে দিয়েও গাওয়াচ্ছেন, নিজেও গাইছেন, সঙ্গে সঙ্গে অনর্গল হাসি। মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছেন, 'দে গরুর গা ধুইয়ে।' আমি গানে টান দিলেই বলে উঠছেন 'অতোলন অতোলন।'

তাঁর নিজের গলা ভাঙা-ভাঙা, কিন্তু কী মিষ্টি, কী স্বর্গীয়। সেদিনই সেখানো শুরু হয়ে গেল। উঠলেন রাত দশটায়। চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ একটা তদ্গত আনন্দের সতেজ হাওয়ায় ভরে থাকলো বাড়িটা।

CASV-390-264 BN

পরের দিন সকালেই আবার সোঁধ চলে এসেছেন। আমি সবে ঘুম থেকে উঠে হাই তুলতে তুলতে মুখ ধুয়ে এলাম। মা আমাদের চা দিচ্ছেন, এই সময়ে কড়া নাড়া। আমরা তো অবাক।

প্রচণ্ড হাসি, 'এসে পড়লাম, বুঝলে? বেলা বাড়তে দিলে কি আর উপায় আছে? সব ছেলেরা ঠিক ভিড় করবে, ধরে নিয়ে যাবে কোথাও। এখান থেকে ফিরে গিয়ে কাল রাত্তিরে একটা গান লিখেছি, এক্ষুণি শিখিয়ে দিতে হবে। নাও, নাও, শীগগির চা খেয়ে নাও। আবার ভুল হয়ে যাবে।'

চায়ের আসরে তিনিও বসে গেলেন। সকালটাই উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তারপর আবার হারমোনিয়াম পানের বাটা আর গান। 'আমার কোন কূলে আজ ভিড়লো তরী এ কোন সোনার গাঁয়, আমার ভাটির তরী আবার কেন উজান যেতে চায়।' এই গানটি লিখেছেন রাতে। দেখা গেল তখনো তার বয়ান যা সুরারোপ সম্পূর্ণ হয়নি, আমাকে শেখাতে শেখাতেই বাকীটা ঠিক করে নিলেন। পকেট থেকে কলম বেরুলো, কাটাকুটি কাগজ বেরুলো, গলা থেকে সুর বেরুলো, গানে সম্পূর্ণতা এলো।

দিন তিনেক বাদে আর একটি গান তৈরী হলো, 'এতো জল ও কাজল চোখে পাষাণী আনলে বল কে।'

যখন গানে বসতেন অবিশ্রান্ত চা খেতেন বলে আমার মা মাঝে মাঝেই অপ্রত্যাশিতভাবে এক কাপ চা এনে দিতেন হাতে, আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠতেন, 'নাহ্, মার মতো মেয়ে হয় না—' সেদিন গেয়ে উঠলেন, 'এতো চা ঐ পেয়ালায় এমন করে আনলে বলো কে।'

এইটুকু থেকেই পরের দিন ঐ গান রচিত হয়ে এলো। 'শেখো, শেখো, শীগগির শিখে নাও।'

এসেছিলেন মাত্রই কয়েক দিনের জন্য, রইলেন প্রায় মাস দেড়েক। উঠেছেন বর্ধমান হাউসে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনের বাড়ি। সেখান থেকে রোজ আসতেন ঘোড়ার গাড়ি করে। দূর তো কম নয়, কোথায় রমনা আর কোথায় বনগ্রাম! যদি গাড়ি না মিলতো তাহলে হেঁটে। গান গুনগুন করতে করতেই হাঁটতেন। বলতেন, কখন পথ ফুরিয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না।

তখনো আমরা হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার চেহারা দেখতে অভ্যস্ত হইনি। স্বদেশী আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠেছে, জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকটি ভারতবাসী বদ্ধপরিকর হয়েছে ইংরেজ বিতাড়নে। টলমল করছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। ইংরেজরা রাস্তা খুঁজছে কোন রন্ধ্রে সর্বনাশের বিষ ঢোকাবে, ভেঙে দেবে এই একতার বাঁধ। নেতারা তখুনি অনুমান করেছিলেন শেষ পর্যন্ত ধর্মের ধুয়ো তুলে অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে এরা না একটা বিদ্বেষের বীজ ছড়িয়ে দেয়।

নজরুল ইসলাম সগর্জনে সর্বত্র বক্তৃতা করছেন এর বিরুদ্ধে। উদাত্ত গলায় প্রাণের সমস্ত আবেগ ঢেলে বলে উঠছেন 'হিন্দু না ওরা মুসলিম এ জিজ্ঞাসে কোনজন? কাণ্ডারী! বলো ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার।'

আমরা ভারতবাসী, এই আমাদের পরিচয়, ভারতভূমি আমাদের মাতা, আমরা তার সন্তান। এর মধ্যে কে হিন্দু কে পার্সী, কে শিখ বা জৈন বা কে মুসলমান—এই চেতনা নিষ্প্রয়োজন। যা নিয়ে মাথা ঘামাবে তা শুধু পরাধীনতার লজ্জামোচন। তারপরেই গানের গলা কেঁপে কেঁপে ঊর্ধ্বে ওঠে, 'দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার হে, লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।' যুবকেরা গেয়ে ওঠে 'আমরা শক্তি আমরা বল, আমরা ছাত্রদল মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান ঊর্ধ্বে বিমান ঝড় বাদল, আমরা ছাত্রদল।'

নজরুল যুদ্ধে গিয়েছেন, জেল খেটেছেন, জেলের নিঃসঙ্গ কুঠুরির অন্ধকারে নির্বাসিত হয়েছেন, অনশন করেছেন, খদ্দরই তাঁর একমাত্র আবরণ, মাথায় গেরুয়া রঙের গান্ধীটুপি, গায়ে গেরুয়া চাদর—কী একটা ব্যক্তিত্ব! ভাবা যায় না।

উনি ঢাকা থেকে ফিরে যাবার মাস আট-দশ বাদে আমাকেও কলকাতা আসতে হল। গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে বছরে ছ'খানা রেকর্ড করবো এই শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলুম। এসেই দেখা হলো ওঁর সঙ্গে। ওঁর সব গান আমার তখন কণ্ঠস্থ। উনি বললেন, 'আমার গানই রেকর্ড করো।' আমি নিজেও তাই স্থির করে এসেছিলুম। আমার মা-বাবারও সেটাই ইচ্ছে। কোম্পানীর কর্তাকে বলে ওঁকেই আমার ট্রেইনার হিসেবে নিযুক্ত করা হলো। আমার ধারণা, গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে সেই প্রথম সংযোগ নজরুল ইসলামের। যদি বা তার আগে কোনো যোগাযোগ হয়েও থাকে, এতটা ঘনিষ্ঠ অন্তত ছিল না সেটা জানি।
জানি।

একসঙ্গে দু'খানা রেকর্ড হলো, এ-পিঠ ও-পিঠ চারখানা গান। সেই সময়ে আমি চুঁচুড়ায় আমার পিসীমার বাড়িতে ছিলাম। আমার পিসেমশাই সেখানকার কলেজিয়েট স্কুলের অ্যাসিস্টেন্ট হেড-মাস্টার। আমি যাবার পরে নজরুল ইসলাম কলকাতা থেকে এসে সেখানেই উঠতেন, থাকতেন, গান শেখাতেন। আমার পিসীমা ওঁকে ভীষণ ভালোবাসতেন। তাঁকে খাঁদা নাক বলে খুব ক্ষ্যাপাতেন উনি। পিসীমা বলতেন, 'থাক, থাক, খাঁদাই হই যাই হই; তোমার মতো কালীকৃষ্ণ তো নই!' হাত বাড়িয়ে বলতেন, 'মেলাও তো রং!' একদিন হাসতে হাসতে নজরুল বললেন, 'দাঁড়ান, কালোর যে কতো গুণ দেখাচ্ছি আপনাকে।'

শ্রীমতী- রানু সোম
কল্যাণীয়াসু

মাটির ঊর্দ্ধে গান গেয়ে ফেরে-
স্বর্গের যত পাখী-
তোমার কণ্ঠে শিয়াছে তাহারা
তাদের কণ্ঠ রাখি'
যে গন্ধর্ব লোকের স্বপন
হেরি মোরা নিশিদিন-
তুমি আনিয়াছ কণ্ঠে ভরিয়া
তাদের সুরটি ক্ষীণ।
তুমি আনিয়াছ শুধু সুরে সুরে
ভাষাহীন আবেদন-,
যে সুর-মায়ায় বিকশিয়া ওঠে-
শশী তারা গগন।
যে সুরে স্বর্গে স্তব গান গাহে-
সুন্দর সুরধুনী-
অসুন্দর এই ধরায় তোমার
কণ্ঠে সে গান শুনি॥
'কাজীদা'

প্রতিভা দেবীর উদ্দেশে লেখা কবিতা

রাত জেগে কীর্তন লিখলেন একটি।
'কেন প্রাণ ওঠে কাঁদিয়া, কাঁদিয়া গো
যতো ভুলি ভুলি করি, ততো আঁকড়িয়া ধরি
ততো মরি সাধিয়া সাধিয়া গো।
শ্যামের সে রূপ ভোলা কি যায়
নিখিল শ্যামল যার শোভায়
আকাশে সাগরে বন কান্তারে
লতায় পাতায় সে রূপ ভায়।'

পৃথিবীতে যে কালো ছাড়া আর কিছুই নেই শুধু তারই আকৃতি শ্যবার গলায়:

'আমি যমুনার রূপের ছায়া বুকে ধরি
আকাশ আরসি নীল গো
বহে ভুবন প্লাবিয়া কালারে ভাবিয়া
কালো সাগর সলিল গো—
আমি তারই লাগি
চকোরিনী হ'য়ে দিলে ডুবে রই তারই লাগি
রাতে রবির কিরণে শরণ মাগি
তারই লাগি
কাঁদে ফালগুনে গুনগুন ফুলভ্রমরা
বনহরিণীর চোখে তারি কাজল পরা
তারে কেমনে ভুলিব—!
যদি ফুল হয়ে ফুটি তরুশাখে
সে যে পাতা পল্লব হয়ে ঘিরে থাকে
যদি একাকিনী চলি বনতলে
সে যে ছায়া হয়ে পিছে পিছে চলে
যদি একা ঘরে মোর দীপ জ্বালি
আসে আঁধারের রূপে বনমালী
তারে কেমনে ভুলিব!'

স্মৃতি থেকে হয়তো সব ঠিকমতো তুলে দিতে পারলাম না। তবে সব কিছুর অর্থই এই যে, ত্রিভুবনে কালোকে ভোলার কোনো উপায়ই রাখেননি প্রভু। 'যদি একা ঘরে মোর দীপ জ্বালি, আসে আঁধারের রূপে বনমালী'—এই লাইনটা গাইতে গাইতে নিজের গানে নিজেই মোহিত। 'দেখেছ, কী কাণ্ড। কী সুন্দর! আসে আঁধারের রূপে বনমালী।' ভাবতে পার? কিন্তু আসে, সত্যিই আসে।' তারপরেই চেঁচামেচি, 'রানু, কোথায়, এসো এসো। বসো হারমোনিয়াম নিয়ে, তুলে নাও গানটা। আমি আবার ভুলে যাবো।'

এর পরেই পেয়ে বসলো কীর্তনে। পর পর দুটি রাতে বসে দু'খানা কীর্তন লিখলেন। তারপরে আর কানু বিনে গীত নেই।

নলিনীকান্ত সরকার (এখন বহুদিন পণ্ডিচেরীর আশ্রমপ্রবাসী) ছিলেন ওঁর প্রাণের বন্ধু। নলিনীদা বলতে পাগল। ওঁর সূত্রে অবিলম্বে আমারও দাদা হলেন তিনি। চুঁচুড়া থেকে কলকাতা এলে ওঁর বাড়িতেই উঠতাম। দাদা তো দাদাই, কখনো কোনো সংকোচের প্রশ্ন রাখতে দেন না। সে বাড়িতে সকলেরই অবাধ গতিবিধি।

যেমন নজরুল ইসলাম একাই এক শো, তেমনি নলিনীদার বাড়িই আমাদের সকলের বাড়ি। সেখানে যদি একবার গানের আসর বসলো, সে সকালেই হোক, দুপুরেই হোক আর বিকেলেই হোক, সময়ের জ্ঞান থাকবে না কোনো। শরৎচন্দ্র পণ্ডিত, যিনি দাঠাকুর নামে বিখ্যাত, একটি ছায়াছবিও হয়ে গেছে তাঁর নামে, সেই উপবীতধারী ধুতি আর চাদর সম্বল আশ্চর্য মানুষটিও হঠাৎ হঠাৎ এসে উপস্থিত হতেন সেখানে। ব্যস। আর দেখতে হবে না।

দাঠাকুর এলে কি আর কথা আছে! দে গরুর গা ধুইয়ে! চিৎকার চেঁচামেচি, হইহল্লা, গান, খাওয়া-দাওয়া—মহা উৎসব। বৌদিও তেমনি—গালে পান, মুখে হাসি, এক বিন্দু বিরক্তি নেই। একেবারে অন্নপূর্ণা! চুঁচুড়া থেকে বেশী দিন না এলেই সুললিত সাহিত্যিক ভাষায় নলিনীদার চিঠি যেতো, 'রানু, শীগগির চলে এসো, নইলে কিন্তু তোমাকে গীতার মাসী বলে রটিয়ে দেব।' গীতা হচ্ছে নলিনীদার কন্যা। এই রসিকতাটা করতে উনি খুব ভালোবাসতেন।

সেই সময়ে নজরুল ইসলাম আর নলিনীদা আমাকে একদিন রেডিয়োর আপিসে নিয়ে এলেন। রেডিয়ো তখন সরকারী প্রতিষ্ঠান ছিলো না, অডিশন ইত্যাদিরও কোনো নিয়ম ছিলো না, যতো দূর মনে পড়ছে নৃপেন মজুমদারই ছিলেন কর্ণধার। তাঁর অনুরোধেই ওঁরা নিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে। নজরুলের গানকে ছড়িয়ে দেবার উৎকৃষ্ট মাধ্যম ছিলেন দিলীপকুমার রায়, কিন্তু তিনি তখন সন্ন্যাসী হয়ে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রম

[illegible]

আমার কোন কূলে আজ ভিড়ল তরী এ কোন সোনার গাঁয়।
আমার ভাটির তরী আবার কেন উজান যেতে চায়॥
আমার দুঃখেরে কাণ্ডারী করি'
ভাসিয়েছিলাম ভাঙা তরী,
তুমি ডাক দিলে কে স্বপন-পরী
নয়ন-ইশারায়॥
আমার নিবিয়ে দিয়ে ঘরের বাতি ডেকেছিল ঝড়ের রাতি,
তুমি কে এলে মোর সুরের সাথী গানের কিনারায়।
ওগো সোনার দেশের সোনার মেয়ে হবে কি মোর তরীর নেয়ে,
আমার ভাঙা তরী চল বেয়ে রাঙা অলকায়॥ নজরুল

**নজরুল নিজের হাতে যে গান লিখে গিয়েছিলেন**

পণ্ডিচেরীনিবাসী। কেমন করে যেন অবধারিতভাবেই সেই ভারটা আমার উপর ন্যস্ত হ'য়ে গেল। আর রেডিয়োর মারফত অতি দ্রুত অনেক বেশী শ্রোতার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হ'য়ে অনেক বেশী সমাদৃত হবার অবকাশ পেলো। পরের দিন বিভিন্ন কাগজে প্রশংসা বেরুলো অনেক। নজরুল ইসলাম আর নলিনীদা দু'জনেই সমান খুশী, সমান উত্তেজিত। এর পরে নানা মহলে বসতে লাগলো আসর। হিজ মাস্টারস ভয়েস আঙুরবালা-ইন্দুবালাকে দিয়েও রেকর্ড করালেন ওঁর গান, এবং ওঁকেই ট্রেইনার নিযুক্ত করলেন। সমস্ত গান দিয়ে নজরুল একখানা গানের বই প্রকাশ করলেন পরের বছর, বইয়ের নাম দিলেন 'চোখের চাতক'। আমাকেই উৎসর্গ করলেন সে বই।

কয়েক মাস বাদে আমি ঢাকা ফিরে এলাম। যোগাযোগ রইলো চিঠিপত্রে। বছর দেড়েক পরে আবার আমাকে কলকাতা আসতে হলো ঐ একই কারণে, চুক্তিমতো গ্রামোফোনে গান দিতে। খবর পেয়ে উনি এলেন, কিন্তু আগের মতো উচ্ছ্বাসের সঙ্গে নয়। এসেই মন মাতিয়ে হেসে উঠলেন না, নতুন কোনো গান শোনাবার জন্য বা শেখাবার জন্য কোনোরকম ব্যগ্রতা প্রকাশ করলেন না। বললেন, সারা দিন বলতে গেলে গ্রামোফোনের আপিসেই সময় কাটে, এখন কাননকে ট্রেনিং দিতে হচ্ছে, একটুও সময় নেই। বসলেন অবশ্য খানিকক্ষণ, চা-ও খেলেন দু'বার, কিন্তু সবই অর্ধ-মনস্কভাবে।

একদিন রেডিয়োতে গান ছিলো আমার। যখন বেরিয়ে আসছি, দেখি চাদর লুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়। বললেন, 'কী আশ্চর্য, শেষে আমাকে অন্যের মুখে শুনতে হ'লো যে, তুমি আজ রেডিয়োতে আমার গান গাইছো? নৃপেনদা না বললে তো আমি জানতেই পারতাম না!'

এর উত্তরে আমার কিছু বলবার ছিলো না। আমার বাবা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। উনি এলেন সঙ্গে, রইলেন অনেকক্ষণ, অনেক নতুন গান শোনালেন, শেখালেনও। 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে, অতীত দিনের স্মৃতি।' যেন ঠিক আগের মতো লাগলো সেদিন।

আমার স্বামী বুদ্ধদেব বসুরও খুব প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন নজরুল ইসলাম। যখন নজরুল ইসলাম ঢাকা গিয়েছিলেন সেই সময়ে বুদ্ধদেবের বাড়ির আড্ডায়ও নজরুলকে ওঁরা অনেকদিন ধ'রে নিয়ে গেছেন। ধরে নিয়ে গিয়েছেন কথাটাই নজরুলের পক্ষে সত্য বলে এই ভাষাটা ব্যবহার করলাম। ওঁকে নিতে গেলে ধরেই নিতে হ'তো। নিজে থেকে গিয়ে হাজির হয়েছেন এমন বাড়ি ওঁর জীবনে নিজের বাড়ি ছাড়া সম্ভবত আর কোনো বাড়িই নয়। নজরুলকে দেখেছে বা তাঁর সংগ একবারের জন্য হলেও ভোগ করেছে এমন ঘটনা ঘটলে তাঁকে ভালোবাসেনি বা আবার তাঁকে চায়নি এমন লোক বিরল।

বুদ্ধদেব সেই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, খ্যাতি-অখ্যাতি দুয়ের স্বাদেই অভিনন্দিত। নজরুলও তাঁর কবিতা পড়েছেন, মধ্যে মধ্যেই এসে বলতেন, 'কী একটা ছেলে, ওরে ব্বাস্। দে গরুর গা ধুইয়ে। একেবারে দুর্দান্ত। আলাপ ক'রে নাও, আলাপ ক'রে নাও।'

আলাপ হয়েছিলো, কিন্তু অনেক পরে। বিবাহ ক'রে কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হ'য়ে আমরা উভয়েই তখন ওঁর সঙ্গে যোগাযোগের কথা ভেবেছি। কিন্তু সেটা যে সম্ভাবনার পরপারে তা বুঝতেও সময় লাগেনি। কারণ ব্যাখ্যা ক'রে লাভ নেই, মোট কথা ওঁকে তখন কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাওয়া নিতান্তই কঠিন ব্যাপার ছিলো। উনি তখন সর্বতোভাবেই গ্রামোফোন কোম্পানী আর তার আর্টিস্টদের হস্তগত। সুতরাং যোগাযোগের চেষ্টা আর করিনি।

সে বছর [কোন বছর? মনে নেই। সম্ভবত [illegible] (?)] ঢাকাতে রেডিয়ো স্টেশন খোলা হলো আমাদের। নারায়ণগঞ্জে গিয়ে পৌঁছিয়ে ট্রেনে মাত্রই কয়েক স্টেশনের দূরত্ব ঢাকা শহর। সেই ট্রেনের কামরায় উঠে বসবার পরে হঠাৎ দেখি উনিও বসে আছেন আমাদের মুখোমুখি আসনে। তার মানে উনিও আসছেন সেই নিমন্ত্রণে। চমকে গিয়ে বললাম, 'আপনি!'

উনি মৃদু হেসে বললেন, 'এইরকমই হয়।'

আমি খুশিতে অস্থির। নিশ্চয়ই অবেলতাবোল অনেক কিছু বলছিলাম। পরে বুঝলাম উনি কিছুই শুনছিলেন না। কিন্তু মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন একদৃষ্টিতে। কথার মাঝখানেই বললেন, 'জান রানু, আমি শ্রীঅরবিন্দকে দেখেছি।'

আমি বললাম, 'সে কি! আপনিও দিলীপদার মতো পণ্ডিচেরী চলে যাবেন শেষে?'

উনি একটু একটু মাথা নেড়ে বললেন, 'না, না, আমি পণ্ডিচেরী যাইনি, আমি তো তাঁকে ঘরে বসেই দেখেছি!'

'ঘরে বসে?'

'এর নামই শক্তিসাধনা, এই সাধনার জোরে আমি কালীদর্শনও করেছি, কথা বলেছি তাঁর সঙ্গে।'

আমি চুপ করলাম।

উনি বুদ্ধদেবের দিকে তাকালেন, 'এই যে, তুমিও আছ। এ বিষয়ে তোমার কি মনে হয়?'

জিজ্ঞেস করে জবাবের প্রতীক্ষা না ক'রে আবার আমার দিকে ফিরলেন, 'জানো তো, বুলবুল মারা গেছে!'

বুলবুল ওঁর প্রথম সন্তান। খবরটা আমি কলকাতাতেই জেনেছি। এও জেনেছিলাম এই মৃত্যু ওঁকে নির্মম আঘাত দিয়েছে। এখানেও আমার বলার কিছু ছিলো না। কিন্তু ওঁরও যে এতোকাল বাদে দেখা হওয়াতে আর কিছু বলার আছে তা-ও মনে হলো না। যেন চেনেন না এরকমভাবে উদাস দৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে থাকলেন। আমার খুব মন খারাপ হয়ে গেল।

ট্রেন নির্দিষ্ট স্টেশনে এসে পৌঁছনো পর্যন্ত আর একটা কথাও বললেন না।

আমরা উঠবো আমার বাবার বাড়ি বক্সীবাজারে। উনি রেডিয়ো আপিসের অতিথি তারাই বাসস্থান ঠিক করেছে। স্টেশনে লোক এসেছে নিতে। নেমে চলে যেতে যেতে একবার ফিরলেন, স্বাভাবিকভাবে বললেন, 'বাবা-মা ভালো আছেন তো? তুমি কেমন আছ?'

আমি বললাম 'ভালো।'

'যাই মাঝে মাঝে। রাগ করোনি তো? আমি যাবো, আবার দেখা হবে। বুদ্ধদেব তুমি আসছো তো সন্ধ্যাবেলা রেডিয়ো স্টেশনে?' হাত ধরে ঝাঁকালেন, 'কতোকাল পরে, না?'

ঐ শেষ দেখা। বুদ্ধদেব বাড়ি এসে বলেছিলেন, 'উনি ঠিক প্রকৃতিস্থ নেই। মাঝে মাঝে স্বাভাবিক হলেও মানুষটাই বদলে গেছেন। বুঝতে পারলে না?'

এ কথায় আমার কান্না পেয়ে গিয়েছিলো। আমি সবেগে মাথা নেড়ে বলেছিলাম, 'না, না, মোটেই না, মোটেই না।'

বছর কয়েক বাদে যখন জানলাম সত্যিই উনি ততোদিনে প্রায় সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেছেন, তখনো সেরকমই কান্না পেয়ে গেল। কিন্তু আমি কখনো তাঁকে দেখতে যাইনি। ঠিকানা তখন তাঁর স্থায়ী, অতদিনে ঐ স্বভাববাউল মানুষটিকে গৃহ-বন্দী হতে বাধ্য করেছে ব্যাধি। কিন্তু তিনি কোথায়? তাঁকে তো আর বন্দী করতে পারেনি। সেখানে তিনি তখনো জয়ী।

একবার শুনলাম খুব দুরবস্থায় পড়েছেন। একটি মুসলমান ছেলে এসে বললো, প্রমীলা ইসলামের ইচ্ছে আপনি কিছু টিকিট বিক্রী করে দিয়ে তাঁকে সাহায্য করুন।

'কিসের টিকিট?'

'একটা ভ্যারাইটি পারফরমেন্সের আয়োজন করেছি অনেকে মিলে।'

এ কথার পরে বলাই বাহুল্য প্রাণপাত করে ঘুরে ঘুরে অনেক টাকাই আমি তাকে তুলে দিয়েছিলাম। পারফর্মেন্সও হয়েছিলো। তাতে নেট সেলও হয়েছিলো অনেক। কিন্তু টাকাটা প্রমীলা ইসলামের হাতে যায়নি।

তারপরে গড়িয়ে গড়িয়ে আরো কতো বছর কেটে গেল, উনি কখন তলিয়ে গেলেন বিস্মৃতির অন্ধকারে। ধর্মে কর্মে মননে সর্বত্রই যখন তিনি ছায়াহীন আর তখনই একদিন রেডিয়ো ঘোষণা করলো, তিনি মারা গেছেন।

আশ্চর্য। মারা তো তিনি বহুকাল আগেই গিয়েছেন, এতোদিন পরে এই সংবাদ। মারা গেলেন! তবু এ সংবাদে আমার কেবল কান্না পেয়েই গেল না, কেঁদে ফেলে বললাম, 'উনি মারা গেলেন! মারা গেলেন!'

কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই। আসলে আমরা কিছুই ভুলি না, ভুলতে পারি না,

# রাখাল বসুর ইচ্ছাপূরণ

## রমানাথ রায়

আসুন, আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি রাখাল বসু, এম এ বি টি। বয়স চল্লিশ, রঙ ময়লা, রোগা চেহারা, কপালে কাটা দাগ, উচ্চতা পাঁচ ফুট দু ইঞ্চি, ওজন সাতচল্লিশ কিলো সাতশো গ্রাম। পেশা : শিক্ষকতা। ডি এ ধরে তাঁর মাইনে বর্তমানে সাতশো পঁয়তিরিশ টাকা। তবে মাসে মাসে ডি এ বাবদ দুশো কুড়ি টাকা পান না। তিন চার মাস অন্তর হঠাৎ হঠাৎ একসঙ্গে টাকাটা পেয়ে যান। এ ছাড়া বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছাত্র পড়িয়ে মাসে মাসে কখনো পান তিনশো, কখনো পান ছশো। রাখাল বসু থাকেন মধুগুপ্ত লেনের সাইতিরিশ নম্বর বাড়ির দোতলায়। ছোট ছোট তিনটে ঘর এবং একটি কমন বাথরুম নিয়ে তিনি বসবাস করেন। এর জন্যে তাঁকে মাসে মাসে দুশো পঁচিশ টাকা ভাড়া গুণতে হয়। ঘরে থাকে তাঁর বিধবা মা, অবিবাহিতা বোন, স্ত্রী এবং দুটি ছেলে। তাঁর বিধবা মা চোখে ভাল দেখতে পান না, হাঁপানিতে ভোগেন। বোন রোজ বিকেলে বহু পুরনো একটা হারমোনিয়াম নিয়ে বসে, রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়, মনে মনে স্বপ্ন দেখে, সিনেমার গল্পের মত একদিন এক সুদর্শন ধনী যুবক এসে তার গলায় মালা পরিয়ে তাকে এখান থেকে এক বিশাল অট্টালিকায় উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। স্ত্রী সংসার চালায় এবং পেটের ব্যথায় ভোগেন। পয়সার অভাবে আজ পর্যন্ত ভাল ডাক্তার দেখাতে পারেননি বলে পেটের ব্যথার কারণ অজ্ঞাত থেকে গেছে। তবে চিকিৎসা বন্ধ হয়নি। সম্প্রতি অ্যালোপ্যাথি ছেড়ে হোমিওপ্যাথির আশ্রয় নিয়েছেন। আর ছেলে দুটি এখনো নাবালক। অবশ্য নাবালক হলেও তারা সিনেমায় লাইন দিতে শিখেছে, সিগারেট টানতে শিখেছে।

এ হেন রাখাল বসুর পক্ষে সংসার চালানো দিন দিন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। মাসের কুড়ি পঁচিশ তারিখ আসতে না আসতে অলৌকিক উপায়ে তাঁর হাত খালি হয়ে যাচ্ছে। একটা পয়সাও থাকছে না। ফলে মাঝে মাঝে তিনি মার ওপর, বোনের ওপর, স্ত্রীর ওপর, ছেলেদের ওপর রেগে যান। মাঝে মাঝে অকারণে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ওপর রেগে যান। মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ওপর রেগে যান। মাঝে মাঝে গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের ওপর রেগে যান। ভাবেন, এই সব মহামানবেরা শেষ পর্যন্ত করল কি। শুধু সারা জীবন ধরে কথা, কথা আর কথা বলে গেল। তাঁর মত মানুষদের বেঁচে থাকবার কোন সুরাহা করে যেতে পারল না। তিনি জানেন তাঁর চেয়ে যারা কম শিক্ষিত তারা তাঁর চেয়ে বর্তমান বাজারে দ্বিগুণ তিন গুণ মাইনে পায়। তারা দক্ষিণ কলকাতায় ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে। তাদের ঘরে টি ভি থাকে, ফ্রিজ থাকে। তারা চেয়ার টেবিলে ভাত খায়। তারা কুকুর পোষে, তাদের ছেলেমেয়েরা ইংরেজিতে কথা বলে। মাসের শেষে তাদের হাত কোনদিন খালি হয় না। মাসের তিরিশ তারিখেও তারা ফ্রিজের ভিতর থেকে সন্ধেবেলা বিয়ারের বোতল বের করে।

এক এক সময় রাখাল বসুর মাথায় রক্ত উঠে আসে, খুন চেপে যায়। চারপাশের প্রতিটি মানুষকে খুন করতে ইচ্ছে হয়। অথচ মুশকিল এই যে খুন করতে চাইলেই খুন করা যায় না। খুন করা অত সহজ নয়। অন্তত রাখাল বসুর মত মানুষদের পক্ষে ত নয়ই। তবে তাঁর হয়ে যদি কেউ খুন করে দেয় তা হলে ব্যাপারটা মন্দ হয় না। আর সেটা নিয়েই বর্তমানে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন রাখাল বসু। তিনি যদি এখন একটা খুনী জোগাড় করতে পারেন তা হলে তাঁর পক্ষে কাজটা অনেক সহজ হয়ে আসে। তিনি তা হলে সকলকে এক হাত দেখে নিতে পারেন। অর্থকষ্টের জ্বালা কি ভয়াবহ তা সকলকে বুঝিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, খুনী কোথায় পাওয়া যায়? খুনীদের যদি সত্যি সত্যি তেমন কোন আস্তানা থাকত যেখানে গেলে তাদের পাওয়া যাবে তা হলে সমস্যাটা এত ঘোরালো হয়ে উঠত না। তিনি সোজাসুজি সেখানে চলে যেতেন, গিয়ে একটা খুনী বাছাই করে নিয়ে আসতেন। দুঃখের কথা, এরকম কোন আস্তানা তাঁর জানা নেই। তবে 'খুনী চাই' বলে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া। কথা তিনি ভেবেছিলেন। কিন্তু কোন কাগজ এই ধরনের বিজ্ঞাপন প্রকাশে সম্মত হবে না জেনে তিনি আর ও পথে পা বাড়াননি। পা বাড়ালেও খুনী সংগ্রহের আশা তিনি একেবারে বিসর্জন দেননি। তিনি তক্কে তক্কে আছেন। কোথাও একটা খুনীর সন্ধান পেলেই তাকে পাকড়াও করবেন।

রাখাল বসু একটা জিনিস ভেবে এক এক সময় খুব বিস্মিত হন। প্রতিদিন মানুষ খুন হয়, প্রতিদিন তার খবর কাগজে ছাপা হয়। অথচ কে খুনী তা সচরাচর জানা যায় না। সংবাদের শেষে সব সময় প্রায় এক ভাষাতেই লেখা হয় : এখনো খুনী ধরা পড়েনি। তবে পুলিস সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। রাখাল বসুর কাছে ব্যাপারটা খুব সন্দেহজনক ঠেকে। তাঁর মনে হয়, এসব খবর আসলে মিথ্যে, বানানো। এসব খবর আসলে সেই সব পাঠকদের কথা ভেবেই তৈরী করা হয় যারা এর নিয়মিত পাঠক। তারা সকালে কাগজ খুলেই আইন-আদালত পড়ে না, তারা খুনের খবর পড়ে। কাগজে খুনের খবর না পেলে তাদের সারাদিন মাথা ঝিমঝিম করে, গা বমি বমি করে। খুনের খবর তাদের শরীরে ভিটামিনের কাজ করে। আমি জানি, রাখাল বসুর এই মত অনেকে গ্রাহ্য করবেন না, হেসে উড়িয়ে দেবেন। কিন্তু একটা প্রশ্ন আমি তাদের করতে চাই। তাঁরা বলুন আজ পর্যন্ত কটা খুনের কিনারা হয়েছে? কজন খুনী ধরা পড়েছে? যারাও ধরা পড়েছে তারাও আবার প্রমাণাভাবে শেষ পর্যন্ত বেকসুর খালাস পেয়ে গেছে। এটা কি করে সম্ভব? খুন হচ্ছে অথচ খুনী ধরা পড়ছে না? আর খুন ত সব সময় রাত্রির অন্ধকারে কোন নির্জন জায়গায় হয় না। আজকাল ত খুন প্রকাশ্য দিবালোকেই হয়ে থাকে। সে সব ক্ষেত্রেও ত খুনী ধরা পড়ে না। রাখাল বসুর কাছে এটাই একটা রহস্য হয়ে আছে।

যাই হোক, রাখাল বসু বর্তমানে আর্থিক কারণে বহু মানুষের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন। অথচ তাদের বিরুদ্ধে কিছু করার ক্ষমতা তাঁর নেই। নেই বলেই তাঁর ক্রোধ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। একটা খুনী ভাড়া করতে না পারলে তাঁর ক্রোধ আপাতত শান্ত হবে না। অথচ খুবই পরিতাপের বিষয় তিনি কিছুতেই একটা খুনীর সন্ধান পাচ্ছেন না।

কিন্তু একদিন একটা ঘটনা ঘটে গেল। ঘটনাটা ঘটল রাখাল বসুরই চোখের সামনে। সেদিন বিকেল পাঁচটার সময় তিনি ছাত্র পড়িয়ে সূর্য সেন স্ট্রীট ধরে বাড়ি ফিরছিলেন। সূর্য সেন স্ট্রীটে সারাদিনই মানুষ উপচে পড়ছে। কোন সময় সে রাস্তা ফাঁকা থাকে না। আর বিকেল বেলা ত কথাই নেই। রাখাল বসু এই ভিড়ের ভিতর দিয়ে হাঁটছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়ালেন। দেখলেন, একটা ছেলে একটা লোককে পিস্তল দিয়ে গুলি করল। গুলি করে ছেলেটা পিস্তল পকেটে পুরে কানাই ধর লেনের ভিতরে ঢুকে গেল। তাকে কেউ ধরল না। লোকটা গুলি খেয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল। সবাই তার দিকে ছুটে গেল, তাকে ঘিরে ধরল। রাখাল বসুও গেলেন। কিন্তু লোকটাকে বাঁচানো গেল না। হাসপাতালে পৌঁছবার আগেই লোকটা মারা গেল। রাখাল বসু বাড়ি ফিরে এলেন। এবং ভিতরে ভিতরে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে রইলেন। কারণ, জীবনে তিনি এই প্রথম একজন খুনীকে প্রত্যক্ষ করলেন। এবং লক্ষ্য করলেন যে খুনী ধরা পড়ল না। খুনী খুব নিশ্চিন্তে হাত দোলাতে দোলাতে চলে গেল। গেলেও রাখাল বসু তাকে চিনে রাখলেন। শুধু একবার তাঁর মনে হল ছেলেটাকে তিনি আগে কোথাও দেখেছেন। ছেলেটা তাঁর যেন চেনা। একবার মুহূর্তের জন্যে ভাবলেন ছেলেটা তাঁর ছাত্র হলেও হতে পারে।

দুদিন পরে এই ছেলেটার সঙ্গে রাখাল বসুর হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। ছেলেটা ছুতোর পাড়া লেনের মোড়ে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছিল। রাখাল বসু ছেলেটাকে দেখেই চিনতে পারলেন। চিনতে পেরে তার সঙ্গে তাঁর কথা বলতে ইচ্ছে হল। কিন্তু ছেলেটা অনেকের সঙ্গে ছিল বলে সে সাহস তাঁর হল না। তিনি ছেলেটাকে দেখতে দেখতে তার পাশ দিয়ে চলে গেলেন।

আর একদিন সকাল বেলায় একটা চমৎকার সুযোগ এসে গেল। ছেলেটা পাড়ার মোড়ের ঘোষ কেবিনে বসে চা খাচ্ছিল, ছেলেটা একা বসে ছিল। তার আশেপাশে কেউ ছিল না। রাখাল বসু তাকে দেখেই দোকানের ভিতর ঢুকলেন।

## "ঈগল গ্যারসঁ সম্বন্ধে আর কি বলা যায়?"

**"সর্বদা আপনার সেবারত..."**

সকাল, দুপুর, রাত্তির।

প্যাঁচ ঘুরিয়ে ঢালুন

**"বহন করা সহজ..."**

ধুলো বাইরে বন্দী...উত্তাপ ভেতরে বন্দী ২৪ ঘণ্টা।

**"হুমমম...হবেই তো, ঈগল ভ্যাকুয়াম ফ্লাস্ক যে!"**

**ঈগলের পক্ষতলে...১২৩ টি মডেল ঝলমলে!**

CASE-112-234-BEN
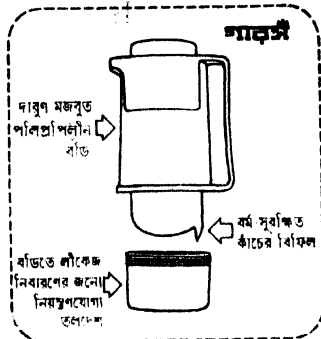
**আজাদের লাইসেন্স আছে**

ছেলেটার সামনে এসে বসলেন। ছেলেটা তাঁকে দেখেই বলে উঠল, স্যার, আপনি।

রাখাল বসু নিশ্চিন্ত হলেন। ছেলেটা তা হলে তাঁ। ছাত্র। যাক, দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই। তাই তিনি ছেলেটার কথার জবাবে হেসে বললেন, চা খেতে এলাম।

ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে রাখাল বসুর হয়ে বেয়ারাকে ডেকে চা দিতে বলল। বেয়ারা চা দিয়ে গেল। চা খেতে খেতে রাখাল বসু জানতে চাইলেন, তোমার নামটা কি যেন...

—কালু।

—তুমি এখন কি করছ?

—ব্যবসা।

—কিসের?

—মানুষ খুনের।

কথাটা শুনেই রাখাল বসু হকচকিয়ে গেলেন। কালু যে খুনী তা তিনি জানেন। জানলেও কেউ যে নিজের মুখে এই কথাটা খোলাখুলি বলতে পারে তা তাঁর ধারণা ছিল না। তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কিরকম পাও?

—আগে স্যার বাজার ভাল ছিল। এখন দিন দিন বাজার খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

—তার মানে?

—দুচার বছর আগে একটা মানুষ খুন করতে পারলে পাঁচশো টাকা পাওয়া যেত। এখন সে জায়গায় দুশো তিনশো করে পাই।

—এরকম হল কেন?

—এ লাইনে এখন স্যার প্রচুর ছেলে চলে এসেছে। এখন জোর কম্পিটিশন।

রাখাল বসু একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ভয় করে না?

—কিসের ভয়?

—ধরা পড়ার।

—ধরা পড়ব কেন? আমা। ত লাইসেন্স আছে।

রাখাল বসু বিস্মিত হলেন, লাইসেন্স!

—বাহ। ব্যবসা করতে গেলে লাইসেন্স লাগবে না? রাখাল বসু এত দিনে বুঝতে পারলেন খুন করে খুনীরা কেন ধরা পড়ে না। সব খুনীরই তা হলে লাইসেন্স আছে।

রাখাল বসুর চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। তিনি তাঁর ও কালুর চায়ের দাম মিটিয়ে উঠে পড়লেন।

কালু বলল, আপনার যদি কোনদিন দরকার পড়ে বলবেন স্যার।

—নিশ্চয় বলব।

—কনসেশন দেব স্যার, কথা দিচ্ছি।

রাখাল বসু দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু কালুর শেষ কথাটা মাথার মধ্যে পাক খেতে লাগল : কনসেশন দেব স্যার, কথা দিচ্ছি। কিন্তু কাকে খুন করবেন তিনি? এতদিন তিনি খুনীর সাক্ষাৎ পাননি। এখন পেয়েছেন। এখন মন স্থির করতে হবে। তিনি দিনের পর দিন ধরে এ নিয়ে ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে তিনি শেষ পর্যন্ত প্রেমাংশু দাশকেই খুন করবেন বলে ঠিক করলেন।

এখন পাঠকদের অবগতির জন্যে প্রেমাংশু দাশকে এবং চারপাশে এত লোক থাকতে তাঁর ওপর রাখাল বসুর এত ক্রোধের কারণ কি তা বলা দরকার। রাখাল বসু যে স্কুলে চাকরি করেন সেই স্কুলের সহ-প্রধান শিক্ষক প্রেমাংশু দাশ। তিন বছর আগে প্রেমাংশু দাশ অবশ্য সহ-শিক্ষকই ছিলেন। কিন্তু তৎকালীন সহ-প্রধান শিক্ষক জীবন ভট্টাচার্য-এর অবসর গ্রহণের পর প্রেমাংশু দাশ সহ-শিক্ষক থেকে সহ-প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হন। এই পদের জন্যে রাখাল বসুও প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু তাঁর পদোন্নতি না হওয়ার পিছনে স্কুলের প্রধান শিক্ষক কিরণ দে মহাশয়ের যে হাত ছিল না তা বলা যায় না। কারণ, রাখাল বসুর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকাল ধরে একটা সূক্ষ্ম মনোমালিন্য চলছিল। এবং এই সূত্রে প্রেমাংশু দাশের সঙ্গে তাঁর একটা গোপন আঁতাত গড়ে উঠেছিল। তাই তিনি সহ-প্রধান শিক্ষকের পদের ব্যাপারে যেমন ছিলেন রাখাল বসুর বিরুদ্ধে, তেমনি ছিলেন প্রেমাংশু দাশের পক্ষে। বস্তুত, তিনিই স্কুলের সম্পাদকের কাছে প্রেমাংশু দাশের হয়ে ওকালতি করেছিলেন। এসব কথা রাখাল বসু জেনেছেন তাঁর এক হিতৈষী কমিটি মেম্বারের কাছ থেকে। কমিটির সেই মেম্বারই তাঁকে আরো বলেছেন যে সম্পাদক মহাশয় নাকি তাঁর প্রতি একটু সহানুভূতিশীল ছিলেন। যাই হোক সেসব অতীত দিনের কথা ভেবে আ। লাভ নেই। কারণ, রাখাল বসু আর সহ-প্রধান শিক্ষকের পদের জন্যে লালায়িত নন। এখন তিনি সহ-শিক্ষক থেকে একেবারে প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হতে চান। আগামী মাসের সাত তারিখে প্রধান শিক্ষক কিরণ দে মহাশয় অবসর গ্রহণ করছেন। সেই মূল্যবান পদের জন্যে তিনি প্রার্থী হবেন। তাঁর সে যোগ্যতাও আছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও বাধা সেই প্রেমাংশু দাশ। প্রধান শিক্ষক হওয়া। যোগ্যতা রাখাল বসুর যেমন আছে, প্রেমাংশু দাশেরও তেমনি আছে। শুধু আছে নয়, প্রেমাংশু দাশের দাবি অনেক বেশি। প্রেমাংশু দাশ যোগ্যতার সঙ্গেই সহ-প্রধান শিক্ষকের পদে তিন বছর ধরে অবস্থান করছেন। অর্থাৎ প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করার পথে তিনি রাখাল বসুর চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে আছেন। তবে বাইরে থেকে যদি প্রধান শিক্ষক আনা হয় তা হলে এসব প্রতিদ্বন্দ্বিতার মানেই হয় না। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় শিক্ষকদের আশ্বাস দিয়েছেন। এই স্কুলের শিক্ষকদের ভিতর থেকে প্রধান শিক্ষক নির্বাচন করা হবে। তাঁর এই আশ্বাস দানের ফলেই পরিস্থিতি আস্তে আস্তে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে।

এমতাবস্থায় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমাংশু দাশকে ধরাধাম থেকে সরিয়ে দিতে পারলেই রাখাল বসু নিশ্চিন্ত। আর এ ব্যাপারে কালুই তাঁর একমাত্র ভরসা। মনে মনে রাখাল বসু স্বপ্ন দেখতে থাকেন। প্রেমাংশু দাশ মৃত। তিনি প্রধান শিক্ষকের সিংহাসনে আসীন হয়েছেন। তাঁর আর্থিক সচ্ছলতা এসেছে। তাঁর সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে তিনি মধুগুপ্ত লেন থেকে সল্ট লেকে চলে গেছেন। মার হাঁপানি ভাল হয়ে গেছে। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। স্ত্রীর পেটে ব্যথা সেরে গেছে। ছেলেরা পড়াশুনায় মন দিয়েছে। সংসারে তাঁর আর কোন সমস্যাই নেই। তিনি প্রতিদিন মিনি বাসে করে স্কুলে যাতায়াত করেন। ছাত্র। তাঁর সামনে মাথা নিচু করে কথা বলে। অভিভাবকরা তাঁকে সমীহ করেন। শিক্ষকরা হেঁ হেঁ করে।

রাখাল বসু কথাটা কালুকে বলবেন বলে ঠিক করলেন। কালু যা নেয় নেবে। কালু অবশ্য বেশি নেবে না। কালু নিজের মুখেই বলেছে, কনসেশন দেব স্যার, কথা দিচ্ছি। এখন দেখা যাক কত কনসেশন দেয়। এ নিয়ে তিনি কালুর সঙ্গে দ। কষাকষি করবেন না। কারণ খারাপ দেখায়।

কালুর সঙ্গে রাখাল বসুর মাঝে মধ্যে দেখা হতে লাগল। কখনো পাড়ার

মোড়ে, কখনো চায়ের দোকানে, কখনো ট্রামে-বাসে। দেখা হলেই রাখাল বসু মুখে হাসি এনে কথা বলতে লাগলেন। নানাভাবে তাকে তুষ্ট করতে লাগলেন। যেমন, চায়ের দোকানে দেখা হলে তাকে চা খাওয়ালেন। ট্রামে-বাসে দেখা হলে টিকিটটা কেটে দিলেন। কিন্তু আসল কথাটা পাড়ব পাড়ব করেও পাড়তে পারলেন না। কারণ, প্রেমাংশু দাশ শত্রু হলেও প্রতিদিন তাঁর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, কথা হয় গল্প-গুজব হয়, হাসি-ঠাট্টা হয়। মাঝে মাঝে রাখাল বসু তাঁর বাড়িও যান। প্রেমাংশু দাশের স্ত্রীর সঙ্গে, বাবা মার সঙ্গে, ছেলে মেয়ের সঙ্গে তাঁর ভাল পরিচয় আছে। প্রেমাংশু দাশ মারা গেলে তাঁর সংসার তছনছ হয়ে যাবে। এটাই রাখাল বসুর মধ্যে দিবারাত্র কাঁটার মত খচখচ করতে লাগল। তিনি কেবলি ভাবতে লাগলেন, কি করা যায়। একবার ভাবলেন প্রেমাংশুদাশের প্রাণের বিনিময়ে যদি তাঁর জীবন সার্থক হয়ে ওঠে তা হলে ক্ষতি কি। আবার কখনো ভাবলেন, তাঁর নিজের জীবনকে সার্থক করতে গিয়ে একটা সংসারকে অনাহারের মধ্যে ঠেলে দেওয়া কি ঠিক।

প্রেমাংশুবাবু আমাকে পাঠালেন

এই হাঁ ও নার টানাপোড়েনে রাখাল বসুর দিন কাটতে লাগল। কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না। অথচ এর মধ্যে পর পর কটা ঘটনা ঘটে গেল : প্রধান শিক্ষক কিরণ দে মহাশয় অবসর গ্রহণ করেছেন, কাগজে প্রধান শিক্ষকের জন্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, রাখাল বসু একটা দরখাস্ত করেছেন এবং তাঁকে ইন্টারভিউতে ডাকা হয়েছে। সামনের রবিবার সকাল নটায় ইন্টারভিউ। দেখতে দেখতে বৃহস্পতিবার গেল, শুক্রবার গেল। রাখাল বসু তবুও মনস্থির করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত শনিবারও গেল। রাখাল বসু বুঝতে পারলেন তাঁর কিছু করার নেই। তিনি তাই রবিবার সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠলেন। নটায় ইন্টারভিউ। তিনি তাড়াতাড়ি বাজার করে, টিফিন করে, দাড়ি কামিয়ে আটটার মধ্যে তৈরী হয়ে নিলেন এখনো এক ঘণ্টা দেরি আছে। স্কুল বেশি দূরে নয়, হেঁটে গেলে আধ ঘণ্টা লাগে। রাখাল বসু হেঁটেই যাবেন বলে ঠিক করলেন। তবে যাবা। আগে একটা সিগারেট ধরানোর কথা তাঁর মনে হল। তিনি খালি গায়ে চেয়ারে বসে আরাম করে একটা সিগারেট ধরালেন। তখন ঘরের মধ্যে কেউ ছিল না। তিনি একা। আর ঠিক সেই সময় কালু এসে ঘরে ঢুকল।

রাখাল বসু কালুকে দেখে চমকে উঠলেন, তুমি!

কালু হাসতে হাসতে বলল, এলাম স্যার।

—কি ব্যাপার?

—প্রেমাংশুবাবু আমাকে পাঠালেন।

—কেন?

—আপনাকে...

কালু কথাটা শেষ না করে পকেট থেকে পিস্তল বের করল। রাখাল বসু বিস্মিত হয়ে বসে রইলেন। তাঁর মুখ দিয়ে একটা কথা বেরল না।

আপনারা যাঁরা পাঠক হিসেবে বুদ্ধিমান, তাঁরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন গল্পটা এবার শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এই গল্পের দু রকম উপসংহার হতে পারে। পাঠকদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন তাঁরা এই দু রকম উপসংহারের যে কোন একটা অথবা ইচ্ছে করলে দুটোই গ্রহণ করতে পারেন।

কালু রাখাল বসুর বুকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। রাখাল বসু চিৎকার করে বুকে হাত দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। কালু নিশ্চিন্ত মনে পিস্তল পকেটে পুরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অথবা

কালু রাখাল বসুর বুক লক্ষ্য করে ট্রিগার টানল। কিন্তু গুলি বেরল না। কালু কিছু বুঝতে না পেরে আবার ট্রিগার টানল। এবারেও কোন গুলি বেরল না। তারপর আরও কয়েক বার কালু চেষ্টা করল। তবুও গুলি বেরল না। কালু তখন হতাশ হয়ে পিস্তল পকেটে পুরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাখাল বসু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তাড়াতাড়ি জামা-প্যান্ট পরে নিলেন। নিয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না। হন হন করে ইন্টারভিউ দিতে ছুটলেন।

# সেই সময়

## সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৪৬ ॥

—তোমার কুসুমদিদির আমি আবার বিয়ে দোবো!

শুনে আঁতকে উঠলো সরোজিনী। তার পতি দেবতাটি যে একটু ক্ষ্যাপাটে ধরনের তা সে অনেক দিন আগেই জেনে গেছে। নিত্য নতুন বাতিক তার মস্তকে ভর করে। কিন্তু এ আবার কী উদ্ভট কথা!

দুই চক্ষু প্রায় কপালে তুলে সরোজিনী বললো, আপনি কুসোমদিদির বে দেবেন? আপনি খোয়াব দেকচেন নাকি? ওর বে হয়ে গ্যাচে সেই কবে, তারপর বেধবা হলো, আপনি দেকলেন না সি দিনকে, মাতায় সিঁদুর নেই, হাতে নোয়া নেই, কপাল পুড়িয়ে বাপের বাড়ি এয়েচে—

—বিধবা বলেই তো ওর বিয়ে দোবো আবার!

—বিধবার বে? সে তো ছোট-লোক, অজাত-কুজাতেদের মধ্যে হয়, আট ঘরের কায়েতের বাড়ির মেয়ের সম্পর্কে ও কি অলুক্ষুণে কতা! আপনার কি পরকালেরও ভয় নেই?

—ঠিক এই কতাটাই বিদ্যেসাগর মশাই বলচিলেন। আমরা এ শহরে যে কটা বনেদী ঘর রয়িচি, আমরা মুখে মুখে বিদ্যেসাগর মশাইয়ের বিধবা-বিবাহ কর্মে সায় দিয়িচি, কেউ কেউ অর্থ সাহায্যও করিচি, কিন্তু নিজেদের বাড়িতে কেউ বিধবা-বিয়ে চালু করিনি! উনি যেদিনকে কতাটা বললেন, লজ্জায় আমার মাথা নিচু হয়ে গেল। উনি তো হক্ কতাই বলেচেন। আমাদিগের যত প্রগতি সব শুধু জিবের ডগায়, কাজে নয়! কিন্তু কী করবো বলো, আমার বাড়িতে তো বিধবা কেউ নেই যে তার বিয়ে দেবো! তুমি যদি বিধবা হতে, কত ঘটাপেটা করে তোমার বিয়ে দিতুম আবার!

সরোজিনী স্বামীর পায়ের কাছে বসে পড়ে অশ্রুজড়িত কণ্ঠে বললো, আমার মাতার দিব্যি, আপনি এসব কতা বলবেন না, এই দেকুন, আমার বুকের মধ্যে কেমন তোপ দাগার মতন গুড়ুম গুড়ুম শব্দ হচ্চে?

নবীনকুমার হাসতে হাসতে বললো, তুমি বিধবা হলে আমি মরে যেতুম, এই তো! তা এতবড় একটা মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য আমি মত্তেও রাজি আচি। দেশের কাজে মরণেও সুখ!

এর পর সরোজিনী ওগো আমার কী হবে গো, বলে ফুকরে উঠলো। নবীনকুমার তার হাত ধরে টেনে তুলে বললো, অবোধ বালিকা আর কাকে বলে! আরে আমি কি সত্যিই মত্তে যাচ্চি নাকি? এ হলো গে কতার কতা! সেই জন্যই তো বলচি, তোমার কুসুমদিদির বিয়ে দেবো। সংসারে শুধু অন্দকারেই রয় গ্যালে, এত বই কাগচ-পত্তর এনে দি, কিচুই পড়ো না! পড়লে জানতে আজকাল ভদ্দরঘরেও বিধবার বিয়ে হয়! আট ঘরের কায়েত কী বলচো, শ্রোত্রিয় কুলীন ব্রাহ্মণরাও বিধবা মেয়ে বিয়ে কচ্চেন! তোমার কুসুমদিদি পাত্রী হিসেবে খুবই ভালো!

অশ্রু মার্জনা করে সরোজিনী বললো, আপনি কুসোমদিদির বে দেবেন, এ কেমনতরো কতা? কুসোমদিদি কি আপনার বাড়ির মেয়ে? তার বাপ-দাদারা রয়েচেন না, ওঁরা এই কতা শুনলে লাঠি নিয়ে আপনাকে তাড়া করবে।

—কেন? ওঁরা কি নির্বোধ? বাড়িতে এমন খাসা একটি বিধবা পাত্রী থাকতেও ওরা বিদ্যেসাগর মশাইকে খুশী কত্তে চাইবেন না?

—বিদ্যেসাগর না কে খুশী হবে বলে ওঁরাবা এমন পাপ কাজ কত্তে যাবেন? ঝাঁটা মারি এমন খুশী হওয়ার মুকে!

—এই হলো মেয়েমানুষের বুদ্ধি! নিজের ভালো নিজেরা বোঝে না! তোমার কুসুমদিদি সারাজীবন বিধবা হয়ে কষ্ট পাবে, তাতে তুমি খুশী?

—বিধবা হয়েচে, ...যার যেমন ভাগ্য, ভাগ্যে থাকলে হবে না?

—আমি ভাগ্য পাল্টে দোবো! কালই কতা বলবো কুসুমের বাবার সঙ্গে। ওর বিয়েতে আমি দশ-বিশ হাজার টাকা খরচা কত্তেও রাজি আচি!

পর দিনই কথা বলা হলো না অবশ্য, কিন্তু বিষয়টা নবীনকুমারের মনে রয়ে গেল। সে এখন বিষম ব্যস্ত। মহাভারত অনুবাদের কাজ নিপুণভাবে চলছে প্রায় অষ্টপ্রহর ধরে। এতদিন কেউ সঠিক বিশ্বাসই করতে পারেনি যে নবীনকুমারের মতন এক বিংশ-বর্ষীয় অস্থির স্বভাবের যুবক সমগ্র মহাভারতের অনুবাদের মতন বিশাল কাজ হাতে নিয়ে সত্যিই তাতে মন দিয়ে লেগে থাকবে। কিন্তু এখন আর অবিশ্বাসের উপায় নেই। কাজ অগ্রসর হচ্ছে অতি দ্রুত বেগে, ইতিমধ্যে প্রথম পর্ব সম্পূর্ণ হয়ে মুদ্রিত হয়েও বেরিয়েছে। দ্বিতীয় পর্বও যন্ত্রস্থ।

অনুবাদের প্রথম পর্ব পাঠ করেও সকলে বিস্মিত। আট দশ জন সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিতদের দিয়ে নবীনকুমার অনুবাদের কাজ করাচ্ছে, এ খবর সকলেই জানে, কিন্তু এমন গাম্ভীর্যপূর্ণ অথচ সুললিত, সরল বাংলা লেখা তো কোনো পণ্ডিতের কর্ম নয়! এতে বিশেষ একজন কারুর হাত আছে, এবং সেই একজন নবীনকুমার স্বয়ং। সেই রচনার ভাষা আদ্যোপান্ত পরিমার্জনা করে।

নিজের বাড়িতে স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না বলে শুধু এ কাজের জন্যই নবীনকুমার বরাহনগরে একটি প্রশস্ত উদ্যান বাটী ক্রয় করেছে, এবং তার নাম দিয়েছে 'সারস্বতাশ্রম'। পণ্ডিতরা সবাই সেখানেই স্থায়ী হয়েছেন। আর একটি বাড়ি কিনে সেখানে স্থাপিত হয়েছে মুদ্রাযন্ত্র। প্রতিদিন জোড়াসাঁকো থেকে জুড়ি-গাড়ি হাঁকিয়ে নবীনকুমার যায় বরাহনগরে। পথে বাগবাজারে তার শ্বশুরালয় পড়ে। এক একদিন বরাহ-নগরে অধিক রাত্রি পর্যন্ত কাজ চললে সেদিনটা আর নবীনকুমার নিজের বাড়িতে ফেরে না, শ্বশুর বাড়িতেই রাত্রি যাপন করে। সরোজিনীও সেখানেই আছে।

কাজের নেশায় যেন পেয়ে বসেছে নবীনকুমারকে। এতবড় একটা কাজ তো রয়েছেই, তার ওপরেও সে নিয়েছে "বিবিধার্থ সংগ্রহ"-এর মতন উচ্চমানের পত্রিকার সম্পাদনা ভার। রাজেন্দ্রলাল মিত্র পদত্যাগ করায় বঙ্গভাষানুবাদক সমিতির এই পত্রিকাটির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠেছিল, তখন নবীনকুমার নিজের স্কন্ধে এই দায়িত্ব নেয়। মান্যবর এবং পণ্ডিত-প্রবর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পরিবর্তে কুড়ি বৎসর বয়েসের এক যুবক "বিবিধার্থ সংগ্রহ"-এর মতন পত্রিকার সম্পাদক! অবশ্য অনুবাদক এবং লেখক হিসেবে নবীনকুমার তার যোগ্যতা ইতিমধ্যেই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে।

তবু এতেও ক্লান্ত নয় সে। প্রতিদিন সংস্কৃত-অনুবাদ ও গুরু গম্ভীর শব্দাবলী শুনতে শুনতে এক এক সময় তার কান ঝালাপালা হয়ে যায়। তার চরিত্রে একটা লঘু আমোদ প্রিয় দিক আছে। এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ সে উচ্চাঙ্গের চিন্তা-ভাবনা চালিয়ে যেতে পারে না। মাঝে মাঝে তার চিত্ত বিনোদন দরকার। মুলুক চাঁদের আখড়ায় সে আর যায় না। হরিশ মুখুজ্যের সঙ্গেও দেখা হয় না, বন্ধু-বান্ধব সংস্পর্শে কালযাপন করার মতনও তার অবসর নেই। সেই জন্যই সে বরাহনগরে মহাভারত চর্চার মাঝে মাঝে হঠাৎ উঠে চলে যায়, সেখানে নিজস্ব একটি কক্ষ আছে, তাতে প্রবেশ করে দ্বার রুদ্ধ করে দেয়। সেই কক্ষের একটি দেয়াল জুড়ে রয়েছে একটি বেলজিয়ান আয়না। নবীনকুমার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নাচতে শুরু করে। লাফায়, ডিগবাজি খায়। এই তার বিনোদন! একা একা সেই কক্ষের মধ্যে সে কখনো শ্রীকৃষ্ণ সাজে, কখনো শ্রী রাধিকা, কখনো সে ভীম, আবার সে নিজেই বক রাক্ষস। আয়নায় সামনে যাকে দেখা যায়, তাকে সে জিহ্বা প্রদর্শন করে, নানা রকম ভেংচি কাটে! একটু পরে সে যখন আবার বেশ-বাস ঠিকঠাক করে কাঁধে চাদরটি দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে গম্ভীর ভাবে, তখন তাকে দেখে কে বুঝবে যে এই মানুষটিই একটু আগে কতরকম ছেলেমি করছিল!

সংস্কৃত ঘেঁষা, সন্ধি সমাস সমন্বিত গুরুগম্ভীর বাক্যগুলি মাথা থেকে তাড়াবার জন্য সে আরও একটা উপায় অবলম্বন করেছে। নিজের গোপন কক্ষটিতে সে একটি ছোট খাতায় যা খুশী লিখে যায়। কিছুদিন আগেই চড়ক গেছে, সেই উৎসবে কলকাতা শহর কেমন মেতে উঠেছিল তার একটা বিবরণ লেখে সে, কিন্তু লেখবার সময় সতর্ক থাকে, পারতপক্ষে সে সংস্কৃত কথা ব্যবহার করবে না!

আপন খেয়ালে এই ভাবে সে লিখে যায়, "এদিকে দুলে বেয়ারা, হাড়ি ও কাওরারা নূপুর পায়ে উত্তরি সুতো গলায় দিয়ে নিজ নিজ বীরব্রতের মহত্ত্বের স্তম্ভ-স্বরূপ বাণ ও দশ লাকি হাতে করে প্রত্যেকে মদের দোকানে, বেশ্যালয়ে ও লোকের উঠোনে ঢাকের সঙ্গতে নেচে বেড়াচ্ছে! ঢাকীরা ঢাকের টোয়েতে চামর, পাখির পালক, ঘণ্টা ও ঘুঙুর বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজিয়ে সন্ন্যাসী সংগ্রহ কচ্চে; গুরু মহাশয়ের পাঠশালা বন্দ হয়ে গিয়েছে—ছেলেরা...ঢাকের পেচোনে পেচোনে রপ্তে রপ্তে বেড়াচ্চে..."

ঠিক যেমন তার মুখের ভাষা সেই রকম লেখা। একই সঙ্গে মহাভারতের বিশুদ্ধ ভাষা এবং এই রকম পথ চলতি গদ্য লিখে চলেছে একই লোক। এই নতুন ধরনের লেখা লিখতে লিখতে বেশ মজা পেয়ে গেল নবীনকুমার। চড়ক পার্বণের পর লিখলো বারো-ইয়ারি পুজো বিষয়ে। ক্রমে ছোট খাতাটি ভর্তি হয়ে যাওয়ায় নবীনকুমারের মনে হলো, এই লেখাগুলি ছাপিয়ে প্রকাশ করলে কেমন হয়? তারই নিজস্ব ছাপাখানা রয়েছে। কিন্তু গ্রন্থকারের নাম কী থাকবে? তার নিজের নাম দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। মহাভারতের অনুবাদক হিসেবে যে পরিচিত, তার কলম দিয়ে এই লেখা বেরিয়েছে, কেউ বিশ্বাস করবে? এ লেখা পড়লে যদি সবাই ছি ছি করে? না, নাম দেওয়া চলতেই পারে না। মুলুকচাঁদের নামটা দিয়ে দিলে হয় না? মুলুক-চাঁদ কাকপক্ষীর মতন ঘুরে ঘুরে শহর কলকাতার সব সংবাদ সংগ্রহ করে। কাকপক্ষী না প্যাঁচা? হুতোম প্যাঁচার নকশা নাম দিলে কেমন হয়?

মাঝে মাঝেই মনে পড়ে কুসুমকুমারীর কথা। ঐ নীল নয়না বালিকাটির গাঢ় চোখের দৃষ্টি যেন নবীন-কুমারের মনে গেঁথে গেছে। ওর কথা মনে এলেই নবীনকুমার মাথা ঝাঁকায়, যেন সে-ই কুসুমকুমারীর অভিভাবক, কুসুমকুমারীর জীবনের সুখকথা করে দেবার দায়িত্ব তারই। একটা কিছু করতেই হবে খুব শীঘ্র. কুসুমকুমারীর পিতার সঙ্গে কথা বলা হয়েই উঠছে না। তিনি কলকাতায় নেই।

একদিন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে গেল নবীন-

চলছে. শত সহস্র মানুষ অনাহারের সম্মুখীন, তা নিয়ে কিছু আলোড়ন হচ্ছে সংবাদপত্রগুলিতে। সেই উপলক্ষে দেবেন্দ্রবাবু ব্রাহ্মসমাজ ভবনে একটি সভা ডেকেছেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের বিন্দুমাত্র বাসনা নেই নবীনকুমারের, কিন্তু ইদানীং সে প্রায়ই ওঁদের সভায় যায়। দেবেন্দ্রবাবুর বক্তৃতা শুনতে তার ভালো লাগে, এমন সুমিষ্ট বাংলা সে অন্য কারুর মুখে শোনেনি। সভায় বেদীস্থলে বসে দেবেন্দ্রবাবু এ দেশের সুদূরতম প্রান্তের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের চিত্র বর্ণনা করলেন মর্ম-স্পর্শী ভাষায়। দেবেন্দ্রবাবু নিজে ঐ সব দেশ ঘুরে এসেছেন, তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। পাহাড়ী জাতির লোকেরা বড় সরল হয়. দেবেন্দ্রবাবুর ভাষায় তাদের দুর্দৈবের চিত্র যেন চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। দেবেন্দ্রবাবু যে-ই বললেন, যে দেশ-বাসীর বিপদে আমরা যদি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত না করি তবে কি আমাদের মনুষ্যত্ব ক্ষুণ্ণ হবে না, অমনি নবীনকুমার আর থাকতে পারলো না, উঠে এগিয়ে গেল দেবেন্দ্রবাবুর দিকে। তার গায়ে যে একটি শাল রয়েছে, যার মূল্য অন্তত দুই সহস্র মুদ্রা, সেটি খুলে দেবেন্দ্রবাবুর পদপ্রান্তে রেখে সে বিনীতভাবে বললো, এই আমার সামান্য দান। পরে যথাসাধ্য অর্থ সাহায় করবো ?

তখনই সভাস্থলের অন্য সকলেই নিজেদের অঙ্গুরীয়, সোনার বোতাম ও গার্ড চেইন সম্বলিত ঘড়ি খুলে দিয়ে দিতে লাগলেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই সময়ও নবীনকুমারের মনে পড়ে গেল কুসুমকুমারীর কথা। কোথাও কোনো মানুষের দুঃখের কথা শুনলেই তার কুসুমকুমারীর কথা মনে আসে। না, ঐ অপাপবিদ্ধা বালিকাটিকে কিছুতেই সারাজীবন কষ্ট পেতে দেওয়া হবে না। শীঘ্রই কুসুমকুমারীর জন্য একটি পাত্র জোগাড় করতে হবে। নবীনকুমার তার পরিচিত অকৃতদার কিংবা কুসুমকুমারীর পিতার অভিমত গ্রহণ করা এমন কিছু জরুরী নয়, একজন উপযুক্ত বিধবা-বিবাহেচ্ছু পাত্রের সন্ধান করাই এখন প্রধান কর্তব্য।

দেবেন্দ্রবাবুর পাশে তাঁর দুই পুত্র বসে আছে, একজনের নাম দ্বিজেন্দ্র। অন্য জন জ্যোতিরিন্দ্র। দেবেন্দ্রবাবুর সন্তান-ভাগ্য খুব ভালো, এর মধ্যেই তার ত্রয়োদশটি পুত্র-কন্যা জন্মেছে। জ্যোতিরিন্দ্র বেশ ছোট, কিন্তু দ্বিজেন্দ্র বোধ হয় নবীনকুমারেরই সমবয়েসী হবে। নবীনকুমার একবার ভাবলো, দেবেন্দ্র-বাবুর কাছে প্রস্তাব দিলে হয় না যে তাঁর এক পুত্র ঐ কুসুমকুমারীকে বিবাহ করুক। দেবেন্দ্রবাবু নব্য পন্থী, উদার মনস্ক ব্যক্তি, তিনি নিশ্চয়ই এতে আপত্তি জানাতে পারবেন না। অসামান্যা রূপ-লাবণ্যবতী কুসুমকুমারী ঠাকুর বাড়ির বধূ হবার অনুপযুক্ত নয়। কিন্তু একটু পরেই তার খেয়াল হলো এ রকম প্রস্তাব করা যায় না। দেবেন্দ্রবাবুরা ব্রাহ্মণ, কুসুমকুমারীরা কায়স্থ। পিরিলির বামুনই হোক আর ব্রাহ্মণই হোন, এঁরা এখোনো বিবাহ-ব্যাপারে জাতি-ভেদ ঘোচাতে পারেননি।

কয়েক দিনের মধ্যেই অবশ্য নবীনকুমার অন্য এক ব্যাপারে মেতে উঠলো, আর মনে রইলো না কুসুম-কুমারীর কথা।

এক প্রাতঃকালে বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে নবীনকুমারকে ধরলো গঙ্গানারায়ণ। সে বললো, ছোটকু, ক'দিন থেকেই তোকে খুঁজচি, তোর আর দেখাই পাই না। মহাভারতের অনুবাদটি বড় সরেস করিচিস রে। আমায় আরও খানকতক বই দিবি ?

নবীনকুমার বললো, তোমার যত খুশী বই নাও না, দাদামণি। দুলালকে বলো, আনিয়ে দেবে। আমি তো মহাভারত বেচবো না, তিন হাজার কপি ছাপিয়েচি, সব বিলিয়ে দোবো, যে যে চাইবে, মহাভারত নিয়ে আমি ব্যবসা কত্তে নামিনি।

বন্ধুদের দেখালুম, তারা তো খুব অমন ... এমন স্বাচ্ছন্দ অনুবাদ, যেন মনে হয় নতুন রচনা।

—দাদামণি, তুমি তো হরিশ মুকুজ্যের ওখেনে যাতায়াত কর্ল্লো, ওঁকে বই দিও এক কাপি।

—তুই আমায় যে বইখানা দিইচিলি সেটা আমার এক বন্ধু জোর করে নিয়ে নিলে। কিছুতেই ছাড়লে না। তার বদলে সে তার লেখা নতুন একটা বই তোকে পড়তে দিয়েচে, তুই পড়ে দেকবি ?

—কে তোমার বন্ধু ?

—মধু, আমার সহপাঠী ছেল. এখন তো বেশ ক'খানা বই লিখেচে. বেশ নামও হয়েচে, তুই নাম শুনিসনি? মাইকেল মধুসূদন দত্ত—

নবীনকুমার হাত বাড়িয়ে বইখানি নিয়ে জুড়ি গাড়িতে উঠে পড়লো। এখান থেকে বরাহনগর যেতে অনেক সময় লাগে, তার মধ্যে বইখানি পড়ে ফেলবে। মধুসূদন দত্তর নাম সে শুনেছে বটে, পাইকপাড়ার রাজাদের বাঁধা নাট্যকার! নবীনকুমার নিজে বাড়ির মঞ্চে থিয়েটারের প্রচলনের পর অনেকেই তার অনুকরণ করছে। পাইকপাড়ার রাজারা বহু অর্থ ব্যয়ের আড়ম্বর করে। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে এক ধনী তার চেয়ে একটু বেশী কোনো ধনীকে ঠিক পছন্দ করতে পারে না। সেই অনুযায়ী পাইকপাড়ার রাজাদের সম্পর্কে নবীনকুমারের মনে একটা বিরাগ ভাব আছে। স্বভাবতই তাদের বাঁধা নাট্যকার সম্পর্কেও সে প্রসন্ন নয়।

বইখানি অবশ্য নাটক নয়, কাব্য। মেঘনাদ বধ। শুধু নামটি দেখেই নবীনকুমারের মনে একটা চিন্তা তরঙ্গ খেলে গেল। মহাভারত নয়, রামায়ণের কাহিনী। রামায়ণেরও কোনো বিশুদ্ধ গদ্যে বঙ্গানুবাদ নেই। মহাভারত শেষ করেই রামায়ণ অনুবাদে হাত দিতে হবে তো ?

তারপর প্রথম পাতা উল্টে সে পড়তে শুরু করলো।

...বধে গেলা যমপুরে/অকালে; কহ হে দেবী অমৃত-ভাষিণী...। নবীনকুমারের ভুরু উত্তোলিত হলো। এই-ভাবে আরম্ভ, এরকম মাঝখান থেকে? শুরু থেকেই এক বীর চূড়ামণির পতন? এ যে নাটকের মতন। এরকম কাব্য নবীনকুমার কখনো পড়েনি।

অন্যদিন হুতোমের নকশা লেখার মাল-মশলা সংগ্রহের জন্য সে পথের দু পাশ দেখতে দেখতে যায়। আজ আর অন্য কোনো দিকে তার আর খেয়ালই রইলো না। এ কী অবিশ্বাস্য রকমের কবিতা? কবিতা সম্পর্কে নবীনকুমারের মনে এমনিতেই একটা বিস্ময়ের ভাব আছে। সে অনেক চেষ্টা করে দেখেছে, কিন্তু কবিতা তার হাতে ঠিক আসে না। গদ্য রচনা বিষয়ে তার আত্মবিশ্বাস জন্মে গেছে, কিন্তু কবিতা জিনিসটা কেমন যেন হয়েও হয়ে ওঠে না। এ রকম কবিতা নবীনকুমার কখনো পড়েনি। এমন ঝঙ্কারময় শব্দ, এমন উন্নত-ভাব, লাইনের শেষে মিল নেই অথচ প্রতিটি লাইনই দৃঢ় সংবদ্ধ।

....শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী  
পিকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে  
সরস মধুর মাসে, কিন্তু নাহি শুনি  
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে।

দুলালচন্দ্র দাঁড়িয়ে থাকে জুড়ি গাড়ির পিছনে। চলন্ত গাড়ি থেকেই নেমে দৌড়ে দরজার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, কী বলচেন, ছোটবাবু?

নবীনকুমার কখন আপনমনে উচ্চস্বরে পাঠ করতে শুরু করেছে। এমন কবিতা মনে মনে পড়া যায় না। হাতের ইশারায় দুলালকে যা, যা বলে সে পাঠে নিমগ্ন হয়ে রইলো। খানিক পরে আবার সে মুখ বাড়িয়ে কোচোয়ানের উদ্দেশে বললো. এই ঘোরা, ঘোরা, শিগগির গাড়ি ঘুরিয়ে নে! দুলাল আবার নেমে এসে জিজ্ঞেস করলো. কী হয়েচে. ছোটবাবু?

নবীনকুমার এমন ঘোরের মধ্যে আছে যেন দুলালকে চিনতেই পারলো না প্রথমে। তীব্র দৃষ্টি মেলে বললো, কে? কে বিরক্ত করে এখন?

পরক্ষণেই আবার সে বললো, ও, দুলাল, আমি আজ কাজে যাবো না, আজ বাড়ি ফিরবো, গাড়ি ঘোরাতে বল, তুই দৌড়ে বরানগরে চলে যা—পন্ডিত মশাইদের খপর দিগে যা—।

সারাদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে নবীনকুমার মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করলো। এমন নেশা সে অনেকদিন পায়নি। তারপর চারদিন ধরে নবীন-কুমারের মুখে শুধু ঐ কাব্যের কথা। যাকে পায় তাকে ডেকে ডেকে শোনায়। এই ফিরিঙ্গি কবি সম্পর্কেও তার মনে দারুণ কৌতূহল জেগেছে। ছোটভাই-এর এতখানি উৎসাহের আতিশয্য দেখে গঙ্গানারায়ণ বললো, তুই মধুর সঙ্গে পরিচয় কত্তে চাস? ডেকে আনবো'খন একদিন তাকে আমাদের বাড়িতে!

কিন্তু মধুসূদনকে এত সাধারণভাবে ডাকা হলো না এ-বাড়িতে। এর মধ্যে একদিন বিখ্যাত অধ্যাপক রিচার্ডসনের বিদায় অভ্যর্থনা হয়ে গেল। আগেকার হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডি এ রিচার্ডসন বৃদ্ধ হয়েছেন, চিরকালের মতন তিনি ভারত ছেড়ে চলে যাচ্ছেন ইংলন্ডে। মধুসূদন, গৌর, গঙ্গানারায়ণ, ভূদেব প্রমুখ ছিল রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র, তারা ওকে টাউন হলে সম্বর্ধনা জানালো এবং তারাই ...দনের ফেরার জাহাজ ভাড়া তুলে দিল। সেই সভাতে উপস্থিত রইলো নবীনকুমার। সভা শেষে বাইরে বেরিয়ে এসেই সে বললো, আমরা প্রধান প্রধান সাহেবদের বিদায়ের প্রাক্কালে রিসেপশান দি, আমরা অদ্যাবধি আমাদের দেশীয় কোনো ব্যক্তিকে তা দিয়িচি?

যদুপতি গাঙ্গুলি বললো, এটা তুমি ঠিকই বলেচো, নবীন! আমাদের দেশে সত্যিকারের বড় মানুষদের পেচোনেও আমরা ঘোঁট পাকাই, গুণের সমাদর করি না। নইলে বলো, বিদ্যাসাগর মশাইকে পাবলিক রিসেপশান দেওয়া উচিত ছিল না কি? তুমি একটা ব্যবস্থা করো না।

নবীনকুমার একটুক্ষণ ভেবে বললো, উনি কি এ সব তোয়াক্কা করেন? কে বলতে যাবে ওঁকে। যদি উনি ধমকে উঠেন? আমি বলি কী, যে নতুন জ্যোতিষ্কের উদয় হয়েচে আমাদের সাহিত্যাকাশে, তাঁকেই প্রথমে সম্বর্ধনা জানানো যাক। আগেকার দিনে রাজা-বাদশারা কবিদের শিরোপা দিতেন। এখন রাজা থাকেন বিভুঁয়ে। আমাদেরই সে দায়িত্ব লওয়া কর্তব্য।

নবীনকুমার পায়ের তলায় জল গড়াতে দেয় না। পরের সপ্তাহেই ব্যবস্থা হলো সম্বর্ধনার। এই সম্বর্ধনা দেওয়া হবে সিংহবাড়ির বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে। কার্ড ছাপিয়ে বিতরণ করা হলো শহরের সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে। ব্যাপারটি সত্যিই অভিনব, কলকাতা শহরের পত্তনের পর এ পর্যন্ত কোনো কবিকে এমনভাবে প্রকাশ্য অভিনন্দন জানানো হয়নি। শুধু মানপত্র নয়, কবিকে একটি উপহারও দেওয়া হবে। উপহারের দ্রব্যটি নবীনকুমারই ঠিক করলো। সুরা-প্রেমিক কবিকে দেওয়া হবে একটি রৌপ্য নির্মিত পানপাত্র।

গঙ্গানারায়ণ গিয়ে সম্মতি নিয়ে এসেছিল মধুসূদনের। নির্দিষ্ট দিনে মধুসূদন সেজেগুজে তৈরি, সঙ্গে যাবে গৌরদাস এবং একজন মাইনেকরা পন্ডিত। গৌরদাসের অনুরোধেও মধুসূদন দেশীয় পোশাক পরিধান করতে রাজি হলেন না। কিন্তু যাবার আগে মনের জোর আনার জন্য মধুসূদন ব্র্যান্ডির বোতল খুলে যেই গলায় ঢালতে যাবেন, তখন গৌরদাস চেপে ধরলেন তার হাত। অনুনয় করে বললেন, প্লীজ মধু, অন্তত আজ থাক। ওখেনে পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসবেন, তোর মুখ থেকে কিছু শুনতে চাইবেন—

বোতলটি নামিয়ে রেখে মধুসূদন বললেন, থাক, আজ আর নিজের পয়সায় কেন খাই! ওরা নিশ্চয়ই সার্ব কর্বে? বড় মানুষের বাড়ির ব্যাপার, আশা করি ওরা বেস্ট কোয়ালিটিই দেবে!

গৌরদাস বললেন, মনে হয় না। যতদূর জানি, ও-বাড়িতে ড্রিংকস-এর চল নেই।

—কী বলিস? সভা খুলেচে, ইংলিশ কায়দায় রিসেপশান দিচ্চে, আর ওয়াইন সার্ব কর্বে না? বিদ্যোৎসাহিনী সভা তো শুনিচি আসলে মদ্যোৎসাহিনী সভা!

—তুই ভুল শুনিচিস মধু!

—তবে আর যাই কেন? হোয়াই বদার! মিচিমিচি গন্ডাখানেক লোকের বকবকানি শুনতে যাই কেন?

—তুই কী বলচিস, এত বড় সম্মান! চল, প্লীজ, ব্যাপারটা সেরে এসে বাড়ি ফিরে তুই যত খুশী ড্রিংক করিস।

ঘোড়ারগাড়ি মাঝরাস্তা পর্যন্ত আসার পর আবার ছটফটিয়ে উঠলেন মধুসূদন! গৌরকে তিরস্কার করে বললেন, তুই কী কল্লি বল তো? আমার গলা শুকো আসচে। ওরা কি ডায়াস তৈরি করে তার ওপর আমায় বসাবে? ওরে বাপ রে বাপ!

গৌরদাস বললেন, বেশীক্ষণ লাগবে না। তোর লেকচারটা শেষ হলেই তুই বাড়ি চলে আসবি।

—হোয়াট? লেকচার? কে দেবে লেকচার? তোর মাতা খারাপ?

—বাঃ, ওদের সম্বর্ধনার উত্তরে তোকে দু-চার কথা বলতে হবে না? সেটাই তো ভদ্রতা!

—তোরা আমায় মেরে ফেলতে চাস। আমি দোবো বেঙ্গলিতে লেকচার? শুনেই আমার সারা গা কাঁপচে। ওরে বাপ রে বাপ, আমি যাবো না, আমি পালাবো—

পন্ডিতটি হো হো করে হেসে উঠলেন। মধুসূদন চক্ষু গরম করে তার দিকে ফিরে বললেন, তুমি হাসচো কেন, পন্ডিত! ভাবচো আমি প্রহসন কচ্চি? আমি বেঙ্গলিতে লেকচার দোবো? নেভার।

পন্ডিতটি বললেন, বলেন কি মশাই, হাসবো না? বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি যিনি তিনি বাংলা বক্তৃতা করতে ভয়ে কাঁপছেন, এতে হাসি পাবে না?

এবার গৌরদাসও হেসে উঠলেন সশব্দে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে কিন্তু মধুসূদনের সব কিছুই বেশ পছন্দ হতে লাগলো। বিদ্যোৎসাহী সভার সভ্যদের উৎসাহ-উদ্দীপন খুবই আন্তরিক। বিশিষ্ট ভদ্রমন্ডলী ঔৎসুক্যের সঙ্গে চেয়ে আছেন তাঁর দিকে। আবেগকম্পিত কন্ঠে নবীনকুমার পাঠ করলেন মানপত্র। সেই আবেগের স্পর্শ লাগলো মধুসূদনের কন্ঠে, উত্তর দেবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে বেশ গড়গড় করেই বাংলা বলতে লাগলেন তিনি। অবশ্য একটুখানি বলার পরই তাঁর হাঁটুদ্বয় কম্পিত হতে লাগলো। হঠাৎ একটুখানি থেমে তিনি বললেন, আমি বক্তৃতা বিষয়ে নিপুণতাবিহীন .... কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিতান্ত অক্ষম....। তারপরই বসে পড়লেন। তাতেই বিপুল হর্ষধ্বনি ও করতালিধ্বনি হলো। এরপর অভিনেতা কেশব গাঙ্গুলি পাঠ করলেন মেঘনাথবধের নির্বাচিত অংশ। মধুসূদন বেশ নিবিষ্টচিত্তে শুনতে লাগলেন তাঁর আর বাড়ি ফেরার তাড়া দেখা গেল না।

ফেরার পথে ঘোড়ারগাড়িতেও গৌরদাসের সঙ্গে মধুসূদন আলোচনা করতে লাগলেন সভাটির সার্থকতা সম্পর্কে। নবীনকুমারকে বেশ পছন্দ হয়েছে মধুসূদনের। ঐ অল্পবয়সী ছোকরাটি এ শহরের সমস্ত খ্যাতিমান ব্যক্তিদেরই আনতে পেরেছে এই সভায়, এটা কম কথা নয়। গৌরদাস বললেন, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র হরিশ মুখুজ্যেকেই দেকলুম না। তিনি বোধ হয় অন্য কর্মে ব্যস্ত—।

মধুসূদন ললাট কুঞ্চিত করে বললেন, আর একজনকে দেকিনি। অথচ দেকবো বলে একস্পেক্ট করিচিলুম। তোমাদের ঐ বিদ্যাসাগর। তিনি এলেন না কেন? তাঁর বুঝি খুব অহংকার! ইফ ইউ মিট হিম, ওঁকে বলে দিও, ঐ সব অহংকারী পন্ডিতদের মাইকেল এম এস ডাট্ গ্রাহ্য করে না। (ক্রমশ)
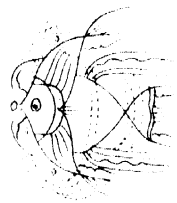
# আই ব্যাংক ও তার সমস্যা

ভোরের আলো তখনও ফুটে ওঠেনি। চৌরঙ্গী এলাকার মেট্রো সিনেমার সামনের ফুটপাতে দুএকজন ভিখারী দাঁড়িয়ে। ষোল বছরের চেতন লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যায় বাসস্টপের দিকে। এটা ওর কলেজ জীবনের দ্বিতীয় দিন। হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়েই বাসটাকে দেখতে পেয়ে ছুটতে শুরু করে চেতন। পা ফসকে পড়ে যায় ও মাটিতে। দোতলা বাসের বিশাল চাকাটা ওর শরীর দুমড়ে বেরিয়ে যায় নির্বিকারে। রক্তমাখা নিষ্পাপ দেহটা পড়ে থাকে সদ্যস্নাত পিচের রাস্তায়। প্রাণচঞ্চল কলকাতার ঘুম ভাঙছে তখন সবে।

ঠিক পেছনের বাসের জানলা থেকে চেতনের বন্ধু শিউরে ওঠে ওর নিথর নিস্পন্দ দেহটাকে দেখে। ছুটে নেমে আসে। রাতের শেষ প্রহরের পেটরলিং পুলিশ ভ্যানটা থমকে দাঁড়ায় চেতনের কাছে।

করনিয়া গ্রাফটিং করে ইনি আবার ফিরে পেতে পারেন পৃথিবীর আলো।

এস এস কে এম হাসপাতালের এমারজেন্সিতে যখন ডাক্তাররা চেতনকে মৃত বলে ঘোষণা করলেন, তখন খবর পৌঁছে গেছে উত্তর কলকাতার দোশী পরিবারে। রামনীকলাল একমাত্র ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েও চোখের জল ফেললেন না এতটুকু। ঠাণ্ডা মাথায় ওঁর বড় ভাইকে ডেকে বললেন, দেরি করো না। ফোন করো এক্ষুনি আই ব্যাংককে।

কলকাতা মেডিকেল কলেজ আই ব্যাংক থেকে এলেন ডাক্তার। মুছে দিলেন চেতনের চোখের চারপাশটা স্পিরিট দিয়ে। মিনিট দশেকের মধ্যে চোখ দুটো তুলে রাখা হল আলাদাভাবে ছোট ছোট দুটো ফ্লাসকে। বরফের মধ্যে। চেতনের চোখের পাতা দুটো এমনভাবে কালো সিল্ক দিয়ে সেলাই করা হলো যেন মনে হচ্ছিল ও চিরনিদ্রায় মগ্ন। ছিল না কোথাও এতটুকু বিকৃতি।

ওদিকে মেডিকেল কলেজ অপারেশন থিয়েটারে শুরু হয়ে গেছে কর্মব্যস্ততা। ছোটাছুটি করছেন নারসরা কেরাটোপ্লাসটির সেট রেডি করতে। ডিপ ফ্রীজে রাখা হল ফ্লাসক দুটি। ১৯৭৯-র ২৫শে সেপটেম্বর চেতনের দেহ যখন মহাপ্রস্থানের পথে শ্মশানের দিকে, তখন কলকাতারই বুকে তারই বয়সী দুটি অন্ধ ছেলে মেয়ে ফিরে পেল তাদের দৃষ্টিশক্তি। চেতনের চোখের স্বচ্ছ করনিয়া দুটো তুলে ডাক্তাররা লাগিয়ে দিলেন তা' ওই অন্ধ দুজনের চোখে।

সার্থক চেতনের জন্ম। মরেও চেতন অমর। কিন্তু এ দৃষ্টান্ত বিরল। ভারতবর্ষে যেখানে ১৫ লক্ষ অন্ধ লোকের মধ্যে প্রায় কুড়ি লক্ষ লোক করনিয়ার অস্বচ্ছতায় ভুগছেন (অর্থাৎ এঁরা সকলেই করনিয়া গ্রাফটিং অপারেশনের কল্যাণে ফিরে পেতে পারেন আবার পৃথিবীর আলো) সেখানে আই ব্যাংকগুলির ডিপ ফ্রীজগুলো প্রায়শই ফাঁকা পড়ে থাকে। অথচ দেশের নানান প্রান্তে শহরে গাঁয়ে গঞ্জে মানুষ মারা যাচ্ছেন প্রতিদিন অসংখ্য। কলকাতা মেডিকেল কলেজের পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, গতবছর এখানে করনিয়া গ্রাফটিং হয়েছে ৪৩টি। '১৯৬৬ সালে আই ব্যাংকে জমা পড়ে মাত্র দুটি চোখ এবং শুরুতে '৬৫ সালে একটিও নয়। যদিও পনের বছরের ব্যবধানে সংখ্যাটা হয়ত বেশি, তবুও প্রয়োজনের তুলনায় তা যৎসামান্য।

অশিক্ষিত বা যাঁরা একদম গাঁয়ের লোক তাঁদের কথা ছেড়েই দিলাম, এমনকি শিক্ষিতরা যাঁরা জ্ঞানের আলো পেয়েছেন তাঁরা চোখদান সম্পর্কে অবহিত থেকেও নীরব। কিন্তু কেন এই অবস্থা? কুসংস্কার? প্রিয়জনের প্রতি অন্ধ আবেগসঞ্জাত ভালোবাসা? অজ্ঞতা? অথবা প্রচারের অভাব? কারণটা খতিয়ে দেখার আগে আসুন দেখা যাক আই ব্যাংক কাকে বলে : কিই বা তার উদ্দেশ্য। আর সেই সঙ্গে জানা যাক করনিয়া গ্রাফটিং অপারেশনই বা কি।

চোখের সামনে প্রায় ছভাগের একভাগ জায়গা জুড়ে যে স্বচ্ছ কাঁচের মত অংশটি রয়েছে তার নাম করনিয়া। আলোকরশ্মি এই করনিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রতিসৃত হয়ে ধাক্কা খায় চোখের মধ্যে ছোট্ট লেন্স বা মণিতে। তারপর এই আলো এসে কেন্দ্রীভূত হয় একদম চোখের ভিতরে সংবেদনশীল রেটিনায়। রেটিনা থেকে নার্ভতন্তুর মাধ্যমে বার্তা পৌঁছে যায় সোজা মস্তিষ্কে। মাথার ঠিক পিছনে। এর নীট ফল : আমরা দেখতে পাই। চোখের এইসব নানান মিডিয়া বা মাধ্যম যদি স্বচ্ছ থাকে আর সেই সঙ্গে নার্ভতন্তুরা সঠিকভাবে বার্তাবহন করে নিয়ে যায় তবেই আমাদের দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক থাকে আর এর হেরফের মানেই হল ক্ষীণ দৃষ্টি বা অন্ধত্ব।

আমাদের দেশে অন্ধত্বের প্রায় শতকরা কুড়ি ভাগ হল অস্বচ্ছ করনিয়াজনিত। করনিয়া অস্বচ্ছ থাকায় আলোকরশ্মি বাধা পায়। প্রবেশ করতে পারে না ভিতরে। কেন এই করনিয়া স্বচ্ছতা হারিয়ে ফেলে? চোখে আঘাত, অপুষ্টিজনিত কেরাটোম্যালেসিয়া, গ্লুকোমা, স্মল পক্স বা বসন্ত—এই সমস্ত নানান কারণে সাদা হয়ে যেতে পারে করনিয়া।

মনে করুন ধান কাটছেন কেউ ক্ষেতে। হঠাৎ চোখে এসে ঠিকরে পড়ল ধারালো ধানের শিষ। অথবা কারখানায় কাজ করতে গিয়ে দুএক ফোঁটা অ্যাসিড বা ওই জাতীয় কোন তরল এসে ছিটকে পড়ল চোখে। বা দেওয়ালিতে পটকা ফাটাতে গিয়ে আগুনের ফুলকি এসে ঢুকল চোখে। এ ধরনের আঘাতে করনিয়া সাদা হয়ে যেতে সময় লাগে না বেশিদিন। আর বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আঘাতজনিত অন্ধত্বের সংখ্যাও বেড়েছে ভীষণভাবে।

অভাব। এর ফলে করনিয়ার যে পরিবর্তন হয় তাকে পরিভাষায় বলে কেরাটোম্যালেসিয়া। এটা সবচেয়ে বেশি হয় পাঁচ বছরের নীচে শিশুদের। এদের অনেকেই পেটের রোগ বা গ্যাসট্রোএনটারাইটিসে ভোগে। আর এটা প্রায়ই দেখা যায় কোন বাচ্চার ডায়ারিয়া হলে মায়েরা তাকে বার্লির জল, পাতলা দুধ বা নরম ভাত ওই জাতীয় কিছু খাবার জোর করে খাওয়ান। এটা চোখের পক্ষে মারাত্মক। দুএকদিন চোখ বুজে থাকে বাচ্চা আর এর পরেই মায়েরা যখন বাচ্চার চোখ খোলানোর চেষ্টা করেন, তখন ইতিমধ্যে চোখের করনিয়া হয়ে গেছে সাদা। দেখা দিয়েছে অপুষ্টিজনিত রোগের ছাপ।

এছাড়া অস্বচ্ছ করনিয়ার অন্য দুটি কারণ হল গ্লুকোমা ও বসন্তরোগ। গ্লুকোমা দেখা দেয় অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশে। ভীষণ ছোঁয়াচে। বিশেষ করে চোখের জল। এক ধরনের মাছি এটা ছড়াতে সাহায্য করে। বর্তমানে পৃথিবীর ৫০ কোটি লোক এ রোগে আক্রান্ত, আর এর দরুন অন্ধ হয়ে আছেন কুড়ি লাখ। ওয়ারলড হেলথ অরগানাইজেশন অবশ্য দাবী করেছেন, স্মল পক্স মুছে গেছে পৃথিবী থেকে। তবে আমাদের দেশে অন্ধদের এক বিরাট অংশ বসন্তের শিকার হয়ে আজও দিন গুনছেন অন্ধকারে।

করনিয়া গ্রাফটিং বা সংস্থাপন নতুন নয়। এর ইতিহাস অনেক পুরোনো। অস্বচ্ছ করনিয়াকে পালটে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা প্রথম মাথায় আসে ফ্রান্সের দ্য কুইংসির। ১৭৮৯ সালে। উনি বললেন, সাদা করনিয়াটাকে কেটে একটা কাঁচের ডিস্ক সুতো দিয়ে চোখের সামনে জুড়ে দিলে কেমন হয়? আর এই সঙ্গে কুইংসি এও বললেন, অপারেশনের জন্য বেছে নেওয়া হোক একটা পরিষ্কার সুন্দর শুচিশুভ্র দিন। রোগীকে লম্বালম্বি শোয়ানো হোক একটা টেবিলে। (তখনকার দিনে চোখের অপারেশন করা হত রোগীদের বসিয়ে।) আর অপারেশনের পর আটদিন টানটান শুইয়ে রাখা হোক রোগীকে যাতে কিনা কাঁচের ডিস্কটা মাটিতে পড়ে না যায় মাধ্যাকর্ষণে। কিন্তু কুইংসির এ প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

১৮৩৭ সালে ডাবলিনে প্রকাশিত একটি বইয়ে স্যামুয়েল বিগার জানালেন, যখন তিনি মিশরে বন্দী ছিলেন তখন একটি পোষা হরিণের চোখে করনিয়া পাল্টে তিনি সফল হয়েছেন। এর ঠিক পরের বছর রিচারড কিসাম ছয়াসের একটি শুয়োরের চোখ থেকে স্বচ্ছ করনিয়া তুলে লাগিয়ে দিলেন একজন অন্ধ আইরিশম্যানের চোখে। ভদ্রলোকের নাম জেমস ডান। নতুন গ্রাফটের মধ্যে দিয়ে জেমস দেখছিলেন ভালোই। কিন্তু এটি টিকেছিল মাত্র একমাস। গ্রাফটি সাদা হয়ে যায় পরে। এরপর ভন হিপপেল, ফুকস সবাই করনিয়া গ্রাফটিং নিয়ে পরীক্ষা চালান ব্যাপকভাবে।

তবে কোন মানুষের দেহ থেকে করনিয়া তুলে অন্য কোন মানুষের চোখে সংস্থাপনে যিনি প্রথম সফল হলেন তিনি হলেন জারম (Zirm)। ১৯০৫ সালের ওলমুটজের একটি ছোট্ট শহরে এই ঐতিহাসিক অপারেশন হয়। আর এতে চোখ দান করেছিল একটি ছোট্ট ছেলে।

এরপর পৃথিবীর নানান প্রান্তে গবেষণা শুরু করলেন বিজ্ঞানীরা। ভাবতে লাগলেন কিভাবে মৃতদেহের চোখ তুলে সংরক্ষণ করা যায় যাতে কিনা ঠিক প্রয়োজনের সময় সারজন সেই চোখের করনিয়া তুলে কোন অন্ধলোকের চোখে গ্রাফট করতে পারবেন। এলো আই ব্যাংকের পরিকল্পনা। আই ব্যাংক প্রথম চালু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। ১৯৪৫ সালে। নিউ ইয়র্ক শহরে। শুরু করলেন প্যাটন। এমনিভাবে গড়ে উঠল একের পর এক বিভিন্ন দেশের আই ব্যাংকগুলি। ভারতবর্ষে আপাতত প্রায় ৫০টি আই ব্যাংক রয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিম বাংলায় দুটি। কলকাতা মেডিকেল কলেজ আই ব্যাংক ও নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে অতুলবল্লভ আই ব্যাংক।

প্রথমটি শুরু হয় ১৯৬৫ সালে ও দ্বিতীয়টি ১৯৭৪-এ

একটা কথা। ষাটের দশকে দক্ষিণ আফরিকার ক্রিশ্চিয়ান বার্নারড যখন প্রথম হৃদযন্ত্র সংস্থাপন করেন কোন এক হৃদরোগীর বুকে, তখন সারা বিশ্বে আলোড়ন উঠলেও উৎসাহে ভাটা পড়ে কয়েকবছরের মধ্যেই। কেননা রোগীরা কেউ বাঁচলেন না বেশিদিন। মৃতদেহের হৃদযন্ত্র নতুন শরীরে প্রবেশ করামাত্রই গ্রাহকের স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তি বা ইমিউনিটির ফলে তা পরিত্যক্ত হতে থাকল। যাকে বিজ্ঞানীরা বলেন 'রিজেকশন'। এই রিজেকশনের সমস্যাটা আজকের বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলেছে খুব বেশিভাবে, ঠিক এমনিভাবে ভাবিয়ে তুলেছে অপ্রতিরোধ্য ক্যানসার রোগের সমস্যা। তবে তুলনামূলকভাবে করনিয়া গ্রাফটিং সোজা। রিজেকশনের সমস্যা অনেক কম। এর কারণ হল করনিয়া শরীরের এমন একটি অংশ যেখানে রক্তনালীরা এসে পৌঁছয়নি। ফলে শরীরের প্রতিরোধকারী কোষগুলির কাছে করনিয়ার দ্বার রুদ্ধ। এটা খুব আশার কথা।

ঠিক এই জন্যেই আই ব্যাংকগুলি ব্যাপকভাবে গড়ে উঠেছিল। এদের কাজ হল মৃতদেহের চোখ সংগ্রহ করা, তার সংরক্ষণ আর উপযুক্ত অন্ধরোগীদের সেই চোখ দান। মনে করুন আপনি স্বেচ্ছায় চোখ দিতে চান। সোজা খবর দিন আই ব্যাংককে। নাম রেজিস্ট্রী করান ওখানে। ওঁরা আপনাকে দেবেন একটা পকেট কারড যা আপনি আপনার কাছে রাখুন সবসময়। কারডের একপিঠে লেখা : দয়া করে মৃত্যুর পর ফোন করুন আই ব্যাংককে। আর হ্যাঁ, এ সম্পর্কে জানিয়ে রাখুন আপনার কাছের লোকদেরও। যদি আপনার আত্মীয়রা মৃত্যুর দুঘণ্টার মধ্যে আই ব্যাংককে খবর পাঠান তবে আই ব্যাংকের ডাক্তার এসে মিনিট দশেকের ছোট্ট অপারেশন সেরে চোখ দুটি তুলে নিয়ে যাবেন। যে কেউ করণিয়া দিতে পারেন। অবশ্য স্বচ্ছ থাকা চাই সেই করণিয়া। চোখগুলি রাখা হবে ডিপ ফ্রীজে ঠাণ্ডার মধ্যে। আর হাসপাতালে যে সমস্ত অন্ধ রোগীরা ভর্তি হয়ে অপেক্ষা করছেন অপারেশনের জন্যে, তাদের দুজনের চোখে এক এক করে গ্রাফট করা হবে করনিয়া দুটো।

এ বছরের গত এপ্রিল মাস পর্যন্ত কলকাতা মেডিকেল কলেজ আই ব্যাংকে এমনি পকেট কারড করিয়েছেন ১৬৫৬ জন। ওঁরা সবাই চক্ষুদানের অংগীকার করেছেন। ও'দেরই একজন হলেন আর পি লাখানী। বয়স ৬৬। ব্যাক ব্রাশ করা সাদা চুল। চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা। থাকেন ফ্রি স্কুল স্ট্রীট এলাকায় এক ছোট্ট ফ্ল্যাটে একলা। রিটায়ার করে এখন রেকরড প্লেয়ার আর পরজন্ম সম্পর্কে নানান বইয়ের পাতায় ডুবে থাকেন। হঠাৎ চোখদানের কথা ভাবলেন কিভাবে, প্রশ্ন রেখেছিলাম। বললেন, স্টেটসম্যানের 'পারসনাল কলাম'-এ জাকোটা পুডিং আর ইকেবানা কোচিং-এর বিজ্ঞাপনের ফাঁকে একদিন দেখলাম আই ব্যাংকের কথা। ভাবলাম আত্মা ত' অবিনশ্বর। যদি মৃত্যুর পর এ দেহ কারো কাজে লাগে মন্দ কি?

এজন্যে সব পাকাপাকি করে রেখেছেন লাখানী। ড্রয়ার খুলে খাম থেকে বের করে দেখালেন টাইপ করা চিঠি যাতে বড় বড় করে লেখা আছে মৃত্যুর পর আই ব্যাংককে ফোন করা ছাড়া আরও অনেক একান্ত কথা। 'আমার শ্রাদ্ধবাসরে ব্রাহ্মণের প্রবেশ নিষেধ' ইত্যাদি। এর দুটো কপিও পাঠিয়ে দিয়েছেন উনি ছেলে আর মেয়ের কাছে।

এমনি অংগীকার করেছেন বিখ্যাত এক ফারমের সুন্দরী রিসেপশনিস্ট অঞ্জলি মুখার্জি। দুই ছেলের মা। বয়স চল্লিশ। উনি অবশ্য আই ব্যাংক সম্বন্ধে প্রথম জেনেছিলেন 'টাইম' ম্যাগাজিনের পাতা উল্টোতে উল্টোতে। তারপর অনেকটা নিজের উৎসাহেই খোঁজ নিয়ে কারড করিয়েছেন। অঞ্জলি হয়ত আজ বলছেন চোখ দান করবেন, কিন্তু মৃত্যুর সময় ছেলে এতে আপত্তি করবে না ত'? মাথা নেড়ে
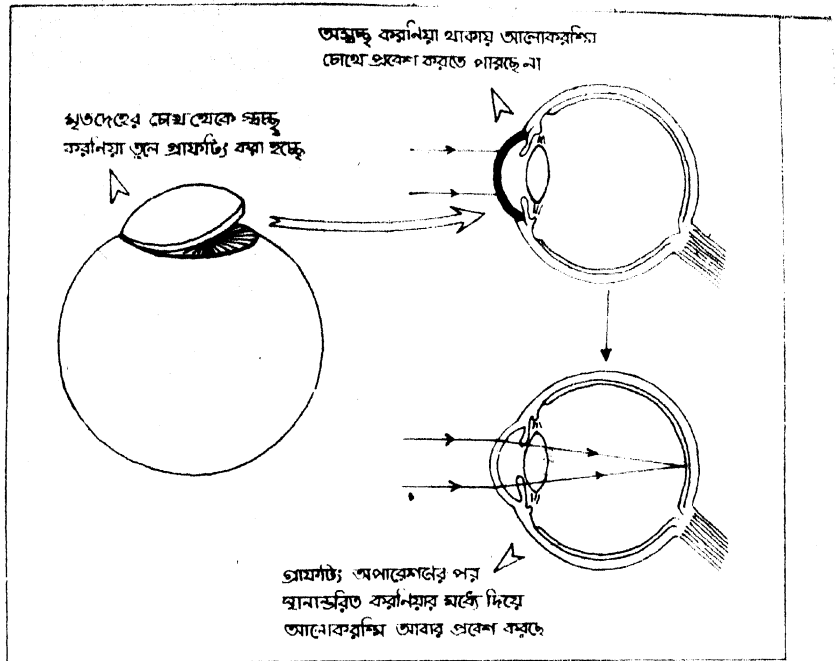
করনিয়া গ্রাফটিং অপারেশন

উত্তর দিয়েছিল ছোট ছেলে একেবারেই নয়।

ফাদার জন এংকেলবারট বললেন, চোখ দান করা মানবসেবার এক বড় সুযোগ। কলকাতার বাসিন্দা উনি। পরিষ্কার বাংলা বলেন। বেলজিয়ামে ওঁর মা আছেন বেঁচে। ওখানকার মেডিকেল কলেজকে ও'র পুরো শরীরটাই দান করেছেন। মৃত্যুর পর ব্যবহারের জন্য। এংকেলবারট জানালেন, ওঁদের শ্রদ্ধার পাত্র ফাদার জুলিয়েন হেনরি মৃত্যুর সময় চোখ দান করে গেছেন। তালতলার বাঙালী খ্রীষ্টানরা ওঁকে গুরু বলে মানতেন। হেনরি ও'দের অনুপ্রাণিত করেছেন।

কিন্তু কুড়ি লাখ অন্ধ রোগীর তুলনায় উৎসাহী দাতার সংখ্যা নেহাতই কম। কেন সকলে এগিয়ে আসছেন না চক্ষুদানের এমন মহান কাজে? কথা হচ্ছিল কলকাতার রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ অপথ্যালমোলজির ডিরেক্টর ডাঃ আই এস রায়ের সংগে। ওঁর কথায়, কুসংস্কার এখনও মানুষের মনে বাসা বেঁধে আছে প্রবলভাবে। অনেকেই মনে করেন মৃত্যুর সময় চোখ অপসরণ করলে হয়ত পরজন্মে অন্ধ হয়ে জন্মাতে হবে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? তাহলে প্রতিদিন ত' কত লোক মারা যাচ্ছেন যাঁদের একটাও দাঁত নেই কিংবা নেই কোন টনসিল?

ডাঃ রায়ের মতে, আমাদের নেতারা ত' এ ব্যাপারে দৃষ্টান্ত রাখতে পারেন। কোন ফিল্ম বা নামী খেলোয়াড় বা সাহিত্যিক যদি চোখ দান করেন তবে নিশ্চয় আরও অনেকে এগিয়ে আসবেন। আর সবচেয়ে এ বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন ধর্মীয় গুরুরা। কলকাতায় যাঁরা এ পর্যন্ত চোখদান করেছেন তাঁদের বেশির ভাগই হলেন জৈন কিংবা পারসী। ওঁদের ধর্মীয় নেতারা শিষ্যদের প্রভাবিত করতে পেরেছেন খুব বেশি করে।

ধর্মীয় নেতারা এ সম্বন্ধে কি ভাবছেন? কলকাতার বিশপ রেভারেনড জোসেফ অমৃতানন্দকে প্রশ্ন করলে উনি বললেন, যদি যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে তাঁর নিজের শরীর উৎসর্গ করতে পারেন, তবে আমরা কেন পারব না সামান্য চোখ দিতে? মৃত্যুর পরও যদি আমাদের শরীর কাজে লাগে তবে তা ত' সৌভাগ্যের কথা।

তবে একটা কথা। অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, যদি এমন একটা আইন পাশ করানো যায় যাতে আই ব্যাংকের ডাক্তাররা যে কোন মৃতদেহ থেকে চোখ সংগ্রহ করতে পারবেন। এর জন্যে শুধুমাত্র মৃত-ব্যক্তির অনুমোদন পেলেই চলবে। প্রয়োজন হবে না কোন আত্মীয়স্বজনের পরামর্শ। কেননা এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে যেখানে মৃত ব্যক্তি ইচ্ছে প্রকাশ করা সত্ত্বেও তাঁর নিকটজনেরা মুখবিকৃতি বা কুসংস্কারের ভয়ে চোখ সংগ্রহে বাধা দিয়েছেন সক্রিয়ভাবে।

রেভারেনড জোসেফের এতে ঘোরতর আপত্তি। বললেন, জোর করে আইন করে কিছু করা সম্ভব নয়। এতে ফল হবে উল্টো। বাড়বে অশান্তি। একমত ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী বিকাশানন্দও। ওঁর মতে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে চোখদানের ইচ্ছে না থাকলে কখনই আইন করে চোখ নেওয়া উচিত নয়। হিন্দুধর্মে চোখদানে কোন বিধিনিষেধ নেই। বরং গীতায় আছে—'সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি।' সৎকাজের জন্য ত্যাগ করাও ভালো, কেননা এ শরীর ত' নিশ্চিত নষ্ট হবেই। এই কারণেই আমাদের মুনিঋষিদের মধ্যে 'জলসমাধি' প্রচলিত ছিল। মৃত্যুর পর জলের নীচে সমাধি দেওয়া হত। মাছেরা ও অন্যান্য প্রাণীরা তাদের শরীর খেয়ে নিত আস্তে আস্তে।

পারসীদের মধ্যে অনেকটা এইরকমই শেষকৃত্য প্রচলিত আছে। উঁচু টাওয়ারের মাথায় মৃতদেহকে জালের উপর শুইয়ে রাখা হয়। শকুনজাতীয় পাখিরা এসে তখন সেই দেহ খুঁটে খুঁটে খেয়ে যায়। নীচে পড়ে যায় দেহের হাড়গুলো। এর পিছনে হয়ত এই বিশ্বাস কাজ করছে যে মৃত্যুর পরেও যদি এই দেহ কারো প্রয়োজনে আসে তা সে যে কোন প্রাণীই হোক না কেন তবে, তাতে পুণ্যই হয়। যদি হিন্দু বা খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মগতভাবে কোন বাধা না থাকে তবে ত' এই দুই ধর্মের নেতারা এগিয়ে আসতে পারেন লোকের মনের অন্ধ কুসংস্কার দূর করতে। আরো অনেককে চক্ষু দানে উদ্বুদ্ধ করতে।

তবে ঘোরতর আপত্তি এসেছে মুসলিম ধর্ম থেকে। প্রথমে অনেকটা অবাকই হয়েছিলেন মহম্মদ সাকির করণিয়া গ্রাফটিং-এর কথা শুনে। উনি কলকাতার নাখোদা মসজিদের ইমাম। বললেন, 'জো

অন্ধ হো, সারা জগৎকে দেখনেদার ওপরওয়ালা হ্যায়, খুব সহী।' যে অন্ধ হয়ে গেছে তার ভার ত' নেবেন আল্লা, আমরা নই। যে অন্ধ তাকে ত' পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। পবিত্র কোরাণে লেখা আছে মৃত বা জীবিত কাউকেই আঘাত করা পাপ।

ভাগ্যবান বাঁকুড়ার কোটালপুরের অনিল বাজো। দীর্ঘ বাইশ বছর অন্ধকার জগতে কাটিয়ে ও আবার ফিরে এসেছে আলোর জগতে। মাত্র তিন বছর বয়সে রক্ত আমাশায় ভুগে অনিল অন্ধ হয়ে যায়। ওর স্কুলজীবন কেটেছে নরেন্দ্রপুরে। পড়াশুনো শিখেছে ব্রেইল সিসটেমে। এখন বহুল-প্রচারিত এক প্রসাধনী দ্রব্যের কারখানায় প্যাকিং-এর কাজ করে। কিছু দিন হল ওর ডানচোখে করনিয়া গ্রাফটিং হয়েছে।

অনিলের কাছে এ যেন নবজন্ম। 'এতদিন যা শুনেছি তা মিলিয়ে নিচ্ছি নিজের চোখে'। অনিলের অনেক আশা পৃথিবীটাকে ও আবার দেখতে পাবে। ফিরে পাবে স্বাভাবিক জীবন।

এমনিভাবে ফিরে পেতে চায় পৃথিবীর আলো আরো লাখ লাখ অন্ধ মানুষ। গরীব দেশে ভিক্ষের পথ নিয়েছে ওরা অনেকেই। দেখতে পাবেন ওদেরকে মসজিদে, মন্দিরে সর্বত্র। এটা একটা দেশের পক্ষে ম্যানপাওয়ার বা কর্মশক্তির বিরাট অপচয়। অর্থ-নৈতিক ক্ষতি।

আই ব্যাংকে চোখ কেন জমা পড়ছে না? আগেই বলেছি আইন করে চোখসংগ্রহ সম্ভব নয়। বড়জোর এমন একটা কিছু করা যেতে পারে যাতে করে হাসপাতালে বেওয়ারিশ কোন মৃতদেহ—মৃত্যুর দুঘণ্টার মধ্যেও যার কোন দাবীদার নেই—তার থেকে চোখ নেওয়া সম্ভব হয়। বর্তমান করনিয়াল গ্রাফটিং অ্যাক্ট (১৯৬৫) অনুসারে, যদি কোন ব্যক্তি লিখিতভাবে বা মৃত্যুর সময়ে দুজন বা তারও বেশী সাক্ষীর উপস্থিতিতে মৌখিকভাবে মৃত্যুর পর তাঁর চোখ চিকিৎসার প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য ইচ্ছে প্রকাশ করে থাকেন, তবে 'আইনগতভাবে' ওই দেহের অধিকারী যিনি তিনি চোখ সংগ্রহের ব্যাপারে অনুরোধ করতে পারেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মৃতব্যক্তির ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বাধ সাধছেন আত্মীয়রা। ওঁরা যদি কেউ খবর না দেন আই ব্যাংককে, তবে কিছুই উপায় থাকছে না ডাক্তারদের।

আর প্রয়োজনের তুলনায় আই ব্যাংকের সংখ্যাও নগণ্য। ধরুন বর্ধমানে কোন সহৃদয় ব্যক্তি তাঁর চোখদুটি দান করতে চান। খবরও পাঠানো হল আই ব্যাংককে। কিন্তু এটা কিছুতেই সম্ভব নয় কলকাতা থেকে গাড়ি ছুটবে বর্ধমানে। কেননা মৃত্যুর দুঘণ্টার মধ্যে চাই চোখদুটি। অনেকে প্রস্তাব রেখেছেন 'জোনাল আই ব্যাংক' তৈরি হোক। জেলায় জেলায় একটি করে। এতে সংগ্রহের ভাঁড়ারে জমা পড়বে অনেক বেশি চোখ। যত বেশি আই ব্যাংক হবে আর কর্মীসংখ্যা বাড়বে, তত জোরদার হবে এই সংগ্রহ। তবে সমস্ত আই ব্যাংকগুলি থাকা উচিত একটা কেন্দ্রীয় সংস্থার তত্ত্বাবধানে। এতে কাজ এগোবে অনেক সুনির্দিষ্টভাবে। কানাডায় এমনি-ভাবে গড়ে উঠেছে সারা দেশ জুড়ে কানাডীয়ান আই ব্যাংক। প্রতিটি প্রভিন্সে একটি করে।

এছাড়া চাই দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা। খবর পাওয়ামাত্র যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা' বাস বা ট্রেনেই হোক (বিদেশে প্লেনেও) চোখ সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকা চাই। কানাডার টরন্টো এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থাটি অভিনব। টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অপথালমোলজি কোরসের প্রথম বার্ষিক ছাত্ররা টানা তিন মাস আই ব্যাংকের কাজে নিযুক্ত থাকেন। ওঁদের প্রতিটি ছাত্র সবসময় বয়ে বেড়ান রেডিও চালিত "বেল বয়" সিসটেম আর "ইনিউক্লিয়েশন ব্যাগ"। এই ব্যাগে থাকে চোখ তোলার নানান যন্ত্রপাতি। "বেল বয়"-এ খবর পেলেই ওঁরা ছুটে যান চোখ সংগ্রহে। আর ফিরে এসে তা জমা দেন আই ব্যাংকে। আবার নতুন একটি ব্যাগ নিয়ে সাগ্রহে ওঁরা প্রতীক্ষা করেন পরবর্তী কল-এর জন্য।

পশ্চিম বাংলায় যে দুটি আই ব্যাংক আছে তাদের নিজস্ব কোন অ্যামবুলেনস নেই। তাই কলকাতায় যদি কেউ চোখ দিতে চান সেটাও সময়ে সময়ে দুরূহ হয়ে পড়ে। প্রথমত কান্নাকাটির শোরগোলে খবর দিতে দেরি হয়। তারপর ত' আছে কলকাতার টেলিফোন বিভ্রাট। আর টেলিফোনেও বা যদি পেলেন, পেতে দেরি হয় হাসপাতালের অ্যামবুলেনস। সারা হাসপাতালে গাড়ী চলছে হয়ত দুটো। বাকিগুলি ভাঙা নয়ত মেরামতে। এমনও ত' হতে পারে ঠিক ঐ সময়ে অ্যামবুলেনস দুটো ছুটেছে কোন মরণাপন্ন ব্যক্তি বা প্রসূতি মাকে হাসপাতালে আনতে। তাই ট্রানসপোরট চোখসংগ্রহের ব্যাপারে একটা বড় সমস্যা। তবে সবচেয়ে বেশি যেটা প্রয়োজন তা হল লোকের মনে গেড়ে বসা কুসংস্কারগুলো উপড়ে ফেলা। দূর করতে হবে অজ্ঞতা। চাই প্রচার। এ' ব্যাপারে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা সবাই এগিয়ে আসুক।

**ডানচোখে অস্ত্রোপচারের পর এই তরুণটি দেখছে আবার পৃথিবীকে নতুন করে।**

এগিয়ে আসুক ধর্মনেতারা। মুখে আপত্তি না জানালেও ওঁরা কিন্তু কেউ কোন সুনির্দিষ্ট প্রচারের কর্মসূচী নেননি। দুঃখের কথা সরকারের ভূমিকাও এখানে সামান্য। যদি ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর বার্তা ঘরে ঘরে লক্ষ হিন্দীগানের ফাঁকে ফাঁকে জনজন পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে, তবে কেন প্রচার করা যাবে না চোখদানের কথা?

এটা ত' ঠিক, লাল ত্রিভুজের চিহ্ন দেখে আজকাল বুঝে নিতে কারো অসুবিধে হয় না ওটা কি বা কিসের প্রতীক। সরকার পরিবার পরিকল্পনা প্রচারের জন্য যতটা ব্যয় করেন তার একশ ভাগের একভাগও যদি চোখসংগ্রহের প্রচারে ব্যয় করেন, তবে সফল হওয়া যাবে অনেকটা।

সম্প্রতি কলকাতায় ইনটারন্যাশনাল আই ব্যাংকের সূচনা হয়ে গেল আনুষ্ঠানিকভাবে। এটা খুব আশার কথা বেসরকারীভাবে এমন একটি প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। গত ৩০শে এপ্রিল এক আনন্দ-সন্ধ্যায় গ্র্যান্ড হোটেলের বলরুমে ফ্রানসের অ্যামবাসাডার আন্দ্রে রস প্রদীপ জ্বালিয়ে এর উদ্বোধন করলেন।

স্বাগত ভাষণে সভাপতি অশোককুমার সরকার জানালেন, বিদেশে দেহের কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দান করাকে এক বিরাট সমাজসেবা হিসেবে গণ্য করা হয়। আমাদের দেশে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার চোখদানে আজও এক বিরাট প্রতিবন্ধক। তাঁর আশা, ইনটারন্যাশনাল আই ব্যাংক এই কুসংস্কার দূরীকরণের সফল হবে।

প্রধান অতিথি রাজ্যপাল, ত্রিভুবন নারায়ণ সিং বললেন, এককালে কলকাতা ভারতবর্ষের রেনেশাঁসের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। চোখদানের ব্যাপারে এমন এক শুভ প্রচেষ্টায় কলকাতা যে নেতৃত্ব দিচ্ছে এটা খুব আনন্দের কথা।

তবে এই আই ব্যাংক গড়ে তোলার পিছনে অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যে মানুষটি তিনি হলেন মনোরঞ্জন মজুমদার। শ্রীলংকা থেকে ঘুরে এসেছেন তিনি গত এপ্রিলের গোড়ায়। কলমবোর ডঃ হাডসন সিলভার গড়ে তোলা পৃথিবীবিখ্যাত আই ব্যাংকটি ওঁকে মুগ্ধ করেছে। দেখেছেন কি করে একটি মানুষ তাঁর সারাজীবন উৎসর্গ করেছেন অন্ধ জনের সেবায়। সারা শ্রীলংকায় সিলভা একটি কিংবদন্তী। ওখানকার প্রতিটি মানুষের মনে সিলভা এটুকু বিশ্বাস জাগাতে পেরেছেন যে মৃত্যুর পর চোখ দানে পুণ্য হয়, মহানির্বাণ লাভ হয়।

প্রতি বছর এই কলমবো থেকে প্রায় হাজার বারোশ চোখ পৃথিবীর নানা প্রান্তে পাঠানো হয় ঠান্ডা প্যাকিং-এ। এর জন্যে কোন অর্থ দাবী করেন না সিলভা। মনোরঞ্জনবাবু জানালেন, তাঁর এই সংস্থা পুরোদমে প্রচার চালিয়ে যাবে চোখদানের ব্যাপারে। এর কর্মীরা ঘরে ঘরে গিয়ে ইচ্ছুক চোখদাতাদের নাম সংগ্রহ করবেন। মৃত্যুর পর চোখসংগ্রহে ছুটে যাবেন এঁরাই ঘরে ঘরে। প্রয়োজন অনুযায়ী এই আই ব্যাংক নানা হাসপাতালে চোখ পাঠিয়ে চাহিদা মেটাবেন। তবে এটা ঠিক এই ব্যাংক রাজ্যের সরকারী দুটি আই ব্যাংকের সঙ্গে কোন প্রতিযোগিতায় নামছে না। চোখদানের ব্যাপক অভিযানে এঁরা সবাই হবেন একে অন্যের পরিপূরক। ইতিমধ্যে অনেক সাড়া এসেছে। ইনডিয়া টোবাকো কোম্পানীর এ এন হাসকার ডাঃ মুরলী সেনগুপ্ত ও ডাঃ রণবীর মুখারজি এই সংস্থার সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। অভিনন্দনযোগ্য এই অভিযান।

এমনি করে গড়ে উঠুক আরো আই ব্যাংক সারা দেশে। আমেরিকায় পঞ্চাশ দশকের গোড়ায় ছিল অল্প কয়েকটি আই ব্যাংক। এগুলি সবই ছিল বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে যুক্ত। তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ল প্রচার। গড়ে উঠল অসংখ্য আই ব্যাংক। সবচেয়ে বড় কথা, এদের সবগুলি কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল কলেজের সঙ্গে যুক্ত নয়। অনেকগুলিই বেসরকারী এবং সাধারণ মানুষ দ্বারা পরিচালিত। তবে যতদিন না আমরা দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারছি, দূর করতে পারছি মনের অন্ধকার ততদিন আই ব্যাংকের ভাঁড় শিশিগুলি পড়ে থাকবে খালিই।

নাখোদা মসজিদ থেকে আমরা যখন বেরিয়ে আসছিলাম তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল। নমাজ পড়া চলেছে ভিতরে। দরজার গোড়ায় বসে আলকুদ্দীন। বয়স কুড়ির কোঠায়। মাথায় টুপি। লাল গামছা পেতে ভিক্ষে করছে সুর করে গেয়ে। দুচোখ ওর অন্ধ। আলকুদ্দীনের চোখের করনিয়া দুটো সাদা হয়ে গেছে একেবারে যখন ওর বয়স ছিল পাঁচ। করনিয়া গ্রাফটিং করে ফিরে পেতে পারে ও আবার ওর দৃষ্টিশক্তি। সুস্থ স্বাভাবিকভাবে আর দশটা দৃষ্টিবান লোকের মত তারও বাঁচবার ইচ্ছে হয়। কিন্তু হয়ত এমনি করেই সারাজীবন ওর থেকে যাবে অন্ধকারময়। কেননা 'উসকো অন্ধা কিয়া উপরওয়ালা'। আল্লাই ওকে পাঠিয়েছেন অন্ধ করে। আর এমনি করেই সারা দেশের কুড়ি লাখ অন্ধ লোক আলকুদ্দীনের মত ভাগ্যকে মেনে নিয়ে দিন গুনেছেন অন্ধকারে।

তবে ওঁদের আলো দেখাতে পারি আপনি আমি সবাই, তাই না?

# '৮০ ওলিম্পিকের আগে রুশ দেশ চিরঞ্জীব

॥ ১০ ॥

ধারণা ছিল ঐসব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে না। এই আমাদের কাছে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন—পশ্চিম বাংলার বেকার কত, কলকাতার রাস্তায় কত মানুষ রাত কাটায়, কত ভিক্ষুক আছে কলকাতায়। বিব্রত বোধ করব না কি? শুনেছিলাম সোভিয়েট দেশে অনেক কিছুই সাজানো। অনেক কিছুই 'অভিনয়'-এর মত, ভিতরের কথা জানা খুবই দুষ্কর। হয়তো এসব ঠিক, কিংবা ঠিক নয়। তবে আমি তো কিছু সাধারণ তথ্য জানতে চাই। আরমেন দ্বিধা না করে একে একে প্রশ্নের জবাব নয়, আলোচনা শুরু করলেন। বিনীতভাবেই বললাম, আপনাদের দেশ সম্পর্কে আমাদের কত যে অনুসন্ধিৎসা.......

বেকার আর ভিক্ষুকের কথা উঠতেই জানালেন, "শুধু আমার কথায় বিশ্বাস না করে, এখানে আপনার পরিচিত ভারতীয়দের কাছে খোঁজ নেবেন তা হলে আরও জানতে পারবেন। সমাজতন্ত্রে বেকার থাকতেই পারে না। লেনিন বলেছিলেন প্রতিটি মানুষকে কাজ দিতে হবে, বাঁচার মত খাদ্য দিতে হবে। আমাদের সরকার বিপ্লবের পর থেকেই এজন্য প্রয়াস চালিয়েছে। বড় বড় রাস্তায় হোর্ডিং-এ দেখেছেনও লেনিনের ওই কথাগুলি রয়েছে তাঁর নানা বাণীর সঙ্গে। তা ছাড়া বেকার থাকবে কেমন করে। এতবড় দেশে আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় জনসংখ্যা বেশ কম। প্রতিটি মানুষকে দ্বিগুণ পরিমাণে কাজ করতে হয়। চাকরির বয়স হলে তাই কলেজ বা অনুরূপ সংস্থায় শিক্ষানবীশ কাল শেষ হতে না হতেই আ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার চলে যায়। বেকার থাকার কোনো সুযোগই (?) নেই। শিল্প বেড়েই চলেছে, কলকারখানাও। কাজের সুযোগও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিদিন আমরা কাজের লোক খুঁজে বেড়াচ্ছি। পুরুষরা তো নয়ই, কোনো বাড়িতে সমর্থ মেয়েরাও বসে নেই। শুধু তাই নয়—কাজের লোকের অভাব বলেই পুরুষদের মত মেয়েরাও কঠিন পরিশ্রমের কাজে নিযুক্ত। সব দেশের মত আমাদের এখানেও নির্দিষ্ট বয়সে অবসর নিতে হয়। তারপর ওঁরা পেনসন পান। কিন্তু কাজের লোকের অভাব বলেই সমর্থরা ইচ্ছা করলে অবসরের পরেও কাজ পান। কাজ দেওয়া হয় আংশিক সময়ের বা পুরো সময়ের।"

আরমেন হেসে বললেন, "দুই বন্ধু দেশ ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নেই জনসংখ্যার সমস্যা। তবে ব্যাপারটা একদম বিপরীত। আপনাদের জনসংখ্যা বেশি। আমাদের জনসংখ্যা কম। জনসংখ্যা কমজনিত সমস্যা নিয়ে সরকারের চিন্তাও খুব। কদিন আগে খবরের কাগজে দেখছিলাম সোভিয়েটে মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে বলে অবসরের বয়ঃসীমা পাঁচ বছর বাড়ানোর চিন্তা করা হচ্ছে। চিন্তার কারণ আরও। হিসাব করে দেখা গেছে আগামী দশ বছরে প্রায় পাঁচ কোটি লোক অবসর নেবেন চাকরি থেকে। এতে দারুণ সমস্যা দেখা দিতে পারে কলকারখানা, শিল্প ও অন্যান্য সব কিছুতেই। সরকার এদিকটাও ভাবছেন।" আরমেন বললেন, "যেখানে কাজের তুলনায় জনসংখ্যা খুব কম সেখানে ভিক্ষুক থাকতে পারে?"

রাশিয়ায় আমি শহর ও শহরতলীতে ঘুরেছিলাম। জানি না, একেবারে গণ্ডগ্রামের অবস্থা কেমন। শহর ও শহরতলীতে ভিক্ষুক বা ছেঁড়া জামা-কাপড় বা ওই ধরনের পোশাক পরে কাউকে ঘোরাঘুরি করতে দেখিনি। অলিতে-গলিতে ঘুরে, চাকুরে বা ছাত্র ভারতীয়দের কাছে জিজ্ঞাসা করেও ভিক্ষুক বা বেকারের সন্ধান পাই নি।

আরমেনের কাছে শুনলাম, অধিকাংশ দম্পতীরই একটি সন্তান, শতকরা কুড়িটি দম্পতীর দুটি সন্তান, তিনটি সন্তান আছে—এমন দম্পতী
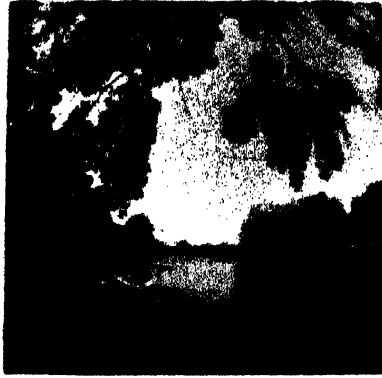
গোর্কি রিক্রিয়েশন পার্কে ছুটির দিনে নৌবিহার

গোর্কি রিক্রিয়েশন পার্কের আর একটি দৃশ্য

ছোটদের জন্য বিশ্বের বৃহত্তম 'জঙ্গলে' খেলার স্বর্গ

পার্কের ভিতর থেকে বলশয় থিয়েটার

একসময়ে হয়তো তিনটি বা চারটি কিংবা আরও কম।

খোলাখুলি জানতে চাইলাম, সন্তান-সন্ততি কমের কারণ কী? সকলেই কি ফ্যামিলি প্ল্যানিং করেন? না, অন্য কোনো ব্যাপার? প্রচণ্ড শীতও কি অন্যতম হেতু? শেষের প্রশ্ন সম্পর্কে আরমেনের বক্তব্য—'হয়তো তাই'। তবে অন্য যে বক্তব্যটি রাখলেন সেটি শুনে কিছুটা অবাক হতে হয়। আরমেন নিজের প্রসঙ্গে এলেন। "আমার একটি মেয়ে বয়স সাত। কিন্তু ওর জন্মের পর সমস্যায় পড়তে হয়নি। ওর জন্মের আগে সমস্যায় পড়লাম স্ত্রীকে নিয়ে। স্ত্রী ও আমি থাকি মস্কোর একটি ফ্ল্যাটে। তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই। প্রথমে মেয়ের জন্মের ছ' মাস আগে স্ত্রীর তো কাজকর্ম ডকে। তার উপর হাসপাতালে পাঠাবার আগে যে কত সমস্যা। অফিস কামাই করে আমাকেই দেখাশোনা করতে হত। আমাদের এখানে তো চাকরবাকরের রেওয়াজ নেই। বাধ্য হয়ে সরকারকে জানালাম। আমার মা থাকেন অনেক দূরে জর্জিয়ায়। তাঁর পক্ষে মস্কোয় এসে বেশীদিন থাকাও সম্ভব নয়। সরকারকে বলতেই মস্কোয় আমার শাশুড়ির ফ্ল্যাটের কাছাকাছি একটি ফ্ল্যাট দিলেন আমাকে। শাশুড়িই দুবেলা দেখে যেতেন তাঁর মেয়েকে। আরও সমস্যা মেয়ে হওয়ার পর। শাশুড়ির প্রয়োজনটা আরও বাড়ল। আরও ছ' মাস স্ত্রী কাজে (শিক্ষিকা) যেতে পারলেন না। অর্থাৎ এক বছর কাজ বন্ধ। মেয়ের জন্মের ছ' মাস পরেও নিশ্চিন্তে স্ত্রী স্কুলে যেতে পারতেন না। তবুও আমার না হয় শাশুড়ি আছেন, ওঁদের কাছাকাছি ফ্ল্যাটও পেয়েছিলাম। অন্যদের ক'জন এমন সুযোগ পান? একথা ঠিক—আমার মেয়ে বড় হয়ে নিশ্চয়ই রাষ্ট্রকে সাহায্য করবে। কিন্তু স্ত্রী ৬+৬=১২ মাস রাষ্ট্রের কোনো কাজে লাগলেন না মেয়ের জন্য। নিশ্চিন্তে ছিলাম না আমরা দুজন যতদিন ওর বোঝার বয়স হয়নি। এখন তো প্রতিদিন মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আমি অফিসে আসি। কিন্তু তাও অনেকদিন সম্ভব হয় না। স্ত্রীকে কষ্টে পড়তে হয় কিংবা ওর দিদিমাকে। এই ক'দিন আপনার সঙ্গে থাকায় মেয়ের ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারছি না।"

অপ্রাসঙ্গিক হলেও আরও একটি প্রশ্ন করে বসলাম। আরমেন দ্বিধাহীনচিত্তে জবাব দিলেন, "সমাজতন্ত্রে পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ সোভিয়েট দেশে এর চিহ্ন পাবেন না।" কলকাতায় ও দিল্লিতে কয়েকজন কমিউনিস্ট বন্ধু বলেছিলেন, "রাশিয়ায় পতিতা নেই তবে বান্ধবী পেতে পারেন।" আরমেন ওই শুনে বললেন, "এখানকার প্রতিটি মেয়ে ও পুরুষ ওয়েল বিহেভড, অনেক সময় এর সুযোগ নিয়ে বিদেশীদের কেউ কেউ মেয়েদের নানারকম প্রস্তাব দেন। হোটেলে হয়তো অতিরিক্ত মদ্যপান করে কেউ কেউ মেয়ে কর্মীদের উপর চড়াও হয়েছেন, কিন্তু পরে বুঝেছেন কাজটা ঠিক করেন নি। তা ছাড়া মেয়েরা দেহ-ব্যবসায়ে যাবে কেন? চাকরি তো প্রত্যেকেরই রয়েছে, আরও কম নয়। সরকারীভাবে তো পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধই।"

চুরি, ডাকাতি বা ওই ধরনের কার্যকলাপ সম্পর্কে অন্য কয়েকজনের সঙ্গে আরমেন মোটামুটি একমত। কালেভদ্রে বা বছরে এক-আধটি ঘটনা ঘটে না এমন নয়। তবে তার জন্য কঠোর শাস্তি যেমন আছে, তেমনি খতিয়ে দেখা হয় চুরি, ডাকাতির কারণটা কি? মূলটা খুঁজে তার উৎপাটিত করার দিকে সরকার নজর দেন।

রাজনীতি সম্পর্কে আমার ধারণা খুবই কম, বরং বলব একদম নেই। তবু কয়েকটি সাধারণ প্রশ্ন মনে এল। যেমন : সোভিয়েট ইউনিয়নের নাগরিক মাত্রেই কি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য? আরমেন বললেন, না। জনসংখ্যার দিক থেকে
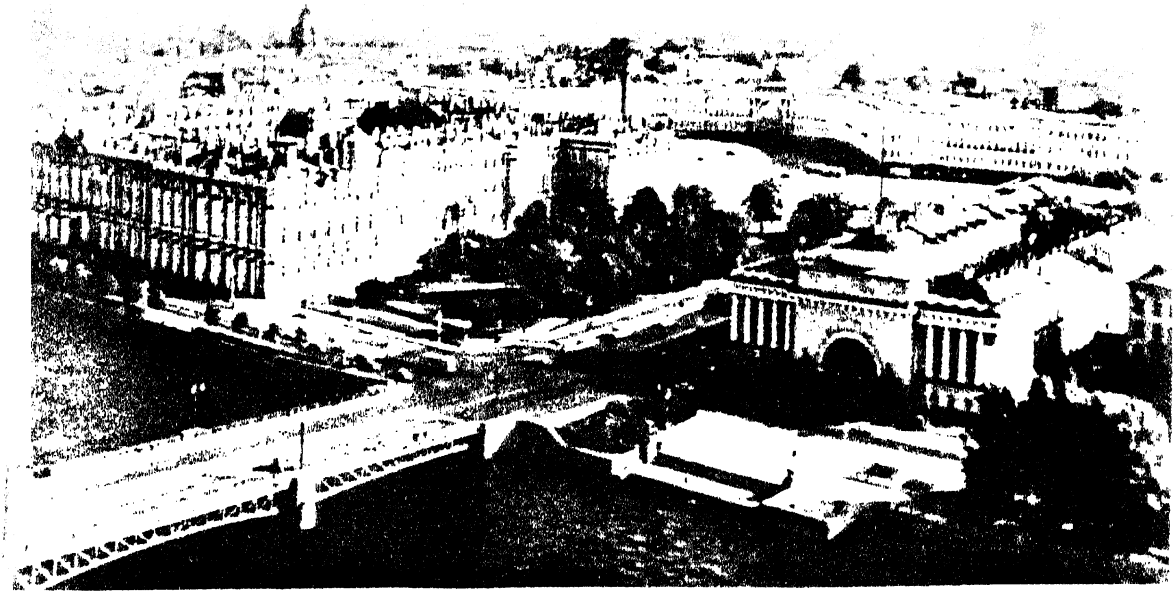
লেনিনগ্রাড : নেভা নদীর তীরে উইন্টার প্যালেস ও প্যালেস স্কোয়ার

ইতালীর চাইতে আমরা অনেক বেশী। কিন্তু ইতালীতে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যসংখ্যা আমাদের দ্বিগুণ। স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ বা অধিকার আছে কি-না জিজ্ঞাসা করায় উনি জানালেন, নিশ্চয়ই এ অধিকার প্রত্যেকেই ভোগ করেন। তবে তার মধ্যেও ডিসিপ্লিন রয়েছে। যথেচ্ছ মন্তব্য করার অধিকার কারুও নেই। পার্টি কর্মী বা নেতাদের মাধ্যমে আমরা সব বক্তব্য পেশ করি। এমন কোনো মন্তব্য বা মত প্রকাশ করা হয় না যাতে মূল্যবোধ নষ্ট হয়, বা যাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। বললেন, আমাদের ফুটবলের কথা তো শুনেছেন—বেশ কিছুদিন ধরে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় তেমন যুঝতে পারছে না দেখে কাগজে তার সমালোচনা হল। পার্টি এবং সরকারের তরফ থেকে অনুসন্ধান হল; তারপর তখনকার ফুটবল কর্তাদের হাত থেকে ক্ষমতা নিয়ে কলোকসভ লেভ ইয়াসিনের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য সব কাজের একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা থাকে। কার্যকাল বা মেয়াদ শেষে দেখা হয় সেই কাজ ঠিক ঠিক হল কিনা—না হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বললেন, সরকারী কাজের সমালোচনা আমরা করি, কিন্তু সেই সমালোচনা কখনও দেশের জনগণের স্বার্থ-বিরোধী হয় না, রাষ্ট্রবিরোধী হয় না। আমরা সব সময় মনে করি ব্যক্তি স্বার্থ অপেক্ষা রাষ্ট্র স্বার্থ অনেক বড়। অন্যদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য এখানেই।

তাস-এর এক রাজনৈতিক সংবাদদাতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আপনারা কি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নন? বলেছিলাম, আপনাদের একদল-তন্ত্রে নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। উনি আমাকে আহত করতে চান নি। জবাবে শুধু বলেছিলেন, যে দেশে যে 'তন্ত্রই' থাকুক—তার ভালমন্দ দুটি দিকই থাকে। তবে সেই 'তন্ত্রের' যথাযথ প্রয়োগ হতে পারে বা প্রয়োগের সবটাই নির্ভর করে সেই দেশের নাগরিকদের উপর। জনসাধারণ যদি যথেষ্ট সচেতন না হন, ভোটপ্রয়োগে কারচুপি হয় তা হলে কোনো 'তন্ত্রই' সফল হতে পারে না।

উঠেছিল। বললাম, কলকাতায় দেওয়ালে দেওয়ালে তাঁর ছবি, তাঁর বাণী রয়েছে। আমাদের ওখানকার কমিউনিস্ট পার্টি ওঁকে খুব শ্রদ্ধা করে। আরমেন বললেন, আমরা তো তাঁকে অশ্রদ্ধা করি না।

এবার অন্য প্রসঙ্গে এলাম—ক্রিকেট আপনাদের সমর্থন পায় না কেন? ইম্পিরিয়ালিস্ট গেম বলেই কি?

—না। আমাদের পুরো দেশটাই খেলা অন্ত প্রাণ। কিন্তু অত সময় দেব কেমন করে! সারাদিন ধরে খেলা—আমরা ভাবতেই পারি না। কাজের সময় নষ্ট করে কোনো খেলাকে আমরা সমর্থন করি না। সারা বছর ধরে আমাদের দেশে খেলাধুলো কিন্তু সাধারণের অফিসটাইমে কোনো খেলাই হয় না। কলকারখানা, অফিসকাছারি, কৃষি খামারের কাজ বন্ধ রেখে খেলাধুলোয় উৎসাহ দেওয়া না। উৎপাদন বন্ধ রেখে খেলাধুলো চলবে এটা কি করে সম্ভব?

ট্রেন দ্রুত চলেছে লেনিনগ্রাডের দিকে। জানালার পর্দা তুলে কাচের ভিতর দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছি। বিদ্যুৎ আলো মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে কোনো স্টেশন বা শহর এলাকা এলে। মাঝে মাঝে গ্রাম ধরনের লোকালয়ও দেখালেন আরমেন। গ্রামাঞ্চলের কৃষিকাজ চলে সবই কালেকটিভ ফার্মের মাধ্যমে। গ্রামাঞ্চলে পুরনো বাড়িও চোখে পড়ল। তবে তার ধারেই এখন গড়ে উঠছে আধুনিক হাউসিং এস্টেট। সরকার গ্রাম বা মফস্বলের অধিবাসীদের জন্যও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছেন। আমাদের দার্জিলিং, সিমলা প্রভৃতি অঞ্চলে যেমন শীতে আগুনের তাওয়া বা ওই ধরনের কিছু আছে ঘর গরম রাখার জন্য। তেমনি এদেশেও কাঠ বা কয়লা জ্বালিয়ে গরম করার ব্যবস্থা রয়েছে আজও। তবে এখন সর্বত্র বিদ্যুৎ-হিটার বসানো হচ্ছে—শহর-গ্রামের ভেদটা তুলে দেওয়া হচ্ছে।

মাঝে মাঝে স্টেশন দেখছি। দেখছি এই শীতে, এই মাঝরাতেও লোকজন ঘুমিয়ে নেই। নানা কাজে ওঁরা ব্যস্ত। বরফ সরানোর কাজ হয়তো প্রধান, কিন্তু মালগাড়ির ওয়াগন থেকে মাল খালাস বা বোঝাইও চলছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে এদের এই [illegible]

বরফের মরুভূমি সাইবেরিয়াতেও এরা চাষ করছে, শিল্প গড়ে তুলেছে। আর আমাদের সোনার বাংলায় একটু বৃষ্টি না হলে চাষ বন্ধ, খাদ্যাভাব। বেশী বৃষ্টি হলে বন্যা—তা নিয়ন্ত্রণ আজও করতে পারি না। ফরক্কা পরিকল্পনার পরেও গঙ্গা শুকিয়ে যায়। পলি পড়ে পড়ে কলকাতা বন্দর প্রায় অচল। এরা চাষ করে হোক, অন্য দেশ থেকে আমদানী করে হোক খাদ্যশস্য শীতের পাঁচ-ছয় মাসের জন্য প্রতি বছর গুদামজাত করে রাখে।

এদের সঙ্গে তুলনা করে নিজেকে বড় ছোট মনে হচ্ছিল। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু হুমকি দিয়েও কর্মীদের ঠিক সময়ে অফিসে আনাতে পারেন না। বেশ কয়েক বছর আগের কথা, তখনকার মন্ত্রী ও এস ইউ সি নেতা সুবোধ ব্যানার্জি একদিন সাংবাদিকদের কাছে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, বেতন কমিশন মাইনে বাড়ালেন বলে কি কাজ বাড়বে ভেবেছেন? বাস : দয়া করে অফিসে আসেন তাই বেতন বাড়ুক কাজ বেশী করার জন্য হয়তো দু-চারটি বেতন কমিশন চাই। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় না, সত্য চক্রবর্তী ঠিক মনে নেই ; সুবোধবাবুর কথার জের টেনে বলেছিলেন—তাতেও কি কাজ করার মানসিকতা আসবে?

ভাবছিলাম কলকাতা কর্পোরেশনের কথা। পার্কগুলোর রেলিং উধাও। ছেলেমেয়েদের খেলার সরঞ্জাম আজ আর সকালে বিকালে চোখে পড়ে না। অন্তত ১০ বছর আগেও সকালে বিকালে খেলার ধুম পড়ে যেত কচিকাচাদের মধ্যে। আজ কিন্তু ওসবের জন্য বাজেট বেড়েছে কর্মী বেড়েছে। কিন্তু সরঞ্জামের পাত্তা নেই। মালী বা ওই ধরনের কর্মীও দেখা যায় না। মনে পড়ে? কয়েক বছর আগেও প্রতিদিন সকালে বিকালে হোস্ পাইপের জলে সারা কলকাতা ধুয়ে ফেলা হত। আজ ওসবের জন্য বরাদ্দ বেড়েছে, কর্মী সংখ্যাও। কিন্তু ১০ বছর আগের তুলনায় আজ কটি রাস্তা স্নান করে সকালে ও বিকালে? বিশ্বব্যাংক না কারা নাকি বলেছেন, গত কয়েক বছরে কলকাতার পিছনে ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে, কিন্তু কোনোরকম ইমপ্রুভ

চোখে পড়ছে না। এর জায়গায় নতুন একটা শব্দ পড়ে নিলে ভাল হত। জানি না কেন এমন লিখছি। শুধু সোভিয়েট নয় জার্মানি, আমেরিকা, জাপান, ইংল্যান্ড দেখেও মনে হবে আমরা দীন শুধু আর্থিক ক্ষেত্রে নয়, মানসিক দিক থেকে দীনতর এবং হীন। মনে হবে গীতা রামায়ণ আমাদের কিছুই শিক্ষা দেয়নি। মনে হবে রামকৃষ্ণ রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, স্বামীজী, নেতাজী, জওহরলালের উত্তরাধিকারী আমরা নই!

রাত প্রায় একটা আরমেনের ঘড়িতে। আমাদের সময় প্রায় সাড়ে তিনটা। শুয়ে শুয়ে কলকাতার অফিসের কথা মনে পড়ল। বিজয়দা, তুষারদা, সোমনাথদা বা অমিয়বাবুরা অনেক আগেই বাড়ি চলে গেছেন। আজ রাতে চিফ সাব কে আছেন—সুকুমারবাবু, না তপেশবাবু, না শিশিরদা? ওঁরাও পেজ ছেড়ে শুয়ে পড়েছেন টেলিপ্রিন্টারের কাছে। আর আমাদের স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টে নাইটে পুষ্পেনবাবু বা কিরণবাবুর নিশ্চয়ই নাক ডাকছে এতক্ষণে। আরমেন লাইট নিভিয়ে তাড়া দিলেন, চোখ বুজুন। সকালে লেনিনগ্রাডে পৌঁছে বিশ্রাম পাবেন না।

লেপ মুড়ি দিতেই ঘুম এল। কিন্তু কলকাতার অভ্যাসটা দূর হয়নি। ছটা না বাজতেই ঘুম ভাঙল। অর্থাৎ প্রায় আড়াই ঘন্টার মধ্যে জেগে গেলাম। বাইরে তখনও অন্ধকার। স্থানীয় সময় অনুযায়ী তো রাত পোহাতে অনেক দেরী। কেবল শুয়েই কাটালাম বাকি সময়টা। আরমেন একটু লেট রাইজার, তবুও ওঁর ঘড়ির ছটার একটু আগে উঠে পড়লেন। আরমেন বললেন, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে, তাড়াতাড়ি জামা-প্যান্ট পরে নিন। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাবো লেনিনগ্রাডে। গাড়ির স্পিডও কমে গেছে। আরমেনের দেখাদেখি লেপের ও বালিশের ওয়াড় খুলে ভাঁজ করলাম, লেপ গুটিয়ে তার উপর বালিশ রাখলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—এগুলো কি ধোপাখানায় যাবে?

—অবশ্যই, ওঁর উত্তর। এখনই প্রতিটি কম্পার্টমেন্টও ডিসইনফেক্ট করা হবে।

ছটা দুই কিংবা তিন মিনিটে গাড়ি থামল লেনিনগ্রাড স্টেশনে। পাশেই থেমেছে মস্কো থেকে আমাদের এক মিনিট আগের ট্রেনটি। যাত্রীরা এখনও নামছেন। আরমেন বললেন, ধীরে সুস্থে নামুন। ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে প্রচণ্ড ভিড়। ভিড় কমা পর্যন্ত কিউয়ে দাঁড়াতে হবে। বাইরে ঠাণ্ডায় আপনি কষ্ট পাবেন। বাক্স-পেঁটরা নিয়ে পা টিপে টিপে হাঁটতে লাগলাম। এখানেও প্লাটফর্মে শক্ত বরফ। প্রতি মুহূর্তে পা হড়কে যাওয়ার আশঙ্কা। এগোচ্ছি, হঠাৎ দেখি ট্রেনের সামনে অ্যাটেনশন হয়ে একদল লোক ছবি তুলছেন। কাছে যেতে বুঝলাম উত্তর কোরিয়ার সেই ডেলিগেটরা। প্লেনে দিল্লি থেকে যাঁদের সঙ্গে এসেছিলাম। মস্কোর কাজ সেরে ওঁরা লেনিনগ্রাডে এলেন।

ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে আমাদের যেতে হল না। এক ভদ্রলোক তার আগেই আরমেনের কাছে এসে ফিস ফিস করে কি সব বললেন। আরমেনও আমাকে রিলে করে দিলেন—ট্যাক্সির জন্য কিউ দিতে হবে না। তবে সামান্য হাঁটতে হবে। গাড়ি রেডি আছে। তা হলে এখানেও কি হাওড়া বা শিয়ালদহের মত বাঁকা পথে ট্যাক্সি পাওয়া যায়? আরমেন হেসে ফেললেন। বললেন, —না ঠিক তা নয়। আর ঘণ্টার মধ্যে ওর ডিউটি শুরু। কিউয়ের ওখানে গেলে ওর দেরী হয়ে যাবে। তার জন্য অনুমতি চাই কম্পিটেন্ট ডিপার্টমেন্টের। উনি সারা রাত ডিউটিতে ছিলেন। অনুমতি মিলবে না। এদিকে একটা ট্রিপ চলে গাড়ির আয় হবে। আয় সরকারের। খালি গাড়ি গেলে তো তা হবে না। তাই ট্যাক্সিটি আউট অফ দ্য ওয়েতে আছে। কাছের সওয়ারী পেলে ওর ওভারটাইমের প্রশ্ন আসবে না সেও হবে। দু মিনিট হাঁটা মানে তো এই শর্মার নাক পড়ে যাওয়া! কিন্তু বিরক্তি বা অক্ষমতা জানানো কাকে! কেনই বা জানাবো! শীতের জন্য কষ্ট নিশ্চয়ই হচ্ছিল। আরও কষ্ট ২০-২৫ কিলো ওজনের সুটকেসের জন্য। তাও ভাল মস্কোয় কিছু খালি হয়েছিল। এদের কাছে এসব ওজন কিছুই নয়। আসলে কুলি, চাকর ইত্যাদি ব্যবহার করে আমরা বাবু হয়ে গেছি।

লেনিনগ্রাড প্রাচীন শহর। সোভিয়েটের প্রথম রাজধানী। বিপ্লবের পর এটাই ছিল সারা দেশের প্রধান কর্মকেন্দ্র। লেনিনগ্রাডের আগের নাম সম্ভবত সকলেরই জানা—সেন্ট পিটার্সবার্গ। তারপর নাম বদলে হয় পেত্রোগ্রাড এবং যেহেতু লেনিনের জীবনের বহুদিন কাটে এখানে তাই তাঁর নামে পরে হল লেনিনগ্রাড। অক্টোবর বিপ্লবের শুরুও এখানে। রুশ ইতিহাস ও সংস্কৃতির গৌরবময় অধ্যায় এই মনুমেন্ট, প্রাসাদ ও নদীনালাময় শহরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। স্কুল কলেজে ইতিহাস বইয়ে পড়া সেই পিটার দ্য গ্রেটের গড়া শহর

লেনিনগ্রাডের সবচেয়ে ব্যস্ত রাস্তা নেভস্কি অ্যাভিনিউ কাজের দিনে

পরিচয় করুন এইদশকের এক নতুন চাঞ্চল্যের সঙ্গে!
সুলজোন
বম্বে ডাইং

বসে আর কতটুকু লক্ষ করা যায়। এখনও লেনিনগ্রাডের ঘুম বোধ হয় পুরোপুরি ভাঙেনি। তাছাড়াও শীতের জন্য ওরা বোধ হয় ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ। তা ছাড়া ছুটির দিন। বেরোনোর তাড়া নেই তেমন। মস্কোর মত এখানেও কাজ আর ব্লক। তবে প্রতিটি বাড়িই দেখার মত। মস্কোয় ফাঁকা ফাঁকা জায়গা রয়েছে নতুন এলাকাগুলোয়। কিন্তু লেনিনগ্রাড পুরনো শহর। সব কিছুই সেকেলে। সবচেয়ে উঁচু বাড়িগুলো ছয় বা সাত তলার বেশী নয়। মস্কোর মত স্কাইস্ক্র্যাপার নেই। এখানকার বাড়িগুলিকে কিসের সঙ্গে তুলনা করব? অনেকটা রাইটার্স বিল্ডিং, কলকাতার জি পি-ও বা মুর্শিদাবাদের নবাববাড়ির কাছাকাছি। কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরির পুরনো বাড়ি বা গ্রাণ্ড হোটেলের সঙ্গেও কিছুটা তুলনা করা যেতে পারে।

ট্যাক্সি দ্রুত এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। আরমেন জানালেন, ওর কন্ট্রোল জিজ্ঞাসা করছে এখন গাড়িটি কোথায়, ডিউটি টাইম প্রায় শেষ হয়েছে। তিনি কি আর কাজ করবেন? না—গাড়ি গারাজ করবেন। ড্রাইভারের উত্তর: মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আমার ট্রিপ শেষ হবে। এখন আমি এ পি এন এর করেসপণ্ডেণ্ট ও একজন ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্টকে নিয়ে হোটেল ইউরোপায় যাচ্ছি।

রেল স্টেশন থেকে পনের মিনিটের পথে শহরের লেনিনগ্রাডের বুক চিরে বেরিয়েছে। কিন্তু নদীতে জল নেই। সব জল জমে বরফ। নদীর তীরে প্রাসাদের পর প্রাসাদ অতিক্রম করে অসংখ্য পার্ক, মনুমেন্ট ডাইনে বাঁয়ে রেখে আমরা থামলাম হোটেল ইউরোপার সামনে। সারিবদ্ধভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে ইনটুরিস্টের বড় বড় বাস ও কিছু ট্যাক্সি। এখানেও মস্কোর মত, পিকিং হোটেলের মত নিয়ম। ফর্ম পুরণ পাসপোর্ট জমা দেওয়া ইত্যাদি অবশ্য হোটেলের প্রবেশ মুখেই রয়েছে। বাঁ দিকে ইনটুরিস্টের অফিস। হোটেলের রুমে যাওয়ার আগে খোঁজ নিলাম সকালে কোথাও বেড়াতে যাওয়া যায় কিনা। মস্কোর মত লেনিনগ্রাডেও এসবের দায়িত্ব মেয়েদের। ইনটুরিস্ট পাসপোর্ট রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি সবই মেয়েরা করছেন। মানি এক্সচেঞ্জ খবরের কাগজের কিয়স্ক, সুভেনিরের দোকান হোটেলের ভিতরকার—সবই মেয়ে পরিচালিত। ইনটুরিস্টের ওরা কৌতূহলের সঙ্গে আরমেনের কাছে আমার পরিচয় জেনে নিলেন। এখানে একটু সুবিধা হল—এঁরা প্রত্যেকেই কাজ চালাবার মত, বোঝার মত ইংরাজী জানেন। প্রথম পরিচয়েই সুভেনির হিসাবে কিছু ব্যাজ পেয়ে গেলাম। কেন জানি না, একটা ধারণা ছিল রুশ বা সোভিয়েট মেয়েরা মোটা সোটা বা গাব্দা গোব্দা চেহারার হন। হোটেল ইউরোপার ইনট্যুরিস্ট অফিসে এসে ধারণাটা ভুল প্রমাণিত হল। ওদের হেড বা চিফ ছাড়া বাকি সকলেই দোহারা চেহারার এবং বেশ সুন্দরী। ট্যুরিজম-এর জন্য বোধ হয় সুন্দরী চাই। সুন্দর মুখের জয় তো সর্বত্র। এদেশে এসে এই কদিনে একটা জিনিস লক্ষ করছিলাম—তা হল ট্যুরিজম ব্যবসা। সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ আর 'লৌহ যবনিকা' নয়। তাহলে পর্যটনকে এঁরা এমনভাবে উৎসাহিত করতেন না। প্রতিবছর এখন লক্ষ লক্ষ ভ্রমণ-বিলাসী আসছেন সারা দুনিয়া থেকে। সামান্য অভিজ্ঞতা বলছে—এই পর্যটন ব্যবসায়ে এদেশে বোধ হয় লেনিনগ্রাড শহর সবার উপরে।

এখানে এসে ডি এল রায়ের কয়েকটি কথাও প্রয়োগ করা যায়। 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরী' আর যেন 'স্মৃতি দিয়ে ঘেরা'। কে জানে কত কবির কবিতায় ও গানে লেনিনগ্রাড উচ্চারিত। কে জানে কত শিল্পীর তুলিতে এই সেন্ট পিটার্সবার্গ মহনীয়।

এই সকালে ইনট্যুরিস্টের দুটি প্রোগ্রাম আছে। একটি চার ঘণ্টার, আর একটি আড়াই ঘণ্টার। প্রথমটিতে দূরের ঐতিহাসিক জায়গাগুলো দেখা যাবে, দ্বিতীয়টিতে নাম লেখালে শুধু শহরের ভিতরের দ্রষ্টব্য স্থানে যাওয়া যাবে। আরমেন বললেন, যে কোনো একটি বেছে নিন। দুটির ভালো মন্দ সহ ব্যাখ্যা করলেন। এর মধ্যে আমাদের স্পোর্টস প্রোগ্রাম রয়েছে। লেনিনগ্রাডের পথঘাট, দোকান দেখার ইচ্ছা। কলকাতায় ডেসপ্যাচ পাঠানো, ডায়েরি লেখা, চিঠি লেখা কত কি! শহর দেখার প্রোগ্রামে 'ইয়েস' জানিয়ে উপরে উঠলাম বাক্স পেঁটরা
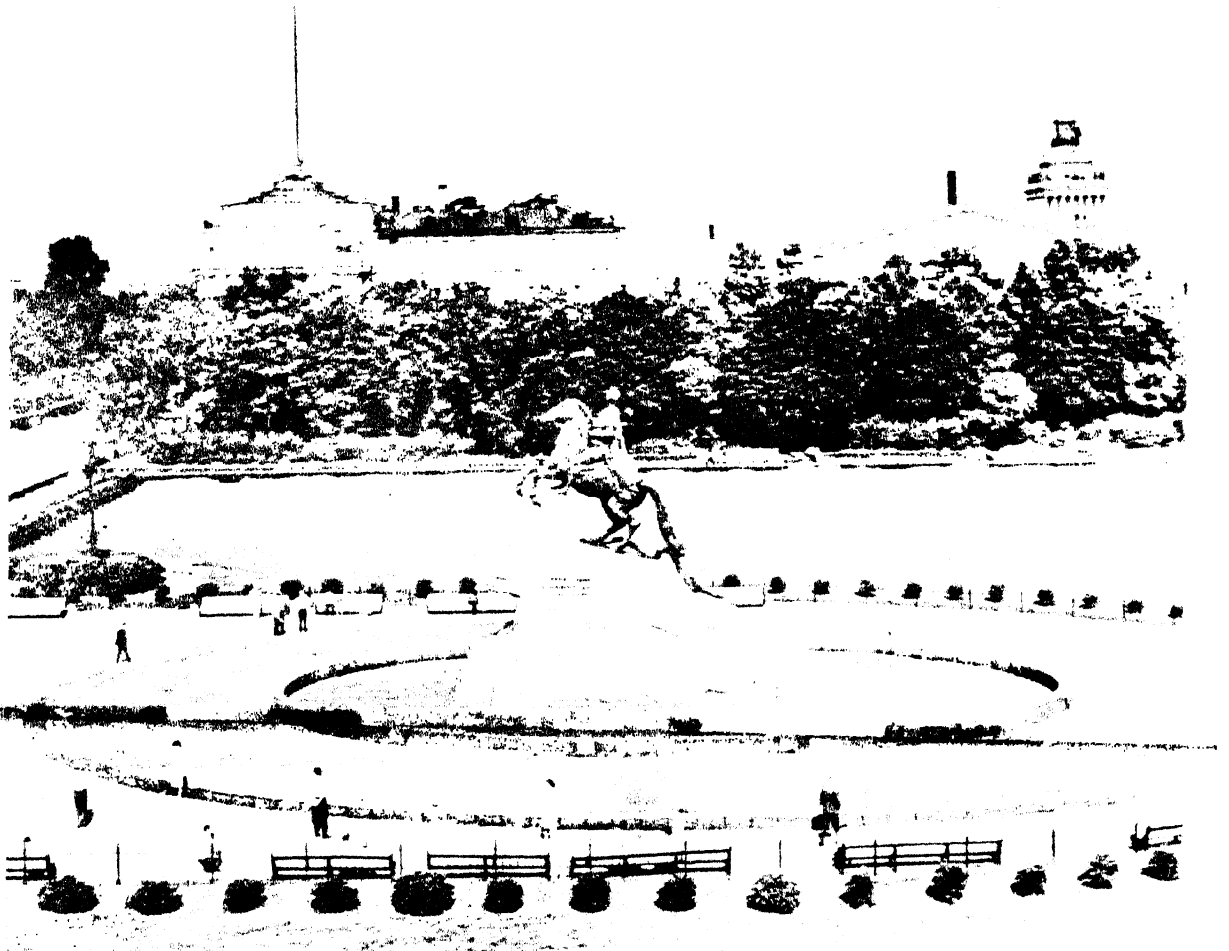
১৭০৩ সালে সম্রাট পিটার দ্য গ্রেট-এর নির্দেশে শহরের পত্তন হয় এবং নাম দিন সেন্ট পিটার্সবার্গ। [illegible]
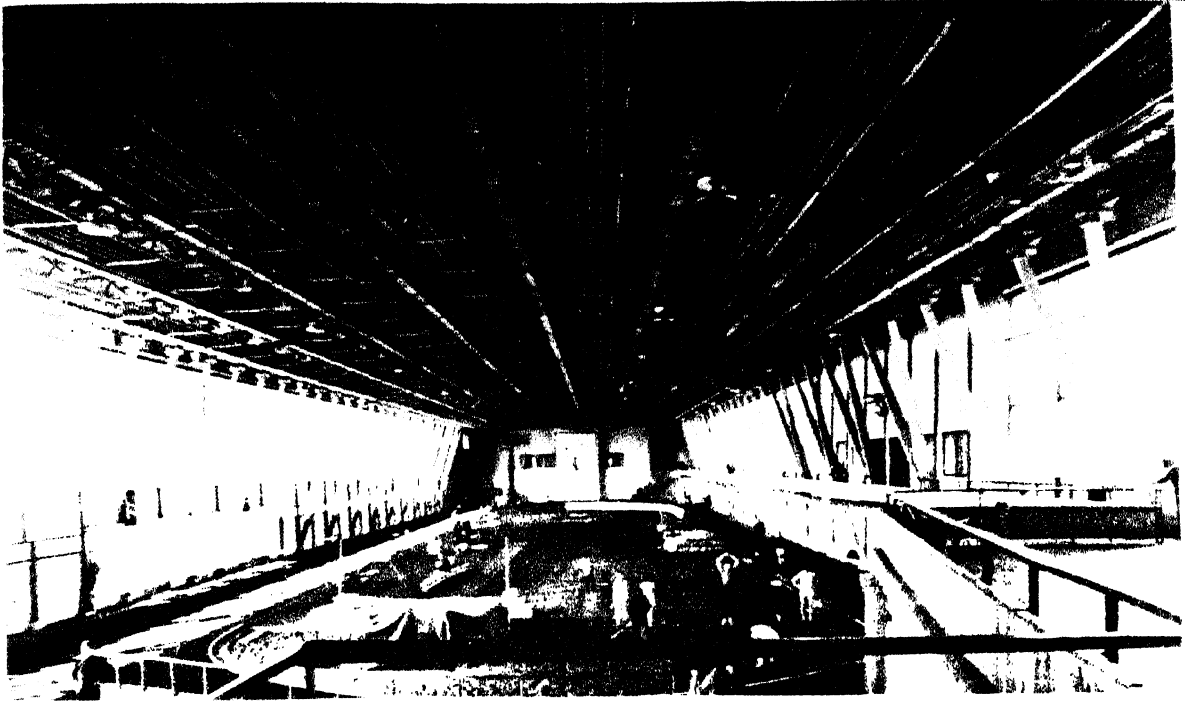
**সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ খেলাধুলো। এটি লেনিনগ্রাডে অ্যাথলেটিকসের সব ইভেন্টের ইন্ডোর ট্রেনিং সেন্টার। হলের ভিতরে ৪০০ মিটার দৌড়ের টার্টান ট্র্যাকও রয়েছে**

নিয়ে। '২০ মিনিটের মধ্যে নেমে আসবেন। বাস রেডি থাকবে।' বলা হল

মস্কোয় একলা ভাল লাগেনি। ভেবেছিলাম, এখানে আরমেন আমার রুম মেট হবেন। কিন্তু তা হল না। দুজনের আলাদা আলাদা ঘর। তাও আবার কাছাকাছি নয়। শুধু তাই নয়, ছতলার এই হোটেল ইউরোপায় তখন একটি রুমই খালি ছিল। সেটি আমাকে দেওয়া হল। আরমেন আপাতত ছতলায় আমার ৩১০ নম্বর ঘরে ওঁর ব্যাগটি রাখলেন। তারপর দুজনে হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়লাম। হোটেল ইউরোপার বয়স কম নয়। ১৯৭২-এ সে শতবর্ষ পূর্তি উৎসব করেছে। কত ঘটনার সাক্ষী সে। রুশ বিপ্লবও দেখেছে, দেখেছে এর আগের শাসকদেরও। হোটেলের এই বাড়িও ১৯৭৯ তে ১০৭ বছর পূর্ণ করেছে। পুরনো আমলের বাড়ি হলেও এর কোথায় ক'টি লিফট, কোথায় ক'টি সিঁড়ি—নতুনদের পক্ষে খুঁজে পাওয়া রীতিমত সমস্যার। আরমেন বহুবার এখানে এলেও সমস্যায় পড়ছিলেন। পিকিং হোটেলের মত এখানেও পুরনো আমলের আলোর সাজ রয়েছে। আধুনিক হোটেলগুলির মত আধুনিকতম বন্দোবস্ত থাকলেও সাজসজ্জা কিন্তু প্রাচীন ইউরোপের ভাবধারায়। এখানেও ভি আই পিদের জন্য সংরক্ষিত স্যুটে স্থান হল এই প্রতিবেদকের। একই নিয়ম—বাইরে যাওয়ার সময় যেমন, তেমনি বাইরের থেকে এসে সকলের আগে ফ্লোর ক্লার্কের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

আরমেনের তাড়ায় নেমে গেলাম নীচে। সময় আছে দেখে ব্রেকফাস্টের জন্য গেলাম ইনট্যুরিস্টের কাছাকাছি রেস্তোরাঁয়। এই হোটেলে একাধিক রেস্তোরাঁ রয়েছে। আরমেন বললেন, লেট আস ট্রাই আনোদার সিস্টেম। এই রেস্তোরাঁয় খাওয়া আমার পক্ষে লোকসানের। যারা ভোজনবিলাসী তাদের খুব উপযোগী। পেটচুক্তির ব্যাপার। যতখুশি খান, দাম বেশী দিতে হয় না। ব্রেকফাস্ট ১ রুবল ২০ কোপেক। কত আইটেম, হিসাব করাই মুশকিল। কলকাতায় আমাদের অফিসের ক্যানটিনে গিয়ে সহকর্মী শরদিন্দু মাঝে মাঝে বদ্যিনাথবাবুকে বিপদে ফেলে। আহা শরদিন্দু যদি এখানে আসতে পারত! ফ্রি দুই ধরনের রুটি তো আছে, রয়েছে ফ্রি সুইট ওয়াটার সর্বত্র। আর এই পেটচুক্তির খাওয়ায় সসেজ, স্যালাড, ভেজিটেবল তিন চার রকমের, চিকেন, পোর্ক, চিংড়ি, চাঁদা ও চেলা মাছ ধরনের দুরকম মাছ, কেক প্যাস্ট্রি হাফ ডজন। গুণে দেখি মোট ২১টি আইটেম। এছাড়া আপেল বা আনারসের জুস এবং চা বা কফি। কুপন কিনে প্লেট নিয়ে নিজের পছন্দমত খাবার তুলুন। লজ্জার কিছু নেই। সবাই নিচ্ছেন। দোষটা কি শুধু শরদিন্দুর?

খাওয়ার মাঝে আরমেন ইনট্যুরিস্টে গিয়ে খবর নিলেন। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বাস ছাড়বে।

**মস্কো শহরে অন্যতম দর্শনীয় কবি মায়াকোভস্কির মূর্তি**

আসল ব্যাপারটা একটু অন্য ধরনের। কলকাতায় মিনিবাসগুলো ভর্তির আগে পর্যন্ত যেমন স্টার্ট নিয়ে থাকে, প্রতি মুহূর্তে 'ছাড়ছি' ভাবটা দেখায় তেমনি অনেকটা। প্যাসেঞ্জার ফুল হলেই এদের ট্যুরিস্ট বাসটি ছাড়ে। আমরা বাসে গিয়ে বসতেও দুটি সিট খালি ছিল। এলেন দুজন। দম্পতী। বেশ বয়স্ক। এই হোটেলেই উঠেছেন। এসেছেন রোম থেকে।

কলকাতায় যেমন টেস্টের সময় ক্রিকেটারদের নিতে ডিলাক্স বাস দেখি এই ট্যুরিস্ট বাসও অনেকটা তেমনি; তবে লম্বায় একটু বেশী। প্রচন্ড ঠান্ডা প্রত্যেকটি জানালা বন্ধ। মোটা প্লাসে ঢাকা। খুললেই হুহু করে ঠান্ডা হাওয়া ঢুকবে। ড্রাইভারের পিছনে ঘোষিকা। সামনের দরজার ধারে ডানদিকে প্রথম সিটে আরমেন ও আমি পাশাপাশি। ঘোষিকা উঠে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ওভারকোট খুলে রাখলেন। খুললেন ফার-এর টুপি এবং প্লাভসও। ইনিও দোহারা চেহারার। ফর্সা তো হবেনই। কিন্তু এমন সোনালী চুল এই প্রথম চোখে পড়ল। মেয়েদের বা পুরুষদের চুল আর দেখছিই বা কোথায়। সকলেরই মাথায় টুপি তো। একটা বিষয়ে এদের তারিফ করতেই হয়। এরা পোশাক পরে আব্রু রক্ষার জন্য। এমন পোশাক পরে না যার মাধ্যমে সেক্সকে প্রকাশ করা যায়। অথচ মেয়েদের কোনো পোশাকই কিন্তু সেকেলে নয়। ঘোষিকা বা গাইড নিজের নাম বললেন। লক্ষ করছিলাম ওঁর হাত, মুখ, অলংকার ইত্যাদি। দুহাতেরই নখগুলো লম্বা লম্বা, গাঢ় লাল নেলপালিশ লাগিয়েছেন। ওর সঙ্গে ম্যাচিং লিপস্টিক। মিষ্টি কণ্ঠস্বর। চমৎকার ইংরাজি বলেন। বলছিলেন রুশী, ফ্রেন্চ ও লাতিন। বাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জানালেন :

**The rare beauty of this northern city, stretching along the banks of the Neva River under the inclement Baltic skies, has been sung by poets and perpetuated by painters; it is famous for its "white nights", arrow-straight avenues, shady parks, innumerable bridges and canals.**

(ক্রমশ)

॥ একত্রিশ ॥

প্রীতম জিজ্ঞেস করে, তুই কোত্থেকে শিখলি এ সব?

শতম লজ্জা পায়, শিখেছি, শিখেছি। দেখ না তোমাকে ভাল করে তুলবই।

তোর মনের জোর আছে। আমার নেই।

জোর-টোর নয়, আসলে তোমার ইচ্ছে নেই। তুমি কি বিশ্বাস করো না, যার মনে যত প্যাঁচ-ঘোঁচ, যত কুটিলতা জটিলতা তার তত ব্যায়রাম? খামোখা কারো ব্যায়রাম হয় না। রোগের প্রথম অঙ্কুর গজায় মনে। তারপর তা শরীরে ফুটে বেরোয়।

ম্লান হেসে প্রীতম বলে, আমার মনে বোধ হয় অনেক প্যাঁচ-ঘোঁচ, অনেক জটিলতা কুটিলতা!

মাথা নেড়ে শতম বলে, তা নয়। তবে তোমার একটা রোগ রোগ বাতিক ছিল দাদা। শরীর নিয়ে তুমি বড় বেশী ভেবেছো।

তা ভেবেছি।

তোমরা কখনো ভাবতে ইচ্ছে করোনি যে, এই শরীর মানুষকে দেওয়া হয়েছে কাজ করার জন্য! বসিয়ে রাখার জন্য নয়! যত শরীর শরীর করবে তত আজ চুলকুনি কাল পাঁচড়া, পরশু আর একটা না একটা কিছু এসে ধরবেই।

শরীরকে ভুলে যেতে বলছিস?

একদম। গতর পুষে রাখার জন্য তো নয়। মনের ওপর শরীরের সব ভালমন্দ। মনটাকে তাজা রাখো, শরীর উজ্জ্বল হবে। আর বসে বসে মরণের চিন্তা করো, শরীরে তার ছায়া পড়ে যাবে। শরীরকে কখনো বিশ্রাম দিও না। খাটাও, কেবল খাটিয়ে যাও।

প্রীতম হেসে বলে, বিশ্রাম নেবো না?

নেবে। কেন নেবে না? তবে শরীরের বিশ্রাম কেমন জানো?

কেমন?

তুমি তো অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট! রোজ হিসেবনিকেশ করতে করতে যখন ক্লান্তি আসে তখন যদি হঠাৎ একটু টেবিল টেনিস খেল বা কবিতা লেখো, কি একটু বাগান করলে, সেইটেই বিশ্রাম। রোজকার অভ্যস্ত কাজ ছেড়ে অন্য কাজ করলে শরীর বিশ্রাম পায়।

ঘুমোবো না?

ঘুমোবে। দিনে রাতে চার ঘন্টা।

বলিস কি? ডাক্তাররা যে আট ঘন্টার কথা বলে।

বলে তো কি? শরীরের জন্য চার ঘন্টা ঘুমই যথেষ্ট। দেখ না কুলি-লাইনের পশ্চিমারা সারা দিন মাল বয়, অসুরের মতো খাটে, আবার কত রাত অবধি জেগে 'রামা হো' গান গায়! আবার ভোর-রাতে কাজে বেরিয়ে পড়ে। ক'ঘন্টা ঘুমোয় বলো তো! তারা বেঁচে নেই? তোমার আমার চেয়ে ঢের ভালভাবে বেঁচে আছে। ঐ যে চার ঘন্টা ঘুমোয় সে-ঘুম গভীর, নিপাট, গায়ের ওপর দিয়ে মোষ হেঁটে গেলেও টের পাবে না তা জানো?

জানছি।

ভুল বললাম?

প্রীতম মাথা নেড়ে বলে, না। তবে এত সব ভাল করে কখনো লক্ষ করিনি।

এখন থেকে করো। শরীর নিয়ে ভেবো না।

রোজ সকালেই এ রকম কিছু উজ্জীবক কথাবার্তা বলে শতম তার মোটরসাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যায়। দুধের গ্লাস হাতে আসে মা। শরীর নিয়ে কখনো কিছু বলে না। কথাবার্তা অনেকটা কমে গেছে। দুধের মধ্যে অনেকটা সর তুলে নিয়ে আসে। পাশে বসে চামচ দিয়ে ঘুঁটে ঘুঁটে সরটাকে দুধের মধ্যে মেশাতে থাকে। এতে নাকি বেশী পোষ্টাই।

কিন্তু এ সবই অনভ্যস্ত অস্বাভাবিক লাগে প্রীতমের কাছে। বিলুর সঙ্গে থেকে থেকে ঐ এক রকম অভ্যাস তৈরী হয়ে গেছে। বিলু কোনোদিন তার দিকে বিশেষ নজর দেয়নি, মনোযোগী হয়নি। তবে মনকে সরিয়ে রেখে হৃদয়হীন কর্তব্য করে গেছে। আর তাইতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে প্রীতম। এখন তার প্রতি কেউ বেশী মনোযোগ দিলে, তাকে কেউ বেশী ভালবাসলে ভারী অস্বস্তি বোধ করে সে। মাঝে মাঝে বাড়ির লোকের অতি আদরের অত্যাচারে সে বিরক্ত হয়। রেগেও যায়। মা বরাবরই তাকে খুব ভাল বোঝে। তার মুখ দেখেই মনের ভাব এঁচে নিতে পারে। তাই প্রীতমের জন্য আহা উহু সব চেয়ে কম করেছে মা।

সর ঘুঁটে দুধটা খাইয়ে নীরবে মা একটা তেল-পড়ার বোতল নিয়ে এসে হাতে পায়ে মালিশ করে দেয়। প্রথম প্রথম বিচ্ছিরি লাগত, মাখতে চাইত না প্রীতম। আজকাল হাল ছেড়ে দিয়েছে। তার অসুখের প্রথম দিকে অফিসের এক কলিগ গৌরাঙ্গ বোস হাবড়ার এক ফকিরের কাছ থেকে বার দুই মন্ত্রপূত তেল এনে দিয়েছিলেন মালিশের জন্য। সে তেল আবার আগাগোড়া হাতে করে বয়ে আনতে হত, কোথাও রাখার নিয়ম ছিল না। গৌরাঙ্গবাবু ভীড়ের ট্রেনে ঘেমে চুপসে কষ্ট করে সে তেল আনতেন। বিলুকে পই পই করে বুঝিয়ে দিতেন, কি করে মালিশ করতে হবে। বিলু সে তেল রেখে দিত। কখনো মালিশ করেনি। একদিন প্রীতম বলেছিল, গৌরাঙ্গবাবু কষ্ট করে তেলটা আনলেন, ফেলে রাখবে?

ও সব বুজরুকি দিয়ে কী হবে? তেলপড়ায় অসুখ সারলে এত লোক ডাক্তারদের কাছে যেত না।

খুবই যুক্তিপূর্ণ জবাব। অবশ্য প্রীতম নিজেও তেলপড়ার গুণে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু তার মন বলত, আমি যদি তোমার প্রিয়জনই হয়ে থাকি তবে আমার এই কঠিন অসুখের সময় তুমি লজিক মেনে চলতে পারো কি করে? মানুষ যাকে ভালবাসে তার একটু কিছু হলেই সে পাগল হন্যে হয়ে যায়। তখন যুক্তি থাকে না, বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন থাকে না, সে তখন ডাক্তার বদ্যি, তাবিজ তাগা মাদুলি জলপড়া মাথাখোঁড়া ধর্ণা দেওয়া সব করে করে বেড়ায়। তাতে কাজ না হোক উদ্বেগ আর ভালবাসার একটা জমজমাট প্রকাশ তো ঘটে। বিলুর ঠান্ডা মুখশ্রী আর ক্ষুরধার যুক্তির সামনে কচুকাটা হয়ে গেল প্রীতম। কিন্তু বিলু জানে না, সংসারে সব লড়াই জিততে নেই।

তেলের প্রথম শিশিটা কৌতূহলভরে নাড়া-চাড়া করতে গিয়ে ভেঙে ফেলেছিল লাবু। গৌরাঙ্গবাবু খবর পেয়ে আবার তেল এনে ছিলেন। দ্বিতীয় শিশিটা আবার তাকে তোলা রইল। মাস দুই পরে একদিন শিশিটা নজরে পড়ায় গৌরাঙ্গবাবু প্রীতমকে একান্তে বললেন, আজকালকার ওয়াইফরা কেমন বলুন তো মশাই? এদের কাছে স্বামী কি কোনো ফ্যাক্টরই নয়? আমি বলে গেলাম আপনাকে, যদি বাঁচতে চান তা হলে নিজের মায়ের কাছে চলে যান।

এখন মা পায়ের গোছ থেকে উরু পর্যন্ত টান টান করে ভারী এবং দুর্গন্ধযুক্ত তেলটা মালিশ করে দিচ্ছে। মুখে কথা নেই। মা জানে, প্রীতমের মেজাজ এখানে এসে ভাল থাকছে না। এখানে মন বসতে সময় নেবে। এ জীবনে তো তার বহুকাল অভ্যাস নেই।

নিষ্ঠুর হোক, শীতল হোক তবু বিলুর প্রতি এক চোখভরা তীব্র আকর্ষণ আজও আছে প্রীতমের। শুধু আছে নয়, এখানে আসার পর তা আরো তীব্র হয়েছে। সব দাবি-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে এসেছিল, তবু মন থেকে বিসর্জন দেওয়া গেল না। তেমনি বুকে ঢেউ দেয় লাবুর কথা মনে হলে। সারাদিন ভবানীপুরের সেই ঘরটার ছবি চোখে ভাসে। নাকে আসে লাবুর গায়ের গন্ধ। বিলুর স্পর্শ টের পায় যেন শরীরে।

প্রীতম ডাকল, মা।

উঁ!

শতমকে বলো, আবার আমায় কলকাতায় দিয়ে আসুক।

ভাল হ, যাবি।

আমার এখানে খুব ভাল লাগছে। কিন্তু কলকাতায় থাকলে ঘরে বসেও আমি কিছু কাজ-টাজ পাই, রোজগার করতে পারি।

মা কথাটার কোনো জবাব দিল না, কিন্তু আপন মনে বলতে লাগল, বউ-মেয়ের জন্য মন তো কেমন করবেই। কিন্তু সেখানকার যা অবস্থা শুনি —কে কাকে দেখে।

প্রীতমের এ সব কথাও ভাল লাগে না। চোখ ফিরিয়ে সে জানালার বাইরে কলকে ফুলের গাছটার দিকে চেয়ে থাকে। ঘন সবুজ পাতায় ঝোপ ফেলেছে জানালাটাকে। তার ওপাশে শরতের নীল আকাশ জুড়ে অফুরন্ত রোদ।

প্রীতম চুপ করে থাকে। তেল মালিশ করা শেষ হলে মা আবার নিঃশব্দেই চলে যায়।

বাড়ির লোক এ-ঘরে কমই আসে। প্রীতমের বিরক্তি ও বদমেজাজ সবাই লক্ষ করেছে। এমনিতেও প্রীতমকে সবাই বরাবর একটু সমঝে চলে। বাবা একদমই ঘরে ঢোকে না। মেজো বোনটার সঙ্গে ভাব ছিল খুব এক সময়ে। সে মাঝে মাঝে আসে, গল্প করে বসে বসে। কিন্তু অল্পেই ক্লান্তি আসে প্রীতমের। তার কেবল ভবানীপুরের বাসার কথা ভাবতে ইচ্ছে করে, চুপচাপ শুয়ে থেকে।

বিলুকে একটা পৌঁছে সংবাদ দিয়েছিল প্রীতম। তারপর বিলুর তিন-চারখানা চিঠি এসেছে। প্রীতম জবাব দেয়নি। মেজো বোন ছবি এসে বহুবার বলেছে, বউদিকে চিঠি দেবে, দাদা? দিলে বলো, লিখে নিচ্ছি।

প্রীতম মাথা নেড়ে বলেছে, তোরাই দে। আমার ইচ্ছে করছে না।

নিজে চিঠি না লিখলেও বিলুর চিঠির জন্য উৎকণ্ঠা থাকে সব সময়ে। আজকাল বিলু বাবাকে বা শতমকে বা ছবিকেই চিঠি দেয়। বেশ ঘনঘন দেয়। প্রীতমের সব খবর খুঁটিয়ে জানতে চায়। ওরা কী জবাব দেয় তা জানে না প্রীতম! জিজ্ঞেস করে না। কিন্তু বিলুর চিঠি যখন আসে তখন বুকটা কেঁপে ওঠে উত্তেজনায়, আবেগে।

বিলুর প্রতি নিজের এই অন্ধ ভালবাসা দেখে অবাক মানে প্রীতম। ঐ ঠান্ডা, নিরুত্তাপ যুক্তিবাদী নিষ্ঠুর মহিলাকে এতকাল ধরে কি করে ভালবাসছে সে?

নিজেকেই প্রশ্ন করে প্রীতম, ও যে অরুণের সঙ্গে....তোমার ঘেন্না করে না, প্রীতম?

নিজেই জবাব দেয়, করে তো! শিউরে উঠি, কেঁপে উঠি ঘেন্নায় লজ্জায়। তবু অন্ধ অবাধ্য এক মমতা কেন যে মনের মধ্যে টলটল করে।

নিজেকে বিষিয়ে ফেল, প্রীতম। অব্যাহত রাখো ঘৃণাকে। কখনো ক্ষমা কোরো না, নরম হয়ো নাকো।
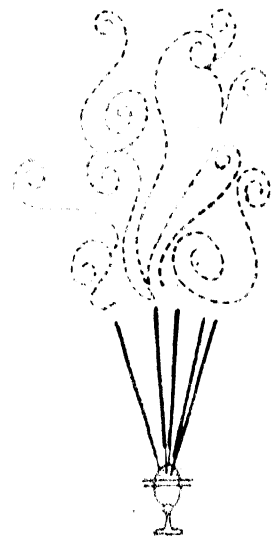
বিষিয়ে গেছি। জ্বলছি। টানটান রাখছি নিজেকে। তবু স্পঞ্জের মধ্যে যেমন লুকোনো নিংড়োলেই বেরিয়ে আসে, এই ভালবাসাও তেমনি।

অবিশ্বাসী স্ত্রীকে ভালবাসা কি ঠিক, প্রীতম?

শোনো শোনো। আমার লাবু যদি শত অন্যায়ও করে তবু কি আমি তাকে না ভালবেসে পারি? বলো! যাই করুক তবু মনে হবে, ও যে আমার লাবু! আমার ছোট্ট লাবু! বিলুর প্রতি আমার ভালবাসাও অবিকল সেরকম। যাই করুক, যেমনই হোক, ও যে বিলু।

তোমার বিলু?

হতাশায় মাথা নেড়ে প্রীতম বলে, তা বলছি না। বিলু কার তা কি করে বলব? কিন্তু মন! মনকে কি করে মেরে ফেলা যায় বলো তো! বিলুকে আমি এক ফোঁটাও ক্ষমা করিনি, জানো? তবু বিলুকে মন থেকে তাড়াবোই বা কি করে, যায় না যে!

কিন্তু বড় জঘন্য যে তার পাপ!

মানুষ কখনো পাপ থেকে মুক্তি পায় না, না? কিছুতেই শুদ্ধ হয় না? মুক্ত হয় না?

উত্তেজিত প্রীতম কাত হয়ে দু হাতে ভর দিয়ে উঠে বসে বিছানায়। সারা গায়ে ঘন তেলের প্রলেপ। পায়জামাটা তেলে ভিজে সপসপ করছে। গায়ের বুকখোলা শার্টটা নিংড়োলে বোধ হয় এক-পো তেল বেরোবে।

রাগের গলায় প্রীতম ডাকে, মা! মা!

ছবি দৌড়ে আসে। পরনে ইস্কুলের খয়েরি পাড় শাড়ি, চুল আঁচড়ানো, মুখে পাউডার। বলল, কি দাদা?

দেখ তো, কি বিচ্ছিরি তেল মাখিয়ে গেছে। গা'টা মুছিয়ে দেওয়ার কেউ নেই।

আমি দিচ্ছি, দাঁড়াও।

মা গেছে কালীবাড়ি।

থাক গে, তুই ইস্কুলে যা।

কিছু হবে না, মুছে দিচ্ছি দাঁড়াও। বলে দৌড়ে গিয়ে একটা গামছা আনে ছবি।

লজ্জা পেয়ে প্রীতম হাত বাড়িয়ে গামছাটা নিয়ে বলে, তুই যা, আমি পারব।

ছবি দ্বিধাভরে দাঁড়িয়ে থাকে একটু। আর চাপাচাপি করতে সাহস পায় না। দাদা হয় তো রেগে যাবে। বড্ড রেগে যায়।

আসছি তা হলে, দাদা! বলে ছবি চলে যায়।

গামছাটা পায়ের কাছে মেঝেয় ফেলে দিয়ে চুপ করে বসে থাকে প্রীতম। বুকের মধ্যে এক অক্ষম রাগের মাথা খোঁড়াখুঁড়ি। অভিমানের বান ভাসিয়ে নিচ্ছে তাকে।

গাড়োয়ান যেমনভাবে তার দুষ্টু অবাধ্য গরুকে সামলায়, চাবুক মারে, পাঁচনের গুঁতো দেয়, ঠিক তেমনিভাবে নিজেকে লক্ষ করে প্রীতম বলে, র র'! শান্ত হও। শান্ত হও। তুমি কখনো এ রকম ছিলে না। তুমি এ রকম নও। মনে করো, পৃথিবীতে তোমার কেউ নেই। ইউ আর এ লোন বাস্টার্ড।

কিন্তু এই মনের খেলা বেশীক্ষণ খেলতে পারে না প্রীতম। বড় ক্লান্তি আসে, হতাশা ধৈর্য-হীনতা আসে।

দুপুরে শতম খেতে আসে। একবার উঁকি মারে ঘরে।

দাদা।

আয়।

ঘুমোওনি?

না।

বড় বেশী রেস্টলেস দেখছি তোমাকে।

না, না ভাল আছি।

ভালই তো আছো। তবে কেন মাকে বলেছো, কলকাতা যাবে!

ভাবছিলাম, চেষ্টা করলে হয় তো এখনো অডিটের কাজ করতে পারি ঘরে বসে। সময়ও কাটবে, কিছু টাকাও আসবে।

করবে? তা তার জন্য কলকাতা কেন, এখানেই কাজ দেবো।

দিবি? দে না!

শতম দুপুরেই একগাদা কাগজপত্র সমেত গোটা তিনেক ফাইল প্রীতমের চৌকির পাশে একটা টেবিল এনে রেখে গেল। সঙ্গে রেখে গেল একটা টেপ-রেকর্ডার আর অনেকগুলো গানের ক্যাসেট। বলল, হিসেব করতে করতে টায়ার্ড লাগলে একটু গান শুনো। তুমি তো একটু আধটু গাইতেও পারতে। গাও না কেন?

দূর, বরং হিসেব করলেই ভাল থাকবো।

যা খুশি করো। শুধু মরার কথা ভেবো না।

প্রীতম অনাবিল হেসে বলে, আচ্ছা তুই যা তো।

শিলিগুড়িতে বেশ শীত পড়ে গেছে এই শরতের শুরুতেই। দুপুরেও গায়ে একটা কিছু দিতে হয়। পায়ের জানালাটা দিয়ে রোদ আসে।

প্রীতম নির্জন দুপুরে খানিকক্ষণ ফাইলের কাগজপত্র দেখল। ছক কেটে অনেকগুলো এনট্রি করল। আস্তে আস্তে অ্যাকাউনট্যানসির পুরোনো নেশা খুব পেয়ে বসল তাকে। বিলু হলে বাধা দিত। এখানে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। দরজা ভেজানো। একটানা অনেকক্ষণ কাজ করে গেল সে। শতমের ব্যবসার কাগজপত্র থেকে সে জানতে পারল, বছরে কম করেও শতম ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা রোজগার করে। জেনে ভারী খুশি হল সে।

বিকেলের দিকে ক্লান্তি এল। চোখ বুজে শুয়ে বিশ্রাম নিতে গিয়ে হঠাৎ শতমের সেই কথাটা মনে পড়ল, অভ্যস্ত কাজ ছেড়ে অন্য কাজ করলে মানুষের বিশ্রাম হয়। ভেবে একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসল সে। তবু একসপেরিমেন্ট করতে উঠেও বসল সে।

গান গাইবে? গাইত এক সময়। অল্পস্বল্প। কতকাল গায় না! ভুলে গেছে কথা, সুর।

বালিশে ঠেস দিয়ে চোখ বুজে নীচু স্কেলে সে গুনগুন করল কিছুক্ষণ। অনেক বিস্মৃতি আর অনভ্যাসের পালমাট পড়েছে গলায়। তবু কিছুক্ষণ চেষ্টার পর সে মোটামুটি সুরের ওপর রেখে গাইতে লাগল, দোলাও দোলাও দোলাও আমার হৃদয়।

আশ্চর্য! ক্লান্তিটা ধীরে ধীরে কেটে গেল।

শতম অনেক রাতে এসে হানা দিল ঘরে। বলল, দেখি, কী করলে সারাদিন!

কাগজপত্র উল্টেপাল্টে দেখে বলল, বা!, এ যে অনেকটা হিসেব করে ফেলেছো। বলে খানিক চুপ থেকে শতম বলে, তোমাকে খাটাচ্ছি জানলে বউদি আমাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু না খাটালে যে হবে না। মানুষ নিজের ক্ষমতা টের পেলে বুঝতে সে কতখানি। খাটতে খাটতে শরীর যখন ভেঙে পড়ে, হাত-পা চলতে চায় না, তখনো ইচ্ছে করলে জোর করে মানুষ ফ্যাটিগ লেয়ার পেরিয়ে যেতে পারে। তখন দেখা যায় ক্লান্তি ঝেড়ে সে আবার দ্বিগুণ কাজ করছে।

তোর অডিট আমিই করে দিতে পারবো।

দিও। তুমি থাকতে আমি অন্যের কাছে খামোকা যাবো কেন?

আগের রিটার্নের রেকর্ডটা দেখলাম। সব কিছুই রিটার্নে দেখাস কেন? অনেকগুলো এনট্রি না দেখালেও চলত।

আমি কিছুই লুকোই না।

প্রীতম মাথা নাড়ল, বুঝেছে। শতম আর পাঁচজনের মতো তো নয়। সামান্য একটু অহংকার বুকের পালে এসে লাগে।

শতম বিছানায় বসে বলে, রোজ রাতে খাওয়ার পর আমি মা ছবি মরম রূপম পঁচুকি মিলে আড্ডা দিই। তা জানো?

না তো! টের পাই না।

তোমাকে কেউ ভয়ে আড্ডায় ডাকে না।

প্রীতমের অবশ্য এই পারিবারিক আড্ডা ভাল লাগার কথা নয়। একা ঘরে বসে ভবানীপুরের বাসায় স্মৃতি আঁকড়ে গুমরে গুমরে উঠতেই সে বোধ হয় আনন্দ পায় বেশী। তবু ভদ্রতাবশে সে বলল, ভয়ের কি? ডাকলেই পারতিস!

ডাকব না। মাঝে মাঝে সবাই মিলে তোমার ঘরেই চলে আসবো।

বেশ তো।

আজ গান গেয়েছিলে! ছবি বলছিল, দাদার গলায় এখনো কী সুর!

ধ্যেত!

বউদির একটা চিঠি এসেছে আজ। দেখেছো?

না তো, কেউ দেয়নি আমাকে।

তোমাকে লেখা নয়। বাবাকে লেখা।

কি লিখেছে?

বউদি নভেম্বরের আগে আসতে পারবে না। ডিসেম্বরও হতে পারে।

ও।

এ মাসেই আসার কথা ছিল।

আর কোনো খবর নেই, না?

না।

প্রীতম বসে ছিল। আস্তে আস্তে শুয়ে চোখ বুজল। (ক্রমশ)

উষা
শোভন সুন্দর কারিগরী
পরিপূর্ণ গড়ন
বৈশিষ্ট্য ঃ
● মেসিনে ওয়াইণ্ড করা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মোটর দ্বারা পরিচালিত বলে এই পাখা বহুদিন নিঃশব্দে ও নির্ঝঞ্ঝাটে চলে।
● হাওয়া খেলানোর উপযোগী সুষম গড়নের ব্লেড আরও বেশী বাতাস সঞ্চালিত করে।
● বিভিন্ন ধরনের ও নানারঙের চোখজুড়ানো মডেল
● ২৫০০ এরও বেশী ডীলার সার্ভিস কেন্দ্র।
● ৬০টিরও বেশী দেশে রপ্তানী করা হয়।
উষা
গুণের মহান ঐতিহ্য

B-JEW-84 B
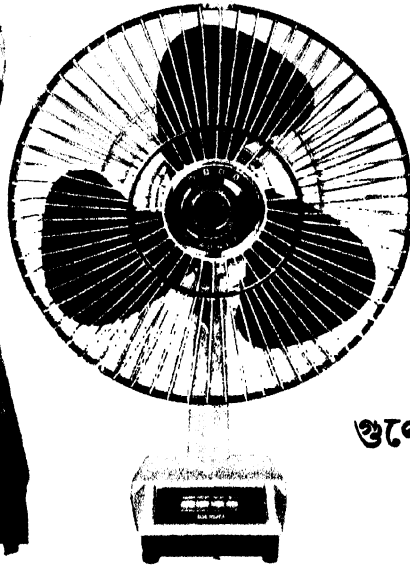
## বিজ্ঞান

### ধূলি ঝড় বাড়ছে

মে মাসের গোড়ায় বস্তি এবং গোরখপুর জেলার উপর দিয়ে প্রচণ্ড ধূলি ঝড় বয়ে গেল। এই ঝড়ের গতি ছিল ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার। প্রাথমিক সংবাদে জানা গেছে, এই ধূলি ঝড়ের মধ্যে পড়ে ছয়জন প্রাণ হারিয়েছে। মারা গেছে প্রায় একশ'র মত গবাদি পশু। সাম্প্রতিককালে এমন প্রলয়ঙ্কর ধূলি ঝড় আর কখনও দেখা যায় নি।

জনৈক ভুক্তভোগী প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণঃ সকাল থেকেই আবহাওয়াটা কেমন যেন থমথমে ছিল। গত কয়েকদিন ধরে চলছিল প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ। খরায় পুকুর ডোবা খটখটে। জলের জন্যে চারদিকে হাহাকার। আকাশে মেঘ নেই। কয়েকদিন ধরে বিকেলের দিকে আকাশের রঙ কেমন যেন তামাটে মনে হচ্ছিল। অবশেষে সেদিন—বিকেল শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল চারদিক কেমন ঘোলাটে হয়ে আসছে। পরক্ষণেই অন্ধকারে ছেয়ে গেল চারদিক। প্রথমে মৃদু বাতাস। তারপর ঝড়। দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের উপর দিয়ে রাক্ষুসে থাবা বাড়িয়ে প্রচণ্ড সেই ঝড় ছুটে এল। গ্রাস করল গ্রামের পর গ্রাম। আমার চোখের সামনে ছুটে যাচ্ছিল একদল গরু। ঝড়ের দাপটে তাদের মধ্যে একটি ছিটকে পড়ে গেল। তারপর হাওয়ায় যেমন কাগজ ওড়ে, ঠিক সেই রকম ঝড়ের ধাক্কায় তার দেহটি উড়ে চলল শক্ত মাটির উপর দিয়ে। চোখে আমি তখন অন্ধকার দেখছি। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, ধূলিকণায় আমার দু চোখ জ্বালা করছে। ছুঁচের মত ধূলিকণা এসে বিঁধছে আমার চোখে। মুখের ভেতর ধূলিকণা, গলায় গিয়ে বিঁধছে। কাশতে শুরু করেছি আমি। মাথার চুলে শুধু মাটি আর মাটি। শ্বাস বন্ধ হওয়ার মত অবস্থা। মাঠের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। ঝড়ের ধাক্কায় হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম। আর ওই ভাবেই পড়ে রইলাম বেশ কিছুক্ষণ। অবশেষে ঝড় কমলো। ভয়ে আমার শরীর তখনও কাঁপছে। পরে মনে হয়েছে, আমি ঝড়ের ধাক্কায় পড়ে গিয়েছিলাম বলেই বেঁচে গেছি। নইলে দম বন্ধ হয়ে হয়ত মারা যেতাম।

বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, বস্তি এবং গোরখপুর জেলার এই ধূলি ঝড় একটি বড় রকমের বিপদ-সংকেত। ধূলি ঝড় এদেশে এমন কোনো নতুন ঘটনা নয়। গরমের সময় রাজস্থানের থর মরুভূমি এলাকায় প্রায়শই ধূলি ঝড় ওঠে। উত্তর ভারতেও কোন কোন অঞ্চলে প্রচণ্ড ধূলি ঝড় হয়ে থাকে। কিন্তু গত দুই দশকে ধূলি ঝড়ের বিস্তৃতি বেড়েছে। উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, বিহার, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশের ব্যাপক এলাকায় এখন মরুভূমির মত অবস্থা। এইসব অঞ্চলে একটু বাতাস উঠলেই ধুলো উড়তে থাকে। বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার পরিমাণও বেড়েছে অনেক। রাজস্থানের থর মরুভূমি এলাকায় দৈনিক ৩০০ টনের মত ধূলিকণা বাতাসের তোড়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে পরিবাহিত হচ্ছে। ধূলি ঝড় মুখ্যত প্রাকৃতিক ঘটনা সন্দেহ নেই। কিন্তু ইদানীং মানুষের অদূরদর্শিতার দরুনও ধূলি ঝড় বাড়ছে।

*

নানা কারণে বাতাসে ধূলিকণা জমতে পারে। এদের মধ্যে সবচেয়ে নাটকীয় হলো আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ। পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র আগ্নেয়গিরি। বড় বড় এক-একটি আগ্নেয়গিরিতে যখন বিস্ফোরণ ঘটে, তার গহ্বর থেকে তখন বেরিয়ে আসে প্রচুর ভস্মকণা। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড ধাক্কায় সেই ভস্মকণা ঊর্ধ্বাকাশে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার পর্যন্ত উঠে যায়। সেখানে নিয়ত বেগে বাতাস বয়ে থাকে, সেই বাতাস আগ্নেয়গিরির ভস্মকণা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়। এই ভস্মকণা অথবা ধূলি কখনও কখনও মাসের পর মাস বাতাসে ভেসে থাকে এমনও দেখা গেছে। যেমন ধরুন, জাভা এবং সুমাত্রার অন্তবর্তী ক্রাকাতোয়ার বিস্ফোরণ। ২৬ আগস্ট, ১৮৮৩ পর্যন্ত ক্রাকাতোয়াকে সবাই দেখেছিল একটি দ্বীপের মত। দ্বীপটি ২৬০০ ফুট উঁচু একটি পাহাড়ের মত সমুদ্রের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল কতকাল, কেউ তার খবর রাখে নি। অনেকেই বুঝতে পারে নি, সেটা আসলে ছিল একটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। ২৬ আগস্ট প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটলো ক্রাকাতোয়ায়। বিস্ফোরণের দরুন দ্বীপটির একটি অংশ অদৃশ্য হয়ে গেল। তার গহ্বর থেকে ভস্মকণা ছড়িয়ে পড়লো ঊর্ধ্বাকাশে। এই ভস্মকণা পৃথিবীর বুকে অধঃক্ষিপ্ত হতে সময় লেগেছিল প্রায় দুই বছর। আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ঊর্ধ্বাকাশে অতিরিক্ত ধূলিকণ জমার দরুন পৃথিবীর আবহাওয়া কখনও কখনও অস্বাভাবিক রকম ঠাণ্ডা হয়ে থাকে।

বাতাসে ধূলিকণা ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে মানুষের ভূমিকাও কম নয়। জনসংখ্যা বাড়ছে। অতএব মানুষের মুখের গ্রাস যোগানোর জন্যে চাই প্রচুর জমি। বনজঙ্গল কেটে ফেলা হচ্ছে। কেটে ফেলার পর গাছের গুঁড়ি এবং লতাপাতা যা কিছু পড়ে থাকে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সেই আগুনে গুঁড়ি এবং লতাপাতা পুড়ে ছাই হয়। আগুনে জমির উপরের বাতাস গরম হয়ে পরিচলন পদ্ধতিতে সেই ছাই ঊর্ধ্বাকাশে চালান করে। এ ছাড়া গাছপালা কেটে ফেলার দরুন বিস্তৃত অঞ্চলের মাটি শুকিয়ে যায়। প্রখর রৌদ্রে ফেটে গিয়ে সৃষ্টি করে ধূলিকণা। সেই ধূলিকণা বাতাসে ভর দিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং মাঝে মাঝে সৃষ্টি করে ধূলি ঝড়।

বহুদিন ধরেই ধূলি ঝড় নিয়ে পৃথিবীর বহু দেশে গবেষণা চলেছে। গবেষকরা দেখেছেন এই ঝড়ে মানুষ এবং গবাদি পশুর মৃত্যু ছাড়াও অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতিও বড় কম হয় না। ধূলি ঝড় নানা রকম রোগের জীবাণু ছড়ায়। এই সব জীবাণু মানুষ, পশুপাখি এবং উদ্ভিদেরও ক্ষতি করে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের মানুষ এক ধরনের জ্বরে ভোগে থাকে। রোগটির নাম 'ভ্যালি ফিভার'। এই রোগের মূল কারণ এক ধরনের পরজীবী জীবাণু,—কোক্‌কিডাইওইডেস ইমাইটিস। ধূলি ঝড়ে এই জীবাণু বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে কখনও কখনও মহামারী সৃষ্টি করে। আর এক ধরনের জীবাণু আছে, যার নাম ক্রিপটোককাস নিওফরমানস। ইস্ট কোষের মত এই জীবাণু মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, ফুসফুস এবং দেহত্বক আক্রমণ করে। যার ফলশ্রুতি স্নায়বিক রোগ, শ্বাসকষ্ট এবং চর্মরোগ। এই ধরনের জীবাণুও ছড়ায় ধূলি ঝড়। নানা রকম উদ্ভিদ রোগের জীবাণুও।

ধূলিঝড়ের উৎপত্তি সম্পর্কে একাধিক তত্ত্বের কথা বলা হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তত্ত্বটি সংক্ষেপে এই রকম : প্রখর রোদে ধূলিধূসরিত কোন জায়গা হয়ত ঝলসে যাচ্ছে। এমন সময় মাথার উপর এসে জমলো এক ফালি বর্ষার মেঘ। সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি। বৃষ্টির সবটুকু জল নেমে আসার সময় মাঝপথে বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে পারে। অথবা তার কিছু অংশ মাটির উপরও পড়তে পারে। এই জলের স্পর্শে আশপাশের বাতাস থেকে সেখানকার বাতাস শীতল হয়। শীতল হওয়ায় ঘনত্বও যায় বেড়ে। আশপাশের উষ্ণ বাতাসের চেয়ে শীতল এই বাতাস ভারী হওয়ার দরুন সবেগে মাটির দিকে ধেয়ে আসে। তারপর মাটিতে আঘাত করে প্রতিহত হয় এবং সামনের দিকে এগিয়ে যায়। মাটি যদি শুকনো এবং ধূলিধূসরিত থাকে, বাতাসের ধাক্কায় সেই ধূলি ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে। শীতল এই বায়ুর বেগ কতটা হবে সেটা নির্ভর করে মাটি থেকে মেঘ কতটা উঁচুতে রয়েছে তার উপর। উচ্চতা বেশি হলে বাতাসের বেগ বাড়ে।

আবহাওয়াবিজ্ঞানীদের বক্তব্য, মরুভূমি অঞ্চলে ধূলি ঝড় এইভাবেই হয়ে থাকে।

আরবী ভাষায় ধূলি ঝড়কে বলা হয় 'হাবুব'। হাবুবের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি দেখা যায় সুদানে। খারতুম অঞ্চলে এই ঝড় কখনও কখনও বছরে চব্বিশ বারও হতে দেখা গেছে। সাধারণত মে থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যেই হয়। জুন এবং জুলাই মাসেই অবশ্য তার প্রকোপ সবচেয়ে বেশী। এই দুই মাসে হাবুবের দরুন খারতুমের কোন কোন জায়গায় বারো থেকে পনের ফুট উঁচু ধূলি স্তর জমতে দেখা যায়।

হাবুবের গড় বেগ ঘণ্টায় প্রায় ৫০ কিলোমিটার। কখনও কখনও এই বেগ ৮০ কিলোমিটারও হয়ে থাকে। হাবুবের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের আর্দ্রতা বেড়ে যায়। তাপমাত্রা কমে। কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রায় ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতও কমতে দেখা যায়।

হাবুবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে প্রায় অন্ধকার হয়ে যায়। কখনও খুব কাছের জিনিসও দেখা যায় না। গড়ে আধ কিলোমিটারের বেশি দূরত্বের কোন বস্তুই আর দৃষ্টিগোচর হয় না। ধূলি ঝড়ের পর প্রায় বজ্রবিদ্যুৎ এবং বর্ষণ। বর্ষণ হলে ঘণ্টা দুই-এর মধ্যেই চারদিকটা পরিষ্কার হয়ে যায়। বর্ষণ না হলে ঝড়ের পর বাতাস ধূলিকণা ভাসতে থাকে। কয়েক দিনেও বাতাসের ঘোলাটে ভাবটা কাটে না।

বিজ্ঞানীরা মহাকাশযান থেকে সারা পৃথিবীর ছবি তুলেছেন। পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে ধূলি ঝড়ের প্রকোপ সবচেয়ে বেশী, ওই ছবি দেখে তার হদিসও পাওয়া গেছে। জানা গেছে, পৃথিবীর মধ্যে সাহারার দক্ষিণ অঞ্চলই সব চেয়ে বেশী ধূলি ঝড় অধ্যুষিত এলাকা। মরিটানিয়া এবং নাইজার অঞ্চলের ২৫০০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য এবং ৬০০ কিলোমিটার প্রস্থ জুড়ে বাতাসের স্তরে শুধু ধুলো আর ধুলো। ভূমধ্য সাগরের দক্ষিণাঞ্চল, সুদানের উত্তরপূর্ব, আরবের উপদ্বীপ এলাকা, ভল্‌গা নদীর নিম্নাঞ্চল, ককেসাসের উত্তরে, টাকলা মাকান, গোবি এবং অরদসের বিস্তৃত অঞ্চল, অ্যারিজোনা—এই সব অঞ্চল ধূলি ঝড়ের স্বর্গরাজ্য। ভারতের থর মরুভূমিও এর মধ্যে পড়ে। থর ক্রমে এগিয়ে যাচ্ছে পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশের কোন কোন অঞ্চলের দিকে। থর দিল্লির দিকেও থাবা বাড়িয়েছে।

পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মানুষের অদূরদর্শিতার দরুন পৃথিবীর বহু অঞ্চলের অবস্থা এখন প্রায় মরুভূমির মত। বাসস্থান, কলকারখানা এবং শস্য উৎপাদনের জন্যে বন কেটে গত কয়েক বছরে প্রচুর জমি বের করা হয়েছে। জ্বালানির জন্যে নির্মূল করা হয়েছে প্রচুর বন। এর ফলে আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে। এক সময় যেসব অঞ্চল বর্ষায় সিক্ত হত, সেসব অঞ্চল এখন খরায় ধুঁকছে। জলের অভাবে মাটি শুকিয়ে গিয়ে ভেঙে ধূলিকণায় পরিণত হচ্ছে। হঠাৎ প্রবল বর্ষণ হলে সেই ধূলি জলে পরিবাহিত হয়ে গিয়ে পড়ছে নদীনালায়। এতে করে নদীনালা মজে যাচ্ছে। এ ছাড়া ওই ধূলি বাতাসেও ছড়িয়ে গিয়ে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। মাঝে মাঝে উঠছে ধূলি ঝড়। তাঁদের বক্তব্য, ধূলি ঝড় রোধ করতে গেলে দেশে বনভূমি বাড়াতে হবে। এ ছাড়া চাষের জমিও এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে করে সেই জমি থেকে বেশি পরিমাণ ধূলিকণা বাতাসে না ছড়িয়ে পড়ে।

সমরজিৎ কর

যুগল
মিলন
ভারতের একমাত্র শারীরিক দুর্গন্ধনাশক
সাবান ও ট্যাল্‌ক
দু'ভাবে দুর্গন্ধ প্রতিরোধের জন্য একেবারে সঠিক
যুগল মিলন... সিন্থল সাবান মেখে পরিষ্কার স্নান...
আর তারপর সুগন্ধ পাউডার মাখা...
যার ফলে আপনি ঝরঝরে তাজা
বোধ করবেন।
গোদরেজ -এর নিবেদন–সিন্থল
CINTHOL
DEODORANT
LUXURY
TOILET POWDER
BY
Godrej
CINTHOL
CINTHOL
DEODORANT AND COMPLEXION SOAP
Interpub/CTS/I/80

# বই, বাঙালী ও বইপাড়া

অশোক দাস

বাঙালী পুস্তক-প্রেমিক। সদ্য সমাপ্ত পুস্তক মেলা নাকি সেই সাক্ষ্য দেয়। কথাটা যদি আংশিকও সত্যি হয় তবে আশার কথা। অবশ্য মেলার পরিসংখ্যান আশার কথাই বলে। গত তিন বছরে মেলায় দর্শক সংখ্যার হিসাব (অবাঙালী দর্শক সমেত) যথাক্রমে : প্রায় দুলক্ষ, তিন লক্ষ, এবং দশ লক্ষ; এই সময়ে বই বিক্রির পরিমাণ যথাক্রমে : পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা, পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এবং এক কোটি টাকা। বাহ্যিক চিত্রটি ঝকমকে ঝলমলে হলেও আসল ছবিটি পরিষ্কার হচ্ছে না। মেলাটি যখন কলকাতায় হচ্ছে তখন মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে মেলায় এই ক্রয়-বিক্রয় থেকে এই অঞ্চলের, এখানকার অধিবাসীর কি উপকার হচ্ছে? প্রশ্নটি সামান্য গুছিয়ে আরও স্পষ্ট আরও নির্দিষ্ট করে বলা যেতে পারে : বাংলা বইয়ের পাঠকের রুচির কি উন্নতি হচ্ছে? প্রকাশনার ক্ষেত্রে বাংলা বইয়ের অগ্রগতি আদৌ হচ্ছে কি? বাঙালীরা কত টাকার বই কিনেছেন? তার শতকরা দশ ভাগ বইও কি বাংলায় কিনেছেন? এ সবের উত্তর পরিসংখ্যান দিতে অক্ষম।

বইপাড়ার লোকেদের অভিজ্ঞতা বলে যে অবস্থা ক্রমাবনতির দিকে। প্রকাশিত বইয়ের বৈচিত্র্য দিন দিন কমে আসছে। অন্য দিকে বাংলা বই এগারো শ'র পরিধি আর ছাড়াতে পারল না। অন্তত এখনও পারেনি। ব্যতিক্রম হিসেবে যেসব বই এগারো শ'র বেশী ছাপা হয়, বইপাড়ার ভাষায় তা নাকি 'সাড়া জাগানো বই'। যদিও শিক্ষার প্রসার ক্রমবর্ধমান। বাঙালী বই কেনে না অর্থাৎ বাংলা বই কেনে না; যা কেনে তা হচ্ছে 'অথেনটিক' 'অথরিটেটিভ' বই অর্থাৎ ইংরেজী। বাংলা বইয়ের প্রকাশকও তাই ব্যক্তিগত পুস্তক-ক্রেতার উপর ভরসা রাখতে পারেন না; তাঁরা আকুল নয়নে চেয়ে থাকেন সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির দিকে। আপাতত বর্তমান সমস্যার কথা মুলতুবী রেখে গোড়ার কথায় আসা যাক।

পাশ্চাত্ত্য জগতের সংস্পর্শে আসার ফলে আমরা যা কিছু পেয়েছি মুদ্রণযন্ত্র তার অন্যতম। এই মুদ্রণযন্ত্রের আনুকূল্যে কালক্রমে পেলাম গ্রন্থ-রাজি। আগে ছিল পুঁথি যা কিনা প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা বিদ্যাচর্চা করতেন তাঁদের সংগ্রহে শিষ্যপরম্পরায় বিরাজ করত। মুদ্রিত পুস্তকের আবির্ভাবের ফলে সাধারণ ব্যক্তির পক্ষেও তা যোগাড় করা অপেক্ষাকৃত সহজ হল। পুঁথির আমলে যা ছিল দুর্লভ বস্তু, মুদ্রণযন্ত্র তা সাধারণের পক্ষে করলো সহজলভ্য। এটা মুদ্রণযন্ত্রের আশীর্বাদ। কিন্তু এর অভিশাপ?

"গ্রন্থ মানুষের বন্ধু"। এটা আপ্তবাক্য। বিদ্যালয়-স্তরে 'রচনা' লেখা অভ্যাসের কল্যাণে তাই জেনে এসেছি এবং কালে সেই ধারণা বিশ্বাসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশে মুদ্রণযন্ত্র তথা মুদ্রিত পুস্তকাদি মুষ্টিমেয় (অঙ্গুলিমেয়?) ব্যক্তির সুবিধা ঘটালেও, আপামর জনসাধারণের পক্ষে মামুলী বিদ্যা আহরণের ক্ষেত্রেও তা এক বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কথাটা আজগুবী শোনালেও তা রূঢ় বাস্তব। জ্ঞানের চর্চা যুগে যুগে দেশে দেশে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল (বা এখনও আছে)। আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু সেই জ্ঞানচর্চার ফল পূর্বে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষও ভোগ করত। যোগাযোগ-ব্যবস্থা আদিম থাকা সত্ত্বেও মনের যোগাযোগের ক্ষেত্রে এমন কিছু ব্যবস্থা ছিল, যার জন্য বর্তমান কালের 'কমুনিকেশন গ্যাপ'-এর সমস্যা তখন দেখা দেয়নি। সে যুগে আমাদের দেশের চণ্ডীমণ্ডপ (বা পড়শী রাজ্য ওড়িশার ভাগবতটুঙ্গি) কেবল গ্রাম্য দলাদলির আখড়া বা পরনিন্দা পরচর্চার পীঠস্থান ছিল বলে ভাবলে ভুল করা হবে। সেখানে সর্ব স্তরের মানুষ আলোচনা হত। এই আলোচনার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ আর যাই হক অশিক্ষিত থাকত না। সময়ের সংগে তাল রেখে চলতে চন্ডীমণ্ডপ মানুষকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করত।

কোম্পানী আমলের শেষের দিকে সাব্যস্ত হল যে অতঃপর বঙ্গদেশে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে কেবলমাত্র শহরাঞ্চলে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করা হবে এবং সেখান থেকে ছেলেরা শিক্ষিত হয়ে দলে দলে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে গ্রাম বাংলার অধিবাসীদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করবে। এর দ্বারা একদিন দেখা যাবে যে জ্ঞানের বন্যায় সারা বাংলা টইটম্বুর করছে। এই তত্ত্বকে বলা হল 'ডাউনওয়ার্ড ফিলট্রেশন থিওরি'। খুবই সুন্দর পরিকল্পনা। কিন্তু পরবর্তী ইতিহাস বলে যে উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষিত মানুষ জ্ঞানের 'আলোক বর্তিকা' নিয়ে গ্রাম বাংলায় ছুটে যাননি (এখানে রাজনারায়ণ বসুর মত দু-চারজন ব্যক্তির ব্যতিক্রমের কথা আসছে না)। ফলে 'ফিলট্রেশন'-এর বদলে তা 'স্টাগনেশন' হয়ে শহরেই সীমাবদ্ধ রইল। 'কম্যুনিকেশন গ্যাপ'-এর রোগ তখন থেকেই শুরু। কবীর বলতেন, 'বহতা পানী নির্মলা, বন্ধা গংধিলা হোয়'। জল বয়ে না গিয়ে এক জায়গায় বন্ধ হয়ে থাকলে তা পচে দূষিত হয়। জলের অপর নাম জীবন। সত্যি কথা। তা বলে অই পুতিগন্ধময় পচা জল নয়, যা কিনা মানুষের প্রাণ সংশয়ের কারণ হতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই কথা। নতুন ব্যবস্থায় শিক্ষা সর্বত্র বিস্তার লাভ না করে তা শহরেই গণ্ডীভূত হয়ে থাকল। সমাজের উপকারের বদলে তা সমাজকে করল কলুষিত, পরিবেশ করল দূষিত।

অতীতে গ্রাম বাংলার প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল জীবনমুখী। গ্রাম্য পাঠশালায় শেখান হত বর্ণ-পরিচয়, হাতের লেখা, পত্র-লিখন, শুভংকর, অঙ্ক-মানসাংক। আর অন্যান্য বিষয়ে মুখে মুখে পড়ান হত। এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় সর্দার পোড়োর এক বিশিষ্ট স্থান ছিল। মুদ্রিত বইয়ের কোন ব্যাপারই ছিল না আর তা থাকারও কথা নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য : পাদ্রী উইলিয়ম অ্যাডাম তাঁর প্রথম রিপোর্টে (১৮৩৫) উল্লেখ করেন যে তৎকালীন বাংলা-বিহার অঞ্চলে জনসংখ্যা ছিল চার কোটির মত; এবং এই চার কোটির জন্য পাঠশালা ও মক্তব ছিল এক লক্ষ। অর্থাৎ চার শ'জন মানুষ পিছু একটি পাঠশালা। নতুন ব্যবস্থায় স্পষ্ট হল যে অই পাঠশালা-গুরুমশাই-সর্দার পোড়ো প্রথা অচল—তা কালোপযোগী নয়। অথচ এই 'সর্দার পোড়ো' ব্যবস্থার উপযোগিতা উপলব্ধি করে বিদেশী শাসক তা নিজের দেশে চালু করল 'মনিটরিয়াল সিসটেম' নাম দিয়ে। থাক সে অন্য প্রসঙ্গ। মোদ্দা ব্যাপারটা দাঁড়াল যে, পুরনো শিক্ষা-ব্যবস্থা বাতিল হল অথচ পুস্তক নির্ভর নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে প্রচলন করা হল না। শহর আর গ্রাম বাংলার মধ্যে এক অদৃশ্য কূটরেখা টানা হল। রাতারাতি সৃষ্টি হল 'শিক্ষিত' ও অশিক্ষিত মানুষের। মুদ্রণযন্ত্রের আগমনে আমাদের সমাজের এই হল নিট লাভ! আর শহুরে মানুষ 'শিক্ষিত' হল অথচ তার জ্ঞানের স্পৃহা জাগল না বিন্দুমাত্র। শিক্ষা অর্জন চাকুরি-লাভের পূর্ব শর্ত হিসেবে গণ্য হল। তাই শহুরে বাঙালী 'গোলদীঘি থেকে লালদীঘিতে পাড়ি জমিয়ে' শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে লাগল। আজও সেই ঐতিহ্য অব্যাহত। বাঙালীর কাছে বই কেনা, পড়াশোনা করা অর্থের অপচয়, সময়ের অপব্যবহার—পণ্ডশ্রম মাত্র। বাংলা বইয়ের সঙ্কট আর অই নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থা একই সংগে যাত্রা শুরু করেছে, তারা অঙ্গাঙ্গিভাবে পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে রয়েছে। এই শিক্ষা-ব্যবস্থা সময়ে সময়ে বর্তমান, এবং বাংলা বইয়ের সঙ্কটও।

মুদ্রিত পুস্তক তথা নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদের সমাজের ক্ষতি করেছে। এটা ঘটনা, এটা বাস্তব সত্য। তবে যে ব্যবস্থা আমাদের সমাজে এসেছে তা থাকবেই। পুরনো শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। 'দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর' বলে আক্ষেপ করে লাভ নেই। তবে আমাদের দেশে আমাদের সমাজেও যাতে বই প্রকৃতপক্ষে বন্ধুর স্থান গ্রহণ করে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। বই যাতে সর্বত্র সর্ব স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে যায় তাই হওয়া উচিত লক্ষ্য। প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির সংগে সংগে নব আবিষ্কৃত টেপ রেকর্ডার, রেডিও, টেলিভিশন হয়ত একদিন মুদ্রিত পুস্তকের প্রয়োজন অনেকাংশে মেটাবে, তবে বইয়ের স্থান সে কখনই গ্রহণ করতে পারবে না। মানব সভ্যতা যতদিন থাকবে, বইয়ের প্রয়োজনও থেকে যাবে। তাই আমাদেরও চাই বই, আরও বই, অনেক অনেক বই। বাঁধা-ধরা স্কুল-কলেজী শিক্ষা শেষ হবার পরও জ্ঞান-পিপাসা তৃপ্ত হওয়া উচিত নয়। তাই এর পরবর্তী স্তরে মানুষের জ্ঞানচর্চা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হয় বিভিন্ন ধরনের বইয়ের—ভিন্ন রুচির মানুষের জন্য। অন্যথায় যে বিদ্যা মানুষ অর্জন করেছে, তাও যাবে সে ভুলে। আবার, আমাদের দেশে নিরক্ষরদের সাক্ষর করার উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাদের জন্যও চাই বিশেষ ধরনের বইয়ের। নচেৎ তাদের অ-আ-ক-খ শেখানোটাই হবে সত্যিকারের পণ্ডশ্রম। জাতীয় অপচয়। অর্থাৎ আমাদের বইয়ের প্রয়োজন প্রচুর।

আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। প্রকাশকদের আক্ষেপ আমরা শুনেছি। এবার, বাংলা বইয়ের ক্রেতা কি বলেন দেখা যাক। ক্রেতাদের অভিযোগ যে এর জন্য প্রকাশকদের লোভ সম্পূর্ণ দায়ী। প্রকাশকরা বাংলা বইয়ের দাম ক্রমশ বাড়িয়ে বর্তমানে যা করেছেন তাতে বাঙালী মধ্যবিত্তদের কাছে বই এখন আকাশকুসুম। উদাহরণ হিসেবে তাঁরা বলেন যে, এই কয়েক বছর আগেও যে 'সঞ্চয়িতা'র দাম ছিল দশ টাকা, এখন তার দাম হয়েছে ছাব্বিশ টাকা—মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে শতকরা তিনশ' ষাট ভাগ! ঠিক একইভাবে অন্যসব বাংলা বইয়ের দাম কম-বেশি একই হারে বেড়েছে। সেজন্য মধ্যবিত্ত বাঙালী ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য বই কেনা এক রকম বন্ধ করেছে।

বাংলা বইয়ের হঠাৎ এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ কি? প্রকাশকদের বক্তব্য এই মূল্যবৃদ্ধি কেবল বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য সব ভাষার ক্ষেত্রেও ঘটেছে। মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি প্রকাশকদের মর্জির উপর নির্ভরশীল নয়। বই প্রকাশনের আনুষঙ্গিক সব কিছুরই দাম তিন-চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বইয়েরও দাম বেড়েছে, যদিও সেই অনুপাতে বইয়ের দাম তাঁরা বাড়াননি। কারণ হিসেবে তাঁরা বলেন যে এখন তবুও যাও বা কিছু বিক্রি হচ্ছে, বইয়ের দাম সেই হারে বাড়ালে বই বিক্রি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে।

সে যুগে কালি-কলম-মন হলেই পুঁথি রচনা চলত। ব্যাপারটির ওখানেই সাঙ্গ হত। বর্তমান যুগে, বলতে গেলে ব্যাপারটির শুরু ওখান থেকেই। মূলত প্রয়োজন তিনটি : কাগজ চাই; তাকে ছাপাতে হবে; এবং বন্ধন পর্বের পর তবেই তা ভোগ্য পণ্য হবে—সমাজের প্রয়োজন মেটাবে। এখানে কাগজই হল বিরাট প্রতিবন্ধক।

বেশ কিছুদিন ধরে পৃথিবীব্যাপী একটা আশঙ্কার কথা শোনা যাচ্ছে যে কাগজের দুর্ভিক্ষ আগতপ্রায়। উন্নয়নশীল এবং অনগ্রসর দেশগুলিতে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রসারের সংগে সংগে গ্রন্থের প্রয়োজন বাড়ছে অতি দ্রুত গতিতে। কিন্তু সেই তুলনায় কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভবপর নয়। কাগজ উৎপাদনের প্রধান উপকরণ বনজ এবং কৃষিজ সম্পদ;

দেশেও বেশ সময়সাপেক্ষ। ফলে চাহিদার তুলনায় কাগজের যোগান প্রচণ্ডভাবে কমে যাচ্ছে : এর ফলে কাগজের দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। এটা আসন্নপ্রায়। গত কয়েক বছর হল আমাদের দেশেও কাগজের সঙ্কট দেখা দিয়েছে—কাগজের জন্য হাহাকার পড়েছে। এ যেন কালবৈশাখীর পূর্বে চৈত্রালী ঘূর্ণি। যখন প্রকৃত দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে তখন কি হবে?

অবস্থা শোচনীয়। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি কি তাই বলে? বর্তমানে কাগজের মিলগুলির উৎপাদন-ক্ষমতা যা তাতে এই অভাব এখনই দেখা দেওয়ার কথা নয়। বর্তমানে আমাদের দেশে কাগজের চাহিদা প্রায় সাড়ে এগারো লক্ষ টন। সেখানে কাগজ উৎপাদন হয় দশ লক্ষ টনের মতো। অর্থাৎ লাখ দেড়েক টনের মতো কাগজের অভাব থেকে যাচ্ছে। অবশ্য সরকারী হিসাব মতে এই অভাবের পরিমাণ নাকি আরও কম।

কাগজের বর্তমান অবস্থার জন্য মিল কর্তৃপক্ষ ও সরকার—উভয় পক্ষ পরস্পরকে দোষারোপ করছে। মিলঅলাদের বক্তব্য দেশে কাগজ প্রস্তুতকারী যন্ত্রপাতি বহু পুরনো। বর্তমান চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে উৎপাদন বৃদ্ধি করা এই মান্ধাতা আমলের যন্ত্রপাতির সাধ্যাতীত। অথচ সরকার বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানির ব্যাপারে ভীষণ কড়াকড়ি করে। আমাদের দেশে এই ধরনের যন্ত্রপাতি যা তৈরী হয় তা সঠিক মানের নয়। এরপর বিদ্যুৎ। শক্তির জন্য এই শিল্পে বিদ্যুতের একান্ত প্রয়োজন কিন্তু তার যোগান অব্যাহত রাখতে সরকার অপারগ। অন্যদিকে কাঁচা মাল ও কয়লা আনার জন্য রেল ওয়াগন ঠিকমত পাওয়া যায় না। এই পরিস্থিতিতে সুষ্ঠু উৎপাদন আশা করা বাতুলতা মাত্র। মিল মালিকদের অভিযোগ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সরকার প্রতিবিধান করতে চেয়ে বেশ কিছুদিন আগে এক প্রস্তাব তাদের দিয়েছিল। তাতে একটিমাত্র শর্ত ছিল : মিলকে তাদের উৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু সরকারের এই প্রস্তাবে মিলের কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

কয়েক বছরে কাগজের দর কি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে চলেছে তা নিচের তালিকা থেকে বোঝা যাবে (প্রতি কেজি কাগজের দাম)—

| | |
|---|---|
| ১৯৬৮ | ১·৬০ টাকা |
| ১৯৭০ | ২·০৬ ,, |
| ১৯৭৪ | ৩·৫২ ,, |
| ১৯৭৮ | ৪·৬০ ,, |

বর্তমানে সরকার আশু প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিদেশ থেকে (ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশ) কাগজ এনেছে এবং তা নিজ তত্ত্বাবধানে বাজারে বিক্রয় করছে আট টাকা কেজি দরে। অর্থাৎ ১৯৬৮-র তুলনায় কাগজের মূল্যের বৃদ্ধি ঘটেছে পাঁচ গুণ। ফলে বাজারে অন্য কাগজের দাম আরও উর্ধমুখী।

বর্তমানে ভারতে আটটি বৃহৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তাদের কর্তৃত্বাধীন সতেরটি মিলের মাধ্যমে শতকরা প্রায় পঁচাত্তর থেকে আশী ভাগ কাগজের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। পক্ষান্তরে, আড়াই শ ডিসট্রিবিউটর বাজারের প্রায় শতকরা ষাট ভাগ কাগজ বিলি বন্দোবস্ত করে থাকে। শোনা যায় এইসব ডিসট্রিবিউটরদের সঙ্গে মিলের যোগাযোগ পারিবারিক সূত্রে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ পুস্তকের জন্য কাগজের সরবরাহে যে শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হবে তা বলাই বাহুল্য। আরও একটি মজার ব্যাপার আছে। কাগজ উৎপন্ন হয় কেজি বা মেট্রিক টন হিসেবে এবং তা বিক্রয়ও হয় ঐভাবে কিন্তু কাগজের ব্যবহার হয় রিম হিসাবে। অর্থাৎ কোন একটি বই ছাপতে যত রিমের প্রয়োজন হয় তা কাগজ কত পাতলা বা মোটা তাতে রিমের সংখ্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। কাগজ কত পাতলা বা মোটা তা প্রকাশ করা হয় 'জি এস এম' দিয়ে—জি এস এম অর্থে 'গ্রাম পার স্কোয়ার মিটার'। এখানে একটা টনে ৬০ জি এস এম কাগজ পাওয়া যায় ৬৫ রিমের মত, সে ক্ষেত্রে এর থেকে সামান্য পাতলা কাগজ ৫৬ জি এস এম পাওয়া যাবে এক টনে প্রায় ৭০ রিমের মত। আলোচনার সুবিধার জন্য ধরা যাক, কোন একটি বই ছাপানোর জন্য ৯১০ রিম কাগজের প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে ৫৬ জি এস এম কাগজ হলে ১৩ টন কাগজের প্রয়োজন হয় কিন্তু ৬০ জি এস এম হলে কাগজের প্রয়োজন হবে ১৪ টনের মত, অর্থাৎ এক টন বা এক হাজার কেজি কাগজ বেশী দরকার হবে। অন্য কথায় কাগজের দর পাঁচ গুণ বাড়িয়ে তারা সন্তুষ্ট নয়, হিসেবের মারপ্যাঁচে এক হাজার কেজি কাগজ বেশী কিনতে বাধ্য করে আরও আট-ন' হাজার টাকা বেশী দাম আদায় করে। অন্য পক্ষে, আগে যেখানে ৫৬ জি এস এম কাগজ (ধরা যাক) দশ হাজার টন (অর্থাৎ ৭,০০,০০০ রিম) তৈরি করত; এখন সেখানে ৬০ জি এস এম কাগজ হয়তো সাড়ে দশ হাজার টন (অর্থাৎ ৬,৮২,৫০০ রিম) কাগজ তৈরি করছে। এতে সরকারকে বোঝানো সম্ভব হচ্ছে যে, তাদের কাগজ উৎপাদনের পরিমাণ পাঁচশ' টন বেড়ে গেছে। যেখানে বাস্তব চিত্র হচ্ছে : আগে যেখানে ৭,০০,০০০ রিম কাগজ পাওয়া যেত, এখন সেখানে ৬,৮২,৫০০ রিম কাগজ পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ ব্যবহারযোগ্য কাগজের পরিমাণ ১৭,৫০০ রিম কমে গেল। কিন্তু এই কারচুপি সরকার কেন ধরতে পারে না তা বোধগম্য নয়।

গ্রন্থ উৎপাদনের জন্য কাগজের পর প্রয়োজন হয় ছাপানোর। ছাপানোর খরচ গত দশ বছরে তিন গুণেরও বেশী বেড়েছে। এক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক জিনিসের দাম বৃদ্ধি ছাড়াও লোডশেডিং এক অন্যতম কারণ। এর দাম কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা নিচের তালিকায় চোখ বুলোলে বোঝা যাবে (হাজার কপি ডবল ডিমাই এক ফর্মা ছাপানোর খরচ) :—

| | |
|---|---|
| ১৯৬৯ | ৫৫ থেকে ৬০ টাকা |
| ১৯৭২ | ৬৫ ,, ৭৫ টাকা |
| ১৯৭৬ | ৭৫ ,, ৮৫ টাকা |
| ১৯৭৮ | ৯০ ,, ১০০ টাকা |
| ১৯৭৯ | ১৫০ ,, ১৭০ টাকা |
| ১৯৮০ | প্রায় ২০০ টাকা |

কাগজ ও ছাপানোর খরচ ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে যথা বাঁধাই, ব্লক, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির খরচ অনুরূপভাবে বৃদ্ধির দিকে। এই পরিস্থিতিতে বইয়ের দাম স্থিতিশীল থাকার কোন উপায় নেই বলে প্রকাশকরা জানালেন।

বাংলা প্রকাশন শিল্পের ঐতিহ্য বহুদিনের। বটতলার কথা বাদ দিলে বাংলা বই প্রকাশনায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর হচ্ছেন আদি পুরুষ। ব্রিটিশ যুগে বাঙালী প্রকাশকদের প্রচেষ্টায় এই অঞ্চল ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অগ্রগণ্য ছিল—ভারতীয় প্রকাশন-জগতের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কলকাতা। স্বাধীনতা উত্তর যুগে কিন্তু চিত্র বদলে গেছে; কলকাতাকে অনেক পিছনে ফেলে দিল্লি-বোম্বাই এগিয়ে গেছে। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার করণ-কৌশল প্রয়োগের ফলে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে প্রকাশন-শিল্প প্রায় বৃহৎ শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। দিল্লি-বোম্বাইও সেদিকে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলা বই প্রকাশনার ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্প তো দূরস্থান, তা ক্ষুদ্র শিল্প বলে গণ্য হবার দাবি করতে পারে না। বিদ্যাসাগরের আমলের মত তা কুটিরশিল্প পর্যায়েই রয়ে গেছে। কুটিরশিল্পরূপী নাবালকত্বের গণ্ডী না পার হতে পারলে ম্যাস প্রোডাকশন সম্ভব নয় আর ম্যাস প্রোডাকশন না করতে পারলে বইয়ের দাম কমিয়ে তা সাধারণের নাগালের মধ্যে আনা যাবে না।

এখানে আসে মূলধনের কথা। সাধারণত মধ্যবিত্ত বাঙালী এই ব্যবসায়ে লিপ্ত এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদের ব্যবসায়িক যোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়। এই সব কারণে মূলধনের অপ্রতুলতার সমাধান হচ্ছে না। এই শিল্পের উপর যদিও প্রায় লক্ষাধিক লোক পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে জীবিকার জন্য নির্ভরশীল তবুও রাজ্য সরকার এই শিল্পের জন্য কিছু করা প্রয়োজন বোধ করে না। কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করতে আগ্রহী তবুও কিছু করা যাচ্ছে না। প্রকাশন শিল্পে মূলধনের সমস্যা কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নয়, ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও একই সমস্যা বিরাজ করছে। কয়েক বছর আগে ভারতীয় প্রকাশকরা ভারতের শিক্ষা মন্ত্রকের কাছে আবেদন করে, যেন অন্যান্য শিল্পের মত ভারতীয় প্রকাশকরাও মূলধনের ব্যাপারে ব্যাঙ্ক, এল আই সি, ইনডাসট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন প্রভৃতির কাছ থেকে সহযোগিতা পায়। শোনা যায়, নাকি শিক্ষা মন্ত্রক এই বক্তব্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়ে শিল্প মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করে পুস্তক প্রকাশনকে 'শিল্প' বলে ঘোষণা করবার ব্যাপারে অনেক দূর এগিয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি উল্লিখিত সরকারী সংস্থাগুলি কেবলমাত্র সরকারীভাবে স্বীকৃত শিল্পগুলিকে ঋণ দিয়ে থাকে। প্রকাশনাকে শিল্প হিসাবে ঘোষণা করার মাঝপথে আইন মন্ত্রক ঘোরতর আপত্তি জানায়। কারণ, প্রকাশন ব্যবসাকে শিল্প হিসাবে ঘোষণাটা হবে নাকি রীতিমত সংবিধান-বিরোধী! একে শিল্প হিসাবে গণ্য করলে, তাকে অন্যান্য শিল্পের ন্যায় কতকগুলি বিধিনিষেধের আওতায় আনতে হবে এবং সরকারী খবরদারির অধীন করতে হবে; কিন্তু সরকার তা পারে না। বাক স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা ইত্যাদির ন্যায় মুদ্রণ যন্ত্রের স্বাধীনতা সংবিধান-স্বীকৃত ব্যাপার। সে ক্ষেত্রে বেসরকারী পুস্তক প্রকাশন ব্যবস্থাকে শিল্প হিসাবে ঘোষণা করলে তা হবে মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ। সুতরাং, ব্যাপারটির এখানেই ইতি। তবে অন্যভাবে সাহায্য করার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার নিচ্ছে। সুতরাং, আপাতত বইয়ের দাম কমার কোন আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে না।

বাংলা বইয়ের কেন এই সঙ্কট? কেন বাঙালী (বাংলা) বই কেনে না? হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধি এর কারণ? না, বাঙালীর জীবনে বইয়ের কোন প্রয়োজনবোধ বা অভাববোধ দেখা দেয় নি? নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বইও বাঙালীর জীবনে এক পর্যায়ে স্থান লাভ করবে, এতটা ভাবা যায় না। কিন্তু আপসোসের ব্যাপার এই যে, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিত্যপ্রয়োজনীয়, প্রয়োজনীয় তো বটেই এমনকি অনেক শৌখিন বস্তুরও পরে তার স্থান নির্দিষ্ট। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে যে বাঙালী টুইলের শার্ট বা লঙ ক্লথের পাঞ্জাবিতে অভ্যস্ত ছিল এখন তারই অঙ্গে দেখা যাচ্ছে অনেক শৌখিন তন্তুর পোশাক; এ ক্ষেত্রে মূল্য কোন বাধার সৃষ্টি করছে না। গান বাজনা বা খেলাধুলার ক্ষেত্রেও তার হাত দরাজ—এখানে গানবাজনা চর্চা বা খেলাধুলাচর্চার কথা হচ্ছে না। কোথাকার কোন বাগানে ট্রুপ আসছে বা জ্যাজ পার্টি এসেছে, বাঙালী হুড়োহুড়ি খেয়ে পড়ছে। বাইরের কোন টিম আসছে খেলতে, তার টিকিটের জন্য কালোবাজারী দরে আপত্তি নেই। সেই বাঙালীর মুখে যখন আক্ষেপ শোনা যায় যে, গত কয়েক বছরে বইয়ের দাম এত বেড়ে গেছে বলে সে আর এখন ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য বই কিনতে অপারগ—তখন তা বাজে ওজর বলে মনে হয়। এটা তার বই না কেনার ছল মাত্র, কারণ সে (বাংলা) বই কখনই কেনে নি—আগেও কিনত না এখনও কেনে না। সত্যিই যদি মূল্য বৃদ্ধির জন্য বাঙালীর বর্তমানে বই কেনা বন্ধ হয়ে যা কমে গিয়ে থাকে (অর্থাৎ আগে সে কিনত), তা হলে আগে প্রকাশকরা যে ক্ষেত্রে এগারো শ' করে বই ছাপিয়ে এখন তারা আরও অনেক কম সংখ্যক বই ছাপতে ঘটনা যখন তা নয় তখন বাঙালী হঠাৎ বই বন্ধ করেছে—এ যুক্তি মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। বই কেনাটাই বাঙালীর ঐতিহ্য। অবশ্য বই কেনার ব্যাপারে অনীহা কেবল আমাদের মধ্যেই নয়, পশ্চিমেও—এত প্রকট না হলেও—জড়তা বেশ আছে। ইংলন্ডের বিখ্যাত প্রকাশন-সংস্থা জর্জ অ্যালেন অ্যান্ড আনউইনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্যার স্ট্যানলী আনউইন প্রভৃতি কথায় এ ব্যাপারে স্বদেশবাসীদের সম্বন্ধে

মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'মোস্ট পিপ্‌ল হ্যাভ নট ইয়েট লার্নড্‌ টু রিগার্ড বুকস অ্যাজ এ নেসেসিটি। দে উইল বো, দে উইল বরো, দে উইল ডু এভরিথিং, ইনফ্যাক্ট, বাট বাই দেম। পিপ্‌ল উড্‌ বি অ্যাশেমড্‌ টু ক্যাজ ফর এনিথিং এলস দে ওয়ানটেড। হু উইল আনহেজিটেটিংলি পে টেন শিলিংস ফর এ মিল, টুয়েলভ শিলিংস সিক্স পেন্স ইচ ফর সিটস অ্যাট এ থিয়েটার, উইল থিংক টোয়াইস, ইফ নট থ্রি টাইমস, বিফোর স্পেন্ডিং ইভ্‌ন সিক্স শিলিংস আপঅন এ বুক হুইচ উইল লাস্ট এ লাইফ টাইম।' ও দেশে দুবার, পারলে তিনবার ভেবেও, অনেকেই শেষ পর্যন্ত বই কেনে। বাঙালী এ সব ব্যাপারে ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দেয় না, সে বই কেনার কথা ভুলেও ভাবে না। 'ধনবানে কেনে বই' ইত্যাদি। বাঙালী বুদ্ধিমান তো বটেই তার চাইতেও বুঝি এককাঠি সেরা, তাই সে বই পড়েও না।

সংবিধান-নির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের দেশে এখনও চালু হয় নি, তাই আশানুরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রসার হচ্ছে না। দেশে পড়ুয়ার সংখ্যা না বাড়লে সাধারণ বই পড়বেই বা কতজন, কিনবে তো আরও কম। আশানুরূপ না হলেও দেশে স্কুল-কলেজের সংখ্যা বা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা স্বাধীনতা উত্তরকালে কিন্তু যথেষ্ট দ্রুত গতিতে বাড়ছে। নাই নাই করেও তাদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। স্বাধীনতার ঠিক পূর্বে (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) এবং পরে (১৫ আগস্ট ১৯৪৭) স্কুল-কলেজের সংখ্যা ছিল এই রকম:

| | স্কুল | কলেজ |
|---|---|---|
| ১৪ আগস্ট | ২,৩০০ | ১১৬ |
| ১৫ আগস্ট | ৭৮০ | ৬৯ |

বিভিন্ন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৯৪৭ সালে (অর্থাৎ অবিভক্ত বঙ্গদেশে) এবং ১৯৪৮ সালে (অর্থাৎ কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে) নিম্নরূপে ছিল (আনুমানিক):—

| | ১৯৪৭ | ১৯৪৮ |
|---|---|---|
| ম্যাট্রিক | ৬২,০০০ | ৩০,০০০ |
| ইণ্টারমিডিয়েট | ২০,০০০ | ১৪,০০০ |
| আণ্ডার-গ্রাজুয়েট | ৭,৫০০ | ৫,০০০ |

পরবর্তীকালে স্কুল ফাইনাল (উচ্চ মাধ্যমিক) ইত্যাদি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ:—

১৯৬৬:

| | |
|---|---|
| উচ্চ মাধ্যমিক | ৫৯,০৫৮ |
| স্কুল ফাইনাল | ৬৩,২৬২ |
| | ১,২২,৩২০ |

১৯৭৫:

| | |
|---|---|
| উঃ মাঃ | ১,৬৯,০৪৭ |
| স্কুঃ ফাঃ | ১,৯৬,৯১১ |
| | ৩,৬৬,২৫৮ |

১৯৭৭:

| | |
|---|---|
| স্কুঃ ফাঃ (রেগুলার) | ২,২৮,০০০ |
| স্কুঃ ফাঃ (এক্সটারনাল) | ২০,০০০ |
| স্কুঃ ফাঃ (প্রাইভেট) | ৬৫,০০০ |
| উঃ মা | ৭৮,০০০ |
| | ৩,৯১,০০০ |

১৯৭৮

| | |
|---|---|
| মাধ্যমিক | ২,৩৭,৬৩৮ |
| ঐ (এক্সটারনাল) | ৮,৪২৪ |
| স্কুঃ ফাঃ | ১৪,০৬৫ |
| উঃ মাঃ | ৪০,০০০ |
| | ৩,০০,১২৭ |

এর পর ১৯৭৯ সালে কেবলমাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২,৪২,০০০ আর এ বছর (১৯৮০) তা হয়েছে আড়াই লক্ষের মত।

এ গেল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা। স্কুলের পড়ুয়ার সংখ্যা? তার বৃদ্ধি নিম্নরূপ:—

| | |
|---|---|
| ১৯৬৫-৬৬ | ১৪ লক্ষ |
| ১৯৭৩-৭৪ | ২১·৫৭ লক্ষ |
| ১৯৭৬ | ২৬ লক্ষ |

বর্তমানের সংখ্যা নিশ্চয় আরও বেড়েছে।

স্কুলের সংখ্যা—যা স্বাধীনতার সময় ছিল ৭৮০—তার বৃদ্ধি এই রকম [ত্রিপুরা ও সিকিম সহ]:—

১৯৬৫-৬৬

| | |
|---|---|
| জুনিয়র | ২,১১৬ |
| উচ্চ এবং উঃ মাঃ | ৩,১৯২ |
| | ৫,৩০৮ |

১৯৭৪

| | |
|---|---|
| জুনিয়র | ৪,২২৪ |
| উচ্চ | ২,৩৬১ |
| উচ্চ মাধ্যমিক | ২,০৫৮ |
| | ৮,৬৪৩ |

স্কুলের ব্যাপারে একটা ছবি মোটামুটি পাওয়া গেল। এবার কলেজের ক্ষেত্রে আসা যাক। [এখানে স্মর্তব্য যে, স্বাধীনতার পর কেবলমাত্র পূর্ব বাংলাই নয়, ক্রমে ক্রমে সমগ্র আসাম, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলো বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় নেই।] আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা নিচের সারণী থেকে মালুম হবে:—

| | বি. এ. | | বি. এস-সি | | বি. কম | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বছর | পাস | অনার্স | পাস | অনার্স | পাস | অনার্স |
| ১৯৬৬ | ৯,৮৩৭ | ২,২৫৮ | ২,৩৭৮ | ১,৬৮৮ | ৬,০১৬ | ৬৭৫ |
| ১৯৬৭ | ১৭,৩৬৭ | ৩,২০০ | ৩,৫৬২ | ১,৩৬৩ | ৪,৯৬৯ | ৭৭০ |
| ১৯৬৮ | ২২,৯৮৫ | ৪,০৫৩ | ৫,৪৯৬ | ২,০০৪ | ৭,০৪১ | ১,০৩৯ |
| ১৯৬৯ | ১৮,৯৪০<br>৩,০৮৩ | ২,৮০৪<br>২২৬ | ৬,৪৯৯<br>১,৮৩৩ | ১,৮৫৭<br>২০৬ | ১০,৫৪৩<br>২,৮২০ | ১,১১৭<br>৩৬৩ |
| ১৯৭০ | ২২,৪৯৯ | ৫,০৪১ | ৭,৮৮১ | ২,৩৯০ | ১০,৮৪১ | ১,৪৬৮ |
| ১৯৭১ | ২০,৪৬৬<br>৪,৪৬০ | ৩,২৮৯<br>২৪৪ | ১০,৫৪৬<br>২,৯৪৩ | ২,৯৬০<br>২৩৯ | ১০,৭৬৬<br>৩,৪৪২ | ১,৫৮৪<br>২৬৭ |
| ১৯৭২ | ২০,৭৮৮<br>৪,৩৫৯ | ৪,৪৬০<br>১৯৮ | ১২,৮৮৮<br>১,৭৩৩ | ৩,৪০৪<br>১৭৮ | ১২,৭৯১<br>২,৮৩৭ | ২,৩০৩<br>৩৯২ |
| ১৯৭৩ | ১৪,১৩৫<br>৭,৩০৯ | ২,৬৬৫<br>৯৫২ | ৬,২৯৯<br>৪,১৭৫ | ১,৯৩২<br>৪২৫ | ১০,০২৭<br>৫,৬৭৩ | ১,৩৩৮<br>৯৪৮ |
| ১৯৭৪ | ৯,৫৮৬<br>১১,২০৯ | ২,১০৮<br>১,৪৩০ | ৩,৭৭০<br>৫,৯২৯ | ১,৫৬৪<br>১,০৮৫ | ৭,৩৪৩<br>৬,২৪০ | ১,৭৪০<br>১,৩৪২ |
| ১৯৭৫ | ১৪,৮০৮<br>১৬,৩৫১ | ২,৭৬০<br>১,৭২৫ | ৭,৪৪২<br>৭,১৪৩ | ১,৮৯৯<br>১,০০৮ | ১৩,৫৮৫<br>৬,৯৩৭ | ২,৭০৭<br>৯৩৬ |

বলা বাহুল্য যে, অকৃতকার্যকারী ছাত্ররা পরবর্তী বছরের সংখ্যাকে স্ফীতকায় করেছে। পক্ষান্তরে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা যোগ হলে এ সংখ্যা আরও বাড়বে।

কলেজের সংখ্যা যা স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ছিল ৬৯, তা ১৯৬৫ সালে বেড়ে হয় ২০৪টি (কলকাতা—১৪৯, বর্ধমান ৩৯ এবং উত্তরবঙ্গ ১৬)। বর্তমানে (১৯৭৮-৭৯) কেবলমাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ২২১টি অনুমোদিত কলেজ আছে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, সমগ্র বাংলা ও আসামে কলেজের সংখ্যা ছিল ১১৬। অপ্রাসঙ্গিক হলেও কৌতূহল মেটানোর জন্য তদানীন্তন বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলার কলেজের সংখ্যা দেওয়া হল—কলকাতা ২৩, মেদিনীপুর ৩, বর্ধমান ৩, হুগলি ৪ হাওড়া ৩, নদীয়া ১, মুর্শিদাবাদ ৩, বাঁকুড়া ২, বীরভূম ১; মালদা ২, জলপাইগুড়ি ১, দার্জিলিং ৬, কুচবিহার ১, যশোর ২, দিনাজপুর ১, বরিশাল ২; ঢাকা (ঢাকা শহর বাদে) ৩, ময়মনসিংহ ৫, কুমিল্লা ৪, ফরিদপুর ২; খুলনা ৪, চট্টগ্রাম ২, নোয়াখালি ১, বগুড়া ১; পাবনা ৩, রাজশাহী ১, রংপুর ১। এ তালিকার দিকে তাকালে একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার চোখে পড়বে। তদানীন্তন চব্বিশ পরগনা জেলায় একটিও কলেজ ছিল না। এ যেন গল্প হলেও সত্যির মত খবর। এখন চব্বিশ পরগণা জেলায় কলেজের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ, যেখানে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সময়ে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে কলেজের সংখ্যা ছিল মাত্র উনসত্তরটি। মেদিনীপুর এক লাফে তিন থেকে উঠে গেছে একত্রিশে; কলকাতায় তেইশের জায়গায় হয়েছে নব্বইটি কলেজ। শিক্ষা-বিস্তার আশানুরূপ হয় নি ঠিকই, তবে যা হয়েছে তাই বা মন্দ কি! কিন্তু এর প্রতিফলন বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে—প্রচার সংখ্যা এবং বিষয় বৈচিত্র্যে—দেখা যাচ্ছে না কেন?

স্কুল-কলেজ ছাড়া জ্ঞানচর্চার আরও একটি কেন্দ্র হল, সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি। এর সঠিক সংখ্যা ঠিক জানা যায় না। তবে বর্তমানে বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন গ্রন্থাগারগুলির বিশদ বিবরণ তৈরি করছেন। ঐখান থেকে জানা গেল যে, আটটি সরকারী ও প্রায় আট শ'টি স্পনসর্ড গ্রন্থাগার সমেত বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে পাঠগৃহের সংখ্যা পাঁচ হাজারের মত।

পরীক্ষার্থী ও পড়ুয়ার সংখ্যা যথেষ্ট। এর মধ্যে যদি শতকরা ১০ জনও পাঠাভ্যাসও বজায় রাখে তা হলে বাংলা বইয়ের পাঠকের সংখ্যা কেন এত কম? অঙ্কশাস্ত্র এর ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম। জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাংলা বইয়ের হিসেবের বিশ্লেষণ দেখলে দেখা যাবে যে, শুধু টাইটেলের সংখ্যা কমতির দিকে নয়, বৈচিত্র্যও বছর বছর কমতির দিকে। পরবর্তী ৫০ পৃষ্ঠার সারণী দেখলে ব্যাপারটি বোঝা যাবে। উক্ত সারণী দেখে এক লহমায় এই সিদ্ধান্তে আসতে অসুবিধা হয় না যে, শিক্ষা-ব্যবস্থার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের (টাইটেলের) সংখ্যা কমে যাচ্ছে! ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য। ব্যতিক্রম একমাত্র ধর্মের বইয়ের ক্ষেত্রে। তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। অথচ জাতিগঠনমূলক বই (অর্থাৎ সমাজবিদ্যা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা)-এর ক্ষেত্রে অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হচ্ছে—যেখানে আমাদের দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রসর হচ্ছে। ভারতের অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রে এই দীন অবস্থা দেখা যায় না। অবস্থাটি বোঝার সুবিধার জন্য বাংলা, হিন্দী, মারাঠী ও তামিল ভাষায় ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, সমাজবিদ্যা এবং সাহিত্য সম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রকাশনের হার (শতকরা হিসাবে) নিচের তালিকায় দেওয়া হল:—

| | বাংলা | হিন্দী | মারাঠী | তামিল |
|---|---|---|---|---|
| বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা | ২·৬৩ | ৩·৩৯ | ১৭·৪৬ | ৮·১১ |
| সমাজবিদ্যা | ৪·২৪ | ৫·৪১ | ৩৯·৬৯ | ১২·১৬ |
| সাহিত্য | ৬০ | ৬৭·৮৬ | ২৩·৯৮ | ৫৪·৩৭ |

দশ বছরের প্রকাশিত বইয়ের যে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে 'ইতিহাস, জীবনী ইত্যাদি' সম্বন্ধে কিছু বলার আছে। যদিও শিরনাম 'ইতিহাস, জীবনী' কিন্তু সেখানে যে সংখ্যাগুলি দেওয়া হয়েছে তার সবই প্রায় জীবনী বিষয়ক এবং জীবনীর মধ্যে

[illegible] আছে [illegible]। [illegible] যদি আমরা [illegible], [illegible] যোগ দিই তা হলে দেখা [illegible] প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা [illegible]। [illegible] শিক্ষায় অবনতি, অন্যদিকে বাংলা বইয়ের [illegible] বাজারে এক মেয়েলি! 'ইংরেজ' বলেন [illegible] বসন্ত হয় না—অর্থাৎ আর পাঁচ রঙের [illegible] পত্রও চাই। বাংলা সাহিত্যের উদ্যানে যদি [illegible] ঋতু এসে থাকে তা হলে কোকিলও থাকবে, [illegible]ও থাকবে, লক্ষ্মীপেঁচাও থাকবে, হতুম-[illegible]ও থাকবে। মনোরাজ্যে যখন নানা পক্ষ আছে [illegible] নানা পক্ষী থাকাও স্বাভাবিক। যেমন এক "বউ-[illegible]" দিয়ে কবিতা হয় না, তেমনি এক "চোখ-[illegible]" দিয়ে দর্শনও হয় না।' (প্রমথ চৌধুরী)

হাল আমলের এক দশকের হিসাব দেখলাম। [illegible] তার পূর্বের চিত্রটি কি রকম ছিল তা দেখা যাক। ১৮৭০ সাল থেকে কয়েক বছর অন্তর অন্তর মোট প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা এখানে দেওয়া হল : —

১৮৭০ — ৩৮৫টি; ১৯৩০ — ১,০২৯টি
১৮৮০ — ৮৯৮টি; ১৯৪০ — ১,৮৮৪টি
১৮৯০ — ৭০৮টি; ১৯৪৭ — ১,০১৮টি
১৯০০ — ৯০৯টি; ১৯৫০ — ৭১৫টি
১৯১০ — ১,১৯৪টি; ১৯৬১-৬২ — ২,০৪৩টি
১৯২০ — ১,১৭৭টি; ১৯৬৫-৬৬ — ১,৪২২টি

অর্থাৎ ১৯১০ সালে যেখানে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা (টাইটেল) ১,১৯৪ খানা। সেখানে ১৯৭৭-৭৮তে ১,১০৪ খানা। এর পরের বছরের (১৯৭৮-৭৯) অবস্থা আরও করুণ—১,০৩৯ খানা। শিক্ষা বিস্তারের ফল হাতে হাতে পাওয়া যাচ্ছে!

| | ৬৮-৬৯ | ৬৯-৭০ | ৭০-৭১ | ৭১-৭২ | ৭২-৭৩ | ৭৩-৭৪ | ৭৪-৭৫ | ৭৫-৭৬ | ৭৬-৭৭ | ৭৭-৭৮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| দর্শন, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি | ৪৭ | ২৪ | ৩৩ | ৩৫ | ২০ | ৪৮ | ২৪ | ৩২ | ৪৪ | ৩৮ |
| ধর্ম | ১০৩ | ৯৯ | ৮৬ | ৮৬ | ৪১ | ১০২ | ৫৮ | ৯০ | ১২৬ | ১৭০ |
| সমাজ বিদ্যা | ১৬৩ | ১৩৩ | ১৩২ | ১০৭ | ১১৫ | ৫৬ | ৭৪ | ৫৭ | ১০৯ | ৭৬ |
| ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ ইত্যাদি | ৪৪ | ২৯ | ১৫ | ২৫ | ১৮ | ১২ | ১২ | ৫ | ২৬ | ২৬ |
| বিজ্ঞান | ৭০ | ৬২ | ৬৬ | ৬৯ | ৩৩ | ২০ | ১৮ | ১৮ | ৩৮ | ৬৬ |
| প্রযুক্তিবিদ্যা | ৮৩ | ৬৫ | ৩৪ | ২৭ | ১৭ | ২৭ | ২৬ | ১৮ | ১৬ | ২৬ |
| ললিতকলা, খেলাধুলা ইত্যাদি | ৮০ | ৫৪ | ৭০ | ৪৮ | ৫৮ | ১০৮ | ৬৫ | ৪৮ | ৫৩ | ৩৪ |
| সাহিত্য | ৭৭৪ | ৬২৮ | ৬০৩ | ৬০৫ | ৫৭৯ | ৬৮১ | ৫২৯ | ৫৫২ | ৬৫৯ | ৫৩০ |
| ইতিহাস, জীবনী ইত্যাদি | ২৩৮ | ২২৫ | ২৬১ | ২০২ | ১৪৬ | ১৪৮ | ১৪৭ | ১৩৭ | ২৫৮ | ১৪৫ |
| বিবিধ | ৫২ | ৫৭ | ৫০ | ৫৬ | ২৬ | ৬৬ | ১৭ | ২২ | ১৮ | ১৬ |
| মোট : | ১,৬৫৪ | ১,৩৭২ | ১,৩৬৯ | ১,২৮৪ | ১,০৫৩ | ১,২৭১ | ৯৭০ | ৯৭৯ | ১,৩৩৯ | ১,১০[illegible] |

বাংলা বই না চলার অন্যতম কারণ, যে-সব বাঙালী জ্ঞানের চর্চা করেন তাঁদের বেশির ভাগই বাংলা বই থাকলেও তার উপর ভরসা করতে পারেন না, পক্ষান্তরে তাঁরা ইংরেজী বইকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন। কিন্তু ভুলত্রুটি কি ইংরেজী বইয়ে থাকে না? ঐ সব 'অথেনটিক' বইয়ে '...পুরী, নিয়ার ক্যালকাটা...' জাতীয় অসতর্ক উক্তি যত্রতত্র। এগুলিকে তবুও নয় ক্ষমা-ঘেন্না করে নেওয়া গেল। কিন্তু তাই বলে 'জামসেদপুর ইজ দি সুবার্ব অব ক্যালকাটা'কে সহ্য করা যায় কি করে! কনসাইজ অক্সফোর্ড ডিক্সনারীতে পাকিস্তান সম্পর্কে লেখা আছে, '...প্রোপোজড সেপারেট মোসলেম স্টেট (এসটাবলিসড অ্যাজ এ সেপারেট ডোমিনিয়ন ইন ১৯৪৭)...'। পাকিস্তান সৃষ্টির পর অভিধানটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে এবং তারপর ১৯৬৪ সালের পঞ্চম সংস্করণে এই 'প্রোপোজড' কথাটিও বর্তমান! ঐ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের অপর একটি অভিধান 'অ্যাডভানসড লারনার্স ডিক্সনারী' (২য় সংস্করণ, ১৯৬৩)-তে একটি কৌতূহলজনক তথ্য দেওয়া আছে। উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টের এক জায়গায় বলা হয়েছে যে সাড়ে পাঁচ গজে এক রড, বা এক পোল ইত্যাদি। আবার বলা হয়েছে ৪৮৪০ বর্গ গজে এক বর্গ রড ইত্যাদি! সাড়ে পাঁচ গজ গুণিত সাড়ে পাঁচ গজ কোনো দেশীয় অঙ্কশাস্ত্র অনুযায়ী ৪৮৪০ বর্গ গজ হয়! ব্যাপারটি হবে ৩০·২৫ বর্গ গজে এক বর্গ রড বা এক বর্গ পোল। না হয় হবে ৪৮৪০ বর্গ গজে এক একর। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে অ্যানি বেসান্ট সম্বন্ধে বলা হয়েছে '...বিকেম দি ফার্স্ট অ্যান্ড অনলি ইংলিশ ওম্যান টু সার্ভ অ্যাজ প্রেসিডেন্ট অভ দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস...'। নেলী সেনগুপ্তার পদবীটি 'অনলি' শব্দটির জন্য দায়ী। এরকম আরও অনেক 'অথেনটিক' উদাহরণ দেওয়া যায়।

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা এসে পড়ে। কিছু কিছু সংস্থা পুরনো নাম করা বই নতুন করে বার করছেন, বিশেষত গ্রন্থাবলী জাতীয় বই। এগুলির মধ্যে বেশ কিছু বই ভালই বিক্রি হচ্ছে অর্থাৎ কয়েক হাজার করে। এর দ্বারা কিন্তু প্রমাণ হয় না যে বাঙালী বই কেনে বইয়ের জন্য। এঁদের বেশির ভাগই কোন ঘর সাজাবার জন্য। যাঁদের বাড়িতে একটি ঘর আছে [illegible] রচনাবলী। দু-চারজন যাঁরা রেফারেন্সের জন্য কিনেছেন তাঁরা ছাড়া আর সবাই ঐ বই কোনদিনও ঘাটবেন না—পড়া তো দূরের কথা। উপরন্তু এই সব পুরনো সৃষ্টি কিনে তো কৃষ্টি-সংস্কৃতির চর্চাকে আগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। নতুন সৃষ্টি চাই আর তার পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে।

তা হলে কি দাঁড়াচ্ছে, স্কুল-কলেজে পড়ুয়ার সংখ্যা যত বেড়ে যাবে বাংলা বই ততই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়বে! ব্যাপারটি যখন তাই তখন বুঝতে হবে এই শিক্ষা-ব্যবস্থা আগাগোড়া ত্রুটিপূর্ণ। বেশ কয়েক বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তদানীন্তন সভাপতি একবার একটি বেফাঁস কথা বলে ফেলেছিলেন। পরীক্ষা ব্যবস্থার অনেক রকম কেলেঙ্কারি তখন পর পর কাগজে প্রকাশিত হচ্ছিল। পাস-ছেলেকে ফেল, ফেল-ছেলেকে পাস। এর নম্বর ওর মার্কশীটে ইত্যাদি। সাংবাদিকদের নানান প্রশ্নের উত্তরে বেকায়দায় পড়ে তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে ভাল ভাল স্কুলের ছাত্রদের এই অব্যবস্থায় যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে না হয় তার জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ ভীষণ সতর্ক। তাতে সাংবাদিকরা যখন তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'ভাল স্কুল মানে?' 'খারাপ স্কুল আছে নাকি?' 'তা হলে তাদের অনুমোদন বাতিল করছেন না কেন?' ইত্যাদি। ভদ্রলোক মহা ফাঁপরে পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি ব্যাপারটি বোধহয় ঠিকই বলেছিলেন। ভাল স্কুল বলতে তিনি বোধহয় বলতে চেয়েছিলেন, ইংরেজী মাধ্যম স্কুল এবং সরকারী স্কুলগুলির কথা। এখানে তবু কিছু কিছু পড়াশুনা হয়। বাকি স্কুলগুলি লোক-দেখানো বা লোক-ঠকানোর জন্য। তাই বছর বছর পড়ুয়া ও পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা বাড়ছে—প্রকৃত শিক্ষার প্রসরণ বিন্দুমাত্র হচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে 'নেটিব' স্কুল থেকে যারা বের হচ্ছে তাদের প্রায় সবাই জড় ভরত আর তথাকথিত 'ভাল' স্কুল থেকে যারা আসছে তারা প্রায় সবাই হচ্ছে কেরিয়ার সর্বস্ব। এই দু দলের কারোরই বাংলা বইয়ের প্রয়োজন হবার কথা নয়। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় আপাতদৃষ্টিতে সবই আছে অথচ তা ফলপ্রসূ হচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'প্রদীপে অজস্র তেল ঢালিতে পারিলেও দীপ জ্বলে না এবং সলিতা পাকাইবার নৈপুণ্যে সুদক্ষ হইয়া উঠিলেও দীপ জ্বলে না। যেমন করিয়াই হউক, আগুন ধরাইতে হইবে।' (পথের সঞ্চয়) আমাদের [illegible] একটি আদর্শ। এমনটি মহৎ উজ্জ্বলতা। যা ছাত্রদের উদ্দীপ্ত করতে পারবে। উপরন্তু বর্তমা[illegible] স্কুলগুলির পরিবেশ যা হয়েছে তাতে দু-এক[illegible] কথা বাদ দিলে সেখানে স্কুলিং বলতে যা বোঝ[illegible] তা হয় না। স্কুলগুলির এই দীনতা তখনই আ[illegible] বেশী করে প্রকট হয়ে পড়ে যখন দেখা যায় [illegible] কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকা তাঁর নিজের পুত্র বা কন্যা[illegible] নিজের স্কুলে ভর্তি না করিয়ে কোন 'ভাল' স্কু[illegible] ভর্তি করবার জন্য ছুটোছুটি করছেন। পশ্চি[illegible] অনেক দেশে 'নেবারহুড স্কুল' প্রথা চালু, আ[illegible] অর্থাৎ সবচেয়ে নিকটবর্তী স্কুলে বাপ-মা তাঁদের প[illegible] কন্যাকে ভর্তি করতে বাধ্য। এখানেও ঐ প্রথা চ[illegible] হলে স্কুলগুলির পরিবেশ অন্তত ভাল হবে। [illegible] হতে পারে বাংলা বইয়ের সংকটের সঙ্গে এর [illegible] সম্পর্ক? গোড়া কেটে আগায় জল ঢালার [illegible] সার্থকতা নেই। ভিত চাই পাকাপোক্ত। তাই শি[illegible] ব্যবস্থাকে সবাগ্রে ত্রুটি মুক্ত করতে হবে।

সাধারণ গৃহিণীদের জন্য ব্যবসায় তবু এখ[illegible] চালু আছে। বেশির ভাগ গৃহিণীর, সংসারের ব[illegible] সারবার পর এবং দিবানিদ্রার আগে, একটি বই[illegible] প্রয়োজন হয়; এবং তা উপন্যা[illegible] রম্যরচনা, ভ্র[illegible] কাহিনী বা ঐ জাতীয় [illegible] হওয়া চাই। এই [illegible] যোগান দেবার দায়িত্ব পাড়ার গ্রন্থাগারগুলির। সেই [illegible] গ্রন্থাগারগুলি উপন্যাস ইত্যাদি বই নিয়মিত কেনে। [illegible] যে স্বল্প সংখ্যক বাঙালী এখনও বই কেনেন তার বে[illegible] ভাগই অবিবাহিত পুরুষ। কেবলমাত্র তাই নয় বিবা[illegible] পুরুষদের তুলনায় অবিবাহিত পুরুষরা ব্যক্তিগতভ[illegible] অনেক বেশী পরিমাণ বই কেনেন। গৃহিণীরা [illegible] পছন্দ করেন ঠিকই তবে বই স্থায়ীভাবে বাড়ি[illegible] আসন পেতে বসবে—এ তাঁরা ভাবতেও পারেন [illegible] তাই 'ঘরের লোকটি' বই কিনতে চাইলে প্রবল ব[illegible] আসে ঐ গৃহিণীদের কাছ থেকে। যুক্তি : বই রাখ[illegible] ঘরে নোংরা জমে, জঞ্জাল হয়ে ওঠে, ঘরদোর পরিষ্ক[illegible] রাখা যায় না। এ এক চিরন্তন দ্বন্দ্ব। 'মান্ধাত[illegible] আমল থেকে বউ আর বইয়ের বিরোধ চলে আসে[illegible] সেইজন্য একটিকে শেষ করে অপরটিকে ধরা উচি[illegible] বউ শেষ করে বই ধরবার মত পরমায়ু ভগ[illegible] মানুষকে দেননি; সেজন্য বই শেষ করে বউ [illegible] বুদ্ধিমানের কাজ।' (শশিনাথ—উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যা[illegible]

---

প্রকাশনা সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের জন্য শ্রীচিত্ত[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট কৃতজ্ঞ।

# পরমাত্মীয় দিলীপকুমার

গীতা বিশ্বাস

ছোটবেলায় তাঁর কথা কতো যে শুনেছি! আমার রাঙাকাকাবাবুর (শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু) পরম বন্ধু, আমার বাবা ও মা-র (স্বর্গত শরৎচন্দ্র বসু ও স্বর্গত বিভাবতী বসু) বিশেষ স্নেহভাজন—স্বর্গত দিলীপকুমার রায়। আমরা যখন বড় হলাম, তখন তিনি সংসার ত্যাগ করে পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দ আশ্রমে চলে গেছেন। তাই তাঁকে দেখবার ও তাঁর গান শোনবার সুযোগ এল অনেক পরে।

কবি ও নাট্যকার স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র স্বর্গত দিলীপকুমার রায়। আমার মা-র কাছে শুনেছি, রাজপুত্রের মত চেহারা, শৌখিন মানুষ দিলীপকুমার রায়ের কথা। গরদের ধুতি-চাদর পরনে, চোখে রিমলেস্ চশমা। গায়ের চাদর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ছে। যেমন অপরূপ রূপ তেমনি অপূর্ব গান। তখন তিনি তাঁর বাবার স্বদেশী-সংগীত, কবি নজরুল ইসলামের ও অতুলপ্রসাদের গান—এইসবই বেশী গাইতেন। মা বলেছিলেন, একবার এলগিন রোডের বাড়িতে গানের জলসা হলো, গাইলেন স্বর্গত কবি নজরুল ইসলাম ও স্বর্গত দিলীপকুমার রায়। অন্যান্য গানের সঙ্গে তাঁরা দুজনে মিলে "বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিস নে আজি দোল" এই গানটি গেয়ে আসর মাতিয়ে দিলেন। তখন তাঁর মাত্র একখানি রেকর্ড ছিল "রাঙাজবা কে দিল তোর পায়ে মুঠো মুঠো"। লোকে বলত "দিলীপকুমার রায় অফ 'রাঙাজবা' ফেম"। আমরা শুধু বারবার করে তাঁর ঐ রেকর্ডটি শুনতাম।

ইতিমধ্যে তাঁর আর একখানি রেকর্ড বেরিয়েছিল, পণ্ডিচেরী থেকে রেকর্ডিং করিয়ে আনা হিন্দুস্থান রেকর্ড কোঃ থেকে। গান দুটি হলো, "চমকে তিমির ঘির বিজলী" ও "মজল আমার মন-ভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে।" বহু দিন পরে ১৯৩৭ সালে তিনি অল্প দিনের জন্য কলকাতায় এলেন পণ্ডিচেরী থেকে। সেই সময়ে তাঁকে দেখবার ও জানবার সুযোগ হলো। আমরা দেখলাম গেরুয়া বসনধারী সাধক দিলীপকুমার রায়কে। শিশুর মত স্বচ্ছ মন, অফুরন্ত স্নেহ সকলের জন্য। হাসিতে আমোদে আনন্দের লহরী তুলে দিলেন। উডবার্ন পার্কের বাড়িতে মাঝে মাঝেই তাঁর গানের জলসা হতো। এক-একটি গান করতেন এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা ধরে। সমস্ত শ্রোতা স্তব্ধ হয়ে শুনত তাঁর অপূর্ব গলা ও গায়কী। এই সময়ে তিনি তাঁর বাবার স্বদেশী-সংগীত খুব বেশী গাইতেন না। তখন তাঁর মন আধ্যাত্মিক জগতে চলে গিয়েছে। ভজন, বাউল ও কীর্তনাঙ্গের গানগুলিই তিনি গাইতে ভালবাসতেন। কবি নিশিকান্তের অনেক গানে তিনি সুর দিয়েছিলেন। যখন তিনি প্রাণ ঢেলে উদাত্ত কণ্ঠে গান গাইতেন, মনে হতো তিনি এই পার্থিব জগতের অনেক ঊর্ধ্বে। তাঁর এই পরশকাঠির ছোঁয়া লেগে শ্রোতাদের মনও অন্যরকম হয়ে যেত। মনে আছে তাঁর গান "মজল আমার মনভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে", "জ্বলবার মন্ত্র দিলে মোরে", "সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম" ইত্যাদি। দিলীপবাবু গান গেয়েই চলেছেন, বাবা, রাঙাকাকাবাবু ও অন্য সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে আছেন। গান যখন শেষ হলো, তখন দেখলাম দুই ভাইয়ের চোখে জল। দিলীপবাবুকে তাঁরা সাদরে আলিঙ্গন করলেন। এইসব গানের আসরে অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি, বহু প্রসিদ্ধ গায়ক-গায়িকা উপস্থিত থাকতেন। স্বর্গত শচীন দেব বর্মন, স্বর্গত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, স্বর্গত পাহাড়ী সান্যাল প্রমুখ শিল্পীদের দিলীপবাবুর গানের সভায় দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। দিলীপবাবু গান শেষ করবার পর দেখেছি তাঁরা সসম্ভ্রমে মাথা নত করেছেন তাঁর স্বর্গীয় সংগীতকলার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে।

সে সময়ে দিলীপবাবু কলকাতায় এলে থাকতেন তাঁর মামা স্বর্গত খগেন্দ্রনাথ মজুমদারের থিয়েটার রোডের বাড়িতে। উডবার্ন পার্কে আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে এসে থাকতেন তিনতলার ঘরে। ঘরের সামনেই প্রশস্ত ছাদ। ভোরে উঠে গুনগুন করে গান করে ছাদে পায়চারি করতেন। বলতেন, আমাদের বাড়ির মত এত সুন্দর ছাদ তিনি দেখেননি। দিলীপবাবুর কাছে এ কথা শুনে অনেকে ছাদ দেখতে চাইতেন। বাবা অবাক হয়ে যেতেন। বলতেন, ছাদ তো সবাইয়ের বাড়িতেই থাকে। এর মধ্যে দেখবার মত কি আছে? এই ছাদে দিলীপবাবু গান গেয়ে শোনালেন মহাত্মা গান্ধীকে। গান্ধীজী তখন (১৯৩৮ সাল) আমাদের বাড়িতে রয়েছেন। দিলীপবাবুও তখন পণ্ডিচেরী থেকে এসেছেন। সন্ধ্যায় ছাদে মহাত্মাজীর প্রার্থনা-সভা হতো। সেই সময়ে ভজন ইত্যাদি গানও তিনি শুনতে ভাল-বাসতেন। দিলীপবাবু কয়েক দিন সন্ধ্যায় তাঁকে গান শোনালেন উমা বসু (হাসি) সহ। দিলীপবাবুর গান শুনে মহাত্মাজী মোহিত হলেন। উমার গান শুনে মহাত্মাজী তাকে "নাইটিঙ্গেল" বলে অভিহিত করলেন।

আর একদিনের কথা। দিলীপবাবু ক'টা দিন উডবার্ন পার্কে কাটাচ্ছেন। একদিন মধ্যাহ্নভোজে নিমন্ত্রিত হলেন তাঁর দুজন বন্ধু—শাহিদ সুরাবর্দি (বাগেশ্বরী প্রফেসর) ও স্বর্গত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী। সঙ্গে অবশ্যই ছিলেন আমার রাঙাকাকাবাবু শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু। এই চতুর্মিলনের দৃশ্য কেন এত মনে আছে জানি না। সারা দিন ধরে তাঁদের চলল নানা রকম আলোচনা। সব কথা বোঝবার বিদ্যাবুদ্ধি বা বয়স তখন হয়নি। তবে বুঝেছিলাম এঁরা সকলেই আলাদা ও উঁচু ধরনের মানুষ।

দিলীপবাবুর সঙ্গে তাঁর মামার বাড়িতে প্রায়ই যেতাম। তাঁর মামাতো ও মাসতুতো বোনেদের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তাঁর মামা ও মামীমার কাছে অনেক স্নেহ পেয়েছি। দিলীপকুমার যে তাঁদের কতো আদরের তা বেশ বুঝতে পারতাম। আমাদের বাড়িতে নিজে এসে আমাকে নিয়ে যেতেন থিয়েটার রোডে। গান করতে করতে সারা রাস্তা হাঁটতেন। থিয়েটার রোডে তাঁর বোনেদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে গান শিখতাম। সে কি আনন্দের দিনগুলি! এ ছাড়া দিলীপবাবুর সঙ্গে তাঁর গানের জলসায় অনেক জায়গায় গেছি। আর গেছি তাঁর বোন মায়া দেবীর বাড়িতে। মায়া দেবীর বিয়ে হয় স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে স্বর্গত শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যারাকপুরের বাড়িতে তাঁরা থাকতেন। গঙ্গার ধারে ভারি সুন্দর বাড়ি। স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একমাত্র পুত্র স্বর্গত দিলীপকুমার রায় ও একমাত্র কন্যা স্বর্গত মায়া দেবী। তাঁরা অল্প বয়সে মাতৃহারা হন। স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল মাতৃবৎ স্নেহে পুত্র-কন্যাকে পালন করেছিলেন। তাঁর কবিতা 'ঘুমন্ত শিশু' দিলীপবাবুকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

কলেজ-জীবনে সুভাষচন্দ্র ও দিলীপকুমারের প্রথম আলাপ। কৈশোরের বন্ধুত্ব দিলীপকুমার ও সুভাষচন্দ্র জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন, যদিও তাঁদের মত ও-পথের অনেক পার্থক্য ছিল। দিলীপকুমার ছিলেন সন্ন্যাসী, সুভাষচন্দ্র সৈনিক। কিন্তু তাঁদের মধ্যে ভালবাসার অভাব ছিল না। এক খাটে দুই বন্ধু জড়াজড়ি করে

শুয়ে সারা রাত গল্প করে কাটিয়ে দিয়েছেন দেখেছি। এইসব দেখে আমাদের শ্রদ্ধেয়া ঠাকুমা ('বাসন্তী দেবী) শংকিত হয়ে পড়েছিলেন পাছে না দিলীপ সুভাষকে সন্ন্যাসের পথে টেনে নিয়ে যায়। একদিন বললেন 'দেখ সুভাষ, তুই দিলীপের সঙ্গে বেশী মিশবি না। ওর মত তুইও কবে আশ্রমে চলে যাবি সেই ভয় করে।' শুনে রাঙাকাকাবাবুর কি হাসি। সুভাষচন্দ্রের অন্য লক্ষ্য অন্য পথ—'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।' তবুও মায়ের মন মানতে চায় না।

দিলীপবাবুর বিরাট পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা দেশের ছেলেমেয়েদের কল্যাণে লাগুক—এই ছিল সুভাষের কাম্য। বারবার তিনি বলতেন 'দিলীপ, দেশকে তোমার অনেক দেবার আছে, তুমি কিছু দিয়ে যাও।" দেশ কতোখানি তা গ্রহণ করেছে জানি না।

দিলীপবাবুর কাছে কন্যাসম স্নেহ পেয়ে ধন্য হয়েছি কিন্তু তিনি 'দাদা' বলে পরিচিত হতে ভালবাসতেন। রাঙাকাকাবাবু বলেছিলেন, "আচ্ছা দিলীপ, তুমি গীতার দাদা হলে কি করে? তুমি তো আমার বন্ধু, আর আমি গীতার কাকা। অতএব তুমি গীতার কাকা হও।" দিলীপবাবু বলে উঠলেন, "না, না, ও-সব কাকা-টাকা আমার ভাল লাগে না—বুড়ো হয়ে যাব যে। আমি গীতার দাদাই হব।"

পরে তিনি পণ্ডিচেরীর অরবিন্দ আশ্রম ছেড়ে পুনেতে চলে যান। মাঝে অনেক দিন কলকাতায় তিনি আসেননি। আমিও বাইরে বাইরে ঘুরেছি, তাঁর সঙ্গে সংযোগের সুযোগ ঘটেনি। ১৯৬৪ সালে আমরা নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর উদ্যোগে দিল্লীতে নেতাজীর আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করি। এই প্রদর্শনীতে চিত্রে নেতাজীর জীবন-আলেখ্য দেখে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ, উপ-রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেন ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী চমৎকৃত হয়েছিলেন। আমাদের কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ডঃ সি ডি দেশমুখ, সম্পাদিকা শ্রীমতী কল্যাণী ভট্টাচার্য এবং অন্যতম সদস্য শ্রী সি সি দেশাই, শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথ প্রমুখরা। শ্রী সি সি দেশাই রাঙাকাকাবাবু ও দিলীপবাবুর সঙ্গে বিলাতে একসঙ্গে ছিলেন এবং তাঁদের বিশেষ বন্ধু ও ভক্ত। দিলীপবাবুকে চিঠি লেখা হলো তিনি যদি প্রদর্শনীর সময়ে দিল্লীতে আসেন ও সুভাষ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলেন। দিলীপবাবু সানন্দে রাজী হলেন ও আমাদের আমন্ত্রণে পুনে থেকে দিল্লীতে এলেন। সঙ্গীত ও বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি দিল্লীর প্রাণে আলোড়ন তুলে দিলেন। দিল্লীবাসীরা তাঁর গান শোনবার সুযোগ আগে বেশী পায়নি। অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যাণ্ড ক্রাফটস সোসাইটি হলে লোক ধরে না। দিলীপবাবু নানা ভাষাবিদ ছিলেন এবং অনেক বিদেশী সুরও তিনি আমাদের বাংলা গানে আরোপ করেছিলেন। সেদিন তিনি গাইলেন তাঁর বাবার (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) "যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ" গানটি। পরে শোনালেন ঐ গানের হিন্দী, জার্মান, স্প্যানিশ ও ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গেয়ে। আরো দুটি স্বরচিত স্মরণীয় গান তিনি শোনালেন। প্রথমটি সুভাষচন্দ্রকে উদ্দেশ করে লেখা। তার কয়েকটি লাইন এখানে উদ্ধৃত করছি :

You sang the Gita's song of songs:
"Up! quell the shadows' tyranny!"
And so our Lord of Dawn booned you
with the crown of immortality.
You chanted the Gita's deathless hymn,
"Wage war we must to do His will,
And charge the embattled alien hordes
and dying to night, His Morn reveal;
We'll cross the seven seas, ride the storm
and rule the waves—may bless us God:
We'll stake our all for the All—in all,
redeem our Motherland with
our blood."

চীন-ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সেনাবাহিনীকে উদ্দেশ্য করে তাঁর রচিত গানও তিনি সেদিন আমাদের শোনালেন। তার সঙ্গে সঙ্গে করলেন তাঁর আজীবন বন্ধু সুভাষের স্মৃতিচারণ।

তাঁর সঙ্গে শেষবারের মত দেখা হয়েছিল ১৯৭৬ সালে কলকাতায় শ্রীমিলন সেনের বাড়িতে। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম আমার অটোগ্রাফ বইটি, যাতে তিনি ১৯৩৭ সালে নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখে দিয়েছিলেন। নিজের লেখা কবিতাটি একবার পড়লেন, তারপর তার নীচে সই করে দিলেন।

"গীতা,
স্নেহ তোমার রইবে মনে যখন যাব দূরে,
শুভ্র তোমার কান্তি স্বভাব সুন্দর মধুরে।
তোমার তরে তাই করি প্রার্থনা
হোক তোমার এই জীবন আরাধনা,
সুররাজের সুরেই মেলাও এই স্বভাবের সুর
তা হলে সব নিগড় হবে আনন্দ নূপুর।"
—দিলীপদা

তার নীচে আবার তাঁর স্বাক্ষর ২৭।১।৭৬ তারিখে।

ইন্দিরা দেবীকে বললেন, "জানো ইন্দিরা, গীতাকে কতো যে কোলে করেছি। আমার কোলে উঠতে ও খুব ভালবাসত।" আমি বললাম, "আপনি যদি অনুমতি দেন, আজও আমি আপনার কোলে বসতে পারি।"। শুনে তাঁর সেই প্রাণখোলা হাসি হাসলেন।

কানে কিছুটা যেন কম শুনতেন। চোখের দৃষ্টিও ম্লান হয়ে এসেছিল। কিন্তু সেই মন, সেই প্রাণ, সেই মন-ভোলানো হাসি ছিল আগের মতই।

এই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ।

## কাছাকাছি থেকো

**মতি মুখোপাধ্যায়**

'কাছাকাছি থেকো তুমি, বেশি দূরে কোথাও যেয়ো না'
সতর্ক ধ্বনির মতো মার কথা আজো মনে পড়ে
আমি তো চাইনি যেতে চেনা জল চেনা রোদ থেকে
কুয়াশার ঘেরাটোপে

গাছের একটি পাতা, খুব চেনা পাতা
খসে যেতে দুঃখ পাই
পাতাটা কুড়িয়ে এনে ফিসফিস বলি
মা'র কথা কেন শুনলে না
সদর দরোজা খুলে কেন তুমি
ফেরিঅলা বাতাসের ডাকে ছুটে গেলে?

এইসব বলি, তবু বেড়ে যায় আমারি বিরহ
বেতস লতার মতো জন্ম থেকে দূরে যাই
ক্রমশঃ বিচ্ছেদ বাড়ে
দুরন্ত বেড়ে চলে কৈশোরের যৌবনে থেকে
সূচীমুখ কান্না নিয়ে ভালোবাসা যায়
পড়ন্ত রোদের মতো আমার সময়
তবু যাই, যেতে হয় দূরে
আরো আলো আরো তাপ উৎসবের দিকে
চেনা জল চেনা রোদ ছেড়ে এই যাওয়া
প্রতিদিন অগস্ত্যের মতো।

মনে পড়ে মার কথা।
'কাছাকাছি থেকো তুমি, বেশি দূরে কোথাও যেয়ো না।'

## ভিখারী

**চন্দন মুখোপাধ্যায়**

চারটে দেওয়াল সরে গেছে খুব দূরে
ছাদ উঠে গেছে অনেক শূন্যে, ফাঁকা
ঘর ব'লে আর কিছু নেই পৃথিবীতে
শীতের বাতাস সব দিকে ব'য়ে গেলো।

রাত একটায় দু' পা বাড়িয়েছ তুমি
এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে খুব ধীরে
তোমাকে ভীষণ শাশ্বত মনে হ'লো
শীতের বাতাস সব দিকে ব'য়ে যায়।

কোনো মানে নেই তবু তুমি উদাত
পৃথিবী ভাঙছে গ'ড়ো গ'ড়ো ওই পায়ে
তোমার মুখের রেখা আমি দেখব না
শীতের বাতাস সর্বদিকে ব'য়ে যাক।

## উৎকীর্ণ বিষাদ

**উজ্জ্বল সিংহ**

শোকস্তব্ধ রাত্রি ঘিরে হে মেঘোৎক্ষিপ্ত শিলারাশি
এসো নষ্ট পৃথিবীতে এসো, ভাঙো গান, অবনত স্বপ্নের সম্ভার
হলুদ সর্পের ক্রীড়া শুরু হলো এইবার অবাধ্য শয্যায়
তড়িৎ প্রবাহ কেটে ফুটেছে নিষ্প্রাণ তারা আঁধার আকাশ
এই রাত আত্মঘাতী হবে।

গোপন প্রবাহ থেকে দূরে প্রবল পাহাড়ে
পাথরযন্ত্রণা ফেটে উড়ে যায় মর্মজ্বালা মানুষের সফল গোলাপ
ওগো ব্যর্থ শাদা শিলা, নবীন ঘরের ছাদে বেজে ওঠো নিপুণ মঞ্জীর
সজোর পবনে বহো বিধুর শ্রাবণ, কাঁপো শস্য
ক্ষেতের কল্লোলে ভ্রষ্টাচার উড়ে যাক পতঙ্গধ্বংসের ধ্বনি হয়ে।

প্রান্তর ভাসিয়ে ওড়ে বিজয়পতাকা ওড়ে ছেঁড়া পায়জামা
তীরন্দাজ শতাব্দীর হাত ভাঙে ক্রস ভাঙে স্মৃতির ফলক
ভৌগোলিক চতুঃসীমা ছুঁয়ে হে কুটিল হাওয়ার গীটার
গেয়ে ওঠো সেমেটারি গান।
মলিন কার্পাসে মাগো লেগে আছে সন্তানের কিছু ভুল নারীপ্রেম।

## দেখা যেতো

**দেবাশিস বসু**

আসলে আমাকে নয়, ফিরিয়েছো এক মুঠো হাওয়া
হাওয়ার ভেতরে ছিলো করঞ্জা ফুলের ঘ্রাণ
আরো কত কী যে
আমিও জানি না,
জীবনযাপনে মিশে যেরকম পাগল পাগল ছিলো দিন
যেভাবে এলেন মেঘ মাননীয় অতিথির মতো,
লঘুভার, ঘুরে বেড়ালেন—
ছেঁড়া ছেঁড়া এইসব দৃশ্য মনে আছে ;
অথচ যখন বৃষ্টি সহস্র আঙুলে আঁকিবুকি
খেলাছিলো জংলা কাঁথায়
মনে হ'লো বুঝি আমন্ত্রণ—
না-হ'লে কি পাওয়া যেতো এক জীবনের ভুল, অমন সহজে
একদিনে,
এবং তোমাকে নয়
দেখা যেতো তোমার আলোয়া!

# অরণ্যদেব

* অরণ্যদেবকে রাজা বলে ওয়াকার-কাকা

ক্রমশ ● ৩৮
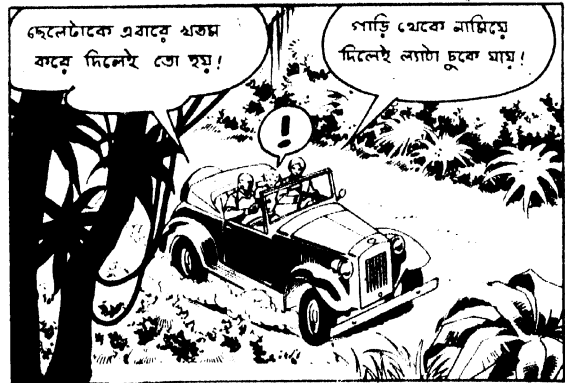
# এশীয় টেবল টেনিসে চীনাদের জয়জয়কার

চীনা নামগুলি আমাদের পক্ষে মনে রাখা একটু শক্ত। এবং নাম থেকে বোঝাও শক্ত কে পুরুষ, কে মেয়ে। যেমন— শি জি-হাও, জাই সাইকে, গুয়ো উইয়ে-হুয়া, কাই জেন-হুয়া হুয়াং লিয়াং জা ডাইং; টং লিং; কী বাও-জিয়াং, লিউ ইয়াং প্রভৃতি। আন্তর্জাতিক টেবল টেনিসে ক্রীড়া দক্ষতার জন্যই চীনাদের চিনে রাখতে হয়, জেনে রাখতে হয় কে পুরুষ কে মেয়ে।

ইডেনে নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে মে মাসের ১০ থেকে ১৮ তারিখ পর্যন্ত যে পঞ্চম এশিয়ান টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ হয়ে গেল সেই প্রতিযোগিতার দলগত ও ব্যক্তিগত ইভেন্টের খেলা দেখে চীনের মেয়ে পুরুষদের আমরা ভাল করেই চিনে রেখেছি, যেমন চিনেছিলাম ৭৫ সালে ওই ইনডোর স্টেডিয়ামেই বিশ্ব টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে চীনের শি য়েন-টিং, লিয়াং কো-লিয়াং, লি চেন-শি, সু সাও-ফা, চ্যাং লি, কে শিন-আই হু উ-লান প্রভৃতিকে।

কিন্তু অকপটে স্বীকার করছি, চীনের কোন পুরুষ বা কোন্ মেয়ে টেবল টেনিসে সবশ্রেষ্ঠ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে যেমন সঠিক হদিস পাইনি, তেমন এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপেও প্রমাণ হয়নি পুরুষ বিভাগের চ্যাম্পিয়ন শি জি-হাও এবং মেয়ে বিভাগের চ্যাম্পিয়ন কী বাও-জিয়াং সর্বশ্রেষ্ঠ কিনা। টেবল টেনিসের উন্নত কলাশৈলীতে সবাইকেই প্রায় সমদক্ষ বলে মনে হয়েছে। টপস্পিন লুপড্রাইভ স্ম্যাশ, ড্রপশট, চপ-এর রকমফের এবং সার্ভিসে কেউ বুঝি কারো চেয়ে কম নয়। অবশ্যই মারের পরিমার্জনে ইতর বিশেষ আছে। যেদিন যে সময়ে যে খেলোয়াড়ের হাত ভাল খুলেছে সেই জিতে গেছে। পুরুষ বিভাগের সেমিফাইনালে সকালে দেখলাম বিশ্বের দুই নম্বর খেলোয়াড় এবং প্রতিযোগিতার এক নম্বর বাছাই গুয়ো উয়ে-হুয়াকে প্রায় নাস্তানাবুদ করে স্ট্রেট গেমে জিতল ১৮ বছরের তরুণ জাই সাইকে। আবার সন্ধ্যায় ফাইনালে দেখলাম ওই সাইকেরই খেলা খুলল না শি জি-হাওয়ের বিরুদ্ধে। কিছুটা সহজেই হেরে গেল।

এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে আর যেটা দেখলাম তা হচ্ছে চীন, জাপান, উত্তর কোরিয়া, হংকং প্রভৃতি দেশের খেলোয়াড়দের পেনহোল্ড গ্রিপের বৈশিষ্ট্য আর বজায় থাকছে না। শেকহ্যান্ড গ্রিপে খেলেও সমান নৈপুণ্যের পরিচয় দিচ্ছে। এই চ্যাম্পিয়নশিপে মাধ্যমিক মধ্যে অনেকই খেলছে শেকহ্যান্ড গ্রীপে। বিশিষ্ট নামগুলি চ্যাম্পিয়ন শি জি-হাও (চীন), হুয়াং লিয়াং (চীন—বিশ্বের ১৭ নম্বর), টং লিং (চীন—বিশ্বের ৪ নম্বর মেয়ে), হিদেও গোটো (জাপান—বিশ্বের ১৬ নম্বর), কেনেচি ইকেদা (জাপান—মেয়ে), বাই ওয়াদা (জাপান—মেয়ে) লি সং সুক (উত্তর কোরিয়া—বিশ্বের ২ নম্বর মেয়ে), হং গেল সন (উত্তর কোরিয়া) প্রভৃতি।

বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে এবার সার্ভিসেও। খুব উঁচুতে বল তুলে ব্যাটের আলতো ছোঁয়ায় স্পিনের বিষ মিশিয়ে আমরা প্রথম সার্ভিস করতে দেখেছিলাম চীনের সু সাও-ফাকে ৭৫-এর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে। সু সাও-ফা প্রচুর পয়েন্ট নিয়েছিল সার্ভিস থেকে। এবার দেখলাম অনেকেই ওই আর্টে দক্ষ। এমন কি ভারতীয়রাও। তবে প্রায় কুড়ি-বাইশ ফুট উপরে বল তুলে ওই সার্ভিসে সবচেয়ে বাহাদুরি দেখিয়েছে উত্তর কোরিয়ার এক নম্বর পুরুষ খেলোয়াড় জো ইয়ং জো। প্রতিযোগিতায় ছিল পাঁচ নম্বর বাছাই।

শি জি-হাও

সব মিলিয়ে অবশ্যই চীনাদের জয়জয়কার। পুরুষ ও মেয়েদের দলগত ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হও ছাড়াও ব্যক্তিগত ইভেন্টে ৭টি খেতাবের মধ্যে ৫টি পেয়েছে চীন। যদি বালক ও বালিকা বিভাগে তাদের ছেলে-মেয়ে খেলত তাহলে হয়তো প্রতিযোগিতার ৯টি খেতাবই যেত চীনাদের হাতে। তবু তো চীনে বেশ কয়েকজন নামী মেয়ে-পুরুষ খেলোয়াড় কলকাতায় খেলতে আসেনি। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের সময় চীনের একটি দল সফর করছিল ইউরোপে, আর একটি দল অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে।

বেশিরভাগ উঠতি খেলোয়াড় নিয়ে চীন যে ফল করল এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে তা নতুন রেকর্ড হয়ে রইল। এর আগে কোনো দেশই ৭টি খেতাব পায়নি। ৭৮ সালে কুয়ালালামপুর চ্যাম্পিয়নশিপে চীন পেয়েছিল চারটি খেতাব।

এশিয়ান টেবল টেনিস ইউনিয়নের সংগঠনে এটি ছিল পঞ্চম চ্যাম্পিয়নশিপ। এর আগে ১৯৬ সালে ভারতে আর একবার এশিয়ান টেবল টেনিসের আসর বসে। সেবার পঞ্চম প্রতিযোগিতা হয় বোম্বাইয়ে এশিয়ান টেবল টেনিস ফেডারেশনের অধীনে। নবগঠিত এশিয়ান টেবল টেনিস ইউনিয়নের প্রথম চ্যাম্পিয়নশিপ হয় ৭২ সালে পিকিংয়ে, দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা হয় ৭৪ সালে ইয়োকোহামায়, তৃতীয় প্রতিযোগিতা ৭৬ সালে কোরিয়ার পিয়ং ইয়ংয়ে এবং চতুর্থ প্রতিযোগিতা হয় ৭৮-এ কুয়ালালামপুরে।

কুয়ালালামপুরে ভারতের পুরুষ দল পেয়েছিল ষষ্ঠ স্থান, মেয়ে দল চতুর্থ স্থান। এবার কলকাতায় ঠিক উল্টো ফল হয়েছে। পুরুষরা দুই ধাপ উপরে উঠে চতুর্থ হয়েছে। মেয়েরা নেমে গেছে দুই ধাপ। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় ভারতীয়দের ভূমিকা মোটেই উজ্জ্বল নয়। পুরুষ মেয়েদের মধ্যে কেউ আশানুরূপ খেলতে পারেনি। শুধু বালক বিভাগে মহারাষ্ট্রের একটি ছেলে সুজয় ঘোরপাড়ে ফাইনাল খেলে রানার্স হয়েছে আর বালিকা বিভাগের সেমিফাইনাল খেলেছে আসামের একটি মেয়ে, নিয়তি রায়।

ব্যাকহ্যান্ড ও ফোরহ্যান্ডে মারের চটক দেখিয়ে সুজয় ঘোরপাড়ে সেমিফাইনালে হারিয়েছিল জাপানের বালক প্রতিভাদের অগ্রগণ্য কোনিচি ইকোদাকে। কিন্তু ফাইনালে হংকংয়ের ল কান টুংয়ের বিরুদ্ধে ফুটে উঠতে পারেনি সম্ভবত অভিজ্ঞতার অভাবে এবং স্নায়ু চাপে। ছেলেটির কিন্তু ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। গত বছরই জাতীয় জুনিয়র হয়েছে। উল্লেখ্য এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে কোনো ইভেন্টে ফাইনাল খেলার যোগ্যতায় সুজয় ভারতের দ্বিতীয়। এর আগে ইয়োকোহামার চ্যাম্পিয়নশিপে বালক বিভাগের ফাইনালে খেলেছিল ভারতের অরুণ কুমার।

দলগত প্রতিযোগিতায় চন্দ্রশেখর, মনজিত দুয়া মনমিত সিং ও কমলেশ মেটাকে নিয়ে গড়া ভারত দল ৭টি খেলার মধ্যে জেতে তিনটি খেলায়। হারে চারটি দেশের কাছে। চীনের কাছে ০—৫ খেলায়, জাপানের কাছে ২—৫ খেলায়, মালয়েশিয়ার কাছে ৪—৫ খেলায় এবং উত্তর কোরিয়ার কাছে একই ফলে। জেতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৫—১, ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে ৫—৪ এবং থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫—৩ খেলায়। টেবল টেনিসে উত্তর কোরিয়ার স্থান অনেক উপরে। তাদের সঙ্গে খেলায় ভারতের ৪—৫ ফল প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু মালয়েশিয়ার কাছে পরাজয় অপ্রত্যাশিত ছিল।

উল্লেখ্য, পুরুষদের দলগত প্রতিযোগিতার ফল মীমাংসা হয় ৯টি সিঙ্গলস খেলায়। প্রতি দেশের পক্ষে খেলে তিনজন করে খেলোয়াড় প্রথম এবং পাল্টা সিঙ্গলসের ভিত্তিতে। মহিলাদের দলগত প্রতিযোগিতার মীমাংসা হয় চারটি সিঙ্গলস এবং একটি ডাবলস খেলার ফলে। ভারতের মেয়ে দলে খেলেছে নন্দিনী কুলকার্ণি, ইন্দু পুরী, মোনালিসা বরুয়া, কল্যাবতী সীতারাম ও স্নিগ্ধা মেটা।

ভারতের মেয়ে দল হেরেছে ৫টি দেশের কাছে,

বিভেত্রে শুধু অস্ট্রেলিয়া (৩—০) ও থাইল্যান্ডের (৩—১) বিরুদ্ধে। চীন, উত্তর কোরিয়া ও জাপানের মেয়েদের বিরুদ্ধে ভারতের মেয়েরা একটি খেলাতেও জিততে পারেনি। শুধু হংকং ও ইন্দোনেশিয়ার কাছ থেকে একটি করে ম্যাচ পায়, যদিও দুই দেশের কাছেই হারে ১—৩ ফলে।

ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় ভারতের রমেশবাবু, কমলেশ মেটা, এমন কি মনজিত দুয়া এবং মনমিত সিং প্রাথমিক ধাপ পার হয়ে মূলে খেলার যোগ্যতা পায়নি। মূলে ১৬ জনের মধ্যে এসেছিল শুধু জাতীয় চ্যাম্পিয়ান চন্দ্রশেখর এবং অরুণকুমার। দুজনের কেউই ৮ জনের মধ্যে যেতে পারেনি। চন্দ্রশেখর হারে চীনের শি জি-হাওয়ের কাছে, অরুণকুমার জাপানের শিগেরু ফুকের কাছে। দুজনেই অতি সহজে এবং স্ট্রেট গেমে। মেয়েদের মধ্যে মূলে খেলার অধিকার অর্জন করতে পারেনি ইন্দু পুরী, মোনালিসা বড়ুয়া ও কলাবতী সীতারাম। নন্দিনী কুলকার্নী, কাশ্মীরা প্যাটেল ও স্নিগ্ধা মেটা হারে প্রথম রাউন্ডে। সুতরাং কোরীয় কোচের প্রশিক্ষণে টেবল টেনিসে ভারত অনেক উন্নতি করেছে বলে যে প্রচার চালানো হচ্ছে খেলার ফলের সঙ্গে তার সঙ্গতি কোথায়? তবে নিঃসন্দেহে ভারতের খেলোয়াড়দের লড়তে হয়েছে পৃথিবীর বহু নামী খেলোয়াড়দের সঙ্গে। যদিও এটা ছিল এশীয় চ্যাম্পিয়নশিপ, তবু চীন এবং জাপানই তো টেবল টেনিসে পৃথিবীর এক নম্বর ও দুই নম্বর দেশ। উত্তর কোরিয়াও দারুণ শক্তিশালী। তবে জাপান এবং কোরিয়ার খেলোয়াড়রা এবার বহুলাংশে স্তিমিত ছিল। ৭৮-এ কুয়ালালামপুর চ্যাম্পিয়নশিপে উত্তর কোরিয়া পুরুষ ও মেয়ে বিভাগে দলগত রানার্স হওয়া ছাড়াও তিনটি পেয়েছিল জুড়িগত খেতাব। এবার একটি খেতাবও পায়নি। জাপানের শুধু বালিকা বিভাগে চ্যাম্পিয়নশিপ। দু-বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ান কোরিয়ার সেই অসাধারণ মেয়ে পাক ইয়ং সুনের ক্রীড়াদ্যুতি অনেক ম্লান। দলগত ও ব্যক্তিগত খেলা মিলিয়ে তিনটি খেলায় হার স্বীকার করতে হয়েছে। বিগত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপের রানার্স এবং এই প্রতিযোগিতার এক নম্বর বাছাই লি সং সুক মূল প্রতিযোগিতায় খেলতে পারেনি প্রাথমিক ধাপে হেরে গিয়ে।

জাপানের হিদেও গোটো বহু খেলায় অসাধারণ সংগ্রামী শক্তির পরিচয় দিয়েছে। অসাধারণ ডিফেন্স। অবিশ্বাস্যভাবে বল ফেরৎ পাঠায় যে বল তোলা অসম্ভব বলে মনে হয়। কিন্তু ডিফেন্সের তুলনায় অ্যাটাক দুর্বল। নিজের কৃতিত্বে যত পয়েন্ট পায় তার চেয়ে অনেক বেশি পয়েন্ট পায় প্রতিদ্বন্দ্বীর ভুলে, যাকে নেগেটিভ পয়েন্ট বলে। কিন্তু নেগেটিভ পয়েন্টে ম্যাচ জেতা যায় না যদি প্রতিদ্বন্দ্বী সতর্ক থাকে। জাপানীরা যেখানে ফোরহ্যান্ড ও ব্যাকহ্যান্ডে মারের বন্যায় টেবিলের উপরে তুফান তুলেছে গোটো ঢেউয়ে ভেসে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে। চীনাদের নীতি অ্যাটাকই বেস্ট ডিফেন্স।

চীনাদের জয়জয়কারের কথা আগেই লিখেছি। অন্যান্য দেশের খেলোয়াড়দের তুলনায় তারা যে কত পোক্ত তার প্রমাণ, পুরুষ বিভাগের ৭টি দেশের বিরুদ্ধে তারা একটিও ম্যাচ হারেনি। সব খেলাতেই জয় ৫—০ ফলে। মেয়ে বিভাগে শুধু উত্তর কোরিয়ার কাছে একটি ম্যাচ হারা ছাড়া ৬টি দেশের বিরুদ্ধে জয় ৩—০ ফলে। উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে ৩—১ ম্যাচে। পুরুষ মেয়ের ব্যক্তিগত সিঙ্গলসে ৮ জন সেমিফাইনালিস্টের মধ্যে ৭ জনই ছিল চীনের।

আগেই লিখেছি, চীনাদের নৈপুণ্যগত পার্থক্য বড় হয়ে ফুটে ওঠেনি। চোখের দৃষ্টি, হাতের মার, পায়ের ছন্দ, টেবল ক্র্যাফট—সবই যেন সমান তারে বাঁধা। তবু এটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, বিশ্ব-প্রতিযোগিতার রানার্স গুয়ো উইয়ে হুয়ার প্রতিভায় এখন ভাটার টান এবং বাঁ-হাতি, তরুণ জাই সাইকের মধ্যে স্বর্ণ সম্ভাবনা। হয়তো তার জন্য বিশ্ব খেতাব অপেক্ষা করছে।

এশিয়ার ২৪টি দেশের খেলোয়াড় ও তোফিসিয়ালদের নিয়ে সুষ্ঠুভাবে এই প্রতিযোগিতা পরিচালনা ছিল বেঙ্গল টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সামনে এক বড় চ্যালেঞ্জ। এই জন্যই চ্যালেঞ্জ বলছি যে, হাতে সময় খুবই কম ছিল এবং দায়িত্ব ছিল মস্ত বড়। কিন্তু বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের সংগঠনায় কলকাতা যেমন সুনাম পেয়েছিল তেমনই সুনাম পেয়েছে পঞ্চম এশিয়া টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় এবং অভ্যর্থনা ও আতিথ্যে বিদেশীদের সন্তুষ্টি বিধানে।

নীচে ফাইনাল খেলায় বিজয়ী ও রানার্সের নাম দেওয়া হল।

**পুরুষদের সিঙ্গলস—বিজয়ী** শি জি-হাও (চীন), রানার্স—জাই সাইকে (চীন)। **মেয়েদের সিঙ্গলস—বিজয়িনী—কী** বাও-জিয়াং (চীন), রানার্স—লিউ ইয়াং (চীন); **পুরুষদের ডাবলস—বিজয়ী—জাই** সাইকে ও গুয়ো উইয়ে হুয়া (চীন), রানার্স—সি জি-হাও ও কাই জেন-হুয়া (চীন); **মেয়েদের ডাবলস—বিজয়িনী**—লিউ ইয়াং ও জ্যাং ডাইং (চীন), রানার্স— পাক ইয়ং ওক ও জং গিল সুন (উত্তর কোরিয়া); **মিক্সড ডাবলস**—বিজয়ী—সাইকে ও জ্যাং ডাইং (চীন), রানার্স— গুয়ো-উইয়ে-হুয়া ও লিউ ইয়াং (চীন) **বালকদের সিঙ্গলস—** বিজয়ী—লা কাম টুং (হংকং), রানার্স—সুজয় ঘোরপাড়ে (ভারত)। **বালিকাদের সিঙ্গলস**—বিজয়িনী—ফুমিকো ওকামোটো (জাপান), রানার্স—মিকা হোসিনো (জাপান)।

**দলগত স্থান** (পুরুষ)—১। চীন, ২। জাপান, ৩। উত্তর কোরিয়া, ৪। ভারত, ৫। ইন্দোনেশিয়া, ৬। অস্ট্রেলিয়া। (মেয়ে) ১। চীন, ২। উত্তর কোরিয়া, ৩। জাপান, ৪। হংকং, ৫। ইন্দোনেশিয়া, ৬। ভারত।

মুকুল

# আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

## বই

**পুরনো কলকাতার কথাচিত্র। পূর্ণেন্দু পত্রী। দে'জ পাবলিশিং কলকাতা। মূল্য ৫০·০০।**

পুরনো কলকাতা সম্পর্কে কৌতূহল অথবা জানার আগ্রহ শুধু ইতিহাসাবিদদের নয়, সাধারণ মানুষেরও অপরিসীম। ভারতের আর দশটা শহরের মতো প্রাচীনত্বের দাবীদার নয় কলকাতা; এর জন্মকাল নিতান্তই ধরাছোঁয়া নাগালের মধ্যে। তবু সুতানুটিতে চার্ণকের নোঙর ফেলা থেকে শুরু করে পরবর্তী একশো বছরেরও কম সময়ের মধ্যে কলকাতার গায়ে ফুটে উঠলো জাঁকজমকের চিহ্ন—কলকাতা হয়ে উঠলো Colonial city par excellence-এর প্রতিচ্ছবি। এ অঞ্চলে ইংরেজ কোম্পানীর প্রাধান্য লাভের গুরুত্ব ও ফলাফল নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে

পূর্ণেন্দু পত্রী
পুরনো কলকাতার কথাচিত্র

গবেষণা চলছে। আরো চলবে। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে—কলকাতার দাবি অন্য কারণে। সুতানুটি, কলিকাতা, গোবিন্দপুর অধ্যুষিত (এ সম্পর্কে মতভেদের অবকাশ রয়েছে) পল্লীগুলি নিয়ে শহরের আদি চেহারা থেকে শুরু করে কি ভাবে এই শহরটি উন্নীত হল প্রাসাদনগরীর স্তরে, কি ধরনের লোক ছিল এ অঞ্চলের আদিম বাসিন্দা, কি ছিল তাদের উপজীবিকা, নতুন বৃত্তিধারী নানা দলের উদ্ভব। সমাজ-জীবনে তার প্রতিক্রিয়া, ভিনদেশী মানুষদের ভিড়, এখানকার নয়া সমাজের রূপরেখা, ইংরেজ তথা পাশ্চাত্য সংস্পর্শের প্রভাব। অর্থনীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন, নতুন গজিয়ে ওঠা শহরের রাস্তাঘাট, অফিস কাছারি, গির্জা, মন্দির, মসজিদ, ধনী বাসিন্দা নতুন ধনী, তাদের চালচলন, বাবু সমাজ—এসব সম্পর্কে মানুষের জানার আগ্রহ দুর্নিবার।

সাধারণ মানুষের এই আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রন্থকার কথার পর কথা দিয়ে গেঁথেছেন পুরনো কলকাতার কথাচিত্রের মালা। বইখানি অত্যন্ত সুখপাঠ্য। অবশ্যই ভাষা, ভাবের এতো স্পষ্ট কথাচিত্র। তথ্য যতই ভারাক্রান্ত হোক না কেন, বক্তব্য পরিবেশন করতে গ্রন্থকার যে প্রকাশ-ভঙ্গিটি বেছে নিয়েছেন তা পুরোমাত্রায় কৌতূহল বজায় রেখে পাঠককে বিনা আয়াসে পৌঁছে দেয় শেষ পাতার শেষ পঙক্তিতে। প্রথম থেকে শেষ অধ্যায়ের ব্যবধান চারশো পৃষ্ঠা। এক একটি অধ্যায় যেন কথা দিয়ে সাজানো এক একটি ছবি। পটে আঁকা দৃশ্যের মতোই লেখার আকর্ষণ।

পূর্ণেন্দু পত্রী মনে রেখেছেন যে আরম্ভেরও আরম্ভ আছে। তাই কলকাতার আরম্ভ তিনি শুরু করেন নি—কালীক্ষেত্র কিংবা জোব চার্ণক দিয়ে। শহরের বাল্যলীলার পরিচয় তিনি শুরু করেছেন বইখানির ৭৩ পৃষ্ঠায়। তার আগে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন পাশ্চাত্যের বণিকদের আনাগোনার বিস্তৃত কাহিনী। গ্রন্থকার তার বক্তব্য শুধু শহর কলকাতার উত্থান এবং প্রসারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। যে পটভূমিকায় একদিন কলকাতা ইংরেজ কোম্পানীর প্রধান কর্মকেন্দ্ররূপে পরিণতি লাভ করেছিল গ্রন্থকার তা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। মোগল-মহিমার তখন শ্মশান-শয্যা, মুর্শিদকুলি খাঁর নেতৃত্বে বাংলার নবাবদের প্রায়-স্বাধীন নরপতির ক্ষমতালাভ, ইংরেজ ও অন্যান্য পাশ্চাত্য বণিকদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বাংলার নবাব বনাম ইংরেজ সওদাগর মুর্শিদাবাদের মসনদ নিয়ে হানাহানি, সরফরাজ খাঁ, আলিবর্দি, আফগান বিদ্রোহ, বর্গী আক্রমণ সিরাজের সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানীর প্রকাশ্য ও গোপন শক্তিপরীক্ষার শেষ পরিণতি, পলাশীর যুদ্ধ—বিস্তীর্ণ ও বিচিত্র এই পটভূমিকায় পূর্ণেন্দু পত্রী আলোচনা করেছেন কলকাতার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের ইতিহাস। সমাপ্তি টেনেছেন ক্লাইভের আমলের কলকাতার বর্ণনা দিয়ে। গ্রন্থকার আশ্বস্ত করেছেন—ক্লাইভ পরবর্তী আঠার শতকের শেষার্ধের এবং উনিশ শতকের কলকাতার কথাচিত্র আমরা পাবো পরবর্তী খণ্ডে।

পূর্ণেন্দু পত্রী সুলেখক, সাহিত্যিক জগতের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নাম। সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে তার কৃতিত্ব এ প্রসঙ্গে অনুল্লেখিত থাকতে পারে। কলকাতার যে ইতিহাস তিনি বর্তমান গ্রন্থের মাধ্যমে পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছেন ইতিহাস-অনুরাগীদের কাছে তা সাদরে গৃহীত হবে। নিছক ইতিহাসের গবেষক অবশ্যই তার নিজস্ব পদ্ধতিতে কলকাতার ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবেন এবং ঐতিহাসিক মহলে তার যথাযথ মূল্যায়নও হবে। কিন্তু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে একটি বিষয় নিয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ অথবা এই সম্পর্কে যারা যথার্থ আগ্রহী তাদের সংখ্যার তুলনায় সাধারণভাবে কতকগুলো বিষয় সম্পর্কে জানতে আগ্রহী পাঠকদের সংখ্যা স্বভাবতই অনেক বেশী। এই শেষোক্ত শ্রেণীর 'সাধারণ' মানুষের

বইটি পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন। এটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যম। কিন্তু ইতিহাসকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলার দায়িত্ব অপরিসীম। পূর্ণেন্দুবাবু শুধু সরকারী অথবা মহাফেজখানার নথিপত্র, কিংবা বিদেশীদের লেখা ভ্রমণকাহিনী অথবা ডায়েরী জাতীয় পুঁথিপত্র থেকেই তার লেখার উপকরণ সংগ্রহ করেননি। এতদ্দেশীয় পুরাতন সাহিত্য, ছড়া, প্রবাদ এ সব উপকরণকেও যথাযথ স্বীকৃতি দিয়েছেন। এটিও উৎসাহপ্রদ ব্যতিক্রম। এছাড়া গ্রন্থকার বলেছেন 'কলকাতা বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। মোটামুটি সমস্ত মতকে সামনে রেখেই গল্প বলার মত করে ইতিহাস বর্ণিত বা বলতে চেয়েছি।' এটিও বইটির গুরুত্ব বৃদ্ধির সহায়ক হবে। কিন্তু সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় যে ক'টি নাম সংযোজিত হয়েছে তার মধ্যে দুটি একটি নামের অনুল্লেখ পীড়াদায়ক বলে মনে হয়, যেমন— A. K. Ray—A short History of Calcutta, Part I, Census of India, rol VII, Calcutta. Town and Suburbs, S. N. Mukherjee—Calcutta Mytho and History

তাছাড়া সমসাময়িক ইংরেজ ও অন্যান্য বিদেশীদের লেখা Memoris and Journals ইত্যাদি। এছাড়া বইটির নানা জায়গায় মূল ইংরেজী থেকে যে সব উদ্ধৃত ছাপা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে বিস্তর মুদ্রাকর প্রমাদ। রীতিমত পীড়াদায়ক। বহু-চিত্রের প্রাত্যালাপ রয়েছে—ছাপগুলো কার অঙ্কা অথবা কোন জায়গা থেকে আঁকা তার নির্দেশ থাকলে পাঠক খুশি হতেন। জোব চার্ণক (বই-এর ভাষায় জব চার্ণক) পারচয়ে যে ছবির প্রাত্যালাপ দেওয়া হয়েছে তার প্রামাণিকতা সম্পর্কে ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে। এছাড়া বই-এর মূল বক্তব্যে এমন কয়েকটি উক্তি স্থানলাভ করেছে যার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে যেমন ১১ পৃষ্ঠায় চিকিৎসা বিদ্যার আদি জনক, মধ্যযুগের ইউরোপের অন্ধকার (১১ পৃঃ), কালিকটের রাজা জামোরিন (পৃঃ ১৩), রাজা সপ্তম হেনরী ও ভারত জয়ের আকাঙ্ক্ষা (পৃঃ ২৭), চার্ণকের মৃত্যুকাল (পৃঃ ৬৪), কলকাতার প্রথম আর্মেনিয়ান (পৃঃ ১০৬), ১৭১৭ সালের ফর্মানের সঠিক তারিখ জানা নেই (পৃঃ ১০৮), আদি তিনটে গ্রাম ছাড়া আরও ৩৮ গ্রামের জমিদারী লাভ (পৃঃ ১৪১)।

এছাড়া কয়েকটি ক্ষেত্রে ঘটনার সন তারিখ বিভ্রান্তিকর—যেমন, ভাস্কো ডা গামার কালিকটে অবতরণ, তার মৃত্যুর তারিখ (পৃঃ ১৫), নতুন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আবির্ভাব (পৃঃ ৭৪), কতলব খাঁর বাংলার দেওয়ানি লাভ (পৃঃ ৭৯), গিরিয়ার যুদ্ধ ও সরফরাজের মৃত্যু (পৃঃ ১৬৫), আলিবর্দি খাঁর মৃত্যু (পৃঃ ২০৩) ইত্যাদি। পরবর্তী সংস্করণে

গ্রন্থকার এ বিষয়ে অবহিত হলে তার বইখানি কলকাতা সম্পর্কে সাধারণের কাছে একটি অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থরূপে নির্দ্বিধায় গৃহীত হবে।

শিশিরকুমার রায়

---

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **চিত্রকলা**

## অঞ্জু চৌধুরীর উজ্জ্বল এচিং

বিবাহ-সূত্রে ফ্রান্স-প্রবাসিনী, শ্রীমতী অঞ্জু চৌধুরীর গ্রাফিকের প্রদর্শনী হয়ে গেলো বিড়লা আকাডেমীর মুক্তাঙ্গনে। শ্রীমতী চৌধুরীর প্রায় প্রতিটি কাজই আমাকে মুগ্ধ করেছে। গ্রাফিক বা এচিং-এর কাজে প্রযুক্তি এবং আঙ্গিক কৌশলের বিশেষ একটা ভূমিকা আছে, অঞ্জু চৌধুরী যা সহজেই করায়ত্ত করেছেন। শুধু তা-ই নয়, প্রতিটি কাজেই শ্রীমতী চৌধুরীর বিশিষ্ট শিল্পীমানস এবং দৃষ্টিভঙ্গী আভাসিত হয়েছে। উপরন্তু, তাঁর এচিং-এ তিনি বিভিন্ন বর্ণবিন্যাস যেভাবে ব্যবহার করেছেন তা-ও নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

প্রবাহিত রেখা, রেখাবন্ধ, এবং বৃত্তাভাস—এই তিনটি সূত্রকেই তিনি কাজে লাগিয়েছেন তাঁর এচিং-এ—কখনও প্রথমটির ওপর জোর পড়েছে, কখনও বা দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির ওপর। 'মোমেন্ট টু ওয়াটার লিলিজ'—কাজটিতে প্রবাহিত রেখাসমষ্টি তলার অর্ধবৃত্তাকার পুষ্পসদৃশ ফর্মে গিয়ে মিলিত হয়েছে, এবং নিবিড় বেগুনী রং পলে ছবিটার পরিণত হয়ে আছে। খুব সুন্দর। 'ঔইণ্ড রোজ'-এ রেখাকীর্ণ আকারসমষ্টির ওপর দিয়ে যেন বায়ুহিল্লোল প্রবাহিত হয়েছে—এখানেও বেগুনী এবং আবছা-লাল রং-কে তিনি কম্পমান পটভূমিকার সঙ্গে সমানুপাতিকভাবে আভাসিত করতে পেরেছেন। একই কথা বলা যায় 'অন দ কন্সটেলেশন' কাজটি সম্পর্কে—এখানেও দিগন্তের ক্রমোন্মোচিত সীমার সঙ্গে সবুজ রঙের সুসমঞ্জস ব্যবস্থা অত্যন্ত সুন্দর।

কোনো কোনো কাজে শ্রীমতী চৌধুরী জৈব জীবনবৃত্ত (মানুষের, লতাপাতার, প্রকৃতির) অন্তর্নিহিত রহস্য এবং রূপাভাসকে ধরতে চেয়েছেন (এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন)—যেমন 'একুয়াটিক', 'অ্যারাউণ্ড দ্য বার্ক', 'আরাউণ্ড দ্য রুটস', 'বার্ক', 'ফোলিয়েজ', 'শোর ডার্ক', 'সোর্স', 'বার্থ' প্রমুখ কাজগুলিতে। 'একুয়াটিকে' সামুদ্রিক উদ্ভিজ্জকে শ্রীমতী চৌধুরী অত্যন্ত দৃঢ় রেখায় এবং কল্পনাময় রঙে আভাসিত করেছেন; 'শোর ডার্কে' তিনি একটি গাছের গুঁড়ির আকারের চারপাশে বিভিন্ন বৃত্তাভাস এবং শিকড়-বাকড়ের শিহরিত শরীর কুটিরে আবিষ্কার করেছেন একটি শিল্পসম্মত টেকশ্চার। অন্যান্য উল্লিখিত কাজগুলিতেও মোটামুটি একই ধরনের চিত্ররূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আঙ্গিকের দিক থেকে শ্রীমতী চৌধুরীর এচিং-এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হ'লো যে কোনো কোনো কাজে তিনি পুরো কর্মটিকে দুটি কি তিনটি আকারে ভেঙে দিয়েছেন—তাতে অন্য একটি আয়তন আস্তীর্ণ হয়েছে তাঁর কাজে। এই ধরনের কাজগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'লো 'ডিভাইডেড স্পেস' এবং 'হাফ অ্যাণ্ড হোল' কাজ দুটি।

শ্রীমতী অঞ্জু চৌধুরীর জন্যে আমার অভিনন্দন রইলো।

## কলা-ভারতীর চিত্রপ্রদর্শনী

"কলা-ভারতী" এবং ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্টের উদ্যোগে শ্রীমৃণালকান্তি দাস এবং তাঁর ছাত্রছাত্রীদের চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হলো বিড়লা আকাডেমীতে। মৃণালকান্তি দাসের ছবি (প্রায় সবই জলরঙে, ওয়াশ-পদ্ধতিতে আঁকা) দেখতে দেখতে মনে হলো যে তিনি অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত চিত্ররীতিই অনুসরণ করেছেন—প্রায় সমস্ত ছবিই 'বেঙ্গল স্কুলের' স্মৃতিগন্ধময়। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে ছবিগুলো দেখতে আদৌ খারাপ লাগে না: অধিকাংশ ছবিই নয়নরঞ্জন, স্নিগ্ধ এবং সুরুচিত। মৃণালকান্তি দাসের ছবি দেখে আরো একটি সত্য মনে হলো আমার—'বেঙ্গল স্কুল' প্রভাবিত ছবি শুধু আঙ্গিকের দিক থেকেই পেলবকোমল রোমান্টিক নয়, বিষয়বস্তুর দিক থেকেও বটে। অর্থাৎ, ওয়াস-পদ্ধতিতে আঁকা ছবিতে যে পেলবতায় ও নমনীয়তা থাকে তা ছবির বিষয়বস্তুর সঙ্গে সর্বতোভাবে সমানুপাতিক। এই প্রায়-লুপ্ত রোমান্টিকতার প্রতি আমাদের কোথায় যেন একটা গোপন সমর্থন আছে। সমর্থন, কিংবা সহানুভূতি।

'স্নানমগ্ন', 'ফোরেস্ট', 'আফটার বেদিং' প্রভৃতি ছবিতে প্রায়-নগ্ন রমণী শরীর খুবই রোমান্টিকভাবে আভাসিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, রমণী-শরীরকে এমনভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে যে তাকে প্রায় স্পর্শ করতে ইচ্ছে হয়। অথচ সমস্ত ছবিরই বর্ণিল বাতাবরণে এমন এক ধরনের কমনীয়তা উপস্থিত যে বিষয়বস্তুকে কখনোই অশ্লীল বলে মনে হয় না। রুবেন্স তাঁর নারী-প্রতিকৃতি আঁকার পরে তাকে আলিঙ্গন করতে চাইতেন, রেনোয়া চাইতেন তাঁরই আঁকা নগ্নিকাদের দেহ দংশন করতে। বলা বাহুল্য রুবেন্স বা রেনোয়া'র সঙ্গে কোনো দিক থেকেই মৃণালকান্তি তুলনীয় নন, আগেই লিখেছি যে তাঁর চিত্ররীতি 'বেঙ্গল স্কুল' থেকে

অন্যদিকে, শুধু তাঁর নারীমূর্তিতে এমন এক ধরনের ইন্দ্রিয়জ আবেদন আছে যা আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বিরাট ক্যানভাসে আঁকা "লাস্ট সাপার"-এ যীশু খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যদেরও ভারতীয় রীতিতে আঁকা হয়েছে—মানুষদের হাত-পা রাখার ভঙ্গীতে, বর্ণব্যবহারে, সব কিছুতেই। ছবিটি সুন্দর। "নিদ্রা" ছবিতে বৃক্ষতলে আশ্লিষ্ট একটি যুগলের ছবি এমনভাবে আঁকা হয়েছে যে, নরনারীর আলিঙ্গনের ছন্দ প্রকৃতির অন্তঃস্পন্দের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। যেখানে শুধু প্রকৃতির ছবি এঁকেছেন মৃণালকান্তি, সেখানেও প্রকৃতির অন্তঃশীল মাধুর্যকে তিনি সুন্দর-ভাবে প্রকাশ করেছেন—যেমন "গোল্ডেন ইয়েলো", হার্ভেস্টিং হরাইজন, 'ফিশিং' প্রভৃতি ছবিতে। একটি ছবিতে গাছগাছালির শরীরে তিনি এমন উজ্জ্বল সোনালি-হলুদ রং ব্যবহার করেছেন যে পুরো ছবিটিই দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। 'গোধূলি' ছবিতে তেলরঙের ওপর প্যালেট নাইফের দ্রুত ব্যবহারে তিনি রঙের ঘূর্ণি নির্মাণ করে প্রমাণ করেছেন যে, তেলরঙের ব্যবহারেও তিনি সিদ্ধ-হস্ত। আগেই লিখেছি যে তাঁর প্রায় প্রতিটি ছবিই নয়নরঞ্জন—শুধু টয়মেন্ট এবং এগানি ছবি দুটি ছাড়া। দুটি ছবিতেই কৃত্রিমতা প্রশ্রয় পেয়েছে, বর্ণব্যবহারও দুর্বল। "শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথ" ছবিতে শরৎচন্দ্রের

সন্ধানে : মৃণালকান্তি

আবিষ্মরণায় এই দুটি চরিত্রের কৈশোরলীলাকে খুব সার্থকভাবে আভাসিত করেছেন মৃণালকান্তি। 'সেল্ফ-পোর্ট্রেট' ছবিতে রেখা ও রং খুব সংযতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সুন্দর।

মৃণালকান্তির ছাত্রছাত্রীরা একই রীতিতে চিত্রচর্চা করেছেন, এবং তা-ই বোধ হয় স্বাভাবিক। আমার কাছে উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে তাপস বড়ুয়ার "সুবারেস্ত", তপন বিশ্বাসের "পিপাসা", জনার্দন চক্রবর্তীর 'স্প্রিং', কৃষ্ণ দত্তর ল্যান্ডস্কেপ, কাজী অনির্বাণের "গ্রাফিক", স্বাতী ঘোষের "হ্যারেম", দীপ্তি শেঠের 'পূজা' সুস্মিতা সিংহের "স্টাডি" এবং "ল্যান্ডস্কেপ"।

কিন্তু কাজী অনির্বাণ এবং তাপস বড়ুয়ার ছবি কয়েক মাস আগে অন্য কোনো সংস্থা আয়োজিত প্রদর্শনীতে দেখেছিলাম মনে হয়।

চন্দ্রনাথ দত্ত-র প্লাস্টারের ভাস্কর্য অত্যন্ত অনুল্লেখযোগ্য।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি চলচ্চিত্র

## গৃহপ্রবেশ

গৃহ হল মন। মনের বন্ধ দুয়ার উন্মোচিত করে অন্দরে প্রবেশ করার একটি হৃদয়স্পর্শী কাহিনী 'গৃহপ্রবেশ'। চরিত্র বলতে তিনটি—অমর, (সঞ্জীবকুমার) মানসী (শর্মিলা ঠাকুর) ও স্বপ্না (সারিকা)। ভিড় এবং দিনরাত হই হট্টগোলে ভরে থাকা ফ্ল্যাটবাড়ির বাসিন্দা অমর ও মানসীর অভিলাষ নিজেদের একটি স্বতন্ত্র গৃহের। এজন্য মানসী কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা তিল তিল করে অর্থ সঞ্চয় করে যায়। সাধ আহ্লাদ বিসর্জিত জীবন মানসী নিজস্ব গৃহের ধ্যানে সারাক্ষণ মগ্ন থাকে। গৃহচিন্তায় নিমগ্ন মানসী ক্রমেই স্বামী অমরের অভিনিবেশ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। অমরের মনে হয় মানসী যেন তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এমনি পরিস্থিতিতে অমরের দৃষ্টি আকর্ষণ করল অফিসের টাইপিস্ট স্বপ্না। স্বপ্নাকে নিয়েই অমর নতুন করে মনের পাতায় স্বপ্নসংকল্প—আর তখনই অমর মানসীর মনোগৃহে প্রবেশের দুয়ার খোলা পেল।

পরিচালক বাসু ভট্টাচার্যের নিজেরই পরিকল্পিত এই কাহিনীর মধ্যে নতুনত্ব নেই। বস্তুত স্ত্রীকে ছেড়ে অন্য নারীর প্রতি আসক্ত স্বামী—এমন কাহিনী নিয়ে একাধিক ছবি ইতিপূর্বেই দেখা গিয়েছে। কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে বিন্যাসের ক্ষেত্রে। অমর ও মানসীর সদ্য বিবাহিত জীবন; ওদের আশা আকাঙ্ক্ষা; নিজস্ব গৃহের স্বপ্নে মানসীর মশগুল থাকা, অমরের জীবনে স্বপ্নার আবির্ভাব; বিরাগ থেকে স্বপ্নার প্রতি অমরের অনুরাগ এবং মানসীকে ত্যাগ করার কল্পনা; অমরের মানসিক দ্বন্দ্ব; অমরকে সুখী দেখার জন্য স্বপ্নাকে অভ্যর্থনায় মানসীর গৃহ ও অঙ্গসজ্জার পিছনে অমরের মানসীকে নতুন করে চেনা—অমর-মানসী ও স্বপ্নার চিন্তা ও চলন-চলনকে নাট্যবৈভবে সুবলিত করে উপস্থাপনে পরিচালকের বস্তুবান্ধব শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্কে ধীরে ধীরে কিভাবে চিড় খায় এবং পরিশেষে নিজেদের ভুল বুঝে আবার উভয়ের অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠার একটি অনুপম কাহিনী 'গৃহপ্রবেশ'। স্বপ্নার অভ্যর্থনায় মাত্র চার-ঘণ্টার মধ্যে ঘরের ভোল সম্পূর্ণ পালটে দেওয়ার মত

শর্মিলা ঠাকুর

অস্বাভাবিক ব্যাপারও পরিচালন সৌকর্যে প্রতীতিতে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে।

জীবননাট্যের অতি পরিচিত এবং আপাতদৃষ্টিতে নগণ্য ঘটনাও ক্যামেরার সাহায্যে দর্শকচেতনাকে অভিভূত করে তোলার পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ায় অসাধারণ বিন্যাস দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। পরিচালকের অভীপ্সিত সিদ্ধিতে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ক্যামেরার কাজে অদীপ ট্যান্ডন এবং সঙ্গীতযোজনায় কানু রায়। অর্থবহ সংলাপ রচনায়ও গুলজার চরিত্র ও ঘটনার মেজাজ পরিস্ফুটনে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সঞ্জীবকুমার, শর্মিলা ঠাকুর বা সারিকা—প্রধান তিনটি শিল্পীর চরিত্রচিত্রণে আয়াসলব্ধ অভিনয়ের ছাপ পাওয়া যায় না। তাঁদের অভিনয় চরিত্রগুলিকে বাস্তব রূপ দিয়েছে।

## স্বয়ম্বর

পুত্রের জন্য পাত্রী পছন্দ হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যাখ্যাত হল শিল্পপতি শ্রীরাম লাগু। কারণ পাত্রী মৌসুমীর পিতার একদা সে কর্মচারী ছিল বলে। পিতার এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে রণদামামার তালে মার্চ করে বেরিয়ে পড়ল দুই ভাই—সঞ্জীবকুমার ও শশি কাপুর। সঞ্জীবকুমার সাজলো গৃহভৃত্য আর শশি কাপুর রামনগরের রাজকুমার। বে-মগজ পরিকল্পনায় গড়ে তোলা নানা ঘটনার মধ্যে দুই ভাই-ই তাদের উদ্দেশ্যে সফল হল। সঞ্জীবকুমার জয় করল বিদ্যা সিনহাকে। বিদ্যা আসলে মৌসুমীর বৈমাত্রেয় বড় বোন হলেও ওকে ওই গৃহের দাসী রূপে দেখানো হয়েছে। কারণ ওই চরিত্রই ভৃত্য-বেশী সঞ্জীবকুমারের

সঙ্গে তার মিলন ঘটানো সহজ। তেমনি মৌসুমী ধনী ও উগ্র আধুনিকা হতে রাজপুত্রের প্রতি তার আকর্ষণ স্বাভাবিক বলে প্রতিপন্ন করানো যায়।

বংশ মর্যাদা নিয়ে আত্মম্ভরিতা অাখেরে টেঁকে না; পতিই পত্নীর একমাত্র গতি; এবং জীবনকে ঠিক মতো জানতে হলে দুঃখ-কষ্টের তাপে নিজেকে শুদ্ধ করে নিতে হয়—এমত বক্তব্য কাহিনীর অন্তরালে প্রলম্বিত। কিন্তু ওই বক্তব্যগুলিকে মূর্ত করে তোলায় যে সব ঘটনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন পরিচালক পি সবাশিন্ড রাও তা দর্শক সমক্ষে একটা নিকৃমানের প্রহসনের চেয়ে বিশেষ কিছু দিতে সক্ষম হয়নি। চরিত্রগুলির অসংবৃত আচরণ এবং প্রলাপ-ঘেঁষা সংলাপ হাসির উদ্রেক অবশ্যই করে। হাল্কা-মেজাজী দর্শককুল হয়ত তা উপভোগও করবেন, কিন্তু প্রায় পৌনে তিন ঘণ্টার দীর্ঘ ছবিখানি শেষ হলে মনে দাগ কাটার মতো কিছু নিয়ে প্রেক্ষাগৃহ থেকে আসা যাবে না।

ছবির চেহারা অবশ্যই চটকদার। রাজেশ রোশনের সংগীত পরিচালনা ঘটনার চরিত্র ফুটিয়ে তোলায় সহায়ক হয়েছে। চরিত্রাবলীর মধ্যে বিদ্যা সিনহা ও শ্রীরাম লাগুই যা কিছুটা স্বাভাবিক—তাই ওদের অভিনয়ও ভাল লাগে।

## সবুত

অর্থই যত অনর্থের কারণ। এই আপ্তবাক্য বলে বলে নাটের গুরু ধনরাজ একের পর এক প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধরা থেকে সরিয়ে ফেলতে থাকে। খুনের তদারকিতে নিয়োজিত হয় ইনসপেকটর সাহানি (নবীন নিশ্চল)। শেষ পর্যন্ত নিহত শিল্পপতি ধর্মদাসের কন্যা আশা ও কিরণের (বিদ্যা সিনহা ও কাজল কিরণ) অভিভাবকস্থানীয় অজিত রায় (ওম শিবপুরী) যখন আসল খুনী রূপে ছবিতে সাব্যস্ত হল তার আগেই দর্শকদের কাছে রহস্য ফাঁস হয়ে গিয়েছে। কাহিনী রচয়িতা জে কে আহুজা কিভাবে ঘটনা সাজিয়েছিলেন জানি না। কিন্তু পরিচালক তুলসী রামসে ও শ্যাম রামসে যেভাবে ঘটনা বিন্যস্ত করেছেন তাতে বোঝা গেল রহস্য-রোমাঞ্চ জমিয়ে তোলার দক্ষতা তাদের নেই। কিংবা বলা যায়, 'রহস্য-রোমাঞ্চ'র নাম করে বাজার-চলতি ফরমুলায় সেকস ও ক্রাইম-এর অনুপানে ভরা দৃশ্যাবলীর উপস্থাপনই পরিচালকদ্বয়ের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সেদিক থেকেও তাঁরা অসাধারণ কিছু পরিবেশনে অক্ষম হয়েছেন।

ছবির নাম 'সবুত' অর্থাৎ প্রমাণ। কিন্তু দেখা গেল একটার পর একটা খুন হতে থাকল এবং ইনসপেকটর সাহানিও খুনী সম্পর্কে যে সব প্রমাণ হাতে পাচ্ছেন তাতে খুনী কে তা জানতে কোন ধন্দ থাকে না। সুতরাং সাসপেন্সটাও পরিচালক জমিয়ে তুলতে পারেননি। ইনসপেকটর সাহানী চরিত্রে নবীন

রায় অপহরণ করে। কেবল তাকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছিল যেন তারই হাতে নিজের মৃত্যু ডেকে আনতে। যুক্তি ও সংগতিহীন এবং পরিমিতিবোধ রহিত দৃশ্যবিন্যাস। শুরু থেকেই যাবতীয় কিছু উদ্ভট মনে হয়।

পঙ্কজ দত্ত

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

## মহাজাতি সদনে আমজাদ আলী খাঁ

ওস্তাদ কেরামতউল্লা খাঁ মিউজিক সারকেল সরোদ বাদক ওস্তাদ আমজাদ আলী খাঁ'র এক বৈঠকের আয়োজন করে ছিল মহাজাতি সদনে গত ১৭ই মার্চ। অনুষ্ঠানের আরম্ভে রাইচাঁদ বড়াল ও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ স্বর্গীয় ওস্তাদ কেরামতউল্লার বিষয়ে ভাষণ দেন। আমজাদ আলী বাজনা শুরু করার আগে বলেন যে এ তবলা নায়কের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল বিশেষ ধরনের। তিনি যখন কলকাতা শহরে প্রথম বাজান (সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন, ১৯৫৮) তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি কার তবলা সঙ্গত চান। তিনি অবিলম্বে স্বর্গীয় কেরামৎ খাঁর নাম করেছিলেন, কারণ এঁর বাজনায় তাঁর এক বিশেষ আসক্তি ছিল।

মিশ্র কাফিতে আওচার ও একটি হোলি ঢঙে রচিত চাচর তাল গৎ বাজিয়ে আমজাদ আলী তাঁর বৈঠক শুরু করেন। আমি এই প্রথম কোন যন্ত্রীকে ঠুংরী ঢঙের বাজনা দিয়ে বৈঠক শুরু করতে শুনলাম। আওচারটি পরিচ্ছন্ন এবং ধ্বনিমাধুর্যে ভরা ছিল এবং গৎটিতে ছিল প্রাণবন্ত বিস্তারের কাজ।

এরপরে শোনা গেল বৈঠকের মূল নিবেদন শ্রী রাগে আলাপ, জোড়, ঝালা ও তিনটি গৎ। আলাপটি একটু চঞ্চল প্রকৃতির হয়েছিল এবং এটির মীড় আশের বাহার ও বুদ্ধিদীপ্ত স্বরব্যঞ্জনা সুশ্রাব্য হলেও শ্রী রাগের গম্ভীর মেজাজ সম্পূর্ণভাবে ফুটে ওঠেনি। স্বরগত রাগরূপ অবশ্য কোথাও বিকৃত হয়নি। জোড় এবং ঝালার বিষয় এই মন্তব্যই খাটে। প্রথম গৎটি ঝাঁপতালে ছিল এবং তাতে বেশ ভাল রেল অঙ্গের কাজ ও উচ্চাঙ্গের তান-তোড়া বাজানো হয়েছিল। পরের গৎটি ছিল দ্রুত ত্রিতালে নিবন্ধ এবং এতে ছিল চমৎকার দুনি গমক তান, দৌড় তান আটমাত্রায় সওয়াল-জবাব ও সাথ-সংগত। কেরামৎ পুত্র সবির খাঁ নিপুণতা ও বলিষ্ঠতার সঙ্গে তবলা সংগত করেছিলেন। শেষের অতি দ্রুত গতের ক্ষিপ্রগতি ঝালার সঙ্গে তাঁর ঠেকাও বেশ খুলেছিল।

বিরতির পর আমজাদ আলী তিলক কামোদ রাগে একটি বিলম্বিত তিনতাল গৎ ধরেন এবং বিস্তারের কাজে রাগের আনাচকানাচ দক্ষতা ও শিল্পবোধের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলেন। দ্বিতীয় সপ্তকের স্বরের মিশ্রণ এবং আলঙ্কারিক তানের প্রয়োগও ভাল হয়েছিল। তবে শিল্পী বড়ো আকস্মিকভাবে গৎটি শেষ করে নন্দ বা আনন্দী কল্যাণে একটি দ্রুত তিনতাল গৎ ধরেন। এই রাগটিতে

আমাদের মন বসতে না বসতেই তিনি হঠাৎ ছায়া রাগে একটি দ্রুত তিনতাল গৎ শুরু করেন। এটি নিয়ে সামান্য কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে তিনি কামোদ রাগে দুটি গৎ বাজান। এই গৎ দুটি তুলনায় বেশিক্ষণ বাজানো হয় এবং শিল্পী এগুলিতে কিছু উচ্চাঙ্গের তান জোড়া শোনান।

এবার সবির খাঁ'র অনুরোধে কর্ণাটক রাগ হেমাবতীতে আওচার ও একটি রূপক তালে নিবন্ধ গৎ বাজান আমজাদ আলী। সুরেলা ও সুপরিকল্পিত বিস্তার ও একহারা তানের কাজগুলিতে বেশ একটি বিশুদ্ধ কর্ণাটক রস ছিল। এই রস সাধারণত হিন্দুস্থানী যন্ত্রীদের হাতে ফোটে না —তাঁরা কর্ণাটকী রাগগুলিকে হিন্দুস্থানী নিয়ম-কানুনে বেঁধে একটি ভিন্ন চরিত্রের আমদানি করে ফেলেন। স্বরচিত ভাটিয়ালী বাজিয়ে আমজাদ আলী তাঁর বৈঠক শেষ করেন।

নীলাক্ষ গুপ্ত

## উত্তরপাড়া সংগীত চক্র

চব্বিশ বছর ধরে অক্লান্ত উদ্যমে অসীম অধ্যবসায় এবং আন্তরিক অনুরাগে শহরতলীর একটি বিশেষ অঞ্চলে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের অনুশীলন এবং সম্প্রসারণে ব্যাপৃত থেকে উত্তরপাড়া সংগীত চক্র সুধিজনের অকুণ্ঠ সাধুবাদ লাভ করেছেন। প্রশংসা এবং সাধুবাদে তাঁদের প্রয়াস আত্মস্ফীত হয়নি, বরং অধিকতর প্রাণবান হয়েছে। বছরে একটি করে সংগীত সম্মেলনের আয়োজন করেই ক্ষান্ত হননি তাঁরা। উত্তরপাড়া সংগীত ভবন প্রতিষ্ঠা করে শহরতলীর উৎসুক শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের সুযোগ করে দিয়েছেন। এঁদের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে নতুন করে নিঃসংশয় হলাম এবারের বার্ষিক সংগীত সম্মেলনে। জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরীর মাঠে সারারাতের আসরে ব্যবস্থাপনায় পারিপাট্যের অভাব ছিল না। নামী এবং স্বল্পনামী উভয় পংক্তিরই শিল্পী আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এতে রসাভাস তো ঘটেই নি, পরন্তু দু-একটি সদ্যোদ্গত প্রতিভার ঠিকানা পাওয়া গেছে।

# ত্বকের অধিক সযত্ন পরিচর্যা...
# অধিক স্বাস্থ্যোজ্জ্বলতার জন্যে—
# নিকো ঔষধিযুক্ত সাবান

স্তাদ বিসমিল্লা খাঁ

সংগীত ভবনের ছাত্রছাত্রীরা বৃন্দবাদ্য
য় শাস্ত্রীয় সংগীত পরিবেশন করে
নুষ্ঠানের মাঙ্গলিক পাঠ করলেন। এরপর
ইলেন লক্ষ্মীশংকর। রাগ বাগেশ্রী।
খ্যা বিস্তৃত করে খেয়ালটিকে তিনি
থিল অথবা ক্লান্তিকর করে তোলেন
পরিসর সংক্ষিপ্ত রেখে রাগ
নাবৃত করার কৌশল তিনি জানেন।
থচ দুর্বলতার কারণে কোথাও তাড়া-
ড়ো করার প্রয়োজন ঘটেনি। তাঁর
য়ালের বিশেষভাবে আদরণীয় অংশ
স্তার। সুরের কাজে অংশটি খুবই
নারম হয়ে ওঠে। লক্ষ্মীশংকরের
লাও মিষ্টি। তবে তানকর্তবে সাব-
লিতা বা বৈচিত্র্যের অভাব আর
সানগমের স্বরপুঞ্জ পরিকল্পনায় তাক-
লাগা নজির রাখতে পারেননি। কণ্ঠমাধুর্য
এবং আবেগময়তার গুণে মিশ্র পিলু
ঠুমরীটির কোথাও অবশ্যই কোন খাদ
ছিল না। তাঁর বোলবানানোর সহজ
পারিপাট্য মনোমুগ্ধকর। দরবারী
কানাড়া আর চার বেশী আশ্রিত ধীরায়
দুটি ভজনেও তিনি ভাবসম্পূর্ণ প্রসন্ন
একটি পরিবেশ গড়ে তোলেন।
রবিশংকর সুরারোপিত শেষের
বাংলা রাগপ্রধান গানটিও তাঁর
কণ্ঠে সার্থক রূপ নেয়। তবলায়
গোবিন্দ বসুর এবং হারমোনিয়মে
সোহনলাল শর্মার সঙ্গত—অনুষ্ঠান-
টিকে আদ্যন্ত সজীব রাখে। অসাধারণ,
অবিস্মরণীয় সানাই শুনিয়ে গেলেন
বিসমিল্লা খাঁ। প্রায় আড়াই ঘণ্টাব্যাপী
অনুষ্ঠানের সূচনা হল মারুবেহাগে।
তারপর আরও দুটি বড় রাগ, দরবারী
আর মালকোষ। উত্তরপর্বে কাজরী আর
ভৈরবীতে ধুন। প্রতিটি রাগ রূপায়ণের
আলাদা আলাদা বিশ্লেষণের প্রয়োজন
হয় না, কারণ যন্ত্রীর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি
সাধারণ লক্ষণ হিসাবে প্রতিটি প্রয়াসেই
উপস্থিত ছিল। মুক্তগতি পাখির মতো
সুরের উঁচু-নীচু স্তরে সহজ চলাচল।
গুচ্ছ গুচ্ছ স্বর একত্র করে নানা ছাঁদে
তাদের গ্রন্থনা, তানের গতি ও বাঁকের
আকস্মিক ছন্দময় পরিবর্তন কল্পনীয়
প্রতিভার অনন্যসাধারণত্ব বারংবার স্মরণ
করিয়ে দিয়েছে। আর আশ্চর্য কলা-
কৃতির তলে তলে কি গভীর রাগচেতনা
ও মানবিক কল্পনা। সরোদিয়া নরেন
ধর বয়সে তরুণ। তবে আদৌ অপটু

# কফি, চা আর আমি!

# সাগর
## স্কিম মিল্ক পাউডার

ASP-SMP-2-79

বিশেষভাবে তৈরীর দরুন কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে জলে মিশে যায়!

সাগর স্কিম মিল্ক এমন বিশেষভাবে তৈরী যে, এটি নিমিষের মধ্যে জলে সুন্দরভাবে মিশে যায়। এই বিশুদ্ধভাবে তৈরী দুধ প্রোটিন-সমৃদ্ধ এবং এতে স্নেহ-পদার্থের পরিমাণ খুবই সামান্য। যাঁরা দুধ খেতে ভালবাসেন অথচ ওজন বাড়াতে চান না, এবং অতিথি আপ্যায়নের জন্য গৃহিণীদের পক্ষে এটি এক দারুণ সুখবর।

জলে সাগর মিল্ক পাউডার মিশিয়ে কয়েক সেকেণ্ড নাড়ুন, ব্যস, দুধ একদম তৈরী। চা, কফি, মিল্ক ড্রিঙ্ক, পুডিং এবং মিঠাই যা খুশি এই দুধ দিয়ে বানান। ৫½ লিটার পরিমাণ দুধের সমতুল এই দুধ সুবিধাজনক ৫০০ গ্রামের প্যাকে পাওয়া যায়, যার দাম মাত্র ১০টাকা (কর আলাদা), অথচ যা থেকে আপনি সবসময়েই খাঁটি দুধ পেতে পারেন।

*যাঁরা আপনাদের দিয়েছেন আমূল মাখন, আমূলস্প্রে, আমূল চীজ, আমূল চকোলেট, বালআমূল, ও নিউট্রামূল, তাঁদেরই নিবেদন।*

নন। বরং উনি যে ক্রমান্বয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিজের রীতিপদ্ধতি অল্পে অল্পে সংশোধন করে নিচ্ছেন তার প্রমাণ পেলাম। যেমন আগে আগে লক্ষ্য করেছি রাগের বাড়তের ব্যাপারে উনি তেমন সতর্ক নন। এবারে তাঁর মিশ্র কি তোড়ী কি ভৈরবী কি সিন্ধু ভৈরবীর রূপায়ণে এর ব্যতিক্রম দেখলাম। তাঁর পরিবেশনায় মীড়ের প্রয়োগ, তানসৃষ্টি, জোড়ের কাজ এবং ছন্দোরচনা অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য। তবলায় সাহচর্য সম্পন্ন করেন অরুণ ঘোষাল। মল্লিকার্জুনের মনসুরের সঙ্গেও সম্পন্ন দায়িত্ব নেন অরুণ। মল্লিকার্জুন শুক্কার ও বিভাস রাগে দুটি খেয়াল গাইলেন। তাঁর গান শ্রোতৃসাধারণনির্বিশেষে সকলের কাছেই সমাদৃত হতে না পারে, তবে সংগীতবোদ্ধামাত্রই যে পরিতৃপ্ত হবেন সে কথা বলা বাহুল্য, কারণ, তাঁর গানে শাস্ত্রীয় শুদ্ধতার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। অবশ্যই তা নীরস পাণ্ডিত্যের প্রকাশ নয়—ব্যাকরণের শাসন মেনেও মল্লিকার্জুন সংগীতের রস-সঞ্চারে পারঙ্গম। তাঁর দুটি খেয়ালই স্বরবিন্যাস, তান, বোলতান, এবং ছন্দের কাজে এর নিঃসংশয় প্রমাণ বারবার মিলেছে। যোগী মত যা ভজনটি গেয়ে প্রবীণ শিল্পী তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করেছিলেন। দিল্লীর তরুণ হারমোনিয়ম বাদক মাহমুদ ঢোলপুরী কণ্ঠশিল্পীকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেন। সারারাতের আসরে উদ্যোক্তারা মাচের অনুষ্ঠানও বাদ দেননি। দৈবত কথক নাচ দেখান শাশ্বতী সিনহা। তাঁদের অনুষ্ঠান আহামরি না হলেও নিন্দনীয় নয়।

অভীক চট্টোপাধ্যায়

## রবীন্দ্রসংগীতের স্মরণীয় আসর

রবীন্দ্রনাথের গানের ক্ষেত্রে 'ঘরানা' শব্দটির ব্যবহারে যাঁদের অনীহা তাঁরা ২৭ এপ্রিল সকালে রবীন্দ্রসদনে রক্তপল্লব নিবেদিত 'রবীন্দ্রসংগীতের স্মরণীয় আসর'-এ উপস্থিত থাকলে 'ঘরানা' শব্দ ব্যবহারের যাথার্থ্য সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করতেন না।

এদিনের আসরে দুজন মাত্র শিল্পী ছিলেন—শান্তিদেব ঘোষ এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। শান্তিদেব ঘোষ আজন্ম রবীন্দ্রনাথ-দিনেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শিক্ষাধীন তাঁদের গায়কী কণ্ঠে ধারণ করে আজ একটি প্রতিষ্ঠান বিশেষ। দীর্ঘ সাধনা ও অভিজ্ঞতায় এই গান অনিবার্যভাবে আজ এক অনন্য সৃষ্টি রূপে তাঁর কণ্ঠে বিভাসিত। আর হরগোপম কণ্ঠের অধিকারী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রসংগীত-জগতে দীর্ঘদিনের একটি জনপ্রিয় নাম। শিল্পী হিসাবে এই জনাদরের মূল সম্পদ তাঁর কণ্ঠলাবণ্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গায়ন-ভঙ্গির পরিচ্ছন্নতা। আরো দুটি বিষয়ে তাঁর বৈশিষ্ট্যের কথা এক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি : গান নির্বাচনে কণ্ঠের উপযোগিতা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা, দ্বিতীয়টি : সুরের শুদ্ধতা রক্ষায় সযত্ন প্রয়াস। তাঁর গায়কী নিঃসন্দেহে পঙ্কজকুমার মল্লিকের—বা কালের অগ্র-

শান্তিদেব ও হেমন্তকুমার

নানা কারণে তাই এই দুই শিল্পীর অনুষ্ঠান স্মরণীয় হয়ে উঠবে এমন প্রত্যাশা নিয়েই সেদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু প্রথম শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর গানে সেই প্রত্যাশা পূর্ণ করেন নি।

প্রথমত এবং প্রধানত কণ্ঠ বিপর্যাসের কারণে তাঁর গানগুলি পূর্ণ মর্যাদায় বিকশিত হয়ে উঠল না। প্রথম গান থেকেই তাঁর কণ্ঠ আয়ত্তাধীন ছিল না, ক্রমাগতই এজন্য তিনি বিব্রত বোধ করছেন আর সম্ভবত সে কারণেই গান পরিবেশনে মনোনিবেশ অক্ষুণ্ণ থাকে না। গানগুলি প্রায় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাঁর কণ্ঠ নিঃসৃত হতে দেখা গেল, এমন কি সেদিনে তাঁর কণ্ঠে বহুশ্রুত গানগুলির সুরস্মৃতিও অম্লান ছিল না। 'তোমার আমার এই' গানটির 'এবার সেবার কাজে ডেকে লও' অংশটির পরম্পরাগতির কালে সুরান্তরে একটি বৈচিত্র্য আছে কিন্তু হেমন্তবাবু এই অংশটি গাইলেন একবারই। ঐ গানের 'অন্তরে যা লক্ষটি কখনো উচ্চারিত হল 'অন্তরের কখনো বা অন্তরের'। 'আমি তোমার সংগে বেঁধেছি আমার প্রাণ' গানটি সঞ্চারীর অংশের সুরও তাঁর স্মৃতিতে উজ্জ্বল ছিল না। এই তালিকা দীর্ঘ করা অসম্ভব নয়। বিস্মিত হয়েছি কারণ হেমন্তবাবুর কাছে এই ধরনের ত্রুটি অপ্রত্যাশিত। সামগ্রিক 'ভয়ের আমার এপথ', 'যৌবন সরসীনীরে' অথবা 'ও গো দেরী নিশেষ কথার মতো' কয়েকটি গান ব্যতিরেকে সেদিন তাঁকে কেমন ক্লান্ত বিমর্ষ মনে হল।

নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হয় দ্বিতীয়ার্ধে শান্তিদেব ঘোষ আসরটিকে স্মরণীয় করে তুললেন। প্রবীণ এই শিল্পী আজও কী অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে তাঁর কণ্ঠে মূর্ত করে তুললেন তা যেমন অবর্ণনীয় তেমন চমৎকৃতিজনক। মুক্তকণ্ঠে গান গাওয়ায় গানের শৈল্পিক সৌন্দর্যের হানি হয় এ কথা যাঁরা মনে করেন তাঁদের কাছে প্রতিবাদের অঙ্গীকার নিয়ে আসরে বসেছিলেন তিনি। মুক্ত কণ্ঠে প্রথম গানে 'আলোকের এই ঝরনাধারায়' যখন গেয়ে উঠলেন তখন যে অনাস্বাদিত রসপরিমণ্ডলের সৃষ্টি হল তাকে অবিস্মরণীয় বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। তিনি একাদিক্রমে 'কখন দিলে পরায়ে', 'আলো আমার। আলো আমার হিয়ার মাঝে', 'যুগে যুগে বাঁধি আমার', 'যখন এসেছিলে', 'সব দিবি কে', 'না বলে যায় পাছে সে', 'কাঁদালে তুমি মোরে', 'দুঃখের যজ্ঞ অনল জ্বলনে', 'আঁধার এল বলে', 'এখন আমার সময় হল'-র পর বাল্মীকি-প্রতিভা ও চণ্ডালিকার কিছু অংশ

পিকনিক, পার্টি, জন্মদিন, ছুটিতে ভ্রমণ, সবেরই আনন্দঘন মুহূর্তগুলি আগ্ফা-ক্লিক ক্যামেরায় ধরে রাখুন। এত কম দামে এত অপার আনন্দ, আপনি কল্পনা করতেও পারবেন না।
এই আনন্দদায়ক সুবিধেজনক 'ক্লিক' সর্বদা সঙ্গে রাখুন। আপনার নিকটতম আগফা-গেভার্ট ডীলারের কাছে এখনই চলে আসুন।
লেখামাত্রই ছবি তোলা যায়
পরিবেশক :
আগ্ফা-গেভার্ট ইণ্ডিয়া লিমিটেড,
রেজিস্টার্ড অফিস :
মার্চেন্ট চেম্বার,
৪১, নিউ মেরিন লাইন্স,
বম্বে ৪০০ ০২০
ক্লিক III আর ক্লিক IV
® ফোটোগ্রাফ সম্বন্ধীয় যাবতীয় উৎপাদনের প্রস্তুতকর্তা আগফা-গেভার্ট, অ্যানটওয়ার্প/লিভারকুসেন এর ট্রেডমার্ক।
SIMOES/AG/6/79 BEN

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি'—এই গানটির সঙ্গে 'কালো' শান্তিদেবের ব্যাপার নয় কিংবদন্তীর মতো। এ কথা অনস্বীকার্য শান্তিদেব ঘোষের গান শোনা একটি অভিজ্ঞতা। কিভাবে স্বরের দোলনে, শব্দোচ্চারণে অলংকরণের বিশিষ্টতায় বিচিত্র রসের গানকে শ্রোতার মনপটে অঙ্কিত করে দিতে হয় তা তাঁ। কাছে অজস্র শিক্ষণীয়। যেমন শিক্ষণীয় পুরুষের ভরা অনল জ্বলনের মতো জোরালো সমবেত কণ্ঠের উপযোগী গানকে কেমন করে উচ্চারণ-পদ্ধতি ও বলিষ্ঠ গায়ন ভঙ্গিমায় একক কণ্ঠে পরিবেশনের উপযোগী করে নেওয়া যায়। 'আলো আমার আলো ওগো' গানটির সাধারণ সুরবিন্যাস তাঁর কণ্ঠে দৃপ্ত প্রাণবান হয়ে ওঠে ওজস্বী গায়ন শৈলীতে, আবার ঠিক তার পরবর্তী গান 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে'... আর্তি ফুটে ওঠে অবাধ লয়ে ছন্দের অন্তঃশীল শিঞ্জনে। আবার নাট্যব্যাপকতার সংহত রূপ দেখি 'যখন এসেছিলে' 'যুগে যুগে বুঝি আমায় অথবা না বলে যায় পাছে সে' গানগুলিতে আবার 'আঁধার এল বলে' গানটিতে তাঁর কণ্ঠেই লোকসংগীতের উপাদানের পরিমার্জিত প্রয়োগের প্রকাশ পরিস্ফুট। গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের গানগুলিতে এ যুগে তিনি সর্বোত্তম। গানকে একই সঙ্গে বুদ্ধিস্পর্শী ও প্রাণস্পর্শী করে তোলায় নিঃসন্দেহে তিনি অনন্যতম। এখানেই তিনি সার্থক শিল্পী।

পরিবেশন করলেন। রবীন্দ্রনাথের গান যত বেশিবার তাঁর কণ্ঠে শোনার সুযোগ আসবে তা সৌভাগ্য বলে বিবেচিত হবে—ভবিষ্যতে সঠিক গায়ন ভঙ্গির আদর্শরূপে। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের কথায় যাহা গভীর তাহা অপাতত বহু লোকের গম্য না হইলেও বহুকাল তাহার পরমায়ু থাকে, তাহার মধ্যে যে একটি শ্রেষ্ঠতার আদর্শ আছে তাহা সহজে জীর্ণ হয় না।" অনুষ্ঠানটিকে সার্থক করে তুলতে যাঁরা যন্ত্রানুষঙ্গে সহায়তা করেছেন : নির্মল নন্দী, বিজয় সিংহ প্রভাত পাল পুলক দত্ত এবং সর্বোপরি অনাদি দত্ত যাঁ। খোল বাদন এই অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রা যোজনা করেছে।

**সুভাষ চৌধুরী**

## শুদ্ধজনের রুদ্ধসংগীত

"আপনার কাছে আমাদের ঋণ অপরিসীম। অজ কৃতজ্ঞ বঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে আমাদের সামান্য এই শ্রদ্ধাঞ্জলি আপনি গ্রহণ করুন এবং আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু লাভ করে শত সহস্র বাঙালীকে সুরের ইন্দ্রজালে সম্মোহিত রাখুন।"

দেবব্রত বিশ্বাসের উদ্দেশে প্রদত্ত এক সংবর্ধনা-সভায় যে-মানপত্র পাঠ করা হল, তাতে ছিল উপরের এই কথাগুলি। পুরো মানপত্রটি পাঠ করলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, তারপর শ্রদ্ধার্ঘ তুলে দিলেন "কাকা" ওরফে

Nestlé
প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর
নেস্‌কাফে
NESCAFE
বিশ্বের সর্বাধিক
বিক্রীত কফি
শতকরা ১০০ ভাগ খাঁটি কফি থেকে তৈরী
একমাত্র ইনস্ট্যান্ট কফি

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সংবর্ধনা জানাচ্ছেন দেবব্রত বিশ্বাসকে।

দেবব্রত বিশ্বাসের হাতে। বস্তুত, এই সংবর্ধনাসভার মুখ্য উদ্যোক্তা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, "কিংশুক" সংস্থার আয়োজনে নিবেদিত হল সভাটি গত ২১ মার্চ সন্ধ্যায়, রবীন্দ্রসদনে। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের পক্ষ থেকে যে এই আয়োজন নয়, সে-কথা মুখে বলে দিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মানপত্রেও স্পষ্ট উল্লেখ ছিল—"বঙ্গবাসীর পক্ষে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।"

খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এই অনুষ্ঠান। অত্যন্তই প্রয়োজনীয় ও জরুরী কাজ সম্পন্ন করলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্দেহ নেই। সত্যজিৎ রায় এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে যেমন লিখেছেন—"শুনতে পাই জর্জদার মনে ব্যক্তিবিশেষ ও সংস্থাবিশেষ সম্পর্কে এখনও নানান নালিশ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে : আশা করি আজকের এই অনুষ্ঠান তাঁর মন থেকে সব অভিযোগ অভিমান দূর করতে সাহায্য করবে" সে-কথা আরও অনেকের মনের কথা। আনুষ্ঠানিক এই সংবর্ধনার মূল্য সেদিক থেকে অপরিসীম।

সেই মূল্যের কথা ভেবেই বোধহয় প্রেক্ষাগৃহে সেদিন তিল ধারণের জায়গা ছিল না। মঞ্চে ভেঙে পড়েছিল সর্বস্তরের গুণিজনের সমাবেশ। চিত্রপরিচালকরা, প্রবীণ-নবীন সঙ্গীতশিল্পীরা, আবৃত্তিকারেরা, চেনা-অচেনা আরও বহু জন ভিড় করেছিলেন মঞ্চে, উইংসের দুই ধারে, এ-কোণে ও-কোণে সর্বত্র। পুষ্পস্তবক উপহার দিলেন অমিয়া ঠাকুর, কনক বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, দ্বিজেন চৌধুরী, সন্তোষ সেনগুপ্ত, শুভ গুহঠাকুরতা, নীহারবিন্দু সেন, সাগর সেন, তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার অজয় কর, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

সন্তোষ সেনগুপ্ত দেবব্রত বিশ্বাসের বিপুল জনপ্রিয়তার কথা বললেন তাঁর ভাষণে। নীহারবিন্দু সেন তাঁকে "গীতব্রত" অভিধায় আখ্যাত করে তিনটি প্রার্থনা জানালেন—রোগমুক্তি, সুরের অব্যাহত গতি এবং শতবর্ষের আয়ু। তরুণ মজুমদারের ভাষণে ফুটে উঠল কিছুটা জ্বালা। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যাকরণের চারপাশে পাহারা তুলে যাঁরা জর্জ ব্যাকরণ

অব্যাহত করতে হবে—আবেগজড়ানো কণ্ঠে বললেন তরুণ মজুমদার।

পরনে গেরুয়া বসন, এক মুখ দাড়িতে ঢাকা মুখ, যেন আরেক দেবব্রত বিশ্বাস সেদিন মঞ্চে আসীন। কিন্তু সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে কথা শুরু করতেই গমগমে গলায়, নিজস্ব পূর্ববঙ্গীয় টানে ভরা উচ্চারণে চেনা গেল তাঁকে। জনগণের মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত ছড়িয়ে দেবার ব্যাপারে দুজনের কাছেই যে আসল ঋণ, বললেন তিনি। প্রথম জন পঙ্কজকুমার মল্লিক, দ্বিতীয়—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। প্রথম জনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে নিজের কণ্ঠ থেকে মালাটি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন দেবব্রত বিশ্বাস।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল গান। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় শোনালেন প্রথমে। নির্বাচন এলোমেলো, কিন্তু পরিবেশকে লাবণ্যময় তাঁর নিবেদন। বিশেষত 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা', 'প্রাঙ্গণে মোর' এবং 'এমন দিনে তারে বলা যায়' সেদিন অসামান্য পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু "আছে দুঃখ আছে মৃত্যু" গানটিকে সেদিন কেন বাছলেন তিনি, বোঝা গেল না।

দেবব্রত বিশ্বাস ভাষণে যে-কথা বলেননি, তাই বললেন গানে সেদিন। প্রেক্ষাগৃহের আলো জ্বালিয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর আলোকিত প্রত্যাশার সামনে তিনি চারখানি গানে তুলে ধরলেন তাঁর গোপনতম উচ্চারণগুলি। প্রথম গান "এ-মণিহার আমায় নাহি সাজে।" সংবর্ধনার উত্তর হয়ে এল যেন। দ্বিতীয় গান—"আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল" নালিশ নয়, বেদনা হয়ে ঝরে পড়ল। তৃতীয়ত, "গান আমার যায় ভেসে যায়"-তে ক্রমশ স্পষ্টতর হল সেই বেদনা। "চাস নে ফিরে চাস নে, দে তারে বিদায়" স্বগতোক্তির মতো শোনালো, এবং বলাবাহুল্য, সেই উক্তিতে যে-অভিমান, যে-যন্ত্রণা, যে আকুতি তা সেই সন্ধ্যায় সমস্ত শ্রোতার আঁখিকেই বেদনায় ছলছল করে দিয়েছিল। এবং সেই বেদনাবিদ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীকে আরও অশ্রুপ্লুত করে শেষ গান ধ্বনিত হল তাঁর কণ্ঠে তীব্রতর বেদনায় ভরা জিজ্ঞাসা হয়ে "যেদিন সকল মুকুল গেল ঝরে, আমায় ডাকলে কেন গো এমন করে।" "হাতে আমার শূন্য ডালা", "রিক্ত বাহু এই তো আমার" এই কলিগুলি গাইবার সময় হাত উঠে এসেছিল তাঁর, এ-কথা সত্য, কিন্তু তাঁর সেদিনের কণ্ঠ, গায়নভঙ্গি, সম্মোহক উচ্চারণ বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছিল যে তাঁর অনুভবটি এখনো শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে শূন্য হয়ে ওঠেনি। তাঁরও কোনো অধিকার নেই শ্রোতৃমণ্ডলীকে এভাবে বঞ্চিত করে রাখার। সব শেষে সেদিন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত বিশ্বাস একত্রে পরিবেশন করলেন "ক্লান্তি আমার"। বাংলায় ও ইংরেজীতে। বাংলায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ইংরেজীতে—দেবব্রত বিশ্বাস।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

## প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

### কার্তিকচন্দ্র পাইন
### (১৯৩১—)

শিল্পী-সমাজে তিনি সুহৃদ কার্তিক পাইন। উনি কলকাতার পুরোনো বাসিন্দা। উত্তর কলকাতার বনেদী সুবর্ণ-বণিক পরিবারের ঐতিহ্য ওঁদের বাড়িতে। মেঠো ভাই হুলোচাঁদ দত্ত মস্ত তাদের। এই বাড়ির গৃহদেবতা, অন্ন জীবনের বাড়িতে আসেন। সেই বাড়ির ছেলে গণেশ। ওঁদের জাতিভাই। তিনিও নামী শিল্পী। বস্তুত একই প্রজন্মে একই বংশে তিনজন খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী বড় কম কথা নয়।

প্রচ্ছদের "পাখি হস্তরেখা বলে" (জলরঙ ১২"×৬") ছবিটি খুবই মজাদার কাজ। হাতের ছাপ এঁকেছেন নানা রঙে মজা করে। ওপরে টিয়া-পাখি। সমস্ত ছবির সাজানোটার মধ্যেই জীবন লৌকিক ব্যাপার। একটু হাসি। আসলে ওঁর সতীর্থ শিল্পী সত্যেন পোদ্দার হস্তরেখা দেখেন। তাঁকে নিয়ে মজা করার ইচ্ছা হয়। শেষে ভারতীয়দের ভাগ্যবাদী রূপটা ব্যাখ্যা করেন। এই ছবির পরিমিত টুকটুকু রেখায়। অনাবশ্যক কিছু নেই। পরে হাতের চারপাশে কালির দ্রুত আঁচড় টেনেছেন। সামান্য আয়োজন কিন্তু দামদার ব্যঞ্জনা।

কার্তিক সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক। বহুকাল সর্ব-ভারতীয় প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করছেন। আকাদমী অব ফাইন আর্টস পুরস্কার ১৯৬৬, '৬৯, '৭৩, '৭৬। মহাকোশল কলা পরিষদ পুরস্কার ১৯৭৩, '৭৪। একক প্রদর্শনী করেছেন একাধিক কলকাতায়। দিল্লির আইফেক্স আয়োজিত যুগলবন্দী প্রদর্শনী (১৯৬১)। ললিতকলায় একক প্রদর্শনী '(১৯৬৮) এবং জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারী বোম্বাই (১৯৬৮)। কিছুকাল সোসাইটি অব কনটেমপোরারী আর্টিস্টস্-এর সদস্য ছিলেন। বর্তমানে ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্টিস্ট কেন্দ্রাশেনের। সম্প্রতি জাপানের ফুকুওকা আর্ট মিউজিয়ামে "এশিয়ার শিল্পকলার এক শত বৎসর (১৮৬১ — ১৯৬১)" প্রদর্শনীতে ভারতীয় বিভাগে রবি বর্মা থেকে কার্তিক পর্যন্ত এক শ জনের কাজ ছিল। সমবয়সীদের মধ্যে ছিলেন এ শহর থেকে মাধব ভট্টাচার্য, শর্বরী রায়-চৌধুরী, অজিত চক্রবর্তী। এঁদের কাজ ১৯৬১-তে ন্যাশনাল গ্যালারী সংগ্রহ করেন। দুটি ম্যুরাল করেছেন একটি হোম পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্ট পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের জন্য। অপরটি ভারত সরকারের তথ্য এবং জনসংযোগ বিভাগের জন্য। ন্যাশনাল গ্যালারী অব মডার্ণ আর্ট বিড়লা আকাদমী প্রভৃতি স্থানে তাঁর কাজ আছে। আড়াই বছর ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে অধ্যাপনা করেছেন।

কার্তিকের হাতে নানারকমের কাজ আছে। এই অন্তরের স্পষ্ট সংবেদ বিদেশের রেখার মেলার উদাসীন বা ফিকেতলা রেখার কাজ আছে। তারা প্রভাবের ছাপ জানেন বলেই দ্রুপদন্দ তেলেপ গড়তে পারেন সফলতায়। এক সময় জগতে আটপৌরে চেহারার শ্রীবিশ হয়ে গেছে। ছবিতেও তার প্রতিফলন

ঘটে। অন্যদিকে ইউরোপীয় তৈলচিত্রের প্রতি তাঁর আকর্ষণ। এই উভয় রীতির সংমিশ্রণে তাঁর নিজস্ব শৈলী। উত্তর কলকাতার গলি, লোকাচার, স্ত্রী আচার, পুজো পার্বণের জগৎ এবং ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি, সব মিলিয়ে শহর কলকাতার মানুষজন এবং মানসিকতার প্রতিবিম্ব আছে তাঁর কাজে। কার্তিক জলরং-এর কাজে সমান দক্ষ। সেখানেও তাঁর বর্ণ-রেখায় সমান কলাকুশলতা। বস্তুত তাঁর কাজের সৌকর্য মনে লেগে থাকে।

কার্তিকের মত কিছু শিল্পী কল-কাতায় আছেন যাঁরা নিয়মিত রেওয়াজ করেন। রচনা করেন। অথচ লোকের উৎসাহ বা পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, অর্থের অপ্রাচুর্য এবং গুছিয়ে উপস্থাপন করার লোক না থাকায়, এঁরা অপরি-চিতই থেকে যান। একজন তৃতীয় শ্রেণীর কবি বা গল্পকার কলকাতায় যে সম্মান পান, একজন প্রথম সারির শিল্পী তা পান না। অথচ শিল্পীরা ফুলের মতো। ভাল ফুল গাছের তলায় মাটি নিড়তে হয়। জল দিতে হয়। গত বছরে ১৮৬১-১৯৬১ পর্যন্ত এশিয়ার শিল্পকলার প্রদর্শনীতে কিংবদ জাপানীরা যাঁকে নির্বাচন করেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিগ্রহণের পর ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের দিবা বিভাগ থেকে তাঁর চাকরি যায়। এই দেশ!

কার্তিককে যাঁরা চেনেন, তাঁরা অবশ্যই সাক্ষ্য দেবেন ছুটকো টুইসানী করে কি-ভাবে তাঁর শিল্পকলা চালিয়ে গেছেন। কখনো নৈরাশ্য বা দুঃখে তাঁর চিরাচরিত হাসিটুকু উড়ে যায়নি। বরং তিনি কাজ করে গেছেন। পয়সা ছবির পেছনেই কাজ করেছেন। তাঁর কল্পনা-প্রবণ জগৎ। নির্জন দ্বীপে পাখিরা হাত ধরে হাঁটে। বাঘ হয় মানুষ। মানুষ হয় জন্তু। বাদকের কার্তিক পাইন।

# ঘামাচির চুলকানি আর জ্বালা-যন্ত্রনা ভুলে যান!
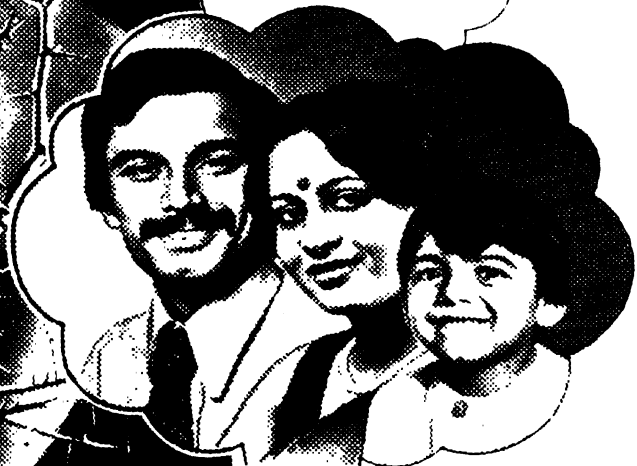
TIPS AND TOES

বিশেষ নখরঞ্জনী
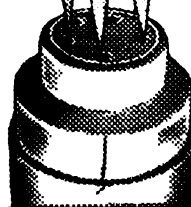
এ হ'ল আপনার মত হাসি লাস্যে ভরা যুবতীদের সুন্দর নখ রাঙ্গানোর জন্য— ঝকমকে মনোলোভা রঙ। যে রঙ আপনার নখে একবার লাগালে বহুক্ষণ পর্যন্ত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে।

নানান সুন্দর সুন্দর রঙ যা' আপনার ব্যক্তিত্ব ফোটায়, নখকে সাজায়, মনকে রাঙ্গায়।

নানান মনোলোভা রঙ যেমন, চকলেট ফ্রস্ট, ডাস্কি পিংক, স্ট্রবেরী ক্রীম, কফি ক্লাউড আর অরেঞ্জ স্ন্যাপ।

টিপস্ অ্যাণ্ড টোজ্ নেল লাস্টার রিমুভার ও পাওয়া যায়।

যেকোনও বড় দোকানে খোঁজ করলেই পাবেন।

# ঘামাচির চুলকানি আর জ্বালা-যন্ত্রনা ভুলে যান!
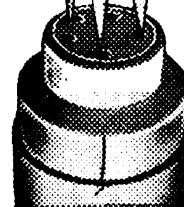
বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের রচনাবলী

সপ্তম খণ্ড পঁচিশ টাকা

প্রকাশিত হয়েছে

## বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

# বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র

প্রথম খণ্ড : ১১১টি গল্প ৪০৲

দ্বিতীয় খণ্ড : ১১২ টি গল্প ৪৫৲

## অবধূত-এর

'মরুতীর্থ হিংলাজ', 'হিংলাজের পরে' 'দুর্গম পন্থা' এবং 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' এই চারখানি বইয়ের একত্র সংকলন

ত্রিশ টাকা

— সদ্য প্রকাশিত —

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

## কথা কল্পনা কাহিনী

দ্বিতীয় খণ্ড : কুড়ি টাকা

সুমথনাথ ঘোষের

## বাঁকাস্রোত

(পেপার ব্যাক) নয় টাকা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

## সোনার হরিণ নেই ৫০৲

সুজিত কুমার সেনগুপ্তের **সোনালি দিনের পাখিরা** ১২৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তর

কিশোর পাঠোপযোগী সমগ্র গ্রন্থের সংকলন

## কিশোরসাহিত্য-সমগ্র

তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে

৩য়:—১৪·০০

কিশোরদের জন্যে লিখিত লেখকের সমগ্র রচনাগুলি তিন বা চার খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতিখণ্ড আনুমানিক ৩০০—৩৫০ পৃষ্ঠা, প্লাসটিক জ্যাকেটে মোড়া, ছোটদের উপহার দেবার মত। এখনই সংগ্রহ করুন। মূল্য—১ম খণ্ড সাড়ে বারো টাকা

২য় খণ্ড সাড়ে বারো টাকা

মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ ৩৪-৮৭৯১

## চিঠিপত্র

### মেলাবেন, তিনি মেলাবেন

শ্রীশঙ্কর ঘোষের 'মেলাবেন, তিনি মেলাবেন' প্রবন্ধটিতে মাও সে তুং-এর মৃত্যুর পর চীনে নেতৃত্ব বদলের লক্ষণ এবং অদূর ভবিষ্যতে সোভিয়েট-চীন মৈত্রীর সম্ভাবনার কথা আলোচিত হয়েছে।

মাও সে তুং সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য নেতৃত্বের উত্তরাধিকারী হিসাবে গণ্য হতে পারেন এমন কাউকেই তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না, আমার মনে হয় ঠিক নয়। জীবনের শেষ দশকে মাও সে তুং তাঁর নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য দিনরাত ভাবতেন। স্ট্যালিনোত্তর রাশিয়ার অভিজ্ঞতা তাঁকে খুবই উৎকণ্ঠিত করে তোলে। ১৯৬৯ সালের পার্টি কংগ্রেস থেকে লিন পিয়াওকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হয়। চীনের মুক্তিসংগ্রামের প্রতিটি স্তরে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা, মাও-এর সঙ্গে চিন্তায় ও কর্মে সহমর্মিতা, গণমুক্তি ফৌজের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা এবং তুলনায় অল্প বয়স, এইগুলি লিন পিয়াওকে নেতৃত্বের আসনে মনোনীত করার অন্যতম কারণ। চু এন লাই কোন স্তরে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। চীনের সাম্প্রতিক নেতাদের বক্তব্যকে ভিত্তি করে মাও-এর কাজের বিচার বা ব্যাখ্যা করা মারাত্মক ভুল হবে।

শ্রীঘোষ মন্তব্য করেছেন, মাও-এর গ্রেট লীপ ফরওয়ার্ড আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সেনাবাহিনী থেকে সোভিয়েট প্রভাব দূর করা এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল ব্যুরোক্র্যাসীকে সোভিয়েট প্রভাবমুক্ত করা। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য কি তাই? আদর্শগত সংগ্রামের চরম পর্যায়ে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে তীব্র বৈরিতার সৃষ্টি হয়। ক্রুশ্চেভ চীনের উৎপাদন-কেন্দ্র থেকে হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ার ও দক্ষ কর্মীকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। চীনের শত শত কলকারখানা ও প্রজেক্ট অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে থাকে। উৎপাদন-ক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলা ও সংকট দেখা দেয়। গ্রেট লীপ ফরওয়ার্ড আন্দোলন সমগ্র চীন জাতিকে সর্বাত্মকভাবে উৎপাদন-ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করে এবং বহু ব্যর্থতা ও ভুল-ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে চীন আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ার ও উন্নত ধরনের কৃষক-কর্মীর সৃষ্টি হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে কয়েক দশকের কাজ সম্পূর্ণ হয়।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব আদর্শগতভাবে রুশ-বিরোধী আন্দোলন সন্দেহ নেই। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি মার্কসবাদের মূল তত্ত্বকে বিকৃত করে যেভাবে ধনতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন ঘটাবার চেষ্টা করছে তার হাত থেকে মার্কসবাদকে রক্ষা করবার জন্যই মাও-এর সাংস্কৃতিক বিপ্লব। যদিও ছোটখাট বলপ্রয়োগ, বাড়াবাড়ি, ভুল-ভ্রান্তি অনেক ঘটেছে, কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, এত ব্যাপক, [illegible] এবং সর্বাত্মক [illegible] সাংস্কৃতিক বিপ্লব পৃথিবীর মানুষ এর আগে দেখেনি। এটা একটা বিরাটতম এক্সপেরিমেন্ট। এই বিপ্লবের ভুল ত্রুটি ব্যর্থতা যেমন বুঝতে হবে এর ব্যাপক ইতিবাচক দিকটাকে শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও একনিষ্ঠতার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। মাও বলেছেন, সাংস্কৃতিক বিপ্লব ধারাবাহিক এবং অতি দীর্ঘস্থায়ী হবে।

শঙ্করবাবু ঠিকই বলেছেন যে, বর্তমান চীনের নেতারা যা বলছেন সোভিয়েট নেতাদের বক্তব্যের সঙ্গে তার কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ও পার্টি স্তরে চীনে মাওবাদের অবসান হয়েছে এবং রুশ-চীন মৈত্রীর সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মাও-এর নামকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে চীনের নেতারা মডার্নাইজেশনের আওয়াজ তুলেছেন। ইউরোপে . তো এত মডার্ন স্টেট আছে, মডার্নাইজেশন কি তাদের কোন মৌলিক সমস্যার সমাধান করেছে?

শঙ্করবাবু বলেছেন, কোন দেশের সামরিক বাহিনী অসামরিক দায়িত্ব পালনে ইচ্ছুক নয়। চীনেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। চীনের কিছু জেনারেল এবং হয়ত কিছু সৈনিক সম্পর্কে এ কথা সত্য হলেও, গণমুক্তি ফৌজ জন্মকাল থেকেই উৎপাদন, পুনর্গঠন, জনগণের সেবাকে সামরিক কর্তব্যের সঙ্গে সমান গুরুত্ব দিয়েছে। মাও-এর নেতৃত্বে এবং চু টে-র পরিচালনায় গণমুক্তি ফৌজ যে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে, তার প্রধান কারণই এই। এমন কি, সাংস্কৃতিক বিপ্লবেও তারা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল।

সঞ্জয় সেন
[illegible]কালী,

### বামফ্রন্ট বনাম মন্ত্রিসভা

তত্ত্বকথা এবং তথ্যকথা এক জিনিস নয়। অতুলবাবু বাম ফ্রন্ট বনাম মুখ্যমন্ত্রী বিষয়ে লিখেছেন, তাই আমার আলোচনা ঐ ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ রাখছি।

প্রশ্ন হল, ইনজিনিয়ারিং কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজে এনট্রান্স পরীক্ষা নেবার ব্যাপারে বাম ফ্রন্টের কোনও নীতি নির্ধারণ করার অধিকার আছে কিনা। অতুলবাবু নিজেই বলেছেন যে, নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে দলের দায়িত্ব অবশ্যই আছে। সুতরাং এই নীতি যখন একবার নির্ধারিত হল তখন সেই মত কাজ করাই মন্ত্রিসভার কর্তব্য। কোনও বিশেষ কারণে যদি মন্ত্রিসভা দলের নীতি সম্পূর্ণভাবে মানতে না পারেন তবে সেটা দলকে অবশ্যই জানাতে হবে এবং আলোচনার মাধ্যমে ফয়সালা করতে হবে। মন্ত্রিসভা যদি দলের নীতি মেনে চলেন তবে তো দল খুঁটিনাটি ব্যাপারে মন্ত্রিসভার কাজে নাক গলাবে না। কিন্তু দলের নির্দেশনীতি থাকা সত্ত্বেও সেটাকে অমান্য করা কোনও সুস্থ মন্ত্রিসভার পক্ষে উচিত নয়।

মুখ্যমন্ত্রী কেবল দলের মুখ্যমন্ত্রী নন—এ কথাটা অবশ্যই ঠিক। তবে কোনও মুখ্যমন্ত্রী তো তাঁর ব্যক্তিগত খেয়ালখুশিমতো চলতে পারেন না; [illegible]

দলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও [illegible] বলেই খাম ক্লপ্টর নির্দেশ মেনে নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

শ্রীলেখা মুখোপাধ্যায়
হাবড়া, ২৪-পরগনা

## ম্যালোরীর মৃতদেহ

দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রসেন চক্রবর্তীর "এভারেস্ট থেকে ম্যালোরীর মৃতদেহ আবিষ্কার" লেখাটি পড়ে ভাল লাগল। ১৯২৪ সালের এভারেস্ট অভিযানের ঘটনাবলী সম্ভবত তিনি স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ডের 'দি এপিক অব মাউন্ট এভারেস্ট' থেকে সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু তাঁর লেখায় কয়েকটি তথ্যগত ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারছি না।

শ্রীচক্রবর্তী লিখেছেন যে, '১৯৪২ সালে রাশিয়ান এক অভিযাত্রী দলও এভারেস্ট শিখর আরোহণের প্রচেষ্টা করেছিলেন শোনা যায়।...তাতে মোট সাতজন রুশী পর্বতারোহী প্রাণ হারিয়েছিলেন।' কিন্তু এপারিল, ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হিমালয়ান ক্লাব নিউজ লেটার নং ৮এ বলা হয়েছে যে, অভিযানটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে। অভিযানের মোট ছয়জন সদস্য ২৭০০০ ফুট পৌঁছে আর ফিরে আসেননি। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে কোন এভারেস্ট অভিযান সংগঠিত হতে পারে নি।

১৯৪৭ সালে আর্ল ডেনম্যান যে একক অভিযান চালিয়েছিলেন, তার সঙ্গে দুজন শেরপার অন্যতম ছিলেন শ্রীতেনজিং নোরগে। অভিযানটি বিফল হওয়ায় তাঁরা সকলেই ফিরে আসেন। অভিযানটি যদিও অননুমোদিত ছিল, কিন্তু এ অভিযানে কোন দুর্ঘটনা ঘটে নি। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে ডেনম্যান আবার এসেছিলেন, কিন্তু এবারও অনুমোদন না থাকায় তেনজিং যেতে রাজী হননি। ডেনম্যান ফিরে যান। র‍্যামসে উলম্যানের দ্বারা অনুলিখিত তেনজিং-এর আত্মজীবনীতে এই অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

ম্যালোরীর ক্যামেরায় তোলা exposed film যদি থেকেও থাকে, ছাপ্পান্ন বছর পরেও ফিল্মটি অক্ষত থাকা কি সম্ভব? যদিও এর ফলাফল জানতে বেশী দেরি হবার কথা নয়, কিন্তু আমরা জানি যে, তুষারস্তরের মধ্যে থেকেও বায়ুর আর্দ্রতা (Moisture) এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আর এই আর্দ্রতাই ফিল্মের ক্ষতি করে সব চেয়ে বেশী।

**প্রমথ নাথ সেন**
**কলকাতা-২৬**

## রবীন্দ্রসংগীত

'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীসমীর চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রসংগীত কি লাইট মিউজিক' বিষয়ক চিঠির কয়েকটি বক্তব্য সম্পর্কে কিছু বলা দরকার মনে করি। শ্রোতা এবং শিল্পীর ভূমিকা এবং কর্তব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলে গেছেন। স্রষ্টা এবং শিল্পীর সম্পর্কের [illegible] একটি চিঠিতে।...পূজারি যখন আমার গান করে, শুনলে মনে হয় আমার গান রচনা সার্থক হয়েছে। সে গানে যতখানি আমি আছি ততখানি সেও আছে। এই মিলনের দ্বারা যে পূর্ণতা ঘটে সেটার জন্যে রচয়িতার সাগ্রহ প্রতীক্ষা আছে।" (শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত 'রবীন্দ্রায়ণ', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৩৪)। সুতরাং কে সব রকম বিচার-বিবেচনার ঊর্ধ্বে রেখে স্রষ্টার প্রতি নিঃশর্ত এবং নিরঙ্কুশ আত্মসমর্পণ করতে না পারলে গান গাওয়া অথবা গান শোনা কোনটাই সার্থক হয় না।

শ্রীচট্টোপাধ্যায় ভেবে দেখতে বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ধরনের গানগুলোকে সাংগীতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত করা যায় কিনা।" রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ক কোনো কোনো গ্রন্থে গানগুলিকে ধ্রুপদাঙ্গ, টপ্পাঙ্গ, কীর্তনাঙ্গ, বাউলাঙ্গ প্রভৃতি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে, তবে লঘু-অলঘু বলে কোনো শ্রেণী-বিন্যাসের কথা শোনা যায়নি। রবীন্দ্রনাথের গান কথা-প্রধান, সুর-প্রধান নয়—এ কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বার বার বলে গেছেন এবং এই কারণেই সুর-বিচারের ভিত্তিতে না করে গীতবিতানের গানগুলিকে কাব্য-বিচারের ভিত্তিতেই পর্যায় ভাগ করেছেন। তাঁর গানগুলির ভিন্নতর কোনো শ্রেণী-বিন্যাসের আবশ্যকতা বোধ করলে নিশ্চয় তিনি তা লিখে যেতেন। কিন্তু যতদূর মনে হয়, এমন কথা তিনি কোথাও লেখেননি। সুতরাং, গীতবিতানের পর্যায়-বিন্যাসের পর তাঁর গানগুলির নতুন কোনো শ্রেণী-বিন্যাসের আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কিনা সেইটাই ভেবে দেখা দরকার সবার আগে।

শ্রীচট্টোপাধ্যায় আরও বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের গান কি আধুনিক গান নয়? গত একশ বছর ধরে বাংলা আধুনিক গানের যে ধারা চলে আসছে রবীন্দ্রনাথ তার উৎসে নেই?" বাস্তবিক এ এক অদ্ভুত প্রশ্ন। কিসের উৎসে কি নেই? 'আমি কেবল তোমার দাসী, কেমন করে আনব মুখে তোমায় ভালবাসি' রবীন্দ্রনাথের এই গানটি যদি আধুনিক হয়, তাহলে গোপালের 'মদন আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ করলে কি গুণ ঐ বিদেশী' গানটার আধুনিক হতে বাধা কি? এইভাবে উৎসের উৎস, তস্য উৎস খুঁজলে তো চর্যাগীতিকেও আধুনিক গান বলা যায়। 'আধুনিক গান'—একসঙ্গে এই দুটি শব্দের প্রচলন কত দিনের? তিরিশের দশকের প্রথম দিকে 'আধুনিক গান' নাম দিয়ে কোনো গানের কথা শোনা যেত না। যত বেশীই হোক না কেন, এই আধুনিক গানের বয়স ৪৫ থেকে ৫০ বছরের মধ্যেই ধরতে হয়। বাংলা গানের বিশিষ্ট ধারার অবলুপ্তিই এই আধুনিক গানের প্রকৃত উৎস বললে খুব অযৌক্তিক কিছু বলা হবে বলে মনে হয় না। জয়দেব থেকে নজরুল পর্যন্ত বাংলা গানের যে ধারা, তাতে দেখা যায়, এই সব গানের রচয়িতা এবং সুরকার একই ব্যক্তি। ব্যতিক্রম অবশ্যই কিছু আছে, কিন্তু তা খুবই সামান্য।

নজরুলের পর থেকেই পুরোপুরি আধুনিক গানের যুগ। এখন গান লেখেন একজন আর সুর দেন অন্য আর একজন। ব্যতিক্রম সেই কালেই হয়।

কমলাকান্ত বরাট
হাওড়া

## গ্রাফিক আর্ট ঃ লেখকের প্রত্যুত্তর

১৭ই মে সংখ্যায় সনৎ করের চিঠি পড়ে অবাক হলাম। ছাপাই ছবিকে আমি নিজে চিত্র এবং ভাস্কর্যের সমান মর্যাদা দিই না। সনৎ কর-সহ আমার বন্ধু কিন্তু নিছক ছাপাই শিল্পী। এ-ব্যাপারে ক্ষুব্ধ। আমার বক্তব্য এই-রকম—বড় শিল্পী সময় পেলে এ কাজ করেছেন এবং শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ও ভাস্কর-দের ছাপাই ছবি সবচেয়ে রসোত্তীর্ণ। এ কথা আমরা ক' বছর আগে নিউ ইয়র্ক মডার্ন আর্ট গ্যালারীর প্রেরিত প্রদর্শনী দেখেই আবার নতুন করে বুঝেছি। পিকাসো, মাতিস, ব্রাখ আগামের পাশে দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না হেটারের নান্দনিক বিচারে। এ দৃঢ় বিশ্বাস ছাপাই চিত্রশিল্পীদের আয়ত্ত করে।

হেটারের 'ভিসকসিটি' পদ্ধতির মূল আবিষ্কর্তা অবশ্যই। ভারতবর্ষ থেকে যত দূর জানি তাঁর স্টুডিওতে প্রথম কাজ শেখেন কানওয়াল কৃষ্ণ। এই পদ্ধতির নতুন প্রবৃত্তির উন্নতির পেছনে কৃষ্ণ রেড্ডী এবং কায়কো মোতির দান আছে। এ কথায় লেখক প্রাঞ্জল স্বীকৃত। সনৎ কর লেখা নিজেই বলেছেন।

সনৎ কর আমায় কবে স্বীকার করেছেন—ইন্টাগ্লিও পদ্ধতির ফাঁক দিয়ে ড্রইং না জেনেও কিছু ছেলেমেয়ে ইকড়ি মিকড়ি খেলা খেলে যান অ্যাসিডের মধ্যে ধাতুর পাতার অঘটনের দয়া ধরে। প্রসঙ্গত তিনি বলেছেন, ধাতুর পাতে অ্যাসিড অঘটন ঘটায় না—এত বড় অনুভাবন কি করে করলেন? তাঁর প্রথম দিকের কাজগুলো মনে পড়ল না? সেগুলো তিনি ক্যালকাটা গ্রুপের সভ্য থাকতে করেছিলেন? তাতে মূলত অ্যাসিডের অঘটনপটিয়সী খেলার মাহাত্ম্য কি ছিল না? দ্রষ্টব্য কেমোল্ডে ১৯৬৪-র প্রদর্শনী।

গত ১২-১৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় এসেছিলেন লন্ডনের রয়েল কলেজ অব আর্টের ছাপাই ছবি বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক অ্যালিস্টার গ্রান্ট। তিনি আমায় বলেছেন 'হেটার ইজ এ ভিজনারী'। বললাম, আপনার উদ্ধৃতি করতে পারি? অবশ্যই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ভাস্কররা শ্রেষ্ঠ ছাপাই-কার। ডুরেরার, গোইয়া, পিকাসো মাতিস। যে শুধুই ছাপাই শিল্পী, সে খর্বই সীমাবদ্ধ। রয়েল কলেজে ছাপাই ছবির প্রত্যেক ছাত্রকে চিত্র-ভাস্কর্য করে যেতে বাধ্য করি।'

অ্যালিস্টার গ্রান্ট বনাম সনৎ কর। কলাভবন বনাম রয়েল কলেজ। বিতর্কটির গুরুত্ব সুতরাং বিবেচ্য। নিজ

কলকাতাই কেমন করে এক নিশ্বাসে গোঁফা এবং মহান শিল্পী ভুয়েরারের নাম উচ্চারণ করলেন? আলিয়াঁস ফ্রঁসে এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলে আমার সঙ্গে নিত্য নিয়মিত বহু জ্ঞানী শিল্পরসিকের পরিচয় হয়। তাঁদের জনে জনে জিজ্ঞেস করেছি। তাঁরা হেটারের নাম কেউ শোনেননি। আয়র্ল্যান্ডের গ্রান্ট বললেন, হেটারের রাজার মার্কিন মুলুকে। ইউরোপে তিনি অপরিচিত। এমন কী প্যারিতেও। তাঁর কাজে নান্দনিক কোন গুণ নেই।

অন্যমনস্কতা সোমনাথ হোড় কলাভবনের অধ্যক্ষ। তাঁর এচিং আমার ভালো লাগে। তাই বলে কিন্তু কোন দিন তাঁর সাদার ওপর সাদা কাজগুলো আমার উৎকর্ষ সৃজনশীল কাজ মনে হয়নি। এচিং এবং ইন্তা-গ্লিওর তফাত আছে। আমার মনে আছে অরুণ বস, প্যারী থেকে ফিরে আসার পর কলকাতার ইন্তাগ্লিও শুরু হয়। তাই তাঁকে ভগীরথ বলেছি। এ বিষয়ে সোসাইটি অব কন্টেম্পোরারী আর্টিস্টের মুখপত্র সম্পাদক প্রণবরঞ্জন রায়ের উদ্ধৃতি করব : "অরুণ বোস, অ্যাট প্রেসেন্ট অ্যান অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অব গ্রাফিক আর্টস অ্যাট...সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্ক। অরুণ ইজ এ ফাউন্ডার মেম্বার অব সোসাইটি অব কনটেম্পোরারী আর্টিস্টস। হি ওয়াজ ওয়ান অব দ্য আর্লিয়েস্ট টু বি ট্রেন্ড অ্যাট হেটেরস অ্যাটিলিয়ার। ইট ইজ ফ্রম অরুণ দ্যাট শ্যামল দত্ত রায়, সনৎ কর, শৈলেন মিত্র...হ্যাড দেয়ার ফার্স্ট লেসন ইন মালটি লেয়ার এচিং উইথ ডিফরেনসিয়াল ভিসকোসিটি মেথড অব কলার অ্যাপ্লিকেসন উইথ রেগুলারস অব ডিফরেনসিয়াল মেলেবলিটি, দ্যাট এন্‌এবেলস ওয়ান টু গেট মাল্টি কালার প্রিন্টস ফ্রম এ সিংগল মেট্রিকস। ইট ইজ ফ্রম হিম এগেন দ্যট দে লারন্ট দ্য টেকনিকস অব লিফট গ্রাউন্ড অ্যান্ড একোয়াটিন্ট—এফেকটেড অন এচিং প্লেটস ফর টেকসচারাল এফেকটস অ্যান্ড টোনাল ভেরিয়েসন্স। অন হিজ রিটারন ফ্রম প্যারী অরুণ টুক আপ দ্য রেসপনসিবিলিটি অফ ম্যানেজিং দ্য গ্রাফিক আর্ট ওয়ার্কশপ অফ দ্য সোসাইটি অব কনটেম্পোরারী আর্টিস্টস...। দ্য সোসাইটিস ফার্স্ট এচিং প্রেস (পারচেজসড উইথ এ গ্রান্ট ফ্রম ললিতকলা অ্যাকাদমী ইন ১৯৬২) দ্যাট দ্য মেমবারস কুড হেলড এ শো অব দেয়ার প্রিন্টস ইন ১৯৬৪। (ললিত কলা কনটেম্পোরারী—২১)।

সুতরাং, কলকাতায় ইন্তাগ্লিওর ভগীরথ অরুণ বস, সোমনাথ হোড় নন। হেটারের ঘরানা বললে এঁরা চটেন কেন? পরবর্তী অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ যখন সোসাইটির সদস্য হয়ে ইন্তাগ্লিও করলেন, পরোক্ষে তখন তাঁরাও কি আরুণী-ধারায় অবগাহন করেননি?

সোমনাথ হোড়ের ঘরানা বরং তৈরি হল শান্তিনিকেতনে। তিনি দিল্লি আর্ট কলেজ ছেড়ে দেন ১৯৬৭। কলাভবনে আসেন ১৯৬৮। তাঁর ধারা অ-হেটারী। বিজন চৌধুরীর সতীর্থ সোমনাথ হোড়ের এচিং সম্বন্ধে শ্রদ্ধা মত আমার জন্য হয়ত, সোমনাথ মুখুজ্যে এবং অম্বরের সুন্দর কাজ করেছেন। এগুলি পারেন বলে এবং অঙ্কন জোরাল বলেই তাঁর ছাপাই হাঁপ ভাল।

সন্দীপ সরকার

## শিশিরকুমার ও বঙ্কিমের নাটক

১৬ জানুয়ারী '৮০ তারিখে দেশ পত্রিকায় শ্রীঅপ্রসূন ভট্টাচার্য লিখিত 'কলারশ্ম মঞ্চে বঙ্কিম' নামক নিবন্ধে যে তথ্যাদি তিনি বিবৃত করেছিলেন তাতে কিছু প্রমাদ থাকায়, ২২ মার্চ '৮০ দেশ পত্রিকায় চিঠিপত্র বিভাগে সেইসব প্রমাদের সংশোধনার্থে শ্রীনীরদ হাজরা যা জানিয়েছেন, তাও যে প্রমাদ-রহিত নয়, এই আপত্তি জানিয়ে যে মাসের ১০ তারিখের সংখ্যাতে শ্রীগণেশ শর্মা পত্রক্ষেপ করেছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, অপরের ভুল ভাঙাতে গণেশবাবু নিজেই ভুলের কাটায় জড়িয়ে গিয়েছেন।

শিশিরকুমার ভাদুড়ি চন্দ্রশেখরে অভিনয়ের পাঁচ বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল-এর নাট্যরূপ 'ভ্রমর' নামে মঞ্চস্থ করেন এবং স্বয়ং নায়কের চরিত্রে অভিনয় করেন ২৫-১-১৯২৭ ও ১-১-১৯২৮ তারিখে নাট্যমন্দিরে বড়দিন উপলক্ষ্যে আয়োজিত নাট্যসূচীর দ্বিতীয় প্রদর্শনীতে রাত্রি সাড়ে ৮টায়। হয় তো এ তথ্য নীরদবাবুর জানা ছিল না। ভুল-সংশোধক গণেশবাবুরও তা অজানা ছিল।

গণেশবাবু-উল্লিখিত চন্দ্রশেখর অভিনয়ের ২৩ বছর আগে ১৯৩২ সালে শ্রীরঙ্গম-এর পূর্বতন নাট্যমঞ্চ নাট্য নিকেতনে তৎকালীন নাট্যনিকেতন শিশিরকুমার সাময়িকভাবে, সেখানে ষোড়শী, চন্দ্রগুপ্ত, প্রফুল্ল প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেন, (তাঁর স্বভাবিত বাগ্মোক্তি) 'ভাড়াটে কেষ্ট' হিসেবে। এবং একরাত্রির এক বিশেষ নাট্যানুষ্ঠানে চন্দ্রশেখরের ভূমিকায় মঞ্চাবতরণ করেন এবং সঙ্গে নাট্য নিকেতনের গোষ্ঠীভুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতাপ চরিত্রে অভিনয় করেন। প্রমাণ প্রয়োজনে গণেশবাবু নাট্যশালার নাট্যসম্পর্কিত নথিপত্র দেখে নিতে পারেন।

শ্রীগণেশ শর্মা জানিয়েছেন—'নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের সহিত অভিনেতা হিসাবে একাদিক্রমে কুড়ি বৎসর যুক্ত ছিলাম। তাঁর জীবনের শেষ অভিনয়ের দিনটিতে পর্যন্ত তাঁর পাশে ছিলাম।' —কিন্তু গণেশবাবুর এই উক্তিও যথাযথ নয়। তিনি শ্রীরঙ্গমে নিয়োজিত হয়েছিলেন 'মায়া' নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার সময় ১৯৪২ সালের শেষাশেষি। সুতরাং হিসাব মত কুড়ি বছর নয়, ১৩ বছর কয়েক মাস—১৯৫৬ সালের ২৩শে জানুয়ারী পর্যন্ত। প্রায় ৭ বছরের তফাত। দীর্ঘ সময় যাবৎ সঙ্গে বা পাশে থাকলেই কি সব কিছু জানা যায়?

সুললিতমোহন গোস্বামী

কলকাতা-৩০

। এ-বিষয়ে আর কোন পত্র প্রকাশ সম্ভব

প্রকাশিত হল

## সুনির্মল বসুর

গল্পের মতো জীবনীগ্রন্থ

## বঙ্কিমচন্দ্র দাম ৪.০০

সব জীবনই ঘটনাবহুল, কিন্তু সব ঘটনা গল্পের মতো স্বাদু হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনই কৌতূহলকর। তাঁর শৈশবজীবন থেকে শুরু করে কর্মজীবন, সাহিত্য রচনার আরম্ভ থেকে পরিণতিপর্ব—নানান রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্তে ঠাসা। এমন-কি তাঁর বাবার জীবনেও অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল একবার। আঠারো বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের বাবা যাদবচন্দ্রের মৃত্যু হয়, কিন্তু চিতা থেকে পুনর্জীবন লাভ করে তিনি বাড়ি ফিরে আসেন এক সন্ন্যাসীর আশীর্বাদে। পরে সেই সন্ন্যাসীর কাছ থেকেই মন্ত্র গ্রহণ করেন যাদবচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যজীবন, ছাত্রজীবন, কর্মজীবন এবং সাহিত্যজীবনেও বহু ঘটনার অনঘটা। বহু সরস গল্প, বহু কিংবদন্তী তাঁকে ঘিরে। সুনির্মল বসু তেমনই

কিছু গল্প তুলে নিয়েছেন এবং বর্ণনার সুতোয় গেঁথে তৈরি করেছেন একটি আশ্চর্য মালা। সেই মালাই এই জীবনীগ্রন্থ। এক পূর্ণাঙ্গ মানুষের জীবন-কাহিনী কত কৌতূহলকর করে যে বলা যায় তারই এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত যেন এই বই। মুখ্যত ছোটরা তাঁর লক্ষ্য, কিন্তু বড়োরাও এক নিঃশ্বাসে শেষ করবেন এই জীবনচরিত—এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

লেখকের আরেকটি গ্রন্থ

ছন্দের টুংটাং ৮.০০

পুরস্কৃত গ্রন্থ

## রেবন্ত গোস্বামীর

জীবনধর্মী কিশোর-উপন্যাস

## অরুমিতুদের কথা

দাম ৪.০০

অরু আর মিতু, ছোট্ট দুই ভাইবোন, এবং তাদের বিধবা মা—এই তিনজনের জীবন-সংগ্রামের এক করুণ জীবন্ত আলেখ্য 'অরু মিতুদের কথা।'

শিশুসাহিত্য-পরিষদ-এর পক্ষ থেকে ১৩৮৬-৮৭ সালের জন্য এই বইটির লেখক রেবন্ত গোস্বামীকে দেওয়া হয়েছে ফটিক স্মৃতি পদক।
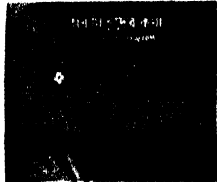
প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ কিশোরগ্রন্থের লেখককে দেওয়া হয় এই পুরস্কার। বইটির প্রকাশক-রূপে লেখকের এই সম্মানে আমরাও গৌরবান্বিত।

---

৫৭টি দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য ছবি এবং ঠাকুরবাড়ির অমূল্য একটি বংশলতিকা যে-বইকে করে তুলেছে অপরিহার্য এবং জরুরী

## চিত্রা দেব-এর

উপন্যাসপ্রতিম রচনা

## ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল দাম ২০.০০

বহু অনাম্নী ও স্বনামধন্যাকে নিয়ে লেখা অন্তরঙ্গ এই আলোচনাগ্রন্থটি উপন্যাসের মতোই স্বাদু। সেই সঙ্গে ৫৭টি দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য ছবি, দুর্ধর্ষ প্রচ্ছদ এবং পুস্থানি। এ-ছাড়া সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ঠাকুর-বাড়ির যাবতীয় আত্মীয়-পরিজনের পরিচয় সংবলিত

একটি বংশলতিকা আলাদাভাবে দেওয়া হচ্ছে

## আমাদের অভিনন্দন

কল্লোল-কালিকলম-এর যুগে আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম পুরোধারূপে যাঁর আবির্ভাব, পঞ্চাশ বছরেরও অধিককাল যাবৎ যাঁর স্বর্ণোজ্জ্বল লেখনী বাংলা সাহিত্যকে নানাভাবে পুষ্ট করে এসেছে, সেই প্রবোধকুমার সান্যাল এ-বছর পেলেন প্রফুল্লকুমার স্মৃতি পুরস্কার।

তাঁর এই সম্মানে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন।

আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাস ঃ

প্রিয়মুখচন্দা ৮.০০ জনম জনম হম (নিঃশেষিত)

কবিগুরুর সর্বস্ব দিয়ে রচিত গুরুকুলের যিনি প্রধানতম, প্রধানতম শিষ্যদের যিনি অন্যতম, লোক সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ে গ্রন্থরচনা করে যিনি সঙ্গীতকে উত্তীর্ণ করেছেন সাহিত্যের আনন্দ-লোকে, যাঁর কণ্ঠে-শরীরে-বোধে-মননে রবীন্দ্র ঐতিহ্যের ও রবীন্দ্রচর্চার অনন্য পরিচয়, সেই শান্তিদেব ঘোষ এ-বছর পেলেন সুরেশচন্দ্র মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার।

তাঁর এই সম্মানে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন।

আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত শান্তিদেব ঘোষের গ্রন্থ ঃ

রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা ১৬.০০
রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদর্শে সংগীত ও নৃত্য ৫.০০
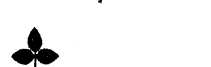
## নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর

আকাদেমি-পুরস্কারপ্রাপ্ত কবিতা-গ্রন্থ

## উলঙ্গ রাজা দাম ৬.০০

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা পড়লেই বোঝা যায়, তিনি এই যুগে সমাজের যাথার্থ্যতা এই দুঃস্থ দিবসের ভাষ্যকার। তাঁর কবিতা যেন সন্ধানী আলোর মতো, দেশ ও কালের নানা গোপন যন্ত্রণাকে যা নিমেষে উদ্‌ঘাটিত করে। সর্বকালের যোগ-সম্পর্কে আস্থাশীল হয়েও তিনি সমকালের সঙ্গী, ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত থেকেও তিনি প্রতি

মুহূর্তেই আবার নতুন কলেবরে দীপ্তিমান। তাঁর যেসব বিখ্যাত কবিতার পংক্তি—'কলঘরে চিলের কান্না', 'অকাল-সন্ধ্যা', 'জোড়া খুন', 'কবিতা—৭০', 'হ্যালো দমদম', 'গোলাপ-যাত্রা' ইত্যাদি—আজ পাঠকদের মুখে-মুখে ফেরে তারই সংকলন এই গ্রন্থ—'উলঙ্গ রাজা।'

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

আজ সকালে (কাব্য গ্রন্থ) ৬.০০ পিতৃপুরুষ (উপন্যাস) ৭.০০ সাদা বাঘ (ছোটদের ছড়া) ১০.০০

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

## পার্থসারথি চক্রবর্তীর

## বুদ্ধি নিয়ে দারুণ মজা

প্রকাশিত হল

## জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

জাদুকরী গল্পগুচ্ছ

## আজ কোথায় যাবেন দাম ১২.০০

কেউ তাঁকে বলেন সুন্দরের কারিগর, কেউ তাঁকে ভাবেন শব্দের জাদুকর, কেউ জানেন তাঁকে গন্ধের কারবারী রূপে, কেউ তাঁর রচনায় খুঁজে পান প্রগতিশীলতা, কেউ পান মর্বিডিটি, কেউ তাঁকে মনে করেন আত্মমগ্ন, কেউ তাঁর লেখায় দেখেন উত্তরণের ইঙ্গিত—বাংলা সাহিত্যে বহু বিতর্কিত তবু বহুবন্দিত লেখক তিনি, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। কিন্তু সবাই তাঁকে একটি ক্ষেত্রে স্বমহিম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হিসেবে মেনে নিয়েছেন, সেই সাম্রাজ্যটি হল ছোট গল্পের। সেখানে তিনি অবধারিত, অপরিহার্য, অনন্য। তিনি নিজেও একদা জানতেন, গল্প হল এক-এক খণ্ড ইঁট যে-ইঁটের সমাহারে গড়ে ওঠে উপন্যাসের ইমারত। সেই ইমারতে থাকে সিচুয়েশনের দরোজা-জানালা, ঘটনার সিঁড়ি ও বারান্দা, স্টাইলের পলেস্তারা, ভাষার রঙ।
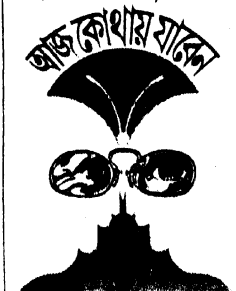
সেই ইঁটগুলি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নির্মাণ করেন এক নিখুঁত নিজস্বতায়। প্রকৃতি এবং নারী, শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ, কিছু ভালো লোক আর মন্দ লোক, নিয়তি-নির্ধারিত নিরুদ্দেশ্য দিন যাপন, প্রবৃত্তি এবং আবেগ, কিছু আলো এবং অন্ধকার তাঁর গল্পের উপজীব্য। তবু লেখার গুণে তাঁর রচিত জগতের এবং আমাদের পরিচিত জগতের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তৃতীয় একটি আয়তন। সেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সাম্প্রতিক কালে রচিত এক গুচ্ছ গল্পের সংকলন

দেশ ৪৭ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা
৭ আষাঢ় ১৩৮৭

## সূচীপত্র



### পরবর্তী আকর্ষণ

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ
জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ও প্রতিকম
তরুণ দত্তের প্রবন্ধ
স্বাধীনতা হীনতায়
রতন ভট্টাচার্যের গল্প
বউয়ের জন্য

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে
নারায়ণ রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮
সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা



# ত্রিপুরায় গণহত্যা

ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল এখন আর শুধু অগ্নিগর্ভ নয়, অগ্নিময়। এই আগুন প্রথম জ্বালানো হয়েছে আসামে। বিদেশী বিতাড়নের ধুয়ো তুলে যে অরাজকতা ও নরহত্যার আবহাওয়া গড়ে তোলা হয়েছিল তারই চরম পরিণতি দেখা গেল ত্রিপুরায়। ত্রিপুরায় যা ঘটেছে তাকে গণহত্যা বলা কোনো ক্রমেই অযৌক্তিক বা আতিশয়োক্ত নয়। সাড়ে তিনশোর মতন মানুষ—যার মধ্যে নারী ও শিশুরও অভাব নেই, আজ মৃত। দেড় লক্ষ অসহায় নরনারী গৃহহীন, আশ্রয়প্রার্থী। হাজার হাজার ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। মৃত, আহত, গৃহহীনের এই সংখ্যাই যে যথার্থ তাও নয়, ত্রিপুরার দূর দূরান্তের খবর এখনও অজানা; কেউ বলতে পারে না—সব খবর জানার পর মৃত ও আহতের সংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।

ত্রিপুরার এই গণহত্যা কেন? এক কথায় 'বিদেশী বিতাড়ন' আন্দোলন। কিন্তু তাই কি! নানা তরফের নানান বয়ান আছে, রাজ্য সরকার যে-ভাবে নিজের মুখরক্ষার চেষ্টা করবেন, কেন্দ্র সরকার নিশ্চয় তা করবেন না। সি পি এম এই নারকীয় ঘটনা ঘটার যে যুক্তি ও ব্যাখ্যা দেখাবেন, ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতারা নিশ্চয় তা দেখাবেন না। কিংবা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মুখপাত্ররাও নিজেদের মনোমত ব্যাখ্যাকেই একমাত্র সত্য বলে প্রচার করবেন। এতে বাস্তবিক কি আসে যায়? যাঁরা মৃত, আহত, নির্যাতিত, গৃহহীন তাঁদের পক্ষে সমস্ত ব্যাখ্যাই মূল্যহীন। সত্য এই যে, এঁদের জীবন ও ধনমান রক্ষা করার জন্যে কেউ ছিল না।

ত্রিপুরার সি পি এম সরকার যে খুবই কর্মদক্ষ এ-কথা তাঁদের দলীয় লোকরাই বলেছেন, গণহত্যার পরও। এমন কি এ কথাও বলা হয়েছে, ত্রিপুরার বর্তমান সরকার উপজাতিদের স্বার্থ ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্যে অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলেন, উপজাতি সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যেও তাঁরা সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই সব কারণেই না 'ট্রাইব্যুনাল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল'-এর নির্বাচনের আয়োজন। এ-ছাড়াও অনেক কিছুই তাঁরা উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্যে করেছেন বলে দাবী করতে পারেন। এত কিছু করার পরও কেন যে এই গণহত্যা কে বলবে? কেন তবে ত্রিপুরা উপজাতি যুবসমিতির বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলন?

এ-কথা বোধ হয় অস্বীকার করা যাবে না, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী এবং তাঁর সরকার গোড়ায় কিছু গলদ করে ফেলেছেন। গলদ ছোটখাট নয়, বড় রকমের। উপজাতি সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্যে তাঁদের দুশ্চিন্তা কি শুধুই উপজাতিদের জন্যে? নাকি সেই সঙ্গে নিজেদের গোষ্ঠী স্বার্থরক্ষারও প্রশ্ন ছিল? যদি তা না থাকত তবে শ্রীচক্রবর্তীর সরকার এবং তাঁর দলকে এমনভাবে বিব্রত ও বিপন্ন করা কেন? অন্য কী যুক্তি থাকতে পারে উপজাতি যুবসমিতির তাও আমাদের কাছে রহস্য। এ-রকম শোনা যায়, অবশ্যই বিরোধীদের মুখে যে, উপজাতিদের সঙ্গে আঁতাত করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কিছু বড় রকমের ভুলচুক করে ফেলেছিলেন। আজ সেই ভুলের মাশুল বড় বেশী করেই গুনতে হচ্ছে।

ত্রিপুরার সাম্প্রতিক অরাজক অবস্থার জন্যে অনেক কিছুকেই কম বেশী দায়ী করা হচ্ছে, যার মধ্যে বিদেশী হস্তক্ষেপের কথাও শোনা যায়। কী ধরনের বিদেশী হস্তক্ষেপ তা অবশ্য জানা যায় না, তবে ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থান এমনই যে বিদেশী রাষ্ট্র থেকে বিদ্রোহীদের অনুপ্রবেশ একেবারে অসম্ভব নয়। তবে বাইরের হস্তক্ষেপে এত বড় ঘটনা রাতারাতি ঘটার সম্ভাবনা কম। ত্রিপুরা সরকার যদি সময়ে সজাগ থাকতেন তা হলে এই অনুপ্রবেশই বা কেমন করে ঘটে? তাঁরা কোনো সময়েই যে সজাগ ছিলেন তাও মনে হয় না, কেননা গণহত্যা শুরু হবার পরও সরকার দ্রুত কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেননি। সরকারের অস্তিত্ব যে আছে তাও প্রথম চার পাঁচ দিন বোঝা যায়নি।

ত্রিপুরায় আজ যে-ঘটনা ঘটেছে তাকে সাময়িক বললে ভুল হবে। ভুল করা হবে—যদি মনে করা হয়, এটা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ! ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল জুড়ে যে বিচ্ছিন্নতাবাদের বিষ কাজ করে যাচ্ছে তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা, মেঘালয়—সর্বত্রই এই মানসিকতা কাজ করে যাচ্ছে। কেন? বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপের চেয়েও বড় কথা অন্তঃশক্তির সঙ্কীর্ণ, আচ্ছন্ন দৃষ্টি। রাজনৈতিক মুনাফা লোটার জন্যে নেতা এবং দলীয় শক্তিগুলি নির্বোধের মতন এমন কাজ করছেন যাতে দেশের সংহতি নিত্যই বিপন্ন হচ্ছে। সবচেয়ে দুঃখের কথা, 'বিদেশী বিতাড়ন'—এই ধুয়া তোলার পিছনে যে সর্বনাশ ওত পেতে আছে তা কি এঁদের অজানা? গোটা দেশ জুড়ে যদি 'বিদেশী বিতাড়ন' যজ্ঞ চলে তবে উত্তর-পূর্ব ভারত যে নিরাপদে থাকবেন তাও তো নয়! আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে না এমন মানুষ নেই। কাজেই আন্দোলনকারীরা নিশ্চয় জানবেন, যে আগুন নিয়ে আজ তাঁরা খেলা শুরু করেছেন

# "হারকিউলিস অ্যাসেম্‌ব্লিং এত সহজ বলেই তো খদ্দেরদের খুশি রাখতে পারি।"

**শ্রী এন আর মুথুস্বামী**
**সাইকেল মেকানিক, সালেম্‌, তামিলনাড়**

"একটি সাইকেল অ্যাসেম্‌ব্লিং করা সহজ কাজ নয়। তাই আমি হারকিউলিস-নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করি। এর প্রতিটি পার্ট্‌ সহজে লাগানো যায় বলে এই সাইকেল অ্যাসেম্‌ব্লিং করা মোটেই ঝামেলার কাজ নয়। সত্যি কথা বলতে কি এক ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে আমি এটির অ্যাসেম্‌ব্লিং করতে পারি(অনেক সাইকেলই আছে প্রায় দু' ঘন্টা সময় লেগে যায়)। এতে শুধু সময়ই বাঁচে না, ক্রেতাদের অভিযোগ থেকেও এটি আমায় বাঁচায়।"

অধিকাংশ সাইকেল মেকানিকদের হারকিউলিস সম্পর্কে প্রশংসার পিছনে সত্যিই যথেষ্ট যুক্তি আছে।

**হারকিউলিস: বহন ক্ষমতা ও গুণমানের কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা**

কাঁচামাল থেকে শুরু করে প্রতিটি হারকিউলিসের উপরই ৬৭টি ভিন্ন ভিন্ন রকমের পরীক্ষা করা হয়। প্রতিটি ব্যাচের একটি করে হারকিউলিস নিয়ে এক সপ্তাহ ধরে অবিরাম চালিয়ে পরীক্ষা করা হয় যাকে বলে 'টরচার' টেস্ট।

রিম, টায়ার, টিউব শুধু ডানলপ থেকেই নেওয়া হয় (TI সাইকেল কেবলমাত্র সেরা জিনিসই কেনে)।

**আপনার হারকিউলিস:**
**সহজে চলার জন্য এতে আছে বিশেষ ধরনের বল বেয়ারিং**

পুরো দুইসারি হাই-ক্রোম স্টীল-বল থাকায় চাকা সহজে ঘোরে ও আরামে চলে—এমনকি ভারী বোঝা থাকলেও। হারকিউলিসের বডি হাই-বেকড্‌ এনামেল আর পুরু ক্রোমিয়াম প্লেটিং-এর তৈরি, ফলে বছরের পর বছর হারকিউলিস থাকে সুন্দর ও ঝকঝকে।

**TI হারকিউলিস**

TIC 2251

# পয়লা পাপ সুধাংশু ঘোষ

ওদের বাজার করে দিয়ে পবন ফিরে যাচ্ছিল। এখনো রোদ্দুর কড়া হয় নি। আম-কাঁঠাল, পেয়ারা গাছ, বাঁশঝাড়ের ছায়ায় ছায়ায় হাঁটছিল। সকালবেলার ঝিরঝিরে বাতাস। তাড়াতাড়ি পা ফেলছিল না। কোনো তাড়া নেই। বাড়ি ফিরে করবার নেই কিছু। অলসভঙ্গিতে হাঁটছিল।

ওদের জন্য বাজার করে সুখ নেই। ওদের সরষের তেলের পলা ওষুধের শিশির মতন। পটল কিনতে হবে গুনেগুনে। পটল তো ওজন দরে বিক্রি হয়। আজ ওদের তিনজনের জন্য ঠিক ছটা পটল কিনতে হল। কেন ঝামেলা। একশো গ্রাম ওজন করলে পাঁচটা হয়ে যায়, দেড়শো গ্রামে ছটার বেশী। আবার ছোটবড় বদলে বদলে বাছতে হল। এরকম দুর্গতিব্যাপার। ভিড়ের সময় দোকানদার বিরক্ত। বাজার নিয়ে এসে পবনের বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, আপনারা গুনেগুনে পটল খেতে খেতেই একদিন পটল তুলবেন। অবশ্য বলতে পারে নি। হাজার হোক ওরা ইসকুলের মাস্টার। ওদের এ কথা বলা যায় না।

একটা টুসটুসে পাকা আম টুপ করে পড়ল পথের ওপর, পবনের পায়ের কাছে। মাথার ওপরে তালপাতার আড়ালে কোনো পাখির ডানার ঝটপটানির শব্দ শুনতে পেল। একবার কেবল পাখিটার ঠিক নীলচে আভা চোখে লাগল। নিশ্চয়ই ওর ঠোঁট থেকে খসে পড়েছে আমটা। পবন খানিক এগিয়ে গেলে তালপাতার আড়াল থেকে নেমে এসে আমটাকে ঠোঁটে করে তুলে নেবে। অল্প হাসির আভাস ফুটল পবনের নিজের পুরু কালচে ঠোঁটে। ওদের জন্য বাজার করার বিরক্তি কেটে যাচ্ছিল।

ওদের তিনজনের মধ্যে চন্দনদা ছাড়া বাকী দুজনের সঙ্গে তো পবনের তেমন ওঠা-বসা নেই। বাকী দুজন, মানে একটু বেশী বয়েসের শ্যামাদাস মান্না আর সুনীল অধিকারী। তাদের কাছে সে পাত্তা কিছু পায় না। তবু অনেক কাজ করে দেয় তিনজনেরই। চন্দনদার সঙ্গে অবশ্য তার আলাদা সম্পর্ক। বয়েসের ফারাকও খুব বেশী নয়। পবনের উনিশ চলছে। চন্দনদা হয়তো তার থেকে পাঁচ বছরের বড় হবে। চন্দন মাস্টার, পবন ছাত্র। গত বছর মাধ্যমিক ফেল করার পর পবন ইসকুলের ক্লাসে আর না এলেও, সন্ধ্যের পর চন্দনের কাছে পড়তে আসে, অন্তত পড়ার নাম করে আসে। সন্ধ্যের পর কাজকর্ম না থাকলে ইসকুলবাড়ির ছাদে মাদুর বিছিয়ে হ্যারিকেন নিয়ে আটদশটি ছেলেকে ইংরেজী পড়াতে বসে [illegible]

দিয়েছে দশ টাকা করে। তার বাপ দুম করে মরে যাওয়ায় এখন আর দিতে পারে না। তবু চন্দনদা তাকে সন্ধ্যের পরের পড়ার আসরে ডাকে।

তার বাপ ইলিশ ধরতে গিয়েছিল নদীতে। নৌকোয় আরো দুটি লোক ছিল। মাঝ রাত্তিরে হঠাৎ বুক চেপে ধরে একটা চিৎকার করে তার বাপ বেহুঁশ হয়ে যায়। পাড়ে নিয়ে আসার আগেই শেষ। তার বাপের নাকি হার্টের অসুখ ছিল। হার্ট কিংবা হৃৎপিণ্ড দুটো কথারই বানান খুব কঠিন। লিখতে গেলে পবনের ভুল হয়ে যায়। হার্ট লিখতে এইচ ইউ আর টি বসায় অথবা এইচ এ আর টি, হৃৎপিণ্ড লিখতে ৎ-র জায়গায় দ বসায়। চন্দনদা কয়েকবার তার ভুল বানান কেটে ঠিক করে লিখে দিয়েছে, তবু মনে থাকে না।

এই তিন মাস্টার ইসকুলের লাইব্রেরিঘরে ঘুমোয়। অন্য মাস্টাররা দূর থেকে আসে, আবার চলে যায়। একটা খড়ের চালের মাটির ঘরে এই তিনজনের রান্না হয়। রান্নার লোক নেই, তিনজন পালা করে রাঁধে। প্রায় রোজ ডাল আর আলু বা পটল ভাজা, মাসে চারদিন মাছ। এরা এতো কষ্ট কেন করে পবন বুঝতে পারে না। শুনেছে, মাস্টারদের পয়সাকড়ি কম। দরিদ্র শিক্ষক কথাটা ছাপার অক্ষরে দেখেছে। আবার এমনও শুনেছে, আজকাল মাস্টারদের মাইনে খারাপ নয়।

একদিন আধাআধি রান্না হওয়ার পর শ্যামাদাসবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, আমি লাইব্রেরির আলমারির তলায় একটা পেঁয়াজ দেখেছিলাম। যা তো পবনা, পাস কিনা দেখে আয় তো।

শ্যামাদাসবাবুর ছাতার বাঁট দিয়ে পবন আলমারির তলা থেকে টেনে টেনে ধুলোমাখা পেঁয়াজ বের করে এনেছিল, একটা নয়—দুটো। একটা শুকিয়ে কুঁকড়ে গেছে, অন্যটার দাড়ি বেরিয়েছে এক ইঞ্চি। ওখানে কী করে যে পেঁয়াজ সেঁধিয়ে গিয়েছিল। আন্দাজ দিয়ে তেল ছিটিয়ে সেই পেঁয়াজ ভেজে ওরা খেয়েছিল।

অন্য দুজনের ব্যাপার পবন জানে না, চন্দনদা টাকা জমাচ্ছে একটা বিশেষ কারণে। চন্দনদা লেখে, পাতার পর পাতা লেখে। আগে ছাপবার জন্য পাঠাত, কেউ ছাপে নি। এখন ঠিক করেছে, নিজের টাকায় একখানা মোটা বই ছাপবে। সেই বই ছাপা হলে নাকি সবাই ছুটে আসবে চন্দনদার গলায় মালা পরিয়ে দিতে। চন্দনদা লেখে আর গ্রামের মধ্যে ঘুরে ঘুরে লোকজনের সঙ্গে গল্প জমায়। হাসে, [illegible]

সব সময় চন্দনদার কাঁধে একটা ঝোলা, একমুখ দাড়ি। একদিন পবন বলেছিল, আপনি দাড়ি রাখেন পয়সা বাঁচাতে।

চন্দনদা হেসে বলল, না রে, তা ঠিক নয়। আমি রোজ রোজ দাড়ি কামাতে বসে বাজে সময় নষ্ট করতে চাই না।

চন্দনদা এখানে এসেছে এই আড়াই বছর। এর মধ্যে একবারই পবনের হাতে একটা পাতলা পত্রিকা দিয়ে বলেছিল, আমার একটা লেখা আছে, পড়।

পবন খুঁজে বের করে বলল, এটা তো পদ্য। পদ্যর আমি কী বুঝি? গল্প হলে পড়তাম।

চন্দনদা ঠোঁট দিয়ে হাসি চেপে বলল, পদ্য নয় রে, কবিতা।

—ও দুটো তো একই জিনিস।

—এক জিনিস নয় রে, আলাদা। তুই বুঝবি না। এই কাগজটা শুধু কবিতার লিটল ম্যাগাজিন।

—সেটা আবার কী?

—তুই বুঝবি না।

পবন সত্যি বোঝে নি। ওই কথাটা সেদিনই প্রথম শুনেছিল।

আরো একদিন চন্দনদা ভুরু কুঁচকে বলেছিল, তোদের এই গ্রামটা পবন, একেবারে যাচ্ছেতাই। আমাদের পুব বাঙলার গ্রাম মোটেই এরকম নয়। সেখানে লিটার‍্যালি মিল্ক অ্যান্ড হানি বয়ে যেত।

—লিটার‍্যালি মানে?

—ওসব ছাড়। তোদের এখানে বিকেলবেলায় গ্রামের মানুষ পুকুরপাড়ের দোকানে বাঁশের মাচায় বসে কড়ে আঙুলের মতন বেগুনি চিবোয়। ছোট ছোট নীলচে গেলাসে চা খায়। চায়ে মড়াপোড়া গন্ধ। শ্যাওলার জন্য পুকুরের জল প্রায় দেখাই যায় না। কেউ হাত বাড়িয়ে এক গোছা শ্যাওলা তোলে না। পুব বাঙলায় বিকেল বেলায় গ্রামের মানুষ খায় চিঁড়মুড়ি, নারকেল কোরা, নাড়ু, সরভাজা—

—আপনি তো জন্মেছেন কলকাতায়। সেখান থেকে এই গ্রামে এসেছেন। আপনার জন্মের কত আগে দেশ ভাগ হয়েছে। পুব বাঙলার গ্রাম আপনি দেখলেন কবে?

—নিজে দেখি নি, বাবাকাকার মুখে তো শুনেছি।

মাস্টার তিনজনের কিপটেমি ছাড়া আরো একটা জিনিস পবনের খারাপ লাগে। ওদের মুখে কোনো লাগাম নেই। গ্রামের অন্য পাঁচটা লোকের মতোই মুখে যা আসে তাই বলে, পবনের সামনেই বলে। পবন গত বছর ফেল করে ক্লাসে আসা বন্ধ করার পর তাকে তো আর ছাত্র ভাবে না। চন্দনদা বাকী দুজনের মতন নোংরা কথা না বললেও তার জিভের ডগায় শালা কথাটা ঝুলছেই। যখন-তখন টুপ করে খসে পড়ে। সামান্য ঝামেলা হলেই বলবে, এই শালার ইসকুলে মানুষ কাজ করে!

তবু সারা ইসকুলের মধ্যে পবনের ইংরেজীর মাস্টার চন্দন ভট্টাচার্যকেই পছন্দ। তার সঙ্গেই গলাগলি, বন্ধুর মতন। চন্দন ছাড়া ইসকুলের গেটের পাশের ইউক্যালিপটাস গাছটাকে পবনের ভালো লাগে। তার ছোটবেলায় পাশাপাশি দুটো গাছ ছিল। গাছ দুটোও তখন ছোট। একটা ভেঙে পড়েছিল ঝড়ে, বাকীটা একা বেড়ে উঠেছে। ইউক্যালিপটাসের পাতার গন্ধ বড় পছন্দ পবনের।

চন্দনদা চায়, পবন পড়াশুনোটা চালিয়ে যাক। তার মারও তাই ইচ্ছে। অথচ সে এখন বেশ বুঝতে পারছে, তার ওসব হবে না। পাস করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। বয়েস বেড়ে যাচ্ছে। ইসকুলে এখন তার বয়সী ছেলে বোধ হয় একটাও নেই। লাইব্রেরি থেকে চন্দনদা তাকে একখানা বই পড়তে দিয়েছিল। নাম আম আঁটির ভেঁপু। এই বইটাই পড়তে পড়তে একটা ছেলেকে চোখের জল মুছতে দেখেছিল। বইটা পড়ে দুর্গার জন্য পবনের কষ্ট হয়েছিল। তারও তো একটা দিদি আছে। নাম পার্বতী। পার্বতী মানেও তো দুর্গা। অথচ বেশী করে কেবল মনে পড়ল, দিদি কতবার তাকে খিমচে প্রায় রক্ত বের করে দিয়েছে। বছর সাতেক আগে সেই দিদিরও বিয়ে হয়ে গেছে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে পবনের খেয়াল হল, গরু দুটো ছাড়া এখন বাড়িতে কেউ নেই। গরুর কথা ভাবতেই সুদামকে মনে পড়ল, দু ডজন গরুর মালিক সুদাম, মস্ত খাটাল, কাঁড়িকাঁড়ি ছানা পাঠায় শহরে। এই মাত্র সুদামকে দেখে এল ইসকুলের গেটের সামনের চায়ের দোকানে, বসে বসে চামচ দিয়ে নেড়ে নেড়ে ডিম ভাজা খাচ্ছে। সকালেই দু'এক গেলাস চোলাই পেটে পড়েছে নাকি! অতো কড়া করে ভাজা, প্রায় পোড়ানো ডিম খাচ্ছে কেন? সুদামের মুখ দেখলে পবনের মন বিষিয়ে যায়। তার বাপ সুদামের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিল। কাগজে কিছু লেখা নেই, তবে সাক্ষী আছে। সেই ধার শোধ হয় নি।

বাঁয়ে মোড় নিতেই সামনে পাড়ার মস্ত এজমালি ডোবাটা। এতক্ষণ গাছ-গাছালির আড়ালে ছিল। ডোবায় পাড়ার একটা বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে জলের মধ্যে ঝুঁকে পড়ে বোধ হয় গুগলি খুঁজছে খুশী। পবন থামল। শ্যাওলা-পানায় ঢাকা জলের ওপর ভাসছে, ঠোঁট ডোবাচ্ছে একগাদা নানা রঙের হাঁস, তাদের এবং পাড়ার অন্যদের। ডালপাতা আর ঝুলন্ত বনোলতার ফাঁক দিয়ে বর্শার ফলার মতন রোদ এসে পড়েছে শ্যাওলা-ঢাকা জলে। খুশী এখনো তাকে দেখতে পায় নি, জলের ওপর ঝুঁকে আছে। খুশীর গলা, বুকের খানিক উদোম, ময়লা জল চলকে উঠে পেছনের কাপড় ভিজিয়ে দিয়েছে, কটাশে চুলের ভাঁজেও চিকচিক করছে ছিটকে-ওঠা জলের বিন্দু।

পবনের শিরদাঁড়া বেয়ে সিরসিরেনি নামছিল। রোদ্দুর তেমন কড়া হয় নি, তবু ঘাম ফুটছিল চিনচিন করে। বয়েস বাড়ছে, আজকাল স্পষ্ট বুঝতে পারে।

ফেলে মুখের দিকে তাকায়। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, যাই, কাজ-কাম পড়ে আছে। খুশীর গায়ে ইউক্যালিপটাসের পাতার গন্ধ আছে কিনা জানবার বাসনা হয় পবনের। মানুষের গায়ে কি অমন গন্ধ হয়?

ঠাঠা নির্জন দুপুরবেলায় ঘুঘুর টানা ডাক নকল করে পবন ডাকল দুবার। খুশী সোজ হয়ে ঘুরে দাঁড়ালে পবন গলা চড়িয়ে বলল, তোরা গুগলি খাস! ওয়াক, ওয়াক।

খুশী অল্প হাসল। —আমিও খাই না, আমার মাও খায় না। আমার ঠামা আর বাবা খায়।

খুশী সোজা হয়ে দাঁড়াতে দেখা গেল, ভেজা শাড়ি সারা অঙ্গে সেঁটে গেছে। ডোবার পাড়ে এমন থেমে গিয়ে এখন খুশীর দিকে চেয়ে থাকা কেমন পাপ-পাপ মনে হল পবনের। জেনেশুনে আজও তো কোনো পাপ করে নি, যদিও ইদানীং এক-এক সময় পাপ তাকে আচমকা টান দেয়, বুঝতে পারে।

পবন জানে, খুশীর ঠাকুমা জ্বরে ভুগছিল। জ্বর থেকে উঠে বুড়ী বোধ হয় গুগলির ঝোল খাওয়ার বায়না ধরেছে। ডোবার পাড়ে আর দাঁড়াল না পবন।

বাড়ির উঠোনে পা দিয়ে বুঝতে পারল, মা ফেরে নি। এতো তাড়াতাড়ি ফিরবার কথাও নয়। চার পাঁচটা বাড়িতে দুধ যোগান দিয়ে মা হাঁসের ডিম আর শাকপাতা নিয়ে বাজারে গেছে। মাকে তো দূর থেকে দেখে এসেছে বাজারে বসে আছে, সামনে ডিম, কলমিলতা, হিঞ্চেশাক, নিমপাতা। কতবার মাকে বলেছে গ্রামের মানুষ শাকপাতা কিনে খাবে না। মা তার কথায় কান দেয় না। জল থেকে, বাগান থেকে ওই সব যোগাড় করে আনে। হয়তো কেনেও দুচারজন, সুদামের মতন যাদের অগাধ পয়সা।

হাঁসগুলো ডোবায়, গরু দুটো জাবনা চিবিয়ে ঝিমোচ্ছে। ঝিম ধরে আছে খালি বাড়িটাও। নিমগাছের মাথায় রোদ্দুর ঝলকাচ্ছে। সকালটা গড়িয়ে যাচ্ছে দুপুরের দিকে। পবন পেটে খিদের মোচড় টের পেল। বনবাদাড় লুটেপুটে সব খেয়েছে। ঘরেই বা কী পাবে? তখন নীলচে পাখিটা অমন টুসটুসে পাকা আম কোথায় পেয়েছিল?

ঘরে গিয়ে হাঁড়িকুড়ি হাতড়াল। বাইরে রোদ চড়ে গেলেও ঘরের মধ্যে খালি হাঁড়ির ভিতরের অন্ধকারটা ঠান্ডা ঠান্ডা। একটা হাঁড়িতে শুকনো কুল। মিষ্টির থেকে টক বেশী। পোকাও ধরেছে। দুপুরের আগে টক ভালো লাগে না। তবু পবন এক মুঠো শুকনো কুল তুলে নিল।

একদিন চন্দনদাকে বলেছিল, আপনি তো পাতার পর পাতা লেখেন, এই গ্রাম থেকে মালমশলা যোগাড় করেও লেখেন। আমাকে নিয়ে লেখেন একআধটু?

—তুই আছিস আমার লেখায়।

—আমার যে খিদে পায়, মাঝে মাঝে দারুণ খিদে পায়। খিদের দাঁতমুখ চেপে ছুর্রিফুর্রি। এই নিয়ে লেখা যায়?

চন্দনদা একটু ভেবে উত্তর দিয়েছিল, কেবল খিদের কথা লিখলে কেউ পড়ে না রে। যারা বেশী খায় তাদের বিরুদ্ধে তোদের উদ্যত হাত নিয়ে লিখলে কেউ কেউ পড়ে। কিন্তু আমি তো শুধু লড়াই নিয়ে লিখছি না। আরো অনেক কিছু। যেমন ওই মেয়েটা, খুশী, যার সঙ্গে তোর একটু ইয়ে আছে, ওই মেয়েটাও আসবে আমার লেখায়। কী সব নিয়ে লিখছি, তোকে বোঝাতে পারব না, তুই বুঝবি না।

বেশী বেলায় ভাত খেয়ে পবন বইখাতা নিয়ে বসল। ঘরের মাটির মেঝের ওপর আবার বাড়তি মাটি লাগিয়ে যে জায়গা খানিক উঁচু করা তার ওপরে আম-কাঠের তক্তা সাজিয়ে আধময়লা বিছানা পাতা। সেই বিছানায় রাত্তিরে পবন ঘুমোয়। মা শোয় কাছেই মাটির মেঝেয়। বেলায় খেয়ে পবন অনেকক্ষণ বইখাতা নাড়াচাড়া করল। মন বসাতে না পেরে বিছানায় বালিশের পাশে বইখাতা রেখে শুয়েও রইল খানিক। যত দিন যাচ্ছে স্পষ্ট বুঝতে পারছে, পাস করতে পারবে না, বই ঘেঁটে লাভ নেই।

বিকেলের দিকে রোদ নরম হলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। বাড়ি থেকে দক্ষিণ-মুখো দশ মিনিট হাঁটলে নদী। নদীর পাড়ে পবনের বাপের মাছ ধরার নৌকোখানা টেনে তুলে রাখা হয়েছে। দু হাত করে লম্বা বাঁশের খুঁটির ঠ্যালা দিয়ে নৌকোটা কাত করে রাখা হয়েছে। নৌকোর খোলের মধ্যে ঝড়ো বাতাসে উড়ে এসে জমেছে শুকনো পাতাপুতি, সরু ডাল, ঘাস, খড়। নদীর পাড়ের এই জায়গাটা মনে হয়, পবনের একার ইজারা নেওয়া। খুশী ছাড়া আর কেউ তেমন আসে না এখানে।

কাত করা নৌকোর গায়ে ঠেস দিয়ে পবন দাঁড়িয়ে রইল নদীর দিকে তাকিয়ে। রোদ আরো নরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নদীর জলের রঙ বদলাচ্ছে। নৌকোর ওপাশের গলুইয়ের ওপর একটা কাঠবেড়ালি। সেদিকে পুরোপুরি মুখ ফেরাতে মাটিতে লাফিয়ে পড়ে কোথায় উধাও হয়ে গেল। পবন দেখছিল, তার বাপের মৃত্যুর পর দশ-এগারো মাসে রোদ-ঝড়জলে নৌকোখানা ফুটোফাটা হয়ে গেছে। আবার নদীতে ভাসাতে হলে প্রচুর মেরামতি দরকার। তার জন্য কাঠ চাই, কারিগর চাই। নদীর দূরের বাঁকের দিকে চোখ ফিরিয়ে পবন ভাবছিল, আমি জেলের বাচ্চা। আমাকে জলে নামতে হবে। ডাঙায় আমি কিছু করতে পারব না।

মরা রোদ্দুরে পাতলা ছায়া ছড়াচ্ছে ঝাউগাছের সারি। রোখ বাড়ছে বাতাসের। ঝাউয়ের চিকন পাতায় সনসন আওয়াজ হচ্ছে। খুশী আজ আসবে না। এলে এর মধ্যে এসে যেত। পবন নৌকোর গায়ে দুবার হাত বুলিয়ে নদীর পাড় বরাবর হাঁটতে শুরু করল। চওড়া সড়কে এসে উঠল খানিক পরে। সড়কটা রেল স্টেশন থেকে এদিকে এসে ঘুরে গেছে। স্টেশন এখান থেকে দেড় মাইল। সড়কে উঠে পবন দেখতে পেল, যেখান থেকে নলখাগড়া আর হোগলাবন শুরু সেখানে সড়কের

ওদিকটায় গাড়ি আসে মাঝে মাঝে। বেশী আসে শীতকালের গোড়ার দিকে। শিকারীর দল। আসল মতলব পাখি শিকার। জলাজঙ্গল আর হোগলাবনের দিকে জাতের পাখি আসে। তবে শিকারীরাও জলাজঙ্গল আর হোগলাবনের বেশী দূর এগোতে পারে না। নানারকম পোকামাকড়। ভিতরে অনেকটা গেলে জলা। সেখানে জোঁক, জলকাদায় পা ডুবে যায়।

কাছে গিয়ে পবন দেখল, গাড়ির মধ্যে কেউ নেই। সড়কের পাশে এদিকটায় শুকনো শক্ত মাটি, ঘাসের বন ঘন নয়। এদিক-ওদিক তাকাল পবন। গাড়ি থেকে পনেরো-কুড়ি হাত তফাতে ঝোপঝাড়ের আড়ালে কালচে লাল রঙের আভাস। এগিয়ে ঝোপের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিতে প্রথমেই চোখে পড়ল, একটি নরম নিটোল পা, হাঁটু পর্যন্ত অনাবৃত। চমকে উঠে মুহূর্তের জন্যে ভাবল, খুন নয় তো? মরা রোদও ফুরিয়ে এসেছে, গাঢ় সবুজ ঘাসের জমিতে পাতা কালচে লাল মোটা চাদরের ওপর মাখন রঙের আলতা পা নজরে আসতে পলকের জন্যে পবনের অমন ধাঁধা লাগল। তখনই অবশ্য আলতা পা গুটিয়ে গেল, ছড়িয়ে গেল আবার। পবন দেখল, একজন নয়, দুজন, চাদরের ওপর গড়াচ্ছে, মোচড় খাচ্ছে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি আর সবুজ শাড়ি ওলট-পালট। চাপা অথচ সুরেলা হাসির মতন ছেঁড়া-ছেঁড়া শব্দের গমক কানে এসে ঘা দিল। তাছাড়া আর দারুণ কালো দুটো হাতের আঙুল দুজনের পিঠের মাংসে গেঁথে যাচ্ছে। চট করে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারল না, বরং পবনের গোড়ালি আরো উঁচু হল। নিষিদ্ধ দৃশ্য থেকে কাঁটা ফল ছিঁড়ে আনবার মতন চোখ ছিঁড়ে আনবার সময় দেখতে পেল, কালচে লাল চাদরের ওপর একটা বন্দুক, খাবারের টিফিন, জলের পাত্র, উচ্ছিষ্ট ছড়ানো পাতে, কাত করা একটা বোতল, বিয়ারের অথবা মদের। এদিকটায় ফেলে-যাওয়া এরকম বোতল পবন আগেও দেখেছে।

চন্দনদা একটা গল্প বলেছিল একদিন, নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার গল্প। ঝোপের আড়ালের ওই দৃশ্যটা লুকিয়ে দেখে সেই ফল খাওয়ার পাপ করল না তো পবন? ইচ্ছে করে তো দেখতে যায়নি। যখন ঝোপের পাশে এগিয়ে গিয়েছিল তখন জেনে নি কী আছে ওধারে। চোখের সামনে দৃশ্যাবলী তুলে ধরলে যারা অন্ধ নয় তারা কী করতে পারে? পাপ হয় নি, কোনো পাপ করে নি পবন, অথচ বুঝতে পারছিল পাপ তাকে টানে, টানছে।

সরে এল। সড়ক ধরে কিছু দূর হেঁটে বাঁয়ে নেমে গেল বাড়ির দিকে। আজ আর চন্দনদার ওখানে যাবে না। আসলে নদীর পাড়ে ফিরে যাবার বাসনা হচ্ছিল। থাক, আবার নদীর পাড়ে গিয়ে কাজ নেই।

রাত্তিরে ঘরে শুয়ে ঘুম নেই। মাঝ রাতের খবর পবন সাধারণত রাখে না, ঘুমোয়। আজ ঘুম আসছে না। চোখে কেমন তাপ, কপাল ঘামে ভেজা, বুকেও। পিঠের তলায় তক্তাগুলো অসমান। তোশকটা এতো পাতলা আগে কখনো টের পায় নি। দু হাত দূরে মেঝেয় মা ঘুমিয়ে। ঘরে অন্ধকার গাঢ় নয়। ফাঁকফোকর দিয়ে চুইয়ে আসছে জ্যোৎস্না।

যেমন হয়, মাঝ রাতে ঘুম না হলে শেষ রাত্তিরের দিকে ঘুম আসে। শেষ রাতে জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস এলো পবন ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়েও অস্থিরতা। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন, খুশীকে জড়িয়ে স্বপ্ন। এমন স্বপ্ন যা নিজের কাছেও লুকোতে পারলে বাঁচা যায়। অন্য দিন ভোরে ঘুম ভাঙে না। মা ভোরের কাজগুলো সেরে এসে তাকে ডেকে দেয়। আজ স্বপ্নের ধাক্কা নতে ঘুম ভাঙল ভোরবেলায়। তাকিয়ে দেখল, মার বিছানা গোটানো। নিজের বিছানায় উঠে বসে পা গুটিয়ে হাঁটুর ওপর থুতনি রাখল। মা দরজাটা ভেজিয়ে রেখে গেছে। ঘরে ভোরবেলার পুরো আলো আসে নি। কোণের দিকে মেদুর অন্ধকার। নিজের মাথার মধ্যে ঝিমঝিম নেশার ভাব।

সারা দিন ঘোরের মধ্যে কাটল। সামান্য যা কাজ তা করে গেল নিয়মমাফিক। গরু দুটোকে জাবনা দিল, বাজার করে দিয়ে এল মাস্টার তিনকড়ির। দুপুরে বেশী বেলায় ভাত খাওয়ার পর মা গলা নামিয়ে একটা কথা বলল। মার গলায় কখনো তীব্র অভিযোগ নেই। মা বলল, বাজার থেকে ফেরার পথে সুদামের সঙ্গে দেখা। সুদাম টাকা শোধ করতে না পারলে একটা গরু দিয়ে দিতে বলছে। আমি বলেছি—এবারে একটা বকনা-বাছুর হোক, তারপর না হয় একটা গরু দিয়ে দেব।

রাগে জ্বলে উঠেই ঠাণ্ডা হয়ে গেল পবন। ঘোর কাটল না।

বিকেল নেমে আসতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। আজ বড় উলটো-পালটা হাওয়া। নেশা বাড়িয়ে দিচ্ছিল। বাগান, ঝোপজঙ্গল ছাড়িয়ে ফাঁকায় এসে দূর থেকে দেখতে পেল, নদীর পাড়ে কাত করা নৌকোর গায়ে ঠেস দিয়ে খুশী বসে আছে পা ছড়িয়ে। মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল জলাজঙ্গল-হোগলাবনের দিকে। কী পাখি চিনতে চেষ্টা করল না।

কাছে গিয়ে লক্ষ করল, খুশীর মুখ গম্ভীর। তাকে আসতে দেখেছে নিশ্চয়ই, তবু এদিকে তাকাচ্ছে না। পাশেই বসে পড়ে পবন বলল, কিছু ভাবছিস? তোমাকে কে বেঁধে দিল গাম্ভীর্যের খোল?

খুশী চট করে কোনো উত্তর দিল না। খানিক চুপ থেকে বলল, পড়ে-পাওয়া সুখামদ খুব অসভ্য। চোখ দুটো কুঁচকে কেমন চেয়ে থাকে। এখন এদিকে আসছি, ওইভাবে তাকাচ্ছিল। আমি চলে আসছি, পেছন থেকে ফ্যাসফেসে গলায় ডাকল, খুকু। ছাই ছেলের বাপ, বজ্জাত, বেহায়া!

একদিনে দুবার সুদামের নামে অভিযোগ। মার মতন গলা নয় খুশীর। খুশীর গলায় প্রচুর ঝাঁঝ। অন্য দিন হলে হয়তো অন্যরকম হত। আজ সুদামের ধূর্ত কটাক্ষে চোখ বসানো মুখ মন থেকে খারিজ করে দিতে চাইল, খারিজ করে দিতে পারল। কাল শেষ বিকেল থেকে পবন নেশার ঘোরে।

মুখ নিচু করে আছে, সরু একটা ডাল ভাঙছে মটমট করে। নদীর বাঁকের মুখে জেলেদের নৌকো সাত দেখাচ্ছে। বেশ দূরে, দেখতে পুতুলনাচের মতন। জলে আজ ঢেউ। ছড়ানো মেঘ আকাশে। মেঘের চাংড়াগুলো এক সঙ্গে জমাট বাঁধলে ঝড়বৃষ্টি আসবে নাকি? চার পাঁচ দিন ঝড়জল হয় নি। বিকেল ফুরিয়ে না গেলেও ছায়া নামছে ঘন হয়ে। কড়ো বাতাসে খ্যাপামি বাড়ছে ঝাউপাতায়। খুশীর আঁচল উড়ে উড়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে পবনের গাল-গলায়। এতো কাছে বসলে খুশীর গা থেকে যে গন্ধটা পায় তা কোনো পাতার গন্ধ নয়, জলের—গভীর জলের গন্ধ।

পবন একটা হাত রাখল খুশীর কাঁধে। বাধা পাবার আগেই আরো কাছে সরিয়ে এনে মুখের ওপর মুখ নামিয়ে জীবনে প্রথম জলগন্ধী আপেলে আলতো করে দাঁত বসাল। ছিটকে দু হাত তফাতে চলে গেল খুশী। পবন একপাশে একটু কাত হয়ে পড়ল। খট করে কনুইয়ের হাড় লাগল নৌকোর কানায়। তখন নৌকোর খোলের ভিতরের শুকনো পাতাপুতির মধ্যে খসখস। কিলবিল করে একটা মাটি রঙ সাপ নৌকোর কানা থেকে মাটিতে নেমে এঁকেবেঁকে চলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে—পবন চোখ ধারালো করে দেখল—না, ওই সাপের বিষ নেই। দূরের মাটির ঢিবির আড়ালে চলে গেল সাপটা।

কনুইয়ের কাছে জ্বালা করছিল। চোখ নামিয়ে দেখল, এক জায়গায় একটু রক্তের আভাস। সাপটা যাবার আগে আলতো করে দাঁত ছুঁইয়ে যায় নি তো, নাকি নৌকোর ভাঙা কাঠের ঘষটানি? সাপটা দাঁত ছুঁইয়ে থাকলে ঘা হবে, সারতে চাইবে না তাড়াতাড়ি।

খুশী প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে কনুয়ের কাছের জায়গাটা চুষে চুষে রক্ত বের করে আনল। ভারী মজা লাগল পবনের। —তোর গায়ে যদি বিষ ঢোকে?

কটাশে চুল ঝাঁকিয়ে খুশী জবাব দিল, দেখছিস না কতবার থুথু ফেলছি।

খুশীর গালে চুল এসে পড়ছে, যেখানে পবন দাঁত বসিয়েছিল। সেদিকে তাকিয়ে ভাবল, আজ আমার পাপ হল না তো? চন্দনদার সেই গল্পটা মনে পড়ছিল আবার। সেই গল্পেও একটা সাপ ছিল।

লম্বা শক্ত ডাল কুড়িয়ে এনে পবন কাত করা নৌকোর মধ্যে থেকে ঠেলেঠেলে শুকনো পাতা, সরু ডাল, ঘাস, খড় সরিয়ে দিল, জোর বাতাসে উড়ে দিল। সাফসুফ হয়ে গেল খোলের ভিতরটা। না, আর সাপ নেই, সাপের ডিম নেই, খোলস নেই।

ঝড়বৃষ্টি এল না। সাঁইসাঁই বাতাসে মেঘ উড়ে যাচ্ছে। খুশীর কাঁধে হাত রেখে পবন বলল, তোকে একটা কথা বলি খুশী। রোজ রোজ চন্দনদার কাছে গিয়ে লাভ নেই। আমি পাস করতে পারব না। খুশী, আমি জেলের বাচ্চা। আমি মাছ ধরব, দিনভর, রাতভর। নৌকোটা আবার ভাসাতে হবে। কয়েকখানা তক্তা চাই। কারিগর আমার চেনা। মা এখন অল্প কিছু দিলে নৌকো মেরামত করে দেবে। বাকীটা আমি পরে শোধ করব। আমার সঙ্গে আয় খুশী।

—কোথায়?

—আয় না একটু আমার সঙ্গে।

নদীর পাড় থেকে সরে এসে যেখানে বাগান-ঝোপঝাড় শুরু সেখানে একটা অদ্ভুত আমগাছ। মাটির তিন হাত ওপরে উঠে গাছটা সমান দু ভাগ হয়ে গেছে। ডালপালা বেশী নেই, আমও হয় না। খানিক দূর থেকে দেখলে পবনের মনে হয়, একটা বিশাল হাড়িকাঠ। সেই গাছের তলায় এসে পবন বলল, তুই এখানে দাঁড়া খুশী। আমি এখনই বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি।

দৌড়ে বাড়ি এসে মাকে কোথাও দেখতে পেল না। মাকে বলবারই বা কী আছে? ওই গাছ কোনো কাজে লাগে না। আগে দু-দশটা ভীষণ টক পাশ-বালিশের মতন লম্বা লম্বা আম হত, তাই গাছটার নাম বালশে। আজকাল একটাও আম ধরে না। মা বরং কাঠুরেদের কাছে গাছটা বেচলে টাকা পেতে পারে। পবন কুড়ুলটা নিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে দেখল, তাদের হাঁসগুলো ডোবা থেকে ফিরছে।

আবার দৌড়ে গাছতলায় এসে পবন হাঁপাচ্ছিল। তবু মোটেই দেরি না করে গাছটার সমান দু ভাগের একদিকে কুড়ুল মারল। চেরাই করলে কয়েকখানা তক্তা পাওয়া যাবে।

খুশী বলল, এই শেষবেলায় গাছ কাটবি?

কুড়ুলের ঘায়ের শব্দে খুশীর কথা চাপা পড়ে গেল। পবন শুনলেও আমল দিল না। এক-আধটু পাখির ডাক ছাড়া চারদিক চুপচাপ। কুড়ুলের ঘায়ের শব্দ বাড়ি অবধি পৌঁছে যেতে পারে। মার কানে গেলে এদিকে চলে আসবে। তখন সব বোঝাতে হবে মাকে। নৌকো মেরামতের মতলব মার ভালো লাগবে?

জঙ্গলের তলা দিয়ে অন্ধকার গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। ভৌতিক ছায়া ছড়াচ্ছে আশপাশের গাছগাছালি। ফাঁকায় বরং ফ্যাকাশে আলো। দিনের আলো তো ফতুর, চাঁদ উঠছে বোধ হয়। পবনের হাত অবশ হয়ে আসছিল। কতবার কুড়ুল মেরেছে হিসেব নেই। গাছটা সরু নয়, কাটতে সময় লাগবে। পবন থামল। থামতে স্পষ্ট বুঝতে পারল, সারা গায়ে ঘাম, ক্লান্ত।

খুশী বলল, আজ আর না।

—কেন?

—সন্ধ্যে হল যে। রাতে গাছ কাটতে নেই। এখন বাড়ি যা।

বাড়ির কথায় এতোক্ষণে পবন টের পেল, পেটে খিদের মোচড়। এখনই বাড়ি গিয়ে কী পাবে? হাঁড়ির খোঁদলে হাত ডোবালে কেবল ঠান্ডা ঠান্ডা অন্ধকার মুঠোয় ধরা যায়।

গাছটা আধাআধি কাটা হয়েছে। আজ থাক। কাল সকালে দেখা যাবে। পবন

[illegible] পড়ে আছে। দেরী হলে মা গালি পাড়বে। যেতে হবে, তুই একা যা।

—একটুক্ষণের জন্য চল। গায়ে একটু হাওয়া লাগাই। ঘেমে গেছি। তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।

নদীর পাড়ে এসে কাত করা [illegible] নৌকোর গায়ে ঠেস দিয়ে পবন বসল। খুশী বসল না, পায়চারি করছিল। নদীর কিনারা দেখা যায় অস্পষ্ট। জেলেদের কোনো নৌকো চোখে পড়ে না। জেলে-ডিঙি সব ফিরে গেছে। ইলিশ ধরতে আবার আসবে বেশী রাত্তিরে। খুশী অস্থির। ওর বোধ হয় দেরীই হয়ে যাচ্ছে। [illegible] উত্তরে যাচ্ছে সন্ধ্যেটা।

কেউ একজন আসছে এদিকে। এ সময়ে এখানে তারা ছাড়া আর কারো আনাগোনা হয় না তেমন। আজ একজন আসছে। কাছে এলে দেখা গেল, সুদাম। খুশীর ভাব দেখে পবনের মনে হল, সে যেন আন্দাজ করেছিল, আজ সুদাম এখানে আসবে। খুশীর চোখমুখে বিরক্তির সঙ্গে আশঙ্কা মিশে যাচ্ছে?

পবনের সামনে এসে সুদাম কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। পবন নৌকোয় ঠেস দিয়ে বসেই রইল, উঠল না। ক' হাত তফাতের খুশীকে দেখল সুদাম, একবার নজর ঘুরিয়ে আনল চারদিকে। পবনের দিকে এক পা এগিয়ে এল। —পেটে ভাত নেই, নদীর পাড়ে বৃন্দাবন বানিয়েছিস। ওদিকে মা'টা খেটেখেটে মরছে। সুদামের কথাগুলো থকথকে ঘেন্নায় ডোবানো।

তারপরই খুশীর কাছে সরে গিয়ে অন্য গলায় বলল, বিকেলবেলায় তোকে আমি ডাকলাম খুশী, সাড়া দিলি না কেন? আলতো করে খুশীর একটা হাত ধরল। খুশী হাত ছাড়িয়ে নিল ঝটকা মেরে।

পবনের মুঠোয় কুড়ুলটা হঠাৎ নড়াচড়া করল, আপনা থেকেই, পবন কিছু করে নি। সুদামের ভঙ্গিটা পবনের খুব চেনা। কেবল সুদাম [illegible] সেই একটানা হাসিটা দিচ্ছে না।

এবারে সুদাম শক্ত করে খুশীর হাত চেপে ধরল, অন্য হাত রাখল খুশীর কাঁধে। —পবনার দিদিটা, পার্বতী, বিয়ের আগে আমার সব কথা শুনতো। তুই কেন আমি ডাকলে সাড়া দিবি না?

—ছাড়ো! খুশীর ককানি পবনের কানে ঘা দিল।

তার আগেই অবশ্য পবন লাফিয়ে উঠেছে, পার্বতীর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে। আজ পাপ করবে, সত্যি পাপ, জীবনে পয়লা নম্বর পাপ। পবনের মুঠোর কুড়ুলটা নেচে উঠল। —হেই, আমি এখানে আছি! নিজের গলা নিজেই চিনতে পারল না। চকিতে এদিকে ফিরল সুদাম, আর কুড়ুলটা তার ঘাড়ে নেমে আসবার আগে পবনের যেখানে খিদের মোচড় সেখানে একটা ভারী পায়ের মোক্ষম ঘা।

[illegible] মুখ থুবড়ে পড়ে গেল পবন, সুদামের পায়ের কাছে।

কষ্টে মুখ তুলে দেখল, সুদামের মাথাটা অনেক উঁচুতে উঠে গেছে, আকাশের দিকে। কুড়ুলটা সুদামের হাতে। সেই কুড়ুল দু হাতে ধরে মাথার ওপরে তুলেছে সুদাম। কুড়ুলের ফলায় চাঁদের আলো। খুশীর ককানি কি আমার কানে এল?

পবনের পিঠ বেঁকে কুঁকড়ে গেল। [illegible] দুটো হাত রাখল সুদামের পায়ের ওপর। পায়ের ধাক্কায় পবনকে সরিয়ে সুদাম নদীর দিকে খানিক এগিয়ে গিয়ে কুড়ুলটা ছুঁড়ে মারল জলে। ভারী জিনিস জলে পড়ার শব্দ হল। চেঁচিয়ে বলল, আমার সামনে থেকে সরে যা পবনা।

উঠে দাঁড়িয়ে জোৎস্নায় ছায়া ফেলে পায়ে পায়ে বাড়ির দিকে ফিরে গেল পবন। খুশীকে সুদাম নদীর পাড় থেকে সরে যেতে বলে নি। তবু খুশী কয়েক হাত তফাত রেখে পবনের পিছু পিছু ফিরে গেল। প্রায় এক সঙ্গেই গেল দুজন, তবে পাশাপাশি নয়। পবনের কাছে যেতে খুশী হয়তো ভয় পাচ্ছিল, সুদামের ভয়।

পরের পরদিন রোদ্দুর বেশ চড়া, মা বাজারে গেছে ডিম নিয়ে, চন্দনদা এসে হাজির। ইসকুল বসে যাবার সময় হয়েছে, তবু চন্দনদা কাঁধে ঝোলা নিয়ে পবনের ঘরের দরজায়। আজ তা হলে রবিবার, পবনের খেয়াল ছিল না। পবন একা ঘরে বিছানায় বসে, হাঁটু মুড়ে, বেড়ায় পিঠ ঠেকিয়ে।

[illegible] বাইরে রেখে চন্দনদা ঘরে ঢুকল, বিছানার পাশে বসে বলল, তোর অসুখ নাকি? কদিন যাস না কেন?

পবন দুটো হাত দেখাল, বুক দেখাল। আগুনের ছ্যাঁকা লেগে বড় বড় ফোসকা পড়েছে।

—কী করে হল?

খোলা দরজা দিয়ে পবন উঠোনটা দেখল। কাছেধারে নেই তো কেউ? তারপর চাপা গলায় বলল, সুদামের বাড়িতে আগুন লাগাতে গেছিলাম কাল। সুদামের খড়ের ঘর একটাই, যেখানে রান্না তৈরি হয়। ছেঁড়া কাপড়ের গোলা পাকিয়ে কেরোসিন মাখিয়ে দেশলাই জেলে ধরিয়ে ছুঁড়ে দিতে চেয়েছিলাম সেই ঘরের চালে। আমার মাথার ওপরেই যে গাছের একটা ডাল হেলে আছে দেখি নি। আগুনের বলটা সেই ডালে লেগে আমার গায়েই ছিটকে পড়ল। আগুনে তেমন তেজ ছিল না। অল্প কেরোসিন নিয়েছিলাম। বেশী নিলে মা টের পেয়ে যেত।

—এখন মা টের পেয়ে গেছে?

—মাকে বলেছি, ইসকুল বাড়ির ছাদ থেকে হারিকেন নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় পড়ে যাই।

—বাঃ, খাসা! বিশ্বাস করেছে?

—জানি না। সরকারী ডাক্তারখানা থেকে মলম তো এনে দিয়েছে।

—কাল ওখানে তোকে কেউ দেখতে পায় নি?

—মনে হয় না। ঘরের পেছন দিকটায় জঙ্গল। জায়গাটা রাস্তা থেকে অথবা বাড়ি থেকে দেখা যায় না।

—কিন্তু এসব করতে গেলি কেন? সুদাম বেশী খায় বলে?

ম্লান একটু হাসল পবন। গালের চামড়ায় টান লাগল। গালেও ফোসকা নাকি? খানিক চুপ থেকে বলল, আপনি সব শুনবেন?

—বল।

—আমি কাল বদলা নিতে গেছিলাম। পারি নি। পরশু সন্ধ্যেয় নদীর পাড়ে খুশীকে অপমান করছিল সুদাম, আমাকেও। গাছ কেটে নদীর পাড়ে গেছিলাম, আমার হাতে কুড়ুল ছিল। আমি সুদামকে খুন করতে চেয়েছিলাম। পারি নি। আমাকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে কুড়ুলটা ছিনিয়ে নিল। আমার ঘাড়েই কুড়ুল বসিয়ে দিত, আমি ওর পা ছুঁয়ে মাফ চেয়ে পালিয়ে এসেছি। খুশী আমার পিছু পিছু চলে এসেছিল, কিন্তু আমার দশ হাত তফাতে, আমার কাছে আসে নি, কথা বলে নি আমার সঙ্গে।

চন্দনদা নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল। পবনের দিকে তাকিয়ে রইল পলকহীন— তুই পরীক্ষা দিলে পাস করতে পারিস না। তুই হাতে অস্ত্র থাকতে লড়তে পারলি না। তুই কী পারলি? আমি যে তোকে আমার লেখার একটা এপিসোডের হিরো বানাব ভেবেছিলাম।

—এপিসোড মানে?

—ও সব ছাড়। কুড়ুলটা তোর হাতছাড়া হল কী করে?

—যুঝতে পারলাম না। নিমেষে ঘটে গেল। গাছ কেটে এসে দুটো হাতই ভারী লাগছিল। সুদাম আমার থেকে সাত আট বছরের বড়, আমার থেকে লম্বা। সুদাম মাখন খায়, মাংস খায়। আমি খিদে নিয়ে [illegible]। দুধ খেতে কেমন, আমি ভুলে গেছি। মা আমাকে কোনো দিন একটা ডিম খেতে দেয় না।

—কথা বলছিস দশ বছরের বালকটির মতন। তোর কথা শুনলে হাসি পায়।

—হাসুন। কিন্তু চন্দনদা, আমি আপনার কাছে একটা জিনিস জানতে চাই। সেদিন নদীর পাড় ছেড়ে আসবার সময় খুশী আমার থেকে দূরে থাকছিল, হয়ত সুদামের ভয়ে। পাশাপাশি হাঁটলে পেছন থেকে দেখে সুদাম আবার খেপে যেতে পারত। তবু সেদিন খুশীর আমার পাশে চলে আসা আমার যে খুব দরকার ছিল। এখন খুশী এলে আমার সেই দরকার মেটে না। খুশী কি সেদিন মরিয়া হয়ে আমার কাছে চলে আসতে পারত না, আমার সঙ্গে কথা বলতে পারত না? এল না কেন?

চন্দন দাঁতের ওপর দাঁত চেপে যেন সদ্য শান দেওয়া গলায় বলল, কেন [illegible]

॥ ৫৪ ॥

সাড়ে তিন ভরি আছে। পান বাদ যাবে।

পান বাদ দেবেন কেন? হারটা তো সুন্দর। একটু পালিশ করলে নতুন বলে বিক্রি হয়ে যাবে। মণিদীপা বুদ্ধি খাটিয়ে বলল।

দোকানী গম্ভীর মুখে বলে, আমি শুধু সোনার দাম দিতে পারি।

মণিদীপার কিছু করার ছিল না। বলল, তাই দিন।

টাকা নিয়ে উঠল এবং ট্যাক্সি ধরল।

বাসায় ফিরে টাকার গোছটার দিকে চেয়ে মুখ বাঁকা করে সে। এ টাকা দিয়ে কিছুই শুরু করা যায় না। আরো টাকার দরকার। অনেক টাকা।

টাকাটা অনিবার্যভাবে মার্কেটিং-এ যাওয়ার জন্য তাকে ঠেলছিল। কষ্টে লোভ সামলে নেয় মণিদীপা। অন্তুর মতো এনটারপ্রাইজিং একটা কিছু করতে হবে। অনেক টাকার দরকার।

কাগজ কলম নিয়ে সারাদিন ডাইনিং টেবিলে বসে অনেক হিসেব-নিকেশ করল। দোকান ভাড়া, কর্মচারীর বেতন, ডেকোরেশন ট্যাকস। তবে অন্তুর মতো টেলারিং শপ না রেস্টুরেন্ট না হ্যান্ডিক্র্যাফটস তা ঠিক করতে পারল না। কিন্তু কিছু একটা করতে হবে।

রাত আটটা নাগাদ যখন টেলিফোন বাজল তখনো মণিদীপার হুঁশ নেই। স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে সে একটা ঝকঝকে দোকানঘর দেখতে পাচ্ছে। ভারী ব্যস্ত দোকান, ভীষণ জনপ্রিয়। প্রতিদিন হাজার হাজার টাকার বিক্রি।

সেই ঘোরের মধ্যেই গিয়ে টেলিফোন ধরল।

বোস সাহেব আছেন?

গলাটা শুনে আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল মণিদীপার। বুকে বড় জ্বালা, বড় ক্ষোভ হতাশা।

এখনো ফেরেনি। কোথা থেকে ফোন করা হচ্ছে?

শিলিগুড়ি। কালকের ফ্লাইটে যাচ্ছি। কিন্তু পৌঁছোতে বিকেল হয়ে যাবে, কাল আর বোস সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে না, বলে দেবেন কাইন্ডলি।

বলবো। আপনার সঙ্গে আমারো একটু দরকার ছিল যে! কবে দেখা হতে পারে বলবেন?

কাল নয়। পরশু চেষ্টা করব। কেন?

একটা কাজ হাতে নিয়েছি। এক্সপার্ট ওপিনিয়ন চাই।

আমি কোনো ব্যাপারেই এক্সপার্ট নই।

এক্সপার্ট বলেই তো অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের পোস্টে আছেন।

পোস্টটা আমি পেয়েছি তেল দিয়ে। আপনি তো জানেন।

ব্যাপারটা সিরিয়াস। আমি একটা দোকান দিচ্ছি।

দোকান? কিসের দোকান?

পান বিড়ির।

ওঃ, তা হলে আমি ভাল অ্যাডভাইস দিতে পারব।

তা হলে পরশু? আফটার অফিস আওয়ার্স?

হ্যাঁ। বোস সাহেবের গাড়িতেই চলে যাবো আপনাদের ফ্ল্যাটে।

শুনুন। আপনাকে কিন্তু আমার পার্টনার হতে হবে।

কিরকম পার্টনার?

পার্টনার আবার কিরকম হয়? ক্যাপিট্যাল ইনভেস্টমেন্ট ফিফটি ফিফটি। অর্থাৎ আপনি পান সাজবেন আর আমি বিড়ি বাঁধব?

শপ ম্যানেজমেণ্ট আমার, আউটডোর আপনার।

আর কিছু?

আর কি?

ধরুন লাভটা আপনার, লোকসানটা আমার।

ফের ইয়ার্কি?

না, ভাবছিলাম রাজনীতি কি একদম ছেড়ে দিলেন?

ছাড়ব কেন? এটাও এক ধরনের লড়াই। অপ্রেশনের বিরুদ্ধে।

আপনি ক্যাপিট্যাল পেলেন কোত্থেকে?

এখনো পাই নি। কি করে পাওয়া যায় তা আপনাকেই জিজ্ঞেস করব। শুনেছি আজকাল ব্যাঙ্ক ব্যবসার জন্য লোন দেয়। সত্যি?

দেয়।

আমার সামান্য কিছু সোনা আছে। বেচে দিচ্ছি।

সর্বনাশ।

সর্বনাশ কেন?

সোনা বেচলে আর কিনতে পারবেন না কখনো। সোনা বেচতে নেই।

ওসব প্রিমিটিভনেস আমার নেই। সোনা আমার কোনো কাজে লাগে না।

ইতিমধ্যেই কি কিছু বেচে দিয়েছেন?

শুধু হারটা।

কতটা সোনা ছিল?

সাড়ে তিন ভরি।

দীপনাথ চুকচুক করে একটা আফসোসের শব্দ করে বলল, নিশ্চয়ই জানি আপনি ঠকেছেন। আজকাল সোনার দর জানেন?

না তো!

কত দিয়েছে আপনাকে।

তিন হাজারের মতো। সোনার পান বাদ দিল যে।

ওরা সব সময়ই পান বাদ দেয়। কিন্তু কথা তো তা নয়। ওর ওপরে বারগেন করতে হয়। আপনি নিশ্চয়ই তা করেননি!

আমি লোককে বিশ্বাস করি। বলল মণিদীপা, কিন্তু গলার স্বরে তেজ ফুটল না। বরং করুণ শোনাল।

দীপনাথ হাসল, আমি গিয়ে পৌঁছোনোর আগে আর কাউকে সোনা বিক্রি করবেন না। খুব ঠকে যাবেন। তা ছাড়া বোস সাহেবের অ্যাডভাইস নিলেন না কেন?

# এইচ এম ভি ফিয়েস্টা পপুলার
# ভারতের সবচেয়ে বেশী বিক্রীত রেকর্ড প্লেয়ার

ফিয়েস্টা পপুলার বাজারে চালু করার সময়ে আমাদের আশা ছিল যে এতে আমরা অনেক বেশী শ্রোতাদের কাছে সংগীতের আনন্দধারা পৌঁছে দিতে পারবো। এইভেবে আমরা ফিয়েস্টা পপুলারে সেই সব বৈশিষ্ট্যের সংযোজন করেছিলাম যা সংগীত প্রেমিক মাত্রেই একটি ছিমছাম এবং মজবুত সেটে আশা করেন। তার প্রথম প্রমাণ হলো এর সুলভ দাম,
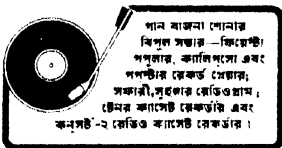
এসি অথবা ব্যাটারী মডেল উভয়েরই। শুধু এই নয়, এতে আছে শক্তিশালী ও বিস্তৃত ফ্রিকোয়েন্সি রেইন্জ-এর অ্যাম্প্লি-ফায়ার এবং ঢাকনায় লাগানো চমৎকার মানানসই স্পীকার যেটিকে আপনি যেখানে খুশি রেখে গান-বাজনা শুনতে পারেন। ধ্বনির গভীরতা ইচ্ছেমত ভারী অথবা হাল্‌কা করার জন্য আছে একটি টোন-কন্ট্রোল। আর আছে সব রকম রেকর্ড বাজাবার জন্য ৩-স্পীডের টার্নটেবল। এসবের উদ্দেশ্য একটি—যাতে

সর্বাধিক অনুমোদিত বিক্রয় মূল্য
৫১৪ টাকা
উৎপাদন শুল্ক সমেত
স্থানীয় কর আলাদা

ফিয়েস্টা পপুলারের মাধ্যমে অনেক বেশী লোক গান-বাজনা শোনার আনন্দ পান।

আনন্দের বিষয় এই যে আমাদের প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে অনেক আগেই ফিয়েস্টা পপুলার ভারতের সবচেয়ে বেশী বিক্রীত রেকর্ড প্লেয়ারে পরিণত হয়েছে। আজ সারা ভারতে ৩,০০,০০০ ফিয়েস্টা পরিবার আছেন। আপনি নিশ্চিত জানবেন—ঠিক এই মুহূর্তে কোথাও না কোথাও এইচ এম ভি ফিয়েস্টা নিশ্চয়ই বাজছে।

**এইচ এম ভি 'হলিডে কন্টেস্ট'-এ যোগ দিন। হংকং, সিঙ্গাপুর, ব্যাংককে রোমাঞ্চকারী সফর! সীমিত মেয়াদী সুযোগ। বিশদ বিবরণের জন্য আজই এইচ এম ভি ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।**

GC 3365R

ও জানলে রাগ করবে।

রাগ করাই উচিত।

সেইজন্যই এক্সপার্ট ওপিনিয়ন চেয়েছিলাম। এ সময়ে আপনি নর্থ বেঙ্গলে গিয়ে বসে রইলেন কেন জানেন তো।

আমাকে খেটে খেতে হয়, অন্যের হুকুমে চলতে হয়। আমি কি জানতাম আমি নর্থ বেঙ্গলে এলেই আপনি সোনা বেচবেন।

সোনা আমি সব বিক্রি করব। তবে এবার আপনার হাতে।

আমি ও দায়িত্ব নিতে পারব না।

তা হলে আমার হাত-খরচ চলবে কিসে?

কেন, বোস সাহেব হাত-খরচও বন্ধ করেছেন নাকি?

ঠিক তা নয়। যা দেয় তাতে চলে না। টুরে থেকে ফিরে এসেই ফিনানসিয়াল ব্যারিকেড তৈরি করেছে।

যতদূর জানি, আপনি চারশো টাকা পান।

বিস্মিত মণিদীপা বলে আপনি জানেন? কি করে? ও কি আপনাকে বলেছে?

দীপনাথ থতমত খেয়ে বুলে, ঠিক ওভাবে বলেন নি। একবার কী একটা কথা প্রসঙ্গে হঠাৎ ইনফর্মেশনটা বেরিয়ে আসে।

কূট সন্দেহে চোখ ছোটো করে মণিদীপা বলে, ও।

চারশো টাকা কিন্তু কম নয় মিসেস বোস।

কম বলছি না। কিন্তু আমি জানতে চাই আমার স্বাধীনতা নেই কেন? আজকাল বয় বাবুর্চির মাইনে পর্যন্ত বোস সাহেব দেয়, আগে আমার হাত দিয়ে দেওয়ানো হত। জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে টাকা নেই। গাড়ি গ্যারাজে তালা বন্ধ। কিন্তু আপনাকে বলে কি হবে? আপনি পুরুষমানুষ, সবসময়ে পুরুষদেরই পক্ষ নেবেন। আই নো ইউ অল।

আপনিও তো অবলা নারী নন মিসেস বোস। চারশো টাকায় নিম্নমধ্যবিত্ত একটা পরিবারের চলে যায়। আর আপনার তো ওটা শুধু হাত-খরচ। খাওয়া থাকা বা পোশাক ওর বাইরে।

হাউ ডু ইউ নো সো মাচ? বোস সাহেব কি এসবও বলেছে?

না। তবে টেলিফোনে আর এসব প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল।

দেন টক অ্যাবাউট ওয়েদার।

এখানে ভীষণ ঠান্ডা। আজ গ্যাংটকে গিয়ে জমে গিয়েছিলাম।

মণিদীপা রাগ করে বলল, রিসিভার রেখে দিচ্ছি কিন্তু।

আরে, রেগে গেলেন যে! ওয়েদারের কথা আপনিই বললেন তো।

রাগ হওয়ার কথা নয় বুঝি? এদেশে বলেই মেয়েদের এত সহজে বেকায়দায় ফেলা যায়। সভ্য দেশ হলে—

দেশটাকে সভ্য করে তুলুন না। কে আটকাচ্ছে?

আপনারাই আটকাবেন, মেয়েরা প্রগ্রেস করলে যাদের ইন্টারেস্ট হ্যামপার্ড হয়।

আমি তো আপনার পার্টনার। আপনি প্রগ্রেস করলে আমারও প্রগ্রেস।

এখনো পার্টনার হননি।

হচ্ছি তো! পরশু দিন।

আপনাকে পার্টনার করব কি-না তা দুবার ভাবতে হবে।

কোনো মেয়েকে পার্টনার করতে চান? মনে হয় না।

তার মানে?

মেয়েতে মেয়েতে কো-অপারেশন এর নাম শুনেছেন? মেয়েতেও তো হচ্ছে না।

পরশু বরং আপনি আমার একটা ইন্টারভিউ দিন।

ইন্টারভিউ বহুবার দিয়েছি। কাওয়ার্ড, সেলফ কনটেন্ট।

আমি?

নয়তো কে? অলস ভীতু আনস্মার্ট।

তবু আমাকেই পার্টনার করতে চেয়েছিলেন একটু আগে।

এখন চাইছি না। আপনি আমাকে রাগিয়ে দিয়েছেন।

আপনি না রেগে কখন থাকেন বলুন তো! যখনই দেখা হয় তখনই দেখি রেগে আছেন।

আমি মোটেই রাগী নই।

আপনার ব্যবসা যদি জমে যায় তা হলে কি হবে মণিদীপা?

নামটা মনে পড়েছে তা হলে?

পড়েছে। কিন্তু প্রশ্নের জবাবটা?

আমার ব্যবসা জমবেই।

কিন্তু তারপর?

তারপর আবার কি? ইট উইল গ্রো বিগার। আমি একটা চেইন অফ শপসের কথা ভাবছি।

সে না হয় হল। কিন্তু আপনার সাংসারিক বা দাম্পত্যজীবনের কী হবে?

তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?

আমি জানতে চাই আপনি সংসার ছাড়াও প্রেলোগ হিসেবে এসব ব্যবসা-ট্যাবসার কথা ভাবছেন কি-না।

আমি তো সংসার ছাড়া হয়েই আছি। গেস্টদের মতো থাকি খাই।

তবু তো একটু হলেও আছেন।

সেটুকু বাদ গেলেও কারো ক্ষতি হবে না। বরং ফ্রি হলে অনেক বেশী কাজ করতে পারতাম। আমাদের ডিভোর্সটা আপনার জন্যই হল না।

কিন্তু তাতে লাভ কি হল বলুন তো।

লাভ-ক্ষতির হিসেব এখনো শেষ হয়নি। সময় হলেই ব্যালানস শীট পেয়ে যাবেন।

বোস সাহেব উকিলকে একটা ভিজিটও দিয়েছিল শুনেছি। আপনার পরামর্শে নোটিশটা সার্ভ করেনি। কিন্তু এটা বালির বাঁধ।

দেখা যাক।

আমি কারো করুণার পাত্রী হয়ে থাকা পছন্দ করি না। সবসময়েই মনে হয়, বোস ইচ্ছে করলেই আমাকে ডিভোর্স করতে পারে, দয়া করে করছে না। একজন আউট সাইডারের মতো এই থাকাটা কি খুব সম্মানজনক?

ধৈর্য ধরুন।

ধৈর্য ধরছি তার কারণ অন্য। বোসের ফ্ল্যাট থেকে বেরোলে আমার কলকাতায় আর থাকার মতো জায়গা নেই। শুধু সেইজন্যেই—

জানি মণিদীপা।

আপনি জানেন বলেই বোধ হয় ডিভোর্সটা আটকেছেন। কিন্তু ও ডিভোর্স না করলেও আমি মামলা আনব। তখন ঠেকাতে পারবেন না।

তারপর কি হবে মণিদীপা?

কিন্তু তার আগে বলুন, আপনি তিন মিনিটের টাইম লিমিট কতক্ষণ আগে পার হয়েছেন?

অনেকক্ষণ। কিন্তু আমি এক্সচেঞ্জ থেকে কথা বলছি। এ জায়গা আমার চেনা। এমন কি পয়সাও লাগে না।

ও। হ্যাঁ, তারপর কি হবে জিজ্ঞেস করছিলেন। জেনে কি হবে? আমি ডিভোর্স করলেও তো কেউ মালা হাতে বসে থাকবে না।

এদেশের কাওয়ার্ড পুরুষেরা ডিভোর্সী মেয়েদের ভয় পায়।

ঠিক তাই মণিদীপা।

কিন্তু আমি তো আর বিয়ে করতে যাচ্ছি না। কাজেই ও প্রশ্ন ওঠে না। আমি চাই কাজ। অনেক হাজা কাজে ডুবে থাকব।

কাজ চাই? সেজন্য দোকান কেন? আপনার বিপ্লব কি শেষ হয়ে গেছে মণিদীপা?

মণিদীপা ভ্রূ কোঁচকায়. কেন শেষ হবে? যে লোকটা বিপ্লবীর জুতোয় পেরেক ঠুকে দেয় সেও বিপ্লবী। আপনি রিভোলিউশন অফ দি প্রোলেতারিয়েত কাকে বলে তাই জানেন না।

আপনি বোধহয় বিপ্লবীদের জন্যই গুণ্ডি দিয়ে পান সাজবেন, আর আমি বিপ্লবী ব্র্যান্ডের বিড়ি লাল সুতোয় বেঁধে দেবো?

কেন যে আপনি এত অশিক্ষিত।

দীপনাথ গা-জ্বালানো হাসি হাসছিল। দীপনাথের ওপর সে কখনো সত্যিকারের রাগ করেনি। আজ করল। হাসির মাঝখানে রেখে দিল ফোনটা।

বোস সাহেব ফিরল নটা নাগাদ। আজকাল সব সময়েই বাসায় ঢোকে গম্ভীর মুখে, ভ্রূ কোঁচকানো। মণিদীপা তাতে ভয় পায় না বা গুরুত্বও দেয় না। লোকটাকে তার বোঝা হয়ে গেছে। এও জানে তারা দুজনে কেউ নিজেকে বদলাবে না। যদি না বদলায় তবে মিলও হবে না কোনোদিন।

তবে আজ মণিদীপা আধঘণ্টা বাদে হানা দিল বোসের ঘরে। ততক্ষণে বোস গরম কাপড়ের ড্রেসিং গাউন পরে এক কাপ কালো কফি শেষ করেছে। বাইফোকাল চশমা চোখে কিছু কাগজপত্র দেখছিল লেখাপড়ার টেবিলের কাছে বসে।

মণিদীপা সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলার পাত্রী নয়। ঘরে ঢুকেই বলল, বুন্দু, তোমার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে।

বোস কাগজ সরিয়ে একটু অবাক চোখে মণিদীপাকে দেখে নিয়ে বিরক্ত গলায় বলে আই নো। তোমার কথা মানেই টাকা। আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়।

অপমানটা খুব ঝাঁঝালো হয়ে মণিদীপার সর্বাঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল বটে, কিন্তু তবু সে আজ মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারল। আর একটা চানস ওকে দেবে সে।

মণিদীপা মাথা নেড়ে বলে, টাকার কথা তোলাটা নিশ্চয়ই দোষের নয়।

দোষের হত যদি যথেষ্ট টাকা তুমি না পেতে।

আমি যথেষ্ট পাই না। তার চেয়েও বড় কথা, টাকার ব্যাপারে আমার কোনো স্বাধীনতা নেই।

স্বাধীনতা দেবো এমন শর্ত ছিল না।

তা হলে আমাকে বউ সাজিয়ে রেখেছো কেন?

চলে যাও। দরজা সবসময়েই খোলা।

আমি যেতেই চাই। কিন্তু যাওয়ার জন্যও আমার কিছু থোক টাকার দরকার। আমাকেও বাঁচতে হবে তো।

সেটা কোর্টে ঠিক হবে।

তুমি কি ডিভোর্স সুট আনছ?

না। পাবলিসিটি আমি অপছন্দ করি। তবে তুমি মামলা করতে পারো। আমি লড়ব না।

আমি কেন মামলা করতে, যাবো? তোমার আমার মিল নেই, ছাড়াছাড়ি দরকার, সেটা কি কাছারির মুখ দিয়ে বলাতে হবে? কাছা রিতে গিয়ে তো আমরা বিয়ে করিনি।

তা হলে আপসে সেপারেশন চাও?

চাই।

আর সেজন্যই টাকাটা তোমাকে দিতে হবে?

তাও নয়। তুমি মীন বলে অন্য রকম অর্থ করছ। চলে যাওয়ার প্রি কন্ডিশন হিসাবে আমি টাকাটা চাইনি। আই ওয়ান্ট টু স্টার্ট সামথিং ইমিডিয়েটলি। পরে আমি ব্যাংকের লোন পেয়ে গেলে তোমার টাকা তখন শোধ করে দেবো।

তুমি কী স্টার্ট করতে যাচ্ছো আগে সেটা আমার জানা দরকার।

এখনো ঠিক করতে পারিনি। আই ওয়ান্ট টু ওপেন এ শপ।

শপ? মুদিখানা নাকি?

তোমার হালচার বেশী দূর ওঠে না, তাই যা খুশি ভাবতে পারো।

ভদ্রঘরের মেয়েরা কি দোকানদারী করে? কখনো শুনিনি।

করে এবং খুব ভাল ঘরের মেয়ে বউও করে। আমার বন্ধু অঞ্জু কত বড় টেলারিং করেছে। ওর বর তোমার চেয়ে অনেক উঁচু পোস্টে কাজ করে।

অঞ্জু? সেটা কে?

ইউ নো হার ওয়েল। ন্যাকামি কোরো না।

বোস নিজেই নাকটাকে দু আঙুলে চেপে ধরে একটু ভাবল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, আই নো। বোধহয় বালিগঞ্জে ওর একটা ফ্যাশনের দোকান আছে, অ্যান্ড শী ইজ এ কাটথ্রোট।

তোমার অ্যাসেসমেণ্ট তোমার নিজস্ব। তবে আমিও ওরকম কিছু করতে চাই।

আমি তোমাকে টাকা দিয়ে বিশ্বাস করতে পারি না। অঞ্জু যা পেরেছে তুমি তা না পারতেও পারো।

তবু তুমি তোমার টাকা ফেরত পাবে। আমি ধার হিসেবে কাগজপত্রে সই করে টাকা নেবো। ইভন আই অ্যাম রেডি টু পে ইণ্টারেস্ট।

বোস হাসল, খুবই শেয়ালমুখো হাসি, যা আসলে হাসি নয়। বলল, তুমি চলে গেলেও তো আমার লাভ হবে না। আইনত আমি বিবাহিতই থেকে যাচ্ছি।

তুমি কি আবার বিয়ে করতে চাও বুশু?

চাইলে দোষ কি?

আর একটা মেয়ের সর্বনাশ হবে। ঠিক আছে আমি মিউচুয়াল করে নিতে রাজি। কেস তো ইন ক্যামেরাও করা যায়।

যায়। তবু আমার ইচ্ছে কেসটা তুমি ফাইল করো।

তবে টাকা দেবে?

ভেবে দেখব।

মণিদীপা অত্যন্ত গভীর বুক-খালি-করা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, চ্যাটার্জি শিলিগুড়ি থেকে ফোন করেছিল।

কবে আসছে।

কাল। তবে কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।

জানি। তুমি যাও।

আর একটা কথা বুশু, চ্যাটার্জি আমার টাকার অসুবিধের কথা সবই জানে। তুমি যে আমাকে রেশনে রেখেছো তা ও জানল কি করে? তুমি বলেছো?

আমি! বলে যেন একটু অবাক হয় বোস। তারপর সত্যিকারের একটু হাসে, ইন ফ্যাক্ট তোমাকে টাকার ব্যাপারে কনট্রোল করার কথা ওই আমাকে প্রথম বলে। হি ইজ এ রিয়্যাল ফ্রেণ্ড। ব্যাংকরাপ্টসি থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

দীপবাবু?

অবাক হওয়ার কিছু নেই। তুমি যখন আমাকে ফকির বানানোর মহান ব্রত নিয়েছিলে তখন আমার অবস্থা পাগলের মতো। অত টাকা আয় করেও কিছুই থাকে না। দীপনাথ ঠিক সেই সময়ে ইনটারফেয়ার করে। আই অ্যাম গ্রেটফুল টু হিম।

মণিদীপা হাত মুঠো করে রাগে কাঁপতে কাঁপতে অন্ধের মতো, আচ্ছন্ন মাথায় নিজের ঘরে ফিরে এল।

তার কান্না আসে না সহজে। আজ এল। আসলে কান্না নয়। অসহায় দুর্দম রাগ তার ভিতরটাকে বিদীর্ণ করে দিল বুঝি। বালিশে মুখ চেপে ধরে নিজের শ্বাসরোধ করতে করতে হাত পা ছুঁড়ে কাঁদতে লাগল মণিদীপা। (ক্রমশ)

## গঙ্গা এবং কাবেরীর সংযুক্তি কতটা বাস্তব সম্মত

উত্তরে গঙ্গা। দক্ষিণে কাবেরী। খাল কেটে ভারতের এই দুই নদীর মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্যে বেশ কিছুকাল ধরেই মাথা ঘামিয়ে আসছেন আমাদের প্রযুক্তিবিদরা। এ ধরনের পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য তিনটি। এক, গঙ্গা এবং তার শাখা নদীগুলির উদ্বৃত্ত জলপ্রবাহ প্রায় প্রতি বছরই প্লাবন সৃষ্টি করে। সেই প্লাবনে জীবনহানি থেকে সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয় বিস্তর। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, গঙ্গার উদ্বৃত্ত জল কাবেরী এবং তার শাখানদীগুলির দিকে খালপথে সরিয়ে নিলে এ ধরনের বিপত্তিকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে। দুই, এই খাল উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের মধ্যে সরাসরি জলপথ স্থাপন করতে সাহায্য করবে। এতে করে পরিবহণ সমস্যার সুরাহা হবে অনেকটা। বিদ্যুৎ অথবা কয়লা এবং ডিজেলের উপর চাপ পড়বে কম। তিন, গাঙ্গেয় উপত্যকায় দক্ষিণ দেশের বিস্তৃত অঞ্চল বছরের প্রায় সব সময় খরাক্লিষ্ট অবস্থায় থাকে। জলের অভাবে ওই সব এলাকায় সেচের জন্যে এখনও পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য কোন ব্যবস্থাই গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, গঙ্গা-কাবেরীর সংযোগকারী ওই খাল এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। ওই খালের জল নালা কেটে হাজার হাজার একর জমির মাটি সিক্ত করে তুলে সেখানে সবুজের জোয়ার আনা তখন আর অসম্ভব হবে না।

'এ ধরনের উদ্যোগে খরচ প্রচুর।' বলেছেন জনৈক সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ। 'খাল, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং তার সঙ্গে আছে ব্যবহার-উপযোগী পড়ো জমির উদ্ধার। এ সব কাজ পরিকল্পনা মত করা গেলে পরে ওই খরচ অবশ্য পুষিয়ে নেওয়া যাবে। সেচ এবং শক্তি ছাড়াও আভ্যন্তরিক জল-পরিবহণ, মাছ চাষ, এমন কি আঞ্চলিক আবহাওয়ারও উন্নতি ঘটানো যেতে পারে।'

দেশে উপযুক্ত সেচ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে সম্প্রতি ভারত সরকারের সঙ্গে সোভিয়েত দেশের কয়েকটি চুক্তি হয়েছে। এদের মধ্যে তিনটি চুক্তি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম চুক্তি খালগুলি তৈরি করবেন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। ঠিক যে বরাবর খাল তৈরি হবে, বিস্ফোরণও ঘটানো হবে ঠিক সেই বরাবর। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় ডাইরেকশনাল ব্লাস্টিং। এতে করে খুব তাড়াতাড়ি খালগুলি তৈরি করা যাবে। দ্বিতীয় চুক্তি, ভারত-সোভিয়েত যৌথ উদ্যোগে গড়ে তোলা হবে একটি কারখানা। এই কারখানায় তৈরি করা হবে কংক্রিটের আবরণ। খালের পাড় এবং তল এই আবরণ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হবে। যেমনটি করা হয় ঘরবাড়ির নালা তৈরির ক্ষেত্রে। এতে করে ভূস্তরে জল চোঁয়ান রোধ করা যাবে। কাঁচা খালে প্রবাহিত জলের বেশ অংশ মাটি যেমন শুষে নেয়, এ ধরনের খালে সেটা হবে না। কংক্রিটের চাদর তৈরির যে কারখানাটি তৈরি হবে সেটি উৎপাদন করবে বছরে দুই লক্ষ ঘন মিটার চাদর। তৃতীয় চুক্তি, যে সব অঞ্চলের ভূস্তর পাহাড়ী নয়, সেখানে পাথর এবং মাটির মিশ্রণে উঁচু বাঁধ তৈরি করে, এবং দরকার হলে কংক্রিট দিয়ে তৈরি হবে বড় বড় জলাধার।

গঙ্গা-কাবেরী ছাড়াও গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সংযোগের কথাও ভাবছেন ভারতীয় প্রযুক্তি বিজ্ঞানীরা। পারস্পরিক দুটি নদীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন এ দেশে এমন কোন নতুন ঘটনাও নয়। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় ভারত যখন অবিভক্ত ছিল, ওই সময় ঝিলাম, চেনাবের উত্তরাংশ এবং বারি-দোয়াবের নিম্নাংশের মধ্যে খাল কেটে পাঞ্জাবের বিস্তৃত এলাকায় সেচের ব্যবস্থা করা হয়। স্বাধীনতার পরও এ ধরনের বেশ কয়েকটি প্রকল্প এ দেশে বাস্তবে রূপায়িত করা হয়েছে। এই সব প্রকল্পের মধ্যে আছে পেরিয়ার প্রকল্প, রাজস্থান খাল প্রকল্প, পারম্বিকুলম-আলিয়ার প্রকল্প, গুরগাঁও

বিড়লা মিউজিয়মের সাপ-ঘরে

খাল প্রকল্প, জিন খাল, শতদ্রু-বিপাশার সংযুক্তি প্রভৃতি।

ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ অঞ্চল বিশেষে স্বতন্ত্র। কোথাও অতি বর্ষণ, কোথাও বৃষ্টির দেখা পাওয়া ভার। কোথাও জলের প্রাচুর্য, কোথাও এক ফোঁটা জলের জন্যে হা পিত্যেশ। নদী অববাহিকাগুলির মধ্যে উপযুক্ত সংযোগ স্থাপন করা গেলে এ সব সমস্যা হয়ত দূর করা যাবে। অতিবৃষ্টি-অঞ্চলের জল অনাবৃষ্টি-অঞ্চলে বন্টন করে শস্যের উৎপাদন বাড়ানো থেকে পশুপালন, কলকারখানার সম্প্রসারণ এমন অনেক কিছুই করা তখন সম্ভব হতে পারে।

তবে এ ধরনের প্রকল্প রূপায়িত করতে গেলে নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। বিশেষ করে গঙ্গা-কাবেরীর ক্ষেত্রে তো বটেই। প্রকৃতির নিজস্ব কারিগরির মধ্যে যে স্থিতিস্থাপকতার পরিচয় পাই, তাকে পুরোপুরি আয়ত্ত করা না গেলে এ ধরনের উদ্যোগ অনেক সময় বিপর্যয়ের কারণও হয়। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে তৈরি হয়েছে বড় বড় বাঁধ এবং জলাধার। বিজ্ঞানীরা দেখছেন, ওই সব বাঁধ এবং জলাধার-অধ্যুষিত অঞ্চল এখন কখনও কখনও মৃদু ভূ-কম্পন হচ্ছে। গঙ্গা এবং কাবেরীর মধ্যে পড়ে রয়েছে বিচিত্র ভূভাগ। তার কোথাও নরম মাটির স্তর, কোথাও পাহাড়-পর্বত ছড়ানো পাথুরে অঞ্চল। অতএব প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, গঙ্গার জলের বেশ কিছু অংশ দক্ষিণে প্রবাহিত করতে গিয়ে আঞ্চলিক আবহাওয়ার উপর চাপ পড়বে না তো? উত্তর নদীর জলবহন-ক্ষমতায় পরিবর্তন ঘটবে না তো? ভূতাত্ত্বিক পরিবেশ বিপর্যস্ত হবে না তো? অরণ্য এবং খনিজ সম্পদের উপর তার প্রভাব কতটা বর্তাতে পারে? উত্তর নদীর অন্তর্বর্তী অঞ্চলে আছে প্রচুর নদী এবং তার শাখা প্রশাখা। ওই ধরনের উদ্যোগে সেগুলি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে দিকটাও দেখতে হবে। সেটা দেখতে গেলে চাই নির্ভরযোগ্য অভিজ্ঞতা। এর জন্যে চাই অগাধ গবেষণার প্রস্তুতি। এই গবেষণায় ভূতত্ত্ব, জল-প্রবাহ বিজ্ঞান আবহাওয়া এবং পরিবেশ বিজ্ঞান—এমন অনেক বিষয়েরই অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের উপর নির্ভর করে তবেই এমন বিরাট একটি প্রকল্পে হাত দেওয়া উচিত।

প্রসঙ্গত আরও একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সারা দেশ জুড়ে রয়েছে অজস্র নদী নালা। উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে তাদের অনেকেই নাব্যতা হারিয়েছে। অনেক নদী শুকিয়ে গেছে। উদ্যোগী হলে এই সব নদী-নালার সংস্কার করে সেচ এবং নৌ পরিবহণের ব্যবস্থা করা যায়। এ ধরনের নদীর একটি পূর্ণাঙ্গ পরিসংখ্যান নেওয়া দরকার। দরকার সেগুলির সংস্কারের ব্যাপারে রুটিন মাফিক গবেষণা। ওই গবেষণার উপর নির্ভর করে কম খরচ এবং কম খাটুনি নিয়ে হয়ত ওই সব নদী-নালা সেচ এবং পানীয় জল সরবরাহের কাজে লাগান যেতে পারে। তা না করে গঙ্গা-কাবেরীর মধ্যে খালকাটা—যার প্রযুক্তিগত দিক এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কেউ নিঃসংশয় নন—তেমন সোনার হরিণের পেছনে ছোটা কতটা বাস্তবসম্মত হবে সেটা ভেবে দেখা দরকার।

## জাজোবা

লাতিন নাম সাইমনডসিয়া চায়নেসিস (লিঙ্ক)। আঞ্চলিক নাম কোথাও পিগনাট। কোথাও গোটনাট। তবে অনেকের কাছেই জাজোবা নামেই পরিচয়। জাজোবা এক ধরনের গুল্মজাতীয় গাছ। চির সবুজ। উচ্চতা কয়েক ফুট মাত্র। আরাইজোনা, ক্যালিফোর্নিয়া এবং মেক্সিকোর কোন কোন অঞ্চলে এই গাছ ব্যাপকভাবে জন্মে থাকে। ভারত সরকারের বিজ্ঞান এবং কারিগরী দপ্তর কিছুদিন আগে মার্কিন দেশ থেকে দুই কিলোগ্রামের মত বীজ নিয়ে এসেছিলেন এ দেশে। ওই বীজ থেকে এ দেশে জাজোবা গাছের চাষ করা যায় কি না, সেটা দেখার জন্যে দায়িত্ব পড়লো যোধপুরের সেন্ট্রাল অ্যারিড জোন রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং লখনৌ-এর ন্যাশনাল বোটানিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উপর। গবেষণাগার দুটির বিজ্ঞানীরা সফলের সঙ্গে বীজ থেকে চারা তৈরি করলেন। গাছগুলি এ দেশের জলবায়ুতে মানিয়ে ঠিক থাকতে পারে কিনা সে সম্বন্ধেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন তাঁরা। সফলও হলেন। এ দেশেও যাতে জাজোবার ব্যাপক চাষ করা যায় সম্প্রতি তার উদ্যোগে হাত দিয়েছেন ভারত সরকারের বিজ্ঞান এবং কারিগরী দপ্তর। এ ব্যাপারে দেশের বিভিন্ন গবেষণাগার এবং বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি প্রকল্পও রচনা করেছেন তাঁরা। আপাতত রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং উত্তরপ্রদেশে এই গাছটি ব্যাপকভাবে চাষ করা যায় কী না সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এই গাছ প্রায়-মরুভূমি অঞ্চলে চাষ করা যেতে পারে। যে সব জমিতে সূর্যের আলো পড়ে কম অথবা সাধারণ চাষবাস লাভজনক নয়, অথবা করা যায় না, সেখানেও জাজোবার চাষ করা যায়। লবণাক্ত অথবা অতিরিক্ত ক্ষার আছে এমন জমিও এ কাজে লাগানো যেতে পারে। সেচেরও তেমন প্রয়োজন হয় না। বরং মাটি সংরক্ষণে সাহায্যই করে জাজোবা।

এমন আদর করে জাজোবা গাছ চাষের কারণ কি?

এর উত্তর : জাজোবার নানা অংশের নানা গুণ। জাজোবার বীজে তেলের পরিমাণ পঞ্চাশ শতাংশ। রাসায়নিক গঠনের দিক দিয়ে এই তেল স্পার্ম তিমির তেলের সঙ্গে তুলনা করা চলে। স্পার্ম তিমির তেল অত্যন্ত মূল্যবান। উচ্চ মানের মোটরগাড়ির তেলে

[illegible] হিসেবে যেমন হয় স্পার্ম-তেল। যন্ত্রপাতির অংশ পিচ্ছিল রাখার ব্যাপারে স্পার্ম তেল যেন তুলনাহীন। তার প্রধান কারণ, অতি উচ্চ তাপমাত্রা এবং চাপে এই তেলের গুণাগুণ নষ্ট হয় না। তা ছাড়া যন্ত্রাংশ নিশ্চল থাকলেও এই তেল তার গায়ে লেগে থাকতে পারে, চুঁইয়ে বা গড়িয়ে পড়ে যায় না। বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন, জাজোবা তেলেও এই সব গুণই আছে। অতএব 'লুব্রিক্যান্ট' বা পিচ্ছিলকারী তেল হিসেবে দেশে এই তেলের চাহিদা যথেষ্ট। জাজোবার বীজ থেকে তরল-মোমও পাওয়া যায়। এই মোম প্রসাধন সামগ্রী, যেমন শ্যাম্পু, সাবান, মোমবাতি প্রভৃতি তৈরির ব্যাপারেও কাজে লাগান যায়। হ্যাঁ, জাজোবার পাতাও যথেষ্ট মূল্যবান। সবুজ সার হিসেবে যথেষ্ট কদর। ঠিক মত চাষ করলে একর প্রতি জাজোবা বীজের উৎপাদন ০·৭৫ মেট্রিক টনের মত হতে পারে। এই তেলের আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদাও যথেষ্ট। দাম কিলোগ্রাম প্রতি ২৪০ টাকার মত। তেল এবং সবুজ সার ছাড়াও জাজোবার কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। বিজ্ঞান এবং কারিগরী দপ্তর মনে করেন, জাজোবার চাষ সাধারণ শস্যাদি চাষের মতই লাভজনক। গ্রামীণ কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাজোবার চাষ যথেষ্ট কার্যকর হবে বলেই তাঁদের বিশ্বাস।

## সাপ-ঘর

"কী, সাপ দেখে ভয় করে? ভয় পাবেন না। সাপ নিরীহ প্রাণী। সাপ অযথা কাউকে দংশন করে না। এই আমাকেই দেখুন না।" বলেই একটি জ্যান্ত লাউডগা সাপ হাতে তুলে নিল কলকাতার 'লা মার্টিনিয়ার'-এর তরুণ ছাত্র অ্যান্ড্রু রাও। সাপটির গায়ে হাত বোলাতে লাগলো সে। কখনও গলের উপর কখনও বা কাঁধে তার মুখটি বোলাতে লাগলো।

তার সামনে তখন রুদ্ধশ্বাস জনতা। শিশু, বালক-বালিকা এবং বড়দের ভীড়।

অ্যান্ড্রু বললো, সাপ দেখে শুধু শুধুই ভয় পান আপনারা। লাউডগা সাপে বিষ নেই। বড় রাগী সাপ। বিরক্ত করলেই কামড়ায়। এই দেখুন না, কেমন কামড়ে দিয়েছে আমার হাত।

সম্প্রতি কলকাতার বিড়লা ইনডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনলজিকাল মিউজিয়াম দুটি 'সাপ-ঘর' তৈরি করেছেন। ঘর বলতে কিছুটা গভীর গর্ত। গর্তের মধ্যে জলের ব্যবস্থা আছে। সেখানে গাছপালা, নুড়ি পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে প্রাকৃতিক পরিবেশ। আর সেই পরিবেশে বহাল তবিয়তে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে কয়েক জাতের সাপ। লাউডগা, গোখরো, বোরা, শঙ্খচূড় প্রভৃতি। গোসাপও আছে। সাপ ঘর দেখার জন্যে মিউজিয়ামে এখন প্রচুর ভীড়।

মিউজিয়ামের কিউরেটার সমর বাগচী বললেন, ভারতে সাপের কামড়ে যাঁরা মারা যান দেখা গেছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বোড়া সাপেই তাঁদের কেটেছে। শঙ্খচূড় বিষাক্ত সাপ। মারাত্মক এর বিষক্রিয়া। তবে চট করে কাউকে আক্রমণ করে না।

অ্যান্ড্রু একটি বোড়া সাপ হাতে নিয়ে তাকে রাগিয়ে তার দাঁত দিয়ে বিষের ফোয়ারা দেখালো। সবাই দেখল বোড়ার বাঁকা দাঁতের ডগা থেকে বিষ পড়ল।

সমরবাবু বললেন, আমাদের কারিগরি সংগ্রহশালায় এবার থেকে কিছু কিছু জ্যান্ত প্রাণী রাখার ব্যবস্থা করেছি আমরা। সাপ-ঘর তৈরি হয়েছে। কিছু কিছু মাছও রাখা হয়েছে। ছোট পুকুর তৈরি করে মাছ এবং জলচর জীব রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে। স্কুলের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী আসে এখানে। আমাদের আশা, প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে জীবজগতের সম্পর্ক কতটা সে সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা যোগানোর ব্যাপারে এই উদ্যোগ তাদের যথেষ্ট সাহায্য করবে।

প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা ছাত্রছাত্রীদের শিখিয়ে থাকি স্কুলের চার দেওয়ালের মধ্যে। সেটা পুঁথিগত বিদ্যা। সেই পুঁথিগত বিদ্যাকে অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করার ব্যাপারে বিড়লা মিউজিয়ামের এই প্রচেষ্টা অভিনন্দনীয়।

## বিজ্ঞান পত্রিকা

জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারের আশায় বছর চার আগে বিজ্ঞান বিচিত্রা নাম দিয়ে আগরতলার কয়েক জন যুবক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করেছিলেন। আনন্দের কথা, তাঁদের সে উদ্যোগ এখন সার্থক। ওঁরা গ্রাহক পেয়েছেন এক হাজারের মত। গ্রাহক বাড়ছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে পত্রিকার বৈচিত্র্যও। বিশেষ করে আইনস্টাইন সংখ্যাটি। আইনস্টাইনের ব্যক্তিগত জীবন থেকে বৈজ্ঞানিক কর্মযজ্ঞের এমন স্বচ্ছ এবং নির্ভরযোগ্য লেখা খুব কমই চোখে পড়ে। কলকাতার পত্র-পত্রিকাতেও দেখিনি। ভৌত এবং জীববিজ্ঞান নিয়ে লেখাগুলির মধ্যে প্রচুর মৌলিকত্ব রয়েছে। বৈজ্ঞানিক সংগঠন, বৈজ্ঞানিক উদ্যোগ, বিজ্ঞানের যে সব কথা জানলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হতে পারে, ছাত্রদের স্কুলের গণ্ডীর বাইরের পঠন অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি—সুপরিকল্পিতভাবে তার চেষ্টা করা হয়েছে এই পত্রিকায়। আরও প্রশংসনীয় পত্রিকার লেখক-তালিকায় যাঁরা আছেন অনেকেই পাঠক-পাঠিকার কাছে হয়ত সুপরিচিত নন, কিন্তু লেখার মুনসিয়ানায় তাঁরা অনবদ্য। বাংলাভাষায় প্রকাশিত এ ধরনের পত্রিকা খুব কমই চোখে পড়ে। মাত্র চার বছরে একটি বিজ্ঞান পত্রিকাকে এমন হৃদয়গ্রাহী করে তোলার দৃষ্টান্ত বিরল ঘটনা সন্দেহ নেই। পত্রিকার সম্পাদক দেবানন্দ দামকে এই কৃতিত্বের জন্যে ধন্যবাদ। ঠিকানা : বিজ্ঞান বিচিত্রা। পোঃ যোগেন্দ্রনগর। আগরতলা, ত্রিপুরা।

সমরজিৎ কর

# '৮০ ওলিম্পিকের আগে রুশ দেশ · চিরঞ্জীব

॥ ১৪ ॥

একে তুষারবৃষ্টি, তার সঙ্গে সমুদ্রের ঝোড়ো হাওয়া। গায়ে কাঁটার মত গেঁথে যাচ্ছিল যেন। গ্লাভসেও হাত আড়ষ্ট হয়ে আসছে। দেখে পকেটে পুরলাম হাত দুখানা। কিন্তু মুখকে বাঁচাই কেমনে। আর জুতোর তলা দিয়েও ঠাণ্ডা উঠছে। আজ আবার মস্কোর জিমন্যাস্টিকস স্কুলে যাওয়ার মত অবস্থা না হয়। তবে আজ বেরোবার আগে ডবল মোজা পরে বেরিয়েছি এই যা রক্ষা। গ্রীষ্মের তাল্লিনকে অনেকেই দেখেছেন, দেখবেন ওলিম্পিকের সময়ে। নীল বাল্টিকে শাদা পালে তুলে নৌকো ভাসাতে দেখিছি ফিল্মে। কিন্তু শীতের তাল্লিন দেখার সৌভাগ্য কজনের হয়? কষ্ট হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বরফ ঘেরা ইয়ট ক্লাব, নির্জন ইয়ট ক্লাব দিন-দুপুরে। অদূরে জাহাজগুলিও নিশ্চল—এমন তাল্লিনকে সচরাচর দেখা যায় না। ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে সোভিয়েট সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ফিরলাম শহরের দিকে। আবার সেই বরফের চড়াই উৎরাই। আবার সেই ক্রেন, তারের বেড়া অতিক্রম। কিন্তু ফিরব কিসে। হোটেল ভিরু-র দূরত্ব কম নয়। একটিও ট্যাক্সি নেই। শহরের এই প্রান্তে বাস চলাচলও খুব কম। কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম বাসস্ট্যাণ্ডে। আপ ডাউন কোনোদিকেই কিছু নেই। আমাদের মত আরও কয়েকজন দাঁড়িয়ে। লিওনার্দোর কথায় আস্তে আস্তে এগোতে লাগলাম। সামনেই আর একটি মোড় আছে ওখানে যদি কিছু মেলে। ঠাণ্ডায় পা দুটো অবশ হয়ে আসছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে আরও খারাপ লাগছে। ওঁরা এধরনের আবহাওয়ায় অভ্যস্ত। জনমানব শূন্য বরফের রাস্তা, বরফের গাছ, বরফের বাড়ির মাঝে লিওনার্দোর কণ্ঠে হঠাৎ বাংলায় রবীন্দ্রসংগীত সব ক্লান্তি, সব অবসন্নতাকে দূরে ঠেলে দিল। নিখুঁত ওয়ার্ডিং, সুরও কাছাকাছি। মস্কো বা লেনিনগ্রাডে ব্যাপারটা হলে অবাক হওয়ার ছিল না। বাঙালী চাকুরে ছাড়াও ছাত্র আছেন কিছু। উপরন্তু ফরেন ল্যাংগোয়েজ ডিপার্টমেণ্টে এদেশী অনেকেই আপনার আমার মতই বাংলা বলেন, লেখেন, গান করেন।

হঠাৎ কটি ট্যাক্সির হদিশ মিলল। অন্যরাও ছুটেছিলেন। কিন্তু লিওনার্দোকে হারানো অসম্ভব ছিল। চলে এলাম হোটেলে। স্নান সেরে আবার বেরোন। লিওনার্দো স্পেশ্যাল লাঞ্চ খাওয়াতে নিয়ে যাবেন। সবচেয়ে সস্তা অথচ এমন ভাল লাঞ্চ নাকি তাল্লিনের কোথাও পাওয়া যায় না। জিজ্ঞাসা করলাম—এ কেমন ব্যাপার। সারা দেশে নাকি সব জিনিসের একই কোয়ালিটি এবং একই রকম দাম? জানি না কোথায় যাচ্ছি। লিওনার্দো মাঝে মাঝে দুটি হিন্দি শব্দ ব্যবহার করছেন—'ঘাবড়াও মাৎ'। এক রাস্তার মোড়ে দেখি প্রায় শখানেক লোকের কিউ। মেয়ে পুরুষ সকলেই দাঁড়িয়ে। কলকাতার মত স্ন্যাক বার এখানেও আছে। লাঞ্চ টাইমে এরা দ্রুত শস্তায় লাঞ্চ প্যাকেট দেন। ইচ্ছে হল দাঁড়াই। কিন্তু ওরা দুজন তীব্র আপত্তি জানালেন। তবে কি সকলের জন্য নয়? লিওনার্দো বললেন, প্রত্যেকে লাঞ্চ প্যাকেট পেতে পারেন। আঙুল তুলে বললেন, ওই যে ওই দেখুন উনি এখানকার মিউনিসিপ্যালিটির চিফ অফিসার। তবে আপত্তি শুধু আপনার ক্ষেত্রে। অতিথি আপনি। অ্যালাউ করি কেমনে! নাছোড়বান্দা দেখে কিউয়ে দাঁড়িয়ে তিনজনে একটি প্যাকেট নিলাম। আশ্চর্য! মনে হবে মস্কো বা লেনিনগ্রাডের কোনো বড় হোটেল থেকে রান্না করে এই স্ন্যাক বারে সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে। হাঁটতে হাটতেই ওটি শেষ হল। এবার ট্রামে উঠলাম। নামলাম রেল স্টেশনের কাছে। লিওনার্দো যে কেমন পরিচিত সকলের আবার বোঝা গেল। রেল ক্যাণ্টিনে প্রচণ্ড ভিড় হয় লাঞ্চ টাইমে। তিনজনের বসার কোনো টেবিল খালি নেই। কোথাও একজনের জায়গা আছে, কোথাও বা দুজনের। কিন্তু ম্যানেজারকে বলে ম্যানেজ করে ফেললেন। মস্কোয়, লেনিনগ্রাডে তবুও মানিয়ে নিয়েছিলাম, কিন্তু লিওনার্দোর পাল্লায় পড়ে কীসব যে খেলাম জানি না। সারাক্ষণ বমি চেপে, দম বন্ধ করে গলাধঃকরণ করেছি। কেবল চিকেন কারি আর আইসক্রিমের সময় ওঁরা আমার মুখে একটু হাসি দেখেছিলেন। কিন্তু যাই খাই না কেন শরীর খারাপ করে না। গলা অবধি খেয়ে কি হাঁটা যায়? লিওনার্দো বললেন, হাঁটুন শরীর গরম থাকবে, ব্যায়াম হবে। তাছাড়া না হাঁটলে শহর চিনবেন

মস্কোর একটি মেট্রো স্টেশনে যাত্রীরা নেমেছেন।

কেমন করে। গাড়ি ঘোড়ায় চড়লে কি মানুষ চেনা যায়? কত জায়গায় কোন্ গলি দিয়ে যে নিয়ে গেলেন বোঝা দুষ্কর। ওর সঙ্গে বেরিয়ে বুঝলাম শহরটা কত পুরনো। কলকাতার বড় বাজারের মত গলি, ঘিঞ্জি এলাকা রয়েছে নানা জায়গায়। কত পুরোন বাড়ি। যেগুলির নাভিঃশ্বাস উঠেছে, সেগুলি না ভেঙে পারছেন না। পুরনো এলাকাগুলির রাস্তা এত ছোট যে দুটি গাড়ি মুখোমুখি এলে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। গলিঘুঁজি দিয়ে আসতে আসতে আরও একটি অভিজ্ঞতা হল। একটি দোকানের সামনে দেখি হঠাৎ এক ভদ্রমহিলা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছেন। দু তিনজন তাঁকে ধরাধরি করে তোলার চেষ্টা করছেন। লিওনার্দো বললেন, সম্ভবত স্ট্রোক হয়েছে। কিন্তু এখনই তো হাসপাতালে পাঠানো দরকার বা ডাক্তার ডাকা উচিত। কথা না শেষ হতেই অ্যাম্বুলেন্স হাজির। মুহূর্তের মধ্যে ওকে নিয়ে গেল। কলকাতায় দমকল এলে সকলে রাস্তা ছেড়ে দেন, এখানে অ্যাম্বুলেন্সেরও তেমনি গুরুত্ব।

লিওনার্দোর একটি নেশা বারে বারে চোখে পড়ল। ওঁর খুব শখ ভোলভো গাড়ির। ওলিম্পিকের জন্য নানা দামের লটারি বেরিয়েছে আধঘণ্টা পরে পরে তার ফল বের হয়। ওর প্রথম পুরস্কার ওই গাড়ি। লটারির টিকিট কিনে আধঘণ্টা পরে সেই কাউন্টারে গিয়ে উনি দেখেন গাড়ি পেলেন কিনা। দ্বিতীয়বার কপাল ঠুকলেন—'আঃ, সামান্যর জন্য পেলাম না। তিনটি টিকিট আগে কাটলেই গাড়ি পেতাম।' আমাদের সঙ্গেই হোটেলে চললেন। আজ এবং আগামীকাল ওঁর ডিউটি আমাদের সঙ্গেই। কিন্তু হোটেলে গিয়ে বিপদে ফেললেন ওঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন স্থানীয় সাংবাদিক। মস্কোয় কথা দিয়ে এসেছিলাম লেনিনগ্রাড, তাল্লিন সফর শেষে ভারতীয় খেলার ডিমনেস্ট্রেশন দেব। এখানে এড়ানো গেল না। হোটেল ভিরু-র ১২ তলায় প্যান্ট কোট পরে কবাডি কিছুটা বোঝাতে পারলেও খো খো কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না। কবাডির ব্যাপারে অবশ্য লিওনার্দো অনেকটা সাহায্য করলেন। বাংলাদেশে তিনি কবাডি দেখেছেন বিভিন্ন জায়গায়।

কলকাতায় খবর পাঠাবার ব্যাপারটা আরমেন আজ লিওনার্দোর উপর ছেড়ে দিলেন। আসলে তাল্লিনে আগে কয়েকবার এলেও আরমেন খুব ওয়াকিবহাল নন। তাড়াতাড়ি ডেসপ্যাচ তৈরী করে তিনজনেই বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে এখানকার জি পি ও-তে। সেখানে কোনো হদিশ মিলল না। ওরা জানালেন, সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসে যান। যা হবার ওখানেই হবে। সেখানেও গিয়ে শুরুতে নিরাশ হতে হল। ওরা জানালেন, ইণ্ডিয়াতে টেলেক্স পাঠাতে হলে মিনিস্ট্রির অনুমতি চাই। লিওনার্দো তাতেও দমলেন না। সি টি ও-র ডিরেক্টরের অফিস থেকে ফোনে মন্ত্রীকে ধরলেন। তিনি অনুমতি দিলেনও মৌখিকভাবে কিন্তু পরে জানা গেল আগস্টে বাল্টিক রেগেটার সময় ইংরাজি টেলেক্স চালু ছিল। কিন্তু এখন বন্ধ। ওলিম্পিকের এক মাস আগে জুনে আবার ইংরাজি টেলেক্স পাওয়া যাবে। ডিরেক্টর চা, বিস্কুট খাইয়ে খুশী করে বললেন, নেক্সট টাইম আসুন বিমুখ করব না।

হোটেলে ফিরে স্নান সেরে ডায়েরি লেখা, তারপর ডিনার। ডিনারের জন্য আরমেন সারা হোটেল চষে ফেললেন। অন্তত গোটাদশেক রেস্তোরাঁ আর বার আছে ভিরু-তে। রয়েছে দুটি নাইট ক্লাব। গোটা তিনেক রেস্তোরাঁ খোলা থাকে রাত তিনটে অবধি। কয়েকবার ওঠা নামা করলাম। সবশেষে গেলাম ২২ তলার উপরের রেস্তোরাঁয়। এখানে নাচ-গানের ঝামেলা নেই, ভিড়টাও কম। ইংরাজিতেও মেনু পেলাম। ট্যুরিস্টদের বোঝার সুবিধার জন্য রুশ, ইংরাজি, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, স্প্যানিশ ও লাতিনে মেনুগুলি ছেপেছেন। আশ্চর্য হতে হয় খাবারের দামে। মস্কোর পিকিং, লেনিনগ্রাডের [illegible] তফাতে কোনো পার্থক্য নেই। আমাদের কলকাতা, দিল্লি, বোম্বাই, মাদ্রাজের দামের ফারাকের কথা নাইবা বললাম। কলকাতায় যে গোটাচারেক বড় হোটেল আছে তার একটির' সঙ্গে আরেকটির কোয়ালিটি ও দামের মিল পাওয়া যায়? তাইবা কেন, একই ওষুধ সাবান, টুথপেস্ট, পাউডার কলকাতায় বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন দাম। রাজ্যে রাজ্যে তো কত বেশীকম। দাম অবশ্য ছাপা থাকে একটিই। কিন্তু প্লাস এক্সট্রা লোকাল ট্যাক্সে আপনার আমার পকেট কাটা যায়। মনে হয় দশজন ইন্দিরা গান্ধী বা কুড়িজন জ্যোতি বসুও এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারবেন না।

গতকাল লক্ষ করিনি। আজ রিসেপশন কাউণ্টারে দেখি নানা দেশের পতাকা ওখানে। গুণলাম—মোট ১৪টি দেশের জাতীয় পতাকা। অষ্টম স্থানে আমাদের তিনরঙা জাতীয় পতাকা। এশিয়ার আর কোনো দেশের পতাকা নেই। বড় ভাল লাগল, মনে মনে গর্ব বোধ করছিলাম। লিওনার্দো ব্যঙ্গ করে বললেন, ওরা বুঝেছে একজন ইণ্ডিয়ান এখানে আছেন, তাই হয়তো টাঙিয়েছেন।

ব্রেকফাস্টের পর আজ প্রথম অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট তাল্লিন ওলিম্পিক কমিটির ডেপুটি প্রেস চিফ গানারে পল-এর সঙ্গে। পল-এর বয়স ৩৫। দারুণ চটপটে লোক। ছিপছিপে চেহারা। রুশ বলেই মনে হয় না। নিজের বিভাগের কাজকর্ম সম্পর্কে জানাতে বেশ আগ্রহী। বাল্টিক রেগেটায় ২৭টি দেশের ৪৬৭ জন প্রতিযোগী এসেছিলেন। ওই সময়েই প্রেস সেণ্টারের কাজকর্ম পরীক্ষা হয়ে গেছে। ওলিম্পিক নিয়ে ওরা তাই খুব ভাবছেন না। পল-এর ধারণা এবারের ওলিম্পিক রেগেটায় রেকর্ডসংখ্যক দেশ ও প্রতিযোগী আসবেন। অন্তত ৫০টি দেশ আসবে। ওঁর দৃঢ় বিশ্বাস, কোনো ওলিম্পিকেই রেগেটা প্রেস সেণ্টার আমাদের মত এত ভাল হয়নি। 'বেস্ট ইন দ্য হিস্টরি অফ ওলিম্পিক গেমস।'

হিসাব কষে জানালেন, রেগেটায় খেলোয়াড় ও কর্মকর্তা আসবেন ৬০০, সাংবাদিক ৩০০, আই ও সি ও অন্যান্য গেস্ট ৫০০ এবং ট্যুরিস্ট ১০ হাজার। সবকিছুর জন্য ডিসেম্বরের আগে ড্রেস রিহারসাল হয়ে গেছে। রেগেটার জন্য টিভি ও রেডিও সেণ্টার বিশেষ ব্যবস্থা করেছে। এখান থেকেও সরাসরি টিভি রিলে করা যাবে বিশ্বময়। প্রেস সেণ্টার থেকে খবরও যাবে মস্কোর মতই। বাল্টিক বিচে আলাদা কমপ্লেক্স হয়েছে, হয়েছে নতুন সুপার মার্কেট, নতুন রাস্তা, দুটি ব্রিজ, একাধিক ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর, হোটেল, পোস্ট অফিস ইত্যাদিও।

ওলিম্পিক শেষে অ্যাস্তোনিয়ার স্পোর্টসম্যানদের হাতে সবকিছু সমর্পণ করা হবে।

আমাদের কথার মাঝে একটি টেলিফোন এল। টেলিফোন রেখে পল জানালেন, স্থানীয় রেডিওর দুই প্রতিনিধি আসছেন, তারা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়। ইয়াটিং নিয়ে আরও আলোচনা হল। ইয়াটিং কীভাবে জনপ্রিয় হচ্ছে ক্রমশ। এই ক্লাবে সুযোগ সুবিধা বাড়ানো হলেও যে তা সদস্য সংখ্যার তুলনায় যথেষ্ট নয়। বোম্বাইয়ে ইয়াটিং কেমন চলছে জানতে চাইলেন।

বিপদে পড়লাম রেডিওর ওরা আসায়। শুরুতেই প্রশ্ন ধ্যানচাঁদের ছেলে অশোককুমার কেমন খেলছেন। ওরা ভারতীয় হকি দলের নামও জানালেন যাঁরা মস্কো ওলিম্পিকে খেলবেন। তাতেও অশোককুমার রয়েছেন। ব্যাপারটা নিয়ে আমতা আমতা করা ছাড়া উপায় ছিল না। কেননা ডিসেম্বরে তো ঠিকই ছিল না ভারত চূড়ান্ত পর্বে খেলতে পারবে কিনা। ভাবছিলাম কারা এই তালিকা পাঠালেন। অনেকটা রাম না হতেই রামায়ণের মত। জিজ্ঞাসা করলেন, আর কোন্ ইভেণ্টে কতজন অংশ নেবেন ইত্যাদি। এরপর এঁরাও এলেন আমাদের লোকসভার নির্বাচন প্রসঙ্গে। এড়িয়ে যেতে চাইলাম খেলার রিপোর্টার বলে। কিন্তু দেখলাম ওঁরা আমাদের নাড়ী নক্ষত্র জানেন। স্পোর্টস রিপোর্টিং-এর আগে কোন্ কাগজে কতদিন অন্য রিপোর্টিং করতাম ইত্যাদি। আরও কয়েকটি প্রশ্ন অবাক করে দিল। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রণ্ট কেমন করবে নির্বাচনে। আপনি তো প্রগ্রেস এরিয়ায় থাকেন, ওখানে কেমন হবে? শুরুতে প্রশ্নটা বুঝিনি। তারপর ব্যাখ্যা করায় বুঝলাম—আমাদের যাদবপুরে কমিউনিস্ট সমর্থক বেশী। কমিউনিস্ট মানে প্রগ্রেস।

রেডিও ইণ্টারভিউ শেষে বেরিয়ে পড়লাম আর একটি অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রক্ষা করতে। ইনি মাটি মার্ক—তাল্লিন ওলিম্পিক কমিটির আর এক প্রধান। মাটি মার্কের এই অফিসেই ১৯৭৫-এ ওলিম্পিক রেগেটার কাজ শুরু হয়। তাঁকে নিয়ে তখন কর্মী ছিলেন মাত্র ৩ জন। তারপর ৮ ও ১১। ১৯৭৯-র ১ জানুয়ারি কর্মীর সংখ্যা বেড়ে হয় ১০০। এখন প্রায় ২০০। এরা সকলেই ফুল টাইম ওয়ার্কার। কিছু একেবারে নতুন চাকুরে। বাকিরা অন্য চাকরি ছেড়ে ওলিম্পিকের কাজে এসেছেন। সরকার পৃথক ওলিম্পিক অ্যাক্ট অনুযায়ী চাকরি দিয়েছেন ওলিম্পিক দফতরে। ওলিম্পিকের সময় কর্মী লাগবে অন্তত ১ হাজার। ওলিম্পিকের পরে কিন্তু এঁরা বেকার হবেন না। বিভিন্ন অফিসে নিয়োগ করা হবে যোগ্যতা ও কার্যধারা অনুযায়ী।

মাটি জানালেন, রেগেটার প্রতিযোগীরা উনিশ জুলাইয়ের আগে এখানে আসবেন। কিন্তু মস্কোয় লেনিন স্টেডিয়ামে ১৯ তারিখে উদ্বোধন অনুষ্ঠানের মার্চ পাস্টে সকলকে অংশ নিতে হবে, তাই ওইদিন সকালেই বিমানে সকল প্রতিযোগীকে মস্কো নিয়ে যাওয়া হবে। পরদিন ওরা তাল্লিনে ফিরে আসবেন। এ সব ব্যবস্থা, খরচ উদ্যোক্তাদের। তাল্লিনে প্রতিযোগিতা আরম্ভ ২০ তারিখ বিকালে।

মাটি-র কাছে জিজ্ঞাসার তেমন কিছু ছিল না। প্রতিযোগিতার নৌকাগুলি সম্পর্কে জানালেন, এই প্রথম প্রত্যেক প্রতিযোগীকে নৌকা ও আনুষাঙ্গিক সব সরঞ্জাম সরবরাহ করবে উদ্যোক্তারা। অতীতের কোনো ওলিম্পিকে এ নজীর নেই। তবে প্রতিযোগীরা ইচ্ছা করলে নৌকা নিয়েও আসতে পারেন।

কালকের মত আজও লাঞ্চ খেতে চলেছি বেল ক্যানটিনে। লাঞ্চের পর আজ একটু বেড়ানো, কয়েকটি জায়গা দেখতে হবে। লেনিনগ্রাডের মত এখানেও ঝটিকা সফর। শুরুতে গেলাম ১৮৬৯ সালে যেখানে প্রথম এস্তোনিয়ান সংগীত সম্মেলন হয়েছিল। ৭০০ শিল্পী সেই উৎসবে অংশ নেন। তার ১০০ বছর পরে ১৯৬৯ সালে শতবার্ষিকী সংগীত সম্মেলনে অংশ নেন তিরিশ হাজার শিল্পী, শ্রোতা ছিলেন ২ লক্ষ। বিরাট খোলা মাঠ। একদিকে মঞ্চের মত করা, ছোট একটি টাওয়ারও রয়েছে। সঙ্গীত সম্মেলনের সময় ওলিম্পিকের মত ওই টাওয়ারে মশাল জ্বালিয়ে রাখা হয়। পিটার দা গ্রেট স্থাপিত কাডির্য়র্গ পার্কে এস্তোনিয়ান আর্ট মিউজিয়মে আপনাকে যেতেই হবে। প্রাচীন এস্তোনিয়াকে জানতে হলে যেতে হবে ওপেন এয়ার মিউজিয়াম অফ রোক্কা আল মারে-তে। অতুলনীয় পাইন গাছের বন পেরিয়ে পিরিতা সমুদ্রসৈকত। গ্রীষ্মে সারা পৃথিবী থেকে অসংখ্য মানুষ আসেন এর বালুময় বিচে রোদ্দুর উপভোগ করতে। আমাদের দীঘা, পুরীকে এর সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়। পুরীর সঙ্গে একটিই মিল পাবেন। পুরীর অদূরে দেখা যায় প্রতি সকালে অসংখ্য ধীবর মাছ ধরতে চলেছেন, পিরিতায় সারাদিন ধরে দেখবেন শয়ে শয়ে নৌকো চলেছে ট্যুরিস্টদের নিয়ে সমুদ্রকে উপভোগ করাতে।

বেড়ানো সেরে চলে এলাম বক্সিং জিমন্যাসিয়ামে। কলকাতায় সারা বছরের জন্য চালু বক্সিং রিং বলতে বুঝি ওয়েলিংটনের এস ও পি সি। কিন্তু এখানকার কুদেদের জন্য বক্সিং জিমনাসিয়াম দেখলে মাথা ঘুরে যায়। লিওনার্দোর আগ্রহে ওখানে গেলাম। ওর এগার বছরের ছেলে এই রিপাবলিকের আন্তস্কুল চ্যাম্পিয়ন। তাছাড়া এই জিমন্যাসিয়ামটি স্কুল ছাত্রদের জন্যই নির্দিষ্ট। হলের মধ্যে আটটি

রিং। এদিক ওদিক ওয়েট ট্রেনিং-এর নানা বন্দোবস্ত। ক্লাই প্র্যাকটিস চলছে আলাদা হাঁট রিং-এ। সব মিলিয়ে হই চই ব্যাপার। সব সময়ের জন্য ডাক্তার রয়েছেন দুজন—আঘাত লাগলে চিকিৎসার জন্য। প্রতিটি ছেলের জন্য প্রতিদিনের পৃথক পৃথক চার্ট, আলাদা আলাদা খাদ্য তালিকাও।

৪৫ মিনিট এখানে কাটিয়ে দ্রুত চললাম তালিনের এ পি এন হেডকোয়ার্টার্সে। তখন অফিস ছুটি হয়ে গেছে। লিওনার্দোই দরজা খুললেন। খবর পেয়ে এলেন এ পি এন-এর ব্যুরো চিফ কার্ল হেলেমে। এলেন এদের আরও দুজন সংবাদ-দাতা। মোট ছজনকে নিয়ে টি পার্টি। লিওনার্দোই চা বানিয়ে পরিবেশন করলেন। সুবিধা হল আরমেনের। এ পি এন মস্কোর সঙ্গে এখান থেকে হটলাইন রয়েছে। উনি জানালেন কাল ভোরেই আমরা মস্কো পৌঁছচ্ছি। জেনে নিলেন কোথায় কি প্রোগ্রাম রয়েছে। একটি সুখবর দিলেন। আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, সোভিয়েট সরকার আপনার মস্কো ভ্রমণ দুদিন বাড়িয়ে দিয়েছেন। আরমেন যখন ফোন করছেন, তখনই লিওনার্দোর একটি ফোন এল তাঁর বাড়ি থেকে। ওর মেয়ে জিজ্ঞাসা করছে, ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্ট অঙ্কেল কোথায়। ওর স্কুলের শিক্ষিকারা খুঁজছেন। লিওনার্দোর মেয়ে আজ ওর স্কুলের উৎসবে শাড়ি-ব্লাউজ আর আমার দেওয়া বাঁশের চুড়ি ও হেয়ারক্লিপ পরে গিয়েছিল। শিক্ষিকারা চুড়ি আর হেয়ারক্লিপ কিনতে চান। অনুরোধ কলকাতায় ফিরে যেন কিছু পাঠাই।

বিদেশে আমাদের রু-সিল্কের কদর খুব। কয়েকটি দেশে সোনার অলঙ্কার বেশ আদৃত। কিন্তু কমদামী হ্যাণ্ডিক্রাফটসেরও বোধ হয় খুব চাহিদা রয়েছে। অন্তত সোভিয়েট দেশে এসে তাই মনে হল।

এ পি এন অফিস থেকে সোজা হোটেলে। সঙ্গে এলেন লিওনার্দো। দুত ছবিগুলোর ক্যাপসান করে দিলেন। ধন্যবাদ জানিয়ে ভারাক্রান্ত মনে চলে গেলেন। আমরাও দ্রুত গুছিয়ে নিলাম। রাতের ট্রেনেই মস্কো রওনা হতে হবে। ইনটুরিস্টে গিয়ে পাসপোর্ট সংগ্রহ, সইসাবুদ করে ট্যাক্সি ধরলাম। বড় খারাপ লাগছিল হই চই করা মানুষটি লিওনার্দোর জন্যে। অমন সঙ্গী থাকলে সব সময় সজীব থাকা যায়। দুদিনের জন্য তালিনে এসে এই শহরটিকেও ভালোবেসে ফেলেছিলাম। জানি না আর কোনোদিন এখানে আসার সৌভাগ্য হবে কিনা। নাই বা এলাম, কয়েকটি কথা কোনোদিন ভুলব না—

'তাল্লিন ইজ এ ব্রেন্ড ব্রিদ অব দ্য সি। তালিন ইজ এ পোয়েটিকাল কালেকশন অফ টাইল্ড রুফস। তাল্লিন ইজ এ ম্যাজিক কিংডম অফ হোয়াইট নাইটস।'

তালিন রেল স্টেশনে একটি অভিজ্ঞতা হল। ১৮০ রুবলের বদলে ডলার পাওয়া যায় ৬৪টি। কিন্তু ডলারের কদর এখানে সম্ভবত বেশ। আরমেন গেছেন রাতের জন্য কিছু স্ন্যাকস আনতে। দুটি মেয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন ভাঙা ইংরাজিতে— আমি বিদেশী কিনা। বিদেশী, ভারতীয় শুনে ওরা চলে গেলেন। এরপর আর দুজন এসে জিজ্ঞাসা করলেন আমার কাছে ডলার আছে কিনা। না, ডলার কোথায় পাব। আমি আপনাদের গেস্ট। এবার অন্য একজন বললেন, ওলিম্পিক কয়েন দেখিয়ে, ডলার দিলে এই কয়েন দিতে পারি। খুব কাছে এসে গোপনে ওরা এসব করছিলেন। ঠিক চৌরঙ্গীতে যেমন কানে কানে এসে বলে—বিদেশী সেন্ট, কলম আছে নেবেন নাকি? তবে চৌরঙ্গীর এদের সঙ্গে বোধ হয় কিছুটা পার্থক্য আছে। কয়েকটি আমাদের দশ পয়সা, পঁচিশ পয়সা ও পঞ্চাশ পয়সা দিলাম। লজ্জা পেয়ে কিনা জানি না ওঁরা দিলেন একটি ওলিম্পিক কয়েন।

ট্রেনে আজও দুই সিটের কুপ পেয়ে গেলাম। আরমেন বললেন, বেশী রাত করার দরকার নেই। ডায়েরি লিখে ঘুমিয়ে পড়ুন। সকালে মস্কো পৌঁছব। হোটেলে যাওয়ার আগেই হয় তো আমাদের প্রোগ্রাম শুরু হবে।

মেয়েদের রিলে দৌড়ে ব্যাটন বদলের মুহূর্ত

নব সুইমিং পুল 'ওলিম্পিক চাকা'

আজ একুশে ডিসেম্বর। শুনেই তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠলাম। স্নান ছাড়া সব কিছুই ট্রেনে সারতে হল। ট্রেন থেকে নেমে একটুও সময় থাকবে না—জানালেন আরমেন। তাড়াতাড়ি ওঠায় রুশ দেশের [illegible] দেখার সুযোগ হল। আবহাওয়া বেশ [illegible]। জানালার পর্দা তুলে দিয়ে দেখছি। মস্কো পৌঁছতে এখন প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার। কিন্তু তার আগেই ট্রেনটা মস্কো শহরে ঢুকে গেছে। কলকারখানারও ভিড় ওখানে। শহরে আগে অনেক কলকারখানা ছিল। কিন্তু আবাসন থেকে কলকারখানা দূরে সরানো হচ্ছে এখন—পরিবেশ যাতে দূষিত না হয়। এখান থেকে মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং শুরু হয়ে। ওদের ভাষায় এগুলো এক একটি ডিস্ট্রিক্ট। এক বা দুই কিলোমিটার গেলে আবার এ রকম একটি ডিস্ট্রিক্ট। সেখানে বাজার, স্কুল, হাসপাতাল সবই আছে।

মস্কোয় পৌঁছবার সময় নটা দশ মিনিটে। আমাদের তো এখন প্লেনও সময় মত ছাড়ে না বা পৌঁছয় না। এখানে কিন্তু ট্রেনেও অমনটি হয় না। ঠিক নটা দশ মিনিটে মস্কো স্টেশনে ট্রেন থামল।

প্ল্যাটফরমের গায়েই গাড়ি দাঁড়িয়েছিল আমাদের জন্য। স্টেশন থেকে সোজা চললাম পুশকিন স্কোয়ারে এ পি এন অফিসে। আরমেন বললেন, কিছু প্রাপ্তিযোগ আছে আপনার। এই কদিন রেডিও, টিভি-র আয়ে তো বেশ ছিলাম। তা ছাড়া যাতায়াত, খাওয়া সবই এদের। খরচ বলতে নিজের জন্য কিছু কিনলে। আজ এ পি এন-এর একটি লেখার জন্য সাড়ে তেতাল্লিশ রুবল পেলাম। পেলাম একটি ওলিম্পিক কয়েন—একটি রুবল। তবে টাকা-পয়সার ব্যাপারে আমাদের অফিসের মহীমবাবুর সঙ্গে এখানকার এ পি এন-এর মহিলা ক্যাশিয়ারের তুলনা করা যায়। আমার মুখটা দেখে, ভারতীয় কিনা (হিন্দি কথা শুনে) পরীক্ষা করে তবে রুবল-গুলি দিলেন।

এবার আমাদের গন্তব্যস্থল সোভিয়েট তথা বিশ্বের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক খেলার পত্রিকার অফিস। এর আগে 'প্রাভদা' অফিস দেখেছি। দেখেছি ট্রেড ইউনিয়নের পত্রিকা ত্রুদ-এর অফিস। ত্রুদ সম্পর্কে সংক্ষেপে জানাই—একটি রাস্তার মোড়ে ওর বিরাট বাড়ি। ওখানে কিছুদিন ধরে ট্রাফিক জ্যাম হচ্ছিল। দুশ-তিনশ মিটার জায়গা চাই জ্যাম কমাতে। তবে তার জন্য বাড়িটি ভাঙতে হবে। এঞ্জিনিয়াররা বললেন ত্রুদ-এর বাড়ি ভাঙতে হবে। স্থপতিরা জানালেন, ভেঙে রাস্তার জন্য তিনশ মিটার জায়গা দিয়ে এবং নতুন বাড়ি করতে ছমাস লাগবে। ত্রুদ কর্তৃপক্ষ বললেন, তা হতে পারে না। অতদিন কাগজ বন্ধ রাখা অসম্ভব। কাগজ খুব বেশী হলে এক সপ্তাহ বন্ধ থাকতে পারে। এঞ্জিনিয়াররা এরপর বললেন, তাই-ই হবে। ত্রুদ-এর বাড়ি ভাঙা হয়নি। তিনদিন ধরে বাড়িটিকে তিনশ মিটার দূরে সরিয়ে নেওয়া হয়। ওই তিন দিন অবশ্য কাগজ বের হয়নি। বাড়ির ভেতরে কাউকে ঢুকতেও দেওয়া হয়নি। তিনদিন টেলি-ভিশনে সারা দেশকে দেখানো হয় কিভাবে ত্রুদ-এর বাড়িটি আস্তে আস্তে সরে গিয়ে ট্রাফিকের জন্য জায়গা করে দিচ্ছে।

ধারণা ছিল এদেশে খবরের কাগজ বলতে ওই প্রাভদা আর ইজভেস্তিয়া। আর কোনো পত্র-পত্রিকা এদের নেই। এই কদিনেই সে ভুল ভেঙে গেছে। কত দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক আর মাসিক পত্রিকা আছে কে জানে।

প্রাভদা বেরোয় ভোরবেলা। ছয় পৃষ্ঠার কাগজ। একটি লাইনও বিজ্ঞাপন থাকে না। দাম তিন কোপেক। প্রচার সংখ্যা এক কোটি দশ লক্ষ। 'ইজভেস্তিয়া' বিকালে বেরোয়। প্রচার সংখ্যা এক কোটি দশ লক্ষ। ছয় পৃষ্ঠা। দাম তিন কোপেক। সার্কুলেশন সব চেয়ে বেশী ত্রুদ-এর। চার পৃষ্ঠার কাগজ। দাম দুই কোপেক। বিক্রি প্রতিদিন এক কোটি কুড়ি লক্ষ। সবগুলিই আধুনিকতম ফোটো অফসেটে ছাপা। অনেকেরই জানা প্রাভদা আর ইজভেস্তিয়ার একটি পার্টির মুখপত্র, অন্যটি সরকারী মুখপত্র। আর ত্রুদ তো ট্রেড ইউনিয়নের কাগজ। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার পার্টি সরকার ও ট্রেড ইউনিয়নের কাগজেও খেলার গুরুত্বটা কোনো অংশে কম নয়। মাঝে মাঝে মনে হবে এগুলি বুঝি খেলার পত্রিকা। টেস্ট ক্রিকেট বা ফুটবলের বড় খেলা থাকলে আমরা আনন্দবাজারে যা করি, ঠিক তেমনি অবস্থা। ওলিম্পিকের খবর তো গত চার বছর ধরেই প্রতিদিন বড় বড় করে দিয়ে চলেছে। রোজ সাধারণত আটভাগ জুড়ে খেলার খবর থাকে।

এই সব কাগজ যখন এই করছে খেলার পত্রিকা তা হলে কেমন? খেলার দৈনিক সোভেৎস্কি স্পোর্ট-এর দফতরে পৌঁছে মাথা ঘুরে গেল। আমার মত সাধারণ একজন রিপোর্টারের জন্য ওদের আগ্রহ দেখে অবাক হলাম। এডিটর ইন চিফ নিকোলাই কিসেলেভ সকাল থেকেই তাঁর ইন্টারন্যাশানাল ডেস্কের ভারত বিশেষজ্ঞকে নিয়ে অপেক্ষা করছেন। বলা বাহুল্য তিনি বছর পঁচিশেকের এক তরুণী। চমৎকার ইংরাজি জানেন। আমাদের দেশের খেলা-ধুলা তাঁর নখদর্পণে।

কিসেলেভ-এর কাছে তাঁর কাগজ সম্পর্কে নানা তথ্য জানলাম। ১৯২৪ সালের জুলাইয়ে সোভেৎস্কি স্পোর্ট প্রথম বের হয় তখন ছিল সাপ্তাহিক। রোটারিতে ছাপা হত। হ্যান্ড টাইপে কম্পোজ হত। এখন সোভিয়েটের ৩৪টি শহর থেকে একই খবরের এই পত্রিকাটি বের হয় প্রতিদিন সকালে। আমাদের আনন্দবাজারের সাইজ। তবে মাত্র চার পৃষ্ঠা। একটিও বিজ্ঞাপন থাকে না। দাম দুই কোপেক। গড় সার্কুলেশন পঞ্চাশ লক্ষ চল্লিশ হাজার। সব রকম খেলার খবর থাকে দেশ-বিদেশের। বের হয় বিভিন্ন শহর থেকে এদেশের বিভিন্ন রিপাবলিকের (অর্থাৎ স্থানীয়) ভাষায়। মস্কো থেকেই চৌদ্দটি শহরে প্লেটগুলি যায়। পঁচিশটি শহরে যায় ফোটো ট্রান্সমিশনে। নয়টি শহরে যায় ম্যাট—প্লেনে। মস্কোর হেড কোয়ার্টার্সে ফোটোগ্রাফার সহ সাংবাদিক দেড়শ জন। এবং এদের মধ্যে মেয়ের সংখ্যা প্রায় অর্ধেক। এডিটর-ইন-চিফ কিসেলেভের ঘরে বিরাট কনফারেন্স টেবলে কথা হচ্ছিল। এক কোণায় তাঁর টেবলে ছোট একটি বাক্সের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছিলাম। পরে জানলাম তেত্রিশটি শহরের ব্যুরো চিফদের সঙ্গে যোগাযোগের যন্ত্র ওটি। এক থেকে তেত্রিশ নম্বর রয়েছে। নব টিপেই উনি কানেকশন পেয়ে যান। তারপর প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলেন। তাসখন্দ, ভ্লাডিভোস্টক প্রভৃতি শহরের ব্যুরো চিফদের ডেকে তাঁদের সঙ্গে আলাপও করিয়ে দিলেন। ভাবছিলাম নাইট ডিউটিতেও আমরা ফায়ার ব্রিগেড, লালবাজার কন্ট্রোল পেতেই কেমন গলদঘর্ম হই।

বিজ্ঞাপন ছাড়াই আপনাদের কাগজ চলে? লোকসান হয় না? —না, লোকসান হবে কেন? চিফ অ্যাকাউন্টান্টকে ডেকে হিসাব নিয়ে বললেন, প্রতি বছর আমাদের লাভ আট মিলিয়ন রুবল। কিসেলেভ গর্ব করে বললেন, পৃথিবীতে এত সস্তায় আর কোনো ক্রীড়া দৈনিক পাবেন না।

বিজ্ঞাপন নেন না, না—পান না? বললেন, মফস্বলের কাগজে বিজ্ঞাপন থাকে। কেন না প্রচার সংখ্যা এত নয়। তবে কোনো বড় কাগজেই বিজ্ঞাপন থাকে না। প্রথমত তাদের বেশ লাভ হয়। দ্বিতীয়ত আমাদের সমাজব্যবস্থায় বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটিকে তেমন উৎসাহ দেওয়া হয় না। উদাহরণ দিলেন—ধরুন, আপনাদের দেশে চারটি কোম্পানী গায়ে মাখার জন্য চার রকমের সাবান বের করল। প্রত্যেকেই বিজ্ঞাপন দিল 'আমারটাই সবার সেরা।' সেরা যা সবার সেরা তো একটিই হয়। চারটি হতে পারে? অর্থাৎ জনসাধারণকে ওরা ঠকাচ্ছেন।

ক্রীড়া সাংবাদিকদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে—ডাইনে 'সোভেৎস্কি স্পোর্ট'-এর প্রধান সম্পাদক নিকোলাই কিসেলেভ।

আমাদের তো সবই রাষ্ট্রায়ত্ত, এখানে ওই ধরনের সুযোগ নেই। তবে, কোনো নতুন জিনিস বেরোলে জানিয়ে দেওয়া হয় তার দাম, গুণাবলী ইত্যাদি। যার যেমন পছন্দ, তিনি তেমনটি কেনেন।

এদের খবরের কাগজের কম দাম হওয়ার আর একটি কারণ সস্তার নিউজ প্রিন্ট। আমরা আমদানি করি অনেক দামে। এরা নিজেদের তৈরী নিউজ প্রিন্ট ব্যবহার করে তো বটেই, রপ্তানিও করে প্রচুর। প্রতি টন সোভিয়েট নিউজ প্রিন্টের দাম এখন একশ সত্তর রুবল। ওদের দেশের অরে একশ সত্তর টাকা। ভারতীয় মুদ্রায় হিসাব করলে এক টনের দাম পড়ে দু হাজার চল্লিশ টাকা। অভাবনীয়।

চৌত্রিশটি প্রধান শহর থেকে এই কাগজটি বের হলেও বিভিন্ন শহরে একাধিক খেলার সাপ্তাহিক, পাক্ষিক রয়েছে স্থানীয় ভাষায়। স্থানীয় সাধারণ দৈনিক পত্রিকাতেও খেলার খবরের গুরুত্ব সর্বাধিক। দাবার একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সার্কুলেশন লক্ষাধিক। খেলাধুলার যে ছত্রিশটি পত্র-পত্রিকা রয়েছে সারা দেশে, তার আটাশটি বের হয় বিভিন্ন রিপাবলিক থেকে। খেলাধুলা নিয়ে প্রতি বছর যে সব বই বের হয় তার প্রচার সংখ্যা প্রায় এক কোটি। এর থেকে বোঝা যায় জনসাধারণ খেলাধুলায় কত আগ্রহী। দৈনিক সোভেৎস্কি স্পোর্ট কর্তৃপক্ষ প্রতি সপ্তাহে দুটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। একটি দাবা নিয়ে, অন্যটি ফুটবল ও হকি সম্পর্কে। বিদেশের খেলাধুলা সংক্রান্ত একটি পাক্ষিক পত্রিকাও বের হয় এই দফতর থেকে।

স্পোর্ট অ্যান্ড ফিজিকাল কালচার নামে আর একটি পত্রিকার সার্কুলেশন প্রায় পাঁচ লক্ষ। আলাদা পত্রিকা আছে অ্যাথলেটিক্সের এবং স্পোর্টস সায়েন্সেরও।

আপনাদের দেশে খেলাধুলার উন্নয়নে পত্র-পত্রিকাগুলি কি কি করে? একে একে বললেন, কিসেলেভ: প্রাভদা প্রতি বছর ক্রস কান্ট্রি দৌড়ের আয়োজন করে সারা দেশ জুড়ে। হাজার হাজার প্রতিযোগী এতে অংশ নেন। আইস হকির একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা করে ইজভেস্তিয়া। জিমন্যাস্টিকস ও ফিগার স্কেটিং এর প্রতিযোগিতা হয় মস্কো নিউজ-এর পৃষ্ঠপোষকতায়। আন্তর্জাতিক একটি সাঁতারের আয়োজক প্রতি বছর কমসোমল-স্কায়া প্রাভদা। এবার স্কেটিং প্রতিযোগিতায় ছেলেমেয়ে ছিল সাতচল্লিশ হাজার। এরা সকলেই সাত থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের। যারা ভাল করে— তাদের পাঠানো হয় স্পোর্টস স্কুলে উচ্চতর ট্রেনিং এর জন্য। মস্কোর যে সাতাশটি রিংক আছে, তা দ্বিগুণ করা হচ্ছে। কম বয়সীদের এই প্রতি-যোগিতাটি করে সোভেৎস্কি স্পোর্ট। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল স্কেটিং এর উন্নতি করা। কিন্তু সারা দেশ থেকে এত ছেলেমেয়ে আসা শুরু করেছে যে মূল অবস্থা হয়েছিল যে পরপর পাঁচটি রবিবারে এমন অবস্থা হয়েছিল যে পরপর পাঁচটি রবিবারে শুধু ট্রায়াল করতে হয়েছে। হয়েছে কোয়ালিফাইং টুর্নামেন্ট। মূল প্রতিযোগিতা হয় মস্কোয়। প্রতিযোগীদের যাতায়াত খাওয়া থাকার ব্যবস্থা সবই করে এই পত্রিকা। কিন্তু ক্রমশ প্রতিযোগিতার আকার বাড়ছে, তাই পত্রিকা কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের মতামত চেয়েছেন কীভাবে বৃহদাকারজনিত সমস্যার সমাধান করা যায়। সোভেৎস্কি স্পোর্ট-এ জগিং-এর উপর নিয়মিত একটি কলাম বের হয়। জগিংকে হৃদরোগের নিস্ক্রিয়াকরণী বলে এঁরা অভিহিত করেন। প্রতি বছর মে মাসের প্রথম রবিবারে সারা দেশে দৌড় দিবস উদ্‌যাপিত হয় এই পত্রিকার উদ্যোগে। ম্যারাথন এবং দূরপাল্লার নানা দূরত্বের দৌড়েরও আয়োজন করেন।

ইন্টারন্যাশনাল ডেস্কের রিপোর্টার তরুণীটি জিজ্ঞাসা করলেন, ভারতের পত্রপত্রিকাগুলির অবদান কেমন খেলার জন্য। বললাম, ভারতে বেসরকারী

Советский
СПОРТ
ШУМЯТ СНЕЖНЫЕ КАРУСЕЛИ
А ПОЛЯНЕ
ВСЕМ ВОЗРАСТАМ ПОКОРНЫ

বিশ্বের সর্বাধিক প্রচারিত ক্রীড়া দৈনিক সোভেৎস্কি স্পোর্ট-এর প্রথম পৃষ্ঠা।

পর্বত অভিযানে আনন্দবাজার পত্রিকার অবদানের কথা। এ ছাড়া নানা অভিযান ও প্রতিযোগিতায় আর্থিক অনুদান দিয়ে কীভাবে সাহায্য করা হয়। টাইমস অফ ইন্ডিয়া এবং আরও কারা কীভাবে নানা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

আগেই বলেছি, সোভেৎস্কি স্পোর্ট-এর সম্পাদকীয় দফতরে কর্মী এখন দেড়শ জন। কিসেলেভের চিন্তা ওলিম্পিক্স নিয়ে। এত বড় যজ্ঞে এই স্টাফ দ্বারা তিনি সামলাতে পারবেন কিনা। এদেশের টিভির বিভিন্ন প্যানেলে প্রতিদিন দীর্ঘক্ষণ ধরে খেলার অনুষ্ঠান (প্রতিযোগিতা, ট্রেনিং, কৃতী-দের সংগে সাক্ষাৎকার, তাদের জীবনযাত্রা ইত্যাদি) হলেও রেডিওয় কয়েক ঘন্টা খেলার প্রোগ্রাম থাকলেও কোনো খেলার পত্রিকার চাহিদা কমে না। বরং চাহিদা বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন শহরে দেখলামও সকালে আধঘন্টা দেরীতে নিউজ স্ট্যান্ডে গেলে সোভেৎস্কি স্পোর্ট আর পাবেন না। ভোরে উঠে লাইন দিতে হয়। তাও আবার কোনো কোনো জায়গায় মাথাপিছু এক কপির বেশী কাউকে বিক্রি করা হয় না।

বড় ভাল লাগল। কমসোমলস্কায়া প্রাভদা-র একটি ক্রীড়া আন্দোলন। এটির সৃষ্টি অবশ্য এক-চল্লিশ বছর আগে কিন্তু শ্রম ও প্রতিরক্ষার প্রস্তুতিতে দশ থেকে তের, চৌদ্দ থেকে পনের, ষোল থেকে আঠার, উনিশ থেকে উনচল্লিশ এবং চল্লিশ থেকে ষাট বছরের নারীপুরুষ নির্বিশেষে (সংক্ষেপে জি টি ও) অংশ নেন এদের আয়োজিত ক্রীড়া-সূচীতে। সোভিয়েট জনগণের সুস্বাস্থ্যের জন্য এতে নানা খেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আরেকটি আন্দোলনের নাম—কাজের জায়গায় জিমন্যাস্টিকস। সকালে ও বিকেলে স্কুলে হোক, কারখানায় হোক, অফিসে হোক—পাঁচ মিনিটের জন্য এরা দেশব্যাপী কয়েকটি সহজ ব্যয়াম চালু করেছেন। কোথাও কোথাও একে পাঁচ মিনিটের ব্যায়াম বলা হয়। ক্লান্তি দূর করতে এর জুড়ি নেই এদেশে।

ভেবেছিলাম, আমাদের হকি ছাড়া আর কোনো খবর এঁরা রাখেন না। কিন্তু প্রকাশ পাড়ুকোনের খুঁটিনাটি এঁরা জানেন। অমৃতরাজদের বেশ পরিচিত। ক্রিকেটের প্রচলন না থাকলেও পতৌদি, গাভাসকরকে ভালভাবে চেনেন। মানেন পতৌদি স্পোর্টওয়ার্ল্ড পত্রিকার সম্পাদক। ভারতীয় খেলা খো-খো, কবাডি সম্পর্কেও ওদের আগ্রহ কম নয়। খেলাধুলার আলোচনা করছিলাম সাংবাদিকতা নিয়ে। ওদের ধারণা, আমাদের দেশের পত্রপত্রিকায় গঠন-মূলক খবর কম থাকে। রাজনৈতিক খবর বড় বেশী।

তাস-এর সাংবাদিককে একদিন প্রশ্ন করেছিলাম, রাশিয়ায় কি সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে? আর একই কথা জিজ্ঞাসা করলাম সোভেৎস্কি স্পোর্টের সম্পাদককে। তিনি বললেন, স্বাধীনতা নিশ্চয়ই আছে। তবে স্বাধীনতা মানে যা খুশি করা নয়। সব কিছুরই একটি সীমা আছে, আমরা তা মেনে চলি। আমরা সব কাজের জিনিসের প্রশংসা করি খারাপের কঠোর সমালোচনা করি। আমাদের ফুটবল কিছুদিন ধরে ভাল করছিল না। ওর কঠোর সমালোচনা করতে পিছপা হইনি। সরকার ফুটবল প্রশাসনে অনেক রদবদল করেছেন তারপর।

একটা জিনিস এই শ্রেণীহীন দেশে লক্ষ করেছি। এদেশে সাংবাদিকরা খুব শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত। সবার উপরে অ্যাকাডেমিশিয়ানরা, শিল্পীরা, সাহিত্যিকরা। সাংবাদিকরা মনে হল তারও উপরে। দ্য কিং ক্যান ডু নো রং। এদেশের সাংবাদিকদের সম্পর্কেও এই কথাগুলি প্রযোজ্য। সাংবাদিকরাও এই কথার মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রাণপাত করেন। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

# ক্যাথিড্রালে সমুদ্র-পক্ষী

রানা দাস

আমন্ত্রণপত্রটি যখন আমার হাতে এসে পৌঁছল, পার্ক হোটেলে আয়োজিত প্রেস-কনফারেন্স তখন অতীত। পরের দিন তাই পূর্ণ কৌতূহলে ছুটে গেলাম কুইন্সওয়ের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের প্রধান ফটক সংলগ্ন স্থানটিতে। অপরাহ্ণের রোদে আসন্ন চৈত্রের তেজ দর্শক বলতে তখন সেখানে জনা দুই শৃঙ্খলা-সাবধানী পুলিস ছাড়া বিশেষ আর কাউকে চোখে পড়ল না। একাকিত্বের তাড়নায় আঙুলে সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে, এগিয়ে একটি ছাতার আড়ালে আবিষ্কার করা গেল নাট্যপ্রেমী দু-তিনজন যুবাকে। তাঁদের সঙ্গে জল্পনা-কল্পনা চলছে, এমন সময় সেখানে এসে দাঁড়ালেন বাংলা থিয়েটারের দুই পারসন্যালিটি তরুণ রায় ও তাপস সেন। একটু বাদেই ছোট্ট একটা দল সমেত দেখা গেল পি পি টি-র সুরেশ দত্তকে। ওঁরা যেমন আমাদের দেখে নিশ্চিন্ত হলেন, আমরাও তেমনি ওঁদের দেখে স্বস্তি বোধ করলাম, খবরটা তা হলে সাচ্চা, সত্যিই এখানে একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

'ঐ তো! এসে পড়েছে!" সম্ভবত তরুণবাবুরই স্ফূর্ত-সম্ভাষে আমাদের প্রতীক্ষায় ছেদ পড়ল। বিকেল তখন চারটে চল্লিশ হবে, স্টিল্ট্ বা রনপায় চেপে দীর্ঘকায় এক সাহেব আমাদের প্রাথমিক নজর কাড়লেন। পরনে লালরঙের সিল্কের ট্রাউজার, সাদা জামার ওপর কালো রঙের কোট, মাথায় টুপি। তাঁর হাতের ছড়ি ঘোরানো আস্ফালন দেখে সেই মুহূর্তে আমরা যেমন অবাক কুইন্সওয়ের বিস্মিত পথচারী তেমনি তাজ্জব। অনুসরণকারীদের সঙ্গে নিয়ে অভিনব আগন্তুক যাত্রা শুরু করলেন ক্যাথিড্রাল রোডের দিকে। তাঁর এই আবির্ভাব কোলকাতার ব্যস্ত নাগরিকদের দৃষ্টিগোচরে এনে দেবার জন্য তীব্র শব্দে বেজে উঠল বিউগল। শব্দের উৎস সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল চার্চের চূড়ো, সেখানে তখন রঙিন বস্ত্রে সজ্জিত এক তূরীবাদক দাঁড়িয়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুটি কাঠির ক্ষিপ্র বিক্ষেপণে গলায় ঝোলানো ড্রামে শব্দ তুলে সন্ত্রস্ত অভিব্যক্তিতে আভাসিত এক যুবতী বেরিয়ে এলেন অ্যাকাডেমি থেকে। সব মিলিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই চোখটানা কাণ্ড। থমকে যাওয়া গাড়ির আরোহীরা নেমে পড়েছেন রাস্তায়। প্ল্যানেটেরিয়াম সংলগ্ন ফুটপাথের জুতো পালিশওয়ালার হাতের বুরুশ গিয়েছে থেমে, সুবেশী বাবুটিও হতবাক। অনন্য আয়োজনে অভিনব সজ্জায় সজ্জিত মূর্তিমান বিস্ময় অনুসরণ করে অপ্রস্তুত দর্শকদের ভিড় ততক্ষণে ক্যাথিড্রাল চার্চের উদ্যানে ঢুকে পড়েছে।

বিস্ময়ের পরিসমাপ্তি তখনো নয়। বরং কৌতূহলকে উসকে দেয় এমন ক্রমোৎকর্ষে সেখানে শুরু হল 'তেআত্রো তস্কাবিলে' নাট্য সংস্থার প্রযোজিত 'অ্যালবাট্রস' মুক্ত অভিনয়। নামের মধ্যেই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে 'তেআত্রো তস্কাবিলে' এ দেশীয় কোনো নাট্য সংস্থা নয়। সুদূর ইটালীর মিলানো থেকে মাত্র কদিনের জন্য এঁরা উড়ে এসেছিলেন এদেশের মাটিতে। কোলকাতায় পৌঁছে শো করবার জন্য এঁদের অ্যাকাডেমি, রবীন্দ্র সদন বা কলামন্দিরের খোঁজ নিতে হয়নি, কারণ তেআত্রো তস্কাবিলে তাঁদের এই পাবলিক শোয়ের জন্য মঞ্চ নয়, মুক্তাঙ্গনে বিন্যস্ত বাস্তব পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে (শুধু উপযুক্ত বলেই মনে করেন, তা নয়) অবিচ্ছেদ্য আঙ্গিকস্বরূপ ব্যবহার করেন। সেই হেতু 'অ্যালবাট্রস'র অভিনয় ক্যাথিড্রাল চার্চের পূব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণেই শুধু সীমাবদ্ধ রইলো না, গড়ের মাঠের একটা অংশেও কিছুক্ষণের জন্য বিস্তৃত হল। আসলে আলোচ্য পারফরম্যান্স নানান

করতে পারে, তেমনি এর লক্ষ্য দর্শককে কোনো একস্থানে জমে যেতে না-দেওয়ায়। ফলত নাট্য-কাহিনীর প্রতি টান ছাড়াও অংশগ্রহণকারী অভিনেতা অভিনেত্রীদের শারীরিক কসরতভঙ্গিমা যার দোলনাপে আন্দোলিত হয়ে উপস্থিত দর্শককেও সচল আগ্রহে ছোটাছুটি করতে হয়। প্রসঙ্গত, যেটা উল্লেখ করার, তেয়াত্রো তস্কাবিলের একটি অনুষ্ঠান আগাগোড়া উপভোগ করতে হলে যে-কোনো দর্শককেই তার শ্রেণীচেতনা জলাঞ্জলি দিয়ে এক-যোগে 'গলদঘর্ম' হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

মোলায়েম সাদা পোশাক পরিহিতা মুখোশ ও রূপহীন একজন মহিলা শিল্পীর ভীত সন্ত্রস্ত কুমারী অ্যালব্যাট্রসের (সামুদ্রিক পক্ষি) ভূমিকায় আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বোদলেয়ার ও কোলরিজ অনুপ্রাণিত 'অ্যালব্যাট্রি'র অভিনয়ের সূচনা। পর-মুহূর্তে রনপায় দাঁড়ানো চারজন অভিনেতার অতর্কিত আক্রমণ প্রতিহত করতে না-পেরে অসহায় কুমারী পাখিটি বন্দী হয়। অন্য পাশ থেকে তখন অ্যালব্যাট্রসের মুখোশ পরা আরেকজন অভিনেতা রনপায় ছুটে এসে প্রাণপণে আক্রমণকারীদের হাত থেকে বন্দিনীকে উদ্ধার করেন। এবং সঙ্গে সঙ্গেই অভিনয়ে সাময়িক ছেদ পড়ে। শুরু হয় প্রদর্শনী হয়ে ছাড়িয়ে ছিটিয়ে উপস্থিত দর্শকদের কাছে যান তারা। বাটার থাকে ফুল। দর্শকেরা যার যেমন সামর্থ্য বা ইচ্ছে পয়সাকড়ি দিয়ে এক একটি ফুল তুলে নেন। দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে এই সূত্রে পারস্পরিক সৌমনস্যের একটা সম্পর্ক স্থাপন হয়ে যায়। এই সময় শিল্পীরা একাগ্রতা ও ভারসাম্যের খেলায় শারীরিক কসরৎ দেখিয়ে এই ধরনের পার-ফরম্যান্সের জন্য উপযুক্ত একজন শিল্পীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, শরীর নিয়ন্ত্রণে দক্ষতা ইত্যাদির কিছু প্রমাণ দিয়ে হঠাৎই আবার নাট্যকাহিনীতে ফিরে আসেন। পরবর্তী পর্বের দৃশ্যাংশগুলোতে কাহিনী দানা বাঁধে অংশগ্রহণকারী চরিত্রগুলোর প্রেম ও প্রতারণায়। সব শেষে আত্মরক্ষার প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও দুষ্টচক্রের হাতে একজন অ্যালব্যাট্রসের বন্দী করুণ মৃত্যু ঘটে, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তখন বাকী অ্যালব্যাট্রসেরা পক্ষ বিস্তার করে তাদের প্রবহমান জীবন ও সংগ্রামের জানান দেয়। একই সঙ্গে বীভৎস ও সুন্দর, নির্মম ও মধুর রস সমন্বিত 'অ্যালব্যাট্রি' অভিনয়ের কাব্যিক পরিসমাপ্তি এখানেই।

'তেয়াত্রো তস্কাবিলের' বর্তমান অভিনয়রাজি স্বল্প সময়ের জন্য হলেও এর প্রতিটি মুহূর্ত চাপা উত্তেজনায় ভরা। নির্বাচিত কাহিনীর অভিনয় ... জন্য দর্শককে আনমনা হতে দেয় না। সংগীত, নৃত্য ও নৃত্যের সম্মিলন প্রতিক্রিয়ার উপস্থাপনার সমগ্র বিষয়টি অতি দ্রুত সম্পাদিত। যার প্রতি একবার আগ্রহ প্রকাশ করলে শেষ পর্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে অনুধাবন করে যেতে হয়। আলোচ্য পারফরম্যান্সে যা লক্ষ করবার তা হল সংশ্লিষ্ট সংস্থার অভিনয় শিল্পীদের—কি নারী, কি পুরুষ—আশ্চর্য প্রাণ-শক্তি, প্রকাশে যা সাঙ্গীতিক ব্যঞ্জনা রচনা করে। প্রতিটি শিল্পীর দেহ বিক্ষেপণ বা অঙ্গ সঞ্চালন কখনো মৃদু ছন্দোময় কখনো বা দ্রুত জোরালো। অভিনয়কালে একজন শিল্পীর শির-বক্ষ-পার্শ্ব কটি-পদ ইত্যাদি অঙ্গ, স্কন্ধ-বাহু-ঊরু জঙ্ঘা ইত্যাদি প্রত্যঙ্গ নেত্র, ভ্রূ, গণ্ড, অধর চিবুক ইত্যাদি উপাঙ্গ সব কিছু ব্যবহারে এমনই বাঙ্ময় যে উপ-স্থাপনায় কোনো রকম 'কমিউনিকেশন গ্যাপ'-এর অবকাশ থাকে না। টের পাওয়া যায়, লাবণ্য, কমনীয়তা ও বাক্তিত্বে 'তেয়াত্রো তসকাবিলে'র প্রতিটি শিল্পী অভিনয়কলায় কেবলমাত্র দক্ষ নন, উৎসর্গীকৃত।

পশ্চিমের পরীক্ষামূলক থিয়েটারের জগতে 'তেয়াত্রো তসকাবিলে'র (পুরো নাম তেয়াত্রো তসকাবিলে ডি বার্গামো) ভূমিকা ইতিমধ্যে অত্যন্ত
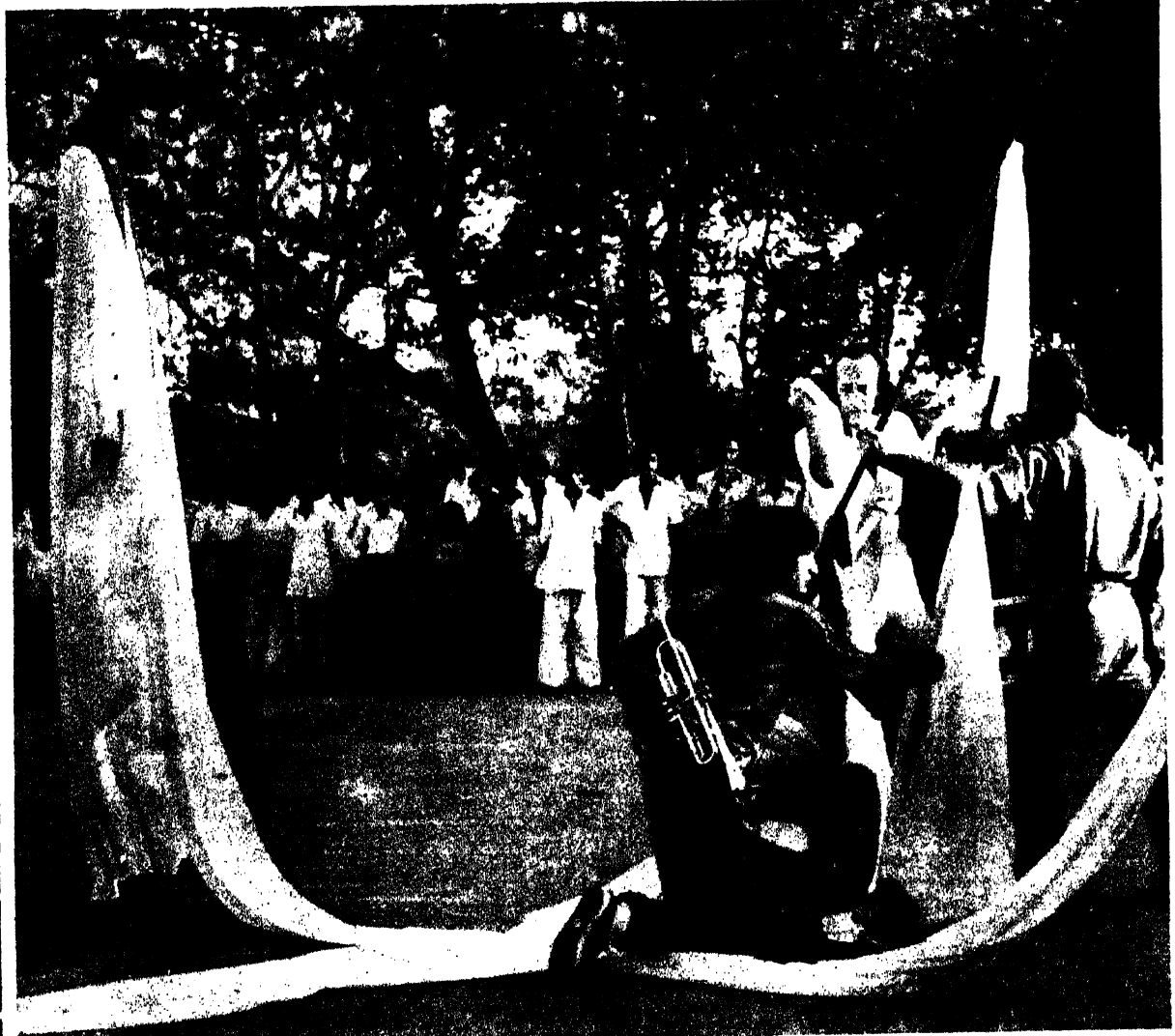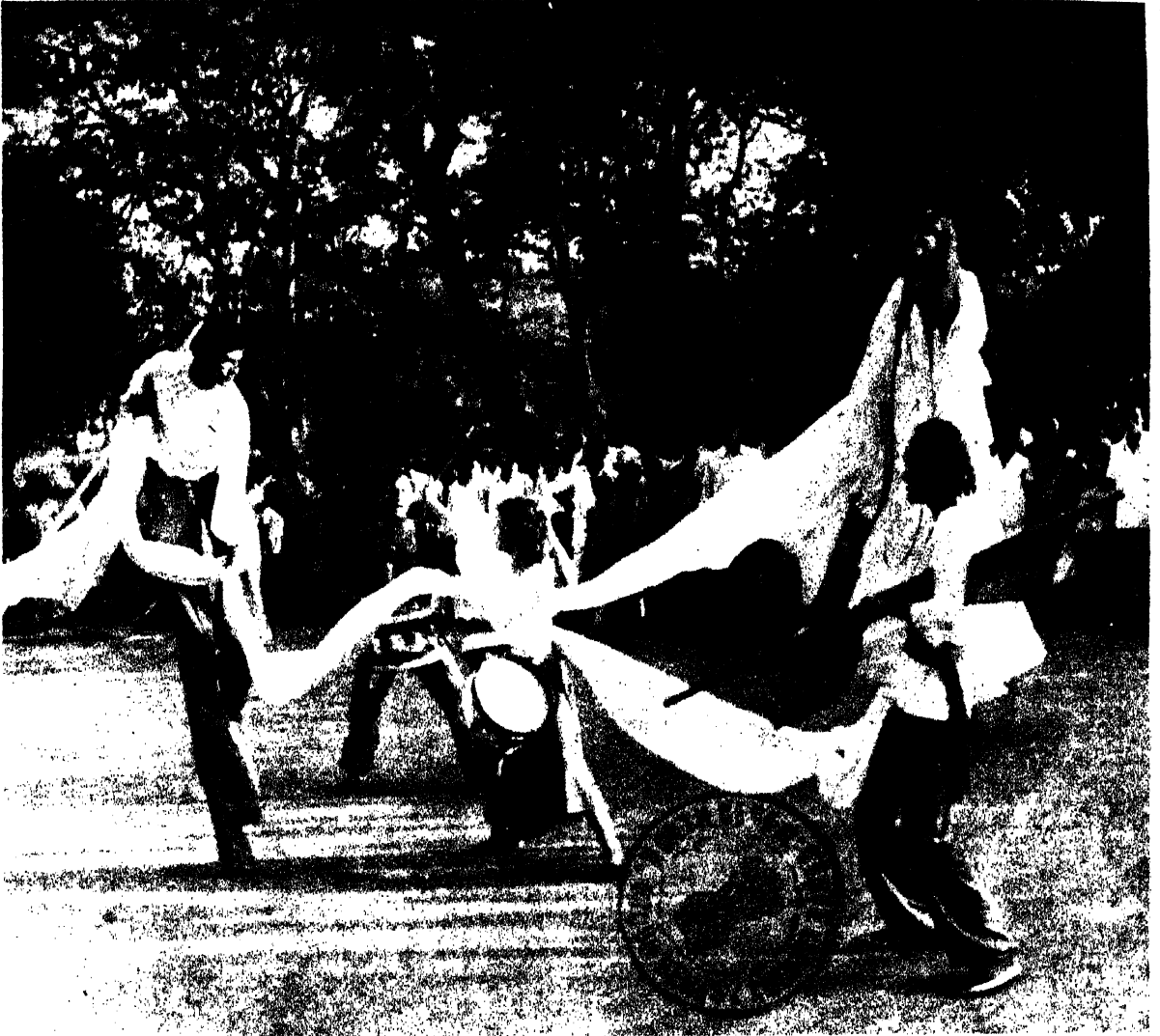
গুরুত্বলাভ করেছে বলে জানা গেল। থিয়্যাটারকে ব্যক্তিগত জীবন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে মানতে এঁরা রাজী নন, বরং সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন দিক ও অবস্থার যে সম্পর্ক তার প্রকাশ হিসেবেই দেখছেন। থিয়্যাটারের সঙ্গে এঁরা এঁদের সম্পর্কের রূপ বোঝাতে জল ও মাছের কথা উল্লেখ করেছেন। একজন অভিনয়শিল্পীর নাট্যপ্রবণ অন্তরের পরিশুদ্ধিতে তেয়াত্রো তসকাবিলে তাই যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। এবং প্রতিটি অভিনয়ক্রিয়ার মধ্যেই বর্তমান তাঁদের সচল অন্বেষা। যেভাবে তাঁরা প্রতিটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন তাতে সর্বাগ্রে স্বতঃস্ফূর্ত গতিশীলতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। ফলত, এক একটি খণ্ড মুহূর্তের রসভোগ করতে যেমন একজন দর্শকের কোনো রকম অসুবিধে হয় না, তেমনি নিবিষ্ট হয়ে পড়লে দীর্ঘক্ষণ ধরেই তিনি সমগ্র অনুষ্ঠানটি থেকে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভ করতে পারেন। এর মূলে আছে এই চেতনা যে দ্রষ্টাও কোনো স্থাণু ভূমিকায় নেই। প্রদর্শনী চলার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও স্থান পরিবর্তন করতে পারেন। প্রথাগত নাট্যানুষ্ঠানগুলোর সঙ্গে এখানেই তেয়াত্রো তস্কাবিলের প্রয়োগ প্রকল্পের মৌল পার্থক্য। তাই এটা ভাবলে ভুল হবে যে 'তেয়াত্রো তসকাবিলে'র অভিনয় দর্শক পরিবেষ্টিত তথাকথিত মুক্ত-মঞ্চে অভিনয়ের সামিল।

প্রথাবিরোধী এই নাট্যপ্রয়োগ সম্পর্কে তেয়াত্রো তস্কাবিলে ১৯৭৭ থেকেই অতিমাত্রায় আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সেবার তাঁরা প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে অরণ্যাঞ্চলে গিয়েও একটি অভিনয় করে আসেন। ১৯৭৯-তে এঁরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের আরো একটি পারফরম্যান্সের ব্যবস্থা করেছিলেন, দস্তয়েভস্কির চরিত্রের অনুপ্রেরণায় 'সোন্‌জা' নামের এই প্রদর্শনীটি শহরের কোলাহল থেকে দূরে বাগান দুর্গ, এবং পুরনো গির্জার ব্যাপ্ত অনুষঙ্গে উপস্থাপিত হয়। ইউনেসকোর সহযোগিতায় ১৯৭৭-এ তেয়াত্রো তসকাবিলে একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছিলেন, পরিচালনায় ছিলেন ইউজেনিয়ো বার্বে, বিষয় গ্রুপ থিয়েটার। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে দুশোরও বেশি তরুণ নাট্যকর্মী এতে অংশ গ্রহণ করেন। একজন অভিনয় শিল্পীর দেহকে কি কি উপায়ে কতভাবে অভিনয়ের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায় তেয়াত্রো তসকাবিলের বর্তমান চর্চার মূল লক্ষ্য সেদিকে। এবং এই চর্চায় আজ প্রায় দু বছর ধরে এঁরা ভারতের ধ্রুপদী নৃত্যসমূহকেও বিশেষ স্থান দিয়েছেন বলে জানা গেল।

যাঁর পরিচালনায় 'তেয়াত্রো তস্কাবিলে' এদেশে এসেছিলেন তাঁর নাম রেনজো তেসকোতি। মাত্র উনিশ বছর বয়সে মিলানোর ইউনিভার্সিটি থিয়্যাটারে রেনজো তেস কাভি ব্রেসটের নাটকে প্রধান চরিত্রে অভিনয় এবং পরিচালনা দিয়ে তাঁর নাট্যজীবন শুরু করেন। এর পর তিনি ক্রমানুসারে মোট কুড়িটি নাটকে (ইউরিপিডিস থেকে কামু) সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে তাঁর নাট্যবোধের ক্রমোন্মোচন ঘটান। পরে তিনি ১৯৭৩-এ সম্পূর্ণ প্রফেশন্যাল গ্রুপ হিসেবে গঠিত তেয়াত্রো তস্কাবিলের পরিচালনা গ্রহণ করেন। রেনজো তেসকোতি পরিচয় দিতে গিয়ে নিজেকে ইউজেনিয়ো বার্বে এবং গ্রোটস্কির ছাত্র বলে উল্লেখ করেন। এ পর্যন্ত ইটালী ছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন নাট্য-উৎসবে তাঁর পরিকল্পিত ও পরিচালিত নাট্যাভিনয় উপস্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি 'অ্যানথ্রপলজিক্যাল ফাউন্ডেশন অব ড্রামা লিংকড্ উইথ অরিয়েন্টাল/ইস্টার্ন ট্র্যাডিশন' এই শিরোনামায় একটি রচনা লেখার কাজে হাত দিয়েছেন। 'তেয়াত্রো তস্কাবিলে ডি বার্গামো' এদেশ ঘুরে গেলেন 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস'-এর আমন্ত্রণে।

বোতল ভেঙে এসেছে.....
!

উঃ...

দমাস্
8/26

আছি হাঁদিনি! জয়ও পাইনি! বালি পড়ে চোখ জ্বালা করছে.....
শাবাশ রাজা!

সর্দারদের হাতে এই দুই লুটেরাকে তুলে দেব!
গাড়িটার কী হল?

জুম্বা ওটাকে শেষ করেছে!
শাবাশ জুম্বা... শাবাশ...

অরণ্যের অলিম্পিক... শেষ খেলা!
পেরেছে! ওয়াম্বেসির ওয়ামুটান জয়ী!

দলগতভাবেও ওয়াম্বেসিই জিতেছে...
কিন্তু পুরস্কারের মোহর না-পেলে তো দাঙ্গা বাধবে!
তাহলে!
ক্রমশঃ
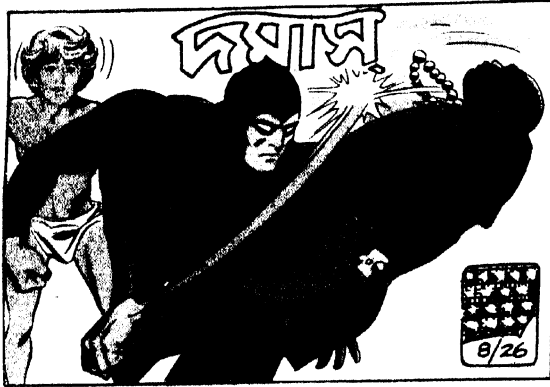
# স্মৃতি সততই সুখের

## প্রতিভা বসু

॥ ১৭ ॥

'নৈশ পাহারা' ছবিটি রেমব্রাণ্ট ছত্রিশ বছর বয়সে এঁকেছিলেন। যে সময়ে তাঁর জীবন ছিল ফলে-ফুলে-পল্লবে-সৌগন্ধে ভরপুর। একেবারে উপচে পড়ছিল সব। কী নেই? ধন মান যৌবন যশ খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রেম শ্রদ্ধা সম্মান—সব কিছুর অধিকারী তিনি। ধনবতী স্ত্রী সাস্কিয়াকে নিয়ে সুমধুর দাম্পত্য জীবন তাঁকে সর্বদাই নিরুদ্বেগে কাজ করবার অবসর যুগিয়েছে। অমিতব্যয়ে সংগ্রহ করা সংগ্রহশালাটিও কাজের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে কাজের সহায়ক হয়েছে—মোট কথা, একজন মানুষ যা চায় সবই ছিল তাঁর করতলগত। কিন্তু এই ছবিটি আঁকার পর থেকেই ধীরে ধীরে নেমে এল কালো যবনিকা। হল্যান্ডের প্রধান পুরুষটি আস্তে আস্তে ডুবে গেলেন দুর্গতির অতল সমুদ্রে। ছবিটিই শুষে নিল সমস্ত ভাগ্য। নিয়ে নিজে গরীয়ান হয়ে অমরত্ব লাভ করল।

তখনকার সময়ে এক-একজন শিল্পীর জীবন যে কী অদ্ভুত গল্পকথার মতো ছিল, এ যুগে তা ভাবা যায় না। প্রতিভা আর ভাগ্যহীনতা যেন একসঙ্গে বাস করত। লেখককুলেও এর কত প্রমাণ ছড়ানো। কষ্টের জগদ্দল পাথর ঠেলে তবে আলোর দ্যুতি। ঈশ্বরের করুণা পেলেই মানুষ অকরুণ হয়ে ওঠে। নিজেদের বিদ্বেষ বিতৃষ্ণা দিয়ে অবিশ্রান্ত প্রতিরোধ করে। ঈর্ষাই মানুষের আদিম বৃত্তি। অনেক আদিম বৃত্তি শিক্ষাসভ্যতার ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও এই বৃত্তিটি দেখা যাচ্ছে দুমর।

যে ছবিটি দেখার জন্য বুদ্ধদেব পাগল হয়ে আছেন, যে ছবি একমাত্র এই মিউজিয়াম ছাড়া অন্যত্র কোথাও নেই, যে ছবি এঁকে রেমব্রাণ্ট তাঁর দুর্ভাগ্যকে ডেকে এনেছিলেন সেই 'নৈশ পাহারা' নামের ছবিটিই যে রেমব্রাণ্টের শ্রেষ্ঠ ছবি তা কিন্তু কেউ বলেন নি। এর ভিতরে মোনালিসার হাসির মতোই এমন এক অপার রহস্য লুকিয়ে আছে যা নিয়ে আজও পণ্ডিতদের তর্কের অবসান হচ্ছে না। যুগ যুগ ধরে মাথা ঘামাচ্ছেন বোদ্ধারা। অনেকের মতে, এই ছবিটিই হচ্ছে ইউরোপীয় চিত্রকলার রোমাণ্টিক ধারার প্রবর্তক।

বিশাল পটে আঁকা হয়েছে এই ছবি। মিউজিয়ামের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হলের মস্ত দেওয়ালেও এর ঠাঁই হয়নি, ছাঁটতে হয়েছে কিছুটা। ঐতিহাসিক মতে, দলপতি ককের শোভাযাত্রার ছবি এটি। তেইশজন নগররক্ষী আছে। বলাই বাহুল্য, তারা আপন আপন প্রতিকৃতি দেখতেই উৎসুক ছিল, তার বদলে যা হলো প্রতিকৃতি তো দূরের কথা, এ ছবিকে অতিপ্রাকৃত বলেই আখ্যা দেওয়া যায়। এর মধ্যে এক বিন্দু বাস্তবতার স্পর্শ নেই। কেবল ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি এক দুর্জ্ঞেয় ভিড়ের সৃষ্টি করেছে তেইশটা ঝাপসা মুখ, তারা যে মানুষ তা-ই প্রায় বোঝা যায় না। মাঝখানে এক অদ্ভুত নারীমূর্তি। যার মুখের পেশীতে কোথাও কোনো ভাব নেই, ভাষা নেই, ইচ্ছে অনিচ্ছে ভালো মন্দ ক্ষুধা তৃষ্ণা স্ফূর্তি কিছুই নেই, অথচ চিত্রকরের আলোর উদ্ভাস ঐ মেয়েটির মুখেই প্রতিফলিত। এই মূর্তির কোমরে একটা মুরগি ঝুলছে, ডান দিকে প্রায় অন্ধকারে একটা কুকুর।

এমন এক অসঙ্গত উদ্ভট ছবি কারোরই পছন্দ হল না। তারা ভুরু কুঁচকুলো, প্রত্যাখ্যান করল এবং এই পাগলামিতে বিরক্ত হল।

শুধু যে তারাই ভুরু কুঁচকে প্রত্যাখ্যান করল তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ক্রেতারাও মুখ ফেরালো। ঝপ করে বন্ধ হয়ে গেল ছবির বিক্রি, উপার্জনও থেমে গেল। এইরকম দুঃসময়ে মারা গেলেন স্ত্রী সাস্কিয়া। শোকে উদভ্রান্ত হলেন সন্দেহ নেই, অসহায়ও হলেন। তবু তারই মধ্যে অবিরতই ছবি আঁকেন, বেঁচে থাকার উৎস। অনটনের মধ্যেও সংগ্রহের নেশাটি কাটাতে পারেন না বলে অভাব আরো দুর্দান্ত হয়ে ওঠে। শেষে একেবারে ধারে-দেনায় তল হয়ে গেলেন।

স্ত্রীর মৃত্যুর কিছু কাল পর থেকেই হেনড্রিকিয়ে নামে একটি মেয়ের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতোই বাস করছিলেন। স্ত্রী সাস্কিয়ার যা কিছু বিষয়-আশয় ছিল, তিনিই তার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন বটে, কিন্তু একটা চুক্তি ছিল, পুনরায় বিবাহ করলে এ থেকে বঞ্চিত হবেন। হয়তো সেইজন্যই মেয়েটিকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলেন ঠিকই, তবে আনুষ্ঠানিকভাবে নয়। অর্থাৎ হেনড্রিকিয়ে যে তাঁর স্ত্রী, সেটা আইনসঙ্গতভাবে সিদ্ধ ছিল না।

হেনড্রিকিয়ে যখন সন্তানসম্ভবা কথা উঠলো তখন। সমাজপতিরা রুখে দাঁড়ালেন নীতিরক্ষক হয়ে। ধর্মপিতারা বললেন, হেনড্রিকিয়েকে সর্বসমক্ষে স্বীকার করতে হবে সে বেশ্যা, স্বীকার করতেই হবে রেমব্রাণ্ট বেশ্যা রেখেছেন। রেমব্রাণ্ট প্রতিবাদ করেছিলেন, বলেছিলেন, বিবাহ তো মানুষের তৈরি একটা সংজ্ঞা, ঈশ্বরের চোখে বিবাহ বলে কিছু নেই। আমি তাতে বিশ্বাস করি না। স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক ভালোবাসাটাই আসল। সেদিক থেকে আমাদের মিলিত জীবন নিশ্চয় সত্য। হেনড্রিকিয়ে সর্বাধিভাবেই আমার স্ত্রী, শুধু আমারই স্ত্রী।

কিন্তু এ সব কথায় চিঁড়ে ভিজলো না। এই পাপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। পিতারা এই বলে শাসালো, যদি নিজেকে বেশ্যা বলে স্বীকার না করে হেনড্রিকিয়ে তা হলে তার অজাত সন্তান অনন্ত নরকে পতিত হবে। চার্চের অনুশাসনে শেষ পর্যন্ত এই অসম্মান মাথা পেতে নিতেই হয়েছিল, হেনড্রিকিয়েকে স্বীকার করতেই হল যে, সে বেশ্যা। অতএব স্বীকার করার পরে ধার্মিকরা বললেন, সন্তান অনন্ত নরক থেকে রক্ষা পেলেও তোমার শাস্তি তাতে মিটবে না। তোমাকে ঈশ্বরের করুণালাভ থেকে আমরা বঞ্চিত করলাম।'

ঈশ্বর কে, কোথায় আছেন, কোথায় থাকেন, তা তো কেউ জানে না; ঈশ্বরের সন্তানরাই প্রতিভূ হয়ে প্রতিবিধান করে। এই দুঃসহ অপমান ও বেদনাজনক পতিত জীবনের দুঃখকেও নিঃশব্দে নিরুপায়ভাবে হজম করতে হল রেমব্রাণ্টকে। তার উপরে জর্জরিত ঋণের দায়ে পাওনাদাররা তাঁর সকল সম্পত্তিও একদিন নিলামে চড়ালো। সেই সঙ্গে তাঁর প্রাণতুল্য সংগ্রহশালাটিও গেল। কেননা, সেটা বেচেই বড় বাড়ি ছেড়ে উঠে এলেন ছোট বাড়িতে। ছবি তো বিক্রি হয় না, তাই দিয়েই কোনরকমে ভরণপোষণ করেন স্ত্রী-পুত্রের। বলা যায়, অতি বুদ্ধিমতী এবং সংবেদনশীলা হেনড্রিকিয়েই কোনরকমে চালিয়ে নেন কষ্ট করে এবং সর্বতোভাবে নিজেকে বঞ্চিত রেখে।

প্রতিভাকে বিনষ্ট করে দেবার সমস্ত আয়োজনই সম্পূর্ণ করতে পেরেছিল সমাজপতিরা, তবু কিন্তু ছবি আঁকা বন্ধ হল না রেমব্রাণ্টের। তিনি তাঁর কাজে বিরতিহীন সংগ্রামী। সন্ন্যাসী যেমন ঈশ্বর ছাড়া জানে না; ঝড়ঝঞ্ঝা যাই আসুক, সেখানেই তন্নিষ্ঠ, তেমনি রেমব্রাণ্টও সব ঝড়ঝঞ্ঝার ঊর্ধ্বে উঠে তাঁর ছবিতেই তন্নিষ্ঠ হয়ে রইলেন।

ষোল কলা পূর্ণ হল হেনড্রিকিয়ের মৃত্যুতে এবং পুত্র টিটাসের মৃত্যুতে। যাদের সহায়তায়, সাহায্যে, মনোযোগে, পরিশ্রমে এবং ভালোবাসার গাঢ়তায় সব অভাব-অপমান কিছুটা অন্তত ভুলে থাকতে পেরেছেন। সব কিছুর পরেও কিছুটা অন্তত শক্তি সংগ্রহ করতে পেরেছেন। তখনো ঈশ্বরের মত অবিচল। তবে মৃত্যু তো সকলেরই আছে। মৃত্যু সকলের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। একদিন তাঁরও মৃত্যু হল। সেই তাঁর প্রথম বিশ্রাম ছবি আঁকার কর্ম থেকে।

পাণ্ডুলিপিটি পড়তে পড়তে আমার মনে হচ্ছিল, মানুষের জীবন শেষ পর্যন্ত অদৃষ্টের সঙ্গেই সাত পাকে বাঁধা। মানুষটি যে পার্থিব অর্থে অতি হতভাগ্য, তাতে আর সন্দেহ কী! চারদিকেই অন্ধকার, তারই মধ্যে অনন্ত মেধা, অনন্ত উদ্দাম, দুর্জয় প্রতিভা শুধু একই লক্ষ্যে আবর্তিত। মরে তিনি অমর হলেন। কিন্তু জীবন তাকে কী দিল? শুধুই লাঞ্ছনা! যে দেশকে তিনি গৌরবের মুকুট পরিয়ে বিশ্বের দরবারে এনে সিংহাসনে বসালেন তারা তাঁকে পাঁকে পুঁতে রেখেছিল। এমন কি, প্রোটেস্টাণ্ট বলে চার্চের দ্বারাও বা কি অবহেলিত! বন্ধু নেই, বান্ধব নেই; আমস্টারডামের কোন একটি অখ্যাত গরীব ইহুদিপাড়ার সরু গলির বাসিন্দা, সেই সরু গলিতেই শেষ নিশ্বাস ফেলে চলে গেলেন।

সেই সরু গলির ছোট কুটিরকে এখন কতই না যত্নে রেখেছে। সে তো তীর্থক্ষেত্র। সারা পৃথিবীর মানুষের পদধূলিতে আকীর্ণ। এই তো আমরাও তো এসেছি তারই টানে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে খাল দু পায়ের রাস্তা। নৌকোর জন্য তীরে এসে দাঁড়ালাম। জলের হাওয়া, জলের গন্ধ, দোদুল্যমান নৌকো আমাকে বহু দূরে নিয়ে গেল। পূর্ববঙ্গের সেই হাঁসাড়া গ্রামে, যেখানে আমি জন্মেছি, যেখানে আমার নাড়ির টান, আমার পিত্রালয়। বড় সুন্দর গ্রাম। শাড়ির পাড়ের মতো ঘুরে-ফিরে জল চলে গেছে এবাড়ির তীর ঘেঁষে, সে-বাড়ির কোল ঘেঁষে। খাল-বিলের দেশ। জলই প্রাণ, জলই সৌন্দর্য, জলই অতি আদরের সামগ্রী।

একটি নৌকো ভাড়া করা হল। একক নৌকো। সাধারণত একক নৌকো বড় কেউ নেয় না। অনেক বেশী ভাড়া পড়ে যায়। তাই বেশির ভাগ লোক শেয়ারেই ওঠে। যে যেখানে যাবে নামিয়ে দেয় ঘাটে ঘাটে। আবার কেউ বিহার করেও ফিরে আসে। ভেবেচিন্তে শেয়ারে না গিয়ে আস্ত নৌকোই ভাড়া নেওয়া হলো। যাবো একটা নির্দিষ্ট গন্তব্যে, নির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে; সেসব ক্ষেত্রে অন্যের সঙ্গে ঠিক সুবিধে হয় না।

নৌকোর গড়ন বোটের মতো। দেখতে বেশ সুন্দর। ইঞ্জিনেও চালায় কেউ, কারো কারো নৌকোয় নিজেরাই দাঁড় টানে। আমরা সেই দাঁড়-টানা নৌকোই নিলাম। বেশ ধীরে ধীরে যাওয়া যাবে, কলের শব্দে বৈকালিক স্তব্ধতাও ক্ষুণ্ণ হবে না, কর্ণপটহও বিদীর্ণ হবে না।

সাহেব মাঝি দারুণ আদরে গ্রহণ করলো আমাদের। নৌকো চলতে লাগলো দুলে দুলে। খানিক দূর এসে বুদ্ধদেব বললেন, 'রেমব্রাণ্টের বাড়ি চেনো তো?'

'রেমব্রাণ্ট?'

'আমরা তাঁর বাড়িটা দেখতে চাই।'

সাহেব মাঝি এক চোখ ছোট করে কিছুক্ষণ ভাবল, ভেবে বললো, 'বেড়াবেন না?'

'হ্যাঁ, বেড়াবো তো বটেই। বেড়াতে বেড়াতেই তো যাবো। আবার বেড়াতে বেড়াতেই ফিরবো। পথে বাড়টা দেখতে নামবো।'

'সে তো বেশ দূর! যেতে যেতে সন্ধে লেগে যাবে।'

'তা যাক না, ক্ষতি কী। বাধা আছে কোনো?'
'তা তো জানি না।'
'তবে চলো।'
'আপনাদের তা হলে স্পীড বোটে যাওয়াই উচিত ছিল।'
'কেন?'
'বন্দরে মনে হয়, সন্ধ্যার পরে যাওয়া যাবে না। তা ছাড়া, কাঠের নৌকো যেখান দিয়ে যাবে, সেটা ঠিক ঘাট নয়। স্পীডের নৌকোই ঠিক ঘাটে যায়। আর আমি ঠিক সেই ঘাটটা চিনিও না।'
শুনে এতো মন খারাপ হয়ে গেল। বুদ্ধদেব বললেন, 'চলো ফিরি।'
আমি তবু আশায় সুতো ধরে বললাম, 'দূরে থেকেও কি দেখিয়ে দিতে পারবে না?'
'তা পারবো।'
'তবে তাই চলো।'
তাই চললো। কিন্তু বুদ্ধদেবের মেজাজ বিগড়ে গেছে, এখন আর কিছুতেই স্বাভাবিক হবেন না। সবটাই মাটি। আমাদেরই বোকামি হয়েছে। জিজ্ঞেস করে আসা উচিত ছিল কখন যেতে হয়, কোন পথে যেতে হয়, কোনো গাইড নেওয়া দরকার কিনা। হোটেলের আপিসে জানতে চাইলে সব খবরই পাওয়া যেতো। এই লোকটি যা বলছে তা হয়তো ঠিক নয়, চেনে না বলেই নানান কৈফিয়ত দিচ্ছে। হয়তো রেমব্রান্টের নামই জানে না। যা একান্তই অসম্ভব নয়।

কী আর করা! নিয়ে গেল অনেক দূরে। যেতে যেতে আলাপ করলো। নিজের জ্ঞানও ঝেড়ে দিল অনেক। সব বাক্যালাপই আমার সঙ্গে। বুদ্ধদেবের তো মেজাজ খারাপ, এখন অনেকক্ষণ আর সেই মেঘ কাটবে না।

হঠাৎ নৌকো ঘুরিয়ে একটা ঝোপঝাড়ের ধার ঘেঁষে চলতে চলতে বললো, 'ঐ দেখ বাড়ি।'
'কার বাড়ি?'
'ঐ যার বাড়ি তোমরা দেখতে চাও।'
'রেমব্রান্ট?'
'হ্যাঁ।'
'বল তো তিনি কে?'
কাঠা থেকে হাত সরিয়ে শূন্যে আঁকার ভঙ্গি দেখিয়ে বললো, 'ঐ যে ছবি আছে মিউজিয়ামে।'

তা হলে ঠিকই চেনে। উৎসুক হয়ে তাকিয়ে 'কই, কই, কোথায়' করতে লাগলাম। ঠিক কোনো নিবিড় গ্রামের মতো ঝোপের অন্ধকারের ফাঁকে সত্যিই একটি বাড়ির আভাস। খাল থেকে বেশ একটু দূরে। চেহারা একটুও বিশেষ নয়, কোনো বিশেষ ব্যবস্থা আছে বলেও মনে হচ্ছিলো না; এমন কি, অন্ধকারে একটি বিশেষ আলো জেলে রেখেও বিশেষ স্থানের সংকেত হয়ে দর্শনার্থীদের দর্শনের হদিস দিচ্ছিলো না।
লোকটি বললো, 'এটা বাড়ির পিছন।'
তৃষিতের মতো সেই পিছনের দিকেই তাকিয়ে থাকলাম।

এই ব্যর্থ ভ্রমণে বাড়ি ফিরেও মনখারাপ যায় না। কথা ছিল নিউইয়র্ক থেকে ডক্টর ভ্যানওয়েভারেন আসবেন সস্ত্রীক। তিনিও আর এলেন কই? আমরা এসেছি তিন দিন, পরামর্শ করে তারিখ মিলিয়েই এসেছি, হোটেলের ঠিকানাও জানানো আছে, এলে নিশ্চয়ই খোঁজ করতেন। ওঁরা এলে একসঙ্গে ঘুরে-ফিরে বেড়ালে অনেক বেশী ভালো লাগত। অন্তত এই ধরনের হতাশার সম্মুখীন হবার জন্য অত অর্থদণ্ড হত না।

এটা ওঁর দেশ, উনি এ-দেশের নাড়িনক্ষত্র চেনেন, আচমকা এসে একা একা কতটুকু জানা যায়! তা-ও এই ক্ষণিক ভ্রমণ। উনি এলে কত ভালোভাবে দেখা হত সব, ভালোভাবে জানা যেত দেশটাকে।

আমাদের পক্ষে ওঁদের এই না-আসাটা তখন যেন আরো ভীষণ হতাশার কারণ বলে মনে হতে লাগলো। কী আর করা! আমি চিঠি লিখতে বসলাম, বুদ্ধদেব বই নিয়ে বসলেন।
অবশ্য এরও প্রয়োজন ছিল। চিঠি লেখা আর বিশ্রাম আর অবসরযাপনের উৎকৃষ্ট বন্ধু বই—এ সবের পাট একেবারে চুকেই গেছে কদিন যাবত। যে কারণেই হোক, হলো যখন তখন কিন্তু একটা অন্যরকম আরাম পাওয়া গেল।
পরের দিন সকালেই শুভ খবর। ডক্টর ভ্যানওয়েভারেন ও তাঁর স্ত্রী এসে গেছেন। চায়ের পাট সাঙ্গ করে চানটান সেরে যখন বেরোবো বেরোবো ভাবছি তখনই ফোন এলো নিচে থেকে।

হাত ঝাঁকাঝাঁকি, ভালোবাসাবাসি, পুনর্মিলনের আবেগ ইত্যাদির পরে জানা গেল, ডক্টর ওয়েভারেনের হাতে হঠাৎ একটি সিরিয়াস রোগী এসে পড়ায় দু' দিন দেরি হয়ে গেছে। বললেন, 'সত্যি আমি খুব দুঃখিত সেজন্য। আমার স্ত্রী বারেবারেই বলছিলেন সে কথা। কিন্তু আমার কোনো উপায় ছিল না। নতুন রোগী হলে হাতে না নিয়ে চলে আসতাম, কিন্তু পুরোনো রোগীকে এড়িয়ে আসা সম্ভবই হল না। যাই হোক, এখন বল আজ আমরা কী করবো? আরো তো দু' দিন আছো।

আমি বললাম, 'আপনারা যে শেষ পর্যন্ত এলেন তাতেই মনে হচ্ছে সব ইচ্ছে পূরণ হয়ে গেছে।'
এ কথায় মিসেস ওয়েভারেন খুশির চোটে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বললেন, 'সত্যি, শেষ পর্যন্ত যে এসে পৌঁছতে পারলাম এবং দু' দিনের জন্য হলেও তোমাদের সঙ্গে যে আর একবার দেখা হল তাতে আমার ভীষণ ভালো লাগছে!'
বুদ্ধদেব বললেন, 'এখন তো দশটা, তাড়াতাড়ি লাঞ্চ খেয়ে যে-কোনো উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেই হবে। আসুন, ততক্ষণ এখানে বসে আড্ডা দেওয়া যাক।'

কফির অর্ডার দেওয়া হল। গল্পে গল্পে চট করেই কখন বারোটা বেজে গেল। এই প্রথম আমরা উঠোনের বাগানে লাঞ্চ খেলাম। প্রথম এই জন্য, ওখানে বসে খেতে হলে যা দাম দিতে হয় তা আমাদের পক্ষে সহজ ছিল না। কিন্তু অতিথি আপ্যায়ন অন্য কথা। তা ছাড়া, যাবার আগে একদিন দুমূল্যের ভোজই খাবো এখানে বসে—এরকম মনে মনে ভাবাই ছিল।

অবশ্য বিল মেটানো নিয়ে ওয়েভারেন দম্পতির সঙ্গে আমাদের প্রায় হাতাহাতি। তাঁরা বলছেন, তাঁরা দেবেন; আমরা বলছি, আমরা দেব। তাঁদের বক্তব্য—সেটা তাঁদেরই দেশ, সেখানে আমরা অতিথি, তাঁরা নয়। আমাদের বক্তব্য—এখানে, এই গৃহে সাময়িকভাবে হলেও আমরাই হোস্ট এবং হস্টেস, সুতরাং, তাঁরাই অতিথি, আমরা নই।
এই করতে করতে শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় জিতে ওয়েভারেনই বুদ্ধদেবকে এড়িয়ে উঠে গিয়ে বিল মিটিয়ে এলেন।

মিসেস ওয়েভারেন বললেন, 'এঁরা তো কাল রেমব্রান্টের বাড়িটা দেখে আসতে পারেন নি, আজ একবার চেষ্টা করলে হয় না?'

ডক্টর ওয়েভারেন কোথায় একটা ফোন করলেন, তারপর বিরস মুখে বললেন, 'আমি জানতাম, বাড়িটা নিয়ে কী একটা গোলমাল চলছে, কেউ এখন যাচ্ছে না সেখানে। বুঝতেই পারছ পনেরো শতকের বাড়ি, তা-ও গরীবের বাড়ি, আর বোধ হয় রাখা যাচ্ছে না। যে কারণেই হোক, বর্তমানে কোনো লোককেই যেতে দেওয়া হচ্ছে না সেখানে। যদি এমনি নৌকোভ্রমণে যেতে চাও, যেতে পার। কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে বিকেল পর্যন্ত।'
তা হলে চলো, দুপুরেই ওঁদের ঘুরিয়ে শহরটা দেখিয়ে দিই, গাড়ি যখন

পাওয়া গেছে, কিছু তো অসুবিধে নেই।' মিসেস ওয়েভারেন আমার পিঠে হাত রাখলেন, 'কী বলো?'

আমি সাগ্রহে বললাম, 'গাড়ি আছে?'

মিসেস ওয়েভারেন বললেন, 'হ্যাঁ, পেয়েছি একটা।'

'অন্যের গাড়ি?'

'গাড়ি অন্যের ঠিকই, তবে আপাতত আমাদের। আমরা এখানে তিন মাসের জন্য এসেছি, আবার এখানকার এক ভদ্রলোক তিন মাসের জন্য নিউ ইয়র্ক গেছেন। এক্সচেঞ্জ হয়েছে। উনি ওখানে গিয়ে আমাদের গাড়ি ব্যবহার করবেন, আমরা এখানে ওঁর গাড়ি ব্যবহার করবো।'

'বাঃ বেশ ভালো তো!'

ডক্টর বললেন, 'তা গাড়ি আমরা পাই বা না পাই, থাক বা না থাক, তাতে কী এসে যাচ্ছে! এ-দেশে কি ক্যাব নেই? তুমি কী ইচ্ছে করো সেটা বলো, আমরা সবাই-ই সেইমতো ঘুরবো।'

ডক্টর ওয়েভারেন বয়স্ক ব্যক্তি, অসম্ভব সুশ্রী, বয়সের ভার কোথাও নেই। ডাক্তার মানুষ, দেহের যত্ন নিতে জানেন, পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে উঠেও একটু ভারি হয়ে যাননি। খাওয়াদাওয়া, ব্যায়াম—সবই নিয়মিত এবং পরিমিত। জীবনযাপন প্রণালীর মধ্যেও ছন্দপতন নেই। স্বভাবতই একটু গম্ভীর কিন্তু কৌতুকপ্রিয়, অতিথিপরায়ণ এবং বন্ধু অত্যন্ত উদার।

মিসেস ওয়েভারেনও চমৎকার মানুষ। ভারি সাদাসিধে। স্বামীর চেয়ে মনে হয়, বেশ কিছুটা বড়। মোটাসোটা নাদুসনুদুস। বয়সের ছাপ পড়েছে, বেশী কাজকর্ম করতে পারেন না। নিউ ইয়র্কে যেদিন ওঁদের বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলাম, ডক্টর ওয়েভারেনই রান্নাবান্না করছিলেন। স্ত্রীর উপর সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে খুব নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না। আমাকে অ্যাপ্রন পরিয়ে সহায়ক করে নিয়েছিলেন। এঁরা দুজনেই মনে করেন আমার বয়স খুব অল্প। তিনজন বড় বড় ছেলেমেয়ের মা শুনে জিজ্ঞেস করেন ভারতবর্ষের রীতি অনুযায়ী বাল্যবিবাহ হয়েছিল কিনা।

এ-দেশে দেখছি অনেকেই আমার বয়েস ধরতে পারছে না। আসলে ছেলেবেলা থেকে রং মাখার জন্য এদের চামড়া অল্প বয়সেই তেল হারিয়ে ফেলে খসখসে হয়ে ওঠে। কচি ভাবটা কমে যায়। তা ছাড়া, মুখে বড় সহজে দাগ পড়ে। তার কারণ, হিসেবে আমার একটা বিশ্লেষণ আছে। এরা কথা বলার সময়ে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ভীষণ হাতমুখ নাড়ে। এত পরিশ্রমেই দাগ ধরে। চীনেদের মুখ ভাবলেশহীন, বুড়ো বুড়ো চীনেদের চামড়াও কী মসৃণ! জাপানীরাও শান্তভাবে কথা বলে। তাদের মুখেও যাকে বলে রিংকল, তা একেবারেই নেই। ভারতীয়রাও খুব চঞ্চল নয়। তারাও শান্তভাবেই বলে চলে সেজন্য তাদের মুখেও দাগ পড়ে কম। ঐজন্যই আমার বয়েস বোঝে না। বোঝে না বলেই স্নেহের ভাবটা প্রবল।

এবার আমি সন্তর্পণে আমার কোথায় যাবার বাসনা সে কথাটা প্রকাশ করলাম।

খাওয়াদাওয়ার পরে কফি নিয়ে বসেই কথা হচ্ছিল। অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললাম, 'ভৌগোলিকভাবে একটা বিষয়ে আমস্টারডামের মতো আশ্চর্য শহর পৃথিবীতে আর কিন্তু কোথাও নেই। সেটা দেখলে হয় না?'

ডক্টর ওয়েভারেন বললেন, 'কী বলো তো?'

'আপনিই বলুন না।'

মিসেস ওয়েভারেন মাথা নাড়লেন, 'বেশ রহস্য করছো মনে হচ্ছে। জুতোর কথা বলছো নাকি?'

'জুতো? কী জুতো?'

'টুরিস্টরা স্যুভেনীর হিসেবে কেনে, জানো না? তুমি কেনো নি?'

'না তো!'

'দেখওনি?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি। ছোট ছোট কাঠের জুতো তো? অ্যাশট্রে, না?'

'না, না, অ্যাশট্রে নয়। এই আধ বিঘত জুতো এখানে কেন বিখ্যাত গল্পটা আমার শোনা ছিল, এখন মনে নেই। তোমার জানা আছে?' স্বামীর দিকে তাকালেন।

স্বামী তাঁর দিকে তাকালেন না। হাসতে হাসতে বললেন, 'ও, এই আশ্চর্য শহরের উৎস সন্ধানে যেতে চাও তুমি?'

আমিও হাসলাম। উনি বললেন, 'দেখ, কেমন ধরে ফেলেছি মনের কথা।'

বললাম, 'জাপানী মেশিন আছে নাকি পকেটে?'

উনি আমার মাথায় টোকা দিয়ে বললেন, 'ইয়ার্কি নয়। সাবধান। আমি মনস্তত্ত্ববিদ। সব কথা ধরে ফেলবো কিন্তু। গৃহদাহ হয়ে যাবে।'

বন্ধুদেব একবার ঘরে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে বললেন, 'কী ব্যাপার, কার গৃহদাহ হবে?'

'আর কার, তোমারই নিশ্চয়। তোমার স্ত্রী ভাবছেন আমার পকেটে মনের কথা ধরার জাপানী মেশিন আছে। ভয় পেয়ে যাচ্ছেন খুব। চলো, চলো, কোথায় যাব ঠিক হয়ে গেছে জায়গা।'

'কোথায়?'

'চলোই না! সমুদ্রের তলা থেকে একবার উপরে ওঠা যায় কিনা দেখে আসি।'

বন্ধুদেব তখনি বুঝে ফেললেন। আমার এই বাসনা ওঁর তো আর অজানা ছিল না! পূরণ সম্ভব নয় জেনেই উৎসাহ থাকলেও আর অগ্রসর হবার কথা ভাবা হয়নি।

মিসেস ওয়েভারেন বললেন, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

আমি বললাম, শুনে লাফিয়ে উঠলেন, 'চমৎকার আইডিয়া। চলো, চলো, আমিও দেখতে খুব উৎসুক।' (ক্রমশ)

# কণ্টককল্পিত

## অতুল্য ঘোষ

(নব পর্যায়)

॥ ৩৪ ॥

**বছরটা** ঠিক মনে নেই। তবে '৬২ সাল বা তার পরে। **ডুরাণ্ড** কাপের ফাইনাল খেলা। **ডঃ রাধাকৃষ্ণণ** তখন রাষ্ট্রপতি। ফাইনালের দিন **রাষ্ট্রপতি মাঠে** এসেছিলেন। আমি তখন **দিল্লীতে ছিলুম**। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দু দলের **পরিচয় করিয়ে** দিতে গিয়ে আমি বললুম, **'এই** আমাদের টিম ইস্ট বেঙ্গল—এই আমাদের **টিম** মোহনবাগান।' **রাষ্ট্রপতি** একটু হেসে **বললেন**, 'তুমি বাজে কথা বলছ। দুটো টিমই কি করে তোমার হবে?' তখন একজন রাষ্ট্রপতিকে বুঝিয়ে বললেন যে, অতুল্যবাবু আই এফ এ-র প্রেসিডেণ্ট। সব টিম সম্বন্ধে তাই উনি এ কথা বলতে পারেন।

আজকে বোধ হয় আর এ কথা বলা যাবে না। কলকাতায় রাজনীতির জগতে যা কোলাহল, তার চেয়ে খেলার জগতে বেশী আবর্ত। সবই বুদ্ধির অগম্য। আবার ইস্ট বেঙ্গল-মোহনবাগান নিয়ে ঘটি-বাঙালের কথাও শোনা যাচ্ছে। রাস্তায় আসতে আসতে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে যে, চিংড়ি মাছ টাঙানো, কি ইলিশ মাছ টাঙানো। এসব কিসের জন্য? এর সঙ্গে খেলার সম্পর্ক কি? আর খেলার জগতে ঘটি-বাঙাল এ কথা আসে কি করে? ১৯১১ থেকে মোহনবাগান ক্লাবকে যাঁরা যশের শিখরে তুলেছেন, তাঁদের মধ্যে কতজনের বাড়ি ইস্ট-বেঙ্গলে, তার খবর আছে কি? যত দূর মনে হয় ১৯১১য় ছিল সাতজন। আর পরের যুগে যাঁকে সমস্ত বিলেতের টিম ভয় করত, যিনি আজন্ম মোহনবাগানের সেবা করে গেছেন, সেই পরম শ্রদ্ধেয় গোষ্ঠ পালের বাড়ি কোথায়? ইংরাজী কাগজগুলো নাম দিয়েছিল 'চাইনীজ ওয়াল'। গোষ্ঠবাবু বল মারলেন, যে সাহেব বল মারতে এসেছিল, সেও বলের সঙ্গে শূন্যে উঠে গেল—এ গল্পকথা নয়, আমরা দেখেছি। ডাঃ সন্মথ দত্ত কোথাকার লোক? চুনি কোথাকার লোক? অবাক হয়ে ভাবি এসব কথা ওঠে কেন। যারা খেলে বা ক্লাবের মেম্বার, তারা ঘটিও নয়, বাঙালও নয়। তারা সেই ক্লাবের খেলোয়াড় এবং মেম্বার। এইটাই শ্রেষ্ঠ পরিচয়। আর তা ছাড়া আজকাল তো কর্ণাটক থেকে খেলোয়াড় আসে, পাঞ্জাব থেকে খেলোয়াড় আসে, হায়দ্রাবাদ থেকে খেলোয়াড় আসে, আবার ইরান থেকেও খেলোয়াড় আসে। কাজেই এখন ঘটি-বাঙালের স্থান কোথায়? আর হায়দ্রাবাদের যে খেলোয়াড়, সে ঘটি না বাঙাল? আর তা ছাড়া ক্লাব বদলের সময়ে এত নাম বেরোয় এবং সেই উপলক্ষে সংবাদপত্রে এত সব কাহিনী প্রচারিত হয় যে, খেলোয়াড়দের দলের প্রতি আনুগত্য নিয়েও বেশ মনে মনে সন্দেহ হয়। কাহিনীর কতটা গল্প, কতটা গুজব, কতটা সত্য জানি না। তবে এটা ঠিক যে ফুসফুস, গুজগুজ, কানাকানিতে টাকার

গোষ্ঠ পাল

লেনদেনের কথাও শোনা যায়। খেলোয়াড়রাই তো ক্লাবের আসল মর্যাদারক্ষক। সেই খেলোয়াড়দের মধ্যে অনেকেই যখন দল বদলের সময়ে অত্যন্ত উৎসাহে মেতে ওঠে, তখন সেই ক্লাবের বা টীমের মর্যাদা বিশেষ রক্ষিত হয় কি? ঘন ঘন দল-বদলের একটাই মানে হয়—ক্লাবের প্রতি মমত্ববোধের অভাব। রাজনীতিতে দল বদলের যখন হিড়িক পড়ে, তখন সেটা সর্বত্র

খেলার মাঠে বিশৃঙ্খলা

বেশ নিন্দনীয় বলেই অভিহিত হয়: তার থেকেই 'আয়ারাম-গয়ারাম' কথাটির সূত্রপাত। নেতারা যখন দল বদল করেন, তখন তাঁরাও সমালোচনার হাত থেকে অব্যাহতি পান না। অবশ্য রাজনীতিতে দেখা গেছে যে, গোটা দলই অন্য দলভুক্ত হয়ে গদি রক্ষা করেছে। খেলার মাঠে এখনও সেটা হয়নি। কিন্তু হতেই বা কত দেরি? কলকাতার বেশ নামজাদা একটি ক্লাবের অনেকগুলি খেলোয়াড় এবার অন্য ক্লাবে গেছেন। এর পর আবার ক্লাবের নিজস্ব মর্যাদার কথা ওঠে কি করে? তিনটি বড় ক্লাবের একটি ক্লাবের নামের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ জড়িয়ে আছে। কিন্তু সে ক্লাবেও অন্য সম্প্রদায়ের কতগুলি খেলোয়াড় খেলছেন? তা হলে সাম্প্রদায়িক জিগিরও তোলা আর চলে না। সেদিন অবধি একটি বড় ক্লাবের জনপ্রিয় সভাপতি ছিলেন ভাগ্যকুলের নামজাদা বংশোদ্ভূত। তার আগে তিনি বহু দিন ভাইস প্রেসিডেণ্টও ছিলেন। তা হলে কি করে সেই ক্লাবের সম্পর্কে ঘটি বা বাঙালের বিসংবাদের কথা ওঠে? আর খেলার জগৎ তো সেইজন্যে নয়! কিন্তু আজ এ কথার কোন দাম আছে বলে মনে হচ্ছে না। এখন যেন ট্রফি পাওয়া নিয়েই কথা। তা সে যত অদল-বদল করেই হোক, বা অন্য যেভাবেই হোক। কাগজে মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায় যে, অমুক প্লেয়ারকে অমুকের বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছে, তা সে দল বদলে বাধ্য করার জন্যেই হোক বা দল বদলে বাধা দেবার জন্যেই হোক। এর মধ্যে ক্লাবের মর্যাদা কোথায়? তা হলে মাঠে যেসব গোলযোগের সৃষ্টি হয়, তার কারণটা কি? এবারের গোলমাল তো খেলার মাঠ থেকে বেরিয়ে ওয়েলিংটনের মোড় অবধি এসে গিয়েছিল। কিসের জন্য এই অশান্তি? এ কি ব্যক্তিগত? আগে মাঝে মাঝে শোনা যেত বটে যে, বিরুদ্ধ ক্লাবের কর্তৃপক্ষকে বলে-কয়ে অনুপস্থিত করে বা খারাপ খেলিয়ে কোন কোন ক্লাব জয়লাভ করেছে। সে রটনা খুবই সামান্য ছিল। এখন তো আর রটনা নেই, এসব কথা সকলের মুখে মুখে। প্রাণহানির দৃষ্টান্তও এখন বিরল নয়। রেফারীর মার খাওয়া, কোচের মার খাওয়া—এসব দৃষ্টান্তও বর্তমানে স্থাপিত হয়েছে। আবার খেলতে গিয়ে না বলে চলে আসা, তার দৃষ্টান্তও আছে। যে ক্লাবের খেলোয়াড় সেই ক্লাবের সমর্থকরাই তাদের প্রহার করেছে—এ দৃষ্টান্তও ভূরি ভূরি। তা হলে আর বাকি রইল কি? তা হলে খেলার নাম করে সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি কেন?

বর্তমানে বড় দুটি দলের মধ্যে খেলা আছে শুনলে নাগরিকরা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। ছেলে-মেয়েরা খেলা দেখতে যাবেই। বাড়ির লোকেরা বাধা দিলেই তাদের বলা হবে যে, ছেলে-মেয়েদের খেলা দেখার উৎসাহে তাঁরা বাধা দিচ্ছেন। কিন্তু অভিভাবকরাও তো নিরুপায়। কোন ছেলেমেয়ে ফিরলই না, কেউ ফিরল রক্তাক্ত দেহে, আবার কেউ ফিরল অর্ধোলঙ্গ অবস্থায়। আর এই যে অবস্থা হয়, তার পেছনে কোন যুক্তি বা কোন সভাভব্য কথা থাকে না। যে-কোন ছেলেমেয়ের যে-কোন সময়ে এই অবস্থা হতে পারে। এর নাম খেলা দেখা।

মুখ্যমন্ত্রী মশাই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ। কিন্তু মনে হয় সেটা কেবলমাত্রই বাণী। তা নইলে যেখানে প্রায় এক ডজন স্থানীয় মন্ত্রী, একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন, সেখানে এক ঘণ্টা ধরে নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহৃত হল কি করে? পুলিসকে দোষ দিয়ে লাভ কি? পুলিস যদি একটু বেশী আগ্রহ দেখায় এবং তাতে যদি কোন দল মনে করে যে, এতে খেলোয়াড়ী মনোভাব দেখানো হচ্ছে না, তা হলে সেই পুলিসকে রক্ষা করার তো কেউ নেই! যখন মন্ত্রীদের চোখের সামনে এইসব ঘটনা ঘটে, সেখানে পুলিসের সাধ্য কি বিশেষ-ভাবে সক্রিয় হবার! বেশ ভাল করে ভেবে দেখলে বুঝতে পারা যাবে যে, খেলার মাদকতা আজকে যতটা, তার চেয়ে ঢের বেশী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার মাদকতা। অভিনব দৃশ্য এবার দেখা গেল। মেম্বার গ্যালারীতেও পুলিস ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তার একটাই মানে হয়। এইসব মেম্বার গ্যালারী,

হয়েছে। পুলিস যে অনর্থক হাঙ্গামা করেনি তা প্রমাণিত হয়েছে কোন বড় ক্লাবের পক্ষ থেকে মেম্বারস গ্যালারীতে হামলার কোন প্রতিবাদ দেখা যায়নি। অনেক নিরীহ মেম্বারও আহত হয়েছেন। কিন্তু ক্লাব কর্তৃপক্ষ একেবারে চুপ। তা হলে যদি এ কথা মনে করা হয় যে, এইসব হাঙ্গামা সৃষ্টির পেছনে ক্লাব-কর্তৃপক্ষের সমর্থন আছে, তা হলে কি খুব ভুল হবে? তা হলে খেলার মাঠে রইলটা কি? খেলার প্রতি যাঁদের অনুরাগ আছে, তাঁরা কখনও খেলোয়াড়-দের বা দর্শকদের আঘাত করতে পারবেন না। ক্লাবের প্রতি যদি অনুরাগ থাকত, তা হলে কখনও এত দল অদল-বদল হত না। খেলার মাঠে একটা গল্প চালিত আছে। দুটো বড় ক্লাব তাঁদের জার্সি একটা কুকুর এবং একটা গাধার গায়ে পরিয়ে রঙ্গ-তামাশা করেছিলেন। গোষ্ঠ পাল মশাই কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন যে, জার্সির অসম্মান তো ক্লাবের অসম্মান! আর জার্সি তো আজকাল শখের থিয়েটার বা যাত্রাদলের ভাড়া-করা পোশাকের মত। যে-কেউ যে-কোনদিন যে-কোন জার্সি গায়ে দিতে পারে। কেন বদল করে জানি না, তবে বদল হচ্ছে এটা সত্য এবং এত তাড়াতাড়ি বদল হচ্ছে যে, অনেক সময়ে মনে হয় যে, আসছে বছর হয়তো ঐ খেলোয়াড়ের গায়ে অন্য জার্সি দেখতে পাওয়া যাবে। তা হলে খেলার মাঠে রইল কি? কিছু অর্থ সংগ্রহ? যদি অর্থ সংগ্রহই হয়, তা হলে সমগ্র কলকাতায় খেলার জগৎকে দূষিত করছে। খেলার মাঠের মধ্যে যে জায়গা সাধারণের পক্ষে নিষিদ্ধ, সে জায়গায় আগে কিছু ক্লাব-কর্তৃপক্ষ এবং খেলোয়াড়দের দেখা যেত। আজকাল তো ডজনে ডজনে, শয়ে শয়ে লোক সেখানে বসে আছেন। এঁরা কারা? এঁদের জন্য কি কোন আলাদা টিকিট আছে, যাতে তাঁরা ঐ নিষিদ্ধ জায়গাতেও গিয়ে বসতে পারেন? আর পুলিস তো এঁদের দেখতে পায় না! আর সেটাই স্বাভাবিক। কারণ, ক্লাব-কর্তৃপক্ষ যেখানে নিয়ম ভঙ্গ করে এঁদের বসতে দিচ্ছেন, সেখানে পুলিস নজর দেবে কেন?

এবারে ফেডারেশন কাপের খেলা নিয়ে কলকাতার খেলার জগৎ এক মর্মান্তিক নজির সৃষ্টি করেছে। অনেকে নিজেদের মধ্যে প্রতিবাদ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু কেউ মুখর হননি। ভয়ে? ২৫ বৈশাখ বিকালে ফেডারেশন কাপের ফাইনাল খেলা। ঐদিনটি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবাসীর কাছে পরম গৌরবের দিন—বিশ্ব-কবির জন্মদিন। এই রাজ্যে আরও অনেক যেসব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন, তাঁদের অনেকের সম্বন্ধে আমরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কয়েকজন মুষ্টিমেয় প্রগতিশীল(!) ব্যক্তি ছাড়া তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে কোন বাঙালীই পশ্চাৎপদ নয়। তাঁর জন্মদিনের বিকেলে কলকাতার দুটি জনপ্রিয় ... খেলার অনুষ্ঠান করে কলকাতার খেলার জগৎ এক অভিনব কীর্তি (!) স্থাপন করল। সেদিন রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষে ছোট বড় কত অনুষ্ঠান যে ব্যাহত হয়েছে, সে খবর খেলার জগৎ রাখে না। যিনি শ্রদ্ধেয়, শত অব-হেলায় তাঁকে শ্রদ্ধার আসন থেকে নামানো যায় না। কিন্তু করুণা হয় খেলার জগতের কর্ম-কর্তাদের অবস্থা দেখে। তাঁদের ঔদাসীন্য যে বহু লোকের কাছে তাঁদের নিন্দার্হ করেছে, এ সত্য তাঁরা জানেন না। বিস্ময় লাগে এই ভেবে যে, রবীন্দ্রনাথ যে মাটিতে জন্মেছিলেন, এঁরাও সেই মাটিতে জন্মেছেন। ভাবতেও অবাক লাগে যে, এই ঘটনা ঘটল কি করে? শোনা যায় যে খেলার মাঠে দিন স্থির করার দায়িত্ব সম্পূর্ণ সরকারের উপর। তাঁরা সকালে রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণে তাঁদের দায়িত্ব সেরেছেন। ব্যস্, তাঁদের ধারণা তাইতেই তাঁদের দায়িত্ব শেষ হয়েছে। সরকার অবশ্য নৈর্ব্যক্তিক। কিন্তু যাঁরা খেলার জগতের কর্তা, তাঁরা ভবিষ্যতের জন্য যে দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন, তা চট করে মুছে যাবে না। দুঃখ তা নয় যে, কেবলমাত্র খেলার জগতের কর্তৃপক্ষ এই কাজ করেছেন; দুঃখ এই যে, খেলার জগতের সঙ্গে যেসব সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি জড়িয়ে আছেন, তাঁরাও কি করে এই অপরাধে মূক-বধিরের অংশ গ্রহণ করলেন? এই প্রসঙ্গ আর না বাড়ানোই ভাল। খেলার জগতের বহু কেলেঙ্কারির মধ্যে এই ঘটনা বহু দিন অনেকের মনকে পীড়া দেবে।

## কেন আসো, কেন যাও

**শান্তনু দাস**

নিজেকে উদোম ক'রে নারী বা শিশুরা আসে
পিতৃত্বের কাছে।
তোমার পায়ের নীচে মাটি দিয়েছিলো—জন্মভূমি।
মায়ের বুকের মধ্যে ঠোঁট গুঁজে বড়ো হতে
ঈশ্বরই শিখিয়ে দ্যায় তবু—
তোমার প্রতিভূ থাকে আরেক শরীরে,
যাকে তুমি দ্যাখোনি, জানো না, তবু তাকে—
কখনো শব্দের কাছে, কখনো বা উপবীত
ঢেউ হয়ে ভাঙে।

কখন টিপের মতো সূর্য ওঠে ভোরে।
বুকের জলায় এসে নামে।
কেউ দ্যাখে, কেউ বা কখনো সেঁকে—আতুর শরীর।
সূর্য বা আগুন ছাড়া কে এত বিশ্বাসী হ'তে পারে।
গভীর জলের মতো শান্তি
গভীর দুঃখের মতো রাত
গভীর রাতের মতো নীরবতা
ক্রমশঃই চলে যায় সর্বস্বহীনতায়।
পৃথিবী তোমার মতো তৈরী হ'তে শেখেনি কখনো।

নিজের গাণ্ডীব নিতে ভুল হ'য়ে যায়।
ভুলে যাই বীজমন্ত্র।
চোখের জলের সাথে হাওয়া উড়ে এলে—
বুক কাঁপে।
কেন আসো, কেন যাও? ডুবে থাকো দুঃখের শরীরে।
এত ভিড়ে খুঁজে পাও,
খুঁজে পাও মধ্যমপান্ডব?
খুঁজে কি পেয়েছো তুমি অনন্ত আড়ালে?
আমরা এখনো ডালে মিশে আছি লতায় পাতায়।
আঠায় রক্ত জমে গেলে মুছে ফেলতে বড় কষ্ট হয়,
তবু এ সময়—কবি কিংবা শব্দকে মানে না
শুধু নতজানু হয়।

## পাতা

**শোভন মহাপাত্র**

ধুলোর ভিতরে পাতা, পাতার ভিতরে মরা দেশ
সবুজ আলপনা আঁকা মৌন প্রকৃতি আর স্বপ্ন-ভুবন;
তুচ্ছ পাতার জন্য মানুষের এত সাধ, এত স্বপ্ন, মায়া,
সন্ধ্যায় কাকভোরে ভেসে ওঠে ছোট্ট মানুষের ছায়া!

তার হাতে কিছু নেই, তবু তার পাতা
ভূগোলের ছবি এঁকে এঁকে বেঁধেছে সে খাতা—
ধুলোর ভিতরে শান্ত সুধাময়, ভুল
নদীতে ভাসান-খেলা, কুয়াশার ফুল?

## টেরেসাকে ব্যক্তিগত

**রবীন আদক**

একটি করুণ হাত বাড়িয়ে দিয়েছ,
কি দেব তোমার করতলে?
আমাদের লুব্ধ নখে অন্ধ পাপ
রক্তে ভিজে আছে,
আমাদের হৃৎপিণ্ডের জবাফুলে নীল ডুমো মাছি!
এমন অশুচি
সময়ের সাচীকৃত মুখের উপর
শিশির পড়ে না স্বর্গ থেকে,
সর্বস্ব জুয়ায় বাজি রেখে
আমরা এখন এক দীর্ঘ মোমবাতির
দু'পাশে আগুন জেবলে পোহাই আঁধার,
তুমি সেই আত্মভুক আলোর তিমিরে
দু'চোখে জেবলেছ, সন্ন্যাসিনী,
ঘৃতদীপ, বর্ণপরিচয়—
তোমার বুকের মধ্যে দুঃখী শিশুদের বাড়িঘর,
ক্রুশবিদ্ধ আতুর ঈশ্বর
তোমার আহ্নিক স্পর্শে আরোগ্যপ্রবণ,
তুমি দুঃখী সিদ্ধার্থের রক্তে-ডোবা হাঁস
বুকের প্রসূনে রেখে, ভিখারী জননী,
একটি করুণ হাত বাড়িয়ে দিয়েছ,

কি দেব তোমার করতলে?

## পাখি চাই

**রাণা মজুমদার**

কত যে শেখালাম পাখি বল তুই কৃষ্ণনাম বল
তা না সে কেবলি বলে পাখি চাই পাখি চাই পাখি—
আমার ছিল না কিছু খাঁচাটাই যা ছিল সম্বল,
নরম পিচ্ছিল গা, দেখি তার বিস্ফারিত আঁখি;
উড়াল দিস না পাখি উড়লে যে বাজে নেবে তোকে,
খুঁটে খা সঞ্চিত দানা তৃপ্তিতে গা না তুই গান—
অধীর অবাধ্য ডানা উড়ে গেলে বলবে কি লোকে;
পা ধরে সেধেছি তবু চোখে জল বুকে অভিমান।

আকাশে ত বৃক্ষ নেই, হা হা শূন্য নেই কোন কাঁটা,
বনজ শস্যের গন্ধ ভেসে আসে প্রসন্ন বাতাসে—
অলীক সান্নিধ্যে আছি শরীরে লৌকিক আড়াল,
সমস্ত দৃশ্যের সামনে ক্যামেরার কাঁচ থাকে আঁটা;

সুবর্ণমণ্ডলে পাখি উড়ে যায় অদ্ভুত আয়াসে
পীতাভ অগ্নির বর্ণে লিপ্ত হবে নৃপতি, চণ্ডাল।

## ভবিষ্যতে কোন খরচের পরিকল্পনা আছে ? তার জন্যে ভাবনা কিসের ?

# ভবিষ্যতে যতই খরচের পরিকল্পনা থাকুক না কেন, কথা দিচ্ছি, কানাড়া ব্যাঙ্ক সেই খরচের অর্ধেক টাকা যোগান দেবে

সময় থাকতে টাকা জমানো শুরু করলে সবকিছুই আপনার সামর্থ্যের মধ্যেই এসে যাবে। ভবিষ্যতের এই সব পরিকল্পনা রূপ দেওয়ার জন্য আপনাকে সাহায্য করতে কানাড়া ব্যাঙ্কের একটি বিশেষ জমা প্রকল্প রয়েছে।

কি চাই বলুন না—গাড়ি ? স্কুটার ? নিজের বাড়ি ? না কি ছেলেমেয়ের উচ্চশিক্ষা কিংবা বিয়ের খরচ ? কামধেনু জমা প্রকল্পের সাহায্যে আপনি খুব সহজেই আপনার টাকা দ্বিগুণ করে নিয়ে সবচেয়ে বেশি লাভ ঘরে তুলতে পারেন।

এই প্রকল্পের সবচেয়ে উল্লেখজনক দিক হল যে এতে আপনার প্রয়োজনীয় অর্থের একটা সামান্য অংশ জমা দিতে হবে। আপনি শুধু জমা টাকার অংক এবং মাসের সংখ্যাটা ঠিক করে ফেলুন। ব্যস, এরপর সুদের উপর সুদ জমতে জমতে মাসের পর মাস বেশ মোটা টাকাই আসবে। ফলে আপনার জমা টাকা হয়ে দাঁড়াবে দ্বিগুণেরও বেশি।

বিশদ বিবরণের জন্য কানাড়া ব্যাঙ্কের নিকটবর্তী শাখায় চলে আসুন। আমাদের অন্যান্য আরও বিশেষ প্রকল্পের মধ্যে আছে বিদ্যানিধি, নিরন্তর এবং বালক্ষেম।

## কামধেনু ডিপোজিট

## কানাড়া ব্যাংক

(একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক)

সারা দেশে এই ব্যাঙ্কের ১২০০-রও বেশি শাখা আছে

GROWING TO SERVE · SERVING TO GROW · CANARA BANK

# সেই সময়

## সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৫০ ॥

নিয়তি ঠাকুরাণী বড়ই কৌতুক পরায়ণা। প্রকৃতির রাজ্যে যে-সব নিয়ম প্রতিষ্ঠিত আছে, মাঝে মধ্যে তার কিছু কিছু ভণ্ডুল করে দিতেই ওঁর বেশী আমোদ। প্রকৃতির পাখিরা মুক্ত আকাশে স্বাধীনভাবে উড়ে যায়, আবার নিয়তির পাকচক্রে তাদের মধ্যেই দু'দশটি পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়। নিয়তির কৌতুকে আজ যে রাজা কাল সে ফকির, আবার ঘুঁটে-কুড়ানীর পুত্রও অর্ধেক রাজত্ব সমেত রাজকন্যা পায়। পথের ঝাঁকা-মুটে কঠোর পরিশ্রম করেও পরিবারের জন্য দু বেলার গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করতে পারে না, অথচ ধনীর দুলাল, যে সারাদিন নিজের হাতে কুটোটিও নাড়ে না, সে নানাবিধ অত্যুত্তম খাদ্য সামগ্রীর সামনে বসে নাক কুঁচকে দিয়ে বলে, এটা খাবো না, ওটা খাবো না। নিয়তি অতি নিষ্ঠুর, এতই নিষ্ঠুর যে মানুষ কোনোদিন তার মূর্তি পর্যন্ত কল্পনা করেনি।

সিংহ পরিবারের প্রতি নিয়তির নেকনজর যেন একটু বেশী। এ বাড়ির গঙ্গানারায়ণকে নিয়ে তিনি কম খেলা খেলেন নি, আবার আর একবার খেললেন।

নীলকর সাহেবরা গঙ্গানারায়ণের নামে যে বিভিন্ন মামলা দায়ের করেছিল, আদালতের বিচারে গঙ্গানারায়ণ তার সব কটিতেই বে-কসুর খালাস পেয়ে গেল। বিচারকদের মধ্যেও তো দু-একজনের সত্যি সত্যিই আইনের প্রতি আনুগত্য থাকে। এমনকি শ্বেতাঙ্গদের মধ্যেও তেমন ব্যতিক্রম আছে। জাস্টিস পীককোর্ড গঙ্গানারায়ণকে সসম্মানে মুক্তি দিয়ে মন্তব্য করলেন যে নিঃস্বার্থভাবে এই ব্যক্তি নীলচাষের ব্যাপারে কয়েকটি অযৌক্তিক ব্যবস্থার প্রতিকার বাসনায় সাধারণ নিরীহ চাষীদের সাহায্য করতে গিয়েছিলেন, তার ফলে ইনি নিজেই অত্যাচারিত হয়েছেন। এই প্রকার ব্যক্তিদের শাস্তি দিলে দেশের আইনশৃংখলার প্রতি প্রজাদের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবার আশংকা আছে।

এদিকে ইণ্ডিগো কমিশন চলছে। গঙ্গানারায়ণের মামলায় এরকম রায়ে অনেক সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা, সেই জন্যই দেশীয় ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্রগুলিতে ফলাও করে এই বৃত্তান্ত ছাপা হলো। অতি ঘনিষ্ঠমহল ছাড়া গঙ্গানারায়ণকে বিশেষ কেউ চিনতো না, সে বিখ্যাত হয়ে পড়লো রাতারাতি। তার কীর্তিকাহিনী নানাভাবে অতিরঞ্জিত হয়ে এবার ছড়িয়ে পড়লো শহরের লোকের মুখে মুখে। অনেকে গঙ্গানারায়ণকে একবার চাক্ষুষ দেখার জন্যও সিংহসদনের দ্বারের সামনে এসে ভিড় করে।

গঙ্গানারায়ণ অবশ্য এই ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো খুবই। সে লোকের সামনে থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, নিজের কক্ষে লুকিয়ে থাকে। এমনকি সে চিন্তা করতে লাগলো যে কলকাতা ছেড়ে কিছুদিনের জন্য অন্য কোথাও ঘুরে আসবে কি না। ঠিক এই সময় নিয়তি দেবী অলক্ষ্যে গঙ্গানারায়ণের দিকে চেয়ে হাসলেন।

আধুনিক কালের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে যিনি শিরোমণি, সেই এজু-রাজ রামগোপাল ঘোষ স্বয়ং একদিন গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে দেখা করে একটি প্রস্তাব দিলেন। না ভেবেচিন্তে হুট করে কোনো কথা বলেন না বলেই রামগোপাল ঘোষের মতামতের বিশেষ গুরুত্ব আছে। হরিশ মুখুজ্যে রামগোপাল ঘোষের বিশেষ অনুগত, এক সময় হরিশ রামগোপালের গৃহের সান্ধ্য আড্ডার নিয়মিত যেতেন। কিন্তু সেখানে পরিমিত মদ্যপান হয় বলে ইদানীং হরিশ আর বড় একটা যান না, কিন্তু রামগোপালের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ আছে।

রামগোপাল বললেন, হরিশের কাছ থেকে আপনার বৃত্তান্ত সব শুনিচি। ইউ আর এ মারভেল! অথচ আপনি এত মডেস্ট, এত সফ্‌ট স্পোকেন, এই আপনিই রুখে ধরেচেন কতকগুলিন ব্লাড হাউণ্ড ঐ প্ল্যানটারগুলিনের বিরুদ্ধে.... এ যে বিশ্বাসই করা যায় না।

গঙ্গানারায়ণ মস্তক অবনত করে বললেন, হরিশ সব কিছুই বাড়িয়ে বলেন, রুখে ধরিচি বটে কিন্তু কারার বরিচি মাত্র একবার।

রামগোপাল অল্পকালের মধ্যেই সরাসরি চলে এলেন মূল প্রসঙ্গে। তিনি বললেন, আমার নিজের পক্ষ থেকে এবং আরও অনেকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি একটি নিবেদন আছে। আপনি বাগবাজারের কৃষ্ণনাথ রায়ের বিধবা কন্যা কুসুমকুমারীকে বিবাহ করার কথা বিবেচনা করে দেখুন।

গঙ্গানারায়ণের মাথায় যেন একেবারে আকাশ ভেঙে পড়লো!

গঙ্গানারায়ণের মতন, কুসুমকুমারীর নামটিও এখন একেবারে অপরিচিত নয়। কৃষ্ণনাথ রায়ের মতন একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি যে তাঁর বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দিতে চেয়েছেন এবং সেজন্য পাত্র খোঁজাখুঁজি চলছে, এ সংবাদ ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছে শহরে। এখন ঐ বিবাহের ব্যাপারটি আর শুধু বাগবাজারে কৃষ্ণনাথ রায়ের পরিবারেই আবদ্ধ নেই। বিধবা বিবাহের সমর্থকরা এই উপলক্ষে আবার কোমর বেঁধে ওঠে পড়ে লাগলেন, যেমন করেই হোক, এই কন্যার বিবাহ দিতেই হবে। অন্যদিকে গোঁড়ার দলও নিশ্চেষ্ট হয়ে নেই, তারা ভেবেছিল, এর মধ্যেই বিধবা বিবাহের ঝোঁক স্তিমিত হয়ে গেছে, আর কিছুদিনের মধ্যেই লোকে এই অনাচার সম্পূর্ণ বর্জন করবে। তার মধ্যে আবার এ কি হাঙ্গামা! কৃষ্ণনাথ রায়ের মতন ধীর, স্থির ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির কি হঠাৎ বুদ্ধিনাশ হলো! গোঁড়ার দল রাজা রাধাকান্ত দেবকে গিয়ে ধরলো, আপনি যেমন করেই হোক এই বিয়ে আটকান!

কৃষ্ণনাথ রায়ের সঙ্গে শহরের অন্য অনেক ধনী ব্যক্তির ব্যবসা-বাণিজ্য সূত্রে সম্পর্ক আছে। তারাও এই বিবাহ বন্ধ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে লাগলো নানাপ্রকারে। কৃষ্ণনাথ নিজ সিদ্ধান্তে অবশ্য এখনো অনড় আছেন, তবে তাঁর একটাই শর্ত। কুসুমকুমারীর প্রথম বিবাহের সময় তিনি ভুল করেছিলেন, এবার ভালো করে দেখে শুনে পছন্দ মতন পাত্র না পেলে যার তার হাতে তিনি তাঁর এই আদরিণী কন্যাকে তুলে দেবেন না।

পাছে বিরুদ্ধ পক্ষীরা কোনো ষড়যন্ত্র করে কিংবা অকস্মাৎ আবার কৃষ্ণনাথ রায়ের মত পরিবর্তিত হয়, তাই বিধবা-বিবাহ-সমর্থকরা যত শীঘ্র সম্ভব এই বিবাহ সম্পাদিত করাতে চায়। এ সব ব্যাপারে কালহরণ মানেই অশুভ। এ পর্যন্ত কোনো পাত্রকেই কৃষ্ণনাথ রায় মনোনীত করেন নি। কুসুমকুমারীকে যারা চক্ষেও দেখেনি, কৃষ্ণনাথ রায়ের পরিবারের সঙ্গে যাদের কোনো প্রকার সম্পর্ক নেই এমন শত শত ব্যক্তি কুসুমকুমারীর জন্য পাত্র অন্বেষণে তৎপর। এদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষের মতন ব্যক্তিও আছেন। বিদ্যাসাগর অবশ্য এ ব্যাপারে কোনো নিজস্ব উদ্যোগ নেননি, তবে কুসুমকুমারীর বিবাহের দিনক্ষণ ধার্য হলে তিনি স্বয়ং যে বিবাহ বাসরে উপস্থিত থাকবেন সে কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

বলা যায় সত্যিই প্রায় শতাধিক ব্যক্তির মুখপাত্র হয়েই এসেছেন রামগোপাল। বিভিন্ন সম্মিলনীতে আলোচনায় এই জনমতই গড়ে উঠেছে যে গঙ্গানারায়ণ সিংহই কুসুমকুমারীর যোগ্যতম পাত্র। এমন উদার ও মহৎ মানুষ এখন সারা দেশেই দুর্লভ, তদুপরি সে ধনী ও অভিজাত বংশের সন্তান, সুশ্রী, স্বাস্থ্যবান, সুগঠিত শরীরের অধিকারী এবং বিপত্নীক। কৃষ্ণনাথ রায় কোনো কারণেই গঙ্গানারায়ণকে অপছন্দ করতে পারবেন না।

গঙ্গানারায়ণকে সম্পূর্ণ নীরব দেখে রামগোপাল ঘোষ আবার বললেন, আমি কন্যাপক্ষের লোক নই, সুতরাং আমার কাচ থেকে এ প্রস্তাব শুনে ইউ মে বী জাস্টিফায়েবলী সারপ্রাইজড.... কিন্তু আসলে আমরা পাত্রপক্ষেরই, আপনার কাচ থেকে সম্মতি পেলে মেয়ে পক্ষের কাচে গিয়ে কতা পাড়বো।

গঙ্গানারায়ণ এবার ধীর কণ্ঠে বললেন, আপনি কষ্ট করে আমাদের বাড়িতে এসেচেন, আমরা কৃতার্থ হইচি, আমার ছোট ভাই এখন গৃহে নেই সে আপনাকে দেখলে খুবই আহ্লাদিত হতো, তবে.... দুঃখের বিষয় এইটুকুই যে আপনাদের নির্বাচন ভুল হয়েছে, আমার আর বিবাহ করার ইচ্ছে নেই। আমি আর সংসারী হতে চাই না।

রামগোপাল হেসে বললেন, আপনি বন-জঙ্গল ছেড়ে সংসারে ফিরে এসেচেন। সংসারে থাকলে তো সকলকেই সংসারী হতে হয়।

—অনেক সংসারেই আবার দু-একজন আলগোচ ধরনের মানুষ থাকে, যারা সাতে-পাঁচে যেতে চায় না। মিঃ ঘোষ, আমি বাকি জীবনটা খোলামেলা থাকতে চাই!

—আপনি চাইলেই বা আমরা দোবো কেন? দেশের স্বার্থে, সমাজের স্বার্থে আমরা চাই আপনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করুন।

—দেশের জন্য আপনি আর যা হোক কর্তে বলুন, কিন্তু বিবাহ কর্তে বলবেন না।

—দেশের জন্য মানুষ প্রাণ পর্যন্ত দেয়, আর আপনি বিবাহের মতন একটা সামান্য কাজ কর্তে পারবেন না? এই দেকুন না, সিপয় মিউটিনির সময় দিল্লির বারুদখানা দখল রাখবার জন্য কজন ইংরেজ কেমন স্বেচ্ছায় প্রাণ দিলে—।

—মিঃ ঘোষ, আমার গাঁয়ে গেরুয়া হাওয়া লেগে গ্যাচে, আমার আর দারা-পুত্র-পরিবারে মন বসবে না।

—হাওয়া পাল্টাতে আর কতক্ষণ! দেকুন না, দেশের হাওয়াই এখন উল্টো দিকে বইচে।

আরও কিছুক্ষণ এরকম কথার পিঠে কথা চলল, কিন্তু গঙ্গানারায়ণ বিবাহে সম্মতি দিল না। শেষ পর্যন্ত তাকে আরও একটু বিবেচনা করতে বলে রামগোপাল ঘোষ বিদায় নিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা সেখানেই ক্ষান্ত হলো না। এরপর গঙ্গানারায়ণের ওপর আক্রমণ আসতে লাগলো নানা দিক দিয়ে। হরিশ মুখুজ্যের কাছেও এ সংবাদ পৌঁছেচে, তিনিও এতে খুব উৎসাহী। গঙ্গানারায়ণের বন্ধুরা গৌরদাস, রাজনারায়ণ, ভূদেব এমনকি মধুসূদন পর্যন্ত দেখা হলেই তাকে ঐ কথা বলেন। সকলেই

অতএব যে একটা বড় কাজ-এর জন্য গঙ্গানারায়ণের একটি বিবাহ করা উচিত।

রাজনারায়ণ ত'ার স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার ভঙ্গিতে বললেন, ওরে গঙ্গা, সেকেলে স্বয়ম্বর সভার কথা শুনিচিস তো, তোর হলো গে একেলে স্বয়ম্বর সভা। আমরা সবাই মিলে ভোটে তোকে বর নির্বাচন করিচি এখন তো তোর পেচপাও হলে চলবে না।

গঙ্গানারায়ণ বললো, আমি কি নমিনেশান পেপার সাবমিট করিচিলুম যে তোরা আমায় ইলেক্ট কল্লি—

রাজনারায়ণ বললেন, ক্রমওয়েলকে যখন রাজা করা হলো, তখন তিনি কি নমিনেশান পেপার সাবমিট করেচিলেন? সবার ক্ষেত্রে লাগে না।

—অর্থাৎ আমার দশাও ক্রমওয়েলের মতই হবে।

—তা ভাই, বিয়ে করা মানেই তো একরূপ ফাঁসী কাঠে চড়া নয়? তুই একবার বিয়ে করেই এত ভয় পেয়ে গেলি? এই দ্যাক না, গৌর, মধু আমি আমরা সবাই তো দুবার করে মাথা মুড়িয়িচি, আর দেরি করিস নি, তুই এবার দুর্গা বলে ঝুলে পড়।

—আমাকে এমন অনুরোধ করে আর বিব্রত করিস নি তোরা।

—তুই কি বিধবা কত্তে ভয় পাচ্চিস? দ্যাক্, বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের অনেক আগেই আমার দ্বিতীয় বিয়ে হয়ে গেচে, নইলে আমি নিশ্চয়ই কোনো বিধবার পাণিগ্রহণ করে অন্তত একজন দুঃখিনী বালিকার দুঃখ দূর কত্তুম। কিন্তু আমি নিজে উদ্যুগী হয়ে আমার দুই ভায়ের বিয়ে দিইচি দুই বিধবার সঙ্গে। তখন লোকে কত ভয় দেখিয়েছেল আমায়। আমি মেদিনীপুরে বাংলো বাড়িতে থাকি, বলে কিনা রাতের বেলা আমার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবে! আমি বলেচিলুম, দিক দেকি একবার। বোড়ালের লোকেরা বললো, আমি গ্রামে গেলে আমায় ইট মারবে। আমি একটা মোটা লাঠি হাতে নিয়ে গ্রামে যেতুম। তোর যদি কোনো বিপদ হয়, আমরা সকলে মিলে তোর পাশে থাকবো।

গঙ্গানারায়ণ মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, না, না, আমি সে কথা বলচি না, সে কথা বলচি না—!

গঙ্গানারায়ণ তর্কবাগীশ নয়। সকলের কাছেই সে যুক্তিতে হেরে যায়, কিন্তু তার মন মানে না। অবস্থা এমন হয়েছে যে তার এখন আর কোথাও যাবার উপায় নেই, সব জায়গাতেই ঐ এক কথা। এরা সকলে মিলে গঙ্গানারায়ণের মনের কষ্ট অনেক বর্ধিত করে দিল।

এতদিন পর আবার বারবার মনে পড়তে লাগলো বিন্দুবাসিনীর কথা। কুসুমকুমারীকে চক্ষে দেখেনি গঙ্গানারায়ণ, কিন্তু তার যে বয়সের কথা সে শুনেছে, সেই বয়সেই বিন্দুবাসিনীকে গোপনে চিরতরে প্রেরণ করা হয় কাশীতে। কৈশোরের ক্রীড়াসঙ্গিনী বিন্দুবাসিনীর মুখ, ঠিক যেন গর্জন তেল মাখা প্রতিমার মুখের মতন, আর সেই সময়কার সুমধুর দিনগুলি গঙ্গানারায়ণের স্মৃতি পটে কতকগুলি স্থির চিত্রের মতন দোলে। তারপর বারানসীর বিন্দুবাসিনীকে মনে পড়া মাত্র তার বুকের মধ্যে যাতনা শুরু হয়। যেন সবকটি তন্তু থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্তপাত হচ্ছে। শেষের সেই অমোঘ কালরাত্রিতে বজরা থেকে নেমে নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে বিন্দু আঃ আঃ শব্দ করেছিল, সে রকম বুক ফাটা আর্তনাদ মানুষের কণ্ঠ থেকেও বেরোয়! তার আগে বিন্দুবাসিনী নেশাচ্ছন্ন গলায় অন্তত দুবার বলেছিল, আমার কিচুই পাওয়া হলো না রে, গঙ্গা! এমন বঞ্চিত কাতোরোক্তি কি গঙ্গানারায়ণ কোনোদিন ভুলতে পারবে? সে প্রাণপণে ভুলে থাকার চেষ্টা করেছিল, কেন সকলে মিলে তার সেই দুঃসহ স্মৃতিকে আবার উস্কে দিতে চায়!

বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের কথা গঙ্গানারায়ণ কারুকে বলেনি, এই গোপনীয়তার বিপুল ভার সে সারা জীবন একলা বহন করবে। কোথায় গেল বিন্দুবাসিনী? সে নিশ্চয় স'াতার জানতো না। নগর কলকাতার বনেদী পরিবারের পুরাঙ্গনা, তাও বালবিধবা, তার সন্তরণ শিক্ষার সুযোগ কোথায়? তা ছাড়া বাঁচতে তো সে চায়নি, ইচ্ছে করে লাফ দিয়েছিল নৌকো থেকে, জলের গভীরে তলিয়ে গেছে, হাঙরে-কুমীরে ঠুকরে খেয়েছে তার দেহ!

একরাত্রে বিন্দুবাসিনীকে স্বপ্নে দেখলো গঙ্গানারায়ণ। বারানসীর বিন্দুবাসিনী নয়, সেই প্রাণোচ্ছলা কিশোরী, যার সঙ্গে একসাথে গঙ্গানারায়ণ পন্ডিতমশাইয়ের কাছে সংস্কৃত পাঠ নিত। স্বপ্নের বিন্দুবাসিনী অভিমানে ভুরু বাঁকিয়ে বললো, তুই না বলিচিলি আমায় মেঘদূত কাব্যখানা পড়াবি? মিথ্যুক! তোর কোনো কতার ঠিক নেই।

স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠে গঙ্গানারায়ণ অনেকদিন পর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো। অন্ধকার কক্ষ, রাত্রি নিশুতি, তার এই কান্নার কথা আর কেউ জানবে না।

মুলুকচাঁদের আখড়ায় হরিশ মুখুজ্যে একদিন নবীনকুমারকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার দাদা এ বিয়ের ব্যাপারে কিছু ঠিক কল্লেন? আমার কাচেও কদিন যাবৎ আসচেন না।

নবীনকুমার মুলুকচাঁদের আখড়ায় আবার নিয়মিত যাওয়া আসা শুরু করেছে। প্রতিদিনই অত্যধিক সুরা পান করে শেষে একসময় চেতনা হারায়। এখন সে ঠিক যেন হরিশ মুখুজ্যেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছে, সারাদিন মহাভারত অনুবাদ এবং অন্যান্য কাজে প্রভূত পরিশ্রম করে, তারপর সন্ধ্যা থেকেই এখানে এসে শুরু করে মদ্যপান। তবে আগের তুলনায় সে অনেক গম্ভীর, অন্য সকলকে চুপ করিয়ে রেখে নিজে একা কথা বলার অভ্যাস একেবারেই পরিত্যাগ করেছে, মাতলামির হুল্লোড়েও সে যোগ দেয় না এবং বারনারীদের সম্পর্কে কোনো

আড়ম্বর নেই। সর্বকর্ত্রীরা এলে সে পানের বদলে শরবত তুলে দেয়।

মুলুকচাঁদের ব্যবসায় অনেক শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে ইতিমধ্যে। রাজস্থান থেকে সে তার ভাই ও আত্মীয় স্বজনদের এনে নানান ব্যবসায়ে জুড়ে দিয়েছে, বড়-বাজার অঞ্চলে অনেকগুলি বাড়ির মালিক সে নিজে। জানবাজারের এই আখড়ায় সে আর প্রতি সন্ধ্যেবেলা আসতে পারে না, তবে ব্যবস্থাদি সবই ঠিক থাকে। মনে হয়, এই আখড়াটি সে টিকিয়ে রেখেছে শুধু হরিশ মুখুজ্যের জন্যই। রাইমোহন এখানে আর আসে না, এটা নবীনকুমারের পক্ষে একটা স্বস্তির বিষয়।

হরিশের প্রশ্নের উত্তরে নবীনকুমার সংক্ষেপে বললো, কী জানি!

হরিশ সচকিত হয়ে বললেন, অ্যাজ এ ম্যাটার অব ফ্যাক্ট, আই ওয়াজ গোয়িং টু আস্ক ইউ. । তোমার এ ব্যাপারে কোনো উৎসাহ নেই কেন বলো তো? ব্যাপার? কদিন ধরেই লক্ষ করছি, তুমি এ সম্পর্কে একটাও কতা কও না। সবাই যখন এত মাতামাতি করছে!

নবীনকুমার বললো, আমি আর কি বলবো?

—তুমি তোমার দাদাটিকে বোঝাওনি? গঙ্গা-নারায়ণ আমাদের গর্ব। উই হ্যাভ্ মেনি প্ল্যানস টুগেদার। গঙ্গাতে আমাতে দেখো না সামনের বছর থেকে আমরা একটার পর একটা মুভমেন্ট লনচ কর্বো—আগামী দশ বছরের মধ্যে আমি এই ইংরেজ ব্যাটাদের টিট করে ছাড়বো।

—এইসব মুভমেন্ট করতে গেলে কি নতুন বিয়েতে জড়িয়ে পড়লে চলে তাতে বাধার সৃষ্টিই তো হবার তা!

—না, না, এই বিয়েটা করা বিশেষ দরকার। এই উদাসীন জাতিকে বারবার ঘা মারতে হবে। এক একটা মহৎ একজামপল সেট করতে হবে। গঙ্গা-নারায়ণ সিংহের মতন মানুষ যদি বিধবা বিবাহ করেন তা হলে আরও কত লোক এ রকম কাজ করতে ভরসা পাবে।

—আমার মনে হয়, এ বিয়ে হবে না।

—কেন?

—আমার মা বেঁচে রয়েছেন, তিনি হরিদ্বারে থাকুন আর যেখানেই থাকুন। এ খবর ঠিকই তাঁর কানে পৌঁছবে, তিনি ডুকরে ডুকরে কাঁদবেন। দাদা নিশ্চয়ই মায়ের মনে এরকম দুঃখ দিতে চান না।

হাতের গেলাসটা নামিয়ে রেখে হরিশ মুখুজ্যে মহা উত্তেজিতভাবে বললেন, তুমি তুমি এই কতা বললে, নবীন? তুমি প্রতিটি বিধবা-বিবাহের জন্য এক হাজার টাকা দান ঘোষণা করেছিলে, সেই তোমার মুখে এমন কতা! তুমি না বিদ্যাসাগরের চ্যালা! এখন নিজের পরিবারে এই বিয়ে ঢুকছে বলেই অন্য সুর গাইছো! জানি, জানি, তোমরা সব একটু এদিক ওদিক হলেই বাপ-মায়ের সুপুত্তুর হয়ে যাও! মুখেন মারিতং জগৎ, তারপর দায় পড়লেই ভালো মানুষের মতন মুখটি করে বলবে, কী কর্বো ভাই, মা অনেক কষ্ট পাবেন, তাই এই বিয়েটা করে ফেলুম! হেঃ! আমি যে কাগজ চালাচ্ছি তার জন্য সর্বস্বান্ত হচ্ছি, সায়েবদের সঙ্গে মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়িচি, সে কি আমার মায়ের মত নিয়ে? তোমার দাদা যদি এ বিয়ে করতে ভয় পান, তা হলে তাঁর সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্কই রইবে না। আমি আমার ক্রুসেড চালিয়ে যাবো!

এমন ভর্ৎসনার উত্তরে নবীনকুমার একটুও কথা বললো না। সে গালিচার ওপর বসে ছিল, হাতের গেলাসটি শেষ করে সে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ে চোখ বুজলো।

হরিশ বললেন, তোমাদের জননী হাজার হাজার মাইল দূরে রয়েছেন, তবু তোমরা মায়ের দোহাই পেড়ে সটকাচ্ছো!

নবীনকুমার নীরবে দুটি হাতের পাতা স্থাপন করলো দুই চক্ষুর ওপর।

—কী কোনো উত্তর দিচ্ছো না যে?

—আমাকে এখন বিরক্ত করো না!

—জানি, যখন তোমরা কোনো যুক্তি দেখাতে পারো না। তখন ঘুমিয়ে পড়ো। খাঁটি ভারতীয় একেই বলে, হেঃ!

নবীনকুমার এবার উপুড় হয়ে গেল। হরিশ মুখুজ্যের অনেক প্ররোচনাতেও সে আর একটি শব্দও উচ্চারণ করলো না।

এর দশ দিনের মধ্যেই বিবাহের দিন ও লগ্ন ঠিক হয়ে গেল। নবীনকুমার হচ্ছে সেই ধরনের মানুষ, যে লোকের অনুরোধের উত্তরে বারবার না বলার চেয়ে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক কোনো ক্রমে মেনে নিয়েই স্বস্তি বোধ করে। সৌজন্য ভদ্রতার খাতিরে এবং বন্ধুদের উপরোধে সে বোধ হয় বিষও খেতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রে কুসুমকুমারীর সঙ্গে বিষের উপমা দেওয়া কোনো ক্রমেই ঠিক হলো না। সেই এক রাত্রে বিন্দুবাসিনীকে স্বপ্নে দেখার পর থেকেই গঙ্গানারায়ণের মন একটু একটু পরি-বর্তিত হচ্ছিল। তার মনে হলো, বিন্দুবাসিনীর বয়সী এক বিধবাকে প্রত্যাখান করার ফলে সে ঐ মেয়েটিকে বিন্দুবাসিনীর মতনই দুর্ভাগ্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই মেয়েটিকে স্ত্রীর সম্মান দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিতা করলে বিন্দুবাসিনীর আত্মা নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হবে। সেই ইঙ্গিত দেবার জন্যই স্বপ্নে আবির্ভূতা হয়েছিল বিন্দুবাসিনী। সুতরাং গঙ্গানারায়ণ বিবাহে এই ভেবেই সম্মতি দিল যে সে যেন অন্য মূর্তিতে বিন্দুবাসিনীকেই গ্রহণ করছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার, এই বিবাহ উপলক্ষে বিধু-শেখর কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টাই করলেন না। সিংহ পরিবারে এত বড় একটা কাণ্ড হতে চলেছে, অথচ তাতে বিধুশেখরের যেন পক্ষে বিপক্ষে কোনো উদ্দীপনাই নেই। যথা সময়ে গঙ্গানারায়ণ বিধুশেখরের অনুমতি নিতে গিয়েছিল, তিনি শুকনো গলায় বলেছিলেন, তুমি বিবাহ করতে চাইচো,. এতে আর আমার বলবার কী আছে। যা ভালো বুঝবে, কর্বে। এটুকু বলেই পাশ ফিরে শুয়েছিলেন তিনি। গঙ্গানারায়ণ তখন সুহাসিনীকে জিজ্ঞেস করেছিল, সুহাস, সব তো শুনিছিস, আমি যদি এই যে করি, তোরা খুশী হবি? উদগত অশ্রু কোনো ক্রমে রোধ করে সুহাসিনী উত্তর দিয়েছিল, গঙ্গাদাদা, দেশসুদ্ধ সব দুঃখিনী মেয়েরা তোমায় দু হাত তুলে আশীর্বাদ কর্বেন।

বাগবাজারে কৃষ্ণনাথ রায়ের প্রাসাদে এই বিবাহের দিন সমারোহ হলো বিস্তর। আসরে উপস্থিত রইলেন গণ্যমান্য বহু ব্যক্তি। নবীনকুমারের অবশ্য যাওয়া হলো না।

বর-বেশী গঙ্গানারায়ণকে কুসুমসজ্জিত জুড়ি গাড়িতে চাপিয়ে এবং অন্যান্য গাড়ি ও পাল্কীতে বরযাত্রীদের চাপিয়েই নবীনকুমার চঞ্চল হয়ে উঠলো। বিকেলের এক নিদারুণ দুঃসংবাদ এসেছে, অতিকষ্টে সে সংবাদ গোপন করে রাখা হয়েছে গঙ্গানারায়ণের কাছ থেকে। গত রাত্রি থেকে হরিশ মুখুজ্যে অনবরত রক্ত-বমি করছেন। তাঁর মাথার কোনো শিরা ছিঁড়ে গেছে বোধ হয়, বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম।

দু জন সাহেব চিকিৎসক এবং ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে নবীনকুমার খানিক পরেই উপস্থিত হলো হরিশের বাড়িতে। সেখানেও একটি ছোটখাটো ভিড় জমে গেছে। গঙ্গানারায়ণের বিবাহের নিমন্ত্রণ সেরে রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন ছুটে এসেছেন এত দূরে হরিশকে দেখবার জন্য। তাঁরা বললেন, নবীন-কুমারকে এখন একবার বাগবাজারে যেতে, সকলেই তাকে খোঁজাখুঁজি করছে। গঙ্গানারায়ণকে হরিশ ও নবীনকুমারের অনুপস্থিতির কারণ সম্পর্কে নানারূপ ভুজুং-ভাজুং দেওয়া হয়েছে, এখন নবীনকুমারের একবার যাওয়া অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু মুমূর্ষু বন্ধুর শয্যাপার্শ্ব ছেড়ে নবীনকুমার কিছুতেই উঠে যেতে রাজি নয়।

রাত্রি ভোর হবার পর বহু কার্য অসমাপ্ত রেখে, বহু মানবকে কাঁদিয়ে শেষ নিশ্বাস ফেললেন হরিশ। আগের দিন থেকেই তাঁর বাকরোধ হয়েছিল, মৃত্যুর আগে ঘনিষ্ঠজনদের একটি কথাও বলে যেতে পারলেন না।

হরিশের গৃহের সামনে যে ছোটখাটো একটা জটলা হয়েছিল, সেখানে মাঝে মাঝে এসে উঁকি দিয়ে যাচ্ছিল রাইমোহন। ভেতরে যায়নি। যাবার মতন অবস্থাও নয়। তার পোশাক শতছিন্ন, বার্ধক্যে শরীর ন্যুব্জ হয়ে গেছে, চক্ষু দুটি স্তিমিত, ঠিক পথের পাগলের মতন চেহারা, চেনাই যায় না আগেকার মানুষটিকে। শেষ সংবাদ শোনার পর সে বেসুরো জড়িত কন্ঠে তৎক্ষণাৎ রচিত একটা গান শুরু করে দিল:

নীল বাঁদরে সোনার বাংলা
করলে রে ভাই ছারখার
অসময়ে হরিশ মোলো
লঙের হলো কারাগার
প্রজার প্রাণ বাঁচানো ভার....

(ক্রমশ)

SAA/FSL/C/1043 BN

# আপনার বাচ্চাকে দেখুন

## সেরেল্যাক-এর সাহায্যে

বাচ্চাদের জন্য পুষ্টিগুণে ভরপুর সিরিয়েল ফুড। দুধ, চিনি...আর আদর ভালবাসায় ভরপুর।

আপনার বাচ্চার বয়স কি ৪ মাস হয়ে গেছে? তাহলে এখন ওর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য দরকার সঠিক মাত্রায় সুষম দানা শস্যের শক্ত আহার। সেরেল্যাক শিশুদের জন্য পুষ্টিগুণে ভরপুর শস্য আহার দানা শস্য, মালাইদার দুধ [illegible] চিনির এক সুস্বাদু মিশ্রণ [illegible] আপনার বাচ্চার বাড়ের জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম পুষ্টিগুণ যোগায়।

- সঠিক সুষমমাত্রায় ফ্যাট আর কার্বোহাইড্রেট থাকার দরুন আপনার বাচ্চা চলতে পারে।
- যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন থাকার দরুন আপনার বাচ্চা বাড়তে পারে।
- অতিরিক্ত পরিমাণে ভিটামিন ও আয়রণ থাকার দরুন আপনার বাচ্চা খেলতে পারে।

এটি বানানো কত সহজ
শুধু এটি জলের সাথে মিশিয়ে নিন।

সেরেল্যাক কৌটার জলে ঢালুন

মিশিয়ে গুলে নিন

এবার খেতে দিন

NESTLÉ

# ফুটবলের গোলমালে
# াইন কী বলছে (১)

বছর তিনেক আগে কলকাতার প্রথম ডিভিসন
টবল লীগকে দু ভাগ করে কাপী ও ব্যাসকাপীতে
রিণত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। বি গ্রুপটা
াসকাপীতেই পরিণত হত যদি পাস হওয়া প্রস্তাব
নুযায়ী খেলা চালু হত। কারণ বি গ্রুপের খেলায়
ে চ্যাম্পিয়নশিপের কোনো প্রশ্ন ছিল না।
াকেচক্রে এবার দুটি গ্রুপ হল। যদিও দুই গ্রুপের
লার ফলের উপর চ্যাম্পিয়নশিপের প্রশ্ন নির্ভর-
ীল তবু তিন প্রধানের মধ্যে একটি গ্রুপে
াহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল এবং একটি গ্রুপে
হমেডান স্পোর্টিং থাকায় কার্যত কাপী ও ব্যাস-
াপীর মতই অবস্থা দাঁড়াল। কেননা গতবারের লীগ
াঠার তৃতীয় দল মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে
-গ্রুপে আর যে বারোটি ক্লাব আছে তার মধ্যে
িআকারের শক্তিশালী ক্লাব একটিও নেই। গ্রুপের
ই নম্বর ক্লাব এরিয়ানকেও গত বছর সাতটি ম্যাচে
ার স্বীকার করতে হয়েছিল। অপরদিকে বি-গ্রুপের
ুই প্রধান মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ছিল
পরাজিত। যেভাবে গ্রুপ ভাগ হয়েছে তাতে বি
ুপের খেলাতেই আকর্ষণ কিছুটা জাঁইয়ে থাকবে।
-গ্রুপের খেলা হয়ে পড়বে একেবারে মলো।
ার সামগ্রিকভাবে লীগের আকর্ষণ যে ক্ষুণ্ণ হবে
ন আলোচনা আগের সপ্তাহেই করেছি।

সামগ্রিকভাবে লীগ খেলার আকর্ষণ কমে
গেলেও ফুটবল নিয়ে ক্লাবের নামের সঙ্গে মোহ
ড়ানো দর্শক সমর্থকদের মাতামাতি ও উৎসাহ
ন্দীপনায় ভাটা পড়বে বলে মনে হয় না। এবং
ফুটবল নিয়ে খেলোয়াড় ও দর্শকদের উচ্ছৃঙ্খল
আচরণ এবং ময়দান ও শহরের শান্তি-শৃঙ্খলায় বিঘ্ন
টার আশংকাও থাকবে সমানভাবে।

রাইটার্স বিল্ডিংসে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষে
াবং পরে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ক্লাব প্রশাসক,
াক্তন খেলোয়াড় ও ফুটবল অনুরাগীদের আলো-
না সভায় খেলার মাঠের শান্তি শৃঙ্খলা বজায়
াখার ব্যাপারে প্রচুর কথা খরচ হয়েছে।

ফুটবল মাঠের অশান্তি একেবারে নির্মূল না হলেও
ড় ধরনের গন্ডগোল অবশ্যই বন্ধ হতে পারে। আর
ান্ডগোল দানা বেঁধে ওঠার সম্ভাবনা অংকুরেই
বনাশ করা যেতে পারে ফুটবল আইনের ধারা
থাযথভাবে মেনে চললে এবং দর্শকদের নয়—
খেলোয়াড় ও ক্লাবকর্তৃপক্ষকে আইনের ধারা
সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে তুললে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, খেলোয়াড় ও ক্লাব কর্তৃ-
পক্ষ কি আইনের ধারাগুলি জানেন না?

উত্তরে বলব, কেউ কেউ জানেন, অনেকেই
জানেন না। যাঁরা জানেন তাঁরাও আইন মেনে চলেন
না।

সবাই জানেন, উত্তেজক ওষুধ সেবন খেলার
আইনেই নিষিদ্ধ। আমি যদি অভিযোগ আনি, অতি
মাত্রায় উত্তেজক ওষুধ সেবন ফেডারেশন কাপের
ফাইনালে খেলোয়াড়দের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের আংশিক
কারণ ছিল তবে অভিযোগ নিশ্চয়ই প্রমাণ করতে
পারব না। কিন্তু সত্যের খাতিরে খেলোয়াড় ও
ক্লাব কর্মকর্তারা কি অভিযোগ অস্বীকার করতে
পারবেন?

এটা গেল সমস্ত খেলার সাধারণ আইনের
কথা। বিশেষভাবে ফুটবল আইনের কথা নয়।
ফুটবল আইন গোলমাল নিরসনের জন্য কী বলছে
সেটাই আমি দেখাতে চাই।

ফুটবল আইনের এক নম্বর ধারায় খেলোয়াড়-
দের প্রতি উপদেশস্তম্ভে বলা হয়েছে :

'Learn the laws thoroughly. Only in this way will you be able to become really good at and get the maximum enjoyment from the game. If all players had a full understanding of the laws, including the Referees' powers, there would be fewer disputes, which so often lead to the cautioning of players."

[Law one : Advice to Players]

দেশ পত্রিকার পাঠকদের কাছে উপরের অংশের বাংলা অনুবাদের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। শুধু এইটুকুই বলতে চাই, ফুটবলের আইন সম্যকভাবে অবহিত হওয়া প্রত্যেক খেলোয়াড়ের পক্ষে অপরিহার্য। এবং সেটা মেনে চললে খেলোয়াড়দের পক্ষে রেফারীর দ্বারা সতর্ক হবারই প্রয়োজন ঘটবে না।

খেলোয়াড়দের অশোভন আচরণের জন্য ক্লাবই যে অ্যাসোসিয়েশনের কাছে দায়ী হয়ে পড়ে নীচের অংশটুকু থেকেই তা পরিষ্কার।

The Football Association holds every club responsible for the behaviour of its players.

[Law Three : Advice to secretaries]

বিশ্রী ধরনের ফাউল, হিংস্র আচরণ, গালি-গালাজ করা প্রভৃতি অপরাধের জন্য খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দেবার অধিকার ও ক্ষমতা তো রেফারীর আছেই, অধিকন্তু খেলার আগে, খেলার সময়ে এবং খেলার পরে দৃশ্যমান জায়গায় দর্শক, কর্মকর্তা ও পরিবর্ত খেলোয়াড়দের অশোভন আচরণ সম্পর্কে রিপোর্ট করার দায়-দায়িত্ব আছে রেফারীর যাতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারেন।

রেফারী যদি তাঁর দায়দায়িত্ব পালন না করেন এবং নিয়ামক সংস্থা যদি মনে করেন অসদাচরণের পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে তবে রেফারীই সাসপেন্ড হতে পারেন। নীচের লেখা আইনের বয়ান থেকেই প্রমাণ পাওয়া যাবে। ফুটবল মাঠে রেফারীর সীমাহীন ক্ষমতা। কিন্তু কর্তব্যে অব-হেলার জন্য শুধু একটি ক্ষেত্রেই তাঁকে সাসপেন্ড করার বিধান রাখা হয়েছে নিয়মনিষ্ঠা বজায় রাখা ও উচ্ছৃঙ্খলতা নিরসনের প্রয়োজনে।

The Referee shall report to the appropriate authority misconduct or any misdemeanour on the part of spectators, officials, players, named substitutes or other persons which take place either on the field of play or in its vicinity at any time prior to, during, or after the match in question so that appropriate action can be taken by the authority concerned.

[Law Five : Board Decisions-4]

The Referee shall not allow any person to enter the field . . . . nor shall he allow coaching from the boundary lines.

[Law Five : Board Decisions-12]

A Referee who fails to report misconduct which came under his notice may be suspended, if it is proved to the satisfaction of the Council that the case of misconduct should have been further investigated.

[Law Five : Advice to Referees]

যে ক্লাবের মাঠে খেলা হয় সেই ক্লাবই যে রেফারীর নিরাপত্তা ও ভালমন্দের জন্য দায়ী এবং কুখ্যাত মানুষদের মাঠে প্রবেশাধিকার না দেবার আর সদাচরণ করার জন্য প্ল্যাকার্ড পোস্টার দেওয়ার দায়িত্বও যে ক্লাবের আইনের মধ্যেই সে বিধান রাখা হয়েছে। আইনের বয়ান :

The home club is responsible for the welfare of the Referee and Linesmen, before, during and after the match, and on leaving the ground.

Notoriously bad characters should be refused admission to the ground. Post bills respecting misconduct towards the Referee, threatening immediate expulsion of any spectator so guilty.

[Law Five : Advice to Secretaries]

ফুটবল মাঠের গোলমাল বন্ধ ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আইনে আর কী কী বিধান আছে পরে আলোচনা করা যাবে।

মাকল

সাদা
ডেট'র
সাদা
নতুন ফর্মূলা
ডেট
ডিটারজেণ্ট কাপড় ধোয়ার
পাউডার
ডেট
অতুলনীয় ধোয়ার শক্তি, অফুরন্ত ফেনা,

# আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

 **বই**

**অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র। গোপালচন্দ্র রায়। দেজ পাবলিশিং। কলিকাতা-৭০০০০৯। দাম ২৫·০০ টাকা।**

গোপালচন্দ্র রায়ের সাধকনামা 'অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র' বইটি বাংলা সাহিত্য পাঠকের বিরাগ এবং কৌতূহল দুইই জাগাবে বলে মনে হয়। যে-বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা জানি, সেই সাহিত্যসম্রাটের সাহিত্য সম্পর্কিত কোনো প্রসঙ্গ বা কথা এতে অতি সামান্যই আছে। সুতরাং সাহিত্যপ্রেমীরা বিরক্ত হয়ে বলতেই পারেন—এ বই কোন কাজে লাগবে? বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক মনের কোনো পরিচয় এতে নেই। প্রকৃতিপ্রীতি, মানবচরিত্র সম্পর্কে বিস্ময়বোধ, জগদ্ব্যাপার নিয়ে তন্ময়তা, অধ্যাত্ম চিন্তা, কৌতুক, পরিহাস আর কিছু না হোক ভাষার চাতুর্য—কোনো কিছুই এই কাজের চিঠিগুলির মধ্যে নেই। এমন একটি চিঠি পেলাম না, যাতে তাঁর উপন্যাসের কোনো চরিত্রের (মধ্যস্থ পরিকার প্রসঙ্গ ব্যতিক্রম) বা ঘটনার কোনো সূত্র মেলে কিংবা বঙ্কিমের জীবনদৃষ্টি বা সৃষ্টিজিজ্ঞাসার কোনো ব্যাখ্যা পাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মনস্বী ভাবুক এবং শিল্পী যিনি মানবচরিত্র এবং জীবন সম্বন্ধে এমন গভীর, অন্তর্দৃষ্টি এবং ভাবনা উপন্যাসে ছড়িয়ে গেলেন, বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় সমাজ ও দেশের সম্বন্ধে এমন আশা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে গেলেন, তিনি যখন পত্র লেখেন তখন তার কোথাও তার সামান্য চিহ্নও মেলে না এটা আশ্চর্য। তাঁর কর্মজীবন আর সাহিত্যজীবন এতই আলাদা ছিল।

এ বই পড়ে কৌতূহলী হয়ে উঠবেন এমন পাঠকেরও অভাব হবে না। এই বঙ্কিমকে তেমন জানা ছিল না। এমন বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন বৈষয়িক কর্তব্য-পরায়ণ স্পষ্টভাষী, আবেগশূন্য ঋজু ব্যক্তিত্বের মানুষটিকে চিঠিপত্রের মধ্যে নতুন করে তারা আবিষ্কার করবেন। রবীন্দ্রনাথ এবং আরো কেউ কেউ বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন রাশভারী মানুষ; সহজে কেউ তাঁর কাছে ঘেঁষতে পারত না। বর্তমান বইয়ের ৮৪-৮৮ পৃষ্ঠার তিনি সহজে বড় একটা কাকেও পাত্তা দিতেন না—লেখকের এই মন্তব্যের নানা উদাহরণ আছে। এই স্বভাবের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু সংখ্যা সীমাবদ্ধ আর সেইজন্যই তাঁর চিঠির সংখ্যা এত কম—তিন শোর মতো। (এই সংখ্যাটা অবশ্য গোপালবাবুর কথাতেই মেনে নিতে হচ্ছে। কারণ নৈহাটির খাস বঙ্কিম সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিপত্রের কোনো সংখ্যা বিজ্ঞাপিত নেই।) রবীন্দ্রনাথের চিঠির সংখ্যা পাঁচ হাজার, শরৎচন্দ্রের চিঠির সংখ্যা হাজারখানেক।

এই কারণেই, বঙ্কিমচন্দ্র চিঠিপত্র লিখতেন প্রধানত আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যাদের সঙ্গে সাংসারিক কাজের কথাই হত। গোপালবাবু এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মীয়পরিজনদের কাছে লেখা চিঠিই বেশি তুলেছেন, সংগ্রহশালাকে সেগুলি উত্তরাধিকারীদের দান। এই সমস্ত চিঠি সবই নানা সাংসারিক এবং পারিবারিক প্রসঙ্গে পূর্ণ। বাড়ির নানা বিলিব্যবস্থা, ভ্রাতুষ্পুত্রকে নানা উপদেশ নির্দেশ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা টাকা-পয়সা সংক্রান্ত বিষয় এবং তার দৃঢ় সিদ্ধান্ত—এ সবই চিঠির বিষয়-বস্তু। বঙ্কিমের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবী, বঙ্কিমের অনুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আরও কয়েকজনের চিঠি আছে। এ সব চিঠি নেহাত কাজের চিঠি হলেও এতে বঙ্কিম-ব্যক্তিত্বের যে পরিচয়টি পাই, তা অসাধারণ। পিতা যাদবচন্দ্রকে লেখা চিঠিতে বঙ্কিমের অতুলনীয় বিনয় ও বাধ্যতা প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু মতভেদ হলে বিনয়ের সঙ্গে দৃঢ়তাও লক্ষ করবার যোগ্য। সঞ্জীবচন্দ্রকে বঙ্কিম যেমন ভক্তি এবং মান্য করতেন তেমনি তার বেহিসাবী স্বভাবটিকে দৃঢ় বাক্যে সংযত করতেও ইতস্তত করেন নি। বঙ্কিমকে এ সব চিঠিতে দেখি অত্যন্ত মিতবাক্, স্পষ্টোক্তিপরায়ণ, কঠোর নীতিনিষ্ঠ এবং আদর্শবাদী। তিনি হিসাবী, কিন্তু একেবারেই কৃপণ নন। বহু পত্রে তাঁর নানাভাবে দান ও অর্থ সাহায্যের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ আছে। সম্পত্তির ব্যাপারে তিনি যেমন আপন অধিকারে সচেতন তেমনি উদার। মিথ্যাচরণের বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণার অন্ত নেই, কত বড় অবহেলা করলে তীব্র গম্ভীর তিরস্কার করতে পারতেন। প্র্যাকটিক্যাল বুদ্ধি তাঁর অসাধারণ। ইংরেজের চাকরি করতে নীতির সঙ্গে বাধ্যতা, অধস্তন কর্মচারীদের প্রতি সদয় ব্যবহার প্রভৃতি নানা উপদেশ দিয়ে জ্যোতিশচন্দ্রকে চাকরিতে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করেছিলেন।

বঙ্কিমের বন্ধুমণ্ডলী খুব বিস্তৃত না হলেও তাঁর নিজস্ব একটি অন্তরঙ্গ সমাজ ছিল। এঁদের মধ্যে ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন এমনি কয়েকজন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে তাঁর যাতায়াত ছিল। দ্বিজেন্দ্র-নাথ ঠাকুরকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন, সরলা দেবীকে তিনি সস্নেহে গ্রন্থোপহার দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি প্রথম সংস্করণ কৃষ্ণচরিত্র উপহার পাঠান তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স পঁচিশ বছর। এই সব নানা প্রসঙ্গ নানা ঘটনার উল্লেখ করেছেন গোপাল রায়। বহু কৌতূহলজনক বিবরণ পাওয়া যায় এই বইতে—সাধারণভাবে অনেকেই তা জানতেন না হয়তো। লেখক বইটা আরম্ভ করেছিলেন বঙ্কিমের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র প্রকাশ করবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু প্রসঙ্গত তিনি চিঠিপত্র ছাড়াও নানা ঘটনারও বিবরণ দিয়ে অন্য এক বঙ্কিমের রূপচিত্র রচনা করেছেন। এই বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস রচনার কোনো যোগ খুঁজে পাই না। তাঁর প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্য রচনায় প্রকাশিত জীবনচিন্তার কোনো আভাস এই চিঠিপত্রে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। উপন্যাসে দেখা যায়, তিনি জ্যোতিষে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু চিঠিতে দেখা যায়, জ্যোতিষকে তিনি মনে করেছেন ভ্রান্ত। সব মিলিয়ে অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্রকে এ বইতে দেখি এক অতল গাম্ভীর্যে রাজকীয় এবং দীপ্ত পৌরুষে প্রকাশিত। বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথম দেখে রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত বর্ণনা মনে পড়ে। বঙ্কিমের সেই চারিত্র্য এ বইতে অতি উজ্জ্বল।

স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের চিঠির কথা মনে পড়ে। কিন্তু দুয়ের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। রবীন্দ্রনাথের চিঠি আত্মভাবনামূলক—বলার ভঙ্গিতে অপরূপ কারুকার্য। ক্ষণিক উপলক্ষকে ছাড়িয়ে নির্বিশেষ বক্তব্য দিয়ে সকলেরই রসপিপাসা মেটান। দীর্ঘ চিঠিতে আত্মভাবনাকে বিশ্লেষণ ও বিস্তার করতে রবীন্দ্রনাথ পেতেন আর্টিস্টের আনন্দ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অন্তর্জীবনের আনন্দ ও বেদনাকে প্রকাশ করেন নি। বঙ্কিমের অবশ্যই একটা অন্তর্জীবন ছিল—তাঁর মতো ভাবুক শিল্পীর থাকবেই কিন্তু সেই খবর তিনি আমাদের দেন নি। তাঁর লেখাপড়া, চাকরি, গ্রন্থ রচনার সাল তারিখ আমরা পেতে পারি, তাই দিয়ে কোনো রকমে একটা জীবনীও লেখা যায়—যেমন হয়েছে শচীশ চট্টোপাধ্যায়-এর, হেমেন্দ্র দাশগুপ্তের অথবা সাহিত্য সাধক চরিতের। এই জীবনচরিতে কবিকে পাওয়া যায় না। বঙ্কিমের উপন্যাসে যে জীবনজিজ্ঞাসা আছে, তার উৎস কোথায় ছিল আজ আর জানবার উপায় নেই।

তবু বঙ্কিমের এতগুলি চিঠিপত্র গোপাল রায় যে প্রকাশ করলেন, সে জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। এর থেকে বঙ্কিমের একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার সম্ভাবনা তৈরী হল। গোপাল রায় বঙ্কিম সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ বলে এ সবই তাঁর আয়ত্তে। আগ্রহী পাঠকের হাতে তিনি এই সম্পদ তুলে দিলেন। কিন্তু এ কথা বলতেই হবে যে পদ্ধতিতে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছেন তা কোনো আদর্শনিষ্ঠ গবেষকের অনুকরণযোগ্য নয়। লেখককে ব্যক্তিগত-ভাবে জানি—অদম্য উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু, কিন্তু তাঁর শিক্ষাতে গৃহিণীপনার অভাব। বঙ্কিম সংগ্রহ-শালায় এই চিঠিগুলি প্রণালীবদ্ধভাবে সাজানো আছে কিনা জানি না, তার কোনো সংখ্যাসূত্র আছে কিনা তাও জানি না। কেউ যদি সংগ্রহশালায় গিয়ে কোনো বিশেষ চিঠি বের করতে চান, তবে কিভাবে বের করবেন তার কোনো হদিশ নেই। যদি সে রকম কোনো প্রণালী থেকেও থাকে, তবে এই গ্রন্থে তার নির্দেশ থাকলে ভাল হত।

লেখকের অনুসন্ধিৎসার প্রমাণ ছড়ানো আছে বইতে। প্রয়োজনমত চিঠির প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করেছেন, সেই সূত্রে আমরা অনেক তথ্য জানতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়া ছেড়ে চুঁচুড়ায় বাস করার সময় নির্ণয়, মধ্যস্থ পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে বঙ্কিমের বিরোধ, অমৃতবাজার পত্রিকায় বঙ্কিমের বদলি সম্পর্কে মন্তব্য—এ রকম অনেক ক্ষেত্রেই গোপাল রায়ের অনুসন্ধান চিত্তাকর্ষক। আবার অনেক ক্ষেত্রে চিঠির সময় নির্ণয় করবার চেষ্টা নেই। বস্তুত এমন এলোমেলো লেখা আজকালকার দিনে দুর্লভ। বইটা যে কোন রীতি অনুসরণ করে

অভাব আছে। অতীতের কাজ করেন। অন্যদিকে কলকাতাতেও যে অভাবর নিয়ে যেতে চেয়েছেন সেটা যেমন প্রশংসনীয়, তেমনি তা যে পুরোপুরি নিখুঁত নয় এখন পর্যন্ত, সেটাও ঠিক। তাঁর অধ্যাবসায়, নিষ্ঠার আমি মুগ্ধ বলেই কঠোর সমালোচনা করলাম।

ভাস্কর্যের মান নিচু। সৌমিত্র মজুমদার এবার পুরস্কৃত ভাস্কর। তাঁর আকাদেমীর সামনে করা তেতো-ওষুধ-খাওয়া ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওলটানো মুরে পড়ে থাকা পাখির মিল সামান্য নয়। অনিককুমারের কাজের মধ্যে তরুণ সেনের "মুকুটহীন রাজা", তাপস সরকারের 'প্লেগ' রথীন রায়ের 'মানব বিষয় ভাবনাচিন্তা' এবং কার্তিক পাইনের 'শান্তি' (মিশ্র মাধ্যম হলেও অসমাপ্ত) মন্দ নয়। তবে এবার ছাপাই ছবি মোটের ওপর ভাল ছিল। রবীন্দ্র ভারতীকে প্রতিষ্ঠিত এবং উদীয়মান বহু শিল্পী পশ্চিম বাংলার ললিতকলা বলে মেনে নিতে অরাজী।
সন্দীপ সরকার

## রূপসী আন্দামান

'ক্যালকাটা আর্টিস্ট সার্কেলের' দুজন সভ্য, নীরেন পোদ্দার এবং স্বপ্নেশ চৌধুরী তাঁদের ছবির প্রদর্শনী করলেন বিড়লা অ্যাকাডেমিতে। দুজনই কর্মসূত্রে আন্দামানে থাকেন—এবং আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নিসর্গ দুজনেরই চিত্র-অভিব্যক্তিকে প্রভাবিত করেছে। আন্দামানের আন্দোলিত সমুদ্র, দুর্ভাবিত্ত চিত্ত ঊর্মি মালা, নানা-রঙের আকাশ, গাছপালা নুড়িপাথর স্বপ্নেশ চৌধুরীর ছবির প্রত্যক্ষ বিষয়-বস্তু। নীরেনের চিত্রমালায় আন্দামান ঈষৎ পরোক্ষভাবে উপস্থিত—কিন্তু সে-প্রসঙ্গে পরে আসছি।

স্বপ্নেশের যে ছবিটি আমাকে সব-চেয়ে মুগ্ধ করেছে, সেটি হলো ১৬ নম্বর ছবি—নীলাভ-সবুজ কয়েকটি পাথরখণ্ড সৈকতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, পশ্চাৎপটে নীল-সবুজের ছোপ-দেয়া আচ্ছন্ন আকাশ। কয়েকটি পাথর উল্লম্বভাবে দাঁড়িয়ে আছে, এবং কয়েকটি সমতলে শায়িত—সুতরাং একটি পরিচ্ছন্ন জ্যামিতিক রূপ স্বতোৎভাসিত হয়েছে ক্যানভাসে। শুধু তা-ই নয়, ছবিটিতে এমন এক ধরনের নিস্তব্ধতা আভাসিত হয়েছে যা স্বভাবতই অভিভূত করে আমাদের। তবে, অধিকাংশ ছবিতেই স্বপ্নেশ ঈষৎ প্রকটভাবে ব্যবহার করেছেন তেলরঙকে—মনে হয়, প্রকৃতির বর্ণাঢ্য-তাকে প্রকাশ করতে চেয়েই অতো রং লাগিয়েছেন স্বপ্নেশ, কিন্তু সর্বত্র তা সফল হয়নি। বিশেষত, কোনো রংটিকে তিনি তেমন সার্থকভাবে ব্যবহার করতে পারেন নি। একটি ছবিতে তিনি অবশ্য কল্পনা-উদ্দীপক একটি রীতি ব্যবহার করেছেন—নির্বিকার, নীল সমুদ্রের ওপরে তিনি ছোটো একটি বৃত্তের ভেতরে নুড়ি, পাথর, ঝিনুকের ছবি এঁকেছেন। অর্থাৎ, সমুদ্রগর্ভে যাদের অবস্থিতি, নিরন্তর যারা সৈকতাবাসে লুটিয়ে পড়ছে, তাদের তিনি স্বতন্ত্র একটি ফর্মের সাহায্যে সমুদ্রের ওপরে দোদুল্যমান রেখেছেন। ছবিটি সুন্দর। যাই হোক, স্বপ্নেশের ছবি দেখে মনে হলো আন্দামান খুবই রূপসী, যেখানে নুড়ি-পাথর, গাছ-পালা ও সমুদ্রতরঙ্গে প্রকৃতির বিপুল বৈচিত্র্য বিস্তীর্ণ হয়ে আছে।

নীরেন, পক্ষান্তরে, প্রকৃতির ছবি প্রত্যক্ষভাবে আঁকেন নি। অর্ধ-বিমূর্ত বিমূর্ত, ঘূর্ণায়মান বৃত্তাকারের সাহায্যে তিনি আভাসিত করতে চেয়েছেন আন্দামানের আদিমতা। তাঁর অর্ধবিমূর্ত রেখাজোল ও বৃত্তপুঞ্জের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে ওখানকার আদিবাসী রমণীর দেহ, কখনো বা শুধু পুরু ওষ্ঠাধর। কখনও কখনও, চকিতে গগাঁর তাহিতিনীদের কথা মনে পড়ে যায়। যে আন্দোলিত প্রকৃতিকে স্বপ্নেশ বাইরে থেকে বাস্তবানুগভাবে এঁকেছেন, তাকেই ভেতরে টেনে এনেছেন নীরেন—বাস্তব ও বিমূর্ত রূপকল্পের সম্মেলনে, কখনো বা প্রতীকের সাহায্যে, কখনও আদিমতাদ্যোতক গাঢ় কৃষ্ণাভ বর্ণে। তাঁর ছবির নামগুলিও এই জৈব-জীবনের আলেখ্য-র সংকেতবহ— এম-ব্রেস, লাইফ ফোর্স, লাইফস প্রেগ্রেশন, স্যাটিমেশন ইত্যাদি। নীরেন পোদ্দারের প্রায় সব ছবিই আমার ভালো লেগেছে।
প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

## গান্ধর্বীর রবীন্দ্রজন্মোৎসব

'গান্ধর্বী' সংস্থার উদ্যোগে অবন মহলে ১ থেকে ৭ মে পর্যন্ত সপ্তাহ-ব্যাপী রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালিত হল। দক্ষিণ কলকাতায় এত বড়ো মাপের রবীন্দ্র-জন্মোৎসব এর আগে হয়নি। সেদিক থেকে এই প্রচেষ্টা অভিনন্দনের যোগ্য। অভিনন্দন এঁদের অন্যান্য কারণেও প্রাপ্য। প্রথমত, একটি-কি-দুটি গানের জলসায় পরিণত করতে চাননি গানের আসরগুলিকে। এক-এক দিনের আসরে এক-একজন শিল্পীকে অনেকটা করে সময় দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, শিল্পী নির্বাচনে সূক্ষ্ম রুচিবোধ কাজ করেছে। আশাভঙ্গ, আপস কিংবা অসহায়তা একদম ছিল না তা নয়, তবে কমই ছিল। চেষ্টা করেছেন, ভেবেছেন, এটাই বড়ো। সার্থকতার সবটুকু যে উদ্যোক্তাদের হাতে থাকে না, নিতান্ত শিশুও তা জানে। তদুপরি এটাই ছিল প্রথম বছর। অভিজ্ঞতা নিশ্চিত নিয়ন্ত্রিত করবে আগামী দিনের অনুষ্ঠান-পরিকল্পনাকে।

১ মে সকালে ছিল প্রথম অধি-বেশন। বেদগান দিয়ে সূচনা। অতঃপর মঙ্গলাচরণ। গান্ধর্বীর পক্ষ থেকে সুবিনয় রায়ের স্বাগত ভাষণের পর, এ-দিনে সভাপতি প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সংক্ষিপ্ত দু-চার কথায় বললেন, উৎসব যেন শুধু প্রমোদের খেলা না হয়ে ওঠে, রবীন্দ্রনাথের কঠিন দিকটির সঙ্গেও যেন আমরা পরিচিত হবার চেষ্টা করি, অনুসরণ করি তাঁর সাংগঠনিক চিন্তা-ধারাকে। প্রধান অতিথি মৃণাল সেন দুটি চমৎকার অভিজ্ঞতার কাহিনীর মধ্য দিয়ে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে রবীন্দ্র-উপস্থিতির ব্যাপকতার কথা তুলে ধরলেন।

সন্তোষ ঠাকুর ও সহশিল্পীবৃন্দের সম্মেলক কণ্ঠের গান দিয়ে গানের অনুষ্ঠান শুরু হল। প্রভাতে বিমল আনন্দে' এবং 'শুভ্র আসনে বিরাজো'তে যথোচিত মহিমার গাম্ভীর্য যেমন কণ্ঠের এই গোষ্ঠীর নিপুণ পরিবেশনে, তেমনই শুধু সম্মেলক মহিলা কণ্ঠে শোনানো 'তোরা শুনিস কি কি' এবং মিশ্র কণ্ঠের 'তুমি যে সুরের আগুন'-এ সহজে সঞ্চারিত হল প্রার্থিত স্ফূর্তি। কণ্ঠের সুষম মিশ্রণে ও স্বাস্থ্যকর মহলায় দীপ্ত এমন সম্মেলক গান শোনা যে বিরল অভিজ্ঞতা, এ-কথা অনস্বীকার্য।

একক আসরের প্রথম শিল্পী ঋতু গুহ যে অসুস্থ, ঘোষিকা তা আগে-ভাগে জানিয়ে দিলেন। সুখের কথা, শিল্পীর পরিবেশনে অসুস্থতার ছাপ তেমন প্রকট ছিল না। শুধু 'বলব, কাঙাল আমারে' গানটিতে ঋতু গুহ নিজেরই স্বাভাবিক মূর্তির কাছে সেদিন পরাহত। এ-ছাড়া শ্রাবণের ধারার মতই অবিরল সুধা ঝরে পড়েছিল 'তাঁর তোমার সোনার থালায়, 'স্বপন যদি ভাঙিলে' বা 'শ্রাবণের ধারার মতো' গানগুলিতে।

অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন দুর্বার দাপটে শুনিয়েছেন 'ঘোর দুঃখে জাগিনু'। বিভাস ত্রিতালে 'নিকষ এই গানে নিশাবসান ও দশ দিশার জাগরণ স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, অনুভূতিগোচর হয়ে উঠল তাঁর গায়নভঙ্গিমায়। সেদিন তাঁর অন্য পরিবেশনের মধ্যে 'নয়ন তোমারে' 'আপনহারা মাতোয়ারা' এবং চারণের দৃপ্ত ভঙ্গিতে শোনানো 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' ভালো লেগেছে। কিন্তু 'প্রখর তপন তাপে'র তপন অংশ তিনি যেভাবে পার হলেন তা অচেনা লাগল কানে।

সন্তোষ ঠাকুর ও সহশিল্পীবৃন্দ

গান ছাড়াও এ-দিনের অন্যতর আকর্ষণ ছিল দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংযত মাত্রার আবৃত্তি।

দ্বিতীয় দিনের শুরুতে ছিলেন চিরনবীন শান্তিদেব ঘোষ। কখনো ফুল-কোমল কখনো বজ্রকঠিন কণ্ঠে চকিত অভিব্যক্তিময় উচ্চারণে তেরটি গানের মধ্যে কখনো বিষন্ন, কখনো উদ্দীপিত, কখনো পুলকিত, কখনো অনুরণিত করে তুললেন তিনি। 'কৃষ্ণকলি' তো ছিলই, এ-ছাড়াও ছিল সেই সন্ধ্যার ডালিতে সুনির্বাচিত আরও বারটি গান। এক হাতে যাঁর কৃপাণ এবং অন্য হাতে হার তিনিই যেন শান্তিদেব ঘোষ, আধেক নিয়ে ফেরেন না কখনো, যা আছে সব একেবারে করেন অধিকার। এখনও সবিস্ময়ে লক্ষ করতে হয়, 'দুঃখের যজ্ঞ অনল জ্বলনে' গানের প্রতিটি যুক্তাক্ষরকে উপলখণ্ডের মতো সবেগে দীর্ণ করে কী করে নেমে আসে সুরের ঝরনাধারা, কী ভাবে 'ফিরবে না তা জানি'র না-র টানকে তিনি করে তোলেন ব্যাকুলতার আকাশ, আর 'ফিরে যাক মধ্যার জাল'-এ কীভাবে ওর্জস্বিতা করেন যুক্ত. 'ও ভাই কানাই'-এর কৌতুকময় রসটিকে কীভাবে করেন মূর্ত। অন্যদিক দলের খোল এই অনুষ্ঠানের আরেক স্মরণীয় অনুকূল।

অপরার্ধের গানের প্রথম শিল্পী পূর্বা দাম পঞ্চম গানে ঈষৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন. কিন্তু তাঁর সকল পরিণত, দক্ষ পরিবেশনভঙ্গিতে 'স্বামী তুমি এসো আজ', 'মেঘে মেঘে যারে যারে' 'ওই আসন তলের' এবং 'ফিরে ফিরে ডাক দেখিরে' গানগুলি অনবদ্য নিবেদন হয়ে উঠেছিল। পূর্বা দামের গানে ইদানীং নতুনতর একটি মাত্রা যুক্ত হয়েছে, ব্যক্তিত্ব ও রুচিবোধকে জুড়ে দিচ্ছেন তিনি, ফলে গান শুধু সুর আওড়ানো হয়ে থাকে না, তাৎপর্যপূর্ণ এবং সূক্ষ্ম চেহারা পায়। অপর পক্ষে. অর্ঘ্য সেন যেন জনপ্রিয়তার সঙ্গে সহজ সন্ধি করতে চাইছেন। স্বর বাড়িয়ে কমিয়ে, মেলোড্রামা যুক্ত করে, তিনি এমন একটা ভঙ্গিতে পরিবেশন করছেন যা তাঁর মতো সিরিয়াস রবীন্দ্র শিল্পীর কাছে প্রত্যাশিত নয়। অসামান্য সুরেলা এবং লাবণ্যময় অর্ঘ্য সেনের কণ্ঠ. উচ্চারণ স্পষ্ট, সতেজ ও ঝংকারপূর্ণ তাঁর স্বরক্ষেপ। সেই সঙ্গে নাটকীয়তার প্রতি সাম্প্রতিক ও অকারণ ঝোঁক সেদিনের প্রতিটি গানেই দেখা গেল।

এ-দিনের আবৃত্তিতে ছিলেন গৌরী ঘোষ ও পার্থ ঘোষ। দ্বৈত কণ্ঠের কোনো নিবেদন ছিল না। কেন যে ছিল না! •

পূর্বা দাম

তৃতীয় দিনের আসরের সূচনা করলেন গীতা ঘটক। তাঁর গান শোনা ক্রমশ অভিজ্ঞতা হয়ে উঠছে। এ-দিনের পাঁচটি গানের মধ্যে প্রথম তিনটিতে দুঃখবোধ ছিল প্রবল। শেষ দুটি ছিল তাঁর কণ্ঠের নিরুপম অনুকম্প-বিজড়িত—'কী ধ্বনি' এবং 'মরি লো মরি'। কিন্তু 'পথে চলে যেতে যেতে' বা 'আরো আঘাত' কিংবা 'যে কাঁদনে হিয়া' গান তিনটিতেও সেদিন গীতা ঘটকের রেশম কোমল কণ্ঠ অনায়াস মসৃণতায় অনন্য হয়ে ধরা পড়েছে।

শুভশ্রী মুখোপাধ্যায় খুবই ভালো গেয়েছেন 'ফিরে ফিরে' এবং 'তুমি কোন পথে যে এলে'। কিন্তু তাঁর পক্ষে 'প্রথম আদি তব শক্তি' বা 'আপনারে দিয়ে' গান দুটি ছিল বেশি ভারিক্কী। তাঁর কণ্ঠ সুরেলা, উচ্চারণ সুন্দর, গায়ন ভঙ্গি স্ফূর্তিময়, তবু এ-গান দুটিতে ছোট মেয়েদের মতো যারা বড়োদের বেনারসী পরে সাজতে চায়। কোথায় যেন ফাঁক থেকে যায়, তরুণ কণ্ঠে খোলে না ভারি গানের মহিমা।

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এ-দিনের প্রবলতম আকর্ষণ। সেদিন প্রথম থেকেই পূর্ণ সত্তায় পাওয়া গিয়েছিল তাঁকে মনে হয়েছে সেইসব সুন্দর 'তোমার শেষ যে না পাই'-এর শুরুর 'তোমার শেষ যে না পাই'-এর শুরুর মধুর শব্দটি, কী করুণতম আর্তি হয়ে বেজে উঠেছিল পিছুই তো হল মা'র ... নীল-প্রতিধ্বনিময় হাহাকার তা ভাষায় ... কঠিন। শেষ গানে, শুধু মনে ... দেখোতে, ক্রমশ তিনি যে জোয়ার থেকে ... ক্রান্ত হচ্ছিলেন সুরের আভিজাত্যে, তা ... গেল বাজনা কাঁদিয়ে দেবার জন্য ... জলাধার। বোঝা গেল, কখন ... দিকে বলতে হয়, আবার এ গান ... ছে তার সকল অলংকার, কখন সে-... কোন্ বিরল মুহূর্তে, লতা হয়ে ... তাঁর গানের শিল্পীর কাছেও।

এ-ছাড়া এ-দিন গানে ছিলেন বাণী ... ও গোরা সর্বাধিকারী। তাঁরা ... মহিমায় আসর উজ্জ্বল করেছেন, ... মহিমায় নয়।

আবৃত্তিতে ছিলেন প্রদীপ ঘোষ। ... রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের নির্বা-... কবিতা নিয়ে তিনি একটি ... লেখা-প্রতিম মালা গেঁথেছেন। ... নির্বাচিত। তবে ... টাই দীর্ঘ।

চতুর্থ দিন সকালে একক সংগীতে ছিলেন গীতা সেন। আটখানি গান শোনালেন তিনি। প্রভাতী আসরে অন্বেষণ নির্বাচিত হয়েছিল তাঁর গানের মধ্য অংশ। তারসপ্তকে ঈষৎ অস্বচ্ছন্দ ছিল তাঁর কণ্ঠ। শেষ গান 'আমার গাহিতে যোলো সাধে যে-দীর্ঘশ্বাস সমস্ত গানটিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, তা যেন কোথাও কাটেন না। তাঁর কণ্ঠের স্বাদু উপহার 'শুভ্র প্রভাতে', 'হৃদয়ে প্রাণ দাও' এবং 'সব আনন্দে জাগো'।

এ-দিন সকালে 'কোমল গান্ধার' গোষ্ঠীর প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হল 'শ্যামা'। তারপর 'লাবরেটরি' নাটকটি। এই নাট্যার্ঘের আলোচনা এই পত্রিকায় এর আগেই হয়ে গেছে। সেদিন ভূমিকালিপিতে সামান্য অদলবদল ছিল, কিন্তু মূল নাটকের আবেদনে কোনো হেরফের ঘটেনি।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

ফটো : সুধীর চট্টোপাধ্যায়

আলোচনা : দিশি সংস্কৃত **রেকর্ড**

## পদ্মের বৃন্তে চোরি

রবিশঙ্কর একবার তাঁর নামের আগে 'পণ্ডিত' শব্দটি ব্যবহারে আপত্তি জানিয়েছিলেন। ভালোই করেছিলেন। কারণ, 'পণ্ডিত' শব্দটির মধ্যে একটা গোঁড়ামি আছে, সংস্কারে আবৃত থাকার চিহ্ন আছে। রবিশঙ্কর সম্পূর্ণভাবেই মুক্তপক্ষের মানুষ—'সর্বতোভদ্র' অর্থাৎ সব জানালা খোলা আছে, সবদিকের বাতাস এসে কোলাকুলি করে।

সম্প্রতি পলিডোর কোম্পানী থেকে রবিশঙ্কর জাপানী শিল্পীদের সহ-যোগিতায় একটি লং প্লেয়িং রেকর্ড প্রকাশ করেছেন। যন্ত্র দুটি 'কোতো' এবং 'শাকুহাচি'। কোতো যন্ত্রে তেরটি তার। যন্ত্রটির উৎসভূমি অষ্টম শতকের 'চীন'। আর 'শাকুহাচি' হল পঞ্চাশ সেমি লম্বা বাঁশের বাঁশি। অনেক আগে বৌদ্ধ প্রচারকরা এই বাঁশি বাজাতেন। পরবর্তীকালে অন্য যন্ত্রের সঙ্গে মিলে জীবনের গভীরতা প্রকাশে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। 'কোতো'র যখন ছাড়া ছাড়া-ভাবে স্বরগুলি বাজতে থাকে, তখন অদ্ভুত একটা শৈল্পিক 'সাসপেন্স' তৈরী হতে থাকে। দ্বিতীয়ত সাসপেন্স মন্দ্র—বেদনার ছায়া যেন আকাশ ঢেকে দেয় ধীর পদসঞ্চারে। আর 'শাকুহাচি'-র আওয়াজ আমাদের বাঁশি, ক্লারিওনেট; বা সানাই; কোন কিছুর সমগোত্রীয় নয় কিন্তু কাছা-কাছি। তিব্বতী ক্লুটের অনেকটা আমেজ আসে। 'শাকুহাচি' গভীর থেকে আর্তিগুলোকে টেনে আনে এবং অনুভূতিকে প্রত্যক্ষ করে তোলে চূড়ান্ত পর্যায়ে।

লং প্লেইং-এর প্রথম অংশে এক 'কোতো' বাজিয়েছেন সুসুমু মিয়াশিতা। প্রয়োজন ছিল এই যন্ত্রের দুর্গমতাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করা যায়—ভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে। যন্ত্রটির বাজানোর ধরন এবং আওয়াজ জনপ্রিয় অথচ যাকে বলেই সুর উঁকি দিয়ে বলে 'দেখ তো দেখি চিনিতে পার কিনা।' আল্লারাখা তবলা লহরায় (অবতারণা) হয়ত জাপানী শ্রোতাদের বিস্মিত করবেন। আর আমাদের কাছে

সেটা উপরি পাওনা। শেষ অংশে সপ্তদশ শতকের একটি সুন্দর 'কোতো' সুর চূড়ান্ত পর্যায়ে রবিশঙ্কর নতুনভাবে সুর গ্রন্থন করেছেন। রেকর্ডের দ্বিতীয় অংশে 'নমো শিবায়' নামে একটি সুন্দর কম্পোজিশনে 'শাকুহাচি' শিবরঞ্জনী রূপটির রস নিঙড়ে আদায় করেছেন। শিবরঞ্জনীর কোমল গান্ধার 'সাকুহাচি'তে তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। শেষ অংশটি যেন উদ্দাম আরতির পর পুষ্পাঞ্জলি দিলেন হোজান ইয়ামোমোতে। কৌশিধ্বনি রাগে রবিশঙ্কর বাজিয়েছেন 'নিপুনের উদ্দেশে পূজা নিবেদন' একটি যথার্থ সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়।

স্বরোদ বা সেতার বা ভারতীয় যন্ত্রে যে মীড়ের কাজ, যে ধরনের গাঁথুনি রেখে সুর এগিয়ে যায়, জাপানী যন্ত্রে সেই সুরগুলি এগিয়ে যায় ছাড়া ছাড়া কাটা কাটা ভাবে। একই সুর ভিনদেশে ভিন্নভাবে আক্রমণ করে। পূজা দেয়। আমরা মালা গাঁথি অনেকগুলি পদ্ম দিয়ে পদ্মাসন রচনা করি—অলঙ্কার, চালচিত্রে আমাদের পূজা নিবেদন। জাপানী কবিতা ছোট, একটি দুটি ফুলের সংস্থাপনে অঙ্গসজ্জা গৃহসজ্জা ভূষণবাহুল্যহীন হয়েও অনেক কিছু বলা। আসলে সুর আসে জীবন থেকে—জীবনবিচ্যুত সুর ধ্যান ভঙ্গাতে পারে, ধ্যানস্থ হতে দেয় না।

## বাগিচার বুলবুলি

অন্য গানের ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছে, নজরুলগীতির ক্ষেত্রে তার বিপরীত অভিজ্ঞতা। বিগত যুগের শিল্পীরা এখনও আধুনিক, সাম্প্রতিক শিল্পীরা অনেক সময় অক্ষমতার জন্য সরলীকৃত করতে চান, অথবা অনেকে সক্ষমতাকে জাহির করার জন্য জবরদখল করেন।

ইনরেকোর এবারের নজরুলগীতির মধ্যে ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের সংকলনে কয়েকটি স্মরণীয় গান স্থান পেয়েছে। 'ভোরের ঝিলের জলে' বা 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি' গান দুটি শিল্পীর নামের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। ভৈরবী ঠাটের ধানশ্রী রাগের বিখ্যাত সন্ধ্যামালতী যবে' গানে অবরোহণ কোমল রে আরোপে সন্ধ্যা ও সকালের এই [illegible] আজও [illegible] 'নিশিরাতে রিমঝিম বাদল নূপুরে' গানে। কোন অকারণ তান বাহুল্য, কথার ইজ্জত হারাতে দেয়নি। তাই সঞ্চারীতে 'খালি পড়শী রূপস মেয়ে/মেয়ের পানে আছে চেয়ে/করে দেখি আমি কারে দেখি/মেঘলা আকাশ না মেঘলা মেয়ে' ছবিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে (রবীন্দ্রনাথের 'কৃষ্ণকলি')। তিনটি ভক্তিগীতির মধ্যে 'শ্মশানে জাগিছে শ্যামা' কাফি-সিন্ধুতে 'ব্রজগোপী খেলে হোরী' বা 'তুই কালি মেখে' গানগুলিতেও একই অনায়াস ভঙ্গি। একমাত্র 'খেলা শেষ হল' গানটি যেন কিছুতেই বাঞ্ছিত মুহূর্তটি আনতে পারে না।

ইনরেকো রেকর্ডিং-এর অসীম ক্ষমতা। তাঁরা শ্রদ্ধেয়া সুপ্রভা সরকারের কণ্ঠকেও অন্যরকম করে দিতে পারেন। যে অসম্ভব দাপট শিল্পীর আকর্ষণী সেই দাপট হঠাৎ বেড়ে যায়—গলা যেখানে ধরে এসেছে সেটিকে সযত্নে ধরে রাখা হয়। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় কার বয়স বেশী, সুপ্রভা সরকারের না রেকর্ড ইঞ্জিনীয়ারিং-এর? এত ত্রুটির মধ্যে বরণীয়া শিল্পী অনাবিষ্কৃত থাকেন না। —'আমার কাণচোরা ঠাকুর এলো' বা ভিন্ন জাতের 'আবার এলো কি বাদল' দুই ভাবের গানেই। ভাল লাগেন 'ঘুমাও ঘুমাও দেখতে এসেছি'। এই ধরনের গানে তিনি বারবার আমাদের আগে আনমনা করে দিয়েছেন। 'আমার নয়নে নয়ন' গানটি স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি কথা বলা দরকার। এই গানটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'হে মোর দেবতা' গানটির প্রায় ছত্রে ছত্রে মিল। এরকম অনেক গান দেখানো যেতে পারে—নজরুল কতভাবে রবীন্দ্রনাথ-অনুপ্রাণিত। সুরের ক্ষেত্রে তিনি যেমন চটকদার করে পাখা মেলতে পারেন—গান রচনায় কিন্তু তিনি আকাশ-ভাবনাকে মর্ত সীমায় এনে ফেলেন। ফলে অনেক সাধারণ পাঠক বা শ্রোতা সহজেই আকৃষ্ট হন। এই প্রসঙ্গ দীর্ঘ আলোচনা-সাপেক্ষ।

পূরবী দত্তের লং প্লেইং এবারেও একটি সম্পদ। পূরবী দত্তের কণ্ঠে সব ধরনের গান সজীব হয়ে ওঠে। বিশেষত তাঁর গায়নভঙ্গি সদর্থে আধুনিক। বাজার চলতি আধুনিক বা ফিল্মের গানের পাশাপাশি নজরুলগীতিকে তিনি জনপ্রিয় করেও মর্যাদা দিতে জানেন। 'ওগো সুন্দর' বা 'শিউলিতলায় ভোর বেলায়' দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের গান। কিন্তু যথার্থ অন্বেষণে তিনি দু-ধরনের গানে শ্রোতাকে চমকিত করতে পারেন। গজলের নির্বাচনে পিলুতে 'ছাড় ছাড় আঁচল বঁধু' বা বাগেশ্রীতে 'চোখের নেশার ভালবাসা' গানেও তিনি অনন্যা। আবার দুটি ভিন্নধর্মী গান 'এসো হে সজল ঘন' বা 'মনে পড়ে আজ' গান দুটির পরিবেশনও বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। ইসলামী গান এখন প্রায় শোনাই যায় না। পূরবী দত্ত 'এ কোন মধুর শরাব দিলে' গানে আবারও নজরুলগীতির আর একটি দিক স্মরণ করিয়ে দিলেন। অবাক হই এই ভেবে এত নৈপুণ্য সত্ত্বেও 'ভুল করে যদি' গানটি রসোত্তীর্ণ হল না কেন?

অধিকাল বসু এবারের জনপ্রিয় শিল্পী। তিনি নিজস্ব একটি ধরন সৃষ্টি করে নিয়েছেন (বয়ানা বলা ভুল হবে) যে রকম গান তিনি ধরনে বেঁধে দেন। এর জন্য কিছু গান মনোত্তীর্ণ হয় কিন্তু সমালোচনা সব ক্ষেত্রে সফল হয় না। এই ধরনে তুমি গান শোনাতে গজলটিকে গজল বলে বিশ্বাস করা শক্ত। 'পাও প্রেমদূত' গানে কাব্য রূপ পায় রাগরূপটি অবহেলিত। অন্তরে তুমি আছ চিরদিন গানটি মনোত্তীর্ণ, আর একটি ভক্তিগীতি খুঁজিছে এ বিশ্ব মনে' গানে কখনই সেই বিরাট শিশু আত্মানিত হয় না যে 'প্রলয় নাচন তব পড়ুক ভেলা/নিরজনে প্রভু নিরজনে' বলে মনে হবে। 'মৃণালকান্তি ঘোষের বিখ্যাত গানের স্মৃতিই কি এর জন্য দায়ী? 'বহু পূর্বে স্মৃতি মনেছেয়, ওকে?' শাওন রাতে যদি' গানটি ভাল গাওয়া হয়েছে। কিন্তু গানটি গাইতে হলে সীমাহীন দেহ নিয়ে অসুবিধায় পড়তেই হবে। সপ্তারীতে খাদে ধীরেন বসু স্বচ্ছন্দে চলে গেলেন কিন্তু তারসপ্তকে তাঁর কণ্ঠের কৃত্রিমতা অনুভূত হয়।

নতুন শিল্পীদের মধ্যে খেয়া চট্টোপাধ্যায়ের সম্ভাবনা প্রচুর। নানা ধরনের গানেই তিনি পারদর্শী। ঐ মানেই তাঁর কৃতিত্ব ও ব্যর্থতা। অতুলপ্রসাদ, নজরুল বা আধুনিক সব রকমের গানের স্বাতন্ত্র্য তাঁকে আবিষ্কার করতে হবে। দিলীপ চক্রবর্তী কিছুতেই মন্দ্রসপ্তকে সুস্থির নন—অন্য ক্ষেত্রেও তিনি স্বনির্ভর নন। যার জন্য উদাত্ত 'বলরে জবা বল' বা 'মদির স্বপনে' গানের জমাটি সুরেও

তিনি স্বতঃস্ফূর্ত নন। দুটি গানের ক্ষেত্রেই কিন্তু সেই জমি তৈরী ছিল যেখানে আবাদ করতে জানলে সোনা ফলত। পলিডোর রেকর্ডে রামানুজ দাশগুপ্ত চারটি নজরুলগীতি পরিবেশন করেছেন। উদাত্ত কণ্ঠ সম্পূর্ণভাবেই নিজের গলায় গাওয়া (যেটি সচরাচর ঘটে না) সবচেয়ে ভাল লাগে 'আমার ভালবাসার সাধ জাগে', 'পরদেশী প্রিয়তম' বা 'দাঁড়ালে দুয়ারে মোর' গান দুটির পরিবেশন পরিচ্ছন্ন কিন্তু 'মদির স্বপনে মম মন ভবনে' গানটি হয়ত কিছু অনুকূল আশা দেখেই তিনি রেকর্ড করেছিলেন—কিন্তু তুলনামূলক আলোচনা হয়ত প্রত্যাশার প্রতিকূল হতে পারে।

ইনরেকো শম্ভু মিত্রের রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তির একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন। আজকের আবৃত্তির যে এত জনপ্রিয়তা, নিঃসন্দেহে শম্ভু মিত্র তাঁর পথিকৃৎ। নাটকের বাইরে তাঁর আবৃত্তির আলাদা মর্যাদা। ইতিমধ্যে আবৃত্তি স্বাধীনতা হয়েছে, নাটকীয়তা পরিহার করে। শম্ভু মিত্রের আশ্চর্য গুণ বিশ্লেষণ। স্বকপ্রতিভা, ইনভলভমেন্ট সত্ত্বেও নাটকীয়তাই এখন কানে লাগে। সুরেলা আবৃত্তির প্রথাভঙ্গ তিনিই করেছিলেন—কিন্তু এখন যে রয়েছে আবৃত্তির সমারোহ, সেইখানে তাঁকে বড়ই বেমানান মনে হয়; এটাই যুগের নিয়ম। 'জীবন দেবতা' কবিতা আবৃত্তি অদ্ভুত একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে—যা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সঞ্চারী প্রতিভা—আবৃত্তিকারের ও একান্ত শ্রোতার। জনতার হয়ত এটি বিড়ম্বনা বিবেচিত হবে। রেকর্ড কম্বারটি অমূল্য।

ভারতী রেকর্ডে চারজন শিল্পীর রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রকাশিত হয়েছে। অসীম ভট্টাচার্যের কণ্ঠটি ভরাট, তবে ট্রিমেলো বাহুল্য অনেক জায়গায় বিড়ম্বনায় ফেলে। রেবা রানী ঘোষ পেয়েছেন 'তোমারি ঝরনা তলায়' রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপযুক্ত কণ্ঠ। তবে গান নির্বাচনে তাঁকে সচেতন হতে হবে। যেমন এই গানটিতে ধন। সার্বাহিনী। পর্দাগুলি অনায়াস নয়। সুস্মিত সেনের কণ্ঠ এখনও অনেক পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে।

সুপ্রকাশ চাকী আধুনিক গানের পরিচিত শিল্পী। রবীন্দ্রসঙ্গীতেও তাঁর সম্ভাবনা উজ্জ্বল। তবে এই প্রথম রেকর্ডে তাঁর স্বরলিপি অনুসরণ রক্ষার জন্য হয়ত কিছুটা নিষ্প্রাণ মনে হয়েছে। আশা রাখা যায়, ক্রমশ স্বরলিপি বজায় রেখেও তিনি স্পষ্ট বলতে পারবেন 'কণ্ঠে নিলেম গান/একলা ঘাটে রইব না আর সেই তরুণার পাড়ি।'

দেবাশিস দাশগুপ্ত

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **নৃত্য**

## মৈতৈ জগোই

মণিপুরী নৃত্যের সঙ্গে প্রলয়-কল্প গুরু আমুবি সিং-এর সুযোগ্য শিষ্যা দেবযানী চালিহা প্রতিষ্ঠিত 'মৈতৈ জগোই' সংস্থার সভ্য সর্বস্ব অনুষ্ঠানটি সম্প্রতি শিশির মঞ্চে উপস্থাপিত হল। আলোচ্য দিনের অনুষ্ঠানে সংস্থার অল্পবয়সী শিল্পীরাই অংশগ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে আক্ষরিক অর্থে বেশ কজন শিশু শিল্পীও ছিল। দেবযানী চালিহার পরিচালনায় মণিপুরী নৃত্যচর্চার প্রাথমিক ও পরিণত পর্যায়ের একাধিক শিল্পীর অংশ গ্রহণে এদিনের আসরে পরিবেশিত হল বাল্যলীলা, গৌরলীলা, লেইমা জগোই, পুঙচোলম, রাস ইত্যাদি বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন নৃত্যানুষ্ঠান। এছাড়া ছিল বৈষ্ণবকবি রায়-শেখরের কবিতা অবলম্বনে 'কসুমিত কুঞ্জে' নামের একটি নৃত্য এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথামৃতের গল্প অবলম্বনে শিশুদের জন্য বিশেষ একটি নৃত্য-নাটিকা। নাটিকাটি শিক্ষামূলক হলেও

(অহংকারই পতনের কারণ) এর প্রয়োগ-পরিকল্পনা শিশুদের পক্ষে অত্যন্ত আনন্দপ্রদ। নাটিকাটির বিভিন্ন চরিত্রে শিশুশিল্পীদের সানন্দ অংশগ্রহণও তারই প্রমাণ।

আলোচ্য আসরে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী শিল্পীদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ পরে নিশ্চয়ই পাবো, আপাতত যে কথাটা বলার তা হল, কোনো শিল্পীই চান না তাঁর শিল্পকীর্তি কম্র সময়সীমায় বাঁধা পড়ে থাক। কিন্তু ভেবে দেখলে অস্বীকার করার উপায় নেই, একজন প্রয়োগশিল্পী অনেকাংশেই কালের গণ্ডিতে বাঁধা। প্রয়োগশিল্পে বিশেষত নৃত্যকলায় একজন শিল্পীর সার্থকতা নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত উৎকর্ষে কিন্তু সেই উৎকর্ষের কাম্য যোগ্য উত্তরাধিকারে। 'মৈত্রে জগোই' সংস্থার মূল লক্ষ্যও সেইটি। যে কারণে আলোচ্য সংস্থা সযত্নেই শিক্ষার্থীদের তথাকথিত 'ডিপ্লোমা' প্রদানে আগ্রহশীল নন, যা প্রকারান্তরে একজন শিল্পীকে তো বটেই, তাঁর শিল্পকেও উদ্দেশ্যঘাতী করে তোলে। রূপকী শিল্পী নিয়েও নানান ধরনের কাণ্ডজ্ঞান-প্রগলভতা যখন এই নগরজীবনে বর্তমান তখন মৈত্রে জগোই সংস্থার মাধ্যমে দেবযানী চালিহার বিশেষ এক নৃত্য ধারার দায়িত্বপূর্ণ প্রসারকল্প নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

রত্না দাস

---

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

---

## কাল বিহঙ্গ

মনোজ মিত্রের একাঙ্ক যখন অন্তর্লোকের উন্মোচন করে, তখন চরম পর্যায়ের উদ্ভাসিত মুহূর্তটি দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে, যেমন 'মৃত্যুর চোখে জল' বা 'টাপুর টুপুর'। কিন্তু একাঙ্ক যখন বাইরের সংঘাতে ঘটনাবাহিত হয়ে আসে তখন ঘটনার ঘনঘটায় প্রেক্ষাগৃহে চমক সৃষ্টি করলেও নাট্যপ্রভাব হয় ক্ষণস্থায়ী। এই কারণেই মনোজ মিত্রের অনেক একাঙ্ক পরবর্তীকালে পূর্ণাঙ্গ অবয়বে ধন্য চরিতার্থ।

বহুরূপী প্রযোজিত 'কালবিহঙ্গ' একাঙ্ক ঘটনাভারাক্রান্ত। ফলে ভজহরের ছলনা যেমন শুধু রিলিফ তাঁর নিদারুণ ট্র্যাজেডি ও সংগ্রামে জয়লাভের হাততালিতে চাপা পড়ে যায়। রমাপ্রসাদ বণিক নিপুণ নির্দেশক। কিন্তু অনিয়মিত অভিনয়ের জন্য 'কালবিহঙ্গ'র অভিনয় খুব কম সময় সেই নৈপুণ্যের চাহিদা মেটাতে পারে। যেমন ভজহরের ভূমিকায় অভিজিৎ নন্দী প্রথম থেকে সুন্দর অভিনয় করেন, কোথাও বাড়াবাড়ি নেই, কিন্তু খোকা আহত হবার পর তিনি খেই হারিয়ে ফেলেন। পার্থ গোস্বামী এবং অন্য কয়েকজনের আরোপিত বাচনভঙ্গি চরিত্রের সঙ্গে মেলে না—এই প্রবণতা সবচেয়ে ক্ষতি করে ডাক্তারের ভূমিকায় সমীরণ মুখার্জির। এঁদের তুলনায় শ্যামলেন্দু মজুমদার অনেক স্বাভাবিক। রমাপ্রসাদ বণিক নির্দেশনায় আঙ্গিক দিয়েও নাটককে অন্যমাত্রা যোগ করার চেষ্টা করেননি। মঞ্চ সামগ্রীতে যা যা

থাকা দরকার তাই আছে—অর্থাৎ দেয়া দর্শন দেখাতে জগ্ ছাড়া, হারিকেন সবই আছে। আলো যেমন ভাবে হয় সেই রকমই ঘনীভূত বা বিস্তারিত হয়। এক জায়গায় খাঁচাটির ছায়া সমস্ত মঞ্চ জুড়ে থাকলেও সেটা কায়দাই হয়ে থাকে।

অনিয়মিত অভিনয় বা মহলার অনিয়মিততে কয়েকজন সংলাপ উচ্চারণে হোঁচট খান (যেটা বহুরূপীর প্রযোজনায় সংবাদ) কিন্তু 'কালবিহঙ্গ'র পরবর্তী একাঙ্ক নিরূপ মিত্রের 'আততায়ী' রমাপ্রসাদ বণিকের নির্দেশনা নৈপুণ্যের সাক্ষ্য দেয়। একটি বহুকথিত বক্তব্য কিন্তু কুশলী উপস্থাপনায় আর একবার ভাবতে প্রলুব্ধ করে।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

ছবি : অজয় দত্তগুপ্ত

---

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **বিবিধ**

---

## তরুণতীর্থের বার্ষিক সম্মেলন

ছোট্ট মেয়ে টুম্পা। তারও একটা সংসার আছে। সেই সংসারে খেলাচ্ছলে সে বড়দের সংসারটাকেই অনুকরণ করে। টুম্পার সংসারে আছে পুতুল মেয়ে পম্পা, আছে খাওয়ানো পরানো অসুখ বিসুখ ডাক্তার ডাকানো। টুম্পা ছোট্টটি থাকলেও তার পুতুল মেয়ে পম্পা এক বেলাতেই কোলের শিশু থেকে ডাগরটি হয়ে যায়। মেয়েকে বিয়ে দেবার চিন্তা করতে হয় তাকে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য-চিন্তাও অবশ্য তার থাকে। সন্ধ্যার আগেই গুটিয়ে ফেলতে হয় নিজের এই খেলার সংসারটিকে। কারণ বাবা তখন অফিস থেকে ফিরে আসেন। আর বাবা ফিরে এলেই তো বই নিয়ে বসতে হয় টুম্পাকে। সমর মজুমদারের রচনার অনুসরণে কাকলী রায়ের নির্দেশনায় এই সমস্ত ব্যাপারগুলোই চমৎকার অভিনয় করে দেখালো ছোট্ট একটি মেয়ে শ্রাবণী। আলোচ্য শিশুনাটকটি কিশোর সংস্থা তরুণতীর্থের প্রযোজনা। এই সংস্থার কেন্দ্রীয় সম্মেলন সম্প্রতি উদযাপিত হল কলামন্দির বেসমেন্টে। তরুণতীর্থ নামে কিশোর সংস্থা হলেও আলোচ্য দিনের অনুষ্ঠানে দেখলাম শিশুদেরই প্রাধান্য, সেটা অনুষ্ঠানসূচী এবং অংশগ্রহণ দু দিক থেকেই। সে যাই হোক, সন্ধ্যাটির সমস্ত পরিচালনা উপস্থিত সকল বয়সের দর্শককেই আনন্দ দান করে। সূচনায় দেখা গেল সন্দীপকে, তরুণতীর্থের অল্পবয়সী এক সদস্য, যে একটি শিশুমেলা পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে মঞ্চে আসে। সন্দীপের ডাকে প্রেক্ষাগৃহের বিভিন্ন কোণ থেকে গুটি-কয় শিশু মঞ্চে উঠে এসে কেউ শোনালো গান কেউ বা আবৃত্তি। ছোটদের অনুষ্ঠানে এই ধরনের শিশুমেলা, যার দায়িত্বে থাকবে একজন শিশু, নিশ্চিন্তভাবে অভিনন্দনযোগ্য। কারণ এতে শিশুরা স্বাবলম্বী হবার পথ খুঁজে পায়। অনুষ্ঠান পরবর্তী পর্যায়ে পরিবেশিত হল কবি প্রণাম (স্বদেশ ও বিচিত্র পর্যায়ের নির্বাচিত রবীন্দ্র-সংগীত, একমাত্র এতেই সংস্থার কিশোর কিশোরীরা অংশগ্রহণ করেন), লোক নৃত্য, কবি গানের ঢঙের আর-শোলা চায় পাখি হতে ইত্যাদি।

রাখী দাস

## আবৃত্তায়ণের আসর

১৪ মার্চ থিয়েটার সেন্টারে 'আবৃত্তায়ণ' গোষ্ঠীর উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছিল এক আবৃত্তির আসর। একক কণ্ঠের আবৃত্তি ছাড়াও তিনটি আকর্ষণ ছিল। সম্মেলক আবৃত্তি ও সম্মেলক পাঠ।

পৃথা ঘোষ নেহাতই বালিকা। কিন্তু তার 'গোরুচুরি' সেদিনের সব থেকে নিখুঁত পরিবেশন, এতে সন্দেহ নেই। অজন ঘোষ, সুনীল বসুর 'আমি এই' কবিতাটির নির্বাচনে যে স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরলেন, পরিবেশনে সেই ধরনের স্বাতন্ত্র্য ছিল না। উচ্চারণেও ভুল রয়েছে। 'গ্যালাম' নয়, গেলাম। পার্থ বসুর কণ্ঠে সুর এবং সবলতা রয়েছে, রয়েছে অর্থ-অনুসরণের দক্ষতা, কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় তার সুরেলা ভঙ্গিটি মাত্রাতিরিক্ত মনে হয়েছে। মহাদেব চক্রবর্তী এবং দেবেশ মুখোপাধ্যায়-এর ভঙ্গি উত্থানপতন-হীন, একঘেয়ে। তপন সান্যাল কবিতার অন্তর্লীন মেজাজের সঙ্গে তাল রাখতে ব্যর্থ। রবীন মজুমদারও তাই। মনে আছে 'কলকাতা' যে প্রশ্নবোধক তা ধরতেই পারলেন না। উচ্চারণেও গোলমাল, কাস্ট-এর রেফ আসেনি, 'বাঁশ' শুনিয়েছে 'বাঁক'। প্রদীপ রায়-চৌধুরীর গলা উদাত্ত, কিন্তু আধুনিক কবিতার সঙ্গে পরিচয় নিবিড় নয়। গদ্য-ছন্দের অন্তর্লীন স্পন্দন ধরতে পারেননি। শিখা সেনগুপ্ত ভুল যতি দেন, মহাপ্রেমিক সে যীশুতে ভুল জায়গায় কেটে ছন্দঃপতন ঘটালেন। ভঙ্গিটিও আবৃত্তির নয়, পাঠের।

শিশুদের জন্য সংকলন 'আয় রে ভোলা খেয়াল খোলা' লেখা ও আবৃত্তির দিক থেকে মোটামুটি সার্থক। 'প্রথম পার্থ' কাব্যনাটক নাট্যরসহীন পাঠে তার চরিত্র হারিয়েছে। কাব্য নাটকে নাটকও যে কবিতার মতোই জরুরী, পাঠের মন্থরতায় তা ধরা গেল না। সংকলিত অনুষ্ঠান 'কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে রক্তজ সূর্যোদয়'-এ বহু-ব্যবহৃত চমৎকার প্রয়োগ। এখন ভোঁতা লাগে। বিশেষত, সম্মেলক আবৃত্তির সঙ্গে যুগপৎ একক কণ্ঠের আবৃত্তিতে কথা বোঝা যায়নি ভাল করে। মাইকেও গোলমাল ছিল সেদিন। কালক্ষেপ ঘটছে ঘোষণাতেও। ভেতর থেকে ঘোষণার ব্যবস্থা থাকলে ভালো হত, অথবা পূর্ববর্তীরা যদি পরবর্তীর নাম বলে যেতেন—যেমন দু-একবার হল—তা হলেও শূন্যতা কমানো যেত।

প্রসূন মুখোপাধ্যায়

# হাই পাওয়ার সার্ফ ধোয় সবচেয়ে সাদা ক'রে...

## এমন, যা নজরে পড়ে!

আপনার ছেলে যদি জামাকাপড় ময়লা করায় চ্যাম্পিয়ন হয়, তাহ'লে সেই ময়লার সঙ্গে লড়াই করার জন্যেও ত' দরকার আর এক চ্যাম্পিয়নেরই— হাই পাওয়ার সার্ফ।

হাই পাওয়ার সার্ফের শক্তিশালী ফরমূলায় আছে বেশী পরিষ্কার করার ক্ষমতা, যা কাপড়ের ধূলো ময়লার প্রতিটি কণা তুলে বের ক'রে ফেলে। সত্যিকারের ময়লা জামাকাপড়ও ক'রে তোলে ধবধবে সাদা!

হাই পাওয়ার সার্ফ আপনার পুরো পরিবারের জামাকাপড়কে দেয় এক বাড়তি শুভ্রতা আর উজ্জ্বলতা। তাই তো বেশীর ভাগ মায়েরা কাপড় ধোয়ার জন্যে অন্য পাউডারের চেয়ে, সার্ফই বেশী ব্যবহার করেন।

**বেশীর ভাগ মায়েরা কা· ড় ধোয়ার জন্যে অন্য পাউডারের চেয়ে সার্ফই বেশী ব্যবহার করেন।**

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উ  দন

লিনটাস-SU 220- 24  BG

গলা ব্যথা
কাশি থেকে রেহাই দেয়...
ULKA-PP-1/80 BEN
মুখরোচক স্বাদ, গলার আরাম।
ভো কা সি ল
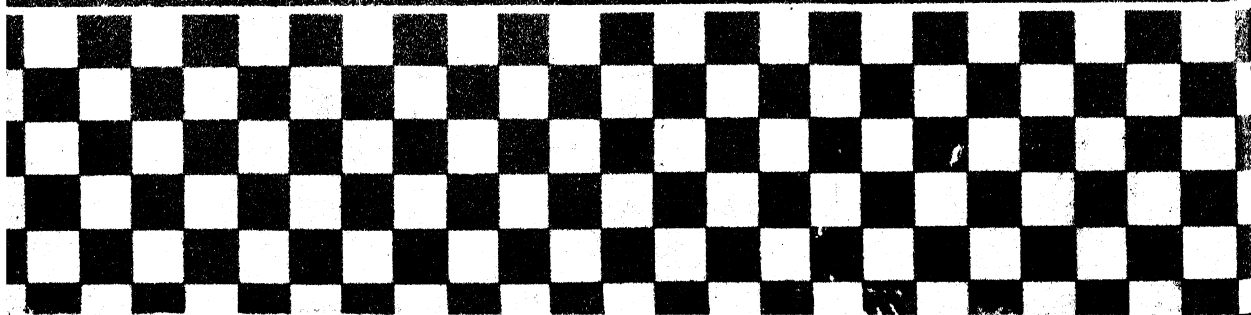
বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ: সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর

STATUTORY WARNING CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH

ইন্ডানা হোল মিল্ক পাউডার
হাতের কাছে এমন খাঁটি দুধ যা দিয়ে মনোমত
অনেক খাবার তৈরী করা যায়।
পান করুন, শীতল
পানীয় তৈরী করুন, দই
জমান, অন্য জিনিসের সঙ্গে
মিশিয়ে খান, মিষ্টি তৈরী করুন
আপনার এলাকায় বিশুদ্ধ পুষ্টিকর দুধ সহজে পাওয়া না গেলে
আপনি কি করবেন ? আপনার রান্নাঘরের কাজই তো বন্ধ হয়ে যাবে,
আর বাচ্চারা দুধের তৈরী তাদের প্রিয় খাবার থেকে বঞ্চিত হবে।
এইসব সমস্যার সমাধান—এক টিন ইণ্ডানা হোল মিল্ক পাউডার
সহজে গুলে যায়, পুষ্টিকর আর সুস্বাদু—এই দুধ দিয়ে আপনি
হরেক রকম মজাদার খাবার তৈরী করতে পারেন। হাতের কাছে
ইণ্ডানা রাখুন—আপনার পরিবারের সবাই খুশী না হয়ে পারবে না।
ইনডানা
হোল মিল্ক পাউডার
—এমন প্রাচুর্য্য যাতে সবাই খুশী
Indana
Whole Milk Powder
FOREMOST DAIRIES LIMITED
OBM 4936 Ben

## চিঠিপত্র

### এশিয়াটিক সোসাইটি

দেশ পত্রিকার এশিয়াটিক সোসাইটি সম্পাদকীয় এবং একাধিক যে সংখ্যাতে প্রকাশিত নির্মল চৌধুরীর চিঠি পড়লাম। বিশ্ববিখ্যাত কিংবদ প্রতিষ্ঠান এশিয়াটিক সোসাইটি আজ মুমূর্ষপ্রায়, আর্থিক অনটনকে তার এই দুরবস্থার একমাত্র কারণ বললে সত্যের অপলাপ হবে। এই ধরনের বিশ্বং প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা খুব কম ক্ষেত্রেই ভালো হয়, কিন্তু অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠান যেখানে এখনও সগৌরবে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, সেখানে এই সুপ্রাচীন ও আমাদের জাতীয় মর্যাদার প্রতীকপ্রতিম বিশ্বত সংস্থাটি কিছু সুযোগসন্ধানী লোকের ক্রীড়াভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্মলবাবু ঠিকই বলেছেন 'এই সোসাইটির কর্মকর্তারা একে ক্লাব হিসাবে গণ্য করেন...কর্তাব্যক্তিরা এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের ইমেজ প্রোজেক্ট করবার জন্য ব্যবহার করেন।' গত কয়েক বছরের সোসাইটির কাজকর্মের ইতিহাস তার সাক্ষী দেবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ গত কয়েক বছর সোসাইটির দুটি সম্মান 'ফেলোশিপ' ও বিভিন্ন পদক—যাঁদের দেওয়া হয়েছে তাঁরা ঐ বছরগুলিতে যাঁরা সোসাইটির কর্ণধার ছিলেন, তাঁদের দলের লোক, বশংবদ ও সোসাইটির সম্মানের বিনিময়ে তাঁদের অনুগৃহীত করায় ক্ষমতাসম্পন্ন। অনেক ক্ষেত্রে কর্তারা নিজেরাই সম্মানগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছেন। এই কর্মকর্তারা ঘুরে-ফিরে গত এক দশকেরও বেশি সোসাইটির পরিচালকমণ্ডলীতে বহাল তবিয়েতে আছেন এবং নিজেদের দলের বাইরের কাউকে এই মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করেন না। এঁদের আর্থিক ও লোকবল আছে এবং সোসাইটির কিছু সংখ্যক কর্মচারী পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচনের সময় সোসাইটির কাজকর্ম ফেলে রেখে ইলেকশন কর্মীর ভূমিকায় নেমে পড়েন।

এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য চাঁদা বছরে পঞ্চাশ টাকা। সাধারণ সদস্য এই চাঁদার বিনিময়ে কী পান? সত্য কথা বলতে কিছুই নয়। গত কয়েক বছর যাবৎ সোসাইটিতে বই কেনা প্রায় বন্ধ হয়ে আছে, সোসাইটি 'জার্নাল'-এর প্রকাশও অনিয়মিত এবং বছরে চারটি সংখ্যার পরিবর্তে একটি মাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তা-ও অসংখ্য মুদ্রণপ্রমাদে ভর্তি। গত পাঁচ সাত বছরে এখানে ও বিদেশে মানবিকী বিদ্যার ক্ষেত্রে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য ও বিশিষ্ট বইপত্র বেরিয়েছে তার পাঁচ শতাংশ বইও এখানকার গ্রন্থাগারে নেই। সোসাইটির সংগ্রহশালায় এখনও বহু মূল্যবান পুঁথিপত্র, পুরালেখ, মুদ্রা ইত্যাদি আছে। শোনা যায় তাদের মধ্যে বেশ কিছু নাকি অন্তর্হিত। কাগজেও এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে দু একটি খবর বেরিয়েছে।

সোসাইটির গ্রন্থাগারের অবস্থা

খুবই খারাপ। সাধারণ পাঠকের জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারগুলি ভাঙা কিংবা ছারপোকায় ভর্তি। বই চাইলে সহজে পাওয়া যায় না। কর্মচারীদের দেখা পাওয়াও সমান শক্ত। এ অভিজ্ঞতা এক-জন সাধারণ পাঠকের। পরিচালক-মণ্ডলীর সদস্য হলে বা সদস্যের বন্ধু হলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। সাধারণ সদস্য তিনখণ্ড বই (দুষ্প্রাপ্য না হলে) বাড়ি নিয়ে যে[illegible] পারেন, কিন্তু কর্তাব্যক্তিরা যে কোন সংখ্যক বই নিয়ে যেতে পারেন, এবং সে সব বই যতই দুষ্প্রাপ্য হক না কেন। সোসাইটির গ্রন্থাগারের বহু বই এই সব 'প্রিভিলেজড' সদস্যদের কাছ থেকে ফেরত আসেনি এবং হয়তো আসবেও না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কিছু-দিন আগে সংস্কৃত 'কামসূত্র'-এর খোঁজ করেছিলাম। পেলাম না। জনৈক গ্রন্থা-গারকর্মী [illegible]লেন, এটি সোসাইটির একজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ১৯৫৭ সালের ১২ সেপ্টেম্বর নিয়ে রেখে-ছেন, [illegible]কে [illegible]বার ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত দেননি। এবং আরও উল্লেখযোগ্য, কামসূত্র সহ তাঁর কাছে মোট বই আছে নটি। যেখানে সাধারণ সদস্য তিনখানার বেশি বই পান না, সেখানে এই প্রেসিডেন্ট মহোদয় নখানা বই নিয়ে রেখে দিয়েছেন। এই হলো সোসাইটির কাজকর্মের নমুনা প্রশাসনিক দক্ষতা ও গণতান্ত্রিক আদর্শের পরিচয়।

সোসাইটির গলদ ও সমস্যার দূরী-করণ সম্ভব দুটি রাস্তাতে। প্রথম, কোন প্রাক্তন বিচারপতি (তিনি অন্য প্রদেশের হলে ভালো হয়)কে দিয়ে সোসাইটির পরিচালন-ব্যবস্থার ও বর্ত-মান ও পূর্বতন পরিচালকমণ্ডলীর কাজকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করানো। এবং দ্বিতীয়, এই তদন্তের ফলাফল না বেরোনো পর্যন্ত সরকারী অনুদানের পরিমাণ বাড়ানোর প্রস্তাব মুলতুবী রাখা।

বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী

কলকাতা-১২

## স্মৃতি সততই সুখের

॥ ৫ ॥

শ্রীমতী প্রতিভা বসুর 'স্মৃতি সততই সুখের' (২৯ মার্চ সংখ্যায়) একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি, 'ভগবান বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব—এঁদের কথা ছেড়েই দিলাম, এই সেদিনও শ্রীঅরবিন্দ এবং মহাত্মা গান্ধী বেঁচেছিলেন। কিন্তু আমরা ভারতীয় হিন্দুরা, কখনোই তাঁদের উপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করিনি। প্রকৃতির বিধান উল্টিয়ে কুমারীর গর্ভ-পাত বলেও প্রচার করিনি। এমন একটা ভারসাম্যহীন উক্তি কী বলে এঁরা তথ্য হিসাবে বিশ্বাস করেন সেটাই আশ্চর্য।'

প্রকৃতির বিধান উল্টিয়ে কুমারীর গর্ভপাতের ঘটনা কি হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞা লেখিকা হিন্দু শাস্ত্রে কখনোই পান নি? ধর্মশাস্ত্রে উক্ত সকল ঘটনা ধর্মবিশ্বাসী মানুষ তথ্য হিসাবেই গ্রহণ করে, ভার-সাম্যহীন উক্তি বলে মনে করে না। কারণ

উপরই প্রতিষ্ঠিত। ধর্মবিশ্বাসীরা ধর্মের তত্ত্বই বিশ্বাস করে, নাস্তিক ধর্মের তথ্যের অনুসন্ধান করে। লেখিকার আর একটি উক্তি, 'ভারতীয় সন্ন্যাসে অন্য ধর্মের উপর কোন হস্তক্ষেপ নেই, শুধু নিজেকে নিয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের কৃচ্ছ্রসাধনা, মিশনারীদের কৃচ্ছ্রসাধনের নীতি এর সম্পূর্ণ বিপরীত।' কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে নিজের আত্মাকে উচ্চতর মার্গে উন্নয়নই কি সব ভারতীয় সন্ন্যাসীদের একমাত্র লক্ষ্য? সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কি মানুষের সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে চাননি? মা টেরেসা তো আজও জীবিত। ধরাছোঁয়ার মধ্যে। যদিও ভারতীয় সংবিধানবলে তিনি আজ ভারতীয়, তবু মূলে তিনি কি মিশনারী নন? তিনি কি খ্রীষ্ট-মতাবলম্বী নন? তিনি কি অন্য ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ না করেই খ্রীষ্ট আদর্শে আর্ত-অসহায় মানুষের সেবার মাধ্যমে ঈশ্বর উপলব্ধি করছেন না?

লেখিকা ধান ভানতে শিবের গীত গেয়েছেন। খ্রীষ্ট ধর্ম সম্পর্কে অল্প জ্ঞানের মূলধন নিয়ে সমস্ত খ্রীষ্টান জগতের মানুষের বিশ্বাসে আঘাত করার মধ্যে স্মৃতি রোমন্থনের কি আত্মসুখ ছিল জানি না।

প্রদীপ্ত মণ্ডল চাম্পাহাটী

## খরা ও স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান

'দেশ' (৩৩ সংখ্যায়) পত্রিকায় অতুল্য ঘোষ মহাশয় "কণ্টকল্পিত" প্রবন্ধে 'খরা' সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকেও কিছু না করার জন্য দোষারোপ করেছেন। বর্তমান সরকার কি করছেন ও কি করবেন তা আমার বক্তব্য নয়। উনি উল্লেখযোগ্য সেবাপ্রতিষ্ঠানগুলি বলতে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম, মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটিকে বোঝাতে চাইছেন। কিন্তু উনি কি জানেন না, ঐ সংস্থাগুলির কোন টাকার গাছ নেই, বা এমন প্রচুর অর্থ নেই যে ইচ্ছা করলেই যখন যে কোন সেবা কাজ শুরু করেন। এবার খরার ব্যাপারে সংবাদপত্রের তেমন কোন ভূমিকা ছিল না। ফলে জনসাধারণও অবহিত নন, এ জন্য ও'দের কাছে রিলিফের জন্য দানও আসেনি। তবুও রামকৃষ্ণ মিশন পশ্চিমবঙ্গের ব্রাঞ্চ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে তাঁদের সাধ্যমত টিউবওয়েল বা কূপ খনন করেছেন এমন রিপোর্ট তাঁদের বিভিন্ন ম্যাগাজিনে দেখতে পাই, তাঁরা যা করেন কংগ্রেসী বা রাজনৈতিক নেতাদের মত তা ঢাক পিটিয়ে করেন না। সাধ্যমত সেবার ভাবে করেন। ক্ষমতার বাইরে ও'রা যান না বলেই এখনও এই মুহূর্তে আরামবাগ খোরাস্ত, ত্রিপুরা, অন্ধ্র প্রভৃতি স্থানে লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ করে চলেছেন। অতুল্যবাবু কি বলতে চান—ও'রা ট্রাকে করে জল নিয়ে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেবেন, যাতে হাজার হাজার গ্যালন ডিজেল লাগবে। লক্ষ লক্ষ টাকা লাগবে। তা কি সরকার ছাড়া কোন স্বেচ্ছা সেবা সংস্থার পক্ষে সম্ভব?

রঞ্জিত রায় কানপুর

প্রকাশিত হল

# সন্তোষকুমার ঘোষের

স্মরকর কিশোর-গ্রন্থ

## দুপুরের দিকে

দাম ৮.০০

কজন মানুষ বারো

র বয়সের মধ্যে যা শেখে

কি জীবন তারই

র্তত চর্বণ চলে। ফলে

জন কিশোরকে যেভাবে

জ ভেবে নাবালক করে

খি আমরা, বোধহয় ততটা

চ সে নয়।

ন্তোষকুমার ঘোষই

ম্ভবত সেই লেখক, যিনি

শেষভাবে শিশুদের

র-শিশুত্ব থেকে মুক্তি

য়েছেন। তাঁর লেখা একটু

ঢ়, একটু গভীর, একটু

টিল। তিনি গা ভাসিয়েছেন

রাচরিত শিশু-সাহিত্যের

তিকূল স্রোতে।

রি রচনা সেই সব

ছলে-মেয়েদের জন্যে, যারা

ই-প্রথম জীবনের

টিলতার আস্বাদ নিতে

শুরু করেছে। যারা

কালবেলা থেকে পা

াড়িয়েছে দুপুরের দিকে।

য়ঃসন্ধির দারুণ সময়ে

ঠাৎ তাদের মনে হতে পারে,

এই তো সেই কথা,

া বস্তুতপক্ষে আমারও!

রবীন্দ্রোত্তর যুগের

বশিষ্ট গল্পকার সন্তোষকুমার

এর আগে শিশুদের জন্য

সময় ব্যয় করেননি একটুও।

আকাদেমী পুরস্কার-প্রাপ্ত

এই লেখক বড়ো বেশি

ব্যস্ত ছিলেন বড়োদের নিয়ে।

এই প্রথম তাঁর কিশোরদের

মনস্তত্ত্বে পদচারনা এবং

প্রথম বারেই ওই আশ্চর্য

সাম্রাজ্যের অনেক অদেখা

বস্তুকে তুলে এনে হাজির

করেছেন তাদের সামনে

এবার বারা তাঁর রচনার বিষয়।

ভেতরে চমৎকার সব ছবি—

এঁকেছেন দেবাশিস দেব।

# শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সর্বপ্রথম উপন্যাস

## দাদার কীর্তি

দাম ৮.০০

'দাদার কীর্তি' শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা জীবনের সর্বপ্রথম উপন্যাস। এই চমৎকার হাসির উপন্যাসটি তিনি যখন লেখেন, তখন তাঁর বয়স মাত্রই ষোলো। প্রথমে এই কাহিনীর নাম শরদিন্দুবাবু রেখেছিলেন, 'প্রেমের প্রায়শ্চিত্ত।' পরে তা পালটে রাখেন, 'দাদার কীর্তি।' বিস্ময়কর ব্যাপার হল, লেখকের জীবৎকালে এই উপন্যাসটি কোথাও প্রকাশিত হয় নি। অথচ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লেখকের ক্ষেত্রে জীবনের সর্বপ্রথম উপন্যাসের তো বটেই, যে-কোনো রচনারই ঐতিহাসিক গুরুত্ব যে অপরিসীম, সে-কথা বলা বাহুল্য। তাঁর লেখক জীবনের ক্রমবিবর্তনের ধারা ও স্বরূপ জানতে গেলে 'দাদার কীর্তি'কে কোনোমতেই উপেক্ষা করা যায় না। আবার 'দাদার কীর্তি' পড়লে বোঝা যায় যে, জীবনের প্রথমতম রচনা হলেও এ-উপন্যাসের প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের হাসির উপন্যাসের দীর্ঘ-অনুভূত অভাব মেটাতে পেরেছে। এর গড়নে হাসি, আত্মায় হাসি, ভাষায় বর্ণনায় অনাবিল অবিমিশ্র হাসি। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠকদের কাছে তাই 'দাদার কীর্তি' এক অমূল্য সম্পদ রূপে গণ্য হবে। বইটির আকার যেমন সুন্দর, মুদ্রণও তেমনই নয়নহরণ। আগাগোড়া দু-রঙে ছাপা, সোনার জলে কাপড়ে ছাপা প্রচ্ছদ, হাফ-লেদার বাঁধাই। উপহারের পক্ষেও দারুণ।

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

# নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর

সর্বাধুনিক কাব্যগ্রন্থ

## আজ সকালে

দাম ৬.০০

যিনি কেবলই বদলে নেন নিজেকে, বিগত তিন দশকেরও অধিক কাল ধরে বাংলা কবিতায় যাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি এক লহমার জন্যও অমনস্ক হবার সুযোগ দেয়নি, তাঁর প্রতিটি কাব্যগ্রন্থই নতুনতর তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয় পাঠকের কাছে। 'আজ সকালে'

নীরেন্দ্রনাথের সেই রকমই তাৎপর্যময় নতুন কাব্যগ্রন্থ। কিছুকাল আগে লেখা তাঁর যাবতীয় স্মরণীয় কবিতা স্থান পেয়েছে এই কাব্যসংকলনে।

এই লেখকের অন্য কাব্যগ্রন্থ:

উলঙ্গ রাজা ৬.০০

ছোটদের দুর্ধর্ষ উপহার

# নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর

ছড়ার বই

## সাদা বাঘ দাম ১০.০০

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কবিতা লিখছেন চার দশক ধরে, কিন্তু তাঁর ছড়ার বই এই প্রথম বেরুল। এই বইয়ের দারুণ-দারুণ সব ছড়ার মধ্য দিয়ে নীরেন্দ্রনাথ যেন বারবার ফিরে গেছেন তাঁর শৈশবে, কৈশোরে। পাঠকও খুঁজে পাবেন তাঁর নিজের শৈশব ও

কৈশোর। বইটির পাতায় পাতায় বাঘা বাঘা ছড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাঘা বাঘা ছবি এঁকেছেন আরেক দুর্দান্ত শিল্পী—বিমল দাস।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

# অভ্র রায়ের

বৈচিত্র্যময় উপন্যাস

## হৃদয়ের শব্দ

দাম ৭.০০
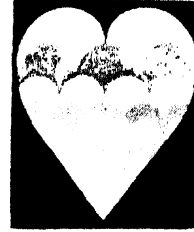
বিমল কর লিখেছেন—

"আমরা যদি অভ্র রায়ের সবে-ধন উপন্যাসটির কথা স্মরণ করি—'হৃদয়ের শব্দ'—যার পটভূমি বাংলা সাহিত্যে একেবারে নতুন (অন্তত এয়ারফোর্স ফ্লাইং ক্লাবের পটভূমি আগে বাংলা সাহিত্যে এসেছে বলে আমি জানি না) তাহলে বুঝতে পারব, লেখক ঠিক শৌখিন দর্শক নয় জীবন-বৈচিত্র্যের। তাঁর নিজের কোনো দৃষ্টিভঙ্গি জীবন-সম্পর্কে জড়িয়ে আছে॥"

# শেখর বসুর

তাঁর গভীর উপন্যাস

## অন্যরকম দাম ৬.০০
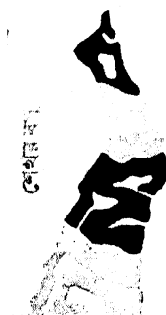
"চরিত্র সম্পর্কে ট্র্যাজিক, কমিক, টাইপ ইত্যাদি বিশেষণগুলো মানি না। আমি নতুন অর্থে 'শ্রেণীহীন' চরিত্রে বিশ্বাস করি।" —এ-কথা লিখেছেন যে-লেখক, তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল হয় তীব্রতর। "অন্যরকম" সব-দিক থেকেই নতুন স্বাদের অন্যরকম উপন্যাস॥

প্রকাশিত হল

# গৌরী ধর্মপাল এর

ছোটদের ছড়ার বই

## ঘোড়া যায়

প্রকাশিত হল

# সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের

নতুন স্বাদের উপন্যাস

## ক্যানসার দাম ৮.০০

ক্যানসার—এই চারটি অক্ষরের মধ্যে যেন লুকনো রয়েছে প্রতিকারহীন এক সর্বনাশের ইঙ্গিত। এ এমন এক ব্যাধি যা শুধু ব্যক্তিমানুষকেই নয়, সমগ্র সমাজকেই ভিতর থেকে করছে আক্রান্ত। অসহায় আক্রোশে নিষ্ফল প্রতিবাদে নিষ্ঠুর নিয়তির হাতে আত্মসমর্পণ হয়ে পড়েছে অবধারিত।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এমনই একটি বিষয়বস্তুকে বেছে নিয়েছেন তাঁর নতুন উপন্যাসে। এ কাহিনীর নায়ক শংকর সৎ, অসচ্ছল, মধ্যবিত্ত এক যুবক। স্ত্রীর ব্রেস্ট ক্যানসারের চিকিৎসার জন্য মরিয়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল অর্থের সন্ধানে। সম্পন্ন আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে পুরনো বন্ধুবান্ধবদের যেমন আবিষ্কার করল সে, তেমনই তার অভিজ্ঞতার পৃথিবীতে যুক্ত হল অনেক নতুন মুখ, বহু নতুনতর মূল্যবোধ। কুখ্যাত পল্লীর বাসিন্দাদের যেমন, তেমনই অভিজাত ফ্ল্যাটবাড়ির লোকদেরও চিনল সে। বন্ধুত্ব, প্রেম, সতীত্ব, নিষ্ঠুরতা, পাশবিকতা, প্রতিশোধ—যাবতীয় চলতি ধারণাগুলো নতুন আলোয় কীভাবে প্রতিফলিত হল তার চোখের সামনে—তাই নিয়েই আদ্যন্ত উৎকণ্ঠা মেশানো এক সজীব কাহিনী রচনা করেছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ:

শ্বেতপাথরের টেবিল ৭.০০

সোফা-কাম-বেড ১০.০০

পায়রা ৬.০০

দেশ ৪৭ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা
২৮ আষাঢ় ১৩৮৭



## সূচীপত্র



## পরবর্তী আকর্ষণ

কল্যাণকুমার দেবের প্রবন্ধ
গ্রাম ঈশ্বরের সৃষ্টি, সবুজ বিপ্লব মানুষের
মিহির মুখোপাধ্যায়ের গল্প
গ্রামীণ সংবাদ

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাণ্ময়াদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ এবং জীবনসত্য প্রিন্টিং হাউস ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

# বিচ্ছিন্নতাবাদের মানসিকতা

সাঁওতাল বিদ্রোহের এক শো পঁচিশ বছর পূর্ণ হল গত ৩০ জুন। ১৮৫৫ সালে দুই সাঁওতাল ভ্রাতা সিধু ও কানুর নেতৃত্বে এই বিদ্রোহের সূচনা। দীর্ঘ ছ' মাস সময় লেগেছিল ব্রিটিশ সরকারের সেই বিদ্রোহ দমন করতে। সিপাহী বিদ্রোহ ঘটেছিল আরও দু' বছর পরে। তবু সিপাহী বিদ্রোহ ভারতের ইতিহাসে যে গুরুত্ব পেয়ে আসছে সাঁওতাল বিদ্রোহ ততটা নয়। এর কারণ বোধ হয় এই, সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রধানত ছিল আঞ্চলিক, সাঁওতাল পরগণা জুড়ে। যদিও সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিচারে এই বিদ্রোহের কারণ নিহিত ছিল অর্থনৈতিক শোষণ ও নিপীড়নের মধ্যেই। আজ এক শতাব্দীর বেশী হয়ে গেল সেই কারণগুলি যে নিশ্চিহ্ন হয়েছে তাও নয়, তবু নতুন করে কোনো বিদ্রোহ ঘটেনি ; সিধু কানু ঐতিহাসিক পুরুষ হিসেবে থেকে গিয়েছেন। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বিশেষ কোনো ভাগ্য পরিবর্তনও যে ঘটেছে আজ এক শো বছরে তাও নয়। কিন্তু কোনো কোনো ঘটনা থেকে আশঙ্কা করার কারণ ঘটেছে, শান্ত নিরীহ পরিশ্রমী এই সম্প্রদায় আবার যদি কোনো দিন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তবে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না।

এ-কথা মনে রাখতে হবে, পশ্চিমবঙ্গের গায়ের পাশে আগুন জ্বলেছে। তার আঁচ কম নয়। ইতিমধ্যেই আমরা বিব্রত, বিড়ম্বিত। আবার এই সুযোগেই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ঝাড়খণ্ড, উত্তরখণ্ডের দাবী উঠেছে, দেওয়াল-লিপি পড়েছে, এবং দাবীদাররা গোপনে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করছে। উত্তরবঙ্গ থেকে উত্তরখণ্ডের দাবী, ঝাড়গ্রাম বীরভুম বাঁকুড়া পুরুলিয়া থেকে দাবী ঝাড়খণ্ডের। এটা লক্ষ করার বিষয়, 'সাঁওতাল মাহাতো ভাই ভাই, বাঙালীর রক্ত চাই' এই ধরনের লেখাপত্র, কিংবা 'উত্তরখণ্ড আলাদা চাই' প্রচারপত্র বিলি করার মধ্যে বিশেষ অভিসন্ধি গোপন রয়েছে। এর পরিণাম ভয়াবহ হতে পারে।

রাজ্য সরকার নিশ্চয় অন্ধ নন। তাঁদের চোখ যে সতর্কভাবে সব কিছু লক্ষ করছে তাতেও সন্দেহ নেই। বিশেষ করে সরকার এখন অধীনস্থ পুলিসকে এমনভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, সাঁওতাল বিদ্রোহের এক শো পঁচিশতম বার্ষিকীতেও ঝাড়গ্রামের মতন জায়গায় সামান্যমাত্র লোক জমায়েত হয়েছিল। অবশ্য সিউড়িতে যে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা সরকার করেছিলেন সেখানে হাজার তিরিশ লোক জমেছিল উপজাতি সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্বোধন উপলক্ষে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু একা নন, আরও অনেক মন্ত্রীটন্ত্রী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হয়ত এই সব কারণেই ভিড় জমেছিল। মুখ্যমন্ত্রী সেখানে তাঁর ভাষণে বলেছেন, কিছু লোক এই রাজ্যে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন সরকার তা বরদাস্ত করবেন না।

মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন তা সঙ্গত কথা। পশ্চিমবঙ্গ বলে কেন, দেশের কোনো প্রান্তেই কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন কোনো সরকারই সমর্থন করতে পারেন না। কিন্তু কোনো কোনো অন্য প্রশ্ন থেকে যায়। ধরে নেওয়া যাক দুমকা জেলার খেজুরিয়া গ্রামের কথা—যেখানে সাঁওতাল সম্প্রদায় গত বছরে রাজপুত জোতদারদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। তখন বিহার সরকারের পুলিস-মহল এবং পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের পুলিস-মহল যুক্তভাবে এই আন্দোলন দমন করতে আসরে নেমেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বীরভূমের রামনগর গ্রামে এমন কী ঘটেছিল যার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও তাঁদের অনুগতরা জনসভা থামাতে চেয়েছিলেন! বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলে এগুলিকে ধরলে ভুল হবে বোধ হয়।

ঐতিহাসিক সিধু কানুর বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে নিশ্চয় কোনো বাধা নেই, বাধা নেই সরকার যদি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমন করার জন্যে কঠোর হন, কিন্তু এমন যদি হয় সরকার সমস্যাগুলিকে ধামা চাপা দেবার জন্যে কিছু লোক-দেখানো সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য দেখাচ্ছেন তবে তার দ্বারা কিছু হবে না। এ-কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, উপজাতি বা আদিবাসী সম্প্রদায়ের সমস্ত অভিযোগই যুক্তিহীন কি অন্যায়। এই সম্প্রদায়ের যথার্থ কল্যাণও নিশ্চয় সরকারের কাম্য হওয়া উচিত।

আমাদের কোনো কোনো ব্যাপারে দ্বিধা থাকা স্বাভাবিক। ইদানীং রাজনীতির যে নগদ-বিদায় পন্থা দেখছি তাতে মনে হয়, যে-কোনো সুযোগই গ্রহণ করে পক্ষ বিস্তার রাজনৈতিক দলগুলির উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে। এমন কথা জোর করে বলা যায় না, বিচ্ছিন্নতাবাদের ইন্ধন সুযোগ মতন যোগানো হয়নি বা হবে না। ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট কী করতে চেয়েছিলেন—পরিণামে কী ঘটেছে এ-বিতর্কের দরকার নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা বড় ভয়ংকর শিক্ষা। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার নিশ্চয় এমন কিছু করবেন না যাতে বিচ্ছিন্নতাবাদের এই ভয়াবহ মানসিকতা স্থায়ী হয়—আবার সরকার নিশ্চয় দেখবেন সাঁওতাল ও অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের যথার্থ কল্যাণ কেমন করে হতে পারে।

কংগ্রেস (আই)-এর
বিক্ষুব্ধ প্রবীণ দল

যুব কংগ্রেস
(আই)

অরণ্যে শিশু

# পালিতানার সিদ্ধাচল ও গিরিতীর্থ হিংলাজ

[illegible] চট্টোপাধ্যায়

কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত পার্বত্য পালিটানার সিদ্ধাচলই গিরিতীর্থ হিংলাজ। সমুদ্রতল থেকে এর উচ্চতা ২৪৭৭ ফুট। হিংলাজ মাহাত্ম্যে আছে গিরিশৃঙ্গলিয়া মহাস্থানং সিদ্ধাচলন্তথৈবচ। সেই সিদ্ধাচলের কথা শুনেই এবারের গুজরাট পরিক্রমায় আমেদাবাদ থেকে ভাবনগরের ট্রেনে চেপে আমি শিহর জংসনে এসেছি। আমার ট্রেন এক ঘণ্টা লেট ছিল। তাই পালিটানার ফার্স্ট ট্রেন আগেই ছেড়ে গেছে। এর পরের ট্রেন বেলা ১১টায়। কি আর করি। যাত্রীশূন্য স্টেশনে একা একাই পায়চারি করতে লাগলাম। স্টেশনে একটি মাত্র চায়ের দোকান ছাড়া আর কিছু নেই। এক কাপ চায়ের দাম ৬০ পয়সা। বাজে চা। তাই খেয়েই পার্বত্য শিহরের আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা। কাছেই একটি নদী আছে। নাম গোতমী। নদীটা এঁকেবেঁকে দূর বনান্তরালে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। নদীর বালিতে নেমে অনেকক্ষণ চরায় ঘুরলাম। নদীর ওপর রেল পোলে দাঁড়িয়ে নদীর জলে মাছেদের খেলা দেখলাম। তারপর আবার ফিরে এলাম স্টেশনে। পালিটানার ট্রেন এলে তাতেই চেপে বসলাম। সামনে পিছনে দুটি মাত্র বগি। মধ্যে ইঞ্জিন। এ এক অদ্ভুত ধরনের ইঞ্জিন। মোটর মেসিনে চলে। যাই হোক। যথাসময়ে ট্রেন ছাড়ল। তারপর ঘোড়ার গাড়ির মতো অসম্ভব রকমের ঝাঁকুনি দিতে দিতে ছুটে চলল পালিটানার দিকে।

ট্রেন ছাড়ার পর চোখে পড়ল দুপাশের মনোরম সৌন্দর্য। চারিদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। ছোট বড় কত অসংখ্য পাহাড় আর টিলা যে দেখলাম তার ইয়ত্তা নেই। শিহরের পর দুটো মাত্র স্টেশন। তারপরই পালিটানা। ট্রেন থেকে নেমে চারদিকের পরিবেশ দেখে ঘাবড়ে গেলাম। এসে দেখছি একেবারেই ফাঁকা জায়গা। কোথায় গিয়ে উঠব তা হলে? বুদ্ধি করে স্টেশন মাস্টারের কাছে গেলাম। তিনি বললেন ভয় পাবার কিছু নেই। স্টেশন অঞ্চলটা ফাঁকা হলেও শহর একটু ভেতরে। থাকারও কোন অসুবিধে হবে না। সরকারি রেস্ট-হাউস, বাংলো সব কিছুই আছে এখানে। আর আছে প্রচুর ধর্মশালা। আমি বললাম, কিন্তু আমি যে শুনেছি এখানকার ধর্মশালায় জৈন ছাড়া কাউকে নাকি থাকতে দেয় না। স্টেশনমাস্টার বললেন, ওসব বাজে কথা। এই তীর্থে হিন্দু ও জৈনে আশ্রয়ের ব্যাপারে কোন ভেদাভেদ নেই।

স্টেশনের সামনে একটিই মাত্র টাঙ্গা যাত্রীর প্রতীক্ষায় ছিল। আমি চার টাকা ভাড়ায় সেটিকে রফা করে যে কোন একটি ধর্মশালায় নিয়ে যেতে বললাম। টাঙ্গায় চেপে কিছু পথ আসতেই পালিটানার শহর পেলাম। এখানে প্রচুর ধর্মশালা রয়েছে দেখলাম। তবুও টাঙ্গা আমাকে নিয়ে আরো এগিয়ে চলল। একসময় শহর শেষ হল। দুপাশে ফাঁকা মাঠ। কতদূরে কোথায় যাচ্ছি তা জানি না। একটু মুষড়ে পড়লাম। আমার মুখের ভাব দেখে টাঙ্গাওলা বলল, ভয় নেই বাবু। আপনি যাত্রী তো। তাই পালিটানার নতুন শহরে পাহাড়ের কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছি। এখানে থাকলে আবার টাঙ্গা ভাড়া করে আপনাকে পাহাড়ে যেতে হবে। যাই হোক। পালিটানার নতুন শহরে যখন ঢুকলাম তখন আনন্দে নন্দিত হয়ে উঠল মন। কি চমৎকার সাজানো গোছানো শহর। মনে হল যেন এক স্বপ্ন-পুরীতে এসে পৌঁছেছি। অথচ এমন যে শহর তাতে কোন প্রাণ চাঞ্চল্য নেই কেন? মনে হচ্ছে কাল যাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় সব কিছুই যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। পথে লোকজনের চলাফেরা নেই। দোকান পাট বন্ধ। ব্যাপার কি? টাঙ্গাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করতে বলল, আজ পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। তাই সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত পালিটানা এইরকমই স্তব্ধ হয়ে থাকবে। তারপরে অবশ্য স্বাভাবিক হবে সবকিছু। কথা বলতে বলতেই পাহাড়ের কাছাকাছি একটা সুন্দর ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে এসে পড়লাম। এটাই ধর্মশালা। নাম ধনাপুরা জিনেন্দ্র ভবন (শ্রাবিকাশ্রমের সামনে)। এই ধর্মশালার দোতলায় একটা ঘর পেলাম আমি। ঘরে একটি লোহার খাট আছে। লাগোয়া বাথরুম। গদি বালিশ সব কিছুই বিনামূল্যে পাওয়া যায়। মোট চারদিন থাকতে দেয়। কোন চার্জ নেই শুধু ডিপোজিট রাখতে হয় কুড়ি টাকা। যাবার সময় সম্পূর্ণ টাকা ফেরত দেয়। এর থেকে ইচ্ছা হলে কেউ কেউ সব টাকাটাই অথবা এগারো টাকা আলোটির দেরিয় নারায়ণের সেবার জন্য দেন। আমি এগারো টাকা দিয়েছিলাম।

পালিটানায় ৭টার পরে সন্ধ্যে হয়। ৬টা পর্যন্ত ধর্মশালায় বিশ্রাম করে যখন শহর ঘুরতে বেরোলাম তখন চারদিক জমজম করছে। রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা করে সকালে পাহাড়ে উঠব তাই কিছু ফল মিষ্টি ইত্যাদি কেনাকাটা করলাম। এখানকার রাবড়ি প্যাঁড়া এবং লাড্ডু অতি সুস্বাদু ও উপাদেয়, একেবারেই নির্ভেজাল। দামও আকাশ ছোঁয়া নয়।

চৌমুখ মন্দির

চক্রেশ্বরী ও অন্যান্য মন্দির

রাবড়ি প্যাড়া ১২ টাকা এবং লাড্ডু ৮ টাকা কেজি। কেনাকাটা করে ধর্মশালায় ফিরে সে রাতের মতো শুয়ে পড়লাম।

সকালে যখন ঘুম থেকে উঠলাম তখন চারিদিক ঝলমল করছে। ঠাণ্ডাও রয়েছে বেশ। তবু পাহাড়ে ওঠার জন্য গরমের জামা গায়ে না দিয়ে হেঁটেই রওনা হলাম। আমার ধর্মশালাটা পাহাড়ের গায়ে নয়। মিনিট দশেক হাঁটতে হয়। আমি হেঁটেই চললাম। প্রশস্ত রাজপথের দুপাশে পালিটানার নব নির্মিত প্রাসাদমালা দেখলাম। আধুনিক ডিজাইনের কত যে সুবৃহৎ অট্টালিকা রয়েছে সেখানে তা গুণে শেষ করা যায় না। মজার ব্যাপার এই যে এগুলো সবই ধর্মশালা। ধনী জৈনেরা যে কি প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয় করেছেন বা করছেন না দেখলে অনুমান করা যাবে না। তাই এখানে এসে ধর্মশালার বাহার দেখব না সিদ্ধাচলের পাহাড় দেখব তা ভেবে পেলাম না।

এক সময় সিদ্ধচালের পাদদেশে এসে পৌঁছলাম। বেশ কয়েকটি অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত জৈন মন্দির রয়েছে এখানে। পাহাড়ের নিচে দুর্বল ও বৃদ্ধ যাত্রীদের বহন করবার জন্য ডুলি নিয়ে ডুলিওয়ালারাও ভিড় করে আছে। রেট খুব বেশি নয়। ৩০ থেকে ৪০ টাকা। আর আছে প্রচুর দোকানদানি। একেবারে জম জমাট জায়গা।

আমি নিচে অযথা সময় নষ্ট না করে পাহাড়ে ওঠা শুরু করলাম। ধাপে ধাপে সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। লোকজনও উঠছে। তবে বেশিরভাগই জৈন। দুজন মেমসাহেবও এসেছেন দেখলাম। তাঁরা ডুলি করেছেন। এই পাহাড়ে মনসা ও বাবলা ছাড়া অন্যান্য গাছপালা বিশেষ নেই। কাজেই গ্রীষ্মকালে পথ ছায়াশীতল নয়।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জৈনদের যেসব তীর্থ আছে তার মধ্যে পালিটানার সিদ্ধাচলই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই সিদ্ধাচলের একুশটি নাম। তার মধ্যে একটি নাম হল শত্রুঞ্জয়। পাহাড়ের পিছনদিকে শত্রুঞ্জয় নামে একটি নদীও আছে। এই পাহাড় তীর্থ মাহাত্ম্যে এমনই মহিমান্বিত যে এই স্থান একেবারেই হিংসাবর্জিত। আগে এই পাহাড়ে বাঘ ও হরিণ পাশাপাশি ঘুরত। বাঘের দুধ বাছুরে খেত। গাভীর দুধ বাঘে। এখন বাঘও নেই হরিণও নেই। দু'একটা ময়ূর অবশ্য আছে। প্রতি বছর চৈত্র পূর্ণিমার সময় এখানে বিরাট মেলা বসে। সে সময় ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু জৈন নরনারী এখানে এসে থাকেন।

এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক অবস্থান ও জলবায়ুর বৈচিত্র্য স্থানটিকে অত্যন্ত রমণীয় করে তুলেছে। মুসলমানদের কাছে যেমন মক্কা-মদিনা, হিন্দুর যেমন কেদার-বদ্রি, জৈনদেরও তেমনি পালিটানার সিদ্ধাচল। শক্তি ও অর্থ থাকলে জীবনে একবার অন্তত এই পুণ্য তীর্থে এসে এর মন্দির দর্শন ও পর্বতারোহণ জৈনগণ মহাপুণ্য বলে মনে করেন। শুধু তাই নয়, জৈনদের বিশ্বাস এই পুণ্যভূমিতে মন্দির নির্মাণ করলে মহানির্বাণের পথ সুগম হয়। তাই সেই বিশ্বাসের ফলে এই পাহাড়ের শিখরদেশে মন্দিরের গ্রাম বসে গেছে।

অনেকটা ওঠার পর এক জায়গায় বাঁকের মুখে একটু নির্জন ও প্রশস্ত স্থান দেখে বসে পড়লাম। পাশেই পাহাড়ের গায়ে পাথরে খোদাই করা একটি মন্দিরে রক্তবস্ত্র পরিধেয়া এক দেবী মূর্তি রয়েছে দেখলাম। দেবীর সামনে ধূপ জ্বলছে। কিছু ফুল ছড়ানো আছে। গুজরাটী ভাষায় লেখাও আছে কি যেন। পড়তে পারলাম না। তবে ভক্তিসহকারে প্রণাম করলাম। এমন সময় একজন বিশাল বপু কাথিয়াবাড়ী যাত্রী লাঠিতে ভর করে ওপরে উঠে আমার পাশে ধপাস করে বসলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করতে হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন তিনি 'হিংলাজ কি হাদো'। এই তবে হিংলাজ। ভগবতী হিংলাজ মাতার মন্দির। একটু পরেই পুজারিণী এলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন হ্যাঁ। মরু-তীর্থের হিংলাজ এখানে গিরিতীর্থে অধিষ্ঠিতা। ভেবে পেলাম না একই দেবীর দুই তীর্থে অধিষ্ঠান কি করে সম্ভব। হিংলাজে তো সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র পড়েছিল। কিন্তু এখানে? পুজারিণী বুঝিয়ে দিলেন। তাঁর মুখে যা শুনলাম তা হল এই—। অতি প্রাচীনকালে করাচীর কাছে এক বনে হিঙ্গল নামে এক রাক্ষস বাস করত। তার উপদ্রবে বহু মানুষ প্রাণ হারাত। ঐ বন পার হয়ে মরুতীর্থে গমনকারী সমস্ত তীর্থযাত্রীকেই বিনাশ করে ভক্ষণ করত সে। একবার ঐ রাক্ষস এক সাধককে আক্রমণ করেছিল। সাধক প্রাণ ভয়ে ভীত হয়ে কাতরকণ্ঠে দেবী অম্বিকার স্তব করতে লাগলেন। সাধুর স্তবে প্রসন্না হয়ে দেবী অম্বিকা আবির্ভূতা হলেন। এবং ভয়ংকরী মূর্তি ধারণ করে বিনাশ করলেন হিঙ্গলকে। মৃত্যুকালে হিঙ্গল দেবীর কাছে একটি বর প্রার্থনা করেছিল। বলেছিল, হে মা অম্বিকে। আজ তোমার হাতে মৃত্যুবরণ করে আমি উদ্ধারপ্রাপ্ত হলাম। আমার অন্তিম কামনা এই যে আজ থেকে যেখানে কোন হিংসা নেই সেই স্থানে তুমি আমার নামে অধিষ্ঠিতা থেকো। দেবী অম্বিকা তখন থেকেই মরু-তীর্থে ও অহিংসার পুণ্যভূমি
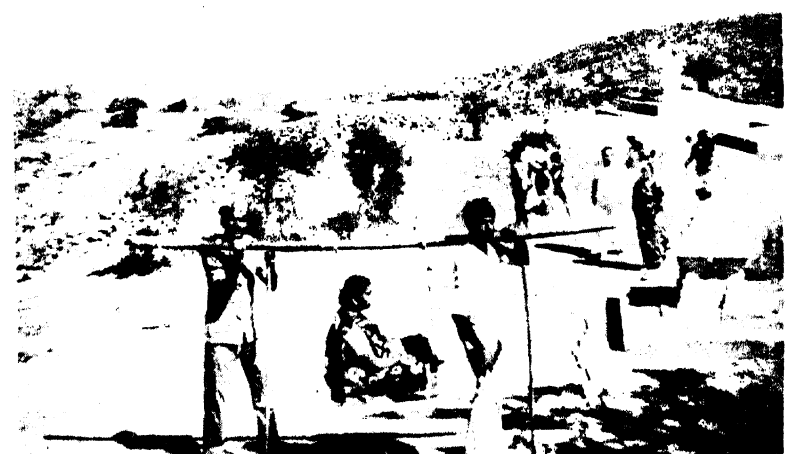
অদূরে সিদ্ধাচল

সিদ্ধাচল শিখরে মন্দিরের গ্রাম

হিংলাজের পথ

সিদ্ধাচলে হিংলাজ নামে অধিষ্ঠিতা আছেন।

হিংলাজের মাহাত্ম্য শুনে যখন আরো উচ্চস্থানে ওঠার জন্য রওনা দিচ্ছি তখন আমার পাশে বসা সেই বিশালবপু কাথিয়াবাড়ী যাত্রীটি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'হিংলাজ নো হাদো, কদে হাথ মুকী চাধো'। অর্থাৎ কিনা হিংলাজের চড়াই বড়ই দুর্গম। এর ওপরে উঠছ যখন কোমরে হাত রেখে ওঠো। তাঁর কথামতো তাই করলাম। হিংলাজের চড়াই অতিক্রম করে যখন আরো উচ্চস্থানে উঠলাম তখন সিঁদুর রঞ্জিত এক প্রকাণ্ড হনুমান মূর্তি চোখে পড়ল। এখান থেকে দুটি পথ দুদিকে ভাগ হয়ে গেছে। একটি পথ দক্ষিণ দিক দিয়ে সিদ্ধাচলের উত্তর শিখরে গেছে আর একটি পথ বাম দিকের উপত্যকার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ শিখরে উপস্থিত হয়েছে। এই দুই শিখরই দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ৩৫০ গজ। আমি প্রথমে উত্তরের সর্বোচ্চ শিখরের দিকে রওনা দিলাম। পথে যেতে যেতে এক মুসলমান পীরের আস্তানা দৃষ্টিগোচর হল। এই পীরের নাম অংগারশের। সাহাবুদ্দিন ঘোরীর রাজত্বকালে মুসলমানরা যখন সিদ্ধাচলের পবিত্রতা নষ্ট করবার চেষ্টা করেছিল তখন জিনেন্দ্র ভগবান আদিনাথের ক্রোধানলে মুসলমান সেনাপতি ভস্মীভূত হন। এই স্থান পার হয়েই উচ্চ শিখরে উঠলাম। এখানে এসে সিদ্ধাচলের যে রূপ দেখলাম তা বর্ণনাতীত। কি পবিত্র ও রমণীয় সেই স্থান। ধর্ম বিশ্বাসী জৈনদের ভক্তিঅশ্রুসিক্ত পুণ্যভূমি। সুন্দর মন্দিররাজি শোভিত যেন এক অলকাপুরী। মন্দিরের তোরণদ্বারে যখন উপস্থিত হলাম তখন সারা মন ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে উঠল। যখন স্থাপত্যের দিকে তাকালাম তখন দুটি চোখ বিস্মিত ও লসিত হয়ে উঠল। এই অসম্ভব কর্মকাণ্ড কি মানুষের দ্বারা সম্ভব। একি দেখছি! মন্দিরের পর মন্দির। তারপর মন্দির। আবার মন্দির। এ যে মন্দিরের গ্রাম বসে গেছে। এত মন্দির তো ঘুরে দেখা একদিনে সম্ভব নয়। এখানকার সীমান্ত প্রাচীরে উঠে যখন চারিদিকে তাকালাম তখন সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য ও নির্জন শান্ত সৌন্দর্যের প্রভাবে আমার সংসারতপ্ত মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আমি বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তন্ময় হয়ে সেই বর্ণাঢ্য শিল্পকলার দিকে তাকিয়ে আমার মানব জনম ধন্য করলাম।

ভেতরে প্রবেশ করে প্রথমেই দর্শন করলাম চৌমুখ নামক মন্দির। এই মন্দির এত বিশাল ও উচ্চ যে তা প্রায় ২৫ মাইল দূর থেকেও দেখা যায়। প্রবাদ আছে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময়ে এই মন্দির নির্মিত হয়। কিন্তু বর্তমান মন্দির ১৬১৯ সংবতে মোগল সম্রাট জাহাংগীরের শাসনকালে আমেদাবাদের প্রসিদ্ধ ধনী শিবসোমজী নির্মাণ করেন। এই মন্দিরে জৈনদের সর্বপ্রথম তীর্থঙ্কর ভগবান আদিনাথের চতুর্মুখ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এতবড় মূর্তি এখানকার অন্য কোন মন্দিরে নেই। এছাড়া কুমারপাল বিমলাশাহ শান্তিনাথ ও আদিনাথের মূল মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জৈনদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চক্রেশ্বরীর মন্দিরও আছে এখানে। আর আছে পৃথক পৃথক নির্মিত নয়টি বড় বড় আশ্রম। এর নাম নওটুক। এইসব আশ্রমে প্রবেশ করার জন্যও কারুকার্যমণ্ডিত এক একটি সুবিশাল সিংহদ্বার রয়েছে। আর রয়েছে অসংখ্য মন্দিরের সমারোহ। এখানকার ছোট বড় মোট মন্দিরের সংখ্যা এক হাজারের ওপর। ছোট মন্দিরের সংখ্যাই ৮৩৯। এইসব মন্দিরের দেবমূর্তির সংখ্যা হল ১১৪৭৪। এছাড়া জৈন অর্হৎগণের ৮৯৬১টি পদচিহ্ন রয়েছে। তবে এই মন্দির নগরীর বেশিরভাগ মন্দিরই খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর। ভারতীয় ভাস্কর্যকলার অপূর্ব নিদর্শন ও জৈন ধনীগণের কোটি কোটি অর্থের বিনিয়োগ সত্যই দেখবার মতো।

ওপরের মন্দির ও আশ্রমগুলি দেখে যখন অপর শিখরে ভগবান আদিনাথের মূল মন্দিরে প্রবেশ করলাম তখন দেখলাম কাতারে কাতারে জৈন তীর্থযাত্রীরা পাটরঙ পরিধানে আর বড় বড় রঙ

আদিনাথ মন্দিরের ভাস্কর্য

গোলাপ ও তুলসী চন্দনের ডালা হাতে লাইন দিয়েছে পুজার জন্য। একদিকে মহিলা এবং অপর-দিকে পুরুষদের লাইন। এরই মাঝে পুজারীরা লাল শালু ও হলদে চাদর পরে ঘোরাঘুরি করছেন। মন্দির প্রাঙ্গণে লোহার আটচালায় বহুবর্ণ রঞ্জিত ত্রিপলের চাঁদোয়ার নীচে গান বাজনা হচ্ছে। দুটি রুপোর ছোট ও বড় সিংহাসনও বসানো রয়েছে দেখলাম। ভেতরে ঢুকে দর্শন করলাম আদিনাথকে। কি সুন্দর ও সুবৃহৎ মূর্তি। সর্বত্যাগী জিনেন্দ্র ভগবান। কিন্তু ভক্তরা তাঁকে সর্বত্যাগী করতে চান না বুঝি তাই নানা রত্নের সমন্বয় ঘটিয়ে বিপুল রত্নালংকারে সাজিয়েছেন তাঁকে। ভক্তদের দ্বারা ভগবান আদিনাথের পুজার ঘটা এখানে খুব। তাই দলে দলে জৈন তীর্থযাত্রীরা পুজা দিতে সর্বপ্রথম এখানেই এসে থাকেন। তারপর য[illegible] পারেন অর্থাৎ শক্তি ও সামর্থ্য যাদের আছে [illegible] অন্যান্য মন্দির দর্শন করেন ও চৌমুখ শিখা[illegible]নে। আগে এই দুই শিখরের মধ্যস্থলে এক প্রকাণ্ড খড্ (খাদ) ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে কোন এক সম্ভ্রান্ত জৈন তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য প্রচুর অর্থব্যয়ে দুই শিখরের মধ্যের খাদ ভরাট করিয়ে দিয়েছেন। কাজেই যাত্রীদের এখন অনেক কষ্টের লাঘব হয়েছে।

এইখানে আদিনাথের মন্দিরে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের অনেক জিনন ভিক্ষুণী দেখলাম। তাদের বেশিরভাগই হয় কুমারী নয় বিধবা। প্রত্যেকে সুন্দরী ও রূপবতী। ওরা এই পুণ্যতীর্থে পরিত্রাতারূপিণী দেবীমূর্তির ন্যায় প্রতীয়মান বলে আমার মনে হল। তাঁদেরই একজনের সংগে আলাপ করে জানলাম শুধু শ্বেতাম্বর নয়, দিগম্বর সম্প্রদায়ের জৈনদেরও অনেক মন্দির এবং ভগবান শান্তিনাথ তীর্থঙ্করেরও বহু মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এখানে। এখানকার পুজারীরা নাকি অনেকে শৈব ধর্মালম্বী। তাই তাঁদের উপাসনার জন্য একটি শিব মন্দিরও রয়েছে। এই জন্যই বুঝি সিদ্ধাচলে পুণ্যতীর্থ নানা ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত নরনারীদের সার্বজনীন তীর্থক্ষেত্র হিসেবে পরিণত হয়েছে।

# মার্কাস বোর্ডিং-এ সুবোধ ঘোষ

অমর সান্যাল

নীলকন্ঠবাবু বললেন, সাত নম্বর লোক এল, মার্কাস বোর্ডিং-এ সিট খালি থাকে না।

আমার চার নম্বর ঘরে কথাবার্তা হচ্ছিল। বোর্ডিং-এর ম্যানেজার নীলকণ্ঠ মিত্র আর চৌধুরী মশাই উপস্থিত ছিলেন। খবর শুনে চৌধুরী ছুটলেন সাত নম্বরে। বোর্ডিং-এ সিঁড়ির নীচে তার চায়ের দোকান, আমার চার নম্বর থেকে দোকানের ভিতরটা পর্যন্ত দেখা যায়।

ফিরে এসে মন্তব্য করলেন চৌধুরী মশায়, ভদ্রলোক আপনার মত চা-খোর নয়, সকালে এক কাপ, বিকেলে না হলেও চলে।

নীলকন্ঠবাবু বললেন, পদবী ঘোষ। বোধ হয় আমাদের যশোরের কায়স্থ, নামটিও বেশ, সুবোধ ঘোষ। বামুন আর বদ্যিদের নামগুলো বড় বেয়াড়া-রকমের।

সন্ধ্যেবেলা ম্যানেজার আবার এলেন। ঘনঘন আসার কারণ আমার মেসচার্জ দু মাস বাকী। যথারীতি তাগাদার পর বললেন, পুলকেশবাবুর কাছে সব শুনলাম। সুবোধবাবুও আনন্দবাজারের লোক, মার্কাস বোর্ডিং-এ সিট খালির খবর ওনার কাছেই পেয়েছেন।

পুলকেশবাবু বোর্ডিং-এ মাস ছয়েক আছেন, গম্ভীর প্রকৃতির লোক, আমার পাশের ঘরে থাকেন। তাঁর কাছে দরবার করলাম—সুবোধ ঘোষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। 'ফসিল' গল্পটি তখন পড়ে ফেলেছি—মুখার্জীর স্রষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ বিশেষ প্রয়োজন। অজানগড় নয়, তিনি আছেন কলা-বাগান বস্তির গায়ে গায়ে মার্কাস বোর্ডিং-এর সাত নম্বর ঘরে।

যতদূর মনে পড়ে সেদিনটি চৈত্র-সন্ধ্যা। চারদিকে বস্তির ঘরে ঘরে আগুন জ্বলছে, বাতাসে শুঁটকারুটির গন্ধ। বোর্ডিং-এর চত্বর ধোঁয়ায় ঢাকা, বালক দত্ত লেনে গ্যাসের আলো তখনও জ্বলেনি। সাত নম্বর ঘর গেটের পাশেই, অন্ধকার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে এক অচেনা মুখ।

পুলকেশবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, অমরবাবু! আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান, আপনার 'ফসিল' পড়ে মুগ্ধ।

অচেনা মুখের মালিক বললেন, আজ সকালেই চৌধুরীমশায় বোর্ডিং-এর বাসিন্দাদের পরিচয় দিয়েছেন। অমরবাবুর কথাও শুনেছি। আপনাকে তো মশায় অনেক দূর যেতে হয় মাস্টারি করতে।

এই সময় লম্বা লম্বা পা ফেলে চৌধুরী মশায় এলেন। খালি গা, খালি পা, হাতে একটা বাল্ব। সাত নম্বরে আলো জ্বললো। সুবোধবাবু দরজা বন্ধ করে দিলেন।

চৌধুরীমশায় সান্ত্বনার সুরে বললেন, খেটে-খুটে এসেছেন, বিশ্রাম দরকার, খুব আলাপী লোক, আজ সকালেই আমার সঙ্গে বেশ জমেছে!

চৌধুরীমশায়কে আমরা একটু এড়িয়ে চলতাম। বাড়ি বর্ধমানে, ডাকাতি করে চার বছর জেল খেটেছেন। খালাসের পর পুলিসের নজর-বন্দী ছিলেন কিছুদিন। তারপর আসর জমালেন মার্কাস বোর্ডিং-এ। ষাটের কাছাকাছি বয়স, দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, মুখমন্ডলে গোঁফের আভিজাত্য। লম্বা ধুতি গুটিয়ে পরতেন হাঁটু পর্যন্ত। বোর্ডিং-এর পঁয়তাল্লিশ জন মেম্বারের হালচাল ও গতিবিধি তাঁর অজানা ছিল না।

চৌধুরীমশায়ের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। পরদিন ফিরতে একটু রাত হয়েছে। চেয়ে দেখি সাত নম্বর ঘরে আলো জ্বলছে, দরজা বন্ধ।

তেতলায় ডাইনিং রুম। খেতে বসেছি, হঠাৎ কার ছায়া পড়লো দরজার মুখে। সুবোধ ঘোষ নিঃশব্দে বসলেন আমার পাশে, এবং ভোজন-পর্ব শেষও করলেন নিঃশব্দে। আমাদের সামনে একজন বোর্ডার খাচ্ছিলেন, তিনি এঁচোড়ের তরকারি দিয়েই থালার ভাত শেষ করে আবার ভাত চাইলেন। সুবোধবাবু তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে আসন ছেড়ে উঠলেন। একতলায় নেমে দেখি আমার চার নম্বর ঘরের সামনে সুবোধবাবু দাঁড়িয়ে, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। বললেন, রাঢ় দেশের লোক ভাত খায় বেশী। ঐ দেখুন চৌধুরী মশায়ের খাওয়া।

সিঁড়ির নীচে চৌধুরী মশায় খেতে বসেছেন। থালায় পিরামিডাকৃতি ভাতের স্তূপ, কি একটা তরকারি দিয়ে দলা পাকিয়ে চৌধুরী মশায় টপাটপ গিলছেন।

আমাদের পরিচয় নিবিড় হল, কিন্তু অনুভব করতাম একটা পার্থক্য। তিনি সংস্কারমুক্ত, আমি সংসারযুক্ত। তার উপর সুবোধ ঘোষ কংগ্রেসানুরাগী ও একনিষ্ঠ গান্ধীভক্ত। কথাবর্তায় মনে হত জগতের জ্ঞান ভান্ডার তাঁর হাতের মুঠোয়।

১৯৪২ সাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মরসুম। গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়' বাণী আমাদের মার্কাস বোর্ডিং-এও উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। নীলকণ্ঠ মিত্তির কাছা আঁটলেন শক্ত করে। তাঁর ভাগ্নে খোকা আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে ডিমের ওমলেট খেতে আরম্ভ করলো—গায়ে জোর করতে হবে। চৌধুরী মশায়ের ধুতি হাঁটু ছাড়িয়ে দাবনায় উঠলো। সুবোধবাবু বললেন সকলের মধ্যেই চেতনা এসেছে। আমি একটু জার্মানভক্ত ছিলাম।

একদিন হিটলারের প্রশংসা করতেই সুবোধবাবু রেগে টং। তখন আমরা আলুরদম খাচ্ছিলাম। একটা আলু আমার হাতে ঘসে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন স্কুল ফেরৎ সোজা গেলাম বর্মণ স্ট্রীটে। সন্ধ্যার অন্ধকারে তেলেভাজা খেতে খেতে দুজনে বোর্ডিং-এ ফিরে এলাম।

সুবোধবাবুর গায়ে হাফসার্ট। অফিসে সাধারণত ধুতি-পাঞ্জাবি পরে যেতেন। তেলেভাজার ঠোঙাটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, পাঞ্জাবি কোথায় গেল!

—চুরি গেছে। রাস্তার দিকে জানালা খোলা ছিল, টেনে নিয়েছে।

—পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম ছিল না?

—হ্যাঁ, চলুন আমার ঘরে।

একটু পরে সুবোধবাবুর ঘর সরগরম। কয়েক জন সহকর্মী এসেছেন। সুবোধবাবুকে সকলেই অভিনন্দিত করলেন তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'ফসিল' গল্পগ্রন্থের জন্য।

সেদিন রাতে ঘুম নেই। গরমে বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করছি। হঠাৎ দেখি খোলা জানলাপথে একটা বাঁশ আমার পাঞ্জাবি ধরে টানাটানি করছে। লাফিয়ে উঠে বাঁশ ধরেই চিৎকার। সে চিৎকারে আমার প্রতি-বেশী পাঁচ নম্বর ও ছয় নম্বরের ঘুম ভাঙলো। [illegible] সাত নম্বর থেকে সুবোধবাবু ছুটে এলেন। আমি তখন বাঁশ ধরে থরথর করে কাঁপছি, সুবোধবাবু ছুটে গেলেন বালক দত্ত লেনে বাঁশের মালিকের সন্ধানে।

পরদিন সকালে দুজনে জোড়াসাঁকো থানায় গেলাম। সুবোধবাবুর হাতে সেই বাঁশ। দারোগা বললেন, বাঁশ রেখে যান, সার্জেন্টদের বলে দেব গলিটায় টহল দিতে।

এ সময়টা সুবোধবাবুর ঘরে প্রায়ই জনসমাগম হত। মন্মথ সান্যাল, বিজন ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, সুশীল রায় এবং আরও অনেকে আসতেন। কাছাকাছি বসাকদীঘি লেনে থাকতেন শিবরাম চক্রবর্তী। তিনি ঘরে বড় একটা ঢুকতেন না, জানলা দিয়ে উঁকি মারতেন। লোকজন এলে চৌধুরী মশায়ের স্ফূর্তি বাড়তো। তিনি ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনতেন ও চা ইত্যাদি সরবরাহ করতেন।

আমি সপ্তাহান্তে প্রায়ই বাড়ি যেতাম। ঘরের চাবি থাকতো সুবোধবাবুর কাছে। এক সোমবার দিন দেখি টেবিলটি এক কোণ থেকে আর এক কোণে স্থানান্তরিত। সুবোধবাবু বললেন, স্বর্ণবাবু রবিবার রাতটা আপনার ঘরে কাটিয়েছেন টেবিলের উপর শুয়ে, ছোটখাট মানুষ, অসুবিধে হয়নি।

১৯৪২ সাল। 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' বাণীতে দেশের আকাশ বাতাস মুখরিত। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।

সুবোধবাবু একদিন বললেন, কথাবার্তা সাবধানে বলবেন, বোর্ডিং-এ স্পাই আছে।

আমাদের সন্দেহ হল এক চাটুর্য্যের উপর। ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে অযাচিত আলাপ জমাবার চেষ্টা করেন। একদিন সুবোধবাবু একটা খাম আমাকে দিয়ে বললেন, চাটুয্যের ঘরে ফেলে দিতে। খামের ভিতরে কি লেখা ছিল জানি না, কিন্তু তারপর থেকে চাটুয্যে আনন্দবাজারের লোককে এড়িয়ে চললেন। সন্দেহভাজন আর একজন ছিলেন উনিশ নম্বর ঘরে—কোন এক অফিসের বড়বাবু। বড়বাবু সেজেগুজে সান্ধ্যবিহারে যাওয়ার সময় আমাদের ঘরের দিকে তাকাতেন। ফিরতেন একটু রাত করে বেসামাল হয়ে, কিন্তু সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে চার নম্বর ঘরের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন। খাওয়ার ঘরে সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে ঘি খেতেন, আর দোতলায় নামতেন সশব্দে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে। সুবোধবাবুকে আমি বলতাম বড়বাবু আপনার 'যাযাবর' গল্পে 'বুঢ়ীমা'র মত। সুবোধ-বাবুর একটা অব্যক্ত মন্তব্য একতলা থেকে বড়বাবুর কানে পৌঁছল, পরিণামে তিনি খাওয়ার সময়টা পালটে দিলেন।

একদিন সন্ধ্যার আগেই সুবোধবাবুর বোর্ডিং-এ আগমন হল। চা খাওয়ার পর বললেন, কাঁচি আছে? আমার কাছে একটা গোঁফ-ছাঁটা কাঁচি
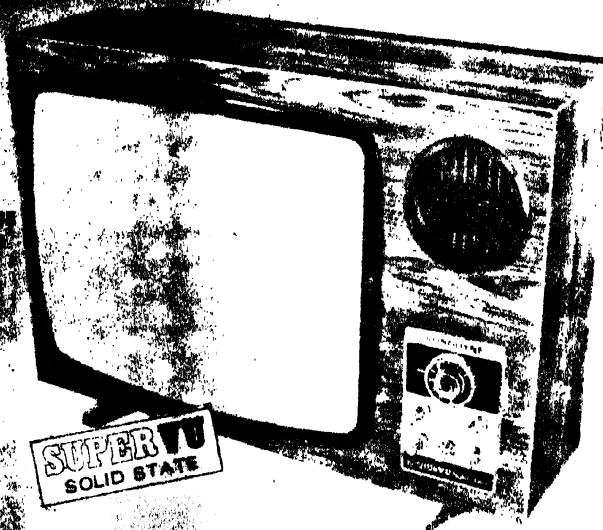
ছিল, সুবোধবাবু বললেন, ওতেই হবে। আমার দিকে পিছন ফিরে বললেন, পাকাচুল যা আছে কেটে দিন।

—কি ব্যাপার।

—হাওড়া যাব। একটা সভায়। ওরা নিতে আসবে এখনি।

কাঁচি চালিয়ে সুবোধবাবুর পাকাচুল বিশেষ কাটতে পারলাম না, কাঁচা চুলই বেশী কেটে ফেললাম।

সুবোধবাবু দুখানা আয়না সামনাসামনি ধরে বললেন, বেশ হয়েছে! ওরা মনে করবে সুবোধ ঘোষের চুলই ওই রকম।

এই সময়টা প্রায় রাতেই সাইরেন বাজতো। সুবোধবাবু নিজের ঘর ছেড়ে আমার চার নম্বরে, আর তাঁর সাত নম্বরে আশ্রয় নিত সামনের বস্তির নারু মিঞা, তার চার বিবি আর ছেলেমেয়েরা। বিবিরা আপাদমস্তক বোরখায় ঢেকে আতরের গন্ধ ছড়িয়ে বোর্ডিং-এ প্রবেশ করতেন। চৌধুরী মশায়ের এ ব্যাপারটা ভাল লাগতো না। আমাকে একদিন চুপিচুপি বললেন, নারু মিঞা এপাড়ার নামকরা গুন্ডা, ওর সঙ্গে মাখামাখি ভাল নয়।

সাইরেন মাঝে মাঝে দীর্ঘস্থায়ী হত, সুবোধবাবু নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন, আমি ঘুমজড়ানো চোখে শুনতাম, আর গলি দিয়ে হেঁকে যেত এক বস্তিবাসী উন্মাদ,—ডর মৎ! ডর মৎ।

সুবোধবাবুর পড়াশুনার পরিধি ছিল সুবিস্তৃত। সাধারণ কথাও বলতেন অসাধারণভাবে।

এই সময় হেমন্তের এক ধূসর সন্ধ্যায় মার্কাস বোর্ডিং-এ আগমন হল এক অচেনা মুখের। সুবোধবাবুর সঙ্গে তেতলায় উঠছেন।

চৌধুরী মশায় বললেন, আনন্দবাজারের লোক, সকালে এসেছেন। তেত্রিশ নম্বরে যান।

আমি ছুটলাম তেতলায়। সুবোধবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন। সাগরময় ঘোষ, 'দেশ'এর সহ সম্পাদক। আগন্তুককে দেখে আমি একটু চমকিত হলাম, রহস্যময় বিষাদে আচ্ছন্ন তাঁর মুখশ্রী। যেন বিষাদসিন্ধু, অনেক গোপন দুঃখ নিহিত।

বছর শেষ হয়ে এল। সেদিন ২৪শে ডিসেম্বর —ক্রীসমাস ইভ। সন্ধ্যে সাতটায় সাইরেন বাজলো। সুবোধবাবু বললেন,—আজ কিছু একটা হবে। আধ ঘন্টার মধ্যেই বোমা পড়ার দুমদাম আওয়াজ। সাগরবাবু বাইরে। সারা বোর্ডিং জড় হল একতলায় বারান্দার নীচে। আলো নিভানো, লোক চেনা যাচ্ছে না। হঠাৎ আমার হাত ধরে কে একজন টানতে টানতে তেতলায় রান্নাঘরে নিয়ে গেল। উনুনের আঁচে ঘরটা লাল হয়ে আছে।

সুবোধবাবু বললেন, —ধরুন। পরাত থেকে ভাজা মাছ চারখানা আমার হাতে দিলেন। দুজনে খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে মাছ খাচ্ছি, আর নীচের তলায় চৌধুরী মশায়ের উল্লসিত চিৎকার কানে আসছে, —ওই পড়লো! আর একটা।

ঘন্টা তিনেক পর অল ক্লিয়ার হল। সুবোধবাবু বললেন, চলুন ডালহৌসী স্কোয়ারে। বোমার আওয়াজটা ওদিক থেকেই আসছিল।

চাঁদের আলো ছিল আকাশে, পথঘাট অনেকটা নিঝুম। ডালহৌসী স্কোয়ারে পুলিসের গাড়ি ছুটোছুটি করছে। স্টিফেন হাউসের সামনে একটা গ্যাসপোস্ট গোড়া ফেটে পড়ে আছে; সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসের বড় বাড়িটার গায়ে স্প্লিনটারের ক্ষতচিহ্ন। হাঁটতে হাঁটতে এসপ্ল্যানেড গেলাম। ট্রাম চলছে না, লাইনের উপর ক্রীসমাস ইভের উৎসব শুরু হয়েছে। সৈন্যরা অঙ্গভঙ্গি করে নাচের আসর জমিয়েছে। আমার ভাল লাগলো না, সুবোধবাবু নির্বিকারচিত্তে নাচ উপভোগ করতে লাগলেন। ফেরার সময় বললেন, পলকা নাচ।

পরদিন বোর্ডিংএ ঘরে ঘরে তালা পড়লো। ঠাকুর, চাকর সব উধাও। ম্যানেজার নীলকণ্ঠ মিত্তির দেশের দিকে ছুটলেন। নেপালী দারোয়ান সুবোধবাবুকে দেখে নিতান্ত অসহায়ের মত ডুকরে উঠলো। —হাম ক্যেয়া করেগা।

খাওয়াদাওয়ার বিশেষ অসুবিধা হল। চৌধুরী মশায় এটাসেটা রান্না করে খাওয়াতেন, কিন্তু তখনকার দিনের তুলনায় খরচ হল বেশী। আমরা কুকারে আহারাদির ব্যবস্থা করলাম। সব সিদ্ধ, আর প্রায়ই মাংসের 'স্টু'। কিছুদিন ভাল লাগলো, তারপর একঘেয়ে। সুবোধবাবু একদিন পথ থেকে কাগজকুড়ানো একটি ছেলে ধরে আনলেন। তাকে সাবান দিয়ে ঘষেমেজে পরিষ্কার করা হল। তারপর তাকে বসানো হল রান্নাঘরে। অনেকদিন পর আমরা রান্না ভাত খেলাম। পরদিন সকালে দেখি ছেলেটা পালিয়েছে, আমাদের দেওয়া ধুতি-গেঞ্জি রান্নাঘরের এক কোণে পড়ে।

বছর শেষ হতেই সারা দেশে মড়ক লাগলো। কুকারে খাওয়ার খরচও বাড়লো। তা ছাড়া চালডালে দুর্গন্ধ। সুবোধবাবু সেইসব 'গন্ধ' একটা একটা বিশেষণে বিভূষিত করলেন। সাগরবাবু আহারাদি বাইরে সারতে লাগলেন; আমরা একটা লঙ্গরখানায় আশ্রয় নিলাম। বোর্ডিং-এর কাছে একটা হিন্দি স্কুলে সস্তায় খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। চৌদ্দ পয়সায় ভাত, ডাল, তরকারি, অম্বল। পেট ভরে খাও।

নানা অসুবিধার মধ্যেও সুবোধবাবুর লেখনী সচল। 'পরশুরামের কুঠার' শেষ করে 'তিলাঞ্জলি'র খসড়া করছেন। চৌধুরী মশায় বললেন, রাত দুটো আড়াইটে পর্যন্ত ওঁর ঘরে আলো জ্বলে।

ভাদ্রমাস শেষ হয়ে এল। সেদিন অবিরাম বর্ষণ, বোর্ডিং-এর চারদিকে একহাঁটু জল। সুবোধবাবু ও সাগরবাবু বর্মণ স্ট্রীট থেকে ফিরলেন একসঙ্গে। আমার ঘরে টোকা দিয়ে বললেন, তেতলায় আসুন।

সেদিন বর্ষামুখর সন্ধ্যায় এক অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। সাগরবাবুর কণ্ঠে গীতবিতানের সংগীত প্লাবিত হল একের পর এক। সভাসমিতিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনেছি, কিন্তু এমনটি নয়। এ যেন গায়কের মুক্ত প্রাণের অনাহত উচ্ছ্বাস। বোর্ডিং-এ তখন সংখ্যায় আমরা ছিলাম তেরজন। বাকী দশজনের অস্তিত্ব আমরা অনুভব করছিলাম ভেজানো দরজার বাইরে বৃষ্টিভেজা বারান্দায়।

সুবোধবাবু বললেন, সাগর লাজুক মানুষ, সভাসমিতিতে গান করতে নারাজ।

রসভঙ্গ করলেন চৌধুরীমশায়। ওমলেট ও চা এনে বললেন, দাম দিতে হবে না। তাঁর গুম্ফশোভিত মুখে তৃপ্তির রেখা।

কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ স্থাপিত হয় এইসময়। সুকৃতি সেন বন্দেমাতরমে নতুন সুর দিয়েছেন। তাঁর বাড়িতে প্রায়ই সংঘের অধিবেশন হত। সুবোধবাবু ও সাগরবাবু বিশিষ্ট সভ্য হিসাবে উপস্থিত থাকতেন, সঙ্গে লেজুড়রূপে আমিও থাকতাম। অন্যান্যদের মধ্যে থাকতেন সজনীকান্ত দাস, সুবল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপ্তি সান্যাল, এবং আরও অনেকে। 'জাগে নব ভারতের জনতা/একজাতি একপ্রাণ একতা!'—গানটি অধিবেশনে গাওয়া হত। সুবোধবাবুও যোগ দিতেন।

সভাসমিতিতে যাওয়া তিনি বড় একটা পছন্দ করতেন না। মাঝে মাঝে আসতেন অমিয় গাঙ্গুলী, শ্রীরামপুর থেকে। ইনি সরকারী চাকুরে ও সাহিত্যানুরাগী। তখন সরকার থেকে যুদ্ধের জন্য সাহিত্যিকদের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা চলছে। নামকরা সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকে ভিড়ে গেলেন সরকারী দলে।

অমিয় গাঙ্গুলী একদিন সুবোধবাবুকে নিয়ে গেলেন ক্যালকাটা ক্লাবে এক আই সি এস অফিসারের কাছে। বোর্ডিংএ ফিরতে রাত হল একটা। আমার ঘুম ভাঙিয়ে বললেন,—অফিসারমশায় 'কর্ণফুলির ডাক'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বললেন, গল্পের নায়ক স্কুলমাস্টার ফ্যাসিবিরোধী হলে আরও ভাল হত।

সাগরবাবু আসবার পর থেকে শিবরামবাবু প্রায়ই বোর্ডিংএ আসতেন। সুবোধবাবু উপস্থিত থাকলে একটু অস্বস্তি বোধ করতেন। তিনি থাকতেন বোর্ডিং-এর অতি কাছে বসাকদীঘি লেনে। আমাদের যাতায়াতের পথে প্রায়ই দেখতাম, ব্যালকনিতে চেয়ারঠাসা এক বিস্তৃত পৃষ্ঠদেশ। সুবোধবাবু এদিক ওদিক তাকিয়ে পথ চলতেন; বসাকদীঘি লেন সামনে পড়তেই বলতেন, ব্যালকনি দেখুন।

খাওয়াদাওয়ায় ঘাটতি হলেও আমাদের আড্ডার ঘাটতি ছিল না। অধিবেশন হত আমার চার নম্বর ঘরে। একদিন কুকারে শুধু ভাত রান্না হল। চৌধুরীমশায় মাংস রান্না করে দিলেন। রাত এগারোটা না বাজতেই চারদিক প্রায় নিঝুম। গলির মোড়ে একটা হোটেল থেকে তন্দুরি রুটি ও শিককাবাবের গন্ধ ভেসে আসছে। সুবোধবাবু বক্তা, আমরা নির্বাক শ্রোতা। সভাভঙ্গের আগে সাগরবাবু গাইলেন,—'কান্নাহাসির দোলদোলানো পৌষ ফাগুনের পালা'। একটিন সিগারেটের শেষ তিনটিতে যখন তিনজন ফুঁ দিলাম, বোর্ডিং-এর ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজলো।

১৯৪৪ সাল। বোর্ডাররা অনেকে ফিরে এসেছেন। সুবোধবাবু বললেন বড় একঘেয়ে লাগছে।

এক ছুটির দিন আমরা বাসার খোঁজে বেরুলাম। বর্মণ স্ট্রীটের কাছাকাছি হলে ভাল হয়; ভাড়াটে বাড়ির সন্ধানে উত্তর কলকাতার অলিগলি প্রায় চষে ফেললাম, কিন্তু সুবোধবাবুর মনোমত বাড়ি পাওয়া গেল না।

আর একদিন বেরুলাম দক্ষিণ কলকাতা অভিযানে। কালিঘাট পার্কের কাছে একটা বড় বাড়ি —'টু-লেট' ঝুলছে। নীচে একটা ডাক্তারখানায় খোঁজ করতেই ভদ্রলোক হেসে খুন। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বললেন, টু-লেট আপনাদের জন্য নয়। আমরা ক্লান্ত হয়ে বসলাম পার্কে একটা গাছের ছায়ায়। পাঞ্জাবী হোটেলে খেয়ে বোর্ডিংএ ফিরতে রাত হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত সুবোধবাবুর বাড়ি ঠিক হল, কাঁকুলেতে। আনন্দবাজার অফিস থেকে অনেকখানি দূরে। নিকটতম প্রতিবেশী সুশীল রায় ও তারাপদ রাহা। বাসস্টপ থেকে বেশ খানিকটা হাঁটতে হয়। যাত্রার দিন ঠিক নেই, শুধু গম্ভীরাকৃতি চৌধুরীমশায় গম্ভীরতর হয়েছেন।

একদিন সকালে সুবোধবাবু ম্যানেজারের ভাগ্নে খোকাকে ডেকে ঘরভাড়া মিটিয়ে দিলেন, আর আমাকে বললেন কুকারটা আপনারই থাকুক। তাঁর জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল বিছানা আর বড় একটা স্যুটকেশ।

বিদায়ের দিন আমি ছিলাম না। সেদিন সকাল থেকেই সুবোধবাবু নাকি মহাব্যস্ত ছিলেন। চৌধুরীমশায় বিছানাপত্র বেঁধেছেঁদে রেডি করলেন। সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়েছে; একটা ঘোড়ার গাড়ি প্রস্তুত মার্কাস বোর্ডিং-এর গেটের সামনে। জিনিসপত্র তুলে নিয়ে আরোহীসমেত গাড়ি চললো ধীর কদমে মার্কাস স্কোয়ারের পাশ দিয়ে। সাগরবাবু ঘরে চলে গেলেন। চৌধুরীমশায় দাঁড়িয়ে থাকলেন গেটের বাইরে; তাঁর দু চোখ বেয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে।

সন্ধ্যেবেলা ফিরে দেখি ঘরের মধ্যে পড়ে একটুকরো কাগজে লেখা চিঠি—

"অমর বাবু,

আমি চললাম। পাশের ঘরে আমার ছাতাটি বন্দী আছে; একদিন এসে নিয়ে যাব।

সুবোধ

ইতিমধ্যে আমার কোন চিঠি আসলে আপনার কাছেই রাখবেন। আর সব সাক্ষাতে হবে।"

আমার চার নম্বর ঘরের নামকরণ করেন সুবোধবাবু—"পাশের ঘর"।

## দুর্ঘট

### কেতকী কুশারী ডাইসন

তোমাকে কোলে ক'রে রাত কাটানো যেতো।
তা হলো না।
তুমি দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেলে।
এক কম্বলে শীত মানলো না,
মাদলের বোল ঘুম পাড়ালো না,
যে রাত্রে মশা কামড়ালো
সে রাত্রেই তোমার ম্যালেরিয়া হলো।
বন্দী গাছগুলো যখন ভোরের কুয়াশা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে
তখনই দরজায় এলো তোমার গ্রেপ্তারের পরোয়ানা,—
সেই কড়ানাড়া আমি এখনও শুনতে পাই।
খিড়কি দুয়োর দিয়ে তুমি পালিয়ে গেলে।
খবর পেলাম তুমি দূরে দেশে ফেরার হয়েছো।

হাতীর পিঠে চ'ড়ে তোমার ডেরায় আসা যেতো।
তা হলো না।
হাতীটা মদমত্ত হয়ে দাপাদাপি করলো,
বাঁশবন লণ্ডভণ্ড হলো।
চিত্রল লুঙ্গি সামান্য তুলে ধ'রে
খালি পায়ে ছুটে এলো মেয়েরা।
তাদের জিজ্ঞাসু চোখের তেরছা আলোয়
আমি অপ্রস্তুত হলাম।

## সন্ধের লোকাল ট্রেন

### শান্ত রায়

আর কেউ নয়, শুধু সন্ধের লোকাল ট্রেন টের পায়
ঊষর ভূমির দীর্ঘশ্বাস ;
এখানে ওপরমুখী চিমনি নেই,
কিছু আগে অবসন্ন উড়াল-পাখির সংক্রামে
আকাশ আঁধার হয়ে গেছে—
জোনাকি-তক্ষক-ব্যাঙ-ডাকপাখিদের শব্দ সাড়া

একটেরে প্ল্যাটফর্মে ট্রেন থামে ধামুয়ায়, তারপর
লোকজন নেমে গেলে, স'রে যেতে থাকে...
উল্টোপারে ঝোপঝাড়, লম্ফর আলোর আবছা খ'ড়োচাল
হঠাৎ সেখান থেকে শিশুর চিৎকার শোনা যায় :
ও বাবা, এসেছো!

## আমার কোথাও যাবার ছিল

### ব্রততী বিশ্বাস

আমার কোথাও যাবার ছিল পরবাসের ঘরে
আমার কোথাও তাড়া ছিল দিনদুয়েকের তরে
আমার ছিল ছিন্নবাস আমার ছিল ঘুম

পাহাড়তলির দীর্ঘ ছায়া অবসরের ডাক
ডাক কি ছিল? ছিল কিছু অন্যতর ফাঁক
গহীন গাঙে জলের মতো যেই না চুপ করা

থমকে আছে সময় এখন হাতের শিরার কাছে
পরবাসের দুঃখ নেই সুখটি জানা আছে
দুঃখ নিয়ে মাথার ওপর আকাশছোঁয়া হাত
আমার এখন ঘরে থাকার, ঘরে থাকার সাধ।

## শেষরাত্রে

### শ্যামলকান্তি দাশ

শেষরাত্রে তুমুল বৃষ্টি হবে,
অপরাহ্ণে আজ আমরা ময়ূর দেখেছি।
দেখেছি জানালা-খোলা মানুষের শূন্য ঘর-
ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নিসর্গের ছিটেফোঁটা
ম্রিয়মাণ বকুল-পারুল,
এলোমেলো ত্রস্ত চাঁদ ঝুঁকে আছে সেতুর ওপারে।

মানুষ কোথায় গেছে, এ-সময়ে, এরকম অসময়ে?
কোথাও যায়নি।
মানুষ হরিণ তাই রঙিন শস্যের ক্ষেতে বেড়াতে গিয়েছে
মানুষ মানুষ তাই কবিত্বের ছেঁড়াকাঁথা গায়ে দিয়ে
পাহাড়ে উঠেছে
মানুষ ময়ূরপাখি ছেঁড়াখোঁড়া জীবনের ধারে বসে
একা-একা গোধূলি দেখছে।
মানুষ কোথাও গেছে, আমি তার গতিবিধি কিছুই জানি না।

শেষরাত্রে তুমুল বৃষ্টি হবে
অপরাহ্ণে আজ আমরা দুজনেই ময়ূর দেখেছি।

# শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা

সত্যেন্দ্র আচার্য

হাত ঘড়ি দেখে নিয়ে আরো একটু জোরে হাঁটল সুদীপ। দ্রুত হাঁটলে সুদীপ ফুটপাত ধরে না, রাস্তায় নামে। রাস্তা যেন তাকেই টেনে নিয়ে যায়, কোন ভ্রূক্ষেপ থাকে না। সে হাঁটে, একটা নিজস্ব ভঙ্গিতে। পেছন থেকে কেউ ডাকলেও সাড়া নেই। সুদীপ হাঁটছে কি ছুটছে ঠিক বোঝা যায় না তখন। যেন সব কিছু সঁপে দিয়ে একটা কলের পুতুল এগিয়ে চলেছে। দম যখন ফুরোবে, গতি শ্লথ হবে তখন।

দম ফুরিয়ে গেল এখন। গতিও শ্লথ হল, বাড়িটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সুদীপ রুমাল বের করে মুখ মুছল, তারপর শ্লথ পায়ে ঢুকে গেল ভেতরে।

টেবিলে মুখ রেখে চুপচাপ বসেছিল ব্রততী। বই খাতা অগোছালো। সুদীপ মুহূর্ত খানেক দাঁড়াল পাশে, বাঁকা চোখে টেবিলটা দেখল, তারপর চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। বসে বলল, 'বসেই তো আছ, পড়ছ কোথায়?'

দ্রুত, ঠিক হাঁটলে যেমন ভিন্ন মানুষ সুদীপ, তেমনি এই টেবিলে। অন্তত ব্রততীকে পড়াতে বসলেই সুদীপ ভিন্ন মানুষ। চোখে মুখে গাম্ভীর্যের প্রলেপ, গলার স্বর গাঢ়। পড়ুয়ার চোখে না তাকিয়েই সেই গাঢ় গলায় বলল, 'কী, আর কতক্ষণ বসে থাকবে?'

তবু কোনো উত্তর এল না। টেবিলটি যেন মরুভূমি, এবং এই বিরাট মরুভূমির ওপর দাঁড়িয়ে ব্রততী এখন অসহায়, এমনভাবে তাকাল।

সুদীপ আরো কঠোর হল। আবার ভারিক্কী স্বর আনল গলায়। বলল, 'আগের জন্মের পাপ না থাকলে, তোমার মত মেয়ের কেউ টিউটার হয় না। বুঝলে?'

তবুও কোন উত্তর নেই। শুধু একটা খাতা টেনে নিল ব্রততী। লেখার প্রস্তুতি আর কী! চোখে মুখে কোন ভাবান্তর ঘটল না। কোন পরিবর্তন লক্ষ করা গেল না।

সুদীপ আবার কঠের হল। তেমনি প্রবীণতার ভাণ করে কঠোর গলায় বলল, 'বসেই আছ তো বসেই আছ। কই, কলম নড়ছে না তো?'

ব্রততী তেমনি বালুকারাশির ওপর সেঁটে থাকা ভঙ্গিতে শুধু বাঁকা করে হাসল। শব্দ হল না।

সুদীপ ইতিউতি একটু তাকাল। সময় কাটাল। পর্দার ওপাশে কান রেখে কী যেন লক্ষ করল। করে আরো কঠোর গলায় যা বলবে ভাবল, তা বলল না। যেন বলা হল না। চোরা বালিতে পুঁতে যাওয়া ব্রততীর শরীর এতক্ষণ পরে যেন নিষ্কৃতি পেল। এতক্ষণ পরে দরাজ গলায় বলল, 'কি, পর্দার ওপাশে কি?'

'ভেব না তুমি স্কুলেই পড়ছ এখনো', সুদীপ ওইটুকু বলে থামল। যেন দম নিল থেমে। তারপর আর একটু গলা চড়িয়ে বলল, 'চেনা বামুন যে। পইতের কদর থাকবে কেন বল?'

'গেঁয়ো যোগীরাও ভিখ পায় না', সঙ্গে সঙ্গে তির্যক মন্তব্য ব্রততীর। একেবারে নাটুকে হাসিতে ফেটে পড়ল ব্রততী। 'কিন্তু ভিক্ষে দেবার মত আমার

সুদীপ গাম্ভীর্য বজায় রাখতে সিগারেট ধরাল। টেবিলের ওপর এক রাশ বই। খাতার ওপর পেন্সিল ছুঁইয়ে আবার তেমনি চুপচাপ বসে থাকল ব্রততী। সুদীপ ঘন ঘন সিগারেট টানল। ধোঁয়ার কুণ্ডলী বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'সময়ের দাম আছে আমার।' ধোঁয়ার কুণ্ডলী টেবিল পার হয়ে হাওয়ায় সাঁতার কাটতে কাটতে কিছু পর্দার ওপাশে, কিছু জানলা দিয়ে ওপারের হাওয়ায় মিশে গেলে, সুদীপ শুধু বলল, 'আমার একটা সুনাম আছে।'

ব্রততী ঠোঁট বেঁকিয়ে তাকাল। পেন্সিল কামড়াল। তারপর খুব মনোযোগ দিয়ে খাতার ওপরে "শ্রীশ্রী সরস্বতী মাতা সহায়" লিখলে সুদীপ চোখ ঘুরিয়ে পর্দার দিকে তাকাল। আর তাকাতেই ব্রততী যেন সুযোগ পেল। 'উঁহু, ওটা পর্দা। পড়ুয়া কেমন উত্তর লিখছে, কি করছে টিউটার সেদিকে লক্ষ রাখবে তো? পড়াতে বসে অন্যমনস্ক হতে নেই।'

'যেন তুমিই পড়াচ্ছ আমাকে, এমনভাবে কথা বলছ?' সুদীপ আবার রাগল। তেমনি রাগের ভঙ্গি করে বলল, 'পড়ছ আর কোথায়, শুধু তো মা সরস্বতীর নাম লিখছো তখন থেকে।' সুদীপ ব্রততীর দিকে তাকাল না। বলল, 'সেই কখন থেকে কলমের ডগায় প্রশ্নটা নিয়ে চুপচাপ বসে আছ।' সুদীপ একার একটু উঠে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল, তারপর জ্বলন্ত সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'আমাকে তুমি ডোবাতে চাও?'

ব্রততী ডটপেনটা এতক্ষণ পরে হাতে ধরে 'সরস্বতী' মাতার চারপাশে গোটা পাঁচেক গোল গোল চিহ্ন দিয়ে সরস্বতী মাতাকে বন্দী করে মাথা দুলিয়ে বলল, 'তুমি না বকলে সব কেমন গুলিয়ে যায়, স্যার।'

সুদীপ এখন আর নতুন করে সিগারেট ধরাল না। এই আর এক অভ্যাস সুদীপের। চিন্তা ভাবনায় ডুবে থাকলে, পর পর গোটা তিনেক সিগারেট পোড়ায়। ব্রততী যেন উপদেশ দিচ্ছে এমন গলায় বলল, 'আর সিগারেট খাবেন না স্যার, খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর।' বলেই নিজের মনেই যেন বলছে আবার বলল, 'আমি তো আর সিগারেট খাই না, আমার আর মাথাব্যথা কি?'

সুদীপ একটা বই টেনে নিল। নিয়ে বইয়ের পাতায় চোখ রাখলে ব্রততী বলল, 'কি গো, সুদীপ ব্যানার্জী স্যার, ক্লাসের ভেতর যদি এস কি স্যারকে সুদীপদা বলে ডেকে ফেলি, তা হলে বকবে তুমি স্যার?'

সুদীপ বই থেকে মুখ তুলল না। না তুলেই কপট রাগের কড়া সুর আনল গলায়. 'আ! কতক্ষণ আর লাগবে বলো তো?' বিরক্তি প্রকাশ করল সুদীপ. 'ঘড়িটাকেই জিজ্ঞেস করো না?'

'বেশ, বাবা, বেশ', ব্রততী তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, 'না হয় রেখেই আসছি ঘড়িটা ও ঘরে।' ব্রততী উঠে দাঁড়াল, কিন্তু ধপাস করে আবার বসে পড়ল চেয়ারে। বসে ঘড়িটাকে লক্ষ করে শাসন করল, ব্রততী। 'রোজ ভাবি তোকে চাবি দিতে ভুলে যাব। কিন্তু ওই যে, ওঘর থেকে—' মুখ ভেঙিয়ে নিজের নামটা বিকৃত উচ্চারণ

সুরে ঘাড়কেই বলল, 'দ্যাখ, কাল থেকে ঠিক তুলে যাব। চাব, দাম কিছু দেব না তোকে। সাইরেন বাজুক আর ওখান থেকে যেই বলুক—'

সন্দীপ রুমাল বের করে চশমাটা একটু মুছে নিয়ে আবার চোখে লাগাল কিন্তু তাকাল না। ব্রততী অপরপক্ষ থেকে কোন জবাবের প্রত্যাশা না করেই অভিযোগ করল, 'সময়ের যে অভাব এস বি স্যার তোমার তা আমি জানি। বিনা পয়সার পড়ুয়া যে আমি, সময়ের দাম আমার টিউটরের থাকবে না তো, আমার থাকবে?' তার পর চোখে হাত চাপা দিয়ে সন্দীপকে লক্ষ করে প্রায় কান্নার গলায় বলল, 'তোমার সময়ের দাম তো আর আমরা যথাযোগ্য দাম দিয়ে কিনতে পারিনি?'

সন্দীপ চুপ। ব্রততী এবার চোখ থেকে হাত নামিয়ে হো হো করে হেসে বলল, 'কি, কেমন দিলাম বলত সন্দীপ স্যার?' একবার হাসতে হাসতে হেলেদুলে বলল, 'তার চাইতে তুমি আমাকে পাকা অভিনেত্রী হওয়ার ট্রেনিং দাও, সিনেমায় নামব। নায়িকা হবার মত চেহারা আমার নেই, কিন্তু নায়িকার ছোটবোন তো হতে পারি? কি গো এস বি স্যার, পারি না?'

'জানি না।' সন্দীপ নিতান্ত সাধারণ গলায় বলল।

প্রথমে ভুরু কোঁচকালো ব্রততী, পরে 'সরস্বতী মাতা'-র জিপিশিপে দৃষ্টি রেখে বলল, 'ভাগ্যক্রমে ধনপতি কোন নায়কের সঙ্গে নায়িকার সানাই সহযোগে ইয়ে ইয়ে হলে তবে ছোট শালী হতে পারব তো? কি গো স্যার, এস বি স্যার ট্রেনিং-মেনিং-এর অভিজ্ঞতা আছে হাতে?'

সন্দীপ হাসতে গিয়েও থেমে গেল। এবারে গলার স্বর একটু কোমল করে বলল, 'অনেক বকেছো, এখন লেখো,' সন্দীপ বইটা বন্ধ করে রেখে দিল। দিয়ে বলল, 'আর না বুঝলে বলো, একশোবার বুঝিয়ে দেব। কিন্তু না বুঝে বোঝার ভাণ করবে না বলছি।'

ডান কাঁধে চিবুক ছুঁইয়ে তির্যক তাকিয়ে বন্দী সরস্বতীকে নমস্কার করল ব্রততী। তারপর জিব দিয়ে ওপরের ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিল। কিন্তু লেখার কোন লক্ষণ প্রকাশ পেল না। সন্দীপ এখন খাতার ওপর আঁকিবুকি কাটতে কাটতে ঠিক এবার বকল না। কিন্তু উষ্মা প্রকাশ পেল গলায়। বলল, 'নিতান্ত তোমার অন্ধ দিদির অনুরোধ, তাই এই দায়। নইলে—'

'নইলে?' ব্রততী যেন টপ করে কথাটা লুফে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার কয়েক উচ্চারণ করল। তারপর প্রশ্ন করে বসল, 'নইলে, আসতে না, এই তো?'

সন্দীপ মুহূর্তখানেক বিব্রত হল। উত্তরের ভাষা খুঁজল। না পেয়ে হেসে ফেলল। তেমনি হেসেই উত্তর দিল, 'যেন তুমিই আমাকে পড়াতে বসেছ। কথায় কথায় আমায় তাই জবাব দিতে হবে।'

ঠোঁটটা ছুঁচোলো করে লেখায় মন দিল ব্রততী। সন্দীপ আর কিছু বলল না। শীতের হাওয়া আসছিল ঘরে। পর্দা সরিয়ে। আজ যেন অন্য দিনের চাইতে একটু শীতের ভাব হাওয়ায়। হঠাৎ লিখতে লিখতে কলম থামিয়ে ব্রততী প্রশ্ন করে বসল, 'তুমি পড়াতে বসলে আমার কেমন হাসি পায়। আচ্ছা—'

'কী?'

'ধরো, আর তো কটা দিন। আমি কলেজ থেকে বেরিয়ে গেলে তুমি তো চাকরি নিতে পারতে?'

'আবার?' সন্দীপ আবার ধমক দিল।

'আচ্ছা, কবে তোমার ভুঁড়ি হবে বলত, সন্দীপদা?'

'ওঃ!' সন্দীপ আবার কপাল কুঁচকোলো।

'কানের পাশে চুল পাকবে? একটা গেরুয়া রঙের ঢিলে ঢালা পাঞ্জাবি পরে অধ্যাত্মানুভূতি, নিসর্গচেতনা, এই সব কঠিন কঠিন বিষয়ের ব্যাখ্যা দেবে?' এর পর যেন কিছুক্ষণ ধরেই নিজের মনেই হাসল ব্রততী, তারপর রসিকতা করল, 'মান্ধাতা আমলের মুখস্থ নোট থেকে লংপ্লেইং রেকর্ড চালাবে?'

এতক্ষণ পরে সত্যিই হেসে ফেলল সন্দীপ। 'কী তুমি পড়বে, না উঠে যাব ও ঘরে?'

'সেইটাই তো চাও', ব্রততী মুখ টিপে হাসল। 'যাও?'

পাশের ঘরে যাবার জন্যে সন্দীপ উঠে দাঁড়ালে ব্রততী হা[illegible] ধরে টানল। সন্দীপ বেজার মুখ করে দাঁড়িয়েই থাকল। বসল না। ব্রততী হাত না ছেড়েই বলল, 'বেশ বেশ ওই জায়গাটা আর একটু বুঝিয়ে দাও।'

সন্দীপ হাত ছাড়িয়ে নিল। নিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'কোন জায়গাটা?'

'সেই জায়গাটা।'

'কোন জায়গাটা?' সন্দীপ শব্দ দুটোর ওপর অনেকখানি জোর দিল।

'সেই যে সেই? ঘাড় দোলাল ব্রততী। সেই যে অভিসারে যাবেন রাধারাণী, তাই জল ঢেলে মাটি পেছল করে তার উপর দিয়ে হাঁটছেন। দুর্গম পথে যেতে হতে পারে বলে, সেই যে সেই, কাঁটা পুঁতে তার ওপর দিয়ে হাঁটছেন? কী যেন, কী যেন সেই লাইনগুলো?' কলম কামড়াল ব্রততী। 'ইস্ কিছুতেই মনে থাকে না।' নিজের মাথায় নিজেই একটা গাঁট্টা মারল, 'মনে পড়েছে, মনে পড়েছে', ব্রততী যেন অনেক চেষ্টা করে মনে আনতে পেরেছে, চোখে মুখে এমন ভাব এনে বলল—

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।

পদ শেষ করে ব্রততী হাসল। দেখল, সন্দীপ তেমনি দাঁড়িয়ে। ওঘরে যাবার জন্যে ব্যস্ত। ব্রততী বলল, 'তা হলে বলছ স্যার, প্রিয়মিলনের জন্য শ্রীরাধিকার এই অনুশীলন বেশ ইম্পর্ট্যান্ট, পরীক্ষায় আসতে পারে?'

'পারে।' ও ঘরের দিকে চোখ রেখে ছোট করে উত্তর দিল সন্দীপ। ■

# "পিয়ারলেস টীম"
## ভারতের জাতীয় সংহতির এক মূর্ত প্রতীক

■ "পিয়ারলেস টীম" গড়ে উঠেছে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সর্বশ্রেণীর মানুষকে নিয়ে। বস্তুতঃ, নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও তাদের মিলনসূত্র একটাই—সেটা হল আপামর জনসাধারণকে স্বল্প সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে, সংগৃহীত অর্থ সরকারী তহবিলে নিয়োজিত করার মহান ব্রত।

■ পিয়ারলেস টীমকে তাদের কাজের মাধ্যমে স্বভাবতঃই নানা জাতি, নানা ভাষা-ভাষী ও বিবিধ সংস্কৃতির লোকের জীবনধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে হয়। সেই অপূর্ব ঘনিষ্ঠতা থেকে তারা সহজেই একজাতি-একপ্রাণ হয়ে যায়।

মোট সম্পদ-
১০০ কোটি
টাকার উর্ধ্বে

পিয়ারলেসের মাধ্যমে সঞ্চয় মানেই
**রাষ্ট্রের কল্যাণে সঞ্চয়**

Estd. 1932

**দি পিয়ারলেস**
জেনারেল ফাইনান্স
এ্যাণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিঃ

রেজিস্টার্ড অফিস : পিয়ারলেস ভবন,
৩, এসপ্লানেড ইস্ট, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯

PRASA/PGF 8/B/80

তাকিয়ে দুহাতটা বাহুরে কেমন শিকল রেখে বলল, 'আমাদের গ্রহটার দিকে তাকালে চাঁদটা চোখে পড়ে। না?'

সন্দীপ কিছু বলল না। সর্বাণী বলল, 'পাতার ওপর দিয়ে একটু তাকাও বাঁ দিকে। কি, নেই?'

'কি?'

'চাঁদ নেই?' সর্বাণী এবার ঠোঁটের ওপর হাসি রেখে বলল, 'ছিঃ, অত ভেব না। কপালের ওপর ভাঁজ পড়বে।'

'ভাবি না।'

'আমি বুঝি।'

'কী বোঝ?' সন্দীপ এবার তাকাল সর্বাণীর চোখে।

'কিন্তু আমি তো আর ভাল হব না।'

সন্দীপ উত্তর দিল না। তেমনি সর্বাণীর চোখে, চুলে, শরীরের ওপর বার বার চোখ বোলালে সর্বাণী বলল, 'আমি জানি, তুমি আমাকে দেখছ, আমার অন্ধ চোখ দুটোর ওপর এখন তুমি তাকিয়ে আছ। না?'

'না', সন্দীপ চোখ না তুলে জবাব দিল।

'আছ। আমি বুঝি।'

সন্দীপ চোখ বোজাল। বুজিয়ে কী যেন ভাবল।

সর্বাণী আরো কাছের গলায় বলল, 'সেই তুমি ভাবছ। এরপর সর্বাণীও যেন কী ভাবল। ভেবে বলল, 'আর তো ক'দিন। ব্রততীর পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে আর কি তুমি আসবে?'

সন্দীপ চুপ করে থাকলে, সর্বাণী নিজের প্রশ্নের উত্তর যেন নিজেই দিয়ে দিল, বলল, কেনই বা আসবে, সেই আর আগের আমি আছি নাকি? সেই আগের সর্বাণী? নিয়তিকে তুমি মানতে না, আমিও না।'

সন্দীপ চুপ করে থাকলে সর্বাণী বলল, 'তোমার মনে পড়ে সন্দীপ, যেদিন আমরা ইউনিভার্সিটির গণ্ডি ছাড়ালাম, ঠিক তার পরের দিন আমরা একটা ট্রেনের কামরায় চেপে সারাদিন ঘুরেছিলাম।'

'হ্যাঁ।'

'স্টেশনে ট্রেন থামলেই তুমি তাকাচ্ছিলে। একটা ভাল নামের স্টেশন পড়লে সেই স্টেশনে নামব আমরা।'

'নামটা তুমিই পছন্দ করেছিলে', সন্দীপ বলল।

'ঠিক।' সর্বাণী উত্তর দিল। একটু ভেবে বলল, 'এমন একটা স্টেশনে নামব যে-স্টেশনের নামে তোমার নামের 'স' আর আমার নামের যে কোন অক্ষর রয়েছে। একটা আজগুবি খেলার ছলে আমরা পর পর স্টেশন পার হচ্ছিলাম। তুমি বলেছিলে তেমন স্টেশন না পেলে এই ট্রেনেই ফিরে আসব আবার। কিন্তু ঠিক পরের স্টেশনেই আমার ইচ্ছা পূর্ণ হল।'

'আমরা নেমে পড়েছিলাম', একটু থেমে সন্দীপ বলল।

'নেমে আমরা দু জনে শুধু দু জনকে দেখেছিলাম,' চোখ বুজল সর্বাণী।

'স্টেশন ছেড়ে আমরা উদ্দেশ্যহীন হেঁটেছিলাম', সন্দীপ যোগ করল।

'আমরা একটা মাঠের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলাম,' সর্বাণী চোখ খুলল এবার, দূরে আকাশ মিশে গেছে, দূর থেকে উড়তে উড়তে এক ঝাঁক পাখি আসছিল।'

'ঠিক।' সন্দীপ বলল।

'তুমি সেই মাঠে তাদের ছায়া খুঁজেছিলে। উত্তর দক্ষিণ, ডাইনে বাঁয়ে ছুটোছুটি করেছিলে।'

সন্দীপ কথা বলল না।

সর্বাণী বলল, 'তোমার সেই চোখ, উড়ন্ত পাখির ঝাঁক, আকাশের শেষ বিন্দু, আমি চোখ বুজোলে ঠিক তেমনি দেখতে পাই।' সর্বাণী চোখ বুজলো। আঁচল তুলে জলের বিন্দুটা মুছে নিলে সন্দীপ, সেই অশ্রুর বিন্দু দেখতে দেখতে নিজের চোখ বুজিয়ে বলল, 'বেশ শীত পড়েছে আজ। গায়ে শালটা জড়িয়ে বসো।' সন্দীপ একটু সরে গিয়ে হেঁট হয়ে গায়ের ওপর শালটা জড়িয়ে দিল। তারপর মাথা হেঁট করে বলল, 'আমি যাই, রাত হল।'

সন্দীপ চলে গেলে সর্বাণী চোখ বন্ধ করে ভাবল, কী আশ্চর্য সুখের দিন ছিল ওদের। এক সঙ্গে পড়ত, একই কলেজে। সেই থেকে আলাপ। এই আলাপের সূত্র শেষে এসে দাঁড় করাল একটা আশ্চর্য জগতে। আলাপ, গল্প, হাসি আর অভিমানের ভেতর দিয়ে শেষে শেষ কথায়, এল ওরা। সন্দীপ বলেছিল, 'তুমি কথা দিচ্ছ?'

সর্বাণী প্রথমে অবাক চোখে তাকিয়েছিল। রক্তের ভেতর কেমন একটা শিহরণ অনুভব করেছিল। তবু বলেছিল, 'কেমন যেন ভয় হয়। এক এক সময় মনে হয়, তুমি আমি পাশাপাশি হেঁটে চলেছি, কিন্তু দূরত্ব অনেক। কেমন ভয় করে। আচ্ছা, কেন এমন হয় বলত?'

'জানি না।' গম্ভীর গলায় ওইটুকু ছোট্ট উত্তর দিয়েছিল সন্দীপ। পরক্ষণেই বলেছিল, 'যত সব বাজে চিন্তা মগজে তোমার ভিড় করে। যত দেরী করবে, ততই তোমার ভয় বাড়বে। আসলে তুমি আমাকে নাকচ করতে চাইছ।'

'আই—'

'আমি জানি,' সন্দীপ অনুযোগ এনেছিল গলায়।

'জানো না।' তারপর সন্দীপের চোখে তাকিয়ে বলেছিল, 'আমার চোখের দিকে তাকিয়েও তুমি বুঝতে পার না?' শেষের কথাগুলো কেমন অস্পষ্ট, কেমন আনুনাসিক হয়ে ঠোঁটের ওপর উঠে এসে সন্দীপ আবো কাছে সরে এসে বলেছিল, 'তা হলে চল রেজেস্ট্রী করে আসি। বিয়ের আগে বিয়ে হতে দোষ কি। ডবল মজা।' আবার রসিকতা এসেছিল গলায়, 'কবে আবার কার হাত ধরে কার ঘর

'ধরো তাই যদি হয়।'

'কি?'

'তুমি আর আমি অনেক দূরে। আলো আর অন্ধকারের মত ব্যবধান।'

'তখনো ভাববো তুমি আছ।' সুদীপ ঠিক গোছাল করে কথাগুলো বলতে পারছিল না। নিতান্ত দুঃখ আর ক্ষোভে বলেছিল, 'ভাববো তুমি একদিন ছিলে।' একটু থেমে সুদীপ আবার বলেছিল, 'তোমার ভাবনা নিয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দেব।'

'এক এক সময় মনে হয় তুমি খুব দূরে সরে যাচ্ছ।' সর্বাণী ওর আঙুল মুঠোয় তুলে নিয়ে বলেছিল, 'জানো, যখন একলা বসে থাকি ঘরে তখন ভীষণ কষ্ট হয়। ভীষণ যেন কান্না পায়। আচ্ছা, কেন এমন হয় বলতে পার?'

'বিয়ে হলে সব সেরে যাবে।' ঠাট্টা করেছে সুদীপ।

'অ্যাই—'

'কি,' সুদীপ উত্তর দিয়েছে।

'এক এক সময় অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনারা আমাকে ঘিরে ধরে।' সর্বাণী আঙুল ছেড়ে দিয়ে বলেছিল, 'মনে হয় তুমি আর আমি খালি মুখোমুখি বসে গল্প করি। কখনো মনে হয়, আমি বাজাব, তুমি শুনবে। তুমি বকবে, আমি রাগব, অভিমান করব। আবার সোহাগ করবে তুমি।'

সর্বাণী নিজে নিজে চমকে উঠল এখন। এসব ভাবতে ভাবতে কোথায় যেন ডুবেছিল এতক্ষণ। চমক ভেঙে দেখল, ব্রততী দাঁড়িয়ে। তেমনি অনুমানে তার উপস্থিতি বুঝে নিয়ে সর্বাণী বলল, 'কি রে?'

ব্রততী ঠিক পাশে বসল না। জানলার আরো কাছে সরে গিয়ে জানলায় হেলান দিয়ে বাইরে তাকাল। বলল, 'গত বছর এমনি সময় তুই কিন্তু হাসপাতালে ছিলি, দিদি।'

গলির মোড় পার হয়ে একটা রিকশা নিয়েছিল সর্বাণী। কথা ছিল, সুদীপের সঙ্গে ম্যারেজ অফিসে গিয়ে 'নোটিস' দিয়ে আসবে দুজনে। দিন ঠিক করে আসবে। বাঁক পার হতেই যেন ঝড়ের বেগে একটা লরি কোথা থেকে ছুটে এসে ওদের ধাক্কা দিল। ছিটকে পড়ল সর্বাণী। জখম হল রিকশাঅলা। সর্বাণী হাসপাতাল থেকে ফিরে এল বাড়িতে। তখনো ঝাপসা দেখতে পেত। আস্তে আস্তে আস্তে তাও মুছে গেলে শুধু কাঁদত সর্বাণী।

সুদীপ একদিন নিভৃতে ব্রততীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, 'আমার চোখ দুটো দান করে এলাম ব্রততী। আই ব্যাঙ্কে। তুমি তো জান', সুদীপ বলেছিল, 'মৃত্যুর পর চোখ পেলে তা দিয়ে ডাক্তাররা কর্ণিয়া গ্রাফটিং করেন। এমনি অন্ধ হয়ে যাওয়া অনেকে তখন চোখে আবার দেখতে পায়। তাই দানপত্রে সই করে এলাম হাসপাতালে।'

ব্রততী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল সুদীপের সামনে। সুদীপ বলেছিল, 'আমার যদি এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়, আমার চোখ দুটোয় তোমার দিদি আবার চোখ ফিরে পাবে।' একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এসেছিল তখন সুদীপের গলা দিয়ে।

চোখ তুলে বাইরে তাকিয়েছিল ব্রততী। সুদীপ আঙুলের বুরুশে সামনে ঝুঁকে পড়া দু' একটা চুল পেছনের দিকে ঠেলে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষণ। ব্রততী চোখ তুলতেই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল সুদীপ। কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারছিল না। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারপর বলেছিল, 'পৃথিবীর আলো আবার নতুন করে দেখবে সর্বাণী।' সুদীপের গলার স্বর কেমন অস্পষ্ট, কেমন বুজে আসছিল। তবু বলল, 'এই সূর্য, চন্দ্র এই আকাশ, নক্ষত্র, এই দিনরাত্রি সব আবার নতুন করে চোখের ওপর ভাসবে। শুধু আমি তখন থাকব না।'

ব্রততী চোখ তুলতে পারছিল না। সুদীপের চোখাচোখি তাকাতে পারছিল না। সুদীপ আকাশ দেখল। বিস্তৃত আকাশ চোখে পড়ে এখান থেকে। সীমাহীন পরিমণ্ডলে নির্নিমেষ চোখে তাকাল সুদীপ। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করেও কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল সুদীপ। গলার স্বর আবার তেমনি বু[...] এল। নিঃশ্বাস দ্রুততর হচ্ছিল। যেন তা গোপন করতে গিয়ে সুদীপ কাঁপা [...] বলল। 'মৃত্যুর পর আমার চোখ, অন্ধজনের আলো হোক।'

ব্রততীও যেন তাকাতে পারছিল না। সাহস করে চোখ তুলতে পারছিল না। সুদীপ আরো কিছুক্ষণ অনড় দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'কাল থেকে আমি আর এ বাড়িতে আসব না ব্রততী। সর্বাণীকে তুমি বল না।'

এবার তাকাল ব্রততী। সুদীপ চোখ নামিয়ে বলল, 'এলেই মনে হয়, সেই দুজনের নামের দুটি অক্ষর নিয়ে গড়া একটা সুন্দর স্টেশনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। শেষ গাড়িতে চড়ে গন্তব্যে ফিরে যেতে ভুলে গেছি আমরা।' সুদীপ যেন দম নিল, বলল, 'কি মনে হয় জান, ব্রততী? যেন গোধূলি ম্লান হয়ে সন্ধ্যার আলো এসে পড়ল আমাদের চোখে। অন্ধকারে সব ঢেকে গেল। সে স্টেশনের নাম আর চোখে পড়ে না। অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধকার। এ সব বুঝবে না, ব্রততী।'

সেই থেকে এই অভিনয়। এই ছলাকলা। সুদীপকে টেনে আনতে হয় এ বাড়িতে। অভিনয় করতে হয় ব্রততীকে। তেমনি জানলা হেলান দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল এতক্ষণ। নিজের চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এলে, ব্রততী বলল, 'আর কত অভিনয় করব দিদি?' গলার স্বর বুজে আসছিল ব্রততীর। চোখে হাত চাপা দিয়ে অস্পষ্ট গলায় বলল, 'আমি তো আর পুরুষ নই?'

কোন জবাব দিল না সর্বাণী। সেতারে আঙুল ছুঁইয়ে শুধু টুং টাং আওয়াজ তুলল।

ছবি : সুধীর মৈত্র

## বিজ্ঞান

### যে প্রাণী কোটি বছর পরেও এখনও প্রাণবন্ত

কে বলবে, ওরা প্রাণী? ডুবুরীর পোশাক এবং যন্ত্রপাতি নিয়ে ক্যারিবিয়ান সাগরের প্রায় তিন শ ফুট গভীরে নামার পর আমার মনে হলো, আমি যেন নন্দনকাননের সামনে এসে হাজির হয়েছি। আমার পায়ের নিচে অজস্র শাখা-প্রশাখা। তাদের গায়ে বড় বড় অজস্র পালক। ফাঁকে ফাঁকে সমুদ্রের নিচের মাটির উপর দাঁড়িয়ে সরু সরু কান্ড। মাথায় ফুলের মত গুচ্ছ। কী বিচিত্র তাদের চেহারা! যেন অজ্ঞাত কোন শিল্পী বিচিত্র রঙ বুলিয়ে তাদের থরে থরে সাজিয়ে তৈরি করেছে স্বগীর্য় কানন। প্রথম অভিজ্ঞতা যাঁদের তাঁদের মনে হবে সমুদ্রের নিচে কী সুন্দর এক অরণ্যই না আবিষ্কার করেছেন। হ্যাঁ, অরণ্যই বটে। তবে এ অরণ্য উদ্ভিদের নয়। ওরা এক ধরনের প্রাণী। ওদের মোহিনী রূপ দেখে অনেকেই হয়ত মুগ্ধ হবেন। যেমন হয়েছি আমি। কিন্তু ওদের দেহ থেকে নিঃসৃত বিষ অনেক জলচর প্রাণীর কাছেও বিভীষিকার মত। —বছর কয়েক আগে সংক্ষেপে ওদের সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতার কথা এইভাবেই তুলে ধরেছিলেন জনৈক পুরা-জীববিজ্ঞানী (পেলিও-বাইওলজিস্ট)।

"আজ থেকে পঞ্চাশ কোটি বছর আগে থেকে শুরু করে পরবর্তী সাড়ে সাতাশ কোটি বছর পর্যন্ত গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের মত দেখতে এই সব প্রাণী পৃথিবীর ব্যাপক সমুদ্র-অঞ্চল যেন জমজমাট করে তুলেছিল। বংশবৃদ্ধি করতে করতে এক সময় এদের সংখ্যা দারুণভাবে বেড়ে গিয়েছিল। মৃত্যুর পর এদের জীবাশ্ম সমুদ্রের নিচে কোথাও কোথাও গড়ে তুলেছিল প্রায় একশ ফুট পুরু চুনা পাথরের স্তর। প্রাচীন সমুদ্রের নিচে শত শত মাইল ছড়িয়ে থাকার পর ওই সব স্তর এখন বহু জায়গায় সমুদ্র তলের উপরেও মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এসেছে। তাদের মধ্যে ওই সব প্রাণীর পাঁচ হাজারেরও বেশি প্রজাতির সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ইংরেজীতে এ সব প্রাণীদের বলা হয় ক্রাইনয়েড। জৈবিক বিবর্তনের বাধা পেরিয়ে সেই পাঁচ হাজার প্রজাতির মধ্যে মাত্র
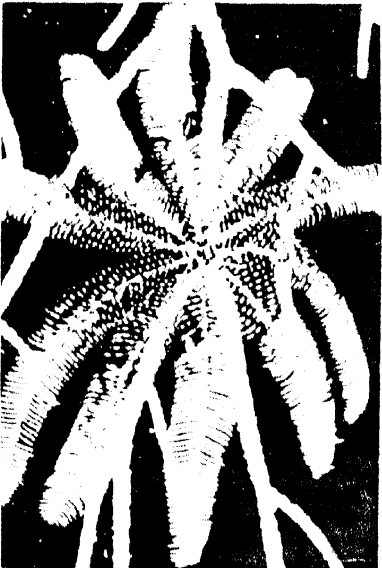
সবৃন্ত ক্রাইনয়েড জলের স্রোতে ভাসমান শিকার ধরার জন্যে প্রস্তুত।

সমুদ্রের গভীরে এমন ৪০০ রকম প্রজাতির ক্রাইনয়েডের সন্ধান দিয়েছেন প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা।

দুটি গোষ্ঠী এখনও পর্যন্ত তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। প্রাণিবিজ্ঞানীদের কাছে যাদের পরিচয় সবৃন্ত সমুদ্র-লিলি এবং অবৃন্ত 'ফেদার স্টার'। এদের বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক কথাই আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু বিবর্তনের প্রতিবন্ধকতাকে অস্বীকার করে সবৃন্তক সমুদ্রলিলি এবং অবৃন্তক ফেদার স্টার আজও পর্যন্ত কীভাবে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হলো সে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমায়িত" সম্প্রতি এই মন্তব্য করেছেন কির্নাসনাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক ডেভিড এল মায়ার এবং হিউস্টনের একসোন প্রোডাকশন রিসার্চ কোম্পানির বিশেষজ্ঞ ডি ব্র্যাডফোর্ড ম্যাকুরডা (জুনিয়ার)।

"এক সময় সব রকম ক্রাইনয়েডেরই বৃন্ত ছিল। প্রায় কুড়ি কোটি বছর আগে ফেদার স্টার নামক তাদের একটি গোষ্ঠী তাদের দেহের বৃন্ত অংশগুলি হারাতে শুরু করে। পরিবর্তে তাদের বাহুর মত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিতে গড়ে উঠতে থাকে জটিল এক ধরনের পেশী। ফলে দেখা গেল, এক সময় যেখানে সবৃন্তক ক্রাইনয়েডের ছিল ছড়াছড়ি এখন সেখানে সেই প্রাচীনতম পূর্বপুরুষদের সাক্ষ্য বহন করে জীবন্ত জীবাশ্মরূপে যারা বেঁচে রয়েছে তাদের বেশির ভাগই বৃন্তহীন। আপাতত এ ধরনের প্রায় ৪৮৫টি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে।"

ফেদার স্টারের বাংলা পরিভাষা করলে হয়ত দাঁড়াবে পালক তারা। পৃথিবীর ব্যাপক সমুদ্র অঞ্চল জুড়ে এদের বাসস্থান। উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর সমুদ্র, কর্কট এবং মকর ক্রান্তি এলাকা যেখানে জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গম, অথবা মহাসাগরে কুড়ি হাজার ফুট গভীরে হাজার হাজার মাইল জুড়ে এরা ছড়িয়ে রয়েছে। তবে রকমারি যদি দেখতে চান তা হলে আপনাকে যেতে হবে প্রবাল দ্বীপ অধ্যুষিত এলাকায় অথবা মহি-সোপানের যে সব জায়গায় গভীরতা প্রায় তিন শ ফুটের মত, সেখানে।

তুলনায় সবৃন্ত লিলির স্থান সংখ্যালঘুর মত। এ পর্যন্ত মাত্র চুয়াত্তরটি প্রজাতির সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তবে তাদের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষদের বহু চরিত্র এবং গঠনবৈচিত্র্য এখনও পর্যন্ত এদের মধ্যে বজায় রয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তিন শ ফুট গভীর অঞ্চলেই এদের বাসস্থান। কোন কোন জায়গায় সমুদ্রের প্রায় ছয় শ থেকে আট শ ফুট গভীরেও এদের দেখা যায়। সেখানে পালক তারার সঙ্গে অদ্ভুত এক সহ-অবস্থান করে এদের বেঁচে থাকতে দেখা গেছে।

সবৃন্ত লিলিরা সমুদ্রের নিচে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, দেখলে মনে হয় সত্যিই ওরা যেন এক একটি গাছ। এদের দেহের প্রধান অঙ্গটি দেখায় কান্ডের মত। সেই কান্ডের নিচে থাকে থাবার মত প্রত্যঙ্গ। এই প্রত্যঙ্গই ওদের মাটির সঙ্গে আটকে রাখতে সাহায্য করে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ভূস্তরের গায়ে এইভাবে লেগে থাকার দরুন

...শ কোটি বছর পুরনো জীবাশ্মে ক্রাইনয়েডের দেহাবশেষ লক্ষ করুন
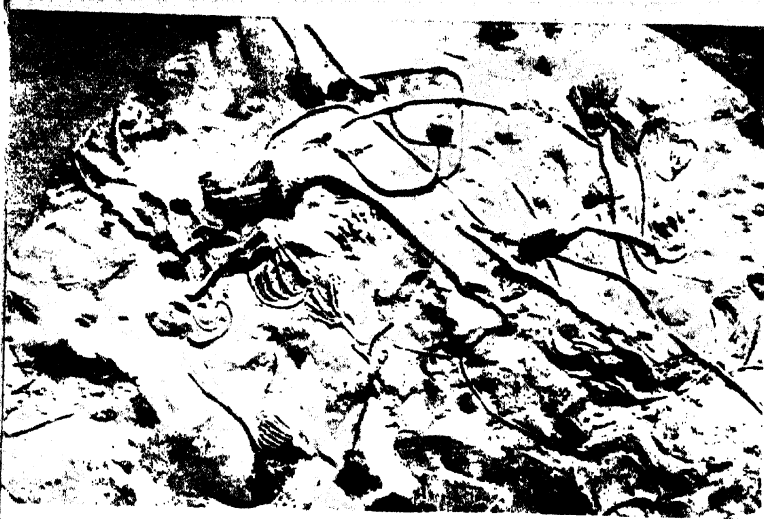
...মুক্ত লিলিদের যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে বেঁচে থাকতে ...য়। শত্রুর মুখে পড়লে আত্মরক্ষার জন্যে নিরাপদ ...য়গায় আশ্রয় নিতে পারে না। সমুদ্রের জল মাঝে ...ঝে যখন বিক্ষুব্ধ হয়, তার আঘাতে ছিন্নভিন্ন ...য়ে মারা পড়ে। জামাইকার কাছাকাছি সমুদ্র-...অঞ্চলে গেলে যে কেউ দেখতে পাবেন হাজার ...হাজারে সবৃন্ত লিলি এর জন্যেই অসহায়ের ...ত মৃত্যুবরণ করছে। ওদের সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়ার ...টাও একটা কারণ।

এদিক দিয়ে দেখতে গেলে পালক তারারা ...অনেকটা নিরাপদ। ওদের দেহে আছে বাহুর মত ...প্রত্যঙ্গ। প্রয়োজনে এই প্রত্যঙ্গের সাহায্যে ওরা ...সাঁতার কেটে অথবা মাটির উপর হামাগুড়ি দিয়ে ...নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিতে পারে।

প্রবাল, স্পঞ্জ, প্রভৃতি প্রাণীর মত সমুদ্র লিলি এবং পালক তারা খাবার সংগ্রহের সময় কোন ...আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করে না। অর্থাৎ খাবারের ...ত কোন প্রাণীর সন্ধান পেলেই মাছ অথবা অন্যান্য ...প্রাণী যেমন সেই খাবারের দিকে ছুটে যায়, ছুটে ...গিয়ে আক্রমণ করে, এরা তা করে না। শারীরিক ...গঠনের দরুন সেটা সম্ভবও নয়। এদের দেহে থাকে ...ক ধরার জালের মত ... জাল ... পদার্থ।

এদের খাদ্য বলতে খুদে খুদে প্রাণী। ওই সব প্রাণী পাশ দিয়ে ভেসে যাওয়ার সময় ওই জাল বা ফাঁদে ধরা পড়ে। তখন ওদের উদরস্থ করতে আর অসুবিধে হয় না। সমুদ্র লিলি এবং পালক তারা অমেরুদণ্ডী প্রাণী। তবু শিকার ধরার সময় যে তৎপরতা ওদের মধ্যে দেখা যায়, যে অপূর্ব কৌশলের ওরা আশ্রয় নেয়, যাঁরা তা দেখেন নি, তাঁরা কল্পনাও করতে পারবেন না।

অনেক পালক তারা খাবারের সময় স্রোতে গা ভাসিয়ে থাকাটা পছন্দ করে। এই সময় তারা খাদ্য-আহরণকারী জালগুলি স্রোতের মুখে ধরে রাখে। ক্ষুদ্রাকার প্রাণী স্রোতের টানে দলে দলে পরিবাহিত হয়ে জালে এসে ধরা পড়লেই নিক্ষেপ। আবার কোন কোন ক্রাইনয়েড জলের স্রোত একেবারেই পছন্দ করে না। সমুদ্রের নীচে ভূস্তরে থাকে অজস্র ফাটল। অতিরিক্ত স্রোতের সময় ওই ফাটলের মধ্যে তারা আশ্রয় নেয়। অবশ্য স্বাভাবিক অবস্থায় বাসও করে ওই ফাটলগুলির মধ্যে। খাবার সংগ্রহের সময় সেখান থেকে বাহুর মত প্রত্যঙ্গগুলি তারা ফাটলের বাইরে মেলে রাখে। সেই বাহুর সঙ্গে থাকে ফাঁদ। সেই ফাঁদেই ধরা পড়ে শিকার।

আরও একটি মজার ব্যাপার দেখা যায়। কোন কোন ক্রাইনয়েড আবার নিশাচর। একমাত্র রাতের দিকেই খাবারের সন্ধানে তারা প্রসারিত করে তাদের বাহু। দিনের দিকে গুটিয়ে নেয়। অদ্ভুত এই ব্যাপারটি সম্পর্কে প্রথম খবর দিয়েছিলেন ম্যাগনাস নামে জনৈক প্রকৃতিবিজ্ঞানী। এ ধরনের কৌশলটা তাঁর চোখেই প্রথম ধরা পড়েছিল লোহিত সাগরের কয়েকটি অঞ্চলে। পরবর্তীকালে ক্যারিবিয়ান সাগর, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং ভারত মহাসাগরেও এ ধরনের ঘটনা অনেকেরই চোখে পড়েছে।

কোন কোন ক্রাইনয়েডের মধ্যে এই যে নিশাচর-চরিত্র, এর কারণ কী?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা বলেছেন, খাদ্য সংগ্রহই হয়ত এর কারণ। বিশেষ প্রজাতির ওই সব ক্রাইনয়েড হয়ত বিশেষ ধরনের খাবারে অভ্যস্ত। খাবার বলতে এখানে প্ল্যাঙ্কটনের কথাই ধরা হচ্ছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী। যারা একমাত্র রাতের দিকেই সক্রিয় হয়। রাতের দিকে চলাফেরা করে। তাই শিকার হিসেবে ওদের পেতে গেলে ওই সব ক্রাইনয়েডদের রাতের দিকেই সক্রিয় হতে হয়।

তা না হয় হলো। কিন্তু কোন কোন জায়গায় আরও একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করেছেন প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা। ওঁরা দেখেছেন, কখনও কখনও একই জায়গায় দুই শ্রেণীর ক্রাইনয়েড দেখা যায়। কত যুগ ধরে তারা পাশাপাশি এক সঙ্গে বাস করে আসছে, সে খবর এখনও অজানা। কিন্তু মজার ব্যাপার এই, ওদের মধ্যে কয়েক শ্রেণীর ক্রাইনয়েড দিনরাত ধরেই আহার করে। ওদের শিকার ধরায় যেন কোন বিরতিই নেই। অথচ ওদের পাশাপাশি বাস করেও আরও কয়েক শ্রেণীর ক্রাইনয়েড এই শিকার ধরার কাজটি করে একমাত্র রাতের দিকে। দিনের দিকে ওরা নিজদের গুটিয়ে নেয়। পাশাপাশি বাস করা সত্ত্বেও উভয় শ্রেণীর ক্রাইনয়েডের এই ভিন্ন আচরণ প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের কাছে আজও পর্যন্ত এক বড় রকমের জিজ্ঞাসা।

আরও একটি ব্যাপার। প্রখ্যাত মার্কিন প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিউবার্ট লিম্যান ক্লার্ক ১৯১৫ সালে তাঁর একটি গবেষণা পত্রে আরও একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। বলা হয়, অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট বেরিয়ার রিফের উত্তরে টোরেস প্রণালীতে কয়েক শ্রেণীর পালক তারা দেখা যায়। বেশির ভাগ মাছ এদের এড়িয়ে চলে। ক্লার্কের ধারণা, সম্ভবত ওই সব পালক তারার দেহ থেকে বিষ নিঃসৃত হয়। তাই আত্মরক্ষার জন্যেই মাছেরা ওই ধরনের আচরণ করে থাকবে। ক্লার্কের এই ধারণা যে সত্যিই, পরবর্তী-কালে তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। কিন্তু এমনও দেখা গেছে, কোন কোন মাছ ওই পালক-তারা খেয়ে বেঁচেও থাকে। এটাই প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের কাছে একটি বড় রকমের প্রশ্ন।

সম্প্রতি ক্রাইনয়েড নিয়ে নানা রকম গবেষণা চালাচ্ছেন প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা। ওদের দেহ থেকে নানা রকম রাসায়নিক যৌগ সংগ্রহ করেছেন তাঁরা। এই সব যৌগের মধ্যে অনেকগুলি প্রচণ্ড বিষ। কিন্তু এই সব বিষ কোন কোন কঠিন রোগের ক্ষেত্রে অব্যর্থ নিরাময়ক হিসেবে কাজ করে। এছাড়া জৈব-বিবর্তনের কলা-কৌশল জানার ব্যাপারেও তাঁরা যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করেছেন ক্রাইনয়েডের উপর পরীক্ষা চালিয়ে। তাঁদের বক্তব্য, আজ থেকে কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে ছিল অগভীর সমুদ্র। আর সেই সময় ক্রাইনয়েডেরও ছিল জয়জয়কার। পরবর্তীকালে সমুদ্রের বহু জায়গা গভীর হয়েছে। ক্রাইনয়েডরাও অভিযোজনের মাধ্যমে সেখানে গিয়ে আস্তানা নিয়েছে। নতুন এই পরিবেশে বিলুপ্ত হয়েছে অনেকে। অনেকে প্রতি-কূল পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে এখনও টিঁকে রয়েছে। কীভাবে এটা সম্ভব হলো, তার সঠিক কারণ জানা গেলে জীবনের অনেক অজানা রহস্যই হয়ত আমরা জানতে পারবো।

**সমরজিৎ কর**

...টলের মধ্যে দেহের প্রায় ... লুকিয়ে রেখে শিকারের আশায় হাতের মত প্রত্যঙ্গগুলি বাড়িয়ে রেখেছে ...বশেষ প্রজাতির এই ক্রাইনয়েড

# এক নতুন রান্না শিখে—
# সুস্বাদু রান্নার পরিমাণ বাড়িয়ে ফেলুন !

# মিলমেকার

## এইসব সুস্বাদু খাবার পরিমাণেও বাড়ায় আর পোষ্টাইও করে।

মিলমেকার মিশিয়ে রেঁধে মাটন ও তরিতরকারির পরিমাণ যথেষ্ট বাড়িয়ে ফেলুন ও পাতে পাতে পরিবেশন করুন—আর দেখুন, আপনার পরিবারের সকলে তো বটেই, সেইসঙ্গে নিমন্ত্রিতরাও কেমন মহানন্দে সেটি খান।

**আপনার খাবারের স্বাদে চমৎকার মিলে যায়**

মিলমেকার আপনার পছন্দসই সুস্বাদু খাবারের সাথে চমৎকার মিলেমিশে যায়।

**প্রোটিনের পুষ্টিগুণে ভরপুর**

এটি পুষ্টিগুণে ভরপুর... ২৫০ গ্রাম মিলমেকারে ৩.৯ লিটার দুধ বা ১ কিলো মাটন কিংবা ২৪টি ডিমের প্রোটিন পুষ্টিগুণ রয়েছে।

**১০০% নিরামিষ**

মিলমেকার সয়া প্রোটিনের পুষ্টিগুণে ভরপুর। এটি পাওয়া যায় মোটা টুকরোয় ও দানাদার ধরনে :

**নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য**

৪ টাকা ৫০ পয়সা—২৫০ গ্রাম— মোটা টুকরোর প্যাকে (স্থানীয় কর অতিরিক্ত) রান্নার পর পরিমাণ ১ কিলোরও বেশী হয়।

৩ টাকা ৭৫ পয়সা—২০০ গ্রাম—
দানাদারের প্যাকে (স্থানীয় কর অতিরিক্ত)
রান্নার পর পরিমাণ প্রায় ১ কিলো হয়।

অল্প গরম নুনজলে··· ২০ মিনিট ভিজতে দিন···

জল ছেঁকে ফেলুন···

এবার সুস্বাদু রান্নার সঙ্গে মিশিয়ে রাঁধুন।

উৎপাদক :
**মাইসোর স্ন্যাক ফুড্স লিমিটেড,**
১৯, প্ল্যাটফর্ম রোড, ব্যাঙ্গালোর ৫৬০ ০২৩

# কষ্টকল্পিত

## অতুল্য ঘোষ

(নব পর্যায়)

॥ ৩৭ ॥

আবার বিতর্ক শুরু হয়েছে। এর আগে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই রিলিফ সংক্রান্ত ব্যাপারে কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্যের পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঠিকমত হিসাব দেননি, এই অভিযোগ করেছিলেন। এবারে বর্তমান কৃষিমন্ত্রী রাও বীরেন্দ্র "খাদ্যের পরিবর্তে কাজ" প্রকল্পে কেন্দ্র থেকে যে অর্থ সাহায্য হয়েছিল, তার ঠিকমত হিসাব পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ করেছেন। বর্তমানে কিছু দিন বন্ধ থাকলেও রাজ্যের অর্থমন্ত্রী শ্রীঅশোক মিত্র বহু মাস ধরে কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্য সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন। এইসব ব্যাপারটাই জনসাধারণের কাছে গোলমেলে ঠেকছে। ভারতবর্ষের সংবিধান অনুযায়ী দুর্গতদের রিলিফের কাজ একান্তভাবেই রাজ্যের দায়িত্ব। যেখানে ভারতবিভাগের জন্য লোকে গৃহহারা বা দুর্গত হয়েছে, সে রিলিফের দায়িত্ব Concurrent List-এ আছে। Concurrent List এর ২৭ অনুচ্ছেদে আছে :

27. Relief and rehabilitation of persons displaced from their original place of residence by reason of the setting up of the Dominions of India and Pakistan.

অতএব সাধারণ রিলিফ নিয়ে কেন্দ্রের সাহায্যের কথা সংবিধানে লেখা নেই। কিন্তু বন্যা, মহামারী, খরা, ভূমিকম্প প্রভৃতির সময়ে কেন্দ্র সাহায্য দিয়ে থাকেন এবং প্রচুর সাহায্য। সাধারণভাবেই এই প্রশ্ন মনে জাগে যে, তা হলে বিসংবাদ কেন? প্রকৃতপক্ষে 'কাজের পরিবর্তে খাদ্য'তে রিলিফের কাজে যেমন মানুষকে সাহায্য করা হয়, তেমনি শুধুমাত্র রিলিফের কাজে যেমন পরনির্ভরতা আসে, তার থেকেও দুঃস্থরা মুক্তি পায়। রিলিফ যেমন সমাজজীবনে একান্ত প্রয়োজনীয়, সংগে সংগে তার একটা খারাপ দিকও আছে। যে মানুষ রিলিফ নেয়, তার সব সময়ে একটা গ্লানিবোধ থাকে। ভিক্ষান্ন না হলেও এ যেন নিজের অক্ষমতার জন্য অন্য লোকের দয়ায় জীবনধারণ করা ও পরিবার প্রতিপালন করা। এতে স্বাভাবিকভাবেই যারা রিলিফ নেয়, তাদের নিজেদের কাছে তাদের নিজেদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এবং তারা পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু 'কাজের পরিবর্তে খাদ্য' প্রকল্পতে মানুষের মনোবল বাড়ে। সেইজন্যই এই সম্পর্কে দেয় অর্থ সবটাই খরচ করা উচিত এবং দেওয়া উচিত। এই নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই।

এমন অভিযোগ শোনা যাচ্ছে যে, রিলিফের জন্য যে টাকা কেন্দ্র থেকে এসেছে, তার কিছুটা অংশ অন্য খাতে খরচ হয়েছে। এ তো অকল্পনীয় ব্যাপার। কারণ, রিলিফ যে যতই পাক, কেউ প্রয়োজনমত সবটা পায় না। সেইজন্য সেই খাত থেকে টাকা কেটে নিয়ে অন্য খাতে সেই টাকা খরচ করা একটা মর্মান্তিক অপরাধ। মনে রাখতে হবে যে, রিলিফ যারা পায়, তাদের মধ্যে অধিকাংশই সর্বহারা। বানে ঘর-বাড়ি যখন ভেঙে যায়, জিনিস-পত্র যখন ভেসে যায়, তখন সেই গৃহস্থের দাঁড়াবার জায়গাও থাকে না, ভবিষ্যত বলেও কিছু থাকে না। কাজে কাজেই, তাদের জন্যে দেওয়া অর্থ অন্য খাতে কিভাবে খরচ হতে পারে এটা ভাবাই মুশকিল। যদি কেন্দ্রের অভিযোগ সত্য হয় তা হলে এই অভিযোগের কোন উত্তর নেই।

রিলিফের ব্যাপার নিয়ে কোন বাদবিসংবাদ একেবারেই শোভনীয় নয়। আর যেখানে রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব তাঁদের উচিত এ বিষয়ে সন্দেহাতীতভাবে কাজ করা। কারণ, তাঁরা ট্রাস্টি। জনসাধারণ মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলে যে চাঁদা দিয়েছেন, সেইভাবে অন্যান্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করেছেন। এসবেরই রাজ্য সরকার হলেন ট্রাস্টি। ট্রাস্টিরা হিসাবে গন্ডগোল করলে আমাদের দেশের আইন অনুযায়ী তাঁরা দন্ডনীয়। কিন্তু এখানে তো আইনের কথা আসে না, আসে নৈতিক দায়িত্ব পালনের কথা। তার সঙ্গে দাতাদের শুভেচ্ছাও একটা বড় কথা। সেইজন্যই এই সম্পর্কে বিসংবাদে বিস্মিত হতে হয়। বন্যা, খরা মহামারী, ঝড়-বৃষ্টি, ভূমিকম্প—এসব তো লেগেই আছে এবং প্রতি বিপদেই রিলিফের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। জনসাধারণ যদি একবার মনে করেন যে, তাঁদের দেওয়া অর্থ ঠিকভাবে খরচ হচ্ছে না, তা হলে সেটা হবে রাজ্যের পক্ষে এক বিরাট দুর্বিপাক। একটা প্রচলিত কথা আছে যে, শুধু সৎ হলেই চলবে না, লোকে যাতে সৎ ভাবে সেটাও দেখতে হবে। এ ক্ষেত্রে এই প্রবাদ বিশেষভাবে প্রযোজ্য। রিলিফের হিসাবের সংগে অন্য কোন হিসাব জোড়া যায় না—এ হিসাব একেবারে স্বতন্ত্র। সেইজন্য রিলিফের টাকা অন্য কোন খাতে কিছুতেই খরচ করা যায় না, তা সে যতই প্রয়োজনীয় হোক। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবার নানা দুঃস্থ লোকের পেন্সনের ব্যবস্থা করেছেন। তাতে অনেক খরচ বেড়েছে, কিন্তু সেই অনুপাতে আয় বৃদ্ধি হয়নি। কাজটা নিশ্চয়ই ভাল; কিন্তু আয় না বাড়িয়ে খরচ বাড়ালে টাকাটা (?) কোথা থেকে আসবে? রিলিফের টাকা যদি এই খাতে ব্যয় হয়ে থাকে, তা হলে সেটা অমার্জনীয় অপরাধ। হিসাববিশেষজ্ঞদের মতে; এক খাতের (Head) টাকা অন্য খাতে খরচ করা অপরাধ। কিন্তু রিলিফের টাকা যদি অন্য খাতে গিয়ে থাকে, তা হলে সেটা সাধারণ অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে না। সামগ্রিক আয় ও সামগ্রিক ব্যয়ের হিসাব হয়তো মেলানো যায়, কিন্তু তাকে হিসাব বলে না।

একটা জিনিস তো অনায়াসেই করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তো দেখাতেই পারেন যে, কেন্দ্র কোন কোন্ খাতে রিলিফের জন্য কত টাকা দিয়েছেন এবং সেই টাকা কিভাবে খরচ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারেরও তো জানাতে কোন অসুবিধা নেই যে, রিলিফ বাবত কোন্ কোন্ খাতে কত টাকা দিয়েছেন এবং সে টাকার হিসাব কতটা পেয়েছেন। সবটাই যেন অত্যন্ত লঘুভাবে হচ্ছে। রিলিফের সাহায্যের উপর বহু লোকের জীবন-মরণ নির্ভর করে; তা নিয়ে তো লঘুভাবে আলোচনা করা যায় না। একটা কথা বুঝতে খুবই অসুবিধে হচ্ছে যে এ নিয়ে বিসংবাদের স্থান কোথায়। এ তো কোন কৌশলগত বা নীতিগত ব্যাপার নয়, এ অতি স্বাভাবিক প্রশাসনিক কাজ। যাঁরা সরকারে আছেন, তাঁরা যে দলভুক্ত, সেই দলের নীতি ও আদর্শ প্রচার করবার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁদের আছে। কিন্তু রিলিফের ব্যাপারে দলাদলির কোন স্থান নেই, আর আদর্শ প্রচারেরও কোন স্থান নেই। তবে বিসংবাদ কেন? তা হলে কি কেন্দ্রীয় সরকার কোন বিশেষ মনোভাব নিয়ে এইসব সমালোচনা করছেন? তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের লাভ কি? আর কেন্দ্রীয় সরকার যা-ই করুন, রাজ্য সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য অতি পরিষ্কার। তাঁদের এই হিসাব দেখাতেই হবে এবং আরও দেখাতে হবে যে, যে খাতে যে টাকা দেওয়া হয়েছে, তার বাইরে কোন খরচ হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মনোভাব খুব পরিষ্কার নয়। কখনো তাঁরা বলেন যে, কেন্দ্রের সরকারী দল স্বৈরাচারী। আবার সেদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অহেতুক কোন হস্তক্ষেপের আশংকা নেই। এই যে পরস্পরবিরোধী কথা, এ বন্ধ হবে কবে? যে দল কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করছেন, সেই দল সম্বন্ধে এবং কেন্দ্রীয় সরকার সম্বন্ধে এখানকার সরকারপক্ষীয় দল এবং সরকারের অনেক দায়িত্বশীল মন্ত্রী বহু অশোভন ও অসঙ্গত উক্তি প্রায়ই করে থাকেন। কিন্তু তাঁদের কোন অপরাধ এখনও প্রমাণ হয়নি। এ কি একটা বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করে তাকে জীইয়ে রাখার জন্যে? শোনা যায় যে, পাকিস্তানে যখন কোন বিপদ ঘনিয়ে আসত, তখন তারা ক্রমাগত ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করত, যাতে পাকিস্তানী অধিবাসীরা নিজেদের ঘরোয়া বিশৃঙ্খলা ভুলে গিয়ে ভারত-বিদ্বেষের দিকে অধিকতর আগ্রহী হয়। ব্যাপারটা মনস্তাত্ত্বিক। অর্থাৎ নিজেদের অকর্মণ্যতা ঢাকবার জন্য কাউকে একটা শত্রু খাড়া করে তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার, যাতে জনসাধারণ বিদ্বেষজর্জর হয়ে দেশের প্রকৃত সমস্যা থেকে মন সরিয়ে নিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এভাবে দেশের লোককে বিভ্রান্ত করার কোন প্রয়োজন নেই। তাঁরা বহু সংখ্যাধিক্য নিয়ে সরকারে এসেছেন, ঘরের মধ্যে তাঁদের এসব বিপত্তি থাকা উচিত নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, তা হলে কেন? এই 'কেন'র উত্তর দেওয়া অত্যন্ত কঠিন।

কিছু কিছু লোক বলেন, পশ্চিমবঙ্গে এখন যাঁরা সরকারে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁরা বহু বছর বিরোধী দলে ছিলেন। বিরোধী দলে থেকে বিরোধিতায় তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। বিরোধিতার অভ্যাস তাঁরা ছাড়তে পারছেন না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর আচরণে এইসব পরস্পরবিরোধী মনোভাব দেখতে পাওয়া যায় যা তাঁর যেমন দৃঢ়তা

আছে, তেমনি তিনি শান্ত ও স্থির। শোনা যাচ্ছে, তিনি শান্ত ও স্থির বলেই তাঁর দলের অনেকেই তাঁর প্রতি বিরূপ। এমন কি, কোন কোন প্রবীণ নেতা তাঁকে সরিয়ে অন্য কাউকে মুখ্যমন্ত্রী করার কথাও ভাবছেন। এইসব অভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্যই কি কেন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষ জাগাবার চেষ্টা হচ্ছে? সরকারী দলের ঘনিষ্ঠ মহল এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারেন, এ আলোচনা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এটা ঠিক যে, কেন্দ্রের সঙ্গে অহেতুক বিবাদ বাড়ানো পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে ক্ষতিকর হবে এবং পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তাঁর দলের কোন কোন অংশের বিরুদ্ধাচরণ তাঁর দল এবং পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশের কারণ হবে। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চল জ্বলছে। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ খুনখারাপি, চুরি-ডাকাতি আছে, কিন্তু প্রাদেশিক উন্মত্ততা নেই। এটা পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষের যে-কোন প্রান্তের যে-কোন অধিবাসী এসে পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করছে, রুজি-রোজগারও করছে, কিন্তু তাদের প্রতি কারো বিদ্বেষও নেই, বিরুদ্ধাচরণও নেই। প্রাদেশিকতার সর্বনাশা কলুষ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গবাসীরা যেমন সচেতন, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও তেমনি সজাগ। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অনেক জায়গায় বঙ্গভাষা-ভাষীদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমবঙ্গবাসীরা তাদের জন্য ক্লিষ্ট, ব্যথাহত ও দুঃখিত। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত দিয়ে পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের বহু আর্ত নরনারী পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করছে। তাদের দুঃখকষ্টের অবধি নেই। কত লোক গৃহহারা, কতজন স্বামীহারা, পুত্রহারা, মা-হারা হয়েছেন তার কোন সঠিক সংখ্যা এখনও জানা যায় নি। তবে অনেকে যে হয়েছে, এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। এইসব ঘর থেকে উৎসাদিত গৃহহারা মানুষদের

পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা সাদরে গ্রহণ করে তাদের যথাসাধ্য ব্যবস্থা করছে। কিন্তু এর জন্য উত্তেজনার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এর জন্য দুঃখ আছে, ব্যথা আছে, বেদনা আছে; কিন্তু উত্তেজনা নেই। পশ্চিমবঙ্গের অনেক দায়িত্বশীল নাগরিকের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও এ বিষয়ে সচেষ্ট যাতে কোন উত্তেজনা না হয়।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের যা অবস্থা তাতে কারো সঙ্গে বিরোধ হলে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতি হবে—কেন্দ্রের সঙ্গে বিরোধ হলে তো হবেই। সেজন্য সংযমের একান্ত প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, কেন্দ্রের সঙ্গে ব্যবহারে মাঝে মাঝে সংযমের অভাব দেখা যাচ্ছে। বিরোধ যে শুধু অনুচিত তা নয়—ক্ষতিকরও। বেশ তো কেন্দ্র যদি কোন অন্যায় করে, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের উপর তার বিচার করার ভার ছেড়ে দেওয়া হোক না; নিজেরা তৎপর হয়ে বিরোধ ঘটাবার প্রয়োজন কী? কেন্দ্রে যে দল সরকার পরিচালনা করছেন, সে দল সত্যিই যদি স্বৈরাচারী হন তা হলে সেটা তো প্রকাশ পাবে। শাসনকার্যে আসার পর থেকে কি কি স্বৈরাচার তাঁরা করেছেন, তার দৃষ্টান্ত মাঝে মাঝে দিলেই তো হয়। কেবলমাত্র 'স্বৈরাচারী' ও 'স্বৈরতন্ত্রী' বলে লাভ কি? ভারতবর্ষের জনসাধারণ তো একবার দেখিয়েই দিয়েছে যে, তারা স্বৈরতন্ত্র ও স্বৈরাচার সহ্য করবে না। অতএব এতে ব্যস্ততা কেন? আর অতীত ইতিহাস যদি দেখা যায়, তা হলে কোন দলই ধোয়া তুলসীপাতা নন। ভারতবর্ষের বহু প্রতিষ্ঠাবান রাজনৈতিক দলেরই সংবিধানবিরোধী কাজ করার অনেক নমুনা আছে। সেইজন্য অতীতের ধুয়ো টেনে এনে বর্তমানকে বিপর্যস্ত করে কারোই লাভ হবে না। বর্তমান রাজ্য সরকার তাঁদেরও বুক ফুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বিশেষ কিছু বলার কৃতিত্ব তাঁরা অর্জন করেন নি। ফলে জল নেই, একটা নোটিস দিয়েই দায়িত্ব শেষ। কিন্তু একটা নোটিস পেলেই মানুষের প্রাত্যহিক কাজকর্মের জন্য যে জলের দরকার, তার অভাব কি পূরণ হবে? এরকম ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যার মধ্য দিয়ে অকর্মণ্যতা, অক্ষমতা ও অসহায়তা ফুটে বেরোচ্ছে। এর প্রত্যেকটারই কৈফিয়ত নিশ্চয়ই আছে এবং অনেক কৈফিয়ত সংগত বটে। কিন্তু তাতে তো সাধারণের দুঃখ-দুর্দশা দূর হবে না—যে দুর্দশা দূর করতে এই সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেইজন্যই বিরোধের মনোভাব পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়।

॥ আটাশ ॥

কুঠে সামন্তর বাড়িটা এখন রোদে হাওয়ায় হাসছে। বাড়ির দাঁত নেই যে হাসবে। তবু কেন যেন ঠিক তাই মনে হয় নিতাইয়ের। চালে খড়, মাটির দেয়ালগুলোয় নতুন পলেস্তারা, উঠোনের দড়িতে একটা আধটা শাড়ি কাপড় টাঙানো, বড় সুখের চেহারা বাড়িটার। রান্নাঘর থেকে রোজ ধোঁয়াও ওঠে।

সকালের দিকটায় প্রায়দিনই নিতাই এসে বাইরে থেকে হাঁক দেয়, কই গো!

কুঠে সামন্তর বউ এ সময়ে বাড়ি থাকে না। ধানকলে যায়। তো তার খোঁজে আসেও না নিতাই। যার খোঁজে আসে সে ভাইবোন সামলে, রান্না চাপিয়ে ভারী ব্যস্ত। তবু একটু হাসিপানা মুখ করে বেরিয়ে এসে বলে, এসো নিতাইদা।

দাদা ডাকটা নিতাই নিজেই শিখিয়েছে। প্রথমটায় কাকা ডাকতে লেগেছিল। সে ডাকটা নিতাই পছন্দ করেনি।

জরিবুটির পোঁটলা পাশে রেখে নিতাই উঠোনে শীতের রোদে ঠ্যাং মেলে বসে যায়। জটার ঘা শুকোলেও উকুনের উৎপাত কষ্ট হয়েছে। খাবলে মাথা চুলকোতে চুলকোতে নিতাই সব খোঁজ-খবর নেয়, কী রান্না হচ্ছে? কেমন আছে সবাই? তারপর নিতাই নিজের কথা পেড়ে ফেলে, কালও এসেছিল ন-পাড়া থেকে একদল। বলে মন্ত্র দাও। কলা মুলো টাকা চাল ডাল পাহাড় প্রমাণ এনে ফেলেছে। আমি বলি কি, মন্ত্র দেওয়া কি মুখের কথা! নিলেই হলো? দিলেই হল? যাও গিয়ে তিন দিন হবিষ্যি করো, মন পবিত্র করো, কালীর থানে পুজো চড়াও, তারপর দেখা যাবে। তা কে শোনে কার কথা! পা দুখানা ঠেসে ধরল।

বিনি, অর্থাৎ কুঠে সামন্তর ডাগর মেয়েটি, এ সব কথার অর্থ বোঝে। নিতাই টোপ ফেলছে। ফিক করে হেসে বলে, জটা বড় বিচ্ছিরি। ও নিতাইদা, জটা ছাড়া তান্ত্রিক হওয়া যায় না?

নিতাইয়ের মুখ বেজার হয়। জটা ছাড়া তান্ত্রিক হয় কিনা তা সে ভাল জানে না। তবে এটা জানে যে জটা ছাড়া ব্যবসা হয় না। জটা রক্তাম্বর রুদ্রাক্ষ ত্রিশূল, রক্ত চক্ষু এ সব না হলে মানুষ ভড়কাবে কেন? আর না ভড়কালে মাথাই বা নোয়াতে যাবে কেন? তাই সে বলে, তা হয়। তবে কিনা আমার জটার অনেক গুণ। স্বয়ং মা গঙ্গা এই জটার মধ্যে সেঁধিয়ে রয়েছেন। কতবার নিংড়ে গঙ্গাজল বের করেছি। তা ছাড়া জটার চুল নিয়ে গিয়ে অনেকে কবচ করে। একগাছা চুল দশ পয়সা।

বলো কি? বলে হাঁ করে থাকে বিনি। আর জটা ছাটবার কথা মুখেও আনে না।

নিতাই মাতব্বরের মতো মাথা নেড়ে বলে, তান্ত্রিকরা যদি পয়সা চায় তবে টাকার বৃষ্টি করে দিতে পারে। তবে কিনা পয়সাকড়ির কথা আমরা ভাবি না, এই যা।

আমাকে একদিন টাকার বৃষ্টি দেখাবে?

দেখাবো। তবে পাঁচজনের সামনে নয়। ভারী গুহ্য সাধনার ব্যাপার তো।

মেয়েটার বিস্মিত মুখের দিকে চেয়েই নিতাই টের পায়। জমছে। খেলা জমছে। কিন্তু জমে লাভ কি? বউদিমণি যদি টের পায় তবে বাড়ি থেকে তাড়াবে। আর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে নিতাইয়ের ঠাঁই জুটবে কোথায়? সত্যি বটে তার নামেও বউদি দশ বিঘে জমি কিনেছে, কিন্তু সে জমি কোথায় তা নিতাই জানে না, দলিলটাও চোখে দেখেনি। সে জমির নাগালও সে কোনোদিন পাবে না। তা হলে তার নিজের বলতে রইল কি? বউ নিয়ে উঠবে কোথায়? খাওয়াবেই বা কোন কাঁচকলা?

তোমার বউ কেন পালিয়েছিল গো, নিতাইদা? তুমি তো লোক খারাপ নও! মা বলে, নিতাইখ্যাপার মনটা বড় ভাল।

সেটা আর সে বুঝল কই বলো? মড়ার খুলি দেখে ভয় পেল কিনা। তন্ত্র-সাধনার গুহ্য কথা কি মেয়েরা বোঝে?

বিনি চোখ কপালে তুলে বলে, ওমা! বউ থাকতে তুমি তান্ত্রিক হয়েছিলে নাকি? লোকে তো বলে, বউ পালানোর পর হয়েছো!

নিতাই ধরা পড়েও ঘাবড়ায় না। আঙুল দিয়ে দাড়ি আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলে, পুরোপুরি ছিলাম না বটে। তবে একটু আধটু নাড়াচাড়া করতাম।

তোমার সেই বউ খুব সুন্দরী ছিল?

ছিল এক রকম। নাকটা চাপা। তা ছাড়া ভালই।

নাক তো আমারও চাপা।

তোমার? যাঃ। তোমার বলে টিকোলো নাক!

এই সব আগড়ম বাগড়ম বকতে বকতে বেলা চড়ে। নিতাই জানে, বেশীক্ষণ বসলে বিনি খেতে বলবে। সেটা ঠিক হবে না। গরীব মানুষ, একটা বাড়তি লোককে খাওয়াতে এদের যে কত কষ্ট হয়। তা ছাড়া খায়ই বা কি? কচু ঘেঁচু আর পাতা সেদ্ধ, একটু লবণ আর লঙ্কা। তাই নিতাই বসে না। উঠে পড়ে।

বিনি খানিকটা এগিয়ে দিয়ে বলে, আবার এসো। তুমি এলে ভারী ভাল লাগে।

একদিন দুপুরে সামন্তর বাড়ি থেকে ফেরার পথে রঘু স্যাকরা ডেকে বলল চা খাবি না কি?

বহুকাল রঘু স্যাকরার সঙ্গে দেখা নেই। একবার খামোখা খুব ঝামেলায় পড়েছিল। সেই থেকে আর ও-পথ মাড়ায় না। তবে কেউ ডাকলে না গিয়েও পারে না নিতাই।

রঘুর নতুন বাড়ির দাওয়ায় বসে বলল, খুব টাকা হয়েছে তোমার দেখছি।

রঘুর মুখখানার চেহারা ভাল না। হাসি নেই, গোমরা পানা। একটা বাটিতে অ্যাসিডে সোনা জ্বাল দিচ্ছে কাঠ কয়লার আঙরায়। গন্ধে কাশি আসে, পেট গুলোয়।

রঘু বাটিটা নামিয়ে রেখে কাছে এসে বসে বলল, খবর টবর সব শুনেছিস?

কি শুনব? সন্দেহের চোখে চায় নিতাই।

ও-বাড়ির খবর। চাটুজ্জেবাড়ির।

খবর তো কিছু নেই। শুধু বড়দিদিমণির বিয়ে হবে শুনেছি। তা সে এখানেও নয়। এলাহাবাদে।

ও খবর নয়। শ্রীনাথ চাটুজ্জে যে আবার মাইফেলে যাচ্ছে, সে খবর শোনোনি?

ওঃ। সে তো নতুন কিছু নয়।

শ্রীনাথের ছেলেটা তো খুব উঠেছে দেখছি।

সজলখোকা? সে আবার উঠবে কি?

উঠবে কি? বলে মুখ ভেঙায় রঘু। আলিসান চেহারা হয়েছে। ডাকাত টাকাত হবে বড় হলে। তেমনি হাড়ে হারামজাদা।

সজলখোকা আবার তোমার কি করল?

দিতুম সেদিনই ঠ্যাং ভেঙে। নেহাৎ ছেলে মানুষ, তা ছাড়া বাপটাও সামনে রয়েছে। কিছু বলিনি। কিন্তু সাবধান করে দিস। এর পর বাঁদরামি করলে পুঁতে ফেলব।

নিতাই হাসে তড়পানি দেখে। মাথা নেড়ে বলে। বাস বাস, অত লাফিও না। সবাই কি আর নিতাইক্ষ্যাপা? ক্ষেড়ে কাশো তো বাপ ব্যাপারটা শুনি আগে।

রঘু রক্ত চোখে চেয়ে বলে, ইঃ, কে আমার সালিশী এলেন। ওঁকে বলতে হবে।

তা খাওয়াবে বলছিলে যে!

রঘু উঠে গিয়ে বাটিটা আবার নেড়েচেড়ে দেখে। অ্যাসিডটা সাবধানে অন্য একটা পাত্রে ঢেলে দিয়ে উঠে আসে। বলে, চা চা করে গলা শুকোচ্ছিস কেন? বলেছি যখন, হবে।

তো কথাটা কি?

কাউকে বলবি না?

কার দিব্যি কাটতে বলো, কাটছি।

মা কালীর।

মা কালীর দিব্যি।

তোর দিব্যির কোনো দাম নেই। তবু বলছি, শ্রীনাথবাবুকে রামলাখনের ঘরে আমি নিজে থেকে নিয়ে যাইনি।

তাই নাকি?

মাইরি।

নিজে থেকে নাওনি, তবে কি বাবু নিজেই গেল?

তাও নয়।

গুহ্য কথাটা কি?

মাসটাক আগে ভটভটিয়া চেপে শ্রীনাথের শালা সরিৎ এপথ দিয়ে যাচ্ছিল। আমি নারকোল গাছের গোড়ায় নুন দিচ্ছিলুম। দেখে ভটভটিয়া থামিয়ে নেমে এসে অনেক আগড়ম বাগড়ম কথা পাড়ল। ছোকরাকে আমার পছন্দ [illegible], তবে মস্তান বলে কথা। খাতির রাখতে হয়। শেষমেষ বলে ফেলল, জামাইবাবুর অবস্থা তো জানেন। কেমন-তরো পাগলা পাগলা ভাব। ডাক্তার বলেছে, আগের সব অভ্যাস হঠাৎ ছেড়ে দেওয়ায় এরকমটা হয়েছে। তা আবার একটু ফুর্তিটুর্তি করলে সেরে যাবে। চিকিৎসাই একরকম।

তাই বটে। চোখ কপালে তোলে নিতাই।

বললে কিন্তু কেটে ফেলব, নিতাই।

কালীর দিব্যি করেছি। নিশ্চিন্তে বলো।

কথা এটুকুই। বলল, জামাইবাবুকে মাঝে মাঝে ডেকে নিয়ে যাবেন। তবে কেউ যেন টের না পায়।

তুমি রাজি হলে?

রাজি না হয়ে উপায়? রামে মারে, রাবণেও মারে যে!

বউদি যদি জানতে পারে?

সে কথাও তুললাম। চোখ টিপে বলল, ডাক্তারের পরামর্শ তো, মেজদি কিছু মনে করবে না। তখনই বুঝলুম, চাটুজ্জেগিন্নীর সায় আছে।

মাকিং তোমাকে কিছু দিল টিল?

না. কী দেবে?

কিছুই না?

মতো খাবি কিন্তু, নিতাই।

নিতাই হেসে বলল, সাধু সেজো না। ক'দিন আগে একজোড়া বালা ভেঙে রতনচূড় করতে দেয়নি বউদি তোমাকে?

সে কি ঘুষ?

তা নয় তো কি? ও বাড়ির গয়না করে কলকাতার স্যাকরারা। তোমার মতো হাভাতে সোনারে বেনেকে কে পোঁছে হে?

ঘ তাহলে চা পাবি না।

তাহলে কথাটাও গোপন থাকবে না।

মা কালীর দিব্যি কাটলি যে!

তুমিও তো চা খাওয়াবে বলে ডেকেছিলে। রেখেছো সে কথা?

চা হবে রে বাপ, কথাটা ওভাবে ধরিসনি।

মাল ছাড়ো, কথা যেভাবে ধরতে বলবে সেভাবেই ধরব।

ধরাধরির কিছু নেই। শ্রীনাথবাবু এখন আবার একটু ফুর্তি করার জন্য আঁকুপাঁকু। বেচারার জন্য কষ্টও হয়। কিন্তু এ কালান্তক ছেলেটার জন্য ভয় পাই। সেদিন রামলাখনের ঘরে ঢুকে লঙ্কাকাণ্ড করে এসেছে। ওকে একটু বুঝিয়ে বলবি যে, দোষটা আমার নয়।

দোষটা কার ঘাড়ে চাপান দেবো তাহলে?

ডাক্তারের ঘাড়ে। বলবি ডাক্তার বলেছে।

ও ছেলে অত সহজে ভুলবার নয়।

তবে ভাবি ভুলবে কিসে?

সে ভার আমার। আমাকে একটা ঘর করার জায়গা দেবে? তোমার তো মেলা জায়গা। আধকাঠা পেলেও আমার হয়।

দূর শালা! ভাগ।

আচ্ছা, এখন তো চা খাওয়াও। বলে নিতাই জুত করে বসে।

*

সজলের বন্ধুদের বলা আছে। তারা চারদিকে নজর রাখে। পাহারা দেয় সজল নিজেও। ইস্কুল থেকে ফিরেই সে আসে ভাবনঘরে ঢুকে বাবাকে দেখে। যখন বিকেলে খেলতে যায় তখন তার হয়ে বাবাকে পাহারা দেয় ক্ষ্যাপা নিতাই বা নতুন মালী। সজল সবাইকে বলে রেখেছে, রঘু স্যাকরাকে কাছেপিঠে ঘোরাঘুরি করতে দেখলেই যেন তাকে খবর দেওয়া হয়।

সন্ধের পর বাড়ির মাস্টারমশাই চলে গেলে সে নিজেই বাবার কাছে চলে আসে। শ্রীনাথও তাকে দেখলে খুশি হয়।

আয়। মাস্টারমশাই চলে গেছেন?

হ্যাঁ।

বোস, কাছে এসে বোস। যা শীত।

এক লেপের তলায় গায়ে গায়ে বাপ-ব্যাটায় বসে গুটিসুটি হয়ে। সজল এখন মাথায় মাথায় শ্রীনাথের সমান লম্বা। শ্রীনাথের চেয়ে তার স্বাস্থ্য ভাল এবং গায়ের জোর অনেক বেশী। খুব হঠাৎ করেই সজলটা এমন ধাঁ বেড়ে উঠল। এই বেড়ে ওঠাটাকে খুব উপভোগ করে শ্রীনাথ। সে গাছপালার বেড়ে ওঠা লক্ষ করেছে। এমন সতেজ সহজ বাড়ন খুব সুলক্ষণ। গাছপালাকে কখনো একটু ছাঁটকাট করতে হয়। তাতে বাড়ে আরো ভাল, কিন্তু মানুষের ছাঁটকাট কীভাবে হবে তা তো সে জানে না।

সজলের বাড়ন্ত শরীরে নিজের শরীরের তাপ সঞ্চার করে দিতে দিতে শ্রীনাথ বলে আজকাল আমি কেমনধারা হয়ে গেছি যেন। বোধহয় বেশীদিন বাঁচব না। তুই আমাকে দেখিস।

সজল গম্ভীর গলায় বলে, আর কখনো যাওনি তো, বাবা?

রামলাখনের ওখানে? দূর বোকা।

আমি কিন্তু চারদিকে পাহারা রেখেছি।

পাহারা। বলে অবাক হয় শ্রীনাথ. সে কি রে। পাহারা কেন?

রঘু স্যাকরা যদি তোমাকে নিয়ে যায়।

শ্রীনাথ চুপ করে থাকে। তারপর অনেকক্ষণ বাদে আস্তে আস্তে বলে, রঘুর দোষ কি? নিমিত্ত মাত্র। আমিও তো ভাল নই। নইলে সে ডাকল আর আমিও কেন চলে গেলাম।

সজল মৃদু কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলে, তুমি খুব ভাল বাবা।

দুজনে আর একটু নিবিড় হয়ে বসে। শ্রীনাথ একটু আবেগের ধরা গলায় বলে ভালই তো ছিলাম একসময়ে। তারপর সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। কাঁচা পয়সা, নিশ্চিন্তের জীবন এসব ভাল নয়। তুই একটু দুঃখে থাকিস। টানাটানিতে থাকিস ভাল থাকবি।

সজল হঠাৎ লেপটা গা থেকে সরিয়ে চিতা-বাঘের মতো দ্রুত গিয়ে এক ঝটকায় পশ্চিমের জানালাটা খুলে বলল, কে?

ভয়ার্ত গলায় জবাব এল, আমি।

সজল তেমনি বাঘের মতো গিয়ে দরজার হুড়কো খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

সজলখোকা, আমি নিতাই।

কি চাও?

একটা কথা।

চালাকি কোর না। স্পাইগিরি করছিলে?

চালাকি নয় গো।

কে তোমাকে লাগিয়েছে কথা শোনার জন্য?

মাইরি কেউ না।

সজল হঠাৎ বিকট স্বরে চেঁচিয়ে বলে আমার বাবার ওপর যে স্পাইং করবে তার টুঁটি ছিঁড়ে ফেলে দেবো।

নিতাই ভড়কে গিয়ে বলে, কথাটা শোনোই না। অত চেঁচালে যে লোক জুটে যাবে।

সজল অবশ্য কথাটা নিতাইকে উদ্দেশ করে আর কাউকে শোনাচ্ছিল। কেননা তার ক্রুদ্ধ চোখ ভিতরবাড়ির দিকে। চোখটা ফিরিয়ে অন্ধকারে কালো চাদরে মুড়ি দেওয়া নিতাইয়ের দিকে চেয়ে বলল, মিথ্যে কথা বলবে না তো।

না। তোমাকে মিথ্যে বলে কি মার খেয়ে মরব?

কি কথা?

রঘু স্যাকরার দোষ নেই। তোমার মামা তাকে লাগিয়েছিল বাবুকে রামলাখনের আড্ডায় নিয়ে যেতে। আমার নাম কোরোনা কিন্তু। বলে গেলাম, এবার পালাই।

সজল খুব অবাক হল না। কিন্তু একা অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাগে বিদ্বেষে পাগল হয়ে দাঁতে দাঁত পিষতে লাগল।

ভিতর থেকে শ্রীনাথ ডাকল, সজল, আয়। কে রে?

ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে সজল বলে, নিতাই।

আবার বাপ-ব্যাটায় কাছ ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে।

শ্রীনাথ বলে, তুই কি খুব ডাকাবুকো? দুষ্টু?

সজল হাসে। বলে, না। তবে আমাকে সবাই ভয় খায়।

তোকে? তুই তো একটুখানি ছেলে, তোকে ভয় খায় কেন?

কি জানি।

মারপিট করিস?

অন্যায় দেখলে। তাছাড়া নয়।

শ্রীনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, ওসব করিস না। চারদিকে শত্রু। কে কবে শোধ নিতে খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে তোকেও মেরে ফেলবে।

আমাকে মা অবধি ভয় পায়। জানো?

তোকে? শ্রীনাথ অবাক, কই তোকে দেখে তো ভয়ের কিছু মনে হয় না।

সজল হাসে, একমাত্র তুমিই আমাকে ভয় পাও না। বরং আমিই তোমাকে ভয় পাই, বাবা।

দূর পাগল। আমাকে ভয়ের কি? কেউ আমাকে ভয় পায় না।

আমি পাই। আমি যে তোমাকে ভীষণ ভালবাসি। (ক্রমশ)

# অরণ্যদেব

ণ্যদেব বাড়ি ফিরছেন.....


এখানে রাত কাটাব আজ।


কীলা-উয়ির সোনা-বেলাভূমি।
বিয়ের পরে তো এখানেই তোমরা এসেছিলে!
হ্যাঁ, রাজা। এখন মাছ মারব!


পেয়েছি!
আমিও!
শাবাশ! রাত্তিরের খাওয়াটা ভালই হবে!


ওয়াকারকাকা,* তোমার ছেলের নাম তো কিট, তা মেয়ের নাম কী হবে?
কে জানে, ডায়ানা কী নাম রাখল!
* অরন্যদেবের আর এক নাম।


নাম রাখা হয়নি বলে বোধহয় মেয়েটা কাঁদছে।
.....হতেও পারে!
ওঁয়া...!


অরন্যদেবের বংশের ইতিহাস।
দেখি যদি এই ইতিহাস ঘেঁটে কোনও.....
নাম খুঁজে পাওয়া যায়।
ওঁয়া...!


মনে হচ্ছে, নামটা ওর পছন্দ হয়েছে!
কী নাম!

# স্মৃতি সততই সুখের

প্রতিভা বসু

॥ ২০ ॥

হল্যাণ্ডের পরে ডেনমার্কে এসে পৌঁছুলাম।

প্যারিসের পরে আমস্টারডাম যেরকম সীমারিত এবং আঁটো-আঁটো লেগে-ছিলো, আমস্টারডামের পরে কোপেনহেগেনে পা দিয়েই তেমনি আবার খোলামেলা মুক্তির নিশ্বাস। ছিমছাম, ছোটো এবং সম্পূর্ণ একটি নিখুঁত নিটোল সুন্দর শহর। তবে এই শহরের সব কিছুর উপরে তার আসল বিশেষণ হলো সচ্ছলতা। সচ্ছলতায় ভেসে যাচ্ছে। আমস্টারডামের মতো এও জলে-ঘেরা শহর। জলের মতোই সব সহজ সরল তরল বেগে প্রবহমান। জীবনযাপন পদ্ধতিতে পার্থিব সুখের এক বিন্দুও অসুবিধে নেই. এক বিন্দু অভাবেরও ছিটেফোঁটা নেই কোথাও।

তেলতেলে চওড়া চওড়া অতি পরিচ্ছন্ন রাস্তা দিয়ে যেসব নর্ডিক চেহারার সুপুরুষ বা সুন্দরী রমণী হেঁটে যাচ্ছে তাদের চালচলন, ধরন, ভঙ্গি, হাসা-পরিহাস—সবই অম্লান। প্যারিসের মতোই অনেক চত্বর আছে। সেখানে ফুলের মতো ছেলেমেয়েরা খেলা করছে, রোদ পোহাচ্ছে, কর্মক্লান্ত মানুষেরা ফিরছেন দাঁড়াচ্ছেন। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা প্রেম করছে, মহিলারা যেতে যেতে পরিচিত মুখ দেখে দাঁড়িয়ে পড়ছেন, আলাপ করছেন; কেউ কেউ রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে আকাশবাতাসও দেখছেন।

আমস্টারডামের মতো শুধু জলই নয়, ফুলেরও মেলা সেইরকম। বেশ গরম পড়েছে, আকাশ নির্মেঘ নীল, শীতের পরেই জিইয়ে উঠে প্রকৃতি একেবারে রঙের সাগরে ডুবে আছে। গাছপালা পাতালতা ঘন সবুজ। জীবন্ত। সতেজ। আর ফুলের তো কথাই নেই। ভগবানের শিল্পের সঙ্গে কে আর পাল্লা দিতে পারে? তাঁর ভাণ্ডারে যে কতো রং আছে কেউ জানে না। আর প্রজাপতি! অজস্র। তারাও তাদের পাখনার আশ্চর্য কারুকার্য নিয়ে রঙের প্রতিযোগিতায় শামিল হয়েছে! পাখিরা বৃক্ষছায়ায় বসে নানান সুরে ডাকছে, উড়ছে, চলে যাচ্ছে: কিন্তু ঝাঁক বেঁধে বসে আছে পায়রারা। চত্বরে চত্বরে তাদেরও ভিড়। তারাও এক-একজন রঙের ফোয়ারা। গলা-গলা ফুলিয়ে আহ্লাদী আহ্লাদী ভাব। মনে হয় সারা শহরের সকল লোকেরই পোষা পাখি। আমিও দানা হাতে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাকুম বাকুম করে এ ওকে ঠেসাঠেসি করে কী বললো, তারপর আমাকে ঘিরে ফেলে খুঁটে খেতে লাগলো সেই দানা। খেয়েই হঠাৎ একযোগে উড়ে গেল সব। সকলের সমবেত পাখনার ঝাপটে ঝড়ের মতো হাওয়ার শব্দ উত্থিত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। আমার বিমল ঘোষের বিখ্যাত কবিতাটি মনে পড়ে গেল:
'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা, সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে চঞ্চল পাখনায় উড়ছে—
নিঃসীম ঘন নীল অম্বরে—'

লন্ডনে পা দিয়েই মনে হয়েছিলো শহরটার মধ্যে বড়ো বেশী গাম্ভীর্য ছড়ানো, বড়ো বেশী সাবধান আর চুপচাপ, বড়ো বেশী সভ্য-সভ্য বায়ু। আবার এডিনবারাতে গিয়েই সব কেমন ধূসরতায় আচ্ছন্ন, প্যারিসে এসেই চটুলতায় উম্বেল এক ফূর্তির বন্যা, আমস্টারডাম বিমর্ষ; এসবের তুলনায় কোপেন-হেগেনের চেহারা খুব সুখী-সুখী। ফূর্তিতে আনন্দ বেশী, চটুলতা কম। প্রয়োজনে গম্ভীর, কিন্তু কখনই মুখ থেকে হাসি বিলীন হয়ে থাকে না। আর বিমর্ষতা ধূসরতা তো বহু দূরে। অত্যন্ত আধুনিক। অত্যন্ত স্বাধীন। বাড়িঘর খাল বিল নদী সমুদ্র উদ্যান অরণ্য এবং অসংখ্য গির্জে নিয়ে এই নগরটি যেন পরিপূর্ণতার প্রতীক।

তবু তথ্য হিসেবে জানা যায় পৃথিবীর মধ্যে এদেশেই নাকি আত্মহত্যার সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। খুবই অবাক করা কথা। তবে কি অবিশ্রান্ত সুখও দুঃখের নামান্তর? একঘেয়ে লাগে? দুঃখের অভাবে সুখের রোমাঞ্চ শিথিল হয়ে যায়? চাইলেই পাওয়া যায় বলে চাওয়াটাই অর্থহীন?

যিনি এখানে আমাদের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'এ নিয়ে যাঁরা চিন্তা করবার করছেন। তবে কি জানেন, অতিরিক্ত স্বাধীনতাও এক ধরনের মৃত্যু। সীমা সব কিছুর মধ্যেই আসা দরকার। সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার সঙ্গে কিছুটা শৃঙ্খলিত থাকারও একটু দরকার আছে। ধর্ম কর্ম বন্ধ—প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটা ফ্রেম আসলে অনেক অশান্তির হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। ভালোবাসার ক্ষেত্রেই এর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। রোগ, শোক, মহামারী —এ তো আছেই জীবনে। ঈশ্বরের বিধান বলে তা আমরা মেনেও নেই। আত্ম-হত্যার কারণ এসব নয়। এই অস্থিরতা, উন্দামতা—সবই ভালোবাসার অভাবে। প্রেম এখানে একেবারেই স্থায়ী নয়। মায়া-মমতা শব্দটা প্রায় উঠে যাচ্ছে যুবক-যুবতীদের মধ্য থেকে। আত্মহত্যা বেশী ঐ যুবক-যুবতীরাই করে।'

কথাটা আমার যথার্থ মনে হলো। যদিও ভদ্রলোকের চেহারাটা বড়োই সাধারণ। দাড়ি নেই, মোটা গোঁফ আছে এক জোড়া, চুল পেটে পাতা করে, আঁচড়ানো, মনে হয় এক গাদা তেল দিয়ে পরিপাটি করে রেখেছেন। বয়েস চল্লিশোত্তর ভারি-সারি মানুষ, একটু ছোকরা ভাব নেই। কিন্তু কথাবার্তায় দেখা গেল দুরন্ত এবং পরিণত। শুধুমাত্র নিজের দেশটুকুই নয়, সারা জগতের খবরও রাখেন। নানা বিষয়ে পড়াশুনো করেন, তার মধ্যে মনস্তত্ত্বেই আগ্রহ বেশী।

আমাদের জন্য এঁরা যে হোটেলটা ঠিক করে রেখেছিলেন সেটি যে পথের ধারে অবস্থিত তার নাম 'এইচ সি আন্ডারসন বুলেভার'। এই এইচ সি আন্ডার-সনই হলেন পৃথিবীর সর্বজনপ্রিয় লেখক হান্স ক্রিশ্চেন আন্ডারসন। ইংরেজ বন্ধুদের কাছে এই নামেই ইনি পরিচিত। আমরা সবই ইংরিজীর মাধ্যমে জানি বলে আমরাও তাঁকে এই নামেই চিনি। হঠাৎ 'এইচ সি আন্ডারসন বুলেভার' নামটা ধরতে পারিনি। ভদ্রলোকটি গোঁফের ফাঁকে মুচকি হেসে বললেন, 'কেমন রাস্তার হোটেল ঠিক করেছি দেখুন। এইচ সি আন্ডারসন দেখে বোধ হয় বুঝতে পারেননি। আমাদের দেশে ও'র ওটাই নাম।'

বুদ্ধদেব লাফিয়ে উঠে উচ্ছ্বসিতভাবে ও'র হাত জড়িয়ে ধরলেন।

শুধু রাস্তাই রোমান্সের উপকরণ নয়। ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেই দুই তীর বাঁধানো নদীর মতো চওড়া খাল। খালের উপর ঝুলন্ত পুল। পুলের উপর দিয়ে অজস্র যানবাহনের অবিরল গতিবিধি। দাঁড়িয়ে দেখতে খুব ভালো লাগছিলো। বাইরে এই দৃশ্য, রাস্তার এই নাম—তাইই আমাদের পক্ষে অতীব সুখের সন্দেহ নেই। বুদ্ধদেব আমস্টারডামে জানালা দিয়ে খাল দেখা যায় এমন বাড়িই চেয়েছিলেন। সেখানে হয়নি, এখানে হলো। আর ঐ রাস্তার নামটা তো উপরি পাওনা!

দৃশ্য বা রাজপথ ছাড়াও হোটেলের অভ্যন্তরটি অভিজাত আধুনিক এবং ব্যবস্থাপনায় ক্ষিপ্র। একটি বোতাম টিপলেই ছুটে আসে পরিচারিকা। অতিথি-দের প্রতি একটুও অমনোযোগী নয়, কথা শেষ হওয়া মাত্রই চলে যায় না, আরো একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে যদি আরো কিছু বলি সেই অপেক্ষায়. অপ্রয়ো-জনেই বিছানার চাদরটা টান করে দেয়, ড্রেসিং টেবিলটা ঠিকঠাক করে দেয় জলের গ্লাসটা এগিয়ে রাখে—সেবার ভঙ্গি। ভালো লাগে। আতিথেয়তাবোধ জন্মায়। শুকনো-শুকনো কাঠ-কাঠ কর্তব্যসাধনের উপরেও আরো কিছু পাওয়া যায়।

পৌঁছেছিলাম সকালে। যে পরিমাণ প্রাতরাশ নিয়ে এলো, আমরা দুজন তো কোন ছার, তেমন তেমন দশজন খাইয়েরও সম্ভবত পেট ভরে যাবে। পরি-চারিকাটি ইংরিজি বলতে পারে, তাতেও খুব সুবিধে, বললো, এই হোটেলে য়ুরোপায়ে আর কোনো দিন কোনো ভারতীয়কে সে দেখেনি। এইরকম লম্বা ড্রেস পরা মেয়ে সে এই প্রথম দেখলো।

কোপেনহেগেন বন্দরটির আয়তন খুবই ছোটো, প্রাকৃতিক সম্পদও যে প্রচুর, তাও নয়; উপরন্তু পরাক্রান্ত প্রতিবেশীদের দ্বারা সর্বদাই আক্রান্ত। কোনো উপনিবেশও নেই, তথাপি কী করে এমন ধনসম্পত্তির অধিকারী হলো কে জানে।

সংস্কৃতিতেও এরা পিছিয়ে নেই। চিত্রশালাটি চমৎকার। এখানেই প্রথম এডভার্ড মুঙ্কের কয়েকটা মূল ছবি দেখে বুদ্ধদেব বললেন, 'আমার বহু দিনের একটা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো।'

এখানকার দর্শনীয় সব কিছুই আমাদের হোটেলের খুব কাছাকাছি। চিত্র-শালাটি তো হেঁটে গেলে পাঁচ-সাত মিনিটের বেশী একটুও নয়। আর খানিক হাঁটলেই টিভলি পার্ক। আবার তার ওপিঠেই টাউন হল। খানিক দূরে একটি অরণ্য।

এখানকার বসবাসও আমাদের খুব ক্ষণিক। সব মিলিয়ে দু দিন কি তিন দিন বক্তৃতা আছে বুদ্ধদেবের। সেটা কাল থেকে শুরু। সুতরাং যেদিন গিয়ে পৌঁছুলাম সেদিন বিকেলেই ভদ্রলোক আমাদের সেই অরণ্যে বেড়াতে নিয়ে গেলেন। অরণ্যটি একান্তই অরণ্য। অনেক দুষ্প্রবেশ্য জঙ্গলও তৈরী আছে সেখানে। গাছের মাথায় মাথায় জড়িয়ে সে জায়গা এমন নিবিড় যে, অন্ধকারে পথ চলা দায়। এরকম জঙ্গল ভারতবর্ষে হলে বাঘ-ভাল্লুকের আস্তানা হতো। কিন্তু এখানে কোনো হিংস্র প্রাণী নেই। শুধু হরিণ। যেহেতু এদের সংহার করবার মতো অন্য প্রাণী কেউ নেই, কাজেই যথেচ্ছভাবে বংশবৃদ্ধি করে পরম সুখে লালিতপালিত।

বলাই বাহুল্য, এই ঘন বনস্থলীটিও পরম যত্নেই লালিতপালিত। এখানে সব আছে। কিন্তু সবই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সহযোগিতা মিশিয়ে প্রস্তুত। যে টলটলে জলের একটি হ্রদ জঙ্গলকে ঘিরে ঘিরে বয়ে যাচ্ছে সেটা মনুষ্যরচিত। হ্রদের মধ্যবর্তী জঙ্গলের মধ্যে রঙিন ফুলের বাগানটিও তাই। বৃক্ষচূড়ায় বাসা বেঁধে যেসব অপরূপ সুন্দর পাখি আসছে যাচ্ছে বসছে ডাকছে, অদের অনেকেই অনেক দেশ থেকে সংগৃহীত। তা ছাড়া প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে এখানে-ওখানে মনুষ্যনির্মিত খানাখন্দ গিরিগুহা প্রস্রবণও অনেক আছে। এই জঙ্গলে বেড়াবার সুখবাহন মোটর গাড়ি নয়, ঊনিশ শতকী ফিটন। মস্ত এক কালো কুচকুচে চঞ্চল ও সতেজ ঘোড়া পিতলের সজ্জায় সজ্জিত হয়ে জোতা আছে বাবুগাড়ির সঙ্গে। ছুটবার জন্য ঘন ঘন পা নাড়ছে। ভদ্রলোক আমাদের নিয়ে সেই ফিটন ভাড়া করে তাতেই উঠে বসলেন। চলতে লাগলো গাড়ি। ঘোড়ার খুরের টকটক শব্দের নির্মিত লয় জঙ্গলের শব্দের সঙ্গে কোথায় একটা সংহতি স্থাপন করে অদ্ভুত সুরের সম্মোহন তৈরি করছে। এইজন্যই বোধ হয় যন্ত্রযানের বদলে পশুযান?

ভিতরে ঢুকে কেবল সবুজ, সবুজ আর সবুজ। চারটের বেলায় বাইরে

সেখানে খর রৌদ্র ছিলো, ঝপ করে ছায়া নেমে গেল সেখানে। কিন্তু তা বলে কোথাও কি রোদ নেই? আছে। নইলে রঙিন ফুলের বাগান বাঁচবে, কার তাপে? বাগানে প্রজাপতির মতো প্রেমিকযুগলেরাও সব ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাশেই সমুদ্র বয়ে যাচ্ছে গম্ভীর গর্জনে।

বুদ্ধদেবের এক সাহিত্যিক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিলো বিকেলে। একটু দেরি হয়ে গেল যেতে। এবং গিয়েই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি উঠতে হলো। এখান থেকে লুইসিয়ানা হয়ে তবে ঘরে ফেরা।

লুইসিয়ানা এখানকার এক ধনী ব্যক্তির উদ্যান-বাটিকা। এটি তিনি শিল্প-সংরক্ষণের জন্য দান করে গেছেন। বাড়িটি এতো সুন্দর! বলা যায় এটিই একটি শিল্পকর্মের উৎকৃষ্ট নমুনা। এবং উদ্যান-বাটিকার আক্ষরিক সংস্করণ। মাইল-মাইলব্যাপী 'মৃগকানন' দেখে আসার পরেও সমুদ্রতটে লুইসিয়ানার বাগান চোখকে তেমনি বিস্ময়ে মুগ্ধ করে। এক দিকে যেমন সমুদ্র, অন্য তিন দিক ঘিরে তেমনি বাগান ও বাগিচা। বৃক্ষের সমারোহ অপরিমিত। কতো জাতের গাছ যে আছে তার ইয়ত্তা নেই।

সমুদ্রকে সামনে রেখে অনেকক্ষণ বসে রইলাম সেখানে। ভদ্রলোক আর এক প্রস্থ চা খাওয়ালেন। মন প্রাণ শ্রবণ দর্শন—সব জুড়িয়ে গেল।

জাপানের মতো দিনেমারদের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের তীব্রতা এসে থেকেই অনুভব করছিলাম। যেমন গৃহসজ্জা, তেমনি পুষ্পসজ্জা, তেমনি স্থাপত্য। এমন সুন্দর জলে-ঘেরা একটা ছোট্ট মিষ্টি শহর সম্ভবত জগতেই বিরল।

বুদ্ধদেব বললেন, 'একেবারেই আন্ডারসনের গল্পের দেশ।' তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় এক্ষুনি বুঝি ঐ লাল আর সাদা নৌকোটাতে লাফিয়ে উঠে বসবে হিয়ালমার, ছটা রাজহাঁস ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তাকে।'

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন, 'এই বনটাকেও সেই বন ভাবতে দোষ কী, যেখানে ফুলেরা পরীদের গল্প বলে, গাছেরা বলে ডাকাতদের গল্প।'

আমি বললাম, 'তা হলে আসুন এই বাড়িটাকেই সেই প্রাসাদ ভাবি যেখানে রাজকন্যা এসে কখনো অলিন্দে দাঁড়িয়ে থাকেন, কখনো বারান্দায়। আর, সোনার তলোয়ার হাতে পাহারা দেয় রাজপুত্র।'

'যা বলেছেন, তা হলে ছোট্টো জলকন্যাটিকেও এই ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় উঠিয়ে আনা যাক না সামনের সমুদ্রতটে—' কোথা থেকে এক ভদ্রমহিলা এসে যোগ দিলেন, 'আর সেই নাটক-নাটক খেলা পুতুল নিয়ে গলা ছেড়ে নদীতীরে দাঁড়িয়ে গান গাওয়া—'

হাসলেন, তারপর ক্ষমার ভঙ্গীতে বললেন, 'অযাচিতভাবে এসে আলাপ করলাম বলে কিছু মনে করছেন না তো? অনেকক্ষণ থেকেই এই বিদেশী অতিথি দুজনকে দেখছিলাম, কথাবার্তা শুনছিলাম—' আমার দিকে তাকালেন, 'খুব ইচ্ছে করলো পরিচয় করি. এমন সুন্দর জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সমুদ্রতীরে লুই-সিয়ানায় বসে হান্স আন্ডারসেনকে নিয়ে কল্পনার খেলাটি আপনারা যেরকম সুন্দর জমিয়ে তুলেছেন, ভাবলাম ফর্মালিটির অপেক্ষা না রেখে যোগ দিই সেই খেলায়। মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি সেজন্য।'

'না, না। কী আশ্চর্য! খুব ভালো করেছেন। আসুন আসুন, বসুন—'

তিনজনেরই সমবেত অভ্যর্থনা ধ্বনিত হলো বাতাসে। খুশী হলেন তিনি। মহিলা সুন্দর দেখতে, অল্প বয়েস, মাথার চুল লম্বা এবং সেই চুল দিয়ে টান-টান করে খোঁপা বাঁধা।

'আমি ওডেনস-এর মেয়ে', আমার পাশে বসলেন, 'যেখান থেকে হান্স নামের সেই চোদ্দ বছরের সাধারণ ছেলেটি একদিন তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাড়নায় কোপেনহেগেনে চলে এসেছিলো কিছু করতে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি কি কোপেনহেগেনে বেড়াতে এসেছেন? নাকি এখানেই থাকেন?'

মহিলা বললেন, 'এখানেই থাকি। চাকরি করি. আমার নাম মিস লিন্ডা আন্ডারসন, হান্সের সঙ্গে একই পদবী।'

বুদ্ধদেব হেসে বললেন, 'শুধু পদবীই কি এক?'

এ কথায় মহিলা ভীষণ হাসলেন। বললেন, 'আমি অনুমান করছি আপনারা ভারতবর্ষের লোক।'

'ঠিকই ধরেছেন।'

'আপনাকে দেখে নয়, কিন্তু এঁকে দেখে। ভারতীয় মেয়ে প্যারিসে আমি অনেক দেখেছি, তাই পোশাকটা চেনা। ভারতীয় দর্শনে বিশ্বাস করলে বলতে হয় হয়তো আমিই সেই লিন্ডা।'

এবার সম্মিলিত হাসির রোলে ইয়োরোপীয় সভ্যতায় কিঞ্চিৎ চিড় ধরলো। থামবার পরে আমাকে স্বীকার করতেই হলো তাঁদের এই আনন্দযজ্ঞে আমার কোনো অংশ ছিল না যেহেতু রসিকতাটা আমি ঠিক ধরতে পারিনি।

'ওঃ হো, আচ্ছা তা হলে শুনুন—' থামলেন লিন্ডা, তাকালেন মুখে মুখে, বললেন, 'আমার পরিচয়টা তো জানলেন, কিন্তু আপনারা—'

এর উত্তরে আমরা তিনজনেই তিনজনের নাম-ধাম বললুম। দেখা গেল ভারতবর্ষের প্রতি লিন্ডা খুব শ্রদ্ধাশীলা। রবীন্দ্রনাথের নাম জানেন, কাল যে রেডিয়োতে বুদ্ধদেবের বক্তৃতা আছে তাও জানেন। ভারতীয় দর্শন তাঁর প্রিয় বিষয়।

'লিন্ডার গল্পটা তা হলে আপনার স্ত্রীকে বলি, কেমন?' লিন্ডা বুদ্ধদেবের দিকে তাকালেন।

কৌতূহল হচ্ছে একবার গিয়ে দেখে আসি তাঁর আদি বাড়ি।'

'আদি বাড়ি? যার বাবা জুতো সেলাই করতেন আর মা বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাপড় কাচতেন, তার আবার আদি বাড়ি! তারপর তো সেই মুচী বাবা কতো অল্প বয়সে মরেও গেলেন, মা আবার বিয়ে করলেন, আর এই সাধারণ ঘরের সাধারণ হান্স—ও, গড—' ক্রস কাটলেন, 'ঈশ্বর যে কাকে কী দেন, কার জন্য কী সাজিয়ে রাখেন, শুধু তিনিই জানেন। নইলে দেশ ছেড়ে, গাঁ ছেড়ে পরিচিত পরিজন সব ছেড়ে চলে এসে সেই ছেলে এই হয়। অবাক লাগে না?'

'তাই তো!'

'আমি হান্সের অন্ধ ভক্ত, হান্সের বই পড়তে পড়তে আমার গায়ে কাঁটা দেয়। আগলি ডাকলিং গল্পটা ভেবে দেখুন, উনি নিজে ছাড়া আর কে? উনি কি জানতেন সেই হাঁসের বাচ্চাটা একদিন মরাল হয়ে আকাশে উড়বে ঠিক তাঁরই মতো—যে তিনি আত্মীয়দের ভাষায় একটা অপদার্থ মাত্র? বাবা মারা যাবার পরে মা-ঠাকুমা কতোবার বললেন, হাতের কাজ শেখো, হাতের কাজ শেখো। শুনলেন? শুনলেন না। আশ্রয় নেই, আহার নেই, সঞ্চয় নেই, কী ভেবে এসে উপস্থিত হলেন এই শহরে। লেখাপড়াও তো জানেন না! সেই থিয়েটারওয়ালারা ভরতি করে দিলেন স্কুলে। ক্লাসে সবচেয়ে ঢ্যাঙা, আর সবচেয়ে বড়ো ছেলে তিনি। আর সবচেয়ে খারাপ ছাত্রও। ভাবুন।'

'তাই তো।'

'দেখতে পর্যন্ত ভালো না—'

'দেখতে ভালো না?' এই বিস্মিত উক্তিটি আমার। আমার চোখে হান্স ক্রিশ্চেন আণ্ডারসন মানেই সোজাসুজি ড্যানি কে। হান্স ক্রিশ্চেন আণ্ডারসনকে নিয়ে জনপ্রিয় চলচ্চিত্রটি নিশ্চয়ই অনেকে দেখেছেন, নায়ক ড্যানি কে। আণ্ডারসনকে ভাবলেই ড্যানি কে তাঁর রূপলাবণ্য, আনন্দ, ফূর্তি এবং অবিরল হাসির ফোয়ারা নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে যান আমার চোখের সম্মুখে। অভিনয়-প্রতিভার গুণে আণ্ডারসন আর ড্যানি কে দুই ব্যক্তি থাকেন না, সম্পূর্ণভাবেই একে অন্যের রূপে রূপান্তরিত হয়ে ওঠেন।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'না, দেখতেও ভালো ছিলেন না। তাঁর বালক-বয়সে তাঁর চেহারায় প্রতিভার বিন্দু ছবিও কোনোখানে ফুটে ওঠেনি।'

আমি বললাম, 'আণ্ডারসনকে তো কখনো দেখিনি দেখবোও না, কিন্তু তাঁর চরিত্রে অভিনয় করে যিনি এখনো আমাদের হৃদয়কে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন তিনি ড্যানি কে। যেন যাদুকর। গন্ধে গন্ধে ছুটে আসছে শিশুরা, আর তিনি তাঁর হাতের বুড়ো আঙুলের নখে মুখ এঁকে ঘাগরা পরিয়ে টুপি মাথায় দিয়ে শিস দিতে দিতে পরী নাচাচ্ছেন। শিশুদের মুখে সুখের স্বর্গ।'

'না, না, না—' মাথা ঝাঁকালেন ভদ্রমহিলা, দেখুন, ওখানেও আমাদের ভীষণ আপত্তি, আমাদের অবিশ্রান্ত প্রতিবাদ। পৃথিবীর সব অনুবাদকই তাঁকে যেন একজন শিশুদের মন-ভোলানো রূপকথাকার হিসেবে উপস্থিত করেছেন—সেটা ঠিক নয়, সেটা অন্যায়।'

এর জবাবে বুদ্ধদেব বললেন, 'আপনার অভিযোগ কিয়ৎ পরিমাণে সত্য হলেও সবটা কখনই নয়। আমার স্ত্রী যেটা বলছেন সেখানে হলিউড হয়তো তাঁকে কৃতী, সুখী, জয়ী, আনন্দে ভরপুর একজন শিশু সাহিত্যিক হিসেবে উপস্থিত করে সত্যিই শিশুদের বিমোহিত করে নিজেদের ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করেছে; কিন্তু হান্স ক্রিশ্চেন আন্ডারসনের লেখার গূঢ় অভিপ্রায় যদি কেউ না-ই বুঝতো তা হলে তাঁর ভক্ত পাঠকদের মধ্যে নিশ্চয়ই ডিকেন্স বা হুইটম্যানের নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হতো না, অস্কার ওয়াইল্ডের হান্স ক্রিশ্চেন আন্ডারসনের অনুকরণে রচিত কাহিনীগুলোই ইংরিজী ভাষায় তাঁর শ্রেষ্ঠ কাহিনী বলে বিবেচিত হতো না।' হেসে বললেন, 'আর এই যে আমরা চারজন এখানে একত্রিত হয়ে তাঁকে স্মরণ করছি, আমরাই কি এতো কথা বলতাম? কিন্তু লিন্ডার গল্পটা মিসেস বোসকে বলুন এবার। সেটাই চাপা পড়ে যাচ্ছে।'

ভদ্রমহিলাটি খুব জমাটী এবং আলাপী। আমার হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বললেন, 'জানেন তো, ব্যক্তিগত জীবন তাঁকে তাঁর সাহিত্যিক মর্যাদা ছাড়া আর কোনো মর্যাদাই দেয়নি। বারেবারে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে কতো কষ্টই না পেয়েছেন! শেষ প্রেম তাঁর সংগায়িকা লিন্ডার সঙ্গে। এই যে আমি, আমি লিন্ডা আন্ডারসন। হান্স সেই লিন্ডার জন্য কী না করেছেন! কোথায় কোথায় না ঘুরেছেন? অমন অভিনন্দিত পুরুষ, জীবদ্দশাতেই যিনি তাঁর দেশের সকল মানুষের সকল সম্মানের অধিকারে ধনী, সেই মানুষকে তাকিয়েও দেখেনি লিন্ডা। শেষে সেই বেদনা নিয়েই স্ত্রীহীন, সন্তানহীন, গৃহহীন, প্রেমহীন এই প্রতিভার এক বন্ধুর গৃহে মৃত্যু ঘটলো। আমি লিন্ডা তার প্রায়শ্চিত্ত করবো, আমি কখনো তাঁর নাম ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসবো না, কখনো বিবাহ করবো না।'

এই গল্প এবং এই ঘোষণার পরে কেমন একটা বিরতি নামলো সমস্ত আলোচনাটার মধ্যে। তারপরে যা টুকটাক দু-চারটা কথা হলো, নিতান্তই আলাপ। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের হাতের ঘড়িতে চোখ ফেলে যে যার গন্তব্যে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

ভদ্রলোক আমাদের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিতে নিতে বললেন, 'মহিলা খুব অদ্ভুত, না? মিস্টিক।'

বুদ্ধদেব বললেন, 'এও প্রায় হান্স ক্রিশ্চেন আন্ডারসনেরই গল্পের বিষয়।'

(ক্রমশ)

# দাড়ি কামানোর পরে ত্বককে নির্ম্মল, তাজা ও নরম করতে...

আপনার ত্বক
স্বাভাবিক, শুকনো বা
তৈলাক্ত যে অবস্থাতেই
থাকুক না কেন,
ইরাসমিক এখন
এনেছে এমন এক
শেভিং ক্রীম যা ঠিক আপনার
ত্বকেরই অনুকূল...এর বিশেষ ফর্মুলা
আপনার ত্বককে নির্মল,তাজা ও
নরম ক'রে দেয়। আজই পরীক্ষা করুন—
ইরাসমিক।

- এন্টিসেপটিক — স্বাভাবিক ত্বকের জন্যে
- ক্রীম রীচ—শুকনো ত্বকের জন্যে
- টাইম ফ্রেশ—তৈলাক্ত ত্বকের জন্যে

## ইরাসমিক হাজির করছে— এমন এক ক্রীম—যা সব প্রকার ত্বকের অনুকূল

লিনটাস-ERS.CR.25-2415 BG

# সেই সময়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৫৩ ॥

হরিশের মৃত্যু নবীনকুমারের বক্ষে একেবারে তীব্র শেলসম বাজলো। কয়েক দিন প্রায় হতচেতনের মতন পড়ে রইলো সে। অমন স্বাস্থ্যবান, অমন তেজস্বী, সব সময় উৎসাহে ভরপুর মানুষটি চলে গেল অকস্মাৎ! আর যে সময় হরিশকে দেশবাসীর সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল, সেই সময়ই সে অপসৃত হলো! বিশ্ব-নিয়ন্তার এ কি অবিচার! আর কী-ই বা বয়েস হয়েছিল হরিশের, মাত্র সাঁইত্রিশ বৎসর।

এক সময় শোক সামলে উঠতেই হলো নবীনকুমারকে। হরিশ বহু কাজ অসমাপ্ত রেখে গেছেন, এখনই সেগুলি জোড়া লাগাবার চেষ্টা না করলে একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে। বিশেষত হিন্দু পেট্রিয়টের মতন পত্রিকা বন্ধ হতে দেওয়া চলে না কিছুতেই।

হরিশ অর্থ উপার্জন করেছেন প্রচুর, আবার তাঁর খরচের হাতও ছিল অতি দরাজ, নীল চাষীদের জন্য তিনি অকুণ্ঠভাবে ব্যয় করেছেন। মৃত্যুর পর দেখা গেল হরিশ ভবানীপুরে একটি ছোট বসত বাড়ি আর হিন্দু পেট্রিয়টের মুদ্রাযন্ত্র ছাড়া আর কিছুই রেখে যাননি। তাঁর বিধবা পত্নী ও মাতার গ্রাসাচ্ছাদন হবে কী করে তারও কোনো ব্যবস্থা নেই।

হরিশের শ্রাদ্ধ শান্তি চুকে যাবার পর নবীনকুমার একদিন ধীর পদে হিন্দু পেট্রিয়ট দফতরের সিঁড়ি বয়ে উপরে উঠে এলো। এখানে হরিশ নেই, তাঁর উচ্চ কণ্ঠস্বর, দরাজ হাসি আর শোনা যাবে না, এ যেন কল্পনাই করা যায় না। নবীনকুমারের শরীর অবশ হয়ে আসে। তার মনে হয়, পৃথিবীতে তার আর একজনও বন্ধু নেই।

পত্রিকা দফতরে একটি যুবক একলা চুপ করে বিষণ্ণ বদনে বসে আছে। এই যুবকটির নাম শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এই যুবকটি কিছুদিন হরিশের সঙ্গে পত্রিকা সম্পাদনায় সহকারিত্ব করেছে। ছাত্রাবস্থা থেকেই অনেক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শম্ভুচন্দ্র, এক সময় সে নিজেও স্বাতন্ত্র্যভাবে একটি কাগজ বার করতে চেয়েছিল, কিন্তু অর্থের সঙ্গতি নেই। যুবকটি ইংরেজী লেখে চমৎকার, যুক্তিজ্ঞান বেশ তীক্ষ্ণ এবং হৃদয়ে স্বদেশপ্রীতি আছে। [illegible] দফতরেই শম্ভুচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাকে নবীনকুমারের ভালো লেগে যায়, এক কথায় নবীনকুমার তার পরিকল্পিত পত্রিকার জন্য কিনে দেয় একটি মুদ্রণ যন্ত্র। শম্ভুচন্দ্র তখন মুখার্জিস ম্যাগাজিন নামে পত্রিকা বার করলো, কিন্তু চললো না বেশীদিন।

শম্ভুচন্দ্র নবীনকুমারের চেয়ে সামান্য বয়েসে বড় হলেও নবীনকুমারকে দেখে সে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো। দুজনে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত, একটিও কথা বললো না। পুরুষ মানুষে অন্য পুরুষ মানুষের সামনে আর কী ভাষায় শোক প্রকাশ করবে! নীরবতাই এখানে বাঙ্ময়।

হরিশ নেই বলেই ঘরখানি যেন নিষ্কারণ শূন্য মনে হচ্ছে। নবীনকুমার চতুর্দিকে চক্ষু বোলাতে লাগলো। সর্বত্রই হরিশের চিহ্ন। দেওয়ালের একটি হুকে ঝুলছে এক গাদা পৈতে। ব্রাহ্মণ সন্তান হরিশ মুখুজ্যে ব্রাহ্ম হবার পর ঢাক ঢোল পিটিয়ে, লোকজন ডেকে উপবীত পরিত্যাগ করেননি বটে, তবে ঐ সুতোগাছিগুলির প্রতি তাঁর বিশেষ সম্মানবোধও ছিল না। প্রায়ই গা থেকে পৈতে খুলে ঝুলিয়ে রাখতেন দেয়ালে, কখনো কখনো গ্যালি প্রুফের আয়তন বোঝার জন্য ঐ পৈতে দিয়েই মেপে নিতেন, আবার বাড়ি ফেরার সময় পরে নিতেন গলায়। শেষদিন আর পরা হয়নি।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, এ পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবে?

শম্ভুচন্দ্র বললো, আর তো উপায়ান্তর দেখি না! এ ছাপাখানাও রক্ষা করা যাবে না বুঝি। নীলকর সাহেবরা ওঁর নামে মানহানির মামলা ঝুলিয়ে রেখেছে, ওঁর মৃত্যু হলেও প্রতিশোধ নেবার জন্য সাহেবরা এই ছাপাখানা ক্রোক করে নিতে পারে।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, তা পারে?

শম্ভুচন্দ্র বললো, সাহেবদের পক্ষে অবশ্যই সম্ভব। এই ছাপাখানাটিও গেলে হরিশের পরিবার একেবারে সর্বস্বান্ত হবে।

নবীনকুমার কয়েক মুহূর্ত মাত্র চিন্তা করলো। তারপর প্রশ্ন করলো, আর কেউ যদি তার আগেই এই ছাপাখানা এবং পত্রিকার স্বত্ব কিনে নেয়!

—তা হলে বাঁচানো যেতে পারে অবশ্য।

—এই ছাপাখানার মোট দাম কত হবে বলে আপনার মনে হয়?

—যন্ত্রটি পুরোনো হয়ে গ্যাচে, টাইপগুলিও বহু-ব্যবহৃত, তা তবুও হাজার বারোশো টাকা দাম উঠবে নিশ্চয়।

—আপনি হরিশের মা ও স্ত্রীকে গিয়ে বলুন, আমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে এই সমুদয় কিনে নিতে চাই।

—কত টাকা বললেন?

—পাঁচ হাজার টাকা। আশা করি সেই টাকার সুদে দুই বিধবার সারা জীবনের খরচ চলে যাবে।

শম্ভুচন্দ্র খানিকক্ষণ বিস্মিতভাবে তাকিয়ে রইলো। তারপর অস্ফুট স্বরে বললো, আপনি হাজার টাকার জিনিস পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে কিনবেন? এমন অদ্ভুত দয়াদাক্ষির কতা কখোনো শুনিনি। কলকাতা শহরে বড় মানুষ অনেকেই আচে, কিন্তু আপনার মতন সৎ কাজে ব্যয় করতে জানে ক'জন? আপনি...

নবীনকুমার হাত তুলে এই সব অবান্তর কথা বন্ধ করিয়ে দিয়ে বললো, আপনি ব্যবস্থা করুন, আমি কালকের মধ্যেই টাকা দিয়ে সইপত্তর করে সব পাকা করে নিতে চাই। আমি নামে মালিক হলেও এ পত্রিকা চালাতে হবে আপনাকেই।

—আমি চালাবো?

—হ্যাঁ। আপনি একা না পারেন, গিরিশ ঘোষকে ডেকে নিন, কাগজের ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতা আচে—আপনারা সম্পাদনার ভার নেবেন, খরচপত্তরের দায়িত্ব সব আমার। এ পত্রিকা কিছুতেই বন্ধ হতে দেওয়া হবে না।

যে কথা সেই কাজ। নবীনকুমারের অধ্যবসায়ে কয়েকদিনের মধ্যেই হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা আবার চালু হয়ে গেল। সেখানেই নিবৃত্ত হলো না নবীনকুমার। হরিশের স্মৃতি রক্ষার জন্য সে উঠে-পড়ে লাগলো। স্বদেশের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ হরিশকে যদি দেশবাসী ভুলে যায় তবে তার চেয়ে কৃতঘ্নতা আর কিছু নেই।

কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে নবীনকুমার গঠন করলো হরিশচন্দ্র মেমোরিয়াল কমিটি। হরিশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থে যার যথাসাধ্য দান করার জন্য আবেদন জানিয়ে মর্মস্পর্শী ভাষায় একটি পুস্তিকা মুদ্রণ করে বিতরণ করলো সে। এই স্মৃতিভাণ্ডারে [illegible] সে নিজেই দিল পাঁচ শত টাকা। কিন্তু দেখা গেল দরিদ্র সাধারণ মানুষ অনেকেই এক টাকা, দু টাকা, পাঁচ টাকা পাঠালেও বিশিষ্ট ধনী যাঁরা পাঁচ শত, হাজার অঙ্ক দানের মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁরা কেউ আসলে কিছুই দিলেন না। নবীনকুমার তখন মেমোরিয়াল কমিটির কাছে এক প্রস্তাব দিল, হরিশের নামে এক স্মৃতি মন্দির নির্মাণ করা হোক, যেখানে থাকবে একটি গ্রন্থাগার, উৎসাহী ছাত্রদের জন্য গবেষণার সুযোগ এবং একটি পাবলিক হল, যেখানে দেশীয় লোকেরা সভা-সমিতি করতে পারবে। এ শহরে স্থানীয় লোকদের ব্যবহার উপযোগী একটিও হল নেই। এবং এই স্মৃতি মন্দিরের জন্য নবীনকুমার এখুনি বাদুড়বাগানে দুই বিঘা জমি দান করতে প্রস্তুত আছে।

তবু কমিটির সভ্যদের বিশেষ কোনো উৎসাহ দেখা গেল না। সকলেই যে-যার স্বার্থ সামলাতে ব্যস্ত। চাঁদা যা উঠেছে তা অন্য কাজে লাগাবার জন্য এক একজন এক একরকম পরামর্শ দেয়। কমিটির সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালের খুব আগ্রহ ও লোভ হরিশের পত্রিকাটি হস্তগত করায়।

বীতশ্রদ্ধ হয়ে নবীনকুমার নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেল এই সব ব্যাপার থেকে। হরিশের মতন স্বার্থত্যাগী মানুষকেও যদি মৃত্যুর পরেই লোকে এমন অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তা হলে এ দেশে আর সত্যিকারের আদর্শবান পুরুষ জন্মাবে কী করে? জীবিতাবস্থায় হরিশকে নিয়ে যারা মাতামাতি করেছে, যারা তার স্তুতি গেয়েছে, এখন তারাই বক্রভাবে বলে, হ্যাঁ, হরিশ অনেক বড় বড় কাজে হাত দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু নিজেই অমিতাচার করে অকালে প্রাণটা খোয়ালেন।

মেমোরিয়াল কমিটির সভা থেকে একদিন রাগত-ভাবে বেরিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠে নবীনকুমার মনে মনে বলতে লাগলো, বন্ধু, পরকাল বলে কিছু আচে কিনা আমি জানি না, তুমি কোনো জায়গা থেকে আমার কতা শুনতে পাবে কি না তাও জানি না, তবু আমি বলচি, আর যে-ই তোমায় ভুলে যাক, আমি যতকাল বেঁচে থাকবো, আমি তোমায় কখনো একদিনের জন্যও বিস্মৃত হবো না! বন্ধু, এমনভাবে আমায় একা ফেলে চলে গ্যালে!

নিজ গৃহে সারা দিনের মধ্যে বোধ হয় একদণ্ডও কাটায় না নবীনকুমার। শোক ভুলবার জন্য সে নিজেকে যেন শত কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে। শুধু কাজ আর কাজ! সান্ধ্য বিনোদনের জন্যও সে যায় না কোথাও। হরিশের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মূলুকচাঁদের আখড়া বন্ধ হয়ে গেছে, নবীনকুমারও আর মদ্য পান করে না। সর্বক্ষণ সে লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত।

একেবারে মুখের ভাষায় সে যে ছোট ছোট নকশাগুলি লিখছিল, সেগুলি একসঙ্গে মিলিয়ে সে বই আকারে ছাপিয়ে বার করে দিল নিজের নাম গোপন করে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-সমাজ একেবারে তাজ্জব। এ কার রচনা? এমন নির্মম সত্য, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপময় সমাজচিত্র কার হাত দিয়ে বেরুলো? টেকচাঁদ ঠাকুরের চেয়েও এ লেখার ভাষায় জোর অনেক বেশী। মহাভারত অনুবাদের সুগম্ভীর ভাষা যার হাত দিয়ে বেরুচ্ছে, সেই ব্যক্তির পক্ষে যে এমন তীক্ষ্ণ, তীব্র, চটুল চলতি বাংলা লেখা সম্ভব, তা কারুর সুদূরতম কল্পনাতেও এলো না। একই সঙ্গে নবীনকুমার [illegible] দিল আবার নতুন নাটক [illegible], আর মহাভারতের কাজ তো চলছেই। 'নীলদর্পণ' নাটকখানি প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হবার পর আর কেউ ভয়ে প্রকাশের ভার নিতে চাইছে না, নবীনকুমার নিজ ব্যয়ে নিজের মুদ্রণশালা থেকে সেই বই [illegible] বার করে দিল।

সরোজিনী প্রীতি [illegible]

# শিশুর খাবারে বৈচিত্র্য আনুন ওকে দিন সেরা চাল থেকে তৈরি এমন খাবার যা সহজে হজম হয়

আপনার শিশু ৪ মাসের হলে ওকে কিছু শক্ত খাবার দিতে শুরু করুন। আর ওর পক্ষে সবচেয়ে ভালো শক্ত খাবার হল নেস্টাম বেবি সিরিয়াল

**সক্কাজেই হজম হয়।**

চাল থেকে তৈরি এই খাবার খুব সহজেই হজম হয়ে যায়।

**অসাধারণ**

প্রথমে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে নেস্টাম দিতে শুরু করুন—সেদ্ধ ফল, রান্না করা ও ম্যাশড শাকসব্জী ও ডালের সঙ্গে মিশিয়ে নেস্টাম দিন।

## নেস্টাম
### বেবী সিরিয়াল রাইস
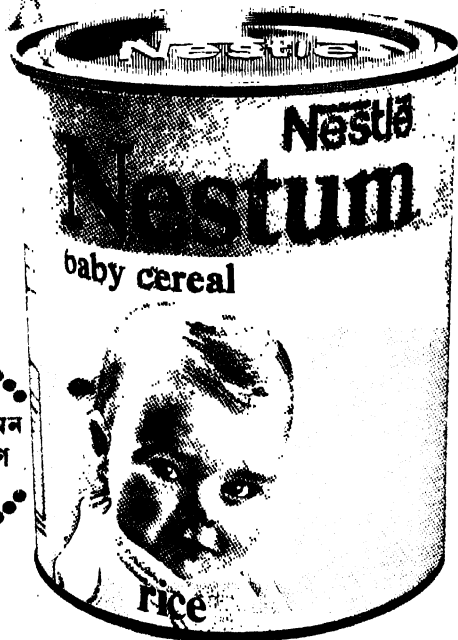
**১১টি ভিটামিন ও আয়রণে সমৃদ্ধ**

NESTLÉ.

ঘরে আসে, তার স্বামী তার দিকে মনোযোগ দেবারও সময় পায় না। রুপোর জাল দিয়ে ঘেরা একটি বিদেশী লণ্ঠন কিনেছে নবীনকুমার যা বাতাসের ঝাপটায় নিবে যায় না। সেই লণ্ঠন জেলে সে অধিক রাত্রি পর্যন্ত লেখাপড়ার কাজ করে যায়।

সরোজিনী কিছুক্ষণ দ্বারের কাছে কুণ্ঠিতার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর এক সময় স্বামীর কাছে এসে আড়ষ্টভাবে বলে, অনেক রাত হলো যে, আপনি একবার শুতে আসবেন না?

নবীনকুমার মুখ না ফিরিয়েই বলে, আমার দেরি হবে, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো গে।

সরোজিনী তবু জিজ্ঞেস করে, আপনার কত দেরি হবে?

নবীনকুমার পাঠে নিমগ্ন থেকে অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেয়, তার ঠিক নেই।

এক প্রশ্ন বারবার জিজ্ঞেস করলে নবীনকুমার হঠাৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় বলে সরোজিনী আর কিছু বলে না। নিঃশব্দে আরও একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে ফিরে যায়। তার সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্র পরা, বাহুতে ফুলের সাজ আর সারা শরীরে চন্দন সৌরভ মাখা সবই ব্যর্থ হয়। নিজের শয্যায় ফিরে গিয়ে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। কিছুদিন হলো তার পতি দেবতাটির কেন এমন পরিবর্তন হলো, সে কিছুতেই বুঝতে পারে না। আগেও তো উনি অনেক কাজে ব্যস্ত থাকতেন, কিন্তু রাত্রে শয়ন কক্ষে সরোজিনীকে কাছে ডেকে নরম সোহাগ বাক্য বলতেন প্রতিদিন। নিত্য নতুন কত না কৌতুক উদ্ভাবন করতেন উনি। কত না খুনসুটি। সেই মানুষটি এই ক' মাসে এমন বদলে গেলেন!

সরোজিনী এই নিয়ে তার মা ও দিদিদের কাছে কান্নাকাটি করেছে। সকলেই শুনে বিস্মিত হয়। বাড়ির বাইরে রাত কাটায় না, বাগানবাড়িতে রক্ষিতা পোষে নি, নিজ গৃহে থেকেও পত্নীর দিকে নজর দেয় না; এ আবার কেমন ধারা কাণ্ড! এমন তো হয় না। হরিশ মুখুজ্যে ওর বন্ধু ছিল, তাঁর মৃত্যুতে নবীন-কুমার মনে আঘাত পেয়েছে ঠিক কথা, কিন্তু সেও তো হয়ে গেল কয়েক মাস। ব্যাটাছেলে বন্ধু মারা গেলে কোনো পুরুষমানুষ এমন মনমরা হয়ে থাকে? তা ছাড়া, এরকম সময়ে তো সবাই ঘরের মানুষকেই বেশী করে আঁকড়ে ধরে।

সবাই সরোজিনীকে দোষ দেয়। সে-ই নিশ্চয়ই তার স্বামীকে বশ করতে পারছে না। যে সধবা মেয়ে-মানুষ নিজের স্বামীর সঙ্গে এক শয়নকক্ষে থেকেও স্বামীকে কাছে পায় না, সে মেয়েমানুষের মরণও ভালো। দিদিরা পরামর্শ দেয়, ওরে সরো, একদম হাত-আলগা দিসনি, সাপটে ধর, দরকার হয় পায়ে পড়বি, একবার মন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে কেঁদেও কূল পাবি না।

সরোজিনী সত্যিই এক মধ্য রাত্রে দৌড়ে এসে নবীনকুমারের পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

নবীনকুমার চমকে উঠে বলে, এ কি, এ কি!

সরোজিনী সর্বাঙ্গে বহু অলঙ্কার পরে, ঝলমলে বেনারসী শাড়িতে নববধূর সাজে সেজেছে। কিন্তু তার চোখে জল। নবীনকুমারের পায়ে মাথা কুটতে কুটতে সে বললো, আজ আপনাকে বলতেই হবে, আমি কী দোষ করিচি! কেন আমায় দেকলেই আপনি হাত নেড়ে বলেন, চলে যাও, চলে যাও! আমি কি বিষ পিমড়ে, আমায় আপনার সহ্য হয় না? বলুন তবে, আমি আগুনে ঝাঁপ খেয়ে মর্বো!

নবীনকুমার টেবিলের ওপর মস্ত বড় একটা কাগজ বিছিয়ে তার ওপর পেন্সিলের দাগ কেটে কী সব হিসেব করছিল। হাতের পেন্সিলটি সরিয়ে রেখে সে সরোজিনীর মুখখানি ধরে ওপরে তুললো। তারপর বিরক্তিচাপা ঈষৎ অস্থির কণ্ঠে বললো, আঃ, সরোজ, কেন, ছেলেমানুষী করো। দেকচো না আমি ব্যস্ত রইচি। কাজের সময় এ রকম বিরক্ত করো না।

সরোজিনী চোখের জল মুছে ফেলে হঠাৎ শান্ত হয়ে যায়। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ঠিক, কাজের সময় বিরক্ত করতে নেই। আর আপনাকে বিরক্ত কর্বো না। তবে আমার মা জিজ্ঞেস করতে বলেচেন, রাত জেগে আপনি কী এত কাজ করেন, তা দিনের বেলা সারা যায় না? এ রকম রাত জাগলে যে আপনার শরীর নষ্ট হবে। যারা পেটের ভাত জোটাবার জন্য কাজ করে তারাও তো এমন দিনরাত্তির খাটে না। ভগবানের কৃপায় আমাদের অভাব নেই—

নবীনকুমার শুকনো হেসে বললো, পেটের ভাত জোটাবার জন্য বেশী খাটতে হয় না ঠিকই, কিন্তু মনের ভাত জোটাতে গেলে সময়ের হিসেব করলে চলে না। আমি এখন যে কাজে হাত দিইচি, সেটা তোমায় বোঝালেও বুঝবে না।

সরোজিনী বললো, তবু বলুন একটু, মা জানতে চেয়েচেন।

—আমি বাংলা দৈনিক কাগচ বার কচ্চি।

—কী?

—ঐ যে বললুম, তুমি বুঝবে না। সাহেবরা ইংরেজীতে ডেলি ন্যুজ পেপার বার করে, কখনো দেকোচো? লোকে সকালে জলখাবার খেতে বসার আগেই ফেরিওয়ালারা বাড়ি বাড়ি সেই কাগজ দিয়ে যায়। আমি এবার সেই রকম বার কচ্চি, বাংলা ডেলি ন্যুজ পেপার। তার নাম 'পরিদর্শক'।

এবারেও কিছু হৃদয়ঙ্গম হলো কিনা বোঝা গেল না. সরোজিনী তার স্বামীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো।

বস্তুত নবীনকুমারের এই নতুনতম উদ্যমটি দেখে তার পরিচিত সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেছে। পত্র-পত্রিকার ব্যাপারে নবীনকুমারের আগ্রহ সেই কৈশোর থেকেই। কোনো পত্রিকাই বন্ধ হয়ে যাক, সে সহ্য করতে পারে না। আর্থিক অনটনে কোনো পত্রিকা উঠে যাবার উপক্রম হলেই নবীনকুমার সেটি কিনে নিয়ে আবার চালু করে দেয়। এমনকি একবার 'দূরবীন' নামে একটি উর্দু পত্রিকার সঙ্কটদশার কথা শুনে নবীনকুমার তৎক্ষণাৎ সেই পত্রিকাটি ক্রয় করে তার এক মুসলমান বন্ধুকে সেটি আবার দিয়ে দেয় চালা[illegible] জন্য। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুবিখ্যাত তত্ত্ববো[illegible] পত্রিকাকেও সে একটি মুদ্রণ যন্ত্র কিনে উপ[illegible] দিয়েছে। কিন্তু এবারের ব্যাপারটি সব কিছুকে ছা[illegible] যায়। দুই ব্রাহ্মণ মিলে পরিদর্শক নামে এ[illegible] উচ্চাকাঙ্ক্ষী পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং কয়েক [illegible] পরেই তাদের সামর্থ্যে ও উৎসাহে ভাঁটা পড়ে। নব[illegible] কুমার অমনি সেই পত্রিকার স্বত্ব কিনে নিয়েছে, [illegible] এটা সে নিজেই চালাতে চায় দৈনিক পত্রিকা হিসে[illegible] বাংলায় আবার দৈনিক পত্রিকা, তাও একুশ ব[illegible] বয়েসের যুবক তার সম্পাদক! এ যে ঈশ্বর গ[illegible] মশাইকেও টেক্কা দেবার চেষ্টা।

পত্রিকাটির প্রকাশ কবে থেকে শুরু হবে [illegible] ঠিক নেই এখনো, তবে কয়েকদিন ধরেই প্রবলভ[illegible] সেই পত্রিকা সংক্রান্ত হিসেব নিকেশ চলছে। সকলে[illegible] ধারণা, নবীনকুমারের যখন একবার ঝোঁক চেপে[illegible] তখন ও পত্রিকা সে বার না করে ছাড়বে না। একদি[illegible] মহাভারত অনুবাদের মতন বিশাল কাজ, অন্যদি[illegible] দৈনিক পত্রের প্রকাশ!

নবীনকুমার সরোজিনীকে দৈনিক পত্রের ব্যাপা[illegible] বোঝাবার চেষ্টা করছিল, মধ্য পথে হঠাৎ সরোজি[illegible] বললো, আমি একটা কতা জিগ্যেস করবো?

—বলো।

—আপনি কুসোমদিদির বেথা জন্য কত ব[illegible] বলেচিলেন, কত আপনার উৎসাহ, সেই কুসোমদি[illegible] আমাদের এ বাড়িতে বউঠান হয়ে এলো, আর আপ[illegible] তার সঙ্গে একটাও কথা বলেন না কেন?

প্রসঙ্গটির আকস্মিকতায় নবীনকুমার থমকে গে[illegible] চক্ষু তারকা দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার। নিস্ব[illegible] যেন স্তব্ধ হয়ে গেল।

তারপর সে বললো, তোমার কুসুমদিদির বি[illegible] হবার দরকার ছেল, বিয়ে হয়েচে ...ভালো হয়েচে[illegible] আমরা সবাই খুশী হয়িচি...

—আপনি কুসোমদিদি-বউঠানের সঙ্গে একদি[illegible] কতা বললেন না...এ বাড়িতে এলো...

—আমি কাজে ব্যস্ত, আমার এখন কারুর সঙ্গে[illegible] কতা বলার সময় নেই। তোমার সঙ্গেও তো ক[illegible] কইতে পারি না।

—কুসোমদিদি-বউঠান সুধোচ্ছিলেন, উনি আপনা[illegible] কী বলে ডাকবেন, ঠাকুরপো না আগের মত[illegible] মিতেনীর বর?

—ওনার যা খুশী তাই ডাকবেন...আমি কী জানি[illegible]

—আপনি তা'লে আজও এখন শুতে যাবেন না[illegible] আমি যাই?

—যাও!

সরোজিনী চলে যাবার পর নবীনকুমার খানিকক্ষ[illegible] বিবর্ণ মুখে গুম হয়ে বসে রইলো। তারপর থর[illegible] করে কাঁপতে লাগলো তার শরীর, ঠিক অত্যধি[illegible] জ্বরতপ্ত রোগীর মতন। চেয়ার থেকে নেমে সে ভূঁয়ে[illegible] ওপর শুয়ে পড়লো টানটান হয়ে। তার শরীরে[illegible] একেবারে অতল থেকে কাতর শব্দ বেরিয়ে আসে[illegible] লাগলো, আঃ! আঃ! (ক্রমশ[illegible]

## জগদীশ গুপ্ত অনুপস্থিত

জগদীশ গুপ্তের সঙ্গে আমার যখন প্রথম দেখা হয় আমি তখন স্কুলের ছাত্র। টিফিনের পয়সা জমিয়েও তখন বই কিনতে পারতাম না। কারণ বাড়ি থেকে টিফিনের পয়সা পেতামই না। লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে যারা পুরনো বই-পত্রিকা, শিশি-বোতল ঝোলা ভরে কিনে আনে, টালাগঞ্জ বাজারের কাছে এ রকম কিছু ফেরিওয়ালার আস্তানা ছিল, এখনও আছে। তাদের কাছ থেকে পুরনো দু-একখানা বই-এর সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার একটা পুরনো শারদীয় সংখ্যা পেয়েছিলাম। তার মধ্যে একটা গল্প ছিল। 'একটি পাপের কাজ' লেখকের নাম : জগদীশ গুপ্ত। আমাদের স্কুলের বাংলার মাস্টার মশাই-এর মুখে বা অন্য কারও কাছে এই লেখকের নাম তখনও শুনিনি।

গল্পটা পড়েই মনে হলো, এ ধরনের গল্প আগে পড়িনি তো। কিছুদিন পর আমাদের প্রতিবেশী দুর্গাদারা যখন তাদের ঘরদোর আরশোলামুক্ত করার জন্য পুরনো বই, কাগজপত্র ট্রাঙ্ক থেকে আলমারি থেকে বের করে রোদে দিয়েছেন তখন আবার জগদীশবাবুর সঙ্গে দেখা হলো। মলাট ছেঁড়া একটা বই-এর নাম : 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী', লেখক আবার সেই জগদীশ গুপ্ত। বইটি কয়েক দিনের জন্য ধার চাইতে দুর্গাদার স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলেন আর দুর্গাদা ইতস্তত করে বললেন, পড়ে আবার ফেরত দিস।

বইটা পড়ে ফেরত দেওয়ার সময় আমার এক বন্ধু যেমন সব বই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তেমনি জিজ্ঞেস করল, বইটা কেমন রে?

আমি কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী' বইটা ভাল কি ভাল নয় আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না। এ বইটা এ রকম নয় যে পড়তে মজা লাগে। পড়তে পড়তে মনে করুণ রসের সঞ্চার হয় এ রকমও নয়। টের পাচ্ছি, এই গল্পগুলোর মধ্যে এক ধরনের আক্রমণ আছে, যা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আমার মধ্যে নেই।

পরবর্তীকালে ঐ বইটির খোঁজ করেছি। কিন্তু ঐ সংকলনের মাত্র কয়েকটি গল্প নতুন করে পড়ার সুযোগ হয়েছে। বাকি গল্পগুলো জগদীশ গুপ্তের অনেক গল্পের মতোই এখন প্রায় দুষ্প্রাপ্য।

'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী'র নতুন করে পড়া গল্পগুলো সম্পর্কে আমার বর্তমান প্রতিক্রিয়া এভাবে প্রকাশ করা যায়, জগদীশ গুপ্তের গল্প মন ভরিয়ে দেয় না বরং যেন একেবারে নিঃস্ব করে যায়। জগদীশ গুপ্তের গল্প স্পর্শ করে বা চমকে দেয় বললে যেন ঠিক বলা হয় না, তাঁর গল্প আমাকে যেন বিমূঢ় করে রাখে। আমি নিজেকে বিপন্ন মনে করি।

কোন লেখক সম্পর্কে বাঙালী পাঠকরা যে ধরনের বিশেষণ ব্যবহার করতে ভালবাসেন, যেমন, দরদী, মরমী—এ সমস্ত কোনো বিশেষণ জগদীশ গুপ্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য [illegible] না মনে হয়। [illegible] একজন লেখক তাঁর কাজ [illegible]কে আঘাত [illegible] তিনি যে জনপ্রিয় হবেন না তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে?

জনপ্রিয় লেখা সম্পর্কে জগদীশ গুপ্তের ধারণাটা কি রকম? প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গল্প প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন : 'তাহার গল্পগুলিতে যে শান্তশ্রী এবং সরসতা আছে তাহা চিরকাল রসগ্রাহীর উপভোগ্য হইয়া থাকিবে। ....গভীর উদ্দেশ্য লইয়া নিজেকে বিশ্বসাহিত্যের সহিত সংশ্লিষ্ট মনে করিয়া কিংবা কোনো অন্তরগত কি ব্যবহারগত সমস্যা লইয়া তিনি অকুতোভয়ে গল্প লেখেন নাই। মানুষের অস্বস্থ অবস্থাটা যাহা চায় তাহাই তিনি তার মনের পাত্র পূর্ণ করিয়া [illegible] পরিবেশন করিয়াছেন। ..... সুখপাঠ্য রচনা [illegible] [illegible] এবং অবহেলার জিনিস নহে।'

কিন্তু জগদীশবাবু নিজে কখনও এ রকম 'সুখপাঠ্য' গল্প লিখতে আগ্রহী হয়েছেন বলে আমার জানা নেই। গল্পে 'শান্তশ্রী' বা 'সরসতার' চর্চাও তিনি করেননি। তাঁর গল্পপাঠে তথাকথিত 'মনের পাত্র' পূর্ণ হয়ে ওঠে না। বরং আমরা সব কিছু হারিয়ে যেন সর্বনাশের মুখোমুখি হই। তাঁর নিজেরই কথায় তিনি লিখেছেন, 'গভীর উদ্দেশ্য লইয়া নিজেকে বিশ্বসাহিত্যের সহিত সংশ্লিষ্ট মনে করিয়া কিংবা কোনো অন্তরগত কি ব্যবহারগত সমস্যা লইয়া.......অকুতোভয়ে।'

সেজন্য তাঁর একটি উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি লিখতে পারেন, 'ইহাতে প্লট নাই—আমার বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছি মাত্র, গল্প তৈরী আমার উদ্দেশ্য নয়।

'উপন্যাসসুলভ গল্পের বস্তুসংস্থান বা পরিপুষ্টি ইহাতে নাই।........তিনটি ব্যক্তির এবং এখানে একজনের আনন্দের উদ্ভব এবং লয় দেখান হইয়াছে। ঘটনা পরম্পরার সাহায্যে উহা দেখাইতে হইয়াছে। ঘটনাগুলিও পরস্পর বিচ্ছিন্ন ....

'.......উপন্যাস বা গল্পের সংস্কার অধীনে আনিয়া উহাদের বিচার না করিয়া প্রবন্ধ হিসাবেই যদি কেহ ইহাদের বিচার করেন তবে আমি বিস্মিত হইব না।'

অন্যত্র শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শেষের পরিচয়'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে জগদীশ গুপ্ত কঠোর মন্তব্য করেন : কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁর পাঠকবর্গকে চিনিতেন; তাঁহাদের তুষ্ট করিতেই তিনি সারদার সৃষ্টি করিয়াছেন। .... গল্পের যখন শুরু তখন সবিতার বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ—বলা চলে, সে প্রৌঢ়। রমণী ত অতি প্রৌঢ়। এই শ্লথ এবং লোল প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার যৌন আকর্ষণের বেগ পাঠকের মনে তেমন তীব্রতা জাগাইতে পারে না—সুতরাং একটি যুবক এবং একটি যুবতী চাই। পাঠককে স্পৃহাযুক্ত রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় সেই যুবক-যুবতী হইতেছে রাখাল আর সারদা।'

শরৎচন্দ্রের শেষের পরিচয় সম্পর্কে এই মন্তব্য পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ এখানে নেই কিন্তু জগদীশ গুপ্ত পাঠকদের 'তুষ্ট' করতে বা 'স্পৃহাযুক্ত' রাখার ব্যাপারে কখনও যত্ন নেননি, আমরা তা জানি। কোনো প্রকাশক তাঁর একটি উপন্যাস আকারে বাড়াতে আর 'অংশবিশেষ অপেক্ষাকৃত অধিক রসঘন' করে তুলতে বলেছিল। উত্তরে জগদীশবাবু বলেন, 'যে উপন্যাস যেখানে যখন সমাপ্ত হওয়া প্রয়োজন বেশী কোন কল্পনাশ্রী লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

তবে জগদীশ গুপ্তও মনে হয় পাঠকবর্গকে চিনতেন। 'সাহিত্য ক্ষেত্রে বিচরণশীল অনেকের কাছেই' তিনি যে 'অনুপস্থিত' তা তিনি নিজে তো স্বীকার করেছেন। মনে হয় সেজন্যই অহঙ্কারে অভিমানে তিনি "শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী" গল্প সংকলনটি "সমান ধর্মাদের উৎসর্গ" করেছেন।

'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী'র গল্পের ভাষা, ভঙ্গিতে আমাদের চোখে পড়বে লেখকের নির্লিপ্ততা এবং হয়তো কিছুটা নিষ্ঠুরতা। অনেক লেখকের গল্প বা উপন্যাস পড়তে গেলে আমাদের মনে হয় তাঁর চরিত্রদের সঙ্গে তিনি যেন একাত্ম, তাঁদের শোকে তিনি বিহ্বল হন, আনন্দে উচ্ছ্বসিত, কখনও আবেগে অস্থির। কিন্তু জগদীশ গুপ্ত যেন নিস্পৃহভাবে একটু দূরে থেকে চরিত্রদের দেখেন "তরঙ্গ হইতে তরঙ্গে" গল্পের বন্ধু সম্বন্ধে পাঠকদের তিনি অবহিত করেন এইভাবে : "স্ত্রী ধমক খাইয়া বন্ধুর মনে হইতো, এ-প্রকার সময় [illegible]দের সুতরাং ধমকে দুঃখের কী আছে?

"তারপরই সে জলের কথাও ভুলিয়া যাইতো ধমকের কথাও ভুলিয়া যাইতো, বহন করিবার মতো বিপুল বক্ষ বন্ধুর নাই।"

"কিন্তু প্রথমা স্ত্রী গুণবতীর কথা তার সমগ্র ভাবে মনে আছে—যেমন একটি পিণ্ডাকার অদ্ভুত বস্তুর কথা মানুষের দৈবাৎ মনে থাকিতে পারে।.. মনে থাকিতেই, যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলো... দ্বিতীয়া গিরিজাকে বিবাহ করিয়াও যে প্রথম গুণবতীকে ভুলিলো না.... এবং না-ভুলিতেই একটি পুত্র সন্তান গিরিজার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলো।"

জগদীশ গুপ্তের পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে 'নিস্পৃহতা', "নির্লিপ্ততা" নিয়ে হট্টগোলের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। অবজেক্টিভ দৃষ্টিভঙ্গির কথা অতি সাম্প্রতিক কালের আগে বিশেষ উচ্চারিত হয়নি। সেই অবজেক্টিভ দৃষ্টিভঙ্গি এবং নিস্পৃহ নির্লিপ্ততা জগদীশ গুপ্তের লেখায় যেন স্বাভাবিকভাবে বর্তমান। মনে রাখতে হবে তিনি কল্লোল যুগের অধিকাংশ লেখকের চাইতে ৮-১০ বছরের বড় ছিলেন এবং তাঁর প্রথম গল্প সংকলন 'বিনোদিনী' প্রকাশিত হয় আজ থেকে প্রায় তিপ্পান্ন বছর আগে অর্থাৎ বিশের দশকে।

একটু আগে জগদীশবাবুর দূরে থেকে নিজের চরিত্রদের দেখার কথা বলেছি।' এমন কি চরম সর্বনাশের বর্ণনার সময়ও তিনি যেরকম নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে যে ভাষায় পরিবেশ বা ঘটনার বিবরণ দেন তাতে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। "শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী"র অন্তর্ভুক্ত নয় এমন একটি গল্পে অবধারিতভাবে একটি বাচ্চা ছেলেকে তার বাবার উপস্থিতিতে কুমীরে ধরে নিয়ে যায়। গল্পের নাম : "দিবসের শেষে", ছেলের নাম : পাঁচু।

যে ভয়ংকর ঘটনার কথা বললাম, জগদীশ গুপ্ত কিভাবে তার বর্ণনা দিয়েছেন দেখুন : "এমন সময় তাহারই একান্ত সন্নিকটে দুটি সুবৃহৎ চক্ষু নিঃশব্দে জলের উপর ভাসিয়া উঠিলো; [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া উঠিলো, লেজটা একবার চমক দিয়া বিদ্যুদ্বেগে ঘুরিয়া গেল—এবং চক্ষের পলক না পড়িতেই পাঁচু জলে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেলো।"

"যখন ওপারের কাছাকাছি পাঁচুকে পুনর্বার দেখা গেলো তখন সে কুম্ভীরের মুখে, নিশ্চল।... জনতা হায় হায় করিয়া উঠিলো। পাঁচুর মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখের উপর সূর্যের শেষ রক্তরশ্মি জ্বলিতে লাগিলো....সূর্যকে তক্ষ্য নিবেদন করিয়া লইয়া কুম্ভীর পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেলো।"

জগদীশ গুপ্তের [illegible] আলোচনা প্র[illegible] অধ্যাপক আলিবরণ রায় যা[illegible] [illegible]ন "সরতামী শক্তি", মোহিতলাল মজুমদার যে প্রসঙ্গে [illegible] "একটা অতিশয় দয়াহীন ও দুর্জ্ঞেয় দৈব-নির্বাচনের

[illegible] ভাঙিয়াছে....মানুষ তাহারই যেন এক অসহায় শিকার"—এই লেখকের অধিকাংশ গল্পের এই যেন পটভূমি।

"শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী"র একাধিক গল্পেও আমরা দেখব ভয়ংকরের মুখোমুখি হওয়া, দেখব মানুষকে অসহায় শিকার হতে। দেখতে পাব, কন্তু কিভাবে "কালের সীমাহীন প্রাচীনত্বের আর জীর্ণতার সংগে একাকার হইয়া বিলীন হইয়া যাইতেছে....গিরিজা তার স্বাবিংশতি বর্ষের একটি অতি সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ স্থানের ভিতর ঘুরপাক খাইতেছে........।"

দেখতে পাব 'অপহৃত আকাশ-কুসুম' গল্পে উল্লাস চৌধুরীর "অতীত দিনের ভিতর মূর্ছিত সংজ্ঞা হঠাৎ ধড়ফড়াইয়া জাগিয়া উঠিলো...."

উল্লাস চৌধুরী অত্যন্ত বিবর্ণ হইয়া উঠিলো; নিজের কাছেই সে জানিতে চাহিলো, তবে কি আমি বুড়ো হয়েছি?"

জগদীশ গুপ্তের গল্পে (এবং উপন্যাসে) 'স্বভাবসিদ্ধ ইতর' আর 'কোমরবাঁধা শয়তানে'-এর অভাব নেই।

প্রসিদ্ধ দরদের সংগে নয়, মমতা ছাড়াই তিনি অশুভ শক্তির অধীন অভিশপ্ত, নির্বোধ—নানা প্রকৃতির মানুষের ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। তাঁর পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে নিষ্ঠুরতা, নির্বুদ্ধিতার অভাব নেই। তারা উচিত-অনুচিতের সমস্যায় অধীর হয় না। অনুশোচনায় অস্থির নয় তারা। এখানে মাটিকে মাটি বলেই দেখানো হয়েছে। কোনরকম ভাবালুতা প্রশ্রয় পায়নি। এইরকম জগদীশ গুপ্তের জগৎ। এই তাঁর সাহিত্যের অন্তর্গত বাস্তবতা।

কিন্তু যতই প্রশ্রয়হীন অনাত্মীয়ের মতো মুখ করে জগদীশবাবু তাঁর চরিত্রদের অজ্ঞতা, মূর্খতা, দুর্বলতা, সঙ্কীর্ণতার কথা বলুন না কেন, আমরা টের পাই তারা বড় অসহায় এবং পাঠক হিসেবে আমরাও কখন অবলম্বনহীন হয়ে পড়ি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে অন্ধকারের কথা আছে। কিন্তু তা প্রথম খুঁজতে বেরিয়েছিলেন জগদীশ গুপ্ত। তবে এই অন্ধকার, এই বাস্তবতাকে মানিকবাবু অন্য এক আদর্শের চশমা পরে দেখেছিলেন।

জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছিলেন, "সতেজ, সজীব লেখক, বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন। দুর্দান্ত সাহসে অনেক উদ্দীপ্ত গল্প লিখিয়াছেন। বয়সে কিছু বড় কিন্তু বোধে সমান তপ্তোজ্জ্বল।"

তিনি কোনদিন 'কল্লোলে'র অফিসে যাননি। "অনেকের কাছেই তিনি অদেখা হয়তো বা অনুপস্থিত....আধুনিক সাহিত্যের নদীতে তিনি একটা বড় রকমের বেগ।"

সাগরময় ঘোষ তাঁর "সম্পাদকের বৈঠকে" বইটিতে জগদীশ গুপ্ত কি করে লেখক হলেন তার একটা মজাদার গল্প বলেছেন।

(জগদীশবাবু) 'গলার স্বরটা কিঞ্চিৎ মৃদু করে বললেন—আমার গিন্নীই আমাকে লেখক বানিয়ে ছেড়েছেন।"

ব্যাপারটা হলো একদিন রেগে গিয়ে 'গৃহিণী বললেন, বলদ আর কি। চোখে দেখতে পাওনা রোজ সকালে কুঁড়েমি না করে নিজে গিয়ে হাট-বাজারটা করলেও দু পয়সা সাশ্রয় হয়।'

'আমার মাথায় বজ্রাঘাত।' এই বাজার টাজার জগদীশবাবুর ধাতে একদম সয় না। বোলপুরের বাজার তার বাড়ি থেকে মাইলখানেকের পথ। পথে ধুলো, বাজারে ভিড়ে লেপ্টালেপ্টি তার ওপর আছে এক পয়সা কমাবার জন্য দরাদরি করা। তা ছাড়া আদালতে যাওয়ার আগে সকালের সময়টাই তার নিজস্ব। তবু বাজারে যেতে-হয়। ফলে গিন্নীর দু-চার পয়সা সাশ্রয় করতে গিয়ে নিজের বিড়ি-সিগারেটের পয়সায় টান। দরাদরির ঝঞ্ঝাট এড়াতে নিজের পকেটের পয়সায় টান। পাশের বাড়ির মোক্তারবাবুর সঙ্গে [illegible] জগদীশবাবু, দরাদরি করে সস্তায় বাজার করছেন, শুনে সেই মোক্তারবাবুর স্ত্রী বাড়ির চাকরকে বরখাস্ত করে স্বামীকেই বাজারে পাঠাচ্ছেন। অন্যদিকে জগদীশ-বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে প্রায়ই বচসা। তার কেনা তরি-তরকারি গৃহিণীর আর পছন্দ হয় না। জীবনে যখন প্রায় কেজো ধরিয়ে দেবার উপক্রম, হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ...একদিন আদালত থেকে একগাদা নথিপত্র বান্ডিল বেঁধে বাড়ি নিয়ে এলাম।' স্ত্রীকে বলা হলো, "আদালতের কাজ। মামলা-মোকদ্দমা অনেক জমে গিয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের কড়া হুকুম। তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দেওয়া চাই।"

গিন্নী মানতেন জগদীশবাবু রাতে চোখে কম দেখেন। অতএব সকালেই এই কাজ করতে হবে। বাজার করার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল। কিন্তু "রোজ সকালে ঘন্টার পর ঘন্টা আদালতের নথিপত্র ঘাঁটা তারও তো মানসিক যন্ত্রণা কম নয়। শেষে বাধ্য হয়ে লিখতে শুরু করে দিলাম। রোজ সকালে বসে লিখি, গৃহিণী ভাবেন কর্তা আমার আপিসের কাজে কী খাটাই না খাটছেন।

লিখতে লিখতে একদিন নিজেই আবিষ্কার করলাম যে একটা ছোটোগল্প লিখে ফেলেছি। গিন্নীকে না জানিয়ে গোপনে লেখাটা পাঠিয়ে দিলাম পত্রিকার সম্পাদকের নামে এবং তা যথা-সময়ে প্রকাশিত হল।"

বাংলা ভাষার একজন প্রধান লেখকের যাত্রা শুরু হলো। কিন্তু তাঁর প্রথম বই "বিনোদিনী" পাঠক-ক্রেতাদের কিরকম সম্বর্ধনা পেয়েছিল? "বিনোদিনী" ছাপানোর টাকা কোনো এক কানুবাবু দিয়েছিলেন। বইটির কয়েক কপি "এঁকে-ওঁকে" দেওয়া হলো। 'অবশিষ্ট হাজারখানেক বই আমার আর কানুবাবুর 'বিনোদিনী' প্যাকিং বাক্সের ভিতর রহিয়া গেল; পরে কীটে খাইল।'

জগদীশবাবুর প্রথম বই যে কীটের খাদ্য হয়েছিল তাতে আমরা খুব বিস্মিত হই না। মনে হয় জগদীশবাবুও হননি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের একটি লেখা প্রসংগে তাঁর মন্তব্য: তিনি একটি অকপট সত্য অতি সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন, জগদীশবাবু সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণশীল অনেকের কাছেই 'অনুপস্থিত'। 'অনুপস্থিত' শব্দটি আমার সঙ্গে পাঠকের যোগাযোগটি চমৎকার নির্বিষভাবে দেখাইয়া দিয়েছে।

পাঠকদের কাছে তাঁর অনুপস্থিতির কথা জগদীশবাবু জানতেন। তবু 'বিনোদিনী'র বছর আট পরে প্রকাশিত 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী'র উৎসর্গ-পত্রে সমান ধর্মার কাছে পৌঁছনোর স্বাভাবিক কামনা ব্যক্ত হয়। এই উৎসর্গের প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর পরেও আমরা দেখতে পাচ্ছি পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। কেউ বলতে পারেন, কাল নিরবধি ইত্যাদি। কিন্তু পাঠক সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা আমাকে বেশী আশাবাদী হতে শেখা[illegible]।

সুব্রত সেনগুপ্ত

---

## পরমানন্দ সরস্বতী

বিশিষ্ট কবি মৃণালকান্তি দাশ, যিনি একদা বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় মৃণাল-কান্তি নামে কবিতা লিখতেন, সম্প্রতি করিমগঞ্জে ৬৫ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি সাধক জীবনে প্রবেশ করেন এবং শ্রীমৎ পরমানন্দ সরস্বতী নামে পরিচিত হন। দীর্ঘকাল তিনি এই নামেই 'কবিতা' লিখেছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং সুজয় ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং নিয়মিত 'কবিতা' ও 'নিরুক্ত' পত্রিকাতে কবিতা লিখতে থাকেন। তাঁর সর্ব প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আকাশ' প্রায় চার দশক পূর্বে প্রকাশিত হয়। সেই থেকে এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় কুড়িটি গ্রন্থ বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে 'দিগন্ত' 'উত্তর বসন্ত', নির্জন স্বাক্ষর প্রভৃতি।

# মস্কো অলিম্পিকস এবং ভারত দল

চার বছর আগে মন্ট্রিয়লে একুশতম অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধন হয়েছিল ১৭ জুলাই তারিখে। পনেরো দিন ধরে বিশ্ব খেলাধুলার মহাযজ্ঞের পর পয়লা আগস্ট সমাপ্তি অনুষ্ঠানে কাঁটা পরিবেশের মধ্যে বিশাল স্টেডিয়ামে আলোর রেখায় ফুটে উঠেছিল বিদায় বাণী—"বিদায় মন্ট্রিয়ল, চার বছর পরে আবার আমরা মিলিত হব মস্কোয়"। তখন স্টেডিয়ামের দুদিকের পর্দার উপর চলছিল বলশয় ব্যালে নৃত্য। টেলিভিসনে মস্কো থেকে মন্ট্রিয়লে সরাসরি প্রতিফলিত।

ঠিক চার বছর পরে ১৯ জুলাই তারিখে মস্কোয় বাইশতম অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধন। অলিম্পিকের প্রতিযোগী, পরিচালক ও পূজারী সবাই কি মস্কোয় মিলিত হতে পারছেন? কিংবা সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মন্ট্রিয়লের মেয়র জিন দ্রেপোর কাছে পঞ্চ বলয়শোভিত যে অলিম্পিক পতাকা গচ্ছিত রাখা হয়েছিল, প্রথা অনুযায়ী সেই পতাকা কি জিন দ্রেপো মস্কোয় এসে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতির হাতে দিতে পারছেন? সহজ উত্তর—না।

রাজনীতির দুষ্ট কীট অলিম্পিকের মঙ্গল দেহে অনুপ্রবেশ করে তাকে কুরে কুরে খেতে শুরু করেছে: আজ থেকে নয়, অনেকদিন থেকে। তবে ১৮৯৬ সালে আধুনিক অলিম্পিক গেমস শুরু হওয়া থেকে এবারের মত এমন আঘাত কোনদিন আসেনি। সাদা ও কালো চামড়ার মানুষের মধ্যে বিভেদের প্রশ্নে মন্ট্রিয়ল গেমসও বয়কট করেছিল আফ্রিকার ২৮টি দেশ। এবার আফগানিস্তানে সোভিয়েট রাশিয়ার সামরিক হস্তক্ষেপের ফলে রাজনৈতিকভাবে অলিম্পিক গেমসের উপর প্রচণ্ড ধাক্কা দিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান নেতা মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী জিমি কার্টারের বয়কটের ডাকে সাড়া দিয়ে ৪২টি দেশ মস্কো অলিম্পিকে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে। ২০টি দেশ আমন্ত্রণে সাড়া দেয়নি। ৮৩টি দেশ অংশ গ্রহণ করছে।

অবশ্য ৯ জুলাই পর্যন্ত এন্ট্রি পাঠাবার সুযোগ দেওয়া হয়। আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েট সৈনারাও দেশে ফিরতে শুরু করে। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিবেশে আর কোনো দেশ মত পরিবর্তন করে মস্কো না গেলেও অলিম্পিকের জাঁকজমক এবং ব্যাপকতায় ঘাটতি পড়ার কোনো কারণ নেই। ঘাটতি পড়বে দলগত ও ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার উৎকর্ষে।

আগের ১৮টি অলিম্পিকে (তিনবার অলিম্পিক হয়নি) যত দেশ যোগ দিয়েছে সে তুলনায় ৮৩টি দেশের যোগদান নিশ্চয়ই কম সংখ্যা নয়। তবে বয়কটকারী দেশগুলির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী এবং জাপান নিঃসন্দেহে খেলাধুলায় তিন অগ্রণী দেশ। মন্ট্রিয়লে এই তিনটি দেশ যথাক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান দখল করেছিল। সোনা-রূপো-ব্রোঞ্জের পদক তালিকা ছিল : যুক্তরাষ্ট্র (৩৪+৩৫+২৫=মোট ৯৪), পশ্চিম জার্মানী (১০+১২+১৭=মোট ৩৯) এবং জাপান (৯+৬+১০=মোট ২৫)। পদক তালিকায় শীর্ষে ছিল সোভিয়েট ইউনিয়ন (৪৭+৪৩+৩৫) এবং দ্বিতীয় স্থান দখল করেছিল পূর্ব জার্মানী (৪০+২৫+২৫)।

তাইওয়ানের সঙ্গে দ্বন্দ্ব শুরু হবার পর থেকে চীন অলিম্পিকে যোগ দিচ্ছে না। এবার চীনের অংশ গ্রহণের কথা ছিল। তারাও বয়কটের শামিল হয়েছে। সুতরাং, খেলাধুলায় তারা কতটা এগিয়ে গেছে তা জানারও সুযোগ মিলল না। বয়কট আন্দোলনে অগ্রণী যুক্তরাষ্ট্রের বহু মিত্র দেশ অলিম্পিক আদর্শের জন্য মস্কোয় দল পাঠালেও পাঠাচ্ছে ভাঙাছেঁড়া দল। যেমন গ্রেট ব্রিটেন, হল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড হকিতে এবং আর কিছু অপ্রধান খেলায় প্রতিযোগিতা করবে না। নিউজিল্যান্ড পাঠাচ্ছে মাত্র ৪ জনের এক প্রতীকী দল। তাই সামগ্রিকভাবে খেলার আকর্ষণ কম হবেই।

বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের মিলনযজ্ঞে পৃথিবীর যুবক-যুবতীদের মিলিত করতে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি কোনো চেষ্টারই ত্রুটি করেনি। আই ও সি-র সভাপতি লর্ড কিলানিন মস্কো এবং ওয়াশিংটনেও দৌড়োদৌড়ি করেছেন। কথা বলেছেন, সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভ এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট কার্টারের সঙ্গে। কিন্তু কাউকে টলাতে পারেননি। দুঃখ করে কিলানিন বলেছেন—"আমরা বাস করছি পাগল পৃথিবীতে"।

সত্যিই পৃথিবীতে পাগলের অভাব নেই। এবং বড় বড় মানুষরাই বেশি পাগল। তাই তো যেটা "গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ" তার উপর এত বড় আঘাত।

**ভারতের প্রতিযোগী**

প্রথমে বলা হয়েছিল, মস্কো অলিম্পিকে যাবে পঞ্চাশ-বাহান্নজন প্রতিযোগীর এক ভারত দল। বিভিন্ন ফেডারেশন প্রতিযোগীদের নাম সুপারিশ করার পর নিখিল ভারত ক্রীড়াপর্ষদ ১০ জন কর্মকর্তা সহ ৭৫ জনের ভারতীয় দলের অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের কাছে সুপারিশ করেন। পরে দরবার করে আরও কয়েকজন প্রতিযোগী ও কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সংখ্যা আরও বাড়বে কিনা জানি না। এই লেখাটা তৈরি করার সময় পর্যন্ত ঠিক আছে ৯১ জনের ভারত দল মস্কো যাবে। বিভিন্ন দলে প্রতিযোগী সংখ্যা দেওয়া হল :

পুরুষ হকি খেলোয়াড়—১৬ জন, মেয়ে হকি খেলোয়াড় ১৬ জন, পুরুষ বাস্কেটবল খেলোয়াড় ১২ জন, অ্যাথলীট ১০ জন (পুরুষ—৮, মেয়ে—২), কুস্তিগীর—৫ জন, বক্সার—৩ জন, শ্যুটার—২ জন, ভারোত্তোলক—২ জন, ও ইকোয়েস্ট্রিয়ান ৫ জন। এ ছাড়া কোচ, ম্যানেজার, আই ও এ-র কর্মকর্তা মোট ২০ জন।

মোট এই ৯১ জনের মধ্যে ইকোয়েস্ট্রিয়ান দলের (৫ জন প্রতিযোগী, ২ জন কর্মকর্তা এবং ৫টি ঘোড়ার যাতায়াত) খরচ সরকার দেবেন না। একজন অ্যাথলীট কোচেরও নয়। সরকার বহন করবেন ৮৩ জনের খরচ।

চার বছর আগে মন্ট্রিয়ল অলিম্পিকে ভারত পাঠিয়েছিল মাত্র ২৬ প্রতিযোগীর দল। ১৬ জন হকি খেলোয়াড় এবং অ্যাথলীট শ্যুটার, বক্সার ও ওয়েটলিফটার নিয়ে মোট ২৬ জন।

ফল আমরা সবাই জানি। ভারতকে মন্ট্রিয়ল থেকে শূন্য হাতে ফিরে আসতে হয়েছিল। ৪৮ বছরের মধ্যে সর্বপ্রথম। ১৯০০ সালে বে-সরকারীভাবে প্যারী অলিম্পিকে যোগ দিয়ে ভারতের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান প্রতিযোগী নর্মান প্রিচার্ডের পদক জয়ের কথা বাদ দিয়ে সরকারীভাবে ভারত অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করেছে ১৯২০ সাল থেকে। সেবার অ্যান্টোয়ার্প অলিম্পিকে এবং পরের বার ১৯২৪-এ প্যারী অলিম্পিকে ভারত কোনো পদক পায়নি। ১৯২৮ সাল থেকে প্রতি অলিম্পিকে ভারতের হকি দল পদক জিতে এসেছে। আর সঙ্গে ১৯৫২-এ হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে কুস্তিগীর কে ডি যাদব জিতেছিল একটি ব্রোঞ্জ পদক। ৭টি অলিম্পিকে সোনা জয়ী হকি দলের বিশ্বপ্রাধান্য খর্ব হলেও '৭২এ মিউনিখ অলিম্পিকেও পেয়েছিল ব্রোঞ্জ পদক। শুধু মন্ট্রিয়ল থেকেই ভারতকে শূন্য হাতে ফিরে আসতে হয়।

**হকিতেই পদক সম্ভাবনা :**

এবার ওই হকির সুবাদেই হাতে একটি পদক আসবে। হয়তো সোনার পদকই। কারণ, গেমস বয়কটের ফলে পাকিস্তান মস্কোয় যাচ্ছে না। গতবারের চ্যাম্পিয়ন নিউজিল্যান্ড, রানার্স অস্ট্রেলিয়া এবং গ্রেট ব্রিটেন ও নেদারল্যান্ডস গেমস বয়কট না করলেও হকিতে প্রতিযোগিতা করবে না। প্রতিযোগিতা করবে মাত্র ছয়টি দেশ। সোভিয়েট, স্পেন, পোল্যান্ড, ভারত, তানজানিয়া ও কিউবা।

এই ছয়টি দেশের মধ্যে স্পেন এক সময়ে হকিতে শক্তিশালী ছিল। এখন সাদামাটা দল। পোল্যান্ডও

তাঁই। জেনজালস্যা এবং কিউবার আন্তর্জাতিক হকিতে কোনো স্থানই নেই। ভয় শুধু রাশিয়াকে। কারণ, স্বদেশে এবং প্রি-অলিম্পিকে মস্কোয় রাশিয়ার কাছেই ভারতকে হার স্বীকার করতে হয়েছে। আর ভয় অ্যাস্ট্রো টার্ফের খেলায়। মস্কোয় হকি খেলা হবে অ্যাস্ট্রো টার্ফে, যে টার্ফে খেলতে ভারতীয়রা অভ্যস্ত নয়। তা ছাড়া, অ্যাস্ট্রো টার্ফে দৈহিক সামর্থ্য এবং গতিবেগে মার খাবারও আশঙ্কা আছে। অবশ্য তারুণ্যের উপর এবং ট্যালেন্টের উপর জোর দিয়েই ভারতের দল গড়া হয়েছে। তাই আশা করা যেতে পারে, তিনটি অলিম্পিকের পর ভারত আবার হকির স্বর্ণপদক পুনরুদ্ধার করবে।

হকি দলে যারা আছে :

**গোলকিপার**—বি এস ছেত্রী (বাংলা) ও অ্যালান সোয়েফিল্ড (সার্ভিসেস);

**ব্যাক**—রাজিন্দার সিং (রেলওয়েজ), দেবীন্দার সিং (পাঞ্জাব) ও ডুংডুং (সার্ভিসেস);

**হাফ ব্যাক**—গুরমেল সিং (পাঞ্জাব), রবীন্দার পাল (উত্তরপ্রদেশ), ভি ভাস্করণ—অধিনায়ক (রেলওয়েজ) ও এম এম সোমায়া (বোম্বাই);

**ফরোয়ার্ড**—চরণজিত কুমার (পাঞ্জাব), এম কৌশিক (বোম্বাই), অমরজিৎ সিং (ইউনিভার্সিটিস), সুরিন্দার সিং সোধি (পাঞ্জাব), মারভিন ফার্নাণ্ডেজ (ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস), জাফর ইকবাল (ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস), মহম্মদ শাহিদ (উত্তরপ্রদেশ)।

**কোচ**—বালকিষেণ সিং।

**মেয়েদের হকি**

অলিম্পিকে মেয়েদের হকি প্রতিযোগিতা হচ্ছে এই প্রথম। কয়েকটি দেশ গেমস বয়কট করায় ভারতের মেয়ে দলের অংশগ্রহণের সুযোগ ঘটেছে। মেয়েদের হকিতেও খেলবে ছয়টি দেশ—সোভিয়েত ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, ভারত এবং জিম্বোবওয়ে।

মাঝেসাজে বিদেশের মেয়ে হকি দল ভারত সফরে এলেও এবং ভারতের মেয়েরা বিদেশে খেলতে গেলেও হকিতে ইউরোপীয় মেয়েদের মত ভারতের মেয়েরা এখনো পটু হয়ে উঠতে পারেনি। কঠিন প্রতিযোগিতার জন্য যে প্রস্তুতি এবং অনুশীলন ও সাধনার প্রয়োজন তারও অভাব আছে। ভারতে মেয়েদের হকি খেলা এখনো শখের পর্যায়েই আছে। সুতরাং, ফল সম্পর্কে কেউই আশাবাদী নয়। দলে আছেন :

**গোলকিপার**—মার্গারেট তসকানো (রেলওয়েজ) হোতাক্ষি বাগলী বা রাজিয়া জাইদি (উত্তরপ্রদেশ);

**ব্যাক**—গঙ্গোত্রী ভাণ্ডারী (রেলওয়েজ), সুধা চৌধুরী (উত্তরপ্রদেশ), ও হরপ্রিত গিল (বিশ্ব-বিদ্যালয়);

**হাফ ব্যাক**—রেখা মুণ্ডাপন (রেলওয়েজ), রূপা সাইনি—অধিনায়িকা (পেপসু), ভারসা সোনী (রেল-ওয়েজ) ও গীতা সারিন (মহারাষ্ট্র);

**ফরোয়ার্ড**—এলিসা নেলসন, বলবিন্দার ভাটিয়া ও সেলমা ডিসিলভা (রেলওয়েজ), নার্সিলন মারসওয়ালা (মহারাষ্ট্র), প্রেম মায়া (উত্তরপ্রদেশ), লোরেন ফার্নাণ্ডেজ (বোম্বাই) ও নিশা শর্মা (পাঞ্জাব)।

**কোচ**—কর্তার সিং।

**অ্যাথলেটিকস :**

খেলাধুলোয়, বিশেষ করে অ্যাথলেটিকসে অগ্রণী দেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী ও জাপান মস্কো অলিম্পিক বয়কট করায় ভারতীয় অ্যাথলীটদের পদক সম্ভাবনা কি উজ্জ্বল হয়েছে? মোটেই না। কারণ, মন্ট্রিয়ল অলিম্পিকে দশম স্থানাধিকারীর যে মান ভারতীয় অ্যাথলীটদের ছাড়পত্র পাবার যোগ্যতামান ঠিক করা হয়েছিল নির্বাচিত ১০ জন অ্যাথলীটদের মধ্যে একজনও সে যোগ্যতামানে পৌঁছতে পারেনি। কেউ কেউ আবার দু বছর আগে ব্যাংকক এশিয়ান গেমসে যে ফল করেছিল ট্রায়ালে তার চেয়েও খারাপ ফল করেছে। সুতরাং, সোনা, রুপো ব্রোঞ্জের কথা বাদ দিচ্ছি। অষ্ট ধাতু দিয়ে গড়া ৮ রকমের পদক অষ্টম স্থানাধিকারী পর্যন্ত পাবে—যদি অলিম্পিকে এই ব্যবস্থা থাকত তা হলেও ভারতের কোনো অ্যাথলীটের পদক পাবার সম্ভাবনা থাকত না। পৃথিবীতে নিত্য নতুন রেকর্ড হচ্ছে। অ্যাথলেটিকসের মান বাড়ছে। যে দেশের কোনো প্রতিযোগী দশম স্থানাধিকারীর যোগ্যতায় পৌঁছতে পারে না সে দেশের অ্যাথলীটদের অলিম্পিকে পাঠানো শুধু নীতি ও আদর্শের খাতিরে—"জয়লাভ নয়, অলিম্পিকে অংশগ্রহণই বড় কথা"—এই নীতির তাৎপর্যে বিশ্বাস রেখে।

অবশ্য অলিম্পিকে যেয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন এবং অনুপ্রেরণা লাভের একটা বাড়তি মূল্য আছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও অনুপ্রেরণা তো তাদেরই প্রয়োজন, যারা বয়সে তরুণ এবং আগামী দিনের আশা। ভারতের অ্যাথলীট দলে কিন্তু প্রায় বাতিলের সংখ্যাই বেশি। স্থানাভাবে পরিসংখ্যান দেওয়া গেল না। না হলে দেখিয়ে দেওয়া যেত, প্রায় প্রত্যেকেই আগের মানের চেয়ে নির্বাচনী ট্রায়ালে কত খারাপ ফল করেছে।

অত্যন্ত লজ্জার কথা, ৬০ বছর অলিম্পিকের মধ্যে থেকেও ৬০ কোটি মানুষের দেশ ভারত অ্যাথলেটিকসে অলিম্পিক থেকে একটিও পদক আনতে পারেনি। অথচ ছোট ছোট দেশের অ্যাথলীটরা দু হাত ভরে পদক কুড়োচ্ছে।

**অ্যাথলেটিক দলে আছে :** শ্রীরাম সিং (৮০০ মিটার দৌড়), হরিচাঁদ (১০ হাজার মিটার দৌড়), বাহাদুর সিং (শট পাট), পি সুব্রাহ্মনিয়াম (২০০ মিটার দৌড়), সন্ত কুমার (১৫০০ মিটার দৌড়), গোপাল সাইনি (৫ হাজার মিটার দৌড়), রঞ্জিত সিং (২০ কিলোমিটার হাঁটা), শিবনাথ সিং (ম্যারাথন দৌড়)।

**(মেয়ে)**—পি টি উষা (১০০ মিটার দৌড়) ও গীতা জুৎসি (৮০০ মিটার দৌড়)।

**কোচ**—যোগীন্দার সিং সাইনি।

**অন্যান্য দল**

বাস্কেট বল, বক্সিং, ভারোত্তোলন, কুস্তি, শ্যুটিং এবং ইকোয়েস্ট্রিয়ানে ভারতের কেউ মস্কো থেকে পদক আনতে পারবে এমন সম্ভাবনা নেই। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিযোগীর চোট আঘাতের ফলে কিংবা অন্য কোনো কারণে যদি কেউ একটি পদক পেয়ে যায় তবে পৃথক কথা। মূলত এদের যাওয়া সেই নীতির প্রশ্নে এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়োজনে।

বাস্কেট বলে ভারতের অংশগ্রহণের সুযোগ এসে গেছে যোগ্যতা অর্জনকারী এশিয়ার তিনটি দেশ চীন, জাপান ও ফিলিপিনস গেমস বয়কট করায়।

শ্যুটার রণধীর সিং মন্ট্রিয়লে ট্র্যাপে পেয়েছিলেন ২১তম স্থান। ব্যাংকক এশিয়ান গেমসে অবশ্য সোনা জিতেছিলেন। কিন্তু এশিয়ান গেমস আর অলিম্পিক গেমসের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। হ্যাঁ, ত্রিশ-বত্রিশটি দেশ অলিম্পিক বয়কট করা সত্ত্বেও।

কোন্ কোন্ স্পোর্টসে ভারতের কারা প্রতিনিধিত্ব করবেন নীচে নাম দেওয়া হল।

**বাস্কেটবল দল :** পরমজিৎ সিং হনুমান সিং, আজমীর সিং, জড়োয়ার সিং (রাজস্থান), পরমদীপ সিং, বলদেব সিং (পাঞ্জাব), জি দলীপ (কর্ণাটক), দরভজন সিং, ডি পি ইরানী (বিহার), অমরনাথ (তামিলনাড়ু), টি এস সাধু, রাধেশ্যাম (সার্ভিসেস)।

**কোচ**—ক্যাপ্টেন রাজন।

**বক্সিং দল :** বি এস থাপা (লাইট ফ্লাই ওয়েট), অমল দাস (ফ্লাই ওয়েট) ও জি মনোহরণ (ব্যান্টাম ওয়েট);

**কোচ**—ওমপ্রকাশ।

**ভারোত্তোলক দল :** ই করুণাকরণ ও এম তামিল সেলভান।

**কুস্তি দল :** মহাবীর সিং (৪৮ কিলোগ্রাম গ্রুপ), অশোক কুমার (৫২ কিলোগ্রাম গ্রুপ), জগমিন্দার সিং (৬৮ কিলোগ্রাম গ্রুপ), কর্তার সিং (৯০ কিলোগ্রাম গ্রুপ) ও রাজিন্দার সিং (১০০ কিলোগ্রাম গ্রুপ)।

**শ্যুটিং দল :** কানাই সিং ও রণধীর সিং।

**ইকোয়েস্ট্রিয়ান দলে**—পাঁচজন প্রতিযোগী (লেখার সময় পর্যন্ত নাম জানা যায়নি)।

মুকুন্দ

## আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **বই**

**ভারতের সঙ্গীতগুণী**। দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট। কলকাতা-৭০০০৭৩। প্রতি খণ্ড ১৫.০০ টাকা।

বাংলা তথা ভারতীয় সঙ্গীতের কয়েকটি ইতিহাস রচিত হলেও শিল্পীদের সম্পর্কে বিশদ তথ্য খুব বেশি পাওয়া যায় না। দীর্ঘদিনের ভারতীয় রাগসংগীত ঘরানা পরম্পরায় সুসংবদ্ধ ও পরিণত হয়েছে কণ্ঠ ও যন্ত্রের যুগল মাধ্যমে। তারই শুশ্রূষায় বিকশিত হয়েছে প্রাদেশিক ভাষাগানের বাণী ও রূপ। আজ বস্তুমুখী মন নিয়ে এই ভাবগ্রাহী শিল্পের বিবর্তনের ইতিহাস উন্মোচন এবং শিল্পীদের জীবনবৃত্তান্ত ও সাধনার ধারাপরিচয় লাভ প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। তা ছাড়া চিরকালের ভারতীয় মন শিল্পীর ব্যক্তিপরিচয়ের চেয়ে উৎসাহী ছিল শিল্পের রসাস্বাদনে। ফলে পরবর্তী কালে কল্পনাবিলাসী ভারতীয় মন তৈরি করেছে নানা আজগুবী গালগল্প ও অসম্ভাব্য অতিনাটকীয় বিবরণ। বাল্মীকির উইয়ের ঢিবি, কালিদাসের গাছের শাখা কর্তন, তানসেনের গায়ে আগুন জ্বলে ওঠা—এ সবই সংস্কৃত কথাকাহিনীর ঐতিহ্যপুষ্ট নির্ভেজাল ভারতীয় সৃষ্টি।

সুতরাং গোড়াতেই স্বীকার করতে হবে দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় যে কঠিন ও আয়াসসাধ্য কাজে হাত দিয়েছেন তার সম্পূর্ণতা ও সর্বজন-স্বীকৃতি লাভ কঠিনতর। কয়েক খণ্ডে প্রকাশিতব্য এই গ্রন্থ পর্যায়ে ভারতের অগণন সঙ্গীতগুণীর (গায়ক-গায়িকা ও বাদক) মধ্যে বিখ্যাতদের তথ্য-নির্ভর জীবনী, সমকালীন সংগীত-ক্ষেত্রে তাঁদের স্থান, তাঁদের পূর্বাচার্য ও শিষ্যদের পরিচয় ইত্যাদি সংকলনের সাধু সংকল্প তিনি নিয়েছেন। এইসব শিল্পীদের আত্মপ্রকাশের কাল, দিলীপবাবুর ভাষায় 'আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ, সমগ্র উনিশ শতক এবং বিশ শতকেও বিস্তৃত। এই বিরাট কালপর্বের সীমাহীন পরিপ্রেক্ষিতে আপাতত তিনি দুই খণ্ডে প্রস্তুত করেছেন ষোলজন সংগীত-গুণীর জীবন-বিবরণ। সঙ্গে সংযোজন করেছেন তেরোজন গুণীর দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র। মুদ্রিত উপাদান ছাড়াও শিষ্যপ্রশিষ্যদের স্মৃতিকথা এবং অন্যান্য মৌখিক সূত্রও তিনি অবিরলভাবে ব্যবহার করেছেন জীবনী রচনায়। আলোচ্য দুই খণ্ডে ষোলজন গুণীর মধ্যে বেশ কজন খানদানী, আবার কেউ কেউ শিক্ষিত পটু, কেউ বা রূপজীবা। এর থেকে বোঝা যায় গুণের বিচারে লেখক শ্রেণীসচেতনতা রাখেন নি। সেটি তাঁর উদারমনস্কতার পরিচয় দেয়। তবে আমাদের প্রশ্ন জ্যাগ, গহরজান আর মানদাসুন্দরী কিংবা মৌজুদ্দিন আর মুরাদ খাঁ জাতীয় শিল্পীর গুণগত পার্থক্য ও উৎকর্ষের তরতম সম্পর্কে তিনি কতখানি সচেতন? মনে হয় ভারতীয় সঙ্গীতগুণীদের বিবরণ কালানুক্রমিকভাবে সাজালে ইতিহাস, সমাজ ও সংগীতবিবর্তনের ছবি অনেক বেশি স্পষ্ট হত।

এসব কথা উঠছে দুটি কারণে' প্রথমত লেখক প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন এবং তাঁর আন্তরিকতায় কোন খাদ নেই। দ্বিতীয়ত, এই গ্রন্থ ভবিষ্যতে লেখকের একক প্রয়াসে আরও অনেক খণ্ডে প্রকাশিত হয়ে সম্পূর্ণতা পাবে। এই দুই কারণে তাঁর দায়িত্ব এবং তাঁর প্রতি আমাদের আশা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হওয়া দরকার। তথ্য যাচাইয়ের উৎসাহ তাঁর আছে, নতুন তথ্য খুঁজে বার করবার সদিচ্ছা আছে কিন্তু সেই সঙ্গে আছে এক বিপজ্জনক প্রবণতা। তিনি বৈঠকী রম্যরচনার ঢং, এমন কি নাটুকেপনাকেও খুব বেশিরকম প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছেন। ফলে তাঁর বিবরণে প্রখ্যাত হিন্দুস্থানী কলাবৎ বাংলা সিনেমার সংলাপের ঢঙে হিন্দী উর্দু মেশানো বাংলা বলেন। যেমন অবাঙালী মালকাজান (আগ্রাওয়ালী) অবাঙালী ফৈয়াজ খাঁকে বলেন 'খাঁ সাব, আপনি আমার মেহমান... তাই জিজ্ঞেস করছি, আপ খামোশ কাহে? আপনার কি তকলিফ আমায় বলুন।' ফৈয়াজ বলেন, 'বেফিকর রহিয়ে। আমার মন খারাপ হয়ে আছে অন্য কারণে।' এর চেয়েও রোমাঞ্চকর দিলীপবাবুর কলমে গায়িকা কৃষ্ণভামিনীর সামনে ইংরেজ সাহেব হ্যালিডের সংলাপ। পাঠক, যেমন কল্পনা করছেন, ঠিক সেই সাধু ভাষা, বঙ্কিমের লরেন্স ফস্টর থেকে সব সাহেব যে' ভাষায় কথা বলেছে বাংলা সাহিত্যে। হ্যালিডে বললেন, 'আমি লালবাজার হইতে আসিতেছি। আপনার নামে রিপোর্ট আছে তাই আসিতে হইল।'

দিলীপবাবুকে অনুরোধ, এই গ্রন্থের ভবিষ্যৎ খণ্ডগুলি লেখবার সময় একটু সতর্ক হবেন। অতীত কালের মানুষগুলির মুখে সাদা বাংলা ভাষাই মানাবে। অতিকল্পিত উর্দু হিন্দী কিংবা কষ্টকল্পিত সাহেবী বাংলা বর্জন করা ভাল। সেই সঙ্গে তাঁকে যত্নবান হতে হবে অনুচ্ছেদ রচনার নিয়ম সম্পর্কে'। একটি করে বাক্যে একটি করে অনুচ্ছেদ রচনা (বিশেষ দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ১) ব্যাকরণ-সম্মত নয়। এ ছাড়াও বর্জন করতে হবে অবান্তর বিশেষণ প্রয়োগের ('স্ফুট গুঞ্জরণ' জাতীয়) দুর্বলতা, ভাষার এলায়িত ভঙ্গী এবং অতিকথনের ক্লান্তি।

'ভারতের সঙ্গীতগুণী' নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। জানা, অজানা, অল্পজানা, ষোলজন সঙ্গীতগুণী সম্পর্কে লেখক যে সনিষ্ঠ বস্তুসন্ধান করেছেন তা প্রশংসনীয়। বিশেষ করে

মোজ্‌দ্দিন ও লালচাঁদ বড়াল সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য আমাদের আনন্দিত করেছে। অমিয়নাথ সান্যাল পরিবেশিত মোজ্‌দ্দিন সংক্রান্ত তিনটি বক্তব্যের তিনি প্রতিবাদী তথ্য দিয়েছেন। সঙ্গীত-রসিকদের পক্ষে তা বিবেচনাযোগ্য। আমাদের দেশে সঙ্গীতের ঐতিহ্য-সচেতন বহু মানুষ আছেন। দিলীপ-কুমার মুখোপাধ্যায়ের বই তাঁদের সংগ্রহে নিশ্চয়ই স্থান করে নেবে। তবে আমাদের প্রত্যাশা তাঁর কাছে একটু বড় মাপের। জেরাল্ড আব্রাহাম বা র‍্যালফ হিল যেমন পাশ্চাত্য সঙ্গীতগুণীদের জীবনী লিখেছেন আমরা সেইরকম সম্পূর্ণাঙ্গ ও সুখপাঠ্য বই চাই। 'গ্রোভস ডিকশ্যনারি অব মিউজিক অ্যান্ড মিউজি-সিয়ানস' বইটির অত্যুচ্চ রচনাদর্শ গ্রহণ করলে তো কথাই নেই।

সুধীর চক্রবর্তী

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **চিত্রকলা**

## ভারততীর্থ

ঔপনিবেশিক খোঁয়াড়ী ভাঙ্গা যুগে একটা প্রশ্ন বারেবারে ওঠে শিল্পকলার প্রসঙ্গে, ভারতীয় ছবির সংজ্ঞা কি? ভারতবাসীর আঁকা ছবি মাত্রই কি ভারতীয়? না তার অন্য বিশেষত্ব আছে। আজ এত দেরীতে হলেও প্রশ্নটা জরুরী। আমার সঙ্গে জনৈক মার্কিন মহিলার পরিচয় হয়েছিল। তিনি ভারতীয় চিত্রকলার অধ্যাপিকা একটা ছোটখাটো মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। কথায় কথায় জানলাম, তিনি প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মুঘল আমল পর্যন্ত পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তারপর থেকে ভারতীয় শিল্পকলার ওপর বৈদেশিক প্রভাব পড়েছে। প্রশ্ন করলাম: কিন্তু গান্ধারের ওপর গ্রীক প্রভাব বা মুঘল চিত্রকলার ওপর পারসিক এবং প্রতীচ্যের প্রভাব তো সুবিদিত। তেমনি চীন জাপান এবং দূর-প্রাচ্যের ওপর বৌদ্ধ হিন্দু প্রভাব পড়েছে। ইউরোপীয় শিল্পকলার ওপরও তো মিশর, প্রাচীন মধ্য প্রাচী থেকে চীন, জাপান, আফ্রিকান শিল্প-কলার প্রভাব সামান্য নয়। বস্তুত বসবাস করার জন্যই হোক, বা যুদ্ধ এবং বাণিজ্য করার জন্য হোক মানুষ এক জায়গা থেকে যখন অন্য দেশে গেছে, তখন চিন্তাধারা, জীবনযাত্রা প্রণালী, ধর্ম এবং শিল্পকলা নিয়েই গেছে। আগন্তুক এবং বাসিন্দাদের পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাচীন-কালের জন্য এই সত্য যদি মেনে নি, তাহলে আধুনিককালের ব্যাপারে মানব না কেন? শিল্পকলার অভি-ব্যক্তি যুগোপযোগী এবং প্রাসঙ্গিক হচ্ছে কি-না—শুধু এই প্রশ্নটাই তোলা যেতে পারে। কালের তাগিদে যদি আমাদের শিক্ষাদীক্ষা জীবনযাত্রায় আধুনিকীকরণ ঘটে থাকে, সাহিত্যের রূপরেখা পালটে গিয়ে থাকে, তাহলে শিল্পকলার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটবে না কেন? ভারতপ্রেমী এবং শুচিবায়ু-

...তি সেই অধ্যাপকো ... ... ...দত্তর দেননি।

মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লক্ষ্মীনারায়ণ পাচোড়ীর সাম্প্রতিক একাদমী অব ফাইন আর্টসের প্রদর্শনীতে শুচিবায়ুগ্রস্তদের উল্লাস শুনেছি এবং দেখেছি আধুনিকপন্থীদের সিঁটকানো নাক। আমার মনে হয় প্রাচীন ঐতিহ্যের ব্যবহারে কেউ যদি পারদর্শী হন, তা হলে সেটা মেনে নিতে আমাদের দ্বিধার কোন কারণ থাকা উচিত নয়। মানিকবাবু রেশমী কাপড়ের ওপর জলরঙ ব্যবহার করেন এবং উইনসর ন্যুটন কোম্পানীর বিলাতী রঙও ব্যবহার করেন। অন্যদিকে তিনি আমাদের সমকালীন গ্রাম এবং ভারতীয় নিসর্গই আঁকেন সাবিক মাধুর্য মিশিয়ে। তাঁর জগৎ এবং দৃষ্টিভঙ্গী প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় নয়। অজন্তা বা মুঘলের মানসিকতার সঙ্গে তাঁর মিল নেই। করণকৌশলের মিল তাঁর ছবিকে লুপ্ত ধারার সঙ্গে একাত্ম করে দেয় না। ধুতি-পাঞ্জাবি পরলেই কেউ যেমন প্রাচীনপন্থী হন না। এবারের প্রদর্শনীতে মানিকবাবুর ভাই জীবনকৃষ্ণের "বনসাই" (জাপানী পদ্ধতিতে করা বামন গাছ) এবং ছবি ভিন্নতর আস্বাদ দিয়েছে।

মানিকবাবুর ছবির বুনোট রচনা করা, বিশেষত রেশমের সুতোর বুনোন এবং জোব্বা কাজে লাগানো, তুলির উল্টো পিঠ দিয়ে কাঁচা রঙকে মুছে তুলে নেওয়া—দারুণ একটা মজা তৈরী হয়েছিল। যদিও আরেকটু দ্যুতিময় চকচকে ঝকঝকে রঙ ব্যবহার করলে পারতেন। ম্লান কালচে রঙের প্রতি ঈষৎ মোহগ্রস্ত তিনি। কিন্তু তাঁর হাতে কি যাদুকরী ক্ষমতা। খড় বোঝাই নৌকা, বা তাঁবুর ভেতর বেদেদের জীবন, একটা কুকুর থেকে দিগন্তের মধ্যে উম্মুক্ত বক্ষ নদী, বা খেজুর রস পাড়ার দৃশ্য—তাঁর ছবিতে জনপদের মানুষজন তাদের আনন্দ আহ্লাদ আর দুঃখ নিয়ে এসেছে। তাঁর আকাশজোড়া কবিত্ব, দরাজ হাওয়ার মতো এসে, আমাদের ঝাঁকড়া মনটাকে ডালপালাসুদ্ধ আমূল নাড়া দিয়ে যায়। আমি বোধ হয় চিরকাল মানিকবাবুর মাটিঘেঁষা ছবির অনুরাগী থেকে যাব।

লক্ষ্মীনারায়ণ পাচোড়ী মানিকবাবুর শিষ্যসচিবসখা। সাধারণভাবে মন্দিরের স্থাপত্যভাস্কর্য, বিগ্রহ এবং তীর্থযাত্রীদের ছবি এঁকেছেন। সনাতনী ভারতবর্ষের একটা স্বাদ এসেছে। যদিও তাঁর ত্রিমাত্রিক পারিপার্শ্বিকতা এবং অদৃশ্য বিন্দুতে দৃশ্যের অবলুপ্তির জন্য তাঁর ভারতবর্ষের সঙ্গে ড্যানিয়েলদের দেখা ভারতবর্ষের মিল তৈরী হয়েছে। যদিও এবং সুখের বিষয় সবক্ষেত্রে নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মন্দিরের জ্যামিতিকে মোটামুটি ছবির জ্যামিতির সঙ্গে মেলাতে পেরেছেন। একটি জায়গায় পাশ থেকে দেখা দশাশ্বমেধ ঘাট এবং কন্যাকুমারীর রেলিঙ সুদ্ধ সমুদ্রের উচ্ছ্বাস এঁকেছেন ভাল।

...এদের ছাবর তিনটে প্রদর্শনী দেখে কিন্তু মনে হয় এবার স্বাদ পালটানোর সময় হলো।

সন্দীপ সরকার

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

## ইয়েহ ক্যাসা ইনসাফ

পত্নীর একমাত্র কর্তব্য ও ধর্ম কি শুধু পতির আজ্ঞাও ইচ্ছাবহ হয়ে থাকা?—এই প্রশ্ন নিয়ে রচিত আই ভি এস অচ্যুতাম্বার মূল উপন্যাসে কোট অবলম্বনে নির্মিত এই ছবি। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এর আবেদনও সর্বস্তরের মানুষের কাছে অনস্বীকার্য। প্রশ্নটির উপস্থাপনে যে কাহিনী গঠিত তা দুপুরুষ নিয়ে। প্রথম পুরুষে রাম (বিনোদ মেহরা) প্রেম করে বিবাহ করে কৃতবিদ্য গায়িকা মধুকে (শাবানা আজমি)। বোনের বিয়ে দিতে ঋণগ্রস্ত হওয়ার পরই রাম কুপিত হতে থাকে। ফলে বিচ্ছেদ। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হল পাওনাদারদের তাগাদায় উত্যক্ত কিন্তু চাকরিস্থল বদল এবং স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের সঙ্গেই যেন সে ঋণমুক্ত হয়ে গেল!

দ্বিতীয় পর্বে দেখা যায় যে সমস্যার জন্য রাম ও মধুর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে ঠিক একই সমস্যা দেখা দিল রামের কন্যা কিরণের (সারিকা) বিবাহের পর। পার্থক্য হল রাম তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে যায়, কিন্তু কিরণ পিতার দুর্দশার দিকটা আসলে না এনে স্বামীকে ছেড়ে থাকতে অনিচ্ছুক। আর সেই সূত্রেই রামের বিবেককে জাগিয়ে তুলে কিরণ পিতার সঙ্গে শৈশব থেকে তার হারানো মায়ের পুনর্মিলন ঘটায়। কিন্তু মজার ব্যাপার হল নারী ও পুরুষের যে সমানাধিকার নিয়ে রাম ও মধুর মধ্যে বিরোধ—অর্থাৎ স্ত্রীর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার—সে প্রশ্ন উবে যায় যখন কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে মধুকে বলতে শোনা গেল, 'পতির পদসেবাই স্ত্রীর একমাত্র ব্রত'!

অথচ এর আগে পর্যন্ত মধুকে বেশ এক মহীয়সী নারী রূপেই দেখানো হয়েছে। যে নিজে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করে নিজের ছোট ভাইকেই শুধু নয়, পরিচারিকার অনাথ পুত্র সুন্দরকেও (রাজকিরণ) উচ্চশিক্ষা দিয়ে মানুষ করে তোলে। মধু কৃতবিদ্য গায়িকা। সুতরাং

শাবানা আজমি

কিন্তু এছাড়াও ছিল হাঁকা থাকা ... রাখতে কোটা মত গান জুড়তে মূল ঘটনাস্রোতে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে দৃশ্যের দৃশ্য উপস্থাপিত করে অতিরিক্ত গান পরিবেশিত হওয়ায় আর সে-সব দৃশ্য এমন যা রূপকথাতেই মানাতে পারে। পরিচালক দাসারি নারায়ণ রাওয়ের কৃতিত্ব হচ্ছে রাম ও মধুর মানসিক বিরোধের ব্যাপারটা (কিছুটা স্থূল হলেও) নাটকীয় করে উপস্থাপনে সক্ষম হয়েছেন। সে-সব দৃশ্য দর্শকের মনে রেখাপাত করে মুখ্যত শাবানার অভিনয় গুণে। বিনোদ মেহরাকেও অন্য ছবির চেয়ে ভাল লাগবে। ভাল লাগবে শেষাংশে সারিকা ও রাজকিরণের অভিনয়ও। শশিকলাও আছেন যথাপূর্বং একটি দজ্জাল চরিত্রে। কে এস মানির ক্যামেরা দৃষ্টিকে তুষ্ট রাখার মত দৃশ্য পরিবেশনে সক্ষম হয়েছে। সুরযোজনায় এবং গীত রচনায় রবীন্দ্র জৈন তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও একটি পরিচ্ছন্ন ও নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে সুসংবদ্ধ ছবি উপস্থাপনে প্রযোজক ও পরিচালক সক্ষম হয়েছেন।

**পঙ্কজ দত্ত**

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি সংগীত

## ফিরে দেখা

বহু বাসনার, বহু প্রতীক্ষার, কড় উতরোল সেই দিনগুলো। দেশে তখন আকাল, চারিদিকে ক্ষুধার বিলাপ, ... নিয়ে এগিয়ে এলেন শিল্পী, সাহিত্যিক। অনেকে কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী না হলেও স্বীকার করতে বাধ্য হবেন, নাটক ও সঙ্গীতে আচমকা পথ পরিবর্তন করল। চেনা সড়কে নয়—নাটকে বাস্তবিকতা এবং গানে নানা ধরনের সার্থক পরীক্ষা। তখন আসরে খেলা যেত—তখন অনেকে হাততালি দিতে ভুলে যেতেন—বিস্ময়টা এমনই জাতের ছিল। অনেক সময় মনে হত চেনা পথটা এতদিন অচেনা ছিল। লোকসঙ্গীতের বিপুল ভাণ্ডার নিয়েই নূতনভাবে লোকের কাছে পৌঁছত। গণনাট্য আন্দোলনের শরিক তখন শুধু শহুরে বুদ্ধিজীবী নয়, গ্রামীণ শিল্পীরাও। হুগলীর দুলাল রায় নামকরা কীর্তনীয়া—তিনি নতুন কীর্তন বাঁধলেন—'ওরে চাষী ভাই/তোর আশায় জো লেগেছে/আজ ফসল বাড়ানো চাই।' ময়মনসিং-এর নিবারণ পণ্ডিত জারী ও পটের তান বাঁধলেন—গেলে হাট-বাজারে/ঘুরে ঘুরে জিনিস পাওয়া দায়/চাল মিলে তো ডাল মিলে না প্রায় সব জায়গায়।' কিংবা জারি গানে, 'হা রে ও কৃষক ভাই/চল সবে মিলে জোট বান্ধিরে সবারে জানাই/নইলে তো আর বাঁচবার উপায় নাই।' এইভাবে নতুন পদ্মপুরাণ, ভাওয়াইয়া, পাইত্যালি, ভাটিয়ালি, বাউল, বেদে-বেদেনীর গান, ছাদ পেটানোর গান নীলের গান, গম্ভীরা সব দেশজ সুরই নতুন বার্তা নিয়ে এল। শ্রমিকদের মধ্য থেকেও কাজরী, কাওয়ালী ঢংয়ে নতুন

বয়ে [illegible] আনে। [illegible] [illegible] ছাড়াও, লোকায়ত ভঙ্গীর কত নতুন রূপের গান, সুরের পরীক্ষা, নাট্য প্রয়োজনার নতুন ধর্ম, কাজে নাচের নতুন চিন্তা—যে সাংগীতিক ফসল ফলিয়েছে এখনও আমাদের গার্হিণী-বৃত্ত। নাটকে যে বাস্তবতার ধরতাই পাওয়া গেল এখনও তার বিস্তার কখনও বিলম্বিতে কখনও দ্রুতে কিংবা চৌদুনে। নির্দ্বিধায় বলা যায় তখনকার গণনাট্যের কর্মী বা সংশ্লিষ্ট শিল্পীরাই পরবর্তীকালে নতুন স্রষ্টা। উদাহরণ হিসাবে স্বীকৃত। সম্পূর্ণ তালিকা দিলে বা কাজের বিবরণ দিলে মনে হবে এক কাঁচা শোভাযাত্রা। যে উদ্দীপ্ত সময় গণনাট্যের কর্মকাল—সেই সময় এখন পালটে গেছে। যাঁরা রাজনৈতিক বদলের জন্য পথে নেমেছিলেন, আজ পরিবর্তিত পটভূমিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অনেকাংশেই তাঁদের হাতে। ফলে প্রশ্ন থেকেই যায় সংগ্রামের পর গঠনমূলক কাজে তাঁরা কতটা নিয়োজিত? ঠিক এই সময় পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন ছিল অত্যন্ত জরুরী, নেতাজী স্টেডিয়ামে দুই দিনের অনুষ্ঠানে সেকাল এবং একালের গণনাট্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এই সময় ফিরে দেখার সুযোগ পেয়ে আমরা রোমাঞ্চিত এবং বিষাদ-গ্রস্ত।

অনেকেই জানেন না ইকবালের সারে জাঁহাসে আচ্ছা'র সুর রবিশঙ্করের। গানটি এখন অবশ্য শিক্ষণীয় দেশাত্মবোধক গানের পর্যায়ভুক্ত। গানটি গণনাট্য সংঘের। এরকম আরও অনেক গান আছে যা দলমত নির্বিশেষে গাওয়া হয়ে থাকে। অনেক কংগ্রেসী জনসভার উদ্বোধন সঙ্গীত হিসাবে তৎকালীন গণনাট্য সংঘের গান শোনা যাচ্ছে। সার্থক সৃষ্টি এইভাবেই জাতি গোত্রের ঊর্ধ্বে চলে যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতে উজ্জীবিত জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের অনেক গান গীতিনাট্য আজও অনেক শিক্ষার্থী সমান মর্যাদায় শিখে থাকেন, সলিল চৌধুরীর পুরনো গান শেখার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠিত শিল্পীও আগ্রহী।

বিজন ভট্টাচার্য, বিনয় রায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের অনেক গান আজও গণনাট্য শিল্পীদের প্রেরণা। এটা শুধু বিগত দিনের জন্য স্বাভাবিক অনুরক্তি নয়। অনেক দিন আগের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, গোঁড়া রাবীন্দ্রিক পরিমণ্ডলে যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং কিছু কিছু নজরুল ছাড়া কিছু শুনতে বা করতে নারাজ ছিলেন—তৎকালীন আধুনিক তো নৈব-নৈবচ—তাঁরাও কিন্তু সাগ্রহে সলিল চৌধুরী বা গণনাট্যের গান শুনতে বা শিখতে চাইতেন—আদর্শের ভিন্নতা সত্ত্বেও। কারণ, ঐ নকশ, কথা ও সুরে একটি নতুন প্রবাহ পরিবর্তিত পটভূমিতে এখন কিন্তু সমকালীন গণনাট্যের শিল্পকর্ম সম্পর্কে সাধারণ তত আগ্রহী নন।

এই সম্মেলনে যখন সলিল চৌধুরী 'ও আলোর পথযাত্রী' 'ধন্য আমি জন্মেছি মা' কিংবা 'ও মোদের দেশবাসীরে' গানগুলি পরিবেশন করেছিলেন তখন যে হার্মনাইজেশন—তার চিহ্নমাত্র নেই। অথচ ঐ পরীক্ষাগুলি হয়েছিল কয়েক দশক আগে। কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকেও সঙ্গীতের নতুনতর পথের কথা তিনি চিন্তা করেছিলেন। প্রতিভার বৈষম্য সত্ত্বেও এখন সেই চিন্তাই অনুপস্থিত। সোজাসুজি গানের মধ্যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধরনে, 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা', কিংবা সেই মেয়ে'র মতো সম্প্রসারণ দুর্লভ। 'তোমার বুকের খুনের চিহ্ন খুঁজে' বা 'ঢেউ উঠছে কারা টুটছে'র মত গানের প্রেরণাও একালের গানে বিরল। পরবর্তীকালে সলিল চৌধুরীর ফিল্মের গান বা আধুনিক গানে অনেক পুনরাবৃত্তি আছে; কিন্তু এই সব গানে পুনরাবৃত্তি নেই। কারণটি সঙ্গত। ব্যবসায়িক জগতে ফরমুলার চাহিদা থাকে—প্রাণ থেকে উৎসারিত গানে নতুন নতুন বাঁক স্বতঃ উৎসারিত। কোন নেপথ্য চাহিদা সেখানে সংক্রমণ হয় না—ফলে বিদেশী অর্কেস্ট্রা থেকে ভাঙা সুরও আমাদের সাড়া জাগায়। আর একটি উদাহরণ এই প্রসঙ্গে দেওয়া যায়। সলিল চৌধুরী অন্যের কবিতায় সুর দিয়ে একটি এমন উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন যা আমাদের বাংলা গানের সম্পদ—কবিতা ছাড়াও গান হিসাবে আমাদের কাছে দীর্ঘস্থায়ী হবে (সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর 'অগ্নিকোণের তল্লাট জুড়ে' গানটি এখন অচ্ছুৎ কেন কে জানে) সেগুলি ছিল প্রাণের তাগিদে। পরবর্তীকালে সম্ভবত মাত্র একবারই তিনি মাইকেলের কবিতায় সুরারোপে সেই তাগিদ অনুভব করেছেন—কমার্শিয়াল জগতের এমনই মারীচ মায়া। বিনয় রায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, বিজন ভট্টাচার্য, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র প্রত্যেকের মধ্যে যে প্রাণের তাগিদ ছিল, তার বদলে আজ এসেছে প্রয়োজনের তাগিদ। এই প্রয়োজন ব্যবসার প্রয়োজন নয়, রাজনৈতিক প্রয়োজন—পুনরাবৃত্ত সুরে ও কথায় শুধুই স্টেটমেণ্ট। প্রবীর মজুমদার, অনল চট্টোপাধ্যায় বা অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁরা আজও কাজ করে চলেছেন—তাঁরা হয়ত পুরনো খাতা খুলে নিজেরাই অবাক হয়ে যাবেন—একদিন তাঁরা এই রকম ভাবতেন—রাত্রে হয়তো ভাবলেন কাল সকাল থেকে আবার নতুন করে ভাবতে হবে। সকালে টেলিফোন এল—এইচ এম ভি পুজো রিলিজে ছয়টি আধুনিক গান চাই—তখন চিন্তায় মাঠ নদী পাহাড় প্রান্তর গুটিয়ে নিয়ে একফালি চাঁদ, দুষ্টু হাওয়া, শাড়ির আঁচল, রজনীগন্ধা ফুলের মধ্যে মাথা কুটে মরে। গানের খাতার পুরনো পাতাগুলি আরও লালচে হতে থাকে। তবুও ব্যবসায়িক স্বার্থে অনেক নতুন পথ খুলে যায় কিন্তু শুধু বক্তব্যের জন্য সংবাদ-বিচিত্রাই হতে পারে—গানে নয়।

সুরের কথা ছেড়ে দিয়েও কথার দিক থেকে দিলীপ সেনগুপ্ত যখন লেখেন, 'তুফানে তুফানে উঠেছে আওয়াজ সইব না মোরা সইব না/ আজন্ম কাঁধে শোষণের চাকা বইব না' এবং আরও অনেক শব্দ, ইমেজ তখন অবশ্যম্ভাবীভাবে সলিল চৌধুরীর

আর একটি গান মনে করিয়ে দেয়, 'ভাঙরে ভাঙরে ভাঙ' গানে 'আলোর পথযাত্রী'র অনেক শব্দ, ইমেজ বিক্ষিপ্তভাবে ছিটোন, এরকম একালের অনেক গানের কথা ও সুর তুলে দেখান যায়—একালের শিল্পীরা সেকালের গানকে অভিধান হিসাবে ব্যবহার করেছেন—যৎসামান্য পুঁজি নিয়ে। তাই সলিল চৌধুরীর বাংলাগীতি বা হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'মাউন্টব্যাটেন কাব্য' কিংবা বিনয় রায় মঞ্জরী লোকগীতির ধরন—জলধরজী বা হারীন চট্টোপাধ্যায়ের বিস্ময়কর রূপান্তর সম্ভব হয়নি—চরিপদ কুশারীর 'মরণ শিয়রে দলাদলি করে' গানের মত প্রাণস্পর্শী গানও এই রূপান্তরিত অবস্থায় সৃষ্টি হয় না। স্বয়ং সলিল চৌধুরী 'কার ঘরে প্রদীপ জ্বলেনি' বা 'কার বাচ্চার দুধ জোটেনি' বহু গানে বহুভাবে ব্যবহার করেছেন—কিন্তু সবটা মিলিয়ে গান হয়েছে, কবিতা হয়েছে। এখন সেই শব্দ নিয়েও নতুন ভাবনা হচ্ছে না এটাই তফাত। একালের শিল্পীদের মধ্যে নরেন মুখোপাধ্যায় দরাজ গলার অধিকারী—কিন্তু মনু ঘোষের মত প্রাণের গান গাইবার সুযোগ তিনি পাননি। তাই তখনকার দিনের বিকেলে বি এন আর এর ফুলব্যাক মন্টু ঘোষ সন্ধ্যায় যেমন গণসংগীত করতেন, আজও প্রবীণ বয়সে সেটা করেন; কারণ, গান গাইতে তিনি উদ্দীপ্ত হন বলে। নরেন মুখোপাধ্যায় কি কয়েক বছর পরে এই গান নিয়ে ততটা উদ্দীপ্ত হতে পারবেন! তখনকার নৃত্যনাট্যে আজও শম্ভু

ভট্টাচার্য, অসিত চট্টোপাধ্যায়, ঋতু পাল, শক্তি নাগ অনেকের মন জয় করেছিলেন—কিন্তু একালের নৃত্যনাট্য 'স্বপ্নের দিন গোনা' শুধুই বিরক্ত। নাটক এই স্টেডিয়ামে সম্পূর্ণ দুষ্প্রাব্য হয়ে দাঁড়ায়। নাটকের ক্ষেত্রেও চল্লিশের দশকে—আগুন, জবানবন্দী, নবান্ন, ল্যাবরেটরি, হোমিওপ্যাথি, বাস্তুভিটা, —পঞ্চাশের দশকে দলিল, রাহুমুক্ত, কুলিয়াস ফুচিক, আজকাল, নীলদর্পণ প্রভৃতি অনেক স্মরণীয় নাটকের নাম করা যায়। ষাট দশকে কিমলিস, হারানের নাতজামাই, অগ্নিকাণ্ড, লেনা প্রভৃতি মাত্র কয়েকটি নাটকের নাম মনে আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে রবীন্দ্রনাথ, ম্যাক্সিম গোর্কি, চেখভ বহুপরীক্ষিত। পরবর্তী পর্বে এ সব নাটকে বরণীয় অনেকের জীবনটা পরিতক্ত। অবশ্য এই সময়ে গণনাট্যের

সঞ্জীবিত হয়ে নাটকের বিস্ময়-
াপ্তি ঘটিয়েছেন গ্রুপ থিয়েটার-
—নিজস্ব ধরনে।
একদিন যাঁরা পথে পথে মিছিলে
ন হয়েছিলেন, গ্রামে গঞ্জে মাঠে
ানায় সাধারণ মানুষকে তাপদগ্ধ
অথবা শীতার্ত রাতে সঞ্জীবিত
ছলেন, তাঁরা অনেকেই সম্মিলিত
ছলেন মেহনতী নাটক করতে গান
ত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নেতাজী
ডার স্টেডিয়ামে। যেভাবেই হোক
কের উপস্থিতি রোমাঞ্চিত হবার
াগ থেকে বঞ্চিত করেছে—এটা
খর। একদিন স্বাধীনতা সংগ্রামের
১৫ই আগস্ট-এ অনেকেই মাথায়
। টুপি পরে কংগ্রেসী হয়ে গেলেন
াত দিনের জন্য জেল খেটেও
ণিডত রাজনৈতিক কর্মীর ভাতা
র যেতে লাগলেন। আজ পরিবর্তিত
ভূমিতে অনেকেই আই পি টি এ
বল দিয়ে কৌলীন্যের অহেতুক
ভমান করেন। কিন্তু শিল্প সাহিত্য
ত্রে পারিবারিক ঐতিহ্য থাকলেও
ৗলীন্য নতুন করে অর্জন করতে হয়
া জানবার, শেখবার এবং ভাববার।
ৗলীন্য অর্জনের প্রসঙ্গে আসি
নাট্যের প্রথম পর্বে সুচিত্রা মিত্র,
লল চৌধুরী গণনাট্যের গান রেকর্ড
রেন। পরবর্তীকালে হেমন্ত মুখো-
াধ্যায়ের 'গাঁয়ের বধূ' রেকর্ড করার
রের অবস্থা সকলেই জানেন।
ৎকালীন রেকর্ডের দুইজন কর্তাব্যক্তি
ছলেন গণনাট্যের সমর্থক। তাঁরা
পের হয়েছিলেন সত্বেপারে—পরবর্তী-

কালে জনসাধারণ অভিনন্দনভাবে বরণ
করে নিয়েছিলেন। এই সাহস এখনকার
অনেক কর্তাব্যক্তিদের নেই এবং সাহস
থাকলেও এখনকার গণনাট্যের গান
জনসাধারণ—শুধু সঙ্গীতমোদীই তাকে
বরণ করে নেবে কিনা সন্দেহ।
সাধারণের কাছে পৌঁছনোর যে
কৌলীন্য সেখানেও আমরা ব্যর্থ।
দেবাশিস দাশগুপ্ত

## আলোচনাসহ তিনটি গানের আসর

রবীন্দ্রসদন আয়োজিত রবীন্দ্র জন্মোৎসবে 'গানের আসর' ভিন্ন 'আলোচনাসহ গানের আসর' পর্যায়ে কয়েকটি অনুষ্ঠান সূচীভুক্ত হয়েছিল।

এই পর্যায়ের প্রথম অনুষ্ঠান ১২ মে সন্ধ্যায় 'মূল গান সহ ধ্রুপদী রবীন্দ্রসঙ্গীত'। প্রযোজনা : রক্তকরবী। অনুষ্ঠানে তিনটি ধ্রুপদ, তিনটি ধামার, দুটি খেয়াল ও দুখানি টপ্পা গান সেই আদর্শে রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের পাশা-পাশি পরিবেশিত হল। সংশ্লিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে মূলানুগ ও মূল-ভিত্তিক, এই দুটি ভাগে গানগুলিকে নির্বাচিত করা হয়। সুর, তাল ও লয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে রচনার বিষয়বস্তু ও কলি গঠন মূলের অনুসরণে রচিত হলেও প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের গান সমহিম্ন। বস্তুত এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই অনুষ্ঠানের প্রযোজনা। পরিকল্পনা ও পরিবেশনায় তেমন কোন নতুনত্ব না থাকলেও অনুষ্ঠান সার্থক

আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা। আমন্ত্রিত প্রখ্যাত শিল্পীদের সহযোগিতায় কখনও এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মর্তব্য। কেবল একটি বিষয় কোথাও পরিষ্কার করা হয়নি। 'ধ্রুপদী রবীন্দ্রসংগীত' বলতে এঁরা কি বুঝেছেন এবং তার যৌক্তিকতাই বা কি?

মূল গানগুলির মধ্যে ধ্রুপদ ও ধামারগুলি গেয়েছিলেন ফাল্গুনী মিত্র। তাঁর কণ্ঠে বলিষ্ঠতার সঙ্গে মাধুর্যের স্পর্শে গানগুলি সুখশ্রাব্য হয়—বিশেষ উল্লেখ্য, ইমন কল্যাণের সুরে সুর ফাঁকতালে নিবদ্ধ 'শঙ্কর শিব পিনাকী' এবং বেহাগের ধামারে 'আজু রঙ্গ খেলত হোরী' গান দুটি। এই প্রসঙ্গে কোনো কোনো গানে দীর্ঘ আলাপের অংশ এ ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। পাখোয়াজ-বাদকের লয়বৈষম্য তাঁর দু-একটি গানে রসহানি ঘটিয়েছে। সম্মেলক গানের ক্ষেত্রেও এই ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। মূল খেয়ালগানগুলি পরিবেশন করেন উমা দে ও স্নিগ্ধা সেন। উমা দের সুরসমৃদ্ধ কণ্ঠে খেয়াল গানগুলি উপভোগ্য হলেও রবীন্দ্রনাথের 'এ পরবাসে রবে কে' গানটি উচ্চারণ ও গায়কীর ত্রুটিতে প্রার্থিত রসসঞ্চারে সমর্থ হয় নি। সাগীরুদ্দিন খাঁর কণ্ঠে 'মিঞা বে মানুলে' এবং 'ও মিয়া বেজানেয়ালে' পাঞ্জাবী টপ্পা দুটি অপরূপ লাবণ্যময় পরিবেশন।

অনুষ্ঠানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তুলনায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের অংশ ছিল নিষ্প্রভ। ব্যতিক্রম অশোকতরু 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' এবং বিশেষ করে ঝিঁঝিটের সুরে মন্দ্র ছন্দে 'হৃদয় বাসনা পূর্ণ হল' গান দুটিতে যে অপূর্ব রসসঞ্চার করলেন তা বিস্ময়কর। সেদিনের অনুষ্ঠানে তাঁর শিল্পীসত্তার পূর্ণ বিকাশ প্রমাণ করে তিনি কোন্ জাতের শিল্পী। তমালিকা গুহের দুটি গানের মধ্যে 'দুঃখ রাতে হে নাথ' গানটি অধিকতর আকর্ষণীয় হয়। 'মন্দিরে মম কে' গানটিতে মাধব মিত্র সহজেই বুঝিয়ে দিলেন তাঁর শিক্ষার ভিতটি কত দুর্বল। তুলনায় চন্দনা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'জাগে নাথ জোছনা রাতে' পরিচ্ছন্ন পরিবেশন। শুভেন্দু বিশ্বাসের একক কণ্ঠের গানগুলি অতি সাধারণ মানের এমন কথাও বলা যায় না। সম্মেলক গানগুলি অনুল্লেখ্য। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থনা এই অনুষ্ঠানে বিশেষ কার্যকর মনে হয়েছে।

২৪ মে এই পর্যায়ের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান 'রবি-অনুরাগিণী'। প্রযোজনা—কিংশুক।

মহাপুরুষ হয়েও রবীন্দ্রনাথ পুরুষ। নারীর প্রতি আকর্ষণ তাঁরও ছিল। বহু নারীর আকর্ষণও ছিল সুপুরুষ রবীন্দ্রনাথের প্রতি। উভয় পক্ষের কাহিনী নিয়েই এই দুঃসাহসিক অনুষ্ঠান। পত্নী মৃণালিনী দেবীকে বাদ দিলে আমরা ছয়জন ভাগ্যবতী মহিলাকে পাই, যাঁরা রক্তে রসে প্রীতিতে ভালোবাসায় কবির জীবন স্নিগ্ধ করে রেখেছিলেন। এই মহিলাদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অনেক গান ও কবিতা
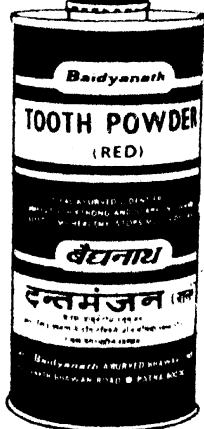
ছিলেন। অর মধ্যে কিছু গান
র উদ্দেশ্যে নিবেদিত না হলেও
র্কত। এই সব গান আর কবিতা
করে কিশোরকের উপহার 'রবি-
রাগিণী।' মানতেই হয়, অনুষ্ঠান
কল্পনার চমক আছে যদিও উপরের
ত অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য না
ও পারে। গ্রন্থনার ভাষা যেমন
বর্ণীয় তেমন সরস কিন্তু বিষয়টিকে
ট সঙ্গীতানুষ্ঠানের উপযোগী করে
ত গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে এই সব
রাগিণীদের নিয়ে রচিত নয় এমন
ক গান সূচীভুক্ত করতে হয়েছে তাতে
ভাষ্য যতখানি আবেগপূর্ণ ততখানি
নিষ্ঠ হয়ে ওঠে নি। উচ্ছ্বাসের
ল্যে অনুষ্ঠানটি তাই সৌসাম্যহীন।

অপরক্ষেত্রে মূলত সংগীতই ছিল অনুষ্ঠানের প্রাণ। সেক্ষেত্রে
শুরু শিল্পীগোষ্ঠী তার পূর্ণ
হার করে স্বতোস্ফূর্তভাবে অনু-
নটিকে আনন্দদায়ক করে তুলতে
ম হয়েছেন। তবে সম্মেলক গান-
লর মতো একক গানগুলিও যদি
নভাবে রসোত্তীর্ণ হত তবে
সন্দেহে—সমগ্র অনুষ্ঠানটি আরো
ভোগ্য হয়ে উঠত। হেমন্ত মুখো-
ধ্যায়ের কণ্ঠে চারটি গানের মধ্যে
বল 'তুমি কি কেবলি ছবি' গান-
তেই তিনি ছিলেন স্বপ্রকাশ। আর
গর সেনের কণ্ঠে 'যদি তোমার দেখা না
ই প্রভু' গানটিই কেবল উল্লেখ
গ্য। বাণী ঠাকুরের কণ্ঠে 'আমি
ন তাঁর দুয়ারে' পরিচ্ছন্ন পরি-
শন। একটিমাত্র গান গেয়ে যিনি

সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে আনন্দ দানে সমর্থ হয়েছেন তিনি সুস্মিত ভট্টাচার্য। তাঁর কণ্ঠে 'অলি বার বার ফিরে যায়' মনে রাখার মতো। সেদিনের আসরের সর্বোত্তম গানটি অবশ্য শোনা গিয়েছিল অর্ঘ্য সেনের কণ্ঠে। 'তাই তোমার আনন্দ আমার পর' গানটির এমন ভাবরসপূর্ণ পরিবেশন কচিৎ শোনার সৌভাগ্য হয়। ভাস্বতী মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণতার আভাস কিন্তু সুরেলা, তিনি গেয়েছিলেন 'আজ সখী মুহু মুহু।' সংগীত পরিচালনা বাণী ঠাকুর। পার্থ ঘোষ ও গৌরী ঘোষ লাবণ্যময় কণ্ঠে ভাষ্যপাঠের দায়িত্ব নিষ্ঠাভরে পালন করেন।

১ জুন (১৭ মে-র পরিবর্তে) অনুষ্ঠিত হল এই পর্যায়ের তৃতীয় অনুষ্ঠান—'আমি যে গান গেয়েছিলেম'। প্রযোজনা : কোয়েল।

'কত বিচিত্রভাবে বিভিন্ন পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ বারবার তাঁর অসংখ্য শ্রোতৃশ্রবণে নন্দিত হয়েছে, কতজনের স্মৃতিতে চিরকালের জন্য বৃত হয়েছে...যাঁরা শুনেছেন সেই কণ্ঠ তাঁরা অমৃতের আস্বাদ পেয়েছেন আর অন্য সেই গান শ্রবণের অতীত হলেও আমাদের কাছে আবৃত্ত গায়ক হিসাবেও তিনি মূর্ত হয়ে আছেন।' এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে গায়ক রবীন্দ্রনাথের কিছু স্মৃতি সংগীতানুষ্ঠানের উপযোগী করে একটি সূত্রে গেঁথেছেন শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী। ধারাভাষ্য রচনায় তিনি প্রধানত নির্ভর করেছেন স্মৃতিকথনের ওপর আর সম্ভবত সে কারণেই বিষয়টিই একদিকে যেমন তথ্যনিষ্ঠ অপরদিকে তেমনি হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি কিন্তু সংগীতাংশের দুর্বলতার জন্য নির্দিষ্ট মানে উত্তীর্ণ হতে পারল না। সম্মেলক গানগুলি প্রাণহীন। একমাত্র ব্যতিক্রম সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'তুমি বিনা কে প্রভু' গানটি। এই গানটিতে অন্যান্য সম্মেলক গানের মতো দলের সদস্যদের সুযোগ দেবার কারণে গানের অংশ বিশেষ একক কণ্ঠে গাওয়ানোর চেষ্টা হয় নি আর সে জন্যই গানে প্রাণের ছোঁওয়া লেগেছিল। জোরালো একটি সম্মেলক গানের মধ্যে, হঠাৎ একটিমাত্র ক্ষীণ দুর্বল কম্পমান একক কণ্ঠে গীত হলে তা কতখানি বেমানান লাগে এই অনুষ্ঠানে বার বার তার নজির মিলেছে। এছাড়া সম্মেলক গানের 'ধরা ছাড়া'-র ক্ষেত্রে অনবধানতা অত্যন্ত শ্রুতিকটু। মনে রাখা উচিত সম্মেলক গানে শুধু কণ্ঠের সাথে কণ্ঠের মিলনেই প্রার্থিত সৌন্দর্য বিকশিত হয় না। আর 'ওরা যায়' গানটিতে একক অংশে আলো স্তিমিত হয়ে আসা এবং সম্মিলিত অংশে আলোর প্লাবন হাস্যকর।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে একক শিল্পীরাও যেন সেদিন কেমন কর্তব্যভারাক্রান্ত হয়েছিলেন। অধিকাংশ গানই ছিল ফরমায়েশী, প্রাণের কোনো স্পর্শ ছিল না। কোনো কোনো গান প্রায় স্বরলিপি পাঠ (আক্ষরিক অর্থেও), কোনোটি বা সুরহীন। তবু এরই মধ্যে সুরসমৃদ্ধ কণ্ঠে গীতা ঘটকের 'তবু মনে রেখো', অরুন্ধতী কণ্ঠ অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না' এবং মন্দ্র বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঋতু গুহর 'এই লভিনু সঙ্গ তব' গানগুলি স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ্য। সংগীত পরিচালনা : শ্রীপর্ণা আচার্য। যন্ত্রানুষঙ্গে রমেশ চন্দ্রের নামটি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে একটি বক্তব্য : একই অনুষ্ঠান বারে বারে প্রযোজনায়

সার্থকতা কি, অন্তত পূর্বের তুলনায় পরবর্তী প্রযোজনায় সামগ্রিক উন্নতির কোন চিহ্নও যদি তাতে না থাকে ? সুজন চৌধুরী।

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

## সুবর্ণলতা

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে বিশ্বরূপায় আশাপূর্ণা দেবী রচিত কাহিনী নিয়ে নতুন নাটক 'সুবর্ণলতা'। লক্ষ লক্ষ নারীর বন্ধনমুক্তি এই নাটকের সোচ্চার বক্তব্য। জানিনা কবে আন্তর্জাতিক নাট্যবর্ষ উদ্‌যাপিত হবে, তখন নাটকের প্রয়োগে মান্ধাতা আমলের ধ্যানধারণার মুক্তি হইহই করে বলা যাবে। শিশিরকুমারের সাধনপীঠ শ্রীরঙ্গমের পর বিশ্বরূপা যখন আরম্ভ হয়েছিল, তখন থেকে আজ পর্যন্ত কোন রূপ বদল ঘটেনি প্রেক্ষাগৃহ, কিংবা নাটকের অথবা প্রয়োগের। এই নাটকেও যেমন সাঁইত্রিশ বছর পরে কয়েকটি চরিত্রের শুধু চুলে কিছু সাদা রং লাগানো হয়—এবং সংলাপে বোঝা যায় সাঁইত্রিশ বছর পার হয়েছে। পারিপার্শ্বিক যথাপূর্বং। বিশ্বরূপা প্রেক্ষাগৃহের নিশ্চয়ই কিছু কিছু সংস্কার হয়েছে—পরিচালক রাসবিহারী সরকারেরও ক্ষুধা, সেতুর আবেগ, মঞ্চমায়া যখন পুরোন হয়ে গেল তখন ক্যাবারে ড্যান্স-এর প্রবর্তনা ঘটালেন, উইংস-এর পাশে রামকৃষ্ণ, গিরিশচন্দ্রের ছবি না নামিয়েই। ক্রমশ এ মার্কা নাটকে যখন বহুতর ইজারাদারি চলে গে[ল] তখন বিশ্বরূপা মহান উপন্যাসে[র] নাট্যরূপ দিতে শুরু করলেন। সুবর্ণলতা সেই রূপ বদলের সাম্প্র[তি]তিতম সংস্করণ। ব্যবসায়িক ম[ঞ্চে] অনেক জোড়তালি সত্ত্বেও একটি জিনিস সকলকে ক্ষণকালের জন্য হলে[ও] নাড়া দেয়—সেটি হল অভিনয়। রাসবিহারী সরকার নির্দেশি[ত] নাটকে পাত্রপাত্রীরা কেউ আধুনিক মনস্ক নন, অভিনয়ের কো[ন] গভীরতা সেখানে দুষ্প্রাপ্য। এ[ই] নাটকের নায়ক বসন্ত চৌধুরী হাস্যক[র] অভিনয় করেন। লোকে হাসে বলে হাস্যকর নয়— তিন ঘণ্টা সময়সীমার মধ্যে চরিত্রটি কোন সময় দান[া] বাঁধতে পারে না। যে বিখ্যাত অভিনেতার প্রভাব তাঁর মঞ্চাভিনয়ে আছে—সে পোশাক তাঁর পক্ষে খুব অস্বস্তিকর। কোন সময় মনে হয় আঁট হয়ে দমবন্ধ করে আনছে। অথচ বসন্ত চৌধুরী শিক্ষিত, মার্জিত বোধের অভিনেতা—কিন্তু নাট্যরূপ তাঁকে দাঁড়াতে দেয় না। আরতি ভট্টাচার্য সম্পর্কেও সেই একই কথা—তিনি যখন রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করেন তখন তা লক্ষ্মীর পাঁচালীর সমগোত্রীয় হয়ে দাঁড়ায়। যবনিকার আগে তিনি যখন পাগলের মত হাসতে থাকেন—সেটি যথা সময়ের হাসি—কারণ আর বেশীক্ষণ চললে দর্শকের পাগল হওয়ার উপক্রম হত। অসম্ভব ভাল অভিনয় প্রেমাংশু বসুর। উপন্যাসের

মহাৰ্ঘ্য নিয়ে এই একটি লাভ হয়েছে—রিলিফ হিসেবে কোন চরিত্র আগন্তুক হয়ে অযথা ভাঁড়ামি করে যায় নি। কণকালের অবস্থিতিতে মন কাড়েন রবীন মজুমদার। অনেক তরুণ শিল্পী যখন প্রধান্যগত্যের রাসবে বাঁধা পড়েন তখন এই প্রবীণ শিল্পী অদ্ভুত ক্যাজুয়াল অভিনয় করে যান। এই নাটকে কিরণ লাহিড়ি খুব সুন্দরভাবে চরিত্র বিশ্লেষণ করে যান। প্রধান চরিত্রের মধ্যে গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী অদ্ভুতভাবে সংলাপ বলেন। কমা, সেমিকোলন, যথাযথ জায়গায় না বসিয়ে এক ধরনের কঠিন সংলাপরীতি তিনি আয়ত্ত করেছেন। অথবা এইটাই নাটকের মূল সুর, বেপরোয়া অনিয়মের রাজত্ব। মিঠু পাল ও গীতা নাগ দাপটে অভিনয় করে বাংলা নাটকের চিরন্তন দজ্জাল শাশুড়ীকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গীতা নাগ অবশ্য একবার 'গাঁজা খেয়ে বাড়ির সব ইঁট খসিয়ে দেবে' বলার জায়গায় 'ইট খেয়ে বাড়ির সব গাঁজা খসিয়ে দেবে' বলে ফেলেন। মিঠু পাল দুবার দর্শকের দিকে মারাত্মকভাবে পা ছড়িয়ে বসেন। আর একবার আর একজনের সংলাপ আটকে যেতে আরতি ভট্টাচার্য সামাল দেন। অনুরাধা রায়ের কণ্ঠ পুরুষ এবং মহিলার বর্ডারে অবস্থান করে। বকুল ধর দুটি-একটি কথা বলে চালিয়ে যাচ্ছিলেন, যেই তিনি দু লাইন কবিতা আবৃত্তি করেন তখনই বোঝা যায় ঘরানাটি যাত্রার। যাত্রা মহান শিল্প কিন্তু হঠাৎ কেউ এ ধরনের ছন্দপতন ব্যঙ্গার্থেই ঘটিয়ে থাকেন। অম্বিকার বউদির ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেন তিনি প্রথমার্ধে খুব স্বাভাবিক, দ্বিতীয়ার্ধে সাইত্রিশ বছর পরে তিনি যে কেন নিজের চলাফেরা, কণ্ঠকে ষাট বছর পেরিয়ে আনেন বুদ্ধিতে তার ব্যাখ্যা চলে না। জামাইয়ের ভূমিকার অভিনেতাও খুব স্বাভাবিক। (এইখানে নাট্যরূপের ত্রুটি—চরিত্রগুলির নাম প্রচার-পুস্তিকায় দেখা যায় কিন্তু নাটকে শোনা যায় না)।

নাটকের প্রথমে সুবর্ণলতা ঘুম থেকে উঠেই হাত নেড়ে (যার প্রসাধনে সবে মাত্র পার্টিফেরা মনে হয়) রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে থাকে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। নায়ক রবীন্দ্রনাথের কবিতা শোনেন নি, কাব্যবোধও তাঁর নেই—কিন্তু একবার 'ধন্য আশা কুহকিনী' বলে ফেলেন। একই ফেরিওয়ালার কণ্ঠ পরপর তরল আলতা, চুড়ি এবং ল্যাঙড়া আম ফেরি করে যায়, পরবর্তী দৃশ্যে সময়োপযোগী 'বেলফুল' হাঁক দেয় হৃদয়বিদারকভাবে। এই সর্বার্থসাধক বটিকা ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চেই সেব্য। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, অমর পাল দীনেন্দ্র চৌধুরীর গাওয়া গানগুলি ভাল হলেও আবহ যথাবিহিত। শৈলেশ রায় দুটি টাইটেলে রেকর্ড করেছেন। এক একটি পাঁচ দশ মিনিটের টাইটেল রাগমালার মত গানের পর পর সুর বাজিয়ে যাওয়া হয়। খালি গলায় অরুণ চৌধুরী বেশ গেয়েছেন। বউয়ের অনুরোধে বারান্দাঅলা বাড়ি করেছে নায়ক—পরে বোঝা গেল বউয়ের অনুরোধে হলে একটু একটু মমতা থাকত—আসলে ঐ বারান্দা পরিচালকের আদেশে তৈরী। সুযোগ পেলেই ওখানে প্রোজেকশনে পুতুলনাচে নানারকম মন্তাজ শটের মধ্যে নায়ক-নায়িকার আলিঙ্গন দেখান যায়। সুরেশ দত্তের সেট বেশ ভাল—পুরোন বাড়ির মেজাজ রেখে মাঝেমাঝেই দেয়াল নড়বড়ে হয়ে যায়। তাপস সেনের অস্তিত্ব শুধু পুতুলনাচের অংশে। কমল চৌধুরীর ধ্বনি বেশ ভাল—কিন্তু মেক-আপ খুব খারাপ। একটি দৃশ্যে নায়ক দুবার দুরকম আলোয়ান গায়ে দিয়ে ঢোকে। অন্য সকলের গায়ে কিছু নেই। বোঝা গেল না ওটা শীতকাল কি-না। অথবা হতে পারে পঞ্চাশ বছরের ঘটনাকে তিন ঘণ্টায় সামাল দিতে গিয়ে সমগ্র প্রযোজনাটিই জরাক্রান্ত হয়ে পড়েছে—নায়ক তার প্রতীক।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

---

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **বিবিধ**

---

## নৃত্যনাট্য সাগরিকা

ইস্ট গড়িয়া এডুকেশন অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটির শিশুশিক্ষা মন্দিরের বাৎসরিক অনুষ্ঠান নিবেদিত হল অবনমহলে, ২৭ এপ্রিল সন্ধ্যায়।

নিজস্ব প্রযোজনা ছিল 'সাগরিকা' নৃত্যনাট্য। এই সন্ধ্যার সঙ্গীত-শিক্ষায়তন সুরবিতান রবীন্দ্রকবিতা অবলম্বনে গান ও নৃত্য সহযোগে যে-আলেখ্যটি রচনা করেছেন তার রূপায়ণে ছিলেন সংস্থারই শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। মোটা-মুটভাবে সার্থক এই আলেখ্যটি। যদিও 'আহো লহো তুলে লহো' গানটি সমুচিত মনে হয়নি, দ্বৈতসঙ্গীতে বিষমতা ছিল। ভারতবর্ষ-এর নেপথ্য গায়ক যতটা সাবলীল সাগরিকা'র নেপথ্যশিল্পী তেমন নন। আবহসঙ্গীত সুন্দর। বিশেষভাবে কানে লেগে আছে সেতারের ব্যবহার।

অনুষ্ঠানের আরম্ভে ছিল পূর্বা দামের কণ্ঠের সাতটি অনবদ্য রবীন্দ্র-সঙ্গীত এবং যোগেশ দত্তর অসামান্য, চারটি মূকাভিনয়ের কাঁচার। নবীন শিল্পী নন্দা চক্রবর্তীর কণ্ঠে নজরুল-গীতি ভাল লেগেছে, ভাল লেগেছে ছোট্ট শিল্পীদের জিপসী নাচও।

এক ঘন্টার লোডশেডিং অনুষ্ঠানের গতি থামিয়ে দিয়েছিল, নইলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোটামুটি একটা পরিচ্ছন্ন ও তরতাজা ভাব ছিল সাময়িক নিবেদনে।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

---

## প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

### লতিকা কাঠ (১৯৪৮—)

লতিকা কাঠের জন্ম স্বাধীনতার পরে। তফাৎটা দেখুন—বি এ (ফাইন আর্টস কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম শ্রেণী, স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ১৯৭১)। এম এ (ব্রোঞ্জ ঢালাই, প্রথম শ্রেণী, বরোদা—১৯৭৫)। পুরাকালে ছিল আর্ট স্কুল। '৫০-এর পর হলো আর্ট কলেজ। এখন থেকে বি এ, এম এ, পি এইচ ডি। ভারতীয় রক্তে ডিগ্রীপ্রীতি। এসব জানতে গেলে লিখতে হয়। সুতরাং ইংরাজী-নবিস হতে হয়। এই শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রকৃত শিল্পীর স্থান নেই।

লতিকার স্বামী বলবীর সিং কাঠ। এঁর সঙ্গে লতিকা ইংলণ্ডে থেকে কাজ করেন (১৯৭১-৭৩)। একক প্রদর্শনী দেরাদুন (১৯৬৮)। জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারী, বোম্বাই, ভাস্কর্য এবং রেখা-চিত্র (১৯৭৫) ডেকর সার্ভিস (১৯৭৭) মাকস মুলার ভবন (১৯৭৮) কলকাতা। এম ডি পাণ্ডেয়ার কাছে ন্যাশনাল কালচারাল স্কলার হিসাবে কাজ করেন (১৯৭৫-৭৮)। বর্তমানে বলবীর এবং লতিকা দুজনেই কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাস্কর্যের অধ্যাপনা করেন চারুকলা বিভাগে।

পুরস্কার পেয়েছেন — গুজরাত ললিতকলা আকাদমী (১৯৭৩)' আইফেকস্, নয়াদিল্লি' (১৯৭৪, ৭৫. ৭৬), অন্ধ্র প্রদেশ ললিতকলা (১৯৭৫)। আকাদমী অব ফাইন আর্টস (১৯৭৪)। আন্তর্জাতিক মহিলাদের প্রদর্শনীর পুরস্কার (১৯৭৫)।

কাজ আছে, ন্যাশনাল গ্যালারী অব মডার্ন আর্ট, নয়াদিল্লি; ললিতকলা আকাদমী, নয়াদিল্লি; উত্তর প্রাদেশিক ললিতকলা; এয়ার ইণ্ডিয়া, দাউদ এবং বাটা সু কম্পানী। এছাড়া নানা ব্যক্তিগত সংগ্রহে। বিদেশে বহু প্রতিকৃতি করেছেন।

আমি মনে করি সমকালে ভারতীয় নারী ভাস্কর্যে পুরুষের সমকক্ষ। অনেক সময় জীবন যৌবন ভাস্কর্যের বেদী তলে সমর্পণ করে পুরুষকে ছাড়িয়ে গেছেন। প্রথমেই মনে পড়ে মীরা মুখোপাধ্যায়ের কথা। ভুলিনি অবশ্য পিলু পোচখানাওয়ালার কথা। হয়তো কালক্রমে লতিকাও এই দলে যোগ দেবেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বারবারা হেপওয়ার্থ। লুইজা নেভেলসান এবং লতিকার সমবয়সী হেড্ডে বিউলের কথা মনে পড়ে। ভাস্কর্য সন্তানের জননী হওয়ার মতো শ্রমসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ কাজ। সুতরাং চিত্রের চেয়ে মূর্তিতে নারীরা কৃতিত্ব দেখিয়েছে বেশি। অবশ্য বার্থা মরিস বা কেথে কোলভিৎসের কথা আমি ভুলিনি।

লতিকার প্রথম দিকের কাজের মধ্যে প্রতিকৃতিগুলো উল্লেখযোগ্য। বিশেষত তাঁর পিতার প্রতিকৃতি। (প্রসঙ্গত দেবী-প্রসাদ থেকে কনিষ্ঠতম ভাস্করদের যাঁদের দেখেছি তাঁদের প্রায় সবাই মূর্তিতে ব্রজেশ্বরের মতো 'পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ' করেছেন। সমাজ, মনস্তাত্ত্বিক এঁর মধ্যে কিছু খুঁজে পেতে প্রতিকৃতি-নির্ভর কাজ। যেমন শো কেসে মেমসাহেবের মুণ্ডুকে আরো অভিব্যক্তিমূলক করে। তার চোখটা বাদ দিয়ে, চকচকে ঝকঝকে করেন। বা একটা মানুষের মুণ্ডুর পেছন দিকটা খোলা। তার বাইরে ভেতরে সিঁড়ির ধাপ উঠে নেমে গেছে।

আরেক ধরনের মুখ লতিকা করতে ভালবাসেন। এখন পচা ধসা মুখ। কিন্তু বার্ধক্য নয়, এঁদের চোখে মুখে ধূর্ততা আর নষ্টামির ভঙ্গী আনেন। হয়তো ভ্রূ বা ঠোঁটের কুঁচকানো। বা কপালের চুলটা পড়ার মধ্যেই এটা ধরেন। দেখে মনে হয় নরকের দরজা খুলে গেছে। এইসব নষ্টভ্রষ্ট নরনারীরা যেন উঠে এসেছে। চোখগুলো ঘোলাটে, মুখ বিকারগ্রস্ত। কখনো মুখের ত্বক মসৃণ। কখনো এবড়ো খেবড়ো। কেমন যেন ভয় ভয় করে।

এছাড়া লতিকা ঘোড়া বা দেহমূল নিয়ে কাজ করেছেন। যেমন ধরুন প্রচ্ছদের ভাস্কর্যটি। অ্যালুমিনিয়ামে করা এক নারী হাঁটু মুড়ে বসে আছে। মাথার পেছনে হাত। কিন্তু দেহমূলের (টরসো) ওপরেই জোর দিয়েছেন। [illegible] তীরবিদ্ধ এক পাখি। যন্ত্রণায় [illegible]ট করছেন। লতিকা নারীদেহের খাঁজ, ভাঁজ, ঢাল গড়ান, চড়াই উৎরাই চমৎকার ধরেছেন।

অবশ্য লতিকা এখনও রচনাধর্মী কাজ খুব বেশি দেখাননি। কিন্তু এখনও তাঁর যাবার রাস্তা অনেকটাই। তাঁর নিষ্ঠাই প্রমাণ করে যে মাঝ পথে তিনি থেমে যাবেন না। মস্ত কথা হলো, বলবীরের প্রভাব তাঁর ওপর পড়েনি। তাঁর ভাস্কর্যের একটাই দোষ, ভারতীয় ভাস্কর্যের ঐতিহ্যের সামান্যতম ছায়া পড়েনি।

লতিকা নানা মাধ্যমে দক্ষ। অ্যালুমিনিয়াম, পেতল, ব্রোঞ্জ, কাঠ, প্লাস্টার, ফাইবার গ্লাস। প্রত্যেকটি মাধ্যমের চরিত্র বজায় রেখে তিনি কাজ করেন। তাঁর যত্ন অধ্যবসায় প্রচণ্ড। তিনি তাঁর কাজে আমাদের প্রচুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এইভাবে চললে শেষ পর্যন্ত তিনি সিদ্ধ নারী হবেন সন্দেহ নেই। না হবার

সোনালীর দীঘল চোখে রূপের ঝিলিক খেলে। গোলাপের মত ওঁর এই ফুটফুটে রূপের বাহার লাক্সেরই প্রসাধনে।
ওঁর নিজের কথায় শুনুন—"আমার রূপ-লাবণ্য কোমল আর সুন্দর রাখার জন্যে আমার প্রসাধন সাবান—লাক্স!"

Sonali Gupta

**শুদ্ধ, স্নিগ্ধ লাক্স—**
**চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য সাবান।**

হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেডের উৎকৃষ্ট উৎপা
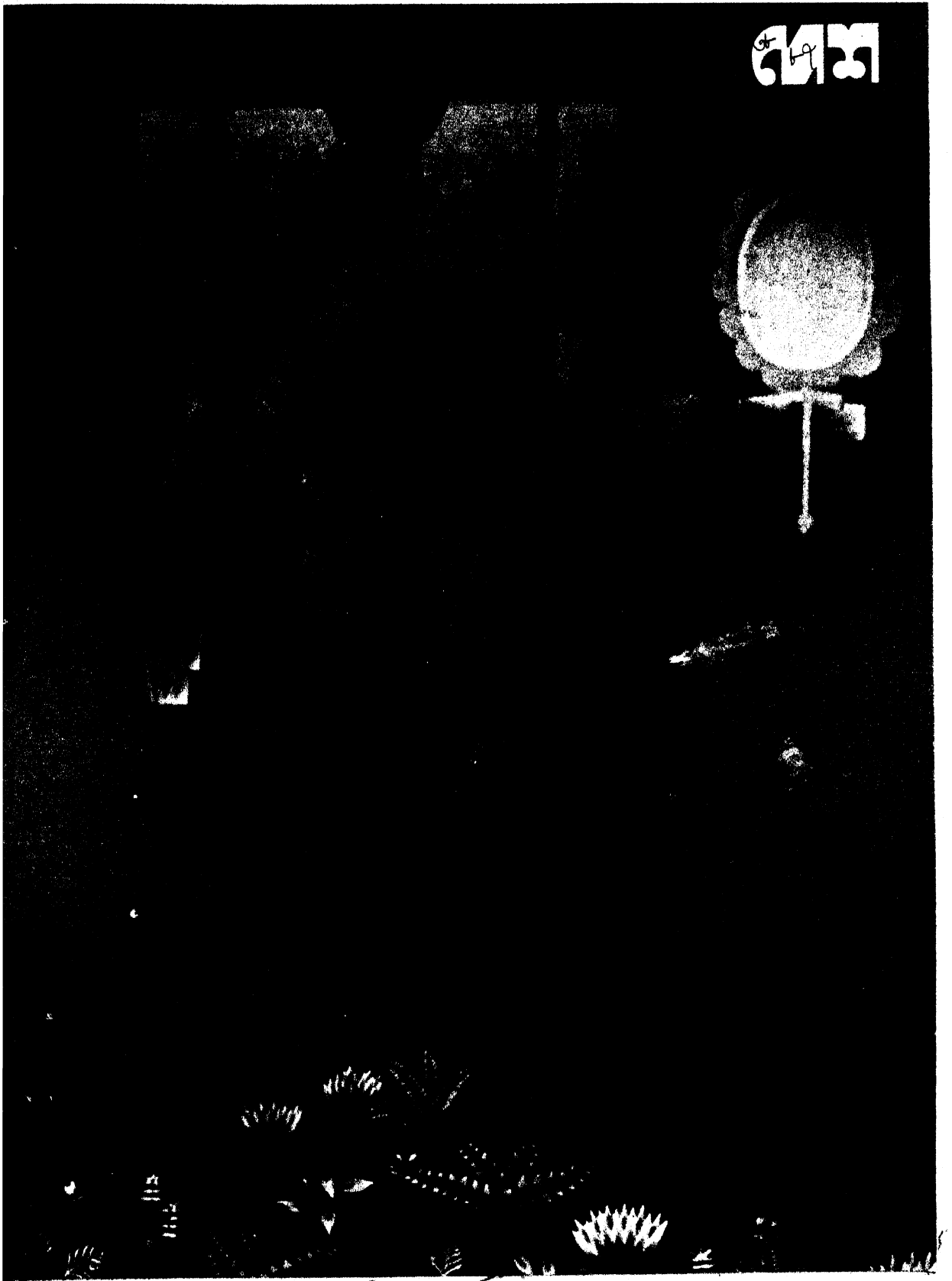
## আপনার চুল স্বাভাবিক,
## তাহলে আপনার শ্যাম্পু সিন্‌থেটিক কেন?

ভেষজ শ্যাম্পু

**ভারতে আর কোন শ্যাম্পু নেই যা এর মত**
**খাঁটি...মোলায়েম...পুষ্টিকর...আর যত্নবান**

**স্বাভাবিক চুলের জন্য বন্য চেরি**
চুলের গোড়া মজবুত করে, চুলের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখে, আর চুলে আনে চাকচিক্য।

**তেলচিটে চুলের জন্য অরেঞ্জ ব্লসম্**
চুলের স্বাভাবিক তেল সংরক্ষিত করার পাতলা চামড়ার আবরণ বিনষ্ট না ক'রে, চুল থেকে আঠাল তেল আর নোংরা দূর করে।

**শুকানো চুলের জন্য ক্যামোমাইল**
তালুতে উত্তেজনা সৃষ্টি ক'রে চুলে স্বাভাবিক তেলের পরিমাণ বাড়ায়··· চুলে আনে কমনীয়তা আর নতুন দীপ্তি।

**খুশকির জন্য রোজমেরী**
তালুকে খুশকির কবল থেকে অবিলম্বে রক্ষা করে। চুল পড়া বন্ধ হয়। চুল কালো করে আর চুলের দৈর্ঘ্য বাড়াতে সাহায্য করে।

**অস্বাস্থ্যকর চুলের জন্য এলো ভেরা**
প্রোটিনে ভরপুর এর ফেনা কেশবৃদ্ধির সহায়ক। নিস্তেজ, নিষ্প্রভ চুলে ফিরিয়ে আনে স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য।

একজন **ন্যাচারেল** নারী হোন
র‍্যানব্যাক্সির গুণ-ভরা উৎপাদন

## মায়েরা!

# এঞ্জেল শিশু-দুগ্ধাহার সহজেই হ…
# এটি আপনাদের মমতার মতই স্নিগ্ধ

### ভিটামিনে ভরপুর এঞ্জেল একটি সুষম আহার এবং সহজে হজম হওয়ার জন্যে খুব মিহি আর মসৃণ করে তৈরী।

এঞ্জেল শিশু-দুগ্ধাহার কয়েকবছরের গবেষণার ফল। শিশুর বাড়-বাড়ন্তের জন্য যে সমস্ত পুষ্টি দরকার, তা সবই আছে এতে। এর দুধের গুড়ো খুব মিহি আর মসৃণ করে তৈরী করা হয়েছে যাতে শিশু এটি সহজেই হজম করতে পারে।

**"শিশুর পাকস্থলীর জন্য মিহি আর মসৃণ দুধের গুঁড়ো দরকার"—**

শিশুর পাকস্থলী নতুন নতুন কাজের সম্মুখীন হয়। তার নবীন পাকস্থলী যাতে বিপদগ্রস্ত না হয়, সেজন্য এঞ্জেল দুধের গুঁড়ো খুব মিহি আর মসৃণ করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এঞ্জেলের চর্বিগুলি ছোট ছোট মিহি দানায় গুঁড়ো করা হয়। পাকস্থলীতে গিয়ে এঞ্জেল নরম আর সহজে গলে যাওয়া দইয়ের মত হয়। শিশু তা চট্ ক'রে হজম ক'রে নিতে পারে।

**"শিশুর বাড় ও গঠনের জন্য সুষম আহারের প্রয়োজন"—**

প্রথম কয়েকটি মাস শিশুর ভবিষ্যৎ গঠন আর তার বেড়ে ওঠার ভিত্তি। এই বিশেষ সময়ে তার দরকার সবরকমের ভিটামিন আর লৌহ। এঞ্জেল একটি ভিটামিন-ভরপুর ফর্মুলা যাতে আছে আটটি ভিটামিন আর লৌহ। প্রকৃত-পক্ষে এঞ্জেলই একমাত্র শিশু-দুগ্ধাহার যাতে রয়েছে বেশী পরিমাণ ভিটামিন-'ই', যা শিশুর কোমল চামড়া রক্ষা করে।

**"মায়েদের কাছে এই দুগ্ধাহার তৈরী করাও এত সহজ"—**

আপনি কেবল আধ মিনিটে দুগ্ধাহারটি তৈরী ক'রে আপনার শিশুকে খেতে দিতে পারেন। শুকনো দুধের পাউডার। আপনি কেবল চামচ দিয়ে এই পাউডার ফীডিং বোতলে ঢালবেন। তারপর গরম জল ঢেলে নাড়ুন। ব্যস্, আপনার শিশুর পুষ্টির আহার তৈরী। সে এটি খেয়ে সহজেই হজম করবে। এবার আপনার শিশু হলো—সত্যই এঞ্জেল শিশু।

**ভিটামিন-'ই' সহ আটটি ভিটামিন দ্বারা সুরক্ষিত।**

**'Progress of an Angel Baby'** বিনামূল্যের এই পুস্তিকার জন্য এক টাকার ডাক টিকিট সহ এই ঠিকানায় লিখুন:—

Consumer Services Division, Foremost Dairies Ltd. 72 Janpath, New Delhi-110001

# বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

## খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে

কোন্ খণ্ডে কি কি বই আছে—

| | | |
|---|---|---|
| প্রথম খণ্ড : | নীলাঙ্গুরীয়, রাণুর প্রথম ভাগ, কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি | ২০৲ |
| দ্বিতীয় খণ্ড : | স্বর্গাদপি গরীয়সী (১ম খণ্ড), রাণুর দ্বিতীয় ভাগ, দুয়ার হ'তে অদূরে | ২০৲ |
| তৃতীয় খণ্ড : | স্বর্গাদপি গরীয়সী (২য় খণ্ড), রাণুর তৃতীয় ভাগ, কথাচিত্র, পোনুর চিঠি | ২০৲ |
| চতুর্থ খণ্ড : | স্বর্গাদপি গরীয়সী (৩য় খণ্ড), রাণুর কথামালা, কলিকাতা-নোয়াখালি-বিহার, দুস্টু-লক্ষ্মীদের গল্প | ২০৲ |
| পঞ্চম খণ্ড : | নব সন্ন্যাস (১ম), বর্ষায়, অণ্টক | ২০৲ |
| ষষ্ঠ খণ্ড : | নব সন্ন্যাস (২য়), বসন্তে, বরযাত্রী, লঘুপাক | ২০৲ |

**— সপ্তম খণ্ডপ্রকাশিত হল পঁচিশ টাকা —**

সপ্তম খণ্ড : উত্তরায়ণ, বাস'র, রূপান্তর, কৈলাসের পাটরাণী।

যে কোন খণ্ড যে কোন সময় কিনতে পারা যায়।

**লেখকের অন্যান্য বই**

স্বর্গাদপি গরীয়সী (১ম/২য়/৩য়) ১১·৫০

আর এক সাবিত্রী ৫৲

দোল গোবিন্দের কড়চা ৮৲

কথাচিত্র ৩৲

**রাণু** ১২·৫০

(পেপার ব্যাক্)

---

প্রকাশিত হল

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের

# ঠাকুরমার ঝুলি

উনত্রিংশতি সংস্করণ বারো টাকা

বিজিতকুমার দত্তের

একটি সার্থক গবেষণামূলক গ্রন্থ

# বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস ২৫৲

★

নারায়ণ সান্যালের

রহস্য উপন্যাস

# উলের কাঁটা ১১৲

---

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

আশাপূর্ণা দেবীর

# বালির নীচে ঢেউ ১০৲

---

নীহাররঞ্জন গুপ্তর

# কিশোরসাহিত্য-সমগ্র

## তৃতীয় খণ্ড
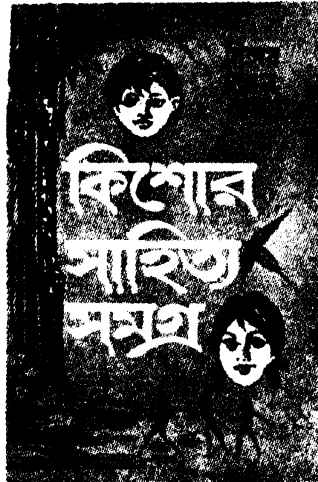
কিশোরদের জন্যে লিখিত লেখকের সমগ্র রচনাগুলি তিন বা চার খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতিখণ্ড আনুমানিক ৩০০-৩৫০ পৃষ্ঠা, প্ল্যাস্টিক জ্যাকেটে মোড়া, ছোটদের উপহার দেবার মত। এখনই সংগ্রহ করুন।

১ম খণ্ড ১৫·০০
২য় খণ্ড ১২·৫০
৩য় খণ্ড ১৪·০০

※ যে সকল সহৃদয় ক্রেতা ৩টি খণ্ড একসঙ্গে সংগ্রহ করবেন তাঁরা ৪১·৫০ টাকার বই ৩৫৲ টাকায় পাবেন।

---

**মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ** ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ / ৩৪-৮৭৯১
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ / ৩৪-৩৪৯২

## চিঠিপত্র

### বিভূতিভূষণ ও সুপ্রভা

৩১ মের "দেশ" পত্রিকায় শ্রীতরুণ মুখোপাধ্যায় আমার "শিলং, বিভূতিভূষণ ও সুপ্রভা" প্রবন্ধটি প্রসঙ্গে যা লিখেছেন সে সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

আমার প্রবন্ধে সুপ্রভা সম্পর্কে যা কিছু লিখেছি তাদের উৎস বিভূতিভূষণের দিনলিপি গ্রন্থ "উৎকর্ণ"। তাতে সুপ্রভা কে, কীভাবে তাঁর সঙ্গে বিভূতিভূষণের পরিচয় হল এবং বিভূতিভূষণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু লেখা নেই। তা ছাড়া, প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিবেচনা করলে সুপ্রভা-বিভূতিভূষণ সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ অপ্রাসঙ্গিক, কাজেই এ সম্পর্কে তথ্য আহরণের কোন চেষ্টা করি নি।

তরুণবাবু যে সব তথ্যগত বিচ্যুতির (?) কথা লিখেছেন, তাদের উৎসও ঐ "উৎকর্ণ"। বিভূতিভূষণ ও সুপ্রভার Spread Eagle Falls-এ বেড়াতে যাওয়া সম্বন্ধে তরুণবাবু লিখেছেন:

'ঈগল ফল্স দেখতে যাবার সময় সুপ্রভার সঙ্গে তাঁর ভাইপো ছিলেন না। ছিলেন শুধু বিভূতিভূষণ। এবং এটাই স্বাভাবিক। পাইনবনে পথ হারাবার পর ষণ্ডামার্কা লোক দুটিকে দেখে সুপ্রভা ভীত হয়ে ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে বন থেকে বেরিয়ে আসেন নি। বনপাগল বিভূতিভূষণ বনচারী ঐ দুটি ষণ্ডা লোককে কথায় বশ করেছিলেন—যা তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। যাবার সময় তারা বিভূতিবাবুকে বিড়ি বিনিময় করে এবং 'বুঝবানবাবা' বলে সম্মান দেখায়। অতঃপর ট্যাক্সি করে সুপ্রভাকে সনৎ কুটিরে পৌঁছে দেন বিভূতিভূষণ।'

কিন্তু এই প্রসঙ্গে "উৎকর্ণে" প্রকাশিত বিভূতিভূষণের উক্তি:

"...চা খেয়ে ওর (সুপ্রভার) সঙ্গে বেড়াতে বেরুই। সঙ্গে রইল তার ভাইপো। প্রথমে ক্রিনোলাইন ফল্স দেখে ও বললে, চলুন Spread Eagle Falls দেখিয়ে আনি। তাই দেখাতে গিয়ে ও পথ হারিয়ে ফেললে। কতদূর শহরের বাইরে নিবিড় পাইনবনের দিকে বিজন পথে চলে গেল। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেচে। পথে খাসিয়া দস্যুর ভয়। ওর মুখ দেখি শুকিয়ে গিয়েচে, যখন দেখা গেল, সত্যিই ষণ্ডামার্কা গোছের দুজন লোক অন্ধকারে আমাদের দিকে এগিয়ে আসচে। ও বললে—আমার ভয় করচে। কী বিপদ! ছেলেমানুষের কাণ্ড। তবে বলেছিল, কেন যে আমি জানি Spread Eagle Falls-এর পথ।

"যাই হোক, অবশেষে নিরাপদে শহরে পৌঁছে ট্যাক্সি করে ওকে লাবানে পৌঁছে দিয়ে আমি হেঁটে হোটেলে ফিরি।..."

সুপ্রভার সঙ্গে পরিকল্পিত সিলেট ভ্রমণ প্রসঙ্গে তরুণবাবু লিখেছেন:

"সিলেটে যাবার সময় সুপ্রভার সঙ্গে ছিলেন তাঁর বোন সেবা—বীণা নয়। এবং কয়েকজন বান্ধবী। [illegible] লিখেছেন যে, সিলেটে যেতে না পারার জন্য সেদিনই বিভূতিভূষণ শিলং ছেড়ে চলে যান। কিন্তু এ তথ্য ঠিক নয়। বরং পরদিন সুপ্রভা এসে বিভূতিবাবুর মান ভাঙিয়ে তাঁকে জোর করে স্নো-ভিউ হোটেল থেকে নিয়ে যান সনৎ কুটিরে।"

এ প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণের ('উৎকর্ণে' প্রকাশিত) বক্তব্য:

"...সেখানে চা খেয়ে বীণা ও সুপ্রভার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলুম। ...কাল যাওয়ার কথাবার্তা হোল, সাড়ে আটটার সময় গাড়ি আসবে আমার হোটেলে। একখানা ট্যাক্সি পাওয়া গিয়েচে, তিনজনে যাব আমরা। ও বললে, কমলা নেব অনেক করে সঙ্গে, গাড়িতে বড় মাথা ঘোরে।"

পর দিন সুপ্রভার ট্যাক্সি অনুসরণ করে তাঁর নাগাল না পেয়ে বিভূতিভূষণ কী করলেন তা তাঁর নিজের জবানীতে ("উৎকর্ণ" থেকে উদ্ধৃত) লিখছি:

"...কী আর করি, নিরাশ হয়ে ফিরলুম। শিলং পোস্টাফিসের কাছে দেখি, কান্তি দাঁড়িয়ে আছে, তাকে গাড়িতে উঠিয়ে নিলুম। সে বললে—একটায় সিলেটের ডাক-ভ্যান ছাড়ে, তাতে লোকও নেই। আমার মন বেজায় খারাপ, শিলং-এ থাকতে একটও ইচ্ছে নেই, কান্তিকে সঙ্গে নিয়ে মেল-ভ্যানে টিকিট বুক করে এলুম। ...একটার সময় বাস ছাড়ল। নঙ্মালুকি গেটে গিয়ে আমি টাইমকিপারের কাছে জিজ্ঞেস করে জানলুম, ওবেলা সুপ্রভাদের ট্যাক্সিখানা ৮-৪২ মিনিটে গেট পার হয়ে গিয়েচে, আর আমি এসেচি ৮-৫২ মিনিটে।..."

সঙ্কর্ষণ রায়
শিলং-৩

[এ সম্পর্কে আর কোনো পত্র প্রকাশ সম্ভব নয়]

### বার্লিন

'বার্লিন : কলোনী ও কলঙ্ক' লেখাটি পড়লাম। অনেকদিন থেকে আমার জানবার ঔৎসুক্য ছিল যে, জার্মান জাতি কি রকমভাবে এই বিসদৃশ দেশভাগ মেনে নিয়েছে। প্রবন্ধটি থেকে মোটামুটি পরিষ্কার একটি ছবি পেয়েছি, পূর্ব জার্মানী ও পশ্চিম জার্মানীবাসীদের। জার্মান জাতি কোনও দিন কম্যুনিস্ট মনোভাবাপন্ন ছিল না, বরং তারা চিরদিনই কম্যুনিজমের বিরোধী। এ কথা ঠিক যে, পূর্ব জার্মান ও পশ্চিম জার্মান মূলত সেই জার্মান। তাই যাঁরা ভাগ্যের ফেরে আজ পূর্বদিকের অধিবাসী, তাঁরা অনেকেই - ব্যক্তি জীবনের ওপর কম্যুনিজমের নিরবচ্ছিন্ন প্রভাব মেনে নিতে পারেন নি। তাই বার্লিন-প্রাকার ডিঙিয়ে বিলাসবহুল পশ্চিম বার্লিনে আগমনে পূর্ব জার্মানদের এত উৎসাহ। কিন্তু আবার এটিও ঠিক যে, সমস্ত পূর্ব জার্মানই এ ব্যাপারে একগুঁয়েমি দেখান নি। বরং তাঁরা যেমন আছেন তেমন থাকতে অনিচ্ছুক নন। এই ব্যাপারটি, অর্থাৎ জার্মান জাতির মধ্যে

আজ যে মতবিরোধ, যা দেশভাগের একটি সুস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া, তা কতখানি জার্মান মানসিকতাকে পরিবর্তিত করেছে, সেটি খুব স্পষ্টভাবে প্রবন্ধটিতে প্রকাশিত হয় নি। প্রবন্ধকার যে উপসংহারে পৌঁছেছেন তা হল সুদূর ভবিষ্যতেও দ্বিধাবিভক্ত জার্মান জাতির মিলন একপ্রকার অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে একটি কথা জানাই যে, প্রবন্ধকার শুধু এক পশ্চিম জার্মান পিটার কোহেগেনকে উপস্থাপিত করেছেন, তাই তাঁর রচনাটি অনেকাংশে একপেশে হয়ে পড়েছে। একজন পূর্ব জার্মান নাগরিকের মানসিক প্রতিক্রিয়া এতে প্রতিফলিত না হওয়ায় আমরা জানতে পারলাম না, তাঁরা কতখানি নিজেদেরকে এই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছেন, বা তাঁরা কতখানি একজন পশ্চিম জার্মানের সঙ্গে স্বজাতিগত নৈকট্য অনুভব করেন।

একটি জায়গায় প্রবন্ধকারের নিতান্ত ছেলেমানুষী বড় চোখে লাগে। তিনি লিখেছেন—এ দেশে আসার আগে তো ধারণা ছিল, বার্লিন বুঝি পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর সীমানায়।" প্রশ্ন হচ্ছে, যুদ্ধোত্তর যুগের জার্মানীর রাজনৈতিক মানচিত্র কি তিনি আগে প্রত্যক্ষ করেন নি?

জার্মান জাতির শক্তির উৎস তাঁদের অহংবোধ ও তথাকথিত আর্যগরিমা। সেই উৎস যে আজও জলসিঞ্চিত হয় তা বোঝা যায়, পিটারের চকিত গর্বোদ্ধত হাসিতে, যার কথা প্রবন্ধকার উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের পর দুই চির-প্রতিদ্বন্দ্বী—তথাকথিত প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী শক্তি ও সমাজবাদী শক্তি জার্মানীকে তাদের বিচরণভূমি করে নিয়েছে। হয়ত এর ফলে আর একটি হিটলারের উত্থানের পথ রুদ্ধ হয়েছে। তাই অজস্র পিটারের গর্বিত হাসিতে আজ শুধু তিক্ত রিক্ততা।

শুভজিৎ রায়
খাগড়া, বহরমপুর

## '৮০ অলিম্পিকের আগে রুশ দেশ

'দেশ' সাপ্তাহিকে চিরঞ্জীবের "৮০ অলিম্পিকের আগে রুশ দেশ" লেখাটি প্রথম কিস্তি থেকেই আমার মত অসংখ্য পাঠক হয়ত অতি আগ্রহে পড়ে চলেছেন, কারণ লেখাটি শুধু খেলাধুলোর বিষয়েই নয়, রুশ দেশকে নানান দিক থেকে জানবার পক্ষেও প্রয়োজনীয়।

১৪ জুন সংখ্যায় ৩৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় প্যারাতে চিরঞ্জীব যে বাহাত্তর বছর বয়েসের তাল্লিনের একটি ফিশিং কো-অপারেটিভের পার্ট টাইম টিচারের কথা উল্লেখ করেছেন। সেই ভদ্রলোকের প্রশ্নগুলির উচিত জবাব দিতে পারলেন না কেন বুঝতে পারলাম না। চিরঞ্জীব লিখেছেন, ভদ্রলোক ভূগোল পড়ান, ভারতবর্ষ [illegible] পর খুঁটিনাটি খবর রাখেন, রবীন্দ্রনাথ পড়াশোনা করেছেন, রাজনীতির খবরও রাখেন, বিলোনিয়ার গোলাগুলি নিয়ে প্রশ্ন করার সময় বলেন " ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ কেন? তোমরা বাংলাদেশের মুক্তিতে সাহায্য করেছ কয়েক বছর আগে। আর আজ তাদের সঙ্গেই গণ্ডগোল"? চিরঞ্জীব কেন জবাব দিলেন না, বাংলাদেশকে যিনি মুক্ত করেছিলেন সেই মুজিবকে সবংশে গুলি মেরে যারা হত্যা করল, যারা জেলখানার ভেতরে ঢুকে জাতীয় নেতাদের হত্যা করে বিনা বাধায় শুধু বেরিয়েই এল না, প্রাইজ পোস্ট নিয়ে বিদেশে দূত হয়ে চলে গেল, জনরোষ থেকে যাদের রক্ষা করল এইভাবে, সে সরকার মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সাহায্যের কথা কি মনে রাখতে চান ও পারেন?

বাহাত্তর বছরের রুশ পণ্ডিত মানুষটিকে চিরঞ্জীব কেন জবাব দিলেন না যে চীনদেশ তাঁদের আদর্শ-গত ভাই, (ক্রুশ্চেভের বক্তৃতা স্মরণীয়) অর্থাৎ কমরেড তাঁদের সঙ্গে রুশদের সীমান্ত সংঘর্ষ হয়েছিল কেন? কেন হালেই সরোজ মুখার্জির কাছে চীনের নেতারা বলেছেন, রুশ চীনকে গুঁড়িয়ে দেবার সব রকম চক্রান্তে লিপ্ত বলেই আমেরিকার সঙ্গে চীনের সৌহার্দ্য বাড়াতে হয়েছে? এখানে ভাইয়ে ভাইয়ে এঁরা কি করছেন? চীন কি বিপ্লবের সময় রুশদেশের সাহায্য পায়নি? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলার যখন রুশদেশ আক্রমণ করল তখন চীনও কি সারা বিশ্বের শ্রমিক বিপ্লবীদের মত তাকে 'জনযুদ্ধ' আখ্যা দেয়নি? ভিয়েতনাম কি বিপ্লবের সময় চীনের কোনো সাহায্য পায়নি? তারা কি ভাই ভাই নয়? তবে অতবড় চীন-ভিয়েতনাম কাণ্ডটি ঘটে গেল কি করে? সেই ভিয়েতনাম কি কামপুচিয়ার ভাই নয়? তবে পল্-পটের পাট চোকালো কেন ভিয়েতনাম? দিয়েন-বিয়েন-ফুয়ের স্মৃতি কি বিশ্বের তাবৎ ভাইয়েরা ভুলে গেলেন এত শীঘ্র? কেউ মুখে রা টি তো কাটলেন না? ক্রুশ্চেভ বলেছিলেন, when comrades debate, they enjoy it, capitalist world has nothing to gain from it—এতো নির্জলা deb[illegible] বা polemics নয়—এ তো যুদ্ধ—ট্যাঙ্ক বিমান বহর নিয়ে একভাই আরেক ভাইয়ের সর্বস্ব, gains of revolution-কে গুঁড়িয়ে ছাতু করে দেবার যুদ্ধ। বাহাত্তর বছর বয়েসের সুপণ্ডিত রুশ ভদ্রলোকটিকে চিরঞ্জীব এসব কথা মনে করিয়ে দিলেন না কেন? তাঁর মত বিজ্ঞ পুরোন ব্যক্তি কি জানেন না, কি অবস্থায় সদামুক্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক কাঠামোটি আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে? ভারত কত সংযত ব্যবহার করে চলেছে, জল নিয়ে নিজের সর্বনাশ মেনে নিয়ে এখনো চুপ করে আছে, বর্ডারে অশ্বিনীকুমারের হাতে গুলি লাগা সত্ত্বেও?

গৌরচন্দ্র চক্রবর্তী হাজারিবাগ

## চক্ষুদান ও ধর্ম

২৪শে মে ১৯৮০ দেশ পত্রিকায়

শ্রীঅরূপ দাসের "আই ব্যাংক ও তার সমস্যা" প্রবন্ধটি পড়লাম। অন্ধত্ব ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা এদিকে ওদিকে চোখে পড়ে কিন্তু এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের যে কিছু করার আছে তা শ্রীদাস আমাদের মনে করিয়ে দেন। এর প্রতিকারে সরকার নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবেন, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহেও এগিয়ে আসুক এটা অভিপ্রেত। শ্রীদাস ধর্মীয় নেতাদেরও আহ্বান জানিয়েছেন। আমাদের দুঃখ এই যে, এদেশে ধর্মীয় নেতারা অধিকাংশই কোন ভাল কাজই করেন না, কেবল বিভেদ সৃষ্টি বিভ্রান্তি আনা আর মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে সমগ্রভাবে মানবিকতা অভিমুখী করার বদলে তাদের অনুগামীদের এমন একটা ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চান যেখানে মানবিকতা মাথা কুটে মরে। আই ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে খৃষ্ট ও হিন্দু ধর্মের নেতারা কিছুটা খোলা মনের দৃষ্টান্ত রেখে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন কিন্তু কলকাতার নাখোদা মসজিদের ইমাম সাহেবের ফতোয়া শুনে দুঃখে বেদনায় অভিভূত হতে হয়। আমরা মানি আমাদের সকল ভাল-মন্দের জিম্মাদার নিশ্চয়ই সেই মহান আল্লাহ। কিন্তু তাঁর উপর নিজের বা মানব জাতির ভবিতব্যকে সঁপে দেওয়ার কথা ইসলামে কোথায় বলা হয়েছে? ইসলামে বলা হয়েছে কোন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হলে তার সমাধানের জন্য প্রথম চেষ্টা করে দেখতে হবে পবিত্র কোরান শরিফে তার কোন সমাধান আছে কিনা। না থাকলে হজরতের (দঃ) জীবনে অর্থাৎ হাদিসে এর সমাধান খুঁজতে হবে। সেখানেও ব্যর্থ হলে নিজের নিজের বিবেকের কাছ থেকে উত্তর খুঁজে নিতে হবে। চক্ষুদান সম্বন্ধে কোরান শরিফে কোন নির্দেশ নেই, হজরতের জীবনকালেও এমন সমস্যা আসে নি। কিন্তু আমাদের বিবেক কি বলে? শ্রদ্ধেয় ইমাম সাহেবের কাছে আমাদের বিনীত জিজ্ঞাসা অসুখ করলে তিনি কি ডাক্তারের কাছে যান না? তাঁর পরিজন অসুস্থ হলে তাঁরা কি বিনা চিকিৎসায় থাকেন পরম করুণাময়ের করুণার উপর নির্ভর করে? সবই মহান আল্লাহতালার উপর ছেড়ে দিয়ে আমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলেই তো পারি! আমরা আমাদের ধর্ম ও বিবেককে বিসর্জন দিতে পারি না।

কেশওয়ার জাহান কলকাতা-১৯

## রবীন মণ্ডল ঃ লেখকের উত্তর

১৪ জুন ১৯৮০ "দেশ"-এ রবীন মণ্ডলের বিষয়ে প্রচ্ছদপটে লেখার সম্বন্ধে পার্বতী মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবাদ পড়লাম। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে না গিয়েও বলবো, সাধারণ কথা বাঁকিয়ে চুরিয়ে দেখার জন্য বিপত্তি ঘটেছে। আর পার্বতী যদি "ফ্রন্টিয়ার" এবং অন্যান্য পত্রিকা থেকে আমার লেখা সংগ্রহ করে থাকেন, তা হলে তাঁকে আমার লেখার অনুরাগীই বলতে হয়। প্রশ্ন হলো, রবীনের সঙ্গে যদি অবনিবনাই থাকে, তা হলে ওঁর বিষয়ে ইংরেজী বাংলায় আমি এত লিখব কেন? এমন কি জয়া আপ্পাস্বামীকে বলে রবীনের বিষয়ে সচিত্র বড় প্রবন্ধ "ললিতকলা কন্টেম্পোরারী" পত্রিকায় আমিই লিখেছি।

রবীন মণ্ডল ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রতিভাবান শিল্পী এ কথা পার্বতী দাবি করলেও, রবীন নিশ্চয় করবেন না। প্রতিভাবান বহু শিল্পী কাজ না করে মিইয়ে গেছেন, এমন কি এই কলকাতারও, এটা তো ঘটনা। প্রাণকৃষ্ণ পাল রবীনের চেয়ে প্রতিভাবান ছিলেন না কি? রবীন ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের নৈশ বিভাগের ছাত্র। মূলত স্বশিক্ষিত। পরে কলেজী দলিল একটা থাকলে কাজে দেবে এটা চিন্তা করেই তিনি স্নাতক হয়েছিলেন, নিজে রবীনই আমায় বলেছেন। অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমই রবীনের সাফল্যের কারণ, এ কথা বলায় দোষ কোথায়? রবীনকে আমি অণুচিত্রকর (মিনিয়েচারিস্ট) বলি নি। খেয়াল গাইতে গেলে নানারকম টুকরো সূক্ষ্ম কাজ করতে হয়। বড়ই হোক আর ছোটই হোক ছবিতেও ছোট্ট ছোট্ট নানা কাজের কেয়ারী করতে হয়। যদিও "অণুপ্রচিত্রকর" যে গালাগাল সেটা জানলাম। সত্যি সারা জীবন ধরে কত কি শিখতে হয়!

চলন্তিকা অনুসারে "পঙ্গু" শব্দের অর্থ খোঁড়া, "যে নড়িতে চড়িতে পারে না"। অবশ্যই আমি এ কথা বলি নি, রবীনের পায়ের হাড়ে ক্ষয়রোগ বা পলিওমাইলাইটিস হয়েছিল। তাঁকে পায়ের জন্য কিছুকাল শয্যাশায়ী হতে হয়েছিল। লোকের সাহায্য ছাড়া 'নড়তে চড়তে' ডাক্তারের বারণ ছিল। ছেলেবেলায় সেই সময় তিনি ছবি আঁকা শুরু করেন, এ কথা বহুকাল আগে রবীন আমাকে নিজেই বলেছেন। প্রসঙ্গক্রমে প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নি দুজন এমন প্রথম শ্রেণীর প্রখ্যাত চিত্রকর কলকাতার দুটো আর্ট কলেজে অধ্যাপনা করছেন, এ কথা জানি। আবার নিখিল বিশ্বাস এবং প্রকাশ কর্মকারের মতো প্রতিভাধর শিল্পী আর্ট কলেজের চৌকাঠ ছাড়াই দারুণ ছবি এঁকেছেন এমন উদাহরণও আছে। প্রাইভেট বা রেগুলার ছাত্র হিসাবে ম্যাট্রিক দেওয়া তো উপলক্ষ। কী ভাগ্যিস পার্বতী বলেননি যে রবীনের আসল নাম আমি ভুল করেছি, সেটা হবে রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল! ফ্রয়েড— অ্যাডলার— ইয়ুঙের শিষ্য না হয়েও বলা যায়, "পঙ্গু" শব্দটাই গোল বাধিয়েছে। একবার অভিধান খুলে দেখলেই হত।

সন্দীপ সরকার

## ললিতকুমার

২৪শে মে তারিখের 'দেশ' পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে সুধীর চক্রবর্তী মহাশয় লিখেছেন যে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে ঈশান স্কলারও ছিলেন, ঐ কথার 'অন্য কোনও সমর্থন' তিনি নাকি পান নি। তাঁকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে ঈশান স্কলারদের নামের তালিকা দেখতে বলি। তাতে আছে যে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ঈশান স্কলারশিপ পেয়েছিলেন ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

অমলেন্দু সেন কলকাতা-২৫

## গ্রাফিক আর্ট

গ্রাফিক আর্ট (আচার্য নন্দলাল বসুকে অনুসরণ করে বাংলায় ছাপের ছবি বলি না কেন? অথবা আরও একটু বদলে নিয়ে যদি বলি ছাপাই-ছবি, তবে তৎসম-তদ্ভব শব্দপ্রধান অনেক ভারতীয় ভাষাতেই এই যুগ্ম শব্দটিকে গ্রাফিক আর্ট বা আর্ট অব প্রিন্ট-মেকিং-এর প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে) বিষয়ে সন্দীপ সরকার-সনৎ কর বিতন্ডায় (দেশ, ১৭ মে এবং ২১ জুন) কিছুতেই নাসিকা-অনুপ্রবেশ করাতাম না যদি না সন্দীপবাবু তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে আমার মতন নগণ্য লোককে সাক্ষী মানতেন।

সন্দীপবাবু সনৎ করের বক্তব্যের বিরোধী বক্তব্য হিসাবে আমার লেখা থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তার সঙ্গে সনৎ করের বক্তব্যের আদপে কোন বিরোধিতা নেই। সনৎবাবু বলেছেন, "অরুণ বসু দেশে ফেরার অনেক আগে... সোসাইটি অব কনটেম্পোরারী আর্টিস্ট-এর ধর্মতলার ঘরে ইন্টালিও পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য স্টুডিও প্রতিষ্ঠিত হয়... এবং ইন্টালিও পদ্ধতিতে কাজ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে।" সন্দীপবাবু আমার লেখার যে অংশ উদ্ধার করেছেন, সাদা বাংলায় তার অর্থ দাঁড়ায়, একটি মাত্র প্লেট বা ম্যাট্রিক্স থেকে বহুরঙা ছাপাই ছবি তৈরি করার রীতি, যা হেটার রীতি নামে পরিচিত, কলকাতায় প্রচলন করেন অরুণ বসু। এর সঙ্গে সনৎ করের বক্তব্যের বিরোধিতা নেই।

ছাপাই-ছবি সম্পর্কে সন্দীপবাবুর ধারণার অস্বচ্ছতার জন্যই তিনি মনে করছেন আমার আর সনৎ করের বক্তব্য পরস্পর-বিরোধী। তাঁর ধারণার অস্বচ্ছতার প্রমাণ পাই যখন তিনি বলেন, "এচিং আর ইনতাগ্লিওর তফাত আছে।" আর এই ধারণাই আছে যত গণ্ডগোলের মূলে।

ছাপাই ছবির জাতি-ভেদ করা হয় দু ভাবে। এক, সাপোর্ট মেটেরিয়াল বা ম্যাট্রিকস মেটেরিয়ালের নামানুসারে এবং/অথবা ম্যাট্রিক্স মেটেরিয়ালে যে পদ্ধতিতে নকশা বা রূপকল্প ফুটিয়ে তোলা হয় সে পদ্ধতির নামানুসারে। ম্যাট্রিক্স মেটেরিয়ালের নামানুসারে নামকরণ হতে দেখা যায় লিথোগ্রাফে (মেটেরিয়াল এখানে লিথোগ্রাফিক স্টোন) ও সেরিগ্রাফে (সেরি=সিল্ক)। ম্যাট্রিক্স মেটেরিয়ালে যে পদ্ধতিতে নকশা বা রূপকল্প ফুটিয়ে তোলা হয় সে পদ্ধতির নামানুসারে নামকরণ হতে দেখা যায় এনগ্রেভিং-এ, ড্রাই-পয়েন্টে, এচিং-এ। উড-কাট এবং উড এনগ্রেভিং-এর ক্ষেত্রে এসে দেখা যায় যে তার মধ্যে সাপোর্ট মেটেরিয়াল এবং নকশা বা রূপকল্প ফুটিয়ে তোলার পদ্ধতি উভয়েরই পরিচয় আছে নামে। দুই, কালির সাহায্যে যে পদ্ধতিতে ম্যাট্রিক্স থেকে কাগজ বা কাপড়ের উপর ছাপ তোলা হয় সে পদ্ধতির নামানুসারে আরেকভাবে ছাপাই ছবির জাত-ভেদ করা হয়ে ইনতাগ্লিও প্রিন্টিং, প্লেনোগ্রাফিক বা প্লেনোমেট্রিক প্রিন্টিং এবং স্টেনসিল প্রসেস। আমরা যখন বলি এচিং, তখন তামার বা দস্তার বা অন্য কোন ধাতব পাতকে অ্যাসিড দিয়ে খাইয়ে নকশা বা রূপকল্প তোলার পদ্ধতির কথা বলি। যখন বলি ইনতাগ্লিও, তখন এমনই একটি ছাপাই পদ্ধতির কথা বলি, যে পদ্ধতিতে কালি লাগানো হয় প্লেট বা ম্যাট্রিক্স-এর খোদাই-কৃত নিম্ন-তলে ছাপাইয়ের সময়ে যে নীচু-তল থেকে কালি উঠে এসে কাগজে লাগে। প্লেটের উপর-তলা থাকে পরিষ্কার। ধাতুর পাতের উপর করা এনগ্রেভিং, ড্রাই পয়েন্ট, এচিং সাধারণত ইনতাগ্লিও প্রথায় ছাপা হয়ে থাকে। এচিং-ই বলি আর ইনতাগ্লিওই বলি, আমরা যখন ফিনিশ্ড প্রডাক্ট-এর কথা বলি তখন তার সৃষ্টিতে নিয়োজিত একটা অপারেশন-এর কথা বলি, পুরোটা বলি না। এচিং কর্মটিকে ছবিতে রূপান্তরিত করতে হলে ইনতাগ্লিও পদ্ধতির ছাপাই কর্মের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এর পরে কি করে সন্দীপবাবু বলেন ফিনিশড ছবি হিসাবে এচিং আর ইনতাগ্লিওর মধ্যে তফাত আছে। যা ইনতাগ্লিও পদ্ধতি স্ট্যানলি উইলিয়ম হেটার-এরই দান, যা অরুণ বসু মারফত কলকাতায় এসে পৌঁছয়?

সনৎবাবু বলেছেন, ইনতাগ্লিও পদ্ধতিতে ছবি তৈরি করা শুরু হয় অরুণ বসু এদেশে এসে পৌঁছনর আগেই। আমি তো বলি, ১৮১৬ সালে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত 'অন্নদামঙ্গল'-এর জন্য যখন রামচাঁদ রায় এচিং করেছিলেন, তখন তাও ইনতাগ্লিও পদ্ধতিতে ছাপা হয়েছিল (তখনও প্রসেস ব্লক আবিষ্কৃত হয়নি বলে লেটারপ্রেস রিলিফ প্রিন্টিং প্রসেসে ছবি ছাপা হতো না।) অতএব, ১৯৩৪-এ যাঁর জন্ম সেই অরুণ বসু কলকাতায় ইনতাগ্লিও পদ্ধতিতে ছবি তৈরীর ভগীরথ হন কি করে? অরুণ বসু পারীর আতেলিয়ে সতের থেকে, একই ম্যাট্রিকস থেকে বহু রঙা ছবি ছাপানোর রীতিনীতি, যা নাকি হেটার-পদ্ধতি বলে সুপরিচিত শিখে এসে কলকাতায় তার চর্চা শুরু করান। তাতে যে ছবি তৈরী হয় তা রঙিন এচিং, ইনতাগ্লিও রীতিতে ছাপা।

এখানেই আমার চিঠি শেষ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু স্ট্যানলি উইলিয়ম হেটার নামক ব্যক্তি কি দরের শিল্পী সে-নিয়ে সন্দীপ সরকার-সনৎ কর বিতর্কে একটু অংশ না-নিয়ে পারছি না।

স্ট্যানলি উইলিয়ম হেটার যে একজন কারিগরের চেয়ে বেশী সম্মান পাবার যোগ্য নন—তাঁর এই বক্তব্যের স্বপক্ষে সন্দীপবাবু এ্যালিস্টার গ্রান্ট নামে লন্ডনের রয়েল কলেজ অফ আর্টের একজন অধ্যাপকের মৌখিক মতামতের কথা উল্লেখ করেছেন। আলাপচারী কথায় কে, কবে, কোথায়, কাকে কি বলেছেন তা যদি যাচাই সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসাবে গ্রাহ্য হতে পারে? সন্দীপবাবু আরও বলেছেন, নানা বিদেশী দূতালয়ে এবং বিদেশী প্রচার সংস্থায় তাঁর সঙ্গে অনেক জ্ঞানী-গুণী সাহেবদের সঙ্গে দেখাশোনা কথাবার্তা হয়। তাঁরাও নাকি বলেছেন যে তাঁরা হেটার মশাইয়ের নাম কখনও শোনেন নি। এই নাম-ধাম-গোত্রহীন সাহেবরা কি ধরনের জ্ঞানী-গুণী, তাঁরা ভাগ্যবান সন্দীপবাবুর কানে-কানে কি কথা বলেছেন তা জানবার এবং যাচাই করার সুযোগ যে-হেতু আমাদের মতন সাধারণ দর্শকের নেই সেহেতু সে-কথা বা তাঁদের কথা সন্দীপবাবুর মুখ থেকে শুনে মানবার দায়ও আমাদের নেই। আমাদের নির্ভর করতে হয় নিজেদের চোখে দেখা অভিজ্ঞতার উপরে ও ছাপা অক্ষরে প্রকাশিত মতামতের উপরে।

হেটারের ছবি দেখার অভিজ্ঞতা থেকে আমি আমার বুদ্ধি বিবেচনা মতন তাঁকে কি দরের শিল্পী বলে মনে করি তা আমি বলছি না, কারণ সাহেব না-হবার কারণে আমার মতামত হয় তো গ্রাহ্য হবে না। আমি সাহেবদেরই প্রকাশিত মতামতের কথা উল্লেখ করছি। হ্যারি অ্যাব্রাহামের নূয ইয়র্কস্থ প্রকাশন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত সংকলন গ্রন্থ 'আর্ট সিনস ১৯৪৫'-এ দেখি স্যার হার্বার্ট রীড উইলিয়ম হেটারকে যুদ্ধোত্তর কালের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সুররিয়ালিস্ত শিল্পী হিসাবে বর্ণনা করেন। সেখানে, তিনি ছাপাই-ছবি নির্মাতা না চিত্রকর সে-প্রশ্ন থাকে উহ্য। ন্যু ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পের ইতিহাস বিষয়ের অধ্যাপিকা ডোরে এ্যানাটন-এর ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ 'সুররিয়ালিজম আফটার সেকেন্ড ওয়ার' গ্রন্থেও স্ট্যানলি উইলিয়ম হেটারের পরিচয় পাই সুররিয়ালিজমের বিবর্তনমুখী পালাবদলের অন্যতম হোতা হিসাবে, কারিগর হিসাবে নয়। ফ্রিটৎস আইখেন-বার্গ এবং জুলে হেলারের ছাপাই-ছবি বিষয়ক দুই মহাগ্রন্থের কথা না হয় বাদই দিলাম, কারণ সেগুলির কথা উঠলে সন্দীপবাবু হয় তো বলবেন, বইগুলি যেহেতু ছাপাই ছবি বিষয়ক সেহেতু কারিগরী গুণের জন্যই হেটার উল্লেখিত হবেন। কিন্তু কারিগরী উদ্ভাবনী শক্তি ও দক্ষতাকে এত হেয় জ্ঞান করা কেন? শিল্পে তো ধ্যান-ধারণা, ভাবনা-চিন্তা, আবেগ-অনুভূতিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু করে তুলতে হয়, শিল্পবস্তু তো নির্মাণ করতে হয়। তার জন্য তো কারিগরী উদ্ভাবনী শক্তি ও দক্ষতার প্রয়োজন আছে।

হেটারের গুণাগুণের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সন্দীপবাবু লন্ডনের রয়েল কলেজ অফ আর্টের অধ্যাপক এ্যালিস্টার গ্র্যান্টের তথাকথিত (এবং স্বয়ং নিবেদিত) বক্তব্যকে শান্তি-নিকেতনের কলাভবনের অধ্যাপক সনৎ করের মতামতের চেয়ে অধিকতর গ্রাহ্য বলে মনে করেন। কিন্তু কেন, কোন বলে (তাঁর নিজের কাজের নিদর্শন কলকাতার ব্রিটিশ কাউন্সিলে কাচের ট্রানসপারেন্সির মাধ্যমে যা দেখলাম, তাতে তাঁকে আমার সনৎ করের চেয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্পী এবং প্রিন্ট-মেকার বলে মনে হয়নি)? তিনি লন্ডন রয়েল কলেজের অধ্যাপক বলে? সনৎ কর ভারতীয় শিল্পী এবং অধ্যাপক বলেই কি তাঁর বক্তব্য হেয়? ছাপাই ছবিচর্চার ক্ষেত্রে রয়েল কলেজ কোন ছবি চর্চার ক্ষেত্রে রয়েল কলেজ কোন অর্থে কলা-ভবনের চেয়ে, হেটারের আতেলিয়ে সতের বা ফ্রিটৎস আইখেন-বার্গের প্রাট ইন্সটিট্যুট-এর চেয়ে বেশী কৃতিত্বের দাবীদার?

প্রণবরঞ্জন রায় কলকাতা-২৯

## ত্রিপুরা

'দেশ'-এর সম্পাদকীয় "ত্রিপুরায় গণহত্যা" পড়ে ভালো লেগেছে। ত্রিপুরায় যে নরমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছে তার জন্য মূলত বামফ্রন্ট সরকারই দায়ী। আজ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ত্রিপুরায় বিদেশী প্ররোচনার অভিযোগ করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, বিদেশী ধর্ম প্রচারকরাই উপজাতীয়দের উসকানি দিয়েছে। কিন্তু আজ থেকে প্রায় সাত-আট মাস আগে যখন নৃপেনবাবুর সরকার উপজাতীয়দের সমর্থনে বাঙালীদের লাঠিপেটা করে দেখিয়েছিলেন পেটানোর ব্যাপারে তাঁরাও কম যান না, তখন তো কই কেউ বিদেশী প্ররোচনার কথা বলেননি। আমি তখন হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড-এর সম্পাদককে লেখা একটি চিঠিতে নৃপেনবাবুর ভ্রান্ত কার্যকলাপের সমালোচনা করেছিলাম। আজকের রাজনৈতিক অংক যদি বিশ্বাস করতে হয়, তবে ধরে নিতে হয় যে, ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারও বিদেশীদের প্ররোচনার বলি।

ত্রিপুরা, মণিপুর, উত্তরবঙ্গ, উপজাতি-অধ্যুষিত বাংলা-বিহারের অংশ বিশেষ—এ সব জায়গায় আজ যে আন্দোলন চলছে তাকে সামন্ততান্ত্রিক অভ্যুত্থান হিসেবে চিহ্নিত করলেই ভাল হয়। প্রতিটি জায়গাতেই বলা হচ্ছে যে, ১৯৪৯ সনে এ সব জায়গার রাজারা প্রাণের ভয়ে ভারতে যোগ দিয়েছিলেন, ভারত নাকি "Gunpoint"-এ এসব রাজ্য দখল করেছিল। তাই আজ, ১৯৮০ সনে, উপজাতীয়দের আগেকার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। বলা বাহুল্য, এ সব দাবির পেছনে অতীতের রাজারানীদের নীল রক্ত কাজ করছে। এ সব রাজারানীরা নেহরুজীর বদান্যতায় অনেক পেয়েও খুশি নন। জনতা সরকারও এদের মদত দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, আজকের কেন্দ্রীয় সরকারও এদের বিরুদ্ধে শক্ত হাতের পরিচয় দিতে পারেননি। রাজা-মহারাজাদের বংশধরদের অর্থে পুষ্ট মার্কসবাদীরাও বিভিন্ন কারণেই এদের সাথে লড়তে পারছেন না। মাঝখান থেকে মার খাচ্ছে হাজার হাজার গরীব বাঙালী।

রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

## গৌরী ধর্মপাল-এর
মজাদার ছাব-ছড়ার বই
# ঘোড়া যায় দাম ৬.০০

"রঙচঙে পাতা আর/ছবি ছড়া মজাদার/হাসি খুশি ফুর্তি/এই দিয়ে ভর্তি" —'ঘোড়া যায়'-এর প্রথম ছড়ার প্রথম চারটি পংক্তিতেই যেন তুলে ধরা হয়েছে বইটির বিষয় এবং বিন্যাস, স্বাদ এবং রস, মজা এবং আনন্দ। ছোটদের জন্য নতুন স্বাদের ছড়া আর সঙ্গে তাল-মেলানো মন-ভোলানো সব ছবি— এ-দুয়ের হরগৌরী মিলনে দু-রঙে ছাপা এ-বই এক অনন্য উপহার।

গৌরী ধর্মপাল-এর ছড়ার বৈশিষ্ট্য হল, অবিকল ছোটদের চোখ দিয়েই পৃথিবীকে দেখতে জানেন তিনি। ছোটদের অনুভব-উপলব্ধি-বিস্ময়-আনন্দ-অভিলাষকে ধরতে পারেন জীবন্তভাবে।
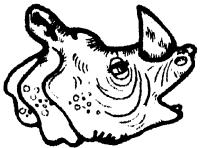
ছোটদের চারপাশের প্রাণী-জগৎ এ-বইয়ের অধিকাংশ ছড়ার বিষয়। ভালুক-হরিণ-ময়ূর-প্রজাপতি-কাকাতুয়া মাছরাঙা-প্যাঁচা-উট-বাঘ-হাতি-বেড়াল-কুকুর—কে নেই! এ যেন এক আজব চিড়িয়াখানায় ছোটদের ডেকে নিয়েছেন তিনি। আর সেই চিড়িয়াখানায়

ভ্রমণের ছাবগুলোকে জ্যান্ত করে তুলেছেন এ-কালের দুর্ধর্ষ শিল্পী দেবাশিস দেব শিশুচিত্রের জন্য এই কদিন

## রমাপদ চৌধুরীর
বিস্ময়-জাগানো উপন্যাস
# বীজ দাম ৭.০০

হঠাৎই একদিন বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন শশাঙ্কশেখর। ইতিহাসের গবেষক, স্ত্রী-পুত্রকন্যা সবাই রয়েছে। তবু চলে গেলেন। গেলেন যে, আর ফিরে এলেন না। কোনও চিঠি নেই, খবর নেই। নিরুদ্দিষ্ট শশাঙ্কশেখরের বইয়ের ভাঁজ থেকে এক-টুকরো কাগজ আবিষ্কার করলেন স্ত্রী সুধাময়ী। এক প্রিয় ছাত্রীর নাম বারবার লিখেছেন শশাঙ্কশেখর সেই কাগজটায়। সংসারে যাঁর কোন সম্পর্কে বা কোন ভালবাসায় কোন খাদ ছিল না তিনি কেন লিখতে গেলেন এক ছাত্রীর নাম? কেন? কেন?

'বীজ' উপন্যাসের আরম্ভেই এক গূঢ়-গহন জট। সেই গ্রন্থি ক্রমশ উন্মোচিত হয়েছে, আর কাহিনীর ভাঁজে-ভাঁজে লুকনো রহস্য ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে। আজকের স্মৃতি-ভ্রষ্ট সভ্যতার সর্বনাশের বীজটি কোথায়. শশাঙ্কশেখরের নিরুদ্দেশকে কেন্দ্র করে সেই কাহিনীই বিস্ময়-জাগানো শিল্পকুশলতায় তুলে ধরেছেন রমাপদ চৌধুরী।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থঃ
রূপ ১২.০০ হৃদয় ৬.০০ লজ্জা ৭.০০ খারিজ ৭.০০ অ্যালবামে কয়েকটি ছবি ৭.০০ যে যেখানে দাঁড়িয়ে ৫.০০ পিকনিক ৬.০০ পরাজিত সম্রাট ৭.০০ বনপলাশির পদাবলী ১৫.০০ এবং গল্প-সমগ্র ৪০.০০

প্রকাশিত হয়েছে
## ইন্দ্রমিত্র-এর
অসামান্য হাসির উপন্যাস
# মহারাজ

নতুন কিছু রান্না সংযোজিত, অনুপ রায়ের পুরো-পাতা তেরখানা ইলাসট্রেশন, অফসেটে ছাপা প্রচ্ছদ
## লীলা মজুমদার ও কমলা চট্টোপাধ্যায়
রচিত রান্না-শেখানোর বই
# রান্নার বই
দাম ১৫.০০

অগ্রগণ্যা কথাসাহিত্যিক লীলা মজুমদার ও তাঁর কন্যা কমলা চট্টোপাধ্যায় এ-বইকে বাছাই রান্নার বই করে তোলেননি।

তাঁরা দেশী-বিদেশী সব-রকম রান্না শেখাতে চেয়েছেন। জন্মদিনে-উৎসবে-অতিথি আপ্যায়নে-অসুখে-পিক-নিকে কীভাবে কী করলে

ভালো হয়, তা যেমন বলেছেন, তেমনই প্রতিদিনের আহার্যকেও কীভাবে স্বাদু করে তোলা যায়, তাও শেখাতে ভোলেননি। কাঁটা-চচ্চড়ি-শাকঘণ্ট যেমন রয়েছে তেমনই রয়েছে চপ-কাটলেট আর পোলাও-বিরিয়ানি, সুপ-সুরুয়া যেমন রয়েছে, বাদ যায়নি আইসক্রিম-কেক-ভাপদই-মিষ্টি বিস্কুট কিংবা প্যাস্ট্রি। উপকরণ দুর্মূল্য নয়, নয় দুষ্প্রাপ্য। মধ্যবিত্ত পরিবারের রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে, জিভের কথা ভেবে, সঙ্গতির কথা মনে রেখেই প্রতিটি রান্না শেখানো। নতুন সংস্করণে আরও কিছু রান্না যোগ করা হল। উপহারে বা বাড়ির ব্যবহারে অপরি-হার্য এই 'রান্নার বই' সর্বদিক থেকেই অদ্বিতীয়।

## মিহির মুখোপাধ্যায়ের
মিষ্টি প্রেমের উপন্যাস
# শঙ্খমালা দাম ৫.০০

শঙ্খমালাকে মানুষ জীবনে একবারই পায়। "এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর"— জীবনানন্দের কবিতার এই আইডিয়াকে এই মিষ্টি প্রেমের উপন্যাসে এক অসামান্য রূপ দিয়েছেন বিশিষ্ট তরুণ লেখক মিহির মুখোপাধ্যায়। অসাধারণ কয়েকটি ছোট গল্প লিখে তাঁর খ্যাতি, কিন্তু উপন্যাসেও তাঁর দক্ষতা যে কত তীব্র তা 'শঙ্খমালা'য় প্রমাণিত।

## সুধাংশু ঘোষের
নিবিড় স্বাদের উপন্যাস
# কে বাজায় দাম ৬.০০

"তখন সেই ধ্বনি, প্রথমে দূর-দূরান্তে অস্পষ্ট, ক্রমে এগিয়ে আসে, স্পষ্ট হয়। সুরেলা নয়, কর্কশ নয়, তবে দুঃসহ ধার। বিরামহীন ধ্বনিতরঙ্গ। কে বাজায়!" উত্তরতিরিশ এক যুবার নিত্য-মরণের যন্ত্রণা এক দরদী গায়কের কণ্ঠে বিশুদ্ধ মার্গসঙ্গীতের বিষন্ন আলাপের মতো ঝরে পড়েছে এই নিপুণ নিবিড় উপন্যাসে।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪ ৪৩ ৫২

প্রকাশিত হয়েছে
## সন্তোষকুমার ঘোষের
বিস্ময়কর কিশোর-গ্রন্থ
# দুপুরের দিকে
দাম ৮.০০

একজন মানুষ বারো বছর বয়সের মধ্যে যা শেখে বাকি জীবন তারই চর্বিত চর্বণ চলে। ফলে একজন কিশোরকে যেভাবে অজ্ঞ ভেবে নাবালক করে রাখি আমরা, বোধহয় ততটা কাঁচা সে নয়। সন্তোষকুমার ঘোষই সম্ভবত সেই লেখক, যিনি বিশেষভাবে শিশুদের

চির-শিশুত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তাঁর লেখা একটু গাঢ়, একটু গভীর, একটু জটিল। তিনি গা ভাসিয়েছেন চিরাচরিত শিশু-সাহিত্যের প্রতিকূল স্রোতে। তাঁর রচনা সেই সব ছেলে-মেয়েদের জন্যে, যারা এই প্রথম জীবনের জটিলতার আস্বাদ নিতে শুরু করেছে। যারা সকালবেলা থেকে পা বাড়িয়েছে দুপুরের দিকে। বয়ঃসন্ধির দারুণ সময়ে হঠাৎ তাদের মনে হতে পারে, এই তো সেই কথা, যা বস্তুতপক্ষে আমারও! রবীন্দ্রোত্তর যুগের বিশিষ্ট গদ্যকার সন্তোষকুমার এর আগে শিশুদের জন্য সময় ব্যয় করেননি একটুও। আকাদেমী পুরস্কার-প্রাপ্ত এই লেখক বড়ো বেশি ব্যস্ত ছিলেন বড়োদের নিয়ে। এই প্রথম তাঁর কিশোরদের মনস্তত্ত্বে পদচারণা এবং প্রথম বারেই ওই আশ্চর্য সাম্রাজ্যের অনেক অদেখা বস্তুকে তুলে এনে হাজির করেছেন তাদের সামনে এবার যারা তাঁর রচনার বিষয়। ভেতরে চমৎকার সব ছবি— এঁকেছেন দেবাশিস দেব। প্রচ্ছদ—এঁকেছেন বিপুল গুহ

দেশ ৪৭ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা
৩ শ্রাবণ ১৩৮৭

সম্পাদকীয়

## সূচীপত্র



## পরবর্তী আকর্ষণ

শংকর ঘোষের প্রবন্ধ
যুবশক্তির রাজনীতি
চিত্তরঞ্জন দেবের প্রবন্ধ
সহজপাঠের সুবর্ণ জয়ন্তী
রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়ের গল্প
স্বর্ণময়ীর ঠিকানা

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ এবং জীবনসত্য প্রিন্টিং হাউস ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

# অতঃপর বিহার ?

উত্তর পূর্ব ভারতের সর্বত্রই রব উঠেছে 'বাঁচাও' আর 'তাড়াও'। বিহার যে এতদিন ঘুমিয়ে ছিল তা ঠিক নয় ; হয়ত দেখছিল, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। দেখল, এই বেনো ঘোলা জল অনেক দূরই গড়িয়ে যেতে পারে। চারদিকে নজর রেখেই দুটি নতুন সংগঠন গড়ে উঠছে বিহারে : একটি 'বাঁচাও'-আন্দোলনের, অন্যটি 'তাড়াও' জিগিরের। সংগঠন দুটির নামকরণ করা হয়েছে, 'বিহার বাঁচাও মোরচা', আর 'অবসু'—অর্থাৎ অল বিহার স্টুডেন্টস ইউনিয়ন। সদ্য প্রসূত এই দুটি সংগঠনের সম্মুখ সমর এখনো প্রত্যক্ষ করা যায়নি। তবে শোনা যাচ্ছে, প্রথমটি জ্যেষ্ঠ হিসেবে যে-চালটি চালবেন, কনিষ্ঠ দলটি তা পালনের ব্যবস্থাগুলি কার্যকর করবেন। যেমন, জ্যেষ্ঠ বলবেন, বিহার থেকে কাঁচামাল বাইরে চালান যেতে দেব না; সঙ্গে সঙ্গে অবসুর রাজ্য-প্রেমিক ছাত্ররা রেল লাইন, কয়লা খনি, কারখানা সব ঘেরাও করতে শুরু করবেন, মুখে বলা হবে পিকেটিং—আসলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটার সব রকম সম্ভাবনাই থেকে যাবে।

যদি প্রশ্ন ওঠে, কী উদ্দেশ্যে এই নতুন সংগঠন দুটি? উত্তর হবে, বিহারের অর্থনৈতিক মুক্তি চাই! অর্থনৈতিক মুক্তি কথাটা শুনতে ভাল, ব্যঞ্জনা এবং অর্থব্যাপ্তি আছে। যদি এমন ধরা যায় যে, সংগঠকরা ওই রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা বলছেন তবে অন্য কথা। অর্থনৈতিক উন্নতি কোন্ রাজ্যের চাই না? আসামের চাই, পশ্চিমবঙ্গের চাই, বিহারের চাই, উড়িষ্যার চাই—গোটা দেশেরই চাই। সেই উন্নতির জন্যে কি প্রতিটি রাজ্য কাঁচামাল বাইরে যাওয়া বন্ধ করার হুমকি দিতে পারে? এই হুমকির কী যুক্তি থাকতে পারে? তেল বন্ধ করে আসাম কি তার অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করেছে? নাকি তার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয়েছে?

আসলে অর্থনৈতিক মুক্তি কথাটা মুখের বুলি। ভেতরের উদ্দেশ্য আলাদা। কিছু স্বার্থান্বেষী, হয় উচ্চাভিলাষ সফল করার মতলব নিয়ে না হয় রাজনৈতিক মুনাফা লোটার জন্যে বড় ধরনের কিছু বিশৃঙ্খলা চান। এ-দেশের রাজনীতিতে এখন বিশৃঙ্খলাই বড় অস্ত্র। কথায় বলে, শয়তান এক লাফে সাত পা যায়। বিশৃঙ্খলা ঘটাতে পারলে কারও কারও লাভ হয় হয়ত, কিন্তু ক্ষতি হয় বহুর। এ-কথা যে কতদূর সত্য তা প্রমাণ করার কোনো দরকার করে না, চতুর্দিকেই সে-দৃষ্টান্ত দেখা যাবে আজ।

বিহারের এই আন্দোলনকে উপেক্ষা করলে ভুল হবে। যখন তার বিষচারা বাড়েনি—অথচ বাড়ার মুখে—তখনও তা অবজ্ঞার ব্যাপার নয়। এ-কথা মনে রাখা দরকার, বিহারের ছোট নাগপুরের নানা অংশে ঝাড়খন্ড আন্দোলনের উগ্র সমর্থকরা রয়েছেন, রয়েছেন এমন অনেক অনুন্নত সম্প্রদায় যাঁদের ওপর বিহারের ভূমিমালিকদের অত্যাচার দীর্ঘস্থায়ী, রয়েছে জাত-পাতের কলহ এবং আক্রোশ। নানা ধরনের বিক্ষোভ ও উষ্মাকে কাজে লাগিয়ে একটা বড় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা অসম্ভব নয়। তাতে বিহারের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করা যাক বা না যাক—বিশৃঙ্খল বিহার কিছুকালের জন্যে অন্তত দেশের লক্ষ্যস্থল হয়ে উঠবে।

আন্দোলনকারীরা যে নির্বোধ তা নয়, তবে অনেক সময় অতি চালাকেরও হিসেবে গরমিল হয়। আজ বিহার যদি বিহারের অর্থনৈতিক মুক্তি দাবী করেন—কাল দক্ষিণ বিহার উত্তর বিহারের থেকে মুক্তি চাইবে, মৈথিলী-ভোজপুরীরা বিচ্ছিন্নতা দাবী করবে অন্য কোনো অছিলায়। এই ধরনের ছোটখাট দাবীদারের সংখ্যা বিহারে কম হবে না। এই রাজ্য একভাষী নয়, কিংবা সকলের অর্থনৈতিক মুক্তি এক নয়। বিহারের আদিবাসী, উপজাতিদের অর্থনৈতিক মুক্তির সঙ্গে পাটনার মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির মিল থাকতে পারে না।

বিহার যদি নিজ রাজ্যের বিশেষ এক শ্রেণীর জন্যে এই রণে মত্ত হয়—তবে অনুমান করি তাকে রণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতেই হবে, কেননা তার নিজের রাজ্যের অসংখ্য খেটে-খাওয়া মানুষ আজ অন্য রাজ্যের প্রতি নির্ভরশীল। পশ্চিমবঙ্গও তা থেকে বাদ যায় না। রাজ্যের সম্পদ এবং তার ভোক্তা একমাত্র সেই রাজ্যের লোক হতে পারে না যে—এও যেমন সত্য সেই রকম অর্থনৈতিক মুক্তিও বিচ্ছিন্নভাবে আসে না।

এটা খুবই আশ্চর্যের কথা, আঞ্চলিক ভেদবুদ্ধি, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা আমাদের এত দিনেও ঘুচল না। বরং স্বাধীনতার পর এই ব্যাধি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থা হয়েছে যে তা ভীষণ ব্যাধির মতন সংক্রামক হয়ে উঠেছে। আমরা সহজেই তাতে সংক্রমিত হচ্ছি। প্রতিটি রাজ্য এবং সেই রাজ্যের স্বতন্ত্র অঞ্চলগুলি যদি নিজ নিজ মুক্তির নামে আন্দোলনে নেমে পড়ে তবে আমাদের ভবিষ্যৎ কী? এই চিন্তা কার?

# গ্রামীন সংবাদ

মিহির মুখোপাধ্যায়

॥ এক ॥

বিকেলবেলা ছোট কানাই এসে বললো, "ব্রজদা, মাছ ধরতে যাবে, তা' হলে চলো বিশ্বাসদের বড় পুকুরে বসি একদিন।"

এই বালিডাঙ্গার বাজারে দু'জন কানাই। বড় কানাই হলেন দত্ত জুয়েলার্সের কানাইলাল দত্ত। ষাটের ঘরে বয়স। মোটাসোটা, রাশভারী মানুষ। সোনারুপোর মস্ত কারবারী। বাজারের ব্যবসায়ী সমিতির প্রেসিডেন্ট। বিস্তর জায়গাজমি, দোতলা দালান, পুকুর। আট-দশটা গাই-বাছুর, সাতটি ছেলেমেয়ের ঘরে একপাল নাতি-নাতনী আর জাঁদরেল গিন্নি নিয়ে জমকালো সংসারের কর্তা। ইদানীং দু'টি কানেই কম শুনতে শুরু করেছেন বলে যন্তর নিয়েছেন। এরকম যন্তর এ তল্লাটে আর কারো নেই। খাস বিলিতী জিনিস, কলকাতার ডাক্তারখানা ঘুরে বালিডাঙ্গা এসে বড় কানাইবাবুর কানে উঠেছে। রোজ-রোজ অনেকের আবদার-উমেদারির কথা শুনতে হয়। পয়সাওয়ালা বড় মানুষদের যা হয় আর কি! সারাদিন নানাজনের নানা নালিশ-নিন্দা, অভাব-অভিযোগের ফিরিস্তি শোনেন, অনেক গোলমেলে কাণ্ড-কারবারের ফয়সালা করেন। যখন আর শুনতে চান না, কিংবা কাউকে ভাগাতে চান, তখন বড় কানাইবাবু একটি মজার কাণ্ড করেন। স্রেফ কানের যন্তরটি খুলে রেখে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকেন। অর্থাৎ আর শুনবো না, এবার কাটো। এ নিয়ে বাজারে হাসাহাসি হয়। কিন্তু বড় কানাইবাবুকে নিয়ে এ গল্প নয়। তাঁর ছোট ছেলে বালিডাঙ্গার মস্তান দুলাল দত্তর কথা যথাসময়ে আসবে।

এই ছোট কানাই হল পঞ্চানন্দ ভাণ্ডারের মালিক বিধু পালের মেজ ছেলে কানাই পাল। নাম-ডাকের দোকান পঞ্চানন্দ ভাণ্ডারের একপাশে চাল-ডাল-তেল-নুন-মশলাপাতির মুদী দোকান, আরেকপাশে মস্ত পাটের আড়ত। দেশ ভাগের পর নদে জেলার বালিডাঙ্গায় এসে ছোট্ট একটা মুদী দোকান দিয়ে শুরু করেছিলেন বিধু পাল। তারপর পাটের কারবারে নামলেন।

সোনালী পাটের গুচ্ছ, কাগজী নোটের গোছা হয়ে ঘরে আসতে লাগল। তিরিশ বছরে লাল হয়ে গেলেন। টাকা হলে হাঁক-ডাক বাড়ে, পয়সার সঙ্গে প্রভাব-প্রতিপত্তি।

ব্যবসায়ী সমিতির সর্দারি নিয়ে কানাই দত্তর সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগল। একদিকে বরিশালের বাঙাল বিধুভূষণ পাল, আরেকদিকে এখানকার আদি-বাসিন্দা নদে জেলার কানাইলাল দত্ত। সে সব অন্য গল্প। এখন বয়স হয়েছে বিধু পালের। কোমরে বাত, চোখে ছানি। তিন ছেলে। বড় ছেলে বলাই পাল ব্যবসা দেখে। বাপের সঙ্গে সঙ্গে থেকে কাজ-কারবার ভালই শিখেছে। ছোট ছেলে নিমাই নৈহাটি কলেজে পড়ে। আর মেজ ছেলে এই কানাই পাল খোশ-মেজাজের মানুষ। পঁয়ত্রিশের মত বয়স। বিয়ে-থা করেছে। দু'টি ছেলে-মেয়ে আছে বটে, কিন্তু উড়ু উড়ু মন। হইচই, আমোদ-স্ফূর্তির দিকেই ঝোঁকটা বেশী। দোকান দেখার দায়-দায়িত্ব বিশেষ নিতে চায় না। বাজারের বারোয়ারী কালীপুজো কিংবা ব্যবসায়ী সমিতির প্রযোজনায় তিন রাত্তিরব্যাপী যাত্রা-উৎসব ইত্যাদি কাজকর্মেই ছোট কানুর উৎসাহ প্রচুর। তার মতে, এসব [illegible] হচ্ছে পাব্লিক ওয়ার্ক। আর এই পাবলিক ওয়ার্কের মাতব্বরি নিয়েই দুলাল দত্তর সঙ্গে রেষারেষি।

বিকেলবেলা যখন মাছ মারার কথা বলতে এল ছোট কানু, ব্রজবিহারী তখন দর্জির দোকানের ঝাঁপ খুলে সবে বসেছে। দোকানঘরটি পাকা দালান, তবে উপরে টিনের ছাউনি, সামনে বাঁধানো রোয়াক। ছোট দোকান "কুণ্ডু টেলার্স"-এর বয়স বেশী নয়, ছ' সাত বছর। বাংলাদেশের হাঙ্গামার সময় এ অঞ্চলে পালিয়ে এসেছিল ব্রজবিহারী।

খুলনার কাছে দৌলতপুরে কুণ্ডু টেলার্স-এর দোকান ছিল।

বালিডাঙ্গার বাজারে খুলনা-যশোরের লোক বেশী। ঢাকা-বরিশাল-ফরিদপুরের লোক অল্প। দেশ ভাগের পর দফায় দফায় লোক এসেছে। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন বরিশাল থেকে বিধু পাল এসেছিলেন, তেমনি খুলনা থেকে এসেছেন ব্রজবিহারীর কাকা শ্রীপতি কুণ্ডু। ধুতি শাড়ির বিপুল আয়োজনের দোকান "মনোমোহিনী বস্ত্রালয়"-এর মালিক কুণ্ডুমশাই এ বাজারের পয়সাওয়ালা পুরনো ব্যবসায়ী। লম্বা, রোগা গড়নের পরম বৈষ্ণব কুণ্ডুমশাইর বাড়িতে রাধামাধবের নিত্য সেবা হয়। ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী আর দোলপূর্ণিমায় মহোৎসব অষ্টপ্রহর কীর্তনের সমারোহ। কিছুদিন আগে কুণ্ডুমশাইর মা অর্থাৎ ব্রজবিহারীর ঠাকুমা মনোমোহিনী দেবী তিরানব্বই বছর বয়সে এখানেই দেহরক্ষা করেছেন।

(মাতৃ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীপতি কুণ্ডুমশাই তিনদিনব্যাপী দরিদ্রনারায়ণ সেবায় যে বিরাট ব্যবস্থা করেছিলেন, এ অঞ্চলে অভূতপূর্ব সে খবর নদীয়া-বার্তা কাগজে ছাপা হয়েছিল।)

কাকার ভরসায় একরকম একবস্ত্রে এখানে পালিয়ে এসেছিল ব্রজবিহারী। সঙ্গে স্ত্রী আর ছোট ছোট দুটি ছেলে। পালিয়ে আসার কয়েক মাস আগে একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল। প্রথম সন্তান শান্তির শ্বশুরবাড়ি নলতা-বাসুদেবপুরে। লোকের মুখে খবরাখবর শুনেছিল, ভৈরবের কূলে সেই গ্রামসুদ্ধ জ্বালিয়ে দিয়েছে মিলিটারীরা। লাশ সব নদীতে ফেলে দিয়েছিল। শান্তির শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামী-ভাশুর-দেওর কারো কোন খোঁজ পায়নি। এই আট বছরে কোন হদিস করতে পারেনি।

এখন পঞ্চাশের মত বয়স ব্রজবিহারীর। কাকার মত লম্বা হলেও রোগা নয়। ছ' ফুটের কাছাকাছি যেমন লম্বা, তেমনি বলিষ্ঠ গড়ন। মাথা জোড়া মস্ত টাক। পাশে আর পেছনে সামান্য কাঁচাপাকা চুলের বলয়। ব্রজবিহারীকে দেখলে মনে হয় না, ছাত্রজীবনে সে কুস্তি লড়ত, দৌলতপুর কলেজের মাঠে ব্যায়ামের কসরত দেখাত।

শান্ত স্বভাবের নিরীহ মানুষ। কম কথা বলে, নিজে না হেসে অন্যকে হাসাতে পারে। সন্ধ্যেবেলা বারোয়ারী কালীতলার আড্ডায় ছেলে-ছোকরাদের কেউ তামাশা করে যদি বলে, "দাদা চিরুনী আছে?"

"চিরুনী নেই, আয়না আছে, মুখ দেখতে পারো।" বলতে বলতে মাথা নিচু করে চকচকে টাকটি সামনে এগিয়ে দেবে। সবাই শব্দ করে হেসে উঠবে, কিন্তু ব্রজবিহারীর মুখে কোন শব্দ নেই, সামান্য হাসির আভাস। বাজারের কোন দলাদলির মধ্যে থাকে না সে, কোন হুজুগে মাতে না। সপ্তাহে একদিন (বৃহস্পতিবার) দোকান বন্ধ রাখে। সেদিন সন্ধ্যায় ওই কালীতলার আড্ডায় বসে পাশা খেলে। মধ্যে মধ্যে ছিপ ফেলে মাছ ধরার নেশা ছাড়া সখ-আহ্লাদ বলতে তেমন কিছু নেই। মাছ-মারার সঙ্গী ওই কানাই পাল। বয়সে বছর পনেরোর ছোট হলেও সঙ্গী হিসেবে ছোট কানু ব্রজবিহারীর পছন্দের লোক। দাদা বলে ডাকে, মান্যগণ্য করে। আগে আড়ালে বিড়ি টানতো। এখন অনুমতি দিয়েছে ব্রজবিহারী। দুজনকে কাছাকাছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফাতনার দিকে চোখ রেখে পুকুরপাড়ে বসে থাকতে হয়। মধ্যে মধ্যে নিচু গলায় দু'চারটি কথা হয়। তখন একসঙ্গে বিড়ি না টেনে উপায় কি?

সেদিন বিকেলবেলা ছোট কানাই যখন মাছ মারার কথা বলতে এল, তখন অন্য কারো সঙ্গে কথা বলছিল ব্রজবিহারী। দোকানঘরের পেছনে বাসা। টিনের ঘর, দরমার বেড়া, মেজেটা অবশ্য পাকা। সেদিকে যাবার দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল কেউ। দোকানের সামনের রোয়াক থেকে সোজাসুজি দেখা যায় না। শুধু ছাপা শাড়ির আঁচলটা চোখে পড়ছিল। ব্রজবিহারীর শেষের কথাগুলি কানে এল, "তোর কাকীমা, তোকে রাখতে চায় না, আমি কি করবো বল—" তারপর ছোট কানুর কথা শুনে এদিকে মুখ ফেরাল। এমন সময় পুরোপুরি চোখের সামনে এল মেয়েটি। পেছনের দরজার দু পাশে দুটি হাত রেখে বললো, "আমি তা হলে কোথায় যাবো, কাকাবাবু?" বাইশ-তেইশের উজ্জ্বল কালো রঙ, বড় বড় চোখ, সামান্য চাপা নাকে রুপোর নাকছাবি, রুপোর হার, কানপাশা। পুরন্ত গড়নের নিটোল শরীর, সুডৌল দুই হাতে মোটা মোটা রুপোর বাউটি। কালো রঙে রুপোর গয়নায় বেশ চেকনাই দিয়েছে। কপালে সবুজ টিপ, সবুজ ব্লাউজ, আর সাদায়-সবুজে-হলুদে মেশানো ফুল-ফল ছাপা শাড়ি।

বড় বড় দুই চোখে রাজ্যের উদ্বেগ নিয়ে ব্রজকাকার মুখের দিকে তাকাল, পরক্ষণেই ছোট কানুবাবুকে দেখতে পেয়ে জড়সড়ভাবে আবার দরজার পাশে সরে গেল। চিনতে পারল ছোট কানু, চেনা মুখ, বেশ ভালভাবেই চিনল। রাখু পাগলার বউ, লবঙ্গলতা। ঘরামির কাজ করত রাখহরি। অল্প বয়সেই ভাল কাজ শিখেছিল। এ বাজারের অনেক দোকানঘর রাখহরির তৈরী। পাঁচ বছর আগে গোবরডাঙ্গা না মছলন্দপুর থেকে ওই মেয়েটাকে বিয়ে করে আনার পরেই অলক্ষ্মী লাগল। লবঙ্গলতার শাড়ি-গয়নার বায়না সামাল দেবার জন্য চুরি আরম্ভ করল। রাত দুপুরে নিজের হাতে তৈরী নতুন দোকান ঘরের ঝাঁপ খুলে মাল পাচার করার সময় হাতে-নাতে ধরা পড়ল রাখহরি। তারপর চোরের মার। তারপর থানা-পুলিস, জেল-হাজত ঘুরে এক বছর পরে বালিডাঙ্গায় ফিরে এল, তখন মাথাটা কেমন খারাপ হয়ে গেছে। আপন মনে বিড়বিড় করে বকে, ফিক ফিক করে হাসে, কখনো বা রাণাঘাটের যতীন মোক্তারের নকল করে লেকচার দেয়, কিংবা সাক্ষী জেরা করে।

রাখু পাগলের কমিক দেখার জন্য বাজারের রাস্তায় এক-একদিন ভিড় জমে যেত।

মধ্যে মধ্যে নিরুদ্দেশ হত। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াত কে জানে। এক মাস দেড় মাস পর ফিরত। ইদানীং প্রায় বছরখানেক হল রাখহরির পাত্তা নেই। বাড়িতে বুড়ি মা আর যুবতী বউ।

ওরা আর কোথায় খুঁজতে যাবে। উড়ো খবর আসে। কে নাকি শেয়ালদা'র কাছে ভিক্ষে করতে দেখেছে। আরেকজন এসে বললো, বারাসতে চাঁপাডালির মোড়ে এক ময়রার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে শালপাতায় করে জিলিপি খেতে দেখেছে।

বালিডাঙ্গার বাজারে রাখহরির শেষ খবর এসেছে, মাস চারেক আগে।

বিধু পালের পাটের আড়তে যে খাতা লেখে সেই যুগল নন্দী পরিবার নিয়ে ঘোষপাড়ার মেলায় গিয়েছিল দোলপূর্ণিমার পরের দিন। সেখানে নিজের চোখে দেখে এসেছে যুগল, মেলার একপাশে আমতলায় বসে চার-পাঁচটা সাহেব-সাধুর সঙ্গে গাঁজা টানছে রাখহরি।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। গলায় মোটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, লম্বা লম্বা চুল আর গোঁফদাড়িওয়ালা হিপি সায়েবগুলো রাখহরির হাত-পা নাড়া দেখে খুব হাসছিল।

রাখুরও অমনি লম্বা লম্বা উসকোখুসকো চুল, একগাল গোঁফ দাড়ি। আধ-ময়লা একটা লুঙ্গি, নীলরঙের উলিঝুলি হাফশার্ট। বুক-পকেটে দুটি পদ্মমুখী জবা ফুল গোঁজা, কপালে ডগডগে সিঁদুরের ফোঁটা। গলায় মালার বদলে কালো সুতো বাঁধা মাদুলী। ওর মা এনে দিয়েছিল, পাগলামী সারাবার স্বপ্নাদ্য মাদুলী। ওই দলে একটি মেমসায়েবও ছিল। আঁটো প্যান্ট, গেরুয়া পাঞ্জাবি, লাল ফিতে দিয়ে পিঠের দিকে সোনালী চুলের গোছা বাঁধা। গলায় আবার একছড়া গাঁদা ফুলের মালা। কি রঙ, কি স্বাস্থ্য! ফুসফুস করে সিগারেট টানছে। যুগলের বউ আর বিধবা দিদি অবাক চোখে দেখছিল।

কিন্তু ওদের কাছাকাছি বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখার ভরসা পায়নি যুগল, রাখহরিকে ডেকে দুটো কথা বলারও সাহস হয়নি।

রাখহরির মা-বউ দিনমানে গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দিত, ঘুঁটে বেচত। কিন্তু ওভাবে আর কদিন চলে। লবঙ্গর বাপের বাড়িতে তেমন কেউ আছে বলে মনে হয় না, থাকলেও এ তল্লাটে কেউ কখনো দেখেনি তাদের। তারা বোধ হয় বেড়াল পার করার মত মেয়ে বিদেয় করে দায়মুক্ত হয়েছে। তারপর যা হয় আর কি! লবঙ্গলতার পেছনে লোক লাগল।

বুড়িরও সায় আছে। পেটের জ্বালা, বড় জ্বালা। পেছনের দরজার দিকে লবঙ্গকে লক্ষ করে বললো ব্রজবিহারী, "এখন যা, এ বেলার মত ঘরের কাজ কর, আমি ভেবে দেখি, আর তোর কাকীমাকে বল, দু' কাপ চা পাঠিয়ে দিতে।" তারপর এদিকে মুখ ফিরিয়ে, "আয়, ভেতরে আয়, মাছের খবর কি বলছিলি?" গুটিগুটি রোয়াক পেরিয়ে দোকানঘরের ভেতর এল ছোট কানু, একটা টুল টেনে তক্তাপোশের পাশে বসল। চোখ রয়েছে পেছনের দরজায়। স্পষ্ট দেখতে পেল হেলেদুলে রান্না ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে লবঙ্গলতা। সেদিকে চোখ রেখে বিড়বিড় করে বললো, "এ আবার এখানে কেন, ব্রজদা?"

তক্তাপোশে পা ছড়িয়ে বসেছিল ব্রজবিহারী। দেয়ালে পিঠ রেখে দেশলাই-এর কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটছিল। তক্তাপোশের উপর মাদুর পাতা, কিছু ছিট কাপড়ের রঙীন টুকরো, মাপ নেবার ময়লা ফিতে, লম্বা খাতার মধ্যে সুতো-বাঁধা পেন্সিল গোঁজা। খাটের পাশে সেলাই-এর কল।

[illegible]
তার চেহারাটা টেনে বলেছে ছোট কানু। এর কথার জবাব দিল ব্রজবিহারী, "আমি ডেকে আনিনি, ও এসে আমার কাছে কেঁদে পড়ল, দুলু দত্ত নাকি ছিঁড়ে খাচ্ছে ওকে, রোজ রাত্তিরে জোর করে ঘরে ঢোকে।"

"ছিঃ, কাঁচ খুকি!" ঠোঁট বেঁকিয়ে, নাক কুঁচকে মুখের একটা বিচিত্র ভঙ্গি করল ছোট কানু, "জোর করে ঘরে ঢোকে, তা হলে ও চেঁচায় না কেন, যতো ন্যাকামি, ওর শাউড়ি চুপ করে থাকে কেন?" কানাই পালের মন্তব্য শুনে বললো ব্রজবিহারী, "ও ভয়ে চেঁচাতে পারে না, আর টাকা দিয়ে দুলালচাঁদ বুড়ির মুখ মেরে রেখেছে।"

"শাউড়ি-বউ দুজনেই টাকা খায়, না হলে শাড়ি-গয়নার অত বাহার হয় কি করে, ওর ঘরে বসে দুলু দত্ত দলবল নিয়ে মাল টেনে জুয়ো খেলে, আর উনি ভয়ে চেঁচাতে পারেন না, ন্যাকা চৈতন, ও সব কথা আমাকে বুঝিও না।"

"তোকে আর বোঝাবো কি, তুই তো সব জানিস, সাত খোপ পায়রা খেয়ে বেড়াল হলেন তপস্বী, তোর হয়েছে সেই দশা, তবে একটা কথা কি জানিস, কাজটা ভাল করিসনি, তোরা পাঁচজনে মিলে মেয়েটাকে নষ্ট করলি, বড় পাপের কাজ করেছিস।"

"আমি! আমার কথা আসছে কি করে?" যেন আকাশ থেকে পড়ল ছোট কানু, "আমাকে জড়াচ্ছো কেন, মাইরি বলছি ব্রজদা, আমি ও সবের মধ্যে নেই, মা কালী!"

"ছিলি বাবা ছিলি, এখন নেই, তবে তিন মাস আগেও ছিলি, আহা থাম, আমাকে বলতে দে। কি একটা বলার জন্য ছোট কানাই তিড়বিড় করে উঠতেই হাত তুলে থামিয়ে দিল ব্রজবিহারী, "আমি সব জানি, দুলাল দত্তর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারিসনি বলে এখন সরে এসেছিস, তা ছাড়া, বাপের ভয় আছে, ঘরে খাণ্ডারী বউ আছে, দাদা-বউদি আছে, আমি সব বুঝি, একেবারে জানাশোনা কাছে-পিঠের মধ্যে কাণ্ডকেচ্ছা, সে জন্য সরে এসে ভালমানুষ সেজেছিস, তবে তোর দলের গোকুলটা রয়ে গেছে ওদের সঙ্গে, শুধু গোকুল কেন, অন্তা, ফটিক, দাস-পাড়ার বিশে, তোর পুরনো মিত্তেরা সব ছোট দত্তর সঙ্গে ভিড়েছে।"

"আমার সামনে গোকুলোর নাম করো না।" ছোট কানু গরগর করে উঠল, "ব্যাটা বেইমান, আমার তিনশো টাকা মেরে দিয়ে এখন দুলু দত্তর চামচা হয়েছে।"

হাসলো ব্রজবিহারী। তার হাসিতে কোন শব্দ হয় না। ঠাট্টা-তামাসার সময় এক ধরনের নিঃশব্দ বিষণ্ণ হাসি থাকে মুখে। এখন কিন্তু গলার মধ্যে সামান্য খুত্‌খুত্‌ শব্দ হল, অর্থাৎ কানাই পালের টাকা চোট খাওয়ার পুরনো ব্যাপারটা আবার শুনে বেশ মজা পেয়েছে সে।

"অমন করে হেসো না ব্রজদা।" ব্যাজার মুখে বললো কানাই, "তোমাদের হাসি দেখলে আমার গা জ্বলে যায়, তুমি তো জানো ব্যাপারটা, গেলবার যাত্রার আগে কলকাতা থেকে পোস্টার, হ্যাণ্ডবিল, গেস্ট কার্ডগুলি ছাপিয়ে আনার জন্য গুনে গুনে ওর হাতে তিনশোটি টাকা দিলুম, জোচ্চোরটা ঘুরে এসে বলে কিনা শেয়ালদার কাছে পকেটমার হয়ে গেছে, মাসখানেক বাদে শোনাশুনতি খবর পেলুম, লবঙ্গর ঘরে বসে দুলু দত্তর সঙ্গে বিলিতি আর কষা মাংস চালিয়েছে, আরো দুজন ছিল, আমি নাম বলবো না, আমার কথা বিশ্বাস না হয়, লবঙ্গকে ডেকে আমার সামনেই জিজ্ঞেস করো।"

"আমার দরকার কি ওসব জিজ্ঞেস করার, তবে ওর মুখেই শুনেছি, সাত-আট দিন আগে নাকি হঠাৎ ভূপেন-দারোগা এসে অনেক খোঁজখবর নিয়েছে, কারা ওর ঘরে আসে, মদ খায়, জুয়ো খেলে, তাদের নাম-ধাম সব জানার জন্য অনেক জেরা করেছে, ও নাকি ভয়ের চোটে দুলাল, অন্তা, ফটিক, গোকুল, বিশুর নাম বলেছে, তবে তোর নামটা আর বলেনি।"

"হুঃ, আমার নাম বলবে কেন?" নাকের মধ্য দিয়ে একরকম তাচ্ছিল্যের শব্দ করল ছোট কানাই, "কোন আক্কেলে আমার নাম করবে, আমি কি ওর ঘরে যাই, না জুয়ো খেলি, তোমার কাছে মিছে কথা বলবো না ব্রজদা, বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে দু-তিনবার গেছি, তা-ও তিন-চার মাস আগে, আর ও মুখো হইনি, সত্যি কথা বলতে কি, আমার তেমন ভাল লাগেনি, জায়গাটা গরম, কাছেই জেলেপাড়ার চুল্লুর আড্ডা, যখন-তখন পুলিস আসছে, দুলু দত্তর পাখা উঠেছে, বাপের পয়সার জোরে কতকাল চাপা দিয়ে চলবে, অনেক দিন ধরে ভূপেন-দারোগার তাক আছে ওর ওপর, এবার বুঝবে বাছাধন, কত ধানে কত চাল, আরে দাদা, ফুর্তি করতে হয় কলকাতা যাব, আমার কাছে সোজা কথা, জানাশোনা এলাকার মধ্যে ঝামেলা বাড়াবো কেন, পয়সা ফেলে নিশ্চিন্তে ফুর্তি করার জায়গা কলকাতা ছাড়া আর—" থেমে গেল ছোট কানু।

ব্রজবিহারীর বড় ছেলে বঙ্কু দু কাপ চা নিয়ে এসেছে। কথা বন্ধ রেখে চায়ের কাপে চুমুক দিল দুজনে। বঙ্কু চলে যাবার পর আবার মুখ খুলল কানাই পাল, নিচু গলায় বললো, "পুলিসের কাছে দুলু দত্তর নাম বলে কাজটা ভাল করেনি লবঙ্গ, দুলু ওকে সহজে ছাড়বে না, ওই বিশে আর অন্তার অসাধ্য কাজ নেই, মেয়েটাকে হয়তো হাপিস করে দেবে।"

"সেই ভয়েই আজকাল রাত্তির বেলা ঘরে থাকতে চায় না, আমার এখানে একরকম লুকিয়ে থাকে খুব সকালে একবার নিজের ঘরে যায়, শাশুড়ির রান্না-বান্নার যোগাড় করে দিয়ে চলে আসে, তোর বউদিকে ঘরের কাজে সাহায্য করে, রাত্তিরে রান্নাঘরের দাওয়ায় শুয়ে থাকে।"

[illegible]
বললো ছোট কানু, "ওকে থাকতে দিয়ে কাজটা ভাল করোনি ব্রজদা, মেয়েটা আঁটি-কাটি (হাব-ভাব, চালচলন) ভাল নয়, তুমি মুশকিলে পড়ে যাবে।"

"তোর বউদিও সেই কথাই বলছিল, আজ চার-পাঁচ দিন আমার এখানে আছে ঘরের কাজ ভালই করছে, তোর বউদি একা পারে না, কাজের লোকের দরকার ছিঃ কিন্তু ওর ব্যাপার শুনে সে ভয় পেয়েছে, কাল রাত্তিরে আমাকে বলছিল, ওে ভালোয় ভালোয় বিদেয় করতে, কিন্তু আমি ভাবছি যাবে কোথায় মেয়েটা?"

"যেখানেই যাক, তোমার ভাবার দরকার কি?"

"আমার কোথায় লাগে জানিস?" চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখল ব্রজবিহারী "ওকে দেখলে নিজের মেয়েটার কথা মনে পড়ে, আজ আমার শান্তি থাকলে ও বয়সী হত, হয়তো ওর চেয়ে বছরখানেকের বড় ছিল—"

"ছিল বলছো কেন, হয়তো এখনো কোথাও আছে, তুমি খোঁজ জানো না

"না রে নেই, আমার মন বলছে নেই, খোঁজখবর অনেক করেছি, ওর শ্বশু বাড়ির কেউ বেঁচে নেই, অনেকবার ভেবেছিলুম পাশপোর্ট করে যাব, নিজে গিয়ে দে আসবো, এখন ভাবি কি লাভ হবে?" গলা ভারী হয়ে এল, খোঁচার খুঁটে চো মুছল ব্রজবিহারী।

"ও সব কথা ভেবে মন খারাপ করো না, মনে করো কোথাও আছে, বেঁ আছে, ভাল আছে, নাও ধরো।" সিগারেট বার করে দিল ছোট কানু।

চুপচাপ সিগারেটে টান দিল কয়েকবার। তারপর আবার মুখ খুলে ব্রজবিহারী, "লবঙ্গ যখন এসে বললো, কাকাবাবু বড় বিপদে পড়েছি, আপন এখানে থাকতে দিন, কার মুখে শুনেছে আমার নাকি কাজের লোক দরকার, ভে ভাবলুম, থাক কটা দিন, তারপর দেখা যাবে, কিন্তু ওর পেছনে গুণ্ডা লেগেছে পুলিসের নজর আছে শুনে তোর বউদি ভয় পেয়েছে, পরশু দিন সন্ধ্যেবে নাকি কে একজন খিড়কির দরজার কাছে ঘোরাফেরা করছিল, চাপাকলে তখন জ তুলছিল লবঙ্গ, আমি কিছু দেখিনি, তোর বউদি বলছিল।"

"বউদি ঠিকই বলেছে, তুমি ওর দায়িত্ব রেখো না, বরং খোঁজখবর করে ও বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও, নয়তো থাক না, ভূপেন দারোগার বাড়ি গিয়ে বাস মাজুক, ভাল থাকবে, থানায় পাঠিয়ে দাও, তোমার ঝামেলা রাখার দরকার কি

এ কথার কোন জবাব দিল না ব্রজবিহারী, সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিল, "থাক গে ওসব কথা, মাছ ধরার খবর কি বলছিলি, শুনি।"

বিশ্বাসদের বড় পুকুরে মাছ ধরতে যাবার কথাটা আবার বললো ছোট কান সকাল থেকে সন্ধ্যা, সূর্য ওঠার সময় থেকে যতক্ষণ ফাতনার ওপর নজর চলে ততক্ষণের জন্য এক একজনের তিনখানি ছিপে বারো টাকা হিসেবে দিতে হ (সরকারী রেট); অর্থাৎ মোট চব্বিশটি টাকা বিশ্বাস-বাড়ির বুড়ো কর্তার হাতে আগাম গুনে দিলে পর (মাছ হোক আর না-ই হোক) ছিপ ফেলার অনুমতি পাওয়া যাবে। "খুড়ো মাকখি চুষ।" এই মন্তব্যটি করে কথা শেষ করলো কান পাল। ডিবে থেকে জর্দা পান বার করে মুখে দিল ব্রজবিহারী। রোয়াকে পিক ফেলে এসে বললো, "আজ শনিবার, সামনের বিষ্যুদবার ব্যবস্থা কর, আমি মশলাপাতি সব তৈরি রাখবো।"

॥ দুই ॥

বৃহস্পতিবার কুণ্ডু টেলার্স-এর ঝাঁপ বন্ধ থাকে। সেদিন খুব সকালবেলা সারা বাড়ি মাছমারা মশলার গন্ধে ভুর ভুর করছিল। দোকানঘরের পেছনদিকে ছোট বারান্দার একপাশে তোলা উনুনে মশলা তৈরী হচ্ছে। ছোট একটা জলচৌকি পেতে সামনে বসে আছে ব্রজবিহারী। আশেপাশে ছোট ছোট কাগজের ঠোঙা নারকোলের মালায়, মাটির খুরিতে নানাবিধ মশলা, যথা, একাঙ্গী, মেথি, তাম্বু সরষের খোল, গাওয়া ঘি-এর গাদ, চিনির গাদ ইত্যাদি।

গোপন ফরমুলায় এই মশলা তৈরিতে পাকা হাত ব্রজবিহারীর। এ সময় কারো সামনে থাকা চলবে না। এই ফরমুলা শিখিয়েছিলেন খালিশপুরের হারাণকাক

হারাণ কাকা বলতেন, "কাউকে শেখাবি না, কারো সামনে বানাবি না, শুধু মরার আগে মেয়ে-জামাইকে বলে যাবি।"

শান্তিকে তিন বছরের দেখে গিয়েছিলেন। বড় ভালবাসতেন। বঙ্কু আ মুনোকে দেখেননি। শান্তির চেয়ে আট বছরের ছোট বঙ্কুবিহারী, আরো দু বছর পর বনবিহারী।

শান্তি জন্মাবার পর ওর মায়ের শরীর খারাপ হয়েছিল। রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে চেহারা, খুব দুর্বল। তখন হাঁড়ি-ভর্তি করে সাত-আটটা মাগুর মাছ আনতে হারাণ কাকা। মাসের মধ্যে দু'তিনবার। এক নাগাড়ে চার-পাঁচ মাস এনেছিলেন

"এ সব আনেন কেন, কাকা?"

"আনি আমার খুশি, বউমার জন্য আনি, আরে জ্যান্ত মাগুরের ঝোল খে গায়ে রক্ত হয়, খুব পুষ্টিকর।"

"ঝোল রান্নার পর কি আর জ্যান্ত থাকে?" ব্রজর কথা শুনে হা-হা ক হেসেছিলেন হারাণকাকা।

হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "যশোরের কালী কোবরেজ বলতেন, মাগু মাছের ঝোল, ভরা যুবতীর কোল, দুটোই নাকি স্বাস্থ্যকর।" বড় মুখ আল ছিল, হাসি-ঠাট্টার কথায় মুখের আগল থাকত না।

"আহ্, চুপ করুন, কাকা, কেউ শুনে ফেলবে।"

"শুনুক, আমি মিছে কথা বলছি নাকি, কালীকান্ত সেনের মত অত বড় কবিরাজ সারা যশোর জেলায় ছিল না, বুড়ো মরে বেঁচেছে, দেশ ভাগাভাগির কেলেংকারী আর দেখে যেতে হয়নি।"

মাছ মারার ঘুণ ছিলেন হারাণ সমাদ্দার। শেষ পর্যন্ত মারাও গেলেন ওই মাছ মারার সর্বনেশে নেশায়। ঘোর বর্ষার দিনে একা-একা মাছ ধরতে গিয়েছিলেন সিংগিয়ার বিলে।

হারাণ কাকার পিসী-বাড়ি ছিল সিংগিয়ায়। সেদিন সকাল থেকে তুমুল বৃষ্টি।

মেঘে মেঘে অন্ধকার আকাশ, ঝোড়ো হাওয়ার সংগে ঝকে ঝকে ঝুঁকিয়ে বৃষ্টি।

কাছে-পিঠে জনমানব নেই। বিলের ধারে পাটক্ষেতের পাশে সাপে কাটল।

ওই অবস্থায় দেড় মাইল মাঠের রাস্তা ভেঙে যখন পিসীর বাড়ি পৌঁছলেন, তখন প্রায় শেষ। ঘোলাটে চোখ, মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছে, সমস্ত শরীর কাঁপছিল। কাঁপতে কাঁপতে দাওয়ায় শুয়ে পড়ে সুধু বলতে পেরেছিলেন, "কালে কেটেছে।"

মাছ মারার মশলা পাকাবার সময় হারাণ কাকার কথা মনে পড়ে, শান্তির কথা মনে পড়ে, দৌলতপুরের কথা মনে পড়ে। দৌলতপুরের পাশে নদীর নাম ভৈরব। ভৈরব নদী নয়, নদ। সেই নদের ধারে শান্তির শ্বশুরবাড়ি নলতা-বাসুদেবপুর।

পাউরুটি, পিঁপড়ের ডিম, ফ্লাস্কে চা নিয়ে এল ছোট কানাই। তখন গাইঘাটার দিকে যাবার রাস্তার মোড়ে বিশাল বটগাছটার পেছনে সূর্য উঠেছে। এদিকে ব্রজবিহারীর মশলা তৈরি শেষ। তাড়া দিল কানাই, "দাদা, বড্ডো দেরি হয়ে গেল।"

"কোথায় দেরি, সাড়ে ছ'টা বাজে, মশলাখানা যা হয়েছে না, যদি মাছ থাকে, মিনিট পনেরোর মধ্যে চারে কিলবিল করবে।"

"যদি মাছ থাকে মানে, তুমি চলোই না, নিজের চোখে দেখবে, আমার কাছে পাকা খবর আছে, চার-পাঁচ কেজি ওজনের কম করে পনেরো-ষোলটা রুই, তা ছাড়া ভাল সাইজের কয়েকটা কাতলা আর মৃগেল।"

"বিশ্বাস-কর্তা যদি আগে-ভাগে মাছ ধরিয়ে থাকেন, তুই জানছিস কি করে?"

"তা' করেননি, তা হলে পাত পেতে চব্বিশটি টাকা নিতেন না, গেল পাঁচ বছরে ওই পুকুরে মাছ ধরেনি কেউ, সরকার মশাইর মুখে শুনেছি, বুড়ো-কর্তার নাকি ইচ্ছে ছিল, বড় নাতনীর বিয়ের সময় জাল টানাবেন, কিন্তু কর্তার ইচ্ছেমত সে বিয়ে হয়নি।"

"কেন কি হয়েছে?" ব্রজবিহারীর জিজ্ঞাসার জবাবে বললো, "কলকাতার কলেজে পড়া মেয়ে, আমি দেখেছি কয়েকবার, চেহারায় বেশ চটক আছে।" বাঁ-চোখ টিপল ছোট কানু, "গেল বোশেখ মাসে নাকি প্রাইভেট মাস্টারের সংগে পালিয়ে গিয়ে রেজেস্টারী করেছে।" প্রথমে জিভ কাটল, তারপর ডান হাত নাকে ঠেকিয়ে খেঁকশিয়ালের কাশির মত খ্যাকখ্যাক করে হাসল কানাই পাল।

আবার বললো, "এ সব খবর বার করার জন্য সরকারমশাইকে তামাক খেতে দুটি টাকা দিতে হয়েছে, ও বাড়ির সবাই টাকা চেনে, মাছ ধরাতে দেবার জন্য বিশ্বাসগিন্নি যে পান-দোক্তার পয়সা চেয়ে বসেনি, এ আমার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি।" আবার খেঁকশিয়ালের কাশি। সব গুছিয়ে নিয়ে আধঘন্টার মধ্যে রওনা হল দুজনে।

## ॥ তিন ॥

*বালিডাঙ্গার বাজার এলাকা থেকে মাইলখানেক দূরে বিশ্বাসদের পুরনো দুই* মহলের দোতলা বাড়ি। এককালে এই অঞ্চলের জমিদার ছিলেন বিশ্বাসরা। এখন তেমন কিছু নেই বটে, তবে চণ্ডীমণ্ডপ আছে, দোলমঞ্চ আছে, জীর্ণ নাটমন্দির আছে, ঠাকুরদালান আছে, কিছু ধান-জমি আছে, বাজারে কয়েকটা দোকানঘরের ভাড়া আছে। গোমস্তা নীলাম্বর সরকার আদায়-উশুল করে টিমটিম করে পুজোপার্বণের নিয়মরক্ষা হয়, টিপে টিপে সংসার চলে।

দুই ছেলে চাকরি করে কলকাতায়। তারা কিছু কিছু পাঠায়। তাদেরও সংসার বাড়ছে। ছেলেমেয়েরা কলকাতার স্কুল-কলেজে পড়ে। সেখানে খরচ কম নয়। এখানে এত বড় বাড়িতে থাকে বুড়োবুড়ী আর এক ভাগ্নী। বাইরের দিকে বৈঠকখানা ঘরে থাকেন সরকারমশাই। পাশের একটা কুঠরিতে থাকে নিতাই পাইক। সর্বঘটে কাঁঠালি কলা এই নিতাইচরণ। গরুর বিচালি কাটা থেকে শুরু করে ধান তোলা, ধান ঝাড়া, হাটবাজার ইস্তক সব কাজ এক হাতে করে। আবার লাঠি কাঁধে সরকারমশাইর পেছন পেছন যায় ধান কাটার সময়। মাসকাবারে বাজারে গিয়ে দোকানঘরের ভাড়ার তাগাদা দেয়।

বুড়ো বিশ্বাস-কর্তার বয়স পঁচাত্তর হলেও বেশ শক্ত-সমর্থ। পুরু কাচের চশমা, সামনের দাঁত নেই বটে, তবে এখনো লাঠি ঠুকঠুক করে ঘুরে বেড়ান। পুকুর, বাগান, পুরনো বাড়ির তদারক করেন। মোটাসোটা থলথলে দেহ, বিশ্বাস-গিন্নীর দোতলায় উঠতে হাঁপ ধরে, ছাদে উঠতে কষ্ট হয়, কিন্তু এখনো দু'টি বেলা দু'এক পদ রান্না করেন। ডালের বড়ি, আমসত্ত্ব, আমের আচার, কুলের আচার দেন। ভাগ্নী অবশ্য হাতে হাতে সব গুছিয়ে দেয়। সেই আচার, আমসত্ত্ব, ডালের বড়ি মাটির ভিজেলে করে সরকার মশাইর হাতে কলকাতার বাসায় কিংবা শ্যামনগরে মেয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন।

বিশ্বাসদের বড় পুকুরটা আসলে বাড়ির পেছন দিকে, আম-বাগানের মধ্যে। বাড়ির সামনের দিকে দেউড়ির বাইরে দু'পাশে দু'টি মাঝারী আকারের পুকুর

আছে। কিন্তু অর [illegible] মধ্যে এই পুকুর। চারপাশে জঙ্গল হয়ে আছে। আম-কাঁঠাল, জাম-জামরুল, সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশটা বড় বড় ফলের গাছ। আমের বেশ কয়েক জাতের আম— হিমসাগর, গোলাপখাস, বেগমফুলি, ল্যাংড়া ইত্যাদি। এ ছাড়া, ফুল পেয়ারা একটা তেঁতুল, কয়েকটা খেজুর আর নারকেল গাছ। উত্তর দিকে বাঁধানো ঘাটের পাশে একটা বাতাবি লেবুর গাছ। পশ্চিমে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাঁশ ঝাড়, মস্ত একটা বাদাম গাছ। শুকনো লাল বাদাম পাতা পড়েছে পুকুরের জলে। পাশেই একটা কাঠগোলাপের গাছ ঝুঁকে রয়েছে জলের উপর। সীমানার পাঁচিলটা অনেক জায়গায় ভাঙা। সেই পাঁচিল ভাঙার ভেতর দিয়ে বাগানে ঢুকল দুজনে। আগে আগে কানাই পাল, পেছনে ব্রজবিহারী। আমগাছের গায়ে ধুঁধুল লতা। গাঁদাল আর ঝিঙে লতা। আকন্দ-আসশেওড়া, ভাঁট-বিছুটির জমাট জঙ্গল। জামা-কাপড় সামলে আলগোছে পা ফেলতে হচ্ছে। পুকুরের দক্ষিণ কিনারায় দুটি বাঁশের মাচা। এই বাগানের বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কিনে নিতাইকে দিয়ে গতকাল মাচা দুটি বানিয়ে গেছে ছোট কানু। এর জন্য দুটি টাকা মজুরিও দিতে হয়েছে। আগের দিন রাত্তিরে বৃষ্টি হয়েছিল কয়েক পশলা। গাছপালা ভেজা ভেজা। এখন বেশ রোদ উঠেছে। তবে ভাঙা ভাঙা মেঘও ঘোরাঘুরি করছে।

পুকুরের দক্ষিণে এসে দাঁড়াল দুজনে। উত্তরে বাঁধানো ঘাট। ঘাট থেকে একটা পায়ে চলা মাটির রাস্তা গেছে বিশ্বাস-বাড়ির খিড়কির দরজা পর্যন্ত। রাস্তার আশে-পাশে কয়েকটি জবা, টগর, কামিনী ফুলের গাছ। গাছ-গাছালির ফাঁকে ফাঁকে বিশ্বাসদের দোতলা দালানের পেছন দিকটা নজরে আসে। একতলার একটা জানালা দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

ওটা বোধহয় রান্নাঘর। উনুনে আঁচ ধরেছে। সকাল সাড়ে সাতটা। কিন্তু প্রথমেই চোখে পড়ল ব্রজবিহারীর, ওপাড়ে ঘাটের পাশে গলা জলে নেমে ডুবে ডুবে শাপলা তুলছে কেউ। ওদিকটায় শাপলা ফুটেছে প্রচুর। ঘাটের উপর এক বোঝা তোলা রয়েছে। চার ফেলার সময় অন্য কেউ দেখুক, এটা ব্রজবিহারীর পছন্দ নয়। চারের জায়গাটি যথা সম্ভব গোপন রাখতে হবে নয়তো, সুবিধে মত অন্য লোক এসে তোমার চারে মাছ ধরে যাবে। এটিও হারাণ কাকার শিক্ষা। বিশ্বাসদের বাড়ির কেউ হবে, নয়তো এই পুকুরে অন্য কোন লোক শাপলা তুলতে নামবে বলে মনে হয় না। তথাপি ডাক দিল ব্রজবিহারী, "এই, কেরে ওখানে?"

মানুষের সাড়া পেয়ে আঁচল টেনে বুক ঢেকে সিঁড়ির ধাপে এক কোমর জলে এসে দাঁড়াল মেয়েটি, বাঁ-হাতে শাপলার গোছা। লবঙ্গলতা।

"নাল (শাপলা) তুলছি গো, কাকাবাবু!" অপ্রস্তুতের মত সামান্য হাসল।

"অনেক তুলেছিস, আর তুলতে হবে না, এবার উঠে যা, আবার কাল তুলিস।"

"এ আবার এখানে এল কি করে?" বিড় বিড় করে বললো ছোট কানু, "এই বাড়িতে উঠেছে নাকি?" "সেই রকমই শুনেছিলুম।" নিচু গলায় জবাব দিল ব্রজবিহারী, "নিতাই পাইক নাকি থাকার বন্দোবস্ত করেছে, বিশ্বাসগিন্নীর লোকের দরকার, থাকা-খাওয়া আর দশ টাকা মাইনে তোর বউদির কাছে সব বলে এসেছে, তুই যেদিন গেলি, তার পরের দিন, গেল রোব্বার চলে এসেছে, মনে হয় সেদিন তুই যে সব কথা বলেছিলি, তার কিছু কিছু ও আড়াল থেকে শুনেছিল।" চাপা গলায় কথা বলতে বলতে হাতের কাজ সারছিল দুজনে। মাটির হাঁড়ি থেকে দলা দলা চারের মশলা বার করে মাচা দুটির চার পাশে ছুঁড়ে দিল ব্রজবিহারী। জল মেপে ফাৎনা ঠিক করল ছোট কানু। চটের কাপড় আর পুরনো খবরের কাগজ বিছিয়ে মাচায় বসল দুজনে। তিন প্যাকেট সিগারেট আর ফ্লাস্ক করে চা এনেছে ছোট কানু। ব্রজবিহারীর সঙ্গে পানের ডিবে, বিড়ির বান্ডিল। পনেরো মিনিটের মত সময় কেটেছে। ওদিকে জল ছেড়ে ঘাটে উঠে গামছা দিয়ে হাত-পা, মাথা মুছল লবঙ্গলতা। ওদের দিকে পিছন ফিরে চুল ঝাড়ল। খালি গায়ে ভেজা শাড়ি। আঁচলটা বুকে জড়াল, তার উপর গামছা চাপা দিল। চোরা চাউনিতে এক একবার দেখছিল ছোট কানাই, আবার আড়চোখে তাকাচ্ছিল ব্রজদা'র দিকে। জলের দিকে চোখ ব্রজবিহারীর, মাছের আনাগোনা লক্ষ্য করছিল। ডান পকেট থেকে পানের ডিবেটা হাতে নিয়েছে, কিন্তু পান মুখে দেবার কথা খেয়াল নেই। এই গভীর পুরনো পুকুরটার অন্ধি-সন্ধি জানা নেই তার। এর আগে কখনো বসেনি এখানে। বছর তিনেক আগে একবার খুড়তুতো ভাই সুরপতির সঙ্গে (শ্রীপতি কুণ্ডুর বড় ছেলে) এই বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কিনতে এসেছিল।

ওপারে ঘাটের সিঁড়িতে বসে শাপলার গোছা গোছগাছ করছিল লবঙ্গ। চারটে গোছা সাজাল। দুই হাতে দুটি করে নিয়ে হেলে-দুলে বিশ্বাস-বাড়ির খিড়কির দরজার দিকে পা বাড়াল। ওর চলার ভঙ্গিটি মনোরম। পেছন থেকে লোভনীয়। ফাৎনার দিকে আর নজর নেই ছোট কানুর। চোখ দিয়ে গেলার মত করে তাকিয়ে আছে। এমন সময় হঠাৎ ঈশান কোণের (উত্তর-পূর্ব) মস্ত জামরুল গাছটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল তিন মূর্তি। গাছটার মোটা গুঁড়ির চারপাশে আকন্দ আর আসশেওড়ার ঘন ঝোপ। ওই ঝোপের আড়ালে ছিল ওরা। হয়তো অনেকক্ষণ ধরেই ওৎ পেতে ছিল। কারণ, বাগানে ওদের ঢুকতে দেখেনি ছোট কানু।

আগে আগে দুলু দত্ত, পেছনে বিশু আর অনন্ত ওরফে অন্তা। লম্বা চওড়া দুলালচাঁদের গায়ে সাদা ফুল শার্ট, ইট রঙের ফুল প্যান্ট, লম্বা চুল, ভারী মুখে মোটা জুলফি, ঝোলা গোঁফ। অন্য দুজনের রুগ্নচেহারা হাড়-হাড্ডি চেহারায় [illegible] গোঁফ-দাড়ি কামানো, চুল পাতলা, পুরু, [illegible] প্যান্ট। ওর হাতে একটা শেকলের মত কি ঝুলছে। এতদূর থেকে স্পষ্ট দেখা না গেলেও, ছোট কানাই জানে, ওটা সাইকেলের চেন। কোথাও কোন অ্যাকশনে যাবার সময় সঙ্গে রাখে অনন্ত। লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘাটের কাছে এগিয়ে এল তিনজনে, লবঙ্গলতার পথ আগলে দাঁড়াল। ওর মুখোমুখি দুলু দত্ত। অন্য দুজন সামান্য তফাতে এমনভাবে দাঁড়িয়েছে যে, লবঙ্গ যেন ছুটে বিশ্বাস-বাড়ির ভেতরে ঢুকে যেতে না পারে। কি যেন বললো দুলু দত্ত, জবাব দিল লবঙ্গ। কথা শোনা যাচ্ছে না ঠিক, কিন্তু কথা কাটাকাটি বোঝা যাচ্ছে। অকারণেই সামান্য পুলকিত বোধ করল কানু পাল। ওদের প্রেম ছুটে গেছে। আরে এ সব কি আর প্রেম! লোভ আর লালসার খাতির। একদিকে পয়সার লোভ, আরেকদিকে দেহের লালসা। বিপাকে পড়লেই সব ফুটে যায়। কিন্তু কথা কাটাকাটিতেই ব্যাপারটা শেষ হল না। আচমকা লবঙ্গর দুহাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিল দুলু দত্ত। টানতে টানতে আকন্দ ঝোপটার দিকে নিয়ে চললো। শাপলার গোছা মাটিতে পড়ে গেল।

"ছাড়ো, ছাড়ো, ছেড়ে দাও বলছি।" লবঙ্গর আফসানি শোনা গেল, "আমি চেঁচাব, চেঁচিয়ে লোক—"

দিন দুপুরে একি কাণ্ড! মগের মুল্লুক নাকি! এত সাহস দুলু দত্তর!

উত্তেজনায় মাচার উপর উঠে দাঁড়াল ছোট কানু, "ব্রজদা, দেখেছো?"

দেখতে পেয়েছে ব্রজবিহারী। হাঁক দিল "এই কি হচ্ছে?"

পরক্ষণেই দেখা গেল, মাচা থেকে লাফিয়ে নেমে পুকুরের পুব পাড় দিয়ে ছুটে যাচ্ছে ব্রজবিহারী, পেছনে কানাই পাল। রাস্তা বলতে তেমন কিছু নেই। বড় বড় গাছের পাশ কাটিয়ে, ঝোপঝাড়, লতাপাতা এড়িয়ে ওদের কাছাকাছি আসতে মিনিট দেড়েকের মত সময় লাগল। ততক্ষণে ঝোপের আড়ালে লবঙ্গকে টেনে নিয়ে গেছে দুলু দত্ত। ঝোপের ভেতর থেকে লবঙ্গর ফোঁপানি আর ছটফটানির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। দুলু দত্তর চাপা গর্জন, "তোর তেজ ভাঙব আমি।" বিশু আর অন্তা এগিয়ে এল এদিকে। ব্রজবিহারীর পথ আটকে বললো বিশু চন্দ, "আপনি সরে যান, কুণ্ডুমশাই, এখান থেকে চলে যান, আমাদের ব্যাপারে নাক গলাবেন না।"

"তোদের ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই, কিন্তু মেয়েছেলের গায়ে হাত দিবি কেন, তোরা না ভদ্দরলোকের ছেলে!"

"আমাদের খুশি গায়ে হাত দেব, আপনার তাতে কি, ওকি আপনার বাবার মেয়েছেলে?"

"কি বললি তুই?" সঙ্গে সঙ্গে প্রবল এক চড়। হকচকিয়ে গেল বিশ্বনাথ, এক মুহূর্ত চোখের সামনে কয়েকটা হলুদ পোকা নড়ে চড়ে উঠল। পুলিশের দুঁদে দারোগা ভূপেন মজুমদার ছাড়া, বাংলাদেশ থেকে নতুন আমদানী আধবুড়ো এক দোকানদার বিশু চন্দর মত মস্তানের গালে চড় মারতে পারে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস হত না, অনন্ত আর কানাই দুজনেই কেমন হতভম্ব হয়ে গেল।

হতবুদ্ধি বিশুও কয়েকপলক বোকার মত ব্রজবিহারীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে হিপ-পকেট থেকে ভাঁজকরা ছুরি বার করল। এমন সময় আকন্দ ঝোপের আড়াল থেকে লবঙ্গর আর্তনাদ, "বাবা গো, বাঁচাও।" তারপর একটা গোঙানির শব্দ। হয়তো মুখ চেপে ধরেছে দুলু দত্ত। মাথায় খুন চেপে গেল ব্রজবিহারীর। ছুরির ভাঁজ খোলার আগেই বিশু চন্দর তলপেটে প্রচণ্ড লাথি মারল, সঙ্গে সঙ্গে নাকে এক ঘুষি। যৌবনে অনেকবার কিল মেরে নারকেল ফাটিয়েছে ব্রজবিহারী। প্রায় সেই ওজনের ঘুষির সঙ্গে লাথি খেয়ে চোখে অন্ধকার দেখল দাসপাড়ার বিশে মস্তান। হাত থেকে ছুরি পড়ে গেল, নাক থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। দুই হাতে মুখ চেপে হাটু ভেঙে মাটিতে বসে পড়ার আগেই সাইকেলের চেন ঘুরিয়ে মারল অনন্ত। কিন্তু মারটা তেমন জুতসই হল না। কারণ দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে টলছিল বিশু। তথাপি ব্রজবিহারীর কপালের ডানপাশে একটা রক্তাভ লম্বা দাগ ফুটে উঠল। দ্বিতীয় আঘাতের আগেই পলকের মধ্যে ডান হাতের কব্জিটা ধরে ফেলল ব্রজবিহারী। হাতটা মুচড়ে অদ্ভুত কায়দায় নিজেই ওর পেছন দিকে ঘুরে গেল। মট করে শব্দ হল একটা। কনুই কিংবা কবজির কাছে হাড় সরে গেল। ওইভাবেই পেছন থেকে অনন্তর কোমরের কাছটা ধরে সামান্য শূন্যে তুলে হাত তিনেক দূরে ছুঁড়ে দিল ব্রজবিহারী। মুমূর্ষু শুয়োরের মত বীভৎসভাবে একবার চেঁচিয়ে উঠল অনন্তহরি, তারপর কোনরকমে উঠে খুঁকতে খুঁকতে ছুটে পালাল। ওদিকে তিন হাত-পায়ে ভর দিয়ে হামাগুড়ির ভঙ্গিতে ডান হাত বাড়িয়ে ভাঁজ করা ছুরিটা তুলে নেবার চেষ্টা করতেই নিচু হয়ে বিশুর গালে আরেকটা চড় মারল ব্রজবিহারী। ছুরিটা তুলে নিয়ে বললো, "এবার তোর ছুরি দিয়ে তোর নাক-কান কাটবো, আর কোনদিন গুণ্ডামি করার সাহস পাবি না, পাজি কোথাকার!"

সাইকেলের চেনটা ততক্ষণে কুড়িয়ে নিয়েছে ছোট কানু। ডান হাতে সাইকেলের চেন, বাঁ-হাতে আধলা থান ইট নিয়ে তৈরী, কিন্তু তার সাহায্যের কোন দরকার ছিল না। হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে আহত জন্তুর মত রক্তাক্ত মুখে ফ্যাল ফ্যাল করে দুজনের দিকে তাকাচ্ছিল বিশু চন্দ। মুখে কোন কথা নেই। ওর ঘাড় ধরে দাঁড় করিয়ে একটা ধাক্কা দিল ব্রজবিহারী, "পালা এখান থেকে, নইলে—" যে পথে অনন্ত পালিয়েছে, সেই পথে টলতে টলতে চলে গেল বিশ্বনাথ। প্রথম চড়টা মারার পর থেকে [illegible] মিনিট [illegible] মধ্যে [illegible]

কেটেছে। ছুরিটা পুকুরের জলে ছুঁড়ে দিল ব্রজবিহারী। তারপর ক্ষ্যাপা হাতির মত আকন্দ ঝোপটার ওপাশে ছুটে গেল। লবঙ্গকে মাটিতে চিত করে ফেলে পেটের উপর চেপে বসেছে দুলু দত্ত। ডান হাতে মুখ চেপে বাঁ-হাতে ওর ডান-হাতটা মুচড়ে ধরেছে। গায়ে কাপড় নেই, কোমরের কষি আলগা। পা দু'টি দাপাচ্ছে লবঙ্গ, একেবেঁকে পাথরের মূর্তির মত ভারী দুলু দত্তকে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে। প্রথমেই নারকেল-ভাঙা কিলের ওজনে ঘাড়ের কাছে এক রদ্দা মারল, হুমড়ি খেয়ে লবঙ্গর বুকের উপর পড়ার আগেই বাঁ পাঁজরে এক লাথি। ছিটকে মাটিতে পড়তে না পড়তেই লম্বা চুলের গোছা ধরে টেনে তুলে ঠাস-ঠাস গুণে-গুণে তিনটি চড়। তারপর চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে ঝোপের এপাশে পুকুরের ধারে নিয়ে এল ব্রজবিহারী। আবার দু'টি চড়। দুই কানে ঝিঁঝিঁ লাগল, মাথার মধ্যে বোমা ফাটার শব্দ দুই চোখে তারাবাজির ফুলকি দেখল দুলালচাঁদ। ফাঁকা চোখে চারপাশে তাকাল। বিলু নেই, অন্তা নেই, পালাবার রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে কানাই পাল। এক হাতে সাইকেলের চেন, আরেকহাতে আধলা ইট। চুলের মুঠি ছেড়ে জোরে একটা ধাক্কা দিল ব্রজবিহারী। কোন রকমে টাল সামলে দিশেহারার মত পুকুরের জলে লাফিয়ে পড়ল দুলু দত্ত। কোনাকুনি সাঁতার কেটে পশ্চিম কিনারায় উঠে কোমর জলে দাঁড়িয়ে এদিকে আঙুল তুলে শাসল, "তোকে দেখে নেব বজ্জাত বুড়ো, আমার নাম দুলু দত্ত, তোকে বালিডাঙ্গা থেকে তাড়াব।" "কানাই, ধরতো ব্যাটাকে, ব্যাটা-বদমাশ!" বলতে বলতে তাড়া দেবার ভঙ্গিতে ব্রজবিহারী কয়েক পা এগিয়ে যেতেই হাঁক-পাঁক করে পাড়ে উঠে জলকাদা মাখা জামা-প্যান্টে, খালি পায়ে বাঁশ ঝাড়ের ভেতর দিয়ে ছুটে পালাল দুলাল দত্ত। এক পাটি স্যান্ডেল এপারে, আরেকপাটি জলে ভাসছে। ওর পালাবার ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল ছোট কানাই। ব্রজবিহারী হাসল না। হাঁপাচ্ছিল সে। এই মুহূর্তে মনে হল, সেই বয়স নেই, সে শক্তি নেই। নয়তো ওই রদ্দা খাবার পর যেখানে অজ্ঞান হয়ে যাবার কথা, সেখানে দুলু মস্তান সাঁতার কেটে পালালো কি করে। পেছনে ফোঁপানির শব্দ শুনে ফিরে তাকাল। শাড়ি-গামছা সামলে ফোঁপাতে ফোঁপাতে শাপলার গোছা তুলে নিচ্ছিল লবঙ্গ।

"আবার শাপলা তোলা হচ্ছে!" ধমক দিল ব্রজবিহারী, পালা, পালা শিগগির এখান থেকে। তাড়াতাড়ি গোছা কয়টি বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে খিড়কির দরজা দিয়ে বিশ্বাসবাড়ির ভেতরে ঢুকে দরজাটি বন্ধ করে দিল লবঙ্গলতা। আধলা ইটখানা, সাইকেলের চেনটা পুকুরের জলে ছুঁড়ে দিল ছোট কানু, তারপর এগিয়ে এসে ব্রজবিহারীর পায়ের ধুলো নিয়ে একগাল হেসে বললো, "দাদা, তুমি অরণ্যদেব; খালি হাতে তিনটে জোয়ান ছেলেকে ঘায়েল করে দিলে, ভাবা যায় না, তুমি যে এককালে কুস্তি লড়তে, আজ প্রমাণ পেলুম, বুড়ো হাড়ে ভেলকি দেখালে বটে!"

"যাঃ যাঃ, ইয়ার্কি মারিস না, তোরা সবাই সমান।" এক দলা থুথু ফেলে বললো ব্রজবিহারী, "আমি বাড়ি যাচ্ছি, আমার ছিপ তিনটে বাড়ি দিয়ে আসিস।"

"সে কি! মাছ ধরবে না?"

"কিচ্ছু ভাল লাগছে না, মনে হচ্ছে সারা গায়ে নোংরা জানোয়ারগুলোর গন্ধ লেগে রয়েছে, গা ঘিন্ ঘিন্ করছে, বাড়ি ফিরে ভাল করে চান করবো, তুই বসে বসে ধর না, চারে অনেক মাছ আসছে, আমি চললুম।" বলে গেল বটে, কিন্তু এখানে বসে একা একা মাছ ধরতে ভরসা পেল না ছোট কানা। কি জানি, যদি দুলু দত্ত আবার দলবল নিয়ে ফিরে আসে। মেরে তক্তা বানিয়ে দেবে। এই বাগানের ভিতর খুন করে রেখে গেলেও কেউ দেখতে আসবে না। বিশ্বাস বাড়ির লোকজনের আচরণও অদ্ভুত! এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল, অথচ জানালা খুলে উঁকি দিয়ে দেখল না কেউ। এমন কি, লবঙ্গর মুখে শোনার পরেও দেখতে এল না। লবঙ্গ নিশ্চয়ই বলেছে, আশ্চর্য ব্যাপার! এমন গোলমেলে জায়গায় একা-একা বসে মাছধরা কোন মতেই নিরাপদ নয়। মাছ তো হলই না, মাঝখান থেকে মাচা বাঁধার বাঁশের দাম সমেত গোটা পঞ্চাশেক টাকা গচ্চা গেল। আদ্ধেক টাকা অবশ্য ব্রজদার দেবার কথা। তা হলেও পঁচিশটি টাকা চোট খেতে হল। গা চড়চড় করে। এই বাজারে পঁচিশটা পয়সা দেয় না কেউ। যত সব বাজে ব্যাপার! একটা ছেনাল ছুঁড়ির জন্য এই বিপত্তি। আপন মনে গজ গজ করতে করতে ছিপটিপ সব গুছিয়ে নিয়ে সরে পড়ল কানাই পাল। বিশ্বাস বাড়ির সাত বিঘার বাগানটা আবার চুপচাপ হয়ে গেল। আষাঢ়ের মেঘলা আকাশ। এক একবার হঠাৎ হাওয়ায় শুকনো বাঁশ পাতা, একটা-দুটো লাল বাদাম পাতা উড়ে উড়ে পড়ছিল পুকুরের জলে। কোথাও জনমানুষের সাড়া নেই। শুধু বাঁশবাগানের ভেতর থেকে থেকে একটা ঘুঘু ডাকছিল, আর বাঁশের মাচা খুঁটির আশেপাশে কয়েকটি বড় জাতের মাছ চারের গন্ধে অস্থির হয়ে ঘুরঘুর করছিল।

॥ চার ॥

মধ্য রাতে ঘরের দাওয়ায় কাঠের খুঁটি ঠেস দিয়ে বসেছিল ব্রজবিহারী। ঘুম আসছে না। কপালের ডান পাশে ওষুধে ভেজা তুলোর উপর গুণ চিহ্নের মত লিউকোপ্লাস্ট লাগানো। কালীতলার পাশে বিশাল ছাতার তুল্য শিরীষ গাছটার মাথায় কৃষ্ণ-পঞ্চমীর চাঁদ। চাল ধোয়া জল রঙের ঘোলাটে জ্যোৎস্না। নলতা-বাসুদেবপুরের আকাশেও এমনি চাঁদ, এই জ্যোৎস্না। ছলছল শব্দে ভৈরব বয়ে চলেছে। আট বছর আগে ওই জলস্রোতে ভেসে যাবার সময় কেউ কি চেঁচিয়েছিল, "বাবা গো, বাঁচাও!"

ছবি : মদন সরকার

# জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ও বঙ্কিম

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

"বঙ্কিমবাবুর অসাধারণ নাক। এই নাকে, সুরুচি, অভিনিবেশ, মানব-চরিত্র-জ্ঞান ও অসাধারণ উদ্যম প্রকাশ পায়। তাঁহার এজ্‌লাসি কাজ সত্ত্বেও, উপর্যুপরি এত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ যে তিনি লিখিতে পারিয়াছেন সে কেবল তাঁর নাকের জোরে।"

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মানুষগুলির সঙ্গে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমের আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ঠতা বন্ধুত্ব বিরোধ ও বিতর্কের ইতিহাস যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনই চিত্তাকর্ষক। আমরা কিছু পরিমাণে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের ইতিহাস জানি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও ঠাকুরবাড়ির অনেকের সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ প্রীতি অনুরাগ শ্রদ্ধা ভালোবাসা ও মৈত্রী ছিল। যখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমের আলাপ হয়নি তার আগেই বঙ্কিমচন্দ্র এসেছিলেন ছয় নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে। শুধু গলি পর্যন্ত নয়, উঠেছিলেন ঠাকুরবাড়ির তেতলার ছাদেও। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা পড়তেন, দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধুত্ব ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বঙ্কিমকে সামনে বসিয়ে এঁকেছিলেন বঙ্কিমের অসামান্য পোর্ট্রেট, রবীন্দ্রনাথের নতুন বউঠান কাদম্বরী দেবী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের একান্ত অনুরাগী পাঠিকা, জ্ঞানদানন্দিনী তাঁর পত্রিকায় বঙ্কিমকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছিলেন—বাংলা সাময়িকপত্রে তিনিই প্রথম ছাপিয়েছিলেন বঙ্কিমের প্রতিকৃতি, সুধীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের উপর লিখেছিলেন একাধিক আর্টিকেল, লিখেছিলেন বলেন্দ্রনাথও, স্বর্ণকুমারী প্রায়ই যেতেন বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ি, সরলা দেবী বঙ্কিমচন্দ্রের অন্ধ ভক্ত ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ থেকে সরলা দেবী পর্যন্ত সকলের সঙ্গেই বঙ্কিমের চিঠিপত্র চলত বঙ্কিম সরলা দেবীকে নিজের এক সেট বই উপহার দিয়েছিলেন আর সরলা দেবীরা দিয়েছিলেন বঙ্কিমের প্রিয় এক প্রেটি দামী দার্জিলিং চা—সঙ্গে সুগন্ধি একগুচ্ছ গোলাপ। বঙ্কিমের যেদিন অকস্মাৎ মৃত্যুসংবাদ এল বিংশোত্তীর্ণা স্বর্ণকন্যার সেদিন মনে হয়েছিল—তাঁর নিজের জীবনেরই একাংশ যেন খসে গেল।

ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের যোগ বঙ্গদর্শন পত্রিকার সূত্রেই। জোড়াসাঁকোয় বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন নিয়মিত আসত। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "বঙ্গদর্শন এলে পাড়ায় দুপুরবেলায় কারো ঘুম থাকত না। আমার সুবিধে ছিল, কাড়াকাড়ি করবার দরকার হত না—কেননা আমার একটা গুণ ছিল—আমি ভলো পড়ে শোনাতে পারতুম। আপন মনে পড়ার চেয়ে আমার পড়া শুনতে বউঠাকরুণ ভালোবাসতেন। তখন বিজলি-পাখা ছিল না পড়তে পড়তে বউঠাকরুণের হাতপাখার হাওয়ায় একটা ভাগ আমি আদায় করে নিতুম।" বউঠানের সান্নিধ্যে এবং তাঁর হাতপাখার মলয় বাতাস গায়ে লাগিয়ে কেমন করে তাঁরা মাসিক বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমের বিষবৃক্ষ চন্দ্রশেখর প্রভৃতি ধারাবাহিক উপন্যাস "মাসের পর মাস কামনা করিয়া অপেক্ষা করিয়া অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘকালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত করিয়া তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি ভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেক দিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া" পড়তেন—তার বিবরণ রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে পাই।

অথচ এই বঙ্গদর্শনে ঠিক সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের জ্যোতিদাদা—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম নাট্যগ্রন্থ কিঞ্চিৎ জলযোগ কিংবা দ্বিতীয় নাট্যগ্রন্থ পুরুবিক্রম নাটক কিভাবে সমালোচিত হয়েছিল বঙ্কিম ভালো বলেছিলেন না মন্দ বলেছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে সেই সমালোচনা কিরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, কবি-বউঠান কাদম্বরী দেবী তাঁর স্বামীর প্রথম বা দ্বিতীয় পুস্তকের সমালোচনা দেখে কতখানি পুলকিত বা উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন—ইত্যাদি কোনো সংবাদ রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে আমরা পাই না।

মনে রাখা প্রয়োজন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থ কিঞ্চিৎ জলযোগ (২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭২) বা দ্বিতীয় গ্রন্থ পুরুবিক্রম নাটক (৯ জুলাই ১৮৭৪) যখন প্রকাশিত হয় তখনো দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ (১৮ অক্টোবর ১৮৭৫) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গদর্শনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গ্রন্থের বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত সমালোচনা ঠাকুর পরিবারের সাহিত্যের ইতিহাসে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অথচ রবীন্দ্রনাথের মনে এই রকম একটি ঘটনা সেদিন বিশেষ কোনো দাগ কাটেনি দেখতে পাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দুটি বই-ই সেদিন নাট্যকারের নাম ছাড়াই ছাপা হয়েছিল। তাই বঙ্গদর্শনের সমালোচনাতেও দেখি গ্রন্থের নামের সঙ্গে গ্রন্থকারের নামটি নেই। সমালোচনাতে নাট্যকারের নামোল্লেখ না থাকলেও কিঞ্চিৎ জলযোগ বা পুরুবিক্রম নাটক যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা—তা নিশ্চয় কাদম্বরী দেবী বা রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাত ছিল না।

বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষেই (১২৭৯ চৈত্র ১৮৭৩ খৃঃ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম পুস্তকের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় (১২৮০ শ্রাবণ ১৮৭৩ খৃঃ) প্রকাশিত হয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের প্রথম সর্গ। পরে সমগ্র কাব্যটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালের ১৮ অক্টোবর।

দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় (পুরাতন প্রসঙ্গ) বঙ্গদর্শনে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য প্রকাশের উল্লেখ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের উক্তি, "আমি যখন প্রথম স্বপ্নপ্রয়াণ রচনা করিতে আরম্ভ করি, তাহার কোনও কোনও অংশ বঙ্কিমবাবুকে পাঠাইয়াছিলাম, তাঁহার বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করিবার জন্য। তখনকার স্বপ্নপ্রয়াণ আর এখনকার স্বপ্নপ্রয়াণে অনেক তফাৎ। আমার পুস্তকে কতকগুলো কাল্পনিক ছবির সমাবেশ ছিল। বঙ্কিমবাবু বোধ হয় সেগুলো ছাপান নাই, এক আধটা ছাপাইয়াছিলেন কি না আমার স্মরণ নাই। কিন্তু তাঁহার বিষবৃক্ষের মধ্যে ঠিক সেই রকম ছবির অবতারণা করিয়া বসিলেন, তফাতের মধ্যে দাঁড়াইল এই যে, যাহা স্বপ্নে অশোভন হয় না, তাহা বাস্তব জগতে, গৃহস্থচিত্রে, বিশেষত হিন্দু গৃহস্থচিত্রে অত্যন্ত অশোভন হইয়া দাঁড়াইল। নগেন্দ্রনাথের ঘরের মধ্যে সেই রকম ছবি থাকিতে পারে; কিন্তু বাড়ির মধ্যে গৃহস্থ বধূ গাড়ি হাঁকাইলেন, এ চিত্র একেবারেই সুশোভন হইল না। কিন্তু এই রকম চিত্র সমাবেশের আইডিয়াটা যে তিনি আমার রচনা হইতে পাইতেছিলেন, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।" সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিনা মন্তব্যে স্বপ্নপ্রয়াণ প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের এই উক্তি পুরাতন প্রসঙ্গ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। ফলে বাংলা সাহিত্যের পাঠকসমাজ দ্বিজেন্দ্রনাথের কথানুসারে এতদিন এই ধারণাই পোষণ করে এসেছেন যে বিষবৃক্ষে দ্বিতীয় প্রদীপে শীর্ষক চতুস্ত্রিংশ সংখ্যক পরিচ্ছেদটি স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের আইডিয়া অবলম্বনে লিখিত। দ্বিজেন্দ্রনাথ যা বলেছেন তার মূলে ... বিষবৃক্ষের ওই পরিচ্ছেদের ছবি বঙ্কিম স্বপ্নপ্রয়াণ থেকে হরণ করেছেন। কথাটার সত্যাসত্য বিচার করা দরকার।

দ্বিজেন্দ্রনাথের কথা অনুসরণে আমরা ... মেনে নিলাম যে বিষবৃক্ষ ও স্বপ্নপ্রয়াণের ... চিত্রধর্মিতায় কিছু মিল আছে। নয় ... একজনের দ্বারা আর একজন প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু কার দ্বারা কে প্রভাবিত হয়েছিলেন? দ্বিজেন্দ্রনাথের দ্বারা বঙ্কিম না বঙ্কিমের দ্বারা দ্বিজেন্দ্রনাথ? দেখা যাক—সাময়িকপত্রে কার রচনা কবে প্রকাশিত হয়েছে।

পূর্বে বলেছি স্বপ্নপ্রয়াণ প্রকাশিত হয় ১২৮০ শ্রাবণে। অপর দিকে দেখি বঙ্গদর্শনে

বঙ্কিমচন্দ্র একাধিকবার ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে এসেছিলেন। শুধু গলি পর্যন্ত নয়—উঠেছিলেন ঠাকুরবাড়ির তেতলার ছাদেও

**জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বঙ্কিমকে সামনে বসিয়ে এঁকেছিলেন এই অসামান্য পোর্ট্রেট।**

বিষবৃক্ষের প্রকাশ হয় ১২৭৯ বৈশাখ (১৮৭২ খ্রী) আর শেষ হয় ওই বছর ফাল্গুনে (১৮৭৩ খ্রী)। অর্থাৎ বঙ্গদর্শনে স্বপ্নপ্রয়াণ প্রকাশের পাঁচ মাস আগেই বিষবৃক্ষ উপন্যাস সমাপ্ত হয়। আর বিষবৃক্ষের চল্লিশ পরিচ্ছেদটি (স্তিমিত প্রদীপে বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত হয় ১২৭৯ মাঘ—১৮৭৩ খ্রী) সংখ্যায়। অর্থাৎ স্বপ্নপ্রয়াণ প্রকাশের ছয় মাস পূর্বে। স্তিমিত প্রদীপে পরিচ্ছেদটি মাঘ মাসে মুদ্রিত হয়েছিল—এর অর্থ, বঙ্কিম এই অংশটি লিখে ফেলেছিলেন অন্তত কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে, কিংবা ধরা যাক পৌষ মাসেই। তা হলেও দাঁড়ায়—স্বপ্নপ্রয়াণ প্রকাশের দীর্ঘ সাত মাস পূর্বে। এই অবস্থায় কখনই কেউ স্বীকার করতে পারেন না যে স্বপ্নপ্রয়াণের দ্বারা বিষবৃক্ষ প্রভাবিত হয়েছিল।

দ্বিজেন্দ্রনাথের উক্তি সমর্থন করে কেউ হয় তো বলতে পারেন—বঙ্গদর্শনে স্বপ্নপ্রয়াণ যবেই ছাপা হোক না কেন কবি তাঁর কবিতা সম্পাদকের কাছে পাঠিয়েছিলেন তার অনেক পূর্বে, বঙ্গদর্শনে স্তিমিত প্রদীপে পরিচ্ছেদটি প্রকাশেরও পূর্বে। অর্থাৎ স্বপ্নপ্রয়াণ মুদ্রিত হবার সাত-আট মাস পূর্বে। দ্বিজেন্দ্র-পক্ষাবলম্বীরা বলতে পারেন—বঙ্কিম দ্বিজেন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি থেকেই চিত্রগুলি সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন। এই কথার উত্তরে বঙ্কিম পক্ষের সমর্থক বলবেন—বঙ্কিম যদি কোনো পাণ্ডুলিপি থেকে কিছু "অপহরণ" করেই থাকেন তবে তিনি নিজে কখনো তাঁর নিজের পত্রিকার পাতায় সেই পাণ্ডুলিপি পুনরায় ছাপতে পারেন না। নিজের অপরাধের সূত্র নিজে থেকে কি কেউ কখনো চোখের সামনে দেখিয়ে দেয়? দ্বিতীয় কথা, ধরে নেওয়া গেল যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ১২৭৯ মাঘের আগেই পাণ্ডুলিপি বঙ্কিমকে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন দেখলেন বঙ্গদর্শনের মাঘ সংখ্যায় বঙ্কিম বিষবৃক্ষের মধ্যে তাঁর স্বপ্নপ্রয়াণের কাল্পনিক চিত্রগুলির মত "ছবির অবতারণা করিয়া বসিলেন" তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ বঙ্কিমের সেই অমার্জনীয় অপরাধ নীরবে মেনে নিলেন কেমন করে? তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও তো একটা প্রতিবাদ-পত্র প্রকাশিত হতে পারত। কিন্তু তেমন কোনো প্রতিবাদ সেদিনের কোনো কাগজে প্রকাশিত হয়নি। সব চেয়ে বড় কথা হল—বঙ্কিম যদি স্বপ্নপ্রয়াণের চিত্র-সমাবেশের আইডিয়াটা বিষবৃক্ষের মধ্যে সত্যিই চালিয়ে থাকেন, তা হলে এই ঘটনার পরেও দ্বিজেন্দ্রনাথ কি করে তাঁর স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ছাপার অনুমতি দিলেন? কিন্তু দেখা যাচ্ছে, দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য বঙ্গদর্শন থেকে তুলে নেননি। ১২৮০ শ্রাবণের বঙ্গদর্শনে স্বপ্নপ্রয়াণ ছাপা হল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ যে বলেছেন, "এই রকম চিত্র-সমাবেশের আইডিয়াটা যে তিনি আমার রচনা হইতে পাইতেছিলেন সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।" —একথা কোনো দিক থেকেই প্রমাণ করা যায় না। বরং ইতিহাস ও তথ্য-প্রমাণ একথাই বলবে যে উভয় রচনার মধ্যে সত্যিই যদি কোনো ভাবগত মিল থেকে থাকে তবে দ্বিজেন্দ্রনাথই চিত্রসমাবেশের আইডিয়াটা বঙ্কিমের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। কারণ বিষবৃক্ষের অনেক পরে স্বপ্নপ্রয়াণ প্রকাশিত হয়।

বঙ্গদর্শনের যে সংখ্যায় স্বপ্নপ্রয়াণ ছাপা হয় তার ঠিক এক বছর পর, ১২৮১ ভাদ্র (১৮৭৪ খ্রী) সংখ্যায় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গ্রন্থ পুরুবিক্রম নাটকের সমালোচনা। কিঞ্চিৎ জলযোগের মত এটিও যে বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত সমালোচনা—তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিজের উক্তি থেকেই জানা যায়।

কিঞ্চিৎ জলযোগের সমালোচনায় বঙ্কিম গ্রন্থকারকে বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। পুরুবিক্রম নাটকের সমালোচনায় বঙ্কিম নাট্যকার সম্পর্কে বললেন, "এইরূপ কৃতবিদ্য এবং মার্জিতরুচি মহাশয়গণ নাটক প্রণয়নের ভার গ্রহণ করেন, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে, নিতান্ত পক্ষে বাঙ্গালা নাটকের বর্তমান অশ্লীলতা এবং কদর্যতা থাকিবে না।"

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমকে প্রথম দেখেন ১২৮২ বঙ্গাব্দে—১৮৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে, রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের এমারেল্ড বাওয়ারে দ্বিতীয় কলেজ রিইউনিয়ন নামক মিলন সভায়। তখন বঙ্গদর্শনের চতুর্থ বর্ষের পৌষ সংখ্যা সবে বেরিয়েছে। শেষ হয়েছে রজনী, শুরু হয়েছে নতুন উপন্যাস কৃষ্ণকান্তের উইল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "সেই সম্মিলন সভায় ভিড়ের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে নানা লোকের মধ্যে হঠাৎ এমন একজনকে দেখিলাম যিনি সকলের হইতে স্বতন্ত্র—যাঁহাকে অন্য পাঁচ জনের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিবার জো নাই। সেই গৌরকান্তি দীর্ঘকায় পুরুষের মুখের মধ্যে এমন একটি দৃপ্ত তেজ দেখিলাম যে, তাঁহার পরিচয় জানিবার কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সেদিনকার এত লোকের মধ্যে, কেবলমাত্র, তিনি কে ইহাই জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলাম। যখনি শুনিলাম তিনিই বঙ্কিমবাবু, তখন বড়ো বিস্ময় জন্মিল। লেখা পড়িয়া এতদিন যাঁহাকে মহৎ বলিয়া জানিতাম চেহারাতেও তাঁহার বিশিষ্টতার যে এমন একটি নিশ্চিত পরিচয় আছে সেকথা সেদিন আমার মনে খুব লাগিয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর খড়্গনাসায়, তাঁহার চাপা ঠোঁটে, তাঁহার তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে ভারি একটা প্রবলতার লক্ষণ ছিল। বক্ষের উপর দুই হাত বদ্ধ করিয়া তিনি যেন সকলের নিকট হইতে পৃথক হইয়া চলিতেছিলেন, কাহারও সঙ্গে যেন তাঁর কিছুমাত্র গা-ঘেঁষাঘেঁষি ছিল না, এইটেই সর্বাপেক্ষা বেশি করিয়া আমার চোখে ঠেকিয়াছিল। তাঁহার যে কেবলমাত্র বুদ্ধিশালী মননশীল লেখকের ভাব তাহা নহে, তাঁহার ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজতিলক পরানো ছিল।"

এই ১২৮২র শেষে, চৈত্র সংখ্যার (১৮৭৬ মার্চ) পর বঙ্গদর্শনের প্রকাশ অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

বঙ্গদর্শনের জন্ম এবং মৃত্যুই ঠাকুরবাড়ির ভারতী পত্রিকার আবির্ভাবের মুখ্য কারণ। ১২৮৩-তে (১৮৭৬ খ্রী) বঙ্গদর্শন বেরলো না। সেই সময় ঠাকুরবাড়ির সাহিত্যিকরা বঙ্গদেশের জন্য একটি সাহিত্য পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করলেন। প্রকাশিত হল নতুন কাগজ ভারতী। প্রথম সংখ্যা বেরলো ১২৮৪ শ্রাবণ (১৮৭৭ খ্রী) মাসে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে এই মাসিক পত্রিকাটির প্রবর্তন হল। সম্পাদক হলেন স্বপ্নপ্রয়াণের কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "জ্যোতির ঝোঁক হইল, একখানা নূতন-পত্র বাহির করিতে হইবে। আমার কিন্তু ততটা ইচ্ছা ছিল না। আমার ইচ্ছা ছিল, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে ভাল করিয়া জাঁকাইয়া তোলা যাক। কিন্তু জ্যোতির চেষ্টায় ভারতী প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের মত একখানা কাগজ করিতে হইবে, এই ছিল জ্যোতির ইচ্ছা। আমাকে সম্পাদক হইতে বলিল। আমি আপত্তি করিলাম না। আমি কিন্তু ঐ নামটুকু দিয়াই খালাস। কাগজের সমস্ত ভার জ্যোতির উপর পড়িল।"

বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বইয়ের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল; এবার ঠাকুরবাড়ির পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের বইয়ের সমালোচনা প্রকাশিত হল। ভারতীতে বঙ্কিমের কবিতাপুস্তক নামক গ্রন্থের অতি দীর্ঘ সমালোচনা বেরুলো ১২৮৫ ভাদ্র (১৮৭৮ খ্রী) সংখ্যায়। রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই বেনামী সমালোচনাটি রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে মনে করেছেন ('রবীন্দ্রনাথের বাল্য রচনা' : কালানুক্রমিক সূচী' রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা প্রথম খণ্ড)। কিন্তু সত্যিই

**"তেতালার ছাদের উপর পাল খাটাইয়া স্টেজ বাঁধিয়া বাল্মীকি প্রতিভার অভিনয় হইল। আমি সাজিয়াছিলাম বাল্মীকি। ...দর্শকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন।" —রবীন্দ্রনাথ।**

এটি রবীন্দ্রনাথের লেখা কি না—তা জোর করে আমরা বলতে পারি না। কারণ আমাদের হাতে, এটি রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে প্রমাণ করবার মত কোনো প্রত্যক্ষ তথ্য নেই। আমাদের বক্তব্য, এটি রবীন্দ্রনাথের লেখা হতেও পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু এটি যে রবীন্দ্রনাথেরই লেখা—এমন কথা নিশ্চয় করে বলার মত কোনো অবকাশ নেই।

ভারতী পত্রিকার সমালোচনার উপসংহার অংশটি উদ্ধৃত করি—

"উপসংহারকালে আমরা একটি মাত্র কথা বলিব—বঙ্কিমবাবু উপন্যাস লিখিয়া যতদূর প্রতিষ্ঠাবান হইয়াছেন, এই নিকৃষ্ট কবিতাখানির প্রভাবে তাঁহার সে যশ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না। আমরা বিলক্ষণ জানি যে, ভাল একজন উপন্যাস লেখক ভাল কবি হইতে পারেন না। স্যার ওয়ালটর স্কটের কবিতাগুলি পর্যন্ত প্রধান প্রধান সমালোচকদের মতে ছন্দগ্রথিত উপন্যাসমাত্র। কিন্তু তাহা না হইলেও সকল ব্যক্তিতে স্যার ওয়ালটর স্কটের প্রতিভা সম্ভাবিত নহে। কবি ও উপন্যাস লেখক ভিন্ন উপাদানে নির্মিত, তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টি ভিন্নভাবে বিক্ষিপ্ত হয়, একজন কেবল ঘটনাগুলি এমন করিয়া সাজাইতে চাহেন যে তাহাতে উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে—অপরজন ঘটনার প্রতি ঈষৎমাত্র দৃষ্টি রাখিয়া কেবল ভাবের বিকাশের দিকেই লক্ষ্য স্থির রাখেন। স্কটের লেডি অফ দি লেকের সহিত বাইরনের ওয়ারের তুলনা করিয়া দেখিলে আমাদের কথার সার্থকতা সপ্রমাণ হইবে।"

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বঙ্কিমের প্রথম আবির্ভাবের সংবাদ পাই "বিদ্বজ্জনসমাগম" সভা উপলক্ষে। বছরে একবার দেশের সমস্ত সাহিত্যিককে একত্র করবার অভিপ্রায়ে ঠাকুরবাড়িতে বিদ্বজ্জন-সমাগম নামে এক সভা স্থাপিত হয়েছিল। সেই সম্মিলন উপলক্ষে গান-বাজনা আবৃত্তি ও আহারাদি হত।

এই সম্মিলনের দ্বিতীয়বারের সভায় বঙ্কিম-চন্দ্র উপস্থিত হয়েছিলেন। সম্মিলনের প্রথম বৎসরের অধিবেশন হয় ১২৮১ বঙ্গাব্দে (১৮৭৪ খৃঃ)। সেবারের সভায় বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন না। দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মিলন আহূত হয় ১৬ ফাল্গুন শনিবার ১২৮৭ (১৮৮১ খৃঃ)। এই সভায় রবীন্দ্র-নাথের বাল্মীকি-প্রতিভা অভিনীত হয়। বাল্মীকি-প্রতিভা বই প্রকাশিত হয় ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১ (২ মাঘ ১২৮৭)। রবীন্দ্রনাথ নিজে বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই সভার বিবরণ ছাপা হয় ১৭ ফাল্গুন ১২৮৭-র (২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১) সাধারণী পত্রে। পত্রিকা লিখেছে—

"কল্য শনিবার সন্ধ্যার পর কলিকাতার জোড়া-সাঁকোস্থ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে 'বিদ্বজ্জনসমাগম' হইয়াছিল। ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু প্যারীমোহন মিত্র, বাবু বঙ্কিম-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, বাবু শীতলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মিষ্টার বি এল গুপ্ত, মিষ্টার টি এন পালিত, আচার্য শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, রাজা শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ডাক্তার কানাইলাল দে, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতি বহুতর আহূত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুরবাড়ির ছোট ছোট সুশিক্ষিত বালক বালিকা সঙ্গীত-যন্ত্রের সুরের সঙ্গে বেশ সুস্বরে গান করিয়াছিলেন। তাহার পর বাল্মীকি প্রতিভা নামে একখানি অভিনব গীতিকাব্য অভিনীত হয়। বাল্মীকি সরস্বতী-কৃপায় দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কিরূপে অমর কবিত্ব লাভ করেন তাহা প্রদর্শন করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং বাল্মীকি হন আর 'প্রতিভা' নাম্নী প্রতিভাসম্পন্না তাঁহার ষোড়শবর্ষীয়া ভ্রাতুষ্কন্যা বাগ্দেবী রূপে অভিনয় করেন।"

রবীন্দ্রনাথ এই অভিনয় প্রসঙ্গে লিখেছেন,

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন—প্রচারে বঙ্কিম যা লিখছেন তার একটা প্রতিবাদ হওয়া উচিত।

বাল্মীকি প্রতিভার অভিনয় হইল। আমি সাজিয়া-ছিলাম বাল্মীকি, আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা সরস্বতী সাজিয়াছিল। বাল্মীকি প্রতিভার নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রহিয়াছে। দর্শকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন—অভিনয়মঞ্চ হইতে আমি তাঁহাকে চক্ষে দেখিতে পাইলাম না কিন্তু শুনিতে পাইলাম তিনি খুশি হইয়া গিয়াছিলেন।"

বিদ্বজ্জনসমাগম অনুষ্ঠানের পরেই রবীন্দ্রনাথ কোনো সময়ে (১৮৮১ ফেব্রুয়ারি—সেপ্টেম্বর, ১২৮৭ মাঘ—১২৮৮ ভাদ্র) 'সাহস' সঞ্চয় করে বঙ্কিমচন্দ্রের বাসায় তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু নবীন রবির সঙ্গে প্রবীণ চন্দ্রের প্রথমবারের সেই আলাপ তেমন জমেনি বলে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন। কবি লিখছেন, "তাহার পরে অনেকবার তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে কিন্তু উপলক্ষ ঘটে নাই। অবশেষে একবার যখন হাওড়ায় তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন সেখানে তাঁহার বাসায় সাহস করিয়া দেখা করিতে গিয়াছিলাম। দেখা হইল, যথাসাধ্য আলাপ করিবারও চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় মনের মধ্যে যেন একটা লজ্জা লইয়া ফিরিলাম। অর্থাৎ, আমি যে নিতান্তই অর্বাচীন, সেইটে অনুভব করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন করিয়া বিনা পরিচয়ে বিনা আহ্বানে তাঁহার কাছে আসিয়া ভালো করি নাই।"

বঙ্কিমের গুরুগম্ভীর চাল দেখে তরুণ বয়স্ক রবীন্দ্রনাথ হয়তো প্রথম আলাপে তেমন সহজ হতে পারেননি। কিন্তু বঙ্কিম যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা উপলব্ধি করেছিলেন তা জানা যায়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত 'বাল্মীকির জয়' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি প্রতিভার উল্লেখ করেন বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ১২৮৮ আশ্বিনে (১৮৮১ অক্টোবর)। বঙ্কিম লিখেছেন, "যাঁহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাল্মীকি প্রতিভা পড়িয়াছেন বা তাহার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা কবিতার জন্মবৃত্তান্ত কখনো ভুলিতে পারিবেন না।"

পরের বছর (১৮৮২ খৃঃ) রবীন্দ্রনাথ পুনরায় বঙ্কিমের বাসায় যাতায়াত শুরু করেন। তখন বঙ্কিম ভবানীচরণ দত্ত স্ট্রীটের বাসিন্দা। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "বঙ্কিমবাবুর কাছে যাইতাম বটে কিন্তু বেশি কিছু কথাবার্তা হইত না। আমার তখন শুনিবার বয়স, কথা বলিবার বয়স নহে। ইচ্ছা করিত, আলাপ জমিয়া উঠুক, কিন্তু সংকোচে কথা সরিত না।" ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা গ্রন্থে লিখেছেন,

কলিকাতায় বদলি হওয়ার পর জাজপুরে গমন পর্যন্ত বঙ্কিমের বাসা কলিকাতায় বউবাজার স্ট্রীটে ছিল; সেখানে প্রায় প্রত্যহই সাহিত্যিক বৈঠক বসিত;.... দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে বঙ্কিমের নিকট যাতায়াত করিতেন।....১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩-এ জানুয়ারি...সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ আসিয়া তাঁহাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বঙ্কিমকে লইয়া যান। সেই দিন ১১ই মাঘ [১২৮৮] ছিল।"

স্বর্ণকুমারীকন্যা সরলা দেবী তাঁর 'জীবনের ঝরা-পাতা' বইতে লিখেছেন, "একবার একটা ১১ই মাঘের উৎসবে বাড়ির ছেলেমেয়ে-গায়নমণ্ডলী আমরা গান গাইতে গাইতে হঠাৎ অনুভব করলুম আমাদের পিছনে একটা নাড়াচাড়া সাড়াশব্দ পড়ে গেছে। কে এসেছেন? পিছন ফিরে ভিড়ের ভিতর হঠাৎ একটি চেহারা চোখে পড়ল—দীর্ঘ নাসা, তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টি, মুখময় একটা সহাস্য জ্যোতির্ময়তা। জানলুম তিনি বঙ্কিম। যে বঙ্কিম এতদিন তাঁর বইয়ে রচনামূর্তিতে আমাকে পেয়ে বসেছিলেন আজ পেলুম তাঁকে প্রকৃতির তুলিতে হাড়েমাসে রক্তমা মূর্তিতে।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে 'সারস্বত সমাজ' নামে একটি পরিষৎ স্থাপিত হল। "বাংলার পরিভাষা বাঁধিয়া দেওয়া ও সাধারণত সর্বপ্রকার উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন এই সভার উদ্দেশ্য ছিল।" এই সভার প্রথম অধিবেশন হয় দ্বারিকানাথ ঠাকুরের গলি ৬ নম্বর ভবনে' রবিবার ২ শ্রাবণ ১২৮৯ (১৭ জুলাই ১৮৮২)। এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। অধিকাংশ উপস্থিত সভ্যের সম্মতিক্রমে প্রথম বর্ষের জন্য সভাপতি, সহযোগী সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন। সভাপতি হন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। সহযোগী সভাপতি তিনজন—বঙ্কিমচন্দ্র, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পাদক মনোনীত হন কৃষ্ণবিহারী সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই অধিবেশনে স্থির হয় "যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন এবং যাঁহারা বাংলাভাষার উন্নতিসাধনে বিশেষ অনুরাগী, তাঁহারাই এই সমাজের সভ্য হইতে পারিবেন।" সভ্যদের বার্ষিক চাঁদা ৬ টাকা বছরের গোড়ায় দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন—এই সভা একটুখানি অঙ্কুরিত হয়েই শুকিয়ে গেল।

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয় রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যার বিবাহসভায়। এই রমেশ দত্তকেই বঙ্কিম একদিন বাংলা ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি করতে উদ্বোধিত করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যাসংগীত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ৫ জুলাই ১৮৮২ (২২ আষাঢ় ১২৮৯)। রমেশ দত্তের মেয়ের বিবাহ হয় ১২৮৯ শ্রাবণে (১৮৮২ খ্রী)। এই নিমন্ত্রণসভাটি ছিল রবীন্দ্রনাথের পক্ষে একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। এই দিনটি ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনে সাহিত্যচর্চার প্রথম গৌরবের দিন। এই নিমন্ত্রণসভায় বঙ্কিমচন্দ্র নিজকণ্ঠ থেকে পুষ্পমাল্য পরিয়ে দিয়েছিলেন সন্ধ্যাসংগীতের কবির গলায়।

"রমেশ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ-সভার দ্বারের কাছে বঙ্কিমবাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন; রমেশবাবু বঙ্কিমবাবুর গলায় মালা পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি সে-মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন, 'এ-মালা ইঁহারই প্রাপ্য। রমেশ, তুমি সন্ধ্যাসংগীত পড়িয়াছ?' তিনি বলিলেন, 'না।' তখন বঙ্কিমবাবু সন্ধ্যাসংগীতের কোনো কবিতা সম্বন্ধে যে-মত ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইলাম।"

লক্ষ করবার বিষয়, সন্ধ্যাসংগীত এক মাস কালও প্রকাশিত হয়নি, এর মধ্যেই ওই কাব্যখানি বঙ্কিমচন্দ্রের পড়া হয়ে গিয়েছে। হয়তো রবীন্দ্রনাথ তাঁর নূতন কাব্যগ্রন্থের একখানি কপি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বহস্তে উপহার দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস বৌ-ঠাকুরাণীর হাট ভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিক মুদ্রিত হয় ১২৮৮ কার্তিক থেকে ১২৮৯ আশ্বিন পর্যন্ত। বই ছাপা হয় ১১ জানুয়ারি ১৮৮৩ (২৮ পৌষ ১২৮৯)। বৌ-ঠাকুরাণীর হাট উপন্যাসটি পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের থেকে একটি প্রশংসাপত্র পাঠিয়েছিলেন লেখককে। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, "এই গল্প বেরোবার পরে বঙ্কিমের কাছ থেকে একটি অযাচিত প্রশংসাপত্র পেয়েছিলুম, সেটি ইংরেজি ভাষায় লেখা। সে পত্রটি হারিয়েছে কোনো বন্ধুর অযত্ন করক্ষেপে। বঙ্কিম এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, বইটি যদিও কাঁচাবয়সের প্রথম লেখা তবু এর মধ্যে ক্ষমতার প্রভাব দেখা দিয়েছে—এই বইকে তিনি নিন্দা করেননি। ছেলেমানুষের ভিতর থেকে আনন্দ পাবার এমন কিছু দেখেছিলেন যাতে অপরিচিত বালককে হঠাৎ একটা চিঠি লিখতে তাঁকে প্রবৃত্ত করলে। দূরের যে পরিণতি অজানা ছিল সেইটি তাঁর কাছে কিছু আশার আশ্বাস এনেছিল। তাঁর কাছ থেকে এই উৎসাহবাণী আমার পক্ষে ছিল বহুমূল্য।"

রবীন্দ্রনাথ এখানে নিজেকে বঙ্কিমের 'অপরিচিত' বলে উল্লেখ করেছেন। এ কথা ঠিক নয়। উপন্যাস সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ হয়তো 'অপরিচিত' ছিলেন সেদিন, কিন্তু বঙ্কিমের তিনি সুপরিচিত ছিলেন বৌ-ঠাকুরাণীর হাট প্রকাশের পূর্বেই।

শ্রীশ মজুমদার বঙ্কিমপ্রসঙ্গে লিখেছেন, "রবীন্দ্রবাবুর কথা উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম —'তাঁর উপন্যাস কি আপনি পড়িয়াছেন?' উত্তর—'পড়েছি। স্থানে স্থানে অতি সুন্দর সুন্দর উচ্ছ্বাসের লেখা আছে কিন্তু উপন্যাসের হিসাবে সেটা নিষ্ফল হয়েছে। রবিকে সে-কথা আমি বলেছি। উদীয়মান লেখকদের মধ্যে হরপ্রসাদ, তুমি ও রবির মধ্যে আমার বোধ হয় রবি বেশি গিফটেড কিন্তু পুকোসাস, এখনি তার বয়স ২২-২৩, সে-কথা সেদিন রবিকে বলেছি।"

১২৯১ শ্রাবণে (১৮৮৪ খ্রী) বঙ্কিমের নতুন মাসিকপত্র প্রচার প্রকাশিত হল। প্রচারের প্রথম সংখ্যায় বঙ্কিমের কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে ছিল 'হিন্দুধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধ। ওই শ্রাবণে নবজীবন পত্রিকায় বঙ্কিম লিখেছিলেন 'ধর্ম-জিজ্ঞাসা'।

বঙ্কিমের ধর্মজিজ্ঞাসা পাঠ করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১২৯১ ভাদ্র সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পর পর দুখানি নাট্যগ্রন্থের বঙ্কিম-চন্দ্র-কৃত সমালোচনা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়।

আদি ব্রাহ্মসমাজ হলে পঠিত রবীন্দ্রনাথের বঙ্কিম-বিরোধী রচনা সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ কি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ছাপতে চাননি?

বঙ্কিমের সমালোচনা করে লিখলেন 'নব্য হিন্দু সম্প্রদায়'।

দ্বিজেন্দ্রনাথ পরে 'পুরাতন প্রসঙ্গে' বলেছেন —তিনি বঙ্কিমের লেখা সমালোচনা করায় বঙ্কিম ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন ও পরে প্রচারে বঙ্কিম প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন। "পত্রিকায় সমালোচনা বাহির হইবার পর তিনি প্রচারে এমনভাবে লিখিলেন যেন সমালোচনা আমার লেখা নহে—কর্তা স্বয়ং লিখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বাবা তখন অত্যন্ত পীড়িত। তাঁহার সঙ্গে তখন আমি চুঁচুড়ায় ছিলাম বটে, কিন্তু তিনি দোতালায় শয্যাগত ছিলেন। তিনি আমাকে এইটুক মাত্র বলিয়াছিলেন—'দেখ, বঙ্কিম যে রকম করে কৃষ্ণচরিত্রের [ধর্মতত্ত্ব হবে] আলোচনা করচে, তার একটা প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক।' তাই আমি প্রতিবাদ করিয়া পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম। সে সমালোচনায় কর্তার কোনও হাত ছিল না; আগা-গোড়া আমার নিজের।"

দ্বিজেন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাদি গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করতেন এবং কোনু লেখার প্রতিবাদ হওয়া উচিত—অসুস্থতার মধ্যেও তিনি পুত্রদের সে-বিষয়ে নির্দেশ দিতেন এবং পুত্রেরাও সে-নির্দেশ সর্বদা পালন করে গিয়েছেন।

বস্তুত পক্ষে বঙ্কিম দ্বিজেন্দ্রনাথের সমালোচনার কোনো প্রতিবাদ করেননি সে-সময়। দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনাকে সমালোচনা বলেই বঙ্কিম গ্রহণ করেছিলেন, আক্রমণ বলে নয়। পরে রবীন্দ্রনাথ যখন ১২৯১ অগ্রহায়ণের ভারতীতে 'একটি পুরাতন কথা' নাম দিয়ে পুরাতন কথাকে আবার টেনে এনে বঙ্কিমকে নতুন করে 'আক্রমণ' করেন, তখনই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রতিবাদ প্রবন্ধ লেখেন 'আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব হিন্দু সম্প্রদায়' শিরোনামে, প্রচারে ১২৯১ অগ্রহায়ণে (১৮৮৪ খ্রী)।

এই প্রবন্ধে বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের উত্তরে নিজের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বলেন, "রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে এরূপ বিচারে আমার প্রবৃত্তি নাই। আমার যদি মনে থাকিত যে, আমি রবীন্দ্রবাবুর প্রতিবাদ করিতেছি, তাহা হইলে এতটুকুও বলিতাম না। এই রবির পিছনে যে ছায়া আছে, আমি তাহারই প্রতিবাদ করিতেছি বলিয়া এত কথা বলিলাম।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনীতে লেখেন, "নব-জীবনের প্রথম সংখ্যায় একপ্রস্থার নূতন হিন্দুধর্মের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে—এবং তাহা প্রশ্নোত্তর

আকারে ব্যাখ্যাত হইতেছে। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহার লেখক—সুতরাং তাহা উপেক্ষণীয় নহে,—আবার তাহা ধর্মের মর্মে আঘাত করিতে *উদ্যত—সুতরাং আমাদের নীরব থাকা অকর্তব্য। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবাবু আমাদের দেশের একজন প্রধান লেখক এবং তিনি স্বয়ং আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র; তবে যে, আমরা তাঁহার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছি—সে কেবল কর্তব্যের অনুরোধে।"*

*প্রচার পত্রিকায় বঙ্কিম* দ্বিজেন্দ্রনাথের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখলেন, "তত্ত্ববোধিনীতে নব্য হিন্দু সম্প্রদায় শিরোনামে একটি প্রবন্ধে আমার লিখিত ধর্মজিজ্ঞাসা সমালোচিত হয়। সমালোচনা আক্রমণ নহে। এই লেখক বিজ্ঞ, গম্ভীর এবং ভাবুক। আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা সব শুনিয়া, যদি প্রথম সংখ্যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া তিনি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তবে তাঁহার কোনো দোষই দিতে পারিতাম না। তিনি যদি অকারণে আমার উপর নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি দোষ আরোপিত না করিতেন তবে আজ তাঁহার প্রবন্ধ এই গণনার ভিতর ধরিতে পারিতাম না। তিনি যে দয়ার সহিত সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আমার ধন্যবাদের পাত্র। বোধ হয় বলায় দোষ নাই যে, এই লেখক স্বয়ং তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

তত্ত্ববোধিনীতে যে সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের সমালোচনা প্রকাশিত হয় সেই সংখ্যায় বঙ্কিমকে 'তিরস্কার' করে 'নূতন ধর্মমত' নামে আরও একটা সমালোচনা মুদ্রিত হয়। বঙ্কিম জানিয়েছেন, এই প্রবন্ধের লেখক দেবেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সুহৃদ রাজনারায়ণ বসু। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের রচনা ভারতী পত্রিকায় বারো'শ একানব্বুই অগ্রহায়ণে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমের প্রবন্ধ প্রকাশের (বারো'শ একানব্বুই শ্রাবণ) দীর্ঘ চার মাস পরে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের বিরুদ্ধে কলম ধরেন পুরাতন প্রসঙ্গ টেনে 'একটি পুরাতন কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে। পত্রিকায় প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে রবীন্দ্রনাথ লেখাটি আদি ব্রাহ্ম-সমাজ হলে সর্বসমক্ষে পাঠ করেছিলেন।

কেন এই দীর্ঘ চার মাস রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের কোনো প্রতিবাদে আগ্রহ বোধ করেন নি?

বারো'শ একানব্বুই আশ্বিনে (আঠারশো চুরাশি খৃঃ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বিজেন্দ্রনাথকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক এবং রবীন্দ্রনাথকে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে নিযুক্ত করেন। সমাজের সম্পাদক হয়েই রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ সমর্থন করে বঙ্কিমের বিরুদ্ধে কলম ধরেন। বঙ্কিমচন্দ্রও মনে করেন—এতদিন পরে রবীন্দ্রনাথের এ প্রবন্ধ নিশ্চয় কারও প্ররোচনায় রচিত।

বঙ্কিম তাঁর প্রবন্ধে লিখছেন, "যে কথা সাধারণ পাঠ্য-প্রবন্ধে বলা রুচিবিগর্হিত, যাহা Personal, তাহা বলিতে বাধ্য হইলাম। আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি রবীন্দ্রবাবুর নিকট বিলক্ষণ পরিচিত। শ্লাঘাস্বরূপ মনে করি,—এবং ভরসা করি, ভবিষ্যতেও মনে করিতে পারিব যে, আমি তাঁহার সুহৃজ্জন মধ্যে গণ্য হই। চারি মাস হইল প্রচারের সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই চারি মাস মধ্যে রবীন্দ্রবাবু অনুগ্রহপূর্বক অনেকবার আমাকে দর্শন দিয়াছেন। সাহিত্য বিষয়ে অনেক আলাপ করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গ কখনও উত্থাপিত করেন নাই। অথচ বোধ হয়, যদি ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া রবীন্দ্রবাবুর এমন বিশ্বাসই হইয়াছিল যে দেশের অবনতি, এবং ধর্মের উচ্ছেদ, এই দুইটি আমি জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছি, তবে যিনি ধর্ম প্রচারে নিযুক্ত, আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, এবং স্বয়ং সত্যানুরাগ প্রচারে যত্নশীল, তিনি এমন ঘোর পাপিষ্ঠের উদ্ধারের জন্য যে সে প্রসঙ্গ ঘূণাক্ষরেও উত্থাপিত করিবেন না, তার পর চারি মাস বাদে সহসা পরোক্ষ বাগ্মিতার উৎস খুলিয়া দিবেন, ইহা আমার অসম্ভব বোধ হয়।"

**বাংলা পত্র-পত্রিকার মধ্যে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীই তাঁর বালক পত্রিকায় বঙ্কিমের প্রতিকৃতি প্রথম মুদ্রিত করেছিলেন।**

ধর্মবিষয়ে তর্ক-বিতর্ক যাই ঘটুক না কেন, শেষ পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ তথা সমগ্র ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে বঙ্কিম-চন্দ্রের সম্পর্ক খুবই ভাল ছিল। আর বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রতি আন্তরিক অকৃত্রিম গভীর অনুরাগ। দীর্ঘ ছয় মাস ধরে বাদ-প্রতিবাদের যে ঝঞ্ঝা বইলো, তার সমাপ্তি ঘটলো পরম প্রীতিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, "এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে—যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন, বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।"

রবীন্দ্রনাথ 'একটি পুরাতন কথা' প্রবন্ধটি আদি ব্রাহ্মসমাজ হলের যে-সভায় পাঠ করেছিলেন সেই সভার একটি বিবরণী পাই সরলা দেবীর লেখা থেকে। জীবনের ঝরাপাতা বইতে সরলা দেবী লিখছেন, "রবিমামার সঙ্গে ছেলেবেলায় একটি সভায় যাওয়া আমার মনে পড়ে। জীবনে এই প্রথম সভা-গমন। কি excitement কি উদ্দীপনা আমাদের—সুরেন বিবি সুধীদাদা বলুদাদারাও আ[illegible]। সভাটি আদি ব্রাহ্মসমাজ হলে আহূত। উ[illegible] সে সভায় বঙ্কিমের একটি মতের বিরুদ্ধে র[illegible]ন্দ্রনাথের তীব্র প্রতিবাদ পাঠ। বঙ্কিমের যশ ও কীর্তি তখন মধ্যাহ্ন গগনে সমুদিত আর রবি সবেমাত্র উদীয়মান। লোক-দের মধ্যে একটা হলচল পড়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের নাম তখন তাঁর গানের ভিতরে রবিছায়াতেই প্রায় নিবদ্ধ। এই বক্তৃতায় যে ওজস্বী গদ্যে, যে যুক্তি-তর্কে তাঁর শ্রোতাদের মন আকৃষ্ট করলেন তা ইতিপূর্বে তাঁর সম্বন্ধে অভাবনীয়। সংক্ষেপে ব্যাপারটি এই—রবীন্দ্রনাথের প্রতিপাদ্য এই যে, মিথ্যা কোনো অবস্থাতেই কোনো সময়েই কথনীয় নয়। এ বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রকারকৃত নীতিক্রম বিধিগুলি তিনি সমর্থন করেন না, বঙ্কিম করেন—এই প্রভেদ। রবীন্দ্রনাথের দুই অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ বিষয়ে শাস্ত্রকারদের ও বঙ্কিমের পক্ষাবলম্বী হলেন, তাঁরা বক্তৃতা-সভায় যোগদান করলেন না। কিন্তু ছোটরা তাঁর hero-worshipper হল।" সরলা দেবীর এই উক্তি থেকে মনে হয় দ্বিজেন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমের সঙ্গে প্রকাশ্যে মতবিরোধে রাজি হননি। রবীন্দ্রনাথের যে

লেখা আদি ব্রাহ্মসমাজে পঠিত হল, সে লেখা তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা হওয়াই তো স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তা তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা না হয়ে ভারতী পত্রিকায় মুদ্রিত হল। তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক কি এই লেখা তাঁর পত্রিকায় ছাপতে চাননি?

বারো'শ একানব্বুই অগ্রহায়ণে (আঠারশ চুরাশি খৃঃ) বিরোধের অবসান ঘটে আর ওই বছর অর্থাৎ বারো'শ একানব্বুই মাঘে (আঠার শ পঁচাশি খৃঃ) বঙ্কিমের প্রচার পত্রিকায় দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের নতুন কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা যে কত গভীর ছিল—তা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী কর্তৃক সম্পাদিত বালক পত্রিকার দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায়। ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় অর্থাৎ বারো'শ বিরানব্বুই বঙ্গাব্দের বৈশাখ (আঠার শ পঁচাশি খৃঃ) সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বৃহৎ চিত্র মুদ্রিত হল। চিত্রকর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বালক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে 'মুখচেনা' বলে যে ধারাবাহিক নিবন্ধের সূত্রপাত করেন, তারই প্রথম কিস্তিতে বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি মুদ্রিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজে বঙ্কিমচন্দ্রকে কাছে বসিয়ে এই পোর্ট্রেট এঁকেছিলেন। বঙ্কিমের জীবৎকালের মধ্যে মুদ্রিত আর কোনো ছবি এখনো পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়েনি। সেইজন্য বালক পত্রিকায় মুদ্রিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা ওই চিত্রটির একটি অসাধারণ মূল্য রয়েছে স্বীকার করতে হয়। বড় আকারের বালক পত্রিকার এক পাতায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজনারায়ণ বসুর ছবি ছাপা হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'মুখচেনা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে যা লিখেছেন উদ্ধৃত করি—

"বঙ্কিমবাবুর উপরিভাগের কপাল উচ্চ ও প্রশস্ত। ইহাতে বিশ্লেষণ শক্তি সমালোচন শক্তি ও হাস্যরস প্রকাশ পায়। আবার ইঁহার নীচের দিককার কপাল বেশ উঁচু—ইহাতে ছোটখাট জিনিস খুব ইঁহার নজরে পড়ে। তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষা বিজ্ঞানের দিকে ইঁহার বেশি ঝোঁক প্রকাশ পায়। তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় লিখিতে গেলেও ইনি বিজ্ঞানের প্রণালী অবলম্বন করিয়া লিখিতে ইচ্ছা করিবেন। বিশ্লেষণ শক্তি, পর্যবেক্ষণ শক্তি অধিক পরিমাণে থাকায় তাঁহার উপন্যাসে মানব চরিত্রের ও বাহ্য প্রকৃতির বর্ণনায় এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে। .... বঙ্কিমবাবুর অসাধারণ নাক। এই নাকে সুরুচি, অভিনিবেশ, মানব-চরিত্র-জ্ঞান ও অসাধারণ উদ্যম প্রকাশ পায়। তাঁহার এজলাসি কাজ সত্ত্বেও, উপর্যুপরি এত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ যে তিনি লিখিতে পারিয়াছেন সে কেবল তাঁর নাকের জোরে।.... বঙ্কিমবাবুর ঠোঁট খুব সরু—ইহাতে কার্যকরী বুদ্ধি—সূক্ষ্ম রুচি ও অসাধারণ দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। বঙ্কিমবাবুর চোখে বহির্দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পায়।....বঙ্কিমবাবুর চেহারায় নেপোলিয়ানের মুখের কিছু আভাস পাওয়া যায়। নেতার লক্ষণ ইঁহার মুখে জাজ্জ্বল্যমান। ইঁহার খড়্গ-নাসা, চাপা ঠোঁট, তীক্ষ্ণ চোখ লইয়া ইনি যদি কাহারও উপরে গিয়া পড়েন তবে সে হতভাগ্য বজ্রাঘাতের মর্ম বুঝিতে পারে। বঙ্কিমবাবুর নাকের নিম্নদেশ যেরূপ ঝুঁকিয়া আসিয়াছে, এবং তাঁহার চিবুকের নীচে যেরূপ ফুল দেখা যাইতেছে ইহাতে তাঁহার অর্থোপার্জনস্পৃহা ও মিতব্যয়িতা প্রকাশ পাইতেছে।"*

এই বালক পত্রিকাতেই জ্যৈষ্ঠ (১২৯২) সংখ্যায় মুদ্রিত হল বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ সংগীতের স্বরলিপি। স্বরলিপিকর্ত্রী প্রতিভাসুন্দরী দেবী। স্বরলিপির ভূমিকায় লেখা "বঙ্কিমবাবুর রচিত বন্দেমাতরং নামক বিখ্যাত গানটির সমস্তটা দেওয়া গেল না, কারণ উক্ত গানের সুর অত্যন্ত কঠিন, সমস্তটা দিলে পাঠকের সহজে আয়ত্ত হইবে না।" বালকের এই সংখ্যায় বন্দেমাতরম্ গানের

ভারতী পত্রিকার জন্য লেখা চাইতে স্বর্ণকুমারী দেবী প্রায়ই বঙ্কিমের কাছে যেতেন।

ভাব অবলম্বনে পূর্ণ পৃষ্ঠার একখানি মনোরম চিত্র মুদ্রিত হয়। ছবির নীচে ছাপা—'বন্দে মাতরং'।

এই সব নানা ঘটনা থেকে বোঝা যায় ঠাকুরবাড়ির লোকজন সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। যে বাড়ির ছেলেরা সকলেই প্রায় কবি ও গীতিকার সেই বাড়ির পত্রিকায় বঙ্কিমের গানের স্বরলিপি প্রথম প্রকাশিত হল—এটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ পরে নিজকৃত সুরে বন্দেমাতরম্ গানের প্রথমাংশ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে গেয়ে শোনান। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে সরলা দেবী সমগ্র বন্দেমাতরম্ গানে সুর দেন।

সরলা দেবী লিখছেন, "বঙ্কিমের স্মৃতি প্রসঙ্গে বন্দেমাতরম্ গান ও মন্ত্রের স্মৃতি ভেসে না উঠে যায় না। সে গান বঙ্কিম-ভক্তিতে ডোবা আমার প্রাণে প্রথম ফোটেনি। অর ফোটানতে ছিল রবীন্দ্রের হাত। জীবনের প্রথম দিকে কাব্য বা সংগীতের রসগ্রাহিতায় রবীন্দ্রের আত্মপর বিচার ছিল না। যে কবির যেটি ভালো লাগতো সেটিতে নিজের সুর বসিয়ে, গেয়ে ও গাইয়ে তার প্রচার করতেন। রবীন্দ্রনাথই বন্দেমাতরম্-এর প্রথম সুর বসিয়েছিলেন। তাঁর দেওয়া সুরে ঐ দুটি পদে গানটি সর্বত্র চলিত হল। একদিন মাতুল আমায় ডেকে বললেন—'তুই বাকিটুকুতে সুর দিয়ে ফেল না।' ওরকম ভার-মাঝে মাঝে আমায় দিতেন। তাঁর আদেশে 'সপ্তকোটিকণ্ঠ কলকলনিনাদকরালে' থেকে শেষ পর্যন্ত ভাবের সঙ্গে ও গোড়ার সুরের সঙ্গে সংগতি রেখে সুর দিয়ে ফুটিয়ে নিলুম। দুই একটা জাতীয় উৎসবে সমস্বরে বহুকণ্ঠে বহুজনকে গাইতেও শেখালুম। সেই থেকে সভাসমিতিতে সমস্তটাই গাওয়া হতে থাকলো।"

বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশিত হল ১৮৮৬-র আগস্টের গোড়ায় (১২৯৩ শ্রাবণ)। বঙ্কিম তাঁর নতুন বইখানি দ্বিজেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথকে পাঠালেন। দ্বিজেন্দ্রনাথকে চিঠি লিখলেন—

"শ্রদ্ধাস্পদেষু, তিনখানি কৃষ্ণচরিত্র পাঠাইলাম। অনুগ্রহপূর্বক আপনি একখানি গ্রহণ করিবেন। জ্যোতিঃ ও রবিবাবু এখন কোথায় তাহা জানি না। এ কারণ তাঁহাদের জন্য দুইখানি পুস্তক আপনার নিকটেই পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগের কাছে পাঠাইয়া দিবেন। ভরসা করি আপনারা ভাল আছেন। ইতি তাং ১০ই অগাস্ট/শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

১২৯১ থেকে এদিকে ভারতী পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী। এ পর্যায়ে তিনি ১২৯১ থেকে ১৩০২ পর্যন্ত পত্রিকা সম্পাদন করেন। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রায়ই বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে যেতেন। ভারতীর লেখকশ্রেণীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। স্বর্ণকুমারীকে বঙ্কিম লেখা দেবেন কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু কাজের চাপে ও নানা ব্যস্ততার কারণে বঙ্কিম শেষ পর্যন্ত ভারতীতে কোনো লেখা দিতে পারেন নি। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও পারেন নি।

দেখতে দেখতে দিন গড়িয়ে যায়। নতুন নতুন পত্রিকা জন্ম নিতে থাকে মধ্যে মধ্যে। সুরেশ সমাজপতির সাহিত্য বেরলো ১২৯৭ বৈশাখে (১৮৯০ খৃঃ)। এই পত্রিকায় সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৯৮ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় লিখলেন দুটি সমালোচনা প্রবন্ধ—সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী, আর কপালকুণ্ডলা ও মিরাণ্ডা। সাপ্তাহিক হিতবাদী পত্রিকা বেরলো ১২৯৮ জ্যৈষ্ঠে (১৮৯১ খৃঃ)। পত্রিকার প্রধান সম্পাদক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক হলেন রবীন্দ্রনাথ। পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে লেখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে বঙ্কিম যে সম্মতি জানিয়েছিলেন তা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি থেকে জানা যায়। শ্রীশ মজুমদারকে রবীন্দ্রনাথ এই হিতবাদীর জন্য লেখা চেয়ে যে চিঠি দেন তাতেই পত্রলেখক লিখেছেন, "বঙ্কিম, রমেশ দত্ত প্রভৃতি অনেক ভাল ভাল লোক লেখায় যোগ দিতে রাজি হয়েছেন।' তবে এই পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক বেশি দিন ছিল না ফলে বঙ্কিমের এখানে লেখার প্রশ্ন ওঠে না।

১২৯৮ অগ্রহায়ণে (১৮৯১ খৃঃ) রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে ঠাকুরবাড়ির নতুন মাসিকপত্র বেরলো—সাধনা। এই পত্রিকায় নামে সম্পাদক হলেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর; কিন্তু কার্যত সম্পাদনার সকল দায়িত্ব হাতে নিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে। সাধনা পত্রিকার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা চাইলেন রবীন্দ্রনাথ। ঠাকুরবাড়ির দুটি কাগজ চলেছে একই সঙ্গে—পুরাতন ভারতী ও নূতন সাধনা। সুরেশ সমাজপতির সাহিত্য বেরিয়েছে সাধনার আগের বছর। বঙ্কিমের কাছে লেখার জন্য হাত পেতেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী রবীন্দ্রনাথ ও সুরেশ সমাজপতি। স্বর্ণকুমারী প্রায়ই আসেন বঙ্কিমের বাড়িতে। চাটুজ্যে পরিবারের সঙ্গেই স্বর্ণকুমারী ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও সাধনা

সরলা দেবীকে বঙ্কিম নিজের এক সেট বই উপহার দিয়েছিলেন—বঙ্কিম পেয়েছিলেন এক গুচ্ছ গোলাপ কুসুম।

খাতা নিয়ে বঙ্কিমের কাছে উপস্থিত হন। সুরেশ সমাজপতি সাহিত্যের জন্য লেখা চাইলে বঙ্কিম বলেন, "আমি যে তোমায় কাগজে কিছু দিতে পারিতেছি না, তাহার কারণ আছে। অন্তত চারিটি প্রবন্ধ না লিখিলে হয় না। তা পারিয়া উঠিতেছি না।" সুরেশচন্দ্র বলেন, "একটাই দিন না।" বঙ্কিম বললেন, "শুধু তোমাকে একটা দিলে তো চলিবে না। স্বর্ণকুমারী আসেন; আমার নাতিদের কত খেলনা দিয়া গিয়াছেন। আমি ত সব বুঝি। তাঁহার ভারতী আছে। রবি আসেন; জানো ত, প্রচারের সময় এক পালা হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সাধনা আছে। তুমি আছ, তোমার সাহিত্য আছে।" সাধনা পত্রিকাতেও বঙ্কিম শেষ পর্যন্ত কিছু লিখে উঠতে পারেন নি।

স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কন্যা সরলা দেবীর সঙ্গেও বঙ্কিমের আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। সরলা দেবীর তখন আঠারো উনিশ বছর বয়স। ভারতীতে লেখালেখি শুরু করেছেন। সরলা দেবী লিখছেন, "তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ সংস্পর্শ আনলে আমার লেখা পড়ে তাঁর চিঠি। সে চিঠি ত যে সে চিঠি নয়। তার দু-চারটি মাত্র সেন্টেন্স বঙ্কিমেরই সেন্টেন্স বটে! ভারতীতে আমার আঠার উনিশ বৎসরের লেখা 'রতিবিলাপ' ও 'মালবিকাগ্নিমিত্র' পড়ে তাঁর লেখা চিঠি। সে চিঠি সাহিত্য দায়রায় দণ্ডায়মান একজন নবীনের উপর তাঁর রায়—বা তাকে দুই বাহু বাড়িয়ে আদর করে নেওয়া। যদিও রবিমামার চিঠিতে তাঁরও appreciation ব্যক্ত হয়েছিল, কিন্তু তাঁর চেয়েও সেদিন সাহিত্যসম্রাট ও সাহিত্যের ন্যায়াধীশ বঙ্কিমের রায়ে নিজেকে বেশি চরিতার্থ মনে করলুম।....বঙ্কিমের চিঠির সাথী হয়ে এসেছিল সেদিন তাঁর নিজের এক সেট বই উপহার—অপ্রত্যাশিত স্নেহ-নিদর্শন। তাঁর হস্তলিপিযুক্ত সে বইগুলিও রাখতে পারিনি শেষ পর্যন্ত।....চিঠি ও বই উপহারের পর তিনি আমন্ত্রিত হয়ে এলেন একদিন আমাদের বাড়িতে। মানুষ বঙ্কিমের সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ আরম্ভ হল। মনে পড়ে তিনি চা-ভক্ত ছিলেন, আর আমার পিতা ছিলেন চায়ের একজন মর্মজ্ঞ। আমাদের বাঘিডর চা বঙ্কিমের সুস্বাদু বোধ হল। তার পরদিন সেই চায়ের এক প্যাকেট এক গোছা গোলাপ ফুলের সঙ্গে তাঁর কাছে উপঢৌকন গেল। কোথায় বঙ্কিমের এক সেট বই—আর কোথায় দার্জিলিংয়ের এক প্যাকেট চা। কিন্তু দুইয়েরই পশ্চাতে প্রেরক ছিল যে দুটি ভাব—স্নেহ ও ভক্তি—তারা বোধ হয় সমানই অমূল্য। তিনি সেদিন আমায় ফরমাস করে গিয়েছিলেন তাঁর সাধের তরণী গানটিতে সুর বসাতে। থিয়েটারে দেওয়া সুর তাঁর পছন্দ হয়নি বললেন। সেটা শুনতে এলেন আর একদিন—শুনে খুব খুশি হয়ে গেলেন। বঙ্কিমের ফরমাসী এই গানের স্বরলিপি 'শতগান' গ্রন্থে দেওয়া আছে। তারপরে আমাদের—আমার মাকে ও আমাকে—দিদি তখন বিয়ে হয়ে নিজের বাড়িতে থাকেন—নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ি একদিন। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হল। বঙ্কিমের স্ত্রীর সহিত বা তাঁর সম্পর্কীয় কথাবার্তায় একটি সুন্দর প্রীতিময় হাসিকৌতুকের ঢেউ খেলিয়া যেত। আমরা যেন তাঁর নভেলেরই একটা দৃশ্যের মধ্যে পড়ে যেতুম।"

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ বৌঠানের সঙ্গে নির্জন দুপুরে বঙ্গদর্শন পড়েছিলেন—পড়েছিলেন নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনীর প্রেমের কাহিনী বিষবৃক্ষ; অপর দিকে জীবনসায়াহ্নে মাসে মাসে বঙ্কিমের হাতে এসে পৌঁছায় রবীন্দ্রনাথের পত্রিকা সাধনা। এই সাধনায় ১২৯৯ পৌষ (১৮৯২-৯৩ খ্রীঃ) সংখ্যায় প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের'। বঙ্কিম সাধনায় প্রবন্ধটি পড়ে অত্যন্ত খুশি হয়ে প্রবন্ধকারকে লিখলেন "পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার

বঙ্কিমের তিরোধানের পর স্টার থিয়েটার হলে শোক-প্রস্তাব পাঠ করেন রবীন্দ্রনাথ।

সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম, এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।" বঙ্কিমের পত্রের এই অংশ সাধনার পৌষ সংখ্যার প্রসঙ্গ-কথা বিভাগে উদ্ধৃত হয়।

সাধনায় ১৩০০ বঙ্গাব্দের (১৮৯৩ খ্রীঃ) আশ্বিন-কার্তিক যুক্ত-সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধ বেরলো। সাধনায় প্রকাশের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটি চৈতন্য লাইব্রেরিতে পাঠ করেন। সেদিন সভামঞ্চে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের অনুরোধেই বঙ্কিমচন্দ্র এই পাব্লিক সভায় সভাপতি হতে সম্মত হয়েছিলেন। একই মঞ্চে চন্দ্র সূর্য—বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ! সভায় পাঠের পূর্বে একদিন রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে এই প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ শুনিয়ে এসেছিলেন। বঙ্কিম প্রবন্ধটি শুনে সপ্রশংস অভিমত প্রকাশ করেন ও সভামঞ্চে সভাপতির আসনে বসতে সম্মত হন।

চৈতন্য লাইব্রেরিতে প্রবন্ধ পাঠের কয়েক দিন পর ১৮৯৩ সেপ্টেম্বরে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে লিখছেন, "বক্তৃতার খবরটা পেয়েছ দেখছি। চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদকের অবিশ্রাম উত্তেজনায় এই অসমসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম, নইলে পাব্লিকের কাছে ঘেঁষতে আমার আর বড় ইচ্ছে করে না। আমার খুব ইচ্ছা ছিল বক্তৃতাটা তোমাদের একবার শুনিয়ে নিয়ে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করতে। কিন্তু সে সময় কলকাতায় তোমরা কেউ উপস্থিত ছিলে না। ....একবার কেবল বঙ্কিমবাবুকে শোনাতে হয়েছিল তাঁর প্রশংসাবাক্যে অনেকটা নিরুদ্বিগ্ন হয়েছিলুম।"

সাধনায় ১৩০০ চৈত্র (১৮৯৪ খ্রীঃ) সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের রাজসিংহ উপন্যাসের দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন। পত্রিকা বেরলো কিন্তু বঙ্কিম এ সংখ্যা আর দেখে যাবার অবকাশ পেলেন না। প্রায় এক মাস রোগযন্ত্রণা ভোগ করার পর সাহিত্য-সম্রাটের তিরোধান ঘটলো ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৬ চৈত্র, ১৮৯৪-এর ৮ এপ্রিল।

তাঁর মৃত্যুর পর স্টার থিয়েটার হলে চৈতন্য লাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক মহামূল্য প্রবন্ধখানি পাঠ করে সাহিত্য-সম্রাটের প্রতি তাঁর অন্তরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ১৩০১ বৈশাখের সাধনায় রচনাটি ছাপা হয়। যে-সাধনায় বঙ্কিমের নিজের লেখার কথা ছিল সেই সাধনায় তাঁর উদ্দেশে শোকপ্রস্তাব প্রকাশ করতে হল রবীন্দ্রনাথকে।

বঙ্কিমের তিরোধান প্রসঙ্গে সরলা দেবীর মন্তব্য, "যেদিন বঙ্কিমের মৃত্যু সংবাদ হঠাৎ কানে এল—মনে হল আমারই জীবনের একাংশ খসে গেল।"

# অনাত্মীয় হাওয়া

**কৃষ্ণা বসু**

হু হু করে মুখে এসে ঝাপটা মারছে অনাত্মীয় হাওয়া
'তুই কে ?' 'তুই কে ?'—বলে চিৎকার করে নোখে দাঁতে
ফালা ফালা করে দিচ্ছে মুখ, সুষমা-চিবুক
আর কপালের আলো,—
চাবকাচ্ছে, ঠা ঠা হাসছে, লম্পটের মতো এই উতলা বাতাস।
একটা দুটো তিনটে করে কিছু ফুল ফলেছিল
ব্যক্তিগত বেদনার নীলবর্ণ স্থলে। 'অবান্তর' 'কিসের দরকার'—বলে
ছিঁড়ে ফেলছে এই উন্মাদ বাতাস তাদের—

অলৌকিক সম্মোহন ছিল পূর্বগামী জ্যোৎস্নার ভিতর,
লোকাল ট্রেনের থেকে দূর মাঠে কৃষ্ণচূড়ার ছিল সাংকেতিক ডাক,
লাল হয়ে যাওয়া পুরোনো চিঠির মতো
সেই সব স্বপ্নবীজ ছেঁড়া খোঁড়া ডাস্টবীনে গেছে,
সাদা নীরক্ত হাওয়া এসে জেনে গেছে এইসব ;
চুপি চুপি দরোজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনে গেছে
ব্যক্তিগত চাপা কান্না গোঙানীর স্বর, চতুর সে আড়ালে রয়েছে ;
দরজা খুলে বেরোলেই
'কেন এলি ?' 'কেন এলি ?'—এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে বিঁধছে আমায়,

হু হু করে মুখে এসে ঝাপটা মারছে অনাত্মীয় হাওয়া।

# জাল গোটানোর আগে

**প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত**

জাল গোটানোর আগে, সমুদ্রের দিকে আমি
একবার চকিতে তাকাই।
চাঁদ গুঁড়ো হ'য়ে আছে, ঢেউ তাই আর্তনাদ করে।
আর কিছুক্ষণ পরে বাড়ি যাবো, আর কিছুক্ষণ
আমি এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবো সমুদ্রের ঠিক মুখোমুখি।

এখন বাড়িতে ঢের কাজ আছে ; জাল তুলে
আমি ঘরে যাবো।
তবু যেখানে পেতেছি জাল, সেই অনন্ত জলের কাছে
জ্যোছনায় দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে মায়া আছে।
বলো, মায়া নেই ?
কব্জির ওজনে আমি টের পাই, জাল আজ
পূর্ণ হ'য়ে আছে।

রাত পাখি উড়ে যায় ; চাঁদ ডোবে, চাঁদ ভেসে ওঠে।

# জলছবি

**নিজন দে চৌধুরী**

কিছুই থাকে না, শুধু স্মৃতি থাকে জলে ও আঁধারে।
এয়োতী বলয়, শঙ্খ-কঙ্কণের অলীক স্মৃতি
বুকের ছলাৎ শব্দে সিঁদুর-মোছানো জলছায়া
তরঙ্গে তরঙ্গে শুধু লিখে রাখে ভুল সপ্তপদী।

কিছুই থাকে না, এই অশ্বত্থের প্রাজ্ঞ পাদমূলে
মঙ্গল-সূত্রের গ্রন্থি ছিঁড়ে যায় হাওয়ায় হাওয়ায় ;
পড়ে থাকে শুধু শঙ্খ-কঙ্কণের অলীক স্মৃতি,
দীঘিপাড়ে দিন যায়, জল-ছবি ধরে রাখে ঘাট।
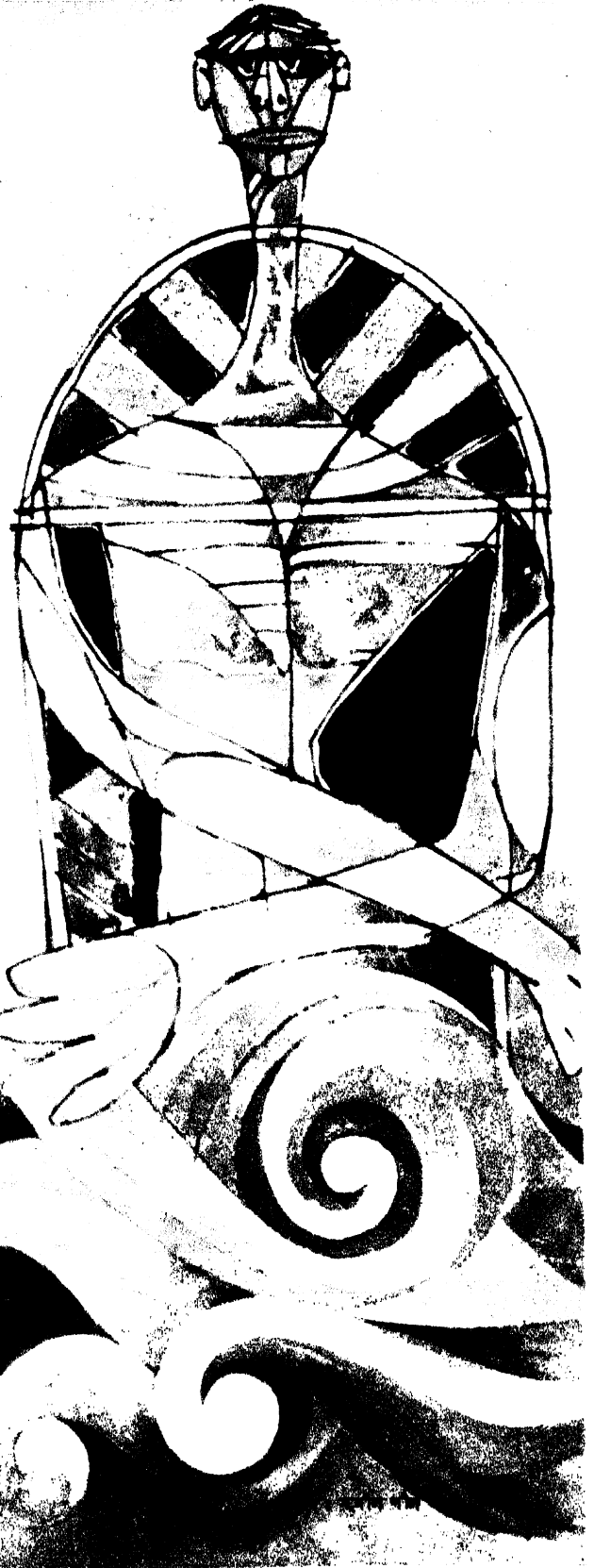
এক ৭০:৩০ পলিয়েস্টার- উল উরস্টেড স্যুটিং সম্বন্ধে
নতুন করে কিছুই বলার নেই!
কিন্তু আমাদের সৃষ্ট স্যুটিং অনেক নতুন কথাই জানান দিচ্ছে।

না। গ্রন্থ-বিষয় কোনো প্রসঙ্গ ওঠালেই, ওমা, সে কি দিয়ে কাজ সারে।

খাওয়া শেষ করে হাত-মুখ প্রক্ষালন করে এসে গঙ্গানারায়ণ কুসুমকুমারীর বইটি খুলে বসলে। কুসুমকুমারী আহার সেরে এসে ফিরে এলে সে বললো, তুমি তো অনেকখানি পড়ে ফেলেচো! কেমন লাগচে?

কুসুমকুমারী উৎফুল্ল মুখে বললো, ভারি ভালো, একবার ধরলে আর ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

—তুমি সব বুঝতে পারো? তোমার কোনো-খানে খটোমটো লাগে না?

—একটুও না। মাঝে মধ্যে একটা দুটো কতার মানে জানি না বটে তবু সব বুঝতে পারি। আমি আগে কাশীদাসী পড়িচিলুম, কিন্তু তার সঙ্গে কত তফাং।

—সত্যি আমাদের ছোটকু এই একটা মস্ত বড় কাজ কচ্চে। কতই বা বয়েস ওর। আমারি চেয়ে অন্তত তের-চোদ্দ বছরের ছোট, এই বয়েসেই গোটা মহাভারত অনুবাদের কাজ হাতে নেওয়া........কেমন সুন্দর ভাষা ....আমাদের এই বংশে ছোটকু একটা প্রতিভা। ওর সঙ্গে তোমার ভালো করে আলাপ পরিচয় হয়েছে?

নীল চক্ষু দুটি স্থিরভাবে মেলে, ওষ্ঠাধরে সামান্য হাসি মেখে, আস্তে আস্তে মাথা দুলিয়ে কুসুমকুমারী বলে, না। তবে আগে দেকিচি আমার মিতেনীর বর হিসেবে—

গঙ্গানারায়ণ বললো, ও খুব ব্যস্ত, তবে আলাপ-পরিচয় তো হবেই তখন দেকো, ও কেমন পাগল! সব সময় বড় কোনো কাজের চিন্তা ওর মাতার মধ্যে টগবগ করে ফোটে।

মহাভারতের মোট তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এ পর্যন্ত তা কয়েকদিনের মধ্যেই কুসুমকুমারীর পড়া হয়ে যায়। আরও পড়বার জন্য সে ছটফট করে। এ বাড়িতে এসে অফুরন্ত অবসরের মধ্যে তার বই পড়ার নেশা অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু অত বাংলা বই সে পাবেই বা কোথায়!

এক রাতে গঙ্গানারায়ণ ফিরলে কুসুমকুমারী জিজ্ঞেস করে, আপনাকে একটা কতা বলবো? আপনি রাগ করবেন না?

গঙ্গানারায়ণ অবাক হয়ে বলে, কী কতা? তোমার ওপর রাগ করবো কেন, কুসুম? তোমার ওপর রাগ কত্তে পারে এমন পাষণ্ড কেউ আচে?

আপনি সারাদিন খেটেখুটে আসেন, তাই বলতে সাহস পাই না। এক একদিন একটু তাড়া-তাড়ি এসে আমায় একটু পড়াবেন? আমি তো সংস্কৃত পড়তে পারি না, যদি আমায় পড়ে পড়ে বুঝিয়ে দেন।

গঙ্গানারায়ণের শরীরে অকস্মাৎ রোমাঞ্চ হয়। স্বপ্নে দেখা বিন্দুবাসিনীর কথা মনে পড়ে। বিন্দুবাসিনী অভিমান করে বলে ছিল, তুই আমায় মেঘদূত পড়াবি বলিচিলি, পড়ালি না তো, গঙ্গা! এ যেন অবিকল সেই কণ্ঠস্বর!

গঙ্গানারায়ণ একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপর আপন মনে বলতে শুরু করে: কশ্চিৎ কান্তাবিরহ-গুরুণা / স্বাধিকারপ্রমত্তঃ / শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্তুঃ ....তারপর ষষ্ঠ শ্লোকের শেষে যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা........এই পর্যন্ত বলে সে থামে। শ্লোক বলতে বলতে গঙ্গানারায়ণ যেন অন্য কোথাও চলে গিয়েছিল, সেখান থেকে আবার ফিরে আসে। তারপর বললো, আমার অনেক কাল থেকেই ইচ্ছে, কারুকে মেঘদূত পড়ে শোনাই........তুমি আজ বললে, এসো, কুসুম, আমার পাশে এসে বসো, তোমায় আমি মেঘদূত পড়াবো।

কুসুমকুমারী বললো, মেঘদূত কী? এ বইয়ের নাম তো শুনিনি কখনো। আমার খুব ইচ্ছে করে শকুন্তলা বইটা পড়বার—।

গঙ্গানারায়ণ একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, শকুন্তলা? হঠাৎ শকুন্তলা পড়বার জন্য ইচ্ছে হলো না কেন? মেঘদূত পছন্দ নয়?

কুসুমকুমারী হেসে বললো, আমি কি ছাই কোনোটাই জানি! ছেলেবেলায় আমার দাদাদের গোঁসাই মশাইয়ের মুখে শকুন্তলার গপ্পোটা শুনিচিলুম, তাও পুরোটা নয়....সেই গপ্পোটা জানতে ইচ্ছে করে। মেঘদূতের তো আমি নামই জানি না!

একটু থেমে থেকে গঙ্গানারায়ণ বললো, তবু প্রথমে মেঘদূতটাই শোনো। শকুন্তলার কতা পরে একদিন বলা যাবে।

মেঘদূত গঙ্গানারায়ণের আগাগোড়া কণ্ঠস্থ। তার বই লাগে না। ফুঁ দিয়ে সে সেজবাতিটা নিবিয়ে দিলে তৎক্ষণাৎ এক ঝলক জ্যোৎস্না এসে পড়ে ঘরের মধ্যে। কুসুমকুমারীর হাত ধরে সে নিয়ে আসে গবাক্ষের ধারে। শরৎকাল, এ সময় আকাশে কাশফুল বর্ণের লঘু মেঘ ভেসে বেড়ায়। সেই রকম একখণ্ড মেঘ দেখিয়ে গঙ্গানারায়ণ বললো, ঐ দ্যাকো মেঘদূত যাচ্ছে....তুমি মহাভারতে নল দময়ন্তীর গপ্প পড়েছো? একটি হংস হয়েছিল ওদের দূত....তেমনি রামগিরি পাহাড়ে এক নির্বাসিত যক্ষ সুদূর অলকায় তার প্রিয়াকে একটি বার্তা

পাঠানোর জন্য একখণ্ড মেঘকে দূত হিসেবে নিয়োগ করেছিল।

কুসুমকুমারী জিজ্ঞেস করলো, রামগিরি কোথায়?

গঙ্গানারায়ণ বললো, তোমার মতন সকলেরই এ প্রশ্ন মনে আসবে বলে কবি কালিদাস প্রথম শ্লোকেই সে কথা জানিয়ে দিয়েছেন........জনকতনয়াস্নান-পুণ্যোদকেষু / স্নিগ্ধছায়াতরুষু বসতিং ....জনক-তনয়া মানে সীতা বনবাসের সময় রাম আর সীতা এই রামগিরিতে ছিলেন কিছুদিন, এখনকার জলে সীতা স্নান করেছিলেন বলে তাঁর অঙ্গ-স্পর্শে জল পবিত্র ....এইখানেই সেই যক্ষ।

—ঐ যক্ষের নাম কী?

—এটাই আর একটা মজা। কালিদাস তাঁর এই কাব্যের নায়কের কোনো নাম দেননি। অর্থাৎ এ যেন জগতের সমস্ত বিরহী মানুষেরই মনের কথা। ধরো, আমি যদি কোনোদিন থেকে দূরে চলে যাই, আমার যদি কেউ নির্বাসন দেয়, তখন আমিও তোমার কতা ভেবে এমনভাবেই বিলাপ করবো।

—তারপর বলুন।

—আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্ট সানুং সেই অভিশপ্ত যক্ষ আট মাস নির্বাসনে কাটিয়েছে, দুঃখে-বিরহে রোগা হয়ে গ্যাচে সে, হাত থেকে বলয় খসে পড়ে যায়.... এরই মধ্যে এলো আষাঢ় মাসের প্রথম দিন, যক্ষ দেখলে পর্বতের সানুদেশ আলিঙ্গন করে আচে একখণ্ড মেঘ, তার যেন মনে হলো এক পরিণত গজ বপ্রক্রীড়া কচ্চে, অর্থাৎ এক খ্যাপা হাতি মেতে উঠেচে ভূমিখননের খেলায়........ কী অপূর্ব সেই দৃশ্য! তখন সে মেঘকে ডেকে বললো........

—মেঘ কি মানুষের কতা শুনতে পায়?

—ঠিক মতো আকুতি দিয়ে ডাকলে নিশ্চয়ই শুনতে পাবে, যেমন এই যক্ষের ডাক শুনেছেল.... তা ছাড়া কবিও বলে দিয়েচেন, যারা কামার্ত, চেতন-অচেতনের প্রভেদ বোঝা তাদের কাচে আশা করা যায় না...

বেশ কয়েকটি শ্লোক শোনবার পর কুসুমকুমারী বললো, ছাতে যাবেন?

গঙ্গানারায়ণ আবিষ্ট হয়ে পড়েছিল। থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ছাতে? কেন! তোমার ভালো লাগচে না?

কুসুমকুমারী গঙ্গানারায়ণের বাহুতে গণ্ড ছুঁইয়ে বললো, ভীষণ ভালো লাগচে, এমন আমি কখনো শুনিনি, আপনি যদি এখন থেমে যান আমি মরে যাবো....চলুন ছাতে যাই, সেখেনে খোলা আকাশ, মাতার ওপর দিয়ে মেঘ উড়ে যাবে সেখেনে বসে শুনতে আরও বেশী ভালো লাগবে।

রাত্রি নিশুতি, সারা বাড়ি নিস্তব্ধ, সকলেরই ঘুমন্ত। খুব সন্তর্পণে শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো কুসুমকুমারী আর গঙ্গানারায়ণ। পা টিপে টিপে উঠে এলো ওপরের সিঁড়ি দিয়ে। যাতে কোনো শব্দ না হয় এমন সাবধানে খুললো দরজা। শরৎকালীন আকাশ থেকে অল্প অল্প শিশিরপাত হচ্ছে, ছাদ ঈষৎ ভিজে ভিজে, কিন্তু তা ওরা গ্রাহ্য করলো না। ছাদে কতকগুলি বৃহৎ মাটির জালায় জল ভরা থাকে, সেরকম একটা জালায় পিঠের ভর দিয়ে পাশাপাশি বসলো ওরা দুজনে। আজকের রাত্রিটিও বড় উপযুক্ত, কোমল, মিহিন সু-পবন বইছে। চোখ আকাশের দিকে তুলে তন্গতভাবে গঙ্গানারায়ণ বললো, কোথাও নদীর তীরে তীরে চাঁপা ফুল ফুটে উঠেচে....কোথাও দাবাগ্নিতে বন পুড়ে গিয়েছিল, হে মেঘ, তোমার বর্ষণে সেখানকার মাটি থেকে মধুর গন্ধ উঠচে। আর সেই গল্প শুনতে শুনতে হঠাৎ যেন ছিল হারিয়ে...।

সম্পূর্ণ পূর্বমেঘ সমাপ্ত করে গঙ্গানারায়ণ চুপ করলো।

কুসুমকুমারী বললো, থামলেন কেন?

গঙ্গানারায়ণ বললো, আজ এই পর্যন্ত থাক। উত্তরমেঘ তোমায় কাল শোনাবো। খুব ভালো জিনিস একদিনে বেশী গ্রহণ কত্তে নেই....যেমন ধরো মধু, এক সঙ্গে যদি বেশী গ্রাস করো, কষ্ট হবে।

—আমার কিন্তু এখন ছাত থেকে যেতে ইচ্ছে কচ্চে না।

—এসো, এখানেই বসে থাকি।

—যদি সারা রাত থাকতে চাই, থাকবেন?

—পাগল মেয়ে, তুমি যদি থাকতে পারো, আমি পারবো না?

—আমার ভীষণ ভালো লাগচে, এত ভালো, যেন কষ্ট হচ্ছে বুকের মধ্যে, এমন সুন্দর দিন আমার জীবনে কখনো আসেনি। দেখুন আকাশের দিকে, মনে হচ্চে না চাঁদ যেন ঠিক আমাদের দুজনকেই দেকচে?

—আমাদের দুজনকে নয়, শুধু তোমাকে। চাঁদ তোমায় হিংসে কচ্চে!

—তা তো হিংসে হতেই পারে। চাঁদ বড় একা।

বেশ কিছুক্ষণ ওরা চুপ করে বসে রইলো এরপর। জাগ্রৎ মানুষের মন কখনো থেমে থাকে না, ওদের চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হতে লাগলো দুদিকে।

এক সময় গঙ্গানারায়ণ পাশ ফিরে জিজ্ঞেস করলো, কুসুম, তুমি একটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারো? এই যে মানুষের জীবন এর উদ্দেশ্য কী?

কুসুমকুমারী বললো, জানি না তো, কখনো ভাবিও নি।

গঙ্গানারায়ণ বললো, এই কতাটা আমার এখন প্রায়ই মনে হয়। এই জগৎ সংসারের একজন পরম পিতা আচেন, একদিন তাঁর পায়ের কাচে যখন যাবো, তিনি শুধোবেন, মানুষের জীবন পেয়েছিলে, সে জীবন চরিতার্থ করে এসেচো তো? তখন কি উত্তর দোবো?

—আমি সামান্য মেয়ে আপনি আমাকে এ কথা জিজ্ঞেস কচ্চেন?

—তুমি সামান্য হবে কেন, কুসুম। তোমারও মন আচে—।

—জীবনের উদ্দেশ্য কী তা আমি জানি না। আসুন আজ থেকে আমরা দুজনে মিলে খুঁজি.... এর উত্তর খোঁজবার জন্য আপনি একলা একলা আমায় ছেড়ে কোতাও চলে যাবেন না কতা দিন! প্রশ্নটা শুনে প্রথমটায় কেমন যেন ভয় করে উঠলো. কিন্তু আর ভয় পাবো না, আমিও খুঁজবো আমায় সাহায্য করবেন, বলুন?

—কতা দিলুম, কুসুম।

কুসুমকুমারী গঙ্গানারায়ণের পায়ে হাত রাখলো। সেই মৃদু জ্যোৎস্নালোকে গঙ্গানারায়ণ দেখলো এই নীলনয়না, স্নিগ্ধ, কোমল, কুমুদিনীর মতন মুখের মেয়েটি বিন্দুবাসিনী নয়, এ অন্য নারী, এর নিজস্ব চরিত্রপ্রভায় আর অন্য কারুর কথা মনে পড়ায় না।

গঙ্গানারায়ণ উঠে দাঁড়াতেই কুসুমকুমারী বললো, আপনি চলে যাচ্চেন? এই যে বললেন—

গঙ্গানারায়ণ দু' হাত বাড়িয়ে বললো, এসো—।

কুসুমকুমারীরও উঠে দাঁড়ালো এবং গঙ্গানারায়ণের আহ্বানে বক্ষলগ্না হলো। গঙ্গানারায়ণ তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে সিঁড়ির দিকে এগোতে এগোতে বললো, জীবনের উদ্দেশ্য যাই হোক, মানুষের একাকিত্ব বড় সাংঘাতিক। আমি অনেকদিন বড় একা ছিলুম গো, কুসুম, এখন থেকে তুমি আমার সেই শূন্যতা সম্পূর্ণ ভরিয়ে দাও।

(ক্রমশ)

গভীর অরণ্যের বামন-প্রহরী....
অরণ্যদেব আসছেন!

কীরে গুগ্রা?
রাজা! টম!

গভীর অরণ্যের গোপন প্রবেশ-পথ।
এসে গেছি

ডায়ানা, ওঁরা ফিরছেন!
!

ডায়ানা!
এসো!

বাস রে, কত বড় হয়ে গেছে এরা!
মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই?
9/23

অরণ্যের আলিপিকে দারুণ মজা হল... দেখেছ, আমাকে চিনতে পেরেছে!
কিন্তু মেয়েটার নাম কী হবে? কিছু ঠিক করেছ?

হ্যাঁ। আশা করি তোমার পছন্দ হবে।
কী নাম?
কী নাম?
ক্রমশ ● ৩

# মানবজমিন

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

(উপন্যাস)

ফেয়ারলি প্লেসে ক্লার্কদের সঙ্গে হাতাহাতি করে, লাইন ম্যানেজ করে এবং বুকিং ক্লার্কদের সঙ্গে বিস্তর অর্থহীন কথা বলে সরিৎ এলাহাবাদের তিনটে সেকেন্ড ক্লাস স্লিপারের টিকিট কেটে ফেলল। ঝাড়া ঘন্টা চারেকের চেষ্টায়।

বেরিয়ে এসে টিকিটগুলোর দিকে চেয়ে চুক-চুক করে একটু আফসোসের শব্দ করল। একেবারে ফালতু গচ্চা। এলাহাবাদ পর্যন্ত অনায়াসে বিনা-টিকিটে যাওয়া যেত, খরচ লাগত অর্ধেকের কম। কিন্তু সেজদিকে সেকথা বলাই যায় না।

শেষ বেলায় বাড়িতে ফিরে বিজয়ীর মতো হেসে সেজদির হাতে টিকিট দিয়ে বলল, ব্ল্যাকে কাটতে হয়নি। লাইনেই পেয়ে গেলাম।

তৃষা কোনো জবাব দিল না। থমথমে গম্ভীর-মুখে টিকিটগুলো নিয়ে ঘরের আলমারিতে রেখে এল। বলল সজলকে একটু ডেকে দিয়ে যাস তো। বোধ হয় পুরোনো গোয়ালঘরটায় আছে।

সরিৎ গিয়ে দেখে, মস্ত বালির বস্তায় হাতে ন্যাকড়া জড়িয়ে ঘুরে ঘুরে ঘুষি চালাচ্ছে সজল। মুখ রক্তবর্ণ, সর্বাঙ্গে জবজবে ঘাম।

অবাক সরিৎ বলে, কি করছিস? বক্সিং?

সজল গম্ভীর মুখে বলে, হ্যাঁ।

কে শেখায় তোকে?

কেউ না। নিজে শিখছি।

সরিৎ নিজের কাজকর্ম এবং ভবিষ্যৎ তৈরি করতে ইদানীং এতই ব্যস্ত ছিল যে, সজলকে ভাল করে লক্ষই করেনি। আজ করল। এবং একটু অবাক হল।

তুই কত ফুট লম্বা রে?

পাঁচ নয়।

সজলের উচ্চতা ও রকমই হবে। বেশী ছাড়া কম নয়। তবে আরও লম্বা হবে। অনেক লম্বা। সরিতের নিজের হাইট মাত্র পাঁচ আট। কিন্তু সে আর বাড়বে না। শুধু লম্বাই নয়, সজলের কাঠামোটা আশ্চর্য রকমের মজবুত। কব্জি দু'খানা চওড়া, হাত দু'খানা যেমন লম্বা তেমনি দ্রুতগতি-সম্পন্ন। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এবং সব চেয়ে গুরুতর ব্যাপার হল, সজলের দু'খানা চোখ।

বহুকাল বাদে হঠাৎ একটা অজানা ভয়ে বুকটা সামান্য কেঁপে উঠল সরিতের। এ ছেলেকে সামলানো মুশকিল হবে। এর ওপর আধিপত্য করা যাবে না কখনো। এ সব সরিৎ এক নজরেই বোঝে।

সে তবু মুখে হাসি টেনে এনে বলে, খুব তিনঠ্যাঙা লম্বা হয়েছিস তো।

সজল ঘুষি থামিয়ে ঘরের বেড়ায় গোঁজা একটা টার্কিশ তোয়ালে দিয়ে ঘাম মোছে।

সরিৎ মস্ত বস্তাটায় হালকা দু-একটি ঘুষি মেরেই বুঝতে পারে, এই ভারী কর্কশ বালিতে ঠাসা হয়ে ওঠা বস্তায় এক নাগাড়ে ঘুষি মারা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কব্জি ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, লিগামেন্ট ছিঁড়তে পারে।

সরিৎ ডান হাতটা বাড়িয়ে বলল, তোর পাঞ্জায় কেমন জোর হয়েছে!

সজল একটু হাসল, তারপর হাত বাড়িয়ে সরিতের চেয়ে অন্তত দেড়গুণ বড় থাবায় চেপে ধরল হাতখানা।

সরিৎ বিস্তর মারপিট করে হাড্ডি পাকিয়ে ফেলেছে। তার হাতে ব্যথা লাগে না, তবু হাত-খানা ধরে সে বুঝতে পারল, সজলের গায়ে জোর যে তার চেয়ে বেশী তাই নয়। বহু বহুগুণ বেশী। সরিৎ না হয়ে অন্য কেউ হলে সজলের আঙুলের চাপে ককিয়ে উঠত। সরিৎ ককিয়ে উঠল না, কিন্তু আবার এক অজানা ভয়ে খানিকটা বিবর্ণ হয়ে গেল।

সজলের পিঠ চাপড়ে সরিৎ বলে, ভাল তৈরি হয়েছিস। খুব ভাল। তোকে কয়েকটা শক্ত কায়দা শিখিয়ে দেবো। কালিমপং-এর একজন ব্রাউন বেল্টের কাছ থেকে শেখা।

সজল খুব উৎসাহ দেখাল না। উদাস মুখে বলল, দিও।

এখন যা। তোকে সেজদি ডাকছে।

গায়ে গেঞ্জী ছিলই। বেড়ার গা থেকে জামাটা টেনে গায়ে চড়াল সজল। বলল, তুমি এগোও। যাচ্ছি।

চিন্তিত মুখে সরিৎ গিয়ে তার মোপেড চালিয়ে বাজারে গেল। রয়ীতে নতুন মাল এসেছে। দাম ফেলতে হবে।

জামার ওপর হাতকাটা সোয়েটার চাপিয়ে সজল এসে মায়ের ঘরের সামনে দাঁড়ায়।

তৃষা বেরিয়ে আসে।

শেষ বেলার শীতের ম্লান রোদ পড়েছে সজলের মুখে। মুখের ঘাম সবটা মরেনি এখনো। লম্বা, সারবান চেহারা। চোখের দৃষ্টি এই বয়সেই যথেষ্ট স্থির এবং গভীর। নির্ভুল একজনের ছাপ পড়েছে সজলের চেহারায়। কিন্তু সেই লোকটিকেও দিনেকালে এ ছেলে ছাড়িয়ে যাবে। তৃষা কিছুতেই আজকাল ছেলের সামনে সহজ বোধ করে না। কেমন অস্বস্তি হয়।

ডেকেছো?

তৃষা গম্ভীর মুখে বলে, সামনের সপ্তাহে আমরা এলাহাবাদ যাচ্ছি।

আমরা মানে

আমি, তুই আর সরিৎ।

আমি গিয়ে কি করব? ইস্কুল কামাই হবে না?

মামী তোকে দেখতে চেয়েছে। আমরা বেশী দিন থাকব না।

সামনেই অ্যানুয়াল পরীক্ষা। সজল ঘাড় শক্ত রেখেই জবাব দেয়।

দু-তিন দিনে কিছু হবে না।

বড়দির বিয়ের ব্যাপার, সেখানে আমাকে দিয়ে কি হবে?

কিছু হবে না। কিন্তু আমি তোমাকে একা বাড়িতে রেখে যেতে চাই না।

সজল অবাক হয়ে বলে, একা কেন? মেজদি, ছোড়দি আছে, বাবা আছে।

তাদের থাকা না-থাকা সমান। তুই কবে থেকে মুখে মুখে জবাব দিতে শিখলি?

তুমি বোকার মতো কথা বলছ বলেই জবাব দিচ্ছি।

বোকার মতো! বলে স্তম্ভিত হয়ে তৃষা চেয়ে থাকে ছেলের দিকে। এত সাহস! এত সাহস এরা কোত্থেকে পায়?

কিছুক্ষণ তৃ কথাই বলতে পারল না।

সজল অভ্যাসে একটু ভয় পেল। মা সম্পর্কে এখনো তার ভয়টা পুরোপুরি যায়নি। শক্ত কাঠামোর গম্ভীর ও আদরহীন তার এই মা তো গায়ের জোরে সবাইকে টিট করে রাখেনি। আরো একটু কিছু আছে। সেই রহস্যময় অজানা একটু কিছুকেই পেরোনো যায় না।

সজল চোখ নামিয়ে বলে, এখন আমি যেতে পারব না। তুমি মেজদি বা ছোড়দিকে নিয়ে যাও।

তৃষা কিছু বলল না। নিঃশব্দে ঘরে চলে গেল। ঘরের ঠিক মাঝখানে আবহাওয়ায় কিছুক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। রাগ হয় না, পরাজয়ের গ্লানিও বোধ করে না। শুধু এক শূন্যতা এসে তার ভিতরটাকে ফাঁকা বোধবুদ্ধিহীন করে দেয় কিছুক্ষণের জন্য।

সজল নিজের ঘরে গিয়ে জামা-প্যান্ট পাল্টায়। একটু চিন্তিত, উদ্বিগ্ন।

আগে সে মায়ের কাছে থাকত। তারপর জায়গা হল দুই দিদির ঘরে। সম্প্রতি তার একটা আলাদা ঘর হয়েছে। এ-ঘরে সে একা থাকে। ভূতের ভয় পেত আগে। এখন পায় না। আজকাল খুব কম জিনিসকেই ভয় পায় সজল।

চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে সে এলাহাবাদ যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবল। বেড়াতে যাওয়া খারাপ নয়, কিন্তু এখন তার কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। মনে হয় সে চলে গেলে বাবার বিপদ হবে।

পায়ে চটি গলিয়ে সজল ঘর থেকে বেরিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ভাবনঘরে এসে ঢোকে।

বাবা!

শ্রীনাথ বাগানের ধারের রাস্তায় বেড়াবে বলে গলায় কম্ফর্টার জড়িয়ে তৈরি হচ্ছিল। বলল, কি রে?

মা এলাহাবাদে যাচ্ছে।

জানি। চিত্রার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে।

আমাকেও নিয়ে যেতে চাইছে।

শ্রীনাথ ভালমানুষের মতো বলে, যা না। ঘুরে আয়।

আমি বলেছি, যাবো না। সামনে পরীক্ষা।

ও। তাও তো বটে। তবে তোকে নিয়ে যেতে চায় কেন?

কি জানি। মার ধারণা, এ-বাড়িতে একা থাকলে আমি বদমাইশী করব।

শ্রীনাথ মুখ বিকৃত করে বলে, বাজে কথা।

মা খুব রাগ করেছে। তুমি মাকে একটু বুঝিয়ে বলবে?

কি বলব বল তো?

বোলো, আমি চলে গেলে তোমার অসুবিধে হবে।

তাতেও তো তোর মা রেগে যাবে।

সে আমি জানি না। তুমি যেমন করেই হোক যাওয়ার ব্যাপারটা কাটিয়ে দাও।

শ্রীনাথ চিন্তিত মুখে চেয়ে থেকে বলে, আমার কথার কি কোনো দাম আছে ওর কাছে? তবু বলে দেখব।

তুমি বললেই হবে।

খুবই গম্ভীর মুখে সরিৎকে নিয়ে পরের সপ্তাহে এলাহাবাদ রওনা হয়ে গেল তৃষা। তিন দিনের নাম করে গেল, সাত দিনেও এল না বা চিঠি দিল না।

তৃষার খবরের জন্য এ-বাড়ির কেউই উদ্বিগ্ন নয়। শুধু বুড়ো দীপনাথ মাঝে মাঝে ডাক-খোঁজ

করেন, ওরে বউমার পৌঁছন সংবাদ এল? ডাকঘরে একটু খোঁজ নে না তোরা। ওরা তো কত চিঠি হারিয়ে ফেলে, বিলি করে না।

প্রায় রোজই মঞ্জু আর স্বপ্নার সঙ্গে সজলের ঝগড়া হয় আজকাল। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। বাগানে প্রায়ই গরু ঢোকে। বাড়ির গরু দুয়ে দুধ অনেক কম হয়, গ্রাহকরা রাগারাগি করে। হাঁস মুরগিদের ডিমও কম পড়ছে আজকাল। উঠোনে শুকনো পাতা পড়ে থাকে। রাত্রিবেলা তৃষার ঘরের দাওয়ার নীচে বসে ইস্পাত রাতবিরেতে কেঁদে ওঠে প্রায়ই।

এই তক্কে একদিন মালাবদল সেরে নিশুতরাতে চুপিচুপি বিনিকে এনে ঝোপড়ায় তুলে ফেলল ক্ষ্যাপা নিতাই।

পরদিন তাকে নিয়ে হইচই পড়ে গেল বাজারে। জটা নেই, টেরিকাটা মাথা। দাড়ি কামানো। প্রথমটায় লোকে চিনতেই পারেনি। গম্ভীর মুখে বাজার করছিল। একজন দুজন করে চিনে ফেলতেই ভীড়ে ভীড়াক্কার।

নিতাই ভীড় ভালবাসে। তাকে নিয়ে লোকে হইচই করুক তা ও চায়।

সে ভীড়ের দিকে হাত তুলে বরাভয় দেখিয়ে টিউবওয়েলের মাথায় উঠে দাঁড়াল। গলা ঝেড়ে বলল, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের পরিচিত নিত্যানন্দ মহারাজ এখনো নিত্যানন্দ মহারাজই আছেন। তন্ত্রসাধনা অতি গুহ্য সাধনা। এর স্বরূপ কেউ জানে না। গতকাল গুরুদেব স্বপ্নে আদেশ করলেন, ওরে নিতাই, অনেককাল ব্রহ্মচর্য হল। এবার একটু গেরস্থ হ। গৃহস্থ না হলে সংসারটাকে টের পাবি কি করে? তোর তো পনেরো আনাই হয়ে আছে, এইটে হলেই ষোলো আনা হয়....

শুনে লোকে হাততালি দিল।

পনেরো দিনের মাথায় এলাহাবাদ থেকে কাশী আর লখনউ ঘুরে তৃষা ফিরে এল। নিতাই ঝোপড়ার দরজা আর দিনমানে খুললই না সেদিন।

তৃষা ফিরে আসার পরই গরুর দুধ বেড়ে যায়, হাঁস-মুরগিরা উচিত মতো ডিম পাড়ে, উঠোন ঝকঝক করে, মঞ্জু স্বপ্না আর সজলের ঝগড়া মিটে যায়।

তবে তৃষার মুখ একটা কাঠের মুখের মতো গম্ভীর থাকে। সহজ হয় না, স্বাভাবিক হয় না।

পরদিন সকালে শ্রীনাথের ঘরে এসে তৃষা বলল, ছেলে আমার পছন্দ হয়েছে। মত দেবো?

পছন্দ হলে মত দেবে না কেন?

তোমার মতও আছে।

আমার মত বলে কিছু নেই।

কিন্তু তুমি মেয়ের বাবা, চিঠিটাও তো তোমাকেই লিখতে হবে।

আমি আজকাল লিখতে পারি না। হাত কাঁপে। তুমি লিখে দাও বয়ানটা, আমি সই করে দিচ্ছি।

ছেলেটা কেমন তা জানতে চাইলে না?

তোমার যখন পছন্দ হয়েছে তখন ভালই হবে। সংসারের এ সব ব্যাপার তুমি আমার চেয়ে অনেক ভাল বোঝো।

তৃষা চলে আসে।

ঝোপড়ার বেড়ার ফাঁক দিয়ে দুই জোড়া ভীতু চোখ লক্ষ করছিল তৃষাকে। এখনো টের পায়নি। তিনি যে এ-ঘরে আছে তা কারো জানা খবর নয়। ধরা পড়লে কী হবে তাও ভেবে ঠিক করতে পারছে না দুজনে।

তৃষাকে কেউ কিছু বলেওনি। তবু আনমনে ভিতরবাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে তৃষা একবার আলতো দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ঝোপড়ার দিকে। তাকিয়েই ভ্রূ কোঁচকাল। ঝোপড়ার উঠোনটা নিকোনো, ঘাস চাঁচা। একটা নতুন গামছা ঝুলছে দড়িতে।

ঘরে এসে সে মংলুকে ডেকে বলে, ক্ষ্যাপা নিতাইকে ধরে আন তো। আর দেখে আসবি ওর ঘরে কেউ আছে কিনা। বলেই পরমুহূর্তে আবার কী একটু ভেবে বলল, থাক এখন। বিকেলের দিকে ডেকে আনলেই হবে।

মংলু হাসিমুখে বলে, আজ্ঞে নিতাই জটা ছেঁটে ফেলেছে। দাড়িও চেঁচেছে।

তৃষা কাঠমুখেই বলল, ও। আচ্ছা যা। সজলকে বলিস, যেন ইস্কুলে যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যায়।

প্লাস পাওয়ারের চশমা চোখে পাত্রপক্ষকে দেওয়ার চিঠিটা মুসাবিদা করতে বসল তৃষা। খুব বেশীকিছু লেখার নেই। তা হলেও অনেকটা সময় নিয়ে সে নিখুঁত করল চিঠিটাকে।

মা!

তৃষা তাকায়। দরজায় সেই মানুষটার ছায়া। সারা জীবনে যে একটি মাত্র মানুষকে ভালবাসতে পেরেছিল তৃষা। কিন্তু তার এই ছায়াকে সে কেন ভালবাসার চেয়েও ভয় পায় বেশী?

মা আর ছেলে মুখোমুখি তাকিয়ে থাকে। দুজনেই আজ যেন স্পষ্ট বুঝতে পারে, আমরা পরস্পরের শত্রু। (ক্রমশ)

# স্মৃতি সততই সুখের

## প্রতিভা বসু

॥ ২১ ॥

রাত্রিবেলা হোটেলের নিয়ম অনুযায়ী যেমন তাড়াতাড়ি খাওয়া হয়ে গিয়েছিলো, তেমনি শোয়াও হয়েছিলো তাড়াতাড়ি। আর ঘুমিয়ে পড়তেও দেরি হয়নি। সারা দিন ধরে যা ঘোরাঘুরি চলছে সর্বত্র, বিছানায় গা দিলে নিদ্রা-দেবীকে আর আরাধনা করতে হয় না। পা বাড়িয়েই থাকেন, শায়িত হলেই চোখের পাতায় এসে আসন পেতে বসেন।

এমনিতে দেরিতে ঘুমোনোই আমাদের চিরাচরিত অভ্যাস। অল্প বয়সে বুদ্ধদেব রাত জেগে লিখতেন, আমি সেলাইয়ের কল নিয়ে বসতাম। স্তূপ স্তূপ সেলাই জমা হয়ে থাকতো। সকালের দিকে সময়ই পেতাম না, আর খেয়ে উঠে দুপুরে ঘুম পেয়ে যেত। শিশুকন্যাটি বড় ঘুমের ব্যাঘাত করত রাত্রিবেলা, ফলত দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রা থেকে চোখ খুলে রাখা দায় হত। কিন্তু এই সময়টা খুব ভালো। খুব নির্জন। কাজ করা যায় মন দিয়ে। তবে বারোটার ওপিঠ আমি দেখতাম না কখনো, বুদ্ধদেব শুতেন তারও অনেক পরে। তাঁরও লেখার কাজটা জমা থাকত রাত্তিরের জন্য। সকালে বেলায় ওঠার অভ্যেস, উঠেই তো ছুটফটিয়ে নেয়ে খেয়ে, কলেজে ছোটা, কলেজ থেকে যদি তাড়াতাড়ি আসতে পারতেন তা হলে তখুনি বসে যেতেন টেবিলে। যেদিন দেরি হত সেদিন আর সময় কই? বৈকালিক চায়ের পর্ব সাঙ্গ হতেই চান-টান সেরে সান্ধ্য আড্ডার জন্য প্রস্তুত। আড্ডা ভাঙতে দশটা সাড়ে দশটা, এর পর আহার। কিন্তু আহারের পরে নিদ্রা নয়। তখন ঘণ্টা তিনেক কাজ। এই নিয়ম ছিল।

বয়স হতে হতে অবশ্য রাত জাগার ব্যাপারটা অনেকখানি বর্জন করতেই হয়েছে শারীরিক কারণে, তবুও রাত জাগার প্রতি খুব আকর্ষণ বুদ্ধদেবের। সুযোগ পেলেই হল। আমিও ঘুম-কাতুরে না হবার দরুন কোনো প্রতিবন্ধকও ছিল না। লণ্ডন প্যারিসে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গেছে সে সুখ। কিন্তু এখানে তার প্রশ্ন নেই। এখানে আটটায় খেয়ে ন'টা সাড়ে ন'টাতেই ঘুম। সুতরাং, ছটাতেই ঘুম ভেঙে গেল আমার। তাকিয়েই সমুদ্র থেকে উঠে আসা সূর্যের লাল লাল রোদের গোধূলি আভা দেখে মনটা পবিত্র হয়ে গেল। সারা ঘরময় যেন ঈশ্বরের প্রতিরূপ। উঠে পড়লাম বিছানা ছেড়ে।

এমনিতেও চোখ খুললে আমি আর বিছানায় থাকতে পারি না। থাকা যায়ও না। কত কাজ থাকে বাড়িতে। এখানে একেবারেই নিষ্ক্রিয় নিরুদ্বেগ। হাঁটাহাঁটি নেই, খাটাখাটি নেই, ঘড়ির নিয়মে সব পৌঁছে যাবে হাতের কাছে, শুধু কষ্ট করে বেলটি টেপা। ইচ্ছে করছিল খুঁজে খুঁজে ওদের কিচেনে গিয়ে হাজির হই। অবশ্য তা গেলাম না, জানালায় গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম দিগন্তব্যাপী আকাশ আস্তে আস্তে লাল থেকে সাদায় রূপান্তরিত হচ্ছে, দীপ্তিতে তেজের বিকিরণ শুরু হচ্ছে, সুশীতল বাতাসে তার ছোঁয়া লেগেছে, আর জলে—

জলে তাকিয়েই আমি চমকে গেলাম। মোহনার উপরের পুলটি কোথায় গেল? এই পুল একটি অতি ব্যস্ত সেতু। সারা দিন গাড়ি মোটর স্কুটার মানুষ কত কী চলছে আর আসছে। দু দিকেই শহর, সুতরাং আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। কিন্তু এখন দেখলাম সেই পথ অন্তর্হিত। এতেই চমকে উঠেছিলাম যে, আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরিয়ে এল।

ভাঙা-ভাঙা ঘুমে বুদ্ধদেব বললেন 'কী ব্যাপার?'

'দেখে যাও—'

উঠে এলেন। নদীর মতো প্রশস্ত মোহনা অবারিত বেগে কুলকুল শব্দে বয়ে যাচ্ছে এপার ওপার মথিত করে। উপরে পুল নেই। এ কি ভোজবাজি নাকি? কাল এসে থেকে যতক্ষণ ঘরে ছিলাম স্পষ্ট তাকিয়ে দেখেছি ঐ সেতুর রাজপথ, রাজপথের লোকজন যানবাহন—সেসব কি তা হলে চোখের ভ্রান্তি? এখন জলে ভেসে ভেসে কত বড় বড় সব পাল-তোলা নৌকো যাচ্ছে, মাস্তুল-তোলা নৌকো যাচ্ছে, সবই মালবাহী সওদাগরের নৌকো, জিনিসপত্রে ঠাসা।

এই ধরনের সওদাগরী নৌকো আমি দেখেছি আমার ছেলেবেলায়। এরকমই খাল বেয়ে আসত, আমাদের ঘাটেই ভিড়ত। আসত বরিশালের গ্রাম দাসপাড়া থেকে, যেখানে আমার পিত্রালয়ের জমিদারি। সংবৎসরের খাদ্যদ্রব্য নিয়ে বোঝাই হয়ে আসত। তাতে যে কতরকমের তৈজসপত্র থাকত তার ঠিক নেই। সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস। চাল ডাল তেল নুন শুকনো লঙ্কা এলাচদানা আলুবখরা কিসমিস মনাক্কা গুড়—আর নারকোল যা আসত সে তো পাহাড়। চালের বস্তাও অবশ্য পাহাড় প্রতিমই। চালগুলো গিয়ে গোলায় ঢালত, মাটি থেকে টুই পর্যন্ত ভর্তি হয়ে যেত। তৈজসপত্র রাখত টানা লম্বা তিন ঘরের ভাঁড়ারের বারান্দায়, নারকোলগুলো জড়ো হয়ে থাকত চক-মিলানো বাড়ির মস্ত চৌকো উঠোনে। আর কাঁদি কাঁদি কলার ছড়া।

এসব জোগা-পাড়া করে জায়গামতো সাজিয়ে রাখতে হিমসিম খেয়ে যেতেন মা-কাকীমা-ঠাকুমারা। সাহায্যকারী ছিল আমাদের সব বাচ্চাদের কোলে-পিঠে করে মানুষ করা কোন্ বালক-বয়সে মজফরপুর জেলা থেকে আসা ছোত্তুম। নৌকোর আট-দশজন মাঝি তো হেঁইও হেঁইও বলে ঘাট থেকে উঠোনে এনে ফেলেই খালাস। উঠোন থেকে বারান্দায় তোলা আবার বারান্দা থেকে ঘরে তোলা সোজা কথা নয়।

আমাদের সবচেয়ে বেশী লোভ থাকত টিন টিন তেঁতুলছড়া আর ধামা-ভর্তি কিসমিসের উপর। ঐজন্যে সবার আগে তাড়াতাড়ি সে দুটো জিনিস চলে যেত ঘরে। তারই মধ্যে চুরি করে করে সেই তেঁতুল খেয়ে এক-একজনের অসুখ করে যেত। মুঠো মুঠো কিসমিস খেয়ে পেট খারাপ হত।

তেঁতুলটা অবশ্য ঘরে তুললেই যে ঘরেই আটকে থাকবে না তা আমরা জানতাম। সব গুছানো হলে সেগুলো আবার বেরিয়ে আসবে উঠোনে, চাটাই পেতে রোদ্দুরে দেওয়া হবে, শুকিয়ে বোঁজা হলে আবার কেটে কেটে তার বিচি বার করা হবে, যে বিচি দিয়ে আমরা জোড় না বিজোড় খেলব। পাহারায় বসে থাকবে আমাদের উঠোন ঝাড়ু দেওয়া বুড়ী, হাতে লাঠি থাকবে একখানা। কাক তো তাড়াতে হবে না, কেননা পাতলা একখানা পুরোনো কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকবে সে তেঁতুল। তাড়ানো হবে আমাদের। ঐজন্যই লাঠি নিয়ে বসে থাকা। বুড়ী বড় কড়া। রাগও খুব বেশী। আশেপাশে হাঁটতে দেখলেই 'কে র্যা' বলে এমন হাঁক দেবে, এক দৌড়ে সে পালিয়ে বাঁচবে। শুধুই কি তেঁতুল? কুলও তো এসেছে, তা-ও তো রোদ্দুরে পড়েছে। সুখ অনেক। অনেকরকমের।

সকালবেলাকার ঘুম-ভাঙা চোখে ঐসব নৌকোর ভিড় দেখে কত কাল বাদে মনে পড়ে গেল সেসব কথা।

বুদ্ধদেব বললেন, 'সত্যি তো, পুলটা গেল কোথায়?'

তারপরেই লক্ষ পড়ল দুই তীরে দুটি উর্ধ্বমুখী লোহার ফ্রেমের দিকে। আসলে পুলটি স্থাবির নয়। প্রয়োজনমতো এইসব বড় বড় সওদাগরী নৌকো বা মালবাহী জাহাজকে বন্দরের দিকে অথবা সমুদ্রের দিকে যেতে দেবার জন্য যান্ত্রিক কৌশলে দু দিকে ভাগ হয়ে উঠে যায়, আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে নেমে আসে নিচে। জুড়ে যায় মুখে মুখে। ঠিক ট্রেনের লেভেল ক্রসিংয়ের মতো।

সময় নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট করা আছে। যেমন রাস্তায় থাকে ট্রাফিক পুলিস। আলো জ্বালিয়ে কিংবা হাত দেখিয়ে কখনো পথিক পার করে, কখনো গাড়ি পার করে। ঠিক তেমনি।

কীভাবে এসে দুটো লোহা আবার বিশাল সড়কে পরিণত হয় সেটা দেখবার জন্য আমি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। এক সময়ে নেমে এলো, জুড়ে গেল মুখ, আর সঙ্গে সঙ্গে দুপাশে জমে-থাকা মানুষজন গাড়ি মোটর স্কুটার সব চলতে লাগল হুসহাস্ করে। একদম অন্য চেহারা হয়ে গেল জায়গাটার।

প্রাতরাশ নিয়ে এল পরিচারিকা। হাসিমুখে অভিবাদন জানাল। জিজ্ঞেস করল রাতে ভালো ঘুম হয়েছিল কিনা। ওদের পরিচর্যায় কোনো ত্রুটি হয়েছিল কিনা। আমি ঠাট্টা করে বললাম, এত খাবার এনেছ কেন? দুজন তো মানুষ! নাকি ভারতীয় দেখে বাঘ ভেবেছ?

হাসতে হাসতে মরে গেল মেয়ে, গাল দুটো আপেল হয়ে উঠল।

কথা ছিল সকালটা আর বেরুব না। দুপুরে লাঞ্চের পরে গোটা তিনেক নাগাত ভদ্রলোক আসবেন, পাবলিক হলে বক্তৃতা আছে বুদ্ধদেবের, সেখান থেকে নিয়ে যাবেন তাঁদের প্রমোদকানন টিভলি পার্কে। তাই হল। বেশ বিশ্রাম হল খানিকটা। ভদ্রলোক তাঁদের জাতীয় স্বভাব অনুযায়ী ঠিক তিনটার সময়েই এলেন।

খুব হাওয়া ছিল, যেন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আকাশ গভীর নীল। ভীষণ ভালো লাগল চারদিকে তাকিয়ে। বক্তৃতার সময় ছিল সাড়ে তিনটে থেকে পাঁচটা। আছি শহরের কেন্দ্রস্থলে, মিটিংয়ের জায়গাটা মাত্রই কয়েক মিনিটের পথ। সেই অবসরে বুদ্ধদেব আর একবার চিত্রশালাটা দেখে নিলেন। এড্‌ভার্ড মুঙ্কের ছবিই তাঁর প্রধান আকর্ষণ।

সভা শেষ করে টিভলি পার্কে এসে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল, শহরের সব আলো জ্বলে গিয়েছিল ততক্ষণে। কিন্তু টিভলি পার্কে ঢুকে যে বিদ্যুৎপ্রভার সম্মুখীন হলাম তা অচিন্তনীয়। যেন দীপান্বিতা। সারা পার্কটা আলোয় আলোময়। তার যে কত রং, কত ধরন, কত চেহারা তার ঠিক নেই। শুধুই কি আলো? ফূর্তির আয়োজনই বা কত! কেউ নাগরদোলায় উঠে ঘুরছে, কেউ দোলনায় দুলছে, কৃত্রিম পাহাড়ে উঠছে কেউ কেউ, গড়িয়ে পড়ছে ইচ্ছে করে, নিকুঞ্জও আছে কোণে কোণে, লতাপাতার আবডালে আলোর ঔজ্জ্বল্য ঝাপসা সেখানে। সেটা প্রেমের জায়গা। কোথাও ম্যাজিক হচ্ছে, কোথাও টিন বাজিয়ে মালিক পুতুল খেলা দেখাতে আকর্ষণ করছে বাচ্চাদের, কোনো তাঁবুতে নাচ হচ্ছে, গান হচ্ছে, বাজনা হচ্ছে—মস্ত এক উৎসবের আয়োজন।

আমি বললাম, 'খুব ভালো সময়ে এসেছি তো, কার্নিভাল হচ্ছে বুঝি?'

ভদ্রলোক বললেন, 'না না, কার্নিভাল কেন। রোজই সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত এই পার্কে এসব হয়, দিনে থাকে না। সন্ধ্যার পরে একঘেয়ে লাগে তো? সেজন্যই এই বন্দোবস্ত।

# রাবেক্স উষ্ণতা দেয়

## রাবেক্স

Alembic

গ্লাইকোডিন-এর নির্মাতা
অ্যালেম্বিক-এর উৎপাদন।

## উষ্ণতা ছড়ায়,
## সর্দি-শ্লেষ্মায় আরাম আনে।

'এই মেলা রোজই চলে এখানে?'

'রোজ। কত খাবার দোকান বসেছে দেখেছেন? অনেক ভালো ভালো খাবারও আছে। অনেকে খায়। আজ আমি আপনাদের খাওয়াব। আসুন না, নাগরদোলায় চড়বেন।'

'নাগরদোলা? না, না। দেখেই মাথা ঘোরে।'

'পাহাড়ে উঠবেন?'

'না, না—'

'অনেকগুলো তাঁবু আছে, চলুন ঢুকে পড়ি কোথাও।'

বুদ্ধদেবের তো প্রশ্নই ওঠে না, আমিও ইচ্ছুক না থাকায় উনি বিফল হলেন। অরপরেই উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে. নৌকোবিহারে চলুন।'

'কোথায়?'

'ঐ দেখছেন না কত দূর পর্যন্ত চলে গেছে বিরাট তাঁবু, আর ভিতরে এক আশ্চর্য জগৎ।'

'জল আছে?'

'নিশ্চয়ই। তাতেই স্টীমবোটে চেপে বেড়ায় লোকেরা। চমৎকার ট্রিপ। খুব সুন্দর, খুব ভালো। চলুন।'

এখানেও বুদ্ধদেব গররাজী। এসব ছেলেমানুষিতে তাঁর আগ্রহ নেই। মৃদু হেসে সবিনয়ে অসম্মতি জানিয়ে বললেন, 'আপনি বরং এ'কে নিয়ে যান, আমাকে মাফ করুন। আমি বরং স্টলগুলো দেখি ততক্ষণ।'

'তাই চলুন।' অমনি টিকিট কাটলেন ভদ্রলোক।

তাকিয়ে দেখলাম টিকিটের যা দাম নিল তার অঙ্ক অবহেলার যোগ্য নয়। বললাম, 'মিছিমিছি কী দরকার ছিল, এই তো কেমন সুন্দর ঘুরে ঘুরে মেলা দেখছিলাম, আলোগুলো কী চমৎকারভাবে সাজানো, কী সুন্দর ফোয়ারা, মহাত্ত—'

আমাকে প্রায় বগলদাবা করে নিয়ে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'এই ড্রীমল্যাণ্ডে আপনাকে আমি নিয়ে যাবই যাব। প্রফেসর বোস এলেন না, এলে নিশ্চয়ই খারাপ লাগত না।'

ভিতরে ঢুকে দেখি সত্যিই একটা রাজত্ব। সেখানেও পার্ক আছে, দোকান আছে, গাছ আছে, অনেকে বসে আছে বেঞ্চিতে, কোকাকোলা খাচ্ছে। তার এদিক দিয়েই বয়ে যাচ্ছে খাল। সেখানে গিয়েও আপিস-ঘরে টিকিট নিতে হল। অবশ্য সেই টিকিটের দাম নেই। টিকিট নিয়ে খালের ধারে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দাঁড়াতেই ভেসে এল বোট। আলাদা প্রবেশপথে ছোট ছোট সিঁড়ি নেমে উঠে এলাম বোটে। বাইরের জগতের সঙ্গে আর এর পরে কোনো সম্পর্ক রইল বলে মনে হল না।

নৌকোটাতে কোনো চালক নেই; নিজেই এসেছিল, নিজেই চলতে লাগল। ছোট বোট মাত্রই দুখানা আসন পাশাপাশি। একখানাতে আমি বসলাম, একখানাতে উনি বসলেন। আর বসা মাত্রই তরতরিয়ে চলতে শুরু করল। কী আঁকাবাঁকা খাল বলা যায় না। দু দিকে তীর। তীরের কোনো জায়গায় গভীর জঙ্গল, কোনো জায়গায় সাজানো বাগান, আবার কোথাও খাড়া পাহাড় উঠে গেছে উপরে। পাহাড়ী পথ বেয়ে গাড়ি নামছে, মানুষ নামছে, দ্বীপের জঙ্গল থেকে তাকিয়ে আছে হরিণ। এক জঙ্গলে একটা সিংহের নিনাদও শোনা গেল। ঐটুকু জায়গায় কী করে যে এত সব করেছে কে জানে। জলাশয়টি অন্তহীন। মনে হয় না সমুদ্র পর্যন্ত না গিয়ে শেষ হবে। এই কাণ্ডকারখানা দেখে আমি স্তম্ভিত।

হাসি-হাসি মুখে ভদ্রলোক বললেন, 'এসব জঙ্গল কিন্তু একটুও নিরাপদ নয়। র‍্যাটল স্নেকে ভর্তি।'

'ও বাপ!'

'হ্যাঁ। একটু সাবধানেই বসুন, টুপ করে কখন লাফিয়ে পড়ে ঠিক আছে?'

'না, না। সাপ আবার লাফায় নাকি?' বলেই গুটিসুটি হলাম।

এমনিতে ভদ্রলোক খুব শান্ত, গম্ভীর। হাসি সব সময়েই মৃদু এবং নিঃশব্দ। লাজুকও বেশ। উত্তরচল্লিশ কিন্তু বিবাহিত নন। অনেক সময়েই দেখা যায় বয়স্ক অবিবাহিতরা মহিলা সম্পর্কে একটু বেশী সচেতন। চোখে চোখে তাকান না, কথাও বলেন দেওয়ালকে সম্বোধন করে। ইনি অনেকটা সেই জাতীয়। এই ক'দিনের পরিচয়ে আমার সেইরকমই ধারণা হয়েছে। মাথা পাটি পাটি করে আঁচড়ে, নিকেলের চশমা চোখে দিয়ে আরো দূরে সরে গেছেন জীবনের উজ্জ্বলতা থেকে। কিন্তু নৌকো চড়ে দেখা গেল বেশ ফুর্তি-ফুর্তি ভাব।

'বিপদ অবশ্য শুধু র‍্যাটল স্নেকই নয়, আরো আছে।' গোঁফের ফাঁকে সেই-রকম মৃদু হাসি।

'কীরকম?' আমি ঈষৎ ভীত।

'স্বয়ংচালিত নৌকো তো, চলে ইচ্ছেমতো, ফেরে ইচ্ছেমতো, আবার যদি হঠাৎ কপালদোষে কোনো যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে যায় তবে তো উপায়ই নেই।'

'সে কি!'

'না, না, এসব ঝামেলার মধ্যে গিয়ে লাভ নেই, তার মধ্যে এরকম এক জনমানবহীন নিরালা জায়গায়—'

'তাই তো—' আমার কথার পাদপূরণ করলেন, 'যেখানে আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবে না—'

'তবে? বরং ফিরে যাই চলুন।'

'তা কি আর হয়!'

'কেন? কেন হয় না?'

'যতক্ষণের জন্য বোটের ভাড়া দিয়েছি ততক্ষণ এই বোট আমাদের নিয়ে ঘুরবেই।'

'ইচ্ছেমতো?'

'ইচ্ছেমতো।'

'খুব অন্যায়।'

'ভয় করছে?' হাসলেন।

বললাম, 'না, ভয় কী!'

সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ভয়ের কিছু নেই, আমি তো আছি। নৌকো ডুবুক, পুড়ুক, যা-ই হোক না কেন, আমি আপনাকে পিঠে নিয়ে ঠিক সাঁতরে পার হয়ে যাব এই নদী।'

বলতে বলতেই নৌকোর স্পীডটা অসম্ভব বেড়ে গেল। একেবারে টালমাটাল, উল্টে যাবার মতো। আমি পাশেই হাতের কাছে একটা মাস্তুল খাড়া হয়ে আছে দেখে সেটা অবলম্বন করে নিজেকে সামলালাম। নৌকোটা ছোট্ট খেলনার মতো তীরবেগে ছুটছে, তাকিয়ে দেখি যেদিকে ছুটছে জলের তলায় সেখানে একটা মস্ত পাহাড়ের আভাস, মাথাটা একটু একটু দেখা যাচ্ছে। দু পাশে বয়ে গেছে জলস্রোত। নৌকোটা স্বয়ংচালিত, তাকে কন্ট্রোল করার কী উপায় আমার জানা নেই। যদি নিজে থেকে বেঁকে জলস্রোতের দিকে না গিয়ে পাথরটায় গিয়ে ঠোক্কর খায়, মুহূর্তে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। আমি চোখ বন্ধ করলাম। একটু পরেই অনুভব করলাম ধাক্কাটা আর লাগল না। শেষ মুহূর্তে সম্ভবত ভাগ্যদেবতাই কাণ্ডারী হয়ে মোড় ফিরিয়ে দিলেন অন্য পথে। আর স্পীডও স্বাভাবিক হল।

ভদ্রলোকের নিঃশব্দ হাসিতে সামান্য শব্দ উত্থিত হল, 'তা হলে এ যাত্রা বেঁচে গেলাম, কী বলেন?'

ঢোক গিলে বললাম, 'হ্যাঁ।'

খোশ মেজাজে ভদ্রলোক বললেন, 'এই ভয়টাই এখানকার আকর্ষণ। আপনি ভয় পেতে ভালবাসেন না?'

গম্ভীর হয়ে বললাম, 'না।'

'সে কি কথা! এই ভয়ের মধ্যেই তো সব রোমাঞ্চ!' আমার জবাবের জন্য একটু অপেক্ষা করে বললেন, 'অবশ্য আমি নিজে একটুও ভয় পাচ্ছি না। কিন্তু যিনি পাশে আছেন তাঁর ভয়টাও তো কম উপভোগ্য নয়! একটা অ্যাকসিডেন্ট যদি হয়ই, ঝাঁপিয়ে পড়ব জলে।'

এবার নৌকো স্বাভাবিক গতিতেই চলছিল। কিন্তু কোথায় কোন বাঁকে কোন পথে তার নিশানা আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল এ যাত্রা যেন আর শেষ হবার নয়। তারই মধ্যে স্পীড আবার বেড়ে গেল। আবার এক মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখে যেন মাধ্যাকর্ষণশক্তির টানে এগিয়ে যেতে লাগল। ভীষণ আগুন লেগেছে জঙ্গলে। কেউ কি সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরো ফেলেছে শুকনো পাতার মধ্যে? লকলক করছে কমলা রঙের ঢেউ। মনে হচ্ছে, সর্বাঙ্গ গ্রাস না করে সে ছাড়বে না আজ। মাঝখানের সরু খাল ডিঙিয়ে উলটো দিকের জঙ্গলটির দিকে ধাবিত হচ্ছে লেলিহান শিখা। জলের মধ্যে তার সর্বনাশা ছায়া [illegible]মান। আমাদের বোট দুর্জয় গতিতে সেই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যেই প্রবিষ্ট হতে চলেছে। আমি অস্ফুটে আর্তনাদ করে উঠে বললাম, 'যে-কোনভাবেই হোক, নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে দিন।'

'স্বেচ্ছাচালিত নৌকো কি আমার কথা শুনবে? ভাগ্যে যদি পুড়ে মরা থাকে তা হবেই। আপনি তো হিন্দু, নিশ্চয়ই ভাগ্য মানেন। আর সহমরণ বলে একটা কথা ছিল না আপনাদের ধর্মে? আমার সঙ্গেই হবে সেটা, কী আর করা! নাকি জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চান? আমার আপত্তি নেই, আমি খুব ভালো সাঁতার জানি। চ্যাম্পিয়নও বলতে পারেন। আসুন—' আমার হাত ধরলেন তিনি এবং ইতিমধ্যে আমাকে প্রায় মূর্ছিত করে নৌকো সেই অগ্নিকুণ্ডের ভিতর দিয়েই নির্বিঘ্নে পার হয়ে গেল। সেই আগুনে এক বিন্দু তাপ ছিল না।

এতক্ষণে আমার বোধগম্য হল এর সবটাই খেলা। এই আঁকাবাঁকা অন্তহীন জলপথ, নিবিড় জঙ্গল, এবড়োখেবড়ো উঁচু পর্বত, পর্বতের খাড়াই রাস্তায় গড়িয়ে যাওয়া গাড়ি, স্থানে স্থানে কুসুমকানন, দ্বীপ, দ্বীপের হরিণ—সবই মায়া। তৈরি করা ইলিউশন। আলোর ধাঁধা। আলো দিয়েই ছোটকে বড় করেছে, সীমাকে অসীম করেছে, কাছকে দূরে নিয়ে গেছে, দূরকে কাছে এনেছে—সবই বিদ্যুতের কারসাজি। এত বড় আগুনটাও তারই অবদান, যে কারণে সে এক ফোঁটা তাপও যেমন উদ্গিরণ করতে পারছে না, একটি তৃণকেও তেমনি দগ্ধ করতে পারছে না।

(ক্রমশ)

# কণ্টকল্পিত

## অতুল্য ঘোষ

**(নব পর্যায়)**

॥ ৩৮ ॥

বাম ফ্রন্ট সরকারের তৃতীয় বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে নানা উৎসবের ঘোষণা হয়েছে। সংবাদটা যখন প্রথম পড়ি, তখন বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয়নি। তারপর দেখলুম সত্যি সত্যিই ঘোষণা হয়েছে। তাজ্জব ব্যাপার! ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে বহু সরকারই তো অনেক বছর থেকেছেন, উৎসব করার কথা তো কখনো শোনা যায়নি; তা হলে এঁরাই বা উৎসবের ঘোষণা করলেন কেন? সংবিধান অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবেই তো এঁদের পাঁচ বছর থাকার কথা! আর এঁরা যেরকম সংখ্যাধিক্য নিয়ে এসেছেন, তাতে তো মন্ত্রিত্ব ছেড়ে চলে যাবার কথাই ওঠে না! তবে হ্যাঁ, যদি ঘরোয়া কোন্দলে ভেঙে যাবার কোন আশংকা থাকে, সেটা স্বতন্ত্র কথা। এবং তা হবে খুবই দুঃখজনক। আর সংবিধানের বাইরে যদি এঁরা না যান এবং তা সত্ত্বেও যদি ওপর থেকে বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়, তা হলে জনসাধারণ তো পুনরায় নির্বাচনে তাঁদের আরও অধিক সমর্থন জানাবেন। এর নজিরও আছে। অবশ্য এঁরা মাঝে-মাঝেই 'ষড়যন্ত্র' প্রভৃতি যেসব কথা বলতেন, তার থেকে মনে হয় স্থায়িত্ব সম্বন্ধে এঁরা নিজেরাই সন্দিহান। আর উৎসবের ঘোষণা করাতেও মনে হচ্ছে যেন সত্যিই এঁরা সন্দিহান—যেন যে ক'দিন থেকে গেলাম, সেইটাই লাভ, এই মনোভাব আর কি!

মন্ত্রিসভায় যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে অনেকে এবং দলের মধ্যেও অনেক কর্মী সত্যিই কঠোর পরিশ্রমী এবং নিজেদের আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন। তা হলে বার্ষিক উৎসব কেন? পাঁচ বছর কাটুক, আগামী নির্বাচনের সময় তো হিসেব নিকেশ হবে। তখনই তো উৎসবের দিন। কোন মন্ত্রিসভাই তো এক মাস, দু মাস, পাঁচ মাস বা এক বছর, দু বছর তিন বছরে কার্যক্রম শেষ করতে পারে না! সকলকেই তো দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। অবশ্য রাস্তা মেরামত, মজা খাল উদ্ধার—এসবের কথা স্বতন্ত্র। এসব করার জন্য তো আর উৎসব করা চলে না! তা হলে কিসের জন্য উৎসব? উৎসবটা কি ওঁরা আছেন বলে? মন্ত্রিসভা বা দলের বাইরে থেকে কেউ যদি উৎসব করেন, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু এখানে মন্ত্রিসভা নিজেরাই তো উদ্যোগী! এ একটা বিসদৃশ ব্যাপার! সব দেখে-শুনে মনে হচ্ছে যে, এঁরা যেন মনে করছেন এঁরা বিরোধী দলে আছেন। যে-কোনরকমে একবার বুড়ী ছুঁয়ে গেলেন অর্থাৎ মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। ব্যস্! তা তো নয়! এঁরা তো স্থায়ী সরকার গঠন করেছেন এবং ভবিষ্যতেও গঠন করতে চান। নির্বাচনে জনসাধারণের ভোট পেয়ে ওঁরা এসেছেন। ওঁদের অহেতুক আশঙ্কার তো কোন কারণ নেই! আর জনতা দলের [illegible] বা নতুন দল নন! তা হলে অর্ধপথেই উৎসবের ঘোষণা কেন? ওঁরা কি মনে করছেন যে, তিন বছর থেকেই দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে? কোন কোন মন্ত্রী আবার বলেছেন যে, তাঁরা নির্বাচনের সময়ে যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন, তার অর্ধেকের উপর সমাধা হয়ে গেছে। এও একটা অদ্ভুত কথা। তাঁরা নিজেরা নিজেদের বাহবা দিলে তো হবে না। তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা কতটা ঘোচাতে পেরেছেন, সেটাই আসল কথা। তিন বছরে সেদিকে বেশী দূর এগোনো কি সম্ভব হয়েছে? ওঁরা হয়তো বলবেন যে, পূর্বতন সরকারের দায়িত্বহীনতার জন্য অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। বেশ তো, যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে, ওঁরা সত্যি কথাই বলছেন, তা হলে ওঁরা জেনে-শুনেই তো ক্ষমতায় এসেছিলেন! এবং দায়িত্ব নেবার সঙ্গে সঙ্গে সেইসব অসুবিধা অপসারণেরও তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। গোটা রাজ্যের কথা ছেড়ে দিয়ে কলকাতা শহরেরই কতগুলি দুরবস্থার কথা ধরা যাক। কলকাতার রাস্তাঘাট কি জঞ্জালমুক্ত? ফুটপাথগুলিতে কি এখন আর বাজার বসে না? মানিকতলা বাজার আর বউবাজারের বাইরে রাস্তার উপর যে বাজার বসে, তা বোধ হয় আসল বাজারের থেকেও বড়। শ্যামবাজারের পশ্চিম দিকের ফুটপাথ দিয়ে কি হাঁটা যায়? বহু রাস্তার ম্যানহোলের উপরে কোনো ঢাকা নেই। রাস্তায় গর্তের কথা তো আলাদা! রাস্তায় ম্যানহোল ঢাকা না দেওয়া যে কি অপরাধ, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এ অবস্থায় কি উৎসব করা সাজে? আগে আগেও মাঝে মাঝে পানীয় জল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটত। আজকাল তো এটা নিত্য-নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাগজে একটা নোটিস আর রেডিওতে একটা ঘোষণা; ব্যস্, তাতেই দায়িত্ব শেষ।

দুটি স্কুলের কথা আগেই বলেছি। মুরারিপুকুরে একটি স্কুল আর বি আর এস (৩)-এ একটি স্কুল। আশেপাশে রাহাজানি, ছিনতাই-এর কথা ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু সে অঞ্চল শুধু দুর্গমই নয়, অগম্যও। কলকাতা শহরেই যখন এই অবস্থা, তখন পল্লী অঞ্চলে কি হচ্ছে বলা নিষ্প্রয়োজন। অদ্ভুত অব্যবস্থা! প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার দণ্ড পেল কলকাতার ছাত্ররা। একই সঙ্গে [illegible] অন্যান্য [illegible] প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে; কিন্তু সেসব জায়গা সম্বন্ধে কোন উচ্চ-বাচ্চ নেই। আর প্রশ্নপত্র যাদের দোষে ফাঁস হল, তাদের কি সাজা হল? সিলেবাসে যেসব বইয়ের নাম দেওয়া আছে, পরীক্ষার আগের দিন অবধি সে বইয়ের খোঁজ পাওয়া যায় না। যে রাজ্যে সামান্য স্কুলের লেখা লেখবার জন্য খাতা কিনতে লাইন দিতে হয়, সে রাজ্যে কি উৎসব মানায়? তারপর বিদ্যুতের কথা। স্বীকার করি অনেক অসুবিধা আছে। যে রাজ্যে বিদ্যুতের জন্য লেখাপড়ার ক্ষতি হচ্ছে, কেরোসিনের জন্য কিউ দিতে গিয়ে ছেলেমেয়েদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে, সে রাজ্যে উৎসব কি মানায়? আর এই যে উল্টোডাঙ্গা থেকে কাঁকুড়গাছি, মুরারিপুকুর প্রভৃতি জায়গায় কয়েক হাজার 'বস্তি রিহ্যাবিলিটেশন স্কীম'-এর যে চারতলা ফ্ল্যাট আছে, তার সব কটিতেই চারতলায় জল ওঠে ইলেকট্রিক পাম্পে। ইলেকট্রিক পাম্প এখন কার্যকরী নয়—সকলেই জানেন। তা হলে যাদের দোতলা, তেতলা, চারতলায় জল তুলতে হয়, তারা কি এই উৎসবে সাথী হতে পারবে? এইসব উৎসব দেখেই তো ঐসব ফ্ল্যাটের অধিবাসীরা উৎসবের প্রতি বিমুখ হয়ে উঠবে। তা হলে কাদের জন্য উৎসব? ত্রুটিবিচ্যুতির তালিকা করার জন্য লেখা হচ্ছে না, খালি কতগুলি দৃষ্টান্তই দেওয়া হল। কোন মন্ত্রী বা দলপতি এসব কথার সদুত্তর দিতে পারবেন না। তবে হ্যাঁ, ক্রোধ প্রকাশ করতে পারবেন। কিন্তু ক্রোধ প্রকাশে তো মানুষের দুঃখকষ্ট লাঘব হবে না বা দায়িত্ব পালন করা হবে না!

কেবলমাত্র কল্যাণ করা বা শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সরকার নয়। বিশেষত বাম ফ্রন্ট সরকার—যাঁরা বলেন যে, আমরা আদর্শ অনুযায়ী কাজ করতে চাই, তাঁদের পক্ষে এ কথা আরও বেশী করে প্রযোজ্য। এ কথা বলা সহজ যে, বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী নিজেদের আদর্শমত সব ব্যবস্থা করা যাবে না। কথাটা

যদি সত্যিই হয় তা হলে সরকারে যাবার প্রয়োজন কি? কিন্তু ক্ষমতা যতই সীমায়িত হোক, কতগুলো কাজ তো অনায়াসেই করা যায়! যেমন—মানুষের মনোভাব পরিবর্তন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে যেসব মন্ত্রী ও অফিসাররা আছেন, তাঁদের আহার, বিহার ও আচরণের সঙ্গে কি বাম ফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী ও তাঁদের পরিচালনাধীন অফিসারদের বিশেষ পার্থক্য আছে? যদি না থাকে, তবে কেন নেই? কৃচ্ছ্রসাধনের কথা বলা হচ্ছে না, কিন্তু আচরণবিধি এই তিন বছরে কতটা পরিবর্তিত হয়েছে? অফিসাররা কি মনে করেন যে, জনসাধারণের সেবা করার জন্য তাঁরা আছেন এবং জনসাধারণের অর্থ থেকেই তাঁদের মাইনে এবং স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করা হয়? রাইটার্স বিল্ডিং-এ চাপরাসী, পিওন বা কনস্টেবল আছে তারা কি উপলব্ধি করতে পারছে যে, আগে যেসব মন্ত্রীরা ছিলেন তাঁদের সঙ্গে বর্তমান বাম ফ্রন্ট মন্ত্রীদের আচরণের কোন পার্থক্য আছে? দু-একজনের কথা বলা হচ্ছে না, সমষ্টিগতভাবে বিচার করতে হবে। মেডিকেল কলেজে ঢুকতে গেলে পরীক্ষা দিতে হবে কি হবে না এই নিয়ে দলপতি মুখ্যমন্ত্রী সমেত অন্যান্য মন্ত্রীদের ভর্ৎসনা করেছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত আচরণের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ভর্ৎসনা করা হয়েছে, এমন কথা কোন দিন তো শোনা যায়নি! সংবিধানের জন্যে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য সর্বাত্মক বিপ্লব করা সম্ভব হচ্ছে না। ঠিক কথা। কিন্তু জনসাধারণ কি বুঝতে পেরেছে যে, এঁদের ইচ্ছা থাকলেও করতে পারছেন না? সে বোঝাতে গেলে তো ব্যক্তিগত আচরণ একেবারেই বদলাতে হবে! কেবলমাত্র বুর্জোয়া, প্রতিক্রিয়াপন্থী এইসব বলে এর আগে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে তো পার্থক্য বোঝানো যাবে না! এঁরা যে প্রগতিশীল, ব্যক্তিগত আচরণে তার কি নজির স্থাপিত হয়েছে? তিন বছরের সালতামামি করতে গেলে এইটিই তো প্রধান বিচার্য বিষয়। যে ক্ষমতা হাতে পেয়েছেন, তার মধ্য দিয়ে নিজেদের আচরণের দ্বারাও তো বোঝানো যায় যে, অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের মন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁদের কি পার্থক্য। দল বেঁধে ওলিম্পিক দেখতে গেলে এ রাজ্যের শতকরা ক'জন লোকের সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হবে? ওলিম্পিকের কথা পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ক'জন লোক জানে? এবং জনসাধারণের মধ্যে খেলাধুলার প্রসারের জন্য কি সরকার, কি স্পোর্টস কাউন্সিল কত টাকা খরচ করেন? গ্রামে গ্রামে যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, তাদের কতগুলি স্কুলের খেলার জায়গা আছে? ক'জন এ বিষয়ে খোঁজ করেছেন এবং এই তিন বছরে কতগুলি স্কুলের খেলার জায়গা হয়েছে? কলকাতা বা বড় বড় শহরে খেলার মাঠের কথা উঠলেই এ কথা বলা হয় যে, জায়গার অভাব। কিন্তু পল্লী অঞ্চলে তো এখনও জায়গা পাওয়া যায়। ভূমিহীনকে ভূমি সংগ্রহ করে দেওয়া অবশ্যপালনীয় কর্তব্য—এ বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। তেমনি ছেলেমেয়েদের খেলার মাঠ এবং খেলাধুলোর ব্যবস্থা করা কি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য নয়? ক'জন মন্ত্রী ট্যুরে গিয়ে এসব খবর নেন বা অফিসারদের এসব খবর নিতে বলেন? এগুলো করার জন্য তো সংবিধানে আটকায় না বা কেন্দ্রীয় সরকার বাধাও দিতে পারেন না। বহু গ্রামে তো ধান শুকোবার জায়গা অবধি নেই। এ কাজ অতি সামান্য। কিন্তু সেই সামান্য কাজেও তো দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। মানবিক দিক দিয়ে বিচার করলে এরকম বহু কাজ করা যায়। এবং সেই পথেও তো বিপ্লবের বীজ বপন করা যায়। কিন্তু তা করতে গেলে তো দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের প্রয়োজন। সে চেষ্টা কতটুকু হয়েছে এই তিন বছরে? ক'জন আজ দাঁড়িয়ে বলবে যে, এই সরকারের ক্ষমতা সীমায়িত, তবু এঁরা আমাদের আপন? অন্যান্য রাজ্যের মন্ত্রীরা যখন ট্যুরে যান, তাঁদের জন্য যে খরচ, যে ব্যবস্থা হয়, তার সঙ্গে বাম ফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীদের কোন পার্থক্য আছে কি? তিন বছরে এই পথে এই সরকার কতটা এগিয়েছে? বহু গ্রামে এখনও চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। মোবাইল হেলথ ইউনিট করে তো গ্রামে গ্রামে ঘোরানো যায়, তাতে তো সংবিধানে বাধে না! অনেক টিউবওয়েল ও পাম্প ওয়াশারের অভাবে অব্যবহার্য হয়ে পড়ে রয়েছে। সামান্য যন্ত্রপাতি হলে গ্রামের লোকেই সেগুলো মেরামত করতে পারে। মোবাইল টেকনিক্যাল ইউনিট তো গ্রামে গ্রামে যেতে পারে এ কাজের জন্য! কংগ্রেসী এক মুখ্যমন্ত্রী এ কাজ করেছিলেন। তারপর কেউ আর সেদিকে নজর দেননি। আরও বহু ছোটখাট কাজ আছে, যেগুলো করলে জনসাধারণ বুঝতে পারবে যে, এখন যাঁরা মন্ত্রী আছেন, তাঁরা তাদের নিজেদের লোক অতি কাছের লোক। আপনা থেকেই তারা একটা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করবে। এই তিন বছরে সেদিকে কতটা কাজ হয়েছে? জলকষ্টের কথা শুনতে পাওয়া যায়। লরি করে খরার সময় জল সরবরাহ করাটা সংবাদপত্রে বেশ চমকপ্রদ খবর বটে। কিন্তু বাস্তবে তো সেটা সম্ভব নয়। হাজার হাজার লোকের জলকষ্ট এভাবে দূর করা সম্ভব নয়। অফিসারদের কথা বাদ দিচ্ছি। মন্ত্রীরা যদি ঐসব অঞ্চলে গিয়ে দু দিন করে বাস করেন, তা হলে বুঝতে পারবেন ঐসব অঞ্চলের লোকের সহযোগিতায় ছোট ছোট পুকুর উদ্ধার করা যায়, ছোট ছোট কুয়ো খোঁড়া যায়। গ্রামে বাস করার জন্য বলা হচ্ছে না যে, যে-কোন অবস্থায় বাস করতেই হবে। টেন্ট খাটিয়ে বাস করা যায়, বাসযোগ্য গৃহ খুঁজে বার করা যায়। আসল কথা—মন, দৃষ্টিভঙ্গী। এই সীমায়িত শক্তি নিয়ে রিক্ত, সর্বহারা মানুষের কতটা আপন হতে পারা যায়, সেই দিকে চিন্তা করলেই এ কাজ করা সম্ভব। তিন বছরে এই বিষয়ে এই সরকার কতটা অগ্রসর হয়েছেন, সেটা তাঁরা নিজেরাই আলোচনা করে স্থির করুন। '৭৭ এবং '৮০র লোকসভা নির্বাচনে জনসাধারণ দেখিয়ে দিয়েছেন যে, শুধু শ্লোগানে তাদের ভোলানো যায় না।

## ভাইরাস ঘটিত রোগ নিরাময়ে নতুন পদক্ষেপ

ধরুন, কোন জীব-কোষের মধ্যে প্রবেশ করলো ভাইরাস। প্রবেশ করার পর এই ভাইরাসের প্রথম কাজই হবে বংশবৃদ্ধি করা। একটি ভাইরাস থেকে তখন সৃষ্ট হবে শত সহস্র ভাইরাস। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, নতুন এই বংশধরদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক কেমন যেন বিকলাঙ্গ। অর্থাৎ যে ভাইরাস থেকে তারা জন্ম নিলো, তাদের স্বাভাবিক রাসায়নিক গঠনের চেয়ে এদের রাসায়নিক গঠন যেন হয়ে দাঁড়ালো কিছুটা স্বতন্ত্র। দেখা গেছে বিকলাঙ্গ এই ভাইরাস তাদের জন্মদাতাদের স্বাভাবিক বংশবৃদ্ধির কাজটিকে বাধা দেয়। প্রকৃতির এই বিশেষ ঘটনাটি নিয়ে এখন বিস্তর গবেষণা চলছে। এই বিকলাঙ্গ ভাইরাসের সাহায্যে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত ভাইরাসঘটিত রোগ প্রতিরোধ অথবা নিরাময় করা সম্ভব হবে। সম্প্রতি এ কথা বলেছেন ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ নিগেল ডিমক।

বিজ্ঞানীরা এই বিকলাঙ্গ ভাইরাসের নাম রেখেছেন 'ডিফেক্‌টিভ ইনটারফারেন্স ভাইরাস' বা সংক্ষেপে 'ডি আই' ভাইরাস। যার বাংলা পরিভাষা করলে দাঁড়ায় প্রতিবন্ধক ভাইরাস।

এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগা সম্ভব। গত চল্লিশ বছর ধরে পেনিসিলিন প্রভৃতির মত কতরকম ব্যাকটেরিয়া নিধনকারী ওষুধই না আমরা কাজে লাগিয়ে আসছি। ইংরেজীতে যাদের বলা হচ্ছে অ্যান্টি-বাইওটিকস। এই সব অ্যান্টি-বাইওটিকের কল্যাণে টাইফয়েড থেকে শুরু করে যক্ষ্মার মত বিপজ্জনক রোগ এখন কত অনায়াসেই না সারিয়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু যত গোলমাল ওই ভাইরাসদের নিয়ে। অ্যান্টি-বাইওটিক ওদের বেলায় যেন শুধু নীরব দর্শক। ভাইরাস-আক্রান্ত রোগীকে চিকিৎসকরা ওষুধ দিয়ে থাকেন ঠিকই। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রোগের উপশম ঘটে শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার দরুন, ওই ওষুধে নয়। নানা রকম অসহনীয় উপসর্গ থেকে রোগীকে রেহাই দেওয়া ছাড়া ওষুধ আর কিছু করে না।

এর প্রধান কারণ ব্যাকটেরিয়া হলো স্বাধীন জীব। তাদের নিজেদের এক একটি স্বতন্ত্র জীব-রাসায়নিক চরিত্র আছে। যেমন আছে অন্যান্য প্রাণী এবং উদ্ভিদেরও। [illegible] চরিত্রের সব কিছুই মোটামুটি ভাবে আমাদের জানা। জীবদেহের অভ্যন্তরে অথবা যেখানেই বাস করুক, ওই সব জায়গায় তাদের শারীরবৃত্তীয় আচরণ কীভাবে ঘটতে পারে, কী ধরনের ওষুধের সাহায্যে তাদের প্রতিরোধ করা যায়, শরীরের নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা বা 'ইমিউন সিস্টেম' তাদের নিকেশ করার ব্যাপারে কী ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করে সে সব ব্যাপারে অনেক তথ্যই বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন। তুলনায় ভাইরাসের চরিত্র সম্পর্কে বহু কথা এখনও পর্যন্ত অজ্ঞাত।

"এখানেই যত সব সমস্যা"। বলেছেন ডিমক্। "ভাইরাস আয়তনে ব্যাকটেরিয়ার চেয়ে অনেক ছোট। তাবৎ জীবের মধ্যেই এদের বাস। ব্যাকটেরিয়া, গাছপালা এবং প্রাণী সবার মধ্যেই। এদের শারীর অঙ্গ বলতে নিউক্লেয়িক অ্যাসিড। যাদের বলা হয় ডাই-অকসি নিউক্লেয়িক অ্যাসিড বা 'ডি এন এ' এবং রাইবো নিউক্লেয়িক অ্যাসিড বা 'আর এন এ'। আর এই 'ডি এন এ' এবং 'আর এন এ' থাকে প্রোটিন অথবা প্রোটিন এবং লিপিডের আচ্ছাদনে ঢাকা। এরা জীব-কোষে প্রবেশ করে। তারপর জীব-কোষ থেকে সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় জীব--রাসায়নিক যৌগ। এদের সাহায্যেই বংশবৃদ্ধি করে তারা। কোন কোন ভাইরাস নিধন করার মত কিছু কিছু ওষুধ যে তৈরি হয়নি, তা নয়। কিন্তু এসব ওষুধ প্রচণ্ড বিষাক্ত। রোগ নিরাময়ের ব্যাপারে যখন সমস্ত রকম ওষুধ ব্যর্থ হয়, যখন ধরে নেওয়া হয় মৃত্যুই একমাত্র পরিণতি, শুধু সে ক্ষেত্রেই চিকিৎসকরা এ ধরনের ওষুধ রোগীর ওপর প্রয়োগ করে থাকেন। ইতিমধ্যে ভাইরাসঘটিত রোগের চিকিৎসায় আর এক শ্রেণীর রাসায়নিক যৌগের কথাও ভাবা হচ্ছে। এদের বলা হয় 'ইনটারফেরনস'। এরা এক ধরনের প্রোটিন শ্রেণীর যৌগ। ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে জীবকোষ আপনা থেকেই এদের প্রস্তুত করে। তারপর এদের সাহায্য নিয়ে ধ্বংস করার চেষ্টা করে আক্রমণ-কারী ভাইরাসদের। কিন্তু মুশকিল এই, গত কুড়ি বছর ধরে চেষ্টা করা সত্ত্বেও যথেষ্ট পরিমাণ 'ইনটারফেরন' তৈরি করার মত কোন পদ্ধতি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। এছাড়া প্রাণীদেহে প্রয়োগ করে ভাইরাসঘটিত রোগ সারিয়ে তুলতে গিয়ে ক্ষতির কোন আশঙ্কা আছে কী না, সে সম্পর্কেও এখনও কেউ নিঃসন্দেহ নন। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক ভাইরাস আমাদের কাছে আশার আলো বলেই মনে হয়।"

বিজ্ঞানীরা বলছেন [illegible] দাঁড়ায় এই রকম : কোষের মধ্যে আছে স্বাভাবিক ভাইরাস। তাদেরই পাশাপাশি রয়েছে 'ডি আই' ভাইরাস। নিজেদের বংশবৃদ্ধির জন্যে যা যা জীব-রাসায়নিক বস্তু দরকার, সংক্রামক ভাইরাসের দেহ থেকেই তারা তা সংগ্রহ করে নেয়। যেসব বস্তু তারা সংগ্রহ করে তাদের সংশ্লেষণ করে ওই সংক্রামক ভাইরাসই। ফলে সংক্রামক-ভাইরাসরূপী বংশ পিতাদের পরিমাণ কমতে থাকে। এর জন্যেই ওদের বলা হয় 'ডিফেকটিভ ইনটারফারেন্স ভাইরাস' 'স্ব-ত্রুটি প্রতিবন্ধক' ভাইরাস। অদ্ভুত ব্যাপার জীব-কোষকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে ভাইরাস। আর 'স্ব-ত্রুটি প্রতিবন্ধক' ভাইরাসের আশ্রয় ভাইরাস। এক কথায়, তারা ভাইরাসেরই পরজীবী বা 'প্যারাসাইট'।

শেষোক্ত এই ব্যাপারটি লক্ষ [illegible] বিজ্ঞানীরা মনে করলেন, যদি তাই হয়, তা হলে প্রতিবন্ধক ভাইরাসদের তো রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে? মানুষ অথবা কোন প্রাণী যদি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়, তাদের দেহে কিছুটা প্রতিবন্ধক ভাইরাস ঢুকিয়ে দিলে নিশ্চয় ওই ভাইরাসের প্রভাব ব্যাহত হবে?

বাঁ দিক থেকে লক্ষ করুন : ১ : আক্রান্ত কোষ থেকে ভাইরাস কণা ছড়িয়ে পড়ছে। ২, ৩ এবং ৪ : ভাইরাস-গুলি পর্যায়ক্রমে কোষগুলির মধ্যে প্রবেশ করে বেরিয়ে আসছে। ওদের মধ্যে কালো ফুটকিগুলি ডিফেক্টিভ ইনটারফারেন্স ভাইরাস বা স্বত্রুটি প্রতিবন্ধক ভাইরাস। ৫ : কোষে শুধুমাত্র ডি আই ভাইরাস এসে ঢুকছে। এখানে তার পিতৃপুরুষ সংক্রমণকারী ভাইরাস অনুপস্থিত। এক্ষেত্রে এই কোষ রোগমুক্ত। নিচের ডান পাশের কোষটির মধ্যে ঢুকছে রোগ সংক্রমণকারী ভাইরাস। বংশবিস্তার হওয়ার পর সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে সংক্রমণকারী এবং প্রতিবন্ধক ভাইরা দুই-ই বেরিয়ে আসছে।

প্রতিবন্ধক ভাইরাস সৃষ্টির মূলেও কাজ করে প্রাকৃতিক ঘটনা। শারীরিক কোন দুর্ঘটনার দরুন হয়ত ভাইরাস গিয়ে দেহকোষ আক্রমণ করলো। ওই দুর্ঘটনার দরুন বংশগতভাবে তার জিনের কোন একটি অংশ হয়ত খোয়া গেল। ফলে যা তৈরি হলো, তাকে বলা চলে 'ডিফেক্‌টিভ ভাইরাস'। দেহের কোষ-কলায় যদি বেশি সংখ্যক ভাইরাস এসে প্রবেশ করে সে ক্ষেত্রে কোষের মধ্যে 'ডি আই' ভাইরাসের সংখ্যাও যায় বেড়ে। তাদের পরিমাণ মাপাও তখন সম্ভব হয়। কিন্তু কম সংখ্যক ভাইরাস প্রবেশ করলে তাদের বংশবৃদ্ধি হারও কম হয়। সে ক্ষেত্রে ঠিক কী পরিমাণ 'ডি আই' ভাইরাস সৃষ্ট হলো সেটা জানা সম্ভব হয় না। কোষের মধ্যে তখন মুখ্যত রোগ সংক্রামণকারী ভাইরাসেরই আধিপত্য চলতে থাকে।

মজার ব্যাপার এই, মূল ভাইরাস রোগ সৃষ্টি করলেও প্রতিবন্ধক ভাইরাস কিন্তু মোটেই সংক্রামক নয়। তাদের মধ্যে রোগসৃষ্টিকারী ভাইরাসের জিনটি অক্ষত অবস্থায় থাকে না বলেই হয়ত এমনটি হয়ে থাকে।

যদি তাই হয়, সাধারণ ভাইরাসের মত প্রতি-বন্ধক ভাইরাসও কি বংশ বিস্তার করে না?

১৯৭০ সালে ম্যাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট অভ টেকনোলজির দুইজন বিজ্ঞানী ডঃ অ্যালিস হুয়াং এবং ডঃ ডেভিড বালটিমোর একটি তত্ত্বও দাঁড় করালেন। তাঁরা বললেন ভাইরাস আক্রান্ত কোষে কতটা প্রতিবন্ধক ভাইরাস সৃষ্ট হবে সেটা ওই কোষের উপরও নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ ইনফ্লুয়েঞ্জার কথাই ধরুন। ইনফ্লুয়েঞ্জা কখনও কখনও মহামারী-রূপে দেখা দেয়। ওই সময় যত সংখ্যক রোগী শয্যাশায়ী হয় তার চেয়ে আক্রান্ত হয় আরও অনেকে। যারা আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয় না তাদের কোষে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের 'প্রতিবন্ধক ভাইরাসে'র পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। আর থাকে বলেই রোগ আক্রমণকারী ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি কমে যায়। কিন্তু কোষে প্রতিবন্ধক ভাইরাসের উৎপাদন হার কম থাকলে, কোষে আক্রমণকারী ভাইরাসের সংখ্যা বাড়ে। আক্রান্ত ব্যক্তি সহজেই শয্যাশায়ী হয়। বলা বাহুল্য, শরীর তার নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা যতক্ষণ না ফিরে পায়, কোষে প্রতিবন্ধক ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি ততক্ষণ সমানে চলতে থাকে।

গত কয়েক বছর ধরে প্রতিবন্ধক ভাইরাস নিয়ে

দেখে সাধারণভাবে তিনটি সিদ্ধান্তও করেছেন বিজ্ঞানীরা। এক, সব রকম ভাইরাসই প্রতিবন্ধক ভাইরাস তৈরি করে। দুই, প্রতিবন্ধক ভাইরাস একমাত্র সেইসব ভাইরাসের সঙ্গেই প্রতিক্রিয়া করে যাদের থেকে তারা সৃষ্ট হয়। যার অর্থ, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসকে যদি প্রতিরোধ করতে হয়, তা হলে এমন ধরনের প্রতিবন্ধক ভাইরাস দরকার যাদের সৃষ্টি ওই ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস থেকেই। অর্থাৎ বিভিন্ন রোগের ভাইরাসের প্রতিবন্ধক ভাইরাস হবে স্বতন্ত্র। তিন একমাত্র জিন ছাড়া ভাইরাস এবং তার প্রতিবন্ধক ভাইরাসের অন্যান্য গঠন-বৈশিষ্ট্যে কোন তারতম্য নেই।

প্রতিবন্ধক ভাইরাসের সাহায্যে চিকিৎসা করার ব্যাপারে ইতিমধ্যে কিছু কিছু গবেষণালব্ধ ফলাফলের কথাও জানা গেছে। যেমন ধরুন, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জন হল্যান্ড এবং তাঁর সতীর্থদের কথা। তাঁরা ভেসিকুউলার স্টোমাটাইটিস ভাইরাস (ভি এস ভি) নামে এক ধরনের ভাইরাস নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। বিশেষ এই ভাইরাস গরুর শরীর এক ধরনের মৃদু রোগ সৃষ্টি করে। কিন্তু ইঁদুরের মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে এই ভাইরাস খুবই বিপজ্জনক। হল্যান্ড দেখিয়েছেন, ইঁদুর যদি প্রাণঘাতী এনকেফেলাইটিস রোগে আক্রান্ত হয় এবং ওই অবস্থায় তার মস্তিষ্কে অধিক মাত্রায় 'প্রতিবন্ধক ভি এস ভি' ইনজেকশন করা হয়, তাহলে আশাতীত সুফল পাওয়া যায়। বেশির ভাগ ইঁদুরই রোগমুক্ত হয়। তবে কখনও কখনও এক্ষেত্রে এনকেফেলাইটিস রোগের উপসর্গের ব্যাপারে কিছু কিছু পরিবর্তনও দেখা গেছে। ইনজেকশন দেওয়ার পর কিছু কিছু ইঁদুরের স্বভাব-শ্লথ হয়। পেছনের পায়ে পক্ষাঘাত হতেও দেখা যায়।

'ডি আই ভাইরাস নিয়ে আমরাও কিছু গবেষণা করেছি।' বলেছেন ডঃ নিগেল ডিমক। "এর জন্যে আমরা কাজে লাগিয়েছিলাম 'সেমলিকি ফরেস্ট ভাইরাস' (এস এফ ভি) নামে এক ধরনের ভাইরাস। এই ভাইরাসটি প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯৪৪ সালে, উগান্ডায়। এরা মানুষের শরীরে কোন রোগ সৃষ্টি করে না। যদিও এক ধরনের স্নায়বিক রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসের সঙ্গে এর যথেষ্ট মিল রয়েছে। পৃথিবীর ক্রান্তীয় অঞ্চলে এদের পাওয়া যায়। এক ধরনের মশা এই ভাইরাসটি ছড়িয়ে থাকে।"

"পরীক্ষার জন্যে আমরা নিয়েছিলাম কয়েকটি ইঁদুর। ইঁদুরদের দুটি দলে ভাগ করা হলো। প্রথমে প্রথম দলের ইঁদুরের নাকে ইনজেকশন করা হলো বেশি মাত্রায় 'এস এফ ভি'। দেখা গেল খুব কম সময়ের মধ্যেই তারা এনকেফেলাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তাদের পাগুলি পক্ষাঘাতে জীর্ণ। তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে সবাই তারা মারা গেল। এরপর দ্বিতীয় দলের ইঁদুরের শরীরে ইনজেকশন করা হলো 'এস এফ ভি' এবং প্রতিবন্ধক এস এফ ভি'। সমান সমান মাত্রায়। অবাক কাণ্ড। এবার দেখা গেল প্রায় সব কটি ইঁদুর ইনজেকশন নেওয়ার পরও সুস্থ রয়েছে। তাদের মধ্যে রোগের কোন লক্ষণই পাওয়া যায়নি। শতকরা নব্বই ভাগ ইঁদুরই বেঁচে গেল শেষ পর্যন্ত।"

কিন্তু প্রশ্ন এই, প্রতিবন্ধক ভাইরাসের ভূমিকাই যে এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছে তারই বা প্রমাণ কী? এমনও তো হতে পারে, প্রতিবন্ধক ভাইরাস ইঁদুরের সহজাত রোগপ্রতিরোধকারী ব্যবস্থাগুলি সক্রিয় করে তুলেছিল বলেই দ্বিতীয় দলের কোন ক্ষতি হয়নি? এর দরুন ইঁদুরগুলির শরীরে হয়ত অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে থাকবে? কোষকলা সচরাচর যেভাবে জীবাণু ধ্বংস করে তেমনটিও ঘটা সম্ভব? এমন কি 'ইনটারফেরন'ও সংশ্লেষিত হতে পারে? যা 'এস এফ ভি'র ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ইঁদুরদের প্রাণ রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে?

এ সব সন্দেহ দূর করার জন্য ডঃ ডিমক নতুন [illegible] চালালেন। এই ইঁদুরদের দেহে এবার ইনজেকশনের সাহায্যে ঢুকিয়ে দিলেন সমপরিমাণ 'এস এফ ভি' এবং প্রতিবন্ধক এস এফ ভি। তবে এবার যে 'প্রতিবন্ধক এস এফ ভি' নিলেন শরীরে প্রয়োগ করার আগে তাদের অতি বেগুনী রশ্মির মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছিল কিছুক্ষণ। এর ফলে কোষের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিক্রিয়া করার মত ক্ষমতা তারা হারিয়ে ফেললো। এক্ষেত্রে ইঁদুরগুলি রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। 'প্রতিবন্ধক এস এফ ভি'-ও বংশ বিস্তার করতে পারে নি। ডঃ ডিমক দেখেছেন, প্রতিবন্ধক ভাইরাস মিশ্রিত 'এস এফ ভি' মস্তিষ্ক কোষে গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু খুব কম সময়ের মধ্যেই সেখানে 'এস এফ ভি' বংশ বিস্তারের হার প্রায় এক লক্ষ গুণের মত কমে আসে। তুলনায় প্রথম এবং তৃতীয় দলের ইঁদুরের ক্ষেত্রে তাদের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে যায়।

সমস্যা এই, এক এক ধরনের ভাইরাস শরীরের এক-একটি অংশে গিয়ে আশ্রয় নেয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা যে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে তা নয়। শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশে বাসা বাঁধার পর সেখানকার কোষে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া তারা করে, বিজ্ঞানীদের কাছে এখনও তা পরিষ্কার নয়। হয়ত সবাই তারা প্রতিবন্ধক ভাইরাস সৃষ্টি করে। কোন ভাইরাসের প্রতিবন্ধক ভাইরাস কোনটি তা সনাক্ত করাও একটা বড় রকম সমস্যা। সনাক্ত করার পর আছে সংগ্রহ করার সমস্যা। গবেষণাগারে কোষ কালচার করে ওই সব প্রতিবন্ধককারী ভাইরাসদের পৃথক করতে হবে।

## কৃত্রিম রক্ত

ওসাকার গ্রীন ক্রস কো-অপারেটিভের বিজ্ঞানী ডঃ জে লাতিও এক ধরনের কৃত্রিম রক্ত তৈরি করেছেন। তিনি এই রক্তের নাম দিয়েছেন 'এফ ড়ি এ'। পারফ্লুরোডেকালিন এবং পারফ্লুরোপ্রয়ল্যামাইন নামে দুটি রাসায়নিক যোগের সাহায্যে এই রক্ত তৈরি করা হয়েছে। এই রক্ত শরীরের স্বাভাবিক রক্তের মতই অক্সিজেন বহন করতে পারে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, থ্রম্বোসিস প্রভৃতির সময় শরীরে রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন হলে এই রক্ত ব্যবহার করা যাবে। একনাগাড়ে তিন দিনের মত ব্যবহার করেও শরীরে এখনও পর্যন্ত এর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া ধরা পড়েনি। এই রক্ত দেখতে দুধের মত। দুধের মতই তরল। এই রক্ত যকৃতের কোন ক্ষতি করে না।

অসুবিধে এই, সাধারণ রক্ত অক্সিজেন ছাড়াও যেমন শরীরের বিভিন্ন অঞ্চলে পুষ্টিকর সামগ্রী পৌঁছে দেয়, কৃত্রিম এই রক্তের সে রকম কোন ক্ষমতা নেই।

সম্প্রতি মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত শল্য চিকিৎসকদের এক সম্মেলনে জাপানের বিশিষ্ট শল্য-চিকিৎসক ডঃ কেনজি হোনদা মন্তব্য করেছেন "এ পর্যন্ত দেড় শ জন রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করার সময় এই কৃত্রিম রক্ত আমি ব্যবহার করেছি। কোন জটিলতা আমার চোখে পড়েনি।"

সাধারণ ক্ষেত্রে কারোর শরীরে রক্ত দিতে গেলে দেখতে হয়, কার শরীরে কোন গ্রুপের রক্ত প্রয়োজন। যে কোন গ্রুপের রক্ত হলেই চলে না। কিন্তু নতুন এই রক্তে তেমন কোন বাছ-বিচার নেই। কৃত্রিম এই রক্ত যে কোন মানুষকেই দেওয়া যেতে পারে। অক্সিজেন ছাড়াও এই রক্ত যাতে ভিটামিন, ধাতু এবং অন্যান্য পুষ্টিসামগ্রী বহন করতে পারে বিজ্ঞানীরা সে নিয়ে এখন গবেষণা করছেন। ডঃ হোনদা বলেছেন, 'যদি আমরা সফল হই ভবিষ্যতে লিউকেমিয়া রোগীদের আর বেঘোরে প্রাণ দিতে হবে না'। জরুরী অস্ত্রোপচারের সময় রক্তের দরকার হলে আপাতত পঞ্চাশ শতাংশ আসল রক্ত এবং পঞ্চাশ শতাংশ 'এফ ডি এ'-র মিশ্রণ রোগীর দেহে ঢুকিয়ে দিয়ে থাকেন ডঃ হোনদা। তিনি আশা করেন, ভবিষ্যতে শুধু কৃত্রিম রক্ত হলেই কাজ চলবে।

সমরজিৎ কর

# গ্রাম ঈশ্বরের সৃষ্টি, সবুজ বিপ্লব মানুষের

কল্যাণকুমার দেব

দুটি শীর্ণতোয়া নদীর কাহিনী। ভূগোল বইতে তাদের নাম খুঁজে পাওয়া যাবে না। একটি জলপাইগুড়ি জেলায়, অপরটি রাঢ় দেশে। দুটিরই তীরে দরিদ্র কৃষিজীবীদের বাস। উত্তর বঙ্গের নদীতীরের গ্রামটিতে শ্রাবণ মাসে ধান রোয়া হয়। কোনো বছর বৃষ্টি না হলে ধান জ্বলে যায়—আসন্ন অনাহারের ছায়া দেখে কৃষিজীবীরা কপাল চাপড়ায়।

দক্ষিণের নদীতীরে তিথি বিচার করে ডোঙা বাঁধা হয়। ধান বসানোর সময়ে প্রায় বছরই বর্ষার জলে যথেষ্ট কাদা হয় না। ডোঙা দিয়ে নদীর থেকে জল তুলে জমি কাদা করা হয়। এরপর তিন মাস যখনই ক্ষেতে জল নেমে যায় ডোঙা দিয়ে জল তুলে দেওয়া হয়।

একটি গ্রামে একদিন আতঙ্কের বন্যা বয়ে গেল। মহকুমা শহর থেকে খবর এসেছে সরকার থেকে নদীতে রিভার পাম্প বসাবে আর সবাইকে তার জন্য বছর বছর জলকর দিতে হবে। অবশেষে ঠিক হল গ্রামের লোকেরা শহরে গিয়ে আর্জি জানাবে খাজনা দিতে পারবে না বলে। বলা বাহুল্য তাদের আর্জি গৃহীত হল, বাতিল হয়ে গেল রিভার পাম্প।

অন্য গ্রামটিতেও একদিন পরিদর্শক দল এল রিভার পাম্পের জায়গা নির্বাচন করতে। গ্রামে একটা আশাতীত সুখের কল্পনায় চাপা শিহরন বয়ে গেল। সারা দুপুর কাঠফাটা রোদে সরকারী অফিসার, করণিক, বার্তাবহের মাথায় ছাতা ধরে ঘুরে বেড়াল গ্রামের মাথারা। গ্রামের বউ-ঝিরা ঘোমটা ফাঁক করে দূর থেকে নজর করতে লাগল পরিদর্শক-দলের লোকজনকে। এখন সেখানে বছরে তিনটে চাষ হয়। আমন ধানের দ্বিগুণ ফসল ওঠে, আউশের মরসুমে সংকর জাতের ধানের। গেল অক্টোবরের বানে মাটির ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ার পর পাকা দেওয়ালের বাড়ি উঠেছে গ্রামে পঁচিশটা।

পশু শিকারের যুগ থেকে যখনই মানুষ পশুপালনের যুগে প্রবেশ করল তখনই মানুষকে এমন অনেক কাজ শুরু করতে হল—ক্ষুন্নিবৃত্তি অথবা পরিধানের প্রয়োজন সরাসরি মেটানোর জন্য পশু হত্যার সঙ্গে যে কাজগুলির সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত অপ্রত্যক্ষ। এইভাবে সে নিজের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয়তার চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে অপেক্ষাকৃত ভবিষ্যতে ফললাভের জন্য বর্তমানে সক্রিয় হতে শিখল। এবং অনিবার্যভাবেই তখন তার ওপর অতিরিক্ত দায়িত্ব এসে গেল নিজের কাজকর্ম নিয়ে নিজের পরিকল্পনা করার। অতএব উৎপাদনের তারতম্য লক্ষ করে উৎপাদন ক্রিয়া থেকে জ্ঞানাহরণ শুরু হল। অথচ এত সব করে তার জীবন হল শিকারী জীবনের থেকে স্বচ্ছন্দতর। এর পর কৃষিতে প্রবেশ করে মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম কাজের সময় আরো কমল। অন্যদিকে উৎপাদনের প্রয়োজনগুলি লক্ষ করবার ও শেখবার সময় সে পেল বেশী।

এর কয়েক হাজার বছর পরে অনাহারক্লিষ্ট মানুষের ক্ষোভের রক্তাক্ত বিপ্লবে পরিণতির বিকল্প হিসেবে দেখা দিয়েছে সবুজ বিপ্লব। সেচ ও সারের ঠিক ঠিক প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন সংকর জাতের বীজের ব্যবহার প্রথাগত ফসলের চেয়ে উৎপাদনকে এতখানি বাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে যে তাকে বিপ্লব নাম দিতেই হয়।

জাতীয় আয়ের ভাগাভাগিতে কৃষির অংশ সামান্য কম হলেও ন্যূনতম বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য খাদ্য ফসল উৎপাদন করে কৃষি এবং অধিক সংখ্যক মানুষের লাভজনক কর্মসংস্থানের নীতি কৃষিতেই বেশী সম্ভব ও বাস্তবসম্মত। ভূমি-সংস্কার রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয় এবং পরিস্থিতি আলাদা রকমের হওয়ায় এই ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে গত তিরিশ বছরে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করা হয়েছে। যেটা সকলেই জানেন পাঞ্জাব হরিয়ানায় কৃষি জমির ব্যবসায়িকরণকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। চকবন্দী অর্থাৎ জমি একত্রীকরণ হয়েছে, সমবায় হয়েছে, নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষিজীবীদের সমবায় নয়—ভূমি মালিকদের সিলিং এড়ানোর জন্য তৈরি বাবা পিসী ছেলের সমবায়। এইভাবে পঁচিশ থেকে পাঁচ শ একর জমি এক একটা সমবায় খামারের অধীনে আনতে পারলে সেচ চাষ আর বাজারীকরণের খরচা অনেক কমে যায়। যেমন ধরা যাক একটা আটঘোড়া (অশ্বশক্তির প্রচলিত বাংলা নাম ঘোড়া) মেশিনের (মোটর পাম্পের) দাম আটটা একঘোড়ার মেশিনের অনেক কম—উপরন্তু তাকে চালাবার শ্রমের এবং পিচ্ছিলকারী মবিলের খরচও অনেক কমে যায়। উৎপন্ন ফসলকে ছোট ছোট ট্রাকে করে বাজারে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। অনেকটা জমি এক লপ্তে থাকবার ফলে চাষের ফসল তোলার অনেকটা কাজ ট্রাক্টর, হারভেস্টর প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে করা যায়। প্রতি একক জমির পেছনে ব্যাংক ঋণ, বীজ সার যোগাড় করার যে সব অপ্রত্যক্ষ শ্রম আছে সেটাও অনেক কমে যায়। জমি বড় হওয়ায় জমির একটা না একটা অংশ জলের উৎসের লাগোয়া থাকে এবং অন্যের জমির ওপর দিয়ে নিয়ে আসবার ঝুটঝামেলা ভোগ করতে হয় না। অবশ্য একটা বড় খরচা—সারের খরচাটা একই থেকে যায়।

ফসল ফলাবার কাজে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলির উন্নততম ফসলগুলির প্রয়োগে এইসব কারণে সর্বত্র বড় বড় খামারগুলিই নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। সে খামার কখনো পাঞ্জাব হরিয়ানার ঢঙে ভূস্বামীদের সমবায়ের অথবা পাশ্চাত্যের দেশগুলির মত একক ভূস্বামীর মালিকানাধীন আবার কখনো বা কমিউনিস্ট দেশগুলির মতন কমিউনের মালিকানাধীন (রাশিয়া) অথবা পরিচালনাধীন (চীন)।

পশ্চিম বাংলার একক বৈশিষ্ট্য হল এই বড় খামারের নেতৃত্ব ছাড়াই এখানে সবুজ বিপ্লব শুরু হয়েছে। কৃষির তথা গ্রামের সামগ্রিক উন্নয়নের মডেল স্থাপনের উদ্দেশ্যে সমবায়িক ভিত্তিতে কৃষি খামার গড়ে তোলার যে মহান প্রকল্পগুলি এই শতাব্দীতে ব্যর্থ হয়েছে এবং হতে চলেছে সি এ ডি পি বোধ হয় তার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত। দু-একটি অতি বিচ্ছিন্ন সফলতার নিদর্শনও নিশ্চয়ই আছে কিন্তু সেগুলির সংখ্যা, মোট জমির পরিমাণ এবং প্রচার এত কম যে সেগুলিকে কোনোক্রমেই পশ্চিম বাংলায় সবুজ বিপ্লবের অগ্রদূত বলা যায় না।

অন্যদিকে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেনি দক্ষিণ ও পূর্ব বর্ধমান সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলাগুলির সেচযুক্ত উর্বর জমির সেইসব বিরাট বিরাট তোতও যেগুলো এক এক প্রাক্তন জমিদার পরিবারের সদস্যদের মালিকানায় হয়েও মালিকদের অধিকাংশ অনুপস্থিত থাকার ফলে যার মালিকানা স্বত্ব একই ব্যক্তির দ্বারা প্রযুক্ত হয়। এই সব অনুপস্থিত মালিকরা সাধারণত উচ্চ বর্ণভুক্ত এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কলকাতার অথবা বড় শহরগুলির স্থায়ী বাসিন্দা ব্যবসায়ী অথবা চাকুরীজীবী এদের মধ্যে হয়ত একজন মাত্র গ্রামে থাকেন এবং বাবার কিংবা ঠাকুরদার সমস্ত উত্তরাধিকারীর জমি একাই দেখাশুনো করেন।

তা সত্ত্বেও পশ্চিম বাংলায় সবুজ বিপ্লব যেটুকু হয়েছে, তার পরিমাণটা হেলাফেলার মতন নয় এবং আশ্চর্যের ব্যাপার এটা সম্ভব করেছে নিম্ন মধ্য চাষীরা, যারা নিজেদের শ্রমে নিজেদের জমিতে ফসল ফলায় তারাই ১৯৬৬-৬৭-র সেই তীব্র খাদ্যাভাবের যুগেই ভেতর ভেতর গড়ে তুলেছিল অনাহারকে প্রতিরোধের দুর্গ। নিবিড় এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচী ছিল সত্যিই একটা অত্যন্ত সুপরিকল্পিত পদ্ধতি। এক একটি অঞ্চলকে বেছে নিয়ে সেখানে একই সঙ্গে সেচ সার, বীজ এবং লাভজনক চাষের পক্ষে প্রচার জোগান হয়। যা হয়নি তাকে সমালোচনা করতে গিয়ে যা হয়েছে তা ভুলে যাওয়া ভুল হবে। সবুজ বিপ্লব বরফ কাটে পশ্চিম বাংলায় সেই প্রথম। লেনিন বলেছিলেন, এমনিতে কুড়ি বছরে জনগণের যা শিক্ষা হয়, বিপ্লবের সময়ে একদিনে হয় সেই শিক্ষা। সেটা অবশ্য রাজনৈতিক বিপ্লব সম্পর্কে। কিন্তু সবুজ বিপ্লব যে সত্যিই বিপ্লব তার প্রমাণ পাওয়া গেল এই কর্মসূচীর ফলাফল দেখে। নিরক্ষর, যুগ যুগ ধরে কূপমণ্ডূকতা আর গোষ্ঠী কলহে নিমজ্জিত প্রান্তিক চাষীরা উত্তাল হয়ে উঠল সৃষ্টির উল্লাসে। সারের

..., ... ..., ... ... ..., ... নিতে এবং অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে কোনো জড়তা দেখা গেল না তাদের।

খাঁ খাঁ দুপুর রোদে একদিন একটি একা ছেলেকে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে দেখেছিলাম আমি। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কোথায় যাচ্ছিস? সে মাইল দুই দূরের একটা জায়গার নাম বলল। আমি তাকে বললাম, বাসে চড়িস নি কেন? সে বলল, ধানে পোকা লেগেছে, এখন ধান বাঁচাতে হবে খাই না খাই। আমি তাকে রাগাবার জন্যে বললাম, না খেয়ে থাকলে ধান বাঁচবে? সে ঠান্ডা মাথায় আমাকে বোঝাল এখন পয়সা বাঁচাতে হবে। তবে ওষুধ কেনা হবে তবে ধান বাঁচবে।

কথাটা নিশ্চয়ই তার নিজের নয়, বাবা-মার কাছ থেকে শোনা। তবু বাবা-মার মধ্যেও কী প্রচণ্ড দৃঢ়তা দেখেছিল সে যা তার শিশু মনকে উদ্দীপ্ত করেছিল। মনে হল যেন কোনো পরাধীন দেশের মুক্তিযোদ্ধার ঘোষণা শুনেছি আমি। এও নিশ্চয়ই মুক্তিযুদ্ধ—অনাহার থেকে মুক্তির। আগামী কালের সোনালী দিনের জন্যে আজকের কষ্টকে বরণ করে নেওয়া।

ছোট খামার এইসব অগ্রণী অঞ্চলগুলিতে কিছু কিছু অসুবিধাকে জয় করতে সমর্থ হয়েছে। সার, বীজ, কীটনাশক খুচরো দোকানে পাওয়া যায়। ছোটখাটো যন্ত্রপাতি যেমন কীটনাশক স্প্রে করার যন্ত্র, প্ল্যান্টার, ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার ভাড়া পাওয়া যায়। অন্যের জমির ওপর দিয়ে নালা কেটে জল নিয়ে যাওয়ার অধিকারও মোটামুটি স্বীকৃত।

সবগুলি অসুবিধা জয় করা অবশ্যই সম্ভব হয়নি। তার একটি হল বিশেষজ্ঞতার প্রশ্নে। ছোট খামারের একজন মালিককে বিভিন্ন বিষয় জানতে হয়, এখানে কোনো দায়িত্ব বিভাজনের সুবিধা নেই। অবশ্যই সরকারী কৃষি প্রসারণ আধিকারিকরা এবং গ্রামসেবকরা এর জন্যে রয়েছেন কিন্তু এই জাতীয় ব্যাপার সরকারী যন্ত্রের দ্বারা ঠিক হয় না। কিছু দক্ষিণার বিনিময়ে গাছের রোগ, পোকা দমন মাটি পরীক্ষা এবং সার ইত্যাদি বিষয়ক বেসরকারী উপদেষ্টার পেশা প্রচলিত হলে সে ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয় হতে পারে। বিশেষ বিশেষ গাছের বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয়। যেমন বড় বড় আমবাগানে প্রতি বছর বসন্তকালে হর্মোন স্প্রে করা হয় যাতে বকুলগুলি ঝরে না পড়ে যায়। আশা করা যেতে পারে যে কিছুদিন পরে এমন লোক পাওয়া যাবে যারা গাছ প্রতি নির্দিষ্ট ... ... প্রতিষ্ঠানের একটা দুটো গাছও স্প্রে ...

জাতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থা এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উৎপাদন বাড়ানোর ব্যাপারে যে গবেষণা করেছেন তা তাঁরা কৃষকদের ব্যবহারের জন্য প্রকাশও করেছেন কিন্তু এই গবেষণাগুলো করা হয় সর্বোত্তম অবস্থায়। গোখাদ্যের চাষের জন্যও তাঁরা নির্দেশ করেন জল দাঁড়ায় না এমন দো-আঁশলা জমি চাই। তবে নিকৃষ্ট জমিতে কি হবে? এ ছাড়া তাঁরা সর্বাধিক উৎপাদনের শর্ত লেখেন কিন্তু চাষীরা জানতে চায় প্রতি একক বিনিয়োগে সর্বাধিক উৎপাদনের শর্ত (আলুর মতন যে সব চাষে খরচ খুব বেশী, চাষী নিজের সবটা জমি সাধারণত সেই চাষ করে না এবং জমির বার্ষিক মূল্য সেখানে ধরতে হয় না কিন্তু সরষে বা কলাই-এর মতন অল্প খরচের চাষে বিনিয়োগের মধ্যে জমির বার্ষিক মূল্যও অন্তর্ভুক্ত থাকে) অর্থাৎ ধরা যাক এক হাজার টাকা বিনিয়োগ করে নির্দিষ্ট জমির থেকে দু হাজার টাকার ফসল পাওয়া গেল কিন্তু পাঁচশো টাকা বিনিয়োগ করলে পাওয়া যেতে পারে বারোশো টাকার ফসল। এখানে চাষী নিশ্চয়ই পাঁচশো টাকা বিনিয়োগ করতে চাইবেন, যদি না জমির পরিমাণ খুব কম হয়। এইসব খুঁটিনাটি বড় খামারগুলি ছোট এক-ফালি জমিতে পরীক্ষামূলক চাষ করে ও হিসেব-নিকেশ করে দেখে নিতে পারেন। ছোটদের পক্ষে এই তথ্যগুলি তৈরী পেলে ভাল হয়। কৃষি গবেষণার ফলাফল যদি সরাসরি ছোট চাষীদের ব্যবহারো-পযোগী পুস্তিকায় খুব সস্তায় তাদের জোগানো হয় তা হলে বিরাট উপকার হয়। আর একটা কথা এইখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না—ছাত্রের অভাবে গ্রামাঞ্চলের বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি যে কার্যত নিষ্ফল হয়ে রয়েছে, এই ধরনের পাঠ্য পেলে নিরক্ষরদের পড়তে শেখার আগ্রহও জন্মাবে।

বলা হয়ে থাকে, গুরু নানক বর্ণাশ্রম লোপ করে খালসা সাম্যের ধারণা ছড়িয়ে দেওয়ায় পাঞ্জাবের কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের সামাজিক ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

এখানে অবস্থাপন্ন ভূস্বামীরা প্রধানত উচ্চ-বর্ণের। তাঁদের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক সামর্থ্য কৃষির উন্নয়নে লাগাবার বদলে কৃষিকে ঘৃণা করে তাঁরা শহরবাসী হয়ে পড়ায় তাঁদের মালিকানায় যে সকল কৃষি জমি আছে সেগুলি অভিভাবকহীন হয়ে, দায়িত্ব আছে অথচ ক্ষমতা নেই এমন একদল বর্গাদারের পরিচালনাধীন হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার বদলে এগুলিকে তাৎক্ষণিক কিছু অর্থপ্রদানকারী সম্পত্তি হিসেবে ভাবা হয়েছে।

অনেক প্রথম অর্থনীতিবিদের মতে অন্যান্য দেশের ইতিহাসে কৃষির উদ্বৃত্ত মূল্য দিয়েই শিল্প গড়ে ওঠে কিন্তু আমাদের দেশে কেবল উল্টো গতি হয়েছে—স্বাধীনতার পর থেকে শিল্পের লভ্যাংশ সরকার কর্তৃক বিনিয়োজিত হয়েছে কৃষিখাতে। (তিনি অবশ্য এর নিদান হিসেবে সমবায়ের কথা বলেছেন যেটা আমরা দেখেছি ও দেখব সামাজিক পরিবর্তনের আগে সম্ভব নয়।) কৃষির উদ্বৃত্ত মূ... যে বিপুল পরিমাণে অবস্থাপন্ন চাষী ও ব্যবসায়ী... দের মারফত শহরে চলে এসেছে, সেটা সম্ভবত ... নজর এড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে যে পরিমাণ ক্ষ... বা বৃহৎ শিল্পে নিয়োজিত হয়েছে, সামগ্রিকভা... দেশের অর্থনীতির তা উপকারই করেছে কি... পরিমাণে তা নগণ্য। এই উদ্বৃত্ত মূল্যের অধিকাংশ গেছে ভোগ্য সামগ্রীর পেছনে অথবা অনুৎপাদনশী... ক্ষেত্রে। গ্রাম থেকে শহরে চলে আসার কারণ খুঁজে গিয়ে অনেক সময়েই শহরের অধিকতর সুযোগ সুবিধার কথা বলা হয় কিন্তু আমার বিশ্বাস ... ধারণা সমাজবিজ্ঞানের ধোপে টেঁকে না। অবস্থাপ... গ্রামবাসীদের শহরে চলে আসার (যাকে কবিগুরু বলেছিলেন দেহের সমস্ত রক্ত মুখে জমা হওয়ার) কারণ খুঁজতে হবে শহরের আকর্ষণের মধ্যে দ্বিতীয়ত এবং প্রথমত গ্রামের বিকর্ষণের মধ্যে। কিছু বেশী টাকা-পয়সা জমাবার পরও একজন গ্রামবাসী গ্রামেরই মানুষ—গ্রামের অসুবিধায় অভ্যস্ত শহরের অসুবিধায় অনভ্যস্ত। টাকা তিনি বিনিয়োগ করতে চান গ্রামের কৃষি বা ক্ষুদ্রশিল্পে এবং ভোগ করতেও চান গ্রামেরই মানদণ্ড অনুযায়ী। কিন্তু বিনিয়োগ করতে গিয়ে গ্রামের অনড় অর্থনীতির সঙ্গে তাঁর ঠোকাঠুকি লেগে যায়—যার কথা পরে বলছি আর ভোগ করতে বসবাসের পক্ষে যে বাধা উপস্থিত হয় তা হল চুরি ও ডাকাতি। বিশেষত বর্ধমানের কৃষি সমৃদ্ধ দক্ষিণ ও পূর্ব অংশে এবং জলপাইগুড়ি জেলায় দু-একবার ডাকাতি হয়ে যাওয়ার পর গ্রাম ছাড়া হয়েছেন বহু পরিবার। প্রথমে হয়ত তাঁরা পাঠিয়ে দেন পরিবারের মহিলা ও শিশুদের। তারপর শহরের ওপর নির্ভরতা বাড়তে বাড়তে আর গ্রামের ওপর নির্ভরতা কমতে কমতে একসময়ে তাঁদের গ্রাস করে ফেলে শহর।

পুরোনো অর্থনীতির অনড়তাকে আরো সাহায্য করছে দশকের পর দশক ধরে অসম্পূর্ণ সেটেলমেন্ট-জনিত বিভ্রান্তি, মামলা, দুর্নীতি ব্রাহস্পর্শ। রাজ্য সরকার আগামী দু-এক বছরের মধ্যে সেটেলমেন্টটা শেষ করুন তো দেখি। কলকাতায় ও জেলা শহরগুলিতে তো রাজ্য সরকারের অনেক উদ্বৃত্ত কর্মচারী আছেন, ডেপুটেশন বৃত্তি দিয়ে তাঁদের নিয়ে আসুন না গ্রামে।

পাঞ্জাবের ভূমিহীনরা ব্যাপকভাবে সেনাবাহিনীতে চাকরী করার ফলে অথবা অন্যান্য রাজ্যে নানান পেশায় ছড়িয়ে পড়বার ফলে পাঞ্জাবে জমির ওপর দারিদ্র্যের চাপ কম ছিল এবং অন্যত্র উপার্জিত অর্থ বিনিয়োজিত হয়েছিল কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পে। আর অন্যতম শিল্প প্রধান রাজ্য হলেও শিল্প এখানে জমির ওপর দারিদ্র্যের চাপ কমাতে সামান্যই পেরেছে এর প্রথমে অর্থনৈতিক ও পরে রাজনৈতিক ফলাফল আলোচনা শুরুর আগে এইটা বলে নেওয়া প্রয়োজন যে জমির ওপর স্থানীয় দরিদ্রদের চাপ না থাকবার ফলে পাঞ্জাব হরিয়ানায় যে অতি যান্ত্রীকরণ হয়েছে তাকে আমি আদর্শ হিসেবে স্থাপন করতে চাইছি না। জনসম্পদের প্রাচুর্যের এই দেশে দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের পরিবর্তে আশু লাভের আশায় আমদানী করা দুর্লভ ডিজেল চালিত ট্রাক্টর ও হারভেস্টরের অতি ব্যবহার একদিকে যেমন কৃষিকে একটা পরমুখাপেক্ষিতার ওপর স্থাপন করেছে অন্যদিকে এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের মারফত একটা সামাজিক ন্যায়বিচার সমন্বিত সমা... গড়ে তোলার দায়িত্ব থেকেও করেছে আত্মস্খলন। আবার এটাও ঠিক পশ্চিম বাংলায় দারিদ্র্যের চা... কৃষির উন্নতিকে বাধা দিচ্ছে।

অধিক ফলনশীল জাতের চাষে পৌনঃপুনিক মূলধন বেশী লাগে বলে চুরিটাকে চাষী সবচে... বেশী ভয় পান। কৃষিজাত ফসলের উদ্বৃত্ত মূ... কৃষির উন্নতিতে বিনিয়োগের বিরুদ্ধে পুরো... ধরনের কৃষি অর্থনীতির অনড়তায় এককভাবে এ... সবচেয়ে বড় কারণ। ধরুন এখানে একটা ম... গ্রীষ্মকালীন উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের চাষ হ...

বিঘা জমি আছে। এই পাঁচশো বিঘা জমির মধ্যে পাঁচ দশটা মাঠ-কুঁড়ে আছে যেখানে একজোজন চাষী পালা করে করে রাত পাহারা দেন। এখানকার চাষীরা চুরি কাকে বলে ভুলে গেছেন পাহারা ছাড়াও দুটো কারণে। এ গ্রামে বেশী ফসল ওঠে বলে এ গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা সাধারণভাবে ভাল। এই গ্রামের ভূমিহীনরা সংবৎসর মাঠে কাজ পান এবং কাজ যখন থাকে না তখনো অবস্থাপন্ন চাষীদের ঘরে হাত পাতলে সামান্য পেট ভরাবার মতন ধানটা কর্জ পেতে অসুবিধা হয় না। দ্বিতীয়ত কৃষিজাত ফসল তো আর ঘড়ি বা রেডিও নয়, চোরেই ফসল বেশী দূরে বয়ে নিয়ে যাওয়া পোষায় না বলে দূরের থেকে চোর আসে না।

এবার এর থেকে মাত্র দু' মাইল দূরের আর একটা মাঠের কথা ধরুন। মাটির উর্বরতা জলের প্রাপ্তিযোগ্যতা এখানে একই রকম। এই মাঠে পাঁচ বা পনেরো বিঘা জমি আছে এমন একজন কৃষক যদি এখানে গ্রীষ্মকালীন উচ্চ ফলনশীল ধানের বা শীতকালীন জ্যোতি বা চন্দ্রমুখী আলুর চাষ করাতে চান তাঁকে একার উদ্যোগে রাত পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে—স্থানীয় চোরদের বিরুদ্ধে কলে যেটা খুব সহজ হবে না। এ ছাড়া তাঁকে জমিতে বিশাল খরচ করে বেড়া দিতে হবে কারণ চাষ হয় না বলে আমন চাষের সময়টুকু ছাড়া এ মাঠে সারা বছরই গরু ছাড়া থাকে। এত কিছু বাড়তি খরচা পুষিয়ে লাভের খুব সামান্যই থাকে বলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যা হয়—অনেক কিছু বিবেচনা করে অবশেষে তিনি নতুন ধরনের চাষ করার পরিকল্পনাটাই পরিত্যাগ করেন। হ্যাঁ হতে পারত যদি গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি চুরি বন্ধের ব্যবস্থা নিতে পারত—এবং নেওয়াটা খুবই উচিত ছিল কারণ গ্রামের সামগ্রিক উন্নতি এটার ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু পঞ্চায়েতের এরকম কোনো কর্মসূচীর কথা শুনিনি।

প্রশ্ন উঠতে পারে ঐ একজনও তো উদ্যোগ নিতে পারেন অধিকাংশকে নিয়ে উন্নত চাষ করাবার। বস্তুত ঐ যে প্রথম গ্রামটার কথা বলছিলাম সেখানেও নিশ্চয়ই একজনই প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন—যাঁর কথায় এক এক করে সম্মত হয়েছিলেন গ্রামের সবাই। কিন্তু এটা খুব সহজ কাজ নয়। হয়ত আগের গ্রামের লোকজনেরা সব একই বর্ণের ছিলেন—সবাই মাহিষ্য, যেখানে দ্বিতীয় গ্রামে রয়েছে দুটি বা তিনটি যুযুধান বর্ণ। একই অবিশ্বাস ও ঘৃণার আবর্তে সবাই পাক খেতেই থাকবে, আরো ভাল-ভাবে যে বাঁচা যায় এই বোধ তাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা সহজ নয়। একবার যদি কোনো গঠনমূলক কাজে সবাইকে সহযোগিতার সম্পর্কে আনা যায়—তখন দেখা যাবে দু-এক মরসুমের মধ্যে পুরোনো কলহ কোথায় উধাও হয়ে গেছে। কিন্তু নেহাৎ সম্ভাবনার ওপর ছেড়ে দিলে এই শুরুটা হয়ত আগামী একশো বছরেও হয়ে উঠবে না।

ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে খাস জমি বিলির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বীজ ও সারের মিনি কিট দিয়ে সরকার ভাল কাজ করেছেন কিন্তু এ নিয়ে লুকোচাপা করে কি লাভ যে অনেক ক্ষেত্রেই বীজটা তারা ভেঙে খেয়ে ফেলে আর সারটা বেচে দেওয়া হয় নামমাত্র দামে। তার বদলে প্রতি ব্লকে গরিব চাষীদের নিয়ে অনেক-গুলি করে কর্মীবাহিনী তৈরী করা হোক যাঁরা জমি চষা হওয়ার পর সার ও বীজতলায় বীজ ওজন দেখিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে আসবেন, এমন কি দরকার হলে রোওয়াও করে আসবেন। এতে করে ঐ ভূমিহীন চাষীরা দু-এক বছরের মধ্যেই দায়িত্বশীল চাষীতে রূপান্তরিত হবেন। খরচ বাড়বে সামান্যই কিন্তু কাজ হবে অনেক নিশ্চিত।

দারিদ্র্যের চাপের রাজনৈতিক দিকটা দেখা যাক এবার। আমাদের দেশের মিশ্র অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হল নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যক্তিগত মুনাফা ব্যক্তিগত মূলধন সঞ্চয়ের অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখে, মূল ভারী শিল্প-গুলির রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং কৃষি জোতে যতদূর

সম্ভব কৃষি শ্রমিকদের মালিকানা কায়েম করা। বর্গাদাররা শ্রম দেন ঝুঁকিও নেন আধাআধি ভাগা-ভাগির ক্ষেত্রে এবং তিন-এক ভাগাভাগির ক্ষেত্রে বীজ এবং সারও দেন। ১৯৭৭-এর সংশোধিত ভূমি সংস্কার আইন এবং অপারেশন বর্গা কর্মসূচী অনুসারে বর্গাদারদের নথিভুক্ত করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার এখন খুব জোর দিচ্ছেন। সরকারের মতে এর ফলে বর্গাদাররা স্থায়ী অধিকার পেলে জমির দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের চিন্তা করতে পারবেন এবং বর্গা নথিভুক্ত হওয়ার পরচা দেখিয়ে ব্যাংকের থেকে কৃষি ঋণ পাবেন। বিপরীতে বলা হচ্ছে স্থায়ী অধিকার পাওয়ার সঙ্গে চাষ উন্নত করার প্রবৃত্তি বরঞ্চ কমে যাচ্ছে এবং লক্ষ্যটা এখন শুধু ভূস্বামীর প্রাপ্য ফাঁকি দেওয়ার দিকে।

গ্রামের বড় ভূস্বামীরা এখন ইন্দিরা গান্ধীর দিকে তাকিয়ে বসে আছেন কিন্তু ইন্দিরা কংগ্রেস রাজ্য ক্ষমতায় এলেও তাঁদের উদ্ধার করবে না। ভেতর ভেতর প্রায় সব দলের উপর মহলের কাছেই তাঁরা একটা অপ্রয়োজনীয় শ্রেণী বলে পরিত্যক্ত হয়ে গেছেন। তাঁদের বাঁচবার পথ নিজেদের হাতে করে নিতে হবে এবং সে পথ ঘৃণা ও লড়াই-এর নয়, সাহায্য ও সামগ্রিক উন্নয়নের। ১৯৬৮-এর মাঝ থেকে '৭০-এর মাঝ পর্যন্ত যখন গ্রামাঞ্চলে নকশালদের খতম অভিযান চলছিল কী ব্যবস্থা নিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার? ব্যাপক নকশাল-বিরোধী অভিযান শুরু হল যখন শহরাঞ্চলে পুলিস মিলিটারী ব্যবসায়ীদের গায়ে হাত পড়ল তারপর থেকে। কেউ কেউ বামপন্থী কৃষক কর্মীদের দুর্নীতির সুযোগ নিয়ে ঘুষ দিয়ে জমি বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। এটা একটা উপায়। কিন্তু এ উপায়ও দীর্ঘদিন ফলপ্রসূ হবে না। দিনমজুরদের জন্য অস্বাভাবিক মজুরী দাবি করা হচ্ছে যা দিতে গেলে চাষ ছেড়ে দিতে হয়। আবার চাষ কমে গেলে কাজ না পেয়ে দিনমজুররা এসে দু' টাকার বিনিময়ে কাজ করতে চাইছে। লোকসানের রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানায় সরকার মজুরী বাড়িয়ে যেতে পারে কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে তা কি করে হবে? মজুরী খুব বেড়ে গেলে জমিতে ট্রাক্টরের ব্যবহার বাড়ছে—দিনমজুররা আরো বেকার হচ্ছে, অনাহারে থাকছে। ট্রাক্টর আমদানীতে আপত্তি নেই বাম নেতাদের। কারণ তার কারিগরী আমদানী হচ্ছে পূর্ব ইউরোপ থেকে। কোথাও কোথাও বামপন্থী দলীয় কর্মীদের নেতৃত্বে বহিরাগত অতি দরিদ্র বলা হচ্ছে কাজ স্থানীয়দের দাও। আসল বর্গাদারকে হটিয়ে দিয়ে অন্যের নাম রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। মোদ্দা কথা হল, গ্রামে অদ্ভুত অদ্ভুত লড়াই লাগিয়ে দিয়ে মজা দেখছেন শহরবাসী নেতারা। ভূস্বামীদের ঘাড়ের ওপর অনেক দায়িত্ব এসে পড়েছেই। সারা দেশের দারিদ্র্যের সমুদ্রে দ্বীপের মতন ভারী শিল্প আর শহর যদি বা বেঁচে থাকতে পারে (যদি একে বেঁচে থাকা বলে) গ্রামের দারিদ্র্যের মধ্যে দ্বীপের মতন থাকতে পারবেন না। ভূস্বামীরা। সাঁওতাল পরগণায় শালগাছের ওপর নির্ভর করে আদিবাসীরা। বেশী লাভের জন্য শাল কেটে সেগুন বসানোর বিরুদ্ধে সেখানে আওয়াজ উঠেছে সেগুন রোপণই বন্ধ কর। আমাদের দেশে কি পরিকল্পনা করার সময়ে অর্থ-নৈতিক জরীপের প্রতিবেদনগুলো পড়ে দেখা হয়? উন্নততর উৎপাদনের যূপকাষ্ঠে কেন বলি দেওয়া হবে প্রথাগত উৎপাদনের ওপর বেঁচে থাকা মানুষ-গুলোকে? উন্নততর উৎপাদনের অতিরিক্ত মুনাফার একটা অংশ কেন আগে থেকেই সরিয়ে রাখা হয় না সেই মানুষগুলোর বিকল্প জীবিকার জন্যে? সবুজ বিপ্লব মানেই যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য নয় তা তো আজ পশ্চিম বাংলায় প্রমাণিত।

এই আলোচনায় ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক কারণ-গুলির ভিতর মূলত ব্যক্তিগত অংশটাই আলোচিত হয়েছে। যে কোনো ক্ষেত্রের মত কৃষির ক্ষেত্রেও উন্নতির হার হল ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক কারণে গুণ-ফলের সমানুপাতী। পশ্চিমের দেশগুলিতে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাগুলির ব্যাপারে ব্যক্তি ভূস্বামীদের পারস্পরিক সহযোগিতা একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে, আমাদের দেশে ঐতিহাসিকভাবে যা অনুপস্থিত, সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাগুলির জন্য রাষ্ট্রের কেন্দ্রীকরণের শক্তির বিশেষ প্রয়োজন। ব্যবস্থা কি কি নিতে হবে, কিভাবে তা হতে পারে এসব বিভিন্ন কারিগরী সমস্যার সমাধান পরিকল্পনা-রচয়িতাদের কাজ। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রয়াসকে কোন খাতে নিয়ে যেতে হবে, সেচ, নদী শাসন, বনভূমি তৈরী, কৃষিপণ্যের বিপণন নিয়ে বিদগ্ধ অর্থনীতিবিদ ও বৈজ্ঞানিকদের বক্তব্য প্রায়ই উচ্চারিত এবং জনচিত্তে এর প্রভাবও যথেষ্ট। কে যেন বলেছিলেন ভারতীয় কৃষি হল বৃষ্টির ওপরে একটি জুয়া খেলা। আমার তো মনে হয় ভারতীয় কৃষি শুধু বৃষ্টির ওপর কেন, চুরি, সম্পূর্ণ অস্থির বাজারদর—অনেক কিছুর ওপরই একটা জুয়াখেলা। এই গত বছরই দেখুন না, অক্টোবরের বন্যায় আমন হেজে যাওয়ার পর রাজ্য সরকার জোরে চাপ দিলেন আলু চাষের ওপর। চাষীরাও বানের লোকসান সামলাতে ঘটি-বাটি বেচে আলু চাষ করলেন। কি ফল হল? না, আলুর দর গত বছর এমনভাবে পড়ে গেল যে শেষ পর্যন্ত ফসল মাঠ থেকে তুলে বাজারে বয়ে নিয়ে যাওয়ার খরচ পোষায় না। চাষীরা আর কাঁহাতক লোকসান সইবেন? পরের মরসুমে খুব কমে গেল আলুর চাষ যার জন্য এ বছরই আলুর দাম আগুন হয়ে গেল। রাজ্য সরকার, যার মন্ত্রিসভায় আছেন নাম-করা একজন অর্থনীতিবিদ, কি এগুলো জানতেন না? যখন আলুর দর যাচ্ছিল, সরকার তখন কিনব বলেও আলু কিনলেন না কেন? এমন অনেকগুলো সহজ কর্মসূচী আছে যার উপকারিতা নিয়ে গত পঞ্চাশ বছর ধরে মানুষের মনে কোনো সন্দেহ নেই অথচ কোনো অদৃশ্য হাতের বাধায় যেন তা হচ্ছে না। এর অন্তত একটা উদাহরণ কাছেই রয়েছে তা হল পড়ে থাকা অনুর্বর জমিতে বনভূমি সৃজন করে ভূমি সংরক্ষণ। অন্যদিকে এমন কিছু কিছু ব্যাপার আছে যা নিয়ে জনচিত্তে যথেষ্ট সন্দেহ আছে কিন্তু কোনো অশ্রুত মন্ত্রের বলে তা হয়ে যাচ্ছে। যেমন আলিপুরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানান্তর। আমাদের এখন যথেষ্ট গবেষণার প্রয়োজন এই সরকার সম্পর্কেই। এই সরকার—সে যে মন্ত্রিসভার পরিচালনাতেই থাকুক না কেন, চলে কিসের জোরে এবং যখন চলে না সেই বা কিসের বাধায়?

# ৮০-র উইম্বলডন
# র্গের অসাধারণত্ব

টানা চার বছরের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন সুইডেনের প্যার স্টার বিয়র্ন বর্গ আবার চ্যাম্পিয়ন হবেন এটা ত্যাশিতই ছিল। অপ্রত্যাশিত ছিল ইভন গুলাগংয়ের তাব জয়।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী মেয়ে গুলাগং প্রথম ইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হন ১৯৭১ সালে। তারপর চনবার ফাইনালে উঠে দুবার (৭২ ও ৭৫ সাল) রেন যুক্তরাষ্ট্রের বিলি জিন কিংয়ের কাছে, একবার ৭৬ সাল) ক্রিস এভার্টের কাছে। এবার নিয়ে পাঁচবার াইনাল খেলে দ্বিতীয় খেতাব পেলেন ক্রিস এভার্টকেই াইনালে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে। ৭৪ ও ৭৬-এর খেতাব বজয়িনী ক্রিস এভার্ট ছয় বার ফাইনাল খেলে হারলেন ার বার। তার মধ্যে শেষ তিন বছর ফাইনালে উপর্যুপরি পরাজয়। গুলাগং ছিলেন চার নম্বর বাছাই, এভার্ট ৩ নম্বর। দুজন দু দেশের মেয়ে কিন্তু এক দেশের ঘরনী। দুজনেরই ব্রিটিশ স্বামী। টেনিস খেলোয়াড় এডওয়ার্ড কলিকে বিয়ে করার পর গুলাগং হয়ে যান গুলাগং কলি। ক্রিস এভার্ট এভার্ট-লয়েডে পরিণত হন টেনিস খেলোয়াড় জন লয়েডের সঙ্গে বিয়ের পর।

তিন বছর আগে একটি কন্যা সন্তান প্রসব করার পর গুলাগং কলি বলেছিলেন, "আমি চাই আর একটি সন্তান এবং উইম্বলডনের আর একটি খেতাব।"

একটি সাধ পূর্ণ হল এবং আবার টেনিসের শীর্ষ তারকার সম্মান পেলেন। সেমিফাইনালে দুই নম্বর বাছাই যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেসি অস্টিনকে এবং ফাইনালে তিন নম্বর বাছাই ক্রিস এভার্টকে হারিয়ে। গত দু বছরের চ্যাম্পিয়ন চেকোশ্লোভাকিয়ার মেয়ে এবং যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারিণী মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা ছিলেন শীর্ষ বাছাই। কিন্তু তিনি নিজের ফর্ম অনুযায়ী এ বছর খেলতে পারেননি। ২৩ বছর বয়সী নাভ্রাতিলোভা অতি কষ্টে ৩৬ বৎসর বয়সী বিলি জিন কিংকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠেন, কিন্তু সেমিফাইনালে হেরে যান ক্রিস এভার্টের কাছে, গত দু বছর যাকে ফাইনালে হারিয়ে খেতাব জিতেছিলেন।

সবাই জানে, খেলোয়াড়দের সাম্প্রতিক যোগ্যতা এবং 'অ্যাসোসিয়েশন টেনিস প্রোফেশনাল সংস্থার পয়েন্টের হিসাব অনুযায়ী বাছাই তালিকা তৈরি করা হয়। এই তালিকা হচ্ছে প্রতিযোগীদের মানের মাপকাঠি। অর্থাৎ খেতাব জয়ে কে কতখানি সম্ভাব্য খেলোয়াড় তারই হিসাব।

মেয়েদের সিঙ্গলসে বাছাই তালিকা অনুযায়ী ফল না ফললেও পুরুষদের সিঙ্গলসে কিন্তু ফল হুবহু মিলে গেছে। শীর্ষ বাছাই বিয়র্ন বর্গই ফাইনালে দ্বিতীয় [illegible] ম্যাকেনরোকে হারিয়ে উপর্যুপরি পাঁচ বছর চ্যাম্পিয়ন হবার অনন্য সম্মান পেয়েছেন এবং ২৪ বছর বয়সে এমন এক কীর্তি সৌধ গড়েছেন যা ক্রীড়া বিশ্বে তাকে কিংবদন্তীতে পরিণত করেছে। কে জানে পৃথিবীর সবচেয়ে মর্যাদাময় এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত টেনিস প্রতিযোগিতায় উপর্যুপরি ছয় বছর তিনি জয়ীর সম্মান পাবেন কিনা।

টানা ছয় বছর উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হবার অবশ্যই নজির আছে। কিন্তু সেটা টেনিসের শৈশব অবস্থায়। উইম্বলডন শুরু হয় ১৮৭৭ সালে। ৮১ থেকে ৮৬ পর্যন্ত টানা ছয় বছর চ্যাম্পিয়ন হন ইংল্যান্ডের উইলিয়াম রেনশ। ইংল্যান্ডের আর ডোহার্টি (১৮৯৭—১৯০০ সাল) টানা চার বছর, তার ভাই হাগ ডোহার্টি (১৯০২-১৯০৬ সাল) টানা পাঁচ বছর এবং অস্ট্রেলিয়ার অ্যান্টনী উইল্ডিং (১৯১০—১৯১৩ সাল) টানা চার বছর বিজয়ী হয়েছেন। কিন্তু তখন ছিল ফুল প্যান্ট পরে শখের টেনিস খেলার যুগ এবং নিয়ম ছিল আগের বারের বিজয়ীকে অন্য কোন ম্যাচ খেলতে হবে না। তিনি চ্যালেঞ্জার হয়ে বসে থাকবেন।

উইম্বলডন ট্রফি চুম্বন করছেন বিয়র্ন বর্গ

প্রতিযোগিতার বিজয়ীকে তার সঙ্গে খেলতে হবে ট্রফি লাভের জন্য। ১৯২২ থেকে চ্যালেঞ্জ প্রথা উঠে যায় এবং খেতাব জয় কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকে।

১৯৩৪ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের ফ্রেড পেরী যখন উপর্যুপরি তিনবার বিজয়ী হন তখনো ছিল ফুলপ্যান্ট পরে খেলার রেওয়াজ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু আগে এবং যুদ্ধের পরে টেনিসে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে এবং টোট্যাল ওয়ার ও পাওয়ার টেনিসের শুরু হয় অ্যামেচার ও প্রোফেশনালদের মিশ্র প্রতিযোগিতা শুরু হওয়া থেকে। এই অবস্থার মধ্যে বিয়র্ন বর্গের টানা পাঁচ বছর চ্যাম্পিয়ানের সম্মানলাভ অসাধারণ এক কীর্তি।

বর্গ কিন্তু এখনো পর পর চারিটি বড় প্রতিযোগিতা জিতে গ্র্যান্ড শ্লাম পাননি। অস্ট্রেলিয়ার অসাধারণ খেলোয়াড় রড লেভার পেয়েছেন দুবার—১৯৬২ ও ১৯৬৯ সালে। অনেকের ধারণা, ৬১ ও ৬২তে চ্যাম্পিয়ন হবার পর লেভার যদি প্রোফেশনাল না হতেন এবং উইম্বলডনে খেলার সুযোগ পেতেন তা হলে তার পক্ষে হয়তো একাধিক্রমে পাঁচ-সাত বছর খেতাব ধরে রাখা সম্ভব হত। কারণ পাঁচ বছর তিনি উইম্বলডনে খেলতেই পারেননি। প্রোফেশনালদের জন্য উইম্বলডনের দরজা মুক্ত হবার পর তিনি আবার খেলতে শুরু করেন এবং ৬৮ ও ৬৯ সালে পর পর চ্যাম্পিয়ন হন।

তাই নিশ্চয় করে বলা শক্ত, কে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড়। রড লেভার? না, বিয়র্ন বর্গ?

গত বছর ফ্রেড পেরীর রেকর্ড ম্লান করে চার বার চ্যাম্পিয়ন হবার পর বর্গ নিজেই বলেছিলেন, "আমি স্বীকার করি না আমি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। আমাকে সেটা প্রমাণ করতে হবে। আমার প্রথম লক্ষ ফ্লাসিং মেডোতে যুক্তরাষ্ট্রীয় চ্যাম্পিয়নশিপ জয়, তারপর গ্র্যান্ড শ্লাম লাভ। কিন্তু ফ্লাসিং মেডোতে হেরে গেলেন রসকো ট্যানারের কাছে। উইম্বলডনের ফাইনালে যাঁকে হারিয়েছিলেন। তার পরে একটি প্রতিযোগিতায় হারেন আর্জেন্টিনার গিলারমো ভিলাসের কাছে। ট্যানার এবং ভিলাস দুজনই বাঁ-হাতি খেলোয়াড়। এবারের উইম্বলডন ফাইনালিস্ট ২১ বছর বয়সী মার্কিন খেলোয়াড় ম্যাকেনরোও খেলেন বাঁ-হাতে। এই ম্যাকেনরোর সঙ্গে বর্গ আগে ৭ বার খেলেছেন নানা প্রতিযোগিতায়। ৪ বার জিতেছেন বর্গ, ৩ বার ম্যাকেনরো। সুতরাং বাঁ-হাতি খেলোয়াড়ের কাছে বর্গের পরাজয়ের অনেক নজির আছে। কিন্তু উইম্বলডনে বর্গের উপর বোধ হয় ভর করে অলৌকিক শক্তি। না হলে কি হারের মুখ থেকেও জয় করায়ত্ত করতে পারেন? ৭৮এ আমেরিকার ভিক্টর আমায়ার কাছে প্রথম রাউন্ডে হারতে হারতে বেঁচে গিয়েছিলেন। গত বছর দ্বিতীয় রাউন্ডে হারতে বসেছিলেন বিজয় অমৃতরাজের কাছে। ৭৭-এর ফাইনালে জিমি কোনর্সকে হারিয়েছিলেন হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে। গত বছর রসকো ট্যানারের সঙ্গেও ফাইনালে দেখা গিয়েছিল টেনিসের ক্লিংসক্লিগ। পাঁচ সেটের মরণপণ সংগ্রামে জিতেছিলেন বর্গ। এবার তো ম্যাকেনরোর সঙ্গে ফাইনাল খেলাটি উইম্বলডনের ১০৪ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে স্মরণীয় শ্বাসরোধকারী সংগ্রাম। দীর্ঘ ৩ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট ধরে সুনিয়ন্ত্রিত সার্ভিস, সার্ভিস রিটার্ন, ড্রপশট, ভলি, পাসিং শট এবং টেনিস কেতাবে যত রকম মার আছে তার সব কিছু অধীর আগ্রহে দেখেছেন সেন্টার কোর্টের ১৬ হাজার দর্শক। আশা নিরাশার দোলায় এবং উত্তেজনার আবেগে টেনিস তীর্থ সরগরম হয়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্র খেতাব জয়ী ম্যাকেনরো তার জীবনের প্রথম উইম্বলডন ফাইনালে বিজয়ী হতে না পারলেও হেরেছেন বীরের মত তাক লাগানো টেনিস খেলে। বর্গ যখন ২—১ সেটে

পয়েন্টের মুখ থেকে বিমুখ করে সেই সেট জিতে জয়গ্রামে ফিরে আসা টেনিস ইতিহাসের বিরল ঘটনা। নতুন ঘটনা পাঁচ বছরে ৩৫টি ম্যাচে বর্গের টানা জয়।

অসাধারণ কিছু ঘটলে আমরা অলৌকিকতার ছোঁয়া লাগাতে চেষ্টা করি। কিন্তু টেনিস তো খেলা। ট্যালেণ্ট, স্কিল, শারীরিক শক্তি ও পটুতা, পরিমার্জন, পরিকল্পনা, টাইমিং, স্ট্রোক এবং কোর্টক্র্যাফট—সব কিছুর সমাহারেই অসাধারণত্বের পরিচয় মেলে। সেই দিক দিয়ে বিয়র্ন বর্গ অসাধারণ খেলোয়াড়।

এই লেখার শেষে ফাইনাল খেলাগুলির ফল দেওয়া আছে। এখন এবারের উইম্বলডনে ভারতীয়দের ভূমিকার কথা বলা যাক।

## ভারতীয়দের ভূমিকা

যাকে নিয়ে আমাদের প্রত্যাশা জীইয়ে ছিল সেই বিজয় অমৃতরাজ প্রথম রাউন্ডেই ১৬ নম্বর বাছাই আর্জেন্টিনার জোস লুইস ক্লার্কের কাছে হেরে যাওয়ায় এ বছরের উইম্বলডনে ভারতীয়দের ভূমিকা বড় হয়ে ফুটে ওঠেনি। কিন্তু সামগ্রিক ফল খতিয়ে দেখলে ভারতীয়দের সংগ্রামের পরিচয় অবশ্যই পাওয়া যাবে।

উইম্বলডনে বর্গের টানা চার বছর খেতাব জয়ের সম্ভাবনা গত বছর বিজয় অমৃতরাজ শেষ করে দিতে পারতেন যদি দ্বিতীয় রাউন্ডে আর একটু দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারতেন এবং ভাগ্য তাঁর সহায় হত। ওই ম্যাচে বর্গ জেতেন ২—৬, ৬—৪, ৪—৬, ৭—৬ ও ৬—২ গেমে। বিজয় ২—১ সেটে এগিয়ে যাবার পর চতুর্থ সেটে ৩—১ গেমে এগিয়ে যান বর্গের সার্ভিস ভেঙে। নিজের সার্ভিস ধরে রাখতে পারলে ৪—১-এ এগিয়ে যেতে পারতেন। আবার ৪—২-এ এগিয়ে থাকা সময়ে বর্গের সার্ভিস প্রায় ভেঙে দিয়েছিলেন ৪০—০ পয়েন্টে এগিয়ে। ডিউস করার পর অসাধারণ দৃঢ়তায় বর্গ গেমটি পান এবং ওখান থেকেই খেলার মোড় ঘোরে। বর্গ অকপটে স্বীকার করেছেন "ওই সময় বিজয় যদি আর একটি পয়েন্ট নিয়ে আমার সার্ভিস ভাঙতেন নির্ঘাত আমি হেরে যেতাম।" সত্যিই তাই, বর্গ ও বিজয়ের জয়-পরাজয়ের মধ্যে ব্যবধান ছিল অতি সূক্ষ্ম। বলতে গেলে গতবার ফাইনালে রসকো টান্নার যতখানি বেগ দিয়েছিলেন বর্গকে তার চেয়েও বেশি বেগ দিয়েছিলেন বিজয় অমৃতরাজ দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায়।

এবার বিজয় হেরেছেন কীভাবে? প্রায় একইভাবে, তাঁরই কাছে যাকে তিনি মাস দুই আগে ফ্রাঙ্কফুর্টে হারিয়েছিলেন স্ট্রেট সেটে। নাম আগেই বলেছি, আর্জেন্টিনার জে ক্লার্ক। অবশ্যই ক্লার্ক স্বদেশের দুই নম্বর খেলোয়াড়। ভিলাসের পরেই তাঁর স্থান। এবং মুখ্যত তাঁরই কৃতিত্বে আর্জেন্টিনা ডেভিস কাপে আমেরিকাকে হারায় এবং ডুসেলডার্ফে জেতে নেশানস কাপ।

বিজয় ৬—১ ও ৬—৩ গেমে অতি সহজে ক্লার্কের কাছ থেকে প্রথম দুটি সেট নিয়েও পরের তিনটি সেট হেরে যান ৫—৭, ৫—৭ ও ৪—৬ গেমে। অবশ্যই বিজয়ের খেলায় সংগ্রামের পরিচয় আছে। কিন্তু মরীয়া রূপের পরিচয় নেই। প্রথম দিন ২—২ সেটে এবং মীমাংসাসূচক পঞ্চম সেটে ২—২ গেমে খেলা সমান থাকা অবস্থায় মন্দ আলোর জন্য খেলা বন্ধ থাকে। পরের দিন ম্যাচ জিতে ক্লার্ক বলেন, "কাল সারা রাত আমি একটুও ঘুমোতে পারিনি, সারারাত ভেবেছি কীভাবে বিজয়কে হারাব। আজ বিজয়েরই প্রথম সার্ভিস ছিল তাই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ধাতস্থ হবার আগেই তাঁর উপর আঘাত হানব। কাল প্রথম দুটি সেট হারার পর আমি খেলার ট্যাকটিকস বদল করে প্রতিটি পয়েন্টের জন্য মরীয়া হয়ে লড়াই করি। তার ফলেই বিজয়ের আত্মপ্রত্যয়ে চিড় ধরে।"

শেষ মুখে এই মরীয়া লড়াই করতে পারেননি বলেই বিজয় ম্যাচ প্রায় হাতের মুঠোর মধ্যে এনেও গতবার হারাতে পারেননি বর্গকে, এবার হারাতে পারলেন না ক্লার্ককে।

ট্রফিসহ ইভন গুলাগং

বিজয়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর আনন্দ অমৃতরাজ প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়ায় উইম্বলডনে মূল প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস খেলার সুযোগ পাননি। প্রাথমিক থেকে মূলে আসে গতবারের জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন রমেশ কৃষ্ণন। আর মূলে খেলে শশী মেনন।

শশী প্রথম রাউন্ডে ব্রিটেনের রবিন ড্রিসডেলকে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে ৪ নম্বর বাছাই যুক্তরাষ্ট্রের ভিটাস গেরুলাইটিসের মুখে পড়ে। প্রায় বাঘের মুখে পড়ার মত। তবে শশীর বিরুদ্ধে মার্কিন টেনিস তারকার জয় সহজে করায়ত্ত হয়নি। টাই ব্রেকারে ৭—৬-এ শশী প্রথম সেটটি নিয়ে পরের তিনটি সেটে হারে দারুণ খেলে, ৪—৬, ৫—৭ ও ২—৬ গেমে।

টেনিসের ঘরানা এবং ঐতিহ্যের কিছুটা প্রমাণ দিয়েছে রামনাথন কৃষ্ণনের পুত্র রমেশ কৃষ্ণন। রমেশ গত বছরই জুনিয়র খেতাব জিতে প্রতিশ্রুতিবান খেলোয়াড় হিসাবে টেনিসবিশারদদের নজর কাড়ে। এবার পর পর দুটি রাউন্ডে যুক্তরাষ্ট্রের বিল স্ক্যানলন এবং ব্রিটেনের মারক কক্সকে হারিয়ে বেশ সাড়া জাগায়। প্রতিদ্বন্দ্বী দুজনই নামী খেলোয়াড়। স্ক্যানলন গত বছর কোয়ার্টার ফাইনালে হেরেছিলেন জিমি কোনর্সের কাছে, মারক কক্সও এসেছিলেন শেষ ১৬ জনের মধ্যে। বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে স্ক্যানলনের স্থানও উঁচুতে, ২৭ নম্বরে। রমেশ স্ক্যানলনকে হারায় ৩—৬, ৬—৪, ৬—৪, ও ৬—৪ গেমে এবং কক্সকে ৬—৭, ৭—৫, ৭—৫ ও ৬—১ গেমে। তৃতীয় রাউন্ডে কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবেই ৩—৬, ৬—৭ ও ২—৬ গেমে হেরে যায় হাঙ্গেরীর বালাজ তারকজির কাছে। তৃতীয় রাউন্ডে জিতলে রমেশকে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতে হত বর্গের সঙ্গে।

সিঙ্গলসে ভারতের কেউ বাছাই তালিকায় না এলেও ডাবলসে আনন্দ ও বিজয় ১২ নম্বরে স্থান পেয়েছিলেন। মিক্সড ডাবলসে ৫ নম্বর জুড়ি ছিলেন বিজয় অমৃতরাজ এবং মার্কিন মেয়ে অ্যান স্মিথ। আনন্দ অমৃতরাজ এবং যুক্তরাষ্ট্রের রোজমেরী ক্যাসালস ছিলেন ৮ নম্বর বাছাই।

অবাছাই জুড়ি যুক্তরাষ্ট্রের ভাই-বোন জন অস্টিন এবং ট্রেসি অস্টিন মিক্সড ডাবলস খেতাব জিতলেও পাঁচ নম্বর বাছাই বিজয় ও স্মিথ দ্বিতীয় রাউন্ডে হেরে যান এক অনামা অস্ট্রেলীয়-চেক জুড়ির কাছে। আনন্দ ও রোজি ক্যাসালস কোয়ার্টার ফাইনালে হারেন ৪ নম্বর জুড়ি অস্ট্রেলিয়ার রস কেস ও ওয়েন্ডি টার্নবুলের কাছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বর্ণবৈষম্য নীতির ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে আমাদের ক্রীড়াসম্পর্ক নেই। ডেভিস কাপের ফাইনালে উঠে একই কারণে ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ফাইনাল খেলেনি। এবার উইম্বলডনে কীভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড় রবার্ট ট্রাগোলোকে জুড়ি করে শশী মেনন ডাবলস খেলল বোঝা শক্ত। শশী ও ট্রাগোলো অবশ্য প্রথম রাউন্ডেই হারে যুক্তরাষ্ট্রের রিজেন-স্টুয়ার্ট জুড়ির কাছে। ট্রাগোলো যদি কৃষ্ণচর্মের খেলোয়াড় হয় এবং বর্ণবৈষম্য সমর্থন না করে পৃথক কথা। তবে তার সঙ্গে শশীর খেলার যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছি না।

আমরা জানি, দুই সহোদর বলে এবং একসঙ্গে খেলার সুবাদে বিজয় ও আনন্দ ডাবলসে শক্তিশালী কম্বিনেশন। এক নম্বর কোর্টে এবার তার প্রমাণও দিয়েছেন তৃতীয় রাউন্ডে তিন নম্বর জুড়ি ব্রায়ান গটফ্রিড (যুক্তরাষ্ট্র) ও রাউল র‍্যামিরেজের (মেক্সিকো) সঙ্গে অসাধারণ সংগ্রাম করে। ৮০-র উইম্বলডনে জুড়িগত খেলার সবচেয়ে স্মরণীয় স... এবার এই একটি খেলাই চলে দীর্ঘ ৪ ঘণ্টা ধরে। মোট খেলা হয় ৬৯টি গেম। গটফ্রিড-র‍্যামিরেজ জুড়ি জেতেন ৩—৬, ৬—৩, ৬—২, ১—৬ ও ১৯—১৭ গেমে। দুই জুড়ি দুটি করে সেট জেতার পর ১৯—১৭ গেমে শেষ সেটের মীমাংসা থেকেই বোঝা যায় কী প্রচণ্ড চাপের মধ্যে চারজনকে প্রতিদ্বন্দ্বি... করতে হয়েছে। সব মিলিয়ে বিজয়-আনন্দ পান ৩৪টি গেম, গটফ্রিড-র‍্যামিরেজ ৩৫টি। সূক্ষ্ম সুতো... ব্যবধানে জয়-পরাজয়... ৪ ঘণ্টা খেলার পর সেণ্টার কোর্টের সমস্ত দর্শক উঠে দাঁড়িয়ে ৪ জন খেলোয়াড়ের ... টেনিসের তারিফ ... অভিনন্দন জানান। ... সময় খেলাটি ছিল ... জুড়িরই মুঠোয়। শেষ সেটে ... গেমে ... আনন্দ সার্ভিস শুরু করেন কিন্তু ধরে রাখতে পারেন না। আনন্দের সার্ভিস ভেঙে খেলায় সমতা আনেন মার্কিন-মেক্সিকো জুড়ি এবং সেই গেমকেই টেনে নিয়ে যান ১৯—১৭য়। সত্যিই অসাধারণ স্নায়ু চাপের খেলা।

**পুরুষদের ফাইনাল**—সুইডেনের বিয়র্ন বর্গ ১—৬, ৭—৫, ৬—৩, ৬—৭ ও ৮—৬ গেমে পরাজিত করেন যুক্তরাষ্ট্রের জন ম্যাকেনরোকে। (সেমিফাইনাল) বর্গ ৬—২, ৪—৬, ৬—২ ও ৬—০ গেমে হারান অবাছাই খেলোয়াড় যুক্তরাষ্ট্রের ব্রায়ান গটফ্রিডকে এবং ম্যাকেনরো ৬—৩, ৩—৬, ৬—৩ ও ৬—৪ গেমে তিন নম্বর বাছাই যুক্তরাষ্ট্রের জিমি কোনর্সকে।

**মেয়েদের ফাইনাল**—অস্ট্রেলিয়ার ইভন গুলাগং (৪নং বাছাই) ৬—১ ও ৭—৬ গেমে হারান ৩ নম্বর বাছাই যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিস এভার্ট লয়েডকে। (সেমিফাইনাল) গুলাগং ৬—৩, ০—৬ ও ৬—৪ গেমে দ্বিতীয় বাছাই যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেসি অস্টিনকে এবং ক্রিস এভার্ট ৪—৬, ৬—৪ ও ৬—২ গেমে এক নম্বর বাছাই চেকোশ্লোভাকিয়ার মার্টিনা নাভ্রাতিলোভাকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠেন।

**পুরুষদের ডাবলস ফাইনাল**—... বাছাই জুড়ি অস্ট্রেলিয়ার পিটার ম্যাকনামারা ও ... ফ্লেমিং ৭—৬, ৬—৩, ৬—৭ ও ৬—৪ গেমে হারান ৪ নম্বর বাছাই জুড়ি যুক্তরাষ্ট্রের স্টান স্মিথ ও বব লাজকে।

**মেয়েদের ডাবলস ফাইনাল**—৪ নম্বর বাছাই জুড়ি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাথি জর্ডন ও অ্যান স্মিথ ৪—৬, ৭—৫ ও ৬—১ গেমে হারান দ্বিতীয় বাছাই জুড়ি যুক্তরাষ্ট্রের রোজি ক্যাসালস ও অস্ট্রেলিয়ার ওয়েন্ডি টার্নবুলকে।

**মিক্সড ডাবলস ফাইনাল**—অবাছাই জুড়ি যুক্তরাষ্ট্রের ভাইবোন জন অস্টিন ও ট্রেসি অস্টিন ৪—৬, ৭—৬ ও ৬—৩ গেমে হারান ৬ নম্বর বাছাই জুড়ি অস্ট্রেলিয়ার মার্ক এডমন্ডসন ও ডায়ান ফ্রমহোল্টজকে।

**জুনিয়র বয়েজ ফাইনাল**—ফ্রান্সের টি টুলাসনি ৬—৪, ৩—৬ ও ৬—৪ গেমে পশ্চিম জার্মানির এইচ ডি কিউটজকে হারিয়ে জুনিয়ার খেতাব পায়।

**জুনিয়র গার্লস ফাইনাল**—অস্ট্রেলিয়ার ডেস ফ্রিম্যান ৭—৬ ও ৭—৫ গেমে স্বদেশের সুয়ে লিয়নকে হারিয়ে পায় জুনিয়ার খেতাব।

মুকুল

# আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

## আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি বই

**জিন্দাবাহার।** পরিতোষ সেন। প্যাপিরাস, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলিকাতা-৭০০০০৪। মূল্য ষোল টাকা।

রূপের রেখা—তা সে তুলির হোক বা কলমের হোক—রসের ধারার মধ্যেই আপন সীমাকে প্রতিক্রম করার চেষ্টা করে। ধর্মগত এই মিলের সঙ্গে কর্ম-প্রকরণগত মিল যুক্ত হওয়ার ফলে চিত্র-শিল্প ও সাহিত্য-শিল্প পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সহচর। উভয়েরই মৌল উপকরণ বর্ণ। তা সত্ত্বেও দেখতে পাই খুব কম শিল্পীই কলম ধরেছেন, কম সাহিত্যিকই সমান্তরালভাবে তুলি চালিয়েছেন। ছবি লেখা এবং গল্প আঁকার দুর্লভ প্রতিভা নিশ্চয়ই আরও বিরল ঘটনা।

পরস্পরের প্রতিরূপে রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে অতি সম্প্রতিকালে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'চিত্রকর' পরিতোষ সেনের 'জিন্দাবাহার' গ্রন্থের বিস্ময়কর পূর্বকর্ম। যদিও এই দুটি গ্রন্থের মধ্যে নানা কারণেই তুলনা চলে না, তবু উভয়ের মধ্যে বৈষয়িক মিলও খুব কম নয়। একটি যুগ-কাল এবং পরিবার-পরিবেশে নিমজ্জিত তরুণ মনের অঙ্কুরিত ও বিকশিত হয়ে ওঠার ইতিহাস, তাল-মান-ছন্দের তালিম এবং সূত্রসংকেত ছড়িয়ে আছে দুটি গ্রন্থেই। একজনের দৃষ্টির ক্ষীণতা, অন্যজনের পারিবারিক সংকীর্ণতা পরোক্ষে শিল্প-চর্চার চ্যালেঞ্জ হিসেবে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। ন-টি নকশা-নিবন্ধে ঢাকা শহরের একটি পথকেন্দ্রিক পল্লীর চালচিত্র এঁকেছেন পরিতোষ সেন, চিত্র-গুলি চালচিত্রের মতই কেটে কেটে বসানো কিন্তু সব মিলিয়ে একটি অর্ধ-বৃত্তাকার মাত্রা যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ বাক-প্রতিমা তৈরি হয়ে গেছে। ঠিক কাহিনী ধরে ধরে জিন্দাবাহার এগোয়নি। কতক-গুলি চরিত্র এবং দৃশ্যোজ্জ্বল ঘটনার অনুবন্ধে জীবন রহস্যের অধ্যায়গুলো বাঁধা হয়েছে। নামকরণের বস্তাবিক ভিত্তির যদিও উক্ত নামের একটি উপসরণি যার আভিধানিক অর্থ জীবন্তবসন্ত। কিন্তু এর তাৎপর্যঘটিত অতিরিক্ত আর একটি অর্থও অলক্ষ্যগোচর নয়।

জীয়ন্ত সৌন্দর্য বা জীবনের দুর্মর বেঁচে থাকার রূপাবলীই তাঁর শিল্পী মনের শৈশব সরণি হয়ে দেখা দিয়েছিল। মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হবার মন্ত্রই তো সৌন্দর্য এবং এই মন্ত্রের সৌন্দর্যই শিল্প। প্রায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী পরিতোষ সেনের প্রতিভাময় জীবন এই মৃত্যুকেই পদে পদে অতিক্রম করে গেছে সমস্ত প্রতিকূল ঔদাসীন্য এবং উপেক্ষা ভেদ করে। ঢাকা শহর থেকে তিনি ছুটে চলে গিয়েছেন মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে, পরে সেখান থেকে প্যারিসে। তাঁর অপ্রকাশিত প্রতিভাকে প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, পরে স্বীকৃতি জানিয়েছেন পিকাসো। পিকাসো পরিতোষকে মডেল করে ছবিও এঁকেছিলেন এই মজার খবর অনেকেই জানেন না। বীর্যবান এবং অনুপুঙ্খ লক্ষ্যভেদী রেখার সঙ্গে হরু-খোলা রঙের বিস্ফোরণ ঘটেছে, পরিতোষ সেনের চিত্রকলায়। জীবন পর্যবেক্ষণে তিনি আস্থাশীল। চিত্রকর হিসেবে তিনি স্পষ্টবাদী, ভণিতাহীন এবং নির্ভীক। তাঁর লেখার মধ্যেও সেই গুণ থাকায় তাঁর প্রথম পর্যায়ের এই লেখাগুলির ভেতরে-বাইরে একটা নিজস্ব এবং আধুনিক স্টাইল গড়ে উঠেছে। নিজের সম্বন্ধে প্রায় কিছুই না বলে শুধু জীবনারম্ভের পশ্চাদ্‌পটটি পুঙ্খানু-পুঙ্খ এঁকে গিয়েছেন। একটি বিশেষ স্থান এবং কালের নাড়ির স্পন্দন ধরা পড়েছে তাঁর কলমের ডগায়। যে কলম নিরপেক্ষ নির্লিপ্ত এবং সংস্কারমুক্ত। হারিয়ে যাওয়া জীবনখণ্ডের ডকুমেণ্টারি অ্যালবাম হয়ে থাকল তাঁর এই ন-টি রচনা। অ-শিল্পী পাঠকের কাছেও পরিতোষবাবুর বিচিত্রিত চরিত্র-ঘটনা

এবং দৃশ্যগুলি স্মরণীয় এবং উপভোগ্য হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে দর্জি হাফিজ মিঞা, সিনপেন্টার জিতেন গোঁসাই, ডেন্টিস্ট আখতার মিঞা, প্রসন্নকুমার, আগুন, নবাবু, সেজোবাবু এবং এই অর্জুন অত্যন্ত প্রশংসনীয় রচনা।

সেই অসামান্য অ্যানাটমি-জ্ঞানসম্পন্ন হাফিজ মিঞার পায়রা ওড়ানো; নাটুকে সিনপেন্টার, ক্ষিপ্রতম তুলিবাহন জিতেন গোসাইয়ের বিচিত্র চিত্রকর্মের পাশা-পাশি মৌতাতী প্রহরে জড়িতকণ্ঠের স্বগত সঙ্গীত—ফাগুনের কু-বাতাসে/বুকের কাপড় যায় লো খসে।/পোড়াব-মুখো কোকিল এসে/কুঁহু-হু করে গো॥—ভোলা যায় না। দাঁত কপাটি লাগানো জঙ্গী ডেন্টিস্ট আখতার মিঞার 'ঘনাদা' সুলভ সত্যানিষ্ঠ শিকার কাহিনী এবং তাঁর অন্তিম বিবাহ-যাত্রা; পিতা বৈদ্যরাজ প্রসন্ন-কুমারের অন্দর মহল-বহির্মহলের হাল-চাল পাঠকের বহুদিন মনে থাকবে। তাঁর আর একটি অসাধারণ রচনা আগুন মৃত্যুরূপাবৃত জীবনের বর্ণভাষ্য যেন শোকাতিক্রমণের মন্ত্র এবং উপলব্ধি একই সঙ্গে। একটি গাছকে চরিত্রায়িত করে আর এক জীবনের প্রচ্ছন্ন গল্প হে অর্জুন মনকে নাড়া দেয়। ন-বাবু, সেজোবাবু এবং এ গ্রন্থের কেন্দ্রীয় রচনা 'আমি' মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারের মর্মস্পর্শী অবক্ষয়ের নিষ্ঠুর তথ্যচিত্রের মত মনের মধ্যে দাগ রেখে যায়। সব মিলে

# জীবনে ছোট-খাটো সুখের মূল্যও অনেক...

শিশুর চোখে আনন্দের ঝিলিক দেখা কিংবা বাড়ির সবাইকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার আনন্দ বড় কম নয়, ছোট হলেও জীবনে এই মুহূর্তগুলির মূল্য অপরিসীম। আজ আপনার বয়স অল্প, সঞ্চয় করার মতো কিছু পয়সাও আপনার হাতে আছে—আজই কানাড়া ব্যাঙ্কে একটি **নিরন্তর ডিপোজিট** খুলে ফেলুন। অল্প কিছু টাকা—তা সে যত কমই হোক না কেন—নিয়মিত ভাবে প্রতিমাসে কিংবা কিছু টাকা একসঙ্গে জমা রাখলে এ থেকে সারা জীবন আপনার বেশ কিছু বাড়তি আয় হতে পারে। কানাড়া ব্যাঙ্ক প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে টাকা দিতে শুরু করবে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—সারা জীবন ধরেই এই টাকা আপনি পেয়ে যাবেন। বিলাসিতা, সুখ—এমন কি অবসর জীবনের শান্তি, সব কিছুই হবে আপনার করায়ত্ব। এই কুবেরের ভাণ্ডার শেষ হবে না কোনদিনও। অথচ আপনার মূলধন অক্ষুন্নই থেকে যাবে, প্রয়োজনে তাও কাজে লাগাতে পারবেন।

যেসব অল্পবয়সী মানুষ জীবনের পুরো আনন্দ উশুল করে নিতে চান, কানাড়া ব্যাঙ্কের দূরদর্শী **নিরন্তর ডিপোজিট** তাঁদেরই জন্যে।

বিশদ বিবরণের জন্যে কানাড়া ব্যাঙ্কের নিকটবর্তী শাখায় চলে আসুন। আমাদের অন্যান্য আরও বিশেষ পরিকল্পনার মধ্যে আছে : **কামধেনু, বিদ্যানিধি** এবং **বালক্ষেম**।

## নিরন্তর ডিপোজিট

(একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক)

সারা দেশে এই ব্যাঙ্কের ১২০০-রও বেশি শাখা আছে।

maa CB 2 Ben A 80

দাবাহয়েকে এক কথায়, একটি জিজ্ঞা-
তিবৃত্ত বলা যায়।

মণ্ডন শৈলীতে তবু একটা ত্রুটি ভবত রয়ে গেছে। শিশু এবং বালক সের পরিতোষের চোখ দিয়ে প্রথম ার আদলে এই গ্রন্থের নাগুলি অনুলিপিত হলেও ন কোন রচনার অংশ বিশেষে মন আগুন রচনায়) পরিণত ল্পী পরিতোষ সেনের মনশ্চক্ষু যুক্ত য় গেছে। এই দ্বিতীয় মাত্রা চিত্রের চত্যো যেন ঘা দিয়েছে। আর একটি ষয়ে আমার কিছু বলার আছে। তাঁর র্লিপ্ত নিরপেক্ষ সংযম একটি রচনায় আমি') ব্যাহত না হলেই ভাল হত। ল্পকে গোপন করাই যেমন প্রকৃত শিল্প মনি ক্রোধকেও। তাঁর মত শিল্পীর ছে এই সামান্যতম বিচলিত অবস্থাও ররা আশা করি না।

।রিতোষবাবুর বারোটি রেখাচিত্র ই গ্রন্থের মূল্যমান বাড়িয়ে দিয়েছে।

**ানন্দ বাগচী**

আলোচনা : শিল্প সংক্রান্ত **চিত্রকলা**

## বাগত বিষাদ

আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ হলো বিপন্নতা এবং বিষণ্নতা। এই র্তভূমির মায়ার সম্বন্ধে আসক্তি-রক্তির টান। কিন্তু তবু হাতের ফাঁক দিয়ে যেন আঁজলা-ভরা জল যায়। মৃত্যুর সাত দিন আগে জাঁ পল সার্ত্র শেষ সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, মানুষ প্রথম যে জিনিসটা বোঝে সেটা হলো : আমি আছি। তারপর দ্বিতীয় উপলব্ধি হয় তার—নৈতিক হিসাবে আমি থাকব। কিন্তু সে থাকা না থাকায় পৃথিবীর কারো যায় আসে না। যা কিছুই করা যাক না কেন তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে (সাত্র "মিস ফায়ার" শব্দটা ব্যবহার করে-ছেন)। তবু কাজ করে যেতে হবে ব্যর্থ হবে জেনেও। অস্তিত্ব মানে এক নিবিড় গভীর বিষাদ।

তরুণতম শিল্পীদের অনেকের কাজেই এই বিষাদের ছায়া। শুভাপ্রসন্ন, অলোক ভট্টাচার্য, কাঞ্চন দাশগুপ্ত, বিশ্বপতি মাইতী বা রেবন্ত গোস্বামী প্রশান্ত নিয়োগীর ছবির বিষয়বস্তু, চিত্রপ্রতিমা (আইকনোগ্রাফি), অঙ্কন-কুশলতার যতই অমিল থাকুক, মানসিকতায় কোথায় একটা সাজুয্য ধরা পড়ে।

হরেন ঠাকুরের মিশ্র মাধ্যমে আঁকা ছবিগুলো শৈলীর ভিন্নতা সত্ত্বেও এই নব্য রীতির সঙ্গে মিল কম নয় এবং তাই স্বাভাবিক। হাতে তৈরী কাগজে প্রধানত জলরঙে আঁকা হলেও অন্য মাধ্যমও ব্যবহার করেছেন।

জন্ম ১৯৫৩। কলাভবনের স্নাতক ১৯৭৫। শান্তিনিকেতন থেকে যান রাঁচীর মেকোন স্কুলের শিল্পকলার শিক্ষক হয়ে। সম্প্রতি হরেন আকাদমীতে একক প্রদর্শনী করে গেলেন।

দীর্ঘায়িত তাঁর মানুষজনের সঙ্গে বিনোদবিহারীর রূপারোপণের অনেক অংশে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু তাঁর বিষয়, ভূমিবিভাজন-রীতি নিজস্ব। সমগ্র পটকে পর পর কয়েকটা অসরল রেখা দিয়ে ভাগ করে তার মধ্যে দীর্ঘায়িত এই সব মানুষজন তিনি দলবদ্ধভাবে সাজান। ফাঁকগুলো সমতল রঙ দিয়ে ভরেন। সাধারণত মৃত্যু, মৃত্যুশয্যা, মৃতজনকে ঘিরে বিলাপ, শববহন, সৎকার সমাধি অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠান নিয়ে তাঁর ইদানীংকালের ছবি। সামনে পেছনে ক্ষয়জীর্ণ ছোট ছোট পাহাড়, রুক্ষ পাহাড়ী প্রান্তর, যেন প্রকৃতিও মুমূর্ষু। হয়তো কোন ব্যক্তিগত পুরাণকল্পের স্পর্শ। বর্ণপ্রয়োগ তাঁর খুবই সীমায়িত। ধূসর, হালকা বাদামী, ফিকে নীল। ছবি মানে রঙ। পেনটিং মানে পেন (বেদনা) তাঁর ছবিতে যার অভাব নেই। পেনটিং মানে আবার পেন্ট (বর্ণ)। সুতরাং, বর্ণ ব্যাপারে কৃপণতা চলবে না। ঘন এবং ফিকে উজ্জ্বল স্বচ্ছ অসচ্ছ বর্ণের কেয়ারী করা ফুলবাগান তৈরি করতে হবে। সেখানে শীতল বর্ণের ব্যবহারে তিনি আমাদের জমিয়ে দিয়েছেন। যেখানে রচনা এবং চিত্রনির্মিতির কাঠামো বহুলাংশে কঠিন সেখানে ঠাণ্ডা রঙ যেন যায় না। তা ছাড়া, তাঁর অঙ্কনও একটু দুবলা। তবুও তাঁর কাজের মধ্যে প্রতিশ্রুতি আছে। যদিও ছাত্রজীবনের কিছু কাজ ছিল যা নিছক হাত মকসো করার পর্যায় পড়ে। এগুলি বাদ দিতে পারতেন। এত দূর থেকে এসে ঘন বর্ষায় প্রদর্শনী করার জন্য আশানুরূপ দর্শক পাননি। আকাদমীর কর্তৃপক্ষ এ সব বিষয়ে তাঁকে সাবধান করবেন না অন্তত সেই অভিজ্ঞতাটুকু তাঁর হলো।

**সন্দীপ সরকার**

আলোচনা : শিল্প সংক্রান্ত **চলচ্চিত্র**

## দর্পচূর্ণ

ছবির টাইটেল আরম্ভের আগেই জানিয়ে দেওয়া হয় যে মূল গল্পটি আকারে ছোট বলে চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে কল্পনা প্রয়োগ করে। চলচ্চিত্রের ভাষায় কোন কাহিনী রূপান্তরিত করতে পরিবর্জন ও পরিবর্ধন অনেক ক্ষেত্রেই অনিবার্য। তাই বলে মূল কাহিনীর অন্তর্গত মুখ্য চরিত্রগুলির নাম এবং কাহিনীভুক্ত ঘটনাবলীর এক-চতুর্থাংশ (ও সামান্য কিছু সংলাপ) মাত্র রেখে বাকি সবটাই কল্পনা থেকে গঠিত করার উদোম স্বাধীনতা যা প্রত্যক্ষ করা গেল তাতে কাহিনীটি শরৎচন্দ্রের বলে ছবিতে উল্লেখ না করলেই শোভন হতো।

শরৎচন্দ্র রচিত কাহিনীতে মূল চরিত্র ইন্দুমতী ও নরেন্দ্র। নরেন্দ্র লেখক বলে সংসারের ব্যয় নির্বাহে অক্ষম। এই নিয়েই ধনী কন্যা ইন্দুর সঙ্গে তার বিরোধ। শান্ত প্রকৃতির ভালো-মানুষ নরেন্দ্র দুঃখটা নিজেই ভোগ করে —ইন্দুকে তার ভাগীদার করাত চায় না। ছবিতে কিন্তু ইন্দুর চেয়ে নরেন্দ্র জীবন প্রায় অতিষ্ঠ করে তোলে পাওনাদার শম্ভু পাল। মূল কাহিনীতে যার আভাস মাত্র দেওয়া আছে। ওই পাওনাদারের ঋণ মেটাতে ব্যর্থ হয়ে নরেন্দ্র জেলে যায়। ইন্দু তখন বাপের বাড়ি তাই সে খবর জানত না। কলকাতায়

ফিরে ইন্দু আরও জানল যে নরেন্দ্রের মামাতো ভগিনী বিমলা তার সমস্ত গহনা বিক্রি করে নরেন্দ্রর ঋণ শোধ করে তাকে কারামুক্ত করেছে। তখনই ইন্দু তার মিথ্যা দর্প ভুলে যায়।

চিত্রনাট্যকার-পরিচালক দিলীপ রায় যেভাবে ঘটনা সাজিয়েছেন তাতে নরেন্দ্রর জীবনে পাওনাদার শম্ভু পালই অভিশাপ রূপে দেখা দিয়েছে। ছবির এক-তৃতীয়াংশে শম্ভু পালের (নিশ্চয়ই চরিত্রটি উত্তমকুমারকে দিয়ে অভিনয় করানোর উদ্দেশ্যেই) অবস্থিতি। এবং এক মাত্র পুত্রকে হারানোর শোকে সে এমন নির্মম যে পাওনা টাকার জন্য নরেন্দ্রকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ব্যাধিগ্রস্ত করে তোলে॥ পরিশিষ্টে কিভাবে তার পুত্র বিপথে গিয়ে আদিবাসীদের হাতে নিহত হয় সে-কাহিনী সবিস্তার ব্যক্ত করার পরই নরেন্দ্রকে ঋণের দায় থেকে মুক্ত করে। পর্দায় যে-কাহিনী প্রতিফলিত তাতে দেখা গেল মানুষকে যন্ত্রণা দিয়ে আমোদ উপভোগ করার দর্প ছিল শম্ভু পালের এবং নরেন্দ্রর অসহায় অবস্থাই যেন তার সেই দর্পকে চূর্ণ করে দেয়। আর এই শম্ভু পাল চরিত্রটিকে প্রাধান্য দেবার জন্যই ইন্দুর সঙ্গে বিবাহের পূর্বেই নরেন্দ্রকে দিয়ে বলিয়ে নেওয়া হয়েছে যে পিতৃঋণ সে শোধ করে দিয়েছে। যা মূল কাহিনীর ঠিক উলটো ব্যাপার। মূল কাহিনীতে ইন্দু ও নরেন্দ্রের মানসিক সংঘাতকে হৃদয়তন্ত্রীর সূক্ষ্ম তারের অনুরণনে ঝঙ্কৃত করে তোলা হয়েছে। দিলীপ রায় তার ধার দিয়েও যেতে চাননি। যার ফলে কাহিনীর আবেদন জোলো হয়ে দাঁড়িয়েছে॥ এমন সব চরিত্র ও ঘটনা তিনি উদ্ভাবন করেছেন যা শরৎচন্দ্রের রচনার সঙ্গে মিশে গুরু-চণ্ডালী দোষ ঘটিয়েছে। শরৎ রচনার 'মেজাজ' সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। আর এই গুরুচণ্ডালী দোষের ব্যাপারটা পরিব্যাপ্ত সর্বাংশে। যেমন, পাত্র-পাত্রীর সাজ-পোশাক দেখে বোঝা যায় ঘটনা-কাল ঝাড়বাতির আমলের॥ অথচ সুইচ টিপে বিজলীবাতি জ্বালানো হয়!

ছবিখানি দেখতে শেষ পর্যন্ত যে বসে থাকা যায় সে আকর্ষণ হলেন অভিনয় শিল্পীরা॥ উত্তমকুমার (শম্ভু) সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (নরেন্দ্র), সন্ধ্যা রায় (ইন্দুমতী), সুব্রতা (বিমলা), দীপঙ্কর দে (গগন), ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, লিলি চক্রবর্তী, সজল পাঠক প্রমুখ কৃতি শিল্পীর অভাব নেই। কিন্তু নরেন্দ্র ও শম্ভুই ছেয়ে থাকে প্রায় অর্ধেক দৈর্ঘ্য। বাকি চরিত্রগুলির ভিতই কেমন যেন

আলগা। বিকাশ রায়ের ছাড়া গল্পের কোন প্রয়োজনই ছিল না। কালী সেনের সুরে মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও অরুন্ধতী হোম চৌধুরী কণ্ঠে শুনতেও ভাল, কিন্তু প্রক্ষিপ্ত মনে হয়।

পঙ্কজ দত্ত

---

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

## রবীন্দ্রসদনে গানের আসর পূজা পর্যায়

রবীন্দ্রসদনের উদ্যোগে রবীন্দ্র জন্মোৎসবের অন্যতম অঙ্গ পর্যায় ভিত্তিক গানের আসর। সামগ্রিকভাবে এবারে অনুষ্ঠানের দিন কমানো হয়েছে কিন্তু গানের আসরের সংখ্যা কমেনি। গত বছর বাংলাদেশের শিল্পীদের জন্য নির্ধারিত ছিল একটি সন্ধ্যা। এবার নেই। কিন্তু আসর বসেছে দশ দিনের। বহু শিল্পী গতবার দুদিন করে গেয়েছিলেন, এবারের অনুষ্ঠানে সেই প্র... বর্জিত। নতুন শিল্পীদের মধ্যে ... জন অন্তর্ভুক্ত। অডিশনে পাশ করে ঢুকতে হয়েছে এঁদের। কিন্তু অডিশনে যে যোগ্যতাকেই একমাত্র মাপকাঠি ধরা হয়েছিল তার প্রমাণ সকলের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়নি। আবার, আগে থেকে সুযোগ পেয়ে আসছেন যাঁরা, সে ভাগ্যবানদের সকলেই যে যথার্থ অডিশনে টিকে যাবেন, এমন কথাও বলা যায় না। দু-একজন আগে গানের অডিশনেও পাশ করেন নি, তবু এবার সুযোগ পেয়েছেন। এমন নয় যে তাঁরা নামী কিংবা যোগ্য শিল্পী—অডিশনে বসতে বলা ধৃষ্টতা, তবু কী করে মঞ্চে জায়গা পেলেন এবং শ্রোতৃমণ্ডলীকে উত্যক্ত করে তুললেন কে জানে। অথচ নামী এবং যোগ্য কিছু শিল্পী যে রবীন্দ্রসদনের আমন্ত্রণ পান না, এ-কথা আমরা আগেও বলেছি, এবারেও বলতে বাধ্য। সদন মঞ্চেই অন্য বহু অনুষ্ঠানে গান গেয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীকে আপ্লুত করেছেন, অথচ কোনবারই আসরে আমন্ত্রণ পান না এমন একজন শিল্পীর কথা এক্ষুনি মনে পড়ছে। তাঁর নাম কৃষ্ণা হাজরা। দেবব্রত বিশ্বাস না হয় আসেন না, শান্তিদেব ঘোষও কি তাই অন্যবার থাকেন, এবারে অনুপস্থিত—

নীলিমা সেন

আশিস ভট্টাচার্য

ন উল্লেখযোগ্য নাম হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ঋতু গুহ, বনানী ঘোষ এবং প্রিয় মুখোপাধ্যায়। আরেকটি উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতি হল—অধিকাংশ দিন শ্রোতৃমণ্ডলীর উপচেপড়া ভিড়। আগ্রহ সত্যি কমে আসছে, নাকি আগ্রহ ধরে রাখতে সদন-কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ? দুটি র গানের জলসা করে তোলা, পরিকল্পনাহীন অসমঞ্জস শিল্পী-সমাবেশ, সামগ্রিক ভাবে নিচু মানের নিবেদন, উদ্যাপনের কার্পণ্য—বহু-কিছুই দায়ী র জন্য। অনুপস্থিত শিল্পীদের সম্পর্কে সদন-কর্তৃপক্ষ কখনোই কিছু জানান না। কেন? টিকিট কেটে দর্শকরা আসেন, শিল্পী তালিকায় হেরফের ঘটলে তাঁদের জানানো নীতিগত দিক থেকে কর্তব্য। তাছাড়া সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট এই প্রতিষ্ঠানে সব শিল্পী কেন আমন্ত্রণ পান না, আমন্ত্রণ সত্ত্বেও কারা এলেন না, এসব তথ্য জানানোর দায়িত্ব থাকে। সে-দায়িত্ব সদন কর্তৃপক্ষ নেন না। এটা কি ঠিক? এক রকমের আত্মসন্তুষ্টি যেন কোথায় কাজ করছে, যেন শিল্পীরাই ধন্য এই অনুষ্ঠানে গান করতে পেরে, দর্শকরা না টিকিট কেটে ঢুকতে পেরে—এমন যদি কারো মনে হয়, দোষ দেওয়া যায় না। ফলে ভিড় কমছে, কমবে; প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা ক্রমশ উদাসীন হয়ে পড়ছেন, পড়বেন। কারো যেন কিছু করার নেই। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা প্রয়োজন। সদন-কর্তৃপক্ষ কি ভাববেন?

এবারের অনুষ্ঠানের তিনটি দিন নির্দিষ্ট ছিল 'পুজো'র গানের জন্য। ৯ মে শুক্রবার দক্ষিণীর সম্মেলক সঙ্গীত দিয়ে শুরু। সূচনা শুভ। কিন্তু একক আসরের প্রথম শিল্পী রিনি মিত্র প্রথম গানেই লয় হারিয়ে ফেললেন। সত্যজিৎ বসু বাছলেন যোগ্যতার অনুপাতে ভারি গান। 'জাগে নাথ জ্যোছনা রাতে' গাম্ভীর্য হারালো গলার কম্পনে, 'কে বসিলে আজি'তে কণ্ঠ হল বিপর্যস্ত। সঙ্ঘমিত্রা গুপ্ত 'হৃদয় নন্দন বনে' গানটিতে সতেজ সমৃদ্ধ আবহাওয়া তৈরি করলেন। আসরের পরের গান, 'এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ'-এ তাঁকে ঈষৎ শ্রান্ত মনে হল। কিশোর শিল্পী অনিরুদ্ধ সিংহ ফুলের মতো সহজ সুরেই গাইলেন, 'যে ধ্রুবপদ', 'তুমি যে সুরের আগুন'-এ সেই আগুনের গুণে

বেঁধেছেন অর্ক এক আবহাওয়া। অবন্তীলার শ্রীনন্দা চৌধুরী দক্ষ ভঙ্গিতে শোনালেন 'ফুল বলে ধন্য আমি'। অভিরূপ গুহঠাকুরতার মধুর উদাত্ত কণ্ঠে 'শূন্যে প্রাণ কাঁদে সদা'র বিষণ্ণ আর্তি সুন্দরভাবে গ্রাস করল আসরের পরিবেশকে। সেই বিষণ্ণতা ছিল রণো গুহঠাকুরতার 'দিন ফুরালো হে সংসারী'তে, ছিল গীতা ঘটকের তারে বাঁধা রেশমী মসৃণ কণ্ঠে শোনানো 'এখনো গেল না আঁধার' এবং 'দুখের রাতে হে নাথ' গানে, ছিল কৃষ্ণা গুহঠাকুরতার 'দিন যায় রে'-তে, এমন কি ঈষৎ কম্পনক্লিষ্ট কণ্ঠে শোনানো শ্রীলা সেনের 'ঘাটে বসে আছি, আনমনা'তেও। এর মধ্যে এণাক্ষী মুখোপাধ্যায় দারুণ সুরেলা কণ্ঠে শুনিয়ে গেছেন 'হৃদি মন্দির দ্বারে' এবং 'অনিমেষ আঁখি'। তাঁর গান পরিবেশনে যত নিখুঁত, আবেদনে তত উজ্জ্বল নয়। কণ্ঠের অতিরিক্ত তীক্ষ্ণতায় কিছুটা যান্ত্রিক অনুষঙ্গ, ভাব কম ফুটেছে যেন। অমল নাগ গত বছর ছিলেন না। এবারের চারটি গানে ক্ষতিপূরণ করলেন। সেদিন তাঁর কণ্ঠের সজীবতম নিবেদন 'সেদিন আপদ আমার যাবে কেটে।' কৃষ্ণা গুহঠাকুরতার 'শ্রান্ত কেন ওহে পান্থ' এই সন্ধ্যার বিশেষ উল্লেখযোগ্য নিবেদন।

মাঙ্গলিক সংস্থার সমবেত সংগীত দিয়ে সূচিত হল ২৫মে তারিখে দ্বিতীয় 'পুজা' পর্যায়ের আসর। মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপস্থিত ছিলেন এইদিন। মাইকের গোলমাল সত্ত্বেও ভাস্বতী মুখোপাধ্যায়ের সবল সতেজ কণ্ঠটি চিনে নেওয়া গেছে। স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের সুরেলা পরিবেশনে ভাব যত ছিল, দম তত ছিল না। আশিস ভট্টাচার্যের ভরাট লাবণ্যময় কণ্ঠে 'ধনে জনে আছি' অসামান্য নিবেদন। আশিস ভট্টাচার্য ক্রমশই নিজস্ব একটি জায়গা করে নিচ্ছেন এতে সন্দেহ নেই। মিতা দস্তিদার 'যা হবার তা হবে' গানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। শুভশ্রী মুখোপাধ্যায় নিবেদনে উজ্জ্বল, নির্বাচনে অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী। প্রসূন দাশগুপ্তের 'ওই পোহাইল তিমির রাতি'তে দাপট ছিল, দাপট ছিল কুমকুম চট্টোপাধ্যায়ের গান দুটিতেও। বিশেষত তাঁর 'এ মোহ আবরণ' মনে থেকে যায়। প্রমিতা মল্লিক সহজ গানে স্ফূর্তিময়, এবারেও দেখা গেল। গোপাল মহাপাত্র চমৎকারভাবে তৈরি হচ্ছেন। অদিতি সেনগুপ্তের 'ঘোর দুঃখে জাগিনু' নিশ্ছিদ্র পরিবেশন, 'যিনি সকল কাজের কাজী'তে তাঁকে বেশি করে পাওয়া গেছে। সুপর্ণা চৌধুরীর 'সকল জনম ভরে' এই আসরের বিশেষ স্মরণীয় পরিবেশন রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। তাঁর উদাত্ত, স্পষ্ট পরিবেশনে সহজেই স্বাতন্ত্র্য ফুটে ওঠে। গোরা সর্বাধিকারী কিছুটা নিষ্প্রাণ পরিবেশ তৈরি করলেন। বাণী ঠাকুর 'তুমি এবার আমায়'-এ নিজস্বতায় সজীব সুশীল চট্টোপাধ্যায়ের পরিবেশন শোনা ক্রমশই অভিজ্ঞতা হয়ে উঠছে। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বমহিম ছিলেন 'লক্ষ্মী যখন আসবে' গানে। কিন্তু 'বারিষ ধরা-মাঝে'-তে ধরা ও মাঝের মধ্যবর্তী ক্লান্তিজনিত খণ্ডন কথার ব্যঞ্জনাকে ক্ষুণ্ণ করেছে, তাঁর মতো পরিণত

...র পাছে যা প্রত্যাশিত নয়। মাত্রা বজায় রেখেও সাবলীলতে ... পেরেছেন। অবাক করেছেন আলপনা রায়চৌধুরী। 'জ্বলন ভাসিল' এবং 'অন্ধজনে দেহ আলো' দুটি গানেই অনবদ্য এক দক্ষতার প্রকাশ। এই শিল্পীও ক্রমশ নিজস্ব স্থান করে নিচ্ছেন সাবলীল স্বচ্ছন্দ নিবেদনে। কল্পনা সিংহ অমৃত-পাথারে সেভাবে ডুবতে পারেন নি। আসরের শেষ শিল্পী অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় 'দুয়ারে দাও মোরে'র প্রচলিত লয় অগ্রাহ্য করে নতুন মাত্রা এনেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু স্তব কোলাহল ছাড়িয়েতে অতিরিক্ত আচ্ছন্ন লেগেছে তাঁকে।

পুজো'র শেষ আসরটি ছিল ৫ জুন সন্ধ্যায়। অরূপ শিল্পী গোষ্ঠীর দুটি গানেই ছিল জমজমাট ভাব। আসরের একক শিল্পীদের মধ্যে নির্মল বিশ্বাস মোটামুটি। শ্যামলী চক্রবর্তী অপরিণত। রত্না সিংহের কণ্ঠলাবণ্য এবারে যতটা বিকশিত, পরিবেশন ততটাই বিপর্যস্ত সঙ্গতের দোষে। সিতাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় ওঠানামা নেই, একঘেয়ে লাগে। ধীরা মুখোপাধ্যায় প্রথম প্রাণ ফেরালেন আসরের। দুটি গানই চমৎকার নিবেদন। রেশমী মজুমদার যে ভাল গাইবেন তার প্রমাণ ছিল 'আমার মন তুমি নাথ'-এ। গলার কম্পন অবশ্যই আয়ত্তে আনতে হবে তাঁকে। রাজেশ্বর ভট্টাচার্যর কাটাকাটা ভঙ্গি, সুর-কম লাগা নিবেদন রস সঞ্চারে ব্যর্থ। সঞ্জীব সুরেলা সপ্রতিভ কণ্ঠের অধিকারিণী

সঙ্ঘমিত্রা গুপ্ত

জয়শ্রী দাশগুপ্তের 'আছ অন্তরে' তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছে পূর্ণ মাত্রায়। দীপালী রায় নিতান্তই অপরিণত অযোগ্য। নীলাঞ্জনা সেনের শ্লেষ্মাভারাতুর বিপর্যস্ত কণ্ঠ বারবার ক্ষুণ্ণ করেছে তার সপ্তকের কথাকে। রতিকান্ত রায়-চৌধুরী বয়সে প্রবীণ, অথচ প্রথম দেখা গেল এই আসরে। পরিচ্ছন্ন, মজলিশী পরিণত গায়নভঙ্গি তাঁর। কণ্ঠটিও সুন্দর। রমা রায়চৌধুরীর কণ্ঠ সুন্দর, 'মাঝে মাঝে তব' গানটি গেয়েছেনও ভাল, কিন্তু 'সার্থক করো সাধনা'-এ তাঁর গোটাগোটা উচ্চারণ কানে লেগেছে। নীলিমা সেনকে বহুকাল বাদে পাওয়া গেল আসরে। দমের কষ্ট সত্ত্বেও 'আরাম জল-লব না' বিরল লভ্য পরিণত নিবেদনের পূর্ণতা ফুটে উঠল। জয়শ্রী রথ এর কণ্ঠ বেশি তীক্ষ্ণ। কিন্তু পরিবেশন নিখুঁত। চিত্রলেখা দত্তের 'সকল জনম ভরে' গানে প্রার্থিত দরদ ছিল। এ-দিনের আসরের সপ্রাণ এবং সব-ছাপানো ব্যক্তিত্ব সুচিত্রা মিত্র এবং সুবিনয় রায়ের। সুচিত্রা মিত্র খুবই প্রাণবন্ত ছিলেন এই আসরে। 'আমি যখন' কিংবা 'এই মলিন বস্ত্র' অথবা 'ঘাটে বসে আছি' নিঃসন্দেহে অসামান্য, কিন্তু 'না রে না রে হবে না তোর স্বর্গসাধন'—এ তিনি যেন আরও অতিরিক্ত কিছু উপহার দেন যা কথায় বা স্বরলিপিতে নেই, নেই অন্য শিল্পীদের নিবেদনেও। তেমনই অমোঘ আকর্ষণ সুবিনয় রায়। তিনি ছিলেন শেষ শিল্পী। চারটি গানেই রেখে গেলেন অশেষের দান। 'যে নিখিলভার ধারণ' বা 'সংশয় তিমির মাঝে'তে যিনি শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়পুরে অনন্য হয়ে বিরাজ করেন, তাঁকেই রাজ-আসনে বসাতে হয় 'আছি রাজ আসনে'তে। এ-কথার পূর্ণ প্রমাণ দিলেন তিনি। আর শেষ গান? 'গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে' গানটিতে সুবিনয় রায়ও ছাপিয়ে যান কথা এবং স্বরলিপির প্রত্যক্ষ বাস্তবতা, অতিরিক্ত একটি মাত্রা যুক্ত করে শ্রোতৃমণ্ডলীর অন্তরে হয়ে ওঠেন অরূপকান্তি এক ব্যক্তিত্ব।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

ফটো : সুবীর চট্টোপাধ্যায়



## নৃত্যের তালে তালে

সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে দক্ষিণ কলকাতার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নৃত্যের তালে তালে তাঁদের চতুর্দশ বার্ষিক উৎসব পালন করলেন। সমবেত যন্ত্র-সংগীত-বাদন ছাড়া দুটি নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠানসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল যা সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষ আনন্দদানে সমর্থ হয়েছে।

প্রথম নৃত্যনাট্য শিশুবর্ষকে স্মরণ করে রচিত 'বিশ্বভ্রাতৃত্ব'। এই নৃত্যনাট্যের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন মৈত্রী দাশগুপ্ত। নৃত্যনাট্যটিতে শতাধিক শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন। সাধারণ গল্প—বুলবুল নামের একটি বালিকা স্বপ্নের মধ্যে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছে এবং সেখানকার সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। সবশেষে তারা একই সঙ্গে ভারতবর্ষে এসে এখানকার সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয় এবং ভারতের বালক বালিকারা বিশ্বভ্রাতৃত্বের চিহ্নস্বরূপ তাদের হাতে রাখী পরিয়ে দেয়। মামুলি এই গল্পকে নৃত্যনাট্যের রূপ দেওয়ায় তাঁদের সযত্ন নিষ্ঠার ছাপ ছিল সর্বত্র। কাহিনী ও সংগীত রচনা করেছেন—আনন্দ মুখার্জি। সংগীত পরিচালনা—শম্পা দাশগুপ্ত। নাটকের মূল চরিত্রে মধুমিতা ঘোষ দস্তিদারের নৃত্যকুশলতা সুবিশেষ প্রশংসনীয়।

দ্বিতীয় নৃত্যনাট্য 'নবরস'-এ অপেক্ষাকৃত বয়স্ক শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কাহিনী : গুরুর আশ্রম থেকে বিতাড়িত হয়ে নায়িকা সুতকণা নটরাজের মন্দিরে আশ্রয় নেয়। মন্দির-গাত্রে নবরসের মূর্তি দেখার কালে আবেশে বিমোহিত সুতকণা নিদ্রায় বিভোর হয়। সেই স্বপ্নের মধ্যে এক-একটি রসের মূর্তির নৃত্যকুশলতায় তার শিক্ষার ত্রুটি সংশোধিত হয়। নটরাজের আশীর্বাদে সুতকণার সুপ্ত প্রতিভার তখন বিকাশ ঘটল। নৃত্যনাট্যের কাহিনী রচনা 'মীরা দাশগুপ্ত এবং নৃত্যনাট্য রূপ বাসন্তী বাগচী। শিল্পীরা এই নৃত্যনাট্যটিকে তাঁদের নৃত্যকুশলতায় প্রাণবন্ত করে তোলেন। বিশেষ করে নায়িকা সুতকণার ভূমিকায় চম্পা মুখার্জি। অন্যান্য চরিত্রে অঞ্জলি ব্যানার্জি, সুদক্ষিণা সরকার, ইন্দ্রাণী দাশগুপ্ত, কণা মুখার্জি, শমিতা সরকার, নূপুর মজুমদার, ডলি মুখার্জি, ঝুমা দাশগুপ্ত এবং পিয়ালী গুপ্ত তাঁদের ভূমিকা যথাযথ পালন করেন।

নৃত্যনাট্যের সংগীত রচনা : নীরদবরণ। সংগীত পরিচালনা : রঞ্জন মজুমদার। সব মিলিয়ে দুটি নৃত্যনাট্যই সেদিন অত্যন্ত উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

**সুভাষ চৌধুরী**

---

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

---

## পঁচিশ বছর পার হয়ে

যে ছবিটি দেখা আছে, সেই ছবিটি থিয়েটার সেন্টার-এর রজত জয়ন্তী উপলক্ষে ইনফরমেশন সেন্টারে আয়োজিত প্রদর্শনী। এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে ইদানীং কালের শক্তিমান পরিচালক এবং প্রবীণ নাট্যকার পরিচালক কে। এঁদের মাঝখানে আছেন থিয়েটার সেন্টারের কর্ণধার তরুণ রায়। যখন থিয়েটার সেন্টার আরম্ভ হয় তখন প্রবীণ পরিচালকের মনে দ্বিধাগ্রস্থ কৌতূহল ছিল। পেশাদারী থিয়েটারের বিরাট সমারোহের পাশাপাশি এ ধরনের বেপরোয়া পাগলামি, করুণা অথবা পিঠচাপড়ানোর উৎসাহই পেতে পারে। আজ পঁচিশ বছরের স্মারক উৎসবে তিনি দর্শক। ইতিমধ্যে অনেক পেশাদারী মঞ্চ উঠে গেছে। হাত বদল হয়েছে। সাম্প্রতিক কালের গ্রুপ থিয়েটারের শক্তিমান পরিচালক যখন কাজ আরম্ভ করেছেন, তার আগে থেকেই থিয়েটার সেন্টার চালু আছে—খুবই ছোট আসরে এবং অকশাই প্রযোজনা ক্ষেত্রে কোন দিকচিহ্ন স্থাপন না করে। কিন্তু একটি সংস্থার কর্ণধার হয়ে তিনি বুঝবেন, সক্রিয়ভাবে টিঁকে থাকাটা কত কঠিন।

থিয়েটার সেন্টার প্রদর্শনীতে আন্তর্জাতিক থিয়েটারের পরিচয় সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন নাট্য উৎসবে নামী অনামী সহযোগিতায়। প্রতিযোগিতার প্রথম পর্বে একালের অনেক প্রতিষ্ঠিত নাট্যকারের কর্মসূচনা মূল্যবান দলিল হয়ে রইল। উৎপল দত্তের দুটি চিঠি—একটি ইংরাজীতে অপরটি বাংলায়—থিয়েটার সেন্টারের আকস্মিক দুর্ঘটনার পর আন্তরিক সহযোগিতার হাত বাড়ানো দেখে বোঝা যায় অনেক মতানৈক্য সত্ত্বেও থিয়েটারের সূত্রে আত্মীয়তা কত

গভীর। জাতীয় নাট্যশালার জন্য তরুণ রায়কে লেখা শম্ভু মিত্রের চিঠিটিও প্রয়োজনীয় তথ্য। পঁচিশ বছরের অনেক শুভ লগ্ন এসেছে প্রদর্শনীতে। সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় নেতা, আন্তর্জাতিক সংগীত শিল্পী, বিখ্যাত অভিনেতা অনেকেরই সংযোগ হয়েছে থিয়েটার সেন্টারের সঙ্গে। থিয়েটার সেন্টার মঞ্চ যখন পুড়ে গেল সেই দুঃখরাত্রির ছবিও দেখা গেল। শুধু দেখা গেল না সেই ঘটে যাওয়া অগণিত দর্শক যারা বিমুগ্ধ থিয়েটার সেন্টারের অভিনয় দেখছে। আসলে থিয়েটার সর্বজনগম্য না হলে সব ছবিই নাগরিক বিলাস বলে মনে হয়।

অনামিকা রজত জয়ন্তী উপলক্ষে বিরাট অনুষ্ঠানসূচীর দ্বিতীয় পর্বে ভারতীয় ভাষা পরিষদে ভারতের নাট্যশাস্ত্রের উপর দীর্ঘ আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করেন। নাট্যশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনাচক্রে আজকের দিনেও প্রাচীন নাটকের যে মূল্যবোধ কাজ করে যায় এবং নাট্যশাস্ত্রের আধুনিক ব্যবস্থায় প্রয়োগবিধি প্রসঙ্গেও আলোচনা হয়। এই আলোচনাচক্রে অনেক আলোচনাই গবেষণামূলক, থিয়েটারের ছাত্রদের কাজে লাগার মত দর্শক অথবা আধুনিক নাট্য প্রয়োগের কাজে আসেন। পঁচিশ বছর পার করে উচিত পঞ্চাশ বছরের জন্য আরও গঠনমূলক প্রকল্প। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা যেটুকু কাজে আসে সেটা বেছে নেওয়াই যথোচিত 'হংসবৃত্ত'।

**দেবাশিস দাশগুপ্ত**

## চেনা মুখ অচেনা গপ্পো

'চেনা মুখ অচেনা গপ্পো'র রচয়িতা প্রণব বসু এমন একটি নাটক লিখেছেন যা বাংলা মৌলিক নাট্যপ্রয়াস সম্পর্কে আরো কিছুটা হতাশা বৃদ্ধির উত্তম সহায়ক। নাটকটিতে চরিত্রের ছড়াছড়ি। নাটকও তাই দাঁড়িয়েছে নাট্যকারের স্থূল খেয়ালবশত। শেষ পর্যন্ত গোটাতে গিয়ে ফটোগ্রাফারবেশী জনৈক কম্যুনিসটের (যথারীতি কাঁধে ব্যাগ ঝোলানো) বকুনীবাজীর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া বোধ কার নাট্যকারের আর কোনো উপায় ছিল না। গত ১০ই মে সন্ধ্যায় অহীন্দ্র-মঞ্চে বসে 'রঙ্গন'-এর বর্তমান প্রযোজনা সম্পর্কে এই আমাদের নীট অভিজ্ঞতা। স্বয়ং নাট্যকারই এক্ষেত্রে নির্দেশক। প্রযোজনা নয়, স্বরচিত নাটকটির 'বাহাদুরী' বোঝাতে বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণকারীদের যাচ্ছে তাই ভাবে ব্যবহার করেছেন তিনি। একজন গণৎকার তো দেখলাম তথাকথিত এই প্রগতিমূলক নাটকে দর্শক মনোরঞ্জনের (?) কথা ভেবেই আগাগোড়া 'ফাজলামো' করে গেলেন। নাটকে এমন অনেক ঘটনাক্রমই আছে, মূল বক্তব্যের সঙ্গে যেগুলো সংস্রবহীন। সমাজের এক শ্রেণীর সুবিধাভোগীরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে অপর শ্রেণীর দীনতা কি ভাবে কাজে লাগায় এই বোধ করি নাটকটির বক্তব্য বিষয়। রচনা, নির্দেশনা বা অভিনয় কোনোদিক থেকেই যা শিক্ষিত থিয়েটারের মান স্পর্শ করে না। বরং অভিনয়ের প্রস্তুতি, মঞ্চায়নের ব্যবস্থা ইত্যাদি থেকে শুরু করে যায় তোষণকল্পে প্রেসের প্রতিনিধিদের ঠাণ্ডা পানীয় সেবনে শুধুই কিছু উৎসুক নাট্যকর্মীর টাকার শ্রাদ্ধ করে।

**রানা দাস**

---

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **বিবিধ**

---

## প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কবিতা

জানুয়ারি মাসে শিশিরমঞ্চে একটি আবৃত্তির আসর বসেছিল, নাম—'সংগ্রামের কবিতা'। বোধকরি সেই অনুষ্ঠানটিই প্রেরণা জুগিয়ে থাকবে রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষকে। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি তাঁরা প্রযোজনা করলেন একটি পাঠ ও আবৃত্তির আসর—নাম, 'প্রতিবাদ, প্রতিরোধের কবিতা'। প্রতিরূপ অনুষ্ঠান, তাই পূর্ববর্তী আসরের বহু কবিতাই এবং কবিতার নামে ভেজাল-দেওয়া বহু রচনাই পুনরাবৃত্ত হল এই আসরে। নতুন কিছু ভেজালের নমুনাও মিলল। মিলল কিছু কবির দেখাও, যাঁরা অনুপস্থিত ছিলেন সংগ্রামের কবিতায়।

আসলে বিষয়টাই অনির্দিষ্ট। কার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কিসের প্রতিরোধ? উদ্যোক্তারা বলেননি, শিল্পীরাও সকলে ধরতে পেরেছেন বলে মনে হল না। ধরা সম্ভবও ছিল না। তাই পড়া হল বিষ্ণু দে-র 'ঘোড় সওয়ার', যেখানে 'কামনার টানে সংহত গ্লেসিয়ার'; পড়া হল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মহারাজ, আমি তোমার', যেখানে রোমান্টিকতার জয়গাথা; পড়া হল রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্যের কবিতা, যেখানে মঙ্গলময়ের কাছে প্রার্থনা রয়েছে, রয়েছে দীক্ষার ভিক্ষা। এমন অনেক অনেক, যা প্রতিবাদে মুখরিত নয়, নয় প্রতিরোধে উদ্দীপিত। তা বলে কবিতা নয়, এ-কথা ভাবলে ভুল হবে। আসলে বিষয় বাছাতেই সীমাবদ্ধতা আরোপিত হয়েছে। কবির রচনায় সমর্থন না পেয়ে অনেককেই হাত বাড়াতে হয়েছে অ-কবিতার দিকে। অকারণে চিৎকার করতে হয়েছে, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের আবহ ফুটিয়ে তোলার অছিলায়।

গোষ্ঠীগতভাবে চারটি সংস্থা পরিবেশন করলেন সমবেত আবৃত্তি। বহু ধরনের পরীক্ষার চেষ্টা ছিল। ছিল ভিন্ন স্কেলের কণ্ঠ মিলিয়ে ঐকতান সৃষ্টির প্রয়াস, ছিল সুরকে আবৃত্তিতে ধরার চেষ্টা, ছিল একক-দ্বৈত-সম্মেলক আবৃত্তির পরম্পরাময় নিবেদন। সব থেকে সার্থক 'আবৃত্তি আকাদেমী'। স্বাস্থ্যকর মহলার চিহ্ন ছিল তাঁদের নিবেদনে। চ্যাঁচামেচিও সব থেকে কম। একক আসরে নতুনদের মধ্যে ছাপ ফেলেছেন রত্না মিত্র। তাঁর আবৃত্তির কণ্ঠ সুন্দর, ভঙ্গি নিজস্ব। শুধু বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা থেকে শেষ [illegible] বিরতি থাকলে ভাল হত। অশোক পালিত এদিন খুবই নিয়ন্ত্রিত ও নিষ্ঠাময় ভঙ্গিতে পাঠ করেছেন। অথচ আবেগ ছিল, ছিল নাটকীয়তাও। কিন্তু সংহত সংযম ছিল। ছিল কবিতার মূল রসটিকে পুরোপুরি অক্ষুণ্ণ রেখে পরিবেশনের সৎ প্রয়াস। অমল গুহ খুব জোরালো ভঙ্গিতে পড়েন। তাঁর নির্বাচিত রচনার ক্ষেত্রে অবশ্য এই জোর-দেওয়া মানিয়ে গেছে। প্রিয়লাল রায়চৌধুরী ব্রেখটের কবিতার 'হে ভাগাহত' যেভাবে আলাদা করে ভাঙলেন, তাতে ছ-মাত্রার ধ্বনি-প্রধান ছন্দ হঠাৎ কেটে গেছে। একই রকম ভুল শুভ্রা বসুর 'ঘোড় সওয়ার' কবিতাতেও কানে লাগে। 'দীপ্ত বিশ্ববিজয়ী বর্শা তোলো' পঙ্‌ক্তির 'দীপ্ত বিশ্ববিজয়ী বর্শা তোলো' এই পর্বভাগ মূল ছন্দের সুরের পরিপন্থী হয়ে গিয়েছিল, বিশেষত দুটি পর্বের মধ্যে বিরতি ঈষৎ বেড়ে যাওয়ায় ছন্দের মধ্যখণ্ডকের মজাটা একেবারেই পাওয়া গেল না। তৃপ্তি মিত্র সেদিন অতিরিক্ত নিরাবেগ একটি ভঙ্গি বেছে নিয়েছিলেন। ফলে পাঠমাত্র হয়ে দাঁড়াল তাঁর নিবেদন। আবার দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এমনই উচ্চকিত আবেগ যুক্ত করলেন শেষ কবিতায়, যা কান-মনকে পীড়িত করে। কাজল চৌধুরী এবারও পাবলো নেরুদার কবিতাটি পড়লেন। তবে শিশিরমঞ্চের থেকে অনেক তৃপ্তিকর ভঙ্গিতে। বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ শিশির মঞ্চে 'সংগ্রামী অভিনন্দন' জানিয়েছিলেন, এবারে জানালেন 'সশ্রদ্ধ নমস্কার' (সংগ্রামের কবিতা ও প্রতিবাদের কবিতায় এতখানি তফাত নাকি?) তাঁর দৃপ্তভঙ্গিতে পরিবেশন মনে দাগ কাটে। অমিয় চট্টোপাধ্যায় বলাকার ৩৭ সংখ্যক কবিতার শেষাংশ বেছে নিলেন। এটুকুর মধ্যেই তিনি হয়তো প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সুর খুঁজে পেয়েছিলেন। তৃপ্তি মিত্র কিন্তু একই কবিতার সবটুকু শোনালেন। বোধ করি, দৃষ্টিভঙ্গির তফাত। তরুণ চক্রবর্তীর নির্বাচন ও নিবেদন উল্লেখযোগ্য। রজত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত তিনটির একটি—'অভিযোগ রাষ্ট্রের হত্যা'—শিশিরমঞ্চে গৌরী ঘোষের কণ্ঠে শুনেছি। গৌরীর পরিবেশনে রচনাটি আরও ভাল লেগেছিল। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ল, এই আসরে গৌরী ঘোষ ও পার্থ ঘোষ দুই উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতি। তাঁরা বাদ পড়লেন কেন? নীলাদ্রিশেখর বসুর 'যৌবনের অভিনন্দন' জানানো নতুন-কিছু-করো মনে হয়েছে, তবে তাঁর এদিনের আবৃত্তি খুবই উত্তীর্ণ। মিনতি দে-র নির্বাচন এলোমেলো, আবৃত্তি অবশ্য খারাপ নয়। শাঁওলী মিত্র এই আসরেও অবিসংবাদী জনপ্রিয়তার জ্বলন্ত প্রমাণ রাখলেন। নির্ধারিত সময় বাড়াতে হল তাঁর ক্ষেত্রে। এবং একমাত্র তাঁর ক্ষেত্রেই। দেখা গেল, প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত প্রান্ত থেকে উদ্বেল অনুরোধ, উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন বাধ্য করল শেষের পরও নতুন করে পরিবেশনে।

**প্রণব মুখোপাধ্যায়**

## প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

### ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত
(১৯৩৯—)

দেশ পূর্ব বাংলায়। জন্ম ত্রিপুরায়। তিনি যখন শিল্পী হতে চাইলেন তখন আপত্তির ঝড় উঠল। আই এ পড়তে হলো গুরুজনের আদেশে। উত্তীর্ণ হবার পর সোজা এসে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে যোগ দিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ত্রিপুরা সরকারের জলপানি পেয়ে গেলেন। শান্তিনিকেতন থেকে চারুকলার ডিপ্লোমা নিলেন (১৯৬১)। কর্ম-জীবনের বেশিরভাগ কাটিয়েছেন সেন্ট টমাস চার্চ স্কুলে, হাওড়ায় (১৯৭৮ পর্যন্ত)। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর, ফলে ছেড়ে দিলেন। ওঁরা কয়েকজন সহকর্মী মিলে হাওড়ার দাসনগরে সেন্ট টমাস হাই ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন (১৯৭৯)। এর ফাঁকে, অল্পসময় রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব প্রিনটিং টেকনোলজিতে অধ্যাপনা করলেন। কিছুদিন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপক ছিলেন। এক বছর রবীন্দ্রভারতী সংসদের সদস্য ছিলেন (১৯৬৯-৭০)।

প্রদর্শনী স্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গে যৌথভাবে আগরতলায় (১৯৬১)। একক প্রদর্শনী, কলকাতা (১৯৬৩)। ত্রিমুখী প্রদর্শনী, নতুন দিল্লী (১৯৬৪)। ছজনের প্রদর্শনী, কলকাতা (১৯৬৬)। দ্বৈত প্রদর্শনী, কলকাতা (১৯৬৭)। শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের প্রদর্শনী, কলকাতা (১৯৬৯)। যৌথ প্রদর্শনী কলকাতা এবং নতুন দিল্লি (১৯৭০)। ১৯৬১-৭০ আকাদমী অব ফাইন আর্টসের বার্ষিকী, কলকাতা। ওয়েস্ট বেঙ্গল আকাদমী অব ফাইন আর্টস, কলকাতা (১৯৬৯)। বিড়লা আকাদমীর বার্ষিকী (১৯৭৫-৭৯)। ১৯৭১-৮০ জাতীয় প্রদর্শনী, ললিতকলা আকাদমী, নয়া দিল্লি। ১৯৭১-এ সোসাইটি অব কনটেমপোরারী আর্টিস্টস সংস্থায় যোগদান। দলীয় প্রদর্শনী হয় নয়াদিল্লি, বোম্বাই, কলকাতা। এছাড়া ঢাকা এবং চাটগাঁ। কলাযাত্রার প্রদর্শনী, নয়াদিল্লি, মাদ্রাজ এবং কুয়ালালামপুর, (মালেশিয়া), ১৯৭৯। ছবি আছে ললিতকলা আকাদমী, নয়াদিল্লি, বিড়লা আকাদমী, কলকাতা এবং সংগ্রহকারীর কাছে।

প্রচ্ছদচিত্র "শাসক" (ক্যানভাসে টেম্পেরা, ২৮" × ২২") সবুজাভ রঙের মধ্যে বাদামী এবং নীলের ব্যবহারে সুন্দর ঐকতান গড়ে উঠেছে। শাসকের মুণ্ডু নেই। হাতে এবং পায়ের কাছে ফুল। তিনি কি এর গন্ধ শুঁকবেন, পায়ে না মাড়িয়ে দেবেন? মাঝ বরাবর মূল চিত্রটির বিষয় অকসর গালি বর্ণের মাধুর্যে দিয়ে ভরেছেন। গোটা ছবি মনোরম আবহ রচনা করেছে।

ধর্মনারায়ণ গোড়াতে তৈলচিত্র আঁকতেন। যতদূর মনে পড়ে তাঁর ছবির প্রথম দিকের বিষয় ছিল তন্ত্র। জোয়ার। এর মূল প্রবক্তা নীরদ মজুমদার। তাঁর দেখাদেখি দিল্লিতে বোম্বাইতে হুদো হুদো তান্ত্রিক শিল্পী তৈরী হল। নীরদবাবুর যে অনুধ্যান তা এঁদের কারো থাকার কথা নয়। বিদেশীরা তখন ভারতীয় কিছু চাইছেন। সুতরাং তন্ত্রের বাজার তখন তেজী। এই গড্ডলিকা স্রোতে যাঁরা গা ভাসালেন ধর্মনারায়ণ তাঁদের অন্যতম। তন্ত্রের প্রতীক প্রতিমা ব্যবহার করে তিনি ভাল ছবি না এঁকেছেন তা নয়। আসলে এই সময়টা পথ হাতড়াচ্ছেন তিনি। কিন্তু নিষ্ঠা ছিল বলেই তিনি পন্থা বদলাতে পারলেন।
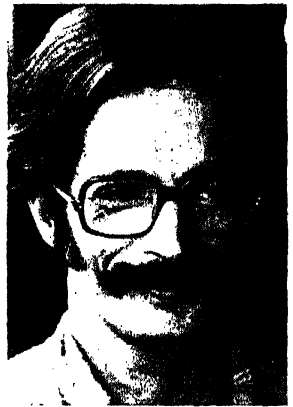
শান্তিনিকেতনে নন্দলাল বসুর কাছে শেখা টেম্পেরার দিকে নজর পড়ল এবার। কিন্তু নন্দলালী ঘরাণায় থাকার কোন ইচ্ছা ছিল না তাঁর। তাঁর মোক্ষ তাঁর নিজের হাতে। গুরুকৃপা শিল্পে চলে না। মোটামুটি তিনি ভারতীয় অণুচিত্রের (মিনিয়েচার) কাছে গেলেন। তাঁর নিরমাণকলার মধ্যে নানা মাত্রিক তান তোড়ার সূক্ষ্ম কাজের দিকে দৃষ্টি পড়ল। তার সঙ্গে কল্পনায়ার অন্য একটা মাত্রা যোগ করলেন। আমাদের গুহাশ্রিত অবচেতনলোকের কাছে ছবির আবেদন করতে হবে। স্বপ্নসম্ভব একটা জগতের স্পর্শ রাখতে হবে ছবিতে! দুনিয়ের রুশোর আরণ্যক জীবজন্তুর সঙ্গে মেলালেন তিনি ভারতীয় অণুচিত্রের নানা চিত্রভঙ্গিমা। ফলে নিজস্ব রীতি সহজে গড়ে তুললেন। এর সঙ্গে পল ক্লীর অনুসন্ধান। তাঁর ছবিতে বিধবা মহিলা পাহাড়ের সামনে, লাল, সবুজ সাপ জড়ানো গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকে। ধান ক্ষেতে হলুদ সাপুড়ে বাঁশী হাতে নাগিনী কন্যাদের ধরতে ছোটে। পাখি উলটোভাবে ডালে বসে থাকে। পরবর্তী পর্বে পুরাতনী মোটর গাড়ি বনপথে চলে। ওড়ে আকাশে। চার্লি চ্যাপলিনের মরদেহ ফুলে ঢাকা পড়ে থাকে। ইদানীং ফোটোগ্রাফ চেঁচে এক ধরনের ছবি আঁকছেন—মেয়েদের কাটা মুখ ভেসে উঠছে। হালের এই ব্যাপারটা পুরোপুরি পরীক্ষার স্তরে। নান্দনিক উত্তরণ ঠিক এখনও ঘটেনি। পর্বে পর্বে পালাবদল তাঁর সহজাত। যদিও এক পর্ব থেকে অন্য পর্বে যাত্রার সেতুবন্ধ খুঁজে পাওয়া দুরূহ। তবুও তাঁর কিছু ছবিতে রয়েছে প্রগাঢ় গীতিকবিতার

সদা প্রাণোচ্ছল...
Waterbury's
Tonic
Contains
12 vital ingredients
for Energy,
Health and Strength
হলদে
লেবেল
দেখে
নিন।
এর জন্যে চাই
ওয়াটারবেরীজ®
ভিটামিন টনিক
কথায় বলে স্বাস্থ্যই সম্পদ ! আর যাঁদের তা আছে—
তাঁদেরই দিনগুলি হাসিখুশিতে ভরে থাকে ! আপনিও আপনার
পরিবারের সবাইকে সদা সুস্থসবল রাখুন—এক সহজ উপায়ে !
নিয়মিত ওঁদের ওয়াটারবেরীজ ভিটামিন টনিক খেতে দিন।
কারণ, এ এক সম্পূর্ণ টনিক, আপনার আহারে যে পুষ্টির অভাব
থাকে, তা পূরণ করে ! স্বাস্থ্য আর শক্তির জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয়
সমস্ত ভিটামিন আর খনিজপদার্থই এতে আছে। সুস্থ রক্তের
জন্যে আয়রণ, ক্ষিদে বাড়ানোর জন্যে বিশেষ উপাদান আর
নিমেষে শক্তি যোগানোর জন্যে মল্ট ! খেতেও দারুণ ভালো !
ওয়াটারবেরীজ ভিটামিন টনিক—আপনার একান্ত প্রয়োজনীয়
যাবতীয় পুষ্টিগুণে ভরপুর !
সারা পরিবারের জন্যে সম্পূর্ণ টনিক
ভিটামিন, খনিজপদার্থ ও আয়রণযুক্ত
লিনটাস-WVT.1-2415 BG

দেশ

আপনিও অবাক হবেন
একটা
ছোট্ট ড্রাই সেলে
কি ক'রে এত শক্তি
থাকতে পারে ?
জীপ
হাই-লাইফ্
শক্তির এক 'অফুরন্ত উৎস'
আপনার ট্রানজিষ্টারের
জন্যই যেন অবিকল তৈরী
এই হল আপনার জন্য জীপ
হাই-লাইফের পরিচয়।
সর্ব্বোত্তম লীক প্রুফ্ ড্রাই সেলের
ওপর পোলীয়েষ্টার ফিল্ম কেসিং
(জাপান হইতে আমদানী)
দেওয়া থাকে বলে নিরাপদ এবং
মরচে পড়ে না। অনেক বছরের
গবেষণার পর উন্নত জীপ প্রযুক্তি
বিত্তার দ্বারা আরো নিখুঁত করা।
জীপ হাই-লাইফ সেল কিনুন, যা
অন্যান্য সবার চেয়ে বেশী দিন চলে।
GEEP
(এ খেরোয়ানী এন্টারপ্রাইজ)
Sterling-GF-4124

## ইসরায়েল

৩১ মে তারিখের 'দেশ'-এ শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় কষ্ট-কল্পিত প্রবন্ধে ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, "আমরা ইসরায়েলকে কখনও সমর্থন করিনি। আর ইসরায়েলের জন্মও তো অদ্ভুত। কবে দু হাজার বছর আগে ইহুদীরা ওখানে থাকতেন। ইংল্যাণ্ড আমেরিকার কূটনীতিতে ইসরায়েলের সৃষ্টি হল।"

এই অবসরে ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম এবং ইহুদী জাতির ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। জনৈক আব্রাহামের দুই পুত্র ইসমাইল এবং আইজাক হতে আরব এবং ইহুদী দুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। সেই থেকেই আরব ইহুদীর ইতিহাস হল নিরবচ্ছিন্ন ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের ইতিহাস। আদি বাসভূমি প্যালেস্টাইন হতে ইহুদীরা তিনবার —প্রথমে রোমান বিজয়ীদের দ্বারা, দ্বিতীয়বার ধর্মযোদ্ধৃগণ (crusader) দ্বারা, তৃতীয়বার আরবদের দ্বারা— বিতাড়িত হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। একমাত্র ভারতবর্ষে তারা কোন প্রকার সামাজিক বা রাজনৈতিক বিসদৃশ আচরণের সম্মুখীন হয়নি। তাছাড়া মিশর, ইউরোপের সকল রাষ্ট্রে তাদের উপর চলে সমানে নির্যাতন। সেক্সপীয়ারের "মার্চেন্ট অব ভেনিস" নাটক থেকে বেশ বোঝা যায় সেকালে ইউরোপে ইহুদীদের প্রতি সামাজিক ঘৃণা কিরূপ প্রবল ছিল। মাত্র কয়েক বৎসরে হিটলারের জার্মানী মেরেছে ষাট লক্ষ ইহুদী। সৈয়দ মুজতবা আলী লিখেছেন, ইউরোপের সব দেশেই ইহুদীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হত কিন্তু হিটলারের অত্যাচারের ভয়াবহতা দেখে তারা আতঙ্কিত হয়ে হাত গুটিয়ে নিল। সোভিয়েট ইউনিয়নে এখনও তারা সুখে নেই।

পৃথিবীর যে দেশেই ওরা থাকুক, প্রথম থেকেই স্বপ্ন দেখে এসেছে এবং বিশ্বাস করে এসেছে যে, ওরা স্বদেশে ফিরবেই। এ ধরনের একটি অত্যাচারিত জাতি, নির্যাতন থেকে মুক্তির অভিলাষে যদি একটি নিজস্ব বাসভূমি (হোমল্যাণ্ড) নিজেদেরই আদিভূমিতে প্রতিষ্ঠার দাবী করে, তা কি অযৌক্তিক? প্যালেস্টাইন ইহুদীরা পুরোপুরি ছেড়ে আসেনি। একটি বিরাট সংখ্যক ইহুদী সেখানে রয়ে গিয়েছিল। প্যালেস্টাইন এদের তীর্থক্ষেত্র। বিদেশে এরা নিজেদের ধর্ম এবং সংস্কৃতি এত বৎসর ধরে বজায় রেখে এসেছে।

এই শতাব্দীর প্রথম থেকে সারা পৃথিবী জুড়ে তাদের হোমল্যাণ্ডের আন্দোলন জোরদার শুরু হয়। ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রী "স্বাধীন ইহুদী রাষ্ট্র" গঠন করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর প্যালেস্টাইনের ইহুদীরা বার বার আরব আক্রমণের সম্মুখীন হয়। সেখানে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত অনেকগুলি দাঙ্গা হয়। ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রসংঘ সোভিয়েট ইউনিয়নের সমর্থন সহ প্যালেস্টাইনে [illegible] ১৯৪৮ সালের ১৫ই মে তারিখে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মুহূর্তেই আরব আক্রমণে পাঁচ হাজার ইহুদীর জীবন আহুতি দিতে হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নও ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেয়। ভারতেও ইসরায়েলের কনসুলেট অফিস আছে বোম্বাইতে। আরবদের অন্ধভাবে আমাদের সমর্থনের কারণ তো সুবিদিত। আরব দেশগুলোতেই না রয়েছে পৃথিবীর জ্ঞাত তৈল সম্পদের ৪২%।

"ইসরায়েলের জন্ম" পর্যন্ত সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। (পরবর্তী ঘটনার কথা এখানে নিষ্প্রয়োজন)। এটা কি খুবই "অদ্ভুত"? তার চেয়ে "অদ্ভুত" কি নয় পূর্ব জার্মানী, বার্লিন, তাইওয়ান, পাকিস্তানের জন্ম!

শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় আবার লিখেছেন, "ভারতবর্ষের কিছু লোক আর্যবংশসম্ভূত তাঁরা যদি বলেন যে, আমরা মধ্য এশিয়া চলে যাই, সেখানে আমাদের একটা রাজ্য দেওয়া হোক, কারণ সেখান থেকেই তো আমাদের পূর্ব পুরুষেরা এসেছিলেন।......ঠিক এই যুক্তিতেই ইসরায়েলের জন্ম হয়েছিল।" এটা বস্তুত একটি কাল্পনিক যুক্তির সঙ্গে মিল খোঁজার চেষ্টা। ভারতের আর্যবংশসম্ভূতরা কি কোন দিন জানতেন বা মনের দিক থেকে বিশ্বাস করতেন যে, তাঁরা মধ্য এশিয়া, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া বা বাইরের কোন দেশ থেকে ভারতে এসেছেন? বা বাইরের কোন অঞ্চলের সঙ্গে কি ভারতীয় আর্যদের সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক কোন যোগসূত্র আছে? তাদের পৌরাণিক বা ধর্মীয় গ্রন্থে কি বহির্দেশ থেকে এদেশে আসার কথা উল্লেখ আছে? একমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিকরা একথা বলেছেন এবং এঁরাও এই ইণ্ডো-এরিয়ান থিয়োরী নিয়ে সপ্তধা বিভক্ত। এঁরা বিভিন্ন মত পোষণ করেন। সাতটি থিয়োরীর মধ্যে অন্যতম "সপ্তসিন্ধুর থিয়োরী" যা কিনা বলে সিন্ধু নদের আশেপাশের ৭টি নদী বিধৌত অঞ্চল আর্যদের আদি বাসভূমি। দাক্ষিণাত্য একসময় সমুদ্র দ্বারা এই অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল।

**সুনীতি ভৌমিক**
রড়ো

## খরায় সাহায্য

অতুল্য ঘোষের "কষ্টকল্পিত" পর্য্যায়ের লেখাগুলি আগ্রহের সঙ্গে পড়ে আসছি। গত ১৪ই জুন সংখ্যায় তিনি লিখেছেন যে "চোত-বোশেখ দু মাসে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলা দাউ দাউ করে জ্বলছে। দাবদাহেও এত কষ্ট হয় না। ইঁদারায় জল নেই, কুয়োয় জল নেই, পুকুরে জল নেই, গরুছাগল জল খেতে পায় না ইত্যাদি ইত্যাদি। ভালভাবে কাগজে বেরোয় না। সেইজন্য আমাদের জনহিতকর সব সংস্থা নিশ্চুপ, নির্বাক ও নিস্পন্দ। রোটারীর নামও শোনা যাচ্ছে না। তিনি আর এক জায়গায় লিখেছেন যে "সরকারী দল ও বিরোধী দল কেউই এ সম্বন্ধে অবহিত নন বলে রোটারী, লায়ন্স, চেম্বার অফ কমার্স ও অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠান

কি এটা ধরে নিতে হবে যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে খুশী করার জন্য এরা জনহিতকর কার্যে উদ্যোগী হয়?"

জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ করে রোটারী সম্বন্ধে অতুলবাবুর এ মন্তব্য সমীচীন হয়নি। রোটারী প্রচারে বিশ্বাস করে না। রোটারী একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এবং কোন রোটারী ক্লাবই নিশ্চুপ হয়ে থাকে না। তিনি বীরভূমের উল্লেখ করেছেন এবং সেজন্য তাঁর অবগতির জন্য কয়েকটি উদাহরণ দিই। বীরভূমের খরার মোকাবিলা করবার জন্য শান্তিনিকেতন রোটারী ক্লাব বোলপুরের সন্নিকটে আমদহরা গ্রামে একটি ৫ ফুট ব্যাসের ইঁদারা খনন করে গ্রামবাসীদের জলের ব্যবস্থা করেছে। নিকটের আর একটি গ্রাম কাপাশটিকুরীতে একটি নলকূপ খনন করেছে। গত বৈশাখ মাসে শান্তিনিকেতন রোটারী ক্লাব চক্ষু শিবির স্থাপন করে দুস্থদের বিনামূল্যে চক্ষু অস্ত্রোপচার করেছে ও চশমাও দিয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ৭৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় যখন বোলপুর এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত হয়েছিল, তখন সরকার কোন প্রচেষ্টা নেবার আগে সর্বপ্রথম রোটারী ও লায়নস স্থানীয় ছেলেদের নিয়ে ত্রাণ ও উদ্ধারকার্যে নেমে পড়েছিল।

রোটারী মানেই সেবা (Service) এবং রোটারী সচেষ্টভাবে রাজনীতি থেকে দূরে থাকে এবং "রাজনৈতিক দলকে খুশী করার" কোন স্পৃহা তাদের নেই।

**পবিত্রকুমার দাস**
শান্তিনিকেতন

## কলকাতার জল সমস্যা

কলকাতার জল সমস্যা নিয়ে যে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে, ও সি এম ডি এ থেকে প্রতিবাদ পত্র বেরিয়েছে এ দুটোর কোনটা পড়েই কলকাতার সাধারণ মানুষ প্রকৃত অবস্থাটা বুঝতে পারবেন না। কলকাতায় জল যেমন বেড়েছে, মানুষও বেড়েছে, বেড়েছে পাইপের ছ্যাঁদাও, ফলে জল নষ্ট হচ্ছে বেশী—ফুটপাথে বাসিন্দার সংখ্যা হিসাবের বাইরে চলে যাচ্ছে। আর যে সব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে সেগুলো কবে শেষ হবে সেটা ভগবান ছাড়া কেউ বলতে পারবেন না। কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মালপত্র পাওয়া যাচ্ছে না। ওয়াগনের অভাব, ট্রাকের অভাব—কারখানাগুলোর অবস্থা পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্য রাজ্যে (যেমন বিহারে) আরও শোচনীয়। অন্যদিকে 'সেকটর' হল জল সরবরাহ। "প্রায়রিটি কোর" (Priority/Core) সেকটরে না আনতে পারলে জলের অভাব কোনও দিন মিটবে না। ভারত সরকার মাথায় হাত দিয়ে কি ভাবছেন এতকাল বসে?

**শিশিরকুমার নিয়োগী**
মহাসচিব, আই পি এইচ ই

## রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি

২৮ জুন তারিখে প্রকাশিত শ্রীমতী প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একমত হতে পারছি না। বিনয়ের সঙ্গে জানাই, বিতর্কে অংশ নেওয়া ভাল কিন্তু যে কোনো মতকে একমাত্র 'সত্য' বলে ধরে নেওয়া ভাল নয়।

সুইডিশ আকাডেমীর কাছে রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার জন্য ইংল্যান্ডের রয়েল সোসাইটি অব লিটারেচার-এর ফেলো স্টার্জ মুর প্রস্তাব দিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু এই সোসাইটির কাছে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর রচনাকর্মকে কে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন? ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২৫ নভেম্বর ইয়েটস-ই এডমন্ড গসের কাছে রবীন্দ্রনাথকে ইংল্যান্ডের আকাডেমীর কমিটির সদস্য করার প্রস্তাব জানিয়ে পত্র দিয়েছিলেন। স্টার্জ মুর নোবেল কমিটিকে জানান তার পরেই।

প্রসঙ্গত ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির অন্তরালে কিভাবে কাজ করেছিলেন তার কিছুটা প্রকাশ করলে চিন্তার একদেশদর্শিতা কিছুটা সংযত হবে আশা রাখি।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১৬ জুন রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি-র কপি নিয়ে ইংল্যান্ডে উপস্থিত হলেন। রোটেনস্টাইনকে কপি দেখালেন। রোটেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী গীতাঞ্জলির তিনটি টাইপ কপি করিয়ে একটিকে তদ্দেশীয় বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর অতি পরিচিত কবি ইয়েটস-এর নিকট পাঠালেন। ইয়েটস তখন দক্ষিণ ফ্রান্সের নর্মান্ডিতে ছিলেন। সেখানে তিনি মড গ্নের আতিথ্যে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তিনি মড-গনকে কপিটি পড়ে শোনালেন ও মতামত চাইলেন। মাদাম গন একা নন, জেমস এইচ কাজিনস সস্ত্রীক সে সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করেন। ২৭ জুন ১৯১২ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইয়েটস-এর সাক্ষাৎ হল। ৩০ জুন সন্ধ্যায় রোটেনস্টাইন গৃহে এজরা পাউন্ড আর্নেস্ট রীজ, মে সিনক্লেয়ার, এন্ড্রুজ প্রমুখের সামনে গীতাঞ্জলি পাঠ করে শোনালেন ইয়েটস। ১০ জুলাই ট্রকেডেরো হোটেলে ইণ্ডিয়া সোসাইটি আয়োজিত রবীন্দ্র সংবর্ধনা সভাতে ইয়েটস সভাপতির বক্তব্য রাখলেন ও ইংল্যান্ডের বহু বিদগ্ধ সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের নিকট তাঁকে অতিশয় আগ্রহের সঙ্গে চিহ্নিত করলেন ও তুলে ধরলেন। ১৭ জুলাই ইয়েটস ও রবীন্দ্রনাথ হোটেলে একসাথে ডিনার খান এবং ইয়েটসের গৃহে বসে পাণ্ডুলিপি খুঁটিয়ে দেখেন—এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ একসময় বলেন, 'তারপর এল সেই আনন্দময় দিনগুলো যখন আমি ইয়েটসের সঙ্গে কাজ করেছি এবং আমি নিশ্চয়ই বলবো যে তাঁর লেখনীর জাদুস্পর্শে আমার ইংরেজী কিছুটা চিরন্তনতার গুণ অর্জন করতে পেরেছে।' গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদগুলিকে তিনি মার্জিত করে তোলেন। গীতাঞ্জলির

ইংরেজী অনুবাদ মুদ্রিত আকারে প্রকাশের ভূমিকা লিখেছিলেন ইয়েটস্‌। ইয়েটস এজরা পাউন্ড, রোটেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথকে ইংল্যান্ডে পরিচিত করালেন। ইংল্যান্ডের পক্ষ থেকে স্টার্জ মুর এবং অসংখ্য সাংবাদিক আবেদন করলেন সুইডিশ কমিটির কাছে। এ বিষয়গুলি মোটামুটি সবাইয়ের জানা। আরেকটি বিষয় কেউ কেউ জানে : ১৯১২-তে রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ যাত্রার আগে সুইডেনের প্রিন্স উইলিয়ম কোলকাতা এসেছিলেন এবং জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ সহ অন্যান্য বহুজনের সঙ্গে রাজনীতি ও বহুবিধ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। নোবেল পুরস্কার নেওয়া ছিল রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক আবর্তে পড়া। 'বিংশ শতাব্দী' পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩৬৮, ৫ম বর্ষ : ১১ সংখ্যা) কমলাপতি দে উল্লেখ করেন নোবেল পুরস্কার দেওয়ার দ্বারা একদিকে ইংরেজদের ওপর একহাত নেওয়া আর একদিকে জার্মানীকে খুশী করা ছিল সুইডিস একাডেমীর কৌশল।'

কবি নিজে বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তবে ভীষণ দেরীতে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারী রোটেনস্টাইনকে লেখা পত্রে উল্লেখ করেছেন—'আপনাদের সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাওয়াটা আমার নিজের পক্ষে একেবারেই প্রয়োজন ছিল না। এটা ছিল একটা দুর্ঘটনা যার জন্যে দায়ী আপনি এবং সম্ভবত ইয়েটস-ই সর্বাধিক।' ....'আমি লজ্জাই বোধ করেছি যে....দৃষ্টিপ্রসাদের অভিলাষী হতে গেলাম উপযাচক হয়ে।' উজ্জ্বলকুমার মজুমদার : 'ইয়েটস ও রবীন্দ্রনাথ' বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৭২ সংখ্যাটি এ বিষয়ে কিছু উপাদান যোগাতে পারে।

এজরা পাউন্ড নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগেই মার্চ ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে 'ফর্টনাইটলি রিভু' পত্রিকায় গীতাঞ্জলির মুগ্ধ প্রশস্তি লিখেছিলেন।

পত্রলেখিকা শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন ইয়েটস বা এজরা পাউন্ড রবীন্দ্রনাথের প্রতি ঈর্ষান্বিত ও বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে তাঁর 'গৌরব আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করেছিলেন।' একথা সত্য যে ইয়েটস কিংবা এজরা পাউন্ড পরে পরেই রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে সমালোচনা করেছিলেন তবে ঈর্ষাপ্রসূত বা রাগে-ক্ষোভে-অভিমানে নয়। যতদূর জানা যায় দুটি কারণে। প্রথমত রবীন্দ্রনাথ কৃত অনুবাদে ইংরেজী ছিল স্থূল, এবং রবীন্দ্ররচনাকর্মে বিষয়গত উপাদান প্রসঙ্গে তাঁরা একমত হতে পারেননি তাই। পত্রলেখিকা শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় সৌরীন্দ্র মিত্রের 'খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে' বই থেকে হুবহু নিয়ে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। সৌরীন্দ্রবাবু এ সম্পর্কে এই দেশ পত্রিকায় বছর দশেক আগে 'ইংরেজী গীতাঞ্জলি ও ডব্ল্যু বি ইয়েটস' শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ ধারাবাহিক (২১ কার্তিক ১৩৭৭ থেকে) ভাবে লিখেছিলেন। তিনিও সে লেখায় ইয়েটস কর্তৃক প্রকাশক ম্যাকমিলান কোম্পানীকে পত্র লেখার উল্লেখ করেছেন। লেখিকার জানা নেই, এ-কাজ গোপনে হয়নি। প্রকাশ্যে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ইয়েটস ম্যাকমিলান কোম্পানীর অধিকর্তাকে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি কাব্য-লেখন/অনুবাদ পদ্ধতির ভুল ইত্যাদি বিষয়ে পত্র দিয়েছিলেন। ১৯৩৫-এ রোটেন্স্টাইনকে তিনি সে কথা জানিয়েছিলেন, ১৯৩৭, ১লা জুন অবিনাশচন্দ্র বসুকে সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, এজরা পাউন্ড ইংরেজীর বিষয় ছাড়া হ্যারিয়েট মনরো-কে পত্রে জানিয়েছিলেন—'ধর্মীয় প্রচারক হিসাবে টেগোর অপরিহার্য, যন্ত্রণাভোগী পাশ্চাত্ত্য মানুষের তিনি তেমন কাজে লাগবেন না'। রবীন্দ্রনাথ বেছে বেছে কতকগুলি ভাবসঙ্গীত, পুজো-পর্বের কবিতা নিয়েই তো গীতাঞ্জলি বেঁধেছিলেন এবং অনুবাদ প্রসঙ্গে তাঁরই নিজের পত্রে, এডু ওয়ার্ড টমসনকে লেখা, তার উল্লেখ আছে—'আমার অনুবাদে আমি ভীরুর মত সব সমস্যা এড়িয়ে গিয়েছিলাম, ফলত সেগুলো, শীর্ণ হয়ে গেছে।' (কবি রবীন্দ্রনাথ, ১৯৬৬ : পৃষ্ঠা ১৩৫)। ইয়েটস ঈর্ষাতুর তো ছিলেন না ছিলেন আজীবন গুণগ্রাহী—সন্ত নিহাল সিং-এর বিবরণ (ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট-টেগোর মেমোরিয়াল সাপ্লিমেন্ট ১৯৪১) থেকেও জানা যায়। আর বিষয়গত দিক দিয়ে ইয়েটস্‌ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে বিষয়ে মূলগত কারণে বিপরীত মত পোষণ করতেন তা হল—'আপনারা ভারতীয়রা অমৃতকে পেতে চান; আমি চাই মর্ত্যকে'। (নরেশ গুহ/বাংলা রূপক নাটোর উত্তরে আইরিশ প্রহসন/চতুরঙ্গ বৈশাখ ১৩৭০)। লেখিকা একমত হবেন কিনা জানি না, ফাঁকি দিয়ে বা ঈর্ষাকাতর মন নিয়ে বা অন্যের গৌরব আত্মসাৎ করে বিশ্বসাহিত্যে স্থান নেওয়া যায় না। ইয়েটস, রবীন্দ্রনাথ, এজরা পাউন্ড—সবাই স্বনামে ও স্ব স্ব কর্মে স্বতন্ত্র।

মিহিরকান্তি ন্যায়বান
কাশীনগর, ২৪ পরগনা

## গ্রাফিক আর্ট

'দেশ' ২১শে জুন ১৯৮০ সংখ্যায় 'চিঠিপত্র' বিভাগে 'গ্রাফিক আর্ট : লেখকের প্রত্যুত্তর' পড়ে পুনরায় কিছু আলোচনা করতে বাধ্য হলাম।

১। 'প্রিন্টস' ('ছাপাই ছবি ওঁর মতে) সম্বন্ধে সন্দীপবাবুর ব্যক্তিগত মতামত নিয়ে উনি থাকুন—তবে পৃথিবী ভাবে অন্যরকম। মোটামুটি ভাবে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ থেকে চারু-শিল্পের ক্ষেত্রে ইন্টালিও প্রিন্ট-মেকিং একটি আধুনিক শিল্পমাধ্যম হিসাবে সারা পৃথিবীতে স্বীকৃত। এই মাধ্যমের গুণগত বৈচিত্র্যের দিকে আকৃষ্ট হয়ে অনেক বিখ্যাত শিল্পী রসোত্তীর্ণ কাজ করেছেন। সন্দীপবাবুর মত অনুযায়ী অবসর বিনোদনের জন্য তাঁরা তা করেন নি।

২। আগের পত্রে লিখেছিলাম—ধাতুর পাতে কোনো অঘটন ঘটে না—প্রয়োজনবোধে নিয়ন্ত্রিতভাবে ঘটানো হয়। আমি এখনও তাই বলছি।

জিঙ্ক বা কপার প্লেটে যদি দুর্ঘটনা ঘটতো তাহলে ব্লক-মেকার্সদের কি অবস্থা হত? আলিয়াঁস ফ্রাঁসে বা ব্রিটিশ কাউন্সিলে কোনো জ্ঞানী শিল্পরসিক হয়ত সন্দীপবাবুকে এই ভুল ধারণা দিয়েছেন—যা ওঁর কাছে বেদবাক্য। কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলাম—স্ক্রায়িং না জেনে প্লেটে যাহোক কিছু এঁকে অ্যাসিডে খাইয়ে দিলেই এচিং হয় না—এখানে নান্দনিক গুণের কথাই বলেছিলাম। আর আমার ১৯৬৪-তে প্রদর্শিত প্রিন্টগুলি সন্দীপবাবু দয়া করে এসে দেখলে বুঝতে পারবেন।

৩। আমরা যারা 'পেন্টার-প্রিন্টার-মেকার'—তারা প্রিন্টের আলাদা সত্তাকে তার বিশেষ গুণগুলিকে তেমনভাবে দেখি না। স্ক্রায়িং-পেনটিং-এর গুণ-গুলিকেও প্রিন্ট-এর ঘাড়ে চাপাই। তাই শান্তিনিকেতনের রতনকুঠীতে অধ্যাপক অ্যালিস্টার গ্রান্টের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ও আলাপের ফাঁকে যখন বলি—আমি বিশ্বাস করি ভাল পেন্টার না হলে ভাল প্রিন্ট-মেকার হওয়া যায় না—তাই আমাদের বিভাগের ছাত্রছাত্রী-দের আমরা প্রিন্ট-মেকিং-এর সাথে স্ক্রায়িং পেন্টিং এমনকি ভাস্কর্যও করাই—তখন উনি বলেছিলেন— 'সুখের বিষয় প্রথম পরিচয়েই এক জায়গায় আমরা একমত হলাম।' এরপর দু দিন উনি আমাদের বিভাগে কাটিয়ে যা বলেছিলেন তা আমার আগের পত্রে লিখেছি। পৃথিবী এগোচ্ছে—নতুনরা প্রিন্ট-মেকিং-কে তার নিজের পায়ে দাঁড় করাতে চাচ্ছে—করছেও। অন্যের গায়ে ভার রেখে দাঁড়াতে চায় না তারা। —অতএব অ্যালিস্টার গ্রান্ট বনাম সনৎ কর বা কলাভবন বনাম রয়েল কলেজ নয়। বিষয়টির গুরুত্ব সুতরাং [illegible] এই [illegible]র মাধ্যমে সন্দীপ-বাবু যা বলতে চেয়েছেন—ভারতীয় হিসাবে সেজন্য তাঁর লজ্জিত হওয়া উচিত। উইলিয়াম হেটার সম্বন্ধে গ্রান্ট সাহেবের নিজস্ব মতামতে আমাদের কিছু বলার নেই। আর তাতে কিছু যায় আসে না। আধুনিক নান্দনিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে শ্রীহেটার একজন দিশারী।

৪। সব এচিং-ই ইন্তালিও (কথাটা 'ইন্তাশিলও' নয়) কিন্তু সব ইন্তালিওই এচিং নয়। এর আগের চিঠিতে পরিষ্কার ভাষায় বলেছি—হেটার প্রদর্শিত ইন্তালিও প্রথায় এদেশে কাজ হয় না,—কোনোদিন হয়নি। উপকরণের অভাবে এদেশের ইন্তালিও প্রিন্ট-মেকার্স-রা নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী ইন্তালিও প্রিন্ট-মেকিং-র কয়েকটি পদ্ধতি করে নিয়েছেন। তাঁদের প্রিন্ট কোনো অংশে অন্যান্য জায়গার প্রিন্ট-এর থেকে নিকৃষ্ট নয় বরং কয়েকটি বিশেষ উৎকর্ষের দাবী রাখে। সেই ঐতিহাসিক সূত্র ধরে আমি আগের পত্রে প্রমাণ করেছি কেন শ্রীসোমনাথ হোড়কে প্রিন্ট-মেকিং-এর ভগীরথ বলব, অরুণ বসুকে নয়—আর তাকিয়েছি রমেন্দ্র-নাথ চক্রবর্তীর দিকে, আরও দেখছি [illegible] তখন আমরা ভগীরথ নিয়ে মাথা নাই ঘামালাম। যে প্রথায় এখানে কোনোদিন কাজ হয়নি—আজও হয় না, সে প্রথা সম্বন্ধে তর্ক করতে যাব কেন? তা একমাত্র করতে পারেন সন্দীপবাবু ও প্রণবরঞ্জন রায় (কারণ প্রণবরঞ্জনের লেখা পড়েই সন্দীপবাবু তর্কে নেমেছেন)। প্রণবরঞ্জন আবার চট করে ক্ষান্ত হন না,—লিখেছেন, অ্যাকোয়া-টিন্ট ইত্যাদিও অরুণ বসু আমায় শিখিয়েছেন—অথচ উনি হয়ত আজও জানেন না কলকাতা আর্ট কলেজে অ্যাকোয়া-টিন্ট ইত্যাদি, বহু আগে থেকেই শিক্ষা দেওয়া হয়ে আসছে—এবং আমি উক্ত কলেজে গ্রাফিক আর্ট বিভাগে শ্রীহরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের ছাত্র ছিলাম। আসলে সন্দীপবাবু এবং প্রণবরঞ্জন উভয়েরই প্রিন্ট-মেকিং পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা বড়ই সীমায়িত। না হলে কেউ বলতে পারে "ছাপাই ছবিকে আমি চিত্র এবং ভাস্কর্যের সমান মর্যাদা দিই না।" —চীনা, জাপানী প্রিন্টস্-এর ঐতিহ্যের কথা একেবারে ভুলে গেলেন। লিখেছেন—"মহান শিল্পী ডুয়েরারের...." —ডুয়েরার তো বিশেষভাবে একজন প্রিন্ট-মেকার-ই ছিলেন। (যদিও পেন্টিং-ও তাঁর আছে) সন্দীপবাবু বলেছেন কয়েক বছর আগে ন্যুইয়র্ক মর্ডান আর্ট গ্যালারীর প্রেরিত প্রদর্শনীতে পিকাশো, মাতিস ব্রাখ, শাগালের সাথে হেটারের ছবিও প্রদর্শিত হয়েছে—তাহলে বুঝতেই পারা যাচ্ছে হেটার কোন শ্রেণীর শিল্পী। আসলে ওঁরা বার বার ভুল করছেন দেখে এর আগের চিঠিটি আমি লিখেছিলাম। আমি ও প্রণবরঞ্জন যুগ্ম সম্পাদক ছিলাম—সোসাইটি অব কনটেম্পোরারী আর্টিস্টের। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে এই সংস্থার সভ্যরা ইন্তালিও প্রিন্টমেকিং স্টুডিও স্থাপন করে ধর্মতলার ঘরে ও প্রিন্ট-মেকিং-এর কাজ করতে থাকে। এই সময়ে অরুণ বসু বিদেশে। ফেরেন ১৯৬৫-র কোনো সময়ে। এবং আমাদের প্রতিষ্ঠিত স্টুডিওতেই এদেশে থাকা-কালীন কয়েকটি কাজ করেছিলেন—তবে হেটারপ্রথায় কোনো কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি—উপকরণের অভাবে। স্টুডিওর দেখাশোনা আমরা সকলেই করতাম—প্রণবরঞ্জনের মত অনুযায়ী কোনো ম্যানেজার আমাদের ছিল না। আর অমৃতবাজার পত্রিকার পুরো 'ব্যাক-পেজে' আমাদের সকলের স্টুডিওকে যে অরুণ বসুর একমাত্র স্টুডিও বলে লেখা হয়েছিল—তাতেও সত্যের অবসান হয়নি।

৫। আধুনিক শিল্পবোধ ও শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে অপরিণত ধারণার জন্য 'ঘরানা' ইত্যাদি লেখা হয়েছে অথচ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতাই যেখানে গোড়ার কথা।

সনৎ কর
কলাভবন বিশ্বভারতী

---

[এ বিষয়ে আর কোন চিঠি ছাপা

প্রকাশিত হল

## ইন্দ্রমিত্র-এর

সরস সজীব কৌতুক উপন্যাস

## মহারাজ দাম ১০.০০

হাসির গল্পের একনিষ্ঠ লেখকরা খুব কম ক্ষেত্রেই হাসির উপন্যাস লিখেছেন। পরশুরাম লেখেননি, শিবরাম চক্রবর্তীও না। অথচ কে না জানে, কৌতুকগল্পের ক্ষেত্রে এই দুটি নাম কী অবধারিত, কী উজ্জ্বল এবং অবিসংবাদী। হাসির গল্পকার ইন্দ্রমিত্র এঁদেরই উত্তরসূরী এবং বিশিষ্ট সফল একটি ব্যক্তিত্ব। তাঁর গল্পগ্রন্থ 'শুভদিন' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন, জীবন থেকে কত সহজে তিনি তুলে নেন অনাবিল কৌতুকে উচ্ছল সিচুয়েশন। বুদ্ধিদীপ্ত, ধারালো তাঁর ভাষা, সরস, সজীব তাঁর বর্ণনা, বিস্ময়কর তাঁর পরিমিতিবোধ।

হাসির গল্পকাররূপে তাঁর সার্থক অভিজ্ঞতাকে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন ইন্দ্রমিত্র 'মহারাজ' উপন্যাসে। আদ্যন্ত কৌতুকময় এই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে এক দুর্লভ ও দুর্মূল্য সংযোজন হয়ে থাকবে। নেপথ্য-জগৎ বা আন্ডারওয়ার্ল্ড-এর যেসব কীর্তিকাণ্ড আমাদের যাবতীয় ঘটনাপ্রবাহকে করছে নিয়ন্ত্রিত, এই উপন্যাসে তারই পরিচয় তুলে ধরেছেন তিনি। ঘটনাগুলো আমরা জানি, ঘটতে দেখি। কিন্তু নেপথ্যকাহিনী জানা ছিল না। দম-ফাটা হাসির রাংতায় মুড়ে অনাস্বাদিত সেই কাহিনীই অনন্য ভঙ্গিতে শোনালেন ইন্দ্রমিত্র।

**এই লেখকের গল্পগ্রন্থ :**
শুভদিন ৬·০০

## দীপালি দত্ত রায়ের

চাঞ্চল্যকর উপন্যাস

## লাল হলুদ সবুজ আলো নেই

দাম ৬.০০
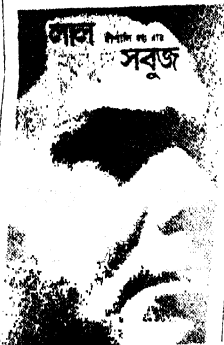
সাহেবিয়ানায় মোড়া শহুরে উচ্চ মধ্যবিত্ত যে-মানুষদের ঝকঝকে বাইরের চেহারাটা দেখে আমরা সম্ভ্রম বোধ করি অথবা হীনম্মন্যতায় হই আক্রান্ত, তাদের ভেতরের জীবনের নীতিহীন নিয়ন্ত্রণহীন যান্ত্রিক সম্পর্কময় ছবিটি অত্যন্ত দক্ষতায় ও আন্তরিকতায় ফুটিয়ে তুলেছেন দীপালি দত্ত রায় তাঁর শক্তিশালী কলমের আঁচড়ে।

## সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

সার্কাসের পটভূমিকায় উপন্যাস

## দিনরাতের খেলা

দাম ১০.০০

সার্কাসের আলো যখন নিবে যায়, থেমে যায় বাজনা, পরীর মতো সুন্দরীরা, সুঠাম পুরুষেরা আর অলীক জোকাররা যখন মঞ্চের আড়ালে ফিরে যায় তাদের নিজস্ব ছাউনিতে, রিংবয়-ট্রেনার-ব্যান্ডমাস্টার প্রমুখ নেপথ্য শিল্পীরা হয় নিজেদের মুখোমুখি, সেই

আলোহীন সুরহীন অপরিচিত জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

## আশাপূর্ণা দেবীর

চমকপ্রদ উপন্যাস

## লোহার গরাদের ছায়া দাম ৭.০০

এক নির্মলচরিত্র মানুষ হঠাৎই দণ্ডিত হলেন কারাবাসে। আড়াই বছর ধরে স্বামীর মুক্তির দিনটির প্রতীক্ষা করেছে স্ত্রী চন্দ্রা। অবশেষে এল সেই ঈপ্সিত মুহূর্ত। কিন্তু কোন্ রূপ ধরে? কী চেহারায়?
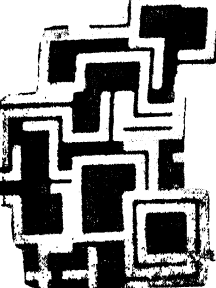
লোহার গরাদের অদৃশ্য এক ছায়া গ্রাস করেছে যেন সমস্ত সত্তাকে। দারুণ চমকপ্রদ কাহিনী 'লোহার গরাদের ছায়া'।

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

## সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

আকর্ষণীয় উপন্যাস

## কবি ও নর্তকী

দাম ১০.০০

এক যুবক ও দুই যুবতীকে নিয়ে এই উপন্যাস। যুবকটি কবি। মেয়ে দুটির একজন কলেজের ছাত্রী, অন্য জন সিনেমার নায়িকা। কুড়ি থেকে ছাব্বিশ বছরের এই তিনটি ছেলেমেয়ের অন্তর সত্তা ও বাইরের জীবনের সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের, আকাঙ্ক্ষার ও উত্তেজনার এক অসামান্য কাহিনী রচনা করেছেন এ-যুগের যৌবরাজ্যের

## শৈলেন ঘোষ-এর

আজব রূপকথার বই

## আজব বাঘের আজগুবি দাম ৭.০০

বাঘ কি কখনো গল্প বলে মানুষের মতো? একটা বাঘকে জানি যে আমাদের শুনিয়েছে তার আশ্চর্য জীবনের গল্প। বাঘটা আজব বই কি! গল্প বলে, বেহালা
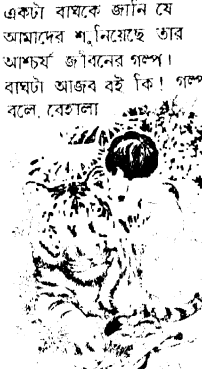
বাজায়, আরও কতসব অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড করে। কিন্তু তা বলে আজগুবি বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না তার গল্পকে। আসলে বাঘও তো একটা জীব, যার বাবা আছে, মা আছে, ঠাকমা আছে। আমরা কি তার সব খবর জানি? কিন্তু আজব এই বাঘটা যখন নিজেই গল্প শোনালো তার নিজের জীবনের, তখন আমরা আজব বনে গেলাম। সে কি সুন্দর গল্প কী বলব। আজব বাঘের সঙ্গে দেখা হল এক ছোট্ট ছেলের, যে ওই বাঘের মতোই দুঃখী। ছেলেটার বাবাকে আটকে রেখেছে এক দস্যু-সর্দার, রাজত্ব নিয়েছে কেড়ে। সেই ছেলেটা আর এই আজব বাঘটা হঠাৎ বন্ধু হয়ে গেল। তারপর তারা দুজনে মিলে কী করে মেরে ফেলল সেই দস্যু সর্দারকে, আর কী করেই বা ফিরে পেল হারানো রাজত্ব সেই কাহিনীই লিখেছেন রূপকথার জাদুকর শৈলেন ঘোষ তাঁর

প্রকাশিত হয়েছে

## গৌরী ধর্মপাল-এর

মজাদার ছবি-ছড়ার বই

## ঘোড়া যায় দাম ৬.০০

"রঙচঙে পাতা আর/ছবি ছড়া মজাদার/হাসি খুশি ফুর্তি/এই দিয়ে ভর্তি"
—'ঘোড়া যায়'-এর প্রথম ছড়ার প্রথম চারটি পংক্তিতেই যেন তুলে ধরা হয়েছে বইটির বিষয় এবং বিন্যাস, স্বাদ এবং রস, মজা এবং আনন্দ। ছোটদের জন্য নতুন স্বাদের ছড়া আর সঙ্গে তাল-মেলানো মন-ভোলানো সব ছবি— এ-দুয়ের হরগৌরী মিলনে দু-রঙে ছাপা এ-বই এক অনন্য উপহার। গৌরী ধর্মপাল-এর ছড়ার বৈশিষ্ট্য হল, অবিকল ছোটদের চোখ দিয়েই পৃথিবীকে দেখতে জানেন তিনি। ছোটদের অনুভব-উপলব্ধি-বিস্ময় আনন্দ অভিলাষকে ধরতে পারেন জীবন্তভাবে। ছোটদের চারপাশের প্রাণী-জগৎ এ-বইয়ের অধিকাংশ ছড়ার বিষয়। ভালুক-হরিণ-ময়ূর প্রজাপতি কাকাতুয়া মাছরাঙা প্যাঁচা-উট-বাঘ-হাতি-বেড়াল-কুকুর—কে নেই! এ যেন এক আজব চিড়িয়াখানায় ছোটদের ডেকে নিয়েছেন তিনি। আর সেই চিড়িয়াখানায় ভ্রমণের ছবিগুলিকে জ্যান্ত করে তুলেছেন এ-কালের দুর্ধর্ষ শিল্পী দেবাশিস দেব—শিশুচিত্রের জন্য এই কদিন আগে যিনি হলেন পুরস্কৃত।

প্রকাশিত হয়েছে
১৩জন বাঙালী বৈজ্ঞানিকের ফোটোসহ জীবনী ও কীর্তির পরিচয়

## সমরজিৎ কর-এর

## অগ্রজ বিজ্ঞানী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯

দেশ
১০ শ্রাবণ ১৩৮৭



## সূচীপত্র



### পরবর্তী আকর্ষণ

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের প্রবন্ধ
সুখেও নয়, দুঃখেও নয়, শুধু শান্তি
পূর্ণেন্দু পত্রীর রচনা
আরোগ্যের কবিতা, রোগশয্যায়
শিশির লাহিড়ীর গল্প
হিমাংশুর দিনরাত্রি

সম্পাদক ঃ সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ এবং জীবনমণ্ডা প্রিন্টিং হাউস ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

# দ্রব্যমূল্য

কিছুদিন আগে এ-রকম একটা আশা হয়েছিল যে, জিনিসপত্রের দাম যে-হারে চড়ে গিয়েছে তার চেয়ে খানিকটা কমবে। জনতা সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি আটকাতে পারেননি। বরং তা ঊর্ধ্বমুখী হয়েছিল। ইন্দিরা কংগ্রেস নির্বাচনের নামার আগে জনতার বিরুদ্ধে যেসব অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন, মূল্যবৃদ্ধি তার অন্যতম। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, জনতার আমলে দেশের অধিকাংশ মানুষ—যাঁদের রোজগার কম এবং বাঁধাধরা, গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণ, অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধিতে হতাশ ও নিত্য-পীড়িত হয়ে উঠেছিলেন। ইন্দিরা কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার ছিল, তাঁরা ক্ষমতায় এলে এটা রোধ করবেন। নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছেন মোটামুটি ছ' মাস। এই ছ' মাসে কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি রোধ হয়নি। বরং একেবারে গোড়ার দিকে কোনো কোনো জিনিসের দাম যাও বা কমেছিল তাও আবার বেড়ে যাচ্ছে। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, রাতারাতি কিছু হবার নয়। ঠিক কথা, কিন্তু ছ' মাসও কি কিছু কম!

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই বিষয়টির সম্পর্কে অনবহিত নন। তিনি যা বলেন তার অর্থ এই দাঁড়ায়, দেশের অর্থনীতির চেহারা গত তিন বছরে এমন দুর্বল করে ফেলা হয়েছে যে, তাকে সুস্থ না করা পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা যাবে না। অবশ্য তিনি মনে করেন, মূল্য আর বাড়ছে না, স্থিতিশীল রয়েছে। এটা অবশ্য তর্কের বিষয়। সাধারণ তা স্বীকার করবেন না।

কেন্দ্রীয় সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমাবার জন্যে যে সচেষ্ট নন সে-কথা বললে ভুল হবে। চাল, গম, বনস্পতি, বাদাম তেল, সরষের তেল, কেরোসিন, কয়লা প্রভৃতি দ্রব্যের দাম যাতে সরকারের নখদর্পণে থাকে তার জন্যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, নজর দেওয়া হচ্ছে সরবরাহের ওপর, মজুতদার এবং কালোবাজারীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তিবিধানেরও পথ প্রশস্ত করা হয়েছে। তবু এখন পর্যন্ত এমন কিছু ঘটেনি যাতে জনসাধারণ আশা করতে পারেন, দ্রুত কোনো সুফল পাওয়া যাবে। সম্ভবত দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির এই প্রবণতা রোধ করার পক্ষে এই ব্যবস্থাগুলিই যথেষ্ট নয়। আরো কিছু করার আছে।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অন্য রাজ্যের তুলনায় ভাল নয়। তেল, ডাল, চিনি, কয়লা, কেরোসিন প্রভৃতি সামগ্রী সকল গৃহস্থের পক্ষেই নিত্য প্রয়োজনীয়। অথচ প্রতিটি জিনিসই আজ অগ্নিমূল্য; সব সময় সংগ্রহ করাও সম্ভব হয় না। রাজ্য সরকারের এ-ব্যাপারে তেমন কোনো মাথা ব্যথা নেই। সমগ্র ব্যাপারটিকে তাঁরা রাজনৈতিক চাল হিসাবেই যেন ব্যবহার করতে বেশী আগ্রহী। কেন্দ্রীয় সরকারের ওপরই সব দোষ চাপিয়ে তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে চান। কখনো বলেন, সরবরাহ আসছে না নিয়মিত, কখনো বলেন কেন্দ্র অসহযোগিতা করছে বা ষড়যন্ত্র করছে রাজ্যের বিরুদ্ধে। কেন্দ্র আবার দোষারোপ করেন রাজ্য সরকারকে। সরবরাহ ব্যবস্থায় অপ্রয়োজনীয় বাধা, অব্যবস্থা, দুর্নীতির জন্যে কেন্দ্র দায়ী করেন রাজ্যকে। পরস্পরের প্রতি দোষারোপ সমস্যাকে বিন্দুমাত্র লাঘব করছে না। বলা বাহুল্য কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর সমস্ত দায় চাপিয়ে দিয়ে রাজ্য সরকার লোক ভোলাতে চাইছেন। মজুতদার, কালোবাজারীরা এর ফলে নিশ্চিন্ত। এমন কি অত্যাবশ্যক পণ্য আইন—যা আরও কড়াকড়ি ভাবে প্রয়োগের সুপারিশ কেন্দ্র করেছেন—রাজ্য সরকার সেখানেও হাত গুটিয়ে বসে আছেন। অসাধু ব্যবসায়ীদের এই আইনের বলে অবশ্যই কিছুটা আয়ত্তে আনা যেত।

জিনিসপত্রের দাম কোনো কোনো সময়ে হয়ত বাড়ে, একাধিক কারণে, কিন্তু ইদানীং যে-হারে বাড়ছে তার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। আর এটা বোঝাই যায়, ব্যবসায়ী-সম্প্রদায়ের হাতেই সমস্ত কিছু নির্ভর করছে। চিনির দাম বাড়ার সঙ্গত কারণ কী তা বোঝানো যাবে না। চিনি-ব্যবসায়ীরা অবশ্য বলছেন, উৎপাদন কম বলে দাম বাড়ছে। কিন্তু এই বাড়ার কি কোনো সীমা নেই? সরষের তেলের দামই বা লাফিয়ে লাফিয়ে কেন চড়ছে? সরষের উৎপাদন নেই বলে নাকি?

এটা বিশেষভাবে লক্ষ করার কথা, নির্ধারিত, এমন কি মুদ্রিত দামের সঙ্গে বিক্রীত দামের কোনো সামঞ্জস্য থাকে না। যে কোনো দোকান তার খুশিমতন দাম নেয়, সে সাবানই হোক আর সিগারেটই হোক। অর্থাৎ ব্যবসায়ী এবং দোকানদার খুশিমতন দামে জিনিস বিক্রী করবে—এ অধিকার তার আছে, সরকার তা স্বীকার করে নিয়েছেন। যিনি কিনবেন—সেই খরিদ্দারের কিন্তু সঙ্গত ও ন্যায্য মূল্যে কিছু পাবার অধিকার নেই। দাম কমা-বাড়ায় যে ব্যবসায়ীদের হাতই প্রধান—সরকার সেটা যদি জেনেও মুখ ফিরিয়ে বসে থাকেন—সাধারণ মানুষের কিছু বলার থাকে না।

আশা করি ওরা
তোমার মগজ ধোলাই
করেনি !
মস্কো—
কলকাতা
Kutty

# যুবশক্তির রাজনীতি

শংকর ঘোষ

আমাদের দেশের [illegible] রাজনীতিতে সঞ্জয় [illegible] তাঁর [illegible] হলেও [illegible] সন্দেহ নেই। আমাদের [illegible] রাজনীতির [illegible] যুবশক্তির প্রাণবন্যাকে [illegible] চেষ্টা গত দশ বছরে অন্ততঃ [illegible] হয়েছে। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক সেই [illegible] সফল হয়েছে ক্ষণস্থায়ী। সঞ্জয়ের মৃত্যুতে [illegible] সার্থক প্রচেষ্টাটির [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] উপস্থিত হল।

সঞ্জয়ের মৃত্যুর পর যেমন [illegible], জীর্ণ-বৃদ্ধের প্রবীণ রাজনীতিকরা তাঁদের নড়বড়ে মাথা খাড়া করে দাঁড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন শোক ও সহানুভূতি প্রকাশের মধ্য দিয়ে [illegible], ইন্দিরা গান্ধীর ছায়ায় একটু জায়গা করে নেওয়ার জন্য ঠেলাঠেলি শুরু করে দিয়েছেন। তাঁরা [illegible] বিষয়টিকে সেভাবে দেখছেন না [illegible] কিংবা দেখলেও প্রকাশ করছেন না। তাঁদের মতে, সঞ্জয়ের মৃত্যুতে বংশানুক্রমিক প্রধানমন্ত্রিত্বের যে-রীতি ইন্দিরা নাকি প্রবর্তনের চেষ্টা করছিলেন তার সম্ভাবনা দূর হল, [illegible] গণতন্ত্রের পথ নিষ্কণ্টক হল।

আমাদের দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা ধার-করা বুদ্ধিতেই বেশী আস্থাশীল। তাঁদের বাইবেল লন্ডনের টাইমস পত্রিকায় বেশ স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে সঞ্জয়ের মৃত্যুতে বংশগত শাসনে ছেদ পড়ল। নেহরু পরিবারভুক্ত নন এমন রাজনীতিকের [illegible] লাভের পথ সুগম হল [illegible] যেন [illegible] লালবাহাদুর বেঁচে থাকলে [illegible] যদি [illegible] সহকর্মী ছিলেন এবং নেহরু যে উত্তরাধিকারী হিসাবে [illegible] মনোনীত করে গিয়েছিলেন সেকথা আজ [illegible] ভোলানোর চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগী হন আমাদের দেশেরই এক নামী সাংবাদিক। তাঁকে নাকি লালবাহাদুর বলেছিলেন নেহরুর ভাবনায় তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে মেয়ে ছাড়া আর কারও স্থান নেই। এই গোপন কথাটি অবশ্য লালবাহাদুর তাঁর স্ত্রীকেও বলেননি, কেননা ললিতা দেবী বলেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন না, এ উক্তি লালবাহাদুরের। তাই বড় ধারণা লালবাহাদুর একথা বলেননি। সাংবাদিকপ্রবর [illegible] বলা বাহুল্য, লালবাহাদুরের গোপন কথাটি তিনি লালবাহাদুর মারা যাওয়ার পর প্রকাশ করেছিলেন, কাজেই উক্তিটিকে সরাসরি দ্বিধাহীন প্রমাণের উপায় নেই। অবশ্য লালবাহাদুর যদি জীবিত থাকতেন ও প্রতিবাদ করতেন তাহলেও সকলেই যে মেনে নিতেন তিনি সত্য কথা বলছেন তা ভাববার কোন কারণ নেই। এই সাংবাদিকই জনতা রাজত্বে, জনতা নিযুক্ত রেড্ডী কমিশনের কাছে স্বীকার করেছেন, তাঁর আর একটি বইতে একটি বিশেষ তথ্য পরিবেষণের আগে তার সত্যতা তিনি যাচাই করেননি, অসত্য সংবাদ সন্নিবিষ্ট করার জন্য তিনি দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন।

লালবাহাদুর বেঁচে থাকলে তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব কবে, কীভাবে শেষ হত, সে-প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব নয়। তবে আমাদের দেশে এখন তো দুজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন, তাঁদের কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়েছেন, তাঁদেরই সহকর্মী ও সহযোগীরা ইন্দিরা ও সঞ্জয় অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়েছিলেন মাত্র। আমাদের প্রথম পাঁচজন প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে মাত্র দুজন নেহরু পরিবারের বাকী তিনজনই বহিরাগত, টাইমস পত্রিকার ভাষায় 'আউটসাইডার'। এঁরা সকলেই নির্বাচনে জয়ী হয়ে সংসদে এসেছিলেন, কেউ কারও

সঞ্জয় গান্ধী

[illegible] এ সুপারিশের জোরে আসেননি এবং প্রধানমন্ত্রী [illegible] বিশুদ্ধ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। অথচ আমাদের [illegible] সংস্থাকে বিকৃত করার, বংশানুক্রমিক প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রবর্তন চেষ্টার অভিযোগ যাঁরা অভিযোগ করছেন, তাঁরা অবশ্য এই বিংশ শতাব্দীর [illegible] একটি বৃহৎ রাজপরিবারকে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে পুষছেন এবং রাজ পরিবারের দুঃখে কাঁদছেন সুখে হাসছেন। রাজপরিবার-প্রীতি ও স্বদেশপ্রীতি সেখানে সমার্থক।

এ ব্যাপারে আমেরিকার কাগজগুলিও কম যায়নি। নিউ ইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোসট ইত্যাদি আমেরিকার প্রায় সবকটি বড় কাগজের সহযোগিতায় প্যারিস থেকে প্রকাশিত ইনটারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন-এর এক সংবাদ সমীক্ষায় বলা হয়েছে সঞ্জয় গান্ধী তাঁর মায়ের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য এবং তাঁর দাদামশায় যে শাসকবংশের আরম্ভ করেছিলেন তাকে আর এক পুরুষে উত্তীর্ণ করার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন, এই প্রকট সত্যটি তাঁর মৃত্যুতে ভূমিসাৎ হল। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে একটি পরিবারের, দলের ও জাতির ভাগ্য জড়িয়ে গেছে, সঞ্জয়ের মৃত্যুতে এই তিনটির ভাগ্য সম্পর্কেই অনিশ্চয়তা দেখা দিল।

ইন্দিরা ও সঞ্জয়ের প্রতি বিদ্বেষে আমেরিকান ও ব্রিটিশ সংবাদপত্র-পত্রিকা একজোট। বিদ্বেষ ঠিক নেহরু পরিবারের বিরুদ্ধে নয়, তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বা নয়নতারা সেগালকে স্পর্শ করে না, বরং ইন্দিরা-সঞ্জয় বিরোধিতার জন্য তাঁরা বীরনারী হিসাবেই পরিচিত। আমেরিকান কাগজে কিন্তু ব্রিটিশ রাজপরিবার সম্পর্কে কোন কটু মন্তব্য করা হয় না, বরং রাজপরিবারের সকলকে সমীহই করা হয়। সঞ্জয়ের মৃত্যু সম্পর্কিত সংবাদ সমীক্ষার ঠিক নীচেই ইনটারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন ছেপেছে ইংলন্ডের রানীর খুড়তুতো ভাই সস্ত্রীক আলস্টার পৌঁচেছেন সেই খবর। তেমনি ব্রিটেনের কাগজেও মার্কিন রাজনীতিতে কেনেডী পরিবারের প্রতিপত্তি অথবা রিপাবলিকান পার্টিতে রকফেলার পরিবারের দাপট নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করা হয় না। জন-এর পর ববার্ট, ববার্টের পর এডোয়ারড কেনেডী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবেন বা দলের মনোনয়ন পাবেন, এ-ভাবনায় আমেরিকা-ইংলন্ডে কেউ কোন অস্বাভাবিকতা দেখেন না, এসব যেন বংশগত কোন ব্যাপারই নয়। হয়ত অস্বাভাবিকও নয়, কেননা সৌদি আরবে এখনও বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পর তাঁর পরের ভাই রাজা হন, সিকি শতাব্দী আগে নেপালের প্রধানমন্ত্রীও এইভাবে নিযুক্ত হতেন। [illegible] একটি সুবিধা, ভাইয়ে ভাইয়ে [illegible] থাকে কেননা সব ভাই-ই জানেন, বেঁচে থাকলে একদিন তার পালা আসবে, ক্ষমতা তার করায়ত্ত হবে। কাজেই সহজে কেউ আওরঙ্গজেব হতে চান না।

ভাবতে পারেন, কোন আমেরিকান কাগজে লিখছে, ইংলন্ডের রানী এলিজাবেথকে তাঁর [illegible] যুবরাজ চার্লস একটি নিমন্ত্রণ-সভায় [illegible] নয় ছয় ছয়বার চড় মেরেছেন এবং সেই [illegible] ইংলন্ডে ও তার মিত্র দেশগুলির সংবাদপত্রে [illegible] করে ছাপছে। ভারতের বেলা তাই হয়েছিল। [illegible] নাকি কোন পার্টিতে ইন্দিরাকে চড় মেরেছিলেন।

নয়াদিল্লির ককটেল-চক্র থেকে এই গল্পটি সংগ্রহ করে ওয়াশিংটন পোসটে পাঠিয়েছিলেন [illegible] সাইমন। ওয়াশিংটন পোসটের খবরটি ইংলন্ডে ছেপেছিল ভারতবন্ধু গার্ডিয়ান কাগজ। মায়ের উপর সঞ্জয়ের কেন এত রাগ তা নিয়েও বেশ কিছু গবেষণা সে সময় চলেছিল। সাইমন রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়েন এই খবরটি ও এই ধরনের আরও কিছু খবর পাঠিয়ে। ফলে তিনি যখন এদেশ থেকে বিতাড়িত হলেন তখন ভারতীয় গণতন্ত্রের অপমৃত্যুতে বিলেত-আমেরিকার কাগজে কাগজে বেশ কড়া ভাষায় শোক প্রকাশ করা হয়েছিল। সাইমনের খবরের সত্যতা সম্বন্ধে ওয়াশিংটন পোসট এতই নিঃসন্দেহ ছিল যে কয়েক মাস পরে ওয়াশিংটন শহরে ঐ কাগজের একজন কর্তাব্যক্তির সঙ্গে আলোচনায় সাইমনের সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে এই লেখক সন্দেহ প্রকাশ করায় সাহেব তৎক্ষণাৎ আলোচনায় দাঁড়ি টেনে দিয়ে বললেন, 'আপনি দেখছি ইন্দিরার সমর্থক।'

দেশেবিদেশে সঞ্জয়ের যে-সব সমালোচনা হয়েছে তাকে দুটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম-পর্বের সমালোচনার প্রধান বস্তু মারুতি। যদিও অভিযোগ করা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর পুত্র হিসাবে তিনি তাঁর ব্যবসার জন্য অনেক রকম অবৈধ সুযোগ পাচ্ছেন ও নিচ্ছেন তবু এই পর্বে তাঁর স্থান ছিল গৌণ। এখানে আক্রমণটি ছিল মুখ্যত ইন্দিরার উপর। সংসদে ভিতরে ও বাইরে সঞ্জয়ের মারুতি নিয়ে তোলপাড় শুরু হয় পোখরান বিস্ফোরণের অব্যবহিত পরে যখন ইন্দিরা গান্ধীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে পারমাণবিক দেশগুলি শঙ্কিত হয়ে উঠেছে এবং তাদের কেউ কেউ এই উপমহাদেশে বিশেষ করে ভারতে একটি রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য উঠে পড়ে লাগার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। এই ঐকতানে সি পি আই সুর মেলায় কিছু পরে, সারঙ্গ পত্রিকায় সঞ্জয়ের সেই বিখ্যাত সাক্ষাৎকারটি বেরোনোর পর। তখন সঞ্জয় ও মারুতির সমালোচনার মধ্য দিয়ে বলবার চেষ্টা করা হচ্ছিল ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু নেই, তিনি স্নেহান্ধ জননী, তিনি দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ইত্যাদি কোন কিছুরই ঊর্ধ্বে নন।

সঞ্জয় সমালোচনার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় জরুরী অবস্থার সময়। যখন সঞ্জয় রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নিতে শুরু করেছেন। তখন বলা হল, 'ইন্দিরা সঞ্জয়কে তাঁর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেছেন, তিনি চেষ্টা করছেন যাতে তাঁর পরে সঞ্জয়ই প্রধানমন্ত্রী হন।' সঞ্জয়ের রাজনীতিতে যোগ দেওয়ায় ইন্দিরার নিশ্চয়ই সায় ছিল, না হলে ১৯৭৭ সালে আমেথিতে তিনি কংগ্রেসপ্রার্থী মনোনীত হতেন না, কিন্তু জরুরী অবস্থার সময়ই ইন্দিরা ঠিক করে ফেলেছিলেন সঞ্জয়ই তাঁর পরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবেন, তা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। জগজীবন রাম, চ্যবনের কথা না হয় বাদ দিলাম, তাঁরা ইন্দিরার চেয়ে বয়সে বেশ কয়েক বছরের বড়, কাজেই তাঁরা কোন মুখে বলেন ইন্দিরা অবসর নিলে প্রধানমন্ত্রিত্ব তাঁদেরই পাওয়া উচিত? কিন্তু সেসময় যে তিনজন কংগ্রেসনেতা ইন্দিরার ঘনিষ্ঠতম সহযোগী ছিলেন [illegible] তাঁদের [illegible] সঞ্জয়কে বসানোর চেষ্টায় [illegible] জানাতে পারতেন। বন্ধ ও সমবয়সী সকলে এক-

দেবকান্ত বড়ুয়া, রজনী প্যাটেল, সিদ্ধার্থ রায়, এ'দের সবাইকে ইন্দিরা জেলে পাঠাতেন মনে হয় না। কাজেই এ'রা ভয়ে চুপ করেছিলেন তা মনে করার কোন সংগত কারণ নেই। এ'রা প্রতিবাদ করেননি, যেহেতু প্রতিবাদের কোন কারণ ঘটেনি।

হতে পারে, ১৯৭৫ সালেই ইন্দিরা বুঝেছিলেন তাঁর পর এদেশের প্রধানমন্ত্রিত্বের গুরুভার বহন করবার মতো কেউ দলে নেই। হতে পারে তখনই তিনি স্থির করেছিলেন, তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য সঞ্জয়ই যোগ্যতম ব্যক্তি। কিন্তু তিনি মনে করা এক জিনিস আর দল ও দেশের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া আর এক জিনিস। সঞ্জয় যে দেশ ও দলের আস্থাভাজন তা প্রমাণের জন্যই তাঁর ১৯৭৭ এর নির্বাচনে অংশ গ্রহণ। ১৯৭৭-এ সে প্রমাণ মেলেনি, এবারে মিলেছিল এবং ইন্দিরাও এবার সঞ্জয়কে কার্যত তাঁর উত্তরাধিকারী ঘোষণার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন।

এই সিদ্ধান্ত ও চেষ্টার পিছনে কেবল অন্ধ মাতৃস্নেহ ছিল একথা মনে করার কোন কারণ নেই। যাঁরা বিশ্বাস করেন, জওহরলালই ইন্দিরাকে প্রধানমন্ত্রিত্বের আসনে বসিয়ে গেছেন এবং এই উচ্চ পদ অধিকারের জন্য আবশ্যকীয় কোন যোগ্যতা ইন্দিরার নেই তাঁরাই অবুঝ মাতৃস্নেহের কথা তোলেন। না হলে তাঁদের স্বীকার করতে হয়, ইন্দিরার রাজনৈতিক বিচার, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন ক্ষমতা অসাধারণ। সঞ্জয়ের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সঠিক ধারণায় তিনি যেমন সক্ষম হয়েছিলেন তেমনি সহকর্মীদের অপদার্থতা সম্পর্কে তাঁর দৃঢ়বিশ্বাসও অভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

নির্বাচনের পর প্রচারের ধরনটি রাতারাতি উল্টে গেল। এতদিন বলা হচ্ছিল ইন্দিরা সঞ্জয়কে গড়ছেন। এখন বলা আরম্ভ হল, ইন্দিরার নিজস্ব

চারু মজুমদার

ভাবনা বা নীতির কোন বালাই নেই, তিনি সঞ্জয়ের কথায় ওঠেন বসেন। আমাদের সংসদীয় পদ্ধতির মূলে একক সব চেয়ে বড় আঘাত যিনি করেছেন, সংসদীয় আচরণবিধি লঙ্ঘন করাকে যিনি বিরোধীপক্ষের নিত্যকর্ম বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন সেই ডঃ রামমনোহর লোহিয়া ইন্দিরাকে বিদ্রূপ করে বলতেন, 'ডাম ডল'—বোবা বা বোকা পুতুল। এতদিন পরে আবার নতুন করে সেই কথাটিই বলবার চেষ্টা হল—ইন্দিরার নিজের কোন বুদ্ধিশুদ্ধি নেই, তিনি কখনও দীনেশ সিং, কখনও হাকসার, কখনও সিদ্ধার্থ সঞ্জয়ের কথামতো। কেউ কেউ আরও খানিকটা এগিয়ে বলছিলেন, সঞ্জয় বেশিদিন তাঁর মাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বরদাস্ত করবেন না, তাঁকে হটিয়ে অর্থাৎ অবসর নিতে বাধ্য করে বর্তমান লোকসভার আয়ুষ্কালের মধ্যেই সঞ্জয় প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসবেন। যাঁরা তোতাপাখীর মতো এই বুলি আওড়াচ্ছিলেন তাঁরা ধর্তব্যের মধ্যে নন, কিন্তু যাঁরা এই সব তোতাপাখীদের বুলি পড়াতেন তাঁরা অসাধারণ। তাঁদের উদ্দেশ্য একটিই—যে-কোনভাবে ইন্দিরার চরিত্রহনন, যাতে ইন্দিরা সাধারণের আস্থা হারান। তাঁরা ভালোভাবেই জানেন, লোকে ইন্দিরাকেই ভোট দেয়, জগজীবনবাবুকে নয়, হেমবতীনন্দন বহুগুণাকেও নয়, সঞ্জয় গান্ধীকেও নয়, সুতরাং যে-কোনোভাবে ইন্দিরার ভোট যোগাড়ের ক্ষমতাকে খর্ব করতে পারলেই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা অস্থিরতা সৃষ্টির পথ সুগম হবে।

এই সব অভিসন্ধিমূলক তত্ত্ব যে ভ্রান্ত তা আগেও বারবার প্রমাণিত হয়েছে, এবারও হবে। ভারতীয় জনতার সঙ্গে যোগ ইন্দিরারই। আমাদের এই মাতৃপূজার দেশে নিরক্ষর, অনশনক্লিষ্ট সাধারণ নাগরিক তাঁকে যে আসনে বসিয়েছে, সে আসন সঞ্জয় বেঁচে থাকলে তাঁরও অধিগত হত না। এ-জনপ্রিয়তা, এ-নেতৃত্ব ইন্দিরার একান্ত নিজস্ব, এ-নেতৃত্বের অবসান তাঁর সঙ্গেই ঘটবে, তিনি চাইলেও আপ্রাণ চেষ্টা করলেও এ-নেতৃত্ব কাউকে দিয়ে যেতে পারবেন না। তা সত্ত্বেও তিনি সঞ্জয়কে গড়ে তুলেছিলেন কেননা তিনি বুঝেছিলেন, জাতীয় স্বার্থে দেশের নেতৃত্ব এক নতুন পুরুষে বর্তানো প্রয়োজন। এবং এই হস্তান্তর যদি তিনি নিজের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন না করেন তা হলে বৃদ্ধেরা আবার ক্ষমতা দখল করবে, যেমন করেছিল ১৯৭৭ সালে।

বৃদ্ধ রাজনীতিকদের আত্মসর্বস্ব রাজনীতির

অবসান ঘটানোর জন্য তিনি যুবশক্তির সহায়তা চেয়েছিলেন। যুবশক্তিকে যাতে তাঁর মনোমত খাতে চালনা করতে পারেন তার জন্য তিনি সঞ্জয়ের রাজনীতিতে যোগ দেওয়ায় সানন্দ সমর্থন জানিয়েছিলেন। সঞ্জয়ের রাজনীতিতে আবির্ভাব যুবনেতা হিসাবে এবং যতদিন পর্যন্ত না তিনি নিজেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী যুবনেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন ততদিন সরাসরি রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার অনুমতি তাঁর মেলেনি। প্রাচীন নেতৃত্বকে পরাজিত করবার জন্য যুবশক্তির সাহায্য নেওয়া এই প্রথম নয়। নেহরু-আমল শেষ হওয়ার পর আরও দুবার এই চেষ্টা হয়েছে, এবং দুবারই সে-চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যাপারে আমাদের দেশ অনন্য নয়। ষাট ও সত্তরের দশকে পৃথিবীর অনেক দেশেই সংগঠিত, অসংগঠিত যুবশক্তির হঠাৎ-বিস্ফোরণ দেখা গেছে, কিন্তু কোথাও তা সফল হয়নি। যে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ, সে ব্যবস্থা অটুট থেকে গেছে, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব বদল হয়েছে। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবেও যুবশক্তিকে নিয়োগ করা হয়েছিল, এবং আজকের চীনা নেতৃত্বের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে স্বয়ং মাও সে-তুং-এর প্রেরণা সত্ত্বেও মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব তার উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হয়নি।

আমাদের দেশে গত দশ-পনের বছরে যুবশক্তিকে সামাজিক রূপান্তরের কাজে লাগানোর যে কয়টি সচেতন প্রচেষ্টা হয়েছে নকশাল আন্দোলন তাদের অন্যতম। যে-কোন কারণেই হোক স্বাধীনতাউত্তরকালে এদেশের যুবশক্তি যার একটি বড় অংশ ছাত্রশক্তিও বটে, রাজনীতিবিমুখ হয়ে পড়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেস দল ও নেতৃত্বের যে চেহারা সাধারণের কাছে প্রকাশ পেল তাতে বৈষয়িক লাভের আশায় হিসাবী তরুণ কেউ কেউ যোগ দিলেও আদর্শের জন্য কারও পক্ষে যোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না। বোহিমিয়ানপনা তারুণ্যের লক্ষণ, কাজেই যত না তরুণ কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যকের যোগ দেওয়া উচিত ছিল বিরোধী দলগুলিতে, বিশেষত কমিউনিস্ট পারটিতে। কেননা প্রথম সাধারণ নির্বাচনেই প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল, কংগ্রেসের পরেই—যদিও অনেক পরে—কমিউনিস্ট পারটির স্থান। কিন্তু তা হয়নি। হয়নি যে তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ ১৯৪৭ সালে এদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের যাঁরা নেতা ছিলেন আজও তাঁরাই নেতা আছেন যদিও ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট পারটি দু ভাগ হয়েছে, তিন দশক গত হয়েছে। কালের অমোঘ নিয়মে যে সামান্য পরিবর্তন অপরিহার্য হয়েছে সেখানেও নতুনের স্থান হয়নি, পুরাতন পরিচিত মুখই শূন্য স্থান পূরণ করেছে। সেদিক থেকে দুই কমিউনিস্ট পারটি ও প্রাক-সঞ্জয় কংগ্রেসের মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

নকশাল আন্দোলনই সর্বপ্রথম যুব ও ছাত্রশক্তির সক্রিয় সমর্থন লাভে সক্ষম হয়। নকশাল আন্দোলন যখন শুরু হয় তখন সম্ভবত সুশীতল রায়চৌধুরী ও সরোজ দত্ত ছাড়া আর কোন নকশাল নেতাই পঞ্চাশ অতিক্রম করেননি। এই অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী নেতৃত্বের অনুগামীরা অধিকাংশই ছিলেন সত্যই তরুণ। চারু মজুমদারের নজর প্রধানত ছিল ছাত্র ও তরুণদের উপর। বিপ্লবী ছাত্র ও যুবকদের উদ্দেশে তিনি লিখেছিলেন, আঠার থেকে চব্বিশ বছর হল মানুষের জীবনের সব চেয়ে ভাল সময়, আর আমাদের দেশের তরুণরা ঠিক এই সময়টিই জনবিরোধী শিক্ষালাভের ও পরীক্ষা পাশের জন্য ব্যয় করতে বাধ্য হয়। কাজেই পরীক্ষা পাশের জন্য শক্তি ক্ষয় না করে তরুণদের উচিত এখনই বিপ্লবের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া।

তরুণের সক্রিয় সমর্থন লাভের চেষ্টা চারু মজুমদার একা করেননি, প্রথমেও করেননি। তাঁর কৃতিত্ব, অন্যেরা যেখানে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তিনি সেখানে সফল হন। সেই সাফল্যের পরিমাণ কী তা বোঝা গেল, যখন তিনি বললেন, এটা আত্মোৎসর্গের যুগ। তাঁর কথামতো তাঁর অনুগামীরা যেমন বিনা দ্বিধায় প্রাণ নিয়েছিল তেমনি অকাতরে অনেক বেশী প্রাণ দিয়েছিল। শোনা যায়, কোন একজন বিখ্যাত যুব নকশাল নেতা নকশাল আন্দোলনের তুঙ্গে দর্পভরে ঘোষণা করেছিলেন, আমি চারু মজুমদারের আদেশের দাস। একটা সময় ছিল যখন সব নকশাল যুবক ও তরুণই এই কথা বলতে পারতেন, দরকার হলে প্রমাণ দিতে পারতেন।

এত আত্মোৎসর্গ সত্ত্বেও চারু মজুমদারের আন্দোলন সফল হয়নি, তিনি যেসব স্ফুলিঙ্গ জেলেছিলেন তা দাবানলে পরিণত হয়নি। কিন্তু তরুণদের রাজনীতিতে আকৃষ্ট করায় তাঁর সাফল্য সম্পর্কে কোন দ্বিমত কখনও দেখা যায় নি। রাজনীতির কারবারীরা তা নিয়ে অনেক জল্পনাও করেছেন, কীভাবে যুবশক্তিকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায় তা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষাও হয়েছে। চারু মজুমদারের পর যুব-ছাত্রশক্তিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে সার্থক ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। সর্বোদয়ী জয়প্রকাশের নকশাল বিরোধিতায় সংশয় প্রকাশ করার কোন কারণ নেই। বরং তাঁর নকশাল-বিরোধিতা ছিল অন্য অনেকের চেয়ে খাঁটি। বিহারের মুশাহারি অঞ্চলে নকশাল আন্দোলনের অগ্রগতি বন্ধ করবার জন্য তিনি দীর্ঘ ছয়মাস শিবির স্থাপন করে বাস করেছিলেন। তাঁর তখনকার অভিজ্ঞতার ফল 'ফেস টু ফেস' পুস্তিকা। এই বইটিতে জয়প্রকাশ নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন যে-আন্দোলন মূলত জাতীয়তাবাদী নয়, যে-আন্দোলন অন্য দেশের নেতাকে এদেশের নেতা ঘোষণা করে শ্লাঘা বোধ করে সে-আন্দোলন কখনও জয়ী হতে পারে না। জয়প্রকাশ তখনও বিনোবাজীর সর্বোদয়ে বিশ্বাসী, এবং সর্বোদয় আন্দোলনকে কীভাবে পরিচালিত করলে তা ওই এলাকায় নকশাল আন্দোলনের স্থান নিতে পারে সে বিষয়ে গবেষণাও ছিল তাঁর মুশাহারি বাসের অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু নকশাল আন্দোলনের মুখোমুখি হয়ে তিনি বুঝেছিলেন ওই এলাকায়—বা অন্যত্র—হিংসার প্রসারের জন্য তথাকথিত নকশালরা দায়ী নন। প্রকৃত দায়ী যাঁরা এতদিন ধরে আইনকে ফাঁকি দিয়ে বাধা আইন লঙ্ঘন করে এসেছেন তাঁরা—তা তাঁরা রাজনীতিকই হন, প্রশাসকই হন, জমিদারই হন, বা মহাজনই হন। রাজনীতিকদের তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেছিলেন, তাঁরাও দায়ী, কেননা তাঁদের স্বার্থান্বেষণের ফলে গণতন্ত্র, দলীয় শাসনব্যবস্থা ও আদর্শবাদ সবকিছুই প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

১৯৭০ সালে মুশাহারিতে জয়প্রকাশের যে-উপলব্ধি হয়েছিল ১৯৭৪-৭৫ সালে তাই প্রকাশ পেল তাঁর সর্বাত্মক বিপ্লব ও দলহীন গণতন্ত্রের শ্লোগানে। জয়প্রকাশ তখন কী চাইছিলেন স্পষ্ট বোঝা না গেলেও তিনি কী চাইছিলেন না সে বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ ছিল না। জয়প্রকাশ ধরে নিয়েছিলেন, সংসদীয় গণতন্ত্রের দ্বারা কিছু হবে না, সচল, অচল রাজনৈতিক দলগুলি ও তাদের নেতাদের দ্বারাও কিছু হবে না। নিঃস্বার্থ ও আদর্শবাদী কর্মীর সন্ধানে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন যুব ও ছাত্র সমাজের কাছে। তাঁর সংঘর্ষ সমিতিগুলি গঠিত হয়েছিল রাজনীতিতে আনকোরা যুবক ও ছাত্রদের নিয়ে, পাওয়া ও পাইয়ে দেওয়া রাজনীতির মালিন্য যাদের স্পর্শ করেনি, তাঁদের নিয়ে। ছাত্র ও যুবশক্তির সাহায্যে বিপ্লব সংঘটনের ভাবনা জয়প্রকাশ কোথা থেকে পেলেন তা নিয়ে কম জল্পনা হয়নি। কেউ কেউ বলেন, ১৯৬৮ সালে প্যারিসের ছাত্র অভ্যুত্থান থেকে তাঁর পরিকল্পনার জন্ম, অন্য অনেকে বলেন, এ বিষয়ে তাঁর গুরু মারকুসে। নকশাল আন্দোলনের মুখোমুখি অভিজ্ঞতা থেকেও যে তিনি কিছু গ্রহণ করেছিলেন

## বিজ্ঞান

### সেন্ট হেলেনস আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ

**কিছু একটা যে ঘটবে,** আগ্নেয়গিরি বিশেষজ্ঞরা সেকথা আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছে দুটি ওয়াশিংটন। একটির নাম ওয়াশিংটন ডি. সি.। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী যেখানে। অপরটির নাম ওয়াশিংটন স্টেট। রাজধানী থেকে যার অবস্থান বহু দূরে। এই ওয়াশিংটন স্টেটেই অবস্থান করছে সেন্ট হেলেনস আগ্নেয়গিরি।

দীর্ঘ **১২৩** বছর নীরব থাকার পর সেন্ট হেলেনস এ বছর মার্চ মাসের গোড়ায় হঠাৎ সরব হয়ে উঠলো। তার ছয় মাইল গভীর ভূস্তরের নিচে ধরা পড়লো মৃদু ভূকম্পন। সেই ভূকম্পনের মাত্রা বাড়তে লাগলো দিন দিন। অবশেষে **১৮** মে সেন্ট হেলেনস-এ ঘটলো প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের সংগে সংগে তার জ্বালামুখ থেকে প্রচণ্ড বেগে বেরোতে শুরু করলো ভস্ম এবং গ্যাস। সেই সংগে কাদা। নদীর স্রোতের মত সেই কাদা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে এসে গ্রাস করলো বিস্তৃত অঞ্চল। পরদিন অর্থাৎ **১৯** মে আগ্নেয়গিরির ভস্মে ওয়াশিংটন, আইডাহো এবং মনটানার আকাশ গেল ছেয়ে। ভস্মের মেঘে ওই সব অঞ্চলে দিন হয়ে উঠলো রাতের মতই অন্ধকার।

সেন্ট হেলেনস-এর জ্বালামুখের ব্যাস প্রায় আধমাইল। সেই জ্বালামুখের ভেতর দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে বেরোতে শুরু করলো বাষ্প এবং ভস্ম। বেরিয়ে তোড়ের সংগে উঠে গেল **১৪০০০ ফুট** উর্ধ্বাকাশে। **১৮৫৭** সালের পর থেকে **৯৬৭৭** ফুট উঁচু এই পর্বতের চূড়া সব সময়ই থাকতো বরফে ঢাকা। বিস্ফোরণের পর তার মাথার প্রায় **১০০০** ফুট উঁচু অংশ পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেল। আশ্চর্যের বিষয় এই বিস্ফোরণে লাভা বেরোয়নি।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য : আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে আসা কাদা দেখতে কতকটা সিমেন্টের লেই-এর মত। মনে হচ্ছিল, কোটি কোটি টন সিমেন্ট গুলে গুলে কাদা সৃষ্টি করে কে যেন ছড়িয়ে দিচ্ছে। সেই কাদার স্রোত ঘণ্টায় প্রায় ৫০ মাইল বেগে নদী, পুকুর এবং রাস্তার উপর ছড়িয়ে পড়ে। কাদার তোড়ে বহু গাড়ি এবং ঘরবাড়ি ভেসে যায়।

মার্কিন ভূতত্ত্ব সন্ধান বিভাগের জনৈক পর্যবেক্ষক বলেছেন, সেন্ট হেলেনসের উত্তরে যে বনভূমি ছিল, সেই বনভূমির বিস্তৃত অঞ্চল বিস্ফোরণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সেখানে একটি গাছের গুঁড়িও আর অবশিষ্ট নেই। সেন্ট হেলেনসের সানুদেশে 'স্পিরিট লেক'। অপূর্ব এই প্রমোদ হ্রদটি ভস্ম এবং কাদায় বুজে গেছে।

বিস্ফোরণের পর আগ্নেয়গিরির উর্ধ্বাকাশে জমে ওঠে ভস্মের মেঘ। সেই মেঘে শুরু হয় বিদ্যুতের চমকানি। এর ফলে আশপাশের বনাঞ্চলে আগুন ধরে যায়। হাজার হাজার একর বনসম্পদ পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

অদূরে মিসোলা শহর। গরম গ্যাস এবং ভস্ম ছড়িয়ে যাওয়ায়, সেখানে দিনের দিকেই পথ চিনে চলা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

**১০০** মাইল দূরে ইয়াকিমা শহর। শহর না বলে গ্রামও বলা যায়। এই গ্রামের শেরিফ বলেছেন, দুপুরের পরই হাইওয়ের আলোগুলি আমাদের জেলে দিতে হয়েছে—এতই অন্ধকার। গ্যাস এবং ভস্মের ভেতর [illegible] দেখা যায় না। মাটির উপর কম করেও প্রায় চার ইঞ্চি পুরু শুধু ছাই আর ছাই। ছাই-এর চোটে মানুষের প্রাণান্তকর অবস্থা। **২০** মে'র খবরে বলা হয় "ওয়াশিংটন স্টেটের দুটি শহরের প্রায় **৫০.০০০** মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আগ্নেয়গিরি থেকে এখনও
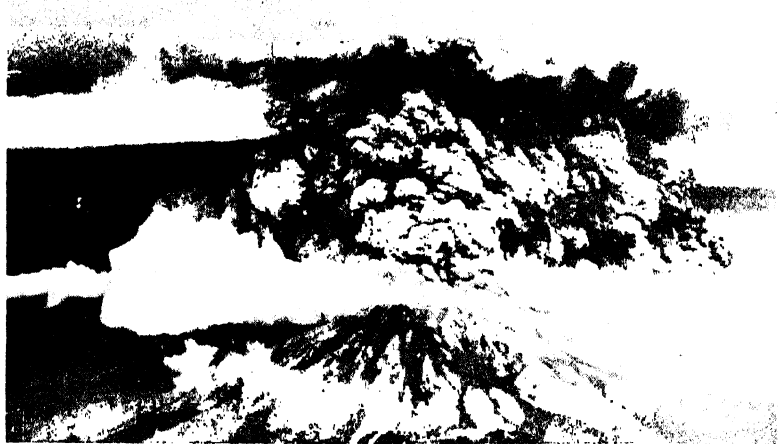
**"মনে হলো, একটি পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে কেউ।" পর্যবেক্ষণ বিমান থেকে সেন্ট হেলেনস আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের এই দৃশ্য দেখে বন বিভাগের জনৈক কর্মীর এটাই ছিল প্রথম মন্তব্য। ব্যাঙের ছাতার মত ছাই আর বাষ্পের মেঘ বিস্ফোরণের পর ১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত উর্ধ্বাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। বিজ্ঞানীদের মন্তব্য, "৭৯ খৃষ্টাব্দে ভিসুভিয়াসের বিস্ফোরণের দরুন যতটা ছাই, কাদা এবং গ্যাস পম্পেই শহরটি কবরস্থ করেছিল, ঠিক সেই পরিমাণ ছাই, কাদা এবং গ্যাসই মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উদ্গিরণ করেছিল সেন্ট হেলেনস।**

জঞ্জাল বেরিয়ে আসছে। তবে তার বেগ কিছুটা কমেছে। প্রায় **৬৩০০০** ফুট উর্ধ্বাকাশে জমেছে গ্যাস এবং ভস্মের মেঘ। ভূকম্পন-কেন্দ্র সমুদ্রগর্ভে প্রায় **১২** মাইল দূরে সরে গেছে। উর্ধ্বাকাশে স্ট্রাটোস্ফিয়ার পর্যন্ত ধূলিকণা ছড়িয়ে পড়েছে। এই ধূলিকণা ইতিমধ্যে অরিগন, আইডাহোর উত্তরাঞ্চলের আকাশ গ্রাস করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমুদ্র এবং আবহাওয়া বিষয়ক দপ্তরের বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই ধূলিকণা আগামী দু বছর বাতাসে ভাসমান অবস্থায় থাকতে পারে। এর ফলে পৃথিবীর আবহাওয়ায় সাময়িক কিছু পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব নয়।

কিন্তু ক্ষয়ক্ষতির প্রথম ধাক্কা সামলে উঠতে না উঠতেই আবার বিস্ফোরণ। **২৫** মে সেন্ট হেলেনস আবার গর্জে উঠলো। এবার ভস্মের পরিমাণ কম। পরিবর্তে আগ্নেয়গিরির গহ্বর থেকে উদ্গিরণ হতে লাগলো বাষ্প। সেই বাষ্পের মেঘ ছড়িয়ে পড়লো উর্ধ্বাকাশে। প্রায় সাড়ে তিন মাইল পর্যন্ত। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের (সিয়াটলে অবস্থিত) ভূপদার্থ বিজ্ঞানীরা বললেন, এই বিস্ফোরণের আগে সেন্ট হেলেনস-এর ভূস্তরে উল্লেখ করার মত ভূকম্পন ধরা পড়েনি। আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের আগে আশপাশের ভূস্তরে আর এক ধরনের কম্পন ঘটে থাকে। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'হারমোনিক ট্রেমরস'। বাংলা ভাষায় যার অর্থ দাঁড়ায় সমলয় কম্পন। এবার এ ধরনের কোন কম্পন ধরা পড়েনি। কাদা এবং লাভা—কিছুই এবার বেরোয়নি। তবে এবার নতুন একটি ঘটনা ঘটলো। আগের বারে ভূকম্পনের উৎস ধরা পড়েছিল প্রায় **১২.৪** মাইল গভীর অঞ্চলে। এবার তা ধরা পড়লো **৫.৩** মাইল গভীরে। এ থেকে বিশেষজ্ঞরা ধরে নিলেন, সম্ভবত ভূস্তরের নিচে যে গলিত পদার্থ রয়েছে, যাকে বলা হয় 'ম্যাগমা'—সেই 'ম্যাগমা'ই এবার হয়ত উপরের দিকে উঠে এসেছে।

[illegible]

এগিয়ে যাচ্ছিল বেশ। কিন্তু কলামবিয়া নদীর মুখে এসে যেই তারা কাউলিটজ্ নদীতে পড়লো, কে যেন থামিয়ে দিল তাদের। কাউলিটজ্ নদীর উপরের দিকেই তো সাধারণত তারা যায়। এবার গেল না। মনে হলো ওরা কিছু একটা যেন আঁচ করতে পেরেছে। সম্ভবত বিস্ফোরণের দরুন সেখানকার জলে আগ্নেয়গিরির ভস্ম এবং রাসায়নিক সামগ্রী মিশে থাকায় ওরা বুঝতে পেরেছিল আর এগোনটা নিরাপদ হবে না।

এই ঘটনার **১৮** দিন পর ঘটলো চরমতম বিস্ফোরণ। **১২** জুন রাত ৮টা বেজে **৪৫** মিনিট। ওই সময় মাউণ্ট হেলেনস-এর কাছাকাছি অঞ্চল দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলো ইস্টার্ন এয়ার লাইনসের একটি যাত্রীবাহী বিমান। ওই বিমানের পাইলটের কাছ থেকেই মার্কিন ভূতাত্ত্বিক দপ্তর প্রথম খবর পান। জানানো হয়, ওয়াশিংটনের দক্ষিণ-পশ্চিমের একটি পর্বতের চূড়া থেকে পাখির পালকের মত শুভ্র মেঘের উদ্গিরণ দেখা যাচ্ছে। পর্বত চূড়া থেকে ওই মেঘ প্রায় **৫২০০০** ফুট উর্ধ্বাকাশ পর্যন্ত উঠে এসেছে।

"একটা সাংঘাতিক [illegible] বিস্ফোরণ!" খবরটি শুনেই মন্তব্য করেন ভূতত্ত্ব অনুসন্ধান বিভাগের ভূতাত্ত্বিক পেটে রাওলে।

পরদিন সকাল চারটের মধ্যে মেঘের উচ্চতা কমে আসে। এই মেঘের মধ্যে ছিল প্রচুর পরিমাণ ভস্ম। পোর্টল্যাণ্ড শহরে জল সরবরাহ করা হয় বুল রান জলাধার থেকে। পোর্টল্যাণ্ডের [illegible] জানালেন ওই জলাধারে বেশ কিছু পরিমাণ ভস্ম জমেছে; এতে জলের অম্লতা বেড়েছে। তবে এই সংগে একথাও জানানো হয়, এতে করে ক্ষতির সম্ভাবনা তেমন নেই। বিস্ফোরণের সংগে এবার ছোট ছোট মার্বেল আকারের পিউমিক পাথরেরও [illegible] হয়ে যায়। [illegible] হয়ে ওঠে। ফলে পোর্টল্যাণ্ডের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বন্ধ করে দিতে হয়। এবং আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, বিস্ফোরণের সংগে এবার 'হারমোনিক ট্রেমার' বা সমলয় কম্পন ধরা [illegible] বিস্ফোরণের শব্দ **১৩৫** মাইল দূরে থেকেও শোনা গিয়েছিল।

ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিক জিওফ ক্লেটন বলেছেন, মাউন্ট হেলেনস-এর এই বিস্ফো-

**সেন্ট হেলেন্স আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ শুরু হওয়ার নাটকীয় মুহূর্তগুলি ধরে রাখা হয়েছে। উপরের ডান দিকে: বিস্ফোরণের পর পর্বতের এক অংশ উড়ে গেছে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে ছাই, বাষ্প এবং কাদা। (বাঁ দিকে—উপরে) পর পর্যায়ক্রমে কী দাঁড়িয়েছে তারই দিকে: বিস্ফোরণের পর সামনের বনাঞ্চল নির্মূল হয়ে গেছে। নীচে, ডান দিকে: বিস্ফোরণের মাত্রা যখন বাড়লো।**

রণে বেশ কিছু অঞ্চল এখন ভস্মাবৃত। এতে করে বহু পতঙ্গ মারা গেছে। পতঙ্গ পাখির খাবার। ফলে ওই সব অঞ্চল থেকে পাখিরা চলে যাবে। কোন কোন জীববিজ্ঞানী মন্তব্য করেছেন, পরাগ বিস্তারের জন্যে চাই পতঙ্গ। পতঙ্গ মারা যাওয়ায় ফল দাঁড়ালো এই, বেশ কিছু অঞ্চল এখন ফসলহীন হয় পড়বে। উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৪৩ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত মেকসিকোর পারাকুতিন আগ্নেয়গিরিতে একনাগাড়ে ভস্মের উদ্গিরণ হওয়ায় ওই অঞ্চলের পরিবেশ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আখের ক্ষতি হয়েছিল প্রচুর। এক ধরনের পোকা আখ গাছের ক্ষতি করে। ক্ষতিকর এই পোকাদের সাবাড় করে আর এক ধরনের পতঙ্গ। আগ্নেয়গিরির ভস্মে ওই পতঙ্গ ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় আখের পক্ষে ক্ষতিকর ওই পোকাদের হাত থেকে আখ গাছ রক্ষা করা খুবই শক্ত হয়েছিল তখন।

আগ্নেয়গিরি থেকে নিষ্ক্রান্ত ভস্ম অন্যভাবেও ফসলের ক্ষতি করে যথেষ্ট। বিশেষ করে আনাজ বা এমন ধরনের গাছপালা যারা লম্বায় হয় খাটো। যেমন ধরুন, ১৯১২ সালে আলাসকার কাতমাই আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সেখান থেকে প্রায় ৬০০ মাইল দূরের শহর কোডিয়াকে দশ ইঞ্চির মত পুরু ভস্ম জমে ওঠে। এর ফলে প্রচুর আনাজের ক্ষয়ক্ষতি হয়।

ক্লেটন বলেছেন, আইডাহো'র কেলোগ শহর থেকে এবারকার আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণজনিত ভস্মের যৎসামান্য নমুনা সংগ্রহ করে আমরা পরীক্ষাও করেছি। তাতে দেখা গেছে, ওই নমুনার মধ্যে এমন কিছু কিছু অকসাইড আছে যারা গাছপালার বৃদ্ধির ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করে। যেমন ধরুন, তার মধ্যে আমরা পেয়েছি ০.০৩ শতাংশ গন্ধকের অকসাইড, ০.০৯ শতাংশ ফসফরাসের অকসাইড, ইত্যাদি। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় ওই নমুনার ৬১.৭ শতাংশই সিলিকন ডাইঅকসাইড (বালি)। এত বেশি সিলিকন ডাইঅকসাইড ফসলের উৎপাদনকে ব্যাহতই করবে।

প্রাচীনকালে অনেকে মনে করতেন, আগ্নেয়গিরির ভস্ম সাময়িকভাবে ক্ষতিকর হলেও পরে তা চাষবাসের পক্ষে উপকারই করে। বিশিষ্ট জ্যোগোলিক স্ট্র্যাবো মনে করেন, ভিসুভিয়াস মানুষের [illegible] ঠিকই কিন্তু তার ভস্মই কামপানিয়ান সমভূমিকে আঙুর চাষের পক্ষে অতটা উর্বর করে তুলতে সমর্থ হয়েছে। মাউন্ট এটনার ঢালু জমিতে যে বিস্তর আঙুর হয়, তার পেছনেও কাজ করে এটনা আগ্নেয়গিরিরই ভস্ম। কলোরোডো বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিদ পেসন শিটস-ও এ ধরনের মতবাদ সমর্থন করেন। তিনিও মনে করেন শত শত বছর ধরে এল-সালভাদোরের বিস্তৃত অঞ্চল যে উর্বর হয়ে রয়েছে, তারও মূলে কাজ করছে এল-সালভাদোরেরই কুড়িটি প্রধান আগ্নেয়গিরি। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'ভলক্যানিক অ্যাকটিভিটি অ্যান্ড হিউম্যান ইকোলজি' গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। বইটি যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেছেন পেসন শিটস এবং ডোনাল্ড গ্রেসন।

"না, মাউন্ট হেলেনস-এর তৃতীয়বারের বিস্ফোরণ এমন কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। ১২ জুন প্যাসিফিক ডেলাইট টাইম রাত ৯টা বেজে ১১ মিনিটে (১৩ জুন, গ্রীনিচ সময় ভোর চারটে বেজে এগার মিনিট)। যখন বিস্ফোরণ ঘটলো, আমরা বুঝলাম, আমাদের গণনা নির্ভুল।" সিয়াটল্-এ অবস্থিত ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের বিজ্ঞানীদের মন্তব্য।

ওই দিন রাত ৮টায় তাঁরা ভবিষ্যবাণী করেন, আর ৯০ মিনিটের মধ্যেই মাউন্ট হেলেনসে আবার বিস্ফোরণ ঘটবে। এই ভবিষ্যবাণীর পেছনে কাজ করেছে একটি তত্ত্ব এবং ওই সময় সেখানকার ভূকম্পনজনিত অবস্থা। এই তত্ত্বে বলা হয়, চাঁদ, সূর্য এবং পৃথিবী যখন একই রেখা বরাবর এসে অবস্থান করবে, এবং মাউন্ট হেলেনসের নিচেকার ভূস্তর যেভাবে কাঁপছে সেটা যদি ওইভাবেই চলে, তাহলে ওই সময় হেলেনসে বিস্ফোরণ ঘটা উচিত।

১২ জুন প্রতিপদ। অর্থাৎ আকাশে নতুন চাঁদের আবির্ভাব। গণনা অনুযায়ী চাঁদ, পৃথিবী এবং সূর্যের ওই দিন সমরেখায় আসার কথা।

এই তত্ত্বের উপর নির্ভর করে ১৮ এবং ২৫ মে'র বিস্ফোরণেরও পূর্বাভাস যোগান হয়েছিল। কিন্তু দুটি বিস্ফোরণই তত্ত্বটিকে নস্যাৎ করেছে। কারণ ১৮ মে'র বিস্ফোরণ ঘটে সমরেখায় আসার চারদিন আগে। আর ২৫ মে'র বিস্ফোরণ ঘটে সমরেখায় আসার চারদিন পরে। কিন্তু তৃতীয় বিস্ফোরণ ভবিষ্যবাণী অনুযায়ী প্রায় ঠিক সময়েই ঘটেছে। যেটুকু হেরফের হয়েছে, তা কয়েক মিনিট মাত্র।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মাউন্ট হেলেনসের পর পর তিনটি বিস্ফোরণ সম্পর্কে গণনা করতে গিয়ে অনেক কিছুই শিখতে পেরেছেন তাঁরা। তাঁদের ধারণা, এই জ্ঞান পরবর্তীকালে অন্যান্য আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণেরও আগাম দিনক্ষণ জানায় ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করবে। এদের মধ্যে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (আলাসকা সহ), ইন্দোনেশিয়া, সোভিয়েত দেশ, জাপান, ইটালি, তুরস্ক কেনিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং দক্ষিণ আমেরিকার মহাদেশীয় আগ্নেয়গিরি সমূহ। উল্লেখ্য, নিঃসঙ্গ দ্বীপের মত অথবা সমুদ্রের আগ্নেয়গিরি থেকে ওইসব আগ্নেয়গিরির বৈশিষ্ট্য অনেকটা স্বতন্ত্র।

১৯৭৫ সালে মার্কিন ভূ-অনুসন্ধান দপ্তরের বিজ্ঞানী ডঃ ডিউইট, আর ক্র্যানডেল, ডঃ ডোনাল্ড আর মুলিনো এবং ডঃ মেয়ার রুবিন 'সায়ান্স ম্যাগাজিন'-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করেন, মাউন্ট সেন্ট হেলেনস সম্পর্কে সাবধান। এর অন্তস্তল এখন প্রচণ্ড সক্রিয়। গত কয়েক হাজার বছরে এই আগ্নেয়গিরি ভয়ংকর রকমের বিস্ফোরক হয়ে উঠেছে। এই অবস্থা চলছে কম করেও ৩৭০০০ বছর ধরে। সম্প্রতি এর গহ্বরের মধ্যে চলছে উত্তপ্ত এবং গলিত ভূ-সামগ্রীর প্রবাহ। ১৯৭৮ সালে ক্র্যানডেল এবং মুলিনো আর একটি প্রবন্ধে সেন্ট হেলেনসের কোন কোন অংশ বিপজ্জনক সে সম্পর্কে একটি মানচিত্রও তৈরি করেন।

বিজ্ঞানীরা সাবধান-বার্তা পাঠালেন এ বছর ২০ মার্চ, যখন তাঁরা আবিষ্কার করলেন ওই সময় সেন্ট হেলেনসের নিচে গভীর ভূস্তরে ভূকম্পন ঘটছে। আর সেই কম্পনের মাত্রা ৪.১ রিখটার।

২৭ মার্চ দেখা গেল ১৬৭৭ ফুট উঁচু আগ্নেয়গিরির গলার কাছের অংশ বাষ্প এবং ভস্মের চাপে বিদীর্ণ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ভূতত্ত্ব অনুসন্ধানীরা সবাইকে সতর্ক করে দিলেন আবার।

এপ্রিল নাগাদ বিমান থেকে আগ্নেয়গিরির গর্তের ছবি তোলা হয়। ব্যবহার করা হয় 'লেজার রশ্মি'। এতে দেখা গেল, ভেতরে বেশ কিছুটা ভূতাত্ত্বিক সামগ্রী ফুলে ফেঁপে উপরের দিকে উঠে আসছে দিনে ১.৫ মিটারের মত।

১২ মে, ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ডঃ ডেভিড এ জনস্টন জানালেন, ১৪ মে পৃথিবীর উপর চাঁদের আকর্ষণ কিছুটা বাড়তে থাকবে। এর ফলে ১৭ মে সেন্ট হেলেনস-এ বিস্ফোরণ ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। ১৮ মে দেখা গেল, সেখানকার ভূস্তরের গভীরে ভূকম্পনের মাত্রা যে মুহূর্তে গিয়ে দাঁড়াল ৫.১ রিখটার সেই মুহূর্তেই বিস্ফোরণ। এরপর কী ঘটলো, তার কিছু কিছু বিবরণ আগেই দিয়েছি।

মাউন্ট সেন্ট হেলেনস-এর সাম্প্রতিক এই বিস্ফোরণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে হাওয়াই আগ্নেয়গিরি বিষয়ক মানমন্দিরের পরিচালক এবং বিশিষ্ট আগ্নেয়গিরি বিশেষজ্ঞ ডঃ রবার্ট ডেকার বলেছেন: দুটি বিষয়ে আমি খুবই অবাক হয়েছি। সাধারণত দেখা যায়, প্রথমে ছোটখাটো বিস্ফোরণ। তারপর তা বাড়তে বাড়তে ঘটে বিরাট বিস্ফোরণ। সেন্ট হেলেনস-এ কিন্তু তা ঘটেনি। এছাড়া ১৮ মে যে ধরনের বিস্ফোরণ ঘটেছে, তার নজির খুবই বিরল।

ঘটনা যাই হোক, একটা ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা খুবই আশাবাদী। সেন্ট হেলেনস-এ নিয়মিত পর্যবেক্ষণের পর কিছু কিছু পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন তাঁরা। তাঁদের বিশ্বাস, ওই সব পদ্ধতির সাহায্যে কোন আগ্নেয়গিরিতে কখন বিস্ফোরণ ঘটবে তা আগে থেকে জানা সম্ভব হবে। হয়ত নিশ্চিত ভাবে দিনক্ষণ বলা এখনই সম্ভব হবে না। তবে আনুমানিক একটি সময় বলে দেওয়া খুব অসম্ভবও হবে না।

সমরজিৎ কর

ছবি: জার্ন হজসন।
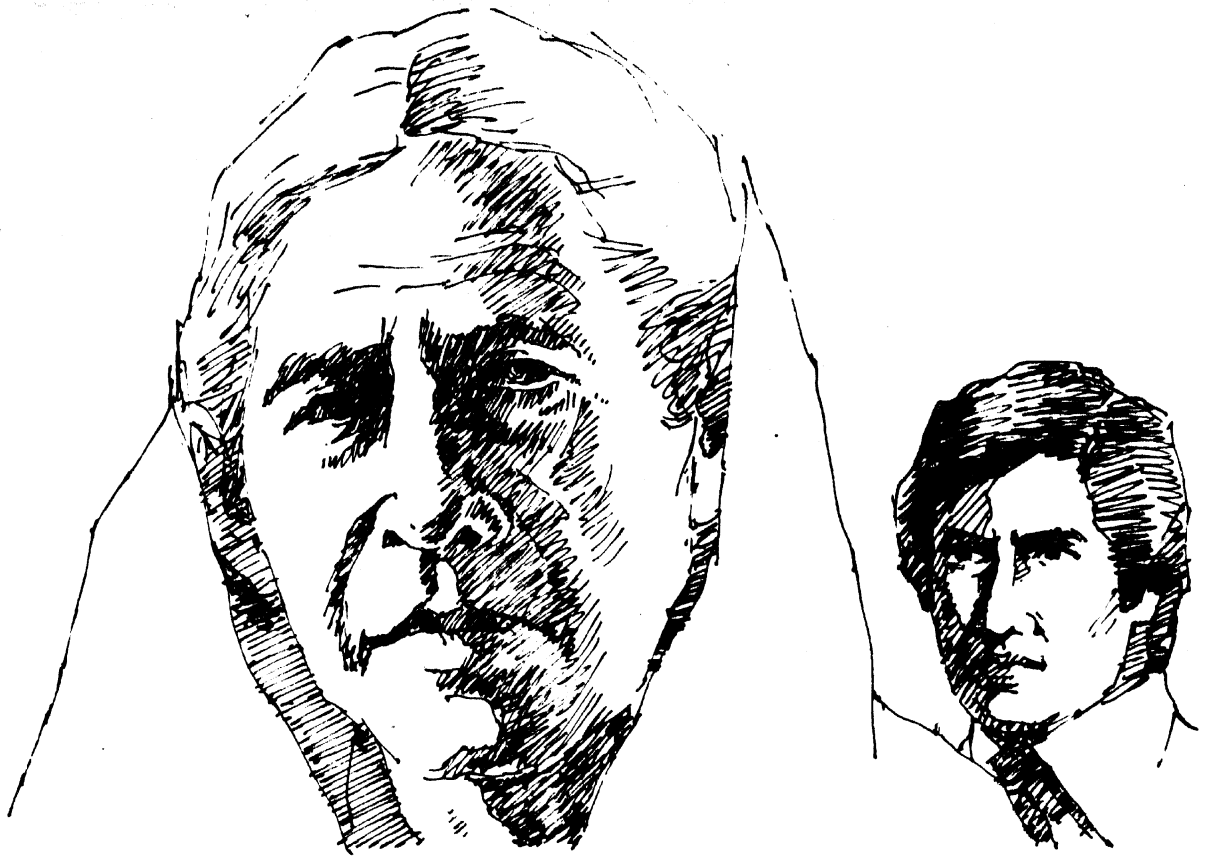
# স্বর্ণময়ীর ঠিকানা

রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়

এবার আর কোনরকম অজুহাত ছিল না, সুতরাং ছোট ছেলে অমলের সঙ্গে আসতেই হল স্বর্ণময়ীকে তাঁর কলকাতার বাড়িতে।

সকালে কি একটা কাজে চুঁচুড়োয় গেছল অমল, ফেরার পথে চন্দননগরে মায়ের সঙ্গে দেখা করে সে বলে বসল, 'চল না, দিনকতক কলকাতায় গিয়ে আমার বাড়িতে থাকবে, মা?'

'এখনই?' কথাটা বলেই স্বর্ণময়ী তাকালেন বড়বউ শুভদার দিকে।

দেওরের কথার সমর্থন জানিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে শুভদা বলল, 'তা যান না, কক্ষনো তো যান নি। ঠাকুরপোর নতুন বাড়ি কোনদিন চোখেই দেখলেন না—'

এ অভিযোগ অমলের নিজেরই আছে। ভিত পুজো থেকে গৃহপ্রবেশ—সবেতেই সে নিয়ে যেতে চেয়েছে মাকে; কিন্তু কোনদিনই যাওয়া তাঁর হয়ে ওঠে নি। ভিত পুজোর সময়টায় বিমলের মেয়ে মুক্তি একজ্বরীতে ভুগছে, আর গৃহপ্রবেশের দিন বড়বউ নিজেই বিছানায় পড়ে। রান্নাবান্না, ছেলেমেয়ে দুটোর দেখাশুনোর ভার কার ঘাড়ে চাপাবেন তিনি! বিমল তো বেরিয়ে যায় কোন্ সাতসকালে, ফেরে সেই দু' প্রহর রাতে!

কিন্তু এবার আর কোনরকম না করতে পারলেন না স্বর্ণময়ী। গোলাপ-ফুল মার্কা চটা-ওঠা টিনের সুটকেশটায় একখানা থান, শেমিজ একটা, গামছা আর টুকিটাকি দু-চারটে জিনিস ভরে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন অমলের সঙ্গে।

কলকাতার বাড়িতে যখন পৌঁছলেন তখন সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ট্যাক্সি থেকে নেমে কোমর-উঁচু লোহার ফটকটা খুলে ধরে অমল বলল, 'এসো, মা!'

আসবেন কি, স্বর্ণময়ীর চোখ দুটো তখন দৃষ্টির প্রদীপ জেলে বাড়িখানাকে যেন আরতি করছে। এই তাঁর অমুর বাড়ি! নিজের উপায়ের পয়সায় তৈরী! চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারেন না স্বর্ণময়ী। শুধু বিহ্বল দৃষ্টিতে ফটকের গায়ে গাঁথা 'সুরমা ভবন' ট্যাবলেটটার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

অমল তাগিদ দিল, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন, মা?' কেন, তা সে ভালোই বোঝে, এবং বোঝে বলেই কণ্ঠস্বরে তার প্রচ্ছন্ন গর্বের সুরটা সে গোপন করতে পারল না।

পালিশ-করা দরজার গায়ে লাগানো বোতামটা টিপে ধরতেই ভেতর থেকে জলতরঙ্গের মিষ্টি সুর একটা ভেসে এল এবং পরক্ষণেই দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়ালো সুরমা। বিয়ের সময় মাত্র একবারই সে শাশুড়ীকে দেখেছিল, তবু চিনতে তার অসুবিধে হল না, প্রণামও করল সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু ঠিক প্রসন্ন হল বলে মনে হল না। মুখে মুখে জবাব দেবার অপরাধে মাত্র দু'দিন আগে সে তাড়িয়েছে তার রাতদিনের লোক গৌরীকে; রান্নাবান্না, মেয়েকে স্কুলে দেওয়া-নেওয়া, নিজের স্কুলের চাকরি বজায় রাখা—সংসারের হাজার ঝামেলা নিয়ে এমনিতেই সে হিমসিম খাচ্ছে, তার ওপর স্বামীর হঠাৎ এই মাতৃপ্রীতিটা যেন একটা উটকো ঝামেলা বলেই মনে হল তার কাছে।

অমলের দিকে ফিরে সংক্ষিপ্ত গলায় সুরমা বলল, 'তুমি আর এখন ঢুকো না, একেবারে দোকানটা সেরে এসো।'

'দোকান?' অবাক হয়ে বলে অমল।

'হ্যাঁ, দোকান। আমি তো জানি না, হোটেল থেকে নিজেদের মতন ফ্রায়েড রাইস আর চিলি চিকেন এনে রেখেছি। কিন্তু—'

সমস্যাটা এবার অমলের কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠল। সুটকেশটা সুরমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'আচ্ছা, এটা তুমি নিয়ে যাও, আমি দেখি কিছু ফলমূল কি দইমিষ্টি—'

এগোতে যাচ্ছে সে, বাধা দিলেন স্বর্ণময়ী, 'এত রাত্রে আর যেতে হবে না, অমু। একটা রাত না খেলে মানুষ মরে না—'

অমল বলল, 'বাঃ, আমরা সবাই খাব, আর তুমি উপোস করে থাকবে নাকি?'

'আমার অভ্যেস আছে, বাবা। কিন্তু তোরা যদি আমার সঙ্গে এরকম কুটুম্বিতা করিস, তা হলে তো এখানে একটি দিনও টিঁকতে পারব না।'

স্বর্ণময়ীর কথায় এমন একটা সহজ সরল আন্তরিকতা ছিল যে, সুরমা কি অমল, একটি কথাও বলতে পারল না।

সুটকেশটা হাতে নিয়ে শাশুড়ীকে নিয়ে সুরমা ভেতরে ঢুকে গেল।

একতলার উত্তরদিকের কোণের ঘরটায় থাকার ব্যবস্থা হল স্বর্ণময়ীর। একটু অবাক হয়ে অমল সুরমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখ মেলতেই সে বলে উঠল, 'বয়েস হয়েছে, ওপর-নিচ করলে কষ্ট হবে না? ওঁর পক্ষে এই ঘরটাই তো ভালো। আলো-হাওয়া একটু কম—তাতে হয়েছে কি? গৌরী তো এই ঘরেই কাটিয়ে গেছে বছরের পর বছর।'

স্বর্ণময়ীকে দেখে সবচেয়ে অবাক হল রীণা। এই প্রথম সে দেখছে তাঁকে।

অবিশ্বাস আর বিস্ময় যেন পাশাপাশি আশ্চর্য এক ছায়া ফেলে তার মুখে। এ কেমন ঠাকুরমা? তার দিদিমাও তো বুড়ো, চুলে পাক ধরেছে, অথচ কেমন ধবধবে সরুপাড় শাড়ি পরে, সায়া পরে, ব্লাউজ গায়ে দেয়। হালকা করে আবার পাউডারও মাখে।' কিন্তু স্বর্ণময়ী যখন টিনের সুটকেশ থেকে কাগজে মোড়া আমসত্ত্বের প্যাকেটটা তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'নে, নিজের হাতে করা—', তখন যেন তার স্বর্ণময়ীকে মনে হল আপনজন কেউ হলেও হতে পারে। এক টুকরো আমসত্ত্ব মুখে পুরে রসাস্বাদন করতে করতে বলল, 'মা এসব একদম খেতে দেয় না, জানো? রাগ করে।'

কুণ্ঠিত হয়ে স্বর্ণময়ী বলে উঠলেন, 'তা হলে—'

জিনিসটা যেমন রসাল তেমনি সুস্বাদু। আরও খানিকটা মুখে ফেলে বিজ্ঞের মত রীণা বলল, 'ঠাকুরমা দিলে দোষ নেই, না? দিদিমাও তো যখন আসে, কেক নিয়ে আসে, প্যাসট্রিজ নিয়ে আসে, আবার ক্যাডবেরীর চকোলেটও। চলো ঠাকুরমা, ওপরের ঘরে চলো—'

আবার কিছুটা সহজ হয়ে উঠলেন স্বর্ণময়ী। রীণার পেছন পেছন দোতলায় উঠে এলেন তিনি। অবাক বিস্ময়ে এধার-ওধার তাকাতে তাকাতে। ঝকমক করছে চারধার। যেমন মেঝে তেমনি দেওয়াল, তেমনি জানলা-দরজা কড়ি-বরগা। গিয়ে দাঁড়ালেন জানলার গোড়ায়। সিল্কের পর্দাটা সরাতেই চোখে পড়ল আশ-পাশের আকাশ-ছোঁয়া নতুন নতুন বাড়িগুলো। ঘরে ঘরে আলো, কোথাও রেডিও বাজছে, কোথাও বা স্টিরিও-এ গান। হাওয়ায় হাসনুহানার মিষ্টি গন্ধ। চন্দননগরের ঘরের কথাটা মনে পড়ল স্বর্ণময়ীর। একপাল্লা ছোট্ট জানলাটা খুললেই পাশের সরু গলি থেকে কাঁচা ড্রেনের পচা গন্ধ নিয়ে ছুটে আসে হাওয়া, নাক যেন জ্বলে যায়।

পাশে দাঁড়িয়ে গর্বিত কণ্ঠে রীণা বলে ওঠে, 'আমাদেরও স্টিরিও আছে ঠাকুরমা, জানো? দিদিমা দিয়েছে, এসো, দেখবে এসো।'

ঠাকুরমাকে সে টেনে নিয়ে যায় আর এক এক করে পরিচয় দেয়, 'এই যে স্টিরিও, ওইটে ফ্রিজ—গত বছর সাড়ে চার হাজার টাকা দিয়ে কিনেছে বাবা। আর পাশের ঘরে আছে একটা অ্যাকোরিয়াম—দেখবে চলো—'

দেখেন স্বর্ণময়ী, দেখেন আর মন তাঁর ভরে ওঠে পুত্রগর্বে। দূর-অতীতের দিনগুলো যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দুর্ঘটনার বলি হয়ে উনি যখন হঠাৎই একদিন চলে গেলেন, বিমু তখন কলেজে পড়ছে, আর অমু বছর ছয়েকের শিশু। চোখে অন্ধকার দেখলেন স্বর্ণময়ী, দিন গুজরান হয় এমন সম্বল নেই। লেখাপড়া ছেড়ে অল্প মাইনেয় বিমু গিয়ে ঢুকলো একটা কাপড়ের দোকানে, অমানুষিক খাটুনি। তবু সেই খাটুনির পরও রাতে ফিরে এসে বিমু পড়াতে বসতো অমুকে নিয়ে। স্বর্ণময়ীও বসে থাকেন নি। পাড়ার লোকের কাঁথা সেলাই করে, শীতের আগে উল বুনে, পাঁপড় বেলে, ঠোঙা গড়ে তিনি রোজগার করতেন যা হয় কিছু। অমুকে মানুষ হতেই হবে।

বৃত্তি-পরীক্ষায় বৃত্তি পেলো অমু, মাধ্যমিকে প্রথম দশজনের একজন। মনে পড়ে, আজ সবকিছু মনে পড়ে স্বর্ণময়ীর। খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ছবি সমেত যখন সংক্ষিপ্ত একটা জীবনী বেরোল অমুর, চন্দননগরের বাইশ টাকা ভাড়ার এঁদো ঘরের কথারও উল্লেখ ছিল তাতে। সেটা পড়ে শুধু তাঁর নয়, আনন্দে বিমুরও চোখ জলে ভরে উঠেছিল সেদিন। অমুর সাফল্যের পেছনে যে তার অনেক রক্ত জল হয়েছে।

কলকাতায় এসে আবাসিক এক কলেজে ভর্তি হলো অমু। গোটা দুই-তিন টিউশানি জুটিয়ে নিয়ে নিজের খরচ নিজেই চালাতে লাগল সে। মাঝে-মধ্যে বিমু কিছু দিতে গেলে, নিত না। বরং রাগ করতো, বলতো, 'আমার জন্যে তোমাদের চিন্তা করতে হবে না। আমি আমারটা চালিয়ে নিচ্ছি, তুমি সংসারটা দেখো।'

বাড়ি ফিরে খেতে বসে বিমু শুধু অমুর গল্পই করতো। বলতো, 'অমু ভীষণ হিসেবী আর আত্মবিশ্বাসী, মা। তুমি দেখো, ও অনেক বড় হবে, অনেক উঁচুতে উঠবে।'

পুরোন দিনের কথা ভাবেন আর নতুন বাড়ির নতুন নতুন আসবাব দেখতে দেখতে আনন্দে চোখের কোল জলে ভরে ওঠে স্বর্ণময়ীর। রাত্রে বিছানায় শুয়েও বিমুর দূরদর্শিতার কথা চিন্তা করেন তিনি। অমুর সম্বন্ধে সে যা বলেছিল, ফলে গেছে তা অক্ষরে অক্ষরে। শুধু নিজের ভবিষ্যৎটাই সে দেখতে পেলো না। সারাজীবন সেই অভাব আর অনটন। সেই ভাঙা তক্তপোশ, তালি-দেওয়া ছেঁড়া মশারি, সারারাত মশার কামড়ে এপাশ-ওপাশ করা।

অনেক রাত পর্যন্ত সেদিন জেগে কাটলেও চিরদিনের যা অভ্যেস সেই ভোরে ওঠায় কিন্তু এতটুকুও ব্যতিক্রম হল না স্বর্ণময়ীর। কাক ডাকেনি, উঠে পড়লেন স্বর্ণময়ী; স্নান করলেন, কাপড়-গামছা মেলে দিলেন তারে, কিন্তু ঠাকুরনামটা জপ করেন কোথায় বসে? পুজোর ঘর বলতে কিছু নেই, অথচ বাড়িতে জায়গা আছে প্রচুর। অমুর না হয় খেয়াল না থাকতে পারে, বউমাও তো ছোটখাটো একখানা করিয়ে নিতে পারত।

খুঁজতে খুঁজতে সংসারের অব্যবহার্য জিনিসগুলো যে ঘরে রাখা হয়, তারই এক কোণে ঠাঁই করে নিলেন তিনি। সবেমাত্র বসতে যাবেন, সদর দরজার বেলটা বেজে উঠল। বসা আর হল না, উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলেন তিনি।

ঠিকে-ঝি কুন্তী। পাঁচ বাড়িতে কাজ করে, নমো-নমো করে ফল-বেলপাতা ফেলাতেও তো কত সময় লাগে। তাই জোর-জের না এলে চলে না। অল্প বয়েস, একটু বা রোগাটে, তবু সাজসজ্জা নেহাত ফেলনা নয়। ভেতরে পা দিয়ে

বাপরে! তাই কি পারেন? সংসার যে তাঁর নিজের! তার সর্বত্র ছড়িয়ে আছেন তিনি। তার ধমনীতে ধমনীতে বইছে তারই বুকের রক্ত।

দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজতে তিনি উঠে পড়ে বারান্দায় গিয়ে স্টোভটা জ্বাললেন। হাঁড়ি করে জল বসাতে গিয়ে মনে হল কে জানে আজ একাদশী কিনা! বাড়িতে পাঁজির বালাই নেই। ছবিওলা একখানা ইংরিজি ক্যালেন্ডার আছে বটে, কিন্তু তাব থেকে একাদশীর কোন হদিস মেলে না। শেষে কি এই বুড়ো বয়সে একাদশীর দিন ভাত খেয়ে ফেলবেন! বড় বউ শুভদা থাকলে স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করতে পারতেন। কোথায় কার কাছে যাবেন খবর নিতে, তার চেয়ে স্টোভ নিভিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত হলেন স্বর্ণময়ী।

দিনে ঘুমোন তাঁর কোনদিনই অভ্যেস নেই। একজন লোক থাকলে দুটো কথা বলেও সময় কাটতো। হাত গুটিয়ে কাঁহাতক আর ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে বসে থাকা যায়! কলঘরে ঢুকে এক বালতি জল আর শুকোতে দেওয়া ন্যাকড়াটা নিয়ে তিনি ঘষে ঘষে মেঝে মুছতে লাগলেন। ঠিকে-ঝি সকালে করে গেছে বটে, কিন্তু ওদের তো দায়সারা কাজ, দরদ কোথায়!

মেঝের রূপ যেন খুলতে লাগল। খুশি হলেন স্বর্ণময়ী। তবু সংসারের একটা কাজে লাগলেন তিনি। নিছক বাড়ি পাহারা দেওয়াই নয়।

কিন্তু সে আর কতক্ষণেরই বা কাজ! আবার সেই অনর্থক ঘোরাঘুরি। পেছনের ছোট ঘরখানায় একগাদা পুরোন খবরের কাগজ থাক করে সাজিয়ে রাখা। স্বর্ণময়ী একবার ভাবলেন, একটু আঠা তৈরি করে নিয়ে ঠোঙা গড়তে বসেন। ইংরাজী কাগজ। ঠোঙাগুলো দোকানদারেরা বেশি দরেই কিনে নেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভরসা পেলেন না। তা ছাড়া, না জিজ্ঞেস করেই বা করেন কি করে? অগত্যা ইচ্ছেটা তাঁকে দমন করতেই হল।

পরের রবিবারেই কিন্তু সুরমা এক পুরোন কাগজের ফিরিওলা ডেকে সব কাগজ বেচে দিল। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল স্বর্ণময়ীর। ক'টাই বা টাকা! ঠোঙা বিক্রি হত আরও অনেক বেশি পয়সায়। বিমলের সংসারের দশ দিনের বাজার খরচ হয়ে যেত।

সদর দরজার বেলটা বেজে উঠতেই ঘড়ির দিকে তাকালেন স্বর্ণময়ী। দুটো বাজে প্রায়। ঝি এলো, তার মানেই আবার ব্যস্ততা শুরু। সামনে দাঁড়িয়ে থেকে না করালে সব কাজই নোংরা করে রেখে যাবে।

কিন্তু দরজা খুলতেই স্বর্ণময়ী অবাক। ঝি নয়, সুরমা। ব্যগ্র গলায় বলে উঠলেন, কি ব্যাপার, আজ এত সকাল-সকাল যে! শরীর ভালো আছে তো, মা?'

গলদঘর্ম সুরমা ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'আপনার ছেলের সঙ্গে আজ একটু বেরোব। চারটের ফিরবে তার মধ্যে তৈরী হয়ে থাকতে বলেছে।' পরক্ষণেই রান্নাঘরের দিকে চোখ পড়তেই সুর বদলে গেল তার। বলল, 'লক্ষ্মী আসে নি এখনও?'

'না মা, এখনও আসেনি।'

'মরেছে! ও আবার কামাই করে বসবে না তো?'

ঘড়ির দিকে আর একবার তাকালেন স্বর্ণময়ী, 'এখনও সময় চলে যায়নি. এসে পড়বেখন। তুমি একটু জিরোও মা, বড্ড ঘেমে গেছো। রোদে পুড়ে মুখটা কালো হয়ে গেছে।'

বাথরুম থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে বেরিয়ে আসার পরও লক্ষ্মী এলো না দেখে সুরমা গজগজ শুরু করল, ঠিকে ঝিয়ের কাণ্ডই এই। সময় বুঝে ডুবে ফেলে।

'এতে আর ডুবে ফেলার কি আছে মা?' স্বর্ণময়ী বলে উঠলেন, 'তুমি কিছুমাত্র ব্যস্ত হয়ো না। তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই, আমি তো রয়েছি। অম অফিস থেকে আসবে, তুমি ধীরেসুস্থে তৈরী হতে থাকো। আমি রান্নাঘরটা ধুয়ে, বারান্দা মুছে বাসন কখানা মেজে তুলে রাখবখন। রীণাও যাবে নাকি তোমাদের সঙ্গে?'

'ওরই জন্যে তো বেরোন আজ!' সুরমা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'আজ ওদের গেট টুগেদার হবে টালিগঞ্জে নীতাদের বাড়ি।'

'সেটা আবার কি, মা?' স্বর্ণময়ীর গলায় বিস্ময়।

'প্রতি মাসে রীণার বন্ধুদের কারো-না-কারো বাড়িতে একবার করে সব অভিভাবকরা জড়ো হন, পড়াশুনো নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়. গান-বাজনা. খাওয়া-দাওয়া—এই আর কি!'

জন্মদিন, বিয়ের তিথি, অফিসের পার্টি, মাসে এক-আধবার সিনেমা থিয়েটার কি জলসায় যাওয়া—শহুরে মানুষদের আনন্দ আহরণের এমন অনেক উপকরণের কথা শুনেছেন স্বর্ণময়ী. কিন্তু আজকের ব্যাপারটা যেন সম্পূর্ণ নতুন ঠেকলো তাঁর কাছে।

সুসজ্জিত হয়ে ঠিক সাড়ে চারটেয় ওরা বেরিয়ে গেল। বাসন ধোয়া শেষ করে স্বর্ণময়ী তখন পোড়া তাওয়াখানা নিয়ে পড়েছেন।

দরজায় ধাক্কা দেওয়ার দুমদাম শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল স্বর্ণময়ীর। ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে তিনি বেরিয়ে এলেন বাইরে। অমু, সুরমা আর রীণার সমস্বর চিৎকার শুনে একরকম ছুটে গিয়েই তিনি সদর দরজাটা খুলে দিলেন।

এবং দিতে-না-দিতেই রীণা বলে উঠল, 'ঠাকুরমার কি ঘুম রে বাবা! যেন কুম্ভকর্ণ।'

অমল বলল, 'তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলে মা?'

অমলের কথা শেষ হতে-না-হতেই সুরমা বলে উঠল, 'আমরা সেই কখন থেকে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছি—'

কথা ঝুটো, গলা কারুরই মিহি নয়, ভঙ্গিও মিষ্টির ধারে-কাছে যায় না। তবু ভারি লজ্জা পেলেন স্বর্ণময়ী। বললেন, 'ছি ছি, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে আমার। এই আসবে এই আসবে করে অনেকক্ষণ জেগে ছিলাম, তারপর কখন যে দু' চোখের পাতা এক হয়ে গেছে—'

কোন জবাব না দিয়ে ওরা ভেতরে ঢুকে এল। কাঁধের স্লিং ব্যাগটা ডিভানের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে সুরমা অমলের উদ্দেশে বলল, 'চোরে যদি দরজা ভাঙতো, মা তো জানতেও পারতেন না। দরজায় একটা অটোমেটিক ল্যাচ লাগাবার ব্যবস্থা করো তুমি।'

ঘরের বাইরে বারান্দার এককোণে কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্বর্ণময়ী। সেদিকে হঠাৎ চোখ পড়তেই সুরমার গলা কিঞ্চিৎ খাদে নেমে এল: মায়ের তো বয়েস হয়েছে, সব সময় কি সব দিকে হুঁশ রেখে কাজ করতে পারেন? কোনদিন হয়তো দরজা খোলা রেখেই ঘুমিয়ে পড়বেন।

বারান্দার ঘড়িতে ঢং ঢং করে আওয়াজ হতেই রান্নাঘর থেকে একটা বেড়াল বেরিয়ে এলো এই সময়, একছুটে লাফ দিয়ে জানলা গলে বেরিয়ে গেল বাইরে। সেটার দিকে লক্ষ পড়তেই সুরমা বলে উঠল, 'রান্নাঘরে আপনার রুটি-তরকারি রেখে গিয়েছিলাম, খেয়েছেন মা?'

'আজ যে আমার নীলষষ্ঠির উপোস বউমা, আজ তো পোড়া জিনিস কিছু খাব না!' স্বর্ণময়ীর গলা তেমনি ঠাণ্ডা আর সঙ্কুচিত।

'ওহো, তাও তো বটে! আমার একদম খেয়ালই ছিল না। ছি ছি, আপনি যদি বেরোবার সময় একটু মনে করিয়ে দিতেন, মিষ্টি কিনে আনতাম ফেরবার পথে। আর ফ্রিজের খাবার তো আপনার চলবে না—নইলে ফল মিষ্টি সবই তো আছে।'

'তাতে কি হয়েছে, একটা দিন না খেলে কি আর আমি মরে যাব। ও তো আমার বহুকালের অভ্যাস, মা! ও নিয়ে তোমায় অত ভাবতে হবে না। নাও, এবার সব শুয়ে পড়ো গে যাও। অনেক রাত হয়েছে, উঠেছো সেই কোন্ সাতসকালে—'

ঘড়ির দিকে তাকালেন স্বর্ণময়ী। বারোটা বেজে সাত।

লক্ষ্মীর কাজ সারা হলে সদরে তালা লাগিয়ে স্বর্ণময়ী বেরিয়ে পড়লেন। রীণার ছুটি তিনটেয়। এখনও দেরি আছে কিছুক্ষণ। রাস্তার লোককে জিজ্ঞাসা করতে করতে তিনি গিয়ে হাজির হলেন আধ মাইলটাক দূরের এক পোস্টাপিসে। একখানা খাম কিনে শেমিজের ফাঁক থেকে বার করলেন একখানা চিঠি, তারপর সেটা খামের ভেতর ভরে ঠিকানা লিখে ডাকবাক্সে ফেলে দিলেন।

আজ ক'দিন ধরেই মনটা তাঁর খুব অস্থির হয়ে পড়েছে। কতদিন হলো, তিনি এখানে এসেছেন, বিমুর কোন খবর পান নি। বড় বউমার শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না, বিমুরও অফিস বন্ধ আছে আজ তিন মাস, কি করে যে চালাচ্ছে ওরা তা ভগবানই জানেন। আলতা-সিঁদুরের একটা কারখানায় ঠিকে যে কাজটা পেয়েছে বিমু, তাতে রেশনের দামটাও ওঠে কিনা সন্দেহ। সংসারের কাজ সেরে মায়ে-বউয়ে ঠোঙা গড়তেন অবসর সময়ে। পেতেন যৎসামান্যই, তিনি চলে আসার পর এখন তাও কমেছে। মাইনের অভাবে ছেলেমেয়ে দুটোর স্কুলে যাওয়া বন্ধ। হাত-খরচ বলে মাসে মাসে তাঁকে কিছু টাকা দেয় অমু, তাই; নইলে কবে ঘর ছাড়তে হত ওদের, আলোর অভাবে বাস করতে হত অন্ধকারে। এখানে আসার আগের দিন রুলি দু' গাছা বিক্রি করতে চেয়েছিল বিমু, বাধা দিয়েছিলেন স্বর্ণময়ী। ও দুটো ওর মামার বাড়ি থেকে দেওয়া। নিজের গলার হারগাছাটা খুলে তার হাতে দিতে যেতে বিমুও হাত সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'তোমার ওই শেষ সম্বলটুকু আর নাইবা ঘোচালুম মা।'

হন্‌হন্ করে হাঁটছিলেন যত, গলগল করে ঘামছিলেনও তত স্বর্ণময়ী। ফিরতে দেরি হলে বেচারা রীণাকে দোরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। বাজলো ক'টা? তিনটে বেজে গেল নাকি? রাস্তার এক ছোকরার কাছে সময় জানলেন, পৌণে চারটে।

পৌণে চারটে! স্বর্ণময়ী যেন একটা ধাক্কা খেলেন। আরও দ্রুত পা চালালেন তিনি। বাড়ির কাছাকাছি হতেই দেখলেন যা ভেবেছেন তিনি ঠিক তাই। গেটের মুখে বইয়ের সুটকেশটা নামিয়ে রেখে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে রীণা আর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। তাঁকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর। বলল, 'আচ্ছা, তুমি কী বল তো ঠাকুমা! রিকশা থেকে নেমেই দেখি দোরে তালা দেওয়া। সেই কখন থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। পা ব্যথা করে না আমার? খিদে পায় না বুঝি? দোরে তালা লাগিয়ে তুমি কোথায় গেছলে শুনি?'

তালা খুলে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে স্বর্ণময়ী বললেন, 'বলছি, বলছি, ভেতরে চল, সব বলছি। আগে বইপত্তর রাখ, হাত-পা ধো, খাওয়া-দাওয়া কর—'

'আমি বইপত্তরও রাখব না, হাত-পাও ধোব না—তুমি আগে বল কোথায় গেছলে? কেন তুমি আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখলে?' রীণার গলায় রাগের চেয়ে অভিমানের সুরটাই যেন এবার বেশি করে বাজে।

লোডশেডিং দেখে, হাত-পাখাখানা টেনে নিয়ে বাতাস করতে করতে স্বর্ণময়ী কৌতুকভরা গলায় বললেন, 'কোথায় গেছলাম জানিস? গেছলাম তোরই জন্য ভালো চকোলেটের সন্ধান করতে। কিন্তু পেলাম না—কোথাও পেলাম না, ভাই। সবাই বললে কাল পাওয়া যাবে। এই দেখ না, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পায়ের কি অবস্থা!'

ঠাকুরমার পায়ের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল রীণা। বলল, 'ও মা, এ যে রক্ত পড়ছে ঠাকুমা! দাঁড়াও, দাঁড়াও, ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছি। তুমি বসো, একদম উঠো না কিন্তু—'

এক দৌড়ে দোতলায় চলে গেল রীণা, ফিরে এল পলকের মধ্যেই—ডেটল শিশি আর তুলো নিয়ে। ঠাকুরমার পা-টা মুছে পরিষ্কার করে দিতে দিতে বলল 'তুমি অমন তাড়াহুড়ো করে কাজ করো না, ঠাকুমা। পড়ে গেলে কি হতো বল তো?'

'কি আর হতো, মরে যেতুম!' স্বর্ণময়ীর গলায় তেমনি কৌতুক।

'ইস্, মরে যেতুম বললেই হলো! মরতে যাবে কেন শুনি? ও কথা কক্ষনো বলবে না—' রীণার গলায় যেন ভর্ৎসনা: 'ও-কথা বলতে নেই।'

দরজায় কলিং বেলের আওয়াজ পেয়ে রীণা বলে উঠল, 'তুমি বসো ঠাকুমা আমি যাচ্ছি। বোধ হয় মা এসেছে—'

স্বর্ণময়ী আদেশের ভঙ্গিতে বললেন, 'মাকে যেন বলিসনি, আমার আঙুল কেটে গেছে!'

রীণাও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'তুমিও বলে ফেলো না যেন আমার জন্যে চকোলেট খুঁজতে বেরিয়েছিলে।'

বিকেলে পার্কে বেড়াতে বেড়াতে রীণা বললে, 'আজ আর বেশি হাঁটবো না ঠাকুমা, কোথাও একটু বসি চলো। তোমার পায়ে ব্যথা, হাঁটলে আরও বাড়বে।'

ওরা একটা ফাঁকা জায়গা দেখে বসলো। রীণা বলল, 'জানো ঠাকুমা, আসছে মাসে আমার জন্মদিন। সেদিন সন্ধ্যেবেলা আমাদের বাড়িতে একটা পার্টি আছে আমার সব বন্ধুবান্ধবেরা আসবে। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো, আর তুমি কিন্তু সেদিন ঝিয়ের মত এরকম ময়লা কাপড় পরে থাকতে পারবে না—এই বলে রাখলুম। একখানা ভালো কাপড় পরবে—পরবে তো? যদি না পরো, তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে যাবে কিন্তু—'

স্বর্ণময়ী চুপ। অস্থির মন তখন তাঁর স্থির হয়ে ছিল চন্দননগরের সেই ঘরে যেখানে মুক্তি আর কেষ্ট হয়তো খুনসুটি করছে, আর সামনের লাল রোয়াকে তোলা উনুনে কয়লা সাজাতে সাজাতে শুভদা বলছে, 'ঘরে এমন এক চিমটি আটা নেই যে, তোদের দুখানা রুটি করে দিই। তোর বাবা কখন আসবে বল তো, কেষ্ট?'

'কী, কথা বলছো না কেন?' স্বর্ণময়ীর হাঁটুতে নাড়া দিয়ে রীণা বলল, 'পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছে? চল, তা হলে বাড়ি ফিরে যাই।'

সম্বিত ফিরে পেলেন যেন স্বর্ণময়ী। রীণার হাত ধরে উঠে পড়লেন তিনি। বললেন, 'সন্ধ্যে হয়ে গেছে, চল। দিদিমণি হয়তো এতক্ষণে এসে গেছেন।'

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলটা যখন চরমে গিয়ে পৌঁছলো, তখনই জিজ্ঞাসা করলেন কথাটা স্বর্ণময়ী: 'হ্যাঁ মা, আজ কি বাড়িতে কিছু আছে নাকি? কেউ আসবে?'

শো-কেস থেকে তোলা-কাচের কাপ-প্লেটগুলো বার করতে করতে সুরমা জবাব দিল, 'হ্যাঁ, ও-বেলা আমার বোন-ভগ্নিপোত আসবে।'

আসবে যে কেউ, সে অনুমান স্বর্ণময়ী অনেক আগেই করেছিলেন। সকাল-বেলা লক্ষ্মী আসতে-না-আসতেই সুরমা যখন হুকুম করল, গৌরীর ঘর থেকে বাঁশের ঝুল-ঝাড়াটা বার কর তো লক্ষ্মী, আর বেলায় কাজ সেরে এ-বাড়িতে চলে আসিস, এখানেই খাওয়া-দাওয়া করবি আর আমার কিছু কাজ করে দিবি।

স্টিলের আলমারি থেকে বেরোল নতুন একসেট রঙ-মেলানো বালিশের ওয়াড়-ঢাকা-চাদর, জানলা-দরজার পর্দা, বেড-কভার। ধুলো মুছে আসবাব আরো ঝকঝকে করা হল, বারবার মুছে সিঁড়ি-বারান্দা-ঘর যেন আয়নার মত চকচকে করে তুললো লক্ষ্মী। নতুন বাড়ি যেন আরো নতুন হয়ে উঠল।

ভাঁড়ার ঘর থেকে যখন আনাজ বার করা হল, ফ্রিজ থেকে নামানো হল ছাল-ছাড়ানো গোটা তিনেক চিকেন আর মাছের প্যান, স্বর্ণময়ী এগিয়ে যাচ্ছিলেন যথারীতি, সুরমা বাধা দিয়ে বলল, 'আজ আর আপনি হাত লাগাবেন না মা, রান্নার ফিরিস্তি অনেক, আমার সুবিধেমত আমি করে নেবো।'

স্কুল থেকে ফেরার পর পোশাক ছাড়ারও যেন তর সইছিল না রীণার। ঠাকুরমাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠল, 'জানো ঠাকুমা, বিকেলে আমার এলাহাবাদের মাসীমা আসবে, মেসোমশাই আসবে, তপুদাদা তনুদাদা আসবে। তপুদাদা তনুদাদা আবার বাংলা কথা বলতে পারে না একদম। ওরা সবাই কানাডায় থাকে তো—ওরা কথা বলে ইংরিজিতে। তুমি তো ওদের কথা বুঝতেই পারবে না—আলাপ করবে কি করে বল তো?'

'কি করে করব, তুই বুঝিয়ে দিবি।'

ঠোঁট উল্টে রীণা বলল, 'আমি কি ছাই সব বুঝবো! ওদের কথার টান একেবারে সাহেবদের মত', পরক্ষণেই সুর বদলে, 'বাবার কাছে জেনে নিয়ে তোমায় বুঝিয়ে দেবো, কি বলো?'

অমল সেদিন একটু সকাল-সকালই অফিস থেকে ফিরে এল। সুরমার রান্নার কাজ তখন প্রায় শেষ। মিটসেফের ভেতর থরে থরে সাজানো ঝকঝকে স্টিলের পাত্রে নানান রকম ভোজ্য। মনে মনে স্বর্ণময়ী তারিফই করলেন সুরমার। সত্যিই বউটা কাজের। কত কম সময়ের মধ্যে গুছিয়ে কত রকমের রান্না সে একা-হাতে সেরে ফেলেছে!

নিজের ঘরে গিয়ে [illegible] একখানা তক্তপোশের তলা থেকে টেনে বার করলেন স্বর্ণময়ী। [illegible] কাচানো থান ধুতিটা, সেই সঙ্গে একটা [illegible] আসল, [illegible] একটা ফিটফাট থাকতে হবে বৈকি। হাজার হলেও আমার [illegible] কম নয় এখানে।

কিন্তু পরে যখন দেখলেন, দোতলায় বসার ঘরে তাঁর ডাক পড়ল না, খাওয়ার টেবিলেও কোনরকম তদারকি করতে হল না তাঁকে, মনে মনে [illegible] একটা স্বস্তি পেলেন যেন। তিনি দরজার ফাঁক দিয়ে [illegible] পড়েছিল, তিনি [illegible] সামনে দাঁড়ালে [illegible] বিব্রত হতে হতো তাকে। [illegible] মেয়ে তাঁর বউমা, [illegible] চায় না [illegible] তাঁকে ডাকে নি সে। [illegible] একবার [illegible] ভুলিয়ে দিতে [illegible] দেরি হয় নি।

[illegible] আরেক [illegible] স্বর্ণময়ীর [illegible] উঠল। [illegible] অর্থ সাচ্ছল্য নয়, বিবাহিত জীবনেও ভাগ্যবান সে। ভগবান ওদের সুখী [illegible]।

সরমা বেরোতে যাবে এমন সময় লোক এলো টেলিফোন অফিস থেকে। জরুরি লাইন পাওয়ার বিশেষ টাকা ক'দিন আগেই জমা দিয়ে এসেছিল অমল। লাইন অবশ্য আরও ক'টা দিন দেরি হবে পেতে। তবে ওরা এসেছে ইন্সপেকশন করতে—কোথা দিয়ে তার যাবে, রিসিভার বসাও কোন ঘরে, দেখতে। সরমা দেখিয়ে দিল, [illegible] দিল, তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'আপনাদের আর কিছু জানবার বা দেখবার আছে কি? কিছু মনে করবেন না, আমার কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে—'

সেদিনকার মত [illegible] ওরা চলে গেল। [illegible] আর থালাটা হাতে নিয়ে [illegible] স্বর্ণময়ী, এমন সময় দরজার বেলটা আবার বেজে উঠল। [illegible] জিনিসগুলো তাড়াতাড়ি টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলতেই মুখখানা খুশি খুশি হয়ে উঠল তাঁর। বলে উঠলেন, 'ও, তুই! আয়, আয়। আমার চিঠি পেলি কবে? বাড়ির সব খবর কি? বউমা কেমন আছে? [illegible], কেষ্ট এরা সব ভালো আছে তো? তোর শরীর কেমন?'

ঘর্মাক্ত বিমল ভেতরে ঢুকে চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'আগে হাঁফ ফেলতে দাও, তারপর সব বলছি। তুমি তো একটার পর একটা প্রশ্ন করে যাচ্ছো। আমি অত তাড়াতাড়ি জবাব দিই কি করে?'

পাখাটা খুলে দিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন স্বর্ণময়ী, 'কটার ট্রেনে বেরিয়েছিস?'

রুমাল দিয়ে ঘাড় মুছতে মুছতে বিমল বলল, 'বেরিয়েছি থার্ড ট্রেনে, বাসের জন্যে এত দেরি।'

শুকনো মুখখানা লক্ষ করে স্বর্ণময়ী বললেন, 'সকাল থেকে খাস নি তো কিছু?'

বিমল মাথা নাড়তে স্বর্ণময়ী ফের বললেন, 'তা হলে স্নান করে নে, দুটো ভাত খা। তোদের অফিস খোলার কি হল, [illegible] কিছু?'

'কিছুই বুঝতে পারছি না, এখনও মাস দুই লাগবে মনে হয়।'

ভাত বাড়তে বাড়তে রান্নাঘর থেকেই স্বর্ণময়ী জিজ্ঞাসা করলেন, 'বড় বউমার শরীর ভালো যাচ্ছিল না, দেখে এসেছিলাম। এখন কেমন আছে?'

প্রথমটায় বিমল বলতে চায় নি। কি হবে বলে? দূরে বসে বুড়ো মানুষটা শুধু উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় ভুগবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চেপে রাখতেও পারল না। বলল, 'তেমন ভালো যাচ্ছে না। দিন কতক ওঠা-হাঁটা বারণ করে দিয়েছে ডাক্তার। ওর জন্যে একটা ওষুধের সন্ধান করতেই তো কলকাতায় আসা।'

স্বর্ণময়ীর হাত যেন থেমে গেল মনে হল। 'ওঠা-হাঁটা বারণ! ডাক্তার কি বলছে?'

'ডাক্তাররা যেমন বলে, অ্যানিমিয়া—ভালো ভালো খাওয়াও চেঞ্জে নিয়ে যাও—'

'ওষুধপত্র কি দিয়েছে?'

'একগাদা। দিলে কি হবে, কিনতে পারছি কটা?'

ভাতের থালাটা ধরে দিলেন স্বর্ণময়ী, 'রান্নার কি হচ্ছে?'

'কি আর হবে। একবেলা যেদিন পারছি দুটো ফুটিয়ে দিচ্ছি, নইলে মুড়ি-চিঁড়ে ভরসা।'

স্বর্ণময়ী যেন ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠতে থাকেন, 'তা হলে চল, আমিও যাই তোর সঙ্গে—'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বিমল বলে উঠল, 'তুমি এখন গিয়ে কি করবে? চিরদিনই তো হাঁড়ি-কুঁড়ি সংসার নিয়ে কাটালে, এবার না হয় কিছুদিন একটু বিশ্রামই নিলে। এসেছ যখন থেকে যাও আরও কিছুদিন। দরকার পড়লে তোমাকে নিয়ে যাব তখন। তা ছাড়া তোমার বউমার তো এমন কর্তব্যই হয়—'

বিমলের কথাটা ঠিক মনঃপূত হলো বলে মনে হলো না স্বর্ণময়ীর। চুপ করে রইলেন তিনি।

সন্ধ্যের পর পাটের কাপড়খানা পরে পুজোয় বসতে যাবেন স্বর্ণময়ী, রান্নাঘর থেকে সুরমা জিজ্ঞাসা করল, 'আজ ক' পিস মাছ কুটেছিলেন, মা?'

'কেন, ছ' পিস—প্রতিদিন যা কুটি।'

'ওবেলা আপনার ছেলে মাছ খায় নি। খেয়েছিলাম আমি আর রীণা দু' পিস। থাকবে চার পিস—তো দেখছি দু' পিস আছে।'

ও হো, ওবেলা তোমার ভাসুর এসে ছিল, তোমার বেরিয়ে যাবার

পরই। বেলা হয়ে গেছল, তাই দুটো ভাত খাইয়ে দিলাম। দু'পিস মাছ তাকেই দিয়েছি।' স্বর্ণময়ীর গলা কেমন নরম শোনালো।

'দিয়েছেন ভালোই করেছেন। তবে কিনা 'ওরা' মুখের মাছ—বললে রাত্রে খাবে—'

গলা নামিয়ে সুরমা আরও দু-একটা কথা কি বলল, শুনতে পেলেন না স্বর্ণময়ী। গরম কড়ায় মাছের তরকারি ছাড়ার শব্দে তা চাপা পড়ে গেল।

ঢং ঢং করে বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একবার ঘড়ির দিকে মুখ তুলে তাকালেন স্বর্ণময়ী। তারপর গিয়ে ঢুকলেন নিজের ঘরে। সন্ধ্যাহ্নিকের সময় পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোতে পারলেন না স্বর্ণময়ী। বারবার কেবলই মনে পড়ে বড় বউমার শীর্ণ পাণ্ডুর মুখখানা, উনুনের ধারে কিশোরীর অক্ষম অপটু হাতের রান্নার জোগাড়, আর অযত্নে অবহেলায় ঘুরে-বেড়ানো ছেলেমেয়ে দুটোর শুকনো মুখ দু'খানা।

স্বর্ণময়ী বললেন, '[illegible] দিদিমণি এসে ফিরে গেলেন, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন।'

'[illegible], মার্কেটিং সেরে আমরা অনেক আগেই ফিরতাম, কিন্তু গাড়ির ব্যবস্থা করতে গিয়েই যত ঝঞ্ঝাট! বাবা যে গাড়িখানা চাচ্ছে, সুরজিৎ সিং সেখানা দেবে না। শেষে অনেক ঝগড়াঝাঁটি করে বেশি টাকা কবুল করে বাবা ওই গাড়িখানার ব্যবস্থা করল। অনেক দূরে যেতে হবে, ভালো গাড়ি না হলে কি চলে?'

একটু যেন অবাক হলেন স্বর্ণময়ী। ভ্রূকুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গাড়ি কিসের গাড়ি? অনেক দূর—কোথায় যেতে হবে?'

'ও, তুমি শোন নি বুঝি ঠাকমা? ক'দিন ছুটি পড়ছে পর পর, সেই ছুটিতে দু' রাত্রের জন্যে আমরা [illegible] দীঘা বেড়াতে যাব মোটরে করে।'

'তাই নাকি? কবে?'

'আগামী বৃহস্পতিবার—গুড ফ্রাইডের আগের দিন রাত্রে। কি মজা হবে বল তো ঠাকমা! সারা রাত গাড়িতে চড়ে—'

'তোরা একা যাবি, না আর কেউ যাবে?'

'আমরা তিনজন, আর বাবার বন্ধু দ্বীপককাকুরা তিনজন। সেই জন্যেই তো মার্কেটিং সেরে গাড়ির ব্যবস্থা করতে গিয়ে এত দেরি।'

দোতলা থেকে ডাক পড়তেই রীণা বলল, 'চল ঠাকমা, ওপরে চল। কি কি জিনিস কেনা হল দেখবে চল।'

মায়ের জিনিসগুলো নিয়ে তত আগ্রহী নয় রীণা, যতটা নিজেরগুলো নিয়ে। একটা একটা করে প্লাস্টিকের মোড়ক খুলতে লাগল রীণা আর বলতে লাগল, 'বাবা দিয়েছে এই দুটো—পোলিয়েস্টারের সারারা কামিজ আর লেস বসানো সিকেল ম্যাক্সি। আর মা দিয়েছে—' অন্য একটা প্যাকেট খুলে রীণা বলল, 'এটা হল মিডি স্কার্ট আর চীজ কটনের কাজ করা টপ। কেমন দেখতে বল তো ঠাকমা, আমাকে মানাবে না?'

'খুব সুন্দর মানাবে। তা আমাকে একবার পরতে দিবি তো?'

'ধোস, তুমি কি এ জিনিস পরবে! তোমার কি এই পোশাক?'

রাত্রে খাবার বেড়ে দিয়ে কতকটা আবদারের ভঙ্গিতে সুরমা বলল, 'দিন দু'তিনের জন্যে আপনার ওপর একটা দায়িত্ব চাপাব, মা।'

'দায়িত্ব! কিসের দায়িত্ব, মা?' সকৌতূহলে মুখ তুললেন স্বর্ণময়ী।

'আমরা একটু বাইরে বেরোব। আপনার ছেলের বন্ধু দীপকবাবুরা যাচ্ছেন, আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কি, বাড়িতে কে থাকবে! লক্ষ্মীকে অবশ্য বলেছি, রাত্রে ওর ভাইকে পাঠাবার জন্যে। আপনি যদি—'

'তা এতে এত "কিন্তু" হবার কি আছে, মা? যাও না, ঘুরেও এসো না দু'দিন—কোন চিন্তা নেই। লক্ষ্মীর ভাই যদি রাত্রে আসে, তা হলে আর ভাবনা কিসের? যাও, যাও, নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে এসো। বারো মাস তিরিশ দিন সংসারের জোয়ালে আটকা পড়ে আছো, হাড়ভাঙা পরিশ্রম করছো দিনরাত—ঘরে আবার বাইরে—সুযোগ যখন পাচ্ছো, চলে যাও।'

দুধের বাটিটা পাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে সুরমা কি একটা বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে স্বর্ণময়ী বললেন, 'তুমি তো জানো মা, দুধ আমি খাই না। আমাকে বরং একটু চিনি দাও, জল দিয়ে ভিজিয়ে নিই রুটিখানা—'

পরদিন থেকে ওদের তোড়জোড় আরো বেড়ে গেল। বৃহস্পতিবার রাত্রে ওরা যাত্রা করবে। তার মানে মাঝে আর তিনটে দিন। সবচেয়ে আনন্দ যেন রীণার। জীবনে প্রথম এই সে বাইরে যাবে, আনন্দে যেন উপচে পড়ছে। থেকে-থেকে হঠাৎ এসে জড়িয়ে ধরছে ঠাকুরমাকে, আর বলছে, 'তুমি খুব পয়মন্ত ঠাকমা, তুমি এসেছো বলেই যাওয়া হচ্ছে। জানো ঠাকমা, মা কি বলেছে জানো তো? বলেছে, আমরা ফিরে আসার পরই তোমাকে নিয়ে অনেক জায়গায় ঘুরিয়ে আনবে। কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, চিড়িয়াখানা—তুমি তো কিছুই দেখো নি এ-সবের।'

কেনাকাটার যেন আর অন্ত নেই ওদের। শাড়ি-ব্লাউজ থেকে শুরু করে থার্মো ফ্লাস্ক, টর্চের ব্যাটারী পর্যন্ত হাজারো জিনিস। গাড়িতে খাওয়ার জন্যে শুকনো খাবারই কতরকম। সারাদিন ধরে বেরোচ্ছে আর ঢুকছে, রাখছে আর আনছে। এটা পাল্টায়, ওটা বদলায়, কোনটা গায়ে ছোট, কোনটার রং পছন্দ নয়।

স্বর্ণময়ীর একবার মনে হল বলেন, 'যাবে তো দুটো দিনের জন্যে, তার জন্যে এত কি বায়নাক্কা!' কিন্তু বললেন না কিছুই। বাইরে যাওয়ার আনন্দে ওরা যা

করছে করুকে। কে জানে হয়তো নিজে হলেও তিনি ওই রকমই করতেন।

যাবার আগের দিনও সুরমা মেয়েকে নিয়ে বেরোল বিকেলে। টুকিটাকি এক-আধটা জিনিস এখনও বাকি। কিনে নিয়ে সোজা যাবে ওরা কেয়াতলা, অর্থাৎ দীপিকাদের বাড়ি। বেরোবার সময় সুরমা বলে গেল, 'আপনার ছেলে অফিস থেকে ফিরলে বলে দেবেন, আমাদের যদি ফিরতে রাত হয়, যেন চিন্তা না করে। মনে করে বলবেন, মা—'

'নিশ্চয়ই বলবো, মা। সে চিন্তা করবে, আর আমি বলব না, তাই কি হয়?'

নিকেলের ফ্রেমের চশমাটা নাকের ডগায় লাগিয়ে বারবার চিঠিখানা পড়লেন স্বর্ণময়ী। গুম হয়ে বসে রইলেন কতক্ষণ। তারপর মুখ তুলে বললেন, বউমাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে—এমনই অবস্থা।

সামনেই বেতের চেয়ারটায় বসেছিল আঠারো-উনিশ বছরের যে ছেলেটি, বয়স অল্প হলেও, স্বর্ণময়ীর মুখ-চোখের অবস্থা দেখে মনের চেহারাটা বোধ হয় পড়ে ফেলল চট্ করে। তাই সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বলে উঠল, 'আপনি অত ভাববেন না ঠাকুমা। ডাক্তার বলেছে, হাসপাতালে থাকলে বিশ্রাম হবে, নিয়ম করে ওষুধ-পথ্য পড়বে—তাই দেওয়া। নইলে—'

স্বর্ণময়ী সে-কথার কোন জবাব দিলেন না। চশমাটা খুলে চিঠিখানায় চাপা দিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন বেসিনের ধারে। চোখে-মুখে জল ছিটোলেন কতবার, পাখার স্পীডটা বাড়ালেন, কমালেন, আবার বাড়ালেন; তারপর সদর দরজায় দাঁড়ালেন একটু। ফিরে এসে অস্থির গলায় বললেন, 'কিন্তু বাড়িতে এখন যে আমি একা, ভাই। অমু না এলে তো বেরোতে পারছি না। তুমি একটু বসো, অফিস থেকে ও ফিরলেই আমরা বেরিয়ে পড়ব। আমি বরং ততক্ষণে তৈরী হয়ে নিই।'

পলকের জন্যে একবার বারান্দার ঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে স্বর্ণময়ী ঢুকে গেলেন তাঁর নিজের ঘরে। পা দুটো তখন তাঁর থরথর করে কাঁপছে, হাত দুটোও। জলে ঝাপসা চোখের সামনে ভেসে উঠছে পায়ে পায়ে জড়িয়ে থাকা মেয়ের বাড়া সেই বড় বউয়ের অভাব-ক্লিষ্ট করুণ মুখখানা। যতদিন পেরেছে, সংসার টেনেছে, তারপর নেহাত যখন অপারগ হয়েছে, বিছানা নিয়েছে। ছেলে-মেয়েগুলোর খোয়াড়ের শেষ নেই। চিন্তায় চিন্তায় বিমুর আহার-নিদ্রা বন্ধ। নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হল স্বর্ণময়ীর। এখানে না এলেই বোধ হয় ভালো করতেন। অমু আবদার করল আর বড় বউমাও একরকম জোর করে ঠেলে পাঠালো তাঁকে, তাই তো তিনি এলেন। নইলে হাজার অভাব হলেও বিমুর সংসারে কোন অসুবিধেই তাঁর ছিল না।

অমল এসে পড়ল, কিন্তু তার আগেই স্বর্ণময়ীর গোছগাছ সব শেষ। গোলাপফুল মার্কা চটা-ওঠা টিনের সুটকেশটা চোখে পড়তেই অবাক হয়ে সে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই গভীর উদ্বেগ নিয়ে স্বর্ণময়ী বলে উঠলেন, 'আমাকে এখুনি চন্দননগরে ফিরে যেতে হবে বাবা, বড় বউমার খুব অসুখ—হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে—বোধ হয় বাঁচবে না।'

কথা শেষে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন তিনি।

বিমলের পাঠানো ছেলেটির কাছে ঘটনাটা সব শুনে নিল অমল। তারপর হালকা গলায় বলল, 'কিন্তু না-বাঁচার তো কোন কারণ দেখছি না—তুমি মিছেই অত উতলা হচ্ছো, মা। অ্যানিমিয়া—তাতে হয়েছে কি! সামান্য কিছু ওষুধ আর খাওয়া-দাওয়ার তদ্বির করলেই তো সেরে উঠবে।'

'তা হয়তো উঠবে—কিন্তু তুই তো ওদের অবস্থাটা জানিস।' তেমনি কান্না-জড়ানো ভারী গলায় স্বর্ণময়ী বললেন, 'না বাবা, আমাকে আর আটকাস নি—আমার মন ভালো গাইছে না। আজ আমি আমার—'

অমলকে আর কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়ে, ভেজা-চোখে হন্ হন্ করে এগিয়ে গেলেন স্বর্ণময়ী। পেছনে সুটকেশ হাতে ছেলেটি। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে হাতব্যাগের চেনটা একবার খুলেও কি ভেবে আবার বন্ধ করল অমল, তারপর শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে।

কথাটা শুনে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলো সুরমা। স্বামীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে একসময় বোমার মতই ফেটে পড়ল যেন সে, 'ভাইয়ের সংসারে অভাব-দেখে মায়ের বোঝা তো কাঁধে চাপালে, এখন দেখলে তো তাঁর আক্কেলখানা! অসুখ কি কারো করে না, না হাসপাতালে ভর্তি হলেই সবাই মরে যায়!'

টেবিলে বিছানো একরাশ কাগজের ওপর থেকে থেকে চোখ তুলে অমল বলল, 'তুমি অত উত্তেজিত হচ্ছো কেন? বোঝোই তো—মায়ের প্রাণ—'

'রাখো তোমার মায়ের প্রাণ!' সুরমার মধ্যে থেকে শিক্ষার খোলস যেন সম্পূর্ণ খসে পড়েছে তখন, 'মায়ের প্রাণ—সে বুঝি শুধু বড়র জন্যেই?'

তেমনি ঠান্ডা গলাতেই অমল বোঝাবার চেষ্টা করল, 'সমস্যাটা তো তোমার বাড়ি পাহারা নিয়ে। যা হয় একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। কাল সকালেই আমি যাব সেন সাহেবের কাছে।'

'তাই যেও। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা কথা যেন সেন সাহেবকে বলতে ভুলো না। যত তাড়াতাড়ি পারেন, আমাদের জন্যে যেন একটা ভালো জাতের কুকুর তিনি জোগাড় করে দেন। কুকুর—আর যাই হোক, বেইমানী অন্তত করবে না—'

অমল চুপ। মাথা নিচু করে তাকিয়ে রইল টেবিলের ওপর বিছানো একখানা ব্যালান্স শীটের ওপর। যেন কিছুই শুনতে পায় নি।

## মিরিক—না-যাওয়া

মঞ্জুভাষ মিত্র

না-যাওয়া মিরিক, সুন্দরী ধ্যানাত্মিকা তুমি মহাজ্ঞান
চিন্তার ভিতর তুমি সঙ্গীতকারী দেবী, স্বরবতী বৃক্ষের মত–
বাদলের রিমঝিম ঝংকারে ঝংকারে বাজে তোমার মধুর
নামের পদ্যাবলী ; জলের বালিশে মাথা রেখে শুয়ে থাকো
অথবা অনঙ্গরঙ্গ হ্রদের সুন্দর তটে নৃত্য করো নানা ছন্দ-তালে
ফুলের ধনুক হাতে সহসা উধাও হও সু-ময়ূরী স্বচ্ছ-সকালে
কুমারী দেবীর মত বিবসনা গৌরাঙ্গী পার্শ্বদেশে ঘাস, ফুল, ঘাস
মেঘপশুদের বিদ্ধ করো, স্বপ্ন দিয়ে স্নিগ্ধ করো তন্নিষ্ঠ হৃদয়
বিচ্ছিন্নের গণ্ডদেশে সমুচ্চ চুম্বন আলো দান করো গাঢ় সহবাস
শুনেছি এ-সব কথা গ্রন্থে তন্ত্রে পথিকের উজ্জ্বল সংলাপে
সকল সংবাদ রাখি লেকশহরের মত অনিষেধ যৌবন-যুবতী
সবেগে অপেক্ষা করে আছো যেদিন সমাপ্ত হবে সমস্ত ভ্রমণ
হয়ত সেদিন তুমি চিন্তার ভিতর এক অনবদ্য সঙ্গীতকারী
শশা-লতাটির মত হবে ত্বকে রূঢ় পদ্যাবলী বাদলের স্নিগ্ধ অন্ধকারে

## পুরোনো দিনের গান

জয়তী মিত্র

অনুরাগী কেউ বলেছিল, 'ভালোবাসি'
দুপুরিয়া সুরে শব্দিত কথকতা
পাতার নূপুরে ছলকিয়ে ওঠে হাসি
ধু ধু মাঠ জুড়ে স্বপ্ন অলোকলতা।

যারা এসেছিল পেরিয়ে দিনের সিঁড়ি
উজল খুশীর আকাশ মুঠিতে পুরে
অনালোকে আজ শূন্য তাদের পিঁড়ি
মনকেমনের হাওয়া বয় রোদ্দুরে

দূরলীন পথ গহন দু-চোখে আঁকা
বিস্ময়ে জাগে সীমন্তিনীর শাঁখা॥

ছবি : সুনীল শীল

# কণ্টককল্পিত
## অতুল্য ঘোষ

**(নব পর্যায়)**

**॥ ৩১ ॥**

বিদেশী ত্রাণমূলক সেবা-প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান বা মিশনারী প্রতিষ্ঠান, যাঁদের সকলেরই উদ্দেশ্য—তা সে হাসপাতালের মাধ্যমেই হোক, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই হোক বা ব্যক্তিগত কিছুর মাধ্যমেই হোক—লক্ষ্য একটাই ঃ যারা অবহেলিত ও সমাজে অনাদৃত, তাদের সেবা করা। এই সেবাকার্য যেসব মিশনারী প্রতিষ্ঠান করে, হঠাৎ পশ্চিমবঙ্গের চিফ সেক্রেটারী খবরের কাগজে ঘোষণা করলেন যে, এইসব বিদেশী মিশনারী প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হবে। কারণ যাই থাক, এই ঘোষণায় অনেকেই একটু চমকে উঠেছিলেন। আরও বিস্ময়ের সৃষ্টি হল তার পরদিন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায়। মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে, এরকম কোন ব্যবস্থার কথা সরকার থেকে হয়নি। তা হলে জিনিসটা একটু ঘোরাল হয়ে দাঁড়াল। মুখ্যসচিবের নিজের বলার তো কোন ক্ষমতা বা অধিকার নেই। তিনি তো সরকারের মুখপাত্র! সরকার তাঁকে দায়িত্ব না দিলে তাঁর বলার অধিকার কোথায়? স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী যখন বলছেন, জানি না, তা হলে—। তাতে ব্যাপারটা শুধু যে বিস্ময়জনক হয়ে উঠেছে তা নয়, একটু ঘোরালও হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংবিধান অনুযায়ী এইসব মিশন বন্ধ করারও কোন অধিকার নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ছাড়া এইসব মিশন চালু হতে পারে না। অনুমোদন প্রত্যাহার করার অধিকারও কেন্দ্রীয় সরকারের। সেখানে চিফ সেক্রেটারী হঠাৎ সংবাদপত্রে এরকম ঘোষণা করলেন কেন? সরকারের পদস্থ কর্মচারীদের শিক্ষিত হতে হয়। আবার সর্বোচ্চ পদে যাঁরা যান, তাঁদের শিক্ষার সঙ্গে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান দুই-ই বাড়ে। এ ক্ষেত্রে এরকম অদ্ভুত ও বিসদৃশ ঘটনা ঘটল কি করে?

কোন নিম্নপদস্থ কর্মচারী যদি এইরকম দায়িত্বহীন, অসঙ্গত উক্তি করতেন, তা হলে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে সাজা পেতে হত। আমাদের দেশে সংবিধানসম্মত উপায়ে যে সব আইন আছে, তাতে উচ্চপদস্থ-নিম্নপদস্থ, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের অপরাধের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখা হয়নি। অপরাধের গুরুত্ব বিচার করে অপরাধীর দণ্ড বিধান করা হয়। এই অবস্থায় কি করে চিফ সেক্রেটারীর মত লোক এইরকম দায়িত্বহীন উক্তি করলেন যা মুখ্যমন্ত্রীর জানা ছিল না এবং মন্ত্রিসভাও এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেননি? এই প্রশ্নের সদুত্তর আজ অবধি পাওয়া যায়নি এবং যত দীর্ঘদিন যাবে, জনসাধারণ এই মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে তত সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠবে। কারণ, জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক মন্ত্রিসভার বা মন্ত্রীদের। সরকারী কর্মচারী যাঁরা আছেন, তাঁরা তো মন্ত্রিসভার কার্যক্রম ও নীতি রূপায়িত করবার জনাই আছেন। আপন আপন মন্ত্রীর কাছে প্রয়োজনমত তাঁরা নিজস্ব মতামত দিতে পারেন। কিন্তু সে মতামতের ভিত্তিতে তো প্রশাসন চলে না বা সেই মতামত বাইরে ঘোষণা করবারও সরকারী কর্মচারীদের অধিকার নেই। সরকারের আদেশে ও নির্দেশে সেগুলি ঘোষণা করা হয়। গেজেট খুললেই দেখা যাবে সামান্য বদলির অর্ডারের নীচেও লেখা থাকে 'By order of the Governor' গণতান্ত্রিক দেশে রাজ্যপালকেও মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হয়। যেখানে পরিষ্কারভাবে সংবিধানে এই কথা লেখা আছে, সেখানে চিফ সেক্রেটারীর এরকম অসঙ্গত ঘোষণা যে খালি তাঁর যশ হানি করেছে তা নয়, সমগ্র মন্ত্রিসভার উপরও কালিমা লেপে দিয়েছে।

অথবা এ কথা কি মনে করবার কারণ উপস্থিত হয়েছে যে, মন্ত্রিসভায় এত মত-বিরোধ যে, সরকারী কর্মচারীরা যদৃচ্ছ আচরণ করবার সাহস পাচ্ছে? আর যদি সত্যিই মন্ত্রীদের মধ্যে ব্যক্তিগত মতবিরোধ থাকে, তার সঙ্গে সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্ক কি? তাঁদের কাছে তো মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তই একমাত্র পালনীয় কর্তব্য। এ কথা লেখবার কারণ তো পূর্বেই ঘটেছে। অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে প্রায় দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন অন্য এক বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মচারী। আর সেইজন্যই সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা এই যে, এইসব মতপার্থক্য ও অসঙ্গত কাজের খুঁটিনাটি বিবরণও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্রের যাঁরা প্রতিনিধি, তাঁদের ক্ষমতা অসাধারণ—এ কথা স্বীকার করলেও এটা তো সত্য যে, তাঁরা কোথাও থেকে সংবাদ সংগ্রহ করেন, এই সংবাদ পাবার সূত্রটি (Source) কোথায়? সূত্রটি নিশ্চয়ই মন্ত্রীদের এবং সরকারী কর্মচারীদের কাছে আছে। সংবাদদাতারা তো আর অশরীরী নন যে, যেখানে সংবাদ সৃষ্টি হচ্ছে, যেখানে কারো প্রবেশাধিকার নেই, সেখানে তাঁরা অলক্ষ্যে প্রবেশ করে সেই সংবাদ সংগ্রহ করছেন। আর 'ওয়াটার গেট'-এর মত অবস্থা এখানে এখনও হয়নি। অবশ্য বিদেশী মিশনারী সংক্রান্ত ব্যাপারটি ঢক্কানিনাদ সহকারে সরকারের সর্বোচ্চ মহল থেকেই প্রকাশ করা হয়েছে।

বিদেশী মিশনারী প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে, বহু মিশনারী

ও মিশনারী প্রতিষ্ঠান আদিবাসীদের মধ্যে অনেক মানুষকে ধর্মান্তরিত করেছে, সেবা-কার্যের সঙ্গে ধর্মান্তর গ্রহণের কোন যোগ নেই। নিছক সেবাকার্য যাঁরা করেন তাঁদের জাতি, ধর্ম বর্ণ কিছুই মানতে নেই। এর ব্যতিক্রম যাঁরা করেন, তাঁরা অন্য কিছু স্বার্থ নিয়ে আসেন, সেবাকার্য তার খোলস মাত্র। এমন অনেক 'অরফ্যানেজ' আছে, যেখানে খৃষ্টান ছাড়া কাউকে নেওয়া হত না। রাঁচী, হাজারিবাগ, পালামৌ, সিংভূম প্রভৃতি জেলায় এবং মধ্যপ্রদেশের বহু জেলায় ভাল ভাল মিশনারী প্রতিষ্ঠান আছে, সেবাকার্য যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। আবার অনেক জায়গায় দেখা গেছে যে, ভালভাবে সেবাকার্য করলেও ধর্মান্তর গ্রহণেও প্রভাবিত করা হয়েছে। এইসব প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলি আবার গোপন সুড়ঙ্গ-পথে রাজনীতিও করেন। যখন দেশ পরাধীন ছিল, তখন এঁরা বিভিন্ন সেবাকার্যের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় লোকেদের চেয়ে বিদেশীরা কত ভাল, তা দেখাতেন এবং ইংরাজ রাজত্বের অবসান হলে এইসব সমাজে অনাদৃত ও অবহেলিত মানুষদের দেশীয় লোকেদের শাসনে কি দুর্দশা হবে, তাও বোঝাতেন। আমার ব্যক্তিগত জীবনে উত্তরবঙ্গে দু-এক জায়গায় এবং বিহার ও ছোটনাগপুরে কয়েকটি জায়গায় এইসব মিশনারী কার্যকলাপের জন্য তাঁদের সঙ্গে কয়েকটি সংঘর্ষও হয়েছে। সেইজন্য অনেক বিদেশী মিশনারী প্রতিষ্ঠান যে বিচ্ছিন্নতাকামী কাজ করেন, এ কথা সত্য। কিন্তু সত্য বলেই সব প্রতিষ্ঠানকে তো একভাবে বিচার করা চলে না! এই প্রসঙ্গে একটা মর্মান্তিক সত্যও আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন। যেসব অঞ্চলে মিশনারী প্রতিষ্ঠান আছে, সেইসব অঞ্চলের কতগুলি অসহায়, অশিক্ষিত ও আমাদের সমাজে অবহেলিত মানুষের কিছুটা দুঃখ-দুর্দশা লাঘব হয়েছে এবং তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারও বেড়েছে। সাধারণভাবে যে সব একটু ভাল কাপড়-চোপড় পরা এবং শিক্ষিত লোকদের এইসব অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়, তারা অধিকাংশই খৃষ্টান হয়েছে। এবং তারা আহারে ও সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্যে কিছুটা মনুষ্যত্বের মর্যাদা লাভ করেছে। তত্ত্বচ[illegible]ণরা হয়তো তাতেও নাসিকা কুঞ্চিত করে। কিন্তু এতে একটা দুঃসহ লজ্জা, গ্লানি ও কলঙ্ক যে, এইসব মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে না পেয়েছে সমাজে স্বীকৃতি, না পেয়েছে রাজা ও জমিদারদের অনুগ্রহ। কঠিন কঠিন কাজ এদের করতে হয়েছে—সবই অর্ধাসনে ও অনশনে। বনে-জঙ্গলে যেসব কন্দ বা মূল পাওয়া যায় এবং যে চাল সবচেয়ে নিকৃষ্ট, তাই এদের সংগ্রহ করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয়েছে। কঠোর পরিশ্রমের পরিবর্তে পেয়েছে হতাদর এবং দু মুষ্ঠি অন্ন ; কোথাও কোথাও আবার গরুকে যে খুদ দেওয়া হয়, তার অবশিষ্টাংশ। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি কঠোর পরিশ্রম করে যারা সমাজে শিক্ষিত অবস্থাপন্ন মানুষদের অন্ন, আহার্য যুগিয়ে এসেছে, দিনান্তে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে এসেও মালিকের বাড়ি বসবার জায়গা পায়নি। আর যিনি একবার ছাতা মাথায় দিয়ে

মাঠে কাজ তদারক করে এসেছেন, তাঁর শারীরিক কষ্ট দূর করার জন্য আয়োজনে প্রাচুর্যের কোথাও অভাব হয়নি। তাও নিভৃতে নয়—এইসব ক্লিষ্ট, খেটে-খাওয়া মানুষদের সামনে। সংখ্যাতত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে এইসব না খেটে খাওয়া, অপরের পরিশ্রমের উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। কিন্তু অর্থ ও সামর্থ্যে তাঁরা গণ্যমান্য। সেইজন্যই এদের এই অসহায়তার সুযোগ নিয়ে যদি কেউ অধিকারের অপব্যবহার করে, তা হলে তাদের দণ্ড দেবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ও প্রশাসনে যাঁরা মাথা, তাঁদের কি দণ্ড পাওয়া উচিত, সেটা বিচার্য বিষয়। স্বাধীনতার পর তপশীলভুক্ত ও আদিবাসীদের জন্য অনেক সুযোগ-সুবিধের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু সেইসব ব্যবস্থার কতটুকু যারা এখনও অবহেলিত অনাদৃত, অজ্ঞাত—তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছচ্ছে, সেটাও বিশ্লেষণ করার বিষয়। আর 'সিডিউল্ড কাস্ট' বা তপশীলভুক্ত'—এই কথাটার মানে কি? ইংরাজের আমলে যে ব্যবস্থা হয়েছিল, তাই এখনও চলে আসছে। ফলে দেখা যাবে 'সিডিউল্ড কাস্ট'দের মধ্যে যাঁরা লোকসভায় বা রাজ্য আইনসভায় যান, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই বিত্তশালী বা প্রভাবশালী। অধিকাংশ মানে শতকরা ৮০ জন। কেন্দ্রীয় সরকারের যে 'সিডিউল্ড কাস্ট' বা ট্রাইব-এর কমিশন আছে, তাঁরা এ সম্বন্ধে কতটা খোঁজখবর রাখেন? যদি না রাখেন তবে কেন রাখেন না? একটা মামুলী কমিশন করেই কি সরকারের দায়িত্ব শেষ হয়? সিডিউল্ড কাস্ট বা ট্রাইব-এর লোকেদের মধ্যে থেকে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে মন্ত্রী হন। এইসব লোকেরা যেসব সমাজ থেকে এসেছেন, আজ মন্ত্রীদের মধ্যে অধিকাংশেরই সেইসব সমাজের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। ক্রমাগতই দেখা যাচ্ছে থাক সৃষ্টি হচ্ছে। যেখানে সমাজ থেকে থাক তুলে দেওয়া স্বাধীন দেশের পক্ষে একটি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য, সেখানে নতুন করে থাক সৃষ্টি হচ্ছে।

এই 'তপশীলভুক্তি' ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যায় না, কেমন গোলমেলে। অনেকে কপশীলভুক্তির কথাটা জানেনও না। তপশীলভুক্তির আসল উদ্দেশ্য ছিল, যেসব সম্প্রদায় সুযোগ-সুবিধা পায় না, সেইসব সম্প্রদায়ের একটি তালিকা তৈরি করা, যাতে সরকারের পক্ষে বুঝতে সুবিধা হয় যে, কি করে সেইসব সম্প্রদায়কে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যায়। কিরকম গোলমেলে ব্যাপার, একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। পশ্চিমবঙ্গে রাজবংশীরা তপশীলভুক্ত, কিন্তু বিহারে ও আসামে রাজবংশীরা তপশীলভুক্ত নন। ধুবড়ীতে যে রাজবংশী আছে এবং কুচবিহারে যে রাজবংশী আছে, তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক পুরোপুরি বজায় আছে, বিয়ে-থা-ও হয়। কিন্তু সরকারী দলিলে পশ্চিমবঙ্গের রাজবংশীদের অনগ্রসর বলা হয়েছিল, কিন্তু আসামের বা বিহারের রাজবংশীদের অনগ্রসর বলা হয়নি। সিডিউল্ড কাস্ট ও সিডিউল্ড ট্রাইব কমিশন এই বৈষম্যের ব্যাপারে কেন্দ্রের কতখানি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বা কেন্দ্র এই ব্যাপারে কতখানি কি করেছেন? এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে যে সিডিউল্ড ট্রাইব-এর ছেলেরা মেধাবী হলেও সাধারণ হস্টেলে জায়গা পায়নি। ১৯৪৭-এর আগে কেউ কেউ এই পার্থক্য দূর করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। যেমন, পুরুলিয়ায় শ্রদ্ধেয় নিবারণ দাশগুপ্ত, বাঁকুড়ায় শ্রদ্ধেয় গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ। কিন্তু সীমায়িত শক্তি নিয়ে তাঁরা সব অবহেলিত মানুষের কাছে পৌঁছতে পারেননি। রাঁচীতে বহু বছর আগে—বোধ হয় পঞ্চাশ বছর—বিড়লাদের অর্থানুকূল্যে আদিবাসীদের জন্য একটি হস্টেল হয়েছিল। কিন্তু সেই হস্টেলে শিক্ষায়তনের অন্য ছেলেরা কেউ যেত না। গান্ধীজী এ নিয়ে অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কংগ্রেসের কার্যক্রমেও এই সমস্যা একটা বড় স্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে এই কাজে সাধারণ কর্মীরা কখনই বেশী যোগ দেননি, মুষ্টিমেয় কর্মী এই কাজ করেছেন। কারণ, আমাদের রাজনৈতিক শিক্ষা ছিল আংশিক। দেশবাসীদের একটা বড় অংশকে বাদ দিলে দেশ স্বাধীন হলেও তাকে সমৃদ্ধ করা যায় না, এই বোধ অনেকেরই ছিল না। আর স্বাধীনতার পরে এ বিষয়ে যদিও অনেক নিয়মকানুন হয়েছে, সবের পেছনেই আছে কল্যাণকর্ম এবং কর্তব্যকর্মের প্রেরণা—প্রায় কাঙালীভোজনের মত। নিজেরা উত্তম আহার্য খেয়ে সামান্যতম আহার্য দিয়ে কাঙালীভোজন করানো হয়। নাম হয়েছে 'নরনারায়ণের সেবা'। হাজার হাজার বছরের অন্যায়ের প্রতিবিধান করেছি, এ কথা কেউ ভাবে না। যারা প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করে তারাও ভাবে না যে, এত বছর ধরে যে মানুষকে হতাদর, অনাদর, অবজ্ঞা করে এসেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন। ভূমিহীনদের ভূমি দিয়ে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের কিছু চেষ্টা হচ্ছে, তার পেছনেও আছে নানাবিধ যুক্তিতর্কের অবতারণা। কোন পার্থক্য যে থাকা উচিত নয়, এটাই যে সবচেয়ে বড় যুক্তি, যতদিন বৈষম্য-পার্থক্য থাকে, ততদিন স্বাধীনতার অমর্যাদা করা হয়, এই বোধ যাঁরা 'ক্লাস-লেস সোসাইটি' চাইছেন, তাঁদের মধ্যেও বিশেষ দেখা যায় না। তত্ত্বকথায় তাঁরা এ কথা স্বীকার করেন, কিন্তু বাস্তবে এই কাজ রূপায়িত করবার কোন চেষ্টা বা ইচ্ছা আছে, তা মনে হয় না। ক্লাস-লেস সোসাইটি'র যাঁরা প্রবক্তা, তাঁদের মধ্যে যাঁরা কৃতী, তাঁদেরও চারদিকে আহার, বিহার, শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সামাজিক মর্যাদার বেশ একটা সীমাবেষ্টনী গড়ে ওঠে। অবহেলিতরা হয়তো মুষ্টিভিক্ষার পরিবর্তে ঠোঙায় বা থলিতে আহার্য পায়। কিন্তু পার্থক্যের কোন পরিবর্তন এখনও দেখা যায়নি এবং মনে হচ্ছে দেখা যাবেও না। বিদেশী মিশনারীদের কার্যকলাপ লেখার সঙ্গে এই বিষয় আনা অনেকের কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে; কিন্তু এই বিষয়টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং যতদিন এই ব্যবধান লুপ্ত না হবে, ততদিন স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিকদের মধ্যে অধিকাংশই মনুষ্যত্বের মর্যাদায় বঞ্চিত থাকবে।

রূপসী সাজের
কাপড়ে
রূপের মাধুর্য
ঝরে!
১০০% পলিয়েস্টার আর জর্জেট শাড়ী
নতুন অবদান
টিশলন
পলিয়েস্টার টিস্যু শাড়ী
বোম্বে
আলোড়ন জাগানো নতুন

ডাইং
নতুন ফ্যাশনে

# সেই সময়

## সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৫৫ ॥

ঠিক সোহাগবালার মতন থাকোমণির শরীরেও মেদ জমতে শুরু করেছে। এটা বুঝি এই ছোট জলচৌকিখানিরই গুণ। নিচের তলার এই দরদালানের জলচৌকিতে যে বসবে ভৃত্য মহলের কর্তৃত্ব যেমন তার হাতে আসবে তেমনি তার চেহারাতেও পুষ্টি লাগবে। কয়েক বছর আগেও থাকোমণির দেহ ছিল যেন পাথরে কোঁদা, সাধারণ রমণীদের তুলনায় একটু বেশী লম্বা বলে তার মেদবিহীন শরীরটি ছিল রীতিমতন আকর্ষণীয়। এখন তার চিবুকে দুটি ভাঁজ পড়েছে, হাত-পা গোল গোল হয়ে এসেছে এবং আঙুলের ডগাগুলো যেন সব সময় টসটস্ করে।

মাঝখানে দু মাস থাকোমণি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায় এই জলচৌকিটি প্রায় বেদখল হবার উপক্রম হয়েছিল। মানদা দাসী এখানে বসেছিল জাঁকিয়ে। মানদা এবং অন্যান্যদের ধারণা হয়েছিল যে থাকোমণি আর বাঁচবে না। প্রায় সেই রকমই দশা হয়েছিল তার, হাত-পা নাড়ার ক্ষমতাও চলে গিয়েছিল, একলা ঘরে পড়ে থেকে চিঁ চিঁ করতো, তবু ভাগ্যক্রমে সে আবার সেরে উঠলো।

তারপর এই জলচৌকি থেকে মানদা দাসীকে সরানোর জন্য প্রায় ধস্তাধস্তি করতে হয়েছিল থাকোমণিকে।

সেই অসুখের পর থেকেই থাকোমণি এ রকম স্ফীত হতে শুরু করেছে। শেষ পর্যন্ত সোহাগবালার মতনই পরিণতি তার হবে কি না এই কথা ভেবে প্রায়ই থাকোমণির বক্ষ কাঁপে। তা ছাড়া, এই জলচৌকিটা সে এখনো আঁকড়ে ধরে আছে বটে, কিন্তু সে টের পেয়ে গেছে, যে-কোনো মুহূর্তে তার পায়ের তলা থেকে মাটি ধসে যাবে। মানদা দাসী এবং অন্যান্য কয়েকজন সব সময় তার দিকে শকুন-চক্ষে তাকায়। থাকোমণির আর ভালো লাগে না, কিছু ভালো লাগে না।

নকুড় আর দুর্যোধন মাছ কুটছে চাতালে বসে। থাকোমণি অলসভাবে চেয়ে আছে সেদিকে। বড়বাবুর কুটুমবাড়ির [illegible] জন আজ নেমন্তন্ন খাবেন এ-বাড়িতে, তাই আজ বেশী মাছ এসেছে। কুটতে কুটতে দু একটা টুকরো বাঁ দিকে ছুঁড়ে ফেললে দুর্যোধন, আর নকুড় তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। ঐভাবে প্রায় সেরখানেক মাছ সরিয়ে ফেলে ওরা বাইরে বিক্রি করে আসবে। থাকোমণি ইচ্ছে করে দেখছে না। ওরা কি ভাবছে, ওরা থাকোমণির চোখে ধুলো দিতে পারবে? থাকোমণি সবই জানে। তবু নিত্যি তিরিশ দিন আর ওদের সঙ্গে খ্যাট খ্যাট করতে থাকোমণির ইচ্ছে করে না। মাছের দরের যা হিসেব দিলে নকুড়, তা শুনেও তাজ্জব হবার কথা। বলে কি না রুইমাছের মন বারো টাকা, এ কী মগের মুলুক পেয়েছে? ন টাকা সাড়ে ন টাকা মন দরে পাকা রুই বাড়িতে এসে বয়ে দিয়ে যায়! থাকোমণি তবু ওদের কাছ থেকে চুরির টাকার বখরা চায়নি।

টাকাপয়সার প্রতিও লোভ কমে গেছে থাকোমণির। কী হবে টাকা দিয়ে? এক সময় ভাবতো বটে, 'বন্ধু নাহি কড়ি বই' কিন্তু বয়েস অস্তাচলের দিকে ঢল পড়ায় সে উপলব্ধি করেছে সে কড়ি থাকলেও মেয়েমানুষের জীবনে নিরাপত্তা নেই। বলতে গেলে থাকোমণি তো টাকার ওপরেই শুয়ে আছে। তার শয্যার নিচে তোড়ায় বাঁধা বাঁধা টাকা আর খুচরো পয়সা। বিশ বৎসর ধরে সে যা উপার্জন করেছে, তার থেকে পাই-পয়সাও খরচ হয়নি, সবই জমা আছে, তবু থাকোমণির অন্তরে অশান্তির আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলে কেন?

এই যে ইদানীং সে নকুড় বা দুর্যোধনের কাছ থেকে চুরির বখরা নেয় না সেইজন্যই বরং সে কিছু খাতির পায়। থাকোমণির এবংবিধ পরিবর্তনে নকুড় আর দুর্যোধন খুব আতান্তরে পড়ে গেছে, ব্যাপারটির আগা-পাশ-তলা কিছুই তারা বুঝতে পারছে না। সেই সোহাগবালার আমল থেকেই এই দরদালানের জলচৌকির অধিকারিণী প্রত্যেকটি চুরির আধলারও ভাগ না নিয়ে ছাড়েনি। থাকোমণি যে এখন আর ভাগ চায় না, তার মানে কি তার গভীর কোনো মতলব আছে? দিবাকরকে বলে থাকোমণি যে-কোনো দাসী বা ভৃত্যের চাকরি যখন খুশী খেয়ে দিতে পারে। থাকোমণির ক্ষমতা সোহাগবালার চেয়েও বেশী, কারণ সে দুলালের মা।

রাত্তিরবেলা সব কাজ মিটে গেলে নকুড় থাকোমণির ঘরের দোরের সামনে এসে জিজ্ঞেস করে, ও থাকোদিদি, ঘুমুলে নাকি, আসবো? পিছনের গোলপাতার ঘর অনেক দিন হলো ছেড়ে এসেছে থাকোমণি। দিবাকরের অনুগ্রহে সে নিচের মহলেই একটা পাকা ঘর পেয়েছে। ঘর থেকে যখনই বেরোয়, তখনই থাকোমণি সে ঘরের দরজায় তালা লাগায়। হুটহাট করে এ-ঘরে কারুর প্রবেশ করার হুকুম নেই। নকুড় বয়েসে থাকোমণির চেয়ে যথেষ্ট বড় তো বটেই, এক সময় সে ছিল থাকোমণির উপপতি, তবু এখন সে থাকোমণিকে দিদি বলে সম্বোধন করে। প্রথম দিন যে আচমকা থাকোমণির ঘরে ঢুকে তার ওপর বলাৎকার করতে এসেছিল, সেই নকুড় এখন থাকোমণির ঘরে ঢোকার আগে বিনীত কণ্ঠে অনুমতি নেয়।

থাকোমনি বলে, না। ঘুমুইনি, আয় ভিতরে আয়।

এই ভৃত্য মহলে নকুড়ের মতন শয়তান আর দুটি নেই। চুরির নেশায় সে এমনই পাগল যে পিঁপড়ের পেট টিপে মধু বার করতেও সে ছাড়ে না। কয়েক বছর অন্তর অন্তর নকুড়ের বউ মরে। আবার সে গাঁয়ে গিয়ে একটি করে বিয়ে করে আসে। এবং অন্যান্য ভৃত্যদের মতনই, দেশের বাড়িতে একটি বউ থাকলেও এখানেও সে একজন সঙ্গিনী রাখে। গ্রামের বাড়িতে যাবার জন্য তো বছরে ছুটি মেলে একবার, তাও বেশী দিন থাকা চলে না, পয়সার টানে নিজেরাই তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। নকুড় আবার ঘন ঘন সঙ্গিনী বদলায়। যথেষ্ট বয়েস হলেও তার শরীরটি এখনো অসুরের মতন এবং সারা দিন ধরে সে এত রকম কাজ করতে পারে যে তার স্বভাবের যতই দোষ থাকুক, প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো কাজে নকুড়কে প্রয়োজন হয়।

নকুড়ের সঙ্গে থাকোমণির শারীরিক সম্পর্ক নেই অনেকদিনই। নকুড় এখন মঙ্গলা নাম্নী এক দাসীকে নিয়ে খুব মেতে উঠেছে। তা থাক, সেজন্য থাকোমণির কোনো খেদ নেই। নকুড় এখন তার সেবা-দাস।

ঘরে ঢুকে নকুড় দেয়ালের এক কুলুঙ্গি থেকে একটা বটুয়া বার করে মেঝের ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে। থাকোমণি বসে থাকে তক্তাপোশের ওপরে। বটুয়াটা খুলে কল্কে বার করে গাঁজা সাজতে শুরু করে নকুড়। সারা দিনের পর এই সময়টার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে থাকোমণি। এই নকুড়ই তাকে এক সময় গাঁজার নেশা ধরিয়েছে। এখন কয়েক ছিলিম গাঁজা না টানলে থাকোমণির ঘুমই আসে না রাত্রে। থাকোমণি নিজে যে গাঁজা সাজতে জানে না তা নয়, তবু অন্য কেউ সেজে দিলে ভালো লাগে। কিছুদিন হলো নকুড় আবার নিজেই গায়ে পড়ে এসে এই ভার নিয়েছে।

নকুড় ছিলিম সেজে ফুঁ দিতে দিতে ডান হাতের কনুই বাঁ হাত দিয়ে ছুঁয়ে সেটি এগিয়ে দেয় থাকোমণির দিকে। তার একদা-শিষ্যা থাকোমণিকেই সে প্রথম টানটি লাগাবার সম্মান দেয়। থাকোমণি দু হাতে কল্কেটি ধরে প্রথমে কপালে ঠেকায়, তারপর শিবনেত্র হয়ে টানতে শুরু করে। পট পট করে বীজ ফাটার শব্দ হয়, অনেকখানি ধোঁয়া বুকে টেনে দম বন্ধ করে থেকে কল্কেটা সে ফিরিয়ে দেয় নকুড়কে। তারপর এইভাবে কল্কেটি হাতবদলাবদলি হতে থাকে। ছিলিম শেষ হলে নকুড় আবার সাজতে বসে।

নকুড়ের চেয়ে থাকোমণিই আগে বুঁদ হয়। চোখ বুজে থেকে সে একটু একটু মাথা দোলাতে থাকে। নকুড়ের এর পরও অন্যত্র বহু কাজ আছে। সে একটু পরেই উঠে যাবে, তার আগে থাকোমণিকে খুশী করবার জন্য বললো, থাকোদিদি, তোমার হাঁটুতে আজ বেদনা আছে? তারপরই সে হাত বাড়িয়ে থাকোমণির পদসেবা শুরু করে। থাকোমণি চোখ মেলে ঘোর-লাগা দৃষ্টিতে নকুড়ের দিকে চেয়ে থাকে, কোনো কথা বলে না।

ঠিক সেই সময়টিতে কোনো রাজ-রাজেন্দ্রাণীর সঙ্গে থাকোমণির কিছু তফাত থাকে না। বস্তুত উপরতলা ও নিচতলায় অনেক কিছু একই ভাবে চলে। অনেক কাহিনী-কিসসায় পড়া যায় যে কোনো স্বেচ্ছাচারিণী রানী প্রতি রাতে এক একজন প্রেমিক পুরুষকে অন্দরমহলে নিয়ে আসতেন। এই ভৃত্য-তন্ত্রে থাকোমণি এখনো সম্রাজ্ঞী, সেও কি তা পারে না? এই তো নকুড়ের মতন একজন সা-জোয়ান তার পা টিপছে। এই নকুড় এক সময় তাকে অসহায় অবলা পেয়ে মাটির পুতুলের মতন ভাঙচুর করতে চেয়েছিল।

একটু পরেই এক পা তুলে নকুড়ের বুকে একটা ঠোক্কর মেরে থাকোমণি বলে, যাঃ, এবার তুই যাঃ।

নিতান্ত বাধ্যের মতন নকুড় উঠে পড়ে এবং যাবার সময় দরজাটি টেনে দিয়ে যায়। দিনের পর দিন থাকোমণি চুরির পয়সার বখরা চায় না, তার বদলে একটা করে পায়ের ঠোক্কর তো সে দিতেই পারে।

নকুড় চলে গেলে থাকোমণি ক্রন্দন শুরু করে, ক্রমশ তার কান্না বাড়তে থাকে। গাঁজার ধোঁয়ার মতন

এই কান্নাও তার ঘুমের ঔষধ, চোখের জলে বালিশ ভিজিয়ে থাকোমণি ঘুমিয়ে থাকে।

দিবাকর এখনো সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেনি থাকোমণিকে। শরীরে আর জোর নেই দিবাকরের, তবু এখনো সে নিচের মহলের প্রভু। বাড়ির কর্তাদের কোনো নজর নেই বলে দিবাকরের ক্ষমতা এখন অনেক বেশী। একা আর বেশীদিন সামাল দিতে পারবে না বলে সে গ্রাম থেকে তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আনিয়েছে। ছেলেটির নাম পঞ্চানন, অপুত্রক দিবাকরের এই পঞ্চাননই উত্তরাধিকারী। ছেলেটি মাথায় টেরি কাটে, সন্ধে হলেই উড়ুনি গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। গ্রামে দিবাকরের যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি, সেইজন্য ছেলেটির স্বভাব হয়েছে বাবু ধরনের। একদিন নবীনকুমার বাড়ি থেকে নির্গত হচ্ছে, সেই সময় পঞ্চানন তার সামনে পড়ে গিয়েও কোমর বাঁকিয়ে নিচু হয়ে হাত জোড় করে থাকেনি। ছোটবাবু অবশ্য লক্ষ্যই করেনি কিন্তু দূর থেকে দিবাকর দেখতে পেয়ে পঞ্চাননকে কান ধরে হিড় হিড় করে ভেতরে টেনে এনে খড়ম পেটা করে কপাল ফাটিয়ে দিল। যে-কোনো উপায়েই হোক, দিবাকর তার এই ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে মানুষ করবেই!

দিবাকর থাকোমণিকে হাতে রাখতে চায় বিশেষ উদ্দেশ্যে। এক একদিন সন্ধেবেলা দিবাকর ডেকে পাঠায় থাকোমণিকে। ওরা স্বামী স্ত্রী নয়। তবু যেন ওদের অনেককালের দাম্পত্য সম্পর্ক, এমনভাবে কথা হয় সুখ দুঃখের। বাইরের জগতের একটু আধটু সংবাদ দিবাকরের কাছ থেকেই শুনতে পায় থাকোমণি। গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে তিন চারবার মাত্র থাকোমণি এ বাড়ির বাইরে গেছে।

দিবাকরের কাছ থেকেই থাকোমণি এই অত্যাশ্চর্য খবরটি শুনেছে যে বড়বাবুর নতুন বউমণি গান গায়।

শুনে থাকোমণি চক্ষু কপালে তুলেছিল, বলে কি, একে বিধবা, তার ওপর গান করে নতুন বউ। এ কেমন বংশের মেয়ে?

থাকোমণির অবিশ্বাস দেখে দিবাকর বলেছিল, হ্যাঁ রে, থাকো, আমি নিজের কানে শুনিচি। আদালতে বেলিফ্ এশিচলো, আমি সে কাগচ নিয়ে ওপরে গিচি বড়বাবুকে সই করাতে, হঠাৎ শুনি কত্তামার ঘরে কে গুনগুনোচ্চে! কী অনাচ্ছিষ্টি ভেবে দ্যাক, কত্তামা আমাদের সতী সাবিত্তির, তেনার ঘরে ঐ অজাত-কুজাতের মেয়েকে ঢোকালেন বড়বাবু!

গঙ্গানারায়ণ বিধবা বিবাহ করায় এ বাড়ির দুজন রসুই ঠাকুর চাকরি ছেড়ে চলে গেছে পাপের ভয়ে।

বধূবরণের সময় কুসুমকুমারীকে দেখেছে থাকোমণি। নতুন বধূর রূপ দেখবে কী, বিধবার কপালে সিঁদুর, এটা ভেবে সেদিকে তাকাতেই ভয় করছিল তার। সবাই যখন উলুধ্বনি দিচ্ছিল, থাকোমণির জিহ্বা নড়েনি।

—এবার কোন্‌দিন দেখবি হিজড়ে মাগীদের মতন বাবুদের বউ ধেই ধেই করে নেত্য কচ্চে।

—অমন কতা বলোনি গো, অমন কতা বলোনি! বাবুদের অমঙ্গল হলে যে আমাদেরও অমঙ্গল।

—তোকে আমি বলে রাকচি, থাকো, মিলিয়ে নিস, এ বাড়ি থেকে মা লক্ষ্মী বিদেয় নিয়েচেন! এত বড় বংশ এবার ছাগলে মুড়োবে। ছোটবাবু যেমন দুহাতে ট্যাকা খর্চা কচ্চেন তাতে কোন্‌দিন না দেউলে হতে হয়। আমার চে তো কেউ বেশী জানে না! মাতার ওপর তো দ্যাকার কেউ নেই—

—ও বাড়ির বড়বাবু আর আসেন না।

—তেনার ভীমরতি হয়েচে, তিনি আর কী কর্বেন!

কথায় কথায় দিবাকর আসল কথাটা পাড়ে। পঞ্চাননকে থাকোমণি নিজের ছেলের মতন দেখে, তাকে শিখিয়ে পড়ে মানুষ করে নেয়। দিবাকর চোখ বুজলে তো পঞ্চাননকেই গোমস্তাগিরি করতে হবে। সুতরাং থাকোমণির সঙ্গে পঞ্চাননের মিল না হলে নিচের মহলের রাজ্যপাট ঠিক ঠাক চলবে না!

থাকোমণি পোড় খেয়ে অনেক কিছু শিখেছে, সে দিবাকরের আসল মতলবটি ঠিকই বোঝে। দিবাকর চিরকালই স্ত্রীলোকদের সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করে, শয্যাসঙ্গিনীদেরও সে একটিও নরম কথা বলে না। অথচ ইদানীং থাকোমণির সঙ্গে তার ব্যবহার একেবারে মধুমাখা। এমনকি নিজের পানের ডিবে থাকোমণির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে বলে, নে থাকো, একখিলি পান খা!

দিবাকর থাকোমণিকে তার ছেলের বিপক্ষে দাঁড় করাতে চায়। দিবাকর জেনে গেছে যে দুলাল তার মাকে একটুও ভক্তিশ্রদ্ধা করে না। ছোটবাবুর পেয়ারের লোক দুলাল এখন সময় সময় দিবাকরের ওপরেও চোখ রাঙায়। সেই জন্যই দুলালের বিরুদ্ধে একটা জোট বাঁধা দরকার, তাতে থাকোমণিকেও দলে টানতে হবে। থাকোমণির যে এতবড় অসুখ গেল, দুলাল একদিনের জন্যও তার মায়ের চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করেনি। সুতরাং অমন ছেলেকে আর থাকোমণির দরকার কী?

থাকোমনির সত্যিকারের দুঃখের জায়গায় ঘা দেয় দিবাকর। সে ভেতরে ভেতরে পুড়তে থেকেও বলে হ্যাঁ, পাঁচু তো আমার ছেলেরই মতন। একটু ভবিষ্যিবার জ্ঞান কম, তা বয়েসকালে শুধ্‌রে যাবে। আমি বলি কি, পাঁচুর বে দাও, তার বউ এসে এখেনে থাকুক।

একটা নয়, ইতিমধ্যে দু-দুবার বিবাহ হয়ে গেছে পঞ্চাননের। কোনো স্ত্রী-ই বাঁচেনি। আবার বিয়ে তো দিতে হবেই দেখে শুনে, তার অগে ছেলেটা খাটুটে খেতে শিখুক।

—পাঁচুর বউ এলে তখন তাকে আমি জলচৌকি ছেড়ে দেবো। ঐ মানদা হারামজাদীকে কোনোদিন দোবো না!

দিবাকর এমন মুখ করে থাকে যেন মানদাকে সে চেনেই না। অথচ থাকোমণির অসুখের সময় মানদা যে জলচৌকিতে গ্যাঁট হয়ে বসেছিল, সে কি দিবাকরের অনুমতি ছাড়াই? দিবাকরের শয্যায় হয়তো এখনো মানদার শরীরের গন্ধ লেগে আছে। থাকোমণি সব জানে। দিবাকর যতই চতুর হোক, সে এটুকু বোঝে না যে মা কখনো তার সন্তানের বিরুদ্ধে যায় না।

থাকোমণির খুব বাসনা ছিল যে দুলালের পত্নী সুবালাকে ক্রমে ক্রমে সব হিসেবপত্র বুঝিয়ে দিয়ে একদিন তাকেই নিজের জায়গায় বসাবে। কিন্তু তা হলো না। সুবালা নিজে যেমন দেমাকী, দুলালও হয়েছে সেরকম। দুলাল তার মাকে ধমকে বলেছিল, তার বউ ভদ্দরলোকের বাড়ির মেয়ে, সে কখনো দাসী-বাঁদীগিরি করতে যাবে না। ছুতোর মিস্তিরির মেয়ে হলো ভদ্দরলোক আর দুলালের নিজের মা দাসী!

দুলাল এখন প্রাণপণে ভদ্রলোক হবার চেষ্টা করছে। বাগানের মধ্যে একখানি একটেরে ঘরে সে তার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে থাকে। সে বা সুবালা ভুলেও কখনো দাসদাসী মহলে পা দেয় না। তাদের জন্য খাবার পাঠাতে হয়। দুলাল ঘরের মধ্যেও জামা পরে থাকে, জুতো পায় দেয় এবং হুঁকোয় তামাক খায়। নিজে সে বই পড়ে এবং বউ ও ছেলেকে পড়তে শেখায়। এমনকি দুলাল নিজের জন্য একটি চাকর পর্যন্ত রেখেছে!

থাকোমণি দেখা করতে গেলে দুলাল বা সুবালা বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলে, একবারও ভেতরে গিয়ে বসতে বলে না। নাতিকে নিয়ে সোহাগ করা আর থাকোমণির এ জন্মে হলো না। নাতি তাকে চিনলোই না ভালো করে। কেন যে মায়ের ওপর দুলালের এত রাগ তা থাকোমণি বুঝেও বুঝতে চায় না। সেটাও বুঝলে তার জীবনের আর বাকি রইলো কী!

একদিন দুলাল তা অতি নির্দয়ভাবে বুঝিয়ে দিল।

থাকোমণির একটাই শুধু সুখ স্বপ্ন আছে। কোনো জমি কিনে ঘর তুলবে, পুকুর কাটাবে, ধান চাষ করবে। দাসীবৃত্তি ছেড়ে সে আবার চাষীর বাড়ির গৃহিণী হবে। সেরকম পয়সা তো তার রয়েছেই, কিন্তু একা তো যাওয়া যায় না, ছেলে-বউকে সঙ্গে নিয়ে না যেতে পারলে সুখ কোথায়? কিন্তু দুলাল এ প্রস্তাব কিছুতেই কানে তোলে না। তবু সে যতই বকুনি ঝকুনি দিক থাকোমণি প্রায়ই এই কথাটা বলে।

একরাত্রে থাকোমণির মাথায় এই স্বপ্নটা আবার বেশী চাগিয়ে উঠলো। গাঁজায় একটু দম দিলেই তার না-কেনা জমি, না-কাটা পুকুর, না-তৈরি বাড়ির চমৎকার ছবি ফুটে ওঠে মানস নেত্রে। সেই জন্যই সে কাঁদে। সে রাত্রে থাকোমণি আর থাকতে পারলো না একলা ঘরে। নকুড় ছুটি নিয়ে দেশে গেছে, দিবাকরের ঘরের দ্বার বন্ধ, শুনশান করছে নিচের মহল। একা একা গাঁজা টেনে থাকো মণির বেশী ঘোর লেগে গেল, সে বাইরে এসে বাগানের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে ধাক্কা মারতে লাগলো দুলালদের দরজায়। ঘুম ভেঙে উঠে দুলাল দরজা খুলতেই থাকোমণি তার হাত ধরে নেশায়জড়িত কণ্ঠে আন্তরিকতম কাকুতি মিনতি করে বললো, অ দুলে, চ না, আমরা গাঁয়ে যাই, সেখেনে মায়ে পুতে সুখে থাকবো, তোর বউকে আমি মাতায় করে রাখবো, অ দুলে, চ না যাই! এক্ষুনি চলে যাই—।

দাঁতে দাঁত চেপে হিংস্র কণ্ঠে দুলাল বললো, বেবুশ্যে মাগী, এত রাতে এয়েচিস ঢলানী কত্তে, এতটুকু হায়া নেই কো, তোর মুখ দেখলে পাপ হয়! ফের যদি কোনদিন—

বলতে বলতেই মাতৃবক্ষে সজোরে পদাঘাত করলো দুলালচন্দ্র। বিস্ফারিত নেত্রে থাকোমণি, ধরাশায়ী হতেই সশব্দে দোর বন্ধ করে দিল তার পুত্র।

পরদিন ভোর থেকে থাকোমণিকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। তাড়া খাওয়া বন্য পশুর মতন ছুটতে ছুটতে থাকোমনি একসময় গঙ্গা পেয়ে গেল। ভোরের প্রথম খেয়ায় গঙ্গা পার হয়ে ওপারের মানুষদের জনে জনে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, ওগো, ভিনকুড়ি গাঁ কোতায় বলতে পারো? আমি সেখেনে যাবো, ওগো তোমরা আমায় পথ বলে দাও—। দু চারজন তাকে সহায্য করার চেষ্টায় জানতে চায় কোন জেলা, কোন পরগনা, কোন মৌজা, কিন্তু থাকোমনি সে সব কিছুই জানে না। ধানকুড়ি আর ভিনকুড়ি পাশাপাশি এই দুটি গ্রামের নাম ছাড়া তার আর কিছুই মনে নেই। কিন্তু শুধু গ্রামের নাম শুনে পথ বা দিকের সন্ধান দিতে পারে না কেউই। তবু থাকোমণি অন্ধের মতন ছুটতে থাকে। সে তার স্বামী শ্বশুরের ভিটেয় ফিরে যেতে চায়। সেখানে পৌঁছোতে পারুক বা না পারুক, সে আর পিছন পানে চাইবে না। (ক্রমশ)

## অরণ্যদেব

টাগামা-দিদি! গুরন! মেয়ের নাম খুঁজে পাওয়া গেছে!
নামটা কী?

??
তা তো জানি না!

নাম তাহলে ঠিক হয়েছে?
হ্যাঁ!
কী নাম ওয়াকার-কাকা?*
আমিও জানি না!
* অরণ্যদেবকে রাজা ওয়াকার-কাকা বলে...

বংশলতিকার মধ্যে চমৎকার সব নাম রয়েছে। ঠিক করলুম, তারই একটা বেছে নেব।
৭/৩০

পূর্ব ইতিহাস!
প্রথম অরণ্যদেবের স্ত্রী ছিলেন জলদস্যু এরিকের মেয়ে। নাম ছিল ক্রিস্টিনা.....

দ্বিতীয় অরণ্যদেবের স্ত্রী কলম্বাসের পৌত্রী। নাম মারাবেলা.....
তৃতীয় অরণ্যদেবের স্ত্রী শেকস্‌পীয়রের ভাগ্নী।
রোজা.....

...ষষ্ঠ অরণ্যদেবের স্ত্রী নাটালা ছিলেন নাভারে রাজ্যের রানী.....

আমার পছন্দ হেলয়েজ!
সেই ডাইনী?
সে কী?
ক্রমশঃ

(ষাট)

সাতসকালে কে যেন 'শ্রীনাথবাবু! শ্রীনাথবাবু!' বলে ডাকাডাকি লাগিয়েছে। এ সময়টায় শ্রীনাথের ভারী একটা আয়েজের ঘুম হয়। আধোঘুম আর আধো-জাগরণের মধ্যে সে ভারী একটা আয়েসী ব্যাপার। বিরক্ত হয়ে উঠে দরজা খুলে দেখে, প্রেসের আর এক প্রুফরিডার মানিক গুপ্ত। বহুকাল দেখা নেই।

কিরে? কী ব্যাপার? আয়, ভিতরে এসে বোস।

জিব কেটে মানিক বলে, বসব কি? স্বয়ং বদুবাবু বাইরে গাড়িতে বসে আছেন। ঘরদোর একটু সামলে নিন: আপনার খবর করতে এসেছেন।

বলিস কি? বদুবাবু! বলে শ্রীনাথ ভারী ব্যস্ত হয়ে লোকজন ডাকাডাকি করতে লাগল।

হাঁকডাকে বৃন্দা আর নতুন আর একটা কাজের লোক দৌড়ে এসে ঘরদোর সারতে লাগে। শ্রীনাথ কোনোক্রমে মুখ ধুয়ে কাপড় পাল্টে নেয়। তারপর ফটকের বাইরে দাঁড় করানো পুরোনো প্রকাণ্ড হাডসন গাড়িটার কাছে এগিয়ে যায়।

আজ্ঞে, আপনি আসবেন ভাবতেই পারিনি।

বদুবাবুর বয়স শ্রীনাথের মতোই হবে। ফর্সা, গোলগাল বনেদী চেহারা। বাবা কষ্ট করে কারবার তৈরি করেছিল। এবাও ব্যবসা জানে। প্রেস ছাড়াও অন্যান্য কারবার আছে। প্রচুর পয়সা।

বদুবাবুর পরনে পাঞ্জাবি আর ধুতি। কাঁধে শাল। মুখটা ব্যক্তিত্বময়, গম্ভীর। একটু হেসে বলে, আপনি সেই যে অসুখের খবর দিলেন তারপর আর দেখা নেই। বাবার আমলের লোক, কী হল কী হল ভাবতে ভাবতে চলে এলাম।

আসুন, আসুন, বড় ভাগ্য।

বদুবাবুর সঙ্গে মানিক আর ড্রাইভার ছাড়াও বাড়ির চাকর এসেছে। সে একটা মাঝারি ঝুড়ি নামাল সামনের সীট থেকে। ফলটল আছে, অনুমান করে শ্রীনাথ।

ভাবনঘর অল্প সময়ের মধ্যেই ফিটফাট হয়ে গেছে। এমন কি, টেবিলে ফ্লাওয়ার ভাসে টাটকা ফুলও হাজির।

বদুবাবু চেয়ারে বসে বললেন, কী হয়েছিল বলুন তো!

স্ট্রোক মতো।

এখন কেমন আছেন?

এখন ভালই।

চেহারা কিছু খারাপ দেখাচ্ছে না।

শ্রীনাথ একটু হেঁ হেঁ করল।

বদুবাবুর হাতে হীরের আংটি। মুক্তোর আংটি, পান্নার আংটি। গলায় সোনার চেনে গৃহবিগ্রহের লকেট। মৃদু একটু সুবাস ছড়াচ্ছে গা থেকে। শ্রীনাথ বিগলিত হৃদয়ে অবাক চোখে কেবল দেখল আর দেখল। স্বয়ং বদুবাবু তার বাড়িতে! বিশ্বাস হওয়ার কথা?

বদুবাবু বলে, শরীর যখন তেমন কিছু খারাপ নয় তখন কাল থেকে প্রেসে আসতে থাকুন না কেন। কাজ টাজ তেমন কিছু করতে হবে না। সুপারভাইজ করবেন একটু।

ঘাড় চুলকে শ্রীনাথ বলে, শরীরের জন্য নয়। মনটাই কেমন হয়ে গেছে। দূরে যেতে ভয় ভয় করে।

বদুবাবু উদাস মুখে বলে, ভয় তো আমারও। বাবা মরে যাওয়ার পর থেকেই কেমন একটা মরনের ভয় এসে ধরেছে। কেবল ভয় পাই, এই বুঝি কে কোথায় মরে গেল, আর বুঝি তার সঙ্গে ইহজন্মে পরজন্মে আর দেখা হল না। মনটা খুব দুর্বল হয়ে আছে সেই থেকে। গত দুদিন কেবল আপনার কথাই মনে হচ্ছে, শ্রীনাথবাবু বেঁচে আছেন তো! তাই আজ ছুটে এসেছি।

দেখি একটু ভেবে।

ভাববার কিছু নেই। আপনার এখনো পঞ্চাশ পেরোয়নি, বুড়োও হননি। এই বয়সে অত ঘাবড়াবার কী আছে?! চলে আসুন, বাদবাকি যে কদিন বাঁচি সবাই মিলেমিশে থাকি।

শ্রীনাথ একথায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

তৃষা খবর পেয়ে ভিতর বাড়ি থেকে প্রচুর খাবার আর চা পাঠিয়েছে। বদুবাবু বসে বসে অনেকটা খেল। চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, এ জায়গাটা বেশ ভাল।

বদুবাবু উঠল। শ্রীনাথ গাড়িতে তুলে দিয়ে এল তাকে। তারপর ঘরে এসে ভাবতে বসল। এখান থেকে কলকাতা আগে হাতের নাগালে মনে হত। আজকাল মনে হয়, কলকাতা বুঝি সাত সমুদ্দুরের পার। কি করে অতদূরে রোজ যাবে শ্রীনাথ?

*

বউদিমণি নোটিশ দিয়েছে, এ বাড়িতে আর থাকা চলবে না। নিতাই বাজারের দিকে বস্তিতে সস্তায় একখানা ঘর পেয়ে গেছে। তার নিজের এলেমে নয়। বউ পাঁচ বাড়ি ঠিকে ঝিয়ের কাজ করবে। তার রোজগারেই এই ঘর নেওয়া।

আজ নিতাই সকালে উঠেই ঝোপড়াটা ভাঙছিল। একটু আগে তার তল্পিতল্পা মাথায় করে বউ বস্তিতে রওনা হয়ে গেছে। ফাঁকা নড়বড়ে ঘরখানা ভাঙতে তেমন কষ্ট নেই। তবে চালের ওপর একটা সতেজ লাউডগা। সেটার জনাই যা কষ্ট। কুসি কুসি লাউ ফলেছে মেলা।

বাঁশের খুঁটিগুলোর গোড়া নড়বড়ে, বেড়ার বাঁধন পচে গেছে কবে। চালে খড় পচে গোবর। পোকামাকড় বিস্তর বাসা করেছিল। নিতাইয়ের সঙ্গে সেগুলোরও আশ্রয় গেল।

লাউডগা সমেত চালের খড়গুলো নামিয়ে নিতাই ঘাম মোছে। গাছটা যদি বাঁচে এই আশায় বাঁশ বাখারি দিয়ে চটপট একটা মাচান খাড়া করতে লেগে যায় সে। মংলু এসে তাড়া দেয়, হল তোর? একটু বাদেই ভুঁইমালী এসে এ জায়গা চৌরস করবে। হাত চালা।

দাঁড়া তো। মাচানটা বেঁধে দিই আগে।

তোর ঐ লাউগাছ থাকবে ভেবেছিস? মালী এসে একটানে উপড়ে ফেলে দেবে। খামোখ খাটছিস।

কথাটা সত্যি। নিতাই দম ধরতে একটু জিরোয়। বলে, বিড়িটিড়ি কিছু আছে? দে না।

তা দেয় মংলু। লোকটা চলে যাচ্ছে। বিড়ি ধরিয়ে দিয়ে বলে, বিয়ে করলি বলে জায়গাটা গেল তোর। দিব্যি ছিলি।

ভৈরবী ছাড়া সাধনভজন হয়, শুনেছিস?

মংলু সঠিক বিশ্বাস করে না নিতাইকে। আবার পুরোপুরি অবিশ্বাস করতেও ভয় পায়। ব্যাটার বাগে কাজ হয় না ঠিকই। আবার যদি এক আধটা লেগে যায়! তাই সে নিতাইয়ের মুখের ওপর তেমন ঠাট্টাইয়ার্কি করে না। তারও বালবাচ্চা আছে। মংলু বলে, সামন্তর বেটি আবার ভৈরবী হল কবে থেকে?

ভৈরবী কি পেট থেকে পড়ে রে ব্যাটা? বানিয়ে নিতে হয়।

কবে আর বানাবি বাপ? নিজেই জটা কেটে দাড়ি কামিয়ে ভদ্রলোক বনে গেলি।

নিতাই বিড়িতে লম্বা টান মারে। নিমীলিত চোখে লাউগাছটার দিকে চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ। বলে, পটাশপুরে এক মহান্ত এসেছে। কপাল থেকে জ্যোতি বেরোয়। সেই জ্যোতিতে হোমের আগুন জ্বালে। বিদ্যেটা শিখে আসতে হবে।

তোরও তো অনেক বিদ্যে শুনি।

দূর! এখনো কত শেখার আছে। বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, বউদিমণি তাহলে এখানে ক্ষেত করবে!

তাই তো বলল ভুঁইমালীকে।

ক্ষেত জ্বলে যাবে।

মংলু অবাক হয়ে বলে, কি করে জানলি?

এখানে পঞ্চমুণ্ডির আসন ছিল রে ব্যাটা। বহুত ইলেকট্রিসিটি জমে আছে এখানে। গাছ কি বাঁচে?

তবে লাউগাছটা বাঁচল কি করে?

সে আমি ছিলাম বলে। আমি না থাকলে ভূতেরা তিনধা নাচন নাচতে লাগবে। দেখিস, বলে দিলাম।

মংলু একটু হাসে। অনিশ্চয়তার হাসি।

নিতাই বিড়িটা শেষ করে অন্যদিকে চেয়ে বলে, বাবু জানে?

তা কে বলবে?

বাবু জানতে পারলে রাগ করবে। আমাকে বাবু বড় ভাল চোখে দেখে।

মংলু উদাস মুখে বলে, বাবু রাগ করলেই বা কি? মা যখন বলেছে তখন সেইটেই হাকিমের আইন।

বড়দিদির বিয়েটা পর্যন্ত থাকতে পারলে বেশ হত। বউদিমণি বলেছিল আমাকে ফাইফরমাস খাটতে এলাহাবাদ নিয়ে যাবে। ভেবেছিলাম, এলাহাবাদ থেকে হিমালয়টা কাছে হয়, একবার ঘুরে আসবো। অঘোরীবাবার চরণ দুখানাও দর্শন হয়ে যাবে।

অঘোরীবাবা কে রে?

নাম শুনিসনি? তিন হাজার বছর এক ঠাঁই বসে সাধনা করে যাচ্ছে। গায়ে পট পট করছে পোকা। জটা মাইলখানেক লম্বা।

বলিস কি?

শুধু কি তাই! সাপের মতো খোলস একশো বছর পর পর। হিমালয়ে অঘো ঠিকানাটা আমাকে এক সাধু লিখে দিয়ে

মংলু সান্ত্বনা দিয়ে বলে, তা য

তাতে কি?

মুখখানা বেজার করে নিতাই বলে, আর তো যেতে বলছে না।

বলবে, বিয়ের দেরী আছে। সেই ফালগুনে।

ফালগুনের আর দেরী কি?

এলাহাবাদটা কোন্‌দিকে বল তো!

হিমালয়ের গোড়ায়। সেখানকার জল হাওয়া খুব ভাল শুনেছি। মেলা সাধু আসে।

মংলু ওঠে। বলে, ঘর ভাঙা হয়ে গেলে ডাকিস। বাঁশবাখারিগুলো বাগানের উত্তর দিকে তলার নিচে জমা করে যাস।

তোকে ভাবতে হবে না। যা।

লাউডগাটা ভুঁইমালী এসে উপড়ে ফেলবে। তবু নিতাই সেটাকে ফেলে যেতে পারছে না। আবার উঠে মাচানটা বাঁধতে লেগে যায়। মালীটা মহা খোঁচড় লোক। কিছু বলতে গেলেই খেঁকিয়ে ওঠে। লাউডগাটার কথা তাকে সাহস করে বলবে কি-না ভেবে পায় না নিতাই। বিড়ির একটু তামাক জিব দিয়ে থুঃ করে ফেলে নিতাই আপনমনে বলে, দূর ক্ষ্যাপা! দুনিয়াটাই তো তোর নিজের। এ জায়গা ও জায়গা বাছিস কেন? সব সমান। বাজারের বস্তিও তা, চাটুজ্জেবাড়ির বাগানও তা।

ঝোপড়া ভেঙে জিনিসপত্র চালার নিচে সরিয়ে রেখে নিতাই মস্ত বকুল গাছটার তলায় বসে জিরোচ্ছিল। হঠাৎ মনে হল, যাওয়ার কথাটা বাবুকে জানানো দরকার।

যেই ভাবা সেই গিয়ে ভাবনঘরে উঁকি মারে নিতাই।

ইজিচেয়ারে বসে ইংরিজি একটা খবরের কাগজ কোলে নিয়ে পেনসিল দিয়ে কী যেন কাটাকুটি করছে বাবু। খবরের কাগজের পিছনে একটা সুন্দর-মতো মেয়েছেলের ছবি।

বাবু!

উঁ! শ্রীনাথ কাগজ নামিয়ে বলে, নিতাই নাকি?

আজ্ঞে। একটা কথা বলতে এলাম।

আমিও তোর কথাই ভাবছি। ভিতরে আয়।

নিতাই ভিতরে ঢুকে মেঝের ওপর বসে।

আমার তো ঝাটিপাটি ওঠাতে হল এখান থেকে।

কথাটা না বুঝে শ্রীনাথ বলে, কি বলছিস?

আজ্ঞে চলে যেতে হচ্ছে।

কোথায়?

বস্তিতে ঘর নিয়েছি।

সে কি! আমার যে তোকে ভীষণ দরকার। কাল থেকে প্রেসের চাকরিতে যাবো। তুই রোজ আমার সঙ্গে গিয়ে সারাদিন থাকবি, আবার আমার সঙ্গেই ফিরে আসবি।

ঠিক এই সময়ে লাউগাছটার কথা মনে পড়ায় বড় হু-হু করে উঠল বুক। নিতাই ভ্যাক করে কেঁদে ফেলে।

কাঁদছিস কেন?

বউদিমণি তাড়িয়ে দিলেন যে!

তাড়ায় কেন?

বিয়ে করেছি বলে।

বিয়ে করেছিস? কই, বলিসনি তো!

আজ্ঞে লুকিয়ে চুরিয়ে করেছি। বউদিমণির ভয়ে।

শ্রীনাথ বহুকাল বাদে একটু সত্যিকারের হাসি হাসল, বিয়ে করে বেশ করেছিস। আর একবারও তো করেছিলি। এবারকার বউটা কেমন?

খুব ভাল। অমন মেয়ে হয় না।

ভাল হলেই ভাল। কিন্তু বিয়ে করলি বলেই বউদি তাড়িয়ে দিচ্ছে, এ কেমন কথা?

আজ্ঞে সবাই বলছে বুড়ো বয়সে কচি মেয়ের সর্বনাশ করেছি।

বউটা খুব বাচ্চা নাকি?

বাচ্চা নয়, ডাঁটো মেয়ে।

তোর বয়স কত?

কত আর হবে! ঠিক বুঝতে পারছি না।

সে যাই হোক, কাল থেকে আমার সঙ্গে রোজ কলকাতায় টানা মারতে হবে, কথাটা মনে রাখিস। বরং আজই গিয়ে স্টেশন থেকে একটা মানথলি করে আয়। টাকা দিচ্ছি।

সে যাব। কিন্তু বউদিকে কথাটা একটু বলে রাখবেন বাবু। নইলে যা চটে আছে আমার ওপর।

তোকে বস্তিতে যেতে হবে না। ঝোপড়াতেই থাক। আমি তোর বউদিকে বলে দিচ্ছি।

ঝোপড়া ভাঙা হয়ে গেছে। মালী সেখানে চাষ দেবে।

শ্রীনাথ অবাক হল। বলল, তুই না দাদার আমলের লোক।

আজ্ঞে। এই বাড়ি ঘর সব আমার চোখের ওপর হয়েছে।

শ্রীনাথ একটু চিন্তিত হয়। একটু ভেবে বলে, ঝোপড়া ভেঙেছিস তো কি আছে। ভাবনঘরের পিছনদিকে ছাড়া জমি আছে। চালাঘরে বিস্তর টিন আর খুঁটি আছে। একটা ঘর বেঁধে নিগে যা।

কিন্তু বউদি?

বউদিকে আমি বলছি।

*

তুষার কথা কোনোদিন ওল্টায় না। যা বলে তাই হয়। কিন্তু আজ যখন গিয়ে শ্রীনাথ তাকে বলল, ক্ষ্যাপা নিতাইটাকে আমার বড় দরকার। কাল থেকে রোজ আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবে। তখন তুষা না করল না।

রঘু স্যাকরা বসেছিল তুষার ঘরে। তাকে বিয়ের গয়নার বরাত দিচ্ছিল তুষা। শ্রীনাথের কথা মন দিয়ে শুনে বলল, ঠিক আছে, ওকে নতুন করে ঘর তুলে নিতে বলো গে। ক্রমশ

# স্মৃতি সততই সুখের

## প্রতিভা বসু

॥ ২২ ॥

ঐ র‍্যাটল স্নেকের কথা বলেই ভদ্রলোক আমার অনভিজ্ঞ মনের মাটিতে ভয়ের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। মিথ্যা অরণ্য আমার কাছে সত্য অরণ্যে পরিণত হয়েছিলো। মিথ্যা ভয় আমাকে সত্যের আকৃতিতে গ্রাস করেছিলো। মিথ্যাকে সত্য ভাবার খোলসই এমন সুন্দর একটা দ্বীপকে সম্পূর্ণ মাটি করে দিয়েছে। আমার ভিতরে যদি কোনো স্বাভাবিক যুক্তি-বুদ্ধি কাজ করতো তা হলে স্বভাবতই ধরে নিতাম প্রত্যহ যেখানে এতো লোক প্রমোদভ্রমণে আসেন সেখানে এরকম কোনো বিপদ থাকতেই পারে না। নিশ্চয়ই সবই মায়া। মেকী। সবই সাজানো। লক্ষ করলেই দেখতে পেতাম বোটটি একেবারেই স্বয়ংচালিত নয়। আরোহীর স্বারাই নিয়ন্ত্রিত। উনি যে আসনে বসে আছেন তার পিছনেই একটি রঙিন বোর্ড মিশে আছে নৌকোর রং-এর সঙ্গে। সেই বোর্ডে ছোটো ছোটো ভুট্টাদানার মতো অনেক সুইচ। এক-একটার পাশে এক-একরকম কথা লেখা। যেমন : স্পীড, হাইস্পীড, স্লো, সিমার, ফায়ার, হিড্‌ন রক, ব্ল্যাক আউট, হ্যারিকেন ইত্যাদি।

আসলে এইসব বিহারে এখানকার স্ত্রী-পুরুষেরা রঙিন হৃদয় নিয়েই এই ভয়-ভয় খেলাটা খেলতে আসে। মেয়েরা কৃত্রিম ভয়ে জড়িয়ে ধরে পুরুষটিকে, পুরুষটিও পরম বীরের মতো তার সবল বাহু দিয়ে সবল বক্ষে ধারণ করে তাকে রক্ষা করে। এবং সেটাই আসল খেলা। সাহেবদের তুলনায় এই ভালোমানুষ শান্ত-শিষ্ট পুরুষটিও যে হাস্য-পরিহাসে এতোটা সহজ হয়ে উঠেছিলেন, হয়তো সেটাই তার কারণ। জুটি হিসেবে আমার মতো এক আনাড়ী বিদেশিনীকে নির্বাচন করে ভ্রমণের সন্ধেটাই মাটি হলো।

এবার আমাদের নৌকো তীরের দিকে চলে এলো সোজা। আর একজনরা অপেক্ষা করছিলো, আমরা নামলে তারা উঠবে। বুঝতে পারলাম, একটিই নৌকো এখানে। এই নৌকোই যায় আর ফিরে ফিরে আসে। যখন আমরা উঠি তখনো এই নৌকো অল্পবয়সী দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ভেসে এসেছিলো। সুইচ টিপে চুপচাপ বসেছিলো বলে আমি ভেবেছি নিজেই ভেসে ভেসে এলো।

নৌকো থেকে আমাকে হাতে ধরে নামিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'খারাপ লাগলো?'

আমি বললাম, 'না, না, খারাপ লাগবে কেন?'

'আমি বুঝতেই পারিনি এতো ভয় পাবেন।'

'ভয় কিসের? বিদ্যুতের এরকম একটা আশ্চর্য খেলা না দেখলে আমি কল্পনাই করতে পারতাম না।'

'খেলাটা তা হলে বুঝেছেন?'

'তা বুঝিছি।'

'তবে আগে থেকে বুঝলে কিন্তু মজা থাকতো না।'

'হয়তো।'

'ঐজন্যই ভয়টা ভাঙিনি।'

'ঠিকই করেছেন।'

'তাও তো ঝড়টা দেখানো হলো না।'

'কেন দেখালেন না?'

'গুহার অন্ধকারে ঢুকে মনে হলো খেলাটা বুঝেও আপনি যেন অন্য কোনো ভয়ে সহজ হতে পারছেন না। ঐজন্য তাড়াতাড়ি ফিরে আসাই ঠিক করলাম।'

এ কথা শুনে আমি মনে মনে লজ্জিত হলাম। অন্য প্রসঙ্গে এসে বললাম, 'আমরা কাল তাহলে এলসিনোরে যাচ্ছি?'

'নিশ্চয়ই।'

বাইরে আকাশের তলায় এসে হাঁপ ছাড়লাম। দেখলাম বুদ্ধদেব তখনো খুব স্টল থেকে ফেরেননি। সেখানে গিয়েই ধরলাম তাঁকে। পাশেই ভোজনালয়, ভদ্রলোক খাওয়ালেন, যাকে বলে নিমন্ত্রণ। এখানকার মাছ রান্নার খুব নাম, অন্তত সাত-আটরকমের রান্না তো খাওয়ালেনই। বললেন, 'যদি একটা [illegible] নিয়ে যেতে পারতাম, অন্তত পঞ্চাশরকম মাছের রান্না খাওয়াতে পারতাম আপনাদের। এমন আর পৃথিবীতে হয় না।'

[illegible] সেইরকমই আমার ইংলন্ডের একটি ছোটো শহরের কথা মনে পড়ে [illegible] এর কাছে [illegible] শহর থেকে [illegible] দূরে [illegible] ঐ [illegible] আমেরিকাতে [illegible] নতুন এবং আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছিলো [illegible] এই [illegible]

[illegible]

[illegible] কম নয়, চওড়ায়ও কটু অনেক তো হবেই, দুই সারিতে সাজানো সব গামলা গামলা খাবার। তলায় ইলেকট্রিক উনুন ফিট করা, প্রত্যেকটি খাবার থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। সেইসব গরম গরম খাবারের যে কতোরকম চেহারা, কতোরকম নাম, তার শেষ নেই। তবে সেখানে মাছ নয়, মাংসেরই নানারকম প্রিপারেশন। মিষ্টি আছেও আট-দশরকমের, স্যালাড আছে আট-দশ-রকমের, অনেকরকম তরকারিও আছে। একসঙ্গে এতো খাবার এতো ধরনের বাসনে এতো সুন্দর করে থরে থরে সাজানো আছে যে, দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। প্লেট সাজানো আছে দূরে, কাঁটা-চামচে রাখা আছে থোপে, ন্যাপকিন আছে ভাঁজ করা, ঘরে [illegible] রঙিন রঙিন চেয়ার টেবিল পাতা আছে, এসো, যতো খুশি নাও, বসো, যতো খুশি খাও, দাম সব এক। ধরা যাক মাথাপ্রতি পাঁচ ডলার। এই ছিলো বোধ হয় তখন। খাবার পরে দুধ আছে, আইসক্রীম আছে, কফি আছে; সেটাও ঐ দামের মধ্যেই।

ওখানে এক কণা খাবারও কেউ ফেলে না, নষ্ট করে না। বারে বারে এসে নেয়, কিন্তু লোভের বশে রাশিকৃত নিয়ে ক্ষতি করে না। প্রত্যেকের প্লেট পরিষ্কার। সেটা কম কাঁটোয়া নয়।

ভদ্রলোক বলছিলেন, 'কাল তো এলসিনোরে যাচ্ছেন—সেখান থেকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে যাবো, ওখানে হান্স আন্ডারসনের গল্পের সেই ছোট্টো জলকন্যাটির একটি শ্বেতপাথরের মূর্তি গড়ে রাখা আছে জলের মধ্যে, দেখলে আপনাদের খুব ভালো লাগবে। লঞ্চ আছে ছোটো ছোটো, ইচ্ছে করলে সেই দ্বীপটাও নিতে পারেন। তার ধারে ধারেও খুব ভালো ভালো রেস্তোরাঁ আছে। মাছের রেস্তোরাঁ ভারি চমৎকার। আমি আপনাদের ওখানে পৌঁছে দিয়ে চলে যাবো, আপনারা না-হয় ঐ লঞ্চেই বাড়ি ফিরবেন।'

'ফেরা যায়?'

'নিশ্চয়ই। সমুদ্র থেকে ঢুকে যাবে মোহনায়, খাল বেয়েই আপনাদের শহরে পৌঁছে দেবে। ভালো ঘাট আছে, কোনো কষ্ট হবে না। তা হলে আজ ওঠা যাক।'

ঘড়িতে দেখলাম রাত মন্দ হয়নি; প্রায় পৌনে নটা। ফিরে এলাম হোটেলে। ভদ্রলোক বিদায় নিয়ে বললেন, 'তবে ঐ ঠিক রইলো, কাল এলসিনোর।'

এই এলসিনোর বা হেলসিংগরেই দিনেমারদের রাজা হ্যামেটের দুর্গ। এই দুর্গই সেই দুর্গ, যার নাম হ্যামলেটের প্রাসাদ। এই রাজাই সেই রাজা, যিনি ভূত হয়ে তাঁর ছেলের কানে নিজের মৃত্যুর বিবরণ দিয়ে প্রতিশোধ নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

ভদ্রলোক অবশ্য মৃদু হাস্যে বলেছিলেন, 'ঐতিহাসিকদের মতে কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। রাজা হ্যামেট যখন এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন, শেক্‌সপিয়রের বয়েস ছিলো মাত্র দশ। প্রাসাদ নির্মিত হবার আঠারো বছর বাদে 'হ্যামলেট' নাটকের বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। হ্যামেটের দুর্গ নাকি ছিলোই না এখানে। কে জানে। পৃথিবীর লোক যখন এটাকেই হ্যামেটের প্রাসাদ বলে চিহ্নিত করেছে তখন সেটাকেই সত্য বলে মেনে নেওয়া উচিত।'

বুদ্ধদেব বললেন, 'এলসিনোর বলতে আমাদের মনে তো একটাই ছবি। সেই উদ্‌ভ্রান্ত যুবক। চলনে বলনে চিন্তায় ভাবনায় বিবেকপীড়নে যার মনে এক বিন্দু শান্তি নেই। দিন অসহ্য, রাত্রি বিনিদ্র।'

'আর এও তো সত্য, শেকস্‌পিয়র হ্যামলেট লিখেছিলেন বলেই আজ এই দুর্গ এতো বিখ্যাত। শত শত বৎসর যাবৎ কতো মানুষের পায়ের ধুলো পড়ছে এখানে।'

দুর্গটি দেখলাম আর পাঁচটা দুর্গের মতোই পরিখা এবং গগনচুম্বী পাথর-প্রাচীরের আবেষ্টনে সুরক্ষিত। একটা বৈশিষ্ট্য এই, এই পরিখা মানুষের কাটা নয়; ঢোকবার মুখেই যে খালের বাধা, সেটাও প্রকৃতির দান; অপর তিন দিক তো সমুদ্রই বেষ্টন করে আছে। খালটি বহু দূর থেকে এসে সমুদ্রেই মিশেছে।

রাস্তা থেকে খালের উপরে পুল, পুল পার হলে দুর্গ। আগে এই পুল নিশ্চয় অন্যভাবে ব্যবহৃত হতো। নিজেদের ব্যক্তিগত কারণে নামিয়ে এপারে এলেও ফিরে গেলেই প্রবেশদ্বারের দরজা হয়ে উঠে যেতো উপরে, মিশে থাকতো দেয়ালের সঙ্গে দেয়াল হয়ে। ফোকর দিয়ে সান্ত্রীরা লক্ষ করতো কোথাও কোনো শত্রু এসে ওত পেতে আছে কিনা। এখন বলা যায় একটি চলার রাস্তা মাত্র, যার দু দিকে রেলিং এবং রাস্তাটি [illegible] এখন এই হ্যামলেট প্রাসাদের প্রবেশদ্বার সর্বদাই উন্মুক্ত, অবারিত। পুল পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলে শেকসপিয়রের প্রাচীরচিত্র আর স্মারকলিপি দেখতে পাওয়া যাবে। [illegible] দোকান আছে, নানা রকমের পণ্য সাজিয়ে বসে আছে [illegible] স্যুভেনীর হিসেবে কিছু [illegible]

[illegible]

[illegible]

মূর্তি, সেই সঙ্গে কিছু সামুদ্রিক জিনিসপত্রও আছে। আরো টুকটাক কী সব। যেহেতু স্যুভেনীর, দাম তুঙ্গে।

সেই সব ছাড়িয়ে ভিতরের চত্বর। শেকসপিয়রের নামে উৎসর্গীকৃত। চারিদিকে কারাপ্রাচীরের বেষ্টনী, মাথার উপর নীল আকাশের একটি চৌকো খন্ড ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। মনে হয় না জগৎসংসারে ঘাস মাটি বৃক্ষ প্রাণী আর কিছুরই কোনো অস্তিত্ব আছে। খানিকটা হেঁটে গেলে ডাইনে দেড়তলা সমান খাড়া-খাড়া সরু পাথরের সিঁড়ি, শেষ সিঁড়ির মুখে আবার লোহার প্রবেশদ্বার। সেই দরজা দিয়ে ঢুকে গেলে প্রাসাদের অন্দরমহলের আঙিনা। আঙিনার যেদিকে সমুদ্র সেদিকে রেলিং ঘেরা, যতো দূর দৃষ্টি চলে ততো দূরই খোলা; অন্য দিকে প্রাসাদের অলিন্দ গবাক্ষ প্রকোষ্ঠ ইত্যাদি।

সমুদ্র থেকে উত্থিত উতল হাওয়া বয়ে যাচ্ছে বেগে। মাথার চুল উড়ে যাচ্ছে, শাড়ি ফুলে উঠছে পালের মতো। এই উঠোনে দাঁড়িয়ে একদিন সেই রাজপুত্রের চুল এবং পোশাকও নিশ্চয় চিরন্তন সমুদ্রের এই চিরন্তন হাওয়ায় বিপর্যস্ত হয়েছে, হয়তো এই উঠোনে দাঁড়িয়েই সে তার পিতার আত্মার সম্মুখীন হয়েছিলো। এই প্রাসাদেরই কোন কক্ষ থেকে হ্যামলেটের মৃত্যুর চিৎকার ভেসে গিয়েছিলো সমুদ্রের গর্জনে।

আমি সারা উঠোনটা প্রদক্ষিণ করলাম। আমরা তিনজন ব্যতীত আর অন্য কোনো দর্শনার্থী ছিলো না সেখানে। তিনজনের অতিরিক্ত আর একজন মাত্র যে ছিলো তার পরনে সান্ত্রীর পোশাক, মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ, হাতে দূরবীন। খুব গম্ভীর ভাবে সেই দূরবীন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যথারীতি সাবধানতা এবং সতর্কতার সঙ্গে এদিক-সেদিক দেখছিলো সে। যেন যে-কোন মুহূর্তেই শত্রু এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, এইরকম তার ভঙ্গি। এও আর এক খেলা। সেকী সান্ত্রী ভালো করেই জানে এই দুর্গে আর কোনো দিন কোনো শত্রুর প্রবেশ ঘটবে না। যাঁদের প্রবেশ ঘটে তাঁরা এই আমরা। আর বছরে একবার করে ইয়োরোপের নানা দেশ থেকে সব শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ অভিনেতারা আসেন, যুবরাজের ভূমিকাটি পাঠ করেন প্রাঙ্গণের মঞ্চে দাঁড়িয়ে। তাঁদের নিপুণ অভিনয়ের দক্ষতায় সেই রাজপুত্রই আবার ফিরে আসে এই মর্ত্যভূমিতে।

সমুদ্র থেকে গেঁথে তোলা প্রাসাদের প্রায় আট-দশতলা সমান আঙিনার রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে পায়ের তলায় সমুদ্র দেখাও একটা দেখার। দুর্গ দেখার চেয়ে এ-ও কম আকর্ষণীয় নয়। যথেষ্ট বিস্ময় উৎপাদন করে। এই আনন্দিত বিস্ময় আরো ঘন হয় যখন দূরের তীরে সুইডেনের আপাস, গাছপালা আর বাড়ি-ঘরের আভাস চোখে পড়ে। রেলিংয়ে উঠে একটা ঝাঁপ দিলেই যেন পৌঁছে যাবো সেখানে। আমাদের ভ্রমণপঞ্জীতে সুইডেন নেই, কিন্তু তখন খুব সুইডেনে যেতে ইচ্ছে করছিলো। এদিকে নরওয়ে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ আর সমুদ্র দেখতে দেখতে বেলা পড়ে এলো। সূর্যের লাল ছায়া ঘন হলো অগাধ জলে। আমরা নেমে এলাম।

আবার সেই চত্বর, ফটক, দোকান, পুল। দোকান থেকে কিছু পিকচার পোস্টকার্ড কেনা হলো, একটি ছোট্টো জলকন্যাও কেনা হলো। ভদ্রলোক গাড়ি পর্যন্ত এসেও হঠাৎ ছুটে গিয়ে অতি দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য একখানা ছবির বই কিনে এনে উপহার দিলেন।

এখানে এসে একটা খুব লক্ষণীয় বিষয় বলে মনে হচ্ছিলো, ডেনমার্কের সবই যেন দেশটির সঙ্গে মিলিয়ে তৈরী। কোথাও কোনো উগ্রতা নেই, ব্যস্ততা নেই, মাপে মাপে খাপে খাপে। দু' দিকে বৃক্ষ সংবলিত চওড়া চওড়া রাজপথ থেকে শুরু করে এখন এই বন্দরটি পর্যন্ত—এইমাত্র যেখানে এসে দাঁড়িয়ে আমরা সূর্যাস্ত দেখছি, যে সূর্যাস্তের রঙিন আভা ছোট্ট জলকন্যার সারা শরীরকে আরক্তিম করে রেখেছে, সবই একই পদ্ধতিতে সুসংবদ্ধ। সমুদ্রও তা থেকে বিচ্যুত নয়। সমুদ্রও এখানে সংবৃত। তার গর্জন রাগী নয়, তার ঢেউ দুর্জয় নয়, তার চেহারা ছোটোখাটো শান্ত-শান্ত।

ভদ্রলোক আমাদের এখানে পৌঁছে দিয়েই চলে গেলেন। বললেন, 'খুব ইচ্ছে ছিলো যতোটা সময় সম্ভব থাকবো আপনাদের সঙ্গে, কিন্তু অন্য কোনো জরুরী কাজে বাধ্য হয়েই যেতে হচ্ছে।'

বন্দরটি ঠিক বন্দরের মতো নয়, বাঁধানো তীরের এদিকে ফুলের বাগান ছড়ানো, বসবার জন্য বৃক্ষতলে আরামদায়ক লোহার আসন বা হেলান দেওয়া সিমেন্টের বেঞ্চি। অনেকেই বেড়াচ্ছে, অনেকেই বসেছে। বাচ্চারা খেলাধুলো করছে। আমরাও বসলাম। দূর দিগন্তে তাকিয়ে মন উধাও হয়ে যায়। সমুদ্রের বিস্তার দেখে সম্ভবত অতি বড়ো পাপিষ্ঠের মনও নরম হয়, অতি বড়ো নাস্তিকও ঈশ্বরের মহিমা অবলোকন করে অন্তত সেই মুহূর্তের জন্য আন্দোলিত হয়।

তীর থেকে কিছুটা দূরের জলে মস্ত এক উন্নত শিলাখণ্ডের উপর হান্স আন্ডারসনের লিটল্ মারমেইড উপবিষ্ট। বসেছে হাঁটু ভেঙে, এই মৎস্যকন্যার উপরের দিকটা মানুষের মতো, পায়ের দিকটা মাছের পুচ্ছ। বসবার ভঙ্গিটি অতি নম্র, অতি কুণ্ঠিত, কটিদেশ মুঠোয় ধরা যায়, নিষ্পাপ, অনিন্দসুন্দর মুখশ্রী বিষাদে ভরা। এই কন্যাই তীরে এক রাজপুত্রের নাচ দেখে প্রেমে পড়েছিলো। উঠে এসেছিলো সমুদ্রের তলদেশ থেকে, মৃত্যুর মূল্যে প্রার্থনা করেছিলো তার প্রেমিকটিকে।

হান্স নিজে ব্যর্থ প্রেমিক। ব্যর্থতার দুঃখ তিনি মর্মে মর্মে জানেন। এই গল্প সেই ব্যর্থতারই প্রতিচ্ছবি। মূর্তিটি শ্বেত পাথরের তৈরী। ঢেউ এসে আছড়ে আছড়ে পড়ছে সেখানে, জল ছিটকে ঝরনা হয়ে স্নাত করছে জলকন্যাকে। একটু একটু শ্যাওলা ধরেছে, মনে হয় সবুজ আবরণ, পিঠে লম্বা বেনী। কয়েকটি দশ-বারো বছরের ছেলে নেমে গেছে নিচে, পাথরের বড়ো বড়ো চাঁই ডিঙিয়ে চলে গেছে জলকন্যার কাছে। গিয়ে প্রাণপণে দুষ্টুমি করছে। এ ওকে জল ছিটোচ্ছে, সে তাকে জল ছিটোচ্ছে। একটা ছেলে বড়ো পাথরটা বেয়ে বেয়ে উঠে গেছে উপরে, আরেকজন উঠছে। হাসছে খিলখিল করে, ফুর্তির বন্যায় ভেসে যাচ্ছে, সমুদ্রের শব্দ আর হাসির শব্দ মিলে-মিশে তানপুরোর পাঁচটা তার। বহু দূরে ফেলে-আসা শৈশবের উত্তাল প্রতিরূপ।

একসময়ে বুদ্ধদেব হান্স আন্ডারসনের প্রায় সব ক'টি কিশোর গল্পই অনুবাদ করেছিলেন, সম্ভবত তিন খণ্ডে বেরিয়েছিলো। কারা প্রকাশক ছিলেন ঠিক মনে করতে পারছি না। বইয়ের নাম অপরূপ-রূপকথা। আমি গল্পগুলো বাংলা অনুবাদেই পড়েছিলাম। এইখানে বসে এই জলকন্যার দিকে তাকিয়ে সেইসব গল্পের খণ্ড খণ্ড অংশ আমার মনে পড়ে যাচ্ছিলো। এখন আর সে বই পাওয়া যায় না, ছাপা নেই। যে-কোনো গুণগ্রাহী বিদগ্ধ ব্যক্তিই নিশ্চয় স্বীকার করবেন বুদ্ধদেবের সাহিত্যনিষ্ঠা তাঁর অনুবাদ-কর্মেও অবিচল ছিলো। অনুবাদে ভাষার মূল সৌগন্ধ্য এনে দেবার জন্য কতো যে পরিশ্রম করতে দেখেছি তার ঠিক নেই। যতোক্ষণ সে কাজ হাতে আছে সারাক্ষণ সেই চিন্তাতেই নিমগ্ন। এক বিন্দু সংশয় নিরসনের জন্য হয়তো এক শো বই এসে গেছে ঘরে। একটি শব্দের একটি সঠিক প্রতিশব্দের অনুসন্ধানে হয়তো ঘুম নেই রাতে। কোথাও এক ফোঁটা ফাঁকি নেই, এক ফোঁটা শৈথিল্য নেই। একজন সৃষ্টিশীল লেখক হয়েও গুণগ্রাহিতার আবেগে নিজের কাজ সরিয়ে দিনের পর দিন নিজের প্রিয় লেখকটিকে সকলের কাছে যোগ্যভাবে উপস্থিত করার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন। তা অনুবাদের মাধ্যমেই হোক বা স্বলিখিত প্রবন্ধের আকৃতিতেই হোক। আমার দীর্ঘ জীবনে বুদ্ধদেবের মতো এরকম নৈর্ব্যক্তিক, নিখাদ, দ্বেষবিদ্বেষহীন গুণগ্রাহী ব্যক্তি আর একজনকেই মাত্র দেখেছি, যাঁর নাম দিলীপকুমার রায়, সন্ন্যাসী দিলীপকুমার। যাঁর মহানুভবতা, সততা, গুণগ্রাহিতা প্রায় গল্পকথার মতোই সত্য এবং সহজাত। যাঁর পাণ্ডিত্য ছিলো সমুদ্রের মতো অগাধ। যাঁকে আজ সবাই ভুলে গেছে। (ক্রমশ)

# সহজপাঠের সুবর্ণ জয়ন্তী

চিত্তরঞ্জন দেব

১৩৮৭ সাল সহজপাঠের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন-কাল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর তিন শতাধিক গ্রন্থ রচনার সঙ্গে এক ডজন শিশুপাঠ্য বইও লিখেছেন। এই বইগুলির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় বোধ করি সহজপাঠ। শান্তিনিকেতন প্রেস থেকে রায়সাহেব জগদানন্দ রায় কর্তৃক সহজপাঠ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৭ সালের বৈশাখ মাসে (২৭শে)। পাতায় পাতায় নন্দলাল বসুর আঁকা ছবি আর বড় বড় অক্ষরে ছাপা তিপ্পান্ন পৃষ্ঠার সুন্দর বই সহজপাঠ প্রথম ভাগের দাম পাঁচ আনা এবং একটু ছোটো আকারে ছাপা একান্ন পৃষ্ঠার দ্বিতীয় ভাগের দাম সাড়ে তিন আনা। বইটির সমালোচনা প্রকাশ করেন মাসিক প্রবাসী ১৩৩৭ সালেরই শ্রাবণ সংখ্যায়। সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লেখেন,

"যেসব শিশুর সবেমাত্র হাতেখড়ি হইয়াছে, তাহাদের জন্য কবি এই বহি দুখানি লিখিয়াছেন। ইহা তাহারা আনন্দের সহিত দেখিবে এবং দেখিতে দেখিতে পড়িতে শিখিবে, পড়িয়া আনন্দ পাইবে।

"বহি দুখানির কবিতাগুলিতে কবিত্ব আছে, রবিবাবুর বহি হইলেও ইহা বলা দরকার এইজন্য, যে অনেক বুদ্ধিমান লোকও ছোট ছেলেমেয়েদের বুদ্ধির উপযোগী করিয়া কিছু লিখিতে গিয়া এমন কিছু জিনিষ লেখেন যাহা সাহিত্য নয়। রবিবাবু শিশুদের জন্য যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাহাদের ভাল লাগিবে, বুড়োদেরও ভাল লাগিবে।"

"গদ্য গল্পগুলিও অক্ষর পরিচয় এবং বানান শিখাইবার জন্য লিখিত হইলেও উপভোগ্য।"

ভূয়োদর্শী সম্পাদকের কথা ব্যর্থ হয়নি। ছেলেবুড়ো সকলের কাছে সমাদরে গৃহীত সহজপাঠ সগৌরবে তার পঞ্চাশ বছর উত্তীর্ণ করল। সমকালে প্রকাশিত অন্যান্য শিশুপাঠ্যের তুলনায় সহজপাঠ সকলের কাছেই বেশি আকর্ষণীয়। এর মূলে আছে সহজপাঠ রচনায় রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘকালের নীরব প্রস্তুতি। শিশুপাঠ রচনার ভাবনাচিন্তার পথ ধরে সহজ পাঠ আসেনি। সহজপাঠের আগমন কাহিনী ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের গল্প মনে করিয়ে দেয়।

বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় প্রকাশের (১৮৫৫) পঁচাত্তর বছর পর রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠের প্রকাশ (১৯৩০) বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন চার বছরও পূর্ণ হয়নি, তখন তিনি বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' পড়ে যে পরিমাণ আনন্দিত হয়েছিলেন পঞ্চাশ বছর পরে জীবন-স্মৃতির পাতায় তার বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নোক্ত ভাষায়,

"সেদিন পড়িতেছি জল পড়ে পাতা নড়ে। এইটেই আমার জীবনে আদিকবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না—তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝংকারটা ফুরায় না, মিলটাকে লইয়াই কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।"

বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' কবিতার বই নয়। আগাগোড়া গদ্যে লেখা এই বইয়ের ৩ সংখ্যক পাঠে মুদ্রিত আছে 'জল পড়ে' কথাটি এবং ৮-সংখ্যক পাঠে মুদ্রিত আছে 'জল পড়িতেছে', 'পাতা নড়িতেছে'— এই দুটি বাক্য। রবীন্দ্রনাথ উক্ত 'পড়িতেছে' ও 'নড়িতেছে' শব্দদ্বয়ের মধ্যে মিল লক্ষ করে 'জল পড়া' ও 'পাতা নড়া'র ঘটনায় আদিকবির প্রথম কবিতার ছন্দ আবিষ্কার করে আনন্দিত হয়েছিলেন। তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডারে অক্ষয় এই আনন্দের অমৃত থেকেই নির্গত হয়েছে তাঁর অমর কাব্যের ধারা। মিলের খেলাতেই তিনি বিশ্বজয়ী হয়েছেন। এই মিলের খেলার সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে তাঁর জীবনের নানা পর্যায়, নানা বাসনাকামনা, তার রূপায়ণে নানা সমস্যা। সংসারী হয়েছেন। পত্নীরূপে পেয়েছেন মৃণালিনী দেবীকে। পাঁচটি পুত্রকন্যার জনকরূপে একদিন যখন সপরিবারে শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে এসে সংসার পেতেছেন, এসেছে আপন সন্তানদের শিক্ষাদানের পালা। শিশুদের বর্ণপরিচয়ের কথা চিন্তা করে মনে পড়েছে তাঁর শৈশবে পড়া 'বর্ণ-পরিচয়' বইখানির কথা। বইখানির নাম ভুলে গেলেও ভুলতে পারেননি সেই বইয়ের 'জল পড়া' ও 'পাতা নড়া'র ছন্দটি। ঠিক তেমনই ছন্দে লিখতে চাইলেন তিনি তাঁর পরিকল্পিত প্রথম শিশুপাঠ্য। ঠিক করলেন, তাঁর বইয়ে তিনি বাংলা বর্ণমালার প্রতিটি বর্ণকেই করে তুলবেন মিলের খেলা। শিশুরা যাতে সহজেই চিনতে পারে প্রতিটি বর্ণ খেলারই ছলে। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছে হল বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের চেয়েও সহজ করে লিখবেন একখানি বই। 'সহজ পাঠ' নামটি তখন তাঁর মনে এসেছিল কিনা, সেকথা অবশ্য জানা যায় না।

সহজপাঠের পাণ্ডুলিপি

মানুষের শিশুকে যথার্থ মানুষ করে গড়ে তোলা, এবং মানুষের ভালো করার চিন্তা ও চেষ্টা যেমন ছিল বিদ্যাসাগরের, তেমনি ছিল রবীন্দ্রনাথের। শুধু শিশুপাঠ্য রচনার ক্ষেত্রেই নয়, সমাজে সংসারে যেখানেই মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও সমস্যা, সেখানেই বিদ্যাসাগরের মতো রবীন্দ্রনাথও এসেছেন এগিয়ে। এই উভয় মনীষীর মধ্যে বয়সের পার্থক্য অনেক ছিল বলে বাহ্যিকভাবে তাঁদের পরস্পরের যোগাযোগ হয়েছে সামান্য, কিন্তু মানসিকভাবে পরস্পরের যোগ ছিল অসামান্য। বলা যায়, বিদ্যাসাগরের জীবন-সাধনার অনেকাংশের যোগ্য উত্তরাধিকারী হতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

যদিও উৎকর্ষের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সহজ-পাঠ বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়কে অনেক [illegible] এসেছে, তবুও সহজপাঠ রচনার উৎসমূলে অত্যন্ত গভীরে রয়েছে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের অদৃশ্য অঙ্গুলিসংকেত—একথা অস্বীকার করা যায় না। আবার, বর্ণপরিচয়কে স্বীকার করেও বলা যায় সহজপাঠের অভ্যুদয় শুধু শিশুপাঠ্য বইয়ের জগতেই নয়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কারণ, সহজপাঠের আবির্ভাবের পূর্বে বা পরে প্রকাশিত কোনো শিশুপাঠ্যেই এত সহজ ছন্দ ও ভাষা, ভাব ও বিন্যাসে এমন মৌলিকতা ও সংযত রুচি লক্ষ করা যায় না। সোনার তরী নৈবেদ্য-গীতাঞ্জলির গভীর উৎস রবীন্দ্রপ্রতিভার উত্তুঙ্গ হিমালয় থেকে সহজপাঠে অবতরণ [illegible] সাধারণ ঘটনা নয়। তা ছাড়াও, যে সহজপাঠের প্রকাশ ১৩৩৭ সালে হয়েছে, তার সূচনা হয়েছে প্রকাশ কালের পঁয়ত্রিশ বছর আগে ১৩০২ সালে। সহজ-পাঠ ব্যতীত এমন অন্য কোনো রবীন্দ্রগ্রন্থের নাম আমাদের জানা নেই, যার সূচনা ও প্রকাশকালের মধ্যে এমন দীর্ঘকালের ব্যবধান আছে।

সহজপাঠের আলোচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য শিশুপাঠ্যগুলির কথাও এসে পড়ে। নিম্নোক্ত তালিকায় তাদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করা গেল :

১। সংস্কৃত শিক্ষা, প্রথম, দ্বিতীয় ভাগ। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত (১৩০৩)
২। ইংরাজি সোপান, প্রথম, দ্বিতীয় খন্ড (১৩১১-১৩১৩)
৩। ইংরাজি পাঠ, প্রথম ভাগ (১৩১৬)
৪। ছুটির পড়া (১৩১৬)
৫। ইংরাজি শ্রুতিশিক্ষা, প্রথম, দ্বিতীয় ভাগ (১৩১৬)
৬। পাঠ সঞ্চয় (১৩১৯)
৭। বিচিত্র পাঠ (১৩২১)
৮। অনুবাদ চর্চা (১৩২৪)
৯। সিলেক্টেড্ প্যাসেজেস্ ফর ইংলিশ ট্রান্সলেশন (১৩২৪)
১০। ইংরেজি সহজ শিক্ষা, প্রথম দ্বিতীয় ভাগ (১৩৩৬)
১১। পাঠপ্রচয়, দ্বিতীয়, চতুর্থ ভাগ (১৩৩৬)
১২। সহজ পাঠ, প্রথম, দ্বিতীয় ভাগ (১৩৩৭)

উদ্ধৃত তালিকায় সর্বশেষে আছে যে সহজপাঠ সেটি রচনার কাজ রবীন্দ্রনাথ সর্বাগ্রে হাতে নিয়েছিলেন, কিন্তু সর্বাগ্রে হাতে নেওয়া বইটির রচনা অসম্পূর্ণ রেখে তিনি কেন প্রথমেই সংস্কৃত পাঠ প্রকাশ করলেন এবং তার পরে ইংরাজি পাঠ্য ইত্যাদি আরও এগারোখানি বই সংকলনে মনোনিবেশ করলেন, সে-বিষয়ে তিনি নিজে কিছু বলেছেন বলে আমাদের জানা নেই। সংগৃহীত তথ্য ভিত্তি করে সে বিষয়ে আমরা অনুমান করতে পারি মাত্র।

যদিও আপন শিশুসন্তানদের জন্য বাংলা সহজপাঠ-সংকলনে রবীন্দ্রনাথ হাত দিয়েছিলেন এবং স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচয় অংশ ছন্দে লিখেছিলেন (মূল পাণ্ডুলিপি থেকে এর দৃষ্টান্ত যথাস্থানে দেওয়া হবে), তবুও লেখা আরম্ভ করে সম্ভবত তাঁর মনে হয়েছিল, বাংলা পাঠ্য শিশুদের আকর্ষণীয় করতে হলে, এ নিয়ে আরও কিছুকাল ধ্যানধারণা প্রয়োজন। হয়ত তিনি সংস্কৃত পাঠ্য-সংকলনের কাজও ঐ সময়েই শুরু করে বাংলা-পাঠের আগেই সংস্কৃত পাঠ্য প্রকাশ করা তাঁর কাছে জরুরি হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া, সংস্কৃতে রবীন্দ্রনাথের অবাল অনুরাগ। একবার পিতার সংগ্রহ থেকে ফোর্ট উইলিয়মের ছাপা বাংলা অক্ষরের সংস্কৃত গীতগোবিন্দ পড়ে তিনি এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন যে বার বার পড়বার লোভে বইখানি তিনি নিজের হাতে আগাগোড়া নকল করে নিয়েছিলেন। জয়দেবের ভাব ও ভাষা তিনি তখন কিছুই বোঝেননি, সে কথাও অকপটে স্বীকার করেছেন, তবু যে বার বার গীতগোবিন্দ পড়তেন, তার কারণ, উক্ত বইয়ের ছন্দে

[illegible]

নন্তার ছন্দের ঝংকারেরই মতো)। সংস্কৃত পাঠ্য প্রথম সংকলনের আরও একটি বিশেষ কারণ; সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট অধিকার না-থাকলে ভারতের ধর্ম দর্শনের গভীর তত্ত্বে ছেলেদের প্রবেশ লাভ ঘটে না। প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে যে-ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৩০৮ সালে, তার পাঁচ বছর আগেকার ঘটনা হল সংস্কৃত শিক্ষা-প্রকাশ।

সংস্কৃত ভাষার সন্তানস্বরূপা বাংলাভাষার শিশুপাঠ্যটি সংস্কৃত পাঠ্যের পরেই কেন প্রকাশ করলেন না, এ-রকম প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, বিদ্যাসাগরের মতো রবীন্দ্রনাথও জানতেন, ইংরেজি ভাষা না-জানার অর্থ বিশ্বের বিচিত্র বিদ্যার অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া। মাতৃভাষা যত সহজে আয়ত্ত হয়, বিদেশী ভাষা তত সহজে আয়ত্ত হওয়ার পক্ষে অনেক বাধা থাকে। যেমন তেমন করে ইংরেজি শিখলে তা দিয়ে অভিপ্রেত ফল লাভ হয় না। সেজন্য, ব্রহ্মচর্যাশ্রম-বিদ্যালয় স্থাপনের চার বছরের মধ্যেই তিনি ইংরাজি-সোপান প্রকাশ করলেন। বই প্রকাশের আগে বইয়ের খসড়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন ছাত্রদের মধ্যে। প্রকাশিত বইয়ের আরম্ভে সে কথা জানিয়েছেন 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' শিরোনামে নিম্নোক্ত ভাষায়,

"ইংরাজি সোপান বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জন্য রচিত হইয়াছিল। এ পর্যন্ত সাধারণের নিকট প্রকাশিত হয় নাই। কয়েক বৎসর বোলপুর বিদ্যালয়ে এই প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া যেরূপ ফল লাভ করা গিয়াছে তাহাতে অসঙ্কোচে এই গ্রন্থ সর্বসমক্ষে উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি।"

সংস্কৃত এবং ইংরেজি পাঠ্য বই প্রকাশ করে, প্রয়োগকালে সর্বদা লক্ষ রাখতেন কোথায় এখনও আছে অপূর্ণতা, অসংগতি। প্রতিদিন সে-সমস্ত সংগ্রহ করতেন। তার ফলে, দেখা যায়, দ্বিতীয় সংস্কৃত পাঠ্য সংকলন করিয়েছেন পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে 'সংস্কৃত-প্রবেশ' নামে। পর পর আরও পাঁচখানি ইংরেজি পাঠ্য স্বয়ং প্রকাশ করেছেন—ইংরাজি সোপান-এর পরিপূরক রূপে।

[illegible] 'ইংরেজী সহজ শিক্ষা'। এই বই প্রকাশের পরই এল 'বাংলা সহজ পাঠ' প্রকাশের পালা। এই 'বাংলা সহজপাঠ' নামটিই রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখেছেন তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা নিম্নোদ্ধৃত পত্রে:

কল্যাণীয়েষু,

.......

বাংলা সহজ পাঠের ব্লকগুলো পেলে অনতি-বিলম্বে কাজ আরম্ভ করে দিতে পারি।... ইতি ১৫ই নভেম্বর ১৯২৯ (২৯ কার্তিক ১৩৩৬)।

উদ্ধৃত পত্রের মর্মানুসারে জানা যায়, সহজ-পাঠ লেখার কাজ শেষ হয়েছে ১৩৩৬ সালের কার্তিক মাসে। প্রথম পর্যায়ে যার শুভারম্ভ হয়েছিল ১৩০২ সালে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সহজ-পাঠ তিনি নূতন করে লিখতে আরম্ভ করেন ১৩৩৫ সালের শ্রাবণ মাসে। অর্থাৎ মোটামুটি-ভাবে প্রায় দেড় বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের সহজ পাঠ লেখা সমাপ্ত হয়, কিন্তু সহজপাঠ রচনার সম্পূর্ণ ইতিহাসে এর সূচনাকালটিকে এড়িয়ে গেলে চলবে না। কাজেই বলতে হবে, ১৩০২ সালে আরম্ভ হয়ে সহজপাঠ লেখা সমাপ্ত হয়েছে ১৩৩৬ সালে। হতে পারে নিরবচ্ছিন্নভাবে পঁয়ত্রিশ বছর ধরে তিনি সহজপাঠ লেখেন নি। কিন্তু সহজপাঠ লেখার ভাবনা যে রবীন্দ্রনাথকে সহজপাঠের সূচনা থেকে প্রকাশের কাল পর্যন্ত সব সময়েই ভাবতে হয়নি, সে কথাই বা কে বলবে। ১৩০২ ও ১৩৩৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে লেখা সহজপাঠের কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি বলেই বলা ঠিক হয় না যে, ঐ সময়ে তিনি সহজপাঠ সম্বন্ধে ভাবনা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছিলেন। বরং একটির পর একটি পাঠ্য লিখছেন আর প্রকাশ করছেন আর সহজপাঠ ভিতর থেকে তাঁকে তাড়া লাগাচ্ছে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসার জন্য। কিন্তু পর পর এগারোখানি শিশুপাঠ্য সংকলনের কাজের বোঝা তো কম ভারী নয়, তা ছাড়া, ঐ সঙ্গে আছে তাঁর কবিতা-গান গল্প-প্রবন্ধাদির নানা বই লেখা ও প্রকাশ করার কাজ। এত কাজের মধ্যে সহজ-মনা শিশুদের জন্য সহজ করে বই লিখতে গিয়ে [illegible] হয়তো দেখলেন, কাজটা যত সহজ ভেবেছিলেন, তত সহজ নয়। সেই অভিজ্ঞতার কথাও লিপিবদ্ধ আছে তাঁর নিজেরই ভাষায়, খাপছাড়া কাব্যের আরম্ভে যেখানে তিনি বলেছেন,

"সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে..."

আমাদের মনে হয়, খাপছাড়ার চেয়ে সহজ-পাঠের সম্পর্কেই এই কথা বেশি খাপ খায়।

অবশেষে সহজপাঠ প্রকাশিত হল দুই ভাগে। প্রথম ভাগের আরম্ভেই মুদ্রিত হল স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণপরিচয়—ছোটো ছোটো ছন্দোবদ্ধ বাক্যে। প্রথমভাগের রচনাসূচীতে আছে প্রথম পাঠ, দ্বিতীয় পাঠ ইত্যাদি শিরোনামে পর পর মোট দশটি পাঠ। প্রতি পাঠ আরম্ভ হয়েছে গদ্য লেখা দিয়ে, শেষ হয়েছে একটি কবিতায়। প্রথম ভাগে পাওয়া যায় মোট দশটি গদ্যপাঠ ও দশটি কবিতা।

দ্বিতীয়ভাগের সূচীতে আছে প্রথম পাঠ, দ্বিতীয় পাঠ ইত্যাদি শিরোনামে পর পর মোট তেরোটি গদ্য পাঠ। কিন্তু প্রতিটি গদ্য পাঠের পরেই একটি করে কবিতা এখানে পাওয়া যায় না। কোনো গদ্যপাঠের শেষে কবিতা আছে, কোনোটির শেষে নেই। মোট আটটি কবিতা পাওয়া যায় সহজপাঠের দ্বিতীয় ভাগে।

এবার আসা যাক সহজপাঠের পাণ্ডুলিপির কথায়। পাণ্ডুলিপি ছাড়া সহজপাঠের সূচনা, ক্রম-বিকাশ ও পরিণতির কথা জানবার অন্য উপায় নেই। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত একাধিক পাণ্ডু-লিপিতে সহজপাঠের বিভিন্ন অংশ ও ভিন্ন ভিন্ন পাঠ ছড়িয়ে আছে। মুদ্রিত পুস্তকের অনুরূপ পারম্পর্য অনুসারে আগাগোড়া সম্পূর্ণ কোনো একখানি মাত্র খাতায় সহজপাঠের পাণ্ডুলিপি লেখা হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত ১২৯৬ সালের একখানি পুরনো পকেট বুকের দুটি পাতায় দেখা যায় সহজপাঠের প্রথমাংশের প্রাথমিক খসড়া নিম্নোদ্ধৃত ভাষায়:

"দুই বাবু অ আ/বসে খায় হাওয়া
দুই বিবি ই ঈ/শীতে কাঁপে হী হী
দুই বুড়ি উ ঊ/কাঁদে বসে হু হু
দুই বুড়ো ঋ/চলে ধীরি ধীরি
দুই বোন ৯ [illegible]/হাসে খিলি খিলি
দুই ভাই এ ঐ/হেঁকে বলে দে দে
দুটি সুটি ও ঔ/বসে আছে দুই দেশ"

.......

ক কাটে কাঠ/খ খায় খই
গ গায় গান/ঘ ঘুমোয় ঘরে
ঙ করে উঁ আঁ/তার চোখে লাগে ধুঁয়া।
চ চড়ে চালে/ছ ছোঁড়ে ছাতা
জ জড়ায় জাল/ঝ ঝাড়ে ঝাঁট
কুকুর ছানা ঞ/কাঁদে ইঁঞ ইঁঞ।
ট টানে টীক/ঠ ঠেকে ঠেকই
ড ডোবে ডোবায়/ঢ ঢোকে ঢাকে
ণ বলে শোনো/আমি মূর্ধন্য ণ।
ত তোলে তেঁতুল/থ থাকে থামে
দ দোলে দোলায়/ধ ধোয় ধুতি
ন বলে শোন ভ/আমার নাম দন্ত্য।
প পড়ে পাঁকে/ফ ফেলে ফল
ব বেড়ায় বনে/ভ ভাঙে ভাড়
ম বলে মামা/আমায় মাচা থেকে নামা।
য যায় যশোরে/র রাঁধে রাস্তায়
ল লাগায় লাঠি/ব বাজায় বীণা
শষস তিন ভাই/শোনায় সানাই।
হ হাঁচে হ ক্ষ/ক্ষ কাশে খক্ষ।"

উদ্ধৃত স্বরবর্ণ পরিচয়ের খসড়া [illegible] পরে আরও দুবার দুরকম করে এটি লিখেছেন [illegible]

[illegible]

সহজ [illegible] শব্দ জুড়ে ছোট ছোট পাঠ ও তাহার ছবি।
যথা, এক বাঘ [illegible] থাকে। সেই হরিণ খায়। হরিণ ভয় পায়। [illegible]
বন থেকে পালায়। [illegible] থাকে না। হরিণ খায় আর [illegible]
সেই বন। হরিণ তাই ভয় পায়। বাঘ দেখে সবাই ভয় পায়। তাই [illegible]
রাম [illegible] বাঘ মারে। হরিণ [illegible] পায়। সবাই
আরাম পায়। হরিণ বনে ফিরে যায়। হরিণ বনে আরামে থাকে। রাম
[illegible] ফিরে যায়। সবাই [illegible]
ছবি [illegible] যথা ঘর, ফল, গাছ, মাছ [illegible]
ছবিতে বর্ণনীয় গল্প দেখানো। যেমন—
গাছে ফল আছে। পাখী [illegible] ফল খায়। [illegible]
আলাদা আলাদা শব্দ লিখে সেই শব্দ জুড়ে বাক্য রচনা।
যথা — [illegible] [illegible]।

"কানে কানে অ আ/করে বলা কওয়া।
কোণে বসে ই ঈ/শীতে করে হী হী।
শুয়ে শুয়ে উ ঊ/করে শুধু হু হু।
খেতে বসে এ ঐ/হেঁকে বলে দে দৈ।
খেলা করে ও ঔ/কিনে এনে বেনে বউ।"

স্বরবর্ণ পরিচয়ের তৃতীয় খসড়া এবং ব্যঞ্জন-বর্ণ পরিচয়ের দ্বিতীয় খসড়াটি পাওয়া যায় ১৩৩৫-৩৬ সালের অন্যান্য লেখার সঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত রূপে:—

"অ আ/ছোটো খোকা বলে অ আ/
শেখেনি সে কথা কওয়া।
ই ঈ/হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ/বসে খায় ক্ষীর খই।
উ ঊ/হ্রস্ব উ দীর্ঘ ঊ/ডাক ছাড়ে কেউ কেউ।
ঋ/ঘন মেঘ বলে ঋ/দিন বড় বিশ্রী।" ইত্যাদি

........ ........ ........ ........ ........

"ক খ গ ঘ/ক খ গ ঘ গান গেয়ে/
জেলে ডিঙি চলে বেয়ে।
ঙ/চরে বসে রাঁধে ঙ/চোখে তার লাগে ধোঁয়া।
চ ছ জ ঝ/চ ছ জ ঝ দলে দলে/
বোঝা নিয়ে হাঁটে চলে।
ঞ/ক্ষিদে পায় খুকী ঞ/
শুয়ে কাঁদে কিয়োঁ কিয়োঁ।" ইত্যাদি

উদ্ধৃত স্বরবর্ণের তৃতীয় খসড়া এবং ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিতীয় খসড়ার প্রায় অনুরূপ পাঠই স্থানে স্থানে যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়ে সহজপাঠে প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায় স্বরবর্ণের প্রথম খসড়াটির সঙ্গে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খসড়া ও প্রকাশিত পাঠের। যেখানে দীর্ঘ ঋ ও দীর্ঘ ৯-র উল্লেখ ছিল প্রথম খসড়ায়, সেখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খসড়ায় উক্ত দুটি বর্ণকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক খসড়ায় সহজপাঠের গদ্যপাঠ ছিল নিম্নোক্তরূপে:

"ঘর কই। ঐ যে। দূরে। আয় না, ঐখানে। না, ওখানে কাদা। এইখানে আয়। ঐ যে খাল। খালে জল। আয় ধারে বসি। ধারে গাছ আছে। আম গাছ। ডালে কত ফল। এখানে ঘাস আছে, আর ছায়া। গাছে কাক ডাকে। পাতা নড়ে। রাম গাছে চড়ে। আম খায়। ডাল নাড়ে। ফল পাড়ে। পাকা ফল নীচে পড়ে। হরি মালী রাগ করে। রাম নীচে নামে। ঘরে ছুটে যায়। মালী পিছে পিছে ছোটে। রাম ছোটো ছেলে তাই ভয় পায়। আমি আম খাই, তার দাম দিই। মালী খুশি হয়। যতো চাই ততো পাই। ওটা কি পাখী। ওটা কাক। ডালে বাসা আছে। বাসায় তার ছানা। ছানা ডাকে। খিদে পায়। খেতে চায়। কাক তাকে খেতে দেয়। কি খেতে দেয়। পোকা দেয়। আরো কত কি দেয়। এই বার ঘরে যাই। না গেলে রাগ করে। দেরি হলে মা ভাবে বাবা বকে।"

"মামার বাড়ি চৌবেড়ে। মা নৌকো করে যায়, বাবাও যায়, আমিও যাই, দাদাও যায়। নৌকো করে যায় না। সে গাড়ি করে যায়। মামার বাড়ি আজ পুজো। তাই মা কৌটো করে গয়না আনে। গয়না মাথায় পরে, হাতে পরে, গয়না গলায় পরে। সৌরীদিদিও গয়না পরে। বৌদিদিও গয়না পরে। নৌকো ঘাটে এল। নৌকো থেকে নেমে দৌড়ে চলি। গৌর দাদাও দৌড়ে চলে। ঐ যে দেউড়ি। ঐখানে ঢাক বাজে ঢোল বাজে সানাই বাজে। রাম নাচে, হরি নাচে, কানাই নাচে। যদু গান গায়, মধু গান গায়, সিধু গান গায়। খুব ঘটা ঐ যে গয়লা দুধ আনে, ছানা আনে। কতো কই মাছ, রুই মাছ। গোরুর গাড়ি করে আনে কলা মুলো শাক আলু কচু তেল ঘি চিনি। ঐ যে মুটে আনে খুরি সরা কলাপাতা।

........ ........ ........ ........ ........

"এক বনে এক বাঘ থাকে। সেই বাঘ হরিণ খায়। হরিণ বাঘ দেখে ভয় পায়। হরিণ বন থেকে

সহজপাঠের পাণ্ডুলিপি

পালায়। হরিণ সেই বনে থাকে না। হরিণ যায় আর এক বনে। বাঘ যায় সেই বনে। হরিণ তাই ভয় পায়। বাঘ দেখে সবাই ভয় পায়। সবাই বন থেকে পালায়। তাই ঢাকা থেকে রাম আসে। বনে গিয়ে রাম বাঘ মারে। হরিণ তাই আরাম পায়। সবাই আরাম পায়। হরিণ বনে ফিরে যায়। হরিণ আর ভয় পায় না। তাই হরিণ বনে আরামে থাকে। রাম ঢাকায় ফিরে যায়। সবাই বনে ফিরে আসে।"

সহজপাঠের কবিতাগুলি রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যতটা ভেবেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি ভেবেছেন গদ্যপাঠগুলি রচনার বেলায়। উপরে উদ্ধৃত গদ্যপাঠের তিনটি খসড়া দেখলেই বোঝা যায় কি পদ্ধতিতে তিনি সহজপাঠ সংকলনের জন্য অসীম ধৈর্য নিয়ে একটি একটি করে শব্দ চয়ন করেছেন, একাধিক শব্দ নিয়ে বাক্য রচনা করেছেন, এবং বাক্যগুলি পর পর সাজিয়ে একটি দৃশ্য এনেছেন চোখের সামনে। উদ্ধৃত খসড়াগুলি থেকে শব্দ ও বাক্য চয়ন করে বহু পরিবর্তন ও সংযোজন সহকারে কেমন করে সহজপাঠে গ্রহণ করেছেন নিম্নোদ্ধৃত প্রকাশিত পাঠগুলি দেখলেই সে কথা জানা যায়:

"বনে থাকে বাঘ। / গাছে থাকে পাখী। / জলে থাকে মাছ। / ডালে আছে ফল। / পাখী ফল খায়। / পাখা মেলে ওড়ে। / বাঘ আছে আম বনে। / গায়ে চাকা চাকা দাগ। / পাখী বসে গান গায়। / মাছ জলে খেলা করে। / ডালে ডালে কাক ডাকে। / খালে বক মাছ ধরে। / বনে কত মাছি ওড়ে। / ওরা সব মৌমাছি। / ঐখানে মৌচাক। / তাতে আছে মধু ভরা।"....

"রাম বনে ফুল পাড়ে। গায়ে তার লাল শাল। হাতে তার সাজি। জবা ফুল তোলে। বেল ফুল তোলে। বেল ফুল সাদা। জবা ফুল লাল। জলে আছে নাল ফুল। ফুল তুলে রাম বাড়ি চলে। তার বাড়ি আজ পুজো। পুজো হবে রাতে। তাই রাম ফুল আনে। তাই তার ঘরে খুব ঘটা। ঢাক বাজে ঢোল বাজে। ঘরে ঘরে ধুপ ধুনো।

"পথে কত লোক চলে। গোরু কত গাড়ি টানে। ঐ যায় ভোলা মালী। মাল নিয়ে ছোটে। ছোটো খোকা দোলা চড়ে দোলে।

"থালা ভরা কৈ মাছ, বাটা মাছ। সরা ভরা চিনি ছানা। গাড়ি গাড়ি আসে শাক লাউ আলু কলা। ভারী আনে ঘড়া ঘড়া জল। মুটে আনে সরা খুরি কলাপাতা।...."

পাণ্ডুলিপির খসড়ার সঙ্গে মুদ্রিত সহজপাঠের প্রতিটি পাঠ মিলিয়ে দেখার সুযোগ এত স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে নেই। সহজপাঠের পাণ্ডুলিপিতে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ চিহ্নিত করা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ আগে অবিচ্ছেদে লিখে নিয়ে ছাপবার সময় দুই ভাগে ছেপেছেন। সহজ পাঠ সহজ পাঠই। প্রথম ভাগ থেকে দ্বিতীয় ভাগে যাবার সময়ও সহজ থেকে কঠিনের দিকে যাত্রা কিছুই বোঝা যায় না। তাই, সহজপাঠ সকলের কাছেই সহজ এবং অম্লান।*

---

* প্রবন্ধে ব্যবহৃত পাণ্ডুলিপি-তথ্য ও ফটোচিত্র বিশ্বভারতীর মাননীয় উপাচার্য মহাশয়ের অনুমতি-ক্রমে প্রাপ্ত।

ইন্ডানা হোল মিল্ক পাউডার
হাতের কাছে এমন খাঁটি দুধ যা দিয়ে মনোমত
অনেক খাবার তৈরী করা যায়।
পান করুন, শীতল
পানীয় তৈরী করুন, দই
জমান, অন্য জিনিসের সঙ্গে
মিশিয়ে খান, মিষ্টি তৈরী করুন
আপনার এলাকায় বিশুদ্ধ পুষ্টিকর দুধ সহজে পাওয়া না গেলে আপনি কি করবেন? আপনার রান্নাঘরের কাজই তো বন্ধ হয়ে যাবে, আর বাচ্চারা দুধের তৈরী তাদের প্রিয় খাবার থেকে বঞ্চিত হবে।
এইসব সমস্যার সমাধান—এক টিন ইণ্ডানা হোল মিল্ক পাউডার সহজে গুলে যায়, পুষ্টিকর আর সুস্বাদু—এই দুধ দিয়ে আপনি হরেক রকম মজাদার খাবার তৈরী করতে পারেন। হাতের কাছে ইণ্ডানা রাখুন—আপনার পরিবারের সবাই খুশী না হয়ে পারবে না।
ইন্ডানা
হোল মিল্ক পাউডার
—এমন প্রাচুর্য্য যাতে সবাই খুশী
Indana
Whole Milk Powder
FOREMUST DAIRIES LIMITED
OBM 4936 Ben

## সাহিত্য

### শরৎকুমারী চৌধুরানী : 'শুভবিবাহ'

আমাদের বাড়িতে ছোটরা স্কুলের গণ্ডি পেরোবার আগে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের লেখা ছাড়া অন্য কারুর লেখা বড়দের বই পড়ার অনুমতি পেত না। আমিও পাইনি। কিন্তু নিষিদ্ধ জিনিসের আকর্ষণ বড় বেশি। কম বয়েসে তো কথাই নেই। এ রকম কোনো একটা সময়েই দুদিনের জন্যে মামার বাড়ি বেড়াতে গিয়ে হাতে পেয়েছিলুম একটা জীর্ণ মলাটের শীর্ণ বই নাম 'শুভ বিবাহ'। কোনোদিকে না তাকিয়ে গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করার মতো করে বইটা পড়ে ফেলেছিলুম। কার লেখা, কী নাম কিছুই স্পষ্ট মনে ছিল না, ছিল শুধু পুরনো বইয়ের গন্ধমাখা একটা আবছা স্মৃতি।

ভেবেছিলুম কোনদিনই হয়ত আর ভালোলাগা সেই উপন্যাসটি আমার হাতে ফিরে আসবে না। সেই ভুবন, ভুবনেশ্বরী বা ভুবনমোহিনী যা হোক কিছু, আর তার ছেলে গণেশের কলকাতা আসার গল্পটাও নতুন করে পড়া হবে না কোনোদিন। কৈশোরের দুটো-একটা ভালো লাগা কিংবা মন-কেমন-করা স্মৃতির মতোই 'শুভ বিবাহ' উপন্যাস মনের কোণে বাসা বেঁধে থাকবে। কিন্তু বছর তিনেক আগে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে শরৎকুমারী চৌধুরাণীর লেখার ওপর চোখ বোলাতে গিয়ে হঠাৎ নতুন করে খুঁজে পেয়ে গেলুম সেই পুরনো উপন্যাসটিকে।

আমি দেখেছি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা মোটেই সুখের হয় না। প্রথম পাঠের রোমাঞ্চ দ্বিতীয় বারে খুঁজতে গিয়ে অনেকেই হতাশ হন। আমারও সে আশংকা ছিল না তা নয় তবু দ্বিতীয়বার পড়তে গিয়ে 'শুভ বিবাহ'কে ভালো লাগল, আবারও। বেশ ঝরঝরে পরিচ্ছন্ন গল্প। নায়ক-নায়িকার প্রেম-পরিণয়, মান-অভিমান কিংবা রুদ্ধশ্বাস চমক কোথাও কিছু নেই তবু উপন্যাস তরতরিয়ে এগিয়ে চলেছে। গল্প শুরু হয়েছে ভুবন ও গণেশের কলকাতা আসার পর থেকে। প্রায় পঁচিশ বছর পরে কলকাতায় এসেছে ভুবন, এসে দেখে অনেক বদলে গেছে দেশটা। তার কলকাতাবাসিনী দিদি ফিসফিসিয়ে তাকে হালফিল গল্প শোনায় : "তোকে চুপিচুপি বলি, কাউকে বলিসনি। শুনেছি বোয়েরা পশ্চিমে কি পাহাড়ে যখন হাওয়া-টাওয়া খেতে যায়, তখন নাকি জুতো মোজা পায়ে দেয়।"

ভুবন কলকাতায় এসেছিল মনের মতো টুকটুকে মেয়ে খুঁজতে, ছেলের বিয়ে দেবে বলে কিন্তু দিদির জায়ের নাতনীর বিয়েতে নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়ে দেখে সেখানে বিষম কাণ্ড। পণ নিয়ে গণ্ডগোল হওয়ায় মেয়ের বিয়ে ভেঙে যায় আর কি। মেয়ের বাবা নীরদ শিক্ষিত ভদ্রলোক, সম্মানবোধ আছে কিন্তু প্রচলিত প্রথাকে এড়াবার মতো মনোবল খুব দৃঢ় নয়। তাই মেয়ের বিয়ে ভেঙে দিয়েই অবসন্ন হয়ে শুয়ে পড়ে। সব দেখে এগিয়ে আসে ভুবন, নিজেই গণেশের সংগে ওই মেয়ের বিয়ে দিয়ে সব সমস্যার সমাধান করে দেয়। একেবারে শেষটা পড়তে প্রথমবার খুব ভালো লেগেছিল :

"...একজন দাসী ছুটিয়া আসিয়া বলিল, 'ওগো, বর আসছে।'—চুপ চুপ করিয়াও ইতিমধ্যে দাসী মহলে জানাজানি হইয়াছে যে, বিবাহ ভাঙিয়া গিয়াছে, বর আসিবে না।"

রাণী। কাদের বর?

দাসী। ওগো আমাদের বর। ঐ দেখ বরের বাড়ির ঝি আসছে!—

বরের বাড়ির ঝি। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) বাবু কোথা গা?

নীরু। কেন?

বরের বাড়ির ঝি। বর আসছে গো—তোমরা

সব উয্যুগ কর। মাঠাকরুণ সব শুনেছেন, তিনি কত্তাবাবুর উপর ভারি রাগ করেছেন, তিনি বললেন 'আঁ, কথা দিয়ে এমন কাজ করা!' তিনি বলেছেন যে, আমি যদি ঐ মেয়ের সংগে ছেলের বিয়ে না দিই, তবে আমি কায়েতের মেয়ে নই।' —ঐ শোন, বাজনা শোনা যাচ্ছে—খবর দিতে আমি ছুটে এসেছি গো ছুটে এসেছি।

নীরু। (দৃঢ়ভাবে গণেশের হাত ধরিয়া) বাছা, যেমন ছুটে এসেছ, তেমনি ছুটে যাও—বরকে ফিরে নিয়ে যেতে বল। আমার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে—এই দেখ আমার জামাই। এস বাবা—"

দ্বিতীয়বার পড়বার সময় শুধু গল্পের আকর্ষণে 'শুভ বিবাহ' পড়েছি, তা নয়। শরৎকুমারীর সংগে পরিচয়ই তখন প্রধান উদ্দেশ্য। যে বইটি পড়েছি সেটিও সেই আগের বারে পড়া ১৩১২ সালের প্রথম সংস্করণের বই নয়। সেবার উপন্যাসে শরৎকুমারীর নাম ছিল না কোথাও। শোনা গেছে, রবীন্দ্রনাথ 'নবপর্যায়-বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ করবার জন্যে পেনসিলে লেখা পাণ্ডুলিপিটি ধরেই টানাটানি করেছিলেন কিন্তু শরৎকুমারীকে রাজী করাতে পারেননি। পরে শরৎকুমারী উপন্যাসটি প্রকাশের অনুমতি দিলেও কিছুতেই নিজের নাম প্রকাশ করতে দেননি। একেবারে নাম-গোত্রহীন অবস্থায় 'শুভ বিবাহ' ১৩১২ সালের চৈত্র মাসে (২৬ মার্চ ১৯০৬) প্রকাশিত হয়। তবু যে উপন্যাসটি একেবারে হারিয়ে যায়নি সে শুধু শরৎকুমারীর লেখার গুণে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সংগে শরৎকুমারী ও তাঁর স্বামী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর যোগ অনেক দিনের। 'ভারতী'র সান্ধ্য মজলিসে তাঁরা ছিলেন উৎসাহী এবং নিয়মিত সভ্য। 'ভারতী'তেই লেখিকা রূপে শরৎকুমারী আত্মপ্রকাশ করেন, যদিও এ ব্যাপারে তাঁর ছিল প্রবল অনীহা। মেয়েদের নিয়ে, কলকাতার স্ত্রী-সমাজ নিয়ে কিছু কিছু রস-রচনা লেখার পরই তিনি 'শুভ বিবাহ' লিখেছিলেন। সেই তাঁর প্রথম উপন্যাস লেখা। বিষয়বস্তু খুবই সামান্য। সামান্য বিষয় নিয়েই উপন্যাস লিখতেন তিনি। এর পরে লেখা যৌতুক আর সোনার কিনুকও এমনি সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে লেখা।

এই একই কাহিনী নিয়ে বাংলায় বোধ হয় কম করেও গোটা কুড়ি পঁচিশ গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে। কিছু কিছু পড়েওছি। কিন্তু তার মধ্যে 'শুভ বিবাহ'কে বিশেষ করে মনে রাখার কারণটা আবিষ্কার করলুম এতদিন পরে, নতুন করে পড়বার সময়। তাঁর নিজস্ব অনুভূতির স্বচ্ছ প্রকাশই উপন্যাসটিকে এত সুন্দর করে তুলেছে। নিতান্ত ঘরের কথা ঘরোয়া ভাষায় বলতে পারাও আর্ট। সহজ কথা এত সহজে বলার দুর্লভ ক্ষমতা দেখেই রবীন্দ্রনাথ শরৎকুমারীর এত প্রশংসা করেছিলেন। তিনি 'শুভ বিবাহ' প্রকাশের পরেই ১৩১৩ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন' নব-পর্যায়ে পুস্তক সমালোচনা করবার সময় প্রশংসা করে

[illegible] তাহার [illegible] যে সহজে লেখা যায়, এ কথা ঠিক নহে। নিত্য-পরিচয়ে আমাদের দৃষ্টিশক্তির জড়তা আনে—মনকে যাহা নূতন করিয়া বিশেষ করিয়া আঘাত না করে, মন তাহাকে জানিয়াও জানে না। যাহা সুপরিচিত, তাহার প্রতিও মনের নবীন ঔৎসুক্য থাকা একটি দুর্লভ ক্ষমতা। 'শুভ বিবাহে' লেখিকা সেই ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে প্রকাশ করিয়াছেন। এমন সজীব সত্য চিত্র বাংলা কোন গল্প বইয়ে আমরা দেখি নাই। গ্রন্থে বর্ণিত অন্তঃপুর ও অন্তঃপুরিকাগণ যে লেখিকার বানানো, একথা আমরা কোন জায়গাতেই মনে করিতে পারি নাই।"

পরবর্তীকলেও শরৎকুমারীর রচনার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ও কৌতূহল ছিল তাই দেখি তিনি সবুজপত্রের সম্পাদককে লিখছেন: লাহোরিনী একটা কি গল্প লিখেছেন, এমন গুজব শুনচি। আমার বোধ হয় তাঁর লেখা তুমি নির্ভয়ে 'সবুজ পত্রের' জন্য দাবী করতে পার।

'শুভ বিবাহে'র ঘটনাস্থল কলকাতাবাসী কায়স্থ সমাজের দুটি অন্তঃপুর। সমস্ত উপন্যাসটা নাটকের মতো সংলাপ দিয়ে লেখা। বর্ণনার বাহুল্য নেই, খুঁটিনাটি আছে। দুটি পরিবারের চালচলন, ভাবধারাও লক্ষ করবার মতো। ভুবনের দিদির পরিবার সাবেকীধাঁচের। সেখানে মেয়েদের স্কুলে পাঠানো হয় না তবে একটু পড়াশুনা জানা না থাকলে বিয়ে হবার জো নেই বলে পন্ডিত রেখে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো হয়। আর নীরদচন্দ্রের শিক্ষিত পরিবারে আপাত সাবেক চালচলন বজায় থাকলেও সেখানে মেয়ে-বউরা সবাই ইংরেজীতে কথা কইতে পারে, গান-বাজনা করতে জানে। "হপ্তায় তিনদিন করে মেম এসে তাদের সেলাই, ইংরাজী আর হারমোনিয়াম শেখায়।" মেয়েলি কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সমস্ত ঘটনা যেন ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

"দিদি পাকা চুল তুলাইতে তুলাইতে বলিলেন —দেখেছিস রাণী, বৌয়ের শিকলি চুড়ির গড়ন দেখেছিস, ঢ্যাপা, ঢ্যাপা—

রাণী। কিন্তু মা, বেলওয়ারি ক-গাছির চমৎকার গড়ন।

আমি। দিদি বাড়ির বৌ কেন নিমন্ত্রণ করিতে আসিল।

দিদি। আজকাল ঐ রকমই নিয়ম হয়েছে। রাণী, আমার মেজ জায়ের আক্কেল দেখেছিস, একটা পুটে বৌ দিয়ে কিনা আমাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। আমি ত যাব না, তুই কাল সেজবৌমাকে নিয়ে যাস। কালই চলে আসিস।

রাণী। মেজোকাকীর যে জ্বর হয়েছে মা, তাইজন্য আসতে পারেন নাই—দেখলে না কত করে বলে দিয়েছেন।

দিদি। বড়বউকে তো পাঠাতে পারতো, বেটার বড় চাকরি হয়েছে কি না, তাই বড় গুমর হয়েছে।

সমস্ত উপন্যাসটাই সংলাপ নির্ভর। পড়তে পড়তে মনে হয় শরৎকুমারীর পর চলতি বাংলায় এমন উপন্যাস আর লেখা হয়নি। নাটকের মতো সংলাপের মাধ্যমেই তিনি 'শুভ বিবাহে'র ছাব্বিশটি চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছেন। শরৎকুমারী নিজেও ছিলেন সুঅভিনেত্রী 'অলীকবাবু' নাটকের নায়িকা হেমাঙ্গিনীর ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি সবাইকে মুগ্ধ করেছিলেন। তাই ভুবন, ভুবনের দিদি, ননদ শ্যামাসুন্দরী রাণী, নীরদ, গণেশ, নীরুর মা, নিস্তারিণী, বিন্দি, আহ্লাদী কেউই প্রতিদিনের শত তুচ্ছের আড়ালে হারিয়ে যায়নি। নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়েছে।

শরৎকুমারী ভুবনের চোখ দিয়েই আমাদের সব কিছু দেখাবার চেষ্টা করেছেন। ভুবনের সংগে তাঁর সাদৃশ্যও প্রচুর, তিনিও ভুবনের মতোই দীর্ঘদিন কলকাতার বাইরে, সুদূর লাহোরে কাটিয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়িতে সেজন্যে শরৎকুমারীকে 'লাহোরিণী' [illegible] ভুবন বাইরে থেকে এসেছে বলেই কলকাতার নারীসমাজকে খুঁটিয়ে দেখেছে একটু দূর থেকে, এটুকু দূরত্ব না থাকলে অনেক কিছুরই ঠিক ঠিক চেহারাটা চোখে পড়ে না। দেখেছেন শরৎকুমারীও। দেখেছেন বাংলা দেশে মেয়েদের চোখে মেয়েদের কী দাম!

"দিদি। ওলো সুহাসিনী, তুই যেন দই খাসনি কোলে কচি ছেলে।

সুহাসিনী। কেন মা, ঐ দেখ নবদুর্গা খাচ্ছে ওরও তো কোলে কচি।

দিদি। ওর যে মেয়েটা—মেয়েনাড়ীতে সব সয়, তোর যে খোকাটি—বেটাছেলে, সুখী শরীর সর্দি হবে যে।"

কিংবা,

"মেয়েমানুষ, পাতের হাতের কুড়িয়ে খেয়ে মানুষ হবে—তাতে আবার ঘৃণা কি, আশীর্বাদ কর হাতের নোয়াগাছটা বজায় থাক, পাঁচ পাত কুড়িয়ে খায়।"

এ সব ছবি মেয়েদের পক্ষেই আঁকা সম্ভব, এমন সংলাপ মেয়েরাই রচনা করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথও হাল ছেড়ে দিয়ে বলেছেন "মেয়ের কথা মেয়েতে যেমন করিয়া লিখিয়াছে, এমন কোন পুরুষ-গ্রন্থাকার লিখিতে পারিত না।" অবশ্য ভুবনের সব অভিজ্ঞতাই যে এ যুগে অচল তা নয়। তার অভিজ্ঞতার শরিক হতে আজকের পাঠক বাধা পাবেন বলে মনে হয় না কারণ সমাজের বাইরের দিকটা যতই বদলাক না কেন ভেতরটা আগের মতই আছে। ভালোমানুষ ভুবন ভেবেছিল শিক্ষিত ছেলেরা লেখাপড়া জানা মেয়ে পছন্দ করে কাজেই মেয়েদের লেখাপড়া শেখালে নিশ্চয় পণ কম দিতে হবে। কিন্তু তার কলকাতাবাসিনী দিদি তাকে অবাক করে দিয়ে যখন বলে, 'সে-গুড়ে বালি বে ভাই। তুমিও যেমন, পয়সার কাছে কেউ নয়। আজকালের বাজারে মেয়ে রূপসীই হোন আর গুণবতীই হোন, বাপ একছালা টাকা ঢালতে না পারলে তার আর পারাপারি নেই।' তখন পঁচাত্তর বছরের ব্যবধান ঘুচে যায় এক পলকে।

এ যুগের পক্ষে 'শুভবিবাহ' বড়ো বেশি জটিলতাবর্জিত, সমস্যাহীন সাদামাটা উপন্যাস। কলাকৌশল বা ভাষার ছটা একেবারেই নেই। সামান্য একটুখানি গল্প, নীরদচন্দ্রের মেয়ের বিয়ে ভেঙে যাবার মতো ঘটনাটিও ঘনঘটাহীন তবু গল্পের বিনুনিতে চেনা পরিবেশ এমনভাবে বাঁধা পড়ে গেছে যে মনে হয় সমস্ত কিছুই জীবন্ত।

'শুভ বিবাহ' হয়ত ত্রুটিহীন উপন্যাস নয়। কল্পনার সংগে বাস্তবের সুচারু মিশ্রণেই গল্প উপন্যাস সার্থক হয়। কিন্তু শরৎকুমারী তাঁর কল্পনাদৃষ্টিকে দূরতর দিগন্তে প্রসারিত করবার কোন চেষ্টাই করেননি। নিজের পরিবেশটিকে নিবিড়ভাবে ফুটিয়ে তুলেই তিনি কাজ শেষ করেছেন। লেখক অতিরিক্ত পরিবেশ সচেতন হলে এবং তাঁর বাস্তবধর্মী ছবি আঁকার প্রবনতা থাকলে অনেক সময় একটা বিশেষ যুগ পার হয়ে এলে আর সেই গল্প বা উপন্যাস পড়তে ভালো লাগে না। 'শুভ বিবাহ'ও হয়ত সাময়িক রচনা তবু বহু বছর আগে লেখা 'শুভ বিবাহ' গতানুগতিক ভংগীতে পাঠকদের সামনে আত্মপ্রকাশ করেনি, এখনও তার স্বাতন্ত্র্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে আমার মনে হল না।

এখনকার পাঠকদের সযত্ন সংগ্রহে হয়ত 'শুভ বিবাহ' নেই। পুরানো বই যাঁরা খুঁজে পেতে পড়েন তাঁরাও শরৎকুমারীর উপন্যাসটি পড়েন কি না জানতে পারিনি, অনেকে নামও শোনেনি হয়ত। কেউ কেউ আবার সেকেলে মহিলার লেখা বলে অবজ্ঞাও করেন কিন্তু 'শুভ বিবাহ' সত্যিই অনাদর পাবার মতো উপন্যাস নয়। পড়তে বসলে আপনিই মনকে টানে, পরে আবার পড়তে ইচ্ছে করে।

চিত্রা দেব

# শতাব্দীর সেরা খেলোয়াড় নির্বাচন অসাধ্য কাজ

সম্প্রতি ফ্রান্সের ক্রীড়া পত্রিকা 'ল্য ইকুইপ' পৃথিবীর ২০টি প্রধান সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের ভোটে শতাব্দীর সেরা খেলোয়াড়দের এক তালিকা প্রস্তুত করেছে। সর্বাধিক ভোটে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান পেয়েছেন ফুটবলের রাজা পেলে। ভোটসংখ্যা সহ নির্বাচিত খেলোয়াড়দের তালিকাটি নিম্নরূপে :

১। পেলে (ফুটবলার—১৭৮ ভোট), ২। জেসি ওয়েন্স (অ্যাথলীট—১৬৯ ভোট), ৩। এডি মার্কস (বেলজিয়ামের সাইক্লিস্ট—৯৯ ভোট), ৪। পাভো নুর্মি (ফিনল্যান্ডের দৌড়বীর—৯২ ভোট), ৫। বিয়র্ন বর্গ (সুইডেনের টেনিস খেলোয়াড়—৭৫ ভোট), ৬। মার্ক স্পিৎজ (যুক্তরাষ্ট্রের সাঁতারু—৭৫ ভোট), ৭। এমিল জেটোপেক (চেকোশ্লোভাকিয়ার দৌড়বীর—৬৫ ভোট), ৮। ফাউস্টো কপি (ইতালির সাইক্লিস্ট—৬০ ভোট), ৯। মহম্মদ আলী (যুক্তরাষ্ট্রের হেভিওয়েট বক্সার—৫৩ ভোট), ১০। রে রবিনসন (যুক্তরাষ্ট্রের হেভিওয়েট বক্সার—৪১ ভোট)।

আমাদের কাছে এই নির্বাচন অদ্ভুত মনে হবে। কারণ সাইক্লিস্ট এডি মার্কস এবং ফাউস্টো কপির নাম অনেকেরই অপরিচিত। [illegible] এডি মার্কস পেয়েছেন তৃতীয় স্থান [illegible]।

[illegible] মধ্যে আছেন একজন মাত্র ফুটবলার, একজন টেনিস খেলোয়াড়, একজন সাঁতারু, দুজন সাইক্লিস্ট, দুজন বক্সার এবং তিনজন অ্যাথলীট। [illegible] কথা বিবেচনা করা হয়নি। [illegible] অলিম্পিক বহির্ভূত স্পোর্টস বলে ক্রিকেট [illegible] করা হয়নি [illegible] অলিম্পিকের [illegible] খেলা। এই নির্বাচনের [illegible] জানানো হয়নি। [illegible] এবং [illegible] সকলের [illegible]।

[illegible] কিন্তু এভাবে মত প্রকাশ [illegible] নির্বাচন নির্ভুল হতে পারে?

[illegible] সেন্টিমিটারের [illegible] যে সব স্পোর্টস [illegible] সম্পর্কে সহজেই রায় দেওয়া যায়। কিন্তু চোখে দেখে এবং দক্ষতা ও নৈপুণ্য সম্পর্কে অনুমান করে এক সময়ের খেলোয়াড়দের সঙ্গে অন্য সময়ের খেলোয়াড়দের তুলনা করা যায় না। সমসাময়িক খেলোয়াড়দের মধ্যেই গুণাগুণ ও যোগ্যতার তুলনা করা যেতে পারে। কারণ খেলার ধারা এবং প্রয়োগপ্রকরণ প্রতিনিয়ত বদল হয়। পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার ফলেও খেলার ধারা বদলে যায়। তাই অতীতের সঙ্গে বর্তমানের তুলনায় ফাঁক থেকে যেতে বাধ্য।

তথ্য ও পরিসংখ্যান দ্বারা শ্রেষ্ঠের স্বীকৃতি অবশ্য পৃথক কথা। প্রতিবাদের ভয় না রেখেই বলা যেতে পারে ডন ব্র্যাডম্যান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার। তবে, খেলার শৈল্পিক সুষমা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। যে খেলার সমস্ত পরিসংখ্যান পুঁথিপত্রে লিপিবদ্ধ আছে সেই খেলার শ্রেষ্ঠ নির্বাচনে যদি তর্কের অবকাশ থাকে তবে অন্যান্য খেলাধুলায় শ্রেষ্ঠ নির্বাচনের মাপকাঠি কি? না, চোখের দেখা, কানে শোনা এবং পত্রপত্রিকার প্রশংসাবাণী।

সন্দেহ নেই, সারা পৃথিবী পেলেকে ফুটবলের রাজা বলে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু পেলের সঙ্গেই এমন কিছু ফুটবলারের নাম উচ্চারিত হতে পারে যাঁরা উপযুক্ত প্রচার পেলে এবং ভাগ্য তাঁদের সহায় থাকলে শ্রেষ্ঠের দাবীদার হতে পারতেন। যেমন হাঙ্গেরীর ফেরেঙ্ক পুসকাস, স্যান্ডর ককসিস, নান্ডর হিদেকুটি, জোসেফ অর্জাসক; ইংল্যান্ডের স্ট্যানলী ম্যাথুজ, ববি চার্লটন, ববি মূর; স্পেনের ডি স্টিফানো, ফ্রান্সের জুস্ট ফন্টেন, ইতালির রিভেরা ও মাজোলা, পশ্চিম জার্মানির হেলমুট রান, হেলমুট হ্যালার, উয়ে জিলার, গার্ড মুলার, বেকেনবাউয়ার, পর্তুগালের ইউসেবিও, রাশিয়ার লেভ ইয়াসিন প্রভৃতি। আরও কিছু নাম অবশ্যই বাদ গেল। পেলে যে ব্রাজিলের খেলোয়াড় সেই ব্রাজিলেই কি অসাধারণ ট্যালেন্টেড খেলোয়াড়ের অভাব ছিল! লিওনিদাস ডা সিলভা, ডিডি, জালমা স্যান্টোস, ভাভা, গারিঞ্চা কত ফুটবল-প্রতিভা। শোনা যায় লিওনিদাসকে "ব্ল্যাক ডায়মন্ড" বলা হত বলেই পেলেকে আর "ডায়মন্ড" বলা হয়নি। বলা হত "ব্ল্যাক পার্ল"। পেলের সঙ্গে মিল রাখার জন্য "ব্ল্যাক পার্ল" নামটি অবশ্য দিয়েছিল ইংলন্ডের ক্রীড়া পত্রিকা 'ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস'। তবে ব্রাজিলের অনেকে মনে করেন পেলের চেয়েও লিওনিদাস ট্যালেন্টেড ফুটবলার ছিলেন। গারিঞ্চা, ভাভা, ডিডি এবং জালমারও কোন অংশে কম ছিলেন না। তবে কেউই পেলের মত বেশিদিন খেলা ধরে রাখতে পারেননি।

মুখ্যত বিশ্ব ফুটবলের চারটি প্রতিযোগিতায় চমক লাগানো ফুটবল খেলার জন্যই পেলের বিশ্বজোড়া নামডাক। এই চারটি প্রতিযোগিতায় পেলে গোল করেন ১২টি। কিন্তু ৫৮ সালে সুইডেনে ষষ্ঠ বিশ্বকাপের ফাইনাল পর্যায়ে ফ্রান্সের জুস্ট ফন্টেন একাই করেছিলেন ১৩টি গোল। ৫৪ সালে পঞ্চম প্রতিযোগিতার ফাইনাল পর্যায়ে হাঙ্গেরীর ককসিস এর, ১১টি গোল করেছিলেন। ৬৬তে ইংলন্ডের বিশ্বকাপের ফাইনাল পর্যায়ে পেলের ক্রীড়াদ্যুতি ম্লান হয়ে গিয়েছিল পর্তুগালের ইউসেবিওর কাছে।

পেলের অসাধারণত্বকে [illegible] আমি এসব কথা লিখছি না। [illegible] অলিম্পিয়া [illegible] কিন্তু [illegible] শতাব্দীর সেরা নির্বাচন [illegible]।

অন্যান্য নির্বাচন [illegible] চতুর্থ স্থান, [illegible] সপ্তম স্থান। নুর্মি ২০ সালের অলিম্পিকে [illegible] হাজার মিটার দৌড়ে ২৪ সালে অলিম্পিকে [illegible] হাজার মিটারে এবং ২৮ সালের অলিম্পিকে [illegible] দশ হাজার মিটার দৌড়ে সোনার [illegible] জেটোপেক ৪৮-এর অলিম্পিকে [illegible] এবং ৫২-র অলিম্পিকে দশ হাজার [illegible] দৌড়ে পেয়েছিলেন [illegible] অলিম্পিক থেকে [illegible] ৫৬ থেকে ৬৮ পর্যন্ত [illegible] অলিম্পিকে [illegible] হয়ে গিয়েছিলেন।

অলিম্পিকে একটি সোনার পদক [illegible] অলিম্পিকে [illegible] পদক জয় [illegible] পেয়েছেন ষষ্ঠ স্থান। [illegible] উপর্যুপরি [illegible] ডেনের বিয়র্ন বর্গ। [illegible] আলীর নবম স্থান পাওয়াও কি [illegible] সম্মান?

মুকুল

# সাদা ডেট'র সাদা

নতুন ফর্মুলা

## ডেট

ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার
পাউডার

অতুলনীয় ধোয়ার শক্তি, অফুরন্ত ফেনা,
সতেজ সুগন্ধ আর ধবধবে সাদা!

# আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

## আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি বই

**স্মৃতির খেয়া।** সাহানা দেবী। প্রাইমা পাবলিকেশনস, কলকাতা। পনের টাকা।

যাঁর নামেই বাজছে বসন্তের গোধূলিরাগ, সেই সাহানা দেবীর স্মৃতির খেয়া বেয়ে আমরা পার হয়ে আসি একটি আশ্চর্য, রত্নগর্ভ সময়ের পারাবার। বইটির মধ্যে অত্যন্ত মহান কয়েকটি ব্যক্তিত্বের হৃৎস্পন্দন জলতরঙ্গের মত বেজে উঠেছে সাহানা দেবীর হৃদয়ের স্পর্শে। সবচেয়ে আপ্লুত হই আমরা তাঁর অভিজ্ঞতার পটভূমির বিস্ময়ে। তার বিশালতায়, গভীরতায়, বিচিত্রতায়। এ বইতে মোট মূটি চার ধরনের স্মৃতি বিধৃত— প্রথমাংশে আছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও লেখিকার বাল্য-শৈশবের কাহিনী, তারই সমান্তরালভাবে চলে খুবই কাছের, কিন্তু মূলত ভূমিকাহীন, এক তরুণীর চোখে দেখা ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের টুকরো টুকরো গল্প। এই ভাগটিই আগে 'মাতৃহীন প্রাণ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল—বইটি সামনে নেই। কিন্তু মনে হলো না নতুন কোন অংশ যুক্ত করেছেন, বা কোনো বিয়োগ ঘটেছে। দ্বিতীয় অংশে আছেন রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির আরো অনেকে, নানা অন্তরঙ্গ উজ্জ্বল মুহূর্তে। তৃতীয় ভাগের শরিক প্রধানত তাঁর দাদা অতুলপ্রসাদ সেন, লখনৌয়ের উচ্চাঙ্গ সংগীতের মহল, দু এক ঝলক উজ্জ্বল উচ্ছল দিলীপকুমার রায়, এবং সাহানা দেবীর কিছু গুরুত্বময় সংগীতভাবনা। শেষাংশে কেবলই আধ্যাত্মচিন্তা, শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের প্রতি স্মৃতিপ্রণতি। এ অংশটি আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়লো না—বাকিগুলি পূর্বপ্রকাশিত। কয়েকজন বিরাট পুরুষের স্নেহের সংস্পর্শে এসে এই গুণময়ী মেয়েটির ক্রমবিকাশের ছন্দ এই বইয়ের পাতায় পাতায় ফুটে আছে। প্রেমই এই বইয়ের মূল সুর—মানবপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, সংগীতপ্রেম এবং অধ্যাত্মপ্রেম। এই ধাপগুলিতে পা ফেলে এগিয়ে গিয়েছে সাহানা দেবীর জীবন। মানুষকে নিয়ে মানুষকে ছাড়িয়ে বহুদূরে ছড়িয়ে গিয়েছে এ বইয়ের এলাকা। মনুষ্যজীবন যে মানুষের চেয়ে বেশী জোরালো এবং সাধন যে সংসারের চেয়ে বেশী মূল্যবান, লেখিকা কোথাও এসব কথা খোলাখুলি বলেন নি। বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই স্পষ্ট দার্শনিকতার। অথচ লেখার সহজ সরল কথা ভঙ্গির গুণে তাঁর এই গভীর জীবনবিশ্বাসটি আপনা আপনিই পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়ে যায়।

তবে হ্যাঁ, বইটি পড়তে পড়তে মনে কিছু জরুরী প্রশ্ন ওঠে, যার উত্তর বইতে পাই না। অনুচ্চারিত কিছু সত্য, অগ্রথিত কিছু সত্য, অনুত্তর কিছু জিজ্ঞাসা রয়েই যায়। কিন্তু এখানে মুখ্য অনুভব। স্মৃতির যে-অংশে প্রবল ঘূর্ণিস্রোত, খেয়া সেখানে বাইতে [illegible] অংশগুলি লেখিকা এড়িয়ে যাবেন, এই-ই স্বাভাবিক। কিন্তু নীরবতা থাকলেও অসত্যতা কোথাও নেই। যেটুকু উক্ত, সেটুকু যথেষ্টই শক্তিশালী। 'স্মৃতির খেয়া'তে দেখতে পাই সাহানা দেবী প্রধানত নিজের গল্প বলতে বসেননি—বসেছেন কয়েকজন মহৎ মানুষের ও মহৎ ঘটনার স্মৃতি-কাহিনী বলতে, সেই প্রসঙ্গেই আত্মকথা। তাই জীবনের সবটা উন্মুক্ত না করার অধিকার তাঁর আছে।

বইটির ছোট্ট মুখবন্ধ লিখেছেন শ্রীহিমঘ্ন রায়চৌধুরী। প্রায় কবিতার মতো গদ্যে। মোট সাতটি ছোট বড়ো প্রবন্ধের সংকলন এই বই, ভিন্ন ভিন্ন মানুষের কথা, কিন্তু প্রত্যেকটিই লেখিকার স্মৃতিচারণ, তাই স্বভাবতই একসূত্রে গ্রথিত। জীবনের নানা [illegible]

এক একটি অধ্যায়ে ধরা পড়েছে। বইয়ের অর্ধাংশ জুড়ে আছেন চিত্তরঞ্জন দাশ, বাকি ছয় নিবন্ধের চারটি রবীন্দ্র সংক্রান্ত, আর দুটিতে অন্যান্যেরা।

এ ধরনের বইতে আমরা যা আশা করি তা পাই এখানে পাই তার চেয়ে ঢের বেশি। ছোটো ছোটো ঘটনার মধ্যে এক একটি বিরাট ব্যক্তিত্ব ধরা পড়েছে সাহানা দেবীর বিনয়ে, তাঁর সর্বশুভদর্শী নজরে মধুময় পৃথিবীর ধূলি—অন্যায় কোনোই ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখ নেই তাঁর লেখায়। বরং বইটি পড়লে মনে হবে কেবল মধুসন্ত দিয়েই এ-পৃথিবী তৈরি। তাঁর মাতুলবংশের সকলেই ঔদার্যে মহত্ত্বে জমাতে উদাহরণ-স্বরূপ যা কিছু মানুষী দুর্বলতা সব কেবল 'খুকু' নামে পিতৃহীন দুরন্ত মেয়েটির মধ্যে নিহিত। এই পেয়ারা গাছ থেকে পড়ছে, এই পুকুরে ঝাঁপাঝাঁপি করছে, এই মামাতো বোনের সঙ্গে খুনসুটি করছে। সর্বদা নিজেকে ক্ষুদ্র করে অন্যকে মহৎ দেখানোর চেষ্টা এখানে। অনুক্ত বা অত্যুক্তির থেকে মুক্ত আত্মস্মৃতিচারণ বড় কঠিন। তবে অত্যুক্তির চেয়ে এইরকম ঈষদুক্তি ঢের ভালো।

সেকালের যে কটি বিশিষ্ট বাঙালী পরিবারের মেয়েরা আলোকপ্রাপ্ত হতে ছিলেন, তারই একটিতে সাহানা দেবীর জন্ম। সেখানেও তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র শেষ পর্যন্ত একা, নিঃসঙ্গ। গোঁড়া [illegible] ধার মেনে নিতে পারেনি। চরম শারীরিক অসুস্থতা, এবং তীব্র মানসিক অশান্তির মধ্যে যুবতী বয়সে অনাত্মীয় পরিবেশে অভিভাবকহীনভাবে বাঁচার যে একক সংগ্রামের চেহারা ফুটে উঠেছে [illegible] ভাওয়ালীর সেবাসদনে বসবাসের গল্পে—সে নিয়ে লেখিকা কোনো আলোচনা করেন নি, অভিযোগ করেননি, কৈফিয়ত দেননি। কেবল ঐ দুঃসময়ে যাঁরা পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের প্রতি আজও লেখিকার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ স্নেহ তিনি সারা জীবনই পেয়েছেন— বিশেষত ওই দুর্দিনে, কবি যেন পিতৃতুল্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। সেই ছবিটুকু পাঠকের মনে একটি শুভ্র চন্দনতিলকের মত সুরভিত ছাপ ফেলে যায়।

বইটি পড়তে পড়তে প্রতি পাতায় চমক লাগে। পারিবারিক সূত্রে তিনি এতই প্রসিদ্ধ কয়েকটি নামের সঙ্গে গাঁথা—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভাগ্নী, লেডি অবলা বসুর বোনঝি, অতুলপ্রসাদ সেনের পিসতুতো বোন, সত্যজিৎ রায়ের মায়ের তিনি মামাতো বোন, আরও অসংখ্য নাম এমনি জড়িয়ে আছে। এমন জমজমাট জনসমুদ্রে যিনি গাঁথা, সেই যুগের সব চেয়ে জরুরী মানুষদের [illegible] নিতান্ত ঘরোয়া পরিবেশে, এতে আর আশ্চর্য কী? গয়া কংগ্রেসে গিয়ে একই বাড়িতে আছেন সরোজিনী নাইডু, [illegible] সুভাষের সঙ্গে, কমলা ও পাঁচ বছরের সুন্দর টুকটুকে মেয়ে ইন্দিরাদের সঙ্গে প্রায় দেখা হত। এই নাতনীটি ছিল মোটে [illegible] [illegible] চড়াফেরা আরম্ভ হয়ে গেছে।' (পৃঃ ৬৭) সত্যি, জগতে এমন [illegible] কমই আছে। [illegible] আসামী মুক্তি পেয়ে এলে যে বাড়িতে মা মাসিদের মধ্যে অতিথি সৎকারের [illegible] ১৯১১ [illegible] ভূমিকায় [illegible] উপস্থিত হন। [illegible] রবীন্দ্রসাহিত্য [illegible] সমালোচক [illegible] রবীন্দ্রনাথ [illegible] কাছে এসেছেন সাহানা দেবীর গলায় কয়েকটি গান তুলে দিতে চান, কিন্তু

কিছুতেই গাড়ি জোগাড় হল না। অতএব জোড়াসাঁকো থেকে দিনেন্দ্রনাথ গান করতে লাগলেন টেলিফোনে। ভবানীপুরে ব্যারিস্টার সি আর দাশের ঐ ব্যস্ত চেম্বারে ফোন ধরে দাঁড়িয়ে সারা দুপুর গান শিখতে লাগলেন সাহানা দেবী। সেইভাবে সেদিন টেলিফোনেই শেখা হলো চোদ্দটি গান! (পৃঃ ১২৭) হায় রে, আমরা যদি কোন রকমে সেই সময়ে একটা ক্রসকানেকশন পেয়ে যেতুম!

সাহানা দেবীর মাসিমা অমলা দেবীর কণ্ঠ-সম্পদের জন্য কবি হিন্দী গানে বাংলা কথা বসিয়ে টপ্পা গান বেঁধে দিতেন। এইভাবেই তৈরি হয় 'চির সখা হে', 'এ পরবাসে রবে কে', 'কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে', 'দিন ফুরালো হে সংসারী' ইত্যাদি অসামান্য গান। আর সাহানা দেবীর জন্যও একইভাবে বেঁধে দেন 'মহারাজা কেওয়াড়িয়া খোলো'র সুরে কথা বসিয়ে 'খেলার সাথী বিদায় দ্বার খোলো'। 'নরমা কানহাইয়া'র সুরে তৈরি হলো 'বঁধু ওই সুদূরে ডাকিল মোরে'। শেষোক্ত গানটি গীত-বিতানে নেই; কোনো রচনাবলীতেও এটির অন্তর্ভুক্তি হয়নি ভ্রমবশত। গানটি এখানে তাই পুরোই তুলে দিয়েছেন—আর সুর তো চেনা। ওই হিন্দি গানটিতেই বাংলা কথা বসিয়ে অতুলপ্রসাদ রচনা করেছেন 'প্রাণ ভুলো না' (পৃঃ ১৩৫) এই খবরগুলি বইটির মূল্য বৃদ্ধি করেছে।

১৯২৩-এ বিসর্জন অভিনয় হচ্ছে এম্পায়ারে, সাহানা দেবী অপর্ণার ভূমিকায়। রবীন্দ্রনাথ আছেন গোবিন্দমাণিক্য ও জয়সিংহের দৈবত-ভূমিকায়। রঘুপতি দিনু ঠাকুর। বাষট্টি বছর বয়স্ক কবি যখন জয়সিংহের রূপ-সজ্জায় মঞ্চে প্রবেশ করেন তখন সাহানা দেবীর চোখ দিয়ে আমরাও মুগ্ধ নয়নে অবাক বিস্ময়ে সাক্ষী হই সেই অসামান্য দুঃসাহসের—'তাঁর সেই রূপসজ্জার মধ্যে রয়েছে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীশ্রেষ্ঠদের প্রতিভার স্পষ্ট ছাপ। (পৃঃ ১৬৪)।

ছোটো ছোটো উল্লেখের মধ্যে আমি কবির গার্হস্থ্য রূপটিও দিব্য ফুটিয়েছেন সাহানা দেবী। কবিকে যখন বলতে শুনি: 'বেলা যখন শিশু, আমি রাতে উঠে দুধ গরম করে তাকে কত খাইয়েছি', তখন সাহানা দেবীর কলমে আমাদেরও মনের কথা প্রকাশ পায়: 'সত্যিই, এসব দৃশ্য আমাদের কল্পনারও বাইরে স্বপ্নেরও অগোচর।' (পৃঃ ১৯২) কবি যখন তাঁর পুত্রবধূকে বলেন—'জানো বউমা, তোমার শাশুড়িকে আমি অনেক রান্না শিখিয়েছি?' তখন কবিকন্যা মীরা দেবীর স্মৃতিকথা মনে পড়ে যায় তিনিও পিতার রন্ধন-উৎসাহের কথা বলেছেন। মীরা দেবী, সরলা দেবী, মৈত্রেয়ী দেবী এঁদের মূল্যবান স্মৃতিকথার সঙ্গে সাহানা দেবীর বইয়ের সামগ্রিক মেজাজের কিছুটা কিন্তু পার্থক্য আছে। এতটা বিপুল বৈচিত্র্যের স্বাদ তাঁদের লেখায় পাওয়া যায় না। বর্ণনা কোথাও ঘটনার চেয়ে বড় হয়ে ওঠেনি, কথক কোথাও কথার চেয়ে প্রাধান্য পান নি। অথচ মীরা দেবীর স্মৃতিকথার মতো নিজেকে মুছে ফেলার প্রয়াসও এখানে নেই। নিজের প্রসঙ্গ সামনেই আছে, কিন্তু বৃহত্তর কোনো ব্যক্তিত্বের স্নেহের দর্পণে অনুবিম্বিত হয়ে। যেমন অহং নেই তেমনি নেই অতি বিনয়ের ক্লেদও। এমনকি নিজের প্রসঙ্গে অন্যের প্রশংসা উদ্ধৃত করার সময়েও লেখিকার মধ্যে আশ্চর্য এক জড়তাহীন, নৈর্ব্যক্তিক দূরত্ব দেখা যায়। এটা বোধহয় তাপসী যোগসাধিকারই যোগ্য সংযম।

ঠাকুরবাড়ি ছেড়ে এক সময় স্মৃতির খেয়া ভেসে আসে গোমতী নদীর তীরে লখনৌ শহরে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জমজমাট আসরে। সেখানে আমাদের দেখা হয় অতুলপ্রসাদ, ধূর্জটিপ্রসাদ, দিলীপকুমারের সঙ্গে। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেকে দেখতে পাই—'সুন্দর ধ্যানী মূর্তি। বসতেন সংগীত সভা আলো করে।' (পৃঃ ১৭৭) সাহানা দেবীর গানে তিনিও মুগ্ধ হয়েছিলেন। পণ্ডিত চন্দন চৌবের গান, মোরাদ খানের বীণা, এনায়েৎ খানের সেতার, আলাউদ্দীনের মইহার ব্যাণ্ড, বীরু মিশ্রের তবলা, হাফেজ আলির সরোদ...অতুলনীয় এক জ্যোতিষ্কমণ্ডলী উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সাহানা দেবীর প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে। সুর-সাধনা সাহানা দেবীর প্রাণরস, সংগীত তাঁর আশৈশবের ভরসা। এই সঙ্গীতের মাধ্যমেই দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। এই বন্ধুত্ব তাঁর জীবনকে এক নতুন পথে পরিচালিত করেছে। [illegible] দিলীপকুমার বলতে বাংলাদেশ [illegible] সঙ্গীতজগতের সেই [illegible] সাহানা দেবীকে দিলেন এক [illegible] জগতের সন্ধান, যার [illegible] এমন কি সঙ্গীতও [illegible] বাড়ি বাড়ি দিলীপকুমার সাহানা [illegible] যুগ্ম গানের আসরের ঝলমলে [illegible] গুলিকেও ম্লান করে দিল সেই [illegible] গাঢ় মহত্ত্বের জ্যোতি—'দিলীপকুমারের কথাবার্তা শুনেই আমি প্রথম যোগজীবনের সম্বন্ধে আলো পাই ও ধীরে ধীরে সেই দিকে আকৃষ্ট হই।' (পৃঃ ২১০)

অবশ্য সঙ্গীতের [illegible] কোনো দিনই চুকে যায়নি, তাঁর রক্তেই রয়ে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর সুর এবং কাজের মন্ত্রজাল ছড়িয়ে। আশ্রমবাসিনী, যোগিনী তপস্বিনী সাহানা দেবী যখন রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ে কথা বলেন, তাঁর অন্তরের সেই উত্তাপ ফুটে বেরোয়। 'এখনকার রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে...মনে হয় তাতে কী যেন পাই না।...দুঃখ বোধ করি এইজন্যে যে যা উনি দিয়ে গিয়েছিলেন তা আর নেই...আমরা তাকে রক্ষা করতে পারিনি।...আজকালে রবীন্দ্রসংগীত সকলেই গেয়ে থাকেন ... সঙ্গীতচর্চা এখন ঘরে ঘরে...তবু রবীন্দ্রসংগীত অনেকের মুখে তেমন ফোটে না,..... অথচ সুর হয়ত ঠিকই থাকে। ...ঠিক করে গাইলেই যে তা সব সময় রবীন্দ্রসঙ্গীত হয়, তা বলা যায় না।' (পৃঃ ১৩৮-৯) পাঠকেরা অনেকেই হয়তো সাহানা দেবীর অন্তর্দাহ অনুভব করতে পারবেন।—কীর্তনের বহুল প্রচলন ছিল দেশবন্ধুর পরিবারে। কীর্তন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কিছু মন্তব্য তুলে দিয়েছেন সাহানা দেবী, যা খুবই জরুরি। কীর্তনের বৈশিষ্ট্য চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, কেন

তা বাঙালার একান্ত নিজস্ব অমূল্য সম্পদ।'

সঙ্গীত বিষয়ে সাহানা দেবীর চিন্তাগুলি গভীর অভিজ্ঞতাপ্রসূত, মহার্ঘ। কিন্তু সঙ্গীতকে ছাড়িয়ে তাঁর জীবন ক্রমশ মিশে যায় এক মহত্তর স্রোতে, 'দিলীপের সংস্পর্শে এসে আমি জীবনকে দেখতে শিখি অন্য দৃষ্টি নিয়ে।...জীবনের গভীরতর দিকে দৃষ্টি পড়ে।' (পৃঃ ২১১) এর পরে শুরু হয়েছে সেই গভীরতর জীবনে খেয়া বাইবার কাহিনী। শ্রীঅরবিন্দ এবং শ্রীমায়ের করুণাঘন ছায়ার আশ্রয়ে এসে পৌঁছোনোর মুগ্ধবোধ কথা। আঘাতের পরে আঘাত হেনে ঈশ্বর নাচিয়ে-গাইয়ে হাসিখুশি ঝরঝরে উচ্ছল মনটাকে জোর করে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিলেন। শ্রীমার সংস্পর্শে এসে তাঁর পুনর্জন্ম ঘটল। অত্যন্ত সহজ, সরল, স্পষ্ট ভাষায় সেই রহস্যময় যৌগিক অধ্যাত্মক্রিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন তিনি, তাঁর ক্রমশ জেগে-ওঠা চৈতন্যের খবর দিয়েছেন আমাদের পড়তে পড়তে অতি বড় কালা পাহাড়েরও রোমাঞ্চ হয়। আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে, যে-মানুষের বুকে শৈশবের পিতৃবিয়োগ থেকে শুরু করে বারবার প্রবল আঘাত এসেছে, যাঁর জীবনসিন্ধু গোড়াতেই ঝঞ্ঝাতাড়িত, তরঙ্গসঙ্কুল, তাঁর মনটিকে লেখাটি কী করে এমন শান্ত-কল্লোল স্থির—যেন সরোবরের উপর ভেসে বেড়াচ্ছে। বইটি সম্পূর্ণ অস্তি-বাচক। জীবনের শান্ত, শুদ্ধ, কল্যাণ সুন্দর দিকগুলিই শুধু এখানে ধরা পড়েছে। সেই মঙ্গলদৃষ্টির মধ্যে বিকশিত হয়েছে একটি সমাহিত হৃদয়ের মাধুর্য। পাঠকের মন শ্রদ্ধায় নম্র হয়ে আসে।

তবে বইটিতে একটু সম্পাদনার প্রয়োজন ছিল। আলাদা প্রবন্ধের শিরোনামাগুলি বর্জন করে অধ্যায় ভাগ করে দেওয়া যেত। অন্যথায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির স্থান ও কালের নির্দেশ দেওয়া উচিত ছিল।

'মৃত্যুহীন প্রাণ' পরিচ্ছেদের সাধনসঙ্গীতের উদ্ধৃত মানসে শ্রীঅরবিন্দের অনুবাদও সম্পূর্ণ, তবু এই বইয়ে সে অংশটি প্রক্ষিপ্ত। তা ছাড়া কবিতাগুলো চিত্তরঞ্জনের মতন্ত্ব নতুন সহায়তা করে না—আমি আজিকে পাঁচটো কান/শুনেছি তোমারি গান, বা আমি যদি তুমি... আমারো ইংরেজি অনেকভাবে রবীন্দ্রনাথ রামপ্রসাদ, মনে পড়িয়ে দেয়। এগুলি এ বইয়ে বাদ দিলেই সবদিক থেকে ভালো হতো। তবে অরবিন্দের অসামান্য ইংরিজি অনুবাদগুলি পড়ে বুঝতে পারি সত্যি 'ট্রান্সক্রিয়েশন' কাকে বলে। দুঃখ হয় কবি অরবিন্দ রবীন্দ্রকাব্য অনুবাদে গা করলেন না বলে।

সততা এবং সারল্য উদারতা এবং আনন্দ 'স্মৃতির খেয়া'র হাল এবং দাঁড়, মাস্তুল এবং পাল। এমন বই লিখতে পারা ভাগ্যের কথা। পড়তে পাওয়া যে সৌভাগ্য বটেই।

**নবনীতা দেব সেন**

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চিত্রকলা**

## হাজার খোকার কাণ্ড

ফেব্রুয়ারীর শেষ তিনটে সপ্তাহে চারিদিকে শিশু চিত্রপ্রদর্শনীর ধুম পড়ে গেল। শিশুমাত্রই সম্ভাবনার আধার এবং শিল্পকলার মাধ্যমে শিক্ষা দিলে তারা ধরতে পারে তাড়াতাড়ি। এমন কী তাদের বুদ্ধির শান (আই কিউ) বেড়ে যায় মনস্তাত্ত্বিকরা দেখেছেন। শিশুর সৃজনী-শক্তির উৎস খুলে দেওয়া এবং তোড়কে বাঁধ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার দিক দিয়ে শিল্পকলার মতো কিছু নেই। সে নিজেকে এবং বাইরের জগৎটাকে আবিষ্কার করে রঙরেখা কাদামাটি ঘাঁটতে ঘাঁটতে। সবাই যে শিল্পী হয় তা নয়। কিন্তু শিল্পকলা তাকে দেয় নন্দনবোধ এবং সুরুচি। ইংরাজী মাধ্যম স্কুলগুলি একথা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু তথা-কথিত ইংরাজীবিবস মাধ্যমিক পর্ষদের বড় কর্তাদের ঘটে এটা ঢোকেনি, সুতরাং চারুকলাকে নির্বাসন দিয়েছেন তাঁরা। কল্পনার নাকের বদলে হাতের কাজের নরুন পেয়েছে শিশুরা।

ইদানীং বসে আঁকা প্রতিযোগিতা থেকে পাড়ায় পাড়ায় শিশু চিত্রশিক্ষার কেন্দ্র গজাচ্ছে বলে আমি খুশি। এরা হয়তো বড় হয়ে বাবা মায়ের চেয়ে শিল্প-কলাকে ভালবাসবে বেশি। শিল্পীদের প্রাপ্য সম্মান দেবে। কিন্তু এইসব কেন্দ্র-গুলির বার্ষিক প্রদর্শনীকে যথার্থ শিল্পীদের প্রদর্শনীর চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে দেখে, আমার ভাল লাগছে না। শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত চলচ্চিত্র, মঞ্চ, শিশু চিত্র, ফোটোগ্রাফ এবং কৃষ্ণনগরের পুতুল ছাড়া বেশি বোঝেন না।

গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন পরি-চালিত সারদা দেবী শিশু চারুকারুকলা কেন্দ্রের প্রদর্শনী বিবেকানন্দ হলে অনুষ্ঠিত হল। এটা দেখাশুনা করেন কথুবর রামানন্দ বন্দোপাধ্যায়। তিনি অবশ্য শিশুদের আর্ট স্কুল খুলেছেন। মেসোনাইট বোর্ডের শিরিষের আঠা আর মেটে রঙ দিয়ে বড় ছেলেমেয়েরা ম্যুরাল-ধর্মী কাজ করেছে। রামানন্দ ভারতীয় পুরাণ মহাকাব্যের জগতের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ছবির পরম্পরা সম্বন্ধে অবহিত করেছেন ছাত্রছাত্রীদের। সৌমেন্দ্রনাথ সুর শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি হাতে এঁকেছে মন দিয়ে। তেমনি ভাল লেগেছে প্রদীপ সুরের সমুদ্রমন্থন দৃশ্য।

রামানন্দ মাটিতে জল রঙ আঠা গ্লিসারিন দিয়ে রেখে তারপর ছবি এঁকে হাতের জোরে ছবির ছাপ তোলাতে শেখাচ্ছেন। বস্তুত অন্য কোনো কেন্দ্রে ছাপাই ছবি হয় না। এছাড়া আমার ভাল লেগেছে কিছু পুষ্প পর্যবেক্ষণের ছবি। বিশেষত আশীষ মুখার্জীর কাজ। দারুন হচ্ছে আচার্য রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নাতনী পিয়ালীর একটি ফুলের কাজ। আর অভীক সেনগুপ্তের কোলাজ। ইন্দ্র-দীপের ঢাকুরিয়া ব্রীজের কাজটি বড় ভাল।

আকাদমী অব ফাইন আর্টসে "বাণী-চক্রের শিশুচিত্র বিভাগের" বিরাট প্রদর্শনী হলো। অজিত গুপ্ত শিশুদের নিয়ে যে কাণ্ড কারখানা করেছেন তা ভাবা যায় না। তিন শ ছবির বিরাট প্রদর্শনী। অজিত সোমনাথ হোড় এবং বিজন চৌধুরীর সহপাঠী। শিশুর কল্পনার দ্বার খুলে দেবার ব্যাপারে তাঁর জুড়ি নেই। তিনি বলেন ছাত্রদের এক-জনকেও তিনি শিল্পী হিসাবে দেখতে চান না। বরং তাদের সমাজদার হিসাবে তৈরী করতে চান। তিনশ শিশু কি ভীষণ কল্পনার দৌড় লাগাতে পারে এই প্রদর্শনী তার প্রমাণ।

তেমনি বালিগঞ্জ ইনস্টিটিউটের ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির সভাপতি স্বর্বিকাবাবুর ছাত্রছাত্রীর কাজ। কিন্তু আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে হাওড়ার তপন মণ্ডলের "বর্ণালীর" কাজ। অন্য-ক্ষেত্রে শিশুদের তোড়কে বাঁধ দেবার চেষ্টা হয়েছে। তপন সেক্ষেত্রে কল্পনাকে অগাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন। বিদেশী শিশুচিত্রের বইতে যে ধরনের মুক্তপক্ষ শিশুদের কল্পনাকে উড়ে যেতে দেখা যায়, তপনের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সেটা দেখলাম। এই অবাধ স্বাধীনতা আমার ভাল লেগেছে।

নিবেদিতা ঘোষ

## নবীন যুবক রূপে শিল্পীর প্রতিকৃতি

নাম এ্যালিস্টার গ্রান্ট। পেশায় চিত্র-শিল্পী। লণ্ডনের রয়েল আর্ট কলেজের ছাপাই ছবির বিভাগের প্রধান অধ্যাপক. পড়াশুনো করেন বার্মিংহাম আর্ট স্কুল এবং রয়েল আর্ট কলেজ। পশ্চিম ইউ-রোপের নানা দেশে প্রদর্শনী করেছেন। বয়স বছর চুয়াল্লিশ। আগামী হেমন্তে কলকাতায় 'ব্রিটিশ ছাপাই ছবির গত পঞ্চাশ বছর' (১৯২৮-৮০) বলে বিরাট প্রদর্শনী আসছে। অ্যালিস্টার তার আগে এসেছিলেন। এদেশের নানা আর্ট কলেজ ঘুরে তিনি কাজ দেখিয়েছেন। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হোটেলের রেস্তোরাঁয় আমার সঙ্গে শিল্পকলা প্রসঙ্গে নানা আলোচনা করলেন।

বললাম : কি দেখলে এ্যালিস্টার?

এ্যালিস্টার : বড্ড বড় দেশ আর প্রাচীন। এক মাসে এর তল খুঁজে পাব?

আ : তবু?

এ : তোমাদের দেশের দেওয়ালচিত্র ভাস্কর্য, অণুচিত্র এবং লোকচিত্রের বৈচিত্র্যে আমি বুঁদ হয়ে গেছি।

আ : আধুনিক কাজ?

এ : দেখেছি বড় কম। ব্রিটিশ কাউন-সিল আমাকে ঘুরিয়েছে নাকে দড়ি দিয়ে। প্লেন, এয়ারপোর্ট, হোটেল এবং আর্ট কলেজ। অধ্যাপকদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাইনি। ছাত্রদের সঙ্গে কেটেছে। এই দেখ গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের ছাত্রদের উপরোধে লিথোগ্রাফ করলাম—নখে এখনও কালির দাগ। ছাত্রদের সঙ্গে কাজ করতে হয় লণ্ডনে। আর চেয়ে খুশি হতাম শিল্পীদের সঙ্গে আড্ডা মেরে। তাদের কাজ দেখে।

আ : আর এখানকার ছাপাই ছবি?

এ : টেকনিক টেকনিক করে এখানে ছাপাইকাররা বড় বাড়াবাড়ি করছে।

আ : এখানে কেউ কেউ হেটারের কাছে প্যারী গিয়ে কাজ শিখেছিলেন—সেইজন্য এই বিপত্তি।

এ : হেটার ইজ এ ডিসেস্টার। এক কৃষ্ণ রেড্ডী বাদ দিলে ওর কাছে যাঁরা কাজ শিখেছেন তাঁরা হেটার-মার্কা কাজ করেন। এচিঙে রেখার আঁকিবুকি কাটা নতুন নয়। তবে তোমাদের এখানে 'সফট গ্রাউণ্ড', 'ডিপ বাইট', 'একুয়া টিণ্ট' এত শুনেছি যে মনে হয় যে চিত্রভাষা আর নন্দনতত্ত্ব এঁরা ভুলে গেছেন।

আ : তা হলে ছাপাই ছবি......

এ : শোন একটা কথা বলি। ইতি-হাস দেখলে দেখবে বড় শিল্পীরাই ভাল ছাপাইকার। ডুয়েরার, রেমব্রা, গোইয়া, পিকাশো, হোগার্থ সমকালীন হকনী পর্যন্ত সবাই প্রমাণ মাপের ক্ষেত্রে বড় শিল্পী। ছাপাই ছবি যাঁরা শুধু করেন তাঁরা খাটো মাপের শিল্পী। ক্ষেত্রটাই সংকীর্ণ। রয়েল একাডেমীর ছাপাই বিভাগে আমরা বড় বড় শিল্পী-দের ডাকি। হেনরী মুর ফ্রান্সিস বেকন, আর সব নামী-দামী শিল্পীরা আছেন। তাঁরা অবলীলায় দারুণ কাজ করেন। যে

এ্যালিস্টার গ্রান্টের ছবি

# নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাস... সুস্থ সবল দাঁত

## কোলগেট
ডেন্টাল ক্রীমের গুণে

প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। আপনার দাঁতকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে সারা পৃথিবীতে দাঁতের ডাক্তাররা এই উপদেশই দেন।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ফলে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আসে, পরে দাঁতে যন্ত্রনাদায়ক ক্ষয়রোগের শুরু হয়ে যায়।

সুতরাং প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। দাঁতকে সাদা ঝকঝকে করে তুলে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দাঁতের ক্ষয় রোধে কোলগেটের অসাধারণ ক্ষমতা বহুবার প্রমাণিত হয়ে গেছে।

**কোলগেটে এমন এক চমৎকার তাজা মিন্টি স্বাদ রয়েছে যে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত ব্রাশ করতে ইচ্ছা করবেই।**

**কোলগেটের নির্ভরযোগ্য ফরমূলা কি ভাবে কাজ করে!**

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়রোগের জীবাণু জন্ম নেয় দাঁতের ফাকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে।

কোলগেটের প্রচুর ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে অবাঞ্ছিত খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু দু'ইই দূর করে।

ফলাফল: সাদা ঝকঝকে দাঁত, নির্মল তাজা শ্বাস-প্রশ্বাস ও দন্তক্ষয় রোগ প্রতিরোধের দৃঢ় মনোবল।

**কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন... দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!**

Colgate DENTAL CREAM

DC.G.74 BN

ই ছাপাই ছাব করে সে খুব বেশ এগোয় না। লক্ষ করে দেখো। মরা ছাত্রদের তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে রো দমে কাজ করতে বলি। তুমি নো আমি তৈলচিত্রকর।

আ : শিল্পীর মর্যাদা প্রসঙ্গে বল।

এ : ইংলণ্ডে? বড় শিল্পীদের কথা দাও। তরুণ শিল্পীদের লড়তে হয়। ব্রিটিশ ঐতিহ্যটাই সাহিত্যিক। ের প্রেমে পড়া জাত— আবার রামান্টিক। শিল্পকলা বড় জোর গরীব মাত্মীয়র মতো। তবে হেনরী মুরের ব্রিটিশ ভাস্কর্য আন্তর্জাতিক মান পেয়েছে। তেমনি সুর রচনায় বেঞ্জামিন ব্রিটন।

আ : আর মার্কিন চিত্রকলা ইউ-রোপকে ডুবিয়েছে তো?

এ : সে ধাক্কা সামলে গেছে। এখন জার্মানিতে প্রচুর কাজ হচ্ছে। সরকার পৌরসংস্থা সবাই শিল্পীর পৃষ্ঠপোষক। ফরাসীরা বরং কিছুটা ঝিম মেরে গেছে। শিল্পীরা অনেকটা ফুলগাছের মতো। তার জন্য পরিবেশ তৈরি করতে হয়। গোড়াটা নিড়িয়ে দিতে হয়। ঝাঁঝরিতে জল দিতে হয়। চারপাশে আগাছা সাফ করতে হয়। গুপ্ত থেকে মুঘল আমল পর্যন্ত তোমরা তাক লাগিয়ে দেবার মতো কাজ করেছ। কেন? শিল্পীর তো পৃষ্ঠপোষক সবাই একযোগে কাজ করেছিল বলে। ফতোয়া জারি করে যক্ষিণী বা মিথুন মূর্তি করতে কেউ কি তোমাদের বারণ করেছিল? কিন্তু শিল্পকলা-সমালোচক— তোমরা আমাদের বন্ধু, উপকারী, কিছু বল শুনি।

আ : তোমার সঙ্গে এতই একমত যে নতুন করে বলার কিছু নেই।

সন্দীপ সরকার

---

আলোচনা : শিল্প সংক্রান্ত **চলচ্চিত্র**

## থোড়িসি বেবফাই

আরম্ভ আদালত দৃশ্যে নীমা (শাবানা আজমি) তার স্বামী অরুণের (রাজেশ) কাছ থেকে বিচ্ছেদ চায়। বিচারক বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর না করে পৃথক থাকার নির্দেশ দিলেন। রায় হল ওদের পুত্র নন্দুর চৌদ্দ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত তার মায়ের কাছে থাকবে এবং অরুণ প্রতি রবিবার বিকেল চারটে থেকে ছটা পর্যন্ত পুত্রকে দেখে আসতে পারবে। নীমা পুত্র নন্দুকে নিয়ে পিতৃগৃহে উঠল। এর পরই ফ্ল্যাশব্যাক দৃশ্যে ওদের পৃথক থাকার কারণ জানা গেল। প্রেম করেই ওদের বিয়ে হয়। নীমার পিতা (শ্রীরাম লাগু) আয়কর দপ্তরের দুঁদে অফিসার আর অরুণের পিতা (এ কে হাঙ্গল) হীরক ব্যবসায়ী। অরুণকে একটি মহিলার সঙ্গে রেস্তরাঁয় বসে হাস্যালাপ করতে দেখেই নীমা তার স্বামীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। মহিলাটি কে এবং অরুণের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক না জানতে চেয়েই ওই ঠুনকো অজুহাতেই নীমা স্বামী গৃহ ত্যাগ করে। ওরা পৃথক হবার পরই দুটি পরিবারই সর্বস্বান্ত হয়। অশেষ দুঃখকষ্ট সহ্য করে নীমা নন্দুকে স্কুলের পাঠ শেষ করালো। কলেজে ভর্তি হওয়ার

রাজেশ খান্না ও শাবানা আজমি

সূত্রেই তার পিতৃদর্শন ঘটে। শেষে নীমা ও অরুণের ঘটে পুনর্মিলন—কিন্তু দুর্ঘটনায় নন্দুকে আহত করে হাসপাতালে না আনা ব্যতিরেকে কাহিনীকার-পরিচালক এসমাঈল শ্রফ আর কিছু কল্পনাও করতে পারেননি। বস্তুত মনোজ্ঞ বিষয়বস্তু চিন্তা করলেও ঘটনার পরিকল্পনায় শ্রীশ্রফ গতানুগতিকতার বাইরে যেতে পারেননি। উপরন্তু নীমা ও অরুণের মানসিক সংঘাত পরিস্ফুট করে তোলার বা রসম্পুষ্ট নাটকীয় মুহূর্ত গড়ে তুলতে নিজের ব্যর্থতা চাপা দিতে বারবার স্বপ্ন-দৃশ্যের অবতরণা ঘটিয়েছেন। এছাড়া অরুণ ও নীমার পরিবারের একপাল চরিত্র সৃষ্টি করে শ্রীশ্রফ আসল সমস্যাকে কেন্দ্রচ্যুত এবং ফিকে করে দিয়েছেন।

রাজেশ খান্না 'রোমান্টিক হিরো'র চেয়ে কথায় ও অভিব্যক্তিতে খল নায়কের চরিত্রই মনে করিয়ে দেন—যা হবার কথা নয়; এক দঙ্গল চরিত্রের মাঝে শাবানা আজমি চাপা পড়ে যান। মৈন-উদ্-দীন রচিত উর্দুপ্রধান সংলাপাংশ উপভোগ্য। ভাল লাগবে খ্যায়েম সুরযোজনা।

## কালো চোখের তারা

আরম্ভতে দেখা গেল একটি মেয়ে রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে.... দর্শক দেখে একটি মৃতদেহ এবং শোনে মেয়েটির আর্তস্বর। পরে জানা যায় মৃতদেহটি ছিল ওই মেয়েটি, যার নাম চম্পা (মহুয়া রায়চৌধুরী) তার মা। পরেই দেখা গেল একটি ঘরের দৃশ্য। চম্পার মামা আশ্রয়দানে অপারগতা জানাল। এর পরই জমিদার রাজনারায়ণের (বিপিন গুপ্ত) ড্রয়িংরুম। রাজনারায়ণ রঞ্জন নামক এক যুবককে নির্দেশ দিচ্ছেন চম্পার দেখাশোনা করার। ডঃ রামনারায়ণ (কমল মিত্র) আসে রিসার্চের জন্য দাদা রাজনারায়ণের কাছে টাকা চাইতে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। এরপরই একজোড়া পা শায়িত রাজনারায়ণের কাছে পৌঁছয়। পরেই জানা গেল রাজনারায়ণের মৃত্যু হয়েছে। পরের দৃশ্য অ্যাটর্নি মহীতোষ মিত্রের (সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়) অফিস। সামনে বসা চম্পা। মহীতোষ চম্পাকে জানালেন রাজনারায়ণের উইল পড়া হবে মুঙ্গেরে এবং সেখানে চম্পাকে হাজির থাকতে হবে। চম্পা সেখানে পৌঁছতেই রঞ্জন বাগানময় নেচে নেচে গাইতে থাকে 'এখানে এলে তুমি মরবেই'। চম্পা (ফ্ল্যাশ ব্যাকে) জানতে পারল তার পিতা রাজনারায়ণের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং অসবর্ণ বিবাহ করার জন্য ত্যাজ্যপুত্র হয়। অ্যাটর্নি মহীতোষ চম্পাকে একটি সিলকরা খাম দেয়। চিঠিতে রাজনারায়ণ জানিয়েছেন চম্পা যেন তাঁর সেক্রেটারি সুপর্ণকে (কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়কে) বিয়ে করে। সুপর্ণও অনুরূপ চিঠি পায়। সঙ্গে সঙ্গেই চম্পা ও সুপর্ণর প্রণয়-সঙ্গীত দৃশ্য। উইল পড়া হতে জানা গেল চম্পা রাজনারায়ণের বিষয়সম্পত্তির অর্ধেক অর্থাৎ নগদ পাঁচ লাখ টাকা, বিশ হাজার টাকার গহনা এবং গঙ্গার ধারের বিরাট বাড়ির উত্তরাধিকারিণী। এরপর বিভিন্ন চরিত্রের সন্দেহজনক গতিবিধি। চম্পাকে রাত্রে ভয় দেখান। চম্পার মামাতো বোনকে হত্যা। পরিচারিকা রাধার মৃত্যু। মাঝে কমিক-উকিল জয়ন্তর (চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়) অসংলগ্ন কথাবার্তা দিয়ে পরিবেশ লঘু করার চেষ্টা। শেষে গোয়েন্দা বাসবের (অনিল চট্টোপাধ্যায়) আবির্ভাব এবং বলা বাহুল্য খুনের কিনারা। খুনীর গ্রেপ্তার হওয়া পর্যন্ত সারা ছবিখান বিক্ষিপ্ত দৃশ্যের মিছিল দর্শকমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনীটির চিত্রনাট্যকার - পরিচালক পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায় রহস্য অনুধাবনে অক্ষমতাবশত এমন বিন্যাসধারা অনুসরণ করেছেন যাতে রোমাঞ্চের কোন স্বাদই পাওয়া যায় না। রহস্যের সমাধান ঘটানো হয়েছে কাজে দেখিয়ে নয়, সংলাপের সহায়তায়। আর সে সংলাপ অনিল চট্টোপাধ্যায়ের মত ক্লান্ত ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ একজন শিল্পীর মুখনিঃসৃত হওয়ার জন্যই শেষ পর্যন্ত বসে থাকা যায়। নতুবা শুরু থেকে একটানা খাপছাড়া অসংবৃত দৃশ্য ও চরিত্র দেখতে দেখতে উত্ত্যক্ত হতে হয়। ছবির নামের সঙ্গে পর্দায় প্রতিফলিত ঘটনার মিল খুঁজতেও হয়রান হতে হয়।

পঙ্কজ দত্ত

---

আলোচনা : শিল্প সংক্রান্ত **সংগীত**

## রবীন্দ্রসদনে গানের আসর— 'প্রকৃতি' পর্যায়

'প্রকৃতি' পর্যায়ের গানের প্রথম আসরটি বসেছিল ১৫ মে সন্ধ্যায়। শুরুতেই 'বাণীচক্র' 'আকাশভরা সূর্য-তারা'য় তাঁদের স্থান পাওয়া এবং বিস্ময়ে গান জেগে ওঠার বিস্ময়কর পরিচয় রাখলেন অসহ্য সিমফনি মিশিয়ে। চন্দনা রায়কে দিয়ে শুরু হল একক সংগীতের আসর। গায়কী নেই,

সুর লাগে না, গলায় কাঁপে। ইন্দ্রাণী চক্রবর্তীর 'মনে হল যেন' সকরুণ নিবেদনের গন্ধ-ঢালা, কোথা যে উধাও হল'তে বরং প্রতিশ্রুতির আভাস মিলল। নির্মাত বসুর গানে দখিন হাওয়া প্রাণ জাগায়নি, পূর্ণ চাঁদের মায়াও অপূর্ণ নিবেদন। ধীরেন চট্টোপাধ্যায় 'যদি জানে নাই চিনিতে' নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অনুভা মৈত্র ছাপ ফেলতে পারেননি। তমালিকা গুহর 'আমার দিন ফুরালো'তে প্রার্থিত অভিব্যক্তি ছিল। ইলা মন্সীর সবল, সুরেলা, স্বচ্ছন্দ ভঙ্গির দুটি গানই রমণীয় নিবেদন। চিত্ত বসুমল্লিকের দাঁত-চাপা ভঙ্গি ভালো লাগেনি। ভালো লাগনি মীনাক্ষি মুখোপাধ্যায়ের শুষ্ক কণ্ঠের গানও। গৌতম মিত্রর কণ্ঠে 'আকাশ আমার' যেমন সজীব, 'গহন ঘন ছাইল' তেমনই আধুনিক এবং উৎকট। 'কী হবে কে জানে'-তে আকুলতা রয়েছে রয়েছে ভয়বিহ্বলতা, একথা সত্যি কিন্তু গৌতম মিত্র এমন ভঙ্গিতে উচ্চারণ করেন যে, মনে হয় ভূতের গল্পের সাসপেনস লুকনো রয়েছে ওই শব্দ কটিতে। রম্ভা গোস্বামীর মাইক-নিয়ন্ত্রণ অনুশীলন করা প্রয়োজন, বেশি কানে লাগে। দীপ্তি চট্টোপাধ্যায়ও সবল, কিন্তু প্রয়োজনীয় কোমলতা প্রয়োগ করতে জানেন। সুনীল মল্লিক-এর গায়ন-ভঙ্গিতে নিজস্বতা নেই, কিন্তু হেমন্তের গান নির্বাচন করেছেন, এজন্য সদন কর্তৃপক্ষের তথা শ্রোতৃ-মণ্ডলীরও কৃতজ্ঞতাভাজন॥ শীতের গান গাওয়াই হয় না, হেমন্তও অচ্ছুত হয়ে থাকে প্রায় প্রতি বছর। বুলবুল ভট্টাচার্য সুন্দর বেছেছেন 'এসেছিনু দ্বারে তব।' গেয়েছেনও সুন্দর। শেষ গানেরই রেশ'-এ তাঁর কণ্ঠ কিছুটা চাপা লেগেছে। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠার মহিমায় চারখানি গান গেয়েছেন, গানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। 'এসো শ্যামলসুন্দর'-এ খোল ব্যবহার করলেন, নতুনত্ব না পরীক্ষা বোঝা গেল না। সুমিত্রা বসু নিঃসন্দেহে এদিনের স্মরণীয় শিল্পী। 'একী গভীর বাণীর' প্রতিটি এ কী-তে বিস্ময়কে আশ্চর্য ব্যঞ্জনায় শরীরী করে তুলেছিলেন সুমিত্রা বসু। মনে গেঁথে যায়। আর বিস্মিত করেছেন নবীন শিল্পী ঋতুপর্ণা ভট্টাচার্য 'বন্ধু রহো

জয়শ্রী ঘোষ

পূরবী মুখোপাধ্যায়

রহো' গানটিতে। সূক্ষ্মতম স্বর অনায়াসে স্পর্শ করল তাঁর কণ্ঠ, গানটির অন্তর্লীন ঐশ্বর্যকে তুলে ধরল পূর্ণমাত্রায়। কিন্তু দ্বিতীয় গানে—'আজি ঝড়ের রাতে' তেমন স্বচ্ছন্দ মনে হয়নি তাঁকে। 'আকাশ কাঁদে হতাশ-সম' প্রথমবার ভুল করে বললেন, 'বাতাস কাঁদে'। পরে অবশ্য শুধরে নিয়েছেন।

'প্রকৃতি' পর্যায়ের দ্বিতীয় আসর ছিল ১ জুন সকালে। রবিচক্রের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্যে 'আজি এই গন্ধবিধুরে'-এ হারমোনির প্রয়োগ সংযত। প্রথম শিল্পী তপতী রায়ের স্নিগ্ধতা কম, কিন্তু সবলতা রয়েছে। সুনীতা মুখোপাধ্যায় মোটামুটি। মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় চমৎকার গেয়েছেন 'এ কী আকুলতা'। গভীর, সুরেলা তাঁর কণ্ঠ। জয়শ্রী ঘোষ প্রথম গানেই বুঝিয়ে দিলেন, ভাবে-রসে আপ্লুত করে গান শোনাতে এসেছেন তিনি। 'চিত্ত আমার হারালো' শান্ত, অনুরণনময় নিবেদন। দ্বিতীয় গানে—'আজি হৃদয় আমার'—তিনি আরও মেজাজী, অর্থ-অনুসরণকারী, অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠলেন। গান থেকে রসটুকু নিংড়ে পরিবেশন করলেন যেন। নূপুর চক্রবর্তী 'এই শ্রাবণবেলায়' নিজেকে তুলে ধরতে পেরেছেন। অবাক করলেন শুভজিত চৌধুরী, সত্যিই নীরস তাঁর ... রস নাই'। প্রথম কলিটি মনে ... স্বীকারোক্তি। সুতপা দেব-এর গানও কোলাহলময়। উমা বন্দ্যোপাধ্যায় 'বসন্তে কি শুধু' খারাপ গাননি, কিন্তু প্রথম গানটি বড্ডোই নিষ্প্রাণ নিবেদন। শিশির বন্দ্যোপাধ্যায় অচল। শ্রীপর্ণা ভট্টাচার্য খুবই আচ্ছন্ন ভঙ্গিতে শোনালেন এবার। দুটি গানই সুন্দর। বিশেষত, 'বন্ধু রহো রহো'তে তিনি নিজেকে ছাপিয়ে উঠেছিলেন। রেশ রেখে গেছেন এই গানে। বীথিন বন্দ্যোপাধ্যায়ও বেশ যত্নবান ছিলেন এবার। 'মধ্যদিনের' এবং 'প্রখর তপন তাপে' দুটি গানই সাবলীল পরিবেশন। রুণা মতিলাল-এর 'বুঝি এল' প্রাণবন্ত পরিবেশ তৈরি করেছিল। বিভাস ঘোষের কণ্ঠটি পরিচ্ছন্ন, গায়কীও সুন্দর। দুটি গানই রসোত্তীর্ণ, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য

'তিমির অবগুণ্ঠনে'। প্রতিমা মুখোপাধ্যায়-এর নিবেদনে জীর্ণতার ছাপ প্রকট। প্রসাদ সেন-এর 'ধরণী দূরে চেয়ে' এবং 'কোথা যে উধাও হল' নিপুণ। নৈপুণ্য ছিল সুপ্রিয়া রায়চৌধুরীর প্রথম গানটিতেও। দ্বিতীয় গানে মন্দ্রসপ্তকে কণ্ঠ অশ্রুত থেকেছে। পূরবী মুখোপাধ্যায় দ্রুত ছন্দের গানে আসর মাতিয়ে তোলেন। এবারেও তাই। 'বসন্তে আজ ধরার চিত্ত' সপ্রাণ, 'মোর বীণা উঠে' জমজমাট। আসরের শেষ শিল্পী ছিলেন কমলা বসু। 'এসো শরতের অমল মহিমায়' জানিয়ে দিলেন তাঁর কণ্ঠের অমল মহিমা এখনো কী অম্লান। তৃতীয় গানের জন্য অনুরোধ ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রসদন সে-অনুরোধে কান দেননি, পরদা নেমে এসেছে আকস্মিকভাবে।

## গীতালির গান

রবীন্দ্রসদনের রবীন্দ্রজন্মোৎসবের আসরের শেষ সন্ধ্যাটি প্রতি বছর 'ইন্দিরা' শিল্পীগোষ্ঠী কোনো-না কোনো তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানে ভরিয়ে তোলেন। আটাত্তরে তাঁরা উপহার দিয়েছিলেন গীতাঞ্জলির গান, ঊন আশিতে গীতিমাল্যের গান, এবার তাঁদের নিবেদন 'গীতালির গান'। গীতাখ্য গ্রন্থত্রয়ের আলোচনাসহ গানের মধ্য দিয়ে তাঁদের একটি পরিক্রমার অবসান ঘটল। সে-পরিক্রমায় শুধু গান শোনানোই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, ছিল কিছু জিজ্ঞাসা এবং কিছু উত্তর-অনুসন্ধান।

সন্দেহ নেই যে, 'ইন্দিরা'র কাছে শুধু নয় ভাষ্য-রচয়িতারূপে শঙ্খ ঘোষের কাছেও শ্রোতৃমণ্ডলীর বিস্তর ঋণ এই তিন বছরের জমা হয়েছে। গীতাখ্য এই গ্রন্থমালার সামগ্রিক নিজস্ব গড়নটিকে তিনি যেমন বিচার করেছেন তেমনই অনুপুঙ্খের বিচারে খুঁজেছেন এদের সাদৃশ্য ও ভিন্নতা, কবিমনের পরিণতির তিন স্তর, এই কাব্যত্রয়ের সমকালীন রচনার সঙ্গে আত্মিক সাযুজ্য, এই পর্বের উপার্জনের সঙ্গে সারা জীবনের সম্পর্ক।

'ইন্দিরা' গোষ্ঠী এবার পাঠের অংশ একটু কমই রেখেছিলেন। শুধু ধরিয়ে-দেওয়ার কাজটুকুর জন্য ভাষ্য। মোট চারটি পর্ব। প্রতি পর্বের শুরুতে পাঠ, তারপর একের-পর-এক গান। গানের মধ্যেও যদি থাকত কিছু ভাষ্য, হয়তো স্পষ্টতর হয়ে ধরা পড়ত ব্যঞ্জনা, সূক্ষ্মতর অনুধাবনের পথ হত সুগম। তবু যেটুকু ছিল, তার মূল্যও কম নয়।

'ইন্দিরা' শিল্পীগোষ্ঠী

গানের অর্ঘ্যেও 'ইন্দিরা' গোষ্ঠী সচেতন থাকেন আমন্ত্রিত শিল্পী-নির্বাচনে, প্রস্তুতি থাকে সম্মেলক নিবেদনে। একথা যদি কারো মনে হয়, আমন্ত্রিত শিল্পীদের ওপর এতটা নির্ভর না করে, নিজস্ব গোষ্ঠীর শিল্পীদের আরও সুযোগ করে দিতেন তাহলে বেশি ভালো হত, তাঁকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সঙ্গীত-শিক্ষায়তনের নিজস্ব শিল্পীরা কতটা তৈরি হচ্ছেন, কেমন তৈরি হচ্ছেন—এটা জানানোরও একটা ক্ষেত্র এই ধরনের অনুষ্ঠান। সেদিক থেকে ইন্দিরা গোষ্ঠী কিছুটা হতাশই করেন। তাঁদের নিজস্ব শিল্পীর অভাব একক সংগীতের ক্ষেত্রে প্রকট।

আমন্ত্রিত শিল্পীদের মধ্যে ঋতু গুহ অনুপস্থিত ছিলেন। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন বিলম্বে। তাঁর তালিকায় চিহ্নিত প্রথম গানটি অন্য শিল্পীর কণ্ঠে পরিবেশিত হল। আমন্ত্রিত শিল্পীদের মধ্যে অর্ঘ্য সেনের দুটি গানই অসামান্য। বিশেষত তাঁর 'কূল থেকে মোর গানের তরী' দীর্ঘকাল মনে থাকবে। কৃষ্ণা হাজরার 'নাই বা ডাক' এবং নীলিমা সেনের 'শুধু তোমার বাণী' ভাবে-রসে উজ্জ্বল নিবেদন। দাপট ছিল অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যেতে যেতে একলা পথে' গানটিতে। সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে পাঠ ছিল, ছিল সম্মেলক সঙ্গীতের লীড, এবং বলা বাহুল্য, একক গান। 'পথের সাথি'তে একক ও সম্মেলকের প্রয়োগ অনবদ্য। এককসংগীত 'তোমার দুয়ার খোলার ধ্বনি'-তে স্বয়ংপ্রভ ছিলেন সুচিত্রা মিত্র।

ইন্দিরা শিল্পী-গোষ্ঠীর মধ্যে পরিণত উপহার শ্রীনন্দা চৌধুরীর 'দুঃখ যদি না পাবে তো।' সম্মেলক গানগুলি প্রতিটিই ভাল। তবু বেশি করে মনে থাকে 'ওরে ভীরু' এবং 'আমার সকল রসের ধারা'। অমিয়াংশু মুখোপাধ্যায়ের 'ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর'ও স্মরণীয় নিবেদন।

**প্রণব মুখোপাধ্যায়**

ফটো ঃ সুবীর চট্টোপাধ্যায়

## সঙ্গীতম্-এর অনুষ্ঠান

তেইশ জুন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে সংগীতম্ আয়োজিত সঙ্গীতানুষ্ঠানের প্রধান দুই শিল্পী ছিলেন প্রসাদ সেন ও নীলিমা সেন। শিল্পীদ্বয়ের একক সংগীতানুষ্ঠানের পূর্বে 'বহু যুগের ওপার হতে আষাঢ় এলো' শিরোনামে একগুচ্ছ বর্ষার গান পরিবেশন করলেন সংগীতম্-এর শিল্পীগোষ্ঠী। দুখানি একক ভিন্ন সব গানগুলিই ছিল সম্মেলক। অনুষ্ঠানের এই অংশের প্রযোজনার যৌক্তিকতা মেলা ভার। প্রবেশপত্র বিক্রয় করে শ্রোতৃমণ্ডলীকে আহ্বান করে শোনানোর জন্যে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন তা এঁরা এখনো অর্জন করেন নি একথা নিঃসংকোচেই বলা যায়। আর গানগুলির সঙ্গে 'তবলা-লহরা' তো অসহনীয়।

অনুষ্ঠানের পরবর্তী শিল্পী ছিলেন প্রসাদ সেন। ইনিও তাঁর গানের ডালি সাজিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গানে। পরিশীলিত কণ্ঠে একাদিক্রমে বারোটি গান তিনি গেয়ে শোনালেন। অভিজ্ঞ এই শিল্পী তাঁর শিক্ষার ধারা অনুসারে গানগুলি সুরে তালে সঠিক পরিবেশনে যতখানি যত্নবান ছিলেন ঠিক ততখানি অমনোযোগী ছিলেন গান নির্বাচন, গানের ক্রম নির্বাচন এবং লয় নির্বাচনে। সেই কারণেই তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্পূর্ণভাবে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হলেন না। সেই সঙ্গে গানের ছত্রগুলি অতিরিক্ত পুনরাবৃত্তিতে অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে সৌসাম্যের মাধুরী হারায়।

প্রসাদ সেন ও নীলিমা সেন

প্রসাদ সেন যখন অনুষ্ঠান শেষ করলেন প্রেক্ষাগৃহ তখন প্রায় শূন্য। তারই মধ্যে পূর্ববর্তী শিল্পীর দীর্ঘ অনুষ্ঠানের ভারে ক্লান্ত নীলিমা সেন আসরে বসেই অত্যন্ত দ্রুত ছন্দে তাঁর গানগুলি গেয়ে গেলেন। তিনি পূজা-পর্যায়ের গান নির্বাচন করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠে যা শোনা ইদানীং বিরল অভিজ্ঞতা। বলা বাহুল্য, এই দ্রুততার জন্য তিনি সমস্ত গানগুলির প্রতি সুবিচার করে উঠতে পারেননি, এমনকি 'আজি নাহি নাহি নিদ্রা' গানটিতে তাঁকে অন্যমনস্কও হতে দেখা গেল। তবু মানতেই হয় তিনি গান শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পরিমণ্ডল বদল করে একটি পবিত্র নির্মল পরিবেশের সৃষ্টি করলেন। যখন তাঁর স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে তিনি 'তুমি বন্ধু তুমি নাথ' অথবা 'আমি তোমায় যত' গেয়ে উঠলেন তখন তা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে রণিত হতে থাকল। বাণীর মহিমা সুরের ছোঁওয়ায় প্রাণ পেল তাঁর কণ্ঠে। আর যখন গাইলেন 'আমার ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়' এবং সব শেষে 'হৃদয়বাসনা পূর্ণ হল' তখন সহজেই উপলব্ধি করা গেল এই গান তাঁর জীবন, জীবিকা নয়। যন্ত্রানুষঙ্গে সার্থক সহযোগিতা করেন সলিল মিত্র, সুকেশ জানা এবং সত্যকাম সেন।

**সুভাষ চৌধুরী**

ফোটো ঃ সুবীর চ্যাটার্জী

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

## সংকেত

'সংকেত' নাটকের উপজীব্য হিটলারের স্বেচ্ছাচারিতা, উদ্দেশ্য স্বেচ্ছাচার শাসনের স্বরূপ সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণকে সচেতন করা। কিন্তু সেটা কিভাবে করা হবে এ ব্যাপারে দেখা গেল নাট্যকার স্বয়ং দ্বিধাগ্রস্ত। তাই তিনি বিভিন্ন দৃশ্যের 'ভাব-সম্প্রসারণ' করেছেন অধ্যাপকরূপী একজন সূত্রধারের সংযোজনে। যা অনেকাংশেই আঙ্গিকগত কৌশল হিসেবে স্বীকৃতি না পেয়ে বাচালতায় পর্যবসিত হয়। এই বাচালতার উৎস দর্শকদের বোধবুদ্ধির প্রতি হাস্যকর আস্থাহীনতা।

অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট নাট্যগোষ্ঠীর 'রূপান্তরী'র ঐতিহ্যে উল্লেখযোগ্য প্রযোজনার গৌরব থাকলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে তা কিছুমাত্র প্রতিফলিত নয়। অস্বীকার করে লাভ নেই, 'রূপান্তর' রূপান্তরীকে অনেকটা দুর্বল করে ফেলেছে। আসলে, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার দায় সর্বক্ষেত্রে যে দায়িত্ব প্রকাশ করে না আলোচ্য প্রযোজনাই তার প্রমাণ। আগেই বলেছি নাটকটি পাকাপোক্ত নয়, সংলাপও অনেক জায়গায় বেশ ঢিলেঢালা। এই অবস্থায় নির্দেশনা বা অভিনয়ে এমন কোনো উৎকর্ষ লক্ষ করা যায়নি যাতে প্রযোজনাটি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। চরিত্রলিপি এবং চরিত্ররূপায়ণ দুক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতার যথেষ্ট অভাব। গোপাল দেবের মঞ্চ পরিকল্পনায় অভিনয়শিল্পীরা সকলেই কমবেশি বিপাকে পড়েছেন। দেবাশিস দাশগুপ্তের আলোক পরিকল্পনাও মামুলী। নাটকটিতে নির্দেশনা দিয়েছেন পার্থ মিত্র। হিটলার চরিত্রটিও তাঁর। এছাড়া উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলোয় অংশগ্রহণ করেছেন কাশীনাথ চক্রবর্তী, কমল রায়, তপন ব্যানার্জী, কাজল মুখার্জী, ঋতা সেন, বিজয় চৌধুরী প্রমুখ। আমাকে যে ভূমিকালিপি দেওয়া হয়েছে তাতে অন্যান্য সকলের উল্লেখ থাকলেও নাট্যকারের নাম নেই। সম্ভবত নাটকটি শ্যামাকান্ত দাসের রচনা।

**রানা দাস**

## ছায়াপথ

নাটক যেহেতু প্রত্যক্ষ শিল্প— তাই তার সমকালীন রুচির শরিক হওয়া দরকার। বিজন ভট্টাচার্যের 'ছায়াপথ' নাটকটির রচনাকাল ও প্রথম অভিনয়কাল ১৯৬১। এর আগের রচনা নবান্ন (১৯৪৪), জতুগৃহ (১৯৫১), গোত্রান্তর (১৯৫৬-৫৭), পূর্ণোদ্দা মরাচাঁদ (১৯৬০) প্রভৃতিতে একটি নিটোল কাহিনী আছে, যার উত্থানপতনের সঙ্গে দর্শক সহমর্মী হয়ে ওঠেন। কিন্তু ছায়াপথ নাটকে সেই অর্থে কাহিনী নেই, অনেকটাই খণ্ডচিত্র, ডক্যুমেন্টেশন, তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি। যে অনুভূতিতে চাষী-বউ সব হারিয়েও সগর্বে বলতে পারে, 'আমরা রাস্তায় থাকি। রাস্তায় তো কোন দরজা জানলা নেই। আড়াল আবডাল নেই—তাই ভদ্রলোকের মত পাপ করতে ভয় পাই।' রাস্তার ভিখারীদের নিয়ে এই নাটক। তার মধ্যে জন্মসূত্রে ভিখারী এবং অর্থনৈতিক সূত্রে ভিখারী—দুরকমই আছে। ১৯৬১ সালে যখন এ নাটক দেখেছি তখন খণ্ডচিত্র সম্পূর্ণভাবে মজাতে
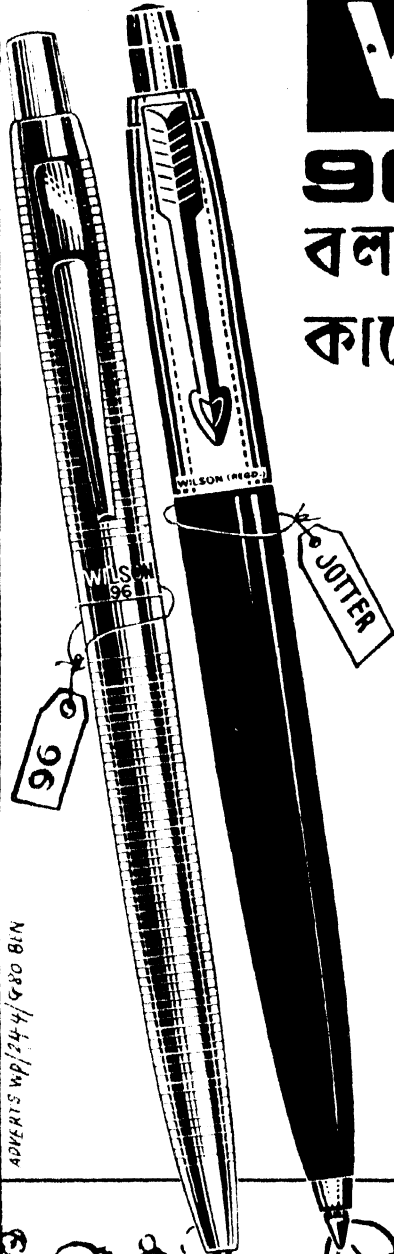
WILSON
(REGD.)
96 & JOTTER
বলপেন
কাদের কাছে এত কদর?
ছাত্র, কেরানী, টেকনিসিয়ান,
ঘরের গৃহিণী ও অন্যান্য
অসংখ্য জন
ন্যায্য দাম ও সর্বাধিক উপযোগিতার জন্যেই
এগুলি সবারই এত প্রিয়। জীবনে সব শ্রেণীর মানুষই চান
উইলসন জটার বা উইলসন ৯৬।
যে কোনো স্টাইলের লেখার জন্যে সুন্দরভাবে ডিজাইন
করা। যে কোনো জায়গার ওপরেই ঝরঝরিয়ে
সুন্দর লেখা পড়ে।
WILSON (REGD.)
JOTTER
WILSON 96
96
Wilson
বালকৃষ্ণ পেন প্রাইভেট লিমিটেড,
নাগরদাস রোড, আন্ধেরী, বম্বে ৪০০ ০৬৯
টেলিফোন: ৫৭৪৩২১, কেবল: WILSONPEN
টেলেক্স: ০১১.৪১৪১ BPPL IN
পরিবেশক: কিরণ অ্যাণ্ড কোম্পানী
৭৩/৭৫, শামসেট স্ট্রীট, বম্বে ৪০০ ০০২, টেলিফোন: ৩২৪৪৩২
ADVERTS WP/244/980 BIN

**পুতুল সান্যাল, অসিত মুখোপাধ্যায় ও অশোক চক্রবর্তী**

পারেনি—কারণ তখনও এ জাতীয় নাটক দেখার অভ্যাস আমাদের গড়ে ওঠেনি। পাশাপাশি অনেক আন্ডার ওয়ার্ল্ড নিয়ে নাটক ছিল—কাহিনীর তবকে মোড়া সেগুলিই আকর্ষণ করত বেশি।

১৯৮০ সালে কবচকুন্ডল এই নাটকটি মুক্ত অঙ্গনে মঞ্চস্থ করলেন। ইতিমধ্যে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি তাই নাটকটি নতুনভাবে আবিষ্কার করা গেল। বিজন ভট্টাচার্য চিরকাল প্রথাভঙ্গের সাধনা করে এসেছেন—সব সময়ে সিদ্ধিলাভ হয়ত হয়নি। ভাবতে অবাক লাগে পরবর্তী কালে অনেক বিখ্যাত প্রযোজনা (যার অবলম্বন প্রায়শই বিদেশী) আমাদের অবাক করলেও, সূত্রপাত দেশজ পটভূমিতে বিজন ভট্টাচার্যই করেছিলেন। কবচকুন্ডলের সাম্প্রতিক প্রযোজনায় নাটকটি অনেকখানি গুছিয়ে ওঠা গেলেও স্মৃতি সতত সুখের হয় না। এই নাটকে মহলার সময় বিজন ভট্টাচার্য শিল্পীদের দেখতে বলেছিলেন রাস্তার মানুষদের এমনকি জন্তুদেরও / বাছুরকে দুধ খাওয়ানোর সময় জননী গাভীর চোখের স্নেহ/পোষা কুকুর জিপসী কিভাবে প্রতিপক্ষ সৃষ্টি করে হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করে নিজের খাবার খায়—সব কিছুই লক্ষ রেখেছিলেন। ফলে তখনকার জান্তব ভিখারিণীর সঙ্গে এখনকার সার্টিফিকেটেড ভিখারিণীর (পুতুল সান্যাল) অনেক ফারাক থেকেই যায়। 'বাস্তব' শব্দের বদলে আমি 'জান্তব' শব্দ ব্যবহার করেছি। তৎকালীন ভিখারিণীর একটা কুৎসিৎ মেক-আপ দেওয়া হয়েছিল—যার জন্য প্রথম থেকেই রস কৌতূহল জাগাত। তবুও অনেক কিছুই অস্পষ্ট হয়ে এলেও সেই ভূমিকা বিস্মৃত হইনি। চাষী বা চাষী-বউ সম্পর্কেও এই কথা। তখন সেটা ছিল যথার্থ ডকুমেন্টেশন, এখন যেন ডকুমেন্ট-এর উপর গবেষকদের লেখা 'সহায়িকা'। তবুও কবচকুন্ডলের প্রযোজনা যে ভাল লাগে তার কারণ মূলে চরিত্রে অসিত মুখোপাধ্যায় ও অশোক চক্রবর্তীর অভিনয় (নির্দেশকও এঁরা দুজন)। কয়েকটি মুহূর্ত যেখানে কানা কথা বলে যায়, ঘোড়ার সঙ্গে ভিখারিণীর দৃষ্টি বিনিময় চলে বা শেষ দৃশ্যে এবং খাওয়ার সময় ভাল লাগে তাঁদের অভিনয়ের জন্য। বিজন ভট্টাচার্যের অনেক সৃষ্টিতেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়ে যায়! কিন্তু 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের সঙ্গে যেখানে 'ছায়াপথের' মৌল পাথকা সেটা সঠিকভাবে নির্দেশকরা খুঁজে পেয়েছেন— খন্ডচিত্রের মধ্যে মাতাল পাগল বা কাগজ কুড়োন ছেলে আরও

কনিষ্ক সেনের আলো। আবহ রচনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব থাকলেও ক্যাসেট রেকর্ডিং এর জন্য কিছু শাব্দিক ত্রুটি আছে। আর আপত্তি, হঠাৎই একবার প্রথমত করুণ সুরে বাঁশিতে মেঠো সুর বাজায়, যেখানে চমৎকারভাবে দুজনের লড়াইয়ের সময় কুকুরের ঝগড়া দেওয়া হয়েছে—সেইখানে প্রধানুগত্য সুরসাম্য হারায়। রবি চট্টোপাধ্যায় নতুনভাবে মঞ্চ পরিকল্পনা করেছেন—পুরনো মঞ্চ বোধ হয় অন্য রকম ছিল। আর যতদূর মনে আছে, বিরতির আগে গোপাল যখন একা দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে বাবা মাকে ডাকছে তখন আর একদিকে প্রচন্ড জ্যাজ মিউজিক-এর সঙ্গে একটা ব্যালেটিক মুভমেন্ট হত—নগর সভ্যতার দিকে আঙুল উঁচিয়ে শূন্যতাকে ব্যঙ্গ করত। অনেকের অভিনয়ের মত ঐ জায়গাটাও এখন কেমন ফাঁকা লাগে—মরমে বেঁধে না।

**দেবাশিস দাশগুপ্ত**

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নৃত্য**

## বসন্ত সন্ধ্যা

আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে, তার এক পিঠে নূতন, এক পিঠে পুরাতন। যখন উলটে পরেন তখন দেখি শুকনো পাতা, ঝরা ফুল; আবার যখন পালটে নেন তখন সকালবেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী,—তখন ফাল্গুনের আম্রমঞ্জরী, চৈত্রের কনকচাঁপা। উনি একই মানুষ নূতন-পুরাতনের মধ্যে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছেন। —১৩২৯-এ বিরচিত 'বসন্ত' ঋতুনাট্যে কবি চরিত্রের আড়ালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলো অনুধাবন করলে কোনো বিচ্ছেদের ব্যথাতেই শেষপর্যন্ত আমাদের ঠকাতে হয় না।

১৩৮৬-র শেষ দিনটিতে উপস্থিত ছিলাম 'গীত ও ছন্দে'র বসন্ত সন্ধ্যায়। বলা বাহুল্য, খুবই তাৎপর্যময় সন্ধ্যা, যেহেতু বিদায়ের মধ্যেই আগমনের প্রতিশ্রুতি। ললিত রাগের বিদায় ব্যথায় অমন সুখের রাশি আর কোনদিন ফুলে ওঠে? দুয়ার আটকে যখন পুরাতনকে ধরে রাখতে চাই তখনই তো নতুনের ডাক শুনি—খোলো খোলো দ্বার/রাখিয়ো না আর/ বাহিরে আমারে দাঁড়ায়ে।

যে কথাটা এই প্রতিবেদক বলতে চান, অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের দিনটি নির্বাচনের মধ্যেই 'গীত ও ছন্দ' তাঁদের কাঙ্ক্ষিত সার্থকতার অনেকটা সোপান পেরিয়ে আসেন। সঙ্গে সঙ্গেই প্রশংসা করি তাঁদের অনুসন্ধেয় চেতনার, গান ও রচনার উপযুক্ত নির্বাচনে যা কবির বসন্তদর্শনের সযত্নব্যাদান ঘটায়।

আলোচ্য নৃত্যনাট্যের নৃত্যাংশের পরিকল্পনা ও রূপায়ণ কিন্তু আমাকে সর্বদা সুখী করেনি। এই ধরনের অনুষ্ঠানে গানকে প্রকাশ করার যে অনিবার্য দায় তা অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের দেহ অনেকাংশেই বহন করেনি, সম্ভবত বহন করবার মতো শিক্ষা গ্রহণের সুযোগও তাঁদের ঘটে নি। পরিণামে তাঁদের উপস্থিতিতে যে 'মনোরঞ্জন' ... মর্মানুসারী হয়ে ওঠে না। ভাষ্য ও সঙ্গীতাংশ সে তুলনায় অনেকটা দায়িত্ববাহী, রচনা নির্বাচন সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের সাহায্য করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সাহায্য গ্রহণে শিল্পীরা প্রত্যেকেই ছিলেন কমবেশি যোগ্য এবং আন্তরিক। 'বসন্ত সন্ধ্যা'র নৃত্য ও সঙ্গীতের পরিচালন দায়িত্বে ছিলেন যথাক্রমে তন্ময় কর ও পলাশ মুখোপাধ্যায়।

আলোচ্য নৃত্যনাট্যের পর সাঙ্গীতিক সন্ধ্যাটি কিছুটা শিল্পীভারাক্রান্ত বোধ হয় দ্বিতীয় পর্বে। ক্লান্ত বোধ করে অনেকেই তখন অবন মহলের আসন ছাড়েন। ধৈর্যের পরীক্ষায় যাঁরা শেষাবধি উত্তীর্ণ তাঁরা অবশ্যই লাভবান হলেন বাণী ঠাকুর ও অর্ঘ্য সেনের সঙ্গীত নিবেদনে।

**রানা দাস**

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **বিবিধ**

## পারিজাত ইনস্টিটিউট অব্ কালচার

পারিজাত ইনস্টিটিউট অব কালচারের প্রধান উদ্দেশ্য পাশ্চাত্য মুখী ভারতীয়দের ভারতবর্ষের ধর্মীয় ঐতিহ্য ও প্রাচীন সংস্কৃতি স্মরণ করিয়ে দেওয়া। আধুনিক টেকনোলজি এঁরা গ্রহণ করেছেন বটে কিন্তু মূলে বক্তব্য ভক্তিবাদ। এই জন্য এঁরা বেছে নিলেন তাঁদের প্রথম অনুষ্ঠানে তুলসী দাসের 'বিনয়পত্রিকা', যেখানে তিনি সমস্ত দেবতাদের প্রতি তাঁর ব্যাকুল প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণ করেছেন।

২৫ মে'র কলামন্দিরের সান্ধ্য অনুষ্ঠানে প্রায় সকলেই হয়ত সেই ভাবে ভাবিত হতে এসেছিলেন। প্রধান অতিথি ও সভাপতি একবাক্যে বললেন রাম নাম শোনার পুণ্য অর্জনই চূড়ান্ত কথা। কেবল বিশেষ অতিথি রইচাঁদ বড়াল সংগীত ও সমাজের যোগাযোগের কথা মনে করিয়ে দিলেন।

'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।' তাই সমালোচকের পক্ষে ভক্তিসুধাপানই শেষ কথা নয়। নানা জিজ্ঞাসার কাঁটা মাথা উঁচিয়ে ওঠে। প্রথমেই মনে হয় কারিকুরি এত বেশি কেন? ছায়া নাটক (শ্যাডো প্লে) থাকুক না, কিন্তু সেটাকে ম্যাজিকের পর্যায়ে ওঠালে অপরিণত, বালকোচিত মনে হয়। প্রতি দেবতার আরাধনায় তাঁদের যে মূর্তি ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখান হল সেগুলি সস্তা ক্যালেন্ডারের আর্টের উর্ধ্বে উঠল না। অথচ এঁরা যে প্রচন্ড অর্থ ব্যয় করেছেন তার পরিচয় পদে পদে, মঞ্চসজ্জা থেকে প্রতিটি শিল্পীকে সুবৃহৎ পুষ্পগুচ্ছ উপহার দেওয়ার মধ্যে স্পষ্ট।

এখানে নাটক আনা হয়েছে, নাচও বিভিন্ন জাতের। উচ্চ মানের ক্লাসিকল থেকে লোক নৃত্য পর্যন্ত। গানেও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। ভজন, ধ্রুপদ, বেদগান সবই আছে। বিশেষ করে পুরুষকণ্ঠে গীত গানগুলি অতি শ্রুতি সুখকর। বালকৃষ্ণ মেননের দক্ষ পরিচালনায় শেষের দুটি ক্লাসিকাল নাচ চমৎকার। সঙ্গীত পরিচালনায় ... সঙ্গীত পরিচালনায় শ্রীমতী জগজ্জা ভাদুটি এতটা কৃতিত্বের অধিকারিণী না হলেও তাঁর অবদান অগ্রাহ্য করার নয়।

কিন্তু সব ছাপিয়ে উঠেছে স্টেজ ক্র্যাফ্‌ট্‌ দেখাবার মোহ। শব্দ যে কত কর্ণপীড়াদায়ক হতে পারে তার একটি অভিজ্ঞতা সেদিনকার দর্শকরা সঞ্চয় করে গেছেন। গম্ভীরতা ও ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য প্রকাশে আলোর খেলা ও সুউচ্চ শব্দপ্রয়োগ ভক্তিবাদকে বিস্মরণ করায়।

প্রতিটি দোহা রচনার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ নাচ ও গান এবং কারণে অকারণে নানাজাতীয় নাচ রসহানি ঘটিয়েছে। যদি এঁরা শুধু 'বিনয়প্রকাশ'কে অবলম্বন করতেন তাহলে এতটা খাপছাড়া হত না। তুলসী দাসের জীবনের কিছু কিছু ঘটনা দেখান যেতে পারত, এই সঙ্গে 'বিনয়প্রকাশ' রচনার প্রসঙ্গ আনা যেত এবং সেই সূত্রে একটির পর একটি নাচ গান সংযোজিত করা যেত। কিন্তু এঁরা প্রথমেই আরাধ্য দেবতাদের ছায়ামূর্তি দেখিয়ে স্তবস্তুতি সম্পূর্ণ করলেন ও পরে তুলসীদাসকে দেখিয়ে রামনামের মহিমা গাইলেন। অথচ 'বিনয়প্রকাশে'র মূলকথা সর্বদেবতার আরাধনা।

অংশে নিয়েছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান কয়েকজন, কিছু শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী। এছাড়া যাঁরা আছেন তাঁরাও স্বনামধন্য। তবু ভক্তির সঙ্গে চারুশিল্পের উচ্চ সহযোগিতায় দুটিতে মিলে তুলসীদাসের প্রধান যে অবদান সহজরস, তাকে দূরে সরিয়ে রাখা হল।

**বাসন্তী জোয়ারদার।**

## টরণ্টোতে শাস্ত্রীয় সংগীতের অনুষ্ঠান

বিদেশে এমন কোন বড় শহর নেই যেখানে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ নৃত্যের স্কুল, বিশেষ করে ভরতনাট্যমের কোন স্কুল নেই। সেতার শেখার সুযোগও রয়েছে অনেক শহরে। কিন্তু উচ্চাঙ্গ গানের স্কুল প্রায় নেই বললেই হয়। পন্ডিত ওঙ্কারনাথের সুযোগ্য ছাত্রী শ্রীমতী শান্তি চক্রবর্তীর উচ্চাঙ্গ সংগীতের স্কুল অন্তত টরণ্টোতে এই অভাবটি মিটিয়েছে। এই স্কুলের প্রায় চল্লিশ জন ভারতীয় ও ক্যানাডিয়ান ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রায় কুড়ি জনকে নিয়ে গত ১৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় এই স্কুলের বাৎসরিক অনুষ্ঠান। বিভিন্ন রাগকে একটি সূত্রে গেঁথে এই উচ্চাঙ্গ গীতলেখাটি রচনা করেছিলেন শ্রীমতী

# একক ব্যক্তি বা সমবায় সমিতি !
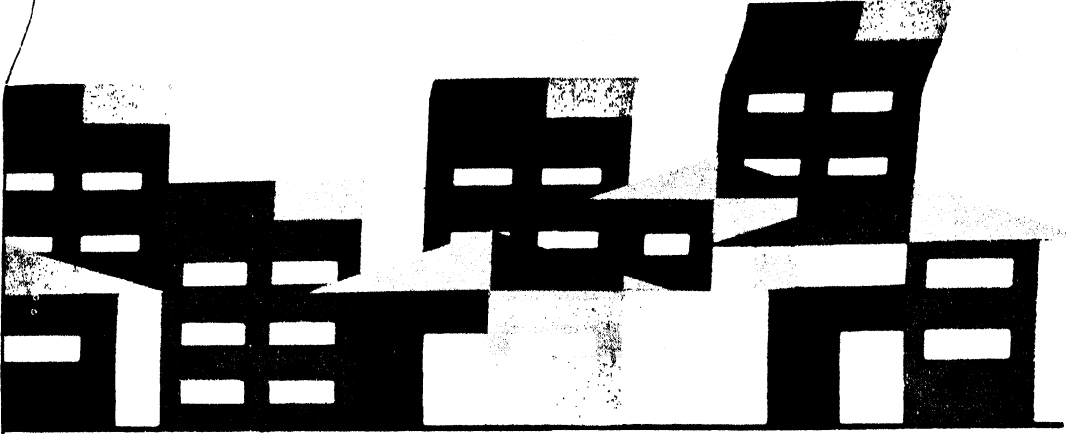
## একক ব্যক্তি বা সমবায় সমিতি !
## এইচ ডি এফ সি থেকে গৃহঋণ পেতে পারেন—এখানে, কোলকাতায় বসেই !

এইচ ডি এফ সি হল এমন এক আর্থিক সংস্থা যা একক ব্যক্তি, সমবায় সমিতি আর কোম্পানীকে দীর্ঘ মেয়াদা গৃহনির্মাণ ঋণ দিয়ে থাকে।

গৃহঋণ আবেদন-পত্র খুব তাড়াতাড়ি যাচাই করা হবে—কোলকাতাতেই !

খবরাখবর, আলোচনা, তথ্য পুস্তিকা এবং আবেদন পত্রের জন্যে যোগাযোগ করুন, এইখানে ঃ—

**আঞ্চলিক দপ্তর**
কুক এণ্ড কেল্ভি বিল্ডিং,
২০, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট,
কোলকাতা-৭০০০০১।
ফোন ঃ ২৩-১৯৮১

**রেজিস্ট্রীকৃত দপ্তর**
রেমন হাউস,
১৬৯, ব্যাকবে রিক্লেমেশন,
বম্বে-৪০০০২০।
ফোন ঃ ২২০২৮২/২২০২৬৫
টেলেক্স ঃ এইচ ডি এফ সি ৬৭৬২
গ্রাম ঃ হাউসকর্প

হাউসিং ডেভেলপমেণ্ট
ফাইন্যান্স করপোরেশান লিমিটেড
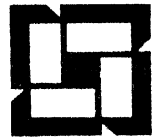
Adroit-3030 BEN

...অনুষ্ঠানটির শেষে টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বাংলাভাষা... জোসেফ ওকোনেল সমবেত ... ও শিল্পীদের ধন্যবাদ জানান এবং ...ী চক্রবর্তীর এই স্কুলের সর্বাঙ্গীণ ...ন্য কামনা করেন। কিছুদিন আগে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বরবিতানীত কবিগুরুর 'বাল্মীকি প্রতিভা' ...কে আনন্দ দেয়।

## আমরা সকলে'র আবৃত্তি

পুরস্কার বিতরণী যে কত ...তিকর হতে পারে, দেখা গেল আমরা সকলে'র অনুষ্ঠানে, গত ২৬ মার্চ সন্ধ্যায়, শিশির মঞ্চে। যত পুরস্কার তার একদশমাংশও বিলি হল না, অনুপস্থিত প্রতিযোগীর নাম শুনতে হল বারবার। মূল অনুষ্ঠানেও সেই ক্লান্তির রেশ কাটল না সেদিন। এত শিল্পী, এবং এত বেশী অযোগ্য নিবেদন, বড়ো-একটা দেখা যায় না। অজিত বসু তাঁর স্বরচিত কাব্যগ্রন্থের 'মূল কবিতা' শোনালেন। মূল কবিতা ব্যাপারটা কি বোধগম্য হল না। নাম-কবিতা? তাঁর ভঙ্গি কোলাহলময়, কবিতা গদ্যময়। অরুণাংশু, বিশ্বাস হুবহু, অমিয় চট্টোপাধ্যায়, অতনু সেনগুপ্ত, নীলাদ্রিশেখর বসু। শ্যামল ঝারিক-এর কণ্ঠ ভরাট, কবিতা-নির্বাচনও সুন্দর, শুধু উচ্চারণ কখনো-সখনো পিছলেছিল। সত্যদ্রষ্টা শোনালো 'সত্যদর্শী'। মণিপদ্ম দত্ত, অরুণ চৌধুরী, কুমকুম দে, প্রণতি মিত্র, মুস্তাফা, দিলীপ ঘোষ ও আইভি রাহার অনুষ্ঠান সেদিন অসার্থক। বিশেষত শেষ দুই শিল্পীর যুগ্ম-নিবেদনে আইভি রাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ, দিলীপ ঘোষের কিছুই করণীয় ছিল না। রাজেশ্বরী রায়চৌধুরীর উচ্চারণ কিছুটা মার্জিত হলে ছাপ রাখতে পারবেন। কণ্ঠ সুন্দর, কবিতাটিও সুনির্বাচিত। কবিতার সঙ্গে অশোক পালিত 'অমিতাক্ষর'—নাটকের অংশও শোনালেন। কেন? এ প্রশ্ন না তুললে বলতে হয়, তাঁর অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্য ছিল। নতুনদের মধ্যে তুলসী রায় কণ্ঠকে যে প্রয়োজনে কোমল করুণ-কঠোর করে তুলতে পারেন, ...াস দক্ষতায় তার প্রমাণ রাখলেন। অমিয় চট্টোপাধ্যায় মনস্কতার ছাপ রাখলেন রবার্ট ফ্রস্টের জন্ম দিনের কথা স্মরণ করিয়ে তাঁর অনূদিত কবিতা পড়ে। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা ভাষা মা আমার'-এ পুরনো দিনের সংবাদ পরিক্রমার স্মৃতিকে উসকে দিলেন। কাজল চৌধুরী ভালো বেছেছেন তারাপদ রায়ের 'কুসুমের পরিহাস', ভালো শুনিয়েছেন রাম বসু 'পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে'। রজত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রোমান্টিক কণ্ঠের উপযোগী কবিতা শোনালেন সেদিন। একই কথা জগন্নাথ বসুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পার্থ ঘোষকে সেদিন পুরো মেজাজে পাওয়া যায়নি। নীলাদ্রিশেখর বসুর কণ্ঠে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'ঘোড়া' বেশি ভালো লেগেছে। কবিতা সিংহ এবং ছোট্ট শিল্পী অরিজিতা বসু সেদিন নিখুঁত নিশ্ছিদ্র। 'আবৃত্তি পরিষদ'-পরিকল্পনা ও প্রযোজনায় ... অনুষ্ঠান 'রক্তিম সূর্যের ঘোষণা' বেশ প্রাণবন্ত পরিবেশন। বিশেষত ভালো লাগল। কবিতাকে সুরেলা পাঠ ও আধখানা গান না করে আলাদাভাবে গানই রেখেছিলেন অনুষ্ঠানের মধ্যে। সেদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছিলেন গৌরী ঘোষ।

**প্রণব মুখোপাধ্যায়**

## পরলোকে পিয়ারীমোহন দাস

আমাদের 'দেশ' পত্রিকার অন্যতম প্রবীণ ও প্রাক্তন সহকর্মী শ্রীপিয়ারী-মোহন দাস গত ১২ জুলাই, শনিবার কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল বিরানব্বই। পিয়ারীমোহন একদা রাজনৈতিক কর্মী হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। বাংলাদেশের বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে তার যোগাযোগ একরকম কিশোর বয়স থেকে। পিয়ারীমোহন বরিশালের মানুষ। বহু বিপ্লবীর কর্মস্থল তখন পূর্ববঙ্গ। যৌবনের শুরুতে বরিশালে থাকার সময় তিনি এই আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন। ফলে

বিপ্লবী পিয়ারীমোহন ব্রিটিশ রাজরোষের শিকার হন সেই তরুণ বয়েসে। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। পাঁচ বছর কারাবাসের পর যদিও তিনি মুক্তি পান—তবু রাজনীতির সংস্পর্শ ত্যাগ করেননি। ১৯৩০ সালে আবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। পরে আট বছর তাঁর বিভিন্ন জেলে এবং বক্সার বন্দী শিবিরে কেটে যায়। রাজনীতির জীবন ছেড়ে যখন তিনি সংবাদপত্রের জগতে এলেন তখন তিনি প্রবীণ, বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে কবে! ১৯৪৪ সালে পিয়ারীমোহন 'দেশ' পত্রিকায় যোগদান করেন। তারপর দীর্ঘ তিরিশ বছর তিনি এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন। স্বনামখ্যাত ত্রৈলোক্য মহারাজ ছিলেন পিয়ারীমোহনের কর্মসঙ্গী। পিয়ারীমোহন তাঁর রাজনৈতিক জীবনে বহু বিপ্লবীর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। সাংবাদিক জীবনেও এই প্রতিষ্ঠানের ও 'দেশ' পত্রিকার সকল কর্মীর শ্রদ্ধার ও অনুরাগের পাত্র ছিলেন তিনি। মোটা খদ্দর পরিহিত, শুভ্র কেশ, শান্ত এই মানুষটির কথা আমরাই শুধু জানি। একদিকে যেমন পরিশ্রমী—তেমনই নিষ্ঠাবান ও অকপট মানুষ ছিলেন তিনি। ছিলেন সুরসিক। তিনি ইহজগতে আর নাই ভাবতে আমরা বেদনা বোধ করছি। আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি তাঁর উদ্দেশে।

## প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

### বেন্দ্রে (১৯১০—)

পুরো নাম নারায়ণ শ্রীধর বেন্দ্রে। বহুবার চিঠি লিখে উত্তর আসেনি। এইবার চিঠি যখন ওঁর হাতে পড়ল তখন সেখানে সৌভাগ্যক্রমে সাগরেদ্দর ভাই সলিল ঘোষ ছিলেন। সুতরাং স্লাইড জীবনবৃত্তান্ত এসে পড়ল। বেন্দ্রের সেই বয়স যখন খ্যাতি আর তাঁকে স্পর্শ করে না। অথচ সমকালীন ভারতীয় শিল্পকলায় তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি কম ছিল না। ১৯৫৯-৬৬ ছিলেন বরোদার মাহারাজা সয়াজিরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পকলা বিভাগের প্রধান এবং চিত্রকলার অধ্যাপক। সেই সময় শিল্পকলা-চর্চার কেন্দ্র হিসাবে বরোদার নাম ভারতের মানচিত্রে স্থান পায়। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় ললিত-কলা আকাদমীর সহ-সভাপতি ছিলেন। তার চেয়েও বড় কথা হলো শিল্পী হিসাবেও তিনি বড়।

জন্ম মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে। বি এ (আগ্রা)। হোলকারের কলেজে চিত্রশিক্ষা। বোম্বাই থেকে চিত্রকলার স্নাতক। ছাপাই ছবির প্রশিক্ষণ আর্ট স্টুডেন্টস লীগ, নু্য ইয়র্ক। চীনামাটির কাজ (সেরামিকস) ওয়াই এম সি এ, নু্য ইয়র্ক (১৯৪৭)। শিল্পী এবং সাংবাদিক হিসাবে কাজ করেন কাশ্মীরের ভিসিটারস ব্যুরোতে (১৯৩৬-৩৯)। সর্বক্ষণের চিত্রকর ছিলেন বোম্বাইতে (১৯৩৯-৫০)। ফাঁকে ফাঁকে ভ্রমণ চলেছে—বিলেত আমেরিকা এবং মধ্য ইউরোপ (১৯৪৭-৪৮)। পশ্চিম এশিয়া (১৯৫৮)। চেকোস্লোভাকিয়া, ইউগোশ্লাভিয়া এবং পোলাণ্ড (১৯৬৯)। ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলের সর্বপ্রথম চীনদেশে ভ্রমণ করার সময় তিনিও ছিলেন (১৯৫২)। জাপানেও যান (১৯৬৩)। বৃদ্ধ বয়সে ঘুরতে যান মার্কিন মুলুক, ক্যানাডা এবং ইউরোপ (১৯৭৭-৭৮)।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিল্পকলাকেন্দ্র থেকে অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন।

**একক প্রদর্শনী :** মার্কিন মুলুকের নানা স্থানে (১৯৪৭, '৪৮)। চেকোশ্লোভাকিয়া, ইউগোশ্লাভিয়া এবং পোলাণ্ড (১৯৬৯)। বোম্বাই ১৯৪৩, '৫০ '৫৭, ৬৩, ৬৮৭০, ৭২, ৭৪, ৭৬, ৭৭,৭৯। পূর্বাপর কাজের সুবৃহৎ প্রদর্শনী (১৯৭৪)। দলীয় প্রদর্শনী নু্য ইয়র্ক এবং টোরান্টো (১৯৭৬)।

নয়াদিল্লি দ্বিতীয় ত্রিবার্ষিক প্রদর্শনীর বিচারকদের সভাপতি ছিলেন (ত্রিয়েনাল : ১৯৭১)।

তাঁর ছবি আছে কাশী হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যাদুঘরে। আকাদমী অব ফাইন আর্টস এবং বিড়লা আকাদমী, কলকাতা। বরোদা যাদুঘর। মাদ্রাজ যাদুঘর। মহীশূর প্রাদেশিক ললিতকলা আকাদমী। সালার জং যাদুঘর, হায়দ্রাবাদ। ন্যাশনাল গ্যালারী অব মডার্ন আর্ট সংগ্রহশালায়। তা ছাড়া দেশ বিদেশের নানা সংগ্রহশালায়। দেওয়ালচিত্র এঁকেছেন এয়ার ইণ্ডিয়ার জুরিখ, ব্রুসেলস এবং লণ্ডন আপিসে। সম্প্রতি বোম্বাই-এর এক ব্যাংক নীরু মজুমদারকে একটি দেওয়ালচিত্র আঁকার জন্য সাধাসাধি করে। তিনি রাজী হন। বলে শেষ পর্যন্ত বেন্দ্রেকে সেই কাজ দিয়েছেন।

বেন্দ্রের কাজ খুবই রোমান্টিক। এই রূপরসগন্ধস্পর্শময় জগৎটা তিনি দেখেন গীতিকবির দৃষ্টিতে। এর মধ্যকার গ্লানি এবং ক্লেদ তিনি সযত্নে বাদ দিয়ে যান। পংক নয়, পঙ্কজে তাঁর সকল আসক্তি। ছবির মধ্যকার ভূমির অহল্যা অংশটুকু তিনি ছবির প্রয়োজনে সুন্দর অথচ অমোঘভাবে ব্যবহার করার পক্ষপাতী। অথচ তিনি মূলত অবয়বী (ফিগারেটিভ) চিত্রকর। মানুষ, জন্তু, গাছপালা তাঁর মেজাজ এবং দৃষ্টিকোণ থেকে পটে রাখেন। পরে তারই সঙ্গে সুর মিলিয়ে গড়ে তোলেন বর্ণময় এক অভিনব ঐকতান। এখানে কাঠামো এবং রচনাসৌকর্য সম্বন্ধে তিনি ভাবিত। অথচ অবয়বকে রূপবন্ধের প্রয়োজনে উপস্থাপন করে আকারকে উপেক্ষা করার পক্ষপাতী নন। তাঁর ছবি গল্প বলে না। আবার অভিব্যক্তিমূলক ভূমিকম্পও তাঁর কাজে নেই। একটা স্নিগ্ধ উচ্ছ্বাস এসেছে তাঁর ছবিতে বারবার। তাঁর বিদেশ পরিক্রমা, চিত্রভাস্কর্যের ইতিহাস সম্বন্ধে বৈদগ্ধ্য তাঁকে ভারতীয় ছবির—বিশেষত অণুচিত্রের—সাত্ত্বিকতা থেকে অন্যত্র নিয়ে যেতে পারেনি। অথচ ছবির সৌন্দর্যতত্ত্ব বাদে, গঠন, দীর্ঘায়ণ, ঈষৎ বিকৃতকরণের ধরনে এমন একটা কিছু আছে যা তাঁকে আধুনিক বলে চিহ্নিত করে।

প্রচ্ছদের ছবি বেন্দ্রের মানসিকতার ভাস্কর। মাথায় ঝুড়ি নিয়ে একটি দীর্ঘদেহী মেয়ে চলেছে ছন্দিত ভঙ্গীতে। পেছনে আরও কতজন। আর ফলের সমারোহ যেন। এই ছবিতে লাল আর কমলার প্রাধান্য। সমস্ত পট সুন্দরভাবে সাজান বর্ণের মাধুরীতে অধরা রূপে যেন ধরা পড়েছে। তেলরঙের যাদু আছে। বেন্দ্রের পর থেকে বহু ভারতীয় শিল্পী বিদেশে গেলেন। এই যাতায়াতের ফলে শিল্পীরা নিজেকে সমকালীন চিত্রের শরিক মনে করতে শুরু করেন। দেশজ ঐতিহ্য এবং প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধেও বেন্দ্রের ভাবনাচিন্তা এবং সমন্বয় পরবর্তী শিল্পীদের পথনির্দেশ দিল অকপটে।

**ফটো : দেবব্রত রায়**

# দেশ
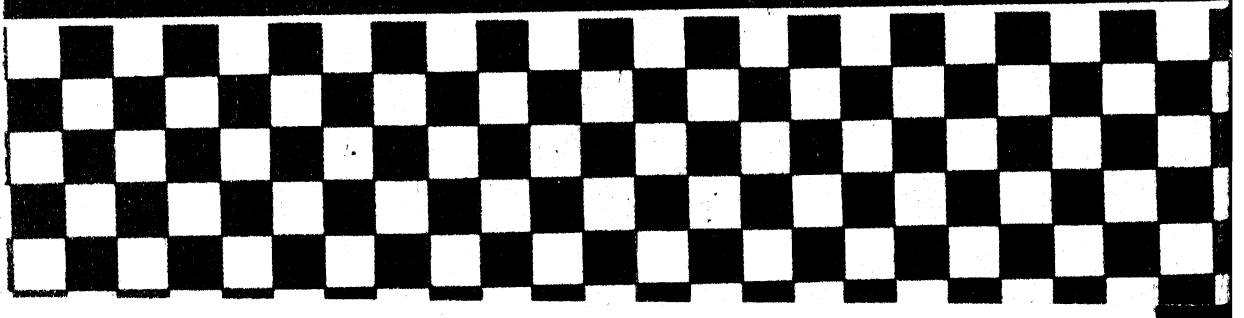
## আপনার শিশু ৩ মাসের মত যথেষ্ট আয়রণ উপহার নিয়ে জন্মেছে

# কিন্তু ৩ মাস বয়েস হলে, শুধু দুধ ওর আয়রণের চাহিদা মেটাতে পারবে না

### ওকে আয়রণে ভরপুর

# ফ্যারেক্স

### দিন

"মায়ের শরীর থেকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আয়রণ নিয়ে শিশু জন্মায়, কিন্তু জন্মের পর এই জমা করা আয়রণ ক্রমশঃ কমে যেতে থাকে। যদিও দুধ আহার হিসেবে ভালো, তবে তা সম্পূর্ণ আহার নয়— কারণ তাতে আয়রণ থাকে না। এইজন্যে শিশুর এমন শক্ত আহারের প্রয়োজন যাতে আয়রণ আছে।"

—ডাঃ সুভাষ চ. আর্য্য : "ইনফ্যাণ্ট অ্যাণ্ড চাইল্ডকেয়ার ফর দ্য ইণ্ডিয়ান মাদার।"

অতএব, তিন মাস বয়েসে আপনার শিশুকে এমন এক শক্ত আহার ধরান যা তার রক্তের জন্যে, রোগ প্রতিরোধ শক্তির জন্যে, সাধারণ স্বাস্থ্যের জন্যে, এবং বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয় আয়রণ যোগায়।

**ডাক্তাররা ফ্যারেক্স খাওয়াতে বলেন কেন?**

. ফ্যারেক্স হল শক্ত আহার ধরানোর জন্যে বিশেষভাবে তৈরী আহার—যা শিশুর কোমল হজমশক্তির উপযোগী করার জন্যে আগে থেকে রান্না করা থাকে।

এতে আছে—দ্রুত বেড়ে ওঠার জন্যে প্রোটিন; শক্তির জন্যে কার্বোহাইড্রেট আর ফ্যাট;

মজবুত হাড় আর দাঁতের জন্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন। ফ্যারেক্স খেলে আপনার শিশু অনেক ঘনীভূত আকারে ক্যালোরি পায়, ফলে তরল আহার খাওয়া কমে যায়, আর সে চিবিয়ে খেতে শেখে। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, ফ্যারেক্স আয়রণে ভরপুর—যা শিশুর সাধারণ স্বাস্থ্য আর বৃদ্ধির জন্যে একান্ত প্রয়োজন।

বিনামূল্যে! চিঠি লিখে চেয়ে পাঠান শিশুর প্রথম বছরের খাতা : নতুন মায়েদের জন্যে শিশুপালন সম্বন্ধে সহজ পরামর্শ। সঙ্গে ডাকখরচ বাবদ ৫০ পয়সার স্ট্যাম্প পাঠাবেন।

**পোঃ অঃ বঃ নং 19119**
**(FAR 77 I) বম্বে 400 025.**

## ডাক্তাররা খাওয়াতে বলেন ফ্যারেক্স— সব দিক থেকে দ্রুত বেড়ে ওঠার জন্যে শিশুর আদর্শ শক্ত আহার

CASGLF-12-244 Ben

প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর
নেস্‌কাফে®
NESCAFE
instant coffee
বিশ্বের সর্বাধিক
বিক্রীত কফি

॥প্রকাশিত হল॥

★

সমরেশ মজুমদারের

নতুন উপন্যাস

## বন্দী নিবাস

*বন্দী নিবাস বাংলা ভাষায়* লেখা প্রথম মৌলিক থ্রিলার যা পাঠকদের নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ দেবে না।

উত্তরাধিকারের লেখক সমরেশ মজুমদার নিজেকে ভাঙ্গতে জানেন, ভেঙ্গে গড়তে পারেন. বন্দী নিবাস সেই আশ্চর্য আবিষ্কার।

দশ টাকা

বিজিতকুমার দত্তের

একটি সাধক গবেষণামূলক গ্রন্থ

## বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারাবাহিক, বিশ্লেষণপূর্ণ আলোচনা। ডঃ দত্তের আলোচনায় ঐতিহাসিক বোধ ও তীক্ষ্ণ সমালোচনা জিজ্ঞাসার নিপুণ সমন্বয় ঘটেছে এই গ্রন্থে। সমবেদনা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে তথ্যনিষ্ঠা যুক্ত হয়ে গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে এক অনন্যসাধারণ মর্যাদা পেয়েছে পঁচিশ টাকা।

নারায়ণ সান্যালের

রহস্য উপন্যাস

## উলের কাঁটা ১১

॥প্রকাশিত হল॥

## মিত্র-ঘোষের আবার এক অবদান

### উপহার দেবার মতো স্বল্প মূল্যের বই

কাগজ ছাপার দুর্মূল্যতার মধ্যে — মিত্র ঘোষের সুলভে সৎ-সাহিত্য প্রকাশের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা।

বরণীয় লেখক-লেখিকার নবতম ও শ্রেষ্ঠতম রচনা উপহারযোগ্য সুদৃশ্য সংস্করণে অথচ সুলভ মূল্যে পরিবেশনের উচ্চাশা-মূলক অভিযান:

—এ পর্যায়ের প্রথম উপন্যাস—

সাহিত্য-অধিরাজ্ঞী আশাপূর্ণা দেবীর অন্তর্দর্শনা উপন্যাস

## বালির নীচে ঢেউ ১০৲

[মোহন মুদ্রণ, সুন্দর প্রচ্ছদ, প্লাস্টিক জ্যাকেটে মোড়া, ডিমাই ২২৫ পৃষ্ঠার স্বাভাবিক নিয়মে যার মূল্য হওয়া উচিত ১৬৲ সেই বই মাত্র ১০৲ টাকায় দেওয়া হচ্ছে]

॥প্রকাশিত হল॥

যাঁর খ্যাতি শুধু বাংলায় নয়

সারাভারতে পরিব্যাপ্ত

সেই অদ্বিতীয় ঔপন্যাসিক

বিমল মিত্রের

নবতম উপন্যাস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট-৭৩/৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড-৯

॥প্রকাশিত হল॥

★

সুমথনাথ ঘোষের

## এক নাটক অনেক দৃশ্য

*লেখকের এই গ্রন্থে আসল* মানুষ আর আর নকল, পুতুলকে অসাধারণ নৈর্ব্যক্তি কতায় পাশাপাশি রেখে দেখানো হয়েছে নকলের চাপে আসল আচ্ছন্ন। গ্রন্থটি আগাগোড়া পড়তে পড়তে কেবলই মনে হবে যে এর বক্তব্য কত স্পষ্ট, কত স্বচ্ছ।

সাড়ে বারো টাকা

জরাসন্ধের

আত্মস্মৃতিমূলক উপন্যাস

## নিঃসঙ্গ পথিক

'নিঃসঙ্গ পথিক' এর পটভূমিও বাংলাদেশ —খেয়ালী নদী আড়িয়াল খাঁর তীরে গড়ে ওঠা কতগুলো গ্রাম ও গঞ্জ একদিন তারই গর্ভে বিলীন হয়ে গেল। সর্বস্বহারা শ্যামাচরণ শিরোমণি একটা যুগের যিনি প্রতিনিধি—নদীহীন দেশে গিয়ে ঘর বাঁধলেন— শুরু হল এক নতুন জীবন ধারা। তাঁর পুত্রের মধ্যে জন্ম নিল আর একটা যুগ। 'নিঃসঙ্গ পথিক' এই দুয়ের মিলন এবং সেই সঙ্গে কিছুটা বিরোধের কাহিনী।

প্রথম খণ্ড-২২৲ দ্বিতীয় খণ্ড-১৮৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অমর উপন্যাস

## পঞ্চগ্রাম ১১৲

(পেপার ব্যাক)

॥প্রকাশিত হল॥

## চিঠিপত্র

### রবীন্দ্রসংগীত

শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্যের লেখা রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ক একটি চিঠি ১২ই এপ্রিল "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর তার উত্তরে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম। শ্রীকমলাকান্ত বরাট ছাপে আমার চিঠির ওপরে এমন কিছু মন্তব্য করেছেন, যেগুলো সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য রাখার অবকাশ আছে।

শ্রীবরাট তাঁর চিঠিতে সাহানা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি থেকে যে উদ্ধৃত দিয়েছেন, তা বিশ্লেষণ করে শ্রীবরাটের মতো কিছুতেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারছি না যে, সৃষ্টিকর্মকে সবরকম বিচার-বিবেচনার ঊর্ধ্বে রেখে স্রষ্টার প্রতি নিঃশর্ত এবং নিরঙ্কুশ আত্মসমর্পণ করতে না পারলে গান গাওয়া অথবা গান শোনা কোনটাই সার্থক হয় না"—এ হেন ভক্তিগদ্‌গদ গুরুবাদ মার্কা শিল্পদর্শনে রবীন্দ্রনাথের আস্থা ছিলো বলে আমার তো জানা নেই। উদ্ধৃত পত্রাংশটিতে রবীন্দ্রনাথ সাহানা দেবীকে যা বলছেন, তা থেকে আদৌ প্রমাণিত হয় না যে (১) সাহানা দেবী সৃষ্টিকর্মকে সবরকম বিচার-বিবেচনার ঊর্ধ্বে রাখতেন রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়ার সময়ে বা (২) রবীন্দ্রনাথ অমনধারা কাজের পক্ষপাতী ছিলেন। আমি যতদূর জানি, গত একশো বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে (আমাদের দেশটিও ব্যতিক্রম নয়) সমালোচনা, বিশ্লেষণ, যাচাই ইত্যাদি ব্যাপারগুলো মানুষের যাবতীয় সৃষ্টির প্রেক্ষিতে দারুণভাবে অনুশীলিত হতে হতে এবং "বিজ্ঞান" নামে একটা ব্যাপার আধুনিক মানসে তার আসন পাকা করে নেবার পর মানুষের বিভিন্ন সৃষ্টি পরিক্রমার সুহৃদেরা (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করনেওয়ালারা নন) বিচার-বিবেচনা না করে মানুষের কোনো সৃষ্টিকে গ্রহণ করা তো দূরে থাক, আমল দেবার কথাও ভাবতে পারেন না। নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ "ডুব দে মন কালী বলে" গোছের মোহময়, মধ্যযুগীয় তমসাচ্ছন্ন, তুরীয় ব্যাপার যা এই অভক্তি, বিভিন্ন গোঁড়ামি এবং মুখকামী কর্তৃত্ব-পরায়ণতার দেশে এক শ্রেণীর মানুষের তা যতই পছন্দ হোক না কেন—আসলে স্থবির, নিষ্প্রাণ, অসুন্দর। তা ছাড়া সংগীত, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি ব্যাপারগুলো তো আর হিটলারের তৃতীয় রাইখ নয় যে "নিঃশর্ত ও নিরঙ্কুশ আত্মসমর্পণ" না করলে সাজা পেতে হবে। মস্তিষ্ক নামে পদার্থটি মানুষের যখন আছেই, তখন বিচার-বিবেচনা করতে ক্ষতি কি? সংগীত-চিন্তার "সংগীত ও ভাব" প্রবন্ধটিতে আমরা পড়ছি : "আমাদের বঙ্গ সমাজে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে...। এই নূতন আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে সঙ্গীতের নব অভ্যুদয় হইয়াছে। সঙ্গীত সবে জাগিয়া উঠিয়াছে মাত্র, কাজ ভালো করিয়া আরম্ভ হয় নাই। এখনো সঙ্গীত লইয়া নানা প্রকার

আলোচনা আরম্ভ হয় নাই, নানা নূতন মতামত উত্থিত হইয়া আমাদের দেশের সঙ্গীতশাস্ত্রের বদ্ধ জলে একটা জীবিত তরঙ্গিত স্রোতের সৃষ্টি করে না। কিন্তু দিন দিন সঙ্গীতশিক্ষার যেরূপ বিস্তার হইতেছে, তাহাতে সঙ্গীত-বিষয়ে একটা আন্দোলন হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে বোধ করি। এ বিষয় লইয়া একটা তর্ক-বিতর্ক দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্ব না হইলে ইহার তেমন একটা দ্রুত উন্নতি হইবে না।"—যে ব্যক্তি আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে সংগীত সম্পর্কে এমন কথা বলেছেন, সঙ্গীত-বিষয়ে আন্দোলন, তর্ক-বিতর্ক, দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বের প্রয়োজনীয়তার কথা সরাসরি উল্লেখ করেছেন, সেই ব্যক্তি যে বিচার-বিবেচনা শিকেয় তুলে "নিঃশর্ত ও নিরঙ্কুশ আত্মসমর্পণের" পক্ষপাতী হবেন না—এই কথাটা নিয়ে আর আলোচনার প্রয়োজন আছে কি?

রবীন্দ্রনাথের গানগুলো সুরপ্রধান নয়, কথাপ্রধান : এ কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বার বার বলে গেছেন বলে শ্রীবিরাট দাবি করছেন। আমি তাঁকে অনুরোধ করছি, রবীন্দ্রনাথ কোথায় কোথায় এই কথা "বার বার" বলেছেন, তা পাঠক-মহলের অবগতির জন্য একবার প্রকাশ্যে জানাতে। সকলেরই বড়ো উপকার হবে। সঙ্গীতচিন্তা গ্রন্থ থেকে আমি শ্রীবিরাটের বক্তব্যের বিপরীতে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি, যেগুলো থেকে সচেতন যে-কোনো পাঠক বুঝতে পারবেন, গানে সুর ও কথা—এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কি বলতে চেয়েছেন। "...কথাও যতখানি ভাব প্রকাশ করে, সুরও প্রায় ততখানি ভাব প্রকাশ করে। এমন কি সুরের উপরেই কথার ভাব নির্ভর করে।...সুরের ভাষা ও কথার ভাষা উভয় ভাষায় মিশিয়া আমাদের ভাবের ভাষা নির্মাণ করে। কবিতায় আমরা কথার ভাষাকে প্রাধান্য দিই ও সঙ্গীতে সুরের ভাষাকে প্রাধান্য দিই।" (সঙ্গীতচিন্তা/পৃঃ ২৪)। "দ্বিতীয়বার বিলাতে যাইবার পূর্বদিন সায়াহ্নে বেথুন-সোসাইটির মেডিকাল কলেজ হলে আমি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম।...প্রবন্ধের বিষয় ছিল সঙ্গীত যন্ত্রসঙ্গীতের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমি গেয় সঙ্গীত সম্বন্ধে ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, গানের কথাকেই গানের সুরের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া তোলা এই শ্রেণীর সঙ্গীতের মুখ্য উদ্দেশ্য। ....কিন্তু যে মতটিকে এ[…] স্পর্ধার সঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছিলাম [...] মতটি যে সত্য নয়, সে কথা আ[…] স্বীকার করিব। গীতিকলার নিজের[…] একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কা[…] আছে। গানে যখন কথা থাকে তখ[…] কথার উচিত হয় না সেই সুযো[…] গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে [...] গানেরই বাহনমাত্র। গান নিজে[…] ঐশ্বর্যেই বড়ো, বাক্যের দাসত্ব সে কে[…] করিতে যাইবে? বাক্য যেখানে শে[…] হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহ[…] বলে। এই জন্য গানের কথাগুলো[…] কথার উপদ্রব যতই কম থাকে তত[…] ভালো।" (সংগীতচিন্তা/পৃঃ ২৭) "আমার মনে যে সুর জমেছিল, সে সু[…]

[য]খন প্রকাশিত হতে চাইলো তখন কথার সঙ্গে গলাগলি করে সে দেখা দিল। [ছে]লেবেলা থেকে গানের প্রীতি আমার নিবিড় ভালোবাসা, যখন আপনাকে [ব্য]ক্ত করতে গেল, তখন অবিমিশ্র সংগীতের রূপে সে রচনা করলে না। সংগীতকে কাব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে, কোন্‌টা বড়ো কোন্‌টা ছোটো বোঝা গেল না।" (সংগীতচিন্তা/পৃঃ [৩]৩) "আধুনিক বাংলা গানও একটি [স্ব]াভাবিক বিশেষত্ব নিয়েছে। এই সংগীতে [ক]াব্যশিল্প ও সুরশিল্পের মিলনে [এ]কটি অপরূপ সৃষ্টিশক্তি রূপ নিতে [উ]দ্যত [হ]য়েছে।" (সংগীতচিন্তা/পৃঃ ৮৭)— রবীন্দ্রনাথের গান আধুনিক গানের উৎসে আছে বলে আমার যে বক্তব্য ছিলো, রবীন্দ্রনাথের এই উদ্ধৃতির প্রেক্ষিতে তার বিচার করলে শ্রীবরাটের বোধ হয় সুবিধে হবে।

"রবীন্দ্রনাথের গান কি আধুনিক গান নয়? গত একশো বছর ধরে আধুনিক গানের যে ধারা চলে আসছে রবীন্দ্রনাথ কি তার উৎসে নেই?"— আমার এই প্রশ্নকে শ্রীবরাটের "অদ্ভুত" মনে হয়েছে। অথচ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে একটি চিঠিতে লিখছেন : "আমার আধুনিক গানে রাগ-তালের উল্লেখ না থাকাতে আক্ষেপ করেছিস।" (সংগীতচিন্তা/পৃঃ ২৪৫)। গানে কথার পাশে পাশে গানের সামগ্রিক কাঠামো, সুরের ইডিয়ম, ছন্দ, মুভমেণ্ট, স্বরবিন্যাস-স্বরসংগতির সম্ভাবনা ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাপার আছে। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল এইসব ব্যাপারগুলো যেভাবে ব্যবহার করেছিলেন এই সব ব্যাপার নিয়ে যেভাবে ভাবনাচিন্তা করেছিলেন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, সেই ধরনের সাংগীতিক কার্যকলাপ বাংলা গানের ক্ষেত্রে তাঁদের আগে ঐ হারে, ঐ মাত্রায় আর কেউ করেছিলেন বলে আমার জানা নেই। বাংলা গানের গঠন-বিন্যাস, গতিপ্রকৃতি, ভাব, চরিত্র উপাদান ইত্যাদির ক্ষেত্রে আধুনিক মনের প্রথম ধাক্কা ও প্রভাব রবীন্দ্র-যুগেই পড়েছিলো। ঐভাবেই আধুনিক গানের জন্ম। তিরিশের দশকের প্রথম দিকে "আধুনিক গান" নামে কোনো কথা শোনা যেতো না বলে শ্রীবরাট কি প্রমাণ করতে চাইছেন? পুরোনো পুরোনো রেকর্ড-এর লেবেল পড়লে বরাট মশাই দেখতে পাবেন যে, সেকালে রবীন্দ্রনাথের গানের রেকর্ডেও "রবীন্দ্রসংগীত" নামটা লেখা থাকতো না। তাই বলে কি "রবীন্দ্রসংগীত" সেকালে ছিলো না? শ্রীবরাটের যুক্তিতে তো বলতে হয় যে "রবীন্দ্র-সংগীত"ও সেদিনের খোকা। "বাংলা গানের বিশিষ্ট ধারার অবলুপ্তিই এই আধুনিক গানের প্রকৃত উৎস" ইত্যাদি কথা ঐতিহাসিক ও সাংগীতিক যুক্তির ধোপে টেকে না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজের গানকে "আধুনিক" বলছেন, তার প্রমাণ আমি দিয়েছি।

সুমন চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশিত হল

**সমরজিৎ কর-এর**

গল্পের মতো স্বাদু জীবনী

## অগ্রজ বিজ্ঞানী

দাম ১৫·০০
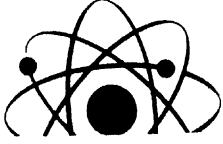
১৯১৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। পরের বছর সদ্য এম সি সি পাশ একদল তরুণ এলেন তাঁর কাছে। তাদের আর্জি, রসায়নের মতো আধুনিক গণিত এবং পদার্থ বিদ্যাতেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এস সি কোর্স চালু করা হোক। "কে পড়াবে?" জিজ্ঞাসা করলেন স্যার আশুতোষ। "কেন? আমরা।" জবাবে বললেন সেই তরুণ ছাত্রদল। সেদিন যাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে মিশ্রগণিত ও পদার্থ বিদ্যায় এম এস সি কোর্স চালু করেছিলেন স্যার আশুতোষ তাঁদের মধ্যে ছিলেন মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। এঁরা নিযুক্ত হলেন নতুন কোর্সের লেকচারার। মাইনে কম, কিন্তু উৎসাহ কম নয়। বিজ্ঞান চর্চাকে সেদিন জীবনের ব্রত হিসেবে যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, দেখা গেল, স্ব-স্ব ক্ষেত্রে নিজেরাই তাঁরা হয়ে উঠলেন এক একটি ইনস্টিটিউশন। ভারতকে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করলেন পৃথিবীর বিজ্ঞান-মানচিত্রে। এমনই কয়েকজন অগ্রজ বিজ্ঞানীর জীবন ও কর্মের সঙ্গে এই বইতে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন সমরজিৎ কর—বিজ্ঞানকে সাহিত্যের মতো স্বাদু ও সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলায় যাঁর জুড়ি মেলা ভার। প্রতিটি বিজ্ঞানীর ফোটো এ-বইয়ের আলাদা আকর্ষণ।

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

**সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের**

নতুন স্বাদের কিশোর উপন্যাস

## ভুংগা

দাম ৭·০০

সন্তুকে মনে আছে? সেই সন্তু, যাকে নিয়ে দুর্ধর্ষ উপন্যাস 'তিন নম্বর চোখ', যে চোখ বুজলে হঠাৎ দেখতে পায় বহু দূরের কোনো দৃশ্য অথবা ঘটনা, যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল গ্রহান্তরের অধিবাসীদের।

সেই সন্তু আর তার আদরের কুকুর ভুংগা আর অন্য গ্রহের লোকদের নিয়েই নতুন স্বাদের অসামান্য উপন্যাস 'ভুংগা।'

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

**সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের**

এক মলাটে দুটি উপন্যাস

## হলদে বাড়ির রহস্য ও দিনে ডাকাতি

দাম ৬·০০

দুটি দারুণ জমজমাট অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর একত্র-সংকলন এই বই। শিমুলতলার লাট্টু পাহাড়ের কাছে দুর্গের মতো এক রহস্যময় বাড়ি নিয়ে 'হলদে বাড়ির রহস্য।' আর, ব্যাঙ্কের এক মৃত দারোয়ানের অশরীরী আত্মার সাহায্যে কীভাবে ধরা পড়ল ব্যাঙ্ক-ডাকাতির নায়ক ডাকাতদল তাই নিয়েই লেখা 'দিনে ডাকাতি।' দুটি

**কালকূট-এর**

উষ্ণ স্বাদের উপন্যাস

## অমৃত বিষের পাত্রে

দাম ৮·০০

বিষবাহী প্রাণের অমৃত-সন্ধানের কথা লিখতেই কালকূট একদা কলম ধরেছিলেন। তাঁর প্রথম যাত্রা 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে।' অমৃত-সন্ধানের শেষ যদি এখানেই হত, তাহলে যে-অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছিলেন তিলোত্তমা নগরী রাজধানী দিল্লীতে গিয়ে, সেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা কোনোদিনই জানা যেত না। এ-ও এক দুর্লভ অমৃতেরই সন্ধান। যমুনার ওপরে টলমলে আকাশে ভেসে-বেড়ানো একটি মুখ—সেই মুখই অমৃতের মুখ, বিষের পাত্রে টলটলানো কার সেই মুখ? সে-মুখ রঞ্জিতার। অগ্নীশ্বরী রূপ তার, দুরন্ত যৌবন। কিন্তু রূপই অভিশাপ। আগুনের মতো সেই রূপে পতঙ্গেরা পুড়ে মরে, কিন্তু মানুষ এই আগুন নিয়ে সুখের ঘর বাঁধতে ভয় পায়। রঞ্জিতাকে চেয়েছে অনেকে, কিন্তু যা ও পায় নি—তার নাম ভালবাসা। প্রবল তৃষ্ণা নিয়ে, তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, আকণ্ঠ বিষের পাত্রে মুখ রেখেছে যে-রঞ্জিতা রিজভি, কালকূটের-এর নির্বাসন-যাত্রায় তার সেই বিষই কীভাবে অমৃত হয়ে দেখা দিল, তারই এক উষ্ণ উজ্জ্বল অসামান্য কাহিনী 'অমৃত বিষের পাত্রে।'

**কালকূট-এর অন্যান্য উপন্যাস:**
শাম্ব ৭.০০ তুষার সিংহের পদতলে ৬.০০ অমাবস্যায় চাঁদের উদয় ৮.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯

**সুরজিৎ দাশগুপ্তের**

চমকপ্রদ উপন্যাস

## বিদ্ধ করো

দাম ১০·০০

একটি ছেলের বড়ো-হয়ে-ওঠার এক চমকপ্রদ কাহিনী 'বিদ্ধ করো।' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালীন এক মফস্বল শহর, ব্রাহ্মসমাজ, সংস্কার, আচার, একটি পরিবারের ভেতরের লুকনো কাহিনী, চারপাশের মানুষজন, নিসর্গ দৃশ্য, স্মৃতি, অপমান, দুঃখ, যৌনতাবোধ, পাপ—এমন বহু-কিছুকে একটি কিশোরের চক্ষুর জানালা
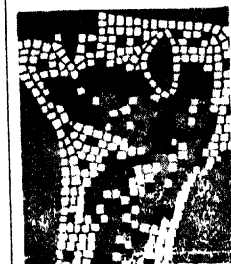
দিয়ে পরিণত দক্ষতায় দেখিয়েছেন সুরজিৎ দাশগুপ্ত।

**শুভ্রাংশু গুপ্তের**

বিশিষ্ট উপন্যাস

## মহাকরণ

দাম ৪·০০

রাইটার্স বিল্ডিংস-এর পটভূমিকায় রচিত এই চাঞ্চল্যকর উপন্যাসে এক অজ্ঞাত পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়েছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক লেখক শুভ্রাংশু গুপ্ত। আমলা-কেরানী-

কর্মচারীদের জীবন থেকে তুলে-আনা এই কাহিনী একাধারে ঐতিহাসিক দলিল এবং বিচিত্র স্বাদের উপাখ্যান।
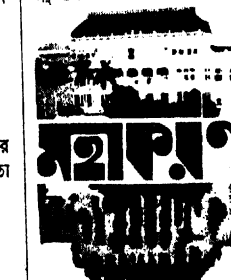
প্রকাশিত হয়েছে

**সমরেশ বসুর**

নতুন উপন্যাস

## বিপর্যস্ত

প্রকাশিত হয়েছে

**ইন্দ্রমিত্র-এর**

সরস সজীব কৌতুক উপন্যাস

## মহারাজ

দাম ১০·০০

হাসির গল্পের একনিষ্ঠ লেখকরা খুব কম পেয়েছে। হাসির উপন্যাস লিখেছেন। পরশুরাম লেখেননি. শিবরাম চক্রবর্তীও না। অথচ কে না জানে, কৌতুকগল্পের ক্ষেত্রে এই দুটি নাম কী অবধারিত, কী উজ্জ্বল এবং অবিসংবাদী। হাসির গল্পকার ইন্দ্রমিত্র এঁদেরই উত্তরসূরী এবং বিশিষ্ট সফল একটি ব্যক্তিত্ব। তাঁর গল্পগ্রন্থ 'শুভদিন' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন, জীবন থেকে কত সহজে তিনি তুলে নেন অনাবিল কৌতুক-উচ্ছল সিচ্যুয়েশন। বুদ্ধিদীপ্ত ধারালো তাঁর ভাষা, সরস সজীব তাঁর বর্ণনা, বিস্ময়কর তাঁর পরিমিতিবোধ। হাসির গল্পকাররূপে তাঁর সার্থক অভিজ্ঞতাকে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন ইন্দ্রমিত্র 'মহারাজ' উপন্যাসে। আদ্যন্ত কৌতুকময় এই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে এক দুর্লভ ও দুর্মূল্য সংযোজন হয়ে থাকবে। নেপথ্য-জগৎ বা আন্ডারওয়ার্ল্ড-এর যেসব কীর্তিকাণ্ড আমাদের যাবতীয় ঘটনাপ্রবাহকে করছে নিয়ন্ত্রিত, এই উপন্যাসে তারই পরিচয় তুলে ধরেছেন তিনি। ঘটনাগুলো আমরা জানি, ঘটতে দেখি। কিন্তু নেপথ্যকাহিনী জানা ছিল না। দম-ফাটা হাসির রাংতায় মুড়ে অনাস্বাদিত সেই কাহিনীই অনন্য ভঙ্গিতে শোনালেন ইন্দ্রমিত্র।

**এই লেখকের গল্পগ্রন্থ:**
শুভদিন ৬·০০

দেশ
৪৭ বর্ষ ৪০ সংখ্যা
১৭ শ্রাবণ ১৩৮৭



সূচীপত্র



পরবর্তী আকর্ষণ

রাজ্যেশ্বর মিত্রর প্রবন্ধ
পুরুলিয়ার ঝুমুর ও ঝাড়খণ্ডী কীর্তন
বলরাম বসাকের গল্প
প্রতিবেদন

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদল দিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ এবং জীবনসত্য প্রিন্টিং হাউস ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

# নগ্নপদ চিকিৎসক

'বেয়ারফুট ডক্টরস' বা নগ্নপদ চিকিৎসক কথাটা আজকাল কাগজে পত্রে প্রায়ই চোখে পড়ে। এটি এক রকম চৈনিক অলঙ্করণ, আসলে আমরা কথাটির মধ্যে দিয়ে যা বোঝাতে চাই তা হল, প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসকদল যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে গিয়ে গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব নেবেন, সেখানে জনসাধারণের চিকিৎসা করবেন। প্রধানত এই উদ্দেশ্যের কথা মনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার সম্প্রতি এক নতুন মেডিকেল পাঠক্রম প্রচলন করতে চাইছেন এবং আপাতত তিনটি মেডিকেল স্কুল খোলার ব্যবস্থাও অনেকটা করে ফেলেছেন। কিন্তু গোল বেধেছে অন্যত্র : ভারতীয় মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের ও পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল কাউন্সিল—চিকিৎসা-বিষয়ক পড়াশোনার যাঁরা মাথা—তাঁরা এই ধরনের স্কুল খোলার বিরোধী। এঁদের বক্তব্য হল : সরকার যদি এই পথে পা বাড়ান তবে কিছু অপরিণত (নাকি অপরিপক্ব ?) ডাক্তারের সৃষ্টি হবে, যাঁরা গ্রামের সমস্যা দূর করার চেয়ে অন্য সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবেন। এঁরা রোগীর রোগ নির্ণয় করতে ভুল করবেন, চিকিৎসাও করতে পারবেন না ঠিক মতন। ফলে সরকারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

ভারতীয় মেডিকেল কাউন্সিল এবং রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের এই সতর্কবাণী আমরা নিশ্চয়ই উপেক্ষা করতে পারি না। প্রসঙ্গত অন্য কয়েকটি কথাও এসে পড়ে। মেডিকেল স্কুলের প্রচলন নতুন কিছু নয়, আগেও ছিল—এবং এ-কথা নিশ্চয় কেউ অস্বীকার করবেন না যে, একদা যাঁরা মেডিকেল স্কুল থেকে পাস করে আজীবন ডাক্তারি করে গেছেন তাঁরা অনেকেই মোটা-মুটি ভাল চিকিৎসক ছিলেন। সকলেই একেবারে অপরিণত চিকিৎসক ছিলেন না। তবু যে এই ব্যবস্থা উঠিয়ে দেও[illegible] তার কারণ, যে-বিদ্যার সঙ্গে মানুষের জীবন-মরণ নির্ভর করছে সেই বিদ্যাকে আমরা সংক্ষিপ্ত বা স্বল্পমেয়াদী করতে পারি না। সেটা মনুষ্য-সমাজের কাছে পাপ-বিশেষ। ডঃ বিধানচন্দ্র রায় এই ব্যবস্থা পছন্দ করতেন না, আর তাঁর সময়েই লাইসেন্সিয়েট পাঠক্রম উঠিয়ে দেওয়া হয়। ডঃ রায় চেয়েছিলেন, চিকিৎসক হয়ে যাঁরা এই বিশেষ পেশাটি অবলম্বন করবেন তাঁরা যেন যোগ্য হয়ে ওঠেন। যোগ্যতার জন্যেই বেশী এবং বিস্তারিত পড়াশোনা।

মেডিকেল কলেজের সংখ্যা বাড়ালে এবং পাঁচ বছর পড়ালেই কি ভাল চিকিৎসক তৈরী করা সহজসাধ্য হয়? তা যে যায় না তার দৃষ্টান্ত, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং বর্ধমান মেডিকেল কলেজ। ভারতীয় মেডিকেল কাউন্সিল উক্ত দুটি কলেজ সম্পর্কে যে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন তাতে আত্মতুষ্টির কারণ নেই। নিম্নমানের শিক্ষার জন্যে এই কলেজ দুটিকে অনুমোদন দিতে কাউন্সিল অস্বীকার করেছেন। এ-রকম কেন হল সে-প্রশ্নের অনেক জবাব থাকতে পারে—তবে এ-কথা ঠিকই যে, ভাল শিক্ষকরা আর কলেজে পড়াতে যেমন আগ্রহী নন—সেই রকম অধিকাংশ ছাত্র পাঠে মনোযোগী নন। ডাক্তারী পড়াশোনার মানও তাই এই রাজ্যে নিম্নগামী হচ্ছে।

আমাদের সমস্যা প্রধানত কী? শহর এবং গ্রাম দু তরফেরই জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করা। সরকারের দায়িত্ব বিশেষ কোনো জায়গার ও বিশেষ শ্রেণীর জন্যে হতে পারে না। আর এ-কথা ঠিকই, কলকাতা শহরে যত ডাক্তার, যত ব্যবস্থা, সুযোগ—পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে তার শতাংশের একাংশও নেই। গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কিভাবে চিকিৎসা করা হয় তা ভুক্তভোগী চিকিৎসক মাত্রেই জানেন : যেখানে ওষুধ থাকে না, পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকে না, অ্যামবুলেন্স থাকে না—সেখানে ধন্বন্তরিও চিকিৎসা করতে অক্ষম। কলকাতা থেকে পাস করা ডাক্তার পাঠালেও সেখানে চিকিৎসা হবে না।

তা হলে গ্রামের মানুষের কী হবে? নগ্নপদ চিকিৎসকদের সেখানে হাজির করালেই চিকিৎসা হবে না যে তাতে সন্দেহ নেই। যেসব সুব্যবস্থা থাকলে চিকিৎসা হয়—সর্বাগ্রে সে-ব্যবস্থা প্রয়োজন। সরকার এদিকে যদি দৃষ্টি না দেন, আমরা মনে করি না অন্য কোনো ভাবে এ-সমস্যা দূর হতে পারে। গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্র-কে যদি সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলা যায়, চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকে, সাহায্য থাকে এবং কাজ করার আবহাওয়া থাকে তরুণ চিকিৎসকরা নিশ্চয় গ্রামে যেতে অনাগ্রহী হবেন না।

একটা কথা বলা প্রয়োজন। চিকিৎসা বিদ্যা এমনই বিদ্যা যা শুধু কেতাবী শিক্ষায় আয়ত্ত করা যায় না। অভিজ্ঞতাও অন্যতম শিক্ষা। মেডিকেল স্কুলের পাস করা ডাক্তারও যেমন রোগীর জীবন বিপন্ন করতে পারেন বিদ্যার অভাবে, মেডিকেল কলেজের পাস করা ডাক্তারও সেই রকম অভিজ্ঞতার অভাবে রোগীকে ভুল চিকিৎসা করতে পারেন। কাজেই বিপদ দু তরফেই।

মেডিকেল স্কুল আবার চালু হবে কি হবে না তা যোগজনে বিচার করুন—আমাদের বলার কিছু নেই। তবে এ-কথা মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, গ্রামের মানুষ স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজ যে-ভাবে বিড়ম্বিত হচ্ছেন ওই বিড়ম্বনা চলতে দেওয়া যেতে পারে না। তবে তার জন্যে নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল—ওই যুক্তিতে ডাক্তারের বদলে হাতুড়ে দিয়ে গ্রামের স্বাস্থ্য তদারকি চলতে পারে না।

# সেও একদিন ছিল মায়ের হাতের রান্না ছিল কত পুষ্টিকর...

# সেদিন আবার ফিরে এনেছে ন্যুট্রি নাগেট®
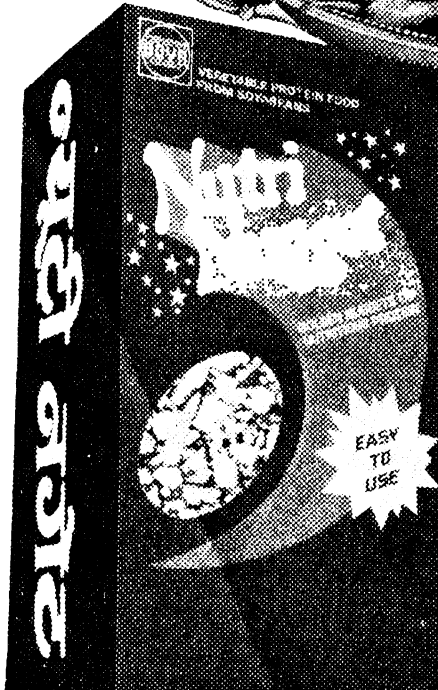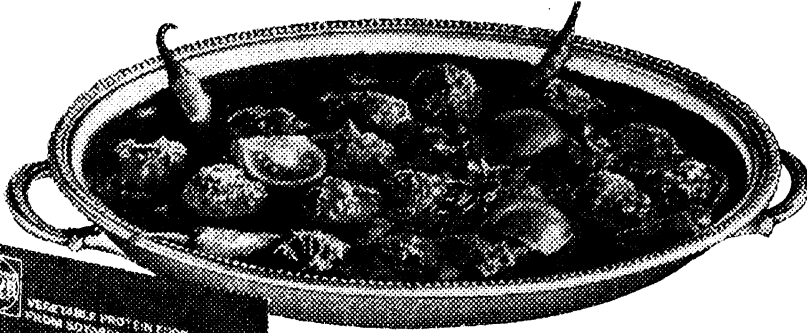
ন্যুট্রি নাগেট—প্রোটিন-সমৃদ্ধ শুদ্ধ আহার। ঘরের রান্নায় এক নতুন প্রণালী।

ন্যুট্রি নাগেট—বেশী পুষ্টিকর, কারণ এতে আছে ৫০ প্রতিশত প্রোটিন। ডিম, দুধ বা ডালেও এত প্রোটিন নেই।

ন্যুট্রি নাগেট—কম দামে লাভজনক, কারণ ২২টা ডিম, ১০ গ্রাম পনীর, বা ৪ লিটার দুধে যত প্রোটিন আছে, তা পাওয়া যায় ন্যুট্রি নাগেটের ২৫০ গ্রামের প্যাকেটে।

ন্যুট্রি নাগেট—সর্বগুণ সম্পন্ন, রান্নায় এনে দেয় অপূর্ব স্বাদ। আপনার দৈনিক রান্নার উপকরণে আজই ন্যুট্রি নাগেট সামিল করুন।

## ন্যুট্রি নাগেট®

### শুদ্ধ, সোনালী সয়াবীনে তৈরি নিরামিষ আহার

দানা বা ছোট ছোট টুকরোয় পাওয়া যায়।

**সয়া প্রোডাকশন এণ্ড রিসার্চ এসোসিয়েশন**
পোস্ট-বক্স নং ৭৫, বেরিলী, ২৪৩০০১, ইউ. পি.
নেব টেকনিকাল ইন্সটিট্যুট এবং জি. বি. পন্থ ইউনিভার্সিটি অব এগ্রিকালচার এণ্ড টেকনলজির একটি সংস্থান।

ULKA/SPRA/1-80 BEN.

# সুখও নয়, দুঃখও নয়, শুধু শান্তি


প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ


## প্রস্তাবনা

কয়েক দিন আগে প্রশান্তচন্দ্রের কাগজপত্র সব গোছাতে গিয়ে এই লেখাটা হাতে ঠেকলো। ৮ই মার্চ, ১৯৪২ সালে শান্তিনিকেতনে বসে লেখা একখানা চিঠি তাঁর কোনো স্নেহের পাত্রীকে লেখা। এটা এমন একটা চিঠি যেটাতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রশান্তচন্দ্রের প্রথম পরিচয়ের একটা অধ্যায় যেন ছবির মতো ফুটে উঠেছে। কবির সে সময়কার সহজ নিরাড়ম্বর জীবনযাত্রার কথা এখনকার দিনে অনেকেই জানে না। তাদের কাছে তাই এই লেখাটা অতি মূল্যবান মনে হবে বলে আমি প্রশান্তচন্দ্রের চিঠিখানা ছাপতে দিলাম। কবির সঙ্গে প্রশান্তচন্দ্রের জীবনের গ্রন্থিবন্ধন দিনে দিনে তিলে তিলে কেমন করে গড়ে উঠেছিল তার ইতিহাসটা ফেলে দেবার মতো জিনিস নয় বলেই আমার বিশ্বাস। আজকের দিনে রবীন্দ্রগবেষণা নিয়ে যাঁরা রত আছেন তাঁদের কাছে নিশ্চয়ই এর মূল্য আছে। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য একজন মানুষ, যাঁর সমগ্র জীবনটাই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব দিয়ে তৈরী, যিনি রবীন্দ্রনাথের আদর্শকেই নিজের জীবনের আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন, যাঁকে রবীন্দ্রনাথের মন্ত্রশিষ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না, কবির মৃত্যুর বেদনা তাঁর নিজের এই লেখার ভিতর দিয়ে কি রকম করে ফুটে উঠেছে তা সবাই দেখতে পাবে। প্রশান্তচন্দ্রের মনের অনুভূতি কখনো বাইরে প্রকাশ পেত না। অন্তরের গভীরে ফল্গুনদীর মতো সব স্নেহ ভালোবাসা শ্রদ্ধার প্রবাহ নিত্য বয়ে যেত, কিন্তু বাইরে তার কোনো উচ্ছ্বাস কখনও দেখিনি। তাই যদি কখনও সামান্য প্রকাশের আভাস কোনো দিন দেখেছি তাতেই বুঝতে পেরেছি সেটা কতখানি। যেদিন এই লেখাটা লিখেছিলেন সেদিনকার কথা মনে পড়ছে। সেদিনও আমার স্বামীকে বাইরে থেকে দেখে কেউ বুঝতে পারেনি যে, তাঁর অন্তর জন্ম-মৃত্যুর তরঙ্গে কি রকম উদ্বেল হয়ে রয়েছে সারাক্ষণ। এ বিষয়েও তাঁর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আশ্চর্য মিল।

শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ

---

"Uttarayan"
Santiniketan
Bengal
৮ই মার্চ ১৯৪২

ল্যাণীয়াসু,

আট মাস পরে শান্তিনিকেতনে সেছি। কবি যাওয়ার পরে এই প্রথম। কাল নৈ আসতে আসতে মনে পড়লো ১৯১০ লে, প্রায় বত্রিশ বছর আগে এইরকম একটা কালের গাড়িতেই শান্তিনিকেতনে প্রথম াসি। এসেই কবির সঙ্গে দেখা করতে য়েছিলুম। আর মনে পড়ছে ঠিক এক বছর াগে মার্চ্চ মাসে দিল্লী থেকে ফিরতি পথে খানে এসেছিলুম। পেঁছেই কবির সঙ্গে খা হোলো। কাল থেকে বারেবারে মনে ড়ছে যে এবার আর দেখা হবে না। থেকে কে ভুলে যাই। মনে হয় এখনি দেখতে াশে পাশে কোথাও রয়েছেন। বুকে মোচড় য়ে ওঠে। কাল রাত্রে শুতে গেলুম। কবির ঙ্গে দেখা হয়নি। রাত্রে বারোটা, একটা জলো। মাঝে এই বত্রিশ বছরের কত কথা ন পড়ছিলো। আজ সকালে উঠে কোনো াড়া নেই। ভোর না হতে রানী উঠে চলে য়—সূর্য্য ওঠার আগে উনি অপেক্ষা রে থাকবেন। সকালে চায়ের টেবিল থেকে ঠে বড়ো ঘরটার পাশ দিয়ে গেলুম—ই সময়টা আমি ও'র সঙ্গে দেখা করতে ই। ঘরটা এখন museum করা হয়েছে। কবার উঁকি মেরে চলে এলুম। উপরে এসে ানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি ফাল্গুন মাসে ৌঠানের বাগান ফুলে ফুলে উজ্জ্বল। রশু কালবৈশাখীর ঝড় হয়ে গিয়েছে—কালবেলার বাতাস আজও স্নিগ্ধ। দূরে াপাই নদীর পারে ঘন সবুজ রঙ লেগেছে। মনে কবির হাতে লাগানো গাছের পাতা ালোয় বাতাসে ঝলমল করছে। চুপ করে বসে ছি। এইরকম কতো সকাল বেলায় কবি গুন গুন করে গান ধরেছেন। পুরানো সব সুর যেন ভেসে আসছে।

বত্রিশ বছর আগের দিনগুলি মনে পড়ছে। অতো বড়ো একটা মানুষকে দেখেছি কতো কাছে থেকে। আজ ছোটোখাটো কতো টুকরো দিনের কথা মনে পড়ছে। বড়ো বড়ো কতো কান্ড ঘটেছে, কতো কবিতা, গান, অভিনয়। আজ মনে পড়ছে এ সমস্ত ছাপিয়ে ও'র কাছে কতো স্নেহ পেয়েছি। ১৯১১ সালে গ্রীষ্মের ছুটির আগে দুমাস শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে ছিলুম—তখন কলেজে পড়ি সতেরো আঠারো বছর বয়স। তখন সারাদিন প্রায় ও'র কাছে-কাছেই থাকতুম। শান্তিনিকেতন পুরানো guest house-এর দোতলায় পূর্বদিকের সেই ছোট ঘরখানায় উনি থাকেন। এই ঘরে বসেই গীতাঞ্জলি, রাজা, ডাকঘর লিখেছেন। মাঝে একটা বসবার ঘর। আমি থাকি পশ্চিমের ঘরে। গ্রীষ্মকাল—আমি একটা মাদুর নিয়ে উপরের বড়ো ছাদে শুতাম। কবির চাকর ছিল উমাচরণ—সেই আমাকে খাওয়াতো। সন্ধেবেলা আশ্রমের লোকজন দেখা করে যাওয়ার পরে দক্ষিণে গাড়ি-বারান্দার ছাদটায় উনি বসে থাকতেন একটা লম্বা চেয়ারে। সন্ধের আগেই আমাদের খাওয়া হয়ে যেতো। খুব সাদাসিধা। হয়তো একটু ফল, বা মিষ্টি, আর এক গেলাস ঘোলের সরবৎ। রাত্রে সে সময় রান্না হোতো না। সকাল-বেলা চায়ের সময় পাঁউরুটি আর ফল। দুপুরে একটু ভাত আর দু একটা নিরামিষ তরকারি—বোধহয় Icmic চলছে। আর কেউ নেই। রথীবাবু, বৌঠান, মীরা সকলে শিলাইদায়। উমাচরণই সব ব্যবস্থা করতো। ঐ একজনই চাকর, রাঁধিয়ে সব কিছু। সমস্ত কিছু ছিল সাদাসিধা। ছোটো ঘরখানায় খুব নীচু করে পাতা ও'র বিছনা। এককোণে একটা ছোটো নীচু লেখবার ডেস্ক। এছাড়া আর আসবাবপত্র কিছু নেই। কয়েকখানা বই ডেস্কের একপাশে আর লেখবার সরঞ্জাম। ঘরে একসঙ্গে দু তিন জনের বেশি মাটিতেও বসবার জায়গা নেই। পাশেই ছোটো স্নানের ঘর। কাপড় চোপড়, পাজামা, পাঞ্জাবি, আর একটা জোব্বাগোছের জিনিষ সেই ঘরেই আলনায় টাঙানো। সিঁড়ির পাশে একটা বাক্সে বোধহয় আর কিছু কাপড় থাকতো। বারান্দায় একটা গোল টেবিলে বসে খাওয়া। এই ছিল তখনকার ব্যবস্থা। রাত্রে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলতে বলতে দেখতুম উনি চুপ করে আসছেন। আমি ছাদে চলে যেতুম। কোনো কোনো দিন আমিও অনেকবার ছাদে বেড়াতে বেড়াতে দেখতুম কবি তখনো স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। তারপরে গভীর রাতে কখন শুতে যেতেন। সূর্য্য ওঠবার আগে নীচে এসে দেখতুম যে কবি তার অনেক আগে উঠেছেন। কোনোদিন বারান্দায় বসে আছেন। কোনোদিন বা মন্দিরের সামনে পূর্বদিকের চত্বরে গিয়ে বসেছেন। সকালবেলা চায়ের টেবিলে নানা রকম আলোচনা। কখনো কখনো বিদ্যালয় থেকে কেউ আসতেন কাজ কর্ম্মের কথা নিয়ে। কখনো অজিত চক্রবর্ত্তী আসতেন কিছু আলোচনা করার জন্য। সকালে অনেকক্ষণ কবি নিজের লেখাও লিখতেন. চিঠির জবাব দিতেন। বেশ একটু বেলায় যেতেন স্নানের ঘরে। এই ছিল ও'র অবসর। কখনো এক ঘণ্টা কখনো দেড় ঘণ্টাও স্নানের ঘরে থেকেছেন। কখনো শুনেছি গান করছেন। দুপুরে খাওয়ার পরে আবার কাজ। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা। লেখা। অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনা। এছাড়া মাঝে মাঝে সকালে বা দুপুরে ক্লাশ পড়াতেন। কোনো নতুন গান লেখা হলেই অজিত বা দীনুবাবুকে ডেকে পাঠাতেন। বিকালে এক একদিন গান শেখানোর পালা। সন্ধেবেলায় আবার দুচার জনের সঙ্গে কতাবার্ত্তা। মাঝে মাঝে খানিকটা বেড়িয়ে আসতেন। কখনো বা বিদ্যালয়ে যেতেন। দু একদিন নীচু বাংলা থেকে বড়োবাবু (কবির বড়োদাদা) এসে হাজির। খানিকটা দর্শন, বা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা। এইরকম করে দিনের পরে দিন ও'কে দেখেছি—ও'র সঙ্গে সত্যিকার পরিচয় এইরকম করে ঘটেছে। শেষের দিকে নিজের কাজ, নানা লোক, নানা ব্যবস্থা নিয়ে ও'র কাছ থেকে খানিকটা দূরে সরে গিয়েছিলুম। কিন্তু আগে শান্তিনিকেতনে এসে ও'র কাছেই থাকতুম। বেশির ভাগ সময় কাটতো ও'র কাছে।

বাঙালী একটা স্বভাব আছে মাখামাখি করা। কবির ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ও'র নিজের সব ইচ্ছায় চিরদিন একটা দূরত্ব ছিল। তাই এক একদিন যখন তার ব্যতিক্রম ঘটতো তখন ও'র ভালোবাসার নতুন পরিচয় পেতুম। স্নানের ঘর উনি বরাবর আলাদা ব্যবহার করতে ভালোবাসতেন। তাই ও'র স্নানের ঘর কখনো কেউ ব্যবহার করতো না। কিন্তু একদিন মনে আছে গ্রীষ্মকালে দুপুরের গাড়িতে এসে পেঁছেছি তখন বেলা সাড়ে বারোটা একটা হবে। জানতেন আমি আসবো। না খেয়ে অপেক্ষা করছেন। আমি যেতেই বললেন, যাও তোমার জন্যে জল রেখে দিয়েছি স্নান করে এসো। তখন থাকতেন "দেহলি"র দোতলায়।

সেখানে শুধু একটা ঘর। আমি থাকবো guest house-এ আরো খানিকটা হেঁটে যেতে হবে। বুঝলুম যে তা ইচ্ছা নয়। অন্য সময় হলে হয়তো না বলতুম। তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে গিয়ে দেখি একটা পরিষ্কার তোয়ালে, জল সব ঠিক করিয়ে রেখেছেন। এই রকম ছোটো ছোটো কতো কথা মনে পড়ছে। সে-ও এক গ্রীষ্মের দিনের কথা। পঁচিশে বৈশাখের কাছাকাছি। সারাদিন অসম্ভব গুমট গরমের পরে একান্ত একটা কালবৈশাখীর ঝড়ে বৃষ্টিতে ধুইয়ে দিলে। তখন ঝড়ের সময় মাঠে ঘুরতে বেরুনো ছিল একটা মস্তো বড়ো আনন্দ। শিলা বৃষ্টির মধ্যে সন্ধে বেলায় খুব দৌড়াদৌড়ি করে কাপড় ছেড়ে ও'র কাছে গিয়ে বসেছি। হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। একটু পরে উনি উঠে পাশের ঘরে গেলেন। একটা গরম কাপড় কোথা থেকে বের করে এনে গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বললেন, বেশ ঠাণ্ডা আছে। আর বাহাদুরি করতে হবে না। অনেকদিন পর্য্যন্ত—আমার বিয়ে হবার আগে—ও'র কিরকম একটা ধারণা ছিল যে আমার খাওয়া দাওয়া, বা শোয়া সম্বন্ধে কিছু খেয়াল থাকে না। তাই সর্ব্বদা ওঁর সঙ্গেই আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। আর শুতামও প্রায়ই ও'র পাশে বা কাছাকাছি কোনো ঘরে। ও'র বরাবর ছোটো ছোটো ঘরে থাকা অভ্যাস। নতুন নতুন বাড়ি যখন করতেন তখন গোড়ায় অনেক সময় একখানা বই দুখানা শোবার ঘর থাকতো না। তাই ও'র বসবার ঘরে খাট ফেলে যে কতো শুয়েছি তার ঠিক নেই। একদিনের কথা মনে আছে। বোধহয় ১৯২২ সাল—৭ই পৌষের উৎসবের আগের দিন বিকালের গাড়িতে এসে পৌ'ছেছি। উনি তখন থাকেন "প্রান্তিক" বলে বোধহয় বাড়িটার নাম। একখানা ছোটো শোবার ঘর, আর প্রায় সেরকমই ছোটো একটা বসবার ঘর, এককোনে সেই মাপের একটি স্নানের ঘর, আর চারদিকে শুধু বারান্দা। শোবার ঘরে একটা ছোটো খাটিয়া ফেলা হোলো। ঘরটা এতো ছোটো যে সেখান থেকে ওঁর তক্তপোষ তিন চার হাত দূরে। মাঝের দরজায় পর্দ্দা ফেলা। তার ঠিক আগে আলিপুরে হাওয়া-আপিসে প্রথম গিয়েছি—উনি কয়েকদিন সেখানে আমার কাছে ছিলেন— তখনো আমার বিয়ে হয়নি। জানতুম মীরার জন্য ও'র মন খুব ব্যথিত আছে। রাত্রে খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলবার পরে গিয়ে বারান্দায় বসলেন। আমি শুয়ে পড়লুম। তখন বেশ গভীর রাত। খানিকক্ষণ ঘুমবার পরে হঠাৎ শুনি উনি শোবার ঘরে, বোধহয় বিছানায় শুয়ে শুয়ে, গান আরম্ভ করেছেন। "অন্ধজনে দেহ আলো মৃত-জনে দেহ প্রাণ। তুমি করুণা-মৃত-সিন্ধু করো করুণা-কণা দান॥ শুষ্ক হৃদয় মম কঠিন পাষাণ সম, প্রেম-সলিল নীরে সিঞ্চহ শুষ্ক বয়ান।" তখন বোধহয় রাত তিনটা হবে। দুঘণ্টা ধরে বারবার করে গাইতে লাগলেন। আস্তে আস্তে, যাতে আমি জেগে না যাই। ভোরবেলা পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে শুনলুম বুঝলুম যে গানের ভিতর দিয়ে মনকে শান্ত করছেন। এক একটা কথা কতোবার করে ফিরে ফিরে আওড়াতে লাগলেন।
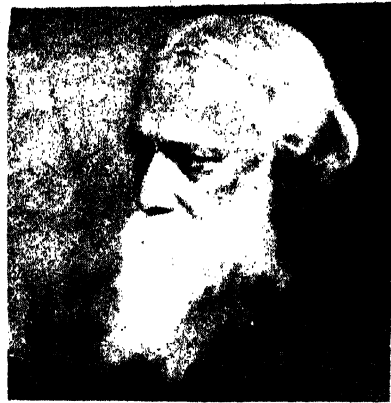
বাইরে থেকে, গানের সুর শুনেও বোঝা যায় না, যে কতোখানি ভিতরের তাগিদে উনি গান লিখেছেন। শুধু গান কেন ও'কে কাছে থেকে না দেখলে ও'র সাহিত্য, ও'র কবিতা, ও'র লেখা যে কতোখানি সত্য ছিল ও'র কাছে তা কেউ বুঝতে পারবে না। ফাল্গুনে চৈত্র মাসে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে যখন গান গাইতেন তখন ও'র সমস্ত শরীর মন যেন সাড়া দিয়ে উঠতো। কালবৈশাখের ঝড়ে, বর্ষার দিনেও আবার দেখেছি ও'র মন কেমন মেতে উঠেছে। যারা শুধু ও'র লেখা পড়বে তারা কিছুতেই বুঝতে পারবে না যে কতোখানি বাদ পড়লো। এবার শান্তিনিকেতনে এসে থেকে থেকে খালি মনে হচ্ছে যে সমস্ত যেন বদলিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ধরে তো রাখা যায় না। আমরাও তো চলেছি। আমাদের দিনগুলিও একে একে নিবে আসছে। কালকের যে দিন সেটা ফুরিয়েছে বলেই তো আজকের দিনটিকে পেয়েছি। আবার আজকের দিনকে না চুকিয়ে দিলে কাল আবার নতুন দিন আসবে কি করে? এ সবই জানি কিন্তু তবুও মনের মধ্যে ফাঁক থেকে যায়। শুধু কবি সম্বন্ধে নয়। সব জানাশুনা, পরিচয় ভেঙে ভেঙে নতুন করে গড়ছে। যেখানে সৃষ্টি সেইখানেই তাই এত ব্যথা। কিন্তু মানুষ তবু ধরে রাখতে চায়, আঁকড়িয়ে রাখতে চায়। কিন্তু সে হোলো মোহ, নিতান্তই মিথ্যা। মহর্ষি শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার পরে বলে দিয়েছিলেন যে ও'র কোনো ছবি, কোনো প্রতিকৃতি যেন এখানে না রাখা হয়। ও'র মনে ভয় ছিল, যে, এই মিথ্যাটাকে মালা চন্দন, ধূপধুনা দিয়ে পূজা করে আশ্রমের আসল সত্যরূপটি চাপা পড়বে। কবি অনেকবার আমাকে এই কথা বলেছেন। "সদর স্ট্রিটে থাকতে বাবামশায় আমাকে ডেকে বললেন, রবি তোমাকে আমি এই কথাটা বলে যাচ্ছি—এ দায়ীত্ব তোমার। শান্তি-নিকেতন আশ্রমে আমার কোনো প্রতিকৃতি যেন না থাকে।" তাই এখানে আজ পর্য্যন্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠাতার কোনো ছবি কোথাও নেই। কবির নিজের মনের ধারাও ছিল ঠিক তাঁর পিতার মতো। আমাকে একদিন বলেছিলেন—"রামমোহন রায় যে ব্রিস্টলে মারা যান খুব ভালো হয়েছিল। এদেশ এমন দুর্ভাগ্য—এখানে মরলে হয়তো ওঁকে পূজা করবার একটা জায়গা তৈরি হোতো।" আজ রথীবাবুর সঙ্গে এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। গোড়ার দিকে "শ্যামলী" বাড়িটায় কবির খাট, বিছানা, চেয়ার, টেবিল, কাপড়চোপড় সব উনি যেমন ব্যবহার করতেন সেইরকম করে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। লোকে দেখতে আসতো। ফুল দিয়ে যেতো। তারপরে ধূপধুনাও দেওয়া হয়। রথীবাবু সম্প্রতি জিনিষপত্র সরিয়ে সেখানে অন্য-লোকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমি অবশ্য তাতে সায় দিলাম। রথীবাবু বললেন, যে, "অথচ বাইরে থেকে যখন লোকজন আসে একটা কিছু ব্যবস্থা থাকলে ভালো হয়। ভাবছি যে যে ঘরটা উনি সব শেষে করিয়েছিলেন সেটা খালি করে, খুব পরিষ্কার করে রেখে দেবো। সেখানে ও'র ব্যবহার করা কোনো আসবাব থাকবে না। কিন্তু ও'র আঁকা এক একখানা ছবি, ও'র কোনো বই বদলিয়ে বদলিয়ে রাখা হবে।' আমি বললুম, যে, তা হতে পারে কিন্তু এর চেয়েও আরো ভালো হয় অন্য একটা ব্যবস্থায়। শান্তিনিকেতন আশ্রমে বারবার করে কবি বলেছেন এখানকার এই উন্মুক্ত উদার প্রান্তরের কথা—দূরে যেখানে আকাশ আর মাটিতে মিশে গিয়েছে সেইখানে পূব দিকে সূর্য্য ওঠা আর পশ্চিমে আবার সেইরকম করেই ডুবে যাওয়া। এখানকার এই খোলা মাঠের মধ্যে একটা জায়গায় একটু উঁচু করে আশে-পাশে ফুলের গাছ দিয়ে সাজিয়ে দিন। তার উপরে হয়তো পাথরের একটি বেদী—কবি ব্যবহার করেছেন এমন কিছু নয়, কিন্তু শুধু দাঁড়াবার বা বসবার একটু জায়গা। কবি নিজের হাতে কাটা আর বুনো গাছের বাগান করে-ছিলেন—সেইরকম ছোটো ছোটো গাছ হয়তো এক এক পাশে। বিস্তীর্ণ প্রান্তর—চারদিক থেকে প্রশস্ত রাস্তা এসে মিশেছে। এই হোলো কবির যথার্থ স্মরণ চিহ্ন। ওঁর মাটির দেহের কোনো চিহ্ন তাতে নেই—আছে শুধু ওঁর ভিতরকার যে কথা তার একটা ইঙ্গিত। এই-খানে লোকে এসে দাঁড়াবে। এইখানে খোলা আকাশের নীচে কবির কথা স্মরণ করবে। উৎসবের দিনে এই হবে আশ্রমের সকলের মেলবার জায়গা। কবির কথা যখন ভাবি এ ছাড়া আর কিছু তো তাঁর যোগ্য বলে মনে হয় না।

মানুষের সঙ্গে অ[illegible]দের যে পরিচয় তাকেও আমরা বারবার নানারকম গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করতে চেষ্টা করি। কিন্তু তাতে শুধু নিজেকেই ছোটো করি। তাই যেখানে আমাদের সত্যি দরদ সেইখানেই বারেবারে বন্ধন কাটবার প্রয়োজন আছে। তাতে মন ব্যথিত হয় ফিরে ফিরে আঁকড়িয়ে ধরতে চায়। তবু মনে রাখতে হবে, যে, সব চেয়ে বড়ো কথা মুক্ত রূপে জানা। কিন্তু মুখে যতো সহজে বলি মন তো অতো সহজে বোঝে না। থেকে থেকে সমস্ত যেন খালি হয়ে যায়। বারেবারে মনকে সামলাতে হয়। আজ সকালবেলা বসে বসে চেষ্টা করছি সেই অনুভূতিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য যা সুখও নয়, দুঃখও নয়, শুধু শান্তি।

ইতি

বুলদা

# আরোগ্যের কবিতা, রোগশয্যায়

পূর্ণেন্দু পত্রী

পঞ্চাশ পেরিয়েছে যখন একান্নয় পা, যখন যথার্থ অর্থে তিনি সুখী এবং সার্থক, যখন উপার্জনে এবং অর্থে তিনি সমৃদ্ধ, সাংসারিক জীবনে যখন নেই কোনো অচরিতার্থতার জের, ঠিক তখনই, আচমকা, অনেকটা যেন তাঁর অজ্ঞাতসারেই, এক প্রবল ভূমিকম্প এসে আছড়ে পড়ল মর্মমূলে। আর এক অসহ্য কাঁপুনিতে প্রত্যহ ধসে যেতে লাগলেন টলস্টয়। এমন কি প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন নিজের মর্মান্তিক অন্তিমতা। যখন তিনি কথা বলতেন এমন এক অন্ধকার গহ্বর থেকে, অথবা লিখতেন এমন এক ভয়াবহ শূন্যতার চূড়োয় বসে, যা তাঁর মতো বলিষ্ঠ শরীর এবং সুগঠিত মনের মানুষের পক্ষে শুধু অপ্রত্যাশিত নয়, অবিশ্বাস্যও। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক গেছে ছিঁড়ে। সন্তানেরা তাঁর স্নেহ-সীমানার বাইরে। রাত্রে নিজের বিছানায় তিনি বিনিদ্র। দিনে, লেখার টেবিলে বসে থাকেন কেবল কলম ছুঁয়ে। কাগজে অক্ষর ফোটে না। নষ্ট এক দিশেহারা পাখি। দৈবাৎ যদি লিখে ফেলেন কিছু, একটু পরেই সেগুলো ছিঁড়েও ফেলেন কুচি কুচি। থেকে থেকে ডুকরে কেঁদে ওঠেন এমন শব্দে, মনে হয় কোনো এক সর্বনাশা দুঃখের ভার বুঝি তাঁর বইবার পক্ষে অসহ্য। অন্ধকারে, ঘরের আলো নিবিয়ে বসে থাকলে কিছুটা আরাম পান যেন। খাম খুলে চিঠি পড়তে তিনি অক্ষম। বন্ধুদের ডাকে সাড়া দিতে অনিচ্ছুক।

সেই দুঃসময়ের দিনগুলোয় তিনি বলতেন বা লিখতেন এই সব কথা—

১। কি করে একজন মানুষের পক্ষে বাঁচা সম্ভব যখন জীবন আর তাকে মাতাল করে না।

২। মানসিক দিক দিয়ে আমি এখন ঘুমন্ত, সে ঘুম আর ভাঙবে না।

৩। আর কিছুতেই আমি পাচ্ছি না জীবনের স্বাদ। জীবনের কাছে আর কিছুই চাইবার নেই আমার। এবার ঢলে পড়বো মৃত্যুতে। আমার সমস্ত প্রাণশক্তি দিয়ে, আমি এখন জীবনের উল্টোদিকে।

৪। মৃত্যুর জন্যে ভয়।

৫। Il faudra mourir sevel (মানুষটি মারা গেছে একাকী)

আর ঐ সময়েই, ১৮৭৯-এ একদিন এক টুকরো কাগজে লিখে বসলেন এইসব অজানা প্রশ্নমালা—

১। কেন বাঁচবো?

২। আমার এই অস্তিত্বের কারণ কি এবং অন্যদেরও?

৩। আমার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কি এবং অন্যদেরও?

৪। ভাল এবং মন্দ সম্পর্কে এই যে দু-রকমের ধারণা রয়েছে আমার বোধে, এর অর্থ কি এবং কেনই বা এরা টিকে রয়েছে?

৫। কেমন করে বাঁচবো?

৬। মৃত্যু কি? কেমন করে বাঁচাবো নিজেকে।

ঐ সময়ে, কী এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছিল টলস্টয়ের জীবনে? তাঁর আত্মার ভিতরে কেন এই অসহ্য ক্রন্দন?

স্তেফান জাইগ এর উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন—
Terrible was the answer: nothing had happened to him. Or, to be precise (and this answer was more terrible still, and truer), Nothing had happened. Tolstoy had glimpsed the Nothing that lies behind things".

পরে জানতে পারা গেল ঐ দুঃসময়টা ছিল তাঁর জীবনে 'আধ্যাত্মিক নবজন্মলাভের সূচনা-পর্ব।'

২ ॥

কী এমন দুর্বিষহ ঘটনা ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনে, নোবেল প্রাইজ পাওয়ার মাত্র ৬ মাস পরে? কেন লিখেছিলেন এণ্ড্রুজকে যে, অরণ্যপথে সংগ্রাম করে চলেছেন তিনি, তাঁর পা দুটো রক্তাক্ত। কেন লিখেছিলেন—

"মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমায় যেতে হবে সে আমি জানি। যে বেদনা আমার হৃদয় বিদীর্ণ করছে, ভগবান জানেন, তা মৃত্যুযন্ত্রণাই।"

চিঠির তারিখ ২১ মে। সাল, ১৯১৪।

একটু সরে যাই পিছন দিকে। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর কবির অনটনের সংসারে শুরু হয়েছে ঈষৎ অর্থাগম, বিলেতে বই বিক্রির বাবদ। খবরের

টলস্টয়

কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে নৈনিতালের কাছে রামগড়ে রথীন্দ্রনাথ, বাবামশায়-এর গ্রীষ্ম-যাপনের সুখ-সুবিধের কথা মনে রেখে, কিনে বসলেন ফলের বাগানসহ এক সাহেববাড়ি। ১৯১৪-র মে মাসে রবীন্দ্রনাথ চলে এলেন রামগড়ে। নোবেল-প্রাইজ সংক্রান্ত বাদ প্রতিবাদের তেতো ঘূর্ণী মিলিয়ে গেছে বাতাসে। কবির মন এখন প্রসন্ন এবং পরিতৃপ্ত। লিখে চলেছেন গানের পর গান। আর এণ্ড্রুজকে লিখছেন নিয়মিত চিঠি। এণ্ড্রুজ তখন দিল্লীতে, নিজেকে প্রস্তুত করছেন শান্তি-নিকেতনে যোগদানের জন্যে। রামগড়ে পৌঁছে এণ্ড্রুজকে প্রথম যে চিঠি, তার তারিখ ১৪ মে। লিখছেন—

"এখানে এসে আমার মনে হচ্ছে, পৃথিবীর ঠিক যে জায়গাটিতে আমার প্রয়োজন ছিল, সেখানেই এসে পড়েছি।...

আমায় ঘিরে এই যে শ্যামশৈলশ্রেণী—এ যেন বা পান্নায় গড়া। তারই ভরা পাত্রটি হতে চিরশান্তি ও দ্যুতি উপচে পড়ছে। এই সুগম্ভীর নির্জনতাটি যেন ফুলের মতো তার সৌন্দর্যের পাপড়ি দিকে দিকে মেলে দিয়ে জ্ঞানের মধু অন্তরে সঞ্চিত করে রেখেছে। আমার সমগ্র চৈতন্য এখন পূর্ণসত্তায় নিমজ্জিত। আর এতে কোনো খণ্ডতা বা অপূর্ণতা নেই।"

এরই পরের দিন চিঠিতে—

"এতদিনে আমি পরিপূর্ণতার সুখ-আস্বাদন পেয়েছি। জায়গাটির বিজনতা যে শুধু আমার ক্লান্ত জীবনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে দিয়েছে তাই নয়, এ আমার মনের স্বাভাবিক খোরাকও জোগাচ্ছে। এরকম জায়গায় এলে বুঝতে পারি এতকাল কি অতৃপ্ত ক্ষুধায় কোনোমতে বেঁচেছিলেম।

এই পরিবেশে পেলাম আমার অজানা পরিচয়। একটি ঘাসের শীষের মধ্যে যে অনন্ত শান্তি ও আনন্দ রয়েছে, আমার সত্তায়ও সেই একই ধারা এই বোধে আমি বিস্ময়ে অভিভূত।..."

এরপর থেকেই বদলাতে লাগল চিঠির রং, ধূসর থেকে ঘন কালোর দিকে। অথবা লাল ফিনকি থেকে প্রবল রক্তিমের দিকে। ১৬ মে-র কোন চিঠি নেই। ১৭ মের চিঠি—

"আজ আমার পিতৃদেবের বার্ষিক-জন্মতিথি। আমাদের ভোরের উপাসনা শেষ হয়ে গেছে, এখন আমার অন্তর পূর্ণের চেতনায় ভরপুর।...."

কিন্তু সেদিন সকাল থেকে বইতে শুরু করেছিল ঝোড়ো হাওয়া, ঘোর অন্ধকারে মুছে গিয়েছিল চারপাশ। তারই মধ্যে থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল আলোর একটা ম্লান রশ্মি। তাঁর মনে হয়েছিল—ঐ আলোর মধ্যে রয়েছে তাঁর 'আধ্যাত্মিক নব জন্মলাভের সূচনা'।

তিনদিন পরের চিঠির ভাষা ও স্বর একেবারেই ভিন্ন।

"আমি অরণ্যপথে সংগ্রাম করে চলেছি। পর্বত-শিখর থেকে যে আলো আসছে তা স্পষ্ট, কিন্তু অন্ধকার ঢাল উপত্যকা—পথের বাঁকা ছায়া ভারি ঘন ও ঘোরালো। আমার পা দুটি রক্তাক্ত, তবু আমি রুদ্ধশ্বাসে চলেছি।

মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমায় যেতে হবে, সে আমি জানি। যে বেদনা আমার হৃদয় বিদীর্ণ করছে, ভগবান জানেন, তা মৃত্যুযন্ত্রণাই। নিজের পুরনো সত্তাকে ত্যাগ করা খুবই কঠিন। সময় না এলে কেউ বুঝতেই পারে না, কতদূর পর্যন্ত তার শিকড় ছড়িয়ে গেছে, আর কোন্ অভাবিত অজ্ঞাত গভীরে তার সূক্ষ্ম তন্তুগুলি পৌঁছে অমৃতময় জীবনরস আকর্ষণ করে শুষে নিচ্ছে..."

এ পর্যন্ত পড়ে মনে হতে পারে, এই বেদনাবোধের অনেকখানিই বুঝি নৈর্ব্যক্তিক। ব্যক্তিগত সংকট-সংশয়-এর চেয়ে এই আলোড়িত অনুভবের পিছনে রয়েছে বুঝি বিশ্বজাগতিক কোনো ভাবনা, যা কবির পক্ষে একান্তভাবেই স্বাভাবিক। কিন্তু পরের দিনের চিঠির অক্ষরগুলো যেন ব্যক্তিগত আর্তনাদে মুখর।

"আমার অবগাহন জলে নয়, আগুনে।...তাই মাঝে মাঝে আমাদের অগ্নিস্নান দরকার।...আগুন পাপকেই দগ্ধ করে, আত্মাকে নয়। আমাদের আত্মাকে আমরা সকল জ্বালার শেষে পাই।...দুঃখের আগুনে যে প্রখর আলো জ্বলে, তাতেই সে পুণ্যচ্ছবি আমাদের চোখে পড়ে। কখনো কখনো মৃত্যুই সেই আলো জ্বালবার মশাল হাতে নিয়ে আসে। আবার, কখনো বা জগতের যে দূত নিঃশব্দে আসেন তাঁকে চোখে দেখা যায় না। এই আগন্তুকটি এবার আমার দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁকে আমি কত প্রশ্ন করি কিন্তু তিনি নিরুত্তর। আমার হৃদয়ে তীব্রভাবে আগুন জ্বলছে—আত্মার সমস্ত নিভৃত গোপন কন্দর উন্মাটিত করে, মিথ্যা ও বঞ্চনার সঞ্চিত স্তূপ দগ্ধ করে সে চলছে। জ্বলুক সেই আগুন, যতক্ষণ তার ক্ষুধার ইন্ধন পায়। যা ধ্বংসের যোগ্য, তার একটুও যেন অবশিষ্ট না থাকে।"

পড়তে পড়তে যখন সত্যিই এক লকলকে আগুনের শিখার মুখোমুখি হয়ে আমাদের ভাবনা-গুলো আতঙ্কিত হয়ে ওঠে, আরো ভয়াবহ কোনো ধ্বংস দৃশ্যের আশঙ্কায়, তখনই মেঘ ভেঙে জেগে ওঠে রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন। পর্যুদস্তের কণ্ঠে শোনা যায় যুদ্ধ-জয়ের আংশিক উল্লাস। পরের দিন, ২২ মের চিঠিতে জানাচ্ছেন—

"এই যে আবার আমি আলো হাওয়াতে বেরিয়ে এসে সহজে নিঃশ্বাস ফেলতে পারছি।"

পারে স্বাস্তর শ্বাস ফেলতে পারে না, তার কারণ, তখনও সাদা ছাইয়ের আড়ালে ধিকিধিকি জ্বলে চলেছে মরা আগুনের লাল আভা।

"গত কদিন আমি এমন একটি জগতে সংগ্রাম করেছি, যেখানে ছায়ারই আধিপত্য। অর অন্ধকারের যেন মাত্রা নেই।...তবে এই অন্ধকারের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে একটি মহৎ শিক্ষা বহন করে এনেছে। ...আমি যেমনি তার অনাবৃত বীভৎস রূপটা দেখে নিয়েছি, অমনি তার সঙ্গে প্রতিদিন সংগ্রামের অঙ্গীকার মেনেছি।"

আগুনে-জ্বালানো কী এমন দুর্বিষহ ঘটনা ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনে মে মাসের এই অল্প কয়েকটা দিনে? "It is the death-pang that is tearing my heart".-এর মতো মর্মান্তিক উচ্চারণের দিকে তাঁর ভাবনাকে ঠেলে দিয়েছিল কোন ধরনের বিপর্যয়? এর সঠিক উত্তর জানার উপায় নেই। এণ্ড্রুজ লিখেছেন—

"গ্রীষ্মের ছুটিটা পাহাড়ে কাটাবেন বলে তিনি বেশ সুস্থ শরীরেই সেখানে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরে আমাকে বলেছিলেন যে, সেখানে পৌঁছবার পর থেকেই যে মানসিক কষ্ট ভোগ করেছেন সে প্রায় মৃত্যু-যন্ত্রণারই সমতুল্য। তার হাত থেকে যে কোনোদিন নিষ্কৃতি পাবেন তাও তখন আশা করতে পারেননি। আরো আশ্চর্যের বিষয় এই, ঠিক যখন তিনি এখানকার অত্যধিক গরম থেকে গিয়ে হিমালয়ের অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে শরীরে মনে অশেষ তৃপ্তি অনুভব করছেন তখনই এই আঘাতটা হঠাৎ এল। মনে পড়ে, তিনি বলেছিলেন মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ থেকে হঠাৎ বজ্রপাতের মতোই এই ব্যাপারটি তাঁকে অভিভূত করে।"

মে মাসের এই মৃত্যু-যন্ত্রণাময় দিনগুলোর স্মৃতি জুন মাসে আর ছিল না। তিনি হয়ে উঠেছিলেন শরীরে মনে বৃক্ষের মতো প্রাণবন্ত। জুন মাসটা কাটল আনন্দে-উদ্দমে। জুলায়ের আরম্ভে আবার নেমে এল সেই পুরনো বিভীষিকা, সেই পুরনো অন্ধকার, যার আঘাতে মোহ্যমান হয়ে পড়তে হলো তাঁকে। কারণ? না, প্রশ্ন করলেই দাখিল করা যাবে হিসেব, এমন কোনো কারণ জানা ছিল না কবির নিজেরও।

এণ্ড্রুজ লিখছেন—

"তিনি কতবার আমাকে বলতেন যে, কি রকম একটা অনির্দেশ্য এবং অবর্ণনীয় ক্লেশ তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে।...তাঁর এই অবসাদের ভার কাটাতে প্রায় তিন মাস লেগেছিল। এ সময়ে বলতে গেলে প্রায় চিঠিপত্র লেখেনই নি। তবু অসহ্য ব্যথায় কি যে কাতর তাঁকে দেখেছি সেই বেদনাদায়ক স্মৃতি এখনো আমার মনে স্পষ্ট হয়ে রয়েছে।"

"অন্ধকার প্রসঙ্গে কবি নিজেও জানিয়েছিলেন একবার—"

"তখন আমার প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা চলছিল এবং সে সময়ে পৃথিবীময় একটা ভাঙ্গাচোরার আয়োজন হচ্ছিল।"

রামগড়ের এই আত্মিক-দুর্যোগ যখন কেটে গেল, কি লাভ করলেন তিনি? অথবা সেই ভয়াবহ সংকটকে রোধ করলেন কোন শক্তির জোরে? এর উত্তরও পেয়ে যাই ঐ সময়ের পরবর্তী চিঠিগুলো থেকে। আরোগ্যের অভিজ্ঞতা সেখানে এইরকম—

১। "আমি যেমনি তার বীভৎস রূপটি দেখে নিয়েছি, অমনি তার সঙ্গে প্রতিদিন সংগ্রামের অঙ্গীকার নিয়েছি।"

২। "এখানকার পার্বত্য ওক গাছের মতো আকাশ থেকে দিনে দিনে আলোর সম্পদ সঞ্চয় করে নিজেকে আমি শক্তিমান করে তুলেছি। ঝড় যদি আসে তবে তার সঙ্গে সানন্দে শক্তি-পরীক্ষায় আমি প্রস্তুত।"

৩। "রাতের চেয়ে অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ হলেও দিন সহজস্বচ্ছ, কারণ তা উজ্জ্বল প্রত্যক্ষ। একাধিপত্য বিস্তার করতে চায়। আলোক সত্যের অন্তস্তল উন্মোচিত করে দেখায়। যা কিছু অপরিণত অথবা সংগ্রামরত, যা কিছু মুমূর্ষু অথবা মৃত, সবই প্রকাশিত করে দেয়, শ্রী ও শক্তি নিয়ে উদ্গত যে অঙ্কুর তার বিস্তারে শুধু সাহায্য করে না, তার মূলেও রয়েছে আলোক।"

৪। "সব অসঙ্গতি দেখেও সঙ্গতির সুষমা আমরা অনুভব করি। দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ সবত্রই আছে, তবু সুন্দর চিরজয়ী।"

৫। "দিন যখন অনাড়ম্বর শুভ্র পরিচ্ছদে আবির্ভূত হয়, রাত্রি তখন মিথ্যার রহস্যজাল নিয়ে লজ্জায় আত্মগোপন করে।"

৬। "এ সবই ভালো। প্রশস্ত এই পথ, দিগন্ত বিস্তৃত এর গতি, তার চারিদিকে বিরাজ করছে বীবর আলো।"

একটু স্থির হয়ে তাকালে এই সব উক্তির মধ্যে চোখে পড়ে যায় যেন দুই প্রতিপক্ষ, যার একদিকে আলো এবং সুন্দর অন্যদিকে অন্ধকার এবং অসত্য। আরো সংক্ষেপ করতে চাইলে, দিন এবং রাত্রি। দিন এবং রাত্রির মধ্যে এই সংঘাতকেই আরো প্রবল-প্রচণ্ড-রূপে আমরা দেখতে পাবো আরো একবার, যখন তিনি পৌঁছে গেছেন জীবনের সূর্যাস্ত লগ্নে। যে কবিতার বই থেকে এই সংকট-সংঘর্ষের ভয়ংকর অভিযান, তার নাম 'রোগশয্যায়'। সেখানে আলোর জন্যে কী ধরনের ব্যাকুলতা, আর অন্ধকারের বিরুদ্ধে কী জাতের ব্যথা, বিক্ষোভ এবং ধিক্কার তার খানিকটা প্রমাণ মিলবে নীচের সংখ্যাতত্ত্বে, যা 'রোগশয্যায়'-র পাতা থেকেই খুঁটে তোলা। সেখানে—

নানাভাবে আলোর উল্লেখ—২৭ বার
নানাভাবে সূর্যের বা সূর্যালোকের উল্লেখ—৬ বার
নানাভাবে জ্যোতির উল্লেখ—৮ বার
নানাভাবে অন্ধকারের উল্লেখ—১০ বার
নানাভাবে দুঃখ রাত্রির উল্লেখ—৯ বার

আর 'রোগশয্যায়' থেকেই আমরা সন্ধান পেয়ে যাবো এমন এক তুমুল রণক্ষেত্রের, যেখানে হতাশ্বাস, পরাভূত, মুহ্যমান, ধূসর, নিস্তব্ধ, অন্ধ অবরুদ্ধ দুর্বল, পাণ্ডুবর্ণ, লুপ্ত, সংকীর্ণ ইত্যাদি বিশেষণ-গুলো কখনো আলোর কখনো অন্ধকারের পক্ষ নিয়ে রচনা করে চলেছে এক মৃত্যুদীর্ণ পরিবেশ।

॥ ৩ ॥

এবার আমরা চলে আসি তাঁর জীবনের একেবারে অন্তিম লগ্নে, যখন তিনি নিরুপায় রোগশয্যায়, যখন বারংবার চেতনা এবং চেতনাহীনতার দ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত তাঁর শরীর, যখন সৃষ্টির ডাকে সাড়া দিতে অক্ষম তাঁর একদা-অনুগত ইন্দ্রিয়গুলো, যখন আলোর কবি হয়েও অন্ধকার ঘরে তাঁর বন্দী জীবনযাপন, প্রকৃতির সঙ্গে দৈনন্দিন কথোপকথনে অভ্যস্ত তাঁকে যখন মাঝে মাঝে গভীর সংজ্ঞাহীনতার ভিতর থেকে জেগে উঠে প্রশ্ন করতে হচ্ছে—'এখন দিন না রাত?'

তাঁর এই রোগযন্ত্রণাজর্জর সময়ের বহু তথ্য-চিত্র ছড়িয়ে আছে তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের স্মৃতি-কথায়। আর তার সাহিত্য-চিত্র পাই এক শয্যারোগী কবির হৃদয়ভেদী রচনায়।

"তিনি বসেছিলেন দক্ষিণের ঢাকা বারান্দায়, মুখ তার শীর্ণ, আগুনের মতো গায়ের রং ফিকে হয়েছে, কিন্তু হাতের মুঠি কি কব্জির দিকে তাকালে বিরাট বলিষ্ঠ দেহের আভাস এখনো পাওয়া যায়। কেশরের মতো যে-কেশগুচ্ছ তাঁর ঘাড় বেয়ে নামতো তা ছেঁটে ফেলা হয়েছে,...তাঁর চোখের সেই মর্মভেদী ভাবটা আর নেই, তিনি যখন কারো দিকে তাকান সে-চাহনি স্নিগ্ধকোমল। এই জন্যে তাঁকে মোগল-বাদশাহের মতো আর লাগে না, বরং অশীতিপর টলস্টয়ের ছবির সঙ্গে কোথায় যেন সাদৃশ্য ধরা পড়ে। এই অপরূপ রূপবান পুরুষের দিকে এখন স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়, যেমন করে আমরা [illegible] রবীন্দ্রনাথ আগে কখনো ছিলেন না। এর জন্যে এই বয়সের জর আর রোগ দুঃখভোগের প্রয়োজন ছিলো। ...বড়ো লেখায় হাত দেবার উপায় নেই, ছোটদের জন্যে ছড়া বাঁধেন, গল্প গাঁথেন, কখনো কবিতা, কখনো সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ লেখেন—হঠাৎ হয় তো একটি ছোটগল্প বেরিয়ে যায় কি রুদ্র তেজে জ্বলে ওঠে রণদীর্ণ সভ্যতার প্রতি অভিশাপ—এইভাবে যেটুকু পারেন তৃপ্ত রাখেন মহান আকাঙ্ক্ষাকে। রোগদুঃখের চাইতে ঢের বেশী নিষ্ঠুর এই যন্ত্রণা, শরীর-মনের দ্বন্দ্ব। একদিকে থেকে তাঁর জীবন এখন উৎপীড়িত, কল্পনার সঙ্গে কর্মের, চিন্তার সঙ্গে প্রকাশের বিরোধে অসহনীয়।"

(বুদ্ধদেব বসু)

ঈষৎ অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ একদিন শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে এলেন কালিম্পঙ-এ, বউমা প্রতিমা দেবীর কাছে। কেন এমন হঠাৎ আগমন, তার কৈফিয়ত দিতে গিয়ে বললেন—

"ডাক্তারেরা বলছে কখন কী হয়, তাই তোমাদের কাছাকাছি থাকা ভালো। আমাকে এবার বড়ো ক্লান্ত করেছে, ভিতরে ভিতরে দুর্বল বোধ করছি, মনে হচ্ছে যেন সামনে একটা বিপদ অপেক্ষা করে আছে।"

কালিম্পঙ-এ পৌঁছনোর তারিখটা ছিল ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪০। এরই সাতদিন পরে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন তিনি। ২৯ সেপ্টেম্বর তাঁকে নিয়ে আসা হল কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠতে সময় লাগল দেড় মাস। আবার ফিরে এলেন নিজের ভুবনে, শান্তিনিকেতনে। এখানেই রুগ্ণ বিধ্বস্ত শরীরে গ্রহণ করলেন আশ্রমবাসীদের শেষ প্রণাম, শেষ জন্মদিনের উৎসব। তারপর বৈশাখ পেরিয়ে এল শ্রাবণ। অসুস্থতায় এখন তিনি আরো বিদীর্ণ। রোগমুক্তির জন্যে অনিবার্য হয়ে উঠল অস্ত্রোপচার। অতএব কবিকে আবার নিয়ে আসা হল কলকাতায়। এরপর মাত্র ষোল দিন। তারপরই সূর্য গেল অস্তাচলে।

তাঁর শেষ পর্যায়ের অসুস্থকালের হিসেবটা দাঁড়ায় ১৯৪০-এর ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪১-৭ আগস্ট, এই এগার মাস। এই এগার মাস ধরে কবিকে রোগমুক্ত করার জন্যে আত্মীয়স্বজন, অনুরাগিবৃন্দ আর কলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তারদের মধ্যে চলেছে প্রাণপাত প্রচেষ্টা। কবি নিজেও জানেন, কারা এখন তাঁর চারপাশে সন্তর্পণে, ছায়ার মতো নীরবে, সর্বান্তঃকরণ শুশ্রূষায় নিযুক্ত। জানতেন বলেই, ঐ রোগের বিছানাতেই, ক্লিষ্ট শরীরে, আড়ষ্ট হাতে কখনো সরস ছড়ায় কখনো গভীর পয়ারে জানিয়ে দিয়েছেন আলাদা আলাদা করে প্রত্যেকের সম্বন্ধে তাঁর আন্তরিক এবং উন্মোথিত কৃতজ্ঞতা। এমনকি তাঁর জীবন যখন মৃত্যুর দুয়ার থেকে আর [illegible]মানা দূরে, তখনও রাণী চন্দকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন—

"দ্বিতীয়া, জ্যোতি নাকি একটি কবিতার জন্যে দুঃখ করছিল।"

অতএব ডাক্তার জ্যোতি সরকারও বঞ্চিত হলেন না প্রীতি-উপহার থেকে। বাইরে যখন কবিকে বাঁচানোর এই প্রাণপাত সংগ্রাম, রোগগ্রস্তকে আরোগ্যের আলোয় পৌঁছে দেওয়ার নিরলস যুদ্ধ, তখন কি কবির আচ্ছন্ন চৈতন্যের ভিতরেও চলছিল অমনি আর এক প্রবল সংগ্রাম, ভিতরের আর এক প্রাণপাত যুদ্ধ, রোগশয্যায় রচিত কবিতাগুলোর অসুস্থ, দুর্বল, পাণ্ডুর, মৃত্যু-ছায়াচ্ছন্ন অনুভূতিগুলোকে আরোগ্যের আলোয় পৌঁছে দিতে? জীবনের একেবারে শেষ পর্বের কবিতাগুলোকে অন্ধকারের গ্রাস থেকে উদ্ধারের জন্যে, জীবনের শেষ রচনায় আলোয় জয়ধ্বনি জাগিয়ে দেওয়ার জন্যে, তিনি কি নিজের ভিতরে

মগ্ন হয়েছিলেন এক মরণাপন্ন লড়ায়ে? তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতিমালা যখন রোগশয্যায়, তখন কি তিনি প্রতিজ্ঞা পালনের মতো ব্রতে নিযুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন নিজেকে, আরোগ্যময় কবিতা রচনার দুঃসাধ্য প্রয়াসে।

মনে হয়, যেন তাই-ই। মনে হয় তিনি যেন একই সঙ্গে স্বতন্ত্র দুটি সংগ্রামে ব্যাপ্ত, ব্যস্ত এবং বিপন্ন ছিলেন তাঁর জীবন-শেষের ঐ এগার মাস। একটা যুদ্ধ, শারীরিক। আর একটা আত্মিক। একজন কবি, যাঁকে আমরা জেনে এসেছি আলোক-সম্পন্ন, যিনি নিজেকে এতদিন জেনে এসেছেন সূর্য-সজাত, কী করেই বা তিনি সইবেন সেই মর্মান্তিক বেদনার ভার, যখন তাঁর আজীবন-লালিত আলোর বলয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে চাইছে বিকট অন্ধকারের আক্রমণে। বুঝতে পারছেন যে, তিনি প্রায় পরাস্ত হওয়ার মুখে। আর পরাস্ত হওয়ার লজ্জিত অপমানই সেই মুহূর্তে তাঁকে এগিয়ে চলেছে শেষ লড়াইয়ের প্রেরণা—আলোর জয়ধ্বনিতে যার শেষ।

মৃত্যুশয্যায় আলোর জন্যে প্রার্থনা বেজেছে অনেক কবি-কন্ঠেই। গ্যেটেকে তো এখনো আলোকিত রেখেছে তাঁর মৃত্যুকালীন সেই স্মরণীয় উক্তি—আলো, আরো আলো। গ্যেটের দেশেরই আর এক কবি হাইনে যখন মৃত্যুশয্যায়, সমস্ত শরীর অবশ, একটা চোখ অন্ধ, পিঠে দগদগে ঘা, মরফিয়া আর কবিতা ছাড়া আর কোন কিছুই যখন তাঁকে দিতে পারছেন না সুখের স্বাদ, কারাগার-সদৃশ কোঠরের বিছানায় যখন অন্ধকার দিয়ে মোড়া তাঁর জীবন-যাপন, তখন কবিতায় ফুটে উঠছে এক মর্মভেদী আর্তনাদ—

"No sunbeam, not a ray of hope
reaches my cell to pierce the gloom."

কিন্তু এ আর্তনাদ নিখিলবেদনার অন্তর্গত নয়। বৃহৎ কোন অন্তঃসংকট থেকে আরোগ্যের চেয়ে, সাময়িক শুশ্রূষাই এই ক্রন্দনের উপলক্ষ্য।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমস্যা স্বতন্ত্র। যেন প্রচন্ড খানিকটা অট্টহাসি হেসে নিয়ে মহাকালের মতো কোনো এক অ-দেহ অস্তিত্ব তাঁকে প্রশ্ন করছে—

সারা জীবন তো আলোর গান গাইলে, এখন যাওয়ার বেলায় যখন তোমার চারপাশে রাহুর মত মৃত্যু বিছিয়ে চলেছে ছায়া, যখন দৃষ্টি তোমার আবিল, ক্লিষ্ট তোমার রচনা, অঙ্গুলি অচেতন, ভাষা অবরুদ্ধ, গতবল শরীরের সমস্ত অর্গল যখন শিথিল,, যখন তোমার দ্বারে প্রতিদিন হানা দিয়ে চলেছে দুঃখের আঁধার রাত্রিগুলো ভয়ের মুখোশ এঁটে, যে-পৃথিবীর ধূলিকণাকে বলেছিলে মধুময় সেই পৃথিবীর ভিতরে এখন যখন ছড়িয়ে পড়েছে 'মানব পীড়নের মহামারী', যে য়ুরোপকে বিশ্বাস করেছিলে সভ্যতার ভাগ্যবিধাতা রূপে, সেই য়ুরোপ যখন বর্বর নখদন্তের বিভীষিকায় সভ্যতার মজ্জার ভিতরে ঘুলিয়ে তুলেছে মানবাত্মার অপমান, তখনও, সমস্ত বিশ্বাস দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার পরও, তুমি কি বলে যেতে পারবে যে, আলোকের মৃত্যু নেই। আলো অপরাজেয়?

রবীন্দ্রনাথকে উত্তর দিতে হবে এই চ্যালেঞ্জের। তাই রোগশয্যায় শুরু হয়ে গেল সেই ট্র্যাজিক সংগ্রাম, যার কথা আমরা অন্যভাবে শুনেছি উনামুনোর রচনায়—

"....the tragic history of human thought is simply the history of a struggle between reason and life, reason bent on rationalizing life and forcing it to submit to the inevitable, to motality, life bent on vitalizing reason and forcing it to serve as a support for its own vital desires."

রোগশয্যায় দীর্ঘ সংজ্ঞাহীনতার ভিতর থেকে জেগে উঠে তিনি যখন প্রশ্ন করেন—'এখন দিন না রাত?' তখন এই সহজ, আপাত-সাধারণ জিজ্ঞাসার দিকে মুখ ফেরালেও আমরা বুঝতে পারি, তাঁর সংগ্রাম চলেছে ঠিক কোনখানে, আর তাঁর প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী এখন কে?

॥ ৪ ॥

রবীন্দ্রনাথের শেষ চারটে কবিতার বই যথাক্রমে—রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিন আর শেষলেখা। এর মধ্যে 'শেষলেখা' বেরিয়েছে কবির অবর্তমানে। 'জোড়াসাঁকোর পৈত্রিক ভবনে চেতনালাভের পর কবির প্রথম রচনা' রোগশয্যায়-এর তৃতীয় কবিতা। অর্থাৎ রোগশয্যা-পর্বের কবিতার সূচনা ঐ তৃতীয় কবিতা থেকেই। যদিও, ক্যালিম্পঙেই তাঁর রোগ-যন্ত্রণাময় শেষ জীবনের শুরু বলেই, ঐখানে লেখা একটি কবিতাও ঐ বইয়ে জায়গা পেয়ে গেছে দ্বিতীয় কবিতা হিসেবে।

'রোগশয্যায়' থেকে তাঁর কবিতার বইয়ে একটা নতুন লক্ষণ খুঁজে পাই আমরা। কবিতার নীচে রচনার স্থান ও তারিখ-এর উল্লেখ তাঁর কবিতার
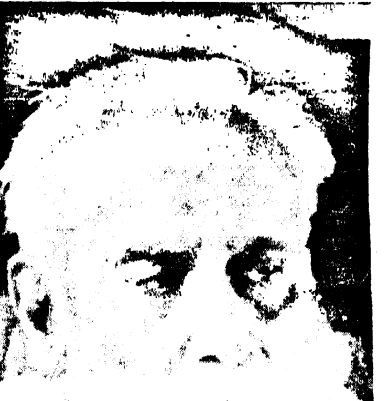
রবীন্দ্রনাথ

বইয়ের একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। 'সানাই' পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত। 'রোগশয্যায়' থেকে শুরু হল এক নতুন সংযোজন—সময়। সকাল, বিকেল অথবা রাত্রির ঠিক কোন্ সময়ে কবিতাগুলো লেখা, সেই অতিরিক্ত সংবাদটুকুও তিনি জুড়ে দিলেন কবিতার নীচে। কিন্তু কেন দিলেন? কেন মনে করলেন তাঁর কবিতা-পাঠকের কাছে এই অকিঞ্চিৎকর তথ্যটুকু জানাও একান্ত জরুরী? নাকি এটা করলেন তাঁর পাঠকদের মনে করিয়ে দিতে যে, এই পর্বের কবিতাগুলো শুধুমাত্র কবিতা নয়, তারও চেয়ে কিছু বেশী, তাঁর অস্তিত্বের ভিতরকার তুমুল আলোড়ন-অভিঘাতের দিনপঞ্জী অথবা ক্ষণপঞ্জী এগুলো। এক মথিত যন্ত্রণার জর্নাল যেন। অনেকটা সেই ভঙ্গীতেই বলতেন তখন। রাণী চন্দ লিখছেন—

"গুরুদেব বললেন, সকাল বেলার অরুণ আলোর মতো মনে পড়ে কয়েক লাইন—লিখে রাখ, নয়তো হারিয়ে ফেলবো।"

ঠিক যেভাবে অবনীন্দ্রনাথের মুখের বচন, অর্থাৎ তাঁর জীবন-স্মৃতিকে লিখে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন একদিন রাণী চন্দকে, সেইভাবেই কবিতার ছন্দে, নিজের নিয়ত আলোড়িত হৃদয়-স্পন্দনকে ধরে রাখার অনুরোধ যেন।

'ইডিয়ট' উপন্যাসের প্রিন্স মিসকিনের মারফত ডস্টয়ভস্কি একবার আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন একটি আলোক-সন্ধানী চরিত্রের এইরকম সংলাপ—

"আমাকে যদি মরতে না হয়, আঃ, কী অনন্ত সময়। পৃথিবী তখন আমার। প্রত্যেক মুহূর্তকে আমি বানিয়ে নেবো এক-একটা যুগ। প্রত্যেকটা মুহূর্তকে গুণে গুণে নেব আলাদা আলাদা করে, ঝরে পড়তে, হারিয়ে যেতে দেব না কোনোটাকেই।"

মৃত্যু থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে অনন্তের সঙ্গে যখন বোঝাপড়া, রবীন্দ্রনাথের সংলাপও যেন সেইভাবেই ফুটে উঠেছে এইসব কবিতায়। মানসিক সংগ্রামের সমস্ত মুহূর্তকেই ধরে রাখবেন তিনি, দেবেন না ঝরে যেতে। মুহূর্তগুলিকে নিয়ে তিনি রচনা করবেন যুগ। যুগোত্তর হতে পারে যে-সব সত্য, তারই তাঁর অনুসন্ধান চলবে এইসব খণ্ড খণ্ড মুহূর্তের অন্তরাল ভেদ করে করে।

অথবা আমরা ভেবে নিতে পারি আরো বেশি কিছু। রোগশয্যা-পর্বের এই কবিতাগুলো যেন রবীন্দ্রনাথের শিয়র থেকে, রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্বের ভিতরে আলো বনাম অন্ধকারের যে অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম, সে সম্পর্কে, কবির স্বরচিত এবং স্বেচ্ছা-প্রচারিত এক ধরনের মেডিকেল বুলেটিন। রিলকের ভাষায় যাকে মনে হয়, কঠিন জ্ঞানে-কখনো নক্ষত্র, কখনো পাথর। তাঁর শেষ জীবনের শেষ দশ দিনের স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত বিবরণ ছাপার অক্ষরে আমরা পড়েছি। সেখান থেকে একটি মাত্র দিনের চেহারার দিকে তাকানো যাক।

১৬ শ্রাবণ। সেদিন অপারেশন।

গায়ের তাপ সকাল ৯টায় ৯৮·৬। বেলা ১টা ৫০ মিনিটে ৯৮·২। ৪টে ১০ মিনিটে ৯৮·৮। রাত ৮টায় ৯৯·৩। ভোর ৪টে ৪০ মিনিটে ৯৯। আর নাড়ির গতি সকালে ৯২, দুপুরে ৯৬, বিকেলে ১০০, রাত্রে ১০০, ভোরে ১০৮।

অনেকটা যেন একই সমানুপাতে চলেছে নিজের অস্তিত্বের ভিতরে আলো-অন্ধকারের সংগ্রামের ধারা-বিবরণী, তাঁর এই সব কবিতায়। কোনদিন সকালে সন্দেহ প্রবল, বিকেলে বিশ্বাসের আরাম। কোনদিন বিকেলে আলোর জয়, আবার রাত্রে অন্ধকারের উল্লাস। এইভাবে এগিয়ে চলেছে তাঁর দিনপঞ্জী। আর ধীরে ধীরে তিনি এগিয়ে চলেছেন চূড়ান্ত আরোগ্যের দিকে, যদিও রোগশয্যায়।

এবার সেই ক্রমান্বয় অভিযানের ইতিহাস।

২৯ অক্টোবর।

সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে আনা হয়েছে কলকাতায়।

৩০ অক্টোবর।

আলো-অন্ধকার সম্পর্কে যেন অনেকটা উদাসীন। বুঝে গেছেন যেন যে, বিহান-বেলায় প্রাণের ঘাটে যারা বয়ে এনেছিল গানের খেয়া, তারা এখন ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে সাঁঝের বেলার ছায়ায়। সুর হারিয়ে সে-সব গান এখন যেন মিথ্যেই খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের একতারা। এখন আলোর চেয়ে অন্ধকারই বেশী।

"প্রহর পরে প্রহর যে যায়,
বসে বসে কেবল গনি
নীরব জপের মালার ধ্বনি
অন্ধকারের শিরে শিরে।"

৩ নভেম্বর।

ঈষৎ অভিমান আলোহীনতার জন্যে। আগের দিনের কবিতায় যে অন্ধকার ছিল অনেকটা প্রাকৃতিক, আজ সেটাকে মনে হচ্ছে অনেক বেশী ভয়ংকর। এ যেন চোখ থেকে অজস্র দিনের আলোকে উপড়ে নেওয়ার অন্ধকার। প্রার্থনার ভঙ্গীতে একটু আলোর জন্যে তিনি আবেদন-মুখর। এমনকি পুরো নয়, যৎসামান্য একটু আলো, যা দিয়ে শেষবারের মতো রচনা করে নিতে পারবেন নিজের জগৎ।

৪ নভেম্বর।

শরীরে প্রবল জ্বর-যন্ত্রণা যেমন, অস্তিত্বে এখন

দেবতাকে 'মহারাজ' সম্বোধন করে প্রায় করযোড়ে ভিক্ষা মেগেছিলেন অল্প কিছু আলো, এখন তিনি বিশ্বের ভৈরবীচক্রে বিধাতার প্রচণ্ড মত্ততায় বিক্ষুব্ধ। এমনকি 'পীড়নের যন্ত্রশালে, চেতনার উদ্দীপ্ত প্রাঙ্গণে' শেল শূলের ঝংকার এবং ক্ষতরক্তের অভিজ্ঞতায়, 'মানুষের ক্ষুদ্র দেহ, যন্ত্রণার শক্তি তার কী দুঃসীম' জেনে গিয়েও, মানুষের যন্ত্রণা অতিক্রমের দুর্জয় চেতনা সম্পর্কে স্তব্ধমুখর।

"মানুষের দুর্জয় চেতনা,
দেহ-দুঃখ-হোমানলে
যে অর্ঘ্যের দিল সে আহুতি—
জ্যোতিষ্কের তপস্যায়
তার কি তুলনা কোথা আছে।
এমন অপরাজিত বীর্যের সম্পদ,
এমন নির্ভীক সহিষ্ণুতা,
এমন উপেক্ষা মরণেরে,
হেন জয়যাত্রা—
বহ্নিশয্যা মাড়াইয়া দলে দলে
দুঃখের সীমান্ত খুঁজিবারে—
নামহীন জ্বালাময় কী তীর্থের লাগি—"

আমরা বুঝে গেলাম, এই মুহূর্তে তিনি আলো-অন্ধকারের সমস্যাকে দেখতে পেয়েছেন ভিন্নরূপে, নিজের ব্যক্তিগত দেহ-দুঃখ-হোমানলকে অতিক্রম করে। নির্ভীক সহিষ্ণুতা আর মৃত্যুকে উপেক্ষা করার শক্তি ছাড়া জ্যোতিষ্কের তপস্যা যে অসম্ভব, তাও আর তাঁর বোধের বাইরে নয়। সমস্ত দুঃখের সীমান্তে যে নামহীন জ্বালাময় তীর্থ, বহ্নিশয্যা মাড়িয়েই যে সেখানে পৌঁছোনোর পথ, রোগশয্যা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছে এতক্ষণে।

১১ নভেম্বর। প্রাতঃকাল।

তাঁর চেতনা আগের দিনের মতো ভারাক্রান্ত নয়। পীড়নের ভার অনেক হালকা। কথা কইছেন ভোরের চড়ুই পাখির সঙ্গে। জ্যোতিষ্কের তপস্যার নিয়ম-নীতি জেনে গেছেন বলেই বিশ্বাস হয়ে উঠেছে এমন সহজ যে একটা চড়ুই পাখির কাছেও 'সকল জীবের দিনের আলো' চেয়ে বসতেও দ্বিধা নেই তাঁর।

১২ নভেম্বর। রাত্রি দুটো।

থার্মোমিটারের পারা হঠাৎ দেখা গেল অনেক উঁচুতে। তাঁর চেতনার স্তরে সংক্রামিত হয়েছে অসুস্থতার এক নতুন বীজ। থেকে থেকে, রুগ্‌ণ শরীরে যেমন জাগে কাঁপুনি, রুগ্‌ণ চেতনায় তেমনি জেগেছে আতঙ্ক। রোগীর আবিল দৃষ্টিতলে আলো একবার মাত্র জাগ্রৎ আবির্ভাব জাগিয়ে যদি চলে যায়, আর তার পরেই যদি নেমে আসে উদাসীন জগতের সেই ভীষণ স্তব্ধতা যা প্রধানত অন্ধকারেরই সৃষ্টি, যেখানে অন্তহীনকালের অগণ্য গ্রহতারা অনুপস্থিত, আতঙ্কের উত্থান এই দুর্ভাবনা থেকেই।

১৩ নভেম্বর।

এই একদিনে চারটি রচনা। চারটি রচনায়, জ্বরের ওঠা-নামার মত চার রকম বোধ। প্রাতে লেখা একটা রচনায় ভাবছেন, নিজের দিনের শেষ ছায়াটুকু যখন মূল তানে মিশে যাবে—কি থাকবে তখন? ঐ একই সময়ে লেখা আর এক কবিতায় পাঠ করছেন বিধাতার অন্তর্গূঢ় সংকল্পের ধারা।

তাঁর অন্তর্ভেদী কথোপকথন এখন প্রাচীন তমস্বিনীর সঙ্গে, কালের প্রথম কল্পে নিরন্তর অন্ধকারে যাকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন সৃষ্টির ধ্যানে। আর সেই মুহূর্তে হুবহু মিলে যাচ্ছে নিজের অসুস্থ দেহের মাঝে ক্লিষ্ট রচনার যে প্রয়াস, তার সঙ্গে তখনকার অনাদি আকাশের ছবি। সেখানে নীরন্ধ্র অন্ধকারের ভিতরে বিকলাঙ্গ, অসম্পূর্ণ, প্রকাণ্ড সব স্বপ্নের পিণ্ড, নব নব সূর্যালোকে, কালের দক্ষিণ হস্তে, একদিন পূর্ণ দেহ, সুসংগত কলেবর পাবার জন্যে অপেক্ষাতুর। সৃষ্টি-রহস্যের শুধু আদি লগ্নে নয়, সৃষ্টির আদিতম সত্যে যেন পৌঁছে যায় তাঁর প্রজ্ঞান। রোগের বিমিশ্র তমিস্রাতেও তিনি অনুভব করছেন আত্মপ্রকাশের শিখায় শিখায় জ্বলে ওঠা ক্ষুধা, যা আপাতত বিরূপ কদর্য হলেও, সুস্পষ্ট শিল্পের সম্ভাবনায় আকীর্ণ। এই তো অন্য ভাবে শুনিয়েছিলেন রিলকে। পৃথিবীর দিকে মুখ রেখে তাঁর প্রশ্ন ছিল—

"What is your urgent command, if not transformation?"

অথচ, এমন সুসংহত অভিজ্ঞতার পরও, সেই দ্বিধা-থরোথরো ভয়-ভাবনার হাত থেকে মুক্তি জোটে না তাঁর। আতঙ্ক আবার ফিরে আসে ঐ একই দিনের অন্য রচনায়।

"মনে হয়, হেমন্তের দুর্ভাষার কুজ্‌ঝটিকা-পানে
আলোকের কী যেন ভর্ৎসনা
দিগন্তের মূঢ়তারে তুলিছে তর্জনী।
পাণ্ডুবর্ণ হয়ে আসে সূর্যোদয়
আকাশের ভালে,
লজ্জা ঘনীভূত হয়, হিমসিক্ত অরণ্যচ্ছায়ায়
স্তব্ধ হয় পাখিদের গান।"

আবার ঐ দিনের আরো এক কবিতায়, আলো-অন্ধকারের সংকট থেকে সরে এসে, তাঁর অভিজ্ঞতা যেন টাল খায় গোপন এক ভূমিকম্পে।

"ভিত্তি যার ধ্রুব বলে হয়েছিল মনে
তলে তার ভূমিকম্প টলে ওঠে প্রলয় নর্তনে।"

দারুণ এক 'অক্ষমা'-কে প্রত্যক্ষ করেন তিনি, বিশ্বের ভিতরে যা জমা হয়ে চলেছে প্রতিদিন, আর যার হাতে সামান্য রেখার ভুলও নির্মূল হয়ে যায় একদিন, অপর্যাপ্ত শক্তির গা থেকেও যে ছিনিয়ে নেয় মহাভার। যদিও, এমন দারুণ ভাঙনও, শেষ পর্যন্ত সান্ত্বনাহীন থাকে না আর। তিনি পাড় নিতে পারেন, এই অক্ষমার পিছনেও রয়ে গেছে পূর্ণেরই আদেশ, —অবাধ মাটিকে গুঁড়িয়ে নতুন প্রাণের অঙ্কুরে এক ভিন্ন সৃষ্টিকে ফুটিয়ে তুলতে।

আক্রান্ত চেতনার জ্বর যেন গড়িয়ে আসে নীচের দিকে।

১৪ নভেম্বর। দুপুর।

এই দিনের কবিতায় না-আলো, না-অন্ধকার, না রোগের দাহ, না-কোনো দুর্ভাবার জিজ্ঞাসা। যেন সব অথবা কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া হয়ে গেছে। অতএব সংগ্রামের বিরতি। অথবা আপাত শত্রুর সঙ্গে সন্ধি। তাই ফিরে এসেছে সহজ, সাবলীল কৌতুকের ঝির্‌ঝিরে বৃষ্টি। এমন কি ফিরে এসেছে হালকা ছন্দের বোল।

১৫ নভেম্বর। প্রাতঃকাল।

এখন মনে হচ্ছে তিনি যেন যুদ্ধ ঘোষণা এবং জয় ঘোষণা দুটোতেই অনিচ্ছুক। কোনো বিরোধী শক্তির কাছে কৈফিয়ত দিতে নারাজ। কেননা 'বিশ্বজগতের শিশুলোকে' নতুন প্রভাতে জেগে ওঠে যে-সব নতুন জিজ্ঞাসা আর যে-সব পুরাতন প্রশ্ন উত্তর না পেয়ে অবাক বুদ্ধিকে ব্যঙ্গ করে যায়—

"সহজ উত্তর তার পাই যেন মনে
সহজ বিশ্বাসে
যে-বিশ্বাস আপনার মাঝে তৃপ্ত থাকে,
করে না বিরোধ,
আনন্দের স্পর্শ দিয়ে সত্যের প্রত্যয় দেয় এনে।"

রোগশয্যাশায়ী রবীন্দ্রনাথের একটা জীবন-পর্ব শেষ হল এইখানে। আগের চেয়ে সুস্থ। এখন তিনি চিকিৎসকদের অনুমতি পেয়েছেন শান্তিনিকেতনে ফিরে যাওয়ার।

॥ ৫ ॥

১৮ নভেম্বর ফিরে এলেন শান্তিনিকেতনে, তাঁর নিজস্ব ভূখণ্ডে, সেই সঙ্গে নিজের সহজ বিশ্বাসে, আনন্দের স্পর্শ লাগানো সত্যের প্রত্যয়ে। এখানে থাকবেন তিনি প্রায় আট মাসের মত সময়। তাঁকে ঘিরে থাকবে অজস্র শুশ্রূষার হাত। তিনি মাঝে মাঝেই আন্তরিক প্রশস্তির মালা পরিয়ে দেবেন সেই সব সেবাব্রতীদের গলায়। আপ্রাণ চেষ্টা করবেন নিজের ... সেইসব সেবাব্রতীদের কারো কারো মনে হবে—

"রোগকাতর রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আমরা যা ... করতুম, তা সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত ... যন্ত্রণাকে অবিচলিতভাবে সহ্য করার ... দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। যাঁরা তাঁর সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকেন তাঁদের চিত্তবিনোদন করেন তিনি ... রকম হাস্য-পরিহাস দিয়ে, নিজের যন্ত্রণাকে ... করবার উপায়ও হয়তো তাই। বিস্ময় ... রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবিরুদ্ধ।"—সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

কিন্তু অসহায়ভাবে তিনি যে পরমুখাপেক্ষী, ... জন্যে তাঁর অনুতাপ বার বার ফুটে উঠবে ... এবং রচনায়। ১৯ নভেম্বর, শান্তিনিকেতনে ফিরে ... পরের দিনের কবিতাতেই লিখে ফেলবেন ... পরিকীর্ণ তাঁর এই রুদ্ধ স্রোত জীবনের ... 'বাহিরের সংবাদের ধারা হতে বিচ্ছিন্ন সুদূরে' ... কদিন পরে লিখবেন :

"সজীব খেলনা যদি
গড়া হয় বিধাতার কর্মশালে
কী তাহার দশা হয়
তাই করি অনুভব
আজি আয়ুশেষে।"

অথবা মুখের কথায় জানাবেন—

"আমি ছ-মাসের শ্লাকসো-বেবি হয়ে গেছি ...

কিংবা—

"আমার জীবনের প্রথম পালা কল্যাণ বাবো, ... সুস্থ শরীরে চলাফেরা চলত, দ্বিতীয় পালা ... কেদারা পরিবেষ্টিত অচল হয়ে বসা।"

আর অনেকটা যেন নিজেকে ভুলিয়ে রাখার, নিজের ভেতরের দীপ-শক্তি ক্লান্তিকে ফাঁকি দেওয়ার ... আপ্রাণ চেষ্টা করবেন তিনি সমমূর্তবর্তীদের ... হাস্য-পরিহাসমুখর ছড়া বা হালকা কবিতায় ... থাকতে। যেন কোনোভাবেই আর সংকোচপ্রভু নন তিনি, এমনিভাবে লিখে যাবেন মিলের কারা, ছোটদের ... অজস্র ছড়া দিয়ে মোড়া হাসি-খুশি 'গল্প-সল্প'।

"রোগের গ্লানি শরীরে রয়েই থাকত কিন্তু ... কেউ দেখা করতে এলে সৌজন্য এবং হাস্যালাপের ব্যাঘাত হত না। তাঁর অনুচরদের সঙ্গে হাস্য কৌতুক করে গল্প করে উচ্ছ্বাসে ভরে রাখতেন, রুগীর ঘর ... একটুও মনে হতো না। ...তাঁর জীবনের অন্য ... বিশেষত্ব কৌতুকপ্রিয়তা তিনি শেষ পর্যন্ত রক্ষা ... এসেছিলেন; জীবনের অন্ধকার দিনেও প্রাণ খুলে হাসতে পারতেন।"—প্রতিমা দেবী।

এমন কি বুদ্ধদেব বসুরও মনে হয়েছিল, কো... আর অসুখ নেই তাঁর।

"কে বলবে তাঁকে যে তিনি অসুস্থ। ...কণ্ঠ ঈষৎ ক্ষীণ, মাঝে মাঝে একটু থামেন, কিন্তু কথার ... কক্ষনো হাতড়াতে হয় না, ঠিক জায়গায় ঠিক কথা আপনিই মুখে এসে বসে। সেদিন এক ঘণ্টার উপর প্রায় অনর্গল কথা বললেন, সাহিত্য সঙ্গীত চিত্র জীবনদর্শন হাস্য পরিহাস মেশানো এক আশ্চর্য ঝরনায় নেয়ে উঠলুম। এঁর অসুখ! ভাবা যায় না।

বাইরে তিনি যখন এই রকম, ভিতরেও কি ... তাই? তাই যদি হবে, তা হলে যখন তিনি মুখে বলছেন, 'হুবহু তাঁর শেষের দিককার গদ্য রূপকের মতো, অতি সাধারণ কথাকেও অসাধারণ করে ক... ক্ষমতায় তাঁর গল্পের সকল পাত্র-পাত্রীকে তিনি মানান, উপমা রূপক থেকে থেকে ফুটে উঠছে, ... অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে ঝিলিক দিচ্ছে কৌতুক ঠিক তখনই, নিজের কবিতার কাছে এসে কেন ... করছেন যে, বাক্যের শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। কেন মনে হচ্ছে তাঁর যে, যে-গাণ্ডীবে পরাভূত করে এতদিন অন্যকে, সেই অনুগত-গাণ্ডীবের কাছেই ... যেন পরাভূত তিনি।

শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছেন ১৮ নভেম্বর। মে মত দিন দুয়েক বিশ্রাম। পরের দিনের অর্থাৎ ভেম্বরের কবিতায় নেই কোনো আর্ত-আলোড়ন। ষৎ প্রশান্ত যেন তিনি। ঈষৎ পরিতৃপ্ত। নদীর শুকনো মরা ডালের মতো যদি বা মনে হয়েছে ক, তবুও তৃপ্ত। কেননা সৃষ্টিশক্তি ভাসমান না দিয়ে প্রকাশ করে চলেছে তার রচনাচাতুরী, চলেছে শৈবালের দ্বীপ। অর্থাৎ রোগীর ঘরের আকাশে আছেন বটে, কিন্তু চারিদিক থেকে আসা বিনিদ্র সেবার হাত সেখানেও সৃষ্টি করে সুধা-ভরা দিন। এমন নিশ্চিন্ত-নিরাপত্তার থেকেও ঈষৎ বিষণ্ণ যে নন, তা নয়। একদিন জলে শৈবালের দ্বীপখানা যে ভেসে যাবে, মনে হয় তাঁর। কিন্তু তার চেয়েও আরো অধিকতর জোগায় আপনার কেন্দ্রে আবর্তিত জীবনের এই স্রোতে, যা
বাহিরের সংবাদের
ধারা হতে বিচ্ছিন্ন সুদূরে।"

একদিন বাদে ২১ নভেম্বরের কবিতাতেই ফুটে ভিন্ন স্বর। যে-সংগ্রাম নিবে যাবে আশা করা ছিল, আবার তা থেকে ফেটে পড়ল অগ্নিকণা। উঠল কবির ভিতরের সেই মানুষ, যে অসুস্থ এবং ই, পৃথিবীর কাছে যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আলোর রচনায় অথচ অন্ধকারে যার বন্দীজীবন। ঐ র শুরুতেই ভাষা বা বাণীর সংকট।

"অসুস্থ শরীরখানা
কোন অবরুদ্ধ ভাষা করিছে বহন
বাণীর ক্ষীণতা
মুহ্যমান আলোকেতে কাঁদিতেছে অস্পষ্টের কারা।"

ই চারটে পঙ্‌ক্তি পড়েই থমকে যেতে হয় য়। বিস্মিত হয়ে যাই, বিহ্বলও। দৈনন্দিন যাঁর এত কথা, কথায় অসামান্য দ্যুতি আর পরিহাসের ঝিলিক এখনও অনর্গল ফোটে যার তাঁর কলমেও ভাষা অবরুদ্ধ? তাঁরও আশংকা— হয়ে আসছে বাণীর ধারা, ভাষা হারিয়ে ফেলছে ন, খণ্ড খণ্ড কুণ্ড মাঝে ক্লান্ত হয়ে থাকছে স্রোত? এইখানে পৌঁছে এক নতুন প্রশ্নের মুখি হই যেন। দৈনন্দিনতার বাণী দিয়ে কবিতার সমস্যা মেটানো যায় না বুঝি তা হলে? কবিতা তার আস্বাদন কিভাবে জীবনানন্দ একবার ছলেন

মামাদের কথাবার্তা ও যুক্তি তর্কের চেয়ে এ স্বাদ কমের; জীবনের যে কোনো মুহূর্তে যুক্তিতর্ক পারি, কথা বলতে পারি, কিন্তু আরো সুস্থির তে না হলে সাদামাঠা কবিতা পড়েও স্বাদ গ্রহণ কঠিন।"

খন মনে হচ্ছে, কবিতা রচনার বেলায়, এই কবিরও। জীবনের যে কোনো মুহূর্তে যে বিষয়ে কথায় বা আলাপে অজস্র বৃষ্টি ঝরাতে একজন কবি। কিন্তু লেখার সময় চাই অন্য এক বোধ, পৃথিবীর সঙ্গে মিলেমিশে এক গহন র স্পন্দন। জীবনানন্দ বলেছিলেন—

যদি দিকপাতের মত গভীরতা ও আকাশের আকাশ, পৃথিবীর ভিতরে পৃথিবীকে কেন্দ্রী ম" করার কথা। এই ধারণার বীজ হয়তো তিনি ছিলেন শেকস্‌পীয়রের কাছ থেকে।
poet's eye, in a fine frenzy rolling,
glance from heaven to earth, from
h to heaven;
as imagination bodies forth
form of things unknown, the poet's
them to shapes, and gives to airy
ng
al habitation and a name."

২১ নভেম্বরের কবিতার প্রধানতম বেদনা এই নয় যে, জীবনের সঞ্চিত গ্লানিতে ধিক্কার দেবার স্পর্ধা হারিয়ে ফেলছে তাঁর বাণী। বেদনা এই জন্যে আরো বড় যে, তাঁর বাণী হারিয়ে ফেলছে বিশ্বদৃষ্টি।

"আত্মগত ক্লিষ্ট জীবনের কুহেলিকা
তাহার বিশ্বের দৃষ্টি করিছে হরণ।"

এই বিশ্বদৃষ্টিকে ফিরে পাওয়ার জন্যে এখন কি করবেন তিনি? কি করা স্বাভাবিক তাঁর পক্ষে? এই প্রশ্নের উত্তরের দিকে ঘুরে তাকাবার আগেই আমাদের মনে পড়ে যায় ইয়েটস-এর একটা কবিতা। "অ্যান একার অব গ্রাস"। সে কবিতায় আমরা দেখতে পাই এমন এক বৃদ্ধ, অন্তর্মুখ, আর অক্ষম লেখককে, যিনি নিজেকে তুলনা করেন ভাঙা বাড়ির মধ্যরাত্রির সঙ্গে, ইঁদুরের হুটোপাটি ছাড়া আর কিছুই সাড়া তোলে না যেখানে। জীবনের এই অন্তদশায় তিনি জানতে পেরে গেছেন—
"Neither loose imagination
Nor the mill of the mind
Consuming its rags and bone
Can make the truth known".

এই বিপুল বাধতার লগ্নে তিনি প্রার্থনা করছেন টিমন বা লীয়র অথবা উইলিয়ম ব্লেকের সেই frenzy বা মত্ততা—অথবা আত্মা-কম্পন—
"Who can beat the wall
Till truth obeyed his call".
অথবা চাইছেন মাইকেল এঞ্জেলোর সেই মেধা
"That can pierce the clouds"
কিংবা
"Shake the dead in their shrouds".

ইয়েটস যখন এই কবিতা লিখছেন, তখন তাঁরও বয়স পেরিয়ে গেছে সত্তর। কারো কারো অনুমান ব্লেকের একটা চিঠিই সম্ভবত এই কবিতার পিছনের প্রেরণা, যে-চিঠিকে অন্তত তিনি উল্লেখ করেছেন 'দ্য মোস্ট বিউটিফুল অফ অল দা লেটারস' বলে। ব্লেকের চিঠির বয়ান—
বয়স পেরিয়ে গেছে সত্তোর। কারো কারো অনুমান,
"মৃত্যুর দরজার খুব কাছাকাছিই পৌঁছে গিয়েছিলাম তবে ফিরে এসেছি দুর্বল আর বৃদ্ধ হয়ে, নিস্তেজ আর যন্ত্রণাদীর্ণ হয়ে। কিন্তু এসব স্পর্শ করতে পারেনি আমার আত্মাকে, জীবনকে, আমার ভিতরের আসল মানুষকে, কল্পনাকে, যা চিরজীবী। সে হিসেবে আমি বরং হয়ে উঠেছি ক্রমশ অনেক বেশি দৃঢ়, পরিণত, যত ভেঙ্গে পড়ছে এই নির্বোধ শরীর।"

ইয়েটস-এর 'মিডনাইট' আর এক মধ্যরাত্রির অনুষঙ্গ মনে পড়িয়ে দেয় আমাদের। নীটশের 'দি ড্রাংকেন সঙ'-এও বারবার বেজে উঠেছে 'মিডনাইট সোল'-এর প্রশস্তি। সেখানে মধ্যরাত্রির নিবিড় অন্বেষণের বিষয় 'ডিপ অ্যান্ড প্রোফাউন্ড ইটার্নিটি।' এই সময়কার রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়েও মনে হয় যেন মধ্যরাত্রির অন্ধকার রোগশয্যাই হয়ে উঠেছে তাঁর জপের আসন। তিনি নিজেই হয়ে উঠেছেন মধ্যরাত্রির সেই আত্মা, যাকে পাঠ করতে হবে অন্ধকারে লুপ্ত সেই ভাষা—নীটশে যাকে বলছেন—'ডিপার দ্যান দা দে কুড রীড।' আর এই দুরূহ অধ্যয়নের জন্যে দুর্বল শরীরে, না শরীরে নয়, অবসন্ন চেতনায়, যা অন্ধকারের আকস্মিক আক্রমণে বিপর্যস্ত, চাই প্রেরণা, চাই অজেয় শক্তি।

২১ নভেম্বরের ঐ কবিতার শেষ স্তবকের কাছে এসে দেখতে পাই, ইয়েটসের মতো তিনিও প্রার্থনারত। সে প্রার্থনা কোনো ব্যক্তিবিশেষের নামে নয়। প্রার্থনা তাঁর দীর্ঘজীবনের সখা, সুহৃদ, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, পিতা, পরামর্শদাতা এবং পথপ্রদর্শক সূর্যের কাছে।
"হে প্রভাত সূর্য,
আপনার শুভ্রতম রূপে
তোমার জ্যোতির কেন্দ্রে হেরিব উজ্জ্বল
প্রভাত ধ্যানেরে মোর সেই শক্তি দিয়ে
করো আলোকিত।"

পরের দিনেই কবিতার দিকে তাকাতেই বোঝা গেল সূর্য তাঁর প্রতি প্রসন্ন। হতাশ্বাস রজনীর মন্থর প্রহরগুলো যার জাগরণ পথে আসে আঁধারের গুহা দিয়ে, সেই অবসন্ন সায়াহ্নের ম্লান ও করুণ মুখচ্ছবির মধ্যে এখন তিনি দেখতে পেলেন কল্যাণরূপ, প্রভাতের অরুণ-কিরণে। আর তাই ২৪ নভেম্বরের কবিতায় জানিয়ে দিলেন যে রোগদুঃখময় রজনীর নীরন্ধ্র আঁধারেও এখন তিনি পড়তে পারছেন আলোকবিন্দুর নির্দেশ। অন্ধকারের এই ঘন আবরণ সাময়িক। ঘুচে গেলেই দেখা দেবে 'দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি।' ঐদিনেরই আরেক কবিতায় ফুলদানিতে রাখা একটা গোলাপের দিকে তাকিয়েই তার দোসরটিকেও দেখতে পেলেন আকাশে, স্তরে স্তরে পাপড়ি-মেলা এক জ্যোতির্ময় বিরাট গোলাপ। এরপর থেকে 'রোগশয্যায়'-এর সব কবিতাই ঝলসে ওঠে 'সপ্তরশ্মি সূর্যালোকসম'। বিকৃতির সভাসদরূপে, চিরনৈরাশ্যের দূত সেজে, ভাঙা যন্ত্রে বেসুরো ঝঙ্কারে কোনো কবি যদি পৃথিবীর শাশ্বত সত্যকে ব্যঙ্গ করে, তিনি জানিয়ে দিলেন পৃথিবীর কাছে সে অনাবশ্যক, তার পক্ষে আত্মহত্যাই শ্রেয়। কবিকে মঙ্গলের দূত হতেই হবে।

২৮ নভেম্বর। প্রাতঃকাল।
একদিনে লিখলেন তিনটি কবিতা। প্রথম কবিতাতেই জানিয়ে দিতে পারলেন এখন
"জীবনের দুঃখে শোকে তাপে
ঋষির একটি বাণী চিত্তে দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল—
আনন্দ-অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ।
ক্ষুদ্র যত বিরুদ্ধ প্রমাণে
মহানেরে খর্ব করা সহজ পটুতা।"

দ্বিতীয় কবিতার বিশ্বাস আরও দৃপ্ত এবং প্রবল।
"আমার বিশ্বাস আপনারে।"
আর তার পরেই—
"এ বিশ্বেরে ভালবাসিয়াছি
এ ভালবাসাই সত্য, এ জন্মের দান
বিদায় নেবার কালে
এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুকে করিবে অস্বীকার।"

তৃতীয় কবিতায় ঘোষিত হল এমন এক আদেশ, যা একই সঙ্গে মনে হয় পার্শ্ববর্তীকে আবার পৃথিবীকে। তিনি উল্লেখ করলেন এমন এক দ্বারের, যা ঘরেরও হতে পারে, আবার হতে পারে তারই অন্তর্গত কোনো প্রতিবন্ধী শক্তির।
"খুলে দাও দ্বার
নীলাকাশ করো অবারিত;
কৌতূহলী পুষ্পগন্ধ কক্ষে মোর করুক প্রবেশ;
প্রথম রৌদ্রের আলো
সর্বদেহে হোক সঞ্চারিত শিরায় শিরায়
আমি বেঁচে আছি তারি অভিনন্দনের বাণী
মর্মরিত পল্লবে পল্লবে আমারে শুনিতে দাও;"

দীর্ঘ সংগ্রামের পর যেন বিজয়-উৎসবের শোভাযাত্রা এই কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে। অন্ধকারের সমস্ত ছলনা-জাল ছিঁড়ে এতদিনে স্থিরতর বিশ্বাসের আলো পৌঁছে গেছে তাঁর জীবনে। আর অসুস্থতা নেই। নেই মৃত্যুও।

'ডেথ অব ইভান ইলিচ'-এর নায়ককে অসুস্থ করেছিলেন টলস্টয় উপন্যাসের চতুর্থ অধ্যায়ে। তারপর ৮টা অধ্যায় জুড়ে তার যন্ত্রণাভোগের ক্রমবর্ধমান অসহনীয়তা। সক্ষম, সার্থক পরিপূর্ণ একটা মানুষকে ক্রমাগত দুমড়ে-মুচড়ে, ছিঁড়ে-নিংড়ে, কীটপতঙ্গের মত ক্ষুদ্রতার দিকে টেনে নিয়ে চলেছে মৃত্যু। দ্বাদশ অধ্যায়ে ইভান ইলিচ হঠাৎ দেখতে পেল একটা আলোকবিন্দু। আর তারপরেই তার সর্বদেহে, শিরায় শিরায় ধ্বনিত হয়ে উঠল—
"Death is over. There is no more death".

'ম্যাজিক মাউন্টেন'-এ জীবনে দার্শনিকতাকে স্যানাটোরিয়ামের ছুরিতে চিরে চিরে দেখার এবং দেখানোর জন্যেই টমাস মান উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছিলেন একটা স্যানাটোরিয়াম। আসলে মৃত্যুকেই করতে

চেয়েছিলেন পটভূমি। মৃত্যুর নিকষ কালো কষ্টিপাথরে ঘষে ঘষে জীবনের সোনার রঙটাকে খুঁজতে চেয়েছিলেন যেন। মৃত্যুচেতনার চেয়ে আর এমন কী আছে যা একজন লেখকের কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য, সবচেয়ে অপরিহার্য? দাদা হেনরিখ মানকে এই কথাটাই লিখেছিলেন একবার।

"Ah, Literature is death! I shall never understand how anyone can be dominated by it without bitterly hating it. It's ultimate and best lesson is this: to see death as a way of achieving its antithesis, life".

মানের অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন যে জীবনকে দেখতে হয় মৃত্যুর জানলা দিয়ে। কিন্তু এখন জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানের জানলাটাও মুছে গেছে তাঁর জীবনে। দুয়ে একাকার। এই কী তবে সেই সুবর্ণ-সময় যখন মৃত্যুর আয়নায় সবচেয়ে পরিষ্কার দেখা যায় মৃত্যুর প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী জীবনকে? হয়তো তাই। নইলে রবীন্দ্রনাথই বা কোথায় পাবেন এত আলো, এমন প্রশান্ত সুস্থতা?

॥ ৬ ॥

'রোগশয্যায়'-এর শেষ ১২টা কবিতা থেকে, এর পর, মুছে যায় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সমস্ত আর্ত-রব। তাঁর উচ্চারণ হয়ে ওঠে ঋজু, প্রত্যয়ী এবং চৈতন্যজ্যোতিতে প্রদীপ্ত। হঠাৎ যদি বা প্রিয় পার্শ্বচর অথবা প্রিয় আলোককে দেখতে না পেয়ে তাঁর মনে হয়
"পৃথিবী পায়ের নীচে চুপি চুপি করিছে মন্ত্রণা
সরে যাবে বলে"
কিন্তু পাশ ফিরেই দেখতে পেয়ে যান, যাকে তাঁর এত ব্যাকুল খোঁজাখুঁজি, সে নতশিরে বসে চলেছে পশম, সৃষ্টির অমোঘ শান্তি সমর্থন করি। আমরা বুঝতে পারি, এরপর কেন তিনি বেছে নেবেন তাঁর পরবর্তী বইয়ের নাম—'আরোগ্য'।

'রোগশয্যায়'-এর শেষ কবিতার রচনাকাল ৫ ডিসেম্বর, ১৯৪০। এরই সাতদিন পরে তাঁর জীবনের শেষ ৭ই পৌষ। তিনি শান্তিনিকেতনে, তব মন্দিরের উপাসনায় সেই প্রথম যোগদানে অক্ষম। সকালে বসলেন অমিয় চক্রবর্তীকে নিয়ে। কবি মুখে বলছেন, লিখছেন অমিয়বাবু, যা পাঠ করলেন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন। আশ্চর্য, সে-ভাষণের নামও 'আরোগ্য'।

এইখানে পৌঁছেই আমরা যেন বুঝে যাই, জীবনের বাকি দিনগুলোয় তিনি কথা বলবেন কোন সুরে। অথবা এরপর, জীবনের শেষ নববর্ষের ভাষণ দিতে গিয়ে সভ্যতার প্রবল সংকটের ছবি এঁকেও তিনি আমাদের কানে বাজিয়ে দেবেন কোন্ বিশ্বাসের বাণী। অথবা চূড়ান্ত মৃত্যুর মুখোমুখি হবেন যখন আর কয়েক মাস পরেই, 'তাঁর দেওয়া দেহ অক্ষতভাবেই তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া ভালো' এমন অনিচ্ছা সত্ত্বেও যখন তাকে মেনে নিতে হবে অনিবার্য-অপারেশন, যখন রাহুর মত মৃত্যু গ্রাস করতে আসবে তাঁর জীবনের স্বর্গীয় অমৃত, হানা দেবে দুঃখের আঁধার রাত্রি, কষ্টের বিকৃত ভান আর ত্রাসের যত বিকট ভঙ্গীর অস্ত্র নিয়ে, তখনও তিনি কোন চিরস্বচ্ছ, চিরসমুজ্জ্বল, আলোক-ধৌত অন্তরের দীপ্তিকণা রেখে যাবেন আমাদের দুঃখ-দুঃসময়ের পথ্য হিসেবে, তাও যেন জানা হয়ে যায় আমাদের।

এইখানে পৌঁছেই আমাদের মনে পড়ে যায় ১৯১৪-য় এন্ড্রুজকে লেখা তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি—

"ঝড় যদি আসে তবে তার সঙ্গে সানন্দে শক্তি পরীক্ষায় আমি প্রস্তুত।" বুঝতে পারি, এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার দায়িত্বেই, যতক্ষণ শরীরে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ওঠা-নামা, যতক্ষণ রক্তের রঙ লাল, যতক্ষণ ইন্দ্রিয় কর্মক্ষম আর মস্তিষ্ক সচল, তিনি বিরত হবেন না বা বিরতি নেবেন না পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বময় বোঝাপড়ায়।

স্বেচ্ছা নির্বাসিত জীবনে তখন শেষ আশ্রয় জুটেছে আসতোপোভো নামের এক অখ্যাত স্টেশনের এক দু-কুঠরী ঘরের একটায়। নীচু ছাদ, আসবাবহীন, অন্ধকার, কাঠের ঘর। লোহার খাটে শয্যা। তারই কাছে একটা টেবিল। টেবিলে তাঁর নিয়তসঙ্গী ডায়েরী, স্তেফান জাইগ যাকে বলেছেন 'দি স্পিকিং-টিউব থ্রু হুইচ হি কনভার্স উইথ গড'। হারিয়ে ফেলেছেন নিজের হাতে পেনসিল নিয়ে লেখার ক্ষমতা; মেয়ে আলেকজান্দ্রা শিয়রে সব সময়েই জাগর। টলস্টয় বলে যান মৃত্যুমুখী জীবনের সর্বশেষ সত্য-উপলব্ধির ছোট ছোট বচন। আলেকজান্দ্রা যান লিখে।

রবীন্দ্রনাথেরও তখন সেই অবস্থা। নিজের হাত অবশ। তবুও তাঁকে লিখতে হয়। লেখেন পরের হাতে। আবার সেই মৌখিক ভাষ্যকেও অভ্রান্ত না ভেবে শুধরে দেন কেটে-ছেঁটে। জীবনের একেবারে শেষ কবিতার শেষ স্তবক হিসেবে তিনি উচ্চারণ করলেন যে তিনটি লাইন—

"অনায়াসে যে-পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।"

পড়ার সময় আমরা যদি 'শান্তি'-র বদলে পড়ি 'শক্তি', তা হলেই যেন তাঁর আজীবনের রক্তক্ষতময় সংগ্রামের উৎসকে ছুঁয়ে ফেলি। আর সত্যিই তো, সভ্যতার অথবা মানুষের অথবা চৈতন্যের স্তরে স্তরে ফুলে-ফেঁপে ওঠা 'অমারাত্রির দুর্গতোরণ'-গুলো ভাঙতে জানেন সে-সব শক্তিমান, তাঁদের ছাড়া আর কার কাছে নত করব আমাদের মাথা?
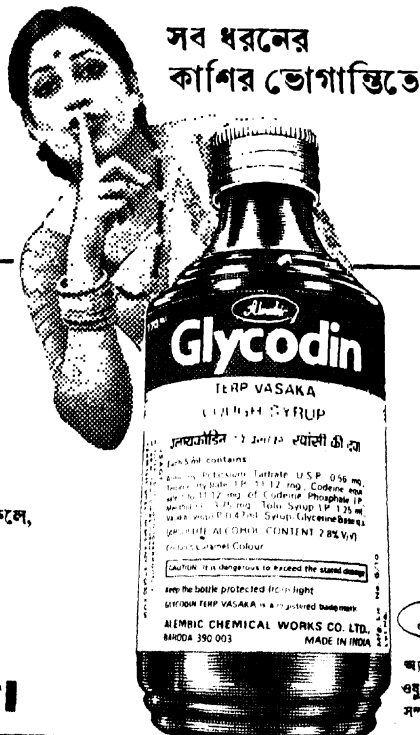
# স্মৃতি সততই সুখের

## প্রতিভা বসু

॥ ২৩ ॥

সমুদ্রের ঐ কোণে আস্তে আস্তে লাল গোল সোনার থালার মতো সূর্য নিচে নেমে আসছিলো, থালাটা বড়ো হ'তে হতে টুপ্‌ করে ডুবে গেল জলে। একটু বাদেই বিকেলের আলো ঘোর-ঘোর হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে মিশে গেল। এখন বন্দরের অন্য রকম চেহারা। এখন আলো জ্বলে উঠেছে, এখন সম্মুখে অনন্ত জলরাশি সহস্র অনন্তনাগের মতো কালো কালো ফণা তুলে পিছল শরীরে ভয়ের মতো। মাঝে মাঝে আলোর বিন্দু হয়ে জাহাজ ভাসছে; লঞ্চ বোট ভটভট করে চলে যাচ্ছে; আমাদের গাছের তলাকার বেঞ্চিতে ঝুপ্‌সি অন্ধকার।

এখন ফেরা। কিন্তু কীভাবে? ভদ্রলোকের নির্দেশমতো জলপথে অথবা স্থলপথে।

জলপথেই যাই। নতুন অভিজ্ঞতা। সমুদ্রের হাওয়া খেতে খেতে ঘরে ফেরা কি কম কথা?

আরো অনেকেই উঠছিলেন। দেখাদেখি আমরাও উঠলাম নিচে নেমে গিয়ে বোট নিলাম একটা। গন্তব্য বলতেই ইঞ্জিনচালক এক মুখ হেসে বললো, 'অলরাইট। থাম্‌ অন—' বলে নিজেই টপাত করে নেমে এলো, হাত ধরে উঠতে সাহায্য করলো আমাকে। আবার স্বস্থানে এসে বসে বললো, 'ফ্রম হোয়্যার, খ্যালখাটা?'

বুদ্ধদেব বললেন, 'তুমি দেখছি বেশ ইংরিজী বলছো, কলকাতা গিয়েছিলে নাকি?'

'অব কোর্স! কতোবার! ঐ যে ব্রিস্টেল হোটেল সেখানে কতোবার খেয়েছি। ঐ জন্যই তো দেখা মাত্রই বুঝতে পারলাম কলকাতার লোক। কলকাতার সব মেয়েরাই তোমার স্ত্রীর মতো দেখতে। ছোটো, নরম, লম্বা পোশাক, তাদের বলে বাঙালী মেয়ে। ঠিক না?'

'একেবারে ঠিক! কেন গিয়েছিলে কলকাতা?'

'জাহাজের নাবিক ছিলাম যে! বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা—সব বন্দরে গিয়েছি আমি। সব শহরে ঘুরেছি। দারুণ! দারুণ! ইন্ডিয়া আমার খুব ভালো লেগেছে।'

'এখন বুঝি অবসর হয়ে গেছে সে কাজে?'

'না, অবসর ঠিক হয়নি, অবসর আমিই নিয়েছি।'

'কেন? ভালো লাগে না?'

'না। এই বেশ আছি নিজের দেশে। এই বোটই আমাকে খাইয়ে পরিয়ে রেখেছে। বুঝলে না, ছোটো থেকে জলে বাস, জল ছাড়া থাকতেই পারি না, তাই এই পেশাই নিলাম আবার।'

বোট সমুদ্রে থেকে মোহনায় ঢুকলো, বললো, 'ঐ দেখ আমাদের পার্লামেন্ট হাউস। আমাদের দেশ তোমাদের কেমন লাগছে?'

'খুব ভালো। খুব সুন্দর।'

মোহনার ঢেউ ছাড়িয়ে নৌকো খালে ঢুকে পড়লো। জল থেকেই সারা শহরটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আমরা তার দেশ ভালো বলাতে উৎসাহিত হয়ে আরো সব চেনাতে লাগলো। পার্লামেন্ট হাউসের পরে টিভলি পার্ক, টাউন হল, কোর্ট, ইয়ুনিভার্সিটি—সব চেনালো। তারপর রেস্তোরাঁ। তীরে তীরে তখন তারাই প্রধান। 'এটা সবচেয়ে বিখ্যাত', 'এটা সবচেয়ে পুরোনো', 'এটা অমুক সময়ের', 'এটা তমুক সময়ের'—বোঝা গেল ভীষণ আলাপী। কথা বলতে খুব ভালোবাসে। আমাদেরও কিছু [illegible] লাগছিলো না [illegible] এই ধরনের হাসিখুশি ফুর্তিবাজ আলাপী ড্রাইভার এবং [illegible]

তার পরেই হঠাৎ সে [illegible] কী গলায় [illegible] ফাঁকা জায়গা [illegible] এই নৌকো [illegible], ভালো খেতে আর গান [illegible] তোমরা কোথায় খাবে?'

'খাবো কোথাও।'

'আমার পরামর্শ যদি নাও, ঐ যে রেস্তোরাঁটা দেখছো, ওখানেই [illegible] জমক কিছু নেই, বরং হঠাৎ ঢুকলে নাপাই মনে হবে, ওরে বাবা, কী [illegible] বুঝলে। আঃ—'

'খুব ভালো বুঝি?'

'ভালো বলে ভালো! দারুণ! সারা শহরে এদের রাঁধুনীদের টেক্কা দেবে এমন কে আছে, বলো?'

'তুমি খেয়েছো কোনোদিন?'

লাজুকভাবে হাসলো, 'বড্ড দাম! এখন আর কোথায় অত টাকা পাবো! ঐ অল্প বয়সে সারা বছর নাবিকগিরি করে ঘরে ফিরলে অনেক কাঁচা পয়সা খরচ করেছি, বেআক্কেলের মতো। খেতে আমি বড়ো ভালোবাসি।'

সে তো বোঝাই যাচ্ছে। আমরা বললাম, 'তা হলে চলো আজ তোমাকে খাওয়াই।'

'ক্ষেপেছো? তোমরা হলে গিয়ে অতিথি, আমারই উচিত তোমাদের খাওয়ানো।' হাসলো, 'আমি শুধু খেতেই ভালোবাসি না, খাওয়াতেও ভালোবাসি।'

'সে তো নিশ্চয়ই। কিন্তু আজ আমরা তোমাকে খাওয়াবো।'

'নৌকো রেখে কোথায় যাবো? তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আরো কয়েকটা ট্রীপ না নিলে তো রোজগারই হবে না কিছু! তবে যাই বলো, তোমাদের দেশের সেই স্পাইসিস দিয়ে রান্না, সে বড়ো ভালো।'

'খেয়েছো?'

'খাইনি? বলছো কী? ঐ ব্রিস্টেলের রান্নাঘরে গিয়ে খেয়েছি। যারা রাঁধতো, কাজ করতো, তারা খদ্দেরদের জন্য যে রান্না করতো ওসব ছুঁয়েও দেখতো না। নিজেদের জন্য আলাদা করে যা রাঁধতো না—'

'খুব ঝাল খায় তারা, তুমি খেতে পারতে?'

'ঝালে ঝালে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করতো—এতো চমৎকার! বুঝলে, ঐ হচ্ছে জিবের চাবুক, যতো মার ততোই সইবে আর ততোই ভালো লাগবে। নেশার মতো। আমি কি একাই খেয়েছি? তাদের সঙ্গে ভাব করে নিয়ে দল বেঁধে খেয়েছি।'

'আবার যেতে ইচ্ছে করে?'

'তা করে। তবে আর কি হবে?'

'গেলেই হয়!'

'পাগল! আমার মতো মানুষ কি শখ করে ইন্ডিয়াতে যেতে পারে? অত পয়সা কি আছে?'

তা অবশ্য ঠিক। বললাম, 'নাবিকের কাজ ছাড়লে কেন? কতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে! কতো দেশ দেখার কতো মজা—'

'মজা ঐ প্রথম প্রথম। শেষে বিয়ে করার পরে বউ ফেলে—তোমরাই ভেবে দেখ, কোথায় পড়ে রইলো সব আপনজন, আর আমি ভাসছি তো ভাসছি। একটা তীর যখন পেতাম পাগলের মতো ছুটতাম শহরের দিকে। আলো দেখতাম, দোকান দেখতাম, ছুঁয়ে ছুঁয়ে গাছ দেখতাম, আর দেখতাম মেয়ে। আসলে কাজটা ছাড়তাম না হয়তো, একবার কঠিন অসুখে পড়ে গেলাম। বউ আর যেতে দিল না। অল্প বয়েস তো ছিলো তখনো। বউর কথা কি ফেলতে পারি? কম দেখা হতো [illegible] খুব ভাব ছিলো।'

'বেশী দেখা হলে বুঝি ভাব থাকে না?'

'থাকলো কই! কাজ ছেড়ে দিয়ে ঘরে থাকা মাত্রই কয়েক দিনের মধ্যে [illegible] ঝগড়া আর ঝগড়া। নিজেই কাজ ছাড়ালো কান্নাকাটি করে, আবার নিজেই [illegible] দিত। যাকে একদিন না দেখলে অস্থির হতাম, তখন তাকে দেখা মাত্রই [illegible] উঠে যেতো। কেন এমন হয় বলো তো?'

'কী জানি।'

'ভারি মজার, না?'

'সেই রকমই তো মনে হচ্ছে!'

'তার মধ্যে আর একটা লোক ঢুকে পড়লো। ব্যাস, হয়ে গেল—'

'কী হয়ে গেল?'

'আরে, ঐ আর কি! ঐ লোকটার সঙ্গেই চলে গেল বউ। থাক গে, আমার কষ্টও হলো না। তবে ঐ মেয়েটার জন্যই যা একটু—'

'মেয়ে আছে বুঝি তোমার একটি?'

'সেই মেয়ে তো এখন কতো বড়ো! এখন সে তার বাহাত্তর বছরের বাবাকে খুব দেখতে আসে।'

'বিয়ে হয়েছে?'

'নিশ্চয়ই! তার মেয়েরও বিয়ে হয়েছে।'

'তখন কেন আবার নাবিকের কাজে ফিরে গেলে না?'

হা হা করে হাসলো, 'যাবোই তো ভেবেছিলাম। প্রেমে পড়লাম যে। বিয়েও করে ফেললাম। বুঝলে, যে পুরুষ একবার বিয়ে করেছে শুধু সে-ই জানে বউ না থাকাটা কী অসুবিধের! নতুন বউ ছেড়ে মানুষ যেতে পারে, বলো? কেউও ছাড়ে না। আমি অবশ্য মনে মনে হাসছিলাম আর ভাবছিলাম, এই ভালোবাসার মেয়াদ কদিন তা তো আমি জানি! যাক না এক-দু বছর, তারপর তো লাগলো বলে।'

'তা তোমার অনুমান কি সত্য হয়েছিলো?'

'আসলে কি জানো! আমরা দুজনই ছিলাম অভিজ্ঞ। আমিও যেমন [illegible] স্ত্রী ছেড়েছি, ও-ও তেমনি এক স্বামী ছেড়েছে। সুতরাং, আমরা বুঝে [illegible] ব্যাপারটা। ভেবেই নিয়েছি দুজনকেই দুজনের কিছুটা মানিয়ে নিতে হবে। [illegible] শুনতে ঐটুকু, কিন্তু তার জোর বড় কম নয়। সেই স্ত্রী নিয়েই তো [illegible] হয়ে গেলাম। তবে হ্যাঁ, এ কথা বলতেই হয় মার্থা ন্যান্সির মতো দজ্জাল নয়। ঝগড়া হয়, কিন্তু মার্থার জন্যই সেটা মারাত্মক হতে পারে না। বুদ্ধিও আছে। আমি তো জল ছাড়া থাকতে পারি না, তাই অন্য কাজ [illegible] না। পরের বোট ভাড়া নিয়ে জলেই ফিরে এলাম। মার্থা [illegible] সংসার [illegible] তিনটে ছেলেমেয়ে নিয়ে অল্প আয়ের মধ্যেও কেমন করে জমিয়ে জমিয়ে ঐ

বোটটা কিনে দিল আমাকে। নিজের বোট, বুঝতেই তো পারো—'

'বেশ ভালো আয় হয় তা থেকে, না?'

'বেশ ভালো। টুরিস্ট এলে তো কথাই নেই। আমেরিকানরা খুব আসে, খুব বেড়ায়, খুব পয়সা দেয়। দিনে-রাত্রে খাটি তখন।'

'তোমাকে দেখে কিন্তু বোঝাই যায় না যে, তোমার বাহাত্তর বছর বয়েস।'

খুব খুশী হলো, 'বোঝা যায় না, না?'

'একটুও না।'

'সবাই তাই বলে বটে। এখনো আমি যা খাই, আমার তেত্রিশ বছরের ছেলেও তা খেতে পারে না। ভালো রান্না হলে তো কথাই নেই। আচ্ছা, তোমাদের আমি এই ঘাটটাতেই নামাই। সামনেই খুব ভালো মাছের রান্নার রেস্তোরা পাবে। সোজা চলে যাও। দামও রিজিনেবল—'

নৌকো থামালো সে। বাঁধানো সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। অনেক ধন্যবাদ দিয়ে নেমে পড়লাম। সেও নামলো। বললো, 'কী সুন্দর কাটলো সময়টা বলো দেখি! তোমরা হয়তো ভাবছো বুড়ো হয়ে এরকমই বকরবকর করা আমার অভ্যেস। তা কিন্তু নয়। তোমাদের দেখে খুব ভালো লাগলো। ভালো লাগলে আমি আপন পর ভুলে যাই। সব কথা বলে ফেলি। গুডবাই কালকাটা—'

ফটফট করতে করতে আবার সে নৌকোর মুখ ঘোরালো। আমরা সিঁড়ি বেয়ে উঠে পথে এলাম। সামনেই যে রেস্তোরা পেলাম ঢুকলাম সেখানে। খাওয়াদাওয়া সেরে হোটেল। কালকেই ফিরে যাবার তারিখ।

যাবো হামবুর্গে। প্লেন রাত্তিরে। তার মানে কালকের দিনটাও পাওয়া যাচ্ছে। কাল কোনো নির্দিষ্ট যাবার জায়গা স্থির করা নেই, স্বাধীনভাবেই ঘোরাঘুরি। যে ভদ্রলোকটি আমাদের নিয়ে ঘুরছেন, তিনি বলেছেন সকালেই চলে আসবেন। বুদ্ধদেব তাঁকে আমাদের সঙ্গে ব্রেকফাস্টে নিমন্ত্রণ করেছেন।

যেদিন এখানে এসেছিলাম, এয়ার পোর্টে প্রায় আমারই বয়সী আমার ঠাকুরদাদার মতো পাকা পাকা চেহারার এই মানুষটির সযত্নলালিত এক জোড়া লাল গোঁফ, চোখের রিমলেস চশমা, আর পরিধানে শার্টের উপর তিনকোণা জ্যাকেট দেখে আমার প্রায় হাসি পেয়ে গিয়েছিলো। এ কয়দিনে দেখলাম সেই পোশাকের সেই চেহারার মানুষটির জন্যই বেশ টান অনুভব করছি। অবিশ্রান্ত একসঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে করতে কখন যে কেমন একটা একাত্মবোধ জন্মে গেছে টেরই পাইনি। আসলে সব দেশের সব জাতির সব মানুষের একই নাড়ির টান।

আমেরিকায় থাকতে সহসা একদিন এক অচেনা ভদ্রলোক নিমন্ত্রণ করেছিলেন আমাদের। ফোনে কথা হয়েছিলো, নিমন্ত্রণ আমরা গ্রহণ করেছিলাম। যথাসময়ে তিনি গাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। মানহাটানে বিশাল এক উচ্চতল বাড়ির মালিক। বিশেষ ধনী সম্প্রদায়ের একজন। গিয়ে আলাপ হলো। বয়সে নবীন যুবা না হলেও খুব বয়স্ক নন। হয়তো সবে চল্লিশ ছাড়িয়েছেন। টিপটপ ফিটফাট মানুষ। দেখতে অত্যন্ত সুন্দর, বেতের মতো ছিপছিপে চেহারা। নিজেই দরজা খুলে দিলেন, বিনীতভাবে অভ্যর্থনা করে এনে বসালেন বসবার ঘরে। বুদ্ধদেবকে বললেন, 'আমাদের ইয়ুনিভার্সিটিতে আপনি আমন্ত্রিত হয়ে পড়াতে এসেছেন আমি জানি। আপনি যে শুধুই একজন বিদগ্ধ অধ্যাপক তাই নয়, একজন বিখ্যাত সৃষ্টিশীল লেখক, তা-ও আমি কবি গলওয়ে কিনেলের কাছে শুনেছি।' আমার দিকে ফিরলেন, 'গলওয়ে আপনার কথাও অনেক বলেছে। আপনিও যে একজন লেখিকা হিসেবে আপনাদের দেশে বিখ্যাত, সে কথাও সে বলেছে। আমি ব্যবসায়ী মানুষ, লোহালক্কড় নিয়ে আমার কারবার, তার ফাঁকে সাহিত্যের নেশা আমাকে অনেকখানিই ভরাট করে রাখে। ব্যবসা আমার নয়, পূর্বপুরুষের। বলতে পারেন ইঞ্জিনটা নিজেই চলে, আমি শুধু হাল ধরে বসে থাকি। ঐ ...টুকু ধরে থাকি তাইতেই সোম থেকে শুক্র পর্যন্ত আমার আহার-নিদ্রার স... থাকে না। নইলে এর অনেক আগেই আপনার সঙ্গে আমার দেখা হতো। নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমারও নানা ধরনের সংস্রব আছে। এমন অনেক মিটিং থাকে যেখানে ফাঁকি চলে না, যেতেই হয়। যাইও। কিন্তু সেসব মিটিংয়ে অধ্যাপকরা আসেন না, সেসব মিটিং একান্তই ব্যবসায়িক। সেজন্যই আপনাদের সঙ্গে আমার কোনোরকম যোগাযোগই ঘটেনি। আজকের এই যোগাযোগের একটা বিশেষ কারণ আছে। আমি আরো কয়েকজনকেও আসতে বলেছি। তাঁরা সকলেই অনেকের কাছে পরিচিত ব্যক্তি। সাহিত্যিক নন কেউ, সমাজসেবক হিসেবেই চিহ্নিত। তাঁরা আসবেন ছটা চল্লিশে। আমি ইচ্ছে করেই চল্লিশ মিনিট হাতে রেখে আপনাদের ছটার সময়ে আসতে বলেছি। বাসনা—এই চল্লিশ মিনিটে আপনাদের সঙ্গে পরিচিতও হয়ে নেবো, আমার উদ্দেশ্যটাও ব্যক্ত করবো।'

কিন্তু উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত করবার আগেই দরজার বেল সঙ্গীতের সুরে বেজে উঠলো। ভদ্রলোকের ইঙ্গিতে তাঁর পরিচারক গিয়ে দরজা খুলে অতিথিদের নিয়ে এসে ঘরে বসালো। সম্ভাষণান্তে গৃহস্বামী তাঁদের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিলেন। এসেছেন পাঁচজন স্ত্রী-পুরুষ। এই পাঁচজনের মধ্যে তিনজনের নামই আমরা শুনেছি এ-দেশে এসে থেকে। এঁরা মহাপ্রাণ মানুষ, বিশ্বমৈত্রীতে বিশ্বাসী শুধু বিশ্বাসীই নন, সক্রিয়ভাবেই সেই কাজে তাঁরা মন-প্রাণ নিয়োজিত করেছেন

সামান্য কথাবার্তা হতে হতে আরো চারজন অতিথি এলেন। দেখা গেল, প্রত্যেকেই খ্যাতনামা সমাজসেবী অথবা ধনকুবের অথবা বেশ বড়ো অর্থে রাজনীতি করেন এমন লোক। এই ধরনের সমাবেশে সহসা আমাদের কেন ডেকেছেন সেটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছিলো না। সবাই আসতে গৃহস্বামী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে। বাড়িতে কোনো মহিলা ছিলো না, দুটি ছাত্রী এলো পরিবেশন করতে। সেই সময়ের মতো তারাই সকলকে আদর-যত্ন করে খাওয়াতে লাগলো। খাওয়াদাওয়ার পরে অন্য ঘরে এসে গোল হয়ে বসলেন সবাই; তারপরেই বৈঠক শুরু হলো।

আসলে এঁরা শীগগিরই একটি মহাসম্মেলনের ব্যবস্থা করতে উৎসুক। সেই অধিবেশনে পৃথিবীর সকল মানুষকেই তার জাতি ধর্ম দেশ নির্বিশেষে একত্রিত করতে চাইছেন। উদ্দেশ্য—হিংসা, দ্বেষ, যুদ্ধবিগ্রহ, পরস্বাপহরণ ইত্যাদি পরিহার করিয়ে বিশ্বমানবতায় উদ্বুদ্ধ করা। এ নিয়ে এটা একটা বিশিষ্ট লোকেদের ঘরোয়া বৈঠক মাত্র, তার বাইরেও কাজ অনেক অগ্রসর হয়েছে। অনেক মানুষ অংশ নিয়েছেন এতে। অনেক ধনপতি দু হাত উপুড় করে তাঁদের অর্থবিত্ত ঢেলেছেন। তাঁদের মধ্যে ইনিও একজন, যিনি আজ আমাদের হোস্ট।

আলোচনা শুনে যা বোঝা গেল, বিশ্বসভার অধিবেশনটা কোথায় কোন দেশের মাটিতে বসবে সেটা নিয়েই এঁদের আজকের জল্পনা-কল্পনা, কথা কাটাকাটি, মতভেদ। সবাই সকলকে যার যার মতে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করছেন।

এই আমন্ত্রণকারী গৃহস্বামীটির ইচ্ছে সেই ভূমি ভারতভূমিই হোক। ভারত-বর্ষ বিষয়ে তাঁর অদ্ভুত মোহ। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় কেন, তা হলে হয়তো কোনো সদুত্তর দিতে পারবেন না, কিন্তু অন্ধ ভক্ত। নিজের বাড়িতে এই সব জ্ঞানী গুণী ত্যাগী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের আজ ঘরোয়াভাবে এ কথা বলে মত করাতেই ডেকেছেন। এঁরাই কর্তৃপক্ষ, এঁরা মত দিলেই সকলে রাজী হবেন।

সম্ভবত তাঁর প্রেমের ভারতবর্ষের প্রতীক হিসেবেই আজ এখানে আমাদের ডেকে এনে পতাকার মতো শোভিত করেছেন।

বিনীতভাবে বুদ্ধদেব জানিয়েছিলেন যে, তিনি এই সভায় একান্তই অযোগ্য ব্যক্তি। এসব বিষয়ে ভারতবর্ষের প্রতিভূ হবার কোনো যোগ্যতাই তাঁর নেই। তিনি বা তাঁর স্ত্রী কখনো সমাজসেবাও করেননি, রাজনীতিও করেননি। এ কথা শুনে সুপুরুষ গৃহস্বামীটি মাথা নেড়ে প্রায় প্রফেটের মতো হাসলেন। গাম্ভীর গলায় বললেন, যাঁরা সাহিত্য করেন তাঁরা সকল মানবের সেবক, সকল মানবের শিক্ষক। গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে সমাজে যে ধরনের নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটতে পারে, মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাজার চেঁচালেও অনেক সময়ে তা ঘটে না। তাঁরা কলমের এক খোঁচায় সবই যেমন নস্যাৎ করে দিতে পারেন, আবার সবই তেমনি তুঙ্গে তুলতে সক্ষম।

এখানে আমি না বলে পারলাম না যে, সেটা সংবাদপত্রের কর্ম, সংবাদপত্রের ক্ষমতা, লেখকদের নয়।

এর উত্তরে ভদ্রলোক তাঁর কনিয়াকের ছোটো গ্লাসটি নিয়ে সোজাসুজি আমার কাছে এসে মুখোমুখি বসলেন, পাঁচ মিনিট ধরে একটি বক্তৃতা দিলেন, এবং যুক্তি-তর্কের জাল বিছিয়ে প্রমাণ করলেন তিনি যা বলেছেন তা-ই বর্ণে বর্ণে সত্য। এর পরে সেই জালের আঁকসি আরো একটু বিস্তার করে অন্যান্যদেরও বোঝালেন এই কংগ্রেস ভারতবর্ষে হওয়াই বাঞ্ছনীয় কেন।

এর পরেও তাঁর আরো কথা আছে। প্রস্তাব আছে যে, এমন একটি গৃহও নির্মিত হবে যেখানে সমস্ত পৃথিবীর সব দেশের মাটিই সংগ্রহ করে এনে ভিত পুজো হবে। তারপরে তার উপরে তৈরী হবে সেই অট্টালিকা। সে গৃহ তোমার, আমার—সকলের। সব বিশ্ববাসীরই সমান অধিকারের জায়গা। ভদ্রলোকের মতে সেটাও ভারতবর্ষেই হোক।

যদিও ঈশ্বরসৃষ্ট মানবকুল কোনো দিনই এই ধরনের কোনো সদিচ্ছার বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইবে না, কিন্তু ইচ্ছেটা বড়ো সুন্দর। আমার খুব ভালো লেগেছিলো সেদিন। প্রত্যেকের কথাই আন্তরিক ছিলো, প্রত্যেকের মধ্যেই প্রচুর বিশ্বাসের জোর ছিলো। এতো বড়ো একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে কাজ তাঁরা করতে উৎসুক হয়েছেন, প্রত্যেকের মধ্যেই সেই মহানুভবতার স্পর্শ ছিলো।

সত্যিই তো, সবাই একই তো মানুষ আমরা, দেশে দেশে কালে কালে আমরা তো একই রকম সুখ-দুঃখ শোক-বেদনা আমোদ-আনন্দ বহন করে চলেছি। তবু বিভেদের সীমা নেই, ঘৃণার সীমা নেই, জাতে জাতে ধর্মে ধর্মে বর্ণে বর্ণে দেশে দেশে লাঠালাঠিরও অন্ত নেই। কেন এমন হয়, অথচ ব্যক্তিগতভাবে আমরা কতো অল্প [illegible] মানুষের যে কোনো জাত নেই, ধর্ম নেই—এ তো অনিবার্যই অনুভব করি।

সারা দিন একসঙ্গে কাটিয়ে বেশ ভোজের আপ্যায়ন করে আমাদের হামবুর্গের ট্রেনে তুলে দিয়ে ভদ্রলোক যখন হাত নাড়াচ্ছিলেন, এসব কথাই আমার মনে হলো। বুদ্ধদেবও দেখলাম হঠাৎ ভীষণ বিমর্ষ হয়ে গেলেন। এবং খুব অদ্ভুত-ভাবে আমার মনের কথার প্রতিধ্বনি করে বললেন, "তোমার মনে আছে [illegible] অনুষ্ঠানে এক বিশ্বপ্রেমিক ধনকুবের আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন? বিশ্বমিলনই তাঁর একমাত্র বাসনা?"

(ক্রমশ)

**॥ একত্রিশ ॥**

কোনো মহিলা যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা চায় তবে তাতে বাধা দেওয়ার কী আছে? বোস সাহেব খুবে ক্লান্ত চোখে চেয়ে জিজ্ঞেস করে।

দীপনাথ মাথা নেড়ে বলে, মিসেস বোসকে আপনিও চেনেন, আমিও খানিকটা চিনি। প্রপার গাইডেন্স না থাকলে উনি সব টাকা পয়সা নষ্ট করে ফেলবেন। ব্যবসা বা দোকান চালানোর জন্য যে মন দরকার তা ওঁর নেই।

গাইডেন্স ও নেবে না।

আমাকে উনি পার্টনার করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু এখন ও আপনার নামটাও সহ্য করতে পারছে না।

কেন বলুন তো।

ও জানে ওর চারশো টাকা অ্যালাউন্স আপনিই ঠিক করে দিয়েছেন এবং ও যাতে সব টাকা ওড়াতে না পারে তার জন্য আপনিই নানারকম প্রিকশন নেওয়ার অ্যাডভাইস আমাকে দিয়েছেন।

কথাগুলো ওঁকে বলে ভাল করেননি।

বোস ক্লান্ত স্বরে বলে, আই অ্যাম টায়ার্ড অফ ইয়র। আর কত অভিনয় করা যায় বলুন তো।

অভিনয় না করতে চাইলে কোর্টে যেতে হয়। সেটাও কি ভাল?

আমি এখন কোর্টে যেতে রাজি।

গেলে আপনি সহজেই ডিভোর্স পেয়ে যাবেন। কারণ মিসেস বোস মামলা লড়বেন না। কিন্তু তারপরে ওঁর অবস্থাটা কী দাঁড়াবে ভেবেছেন? ওঁর বাপের বাড়ির অবস্থাটা ভাল নয়, আত্ম-সম্মানবোধ বেশী বলে উনি নিজেও সেখানে যাবেন না। যতদূর খোঁজ রাখি ওঁকে আশ্রয় দেওয়ার মতো কেউ নেই। চাকরি যে চট করে পাবেন তারও নিশ্চয়তা নেই।

সেইজন্যই ওর দোকানের স্কীমটা আমি সাপোর্ট করছি।

দীপনাথ ম্লান হেসে বলে, উনি তিন মাসও দোকান চালাতে পারবেন না।

আচমকাই বোস সাহেব বলে, লেট হার ম্যারি অ্যাগেন। আবার বিয়ে করুক। সেই স্কাউন্ড্রেলটাকেই করুক, কী নাম যেন, স্নিগ্ধদেব না কি!

দীপনাথ থমথমে মুখে বলে, স্নিগ্ধদেব ম্যারেড ম্যান। তাছাড়া একটা বেশ বড়সড় স্কলারশীপ নিয়ে উনি এখন অ্যামেরিকায়।

আমি তো এতসব জানিও না।

আমি জানি। স্নিগ্ধদেব বোধহয় এসব সমস্যায় জড়াতে চাইতো না। বিয়ের কথা বলছেন। এদেশে এখনো ডিভোর্সি মেয়েদের অত সহজে বিয়ে হয় না।

ফাইন্ড এ ওয়ে চ্যাটার্জি। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডিচ হার। কিন্তু ওকে আটকে রাখা মানে আমার নিজেরও আটকে থাকা। ইউ নো মাই প্রবলেমস।

দীপনাথ স্থির চোখে বোস সাহেবকে দেখছিল। উত্তর বাংলা থেকে ফিরে আসার কিছু পর থেকেই সে বোস সাহেবকে অত্যন্ত ক্লান্ত ও অধৈর্য দেখছে।

দীপনাথ মৃদুস্বরে বলে, আচ্ছা, আমি ভেবে দেখছি। দু একদিন সময় দিন।

বোস সাহেব জবাব দিল না।

দীপনাথ বোসের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের টেবিলে ফিরে এল। অন্য তিনজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের জন্য আলাদা তিনটে প্লাইউডের খুপরি তৈরি হয়েছে। শুধু দীপনাথই খুপরিতে যেতে রাজি হয়নি। তাই সে এখনো মস্ত হলঘরটার এক-পাশে খোলামেলা জায়গায় বসে।

টেবিলের কোণাটার দিকে ভ্রূকুটি করে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে দীপনাথ। উত্তর বাংলা থেকে ফিরে এসে বার দুই মণিদীপার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার চেষ্টা করেছে। মণিদীপা কথা বলেইনি। ক্রুদ্ধ অপমানকর গলায় বলেছে 'আই হেট টু টক উইথ ইউ।' অথচ মণিদীপার সঙ্গে এখন কথা বলার দরকার। বোকা মেয়েটা জানেও না, বা জানলেও বোঝে না যে, তার বিপদ ঘনিয়ে আসছে। দীপনাথ বাইরে থেকে কতদিন বালির বাঁধ দিয়ে রাখবে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দীপনাথ কাজে মন দেয়। কিন্তু আবার আনমনা হয়ে যায়। নিজের ভেতরকার এক পাপবোধ তাকে বড় অস্থির করছে, কুঁকড়ে দিচ্ছে, কাজে মন দিতে দিচ্ছে না। মণিদীপাকে কি সে-ই নষ্ট করেনি? স্নিগ্ধদেব হয় তো মণিদীপার নেতা ছিল, প্রেমিক ছিল না কিছুতেই। কিন্তু দীপনাথ জানে, মণিদীপাকে যদি সত্যিকারের বিভ্রান্ত কেউ করে থাকে তবে সেই ব্যক্তি সে নিজেই। এখন সে মণিদীপার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও লাভ নেই। তাতে ভাঙা সংসার জোড়া লাগবে না। দীপনাথ নিজেও দুর্বল। বড় দুর্বল। মণিদীপার কথা সে খুব কম সময়েই না ভাবে। এখনো এক তীব্র অদ্ভুত আনন্দ রয়েছে মণিদীপাকে মনে করার মধ্যে।

থাকতে না পেরে দীপনাথ বোস সাহেবের বাড়িতে রিং করল। বাবুর্চি ফোন ধরে জানাল, মেমসাহেব বাড়ি নেই। লানচেও ফিরবে না বলে গেছে।

একা বেরিয়েছে?

না, একজন দালাল এসেছিল।

দালাল কিসের?

মনে হয় বাড়ির দালাল। মেমসাহেব একটা দোকানঘর খুঁজছে।

দীপনাথ ফোন রেখে দেয়।

বিকেল পর্যন্ত অনেক ফোন এল। অনেক কাজ করল দীপনাথ। কিন্তু মন কান সবই উৎকণ্ঠ, রয়েছে অন্য দিকে।

বেলা চারটে নাগাদ ফোন বাজতেই তুলে মেয়েলী গলায় 'হেলো' শুনে সে প্রায় চেঁচিয়ে বলল, মণিদীপা?

মণিদীপা? মণিদীপা আবার কে বলো তো সেজদা!

ওঃ, তুই বিলু? কবে ফিরলি?

আজই।

প্রীতম কেমন আছে?

ভালই তো। নিজের আপনজনদের কাছে ভাল থাকারই তো কথা।

ওভাবে বলছিস কেন? কিছু হয়েছে?

এসো, সব বলব।

আজ আসার সময় হবে না রে।

না হয় কাল অফিসের পর এসো। আসবে?

চেষ্টা করব।

মণিদীপাটা কে বলো তো!

ওঃ, বসের বউ। টেলিফোন করার কথা ছিল, তাই হঠাৎ মেয়েলী গলা শুনে ভাবলাম সে-ই।

তোমাকে আর তোমার বসের বউকে নিয়ে কিন্তু অনেক কথা রটেছে। জানো?

দীপনাথ ভীষণ চমকে গিয়ে বলে, সে কি?

এমন কি আমি শিলিগুড়িতেও শুনে এসেছি।

কে বলল?

এলে বলব। ফোনে কি সব বলা উচিত?

কোথা থেকে কথা বলছিস?

মাদ্রাজীদের ফ্ল্যাট থেকে। ছাড়ছি। কাল এসো।

বাকি সময়টা দীপনাথ গাড়লের মতো হত-বুদ্ধি মুখে বসে রইল চেয়ারে। কিছুই করতে পারল না।

এক সময়ে উঠে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। চারদিকে রথযাত্রার ভীড়। গায়ে গায়ে লোক। বাস ট্রাম ট্যাকসিতে বাদুড়ঝোলা মানুষ। দীপনাথ পথে পথে অনেকক্ষণ হাঁটল। হাঁটতে হাঁটতে রেসকোর্স পেরিয়ে এল। ডাইনে, কখনো বাঁয়ে মোড় নিয়ে এ-রাস্তা ও-রাস্তা ধরে অবিরাম হেঁটে সে যখন নিউ আলিপুরে বোস সাহেবের ফ্ল্যাটের সামনে পৌঁছোলো তখন তার ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ার কথা। কিন্তু মানসিক বিকলতায় সে দেহের ক্লান্তি টের পাচ্ছিল না।

সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার নেমে গেছে। শীত-শেষের ঠান্ডার অন্তিম কামড় এবার বেশ তীব্র। দীপনাথ অবশ্য মাইল মাইল হেঁটে ঘেমে গেছে। আকণ্ঠ জলতেষ্টা পেয়েছে তার। তবে ক্ষুধাবোধ নেই। লোকে তার আর মণিদীপার কথা বলাবলি করে! সত্যিই করে। নইলে বিলু জানল কি করে? লজ্জা। লজ্জা।

কলিং বেল টিপতে হল না। দরজা খোলা ছিল। আর খোলা দরজা দিয়ে ঢুকতেই দেখা গেল, বইরের সাজ পরা মণিদীপা বসার ঘরে কিছু কাগজপত্র আর একটা ডটপেন নিয়ে কিছু করছে। টেবিলে এককাপ কফি।

এবার বেশ কিছুদিন পর মণিদীপার সঙ্গে দেখা হল দীপনাথের। অনেক রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা। চোখে-মুখে কিছু রুক্ষতা। সাজগোজে বেশ একটু অমনোযোগ।

দীপনাথকে দেখে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল একটুক্ষণ। তারপর বলল, এত ঘেমেছেন কেন?

আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

কথা! বলে ঠোঁট ওলটায় মণিদীপা, কথা তো অনেক হল। কথায় কিছু হয় না।

দীপনাথ একটা রুদ্ধ শ্বাস ফেলে বলে, জরুরী কথা আছে। এটা ইয়ার্কি নয়।

মণিদীপা এই ধমকটা আশা করেনি। তার স্বাভাবিক সতেজ অহংকারী ভাবটা সম্প্রতি নানা ঘটনায় বড় বেশী মার খেয়েছে। এসেছে ভয়, জীবনের অনিশ্চয়তা, ভাঙা জমির অভাব বোধ।

মণিদীপা দীপনাথের সামনে একটু বিবর্ণ হল, একটু কুঁকড়ে গেল। এতই চোখে পড়ার মতো ব্যাপার যে, উদ্‌ভ্রান্ত দীপনাথেরও চোখ এড়াল না।

মণিদীপা হঠাৎ উঠে সিলিং পাখাটা আস্তে চালিয়ে দিয়ে এসে বলল, বসুন। কফি বলে আসি।

তার আগে কথাটা।

কথাটা তার পরে। আপনি বসুন।

দীপনাথ বসে চোখ বুজল। সিলিং পাখার হাওয়াটা এত মিষ্টি লাগল যে বলার নয়। মণিদীপার গায়ের সুগন্ধ বাতাসটাকে ভারী ঘন করে রেখেছে।

চোখ বুজে বেশ কিছুক্ষণ শূন্য মাথায় বসে থাকার পর মণিদীপা ফিরে এল। বাবুর্চি নয়, নিজেই ট্রেতে কফি আর গোটা দুই চকোলেট কেক-এর টুকরো নিয়ে এসেছে।

দীপনাথ তাকিয়ে দেখল। তারপর হাত বাড়িয়ে কফির কাপটা তুলে নিয়ে বলল, টেলিফোনে আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাননি কেন বলুন তো!

মণিদীপা জবাব দিল না। চুপ করে ফুলদানি থেকে ফুল তুলে তুলে আবার সাজাতে লাগল, দীপনাথের দিকে পিছন ফিরে।

কথা বলবেন না

মৃদু শান্ত স্বরে মণিদীপা বলে, কথা ঢের হয়েছে। আর আমার কথা ভাল লাগে না।

কথা ছাড়া কমিউনিকেট করার আর কী উপায় বলুন!

মণিদীপা মরালীর মতো শরীর বাঁকিয়ে একবার তাকায়। তারপর বলে, লাভ হ্যাজ ইটস ওন ল্যাংগুয়েজ।

দীপনাথ মূক হয়ে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে বলে, আপনি কী চান একটু খুলে বলবেন?

একটা দোকান। খুব সুন্দর জায়গায়, ভদ্র পরিবেশে চালু একটা দোকান। আপাতত আর কিছু নয়।

আপনার মাথায় দোকানটা কে ঢোকাল বলুন তো।

দ্যাট ইজ নান অফ ইওর বিজনেস।

দীপনাথ নীরবে আঘাতটা সহ্য করে শান্ত স্বরেই বলে, দোকান যদি একান্তই দিতে হয় তবে আমার অ্যাপরুভাল ছাড়া তা হওয়ার নয়। আপনি তো তা জানেন।

জানি। তাই আমি বোস সাহেবের কাছ থেকে কিছুই আর প্রত্যাশা করি না। আই অ্যাম অ্যারেঞ্জিং এ ক্যাপিট্যাল ফ্রম এলসহোয়ার।

আপনি ভুল করছেন মণিদীপা। ব্যবসা আপনার ধাতে নেই।

দ্যাট ইজ অলসো নান অব ইওর হেডেক। বোস সাহেব যে ছুকরীটির মধ্যে ঘোরাফেরা করছেন এখন থেকে আপনি তাকেই অ্যাডভাইজ দিতে শুরু করুন না।

দীপনাথের সংশয়টা ছিলই। খুব অবাক হল না। বলল, ছুকরীটি আবার কে?

ন্যাকামি করবেন না দীপনাথবাবু। ইউ নো।

বোস সাহেব কোথায়?

এ সময়ে বাড়ি থাকেন না। এই বয়সে টিন এজারকে হাত করতে হলে একটু বেশী লেবার দিতে হয়। হি ইজ ডুয়িং একজ্যাকটলি দ্যাট। আপনি তো সবই জানেন। উনি হয় তো এটাও আপনার পরামর্শেই করছেন।

দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য দীপনাথ হঠাৎ উঠে মণিদীপার কাছে এসে এক ঝটকায় তার কাঁধ ফিরিয়ে মুখোমুখি দাঁড় করাল। বলল, আমি কিছু জানি না। এখন আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দিন।

(ক্রমশ)

# বিজ্ঞান

## কৃত্রিম রক্ত

জাপানের জনৈক শল্যচিকিৎসক জরুরীকালীন অস্ত্রোপচারের সময় এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ কাজে লাগিয়েছেন। এই যৌগ স্বাভাবিক রক্তের মতই শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ করার ক্ষমতা রাখে।

ভদ্রলোকের নাম ডঃ কেনজি হোনডা। কর্মস্থল ফুকুশিমা মেডিকাল কলেজ, জাপান।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের একজন সাংবাদিক ডঃ হোনডাকে প্রশ্ন করেছিলেন, অস্ত্রোপচারের সময় মোট কতজনের দেহে এই কৃত্রিম রক্ত আপনি ঢুকিয়েছেন?

মোট ১৫০ জন। সবই জরুরী কেস্। এবং প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই আমরা সুফল পেয়েছি—ডঃ হোনডার উত্তর।

সাধারণভাবে যৌগটিকে বলা হচ্ছে কৃত্রিম রক্ত। রাসায়নিক নাম 'এফ ডি এ'। 'এফ ডি এ' তৈরি করার জন্য বিজ্ঞানীরা দুটি রাসায়নিক যৌগের সাহায্য নিয়েছেন। যৌগ দুটির নাম পারফ্লুরোডেকাটিন এবং পারফ্লুরোট্রাইপ্রপ্যলামাইন। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, ঠিক ওষুধ বলতে যা বোঝায়, 'এফ ডি এ' কিন্তু তা নয়। "বরং একে বলা চলে অক্সিজেন পরিবাহী।" বলেছেন ডঃ হোনডা।

'এফ ডি এ'র উদ্ভাবক ওসাকার গ্রীন ক্রস করপোরেশনের বিজ্ঞানী ডি জে নাতিও।

ডঃ হোনডার মতে : এফ ডি এ-ই প্রথম কৃত্রিম রক্ত। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীর দেহে কৃত্রিম এই রক্ত এক নাগাড়ে দুই থেকে তিন দিনও আমাদের ঢোকাতে হয়েছে। এতে করে তাদের কারোর দেহেই কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে নি। কেউ মারাও যান নি। আমরা ভেবেছিলাম, শরীর হয়ত কৃত্রিম এই রক্ত সহ্য করতে পারবে না, পরিত্যাগ করবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তেমন কিছুও ঘটে নি। এবং আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই, কারোর শরীরে রক্ত দিতে গেলে চিকিৎসকমাত্রই কয়েকটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। যেমন ধরুন, স্বাভাবিক রক্তের ব্যাপারে প্রথমেই তাঁদের দেখতে হয় সেই রক্ত কোন গ্রুপের। অনেকেই হয়ত জানেন, এক-এক জনের রক্ত এক-এক গ্রুপের হয়ে থাকে। অতএব যে কোন মানুষের রক্ত ইচ্ছে মত যে-কোন রোগীর দেহে ঢোকানো সম্ভব নয়। কারোর দেহে রক্ত দিতে গেলে প্রথমেই দেখে নিতে হয়, তার রক্ত ঠিক কোন গ্রুপের মধ্যে পড়ে। তারপর দেখতে হয় যার শরীর থেকে রক্ত সংগ্রহ করা হবে তার রক্তের গ্রুপ যাকে রক্ত দেওয়া হবে তার রক্তের গ্রুপের অনুরূপ কী না। যদি অনুরূপ হয়, তবেই এক জনের রক্ত আর এক জনের শরীরে দেওয়া সম্ভব। নইলে হিতে বিপরীত হওয়ারই সম্ভাবনা। সম্ভাবনা কেন, বরং তা ক্ষতিকারকই হয়। অনেক সময় রোগীর জন্য ঠিক যে গ্রুপটির রক্ত দরকার, সেই গ্রুপের রক্ত দেওয়ার মত দাতা হাতের কাছে পাওয়া যায় না। ব্লাড ব্যাঙ্কেও না থাকতে পারে। 'এফ ডি এ' এই অসুবিধেটি দূর করবে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, কারোর দেহে যে কোন গ্রুপের রক্তই থাক না কেন, রক্তের প্রয়োজন হলে তাদের সবাইকেই 'এফ ডি এ' দেওয়া যেতে পারে। এতে করে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে না।

'এফ ডি এ' দেখতে কতকটা দুধের মত। "হুট ইজ অ্যান ইমালসন", ডঃ হোনডার মন্তব্য। "যকৃৎ-কোষ একে গ্রহণ করে, সংরক্ষণও করে। কিন্তু কেন করে শারীরবৃত্তের দিক দিয়ে এর তাৎপর্যই বা কী, সে সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কিছু জানা যায় নি।"

স্বাভাবিক রক্তের সঙ্গে 'এফ ডি এ'-র তা হলে পার্থক্য কোথায়?

ডঃ হোনডার উত্তর, হ্যাঁ, পার্থক্য যথেষ্ট। 'এফ ডি এ' সাধারণ রক্তের মত শুধু অক্সিজেনই পরিবহণ করে। আর কিছু নয়। স্বাভাবিক রক্ত অক্সিজেন ছাড়াও শরীরের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে দেয় নানা রকম খনিজ পদার্থ ভিটামিন এবং পুষ্টি সামগ্রী। দেহ-কোষের বৃদ্ধি, বিভাজন এবং শারীরবৃত্তীয় কাজকর্মের জন্যে এসব দরকার। 'এফ ডি এ'-র পক্ষে একমাত্র অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করা সম্ভব নয়। ওই সব কাজও 'এফ ডি এ'-র পক্ষে করা যাতে সম্ভব হয় অল্প দিনের মধ্যেই তার জন্যে আমরা গবেষণা শুরু করছি। যদি আমরা সফল হই, তা হলে অদূর ভবিষ্যতে লিউকোমিয়া এবং বিভিন্ন রক্ত-দোষজনিত চিকিৎসার কাজ সহজতর হবে।

ফুকুশিমার এই শল্যচিকিৎসক আরও বলেছেন, যে ১৫০ জনের দেহে আমাকে অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল, তাদের সবগুলিই জরুরী কেস। হাসপাতালে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এতটুকু সময় নষ্ট না করে তাদের দেহে অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল। অস্ত্রোপচারের আগে তাদের জন্যে প্রথমেই আমরা স্বাভাবিক রক্ত জোগাড় করার চেষ্টা করেছি। সেই রক্ত সংগ্রহ করা সম্ভব না হওয়ায় আমাদের কৃত্রিম রক্তের সাহায্য নিতে হয়েছে। তবে রুটিন মাফিক চিকিৎসার জন্যে যাতে 'এফ ডি এ' ব্যবহার করা যায় তার জন্যে জাপান সরকারের অনুমোদন দরকার। সে অনুমোদন এখনও আমরা পাই নি। সরকার থেকে বলা হয়েছে, আগে প্রমাণ করুন, কম করেও ৩০০ জন রোগী এ ধরনের রক্ত নিয়ে আরোগ্য লাভ করেছে, তবেই সরকারী অনুমোদন দেওয়া হবে।

চিকিৎসার সময় প্রতিটি রোগীর দেহে 'এফ ডি এ' দেওয়া হয় ২০০০ থেকে ৩০০০ মিলিলিটার। আর তার জন্যে সময় লাগে প্রায় দুই ঘণ্টা। শরীরে প্রবেশ করার পর 'এফ ডি এ'-র প্রতিক্রিয়া থাকে তিন ঘণ্টার মত। চিকিৎসার জন্যে ডঃ হোনডা আপাতত পঞ্চাশ শতাংশ স্বাভাবিক রক্তের সঙ্গে পঞ্চাশ শতাংশ 'এফ ডি এ' ব্যবহার করেছেন। কাজ সারার পর এই যৌগ ফুসফুসের ভেতর দিয়ে এসে নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরের বাইরে পরিত্যক্ত হয়। এবং শরীর থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে সময় নেয় তিন থেকে ছয় মাসের মত।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, অদূরভবিষ্যতে চিকিৎসার ব্যাপারে ব্যাপক রক্তসঞ্চালনের ক্ষেত্রে 'এফ ডি এ'র ভূমিকা যদি নির্ভরযোগ্য হিসেবে প্রমাণিত হয়, অস্ত্রোপচারের কাজ তখন সহজতর হবে সন্দেহ নেই। পৃথিবীর সব দেশে হাসপাতাল বেড়েছে প্রচুর। রোগীর সংখ্যাও বাড়ছে। অস্ত্রোপচারের জন্যে চাই প্রচুর রক্ত। জনসাধারণের পক্ষে অত রক্তের যোগান দেওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। এ ছাড়া আছে গ্রুপের প্রশ্ন। ঠিক যে গ্রুপের রক্ত দরকার, সেই গ্রুপের রক্ত অথবা রক্তদাতাই হয়ত পাওয়া গেল না সময় মত। হয়ত রক্তদাতা পাওয়া গেল, কিন্তু রক্ত দেওয়ার মত তার ক্ষমতাই নেই। এর পর দেখতে হয়, যিনি রক্ত দিচ্ছেন, তিনি আবার রোগমুক্ত কী না। কারোর সংক্রামক রোগ অথবা রক্তে অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তু থাকলে তার রক্ত অপরের শরীরে ঢোকান বিপজ্জনক। কৃত্রিম রক্তের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন বাধাই থাকবে না। এ ছাড়া, কৃত্রিম রক্ত দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করাও যাবে।

## মানবকল্যাণে তেজস্ক্রিয়তা

তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে বাস্তব সমস্যা সমাধানের প্রথম ঘটনাটি সত্যিই মজার ব্যাপার।

১৯১১ সাল। জর্জ দ্য হেভসি নামে একজন তরুণ ম্যাঞ্চেস্টারে এলেন গবেষকদের সাহায্য করার কাজ নিয়ে। খুবই সাধারণ চাকরি। খনিজ পদার্থ থেকে প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় সামগ্রী পৃথক করা, এই ছিল তাঁর কাজ।

অনেকেই জানেন, বস্তুমাত্রই পরমাণু দিয়ে তৈরি। অনেক সময় দেখা যায় একই মৌলিক পদার্থ, কিন্তু তাদের বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করে তাদের পরমাণুর ভর মাপলে দেখা যায় তাদের ভর পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র। একই মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন ভর বিশিষ্ট ওই পরমাণুদেরই বলা হয় আইসোটোপ। এই সব আইসোটোপদের অনেকের স্থায়িত্ব আবার কম। তাদের নিউক্লিয়াস বিকিরণ ত্যাগ করে ভিন্নতর নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। যে সব বস্তুর পরমাণুর নিউক্লিয়াস

জে জে পোকা আফ্রিকার মানুষের কাছে এক জীবন্ত বিভীষিকা। এই পোকা ঘুম-রোগের জীবাণু ছড়ায়। বিকীরণের সাহায্যে এই পোকার বংশবৃদ্ধি প্রতিরোধের চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা

থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকিরণ বের হয়, তাদের বলা হয় রেডিও আইসোটোপ বা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। আবার এমনও কিছু কিছু আইসোটোপ আছে, যাদের কোন বিকিরণ নেই। এদের বলা হয় স্থায়ী আইসোটোপ। উল্লেখ করা যেতে পারে, কিছু কিছু রেডিও আইসোটোপ প্রকৃতিতেই পাওয়া যায়। যেমন, রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম-২৩৫ প্রভৃতি। তবে বেশির ভাগ রেডিও আইসোটোপ তৈরি করা হয়ে থাকে ত্বরক যন্ত্র বা অ্যাকসেলেটারে এবং পারমাণবিক চুল্লিতে। ওই সব যন্ত্রে পরমাণুর উপর নিউট্রন, প্রোটন, প্রভৃতি পারমাণবিক কণার সাহায্যে প্রচণ্ডভাবে আঘাত হেনে বিভিন্ন আইসোটোপ তৈরি করা হয়ে থাকে। হেভসি যখন ম্যাঞ্চেস্টারে এসে কাজে যোগ দেন তখন অ্যাকসেলেটার অথবা পারমাণবিক চুল্লি কিছুই আবিষ্কৃত হয়নি। খনিজ পদার্থের ভেতর থেকে একমাত্র প্রকৃতিজাত তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পৃথক করাই ছিল তাঁর কাজ।

হেভসির আর্থিক অবস্থা তখন খুবই খারাপ। ফলে আশ্রয়ের জন্যে তাঁকে বেছে নিতে হয়েছিল খুব কম ভাড়ায় একটি ছোট্ট ঘর। আর খাওয়াদাওয়া চালাতেন ওই ঘরেরই জনৈকা মহিলা-মালিকের কাছে। অবশ্য এর জন্যেও তাঁকে অতিরিক্ত পয়সা গুণতে হত।

এইভাবেই চললো বেশ কিছুদিন। কিন্তু একদিন খেতে গিয়ে কেমন যেন সন্দেহ হলো তাঁর। তিনি দেখলেন, যে খাবারটি কয়েকদিন আগে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল, সেই একই খাবার গৃহকর্ত্রী আবার তাঁকে খেতে দিয়েছেন। খাওয়ার শেষে কোন কোন খাবারের কিছু অংশ তিনি ফেলে রাখতেন। দেখছেন, কয়েক দিন পর সেই একই রকম খাবার আবার তাঁকে খেতে দেওয়া হয়েছে। একবার ভাবলেন, খাদ্যতালিকার একঘেয়েমিতা দূর করার জন্যেই হয়ত এই ভাবে কয়েকদিন পর পর আগের খাবারের পুনরাবৃত্তি করছেন গৃহকর্ত্রী। আবার এমন সন্দেহও হলো, আগের দিনে ফেলে যাওয়া খাবারই আবার তাঁকে খেতে দেওয়া হচ্ছে না তো?
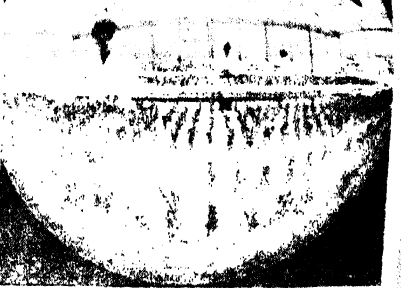
পশ্চিম জার্মানির জুলিখে অবস্থিত এক পারমাণবিক গবেষণাগারে অধিক ফলনশীল বার্লির চারা তৈরি করেছেন বিজ্ঞানীরা। এর জন্যে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সাহায্য নেওয়া হয়েছে

সন্দেহ দূর করার জন্যে অভিনব একটি পদ্ধতির কথা ভাবলেন হেভসি। একদিন খাওয়ার পর যে খাবারটি অবশিষ্ট হিসেবে পড়ে রইলো গৃহকর্ত্রীর অলক্ষ্যে তার মধ্যে যৎসামান্য তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ মিশিয়ে দিলেন তিনি।

এর পর কয়েকদিন অপেক্ষা করলেন হেভসি। তারপর, হ্যাঁ, একদিন সেই ভুক্তাবশেষ খাবারের মতই একটি খাবার টেবিলের উপর রেখে গেলেন গৃহকর্ত্রী। তাঁর মনে হলো, এই খাবারই তো কিছুদিন আগে তাঁকে দেওয়া হয়েছে। তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন একটি 'গোল্ড লিফ ইলেকট্রোস্কোপ'। ইলেকট্রোস্কোপটি খাবারের প্লেটের সামনে আনতেই তার সোনার পাত লাফিয়ে উঠলো। তার মানে, তার খাবার থেকে বেরিয়ে আসছে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ। পরিষ্কার বোঝা গেল গৃহকর্ত্রী তাঁকে পুরনো খাবারই দিয়েছেন। তাঁর ভুক্তাবশেষ খাবার, যার মধ্যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ মিশিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ওই বিকিরণ আসছে সেই আইসোটোপ থেকে।

হেভসি ব্যাপারটা দেখালেন গৃহকর্ত্রীকে। বললেন, বাসি খাবার দিয়েছেন আপনি আমাকে। দিন কয়েক আগে যা আমাকে খেতে দিয়েছিলেন তারই ভুক্তাবশেষ।

ভদ্রমহিলা কিন্তু হেভসির অভিযোগ উড়িয়ে দিলেন। বরং ফল হলো বিপরীত। গোল্ড লিফ ইলেকট্রোস্কোপটি দেখিয়ে বললেন, ওসব ম্যাজিক-ট্যাজিক আমাদের বাড়িতে চলবে না। তুমি এক্ষুনি আমার ঘর ছেড়ে দাও।

হেভসি বাস্তুহারা হলেন।

উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে জীব-বিজ্ঞানে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার ঘটিয়ে গবেষণার জগতে নতুন এক দিগন্ত খুলে দিয়েছিলেন হেভসি। এই অসামান্য কৃতিত্বের জন্যে ১৯৪৩ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। পরে মানবকল্যাণে তাঁর এই অবদান সুদূরপ্রসারী হিসেবে বিবেচিত হয়। এবং তার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ১৯৫৯ সালের 'অ্যাটম ফর পিস' পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৫৭ সালে জন্ম নিলো ইনটারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের ব্যাপারে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন, বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রযুক্তিগত সাহায্য যোগানর ব্যাপারে সাহায্য করা ছাড়াও গোড়া থেকেই তাঁরা আরও একটি ক্ষেত্র নিয়ে উঠে পড়ে লাগেন। সেটা হলো মানব কল্যাণে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের প্রয়োগ। বিগত তিন দশকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনেকগুলি পারমাণবিক চুল্লি বসানো হয়েছে। বসানো হয়েছে শক্তিশালী পারমাণবিক-ত্বারক যন্ত্র। ওই চুল্লি এবং ত্বারক যন্ত্রে তৈরি হচ্ছে নানা রকম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। সেই আইসোটোপের সাহায্যে কী না করা হচ্ছে এখন।

আইসোটোপের তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে নতুন জাতের বীজ। ওই সব বীজ থেকে পাওয়া গেছে অধিক ফলনশীল ফসল। ধান গম, ডাল, আখ—অনেক কিছু। রোগের হাত থেকে ফসল বাঁচানোর জন্যেও কাজে লাগানো হচ্ছে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সাহায্যে নিরাময় অথবা প্রতিরোধ করা হচ্ছে ক্যানসারের মত দুরারোগ্য ব্যাধি। কোন ওষুধ শরীরের কোন অংশে গিয়ে সক্রিয় হয়, ইদানীং সে খবর জানার ব্যাপারেও নির্ভর করতে হয় তেজস্ক্রিয় পদ্ধতির উপর।

পরিবেশের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে নানা রকম দূষিত বস্তু। ওই সব বস্তু কী ভাবে ছড়ায়, কত তাড়াতাড়ি ছড়ায়, সে সব তথ্য জানার ব্যাপারেও পরিবেশ বিজ্ঞানীরা এখন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্য নিয়ে থাকেন। বড় বড় শহরের পয়ঃপ্রণালীর জল এখন বড় রকমের সমস্যা। ওই জলে অজৈব আবর্জনা ছাড়াও থাকে নানা রকম রোগের জীবাণু। মুক্ত পরিবেশে ছেড়ে দেওয়ার আগে ওই সব জীবাণু ধ্বংস করার ব্যবস্থা নিয়েছেন অনেকে। এর জন্যে পয়ঃপ্রণালীর জলে ব্লিচিং পাউডার থেকে কত রকম জীবাণুনাশক রাসায়নিক যৌগই না মিশিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। মুশকিল এই, রাসায়নিক যৌগ জীবাণু ধ্বংস করে ঠিকই। কিন্তু নালানর্দমার জলের সঙ্গে মিশে যখন তারা উন্মুক্ত প্রান্তর অথবা নদী নালার মধ্যে গিয়ে পড়ে তখন তার ফল দাঁড়ায় সুদূরপ্রসারী। জলের মাছ অথবা ডাঙ্গার প্রাণী এবং গাছপালা ওই সব রাসায়নিক সামগ্রীর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ক্ষতির হাত থেকে পরিবেশ রক্ষা করার জন্যেও এখন কাজে লাগানো হচ্ছে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ। নালা নর্দমার জল তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সাহায্যে শোধন করে তবেই উন্মুক্ত পরিবেশে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছেন তাঁরা। বিকিরণের স্পর্শে জীবাণুরা ধ্বংস হয়। অতএব রোগ ছড়ানোর কোন আশংকা থাকে না। ক্ষতিকর রাসায়নিক যৌগ না থাকায় নালানর্দমার পরিত্যক্ত জল পরিবেশেরও কোন ক্ষতি করতে পারে না।

নদীর জল এবং ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ এবং প্রবাহ নির্ধারণের জন্যেও কাজে লাগানো হচ্ছে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। এর জন্যে ভূস্তরে গর্ত খুঁড়ে ভূগর্ভস্থ জলের প্রবাহে মিশিয়ে দেওয়া হয় যৎসামান্য তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। মাটির নিচে দিয়ে যত দূর জল যায়, আইসোটোপও চলে তত দূর। আর যেখানেই আইসোটোপ, সেখানেই বিকিরণ। বিকিরণমাপক যন্ত্রের সাহায্যে ওই বিকিরণ ধরা পড়ে। তখন বিশেষজ্ঞরা বলে দিতে পারেন, ভূগর্ভস্থ জলের প্রবাহ কোন দিক বরাবর চলছে।

ইদানীং খাদ্য সংরক্ষণের ব্যাপারেও কাজে লাগানো হচ্ছে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। কলা, পিঁয়াজ, আলু এবং বিভিন্ন ফলমূল ও মাছ মাংস। নিয়ন্ত্রিত মাত্রার তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মধ্যে উপযুক্ত সময় মত এই সব সামগ্রী রেখে দেওয়া হয়। পরে স্বাভাবিক পরিবেশে রেখে দিলে ওরা পচে না, তাদের খাদ্যগুণও নষ্ট হয় না। রাসায়নিক পদ্ধতিতেও খাদ্য সংরক্ষণ করা যায়। তবে দেখা গেছে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ পদ্ধতিতে রাসায়নিক পদ্ধতির চেয়ে খরচ পড়ে কম, খাদ্যে বিষক্রিয়া ঘটার সম্ভাবনাও কম থাকে।

ট্রম্বের ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে বিকিরণের সাহায্যে খাদ্য সংরক্ষণের ব্যাপারে গবেষণা হয়েছে বিস্তর। তাতে আশানুরূপ ফলও পেয়েছেন গবেষকরা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ওই পদ্ধতি অনায়াসেই কাজে লাগানো যায়।

যেমন ধরুন, সুন্দরবন অঞ্চলের মাছ। সুন্দরবনের নদী নালা এবং সমুদ্র অধ্যুষিত অঞ্চলে ধরা পড়ে প্রচুর মাছ। বরফের অভাবে সেই মাছ সংরক্ষণ করা অনেক সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। যাঁরা বরফের ব্যবস্থা করতে পারেন, তাঁরা বড় বড় কারবারী। ছোট কারবারীদের সস্তা দরে ওঁদেরই মাছ বেচে দিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্যোগী হয়ে যদি সুন্দরবন এলাকায় একটি বিকিরণের প্ল্যান্ট বসান, বহু গরীব মাছ ব্যবসায়ী তাতে লাভবান হতে পারেন। নিজেদের ধরা মাছ ওই বিকিরণ প্ল্যান্টে [illegible] করে নিয়ে কলকাতা বা দূরবর্তী অঞ্চলে নিয়ে আসতে পারবেন তাঁরা। এতে করে মাছের অপচয় কমবে, মাছের মত মূল্যবান খাদ্যের ব্যাপারে অনেকেই বঞ্চিত হবেন না এবং সেই সঙ্গে ক্ষুদ্র মাছ-ব্যবসায়ীরাও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভবান হবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান এবং কারিগরি কমিটি বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন।

আইসোটোপের চল এখন সর্বত্র। শল্যচিকিৎসকদের সাজসরঞ্জাম নির্জীবাণুকরণ—তাও এখন করা হচ্ছে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ নিঃসৃত বিকিরণের সাহায্যে। বাতাসের গতি, অভিমুখ—সে সব জানার ব্যাপারেও আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা এখন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্য নিচ্ছেন।

হেভসি একদিন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্য নিয়েছিলেন নিজের প্রয়োজনে। উনসত্তর বছর পর সেই আইসোটোপই মানবকল্যাণে এখন এক বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ।

সমরজিৎ কর

আমজাদ আলি খান
এক মহান ঐতিহ্যের উজ্জ্বল উত্তরসূরি ;
শুদ্ধ রাগগুলির অনবদ্য ব্যাখ্যা
এঁকে এনে দিয়েছে যোগ্য সম্মান
ও খ্যাতি ।
"আমার সুরের মধ্য দিয়ে আমি পৌঁছতে চাই
সবার কাছে, আমার সুর জানে না ভাষার
বাঁধন । মানে না ধনী গরীবের ভেদাভেদ ।"
এঁর সিগারেট : নাম্বার টেন ফিল্টার ।
আপোসহীন মান • অসীম তৃপ্তি
নাম্বার টেন
ফিল্টার
যে স্বাদ দিন রাত
মন ভরায়
No10
FILTER
CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH
পূর্ব ভারতে
ফিল্টার সিগারেটের
মধ্যে এর বিক্রি
সবচেয়ে বেশি
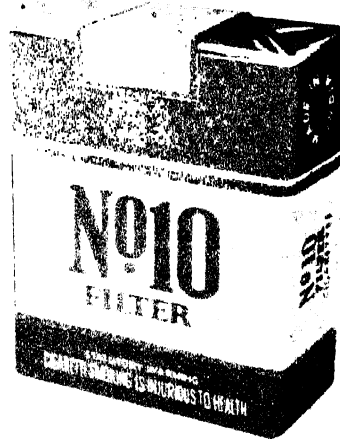
# প্রত্যাশিত আজীবন বীমার পলিসি

## দু'ভাবে লাভবান হবার একটি আকর্ষক প্রকল্প

- পলিসির মেয়াদ অন্তের পূর্বেই নিশ্চিতভাবে বীমাকৃত টাকার ৫০% প্রাপ্তির সুযোগ
- যে কোন সময়ে, এমনকি মেয়াদপূর্তির পরেও বীমাকৃত টাকার ১০০% প্রাপ্তির ব্যবস্থা

আপনি এই পলিসি ২০ বছর, বা ২৫ বছরের মেয়াদের জন্য নিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনার ২৫ বছর বয়সে আপনি যদি ২০ বছরের মেয়াদের জন্য একটি প্রত্যাশিত আজীবন বীমার পলিসি নেন, তাহ'লে আপনি দুটি বিশেষ ধরণের সুযোগ পাবেন। ২০ বছর ধরে নির্দিষ্ট সময় অন্তর আপনি পলিসির শর্তসাপেক্ষে যে টাকা পাবেন, তাতে আপনার ছোটখাটো চাহিদা মেটাতে পারবেন। অধিকন্তু, যে কোন সময়ে, এমনকি মেয়াদপূর্তির পরে যখন প্রিমিয়াম দেবার তাগিদ থাকে না তখনও, আপনার পরিবারকে বীমাকৃত টাকা দেওয়া হবে।

**একজন ব্যক্তি ৩৫ বছর বয়সে যদি ২০ বছরের মেয়াদে একটি ২৫০০০ টাকার পলিসি নেন, তাহ'লে তিনি এইসব সুযোগ পাবেন।**

৪০ বছর বয়স অবধি জীবিত থাকলে তিনি পাবেন ৩১২৫.০০ টাকা।
৪৫ বছর বয়স অবধি জীবিত থাকলে তিনি পাবেন ৩১২৫.০০ টাকা।
৫০ বছর বয়স অবধি জীবিত থাকলে তিনি পাবেন ৩১২৫.০০ টাকা
৫৫ বছর বয়স অবধি জীবিত থাকলে তিনি পাবেন ৩১২৫.০০ টাকা।

এমনকি মেয়াদ অন্তের পরেও যদি তাঁর মৃত্যু হয়, তাহলেও তাঁর পরিবারকে বীমাকৃত টাকা দেওয়া হবে।

২০ বছরের মেয়াদের অন্তবর্তী কালে অথবা তার পরে যে কোন সময়ে মৃত্যুজনিত দাবীর ক্ষেত্রে তাঁর পরিবারকে লভ্যাংশসমেত সম্পূর্ণ বীমাকৃত টাকা দেওয়া হবে, বীমাকারীকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর কোন কিস্তির টাকা দেওয়া হয়ে থাকলে, তাসত্ত্বেও।

এই অনন্য পলিসি থেকে আপনার পরিবার দু'ভাবে লাভবান হবার সুযোগ পাবেন। বিশেষ করে প্রত্যাশিত আজীবন বীমার পলিসির উল্লেখ করে এ সম্পর্কে জেনে নিন।

অনুগ্রহ করে আপনার জীবন বীমার এজেন্ট অথবা নিকটস্থ আমাদের কোন শাখা অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

**ভারতীয় জীবন বীমা নিগম**

RADEUS/LIC/SP-37

## পাখিটা

**ৎপলকুমার গুপ্ত**

পর দিকে দৌড়চ্ছে নদী কিছু বলার আগেই
উড়ে গেল পাখিটা
আকাশ পারল না ধরতে
বাতাস চেষ্টা করল শুধু শুধু
অথচ ওদেরই হাতের মুঠোয় ছিল

। শুধু না-থাকার ছল এ শুধু না-থাকার বেদনা
লেগে থাকে গাছে গাছে আর ছায়ায়
যেখানে এখনো এলোখোঁপা
খুলে ফেলে পুরুষ হাওয়া
একজনের নামে গান গায় দোয়েল
ার ফুলের ঘোমটা খুলে যে দেখেছিল মুগ্ধ দুটি চোখ
সেই বিহ্বল ভ্রমর
তার স্মৃতিও গালে-হাত বসে থাকে চুপচাপ

াখিটা কোনোদিকে না তাকিয়ে
সোজা উড়ে চলে যায়
কেউ ধরতে পারে না

## শৈলাবাস স্মৃতি ও ছবি

**রাণা সরকার**

তুমি যাবে, এ তোমার দুরন্ত পারাপার—
অরণ্য নির্জন ছায়ায় তরায়ের লজ্জাহীন ফুল ঝরে।
এই সব দৃশ্য নিয়ে কিছু ছবি হবে জানি ;
প্রতিধ্বনি শব্দ হয়ে ছুঁয়ে যায় বুকের গভীর।

কাল সারারাত শৈলাবাস নিষ্প্রদীপ ছিল
প্রাদেশিক মেঘ জ্যোৎস্নায় সারাক্ষণ খেলেছিল
লুকোচুরি খেলা।
ঘরছুট বেয়াড়া পর্যটকের মত তুমি নির্দ্বিধায় ভুলেছিলে
উষ্ণতার নিজস্ব আমেজ।

এখন কুয়াশা সকাল, সেঞ্চল লেকের জলে কাগজে নৌকোর মত—
মুক্ত মেঘ ক্রমশই সরে যাচ্ছে দূরে।
মেল ব্যাগ শুভেচ্ছার শুভ্র প্রতীক নিয়ে এইমাত্র ছুটে গেল
দূর সমতলে।

তুমি ফিরে যাচ্ছো, শব্দের বর্ণমালায় বিদায় সংগীত
মসৃণ জলের স্রোতে নিরুদ্দেশ স্মৃতি।

## আমি দাহ চাই

**নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়**

এ বর্ষা থাক নীল পর্বতে একা
কেন বৃথা তাকে আনো দীন সংসারে?
মল্লারগানে বিষাদ যে বিজড়িত
আমি দাহ চাই দীর্ঘ রুদ্র দিনে।

সন্ন্যাসী রোদে ধু-ধু হাওয়া বহে যাক
মরুদেশ হোক এই শ্যাম প্রান্তর
বসন্ত আসে, যেমন শরৎ মৃদু
বড় ভয় আনে উষ্ণ ক্ষণিক সুখ!

অন্ধতা বুঝি মৃত্যুভয়েরও বেশী
সংসারী দিন মিশেছে বিভ্রমণে
কোন দিকে যাওয়া? দুই চোখে নিয়ে ক্ষয়
প্রবাসী প্রণয়ে শুধু মৃত্যুর মোহ!

বর্ষা থাকুক শারদ তৃষ্ণা ছুঁয়ে
আমি দাহ চাই দহন দীপ্ত শীতে।

## অপাবৃত

**অশোক চট্টোপাধ্যায়**

দ্রুত ব্যস্ত সকালের সংসার ছাড়িয়ে
তুমি চলে যাও রোজ একা,
আমার দুপুর—
লঘুপায়ে নেমে আসে বুকের ভিতরে প্রতিদিন।

তুমি দূরে গিয়ে কাছে আসো
চিরটা দুপুর
সহস্র স্মৃতির অভ্রে প্রান্তরে আমার।

তুমি স্বপ্ন ভাঙো গড়বে বলে।
যে বলে বলুক শূন্য
আমি দেখি নীলিমায় ঢেকেছ
আকাশ।

British Paints
Luxol
Silk

# মেঝেতে কার্পেট–পার্সিয়ান কাজ
# দেয়ালে লাকসল সিল্ক–অপূর্ব সাজ

লাকসল সিল্ক সাড়া জাগানো এক নতুন অ্যাক্রিলিক ইমালশন যা গত দু বছর ধরে পাশ্চাত্য জগতে সৃষ্টি করেছে এক বিপুল আলোড়ন। অস্ট্রেলিয়ায় উদ্ভাবিত ও নিখুঁত করে তোলা এই ইমালশন বিশ্বজোড়া বার্জার গ্রুপের অন্যতম সদস্য ব্রিটিশ পেন্টস্ আপনাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

স্পর্শে মোলায়েম, নয়নাভিরাম, রুচিস্নিগ্ধ লাকসল সিল্ক আপনাকে দেয় এমন এক নিখুঁত ফিনিশ যা আজ পর্যন্ত গৃহসজ্জার কোন রঙ অর্জন করতে পারে নি।

### আপনার দেয়াল হয় সমুজ্জ্বলতর

লাকসল সিল্ক "সমগ্র পৃথিবীতে সমুজ্জ্বলতম ইমালশন" বলে আন্তর্জাতিক প্রশংসা অর্জন করেছে। এই প্রশংসার কারণ ব্রিটিশ পেন্টস্ কর্তৃক ব্যবহৃত অ্যাক্রিলিক পলিমার, পিগমেন্ট, সারফ্যাকট্যাণ্ট ও একত্রীভবনকারক উপাদানের সার্থক সংমিশ্রণ।

দুটি পরীক্ষামূলক প্যানেল পাশাপাশি রেখে দেখুন। এ দেশের অন্য যে কোন ইমালশনের তুলনায় লাকসল সিল্ক সমুজ্জ্বলতর বলে প্রতিভাত হবে।

### ধোয়া–মোছা চমৎকার অথচ কোন দাগ পড়বে না

দেওয়াল যতো মসৃণ হবে, ধোয়া-মোছা করতে ততই সুবিধে। লাকসল সিল্ক দেওয়ালকে সিল্কের মতোই মসৃণ করে তোলে, ফলে এই ইমালশন ধোয়া-মোছা করা সবচেয়ে সহজ।

সমস্ত ইমালশনই পরিষ্কার করা যায় বলে দাবি করে কিন্তু প্রত্যেকের গায়েই থেকে যায় 'শেষ করার পর দাগ'। এটা হয়ে থাকে তার কারণ ঐ সব ইমালশনের বেলায় আপনাকে খুব কষে দেয়াল ঘষতে হয় আর তার ফলে দেয়ালে থেকে যায় পালিশের এক অস্বাভাবিক দাগ।

লাকসল সিল্কের বেলায় কিন্তু তা ঘটে না। কারণ এর পিছনে লাগে যৎসামান্য প্রয়াস এবং আরো কারণ হলো এর নিখুঁত রেশমী মসৃণতার ওপর আর কোনরকম পালিশ চলে না। সেইজন্য কেবলমাত্র লাকসল সিল্ক ব্যবহৃত দেয়ালই বছরের পর বছর নতুন থাকে।

### ধুলো ঝেড়ে ফেলে দেয়

খাড়াই দেয়ালে জমার জন্য অণুতম ধূলিকণারও প্রয়োজন পা রাখার জায়গা। তাই দেয়ালের ফিনিশ যত মসৃণ হবে ততই ধুলো জমার সুযোগ হবে কম।

সুতরাং, এখন আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে কেমনভাবে লাকসল সিল্ক যথার্থই ধুলোময়লা ঝেড়ে ফেলে দেয়। আর তাই আপনি সব সময়ই দেখতে পান পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে দেয়াল।

### রেশমী পরশ

লাকসল সিল্ক হলো একমাত্র অ্যাক্রিলিক ইমালশন যা আপনি চোখ বুজে বলে দিতে পারেন। দেয়ালের ওপর দিয়ে আপনার আঙুল একবার বুলিয়ে নিন। আপনি আর কোনদিনও অন্য কোন সাধারণ ইমালশন ছুঁয়ে দেখার আগ্রহ বোধ করবেন না।

এর রেশমী মসৃণতার আরো অর্থ হলো লাকসল সিল্ক অতি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে এবং আপনার দেয়ালকে আবৃত করে আরো সার্থকভাবে।

### চল্লিশটি রঙের বৈচিত্র্য

লাকসল সিল্ক-এর বেলায় আপনি পাচ্ছেন পছন্দ করার অতুলনীয় সুযোগ। আমাদের কালার কার্ডে আপনি পাবেন চল্লিশটি রেশমী রঙের বৈচিত্র্য। আপনার কল্পনাশক্তি ও আমাদের রঙের সার্থক সমন্বয় ঘটিয়ে আপনি পাবেন আরো একশোটি মৌলিক রঙ।

## বাড়ির দেওয়াল দুনিয়ার সেরা ইমালশন
## লাকসল সিল্ক দিয়ে সাজিয়ে নিন

LINTAS/BPLS 6 27

# কণ্টকল্পিত

## অতুল্য ঘোষ

(নবপর্যায়)

॥ ৪০ ॥

—"আমাকে রাজ্যপাল চিঠি লিখেছেন এই যে, তুমি কুটির বানিয়েছ, ব্যাপারটা কি!"

—"আপনি দেখলেই টের পাবেন।"

—"আরে দেখব তো বটেই। গভর্নমেন্ট যে পত্রিকার স্বত্বাধিকারী, সেই কাগজে বেরিয়েছে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই 'কুটির' তৈরী হয়েছে, আর সব বাতানুকূল ব্যবস্থাও আছে। আবার 'আনন্দবাজারে' ছোট্ট টিনের কুটিরের ছবি দিয়ে বলেছে যে, সর্বসমেত লাখ খানেক টাকা খরচ হয়েছে। তা কোনটা সত্যি?"

—"আপনি একবার এলেই তো টের পাবেন।"

"আমি অবশ্য—রাজ্যপালকে লিখে দিয়েছি, এসব লাট-বেলাটের ব্যাপার আমাদের বুদ্ধির অগম্য।"

—"আহা, দেখে লিখলেই তো পারতেন।"

—"দেখ বাবু, তোমাদের এইসব এত বড় বাড়ি—থাকা যায় না, এসব বুঝতে পারি না। মাঝে মাঝে অবশ্য এসব কথা শোনা যায়। কাউকে করতে তো দেখি না। বর্তমান রাষ্ট্রপতিও তো বলেছিলেন, কিন্তু—"

কথা হচ্ছিল আমার সঙ্গে ত্রিভুবনের (শ্রীত্রিভুবন নারায়ণ সিং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল)।

মাঝে মাঝেই শোনা যায় যে, ছোট বাড়িতে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল থাকবেন। কিন্তু কাজে তা হয়ে ওঠে না। অবশ্য গান্ধীজী বলেছিলেন রাষ্ট্রপতিভবনে হাসপাতাল হওয়ার কথা। গান্ধীজীর অধিকাংশ কথাই তো আমরা শুনিনি; এটাও না-হয় শুনিনি। তাতে বিস্মিত হওয়ার কি আছে! একটা কমিশনও বোধ হয় হয়েছিল বা হয়েছে, যে কমিশনের সুপারিশ হচ্ছে মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং কলকাতার রাজ্যপালদের জন্য ছোট বাড়ি। তারও তো কোন উচ্চবাচ্য শোনা যায় না। আর তা ছাড়া ছোট বাড়ি বড় বাড়ি—এসব কথার মানেও তো বোঝা যায় না। রাষ্ট্রপতিভবনে তিন শ'-খানা ঘর আছে। সেখানে রাষ্ট্রপতি থাকেন মাত্র তিনখানি ঘর নিয়ে। কাজে-কাজেই সেখানে ছোট বড় এসব কথা কেন ওঠে, তা বোঝাই শক্ত। আর বাকী ঘর তো সব দেশী ও বিদেশী মহামান্য অতিথিদের জন্য সংরক্ষিত। তা ছাড়া আরও কতরকমের লোক বিভিন্ন ঘরে থাকে—এইসব নিয়েই রাষ্ট্রপতিভবন। দেখতে বাইরে থেকে বিরাট বড়, কিন্তু রাষ্ট্রপতির এলাকা মাত্র তিনটি ঘর। অবশ্য ঘর তিনটি বেশ বড় বড়। কলকাতার রাজভবনের হিসেব নিলে দেখা যাবে যে, সবসুদ্ধ ১৬০টা ঘর আছে, অবশ্য ছোট বড় মিলিয়ে। তার মধ্যে রাজ্যপালের ভাগে দুটি শোবার ঘর, আর একটি বসবার ঘর। সেই বসবার ঘরেই লোকজনের সঙ্গে দেখা করা এবং খাওয়া। অবশ্য ইচ্ছে করলে খাওয়া-দাওয়াটা অতিথিদের আপ্যায়ন করার জন্য যে বড় খাবার ঘর আছে, সেখানেও হতে পারে। কিন্তু সাধারণত রাজ্যপালরা কেউ সেখানে খেতে যান না। এ ছাড়া দেশ-বিদেশের অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য পাঁচটি স্যুইট আছে। আরও আছে কিছু সরকারী অফিস—যেমন, কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট বিভাগের দপ্তর, প্ল্যানিং বোর্ডের অফিস ইত্যাদি। বাড়িটা দেখতে বিরাট। তৈরী হয়েছিল তো তখনকার দিনের বড়লাট—তাঁদের জন্য। লর্ড ওয়েলেসলির আমলে ১৮০৩ সালে প্রথম এখানে বসবাস আরম্ভ হয়। তখন কলকাতা ছিল ভারতবর্ষের রাজধানী। ১৯১১ সালে রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। তখন থেকে এটি এই প্রদেশের লাট-সাহেবের বাসস্থান। আবার স্বাধীনতার পর নাম হয়েছে রাজভবন, এবং গভর্নরের নাম হয়েছে রাজ্যপাল। বাস্তবিকপক্ষে এটি সরকারী অতিথিশালা। যেমন রাষ্ট্রপতি, প্রধান-

ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী
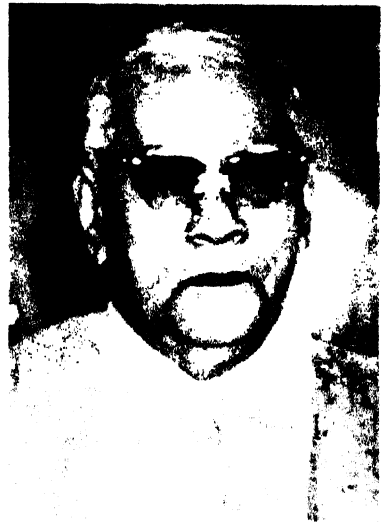
মন্ত্রী, এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য মন্ত্রীরা এলে এখানেই থাকেন, আবার অন্যান্য মাননীয় অতিথিরাও এখানে থাকেন। বিদেশ থেকে অতিথি যাঁরা আসেন, তাঁরাও এখানেই থাকেন। সব ব্যবস্থা আলাদা। আমাদের রাজভবনের এলাকার মধ্যে আবার উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব কোণে মন্ত্রীদের আবাস হয়েছে। তবুও মাঝে মাঝে শোনা যায় রাজ্যপাল এত বড় বাড়িতে কেন? এবং এসব কথা বেশী শোনা যায়, সরকারপক্ষের লোকেদেরই মুখ থেকে।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্যপাল শ্রীত্রিভুবন নারায়ণ সিং এইসব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে দিয়েছেন। তিনি একটি ছোট্ট টিনে ছাওয়া বাড়ি বানিয়ে নিয়েছেন। খুব কম খরচেই এ বাড়ি তৈরী হয়েছে। খুব বুদ্ধি করে তৈরি করেছেন বলেই খুব কম খরচ হয়েছে। দুখানি শোবার ঘর এবং সংলগ্ন স্নানের ঘর। একটি ছোট্ট ঘর—যেটি ওঁর নিজস্ব অফিস এবং এখানেই লোকজনের সঙ্গে

দেখা করেন। আর পশ্চিম দিকে একখানি বারান্দা, তিন দিকে চিক ফেলে সেখানে খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতি কষ্টে তিন-চারখানি চেয়ার ও টেবিল ধরতে পারে। কোন ঘরই বাতানুকূল নয়। সাধারণ সিমেন্টের মেঝে। এর চেয়ে অনেক পথিপার্শ্বস্থ ডাকবাংলো তৈরি করতে ঢের বেশী খরচ পড়েছে। যেমন মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ায় একটি ডাকবাংলোয় দেখেছিলুম সবটা মোজেইক করা, একটি ঘরে গুনেছিলুম সতেরটা ইলেকট্রিক পয়েন্ট। অবশ্য পাঁশকুড়ার বাংলোর ছাদ টিনের নয়, রাজ্যপালের বাড়িটি টিনে ছাওয়া এবং আয়তনে অনেক ছোট। আমি তো ঘুরে ঘুরে সবটা দেখলুম, কিন্তু কোথাও এয়ার কন্ডিশন মেশিন খুঁজে পেলুম না। রাজ্যপাল এখন এই বাড়িতেই বাস করছেন। যে বাড়িতে এয়ারকন্ডিশন মেশিন নেই, সে বাড়িতে সরকারের নিজস্ব সংবাদপত্র এয়ারকন্ডিশন মেশিন দেখলেন কোথা থেকে—অবাক কান্ড! শুনেছি তো এই সরকারের সঙ্গে রাজ্যপালের সম্পর্ক তিক্ত নয়, বরং প্রীতিকর। তবু তাঁদেরই কাগজে এই বাড়ির জন্য সাত-আট লাখ টাকা খরচ হয়েছে এসব খবর বেরোয় কি করে?

এই বাড়ি করতে যে ন্যায্য খরচ হওয়া উচিত, রাজ্যপাল তার চেয়ে অনেক কমে করেছেন। দরজা-জানালা সবই এসেছে পরিত্যক্ত ও অব্যবহার্য জিনিসপত্র রাখবার গুদামঘর থেকে। সেগুলো খালি রং করিয়ে নিতে হয়েছে। করোগেট টিন দিয়ে ঘর ছাইবার জন্য যে লোহার ফ্রেম দরকার হয়, তাও এসেছে ওইরকম পরিত্যক্ত জিনিসের এক গুদামঘর থেকে। আর করোগেটের নীচে যে সিলিং দেওয়া হচ্ছে, তার কাঠও এসেছে ব্যারাকপুর রাজভবন থেকে। তা হলে খরচ হয়েছে খালি ইঁট, চুণ, সুরকি আর করোগেট টিনের। অবশ্য যারা তৈরি করেছে, তাদের মজুরি দিতে হয়েছে, আর হ্যাঁ, দরজা-জানলার রঙও আছে। সবসুদ্ধ এখনও লক্ষ টাকাও খরচ হয়নি। এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ না করে পারছি না। আমাদের দুই রাজ্যপাল ভারতবর্ষের মধ্যে দুটি নজির স্থাপন করলেন, যা হয়তো অন্য অনেক রাজ্যের রাজ্যপালের মনোমত নয়। শ্রদ্ধেয় ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় রাজ্যপাল থাকাকালে মাত্র পাঁচ শ' টাকা করে মাইনে নিতেন। এতে অন্য অনেক রাজ্যপাল অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। হরেনদা হেসে হেসে বলতেন, ''বাড়ি ভাড়া নেই, লোকজনের মাইনে দিতে হয় না, পাঁচ শ' টাকাতেই আমার বেশ তো চলে যায়।'' আর তিনি এমন অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন যে, অনেক অফিসারের পক্ষেও তিনি অসহ্য হয়ে উঠেছিলেন। কি করা যায়, ওঁকে তো তাড়ানো সম্ভব ছিল না! সেইজন্য অনেকে ধরে-করে জওহরলালকে দিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করান যে, ওঁকে বম্বের রাজ্যপাল করা হোক। যুক্তি ছিল যে, কলকাতায় অনেক বিদেশী সম্ভ্রান্ত অতিথি আসেন, সেখানে উনি বেমানান। কিন্তু বম্বেতে [illegible]সেন, সেখানে যা হোক করে চলে যাবে। ভেতরে ভেতরে এইসব
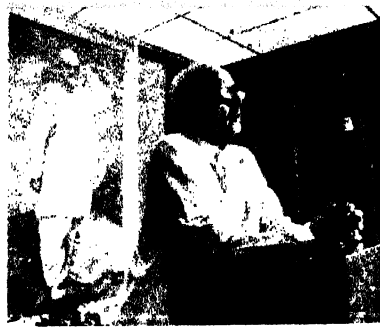
শ্রীত্রিভুবন নারায়ণ সিং

ব্যবস্থা যে হয়েছে তা ডাঃ রায় ঘুণাক্ষরেও জানতেন না। আমি যদিও ওঁর পরিবারভুক্ত ছিলুম, আমিও জানতুম না। হঠাৎ একদিন টেলিফোনে ডাক এল ; গিয়ে দেখি রাজ্যপালের জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হচ্ছে। আমি তো অবাক! জিজ্ঞেস করলুম, ''এত বাঁধাছাঁদা কিসের জন্যে?'' সহাস্যে হরেনদা উত্তর দিলেন, "দেখ, আমাকে বোম্বাই যেতে বলেছে। তা বোম্বাই-এর চেয়ে তো ডিহি-শ্রীরামপুর কাছে, আমি সেখানেই যাচ্ছি।" মধ্য কলিকাতার ডিহি শ্রীরামপুরে এক বস্তির মধ্যে ওঁর একতলা একটা বাড়ি ছিল। সেখানেই উনি থাকতেন। "কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি" যখন ছিল, তখন রাজেন্দ্রবাবু চেয়ারম্যান, হরেনদা ভাইস-চেয়ারম্যান। ঐ পদ আজকের দিনে উপরাষ্ট্রপতির পদের মর্যাদার সমান। তখনও ঐ একতলা বাড়িতেই থাকতেন। আমি সভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "আপনি তা হলে পদত্যাগ করছেন?" উনি সহাস্যে জবাব দিলেন, "আমার তো পদবৃদ্ধি হয়নি, তাই পদত্যাগ করার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এই রাজ্যপালগিরি আর বাপু পোষাচ্ছে না। আমি ত্যাগপত্র লিখে ফেলেছি। তুই দেখবি?" আমি আর ওখানে না বসে ''কয়েক মিনিটের জন্য ঘুরে আসছি'' বলে সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ রায়ের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলুম। একটু শুনেই ডাঃ রায় বললেন, ''চলো, যাচ্ছি।'' অবশ্য রাইটার্স বিল্ডিং থেকে ফোনে রাজভবনে খবর পৌঁছে গেল যে, ডাঃ রায় সেখানে যাচ্ছেন। ডাঃ রায় গিয়েই সরাসরি প্রশ্ন করলেন, "আপনি নাকি ছেড়ে দিচ্ছেন?" হরেনদা সহাস্য মুখে আমায় দেখিয়ে বললেন, "ঐ দুর্বৃত্তটা বলেছে বুঝি? আপনাকে টেনে নিয়ে এল?" ডাঃ রায়ের উত্তর, "ও কেন টেনে আনবে—আপনিই তো আসতে বাধ্য করলেন।

রাজ্যপালের নবনির্মিত কুটির

আমি জানি না, আমার মন্ত্রিসভা জানে না। কি করে আপনি ছেড়ে যাবেন, তা হয় নাকি?" হরেনদা হেসে বললেন, "দেখুন, এই কলকাতা শহরের আমি লোক, একে আমি ভালবাসি। এই কলকাতা শহরেই আমার শেষ সময় কাটাতে চাই। অত দূরে বোম্বাই, সেখানে অনর্থক কেন যাব?" অবশ্য শেষ অবধি তাঁর যাওয়া হয়নি এবং তিনি কলকাতা শহরেই এই রাজভবনে তাঁর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

আগেকার কথায় ফিরে যাই। হরেনদা যেমন পাঁচ শ' টাকা মাইনে নিয়ে নজির স্থাপন করেছিলেন, এই রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণও ঐ বিরাট রাজভবন সংলগ্ন বাগানে কুটির স্থাপন করে নজির সৃষ্টি করলেন। 'সিকিউরিটি'র জন্য খরচ বাড়ল না। আলাদা জমকালো ব্যবস্থার জন্য খরচ বাড়ল না। কারো অনুমতি নিতে হল না। নিজের তহবিল থেকেই সব হয়ে গেল। কোন ঘোষণা নেই, আড়ম্বর নেই, প্রচার নেই। নিঃশব্দে কলকাতা শহরের বুকে এত বড় একটা পরিবর্তন হয়ে গেল। এ কাজ ত্রিভুবন নারায়ণের পক্ষেই সম্ভব। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজভবনে কি হবে জানি না। কিন্তু অন্তত কলকাতার রাজভবন নিয়ে আর কিছু বলার অবকাশ রইল না। ত্রিভুবন নারায়ণ প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য ছিলেন, কেন্দ্রের মন্ত্রী ছিলেন, ভারতবর্ষের বৃহত্তম রাজ্য উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন —কিন্তু আজ অবধি তাঁর আচার-ব্যবহারে কোন পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি। রাজভবন ও রাষ্ট্রপতিভবন নিয়ে তো অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে ; কিন্তু দিল্লীর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বাসভবন নিয়ে আজ অবধি কোন কথা শোনা যায়নি। দিল্লীর মত জায়গায়, যেখানে জমির দর আকাশ-ছোঁয়া, সেখানে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের বাসভবন সংলগ্ন যেসব জমি আছে, তার মূল্য নির্ধারণ করলে দেখা যাবে যে, কয়েক কোটি টাকা। সে সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য শোনা যায় না। যে আদর্শ সামনে রেখে রাষ্ট্রপতিভবন ও রাজভবন সম্বন্ধে আলোচনা হয়, মন্ত্রীদের সম্পর্কে কি সেই আদর্শের কথা আসে না? আমি ব্যক্তিগতভাবে রাজভবন ও রাষ্ট্রপতিভবন নিয়ে যে এইসব কথা ওঠে, তার কোন মানে বুঝতে পারিনা। রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালরা তো থাকেন সীমায়িত জায়গায়। এই ভবনগুলিতে তো অন্য অনেক কাজ হয়। তবু কেন এইসব কথা ওঠে? অনেক দিন আমরা স্বাধীন হয়েছি। এখনও কি আমরা সাবালক হইনি? এখনও কি ভাবপ্রবণতা আমাদের বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখবে? আর যদি আড়ম্বর কমাতেই হয়, তা হলে মনে রাখতে হবে সেটা সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালের দৃষ্টান্ত দিলেই চলবে না, সরকারী দল এবং বিভিন্ন দলের দলপতিদেরও এই আদর্শ অনুসরণ করতে হবে। আর কেবলমাত্র বাসস্থানের উপরই আদর্শ রক্ষা নির্ভর করে না—ব্যক্তিগত আচরণ ও জীবনধারাও এই আদর্শ অনুসরণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।
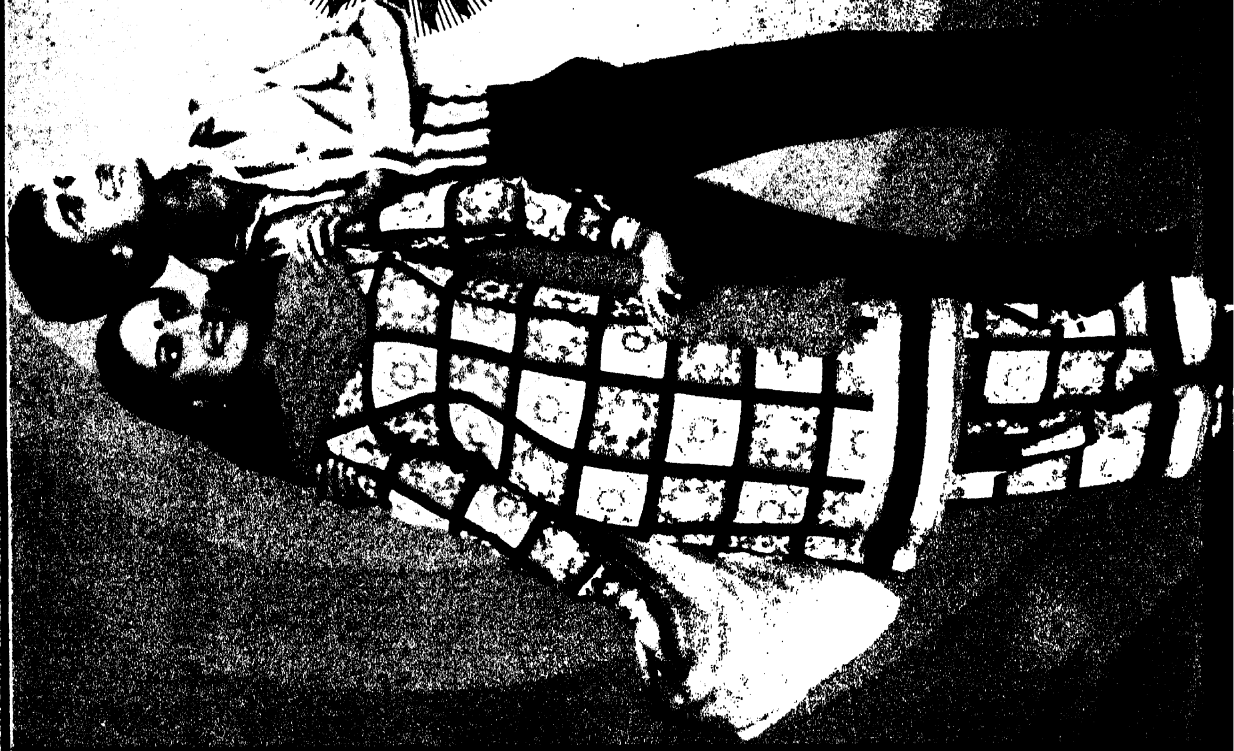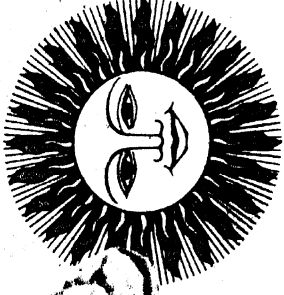
# সেই সময়

## সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৫৬ ॥

দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রর একদা-সহপাঠী কেশব ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার পর থেকেই ব্রাহ্মদের মধ্যে যেন আবার নতুন রক্ত সঞ্চারিত হলো।

কিছুদিন ধরে ব্রাহ্মদের মধ্যে নির্জীব ভাব এসে গিয়েছিল, ভিতরে ভিতরে নানা রকম মনোমালিন্য ও মতভেদ। কেউ কেউ বুদ্ধি ও জ্ঞানচর্চায় যতটা আগ্রহী ততটা ঈশ্বর বা ধর্মচর্চায় নয়। তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কিন্তু তাঁর মুখে ঈশ্বরের কথা কখনো শোনা যায় না। অক্ষয়কুমার দত্তও যেন দিন দিন সংশয়বাদী হয়ে পড়ছেন। দেবেন্দ্রনাথ মনে মনে এঁদের প্রতি বিরক্ত। রাগ করে তিনি পাহাড়ে চলে গিয়েছিলেন, ফিরে এসেও ব্রাহ্মদলের ঠিক মতন হাল ধরতে পারছিলেন না।

দেবেন্দ্রনাথ এখন প্রৌঢ়। এক কালের তরুণ বিপ্লবী এখন রক্ষণশীল। কিছু ব্রাহ্মণের চাপে পড়ে তিনি স্বীকার করেছেন যে বেদ কোনো অভ্রান্ত, পবিত্র গ্রন্থ নয়। কিন্তু ব্রাহ্মসভার বেদীতে কোনো ব্রাহ্মণের বদলে অব্রাহ্মণ বসে শাস্ত্র পাঠ করে শোনাবে, এতটা তিনি মেনে নিতে পারছেন না। পৈতা-বিসর্জন, জাতিভেদ প্রথার অবসান কিংবা বিধবা বিবাহ—এর কোনোটারই ঠিক বিরোধী না হলেও দ্রুত কোনো পরিবর্তনের পক্ষপাতী নন। তিনি ব্রাহ্ম হলেও তাঁর বাড়িতে দুর্গা পুজো হয়, তিনি বাধা দেন না, আবার পুজোর সময় নিজে উপস্থিতও থাকেন না।

কেশবচন্দ্রের মধ্যে তিনি দেখলেন নব যৌবনের এক মূর্ত প্রতীককে। এ ছেলেটি যেমন তেজস্বী তেমনই এর মধ্যে ধর্মের প্রতি উন্মাদনা রয়েছে। প্রবল পাপ বোধ আছে বলে সে পুণ্যের অভিলাষী। বেহালা বাজানোয় বেশী আসক্তি হয়ে যাচ্ছিল বলে নিজের হাতেই সেই বেহালা ভেঙে ফেলেছে কেশব।

বিখ্যাত রামকমল সেনের পৌত্র কেশবকে দেবেন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই দেখছেন। প্রায়ই সে এ বাড়িতে তাঁর ছেলেদের কাছে আসে। বৈষ্ণব বংশের সন্তানকে এক সময় কুল গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হয়, কিন্তু কেশব সেই দীক্ষা নেয়নি, পরিবারের সকলের মতের বিরুদ্ধে গিয়েই সে ব্রাহ্ম হয়েছে। এতেই বোঝা যায় তার সাহস।

কৈশোর ছাড়াবার পর থেকেই কেশব আদর্শ ও নীতিচর্চা নিয়ে মেতে আছে। তার একটা বড় গুণ, সে কোনো কাজই একা করে না, অনেককে একসঙ্গে নেয়। নেতৃত্বের সহজাত গুণ আছে তার মধ্যে, যুবকের দল বিনা দ্বিধায় তাকে নেতা হিসেবে মেনে নেয়। 'ইয়ং বেঙ্গল, দিস ইজ ফর ইউ?' নামে সে একটা ইংরেজী পুস্তিকা লিখেছে, তাতে যেন আগুন ঝরছে একেবারে।

ছেলেদের নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ একবার বোটে করে বেড়াতে গেলেন রাজমহলে, সঙ্গে আছেন রাজনারায়ণ বসু, আর এসেছে পুত্রবন্ধু কেশব। বোটের এক কোণে বসে উপনিষদ পড়েন দেবেন্দ্রনাথ, অন্য কোণে বসে কেশব পড়ে বাইবেল। আবার হঠাৎ হঠাৎ কেশব আর সত্যেন্দ্র এক সঙ্গে গান ধরে। বৈষ্ণব বাড়ির ছেলে কেশব, বাল্যকাল থেকেই গানের চর্চা আছে তার। কেশবের অনুপ্রেরণায় সত্যেন্দ্রও গান লিখতে ও গাইতে শুরু করেছে। দু জনের গান শুনে প্রাণ জুড়িয়ে যায় দেবেন্দ্রনাথের। শুধু শুষ্ক তত্ত্ব নয়, ভক্তি রসের সঞ্চার করে এই দুই যুবক।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের ব্যাপারে কেশবের খুব উৎসাহ। প্রায়ই সে বলে মাত্র এক হাজার দু হাজার লোক ব্রাহ্ম হলে কী হবে? এই নব ধর্ম ছড়িয়ে দিতে হবে সারা দেশে, এমন কি সারা পৃথিবীতে! যেমন তেমন করে হোক আমরা সকলকেই এই ধর্মে দীক্ষা দেবো! আমাদের ধর্মেতে পাগল হতে হবে। উন্মত্ত না হলে কোনো কাজ হবে না।

ব্রাহ্মধর্মের মূল কথাটাও বড় সরল করে বলে কেশব। সে বলে, আমাদের এই ব্রাহ্মধর্মের ঈশ্বর তর্কলব্ধ বা পুরাণ বর্ণিত ঈশ্বর নন। এই ঈশ্বর জীবন্ত ঈশ্বর। বিশ্ব এই ধর্মের মন্দির প্রকৃতি এর পুরোহিত। সকল অবস্থার মানুষ ঈশ্বরের নিকটবর্তী হয়ে পুজো করবার অধিকারী।

তরুণ কেশবের মুখে এসব কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে যান দেবেন্দ্রনাথ। যত শোনেন আরও শুনতে ইচ্ছে হয়। বিষয়-সম্পত্তি কিংবা পারিবারিক সুখ সম্ভোগের জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই এর, কেশব চায় তার সর্ব সময় ব্রাহ্মধর্মের জন্য দেবে, সে সারা দেশে প্রচারে বেরিয়ে পড়বে।

যেন এই রকম একজনের জন্যই এতদিন অপেক্ষা করছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। শুধু একটা বিষয়ে তাঁর খটকা লাগে। কেশব যেমন তেমন বলে কেন? সে যেমন তেমন ভাবে সকলকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দিতে চায়, তা হলে কি সে কোনো কৌশল বা চাতুর্যের আশ্রয় নেবে। কেশব জাতিতে বৈদ্য, লোকে বলে বৈদ্যরা ফিচেল হয়, কিন্তু পবিত্র ধর্মের প্রচারের মধ্যে তো ফিচলেমি থাকলে চলে না। রাজনারায়ণ বসুকে দেবেন্দ্রনাথ চুপি চুপি জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা, তুমি কি জানো, বৈদ্যজাতি ফিচেল বলে অপবাদ আছে না?

রাজনারায়ণ হাসতে হাসতে উত্তর দেন, হ্যাঁ, তা আছে!

দেবেন্দ্রনাথের এ সংশয়ও কেটে যায়। তাঁর মনে হয় কেশব ছেলেটি একেবারে খাঁটি সোনা। সে ভাবাবেগে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, পৃথিবীর সকল জাতি সমস্বরে এই গান করুক, ঈশ্বর আমাদের পিতা, সকল মানুষ ভাই-ভাই! তা শুনে দেবেন্দ্রনাথের মনে হয় ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য এই তো আদর্শ বাণী।

পরের বছর দেবেন্দ্রনাথ সদলবলে গেলেন সিংহলে। জাহাজে চড়ে কালাপানি পার। এবারও সঙ্গী হলেন কেশব এবং কালীকমল গাঙ্গুলী নামে দুই যুবক। বাড়ির লোকের ঘোর অমতে কেশব চুপি চুপি জাহাজে ওঠে এক কুঠুরির মধ্যে লুকিয়ে রইলেন। জানলা দিয়ে বাইরে কোনো বাঙ্গালীকে দেখা মাত্র চমকে চমকে ওঠেন, এই বুঝি তাঁর কোনো আত্মীয় তাকে ধরে নিতে এসেছে। সিংহল যাতায়াতের দীর্ঘ সময়ে দেবেন্দ্রনাথ তাকে আরও ভালো করে চিনলেন।

কেশব যে কতখানি উৎসাহী প্রচারক তার প্রমাণ পাওয়া গেল সিংহল থেকে ফেরার পরের বৎসর। শারীরিক অসুস্থতার জন্য কেশব বায়ু পরিবর্তনের জন্য কিছু দিনের জন্য গেল কৃষ্ণনগর। কলকাতার চেয়েও কৃষ্ণনগর প্রাচীন এবং বহু শিক্ষিত লোকের বাস সেখানে। পাদ্রীরা সেখানে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করার জন্য বড় ঘাঁটি বানিয়েছে। কেশব সেখানে সভা ডেকে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করতে গিয়ে ঝগড়া লাগিয়ে দিল পাদ্রীদের সঙ্গে। পাদ্রী ডাইসন কেশবকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করলে কেশব সিংহ গর্জনে মুখের মতন জবাব দিলেন তাঁর। বহু লোক ভিড় করে এলো কেশবকে দেখতে ও তার মুখের কথা শুনতে। একটার পর একটা সভা, স্থানীয় ছাত্র, শিক্ষকের দল, এমন কি রক্ষণশীল হিন্দুরাও এলো কেশবকে সমর্থন জানাতে। এতদিন পর একজন এসে পাদ্রীদের প্রচার অভিযান রোধ করবার জন্য নিখুঁত যুক্তিজাল দিয়ে পাদ্রীদের চুপ করিয়ে দিয়েছে। কেশব খ্রীষ্টধর্মের নিন্দা করে না, সে বাইবেল থেকেই অজস্র উক্তির উদ্ধৃতি দেয়, দেশের অবস্থা এবং সমাজের অবস্থাও আলোচনা করে সে বুঝিয়ে দেয় যে ধর্ম সমাজ-ছাড়া নয়, আবার সমাজও ধর্ম-ছাড়া নয়।

কেশবের এই বিজয়-অভিযানের বিবরণ শুনে চমৎকৃত হন দেবেন্দ্রনাথ।

ক্রমে অবস্থা এমন হলো যে কেশবকে না দেখে তিনি থাকতেই পারেন না। পুত্রসম এই যুবকটি হয়ে উঠলো তাঁর পুত্রদের চেয়েও প্রিয়তর। কেশব বাড়িতে এলে তিনি শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ান। কেশব অন্য আর পাঁচ জনের সঙ্গে বসতে গেলে তিনি তাকে জোর করে টেনে এনে বসিয়ে দেন নিজের কৌচের এক পাশে। তাঁর জন্য মিছরি বা অন্যান্য কোনো খাদ্য এলে তিনি এক চামচ কেশবের মুখে তুলে দিয়ে তারপর নিজে এক চামচ খেয়ে বলেন, একবার তুমি খাও, একবার আমি খাই! ...তোমাকে দেখলেই আমার আত্মার আরাম হয়, তুমি যে ব্রহ্মানন্দ!

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেশবের সঙ্গে আলাপচারি করে কাটান দেবেন্দ্রনাথ। কেশব বেঙ্গল ব্যাঙ্কে কেরানিগিরি করে, অফিস ছুটি হলেই সে চলে আসে। সঙ্গে আসে তার বন্ধু ও সমর্থকরা। হল ঘরে লম্বা মাদুর পেতে তার ওপরে বসে সকলে। ছেঁড়া ও ময়লা পোশাক পরা যুবক কেরানির দল ধর্ম আলোচনায় গলা ফাটায়, কখনো গেয়ে ওঠে গান। ঘন ঘন চা আসে। অধিক রাত্রি হয়ে গেলে কেউ কেউ ওঠবার জন্য ঘড়ি দেখলে দেবেন্দ্রনাথ তার হাত চেপে ধরে বলেন, রাখো তোমার ঘড়ি, ঘড়ির সময় কি ঠিক থাকে?

কেশবের প্রভাবে দেবেন্দ্রনাথের মধ্যেও কিছু কিছু পরিবর্তন হলো। কেশব তার যুবক বন্ধুদের সঙ্গে এই সংকল্প নিয়েছে যে তাদের মধ্যে যারা ব্রাহ্মণ তারা আর কেউ উপবীত ধারণ করবে না। এই কথা শুনে দেবেন্দ্রনাথ নিজের পৈতের দিকে তাকিয়ে বললেন, তা হলে আর এটা রাখা কেন? এতদিন পর তিনিও পৈতে ত্যাগ করলেন।

দেবেন্দ্রনাথ জানতেন, পিরালী সংসর্গ থাকায় তাঁদের কেউ খাঁটি ব্রাহ্মণ মনে করে না। ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনার সময় উপাচার্য হিসেবে খাঁটি ব্রাহ্মণরাই বেদীতে বসে শাস্ত্র পাঠ করে। দেবেন্দ্রনাথ উপদেশ দেবার সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলেন, সেই বেদীতে কখনো বসেন নি। কেশব একদিন তাঁকে বললো, আপনি আমাদের চক্ষে সকল ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আপনি মহর্ষি, আপনি কেন বেদীতে বসবেন না? ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা এই ধর্মের সার কি বোঝে? এই অনুরোধ

অপেক্ষা করতে পারলেন না দেবেন্দ্রনাথ, দু একদিন দ্বিধা করার পর বেদীতে বসলেন। ব্রাহ্ম সমাজের এতদিনকার এক প্রথার পরিবর্তন হলো।

এর পর একটু বেশী সাহসের কাজ করে ফেললেন দেবেন্দ্রনাথ।

কেশব নারীদের স্বাধীনতার পক্ষপাতী, তার বন্ধু সত্যেন্দ্র অল্প বয়েসেই স্ত্রী স্বাধীনতা নামে একটি বই লিখেছে। দুই বন্ধু স্ত্রীলোকদের শিক্ষা দান এবং বাড়ির ঘেরাটোপ থেকে মুক্তি দান বিষয়ে আলোচনা করে। এসব দেবেন্দ্রনাথের কানে আসে, তিনি আপত্তি করেন না। তিনি বুঝতে পারেন, যুগের পরিবর্তন হচ্ছে।

কেশব কৃষ্ণনগর থেকে ফেরার দু মাস পরে দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা সুকুমারীর বিবাহ। কেশব এবং অন্যান্য যুবকরা খুব একটা উচ্চ কণ্ঠে দাবি না তুললেও কানাকানিয় বলাবলি করতে লাগলো, ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান পুরুষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ের বিয়ে কেন হিন্দু মতে হবে। সেই নারায়ণ শিলা আর অগ্নি-সাক্ষী? ব্রাহ্মরা এই সব পৌত্তলিকতা মানে না, অথচ সামাজিক অনুষ্ঠানে এগুলো মেনে চলতে হবে?

দেবেন্দ্রনাথ রাজি হয়ে গেলেন যুবকদের কথায়। তিনি ঘোষণা করলেন, ব্রাহ্মমতেই কন্যার বিবাহ দেবেন। একেবারে সব কিছু অস্বীকার না করে একটা মাঝামাঝি ব্যবস্থা নিলেন তিনি। হিন্দু রীতি প্রায় সব কিছুই রইলো শাঁখ বাজলো, উলুধ্বনি হলো, বিয়ের আসরে সাজানো রইলো দান সজ্জা। অর্ঘ, অঙ্গুরীয়, মধুপর্ক ও বস্ত্রাদি নিয়ে বরকে বরণ করলেন দেবেন্দ্রনাথ, স্ত্রী-আচারও হলো, শুভদৃষ্টি, মালা বদল, গ্রন্থি বন্ধন সব কিছুই বাদ গেল না। শুধু রইলো না কোনো পুরোহিত আর নারায়ণ শিলা, আগুনের সামনে যজ্ঞও হলো না। তার বদলে বর ও বধূকে নিয়ে হলো ব্রহ্ম-উপাসনা আর পুরোহিতের বদলে প্রবীণ ব্রাহ্মরা দিলেন উপদেশ।

উগ্র ব্রাহ্মরা এতখানি হিন্দুয়ানী মেনে চলায় পুরো-পুরি খুশী না হলেও এটাই হলো প্রথম ব্রাহ্মমতে বিবাহ। হিন্দু সমাজের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এটি। এ কাহিনী ছড়িয়ে পড়লো নানা দিকে। ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স সম্পাদিত বিলাতি সংবাদ-পত্রে 'অল দা ইয়ার রাউন্ড'-এ এই বিবাহের বর্ণনা ছাপা হলো ফলাও ভাবে।

আর এরই ফলে বিরাট কোলাহল পড়ে গেল হিন্দু সমাজে। নতুন ভাবে দ্বন্দ্ব শুরু হলো। ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচলনের পর প্রথমে প্রবল আলোড়ন হলেও আস্তে আস্তে তা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। দেশের মানুষ ধরে নিয়েছিল যে এটা কিছু আলাভোলা বড় মানুষ আর কিছু কলেজীয় ছোকরাদের ব্যাপার। হিন্দু ধর্মের অসংখ্য শাখা আছে, ব্রাহ্মরাও না হয় আর একটা শাখা হয়ে ঝুলে থাকবে।

কিন্তু ব্রাহ্মরা বেদকে অস্বীকার করায় হিন্দুরা আবার নড়ে চড়ে ওঠে। খ্রীষ্টানদের আছে বাইবেল, মুসলমানদের কোরাণ, আর হিন্দুদের বেদ থাকবে না? এই সব দৈব গ্রন্থের কেউ ভুল ধরতে পারে? আর ব্রাহ্মরা বলে কিনা বেদ অভ্রান্ত নয়। এমন কি কেউ কেউ বলতে শুরু করেছে, বেদ একখানি কাব্যগ্রন্থ মাত্র। এমন কথা যারা বলে, তারা হিন্দু ধর্মের শত্রু।

এর পর ঠাকুরবাড়িতে শালগ্রাম শিলা বাদ দিয়ে বিবাহের কথা প্রচারিত হওয়ায় ক্রোধের ফুলকি ছড়াতে লাগলো। ঈশ্বর ও অগ্নিসাক্ষী না রেখে বিবাহ হয়? সে তো ব্যভিচার। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির উদ্দেশ্য নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো সারা দেশের ঘৃণা। শুধু উপহাস ও বিদ্রূপ নয়। ব্রাহ্মদের ওপরে যখন তখন আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিল। ব্রাহ্মরাও যুদ্ধের জন্য কোমর বাঁধলো নবোদ্যমে।

এই সময়ে ব্রাহ্মদের একজন সেনাপতি দরকার। আর কে হবে সেই সেনাপতি, কেশব ছাড়া?

শহরে দেবেন্দ্রনাথের মন টেঁকে না। সুকুমারীর বিবাহের সময় আত্মীয় পরিজনদের কাছ থেকেও অনেক লাঞ্ছনা ও কটূক্তি সইতে হয়েছে তাঁকে। দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছা শহর থেকে বেশ দূরে কোনো নিরালা জায়গায় একটা আশ্রম তৈরি করাবেন। সেই উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে, স্থান নির্বাচনের জন্য ঘুরতে ঘুরতে বর্ধমানের গুসকরায় এক আম্রকুঞ্জে তাঁবু খাটিয়ে রয়েছেন তিনি, হঠাৎ যেন এক রাত্রে প্রত্যাদেশ পেলেন। যেন স্বয়ং ঈশ্বর তাঁকে ডেকে বলছেন, কেশবচন্দ্রকে সমাজের আচার্য করো, তাতেই সমাজের কল্যাণ হবে।

কলকাতায় ফিরে গিয়েই তিনি ঘোষণা করলেন যে কেশবচন্দ্রকে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আচার্যের পদে বরণ করবেন। তাঁর বয়েস হয়েছে। সব কাজের ভার তিনি একার হাতে আর রাখতে পারেন না, তা ছাড়া এখন তিনি বেশীর ভাগ সময়েই বাইরে বাইরে থাকবেন। তিনি নামে মাত্র প্রধান আচার্য থাকলেও সব কাজের দায়িত্ব এখন থেকে নেবে কেশবচন্দ্রই।

কেশবচন্দ্রের বয়েস সবে মাত্র তেইশ বৎসর পার হয়েছে, তাকে বসিয়ে দেওয়া হবে সমস্ত প্রবীণ ব্রাহ্মদের মাথার ওপরে। এবং অব্রাহ্মণ হয়েও সে আচার্য হবে। এ কি সকলে মেনে নিতে পারে? কয়েকজন বয়স্ক শুভানুধ্যায়ী দেবেন্দ্রনাথকে আড়ালে বললেন, এখনই এতটা বাড়াবাড়ি করা কি ঠিক হচ্ছে আপনার? আর কিছুদিন অপেক্ষা করলে হয় না? ঐ মাথা গরম ছোকরাকে আপনি এতখানি সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে একেবারে সমাজের আচার্য করে দিচ্ছেন? ঐ 'বোধ হয়' আর 'চেষ্টা করিব'-কে দিয়ে কতটা কাজ হবে।

'বোধহয়' আর 'চেষ্টা করিব' নিয়ে কেশবচন্দ্রের আড়ালে অনেকেই কৌতুক করে। কেশবচন্দ্রের সত্যানুরাগ এখন এমনই স্তরে গেছে যে যাতে ভুল করেও একটা মিথ্যে বলে ফেলতে না হয়, সেই জন্য কেশবচন্দ্র সব কথার মধ্যে বোধ হয় বা চেষ্টা করিব জুড়ে দেয়। ব্যাঙ্কে অঙ্কের হিসাব মেলাবার পর সাহেবের কাছে নিয়ে গেলে সাহেব জিজ্ঞেস করেছিলেন, হিসেব মিলেছে। কেশবচন্দ্র উত্তর দিয়েছিল বোধহয় মিলেছে! সাহেব ধমক দিয়ে বললেন, হিসাব মিলেছে কিংবা মেলেনি, এর মধ্যে আবার বোধহয় কী? কেউ কেউ রসিকতা বানিয়েছে যে, কেশবচন্দ্র ভাত খেতে বসে বলে, এবার আমি ভাত খাইবার চেষ্টা করিব। খাওয়ার পর হাত ধুয়ে এসে বলে, এবার বোধহয় আমি আঁচাইয়াছি।

প্রবীণদের আপত্তিতে কান দিলেন না দেবেন্দ্রনাথ। কেশবের মতো এমন সত্যনিষ্ঠ, কর্মিষ্ঠ আর কে আছে? সবচেয়ে বড় কথা, তার অন্তরে জ্বলছে আগুন। আগামী ১লা বৈশাখে মহা ধুমধামের সঙ্গে তাকে বরণ করা হবে আচার্য পদে।

বেঙ্গল ব্যাঙ্কে কেরানির চাকরি ছেড়ে দিয়েছে কেশব। প্রায় সর্বক্ষণই সে ঠাকুরবাড়িতে থাকে। উৎসবের দু দিন আগে সত্যেন্দ্র তার বন্ধুকে বললেন, ভাই এত বড় একটা ব্যাপার হবে সেদিন। তোমার স্ত্রীকে আনবে না? তিনি দেখবেন না?

কেশব বললো, এ তো অতি উত্তম কথা। অবশ্যই বোধহয় তাঁকে আনা উচিত।

এবারে কিন্তু কেশবের পরিবারের সকলে একেবারে বেঁকে বসলেন। বাড়ির বউ যাবে ঐ ঠাকুরদের মতন ম্লেচ্ছ ও পতিতদের বাড়িতে? তা একেবারেই অসম্ভব। কেশব যদি তার স্ত্রীকে নিয়ে যায় তা হলে একেবারেই চলে যেতে হবে, এ বাড়িতে আর তার ফিরে আসা চলবে না। এমন কি সম্পত্তির অংশ থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হবে।

কেশবচন্দ্র তাতেও নিরস্ত হলো না। সম্পত্তির চিন্তা না হয় পরে করা যাবে, এখন যেমন ভাবেই হোক সে তার স্ত্রীকে নিয়ে যাবে। সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও কেশব তার স্ত্রীকে কোথাও খুঁজে পেল না। এর মধ্যেই তাকে কোথাও লুকিয়ে ফেলা হয়েছে।

সেই রাত্রেই একটা শিবিকা সঙ্গে নিয়ে কেশব চলে এলো বালীতে। এখানে তার শ্বশুরালয়। ভৃত্যদের কাছে প্রথমে সন্ধান নিল তার পত্নী জগন্মোহিনী সেখানে আছে কি না। আছেন জেনেও কেশবচন্দ্র বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলো না, এক ভৃত্যকে দিয়ে সংবাদ পাঠালো যে সে বাইরে অপেক্ষা করছে, জগন্মোহিনী ইচ্ছে হলে এসে সাক্ষাৎ করতে পারে।

জগন্মোহিনী তৎক্ষণাৎ নেমে আসতেই কেশবচন্দ্র তাকে সমস্ত ঘটনাটি প্রথমে বোঝালো। তারপর বললো, শোনো, তুমি খুব ভালো করে ভেবে দ্যাখো। তুমি যদি আমার সঙ্গে আসো, তবে তোমাকে জাত, ধর্ম, টাকা পয়সা, সোনা-গহনা সব ত্যাগ করতে হবে। তোমার পিতা-মাতা ও অন্যান্যরা যাঁদের সঙ্গে তুমি স্নেহ-ভালোবাসার বন্ধনে বদ্ধ, তাঁদের সঙ্গে নষ্ট হবে তোমার সম্পর্ক। ক্ষুধার অন্ন কখন কী জুটবে ঠিক নেই। আমাকে ছাড়া আর সব কিছুই হারাবে তুমি। এতখানি ত্যাগের বিনিময়ে শুধু আমি কি তোমার যোগ্য?

কোনো উত্তর না দিয়ে কেশবের দিকে এগিয়ে এলো জগন্মোহিনী।

ভোরবেলা সস্ত্রীক কেশব এসে পৌঁছোলো জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দেউড়ির সামনে। দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষা করছিলেন তার জন্য। কেশবকে আলিঙ্গন করার জন্য দু' হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যেতে যেতে তিনি বললেন, এসো ব্রহ্মানন্দ, আমার এ গৃহ, তোমার গৃহ। তুমি সুখে এখানে বাস করো।

(ক্রমশ)

# হিমাংশুর দিনরাত্রি

## শিশির লাহিড়ী

ঘুম ভাঙতে বেশ দেরী হল হিমাংশুর।

এমন বড় একটা হয় না। আজ হয়ে গেল। নড়েচড়ে উঠতে উঠতে হিমাংশু দেখল রোদ্দুরে ঘর ভরে গিয়েছে। গরম লাগছিল। কাল প্রায় সারা রাত ঘুমোতে পারেনি হিমাংশু। শুতে শুতেই লোডশেডিং। ঘুমটা চোখের পাতায় এসেও কেঁচে গেল। ভোরের দিকে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে ঘুম ভাঙতে যদি বেলা হয়, বলবার কিছু নেই। অথচ আজ সকাল সকাল ঘুম ভাঙার দরকার ছিল। ছোট সাহেব ভরমার কি একটা জরুরি কনফারেন্স আছে। ফারগুসন অ্যান্ড মেহেতার ফাইলটাইল সব রেডি রাখতে বলেছিল ভরমা। দাঁতে পাইপ চিবোতে চিবোতে বলেছিল, 'লুক হিয়ার মিস্টার রয়, আই ওয়ান্ট দ্যাট ফাইল রেডি। দ্যাটস্ ভেরি ইমপরট্যান্ট। প্লিস অফার নো এক্সকিউজ।' শালা মহা টেঁটি। খাস দিল্লি থেকে এসেছে। এখানকার জল-হাওয়ায় এখনও চামড়ার রঙ ধুয়ে যায়নি। তাই দিনরাত কাজ কাজ করে পাগল করে মারে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হিমাংশু চমকে উঠল। সাতটা সাত। ন'টা পাঁচের ট্রেনটা আজ আর ধরতে হচ্ছে না। ওটা ধরতে না পারলে নির্ঘাত লেট। এ সপ্তাহে ইতিমধ্যেই দুদিন লেট হয়েছে, তার সঙ্গে আর একদিন যোগ হবে। কিন্তু লেটের জন্য ভাবছে না হিমাংশু, ভাবছে কাজটার কথা। সোনালী মিস্তির আজকাল বড় একরোখা। নিজে যা বোঝে, তাই করবে। অথচ এটা বোঝা দরকার, যে সময় কারও হাতধরা নয়। এই পালিয়ে যাওয়া সময়ের পিছু পিছু ছুটে সময় ধরা, সোনার হরিণ ধরার চেয়েও কঠিন ব্যাপার।

নীতি চা এনে রাখল। 'নিজে দেরী করে উঠবে, আবার কথা। কেন, সকাল সকাল উঠতে পারনি?'

হিমাংশু গলা ভিজিয়ে নিল। 'ইচ্ছে করে উঠেছি। হয়ে গেল, কি করব। সারা রাত একফোঁটা ঘুমিয়েছি!'

'কে ঘুমিয়েছে? তুমি তো বেশ কাত ফিরে একা একা শুয়ে পড়লে। তোমার ছেলেমেয়ে দুটোকে রাতভোর যে হাওয়া করতে করতে হাতের নোড়া ছিঁড়ে গেল, সে কথা জানো?'

হিমাংশু চোখ তুলল। নীতির স্নান সারা। ভিজে চুল গিঁট দিয়ে পিঠের ওপর এলানো। এখনও চুলে চিরুনি দেবার সময় পায়নি নীতি। মুখে প্রসাধনহীন। ত্বকের লাবণ্যের প্রলেপে কোথাও একটা রাতজাগা ক্লান্তির রুক্ষতা। সে রুক্ষতাই কথাবার্তায় এখন ফুটে উঠছে নীতির।

'সব জানি।' হিমাংশু বলল, 'কিন্তু কি করব বল, আমি তো আর বিদ্যুৎ-মন্ত্রী নই যে, তোমার কোন সুরাহা হবে।'

'তবে শুধু শুধু আজেবাজে বকছ কেন? তুমি যেমন ঘুমোওনি, আর পাঁচজনও তেমন ঘুমোয়নি। তবু ভোর না হতেই তাদের উঠতে হয়। হয়েছে। ঘড়ি তো আর তাদের জন্য বসে থাকবে না।'

'আমার জন্য থাকবে?'
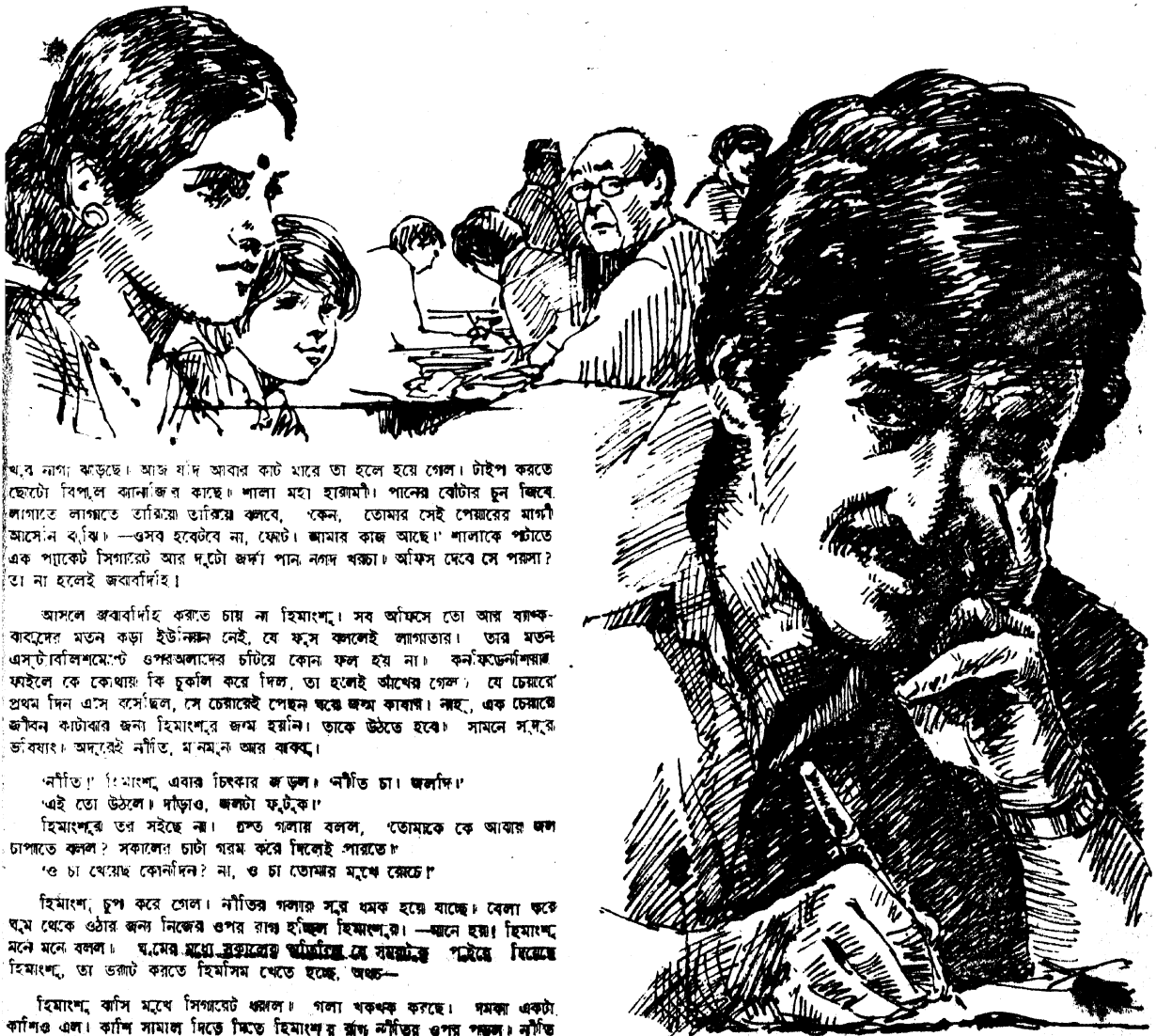
খুব নাগা ঝাড়ছে। আজ যদি আবার কাট মারে তা হলে হয়ে গেল। টাইপ করতে ছোটো বিপুল ব্যানার্জির কাছে। শালা মহা হারামী। পানের বোঁটায় চুন জিবে লাগাতে লাগাতে তারিয়ে তারিয়ে বলবে, 'কেন, তোমার সেই পেয়ারের মাগী আসেনি বুঝি। —ওসব হবেটবে না, ফোট। আমার কাজ আছে।' শালাকে পটাতে এক প্যাকেট সিগারেট আর দুটো জর্দা পান নগদ খরচা। অফিস দেবে সে পয়সা? তা না হলেই জবাবদিহি।

আসলে জবাবদিহি করতে চায় না হিমাংশু। সব অফিসে তো আর ব্যাঙ্ক-বাবুদের মতন কড়া ইউনিয়ন নেই, যে ফুস বললেই লাগাতার। তার মতন এস্টাবলিশমেন্টে ওপরঅলাদের চটিয়ে কোন ফল হয় না। কনফিডেন্শিয়াল ফাইলে কে কোথায় কি চুকলি করে দিল, তা হলেই আখের গেল। যে চেয়ারে প্রথম দিন এসে বসেছিল, সে চেয়ারেই পেছন ঘষে জন্ম কাবার। নাহ্, এক চেয়ারে জীবন কাটাবার জন্য হিমাংশুর জন্ম হয়নি। তাকে উঠতে হবে। সামনে সুদূর ভবিষ্যৎ। অদূরেই নীতি, মুনমুন আর বাবলু।

'নীতি!' হিমাংশু এবার চিৎকার জুড়ল। 'নীতি চা। জলদি।'

'এই তো উঠলে। দাঁড়াও, জলটা ফুটুক।'

হিমাংশুর তর সইছে না। ত্রস্ত গলায় বলল, 'তোমাকে কে আবার জল চাপাতে বলল? সকালের চাটা গরম করে দিলেই পারতে।'

'ও চা খেয়েছ কোনদিন? না, ও চা তোমার মুখে রোচে!'

হিমাংশু চুপ করে গেল। নীতির গলার সুর ধমক হয়ে যাচ্ছে। বেলা করে ঘুম থেকে ওঠার জন্য নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল হিমাংশুর। —মানে হয়! হিমাংশু মনে মনে বলল। ঘুমের মধ্যে সকালের অতিরিক্ত যে সময়টুকু পালিয়ে গিয়েছে হিমাংশু, তা ভরাট করতে হিমসিম খেতে হচ্ছে, অথচ—

হিমাংশু বাসি মুখে সিগারেট ধরাল। গলা খকখক করছে। দমকা একটা কাশিও এল। কাশি সামাল দিতে দিতে হিমাংশুর রাগ নীতির ওপর পড়ল। নীতি
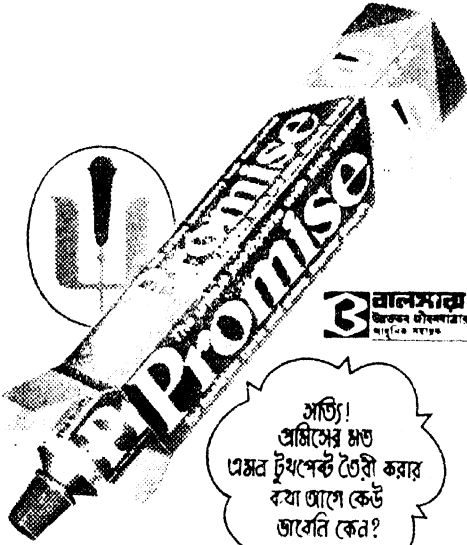
'কি জানি।' নীতি ঠোঁটের কোণ বেঁকা হাসিতে ভিজিয়ে নিল। 'তোমরা - পুরুষমানুষ, থাকলেও থাকতে পারে।'

এ কথার কোন উত্তর নেই। উত্তর শোনবার জন্য নীতিও দাঁড়িয়ে রইল না। রান্নাঘরে অনেক কাজ। ভাত ফুটছে। ছেলেমেয়েরা জলখাবারের জন্য টানাটানি করছে। এক মিনিট এদিক-ওদিক হলেই আলমারি চাল করে ফেলবে। নীতি যেতে যেতে বলল, 'বুকসেফের মাথায় টাকা রেখেছি, বাজার যেতে হবে।'

'বাজার?' হিমাংশু আকাশ থেকে পড়ল।

এক পা সামনে, মুখটা ফেরানো। নীতি ছবির মতন হয়ে দাঁড়াল। 'কথাটা নতুন শুনছ নাকি? সংসার করলে বাজার যেতে হয় জানো না?'

'কালই তো গিয়েছিলাম।'

'কাল নয় পরশু। এই গরমে দুদিনের বাসি কিছু থাকে!'

হিমাংশু উঠতে যাচ্ছিল। আবার বসে পড়ল। এখন বাজার! ঘড়িতে সাতটা সতেরো। এ সময়ে বাজারে প্রচন্ড ভিড়। কোন জিনিসই আর দেখেশুনে কেনবার জো থাকবে না। একটু যে দরদাম করবে তারও উপায় নেই। হারামজাদা ব্যাপারিগুলো ঠিক এই ভিড়ের মুখে ওজন মারবে, দামেও কোপাবে।

বাথরুম থেকে ফিরে তৈরি হতে হতে আরও কয়েক মিনিট গেল। পায়ে চটি গলিয়ে তড়িঘড়ি বের হবার সময় হিমাংশুর হঠাৎ মনে হল প্রয়োজনের সময়ে হাতের টাকার মতন সময়ও বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়।

চটিটা পায়ে দেবার সময় হিমাংশুর খটকা লেগেছিল। এখন চলতে চলতে বুঝল, ওটা বেসুর বলছে। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের স্ট্রাপটা ক'দিন ধরেই ঢিলে ঢিলে লাগছিল। এ সব আধা জোড়া জুতো, মেরামত করবার কথাও ভেবেছিল হিমাংশু। কিছুটা কুঁড়েমি, কিছুটা করছি করব, কিছুটা পাঁচ কাজে হয়ে ওঠেনি। এখন নেহাতই আলগা লাগছে। দাঁত তোলা মুখের কথার মতন কেমন যেন ফস ফস করছে। হিমাংশু অযথা ঝুঁকি নেবার চেষ্টা না করে, পা'টা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাঁটতে লাগল।

'কি হল? পায়ে আবার কি হল তোমার?'

হিমাংশু মুখ ঘোরাল। তেলের ভাঁড় হাতে নারদের মতন অবস্থা হিমাংশুর। পণ্টুদাকে মুখ তুলে দেখেনি। এখন আচমকা কথার জবাবে মুখ তুলতেই পণ্টুদার সহাস্য মুখ দেখে বলল, 'চটিটা বিদ্রোহ ঘোষণা করবার তালে আছে দাদা। একটু কব্জা করে হাঁটছি।'

'কব্জা! তুমিই তো কব্জায় পড়ে গেছ দেখছি। তোমার এখন ইন্দিরা গান্ধীর অবস্থা, শ্যাম রাখি না কুল রাখি। হতে আমার মতন, শ্রীচরণযুগল ভরসা, তাহলে কি আর নেংচে নেংচে চলতে হত?'

'পাদুকাই না হয় পরিত্যাগ করেছেন, এর পর যখন কল্যাখন্ড বিদ্রোহ করবে, তখন কি করবেন দাদা?'

'একটা জব্বর প্রশ্ন করেছ ভায়া! গৃহীরা বস্ত্র বিমোচন করতে পারে না। সন্ন্যাসীরা পারে। সে সময় হলে, না হয় সন্ন্যাসই নেওয়া যাবে।'

সময়! আবার সময়! শব্দটা কানের ওপর ঢং করে বাজল। হিমাংশু প্রায় লাফিয়ে উঠল। মুহূর্তের জন্য চটির কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল হিমাংশু। মাটিতে পা রাখতেই বিপদ। আলগা স্ট্রাপটা পুরো খুলে গিয়ে দাঁত বার করে হাসছে। ভাগ্যিস হোঁচট খায়নি। খেলে বুড়ো আঙুলের নখ কেটে রক্তারক্তি হয়ে যেত।

পণ্টুদা আঙুলে ধরা নস্যির টিপ নাকে সশব্দে টেনে নিলেন। 'নাও, হোল তো! আমাদের কি তড়িঘড়ি সাজে? আমাদের সব গদাই-লস্করি চাল; করছি করব, যাচ্ছি যাব, তা নয়,—তুমিও যেমন! নাও, ওটাকে এখন বগলে পুরে শরৎবাবু সাজো, কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে পাদুকা-পুরাণ।'

এত দুঃখেও হিমাংশু হেসে ফেলল। পণ্টুদা ওইরকমই। [illegible] হাঁস, গায়ে আঁচ লাগে না। কিন্তু হিমাংশু হিমাংশু, পণ্টুদা নয়। হিমাংশুর সময়ে টান পড়েছে। সে টান ক্রমশ গলার ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। হিমাংশু যতই চেষ্টা করুক এই পালানো সময়ের ফাঁস থেকে তার মুক্তি নেই। নিদারুণ এক উপদ্রবের মতন এই সময় আজ সকাল থেকে হিমাংশুকে বড় মলিন করে তুলেছে।

বাজার সেরে ফিরতে বেশ দেরী হল হিমাংশুর।

নীতি আড়চোখে দেখে বলল, 'বাজারে বাজরা নিয়ে বসে গিয়েছিলে নাকি! দেরী দেখে আমি আবার লোক পাঠাবার কথা ভাবছিলাম।'

মুখে অদ্ভুত একটা শব্দ করল হিমাংশু। খোঁড়ার পা খানায় পড়ে। দিন বুঝে চটিটাও আজ ছিঁড়ে গেল।

'যাক গিয়েছে! এবার নিশ্চিন্দি!' নীতি হাসল। 'অনেক দিনই ওটার যাবার সময় হয়েছিল। তুমি প্রাণে ধরে কিছুতেই ফেলতে পারছিলে না।'

হিমাংশু রেগে উঠল। আচমকা রেগে উঠল। কেন যে এই রাগ, হিমাংশু নিজেই বুঝতে পারছিল না। নীতির কথাগুলো খোঁচার মতন শোনাচ্ছে। পুরোনো কোন ক্ষতে যেন আঘাত পাচ্ছিল হিমাংশু। এই মুহূর্তে ক্ষতের স্থানটা চোখের আড়ালে থাকলেও, মনের মধ্যে একটা জ্বালা অনুভব করছিল হিমাংশু। সেই জ্বালাই শব্দের বিস্ফোরণে সহসা চিৎকারে ফেটে পড়ল। 'সব কিছুরই একটা সময় আছে, বাজে বকবক করো না। পায়ের ওপর পা নিয়ে গদিয়ান চালে বসে আছো, খুটে খেতে হলে বুঝতে পারতে!'

নীতি অবাক হল। হিমাংশু হুট্-মেজাজী নয়। আচমকা এই মেজাজের সংগত কোন কারণও নেই। তবু কারও মেজাজ সহ্য করবার মতন মেয়ে নয় নীতি। নীতি সমান গলায় বলে উঠল, 'তুমি বাজে বোকো না! পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে আছি? সারাদিন দাসীবৃত্তি করতে করতে জীবন গেল; —রাতে আবার বাবুর সেবা দাসী! বিনা খাটুনিতে খেতে দিচ্ছ তুমি?'

হিমাংশু মিইয়ে আসছিল। লজ্জা পাচ্ছিল। মিছিমিছি একটা সিন ক্রিয়েট হল। অথচ এমন হয়। মাঝে মাঝেই হচ্ছে। অফিসে তুচ্ছ একটা কারণে সেদিন কথা কাটাকাটি। দিন সাতেক নৃপেন কথাই কইল না। কদিন আগে মুন্মুনকে একটা অঙ্ক বোঝাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল হিমাংশু। বারবার একই ভুল করছে মেয়েটা। হিমাংশু বিরক্ত হাতে একটা আলগা চাঁটি লাগিয়েছে। নীতি কোথা থেকে ছুটে এসে মেয়েটাকে তুলে নিয়ে যেতে যেতে বলল, বোঝাতে না পেরে যারা শুধু শুধু মারপিট করে তারা বাবা হতে পারে, কিন্তু মাস্টার হবার যোগ্য নয়।' কথাটা বুকের মধ্যে কেটে বসেছিল। মেয়ের সামনে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল হিমাংশুর।

হিমাংশু ঘাড়ে হাত রাখল। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। আগে মাঝে মাঝে ঘাড়ে যে ব্যথাটা হত, এখন সে ব্যথা নেই। কিন্তু ভয় আছে। বছরখানেকের মধ্যে প্রেসার চেক করানো হয়নি, প্রেসারটা একবার চেক করা দরকার। কোলেস্টেরালটাও দেখা উচিত। অযথা এ রাগের কোন মানে হয় না। তাস, পাশা, দাবার মতন রাগটাও বড় সর্বনাশা।

চায়ের কাপটা ঠক করে নামিয়ে দিয়ে নীতি চলে গেল। রাগে ফরফর করছে নীতি। একটা উষ্ণতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে সর্বশরীরে। ঠিক স্নান করবার আগে, এই এককাপ চা খায় হিমাংশু। হিমাংশু চায়ে চুমুক দিয়ে গালে হাত রাখল। প্রত্যহের দাড়ি কামানো এখনও হয়নি। গাল করকর করছে। থুতনির কাছে সামান্য দু-চারটে পাকা, না কামালে সেগুলো বড় চোখে খোঁচা মারে। নীতিও রাগ করে। এক যে অভদ্রের মতন এক মুখ দাড়ি নিয়ে অফিস যাও জানি না। তোমার লজ্জা করে না, আমাদের করে।' হিমাংশু হাসতে চেষ্টা করে। বলে, 'অফিসে তো গালের কোন ব্যবহার নেই সখী, যে দাড়ি কামাতেই হবে। যার কাছে আছে তিনি যদি আপত্তি করেন, তবে অবশ্য অন্য কথা।' নীতি মুখ ফিরিয়ে যাবার সময় বলে 'ঢং!' তবু সে বলার মধ্যে কোথাও একটা প্রশ্রয়ের গদগদ ভাব থাকে।

হিমাংশু উদাস হল। আজ বড় কঠিন অবস্থা। সব সেরেসুরে তৈরী হতে কমপক্ষে আরও আধ ঘন্টা। সময় সংক্ষেপ করার দুটি মাত্র পন্থা। এক দাড়ি না কামানো, দুই না খেয়ে অফিস যাওয়া। এ দুয়ের যে কোন একটি করলেই নীতির মেজাজের আগুনে ঘিয়ের আহুতি দেওয়া হবে। সাহেবের দাঁত খিঁচুনি সহ্য হয়। বেশি খিঁচোলে তার পয়ার আছে। আজকালকার আইন-কানুন সব সময় ম্যানেজমেন্টের দিকে ঝোল টেনে কথা বলে না। কিন্তু সংসার আর শরীরের চাবিকাটি যার আঁচলে বাঁধা, তাকে চটিয়ে বেঁচে থাকাই দুঃসহ ব্যাপার। এখানে কোন আইন-কানুন নেই। হার ম্যাজেস্টি ইজ দি ফাইনাল অথরিটি।

'দূর শালা!' হিমাংশু বিরক্তির একটা ভঙ্গি করে উঠে দাঁড়াল। বাথরুমে ঢুকল। নিশ্চিন্তে এখন আধ ঘণ্টাটাক যাক। তারপর ফ্রেশ হয়ে বের হওয়া। একটু আদুরী আদুরী গলায় ডাকপাড়া, 'নীতি, ভাত বাড়ো।' গলার স্বরে খানিকটা তেল, খানিকটা বশম্বদভাব প্রকাশ পেলেই চলবে। তাতেও যদি কর্মাল না ভোলে, তবে বাড়ি ফিরে এসে সোহাগের পালিশ মাখানো। দু-চারবার ফোঁসফাঁস করবে, দু-চারবার ফণাটনাও তুলবে। কিন্তু ওই পর্যন্ত। তারপর এক সময়ে রোঁয়া-ফোলানো কাবুলি বিড়ালের মতন বুকের কাছে সরে এসে, আদর খাবে নীতি।

অফিসে ঢুকতে ঢুকতে এগারোটা।

অ্যাটেনডেন্স রেজিস্টার চলে গিয়েছে। এ আর এক ঝামেলা। ভরমা শালা মহা খচ্চর, নিজের কাছে নিয়ে গেলেই হল। কিন্তু না, হরদেও বলল, 'বড়াবাবুকা টেবুলে পর হ্যায়।' হিমাংশু সামান্য হাসি হাসি মুখে বড়বাবুর টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। একমুখ পানের মধ্যে আলতো আঙুলে ভাজা দোক্তার ময়ান মিশোতে মিশোতে বড়বাবু আড়চোখে চাইলেন। তারপর পিক করে পিচ কেটে বললেন, 'আজও দেরী! শালা দিল্লীঅলা এরই মধ্যে তোমায় দু-দবার এত্তেলা পাঠিয়েছে।'

হিমাংশুর মুখের হাসিটা ফুঁ দিয়ে নেবানো বাতির আলোর মতন ফস করে নিবে গেল। কৈফিয়তের গলায় হিমাংশু বলে উঠল, 'আর পারা যায় না। সারারাত লোড-শেডিং, ভোরের দিকে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তার ওপর আমাদের সাউথ-ইস্টার্নের লোক্যাল, গোদের ওপর বিষফোড়া। একদিনও টাইমে আসবে না।'

বড়বাবু সমব্যথী হলেন। 'হ্যাঁ, অমন হয়। কি করবে। যা দিনকাল। তুমি কাজে লেগে যাও। তবে একটা কথা বলি বুঝলে! আমারও বয়স হচ্ছে, মেঘে মেঘে বছর ছত্রিশ হল। এখন রাত জাগাজাগি বিশেষ ভাল নয়।' মুখটা অশ্লীল হাসিতে ভেঙে পড়ল বড়বাবুর। 'বউমাকে বলবে একটু সকাল সকাল খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে। সময়ের কাজ সব সময়ে। তা না হলে নিত্যি লেট, অফিসে তো ট্রাবল-শুটারের অভাব নেই।'

হিমাংশু মুখে হাসল। মনে মনে বলল, 'শালা খচ্চর।'

জল খেয়ে নিজের চেয়ারে বসতে না বসতেই নৃপেন বলল, 'আমাদের মাই-ডিয়ার বড়দা কি বলল রে?'

'জ্ঞান দিল।'

'কিসের জ্ঞান?'

'সময়ের কাজ সময়ে।'

আর কিছু পরামর্শ করেনি?

'করেছে। —সেকসোলজি।'

'বুঝেছি আমাদের মহীনের মতন ওরও টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টি আছে। একটা বউ পুড়ে মরল, আর একটা তো রাস্তা থেকে ছোকরা ধরে।'

'যাঃ!' হিমাংশু অবিশ্বাসের চোখে তাকাল। পরক্ষণেই নিজের খাতাপত্র টেনে নিল হিমাংশু। ভরমার পোলারয়েড গ্লাস ঢাকা দুচোখ গুলি গুলি হয়ে সুইং ডোর ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

নৃপেন সে দিকে না তাকিয়েই বলল, 'তুমি কি জানো বাচ্চু। এই নৃপেন শালা রাম হারামী। এ অফিসে কে কোথায় ঢুকুঢুকু করছে, কার কোথায় লটরপটর, —সব জানা আছে আমার! তোমার সোনালী মিত্তির কি কম যায় নাকি?'

সোনালী মিত্তির! নামটা শুনেই হিমাংশু প্রায় লাফিয়ে উঠল। 'এসেছে?'

'না।'

হিমাংশু বসে পড়ল। 'আমার যে একগাদা টাইপপত্র করাতে হবে।'

'তা করাতে হলে কি হবে! আজ বেস্পতিবার না, আজ যে ওর বাবু আসে। শালা রানীগঞ্জের কালোয়ার, রহিস আদমী।'

হিমাংশুর রাগ হচ্ছিল। নৃপেনের বকবকানিতে কাজে মন দিতে পারছে না। অথচ এ কাজগুলো না হলেই নয়। —আই ওয়ান্ট দোজ পেপারস রেডি, প্লিস অফার নো এক্সকিউস। —ভরমার মোটা গলার ভারী আওয়াজ যেন কানে ভেসে আসছিল হিমাংশুর। হিমাংশু চাপা অথচ গম্ভীর গলায় বলল, 'তুই থাম নৃপেন, আমার এখন বাবুটাবুর কেচ্ছা শোনবার সময় নেই। কাজটা না হলে পেছনে ম্যাক দিয়ে দেবে।'

'যাঃ! যাঃ! ম্যাক দেনেঅলা সবাই আছে। বড়জোর একটা স্ট্রিকচার আনবে। তার বেশি কি করবে রে?'

না, নৃপেনকে নিয়ে পারা যায় না। ও থামতে জানে না। অথচ হাতের সময় লাটাইয়ের সুতোর মতন ক্রমশ ফুরিয়ে যাচ্ছে। আর একটু টান লাগলেই উড়ুক বেরিয়ে যাবে, তখন আর কোন কিছু করার চারা থাকবে না। হিমাংশু ঘাড়-মাথা গোঁজ করে বসল। নৃপেনের পরোয়া না থাক, হিমাংশুর আছে। তার সংসার—বউ, ছেলে-মেয়ে, তার জীবন। একেবারে সুখের সাগরে না হোক, স্বস্তির দুধ-পুকুরে ডুব দিয়ে হিমাংশু যদি এ জীবন কাটিয়ে দিতে পারে, তবে নিজেকে ধন্য মনে করবে হিমাংশু। সে নিতান্ত মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান, মধ্যবিত্ত মানসিকতায় মানুষ। তার সুখ-দুঃখ-ভালবাসা, আচার-বিচার-কর্তব্য, শিক্ষা দীক্ষা রুচি সব কিছুই তাকে কঠিন মাপের মধ্যে বেঁধে রেখেছে। এই বন্ধন ছিঁড়ে অযথা সাহস দেখাবার কৌতূহল তার নেই। সে নিতান্ত সাধারণ, লক্ষ কোটি মানুষের একজন। তার ভীরুতা, দৈন্য, সব তুচ্ছ আভরণ নিয়েই সে বেঁচে থাকতে চায়।

টিফিনের সময় ওঠা হল না হিমাংশুর। একে দেরী করে এসেছে, তায় টিফিনের ঘণ্টাটা যদি ক্যানটিনে ফুঁকে দিয়ে আসে, তা হলে কাজটা মার খাবে। হরদেওকে পটির খাইয়ে কিছু টোস্ট আর চা আনিয়ে নিল হিমাংশু। কাজটাকে প্রায় কব্জা করে এনেছে। ফারগুসনস অ্যান্ড মেহেতায় যে এত গলদ ছিল কে জানতো। আর ঘণ্টা দুই। টাইপ করাতে পারলে ছুটির আগেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু টাইপ করবে কে?

হিমাংশু একটা সিগারেট ধরাল। অনেকক্ষণ সিগারেট খাওয়া হয়নি। বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়া দরকার। টিফিন সেরে একে একে ধীরে ধীরে সবাই এসে পৌঁছচ্ছিল। নৃপেন হিমাংশুর টেবিলে হাত রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুরলী মাসী যেতে যেতে বলল, 'তুমকো আজ বহুৎ ট্রাপড কর ছোড়া রহা, ক্যা মুশকিল কা বাত'।

আসল নাম মুরলী মনোহর যোশী। কেবল ববছাঁট মেয়েদের মতন ঘাড় অবধি লম্বা লম্বা চুল দেখে হিমাংশুরা ওকে মুরলী মাসী বলে। হিমাংশু কথা শুনে চোখ তুলে হাসল। নৃপেন বলল, 'হি ইজ অ্যান একজামপল। ওর মতন পাঁচটা ছেলে থাকলে অফিসটা সোনা মোড়া হয়ে যেত মাসী। তবু কেউ ওর কদর বুঝল না।'

মুরলী চোখ টিপল। 'বড়বাবুকে বোল। —হি উইল নো।'

হিমাংশু এতক্ষণ কারও কথার জবাব দেয়নি। এবার হাতের কাজ ফেলে তাকাল। 'নৃপেন তুই একটু ক্ষেমা দে মাইরী। ভরমা ডাকার আগে কাজটা ম্যানেজ করে ফেলি। সময়টাকে প্রায় ধরে ফেলেছি। আর ঘণ্টাটাক।'

নৃপেন আশ্চর্য হয়ে তাকাল। 'কাকে ধরে ফেলেছিস? সময়! আব্বেবাস! তুই তো মহাপুরুষরে হিমাংশু! সময়কে কি ধরা যায়? ওটা বড় পিছল মানিক। ঠিক দেখাবে, ঠিক সময়ে ওটা পিছলে বেরিয়ে গিয়েছে।'

'তা যাক। তবু একবার চেষ্টা করে দেখি।'

হিমাংশুর প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করল নৃপেন। ধরাল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে যেতে যেতে বলল, 'দেখ। চেষ্টা করে দেখ। তবে গরীবের কথা বাসি হলে ফলে।'

হিমাংশু হাতের ঘড়ি দেখল। আবার কাজে মন দিল। মিনিট পনেরো যেতে না যেতেই বিদ্যুৎ ডাক পাড়ল, 'হিমাংশুদা ফোন।'

ফোন! হিমাংশুর ভুরু কোঁচকাল। এই অসময়ে, এই শেষ দুপুরে কে ফোন করতে পারে। খুব প্রয়োজন না হলে কেউ বড় একটা ফোন করে না হিমাংশুকে। অন্তত ফোন করবার মতন এত বেশি আত্মীয়-পরিজন নেই। নীতা ইদানীংকালে

মাস দুই আগে একবার করেছিল। একদিন ছোট শালা। কিন্তু সে সব ফোন কালেভদ্রে আসে। হিমাংশু চেয়ার ছেড়ে না উঠেই বলল, 'সে, বলে দে, আমি নেই। আউট।'

'না, না মহিলার গলা শুনছি। বোধ হয় বউদি হবেন।'

নীতা! নীতার ফোন করবার মতন কি এমন জরুরী ব্যাপার হল? খুব তাগিদের কিছু না হলে আজ তো নীতা মচকাবে না। অফিস আসার সময় জলটল, টাকাপয়সা টেবিলের ওপর রেখে নীতা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। অন্যদিন দাঁড়িয়ে থাকে। রুমালটুমাল এগিয়ে দেয়। নীতার কোলে বাবুবুকে চুমু খাবার সময় নীতাকেও একটু খুচরো আদর করে নেয় হিমাংশু। নীতা এক-একবার বলে, 'দিনকে দিন কি অসভ্য হচ্ছ না, মানুষজন জ্ঞান নেই।' বাবুবু আবার মানুষ! হিমাংশু হাসে।

ফোন ধরে হিমাংশু উদ্বেগের গলায় বলল, 'হ্যালো!'

'কে অংশুদা। আমি তৃপ্তি বলছি।'

'তৃপ্তি!' হিমাংশু একটু ঠেক খেল। পরক্ষণেই সোচ্চারে বলল, 'অ্যাঁ হ্যাঁ, বল বল? কি ব্যাপার?'

'উফ্! আশ্চর্য একটা লাইন বাবা!' তৃপ্তি উত্তর দেয়। 'ঝাড়া পায়তাল্লিশ মিনিট ধরে ডায়াল করতে করতে এতক্ষণে পেলাম।'

'কলকাতায় আর কোনটা ঠিক আছে বল। ইলেকট্রিক, টেলিফোন, কনভেয়্যান্স, স্কুল-কলেজ, পরীক্ষা সবই বেঠিক।'

'তা যা বলেছ। শোন, তোমাকে আজ একবার আমাদের বাড়ি আসতে হবে।'

'আজ! আজ তো আমার সময় হবে নারে। হাতে ভীষণ কাজ।'

'ও কাজটাজ বললে চলবে না। আসতেই হবে। বাবা তোমাকে পাগলের মতন খুঁজছে।'

'কি ব্যাপার বলবি তো?'

'ব্যাপার কি ছাই আমিই জানি। বাবা তো আজ সতেরো দিন শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে আছে।'

'শয্যাশায়ী! কই খবর পাইনি তো।'

'নিলে তো পাবে।' তৃপ্তি টেলিফোনেই হাসল। 'তোমাকে সব সময় খবর দিতে হয়, নিতে জানো?'

ফোনটা কটকট করছে। 'হ্যালো! হ্যালো!' হিমাংশুর হ্যালো হ্যালো চিৎকারের মধ্যেই ফোন কেটে গেল। লাইন ডেড। হিমাংশু ফিরে তাকাল। বিদ্যুৎ বলল, 'কেটে গেল?'

'না লাইন ডেড। নো সাউন্ড, নট কিছু।'

বিদ্যুৎ চেয়ারে এলিয়ে বসল। 'যাক বাবা! বাঁচা গেল। আজকের মতন ছুটি। শালা ইনটারকম থেকে খালি একটা করে ঝাড়বে আর বলে লাইন করো। হট লাইন ছাড়া আজ সব ফাঁকা।'

হিমাংশু ফিরে এল। মানে হয়! মিছিমিছি কিছু সময় নষ্ট, অথচ খবরটাও পুরো পাওয়া গেল না। অযথা একটা উদ্বেগের মধ্যে এখন ছুটি না হওয়া পর্যন্ত কাটাতে হবে। অন্য দিন হলে চলে যেতে পারত হিমাংশু। কিন্তু আজ দিন বুঝেই ফোনটা এল। মেসোমশাই যে সতেরো দিন শয্যাশায়ী আছেন, এ কথা কেমন করে জানবে হিমাংশু। আজকাল আর তেমন যোগাযোগ নেই। মা মারা যাবার পর থেকেই কিছুটা আড়োআড়ো ছাড়োছাড়ো ভাব। একহাতে তালি বাজে না। হিমাংশু দিন কতক যাতায়াত করেছিল, কিন্তু মাসীমারা ফিরতি আসা যাওয়া করেন না। ওঁদের বয়স হয়েছে, ওঁরা না আসতে পারেন, কিন্তু তৃপ্তিটৃপ্তিও তো আসতে পারে। মেয়েলি ব্যাপারস্যাপার ঠিক বুঝতে পারে না হিমাংশু। কোথায় কি যে হল, একআধদিন এসে ওরা আসা-যাওয়া বন্ধ করল। নীতিও আর যাবার নাম করল না। অথচ খোঁচাটা হিমাংশুকেই হজম করতে হল। এখন না গেলেও নয় গেলেও বিপদ। একটা মানুষ শয্যাশায়ী এ কথা শুনে কেমন করে না গিয়ে থাকতে পারা যায়! গেলে মেসোমশাই কি যে বলবেন, তারও কি [illegible] জানে না হিমাংশু। ভাল বিপদ।

হরদেওও এসে বলল, 'বড়াবাবু বুলাতা হ্যায়।'

হিমাংশু বলল, 'যাচ্ছি যা।'

মনের তারটা কেটে [illegible] এই মুহূর্তে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাইছে না হিমাংশু [illegible], নিজেকে একটু ধাতস্থ করে নিক হিমাংশু। তারপর [illegible] এমন এক একটা খবর আসে যে, পায়ের মাটি [illegible] মেসোমশায়ের বয়স হয়েছে, কোন দিন আছেন, [illegible] বলা যায় না, ভালমন্দ যদি কিছু একটা হয়ে যায়, তাহলে [illegible] ক্ষমা [illegible] পারবে না হিমাংশু। অথচ তৃপ্তির গলায় তেমন কিছু উদ্বেগের চিহ্ন দেখল না হিমাংশু। ব্যাপারটা কেমন যেন রহস্যময়—ফোঁশ।

আরও কিছুক্ষণ পরে হিমাংশু উঠল।

খড়কে কাঠি দিয়ে দাঁতের ফাঁকে আটকানো সুপারিকুচি বার করতে করতে বড়বাবু বললেন, 'হয়েছে?'

হিমাংশু ঘাড় নাড়ল। 'টাইপ হয় নি।'

'হয়নি। তা বেশ। যাও, ভেতরে যাও।'

হিমাংশু বড়বাবুর মুখের দিকে তাকাল। একেবারে পাঁকাল মাছের মতন মুখ। মুখ দেখে মনের কথা যদি কিসসু ধরা যায়! সুইং-ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল হিমাংশু। পায়ের ওপর পা জড়িয়ে সিলভিয়া ডিকটেশন নিচ্ছে। ফর্সা। লম্বা পা,

অনেক বলে লং লেগ্স। স্কার্ট সামান্য উঠে গিয়েছে, ডান পায়ের হাঁটুর কাছে বেশ কিছু জায়গা অনাবৃত। সেখানে আধুলি সাইজের একটা গোল ক্ষতের চিহ্ন। এক ঝলক তাকিয়েই হিমাংশু চোখ ফিরিয়ে নিল। এরকম একটা গোল জড়ুলের চিহ্ন নীতির বাঁ পায়ের উরুতে আছে। জড়ুল নাকি বড় শুভলক্ষণ।

সিলভিয়া উঠে পড়ল।

ভরমা হিমাংশুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'রেডি? এভরিথিং ও কে।'

হিমাংশু আমতা আমতা করল। 'রেডি। বাট নট টাইপড স্যার।'

'আই ওয়ান্টেড ইট টু বি রেডি।'

'হোয়াট ক্যান আই ডু স্যার! মিস মিত্র ইজ অ্যাবসেণ্ট।'

'কেন গেট ইট ডান ফ্রম এনিহোয়্যার এলস। আই ওয়াণ্ট ইট নাউ।'

কথার ধরনে হিমাংশুর অহমিকা আঘাত খেল। হিমাংশু জোরের গলায় বলল, 'দ্যাটস্ নট মাই জব। প্লিস আসক বড়বাবু টু ডু ইট।'

ভরমার মুখটা লাল হয়ে আসছিল। হিমাংশু ঘর ছেড়ে বের হয়ে এল। রাগে কান মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। বড়বাবুর টেবিলে এসে বলল, 'একখানি টাইপ করিয়ে দিন,—পেটের ছেলে পড়ে যাচ্ছে।'

মুখের সুপুরিকুচি থু থু করে ফেলে দিয়ে বড়বাবু বললেন, 'রাখো তো! কাল কা যোগী।'

হিমাংশুর মুখে সামান্য বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। ওপরঅলাদের সঙ্গে ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু আজ হিমাংশু তর্কে জড়িয়ে পড়ল। ভরমা মনে মনে খচে থাকবে, কোথায় যে কি চুকলি করবে কে জানে।

বেয়ারা চা রেখে গিয়েছে।

হিমাংশু চায়ে ঠোঁট ডুবিয়ে গলা ভিজিয়ে নিল। বাপস্! আজ খাটিয়ে খাটিয়ে জান মেরে দিয়েছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিজেকে সামান্য এলিয়ে দিল চেয়ারে। নৃপেন পাশ থেকে বলে উঠল, 'কিরে, তোর সেই সময়টাকে ধরতে পারলি।'

'ধরেছিলাম। কিন্তু শেষরক্ষা হল না।'

'তাই হয় চাঁদ! তাই হয়। সময়, স্ত্রীলোক এবং জীবন এ কেউ ধরে রাখতে পারে না। যত দিন থাকে, থাকে।'

স্টেশনে নেমে হিমাংশু উৎসুক চোখে বাইরের দিকে তাকাল।

না, নিছক অন্ধকার। দোকানে দোকানে কুপি জ্বলছে। অন্নপূর্ণা বস্ত্রালয় হ্যাজাক জ্বালিয়েছে। এই অন্ধকার কি জীবনে স্থায়ী হয়ে গেল, আলোর রোশনাই কি আর জ্বলবে না? হিমাংশু ভাবল। হিমাংশু ক্রমশ ক্রমশ হতাশ হচ্ছিল।

প্ল্যাটফর্ম থেকে নামার সিঁড়িটা গড়ানে। সিঁড়ির ইট ক্ষয়ে গিয়েছে। দেখবার কেউ নেই। পাশেই ফেরিঅলার ঝোপড়ি। আর একটু হলেই হোঁচট খেত হিমাংশু। খুব সময়ে সামলে নিয়েছে। পিছন থেকে কে যেন বলল, 'রেল আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। লুঠ লো।'

হিমাংশু নেমে এল। সিগারেটের দোকানে দাঁড়াল। এক প্যাকেট সিগারেট দরকার, টুকিটাকি আরও কিছু। আটটা পঁয়তাল্লিশের গাড়িটা পেয়েছিল তাই সব রক্ষে, তা না হলে দশটার আগে ফেরা হত না। দশটায় ফিরলে কেনাকাটা কিছুই সারা হত না। এই অন্ধকারের মধ্যে কে অত রাত অবধি দোকান খুলে বসে থাকবে।

'কটায় গিয়েছে?'

'আড়াইটে।'

'এখনও এল না।'

'আসে কি না দেখুন। কেবল ফলটু। সারানো না হলে আজ সারা রাত হরিমটর।'

'সে কি! তা হলে তো মরে যাব।'

'আপনি মরে যাবেন তাতে সরকারের কি। বরং পোড়াতে গেলে ঘাট খরচ দিতে হবে।'

হিমাংশু আর কথা বাড়াল না। ক'দিন ধরেই মুনমুন একটা ফিতের কথা বলছিল। নীতা এক প্যাকেট সেফটিপিন। সেফটিপিন আবার রাত্রে পাওয়া যায় কি না কে জানে। সুঁচ বিক্রি করে না। এসব জিনিসের বিক্রিবাটার একটা বিশেষ সময় আছে। সব বিষয়েই সময়ের বাঁধাবাঁধি, অথচ নিজের ব্যাপারে আজ কিছুতেই সময়টাকে হাতের মুঠোয় আনতে পারছে না হিমাংশু। কোথা দিয়ে বারবার পিছলে পালিয়ে যাচ্ছে সময়।

অফিস যাবার সময় ভেবেছিল, আজ কাজটাজ সেরেই ফিরে চলে আসবে হিমাংশু। অন্য দিনের মতন অফিস-ক্লাবের তাসের আড্ডায় ঢুঁ মারবে না। সকাল-বেলা নীতির সঙ্গে খচরাখচর হয়ে গেল। একটু সকাল সকাল ফিরে পালিস দিয়ে ওটুকু সরল করে দেবে। মেয়েদের ইগোয় আঘাত লাগলে মেয়েরা খেপচুরিয়াস হয়ে যায়। তা যেতে পারে, বলার কিছু নেই। এ সংসারে পুরুষের তুলনায় মেয়েরা অনেক বেশি স্বার্থত্যাগ করে। সে ত্যাগ অবশ্য নিজের স্বার্থেই। স্বার্থেই হোক আর নাই হোক, পুরুষদের কাজ হাসিল করতে হলে, ওদের চটিয়ে লাভ হয় না। বরং একটু তোয়াজ দরকার। কিন্তু না, সেই তোয়াজের সময়টুকু পাওয়া গেল না। কোথা থেকে তৃপ্তি দুম করে একটা ফোন করে বসল, আর হিমাংশুকে ছুটতে হল উল্টোডাঙ্গা। বাপস্! সে কি এখানে। অফিসের এই রাশ-পিরিয়ডে বেরিয়ে যাওয়া কি চাট্টিখানি ব্যাপার!

হিমাংশু দরজায় নক করল। গলা নামিয়ে ডাকল, 'নীতি।'

ডাকটা ফুরিয়ে যাবার আগেই দুম করে আলো জ্বলে উঠল। চতুর্দিক থেকে একটা একটা উচ্ছ্বাসের গুঞ্জন,—'আলো এসেছে! আলো এসেছে!' মুনমুন যেন হাততালি দিয়ে নেচে উঠল। নীতির আলস্যের হাই তোলা গলার শব্দের সঙ্গে ডোর-বোল্ট খোলার ধাতব আওয়াজ মিলেমিশে একাকার।

হিমাংশু ভেতরে ঢুকল। নীতির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভালো বিপদ! কি ভাগ্যি এল। তা না হলে আজও অন্ধকারে পচে মরতে হত।'

নীতি ঠিক উত্তর দিল না। কথাটায় সায় দেওয়া গোছের গলার মধ্যে একটা শব্দ করল। তারপর মুনমুনের দিকে ফিরে বলল, 'মুনি, যাও এবার পাখা খুলে শুয়ে পড়। রাত হল।'

হিমাংশু এল। আলোও এল। ঠিক এই মুহূর্তে ঘুমোতে যাবার ইচ্ছে মুনমুনের নেই। মুনমুন আদুরি আদুরি গলায় বলল, 'আর একটুখানি মা। একটু পরে শুয়ে পড়ব।'

নীতি চোখ পাকিয়ে বলল, 'না। যাও, শুয়ে পড়। ভোরবেলা স্কুল যেতে হবে জানো না!'

হিমাংশু একবার নীতির দিকে তাকাল। একবার মুনমুনের দিকে। এখন প্রশ্রয়ের চোখে তাকালে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। হিমাংশু লাল ফিতের গুলিটা পকেট থেকে বার করে মুনমুনের হাতে দিয়ে বলল, 'নাও, তোমার ফিতেটা নিয়ে শুয়ে পড়। কাল স্কুলে পরে যাবে। আমার মা-মণি! দ্যাটস্ এ গুড গার্ল।'

বড় অল্পে খুশি মুনমুন। লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

'চা খাবে?'

প্রশ্নের মতন ভাসা ভাসা উত্তর দিল হিমাংশু, 'খেলে হয়।'

গলায় সামান্য জোরের সঙ্গে নীতি বলল, 'খাবে কি না বল।'

'খাবো।'

নীতি রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। হিমাংশু পোশাকটোশাক ছাড়তে ছাড়তে বুঝল, নীতির মেজাজ এখনও নরম হয়নি। বরং লোডশেডিং-এর তপ্ত কটাহে পুড়ে আরও গরম হয়েছে। এই গরমের মোকাবিলা গরম দেখিয়ে করা যায়। কিন্তু সেটা অশান্তির পন্থা। সারা দিন তেতেপুড়ে এসে এই রাত্তিরে আর চেঁচামেচি ভাল লাগছে না। তা ছাড়া, আজকের ঘটনায় হিমাংশুই সবতোভাবে দোষী। খাওয়ার খোঁটা ভয়ানক খোঁটা,—এমন খোঁটা দিলে যে কোন মানুষই দেশান্তরী হতে পারে।

পোশাক বদলে সহজ হল হিমাংশু। শুকনো তোয়ালে দিয়ে গা-পিঠ রগড়াল। পিঠ চুলকোচ্ছে। আজ মোষের শিং-এর হাতটাই ভরসা। নীতি নিজের থেকে এগিয়ে এসে পিঠ খুঁটে দেবে না নিশ্চয়ই।

হিমাংশু পাখার তলায় বসল। যাক, মন্দের ভাল, আলো-পাখা আছে। এই হাওয়ায় খানিক সুস্থির হয়ে বসলেই, সমস্যার মোকাবিলা করবার মতন বুদ্ধি নিশ্চয়ই মাথায় এসে যাবে। আর কিছু না হোক নিজের বুদ্ধির ওপর ভরসা রাখে হিমাংশু।

নীতি চা নামিয়ে রাখল।

হিমাংশু বলল, 'ও বাড়ির পাখি খবর দেয়নি, আমি টেলিফোন করেছিলাম।'

নীতি কাটা কাটা জবাব দিল। 'দিয়েছে।'

নীতি চেয়ারে গিয়ে বসল। রেডিওর চাবি ঘোরাল। চায়ে চুমুক দিয়ে হিমাংশু বলল, 'শুধু শুধু ছুটিয়ে মারল। মেসোমশায়ের এমন কিছু হয়নি।'

প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ করতে চাইছে হিমাংশু, নীতি সেরকমভাবে সাড়া দেয় কিনা। নীতি উৎকর্ণ হল ঠিকই, চোখের কোলে একটু ভাঁজও পড়ল যেন। কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। নীতি কথা কইল না।

'তৃপ্তি ফোন করে বলল, বাবা সতেরো দিন শয্যাশায়ী, তোমাকে আজই একবার আসতে হবে। এরকম খবর পেলে কি করা যায়। গিয়ে দেখি, বাতের ব্যথা! শুধু শুধু দৌড়ঝাঁপ করিয়ে মারা।'

'যাক, তবু বাতের দৌলতে মেসোমশায়ের বাড়ি যাওয়া হল। তা না হলে তো হয়ে ওঠে না।'

কথার মারপ্যাঁচটা ঠিক ধরতে পারল না হিমাংশু। একটু বেঁকানো ভাব আছে, একেবারে সরল নয় বলার ঢং। তবু ওরই মধ্যে হিমাংশু যেন নিজের স্বীকৃতি খুঁজে পেল। হিমাংশু বলল, 'তুমি যাই বল, মা মারা যাবার পর ওঁরা যে ব্যবহার করেছেন, তাতে আর ওখানে যাওয়া যায় না। তবু যেতে হল।'

'যাবে বইকি! তোমার মেসোমশাই, তুমি তো আর ফেলে দিতে পার না। আমি পরের বাড়ির মেয়ে নষ্ট দুষ্টু, আমার কথায় নিজের আত্মীয়স্বজন ছাড়বে না কি!'

এতক্ষণে সকালের সেই প্রসঙ্গ মনে পড়ল হিমাংশুর। সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষতের আঘাতটা। 'প্রাণে ধরে তুমি কিছু ফেলতে পার না', শুনেই হিমাংশু চটে উঠেছিল। আশ্চর্য! মেয়েরা কিছুই ভোলে না। কবে, কোন সময়, কখন, কি হয়েছে সব যেন মেয়েদের স্মৃতিতে স্তরে স্তরে সাজানো থাকে। সময় সেখানে স্তব্ধ, মূক হয়ে যায়।

খাওয়া-দাওয়া সেরেসুরে পান-সিগারেট খেতে খেতে সাড়ে দশটা বাজল। রাত

এমন কিছু গভীর নয়, আবার গভীরও। পাখার হাওয়া পেয়ে ছেলেমেয়ে দুটো প্রাণখুলে ঘুমোচ্ছে। এই গরমে মশা নেই বললেই চলে। মশারি না ফেললেও চলে। তবু ছোটদের মশারি টাঙানো আছে। বড় খাট উদোম। নীতি হাতের কাজ-টাজ সেরে এসে ফেলবে। একেবারে না ফেলতে ভরসা হয় না। মাঝরাতে লোড-শেডিং হলে দু-চারটে যা আছে তাই ছেঁকে ধরবে। তখন ঘুমের দফা গয়া।

কাজ সারতে এখনও বেশ দেরী নীতির। গাটা ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে আসতে আসতে আরও মিনিট কুড়ি। সকালের চান হুটোপাটি করে সারা, তখন স্কুল-অফিসের তাড়া থাকে। রাতের এই গা ধোওয়া অনেকটা যেন আরাম-বিলাসের। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াবে নীতি, মুখের কারুকার্য করবে। স্নো-ক্রীম-সচন্দন গন্ধদ্রব্য কি সব মাখবে। অন্তর্বাসহীন পাতলা চিকণ শাড়ি, টাইট ব্রেসিয়ার পরা নীতির হাত-পা-মুখ তখন সচল ছবির মতন চমৎকার। হিমাংশু অপলকে দেখে। নৈবেদ্যর ভোগ নিজেকে নিজেই সাজায় এ এক আশ্চর্য অনুভূতি। প্রিয় কামনার পরম পরিতোষ তখন হিমাংশুকে ক্রমশ যেন আচ্ছন্ন করতে থাকে।

দুটো বালিশ জোড়া দিয়ে হিমাংশু শুল। ঘরে ফলসা রঙের মৃদু একটা আলো। ফুর ফুর করে হাওয়া লাগছে। সারা শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। হিমাংশু চোখ বুজল। চোখ বুজতেই কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব হিমাংশুকে জড়িয়ে ধরছে। হিমাংশু তাকাতে চেষ্টা করল, তাকাতে পারছে না। অথচ কি আশ্চয, হিমাংশু দেখতে পাচ্ছে। এ যেন আয়নায় প্রতিবিম্ব দেখা। হিমাংশু হিমাংশুর মুখ দেখছে। দুটি মুখ এক, ভাব বিভিন্ন। একমুখে উজ্জ্বলতা, চোখে কৌতুক, ঠোঁটে হাসি। অন্য মুখে বিস্ময়, দৃষ্টিতে অবিশ্বাস, ওষ্ঠে জিজ্ঞাসা।

'কি রে! তুই আজকাল খুব মাতব্বর হয়েছিস শুনছি!'

'কই? না তো! কিসের মাতব্বর?'

'তুমি আজকাল সময়কে ধরতে চাইছ চাঁদু! ভাবছ সময় তোমার বাপের চাকর।'

'যাঃ! তাই কখনও হয়। সময়কে কি ধরা যায়?'

'তবে সকালবেলা নীতির সঙ্গে ঝগড়া করলি কেন? অফিসে গিয়ে রাগ দেখালি। ভাবলি তুই শালা মহাকালের নায়ক, তোর ইচ্ছে অনিচ্ছেয় চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা ঘুরবে।'

'না, মাইরি! আমি এসব কিস্সু ভাবিনি। হয়ে গেল। ওই শালা ঘুম ভাঙতে দেরী হল,—আর মেজাজটা খচে গেল। তারপর কি হল, আমি নিজেই জানি না।'

'জানি না বললে চলবে কেন? জানতে শেখ। নিজের ওজন না বুঝে ব্যাপার করিস, লজ্জায় মুখ দেখাতে পারিস না।'

হিমাংশুর চটকাটা ভেঙে আসছে। মুখের সামনে একটা হাত দেখতে পাচ্ছে হিমাংশু। সে হাতের চুড়ির টুংটাং মৃদু জলতরঙ্গের শব্দ হচ্ছে যেন।

'এ বালিশটাও টেনে নিয়ে শুয়েছে। লোক দেখ।'

হিমাংশু চোখ খুলল। মাথা তুলল। নীতি বালিশ নিয়ে সরে গেল। মশারি আজ ফেলা নেই। শাড়ির আঁচল মুখের ওপর ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়ল নীতি।

কিছুক্ষণ সময় যেতে দিল হিমাংশু। তারপর ধীরে ধীরে কাছে সরে এসে নীতির গায়ে হাত রাখল। নীতি প্রথমে কিছু বলল না, মৃতের মতন শুয়ে রইল। অল্পক্ষণ পরে হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলল, 'হাত নামাও। গরম লাগছে।'

হিমাংশু কথা বলল না। আবার গায়ে হাত রাখল নীতির।

নীতি চাপা গলায় বলল, 'বিরক্ত কোর না। ঘুম পাচ্ছে।'

হিমাংশু পা তুলে পায়ের ওপর রাখল। বুড়ো আঙুল দিয়ে পায়ের পাতা ঘষল। নীতি ঝটকা মেরে পা সরিয়ে নিল। 'এরকম করলে আমি উঠে যাব বলছি।'

গলার স্বরে চাপা অভিমান। কিছু আক্রোশও। হিমাংশু শুনল বুঝল। তবু হাতের বাঁধন শক্ত করে নীতিকে কাছে জড়িয়ে আনতে চাইছিল হিমাংশু।

'কেন, এখন বুঝি সেবাদাসী চাই? ঘুম আসছে না!'

শব্দগুলো কুরে কুরে কানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল নীতি। নিজেকে এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে মেঝের ওপর বালিশ পাতল। মাটিতে শুতে শুতে বলল, 'আমি ভাড়া করা মেয়েমানুষ নই! আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছে সুখ দুঃখ বলে একটা জিনিস আছে।'

হিমাংশু চুপ করে শুয়ে রইল। কথা বাড়াল না। গালের ওপর প্রচণ্ড একটা চড়ের মতন নীতির কথাগুলো কেটে কেটে বসছে। ঘড়ির টিক-টিক-টিক শব্দ শোনা যাচ্ছে। মৃদুমন্দ বাবুবুর নিশ্বাস। হিমাংশু নিস্পন্দ চোখে তাকিয়ে রইল। সময় ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাচ্ছে, রাত গভীর থেকে গভীরতর। সেই ছেলেবেলায় পড়া পড়ানো এক কবিতার চরণ হিমাংশুর স্মৃতিতে হঠাৎ ভেসে উঠল। —'সময় বহিয়া যায়, নদীর স্রোতের প্রায়। যে জন না বুঝে তারে, ধিক তারে ধিক!' হিমাংশু হাসি চাপতে পারল না। আচমকা হেসে উঠল।

নীতি অবাক চোখে তাকাল। আবার ঘুরে শুল।

সকালে যে ঘুম ভাঙাতে দেরী হয়েছিল হিমাংশুর, এখন সেই ঘুম চোখের পাতা থেকে উধাও। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব কিছু দুঃখ থাকে। হিমাংশু সেই দুঃখী মানুষের মতন ঘুমহারা চোখে একা একা জেগে রইল।

ছবি : সুধীর মৈত্র

## বিনয় ঘোষ

বিনয় ঘোষ ছিলেন ষোল আনাই কলকাতার মানুষ। কলকাতাতেই তাঁর জন্ম। কলকাতাতেই তাঁর শিক্ষাদীক্ষা। কলকাতাই ছিল তাঁর কর্মকেন্দ্র। আবার কলকাতাকেই তিনি করে নিয়েছিলেন তাঁর গবেষণা ও অনুশীলনের বিষয়বস্তু। তাঁর মত একজন কলকাতা-কেন্দ্রিক মানুষকে হারিয়ে, কলকাতা আজ নিজেকে খুব নিঃস্ব বোধ করছে।

কলকাতাকে বিনয় ঘোষ মনে-প্রাণে ভালবাসতেন। কলকাতাতেই সারা জীবন কাটিয়েছেন। এটাই ছিল তাঁর জ্ঞানতপস্যার পীঠস্থান। মধ্যে কলকাতার বাইরে গিয়েছিলেন এক দুঃসাহসিক অভিযানে। সেটা করেছিলেন কলকাতাকে ভালভাবে বুঝবার জন্য। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, কলকাতা পশ্চিম বাঙলার নব-সংস্কৃতির লীলাকেন্দ্র হলেও, এর বিকাশ পরিষ্কারভাবে বুঝবার জন্য পরিচিত হতে হবে বাংলার বিশাল গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে। সেজন্য অসাধারণ ধৈর্য, অধ্যবসায় ও দুর্বিষহ ক্লেশ স্বীকার করে তিনি পরিভ্রমণ করেছিলেন পশ্চিম বাঙলার প্রতি জেলার প্রতি গ্রামে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করেছিলেন প্রতি গ্রামের আনন্দ-উৎসব, আচার-ব্যবহার, দেবদেবী ও মন্দির, ও সংগ্রহ করেছিলেন তাদের কুলজী-সংরক্ষিত ঐতিহ্যের কাহিনী। কানে শুনেছিলেন সুপ্ত বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনকান্ডের অনুরণন। তারই প্রতিধ্বনি অবরুদ্ধ করেছিলেন তাঁর "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি" গ্রন্থে। এটা একটি ভ্রমণ-কাহিনী নয়। ভ্রমণ-কাহিনী তো তার আগে লেখা হয়েছিল, পরেও লেখা হয়েছে। কিন্তু একটা জাতের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রাণের স্পন্দন ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের ভিতর দিয়ে তার ছন্দোময় গতি যেরূপে প্রসারিত হয়েছিল, তাই তিনি যেভাবে আবদ্ধ করেছিলেন তাঁর গ্রন্থে, সেরূপটি আর কেউই করেননি। প্রাচীন ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের ছাত্র হিসাবে সাংস্কৃতিক জীবনের ধারা প্রধারা বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করবার তাঁর অসাধারণ ধীশক্তি ছিল। সেজন্যই তিনি পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির অত সুন্দর ভাষ্য দিতে পেরেছিলেন।

ইংরেজীতে একটা বচন আছে—Writers are born and not made—বিনয় ঘোষও লেখকের সত্তা নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইচ্ছে করলে হতে পারতেন একজন বিখ্যাত অধ্যাপক। তা কিন্তু তিনি হননি। সাহিত্য-সাধনাতেই নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। যে বছর এম এ পাশ করেন, সে বছরেই বেরিয়েছিল তাঁর "শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ"। তাঁর পরের বছর লেখেন "নতুন সাহিত্য ও সমালোচনা"।

পরে তিনি হয়েছিলেন কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাসকার। কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাস রচনাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও সাধনা। এ সম্বন্ধে পড়াশোনা করেছিলেন হাজার হাজার গ্রন্থ, পত্রিকা ও অন্যান্য বৃত্তান্ত। কলকাতার লোকসমাজকে তিনি একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি নিজেই বলে গিয়েছেন—"যে কলকাতা শহরে আমি জন্মেছি, যে কলকাতা-সমাজে আমি মানুষ হয়েছি এবং যে কলকাতা-কালচারের আমি একজন নিম্নমধ্যবিত্ত উত্তরাধিকারী, তাকেই আমি বুঝবার চেষ্টা করেছি।" কলকাতা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন একজন বিরাট পন্ডিত। কিন্তু একেবারে নিরভিমানী পন্ডিত। নিজের ভুল সব সময়েই মেনে নিতেন। এটা তখন লক্ষ করেছি যখন তিনি এবং আমি পুরানো কলকাতা সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি কলকাতার টেলিভিশনে।

অখাত বিদ্যার জ্ঞাততে রচনা করে গেছেন ৪৩ খানা মৌলিক ও আকর গ্রন্থ। কলকাতা সম্বন্ধে তাঁর রচিত যতগুলো বই আমার পড়া আছে, তার মধ্যে আছে—"কলকাতা কালচার", "জনসভার সাহিত্য", "বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ", "বাংলার নবজাগৃতি", "কলকাতার ক্রমবিকাশ", "কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত", "মেট্রোপলিটান মন বিদ্রোহ" "বিদ্রোহী ডিরোজিও", "নববাবু চরিত্র", "বাঙলার বিদ্বৎসমাজ", "সাময়িকপত্রে বাঙলার সমাজচিত্র" ইত্যাদি। এছাড়াও তিনি লিখেছিলেন, "কালপেঁচার বঙ্গদর্শন", "বাঙলার লৌকিক সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব" ও "বাদশাহী আমল"। তাঁর ইংরেজী রচনা ও সংকলনের মধ্যে আছে—বিদ্যাসাগরের জীবনী, Statesman Anthology ও আটখন্ডে পরিকল্পিত Selections from English Periodicals of 19th Century Bengal। এগুলি রচনা ও সংকলনের জন্য পরিশ্রম করেছিলেন অমানুষিক। সেই অমানুষিক পরিশ্রমের প্রকোপেই অকালে তাঁর বিলপ্তি ঘটল। জীবনে অনেক কিছু করবার তাঁর ইচ্ছা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাঁর জ্ঞানের পরিধি এত বিস্তৃত ছিল যে, কোন বই লিখেই তিনি সন্তুষ্ট হতেন না। চাইতেন তার চেয়ে বড় ও

বিস্তৃত আরও কিছু লিখতে। "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি" প্রথমে একখন্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে তিনি ওটা চারখন্ডে প্রকাশ করেছিলেন। সাতশ' পাতার বই "কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত" তিনি প্রথম বের করেছিলেন একখন্ডে। পরে এটাকে দু খন্ডে বের করেছিলেন। তিনি আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু সব সময়ই সচেতন ছিলেন জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে। তিনি একবার লিখেছিলেন—"ইচ্ছা আছে যদি ভবিষ্যতে (জানি না 'ভবিষ্যৎ' বলে কিছু আছে কিনা) সুযোগ পাই তা হলে আর একটি পৃথক গ্রন্থে কলকাতা শহর সম্বন্ধে আরও অনেক নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।" কিন্তু তাঁর সে-সাধ সে-আশা পূরণ হল না।

কলকাতা বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের প্রসিদ্ধি কেবল মাত্র এদেশের লোকের কাছেই জ্ঞাত ছিল না, বিদেশের মানুষও তা জানতেন। এ বিষয়ে বৈদেশিক মহলে তিনি সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। বিদেশে যাবার জন্য ভূরি ভূরি আমন্ত্রণ পেয়েছেন, কিন্তু সবই সৌজন্যের সঙ্গে প্রত্যাখান করেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য তাঁর নিজের কথাতেই বলি—"মধ্যে মধ্যে বিদেশী প্রকাশকদের কাছ থেকে ইংরেজী ভাষায় কলকাতার ইতিহাস লেখবার প্রস্তাব এসেছে, কিন্তু নিশ্চিন্তে কাজ করার সুযোগ না থাকায় এ রকম প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারিনি। বিদেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ এসেছে, সেখানে গিয়ে, ইচ্ছা হলে সপরিবারে নিশ্চিন্তে যতদিন খুশি থেকে, এই ধরনের কাজ করার জন্য। কিন্তু নিজের দেশে থেকে কাজ করার কর্তব্য এড়িয়ে বিদেশে গিয়ে নিশ্চিন্তে কাজ করতে মন সায় দেয়নি।" এই উক্তি থেকেই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

তরুণ বয়সে বিনয় ঘোষ রাজনীতি নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। তখন বামপন্থী মতবাদ তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর কাছে, তাঁর তরুণ বয়সের যুগটা ছিল 'এক আশ্চর্য যুগ'। তাঁর কথাতেই বলি—'বিপ্লব সমাজতন্ত্র সাম্যবাদ এসব তখন হাতের মুঠোয় এবং মুঠোগুলো স্বভাবতই নবীন তরুণদের।' নবীন তরুণরা তখন বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল কডওয়েল, অডেন, ইশারউড, স্ট্রাচী, পামে দত্ত ও মার্কসবাদের আরও নানারকম বিচিত্র চিন্তাধারার ভাষ্যকারদের দ্বারা। তাঁদের মতবাদ দ্বারা বিনয় ঘোষও প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। এ মতবাদ ছিল শহরকেন্দ্রিক বামপন্থী মতবাদ। সেজন্য তিনি তাঁর 'বাংলার নবজাগৃতি' গ্রন্থে লিখেছিলেন—"বাংলার নবজাগৃতি আন্দোলনের পুরোধা হিন্দুপ্রধান উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণী, নবশিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবিশ্রেণী।" নবজাগৃতির এই ভাষ্যকে লক্ষ্য করেই তিনি পরবর্তীকালে বলেছিলেন—"সুদূর বাংলা দেশের কলকাতা শহরে আমাদের মতো যুবকদের মনে যে রামধনুরঙের স্বপ্নের সৃষ্টি করেছিল, তা আজ রূপকথার মতো শোনায়।" পরবর্তীকালে রাজনীতি থেকে দূরে সরে গিয়ে ওই নবজাগৃতির মধ্যে যে অভাবটা ছিল, তা উপলব্ধি করেছিলেন। তখন তিনি বললেন—"আজ থেকে তিরিশ বছর আগে (তখন আমার নিজের বয়সও তিরিশ) 'বাংলার নবজাগৃতি' লেখা আরম্ভ করেছিলাম। অনেক বড় পরিকল্পনা ছিল, তিন খন্ডে ওই নবজাগৃতির ইতিহাস রচনা করব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা করা হয়নি। তারপর আরও তিরিশ বছর কাটল, ইতিহাস চর্চার আশিগঙ্গা দিয়ে, অনেক ঘোলা জল বয়ে গেল। অনেক প্রশ্ন জাগল মনে, অনেক প্রশ্ন। শহর থেকে গ্রামের দিকে তাকাবার ইচ্ছা হল প্রবল। অদম্য ইচ্ছা। শহরে জন্ম, শহরে মানুষ হলেও গ্রামের পথে পা বাড়িয়ে চলতে আরম্ভ করে ক্লান্তি বোধ করিনি কখনও, আজও করি না; বয়স হলেও বাংলার গ্রামের মানুষ, গ্রামের সমাজ, গ্রামের জীবনযাত্রা, গ্রামের সংস্কৃতি স্বচক্ষে দেখতে দেখতে বারংবার মনে হতে লাগল, পন্ডিতেরা উনিশ শতকে বাংলার যে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের কথা বলেন সেটা কি পদার্থ? কোথায় এবং কখন 'জাগরণ' হল? জাগল কারা? কলকাতা শহর যদি নবজাগৃতির কেন্দ্র হয়, যদি রেনেসাঁসের সূর্য জ্যোতির কনক পদ্মের মতো কলকাতার আকাশে উদিত হয়ে থাকে, তাহলে কলকাতার খুব কাছাকাছি গ্রামেও দেড়শো বছর পরে, কেন অমাবস্যার রাতের মতো অন্ধকার? কেন অতীতের ছেঁড়াকাঁথায় শুয়ে গ্রামের মানুষ আজও গভীর ঘুমে অচৈতন্য? কেন পৌরাণিক যুগের স্বপ্নের ঘোরে আজও তাদের স্বপ্নচারিতা?" Urban leftism-এর এই অবাস্তবতাই গভীরভাবে আঘাত করেছিল বিনয় ঘোষ মশায়কে। তাঁর কাছে শহরভিত্তিক বামপন্থী একটা tragedy ছাড়া আর কিছু ছিল না।

তাঁর মৃত্যুতে, বাঙলার বিদ্বৎসমাজ একজন প্রকৃত ও নিষ্ঠাবান 'স্কলার'কে হারালেন। আমার কাছে তাঁর মৃত্যু বিশেষভাবে পীড়াদায়ক এই কারণে যে মাত্র দু মাস পূর্বে (২৬ মে ১৯৮০), তিনি আমাকে যে শেষ চিঠি লিখেছেন, তার শেষ লাইন ছিল—"আপনার সুস্বাস্থ্য প্রার্থনা করি।" অপরের সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন, কিন্তু নিজের স্বাস্থ্যকে বরাবর অবহেলাই করেছেন। আমার চেয়ে ১৪ বছরের ছোট হলেও, তিনি আগেই চলে গেলেন।

অতুল সুর

# অরণ্যদেব

পারিবারিক ইতিহাসে তিনি লিখেছেন, 'ডাইনির কথা শুনে আমার খুব মজা লেগেছিল ...

'কিন্তু পৌঁছে দেখি, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ডাইনির দলবলের সত্যিই লড়াই চলেছে।'

ক্রমশ

# আধুনিককালের ১৮টি অলিম্পিকের কথা

আধুনিককালের অলিম্পিকের বাইশতম অনুষ্ঠান হয়ে গেল মস্কোয়। চার বছর অন্তর এক একটি অলিম্পিকের হিসাবে মস্কোয় বাইশতম অনুষ্ঠানই হয়। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য একবার এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য দুইবার অলিম্পিক খেলাধুলা হয়নি। সুতরাং, আগে গেমস হয়েছে ১৮টি। কোন্ দেশে, কখন গেমস হয়েছে, ক'টি দেশ, কত প্রতিযোগী অংশ নিয়েছে, কে কোন্ অলিম্পিকে নায়ক হয়ে উঠেছে চুম্বকে তারই বিবরণ দেওয়া হল।

**১৮৯৬—এথেন্স :** (৬—১৫ এপ্রিল) আধুনিককালের প্রথম অলিম্পিকে যোগ দেন ১৩টি দেশের ৩১১ জন পুরুষ প্রতিযোগী। প্রথমবার মেয়ে প্রতিযোগী অংশ নেননি। ক্রীড়া বিষয় ছিল ৮টি। যথা—অ্যাথলেটিকস, কুস্তি, সাঁতার, টেনিস, শ্যুটিং জিমন্যাস্টিকস, ফেন্সিং ও সাইক্লিং। হপ স্টেপ ও জাম্প জিতে অলিম্পিকের প্রথম চ্যাম্পিয়ন হন আমেরিকার জেমস কনোলী। মোট ১১টি ইভেন্ট জিতে আমেরিকা শীর্ষস্থান পায়। ৮টি ইভেন্ট জিতে গ্রীস পায় দ্বিতীয় স্থান। ম্যারাথন রেস জিতে প্রথম অলিম্পিকের নায়ক হয়ে ওঠেন গ্রীসের এক ডাকপিয়ন স্পিরিডন লুইস। ম্যারাথন রেসে স্পিরিডনের সম্ভাব্য জয় ঘিরে এত উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল যে, শেষদিকে গ্রীসের দুই রাজকুমার স্পিরিডনের পাশাপাশি দৌড়েছিলেন। তখন ম্যারাথন রেসের দূরত্ব ছিল ২৪ মাইল ১৫০৩ গজ। ১৯০৮ সালে লণ্ডন অলিম্পিক থেকে ম্যারাথন রেসের দূরত্ব পাকাপাকি ঠিক হয় ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ।

**১৯০০—পারী :** (১১—১৯ ফেব্রুয়ারি) পারীতে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর সঙ্গে দ্বিতীয় অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হওয়ায় খেলাধুলোর আকর্ষণ অনেক কমে যায়, যদিও যোগ দেন ২২টি দেশের ১৩৩০ জন প্রতিযোগী। মেয়ে প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১১। ফ্রান্স জয়ী হয় ২৮টি ইভেন্টে, আমেরিকা ২২টিতে, ১৪টিতে গ্রেট ব্রিটেন। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল ১৭টি। তার মধ্যে গলফ, ক্রোকেট, বোলিং এবং পোলো খেলাও ছিল। আমেরিকার আলভিন ক্রায়েজলিন ৬০ মিটার দৌড়, ১১০ মিটার হার্ডলস, ২০০ মিটার হার্ডলস ও লং জাম্প—মোট চারটি ইভেন্ট জিতে এই অলিম্পিকের নায়ক হয়ে ওঠেন। আমেরিকার আর এক অ্যাথলীট রে ইউরি জেতেন স্ট্যান্ডিং হাই জাম্প, স্ট্যান্ডিং লং জাম্প ও স্ট্যান্ডিং হপ স্টেপ ও জাম্প। এই তিনটি ইভেন্টে পরবর্তী তিনটি অলিম্পিকে ইউরি পান আরও ৭টি পদক—মোট ১০টি। কলকাতার অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান প্রতিযোগী নর্মান প্রিচার্ড, যিনি আই এফ এ-র সম্পাদক ছিলেন এবং কলকাতার ফুটবলে প্রথম হ্যাটট্রিক করেছিলেন তিনি বেসরকারীভাবে এই অলিম্পিকে যোগ দিয়ে ২০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় স্থান পান। মেয়েদের মধ্যে প্রথম অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হন ব্রিটেনের শার্লট কুপার টেনিসে সিঙ্গলস জিতে। উল্লেখ্য, প্রথম ও দ্বিতীয় অলিম্পিকে শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে পুরস্কার দেওয়া হত। প্রথম যিনি হতেন পেতেন রুপোর পদক, দ্বিতীয় ব্রোঞ্জের পদক। সোনার পদক দেওয়া শুরু হয় চতুর্থ অলিম্পিক থেকে।

**১৯০৪—সেন্ট লুই :** (৪—১৫ ফেব্রুয়ারি) বিশ্ব মেলার অঙ্গ হিসাবে অনুষ্ঠিত হওয়ায় তৃতীয় অলিম্পিকও সারা বিশ্বে তেমন সাড়া জাগাতে পারে না। ইউরোপের ৭টি এবং অন্যান্য ৫টি—মোট ১২টি দেশের ৬২৫ জন অংশ নেন। এর মধ্যে মেয়ে প্রতিযোগী ছিলেন মাত্র ৮ জন। ক্রীড়া বিষয় ছিল ১৪ রকমের। আমেরিকার জেমস লাইটবডি তিনটি সোনার পদক পান স্টিপল চেজ, ৮০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার দৌড়ে। আমেরিকার প্রতিযোগীরা সোনা পায় ৭৮টি।
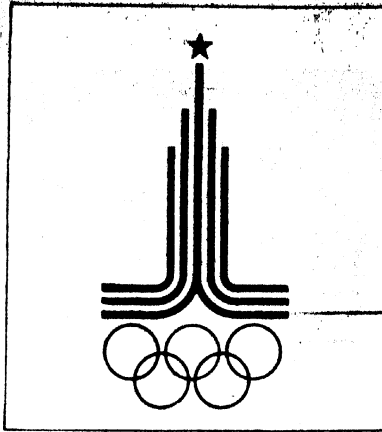
আধুনিক অলিম্পিকে প্রথম দুর্নীতির পরিচয় মেলে সেণ্ট লুইতে। আমেরিকার লরজ ম্যারাথন দৌড়ে প্রথম হন। কিন্তু পরে জানা যায়, দীর্ঘ পথের ১০ মাইল তিনি এসেছেন একটি ট্রাকে চড়ে। ফলে প্রতিযোগিতা থেকে তাঁকে বাতিল করে দেওয়া হয়।

**১৯০৬—এথেন্স :** (২২ এপ্রিল—২ মে) আধুনিককালের অলিম্পিকের দশম বার্ষিক পালনের জন্যই আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির অনুমোদন নিয়ে এথেন্সে আবার অলিম্পিকের আসর বসে। কিন্তু যেহেতু চতুর্বার্ষিক অনুষ্ঠান নয় সেহেতু সরকারী অলিম্পিকের মর্যাদা ছিল না। ১১ রকমের খেলাধুলায় ২০টি দেশের ৮৮৪ জন (মেয়ে ৭ জন) প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিলেন। ফরাসীর প্রতিযোগীরা জিতেছিলেন ১৪টি ইভেন্টে, আমেরিকার প্রতিযোগীরা ১২টিতে।

**১৯০৮—লণ্ডন :** (২৭ এপ্রিল—৩১ অক্টোবর) সুব্যবস্থা, সাংগঠনিক সুষ্ঠতা এবং সুপ্রচারের ফলে এই চতুর্থ অলিম্পিকেই সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক প্রতিযোগিতা শুরু থেকে অলিম্পিক শেষ হতে সময় লাগে ছয় মাস। অলিম্পিকের মূল কেন্দ্র ছিল এক লাখ দর্শক আসন বিশিষ্ট হোয়াইট সিটি স্টেডিয়াম। ২২টি দেশের ২০৩৫ জন (মেয়ে ৩৬ জন) প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিলেন ২১ রকমের খেলাধুলায়। এই অলিম্পিকেই প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয় হকি ও ফুটবল। এই অলিম্পিকেই প্রথম শোনা যায়: "অলিম্পিকে জয়লাভ বড় কথা নয়— অংশ গ্রহণই বড় কথা: পদক জয় মূল লক্ষ নয়—সততার সঙ্গে সংগ্রাম করাই লক্ষ।" বাণীটি পাঠিয়েছিলেন, পেনসিলভেনিয়ার বিশপ।

নিজেদের দেশে প্রথম আয়োজিত এই অলিম্পিকে গ্রেট ব্রিটেন পায় ৫৬টি স্বর্ণপদক, আমেরিকা পায় ২২টি। আগেই লিখেছি, এই অলিম্পিক থেকে স্বর্ণপদক দেবার রেওয়াজ চালু হয়। চতুর্থ অলিম্পিকের দুটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি—৪০০ মিটার দৌড়ের ফাইনালে আমেরিকার তিনজন প্রতিযোগী কারপেণ্টার, রবীন এবং টেলর অন্যায়ভাবে দৌড়নোর ফলে বাতিল হয়ে যাওয়ায় আবার দৌড়ের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু অন্য কোনো প্রতিযোগীর অভাবে গ্রেট ব্রিটেনের হলসওয়েল একাই ৪০০ মিটার দৌড়ে সোনার পদক পান। দ্বিতীয় ঘটনাটি—ম্যারাথন দৌড়ের রাজকীয় মর্যাদার জন্য দৌড় শুরু হয় উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদের সামনে থেকে। দৌড়টি দেখেন প্রায় আড়াই লাখ মানুষ। কোনো স্পোর্টসে তখন পর্যন্ত রেকর্ড জনসমাবেশ। ইতালির খর্বকায় প্রতিযোগী ডোরান্ডো পিয়েত্রি সর্বপ্রথম স্টেডিয়ামে পৌঁছে এবং প্রথম হয়েও স্বর্ণপদক না পেয়ে অমর হয়ে আছেন। কারণ, ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ দৌড়ে শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন পিয়েত্রি ফিতে ছিঁড়বার আগে মাঠে দুবার লুটিয়ে পড়েন। প্রথমবার নিজে উঠে আবার দৌড়তে থাকেন। দ্বিতীয়বার পড়ে গেলে সহানুভূতিবশে স্পোর্টসের কয়েকজন কর্মকর্তা তাঁকে ধরে দাঁড় করিয়ে দেন, সেটা বেআইনী কাজ। তাই পিয়েত্রি বাতিল হয়ে যান। কিন্তু তাঁর অসাধারণ দৌড়ের জন্য ইংল্যাণ্ডের রানী আলেকজান্দ্রা তাঁকে উপহার দেন একটি বিশেষ সোনার কাপ।

**১৯১২—স্টকহোম :** (৫ মে—২২ জুলাই) সুইডেনের সংগঠকদের সুব্যবস্থায় পঞ্চম অলিম্পিক হয় আরও সাফল্যমণ্ডিত। আরও বেশি দেশ এবং আরও বেশি প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। ১৪ রকমের খেলাধুলায় ৫৭ জন মেয়ে প্রতিযোগী সহ ২৮টি দেশের মোট প্রতিযোগী ছিলেন ২৪৪৭ জন। মেয়ে সাঁতারুরা প্রথম অংশ নেন এই অলিম্পিকে এবং প্রথম ইলেকট্রিক টাইমিং এবং ফটোফিনিশের ব্যবস্থা হয়। ফিনল্যাণ্ডের হ্যানস কোলেমিনেন পাঁচ হাজার, দশ হাজার ও আট হাজার মিটার ক্রসকাণ্ট্রি রেস জিতে তিনটি স্বর্ণপদক পান। তবে অসাধারণ অ্যাথলীটের সম্মান পান আমেরিকার নিগ্রো জিম থর্প ডেকাথলন ও পেণ্টাথলনে সোনা জিতে। ডেকাথলনে ইভেন্ট দশটি—১০০ মিটার, ৪০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার দৌড়, লং জাম্প, হাই জাম্প ও পোলভল্ট, লোহার বল ছোঁড়া, ডিসকাস ছোঁড়া ও বর্শা ছোঁড়া এবং ১১০ মিটার হার্ডলস রেস। আর পেণ্টাথলনের পাঁচটি বিষয় হচ্ছে—ঘোড়ায় চড়ে ৮০০ মিটার রেস, ফেন্সিং (এপি), ২৫ মিটার দূর থেকে পিস্তলে গুলি ছোঁড়া, তিনশ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতার এবং চার হাজার মিটার ক্রসকাণ্ট্রি দৌড়। সমস্ত খেলাধুলোয় কত পারদর্শী হলে পেণ্টাথলন ও ডেকাথলনে স্বর্ণপদক লাভ সম্ভব সহজেই অনুমেয়। কিন্তু জিম থর্পের ভাগ্য মন্দ। কখন নাকি আমেরিকায় বাসকেটবল খেলে পয়সা নিয়েছিলেন। তাই প্রোফেশনাল বলে পরিগণিত হন এবং এক বছর পরে দুটি স্বর্ণপদক তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে দেওয়া হয়। তাঁর মৃত্যুর ২০ বছর পরে ১৯৭০ সালে আমেরিকার অ্যাথলেটিক ইউনিয়ন কিন্তু তাঁকে অ্যামেচারের স্ট্যাটাসই দিয়েছেন। স্টকহোম অলিম্পিকে ২৪টি স্বর্ণপদক পায় সুইডেন, আমেরিকা ২০টি।

**১৯১৬—বার্লিন :** ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে জার্মানী যুদ্ধ ঘোষণা করে বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। প্রথম মহাযুদ্ধের ডামাডোলে ষষ্ঠ অলিম্পিক বন্ধ হয়ে যায়।

**১৯২০—আণ্টোয়ার্প :** (২০ এপ্রিল—১২ সেপ্টেম্বর) প্রথম মহাযুদ্ধের পর অলিম্পিক, তাই পাঁচ মহাদেশকে একসূত্রে বেঁধে রাখার পরিকল্পনায় অলিম্পিকের শ্বেত পতাকায় পঞ্চবলয় এঁকে দেওয়া হয় ওই অলিম্পিকে এবং উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা উড়িয়ে দেওয়া হয় শান্তির দূত হিসাবে। দুটি পরিকল্পনাই আসে আধুনিক অলিম্পিকের প্রবর্তক ব্যারন পিয়ের দ্য কুবার্তিনের মাথা থেকে। এই অলিম্পিকেই প্রথম অ্যাথলীটদের পক্ষ থেকে একজন সততার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার শপথ বাক্য পাঠ করেন। শপথ বাক্য পাঠ করেন গেমসের আয়োজনকারী দেশ বেলজিয়ামের ফেন্সার ভিক্টর বয়েন। এই অলিম্পিক ও পরবর্তী দুটি অলিম্পিক মিলিয়ে ফিনল্যাণ্ডের পাভো নুরমি দূরপাল্লার দৌড়ে পান ৯টি সোনা ৩টি রুপোর পদক। আণ্টোয়ার্পে সর্বকনিষ্ঠ অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নের সম্মান পায় আমেরিকার ১৩ বছরের মেয়ে আইলিন রিগিন, স্প্রিং বোর্ড ডাইভিংয়ে বিজয়িনী হয়ে। আমেরিকা পায় ৪১টি সোনা, সুইডেন ১৯টি। অংশ নিয়েছিলেন ২৯টি দেশের ২৬০৭ জন প্রতিযোগী (মেয়ে ৬৪ জন)। ক্রীড়া বিষয় ছিল ২২টি।

**১৯২৪—পারী :** (৪ মে—২৭ জুলাই) যোগদানকারী দেশের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। অষ্টম অলিম্পিকে যোগ দেন ৪৪টি দেশের ৩০৯২ (মেয়ে ১৩৬ জন) প্রতিযোগী। ক্রীড়া বিষয় ছিল ১৮টি। পাভো নুরমি 'ফ্লাইং ফিন' নামে অভিহিত হন ৫টি সোনা জিতে। তিনি জেতেন পনেরোশো মিটার, পাঁচ হাজার মিটার, দশ হাজার মিটার ক্রসকাণ্ট্রি (টিম ও ব্যক্তিগত) এবং তিন হাজার মিটার টিম ইভেন্টে। পরবর্তীকালে যিনি টার্জনের ভূমিকায় ছায়াছবি জগতে বিখ্যাত হন সেই জনি উইসমুলার এই অলিম্পিকে সাঁতারে তিনটি সোনা পান ১০০ মিটার, ৪০০ মিটার

৪ ২×২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রিলেতে। আমেরিকা শীর্ষস্থান পায় ৪৬টি স্বর্ণপদক পেয়ে, ১৭টি সোনা পেয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করে ফিনল্যান্ড।

**১৯২৮—আমস্টার্ডাম :** (১৭ মে—১২ আগস্ট) নবম অলিম্পিকেই প্রথম গেমসের ১৫ দিন ধরে পূতাগ্নি প্রজ্বলিত থাকে। এই অলিম্পিকেই প্রথম ফল জানার জন্য স্কোরবোর্ডের ব্যবস্থা হয় এবং অ্যাথলেটিকসে মেয়েরা প্রথম প্রতিযোগিতার সুযোগ পান। ফলে মেয়ে প্রতিযোগীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯০। মোট প্রতিযোগী ছিলেন ৩০১৪ জন। ১৫ রকমের খেলাধুলায় অংশ নিয়েছিল ৪৬টি দেশ।

আমাদের ভারতের কাছে এই অলিম্পিক স্মরণীয়। ভারতের অ্যাথলীটরা সরকারীভাবে আগের অলিম্পিকে অংশ নিলেও আমস্টার্ডামেই ভারত বিশ্বের ক্রীড়া দরবারে প্রথম বড় সম্মান পায় হকি চ্যাম্পিয়ন হয়ে। এখানে জনি উইসমুলার পান আরও দুটি স্বর্ণপদক। আমেরিকা আবার শীর্ষস্থান পায় ২৪টি সোনা জিতে।

**১৯৩২—লস অ্যাঞ্জেলেস :** (৩০ জুলাই—১৪ আগস্ট) প্রতিযোগীদের একস্থানে এবং একসঙ্গে বসবাসের জন্য লস আঞ্জেলেসেই প্রথম অলিম্পিক ভিলেজের ব্যবস্থা হয় এবং বিজয়ীদের উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে পদক নেবার জন্য ব্যবস্থা হয় ভিক্টরি স্ট্যান্ড-এর। ১৫ রকমের খেলাধুলায় অংশ নেয় ৪৭টি দেশের ১৩০৮ জন প্রতিযোগী (মেয়ে ১২৭ জন)। ৪৭টি স্বর্ণপদকে আমেরিকা শীর্ষস্থান এবং ১২টি স্বর্ণপদকে ইতালি দ্বিতীয় স্থান পায়। এশিয়ার দেশ হিসাবে জাপান কিছুটা সাড়া জাগায় সাঁতারে ৫টি এবং মোট ৭টি স্বর্ণপদক জিতে। একমাত্র লং জাম্প বাদে অ্যাথলেটিকসের ট্র্যাক ও ফিল্ড ইভেন্টের সমস্ত রেকর্ড এখানে ভেঙে গিয়েছিল।

**১৯৩৬—বার্লিন :** (১—১৬ আগস্ট) বার্লিনে একাদশ অলিম্পিকের মাধ্যমে হের হিটলার চেয়েছিলেন আর্য সভ্যতা আর্য আধিপত্যের প্রমাণ দিতে। কিন্তু তাঁর দম্ভে আঘাত হেনেছিলেন কৃষ্ণচর্ম নিগ্রো অ্যাথলীট জেসি ওয়েন্স অ্যাথলেটিকসে চারটি সোনা জিতে। পরবর্তীকালে জেসি ওয়েন্স শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ অ্যাথলীটের সম্মান পেয়েছেন। বার্লিনে ওয়েন্স সোনা পান ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়, লং জাম্প এবং ৪×১০০ মিটার রিলে দৌড়ে।

বার্লিনের একাদশ অলিম্পিক থেকে শুরু হয়েছে অলিম্পিয়ার মন্দির প্রাঙ্গণে সূর্যরশ্মি থেকে আতস কাচের সাহায্যে পূতাগ্নি জ্বালিয়ে সেই অগ্নি রিলে প্রথায় অলিম্পিক অঙ্গনে আনার রেওয়াজ। বার্লিনেই প্রথম বেতারে এবং টেলিভিশনে অলিম্পিকের খবর ও চিত্র প্রচারের ব্যবস্থা হয়। একাদশ অলিম্পিকে যোগ দিয়েছিল ৪৯টি দেশ। ২০ রকমের খেলাধুলোয় অংশ নিয়েছিলেন ৪০৫৬ (মেয়ে ৩২৮) প্রতিযোগী। জার্মানী পেয়েছিল ৩৬টি স্বর্ণপদক, আমেরিকা ২৫টি। নতুন ইভেন্ট ছিল বাসকেটবল।

**১৯৪০—টোকিও; পরে হেলসিঙ্কি**

**১৯৪৪—লন্ডন :**

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়নি। দ্বাদশ অলিম্পিক টোকিওয় হবার কথা থাকলেও চীন-জাপান যুদ্ধের জন্য হেলসিঙ্কিতে করার ব্যবস্থা হয়। লন্ডনে ব্যবস্থা ছিল ত্রয়োদশ অলিম্পিকের।

**১৯৪৮—লন্ডন :** (২৯ জুলাই—১০ আগস্ট) ৩২ বছর পরে যুদ্ধক্লান্ত পৃথিবীতে আবার অলিম্পিকের আয়োজনে সারা বিশ্ব মেতে ওঠে। মরণ আলিঙ্গনের পর বন্ধুত্বের আলিঙ্গনে যদিও জার্মানী, জাপান ও রাশিয়া অংশ নিতে পারে না। ১৮ রকমের খেলায় ৫৯টি দেশের ৪০৯৯ জন (মেয়ে ৩৮৫) প্রতিযোগী অংশ নেন। চারটি সোনার পদক জিতে সবাইকে অবাক করে দেন দুই সন্তানের জননী হল্যান্ডের ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কার্স কোয়েন। তিনি সোনা পান ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে, ৮০ মিটার হার্ডলসে এবং ৪×১০০ মিটার রিলে রেসে। মাত্র ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি উঁচু আমেরিকার জোসেফ পিয়েত্রো ব্যান্টামওয়েট ভারোত্তোলনে ৩০৭·৫ কিলোগ্রাম তুলে নতুন রেকর্ড করেন। পিয়েত্রোর চেয়ে খর্বকায় প্রতিযোগী বোধ হয় অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হননি। আমেরিকা আবার পদক তালিকায় শীর্ষস্থান পায়। সোনা পায় ৪১টি।

**১৯৫২—হেলসিঙ্কি :** (১৯ জুলাই—৩ আগস্ট) ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিঙ্কির জনসংখ্যা তখন মাত্র সাড়ে তিন লাখ। কিন্তু ক্রীড়াযজ্ঞে বিশ্বকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সুন্দর ব্যবস্থাপনায় তাক লাগিয়ে দিয়েছিল সবাইকে। ১৭ রকমের খেলায় প্রতিযোগী ছিলেন ৬৯টি দেশের ৪৯২৫ জন (মেয়ে ৫১৮ জন) প্রতিযোগী। হেলসিঙ্কি অলিম্পিক চিহ্নিত হয়েছিল চেকোশ্লোভাকিয়ার এমিল জেটোপেকের নামে। জিতেছিলেন পাঁচ হাজার মিটার, দশ হাজার মিটার ও ম্যারাথন দৌড়—তিনটিতেই নতুন রেকর্ড। তাঁর সহধর্মিণী ডানা জেটোপেকোভা সোনা পেয়েছিলেন জ্যাভলিন থ্রোতে। শুটিংয়ে র‍্যাপিড ফায়ার পিস্তলে লনডনে সোনা জিতেছিলেন হাঙ্গারীর কারোলি ট্যাকাকস। হেলসিঙ্কিতেও জেতেন। উল্লেখ্য, ছোটবেলায় দুর্ঘটনায় ডান হাতখানি খোয়া যাবার পর ট্যাকাকস গুলি ছুঁড়তেন বাঁ হাতে।

হেলসিঙ্কি গেমসের বড় ঘটনা আমেরিকাকে পিছনে ফেলে রাশিয়ার এগিয়ে যাওয়া। জার-এর আমলে রাশিয়া তিনটি অলিম্পিকে যোগ দিয়ে পেয়েছিল মাত্র একটি সোনা, চারটি রুপো ও তিনটি ব্রোঞ্জ পদক। ৪০ বছর পরে রাশিয়া হেলসিঙ্কি অলিম্পিকেই পায় ৪৩টি সোনা, আমেরিকা পায় ৩৪টি। অবশ্য সোনা-রুপো-ব্রোঞ্জ মিলিয়ে আমেরিকা পায় ৭৬টি পদক, রাশিয়া পায় ৬৯টি।

**১৯৫৬—মেলবোর্ন :** (২২ নভেম্বর—৮ ডিসেম্বর) ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে প্রথম অলিম্পিক হয় অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে। যোগদানকারী দেশের সংখ্যা বাড়লেও প্রতিযোগীর সংখ্যা কম ছিল। ১৭ রকমের খেলায় যোগ দিয়েছিলেন ৭১টি দেশের ৩৩৪২ জন (মেয়ে ৩৮৪) প্রতিযোগী। পদক-তালিকায় রাশিয়া শীর্ষস্থান পায় (৯৮টি), দ্বিতীয় স্থান পায় আমেরিকা (৭৪টি)।

রাশিয়ার মেয়ে জিমন্যাস্ট ল্যারিশা লাতিনিনা পান ৪টি সোনা এবং ১টি রুপো। পরবর্তী অলিম্পিকে আরো পদক পেয়ে তার মোট পদকের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮টি—৯টি সোনা, ৫টি রুপো এবং ৫টি ব্রোঞ্জ। অলিম্পিকে এত পদক আর কেউ পাননি।

অস্ট্রেলিয়ার মেয়ে বেটি কুথবার্ট মেলবোর্নে পান অ্যাথলেটিকসের তিনটি সোনা। দূরপাল্লার দৌড়ে ডাবল পান রাশিয়ার ভ্লাডিমির কুটস, পাঁচ হাজার ও দশ হাজার মিটার দৌড় জিতে।

**১৯৬০—রোম :** (২৫ আগস্ট—১১ সেপ্টেম্বর) ৮৩টি দেশের ৫৩৪৮ জন (মেয়ে ৬১০) প্রতিযোগীর মধ্যে ১৭ রকমের খেলায় সব চেয়ে তাক লাগান ইথিওপিয়ার নগ্নপদ অ্যাথলীট আবেবে বিকিলা এবং আমেরিকার কালো মেয়ে উইলমা রুডলফ। আবেবে বিকিলা রেকর্ড সময়ে জেতেন ম্যারাথন দৌড়। পরের অলিম্পিকে আবার জেতেন। তবে রানিং শু পরে। উইলমা রুডলফ সোনা পান ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে ও ৪×১০০ মিটার রিলেতে। টেনেসির মেয়ে এই উইলমা রুডলফ কিন্তু পোলিও রোগে ৭ বছর বয়স পর্যন্ত হাঁটতে পারত না। পরবর্তীকালে মুষ্টিযুদ্ধের প্রবাদ মহম্মদ আলী এখানেই সোনা জেতেন মিডল হেভিওয়েটে। তখন পরিচয় ছিল ক্যাসিয়াস ক্লে নামে।

রোম ভারতের কাছে স্মরণীয় হয়ে ওঠেনি হকির সোনা পাকিস্তানের হাতে জমা দেওয়ায়। পর পর ছয়টি অলিম্পিকে হকির সোনা জিতে ভারত রোমে রানার্স হয়।

পদক-তালিকায় রাশিয়া আবার শীর্ষস্থান দখল করে ১০৩টি সোনা-রুপো-ব্রোঞ্জ পেয়ে। আমেরিকা পায় ৭১টি।

**১৯৬৪—টোকিও :** (১০—২৪ অক্টোবর) এশিয়া ভূখণ্ডে প্রথম অলিম্পিক হয় টোকিওয়। মোট ৫৬০ লক্ষ ডলার ব্যয়ে অষ্টাদশ অলিম্পিকের আয়োজন, জাঁকজমক এবং বর্ণ-বৈচিত্র্যে প্রাচ্যের দেশগুলির তাক লাগিয়ে দেয় উপস্থিত সবাইকে। ১৯ রকমের খেলায় যোগ দেন ৯৩টি দেশের ৫১৪০ জন (মেয়ে ৬৮৩) প্রতিযোগী।

ব্যক্তিগতভাবে নজর কাড়েন মার্কিন মুলুকের স্কুলছাত্র ডন স্কোল্যান্ডার সাঁতারে ৪টি সোনা জিতে। কিন্তু এখানেই ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে উপর্যুপরি তিনটি অলিম্পিকে সোনা জেতেন অস্ট্রেলিয়ার মেয়ে ডন ফ্রেজার এবং ডিসকাস থ্রোতে পর পর তিনটি অলিম্পিকে সোনা জেতেন আমেরিকার অল ওর্টার। পরে মেক্সিকো অলিম্পিকেও সোনা জিতে ওর্টার এক নতুন কীর্তির অধিকারী হন। টোকিওয় রাশিয়া পায় ৯৬টি পদক, আমেরিকা ৯০টি। জুডো এবং ভলিবল শুরু হয় টোকিও থেকে। টোকিওতে ভারত আবার পায় হকির সোনা। হিরোসিমায় প্রথম আণবিক বোমা বিস্ফোরণের দিন যে ছেলেটির জন্ম হয়েছিল সেই ছেলেটির উপর অর্পণ করা হয়েছিল স্টেডিয়ামের অগ্নিস্থলীতে পূতাগ্নি স্থাপনের দায়িত্ব।

**১৯৬৮—মেক্সিকো :** (১২—২৭ অক্টোবর) সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭৫০০ ফুট উপরে মেক্সিকো শহরে ঊনিশতম অলিম্পিকে আমেরিকার নিগ্রো জাম্পার বব বীমন লং জাম্পে এমন এক রেকর্ড করে রেখেছেন যা কে কতদিনে ভাঙবে ভবিষ্যৎই জানে। লং জাম্পে বিশ্ব রেকর্ড ছিল ২৬ ফুট সাড়ে ৭ ইঞ্চি। বীমন লাফান ২৯ ফুট আড়াই ইঞ্চি। অবিশ্বাস্য কাণ্ড! স্টেপ জাম্পে মেক্সিকোয় বিশ্ব রেকর্ড ভাঙে নবার। এই অলিম্পিক থেকে মেয়ে প্রতিযোগীদের সেক্স টেস্ট শুরু হয়। মেক্সিকোর ১৮ রকমের খেলায় ১১২টি দেশের ৫৫৩১ জন (মেয়ে ৭৮১) প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র পায় ১০৭টি পদক, রাশিয়া ৯১টি। আমেরিকার নিগ্রো অ্যাথলীটরা বর্ণবৈষম্যের প্রতিবাদে মেক্সিকোয় বিজয়মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাতে ব্ল্যাক পাওয়ার ডিমোনস্ট্রেশন দেখায়। চারটি সোনা ও দুটি রুপোর পদক জয় করে জিমন্যাস্ট-রানীর সম্মান পান চেকোস্লোভাকিয়ার ভেরা ক্যাসলাভস্কা।

**১৯৭২—মিউনিখ :** (২৬ আগস্ট—১০ সেপ্টেম্বর) সবচেয়ে বেশি দেশ (১২২টি) এবং সবচেয়ে বেশি প্রতিযোগীর (৭১৪৭ জন—মেয়ে ১০৭০) কিন্তু অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ উল্লেখ করার মত ঘটনা নয়। খেলাধুলোর ইতিহাসে বিভীষিকাময় ও পৈশাচিক ঘটনা ঘটে মিউনিখ অলিম্পিকেই। আরব গেরিলাদের নৃশংসতায় নিহত হয়েছিলেন ১১ জন ইজরাইলী ক্রীড়াবিদ। মোট ১৭টি প্রাণ বলি হয়েছিল। মিউনিখেই বিজয়মঞ্চে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের কিছু হকি খেলোয়াড় জাতীয় মর্যাদা রুপোর পদক ভরে সেই জুতো উঁচু করে তুলে ধরেছিলেন অলিম্পিক বিধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য।

অলিম্পিক ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কীর্তির অধিকারী হন আমেরিকার মার্ক স্পিৎজ, সাঁতারে ৭টি সোনা জিতে। রাশিয়ার ভ্যালেরি বোরজভ পান অ্যাথলেটিকসে স্প্রিন্ট ডাবল। রাশিয়া পায় ১০৯টি পদক, আমেরিকা ৯১টি।

**১৯৭৬—মন্ট্রিয়ল :** (১৭ জুলাই—১ আগস্ট) বর্ণবৈষম্যের প্রতিবাদে আফ্রিকার প্রায় ৩০টি দেশ মন্ট্রিয়ল অলিম্পিক বয়কট করা সত্ত্বেও ২১ রকমের খেলায় ৮৮টি দেশের ৬১৫২ জন (মেয়ে ১২৬১) প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। মন্ট্রিয়লকে মাতিয়ে তোলে ইউরোপের দুই চতুর্দশী, পূর্ব জার্মানীর কর্নেলিয়া এন্ডার এবং রোমানিয়ার নাদিয়া কোমানেচি। সাঁতারে এন্ডার পায় ৪টি সোনা, জিমন্যাস্টিকসে কোমানেচি ৩টি সোনা ও একটি রুপো।

মন্ট্রিয়ল অলিম্পিকে খরচ হয় সবচেয়ে বেশি অর্থ। আমাদের মুদ্রায় হিসাবে তেরোশো কোটি টাকা। রাশিয়া পায় ৪৭টি সোনা, পূর্ব জার্মানী ৪০টি এবং আমেরিকা ৩৪টি। মন্ট্রিয়ল থেকে ভারতের গোটা দলকে শূন্য হাতে ফিরতে হয়। মিউনিখ ও মেক্সিকোতে তবু হকির ব্রোঞ্জ পদক জুটেছিল। মন্ট্রিয়লে হকিতে ভারত পায় সপ্তম স্থান।

মুকুল

# বাংলা চলচ্চিত্রেতিহাসের সর্বোত্তম নায়ক

সামান্য কেরানী থেকে চলচ্চিত্রাভিনয়ে যুক্ত হয়ে দীর্ঘ তিন দশক জনপ্রিয়তার তুঙ্গে অধিষ্ঠিত থাকার যে দৃষ্টান্ত উত্তমকুমার রেখে গেলেন তার দ্বিতীয় নজির নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে তখন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নেই। অর্থাৎ বাংলা চলচ্চিত্রে রোমান্টিক নায়কের অভাব প্রকট। তদুপরি হিন্দী ছবির ক্রমপ্রসার বাংলা ছবিকে জনচিত্ত থেকে হঠিয়ে দিতে আরম্ভ করেছে। ঠিক এমনি মুহূর্তেই উত্তমকুমারের আবির্ভাব। সেই থেকে বাংলার চলচ্চিত্র বাজারে, হিন্দী ছবির প্রাধান্য অবশ্য অপ্রতিহত থাকলেও মুমূর্ষু বাংলা ছবির প্রাণের স্পন্দন জিইয়ে রাখতে অতি মুষ্টিমেয় যে কয়েকজনের নাম ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে উত্তমকুমার নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম। নির্বাক যুগ থেকে সুদর্শন নায়কের অভাব ছিল না, কিন্তু উত্তমকুমারের চেহারায় এমন একটি সম্মোহক আকর্ষণ ছিল যে চিত্রামোদীরা তাঁকে 'গুরু' বা 'মহানায়ক'-এর পদে অভিষিক্ত করে উপাসনা করে এসেছে। উপরন্তু উত্তমকুমারের ছিল অনিন্দ্য অভিনয় দক্ষতা। দুর্বল কাহিনী বা দুর্বলতর বিন্যাস তাঁর অভিনীত বহু ছবির জনপ্রিয়তা বিঘ্নিত করেছে। কিন্তু এমন ছবিরও উল্লেখ করা যায় যে ছবির নায়ক উত্তমকুমার একারই আকর্ষণে দর্শককে মোহাবিষ্ট রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রথম ছবি, যতদূর মনে পড়ে 'কামনা'। এর আগে অপ্রকাশ্য মুক্তিলাভ করে 'সহযাত্রী'। তৎপূর্বে অরূপকুমার নামে খান দুই ছবিতে অবতরণ করেন। এরপর আরও খান দুই ছবির পর রোমান্টিক নায়ক হিসেবে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন 'সাড়ে চুয়াত্তর'-এ। এ ছবির নায়িকা ছিলেন সুচিত্রা সেন। অতঃপর অগ্নিপরীক্ষা, সাঁঝের প্রদীপ, সূর্য-তোরণ, শাপমোচন, হারানো সুর, সাগরিকা শিল্পী সপ্তপদী, প্রভৃতি ছবিতে এই শিল্পী-জুড়ি অবতরণ করে বাংলা চলচ্চিত্রের বাজারে 'মরা গাঙে' বেশ কিছু কাল বাণ ডাকিয়েছিলেন। এর মাঝে এবং পরে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া দেবী সন্ধ্যা রায়, মাধবী চক্রবর্তী, শর্মিলা ঠাকুর এবং সাম্প্রতিককালে সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় প্রমুখের বিপরীতেও বেশ কিছু সংখ্যক ছবিকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন। অভিনয়ে অসামান্য প্রতিভার প্রথম উন্মেষ 'সঞ্জীবনী'-তে (সম্ভবত ১৯৫২)।

উত্তমকুমার বাংলা চিত্রের দর্শকচিত্তকে কি পরিমাণ আবিষ্ট করে রেখেছিলেন তার বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে একটির উল্লেখই যথেষ্ট হবে। সেটা সম্ভবত ১৯৬০ সাল। প্রেক্ষাগৃহের কর্মীদের আন্দোলনের ফলে মাস ছয়েকেরও বেশী সমস্ত চিত্রগৃহ বন্ধ। আন্দোলন প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তিলাভ করল 'সূর্যতপা', যার নায়িকা ছিলেন সন্ধ্যা রায়। ছবিখানির কাহিনী বা পরিচালন দক্ষতা এমন ছিল না যাতে, ছবিখানি জনপ্রিয় হবে বলে আশা ছিল। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক মাস পর উত্তমকুমারকে দেখার দর্শকদের ঝোঁক মুক্তি-প্রাপ্ত চিত্রগৃহগুলিতে এমন ভেঙে পড়ে যে একটানা চার থেকে ছয় সপ্তাহ প্রত্যেকটি প্রদর্শনীর 'হাউস ফুল'-এর এক রেকর্ডই সৃষ্টি হয়। এমনি প্রবাদ পুরুষ হয়ে উঠেছিলেন উত্তমকুমার, যে প্রেক্ষাগৃহে দর্শক আকর্ষণে ভূমিকালিপিতে তাঁর নাম থাকাটাই ছিল যথেষ্ট।

অভিনয়ে বৈচিত্র্য আনার দক্ষতায়ও উত্তমকুমার ছিলেন বিশিষ্ট। যার স্বাক্ষর তিনি রেখে গিয়েছেন 'সাহেব বিবি গোলাম', 'চাঁপা ডাঙার বউ', দেয়া নেয়া, বিজয়ের বিয়ে, নেকলেশ, বসু পরিবার, কমললতা, রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত, শিউলিবাড়ি, মরুতীর্থ হিংলাজ, শ্যামলী, বড়দিদি, থানা থেকে আসছি, যদুবংশ, ছদ্মবেশী, নায়ক, চিড়িয়াখানা, থেকে হালফিলের দেবদাস এবং মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে মুক্তিপ্রাপ্ত 'দুই পৃথিবী' ও 'দর্পচূর্ণ'। ছবিতে অভিনয় সৌকর্যের যে নিদর্শন রেখে গিয়েছেন তা তাঁর বিশিষ্টতা অমর করে রাখবে। তাঁর অভিনয়ে ছিল একটা স্বচ্ছন্দ সাবলীলতা। প্রায় শ'আড়াই ছবিতে উত্তমকুমার অভিনয় করেছেন। অর্থাৎ ঠিক তত সংখ্যকই ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র। সেই শ'আড়াই ছবির প্রতিটি চরিত্রে উত্তমকুমারকে দেখা গিয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে। কোন একটির সঙ্গে অপরটির মিল নেই। শুধু নিজের অভিনয়টুকু সারতেই তিনি তুষ্ট থাকতেন না। অনুজপ্রতিম সহ-অভিনেতা ও অভিনেত্রীদেরও সাহায্য করতেন তাঁদের অভিনীত চরিত্রের সঠিক রূপায়নে।

হালকা ধাঁচের চরিত্রাভিনয়েও অসাধারণ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। 'চিরকুমার সভা', ভ্রান্তি বিলাস' প্রভৃতি কতকগুলি ছবিতে।

শুধু চিত্রাভিনয়েই নয়। মঞ্চাভিনয়েও তাঁর পারদর্শিতা কম ছিল না। উত্তমকুমার যে একদা অতীব জনপ্রিয় মঞ্চাভিনেতা ছিলেন সেকথা অনেকেই আজ বিস্মৃত। স্টারে 'শ্যামলী'-র কথা এই সূত্রে স্মর্তব্য। নাটকের নাম-ভূমিকায় ছিলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। একটানা কয়েক শত রজনী চলার মূলেও মুখ্য আকর্ষণ ছিলেন উত্তমকুমার। বস্তুত পোর্ট কমিশনার অফিসে পে-ক্লার্ক রূপে কাজ করার সময়েও শখ করে মঞ্চে অভিনয় করেছেন। একসময় সংগীতেও তাঁর কৃতিত্ব স্বীকৃতি পেয়েছিল। ছবির পরিচালনাতেও যে তিনি দক্ষ ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে 'বনপলাশীর পদাবলী'তে। তাঁর শেষ পরিচালনা প্রচেষ্টা ছিল প্রয়াত পরিচালক পীযূষ বসুর 'কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী'। কিন্তু ছবিটি শেষ করে যেতে পারলেন না।

বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের দুর্দশা মোচনের ব্যাপারেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতেন। সরকারের কাছে দরবার করার মধ্যেই সে-চেষ্টা সীমায়িত ছিল না। হিন্দী ছবি তৈরি করে সর্ব-ভারতীয় বাজার থেকে অর্থার্জন দ্বারা বাংলা শিল্পকে পুষ্ট করায় তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্যেই প্রযোজিত করেন 'ছোটি সি মোলাকাৎ'। ছবিখানি উত্তমকুমারের উদ্দেশ্য সফল করতে পারেনি 'বক্স অফিস'-এ ব্যর্থতার জন্য। তৎসত্ত্বেও হিন্দী চিত্র-জগতেও তাঁর খ্যাতি বড় কম ছিল না। 'অমানুষ' বা 'আনন্দ আশ্রম'-এর জনপ্রিয়তার মূলে উত্তম-কুমারের ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্রচিত্রণের কৃতিত্ব অন-স্বীকার্য। দীর্ঘ তিন দশকের অভিনয়শিল্পী জীবনে যে আড়াই শতাধিক ছবিতে অবতরণ করেছেন তার অধিকাংশই ছবি হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকার মত নয়। গুণী পরিচালক তাঁর ভাগ্যে খুব কমই জুটেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অনুল্লেখ্য চিত্ররাজির মধ্যেও শিল্পী উত্তমকুমার হারিয়ে যাননি।

আসল নাম অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। চলচ্চিত্রে প্রথম অবতরণ অরূপকুমার নামে। উত্তমকুমার নাম গ্রহণ থেকেই তিনি রোমান্টিক নায়ক রূপে সাড়া জাগিয়ে তোলেন। তাঁর প্রতিভার প্রথম স্বাক্ষর পাওয়া যায় সঞ্জীবনী-তে। এবং সেই থেকেই কেবল-মাত্র দর্শকমনের উপরই নয়, সমগ্র বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পকেই মোহাচ্ছন্ন করে রাখেন। অভিনয়ে অসাধারণ প্রতিভার যেমন অধিকারী ছিলেন তেমনি ছিলেন পরিশ্রমী। দর্শকসাধারণের মনে শিল্পী হিসেবে অনুরাগ ও শ্রদ্ধার আসন অর্জন করা থেকেই কোন একটি বছরও যায়নি যে বছর তাঁকে একই সঙ্গে চার-পাঁচখানি ছবিতে কাজ করতে হয়নি। মৃত্যুর আগের দিনও তিনি 'ওগো বধূ সুন্দরী'র শ্যুটিং করেছেন। আরো তালিকায় ছিল 'সূর্যসাক্ষী' 'কলঙ্কিত নায়ক', 'খনা' ও হার মানেনি।

ছবিতে অবিরাম কাজ করে গেলেও চলচ্চিত্র নির্মাণে সংশ্লিষ্ট বিশেষ করে দুঃস্থ শিল্পী ও কলাকুশলীদের সুখ-দুঃখ নিয়েও চিন্তা এবং কাজ করতেন। কত দুঃস্থ কুশলী যে তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন সে-খবর কলকাতার স্টুডিও মহলে কারো অবিদিত নেই। দুঃস্থ অভিনয়শিল্পীদের সহায়তার জন্য তাঁরই অগ্রহে গঠিত হয় শিল্পী সংসদ। গঠনই নয়, দুঃস্থদের সহায়তার জন্য অর্থের সংস্থান ব্যবস্থায় নিজেই পরিচালনা করেন 'বনপলাশীর পদাবলী'। একই উদ্দেশ্যে নির্মিত হয় 'দুই পৃথিবী' যেটি প্রয়াত পরিচালক পীযূষ বসুর শেষ ছবি। কলাকুশলীদের সহায়তার জন্যও একখানি ছবি প্রযোজনার কাজ অনেকটা এগিয়েছিল। তাঁর প্রয়াণে তা আর এগোতে পারল না।

অভিনয়ে অনন্য গুণের অধিকারী তো ছিলেনই, তাছাড়া ছিলেন সুগায়ক। চলচ্চিত্রে যোগদানের পূর্বেও গান শেখাতেন। ছবিতে স্বকন্ঠে গেয়েছেন 'নবরাগ'-এ প্রয়াত নচিকেতা ঘোষের দেওয়া সুরে। সংগীত-পরিচালক রূপেও তাঁকে দেখা গিয়েছে 'কাল তুমি আলেয়া'-তে। এমন বহুমুখী প্রতিভা, জনপ্রিয়তায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী কিন্তু আত্মম্ভরিতার লেশ-মাত্র কোনদিন তাঁকে স্পর্শ করেনি।

শোকবার্তায় সত্যজিৎ রায় বলেছেন, কেবলমাত্র বাংলাদেশ বা ভারত নয়, তাঁর ধারণায় দীর্ঘ তিন দশক ধরে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে অধিষ্ঠিত থাকতে পেরেছেন এমন অভিনয়শিল্পী সমগ্র বিশ্বেই বিরল। মৃণাল সেনের মতে, আমাদের দেশেই শুধু নয়, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সমকক্ষ হবার মত প্রতিভাবান ছিলেন উত্তমকুমার।

উত্তমকুমারের তিরোধানে যে স্থান শূন্য হল তা আর কারুর দ্বারা পূরণ হতে পারবে মনে হয় না।

**পঙ্কজ দত্ত**

## আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

### বই

**A Biographical Sketch of David Hare by Peary Chand Mittra. New reprint ed. by Gauranga Gopal Sen Gupta. Jijnasa, Calcutta-9 Price Rs. 30.00.**

বাংলার নবজাগরণে যে-সব বিদেশীর দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় ডেভিড হেয়ার তাঁদের অন্যতম। তাঁর কর্মোদ্যোগ যেমন বহুমুখী এমন আর কারও ছিল না। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ভারতীয়দের প্রথম প্রয়োজন আধুনিক শিক্ষার দৃঢ় বনিয়াদ। একবার রামমোহন পৌত্তলিকতা দূরীকরণ সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি ঘরোয়া বৈঠক ডেকেছিলেন। আমন্ত্রিত না হয়েও হেয়ার সেই সভায় উপস্থিত হয়ে বললেন, একমাত্র পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিস্তারই সংস্কার দূর করতে পারে, শুধু আলোচনায় ফল হবে না। হয়ত হেয়ারের এই প্রস্তাবই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সূচনা। কেউ কেউ বলেন, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোগী পুরুষ। এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও একথা প্রমাণিত যে তিনি ১৮১৯ খৃীষ্টাব্দ থেকে হিন্দু কলেজের পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৮৩১ খৃীষ্টাব্দে দক্ষিণারঞ্জন

প্রমুখ ৫৬৪ জন নব্য ভাবনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালী যুবক হেয়ারকে সম্বর্ধনা জানান। উত্তরে হেয়ার যা বলেছিলেন তা থেকে বোঝা যায় শিক্ষাকে তিনি কেন প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বললেন, ভারতে সকল সম্পদের অফুরন্ত উৎস রয়েছে। এখানকার লোকেরা বুদ্ধিমান পরিশ্রমী, তারা অন্যান্য সভ্যদেশের নাগরিকদের তুলনায় কোন অংশে ন্যূন নয়। শুধু বহু শতাব্দীর উৎপীড়ন ও কুশাসনে দেশের নিজস্ব শিক্ষাপদ্ধতি ভেঙ্গে পড়ায় জনগণের এই দুর্দশা। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিস্তার এর প্রতিকার করতে পারে। এই জন্যই তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বীজ বপনে আগ্রহী। তাঁর কৃতিবিদ্য ছাত্রদের মধ্যে সেই প্রচেষ্টার সাফল্য দেখে তিনি আজ আনন্দিত।

কিন্তু অন্য শিক্ষার প্রতি তাঁর বিরূপতা ছিল না। রামমোহন সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধী ছিলেন; হেয়ার বিরোধিতা করেন নি। তারই জমিতে এই বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মিত হয়েছিল। বাংলা শিখতে ছাত্রদের তিনি উৎসাহিত করতেন। পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান যে কেবল ইংরাজী বই থেকেই শিখতে হবে এর কোন অর্থ নেই। বাংলা ভাষায় উপযুক্ত বই প্রকাশ করেও আধুনিক জ্ঞানের পাঠ দেওয়া যায়। প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক রচনার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হল স্কুল বুক সোসাইটি ১৮১৭ খৃীষ্টাব্দে। পর বৎসর কলিকাতা স্কুল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হল শিক্ষা বিস্তার ও স্কুলের পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য। হেয়ার এই দুটি সমিতির সঙ্গেই দীর্ঘকাল সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। স্কুল সোসাইটি আরপুলি পাঠশালাটির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেয় হেয়ারকে। সে দায়িত্ব তিনি দুর্লভ আন্তরিকতার সহিত পালন করেছিলেন।

বালিকাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছিল নেটিভ সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশান। হেয়ারের সহযোগিতা থেকে এই সমিতিও বঞ্চিত হয়নি। তাছাড়া ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন।

ধর্ম সম্বন্ধে হেয়ার ছিলেন অনেকটা উদাসীন। শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পালন করে চলাই ছিল তাঁর আদর্শ। এজন্য তিনি মিশনারিদের আস্থাভাজন হতে পারেন নি।

সে সময়কার শিক্ষা ও সংস্কৃতি-মূলক সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই হেয়ার যুক্ত ছিলেন। অন্যান্য সামাজিক প্রশ্ন সম্বন্ধেও তিনি ছিলেন সচেতন। ভারত থেকে মরিসাস এবং অন্যান্য দেশে মজুর পাঠানোর বিরোধী ছিলেন তিনি। একবার তিনি পুলিসের নিকট লিখিতভাবে অভিযোগ করেন যে প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে বিদেশে পাঠাবার জন্য "কুলীদের" এনে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

জুরির সাহায্যে বিচার এবং মুদ্রাযন্ত্র নিয়ন্ত্রণবিরোধী আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন হেয়ার।

ডিরোজিও তাঁর বন্ধু ছিলেন, রামমোহনও ছিলেন অন্যতম সুহৃদ। লন্ডনে হেয়ার-পরিবারেরই আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন রামমোহন। ডিরোজিও এবং রামমোহন জ্ঞানের আলোকে বুদ্ধির দীপ্তিতে নিজেদের পথ সৃষ্টি করেছিলেন, অন্যদেরও পথ দেখিয়েছেন। হেয়ারের পান্ডিত্য ছিল না, ছিল প্রাণভরা ভালোবাসা। তাঁর শিক্ষাসেবা ভালোবাসার সংযোগে মহিমান্বিত। ছাত্রদের জন্য হেয়ারের ভালোবাসা প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

সাতষট্টি বছর বয়সে কলেরায়

হেয়ারের মৃত্যু হয়। তাঁর শোকযাত্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক যোগ দিয়েছিল। সে যুগের পক্ষে এটা ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। হেয়ারের প্রতি ছাত্র ও জনসাধারণের যে সত্যিকারের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল এটা তারই প্রমাণ। এই অকৃতদার, সেবাব্রতী শিক্ষার সেবক কলকাতা এসেছিলেন ঘড়ির ব্যবসা করতে। খুব ভালো চলছিল ব্যবসা, বেশ উপার্জন হচ্ছিল। কিন্তু শহরের ঘরে ঘরে জ্ঞানের আলো জ্বেলে দেবার কি এক নেশা তাঁকে পেয়ে বসল, একটু একটু করে ব্যবসা থেকে সরে এলেন এবং শেষ পর্যন্ত একেবারে ছেড়েই দিলেন। পরিণামে শেষ জীবনে তাঁকে অর্থকষ্টে পড়তে হয়েছিল।

হেয়ারের দ্বিতীয় বার্ষিক স্মৃতি-সভায় স্থির হয়েছিল যে তাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখা হবে। কিন্তু নানা কারণে তা হয়ে ওঠেনি। হেয়ারের মৃত্যুর ছত্রিশ বছর পরে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্রের রচিত জীবনীটি প্রকাশিত হয়। পূর্ণাঙ্গ জীবনী নয়, তাই প্যারীচাঁদ একে বলেছেন "স্কেচ"। উপকরণের অভাবের জন্যই পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করা সম্ভব হয়নি। এই অভাবের জন্য অনেকাংশে দায়ী হেয়ারের আত্ম-প্রচার বিমুখতা। ঘনিষ্ঠদের সংগেও তিনি নিজের কথা নিয়ে আলোচনা করতেন না। প্যারীচাঁদ যে স্কেচটি রেখে গেছেন তারই যথেষ্ট মূল্য আছে। সুতরাং বইটির পুনর্মুদ্রণ হওয়ায় আমরা আনন্দিত। মূল গ্রন্থ ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত : পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্তনে ডেভিড হেয়ারের দান, মাতৃ-ভাষায় শিক্ষা এবং স্ত্রী-শিক্ষা, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে ডেভিড হেয়ার, ডেভিড হেয়ারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, বিশিষ্ট ব্যক্তির স্মৃতিচারণ ও নিঃস্বার্থ উপকারক ডেভিড হেয়ার। দুটি পরিশিষ্টের একটিতে দেওয়া হয়েছে হেয়ার-রচিত হিন্দু স্কুলের নিয়মাবলী, অন্যটি হিন্দু কলেজ ও তার প্রতিষ্ঠাতা।

নতুন সংস্করণটি সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনা করেছেন গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত। পাদটীকায় তিনি বহু নতুন তথ্য সংযোজন করেছেন। তাছাড়া যোগ করেছেন ছয়টি নতুন পরিশিষ্ট। ডেভিড হেয়ারের উইলটি এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। আর একটিতে বর্ধমানের প্রতাপচাঁদের মামলায় হেয়ার যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সব চেয়ে দরকারী হল প্রায় পৌনে দুশ দেশী-বিদেশী হেয়ারের সমকালীন ব্যক্তিদের জীবনী-তালিকাটি। প্রত্যেকের জন্ম-মৃত্যুর বৎসর সহ সংক্ষিপ্ত পরিচিত দেওয়া হয়েছে। অন্য সূত্র থেকে অনেকের সম্বন্ধে সহজে তথ্য পাওয়া যায় না। সম্পাদকের অনেক পরিশ্রম ও অনু-সন্ধানের ফল এই তালিকা। এটি রেফারেন্সের জন্য কাজে লাগবে।

একটি নির্ঘণ্ট যুক্ত করা হলে বইটির ব্যবহারোপযোগিতা বৃদ্ধি পেত।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চিত্রকলা**

## কোষ্ঠীর ফলাফল

এমন একটা সময় ছিল যখন শিল্পীরা ফরমায়েসী কাজ করতেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকের মত অনুসারে চলতে হতো। তবু পৃষ্ঠপোষকের নির্দেশ এবং পরম্পরা মেনে নিয়েও শিল্পী সাধ আহ্লাদ মেটাতেন বলেই শিল্পকলা নতুন দিকে মোড় নিয়েছে। শিল্পী যেখানে ঘানির বলদের মত ঐতিহ্যের চারপাশে ঠুলি পরে ঘুরেছেন সেইখানে সেটা হয়েছে মুদ্রাদোষ। সে সময় শিল্পী সামগ্রিকভাবে নিজেকে জীবন এবং সংস্কৃতির অঙ্গ বলে ধরতেন বলেই ক্রীতদাস বলে কখনো তাঁকে মনে হতো না। ব্যক্তিগতভাবে কোন খেয়ালী, দুর্মুখ, অত্যাচারী পৃষ্ঠ-পোষকের পাল্লায় কখনো কখনো তাঁকে পড়তে হয়েছে। অনামী শিল্পী দল বেঁধে গুহার দেওয়াল-চিত্র বা মন্দিরে ভাস্কর্য করবার সময় নিজেকে কারিগর হিসাবেই ভেবেছেন। শিল্প-বিপ্লবের পর চিত্র-শিল্পীর পৃষ্ঠপোষকতা করার মত ধর্ম-মহামণ্ডলের মোহন্ত বা রাজদরবারের

বন্দনা রায়ের আঁকা প্রতিকৃতি

অবস্থা রইল না। শিল্পীরা হলেন ক্রমশ স্বাধীন। অহেতুকী আনন্দের বিষয় হল শিল্পকলা কিন্তু যথা ইচ্ছা তথা যাবার অবস্থা সকলের থাকে না।

বন্দনা রায় প্রদর্শনী (আকাদমী অব ফাইন আর্টস, ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি) দেখতে গিয়ে মনে হল এসব। এমন পাঁচ-মিশালী প্রদর্শনী খুব কমই দেখা যায়। প্রতিকৃতিগুলো সাধারণ বাজারে যেমন তৈলচিত্র চলে তেমনি। কিন্তু প্রদর্শনীতে অচল। পেছনে হাওয়া-বাতাস খেলার মতো জায়গা নেই। যদিও ফোটোগ্রাফের মত প্রতিকৃতি এক্ষেত্রে মিলেছে। জল এবং তেলরঙের নিসর্গ মন্দ নয়। এসব আর্ট কলেজের প্রদর্শনীতে মন্দ লাগতো না। বন্দনা আর্ট কলেজে মোটামুটি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ শিখেছিলেন। কিন্তু প্রশিক্ষিত ক্ষেত্রের বাইরে বিচরণের জন্য চাই আলো হাওয়ায় খোলামেলা পরিবেশ। এইখানে শিল্পীর অগ্নি-পরীক্ষা।

বন্দনা একটা গোটা চিত্রমালা করেছেন রাশি নিয়ে। বস্তুত যে যার রাশি মনে করে দেখে নিতে পারেন। যেমন কুম্ভ রাশির জন্য উনি একটা ঘট রেখে গোটা রচনাটা সাজিয়েছেন। এ অধর্বাম্বনর মহাজাগতিক পরিবেশ ধনুক হাতে হল ধনু রাশি। প্রতীক এক্ষেত্রে বহুলাংশে সুতো-ওঠা। ঠিক কাজ করে না। যদিও রাশিকে প্রতীক হিসাবে চিন্তা করার মধ্যে অভিনবত্ব আছে।

বন্দনার জলরঙ বেশি ভারী। তেল-রঙ হালকা। জৌলুস আছে কিন্তু তেলের ভাগ কম। তার ওপরে অঙ্কন কাঁচা। আমার মনে হয় প্রথমে পর্য-বেক্ষণমূলক চিত্র তাঁকে আঁকতে হবে অনেক, বহু। অঙ্কনে জোর হলে তবে ভাঙ্গা, বা জোড়াতাড়া দেওয়া কিংবা বিকৃতিকরণ, অথবা নিজস্ব ভঙ্গে রূপা-রোপের প্রশ্ন আসে।

সুখী গৃহকোণের বাইরে আসেন নি। জীবনটা দেখেছেন, চিকের না হলেও নিরাপদ দূরত্বের আড়াল থেকে। ফলে তীব্র আসক্তির পরিবর্তে ভাবালু রোমান্টিকতা পটে এসে হানা দিয়েছে অ্যাকুরিয়ামের লাল হলুদ মাছ আঁকার দরকার পড়ত না।

সন্দীপ সরকার

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

## শ্রুতিবস্তু

পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কর্ণের ভূমিকা যে কত বড় সেটা নিরক্ষর মানুষেরও অজানা নয়। অজানা যা তা হল কানের গঠন, তার কর্মধারা এবং শ্রবণশক্তি কত রকমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে সম্পর্কিত তথ্য। বধিরত্ব শুধু শ্রবণেই বিঘ্ন ঘটায় না, কোন কোন ক্ষেত্রে মস্তিষ্ককেও কাহিল করে তোলে।

এই বিষয়ের তথ্যপূর্ণ একটি ডকু-মেণ্টারি ছবির নাম 'শ্রুতিবস্তু'।

এই তথ্যচিত্রখানি প্রযোজনা করেছেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ই এন টি বিভাগের প্রধান ডাঃ আবিরলাল মুখোপাধ্যায়। কান সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলায় চিত্র নাট্যকার ডাঃ দেবাশিস সান্যাল কানের গঠন থেকে শ্রবণশক্তি কতভাবে ব্যাহত হতে পারে ধাপে ধাপে তা অভিব্যক্ত করায় সফল হয়েছেন। এই সাফল্যের মূলে পরিচালক অভিজিৎ সরকারের কৃতিত্বও সমধিক। তপন গুহরায়ের ক্যামেরার কাজ, এস মোহন্তীর সম্পাদনা, দেবাশিষ দাশগুপ্তের আবহ সুরযোজনা এবং চণ্ডী লাহিড়ী ও তুলসী লাহিড়ীর কার্টুন ছবিখানির বক্তব্য পরিস্ফুট করে তোলায় সহায়ক হয়েছে। খ্যাতনামা অভিনয়-শিল্পী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ধারাভাষ্য বিষয়টি সরল করে বুঝিয়ে দেয়। বিষয়-বস্তুর গুরুত্বের বিবেচনায় এবং '৮১ সাল বিশ্ব বধির কল্যাণ বৎসর মনে রেখে তথ্য চিত্রখানির বহুল প্রচার প্রচার বাঞ্ছনীয়।

পঙ্কজ দত্ত

## তাসের দেশ ঃ অদ্ভুত রস, মধুর অভিজ্ঞতা

১২ জুলাই ১৯৮০—তারিখটা লিখে রাখবার মত। কারণ ওইদিন রবীন্দ্রসদনে একটা মিরাক্‌ল ঘটিয়ে দিলেন আচার্য শান্তিদেব ঘোষ। একটি বাদলসন্ধ্যাকে পূর্ণভাবে রবীন্দ্রসন্ধ্যায় পরিণত করে দিলেন। প্রগাঢ় হেমন্তের কন্দর থেকে কত অনায়াসে ডাক দিয়ে নিয়ে এলেন প্রমত্ত বসন্তকে। সত্তর বছরের একটি মানুষের নিমেষে জাদুমন্ত্রে উন্মোচিত করে স্ফুরিত হল তেইশটি পুষ্পিত ঋতুর এক যুবা-পুরুষ। খোলা গলায় অবারিত বাতাসে গানের ভেলা ভাসিয়ে, সাবলীল প্রাণবন্ত অভিনয়ে, আর অসামান্য শিল্প-সুষমান্বিত নৃত্যে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহকে একইসঙ্গে জীবন্ত আর সম্মোহিত করে রাখলেন শান্তিদেব। অভিনয়শেষে কিছু শ্রান্তি আর অনেকখানি আবেগ উচ্ছ্বাসের কম্পিতকণ্ঠে যখন তিনি বললেন, "আমার যতটুকু যা প্রাপ্তি, সব গুরুদেবের কাছে, সব তাঁর চরণতলে বসে শেখা"—তখন মনে হল যতদূর আমাদের স্মৃতি বিস্তৃত, ততদূর এই রবীন্দ্র-শিষ্যের উজ্জ্বল অনুভব, বিনয়ী ঔদার্য আর আকাশভরা আনন্দ আমাদেরও সঙ্গে সঙ্গে যাবে।

উপলক্ষ, রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশ-এর সাম্প্রতিকতম অভিনয়, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশনের সাহায্য-কল্পে। অনুষ্ঠান সভাপতি ছিলেন অশোককুমার সরকার। সুনির্বাচিত কয়েকটি শব্দে তিনি যেভাবে আচার্য শান্তিদেবের প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তা তাঁর অগণিত শ্রোতারই মনের কথা। একদা রবীন্দ্রনাথ বার বার নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন বিশ্বভারতীর আর্থিক অভাবমোচনের জন্য। কাজেই এবার অন্য এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাহায্যার্থে তাসের দেশ মঞ্চস্থ করা—সেও ওই মহৎ প্রথারই অনুসরণ করে। ব্যবস্থাপকরা এজন্য অকুণ্ঠ সাধুবাদ পাবেন।

তাসের দেশ রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে পড়ে না। এর বক্তব্য একটু চড়া সুরেই উপস্থাপিত। সংলাপ সহসা লঘু হয়ে রুচিকে ঝাঁকুনি দিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের রঙ্গব্যঙ্গ—সাধারণত সেটাও তাঁর অন্যান্য সব কিছুর মত অত্যন্ত উঁচুমানের। এই নাটকে সবদা তা রক্ষিত হয়নি। শব্দের মোচড়ে স্মিত-হাস্যের জন্ম দান যাঁর স্বভাবজ, তিনি হঠাৎ প্রেক্ষাগৃহে সস্তা হর্ষধ্বনির লোভে কিছু করেছেন এটা অবশ্যই নয়। মুহূর্তের প্রয়োজনে সংবাদপত্র যে ভাষার প্রবর্তন করে, সেটার বিরুদ্ধেও বক্তব্য থাকাটা স্বাভাবিক। বিরস শিক্ষাপদ্ধতি অথবা উগ্র-আধুনিক সমাজের কাণ্ড-কারখানা বিদ্রূপের বিষয়বস্তু অবশ্যই হতে পারে। কিন্তু মস্ত বড় দৈত্যের সঙ্গে যিনি লড়াই করতে নেমেছেন তিনি কেন ছোট ছোট ছায়াভূত এড়া

তাসেরদেশে রাজপুত্রের ভূমিকায় শান্তিদেব ঘোষ

মধ্যে ঝিমিয়ে থেকেও কাজের সময় আর জমালেন তা বোঝা শক্ত।

তবে একথা স্বীকার্য এই সব সমালোচনাও কস্তুত নাটকটির ছোট-খাটো বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। মূলে তাসের দেশ শক্ত যুক্তিকর অন্তঃপ্রকৃতি, ভারসাম্যে সুস্থিত। আলো হাওয়ার মত স্বাধীনতায় তার মাথা মহীরুহের অগাধ প্রাকৃতিকতার। অচলায়তন প্রভৃতি নাটকে রবীন্দ্রনাথ যে জীর্ণ সংস্কার, অন্ধ পুনরাবৃত্তি আর বিবর্ণ প্রথার অভ্যাস-শৃঙ্খলের বিরুদ্ধে ঝনৎকার তুলেছেন, তাসের দেশ রচনার পিছনেও সেই একই বিপ্লবী পরার্থচিন্তা কাজ করেছে। দুটি বিষয়ে অর চেয়েও কিছু বেশী। প্রথম, এখানে প্রাণের স্বচ্ছন্দ ধারাকে রুখবার জন্য যতগুলি বাঁধ, সবকে ভাঙতে তো বলা হচ্ছেই। তদুপরি একদিকে ক্ষীণদৃষ্টি শাস্ত্র আর অন্যদিকে স্পর্ধিত অজ্ঞানতা—এই দুয়ের অশুভ মিলনে একটা সমাজের চিত্তের ভিতরে কীভাবে মরুধারা মজে মজে আসে সেটাও শিল্পিত সত্যের আকারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দ্বিতীয় কথাটা এই, একটা ঘুমিয়ে পড়া জাতকে জাগাতে হলে চাই নারীসমাজের সার্বিক মুক্তি। চিন্তাটা নতুন নয়, নতুন হল রবীন্দ্রনাথ যে ভঙ্গীতে সেই বিশ্বাসকে ব্যক্ত করেছেন, নাট্যকার হিসাবে তাকে কাজে লাগিয়েছেন। তাস দ্বীপের রাজা যখন যুগযুগসাঞ্চিত ধারণার সিংহাসনে বসে রাজকীয় অবজ্ঞামিশ্রিত প্রশ্রয়দানের ভঙ্গীতে জানতে চাইলেন বিদেশীদের কোনও আবেদন আছে কিনা, তখন

# THE ECONOMIC TIMES

## The Thinking Person's Paper

focuses its attention on this important subject
with a distinguished list
of
Contributors

Anees Jung
Asha Bhende
Dina Vakil
Geeta Rao Gupta
Hazel D'Lima
Indira Jaising
Indira Mahindra

Kamla Suri
Leela Dubey
Malavika H. Karlekar
Maitreyi Krishnaraj
Mira Savara
Mala Thapar
Meenakshi Apte

Purnima Mane
Rebecca Kostka
Suma Chitnis
vatsala Narain
Vinita Srivastava

Sunday magazine issues of
August 17 and 24, 1980
Order your copies now

**THE ECONOMIC TIMES**
India's largest circulated economic daily.
Simultaneously published from Bombay, Delhi, Calcutta

কল্পনায় স্পর্শ না করে রাজপুত্র জানালেন, আছে, তবে সেটা রাজসমীপে নয়। আছেন তাসরমণীদের কাছে। তারপরই নাটকের এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। শান্তিদেবের কণ্ঠে সেই অনিন্দ্য প্রার্থনা—শান্তপাষাণমূর্তির মত হে সুন্দরীরা, তোমরা আর মূর্তি হয়ে থেকো না। পরমা হয়ে ওঠো। প্রাণবন্ত হয়ে ওঠো। এবং তোমাদের "নয়নে অশ্রু দিক দেখা"! ওই বক্তব্য ওইভাবে রাখতে গিয়ে অমন একটি পংক্তি উদ্ধার—এক রবীন্দ্রনাথই তা পারেন। ওই অশ্রুর আলিম্পন শুধু পাষাণীকে মানবী করবে না, অবিচারী একদর্শী পুরুষকুলকেও মুক্ত দিয়ে যাবে।

সত্যিই রাজপুত্র চরিত্রটি শান্তিদেবকে দেখে নাট্যকার কল্পনা করেছিলেন কি না জানি না। তবে শান্তিদেবকে ছাড়া ওই ভূমিকায় আর কাউকে আজ অন্তত ভাবাও যায় না। বিখ্যাত বিখ্যাত চরিত্রের বেলা—যেমন শেকসপীয়র রচিত চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে—এটা হয়। একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর সঙ্গে এক-একটি ভূমিকা জড়িয়ে যায়। রাজপুত্র আর শান্তিদেব যেন একসূত্রে গ্রথিত হয়ে গেছেন। তাঁর অভিনয় আর গান, দুয়েরই কোনও তুলনা নেই। কিন্তু অত্যন্ত খরদৃষ্টিও অভিভূত হয়ে যায় তাঁর নাচে। রবীন্দ্র-নাট্যের মঞ্চে নৃত্যশৈলী কী হতে পারে, কী হওয়া উচিত, তার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত শান্তিদেবের শিল্প। রবীন্দ্রসঙ্গীতে কথা যেমন অনায়াসে গান হয়ে যায়, শান্তিদেব তেমনই গানের সহজাত আবেগকে নাচের ভঙ্গিমায় রূপান্তরিত করে দেন। কী ব্যঞ্জনাময় মুদ্রা, কী লঘুছন্দের পদক্ষেপ। এতটুকু কাঠিন্য নেই, একাবন্দ্য, দুর্বাধ চেষ্টা নেই। নাচ-গান অভিনয়ের ত্রিবেণীসঙ্গম হয়ে ওঠে মঞ্চভূমি। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও হয়, এই বিশেষ নৃত্যশৈলী কালচক্রে আবার লুপ্তস্রোতা সরস্বতী হয়ে না যায়। এইসঙ্গে বলে রাখা উচিত, রাজমাতার ভূমিকায় স্বল্পসময়ের জন্য চোখের সামনে এসে সু-অভিনয় ছাড়াও অসামান্য নৃত্যরসের আস্বাদ দিয়ে যান সুজাতা মিত্র। স্মরণ করিয়ে দিয়ে যান, ওই কলাক্ষেত্রে তাঁরও দ্বিধাহীন দখল।

সেদিনের অভিনয়ে আর যাঁরা ছিলেন, সেই সব কুশীলবের প্রত্যেকের মাথার উপর চাপানো ছিল বিরাট দায়িত্ব। তাসের দেশ তো শুধু অভিনব মঞ্চ-সজ্জাশ্রয়ী এক নাটক নয়। শুরু থেকেই একটা গতিবেগ নাটকের মধ্যে সঞ্চারিত, যা শেষদৃশ্যে শেষ সঙ্গীতে গিয়ে সমাপ্ত হয়। পর্বে পর্বে তাসদেশের স্তিমিত ধমনী তাকে বিচিত্র করে, গতিকে আটকাতে কিন্তু পারে না। এই গতিকে অনাহত রাখার বিরাট দায়িত্ব যেমন পরিচালক শান্তিদেব এবং প্রযোজক ইলা ঘোষ সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন, তেমনি অভিনেতারাও যে যার নিপুণতা সম্বল করে প্রাণ দিয়ে দাবি-পূরণ করেছেন। তাসের রাজার চরিত্রটি আপাতত কিঞ্চিৎ ব্যক্তিত্বহীন, তবে আপন প্রজাদের প্রতি তাঁর ভালো-বাসাটি মিথ্যা নয়। এই কঠিন

চরিত্রটি রূপায়িত করেছেন সাগরময় ঘোষ নিতান্ত সংলাপের উপর নির্ভর করে নয়। তাঁর প্রারম্ভিক অস্ব-প্রসন্নতা আর অন্তাপর্বের বিভ্রান্তি সুন্দর তুলে ধরেছেন সুবীরময়। তাসের রাণীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু তিনিই দেশে নবীন প্রাণসঞ্চারে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সুপ্রিয়ার অভিনয় অত্যন্ত ব্যক্তিত্বময়।

নাটকের একটি দুরূহ চরিত্র সওদাগরপুত্রের চরিত্র। তিনি রাজপুত্রের সখা এবং ছায়াসহচর। সর্বদা পাদপ্রদীপের আলোয়। কিন্তু রাজপুত্রের তথা শান্তিদেবের প্রবল ব্যক্তিত্বের আড়ালে পড়ে যাবার আশংকা তার সর্বক্ষণ। এই শঙ্কা কাটিয়ে উঠে সহজ ভঙ্গীতে অভিনয় করে গেছেন আলোকময় ঘোষ। রুইতনের সাহেব (শমীক ঘোষ), ইস্কাবনের গোলাম (সাগরময় ঘোষ) দহলা (বিশ্বজিৎ রায়)—এই বিচিত্র তিনটি চরিত্র নিয়ে রবীন্দ্রনাথ মজার খেলা খেলেছেন। এরাই বস্তুত রাজসভার প্রধান তিন রাজপুরুষ। সাহেব তার যৌবনদীপ্তি নিয়ে চলে গেল তাসের দেশে নবীনের প্রতিষ্ঠাযজ্ঞে প্রেমের প্রথম পুরুষ হতে। ইস্কাবনের গোলাম, যিনি তাসদ্বীপপ্রদীপের কট্টর সম্পাদক, এবং রক্ষণশীলতার প্রতীক দহলা পণ্ডিত প্রায় শেষ পর্যন্ত বিরোধিতা করে গেলেন নব্যচিন্তাধারার বিরুদ্ধে। রুইতনের সাহেবের ভূমিকায় শমীক আড়ষ্ট হতে কিছু সময় নিয়েছেন, বিশেষত হরতনীর সঙ্গে মধুর একটি দৃশ্যে। কিন্তু সব মিলিয়ে চমৎকার তাঁর বাচন ভঙ্গী। চেহারা সাজ চলন বলন সব মিলিয়ে সাগরময় ঘোষের ইস্কাবনের গোলাম যেন তুরুপের টেক্কা। একেক বার মনে হয়েছে অসের দেশে রাজপুত্র যে ঝড়টা আনতে চাইছেন, একা গোলাম তা ঠেকাতে চাইছেন সম্পাদকীয় স্তম্ভ দিয়ে নয়, আপন বিশ্বাস আর শক্তি দিয়ে। বিশ্বজিৎ রায় সর্বদা একটি কৌতুকের পরশ দিয়ে কুশলতার সঙ্গে ফুটিয়েছেন দহলা পণ্ডিতকে। শেষতক যখন কালধর্মের কাছে হার মেনেছেন দুই প্রাচীনতার অভিভাবক, তখনও দহলা পণ্ডিত অনুকম্পার পাত্র নন। জনজিৎ রায়, শুভাশিস মিত্র, সুমিত রায় আর তমোজিৎ রায়ের ছক্কা-পঞ্জা-তিরি-দুরি মনে রাখবার মত। রাজপুত্র যখন ইচ্ছার ঘোষক হয়ে ভাঙছেন-গড়ছেন-চলছেন-চালাচ্ছেন, এই চারমূর্তি তখন হাই তোলা আলস্যের শিথিল প্রহরায় জমিয়েছে ভালো।

সুচন্দ্রা বসুর হরতণী যেমন দৃষ্টিনন্দন, তেমনি তার নাচ আর অভিনয় চিত্তগ্রাহী। তার কথনভঙ্গী অত্যন্ত অপ্রতিভ। সারনী বসুর ইস্কাবনী, সুচরিতা ধরের টেক্কানী, শ্রেয়সী বসুর চিড়েতনী, আত্রেয়ী চৌধুরীর দহলানী সুন্দর চরিত্রচিত্রণ। সংলাপের অংশ যে যেমন পেয়েছেন, বলেছেন। এ ব্যাপারে অভিনয়ের

উৎকর্ষ দেখানো অনুকটাই নিয়তি-নির্ভর। তাসের রাজকুমারীদের ভূমিকায় বিপাশা বসু, অনন্যা রায়, সংহিতা ভট্টাচার্যও মানানসই অভিনয় করেছেন।

নাটকের মনোরম আবহ রচনায় গান তার মান রেখেছে। সবাই ভালো গেয়েছেন। তবে তার মধ্যে দীপ্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর সতেজ সুরেলা কণ্ঠ ও স্পষ্ট উচ্চারণে একটির পর একটি সুন্দর গান গেয়ে মন ভরিয়ে দিয়েছেন। 'কেন নয়ন' গানটি সহজে ভোলার নয়। পূরবী চট্টোপাধ্যায়, উন্মনা দত্ত, প্রভাতকুমার পাল, বিজয় কুমার সিংহ ও অশোক গঙ্গোপাধ্যায় একক ও মিলিতভাবে মনোগ্রাহী। মঞ্চ ও সাজসজ্জায় ইলা ঘোষ, সুখময় মিত্র, সুখেন গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিবি রায় নজর দিয়েছেন প্রত্যাশিত উৎকর্ষের সঙ্গে সেই প্রথমদিককার সজ্জার একটা রাখী বন্ধন ঘটিয়ে দিতে। সংগতকার হিসাবে পুলক দত্ত ও শ্রীপাদভল। সহযোগিতায় পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় দায়িত্ব পালনেরও অতিরিক্ত কাজ করেছেন।

দুটি বক্তব্য পরিশেষে রাখতে চাই। মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা ও ব্যালান্সে ত্রুটি ছিল। ছক্কা-পাঞ্জার গান ভেসে এসেছে পিছন থেকে গানের দলের জোরালো মাইকে। আর রাজপুত্রের গান প্রথম কয়েকটি সারির বেড়া ডিঙিয়ে আর যেতে পারছিল না, মিলিয়ে যাচ্ছিল বলে সন্দেহ করি। কিছু ঝোলানো মাইক থাকলে এটা ঘটত না। দ্বিতীয়ত, প্রথম রাজসভায় তাসবংশীয় মহারথীরা যখন ঢুকছেন, তখন বাজনাটা আর একটু গুরুগম্ভীর হলে মানাত ভালো। রাজরানী সভাসদদের নিয়ে যখন মঞ্চে আসছেন, তখন যেন শ্রোতাদেরও আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার ইচ্ছে জাগে।

অরুণ বাগচী ফটো : অলক মিত্র

## প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

### বিকাশ ভট্টাচার্য (১৯৪০—)

কপালে কাটা দাগ কিন্তু ফর্সা সুপুরুষ বিকাশকে দেখলে সেটা চোখে পড়ে না। কিছুদিন আগে পড়ে গিয়ে হাড় ভেঙে লাঠি নিয়ে চলতে হয়েছিল। সেই সময় লাঠি হাতে চলা-ফেরার সঙ্গে মানানসই একটা ফরাসী কায়দার দাড়ি রেখেছিলো। সব মিলিয়ে নায়কের মতো লাগতো।

বিকাশ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে খুবই জনপ্রিয় শিল্পী। ছবি প্রচুর বিক্রী হয়। খ্যাতির একটা বিড়ম্বনা হল, ছবির গুণাগুণ নিয়ে বিতর্কের ঝড় ওঠে। আমি সে প্রসঙ্গে যাব না। সাধারণভাবে তাকে 'স্যুররিয়্যালিস্ট' (সদবাস্তববাদী) বলা হয়। প্রশ্ন হল : তিনি কি সত্যিই তাই? সদবাস্তববাদ একটি শিল্পকলা এবং সাহিত্যের আন্দোলন। ১ম মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালে ফরাসী দেশে এর উৎপত্তি। অভিজ্ঞতার অযৌক্তিক উপস্থাপনা করে মানুষকে শক দিতে চাওয়াই এর প্রধান লক্ষণ। এইসব লেখক শিল্পীদের ওপর ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের প্রভাব, বিশেষত অবচেতনের যুক্তিহীন ভয়াল চিত্রকল্পের প্রতি আকর্ষণ খুবই স্পষ্ট। এক হিসাবে দাদাবাদের সম্প্রসারিত রূপ। স্বপ্ন, লাগাম-ছেড়ে দিয়ে বিকারগ্রস্ত অনুষঙ্গ নিয়ে লেখা বা আঁকার ঝোঁক স্পষ্ট। এছাড়া বুর্জুয়া বিরোধী একটা ব্যাপার ছিল। বিকাশের ছবির মধ্যে সদবাস্তব বিষয় আছে অবশ্য। অবচেতনা এবং দুঃস্বপ্নের জগতের প্রতিবিম্ব আছে। কিন্তু তা এই কলকাতার বস্তি ফুটপাত-বাসী দুঃস্থ, হতভাগ্য রোগজীর্ণ মানুষের ছবি। কখনো অবশ্য বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ নিম্নবিত্ত, বা বিকারগ্রস্থ ধনীও এসেছে। বিকাশ রেনে মাগ্রীট ডালি, বা ভি চিরিকোর মতই কতকটা বাস্তববাদী প্রথাপ্রকরণে আঁকায় সিদ্ধহস্ত। বিকাশের ছবিতে ওলন্দাজ ইস্পাহানী কলমের প্রথাসিদ্ধ রীতি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। এবং অবশ্য ত্রিমাত্রিকতা। অধুনা মানুষের সমূহ সর্বনাশ এবং উন্মাদ দশার প্রতীক রূপকল্প খুঁজতে গেলে একজন প্রথাসিদ্ধ বাস্তব শিল্পী পৌঁছবেন সদবাস্তবতায়।

বিকাশের ছবির বহু অনুষঙ্গ প্রতীচ্যের। ছোট্ট মেয়ের জামাকাপড়, চুলছাঁটা, ভঙ্গী, পুতুল পর্যন্ত। মানুষ এবং মেয়েমানুষ সর্বত্র ভারতীয় পোশাক আসবাবের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ দেশের কিছু এসেছে। ঔপনিবেশিকোত্তর সময় নাগরিক মানুষের জীবন-যাপন, আবাব, পোশাক সর্বত্র যেন দ্বিধারা। এই স্ববৈপরীত্যের টানা-পোড়েন এসেছে ছবিতে। সংকটের চেহারা আঁকতে গিয়ে আতঙ্কে ভয়ে প্রায় পাগল মানুষগুলোকে তিনি এঁকেছেন। হয়তো রচনা বা নির্মাণ এমন কী রঙ সম্বন্ধে ভাবনার চেয়ে তাৎক্ষণিক ধাক্কা মারায় প্রচেষ্টা। প্রথম দিকে অরুণ বসুর মতো তিনি শহরের বাড়ি ঘর ছাদ আঁকতেন। আঁকতেন কপাটে দরজা জানলা। তারপর আকাশে ভাসমান ভয়ার্ত মানুষ এল। এলেন চৌবাচ্চার জলে নিম জমানো মুখ। মন্দিরের গাত্র থেকে সুরসুন্দরী। শেষে বিলাতী পুতুল যেন সজীব হয়ে উঠল। তারপর ক্রমে সকলে কেমন দৃষ্টিহীন হল। যৌবনে আক্রমণ করল জীবাণু। জরা। পেয়ে বসল। কেউ যেন সুস্থ নয়। তীব্রভাবে ছবিতে বলেছেন একথা। প্রতীচ্যকরণ যে উচ্চমধ্যবিত্তদের ভেতরটাকে ফোঁপরা করে দিচ্ছে এটা দেখিয়েছেন বারবার। অ-সুখের জগৎ যেন।

ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের স্নাতক (১৯৬৩) সরকারী চারুকলা মহা-বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। কলকাতা, দিল্লি, বোম্বাই মিলিয়ে প্রদর্শনীর সংখ্যা দশ। ভারতের সর্বত্র এবং বিদেশে যৌথ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। সোসাইটি অব কনটেমপোরারীর সদস্য। দুবার ললিতকলার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন (৭১, ৭২)। আকাদমী ফাইন আর্টস পুরস্কার (৬২); বিড়লা আকাদমী পুরস্কার ('৭২)। ইউসিস, শিপিং কর্পোরেশন, টি বোর্ডের

আহ্বানে এঁকেছেন। নয়াদিল্লির ললিতকলার সাধারণ পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় কর্মসমিতির সদস্য।

**প্রচ্ছদচিত্র** ("আকাঙ্ক্ষার বেলুন" তৈলচিত্র) নীচের দিকে কালো কালো নিরাশ মুখের [illegible] আকাশে বেলুন উড়ছে। আকাঙ্ক্ষার হাত সেটাকে ধরার জন্য বাড়িয়ে দিয়েছে কে যেন, হয়তো সবাই।

ছবিতে মূল বিষয়টি পটে মধ্যস্থলে থাকে। সাধারণভাবে বর্ণলেপ করেন স্তরে স্তরে। তৈলধৌত ক[illegible] উজ্জ্বল করেন। খুব বেশি বর্ণ ব্যবহা[illegible] পক্ষপাতী নন। আলোছায়ার খেলা এ[illegible] বস্তুপুঞ্জের যথাযথ উপস্থাপনের দি[illegible] ঝোঁক। রচনার জ্যামিতি অনেকা[illegible] সরল। চমক শুধু ঘটনায়। মাইক হা[illegible] নিয়ে যে টিভির স্ক্রীনে গাইছে [illegible] অন্ধ। বা টিউব থেকে রঙের নাড়ি[illegible] ঝুলছে একটি শিশু। বা মুণ্ডহীন দে[illegible] ঝুড়িতে আলুর বদলে অসংখ্য মু[illegible] পেনসিল, কালিকলম, প্যাস্টেল—স[illegible] পরিষ্কার হাত। তাঁর ছবির [illegible] আতঙ্কের ছায়াচ্ছন্ন উপত্যকা।

হন করা বা শিহরণ জাগানো ব্যক্তিত্ব যদি চান...

# ম্যাক্স ফ্যাক্টর-এর

## রয়েছে মানানসই ট্যাল্ক আর সাবান

MAX FACTOR
ELECTRIQUE
Talc

**হিপ্নোটিক**
মনমাতানো মনোরম রেশ,
সারা অঙ্গে জাগায় আবেশ
সম্মোহন করা সৌরভ

**ইলেকট্রিক**
ফুলের সৌরভ ভরা,
দিন-ভর মন মাতোয়ারা
শিহরণ জাগানো সুবাস

MAX FACTOR
ELECTRIQUE

HYPNOTIQUE

ম্যাক্স ফ্যাক্টর-এর অনিন্দ্যসুন্দর সম্ভারের তরফ থেকে—

MORARJEE MILLS
ফ্যাশনে বিজয়ী
ফ্যাব্রিক্স
নতুন দশকে
ফ্যাশনের নিজস্ব নিদর্শন
ড্রেস ফ্যাব্রিক্স, স্যুটিংস্, শার্টিংস্ ও শাড়ী।
আসল পলিয়েস্টারে, কটন ও ব্লেণ্ডস্।
দ্য মোরারজী গোকুলদাস স্পিনিং অ্যাণ্ড উইভিং কোম্পানী লিমিটেড,
বম্বে-৪০০০১২।

# নতুন
## লিটলস্‌-এর ফীড়িং বট্‌ল, যা ভাঙেও না ফাটেও না!
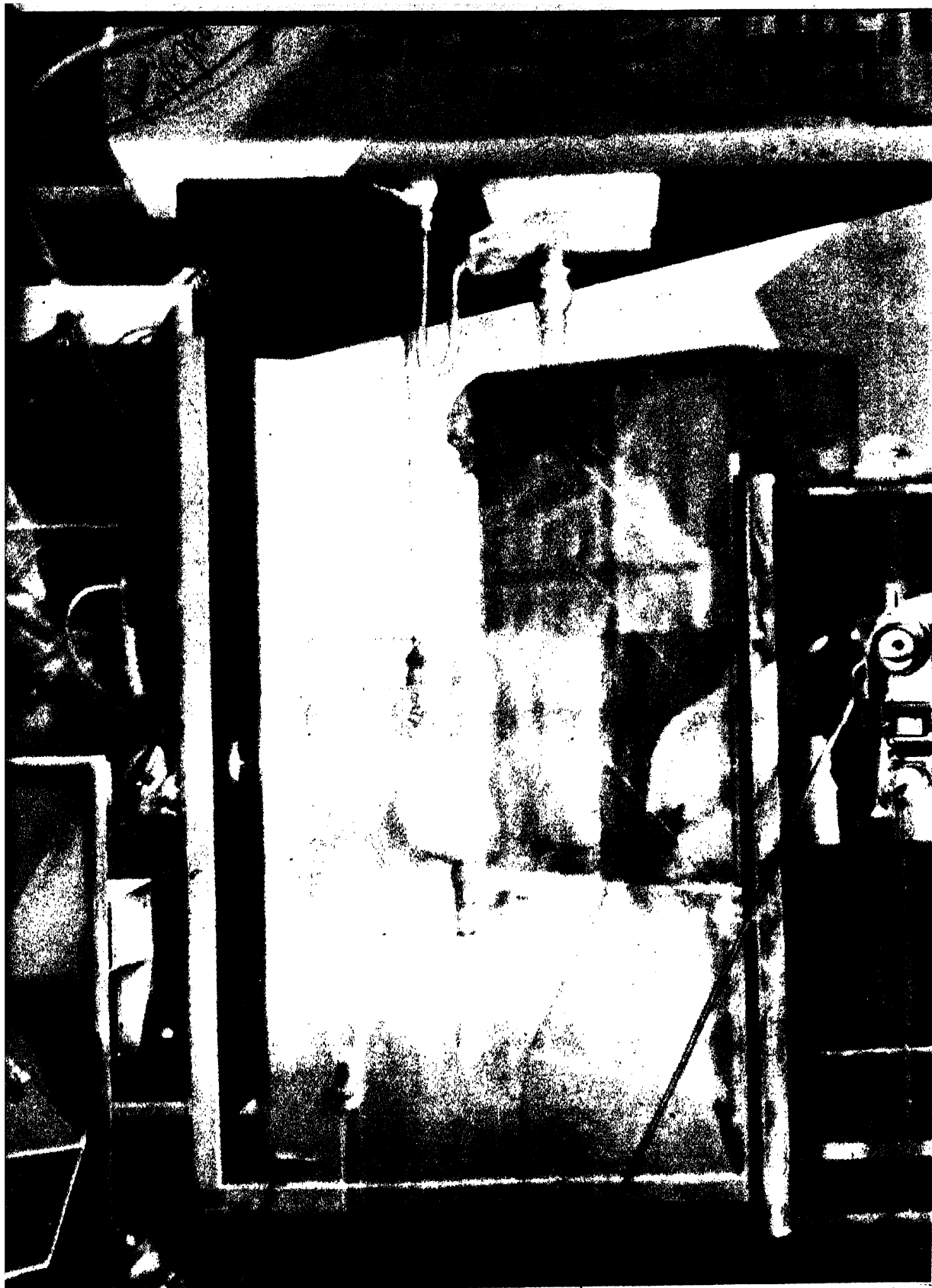
## সবদিক দিয়ে এটি একেবারে অতুলনীয়!

**অতুলনীয় কারণ এটি ভাঙে না।**
লিটলস্‌ হ'ল বিশেষভাবে আমদানী করা পলিকার্বোনেট দিয়ে তৈরী—যা দিয়ে সারা দুনিয়ায় না ভাঙে এমন ফীডিং বট্‌ল তৈরী হয়। এটি একেবারেই জোড়বিহীন আর বেশ পাকাপোক্ত। ভাঙে না, চিড় খায় না— বাচ্চাদের জন্যে খুব সুরক্ষিত।

**অতুলনীয় কারণ এ থেকে একেবারেই চুঁইয়ে পড়ে না।**
দুনিয়ার সর্বোত্তম প্রা[illegible] তৈরী ব'লেই এর সব দিকের [illegible] একেবারে সঠিকভাবে বসে যায়। ধারের মোড়গুলি গোলাকার আর সেজন্যে পরিষ্কার করা খুবই সহজ। এমন কি [illegible] পারে।

[illegible]

ওটিকে চ্যাপটা হতে বা দুমড়ে যেতে দেয় না। উত্তম রবার দিয়ে তৈরী আর খুব টেকসই আর প্রায় ২০০ বার "স্টেরিলাইজ" করা যেতে পারে।

**অতুলনীয় কারণ এটি স্ফটিক-স্বচ্ছ।**
[illegible] স্বচ্ছ রূপ, শুধু দেখতেই অপরূপ সুন্দর নয়, এটি এমনিই সুন্দর।

**অতুলনীয় কারণ এতে একসঙ্গে তিনটি খরিদ হয়।**
লিটলস্‌ এর "[illegible] ক্যাপ" সাধারণ [illegible] জন্যে [illegible] "সীপার", যা [illegible] একেবারে ফিট করে। শক্ত আহার পাতলা ক'রে খাওয়ানোর জন্যেও বট্‌ল-এ লাগানো যেতে পারে!

Babycare that mothers trust
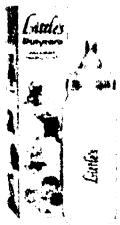
## লিটল্‌স পলিকার্ব ফীডিং বট্‌ল
## সারা দুনিয়ায় সর্বোত্তমের মতই উত্তম।

ULKA-LF-I-80 BEN

## চিঠিপত্র

### স্বাধীনতা হীনতায়

তরুণ দত্তের প্রবন্ধটি (৫ই জুলাই, দেশ) মনকে নাড়া দেয়। নারী স্বাধীনতার নানাদিক নিয়ে আলোচনা করলেও নারীসত্তার প্রকাশের মধ্যেই যে তার স্বাধীনতা হারানর বীজ লুকিয়ে থাকে সে কথা এভাবে বোধ হয় মেয়েরা নিজেরাও ভাবে না। তাই যে নারী ব্যাপক অর্থে স্বাধীনা সেও তার emotional conflict-এর কাছে পরাস্ত পরাধীনা। প্রতি-নিয়ত 'মুখ' আর 'মুখোশে'র দ্বন্দ্ব তাকে ক্লান্ত করে তোলে। মনো-মোহিনী, মনতোষিণী রূপ কি তার কাম্য না জগৎকে নিজের জোরে যাচাই করে নেওয়াতেই সত্যিকারের তৃপ্তি এ দোটানায় পড়ে অনেক সময় তার ভাবনায় আর কাজের সঙ্গতিও থাকে না।

প্রকৃতি যখন তার বিপক্ষে তখন শুধু পুরুষের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে তথাকথিত নারী স্বাধীনতার জিগির তোলার স্বার্থকতাই বা কোথায়॥ নিজেকে বুঝে নিয়ে তবেই তো বোঝাতে হবে যে পুরুষের পছন্দ বা অত্যাধিক মনোযোগ অনেক সময় মেয়েদের কাছে 'দম আটকানির' মতন কষ্টকর। পুরুষ নারীর মনকে বুঝে তার ইমোসানের মর্যাদা সঠিকভাবে না দিতে পারলে নারীর এই আক্ষেপ মিটবে না। কিন্তু নিজেকে পুরোপুরি প্রকাশ করার সাহস, সংগতি বা মানসিক প্রস্তুতি ক'জন মেয়ের থাকে?

সবিতা গুহ
চুঁচুড়া

॥ ২ ॥

তরুণ দত্তের প্রবন্ধ "স্বাধীনতা হীনতায়" পড়ে ভালো লাগল। কিন্তু দু-একটি ক্ষেত্রে বোধ হয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে। যেমন তাঁর প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন: "পনের ষোলো বছরের বালিকা আর দ্বিগুণ বয়সী পুরুষেরা বন্ধু হিসেবে নির্ধারিত হলে সমাজ আলো জ্বালিয়ে শাঁখ বাজায়, খুশী, উৎসব করে এবং ওই নায়ক নায়িকার বয়স উলটিয়ে দেওয়া মাত্র—উৎসব নিবে ভূমিকম্প হতে থাকে।" তরুণ-বাবুকে সবিনয়ে বলি, এই অংশটি পড়তে বা শুনতে খুবই ভালো লাগে এবং কাব্যিকও। কিন্তু পুরোপুরি সত্য কী? আমার নিজেরই চোখে দেখা এবং শোনা কয়েকটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি যে অল্প বয়স্ক কিশোরের (পনের বছরের ছেলে নিশ্চয়ই বালক নয়) সঙ্গে তার দ্বিগুণ বয়সের নারীর বন্ধুত্ব একেবারে অপ্রতুল নয়। এমন কী একটি কিশোর এবং একজন পূর্ণ বয়স্কা নারীর মধ্যে বিবাহও আমার চোখে দেখা। এবং হয়ত আমার মত আরো অনেকের। সেক্ষেত্রে কেউ কেউ আড়ালে মুখটিপে হাসলেও তাদের সামাজিক সহযোগিতা

থেকে বঞ্চিত করেনি। ভূমিকম্প তো একেবারেই স্বপ্ন কল্পনা।

শ্যামল কুমার বিশ্বাস
শ্যামনগর

## পরীক্ষা প্রহসন

গত ২৮শে জুন-এর 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয়ের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রহসন নিয়ে লেখা প্রবন্ধ পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। সরকারী কর্মচারী হিসেবে নয়, অভিভাবক হিসেবে আমি উচ্চমাধ্যমিক কাউন্সিলের কাছ থেকে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই। আমরা সকলেই জানি যে, দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন অংশে ইংরাজী দ্বিতীয় পত্র পুরোপুরি জেনে অনেক ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছে। কেবল কলকাতা নয়, প্রদেশের বহু জায়গা থেকেই একই অভিযোগ এসেছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এ ব্যাপারে বহু অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীর চিঠিপত্র ছাপিয়েছে। অথচ মজার ব্যাপার হলো, সংসদ কর্তৃপক্ষ এসব অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য জেনেও নানা অজুহাতে তা মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য ব্যগ্রতা দেখাচ্ছেন।

এতদিন আমরা জেনে এসেছি যে, দিল্লীর একটি ছাপাখানাতেই যত গোলমাল হয়েছে। একথা বহু লোকই জানেন না যে, কীর্তিনগরের পার্ল অফসেট প্রেস-এ কেবলমাত্র পদার্থ-বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও অংক-র প্রশ্ন-পত্র ছাপা হয়েছিল। তাই যদি হয় তবে ইংরাজীর প্রশ্নপত্র ফাঁস হলো কোথায়? কিভাবেই বা তা ফাঁস হলো? এসব প্রশ্নের জবাব অভিভাবক হিসেবে আমরা অবশ্যই চাইতে পারি। আমরা যদি একথা ভাবি যে, একটিমাত্র ছাপাখানাকে দোষী করে আরও অনেক দোষীকে নির্দোষী করানো হচ্ছে তবে কি ভুল ভাববো?

আরেকটা প্রশ্নের জবাবও আমি বার করতে পারিনি। এত সরকারী ছাপাখানা থাকতে হঠাৎ বেসরকারী ছাপাখানায় সংসদ কর্তৃপক্ষ কেন গেলেন? সরকারী নিয়মানুযায়ী সরকারী স্কুল-কলেজের পরীক্ষার প্রশ্ন সরকারী ছাপাখানাতেই ছাপানো হয়। সংসদে সরকারী প্রাধান্য অনস্বীকার্য। এক্ষেত্রে তো সরকারী ছাপাখানার আশ্রয় নেওয়াই স্বাভাবিক ছিল। হঠাৎ সংসদ বেসরকারী ছাপাখানার সাথে চুক্তিবদ্ধ কেন হলেন? এতে কি কোনও ব্যক্তি-গত বা সমষ্টিগত স্বার্থ জড়িত আছে?

রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা-৩১।

## তাল : ধামার

দেশ পত্রিকার ২৮শে জুন সংখ্যায় শ্রীসুভাষ চৌধুরী গত ২৫ ও ২৬শে মার্চ রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অবনমঞ্চে অনুষ্ঠিত দু দিন ব্যাপী তাল সম্বন্ধীয় আলোচনা সভার সমালোচনা করতে গিয়ে 'ধামার' তাল সম্বন্ধে আমার

ব্যাখ্যায় ৩/৪/৩/৪ এই বিভাগ মেনে নিতে পারেননি। তাঁর মতে ৫/২/৩/৪-এর বঙ্কিম গতিই ধামারের বৈশিষ্ট্য। "না হলে রূপক বা তেওড়ার সঙ্গে ধামার-এর পার্থক্য কোথায়?" এটাই ওঁর বক্তব্য। এই সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য জানাতে চাই।

প্রথম কথা ধামার-এর তাল-ভাগ সম্বন্ধে দুটি মত প্রচলিত আছে। একদল বলেন ৫/২/৩/৪ আর একদলের মত ৩/৪/৩/৪। কোন তালের গঠন-বিভাগ সেই তালের ঠেকার বাণীর ওজন দ্বারা সুনির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ ঠেকার বর্ণগুলি এমনভাবে সাজানো হয় যা শুনে সমগ্র তালটির চিত্র পরিস্ফুট হয়। সেই হিসাবে ধামার-এর ৩/৪/৩/৪ ভাগটিই মন মানতে চায়। তালের ষষ্ঠ মাত্রার যে 'ধা' আছে তাকে অযথা জোরে বাজিয়ে হয় তো ৫/২/৩/৪ মাত্রা বিভাগকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় কিন্তু তা স্বাভাবিক শোনাবে না। রূপক বা তেওড়ার সঙ্গে "ধামার" তালের পার্থক্য নিশ্চয় আছে।

(এক) রূপক ও তেওড়া সাত মাত্রার তাল। ধামার চৌদ্দ মাত্রার তাল।

(দুই) রূপক তবলার তাল। "ধামার" পাখোয়াজের। কোনও পাখোয়াজবাদক যদি পাখোয়াজে রূপকের ঠেকা বাজান, শুনেই বোঝা যাবে ও তাল পাখোয়াজের নয়। সেই একই কথা বোল বাণীর ওজন।

(তিন) উত্তর ভারতীয় সংগীতে একই সংখ্যক মাত্রাবিশিষ্ট বিভিন্ন তালের প্রচলন আছে। কেবল মাত্রা-বিভাগের তারতম্য তাই একটি তাল থেকে অপর একটি তালের পার্থক্য বোঝায় না। প্রত্যেক তালের একটি নিজস্ব গতি আছে। যেমন অতি বিলম্বিত ষোল মাত্রার তাল বাজালে ত্রিতাল-এর বদলে তিলুয়াড়া বাজানো সুবিধজনক। যে কারণ ঝুমরা অতি বিলম্বিত লয়ের তাল কিন্তু আড়াচৌতাল চৌদ্দ মাত্রার মধ্য-বিলম্বিত, মধ্য, মধ্যদ্রুত ও দ্রুত লয়ের তাল। সেইভাবে তেওড়া বা রূপক মধ্য বা মধ্য-দ্রুত লয়ের তাল। কিন্তু 'ধামার' বিলম্বিত বা মধ্য-বিলম্বিত লয়ের তাল।

সনৎ কর কলকাতা-২৬

## মণিপুরী নৃত্য

৭ জুন তারিখের দেশ পত্রিকায় মণিপুরী নৃত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ নৃত্যরীতিতে 'তালের কারুকার্যে বাহাদুরী ও সৌকুমার্য ছাড়িয়ে দাপাদাপি' সম্পর্কে আলোচক কিছু মন্তব্য করেছেন। মণিপুরী নৃত্যে যাঁরা তালের গুরুত্ব বোঝেন তাঁরা কোন সময়েই উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষণ পাওয়া মণিপুরী নৃত্য শিল্পীর তাল দক্ষতাকে বাহাদুরী নেওয়া বলে মনে করেন না।

মণিপুরী নৃত্যে লাস্য হবে সুকুমার এবং তাণ্ডব হবে সুকুমার ও শৌর্যে

...প্রণে। লাস্য যে সব সময়েই ধীর, শান্ত হবে তা নয়, কারণ, পুংলোল জগোইয়ের (বোলের নাচ) ক্ষেত্রে বোল যে লয়ে থাকবে নাচও সেই লয়ে হবে। মধ্য, বিলম্বিত ও দ্রুত হিসাবে। এবং ভাব রস অনুসারে পরিবর্তন হবে। লাস্যের থেকে তাণ্ডবকে উল্লম্ফনের দ্বারা ভেদ করা হয়। তাণ্ডবে উল্লম্ফনেরই প্রাধান্য, যেমন—উপ.লই, বাগচোংবা, লোংক্লৈ মাতেক; মাল হুনবা (ডিগবাজীর মত) ইত্যাদি বহুপ্রকার উল্লম্ফন আছে। এছাড়া তাণ্ডব চেলোম (চলন) এর ক্ষেত্রে 'লোংগুল' বলে একটি অঙ্গ সঞ্চালন আছে, লোংগুল অর্থে উপুড় এবং চিৎ হয়ে লাফিয়ে ঘূর্ণিবেগের মতো ঘুরে যাওয়া। এগুলিকে 'সৌকুমার্য ছাড়িয়ে দাপাদাপি' বলে না, এর দ্বারা তাণ্ডবের লক্ষণ দর্শিত হয়। অপর-দিকে উদুখল রাসে কংসবধে, গোষ্ঠলীলায় বকাসুর, ধেনুকাসুর বধে, কালীয়দমন ইত্যাদি ক্ষেত্রে কি সুকুমার তাণ্ডব প্রযোজ্য? আজকাল মণিপুরী ব্যালেতে 'থাংতা' অর্থে অসি এবং বল্লমের প্রাচীন নৃত্যকেও কথা ও রস অনুযায়ী ব্যবহার করা হচ্ছে। রস ও ভাব অনুযায়ী তাল, লয়, বোল ও উপযুক্ত অঙ্গ সঞ্চালন সংযোজন হবে। তালের ও নৃত্যের সূক্ষ্ম ও জটিল বিন্যাস না আয়ত্ত করলে যে মণিপুরী নৃত্যের সমস্ত নিবেদনই মিথ্যে হয়ে যায়। তালের ক্ষেত্রে কোকিলপ্রিয়, গজেন্দ্রগুরু, বীরদশক, বীরবিক্রম, পঞ্চম তাল, সপ্তমাত্রা রূপকতাল, ৫৪ মাত্রা শূলতাল, রুদ্রতাল ইত্যাদি বহু তাল এক মাত্রা থেকে আটষট্টি মাত্রা পর্যন্ত মণিপুরে প্রচলিত আছে। এছাড়া শালগ, সঙ্কীর্ণ (ফেরতাল) ভেদেও বহু তাল আছে। এবং তাল প্রবন্ধও অনেক আছে।

সুকুমার মিশ্রিত শৌর্য তাণ্ডবকে মণিপুরী নৃত্যে দাপাদাপি বলে না। আজকাল কলকাতায় কিছু অক্ষম গুরুর প্রশিক্ষণের জন্য তাদের সূক্ষ্মতা ও নৃত্যের তাণ্ডবটাই কারু-কার্যের বাহাদুরী বা দাপাদাপি হয়ে ওঠে। বর্তমানে কলকাতায় একথা প্রচলিত হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের সংগে নাচে ঘুংগুর পরা নিষেধ। কিন্তু গুরুদেবের সহিত নৃত্যশিল্পীদের এমন অনেক ছবি আছে যাতে পায়ে চওড়া করে ঘুংগুর বাঁধা আছে।

কুঞ্জ সিংহ
কলকাতা-১২

## গোপালদাস মজুমদার

স্বর্গত গোপালদাস মজুমদার সম্পর্কে যে সুন্দর রচনাটি প্রকাশিত হয়েছে তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। তবে সামান্য একটি ভুল আছে। গোপালবাবুর জন্মস্থান যশোহর জেলার ঝিনাইদহ, রংপুর নয়। রংপুরে স্কুলে পড়াশুনা করেন।

অমূল্য গোপাল মজুমদার
কলকাতা-৬

দেশ ৪৭ বর্ষ ৪১ সংখ্যা
২৪ শ্রাবণ ১৩৮৭

সম্পাদকীয়

## সূচীপত্র



### পরবর্তী আকর্ষণ

প্রভাস সেন ও
পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রবন্ধ, প্রসঙ্গ
রামকিঙ্কর বেইজ
চিত্তব্রত পালিতের প্রবন্ধ
ঠাকুরে বাঙালীর চরিতকথা
সুমন চট্টোপাধ্যায়ের নিবন্ধ
রোল রাফ : এক অ-সাধারণ লেখক
সমীর মুখোপাধ্যায়ের গল্প
চিরদিনের গান
শিবানী চৌধুরীর ভ্রমণকাহিনী
আজকের মেসোপটেমিয়া

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে
বাদ্যাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮
সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ এবং
জীবনসত্তা প্রিন্টিং হাউস ১৩ প্রফুল্ল সরকার
স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ১৫ পয়সা.
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

# আইন শৃঙ্খলা

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার অনেক ব্যাপারেই স্পর্শকাতর। বিশেষ করে কেউ যদি এই রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার কথা তোলেন, সরকার সঙ্গে সঙ্গে ধরে নেন এ-সব অভিযোগ উদ্দেশ্যমূলক। বামফ্রন্ট সরকার বরং বলে থাকেন, এই রাজ্যে যতটা আইন শৃঙ্খলা, শাসন ও নাগরিক শান্তি বজায় আছে অন্য কোনো রাজ্যে তা নেই। আসলে যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলার অবনতির কথা তোলেন তাঁরা চান দিল্লি একটা ছুতো ধরে এখানকার রাজ্য সরকারকে বাতিল করুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যা মনে করেন করুন কিন্তু এই রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার যে দ্রুত অবনতি ঘটছে তাতে সন্দেহ করা চলে না। চলে না যে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ আশি সালের প্রথম চার মাসে হাঙ্গামার সংখ্যা দু'শো নয়টি। সরকারীভাবে এই সংখ্যা সমর্থিত, মনগড়া বা বানানো সংখ্যা এটি নয়। পরের তিন মাসে হাঙ্গামার সংখ্যা কত তা অবশ্য এখনও সরকারীভাবে জানা যায়নি। কিন্তু কংগ্রেসী তরফ থেকে এক হিসেবে—দু'শোর মতন বলা হয়েছে। এটি কি বেশী? খবরের কাগজের পাতা খুললে প্রত্যহ কম করেও তিন চারটি করে এই ধরনের খবর দেখা যায়, অর্থাৎ প্রতি মাসে মোটামুটি একশো-টি ঘটনা ঘটছে। মনে রাখতে হবে, আমরা প্রধানত যে খবর পাই—তা শহর কলকাতার এবং আশেপাশের, ছোট শহর, গ্রামগঞ্জের খবর কদাচিত কাগজে প্রকাশ পায়। কেননা তা জানার সুযোগই হয় না।

কলকাতা কিংবা কলকাতার কাছাকাছি এলাকা গোটা পশ্চিমবঙ্গ নয়। তবু যদি আমরা কলকাতার দিকে তাকাই—দেখতে পাব, খুন, চুরি ডাকাতি, ছিনতাই, গাড়ি চুরি, পাড়ায় হাঙ্গামা বেড়েই যাচ্ছে। কিছুকাল আগে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু স্বীকার করেছিলেন, সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। তিনি পুলিসকে কঠোর হতে নির্দেশও দিয়েছিলেন। এবং এ-কথাও বলেছিলেন, এ-ব্যাপারে রাজনৈতিক দলের মুখের দিকে তাকালে চলবে না। যতদূর মনে পড়ে সেই বৈঠকে থানায় থানায় পুলিস বাড়ানো, ফাঁড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি করা, ফৌজদারি আইনের কোনো কোনো ধারা সংশোধনের কথাও উঠেছিল।

কাগজে কলমে যা যা করণীয় করা হলেও বাস্তবে কী হয়েছে আমরা জানি না। খুন কমেনি। ডাকাতি যে-হারে চলছিল সেইভাবেই চলছে। আর পুলিসের কাজকর্মের বহর দেখে এখন জনসাধারণ নিজেরাই ডাকাত ধরতে মালকোঁচা মেরেছেন। কাজটি নিশ্চয় প্রশংসার, কিন্তু কে বলতে পারে এই উৎসাহ থেকে অন্য কিছুর উদ্ভব ঘটবে না! যার কাজ তারই সাজে অন্য লোকের লাঠি বাজে—এই গ্রাম্য প্রবচনটি একেবারে অর্থহীন হয়ত নয়।

বামফ্রন্ট সরকার যতই কেননা আত্মপ্রসাদ অনুভব করুন, কলকাতা ও শহরতলির দিকে তাকালে আমাদের নিশ্চিন্ত হবার কোনো কারণ ঘটে না। এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, রাজনৈতিক বিরুদ্ধ দলের মধ্যে রেষারেষি বেড়েই চলেছে, হাঙ্গামাও। সমাজবিরোধীরা এই হাঙ্গামার বাইরে থাকে না, অধিকাংশ সময়ে তারাই হয়ে ওঠে প্রধান। কোনো রাজনৈতিক দলই এদের প্রতি কঠোর হন না। হলে হাঙ্গামার সংখ্যাও কমত। ডাকাতি, লুঠ—এমন কি ট্রেনে প্রত্যহ যে ছিনতাই হয়—তার সংখ্যাও কমানো যেত যদি পুলিস দায়িত্ববান ও কর্ম-তৎপর হতেন, যদি সমাজবিরোধীদের দিকে নজর দিতেন তীক্ষ্ণভাবে।

এ-প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার। শিল্পাঞ্চলের পরিবেশ সম্প্রতি রীতিমত আতঙ্কজনক হয়ে উঠেছে। চা বাগানে, কয়লা খনিতে, কারখানায় ও অন্যান্য শিল্পাঞ্চলে প্রায় প্রত্যহই হাঙ্গামা ও খুনোখুনি হচ্ছে। আই এন টি ইউ সি-র পশ্চিমবঙ্গ শাখা তো স্থিরই করেছেন তাঁরা এইবার এক ব্যাপক আন্দোলন শুরু করবেন এই কারণে যে, সরকার দেখেশুনেও শিল্পাঞ্চলের বিশৃঙ্খলা রোধ করার কোনো চেষ্টা করছেন না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার দাবী করেন, তাঁরা সুদক্ষ ...সক এবং শাসন পরিচালনায় আপন পর ভেদ করেন না। দুঃখের বিষয়, এই রাজ্যের নানা বিশৃঙ্খলার ঘটনা সম্পর্কে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো সত্ত্বেও তিনি অন্য দলের নেতাদের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে চান না। মুখ্যমন্ত্রী নিজে যদি এ-বিষয়ে কর্ণপাত করতে না চান তবে অন্য কে করবে! আর এ-কথা ঠিকই, সরকারী তরফের সমর্থকদের প্রশ্রয় এতে বেড়ে যায়, বিশেষ করে যেখানে অভিযোগ মাত্রই মিথ্যা নয়।

গ্রামাঞ্চলের কথাও আমরা বাদ দিতে পারি না। গ্রামের দিকে পুলিস আরও বেশী নিষ্ক্রিয় এমন অভিযোগ অনেকেরই। বামফ্রন্ট সরকারের কাজকর্মে সাধারণ মানুষ যে আতঙ্কিত হননি এমন নয়। তার একটি প্রমাণ পঞ্চায়েত নির্বাচন। সি পি এম ও তাঁর সহযোগী দলের নেতারা মুখে যাই বলুন, মনে মনে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন—যে কয়েকটি মুখ্য কারণে তাঁদের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা কমেছে তার অন্যতম দুটি কারণ হল, অরাজকতা ও দুর্নীতি।

বামফ্রন্ট সরকার যদি আত্মতুষ্ট থাকতে চান থাকুন—কিন্তু এই নির্বিকার মনোভাব তাঁদের শাসন দক্ষতার প্রমাণ নয়।

ব্যাঘ্র যে সংরক্ষিত প্রানী তা ত
জানি। কিন্তু সিংহের ব্যাপারে
ইন্দিরার তেমন মমতা আছে মনে হয় না।
শেখ আবদুল্লা

# পুরুলিয়ার ঝুমুর ও ঝাড়খণ্ডী কীর্তন

## রাজ্যেশ্বর মিত্র

ঝুমুরগান সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই; কিন্তু বহু ভ্রান্ত ধারণা বর্তমান। এর কতকগুলি কারণ আছে। প্রথমত ঝুমুর রাঢ়ের যে অঞ্চলে প্রচলিত সে অঞ্চল সম্বন্ধে আমরা দীর্ঘদিন আগ্রহ পোষণ করিনি। দ্বিতীয়ত, ঝুমুরের উৎস পুরুলিয়া ও মানভূম, এতাবৎকাল পশ্চিমবঙ্গের বাইরেই ছিল, এবং একমাত্র চাকুরি বা ব্যবসা ছাড়া এই জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলের আদিবাসী বা বঙ্গভাষীদের মধ্যে আমাদের অনেকের গতিবিধি ছিল না। অপরপক্ষে এ অঞ্চলের [illegible]নতী মানুষেরা স্বভাবতই কিছুটা অমিশুক; এত দূরবর্তী স্থান থেকে বহু অসুবিধা সহ্য করে সঙ্গীত-প্রচারের জন্য নিম্নবর্তী অঞ্চলে এঁরা আসতে অনিচ্ছুক এবং তার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেন না। তবে অনেক দরিদ্র শ্রেণীর লোক চাষের কাজে বা মজুরীকর্মে হুগলী, হাওড়া জেলা পর্যন্ত এসে অনেকদিন থাকেন। কেউ কেউ পাকাপাকিভাবে থেকেও যান, তবে অধিকাংশই ফিরে যান। এঁদের কণ্ঠে অনেক সময় পুরুলিয়ার খাঁটি ঝুমুর শোনা যায়। এঁরা যে অবসর সময় ঝুমুর গানের চর্চা করেন, তা এঁদের গান শুনলে বোঝা যায়। তৃতীয়ত, পুরুলিয়া অঞ্চলের সঙ্গে এতদঞ্চলের ভাষাগত ব্যবধানও বেশ কিছুটা আছে। উৎকৃষ্ট ঝুমুর বৈষ্ণব পদাবলীর ধারায় রচিত এবং ব্রজবুলি বা ছোটনাগপুর অঞ্চলের মিশ্রভাষায় রচিত হয়েছে। এই সব ভাষা বা ধরন অনেকের কাছে সুপরিচিত নয়। ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে এই যে, ঝুমুর নামক গানের উল্লেখ হলেই, আমাদের একপ্রকার চটুল গানের কথা মনে হয়,—যা খেমটার সমগোত্রীয়। ঝুমুরকে আমরা সাধারণত এমন একটা শ্রেণীর গান বলে মনে করি, যা ইতর সমাজের ব্যক্তি ও বেশ্যাদের মধ্যে প্রচলিত। এই স্ত্রীলোকেরা একদিকে দেহব্যবসায়ে লিপ্ত থাকে, অপরদিকে এমন নৃত্য ও গীতে অভ্যস্ত, যার মধ্যে যৌন আবেদনই প্রধান। কবিগানের ধরনে এদের মধ্যে দুই দলে প্রতিযোগিতা চলে থাকে এবং তা অতিশয় অশ্লীল পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়। তারাশঙ্কর, তাঁর 'কবি' উপন্যাসে এই সমাজেরই বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু এদেরও আজকাল আর গ্রাম্য মেলা বা উৎসবে দেখা যায় না; কবিদের মত, এদেরও অচিরেই বিলুপ্তি ঘটেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। সম্ভবত পুরুলিয়া অঞ্চলের বিখ্যাত 'নাচনি' সম্প্রদায়ের এঁরা একটা অধঃপতিত শ্রেণী। ক্রমে, এই নর্তকীরা ঘটনা-বিপর্যয়ে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে এবং উচ্চাঙ্গ নৃত্যপটুত্ব থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু, যথার্থ নাচনি-নাচ আজও এ অঞ্চলে বর্তমান। কিছুকাল পূর্বেও এঁদের গুরু 'রসিক' নামে পরিচিত যাঁরা ছিলেন, তাঁরা উচ্চশ্রেণীর নৃত্য ও গীতে দক্ষ ছিলেন; নাচনিদের মধ্যেও অনেকে ছিলেন, যাঁরা এই সব আর্টে সমানভাবে কৃতী ছিলেন। যথার্থ নাচনি-নাচে দেখা যায়, নৃত্য যেন একান্তভাবে অন্তর্মুখী হয়ে ওঠে। ভাবে এবং রসে এঁরা যেন আপাদমস্তক আপ্লুত হয়ে যান। দর্শকেরাও একইভাবে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে নৃত্য এবং ঝুমুরগীতি শুধু উপভোগই নয়, উপলব্ধি করতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে, ছোটনাগপুর, মানভূম এবং রাঢ়ের তথাকথিত রাজারাজড়া, অর্থাৎ জমিদার শ্রেণীরাই বহুদিন পর্যন্ত এঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছিলেন, যার ফলে বৈঠকী ঝুমুরও এঁদের মাধ্যমে রক্ষিত হয়েছিল। আজ, সেটা আর অনেকের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নয় এবং সেই শ্রেণীও আর তেমন গৌরবে অধিষ্ঠিত নেই। তথাপি, এই শিল্পকে ধরে রাখবার একটা যথার্থ প্রয়াস এখনও লক্ষ্য করা যায় এবং অশীতিপর বৃদ্ধ সুচাঁদ মাহাতো আজও বর্তমান। গত এপ্রিল মাসে তাঁর গান এবং ভাষণও শুনে এসেছি পুরুলিয়াতে। নাচনি-নাচও অবলুপ্ত হয়নি, বরঞ্চ কোনও কোনও স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তি এই নৃত্যের শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরবার জন্য যত্নবান হচ্ছেন,—এরকম শুনেছি।

অবশ্য, প্রকৃত ঝুমুর সম্বন্ধে অনেকে অবহিত না হলেও একদা ঝুমুরের পরিধি কম বিস্তৃত হয়নি। অষ্টাদশ শতকেই ঝুমুর ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয় এবং বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, এমনকি মুর্শিদাবাদেও এর প্রসার এতটা দেখা যায় যে মনোহরসাই কীর্তনরীতিতেও এর অনুপ্রবেশ ঘটে। আজ যাঁরা মনোহরসাই ঢঙের কীর্তন গান করেন, তাঁদের গান যদি বিশ্লেষণ করা যায় তা হলে ঝুমুরের গায়কী অনেকটাই ধরা পড়বে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গোবিন্দদাসের ভণিতাযুক্ত পদ,—নাপিতানী বেশে রাধিকার কাছে শ্রীকৃষ্ণের আগমন বা যদুনাথদাসের পদ,—'সখি সঙ্গে বিনোদিনী কৃষ্ণ আলাপনে, হেনকালে শ্যামের বাঁশি বাজিল বিপিনে', অথবা বাণেশ্বর রায়ের একাধিক পদ সম্ভবত বৈঠকী ঝুমুর থেকেই মনোহরসাই কীর্তনে প্রবর্তিত হয়েছে। দুঃখের বিষয়, বহু কীর্তনীয়াই ক্লাসিকাল ঝুমুরের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত নন। বোধ করি, এখবর অনেকেই রাখেন না যে বিদ্যাপতি থেকে বৈষ্ণব পদাবলীর যে ধারা মিথিলায় সংরক্ষিত ছিল, তা

ছো-নৃত্যের একটি দৃশ্য

দ্বারভাঙা, তিরহুত অঞ্চল থেকে সন্নিহিত ঝাড়খণ্ডে প্রবেশলাভ করে এবং ক্রমে এই পদাবলী গান এই অঞ্চলের চর্চা ও পরিশীলনে এমন একটি রূপ পরিগ্রহ করে, যে সেই ধারাটিই 'ঝাড়খণ্ডী রীতি' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। খুব প্রাচীনকালে প্রচলিত ঝুমুরের অস্তিত্ব আজ আছে কিনা সন্দেহ, তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বহু উৎকৃষ্ট ঝুমুর পদাবলী রচিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে একজন প্রধান ছিলেন রাঁচি জেলার সিল্লীর রাজপরিবারের বিনন্দ সিংহ। ইনি এই অঞ্চলের ভাষাতে ঝুমুর রচনা করেন। বাঘমুণ্ডির গৌরাঙ্গ সিং (গৌরাঙ্গিয়া দাস) নাকি এঁরই সমসাময়িক ঝুমুর-রচয়িতা। বিনন্দ সিং আনুমানিক ১৭৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন বলে ধারণা করা হয় ("ছোটনাগপুরের মহাকবি শ্রীবিনন্দ সিং—সিল্লী"—জ্যোতিলাল মহাদানীর হিন্দী রচনা থেকে অনুবাদ করেছেন শ্রীনরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়;—'ছাত্রক', শারদীয়া সংখ্যা ১৩৮৩)। তাঁর একটি পদ, অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত-রত্নাকর', দ্বিতীয় খন্ড থেকে উদ্ধৃত করছি :

কানাই (কানাফুল) ফুটত আশা লাগেরে সজনী  
এথারে আওত ভয়া (ভাগ্য) মোর।  
কানাই উড়ত আশা ছুটে রে সজনী,  
নোইরে আওত ভয়া মরি।  
বিনন্দ সিংহ বলে ঝুমুরি বানাইবো বলে  
কানাই উড়ত ছুটত রজনী  
এবে রে আওত ভুয়া মোর।

এইটি বোধ করি পাঁচ পরগনার ভাষা, যাতে বিনন্দ সিংহ সাধারণত গান রচনা করতেন। 'কানাফুল' যে পুষ্পজগতের কোন বস্তু, তা অবশ্য এই লেখকের জানা নেই।

একেবারে এ-যুগের একজন প্রবীণ পদকর্তা ছিলেন বৈদ্যনাথধামের ভবপ্রীতানন্দ ওঝা। এঁর পূর্বপুরুষের বাসভূমি ছিল মিথিলায়। ইনি বাংলা জানতেন এবং বাংলা, ব্রজবুলি ও হিন্দীতে প্রচুর পদ রচনা করে গেছেন। এঁর রচনায় বিদ্যাপতির প্রভাব অসামান্য। বোধ করি, তাঁর আদি নিবাস মিথিলাকে স্মরণ করেই তিনি বিদ্যাপতির ধারায় উৎকৃষ্ট ঝুমুর রচনা করেন। তাঁর একটি গান (গানটি অবশ্যই ঝুমুর)—

বরষা আগত ভেল মেঘেতে বিজুরি খেল  
মাতি গেল যত শিখিকুল গো  
হরিশূন্য হইল গোকুল।  
বরষিছে জলধারা নিশিশশী তারাহারা  
শ্যামহারা-গোপিনী গোকুল গো,  
পিয়াল তরুশোভিত শীতবায়ু প্রবাহিত  
বিকশিত মালতী বকুল গো।  
অশনির ঝনঝনি মদন দুন্দুভি ধ্বনি  
বিরহিনী হৃদে বিঁধে শূল গো  
রাধা কহে সখী সনে ভবপ্রীতা ভাবে মনে  
রাধা সনে জগতের মূল গো।

(সংগ্রহ—অধ্যাপক শ্রীসুবোধ বসুরায়। সামান্য পরিবর্তিত আকারে বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর—দ্বিতীয় খন্ড)।

ভবপ্রীতানন্দের ঝুমুর বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে মানভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর সর্বত্রই গীত হয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত সম্প্রতিকালের পদরচয়িতাদের মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছেন,—পাতকুমের রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, গঙ্গাধর ঘোষ, দিবাকর সিংপাতর, দুর্যোধন দাস; বাঘমুণ্ডির জগৎ কবিরাজ, উদয় কবি, দীনা তাঁতি। ব্রজবাম দাস, আড়ষার চৈতন সিং ঝালদার নরোত্তম সিং, জয়পুরের ফণীভূষণ হাজরা, পুরুলিয়ার টামা ঠাকুর—ইত্যাদি। এই নামগুলি এবং আনুষাঙ্গিক বহু তথ্য পুরুলিয়া সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শ্রীসুবোধ বসুরায় আমায় গোচর করেছেন, যা কেবল সংগ্রহ গ্রন্থ থেকেই পাওয়া সম্ভব নয়। এঁদের মধ্যে উদয়কবির ভণিতাযুক্ত একটি পদ উদ্ধৃত করছি। এই পদটিও বিদ্যাপতিকে স্মরণ করিয়ে দেয় :

কি কহব তোরে দূতী, কি কহব তোরে  
আজ স্বপনে হাম ভেটিল নাগরে।  
জুঁই ও চামেলিফুল গাঁথলি সকালে  
ধীরে ধীরে তুলি দিল চূড়ার উপরে।  
দেড় প্রহর রাতি আসল অবসরে  
হাসিয়া উঠিল শ্যাম পালঙ্ক উপরে।  
হেন উদয় সাড়া রইল দুয়ারে  
নিদ ভাঙ্গল হাম পড়ল ফাঁপরে।

(বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর, দ্বিতীয় খন্ড)

উপরে উল্লিখিত কবিদের অনেকেই খুব বেশিদিনের নন। ঝুমুর পর্যায়ের পদাবলী এখনও রচিত হয়ে চলেছে, যদিও মনোহরসাই ঢঙের গান প্রাচীনদের মধ্যেই সীমায়িত হয়ে রয়েছে—নতুন পদকর্তার উদ্ভব হচ্ছে না। এর কারণ ঝুমুর জীবিত; মনোহরসাই ক্লাসিক উত্তীর্ণ হয়ে থেমে পড়তে বাধ্য হয়েছে, নানান পরিস্থিতির দরুন। ঝুমুর পর্যায়ের বহু কবির ভণিতাযুক্ত পদই 'লোকসঙ্গীত রত্নাকর' নামক কোষগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। যাঁরা এইসব পদ যথাস্থানে গিয়ে সংগ্রহ করেছেন, তাঁরা যথার্থই সাধুবাদের

[illegible]যোগ্য, কেননা তাঁরা এমন একটি আর্টের উদ্ধারকল্পে কাজ করেছেন, যার ইতিহাস আজও পূর্ণভাবে রচিত হবার অপেক্ষায় আছে। অবশ্য এই ধারণাটা অযৌক্তিক নয়, যে কলকাতার কবিগানও একপ্রকার পদাবলী সংগীতের পর্যায়েই পড়ে। উৎকৃষ্ট কবিগানের বহু পদই উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব কাব্যের নিদর্শন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এর বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করবার পূর্বে এর সঙ্গে ঝুমুরের কোনও যোগ ছিল কিনা বলা যায় না, তবে এর সংগঠনেও ঝুমুরের প্রভাব লক্ষ করা যায়। খেউড় প্রভৃতি গান যদি শান্তিপুর অঞ্চল থেকে আসতে পারে তবে তার বহু পূর্বেকার ঝুমুর যে [illegible] মেদিনীপুর এবং মানভূম অঞ্চলাদি থেকে [illegible] পারে না, এমন নয়। এবিষয়ে প্রবন্ধের শেষে [illegible] আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়টি ঠিক এই [illegible] প্রাসঙ্গিক নয় বলেই অধিক অগ্রসর হবার সুযোগ নেই।

[illegible] ঝুমুরের এই দিকটার কথা বোধ করি [illegible] প্রথম মনে করিয়ে দেন বিদ্বৎবল্লভ বসন্ত-রঞ্জন [illegible] তাঁর [illegible] 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আবিষ্কারের [illegible] দুই বৎসরকাল আমি তাঁর সাহচর্য লাভ করেছিলাম ব্যারাকপুরে, গত মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে। তখন তাঁর বয়স সত্তরের কিছু ওপরেই হবে, কিন্তু তাঁর স্মরণশক্তি ও ইনটেলেক্ট তখনও খুবই প্রখর ছিল। সেইসময় আমার বয়স অল্প বলে তিনি আমাকে অবহেলা করেননি, বরঞ্চ বহু চমকপ্রদ বিষয় [illegible] করতেন তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে। তাঁর দৃঢ় [illegible] ছিল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গানগুলি ঝুমুর [illegible] বহু রাগ, তালের উল্লেখ পদগুলিতে [illegible] তাঁর মতে সেগুলি ঝুমুর পর্যায়েই [illegible] কালক্রমে সেগুলির ভাষা ও গায়কীতে [illegible] কিন্তু সেগুলিও যে ঝুমুর গানের [illegible] বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার বহুস্থানে [illegible] [illegible] করতেন। এই উক্তির সত্যতা 'বঙ্গীয় লোকসংগীত রত্নাকর—দ্বিতীয় খণ্ড' থেকে প্রমাণিত হয় এবং অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যও এরকম ইঙ্গিত স্থান বিশেষে করেছেন। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সংগীতাংশ নিয়ে কিছু কিঞ্চিৎ আলোচনা যে হয়নি তা নয়, তার মধ্যে এই লেখকও আছেন ; কিন্তু পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে প্রধানত প্রবন্ধসংগীতের দিক থেকে। সমীক্ষণের অপর একটা দিকও আছে, যা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে সেটিও পরিষ্কার করে নিতে চাই। বলা বাহুল্য সেটি ঝুমুরের অন্তর্গত।

ঝুমুরের গায়নরীতি প্রধানত অবরোহণধর্মী। চড়ার দিকে এঁরা অবশ্য অনেকটাই যান, কিন্তু ক্রমে নেমে আসতে থাকেন বক্রগতিতে এবং অবশেষে খাদে এসে একটি পদে স্থিতিলাভ করেন। এই যে বক্রগতি এটি আশ্চর্য সুন্দর এবং এর মধ্যে এমন একটি আর্ট আছে যা অধ্যবসায়ের সঙ্গে অভ্যাস না করলে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। এই অবরোহণটি অত্যন্ত সুললিত এবং মনোরম। আরও একটা চিত্তাকর্ষক বিষয় হল যে, অবরোহক্রমে অনুষ্ঠিত হলেও গানের চড়া এবং খাদের ভারসাম্যটি কিন্তু যথাযথভাবে রক্ষা করা হয়, যাতে সমস্ত গানটিতে একটি নিটোল ভাব থাকে। মাঝে মাঝে কিছুটা একঘেয়ে লাগলেও সর্বাঙ্গীণ-ভাবে সমগ্র গানটি খুব ভাল লাগে। তখন এটা বোঝা যায় যে, এই গায়কীটি লোকরীতির অন্তর্ভুক্ত। পূর্বে যে পদগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি পড়তে গেলে হয়ত লোকসংগীতের পর্যায়ে ফেলতে দ্বিধাবোধ হবে, কিন্তু যখন ঝুমুরের ধারায় রূপায়িত হয়, তখন যে আবেদনটি ফুটে ওঠে, সেটি লোকসংগীতের আবেদন। একদিকে পদাবলী সাহিত্য (অবশ্য খুব উচ্চ পর্যায়ের নয়), অপরদিকে ঝুমুরের আবেদনে লোকসংগীতের যে ছায়াপাত ঘটে, সেটি বাস্তবিকই এই একটি ক্ষেত্র ছাড়া বোধ করি আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। এই গায়নরীতিকেই বলা হয় বৈঠকী ঝুমুর।

অবশ্য বৈঠকী ঝুমুর ব্যতীত আরও নানা প্রকার ঝুমুর বর্তমান। আমরা সাধারণত রেডিওতে, রেকর্ডে বা তথাকথিত লোকসংগীতে ঝুমুরের নামে যা শুনি, তা একেবারে চটুল গানের নিদর্শন। অনেক সময় এতে সাঁওতালি ঢঙের নকল দেখা যায়। এসব গান থেকে বৈঠকী ঝুমুরের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না : কারণ যে অবরোহক্রম এই গীতের বৈশিষ্ট্য, তা এতে আদৌ নেই, যা আছে, তা হালকা ছন্দের লঘুগতি। মাঝামাঝি এক স্তরের ঝুমুর আছে যা যথেষ্ট জনপ্রিয়। এইগুলির মধ্যে কিন্তু যথেষ্ট আর্ট রয়েছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক :

> মেঘ আঁধার রাতি বিজুলি চমকে
> এমন সংকট পথে এলে কার সাথে
> বঁধু, এত রাত কিসে।
> এলে বঁধু ভাল করিলে, তুমি বস পালংকেতে
> তোমার পা ধুয়াব নয়নজলে, মুছাইব কেশে
> যার সঙ্গে যার ভাব থাকে মরিলে না টুটে
> লাল শালুকের ফুল ফুটে আঁধারেতে।
> (বঙ্গীয় লোকসংগীত রত্নাকর দ্বিতীয় খণ্ড)

এই গানটির অবশ্য কয়েকটি ভাবান্তর বর্তমান, ভণিতাও আছে বলে শুনেছি; কিন্তু এই গানটির সঙ্গে পরিচিত নন, এমন ঝুমুর-গায়ক পুরুলিয়ায় বিরল। এতে অবরোহণের মধুর গতিটি সুন্দরভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় এবং এটি যে প্রচলিত ঝুমুরের একটি উত্তম নিদর্শন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই ধরনের দু-চারটি গান শুনলে প্রকৃত ঝুমুরের মাধুর্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়।

পুরুলিয়ার ঝুমুর সম্বন্ধে পূর্ব থেকে কিছু পরিচয় ছিল। এবারে বাঘমুণ্ডি ব্লক যুব-অফিসের প্রযোজনায় ঝুমুর এবং "ছো-নাচ"-এর যে ব্যাপক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, এপ্রিল মাসের

শেষের দিকে সেটি পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত উপকৃত হয়েছি। ব্লকের তরুণ যুব-অফিসার জি এম আবুবকর সাহেব এই অয়োজনে এই অঞ্চলের সমস্ত ঝুমুর-গায়ককেই একত্র করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ সচাঁদ মাহাতো, বিশিষ্ট ছো-নৃত্যে শিল্পী গম্ভীর সিং এবং অভিজ্ঞ ও রসজ্ঞ গোলাম মোহম্মদ সাহেব। এঁরা বিশেষভাবে সম্মানিত হন। কলকাতার বিশিষ্ট লোকসংগীত শিল্পী শ্রীদিনেন্দ্র চৌধুরীকে দেখলুম ছাত্রের ভূমিকা নিয়ে এইসব গানকে অ্যাকাডেমিক অনুসন্ধিৎসা সহকারে অনুধাবন করছেন। এবারে অবিশ্রান্তভাবে বহু উৎকৃষ্ট বৈঠকী ঝুমুর শোনবার সুযোগ হয়েছিল এবং আমার মনে এ সম্বন্ধে যে প্রধান সমস্যাটির উদয় হয়েছিল, সেটির যেন সদুত্তর এই গানগুলি থেকে পাওয়া সম্ভব বলে ধারণা হল। এর পূর্বে, পুরুলিয়ায় এসে মাঝে মাঝে যখন বৈঠকী ঝুমুর শুনেছি তখন এই প্রতীতি হয়েছিল যে এইটিই তথাকথিত ঝাড়খণ্ডী কীর্তনের মূল ধারা; কিন্তু এবারে বহু নিদর্শন থেকে এই উপলব্ধি হল যে এই ঝাড়খণ্ডী রীতিই পদাবলী কীর্তনের প্রাচীনতম রূপ, যাতে বাহুল্য বা আড়ম্বর নেই, কিন্তু প্রকৃত একটি আর্ট এবং রস বর্তমান। পয়ার ছন্দে রচিত বহু ঝুমুরের পদে সাধারণ্যে প্রচলিত পদাবলী কীর্তনের আলাপের ধারাটিও কিছুটা লক্ষ করা গেল; কিন্তু আখরের প্রয়োগ নেই বললেই চলে, তার বদলে গুরুত্ব অধিকার করেছে "ধুবো", যাকে "রঙ্গ" বলা হয়। অধিকাংশ গায়ক তবলার সংগত বর্জন করলেন, এমনকি হারমোনিয়মের সহযোগিতাও গ্রহণ করতে দেখলুম না। খালি গলায়, গ্রামীণ পরিশীলনটুকুকে অবলম্বন করে তাঁরা যাঁদের পদ গাইলেন, তাঁদের নাম পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আমার মনে হল, খোলের সংগত হলে তাঁদের এই স্নিগ্ধ, সুরেলা অবরোহণটি ঠিক ধরা যেত না এবং গানের বৈশিষ্ট্যও ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হত। বরঞ্চ একতারা বা দোতারার সহযোগিতা বোধ করি এই একক গানগুলির পক্ষে উপযোগী হত। স্বয়ং বিনন্দ সিং একতারা বাজাতেন।

এখন প্রশ্ন উঠছে, ঝাড়খণ্ডী রীতির পদাবলী গায়ন কত প্রাচীন এবং এর ঐতিহ্য কোথায় নিহিত? আরও একটি প্রশ্ন, বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রভাবে অথবা মল্লরাজ বীর হাম্বিরের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের ফলেই কি এই রীতির উদ্ভব হয়েছে? যা সাধারণত আমাদের সাহিত্যে প্রচারিত হয়ে আসছে।

এই দুটি বিষয়ে প্রবেশ করবার পূর্বে একটু বক্তব্য গোচর করা প্রয়োজন মনে করি। পদাবলী কীর্তন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ সম্প্রতি প্রয়াত পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রসঙ্গে আমার বহুবার আলোচনা হয়েছিল। শ্রদ্ধেয় মুখোপাধ্যায় মহাশয় জানতে চেয়েছিলেন ঝুমুর সম্বন্ধে খুব প্রাচীন কোনও উল্লেখ সঙ্গীতশাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায় কিনা। তদুত্তরে আমি তাঁর কাছে সংগীতরত্নাকরে বর্ণিত শুদ্ধ সূড় পর্যায়ের 'ঝোম্বড়া' নামক একটি বৃহৎ সংগীত গোষ্ঠীর উল্লেখ করি। এর প্রকারভেদ ও লক্ষণাদি শুনে তাঁর কাছে সেটি প্রাচীন ঝুমুরের আদি উৎস বলে মনে হয়েছিল এবং তদীয় "বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া" গ্রন্থে তিনি এবিষয়ে মত প্রকাশ করে গেছেন (পৃষ্ঠা ১৫)। বহু পরবর্তীকালে শুভঙ্কর রচিত "সঙ্গীত দামোদর" নামক সংকলন গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে—কালক্রমে এই গীতধারাটি "সালগ সূড়" (অর্থাৎ, মিশ্র এবং সহজতর সূড় পর্যায়ের গীত) পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন এটি আর "ঝোম্বড়া" নামে পরিচিত ছিল না, তাকে বলা হত "ঝুমরি"। শুভঙ্কর বলছেন,—একৈব ঝুমরিশ্চোক্ত শালগাঃ কথিতা ইমে (কলকাতা সংস্কৃত কলেজ প্রকাশিত সংগীত দামোদর, পৃষ্ঠা ১৯); অর্থাৎ অপরাপর সালগ সূড় পর্যায়ের গীতে যেমন একাধিক প্রকারভেদ বর্তমান, ঝুমরির ক্ষেত্রে সেরূপ দেখা যায় না।

অতঃপর, আর একটু বিস্তৃত বর্ণনা প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে লেখা হয়েছে,—

প্রায়ঃ শৃঙ্গারবহুলা মাধ্বীকমধুরা মৃদুঃ
একৈব ঝুমরি লোকে বর্ণাদিনিয়মোজ্‌ঝিতা,
অতো লক্ষণমেতস্যা নোদাহার্যি বিশেষতঃ।

অর্থ: প্রায়শই শৃঙ্গারবহুল মৃদু এবং মাধ্বী নামক সুরার মত মধুর ঝুমুর একপ্রকারই দৃষ্ট হয়। এতে বর্ণাদি সম্পর্কে (অর্থাৎ লঘু, গুরু, প্লুত প্রভৃতি বর্ণের নিয়ম অনুযায়ী সন্নিবেশ, অথবা আরোহী, অবরোহী, সঞ্চারী প্রভৃতি বর্ণের সুনির্দিষ্ট নিয়মের অনুসরণ) নিয়ম পরিত্যক্ত হয়ে থাকে। এইটুকুই এর লক্ষণ: আর বিশেষ কোনও উদাহরণ দেওয়া হয়নি।

এইসব তথ্যানুসন্ধানে পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু কার্যত কিছুই হয় না। একটা উদাহরণও যদি না পাওয়া যায়, তাহলে বর্ণনার কোনও তাৎপর্য নেই। কেবল এইটুকু বোধগম্য হতে পারে যে, "ঝুমুর" নামক গীতধারাটির ঐতিহ্য খুব প্রাচীন। দুঃখের বিষয়, পরবর্তীকালের লেখকগণ একটু খোঁজ নিয়ে এটুকু পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করেননি যে, "ঝুমরি" কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল।

যাই হোক, এবার উক্ত দুটি প্রশ্নের মূল বিষয়ে আসা যাক। আমরা সঙ্গীতশাস্ত্রাদি থেকে এই গানের প্রাচীনত্ব ছাড়াও এতে যে গায়কের প্রচুর স্বাধীনতা ছিল, সেটাও জানতে পারি। মনোহরসাই পদাবলী কীর্তনে এখনও বড় বড় তালের ব্যবহার আছে; কিন্তু ঝুমুরে সেইরকম বাঁধাবাঁধি নেই। তথাপি ব্রজবুলিতে নিবদ্ধ এমন বৈঠকী ঝুমুর অনেক আছে, যাতে নানান ধরনের তালের প্রয়োগ বর্তমান। কিন্তু সেগুলি ঝাড়খণ্ডী কীর্তনের পর্যায়ে পড়ে না। ঝুমুর যে কেবল পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ এমন নয়, বিহারের বহু অঞ্চলেও নানা উপভাষায় এর বিবিধ প্রকারভেদ বর্তমান। এমনকি কলকাতাতেও লক্ষ করা যায়, দারভাঙা, ভাগলপুর, মিথিলা অঞ্চলের বহু দরিদ্র অধিবাসী তাঁদের ভাষায় একপ্রকার গান গেয়ে থাকেন যা পুরুলিয়ার ঝুমুরের মতই অবরোহধর্মী। এইগুলিও ঝুমুর পর্যায়েরই গান। অতএব, এই সঙ্গীতের প্রভাবও বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আছে।

বৈঠকী ঝুমুরের যে ধারাটি পদাবলী সাহিত্যকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে, সেটি প্রধানত মিথিলার কবি বিদ্যাপতিকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করেছে, তারপরেই চণ্ডীদাসের স্থান। উৎকৃষ্ট ও উচ্চাঙ্গের ঝুমুর, যা আজও শুনতে পাওয়া যায়, তা এই দুই কবির উদ্ভাবিত ধারা থেকেই প্রভাবিত হয়েছে। খেতুরির মহোৎসবে গরানহাটি ধারার প্রবর্তনের বহু আগেই ঝাড়খণ্ড বিদ্যাপতিকে তাঁদের ঝুমুর সংগীতে গ্রহণ করেছে, কেননা এগুলি সবই সন্নিহিত অঞ্চল।

বিদ্যাপতির গানকে, অথবা বিদ্যাপতির গাইবার স্টাইলকে গ্রহণ করবার পক্ষে ঝাড়খণ্ড নামক বৃহৎ জনপদের বেশ কিছু সুবিধা ছিল, কারণ বিদ্যাপতি যে ধারার প্রবর্তন করেন, তা চিরাচরিত পদ্ধতি থেকে অন্য প্রকার এবং বাহুল্যবর্জিত। এ সম্বন্ধে বলতে গেলে মৈথিলী বিদগ্ধ কবি লোচন ঝা প্রণীত "রাগতরঙ্গিণী" নামক গ্রন্থটির সহায়তা গ্রহণ করতে হয়। গ্রন্থটি পণ্ডিত বলদেব মিশ্র কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে, দারভাঙা থেকে ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপরে এর আর কোনও সংস্করণ হয়েছে বলে জানি না। এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ হওয়া একান্ত উচিত ছিল, কিন্তু তাও হয়েছে বলে শুনিনি। লোচন ঝা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। রাগতরঙ্গিণী বইটি সংগীতবিষয়ক হলেও ভাষার দিক থেকেও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এতে তিনপ্রকার ভাষার সমাবেশ হয়েছে, সংস্কৃত, হিন্দী (ব্রজভাষা), মৈথিলী দেশভাষা তথা অবহট্ট অর্থাৎ অপভ্রংশ বা অপভ্রষ্ট। এমনকি, এই গ্রন্থে উদ্ধৃত, জয়দেবের কোনও কোনও সংস্কৃত পদেও মৈথিলী মিশ্রণ দেখা যায়। বিদ্যাপতির পুত্রবধূরাই নাকি এই প্রকার একটি পদে কিঞ্চিৎ মৈথিলী যোজনা করেছিলেন। রাগতরঙ্গিণীর গ্রন্থভাগ বা টেকস্ট হচ্ছে প্রধানত সংস্কৃত কিন্তু উদাহরণগুলি বা দোহাগুলি সবই দেশীয় ভাষায় দেওয়া হয়েছে। এই অপভ্রংশ কিন্তু আমাদের কাছে দুর্বোধ্য নয়, কারণ তা প্রায় বাংলারই শামিল।

এই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে প্রত্যেক দেশের গানের এক একটি বিশেষ গতি আছে এবং সেই অনুসারে দেশে দেশে গানের গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হয়। মিথিলায় এইরকম একটি গতির প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন স্বয়ং বিদ্যাপতি, তদঞ্চলের অপভ্রংশকে অবলম্বন করে। এই নব উদ্ভাবিত গতিকে "মিথিলাগতি" আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। প্রচলিত কাহিনী, যা লোচন বর্ণনা করেছেন, তা থেকে জানা যায় যে, একদা ভবভূতির কোনও একটি [illegible] পুরাণ-কাব্যের রূপ দিয়ে সুমতি নামক একজন কায়স্থ কুলোদ্ভব কথক রাজার কাছে সেটি গান করে ও কথকতার মাধ্যমে প্রচার করেছিলেন। এটি অত্যন্ত মনোগ্রাহী হয়েছিল। অতঃপর রাজা শিবসিংহ উক্ত কথকের পুত্র জয়তকে কবিশেখর বিদ্যাপতির হস্তে সমর্পণ করলেন। বিদ্যাপতি এবং জয়ত—এঁরা দুজনে যে গীতরীতির উদ্ভাবন করলেন, সেইটিই মিথিলার রীতি বলে পরিচিত হয়েছে। বিদ্যাপতি স্থির করলেন, একটি গান যে রাগে গাওয়া হবে, সেই রাগটিকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করবার জন্য তার ছন্দ এবং গতি নির্দিষ্ট করতে হবে এবং তার সঙ্গে উপযুক্ত স্থানে ধ্রুবারও পরিকল্পনা করতে হবে। অর্থাৎ, তিনি রাগ বা সুরটিকে মাত্র গ্রহণ করলেন, কিন্তু তালের দাসত্ব স্বীকার করলেন না। তিনি এক একটি রাগের আবেদন অনুসারে গানের বাণীকে এমনভাবে সাজালেন যে লঘু, গুরু বর্ণের সমাবেশে, মাত্রানুসারে (সংস্কৃত ছন্দের গণ-নিয়মও তিনি মানতেন) উক্ত রাগটি সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে বিকশিত হয়ে উঠল। জয়ত রাজসভায় বিদ্যাপতি পরিকল্পিত গানগুলি সার্থকতার সঙ্গে সম্পাদন করলেন। এরপর যিনি বিদ্যাপতির প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হলেন তিনি জয়তবংশীয় কথক হরিহর মল্লিকের মধ্যম পুত্র ঘনশ্যাম। তিনি তাঁর তিন পুত্রের সহায়তায় বিদ্যাপতির বহু কাব্যবর্ণে নিবদ্ধ এইরকম গান রাজসভায় গেয়ে শোনালেন। রাজা নরপতি সেইসব গীত সংগ্রহ সবিস্তারে লক্ষণ অনুসারে লিপিবদ্ধ করবার জন্য তৎকালীন মিথিলার কবি লোচন ঝাকে অনুরোধ করলেন। লোচন, তদীয় গ্রন্থে তাঁর নিজের রচিত বহু গানও সন্নিবেশিত করেছেন এবং রাজা নরপতি ও তৎপূর্ববর্তী রাজা মহিনাথ ঠাকুরের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তাঁর গ্রন্থে আরও বহুজনের উৎকৃষ্ট পদসমূহ উদ্ধৃত হয়েছে।

বিদ্যাপতি যে রীতি নির্দেশ করেছিলেন তার দুটি ভাগ, একটি ছন্দ এবং অপরটি গতি। লঘু, গুরু বর্ণের সমাবেশে এবং মাত্রানুসারে প্রত্যেকটি রাগাশ্রয়ী গানের ছন্দ নির্ধারিত হত; সেইসঙ্গে 'কলি'-র সংখ্যা এবং ধ্রুবার স্থানও নিরূপিত হত। সেই ছন্দ অনুসারে গান করা হলেও, সাধারণত তাতে তিনটি গতি অবলম্বন করা হত; যথা সত্বর, মধ্যম এবং বিলম্বিত। কখনও কখনও এই তিনটির মাঝখানে আরও একটি মধ্যম বিলম্বিত গতি অবলম্বন করে, চারটি গতিতেও গান করা হত। এইভাবে, মিথিলার রাগসংগীতে মার্গতাল তার প্রাধান্য থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ লোচন ভৈরবী রাগে জয়দেবের, "[illegible] গুরুজাগর" গানটির উল্লেখ করে বলেছেন,—এক্ষেত্রে "চচ্চৎপুট" প্রভৃতি মার্গতাল পরিত্যাগ করে বিদ্যাপতি প্রবর্তিত মৈথিলী রীতি অনুযায়ী সত্বর, মধ্যম এবং বিলম্বিত লয়ে গানটি রূপায়িত হয়েছে।

এইভাবে তীরভুক্তি (তিরহুত) প্রদেশে ছত্রিশটি
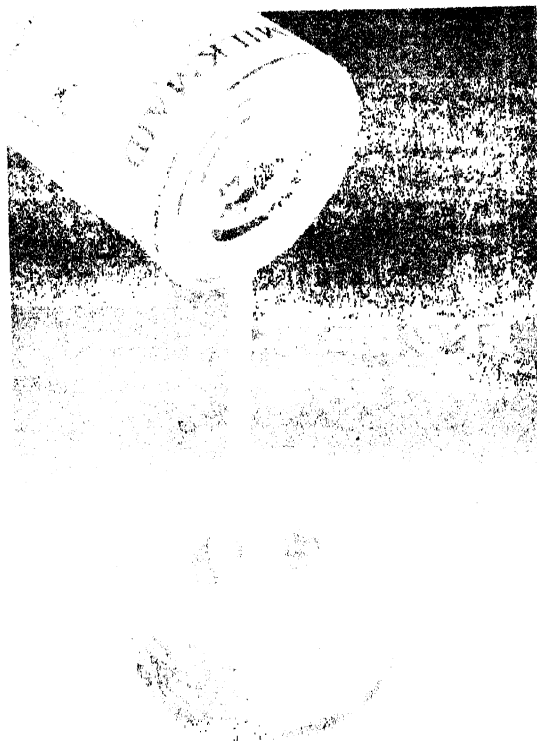
প্রধান রাগ, রাগিণীসহ গাওয়া হত। এই বিশেষ প্রথাটি "মিথিলাগীতি" আখ্যায় স্বীকৃতিলাভ করেছিল। এই রীতি কেবল উক্ত দেশেই নয় অন্যান্য সন্নিহিত অঞ্চলেও প্রচলিত হয়েছিল। এতদ্ব্যতীত, আরও রাগিণীসহ নয়টি রাগ বিশেষভাবে মিথিলাতেই প্রচলিত ছিল। এই কারণে এদের সংকীর্ণ রাগ বলা হত। সর্বসমেত রাগিণীসহ সাতানব্বইটি রাগকে তিরভুক্তি দেশীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি রাগ বা রাগিণীর আবেদন অনুসারেই গানের ভাষা, ছন্দ এবং গতি নিরূপিত হত।

মিথিলার এই রীতি সর্বাগ্রে বিহারের কয়েকটি সন্নিহিত অঞ্চলে প্রচলিত হয়েছিল এবং ঝাড়খণ্ডে আগে থেকে প্রচলিত ঝুমুরের পাশাপাশি এই রীতিও চলতে লাগল। কিন্তু, ঝুমুরের রীতিটা ছিল আরও উদার: অর্থাৎ বিদ্যাপতি বর্ণাদির নিয়ম মেনে চললেও উক্ত গানে তাও ছিল না; কারণ ঝুমুর ছিল বর্ণাদি নিয়মকানুনের বাইরে। অতএব, ধীরে ধীরে মৈথিলী, ব্রজবুলী রীতিতে নানাপ্রকার পদাবলী রচিত হতে লাগল এবং সেগুলিও ঝাড়খণ্ডী রীতির অন্তর্ভুক্ত হতে লাগল। অবশ্য, ধ্রুবা এবং গতির বৈশিষ্ট্য বৈঠকী ঝুমুরেও রক্ষিত হয়ে এসেছিল। কিছুকাল পরেই চণ্ডীদাসের আবির্ভাব ঘটল। তাতে আরও একটা সুবিধা হল, কেননা বাংলা ভাষা অনেকটা প্রেরণা পেল। কথিত আছে, শ্রীচৈতন্য পুরীতে বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের পদ আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন। তিনি যে মিথিলার ধারাতেই বিদ্যাপতির গান শুনতেন এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। চণ্ডীদাস অবশ্য শ্রীচৈতন্যের অব্যবহিত পূর্বেই ছিলেন এবং তাঁর ধারাও সম্ভবত মৈথিলী ধারাকেই অনুসরণ করেছিল। জয়দেবের গান তিনি শুনতেন স্বরূপ দামোদরের কণ্ঠে এবং তাঁর পদ্ধতি ছিল দাক্ষিণ ভারতীয়, কেননা জয়দেব বহু পূর্বেই উড়িষ্যার মাধ্যমে সারা দক্ষিণ ভারতে পরিচিত হয়েছিলেন।

কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালে, নরোত্তম, শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ প্রভৃতি সকলেই বিস্তৃতভাবে ঝাড়খণ্ড পরিক্রমার অবকাশ পেয়েছিলেন এবং ঝাড়খণ্ডী ও মৈথিলী রীতির সঙ্গে তাঁরাও সবিশেষ পরিচিত ছিলেন। কিন্তু উক্ত ট্রাডিশন তাঁরা গ্রহণ করেননি। শ্রীচৈতন্যের বেশ কিছুকাল পরে, খেতুরির মহোৎসবে নরোত্তম পদাবলী কীর্তনকে একটি নতুন আর্ট করে গড়ে তুলতে চাইলেন। বিদ্যাপতি, কাব্যের আবেদনকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে যে তালের বাঁধাধরা নিয়মকে পরিহার করেছিলেন, নরোত্তম সেইটিই আরোপ করে, বৈষ্ণব পদগায়নে সফিস্টিকেশন আনতে চাইলেন। তাঁর ধারণা ছিল পদাবলী কীর্তনে অনেকটা ধ্রুপদের মত একটা প্রবন্ধসংগীতের আর্টিস্টিক রূপ দেওয়া। তিনি করেও ছিলেন তাই; কিন্তু তাতে কীর্তনের তাল, মান এবং জটিলতা এত বেড়ে গেল যে আসল রসটাই অনেকখানি চাপা পড়ে গেল। ফলে, গরাণহাটি ঢং ক্রমে ক্রমে জনপ্রিয়তা হারাতে লাগল। নরোত্তম যদি মিথিলার রীতিটা আয়ত্ত করে দেখতেন এবং বিদ্যাপতির রসভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে সফলতর করতে সচেষ্ট হতেন, তাহলে হয়ত পদাবলী কীর্তনে রসের দিক থেকে একটা নতুন প্রেরণা পেতেন। কিন্তু তা না করে নরোত্তম ওস্তাদী রীতির প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন, যা পদাবলী কীর্তনের পেলবতার সহায়ক হতে পারেনি। বিদ্যাপতি স্বীয় অভিজ্ঞতা-দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, একটা রাগ যে লালিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম, একটা তাল যে সেই অনুপাতেই তার পরিপূরক হবে, এমন কথা নেই। বরঞ্চ, তার বিপরীতও হতে পারে, কারণ যেখানে একটা রাগ বিস্তৃতভাবে রসসৃষ্টি করে, সেখানে তাল তার সীমায়িত গাণিতিক নিয়মে গায়ককে তার পথ ধরে সংকীর্ণভাবে চলতেই বাধ্য করে। অতএব, যে সংগীত, রাগ এবং মার্গতালকে অবলম্বন করে চলে, বিদ্যাপতি মনে করতেন, তার বাঁধুনি, রীতিনীতি ও প্রকাশভঙ্গী স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। তাই, পদাবলীর আকৃতি-প্রকৃতির সঙ্গে মার্গতালাদির সংযোগে সন্তুষ্ট হতে না পেরে, রাগের সুষ্ঠু প্রকাশকে তাঁর সৃষ্ট পদে অব্যাহত রাখবার জন্যই তিনি রাগের পরিমাপে ছন্দের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু, লয়ের দিক থেকেও তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, তাই ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রতিটি কলিকে লঘু, গুরু বর্ণদ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন এবং দীর্ঘ পদসমূহ যাতে একঘেয়ে না হয় সেজন্য বিলম্বিত, মধ্য এবং দ্রুত—এই তিনটি লয়কেই যথাযথভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। লোচন তাঁর গ্রন্থে এই রকম রচনার বহু দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন। এটা বিদ্যাপতির স্বেচ্ছাচারিতা নয়, এটা তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ কম্পোজিশন। তা ছাড়া, যত্রতত্র একটা ধ্রুবা যোগ করবার পক্ষপাতীও তিনি ছিলেন না; সেটাও তিনি শোভনভাবে পদের বিন্যাস অনুযায়ী যথাস্থানে স্থাপন করেছিলেন। এখানে কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে, বাংলার মত বিদ্যাপতির অপভ্রংশও সংস্কৃত লঘু-গুরু নিয়মে চলেনি। চলন অনুসারে লঘু-গুরু নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। শ্রী-মালব রাগে একটি গানের ছন্দ-লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে :—

চতুর্ভিঃ সময়েব স্যাৎ পদার্থশ্চতুষ্কলৈঃ। •
গণৈঃ কচিন্নান কলৈস্তদ্ শ্রীস্তত্রৈব গীয়তে॥

অর্থাৎ, —প্রতিটি পদার্থ চারটি করে সমান মাপের চতুষ্কল (চতুর্মাত্রিক) বর্ণ সমাবেশে রচিত হবে।

অযোধ্যাপাহাড়ে আদিবাসী পল্লীতে মাটির দেয়ালে অলংকরণ

কোনও কোনও ক্ষেত্রে কলাবিধি বা গণনিয়ম অনুসারে (লঘু-গুরু বর্ণের সংযোজন অনুসারে) নির্ধারিত এই বিভাগগুলি অবশ্য ন্যূন হতেও দেখা যায়। এই ভাবে ছন্দ পরিকল্পনা করে, শ্রী (শ্রী-মালব) গান করা হয়ে থাকে।

উদাহরণের খানিকটা উদ্ধৃত করি :—
প্রথম পহর রাতি রভসে বহলা
দোসর পহর পরিজন নিঁদ গেলা,
নিঁদ নিরূপইতে ভেলি অধরাতি
তখন জাগল চাঁদা পরম কুজাতি।
ভনই বিদ্যাপতি তখন কুভাব
জেহে পুনমত সেহে জনপঞ পাব।

এখানে কিন্তু ছয়টি ছত্র মিলিয়ে তিনটি পদ ধরা হয়েছে এবং এক-একটি ছত্রকে পদার্থ বলে ধরতে হবে। উক্ত ছন্দ-নিয়ম অনুসারে এই অংশটি কিভাবে গীত হতে পারে, তার একটি নিদর্শন দেওয়া গেল।

প্রথম প । হররতি । রভসেব । হংলাং ।
দোসর প । হরপরি । জননিঁদ । গেংলাং ।
নিদনির । পইতেং । ভেলিঅধ । রাং তিং ।
তখন জা । গলচাঁদা । পরমকু । জাংতিং ।
ভনইবি । ০ দ্যাপতি । তখনকু । ভাং বং ।
জেহেপুন । মতসেহে । জনপঞ । পাং বং ।

এর ইতরবিশেষ হতে পারে, কিন্তু ভঙ্গীটি এইরূপ চতুর্মাত্রিক হবে।

এই রকম উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, বিদ্যাপতি তাঁর নিজের পদের উৎকৃষ্ট রূপারণ, অর্থাৎ সেটা যাতে একটা উন্নত আর্ট সংগীতে পরিণত হয়, সে সম্বন্ধে কতখানি চিন্তা পোষণ করতেন। অপরপক্ষে, নরোত্তমের ধারণা ছিল যে চিরাচরিত উচ্চাঙ্গ নিবন্ধ সংগীতের রূপ প্রদান করলে পদাবলী উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত হবে। এই পরিকল্পনা সার্থক না হওয়াতে মনোহরসাই রীতিতে কীর্তন আর একটু সবলীল হয়ে উঠল;— কিন্তু তাতেও অন্যান্য মিশ্রণ বহুল পরিমাণে আনতে হয়েছে। তা ছাড়া, বড় বড় তালকে মনোহরসাই করবার জন্যও চেষ্টা কম করতে হয়নি। আসলে পদাবলী কীর্তনের জন্য তো বড় বড় তালের সৃষ্টি হয়নি, হয়েছিল মার্গ সংগীতের জন্য। যেহেতু পদাবলীর গায়ন-পদ্ধতি ভিন্ন রকমের, সেহেতু এই তালবিন্যাসেও যথেষ্ট সংস্কার-সাধনের প্রয়োজন হয়েছিল। ক্রমে, প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিন্তা, গবেষণার পর মনোহরসাই-রীতি একটি আর্টে পরিণত হয়।

ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন বিষ্ণুপুরের অধিনায়ক হাম্বির মল্ল নাকি নরোত্তম ঠাকুরকে আমন্ত্রণ করে, তৎপ্রবর্তিত কীর্তনের অনুষ্ঠান বিষ্ণুপুরে করেছিলেন—এ রকম জনশ্রুতি বর্তমান। কিন্তু, ঝাড়খণ্ডে যদি তার প্রভাব পড়ত তা হলে ঝাড়খণ্ডী রীতিতে অনেক পরিবর্তন সাধিত হত। কিন্তু, তার কোনটাই হয়নি। এমনকি, সরকার মন্দারণ, যা মল্লদের অধীনে ছিল, সেখানেও স্বকীয় রীতিতে সংগঠিত মন্দারিণী নামক কীর্তন ধারার সংবাদ পাওয়া যায়। সম্ভবত—এটিতেও বৈঠকী ঝুমুরেরই প্রাধান্য বেশী ছিল। "ঝাড়খণ্ডী কীর্তন" বলে একটি শ্রেণী নির্ণয় করেছিলেন পদাবলী কীর্তনের পৃষ্ঠপোষকগণ, যাঁরা গরাণহাটি ধারা প্রতিষ্ঠিত হবার পর, তার প্রভাবে কীর্তনের অন্যান্য শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়েছিল, এই রূপে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। এটা সত্য নয়; আসলে ঝাড়খণ্ডের পদগীতি তাদের স্বকীয় কাব্যসংগীত এবং সেই সঙ্গে ঝুমুরও সম্পূর্ণভাবে মানভূম, পুরুলিয়া অঞ্চলের লোকায়ত সংগীতশিল্প।

ঝাড়খণ্ডী রীতি এবং গরাণহাটি তথা মনোহরসাই রীতির মধ্যে তফাতগুলি হচ্ছে এই :—

গরাণহাটি এবং মনোহরসাই ধারায় একটি কনসার্টের রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল, যাতে পদাবলী কীর্তন একাধারে একটি শাস্ত্রীয় রীতিকে এবং তা জলযন্ত্রে গীতবাদ্যের সমন্বয়ে একটি ঐকতানকে গ্রহণ করতে পারে।

ঝাড়খণ্ডী রীতি বা বৈঠকী ঝুমুরে গৌর-চন্দ্রিকার ভূমিকা নেই। উক্ত নামে যে দু-চারটে গানকে চিহ্নিত করা হয় সেগুলি বাউল সম্প্রদায়ই প্রধানত গেয়ে থাকেন। বাউল ছোঁয়া ঝুমুর বলেও একটা কথা আছে। কোনও বৈঠকী ঝুমুরের আসর গৌরচন্দ্রিকা দিয়ে আরম্ভ হয় না, বরঞ্চ গণেশ বন্দনা করতে দেখা যায় দু-একটি ক্ষেত্রে।—বা ছো-নাচে প্রচলিত আছে। খোল, করতাল ইত্যাদি এই ধরনের আসরে বাজানো আবশ্যিক নয়।

মনোহরসাই রীতি থেকেই বোধ করি আখরের প্রয়োগ বিস্তৃত হয়েছে; কিন্তু ঝাড়খণ্ডী রীতিতে আখরের পরিবর্তে ধ্রুয়োর (যাকে রঙ বলা হয়) প্রতি সমধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়। বৈঠকী ঝুমুরে এবং নাচনি-নাচেও এটি অতি মনোরমভাবে রূপায়িত হয়।

মনোহরসাই কীর্তনে একজন প্রধান গায়ক থাকলেও অপরাপর সহযোগীদের উপর তাঁকে প্রচুর পরিমাণে নির্ভরশীল হতে হয়। এই পদ্ধতি যতটা পরিমাণে একক অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সমকণ্ঠী। অতএব, মেলডি এখানে তেমন একটা প্রাধান্য অর্জন করেনি; কিন্তু বৈঠকী ঝুমুর বা ঝাড়খণ্ডী সাধারণত একক কণ্ঠের গীত হওয়াতে, মেলডির প্রতি অত্যন্ত অধিক মনোযোগ দেওয়া হয়। গায়ক যদি সুকণ্ঠ হন, তা হলে পদাবলী অবলম্বনে যে বৈঠকী

ঝুমুরে গাওয়া হয়, তার লীলায়িত সুরে মুগ্ধ হতে হয়।

গরাণহাটি বা মনোহরসাই.—এই দুটির কোনটিই বিদ্যাপতি-প্রবর্তিত মৈথিলী ধারাকে অবলম্বন করেনি; কিন্তু ঝাড়খন্ডী উক্ত ধারাকে কেবলমাত্র অবলম্বনই করেনি, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রচার করে গেছে। ঝুমুর এই ধারাকে গ্রহণ করে একটা স্বকীয় কাব্যমাধুর্যকে চিত্তাকর্ষক-ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

মনোহরসাই রীতিতে যাকে ঘটকালি বা কথকতার ঢঙ বলা হয়, সেটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা পেয়েছে। এর প্রয়োগে পদাবলী কীর্তনে একটা অভিনয়ের ধারা আনা হয় এবং আসরকেও দীর্ঘায়িত করা হয়। ঝাড়খন্ডী রীতিতে গানের মাঝখানে কথকতার অবকাশ রাখা হয়নি। পরন্তু এই ধারার গান অত্যন্ত সংবেদনশীল হওয়াতে মেলডিতেই যা কিছু প্রচ্ছন্ন সব প্রকাশ হয়ে যাবার সুযোগ থাকে।

আসলে, হয়তো বড়ু চন্ডীদাসের আমলে ঝুমুরে এক-একটা পালা হিসাবে আচরিত হত; কিন্তু ক্রমে সেটা কমে আসতে থাকে এবং বর্তমানে বৈঠকী ঝুমুর একক সংগীত হিসাবেই প্রাধান্য লাভ করেছে। তবে, যদি কোনও উদ্যোক্তা, শুধু ঝুমুরের পদাবলী দিয়ে একটি পালা গাওয়াতে চান, তবে তার উপযুক্ত রচনা প্রচুর পাওয়া যাবে। ঝুমুর এখনও রচিত হয়ে চলেছে; কিন্তু মনোহরসাই পুরোনো ধারাকে অবলম্বন করেই চলেছে, কেননা নতুন পদ রচনার সম্ভাবনা বাংলার এ-প্রান্তে নানা পরিস্থিতিতেই আর সম্ভব নয়। মহাকাব্যের যুগ যেমন চলে গেছে তেমনি পদাবলীর যুগও আর ফিরে আসবার নয়। পুরুলিয়ার দিকের অবস্থাটা এখনও অন্য রকম। সেখানকার বৃহৎ জনসমাজ ঝুমুরকে তাঁদের জনপদের জাতীয় সংগীত বলে মনে করেন। ভাল বৈঠকী ঝুমুরের আসরে যে কী পরিমাণ ভিড় হয় তা না দেখলে কল্পনা করা যায় না এবং সেখানে আসর আরম্ভ হবার পর কোন রকম বিশৃংখলা বা শ্লেষাত্মক ধ্বনি শোনা যায় না। পুরুলিয়ার বিশিষ্ট শিক্ষিত জনগণের অনেকে ঝুমুর সম্বন্ধে অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং এখানে বেশ উঁচু দরের কাজও আরম্ভ হয়েছে নানা পরিপ্রেক্ষিতে।

ফলকথা এই যে, ঝাড়খন্ডী, গরাণহাটি বা মনোহরসাই—এই সব রীতিই এক একটি বিশিষ্ট কম্পোজিশন। প্রত্যেকটিরই রূপায়ণ সম্বন্ধে এক একটি উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা ছিল। এদের মধ্যে কোনও প্রতিযোগিতার ভূমিকা আনা আমার উদ্দেশ্য নয়; শুধু আমার বক্তব্য এই যে, পদাবলী গায়নে, ঝাড়খন্ডী রীতিই প্রাচীনতম। বিদ্যাপতির গান থেকেই এর সূচনা। গরাণহাটি এবং মনোহরসাই অনেক পরবর্তীকালের কম্পোজিশন, সেটা ধারাবাহিকতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। নরোত্তম দত্ত,—যিনি গরাণহাটি ধারার প্রবর্তক, তিনি ঝাড়খন্ডী রীতির সবিশেষ জেনেও, বিদ্যাপতির রীতিকে তথা প্রাচীন উচ্চাঙ্গ ঝুমুরের পদ্ধতিকে পরিহার করে, একটি স্বকীয় রীতির প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পদাবলী গায়নকে উত্তর ভারতের সর্বত্র প্রচলিত উচ্চাঙ্গসংগীতের শামিল করা। কিন্তু হয় তাঁর প্রবর্তিত রীতি কঠিন ছিল অথবা দেশ এই রকম একটি সৃষ্টিকে গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। অপর পক্ষে, মনোহরসাই শেষ পর্যন্ত বৈঠকী ঝুমুরের বহু আঙ্গিককে, এমন কি কতিপয় পদকেও কাজে লাগাতে দ্বিধা করেননি। আমি এই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ ইতিহাসকেই সবিস্তারে তুলে ধরেছি এবং ইতিহাস যা বলে, তাই বলতে চেয়েছি,—এর বেশী কিছু নয়।

তবে সব ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে, বৈঠকী ঝুমুরের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এতেও হয়ত অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত কবি, পাঁচালি প্রভৃতি ধারার প্রভাব কিছু কিছু পড়েছে, অথবা কবি ও পাঁচালিতে ঝুমুর থেকে বেশ কিছু আমদানি ঘটেছে। একটি চিত্তাকর্ষক উদাহরণ দেওয়া যাক:

বলি চন্দ্রমুখী কি করিব সখি
কেন লম্পট কুঞ্জে এল না
বিষাদের বাতি জেলেছে শ্রীমতী
তাহাতে আহুতি দিও না।
ফিরে যাও হে মরম বঁধু
এখানে দাঁড়ায়ে থেকো না,
নিবেদন করি, যাও ফিরে হরি।
কত নারীর সঙ্গ করিয়াছ রঙ্গ
বঁধু, শ্রীমতীর অঙ্গ ছুঁয়োনা
গোবিন্দদাস ভণে আশা করি ঐ চরণে
রাধে, মান করিলে শ্যামকে পাবি না।
শুন ওগো প্যারী কহিতে বিচারি
ফিরে গেলে শ্যাম আর আসিবে না।
(বঙ্গীয় লোকসংগীত রত্নাকর, দ্বিতীয় খন্ড)

এই গোবিন্দদাস যে কে, তা এই লেখকের জানা নেই, তবে এটি বৈঠকী ঝুমুর হিসাবে গাওয়া হয়। এই ভাষাটিই, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কবিবর রাসু ও নৃসিংহের কবিগানে (সাঁখসম্বাদ)

**বৈঠকী ঝুমুরে হারমোনিয়ম সহযোগে গাইছেন তরুণ যুবক**

পাওয়া যাচ্ছে। তাঁদের পদটি সুদীর্ঘ, শুধু প্রথম দিকের প্রয়োজনীয় অংশটুকুই উদ্ধৃত করি:

শ্রীমতীর মন মানেতে মগন
ওখানে এখন যেও না
মনে করি কলহ আর বাড়াও না।
বিষাদের বাতি জেলেছেন শ্রীমতী
তাহাতে আহুতি দিও না।
নিবেদন করি ফিরে যাও হরি
দুয়ারে দাঁড়ায়ে থেক না
কত নারীর সঙ্গ করেছ কি রঙ্গ
শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ ছুঁয়োনা। ইত্যাদি।
(বাঙালীর গান)

এই পদটি মূলত গোবিন্দদাস নামক কবির রচনা বলেই মনে হয়। যেভাবে গানটি গাওয়া হয়ে থাকে, সেইভাবে এটি লিখিত হয়েছে। 'বঙ্গীয় সংগীত রত্নাকর' গ্রন্থে গানটি তিনবার উদ্ধৃত হয়েছে, বোধ করি তিনজনের সংগ্রহ থেকে। মনে হয়, এক সময় গানটির জনপ্রিয়তা এত অধিক ছিল যে রাসু ও নৃসিংহ এটিকে তাঁদের দীর্ঘ সাঁখ-সম্বাদ পদের শীর্ষদেশে কিছু এদিক ওদিক করে, যুক্ত করেছেন। কিন্তু, এ ছাড়াও আর একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী এই গীতাংশটিকে স্মরণীয় করে রেখেছে,—সেটি নিধুবাবুর নামের সঙ্গে জড়িত।

রাসু-নৃসিংহের পদ থেকে যে অংশটি উদ্ধৃত হয়েছে, সেটি উৎকৃষ্ট কাফীসিন্ধুতে গেয়ে আসা হচ্ছে টপ্পার আঙ্গিকে। গায়কপরম্পরা কথিত আছে যে নিধুবাবু তাঁর প্রতি প্রণয়াসক্তা শ্রীমতী নাম্নী স্ত্রীলোককে উদ্দেশ করে, নিজেই নাকি এই গানটি রচনা করে গেয়েছিলেন। গানটি টপ্পা হিসাবে একটি চমৎকার সৃষ্টি হলেও নিধুবাবু এটি রচনা করেছিলেন বলে মনে হয় না, কারণ নিধুবাবু এই রকম পয়ার লিখতেন না এবং রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ রচনায় তাঁকে উৎসাহিত হতে দেখা যায়নি। তবে তিনি যদি শখ করে সুর দিয়ে থাকেন, সেটি অন্য কথা। কারুর অনুরোধে সুর দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। বহুদিনকার জনশ্রুতির মূলে কি ঘটনা নিহিত আছে, তা বলা খুব কঠিন ব্যাপার। গানটি এখনও কেউ কেউ বেতারে গেয়ে থাকেন। এই গানটি কিন্তু নিধুবাবুর কোন গীত-সংকলনে বা অপর কোনও সংকলন গ্রন্থে নিধুবাবুর নামে দেখা যায় না।

এই রকম আর একটি পদ:—

আসবে বলেছিলে ঠিক সময় কৈ এলে হে,
বিফলেতে গেল আমার যামিনী,
গত নিশি কোথা ছিলে কার প্রেমেতে মজেছিলে
প্রভাতে কি কাজে এলে বল হে শুনি।
ফিরে যাও হে প্রাণের বঁধু
বাসি ফুলে নাই হে মধু
বিপদ হবে হলে তোদের লোকে জানাজানি।
হেন যামিনী ভণে, প্রেম রাখিবী গোপনে
গলে বস্ত্র দিয়ে তোদের প্রেমকে প্রণামি,
আমি জানি হে জানি বঁধুর মুখের ফুটানি।
(বঙ্গীয় সংগীত রত্নাকর, দ্বিতীয় খন্ড)

প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা নীলকন্ঠ মুখোপাধ্যায় রচনা করেছেন,

তোমায় হেরে অঙ্গ জ্বলে
তুমি কি আশায় এখানে এলে
ফিরে যাও হে চিকন কালা
বাসি ফুলে কি মধু মেলে।
গত নিশিতে কার কুঞ্জেতে
কোন ফুলেতে মজেছিলে
সখাভাবে মন রাখিতে
প্রভাতে আসি দেখা দিলে
ফিরে যাও হে রসময়, হয়েছে যে অসময়
বয়ে গেলে ক্ষুধার সময়, ভাল লাগে কি সুধা পেলে।
কণ্ঠ কষ এ প্রভাতকালে, কেন এলেহে চিকনকালা
কুঞ্জ বনে মৌনস্বরে গাহিছে যত কুলবালা
ফিরে যাও হে ভ্রমর বঁধু শুকায়েছে কমল মধু
চন্দ্রাবলীর মত মধু রস [illegible] সেই কমলে।

এই দুটির মধ্যেও মনে হয় 'যামিনী' ভণিতাযুক্ত ঝুমুর পদটিই প্রাচীনতর। নীলকন্ঠের বিন্যাসে রচিত এই গানটিও ঝুমুরের পর্যায়ে পড়ে, কেননা গায়নরীতিতে ঝুমুরের বিশেষত্ব যথেষ্ট সোচ্চার।

এই রকম আরও বেশ কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রবন্ধকে দীর্ঘ করবার প্রয়োজন নেই। এই দুটির উল্লেখ করা হল এটুকু মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্য যে একদা ঝুমুর, এবং অন্যান্য প্রচলিত সংগীতে বেশ খানিকটা আদানপ্রদান ঘটেছে। কবিগানে এমন অনেক গায়নরীতি ছিল বা রচনারীতি ছিল, যাতে প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে এক্ষেত্রেও ঝুমুরের প্রভাব অস্বীকার করবার মত নয় এবং এটাও অনুমান করা যেতে পারে যে, অনেক রচয়িতা ভাল ঝুমুরের গানের খোঁজ খবর রাখতেন। অর্থাৎ, ঝুমুরের ব্যাপকতা কলকাতাতেও যে না পৌঁছেছিল, এমন নয়।

---

ছবিগুলি বাঘমুন্ডি ব্লক যুব দপ্তরের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

# প্রতিবেদন বলরাম বসাক

আপনার দেখা পাওয়ার সৌভাগ্য তো কখনো হয় না, তাই আপনার সাত নম্বর পি এ সুন্দর ভাট-এর কাছে আমার এই লিখিত বক্তব্যটি রেখে যাচ্ছি। আজ, আমি আমাদের ব্রাঞ্চ অফিস থেকে পনেরো মিনিট আগেই বেরিয়েছিলাম। বাড়ি যাব বলে। নতুন বিয়ে করেছি বলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার জন্যে মনটা ছটফট করছিল। কিন্তু বাড়ি ফিরে কলিং বেলটা টিপতেই বুঝলাম ওটা বাজছে না। দরজায় ধাক্কা মারতেই দেখি, ঠাস করে তা খুলে গেল। ভেতরটা অন্ধকার। ঢুকতেই পায়ে কী যেন ঠেকল। উবু হয়ে জিনিসটা তুলতেই ফুলদানির টুকরো মনে হল। চিনেমাটির ফুলদানি। খুব সুন্দর দেখতে ছিল জিনিসটা। বউভাতে পেয়েছিলাম। টুকরোটা হাতের মুঠোয় নিয়ে চুপ করে একঠায় দাঁড়িয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। চোখ দুটো আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে গেল। ফুলদানির শোকে নয়, ওটা গেছে তো কী হয়েছে? আসলে, মানে, এই যে ভাঙচুর...!

উবু হয়ে আরো কয়েকটা টুকরো কুড়োলাম। টুকরোগুলো এদিক ওদিক ছিটকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার মানে ফুলদানিটা খাউবু জোরে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল।

ঝাপসা চোখে একটা খুব জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। অন্ধকার বলে কিছু ঠাহর করতে পারছিলাম না। পায়ে আরো কি কি যেন ঠেকল। উবু হয়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখলাম—যা যা হাতে ঠেকল, তার মধ্যে কতগুলো কাচের টুকরো। একটা টেবিল ল্যাম্প উল্টে আছে। একটা
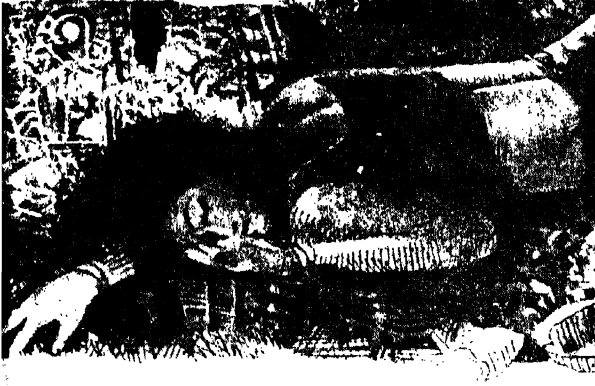
পলিথিনের মত যেন মনে হল, হাতের ঘা খেয়ে অন্যদিকে গড়াতে গড়াতে চলে গেল। ভাঙা গেলাস ছিল হয়তো একটা—জুতোর ঠোকর খেয়ে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে আরো খানিকটা ভেঙে গেল। কতগুলো বড় বড় আয়নার টুকরো হাতে উঠে আসতেই আমি আঁৎকে উঠলাম—এ-এ-কি, ড্রেসিং টেবিলটাও ভেঙে ফেলেছে না কি! তাড়াতাড়ি সুইচবোর্ডের দিকে দু পা এগিয়ে গিয়ে, হাত বাড়িয়ে সুইচে আঙুল রাখলাম, রাখবার সাথে সাথে, হাত কনুই বুক মেরুদণ্ড একসঙ্গে ঝিঁঝিন্‌ ঝিঁঝিন্‌ করে উঠল। শক্‌ খাচ্ছি মনে করে তাড়াতাড়ি হাতটা ঝাঁকুনি দিয়ে নামিয়ে ফেললাম। মনে হল, সুইচবোর্ডটা ঝুলছে। চারদিকে তার ছিঁড়ে একটা এত্তো বড় মাকড়সার মতন করে ঠ্যাংগুলো বের করে রেখেছে। অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল বলে, মনে হচ্ছিল সত্যি সত্যি একটা বিশাল মাকড়স, আমার ঘরে ঢুকে পড়েছে। ভাবলে কি বুকটা ঢিব ঢিব করে উঠবে না? অবশ্য ফ্ল্যাটটা পাবার সময়ই দেখেছিলাম সুইচবোর্ডটা অল্পবিস্তর ভাঙা। এখন ওটা হাত দিয়ে টেনে মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। দেখে দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সুইচবোর্ড ভাঙার উদ্দেশ্য ঘরে যাতে আলো না জ্বলে। সন্ধেবেলা ঘরে আলো জ্বলবে না—ভাবলে মাথাটা কিছুতেই ঠান্ডা রাখা যায় না, স্যার।

ক্রমে ক্রমে দেখলাম টেবিল চেয়ার সব উল্টেপাল্টে রয়েছে। অনেকক্ষণ অন্ধকারে থাকার জন্যে একটু একটু করে ভেতরের ভাঙচুর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। শোবার ঘরে ঢুকতেই দেখি, আরো কাচের টুকরো, গেলাস-ডিশের টুকরো। দেয়ালের প্লাস্টার অনেক জায়গাতেই চটে উঠেছিল। গেলাস, ডিশ, সস্‌প্যান, জগ, অস্ত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে ভাঙা হয়েছে। আলমারির কাচ ভাঙা। পুতুলগুলোর কোনটার মুন্ডু নেই। কোনটার হাত-পা নেই। কোনটার কোমর নেই। সব গড়াগড়ি খাচ্ছিল। গড়াগড়ি খাচ্ছিল রাইসকুকার। হিটারের স্প্রিং ছিটকে বেরিয়ে পড়েছিল। দেখতে দেখতে চোখ দুটোতে জল ধরে রাখতে পারছিলাম না, খাটের ছবিগুলো এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছিল। খাটের ওপর বিছানার চাদর এলোমেলো। কোলবালিশ ছিঁড়ে তুলো বেরিয়ে পড়েছিল। ঠিক তারই পাশে বুক দিয়ে পড়েছিল। ফুঁসে ফুঁসে কাঁদছিল। কাপড়চোপড় একেবারে এলোমেলো। চুলগুলো এমন খোলা অবস্থায় ছিল যে, মনে হচ্ছিল যেন ঝাপস করে পড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

উরুর অর্ধাংশ থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত নগ্ন উজ্জ্বল ধবধবে পা দুটো থরথর করে কাঁপছিল।

ইচ্ছে হয়েছিল, অত্যন্ত কর্কশ গলায় রূঢ়ভাবে ডাকি 'শম্পি', কিন্তু তা না করে শুধু একবার গলা খাঁকারি দিলাম। তাই শুনে আরো জোর জোর ফোঁস ফোঁস শব্দ কানে এল। পা দুটো আরো থরথর করে কাঁপল। পিঠখানা ওপরে। হাতের একটা বুকের তলায়। আরেকটার ওপর মুখ গুঁজে শুয়ে ছিল। কী যে হয় ওর মাঝে মাঝে। একটা দীর্ঘ নিশ্বাশ ফেলতেই হল, স্যর।

আপনি তো সবই জানেন। মাত্র কয়েক মাস হল বিয়ে হয়েছে। এখনও আমার ওপর তেমন টান আসেনি। মাঝে মাঝে অকারণে আচমকা রেগেমেগে কাপ ডিশ গেলাস ভেঙে ফেলে। আলমারি খুলে শাড়ি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। বাসনকোসন ছুঁড়ে দেয় এদিক ওদিক। তারপর বিছানায় পড়ে পড়ে কাঁদে। কিন্তু আজ ও বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।

পছন্দ হয়নি আমাকে। হয়তো অন্য কোথাও ওর মন পড়ে আছে। এইভাবে জোর করে কি ওকে বাধ্য করানো যায় আমার ঘর-সংসার করতে? সেণ্ট্রাল অফিসের ওপরতলা থেকে আপনার নোট এল। বিশেষ অনুরোধ। শম্পিকে যেন আমি বিয়ে করি। আপনি, শুনেছি, শতিনেক কোম্পানীর জোটের মালিক। সবচে বড় কর্তা আপনি। আপনার পি এ-দেরই শুধু দেখা পাওয়া যায়। আপনার দেখা পাওয়ার সৌভাগ্য কারুর হয় না। এমন বসের বিশেষ অনুরোধ মানেই বিশেষ আদেশ। আর সে আদেশ অমান্য করার অত শক্তি আমার নেই। তাই শম্পিকে বিয়ে করেছি। তাই নীরারেখাকে আর আমলই দিই নি। বলতে পারেন, মনের মধ্যে তাকে একটু
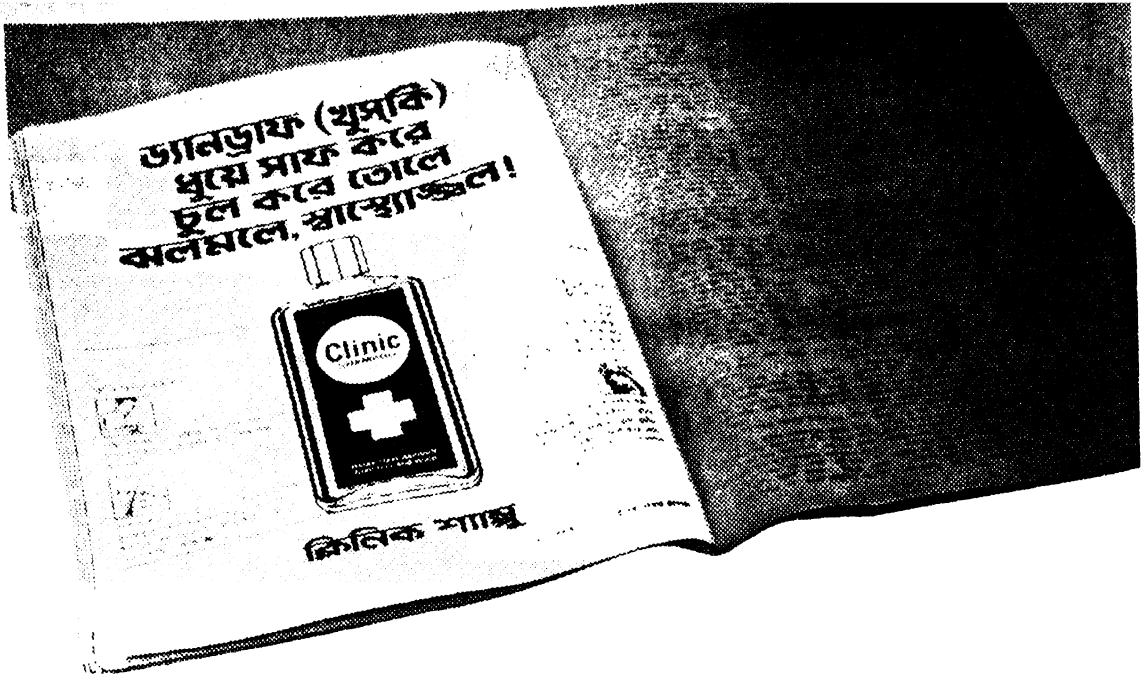
কিন্তু... আপনার খুস্‌কি যদি
নাছোড়বান্দা ও জোরদার
ধরনের হয়, তাহলে আপনার
দরকার এমন এক শ্যাম্পুর
যা ক্লিনিক-এর চেয়েও
বেশী শক্তিশালী !
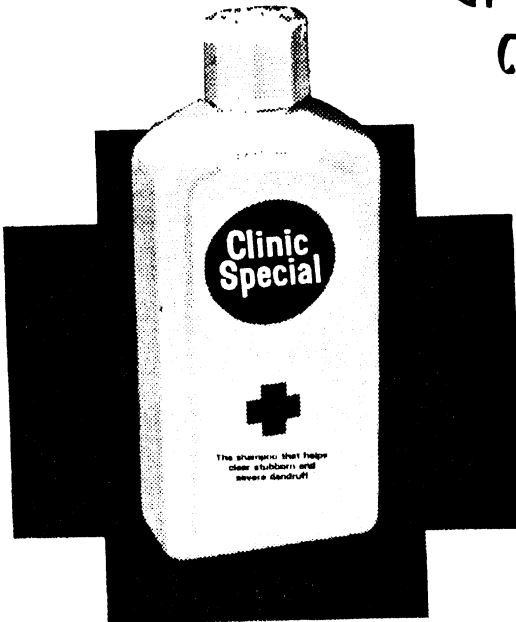
# ক্লিনিক স্পেশাল

ক্লিনিক-এর ওপর আপনি যে যথেষ্ট সন্তুষ্ট তা আমরা জানি, কারণ এটি আপনার খুস্‌কিতে অনেক কাজ দিয়েছে। কিন্তু এমন লোকও আছেন যাঁদের খুস্‌কি একেবারে নাছোড়বান্দা ও জোরদার ধরনের। সেজন্যেই আমরা এক নতুন ফর্মুলার শ্যাম্পু তৈরী করেছি যা, এই ধরনের নাছোড়বান্দা ও জোরদার খুস্‌কিও ধুয়ে সাফ ক'রে দেবে—এমন কি, ক্লিনিক-এর চেয়েও অনেক বেশী কার্য্যকরীভাবে। এ হ'ল ক্লিনিক স্পেশাল

তার মানে এখন পাবেন দু'ধরনের ক্লিনিক। ক্লিনিক—সাধারণ খুস্‌কির জন্যে। ক্লিনিক স্পেশাল—নাছোড়বান্দা ও জোরদার খুস্‌কির জন্যে। এবারে খুস্‌কির সব সমস্যার সমাধান।

হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেড-এর এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

সম্মান দিয়ে রেখেছি। কিন্তু সেও তো মন থেকে তাকে ধরেমরেছে ফেলার জন্যে খুবই চেষ্টা করে যাচ্ছি। ওর সাথে তো আর কোন রকম যোগাযোগ রাখিনি।

গলার ভেতরটায় ভারি জল জমছে, স্যার। কিংবা কফ্। স্বরযন্ত্র এই সময় বিকল হয়ে যায়। দুটো চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। আমার ফ্ল্যাটটা কত সুন্দর। ঐ ফ্ল্যাটের ব্যালকনি থেকে অর্ধবৃত্তাকারে কলকাতার বাড়িঘর, গাছপালা, রাস্তা মনুমেন্ট ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, হাওড়ার পুল, আর ঘন নীল আকাশের ছুঁয়ে থাকা—সব দেখা যায়। ফ্ল্যাটের ভেতরে কত সুন্দর সুন্দর ফার্নিচার কিনেছি, কত পুতুল, কাপড়চোপড়, বই কত কি। সবই কোম্পানীর টাকায়। সবই আপনি করে দিয়েছেন। অথচ কি বলব, ঠিক এরকম ফ্ল্যাটেরই স্বপ্ন দেখেছিল নীরুরেখা। ওর চোখ দুটো কত সুন্দর নরম আর শান্ত ছিল। মেজাজী একদম ছিল না। দেখতে তেমন ভাল ছিল না, আর ওর বাবা খুবই গরীব ছিল। সে জন্যেই ওকে বিয়ে করা উচিত ছিল আমার। দাঁতে দাঁত চেপে ভাবছি এ সব। চোখে কেন যে জল আসছে। এইভাবেই বোধ হয় অপরাধীরা দাঁতে দাঁত চেপে বিবেকদংশন সহ্য করে। তাই না, স্যর?

মনে পড়ে যায় আপনার তের নম্বর পি এ শান্তনু যাজ্ঞিক আমার হোস্টেলে কী রকম ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছিল। ওর হাতে ছিল আপনার নোট। আর সেই নোটের সঙ্গে একটা আলাদা কাগজ এনক্লোজড্ করা ছিল। তাতে ছিল শম্পির বায়োডাটা। আপনি লিখেছিলেন, শম্পি খুব ভাল মেয়ে। ওকে বিয়ে করলে আমি সুখী হব। আর আপনিও খুশী হবেন। কোন অসুবিধে হবে না। অসুবিধেয় পড়লে আমি যেন তক্ষুনি সমস্ত অসুবিধের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আপনার পি এ-সেভেন সুন্দর ভাটকে জানাই। তাই তো আজ ছুটে এসেছি। সুন্দর ভাটের কাছে এই বক্তব্য রাখছি। আজ শম্পি অনেক বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। আজ ও টিউব লাইটও ভেঙেছে। রেডিওটাও আছাড় মেরে ভেঙেছে। স্টোভখানা ছুড়ে ফেলে দিয়েছে টান মেরে। কেরোসিন তেলে মেঝের অধেকটা ভিজে গেছে। জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো কিংবা দেশলাই কাঠি পড়লে, দাউ দাউ করে আমার ঘরে আগুন জ্বলে উঠতে পারত। ইলেকট্রিকের তারে আগুন ধরে যায়নি, তা-ই আমার ভাগ্য। আমার ভীষণ রাগ হয়েছিল। কী ভয়ংকর রাগ হয়েছিল বলে বোঝাতে পারব না। অফিস থেকে ফিরে কোন মানুষই স্বেচ্ছায় হোটেলে থাকতে চায় না। বারে থাকতে চায় না। ফুটপাথে ফুটপাথে হেঁটে বেড়াতে চায় না। বাড়ি যেতে চায়। বাড়ি মানে খুউব সুন্দর একটা নিজস্ব আশ্রয়—যাকে লোকে বলে ঘর, কেউ বলে সংসার—আমি যে সেটা এখনো পাই নি, স্যর। —এখনো কপালে জুটল না।

॥ ২ ॥

অফিস থেকে ফিরে এই ভাঙচুর দেখলে মেজাজ কি ঠিক রাখা যায়? বিছানায় বুক দিয়ে শুয়ে মুখ গুঁজে কাঁদছিল। একবারও আমার দিকে ফিরে তাকায় নি। ইচ্ছে করছিল, চুলের মুঠি ধরে একটা চড় কষাই। কিন্তু তক্ষুনি আপনার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। আপনার দয়ার কথা। আপনি আমাকে চাকরি করে দিয়েছেন। ফ্ল্যাট দিয়েছেন। বউ দিয়েছেন। অফিসে সর্বোচ্চ পদ দিয়েছেন। তাই আপনার কাছেই ছুটে এসেছি। বলে দিন, এখন কী করি?

আপনি নোটে যা যা লিখে পাঠিয়েছেন তাই করে গেছি। সেদিন বাড়ি ফিরে যাবার আগে আমাদের পাড়ার স্টেশনারি দোকান থেকে একটা মোমবাতি কিনে নিয়ে গেছি। মোমবাতি জ্বালিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে, ওটা ছোট একটা টি-টেবিলে রেখে বিছানায় বসেছি। তারপর যা যা বলেছেন তাই করেছি। প্রথমে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছি। দেখলাম, আরো জোরে জোরে কাঁদতে লাগল। তখন চুলের ভেতর আঙুল ডুবিয়ে চিরে চিরে দিলাম। খুব নরম গলায় আস্তে আস্তে ডাকলাম, 'শম্পি'। এইভাবে ডাকতেই দারুণ ফল দিল স্যর। গা-টা আর শক্ত করে রাখল না। কেমন তুকতুকে নরম হয়ে গেল। তখন ওকে আস্তে আস্তে টেনে বুকে তুলে নিলাম। পিঠে হাত বুলিয়ে দিলাম। দিতেই ও কী রকম হাউ হাউ করে অঝোরে কাঁদতে লাগল। তাই ঠোঁটে ঠোঁট রেখে অনেকক্ষণ চুমু খেয়ে খেয়ে ওর সজোরে কান্না বন্ধ করলাম। আমার জামা দিয়ে ওর চোখ মুছিয়ে দিলাম। দেখলাম, ঘরের জিনিসপত্র ভেঙেছে বলে ও খুউব আফসোস করতে লাগল। আমি ওকে সান্ত্বনা জানালাম। বললাম, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আবার সব হয়ে যাবে।' বলতে বলতে আপনার কথা মনে পড়ল। আপনার দয়ার কথা—। আপনার কথা, আপনার দয়াতেই আমার কী রকম উন্নতি হয়েছে ওকে বললাম। বলতেই, স্যর, দেখলাম ওর মুখটা কী রকম হয়ে গেল। কপাল গোঁজ করল। কেন করল বুঝতে পারলাম না। তারপর আস্তে আস্তে আমাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরল। অনেকক্ষণ আমিও নানা-ভাবে আদর করলাম। সারারাত ওকে বুকে নিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে শুয়ে থাকলাম।

ঘরের ফার্নিচার যা যা ভেঙেছে, সে সব খুব সকালবেলা উঠে এক জায়গায় একত্র করলাম। পুরানো ভাঙাচোরা জিনিস যারা কেনে, তাদের কাছে বিক্রি করব বলে রেখে দিলাম। নিজের হাতেই ইলেকট্রিকের লাইনটা ঠিক করলাম। ইলেক-ট্রিকের কাজটা জানা ছিল, তাই করলাম। সুইচবোর্ডটা অবশ্য ছুতার-মিস্ত্রী ডেকে মজবুত করে বানিয়ে নিয়েছি। এখন তো আর কোম্পানীর কাছ থেকে নতুন করে সব ফার্নিচার প্রার্থনা করা যাবে না। তাই শম্পিকে নিয়ে ব্যাংকে গেলাম। আমার সেভিংসে যৎসামান্য যা জমে ছিল সব তুলে ফেললাম। এবারে শম্পির পছন্দ অনুযায়ী স্টিরিও, রেডিও, একটা টি ভি (ইনস্টলমেন্টে), কাচের সরবত সেট, টি সেট, কফি সেট, ডিনার সেট, কুকার, হীটার, স্টোভ, পুতুল, ফুলদানি বাঁকুড়ার

ঘোড়া, পেন্টিং, দু-তিন রকমের তিন সেট কসমেটিক্স, চাররকম শাড়ি, খুব সুন্দর ডিজাইনের তিন জোড়া বেড সীট্, টেবিল ক্লথ, অ্যালার্ম ক্লক, রূপোর জড়োয়া সেট—সব সব কিনে ফেললাম। শম্পিকে নিয়ে মাঝে মাঝে অভিজাত হোটেলে গিয়ে রাজকীয় ডিনার খেলাম। সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা সবই দেখিয়েছি। আর সংগে সংগে লক্ষ করেছি ওর মধ্যে একটা উৎফুল্ল ধরনের মেজাজ ফিরে আসছে। ক্রমে ক্রমে হই-হুল্লোড় হাসি ঠাট্টা শুরু করছে। কিন্তু স্যার, কতদিন তার আয়ু? কিছুদিন গেলে, আবার কেমন যেন চুপচাপ বসে থাকে। কথা বলে কম। মাঝে মাঝে পড়ে পড়ে ঘুমায়। মাঝে মাঝে রান্নাটান্না একদম ভুলে যায়।

আজ অফিস থেকে ফিরে দেখি আবার সেই অন্ধকার। আবার সেই ভাঙচুর। স্টিরিও, রেডিও, টি ভি, ফানিচার, গেলাস ডিশ কাপ, ফোটো ড্রেসিং টেবিলের কাচ, পেন্টিং, টিউবলাইট্, টেবিলল্যাম্প, কিছু বাকি রাখে নি। সব টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। আমার যৎসামান্য সেভিংসের টাকায় ঐ সব কিনেছিলাম। কী রাগ যে আমার হচ্ছে, আমি আপনাকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না। আমার পা দুটো থর থর করে কাঁপছিল। দাঁত ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল। নিজের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে স্যার, আপনার কথামত সংসারটা আবার ঠিকমত গড়বার চেষ্টা করেছিলাম,—এই হল তার হাল। আমি নিঃশেষ হয়ে গেলাম! কয়লার ঘরে একটা পুরোনো তারকাটার টুকরো পড়েছিল, সেটা একটানে বার করে আনলাম। আমাকে আপনি মাপ করবেন, স্যার! আমি তখন রাগে অন্ধ, আমার মাথায় চড়াৎ করে রক্ত উঠে গেছিল। গাঢ় অন্ধকার শোবার ঘরে ঢুকে, কোনদিকে খাট তা একবার শুধু আন্দাজ করে, তারপর খাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে, বিছানায় পড়ে থাকা এবং হয়তো ফোঁস ফোঁস করতে থাকা আবছা-আবছা শম্পিকে একবার যেন লক্ষ করলাম। পরক্ষণেই তার পিঠ লক্ষ করে তারকাটা দিয়ে চাবুকের মত মারতে লাগলাম। অনেকক্ষণ পর খেয়াল হল কোন যন্ত্রণার কাতর শব্দ শুনতে পাচ্ছি না তো। শম্পিকে কি মেরে ফেললাম?

তখন একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে, দেখলাম শম্পি বিছানাতেই নেই। শুধু, বিছানার ওপর তোশক ছিন্নভিন্ন হয়ে আছে। তারকাটার ঘা খেয়ে খেয়ে, পাশবালিশটাও বীভৎস মতন দেখতে হয়েছে। চারদিকে তুলো ছড়িয়ে পড়েছে। শম্পি বিছানায় নেই। সারা ঘর, বাইরের ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম, কয়লাঘর। পাশের ফ্ল্যাটে নীচে, ওপরে, বাড়ির কাছাকাছি সর্বত্র খুঁজলাম। শম্পি সব ভেঙেচুরে কোথায় যে চলে গেছে...। এখন বলুন, কী করি?

॥ ৩ ॥

আপনার নোট অনুসারে পুলিসে খবর দিয়েছি। তারপর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের বাড়ি গেছি। কোথাও না পেয়ে শূন্য বাসায় ফিরে এসেছি। ঘরের ভেতর ধ্বংস-স্তূপ। বেশীক্ষণ চোখে দেখা যায় না।

ফ্ল্যাটে তালা লাগিয়ে, অফিস থেকে একদিনের ছুটি নিয়ে বর্ধমান চলে গেছি। শম্পিদের মামার বাড়ি। সেখানেও খোঁজ করলাম। নেই। ফিরে এলাম। হাওড়া স্টেশন থেকে বেরিয়ে তক্ষুনি বাসে না উঠে, ট্রামে না উঠে হাওড়ার ব্রিজে গিয়ে দাঁড়ালাম। হুগলী নদী তখন চারদিকে বিশৃঙ্খল ব্যাপ্ত করে আপনমনে ভেসে যাচ্ছিল। দূরে দূরে জাহাজ দাঁড়িয়ে ছিল। ছোট ছোট নৌকা দুলছিল। আকাশে কত যে রঙের ফোয়ারা মেঘ থেকে মেঘে ছড়িয়ে পড়ছিল। দূরে দূরে কত দালান কোঠা, গম্বুজ, মিনার...কতভাবে ঘুরপাক খাচ্ছিল দলবদ্ধ পাখিরা—সবই দেখছিলাম; কিন্তু মনটা আমার কিছুতেই সেসব নিতে পারছিল না। ঐ যে, সবুজ পাতা কৃষ্ণচূড়া গাছটা যেন অনেক দিন আমি দেখিনি। গাছে থোকা থোকা হলুদ রঙের ফল দুলছে। আমি যেন অনেক দিন ভুলে গেছিলাম গাছে গাছে ঐরকম ফলের কথা। লম্বা কতগুলো ছেলে ঘাট থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। পায়রাগুলো গোল হয়ে ঘাটের আরেক ধারে ঘুরছে ফিরছে। একটা লাল মেঘ ঝলমল করে উঠেছিল, আমি মনমরা হয়ে দেখলাম। কত দিন যে জেলেডিঙি দেখিনি, জাহাজের মাস্তুল দেখিনি, নদীর সুদূর প্রান্ত যেখানে তালগাছগুলোর ঝাঁকড়া মাথা আকাশের রঙে চোখ ডুবিয়ে রেখেছে—আমি অনেকদিন এসব দেখিনি...। কী দেখেছি তা হলে এতদিন?

ভাবতে গিয়ে মাথাটা ঝাঁকাতে লাগলাম। সুন্দর ফ্ল্যাট, সুন্দরী স্ত্রী সব কিছুর মধ্যেই এখন কেমন একটা যেন ভাঙচুর। আমি যে কিছুই সামলাতে পারছি না, স্যার। প্রচণ্ড বেগে পাশ দিয়ে ট্রাম-বাস-লরি-ট্যাক্সি-টেম্পো প্রসেশন যাচ্ছে। কাতারে কাতারে লোক হাঁটছে অফিস ছুটির আনন্দে। হঠাৎ দেখি নীরেখা ঐরকম ভিড়ের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কী শান্ত নির্মল দুটি চোখ ওর হাওয়ার স্পর্শে চুলগুলো যেন ফ্রীডম্ অনুভব করছে। ও হাঁটছে কেমন দৃপ্তভঙ্গিতে। কথা বলছিল বোধ হয় পাশের কোন ছেলের সাথে। তক্ষুনি আমার মনে হল, শম্পি তো আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, তাই আপনার অফিসে চাকরিটা নেবই বা কি হবে! ফ্ল্যাটখানাও ছেড়ে দেব। সুতরাং, নীরেখাকে আবার আমি ফিরে পেতে পারি—আমি না হয় ওর পিছু পিছু ধাওয়া করি, ছুটে ছুটে চলে যাই ও যেদিকে যায়—চিৎকার করে না হয় ডাকি 'নীরেখা, শোন শোন...।'

কিন্তু ছুটতে গিয়ে পায়ে পা জড়িয়ে গেল। চিৎকার করতে গিয়ে জিভ আটকে গেল। তক্ষুনি আপনার কথা মনে পড়ে গেল। আপনার দয়ার কথা! আপনি যা করেছেন সবই তো আমার ভাল চেয়েই করে এসেছেন। মন্দ তো কিছু করেন নি। তা হলে কেন আপনাকে খিস্তি করব। তাই আবার ছুটে এসেছি এই

সন্ধ্যে বেলা আপনার অফিসে, আপনার পি এ-সেভেন সুন্দর ভাটের কাছে। এখন বলুন, কী করি?

॥ ৪ ॥

সেদিন নোট পাঠিয়ে যে সান্ত্বনাদান করেছিলেন, তাইতে মনটা খুব শান্ত হয়ে গেছিল। সেদিন রাতে বাড়ি ফিরে এসে দেখি একটি মেয়ে বসে আছে আমার ফ্ল্যাটের কাছাকাছি, সিঁড়িতে। মাথা নীচু করে বসে আছে। কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। এবং চিনতে পারলাম যে মেয়েটি শম্পি। মুখের রঙ কালো হয়ে গেছে। চুল খুবই উস্কখুস্ক। শাড়িটাতে কাদা আর কালিঝুলি এমন করে মেখে গেছিল যে, ওকে ঝি-ঝি-এর মত লাগছিল। ঘরে তালা লাগানো ছিল বলে ঘরে ঢুকতে পারে নি। আমাকে দেখে তক্ষুনি মাথা নামিয়ে নিল। আমি ভাবলাম, একটা প্রচণ্ড জোরে চড় কষাই। কিন্তু স্যার, আপনার কথা মনে পড়ে গেল। আপনি সবার অগোচরে থেকে, সব সময়ই কেমন ক্ষমা করতে বলেন যত রাগই হোক, যত অপরাধই হোক। আপনি নিজে সবার আড়ালে থেকে কেবলই বলেন, শুধু ক্ষমা কর, আর আদর কর।"

তাই ওকে দু হাতে কাছে টানলাম। দেখলাম সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখ ফেটে গেল। জল পড়তে লাগল।

রুমাল দিয়ে প্রথমে গালের ওপরকার জলের ধারটা মুছে দিলাম। চোখের পাতার প্রতিটি লোম বিন্দু বিন্দু জল ধরে রেখেছিল মুক্তোর মতো। তারপর সেগুলো রুমাল দিয়ে শুষে নিলাম। যখন ফ্ল্যাটের দরজা খুলছি তখন ও নিজে থেকেই বলল, ও একটা ছেলের সাথে পালিয়ে গেছিল। পালিয়ে কসবার সুরকি কলের কাছে একটা বাড়িতে উঠেছিল। তারপর ছেলেটাই নাকি সেই বাড়িতে তাকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

শুনে একটু চমকে উঠেছিলাম। না, কোন একটি ছেলের সাথে ও পালিয়ে গেছিল—তা শুনে আমি চমকাই নি। ছেলেটাই যে ওকে একা ফেলে পালিয়ে গেছে তাই শুনে চমকে উঠেছি। কেন ছেলেটা শম্পিকে আমার ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেল। কেন কসবার সুরকি কলের কাছে একটা বাড়িতে তুলল। আবার কেনই বা ওকে ওখানে একা ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। শুনে আমার কাছে কেমন যেন রহস্যজনক ঠেকছে। ছেলেটা শেষে ওকে ফেলে পালাল কেন? কিসের ভয়? কেন হঠাৎ এত ভয় পেয়ে গেল? এ ব্যাপারে কি গোপনে গোপনে আপনার হাত কাজ করেছে? একটা সিগারেট ধরিয়ে আপনার কথা ভাবতে লাগলাম। আপনাকে কখনো দেখিনি। আপনি সব সময় সবার আড়ালে থাকেন। সবার অলক্ষে নীরবে কাজ করে যান। আমরা কিছুই টের পাই না, স্যার। আপনার অসীম দয়া। তাই শম্পিকে আবার ফিরে পেয়েছি। এবারে আমার কাছে নিজে থেকেই ফিরে এসেছে। একেবারে আমার অনুগত হয়ে, বাধ্য মেয়ের মত ফিরে এসেছে। আমার যে কী আনন্দ হল স্যার, আমি কেঁদে ফেললাম। দু হাতে ওকে বুকে টেনে আমার চোখের জলে গাল ভেজালাম। ক্ষমা আর আদর যে এমন একটা মেজাজ এনে দেয় যে কী বলব। কৃতজ্ঞ চিত্তে আপনাকে স্মরণ করে মাথা নুইয়ে দিলাম। শম্পিকেও বললাম, এই স্যারের জন্যে হল—স্যারের কাছে আমাদের দুজনেরই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

কিন্তু স্যার, শম্পি তক্ষুনি কেন যে কপাল গোঁজ করল! দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল শক্ত করল। ও আপনাকে কেন যেন সহ্য করতে পারে না। একটু কাঁদো কাঁদো করে থেকে কেঁদে ফেলল। অবশ্য কান্নাটা অন্য কারণেও হতে পারে। হয়তো সে সময় আমার কথা শুনতে পাচ্ছিল না। অন্যমনস্ক ছিল। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে আমার ঘরের ভেতরের ভাঙচুরটা লক্ষ করছিল। এদিক ওদিক চোখ ফেলে দেখছিল। দেখতে দেখতে ওরকম করে কেঁদে ফেলল। এই যে ভাঙচুর—এ তো নিজের হাতেই ঘটেছে বলে এখন হয়তো ওই খুবই আফসোস হচ্ছে। ... কাঁটায় বিছানার ছিন্নভিন্ন অবস্থা দেখে একটু শিউরে উঠল। আমার দিকে ... ভাসা চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল।

একটু পরে আচমকা খিলখিল করে হেসে উঠল। আমাকে ... বুকে মুখ ডুবিয়ে ঘষতে লাগল। হঠাৎ ঐ খিলখিল হাসি, হঠাৎ এই ... কখনো মনে হল রহস্যজনক, কখনো মনে হল সত্যি, কখনো মনে হল ... কখনো মনে হল অবিশ্বাস্য। কোন কোন সময় মনটা আনন্দে নেচে উঠল, কোন সময় মনটা ভয় ভয় করে উঠল। তাই তো আপনার সেন্ট্রাল অফিসে, ... পি এ-র কাছে ছুটে এলাম। আপনার অ্যাডভাইস চাইতে। এখন বলুন, কী ...

॥ ৫ ॥

আপনার নির্দেশমত আগের ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিয়ে, রবীন্দ্র সরোবর লেকের ... নতুন ফ্ল্যাট নিয়েছি। অপূর্ব সুন্দর এই ফ্ল্যাট—যেখানে বসে দেখা যায় ... নিবিড় শান্তি, সবুজ প্রকৃতি, আর প্যানারমিক আকাশ। আপনার নির্দেশে অফিস থেকে লোন করেছি। আপনার দয়ায় সেই লোন দীর্ঘমেয়াদী আর সুদে ... পেয়েছি। তার ওপর লোন যাতে শোধ করতে পারি তার জন্যে মাইনেটাও ... উপযুক্তভাবে বাড়িয়ে দিয়েছেন।

আবার নতুন করে ফার্নিচার কিনেছি। বাসনকোসন কিনেছি। রেডিও, স্টিরিও, টি ভি, ফ্রিজ সব—সব কিনেছি। বাথরুম, কিচেন, ড্রইংরুম, বেডরুম আর স্টাডি যা যা দিয়ে সাজাতে হয়, সাজিয়েছি। আবার হাসি-খুশি গান নাচ কথকতা খাওয়াদাওয়া হইহল্লা সব ফিরে এসেছিল। কিন্তু...

কিন্তু স্যার, কী বলব, আবার একদিন অফিস থেকে ফিরে ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখি অন্ধকার। না, কোন ভাঙচুর নয়, সবই ঠিক আছে। ঘরটা শুধু অন্ধকার। আলো জ্বালতেই, আলো জ্বলল। খাটে শম্পি—। না, শুয়ে কাঁদছিল না, কিছুই করছিল না। শুধু জবুথুবু হয়ে বসেছিল বিছানার ওপর। একটাও কথা বলছিল না। একটু পরে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে দেখি, হুকে একটা দড়ি বাঁধা রয়েছে, আর তাতে ফাঁস লাগানো। দড়িটা ঝুলছে। শম্পি বোধ হয় ফাঁসিতে লটকে মরতে চেয়েছিল। ভাবতে ভাবতে সময় পার করে ফেলেছে। আমি, স্যার, তক্ষুনি দড়ি সিলিং-এর হুক থেকে খুলে আপনার পি এর কাছে ছুটে চলে এসেছি। এখন বলুন...

॥ ৬ ॥

আপনার নির্দেশ মত বাড়ি ফেরার পথে কতগুলো স্লিপিং ট্যাবলেট কিনেছি। আসলে যে সুইসাইড করার কথা ভাবে, তার যে কী প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা—সে কথা আপনি আপনার নোটে উল্লেখ না করলে জানতেই পারতাম না। তাই আপনার নির্দেশ মত স্লিপিং ট্যাবলেটগুলো শম্পিকে দিয়েছি। ক'টা দিয়েছি ঠিকমত খেয়াল করিনি। হয়তো তিনটে দিয়েছি কিংবা পাঁচটা। আমার নিজেরই মন যেন কেমন কেমন হয়ে গেছে, ঠিক যেরকমটি হয়েছিল নীরেখার সঙ্গে যখন আমি প্রথম যোগাযোগ ছিন্ন করি। সেদিনও আমি ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েছিলাম—ক'টা খেয়েছিলাম? একটা-দুটো-তিনটে—! আমার মনে নেই। সারা রাত ঘুম আসছিল না। আমি কি নীরেখাকে বিয়ে না করে, তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে কোন ভুল করেছি? ভুল আপনি কেন আমাকে করতে দেবেন? আমি তো সব সময়ই আপনার নির্দেশ মত কাজ করে যাচ্ছি, তাহলে কেন ভুল হবে?

তবু, আমার গণনাতে ভুল হয়ে গেছে, স্যার। শম্পিকে ক'টা স্লিপিং ট্যাবলেট খেতে দিয়েছিলাম আমার মনে পড়ছে না। আপনি খুব স্বাভাবিক কারণেই সন্দেহ করতে পারেন আমাকে। সত্যি বলছি, ক'টা স্লিপিং ট্যাবলেট—তার হিসেব করতে বসে মনে পড়ছে, আমারও ঘুম আসছিল না বলে আমিও একটা কি দুটো খেয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি টেবিলের ড্রয়ারে একটাও ট্যাবলেট নেই। আমিই কি শম্পিকে মেরে ফেলেছি? সকাল কখন হয়ে গেল, ও এখনও ঘুম থেকে উঠল না, কথা বলল না, ওর বুক উঠছে না, নামছে না, হাত-পা কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা...আমিই ওকে বেশি করে ট্যাবলেট খাইয়ে মেরে ফেললাম। —এখন আমি কী করি?

॥ ৭ ॥

আপনি যা যা বলেছেন তাই করেছি। ডাক্তারকে খবর দিয়েছি। ডাক্তারের কথা অনুযায়ী অ্যাম্বুলেন্স ডেকে হাসপাতালে নিয়ে গেছি। হাসপাতালে পাম্প করে ওর পেট পরিষ্কার করা হয়েছে। ও বেঁচে উঠেছে। কয়েক দিন পর সুস্থ হয়ে বাড়ি এসেছে। এখন একটু ভাল। কিন্তু, বেঁচে উঠলেও মড়ার মতই পড়ে থাকে। মরা মানুষের মতই তাকায়। মরা মানুষের মতই কথা বলে, আমার ভাল লাগে না। কেমন ভয় ভয় করে। আর যে আমার ভাল লাগছে না, স্যার। বলুন, কী করি।

ছবি : সুধীর মৈত্র

(বাকাংই)

মণিদীপা অনেক পুরুষকে পার হয়ে এসেছে জীবনে। সে জানে, পুরুষমানুষের এই হঠাৎ রাগ থেকেই আসে আশ্লেষ। দীপনাথ তাকে এই থরো থরো রাগের চূড়ায় যে হঠাৎ জড়িয়ে ধরে ভেঙে পড়তে পারে অনুরোগে, চুমু খেতে পারে, এমনতরো ঘটনার জন্য সে প্রস্তুত ছিল।

কিন্তু দীপনাথ পিছিয়ে গেল। ক্লান্ত স্বরে বলল, চারদিকে বদনাম রটে গেছে মিসেস বোস।

কিসের বদনাম?

আপনাকে আর আমাকে নিয়ে। আমার ছোটো বোন পর্যন্ত জানে।

অবাক হয়ে মণিদীপা বলে, এই জন্য আপনি এত ডিসটার্বড আজ?

ভীষণ ডিসটার্বড।

বদনাম রটলে ক্ষতি তো মেয়েদের। আপনারা পুরুষমানুষ, আপনাদের বদনামটাই ফেমস।

দীপনাথ মাথা নাড়ে, না। আপনি কবে বুঝবেন, নিজের জন্য আমি ততটা চিন্তিত নই, যতটা আপনার জন্য।

মণিদীপা আবার একটু অবাক হয়। তবে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, বদনামকে আমি তো ভয় পাই না। আমার নামে এ পর্যন্ত বহু বদনাম রটেছে। আপনি আমার জন্য অনর্থক ভাবছেন।

অনর্থক। তাই হবে। বলে দীপনাথ সোফায় বসে অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে নিজের আঙুলগুলো দেখে। তারপর এক সময়ে বিবর্ণ বিভ্রান্ত মুখখানা তুলে বলে, আমার মাথার ঠিক ছিল না। আপনার সঙ্গে একটু রাফ ব্যবহার করে ফেলেছি।

মণিদীপা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকেই একদৃষ্টে দেখছিল দীপনাথকে। চোখের দৃষ্টি কোমল, স্বপ্নাচ্ছন্ন। কথাটা শুনে মৃদু একটু হাসল। বলল, রাফ ব্যবহার? একটুও নয়। আমি পুরুষদের সত্যিকারের রাফনেস দেখেছি। আপনি রাফ নন। তবে টাফ। ভেরী টাফ আর হেডস্ট্রং।

কফি ঠান্ডা হচ্ছিল। কয়েকটি ব্যগ্র চুমুকে কাপ শেষ করে দীপনাথ উঠল, আজ চলি।

হঠাৎ কেন উদয় হয়েছিলেন, বললেন না তো!

আপনার সঙ্গে একটা শো-ডাউনের জন্য। অনেক দিন ধরে আপনি আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে যাচ্ছেন।

শো-ডাউন কি হয়ে গেল?

ম্লান হেসে দীপনাথ বলে, হল আর কই? আপনার সামনে এলেই আমার সব গুলিয়ে যায়।

আমার বদনাম নিয়ে আপনি খুব চিন্তিত, কিন্তু একবারও বোস সাহেবের বদনাম নিয়ে ভাবছেন না তো!

দীপনাথ হেসে বলে, এই যে বললেন পুরুষ-মানুষের বদনাম মানেই ফেম।

তা ঠিক। তবু অ্যাজ এ ওয়েল-উইশার আপনারা আর একটু ইন্টারেস্টেড হওয়া উচিত। আজকাল শুনি বোস সাহেব আপনাকে জিজ্ঞেস না করে কোনো ডিসিশন নেন না।

অতটা সত্যি নয়। তবে কোনো কোনো ব্যাপারে উনি আমার অ্যাডভাইস নেন।

শুনেছি আমার মাসোহারা কত হওয়া উচিত তাও আপনিই ঠিক করে দিয়েছেন।

দীপনাথ অস্বস্তি বোধ করে বলে, আমাকে বোস সাহেব জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি যা ভাল বুঝেছিলাম তাই বলেছি। আপনি কি তার জন্য রেগে আছেন?

আমি মাঝে মাঝে খামোখাই রেগে যাই। সে আমার স্বভাব। কিন্তু চারশো টাকা যে অনেক টাকা তাও আমি জানি।

আপনি রাগ করেছেন।

আমার রাগে আপনার কি আসে যায়! আপনি আমার কে? আমি শুধু ভাবছি বোস সাহেব কি করে এ কথাটা মেনে নিল। চারশো টাকার প্রশ্ন নয়, আমার হাত থেকে সব অর্থনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার ডিসিশনটাও মেনে নিল কি করে?

দীপনাথ মুখ তুলল না। কিন্তু শান্ত গলায় বলল, এই ডিসিশন না নিলে বোস সাহেব এতদিনে পথে দাঁড়াতেন। অফিসে ওঁর লোন কত ছিল জানেন?

ঠোঁট উল্টে মণিদীপা বলে, জানতে চাই না। আমি জানতে চাই, বোস সাহেব যে মেয়েটাকে নিয়ে মাথা-মাখি করছে সেও আপনার রিক্রুট কিনা।

দীপনাথ এবার মুখ তোলে। মুখ সামান্য লাল। শ্বাস গাঢ়। চাপা গলায় সে বলে, আমাকে আপনি কি ভাবেন বলুন তো!

এ ম্যান উইদাউট ব্যাকবোন অ্যান্ড ভয়েড অব পারসোন্যালিটি! আপনার মতো মানুষ বসকে সন্তুষ্ট করতে সব পারে।

দীপনাথ উঠে দাঁড়াল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ঠিক আছে। কোনোদিন আমার সম্পর্কে আপনার ধারণা যদি পাল্টায় তবে আবার দেখা হবে।

মণিদীপা তাকিয়েই ছিল। স্থির গভীর দৃষ্টি। একটু হাসল। বলল, আপনি আমার অনেক ক্ষতি করেছেন। আমার এত ক্ষতি আর কেউ কখনো করেনি। কিন্তু মুশকিল হল, সেটা আপনি টের পাচ্ছেন না।

দীপনাথ মণিদীপার দিকে চেয়ে বলল, সত্যিই জানি না। চারশো টাকা মাসোহারা বা অর্থনৈতিক অধিকারে হস্তক্ষেপকে যদি ক্ষতি করা বলেন তবে ক্ষতি করেছি। কিন্তু তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি হয়নি। গত কয়েক মাসে বোস সাহেবের কিছু টাকা জমে গেছে। গলফ ক্লাবে একটা জমি বায়না করেছেন। এ সব কি ক্ষতি?

মণিদীপা চেয়েই ছিল। ধীর স্বরে বলল, না, এসব বোস সাহেবের দিক থেকে খুবই ভাল খবর। নিজের বাড়িতে নতুন ছুকরি বউ নিয়ে থাকবে। কিন্তু তাতে মণিদীপার কি এসে যায়?

দীপনাথ গভীর শ্বাস ফেলে বলে, বিশ্বাস করুন, আমি বোস সাহেবের প্রণয়ঘটিত কোনো ব্যাপার আছে বলে জানি না।

মণিদীপা শান্ত স্বরে বলে, বিশ্বাস করছি। আপনি হয়তো এখনো অত নীচে নামেননি। তবে জেনে রাখুন, বোস সাহেব গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসী-পাতা নন।

আমি খোঁজ করব। ইফ ইট ইজ ট্রু, তা হলে আমি ওঁর সঙ্গে কথাও বলব।

তাতেও মণিদীপার কিছু যায় আসে না। মণি-দীপা তেমনি অকপটে চেয়ে থেকে বলে, তাতেও আমার ক্ষতিপূরণ হওয়ার নয়।

আমি আপনার আর কি ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখি?

কি ক্ষতি তা জানেন না?

এতক্ষণে মণিদীপার এই অস্বাভাবিক শান্ত স্বর, স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টি আর একভাবে দাঁড়িয়ে থাকার একটা অর্থ খুঁজে পেয়ে কেঁপে উঠল দীপনাথ। বলল, না জানি না।

লোকে কি মিথ্যে বদনাম করে?

দীপনাথ চুপ করে চেয়ে থাকে।

বলুন, লোকে কি মিথ্যে মিথ্যেই কিছু রটায়? মণিদীপা জিজ্ঞেস করে।

দীপনাথ মুখ নামিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলে, আমি জ্ঞানত আপনার কোনো ক্ষতি করিনি।

মণিদীপা যে সুখে নেই তা কি জানেন?

মাথা নাড়ে দীপা। জানে।

কেন, তা জানেন না?

মৃদু স্বরে দীপনাথ জিজ্ঞেস করে, আমি কি তার কারণ?

হিংস্র অস্ফুট চাপা স্বরে ক্রোধ হতাশা অপমানকে মুক্তি দিয়ে মণিদীপা বলে ওঠে, আপনি! শুধু আপনি। আর কেউ নয়। আর কিছু নয়। দয়া করে আমার আর ভাল করতে হবে না আপনাকে। এবার যান! যান!

এরকমভাবে ভেঙে পড়ার মেয়ে মণিদীপা নয়। দীপনাথ একটু অবাক হয়ে তাকাল। মণিদীপা পেছন ফিরে আবার ফুলদানীতে ফুল সাজাচ্ছে। কাঁদছে কিনা তা পিছন থেকে বোঝা গেল না।

প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে নিয়েছে দীপনাথ। গাঢ় এক ভালবাসা বহুকাল যাবৎ তার বুক থেকে ঐ কিশোরী-প্রতিম মেয়েটির দিকে বয়ে যাচ্ছে। এত লোভনীয় বহুকাল যাবৎ তার কাছে আর কেউ নয়। এই তো সময়। উঠে গিয়ে শুধু একবার স্পর্শ করে বলতে পারে যে, তোমাকে ভালবাসি মণিদীপা। তা হলেই ও বুকের মধ্যে ভেঙে পড়বে, আর কোনোদিকে চাইবে না, তার হয়ে যাবে চিরকালের মতো। বড় অসুখী মণিদীপা, বহুকাল এই পরের ঘরে বাস করছে।

লোভ হল, বড় লোভ হল আজ। সমস্ত শরীর পিপাসায় উন্মুখ। পলকা ডিমসুতোর মতো একটু নীতিবোধের বাধা আছে বটে, সেটুকু ছিঁড়তে কষ্ট নেই।

ঘর ভাঙবে দীপনাথ। ভিতরে ভিতরে সেই সিরিও-কমিক স্বরটা আবার বহুকাল বাদে শুনতে পেল সে।

ঘরই কি সব? ভালবাসা কিছু নয়?

ভালবাসার মানে হল ভালতে বাস করা। বাস করতে ঘর চাই, দীপনাথ। পাকা ঘর। নইলে আবার কোন ভালবাসার ঘুঘু এসে তোমার ভিটেতেও চরবে। ওকে বরং এই ঘরে স্থিতু হতে দাও। নিজের সুখ-অসুখ বুঝতে দাও। সওয়া নেই, বওয়া নেই, বিয়ে কি চাট্টিখানি কথা! কত সুখ-দুঃখ সয়, কত ঝড়-ঝাপটা পেরিয়ে তবে স্বামী আর স্ত্রীর ভালবাসা হয়। ওদের সময় দাও আর একটু।

দিলাম।

দীপনাথ ওঠে।

মিসেস বোস।

মণিদীপা খুব আস্তে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। বড় চোখ, অবাক দৃষ্টি।

আমি আজ আসি।

একটু হাসল মণিদীপা, অনেকক্ষণ ধরেই যাই-যাই করছেন। এত তাড়া কিসের?

আমিও সুখে নেই। বড় জ্বালা, এক জায়গায় বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারি না।

তাই বুঝি? আজ আমি কেবল ঝগড়া করলাম।

না। তা নয়। আপনার দুঃখ আমি বুঝি।

ধন্যবাদ। কিন্তু বেশী বুঝতে যাবেন না। তাতে বিপদ বাড়বে।

তার মানে?

বোস সাহেবকে ঘাটানোর দরকার নেই। ও আমাকে চায় না। আমি বরং চলেই যাবো। আপনি শুধু কিছু টাকার ব্যবস্থা করে দিন ওকে বলে। আমার তো একটা ফুটিং চাই।

সেই দোকানের কথা এখনো মাথা থেকে যায়নি?

অন্য কোনো আইডিয়া আসছে না যে!

দোকান করাটা আমার পছন্দ নয় মিসেস বো[illegible]

অচ্ছন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে মণিদীপা মৃদু হেসে ব[illegible] তবে কি পছন্দ?

ভেবে দেখি। বলব। কিন্তু যা বলব শুনবেন তো[illegible]

মণিদীপা মাথা নাড়ে, শুনব। আমাকে কেউ [illegible] গাইডেনস দেয়নি এতকাল। আমি ভারী একা হ[illegible] গেছি। এত একা সহ্য হয় না।

আমি আপনার ভাল চাই। ভীষণভাবে চাই।

মণিদীপা সত্যিকারের লজ্জায় মাথা নত ক[illegible] বলে, জানি। খুব জানি।

আজ যাই।

আসুন। বলে একটু থেমে মণিদীপা আরো মৃ[illegible] স্বরে বলে, এবার ফোন করলে কথা বলব।

দীপনাথ বোস সাহেবকে এতটাই জানে যে, খ[illegible] বেশী খোঁজ খবর না করেই সে মেয়েটির পাত্তা লাগি[illegible] ফেলতে পারল পর দিন।

বোস সাহেব বোকা নয়। সন্ধের মুখে দীপনা[illegible] হঠাৎ বিনা এত্তেলায় তার খুপরিতে ঢুকলে দীপনাথে[illegible] মুখের দিকে চেয়েই বোস সাহেব বুঝতে পারে, সামথি[illegible] রং।

বসুন চাটার্জি।

দীপনাথ বসে এবং বিনা ভূমিকায় বলে, মহুয়া আপনার কাজিন?

বোস স্তব্ধ ও স্থির হয়ে বসে থাকে। চোখ টৌবলে। বোস সাহেবের শরীরের যন্ত্রপাতি খুব ভাল নয়, দীপনাথ জানে। তাই ঐ স্তব্ধতায় একটু ভয় পেল সে। কিন্তু তবু নীরবতা ভাঙল না। বাকিদের লড়াইতে প্রথম রাউণ্ডটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বোস সাহেব ঠিক এক মিনিট দশ সেকেণ্ড বাদে বাঁ হাতের তর্জনীর ধার দিয়ে থুতনিটা ঘষে নিয়ে নড়ে বসল। তারপর খসখসে ভাঙা গলায় বলে, দরজাটা লক করে দিয়ে আসুন।

দরকার নেই। অফিস ফাঁকা।

বোস মাথা নাড়ল। মুখটা ফ্যাকাসে, অসহায়, ভীতু কেমন এক ধরনের হয়ে গেছে। হাতে একটা কাগজচাপা নিয়ে নাড়তে নাড়তে তেমনি অদ্ভুত গলায় বলে, দীপা কতটা জানে?

সামান্যই। অন্তত মহুয়ার কথা জানে না। শুধু জানে সামথিং ইজ কুকিং।

মহুয়া আমার ডিসট্যান্ট কাজিন।

তা হোক বোস সাহেব। ইট ইজ এ রং চয়েস।

উই হ্যাভ অ্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফ্রম অলমোস্ট চাইলডহুড। কিন্তু পারিবারিক বাধায় বিয়ে হতে পারেনি। ওর বাবা ছিল ভীষণ কনজারভেটিভ।

বাট ইট ইজ নাউ এ ডেড কেস।

বোস মাথা নাড়ে, না। রিলেশন না থাক উই অলওয়েজ হ্যাড দ্যাট ফিলিং ফর ইচ আদার।

বোস সাহেব! দীপনাথের গলা [illegible]মকের মতো শোনায়, ব্যাপারটা ইনএভিটেবল নয় [illegible]মি জানি।

আমি তা বলিনি।

তবে? আপনি অতীতকে খুঁড়ে বের করছেন।

দীপার সঙ্গে আমার রিলেশন তো আপনি জানেন। অথচ আই নীড সামওয়ান। যাকে বিশ্বাস করা যায়, যার ওপর নির্ভর করা যায়।

বোস সাহেব, আপনার এক ভাই এই অফিসে কাজ করে।

বোস অবাক হয়ে বলে, ও কিছু বলেছে?

না। তবে ও শুনেছে। ওর মুখে ঘেন্নার ভাব দেখলেই তা বোঝা যায়।

বোস সাহেব পিছনে মাথা হেলিয়ে বলে, দীপা অলসো উইল হেট মি। চ্যাটার্জি, আই অ্যাম সরি। কিছু করার নেই!

দীপনাথ বিদায় নেওয়ার একটা নাটকীয় এক মুহূর্তেই ক্ষণের জন্য অপেক্ষা করছিল। একটা সাইকোলজিক্যাল মোমেন্ট। এই কথার পরই তা পেয়ে গেল সে। আচমকা উঠে দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল।

(ক্রমশ)

## বিজ্ঞান

# পশুপাখির চোরাকারবারে কে বেশি লাভবান ?

মাথার ওপর ময়নার ঝাঁক। একশ, দুশ, কখনও বা হাজার। প্রাণচঞ্চল পাখির দল কখনও উড়ছে। কখনও গিয়ে বসছে গভীর বন-জঙ্গলে বড় বড় গাছের মাথায়। উন্মুক্ত উপত্যকায় দল বেঁধে ঝাঁপিয়েও পড়ে কখনও কখনও। শ্বাপদসংকুল পরিবেশ। বনবাদাড়ের মধ্যে নানা রকম কীট পতঙ্গের দংশন। কিন্তু অত সব দেখলে তো আর বেঁচে থাকা যায় না ?

ওরা দরিদ্র। ময়নার ঝাঁকের উপর চোখ রেখে সেই বিষময় বনবাদাড়ের আড়ালে ওরা ঘাপটি মেরে বসে থাকে। কখনও বা গুটিগুটি এগিয়ে চলে আলতো হাতে দু পাশের বন সরিয়ে। নিঃশব্দে। রুদ্ধশ্বাসে প্রতিটি মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা। কখনও কয়েক মিনিট। কখনও বা কয়েক ঘণ্টা। পেটে দানাপানি পড়েনি হয়ত সকাল থেকেই। তা না পড়ুক। ওই ময়না। ওই ময়নাই তো তাদের দানাপানি।

যাক। নিষ্ফলা হয়নি আজকের দিনটি। আগেই ওরা বিছিয়ে রেখেছিল জালের ফাঁদ। ময়নার ঝাঁক গিয়ে বসলো সেই ফাঁদে। ফাঁদে পড়ে কী তাদের ছটফটানি। ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অপেক্ষমান শিকারীদের মধ্যে তখন উল্লাস। মানুষগুলি মুহূর্তে ভুলে গেল তারা দরিদ্র। দানাপানির আশায় ওদের মুখ তখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

এবার সহজ কাজ। গুটিয়ে নাও জাল। জ্যান্ত ময়নাগুলি খপ খপ করে ধরে এবার খাঁচায় পোরা।

ভারতীয় কোবরা। সাপ-খেলা যারা দেখায় তাদের কাছে এদের দাম অনেক বেশী। গবেষণা, পশুশালায় সংরক্ষণ, সাপ খেলা থেকে শুরু করে বিষ সংগ্রহের জন্যে এ দেশ থেকে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ কোবরা চোরাপথে বিদেশে রপ্তানি হয়ে থাকে

তারপর চলো স্থানীয় মহাজনের কাছে।

তা মহাজন তো আর জঙ্গলে থাকে না। তার আখড়া লোকালয়ে। সে লোকালয় হয়ত গ্রামে, অথবা শহরে। দুর্গম পথ ধরে কখনও পায়ে হেঁটে অথবা গাড়ি চড়ে তার কাছে পৌঁছতে কখনও দুই দিন, কখনও তিন দিনও লেগে যায়। পাখিরা প্রথম দিকে ডানা ঝাপটায়। পরে নির্জীব হয়ে বসে থাকে। এই দুই বা তিন দিন তাদের পেটে দানাপানি পড়েনি, দানাপানি দেওয়ার কথাও কেউ ভাবে না। যাদের হাতে তারা বন্দী দানাপানি যোগানোর মত সামর্থ্যও তাদের নেই। তাদের এখন একমাত্র লক্ষ্য, যেভাবেই হোক, পাখিগুলি এখন জ্যান্ত অবস্থায় মহাজনের কাছে পৌঁছে দাও। তারপর হাত উপুড় করে সেই মহাজন যা দেবে, মাথা নিচু করে তা গ্রহণ করে নিজের এবং পরিবারের পাঁচ জনের পেটে দানাপানি যোগাও।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন পশুপাখি নিয়ে যারা ফলাও কারবার ফেঁদে বসেছে তাদের ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য পরিবেশন করেছেন জিন-ইভেস ডোমালিয়ান নামে জনৈক প্রাণী বিশেষজ্ঞ (ন্যেচারাল হিস্টোরি : মে, ১৯৭৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। ডোমালিয়ান লিখেছেন : প্রচুর পরিশ্রম করে ময়না সংগ্রহ করে দরিদ্র চাষীরা। এক-একটি ময়নার জন্যে মহাজনরা তাদের দিয়ে থাকে ০·৬০ থেকে ১ ডলার। মহাজনরা কিছুটা লাভ রেখে সেই পাখি বিক্রি করে হোল-সেলারদের কাছে। হোল-সেলাররা সেই পাখি বিদেশের বাজারে রপ্তানি করার সময় চড়া দাম ধার্য করে। এক-একটি ময়নার দাম দাঁড়ায় তখন ৩০ ডলারের মত। যদি কথা বলিয়ে ময়না হয়, ওই দাম আরও বাড়তে পারে। ইউরোপ এবং আমেরিকার আমদানি-কারকদের হাতে পৌঁছনোর পর দাম বাড়ে আর এক ধাপ। অবশেষে প্রকৃত খদ্দেরের হাতে গিয়ে যখন পৌঁছয়, তখন এক-একটি ময়নার দাম দাঁড়ায় ৩০০ ডলার। কখনও বা তার চেয়েও বেশী। অর্থাৎ যে বেচারা পরিশ্রম করে ময়না ধরলো, সে পেলো এক-একটি ময়নার জন্যে ১ ডলার। আর লাভের গুড় খেলো মাঝ পথের কারবারীরা।

শুধু ময়নাই নয়, অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রেও ওই একই ব্যাপার। বন-জঙ্গলে ছোটাছুটি করে গিবন ধরলো দরিদ্র চাষী। ধরার পর গিবনের দৈহিক স্বাস্থ্য যদি ঠিক ঠাক থাকে তা হলে এক-একটি গিবনের জন্যে মহাজনরা তাদের দেবে ১০ থেকে ১৪ ডলার। মহাজনরা রপ্তানিকারকদের কাছ থেকে নেয় ৩০ ডলারের মত। তার হাতে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে একটি গিবনের দাম এক লাফে গিয়ে দাঁড়ায় ২০০ ডলার। প্রকৃত খদ্দের তাকে কেনে ৪০০ ডলারে। অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই : আমদানি এবং রপ্তানিকারকরাই পেলো অগাধ অর্থ। বেচারা আসল সংগ্রাহক! সে-ই রইলো গরীব। ওদিকে প্রকৃত খদ্দেরের পকেট ফাঁক।

রপ্তানিকারকদের বক্তব্য, আমাদের খরচ কম। ওই সব জানোয়ারদের খাওয়ানো, যথাযথভাবে আমদানি-কারকদের হাতে তুলে দেওয়া, এ সব করতে খরচ কত? কিন্তু যতই তারা বলুক, পশুগুলি নিজেদের হেফাজতে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ যে ধরনের খাবার তাদের দেওয়া হয়, তার দাম খুবই কম। রপ্তানিকারকদের জন্যে যথেষ্ট যত্ন নেওয়া উচিৎ। সে ব্যাপারেও তাদের ভ্রূক্ষেপ থাকে না।

মেঘলা চিতা বা 'ক্লাউডেড লিওপার্ড' এখন বিরল প্রাণী। এ ধরনের একটি প্রাণী বিক্রি করে প্রচুর লাভ করে চোরাচালানীরা। চলান পথে কখনও কখনও এদের সপ্তাহের পর সপ্তাহ প্রচুর কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়

গিবন সহজে পোষ মানে না। কিন্তু ইউরোপের বাজারে এদের প্রচুর কদর। এদের সংগ্রহ করতে হয় শিশু অবস্থায়। আর একটি গিবন শিশুকে তার মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে আনতে শিকারীরা তার মাকে গুলি করে হত্যা করে

প্যাক করার খরচ, প্লেন, জাহাজ অথবা গাড়ির ভাড়া। আরও কত কী আছে।

এই 'কত কী'-র মধ্যে থাকে নানা ঘোর প্যাঁচ। পরিবহণ ব্যবস্থার কর্মী, শুল্ক বিভাগের কর্মচারী—বহু সময় ওদের সঙ্গেও যোগসাজস রেখে চলতে হয়। কোন দেশের সরকার হয়ত বিশেষ কোন প্রাণীর রপ্তানি বে-আইনী ঘোষণা করেছে। সেই সব প্রাণী চোরাপথে চালান দিতে পারলে প্রচুর লাভ। এ সব ক্ষেত্রে কিছু কাঁচা পয়সা ছড়ানো দরকার। এই খরচের বোঝাও সামলায় প্রকৃত খদ্দের।

*

যারা দরিদ্র শিকারী তাদের একমাত্র লক্ষ্য, শিকার ধরতে হবে। এ ব্যাপারে তারা কোন বিধি নিষেধের ধার ধারে না। শিকার ধরার পর দেখা গেল কোন প্রাণী অন্তঃসত্ত্বা। দেখা গেল, ফাঁদে ধরা পড়েছে খুবই কম বয়স্ক কিছু সংখ্যক শাবক। মায়ের বুকের দুধ ছাড়া তাদের কিছু খাওয়ানোই শক্ত। অথবা তারা এমন কোন প্রাণী ধরলো যারা বিরল এবং বিলুপ্ত হতে চলেছে। এ ব্যাপারে কোন বাছবিচার তারা করে না। বরং বিরল প্রাণীর দিকেই তাদের বেশি ঝোঁক। কারণ ওই ধরনের প্রাণীর খদ্দের পাওয়া সোজা। ভালো দামও পাওয়া যায়।

খদ্দের, মানে স্থানীয় মহাজন। সে জানে সব কিছুরই বাজার আছে। তা সে ব্যাঙই হোক অথবা বাঘ। বুনো বেড়াল, সাপ, পাখি, হাতি, ডলফিন তিমি নানা জাতের মাছ, প্রবাল কীট, কাঁকড়া, নেউল, ইঁদুর বাঁদর প্রভৃতি। অথবা মাকড়সা, কাঁকড়া বিছে, জোনাকি, ফড়িং থেকে শুরু করে নানা রকম কীটপতঙ্গ। যা কিছু জ্যান্ত, তার বাজার আছে। মহাজনের কাছে ফালতু বলে কিছু নেই।

আর দরিদ্র ওই সংগ্রাহকরা? অসাধারণ তাদের শিকার ক্ষমতা। কোথায় কী ধরনের প্রাণী এবং কীট-পতঙ্গ পাওয়া যায় তার খবর তাদের নখদর্পণে। কোন প্রাণী অথবা কীটপতঙ্গের স্বভাব চরিত্র কী রকম তারও খুঁটিনাটি খবর তাদের জানা। তারা জানে, কে হিংস্র, কে শান্ত প্রকৃতির। কে বিষাক্ত, কে বিষাক্ত নয়। স্থানীয় ওই সংগ্রাহকদের সহজাত কলা-কৌশল এবং দক্ষতার যেন তুলনা হয় না। যা কিছু হোক না কেন, তাদের ফাঁদে ধরা পড়বেই। প্রচণ্ড সন্তর্পণে অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তারা শিকারের পেছনে ধাওয়া করে। এর জন্যে যেমন কৃচ্ছ্রসাধনা করতে হয় প্রচুর, সেই সঙ্গে থাকে জীবনের ঝুঁকি।

তা থাক। তবু শিকার চাই। কারণ শিকার মানেই তাদের কাছে পেটের ভাত। তাই শিকার হাতে হাত ছাড়া না হয়, তার জন্যে সব রকম ঝুঁকি নিতে তারা প্রস্তুত। ফলে তাদের পদ্ধতিগুলিও হয় এমন, শিকারের পক্ষে যাদের এড়িয়ে যাওয়া খুবই শক্ত। যেমন ধরুন থাই শিকারীদের কথা। এক-একটি পাইথন। লম্বায় হয়ত দশ বারো ফুট। মোটা দড়ির ফাঁদেই হয়ত তাকে ধরা যায়। তাতে সাপের কষ্টও হয় কম। সেটা না করে তারা ব্যবহার করে মোটা তারের ফাঁদ। ফাঁদে ধরার পর তারে জড়িয়েই সাপটিকে নিয়ে যায় মহাজনের কাছে। এর ফলে অনেক সময় সাপের দেহ ক্ষত সৃষ্টি হয়। মারাও যায় অনেকে।

"নেকড়ে ধরার জন্যে এক ধরনের ফাঁদ তৈরি করে তারা।" বলেছেন ডোমালয়ান। "মরণ ফাঁদই বলতে পারেন। এর জন্যে ওরা তৈরি করে গভীর গর্ত। কিন্তু সেই গর্ত অতটা গভীর না হলেও তো চলে? না, কোন ঝুঁকি নিতে তারা রাজি নয়। এই মরণ ফাঁদে পড়ে অনেক সময় নেকড়ে ভীষণভাবে আহত হয়। একবার কেন বড়সড় একটি বাঘ ধরা পড়লো। ধরা পড়ার পর তেমন ক্ষতি অবশ্য তার হয়নি। কিন্তু পাছে সেই হিংস্র প্রাণীটি কারুর ক্ষতি করে কিংবা পালিয়ে যায়, এবং ওই অবস্থাতেই পাঠানো হয় আমার কাছে। দশ দিন পর বাঘটি আমার কাছে এসে পৌঁছলে দেখলাম, তার পা তারে কেটে গিয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে। গ্যাংগ্রিন হয়ে কয়েক দিন পর বাঘটি মারা গেল।

"বন্দী শিকারের উপর নৃশংস অত্যাচারও হয় অনেক সময়। যেমন ধরুন, প্যাংগোলিন। গায়ের ওপর পুরু আঁশওয়ালা এই প্রাণীর খাবার পিঁপড়ে এবং উইপোকা। এদের নখ হয় ভীষণ তীক্ষ্ম এবং শক্ত। তাই কাঠের খাঁচায় পুরে যে এদের চালান দেওয়া হবে তার জো নেই। নখের ধারে ওরা খাঁচা ভেঙ্গে ফেলে। এর জন্যে স্থানীয় সংগ্রাহকরা এই প্রাণীদের খাঁচায় পুরে তাদের লেজ মোটা গজাল বিঁধিয়ে খাঁচার কাঠের সঙ্গে আটকে রাখে। কী নৃশংস ব্যাপার একবার ভেবে দেখুন! বন্দী করার পর বাঘ, ভালুক প্রভৃতি হিংস্র পশুকে ঠাণ্ডা রাখার জন্যে কখনও কখনও তাদের মাথায় মুগুর দিয়ে আঘাত করা হয়। বাচ্চা সংগ্রহ করতে গিয়ে তাদের মাকে খুন করা হয় কখনও কখনও। সতর্কতার অভাবে বাচ্চাদের দেহে আঘাত লাগা; অথবা ধরুন, মা আহত হলো, কিন্তু তাকে ধরা গেল না। গভীর বনে পালিয়ে গেল সে। তারপর মারা গেল। এর ফলে তার বাচ্চারা অনাহারে মারা পড়লো। এই ভাবে বন্য প্রাণীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বনে আগুন লাগিয়ে প্রাণীদের বন থেকে বের করে এনেও শিকার করার চল আছে নানা দেশে। অনেক সময় গ্রামবাসীরা মিলে বড় বড় জাল দিয়ে বন-জঙ্গল ঘিরে শিকার করে। এ সব ক্ষেত্রে বহু পশু প্রাণী মারাও পড়ে।

"আদিবাসী ছাড়াও বিভিন্ন পশু পাখি সংগ্রহের জন্যে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানও কাজ করে কোন কোন দেশে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান একমাত্র পূর্ব-আফ্রিকাতেই তৎপর। এদের দলে থাকে বিজ্ঞানী, পশু চিকিৎসক, শিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রমিক। বন্দী পশুর উপর যে ধরনের সেবা যত্ন নেওয়া দরকার এরা তা নিয়ে থাকেন। শিকারের সময় এরা সতর্ক থাকে। যাতে বিরল প্রাণীর না ক্ষতি হয়, অবশিষ্ট প্রাণীরাও না ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কিন্তু সমস্যা ওই দরিদ্র সংগ্রাহকদের নিয়ে। তারা চায় পয়সা। সে যত কমই হোক। অতএব যে ভাবে হোক জ্যান্ত পশুদের ধরে মহাজনদের হাতে পৌঁছে দিলেই তাদের কাজ শেষ। দায়িত্বও।"

সম্প্রতি হুগলী জেলার বেগমপুর অঞ্চলের কয়েক জন সাপুড়ের সঙ্গে কথা হয়েছিল বর্তমান লেখকের। আশপাশের গ্রাম থেকে নানা রকম সাপ সংগ্রহ করে ওরা নিয়মিত চালান দিয়ে থাকে। ওরা বললো, কী আর পাবো, বাবু। বন বাদাড় ঘুরে সাপ ধরা। এই তো দেখছেন। বলেই গোটা দশেক বাঁশের তৈরি আধারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলো আমার। বললো, দশটি সাপ ধরেছি চার জনে। গোখরো, লাউডগা, চন্দ্রবোড়া এবং শাখামুটি। কলকাতায় মহাজন আছে। কত আর পাবো? ধরুন না, একটি গোখরোর জন্যে পাবো তিরিশ টাকা। ওরা ভিন দেশী। সাপ ধরতে এসে ঘর বেঁধেছে বেগমপুরে। গরমের সময় সাপ ধরে। অন্য সময় জন-মজুরী অথবা সাপের খেলা দেখিয়ে রোজগার। তাতে পেট চালানোই দুষ্কর।

*

জীবন্ত প্রাণীই শুধু নয়। দরিদ্র সংগ্রাহকদের আরও অনেক কিছুর উপরও নির্ভর করতে হয়। বিভিন্ন প্রাণীর চামড়া, হাতীর দাঁত, পাখির পালক, পশুর দাঁত, শিং, পায়ের খুর, নখ, লেজ—এ সবও সংগ্রহ করে তারা বিক্রি করে। সম্প্রতি এক লক্ষ সাপের চামড়া চোরাচালান হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের পেট্রাপোল সীমান্ত পথে কীভাবে পাচার হচ্ছিল তার খবর অনেকেই তো পড়েছেন আপনারা।

... আছে ... এক ধাপ। ...দেরকে আকর্ষণ করতে গেলে পণ্যও তো মনোহারী করা দরকার। বন-জঙ্গল থেকে পশু পাখি ধরার পর হাত চালাচালি করতে গিয়ে তাদের অনেকের চেহারা আকর্ষণ হারায়। অতএব দরকার ঘষামাজা। ধরা যাক, একটি ভোঁদড়। আমদানি রপ্তানির টানা পোড়েনে তার মসৃণ লোম হয়ত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। দাও তার লোম খানিকটা হাইড্রোজেন পারঅকসাইড দিয়ে ধুয়ে। কয়েক বার ধোয়ার পর তার লোমের রঙ হয়ে পড়লো শ্বেত শুভ্র। আর চড় চড় করে তার দাম ৩০ ডলার থেকে বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো ১০০০ ডলারে। এই ভাবে সাপের গা চেঁচে ধুয়ে চকচকে করে বাড়ানো হয় দাম। কোন কোন চিতা বাঘকে রঙ লাগিয়ে কালো করে, পাখির ঠোঁটে বা গায়ে রঙের বাহার ঘটিয়ে খদ্দের ঠকানোর ব্যবস্থাও ফেঁদে বসে অনেকে। রঙ এবং বিভিন্ন রাসায়নিক সামগ্রীর জন্য অনেক পশু পাখির ক্লেশ বাড়ে, ক্ষতিগ্রস্তও হয় তারা।

রপ্তানিকারকদের চালাকিও কম নয়। আইন অনুযায়ী কোন কোন প্রাণী রপ্তানি করা নিষেধ সে খবর তারা ভালোভাবেই রাখে। এমন ধরনের বন্য প্রাণী রপ্তানির সময় নানা রকম ফন্দি ফিকিরের আশ্রয় নেয় তারা। যেমন ধরুন, কোন দেশের আইনে বলা হয়েছে, সমতল-মুণ্ডু বেড়াল (লাতিন নাম : ফেলিস প্ল্যানিসেপ্‌স) রপ্তানি করা চলবে না। রপ্তানিকারক কিন্তু বিদেশে চালান দেওয়ার জন্যে ওই বেড়ালই খাঁচায় পুরে বিমান বন্দরে হাজির হলো। শুধু খাঁচার উপর লেখা : মেছো বেড়াল (লাতিন নাম : ফেলিস ভাইভেরিনা)। বিমান বন্দরের কর্মীর অজ্ঞতার তারা সুযোগ নেয়। কারণ, বেশির ভাগ কর্মীই জানে না মেছো বেড়াল এবং সমতল মুণ্ডু বেড়ালের মধ্যে পার্থক্য কী। অনেক সময় নিষিদ্ধ প্রাণীর গায়ে খানিকটা রঙের প্রলেপ মাখিয়ে তাকে অন্য প্রাণী বলে চালিয়ে আইনের ফাঁকা পথেরও আশ্রয় নেয় তারা। এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি ঘটনার কথা বলি। তখন এক সময় হঠাৎ চিনির আকাল পড়ে। সরকার থেকে আইন করে দেওয়া হয় বিনা পারমিটে চিনি চালান চলবে না। অসাধু ব্যবসায়ীরা তখন জলে গুলে চিনির গাঢ় রস তৈরি করে চিনি চালান দিতে শুরু করলো। তাদের যুক্তি চিনি চালান বারণ। কিন্তু যা তারা চালান করছে সেটা 'ক্যান্ডি'। মিছরিও ক্যান্ডি বলে চালিয়েছিল তারা।

পশু পাখি এবং অন্যান্য প্রাণীর অবাধ চোরাকারবারে আরও একটি বড় বিপদ আছে। যথাযথ আইন মেনে ওদের চালাচালি করা হয় না। ওদের সবারই শরীরে থাকে কোন না কোন রোগের জীবাণু এবং ভাইরাস। উপযুক্ত পরীক্ষা না করে ভিন দেশে ওদের নিয়ে গেলে সে সব দেশে নানা রকম রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা থাকে। এতে করে বিপদই ডেকে আনা হয়।

বন্য পশু পাখি ধরার ব্যাপারে আইন সব দেশেই আছে। কিন্তু সেই আইন রক্ষা করার উপযুক্ত ব্যবস্থা অনেক দেশেই নেই। আমাদের ভারতেও নেই। এর জন্য দরকার বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পুলিসী উদ্যোগ।

দরকার সৎ কর্মীর। বিরল প্রাণী যাতে কেউ না ধরে সে ব্যাপারে জনসাধারণেরও চোখ রাখা দরকার। নিষিদ্ধ পশু পাখি হত্যা, অথবা যে সময়ে যে সব প্রাণী শিকার করা নিষেধ—তা না করা, এ সব দিকে নজর রাখা দরকার। চোরা পথে ভারতের বহু বিরল প্রাণী প্রতি বছর বিদেশে যাচ্ছে। তাতে সওদাকারের ইন্ধন যারা যোগায়, সেই দরিদ্র সংগ্রাহকরা, তাদের দারিদ্র্য ঘোচে না। পরিবর্তে আমাদের প্রাণীজ পরিবেশ ভারসাম্য হারাচ্ছে। সমস্যাটি জাতীয় পর্যায়ে খতিয়ে দেখা দরকার।

**সমরজিৎ কর**

## এক নিঃশ্বাসের গল্প

আনন্দ বাগচী

শুকোয় ডালের বড়ি, ভিজে কাঁথা—গেরস্থ রোদ্দুরে ভাঙা ছাতা
খোলার চালের খাঁজে ঠোঁট ঘষে স্মৃতিভ্রষ্ট কাক
আচমকা মুঠোর ফাঁকে শহরের জলছবি দেওয়ালে
অনন্ত মুলের মত বটচারা যেন বিঁধে আছে—
সন্ধ্যায় শাঁখের ফুঁ ফেরাতে ফেরাতে অন্ধকার-
চোখের পলকে সব রাস্তা শেষ, গল্পের গলায়
দড়ি। দমবন্ধ দরোজায় শেষ টোকা....এমনি করে
সুগন্ধি জর্দার কৌটো ফেলে যায় ভর্তুকী স্মৃতির
রোজ ঝাড়ফুঁক খাওয়া তুক-তাকে মোচড়ানো জীবন,
মুড়োয় ফুরোয় কাঁটা-নটে গাছ রোমন্থনে রক্তমুখী উট।

ঘর-ভাঙা কান্নুন এসে পায়ের তলার মাটি কাড়ে
যে ভাবে শরীর যায় নষ্ট চোখ ভ্রষ্ট দাঁত ফেলে
আপাদমস্তক ছুঁয়ে চিতার চৌকাঠ—আমি সেভাবে যাব না

নারী শিশু প্রেম স্মৃতি কবচকুন্ডল বর্ম সব
ছুঁড়ে ফেলে পদতলে ফেলনা খেলনা, যাবো—
রাজ-সমারোহে যাব লুব্ধ ভিখারীর সামনে দিয়ে।

## শ্রীচরণেষু, ভারতবর্ষ

তারাপদ রায়

আমার মাঝে মাঝেই জ্বর হয়;
জ্বর হওয়া ভালো না খারাপ?
নিশ্চয়ই খারাপ।

কিন্তু তার চেয়েও খারাপ,
তিরিশ বছর পরেও বার বার মনে সংশয় হয়,
আমার কি মাঝে মাঝেই জ্বর হয়,
নাকি মধ্যে মধ্যে জ্বর হয়।

মধ্যে মধ্যে নাকি মাঝে মাঝে,
সঙ্গে সঙ্গে নাকি সাথে সাথে?
এতো উত্তাপ, এতো ঘাম, হাতে-পায়ে ব্যথা, মাথা ধরা.
শুকনো জিবে. তেতো মুখে সারা দুপুর বিছানায় শুয়ে শুয়ে
শ্রীচরণেষু,
ভারতবর্ষ,
এতদিন পরে আমার আবার ভয় হয়,
আমি স্বদেশী না আমি বিদেশী?

## ফুল

মলয় সিংহ

আমি কোনদিন ফুল কিনতে পারিনি—এ স্বভাব
আমার শৈশব থেকে বড়ো হয়েছিলো : গোপন
হৃদয় থেকে তুলেছি ফুল, ভুল করে, সোহাগে
আপন করে ছিঁড়েছি ওই বসন্ত বকুল : এ
পাপ? এ এতো কাছে টানে কেন? কে পরালো
ঋতুরঙা বেহাগশৃঙ্খল? বড়ো মানিয়েছে তো।

কতোদিন ভেবেছি গাছকে ; শেকড় ও ডাল
কি বুঝে সভ্যতা টানে, টেনে আনে বিক্ষোভ—
সে শুধু পাখিদের—ফুলের, বাঁচা নিয়ে কথা!

এখন কী তরুণের অসুখ? পৃথিবীর ছোট গলি
তার শেষে পরাণের বাড়ি। সেখানে অন্ধকার।
তবু জানলার দিকে মাথা—পরাণের বাথটবে
দেখি, সাজিয়ে রেখেছে বহুদিন হলুদ আর
শাদা কিছু চন্দনের ফুল; বড়ো মানিয়েছে তো।

## লিখন

বিজয়কুমার দত্ত

খররৌদ্রে অন্ধকারে, পড়ে আসা বিকেলবেলায়
যখন বুকের মধ্যে জ্বালা ধরে (কেন তা জানি না)—
হাসপাতালের করিডরে যখন অজস্র মানুষের
দিশভ্রান্ত আনাগোনা, যখন কোথাও
আলোকিত ঘর নেই, খোলা জানালায়
অতর্কিত হাওয়া নেই, কে যেন তখন
চোখের সামনেই এসে সপ্রতিভ হয়ে উঠতে চায়,
তাকে কোন্ সাজানো ফ্রেমের
ঘেরাটোপে বেঁধে রাখবো সকাল সন্ধ্যায়।

ঘরোয়া সংসার কিংবা মনের মানুষ
কিছুই সাজাতে আমি শিখিনি কখনো
আমার চারদিকে শুধু অকীর্তির ইতিবৃত্ত জমে
প্রতিরাত্রে ঘুমহারা ঘরের দেওয়ালে
যেমন নিঃশব্দে ঝোলে গতবছরের
উদাসীন ক্যালেন্ডার দরজার মাথায়
বিবর্ণ হরফে লেখা অসম্পূর্ণতার
অতি স্বচ্ছ দায়ভাগ মেলে—

এমন মূর্খতা নিয়ে, এমন বিস্মৃতি নিয়ে, তবে
অমোঘ প্রতিভা তার লিখে রাখবো কিভাবে এখন
বহুব্যবহারে জীর্ণ শব্দ সমাহারে?

একমাত্র বিমল'ই তাদের বিশিষ্ট ধরনের অনন্য স্যুটিং
বানানোর শিল্প-কলায় বছরের পর বছর অতুলনীয় রয়েছে।
এই ঐতিহ্যধারা আজও অম্লান।
একমাত্র
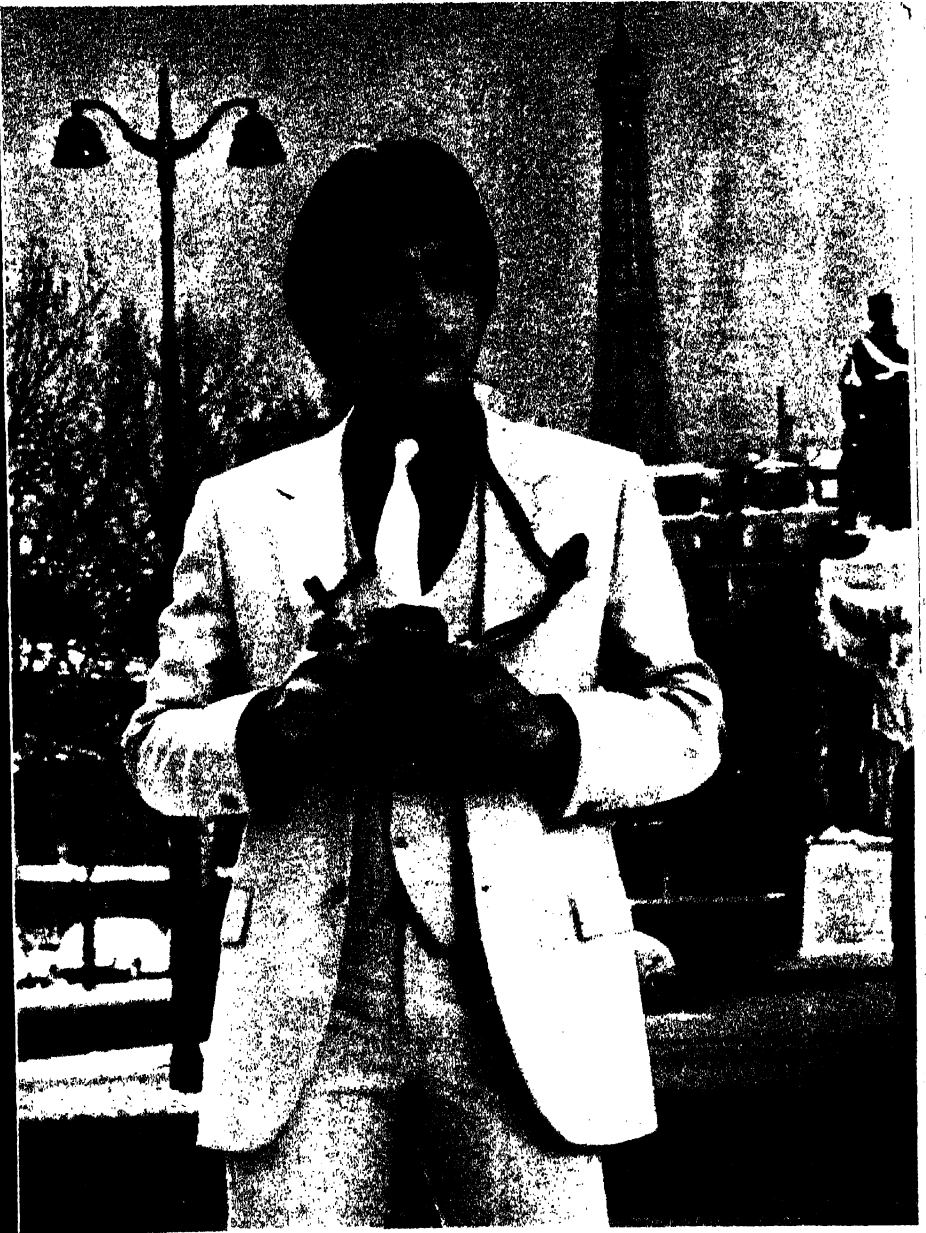
# কণ্টকল্পিত

## অতুল্য ঘোষ

**নব পর্যায়**

॥ ৪১ ॥

অনেকে যা আশঙ্কা করেছিলেন, তাই ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গের সুযোগ্য (!) অর্থমন্ত্রী এবারে রামকৃষ্ণ মিশনের উপর হানা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। গোল পার্কে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের 'ইনস্টিটিউট অব কালচার' নামে যে প্রতিষ্ঠান আছে, তার খ্যাতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে। কত দেশ-বিদেশের কত পণ্ডিত এবং সজ্জন ব্যক্তি প্রায়ই এখানে আসেন এবং এখানে যেসব আলোচনা হয় তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতীয় সংস্কৃতির উপর এঁদের প্রকাশিত বই একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। বর্তমানে সংস্কৃতির নামে যেসব ঘটনা ঘটে, তাতে অনেক সময় নিজেদের কাছে নিজেকে লজ্জিত হতে হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে যেসব গান হয় তার অধিকাংশই যে-কোন সভ্য জগতের পক্ষে লজ্জাকর। কয়েক বছর আগে পুজোর সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে একটি গান মাইকে প্রায়ই শোনা যেত। তাতে এই কথাগুলি ছিল : 'ভ্যাবাচ্যাকা, ভ্যাবাচাকা, ভাবাচাকা'। কোন সংস্কৃতি থেকে এইসব অনুষ্ঠানের নাম 'সাংস্কৃতিক' হয়েছে জানা নেই, কিন্তু এটা এখন নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংস্কৃতির নামে যখন এইসব নর্তন-কুর্দন চলছে, সেই সময়ে গোল পার্কের এই প্রতিষ্ঠানটি মরুভূমির মাঝে মরুদ্যান। এখানে যেসব আলোচনা হয়, তা শুনলে নিজের দেশের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে, দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে, আর দেশের জন্য গৌরববোধও হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে হস্তক্ষেপের ঘটনা পূর্বেও ঘটেছে। যেমন মিশন পরিচালিত কোন কোন বিদ্যালয়ে তাণ্ডবলীলার চেষ্টা হচ্ছে, তেমনি 'ইনস্টিটিউট অব কালচার' সম্পর্কেও অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। ভারতবর্ষের সৌভাগ্য যে, সে অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মহাপ্রতাপশালী অর্থমন্ত্রী এখানকার জন্য রাজ্য সরকারের যে অর্থসাহায্য অনুদানের ব্যবস্থা আছে, তা বন্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন। যুক্তিটা অদ্ভুত—যে, এদের অর্থসাচ্ছল্য আছে। রামকৃষ্ণ মিশন তো কোন দলভুক্ত নন, বা এঁদের কোন জমিদারিও নেই। এঁরা লোকের কাছে ভিক্ষাও করেন না। এঁরা পরিশ্রম করেন ; সাধারণ মানুষ ভাল কাজ বলতে যা বোঝায়, এঁরা সেই সব কাজ করেন। সেই জন্য লোকের মনের উপর এঁদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। 'শ্রদ্ধয়া দেয়ং'—এঁদের সম্পর্কে এই কথাটাই খাটে। সেইজন্যই এমন অনেক লোক আছেন, যাঁরা শ্রদ্ধাহীনতায় দেশকে ঢেকে দিতে চান, তাঁরা এঁদের পছন্দ করেন না। মিশনের অর্থসাচ্ছল্য মানে? এঁদের কৃতকর্মের জন্যই সাচ্ছল্য। নিরন্তর, নিরলস সৎ কাজের কর্মসাধনায় এঁরা হোমাগ্নি জ্বালিয়ে নিজেদের পূত পবিত্র করেছেন। যাঁরা রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু-সন্ন্যাসী, তাঁরা এই হোমাগ্নিতে নিজেদের আহুতি দিয়েছেন এবং সে যজ্ঞ এখনও চলছে। পার্থিব কাজের মধ্যে এঁদের আকর্ষণ একটাই। এঁরা ডাক শুনেছেন—আরামের শয্যাতল ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছেন। পুত্র-পরিবার-পরিজনের কথা এঁরা ভাবেননি। তথাকথিত পার্থিব সম্পদ এঁদের আকর্ষণ করতে পারেনি। জনসাধারণের উপর আধিপত্য, নেতৃত্বের মোহ এঁদের মনকে বিচলিত করতে পারেনি। পুজা-পাঠ, সাধন-ভজন নিয়ে যাঁরা নিজেদের মধ্যে আত্মসমাহিত হয়ে আছেন, দুর্ভিক্ষে, প্লাবনে, মহামারীতে তাঁদের দেখা যাবে আর্তের কুটিরে কুটিরে। হিমালয়ের অন্দর-কন্দরে যেসব সাধু বাস করেন, পার্থিব জগতের সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু মিশনের এইসব সাধু-সন্তরা, যাঁদের তপস্যা হিমালয়ের ঐসব সাধু-সন্তদের চেয়ে একটুও কম নয়, দুর্দিনে আর্ত মানুষদের পাশে এসে দাঁড়ান সব ছেড়ে দিয়ে এমন অপূর্ব সমন্বয় খুব কম দেখতে পাওয়া যায়। পার্থিব সম্পদের মায়া তুচ্ছ করে যাঁরা দিব্যজ্ঞানের জন্য ধ্যান-ধারণায় মগ্ন, পার্থিব মানুষদের দুর্দিনে তাঁরা আর আত্মসমাহিত থাকেন না, প্রভাত-সূর্যের মত জ্যোতিষ্মান হয়ে তাঁরা সকলের কাছে দেখা দেন। এইভাবেই তাঁরা মানুষের মনের মধ্যে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছেন। তার ভিত এত মজবুত যে তাকে টলানো যায় না। জমিদারি, ব্যবসাদারি, পেশাদারি—সবেরই ভিত টলানো যায়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে যে প্রতিষ্ঠা, শ্রদ্ধায় যে প্রতিষ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে, তার শিকড় তো মানুষের সমাজের অন্দরে-কন্দরে প্রবেশ করে স্থায়ী স্থান করে নিয়েছে। গভর্নমেণ্টের সামান্য অনুদানের উপর এঁদের স্থায়িত্ব নির্ভর করে না। এই অনুদান দিয়ে গভর্নমেণ্ট ধন্য হয়। দুর্ভাগ্য অর্থমন্ত্রীর, তাঁর এ বিষয় অনুধাবন করবার শক্তি নেই। তিনি মনে করেছিলেন, অন্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানের অর্থসাহায্য বন্ধ করলে তাদের যেমন কষ্ট হবে, তেমনি অনুদান, বন্ধ করে মিশনকেও অসুবিধায় ফেলা হবে। তিনি দুর্ভাগা, তাই তিনি বোঝেননি যে, মিশনের যাঁরা সাধু-সন্ন্যাসী তাঁরা সাধারণ সুবিধা-অসুবিধার গণ্ডির মধ্যে বাস করেন না। তাঁদের আদর্শ এবং লক্ষ্য স্থির, করণীয় যেটা সেটা তাঁরা করবেনই এবং তাঁরা জানেন যে, সেই কাজের জন্য অর্থের অভাব হবে না। যারা স্বার্থপর, ক্ষুদ্রমনা, তারা অর্থের অভাবের জন্য বৃহৎ কাজ থেকে বিরত হন। যাঁরা সে অবস্থা অতিক্রান্ত হয়েছেন, তাঁদের মনে সে সংশয়, সন্দেহের কোন দিন উদ্ভব হয় না।

অদ্ভুত যুক্তি যে, মিশনের অর্থসাচ্ছল্য আছে—তাই তাঁদের আর দেবার প্রয়োজন নেই। মিশন যদি এমন কাজ করে থাকেন যে, যাতে তাঁরা অর্থ অনুদান পাবার যোগ্য, তা হলে অর্থসাচ্ছল্য বাধার সৃষ্টি করবে কি করে? আর অর্থসাচ্ছল্য তো কাজের জন্যই হয়। অনুদান যেটা পান, সেটা তো তাঁদের কাজের স্বীকৃতি। জনসাধারণ দেয় শ্রদ্ধায় ; আর

স্বীকৃতিস্বরূপ দেন। বিচার তো একটাই—অর্থের সদ্ব্যবহার। যে কাজের জন্য অর্থ দেওয়া হয়, সেটা যদি ঠিকমত হয়, তাকেই তো সদ্ব্যবহার বলে। তা হলে অর্থসাচ্ছল্যের কথা আসে কি করে? তবু ভাল যে, অর্থমন্ত্রী এটাকে অধিগ্রহণ করতে চাননি। যেখানে কাজের পেছনে যুক্তির কোন বালাই নেই, সেখানে যে-কোন অনর্থ হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর সময়োচিত হস্তক্ষেপে অর্থমন্ত্রীর এই যুক্তিহীন, অর্থহীন, বিচারহীন কাজ যে বন্ধ হয়েছে, তাতে জনসাধারণ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। রামকৃষ্ণ মিশন ও তাঁদের কার্যকলাপ নিয়ে কিছু যে বলার প্রয়োজন আছে, তা অনেকেই মনে করেন না। দুঃখ এই যে, তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এসব বিষয়ের অবতারণা করতে হয়। যাঁদের কাজ নিজেদের অস্তিত্বকে স্থায়িত্ব এনে দিয়েছে এবং যে কাজ এখনও অব্যাহত গতিতে চলছে, তাঁদের সাধুবাদ দেবার প্রয়োজন হয় না। দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত কোন কোন মানুষের অবিমৃশ্যকারিতার জন্য সাধুবাদ মাঝে মাঝে প্রয়োজন হয়, এটাই দুঃখের।

অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া ভাল। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী বারবার করে বলেছেন যে, 'কাজের বদলে খাদ্য' এই প্রকল্পে কেন্দ্রের যে সাহায্য দেবার কথা, তা ওঁরা দেননি। এইজন্য, তিনি রাজ্যে তো বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেনই, দিল্লীতে গিয়েও বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন। ব্যাপারটা কি কোন দিন কেউ স্পষ্ট করে খুলে বলেননি। এদিকে এই ব্যাপারে কেন্দ্র যে সমীক্ষকদল পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের অনেক মন্তব্য সংবাদপত্রে বেরিয়ে গেছে। মন্তব্যের সংবাদ যদি সত্য হয়, তা হলে এটা পরিষ্কার যে, যে যে নিয়মকানুনের ভিত্তিতে সাহায্য এসেছিল, তার অধিকাংশই রাজ্য সরকার পালন করেননি। মোরারজী সরকারের সময় থেকেই একটা কথা বারবার শোনা যাচ্ছে যে, এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ঠিকমত হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। এই অভিযোগ অতিশয় গুরুতর এবং সমীক্ষকদলের মন্তব্যগুলিও রাজ্য সরকারের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। হিসাবের ব্যাপারে যদি তিলমাত্র সত্যতা থাকে, তা হলে তো কোন অভিযোগের প্রশ্নই ওঠে না; সাধারণের অর্থ সাধারণের জন্য খরচ হচ্ছে। তার হিসাব এমনভাবে রাখতে হবে, যা সন্দেহাতীত। এ কথাও বেরিয়েছে যে, যারা খাদ্য পাচ্ছে, তারা জানেও না যে, 'কাজের পরিবর্তে খাদ্য' এই পরিকল্পনায় তারা খাদ্য পাচ্ছে। কেন্দ্র যে এই পরিকল্পনা বাবত অর্থ পাঠাচ্ছেন, এটা না জানালে সাধারণভাবেই সকলের মনে হতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দাক্ষিণ্য। এখানে দাক্ষিণ্যের কোন প্রশ্নই ওঠে না। পরিকল্পনা যে কেন্দ্রের এবং কেন্দ্রই সাহায্য করছেন, এ কথা বারবার নিশ্চয়ই বলা উচিত। সমীক্ষকদল লম্বা ফিরিস্তি দিয়েছেন। সব ফিরিস্তি নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। প্রশ্ন এই যে, কোন ত্রুটি থাকবে কেন? অভাবগ্রস্ত অঞ্চলের জন্যই এই পরিকল্পনা। সরকারের কোন দাক্ষিণ্যও নয়, সেবাকার্যও নয়। এটা দায়িত্বপালনের কাজ এবং এই দায়িত্বপালনের জন্যই তো তাঁরা সরকারে এসেছেন! দায়িত্বপালনে যদি তাঁদের ত্রুটি হয়, তা হলে সে ত্রুটি তো কেন্দ্রের নিন্দাবাদ করে বা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে সংশোধন হবে না! কেন্দ্র যদি সত্যিই পশ্চিমবঙ্গের ন্যায্য দাবিকে উপেক্ষা করে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে করণীয় কাজ যদি না করে, তা হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিশ্চয়ই জনসাধারণের সমর্থন পাবেন। কিন্তু অর্থমন্ত্রী যেভাবে বিষোদ্গার করেন, তাতে পুরো ছবিটা কারো চোখেই ভেসে ওঠে না। বেশ তো, রাজ্যের অর্থমন্ত্রী পরিষ্কার করে 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' প্রকল্পের যাবতীয় তথ্য ভাল করে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করলেই তো পারেন। কিন্তু তা তো হচ্ছে না—ক্রমাগত বাগাড়ম্বর আর আস্ফালন। সমীক্ষকদলের মারফত অনেক অভিযোগই তো সংবাদপত্রে বেরিয়েছে এবং আপাতদৃষ্টিতে অনেকেরই ধারণা, এইসব অভিযোগ মোটামুটি সত্য। কারণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট অভিযোগের নির্দিষ্ট উত্তর আজ অবধি প্রকাশিত হয়নি। এ সম্বন্ধে জনসাধারণের সন্দেহ নিরসন করা দরকার। কেবলমাত্র 'দাবি, দাবি' করে চেঁচামেচি করলেই যে দাবি করার অধিকার আছে, এ কথা প্রমাণ করা যায় না। যখন বিরোধী দল থেকে অভিযোগ করে, তখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করা যায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সমীক্ষকদল সরকারীভাবে যা বলেন, তা সব সময়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ কথাও বলা যাবে না যে, কেন্দ্রে যে দল সরকার পরিচালনা করছেন, তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ অনেকেই বলেছেন যে, কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক; কোন তিক্ততা নেই। কেন্দ্রের মন্ত্রীরাও বারবার বলেছেন যে, যেসব রাজ্যে বিরুদ্ধ রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করেছেন, তাঁদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধাবার ইচ্ছা তাঁদের নেই। অতএব এই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিদ্বেষজনিত অভিযোগের কথা ওঠে না।

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচার

পশ্চিমবঙ্গ খরা এবং বন্যা—দুইয়েতেই গভীর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই অবস্থায় কেন্দ্র যদি অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে যথোচিত সাহায্য পাঠিয়ে থাকেন, তা হলে রাজ্য সরকারের তা অস্বীকার করা উচিত নয়। স্তুতিবাদ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু অহেতুক অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার যদি রাজ্যের প্রতি তাঁদের ন্যস্ত দায়িত্ব পালন না করেন, তা হলে নিশ্চয়ই প্রতিবাদে মুখর হতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বিচার করে দেখতে হবে যে, সংবিধানে রাজ্য সরকারের যে দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা আছে, তা ঠিকমত পালিত হচ্ছে কি না। তা হলে গণতান্ত্রিক সরকার বলে যাঁরা নিজেদের অভিহিত করেন, তাঁদের নিজেদের অক্ষমতা স্বীকার করা উচিত। তা তো দেখা যায় না! সেইজন্যই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কোন কথা বা কোন সমালোচনা জনসাধারণের মনকে স্পর্শ করতে পারেনি। দু' বছর আগে যা ছিল, তা ছিল। এখন রাজ্যের অবস্থা অন্য যে-কোন রাজ্যের চেয়ে ভাল—এ কথা বলা যাবে না। মুখ্যমন্ত্রী প্রায়ই এ কথা বলতেন যে, অন্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভাল। এখন আর এ দাবি করবার কোন উপায় নেই। আমরা যে-সব অঞ্চলে বাস করি, মুখ্যমন্ত্রী বা পুলিস কমিশনারের বিশ্বস্ত কেউ একজন যদি সেই অঞ্চলে এক রাত্রিও বাস করেন, তা হলে আর বলতে পারবেন না যে, অন্য রাজ্যের চেয়ে এই রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলার অবস্থা ভাল। কয়েক সপ্তাহ আগে মানিকতলা বাজারে সকালের দিকে বন্ধ হয়েছিল। মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সীমা ছিল না। যারা রোজকার বাজার করে কর্মক্ষেত্রে যায়, তাদের সেদিন খাওয়া হয়নি। এ এক দিনের ঘটনা নয়, এসব ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। রাত্রি দুটো-তিনটে অবধি কারো ঘুমোবার উপায় নেই বোমা আর গুলির আওয়াজে। আমার যে গৃহচিকিৎসক, অতি নিরীহ মানুষ—চিকিৎসা নিয়েই আছেন। তাঁর চেম্বারে বসে রুগী দেখছিলেন। বোমার স্প্রিন্টার গিয়ে আঘাত করল। চশমা ছিল, তাই চোখ রক্ষা পেল, নয়তো চোখে আঘাত লাগত। এমন বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। এমন অনেক সাধারণ কাজ আছে, যা ভুলভাবে করার জন্য ঐ অঞ্চলের লোকদের কষ্টের সীমা নেই। আমার এত বয়স হল, আমার জীবনে বিডন স্ট্রীটে জল দাঁড়াতে প্রায় কখনোই দেখিনি। গত দু বছর ধরে একটু বৃষ্টি হলেই বিডন স্ট্রীট যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সুপরিকল্পিত উপায়ে কলকাতার রাস্তা খোড়াখুঁড়ি হচ্ছে, সেজন্য যেসব রাস্তা যাতায়াতের যোগ্য ছিল, তা যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে উঠছে। আর দৃষ্টান্ত বাড়াতে চাই না। এখনও তো রোজ রোজ নতুন নতুন কাজ হচ্ছে! সরকারের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবও হয়ে গেল। কিন্তু হিসাব করে এটা কি দেখা হয়েছে যে, সংবিধানে রাজ্য সরকারের উপর যেসব দায়িত্ব ন্যস্ত আছে, তা প্রতিপালিত হচ্ছে কি না। তা যদি না হয়, তা হলে বাদ-বিসংবাদের প্রয়োজন কি? যে যতদিন পারে, টিঁকে থাকুন—তাই আদর্শ(!) হওয়া উচিত। যথোচিত কাজ করছেন বলে রামকৃষ্ণ মিশনের সরকারী অনুদান বন্ধ হতে গেছল; তা হলে কি যথোচিত কাজ হচ্ছে না বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে যেসব অনুদান আসছে, তা বন্ধ হওয়া উচিত?

"আমি অফিস সেক্রেটারি,
আমার চটপটে কাজের ধারার মতই আমার ড্রেসও হবে স্মার্ট।"

সবার রুচি-মাফিক পোশাকের জন্যে
নানান পছন্দসই মনোলোভা কাপড়!

সুটিং, শার্টিং, শাড়ী, ড্রেস মেটিরিয়াল ও ডেনিম।

**মফতলাল ইণ্ডাস্ট্রীজ** নিউ শরুক মিলস **মফতলাল ফাইন**

MF-33 BEN

# সেই সময়

## সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৫৭ ॥

পরিদর্শকের কার্যালয়ের জন্য চিৎপুরে একটি বাড়ি ক্রয় করেছে নবীনকুমার। নতুনভাবে সব কিছু সজ্জিত করা হচ্ছে। সম্পাদকের কক্ষটি দিতলে।

অগ্রহায়ণ মাসের এক দ্বিপ্রহরে নবীনকুমারের জুড়ি গাড়ি সেই গৃহের সামনে থামলো। আজ থেকে সে এই দৈনিক পত্রিকাটির পরিচালনা ও সম্পাদনার ভার গ্রহণ করবে। জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোস্বামী নামে দুই ব্রাহ্মণ নবীনকুমারকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সসম্ভ্রমে নিয়ে এলো দ্বিতলে। এই দুই ব্রাহ্মণই পত্রিকাটি শুরু করেছিল, ক্ষুদ্র আকারের এক পাতার কাগজ এরা চালাতে পারেনি, নবীনকুমার ওদের কাছ থেকে পরিদর্শকের সর্বস্বত্ব গ্রহণ করেছে। হরিশের মৃত্যুর পর সাপ্তাহিক হিন্দু পেট্রিয়টের সেই মালিক দুরবিন নামে একটি উর্দু পত্রিকাও চলে তার অর্থানুকূল্যে। এবার সে অধিগ্রহণ করলো এই দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র।

সম্পাদকের কেদারায় আসীন হয়ে নবীনকুমার অন্যদের বললো, অনুগ্রহ করে আপনারাও বসুন। প্রথমেই আমি প্রয়োজনীয় কটা কতা বলে নিতে চাই।

প্রাক্তন দুই সম্পাদক ছাড়াও আর দু জন মুদ্রাকর এই কাগজের কর্মী। এ ছাড়াও নানাভাবে সংশ্লিষ্ট সাত-আট জন ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত। কয়েক জন আসন গ্রহণ করলো, কয়েক জন রইলো দন্ডায়মান।

বাইশ বৎসর বয়স্ক সম্পাদক গম্ভীর কন্ঠে বললো, প্রথমেই জানাই, তর্কালঙ্কার মশাই ও গোস্বামী মশাই সমেত এই পত্রিকার যারা যারা কর্মী ছিলেন, সকলেই ভবিষ্যতে এ কাগজে বহাল থাকবেন।

সকলে একসঙ্গে সাধু! সাধু! বলে উঠলো। ছলছল করে উঠলো তর্কালঙ্কার ও গোস্বামীর চক্ষু। তারা এতটা আশাই করেনি।

নবীনকুমার বললো, আপনারা আরও যোগ্য লোক খুঁজুন, আমার আরও কর্মী লাগবে। এক-পাতা নয়, এই পত্রিকা হবে চার পৃষ্ঠা।

এবার সকলে আরও বিস্মিত। চার পৃষ্ঠার বাংলা কাগজ? প্রতিদিন? এমন কথা কেউ কখনো শুনেছে!

অন্যদের মুখে বিস্ময়-লেখা পাঠ করেই নবীনকুমার আবার বললো, হ্যাঁ, প্রতিদিন চার পৃষ্ঠা। এ কাগচ হবে ইংরেজি পত্রিকাগুলির সমতুল্য। আপনারা সকলেই জানেন, এতকাল যে সব বাংলা সংবাদপত্র বেরিয়েচে, তা ইংরেজি কাগচগুলির উচ্ছিষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। ইংরেজি কাগচের বস্তাপচা পুরোনো খবর বাংলা কাগচে বেরোয়। আমি নাম কত্তে চাই না, এমন বাংলা কাগচ আচে যার সংবাদ অংশ ইংরেজি কাগচের চোখো অনুবাদ, কী তাই না?

অন্যেরা আর কী বলবে! এ তো জানো কথাই। বাংলা কাগজের নিজস্ব সংবাদ সংগ্রহের সুযোগ কোথায়?

আমরা পরিদর্শকের জন্য নিজস্ব রিপোর্টার নিয়োগ কর্বো। তারা হাইকোর্টে যাবে। মফস্বলে যাবে, হাটে-বাজারে ঘুরবে, গবরমেন্টের হাই হাই ব্যক্তিদের সঙ্গে কতা বলবে, তারপর নিরপেক্ষ সংবাদ দেবে। দেখুন, অনেক সংবাদ আচে, যা সাহেবদের কাজে লাগে কিন্তু আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। তবু বাংলা কাগচে ইংরেজির অনুকরণ করে সেগুলি ছাপে। যেমন ধরুন, অমুক জাহাজ অমুক স্থল থেকে এসেচে। অমুক জায়গায় অমুক দিনেতে কলকাতা ছেড়ে ইংলন্ডে যাবে। এই সংবাদ পাঠে বাঙালীর কী উপকার? আমাদের আচার-ব্যবহার সমুদয়ই ইংরেজ জাতি হতে ভিন্ন। সুতরাং বাঙলা কাগচে বাঙ্গালার নিজস্ব খবর, যাতে দেশের কল্যাণ হয়। মানুষের চেতনা জাগ্রত হয়, এমন বিষয় পরিবেষণ কত্তে হবে। তা ছাড়া আপনাদের সকলকে এক শপথ নিতে হবে, আপনারা রাজি?

সকলের মুখপাত্র হয়ে মদনমোহন গোস্বামী বললেন, সিংহমশাই, আপনার বাক্যগুলি শুনে আমাদের মনে এক নতুন ভাবের উদ্রেক হতেছে। এ সব যে বড়ই সত্য কথা। তথাচ তাহা আমরা এতদিন উপলব্ধি করি নাই।

নবীনকুমার বললো, মেডিক্যাল কলেজ থেকে ছাত্ররা পাশ করে যখন ডাক্তার হয়, তখন মানবসেবার জন্য তাদের শপথ নিতে হয়। সংবাদপত্রেও মানুষের মনের চিকিৎসা হওয়া কর্তব্য। সে কারণে আসুন আমরা শপথ গ্রহণ করি, জ্ঞানপূর্বক সত্য পথ থেকে বিচলিত হবো না। যাতে কোনো বিষয়ের অতি বর্ণন না হয় সে বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হবো আর ....পৃথিবীর কোনো মানুষই পক্ষপাতের হাত এড়াতে পারেন না যদিও তবু আমরা অঙ্গীকার কচ্চি যে, জ্ঞানত কোনো পক্ষপাত দোষে লিপ্ত হবো না। কেমন, এ শপথ ঠিক?

—অবশ্যই, অবশ্যই!

—আপনারা জানেন, আমি মহাভারত অনুবাদ-কার্যে ব্যস্ত আছি। অর্ধেকের বেশী হয়ে গ্যাচে, এ সময় সে কাজে ঢিল দেওয়া চলে না। সেজন্য এখানে আমি খুব বেশী সময় দিতে পারবো না। দায়িত্ব নিতে হবে আপনাদেরই। আমি সকাল আট ঘটিকা থেকে দুপুর দুই ঘটিকা পর্যন্ত মহাভারত কার্যালয়ে থাকব। সেখান থেকে আসতে আমার এক ঘন্টা লাগবে। অর্থাৎ তিন ঘটিকা থেকে রাত্র আট-নয় ঘটিকা পর্যন্ত আমি আপনাদের সঙ্গে এখানে কাজ কর্বো!

—সে কি মহাশয়, আপনি আহার-বিশ্রামেরও সময় রাখবেন না?

—আমার এ শরীরের পক্ষে খুব বেশী আহার্যের প্রয়োজন হয় না, আর বিশ্রামের জন্যও আমার শয্যার প্রয়োজন হব না। সেজন্য আপনাদের চিন্তা করবার দরকার নেই। বাংলার ঘরে ঘরে এই কাগচ পৌঁচে দেওয়া চাই। যাতে লোকে ইংরেজি দৈনিক ফেলে সাগ্রহে এই কাগচ পড়ে। আর একটা কতা! গোস্বামী মশাই, এ কাগচে লেকবার সময় আপনাদের ভট্টাচার্যি-বাংলা ছাড়তে হবে। সংস্কৃত আর নস্যির গন্ধওলা বাংলা আমার চাই না। সাধারণের বোধগম্য সহজ সরল ভাষাতেই সংবাদপত্র প্রচারিত হওয়া উচিত। তাতে ব্যাকরণ একটু ক্ষুণ্ণ হলে কিংবা ব্যোপদেব রাগ কল্লেন কিনা তা নিয়ে মাতা ঘামালে চলে না।

শুরু হয়ে গেল দৈনিক পরিদর্শক। চার পৃষ্ঠার কাগজ, দাম চার পয়সা। সম্পূর্ণ নতুনভাবে সংবাদ পরিবেশন, ঝকঝকে ছাপা, সবই অভিনব। লোকে প্রাতরাশ গ্রহণ করবার আগেই যাতে এই কাগজ পেয়ে যায়, তেমন ব্যবস্থা করা হলো। শিক্ষিত ব্যক্তিরা সকলেই স্বীকার করলেন, বাংলায় এমনটি আর কেউ দেখেনি।

বিদ্যাসাগর প্রথম দিন পরিদর্শক পেয়ে বিস্মিত হলেন। নবীনকুমার কী কান্ড শুরু করেছে! দৈনিক সংবাদপত্র বার করা কি সোজা কথা! ওদিকে মহাভারত অনুবাদের মতন অত বড় কাজ হতে রয়েছে........হুজুগে যুবক, তবে কি মহাভারতের কাজ মুলতুবি রেখে এবার এটাতে মেতেছে?

একদিন তিনি চলে এলেন বরাহনগরে। সারস্বত-আশ্রমে মহাভারত অনুবাদের কাজ কিন্তু একটুও থেমে নেই। নবীনকুমার পন্ডিতদের এক-দন্ডও নিবৃত্তি দেয় না। পন্ডিতরা মহাভারতের বিভিন্ন পান্ডুলিপি থেকে মিলিয়ে একটি একটি মূল নির্বাচন করে তার আক্ষরিক বাংলা অনুবাদ করে রেখে দেয়। নবীনকুমার প্রত্যেকদিনের প্রথমার্ধে এখানে কাটিয়ে ভাষার পরিমার্জনা করে। তারপর সে চলে যায় পরিদর্শক কার্যালয়ে।

বিদ্যাসাগর ভাবলেন, তা হলে এই বাংলা সংবাদপত্র বেশীদিন বেরুবে না।

অথচ দিনের পর দিন ঠিক সময়ে পরিদর্শক প্রকাশিত হতে লাগলো।

এক সন্ধ্যাকালে পরিদর্শকের সম্পাদকের কক্ষে এসে প্রবেশ করলো সম্পাদকেরই সমবয়সী এক যুবক। নবীনকুমার সম্পাদকীয় লিখছিল অভিনিবিষ্টভাবে, যুবকটি গলা খাঁকরি দিয়ে বললো, কী হে, নবীনবাবু, একটু বসতে পারি?

নবীনকুমার মুখ তুলে, ঈষৎ বিস্মিত হয়ে বললো, এ কি কৃষ্ণকমল নয়? আরে, আরে, বসো বসো! অ্যাদ্দিন বাদে হটাৎ কী মনে করে?

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য নবীনকুমারের সহপাঠী ছিল হিন্দু কলেজে, কিছুদিন সে বিদ্যোৎসাহিনী সভাতেও যোগ দিয়েছিল উৎসাহের সঙ্গে। তারপর বেশ কিছুদিন তার দেখা নেই। কৃষ্ণকমল যেমন মেধাবী, তেমনই খেয়ালী।

কৃষ্ণকমল বললো, কেমন দেশোদ্ধার কচ্চো মেতেচো, তাই দেকতে এলুম।

নবীনকুমার বললো, একটু বসো, কৃষ্ণকমল। আমি হাতের এই কাজটা সেরে নি আগে তারপর তোমার সঙ্গে কতা কইবো।

সম্পাদকীয় লেখা শেষ করে, কপি বয়কে ডেকে তার হাতে দিয়ে সেটি ছাপাখানায় পাঠিয়ে দিয়ে নবীনকুমার বললো, কৃষ্ণকমল, তুমি এসেচে বড় ভালো হয়েচে, তোমার মতন একজনকেই খুঁজিচিলুম।

—ঘরে হুঁকো-গড়গড়া কিছুই রাখোনি?

—আমি তো ধূমপান করি না।

[illegible] আপ্যায়নের জন্য তো অন্তত রাকবে, সম্পাদকের ঘরে কত রকম মনুষ্য আসবে।

—এখুনি আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা কচ্চি।

—থাক, থাক, আপাতত নস্যিতেই কাজ চালাই। ভট্টাচার্য বংশের ছেলে, সঙ্গে সব সময় নস্যির ডিবেটা রাকি।

—তা ভট্টাচার্যির বংশের সন্তান হয়েও তুমি তো পুরোপুরি নাস্তিক শুনিচি! আরও কী কী যেন কচ্চো, যা ঠিক ভট্টাচার্য-সুলভ নয়?

—আরে, নাস্তিক হয় বামুনরাই। চাঁড়াল কখোনো নাস্তিক হয় না। বামুন ব্যাটারা তো জানে যে অন্য জাতের লোকেদের ভগবানের নাম করে খুব ভয় দেকাচ্ছি বটে, আসলে ভগবান-টগবান কিচু নেই। মন্দিরের পুজোরিরা দেকবে টপ করে ঠাকুরের প্রসাদ এঁটো করে খেয়ে নেয়।

—হা-হা-হা-হা।

—তোমরা কায়েতরা আর বেনেরা ধুমধাম করে মা-বাপের ছেরাদ্দ যজ্ঞ করো, ব্রাহ্মণকে গোরু-বাছুর দান করো। কত না যেন পবিত্র পুণ্যের কাজ। আর সে বামুন বাছুরের গলায় দড়ি বেঁধে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে কশাইয়ের কাচে বিক্‌কিরি করে দেয়।

—হ্যাঁ। ছেলেবেলায় এ রকম দেকিচিলুম বটে, তখন রাগ করে সেই বামুনের টিকি কেটে নইচিলুম। যাক সে কতা। তুমি এসে পড়েচো, তামাকে আমার দরকার।

কৃষ্ণকমল দীর্ঘাঙ্গ, কৃশকায়, গাত্রবর্ণ মাজা মাজা, এই বয়েসেই একটু একটু টাক পড়তে শুরু করেছে, কিন্তু গুম্ফটি বেশ পুরুষ্টু। পরনে ধুতি, বেনিয়ান ও চায়না কোট, পায়ে তালতলার চটি। ওষ্ঠে একটু যেন বিদ্রূপ হাস্য সব সময় লুকিয়ে থাকে।

এক টিপ নস্য নাকে ঠুসে দিয়ে সে বললো, আমার মতন লোককে তোমার কী দরকার পড়লো বলো তো?

—তুমি দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ নামে একখানা বেশ সরেশ গ্রন্থ রচেচিলে, পড়ে বড় মজা পেয়েচিলুম। আর তো বাংলায় তেমন লিকলে না! তোমার মতন বিদ্বান, তীক্ষ্ণধী লোককে আমাদের চাই। তোমরা কলম ধরলে দেশের অনেক ওপকার হবে। তুমি আমাদের কাগচের জন্য লেগে পড়ো না।

—হুঁ, তোমার কাগচে দেশসেবার বিষয়ে অনেক বড় বড় কতা থাকে তো দেকচি। তা এ জন্য তোমার কত খর্চা হচ্ছে?

—খর্চার কতা ভাবলে কি কোনো ভালো কাজ হয়?

—সাহেব ব্যবসায়ীরা তোমার কাগচে বিজ্ঞাপন দেয় না। অর্থাৎ রেভিনিউ নেই। সবটাই তোমার ট্যাঁক থেকে যাচ্চে তাই না?

—কাগচ ঠিক মতন চললে ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞাপন ঠিকই দেবে।

—বাংলা কাগচে? হেঃ।

—[illegible] ইংরেজের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে? ইংরেজিতে ভালো নূজ পেপার হয় আর বাংলায় আমরা তেমন পারি না?

—ঈশ্বর গুপ্ত কিংবা গুড়গুড়ে ভট্‌চাযের মতন খিস্তি-খেউড় ছাড়া, কাগচ চলবে। তোমার এই বড় বড় আইডিয়ালিজ্‌ম-এর কথা ক'জন বুঝবে? দেশাত্মবোধ, হুঃ, ক'জন লোক জানে দেশ কাকে বলে?

—কৃষ্ণকমল, তুমি কি আমায় নিরাশ করে দেবার জন্যই আজ এখেনে এসোচো। তোমার এ সব বিনি পয়সার উপদেশ আমি শুনতে চাই না। তুমি আমার কাগচে লিখবে কি না?

—পয়সা পেলে লিকতে পারি বটে।

—পয়সা পাবে। প্রেসিডেন্সি কালেজে ইংরেজির অধ্যাপনা করচো শুনিচি, তোমার কি এমনই পয়সার অভাব যে লেকার আগেই পয়সার কথা মনে এলো?

—পয়সার কতা কার নেই! স্বয়ং লর্ড ক্যানিং পর্যন্ত বলেন যে সরকারি ফান্ডে টাকার অভাব। তোমাদের মতন দেশের উপকার করবার জন্য আমি মাতা ফাটাফাটি করতে রাজি নই। সমাজ পরিবর্তনের জন্য যারা উঁজিয়ে বেড়াচ্চেন বেড়ান, আমি প্রফেশনাল মানুষ।

—বেশ ভালো কতা। প্রফেশনাল লেখক হিসেবেই তুমি আমাদের নতুন কী দিতে পারো? সাহেব-সুবোর গল্প কিংবা বিলেতি চালের বাংলা আমার চলবে না।

—তুমি দেশীয় বিষয় চাও। এ দেশের কোতায় কী কান্ড ঘটেচে তুমি কতটুকু জানো? তুমি এমন কোনো স্থানের কতা জানো, যেখেনে হাজার হাজার নারী-পুরুষ প্রকাশ্য স্থানে পাশাপাশি বসে খাওয়া-দাওয়া করে, নাচে, গায়?

—হাজার হাজার নারী-পুরুষ?

তার বেশী ছাড়া কম নয়। পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যাই বেশী, এক পুরুষের পাশে তিন-চারজন যুবতী—

—এ সব কী গাঁজাখুরি চালাচ্চো, কৃষ্ণকমল? নারী-পুরুষ প্রকাশ্য স্থানে বসে আহারাদি করবে? এ কি তোমার সাধের ইংলন্ড না সুদূর আমেরিকা? হিন্দুস্তানে এমন সম্ভব নয়।

—হিন্দুস্তান বাদ দেও কলকেতা থেকে মাত্র ষোল ক্রোশ উত্তরেই এমন হয়, আমি নিজের চক্ষে দেকে এসিচি। রেলযোগে কাঁচড়াপাড়া চলে যাও, তার কাচেই ঘোষপাড়া গ্রাম। সেখানে প্রতি দোল-পূর্ণিমায় আউলে সম্প্রদায়ের মেলা বসে। আউলে সম্প্রদায়ের নাম শুনেচো? শোনোনি? অথচ দেশের অবস্থা বদলাতে চাও? সেইজন্যই বলচিলুম, ক'জন জানে দেশ মানে কী?

—বাংলায় হিন্দুদের কত সম্প্রদায় আচে। তার মধ্যে সব কটি সম্প্রদায়ের পরিচয় না জানলেই দেশকে জানা হলো না?

—নবীন, তোমায় একটু ক্ষেপাচ্চিলুম। আমি নিজেই কি ছাই জানতুম? নেহাত গতবারে গিয়ে মানুষের মেলা। তার মধ্যে চোদ্দ আনাই স্ত্রীলোক। কুলকামিনীরা আর অমন ধেই ধেই করে মেলায় যাবে এমন বিশ্বাস হয় না, মনে হলো বেশ্যার সংখ্যাই বেশী। কেউ হত্যে দিয়ে আচে, কেউ পুজো দিচ্চে, কেউ বা নাচা-গানা করে চলেছে, আবার কেউ বা নিজের লোককে বোবা সাজিয়ে 'বোবার কথা হোক' বলে রোগ আরামের ভেল্কি দেকাচ্চে!

—এত লোক এক সঙ্গে?

—হ্যাঁ। আউলে সম্প্রদায়ের কর্তা এখন ঈশ্বরচন্দ্র মহাশয়। তার সঙ্গে দেকা করতে গিয়ে দেকলুম, কর্তাবাবু একটা শয্যায় শয়ন করে আচেন আর অনেকগুলি স্ত্রীলোক তাকে ঘিরে বসে কেউ পদসেবা কচ্চে, কেউ গা টিপে দিচ্চে, কেউ মুখে সন্দেশ তুলে দিচ্চে, কেউ অঙ্গে চন্দন লেপচে আর কেউ গলায় মালা পরাচ্চে। বেড়ে ব্যাপার। কর্তাবাবু আমার সঙ্গে কতা বলার সময়ই পেলেন না। শুনলুম নাকি বৃন্দাবনের কেষ্টলীলার মতন এখানেও স্ত্রীলোকদের বস্ত্রহরণ হয়!

কৃষ্ণকমল, তোমার ঝোঁকটা কোন দিকে বলো তো? তুমি যেন আদি রসের ব্যাপারে বেশী পেয়েচো? আমার কাগচে ওসব আমি প্রচার কত্তে চাই না।

—ওঃ হো, তোমার বুঝি আদি রসের দিকে ঝোক নেই। ঐ যে হুতোম প্যাঁচার নক্সা বাজারে ছেড়োচো, তাতে তো আদিরসের টিপ্পনী কম নেই!

—ওটা, ওটা—

—বুঝিচি, ওটাও সমাজসংস্কার! শোনো, আমি এই মেলার কতা সবিস্তারে বললুম কেন জানো? ঐ মেলাটা দেকে আমি মুগ্ধ হয়িচি। এ আদিরসের জন্য নয়, এই প্রথম আমি একটা মেলা দেকলুম, কোনো জাতিভেদ নেই। এখানে হিন্দু-মোছলমান সব সমান। মোছলমান এখানে সানন্দে বামুনের মুখে অন্ন দেয়, বামুন আহ্লাদ করে খায়। সদগোপ, কলু, মুচি, বৈষ্ণব সব ওখেনে এক। এমনকি নারী-পুরুষেরও প্রভেদ নেই। অবস্থা বৈগুণ্যে যে-সব অবলা নারী বেশ্যা হয়েচে, তাদেরও কেউ ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রাকে না! এ যেন এক মহামিলন মেলা। এ কতা সারা দেশকে জানাবার দরকার নেই?

—বেশ তো তুমি লিকে দাও!

কৃষ্ণকমল প্রায়ই সন্ধ্যের দিকে আসতে লাগলো পরিদর্শকের সম্পাদকীয় দফতরে। কিন্তু গাল-গল্পই করে, লেখার ব্যাপারে অলস। ঈষৎ ঝাঁঝালো বিদ্রূপ মিশ্রিত গল্প বলায় তার জুড়ি নেই, কাজ বন্ধ করে নবীনকুমারকে শুনতে হয়।

নবীনকুমার তাকে লেখার জন্য [illegible] দিলেই সে বলে, আরে দাঁড়াও, তোমার কাগচ ভালো করে চলুক। আগে দেকি, তোমার এলেম কতদূর! এর মধ্যে কত টাকা গলে গ্যাচে, ঠিক করে বলো তো ভাই?

নবীনকুমার এই শেষের কথাটিতে অপ্রসন্ন হয়। সে হাত তুলে বাধা দিয়ে বলে, ও প্রসঙ্গ তুলো না। আমি টাকা-পয়সা নিয়ে চিন্তা করতে চাই না।

(ক্রমশ)
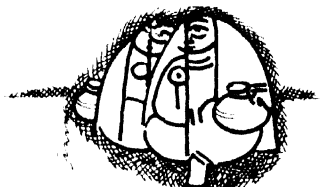
# স্মৃতি সততই সুখের

## প্রতিভা বসু

॥ ২৮ ॥

পৌঁছনো গেল হামবুর্গে। জার্মান দেশে পা দিয়েই বোঝা গেল, জার্মানরা জাত হিসেবে পৃথিবীর অন্যান্য বাসিন্দার চাইতে বেশ কিছুটা স্বতন্ত্র। জার্মানবাসী অথবা জার্মান-ফেরতা অনেক ভারতীয়ের মুখে শুনেছি পাশ্চাত্ত্য জগতে অন্যান্য দেশের তুলনায় তাদের কাছে এই দেশটাকেই বেশী ভালো লাগে। যদিও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে এরা যে খুব বলীয়ান তা নয়। পৃথিবীর বহু দেশই সে ব্যাপারে এদের টেক্কা দিয়ে বেরিয়ে যেতে সক্ষম। চমক লাগাবার মতোও তেমন কিছু আছে তাও নয়। এদের নিউ ইয়র্কের মতো এক শো সাততলা বাড়িও নেই, প্যারিসের মতো চত্বর, লুভার বা চতুর্দশ লুইয়ের প্রাসাদও নেই। তবু যে সে দেশ সহজেই, বলা যায় প্রথম দর্শনেই, ভ্রমণকারীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তার প্রধান কারণই সম্ভবত এদের যোগ্যতা তুলনারহিত। যোগ্য কিন্তু ঠিক দাম্ভিক নয়, চপল নয়, সচেতনও নয়। এরা জানে এরা কী। এদের ডিগনিটি আছে, অহংকার নেই। রাস্তাঘাট, লোকজন, দোকানপাট—সর্বত্রই যেন লেখা আছে সে কথা।

অবশ্য হামবুর্গের ক্ষণিক অবস্থানে সেটা ততো বেশী প্রকট হয়ে ওঠেনি, হয়েছিলো বার্লিনে ঢুকে।

হামবুর্গে পৌঁছেছিলাম রাত্তিরে। এয়ার পোর্ট থেকে আসতে আসতে যতটুকু দেখা সেটুকুতেই তৃপ্ত হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে হলো। সকালবেলা দুটি ছাত্র এলো বুদ্ধদেবের কাছে। একান্তই তরুণ যুবা। অতি সুন্দর চেহারা, বীট নয় সুতরাং পোশাক সাবাস্ত, ব্যবহার নম্র, ভঙ্গি বিনীত। গাঢ় নীল চোখ, পাকা সোনার মতো রঙের ঘন চুল। তাদের বাসনা তাদেরই আয়োজিত একটি ছোটো আসরে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইনটেলেকচুয়াল যুবক এবং আধুনিক লেখকের সঙ্গে বুদ্ধদেব সস্ত্রীক একবার মিলিত হোন। তারাই লাঞ্চের ব্যবস্থা করবে, শহর চেনাবে, মিউজিয়ামে নিয়ে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

হামবুর্গে বুদ্ধদেব বিশেষ কোনো জরুরী কাজ নিয়ে আসেননি। নিমন্ত্রিত হয়ে এলেও নানা স্থানে বক্তৃতা করে বেড়াবার চুক্তি নেই কোনো। একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া।

ছেলে দুটি বললো, 'এটা কোনো সভাসমিতি নয়, ধরে নিতে পারেন আপনাদের দুজনকে নিয়ে আমাদের একটা আড্ডা মাত্র। আপনাদের আমরা একটুও কষ্ট দেবো না।'

বুদ্ধদেব সানন্দে রাজী হলেন। বেরিয়ে পড়লাম তাদের সঙ্গে। যেখানে নিয়ে এলো বোধ হয় কারো বাড়ির হলঘর। জনা পঁচিশেক যুবক সমবেত হয়েছে সেখানে। খুব খুশী হয়ে আদর-অভ্যর্থনা করলো তারা। বসলো গোল হয়ে, আলাপ-পরিচয়ের পরে প্রশ্ন এবং উত্তর-প্রত্যুত্তরের ক্রমবিকাশে আসর জমে উঠলো সহজেই। বুদ্ধদেবের ভাষায় একসঙ্গে এতজন সমান শিক্ষিত আধুনিক যুবক সহজে দেখা যায় না। ভারতবর্ষ বিষয়ে তারা কেউ অজ্ঞ নয়, রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে শুধু শ্রবণের দ্বারাই শ্রদ্ধাশীল বা কৌতূহলী নয়, দস্তুরমতো পড়াশুনো করেছে, তাঁর জীবনবৃত্তান্ত তারা জানে। সংস্কৃত পড়ছে এমন ছেলেও আছে সেখানে।

বেলা তিনটে পর্যন্ত তাদের সঙ্গেই কাটলো। নদীতে নৌকো চড়ে বেড়াতে বেড়াতে দ্বিপ্রাহরিক ভোজ, তারপর মিউজিয়াম সেরে হোটেলে ফেরা।

কলেজের মিটিং সাড়ে পাঁচটায়। পাঁচটাতেই এসে গেলেন দুজন অধ্যাপক। আমি আর বেরুলাম না, বুদ্ধদেবকে তো যেতেই হবে!

আমি ভেবেছিলাম সারাটা সময় শুয়েই থাকবো। বিশ্রাম। সেটা কিন্তু পারা গেল না। ঘণ্টাখানেক পরেই মনে হলো, ঘোরাঘুরির ক্লান্তির চেয়ে শুয়ে থাকার পরিশ্রমও নেহাত কম নয়। তখন হোটেলের একা ঘরে অসম্ভব খারাপ লাগতে লাগলো। অধ্যাপক দুজন এতো অনুরোধ করলেন তবু কেন গেলাম না ভেবে আফসোসই হলো। খানিকক্ষণ এ-জানালায় ও-জানালায় দাঁড়িয়ে, আবার এসে বিছানায় বসে, আবার দাঁড়িয়ে শেষে মনে হলো নিচে যাই, লবিতে গিয়েই বসি। অন্তত লোকজন দেখে তো সময় কাটবে! পায়ে পায়ে লিফটের কাছে এসে নিচে নেমে এলাম। সাজানোগুছোনো পরিপাটি লবিটি আশ্চর্যজনকভাবে জনমানবহীন। এরকম একটা অজানা অচেনা দূর বিদেশে এই নির্জনতা আমার একটুও মনঃপূত হচ্ছিলো না। সাহস করে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। সেখানে খুব লোক চলছিলো। পেরাম্বুলেটর ঠেলে মায়েরা যাচ্ছে বাচ্চা নিয়ে, বয়স্ক স্বামী-স্ত্রী যাচ্ছে, যুবক-যুবতী যাচ্ছে, কিন্তু সব এক দিকে, ডাইনে।

আমি দাঁড়িয়ে আছি চুপচাপ। নিশ্চয় খুব বোকার মতো দেখাচ্ছিলো। কেউ কেউ কী বলছিলো, হাসছিলো। তার মধ্যে একজন আবার মুখ নেড়ে নেড়ে কিছু জিজ্ঞাসা করলো। এক বর্ণও আমি বুঝতে পারলাম না। আবার আমি যা বললাম সে কথাও সে এক বর্ণ বুঝতে পারলো না। সে এক ফোঁটা ইংরিজী জানে না, আমি এক ফোঁটা জার্মান জানি না। তখন মনের সুখে পরিষ্কার বাংলায় বললাম, 'শোনো, তোমরা সবাই ওদিকটায় যাচ্ছ কেন? ওদিকটায় কী আছে? মেলা বসেছে নাকি? আমাকে নিয়ে যাবে?' বলার সঙ্গে প্রচুর অঙ্গভঙ্গিও করেছিলাম। জবাবে সে-ও প্রচুর অঙ্গভঙ্গি সহযোগে দাঁত লম্বা লাইন নির্দেশ করলো। মুখভঙ্গি করে, তারপর যেমন চলছিল তেমনি চলে গেল। মনে হলো মাতৃভাষার আবেগ দিয়ে ভাবভঙ্গিতে তাকে আমি যা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে তা বুঝেছে। আবার সে তার মাতৃভাষার আবেগ দিয়ে আমাকে যা বলেছে আমিও তা বুঝেছি। সুতরাং সেই বোঝাটুকু সম্বল করে আমিও ডাইনের দিকে হাঁটতে লাগলাম। যদি কোনো রকমে হারিয়ে যাই তা হলে যে ফেরা সাংঘাতিক কঠিন হবে বুঝতে পারছিলাম। এরা এখন ভাষার দিক থেকে আমার কাছে একান্তই অন্য গ্রহের লোক। পথ জিজ্ঞেস করলে কারো সাহায্যই পাব না। ভীরু ভীরু বুকে তবু হেঁটে হেঁটে ডাইনে একটা ব্লক পার হলাম। আবার থামলাম। স্মরণশক্তির খাতায় টুকে নিলাম—এক; আর একটা ব্লকে পা দিলাম—দুই; আরো একটা—তিন। তারপর চতুর্থ ব্লকের শেষে এসে দাঁড়িয়েই দেখলাম, মস্ত হ্রদ নদী হয়ে বয়ে যাচ্ছে, তীরের বিস্তীর্ণ সমতলে মানুষের মেলা। ঐজন্যই ঐ বিকেলে অত মানুষ হাঁটছিলো ওদিকে?

এখন আর বিকেল নেই, সন্ধে হয়ে এসেছে। একটি বিদেশী মেয়ে আমি কিছুই জানি না, বুঝি না, চিনি না, এ অবস্থায় একা একা এ সময়ে লেকের ধারে গিয়ে বেড়ানো উচিত হবে কিনা বুঝে উঠতে পারছি না।

তবুও এক সময়ে দেখি, ভাবতে ভাবতে পার হয়ে এসেছি রাস্তাটা, একটু বাঁয়ে এসে কখন ঢুকে গেছি ভিতরে। পিছনে ঘোরানো প্রবেশপথ পড়ে আছে দূরে। ঢুকে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ভারি সুন্দর বেড়াবার জায়গাটি। কিন্তু এতোটাই ছড়ানো এবং চারদিক ঘিরে এতোগুলো প্রবেশপথ যে, নিজের নির্দিষ্ট প্রবেশপথটি হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। আবার সব প্রবেশপথই একরকম। ঠিকটি দিয়ে না বেরুতে পারলে ঠিক রাস্তা ধরে যাওয়া যাবে না। সবচেয়ে বড়ো বিপদ নিজের রাস্তার নাম আমার জানা নেই। এরা তো কথা বোঝে না, তবু হারিয়ে গেলে রাস্তার নামটা বললে হয়তো বুঝবে এবং দেখিয়ে দেবে। কিন্তু পড়ন্ত বিকেলের সেই উন্মুক্ত মাঠ জল বাগান মানুষ সবটা মিলিয়ে এমন একটা আনন্দপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে সেখানে, যা ফেলে হোটেলের একা ঘরের বন্ধ দরজায় আর ফিরতে ইচ্ছে করলো না। বস্তুত হারাবারই বা প্রশ্ন কী? আমি তো ছেলেমানুষ নই।

তবু চারদিকে তাকিয়ে ভ্রমণার্থীদের মধ্যে সেই মহিলাটিকে খোঁজবার চেষ্টা করলাম, যার পিছনে পিছনে আমি এসেছিলাম। কেননা, উনি যে পথে এসেছেন আমিও সে পথেরই পথিক। ওঁকে চোখে চোখে রাখতে পারলে আর আমার ফেরার কোনো অসুবিধে থাকে না। কিন্তু পথে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ ধরে ঢুকবো কি ঢুকবো না চিন্তা করেছি ততক্ষণে উনি চোখের আড়াল হয়ে গেছেন।

সাধারণত আমরা প্রত্যেক দেশ এবং প্রত্যেক জাতি সম্বন্ধেই মনে মনে একটা ধারণা নিয়ে বসে থাকি। যেমন জাপান যাবার আগে জাপানীদের চেহারা বিষয়ে বেশ একটা ভুল ধারণা ছিলো, নিজের দেশে বসে কল্পনাই করিনি তারা দেখতে এত সুন্দর। এখন বিকেলের এই পড়ন্ত আলোয় জার্মানীর এই হামবুর্গ শহরের এক লেকের ধারের পার্কটিতে এসে আবার সেই কথাই মনে পড়লো। আমার জার্মানদের বিষয়েও আমার মনের মধ্যে এক ধরনের ধারণা ছিলো। এরা যোদ্ধা জাত, নিশ্চয়ই এদের সমস্ত ভঙ্গির মধ্যেই সৈনিকের ছাপ স্পষ্ট থাকবে। এরা হবে বড়োসড়ো ভারি দেহী, যারা হাঁটু ভেঙে হাঁটে না, বেশী কথা বলে না, অকারণে হাসে না, বন্ধুতায় অপারদর্শী এবং সন্দিহান।

কিন্তু সেই মুহূর্তে সেই পার্কে সেই দেশের এতোগুলো মানুষকে একসঙ্গে দেখতে পাবার সুযোগে প্রায় প্রত্যেকটি মানুষের চেহারার মধ্যেই যে লালিত্য ধরা পড়লো তাতে তাদের সৈনিকত্বের ছাপ এক ফোঁটাও ছিলো না। এক কথায় বলা যায়, তারা সুন্দর। খুবই সুন্দর। হাসিখুশিও খুব। খুব উঁচু গলায় হাসছে, কথা বলছে, বন্ধুতা করছে, আমাকে বিদেশিনী দেখে মাথা নামিয়ে সম্ভাষণ করছে—বেশ হৃদ্যতার আমেজ।

থরে থরে দোকানপাট বসেছে অনেক। খাবার দোকান, খেলার দোকান, রেলিংয়ে ঝোলানো সস্তা জামা-কাপড়ের দোকান—সবই বলা যায় অস্থায়ী। বসেছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, পার্ক নির্জন হলেই উঠে যাবে। আমি খুব সাবধানেই ঘোরাফেরা করছি ছেলেবেলায় পড়া সুখলতা রাওয়ের খুকি আর গিরির গল্পের মতো পথে পথে নিশানা রেখে রেখেই এগুচ্ছি। খেলনার দোকানটায় একটু না দাঁড়িয়েই পারা গেল না। দেশে নাতনী আছে তো। কতরকম আর কতো ধরনেরই যে খেলনা এনেছে একটা চাকাওলা গাড়িতে তার ঠিক নেই। সেইসবের ডিমনস্ট্রেশনও হচ্ছে, আকাশে উড়ে গেল বিমান, লাইনের উপর চলে গেল ট্রেন, জলের গামলায় ভেসে গেল জাহাজ, হেঁটে বেড়াচ্ছে পুতুলরা, কথা বলছে হাঁটতে হাঁটতে, উঁচুনিচু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে ট্রাক জিপ, স্বয়ংচালিত মোটরগাড়ি চলে গেল একটা বাচ্চা নিয়ে, রীতিমতো রোমাঞ্চকর ব্যাপার।

কিছু দূরেই লিলিপুল। বসন্তের বিকেল, অনেকেই ঝাঁপাচ্ছে ঘেরা জলে। একটু নিরালা দেখে একটা গাছের তলায় বেঞ্চে গিয়ে বসলাম। ভীষণ ভালো লাগছিলো। ভাবতে অবাক লাগছিলো ইয়োরোপের হৃৎপিণ্ডে অবস্থিত এমন এক দেশের অভ্যন্তরে এসে পৌঁছেছি, আবার একা একা বেড়াতেও এসেছি লেকের ধারে। আসলে ঐ একা একা সংজ্ঞাটাই আমাকে বেশী উত্তেজিত করে তুলছিলো।

সুগঠিত দেহ নিয়ে যে পুরুষেরা সাঁতার কাটছিলো লেকে তাদের দেখে মনে হচ্ছিলো প্রত্যেকেই যেন মহাভারত থেকে উঠে এসেছে। সকলেই যেন এক-একজন কর্ণ আর অর্জুন।

অষ্টম অরণ্যদেব
!

তারপর কী হল?
ডায়ানা, ফিরে এলে বলব!

খুলি গুহায়.....
শিগগির এসো।
দাঁড়া, এদের ঘুম পাড়িয়ে আসছি।

তাহলে শুরু করো।
প্রথম অরণ্যদেব দেখলেন, ডাইনির চেলারা ব্যবসায়ীদের উপরে হানা দিয়েছে।
10/14

ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি।

'তিনি যখন দুর্গসেতুতে পৌঁছেছেন, কাঠের সেতু অমনি শূন্যে উঠে গেল...

'নীচের পরিখার মধ্যে পড়ে গেলেন অরণ্যদেব.....

'দেওয়াল বেয়ে উঠতে যাবেন, ওপর থেকে পড়তে লাগল গরম তেল! জানালায় দাঁড়িয়ে নতুন এক আততায়ী!'

## সাহিত্য
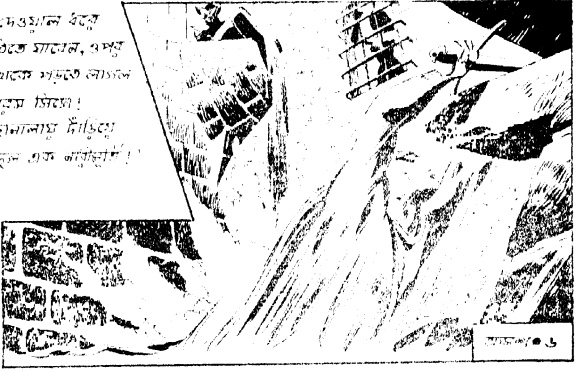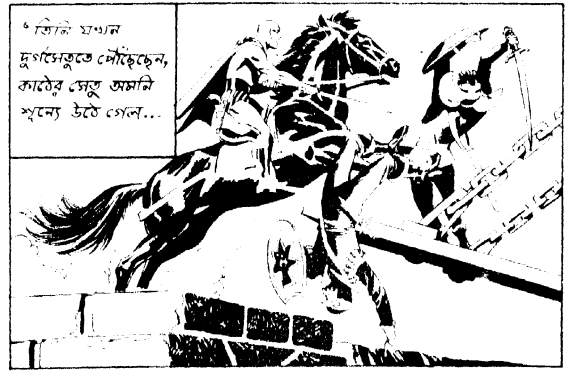
### মহাস্থবির জাতক

প্রকৃতির মুক্ত এলাকা থেকে, দিগন্ত ছলকানো ফসলক্ষেত আর নদী-খাল-বিল-পুকুরের হাতছানি স্বায়ত্তশাসনের অঢেল জীবন থেকে এসে পড়েছিলাম কঠোর অনুশাসনের চাপাচাপি ছোট খাঁচার মধ্যে। তখন বলতে গেলে বালক বয়স পার হয়েছি মাত্র। স্কুলটাস্ক আর হোমটাস্কের ঘানির মধ্যে ছুটির দিনান্ত রেশন, তোলা জলে স্নান আর জানলা দিয়ে নিষিদ্ধ রাস্তার দিকে ক্ষুধিত চোখে তাকিয়ে থাকা। ঘড়ির কাঁটা আর রোদ সরছে, নগরের রাস্তা প্রহরে প্রহরে রঙ বদলাচ্ছে অতিকায় গিরগিটির মত—ফেরিঅলার হরবোলা হাঁকে আর রাস্তা ধোয়া জলের শব্দে। অফিস টাইমের জোয়ার ভাটার মধ্যিখানে তন্দ্রালু জমা থিতোনো দুপুরে, আলস্যে বুজে আসা চোখের মত খড়খড়ি নামানো জানালা, ব্যোমমুখো উড়ুনী লগি হাতে তালিবাজদের গগনভেদী শিস আর ম্যাটিনী শোয়ের দশ আনা-ছ আনার উপোসী লাইন। এই পরিবেশের মধ্যে রীতিমত মুষড়ে পড়ছিলাম, এমন সময় পেয়ে গেলাম আমার মুক্তির উপায়। অর্থাৎ বই, মানে গল্পের বই। ঘরের চার দেওয়ালকে বেহুঁশ ভুলিয়ে রক্তে নেশা ধরানো সেই গল্পের বইয়ের যুগে হাতে এসে গেল "মহাস্থবির জাতক"। যেমন নাম, তেমনি মার্বেল পেপারে বাঁধানো দু-নম্বরী মলাট, সমান আকর্ষণহীন। লেখকের নামটিও বৌদ্ধশ্রমণ টাইপের। জাতকের গল্প ভেবে টেবিলের ওপর নিরাসক্ত মনে নামিয়ে রাখতে গিয়েছিলাম কিন্তু পারলাম না। আরম্ভের পৃষ্ঠা থেকেই চোখ যেন কিসের আঠায় আটকে গেল। তারপর সেদিন একদমে কাহিনী শেষ করে যখন দুই মলাটের ফটক বন্ধ করলাম তখন অনেক রাত। বিচিত্র কলকাতা শহর আর তার বিচিত্রতর সব চরিত্র মাথার মধ্যে কেমন ঝিম ঝিম করছে।

এটা যে নতুন কেতার কেতাব তাতে আর সন্দেহ থাকল না, মনে হল বাংলা গল্পের ছাঁদ বদলে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে পথের পাঁচালী পড়ে যে রকম নাড়া খেয়েছিলাম, কয়েক দিন একটানা অভিভূত হয়ে ছিলাম, সে রকম অতটা নয়। তবে এটা পথেরই উল্টো পাঁচালী, মানে বিপরীত পিঠের রচনা তা বোঝা শক্ত না। শৈশব-বাল্যের এ আর এক রূপ, অন্য স্বাদের। কাহিনীর মধ্যে লুকোনো চুম্বক আছে, গল্পের টান থাকে বলি—শেষ না করে পারা যায় না: এমন তুচ্ছ ঘটনা, হররোজের চেনা দৃশ্য নিংড়ে যে নাট্যরস বের করা যায়, দুঃখ দারিদ্র্য ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে নিষ্কলঙ্ক হাস্যরস, এবং কাহিনীর ইনডোর ডেকোরেশনের মত কথা-চরিত্র উভয়কে জারিয়ে তোলার মত ইতিহাসের রস বইটি না-পড়া পর্যন্ত ভাবা যায়নি। ঊনিশশতকী ঘরানার শহর কলকাতা, তার প্লেগ, ছেলেধরা, সাপের ভীতি, সাহেব-প্রীতি, ঘোড়ায় টানা ট্রাম, রাহ্ম শিক্ষা-সংস্কার-সহবত, গুরুশিষ্যঘটিত শিক্ষা-সংকট, গুজবিলাস ইত্যাকার জীবনযাপনের বাংলাছাঁদ ঠাসা রয়েছে এর মধ্যে।

মহাস্থবির জাতক পড়তে পড়তে আমি তার দ্বিতীয় পর্বের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলাম। গল্পের সূত্রধার স্থবিরের জীবনের পরবর্তী অধ্যায়, অলিখিত ইতিহাস জানার জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। সেই বয়সেই বুঝতে পেরেছিলাম, এটি কোন ছদ্মনামী লেখকের আত্মজীবনী। কিন্তু কে এই লেখক, কোথায় তিনি থাকেন? আমার সব প্রশ্নের নিরসন হয়ে গেল কয়েক দিনের মধ্যেই, দ্বিতীয় পর্ব তখনও হাতে আসেনি। আমার এক সদা পরিচিত দাদা একদিন মদন মিত্র লেনের রোয়াকে জমাটি আড্ডায় বসা মহাস্থবিরকে স্বচক্ষে দেখিয়ে দিলেন। পাকা বাঁশের মত গৌরবর্ণ ছিপছিপে মানুষটি মজলিশের মধ্যমণি হয়ে সবাইকে জমিয়ে রেখেছেন, মাথার সব চুল সাদা। যে স্থবিরের সমব্যথী দোস্ত বনে গিয়েছিলাম মনে মনে তার লেখক মূর্তির কাছে এগিয়ে যাবার সাহস হল না। তাঁর গলা শুনলাম, নাম শুনলাম, ডাক নাম শুনলাম এবং নিঃশব্দে পায়ে পায়ে সেদিনের লাজুক আমি পালিয়েও এলাম। মহাস্থবিরের প্রকৃত নাম প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, অনেকেই তাঁকে বুড়োদা বলে ডাকে। অনুমান করলাম, এই বুড়ো নামটাই স্থবির নামের উৎস। যেমন তাঁর বাবার নাম মহেশচন্দ্র আতর্থীকেই চরিত্রে যথাযথ রেখে উপন্যাসে নামকরণ করেছিলেন মহাদেব শর্মা। জানতে পারলাম মহাস্থবির জাতকে অতিরঞ্জনের কোন ব্যাপারই নেই। স্কুল পালানো, বাড়ি পালানো, দুঃসাহসী, পথে পথে ভেসে বেড়ানো এই মানুষটির জীবনে যে সব বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে তার বারো আনাও লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা সন্দেহ। শুনে আমার শ্রদ্ধা কয়েক ডিগ্রি বেড়েই গেল। আর এই ভক্তিমুগ্ধ অবস্থাতেই হাতে পেয়ে গেলাম গরম কেকের মত দ্রুতভঙ্গা দ্বিতীয় পর্ব।

সাহিত্য মূল্যে যাই হোক দ্বিতীয় পর্বের টান প্রচণ্ড, অন্তত বয়ঃসন্ধিকালের কাছে। প্রথম পর্ব যদি হয় ইজেলে আঁটা স্থির ছবি তবে দ্বিতীয় পর্ব দ্রুতগামী চলচ্চিত্র। তার পটভূমি অস্থির, পরিবেশ রোমাঞ্চকর, তার চরিত্রের মিছিলে নতুন নতুন মুখের সমাবেশ। প্রবেশ এবং প্রস্থান নাটকীয়। দুটি কপর্দকশূন্য কিশোরের মর্মান্তিক অভিযানের কাহিনী। উত্তর প্রদেশের অপরিচিত শহর-গ্রামের রহস্যময় নরনারীর ঘরগৃহস্থালির এবং বিচিত্র জীবনযাত্রার যে পুঙ্খানুপুঙ্খ চমকপ্রদ বর্ণনা আছে তা বাংলা গল্পসাহিত্যে অভাবনীয় ছিল। অন্তত সে সময়ে আমার কাছে তাই মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল দিগন্ত প্রসারিত করে বাংলা সাহিত্যের ভূগোল বিস্তারিত হয়েছে, কাহিনী একটা আন্তর্দেশিক সেতুবন্ধন ঘটিয়েছে।

*

দীর্ঘ বত্রিশ বছর পরে 'মহাস্থবির জাতক' উপন্যাসটি আবার হাতে আসায় ভীত এবং রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ থাকে, দ্বিতীয়বার পড়তে গিয়ে এ রকম পেয়ে-হারানোর দুঃখ অনেকবার পেয়েছি। প্রথম দেখার মতই প্রথম পড়ার মধ্যেও বিপজ্জনক উন্মাদনা মিশে থাকে। একে বলা যেতে পারে মনশ্চক্ষের মায়াকাজল বা শুভদৃষ্টি। এই দেখা এই পড়ার স্বাদই আলাদা, দ্বিতীয় বারে তার কিছুই প্রায় অবশিষ্ট থাকে না। তাই ভয় হয়েছিল হয় তো ভাল লাগবে না, হয় তো কয়েক পাতা পড়ার পরেই অপাঠ্য মনে হবে। মনের মধ্যে এতদিনকার লালন করা সুরটা হয় তো বা কেটে যাবে। সেটা মর্মান্তিক হবে কারণ এই স্মৃতিকাহিনীটি তো আমার কাছে নিছক আর একটি গল্পকাহিনী মাত্র নয়, এ আমার ফেলে আসা সেই ছেলেবেলা যেখানে ফিরে যাবার ইচ্ছা বার বার মনের মধ্যে ঠেলা দেয়। আমার কাছে এর বাড়তি মূল্য এই জন্যে যে, মহাস্থবির জাতক এবং বর্তমান জাতক প্রায় একই মানসিকতায় যুগলবন্দী, অনুভূতির একই অনুভূমিরেখায় এরা উভয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। আলোচ্য জাতকের সূত্রপাত ও সূত্রবিস্তার সেই কলকাতায় যার মধ্যে তখন আমি সদ্য সদ্য এসে পড়েছি—সেই সময়ে যা অতীত হলেও তক্ষুনি হাত বাড়ালে যেন ছোঁয়া যায় এবং তার নায়কের তখন সেই বয়স সেই জীবন যার মধ্যে তৎকালে আমি হাবুডুবু খাচ্ছি। আসলে বয়ঃসন্ধির ব্যাপারটাই হয়ত এই রকম। এখন একটা পুরনো টাকা হাতে এলেও অনেক সময় মনে হয় 'টস'-এ জিতে গেছি, টাঁকশালের সেই বিশেষ সাল

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, জন্ম : ১৮৯০ মৃত্যু : ১৯৬৪
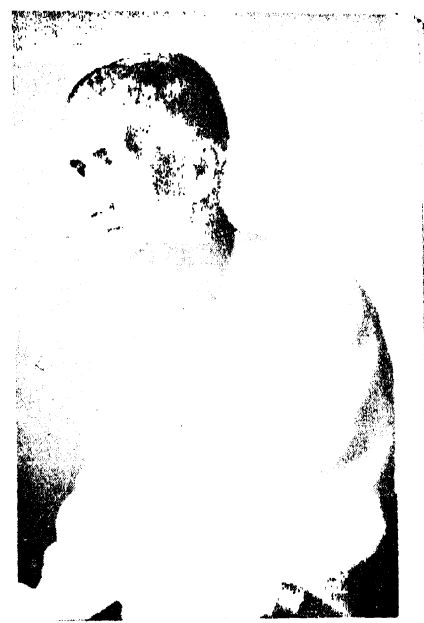
তারিখটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠতে হয়, মনে হয় গোটা খেলার মাঠটাই বুঝি আমার হাতের মুঠোয় এসে গেছে। পুরনো বইয়ের বেলায় সেটা তো অক্ষরে অক্ষরে সত্যি, সে হয়ে ওঠে সেকালকে স্বকালে ফিরিয়ে আনার সক্ষম তুরুপ। অনেক বিস্মৃতির খড়ির গন্ডী দিয়ে ঘেরা সেই দুর্লভ স্মৃতি—মহাস্থবির জাতক আমাকে হাত ধরে আবার পৌঁছে দিল সেখানে।

খৃষ্টীয় ঊনিশ শতক প্রায় শেষ, ভিক্টোরিয়া রাজত্বের হীরক জুবিলি হয়ে গেছে। ৩১ ডিসেম্বরের শেষ রাতে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের একটি বাড়িতে, তখন চলেছে গড়ের মাঠে নববর্ষের কুচকাওয়াজ দেখতে যাওয়ার প্রায় জঙ্গী প্রস্তুতি। এক সাবালক পিতা আর তিন নাবালক পুত্রের বর্ষফল দিয়ে উপন্যাসের শুরু। হিংকসের হ্যারিকেন লণ্ঠনের ওপর কাঁসার বাটি রেখে মহাদেব শর্মার দুধ গরম করা, পুত্রদের বোধোদয় ঘটাতে ঘটাতে লংমার্চ, পুলিসের সঙ্গে গড়ের মাঠে খণ্ডযুদ্ধ শেষে আহত ছাপরাবাসীকে নিজের ধুতি ছিঁড়ে বিপুল ব্যান্ডেজ বেঁধে দেওয়ার পর প্রায় নঙ্গা মহাদেবের প্রত্যাবর্তন ভোলা যায় না।

'চৌরঙ্গীর রাস্তা দিয়ে মহাদেব চলেছেন। আবক্ষ কালো দাড়ি কাদা ও জলে প্রায় জটিয়াবাবা। গায়ে একখানা রুক্ষ কমলালেবু রঙের আলোয়ান, পরনে আধখানা ধুতি, হাতে কাদা মাখানো একপাটি জুতো। পেছনে তিন ছেলে গটগট করে চলেছে। দুধারী লোক এই অপূর্ব শোভাযাত্রা বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দেখতে লাগল।'

এই মহাদেব শর্মার চরিত্র প্রথম পর্বের প্রায় আধখানা জুড়ে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। এমন বিচিত্র আদর্শবাদী, নাটকীয়, বিপজ্জনক রকমে গোঁয়ার মানুষ এযুগে দেখা যায় না, সেযুগেও বিরলই ছিল। তবে কিনা সে যুগটাই ছিল মেলোড্রামাটিক, কর্তব্য অকর্তব্য দুইই ছিল প্রমাণ সাইজের। সরলতা ছিল টীকা-টিপ্পনীহীন।

একবার এক নির্বোধ চিল বাজার-ফেরত মহাদেবের হাত থেকে দেড়সেরী ওজনের একটা শিলংমাছের টুকরো ছোঁ মেরে নিয়ে পালাতে গিয়েছিল। চিলটির মনুষ্য চরিত্র জানা থাকলেও সম্ভবত মহাদেব শর্মার বিষয়ে সম্যক জ্ঞান ছিল না। যে

[illegible] উদ্ধার করার জন্য নববধূ সহ অর্ধভাজিত ইলিশের স্বত্ব ত্যাগ করে নিঃশব্দে নৌকো থেকে পদ্মার ভয়ংকর জলস্রোতে ডুবুরির মত ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, ডাঙার ওপরে তাকে ঘাঁটানো যে কত বড় অহম্মকি সেকথা তা হলে তার অজানা থাকতো না। ঢিলের আঘাতে এক মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব হয়ে পড়লেও পরের মুহূর্তেই দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য ক্রুদ্ধ মহাদেব কলেজ স্ট্রীট থেকে সুদূর তিলজলার মাঠ পর্যন্ত সমানে ইন্টকবৃষ্টি করতে করতে ঢিলের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। পথে অবশ্য কিছু অনৈসর্গিক বাধার সৃষ্টি হয়েছিল, দু-চার জায়গায় গৃহস্বামী-দের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়েছিল। ওদিকে বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গিয়েছে। ভোর-বেলা যে লোকটা থলি হাতে নিয়ে বাড়ির কাছের বাজারে বেরিয়েছিল, বেলা দুটো বেজে গেল তার কোন পাত্তাই নেই। কেন এই রহস্যময় অন্তর্ধান বুঝতে না পেরে থানায় থানায় আর হাসপাতালে লোক ছুটল, কিন্তু কোন হদিশ মিলল না। শেষে বিকেল চারটের সময় রক্তকাদাঘামে মাখামাখি, রোদে পোড়া ভয়াবহ মূর্তি নিয়ে তিনি ফিরে এলেন। হাতে ঢিল কর্তৃক মানে মানে ফেরত দেওয়া শিলং মাছের টুকরোটি, বিজয়ী খেলোয়াড় যেন ট্রফি জিতে ফিরলেন। কিন্তু হায়, বাজারভর্তি থলিটি কোন বাড়ির দাওয়ায় দড়ি কবিয়ে রেখে এসেছেন খেয়ালই নেই। 'এই যাঃ!' বলে আবার তখনই ছুটছিলেন কিন্তু সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধে নিরস্ত হলেন বটে, তবে সেখানেই থামলেন না। ছুঁই-মার্গী গৃহিণী ওই উচ্ছিষ্ট মাছ ঘরে নিতে নারাজ হওয়ায় বাইরে উনুন পেতে ওই অবেলায় তিনি স্বহস্তে রন্ধন সারলেন। তারপর একাই এক হাঁড়ি ভাত সহযোগে সেই দেড়সের মাছ উদরস্থ করে আপিসে ছুটির দরখাস্ত লিখতে বসলেন।

পরে কথায় কথায় জানা গিয়েছিল যে তিনি নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্যে এই ঢিলছোটান ছোটেন নি, লোকহিতার্থেই একাজ করেছিলেন। তাঁর ধারণা এই ঢিল আর কোনও জন্মে মানুষের হাত থেকে কিছু ছোঁ মারবে না।

এই শিক্ষাদানের প্রবল নেশায় তিনি পুত্রদের যথাসাধ্য প্রহার করতেন। এ ব্যাপারে কোন কৃপণতা বা আলস্য তাঁর ছিল না, দরাজ হাতে যেদিন তাদের ধরতেন সেদিন শুধু প্রাণটুকু মাত্র রেখে ছেড়ে দিতেন। স্থবির এইভাবে অতি অল্প বয়সেই সিজিন্‌ড সেগুন হয়ে গিয়েছিল। তার বালা বৈরাগ্য আর কৈশোরে গৃহত্যাগের পেছনেও এই পৈতৃক প্রহার সশব্দে কাজ করে গেছে। তবে শুধু হাতে নয়, কলমেও তিনি ছিলেন সমান রকম অকপট। সানডে স্কুলের একটি চরিত্র পুস্তক থাকতো, তাতে রবিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত সাতদিনের 'পাঠ' এবং 'ব্যবহার' সম্বন্ধে অভিভাবকরা মন্তব্য লিখে দিতেন। স্থবিরের বাবা সব অভিভাবকের ব্যতিক্রম, তিনি চোখ বুজে 'মন্দ' কথাটাই লিখে আসছিলেন. একবার সামান্য অপরাধের পুরস্কার হিসেবে লিখে দিলেন, 'এই ব্যক্তি অত্যন্ত আত্ম-সুখপরায়ণ। দুর্বৃত্ত ক্ষণিক আত্মসুখের জন্য নারী-হত্যা এমনকি মাতৃহত্যায়ও পরাঙ্মুখ নহে।'

পুত্র প্রসঙ্গ বাদ দিলে মহাদেব ছিলেন নিঃস্বার্থ নিখাদ মানুষ। পরার্থে জীবন দিতেও তাঁর দ্বিধা ছিল না। এবং এ জীবন বহুবার দিয়ে দিয়ে আবার তিনি ফিরে পেয়েছিলেন। একরাতে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের ওপর একটি মেয়েকে যখন তিন দুর্বৃত্ত মিলে খুন করছিল তখন কেউ বেরোয়নি। মহাদেব এঁটো হাতে উঠে গিয়ে একাই তাদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে মেয়েটিকে নিয়ে যমে-মানুষে ধস্তাধস্তি হবার পর রামদায়ের ঘায়ে মহাদেব গুরুতর জখম হলেন। মাথার মাঝখান থেকে ডানচোখের ভুরু অবধি একেবারে দুফালা। সেবার চল্লিশ দিন পরে জ্ঞান ফিরেছিল, ছ মাস পরে বাকশক্তি। ভালভাবে সেরে উঠতে লেগেছিল দেড় বছর। আর একবার পাগলা জুড়িঘোড়ার সামনে থেকে একটি ছোট ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিলেন। এবং আর একবার স্টীমার থেকে জলে পড়ে যাওয়া একজনকে উদ্ধার করতে গিয়ে প্রপেলারের ধাক্কা খেয়ে ছটি মাস শয্যাশায়ী ছিলেন।

খামখেয়ালী পরিকল্পনায়-ও তাঁর জুড়ি ছিল না—তা সে ব্যবসার ক্ষেত্রেই হোক কিংবা সমাজ-সেবার ব্যাপারেই হোক। স্বদেশী শ্লেটের ব্যবসা করতে গিয়ে যেমন সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন তেমনি একবার রাস্তা থেকে নিত্য নতুন পাগল ধরে এনে নিজে হাতে তাদের পরিচর্যা করতে গিয়ে গোটা বাড়িটাকেই কেবল পাগলাগারদ বানিয়ে তোলেন নি, তাঁর স্ত্রীর জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করে ফেলেছিলেন। এ রকম সব অদ্ভুত ঘটনায় মহাদেব চরিত্র স্মরণীয় হয়ে আছে।

স্মরণীয় হয়ে থাকে উনিশ শতকের প্রথম দশকে তিয়াত্তর বছর বয়সী, সংস্কার মুক্ত ভদ্রলোক 'পাগলা সন্ন্যাসী'র চরিত্র। যিনি তাঁর বার ও চৌদ্দ বছরের দুই বালক বন্ধু অস্থির আর স্থবিরকে শেলী-বায়রনের স্বাদই কেবল দিয়ে যাননি বিলিতি পানীয়ে আচমন করিয়ে চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। মনে থাকবে লতুর সঙ্গে স্থবিরের নাবালক গান্ধর্ব বিবাহ, বিচিত্র কুমারী বধূ গোষ্ঠদিদির হঠপ্রেমীর উদ্দেশে পৈশাচী অপভ্রংশে লেখা স্থবির-অস্থিরকৃত মোহমুদ্গর, জোড়াবাগানস্থ ডফ স্কুলের ড্রাই ক্লিনার মাস্টারবাবুদের জন্য আহিরীটোলাবাসীদের গুরুদক্ষিণার আয়োজন। স্কুলের বিচিত্র সব বন্ধু, প্রমথ, শচীন, প্রকাশ পরিতোষ। সাধনা করার জন্যে বনবাসী হবার পরি-কল্পনা, বাড়ি থেকে পলায়নের উদ্যোগ বানচাল হয়ে যাওয়া। কলকাতায় প্লেগ-দাঙ্গার পাশাপাশি ব্রাহ্ম-সহশিক্ষার বিদ্যালয়ে নারী শিক্ষিকার দুঃশাসনের তথ্যচিত্র যেমন রয়েছে তেমনি সরল শিশুচক্ষের সামনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে মাঘোৎসবের আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের সচিত্র ধারাভাষ্য।

তাঁদের আগেও দু-চারটি ব্যাকুলাত্মা এসে স্থান সংগ্রহ করেছেন। সর্বাঙ্গ র‍্যাপারে মোড়া এক-একটি আধুনিক ধ্যানী মূর্তির মত দেখাচ্ছে তাঁদের। কার্পেটের আর এক কোণে কয়েকজন মিলে ভীষণ হুংকারে কীর্তন করছেন, তীক্ষ্ণ বিষব্যালী সম সতত দংশায় রে—

..সংগীতান্তে শাস্ত্রী মশায় (শিবনাথ) চীৎকার করে কি সব বলতে আরম্ভ করলেন। সে সব ভাল ভাল কথা, গূঢ় তার অর্থ, নানা অলংকার পূর্ণ সে ভাষা—শিশুর কাছে তা প্রহেলিকা।. স্থবিরের মনে হতে লাগল এ যেন একটা ইস্কুল। বেদীর ওপরে বসে আছেন ওই মাস্টার মশায়—চেঁচিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন... হঠাৎ একটা কান্নার আওয়াজে তার অমন মনোরম ঘুম ছুটে গেল। চোখ চেয়ে সে দেখতে পেলে, তার পাশেই একটি বৃদ্ধ হেঁচকি তুলে কাঁদছে আর বিড়বিড় করে কি বলছে।

......শাস্ত্রী মশায় চীৎকার করে উঠলেন, ওই যে বিহঙ্গ শূন্যপথে মুক্ত পক্ষে প্রয়াণ করিল—

স্থবিরের পাশের লোকটি, যিনি এতক্ষণ কান্নার সঙ্গে বিড়বিড় করে বকছিলেন, হঠাৎ ডাক ছেড়ে ডুকরে উঠলেন, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়—

স্থবির ভাবলে, এবার বোধ হয় শাস্ত্রী মশায় বেদী ছেড়ে নেমে এসে এঁদের প্রহার করবেন।

*

পনের বছর বয়সে প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থায় বন্ধু পরিতোষকে সঙ্গী করে স্থবির দূরপাল্লায় পাড়ি জমিয়েছিল। দ্বিতীয় পর্বের পাতায় পাতায় সেই দুঃসাহসী পরিব্রাজকের চমকপ্রদ করুণ কাহিনীর বিচিত্র বিবরণ ছড়িয়ে রয়েছে। ঘাটে-অঘাটে মুহুর্মুহু আছড়ে পড়া সেই জীবন কাহিনীর তুলনা ছিল না আমাদের সেই বয়সে। এই একখানা বই আমাদের বয়স বাড়িয়ে দিয়েছিল রাতারাতি, কার্বাইড দিয়ে পাকানোর মত বন্ধ ঘরের মধ্যেই আমাদের বাজার-চালু হবার মত তৈরি করে দিয়েছিল। নিজে তখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের বাইরে কোথাও যাবার সুযোগ পাইনি কিন্তু ভেতরে ভেতরে মনটা বারমুখো হয়েই ছিল। বিশেষ করে পাড়ায় তিনকড়ি নামে একটি বন্ধু জুটেছিল যে ছিল শেকলছেঁড়া পাখির মত, থেকে থেকেই বাড়ির টাকাকড়ি মায় গয়নাগাটি হাতিয়ে উধাও হয়ে যেত। কোথায় যেত কি করত কিছু সে খুলে বলত না। ব্যাপারটা আমাদের কাছে রহস্যময় এবং রোমান্টিক ছিল। তাই মহা-স্থবির জাতকে স্থবরে যখন ঘর ছাড়ল মনে মনে আমি তার সঙ্গ ছাড়িনি। কাশী শহরের অলিগলি এবং আশপাশের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে বিভোর হয়ে গেছি। কাশীর পান্ডা গিরিধারী, বাঙালীটোলার বাড়ি-কাম হোটেলঅলা মহেন্দ্র চাটুজ্জে, নিত্য নতুন ছেলেধরা গুরুমা লক্ষ্মীমণির বিচিত্র জীবনেতিহাস, জয়া-গিন্নী, বাঙালমা, কাশীর গুন্ডা বৈদনাথ, কাশীতে নির্বাসিত অসহায় বিধবা সমাজের করুণ ইতিহাস মনকে কেমন ভারী করে রাখে। উত্তর প্রদেশী ভাষায় এবং ঘরানায় প্রায় জন্মান্তর পাওয়া প্রবাসী বাঙালী বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের নিশ্চিত মৃত্যুপথযাত্রী 'ছোটো সাহেব', বিশুদা, দিদিমণি এবং কথায় কথায় 'বিছুয়া' চালিয়ে বড়কর্তার কাহিনী কাশীর গণ্ডী পেরিয়ে এক নতুন অভি-জ্ঞতা। তারপর বিহারশরিফের পথে। নবাবী আশ্রয়ে প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্র পিয়ারা সাহেব এক আশ্চর্য চরিত্র। যিনি ঘনাক মুরগী দাল বরাবের জ্ঞান করে তৃতীয় বার বিবাহ করতে চলে গেলেন, খানাপিনা ও রঙীন আনন্দানুষ্ঠানের পর্বও শেষ হয়ে গেল স্থবিরদের জীবনে। ঘরের ছেলেদের এবার ঘরে ফেরার দিন এসে গেল। কিন্তু ফ্লাশ-ব্যাক আরও কয়েক ধাপ পিছিয়ে এসে বৃন্দাবনের এক মর্মস্পর্শী উপাখ্যান দিয়ে এই পর্বের পূর্ণচ্ছেদ টানা হয়েছে। বাঙালী বিধবাদের ডাম্পিং গ্রাউন্ড কোনো দিক থেকেই আকর্ষণস্থল নয় তবু জায়গাটা স্থবিরকে একাধিক-বার টেনে নিয়ে গেছে। পরবর্তী জীবনে এই রকমে বৃন্দাবন পুনর্দর্শন করতে গিয়ে এক বৃদ্ধা ভিখারিণীর পাল্লায় পড়ে। প্রথমটায় স্থবির চিনতে পারেনি কিন্তু পরে আবিষ্কার করেছে তার জীবনের সঙ্গে স্নেহে-অভিমানে-ভালোবাসায় প্রায় অবিচ্ছেদ্য রকমে জড়িয়ে যাওয়া ছোটে সাহেবের ভগিনী প্রায় রাজনন্দিনী দিদিমণিকে। ভাগ্যপথের হস্ক বড় বিচিত্র. সেই মানচিত্র যে কার জীবনে কোথায় গিয়ে বাঁক নিয়েছে, কোন অন্ধ গলিতে গিয়ে শেষ হয়েছে তা সব রকম অনুমানেরই বাইরে। সময় এবং বয়স মানুষের সব কিছু ক্রমে ক্রমে কেড়ে নেয় কিন্তু সেই সঙ্গে তাল রেখে কিছু দিয়েও যায়। নিরাবেগ সহিষ্ণুতাই এই প্রাপ্তি, যাকে বলা যেতে পারে বিস্ময়বিহীন গ্রাহকশক্তি. আকস্মিক অভুত-পূর্বকে পরিপাক করবার সহজিয়া ক্ষমতা। মহা-স্থবির জাতক আমাদের অকালে পাকিয়েছিল, পোড় খাইয়ে সাবালক করে দিয়েছিল। জীবনে পূর্ণ-অপূর্ণের ছোঁয়া লাগবার বহু আগেই আমাদের জাগতিক নশ্বরতায় ওয়াকিবহাল এবং সর্পাতঙ্ক করেছে, পেয়ে হারানোর সহাশিক্ষা দিয়েছে।

পরিণত বুদ্ধি এবং শিল্পকরণের হাতে-কলমে অর্জিত জ্ঞান নিয়ে মহাস্থবির জাতক বিচার করতে গিয়ে তার ত্রুটি এবং স্বাদুতার কারণ দুইই স্পষ্ট চোখে পড়ে। তার ভাষা-প্রকাশ এবং মণ্ডনরীতি কোনটাই অজ আর আধুনিক নয়। সাহিত্যিক মূল্যে হয়তো কিছু ঘাটতি আছে। শালীনতা থাকলেও সংহতির অভাব

মিতবাচনের অনুশাসন সর্বত্র কার্যকর হয়নি। কিন্তু সেইসঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, ইতিহাসের একাত্মতা এবং হাস্যরস এমন নির্লিপ্ততার সঙ্গে মিশেছে যে তার লক্ষ্যভেদ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া এমন এক চিরন্তন বিষয়—নিঃসঙ্গ অবহেলিত কিশোর মনের স্বপ্ন ও বেদনাকে লেখক তাঁর উপজীব্য করে তুলেছেন যে তার আবেদন নিঃশেষিত হবার নয়। মহাস্থবির জাতক সঠিক আত্মজীবনী নয়, উপন্যাসও আক্ষরিক অর্থে নয়। লুজ প্লটে বোনা, উত্তম পুরুষের বয়ান-আশ্রিত হলেও এবং ঘটনা ও চরিত্রের টানা-বুনোয় এর কাহিনীর জমি জমে উঠলেও একে উপন্যাস বলতে কোথায় যেন আটকায়। অথচ কনফেশন জাতীয় রচনার বহিরঙ্গী আদল থাকলেও এর অন্তর্বর্তী মনোভঙ্গিটাই কনফেশন-বিরোধী হয়ে উঠেছে। কৃতকর্মের প্রত্যাশা বা অনুতাপ কোনটাই এর মধ্যে নেই। কোন কিছুই না হোক এটা যে মহাস্থবির জাতক হয়ে উঠেছে তাতে আর সন্দেহ নেই। আমার বয়সী শহরবাসী অনেকেই হয় তো এর মধ্যে একটা দুরাশ্বয়ী নস্টালজিক বেদনা অনুভব করবেন। বুড়ো বয়সের এই বাতের ব্যথাটাই মনে হয় নগদ লাভ।

আনন্দ বাগচী

ফটো : পরিমল গোস্বামী

---

# মেলভিন ব্রাগ

না, কোন মারকেনটাইল ফারম-এর একজিকিউটিভ নন। লনডন দূরদর্শন দর্শকদের কাছে প্রিয় মেলভিন ব্রাগ একাধারে সাহিত্যিক, কবি, সম্পাদক, টিভির প্রোডুসার। ব্রিটেনের আরট কাউনসিলের লিটারেরি প্যানেল বা সাহিত্য শাখার চেয়ারম্যান হবার পর থেকে ইংলন্ড তো বটেই, সারা বিশ্বে সাহিত্যানুরাগী মহলে সাড়া জাগিয়েছেন। অনেকটা আমাদের দেশের সাহিত্য আকাদামির মতনই আরট কাউনসিলের লিটারেরি প্যানেলের কাঠামো। পুরস্কার না দিলেও সমসাময়িক ও ক্লাসিক সাহিত্য মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই প্যানেলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। মেলভিনের ঠিক আগে এই পদটির দায়িত্বে ছিলেন খ্যাতিমান সাহিত্যিক রয় ফুলার।

মেলভিনের সঙ্গে আলাপ হল সেকসপিয়ার সরণিতে, ব্রিটিশ কাউন্সিল ভবনে। সেদিন ছিল সোমবার, নয় জুন। রাত আটটা হবে। একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। কোন 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট' ছিল না। নীচে মেন গেট থেকে ফোন করতেই মেলভিন দেখা করতে রাজি হয়ে গেলেন। ওইদিনই সকালে লনডন থেকে সোজা উড়ে এসেছেন কলকাতায়। শ্বেতপাথরের সিঁড়ির গোটা কতক ধাপ অতিক্রম করতেই ব্রিটিশ কাউনসিলের রিজিওনাল এডুকেশন অ্যাডভাইজার রবীন টোয়াইটের সঙ্গে দেখা। তিনি নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে। হাতের ঘড়ির দিকে চোখ রেখে বললেন : চটপট সেরে ফেলুন। হাতে সময় কম। দু জন ভদ্রমহিলা বসে আছেন। ডিনারে যেতে হবে।

মসৃণ টেবিলে। একপাশে আমি, আমার এক তরুণ সহকর্মী আশীষ ঘোষ ও রবীন। বিপরীত দিকে মেলভিন। দেওয়ালে টাঙানো চিত্রমালার উপর চোখ বোলাতে ব্যস্ত। দুধ-সাদা প্যান্ট-শারট পরনে। দীর্ঘ দেহ। ঘন সোনালী চুল। বোঝাই যায় না একচল্লিশ বছর বয়স। এরই মধ্যে তাঁর জগতে খ্যাতির শীর্ষে। ব্যথা, বেদনায় ভরা মেলভিনের জীবন। বাইশ বছরে বিয়ে করলেন মেরি এলিজাবেথ রোচিকে। একটি কন্যা রেখে মেরি মারা গেলেন কয়েক বছরের মধ্যে। মেলভিন মায়ার টানে আবার সংসার পাতলেন ১৯৭৩ সনে। এবার তাঁর স্ত্রী হয়ে এলেন ক্যাথারিন মেরি হেসট। স্বামীর মত না হলেও ক্যাথারিন মেরি হেসটও লেখিকা হিসাবে পরিচিত।

প্রশ্ন করতেই মেলভিন বললেন : আমার আবার ইনটারভিউ। আমি নিজেই তো অসংখ্য মানুষের 'ইনটারভিউ' নিয়েছি। এই বলে অতীতে ডুব দিলেন।

একুশ বছরে লনডন দূরদর্শনে আত্মপ্রকাশ। সুদর্শন, গলাটাও খারাপ নয়। তাই 'গেলাম, দেখলাম, জয় করলামের মত' কিছুদিনের মধ্যেই লনডনের পাড়ায় পাড়ায় মেলভিনের নাম ছড়িয়ে পড়ল। তখনও অকসফোরডের ওয়াডহ্যাম কলেজের গন্ধ গা থেকে যায়নি। কখনও সংবাদ পাঠক, কখনও চমকপ্রদ প্রবন্ধ শুনিয়েছেন। আবার কখনও দর্শকদের সামনে হাজির করেছেন বিশ্বখ্যাত কোন সাহিত্যিক, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ কিংবা কোন চিত্রপরিচালককে। সেই থেকে ধাপে ধাপে বি বি সি রেডিও টি ভি-র প্রোডুসার, প্রেজেন্টার, এডিটর। সুখে, দুঃখে, আনন্দ-বেদনা, খ্যাতি-অখ্যাতি সব কিছুই যেখান থেকে পেয়েছেন সেই বি বি সি টি ভি-র সঙ্গে তাঁর এখন আর কোন যোগ নেই। মেলভিন বর্তমানে ইনডিপেনডেন্ট টি ভি-র সঙ্গে যুক্ত।

—আপনি তো এখন আরটস কাউনসিলের লিটরেরি প্যানেলের চেয়ারম্যান। লনডনের টি ভি-তে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের উপন্যাস, নাটক দেখানোর ব্যাপারে আপনি কি কিছু ভাবছেন ?

মেলভিন ঃ ওঃ ইয়েস। টি ভি-র ছবি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সিনেমায় দেখানো বস্তাপচা ছবি কখনই টি ভি-তে প্রচার করা উচিত নয়। তবে কলকাতা বা দিল্লির ক্ষেত্রে এ কথাটা পুরোপুরি খাটে না। কলকাতার টি ভি-র তো এখনও শৈশবাবস্থা কাটেনি। দিল্লির অবস্থাও তদনুরূপ। লেখককে সরাসরি টি ভি কর্তৃপক্ষের কাছে বই পাঠাতে হবে। পাণ্ডুলিপি লেখক অনুমোদন করলেই তা টি ভিতে দেখানোর যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। অনেক সময় দেখা গেছে ডিকেনস, হারডি, লরেনস, জয়েসের বই-ও রূপালী পর্দায় বিকৃত করে দেখানো হয়েছে। টি ভি-তে সাহিত্যের মূল ভাষা যতটা সম্ভব রেখে নাটক সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এখানে কি হয় বলতে পারব না, ইংলন্ডে কখনও কখনও সিনেমায় মূল বইয়ের বিষয়বস্তু এমনভাবে বিকৃত করা হয় যা দেখে স্বয়ং লেখক পর্যন্ত প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। ইদানীং এটা অনেকটা কমে এসেছে।

পশন : শুধু টি ভি-তে ছবি দেখালে লেখকরা কি যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবেন ?

প্রশনটা যেন মেলভিনকে অবাক করে দিল। বললেন : শুধু টি ভি-র জন্য ছবি করালে একটি বড় গল্প বা উপন্যাসের জন্য লেখক পাবেন দশ থেকে বার হাজার পাউনড যার অর্থ মূল্য লাখ টাকার কাছাকাছি। অর্থাৎ একখানি বই টি ভি-তে দেখানো হলেই অখ্যাত লেখকও লাখপতি হয়ে যাবেন। তাই বলে সব লেখকের বই তো আর টি ভি কর্তৃপক্ষ নেবেন না। বাজারে কোনটা চলবে সেটাও তাঁদের বিচার্য বিষয়।

বি বি সি কিংবা আই টি ভি-র বিভিন্ন চ্যানেলে ব্রিটেন ছাড়া অন্যান্য দেশের খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের উপন্যাস, নাটক দেখানো হয়ে থাকে। ভারতের সাহিত্যিকের রচনা অবলম্বনে কি কিছু দেখানোর ব্যবস্থা আছে ?

প্রশ্নটি শুনে মেলভিন প্রথমে যেন একটা হোঁচট খেলেন। খানিকক্ষণ চুপচাপ। নিজেই নীরবতা ভাঙলেন। টেবিলের উপর আস্তে করে টোকা দিতে দিতে বললেন, রবীন্দ্রনাথ টেগোর কিংবা অন্য কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের লেখা উপন্যাস, নাটক টি ভি-তে দেখানোর আমাদের খুবই ইচ্ছে আছে। যথোপযুক্ত ইংরেজী অনুবাদ বা রূপান্তরের অভাব এর অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একমাত্র আর কে নারায়ণের ইংরেজী লেখাগুলির ভিতর দিয়ে ব্রিটেনের সাহিত্যানুরাগীরা ভারতীয় সাহিত্যের কিছুটা স্বাদ পান। রুডইয়ারড কিপলিংয়ের রচনাবলী এখনও পর্যন্ত ভারত সম্পর্কে জানবার সবচেয়ে বড় দরজা। অন্ততপক্ষে ইংলন্ডবাসীর কাছে। নীরদ সি চৌধুরীর নামটিও এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। ব্রিটেনের টি ভি-র দর্শকদের একটা বড় অংশ নিজের দেশের তো বটেই, অন্যান্য দেশের ক্লাসিকাল সাহিত্যকে ভালবাসেন। লনডন টি ভি-তে জাপান, চীন, রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিকের নাটক-উপন্যাস দেখানো হয়ে থাকে। নীতিগতভাবে ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের উপন্যাস দেখানোর কোন বাধা নেই।

কলকাতা, দিল্লির টি ভি সম্পর্কে কোন অভিমত না দিলেও মেলভিন ইংলন্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সের টি ভিও সাহিত্যঘেঁষা হবে বলে তাঁর ধারণা। মেলভিন বললেন :

London's T.V. is literary; American T.V is light and sensational; French T.V. is too serious and boring.

মেলভিন বললেন, ইংলন্ডের মত কলকাতার টি ভিও সাহিত্য ঘেঁষা হবে বলে তাঁর ধারণা। রবীন্দ্রনাথ বা অন্য যে-কোন শ্রেষ্ঠ ভারতীয় সাহিত্যিকের উপন্যাস ইংরেজীতে সাধু রূপান্তর করে তাঁর কাছে পাঠালে তিনি নিশ্চয়ই দেখবেন যাতে সেই বইখানি টি ভি-তে প্রদর্শিত হয়। রূপান্তরের দায়িত্বটা নিতে হবে ভারতের কোন বিদগ্ধজনকে তা হলে 'গীতাঞ্জলি'র স্রষ্টাকে ব্রিটেনের মানুষ আরও কাছ থেকে দেখবার, অনুভব করার সুযোগ পাবেন। তার কারণ, যে-কোন দেশের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মধ্যে সর্বজনীন আবেদন বর্তমান।

প্রশ্ন : টেলিভিশনে কোন উপন্যাস বা নাটক দেখানো হলে সঙ্গে সঙ্গে বাজারে সেই বই-এর কাটতি কমে যায় এবং তাতে লেখকের আর্থিক ক্ষতি হয়। পাবলিশারসদেরও তাতে সুবিধা হয় না। তার চেয়ে বড় কথা সাধারণ পাঠকের মধ্যে সেই বইখানি

পড়ার চাহিদা অনেকাংশে কমে যায়। এ সম্পর্কে আপনার মত কি?

মেলভিন : সিনেমার মত কখনও কখনও টেলিভিশনে প্রদর্শিত ছবিতেও মূলে বইয়ের কতকগুলি গল্পাংশে অংশ কাটছাঁট করে দেওয়া হয়। তাতে কোন কোন ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুই হারিয়ে যায়। কিন্তু একথা বলা ঠিক হবে না টেলিভিশনে কোন বই দেখানো হলে বাজারে সেই বইয়ের কাটতি কমে যাবে। বরং প্রায়ই এর উল্টোটা হতে দেখা যায়; টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' বইখানি টেলিভিশনে দেখানোর পর লনডনের বই পাড়ায় হু হু করে এই বইয়ের চাহিদা বাড়তে লাগল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে টেলিভিশনে 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' দেখানোর আগের সপ্তাহে বিক্রি হয় তিনশ কপি। টি ভি-তে দেখানোর পর থেকে ছমাসের মধ্যে পাঁচ লাখ কপি 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' বিক্রি হয়েছে। এইবার ভেবে দেখুন, আপনার প্রশ্নের সত্যাসত্য কতটা?

শুধু কি তাই! লিটারেরি প্যানেলের চেয়ারম্যান হবার পর বহু সাহিত্যিক, কবি তাঁর কাছে আসছেন। অনেকেই চান, তাঁর অন্ততপক্ষে একখানি বই টি ভি-তে দেখানো হোক। টি ভি এখন সাহিত্যিক, কবির খ্যাতির মানদণ্ড বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। থিয়েটার, সিনেমার সম্মান এখন অতীতের বিষয়-বস্তু।

মেলভিন উপন্যাস লিখেছেন ডজনখানেক। ফর ওয়ান্ট অফ নেল, দি সেকেন্ড ইনহেরিটেনস, উইদাউট এ সিটি ওয়াল, দি হুয়ারড ম্যান, দি সিলেকন নেট প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

—এত উপন্যাস, নাটক লেখা সত্ত্বেও ইংলন্ডের বিশেষ করে লনডনের পত্র-পত্রিকায় কেউ কেউ আপনাকে 'minor writer' বা 'নাবালক সাহিত্যিক' হিসাবে বর্ণনা করেছেন কেন?

শিশুর মত হো হো করে হেসে উঠলেন—তাহলে লনডন-কলকাতায় সত্যিই আর কোন ফারাক নেই। নিন্দার গতি দ্রুত। কিন্তু এত দ্রুত তা জানতাম না। ইভলিন ওয়াফের মত সাহিত্যিক যদি বলতে পারেন তিনি ডিকেনস-এর তুলনায় 'মাইনর রাইটার', তা হলে আমারই বা 'মাইনর' হবার বাধা কোথায়? আসলে কে 'মেজর' আর কে 'মাইনর' সময়ই তার একমাত্র নির্ণায়ক। তাই নয় কি? আর্ট কাউনসিলের লিটারেরি প্যানেলের চেয়ারম্যান হবার পর থেকে আমার নিন্দা ও প্রশংসার ছড়াছড়ি হচ্ছে। সেটাই স্বাভাবিক।

—লনডন টি ভি-তে ক্ল্যাসিক্যাল লিটারেচারের চাহিদা কেমন?

মেলভিন : খুব ভাল বলব না। তবে নেহাত খারাপও নয়। সীমায়িত হলেও ডিকেনস হার্ডি, লরেন্স, হেমিংওয়ের ছবি দেখবার আগ্রহ কমেনি।

ভারতীয় টি ভি সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করলেও শ্যাম বেনেগালের একটি ছবি সম্পর্কে মেলভিন বললেন, ছবির বিষয়বস্তু দুর্বল। তবে অভিনয় ভাল। বইখানির নাম সম্ভবত জুনুন। কথায় কথায় জানালেন সেকসপিয়ারওয়ালায় তাঁর এক নিকট আত্মীয় অভিনয় করেছেন। নাম টমাস জেফার। বইয়ের পরিচালকও তিনি কিন্তু ছবিখানি আজও দেখা হয়ে উঠল না।

কলকাতায় স্বল্প সময়ের মধ্যে মেলভিন সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে দেখা করেছেন।

প্রশ্ন : সত্যজিৎবাবুকে কি আপনি আগে থেকে চিনতেন?

মেলভিন : হ্যাঁ, ওঁকে নিয়ে আমি লনডনের টি ভি-তে ডকুমেন্টারি করেছি। ভারতে কি সত্যজিৎয়ের উপর কোন ডকুমেন্টারি হয়নি?

রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন, ভারতের শিল্পীদের নিয়ে মেলভিন সত্যজিৎয়ের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। এক ঘণ্টা তিনি সত্যজিৎবাবুর বাড়িতে ছিলেন। আগামী বছর লনডনে 'ইন্ডিয়া ফেসটিভ্যাল'-এর রূপরেখা নিয়েও মেলভিন সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। এজন্য লনডনে তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। ব্রিটিশ সরকার এই উৎসবানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। আর্ট-এর ব্যাপারে সত্যজিৎবাবুর সক্রিয় সহযোগিতা চেয়েছেন মেলভিন। সত্যজিৎবাবু ওই গুরু দায়িত্ব নেবার ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত পরে জানাবেন। ভারতের শিল্পকলা ওই উৎসবানুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ। মেলভিন এই উৎসবানুষ্ঠানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এজন্য তাঁকে এ বছরের মধ্যে হয়ত আরও কয়েকবার ভারতে আসতে হবে। শান্তিনিকেতন, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে শুরু করে অজন্তা-ইলোরা সর্বত্রই যেতে হবে মেলভিনকে। সংগ্রহ করবেন দুর্লভ ভারতীয় শিল্পকলা।

কলকাতা কেমন লাগল?

—একদিনে কি আর কোন বড় শহর চেনা যায়! আর কটা দিন কাটিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না।

দুই মেয়ে, এক ছেলের বাবা মেলভিনের কণ্ঠস্বর যেন হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে এল। বললেন, ক্যাথারিন বা মেয়ে দুটির জন্য নয়, ১২, হ্যামস্টেড হিলগারডেনস (লনডন)-য়ের বাড়িতে ক্যাথারিনের কোলের চার মাসের শিশুটির মুখখানি না দেখে এক মুহূর্তও থাকতে পারি না। বড় কষ্ট হয়। এই বলেই আবার সেই শিশুর মত হো হো করে হেসে উঠলেন।

সুদেব রায় চৌধুরী

# অলিম্পিকে কার কীর্তি সবচেয়ে বড় ?

অলিম্পিক খেলাধুলোর ইতিহাসে কার কীর্তি সবচেয়ে বড় এবং চোখ-ধাঁধানো এ সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত।

ইতিহাস বলতে অবশ্য প্রাচীন অলিম্পিকের কথাও এসে পড়ে, যদিও সে ইতিহাস কতটা তথ্য-নির্ভর এবং কতটা গল্প কথা বলা শক্ত। তবুও অনাদিকালের পথ বেয়ে যে সব বিবরণ আমাদের হাতে এসেছে তা যেমন বীরত্বব্যঞ্জক, তেমনই রোমহর্ষক।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং খেলায় নিষ্কাম শৌর্য প্রদর্শনের অঙ্গন গ্রীসের অলিম্পিক স্টেডিয়াম যখন অ্যাম্পিথিয়েটারে পরিণত হল এবং গ্লাডিয়েটর-দের প্রদর্শনী হয়ে উঠল বড় আকর্ষণ তখন বনের হিংস্র পশুর সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের অনেক গল্প আছে। সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ের ঘটনার কথাও লেখা আছে। অলিম্পিকের প্যাংক্রাশন প্রতি-যোগী পোলিডামাস নাকি খালি হাতে এক সিংহকে বধ করেছিলেন। প্রাচীন অলিম্পিকে প্যাংক্রাশন ছিল একই সঙ্গে কুস্তি ও মুষ্টিযুদ্ধের প্রতি-যোগিতা। আবার ওই পোলিডামাস ছিলেন মহাবলী মাইলোর তুলনায় খুবই দুর্বল। ইতিহাস বলছে, কুস্তিতে মাইলো অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ছয়বার। খাদ্য-তালিকার যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায় তাঁর প্রতিদিনের আহার ছিল সাত পাউন্ড মাংস, সাত পাউন্ড রেড ও পাঁচ গ্যালন মদ। প্রাচীন অলিম্পিকের ইতিহাসে আছে অলিম্পিয়ায় একদিন মাইলো একটি আস্ত ষাঁড় খেয়ে ফেলেছিলেন। এসব খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কথা। তখন আর কোনো অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন মাইলোর মত কীর্তি অর্জন করতে পারেননি। কিন্তু আগেই লিখেছি, প্রাচীন অলিম্পিকের ওই সব কাহিনীতে কতটা কল্পনার কালি আছে কেউ বলতে পারেন না। আধুনিককালের অলিম্পিকের সব ঘটনাই তথ্য-নির্ভর এবং রেকর্ড বইয়ে নথীভুক্ত। বেশি দিনের ঘটনাও নয়, শুধু চুরাশি বছর আগে, ১৮৯৬ থেকে।

এই চুরাশি বছরে অনুষ্ঠিত আঠারটি অলিম্পিক গেমসে কতজনের কত কীর্তি। প্রথম অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেমন স্মরণীয় হয়ে আছেন আমেরিকার ট্রিপল জাম্পার জেমস কনোলী, তেমনি প্রথম ম্যারাথন রেস জিতে বরণীয় হয়ে আছেন গ্রীসের ডাকপিয়ন স্পিরিডন লুইস। দিন দিন মানুষের ক্রীড়াদক্ষতা বেড়েছে। অলিম্পিকের লক্ষ্য হয়েছে সিটিয়াস-অলটিয়াস-ফর্টিয়াস। অর্থাৎ আরও জোরে দৌড়ো, আরও উপরে ওঠো এবং আরও শক্তি দেখাও। সেই লক্ষ্য মানুষ অনুশীলন অধ্যবসায় এবং বিরামহীন সাধনায় অসাধ্য সাধনের প্রয়াস পেয়েছে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে ক্রীড়াবিজ্ঞান এবং স্পোর্টস মেডিসিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তার ফলে এক অলিম্পিকের রেকর্ড ভেঙে গেছে পরের অলিম্পিকে। তারপর হয়েছে ভেঙে গুঁড়োগুঁড়ো। ফলে অ্যাথলেটিক, সাঁতার, জিমন্যাস্টিকস বা অন্যান্য খেলায় প্রথম দিকে যাঁরা স্মরণীয় কীর্তির অধিকারী হয়েছেন পরবর্তী অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নরা তা ম্লান করে দিয়েছেন। তবু কালের গণ্ডির মধ্যে খণ্ডকীর্তিরা সব সময়ই অলিম্পিকের অমর নায়ক। অনেকে সত্যিই মরলোক ত্যাগ করেছেন কিন্তু নামগুলি অমর হয়ে আছে। যখনই অলিম্পিকের আসর বসে বা নায়কদের কথা ওঠে তখনই তাদের কীর্তির কথা আমরা স্মরণ করি। গবেষণা করি কার কীর্তি বড়।

নায়কদের নামের অভাব নেই। অসাধারণ ক্রীড়া-দক্ষতার পরিচয়ে কেউ একটি স্বর্ণপদক পেয়ে স্মরণীয়

জিম থর্প

হয়ে আছেন, কেউ একটি অলিম্পিকে পেয়েছেন তিনটি কি চারটি স্বর্ণপদক, কেউ বা উপর্যুপরি তিনটি অলিম্পিকে বা চারটি অলিম্পিকে একই ইভেন্টে সোনা জিতেছেন। একটি অলিম্পিকের একটি স্বর্ণপদক লাভ যেখানে একজনকে ক্রীড়া-বিশ্বে পরিচিত করে তোলে সেখানে একাধিক পদক লাভ এবং একাধিক রেকর্ড সৃষ্টি অসাধারণ কৃতিত্বের নজির।

কত নাম মনে পড়ছে। অ্যাথলেটিকসে রে ইউরি, কোলেমেনেন, রিটোলা, জিম থর্প, পাভো নুর্মি, বেব ডিড্রিকসন, জেসি ওয়েন্স, ফ্যানি ব্ল্যাংকার্স কোয়েন, এমিল জেটোপেক, বেটি কুথবার্ট, আবেবে বিকিলা, অল অর্টার, স্যান্ডভাকোভজে, বব বীমন প্রভৃতি। সাঁতারে জনি উইসমূলার, ডন স্কোল্যান্ডের, ডন ফ্রেজার, রোনাল্ড ম্যাথেস, মার্ক স্পিজ। জিম-ন্যাস্টিকসে ভিক্টর চুকারিন, লারিশা ল্যাটিনিনা, ওলগা করবুট, ভেরা ক্যাসলাভস্কা, নাদিয়া কোমানেচি। বক্সিংয়ে লাজলো প্যাপ, টিওফিলো স্টিভেনসন।

মসকো অলিম্পিকের ফল জানার আগেই লিখছি। লাস ভিরেন এবং বক্সার টিওফিলো স্টিভেনসন আগে থেকেই অলিম্পিক নায়ক। যদি পাঁচ হাজার ও দশ হাজার মিটার দৌড়ে ভিরেন আবার সোনা জেতেন তবে তিনটি অলিম্পিকে দূরে পাল্লার ডাবল জয়ে অনন্য কীর্তির অধিকারী হবেন। স্টিভেনসন যদি আবার চ্যাম্পিয়ন হন করবেন হেভিওয়েটে সোনা জয়ের হ্যাটট্রিক যা আর কেউ করতে পারেননি।

এমিল জ্যাটোপেক

আগে যাঁদের নাম করেছি তাঁদের কৃতিত্বের খতিয়ান দিতে গেলে লেখা অনেক বড় হয়ে যাবে। অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জনকারী কয়েক জনকে আমি বেছে নিচ্ছি।

অলিম্পিকে সবচেয়ে বেশি পদক জয়ের নজির আছে রাশিয়ার জিমন্যাস্ট লারিশা ল্যাটিনিনার। মোট আঠারটি—নয়টি সোনার পাঁচটি রুপোর ও চারটি ব্রোঞ্জের। একটি অলিম্পিকে সাতটি সোনার পদক পেয়েছেন মার্কিন সাঁতারু মার্ক স্পিজ। উপর্যুপরি তিনটি অলিম্পিকে সোনা পেয়েছেন অনেকেই। টানা চারটি অলিম্পিকে সোনা জয়ের অনন্য কৃতিত্ব একমাত্র অ্যাথলীট যুক্তরাষ্ট্রের ডিসকাস ছুঁড়িয়ে অল অর্টার। চারটি রেকর্ড সহ বার্লিন অলিম্পিকে জেসি ওয়েন্সের চারটি সোনা জয়ের কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে ৪৮এ লণ্ডন অলিম্পিকে দুই সন্তানের জননী নেদার-ল্যান্ডসের ফ্যানি ব্ল্যাংকার্স কোয়েনের অ্যাথলে-টিকসে চারটি সোনা জয়ের কথাও। কিন্তু কোনোদিনই ভোলা যাবে না একই অলিম্পিকে জিম থর্পের পেন্টাথলন এবং ডেকাথলন জয়ের অনন্য নজির আর ব্রডজাম্পার বব বীমনের অলৌকিক লাফের ঘটনা।

চারটি অলিম্পিকের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যাপ্তি বারো বছর। কেউ যদি বলে যে অ্যাথলীট এই বারো বছর ধরে একটি ইভেন্টে বিশ্বের এক নম্বর ছিলেন তাঁর কীর্তিই বড় তবে তাঁর যুক্তি অস্বীকার করা শক্ত। আবার কেউ যদি বলে, যে সাঁতারু একটি অলিম্পিকে সাতটি সোনার পদক পেয়েছেন তাঁর চেয়ে বড় কীর্তি আর কেউ অর্জন করতে পারেননি তবে তাঁর কথাও উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

কিন্তু আমি বলব, একক কীর্তি হিসাবে জিম থর্পের ভূমিকাই বড়। ১৯১২-র স্টকহোম অলিম্পিকে ওই আমেরিকান নিগ্রো সব চেয়ে কষ্ট-সাধ্য দুটি ইভেন্ট—ডেকাথলন ও পেন্টাথলন জয় করেছিলেন। সবাই জানে ডেকাথলন সর্ববিদ্যা-বিশারদ অ্যাথলীটের ইভেন্ট, যার মধ্যে আছে তিন রকমের দৌড়, তিন রকমের লাফ, তিন রকমের নিক্ষেপ এবং হার্ডল রেস। আর পেন্টাথলন হচ্ছে যৌথস ক্রীড়াবিদের ইভেন্ট। সাঁতার, গুলি ছোড়া, অসি চালনা, অশ্বারোহী হয়ে তিরিশটি লাফের মাধ্যমে পাঁচ হাজার মিটার স্টিপল চেজ এবং ক্রসকান্ট্রি দৌড় হচ্ছে পেন্টাথলনের ইভেন্ট। সমস্ত রকমের খেলা-ধুলোয় কত দক্ষ হলে এই দুই ইভেন্ট জেতা সম্ভব সহজেই অনুমেয়। বিজয়ী জিম থর্প পরে পেশাদার প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর কাছ থেকে দুটি স্বর্ণপদক ছিনিয়ে নিয়ে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নের সম্মান থেকে বঞ্চিত করা হয়। কিন্তু তাঁর মত সর্ববিদ্যাবিশারদ অ্যাথলীটকে অলিম্পিকে আর দেখা যায়নি।

একটি মাত্র ইভেন্টে অবিশ্বাস্য রেকর্ডের কীর্তি আর এক নিগ্রো লং-জাম্পার বব বীমনের। মানুষ যখন দক্ষতা ও ক্রীড়াক্ষমতায় প্রায় তুঙ্গে পৌঁছয় তখন সময়ের সামান্য উন্নতি বা দূরত্ব এক সেন্টিমিটার বাড়ানোর জন্য বহু সাধনার প্রয়োজন হয়। তার প্রমাণ একশ মিটার দৌড়ে জেসি ওয়েন্সের ১০·৩ সেকেন্ড রেকর্ড ১০·২ সেকেন্ডে ভেঙে ছিল দীর্ঘ চব্বিশ বছর পরে। ১৯৬৮ সালে মেক্সিকো অলিম্পিকে বব বীমন লাফের দূরত্ব কতটা বাড়িয়েছিলেন? দু ফুটের কাছা-কাছি। বিশ্ব রেকর্ড ছিল ২৬ ফুট ৫½ ইঞ্চি। বীমন লাফান ২৯ ফুট ২½ ইঞ্চি। লাফ দেখে ক্রীড়া-বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন—অবিশ্বাস্য, অলৌকিক। গবেষণা করে আরও বলেছিলেন—বিশ্বকাপ ফুট-বল ফাইনালে একজনের তিনটি গোল করা কিংবা টেস্ট ক্রিকেটে একদিনে একজনের ... করা অথবা নয় সেকেন্ডে একশ মিটার দৌড়ানো সহজ কৃতিত্ব। অনেকের অভিমত একুশ শতকেও কারো পক্ষেই বীমনের রেকর্ড ম্লান করা সম্ভব হবে না।

মুকুল

সাদা

ডেট'র

সাদা

নতুন ফর্মুলা

ডেট

ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার

পাউডার
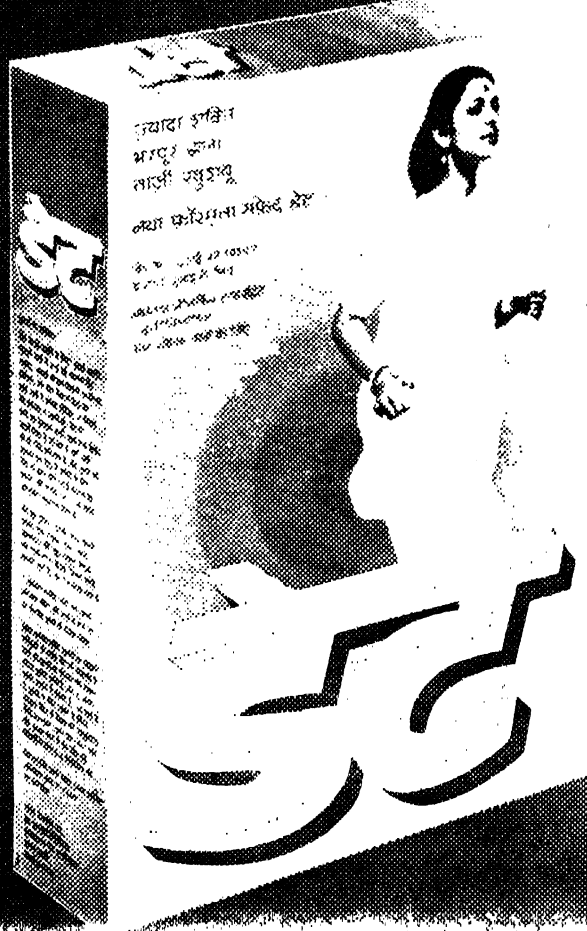
# সমকালীন ভারতীয় চিত্রকলার স্তম্ভ—গোপাল ঘোষ

শিল্পী গোপাল ঘোষ পরলোকে—কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না। এই কিছু দিন আগেও তাঁর সঙ্গে কথা হল। উনি মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন লাগছে আমার অয়েলের কাজ?" তেল মাধ্যমে কাজ শুরু করেছিলেন কিছু-দিন হল; যে মাধ্যম তাঁকে ভারত-বিখ্যাত করেছিল তা কিন্তু তৈল নয় টেমপরা আর প্যাস্টেল; স্বচ্ছ জল রঙের কাজও কিছু দেখেছি যার তুলনা হয় না।

অধুনালুপ্ত ক্যালকাটা গ্রুপ শিল্পীগোষ্ঠীর গোপাল ঘোষ ছিলেন, বলতে গেলে, মধ্যমণি। ক্যালকাটা গ্রুপের সবাই ছিলেন বেপরোয়া। কিন্তু গোপাল ঘোষের সাহস যেন সবার ওপরে। শুনেছি তাঁকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করায় গোপাল ঘোষ রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ডাঃ বিধান রায়ের সামনে। বিধান রায় ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চান। কারোর কাছে মাথা হেঁট করা তাঁর স্বভাব ছিল না। শিল্পী হিসেবেও সমকালীনদের মধ্যে মাথা ছিল তাঁর উঁচুতে।

প্রথাগত ধারায় গোপাল ঘোষ ছবি আঁকতেন না, কিন্তু ইউরোপের আরট আভাঁ-গারদ-এর সমর্থন কোনও দিন তাঁর মুখে বা কাজে প্রকাশ পায় নি। বরং ভারতীয় শিল্পে পাশ্চাত্যের বিকৃতি প্রধান কিংবা বিমূর্ত কল্পনার পুনরাবৃত্তির তিনি ছিলেন কঠোর সমালোচক। তাঁর ছিল বিশ্বাস পশ্চিমের আরটকে অনুকরণ করে ভারত শিল্পের কোনও উন্নতি সাধন হতে পারে না। একথা, সুবিধে পেলেই তিনি সোচ্চারে জানাতেন উঠতি শিল্পীদের, ছাত্রদের। মডার্ন বলতে তিনি বুঝতেন সমকালীন জগৎ অর্থাৎ মডার্ন বাড়ি, মডার্ন গাড়ি, মডার্ন ব্যবহারিক জিনিসপত্র। ওসবের ছবি আঁকলেই তো মডার্ন আরট হল, প্রকাশভঙ্গীতে, ক্রিয়া-কৌশলে, মডার্ন হওয়া বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলাল বসুর নাম উঠলে তিনি শ্রদ্ধায় নিজ কপালে হাত ঠেকাতেন।

রাজনীতি তাঁকে কব্জায় আনতে পারে নি। কলকাতার রাস্তায় যখন নানা দাবিতে ঝাণ্ডা উড়িয়ে রাজনীতিক র‍্যালি চলেছে, গোপাল ঘোষকে তখন দেখা যেত ক্যাকটাস কিংবা সজিনা-ফুল কিংবা পলাশ ফুলের ছবি আঁকায় তন্ময়। যুদ্ধের সময় আকাশে বিমানপোতের গোঙানি এবং দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নারী-পুরুষের ক্ষুধায় কাকুতি—কোনওটিই তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি তাঁর প্রকৃতি-সাধনা থেকে। তিনি তখন এঁকে চলেছেন রৌদ্রতপ্ত ধু-ধু মাঠ কিংবা শান্ত শীতল বাংলার পল্লী। যখনই কলকাতার বাইরে গেছেন, তা দশ মাইলই হোক আর দশ শো মাইলই হোক, গোপাল ঘোষ তুলে এনেছেন ছবি, ক্যামেরায় নয়, হাতে এঁকে, রঙ দিয়ে। গোপাল ঘোষের ছবির মত রঙের বাহার আর ক'জন শিল্পীর কাজে দেখা যায়? সারা জীবনে অজস্র ছবি এঁকেছেন গোপাল ঘোষ, সংখ্যায় তা কত হবে

বলতে পারবো না। কোনও দিন ছবি না আঁকতে পারলে তাঁর [illegible] সীমা থাকতো না, প্রাকৃতিক ক্রিয়া-কর্মাদির মত ছবি আঁকাটাও ছিল তাঁর দৈনন্দিন কাজ।

গোপাল ঘোষের [illegible] রঙের ওপরেই [illegible] ফরাসী ইম্প্রেশনিসম-এর মত [illegible] তিনি চেয়েছিলেন [illegible] প্রকৃতি সোচ্চারে প্রতিষ্ঠিত করতে, একদিকে তার নিজ মর্যাদায় উপস্থাপিত করবার জন্যে ফরম [illegible] করতে শিল্পীর [illegible] ছিল না। কিন্তু অ্যাবসট্রাকট আরট-এর দিকে ঝোঁক আদৌ নয়। গোপাল ঘোষের প্রভাব সমকালীন শিল্পীদের অনেকেরই ওপর বর্তায়, কিন্তু ঐ স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশভঙ্গী কোথায়? মনে পড়ে, তখন ১নং চৌরঙ্গী টেরাস-এ প্রদর্শনী হত সমকালীন আর্ট-এর নিয়মিত। ঐখানেই গোপাল ঘোষের ছবি দেখতে দেখতে প্রশ্ন করেছিলাম এক মান্য স্বনামীয় সাহেব শিল্পীকে, কবে তিনি প্রদর্শনী করছেন। তাঁর জবাব, 'আর নয়; গোপালের প্রদর্শনীর পর আমার পক্ষে জমান মুশকিল।' সতিই গোপাল ঘোষের রঙ খেলার পর আর কারোর সাধ্য ছিল না তাঁকে ডিঙিয়ে যাবেন। শুধু ল্যাণ্ডস্কেপ আর ফুলই নয়, তাঁর 'চিড়িয়াখানা' সম্মোহিত করে রাখে রসিক দর্শককে। তারা খাঁচায় বন্দী নয়, স্ফূর্তিতে ডগমগ মুক্ত বিহঙ্গ। সেখানেও রঙের ঘাটতি নেই, স্বকীয় করণকৌশলে বেপরোয়া শিল্পী প্রয়োগ করেছেন রঙ বাহার। প্যাস্টেল রঙ ব্যবহারে তাঁর ছিল নিজস্ব টেকনিক; প্যাস্টেল দিয়ে অমন পেইন্টিং করতে একমাত্র গোপাল ঘোষই পারতেন।

ভারতীয় সমকালীন শিল্পের একটি স্তম্ভ ভেঙে গেল, ঐ শূন্যস্থান কোনও দিনই আর পূরণ হবার নয়।

অহিভূষণ মালিক

# ইনডানা হোল মিল্ক পাউডার

# আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি

## আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি বই

**TRADE & FINANCE IN THE BENGAL PRESIDENCY 1793-1833. By Amalesh Tripathi. Oxford University Press, Calcutta. Rs. 100.**

ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বিজ্ঞ ঐতিহাসিক। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ও আশুতোষ অধ্যাপক। বইখানিতে তিনি বাংলা প্রেসিডেন্সির এক অতি গুরুত্বপূর্ণ যুগের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এই চল্লিশ বৎসরব্যাপী যুগটাকে কোম্পানির জীবনের এক ক্রান্তিকাল বলা যেতে পারে। কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরুদ্ধে এদেশে ও বিলাতে যে ঘোর বিরোধিতা প্রকাশ পেয়েছিল, তার প্রতিঘাতে এই যুগেই কোম্পানি তার একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার হারিয়ে, বাণিজ্য সংস্থা থেকে শাসন সংস্থায় পরিণত হয়েছিল। বস্তুত এই যুগেই রাষ্ট্রীয় শক্তি হিসাবে এদেশে ইংরেজের প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়। আবার এই যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয় বেসরকারী বাণিজ্য সংস্থাসমূহ, যেগুলি পরবর্তীকালে 'এজেনসী হাউস'-এর রূপ পরিগ্রহ করে রাজশক্তির সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়। এর প্রতিঘাতে বাঙলাদেশে কি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, সে সম্বন্ধে ডঃ ত্রিপাঠীর অনেক কথা বলবার আছে। তিনি এ সম্পর্কে আগেকার দিনের অর্থনৈতিক ইতিহাসকারদের (যথা রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ) একদেশী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি আমাদের অবহিত করেছেন: আগেকার দিনের ঐতিহাসিকরা ভারতীয় তন্তুজ শিল্পের অবনতি ও তার কুফলের ওপরই বেশী জোর দিয়ে গিয়েছিলেন। এই যুগে কাঁচামালের বাণিজ্যের যে অসাধারণ প্রসার ঘটেছিল, তার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করতে ভুলে গিয়েছিলেন। আরও পাশ্চাত্ত্য দেশে ওই যুগটা ছিল শিল্প-বিপ্লবের যুগ। সে যুগে কলকারখানায় প্রস্তুত তন্তুজ বস্ত্রের প্রতিযোগিতায় বিদেশের হাটে ভারতীয় তন্তুজ শিল্পের পক্ষে দাঁড়ানোও অসম্ভব ছিল। তা ছাড়া, অত্যধিক ভূমিরাজস্ব জমির উৎপাদনী শক্তির ওপর আঘাত হেনেছিল, রমেশচন্দ্র দত্তের এ মতবাদও যে সম্পূর্ণ ঠিক নয়, তা-ও ডঃ ত্রিপাঠী দেখিয়েছেন। কিভাবে জমির উৎপাদন বেড়েছিল, তা তিনি বাণিজ্য সংক্রান্ত পরিসংখ্যান দ্বারা প্রমাণ করেছেন। আলোচ্য চল্লিশ বছরের মধ্যে কাঁচামালের রফতানি প্রায় সাড়ে চারগুণ বেড়ে গিয়েছিল। এর ফলে কৃষক সম্প্রদায়েরই সচ্ছলতা বেড়েছিল—যে সচ্ছলতা তাদের উৎসাহিত করেছিল ক্রমাগত উৎপাদন বাড়াতে। কিন্তু এর এক সহজাত দুর্বলতা ছিল, এবং তার প্রতিও ডঃ ত্রিপাঠী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তন্তুজ শিল্পের অবনতির ফলে কৃষক সম্প্রদায় ক্রমশ বৈদেশিক মূলধনী শিল্পসৃষ্ট আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের (forces) দাস হয়ে পড়েছিল। এর কুফল এদেশের লোক উপলব্ধি করেছিল, এবং এই চেতনাই ভারতকে উদ্বুদ্ধ করেছিল দেশের শিল্প উন্নয়নের প্রতি অবহিত হতে। এরই ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতে শিল্প প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত এক বিরাট কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই কর্মযজ্ঞই ভারতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এক নূতন সমাজবিন্যাস, যার মেরুদণ্ড ছিল মধ্যবিত্ত সমাজ।

পরবর্তীকালের এই পরিস্থিতিকে সামনে রেখেই ডঃ ত্রিপাঠী রচনা করেছেন তাঁর আলোচ্য চল্লিশ বছরের ইতিহাস। বিভিন্ন অধ্যায়ে তিনি বিশদভাবে ও বৈচারিক পদ্ধতি অনুযায়ী আলোচনা করেছেন জমির মালিকানা স্বত্ব, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে কর্নওয়ালিশের আশা ও নৈরাশ্য, 'এজেনসী হাউস'সমূহের উত্থান ও পতন ইত্যাদি ওই যুগের নানা ঘটনা ও সমস্যা। সমস্ত পরিস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে লেখক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, সেটা এখানে সংক্ষেপে বলি—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মঙ্গলকামী রাষ্ট্র (welfare state) আশা করা যেমন স্বপ্নবিলাস, অপর দিকে ইংরেজ পূর্বকল্পিত কোন ছক নিয়ে ভারতকে শোষণ করতে এসেছিল, তা ভাবাও তেমনই ভুল। ভারত যদি অবক্ষয়ের পথে গিয়ে থাকে, তার সূচনা ইংরেজগণ কর্তৃক বাঙলায় সার্বভৌমত্ব গ্রহণের অনেক আগে থেকেই ঘটেছিল। রাষ্ট্রীয়, আর্থিক ও সামাজিক—সকল ক্ষেত্রেই বাঙলায় শুরু হয়ে গিয়েছিল অবক্ষয়ের লক্ষণ ইংরেজ সার্বভৌমত্ব স্থাপনের আগে থেকেই। দেশের মধ্যে কোনরূপ ঐক্য ও সংহতি ছিল না। শান্তি-শৃঙ্খলাও ছিল না। লেখক বলেছেন—

"Caste stood against initiative, chaos against enterprise, localized markets against nationalized market, and economic fragmentation against formation of capital".

বৈদেশিক শাসনের কুফল ছিলই। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও শান্তি-শৃঙ্খলা।

বইখানার সবচেয়ে আকর্ষণীয় অঙ্গ হচ্ছে মূল্যবান পাদটীকাসমূহ ও পরিশিষ্টে প্রদত্ত পরিসংখ্যানের প্রাচুর্য। বইখানা যে বিদগ্ধ সমাজে সাদরে গৃহীত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

**অতুল সুর**

## আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি চিত্রকলা

### বহিরাগত

সাধারণত কলকাতায় কেউ প্রদর্শনী করতে এলে আমি নিষ্ঠুর হতে পারি না। শিল্পীকে তাঁর কাজ নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টার জন্য সাধুবাদ দিতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাতে হল।

অমিত আম্বালাল (জন্ম ১৯৪৩) আমেদাবাদের মানুষ। প্রদর্শনী অনেকের করেছেন। কিন্তু তিনি প্রশিক্ষিত শিল্পী নন। তাঁর কাজে বোধহয় সেটা স্বপ্রকাশ (আকাদমী অব ফাইন আর্টস—২১শে ফেব্রুয়ারী)। প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সেটা হল উজ্জ্বল দ্যুতিময় মৌলিক এবং যৌগিক বর্ণ। যদিও ছায় (টোন)-এর চেয়ে বরং সমতল ভাবে চাপানোর দিকে ঝোঁকটা বেশি। একটু সামলে নিলে বোঝা যায়, বাজারে বিজ্ঞাপন-চিত্রের প্রভাব পড়েছে তাঁর ওপর। অবশ্য শিশু-চিত্রের রূপারোপ (স্টাইলাইজেশন) তিনি আগাগোড়া কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ছবির কাঠামো আর নির্মাণ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ভাসা ভাসা। কিন্তু সহজাত বোধের জন্য কোন ছবি উৎরে গেছে মোটামুটি।

আমার ভাল লেগেছে তাঁর সাদা কালো মজাদার মুখগুলো। চেয়ারে 'পোজ' দিয়ে বসা মেয়েকেও। ছোট ছবির

হঠযোগী—অমিত অম্বালাল
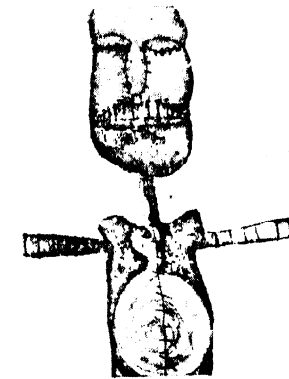
মধ্যে গাছের তলায় বাচ্চা ছেলের মতো আঁকা পাখিগুলো ভারী মিষ্টি। আমার ছোট ছবিগুলো বেশি ভাল লেগেছে।

বড় ছবি তেমনভাবে টানে না সবসময়। এখানে তিনি পশ্চাদ্ভূমিতে একটা বর্ণকে প্রাধান্য দিয়েছেন—সবুজ হোক বা নীলই হোক। মাঝে মধ্যে একটা অনুভূমিক রেখা টেনে অন্য একটি বর্ণকে পশ্চাদ্ভূমিতে এনেছেন। অবশ্য তার সংখ্যা কম। শিশুচিত্রকরের সারল্য ব্যঙ্গচিত্রের মিতবাক তিনি ব্যবহার করেছেন। হয়তো চারটে ছবির নাম 'কুস্তিগির' বা অন্য চারটের 'ম্যানেজিং ডিরেক্টারা'—এঁদের ভঙ্গী নিয়ে একটু মশকরা করেছেন। দর্শকের মনের ভেতর এই কুস্তিগির, ম্যানেজিং ডিরেক্টার, বা "হঠযোগী" আছে। মানুষের আত্মম্ভরিতা নিয়ে তিনি হাসতে এবং হাসাতে চেয়েছেন। স্যুট পরা ম্যানেজিং ডিরেক্টারের সুখী আত্মসন্তুষ্ট ভঙ্গী যখন তিনি কেদারায় বসেন বা উঠে দাঁড়ান সেটা তুলে ধরতে চেয়েছেন, বা যখন কুস্তিগিররা বিশ্রাম করেন গড়াগড়ি দিয়ে। মজাটা উপভোগ্য। হয়তো তর্জনীর মুদ্রা যেখানে প্রাধান্য দিয়েছেন সেখানে ফ্রেম দিয়ে লোকটির মাথা কপাল থেকে কেটে দিয়েছেন। মানুষের ফোলানো ব্যক্তিত্বের হাস্যকর দিকটা দেখিয়ে, কতদূরে খারাপ মানবসমাজ, এটা বলতে চেয়েছেন। "এইসব ভয়াবহ আরতি"—তিনি নিজে মানুষের স্ববৈপরীত্যে ভয় পাননি, ফলে ব্যাপারটা নিছক "ক্লাউনিং" (গোদা বাংলায়

ভাড়ামো বললে একটু বেশি আঘাত দেওয়া হতো) হয়ে গেছে। আসলে অমিত আহমেদাবাদের মিল মালিকদের কনুইয়ের গাঁতো মেরেছেন। কিন্তু বন্ধুরাই বন্ধুদের নিয়ে তেমন মশকরা করতে পারে। ফলে সমস্ত ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা মস্ত প্রহসন। এমন মনে হবার একটা কারণ রচনাসৌকর্য (কম্পজিসানে) জোর নেই। যদিও হাত দিয়ে ফুল ধরা, বা বসতে যাওয়া, আসন করার মুদ্রা বা মুদ্রাদোষগুলি কিন্তু ধরেছেন ভাল। বড় ছবির দুটো ছবি মিলিয়ে একটা গোটা ছবি হয়েছে একটি ক্ষেত্রে। সেখানে ওপরের দিকে অনুভূমিক রেখা টেনে ক্যাম্বিস সাদা রেখে ছবির ফ্রেমের বাইরে করে দেওয়া হয়েছে। তারপর ছবির চরিত্রের হাতটিকে ছবি থেকে টেনে ফ্রেমের এই সাদা জায়গাটায় এনে একটা মজা করেছেন। একটিতে একটি মেয়ে। অন্যটিতে দশাসই পুরুষ। মেয়েটি আকাশী কামিজ পরেছে। সবুজ ওড়না। কালো চুল। কিন্তু কাম্বিসের সাদা রঙের মুখ (এখানেও তিনি বেশ বাহাদুরী দেখিয়েছেন)। তার একটা হাত চলে গেছে ফ্রেমের বাইরে সাদা জায়গায়। আঙ্গুলে ধরা ফুল। অন্যটিতে লালচে কোনী কোট পরা লোকটির মুখ সবুজ রঙের। মেয়েটিকে দেখে সেও একটা হাত তুলে দিয়েছে ফ্রেমের বাইরে সাদা জায়গায়। পাশ থেকে আঁকা ছবি। হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়াতে দুজনেই উল্লসিত। ছবি দুটির নাটক উপভোগ্য। আর "লাল কুকুর" বলে ছবিটা অসাধারণ মন্দ লাগেনি। সবুজ বাহারী লম্বা পাতার মধ্যে কুকুরটিকে সামান্য রেখায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

আমার মনে হয় গোটা রচনা সম্বন্ধে তাঁর আরেকটু ভাবা উচিত। এক বা দুই রঙা পটভূমির মাঝ বরাবর একটা লোককে ছেড়ে দিয়ে তিনি সহজে কিস্তিমাত করতে চেষ্টা করছেন।

**সন্দীপ সরকার**

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

## শেষ বিচার

কাহিনী বিচারক শিবনাথ ব্যানার্জীকে (উৎপল দত্ত) নিয়ে। খুনী নিজেরই পুত্র রাজা। বিচারক শিবনাথ রাজাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা দেখান। এই ব্যাপারটা পরিস্ফুট করতে, অর্থাৎ রাজার খুনী হওয়ার পিছনে যে ধরনের ঘটনার সমাবেশ তার সবকিছুই যেন প্রক্ষিপ্ত। কেমন সব এলোমেলো ঘটনা দেখতে দেখতে মনে হয় কাহিনীকার-পরিচালক বিমল রায় ঘটনাবলী যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন তাতে দর্শক কাহিনীর সেই মেলাতেই পরিশ্রান্ত হয়ে ওঠেন। স্ত্রী শুভ্রাকে (সুমিত্রা মুখার্জি) খুনের দায় নিজের ঘাড়ে নেয় অধ্যাপক স্বামী রাজীব (দীপংকর দে)। বিচারক শিবনাথের সন্দেহ হতে

সুমিত্রা ও দীপঙ্কর
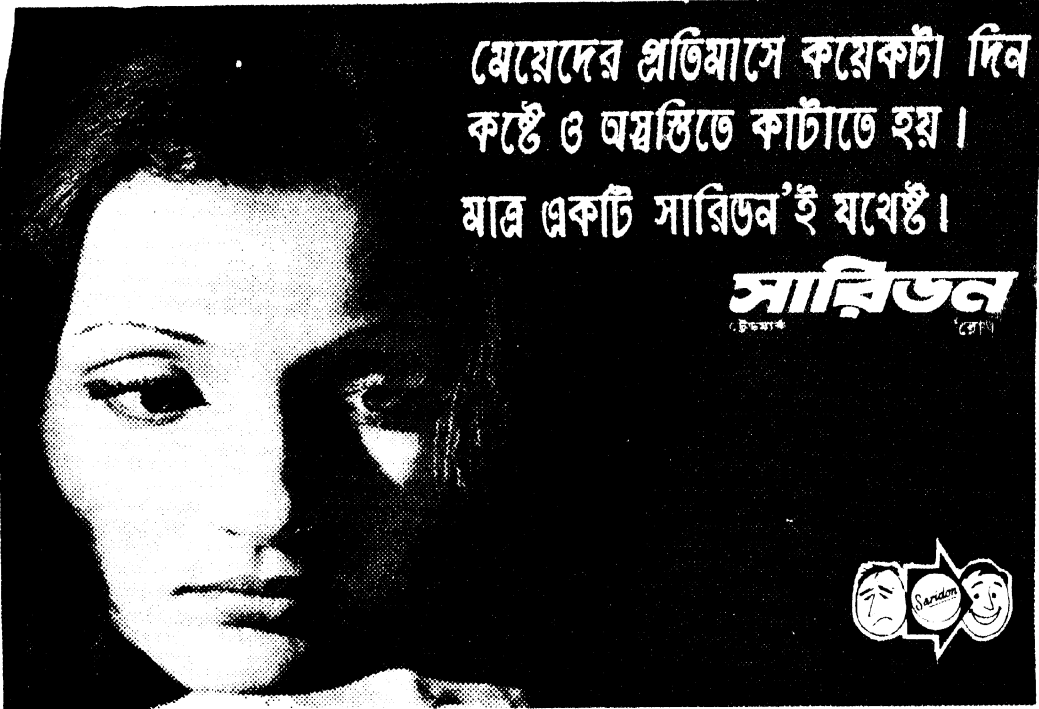
রাজীবের সংগে গোপনে দেখা করে প্রকৃত ঘটনা জানতে পারেন। রাজীবের এই জবানি থেকেই ফ্ল্যাশ-ব্যাকে কাহিনীর অবতারণা। আর এই ফ্ল্যাশ-ব্যাকের ব্যাপারেই পরিচালক চলচ্চিত্রের সরল ব্যাকরণও উপেক্ষা করেছেন। ফলে রাজীবের জবানি সূত্রে এমন ঘটনাও দেখানো হয় যা সে প্রত্যক্ষ করেনি। খলচরিত্র রাজা (সন্তু মুখার্জী) আসলে নারী শিকারী। রাজীবের বোন রোচনারও সে সর্বনাশ করে। রাজার সংগে পরিচিত হবার পর শুভ্রা একদা এক ক্যাবারে নাচিয়ে রূপে রোচনাকে দেখে। পরে রাজীবের সংগে বিবাহের পর শুভ্র জানতে পারে রোচনা আসলে তার হারিয়ে যাওয়া ননদ। কিন্তু শুভ্রা রাজীবকে সে-তথ্য আর জানিয়ে যেতে পারল না। রোচনা (মহুয়া রায়-চৌধুরী) কিভাবে রাজার ফাঁদে পা দেয় এবং তার পরিণতি ঘটে সে ব্যাপারটার জন্য আবার ফ্ল্যাশ-ব্যাক। এবং সেটা ঘটে আদালতে রায় বের হবার অব্যবহিত পূর্বে। যার ফলে রাজীব মুক্তি পায়, আর রাজার হয় মৃত্যুদণ্ড। বিন্যাসে সাসপেন্স গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে যা অত্যন্ত ঠুনকো। ঘটনায় অবিনাস্ত পরিচর্যা ছবিখানির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার অন্তরায় ঘটায়।

ছবি কতকটা জমে বিচার দৃশ্যে। বিচারকরূপী উৎপল দত্ত এবং দুই-পক্ষের উকীলের চরিত্রে বিকাশ রায় ও শেখর চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ই ওই অংশ জমিয়ে তোলায় সহায়ক হয়েছে। কিন্তু সে-তৃপ্তিও দর্শকমনে স্থায়ী হতে পারে না আদালতে বিচারক পত্নীর বুকফাটা আর্তনাদ এবং রায়দান শেষে বিচারকের কর্মে ইস্তফা পত্র সামনের টেবলে রেখে চেয়ার ত্যাগের মত অসঙ্গত ও হাস্যকর ব্যাপারে। সন্তু মুখার্জি ভিলেন চরিত্রেও সচল প্রমাণ দিয়েছেন। দীপঙ্কর দে'র রাজীবও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পঙ্কজ দত্ত

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

## নরেন্দ্রনাথ ধরের একক আসর

তরুণ সরোদ বাদক নরেন্দ্রনাথ ধরের একটি আসরের আয়োজন করে-ছিল নবদীপা নামক এক সংস্থা শিশির মঞ্চে গত ৮ জুন। তবলা সঙ্গতে ছিলেন স্বপন চৌধুরী।

মাড়োয়া রাগে সংক্ষিপ্ত আলাপ-

# নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাস... সুস্থ সবল দাঁত

## কোলগেট
ডেন্টাল ক্রীমের গুণে

প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। আপনার দাঁতকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে সারা পৃথিবীতে দাঁতের ডাক্তাররা এই উপদেশই দেন।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ফলে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আসে, পরে দাঁতে যন্ত্রনাদায়ক ক্ষয়রোগের শুরু হয়ে যায়।

সুতরাং প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। দাঁতকে সাদা ঝকঝকে করে তুলে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দাঁতের ক্ষয় রোধে কোলগেটের অসাধারণ ক্ষমতা বহুবার প্রমাণিত হয়ে গেছে।

**কোলগেটে এমন এক চমৎকার তাজা মিন্টি স্বাদ রয়েছে যে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত ব্রাশ করতে ইচ্ছা করবেই।**

**কোলগেটের নির্ভরযোগ্য ফরমূলা কি ভাবে কাজ করে!**

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়রোগের জীবাণু জন্ম নেয় দাঁতের ফাকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে।

কোলগেটের প্রচুর ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে অবাঞ্ছিত খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু দু'ইই দূর করে।

ফলাফল: সাদা ঝকঝকে দাঁত, নির্মল তাজা শ্বাস-প্রশ্বাস ও দন্তক্ষয় রোগ প্রতিরোধের দৃঢ় মনোবল।

**কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন... দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!**

Colgate DENTAL CREAM Colgate

দাঁতের পুরোপুরি যত্ন নেবার জন্যে
কোলগেট ট্রাইপার্ট টুথব্রাশ ব্যবহার করুন...
এটি দাঁতকে তিন ভাবে সুরক্ষা করে
1 দাঁতের এনামেল সুরক্ষা করে।
2
3 মাড়ির সুরক্ষা করে।

DC.G.74 BN

নরেন্দ্রনাথ ধর

জোড় দিয়ে আসরটি শুরু হয়। ছোট্ট করে বাজানো আলাপটিতে রাগের মৌলিক রূপ মোটামুটি ভালো ফুটলেও জোড়টিই বেশি আনন্দ দিয়েছিল। এটি অতি সুরেলা ও সুগঠিত হয়েছিল এবং এতে শিল্পী ডাল লপেট ও গমকের কাজ করেছিলেন॥ মধ্যলয় তান-তোয়া সংক্ষিপ্ত লড়গুথাওয়ের কাজও বেশ ভাল লেগেছে তবে ঝালার কাজ বড় তাড়াহুড়ো করে শেষ করা হয়েছিল।

শ্যামকল্যাণ রাগে বিলম্বিত তিনতাল গৎকারি সরোদ ও তবলার ছন্দ ও তেহাই-এর আদান-প্রদানে রীতিমত জমে উঠেছিল। নরেন্দ্রনাথ ধরের ছন্দের কাজে যেমন ছিল সুর, তেমন ছিল বৈচিত্র্য ও বোলের বিস্তার—চৌগুণ, আটগুণ, কুআড়ি, বিআড়ি ও বারগুণের বলিষ্ঠ স্বরসংগতি তিনি বাজিয়ে ছিলেন শিল্পবোধ ও নিপুণতার সংগে। এর উৎকৃষ্ট জবাব উঠেছিল স্বপন চৌধুরীর তবলায়। এই রাগে দ্রুত তিনতাল গৎটিতে ভাল তানের কাজ ছিল—লম্বা ও সুনিয়ন্ত্রিত একহারা তানগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এর মধ্যে কয়েকটি সেতারের কায়দায় শুধু একটি তারের উপরে বাজানো হয়েছিল—সরোদে এ জিনিস বাজানো খুব কঠিন। ঝালার কাজ, দ্রুত, পরিষ্কার ও সুরেলা হয়েছিল এবং এতে ছিল অসাধারণ বোল-বৈচিত্র্য। এই বোলবৈচিত্র্যের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছিল স্বপন চৌধুরীর ঠেকা বৈচিত্র্যে।

এরপর শিল্পী শোনালেন ঝিঁঝোটি রাগে একটি মসৃণ, আবেগপূর্ণ আওচার এবং একই মেজাজের দ্রুত তিনতাল গৎ। গৎকারিতে সেই একই কোমল মসৃণতা দেখা গেল—তিন সপ্তক জোড়া সুগঠিত একহারা তানগুলিতেও। এই তানগুলিতে খাদের তারের ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। স্বপন চৌধুরীর রেলার কাজেও এই একই মসৃণতা দেখা গেল। উল্টো-ঝালার কাজে যেমন ছিল ধ্বনি-মাধুর্য তেমন ছিল বোলবৈচিত্র্য।

সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজের ছিল পরের বাগেশ্রী রাগে বিলম্বিত গৎটি। এটির অতি-বিলম্বিত লয়ে বাজানো প্রথম মিনিট দশেক শিল্পী মীড়ের

রেশে তরা গায়কি অঙ্গের বিস্তার বাজিয়েছিলেন। এতে রাগের গম্ভীর মেজাজ সুন্দরভাবে ফুটেছিল। লয় একটু বাড়ার পর ভজা ছন্দের কাজ, তান-তোড়া ও সাথ-সঙ্গত শোনা গেল। এই রাগে দ্রুত ও অতি দ্রুত তিনতাল গৎ দুটিও ভাল হয়েছিল। প্রথমটিতে ছিল জমজমাট বোল অঙ্গের তান-তোড়া এবং দ্বিতীয়টিতে উচ্চাঙ্গের বোলকারি ও ঝালার কাজ। শেষের জিলা কাফি আওচার ও দ্রুত তিনতাল গৎ-এ ঠুংরী অঙ্গের কথা-বলা মাদকতা এবং রংদার স্বরের নকশা ছিল। জায়গায় জায়গায় আলী আকবরের প্রভাব দেখা যাচ্ছিল, জায়গায় জায়গায় আমজাদ আলীর। দ্বিতীয়োক্তের প্রভাব অবশ্য আসরের সব জায়গাতেই ছড়িয়ে ছিল—বিশেষ করে একহারা তানের কাজে। কারণ একথা আজ সর্বজন স্বীকৃত যে সরোদে একহারা তানের বহুল প্রয়োগ আমজাদ আলীই প্রথম করেন।

নীলাক্ষ গুপ্ত

## নানা স্বাদের গান

পরিকল্পনায় অভিনবত্ব ছিল না, তবু 'ঋষি অরবিন্দ স্মৃতি সংঘ'র তরফে মহাজাতি সদনে শশাঙ্ক দাস-এর আয়োজিত সাম্প্রতিক বিচিত্রানুষ্ঠানটি নানা স্বাদের গানের এক বর্ণময় সমাহার হয়ে উঠেছিল। প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা যত্নবান ছিলেন, নতুনরা ছিলেন সম্ভাবনাময়। শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায় 'আমার অঙ্গে জ্বলে' গানে প্রত্যাশার রংমশাল সত্যিই জ্বেলেছিলেন, যদিও অন্য গানে তা হয়ে উঠেছিল, কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ। ভূপেন হাজারিকা শান্ত ভঙ্গিতে জনপ্রিয় গানের পরিধিতে ডেকে নিয়েছিলেন শ্রোতৃমণ্ডলীকে। হইচই বসাক-এর গানে যতটুকু গান, ততটুকুই হইচই। কিংবা তার বেশীই। তবে ছড়া-গানটি ভালো লেগেছে। অভিজিৎ বিশ্বাস শোনালেন হরবোলা-কণ্ঠের কিছু নমুনা। ধ্বনির অনুকরণে এই নবীন শিল্পী বিস্ময়কর দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। বিশেষত দুই বিপরীত ধ্বনির দুরূহ মিশ্রণ, ট্রেনের বিভিন্ন গতিপথের ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনিব্যঞ্জনা, ভিণ্টেজ কার র‍্যালি—অনবদ্য। খেলার রিলের ধ্বনির অংশ বেশী ভালো, কণ্ঠ আরও মার্জনার মুখাপেক্ষী।

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়-এর নজরুলগীতির সবটুকুই ছিল রাগাশ্রয়ী। অত্যন্তই পরিচ্ছন্ন ছিল তাঁর কণ্ঠ সেদিন। ছিল দাপট এবং মেজাজ। গানের সঙ্গে হাত তোলা নেহাতই লোক-দেখানো কারসাজি যে নয়, ভেতরের মেজাজের বহিঃপ্রকাশ—বুঝতে অসুবিধে হয়নি। আর ছিলেন রবীন্দ্রসংগীতের আসরে সুচিত্রা মিত্র—আসর ভরে-দেওয়া ন'খানি গানে যাঁকে নতুন করে পাওয়া গেল সেদিন। 'জাগিতে হবে রে'র আরম্ভের 'জা' বলে টান সুপ্তির শিকড় ধরে কীভাবে দেয় টান, 'তোমার কথা হেথা'র কোথায় লুকনো রয়েছে অনালোচনার দীর্ঘশ্বাস, 'তিমির অবগুণ্ঠনের

এ-নিশি নাহি কাটে'তে কীভাবে চাঁকতে বিষণ্ণতায় উত্তীর্ণ হয় ধ্বনিময়তার বিহ্বল আবেশ, 'ঝরো ঝরো বরিষে'র মধ্যে মেঘের গুরুগুরু ধ্বনি কীভাবে ছড়ানো রয়েছে শুরু থেকে শেষাবধি—নতুন করে জানিয়ে দিলেন সেদিন সুচিত্রা মিত্র।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

## বেহুলা

এড়িয়ে যাবার মনোভাবটা প্রতিরোধকে ক্রমশ দুর্বল করে তোলে এবং এই দুর্বলতার সুযোগেই অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়—বেহুলা গল্পের প্রধান চরিত্র শ্রীপদ মাল নিরক্ষর নিরসীকৃত একজন ওঝা হয়েও এই কথাটা বুঝতে পেরেছে। সেই হেতু সংস্কারের মধ্যে বেড়ে উঠলেও বিজ্ঞানের প্রতি তার অধিক বিশ্বাস। যদিও এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব তার মধ্যে রয়েছে। বলা বাহুল্য, গল্পটির বাস্তবিকতাও সেখানেই। "একদিনে যেখানে শত শত সাপ জন্ম নিচ্ছে সেখানে তিন-চারটে মানুষকে বাঁচিয়ে তুলে কি লাভ"—ছোট্ট এই সংলাপটির মধ্যেই বেহুলা নাটকের মূল বক্তব্যটি নিহিত। অতএব আক্রমণ হানতে হবে সেই উৎসে যেখানে সাপের বংশবৃদ্ধি হয়। একটু মনস্ক হলেই টের পাওয়া যায়, হেদোবাবুর ইটের পাঁজা আসলে একটা রূপক, যা একটি সমাজ-ব্যবস্থাকেই প্রতিফলিত করে। তথাকথিত শ্রেণীচেতনার নাটক দেখে দেখে দর্শকের নাট্যচেতনা যখন প্রায় নাজেহাল অপরূপ (নর্থ) তখন কিঞ্চিৎ আশাপ্রদ একটি প্রযোজনা করলেন মহাশ্বেতা দেবীর বেহুলা। মূল কাহিনীর আনুকূল্যে যথার্থ পালটি মেলে দিতে পেরেছেন নাট্যরূপকার (মলয় সেনগুপ্ত), ঢেউ-ডুবির ভয়টা সামলে দিয়েছে নির্দেশনার সতর্ক হাল (অসীম চক্রবর্তী), প্রযোজনার নৌকাটি তাই এগিয়ে গেছে তরতর করে।

চরিত্র রচনায় শ্রীপদর ভূমিকায় অসীম চক্রবর্তীর অভিনয়ে তাঁরই রচিত পূর্ববর্তী একটি চরিত্রের ছায়া লক্ষ করা গেলেও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সেটা খাপ খেয়ে গেছে। নিরক্ষর ওঝা শ্রীপদর বোধ ও বোধের প্রতিক্রিয়াগুলো ধারালো অভিব্যক্তিতে ধরে দিয়েছেন তিনি, যার প্রভাবে আলোচ্য প্রযোজনার অভিনয়াংশ অনেকখানি মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি আর কিছু না-হোক সংলাপে সপ্রতিভ থেকে তাপস ঠাকুর ও সুদীপ দে যথাক্রমে বসন্ত ও ডাক্তার চরিত্র দুটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলেন। অথচ প্রথার পিছুটানে বারেবারেই আক্রান্ত হন হেদোর ভূমিকায় আদিত্য দাস। অন্যান্য সকলের অভিনয়েই পরিণতির যথেষ্ট অপেক্ষা। কিন্তু কুশলী নির্দেশনায় যোগ্যতার এই তারতম্য মূল প্রযোজনাকে কোথাও লক্ষচ্যুত করেনি। শুধু

শেষের দিকে ইটের পাঁজা আক্রমণের দৃশ্য পরিকল্পনাটি একটু বেশি "নাটুকে" বলে মনে হয়, যা প্রযোজনার পক্ষে কিছুটা তালভ্রষ্ট লাগে। পংকজ ধরের আলো সংযমী কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে সর্বক্ষেত্রে ব্যঞ্জনাময় নয়। সংগীতে প্রীতি চৌধুরী প্রযোজনার সঙ্গে সংগতি রেখেছেন।

## শেষ দৃশ্যে পৌঁছে

মেদিনীপুর নন্দীগ্রাম থেকে 'উদয়ন' নাট্যসংস্থা সম্প্রতি শিশির-মঞ্চে দুটি একাংক মঞ্চস্থ করে গেলেন। পদবী ব্যবহারে সম্ভবত লাজুক জনৈক 'শংকরের' নির্দেশনায় এদিন তাঁরা যে দুটি নাটক অভিনয় করলেন তার মধ্যে রয়েছে সজল ভট্টাচার্যের 'অথ ধনপতি কথা' এবং রতন ঘোষের 'শেষ দৃশ্যে পৌঁছে।' আলোচ্য নাট্যানুষ্ঠানের সাক্ষী হতে গিয়ে যাঁরা বাস্তবিকই শেষ দৃশ্য পর্যন্ত প্রেক্ষাগৃহে বসেছিলেন তাঁদের সৌজন্যবোধের প্রতি 'উদয়ন' নিঃসন্দেহে কৃতজ্ঞ হবেন। অমার্জিত পরিচালনাই মূলত উদয়নের প্রযোজনাকে লঘু করে দিয়েছে।

**রানা দাস**

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **বিবিধ**

## নৃত্যের তালে তালে

ইণ্ডিয়ান ড্যান্স অ্যাণ্ড মিউজিক সেন্টারের দশম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন মেনকা ঠাকুর, বালকৃষ্ণ মেনন প্রধান অতিথি। মুখ্যত নাচের স্কুল। তাই মহাজাতি সদনের এবারের সাংস্কৃতিক উৎসবে প্রধানত পরিবেশিত হল নৃত্যানুষ্ঠান। ভারতনাট্যমে শ্বেতা বেরা এবং কথকে হেনা ভট্টাচার্য নিঃসন্দেহে স্কুলের গৌরব। আধুনিক নৃত্যে চন্দনা পাল সাবলীল। শিশু-শিল্পী সুদীপ্তি মিত্রের আবৃত্তিও স্পষ্টত সম্ভাবনাপূর্ণ। রবীন্দ্র সংগীতের সঙ্গে নৃত্যের যে অনুষ্ঠানটি নিবেদিত হল তাতে চারটি গানে স্কুলের ছোট-বড়ো-মাঝারি বহু ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছিলেন। এই নাচগুলি যত সযত্ন ও সচেষ্ট নিবেদন, ততটা সপ্রাণ নয়। অভিনিবেশ ছিল, স্ফূর্তি ছিল না। সলিল চৌধুরীর গানে নিয়ে তৈরী "শপথ" নৃত্য-নাট্যটিতে গানের কথা সর্বত্র শোনা সহজ ছিল না। পোশাক পরিকল্পনাতেও ছিল ত্রুটি। "আল্লা মেঘ দে" বা "আয় বৃষ্টি ঝেঁপে"তে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা সকলেই লুঙ্গি পরা কেন? প্রথমটি আব্বাসউদ্দীনের বলে? গ্রামে তো সকলেই লুঙ্গি পরে না, বেশির ভাগ কোনো কোনো গ্রামে পরতে পারে। এই নৃত্যনাট্যে "হেই সামালো" গানটি একমাত্র জমজমাট। বিরতির পর ছিল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক-নৃত্য। এই নৃত্যানুষ্ঠানটি সুপরিবেশিত, একেবারে ছোটদের "লোকনৃত্য"টিও ছিল মধুর হইচইতে ভরা।

**প্রণব মুখোপাধ্যায়**

## প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

### রণবীর সিং কালেকা (১৯৫৩—)

তরুণতম শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন তাঁদের মধ্যে রণবীর অন্যতম। বিকাশ ভট্টাচার্যের সাফল্য যে সদ্বাস্তব ছবির দিকে কিছু শিল্পীকে আকর্ষণ করেছে সন্দেহ নেই। কালেকা নিজে প্রথাগত বাস্তব ছবি ভাল আঁকতে পারেন, সুতরাং ইদানীং এই গ্রহের বিকারগ্রস্ত চেহারা আঁকতে গেলে তাঁকে সদ্-বাস্তব ছবির দিকে যেতে হবেই। কালেকা অবশ্য বলেন না, কিন্তু তাঁর ধমনীতে পাতিয়ালার রাজবংশের নীল রক্ত। এই বংশের পৃষ্ঠপোষকতা কিছুকাল হেমেন মজুমদার মহাশয় লাভ করে বিপুল ধনের অধিকারী হয়েছিলেন। শিল্প-বিপণির মালিকের বংশে ভ্যান গঘের জন্ম, আর গুণীর পৃষ্ঠপোষকের বংশে চিত্রকরের জন্ম! অলক্ষ্যে সরস্বতী হয়তো ঈষৎ হাস্যে এক একটি বংশের শিল্পকলানুরাগকে এইভাবে পুরস্কৃত করেন।

জন্ম পাতিয়ালায়। চণ্ডীগড় আর্ট কলেজের স্নাতক (১৯৭৫)। পরের বছর থেকে ললিতকলার জাতীয় প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ। ললিতকলা আয়োজিত 'ছবির দেশ' (পিকটো-রিয়াল স্পেস) প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ (১৯৭৭-৭৮)। প্রথম সর্ব-ভারতীয় সদ্বাস্তব চিত্রকলার প্রদর্শ-নীতে যোগদান (আইফেকস ১৯৭৬)। আইফেকসের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ('৭৭-৭৮)। তা ছাড়া অমৃতসর ফাইন আর্টস আকাদমীতে যোগদান করেন। পুরস্কার — ললিত কলা আকাদমীর জাতীয় পুরস্কার (১৯৭৯), সুবর্ণ ফলক, মহাকোশল কলা পরিষদ ('৭৬)। পাঞ্জাব ললিত-কলা আকাদমী (১৯৭১, ৭৫, ৭৭)।

বিত্ত বৈভবের মধ্যে মানুষ হয়েছেন। তবুও কখনো তাঁর মুখে মুহূর্তের জন্যও অহংকারের প্রকাশ দেখিনি। সবই শিষ্টাচার সহবৎ মেনে। একবার দিল্লিতে প্রকাশ কর্মকার এবং আমি পাঞ্জাবী শিল্পী দেবের বাড়িতে ছিলাম। সেই সময় রণবীর সেই বাড়িতে অতিথি ছিলেন। তাঁর চালচলনে এমন একটা বিনীত খান-দানী ছাপ ছিল যে তাঁকে না ভালবেসে পারা যায় না। ওঁর সঙ্গে ত্রামা স্কুলের আলকাজি শাহের কাছে যাওয়ার ঘটনাটা মনে থাকবে। রণবীরের হাতে একটা ক্যানভাস। আমার হাতে একটা। অবসর গ্রহণ করে আলকাজি 'ব্ল্যাক হেরিটেজ' গ্যালারী খুলেছেন। রণবীরের একটি ছবির বিষয় ছিল একটি কনট্রোল রুমের সুইচ বোর্ড, তার, পাইপের জঙ্গলে বন্দী যীশু খৃষ্ট। আলকাজি শুধালেন, ভারত-বর্ষে টেকনোলজি কোথায় মানুষকে এমনভাবে চেপে ধরেছে? এই ছবিটার ভারতীয় প্রাসঙ্গিকতা কি? ঝাড়া ঘণ্টাখানেক লেকচার। রণবীরের হাসি হাসি নিষ্পাপ মুখে কিন্তু কোন ভাবান্তর দেখিনি। পরেও এ নিয়ে একবারও অভিযোগ শুনিনি। রণবীর যে পরিবেশে যেসব দামী দামী গ্যাজেটের মধ্যে মানুষ, তাতে করে ওঁর ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা অন্য রকম। দেবের বাড়িতে সেই শিল্পী-কিশোর পাশা-পাশি নেয়ারের খাটিয়ায় শুয়ে শিল্প-কলা সম্বন্ধে প্রশ্ন করছেন। কখনো কখনো তর্ক। পাঞ্জাবী ট্যাক্সি ড্রাইভার-দের ধাবায় বসে খাওয়া। পুরনো দিল্লিতে ঘুরে বেড়ানো। অনেক দিন ধরে ওঁকে দেখেছি। আমাদের হিন্দু-স্থানী স্কুটারচালক, এক পাঞ্জাবী ড্রাইভারের ট্যাকসীর সঙ্গে ধাক্কা মারতে
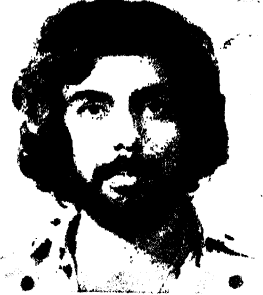
মারতে ব্রেক কষে রণবীরের সামনেই বলল, পাঞ্জাবীগুলো এসে দিল্লির বারোটা বাজাল! রণবীরের মুখে হাসি।

অথচ তাঁর ছবিতে কেমন এক বিকারগ্রস্ত, বিকৃত, ভাঙাচোরা মানুষের মিছিল। যেন্কা অনেক সময় মন্তাজের মতো। পটভূমির ভিতরে উপস্থাপনের সময় শরীরীকে কিছুটা ইচ্ছা করে অযথাস্থানে রেখে তিনি অদ্ভুত রকম খেলা খেলেন। অপ্রত্যাশিত স্থানে অদ্ভুত-দৃশ্য দেখা! তার মধ্যেই পট-বিভাজনে কিছু ওস্তাদি। শহুরে যুবকেরা নার্সিসাসের মতো অসংখ্য আয়নায় নিজের মুখ দেখছে। বা নানা রকম উৎপাদিত বস্তুর মধ্যে যন্ত্রপাতির মধ্যে ভাঙা তোবড়ানো মানুষের উপস্থিতি। মানুষ নিজেকে যন্ত্রের কারাগারে বন্দী করেছে। [illegible]আত্ম সংকট ঠিক নয়, ফুটে ওঠে [illegible] ছবিতে হলো যন্ত্রের সামনে মানুষের অসহায়তা। ওঁর ছবিতে 'ফাউস্টের' বা রক্তকরবীর সংকটের রূপটা ধরা পড়েনি। বরং মেরী শেলীর "ফ্রাংকেনস্টাইনের" মানসিকতাই প্রতিফলিত। মানুষ যন্ত্রদানবের বশ। চিত্রকল্পরূপক দিয়ে এটা বুঝিয়েছেন চমৎকার। রণবীরের ছবিতে বর্ণের স্থান গৌণ। রং-এ কিছুটা কার্পণ্য করেন। মূল শরীরী আকৃতিটাই এখানে প্রধান। উপস্থাপনের অভিনবত্বে কিছুটা অত্যাশিত ঝোঁক। স্বল্পবয়সী তো! সামনে অনেক পথ।

"আদমের অসুখগুলো" (তৈলচিত্র ১৯৭৭) ছবিতে একটা প্লাস্টিকের স্যুট হ্যাঙারের খাঁচায় ঝুলছে মানুষটা। চার-পাশে তার, বাল্ব, ক্যামেরা, মাইক্রো-ফোন ইত্যাদি যন্ত্রপাতি তাকে ঘিরে রেখেছে। সে এখন বন্দী। ছবির অঙ্কন সুন্দর এবং পট বিভাজন দারুণ।

প্যারাগন
ELPAR
এলপার কাপড়
everest/80/PTM

Interpub/AM/3/79-BN
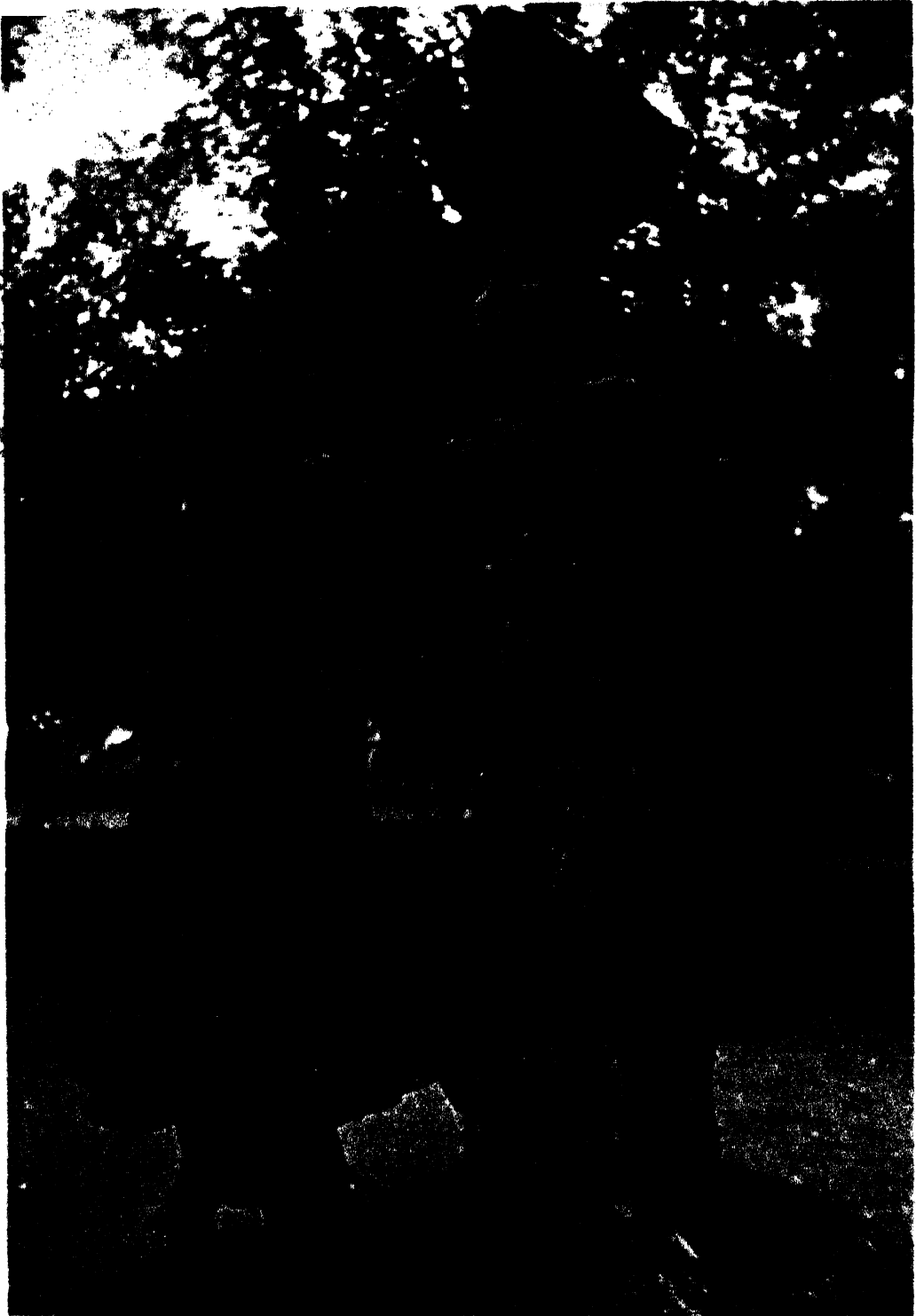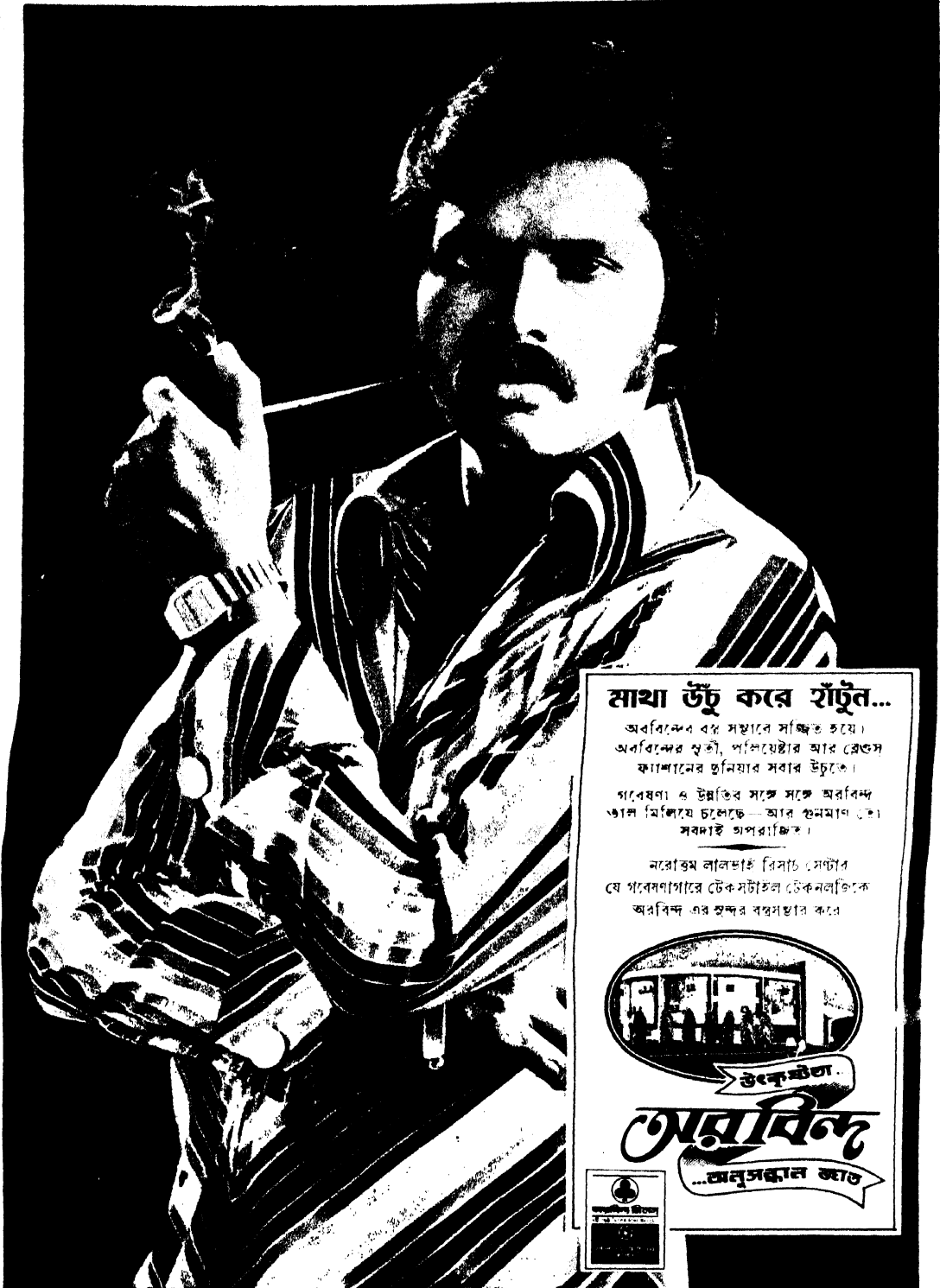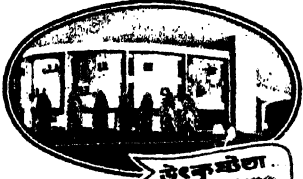
রিটেল বিক্রেতা : কলিকাতা : গঙ্গাদিন গুপ্তা, ৩২ নিউ মার্কেট ● সুনিট, এফ-২৯/৩৮ নিউ মার্কেট ● রাঁচী : মধুকুঞ্জ, মেন বাজার, বেগুসরাই ● পাটনা : চন্দুলাল দুর্গাপ্রসাদ, বাঁকীপুর ● সেলস রিপ্রেসেনটেটিভস ● আগ্রা : অরোরা টেকসটাইল ট্রেডিং করপোরেশন,৪২/১৬৪ বিলোচপুর, মোতিকুঞ্জ রোড ● কানপুর : গনেশপ্রসাদ হীরালাল, ৪৯/২৬ জেনোরল গঞ্জ ● কলিকাতা : গিরধরীলাল রামনারায়ন, পি/১০ নিউ হাওরা ব্রীজ, এ্যাপ্রোচ রোড। আসাম : জয়শ্রী টেকসটাইলস, অশোক ভবন, এস আর সি বী রোড, গৌহাটি ● ওরিষ্যা : আগরওয়াল টেকসটাইল এজেন্ট, জৌনালিয়াপট্টি, কটক।

# দাড়ি কামানোর পরে ত্বককে নির্মল, তাজা ও নরম করতে...

আপনার ত্বক স্বাভাবিক, শুকনো বা তৈলাক্ত যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, ইরাসমিক এখন এনেছে এমন এক শেভিং ক্রীম যা ঠিক আপনার ত্বকেরই অনুকূল...এর বিশেষ ফর্মুলা আপনার ত্বককে নির্মল, তাজা ও নরম ক'রে দেয়। আজই পরীক্ষা করুন—ইরাসমিক।

- এণ্টিসেপটিক — স্বাভাবিক ত্বকের জন্যে
- ক্রীম রীচ — শুকনো ত্বকের জন্যে
- লাইম ফ্রেশ — তৈলাক্ত ত্বকের জন্যে

## ইরাসমিক হাজির করছে—এমন এক ক্রীম—যা সব প্রকার ত্বকের অনুকূল

## চিঠিপত্র

### স্বাধীনতা হীনতায়

৫ জুলাইয়ের 'দেশ'-এ শ্রীতরুণ দত্তের 'স্বাধীনতাহীনতায়' লেখাটি ভালো লাগল। এই সম্পর্কে কয়েকটি কথা লিখছি।

শ্রীদত্ত ঠিকই বলেছেন যে, 'উইমেনস লিব-এর বাংলা অর্থ স্বামীমুক্তি নয়, যৌনতা থেকে মুক্তি।' অবশ্য এখানে মনে রাখা দরকার যে একজন সন্ন্যাসিনী যে অর্থে যৌনতা থেকে মুক্তি চান, কোন সাধারণ মহিলা ঠিক সেই অর্থে তা চান না—তিনি চান পুরুষের আগ্রাস থেকে মুক্তি, স্ব-ইচ্ছার প্রতিষ্ঠা এবং বেশির ভাগ সময়েই নারী-পুরুষ দিয়ে সমাজ কেবলমাত্র 'মানুষ' এই পরিচয়ের স্বীকৃতি অর্থাৎ এক কথায় দেহ-নির্ভর নারীত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি।

এই চাওয়া কিন্তু কখনোই খুব সোচ্চার বা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠেনি অন্তত আমাদের দেশে। কারণ প্রায় সেই বেদ উপনিষদের যুগের পর থেকেই সমাজ আমাদের শিখিয়েছে যে নারীর সমাদর তার অর্জিত গুণে নয়, পুরুষ নির্মিত মাপকাঠি-নির্ভর দেহ-ভিত্তিক রূপে। যে রূপ মেয়েদের আরো মেয়েলি করে—শ্রীদত্তের মতে 'কামিনী' করে। আর এই শিক্ষাকে প্রায় অবসেশন-এর পর্যায়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন সাহিত্যিকেরা।

আমাদের সাহিত্যে নায়িকারা সব সময়েই সুন্দরী, প্রায়শ তাদের একমাত্র মূল্যই তাদের সৌন্দর্যে এবং সময়ের হিসেবে যত পিছিয়ে যাবেন তত দেখবেন এই সৌন্দর্যের বর্ণনা প্রাসঙ্গিকভাবে না এসে বেশির ভাগ সময়েই অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে নায়িকার প্রথম উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আমলে তো নায়িকাদের কেবল সুন্দরী নয়, পরমা সুন্দরী হতে হতো। ছেলেবেলায় প্রায়ই আমি বঙ্কিমচন্দ্রের সব নায়িকাদের নিয়ে বিউটি কনটেস্ট আয়োজন করার স্বপ্ন দেখতাম। মজার কথা হল, যেসব লেখায় কদাচিৎ অসুন্দর নায়িকা থাকত, সেখানে লেখার বিষয়ই হত অসুন্দর হওয়ার জন্য তাদের কত হেনস্তার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাই নিয়ে। আর আমাদের মেয়েরা এইসব লেখা পড়ে হলুদ-বাটা গায়ে মেখে, নারকোলের ছিবড়ে চুলে ঢুকিয়ে ও আরো অনেক কিছু করে লোভনীয় হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করত।

বিশেষভাবে নারীত্বের এই স্তুতি এবং মেয়েলিত্বকে ভোলার চেষ্টার প্রতি অনীহা কিন্তু রবীন্দ্র সাহিত্যেও বিরল নয়। রবীন্দ্রনাথ যে নায়িকাকে বরণীয় বলে মনে করেছেন, সানাই-এর অন্তর্ভুক্ত 'অনসূয়া' কবিতায় তার পরিচয় 'সেই মেয়ে নহে বিংশ শতকিয়া ...সে নয় ইকনমিক্স-পরীক্ষা বাহিনী।' পর্বত অভিযাত্রিনী বা ক্রিকেট পারদর্শিনী মেয়েদের নিয়ে এখন যে ঠাট্টা, রবীন্দ্রনাথের সময়ে ইকনমিক্স-পড়া মেয়েদের নিয়ে সেই ঠাট্টাই করা হত। অপরদিকে বীথিকার নিমন্ত্রণ-এ রবীন্দ্রনাথ তাঁর মুগ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন এই বলে 'পিছন হইতে দেখিনু কোমল গ্রীবা লোভন, হয়েছে রেশম চিকণ চুলে।' এই মুগ্ধতা ছন্দের অপরাধে অপরাধী হতে হয় পাছে তাই চার অধ্যায়ের বিপ্লবী এলাও অপূর্ব সুন্দরী, বাঁশরির নায়িকা বাঁশরি বিলিতি-য়ুনিভার্সিটিতে পাস করা মেয়ে তাই রূপসী না হলেও তার চলে—এই সাফাই একেবারে গোড়াতেই গেয়ে রাখা হয়েছে। এর ফল সাধারণ ঘরের মেয়েরা যারা অতগুলো পাস করতে পারে না তাদের সেই হলুদ-বাটা, নারকোলের ছিবড়ের প্রতি অনন্য আকর্ষণ।

মেয়েদের বোধকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা আমাদের দেশে প্রথম ভাবেন বিদ্যাসাগর। তাঁর শত বিপত্তির মধ্যেও একের পর এক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তারই পরিচয়। বিদ্যাসাগরও কিন্তু মেয়েদের এই পুরুষ নির্ভরতার কাঠামো থেকে বাইরে আনতে সাহস পাননি, তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা ভাবেননি। তাই বিধবাদের বাবা-দাদার ঘর থেকে পাঠাবার চেষ্টা করেছেন দ্বিতীয় স্বামীর ঘরে। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, বিদ্যাসাগরের মানসিকতায় কাজ করেছে তাঁর অসাধারণ মমত্ব ও হৃদয়শীলতা। তাই মেয়েরা চিরকাল তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

আমার মনে হয় আমাদের দেশে মেয়েদের এই পরাধীন-যৌনতা থেকে মুক্ত করে দেখার কথা প্রথম বলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে এই জন্য যে তিনি কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক কারণে একথা ভাবেননি, সমাজে মেয়েদের হৃত সম্মান ফিরিয়ে দেওয়ার কারণেই ভেবেছিলেন। ঠিকই যে শ্রীরামকৃষ্ণ মেয়েদের মাতৃরূপে দেখতে বলেছিলেন কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, স্বামীরা স্ত্রীদের মাতৃসম্বোধন করে, পুত্রের মত আচরণ করে বিকৃতিকে প্রশ্রয় দেবে। তিনি চেয়েছিলেন কামিনীত্বের গ্লানিহীন মানবরূপটির প্রতিষ্ঠা। আর সাধারণ মানুষ বিশেষভাবে মাকেই এভাবে দেখতে অভ্যস্ত। কাজেই প্রত্যেক নারীর মাতৃত্বকে স্মরণ করানোর মানে তার যৌনতা বর্জিত জীবরূপটির দিকে দৃষ্টি দেওয়া। এই প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে যে, শ্রীমা সারদাদেবীর সঙ্গে তাঁর দেহ-হীন, আধ্যাত্মিক সংযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন 'আমি যদি ষোল আনা পারি, তোমরা অন্তত চার আনা করে দেখাও।' অর্থাৎ ঠাকুর তাঁর মাতৃ পূজার আদর্শের মাধ্যমে কোন অস্বাভাবিকতা বা আরোপিত বিকৃতির প্রশ্রয় সাধারণ মানুষকে দিতে বলেননি।

ভাবতে অবাক লাগে যে, মেয়েদের প্রথম আত্মপ্রতিষ্ঠ, পুরুষ-শাসন মুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন আজন্ম ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী স্বামী

বিবেকানন্দ। মেয়েরা নিজেদের সমস্যা সমাধান করবে, এই ছিল তাঁর বক্তব্য। তিনি লিখেছেন—
"I am asked again and again, what I think of the widow problem and what I think of the woman question .. am I a widow that you ask me that nonsense? Am I a woman that you ask me that question again and again?"
(Swami Vivekananda, Complete Works, Volume III P 246)

কেবলমাত্র মেয়েলিস্বকে উপজীব্য করে বেঁচে থাকার বিরোধিতা করেছিলেন বলেই বিধবা বিবাহও তিনি পছন্দ করেন নি। এই প্রসংগে তাঁর উক্তি—
"Our reformers do not see where the wound is, they want to save the nation by marrying the widows; do you think that a nation is saved by the number of husbands its widows get?"
(Complete Works, Volume VIII P 307)

বিবেকানন্দ সম্পূর্ণভাবে নারী পরিচালিত স্ত্রীমঠ স্থাপন করেন মেয়েদের স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য। এইসব মঠের মেয়েদের নানা হাতের কাজ শিখিয়ে উপজীবিকার উপায় করে দেওয়া, এবং ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়ার কথা তিনি বার বার বলেছেন। আধ্যাত্মিকতার খোলসে মোড়া থাকলেও এই মঠ কিন্তু শ্রীদত্ত বর্ণিত সেই পুরুষের তৈরি চার দেওয়াল বা চাপচিত্র থেকে মেয়েদের বাইরে খোলা হাওয়ায় অসারই উপায়মাত্র।

স্বাতী রায়
কলকাতা-২০।

জগদীশ গুপ্ত

'দেশ' পত্রিকার সাহিত্য কলমে সুব্রতবাবুর আলোচনা "জগদীশ গুপ্ত অনুপস্থিত" আমাদের মনেও ক্ষোভের সঞ্চার করে। সত্যি বলতে কী, অধিকাংশ বাঙালী পাঠকের কাছে জগদীশবাবু আজো অপরিচিত। আমি নিজেও জগদীশবাবুর লেখার সংগে পরিচিত হয়েছি অনেক পরে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসংগে নারায়ণ গংগোপাধ্যায়ের একটি আলোচনায় পড়েছিলাম, 'মানিকের সাহিত্যচিন্তার উপর যদি কারো প্রভাব পড়ে থাকে তিনি জগদীশ গুপ্ত'। কে এই জগদীশ গুপ্ত যিনি মানিকের সাহিত্যচিন্তাকে প্রভাবিত করতে পেরেছেন? তারপর হন্যে হয়ে বইপাড়ার দোকানে দোকানে জগদীশ গুপ্তর বইয়ের খোঁজ করেছি। পাইনি। অধিকাংশ বই বিক্রেতারা জগদীশবাবুর নামও শোনেন নি। হঠাৎ একদিন কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথে পুরনো বইয়ের স্তূপের মধ্যে একটা বই পেয়ে গেলাম—মেঘাবৃত অশনি। লেখক—জগদীশ গুপ্ত। সেই প্রথম জগদীশ গুপ্তর লেখার সাথে আমার পরিচয়। তারপর ১৯৭৮ সালের বইমেলায় হই হই করে বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডের প্রকাশিত জগদীশ গ্রন্থাবলী বিক্রী হয়েছে। পরে অবশ্য জগদীশবাবুর আরো একটি গল্পসংকলন প্রকাশিত হয়েছে। তবুও কয়েক দশক আগে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত যে লিখেছিলেন, 'জগদীশবাবু সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণশীল অনেকের কাছে অনুপস্থিত'—সেটা আজো সমান সত্য। আর সেটাই আমাদের ক্ষোভের কারণ। মানুষের মনের অতল অন্ধকারে ডুব দিয়ে আমাদের সর্পিল ভাবনাগুলোকে জগদীশবাবু যে নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গীতে মনস্তত্ত্বের আলোকে সাহিত্যের অঙিনায় হাজির করেছেন—তা শুধু দুর্লভ নয়, স্বতন্ত্র। কখনো কখনো তা এত নিষ্ঠুর অথচ বাস্তব যে আমাদের অস্বস্তির কারণ হতে পারে। কারণ তাতে আমাদের সভ্যতার আবু খসে পড়ে। আমরা প্রকৃতই যেমন ঠিক তেমনিভাবে অন্যের চোখে ধরা পড়ে যাই। এ প্রসংগে একটা গল্পের কথা মনে পড়ছে। গল্পটির নাম লোকনাথের তামসিকতা। লোকনাথ পেশায় উকিল; ভাল পসার; কিন্তু স্ত্রী অসুন্দরী। ছেলে বড় হয়েছে; তার বিয়ে দিতে হবে। চারিদিকে পাত্রী দেখে বেড়াচ্ছেন লোকনাথ। পাত্রী কিন্তু সহজে পছন্দ হয় না। কোনোটা কালো; কোনোটা বেঁটে আবার কোনোটা মুখরা। দিনাজপুরের মেয়েটা তাঁর ভীষণ পছন্দ হয়ে গেল, "সুন্দরী তন্বী সুঠাম লঘুদেহ বর্ণগৌরবে আর পরিমাণ সুষমায় আর শ্রীলাবণ্যের এমন একটি মসৃণ পারিপাট্য আর সুনির্মল সমগ্রতা লাভ করিয়াছে যে, লোকনাথের মনে হইল, পুরুষের এ প্রাণপণ তপস্যার সামগ্রী।" লোকনাথ এখানেই ছেলের বিয়ে দেবেন। এমন কী কোষ্ঠীগত কোনো বিঘ্ন থাকলেও তিনি পিছপা হবেন না। পাত্রীপক্ষকে লোকনাথ কথা দিলেন।

কিন্তু ভাবান্তর হলো বাড়ি ফেরার পথে। "লোকনাথের হঠাৎ জন্মিল জ্বালাময় ঈর্ষা—জীবন অতিবাহিত হইয়া গেল; দুর্ভাগ্য এমনি প্রবল যে, রূপ তাঁহার সংগে অভিন্ন একাকার হইয়া তাঁহার চক্ষুগোচর হইল না। কিন্তু পুত্র অসীম ভাগ্যবানের মত ঐ রূপ তার [illegible]খের তারায় আর প্রাণের হিল্লোলে বহন করিয়া অহর্নিশ সম্মুখে বিচরণ করিবে, আর তাহাই তিনি চিরবুভুক্ষায় শুষ্ক অন্তর লইয়া তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিবেন কেবল! ইহা হইতে পারে না....।"

বাড়ি পৌঁছিলে স্ত্রী ভবানীর প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, মেয়ে পছন্দ হয়নি। বললেন, "বিক্রমপুরের সেই মেয়েটিকেই ঠিক করে ফেলি—।"

ভবানী চমকিয়া উঠিলেন; ভীতভাবে বলিলেন, সে যে কালো!

লোকনাথ হাসিয়া মুখ তুলিলেন; বলিলেন, সে ত তুমিও।"

এই পরিবেশনা বড়ই রূঢ়, নির্মম। কারণ মেকী সভ্যতার খোলস ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমাদের কুটিল ভাবনাগুলোকে নাংটো করে সবার সামনে তুলে ধরলে আমরা বড্ড নিঃস্ব হয়ে যাই; হীন হয়ে পড়ি। মনস্তত্ত্বের

র্পণে নিজেদের প্রতিকৃতি অবিকৃত-ভাবে দেখতে পেয়ে নিজেরাই লজ্জায় মরে যাই। তাই বোধ হয় কালচারাল বা ইনটেলেকচুয়াল বলে পরিচিত বাঙালী পাঠকদের কাছে মনস্তাত্ত্বিক প্লেষণী গল্প আজো অনুপস্থিত এবং উপেক্ষিত রয়ে গেলেন।

শ্রীসকৃষ্ণ পাল
কলিকাতা-৮৪

## কণ্টকিল্পিত

দেশ পত্রিকার ১২ জুলাই, ১৯৮০ তারিখের সংখ্যায় 'কণ্টকিল্পিত' শিরোনামায় শ্রীঅতুল্য ঘোষের নিবন্ধটির প্রতি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

গত ৫ জুলাই, '৮০ কলকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্রের যে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে, তা শ্রীঅতুল্য ঘোষের নজর এড়িয়ে গেছে বলে মনে হয়। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী রাও বীরেন্দ্র সিং-এর একটি প্রতিবাদে ডঃ মিত্র যে চিঠি লিখেছিলেন তাও সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে দেওয়া হয়েছিল। ডঃ মিত্র সেদিন জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ১৯৭৯-৮০ সালে কেন্দ্রের কাছ থেকে বছরে পাওয়া ১,৬৪,০৫৪ মেট্রিক টন গমের ৯৯.২ শতাংশ সদ্ব্যবহারের জেলাওয়ারী হিসাব কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়েছে। আর কোন রাজ্য সরকার ঋণ-অনুদান সম্পর্কে কেন্দ্রের কাছে যথাসময়ে এতো খুঁটিনাটি হিসাবপত্র দিয়েছেন কিনা আমাদের জানা নেই।

তা ছাড়া, ১৯৭৮-৭৯ সালে অনাহারে কেন্দ্র ৮৮.৯৩ কোটি টাকা রাজ্য সরকারকে দিয়েছিলেন। সমস্ত হিসাব পরীক্ষা করে ভারতের কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল জানিয়েছেন রাজ্য সরকার ও-বছর ত্রাণ খাতে খরচ করেছেন ১০০.৫৩ কোটি টাকা, অর্থাৎ কেন্দ্রের দেয় অনুদান থেকেও প্রায় বারো কোটি টাকা বেশি।

প্রদীপ চক্রবর্তী
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

## নওগাঁয় লোকবসতি

৫ জুলাই তারিখের দেশ পত্রিকায় শ্রীঅতুল্য ঘোষ 'কণ্টকিল্পিত'তে লিখেছেন 'অনেক লোকের ধারণা শাদুল্লা সরকার আসামে পূর্ববঙ্গের জেলা থেকে লোক এনে আসামে বসিয়েছিলেন'। এ সম্বন্ধে দু-একটি কথা লিখতে চাই।

১৯ শতাব্দীর শেষে আসামের নওগাঁ জেলায় বিশেষ করে যমুনামুখ এলাকায় কালাজ্বর মহামারীর আকার ধারণ করে। এ রোগে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন এ রোগের কোনো কারণ আবিষ্কৃত হয় নি এবং এ রোগের কেনো চিকিৎসা ছিল না। তাই ইংরাজ সরকার রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের আলাদা জায়গায় ক্যাম্প করে রাখে এবং রোগীদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। এর ফলে নওগাঁ জেলার বহু এলাকা পরিত্যক্ত হয়। ওই এলাকা বহু বছর জনবিরল ছিল। বহু বছর এভাবে থাকাতে জমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পায়। ঐ সময় পূর্ববঙ্গের কিছু কিছু লোক যাদের হয়ত পুলিস নরহত্যা, ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধের জন্য খোঁজ করত তারা পুলিসের হাত এড়াবার জন্য ওই সব এলাকায় পালিয়ে এসে বসবাস শুরু করে। জমির উর্বরতার খবর পেয়ে ক্রমশ আরও লোক বিশেষ করে ময়মনসিংহ জেলা থেকে বহু লোক চাষাবাদ করতে নওগাঁ জেলায় আসতে থাকে। ওই জেলার অধিকাংশ লোক ছিল মুসলমান যারা চাষাবাদে ছিল বিশেষ পারদর্শী। এদের নওগাঁ জেলায় যাতায়াতের সুবিধার জন্য যাতে বিভিন্ন জংসনে গাড়ি বদল না করতে হয় তদানীন্তন A B Ry ময়মনসিংহ থেকে নওগাঁ (ময়নাবাড়ী অঞ্চল) পর্যন্ত 'থরু' (through) গাড়ির প্রচলন করে। এই মুসলমান কৃষক সম্প্রদায় আশ্চর্যজনক পরিশ্রমী ছিল। তারা এসব এলাকায় ধানের ফলন এত বাড়ায়, যার জন্য নওগাঁ জেলাকে Granary of Assam এই আখ্যা দেওয়া হয়। আসাম গবর্নমেণ্ট তখন এদের এক বছরের মেয়াদে জমির পাট্টা দিতেন এবং আলাদা নির্দিষ্ট জায়গায় বসবাসের অনুমতি দিতেন। একে সরকারীভাবে বলা হতো Line system. যখন আসামে শাদুল্লা সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সময় পরলোকগত আবদুল মতিন চৌধুরীর নেতৃত্বে মুসলীম লিগ এই Line system ও এক বছরের মেয়াদী পাট্টার তীব্র বিরোধিতা করে, কারণ এতে বিশেষ করে মুসলীম সম্প্রদায়ের স্বার্থ জড়িত ছিল। এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে শাদুল্লা গবর্নমেণ্ট Line system উঠিয়ে দেন এবং এদের স্থায়ী পাট্টা দেওয়ার জন্য আইন করেন। এর ফলে এরা স্থানীয় অধিবাসী বলে পরিগণিত হন।

সুখেন্দুভূষণ দাশগুপ্ত
কলকাতা-৬৪

## গিরিতীর্থ হিংলাজ

১২ জুলাই '৮০ সংখ্যা 'দেশে' ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়কে 'পলিটানার সিদ্ধাচল ও গিরিতীর্থ হিংলাজ' প্রবন্ধের জন্যে ধন্যবাদ। লোকের ভ্রমণ-অনুরাগ দিন দিন বাড়ছে সন্দেহ নেই। সেই জন্যে ভ্রমণ ফিচার বর্তমানে খুবই দরকার, সেই সঙ্গে দরকার তথ্য সরবরাহে যথেষ্ট সক্রিয়শীল হওয়া। আমার একাধিকবার গুজরাট ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় পলিটানাকে দেখেছি বিস্ময়ের চোখে। কতকগুলো তথ্য দিচ্ছি, পাঠকরা সংযোজন হিসাবে তা গ্রহণ করলে আশা করি উপকৃত হবেন।

প্রথমে জানাই গুজরাটে একমাত্র হিংলাজ মাতা মন্দির পলিটানাতেই আছে এমন নয়, আমেদাবাদ থেকে ৭২ কিলোমিটার দূরে নলসরোবরের একটি

নবদ্বীপেও দেবী হিংলাজের মন্দির দেখে এসেছি।

ভারতে যে সব জায়গায় জৈন মন্দির আছে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের মতে পালিটানাই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। আমার ভারত দর্শনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি ভারতে পাঁচটি জৈন তীর্থ সমান প্রসিদ্ধ। তিনটি আছে গুজরাট যথা গিরনার, পালিটানা (শত্রুঞ্জ পাহাড়) ও তারাঙ্গা পাহাড়, অপর দুটি রাজস্থানের আবু পাহাড় ও বিহারের সামেত শিখর।

শত্রুঞ্জ পাহাড়ের উচ্চতা উনি যা দিয়েছেন (২৮৭৭ ফুট) তা ঠিক নয়। প্রকৃত উচ্চতা ১৯৭৭ ফুট। পাহাড় পথের প্রায় ১০০০ ফুট উচ্চতার পার্থক্য সাধারণ যাত্রীদের বেশ ভীতির কারণ হয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আমার সঙ্গে এক মত হবেন ভরসা রাখি। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের মন্দির সংখ্যার পরিসংখ্যানেও কিছু প্রমাদ থেকে গেছে। মন্দিরের সংখ্যা ৮৬৩, এক হাজারের ওপর নয়। এ তথ্য সংগ্রহ করতে আমায় সাহায্য করেছিলেন মাংরোলের মিঃ ধীরুভাই।

তীর্থস্থান হিসাবেই যখন পালিটানাকে শ্রীচট্টোপাধ্যায় হাজির করেছেন, তখন দেবদর্শনের কিছু তথ্য লেখা উচিত ছিল। (১) সকল ৯টায় 'আঙ্গি' অর্থাৎ শ্রীআদিনাথকে অলংকারে সাজান হয়। (২) ৯টা ৪৫ মিঃ-এ স্নান করানো হয়। দর্শনার্থীরা এক ঘণ্টা ধরে তা দেখার সুযোগ পায়। (৩) ১০টা ৪৫ মিঃ-এ পুজো শুরু হয়। (৪) বেলা ৩টায় ফের রত্নরাজি ভূষিত করা হয়।

মন্দিরের অলংকার ও রত্নাদি দেখবার সুযোগও আলোচ্য প্রবন্ধে বলা নেই। এ ক্ষেত্রে জানাই, অলংকারাদি দেখা যাবে বিশেষ অনুমতি নিয়ে। অনুমতি দেবেন হিল ইনসপেক্টর অথবা আনন্দজী কল্যাণজী ট্রাস্টের ম্যানেজার।

মন্দিরের উৎসব উল্লেখযোগ্য। কার্তিক পূর্ণিমা, ১৩ই ফাল্গুন, ৩রা বৈশাখ এবং চৈত্র পূর্ণিমায় বড় উৎসব হয়। মন্দির খোলা থাকে সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

যে মুসলমান পীরের কথা উল্লিখিত হয়েছে সেই অংগারনোরের থানে বন্ধ্যা নারীরা সন্তান কামনায় ছোট্ট ছোট্ট দোলনা দিয়ে যায়। এমন একটি ঘটনার উল্লেখ শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে থাকলে পাঠকরা খুশী হত কারণ, এমনটি সারা ভারত তীর্থে একমেবাদ্বিতীয়ম্।

যাঁরা পুরাতত্ত্বে আগ্রহী শ্রীচট্টোপাধ্যায় তাঁদের একটি মূল্যবান তথ্য থেকে বঞ্চিত করেছেন। সেটি হল, রাজস্থানের দিলওয়ারা ও জামনগর জেলার খাম্ভালিয়ার কারিগর বংশই পালিটানা মন্দিরের স্রষ্টা।

পরিশেষে জানাই, শত্রুঞ্জ পাহাড় থেকে নির্গত শত্রুঞ্জ নদী প্রোজেক্ট গুজরাটের ঐ অঞ্চলকে বাঁচিয়েছে। ঐ প্রোজেক্ট ১৯৫৯ সালে শেষ হওয়ার ফলেই আজ পালিটানার সমৃদ্ধি ও জয়জয়কার।

## ধূমকেতু

২৮ জুন তারিখের 'দেশ'-এ প্রকাশিত 'সেই রাজকীয় ধূমকেতু আবার আসছে' প্রবন্ধটিতে অনেক তথ্য আছে।

কিন্তু প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদে হ্যালির ধূমকেতু সম্পর্কে একটি উক্তি আছে যা ইতিহাস-সম্মত নয়। লেখক লিখেছেন, "বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডমান্ড হ্যালি সর্বপ্রথম এর সঞ্চার পথটি আবিষ্কার করেন।" আসলে কিন্তু হ্যালির জন্ম ১৬৫৬ সালে: তিনি ছিলেন নিউটনের স্নেহধন্য সহযোগী ও বন্ধু। তাঁর আগে ধূমকেতুদের গতিবিধি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। ১৬৮২ সালে যখন আকাশে অতি বৃহৎ উজ্জ্বল এক ধূমকেতু আত্মপ্রকাশ করল, তখন হ্যালি (তাঁর স্বনামধন্য বন্ধু নিউটনের সাহায্যে) পর্যবেক্ষণ ও গণনার মাধ্যমে ধূমকেতুটির কক্ষ, পরিক্রমণকাল ইত্যাদি নির্ণয় করেন. আর তার ফলেই অতীতে প্রতি প্রায় ৭৬ বছরের ব্যবধানে ঐ ধূমকেতুটিই যে বারংবার দেখা দিয়েছিল এবং ইতিহাসে বা সমকালীন সাহিত্যে সবিশেষ উল্লেখ পেয়েছিল তা প্রতিপন্ন হয়। ধূমকেতুদের আচার-আচরণ সম্পর্কে গাণিতিক পর্যালোচনার সেই সূত্রপাত।

হ্যালির ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, ১৭৫৮ সালে ধূমকেতুটির পুনরাবির্ভাব ঘটবে। হ্যালি নিজে তাঁর হিসাবে নির্ভুলত্ব প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাননি, তার ষোল বছর আগেই (অর্থাৎ ১৭৪২ সালে) তাঁর মৃত্যু হয়, কিন্তু ধূমকেতুটি বাস্তবিকই নির্ধারিত সময় আবির্ভূত হয়ে হ্যালিকে অমরত্ব দান করে।

এই ধূমকেতুটিকে শেষ দেখা গেছে ১৯১০ সালে। আবার দেখা যাবার কথা ১৯৮৬ সালে। এ তথ্যগুলোর উল্লেখ অবশ্য সমরজিৎবাবু করেছেন।

রমাতোষ সরকার
সহকারী অধ্যক্ষ, বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম

## প্রচ্ছদশিল্পী পরিচয়

গত ৩রা শ্রাবণ ১৩৮৭ সংখ্যা 'দেশ'-এর প্রচ্ছদশিল্পী পরিচিতিতে কয়েকটি ভুল তথ্য আছে। সেগুলো সংশোধনের প্রয়োজন।

প্রথমত, আপনারা লিখেছেন— 'একবছর রবীন্দ্রভারতী সংসদের সদস্য ছিলেন।' 'রবীন্দ্রভারতী' নয়, বিশ্বভারতী হবে।

দ্বিতীয়ত, নন্দলাল বসুর কাছে শেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমি যখন কলা-ভবনে শিখছি তখন তিনি অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন এবং অসুস্থ।

ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত

## ভ্রমসংশোধন

২৬ জুলাই '৮০ সংখ্যা 'দেশে' প্রকাশিত 'পুরনো দিনের গান' কবিতার রচয়িতার নাম জয়িতা মিত্র হবে। এই মুদ্রণ ভ্রান্তির জন্য আমরা

দেশ ৪৭ বর্ষ ৪২ সংখ্যা
৩১ শ্রাবণ ১৩৮৭

## সূচীপত্র



### পরবর্তী আকর্ষণ

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ
তুমি মোর পাও নাই পরিচয়
শিবাণী চৌধুরীর ভ্রমণ কাহিনী
আজকের মেসোপটেমিয়া
তুলসী সেনগুপ্তের গল্প
শরশয্যায়

সম্পাদক ঃ সাগরময় ঘোষ

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ এবং জীবনসত্য প্রিন্টিং হাউস ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা



# কলকাতা ও জনসংখ্যা

ডেনিয়েল পি ময়নিহান, একদা যিনি আমেরিকার রাষ্ট্রদূত হিসেবে ভারতে ছিলেন, তাঁর একটি গ্রন্থে কলকাতাকে কবরখানা বলে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, কলকাতা হল মৃত ও মুমূর্ষুর নগরী ; বিশাল, পচনশীল, বিস্মৃত। পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ কলকাতার পথের পাশে শুয়ে জীবন কাটায়।

ময়নিহান-সাহেবের এই রূঢ় মন্তব্য আমাদের কানে নিশ্চয় মধু-বর্ষণ করবে না, বিশেষ করে যখন কথাটা বলেছেন সেই আমেরিকান সাহেব যাঁকে নিয়ে কিছু বিতর্ক তো হয়েছে সেদিনও। কিন্তু কথাটা কি পুরোপুরি মিথ্যে? এই নগরীর দেহে কি পচনশীলতা প্রত্যক্ষ নয়?

কলকাতার লোকসংখ্যা কত? কলকাতা কর্পোরেশনের '৭৭-'৭৮ সালের হিসেব খাতায় লেখা আছে, প্রায় সাড়ে একত্রিশ লক্ষ। হিসেবটা অবশ্য '৭১ সালের। ওই হিসেবমত বৃহত্তর কলকাতার লোকসংখ্যা সওয়া সত্তর লক্ষের কিছু বেশি। অনেকের মতে আশি লক্ষ। গত ন বছরে এই সংখ্যা আরও কয়েক লক্ষ নিশ্চয় বেড়েছে। মোটামুটি তিন লক্ষ ধরা যেতে পারে, কেননা তিন দশকের হিসেব ধরলে দেখা যায়, দশ বছর অন্তত তিন লক্ষের মতন জনসংখ্যা এখানে বাড়ছে। আশি লক্ষ মানুষের এই শহর, বলা যাক বৃহত্তর শহর কলকাতা, যা পৃথিবীর কয়েকটি বৃহৎ শহরের অন্যতম।

প্রশ্ন হল, জনসংখ্যার এই অস্বাভাবিক চাপের জন্যেই কি কলকাতা শহরের এই মুমূর্ষু অবস্থা? জনসংখ্যার চাপ অনেক শহরেই আছে, যেমন বৃহত্তর টোকিওতে এক কোটিরও অনেক বেশি মানুষের বসবাস ; যেমন নিউইয়র্কে, মস্কোতে ও অন্যান্য কিছু শহরে। কিন্তু এমন কথা শোনা যায় না যে, এই বৃহৎ শহরগুলি মৃত অথবা মুমূর্ষু। কলকাতার বেলায় শোনা যায় কেন? এ-দেশ গরীব বলে? কলকাতা শহরের পঞ্চাশ লক্ষ গৃহহীন, রাস্তায় শুয়ে ঘুমোয়—এ-কথা শুনলে আমাদের অভিমানে লাগতে পারে নিশ্চয় তবে কথাটা উড়িয়ে দেওয়া বোধ হয় যায় না। বড় জোর বলা যায়, ওটা অতিশয়োক্তি। সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করে নিতে হবে, এই শহরে ফুটপাথে-ঘুমোনো মানুষের অভাব নেই, অভাব নেই সেই মানুষের যারা রাস্তার গঙ্গাজলের কৃপায় স্নান বাসনমাজা, শৌচকর্ম ইত্যাদি নিত্যক্রিয়া সম্পন্ন করে দিনের পর দিন।

নগর পরিকল্পনায় কলকাতার আদি ত্রুটি কোথায় কী ছিল সে-প্রসঙ্গ আজ আর নতুন করে তুলে লাভ নেই। যা বাস্তব তার সমস্যা কেমন করে ঘোচানো যায় সেটাই বিবেচ্য। এই সমস্যাকে কি আমাদের নগর-পরিকল্পনাকারীরা সমাধান করার চেষ্টা করছেন? করছেন না—এ-কথা বলা যাবে না, কেননা কলকাতার উন্নয়ন নিয়ে অনেক মাথাঅলা মাথা ঘামাচ্ছেন। তবু কলকাতার অবনতি এত প্রত্যক্ষ কেন? কেন কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় দু-পাশ জুড়ে আবর্জনার স্তূপ, কেন গাড়িঘোড়া চলতে পথ পায় না, কেন প্রত্যেকটি পার্ক আজ বৃক্ষহীন, ধূলিময়, কেন হাওড়া-শিয়ালদহ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জনারণ্য হয়ে থাকে, আর কেনই বা এই শহরের আবহাওয়া নিত্য দূষিত?

কলকাতাকে বাঁচিয়ে রাখার একটি মাত্র পথ খোলা ছিল বলে শোনা যায়। বলা হত, কলকাতার কাছাকাছি উপনগরী গড়ে তুলে জনসংখ্যার এই চাপ কমানো সম্ভব। কল্যাণী উপনগরী এই মনোভাব নিয়ে গড়ে তোলা। কিন্তু কল্যাণী কি সফল হতে পেরেছে? তাছাড়া একটি মাত্র উপনগরীর সাধ্যই বা কতটুকু? উপনগরী গড়ে তোলা মানে ঘরবাড়ি তৈরী করা নয়। জনজীবনের একটি স্বাভাবিক প্রবাহ আছে—সেটিকে বজায় রাখাই প্রয়োজন। তার জন্যে চাই অফিস কাছারি, বাসস্থান, স্কুল কলেজ, হাসপাতাল, এবং সর্বোপরি রুজি রোজগারের ব্যবস্থা। কলকাতাকে সমস্ত কিছুর কেন্দ্র করে রেখে বাইরে উপনগরী গড়ে তুললে লাভের লাভ কিছুই হবে না। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। এ-রকম শোনা যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতা শহরে একাধিক অফিস রাখার জন্যে প্রতি মাসে কয়েক লক্ষ টাকা বাড়ি ভাড়া গোনেন। কেন গোনেন? এই দপ্তরগুলি অন্যত্র সরিয়ে ফেলতে অনাগ্রহ কেন? কর্মচারীরা কলকাতা ছেড়ে যেতে চান না বলেই কি? কলকাতায় কি তবে এত মধু রয়েছে? ময়নিহান-সাহেব জানতে পারেনি অনেক রহস্য। কলকাতায় শুধু রুজি নেই, কলকাতা-বিকার বলে একটি ব্যাধিও বাঙালীর রয়েছে। অবশ্য কলকাতা শুধু বঙ্গবাসীর রুজি রোজগারের জায়গা নয়, ভিন্ন প্রদেশের মানুষেরও উপার্জনের জায়গা। মনে রাখতে হবে, এদের সংখ্যা কম নয়, এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি কারণ অবশ্যই এই ভাগ্যান্বেষীরা।

সম্ভবত একটা কথা এখানে বলা যায়। কলকাতায় যেমন-তেমন কিছু উপার্জন ভিতর খাটালে করা সম্ভব, তাতে দিন গুজরান চলে। যেমন রিকশাঅলা, ফেরিঅলা, মুটে মজুরে করছে। কলকাতার বাইরে সে-সুযোগ নেই। এই শহরের বাইরে যেসব শিল্পাঞ্চল রয়েছে সেখানকার সীমাস্থিত সুযোগের সদ্ব্যবহার বোধ হয় নিঃশেষ হয়েছে। কিন্তু কলকাতাও কি নিঃশেষিত নয়? কলকাতা সম্পদ আহরণ করেনা। আজ কলকাতা সর্বস্বান্ত হলেও তার কাঠামোটুকু সে বজায় রেখেছে এই মাত্র। তবে কতদিন পারবে তা বলা মুশকিল।

ব্যঙ্গচিত্র
মধ্যবিত্ত শ্রেণী
মুদ্রাস্ফীতি
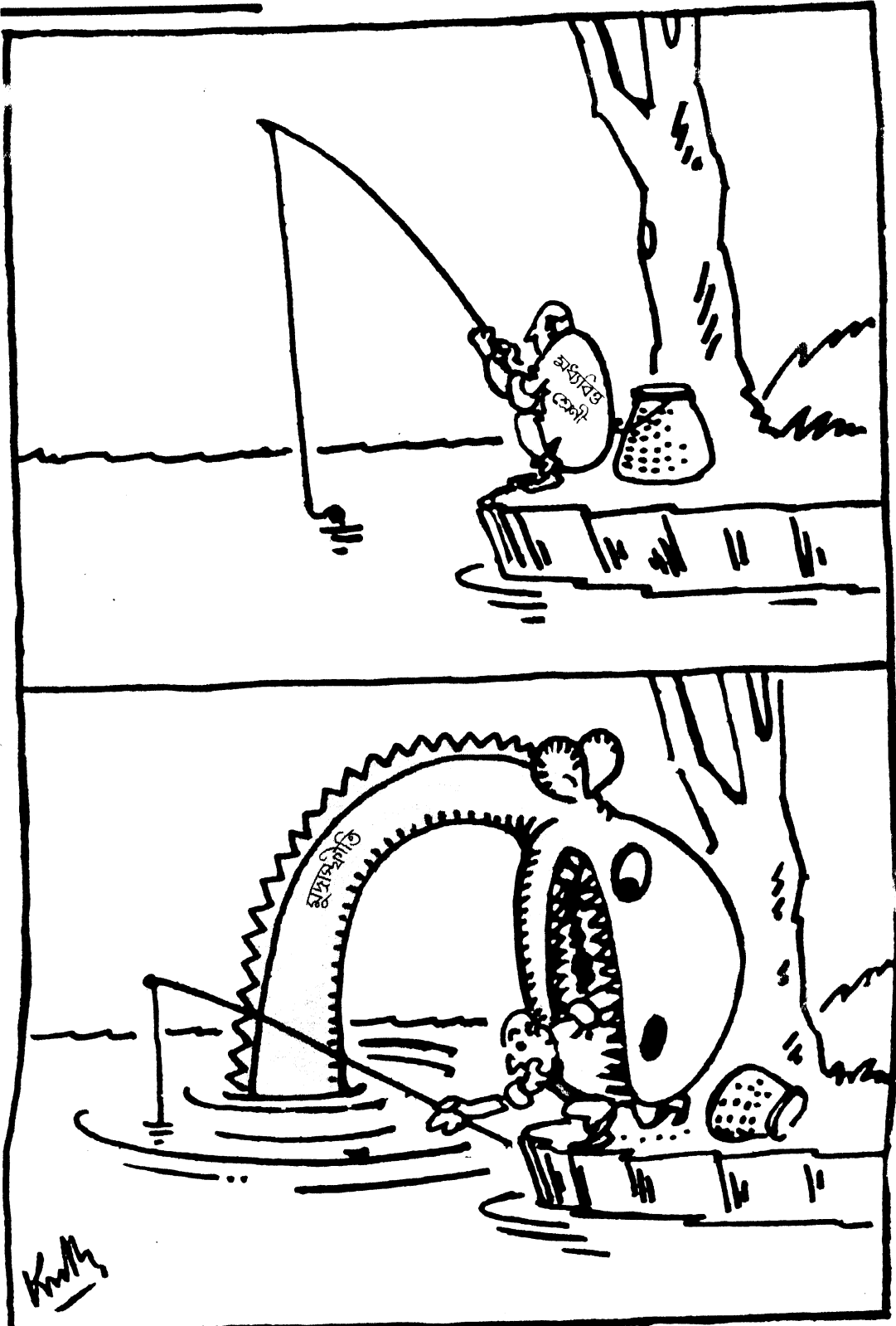
# কিঙ্করদা প্রভাস সেন

কি এক আশ্চর্য যোগাযোগের ফলে আমাদের শর শিল্প-জগতের তিনটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের আকাশে একই সঙ্গে টে উঠেছিলেন। আচার্য নন্দলাল আর তাঁর দুই ষ্য বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর। এঁদের ত্যেকেই বিংশ শতাব্দীর ভারতের শিল্প-জগতে ষ্টিশীল স্বকীয়তার অভূতপূর্ব পরিচয় রাখতে ম হয়েছেন। গুরু নন্দলাল চৌদ্দ বছর পূর্বে প্রয়াণ করেন। আজ রামকিঙ্কর গুরুকে অনু- ণ করলেন।

বিংশ শতাব্দীর ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর এবং ক্ত ক্ষমতাশালী ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল স্কর রামকিঙ্কর তাঁর যুবা বয়সে ছিলেন যেন শ 'নতুন যৌবনের দূত'। 'ক্ষেপামীর নেশায়' নিজে তে তাঁর কর্মস্থান শান্তিনিকেতনে আশেপাশের াইকেও মাতিয়ে রাখতেন তিনি—গানে, নাচে, ভিনয়ে, মূর্তি গড়ায়, ছবি আঁকায়। কোন শিল্পের ত্রেই বাঁধাধরা নিয়ম কানুনের ধার ধারতেন না। চোখ খোলা, মন উদার, অনুভূতি প্রখর। শান্তি- কেতন আশ্রমগুরুর মনের মতো ছাত্র—নিজস্ব া নিয়ে বিকশিত। শিল্পগুরু নন্দলালের দামাল ্য—শিল্পের নানা আঙ্গিক, নানা বক্তব্য নিয়ে া পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মত্ত।

১৯০৬ সালে বাঁকুড়া শহরে যুগীপাড়ায় মকিঙ্কর বেইজের জন্ম হয় ২৫শে মে তারিখে— টি সাধারণ শ্রমজীবী পরিবারে। তাঁর বাবার নাম ল চণ্ডীচরণ বেইজ, মার নাম সম্পূর্ণা। বেইজ বীটি খুবই বিরল। স্বর্গত ক্ষিতিমোহন সেনের ত পদবীটি সংস্কৃত বৈদ্য শব্দের অপভ্রংশ। বৈদ্য কে প্রাকৃত বৈজ্জ এবং তা থেকে এসেছে বর্তমান পভ্রংশ বেইজ। হিন্দু বর্ণবিভাগ অনুসারে ইজরা জাতিতে নাপিত। পুরাকালে নাপিতদের ভতর থেকেই শল্য চিকিৎসক হতেন। বৈদ্য পদবীটি াধ হয় এইভাবেই তাঁদের ভেতর এসেছিল।

ছুতোর, কামার ও অন্যান্য নানা কারিগরদের সঙ্গে বসবাসের আবহাওয়ায় পুষ্ট রামকিঙ্করের বাঁকুড়ায় স্কুলে পড়াশুনার সঙ্গে চলে কুমোরদের সাথে মূর্তিগড়া আর পোটোদের সঙ্গে ছবি আঁকা। সেকালের বিখ্যাত সম্পাদক ও রবীন্দ্রনাথের বন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নজরে পড়ে এলেন শান্তিনিকেতনে ১৯২৫ সালে। সেই থেকে সেখানেই তাঁর স্থিতি।

শিষ্যের মূর্তি গড়বার ঝোঁক দেখে নন্দলাল কলাভবনে ভাস্কর্যের ক্লাস খুললেন। ছবি আর মূর্তির কাজ সমানে চলল। আর চলল লাইব্রেরীতে দেশবিদেশের ছবির বই ঘাঁটা—আর এক নতুন জগৎ। নন্দলালের প্রেরণায় দেশের নানা শিল্প-ঐতিহ্য- গুলির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় হল তাঁর। আর ডঃ স্টেলা ক্রামরিশের সঙ্গে আলোচনায় আর শিল্পীবন্ধু অগ্রজপ্রতিম বিনোদবিহারী মুখো- পাধ্যায়ের সাহচর্যে ইউরোপের শিল্প-আন্দোলন সম্বন্ধে জাগল প্রবল অনুসন্ধিৎসা।

রামকিঙ্কর শান্তিনিকেতন আসবার পূর্বেই ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে স্টেলা ক্রামরিশ আধুনিক ইউরোপীয় শিল্প-আন্দোলন সম্বন্ধে কলাভবনে বেশ কয়েকটি বক্তৃতা দেন, যেগুলির মাধ্যমে দাদাইজম্, কিউবিজম্, সুররিয়া- লিজম্ প্রভৃতি ইউরোপীয় শিল্প আন্দোলনের ধারা- গুলির সঙ্গে কলাভবনের ছাত্র ও শিক্ষকদের পরিচিতি ঘটে। এরপরও বহু বছর ধরে স্টেলা- ক্রামরিশ শান্তিনিকেতনে আসতেন এবং শিল্পীদের সঙ্গে নানা শিল্পতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন। রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় এবং কলাভবনের ছাত্র ও শিক্ষকদের বিশেষ করে বিনোদবিহারীর উৎসাহে শিল্প বিদ্যালয়ের প্রথম যুগ থেকেই পূর্ব ও পশ্চিমের সমস্ত শিল্প-ঐতিহ্য ও আন্দোলন সম্পর্কীয় গ্রন্থে কলাভবনের গ্রন্থাগারটি ভরে উঠতে থাকে। যার কোনও নজির সে যুগে সুনিশ্চিতভাবে আমাদের দেশে ছিল না।

পাশ্চাত্যের আধুনিক শিল্প-আন্দোলনের সঙ্গে এইভাবে নিবিড় পরিচয় সত্ত্বেও কিন্তু সে সময়ে শান্তিনিকেতনে কোনও অনুকরণ প্রবণতা দেখা দেয় নি। তার কারণ সে যুগের শান্তিনিকেতনে শিল্পী ও ছাত্রদের তীব্র স্বাদেশিকতা বোধ, শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ, শিল্পকর্মের পরিপোষক বীরভূমের অপূর্ব পারিপার্শ্বিক পরিবেশ—যে পরিবেশের সঙ্গে সে যুগে আশ্রম-জীবনের কোন সংঘাত ছিল না এবং সবচেয়ে বড় কথা তিন মহা- শক্তিধর সৃষ্টিশীল শিল্পীর সমাবেশ যাঁরা একে অন্যকে সাহায্য করেছেন সমস্তরকম প্রভাবের ঊর্ধ্বে নিজস্ব শিল্প-বক্তব্য যাঁর যাঁর নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ করতে।

কলাভবনে শিল্পশিক্ষার সময় রামকিঙ্কর মূর্তি গড়বার প্রাথমিক পাঠ পেয়েছিলেন আচার্য নন্দলাল ছাড়া অস্ট্রিয়ার শিল্পী লিজ ভন্ পট আর প্রখ্যাত ফরাসী ভাস্কর বুরদেলের শিষ্যা মার্কিন মহিলা মিসেস মিলওয়ার্ডের কাছে। দুজনেই রবীন্দ্র- নাথের আমন্ত্রণে স্বল্প সময়ের জন্য কলাভবনে শিক্ষা দেন। রামকিঙ্করের দু-এক বছর পর মডেলিং ক্লাসে যোগ দেন শিল্পী সুধীর খাস্তগীর। সুধীর খাস্তগীরকে সঙ্গী করে আচার্য নন্দলালের উৎসাহ ও সহায়তায় ভাস্কর্যে হাত পাকাবার কাজ চলল, সঙ্গে চলল ছবি আঁকা—ওয়াশ, টেম্পারা আর অল রং-এ। এ ছাড়া এচিং, ড্রাই পয়েণ্ট আর তুলি দিয়ে সাদা কালোর কাজ। বিনোদবিহারী আর নন্দলালের সঙ্গে নন্দন-তত্ত্বের আলোচনা চলল শিল্প কাজের ফাঁকে ফাঁকে—আর চলল বীরভূমের রুক্ষ প্রান্তর, শাল, তাল, শিমুল, পলাশের এবং সেই পরিবেশের সঙ্গে মিশে থাকা মানুষ সাঁওতালদের সঙ্গে মিতালীর সাধনা।

ঋতুভেদে বীরভূমের বিভিন্নরূপ রামকিঙ্করকে চিরকাল মুগ্ধ করেছে এবং তার ছাপ তিনি রেখে গেলেন তাঁর ছবিতে, ড্রইং-এ, স্কেচে এবং ভাস্কর্যেও।

ছাত্রাবস্থায় সমসাময়িক বা দু-চার বছর আগেপিছে তাঁর সঙ্গী ছিলেন বিনোদবিহারী, ধীরেন দেববর্মণ, সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেন চক্রবর্তী, মণী গুপ্ত, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভি এস মাসোজী প্রভৃতি। যতদূর জানা যায় ভাস্কর্য শেখবার সঙ্গী ছিলেন শুধুই সুধীর খাস্তগীর।

শান্তিনিকেতনে কয়েক বছর কাটাবার পর রামকিঙ্কর দিল্লির মডার্ন স্কুলে শিল্পশিক্ষকতার কাজ নিয়ে যান। কিন্তু ভাল না লাগায় মাস ছয়েকের মধ্যে সে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন এবং নন্দলালের অনুরোধে কলাভবনে তাঁর সহকারী হিসাবে যোগ দেন। এর পর তাঁর সমস্ত জীবন তিনি শান্তি- নিকেতনেই কাটিয়েছেন এবং শিল্প অধ্যাপনার সঙ্গে নানা মাধ্যমে অনবদ্য শিল্পসৃষ্টির যে পরিচয় রেখেছেন তা যে কোন যুগের পক্ষে গৌরবের বস্তু।

রামকিঙ্করের শিল্পকর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসে প্রথমেই যে কথা মনে হয় তা হল একটি বলিষ্ঠ সৃষ্টিশীল মানুষের বিশ্ব প্রকৃতির প্রতি অগাধ ভালবাসা এবং বিশ্বাস ও সেই ভালবাসা আর বিশ্বাসের রূপকল্প সৃষ্টিতে তাঁর আনন্দ বেদনার অপূর্ব প্রকাশ। নানা মাধ্যমে তাঁর শিল্পকর্মের ভিতর দিয়ে তিনি জীবনের জয়গান গেয়ে গেছেন। সমস্ত বৈষয়িক বিষয়ে বা শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। সমস্ত কর্মজীবন কেটেছে যেন সৃষ্টির নেশায় সৃষ্টির আনন্দে। যে সৃষ্টি থেকে আর কোনও প্রাপ্তি তাঁর মনে স্থান পায়নি। তাঁর স্বভাবে বা কর্মে কোনও কৃত্রিমতার স্থান ছিল না। অনেকে বলে থাকেন সে যুগের শান্তিনিকেতনে তিনি ছিলেন 'রেবেল'। এবং এজন্য তিনি তাঁর কাজকর্মে অনেক বাধা পেয়েছেন। কিন্তু এ কথাগুলি একেবারেই ঠিক নয়। নন্দলাল বা রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন সৃষ্টিশীল মৌলি- কতাকে সর্বদাই উৎসাহ দিয়েছে। না হলে রামকিঙ্কর

াস্কর্যের গুরু রামকিঙ্কর

ফটো : নীরোদ রায়

বা বিনোদবিহারী তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনও সুযোগ পেতেন না। সে যুগে বিশ্বভারতীর আর্থিক অপ্রতুলতার মধ্যেও নন্দলাল বসু আয়াসে মালমশলা সংগ্রহ করে দিয়েছেন বলেই রামকিঙ্কর বড় বড় মূর্তিগুলি আশ্রমের নানা জায়গায় তৈরি করতে পেরেছিলেন। রামকিঙ্করকে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট বা কিউবিস্ট শিল্পী যাঁরা বলেন তাঁরাও ঠিক বলেন না। ইউরোপীয় আধুনিক শিল্প-আন্দোলনগুলি বুঝবার জন্য নানা শিল্প-মাধ্যমে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। বহু ছবি বা মূর্তিতেই আমরা দেখেছি একটি বাস্তব বস্তুকে তিনি কিভাবে কখনও অভিব্যক্তির দিকে কখনও বা গঠন বা আকারের দিকে ভাঙাচোরা করতে করতে এমন এক জায়গায় পৌঁছেছেন যেখানে ইউরোপীয় কিউবিস্ট বা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট শৈলীর সঙ্গে কিছুটা বাহ্যিক সাদৃশ্য দেখা গেলেও, মৌলিক পার্থক্যে শিল্পীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও বনিয়াদের পরিচয় ফুটে ওঠে।

রামকিঙ্করকে আমরা একজন প্রকৃত ভারতীয় আধুনিক শিল্পী ও ভাস্কর বলতে পারি, যাঁর আধুনিকতা বিদেশী আধুনিকতার অনুকরণ বা অনুসরণকারী নয়। বিদেশী আধুনিকতার সমান্তরাল ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ থেকেই সৃষ্ট তাঁর নিজস্ব আধুনিকতা। তিনি প্রধানত বাস্তবধর্মী শিল্পী কিন্তু তাঁর বাস্তবতা প্রকৃতির অনুকরণকারী বাস্তবতা নয়। নিজের ভালবাসার আবেগ দ্বারা পরিশীলিত প্রকৃতির শিল্পী সৃষ্ট রূপ। শান্তিনিকেতন কলাভবনের ছাতে বসে বসন্তকালে সামনের শিউলী বাগান আঁকতে বসলেন জল রং-এ, প্যাস্টেলে ছাত্রদের নিয়ে। শিউলী বনে মাকড়শার জালের মতো পায়ে-চলা পথের মেশামেশি। হলুদ আর ধূসর জমির উপর বাদামী শিউলীর ঝোপগুলি যেন পাখনা ছড়ান একগুচ্ছ প্রজাপতি। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে অনুশীলনের পাট শেষ করে আমাদের বললেন—দেখ দেখ কি অপূর্ব রং-এর বিন্যাস। রং ও রেখার কী ছন্দের অনুরণন! বিকেলেই বসে গেলেন ক্যানভাস, তুলি আর রং নিয়ে সেই ছন্দোবদ্ধ রং আর রেখার রূপ দিতে। শিল্পীর কাছে শিউলীর বাগানটি যতটা বাস্তব, রং রেখায় তার ছন্দোবদ্ধ রূপটিও তার চাইতেও কম নয়।

কলাভবনে প্রথম জীবনে সূক্ষ্ম ওয়াশের কাজ শিখলেও রামকিঙ্করের জটিলতাহীন অকৃত্রিম মানসিকতা শান্তিনিকেতনের পারিপার্শ্বিক উষর প্রকৃতি ও সেই প্রকৃতির কোলে লালিত সাঁওতালদের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পায় এবং তাঁর শিল্পকর্মের আঙ্গিকও পারিপার্শ্বিক এই বাস্তবতার উপযুক্ত প্রকাশের প্রয়োজনীয় রূপ নেয়। সংখ্যাতীত ড্রইং এবং জলরং-এর ছবির মধ্য দিয়ে এই প্রকৃতি ও তার মধ্যে বিচরণশীল মানুষের নানা রূপ রং ও রসের বৈচিত্র্য তিনি আনন্দের স্রোতের মতো ধরে রেখেছেন। তাঁর সমস্ত কাজের মধ্যে একদিকে যেমন পাওয়া যায় মাটির গন্ধ আর তীব্র আকর্ষণী শক্তি অন্যদিকে তেমনি আছে একটি রোমান্টিক জীবন-দর্শনের ছাপ।

১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি রামকিঙ্কর তেল রং-এর অংকন পদ্ধতি নিয়ে ঐকান্তিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন এবং একটি অবয়ব চিত্রকে আধার করে তেল রং এর ইউরোপীয় অংকন শৈলীগুলির অন্তত দশটি প্রতিকৃতি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তেল রং ব্যবহারের নিজস্ব অংকন-রীতি খুঁজে পান। তাঁর এই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ তেল রং-এর ছবিটি হল শিল্পামোদী মহলে পরিচিত সোমা যোশীর অংকন চিত্র। [illegible] হিসাবে শুধু মাথা বা মুখ মূর্তি অংকন করলেও ছবিতে পোর্ট্রেট [illegible] এবং সোমা যোশীর ছবিটি করবার পর কোনও নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা না করে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে যখন যেমন খুশী সেই-ভাবেই তেল রং ব্যবহার করেছেন। কিউবিক ধাঁচে করা তাঁর ছবিগুলির মধ্যে শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন ঋতুর দৃশ্যের আলোবাতাস, গাছপালা বা ভূপ্রকৃতির পূর্ণ অনুভূতি পাওয়া যায়।

শান্তিনিকেতন কলাভবন প্রতিষ্ঠার পূর্বেই অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রদের নিয়ে ভারতীয় শিল্প আন্দোলন শুরু করেছিলেন। কিন্তু তার ঢেউ তখনকার ভাস্কর্যের গতানুগতিকতাকে স্পর্শ করেনি। রামকিঙ্কর যখন শান্তিনিকেতনে ভাস্কর্যের কাজ শুরু করেন তখন পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে বা ওড়িষ্যায় ঐতিহ্যবাহী শিল্পীরা গতানুগতিক দেবদেবীর মূর্তি গড়ছেন। আর বম্বাই-এর কর্মারকার বা লখনৌ-এ হিরণ্ময় রায়চৌধুরী প্রভৃতি ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষিত ভাস্করেরা মানুষের অবয়বের হুবহু নকলের চেষ্টার মধ্যে আটকে আছেন।

দেশের নানা মন্দির বা পুরাকীর্তির ভাস্কর্যের নব মূল্যায়ন শুরু হলেও সেই সব ভাস্কর্যের পর্যালোচনার ভিত্তিতে আধুনিক ভাস্কর্য সৃষ্টির কোনও প্রয়াস তখন পর্যন্ত হয়নি। এই সব বাধা-বিপত্তি কিন্তু রামকিঙ্করের ভাস্কর্য কাজে কোনও অসুবিধার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় নি। তাঁর প্রাণপ্রাচুর্য তাঁর শিল্পীসত্তাকে এই শ্রমসাধ্য কঠিন রাস্তায় এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছে। বিদেশী শিল্পী দুজনের কাছে ভাস্কর্যশিক্ষার প্রাথমিক পাঠ নেবার পর মূর্তি গড়বার কাজেও তিনি নিজস্ব রাস্তার খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। মূর্তি গড়বার কাজে প্রকৃতির রংরেখার রূপবন্ধের শিহরন নেই। এখানে মূর্তির উপাদান ও ভরের সামঞ্জস্যের সমস্যা, আয়তন ও বিন্যাসের দৃঢ়তার সমস্যা ও স্থায়িত্বের সমস্যা শিল্পীর রূপকল্পনাকে সংহত করে।

ভারতীয় ভাস্কর্যে কোন সৃষ্টিশীল আধুনিক ধারার অভাবে এবং তাঁর ভাস্কর্যশিক্ষার প্রথম পাঠগুলি ইউরোপীয়দের হাতে হবার ফলে রামকিঙ্কর পাশ্চমী আধুনিক ভাস্কর্যের প্রতি অনুসন্ধিৎসু হলেন। এবং আকৃষ্ট হলেন ফরাসী ভাস্কর রদাঁ এবং বুরদেল ও ইংরেজ ভাস্কর এপস্টাইনের কাজের প্রতি। ফলে ৩০, ৩২ বা ৩৩ সালে করা তাঁর ভাস্কর্য রচনাগুলির মধ্যে রদাঁর এক্সপ্রেশানিস্ট রোমান্টিক ভাব ও মর্ডেলিং-এর ফর্ম [illegible] আভাস যেমন পাওয়া যায় তেমনি ঐ সময়ে তৈরী রামকিঙ্করের অত্যন্ত দক্ষতাপূর্ণ প্রতিমূর্তিগুলির ভেতর এপস্টাইনের ভাবভাবের কিছু প্রভাব দেখা যায়। বুরদেল নিজে তাঁর কাজে প্রাচ্য ভাবধারায় প্রভাবিত এবং রামকিঙ্করের ভাস্কর্যের সঙ্গে তাঁর নৈকট্য অধিক বিস্তৃত।

৩৩।৩৪ সালের পর থেকেই কিন্তু আমরা দেখতে পাই তিনি ভাস্কর্যেও তাঁর ইউরোপের আধুনিকতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পালা কাটিয়ে উঠেছেন। ইউরোপীয়ান আধুনিকতার উপলব্ধি, ভারতীয় ভাস্কর্যের ঐতিহ্য সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান এবং পারিপার্শ্বিক বাস্তবতাকে শিল্প-মাধ্যমে প্রকাশ করবার জন্য তাঁর অদমনীয় আগ্রহ তাঁকে আত্ম-প্রকাশের নিজস্ব ভাষা খুঁজে নিতে সাহায্য করল। ভাস্কর্য মাধ্যমেও তিনি কিউবিস্ট ও অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ধরনের কাজ করেছেন কিন্তু সেগুলোও শিল্প বক্তব্য নিয়ে তাঁর নিজস্ব সমস্যা সমাধানের চেষ্টার ফসল বলে কখনই অনুকরণ বা অনুসরণে পর্যবসিত হয়নি।

ভাস্কর্যের উপাদান হিসাবে রামকিঙ্কর প্রধানত ব্যবহার করেছেন মাটি, কাঁকর, বালি আর সিমেন্ট। পাথর কাঠের কাজ কিছু করেছেন পরিণত বয়সে। যৌবনের সবচেয়ে সৃষ্টিশীল সময়ে [illegible] পাথর বা ব্রোঞ্জ ইত্যাদি নিয়ে কাজ করবার আর্থিক সামর্থ্য তাঁর ছিল না। অবশ্য পরে কিছু ছোটখাট কাজ ব্রোঞ্জে ঢালাই হয়েছে নানা প্রতিষ্ঠানের জন্য।

শিল্পী ও শিল্পামোদী মহলে রামকিঙ্কর বহুদিন থেকেই সুপরিচিত হলেও সাধারণ মানুষের কাছে তিনি প্রায় অজানা। অন্তত [illegible] দশক ধরে নানা উপাদানের শিল্পকর্মের মধ্যে [illegible] থাকলেও তিনি নিজে থেকে কখনও কোন প্রদর্শনী করবার আগ্রহ দেখান নি। যখন যে মূর্তি বা ছবি তাঁর মনের আকাশে ফুটে উঠেছে সেটিকে [illegible] শিল্প উপাদানের মাধ্যমে প্রকাশের আনন্দেই তিনি পরিতৃপ্ত হয়েছেন। বড়জোর দেখিয়ে খুশী হয়েছেন অন্তরঙ্গ দু-চারজনকে। ছবি বা মূর্তিতে [illegible] পোর্ট্রেট করলেও, বিশেষ অনুরোধে দু-একটি [illegible] তিনি কোনও ফরমাশি পোর্ট্রেট করেন নি।

ভাস্কর্য-মাধ্যমে রামকিঙ্কর যে বড় [illegible] করেছেন তার একটি ছাড়া সবই [illegible] শান্তিনিকেতন বাড়ির সামনের মূর্তিটিকে [illegible] আধারকে ভাঙাচোরার পরীক্ষা-নিরীক্ষার [illegible] উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলা যায়। বড় ভাস্কর্যগুলি [illegible] তিনি করেছেন লোহা আর কোথাও তার [illegible] কাঠামোর উপর তারের জাল, [illegible] সিমেন্ট দিয়ে। আর্থিক কারণে সিমেন্টের [illegible] কম থাকায় এগুলি সবই আজ প্রায় ধ্বংসের মুখে।

এ ছাড়া তাঁর ভাস্কর্যকে প্রধানত দুটি [illegible] দেখা যেতে পারে। রচনা বা কমপোজিশন [illegible] পোর্ট্রেট। রচনাগুলির ভেতর কিছু [illegible] পরীক্ষা-নিরীক্ষা থাকলেও দুটি মাধ্যমেই [illegible] তাঁর পারিপার্শ্বিক জীবনকে নিজস্ব [illegible] মাধ্যমে পৌঁছিয়েছেন অত্যন্ত [illegible]

এগুলির বাইরে তাঁর একটি [illegible] গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল দিল্লিতে [illegible] ভবনের সামনে বিশাল যক্ষ যক্ষিণী [illegible] পূর্বে প্রায় দু বছর ধরে করা যক্ষ যক্ষিণীর [illegible] খসড়া মূর্তি। এগুলির মধ্যে [illegible] মূর্তিকে শিল্পীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলির মধ্যে [illegible] অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বহুদিন থেকে এই মূর্তিগুলির কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না [illegible] দিল্লিতে কারো বাড়িতে মূর্তিগুলি [illegible] শিল্পী এর চেয়ে বেশী মনে করতে পারেন নি [illegible] যাঁর বাড়িতে সেগুলি আছে [illegible] আছেন। রামকিঙ্করের [illegible] আশা করব কেউ সেগুলি [illegible] বঞ্চিত করবেন না।

ছবির ক্ষেত্রে রচনা ও পোর্ট্রেট ছাড়া [illegible] হয়েছে দৃশ্যচিত্র ও বীরভূমের [illegible] সাঁওতাল ও অন্যান্য সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রার অনবদ্য আলেখ্য।

॥ ২ ॥

রামকিঙ্করের শিল্প [illegible] সম্ভার, শিল্পী রামকিঙ্করও [illegible] অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন, শিশুর [illegible] সাহস নিয়ে তিনি শিল্প সৃষ্টির [illegible] করে গেছেন একাধারে মূর্তি আর ছবির ক্ষেত্রে ভারতীয় আধুনিকতার পথ নির্দেশ করেছেন [illegible] পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে। কিন্তু সেই সঙ্গে অট্টহাসিতে, গানে, তারুণ্য আর ভালবাসার উষ্ণতায় শান্তিনিকেতনে তাঁর পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকে মাতিয়ে রেখেছেন যখন ছাত্র হিসাবে আমরা তাঁর সান্নিধ্যে ছিলাম।

আমি কিঙ্করদার সংস্পর্শে প্রথম আসি ১৯৩[illegible] সালের পূজোর ছুটিতে গোপীনের দোকানে। [illegible] বছর পূর্বের কলকাতার আড্ডাখানা কফি হাউসের মতো ছিল শান্তিনিকেতনে গোপীনের দোকান। চেহারায় অবশ্য তফাত ছিল। সে [illegible] দোকান ছিল [illegible] থেকে শান্তিনিকেতনে [illegible] [illegible] বাড়িতে। কাঁচামাটি একটি [illegible] [illegible] বাঁশের খুঁটির উপর, যার মেঝে [illegible] দেড় হাত উঁচু। [illegible] নানা মাপের ভাঙাচোরা মোড়া আর তক্তাপোশ [illegible]

মোটা কাঁচের গ্লাস আর ভাঙা পেয়ালা পিরিচ। দোকানের স্বত্বাধিকারী, পাচক, বয় সবই একমেবাদ্বিতীয়ম ভাঙাচোরা যোগীন। সেকালের শান্তিনিকেতনে যোগীনের দোকানে চা খায়নি এরকম কোন লোক পাওয়া যাবে না। কফি অবশ্য সে বানাতো না।

আমি তখন কলকাতার আর্ট স্কুলের ছাত্র। তিন মাস ধরে শুধু মেলোর ভেনাস কপি করে শ্রান্ত। পুজোর ছুটিতে শান্তিনিকেতন বেড়াতে গিয়ে দিদির খালি বাড়িতে উঠেছি। সকালবেলায় তেল-রং-এ খোয়াইয়ের এক স্কেচ করে ইজেল কাঁধে দশটা নাগাদ উপস্থিত হয়েছিলাম যোগীনের দোকানে। কিংকরদা আর বিনোদদা সেখানে চা খাচ্ছিলেন—আমি তাঁদের চিনতাম না। লটবহর দেখে কিংকরদা ছবি দেখতে চাইলেন, বেশ সুন্দর উপদেশও দিলেন। তারপর আমি কোথায় আছি জেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—খাওয়া দাওয়া কোথায় হচ্ছে? তারপরই বললেন—চলে এসো এখানে, যোগীন তোফা রাঁধে। আমরাও ছুটিতে এখানেই খাই। তারপর তিন সপ্তাহ ধরে বিউলীর ডাল আর সজনেপোস্ত দিয়ে ভাত খেতে খেতে তাঁদের সংগে পরিচয় দৃঢ় হল। সংগে গিয়ে তাঁদের কাজ দেখলাম। আমার ১৮ বছর বয়সে সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। তার পূর্বে ২।৩ বছর ধরে কলকাতায় প্রদর্শনী দেখেছি; বিদেশী শিল্পীদের কাজের বই-পত্রও সামান্য দু'-চারখানা দেখেছি কিন্তু কিংকরদার কাজের বলিষ্ঠ উচ্ছলতা, রং রেখার অপূর্ব বিন্যাস আর বিনোদদার কাজের সরল ঋজু কমপোজিশনের রুক্ষ গভীরতা, রং ও রেখার পরিমিত ব্যবহার সেই অল্প বয়সে আমার মনকে অদ্ভুতভাবে নাড়া দিয়েছিল। ছুটির শেষে তাই যখন বিনোদদা বললেন কি হবে আর্ট স্কুলে পড়ে, এখানে চলে এসো, আমি সংগে সংগে আর্ট স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে গেলাম।

শান্তিনিকেতনে এসেই কলাভবনের হস্টেল কালো বাড়িতে বাইরের দেয়ালে রিলিফ-মূর্তি সজ্জার কাজে কিংকরদার চেলা হয়ে লেগে পড়লাম। কিংকরদার স্টুডিও তখন ছিল সিংহসদনের পাশের দোতলা দুটি বাড়ির একটির উপর তলায়। শঙ্খ চৌধুরী তখন কলেজে পড়তে পড়তে কিংকরদার স্টুডিওতে রাত্রিবেলা কাজ শেখেন।

যে সময়টা কলাভবনের ছাত্র হিসাবে আমরা শান্তিনিকেতনে ছিলাম সেটাই বোধ হয় কিংকরদার জীবনের সবচেয়ে সৃষ্টিশীল যুগ। ৩০ থেকে ৩৫-এর মধ্যে বয়স, অসাধারণ স্বাস্থ্য, প্রাণোচ্ছল এক মানুষ, সমস্ত জটিলতার ঊর্ধ্বে। জীবনযাত্রা-প্রণালী সহজ ও সরল।

চারদিকের পৃথিবীকে প্রাণভরে দেখছেন ভাল বাসছেন এবং পরম আনন্দে নানা শিল্প-মাধ্যমে সেই আনন্দের প্রকাশ করে চলেছেন। দিবা রাত্রি প্রায় বিরামহীন আনন্দের জোয়ার-ভাঁটা কখনও দেখিনি। সারাদিন মূর্তির কাজ চলেছে, সন্ধ্যা আর ভোর রাত্রে চলেছে তেল রং নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তার সংগে ছেলেমেয়েদের নিয়ে নাটকের মহড়া। গান তো মুখে সব সময় লেগেই আছে—মাঝে মাঝে ছাত্র বা বন্ধুদের প্রশ্নেরও জবাব দিতেন বাউলদের মতো গানে। বেশির ভাগই রবীন্দ্রনাথের গান—গাইতেন রবীন্দ্রনাথের সুরের তাঁর নিজস্ব ইন্টারপ্রিটেশনে!

তখন শান্তিনিকেতনে এতো গাছপালা ছিল না। গ্রীষ্মকালে তাপ ১০৭।১০৮° পর্যন্ত উঠতো। সেই নিদারুণ গ্রীষ্মে শান্তিনিকেতনের রুক্ষ প্রকৃতি কিংকরদাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করত। বেলা দুটোর সময় মাঠে, ঘাটে, শালবনে ঘুরে বেড়ানো তাঁর একটা নেশা ছিল। শান্তিনিকেতনে ছড়িয়ে থাকা বড় বড় মূর্তিগুলি সবই গ্রীষ্মকালে করা। গ্রীষ্মের ঠাঠা রৌদ্রে খোলা আকাশের নীচে কাজ করতে তিনি ভাল বাসতেন। আখ্যাত সাঁওতাল পরিবারের বড় মূর্তিটি গড়বার সময় মনে পড়ে গ্রীষ্মের নিঃঝুম দুপুরে কাঁকর, বালি, সিমেন্টের মশলা ছুঁড়ে মূর্তির নানা অঙ্গ ফুটিয়ে তুলছেন বা প্রয়োজনে ছেনী হাতুড়ি দিয়ে সেগুলো কাটছেন। মাথায় টোকা, ডানহাতে রবারের গ্লাভস পরা আর মুখে যতদূর সম্ভব উঁচু স্বরে গান—'দারুণ দহনজ্বালা—রস নাই রস নাই' বা 'ধরা দিয়েছি গো আমি—আকাশের পাখী' তাঁর নিজস্ব সুরে। একপাশে সরঝোপের ধারে একটি সুইস তাঁবু খাটান। প্রায়ই তার ভেতর বসে কাজ দেখছেন আমাদের সবাই-এর মাস্টারমশাই নন্দলাল বসু। মাথায় ভেজা গামছা জড়ান আর হাতে বিড়ির বান্ডিল পাশে চায়ের ফ্লাকস। মাঝে মাঝে ডাকছেন—এসো হে কিঙ্কর, একটা বিড়ি খেয়ে নাও। তোমরাও একটু চা খাও।

তখন রবীন্দ্রনাথ বেঁচে। বহু বিখ্যাত লোক তাঁর সংগে দেখা করতে আসতেন। অনেকেই কলা-ভবন ও তার শিল্পীদের খোঁজখবর করতেন। কিংকরদা এই সময় সর্বদা পলায়ন করতেন—আশ্রয় প্রায়ই যোগীনের চায়ের দোকান। মাঝে মাঝে সেরকম না-ছোড়-বান্দা লোকের পাল্লায় পড়লে আমরা তাঁকে ধরে আনতাম।

মৃত্যুর বছরখানেক আগে বোধ হয় গুরুদেব বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর দিন ফুরিয়ে আসছে। সে সময় তিনি কদিন ধরে গাড়িতে বসে সমস্ত শান্তিনিকেতন ঘুরে দেখছিলেন। একদিন কলাভবনে এসে কিংকরদার খোঁজ করলেন—কিংকরদা প্রথামতো পলায়িত। ধরে নিয়ে আসবার পর গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন তোকে দেখি না কেন রে? কিংকরদার জবাব—আপনি কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, আমিও তাই থাকি, আপনার কাছেই তো আছি। তুই তো এতো মূর্তিটূর্তি করছিস, বুড়োটার তো কিছু করলি না—এরপর মরে গেলে আপসোস করবি—গুরুদেব হেসে বললেন। এর কিছুদিন পরই কিংকরদা গুরুদেবের আবক্ষ মূর্তিটি তৈরি করেন যা নিয়ে ক'মাস পূর্বে এতো হইচই হল।

গুরুদেবের মৃত্যুর পর অবনীন্দ্রনাথ বিশ্ব-ভারতীর আচার্য হয়ে কিছুকাল শান্তিনিকেতনে ছিলেন। রোজ সকালে এসে কলাভবনের বারান্দায় বসতেন আর ছাত্র শিক্ষক সবার সংগে নানা আলোচনা করতেন। শুনেছেন তাঁর নিজের প্রিয় 'ওয়াশ' পদ্ধতিতে ছবি আঁকবার রেওয়াজ তখনকার কলা-ভবনে উঠে গেছে। হঠাৎ সেদিন কিংকরদা সামনে পড়ে গিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিলেন। অবনীবাবুর হুকুমে আমরা তাঁকে 'ধরে নিয়ে' এলাম। পালাচ্ছিলি যে বড়ো? ওয়াশ শেখাতে পারিস না তাই বকবো বলে পালাচ্ছিস, না? কিংকরদা হেসে বললেন, অনেক কিছু তো শিখছে, এখন ওয়াশ না শিখলেও চলবে। "নিজে পারিস না তা শেখাবি কি করে তাই বল?" কিংকরদা আবার হেসে বললেন—পারি। পাশে জানালার নিচে ছিল নতুন ফোটা দোলনচাঁপার গাছ। অবনীবাবু জ্বলন্ত সিগার সুদ্ধ হাত দুলিয়ে বললেন—বেশ আজ তোতে আমাতে কমপিটিশন—ওয়াশে ঐ দোলনচাঁপার ছবি হবে—তিনদিন সময়। ওরে আমাদের দুটো বোর্ড, কাগজ টাগজ দে তো রে। নন্দলাল তুমি হবে জজ।' দুদিন পরই কিংকরদাকে বিকেলে ডেকে পাঠালেন 'কদ্দুর হল? শুরু করেছো তো?' 'শেষ করে ফেলেছি'। 'সেকি গো, নিয়ে এসো, নিয়ে এসো'। ছবি এলো, দেখতে দেখতে উঠে দাঁড়ালেন—কিংকরদাকে জড়িয়ে ধরলেন তারপর উচ্চৈঃস্বরে ডাক 'নন্দলাল আর জাজ করবে কি? তোমার ছাত্তর আমায় হারিয়ে দিলে।' তারপর কি তাঁর আনন্দ। আমরাও হতবাক হলাম সেই ছবির অতি সূক্ষ্ম ও কোমল রেখা ও রং-এর বিন্যাস দেখে। কিংকরদা তখন বড় বড় মূর্তি গড়ছেন আর নয়তো বিরাট ক্যানভাসে জুতার বুরুশের পোঁচড় মেরে তেল রংএ বড় বড় ছবি করছেন।

১৯৬০-৬৫ সাল পর্যন্ত কিংকরদা দাপটে কাজ করে গেছেন। শান্তিনিকেতনের বাইরে বড় কাজ করেছেন ৪০-এর দশকে নেপালে ওয়ার মেমোরিয়াল—অজানা শহিদ সৈনিকের মূর্তি। আর ৬০-এর দশকে ২৪ ফুট উঁচু দুই যক্ষ যক্ষিণীর মূর্তি দিল্লির রিজার্ভ ব্যাংকের সামনে। গান্ধীজীর বড় ব্রোঞ্জের মূর্তি একটি আছে আসাম গৌহাটিতে। তাঁর অসুস্থ অবস্থার কাজ। এর মূল মূর্তিটি শান্তি-নিকেতনে আছে সিমেন্টে গড়া। ছাত্ররা সাহায্য করে-ছিলেন এটি গড়তে।

আমাদের পূর্বে কিংকরদার প্রথম ভাস্কর্যের ছাত্র ছিলেন রুদ্র হানজী। বছর দুই পূর্বে তিনি পরলোকগমন করেন। তারপরই আমরা কজন শঙ্খ চৌধুরী, রবী চট্টোপাধ্যায় আর আমি। এরপর যাঁদের নাম মনে পড়ছে তাঁদের মধ্যে আছেন কৃষ্ণ রেড্ডি, ধর্মানী, জিতেন্দ্রকুমার, সুষেন ঘোষ, সুরেন দে, বিপুল সাহা, বলবীর সিং কাট, প্রণব দেববর্মন ও অবতার শিং পারমার ইত্যাদি।

গত ১লা আগস্ট শুক্রবার রাত্রি সাড়ে বারটায় আমরা দেশের এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, মহান শিল্পী রামকিংকরকে হারিয়েছি। বেশ কয়েক বছর ধরে অসুস্থ শিল্পীকে গত এপ্রিলের প্রথমে পশ্চিমবংগ সরকার চিকিৎসার জন্য শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার সুখলাল কারনানী মেমোরিয়াল হাস-পাতালে আনবার ব্যবস্থা করেন। এই কমাস ধরে বিচক্ষণ চিকিৎসকদের নিয়ে গঠিত একটি মেডিকাল টিম তাঁর চিকিৎসা করছিলেন। এতদিন বহু যত্ন নিয়ে তাঁর দেখাশুনা করতেন কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র শচিব্রত দেব।

শরীরের কিছু অংগ প্রত্যংগের স্বাভাবিক কাজকর্মে ব্যাহত হওয়ায় গত ২৬শে জুলাই তাঁর মস্তিষ্কে একটি সাধারণ অস্ত্রোপচার করে 'শান্ট' নামের একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র বসান হয় মস্তিষ্কের একটি অংশের রক্ত চলাচল ব্যবস্থার সুরাহা করবার জন্য। ধীরে ধীরে তিনি সুস্থ হয়ে উঠছিলেন, ৩০শে জুলাই ভোরের দিকে হঠাৎ গুরুতর সেরেব্রাল থ্রমবসিস্ রোগে আক্রান্ত হয়ে অজ্ঞান হয়ে যান এবং ডাক্তারদের সমস্ত চেষ্টা বিফল করে দুদিন পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কিঙ্করদার কোনও দিনই নামের মোহ ছিল না। প্রচার বা প্রদর্শনীর দিকে কখনও নিজে কোন উৎসাহ দেখাননি। তাঁর কাজের অসাধারণত্ব কিছু গুণিজনকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছে আর শান্তি-নিকেতনের বড় বড় মূর্তিগুলি টেনেছে কিছু সাধারণ মানুষকে।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে তাঁর কাজ সম্বন্ধে কোনও উপযুক্ত পুস্তকাদি না থাকায় দেশে বা বিদেশে এতো বড় একজন শিল্পীর ব্যাপক পরিচিতি নেই। ১৯৫০ সালের কাছাকাছি ২-৩ বছর ফরাসী দেশের রিয়ালিতে নুভেল গ্রুপ তাঁর কিছু ভাস্কর্য প্যারিসে প্রদর্শন করেছিলেন। কিন্তু পাঠাবার হাংগামা, খরচা ইত্যাদি তাঁকে এ বিষয়ে নিবৃত্ত করেছিল। এ ছাড়া বিদেশে দু'একটি জায়গায় ভারত সরকার প্রেরিত প্রদর্শনীর সংগে তাঁর দু'চারটি কাজ প্রদর্শিত হয়েছে। দেশেও ৮ বছর পূর্বে বিড়লা অ্যাকাডেমীর প্রদর্শনী ও প্রায় ১৫-২০ বছর পূর্বে কলকাতা আর দিল্লিতে তাঁর গুণমুগ্ধদের আয়োজিত দুইটি প্রদর্শনী ছাড়া শান্তিনিকেতনের বাইরে তাঁর কাজের একক প্রদর্শনী আর হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

আমি ১৯৫৪ সালে রোমে বড় বড় শিল্পী ভাস্করদের এক জমায়েতে তাঁর মূর্তির কিছু ফোটো-গ্রাফ দেখিয়েছিলাম। তাঁরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তাঁর কাজ সম্বন্ধে প্রকাশিত সমস্ত পুস্তকাবলী পাঠাতে অনুরোধ করেছিলেন এবং কোনও বইই নেই শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলেন। আমি দেশে ফিরে দিল্লির ললিতকলা আকাডেমির তদানীন্তন সম্পাদককে একথা জানিয়েছিলাম। সেখানে শিল্পীদের রাজনীতি ভেদ করে একটা চটি বই ছাড়া আর কিছু প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি এখনও পর্যন্ত। তাঁর ছবি ও মূর্তিগুলি জাতীয় সম্পদ সেগুলি সুষ্ঠু রক্ষণা-বেক্ষণের ভার আজ দেশের উপর ন্যস্ত হল।

## মানুষের অপেক্ষা এখন

সুধেন্দু মল্লিক

সব তো হচ্ছিলো ভালো সব চলছিলো বেশ ভালো
সামনের করতালি পিছনের মন্দিষ্ঠ গুঞ্জন
সহসা ছাপিয়ে গিয়ে বেজে উঠলো
সাহেবের অর্কেষ্ট্রার মতো।
মুখপদ্মে বারংবার আলোর আঘাত আহা ক্লিক ক্লিক
ক্লিক ক্লিক কিল্লুক।
ফুলের মালাও যেন বলবো কি—ভেসে এলো,
গলায় জড়িয়ে গেলো বাহুর আদরে।

তখনি আচমকা খুব ভয় হলো, কোনদিন ওব্যেস তো নেই!
বল্লাম মূর্খের দল ছেড়ে দে আমাকে ধিক্ ধিক্—
অমরত্ব পাওয়া যায় এতো সহজেই?
ছেড়ে দে ছেড়ে দে বলছি। বলতে বলতে ছুটছি ছুট ছুট ছুট।
ধপাস পড়েছি যেই ওই সব ধেয়ে আসছে এবার তো মালা নেই হাতে।
এ যে লাঠিসোঁটা! এই ধরে। ধরলো রে। কারো কি করো কি বলে
হঠাৎ জাগ্রত, সিনেমার বিরতি যেমন।

দুয়ারে রৌদ্রের বাঙ্গ। মুখ ঠুকছে অতি ক্রুদ্ধ কাক।
বাজে স্বপ্ন! একটুকু বুদ্ধি করে না চেঁচিয়ে চেপে গেলে হতো।

## অমরত্ব ও একটু বোকামি

নীরদ রায়

মানুষের অপেক্ষা এখন একা—
তার নিকটে কোনো রোদ্দুর নেই,
শুধু প্রকৃত সুন্দরের নষ্ট হয়ে যাওয়া ঘরবাড়ি মাথার মুকুট.
সমস্ত দেখা তাই কী ভীষণ দুঃখের পাশে উবু হয়ে বসা—
কুসুমের শীর্ণ সময় বোঝেনি বৃক্ষের অক্ষম কোলাহল
দৃশ্যের সংসার তাই প্রায়শই ভুল পথ, ভুল নারী.
ভুল নদীর দিকে—;

মানুষের অপেক্ষা এখন একা—
তার নিকটে কোনো রোদ্দুর নেই,
উজ্জ্বল প্রজন্ম নিয়ে সমস্ত আঁধারের যৌবন তাই সহসা
ঢুকে যায় প্রত্যেকটি মানুষের নিজস্ব ভূমণ্ডলে—
এলোমেলো খেয়ে ফেলে—যা কিছু দুষ্প্রাপ্য সোনালী প্রতীক,
মতিচ্ছন্ন ফসলের মাঠ!
আসলে, মানুষের অপেক্ষা এখন বড় একা!

## জলবিন্দু

সুনীল বসু

তোমাকে চিনেছি আজ আমি ক্ষেমঙ্কর
ক্রমে ক্রমে ধোঁয়া হ'য়ে আসে পরমায়ু,
আমাকে আঘাত দিল নিয়ত বর্বর
কোন অভিশাপ?
আজ নৈরাশে উদ্বায়ু!

বিষে বিষে নীল হ'য়ে এলো সব শিরা
কিছুতে কিছুই নেই ভাল আর নেই
নিষ্ফল আমার দেখা জলবিন্দু ভেঙে ভেঙে হীরা
যতবার বাঁধি গান ততবার ছিঁড়ে যায় খেই।

নিয়তির কুলিশ-কঠোর এই অদৃশ্য কুঠার
নেমে এসে ছোঁবে ক্লান্ত ঘাড়
মৃত্যুর হিমানী গর্ভে প্রবল শীতলে
মরে র'ব, অনর্থক স্মৃতির পিতলে!

চিনেছি তোমাকে শোনিতস্রাবী হে চাঁদ
তুমি সেই মান্ধাতা জল্লাদ,
দুই চক্ষুতে সিন্ধুর লবণাক্ত বারি
উথলিয়ে, চেনাতে কি চাও
যূথভ্রষ্ট নারী?

## অধম

মানস রায়চৌধুরী

ধর্মান্তরিতের কাছে ধর্ম ও অধর্ম বলে হয়তো কিছু আছে
দৃশ্য থাকে মন্দির, গথিক চূড়া অথবা গম্বুজ
ঘুমোতে যাবার আগে ইষ্ট বীজমন্ত্র খুঁটিনাটি
প্রাণায়াম, জপমালা আঁধারে আলোয়—
যাদের সে সব নেই তাদের পথের আড়াআড়ি
চলে গেছে অবিশ্বাসী নদীটির স্রোত
জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো দিনান্তের রোদ
ধর্ম আর অধর্মের মাঝামাঝি অদৃশ্য দেওয়াল গড়ে তোলে।

সে দেওয়ালে পা ঝুলিয়ে বসে আছে দুজন প্রেমিক
'দুজনেই দুজনের জন্যে জন্মেছিল'
ওদের পৃথিবী জুড়ে ফাল্গুন বাতাস বইছে, আর
গীর্জার ঘণ্টার চেয়ে গাঢ়তর অন্তর-স্পন্দন।
দূরে থেকে যদি দেখতে পাওয়া যায়, তবে কাছে যাওয়া কেন
দূরত্বের চেয়ে এই অসহিষ্ণু পাগল সময়
চারপাশে ঘূর্ণী তুলে বলে ঃ ভেবে দেখো
গম্বুজে আজান শোনা যায়, দূরে মন্দিরে আরতি
ধর্ম তো গিয়েছে কবে কতদিন আগে
অধর্মের অর্থ বুঝতে বাকিটা জীবন
দেওয়ালে কি বসতে হবে পা ঝুলিয়ে
কাকে সঙ্গে নেবে?
ধর্মহীন মধ্য রজনীর খেদ হাতে তুলে নিলো
ঠাণ্ডা জল, সর্পগন্ধা গাঢ় নীল ঘুমের মশারি।

# ামকিংকরের ভূমণ্ডল

## ূর্ণেন্দু পত্রী

"সাহিত্য নিজেকে প্রকাশ করে কিন্তু তার ভিতর দিয়ে, আর পেনটিং রেখা রঙের সমন্বয়ে আমাদের পারসেপশন এমনকি সেনসেশনকেও গড়ে তোলে স্থির অবয়বে। নেচারের কাছে কারুর গদগদ্ হওয়ার কিংবা ভীষণ অনুগত ওয়ার অথবা আত্মসমর্পণ করার দরকার নেই। যেটা দরকার, সেটা হল নিজের ডল আর সবার উপরে নিজের প্রকাশ-মাধ্যমের উপর দখল। তোমার সামনে রয়েছে তার ভিতরে ঢুকে পড়ো আর যতটা সম্ভব যুক্তিযুক্তভাবে সেটা প্রকাশ রতে চেষ্টা করো।" সেজান

"যেখানে যত লাইন আছে সব আয়ত্ত করা উচিত। নেচার হচ্ছে দেবশিল্পী। ত সুন্দর সুন্দর লাইন সৃষ্টি করে চলেছেন। সে সব শিখে নিয়ে মনে রেখে র প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে হবে।" রামকিংকর

"ইনস্টিটিউশন, পেনসন, অনারস,—এগুলো স্থূল-রুচি, প্রতারক আর সকেলদের জন্যেই।" সেজান

"গান্ধিজী আঁকলেই ফার্স্ট প্রাইজ, অন্য কিছু করলে মার খেতে হবে, তা য় চলতে পারে না। শিল্পী সব সময় পথে রয়েছে। সে চলছে। কোথাও টিকে নেই।" রামকিংকর

"ল্যুভর হল এমন একটা বই, যা দেখে আমরা পড়তে শিখি। তাই বলে মেরা কখনোই আত্মতুষ্ট হয়ে আটকে থাকবো না আমাদের শ্রদ্ধেয় পূর্বসুরীদের জ্বল ফরমুলায়।" সেজান

"আমাদের ক্লাসিক্যাল গান একভাবে ইনফিনিটিকে ধরছে, শুধু সুর দিয়ে, নুভব দিয়ে। কথা দিয়ে নয়। গুরুদেবের গান আবার আরেকভাবে সেই নফিনিটিকে ধরছে। সেখানে সুরের সঙ্গে কথাও আছে, অর্থও আছে। ছবিতেও াই—কখনও বর্ণনা বা অর্থ দিয়ে ধরা হয়, কখনও হয় অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের র্ণনা বাদ দিয়ে শুধু রাগিণীর মত রূপ দিয়ে। আমরা তো শিল্পের শিক্ষার কটা ওড়াচ্ছি না। শিল্পের মূল মন্ত্রগুলি শিখতে হবে। কিন্তু আজকের নে এই আর্টের প্রতিও প্রবণতা রয়েছে, লোকে আনন্দ পাচ্ছে—সেটা কেন স্বীকার রা হবে না।" রামকিংকর।

২ ॥

সালটা সম্ভবত ৫১। তখন আর্ট স্কুলের ছাত্র। তখন গরগরে আবেগের য়স। কাকার উপর রাগ করে চলে গিয়েছিলাম শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায়। ায়ে কম্বল। পকেটে ফাউন্টেন পেন। হাতে কিছু কাগজ, স্কেচ করার। গান ুনছি, মেলা দেখছি, আড্ডাও চলেছে, তারই ফাঁকে ফাঁকে চলেছে স্কেচিং। াউন্টেনপেনের নিবের টানে রেখা। আর নিবের পিঠে বুড়ো আঙুল ঘসে সেই ালিতে দরকার মত শেড। সেবারে সদ্য আলাপ হয়েছে তিন জনজন্ম(?) ুবকের সঙ্গে। অমিতাভ চৌধুরী, এখন যিনি ডাকসাইটে সাংবাদিক। অমর্ত্য সেন, এখন যিনি দিগ্বিজয়ী অর্থনীতিবিদ। আর বুদ্ধিদীপ্ত প্রশান্ত শুভময় ঘোষ। স্কেচগুলো দেখে অনেকেরই ভালো লেগেছিল। অমিতদা দেখেই বললেন—

—চলো।

—কোথায়?

—কিংকরদাকে দেখাবো। আসল লোক, যার সার্টিফিকেট পেলে বুঝবে, কছু হয়েছে।

ভয়ে আধমরা। কিংকরদা মানে রামকিংকর? শান্তিনিকেতনের বাগানে যার ইসব দুর্ধর্ষ মূর্তি? সর্বনাশ। অত বড় শিল্পীর কাছে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কন? অমিতদার আশ্বাস—

—মানুষটাকে আগে দেখ, তারপর বুঝতে পারবে কেন নিয়ে যাচ্ছি।

মানুষটাকে দেখলাম। কালো পাথরের একটি জীবন্ত ভাস্কর্য। খালি গা। পরনে আধময়লা লুঙ্গি কিংবা খাটো-ঝুলের পাজামা, যে-রকম পাজামা পরে টোকা াথায় নন্দলাল হেঁটে যান শালবীথির ছায়ায়। শক্ত চোয়াল। সামনে এগিয়ে াসা ঠোঁট। পেশীবহুল আঁটসাট শরীর। চোখ দুটো যেন বুঁদ হয়ে আছে কসের নেশায়। যে-রকম রোজ দেখা যায় সে-রকম কোনো মানুষ নয় যেন। াদের চেয়ে আদিম, তাদের চেয়ে অনেক বেশি অকৃত্রিম, স্বাভাবিক।

গোটা পাঁচেক স্কেচ। প্রত্যেকটা মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন। আর ামি দেখতে লাগলাম তাঁর ঘর বাড়ি, তাঁর জীবনযাপনের পরিবেশ। গৃহসজ্জা লতে যা বুঝি তার চিহ্নমাত্র নেই কোনখানে। কুঁড়েঘরের মতো একটা ঘর। ভতরে একটা চৌকি। চৌকির উপর অতি সাধারণ বিছানা। দেয়ালে দেয়ালে হেলান-দিয়ে-রাখা দরজা-সমান অয়েল পেন্টিং। এদিকে সেদিকে ভাস্কর্যের ুকরো-টাকরা। বাস্ট একটা। অনেকা স্বাস্থ্যবতী যুবতীর-মুখ। এইভাবে ুরতে ঘুরতে চোখটা চলে গেল চৌকির নীচেয়। সেখানে মেঝের উপর ডাঁই য়ে পড়ে রয়েছে হাজার খানেক কিংবা তারও বেশী চিঠিপত্র, খাম-পোস্টকার্ড-ার্সেল-প্যাকেট সব মিলিয়ে। মনে হল অনেক চিঠির গায়ে প্রাপকের হাতের ছাঁয়াটুকুও পড়েনি এখনো।

চাপা গলায় অমিতদাকে জিজ্ঞেস করলাম—

—চৌকির নীচে এত চিঠি জমা হয়ে আছে কেন?

—ঐখানেই তো থাকবে। কিংকরদার চিঠি আবার থাকবে কোথায়?

—দেখে তো মনে হচ্ছে অনেক চিঠি খোলাই হয়নি এখনো।

—কিংকরদা কি ওসব খুলে পড়বে নাকি? ওর মধ্যে দেশ-বিদেশের নিমন্ত্রণ পত্র আছে, অ্যাডমায়ারারদের কত প্রশস্তি আছে, খুঁজলে দু চারটে চেক-টেকও পাওয়া যাবে হয়তো।

অমিতদার এইসব কথার গায়ে মিশে ছিল এক ধরনের তরল হাসি। কিন্তু আমার কাছে সবটাই ধাঁধার মতো। কিংবা অবিশ্বাস্য কোনো রূপকথা। আমাদের এইসব চাপা-গলার কিচির-মিচিরের মধ্যেই বেজে উঠল রামকিংকরের তীক্ষ্ণ ভরাট কণ্ঠস্বর।

—এই যে এটা এঁকেছো...

এগিয়ে গেলাম কাছে। যেন আঁষবটির দিকে মাছ।

—এই যে এটা এঁকেছো, এটা ঠিক হয়নি।

রামকিংকরের হাতে তখন যে-স্কেচ, সেটা একটা মালকোঁচা-মারা বাচ্চা সাঁওতালের। তার হাতে-মুখে একটা বাঁশী। সেটা বাজাচ্ছে। আরও একটা বাঁশী তার দুই জঙ্ঘার ফাঁকে গোঁজা। রামকিংকর সেই জঙ্ঘার ফাঁকে গুঁজে রাখা বাঁশীটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—

—এটা বাদ দেওয়া উচিত ছিল। ঠিক হয়নি।

কাঠগড়ায় দাঁড়ানো সাক্ষীর গলায় আমি বললাম—

—ছেলেটার ঐখানে একটা বাঁশী ছিল।

—সেটা তো বুঝতে পেরেছি। তুমি মন থেকে আঁকনি। কিন্তু রিয়্যালিটির সবটাই কপি করতে নেই। কিছু ছাড়তে হয়, বাদ দিতে হয়, জুড়তে হয়। কেউ কেউ তো মনে করতে পারে ওটা বাঁশী নয়, ছেলেটার নুনু। হাঃ হাঃ হাঃ। কনফিউশন হতে পারে তো। হাঃ হাঃ হাঃ।

পাথর ফাটিয়ে যে-ঝরনা নামে, ঝরনা-কল্লোলের মতো সেই হাসির সঙ্গে ঐ আমার প্রথম সাক্ষাৎকার। কলকাতায় তখনো পর্যন্ত যে-সব হাসি দেখেছি, সেগুলো চায়ের পেয়ালার মধ্যে ঠোঁট ডুবিয়ে চুমুক দেওয়ার মতো চাপা এবং মুচকি। তাই চমকে উঠেছিলাম প্রথমে। অবজ্ঞার অট্টহাসি নয়তো এটা? পরে, বেশ কিছু পরে, বুঝে গেলাম এই হাসি হল সভ্যতার সেই প্রথম যুগের সমবেত বিজয়-উৎসবের দামামা-দুন্দুভির বোল।

এরপর অমিতদার অনুরোধে তিনি খুললেন তাঁর কিছুকাল আগের শিলং-সিরিজের ছবিগুলো। সবই ওয়াটারকালার। প্রথমে মোটা ব্রাশে রঙ চাপিয়ে পরে

প্রতিকৃতি (স্কেচ)—পূর্ণেন্দু পত্রী

কনট্যুরের বা বহিঃসীমার রেখা টেনেছেন ঐ কাঁচা রঙের ঘা ঘেঁষেই চাইনিজ কালিতে তুলির বাঁটের পিছন দিয়ে। ফলে কোথাও কোথাও রঙের জল পেয়ে চাইনিজ কালি ছড়িয়ে গেছে ফার্নের মতো, শিরাবহুল শিকড়ের মতো। যা হতে পারতো মনোমুগ্ধকর দৃশ্য শুধু, এই নিয়ম ভাঙার ফলে তা হয়ে উঠেছে অনেক বেশী প্রাকৃতিক, আরো অরণ্যগন্ধী, এবং এলিমেন্টাল। শিলং যেন নড়ছে, চড়ছে, দুলছে গাছ, হাঁটছে মেঘ, রঙ বদলাচ্ছে রোদ, গাছ শিকড় নামাচ্ছে মাটিতে, খসে পড়ছে কিছু, কেউ যেন জড়িয়ে যাচ্ছে কারো সঙ্গে আলিঙ্গনে-মন্থনে।

ঐ এক দিনের আলাপে আমার অভিজ্ঞতার সংখ্যা হল চার।

১। চিত্রকলা বাস্তবের হুবহু অনুকরণ নয়।

২। কাঁচা রঙের উপর চাইনিজ কালির রেখা টানলে সেটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে তৈরী হয় এক আকস্মিক আদিমতা।

৩। তুলির বাঁটের পিছন দিয়ে রেখা টানলে তা হয়ে ওঠে অনেক গতিশীল, ক্ষিপ্র, সরল, সবল এবং বৈদ্যুতিক ঝলকের মতো রূপবান।

৪। পৃথিবীতে কিছু কিছু মানুষ জীবনযাপন করেন না, জীবন সৃষ্টি করেন শুধু।

॥ ৩ ॥

সেজান প্রসঙ্গে রামকিংকর—

১। "সেজানের ছবির ভিতরে ঢোকা যায়, কেননা সেজানের ছবি ফ্ল্যাট নয়, ওতে ভল্যুম আছে।"

২। "পাশ্চাত্ত্য ছবি অনেক দেখেছি, সেজানকেও ভালো লাগে, কিন্তু সম্প্রতি একটি পত্রিকাতে দেখলাম যে আমি নাকি বলেছি—সেজানকেই ভালো লাগে। তা কিন্তু না, নট নেসেসারিলি, তবে সেজান কিউবিজমটাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন।"

রামকিংকরের প্রসঙ্গে সেজান ঃ

১। "তাঁর কিছু নিসর্গচিত্র সেজার প্রতিধ্বনি। বাংলাদেশের মাঠে নদীতে যে আলো, তাকে প্রতীচ্য প্রিজমে ভাগ করার, ভাঙার এই নিদর্শনগুলি আমাদের উপকারী সম্পদ।"—গণেশ পাইন।

২। "রামকিংকরের কোনো কোনো ছবিতে—যেমন ১৯৪৪-এ আঁকা হলদের ছোপ-মাখানো নীল-সবুজ-ল্যাণ্ডস্কেপে—সেজানের প্রভাব চোখে পড়ে,..."—প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত।

৩। "In most of his paintings there is a happy and unself-conscious co-mingling of impressionist light, Cezanian space, cubist plains and transparency and the verve of oriental calligraphy"—Ratan Parimoo.

৪। "Some of these (watercolour studies) have a slightly Cezannesque feel because of the treatment"—Jaya Appasamy.

॥ ৪ ॥

খরার দেশ বাঁকুড়া আমাদের দেশের শিল্পকলাকে উপহার দিয়েছে দুই প্রখর প্রতিভা, যামিনী রায় আর রামকিংকর। দুজনেই আজন্ম শিল্পী। দুজনেরই শিল্পী হয়ে ওঠার প্রাথমিক প্রেরণা স্থানীয় লোকশিল্প। যামিনী রায় গোড়ায় পাশ্চাত্ত্য বা য়ুরোপীয় করণ-কৌশলে পুরোপুরি হাত পাকিয়েও একদিন কপিলাবস্তুর রাজকুমারের ভঙ্গীতে সুখী-জীবনের সমস্ত সুখ-সাধকে পিছনে ফেলে চলে এলেন বাংলার লোকশিল্পের কাছে, মিথ্যে অনুকরণের জ্বালা যন্ত্রণা থেকে নিজের স্বাধীন মুক্তির প্রার্থনায়। তাঁর দীর্ঘ বেদনার্ত তপস্যায় মুগ্ধ হয়ে বাংলার লৌকিক পট একদিন তাঁর হাতে তুলে দিল চূড়ান্ত সিদ্ধিলাভের সোনার কাঠিটি। দীর্ণ-বিদীর্ণ যামিনী রায়, সেই চাবিটি পাওয়ার পর হয়ে গেলেন শান্ত, সমাহিত, স্থিত। রামকিংকর সে-রকম কোনো চাবি পেলেন না তাঁর জীবনে। [illegible] তার কারণ তিনি কোথাও স্থিত হতে চাননি, আর শান্ত-সমাহিত জীবন [illegible] তাঁর পক্ষে অকল্পনীয়। যেমন তাঁর প্রবল প্রপাতময় হাসি, সেই রকমই প্রব[illegible] আলিঙ্গন ছড়িয়ে তিনি ধরাতে, ছুঁতে, ঘাটতে, নিংড়োতে চেয়েছেন শিল্পকলার সবখানের সব কিছুকেই। নিজের এক অপ্রকাশিত আত্মচরিতে তিনি নির্দ্বিধায় বলে গেছেন—,

"জীবনে অনেক মেয়ে এসেছে, কেউ দেহ নিয়ে, কেউ মানসিক তীব্র আকর্ষণ নিয়ে। কিন্তু ছাড়িনি কাউকে। ধরেছি, আষ্টেপৃষ্ঠে ধরেছি। হজম করে ছিবড়ে করে ছেড়েছি। হজম করার মানে জানো? ও মন্ত্রটা আমার গুরুদেবের কাছে শেখা। তার থেকে জন্ম নিয়েছে আমার অনেক ছবি, মূর্তি, অনেক কল্পনা, আর অনুভব।"

ঠিক এইভাবেই শিল্পকলার ক্ষেত্রে পৃথিবীর যেখানে যা কিছু জীবন্ত, যা স্পন্দিত করে চলেছে সৃষ্টির জগৎ, তার সব কিছুর দিকেই কখন যেন আড়চোখে তাকিয়ে নিয়েছেন তিনি। গোপনে কখন যেন শুঁকে নিয়েছেন তার গন্ধ, চিবিয়ে নিয়েছেন শাঁস, শুষে নিয়েছেন একেবারে ছিবড়ে করে তার অস্থি-মজ্জা। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ যা, আর ঠিক যেভাবে তিনি দেশান্তরের সাহিত্য থেকে খুঁজে নিয়েছেন অন্তঃপ্রেরণা, বাংলা কবিতার আকাশকে টেনে ছড়িয়ে দিয়েছেন পৃথিবীর অনেক দূরের আকাশে; অবনীন্দ্র-নন্দলালের যুগে রামকিংকরেরও যেন ছিল সেই রকমই আত্মানুসন্ধান। জীবনানন্দের কবিতার দিকে তাকিয়ে আমরা কেউ হয়তো কখনো দেখেছি ইয়েটস কিংবা পো-র এক টুকরো দ্যুতি, কখনো বা কীটস-হুইটম্যানের এক ঝলক আলো; ঠিক তেমনি ভাবেই আমরা রামকিংকরের ছবিতেও খুঁজে পাই সেজানের, পিকাসোর, ব্রাকের হঠাৎ আলোর ঝলকানি কখনো কখনো। আমাদের মনে গরম দুধের ফেনার মতো উথলে ওঠে তখন এই সব অসংখ্য জিজ্ঞাসা—তিনি কি কিউবিস্ট? শেষ পর্যন্ত কি দক্ষ-

্যালিজমের দিকে ঝুঁকতে চেয়েছিলেন তিনি? অ্যাবসট্রাক্ট আর্টের দিকে কি ছিল র মাড়ীর টান? অবনীন্দ্র-নন্দলালের অনিবার্য প্রভাবকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যেই তিনি বেশী করে ঝুঁকে ছিলেন ওয়েস্টার্ন ধারার দিকে?

শেষ পর্যন্ত কোনো উত্তরই কাজে লাগে না আমাদের। কেননা তার আগেই, ও নিমগ্ন হয়ে তাঁর সমগ্র শিল্পকলার দিকে তাকাই যখন, ঠিক জীবনানন্দের তের মতোই আমাদের চোখে ধরা পড়ে যায়, পৃথিবীর নানা কিছু আত্মসাৎ রও তিনি সগৌরবে স্বকীয় এবং সন্দেহাতীতরূপে দেশজ।

৫ ॥

পাশ্চাত্য শিল্পকলা প্রসঙ্গে রামকিংকর—

১। "অনেকেই ওয়েস্টার্ন ইনফ্লুয়েন্সের কথা বলেন, কিন্তু ওয়েস্টার্ন ইনফ্লু-ন্স' বলতে একটা ভয়ানক গোলমাল হয়ে যাবে, আমাদের এটা ভুল কিন্তু এক ক দিয়ে। যেমন ধরুন, আমাদের শিবলিঙ্গ। এটা কি ওয়েস্টার্ন?"

২। "পিকাসো আমার চিরদিনই ভালো লাগে। শান্তিনিকেতনে এই সব য়স্টার্ন মাস্টারদের ছবি দেখার কোনো অসুবিধে ছিল না, খুব ভালো প্রিন্ট ল এইখানে, বইও ছিল কতো। এই যে পিকাসোর কথা বলছেন, ওঁরও তো কন্নরেই অ্যাকাডেমীক্যাল, স্টুডেন্ট হিসেবে নাম করেছিলেন, ভালো হাত ছিল। র থেকেই ভ্যারী (vary) করেছে।"

৩। "পিকাসোর যেমন ভাঙা ভাঙা গড়ন সব, দেখেছ তো? ওই সবের মধ্যে রয়েন্টাল ছাপ আছে অনেক। মডার্ন, মডার্ন, আধুনিক।"

৪। "ডাইমেনশন মানেই হচ্ছে, সামনে যেটা দেখছি, তার পিছনটাও যে আছে, ই পিছনদিকের ফীলিংটা ফোটানো। কিউবিজম্ ব্যাপারটারও মূল এইখানেই। । কি? কিউবিক ছবিতে দেখবেন দু'রকম ভাবে মুখ আঁকা। এটা অবশ্য ধুনিককালের সৃষ্টি এই কিউবিজম-এ শুধু নয়, চিরকালের কথা। জন্তাতে দেখবেন, আয়নাতে চুল আঁচড়াচ্ছে মেয়ে। তিনটে ফিগার। তারা -টা উল্টে দিয়েছে, তলার পা দেখা যাচ্ছে। তা এটা তো সেকালের জিনিস, জকাল করলে বলা হতো খুব মডার্ন হয়েছে, কিউবিক হয়েছে—কিন্তু তাতো । এখানে সব দিকের ডাইমেনশান একসঙ্গে ধরতে চেয়েছে। কিউবিজম্-এও টা করা হয়। পিকাসোর ছবিতে দেখুন, তিনটে চোখ, কোথাও নাকটা সোজা নে পাশে চালিয়ে দিয়েছে। চোখ আর নাকের ট্রুথফুলনেসটা আছে কিন্তু। ব দিকের দেখাটাকে একসঙ্গে ধরে রাখাটাই কৃতিত্ব। এতে টোটাল এফেক্ট কিন্তু ্যাবসট্রাক্ট হয়ে যায়।"

৫। "কিউবিক আবার অন্যভাবেও বোঝানো যায়, কোনো জিনিসের, যেমন ন এই বইটার, তিনটে সাইড দেখা যাচ্ছে, তার এধারটা এরকম, ওধারটা অন্য কম, আরেক ধার আরেক রকম, বইটা আঁকতে গেলে তিনটে ধারের শেপ কি রকম বে অ হলে ভাবুন। এই রকম দৃষ্টিভঙ্গীতেও কিউবিজম এসে যাচ্ছে।"

৬ ॥

এখন আমাদের জানা হয়ে গেছে যে রামকিংকর দুটো মানুষ। তাঁর দুটো রার একটা দিন আর একটা রাত। দিন ফুটেছে তাঁর ছবিতে। রাত ভাস্কর্যে। না হয়ে গেছে, কারণ তিনি নিজেই জানিয়ে গেছেন ঐ রকম কথা—

"জীবনের উদ্যানে যেটা দেখি চোখের সামনে দিনের আলোয় তা ছবিতে আঁকি, ার যা টাচ্ করি অন্ধকারে তা স্কাল্পচার করি।"

ছবি আর ভাস্কর্যের কথা বাদ দিলেও দিন রাতের দুই রামকিংকরকে অন-াবেও দেখেছি আমরা, দেখেছে শান্তিনিকেতন। দিনের রামকিংকর গ্রীষ্মের রূপ দহন দিনে, আগুন-ঝরানো রোদের মধ্যে গড়ে চলেছেন ভাস্কর্য। আর তের রামকিংকর মধ্যরাতে তাঁর দরাজ গলার সমস্ত জানলা-দরোজা খুলে দিয়ে বীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গাইতে হেঁটে চলেছেন খোয়াই-এর দিকে। দিনের রাম-িংকর তাঁর ছাত্রদের ধমকাচ্ছেন তারা বেসিক স্ট্রাকচার শেখেনি বলে। রাতের ামকিংকর ছাত্রদের পরামর্শ দিচ্ছেন—কাল রাতে যে যা স্বপ্ন দেখেছো তাই নিয়ে কটা কিছু তৈরি করো।

দিন এবং রাতের এই দুই শিল্পী মিলেমিশে এক। যেন এক ডালে পনিষদের দুই পাখি, দ্বা সুপর্ণা, একটা ঘুমের অন্যটা জাগার। আবার এই ুম ও জাগাকে ভর করে আমরা যদি চলে আসি চেতন এবং অবচেতনের প্রসঙ্গে, ামকিংকরের বেলায় সেটাও পেয়ে যায় তাৎপর্যের মহিমা। চেতনেও তিনি, বচেতনেও তিনি। যখন সময় বা ইতিহাস-চেতনায় শিল্পী তিনি গড়ছেন ভিস্তিওয়ালা, কাঁধের বাঁকে সংসার এবং শিশুকে বয়ে নিয়ে চলা সাঁওতাল দম্পতি, লের ভোঁ শুনে ছুটে চলা সাঁওতাল রমণী, ধান ঝাড়ায় ব্যস্ত কৃষক, আঁকছেন ুধ-দাঙ্গা, বন্যায় বিপন্ন মানুষের ছবি, তাঁর লিনোকাটে ফেটে পড়ছে দুঃস্থ-ুর্গত মানবমূর্তির বীভৎস-বিকৃত মুখ-ছাঁদের আর্ত হাহাকার, তাঁর স্কেচে ধরা ড়ছে সাধারণ মানুষের দৈনিক জীবনযাপনের ঘাম-রক্ত, হাসি-কান্না, শোক-সন্তাপ, ানন্দ-বেদনা, ফুর্তি-উল্লাস। সেই সব মানুষের হাড়-গোড়, অস্থিমজ্জা, চোয়াল-চিবুক, বাহু-স্তনের দিকেই তাঁর যেন অধিকতর ভালবাসা, যারা ছিন্ন হয়ে আছে দেশও, যাদের নিরন্ন জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তই সংগ্রামে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। এই ছিন্ন-বিচ্ছিন্নতার চেহারা অথবা ধারণা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখি তিনি বির জমিকে কোথাও অখণ্ড করে না জুড়ে, রঙের নানা মাত্রা জুড়ে, নানা কোণে মিকে ভাগ করে, ভাঙা কাচের টুকরোর মতো ছড়িয়ে-সরিয়ে দিতে চাইছেন ব সময়।

তাঁর বাস্তব-ঘেঁষা ছবিতে ঘুরে ফিরে আসে আরও একটা মোটিভ। সেটা

কলসী কাঁধে বালিকা (জল রং)—রামকিংকর

শিশুরে। তাঁর সাঁওতাল রমণীর স্কাল্পচারে আমরা দেখেছি একটি ন্যাংটো শিশু ছুটে চলেছে মায়েদের পিছন-পিছন। আবার সেই রকমই এক শিশু বাঁকের মধ্যে জবুথবু, গুড়িসুড়ি মেরে বসে রয়েছে সাঁওতাল দম্পতির ভাস্কর্যে। তাঁর নানা অয়েল পেন্টিংয়েও দেখা যায় এক অনাদৃত অবহেলিত রুগ্ণ শিশু, কখনো আঁকড়ে আছে জননীর শুকনো স্তন, কখনো পড়ে আছে ধান ঝাড়ার দৃশ্যের এক কোণে ভিজে মাটিতে, পুড়তে থাকে গ্রীষ্মের গনগনে দুপুরে কোনো কোনো শিশু জড়িয়ে থাকে মায়ের পা, মা যখন ধান কাটছে মাঠে। মা এবং শিশু এই নামে একটা ভাস্কর্যও রয়েছে তাঁর। হাঁটু মুড়ে বসা মা আর সেই মায়ের দিকে, মায়ের সর্বাঙ্গ পেয়ে সাপের মতো, গাছের শিকড়ের মতো উঠে যেতে চাইছে একটি শিশু। এরকম ভয়ানক ভাস্কর্য খুব কমই দেখেছি আমরা। যেন মা নয়, শিশু নয়, পৃথিবীর আদিমতম কোনো জীবজন্তুর কংকাল অথবা ফসিল। শত-শতাব্দীর মাটির তলা থেকে উপড়ে তোলা কোনো গাছের গুঁড়ি হয়তো বা, পচে-গলে-নষ্ট হয়ে গেছে যা অনন্তকাল আগে। আবার এমন ভাস্কর্যও রয়েছে যেখানে শিশু নেই, শুধুই মা, শুধুই একটি রমণীর আবক্ষ, যার হাড়-কঙ্কালসার রুক্ষ, কৃশ, কদর্য, মূর্তির মধ্যে সবচেয়ে পুষ্ট, পাকা ফলের মতো রসালো হয়ে ঝুলে রয়েছে দুটি স্তন। কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসা দুটো চোখ আর দুই ভাঙা চোয়ালের মাঝখানে বিস্তীর্ণ করাল হাসিটির দিকে তাকিয়ে আমরা বুঝতে পারি না একি অদূরবর্তী শিশুর জন্যে আহ্বান, না পৃথিবীর শিশুদের মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে মাতৃত্বের শব্দহীন বিলাপ? বাস্তবের অথবা চেতনার রামকিংকর তাঁর অনেক ছবিতেই আমাদের আধুনিক দেশকাল সম্বন্ধে তাঁর চোরা হাসিটিকে এইভাবেই লুকিয়ে রাখেন তাঁর ছবিতে, ছোরা যেমন করে লুকনো থাকে খোদাই-করা খাপে।

অবচেতনের রামকিংকরও আরও জটিল এবং ভয়ংকর।

তাঁর সঙ্গে বছর চারেক আগের এক সাক্ষাৎকারের বিবরণ থেকে উদ্ধৃত করছি একটু। সাক্ষাৎকারের সময়ে রামকিংকর ছাড়াও মাঝে মাঝে এসেছে তখনকার একমাত্র নির্ভরশীল বন্ধু এবং ছাত্র বড়ুয়ারও স্বগতোক্তি।

"শুনেছি এক মণিপুরী মেয়ে এসেছিল। রাজপরিবারের মেয়ে। রাম-কিংকরদা ওই মেয়েটার একটা পোর্ট্রেট করেন। যদি দ্যাখো তুমি, বুঝতে পারবে, কী সাংঘাতিক কাজ ওটা। গোটা ক্যানভাসটা যেন জ্বলছে। জীবন্ত। আগুনের

কম্পোজিশন (জলরং)—রামকিংকর

মতো। চোখ দুটো ঠিকরে আসতে চাইছে যেন। ঐ রকম লাইভ্‌লি কাজ আমি দেখি নি। ...মানে প্রচণ্ড একটা টান ছিল। রামকিংকরদার মন অই প্রোট্রেটটা দেখলেই বোঝা যায়—ভেতরের, সম্পূর্ণ সাবকনশাসের মানুষটাকে টেনে বের করে আনা একেবারে। মেয়েটি চলে যায়।"—সিদ্ধার্থ রায়, রামকিংকর

আর এই প্রসঙ্গেই আমাদের স্বাভাবিকভাবে মনে পড়ে যায় তাঁর প্রিয়তম ছাত্র এবং ভারতীয় শিল্পের জগতে প্রতিষ্ঠাবান ভাস্কর শঙ্খ চৌধুরীর কিছু কিছু উষ্ণ, উত্তপ্ত অভিযোগ। এই অভিযোগের সূত্রেই আমরা বুঝতে পেরে যাবো, যে এলিমেন্টাল প্যাশন রামকিংকরের ভাস্কর্য এবং ছবিকে জাগিয়েছে এক প্রাণময় গতি, অস্থিরতা, সেই প্যাশনই তাঁকে, শান্তিনিকেতনের সেই আরম্ভের যুগের কলুষ্ক পরিবেশেও, কী ভাবে উন্মোচিত করেছিল জীবনের অবচেতন-সত্তাকেও নিজের সৃষ্টির বিষয় হিসেবে বেছে নিতে।

"ব্রহ্মচর্যাশ্রমে কটিবাসহীন মূর্তি বা যৌনযুগল বন্ধন ভাস্কর্যে পরিণত করার অসীম সাহস দেখানোর স্পর্ধা সহজে মেনে নেওয়া সহজ নয়, এবং তা স্বভাবতই হয়নি। নন্দলাল প্রায়ই যে ক্ষমার আদর্শ প্রদর্শন করেছিলেন, সেটা ওঁরই গৌরব। যদিও দু-একটা কাজ আশ্রমবাসীর ও ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টির অগোচরে সরানোও হয়েছিল। রামকিংকর এই ধরনের শিল্প করার সময়, কাল ও স্থানের গন্ডী পার হয়েছিলেন কোনো উৎসাহ বা পারিতোষিকের প্রত্যাশা ব্যতিরেকে। ওঁর শিল্পপ্রয়াস অনুপ্রাণিত হয়েছিল তখনকার ক্ষণভঙ্গুরে, লাবণ্যময়ী ছবির মাজাঘষা বাঁধাধরা প্রাণহীন সুন্দরতার বন্ধনমুক্ত হওয়ায়। সেখানে তিনি বিদ্রোহী হলেও, সেই বিদ্রোহের ইন্ধন রবীন্দ্রনাথের স্বতঃস্ফূর্ত ছবির নতুনত্বে ও অবনীন্দ্র-নাথের কুটুম কাটামের অভিনব প্রণালীতে সমাহিত ছিল। ...নন্দলাল ছিলেন রামকৃষ্ণ-অরবিন্দের ভক্ত সাধক, বিনোদবিহারী বই পড়েছেন প্রচুর, জ্ঞানী পন্ডিত, সব কাজ আধুনিক রীতিতে মাপজোক করে করতেন। রামকিংকর সেখানে সাধক কাপালিকের মতো মাংসপেশী নিংড়ে ছবির রস বার করেছেন, নরমুণ্ড, অস্থি কংকাল দিয়ে স্কাল্পচার করেছেন।"—শঙ্খ চৌধুরী।

অভিযোগ ফেটে পড়েছে আরও এক শিল্পীর রচনায়। সে রচনায় চোখ পাতলেও আমরা দেখতে পাই এক বিদ্রোহী রামকিংকরের ছবি, যিনি ধরা-বাঁধা বিষয়ের সীমাকে অতিক্রম করে ঢুকে পড়তে চান জীবনের মর্মমূলে, প্রকাশ করতে চান জীবনের আদিমতম সমস্ত পিপাসাকে মরাল রেস্ট্রিকশনের যাবতীয় কাঁটাতারের বেড়াজাল ছিঁড়ে ফেলে।

"রামকিংকরের একটি অপূর্ব ভাস্কর্য—'হারভেস্টিং'। একটি মুণ্ডহীন নগ্ন নারীমূর্তি ধান ঝাড়ছে—সেটা এখন দেখা যায় না। ওঁর আরও কিছু কাজের মতো এটিও গোপনে সরিয়ে ফেলা হয়েছে? কারণ—অশ্লীল। কি অদ্ভুত মানসিকতা! মোট কথা রামকিংকরের সব কাজেই একটা অর্গানিক গ্রোথ লক্ষ করা যায়। তা ছাড়া আমার নিজের ধারণা রামকিংকরের কাজের মধ্যে 'সেক্স' প্রাধান্য রয়েছে। কথাটাতে ভুল বুঝবেন না, আমি রামকিংকরকে নিছক 'এরোটিক আর্টিস্ট' বলতে চাইছি না, বরং বলা যায়, তাঁর কাজে একেবারেই অহেতুক 'সেক্স'-এর প্রয়োগ নেই। রামকিংকরকে যা আকৃষ্ট করতো তা হচ্ছে গতিশীল স্বাভাবিক অপ্রতিরোধ্য সেক্স-এর ক্ষমতা। কারণ, সেক্স হচ্ছে, আর কিছু না হোক, এক ধরনের এনার্জি। শান্তিনিকেতনের আবহাওয়াতে না থেকে রামকিংকর যদি আর একটু মুক্ত পরিবেশে থাকতেন, তবে 'সেক্স এ্যাজ ... অফ এনার্জি'-র প্রকাশ ওঁর কাজে আরো বেশি ধরা পড়তো।"—পরিতোষ সেন।

এইখানে এসে আরও একটা নতুন প্রশ্ন কড়া নাড়ে আমাদের ভাবনার দরজায়। নানা সময়ে, নানা সাক্ষাৎকারে রামকিংকর শিল্প সম্পর্কে যত কথা বলেছেন তার ভিতরে অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলালের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেশ কিছু, কিন্তু তাঁদের শিল্পসৃষ্টি সম্পর্কে রামকিংকর বলতে গেলে এরকম নীরবই। অথচ রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রসঙ্গে তাঁর আবেগ উচ্ছ্বাস যেন অফুরান। এটা কেন ঘটে? রবীন্দ্রনাথের ছবির যাবতীয় নিয়ম-ভাঙা অনাসৃষ্টি-তুল্য আগ্নেয়-বিস্ফোরণই কি তাহলে ছিল তাঁর সৃষ্টি-উল্লাসের প্রধানতম প্রেরণা এবং সাহসী দাপটের উৎস?

একবার দিল্লী যাওয়ার পথে এক আদিবাসী রমণীর যৌবনের টানে রামকিংকর হঠাৎ তার সঙ্গে নেমে গিয়েছিলেন এক অজানা স্টেশনে। দীর্ঘ দিন তিনি বেপাত্তা। হঠাৎ একদিন শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছল এক ঠিকানাবিহীন টেলিগ্রাম— "I lost myself, search myself."

এমনিভাবে বারবারই নিজেকে হারিয়েছেন রামকিংকর কখনো প্রেমে, কখনো গানে, কখনো নাটকে, কখনো মঞ্চসজ্জায়, কখনো মোরামে-কংক্রীটে, কখনো পাথরে-ছেনীতে-হাতুড়ীতে, কখনো ক্যানভাসে-অয়েলে, কখনো কাগজে-রঙে, কখনো দিনের রোদে, কখনো রাতের জ্যোৎস্নায়, নিমগ্ন চেতনে কখনো, কখনো উলঙ্গ অবচেতনে।

॥ ৭ ॥

রামকিংকরের রচনা রবীন্দ্রনাথের ছবি প্রসঙ্গে—

১। "রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে বিশেষ কোনো রিঅ্যাকশন হয়নি এখানে। এখানকার লোকে আর ভাল মন্দ কি বলবে? শুনেছে প্যারিসে ভালো বলেছে আর খারাপ বলে কি করে? ওঁর ছবিগুলো বেশ মজার; নানা রকমের, হুইমসিক্যাল তো।...নানা ধরনের ফিগার এঁকেছেন, রঙও বিচিত্র। তবে দু-একটা জিনিস একটু স্টিরিও-টাইপ হয়ে গিয়েছে, যেমন—নাক, সেটা কখনো বদলায়নি, একই রকম রয়ে গিয়েছে সব ছবিতে। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে রঙের ব্যবহার দারুণ। ন্যাচারাল কালার আনবার চেষ্টা করেছেন, মহুয়ার কভারের ছবির রঙ দেখবেন—ঠিক যেন মৌ ফুলের রঙ। খুব কড়া অবজার্ভেশন ছিল কিন্তু। রিয়ালিস্টিক ছবিও কোথাও কোথাও আছে, টুরিস্ট লজে একটা ছবি দেখলাম, নাচের ছবি, বেশ রিয়ালিস্টিক। নিজের ছবি অর্থাৎ সেলফ পোর্ট্রেটও সুন্দর। সব মিলিয়ে বেশ অদ্ভুত রস। কুমারস্বামী রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে দু লাইন লিখেছিলেন, ওঁর ছবিগুলো 'নট চাইল্ডস বাট চাইল্ড লাইক'। তাছাড়া, রস না থাকলে এতদিন ধরে যে ছবি আঁকলেন—প্রায় দশ বছর—, তা কি সম্ভব হতো!"

২। "তখন তো ওঁর শেষ দিকের অবস্থা। ওঁকে দেখতাম নানা অনুষ্ঠানে, মন্দিরে-টন্দিরে। আমরা কাজ করতাম। উৎসাহঅ, উৎসাহঅ, আসত তাঁর কাছ থেকে, উৎসাহঅ, করে যাও, করে যাও।"

৩। "রবীন্দ্রনাথের বাস্ট করেছি যে বছর সেই বছরই উনি ... যান। সংস্কার আছে যে কারো ছবি আঁকলে বা মূর্তি করলে সে নাকি বাঁচে না, এখন মনে হয় কেন করলাম তখন। রবি ঠাকুরের বাস্ট সিটিং নিয়ে করা। মূর্তিটা খুব কাছ থেকে বোঝা যাবে না, একটু দূরে থেকে ভালো বোঝা যাবে। উনি বললেন—'মাপজোক নিও না কিন্তু। এপস্টাইন কি রকম জ্বালাতন করেছে আমায়, সমস্ত সময় ক্যালিপার্স নাকের কাছে ধরা আছে, ওসব কি পোষায়?' তখন আমি পোর্ট্রেট করছি খুব, সাহস ছিল, অল্প বয়েস। আমি বললাম—'আচ্ছা বেশ, আপনি বসে বসে কাজ করে যান, আমি কোনো ডিসটার্ব করবো না।' উনি ঝুঁকে বসে লিখতেন, আমার কাজটাও সেই রকম। চুল দাড়ি অল্প, সে বছরই কাটা হয়েছিল তো। প্রথমে ভেবেছিলাম পুরোটাই করবো। ওঁকে পোশাক ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করাতে বললেন—'পোশাক দিয়ে কেন মানুষটাকে ফোটাবে, তার চরিত্র, তার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলো, তবেই বুঝবো তুমি কেমন আর্টিস্ট?'

আমিও আর চেষ্টা করিনি।

রবীন্দ্রনাথের একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট মূর্তিও করেছিলাম। এটা সিটিং নিয়ে নয়, মন থেকে গড়া। উনি শুনেছিলেন এটার কথা। কেউ ওঁকে গিয়ে বলেছিল—'ওটা যে কি করেছে, চোখে বল দেওয়া, চেনা যায় না।' রসিক লোক তো, বলেছিলেন—'ঐটেই ঠিক করেছে'।"

৪। 'প্রথম দিকে আমি শুধু মডেলিং শেখাতাম। কারো স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত কাজকে বাধা দিতাম না। রবি ঠাকুরের এ ব্যাপারে উদার মত ছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন—সবাইকে নিজের নিজের ইচ্ছেমত করতে দাও, কখনো বাধা দিও না।

... abstract

...র বছর বয়সে রোগশয্যায় রামকিংকর

ফটো : বরুণকান্তি চট্টোপাধ্যায়

...জ বা অয়েল পেনটিং নন্দবাবুর পছন্দ না হলেও আমাকে বাধা দেননি নিন্দামাত্র। ...ভালো কাজ করেছিলাম অয়েলে যতদূর মনে হচ্ছে গাল অ্যান্ড দা ডগ। নন্দবাবু ...ন্তু অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন অয়েলে করেছিলাম বলে। তবে বাধাও দেননি। আর ...বীন্দ্রনাথের আইডিয়া ছিল দারুণ মডার্ন। উনি আমাদের কাজ দেখতেন আর ...লতেন—'খালি করে যাও, নতুন কাজ কর। ওদেশে কত ভালো ভালো কাজ ...চ্ছে, তোমরা কর।'"

৫। "আমাদের প্রচলিত শিল্পধারা থেকে গুরুদেব প্রথম অন্য পথে গেলেন। ...না অনেক বড় বড় কবি ছবি এঁকেছেন—কিন্তু তাঁদের ছবি অত্যন্ত অ্যাকাডেমিক। ...রণ গুরুদেবের মত দৃষ্টিশক্তি, অনুভূতির গাঢ়তা তাঁদের ছিল না। এই দুটি ...ণ না থাকলে গুরুদেব অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট ফেল করতেন। অন্য কবি হলে ...র কাব্যের ছবি আঁকতেন। এদেশের অনেকে আঁকিয়ে তা করেছেন, আবার ...রুদেবেরই কবিতার লাইন ছবির তলে বসিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু গুরুদেব তা ...রলেন না। তাঁর ছবিতে রয়েছে বলিষ্ঠতা, ভাইটাল অবজারভেশন, ঘনভাব, ...য়ারমুথ..."

৮ ॥

শান্তিনিকেতনে প্রথম অয়েল পেনটিং-এ হাত লাগিয়েছেন তিনি। তখনকার ...শান্তিনিকেতনে সেটা এক ধরনের বিদ্রোহ। তাঁর আর এক বিদ্রোহ স্কাল্পচার। ...শান্তিনিকেতনের প্রথম ভাস্কর তিনিই। আবার আধুনিক ভারতীয় শিল্পের ...টভূমিকায়ও তিনিই প্রথম আধুনিক ভাস্কর। আধুনিক ভাস্কর্যের অ্যাবস্ট্রাক-...নও তাঁর বিদ্রোহী মানসিকতার প্রথম দান। রেখে-ঢেকে মূর্তি আর মেজে-ঘসে ...ব, দুটোই তাঁর স্বভাবের বাইরের জিনিস, সেই ছেলেবেলা থেকে। বাঁকুড়ার ...লাকশিল্পে, পোড়া মাটির কাজে, নিয়ম-ভাঙার নৈপুণ্য বহুকালের। বাঁকুড়ার ...ড়া যার খ্যাতির দৌড় আজ বিশ্বভুবনময়, ঘোড়ার প্রতিমূর্তি নয়। ঘোড়ার ...তেজস্বীতার প্রতীক। কোনো রকম প্রাথমিক প্রস্তুতি ছাড়াই তিনি যে আকস্মিক-...াবে ভাস্কর্যের দিকে ঝুঁকে পড়লেন এর পিছনে সম্ভবত দুটো কারণই বড়। এক ...ামার-ছুতোর পরিবৃত্ত তাঁর জন্ম-পরিবেশ। দুই, শান্তিনিকেতন-পূর্ব ...ন্দলালের ড্রয়িং-এর ভাস্কর্য গুণ। অবশ্য তৃতীয় একটা কারণেরও আভাস ...াই আমরা। সেটা হল রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে-উদ্যমে গড়ে ওঠা আধুনিক শিল্প-...লার লাইব্রেরী। সেই সঙ্গে আধুনিক শিল্পকলার উপর আলোচনার ব্যবস্থা। ...রামকিংকর শান্তিনিকেতনে যোগ দেবার চার বছর আগে, ১৯২১-এ, স্টেলা ...ক্রামরিশকে দিয়ে এক বক্তৃতামালার আয়োজন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আর ...ন্দলালকে ডেকে বলে দিয়েছিলেন—'এটা কিন্তু বাধ্যতামূলক নন্দলাল, এটা ... [illegible]-এর আলোচনার বিষয় ছিল দাদাইজম, কিউবিজম, সুররিয়্যালিজম—আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিল্পের সব ধারাকে ধরেই। সেদিনের সেই আলোচনার এক নিবিষ্ট ছাত্র-শ্রোতা আজকের প্রসিদ্ধ শিল্পী বিনোদবিহারী। রামকিংকর বিষয়ে তাঁর এক রচনা থেকে আমরা জানতে পারি তাঁর সেদিনের অভিজ্ঞতা :

"তখন আমরা পারি বা না পারি মুখে তো কপচাতে পারি। অর্থাৎ আবহাওয়া তৈরী ছিল। আর্টের উপরে বইও পাচ্ছিলাম লাইব্রেরীতে। ছবির কপি, স্লেটও ছিল যা এখনো হয়তো কলাভবনে আছে।"

আবহাওয়া তৈরী ছিল। রামকিংকর এসে সেই আবহাওয়ার গায়ে জুড়ে দিলেন গতি অথবা বেগ। থেমে-থাকা আবহাওয়াকে ঝাঁকুনি দিয়ে করে তুললেন খ্যাপা। জুতোর বুরুশ দিয়ে ছেলেবেলার সেই চওড়া আর দরাজ টানে থিয়েটারের ড্রপসিন আঁকার ট্রেনিং, শান্তিনিকেতনে পৌঁছে মোটামুটিভাবে ভারতীয় চিত্রকলার সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা, পাশ্চাত্ত্য শিল্পধারায় যাবতীয় উদ্দাম ভাঙচুরের সম্বন্ধে সদ্য-পাওয়া অভিজ্ঞতা, এই সব কিছুকে মিলিয়ে—আর তারই সঙ্গে নিজের রক্তের আদিম উন্মাদনার ঝনৎকার মিশিয়ে গড়ে তুললেন নিজের এক অনন্য ভূমণ্ডল, ছবি বা মূর্তি সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত পূর্ব-সংস্কারের দেয়াল ধ্বসিয়ে।

১৯৭৩। আনন্দবাজার পত্রিকা আমন্ত্রণ জানালো রামকিংকরকে, কলকাতার ভাস্কর্যের চেহারা-চরিত্র সম্বন্ধে আপনার মুখ থেকে আমরা কিছু শুনতে চাই। ঘর-কুনো রামকিংকর, আমাদের চমকে দিয়ে, আশ্চর্যভাবে জানিয়ে দিলেন তাঁর সম্মতি। আর নির্দিষ্ট দিনে, ভাস্কর-ছাত্র সুশেন দে'কে সঙ্গে নিয়ে চলে এলেন কলকাতায়। প্রোগ্রাম হল এইরকম, রামকিংকরকে নিয়ে আমরা কয়েকজন কলকাতার সমস্ত স্ট্যাচু ঘুরে ঘুরে দেখাবো। তিনি যা মন্তব্য করবেন তা টুকে নেবো টেপরেকর্ডারে। পরে সেটা ছাপা হবে দৈনিক আনন্দবাজারে।

এখন মনে হচ্ছে কি সৌভাগ্যবান আমি। কারণ তাঁকে ঘোরানোর-দেখানোর প্রশ্ন করে-করে জানার এবং সবশেষে তা নিয়ে প্রকাশিতব্য রচনাটিরও ভার পড়েছিল আমার উপর। আমরা আড়াই দিন ঘুরেছিলাম তাঁকে নিয়ে, সকাল সাড়ে দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা। পরে 'মূর্তিমান কলকাতা' নাম দিয়ে কলকাতার স্কাল্পচার সম্বন্ধে তাঁর মতামত ছাপা হয়েছিল দু-কিস্তিতে।

কিন্তু এই ৭ ঘণ্টার অন্তরঙ্গ সঙ্গলাভের বাইরেও আমাদের কপালে জুটেছিল আরো কিছু উপরি পাওনা। যে কদিন কলকাতায় ছিলেন, তাঁকে এতটুকুও বিশ্রাম না দিয়ে আমাদের টেপ রেকর্ডারের মাউথপীসটা সব সময়ে সাপের ফণার মতো উঁচিয়ে থাকতো তাঁর মুখের দিকে। অবিরল প্রশ্ন আমাদের বৈঠকী মেজাজে, অর্থাৎ একেবারে খোলা মনে আমাদের শত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেতেন তিনি সহাস্যে, স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গীতে।

একবার প্রশ্ন করেছিলাম—

—শান্তিনিকেতনের পরিবেশ ছেড়ে অনেকদিন পরে তো কলকাতায় এলেন? কেমন লাগছে কলকাতাকে?

তাঁর উত্তর—

—এর উত্তর দেওয়া সহজই বটে। শান্তিনিকেতন আজকে আছে বটে, সেটাই যে কাল কলকাতা না হয়ে যাবে, তা কি করে জানলেন? হাঃ হাঃ হাঃ। এখন যা অবস্থা হয়েছে, কোথায় সবুজ আর কোথায় কি? ইটের বাড়ি উঠে চলেছে। এটাও না কলকাতা হয়ে যায়। আমরাই তো বলি অমুকের বাড়ি দু' মাইল যেতে হয়। এখন কবে হয়তো ট্রাম চালু হয়ে যাবে। মোটর গাড়ি তো আছেই। চলেছে। গতি।

—কলকাতার, ধরুন ঐ চৌরঙ্গীর বিশাল বিশাল স্কাইস্ক্র্যাপারের উল্টোদিকের মাঠে আজ যদি কোনো শিল্পীকে একটা ভাস্কর্য তৈরী করতে দেওয়া হয়, আপনার মতে তার গড়ন-গঠন কেমন হওয়া উচিত হবে?

—সেটা নির্ভর করছে শিল্পী কি করতে চায়, তার উপরেই তো।

—শিল্পীর অত স্বাধীনতা কি আছে আমাদের দেশে। এসব অর্ডার আসে সরকারী মহল থেকে। তারাই মাপজোক দর দাম ঠিক করে দেন আগে ভাগে।

—দ্যাট্স রাইট। গ্রামে সরস্বতী পুজোর মূর্তি হয়। ছেলেরা এসে বলে যায় অমুক আর্টিস্টের মত মুখ চাই। হাঃ হাঃ হাঃ। মায়ের মুখ হোক বা না হোক, ঐ রকম মুখ চাই। হাঃ হাঃ হাঃ। আর্টিস্টদের ফ্রীডম কই? ফ্রীডম দিলে আর্টিস্টরা কি করবে তা আপনিও জানেন না, আমিও জানি না। কিন্তু ফ্রীডমটা দিক তো আগে। শান্তিনিকেতনে আমি তো কাজ করেছি, নিজের মতো করে কাজ করেছি। কেউ অর্ডার দেয়নি। রিয়েলিসটিকও করেছি। অ্যাবস্ট্রাক্টও করেছি। কেউ বাধা দেয়নি। ফ্রীডম ছিল।

—আচ্ছা, আপনাকে যদি অনুরোধ জানানো হয় কলকাতার জন্যে একটা মূর্তি করে দিতে, কি করবেন আপনি?

—সে বলা খব কঠিন। কত কিছুই তো করা যায়। গাছ, একটা গাছ, গাছ যেমন হয়ে যায়, ঐ রকম একটা গাছই করতে পারি। আমারও তো ইচ্ছে করে ঐসব বাড়ির মতই একটা মূর্তি করি। হাঃ হাঃ হাঃ। কিন্তু দিচ্ছে কে? হাঃ হাঃ হাঃ। কে দিচ্ছে করতে? হাঃ হাঃ হাঃ। দেবে না।

—এখনো আপনার বিরাট মূর্তি গড়তে ইচ্ছে করে?

—ইচ্ছে করে। হাঃ হাঃ হাঃ। ধরুন না, মিশরের পিরামিড, মিশরের পিরামিডের মতো মূর্তি করতে ইচ্ছে করে। এত বড় পৃথিবী। চন্দ্র সূর্য জ্বলছে। কি বিশাল জ্যোতি। জগৎটাই তো কী বিরাট। তার মধ্যে আমি যদি একটা পুতুল গড়তে চাই, আমি তো পুতুল গড়ি, হাঃ হাঃ হাঃ, তো দিক একটা পুতুলই গড়তে দিক আমাকে।

আমরা আশা করেছিলাম, আনন্দবাজারে রামকিংকরের এই প্রতিবেদন অর্থাৎ উৎসাহী আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হওয়ার পর তখনকার সরকারী কর্তৃপক্ষ সত্যিই সাড়া দিয়ে অনুরোধ এবং আমন্ত্রণ জানাবেন তাঁকে। তিনি বলেছিলেন টাকা-পয়সা চাই না, চাই শুধু এক টুকরো জমি, সস্তার সিমেন্ট বালি মোরাম আর মনের মতো কিছু একটা করার স্বাধীনতা। কিন্তু এমন উন্মুখ প্রার্থনাতেও কর্ণপাত করার মতো সাধ ও সদিচ্ছা জোটে নি সরকারী মহলে। বিষয়টাকে নিয়ে যাতে আলোচনা হয়, আর ব্যাপ্ত এবং বলবান হয়ে ওঠে আমাদের দাবি, সেই তাগিদে আনন্দবাজারে রচনা কিছুদিন পরে 'দেশ' পত্রিকায় 'রামকিংকর' নাম দিয়েই কবিতা লিখেছিলাম একটা। সে কবিতা রামকিংকরেরই কথা যেন। মুখে কথা বলতে বলতে তাঁর [illegible] আগুনে অট্টহাসিতে যে আবেগ এবং অবরুদ্ধ বেদনা অনুভব করেছিলাম সেটা কবিতার ছত্রে ভিন্নভাবে সাজানো। তার প্রথম চারটে লাইন—

"খানিকটা পাথর দাও আর একটু বুক-খোলা মাঠ
হে কলকাতা, হে আমার রুগ্ণ জীর্ণ মুহ্যমান শিল্পের সম্রাট
রক্তে নাচে ছেনী
বাতাসে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে যুবতীর বেপরোয়া বেণী।"

॥ ৯ ॥

নিজের রচনা প্রসঙ্গে রামকিংকর।

১। "এক ফটোগ্রাফার এসেছেন ফিল্ম করতে। তখন অবনীন্দ্রনাথ আছেন। ফোটোগ্রাফারটি বললেন—'হ্যাঁ মশাই, ও একটা কি দেখছি, আমি ওদিকে গিয়ে দেখলাম, এদিকে এসে দেখলাম—কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না।' অবন ঠাকুর হেসে বললেন—'ঐ তো গো, ও যে ঘোরাবে ফেরাবে দেখাবে—ঐ হচ্ছে রামকিংকর।' ঐ কম্পোজিশনটা সম্বন্ধে যা বলছিলাম—ওটার মধ্যেকার কাজগুলো ভাগ করা যায়। একটা দেখবেন নারীমূর্তি, চুম্বনরত, তার পরে দেখবেন পাখি আছে—'লাভ বার্ডস'। নারীমূর্তি এক পাশে দেখা যাবে এবং সেই নারীমূর্তির সবটা নেই। কিন্তু সবটা না থাকলেও বোঝা যায়। এইভাবে অ্যাবস্ট্রাক্ট করলে কতকগুলো ফর্ম আসছে, যেগুলো সাধারণ কাজে নেই। এই ফ্রীডম ঠিক ঠিকভাবে প্রয়োগ করলে একটা অন্য ফর্ম আসছে, যেন চেনা যাচ্ছে না, অথচ চেনাজানা লাগছে। নতুন ডাইমেনশন এসে যায়, মিস্টিক ভাব আসে, অহেতুক ভাবটা বাড়ছে।"

২। "একটা ঘটনা মনে পড়ল। তখন পুরনো গেস্ট হাউসের সামনে মূর্তি তৈরী করছি। একদিন আমি কাজ করছি, নন্দবাবু এসেছেন। আমাদের এখানে একজন পণ্ডিত মশাই ছিলেন, তা তিনি এসে জিজ্ঞেস করছেন—আরে মশায় এটা কি? নন্দবাবু একটা তালগাছের দিকে দেখিয়ে বললেন—এটা কি বলুন তো? নন্দবাবু গম্ভীর হয়ে পণ্ডিত মশাইকেই প্রশ্ন করলেন—তা হলে ওটা কি? আঁ! এটা যদি অ্যাবস্ট্রাক্ট হয়, তা হলে তাল গাছটা কি? তা হলে কোনটা অ্যাবস্ট্রাক্ট? অ্যাবস্ট্রাক্ট মানেই বা কি? পণ্ডিতমশাই পালিয়ে গেলেন।"

৩। "মন্দিরের সামনে ঐ কাজটা আছে না? কেউ বলে লাইট স্ট্যান্ড, কেউ বলে নির্বাণ, কেউ বলে অনির্বাণ, হাঃ হাঃ হাঃ, কেউ বুঝতেই পারবে না। আমি অনেক আধুনিক করে ফেলেছি, হেঃ হাঃ হাঃ হাঃ। —হ্যাঁ হ্যাঁ, ফিমেল ফিগারই মেইন ওটার। আর এক দিক থেকে দেখলে পাখি মনে হবে। পাখি।"

৪। "সে যা কাণ্ড! সুচিত্রার একটা পোর্ট্রেট করেছিলাম। ও এসে ধরল, দিতেই হবে সেইটে। আমি যত বলি, আরে ওটা নিয়ে কী করবে—বাজে জিনিস, কিছুতেই শুনবে না। দিয়ে দিলাম। তার পর কী হয়েছে—কী কারণে সেই পোর্ট্রেটটা একদম ভেঙেই ফেলেছে। তারপর আমার কাছে এসে বলছে—ক্ষমা করুন। শাস্তি দিন। আমি কী শাস্তি দেব! হাঃ হাঃ হাঃ। তো বলেই দিলাম—তোর শাস্তি হলো বসে বসে গান কর, গান কর, হাঃ হাঃ হাঃ ভেঙেই ফেলেছিল পোর্ট্রেটটা।"

৫। "দিল্লীতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সামনে করেছি যক্ষ-যক্ষী। এটা পাথরের। এই মূর্তির মোটামুটি আইডিয়া জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে এটা ব্যাঙ্কিং-এর ব্যাপার। সিম্বলটা তাই অর্থের এবং কৃষির। এগ্রিকালচারের যক্ষীর [illegible], তাতে আছে ফ্লাওয়ার, এগ্রিকালচার ও ডান হাতে কর্ন। যক্ষের হাতে যা আছে তা আমার স্বকপোলকল্পিত। যক্ষের এক হাতে রয়েছে পেনিয়ান—ইন্ডাস্ট্রীর প্রতীক, অন্য এক হাতে মানি ব্যাগ। যক্ষের ব্যাপারটা ভেবে নিতেই হয়েছে, নইলে যক্ষের যত মূর্তি পাওয়া যায় তাদের কারোরই হাত নেই। কলকাতার মিউজিয়ামে যে যক্ষ-মূর্তি আছে এটা তারই ধাঁচে তৈরী। কলকাতার মূর্তি মথুরা থেকে পার্সি ব্রাউনের সময় সংগৃহীত। আমার কাজটার নাম যক্ষ যক্ষী। অনেকে ভুল করেন যক্ষিণী ভেবে তা কিন্তু নয়, আসলে পৌরাণিক বাস্তবে এরা ভাই-বোন, কখনাই স্বামী-স্ত্রী নয়, তাই যক্ষিণীও নয়। যা বলছিলাম—ওটা ছিল বিশাল কাজ, অনেক মুশকিলের ব্যাপার ছিল ওটাতে। সিলেকট করেছিল কুলু ভ্যালীর কাছে বৈদ্যনাথ বলে এক জায়গায়। কিন্তু ওখানকার রেল যে মাটির গেজ তা খেয়াল ছিল না। ২৪ ফুটের এক একটা স্ল্যাব রেলে আনা গেল না। তাই পাথর টুকরো করা হল চার ভাগে। দিল্লীতে এনে জোড়া হয়। আসল প্ল্যান ছিল একটা মাত্র পাথরে কোনো মনোলিথ কাজ করার।"

॥ ১০ ॥

একবার এক পত্রিকা, অন্য মনে, তাঁর দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেবার পর অনুরোধ জানিয়েছিল একটা আত্মপ্রতিকৃতির জন্যে। রামকিংকর তার বদলে এঁকে দিয়েছিলেন একটি সূর্যমুখী ফুল। তাঁর পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। তিনি যা, তাই-ই এঁকেছেন তিনি। ভ্যান গগ সম্বন্ধে এক বিখ্যাত সমালোচক একবার মন্তব্য করেছিলেন—ভ্যান গগ আঁকেন "not trees but growth, not blossoms but bloom"! সেই গ্রোথ, সেই ব্লুম, সেই সূর্যমুখীই রামকিংকর।

# চাকুরে বাঙালীর চরিতকথা

## সত্যব্রত পালিত

উনিশ শতকে বাঙালীর ইংরেজীচর্চার মূলে ...নান্বেষণের চেয়েও বড় প্রেরণা ছিল উপায়-...পার্জন। ইংরেজী-নবিশেরাই চাকুরে বাঙালীর চতুর্দশ ...রুষ। রাজদরবারের ভাষা জানলেই না চাকরি পাবার ...শা!

ব্রিটিশ আমলে জমি-জিরেতে পরিবারের সকলের ...রণপোষণের ভরসা দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসছিল। ...ড় বড় জমিদারী ভেঙে টুকরো টুকরো। ব্যবসা-...ণিজ্য ব্রিটিশের হাতে। লাখেরাজ সম্পত্তি দিয়ে গুণের ...দর বা কাজের পারিশ্রমিক দেবার রেওয়াজ আর ...ই। টাকা দিয়ে অর্থনীতির চাকা ঘোরে। মাস-...ইনেতে চলে সংসার। এরকম পরিবেশেই নিছক ...করিসবস্ব বাঙালীর জন্ম। ইংরেজী শিখে প্রথম ...রা চাকরিতে এলেন, সন্তান-সন্ততিদের ইংরেজীতে ...ড়গড় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তাঁরা। ১৮৩০ সনের ...মাচার দর্পণ জানাচ্ছেন, কোম্পানীর দেওয়ানের ছেলে, ...রানীর ভাই, তহবিলদারের ভাইপো, গোমস্তার ...তিরাই হিন্দু কলেজে ভিড় করছেন ইংরেজীর দোলাকে ...করি ধরবেন বলে। ১৮৭০ সালের এক প্রতিবেদনে ...ক্ষা অধিকার এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করেছেন। ...শীর ভাগ কলেজের ছাত্ররাই এসেছে আইনজীবী ...বং সরকারী চাকুরের ঘর থেকে। যতই ইংরেজী ...শিক্ষার প্রসার ঘটেছে, ততই চাকুরে বাঙালীর সংখ্যা ...হাওয়া মন্ডলের আড়ালে পড়ার দরুন নক্ষত্রটি বড়েছে। তারা পৌঁছে গেছে এক প্রজন্ম থেকে অন্য ...জন্মে।

মূলত আমলাতান্ত্রিক খরচ বাঁচানোর প্রয়োজনে ...৮৩৩ সনে লর্ড বেণ্টিংক কিছু দেশী ডেপুটি ...লেক্টর নিয়োগ করেন। ঐ সালের চার্টার আইনেও ...াতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে যোগ্য প্রার্থীর চাকরিতে ...ধিকার স্বীকার করা হয়। ১৮৪৩-এ আরো বাঙালী ...ডপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হলেন। ১৮৩৩ থেকে ১৮৪৩-এর ...শকে মুখ্য নব্যবঙ্গের অনেকেই ঐ পদ লাভ করেন। ...সিককৃষ্ণ মল্লিক, চন্দ্রশেখর দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, ...কশোরীচাঁদ মিত্র, গোবিন্দ বসাক প্রভৃতির নাম এ ...প্রসঙ্গে সহজেই মনে আসে। মহার্ঘতার দরুন বেঙ্গল ...প্রেসিডেন্সীতে ব্রিটিশ কর্মচারীর সংখ্যা ১৮৩৫ সনে ...১৬ এবং ১৮৫৫তে ৫১১-এর বেশী ছিল না। অত ...৮৪৪ সনে লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রস্তাবক্রমে পাশ্চাত্য ...শিক্ষায় পারঙ্গম মেধাবী ছাত্রদের এক তালিকা প্রস্তুত ...রলেন শিক্ষা-অধিকার। সেই তালিকা থেকে অতঃপর ...রকারী চাকরি দেবার সুপারিশ করা হতে থাকল। ...রকারী কলেজগুলো থেকে নাম পাঠান হত নিয়মিত। ...মেতার মত ধারাপাত থেকে ভাগ্যবান কিছু ধীমানের ...রকারী চাকরির ছিটেফোঁটা জুটতে লাগল।

১৮৪৪-এর হিন্দু কলেজের তালিকা থেকে চাকরি ...াভের দু'একটা নমুনা দিই। অবতারচন্দ্র গাঙ্গুলী ...প্রীম কোর্টের কেরানী নিযুক্ত হয়েছেন, নন্দলাল দে ...রিপ বিভাগের গণক, শ্রীকৃষ্ণ দত্ত খাজাঞ্চিখানার ...র্যবেক্ষক। ১৮৪৫এ ... ...শেঠ গোবরডাঙ্গার নুনের ...চৌকির দারোগা, ধরণীধর রায় কমিশনার ডনেলীর ...অফিসের মসীজীবী। হরচন্দ্র রায় সরকারী চাকরি না ...পেয়ে চুঁচুড়ায় নিজের প্রতিষ্ঠিত স্কুলের শিক্ষক। হিন্দু ...কলেজের ছেলেদেরই এই হাল। তা হলে হুগলী ...কলেজের ছেলেরা হালে পানি পেল কি? ১৮৪৯-এ ...ই কলেজের মথুরানাথ ব্যানার্জি শালকিয়ার আবগারী ...দারোগা, কালীনাথ মুখার্জি রাজকীয় সেনাবাহিনীর ...১তম রেজিমেন্টের চিকিৎসা বিভাগের কেরানী, ...মতারক রায় হুগলী কলেজেরই মাদ্রাসায় আইন ...াগের মৌলভী। দেলওয়ার আলি দেওয়ানী ...আদালতে অমুসলমান ল' অফিসার। মমতাজ আলি ...হুগলী কালেক্টরেটে মুহুরী, ওকীল উদ্দীন ...মিল্লার সরকারী স্কুলে আইন শিক্ষক। চাকরির মন্দা ...বাজারে এই বা মন্দ কি। ঢাকা কলেজের দিকে চোখ ফেরানো যাক। ১৮৪৫-৪৬ সনে এই কলেজের বিশ্বম্ভর দাস আবগারী কমিশনারের দপ্তরে কেরানী। শ্রীনাথ বসু তথৈব। চন্দ্রকিশোর গুহ ময়মনসিংহের আবগারী দপ্তরের অধ্যক্ষের সেরিস্তাদার আর জগমোহন দাস ঢাকারই ইঞ্জিনীয়ারের অফিসে কলমনবিশ।

এ'রাই পথিকৃৎ চাকুরে বাঙালী। স্পষ্টতই মেধাবী ছাত্রদেরও এক নগণ্য অংশ চাকরি পেতেন। অধিকাংশই হয় শিক্ষকতা নিয়ে আবার পুরনো ক্লাশঘরে ফিরে যেতেন, নয় কোন না কোন দপ্তরে সেঁধোতেন কেরানী হিসেবে। ১৮৪৯-৫০ সনের প্রতিবেদনে শিক্ষা অধিকার অকপটে স্বীকার করছেন যে, এই সব প্রতিভাবান ছাত্রদের আরো ভাল মাইনেতে আরো মর্যাদাশীল পদে বৃত হওয়া উচিত ছিল। ১৮৫৫-৫৬ সনের প্রতিবেদন থেকে এ'দের বেতনক্রমের একটা ধারণা দেওয়া যেতে পারে। গুরুচরণ চ্যাটার্জি (হুগলী কলেজ) দিনাজপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক। মাইনে পেতেন মাসিক ১৫০ টাকা। ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র (হিন্দু কলেজ) ছিলেন দিনাজপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মাস-মাইনে ২০০ টাকা। জগদীশনাথ রায় (হিন্দু কলেজ) মেদিনীপুর নুনের চৌকির অধ্যক্ষ, মাসিক বেতন ৩০০ টাকা। কেদারনাথ সেন (হিন্দু কলেজ) জরীপ দপ্তরের কেরানী, সাকল্যে ৪০ টাকা পেতেন। প্রসন্ন সর্বাধিকারী (হিন্দু কলেজ) সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক, পারিশ্রমিক ১০০ টাকা। গোপালচন্দ্র ভট্ট (হিন্দু কলেজ) হাওড়ার নুনের চৌকির দারগা, মাসিক দক্ষিণা ৩০ টাকা মহেন্দ্রলাল সোম (হিন্দু কলেজ) হিন্দু স্কুলের থার্ড মাস্টার। মাস পয়লায় হাতে পেতেন ১৫০ টাকা। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। এদেশীরা যতই কৃতবিদ্য হোন না কেন, ৪০০ টাকার উপরে যেতেন কদাচিৎ। মোটা মাইনে ধরা ছিল ইংরেজদের জন্য, যোগ্যতায় খাটো হলেও।

১৮৫৮—১৮৮১র মধ্যে কলকাতার মোট স্নাতকের সংখ্যা ১৭১২ বলে হিসেব করা যায়। এর মধ্যে ৩৩৪ জনের খবর নেই, ৩৩ জন মৃত। বাকী ১৩৪৫ জনের মধ্যে ৫২৫ জন সরকারী চাকুরে, ৬১৩ জন আইনের আঙিনায়। উকীল ৪৬৬ জন, এ'রাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এ'দের পরেই শিক্ষক ৩২৬ জন। এই সময়ের মধ্যে মর্যাদাশীল পদে তুলনায় আগের চেয়ে অনেক বেশী ভারতীয়কে দেখা যায়। ৩৪ জন সাবজজ এবং ১৬৩ জন মুন্সেফ এবং ডেপুটি কালেকটরের হদিশ মেলে। এ প্রসঙ্গে স্মতর্ব্য, সবাই যথার্থ বাংলাদেশে চাকরী পান নি। মত্র ৪০৪ জন পেয়েছেন, তার মধ্যে খোদ কলকাতায় ৩২৬ জন। আর সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছেন। বিহারে ১০৪, উড়িষ্যায় ১৮, আসামে ২৯, উত্তরপ্রদেশ-অযোধ্যায় ১০৭, পাঞ্জাবে ২২, মধ্যপ্রদেশে ২৭ জন। পাটনা, মুঙ্গের, মজফ্ফরপুর থেকে শুরু করে সুদূর পশ্চিমে বেনারস, লক্ষ্ণৌ পেরিয়ে শ্রীনগর, লাহোর, পেশোয়ারে বাঙালীকে নানা পেশায় দেখা গেছে। বঙ্গের বাহিরে বাঙালীকে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এ'দের তীব্র বিষোদ্গার এবং বিতাড়নের শিকার হতে হয়েছে। যেটুকু পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করা গেল, তাতে সহজেই বোঝা যায় যে এ'রা ছিলেন সংখ্যালঘু কিছু কর্মচারী মাত্র অথবা উকীল-ডাক্তার। নিজ বাসভূমে ঠাঁই হয়নি বলেই রুজি-রোজগারের তাড়নায় প্রবাসী হয়েছিলেন। এ'দের প্রভাবেই প্রদেশগুলি ...নগ্রসর হয়ে পড়েছিল, এমন যুক্তি টেঁকে না। এরকম ভ্রান্ত ধারণার চক্রান্তে দৈবের বশে নয়, জৈবিক হিংসার হলাহলে যদি এ'দের জীবতারা খসে পড়ে, তাহলে পরিতাপের অবধি থাকে না।

প্রাদেশিকতার কুতর্কে না গিয়ে চাকুরে বাঙালীর দুটি বিশেষ পেশার প্রতি প্রবণতার উৎস সন্ধান করা যাক। ডাক্তারি আর মোক্তারি। কলকাতার মেডিকেল কলেজ ১৮৩৫ সনে স্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল, সরকারী সামরিক, বেসামরিক হাসপাতালে সাহেব ডাক্তারের বদলে এদেশীয় চিকিৎসক গড়ে তোলা। শুরুতে সাহেবের সহকারী, প্রস্তুতি সারা হলে সমকক্ষ। এই প্রতিশ্রুতি শিক্ষিত বাঙালীর মনে সেদিন সাড়া জাগিয়েছিল। কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ব্রামলি লিখেছেন, শবব্যবচ্ছেদ শিক্ষানবিশদের কাছে য়ুরোপেও আতংক ও ঘৃণার ব্যাপার ছিল। তাঁর মনে আশঙ্কা ছিল, এদেশী ভাবপ্রবণ তরুণদের মধ্যে এর প্রচলন সহজ হবে না। জাতপাতের কথা চিন্তা করে প্রথম পরীক্ষাটি লোকচক্ষুর আড়ালে গোপনে সমাধা করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। ব্রামলি মুগ্ধ বিস্ময়ে জানাচ্ছেন, ১৮৩৫ সনের ২৮ অক্টোবরের সেই অবিস্মরণীয় দিবসে তাঁর সব ধন্দের অবসান হল। কলেজের চারজন কৃতী ছাত্র স্বেচ্ছায় এই কাজে ছুরি-কাঁচি নিয়ে এগিয়ে এল। এই নীরব বিপ্লবের প্রথম নায়ক মধুসূদন গুপ্ত। এই অসামান্য সুকৃতির জন্য ডাঃ গুডিভ এবং বেথুনের স্বাক্ষর সম্বলিত এক স্ব-প্রতিকৃতি তাঁকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। ছবির তলায় লেখা ছিল 'ভারতের প্রথম দেহবিজ্ঞানী।' মেডিকেল কলেজের বিপরীতে আরপুলি লেনের ভিতের প্রান্তে যে গলির সূত্রপাত, সেই মধু গুপ্ত লেন তাঁর স্মৃতির সলতে হয়ে আজো তাঁর কথা আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে। ১৮৩৫-এ ৬৭ জন কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। এ'রা প্রায় সবাই হিন্দু মধ্যবিত্ত ঘরের ভদ্রসন্তান। ডেভিড হেয়ার কলেজের সম্পাদক হলেন। কলেজের সঙ্গে যুক্ত হল হাসপাতাল। ১৮৪২এ মধুসূদন গুপ্ত, নবীনচন্দ্র মিত্র, শিবচন্দ্র কর্মকার এবং প্রসন্নকুমার মিত্র, এই চারজনই সরকারী স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রথম পদাধিকারী বাঙালী। ১৮৪০ সালে প্রথম যে পরীক্ষা হল, তাতে সফল হয়ে কাজে যোগ দিতে আরো এলেন যাদবচন্দ্র ধাড়া, রাজকৃষ্ণ চ্যাটার্জী, গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত এবং নবকৃষ্ণ গুপ্ত। 'সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন' পদে একে একে নিযুক্ত হলেন এ'রা। আর একটি যুগান্তকারী ঘটনা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতেই হবে। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের চেষ্টায় এবং অর্থানুকূল্যে তিনজন এবং কলেজের অধ্যাপক ডাঃ গুডিভ এবং মুর্শিদাবাদের নবাবের যুগ্ম প্রচেষ্টায় চতুর্থ জন— এই চারজন বাঙালী, গোপালচন্দ্র শীল, ভোলানাথ বসু, দ্বারকানাথ বসু এবং সূর্যকুমার চক্রবর্তী বিলেতে পাড়ি দিলেন উচ্চতর শিক্ষার জন্য। এ'রাই আমাদের প্রথম এম আর সি পি এবং এফ আর সি এস ধরা যেতে পারে। তাঁরা ফিরে এসে নিজেদের কলেজের উঁচু পদে অধিষ্ঠিত হলেন। ১৮৪৮ সালের এক প্রতিবেদনে কলেজের ৫৩ জন প্রাক্তন ছাত্রকে সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনের পদে ভারতের নানা প্রান্তে কর্মরত পাওয়া যায়। মেডিকেল কলেজে ছাত্র হ্রাস পাবার একটা প্রধান কারণ ছিল স্বাস্থ্য দপ্তরের চাকরীতে এদেশীদের স্বল্প বেতন। ১৮৪৮-এ বেতনহার বাড়িয়েও সাত বছরের কম অভিজ্ঞদের মাসিক আয় দাঁড়ায় ১০০ টাকা, সাত থেকে চোদ্দ বছরের পুরনোদের ১৫০ টাকা আর তার উপরে ২০০ টাকা। স্বয়ং মধুসূদন গুপ্ত তের বছরের বেশী সবিশেষ কর্মনৈপুণ্য দেখিয়েও অবশেষে মাত্র ২০০ টাকা বেতনে উন্নীত হন। শিক্ষিত বাঙালীর এতে মোহভঙ্গ, হতাশা এবং রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

উকীলপাড়ায় প্রবেশ করি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ১৮৪৩-৪৪ সালে প্রথম আইন পড়াবার

থা হয়। শিক্ষা-অধিকার স্পষ্টই লিখেছেন, ন শিক্ষার এবং আইন ব্যবসায়ের বিপুল বনা বাঙালীর চোখে ধরা পড়ে। ব্রিটিশ রাজত্বে নের শাসনে আইনচর্চার মূল্য বুঝতে পেরে কেই এগিয়ে আসেন। ১৮৪১ সনে হিন্দু জে আইনের অধ্যাপকের পদ চালু করা হলেও ৭ সালের আগে কেউ সেই পদাভিষিক্ত হননি। ৫ সনে হিন্দু কলেজে আইন পরীক্ষার বিষয় গণ্য হয় এবং ১৮৫৭তে কলকাতা বিশ্ব-লয় স্থাপিত হলে প্রথম যে ছাত্র প্রেসি-ী কলেজ (প্রাক্তন হিন্দু কলেজ) থেকে আইন ক্ষায় স্নাতক হন, তাঁরা হলেন অমৃতলাল র্জী, আশুতোষ ধর, দ্বারকনাথ চক্রবর্তী, ফর্বস, গিরিজাশঙ্কর দাস, হরিহর মুখর্জী, রনাথ চ্যাটার্জী, নীলমাধব বসু, প্রভচন্দ্র, রতনলাল ঘোষ ও শ্রীনাথ মিত্র। ১৮৬৪-৭০-মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৭০৪ জন ন পাশ করে বেরোন। কলকাতার স্নাতকদের কর্মতালিকা থেকে জানা যায় ১৮৫৮-৮১র আইনজীবী ৬১৩ জন। এর মধ্যে ব্যারিস্টার উকীল ৪৬৬, অ্যাটর্নী ১৪, এঁদের কর্মচারী এবং পাঠরত ১০০ জন। পেশা হিসেবে আইন রেই সবচেয়ে লোভনীয় হয়ে পড়ে। বাংলা-ের গোলকধাঁধার মত ভূমিব্যবস্থার ফলে ৫৬-৮৮র মধ্যে সারা ভারতের প্রায় একের পাঁচ-দেওয়ানী মামলা (৫ লাখের মত) শুধু নেকার আদালত ছেয়ে থাকে। শহর হিসেবে কাতাতে এবং সংলগ্ন ২৪ পরগণায় ১৮৭৫ ন ২৬ জন ব্যারিস্টার, ১২৭ জন অ্যাটর্নী, ৫৩১ উকীল এবং ৭৮৪ জন অন্যান্য আইন ব্যবসায়ী জন। কলকাতা অতএব উকীল-মোক্তারের মক্কা। পরেই ঢাকার স্থান। এখানে ৩৭২ জন উকীল ৪৭০ জন আইন ব্যবসায়ী। অন্য চাকরীর তুলনায় এঁদের আয় ভালই ছিল। ১৮৮৮-৮৯-এর এক হিসেবে জানা যায়, উকীল-ব্যারিস্টারের বাৎসরিক আয় ৫০০-২০০০ টাকার মধ্যে ছিল ১৪০৪ জনের। ২০০০ টাকার উপরে আয় ৫৫১ জনের। অন্যান্য আইন-ব্যবসায়ীদের সেই অনুপাতে আয়ের নীচু এবং উঁচু সীমায় ছিলেন যথাক্রমে ১৮০১ এবং ২২১ জন। তাই বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর স্মৃতিকথায় সকৌতুকে লিখেছেন, বাংলাদেশে ব্রিটিশ রাজের পরেই ছিল ভকীলরাজ। ব্রিটিশ রাজত্বে জীবিকার সন্ধানে কৃতী ছাত্ররা পথে পথে পাথর ছড়ান দেখে অবশেষে আইনের কাননে ঝরনা ঝরিয়েছিল।

উপসংহারে নিবেদন, চাকুরে বাঙালীর উদ্ভব এবং পদসঞ্চার মাত্র এই প্রবন্ধে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। তার পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থার সব কটি মাইলস্টোন ধরে দেবার দুঃসাহস করিনি। লক্ষণীয় এই যে প্রধানত চাকুরেরাই নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে থেকে পরবর্তী প্রজন্ম গড়ে তুললেও, তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন অভাবী ভূস্বামী পরিবার। জমিতে পরিবারের ভরণ-পোষণ না হওয়াতে কিছু সদস্য কাজ-কারবারে বেরিয়ে পড়ে-ছিলেন। মাটিতে এঁদের নাড়ীর যোগ ছিল টন-টনে। নিছক চাকুরে মধ্যবিত্ত হিসেবে চিন্তা বা কর্মের জগতে কোন সমাজ-বিপ্লব এঁদের দ্বারা সম্ভব ছিল না। এঁদের অনেকেই চাকরীর জমানো পয়সায় আবার জমি-জোত কিনে ভদ্রলোক-জোতদার হয়েছিলেন এবং প্রজাস্বত্ব আইন নিয়ে মাতামাতি করেছিলেন।

তবু মানতেই হয়, এঁদের অনেকেই বাংলার নব জাগরণের পুরোধা-পুরুষ। তথাকথিত জমি-দার বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের চেয়ে এঁদের অবদান হয়ত কিছু বেশী। এঁরা পাশ্চাত্য-বিদ্যা আয়ত্ত করে হাতে-কলমে অনেক বেশী প্রয়োগ করেছেন। দেশীয় অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে এক সেতুসন্ধান সভ্যতার জনক হয়েছেন।

আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের নান্দীকার এঁরাই। ১৮৫১ সালের ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সভা থেকে শুরু করে ভারতসভা এবং জাতীয় কংগ্রেসের এঁরাই ছিলেন মেরুদন্ড। ১৮৫২ সনে প্রথমোক্ত সভার তরফে দিগম্বর মিত্র সরকারী চাকরী ভারতীয়-করণের দাবী করেছেন। ১৮৬৭তে মনোমোহন ঘোষ অন্যায়ভাবে বিলেতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অমনোনীত হলে এবং ১৮৭৭-এ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী মনোনীত হয়েও উপযুক্ত পদ না পেয়ে যে আন্দোলনের সূচনা করেন, তাকে ব্রিটিশ সরকার সে যুগে সিভিল সার্ভিস আন্দোলন এবং কিছু সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাক্রান্ত ঐতিহাসিক ইদানীং স্বার্থান্ধ আন্দোলন বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু গভীরভাবে ভেবে দেখলে বোঝা যাবে কেন রুটির লড়াই শিক্ষিত ভারতীয় জনমানসকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রতিবন্ধকতার স্বরূপ সম্বন্ধে সর্ব-প্রথম প্রবলভাবে সচেতন করে দিয়েছিল। জাতীয়তাবাদের দর্শন বাস্তবতার এই কষ্টিপাথরে শান পড়ে জাতীয়তাবাদী কর্মপন্থায় পরিণত হয়েছিল। যে বোধে আক্রান্ত হয়ে ১৮৫৬ সনে কৃষ্ণদাস পাল ব্রিটিশ দপ্তরে কেরানী হওয়াকে পোষা কুকুরের খোঁয়াড়ে প্রবেশের মত হীন কর্ম বলে মনে করেছিলেন এবং নব্যবঙ্গকে ধিক্কার দিয়ে স্বাধীন বৃত্তি নিয়ে স্বাধীনতার আস্বাদ নিতে উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছিলেন, যার ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি স্বদেশী যুগে ব্রিটিশপুষ্ট কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়কে গোলামখানা বলে গণনা করা, সেই জাতীয় চেতনাকে স্বার্থপরের প্রতিক্রিয়া বলে মেনে নিলে সত্যের অপলাপ হয়।

চাকরীজীবী মধ্যবিত্ত ইতিহাসে উপেক্ষিত পুরুষ। চরিতকথার এই স্মৃতিতর্পণ তাঁদের প্রাপ্য।

# চরদিনের গান

মীর মুখোপাধ্যায়

আমার এই চলতে চলতে দেখা, আর দেখতে দেখতে চলা। চলতে চলতে তো কি দেখি॥ দেখতে দেখতে কতো পথেই না চলি। এ যেন পিরীতি-ঝুলিটি ধে নিয়ে পিরীতি-নগরে ফেরা॥ এই রসেই মন মজেছে। এই রসেই আছি। ই রসেই কলম ভিজিয়ে বড় অনুরাগ একটি দুটি করুণ-রঙিন গল্প সাজাই।

বীণার কাজল দিয়ে উজ্জ্বল-করা চোখ আজ কোন্ বেদনায় টলটল ক'রে ঠলো, আমার কাছে এ খবরটি সবচেয়ে জরুরী। সুচরিতার আধোচাঁদের মত দুগ কপালে কেন চন্দনের টিপ নষ্ট হ'য়ে গেছে অনেকদিন, এ শহরে একমাত্র মিই তা' জানি। সেই সরু গলির তৃপ্তা এতোদিন যে সোজা সিঁথি কাটতো, জ কেন সে বাঁকা সিঁথিতে চলে এলো, এ সংবাদে আমি ছাড়া আর কে গুরুত্ব বে? কোন বিনোদিনীর নয়ন কোণে অগ্নিবাণ ঝলসে উঠেছে, কার চোখের গে চঞ্চলতা, কার ঠোঁটে গোপন প্রেমিক সেদিন চিহ্ন রেখে গেছে, কে কার কে আড় নয়নে চেয়ে একেবারে বিবশ, বিকল ক'রে দিয়েছে, নবীন কার লোবাসা সোনালী মদের মত ফেনায় ফেনায় উচ্ছ্বসিত—জীবনের কাটাকুটি লায় কতো হার-জিত, কতো জয়-পরাজয়, কতো শোধ-প্রতিশোধ, এই বিচিত্র জীবনের শাড়ির গায়ে এইগুলোই শুধু সাচ্চা জরির কাজ॥ আমি এদের মোহনিয়া দে আটকে পড়েছি।

...সেদিন আষাঢ়ের এক পড়ন্ত দুপুরে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, একটু আগে শ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, জলের টাংকের শীর্ষবিন্দুতে একটা একক ক বড় চুপচাপ এখন, জল পড়ছে না আর, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি একটা বাড়ীর নেকগুলি পাইপের মধ্যে একটা ফাটা পাইপ থেকে তখনো ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে জ,. আকাশে এখনো ছিন্ন মেঘ তবু রোদ উঠলো বেশ জমকালো ভঙ্গিতে, য়েরা বাড়ির ছাদে ছাদে উঠে পড়েছে হই হই করতে করতে, তারা ভিজে শাড়ি বার টান টান ক'রে মেলে দিচ্ছে এই আশ্চর্য বর্ষা-ধোওয়া তরুণ রোদ্দুরে—ব মিলিয়ে রঙ আর রূপের এক মধুর অর্কেস্ট্রা॥ এই মধুরে আরো মধুর ঢেলে রেক দৃশ্য হঠাৎ জেগে উঠলো আমার মুগ্ধদৃষ্টির সামনে।

স্কুলবাড়ির ঠিক মুখোমুখি একটা বাড়ির গরাদ দেওয়া জানলা, সেই জানলায় শ ফিরে বসে সদ্য যুবতী বয়সে প্রমোশন পাওয়া এক তরুণী, আর তার গোপন, সলজ্জ হাসির সোনালী বিভ্রমের ঠিক নীচে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে রূপবান ক যুবক, উড়ো পাখির ডানার মত যার ভুরু, মুখটা এমন মিষ্টি যে আদর রাতে ইচ্ছে করে, কাঁধে একটি কাজ-করা শান্তিনিকেতনী ঝোলা, (যুবক, আমি নিশ্চিত জানি, তোমার ওই ঝোলাটি নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়॥ ওতে তেমন রুরী কোন কাগজপত্র কিছু নেই॥ ওটা প্রেমিকার কাছে নিজেকে মহার্ঘ করার কটা সুপ্রচলিত আর্ট)। যুবকটি যেন যুবতীটির খুব নির্জনে এসে দাঁড়িয়েছে মন ভঙ্গিতে মুগ্ধ, আবিষ্ট চোখে, তন্ময় হয়ে ওর সব দামী আবোল তাবোল নে যাচ্ছে। যে রাস্তার ওপর, জানলায় বসে, নারী তার একপাত্র পুরুষের গায়ে হমবর্ণ শরীরের আলো ফেলছে সেই রাস্তাটি এই শহরের হৃৎপিন্ড, সেখান দিয়ে খন হাজার মানুষের ব্যস্ত চলাফেরা, কিন্তু এরা ভ্রূক্ষেপহীন, ওদের চার চোখে খন বিজলী হানাহানি॥ দৃষ্টি ফেরানো উচিত॥ কিন্তু তরুণীটি ওর সুন্দর, উজ্জ্বল চুলে যে একেবারে ঝলমলে হয়ে উঠেছে। দৃষ্টি কি ফেরে? কেনই বা ফিরবে॥ এই সব দৃশ্যের জন্যেই বেঁচে থাকা, তাই নয় কি! ওরা দুজনে দুজনাকে নিয়ে খুবই স্ত, তবু অতো ব্যস্ততার ভেতরেও কোনক্রমে সময় চুরি করে নিয়ে আমার কে নিত্রান্ত অবহেলায় একবার তাকালো। ব্যস, ওই পর্যন্তই। তারপর দুজনে আবার কূজনে মত্ত হয়ে গেল॥ কিন্তু আষাঢ় শেষের এই গাঢ় দুপুরের উতপ্ত নায়িকাটি দেখছি এককাঠি সরেশ॥ হঠাৎ উচ্ছল ভঙ্গিতে তার বাহু দুটি মাথার ওপর তুলে ও আর ঠাসবুনোট, উজ্জ্বল চুলের রাশি ঠিক করে নিলো॥ যুবক চোখ নীচু করলো। করবেই তো॥ তারই তো জিনিস। আর দু'চারদিন পর তারই তো একার সম্পত্তি হবে॥ তখন অনেকবার অনেকভাবে ওই আশ্চর্য শরীরটির অলীক মাধুরী নেড়েচেড়ে নানাভাবে যুবক আবিষ্কার করবে। আজ, এখুনি এতো তাড়া কিসের? কিন্তু আমার তো সে উপায় নেই॥ আমার যে বেলা যায়। ঝিমে আঁচ॥ এই চেনাশোনার সাঁঝবেলায় যেটুকু যা রোজগারপাতি হয় সেটুকু থেকে একটুও যাতে অনাদরে হাতছাড়া না হয়ে যায় সেটুকু তো আমায় দেখতে হবে! অতএব আমি ওই আঁকাবাঁকা শরীরের সঙ্গে গভীর নেশার মত জড়ানো তরঙ্গিত শাড়িটির দিকে অপলকে তাকিয়ে রইলাম। প্রতিবাদ-স্বরূপে রমণী তার নিপুণ দাঁতে নীচেকার লাল ঠোঁটে আস্তে করে দংশন করলো। ভাবখানা এই, কি অসভ্য লোক একখানা!

বুঝি, বুঝি॥ সুন্দরী তরুণী, তোমাদের এ খেলাটাও বুঝি। যাকে তোমরা একদম পছন্দ করো না, যে তোমাদের চোখের বালি, তাকে তোমরা তো সভ্য দেখতে চাইবেই। আর যাকে তোমরা পছন্দ করো তার কাছে রোজ রোজ, প্রতি মুহূর্তে দাবী কর নতুন নতুন অসভ্যতা॥ তাই নয় কি?

তবে তাই হোক, তোমার জানলার ময়ূরপালঙ্কে তুমি রাজরাজেশ্বরী হয়ে বসে থাকো, আমি রূপবান যুবকটিকে তোমার ঠিক নীচে, রাস্তায় রেখে এখন চলে যাই। কিন্তু চলে যাই বললেই কি চলে যাওয়া সহজ!

যে মেয়েটিকে ভালো লাগে তার বাড়ীর চাকরটিকেও তো না ভালো লেগে

উপায় নেই।" এ বাড়ীতে কি চাকর আছে? থাকলেও তাকে এখন পাচ্ছি কই অতএব বাড়িটির দিকেই তাকাতে হল।

তাকাবার মত বাড়িই বটে। এমন সিন্দুকের মত বাড়ি এর আগে কখনো দেখিনি। নুড়িইঁটের গাঁথুনি। এক্ষুনি যেন খুলে পড়ে যাবে। প্লাস্টার ট্যাস্টারের বালাই নেই কোন। জায়গায় জায়গায় প্রকাণ্ড আস্তর উঠে গেছে যেন খাবলা খাবলা দেখায় তেমনি এখানে ওখানে গর্ত হাঁ করে আছে। দুপাশে দুটি সেকেলে ঝরোকার মত জানলা ভেঙে প্রায় পড়ে আর কি। বাড়িটি শেষদিকে বাড়িটিকে প্রায় দ্বিখণ্ডিত করে একটা দজ্জাল অশথ গাছ ... সবুজ পাতায় ঝলমল করতে করতে শয়তানের হাসি হাসছে, না, সর্বনাশের আর বাকি নেই। হঠাৎ একটা চামচিকে কালো শিখায় জেগে উঠে কানের পাশ দিয়ে উড়ে গিয়ে আকাশের নীলিমায় চলে গেল।

একদিকে এই সুন্দরী নারী আর তার কটাক্ষ-গর্ভ চোখ, রূপবান যুবকের উড়ো পাখির ডানার মত ভুরু আর তার প্ররোচনাময়, নরম মুখ—অন্যদিকে এই রংচটা, নোনার দাগ লাগা, এঁদো, বিবর্ণ, প্রায়-বিধ্বস্ত, পলেস্তরা-খসা এই পোড়ো বাড়ি—জীবনের এ এক বিচিত্র কনট্রাস্ট, একথা ভাবতে ভাবতে সেদিন নেহাৎ অনিচ্ছায় সরে এসেছিলাম সেদিনের সেই জানলার ধারের বিহ্বলতা থেকে। ফিরে আসতে আসতে, কে জানে কেন সেই গানখানিই বেজে উঠেছিলো, 'অপারূপ আঁচলে নব নীলিমা'। কার আঁচল? সে কি তুমি? সে কি তুমি? হেমন্ত সুন্দরী? না অন্য কোন হাওয়া-ঝরা ফুল? অন্য কোন মাধুরী? সে যাই হোক আর যেই হোক সেদিন আমার সমস্তদিন কোন এক অদৃশ্য মৌচাক থেকে মধু নিঃশব্দে ঝরে ঝরে পড়েছিলো। আমি একথা ভাবতে বাধ্য হয়েছিলাম, আজ কার মুখ দেখে আমি উঠেছি। যার মুখ দেখে উঠেছি তার মুখ যেন রোজ রোজ দেখি।

...প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুনকালের বৈভব মিশে আমাদের এ শহরটির চেহারা অনেকটা দাঁড়িয়েছে বয়স্কা, পৃথুল এক বারবিলাসিনীর মত। যৌবনের সে ঢেউ আর নেই। চামড়া অনেক শিথিল হয়ে গেছে। শরীরের রেখাগুলি আর তেমন টানটান নেই। তবু যে একদিন ছিল রূপের দাপট, রঙের অহংকার, তার জেল্লা আজো হীরার ধুলোর মত গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে এ শহরের এখানে ওখানে চিহ্ন রেখে গেছে।

এই শহরের গঙ্গার বিস্তীর্ণ পাড়ে, বটের ছায়ায়, দুমুখ খোলা ট্রাম রোডের ছায়াচ্ছন্ন বসবার জায়গাগুলিতে, রাস্তার দুধারের বাড়ির রোয়াকে অথবা ধাপিতে, লাইব্রেরীর বারান্দায়, ব্যানার্জি কেবিনের চালের ধারে, সদ্য নির্মিত পার্কে, বৃদ্ধদের গীতার আড্ডায়, ব্রিজ খেলার আসরে, সাঁতার সেঁটে যাওয়া চাতালে, অপরিচ্ছন্ন অসংখ্য, ছোটখাটো চা-খানায় এখন এই একটিমাত্র আলোচনা, এই সদ্য উত্তীর্ণ যুবতী আর ওই রূপবান যুবকটিকে নিয়ে।

হ্যাঁ, সবাই ওদের দেখেছে, ওরা কোথাও যায় না। ওরা আড়াল, আবডাল খোঁজে না। রেস্তোরাঁর পর্দা-খাটানো সংক্ষিপ্ত আসনে ওদের কখনই পাওয়া যায় না। ওদের যুগলে ম্যাটিনি অথবা নাইট শো'এ কখনো কেউ দেখেনি। ওদের সবই প্রকাশ্য, কোন ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই, সকলের চোখের সামনে দিনান্তে একবার বা তিনবারই, সকাল, দুপুর, সন্ধ্যে, ওদের দুজনকে দেখা যাবেই একই জায়গায়, একই ভঙ্গিতে। জানালার একপাশে ফিরে বসে আছে তরুণী যুবক নীচেতে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে, আর ওরা কথা বলে যাচ্ছে অনর্গল, অনবরত, আষাঢ়ের ধারার মত, কে দেখলো না দেখলো তাতে তাদের বড় বয়েই গেল, যে কেউ এ পথে যাবে, তার একবার দৃষ্টি পড়বেই। তার মনে হবেই যুবকটি মেয়েটির সঙ্গে আছে অর্থাৎ মেয়েটিও আছে যুবকটির সঙ্গে আর তারা কথা বলছে না তো যেন চারিদিক আলো করে শিউলি ফুল ঝরে ঝরে পড়ছে।

এরপর যখনই ওপথ দিয়ে গিয়েছি, যখনই বারেক ওদের সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে, আমি দাঁড়িয়ে গেছি, বলেছি না, তরুণীটি এক কাঠি সরেস! সে হয় সঙ্গোপনে আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ভ্রূভঙ্গি করেছে অথবা অকারণে উচ্চকিত হ'য়ে উঠেছে ওর অমলিন, বিজয়িনী হাসি, অথবা তার অবাধ্য দৃষ্টি, আঁচলটি অশাসনে কাঁধ থেকে খসে পড়েছে, আমি কি ক'রব, আমাকে নিতান্ত বাধ্য হয়েই সেই 'গোল্ডেন মাউন্ড'এর দিকে তাকাতেই হয়েছে, অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে চোখও ফিরিয়েছি, কিন্তু তা হলে কি হয়, তাতেই রমণীর চোখের দৃষ্টি হয়েছে প্রখর ঠোঁটের রক্ত রেখায় ফুটে উঠেছে তাচ্ছিল্য, গ্রীবার অনবদ্য ভঙ্গিতে এসেছে রানীর মত অহংকার—যা' কেবলমাত্র তাকেই মানায়।

আমার এই সবই দেখতে দেখতে চলা আর চলতে চলতে দেখা। এই দেখা যেমন ফুরোয় না, এ চলারও তেমনি শেষ নেই।

...এর মধ্যেই হঠাৎ দমকা বাতাস একদিন আমাদের চিরকালের শান্ত শহরটির ওপর দিয়ে বয়ে গেল। এই প্রাচীন শহর যেন বড় বেশি জীবন্ত, বৃহৎ হয়ে উঠলো। কি যে হল কাণ্ডখানা! অবাক হয়ে দেখলাম, এতোদিনের সাজানো ছক উল্টে গেছে। পুরোনো স্তম্ভগুলি যেন মুখ-থুবড়ে পড়ে গেল। এলো এক বিদঘুটে, আজব, বান। এই বান, বেশ মনে হ'ল, ডাঙা ডহর সব ভাসিয়ে নেবে। একটা দিক—হারানো, ভয়ংকর স্রোত আমাদের স্থবির গার্হস্থ্যকে যেন ফর্দাফাঁই ক'রে, ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার ক'রে দিলো।

আমি একদিন সন্ধ্যের ঝোঁকে কাছের স্টেশন দিয়ে গরিফা যাবো, স্টেশনের নীচেটায় যে চার নম্বর বাসটা এসে দাঁড়ায়, সেইখানে দাঁড়িয়েছি, অন্ধকারে কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছিলো, হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে একটি ছেলে উঠে এ'লো আমার

আমার কাছে পড়েছে। শুনেছি ওর বাবা নেই বিধবা মা আছে। যাই, ওঁর কাছে যাই। সান্ত্বনা আর কি দেব। কে কাকে সান্ত্বনা দেয়! অমনি একটু যাওয়া। দশ বারো দিন পর ওদের পাড়ায় ঢুকতে যাবো, পাশ দিয়ে সাঁ করে অন্ধকারে কে একজন চলে গেল। তার পরেই মুখে জোরালো টর্চের আলো, 'হল্ট'। দাঁড়িয়ে পড়লাম কাছে এসে আমার আপাদমস্তক ভালো করে নিরীক্ষণ করে কে যেন বলল, 'ও আপনি। তা সন্ধেবেলা এ গলিতে কেন?'

কারণটা বললাম। বলতেই ওরা পথ ছেড়ে দিলো। খানিকটা গিয়ে আর একটা বড়, দোতলা, ভাঙা বাড়ির কড়া নাড়তে লাগলাম। মিনিট খানেক পর থান কাপড়ে মোড়া এক বুড়ী মতন, মাজা-ভাঙা মেয়েমানুষ বেরিয়ে এলো।

বললে, 'কি বাবা!'

বললাম, 'অমলকে পড়াতাম। তাই একবার—'

বাক্যটা আর শেষ হতে দিলাম না। এসব বাক্য কেমন করে শেষ করতে হয় আমি তার ব্যবহার জানি না।

উনি হ্যারিকেনটা মুখের সামনে তুলে, কি আশ্চর্য, হেসেও ফেললেন।

'তোমার বাড়িতে পড়তে যেতো, বাবা।'

'হ্যাঁ।'

'অমলের মাস্টারমশাই আপনি? আমি ভেবেছিলাম পুলিসের লোক। আসুন বাবা, ভেতরে আসুন।' আমি নিঃশব্দে সেই বিশাল পোড়ো, প্রায়ান্ধকার বাড়ির জঠরে প্রবেশ করে, স্যাঁতা-পড়া ভিজে ভিজে কাঠের সিঁড়ি পার হয়ে, একটা অনতিপ্রশস্ত ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম।

উনি বললেন, 'ওই আমার আট ছেলের পর শেষ ছেলে। বোমা বাঁধতো। অনেক বলেছি, কেঁদেছি, শোনেনি। বোমার বস্তা মাথার শিয়রে নিয়ে শুতো। বললে বলতো, কখন পুলিস আসে ঠিক নেই। ঠিক সময় যেন বস্তা নিয়ে সরে যেতে পারি তাই মাথার শিয়রে রেখেছি। আমি শুনতাম না। আমি বলতাম, বোমার বস্তা যদি রাখতেই হয় সে আমার মাথার শিয়রেই থাক। আমি বুড়ী মানুষ। পুলিস বস্তা দেখে মনে করবে ঘুঁটের বস্তা। ছেলে রাজী হল। এতো করেও ওকে বাঁচাতে পারলাম না। বোমা তৈরি করতে করতে হঠাৎ ফেটে গিয়ে'—

বুড়ী হু হু করে কেঁদে ফেললে। মাথা নীচু করে আছি। টেবিলে রাখা হ্যারিকেনের রক্তবর্ণ আলো আমার পিছনের দেয়ালে আমারি একটা ভৌতিক ছায়া তৈরি করেছে। আমি সেই দিকে মুখ ঘুরিয়ে কতক্ষণ ছিলাম জানি না, কে একজন ঘরে ঢুকলো, একটি মধ্যবয়সী মাসী পিসী গোছের মানুষ, আমার সামনে টেবিলের ওপর ঠক করে কি একটা নামিয়ে দিলো, বললে, 'এটুকু খান।'

আমি চমকে চেয়ে দেখলাম, সন্দেশ।

অমল বোমা বার্স্ট করে মারা গেছে। ওর চোখ দুটো উড়ে গিয়ে সেখানে কালো কালো দুটো গর্ত হয়েছে, ঘটনাটি নৃশংস কিন্তু তার চেয়েও নৃশংস এই নিরীহ দেখতে সন্দেশটি। অপঘাতে মৃত এই বাড়ীর বাড়িতে মাস্টারমশাই হিসেবে প্রথম ঢুকেছি বলে এটি আমাকে খেতে হবে। জীবনে এর আগে অনেক পরীক্ষা দিয়েছি, কিন্তু এমন পরীক্ষা বোধ করি এই প্রথম। কোনক্রমে সন্দেশটি গলাধঃকরণ করে, জলের গ্লাসের শেষ বিন্দুটুকু পান করে, সটান উঠে দাঁড়িয়ে, 'চলি' বলে সেদিন বেশ একটু অশোভনভাবেই অমলের মার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম।

...পর পর এই রকম চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে যাবার পর, এই সব বোমাবাজী, রক্তারক্তি অনেকটা নিস্পৃহ চোখে দেখতে লাগলাম। এই রকম মারামারি, কাটাকাটি নোতুন কিছু নয়, যুগ ইতিহাসের পর্বে পর্বে মানুষের আদিম রক্ত এক এক সময় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, এক একবার, এক এক নামে, এক এক পতাকার নীচে শুরু হয়েছে তাণ্ডব, গভীর নিশীথে বেজে উঠেছে কাড়া-নাকাড়া, রক্ত মশালের ধবকো ধবকো আলোয়, অন্ধকার আরো করাল, আরো ভয়াল হয়ে উঠেছে, মানুষের কাটা-মুণ্ডু জমিয়ে জমিয়ে মানুষ নিতান্ত ফাঁপা, অর্থহীন জয়স্তম্ভ তুলেছে, অশ্বক্ষুরের ধুলোয় ধুলোয়, বন্দুকের শব্দে, বারুদের ধোঁয়ায় সেদিন যে এসেছিলো আজ লাল তিলকে ললাট রাঙিয়ে সেই আবার এসেছে, এ নোতুন কিছু নয়, চমকপ্রদও কিছু নয়, সেদিন যদি মানুষ সব সহ্য করতে পারে, আজকেও মানুষ তা পারবে—এই সব ভেবে, সময়, জীবন আর ইতিহাসের এই ব্যাখ্যায় বেশ একটু আত্মপ্রসাদও লাভ করলাম। কিন্তু একদিন আমার নিজের আবাসেই এমন এক কাণ্ড ঘটলো যে আমার এই বড় বড় আইডিয়া দিয়ে তৈরী এই অতি-সৌখিন, রুচিবান, বিদগ্ধ আত্মপ্রসাদটি, (আহা বেচারী!) বেলুনের মত ফুটো হয়ে গেল। ঘটনাটি সামান্য কিন্তু আমার কাছে বিভীষিকার মত লাগলো।

...আমি বাড়িতে ঢুকেছি, সিঁড়িতে একটা পা রেখেছি, কি রাখিনি, দেখি যে ঘরটি আমরা ব্যবহার করি না সেই ঘরটি এতোদিন তালা ঝোলানো ছিলো, হঠাৎ দেখি সে ঘর থেকে গোণ্ডাচারেক পাড়ার ছেলে বের হচ্ছে।

ব্যাপারটা কি জানতে যাবো আমার স্ত্রী প্রজ্ঞা এসে আমার হাত ধরে টানতে টানতে ওপরে নিয়ে গেল। আমি প্রজ্ঞার ব্যাপারে হকচকিয়ে গেলাম। বললাম, 'কি ব্যাপার! এসব কি? এরা কারা?'

'বুঝতেই তো পারছো। চুপ করে থাকো।'

'কি চুপ করবো। আমার ঘরে আমার বিনা পারমিশনে—'

'আঃ, কেলেঙ্কারী কোরো না। মরবে বলে মতিভ্রম হয়েছে!'

'মরণ' কথাটি শুনে আমি একটু থতমত হলাম। তবু বললাম, 'আমার বাড়িতে আমারি পাড়ার ছেলে ঢুকে ভোগ দখল করবে, তবু আমি কিছু বলতে পারবো না!'

'ওগো, না। ওরা আর পাড়ার ছেলে আছে নাকি! ওদের দিকে কখনো তাকিয়ে দেখোনি?'

রা কি আর ওরা আছে। ওরা অন্য রকম হয়ে গেছে। ওদের সঙ্গে পাইপগান

কার আমার বিস্ময়ের পালা।

ম পাইপগান জানো, দেখেছো?'

মি বলতে গিয়েছিলাম, ওরা পাঞ্জাবির গলাটা একটু ফাঁক করে পাইপগান া। তাই তো আমি তোমাকে বারণ করছি।'

লা দেওয়া ছিলো যে ঘরটায়?'

রা তালা ভেঙে ঘরে ঢুকেছে।'

কন ঢুকছে জিগেস করলে?'

ক যেন বলল, বিপ্লব করবে ভাই।'

বপ্লব!' তা বটে। ওই অবস্থাতেও কথাটা শুনে হাসি পেল। কিন্তু এ তো শ। এতোদিন যা হচ্ছিলো সবই পরের ওপর দিয়ে। তাতেও ভয় ছিলো না নয়, তবে রোমাঞ্চ ছিলো অনেক। কিন্তু এখন যখন নিজের ঘরেই যবনিকা ন, তখন দেখছি রোমাঞ্চের ছিটেও নেই. শুধু ভয়ই আছে, ভয় আর অসীম , বিরক্তি আর কিছু করতে না পারার জন্যে একটা অন্ধ আক্রোশ, যে শ মানুষ নিজের আঙুলে নিজে কামড়ায়। আচ্ছা জ্বালা হল দেখছি। উঠতে এ বেশ ভালো দুশ্চিন্তা হল। সিঁড়ি দিয়ে যখনই উঠবো নামবো তখনই কারুর না কারুর সঙ্গে চোখাচোখি হবেই আর সমস্ত রাত আমি ঘুমোতে া না। এ আবার কি আপদ জুটলো দেখ। ঠোঁটের ওপর একটা ওষ্ঠব্রণ গজে 'বিপ্লব' হচ্ছে! যতো সব—

...যেমন জোয়ারের জলের মত সগর্জনে আজ এই সব মারামারি, কাটাকাটি তেমনিই একদিন এসবই কাতরাতে কাতরাতে চলে যাবে। আশ্বাস দেওয়া হবে ছু সুন্দর হবেই, শেষ পর্যন্ত দেখা যায় কোন কিছুই সুন্দর হয় না, বরং আগের চেয়ে অনেক খারাপ হয়, মাঝখান থেকে রেখে যায় কিছু তিক্ত স্মৃতি। সোনার মত ছেলের জীবন্ত ও উষ্ণ গল্প, রাস্তার এ মোড়ে ও মোড়ে ছড়ানো বিগ্রহের মত কিছু শহীদবেদী, আলকাতরা দিয়ে আঁকা দেয়ালে দেয়ালে লাঘামর কিছু হিংসা ও প্রতিহিংসার বাণী। ওই তো বিপ্লব। ক্রমে একদিন তিক্ত স্মৃতির গায়েও জমে কালের ধুলো, সোনার ছেলেদের রূপকথাও তার হারায়, শহীদবেদীর ইঁট কারা যেন পালা করে করে খুলে নিয়ে যায়, জলে রোদ্দুরে ভিজে আর পুড়ে গিয়ে বিবর্ণ পতাকার মত আলকাতরার লেখা- রঙের জৌলুস হারায়, দেয়ালে দেয়ালে লটকানো বাণীগুলো আজ যতো ত মনে হোক, সেগুলোর দিকে লোকে একদিন ভুলেও তাকায় না, কেননা লো ততোদিনে সব অর্থহীন, দ্যুতিহীন হয়ে পড়েছে, পোস্টার আর ইস্তাহার বাড়ির গা থেকে পুরোন ঘায়ের খোসার মত পড়ে যায়—এই তো বিপ্লবের ।

ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলাম, ভালো লাগলো না, রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। মাথাটা ধরে গেছে। আজ একটা ঘর দখল করেছে পাড়ার ছেলেরা, কাল গোটা বাড়িটাই করে নেবে। তা হলেই হয়েছে আর কি! ঠিক আছে, এ রকম যদি করে, লে আমিও সটান ওদের দলে ভীড়ে যাবো। পরের ঘর আর পরের বাড়ি দখল র জন্যে ওসকাবো। তখন হয়তো ছোঁড়াগুলো বুঝবে লোকটাকে ওপর থেকে সাধু সাধু দেখাক আসলে একটি, তখন আর আমায় ঘাটাবে না, হয়তো বেই আমার ঘর বাড়ি রক্ষা পাবে। চাই কী এমন নিয়ম হতে পারে, এবার যে নিজের ঘর নিজের বাড়ি দখল করো।

মনে মনে খুব একচোট হাসলাম।

ইউরেকা, পেয়ে গেছি। ব্রাভো ওয়েল ডান।

আজ সারাদিন খুব বৃষ্টি গেছে। সকাল থেকে শেষ বিকেল পর্যন্ত একটুও ছিলো না। এই এখন একটু থেমেছে। রাস্তার নিয়ন লাইটে জলে ভেজা, য় থকথকে রাস্তাঘাট, ভিজে সপসপে ঘরদুয়ার কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। আকাশে এখনো জমাট কালো মেঘ, মাঝখানে একটখানি ফাটল, সেই ফাটল জ্যোৎস্নার মরা আলো সদ্য উঁকি দিয়েছে। লোকজন প্যান্ট গুটিয়ে জলে- া শহরের ওপর থপ থপ শব্দ করতে করতে ভূতের মত হেঁটে চলেছে। আমিও ছ ভারাক্রান্ত মনে, হু হু জোলো হাওয়া দিচ্ছে, কেমন একটু শীত শীত াছে, মরা আলোয় শহরটাকে ভারি অদ্ভুত লাগছে, মনে হচ্ছে, 'আনরিয়েল', অন্য কোন দূরের গ্রহ, এ পৃথিবীর নয়।

এমন সময় হঠাৎ কান ফাটানো সেই ভয়ংকর আওয়াজ, সেই বুম বুম শব্দ, ব্রিজের ভেতর প্রথম শুনেছিলাম, সেই ভয়ংকর শব্দ, তার পরেই একটা তীক্ষ্ণ —আর সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট ওয়ারলেস ভ্যান...তার সার্চ লাইটের তীব্র লা যে যেখানে ছিলো দুদ্দাড় ছুট...আমি ছুটলাম...

ঘণ্টা দুয়েক পর খবর নিয়ে যা জানলাম তাতে মন বিষাদে একেবারে ভরে া। হ্যাঁ সেই রূপবান যুবক, উড়ো পাখির ডানার মত যার ভুরু, কাঁধে কাজ-করা ন্তিনিকেতনী ঝোলা নিয়ে জানলায় বসে থাকা প্রেমিকার কাছে যার ছিলো জকে মহার্ঘ্য করবার প্রয়াস, সব সময় যাকে দেখা যেতো রাস্তায়, সকাল-দুপুর- ত্র যখনই লোকে এ পথে হেঁটে যেতো তখন কোন না কোন সময়ে তাকে দেখা তাই এর কোন ফাঁক ছিলো না, আজ, এই কিছুক্ষণ আগে খতমওয়ালাদের ত সে খতম হয়ে গেল।

তাকে প্রথম তার প্রিয় জানলার ধার থেকেই নাকি ডাকা হয়েছে, সে অকপট পাইপগান, বৃষ্টি আর অন্ধকার মেশা দিন...ঝির ঝিরে বৃষ্টি আর পাতলা, তরল অন্ধকার...মাঝে মাঝে আকাশে বিদ্যুতের টান, দমকা বাতাস এলোমেলো...কে কার খোঁজ রাখে...খোঁজ রাখলেই বা বাধা দিচ্ছে কে...তাকে একটা গলির মধ্যে নিঃশব্দে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, প্রথমে ঘাড়ে মারা হয়েছে মুগুর, ও মুখ থুবড়ে পড়েছে মাটিতে, ও তখনো মরেনি, ও তখনো চেয়েছে জল, ওর মুখে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে পিস্তল, সবশেষে যা নিয়ম, বোমা ফাটিয়ে চলে যাওয়া—সেইভাবেই ওরা চলে গেছে।

ওকে মারা হল, কেননা ওকে ওদের অনেক দিন থেকেই সন্দেহ, ও নাকি স্পাই ও নাকি সকাল-দুপুর-সন্ধ্যে জানলার নীচে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওদের গতি-বিধি লক্ষ করতো, একদিন কি একটা নাকি খুব গোপন জিনিস ও দেখে ফেলে, সেটা এমনই এর পর যুবকটিকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থই হচ্ছে নিজেদের সর্বনাশ সাধ করে ডেকে আনা। হ্যাঁ, বৃষ্টি আর অন্ধকার মেশা দিন...ঝির ঝিরে বৃষ্টি... আর পাতলা, তরল অন্ধকার...দমকা বাতাস এলোমেলো...মাঝে মাঝে আকাশে বিদ্যুতের টান...হ্যাঁ, ভালোই হল, বেশ হল।

এর পর থেকে জানলার ধারে সেই মেয়েটি আর বসবে না, কেন না ছেলেটি তো আর নেই, সে খতম হয়ে গেছে, আর কেউ ওদের কথা বলতে দেখবে না, ওদের নিয়ে আলোচনাও আজ থেকে খতম হয়ে গেল।

যে মারা গেল—সে গেলই তার জন্যে কোন চিন্তা নেই, কিন্তু বেঁচে যে রইলো সেই মেয়েটি? তার কি হবে? সে এই ভয়ংকর শোক কিভাবে গ্রহণ করবে? এর কি কোন উত্তর আছে? না, একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে আমাকে মাথা নীচু করে মেনে নিতেই হল—এর কোন উত্তর নেই।

উঃ! আজকের গোটা দিনটাই কেমন অবিশ্বাস্য, কেমন অভিশপ্ত। একটু আগেই মনে হচ্ছিলো শহরটা কি 'আনরিয়েল'। আর এখন? এখন মনে হচ্ছে বড় বেশি 'রিয়েল'। অন্য কোন দূরের গ্রহ এটা নয়।

আমি কাঁদতে পারি না, এই এক অসুবিধে আমার, ন... একটু কাঁদতাম, নিজের মনে। হায় বিপ্লব! হায় তার বলি!

...যা স্বাভাবিক। জানলা আর খুলল না তার পরের দিন। তার পরের দিনও না। তার পরেও না। শুনলাম, মেয়েটিকে নিয়ে ওর বাবা অন্য কোন জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছে। আহা, দেবেই তো। ও আর এখানে থেকে কি করবে? কি করেই বা থাকবে? এখানে যে ওর অনেক দিনের অনেক স্মৃতি।

এখনো চোখ বুজলে আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাই, স্কুলবাড়ির সামনাসামনি একটা বাড়ির জানলা, সেই জানলায় পাশ ফিরে বসা এক তরুণী, তার গোপন, সলজ্জ, মোহিনী হাসির বিভ্রমের নীচে রাস্তার ওপর দাঁড়ানো সেই রূপবান যুবক, উড়ো পাখির ডানার মত ভুরু, কাঁধে শান্তিনিকেতনী ঝোলা, মুগ্ধ হয়ে সে যেন মেয়েটির অনেক বেশী নিজনে এসে তার সবচেয়ে দামী আবোল তাবোল তন্ময় হয়ে শুনে যাচ্ছে। এ সংসারের সমস্ত কলরোল ছাপিয়েও আমি যেন তাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি।

...মাসখানেক পর, এই পথ দিয়েই ফিরছি, হঠাৎ, এমনিই জানলায় চোখ পড়ে গেল। কি আশ্চর্য! এ কি ভোজবাজী নাকি! ম্যাজিক! যাদু! চোখে ঠিক দেখছি তো! রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে সেদিনের সেই যুবকটির মত একজন যুবক, কাঁধে অভ্রান্তভাবে কাজ-করা শান্তিনিকেতনী ঝোলা আর সেদিনের সেই মেয়েটির মতই আর একজন, সে জানলায় বসে আছে। আহা, মুখখানি কি সুকুমার! চাঁদের মতন মসৃণ কপাল! পিঠে একতাল কুঞ্চিত চুলের রাশ! ওই রকমই দীঘল চোখ বড় বড় পালক দিয়ে ঘেরা। হাসিতে, লজ্জায় অপরূপ হয়ে কথা বলে যাচ্ছে! ওরাও কোনদিকে তাকাচ্ছে না—রাস্তায় এখন কতো লোক, তাদের কতো রকমের অর্থ-পূর্ণ চাহনি, কেউ কেউ টিপ্পনী কাটছে, ওরা কিন্তু নির্বিকার, ওরা কোনকিছু গ্রাহ্য না করে পরস্পর কথা বলে যাচ্ছে। বাস্তবিক, জীবন কি বিচিত্র, কি বিচিত্র জীবনের ধারা।

প্রথমটায় একটু থতমত খেলেও ব্যাপারটা না বোঝার কিছু নেই। মেয়েটির দিকে একটু নিরীক্ষণ করলেই টের পাওয়া যায়, এ মেয়েটি কিছুতেই সে মেয়েটি নয়, কিন্তু সম্ভবত মেয়েটি সে মেয়েটিরই বোন, মুখের গড়নে, হাসির ধরনে, বসবার আলস্যময় ভঙ্গিতে, বেশেবেশে অনেকটা তারই মত, তবু সে নয়। আর যুবকটি যে অন্য যুবক তা কল্পনার অপেক্ষা রাখে না, মুখ চোখের গড়নও আলাদা, উড়ো পাখির ডানার মত ভুরুও নেই, কিন্তু চোখে মুখে অবিকল সেই একই মুগ্ধতা, যা চিনে নিতে ভুল হয় না।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত একটা কথা আমার মনে হল। যদি এই তরুণী বা ওই তরুণকেও পুলিসের স্পাই বলে সন্দেহ করা হয় বা ভয়ংকর কোন অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—এরকম দেখানো হয় তবু আমি যেন কেমন করে জেনে গেলাম, এ জানলা কখনো বন্ধ হবে না।

এ আর কি সামান্য দু' চারটে বোমা আর পাইপগান বা স্টেনগান! এ আর এমন কি সাঙ্ঘাতিক দুর্যোগের দিন! শত শত আগ্নেয়োচ্ছ্বাস, বা ভূমিকম্প বা পরাক্রান্ত মহামারী বা বন্যার ওপরেও এ জানলা খোলা থাকবে, সেদিনো যুবক দাঁড়িয়ে থাকবে রাস্তায়, আর জানলায় বসে নারী তার একমাত্র পুরুষের গায়ে তার হেমবর্ণ শরীরের আলো ফেলবে, আর তারা কথা বলে যাবে অনর্গল যেমন করে ঝরে শিউলি, শিউলি ঝরে বনভূমি আলো করে।

ছবি : সুধীর মৈত্র

# মায়েরা!

# এঞ্জেল শিশু-দুগ্ধাহার সহজেই হজম

# এটি আপনাদের মমতার মতই স্নিগ্ধ

## ভিটামিনে ভরপুর এঞ্জেল একটি সুষম আহার এবং সহজে হজম হওয়ার জন্যে খুব মিহি আর মসৃণ ক'রে তৈরী।

**এঞ্জেল শিশু-দুগ্ধাহার কয়েকবছরের গবেষণার ফল। শিশুর বাড়-বাড়ন্তের জন্য যে সমস্ত পুষ্টি দরকার, তা সবই আছে এতে। এর দুধের গুড়ো খুব মিহি আর মসৃণ করে তৈরী করা হয়েছে যাতে শিশু এটি সহজেই হজম করতে পারে।**

**"শিশুর পাকস্থলীর জন্য মিহি আর মসৃণ দুধের গুঁড়ো দরকার"—**

শিশুর পাকস্থলী নতুন নতুন কাজের সম্মুখীন হয়। তার নবীন পাকস্থলী যাতে বিপদগ্রস্থ না হয়, সেজন্য এঞ্জেল দুধের গুঁড়ো খুব মিহি আর মসৃণ করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এঞ্জেলের চর্বিগুলি ছোট ছোট মিহি দানায় গুঁড়ো করা হয়। পাকস্থলীতে গিয়ে এঞ্জেল নরম আর সহজে গলে যাওয়া দইয়ের মত হয়। শিশু তা চট্ ক'রে হজম ক'রে নিতে পারে।

**"শিশুর বাড় ও গঠনের জন্য সুষম আহারের প্রয়োজন"—**

প্রথম কয়েকটি মাস শিশুর ভবিষ্যৎ গঠন আর তার বেড়ে ওঠার ভিত্তি। এই বিশেষ সময়ে তার দরকার সবরকমের ভিটামিন আর লৌহ। এঞ্জেল একটি ভিটামিন-ভরপুর ফর্মুলা যাতে আছে আটটি ভিটামিন আর লৌহ। প্রকৃত পক্ষে এঞ্জেলই একমাত্র শিশু-দুগ্ধাহার যাতে রয়েছে বেশী পরিমাণ ভিটামিন-'ই', যা শিশুর কোমল চামড়া রক্ষা করে।

**"মায়েদের কাছে এই দুগ্ধাহার তৈরী করাও এত সহজ"—**

আপনি কেবল আধ মিনিটে দুগ্ধাহারটি তৈরী ক'রে আপনার শিশুকে খেতে দিতে পারেন। শুকনো দুধের পাউডার। আপনি কেবল চামচ দিয়ে এই পাউডার ফীডিং বোতলে ঢালবেন। তারপর গরম জল ঢেলে নাড়ুন। ব্যস্, আপনার শিশুর পুষ্টির আহার তৈরী। সে · দি খেয়ে সহজেই হজম করবে। এবার ·পনার শিশু হলো—সত্যই এঞ্জেল শিশু।

**ভিটামিন-'ই' সহ আটটি ভিটামিন দ্বারা সুরক্ষিত।**

**'Progress of an Angel Baby'**

**বিনামূল্যের এই পুস্তিকার জন্য এক টাকার ডাক টিকিট সহ এই ঠিকানায় লিখুন :—**

Consumer Services Division, Foremost Dairies Ltd. 72 Janpath, New Delhi-110001

**ইণ্ডানা** ডেইরীর দুগ্ধজাত দ্রব্যের প্রস্তুতকারকদের তরফ থেকে।

**আপনার এঞ্জেল শিশুর জন…**

# কষ্টকল্পিত
## অতুল্য ঘোষ

**(নবপর্যায়)**

**॥ ৪২ ॥**

মধ্যে মধ্যেই শুনতে পাওয়া যায় যে, তারা বলেন 'রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা য়েছি বটে কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ইনি।' এ নিয়ে পূর্বেও লিখেছি যে, এ র কোন অর্থ হয় না। ভারতবর্ষ স্বাধীন ার পর একটি রাজনৈতিক দল তারস্বরে ংকার করত যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ়ুটো'। কয়েক বছর ধরেই তাঁরা এ কথা লছিলেন; কিন্তু এখন তাঁরা আর এ কথা লন না। অবশ্য তাঁরা এ কথা বলা বন্ধ রেছেন এবং সেই অনুযায়ী কাজও করছেন। জনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এইসব বুলি কবে যে বন্ধ হবে, জানি না। াধীনতার আগে আবার কোন বিশেষণ কবে কেন? শর্তাধীন স্বাধানতা কোন াধীনতাই নয়। স্বাধীনতার অর্থ একটাই— শের পুরোপুরি দায়িত্ব দেশবাসী নিজের তে তুলে নিয়েছেন। বিদেশীর ইঙ্গিতে সে য়িত্ব প্রতিপালিত হয় না। স্বাধীন দেশ জেদের সমৃদ্ধির জন্য কতটা চেষ্টা করেছে, টা সে দেশের নাগরিকদের দায়িত্ব ও র্তব্যবোধের উপর নির্ভর করে। সমৃদ্ধ না লেও স্বাধীন দেশ স্বাধীনই থাকে। এমন কছু দেশ আছে, যারা কখনও পরাধীন ছিল া, কিন্তু তারা সমৃদ্ধ নয়। তার অর্থ এই য় যে, তারা পরাধীন ছিল। এর একটাই অর্থ য় যে, তারা নিজেদের সমৃদ্ধির জন্য চেষ্টা রেনি। দেশ স্বাধীন হলেই সব দেশের রাষ্ট্র-ন্ত্র যে এক হবে, তা তো নয়। কতরকম কাঠামো আছে। যুক্তরাজ্যে রাজতন্ত্র; কিন্তু সেখানকার জনসাধারণের হাতেই সব ক্ষমতা। রাজা বা রানী প্রতীকস্বরূপ। যেখানে রাজতন্ত্র নেই, সাধারণতন্ত্র অধিষ্ঠিত, সেখানকার মানুষদের যা ক্ষমতা, যুক্তরাজ্যের নাগরিক-দেরও সেই ক্ষমতা। যুক্তরাষ্ট্র সাধারণতন্ত্রী দেশ। কিন্তু সেখানকার নাগরিকদের যে অধিকার আছে, যুক্তরাজ্যের নাগরিকদেরও সেই অধিকার আছে। আবার কোন কোন দেশ সাধারণতন্ত্রী বলে অভিহিত হলেও সেখানকার নাগরিকদের সব ক্ষমতা নেই। যেমন কম্যুনিস্ট প্রভাবিত রাজ্যগুলি। এইসব রাজ্যে যে-কোন নাগরিক নির্বাচনে দাঁড়াতে পারেন না। পার্টির সদস্য হওয়া চাই। অথচ এঁরাও গণতন্ত্রী; এঁরাও স্বাধীন। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের আগে জাপানের সম্রাটের হাতে জাপানের সর্ব-ময় কর্তৃত্ব ছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের পর জাপানের সম্রাটের আর কোন ক্ষমতা নেই; জনসাধারণের নির্বাচিত আইনপরিষদের সভ্যদের হাতেই এখন সব ক্ষমতা। এখনও পৃথিবীর কিছু কিছু দেশ আছে বটে, যারা স্বাধীন বলে অভিহিত হলেও বিদেশী রাষ্ট্রের ইঙ্গিতে সেখানকার শাসনকার্য পরিচালিত হয়। এই স্বাধীনতা 'ঝুটো' বটে; কিন্তু ভারতবর্ষের সে অবস্থা নয়। ভারতবর্ষ একটি স্বাধীন, সার্বভৌম গণতান্ত্রিক দেশ। ভারতবর্ষ সব দেশের সঙ্গেই সখ্য চায়। কিন্তু কেউ যদি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে বা শত্রুতা করার চেষ্টা করে, তা হলে সখ্যের বন্ধন আপনা-আপনি ছিঁড়ে যায়।

স্বাধীনতার সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ইত্যাদি কোন বিশেষণই যুক্ত হতে পারে না। ভারতবর্ষে যেসব জিনিস পাওয়া যায় না বা এখনও উৎপাদন করা সম্ভব হয়নি, তা ভারতবর্ষ অন্য দেশ থেকে নিতে পারে। তার মানে অন্য দেশের অধীনতা নয়। পৃথিবীর সমস্ত উন্নত ও উন্নতিকামী দেশ, তারাও এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তার দ্বারা যে অর্থনৈতিক পরাধীনতা হয়েছে, এ কথা বোঝায় না। ইউনাইটেড নেশনস-এর কথা বললে অনেকে হয়তো হাসবেন। কিন্তু ইউনাইটেড নেশন যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন এই নীতির উপরই সৃষ্টি হয়েছিল যে, সমস্ত দেশ পারস্পরিক সহযোগিতার উপর নির্ভর করবে। অবশ্য কোন দেশ যদি অপর দেশের কাছে নিজেদের মঙ্গলকে বাঁধা দেয়, তা হলে সে দেশকে স্বাধীন বলা চলে না; যদিও সে দেশ বাস্তবিকপক্ষে স্বাধীন বলে অভিহিত হয়। এ কথা আগেও বলেছি। স্বাধীনতা শব্দটার অর্থ তো সংকীর্ণ নয়! স্বাধীনতার অর্থই হল সর্ব প্রকার স্বাধীনতা। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক—সবই এর মধ্যে পড়ে। আলাদা করে বিচার করতে হয় না। বড় বড় যেসব আবিষ্কার পৃথিবীতে হয়েছে, তা তো কোন একটি দেশের জন্য হয়নি—সমগ্র মানবসমাজের জন্যই হয়েছে! একসময়ে বড় বড় জার্মান পণ্ডিতরা সংস্কৃত ভাষার শ্রদ্ধা সহকারে অনুশীলন করেছেন। তার মানে এ নয় যে, তাঁরা জাতীয় সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতিকে অবলম্বন করেছিলেন। তার দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে, তাঁদের জার্মান সংস্কৃতি আরও লাভবান হয়েছিল। গ্যালিলিওর আবিষ্কারে সারা পৃথিবী লাভবান হয়েছে। দেশ যদি স্বাধীন হয়, তবেই বিদেশে যেসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও আবিষ্কার হয়েছে তা গ্রহণ করে দেশ লাভবান হতে পারে। আমাদের দেশে অনেকদিন ধরে রেললাইন আছে, রেল চলাচল করছে। আমরা যখন পরাধীন ছিলাম, তখন ইঞ্জিন, গাড়ির কামরা দূরে থাক, রেললাইনও তৈরি করতে পারতাম না। কিন্তু এখন আমরা সবই পারি। এর সঙ্গে পরাধীনতার সম্পর্ক কোথায়? পেনিসিলিন যিনি আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি কি কেবল-মাত্র তাঁর দেশের জন্যেই আবিষ্কার করেছিলেন? যখন আমরা পরাধীন ছিলাম, তখন বহু জিনিসই আমাদের বিদেশ থেকে আনাতে হত। আমাদের সম্পদ থাকলেও পরাধীনতার জন্য সেই সম্পদের সদ্ব্যবহার করতে পারিনি। এতগুলি নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা (রিভার-ভ্যালি প্রোজেক্ট) হয়েছে। প্রথম যখন কাজ আরম্ভ হয়েছিল,

তখন বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ আনাতে হয়েছিল। এখন আমাদের দেশের সম্পদ নিয়ে আমাদের দেশের বিশারদরাই তৈরি করতে পারেন। এরই নাম স্বাধীনতা। আমাদের দেশে প্রথম যখন ঘড়ি তৈরী হয়, তখন বেশির ভাগ সরঞ্জাম বিদেশ থেকে আনতে হত; এখন আর হয় না। আমাদের দেশের জঙ্গলে, পর্বতে, নদীতে—সর্বত্র কত সম্পদ ছড়িয়ে রয়েছে। পরাধীন অবস্থায় এই সম্পদের সদ্ব্যবহার আমরা ঠিকভাবে করতে পারতাম না; এখন পারি, আমরা স্বাধীন বলেই তো তা পারি! জাপান একটি স্বাধীন দেশ। সে দেশে কোথাও এক মুঠো লোহা পাওয়া যায় না। বিদেশ থেকে লোহা আনিয়ে জাপান এখন ইস্পাতশিল্পে পৃথিবীর প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। এতে কলঙ্ক কোথায়? আমাদের দেশে তো প্রচুর লোহা আছে! কিন্তু পরাধীন অবস্থায় অতি সামান্য সামান্য লোহার জিনিসও বিদেশ থেকে আসত। তার কারণ নিজের দেশের সম্পদের সদ্ব্যবহার করার ক্ষমতাও আমাদের ছিল না। বিদেশী রাজ তার দেশকে সমৃদ্ধ করার জন্য আমাদের দেশের সব সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যেত। তার নামই ছিল শোষণ। ক'জন বিদেশী কর্মচারী বেশী টাকা মাইনে নিয়ে আমাদের দেশকে শোষণ করত, এটা তো ঠিক কথা নয়। আমার দেশের সম্পদ আমারই দেশে সদ্ব্যবহার হত না, এরই নাম শোষণ। এখন শোষণ করবার কেউ নেই। আমরাই আমাদের দেশের সর্বময় কর্তা। এখন আমরা আমাদের দেশের সম্পদ যদি ঠিকমত ব্যবহার করতে না পারি, তাতে আমাদের অকর্মণ্যতাই প্রমাণিত হয়। নিজেদের অকর্মণ্যতাকে ঢাকা দেবার জন্য 'অর্থনৈতিক পরাধীনতা' এই কথা ব্যবহার করা অসাধুতারই নামান্তর।

মাঝে মাঝে আরও একটা কথাও শুনতে পাওয়া যায়—যখন আমাদের দেশের সঙ্গে অন্যান্য কতগুলি দেশের তুলনা করে বলা হয় যে, আমরা সেইসব দেশের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছি। পৃথিবীর ক'টা দেশ আমাদের মত পরাধীন ছিল? ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের কথা শোনা যায়। ফরাসীরা তো আমাদের দেশের মত পরাধীন হয়নি! তাদের দেশেরই দুটো দলের মধ্যে মারামারি-কাটাকাটি হয় শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের জন্য। অবশেষে দেশে স্থিতিশীলতা আসে। দু'শো বছর ধরে তো বিদেশীরা তাদের দেশ শোষণ করেনি! বহু ইংরাজ ঐতিহাসিকের লেখায় ভারতবর্ষ থেকে ইংরাজ ধনরত্ন কিভাবে শোষণ ও লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিল, তার বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে। ইংরাজ এ দেশে আসবার পর মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠন করে যে ধনরত্ন নিয়ে যায়, তার নিখুঁত বিবরণ কেউ দিতে পারেনি। যে বিবরণ পওয়া যায়, তাতে লেখা আছে যে, লন্ডন শহরে যে ধনরত্ন ছিল ঐরকম ১৯টা শহরের ধনরত্ন একত্রিত করলে যা হয়, তার চেয়ে ঢের বেশী ধনরত্ন মুর্শিদাবাদ থেকে লুণ্ঠিত হয়েছিল। এসব কথা সকলেরই জানা। তবু বারবার বলা প্রয়োজন হয়ে পড়ে এইজন্য যে, এ কথা যাদের বলার দায়িত্ব, তারা নির্বাক হয়ে থাকেন বলে। রাশিয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়। রাশিয়া তো পরাধীন ছিল না! রাশিয়ায় ঘটেছিল অন্তর্বিপ্লব! তা হলে কী করে সেইসব দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা হতে পারে? সমালোচনা নিশ্চয়ই করা উচিত। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত তথ্যও প্রকাশিত হওয়া দরকার। একদা ভারতবর্ষে জাহাজশিল্প ছিল মহা সমৃদ্ধ। বিদেশী শাসনের সময়ে সে শিল্প একেবারে নির্মূল হয়েছিল, এখন নতুন করে আরম্ভ করতে হয়েছে। আর কোন দেশে কি এরকম ঘটেছে! আমাদের দেশের সিল্ক ও সুতী তাঁতের কাপড় সারা পৃথিবীতে চালান যেত। আমরা জ্ঞান হয়ে অবধি দেখেছি, হয় ইংল্যান্ডে তৈরী কাপড়, অথবা ইংল্যান্ডের তৈরী সুতোয় এখানকার মিলে তৈরী কাপড়। মিলের যন্ত্রপাতিও আসত বিলেত থেকে। এরই নাম তো শোষণ! আমাদের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে বিদেশী রাজের অর্থনীতির সমৃদ্ধি। এইভাবে যেখানে শোষণ চলেছিল—সর্বাঙ্গীণ, সামগ্রিক ও সর্বজনীন, সেই দেশের সঙ্গে অন্য কোন দেশের তুলনা করা কি উচিত? এ কথা তো অনেকের জানা আছে যে, ভারতবর্ষে জাহাজ-ভরতি নুন বাহির থেকে আসতো। অথচ আমাদের দেশের তিন দিকে সমুদ্র এবং মাঝখানে নুনের পাহাড়! অনেকের হয়তো এ কথা জানা নেই যে, ভারতবর্ষে কয়লা আসতো বিদেশ থেকে। আজকে এটা আজগুবি মনে হলেও এটা সত্য। এবং এসব তথ্য ইংরেজ লেখকদের বই থেকেই পাওয়া যাবে। ক্রমাগত ভারতবর্ষ থেকে কাঁচা মাল চালান গেছে সেইসব সম্পদ নিয়ে সে দেশে কল-কারখানা হয়েছে, সে দেশের লোক অর্থোপার্জন করেছে সে দেশ সমৃদ্ধ হয়েছে। এই শোষণের সঙ্গে পৃথিবীর ক'টা বড় দেশের তুলনা হয়? আমাদের দেশে হিন্দু রাজত্ব ছিল, মুসলমান রাজত্ব ছিল, মাঝে মাঝে লুটেরা হানা দিয়ে ধনরত্ন লুঠ করে নিয়ে গেছে; কিন্তু অব্যাহত গতিতে এরকম শোষণ ও লুণ্ঠন কখনও হয়নি।

যাঁদের হাতে শাসনক্ষমতা আছে, তাঁরা যদি ঠিকমত কাজ না করেন, তা হলে বিরোধী পক্ষের সমালোচনা করার পূর্ণ অধিকার আছে কিন্তু 'অর্থনৈতিক স্বাধীনতা' এইসব বলে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা কি উচিত? আর সরকারী দলে যাঁরা এইসব কথা বলেন, তাঁরা নিজেদের অকর্মণ্যতা ঢাকা দেবার জন্য বলেন এতে সরকারী দলের কোন উপকার হয় না এতে খালি সৃষ্টি হয় জনসাধারণের মনে ধোঁয়াটে ধারণা। স্বাধীনতার বিকৃত ব্যাখ্যা দেবার অধিকার কারো নেই। স্বাধীনতা যেমন আনে নিজেদের দেশে সম্পদ সৃষ্টি করার অবাধ অধিকার, সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন দেশের নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথাও মনে করিয়ে দেয়। যাঁরা সরকার চালাচ্ছেন, তাঁদের নিশ্চয়ই দায়িত্ব আছে এবং সমালোচনার পথ রোধ করা তাঁদের উচিত নয়। ঠিক সেইভাবে সমালোচনা করার অধিকার যাঁদের আছে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকের দায়িত্বও পালন করতে হয়।

চমকলাগা আলো-
নীল রঙের বিচিত্র মেলা...
টেরিভয়েলের পোষাকে
নম্র-চপলতার খেলা !
চেহারায় ফুটিয়ে তোলে
নির্ভীক দীপ্তি ! পাবেন
নানান বিশিষ্ট রঙে !

# বিদেশে রবীন্দ্রচর্চা

ঘানা লেখক সঙ্ঘের সভ্যরা রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা' কবিতা আবৃত্তি করছেন

## ঘানাতে রবীন্দ্রজয়ন্তী

উদভ্রান্ত আদিম যুগে রুদ্রসমুদ্র যে আফ্রিকাকে নিয়ে নিয়ো গিয়েছিল প্রাচী পৃথিবীর বুক থেকে চোর কবি রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গে সেতুবন্ধন ঘটিয়ে- লেন আফ্রিকা কবিতায়। তারপর প্রায় অর্ধ শতাব্দী রা ঘানার প্রথম রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে গত ২০ মে রিখে যেন তারই পুনশ্চারণ ঘটল। আমাদের বাঁর বিবর আফ্রো-বঙ্গ সংস্কৃতির মেলবন্ধনের পদা সূত্রটি এখনও রবীন্দ্রনাথ।

ঘানা লেখক সংঘ ভারতীয় দূতাবাসের সহ- যোগিতায় স্থানীয় ব্রিটিশ কাউন্সিল হলে এ বছর যে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব পালন করলেন তার পরিকল্পনা কোস্মিক ভাবেই গড়ে উঠেছিল অনুষ্ঠানের কয়েকদিন আগে একটি ঘরোয়া আলোচনার আসরে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ উঠে পড়ায় এবং তাঁর কবিতা পাঠের ফলে। দূতাবাসের সাংস্কৃতিক সচিবের বাড়িতে সাহিত্য বিষয়ে কথা হচ্ছিল ঘানা লেখক সংঘের সভাপতির সঙ্গে। অনিবার্য- ভাবেই রবীন্দ্রনাথের কথা উঠল, তাঁর দু একটি কবিতাও পড়া হল। সবাই অভিভূত। আশ্চর্যের বিষয়, কিছুক্ষণের মধ্যেই উপস্থিত কবি-লেখকরা স্থির করে ফেললেন ঘানায় টেগোর সোসাইটি স্থাপন করা দরকার যেখানে ব্যাপকভাবে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে আলোচনা করা যাবে। এঁরা ঠিক করলেন কবির জন্মদিন পালন করতে হবে। যাওয়া হল ঘানার শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর কোয়ামেনা ওকরান মশাইয়ের কাছে। উনি তো খুব উৎসাহী। ঘানাতে অনেকদিন পর জঙ্গী শাসনের অবসান হয়ে আবার গণতান্ত্রিক সরকার এসেছে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয়। নতুন সরকার টালমাটাল নৌকো সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রীর ইচ্ছা ঘানার ছাত্ররা আরও বেশী করে ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ করুক। এ সম্বন্ধে উনি গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনা পড়েছেন এবং পড়ছেন। ২০ মে তারিখে প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানে উনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে স্বীকৃত হলেন।

ব্যস, উৎসবের আয়োজন শুরু হল। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী উৎসাহী ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী প এ নাজারেথ। পত্র-পত্রিকায়, রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচার শুরু হয়ে গেল। স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ওপর লিখলেন ঘানা লেখক সংঘ।

অনুষ্ঠান সূচী তৈরী হয়ে গেল। ঠিক হল ঘানা লেখক সংঘের সভ্যরা রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করবেন আর ভারতীয়রা করবেন রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং নৃত্যপরিবেশন। ছেলেমেয়েরা যারা বিদেশে মানুষ তাদের বাংলা গান-নাচ যাঁরা শেখাবেন তাঁদের নিজেদেরই এ ব্যাপারে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার দরুন বা দীর্ঘকাল চর্চার অভাবের জন্য কাজটা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কয়েক- জন বাঙালী ও দক্ষিণ ভারতীয় মহিলাদের নিয়ে তালিম দেওয়ার কাজ শুরু হল। পুরুষকণ্ঠেও দুজন বাঙালীকে পাওয়া গেল। একটা হারমোনিয়াম (কাজ চলে যায় গোছের) আর বাঁয়া তবলা ছাড়া আর কিছু নেই। একটি বাঙালী মেয়ে পিয়ানো বাজায়, তাকেও দুখানা গানের সুর শেখানো হল।

নির্ধারিত দিনে সন্ধে সাড়ে ছটায় সভাগৃহ দর্শক- শ্রোতায় ভরে গেল। এঁদের মধ্যে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ছাড়াও বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতেরাও উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী ওকরান তাঁর ভাষণে বললেন—

"In our country today as in many other developing countries, we appear still to be in slumber as to the relationship of language to culture. Let us learn from Tagore and others before him who re- cognised language as a tool of culture. He was born in Bengal and all his life wrote in Bengali. However, he was not blinded therefore to write and think in narrow terms. While he loved his monther-tongue, he used it as a vehicle for his learning and wisdom which transcended all barriers of language, caste, race and creed. I am sure that the parochial linguism and atavistic na- tionalism that often rear their ugly heads in some parts of Africa must now be torturing the spirit of Tagore."

ঘানার লেখক-লেখিকারা উদাত্ত কণ্ঠে কবিতা দিয়ে তাদের আবৃত্তি শুরু করলেন। সবচেয়ে আকর্ষক হয়েছিল একসঙ্গে চারজনে মিলে এঁদের 'আফ্রিকা' কবিতার ইংরেজী অনুবাদ পাঠ। ভারতীয় মেয়েদের নাচও খুব প্রশংসা কুড়িয়েছিল দর্শকদের।

বিশ্বপতি ঘোষ

## আমেরিকান কলেজে রবীন্দ্রচর্চা

এবছর বসন্তকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব- উপকূলে অবস্থিত ব্রিন্ ম'র (Bryn mawr) কলেজে তৃতীয় রবীন্দ্র-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। গত কয়েক বছরে এই অনুষ্ঠানটি কলেজের সাংস্কৃতিক জীবনের একটি অঙ্গ হয়ে গেছে। ব্রিন্ ম'র কলেজ তার আন্তর্জাতিক ছাত্রী-সম্প্রদায়ের জন্য খ্যাত। প্রতি বছর বসন্তকালে এখানে মহা ধুমধামের সঙ্গে 'আন্ত- র্জাতিক সপ্তাহ' পালিত হয়। উৎসবের উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। কলেজে এত বিদেশিনী ছাত্রী থাকায় নানা দেশের গানবাজনা, লোকনৃত্য, ছায়াছবি, এমনকি রান্নাবান্নার নিদর্শনে সারা কলেজ সরগরম হয়ে ওঠে। ১৯৭৭ সাল থেকে এই উৎসবে বড় রকমের জাগা বসিয়ে আসছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে, মেয়েদের পুরুষদের সমান উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেওয়ার জন্য ব্রিন্ ম'র

রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে ভারতীয় মেয়েদের নৃত্য

"নৃত্যের তালে তালে"

সমবেত নৃত্যে আমেরিকা, ফিলিপিনস, তাইওয়ান, ইয়েমেন, পাকিস্তান ও ভারতবর্ষের মেয়েরা

কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতারা সকলেই ছিলেন 'সোসাইটি অফ্ ফ্রেন্ডস্' বা 'কোয়েকার' সম্প্রদায়ের সভ্য। ব্রিন্ ম'র আমেরিকার পূর্ব উপকূলের 'সেভেন সিস্টার' কলেজগুলির অন্যতম, কিন্তু ১৮৮৫ সালে যখন এটি খোলা হয়, তখন বি-এ, এম-এ, পিএইচ-ডি ডিগ্রীর শিক্ষাক্রম সমেত এটিই ছিল প্রথম মহিলাদের কলেজ। সেই থেকেই কলেজটি ফেমিনিজম্ ও মেয়েদের উচ্চশিক্ষার একটি দুর্গ বলা চলে।

কলেজে আমরা কয়েকজন মাত্র ভারতীয়। কিন্তু আমাদের সঙ্গে আমেরিকান ও অন্যদেশীয় ছাত্রীরা দলবেঁধে অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। তারা গলা মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান গায়, শাড়ী পরে সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে। গানের দলের সকলেই পাশ্চাত্য ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীত অথবা নিজদেশীয় সঙ্গীতে পারদর্শিনী। ঠিক তেমনি, নাচের দলের সকলেরই কোন না কোন নৃত্যধারার সঙ্গে বহুদিনের পরিচয় —হয় ব্যালে, নয় মডার্ন ডান্স, কিংবা হয়ত আরব-দেশীয় বা ফিলিপিনো নৃত্য।

এবছর অনুষ্ঠানের 'theme' ছিল 'তারুণ্য'। এছাড়া অবশ্য আন্তর্জাতিক সপ্তাহের 'লেকচার সিরিজের' আমন্ত্রণে শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর ধর্মচিন্তা ও রাজনৈতিক চিন্তার উপর দুখানি বক্তৃতা দেন। সঙ্গীতানুষ্ঠানের আগে বিদেশী দর্শকমন্ডলীর কথা মনে রেখে অল্পকথায় একটি ভূমিকা থাকে। প্রতিটি গানের আগে সেটির কবিতায় ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করা হয়। কোন কোন অপেক্ষাকৃত দুরূহ নাচের আগে একটি 'ডেমনস্ট্রেশন' করা হয়, যাতে দর্শকেরা সেটি পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারেন। শাড়ীপরিহিতা গাইয়েরা বসেন মঞ্চের পিছন দিকে। তাঁদের মধ্যেই কেউ তানপুরা ধরেন। পেশাদার ভারতীয় তবলাবাদক অবশ্য আসেন নিউ ইয়র্ক থেকে।

একই ছকে ১৯৭৮ সালে রবীন্দ্রনাথের ঋতু-পর্যায়ের বিভিন্ন গান নিয়ে একটি ছোটখাট 'ঋতুরঙ্গ' মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু ছিল বর্ষা। তারা ইংরেজী নামকরণ হয়েছিল 'হোয়েন দ্য রেইনস কাম'। সেবার সত্যিই অনুষ্ঠানের সময় পর পর কয়েকদিন ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়তে লাগল! তাই বঙ্গদেশের বর্ষার আমেজও তৈরী হয়ে গিয়েছিল। সেবার ফিলাডেলফিয়া অঞ্চলের ভারতীয় সম্প্রদায়ের আমন্ত্রণে আমরা ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভেনিয়ায় অনুষ্ঠানটির পুনরাবৃত্তি করি।

বিদেশিনীদের গান বা নাচ শেখাতে গিয়ে আমাদের যা চমৎকৃত করেছে তা হল তাদের উৎসাহ এবং শিখবার অদম্য ইচ্ছা। আমেরিকান ছাত্রছাত্রীদের বোঝানো হয়েছে, যে বিদেশী সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় হওয়াটা তাদের শিক্ষার এক বিশেষ অঙ্গ। এত পড়াশোনার মধ্যেও নিয়মিত রিহার্সাল হয়। কোনদিন না আসতে পারলে যা শেখানো হয়েছে তা শিখে নেওয়ার দায়িত্ব ছাত্রীদের নিজেদের।

গান শেখাতে গিয়ে আমি দেখেছি তাদের কি অধ্যবসায়। কলেজ choirএ সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে তারা অভ্যস্ত। পাশ্চাত্য ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীত আবার প্রায়ই ল্যাটিন অথবা অন্য বিদেশী ভাষায় গাইতে হয়—যেমন ফরাসী বা জার্মান। এসবের সঙ্গে বাংলা যুক্ত হয়েছে মাত্র! পরিশ্রম করতে হয় সঠিক উচ্চারণের জন্য, আর বিদেশী ভাষায় লেখা গানের ভাবটি শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। কোন অংশ মনঃপূত না হলে সেটি হাজারবার পুনরাবৃত্তি করতে বললে তারা বিনা প্রতিবাদে তাই-ই করে। সেসময়ে অষ্টপ্রহর আমাদের তৈরী থাকতে হয়—যেকোন সময়ে কেউ এসে জিজ্ঞাসা করতে পারে গানের কোন অংশ বা নাচের কোন ভঙ্গী নির্ভুল হচ্ছে কিনা।

আমেরিকান ছাত্রীদের এই রবীন্দ্রচর্চা কিন্তু কেবলমাত্র একটি সান্ধ্যঅনুষ্ঠানেই সীমায়িত নয়। ওদেশী মে ডে উৎসবে খোলা আকাশের নীচে নানা নৃত্যগীত—অভিনয়ের সঙ্গে আজকাল শুনতে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের বসন্তের গান। কিংবা কোন সুন্দর দিনে হয়ত ব্রিন্ ম'রের বড় বড় গাছগুলির ছায়ায় অধ্যাপকেরা ক্লাস নিচ্ছেন, পথ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ কানে ভেসে আসে পরিচিত গানের কলি। মুহূর্তের জন্য ভ্রম হয়, তবে কি শান্তিনিকেতনে রয়েছি?

"আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়"—আমেরিকার মার্গারেট বাপ্টিট

ব্রিন ম'র অবশ্য দাবি করতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয় বহুদিনের। উনিশশো কুড়ি সালে নভেম্বর মাসে আমেরিকা ভ্রমণ করার সময় রবীন্দ্রনাথ এই কলেজে এসেছিলেন। ১২ই নভেম্বর, শুক্রবার তিনি এখানে 'ভিলেজ মিস্টিকস অফ বেঙ্গল'—এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন। মধ্যযুগের কাসল'এর মত টমাস হল-এর ভিতরের স্থির 'ক্লয়েস্টার্স'-এ' তোলা তাঁর ছবি রয়েছে।

কলেজ 'আরকাইভস্'এ রক্ষিত তখনকার কাগজপত্র পড়ে দেখলাম, তিনি আসার তিন সপ্তাহ আগে থেকে কলেজের সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাঁর আগমনবার্তা ঘোষণা করা হয়েছিল ও তাঁর জীবন সম্বন্ধে নানা কথা পাঠকদের জানানো হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল যে কলেজের প্রিয় কিছু বিতর্কমূলক বিষয়-এর উপর রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট মতামত রয়েছে—যেমন ফেমিনিজম, শিক্ষা, বা আমেরিকানদের দোষগুণ।

এইসব লেখায় রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা বর্ণনা করার সময় স্বভাবতই তিনি যে শিক্ষাবিদ, এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। শান্তিনিকেতনে তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলের বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে, যে এখানে প্রথম ছাত্রদের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন চালু করা হয়। বক্তৃতার পর তাঁর জন্য দেওয়া ডিনার এবং সম্বর্ধনাসভায় রবীন্দ্রনাথ নাকি শান্তিনিকেতনের স্কুলের কথা বিশদভাবে আলোচনা করেছিলেন। এমনকি বক্তৃতায় রিজার্ভ আসনের জন্য এক ডলার ও তা নয়তো দেড় ডলার মূল্য ধার্য হয়েছিল। পত্রিকায় বলা হয়েছে যে এই অর্থ শান্তিনিকেতনের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হবে।

কলেজ পত্রিকার বিবরণী পড়ে মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথের চেহারা, জীবনবৃত্তান্ত, ভাষণভঙ্গী, বক্তৃতার বিষয়বস্তু, সবেতেই আমেরিকান শ্রোতারা চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিলেন। সভার ভিড়ে তিনি সকলের থেকে আলাদা—

"He stood apart, not only by virtue of his appearance, his eastern dress, his calm face with the deep, quiet eyes and long gray hair and beard, but by the mysticism expounded in his lecture."

কিন্তু সবথেকে মনে ধরেছিল 'বুকম্যান'-এর বর্ণনা, যা অনুসরণ করে বলা হয়েছে, যে তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন দা ভিঞ্চির চিত্রের যীশুখৃষ্ট।

বিদেশিনী গাইয়েদের রিহার্সাল চলছে

মঞ্চের একপাশে বিদেশিনী গায়িকার দল

'কেন পান্থ এ চঞ্চলতা'—নাচে ফিলিপিনসের জোসেফিন ফেলিচিয়ানো

প্রতিবছরই আমরা রবীন্দ্রনাথের ব্রিন্ ম'র আগমনের কথা স্মরণ করেছি। অতীতের এই যোগাযোগের কথা ছাত্রীমহলে বিশেষ কৌতূহল ও অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে। কে জানে, হয়ত সেই ক্ষণিক সান্নিধ্যের ছোঁয়ায় রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সহজতর হয়েছে।

শ্যামলা বসু

## লণ্ডনে রবীন্দ্রনাটক

স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে যে প্রবাসী বাঙালীরা দীর্ঘকাল বিলেতে রয়েছেন তাঁদের পায়ের তলা থেকে কেবল দেশের মাটিই সরে যায়নি ভাষা ও সংস্কৃতির মূত্তিকাও ক্রমে ক্ষীয়মান হয়ে আসছে। এখন দেশের সাংস্কৃতিক জলবায়ুর সঙ্গে তাঁদের একমাত্র যোগসূত্র বজায় আছে গ্রামোফোন রেকর্ডে, দেশ পত্রিকার সাধারণ-বিশেষ সংখ্যাগুলির আর মাঝেমধ্যে দেশে বেড়াতে যাওয়ার মাধ্যমে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে একে সংস্কৃতিচর্চা বলে না, কারণ এতে অংশ গ্রহণ করে মন ভরাবার, নিজেদের সক্রিয়ভাবে কিছু গড়ে তুলবার কোন সুযোগ বা আনন্দ নেই। ক

অথচ এই প্রবাসী বাঙালীদের অনেকের মধ্যেই কমবেশী প্রতিভা ছিল। তাঁরা কেউ লিখতেন, কেউ ছবি আঁকতেন, কেউ কেউ গান গাইতে এবং কবিতা আবৃত্তি করতে পারতেন অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গেই। কিন্তু সুযোগ উৎসাহ ও অনুশীলনের অভাবে এঁদের এই গুণগুলি ক্রমশ বিনষ্ট হতে চলেছে। পরবর্তী প্রজন্মের ইতিহাস আরও হতাশাজনক। এঁদের ছেলেমেয়েরা যারা হয় এদেশেই জন্মেছে নয়তো এদেশের মাটিতেই জীবনের প্রথম পর্ব শুরু করেছে, তারা তো বাংলা ঘরানা থেকে পুরোপুরিই নির্বাসিত। স্কুলে সর্বতোভাবে ইংরেজী শিক্ষা, রেডিও টেলিভিশনে সর্বক্ষণ ইংরেজী গান নাটক

আলোচনা খবর শোনা এবং তদুপরি অনেকেরই মা-বাবা তাদের সংগে ইংরেজীতে কথা বলায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্বাদ পাওয়া দূরের কথা বাংলা অক্ষরের সংগেও এদের অনেকের পরিচয় ঘটছে না। নিজের দেশের ও জাতির ঐতিহ্য ইতিহাস ও সাহিত্য এদের কাছে অজ্ঞাতই থেকে গেল। তার ফলে বাঙলার সংগে তাদের রক্তের সম্বন্ধ এবং অন্তরের টান গড়ে উঠল না। উপরন্তু ইংরেজ সমাজের সংগেও তেমন গভীর যোগাযোগ ঘটল না।

একটি জাতির পক্ষে এই চ্যুতি গভীর উদ্বেগের বিষয়, এর অব্যবহিত পরিণাম অত্যন্ত আশংকাজনক এই কারণে যে, আত্মিক উৎসের সন্ধান এবং ঐতিহ্যের বার্তা না জানলে এই আসন্ন তরুণ সমাজ অচিরেই দারুণ হীনম্মন্যতায় ভুগবে যেমনটি ভুগছে নিগ্রো দাসদের উত্তরাধিকারী এদেশের ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান তরুণেরা।

এই অভাববোধ এবং জাতীয় নৈরাশ্যের কথা চিন্তা করেই আমরা কয়েকজন বাঙালী একত্র হয়ে লণ্ডনের নিকটবর্তী নিউ মলডেন-এ 'প্রান্তিক' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেছি। আমাদের এই উদ্যোগপর্বের বয়স যদিও বছর-খানেকের বেশী নয় তবু আশাতিরিক্ত সাড়া পাওয়া গেছে। ইদানীং সৌভাগ্যবশত অনেক বাঙালীই এ বিষয়ে সচেতন হয়েছেন, ফলে এখানে শুরু করা গেছে বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্লাস, বাংলা গানের ক্লাস। প্রান্তিকের এই আরম্ভ যে শুভারম্ভ তাতে সন্দেহ নেই। কয়েকটি বাঙালী পরিবারের বাবা-মা-ছেলে-মেয়ে সকলেই যোগ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্লাসে। এরকম সপরিবারে যোগদানের উদ্দেশ্য ছেলে-মেয়েদের আরও বেশী করে অনুপ্রাণিত করা। বর্তমানে দুটি গানের ক্লাস (প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ) এবং একটি শিশুবিভাগ খোলা হয়েছে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, গান ও ইতিহাসের কথা শোনার আসর নিয়ে।
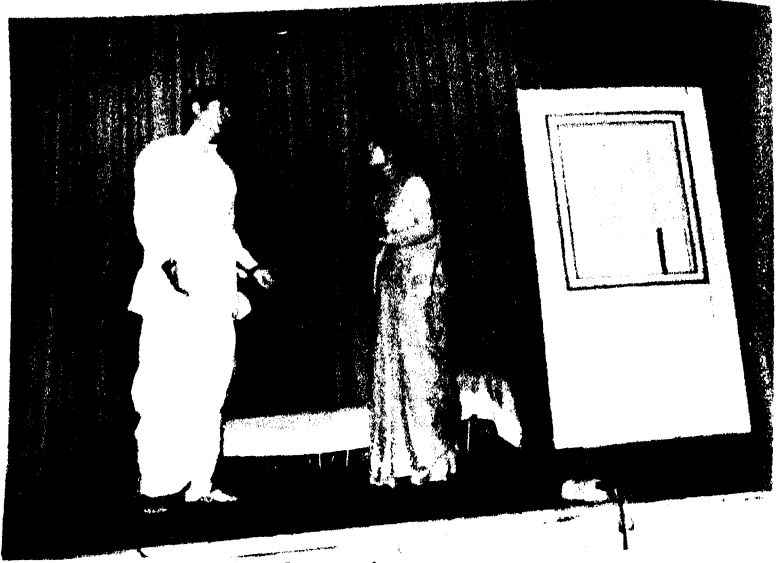
বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গত ১৯ এপ্রিল রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটি অনুষ্ঠান ও পরে তাঁর 'চার অধ্যায়' নাটক অভিনয় করা হয়েছিল। এই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে প্রান্তিকের শিল্পীরা ছাড়াও অংশ গ্রহণ করেছিলেন শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়ের স্বজন ছাত্রী শ্রীমতী আরতি ভট্টাচার্য। শ্রীমতী ভট্টাচার্যের 'এ পরবাসে রবে কে' গানটি অনুরণন জাগিয়েছিল। চার অধ্যায় নাটকটিও দর্শকদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছিল। এলার ভূমিকায় নমিতা আচার্য, ইন্দ্রনাথের ভূমিকায় দিলীপ মুখোপাধ্যায় এবং অতীনের ভূমিকায় অমিতাভ আচার্য বেশ ভাল অভিনয় করেছিলেন। প্রায় নাটকের ধাঁচে লেখা 'চার অধ্যায়'-এর চারটি অধ্যায়ের চারটি দৃশ্য সামান্য মাত্র অদলবদল করা হয়েছিল নাটকের খাতিরে। স্টিরিও-ফোনিক শব্দের এফেক্ট, সেটের ডিজাইন, আলোক-সম্পাত—সব মিলে নাটকটি ভালই উতরে গিয়েছিল। যতদূর জানা যায় লণ্ডনে কোন অপেশাদার দল-কর্তৃক চার অধ্যায়-এর অভিনয় এই প্রথম।

জয়ন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

চার অধ্যায়-এ অমিতাভ আচার্য ও নমিতা আচার্য

## জাপানে প্রকাশিতব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যেমন নতুন করে রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগ হচ্ছে, তেমনি রবি-অনুরাগী সূর্যের দেশ সুদূর জাপানেও বৃহৎ আয়োজন চলেছে জাপানী ভাষায় বারো খণ্ডে রবীন্দ্র-রচনাবলী মুদ্রণের। প্রথম খণ্ডটি ছাপা হয়ে বেরবে ১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে, আর শেষ বা দ্বাদশ খণ্ডটি প্রকাশিত হবে ১৯৮২-র নভেম্বরে। এখন আমাদের কৌতূহল থাকবে—জাপানের আগে আমরা রবীন্দ্র-রচনাবলী ছাপার কাজ শেষ করতে পারি কি না।

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীর সময় জাপানে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী একবার প্রকাশ করা হয়েছিল। তার দুই দশক কাল পর আধুনিক জাপান আজ আবার নতুন করে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী প্রকাশ ও প্রচারের প্রয়োজন অনুভব করেছেন গভীরভাবে। মূল বাংলা থেকে বা ইংরেজী থেকে জাপানী ভাষায় তর্জমার কাজ চলেছে অনেক দিন ধরে—অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে অতিশয় যত্ন সহকারে। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পূর্বেই জাপানে রবীন্দ্রনাথের কবিতার তর্জমা প্রকাশিত হয়েছিল সেখানকার সাময়িকপত্রের পাতায়। ১৯২০ সালেই জাপানী ভাষায় গোরা প্রকাশিত হয় মূল থেকে। অনুবাদক ছিলেন ইনুেসকে সানো। ইনি ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন। ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন দ্বিতীয় বার জাপানে যান তখন তাঁর হাতে উপহার দেওয়া হয় জাপানী গোরা।

এ বছর বৈশাখে, ১০ মে তারিখে জাপানে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে একটি সুন্দর স্মারক-পুস্তক বেরোয় জাপানে। টোকিওর একটি বড় পাবলিক হলে সন্ধ্যা ছটা থেকে আনন্দ-অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা একজন মহিলা। ইনি শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী জাপানের বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী মীনা কানু। অনুষ্ঠানে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হয়। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে এই নৃত্যনাট্য অভিনীত হয়। চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন মীনা কানু ও তামাকি মাৎসুওকা।

স্মরকপত্রের শেষ পাতায় প্রকাশিতব্য রচনাবলীর বিজ্ঞাপন বেরোয়। এই বিজ্ঞাপন থেকে জাপানে এখন রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের কি রকম আয়োজন চলছে তার একটা স্পষ্ট ছবি পাই। বিজ্ঞাপনটি তর্জমায় আমাকে সাহায্য করেছেন শান্তিনিকেতনের জাপানী বিভাগের অধ্যাপক শ্রীসাইজি মাকিনো।

✻

মনুষ্য হৃদয়ের উদ্বোধক ভারতীয় ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাবলীর প্রকাশ সমাসন্ন।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

**১২ খণ্ড**

সম্পাদকমণ্ডলী : সিজুকো ইয়ামামুরো, হিরোসি নোমা, তাতসুও মরিমতো এবং কাজুও আজুমা।

কবিতা, উপন্যাস, নাটক, নিবন্ধ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার রচনার দ্বারা মানবচিত্তজাগরণের ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব ও গভীর বিচারশক্তির দ্বারা ভবিষ্যৎ মানবজাতির জন্য যে বাণী প্রচার করে গেছেন—তার আধুনিক অর্থ নূতন করে সন্ধান করা প্রয়োজন। বর্তমানের এই অস্থির সমাজে মানবমনে পুনরায় সুস্থ চিন্তাশক্তি জাগিয়ে তুলতে আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট রচনাবলী প্রকাশের আয়োজন করেছি।

**—খণ্ডগুলির প্রধান সূচী—**

**প্রথম খণ্ড**
কবিতা সংগ্রহ—১
প্রকাশিত হবে ১৯৮১ জানুয়ারি।
কাব্য-আলোচনা : সীন ওয়োকো
গ্রন্থ-পরিচয় : তাতসুও মরিমতো
রচনা : গীতাঞ্জলি দি গার্ডেনার শিশু, ফ্রুট গ্যাদারিং, ক্রস রোড ইত্যাদি।

**দ্বিতীয় খণ্ড**
কবিতা সংগ্রহ—২
প্রকাশিত হবে ১৯৮২ জানুয়ারি।
কাব্য-আলোচনা : সিজুকো ইয়ামামুরো
গ্রন্থ-পরিচয় : কাজুও আজুমা
রচনা : সোনার তরী, লিপিকা, পূরবী, লেখন, মহুয়া ইত্যাদি।

**তৃতীয় খণ্ড**
বৃহৎ উপন্যাস
প্রকাশিত হবে ১৯৮১ নভেম্বর।
উপন্যাস-আলোচনা : হিরোসি নোমা
গ্রন্থ-পরিচয় : কাজুও আজুমা
রচনা : গোরা

**চতুর্থ খণ্ড**
ছোট উপন্যাস ও গল্প—১
প্রকাশিত হবে ১৯৮১ মে।
উপন্যাস ও গল্প-আলোচনা : মিনোরু ওদা
গ্রন্থ-পরিচয় : তাতসুও মরিমতো
রচনা : চতুরঙ্গ, মণিহারা, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি।

**পঞ্চম খণ্ড**
ছোট উপন্যাস ও গল্প—২
প্রকাশিত হবে ১৯৮২ মে।
উপন্যাস ও গল্প-আলোচনা : মিতসুহারু ইনোয়ে
গ্রন্থ-পরিচয় : স্তুওসি নারা
রচনা : দুই বোন, চার অধ্যায়, দুর্বুদ্ধি, কর্মফল, শুভদৃষ্টি, চোরাই ধন ইত্যাদি।

**ষষ্ঠ খণ্ড**
নাট্যসংগ্রহ
প্রকাশিত হবে ১৯৮১ সেপ্টেম্বর।
নাট্য-আলোচনা : জুনজি কিনোসিতা
গ্রন্থ-পরিচয় : তাতসুও মরিমতো
রচনা : প্রকৃতির প্রতিশোধ, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা, ডাকঘর, রাজা ইত্যাদি।

জাপানে রবীন্দ্র রচনাবলীর বিজ্ঞাপন

**সপ্তম খণ্ড**
দার্শনিক প্রবন্ধ সংগ্রহ
প্রকাশিত হবে ১৯৮২ মার্চ।
প্রবন্ধ-আলোচনা : সুনতারো মাতসুআমনো
গ্রন্থ-পরিচয় : তাতসুও মরিমতো
রচনা : দি রিলিজিঅন অব ম্যান, থট্‌স্‌ ফ্রম টেগোর ইত্যাদি।

**অষ্টম খণ্ড**
সামাজিক প্রবন্ধ সংগ্রহ
প্রকাশিত হবে ১৯৮১ মার্চ।
প্রবন্ধ-আলোচনা : সাবুরো ইচি
গ্রন্থ-পরিচয় : তোকুও ইহারা
রচনা : সাধনা, ন্যাশানালিজম্‌ ইত্যাদি।

**নবম খণ্ড**
সাহিত্য কলা শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ সংগ্রহ
প্রকাশিত হবে ১৯৮১ জুলাই।
প্রবন্ধ-আলোচনা : মাসাকিও মিয়ানোতো
গ্রন্থ-পরিচয় : স্তুওসি নারা
রচনা : ক্রিয়েটিভ য়ুনিটি, পার্সোনালিটি ইত্যাদি।

**দশম খণ্ড**
আত্মজীবনী স্মৃতিকথা ও ভ্রমণকাহিনী
প্রকাশিত হবে ১৯৮২ জুলাই।
আলোচনা : সুনেসুকে স্তুরুমি
গ্রন্থ-পরিচয় : সিজুকো ইয়ামামুরো
রচনা : জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা, আত্মপরিচয়, জাপানযাত্রী ইত্যাদি।

**একাদশ খণ্ড**
ডায়রি ও পত্রসংগ্রহ
প্রকাশিত হবে ১৯৮২ সেপ্টেম্বর।
আলোচনা : আকিহি সুজিউরা
গ্রন্থ-পরিচয় : কাজুও আজুমা
রচনা : ছিন্নপত্রাবলী ও অন্যান্য।

**দ্বাদশ খণ্ড**
(বিশেষ খণ্ড)
প্রকাশিত হবে ১৯৮২ নভেম্বর।
রবীন্দ্র-চর্চা (ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য) : রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত গ্রন্থের তালিকা, রবীন্দ্র-রচনার কালানুক্রমিক সূচী, রবীন্দ্রজীবনের কালানুক্রমিক সূচী।

এখন রবীন্দ্র-রচনাবলীর স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপনপত্রী প্রস্তুত হচ্ছে। আগ্রহী ব্যক্তি এই ঠিকানায় লিখুন। প্রস্তুত হলে প্রেরিত হবে।

তৃতীয় সভ্যতা কোম্পানি
১০১ ২-৫-৪ সারুগাকু—চো, ছিওদা-কু
টোকিও টেল : ০৩ (২৯৪) ৮৭০১
এম ও নং টোকিও ৫—১১৭৮২৩

রেগুলেস্‌ পেপার বুকস্‌
প্রশংসাধন্য বই—বিক্রয় চলছে
নোবেল সাহিত্য পুরস্কার জয়ী
ঋষি-কবির জীবনচরিত
**রবীন্দ্র জীবনী**
(১ম ও ২য় খণ্ড)
লেখক : কে কৃপালনী
অনুবাদক : তাতসুও মরিমতো
প্রতি খণ্ড ৪৮০ ইয়েন।

সমগ্র জীবন মানব-সত্যের পূজারী রবীন্দ্রনাথ, যিনি ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়ে অকস্মাৎ বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথের বিস্তারিত সমগ্র জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

# এক নতুন রান্না শিখে—
# সুস্বাদু রান্নার পরিমাণ বাড়িয়ে ফেলুন !

# মিলমেকার

## এইসব সুস্বাদু খাবার পরিমাণেও বাড়ায় আর পোস্টাইও করে।

মিলমেকার মিশিয়ে রেঁধে মাটন ও তরিতরকারির পরিমাণ যথেষ্ট বাড়িয়ে ফেলুন ও পাতে পাতে পরিবেশন করুন— আর দেখুন, আপনার পরিবারের সকলে তো বটেই, সেইসঙ্গে নিমন্ত্রিতরাও কেমন মহানন্দে সেটি খান।

**আপনার খাবারের স্বাদে চমৎকার মিলে যায়**

মিলমেকার আপনার পছন্দসই সুস্বাদু খাবারের সাথে চমৎকার মিলেমিশে যায়।

**প্রোটিনের পুষ্টিগুণে ভরপুর**

এটি পুষ্টিগুণে ভরপুর... ২৫০ গ্রাম মিলমেকারে ৩.৯ লিটার দুধ বা ১ কিলো মাটন কিংবা ২৪টি ডিমের প্রোটিন পুষ্টিগুণ রয়েছে।

**১০০% নিরামিষ**

মিলমেকার সয়া প্রোটিনের পুষ্টিগুণে ভরপুর। এটি পাওয়া যায় মোটা টুকরোয় ও দানাদার ধরনে।

**নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য**

৪ টাকা ৫০ পয়সা—২৫০ গ্রাম—মোটা টুকরোর প্যাকে (স্থানীয় কর অতিরিক্ত) রান্নার পর পরিমাণ ১ কিলোরও বেশী হয়।

৩ টাকা ৭৫ পয়সা—২০০ গ্রাম—দানাদারের প্যাকে (স্থানীয় কর অতিরিক্ত) রান্নার পর পরিমাণ প্রায় ১ কিলো হয়।

অল্প গরম নুনজলে··· ২০ মিনিট ভিজতে দিন···

জল ছেঁকে ফেলুন···

এবার সুস্বাদু রান্নার সঙ্গে মিশিয়ে রাঁধুন।

উৎপাদক :

**মাইসোর স্ন্যাক ফুড্স লিমিটেড,**
১৯, প্ল্যাটফর্ম রোড, ব্যাঙ্গালোর ৫৬০ ০২৩

maa VL 20 BEN

# সেই সময়

## সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৫৮ ॥

হরিশের মতন কৃষ্ণকমলও বেশ খানিকটা প্রভাব বিস্তার করলো নবীনকুমারের মানস-জগতে, যদিও হরিশের সঙ্গে কৃষ্ণকমলের অনেক প্রভেদ। হরিশ যথেষ্ট কৃতবিদ্য হয়েও তাঁর মধ্যে সব সময় জ্বলন্ত ছিল দুর্বার দেশপ্রেম এবং তীব্র প্রাণশক্তি। হরিশের কর্মচাঞ্চল্য অন্যদেরও জাগিয়ে দিত। সেই তুলনায় কৃষ্ণকমল শুধুই বুদ্ধিজীবী, তার মধ্যে কর্মের উদ্যম নেই, বরং অন্য সকলের সশ্লেষ সমালোচনা করতে সে খুব পারদর্শী।

কিছুদিন আগে কৃষ্ণকমলের দাদা রামকমল আত্মহত্যা করেছেন। সংস্কৃত কলেজের বিখ্যাত মেধাবী ছাত্র এবং রূপবান, গুণবান রামকমল স্বহস্তে নিজের জীবনের অবসান ঘটানোয় দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই বিস্মিত হয়েছিলেন। ইদানীংকালের মধ্যে এরকম ঘটনা আর শোনা যায়নি। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান এই মানব-জীবন, তা কেউ নিজের হাতে নষ্ট করে? দাদার মৃত্যুর পর থেকে কৃষ্ণকমল যেন আরও তিক্ত হয়ে উঠেছে, সব কিছুর প্রতিই তার বিদ্রূপ হাসি। একমাত্র রমণীদের প্রসঙ্গ উঠলেই সে সরস হয়ে ওঠে।

'পরিদর্শক' কার্যালয়ে সে নিয়মিত আসতে লাগলো কিন্তু তার লেখার নামটি নেই। একদিন সে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটি যুবককে সঙ্গে করে এনে নবীনকুমারকে বললো, এ বেশ কবিতা-টবিতা লিখছে, দ্যাখো না, একে কোনো কাজে লাগাতে পারো কি না! আর একদিন সে বললো দেবেন্দ্রবাবুর বড় ছেলে দ্বিজেন্দ্রকে কিছু লিখতে বল না! দ্বিজেন্দ্র তোমার-আমার সমবয়েসী হবে বোধ করি, মগজে বিদ্যা-বুদ্ধি আছে।

একদিন সন্ধ্যার পর বিদ্যাসাগর 'পরিদর্শক' কার্যালয় দেখতে আসবেন শুনে কৃষ্ণকমল তড়িঘড়ি পায়ে চটি গলিয়ে বললো, তা হলে আমি উঠি।

নবীনকুমার অবাক হলো। সে জানতো, কৃষ্ণকমল বিদ্যাসাগরের বিশেষ প্রিয় পাত্র, শিষ্য, কৃষ্ণকমলকে বিদ্যাসাগর নিজে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, কেন, বিদ্যাসাগর মশায়ের সঙ্গে দেখা করে যাবে না?

কৃষ্ণকমল উঠে দাঁড়িয়ে বললো, না হে, উনি আমায় দেখলে ব্যাজার হবেন। কেন আর মিছামিছি ওঁর বকুনি শুনি!

—কেন, উনি তোমায় বকবেন কেন?

—কারণ আছে। তুমি জানো না, উনি চেয়েছিলেন আমি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে ডাক্তার হই। তাতে আমার রুচি হয়নি। ওঁর আদেশ আমি মানি নি!

—সে তো অনেকদিন আগের কথা। উনি তো পুরোনো রাগ পুষে রাখেন না!

—ইদানীং অন্য একটি কারণেও উনি খুব কুপিত হয়ে আছেন আমার ওপরে। বীরসিংহার ঐ ব্রাহ্মণটির একটা দোষ কি জানো, যারা সঙ্গে নিজের মত না মিলবে, তাকেই আর উনি সহ্য করতে পারেন না।

—কিন্তু উনি তো অন্যান্য বিষয়ে রাগ করেন না। তোমার ওপর কোন্ কারণে রাগ করেছেন?

—সেটি এখন বলা হচ্ছে না। আমি যাই।

বেশ ব্যস্তসমস্ত হয়েই চলে গেল কৃষ্ণকমল।

একটু পরেই এলেন বিদ্যাসাগর। বিশেষ যত্ন নিয়ে তিনি দেখতে লাগলেন সংবাদপত্র-পরিচালনার কাজকর্ম। তারপর বললেন, সোমপ্রকাশে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তোমার এই উদ্যমের খুবই প্রশংসা করেছেন। এখন দেখছি, তিনি অতিরঞ্জন করেন নি মোটেই। তবে এটিকে টিঁকিয়ে রাখাই দরকার।

নবীনকুমারের মাথায় কৃষ্ণকমলের কথাটাই ঘুরছিল। সে ফস্ করে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কৃষ্ণকমলকে পছন্দ করেন না?

বিষয়টি এড়িয়ে গেলেন বিদ্যাসাগর। উদাসীনভাবে বললেন, লোকে ভাবে আমি যা বলবো কৃষ্ণকমল বুঝি তা সবই শুনবে। আসলে সে আমাকে মোটেই মানে না।

পরদিন কৃষ্ণকমল আবার আসতেই নবীনকুমার তাকে চেপে ধরলো। সে বললো, বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সঙ্গে তোমার কী নিয়ে মনোমালিন্য হয়েছে, তা বলতেই হবে। ঐ চিন্তাটা কিছুতেই মাথা থেকে তাড়াতে পারছি না।

কৃষ্ণকমল হেসে বললো, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে তোমার এত কৌতূহল কেন, নবীন?

নবীনকুমার বললো, আমার কৌতূহল তোমার ব্যাপারে নয়, আমার গুরু কোন্ কারণে তোমার মতন প্রিয়জনের ওপরেও রাগ করেন সেইটি শুধু আমি জানতে চাই।

কৃষ্ণকমল বললো, সেটি জানতে হলে তোমাকে এক স্থানে যেতে হবে আমার সঙ্গে। তুমি যেতে পারবে?

নবীনকুমার বললো, কোথায়?

কৃষ্ণকমল বললো, সে যে-স্থানেই হোক না কেন, তুমি যেতে পারবে কি না বলো?

নবীনকুমার বললো, কেন পারবো না? আমি পুরুষমানুষ হয়ে এমন কোন্ স্থান আছে, যেখেনে যেতে পারি না?

—তা হলে আগে কাজ সেরে নাও!

রাত্রি নটার পরিদর্শক কার্যালয় থেকে বেরুলো দুজনে। জুড়ি গাড়িতে উঠেই দার্শনিক আলোচনা শুরু করে দিল কৃষ্ণকমল। ফরাসী দার্শনিক কোঁৎ-এর সে খুব ভক্ত, প্রায়ই সে কোঁৎ প্রচারিত পজিটিভিজম তত্ত্ব বোঝাতে চায় নবীনকুমারকে। নবীনকুমারের অবশ্য দর্শনের জটিল ব্যাপার নিয়ে মস্তক ঘর্মাক্ত করার তেমন আগ্রহ নেই।

কৃষ্ণকমল বললো, দ্যাখো, ইংরেজি মাসের নামগুলি যে ঠাকুর দেবতাদের নামে, এটা আমার মোটেই পছন্দ হয় না। এ বিষয়ে কোঁৎ একটা চমৎকার ব্যবস্থা দিয়েছেন। তিনি বৎসর ভাগ করেছেন তের মাসে, প্রত্যেক মাসের নাম হবে মোজেস, হোমার, অ্যারিস্টটল, আর্কিমিডিস, শেক্সপীয়র, এঁদের নামে।

নবীনকুমার বললো, তা বেশ তো। কিন্তু আমাদের ব্যাস, বাল্মীকি এঁরা কি দোষ করলেন? ব্যাস-বাল্মীকি কি হোমর-শেক্সপীয়রের চেয়ে কিছু খাটো?

—কোঁৎ সারা মাসটা ভাগ করেছেন আঠাশ দিনে। প্রত্যেক দিনের নামও হবে এক একজন মহাপুরুষের নামে। মনু, মহম্মদ, বুদ্ধ, নিউটন, কলম্বস এঁরা।

—তা আগে থেকে এই সব মহাপুরুষদের নামে মাস আর দিনের নাম ঠিক করে ফেললে, ভবিষ্যতেও যে এঁদের চেয়ে আরও বড় মহাপুরুষ জন্মাবেন না, তার কোনো ঠিক আছে? তখন আবার নাম বদলাবে? তা ছাড়া এই নাম নিয়ে পৃথিবীর সব দেশের লোক একমত হবে কেন?

—আমি কোঁৎ-এর মতটিই শ্রেষ্ঠ মনে করি।

—আমি কিন্তু ফ্রেডারিক দি গ্রেটের চেয়ে সম্রাট অশোককে বড় বলবো। আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি বলো তো?

—আমি কোচোয়ানকে বলে দিয়েছি। শোনো, জন স্টুয়ার্ট মিল এই পজিটিভিস্ট ক্যালেণ্ডার সম্পর্কে কী বলেছেন জানো? এতে পরস্পর-বিরোধী, বিভিন্ন মতাবলম্বী এমন সব ব্যক্তিদের নাম পাশাপাশি রাখা হয়েছে যারা জীবিত অবস্থায় দেখা হলে পরস্পরের গলা কাটাকাটি করতেন নিশ্চয়ই। কোঁৎ-এর এই যে বিশ্ব মানবিক উদার মনোভাব, এটি পৃথিবীর আর কোন দার্শনিকের মধ্যে দেখেছো? ডিস্টিংকশান অফ ফাংশান, অর্থাৎ কর্মে অধিকার ভেদ কোঁৎ-এর একটা প্রধান কথা।

গাড়ি এসে থামলো এক জায়গায়। পিছন থেকে দুলাল এসে জিজ্ঞেস করলো, এবার কোন্ দিকে যাবো?

কৃষ্ণকমল বললো, সামনের গলিতে লাল বাড়িটির সামনে।

গাড়ি থেকে নেমে নবীনকুমার এদিক-ওদিক তাকিয়ে বিস্মিত হলো। এ যে রামবাগানের রূপ-পল্লী! কোঁৎ-শিষ্যের এখানে কী জন্য আগমন? বিশ্বের সমস্ত সতী রমণীদের সম্মানার্থে কোঁৎ চার বৎসর অন্তর বিশেষ একটি দিনে সারা পৃথিবীতে একসঙ্গে একটি উৎসবের প্রস্তাব দিয়েছেন, সেই কোঁৎ-এর শিষ্য হয়ে কৃষ্ণকমল অসতী নারীদের কাছে এলো কেন এত রাত্রে?

লাল রঙের বাড়িটির দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকমল বললো, এসো, তিনতলায় যেতে হবে।

কোনো আপত্তি না জানিয়ে নবীনকুমার তাকে অনুগমন করলো।

আলো ঝলমল কক্ষ এবং রমণীকণ্ঠের নির্লজ্জ হাস্যধ্বনি শুনে বাড়িটির চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।

ওপরে উঠে এসে একটি বন্ধ দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকমল ডাকলো, প্রমদা, প্রমদা।

চওড়া লালপেড়ে ধনেখালির শাড়ী পরা এক যুবতী দ্বার খুলে ওদের দেখে একটু সরে দাঁড়ালো।

ঘরের মধ্যে একটি মোটা জাজিম পাতা, আর দেয়ালের সঙ্গে ঠেসান দেওয়া কয়েকটি চেয়ার। জুতো না খুলে ধুতির কোঁচাটি বা হাতে ধরে নবীনকুমার গিয়ে বসলো একটি চেয়ারে। এখনো যেন সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। পূজারী ব্রাহ্মণের সন্তান, পাশ্চাত্ত্য দর্শনে বিভোর কৃষ্ণকমল এরকম বাড়িতে যাতায়াত করে। অথচ নানা প্রসঙ্গে সে কৃষ্ণকমলের মুখে শুনেছে যে সে মদ্যপানের ঘোর বিরোধী।

যুবতীটির মুখ মাত্র এক ঝলক দেখেছে নবীন-

কুমার। এখন সে লজ্জায় সঙ্কুচিতা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরের এক কোণে।

কৃষ্ণকমল বললো, একটু চা পান করবে নাকি, নবীন?

নবীনকুমার সবেগে দু'দিকে মাথা আন্দোলিত করলো। বাড়ির বাইরে কোথাও সে পারতপক্ষে কোনো খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে না।

কৃষ্ণকমল বললো, আমি একটু চা পান করবো। প্রমদা, একটু চায়ের জোগাড়ে লেগে পড়ো তো!

যুবতীটি একটি দরজার পর্দা সরিয়ে চলে গেল পাশের কক্ষে।

কৃষ্ণকমল বললো, আমি ওকে চা প্রস্তুত করা শিখিয়েছি। এ বাড়ির অন্য কোনো স্ত্রীলোক চা কী দ্রব্য তাই আগে জানতো না।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে সংশোধনের ভঙ্গিতে আবার বললো, অবশ্য প্রমদাকে তুমি এ বাড়ির অন্য স্ত্রীলোকদের মতন মনে করো না। সে কোনো এক মর্যাদা-সম্পন্ন ভদ্রবাড়ির কন্যা। বালবিধবা। পরিবারের কয়েকটি অমানুষের অত্যাচারে সে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হয়। আমার এক পরিচিত লোকের সাহায্যে এখানে এসে উঠেছে। প্রমদা বিশেষ গুণবতী। আমি তাকে বিবাহ করবো ঠিক করেছি।

—বিবাহ করবে?

—কেন, তোমারও আপত্তি আছে নাকি?

—তোমার তো একটি পত্নী বর্তমান।

—তা থাক না। আমার একটি পত্নী আছেন বটে কিন্তু তিনি আমার সহধর্মিণী নন। তাই আমি প্রমদাকে সহধর্মিণী করতে চাই। তাতেই তোমার গুরুর ঘোর আপত্তি!

নবীনকুমার হাসলো।

কৃষ্ণকমল আবার বললো, তিনি বিধবা বিবাহের প্রতিষ্ঠাতা অথচ এই বিধবা রমণীটিকে আমি গ্রহণ করতে চাই শুনে একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন।

নবীনকুমার বললো, আমার গুরু যে আপত্তি করবেন তা জানি। তিনি বিধবা বিবাহের নামে পুরুষের একাধিক বিবাহের ঘোর বিরোধী। কিন্তু তোমার মতন ঘোর নাস্তিক এবং পজিটিভিস্ট যে হঠাৎ বামুন পণ্ডিতদের ধারা অনুসরণ করে একাধিক বিয়ে করতে চাইবে, তাতে আশ্চর্য হচ্ছি। তোমার গুরু ফরাসী কোঁৎ সাহেব বেঁচে থাকলে কী বলতেন? তিনি একাধিক বিবাহ সমর্থন করেন?

—কোঁৎ-এর জীবনেও একজন ক্লোটিলড নাম্নী রমণী ছিলেন, তা জানো না বুঝি?

—মাদাম ক্লোটিলড-কে দার্শনিক কোঁৎ কোনোদিন সামাজিকভাবে বিবাহ করেছিলেন, এমনও তো শুনি নি!

—শোনো, তাঁর মতে বিবাহ তিন প্রকার। প্রথম তো হলো সিভিল ম্যারেজ, যাতে বিবাহ একটা চুক্তি মাত্র, দম্পতির মনের অমিল হলে সে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হতে পারে। দ্বিতীয় হলো তোমার রিলিজিয়াস ম্যারেজ, ধর্মের নামে বিবাহ, যা চিরদিনের জন্য অবিচ্ছিন্ন। এই বিবাহের পর শুধু বিধবা নয় বিপত্নীক পুরুষও আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারবে না। আর এক রকম বিবাহকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন চেইস্‌ট ম্যারেজ। এ বিবাহে স্ত্রী পুরুষের মানসিক মিল হলে তবেই তারা একত্র বাস করবে কিন্তু সহবাস করবে না। আমি প্রমদাসুন্দরীকে অন্ত চেইস্‌ট বিবাহ করতে চাই। পারস্পরিক সাহচর্যই বড় কথা।

—তাতে বাধা কোতায়?

—মুশকিল কি জানো, এ দেশের লোককে তো চেনো তুমি, তারা এর মর্ম বুঝবে না। মনে করবে, আমি বুঝি অন্য ভড়ং করে একটি উপপত্নী রেখেছি। তাই একে একটা সামাজিক বিবাহের আবরণ দিতে চাই।

নবীনকুমার উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তোমার চেইসট বিবাহ মাথায় থাক আমিও ওতে বিশ্বাস করি না। আমিও বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সঙ্গে একমত। কৃষ্ণকমল, আমি আর তোমার সংসর্গে থাকতে চাই না। চললুম!

—আরে, আরে, দাঁড়াও, অত চটলে কেন?

কিন্তু নবীনকুমার আর অপেক্ষা করলো না। সিঁড়ি দিয়ে জুতো মশমশিয়ে, কোনো দিকে দৃক্ষেপ না করে সে নেমে এলো নিচে। তার শরীর কিস্‌কিস করছে বিরক্তিতে। চেইস্‌ট ম্যারেজ না ঘোড়ার ডিম!

পরিদর্শক নিয়ে কয়েক মাস উঠে পড়ে লেগে থাকলেও নবীনকুমার কাগজটিকে ঠিক দাঁড় করাতে পারলো না। কেচ্ছা-খেউড় পড়ায় যারা অভ্যস্ত তারা পরিচ্ছন্ন সংবাদ সম্পর্কে আগ্রহী নয়। বাঙালী শিক্ষিত সমাজ কিছুতেই বাংলা কাগজ পড়তে চায় না। ইংরেজি সংবাদপত্র বাড়িতে না রাখলে তাদের মান যায়। যাদের একাধিক পত্রিকা রাখার সামর্থ্য আছে তারাও মনে করে বাংলা সংবাদপত্র পাঠ করলে অন্য লোকেরা বুঝি তাদের কম শিক্ষিত মনে করবে।

কিন্তু নবীনকুমারের জেদ, পরিদর্শক সে চালাবেই। কাগজের চাহিদা যত কমতে লাগলো ততই সে পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়িয়ে দাম কমিয়ে দিতে লাগলো। কমতে কমতে দাম হলো এক পয়সা। এর পর বোধ-হয় সে বিনা পয়সায় বিলি করবে। অর্থ ব্যয় হতে লাগলো জলের মতন।

এক সময় গঙ্গানারায়ণ পর্যন্ত সচকিত হলো। বেঙ্গল ক্লাব নামে সাহেবদের বিখ্যাত একটি ক্লাব আছে। সেই ক্লাববাড়িটি এবং জমির মালিক নবীন-কুমাররা। খুব মূল্যবান সম্পত্তি। নবীনকুমার সেই বেঙ্গল ক্লাবের বাড়ি-জমি বিক্রয় করে দিতে চায়।

গঙ্গানারায়ণ একদিন নবীনকুমারকে ডেকে বললো, তুই এ কি ঠিক করিচিস, ছোটকু? ওদিকে জমির দাম যে হু-হু করে বাড়চে। এসপ্লানেড ছাড়িয়ে সাহেবরা পার্ক স্ট্রীটের দিকে বিস্তর বসতি কচ্চে ওদিকে যে দু' চারদিন বাদে জমি হবে সোনা!

নবীনকুমার বললো, উপায় কী, দাদামণি! তোমার তবিল যে শূন্য দেকচি! আমার এখন অনেক টাকার দরকার।

গঙ্গানারায়ণ বললো, তুই যে-ভাবে টাকা বায় কচ্চিস, তত টাকা আসবে কোতা থেকে! গত পাঁচ মাসে তুই এক লক্ষ টাকার ওপরে নিয়েচিস!

—আমার আরও টাকা লাগবে। তুমি দেকলে তো দাদামণি, হরিশ যেই মলো, অমনি বেমালুম সব্বাই তাকে ভুলে গেল। তার কাজ তো কারুকে না কারুকে চালিয়ে যেতে হবে? এখন টাকার জন্য চিন্তা কল্লে চলে? তুমি বরং একবার জমিদারি দেকতে বেরোও [illegible] দাদামণি, তুমি কি আমায় হার মানতে বলো?

অনেকদিন পরে গঙ্গানারায়ণ গেল বিধুশেখরের সঙ্গে দেখা করতে। বিধুশেখর ইদানীং প্রায়ই ব্যাধি-গ্রস্ত হয়ে শয্যাশায়ী থাকেন। কেউ সাক্ষাৎ করতে গেলে হুঁ-হাঁ ছাড়া কিছু বলেন না। কয়েকদিন হলো তাঁর পীড়া খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। সুহাসিনী সেই সংবাদ দিয়ে সকালবেলা লোক পাঠিয়েছিল।

কবিরাজ ছাড়া অন্য কারুকে দিয়ে চিকিৎসা করান না বিধুশেখর। গঙ্গানারায়ণ তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলো যে বহুমূত্র রোগের খুব ভালো চিকিৎসা আছে অ্যালোপ্যাথিতে, সেই একজন চিকিৎসক ডাকলে বিধুশেখরের যন্ত্রণার উপশম হবে।

বিধুশেখর উদাসীনভাবে বললেন, আর কী হবে, আমি তো এখন দিন গুণচি, আর এই শেষ সময় ম্লেচ্ছ ওষুধ গলায় দিয়ে কী হবে!

আরও কিছুক্ষণ অন্যান্য কথার পর গঙ্গানারায়ণ খানিকটা ইতস্তত করে বললো, জ্যাঠাবাবু, আপনাকে আর একটা কতাও জানানো দরকার বোধহয়। আমাদের ছোটকু এক সঙ্গে অনেক বড় বড় কাজ হাতে নিয়ে নিয়েচে, এমন দু' হাতে টাকা খরচ কচ্চে যে আর বুঝি সম্পত্তি রাখা দায়। আমি তো কোনো দিকে তাল সামলাতে পাচ্চি না।

জীর্ণ শরীরখানা একটু কাত করে বিধুশেখর মুখ উঁচু করলেন। তাঁর বিবর্ণ ওষ্ঠে একটু যেন হাসির ছায়া দেখা গেল। চোখে জ্বলে উঠলো আগ্রহ। এতদিন পরে সিংহ বাড়ির এই উদ্ধত যুবক তাঁর কাছে এসেছে বিষয়-সম্পত্তির জন্য পরামর্শ নিতে! তিনি জানতেন, আসতেই হবে একদিন না একদিন।

সমস্ত বিবরণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনলেন তিনি। তারপর মন্তব্য করলেন, ওর ঐ দৈনিক পত্রিকা বন্ধ করে দেবার জন্য কৌশল করো। আর নবীনকে একবার পাঠিয়ে দিতে পারো আমার কাচে। তাকে অনেকদিন দেখিনি, একবার দেকতে সাধ হয়।

কিন্তু বিধুশেখরের কাছে যাওয়ার সময় পেল না এবং সত্বর বেঙ্গল ক্লাবের সম্পত্তি বিক্রয় করে দিল।

গঙ্গানারায়ণকে কোনো কৌশল করতে হলো না অবশ্য, তার আগেই শেষ দশা ঘনিয়ে এলো পরিদর্শক সংবাদপত্রের। শুধু অর্থ ব্যয় করেই তো পাঠকদের মন বদল করা যায় না। শেষ পর্যন্ত এই অবস্থা দাঁড়ালো যে ঐ পত্রিকা বিনামূল্যে পাঠানো হয় দেড়শত ব্যক্তিকে আর নগদ মূল্যের ক্রেতা মাত্র চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ জন। বাণ্ডিল বাণ্ডিল অবিক্রিত কাগজ স্তূপাকার হয়ে থাকে। এমনকি কর্মচারীরাও আড়ালে হাসাহাসি করে মালিককে নিয়ে। যে কাগজ পাঠকরা কিনে পড়ে না, সে কাগজের জন্য মন দিয়ে লিখতেই বা ইচ্ছে করে কার? পত্রিকার মানও কমতে লাগলো দ্রুত।

কৃষ্ণকমলের সংসর্গ পরিত্যাগ করতে চেয়েছিল, তবু একদিন এসে বিদ্রূপ করে গেল সে। পঁয়তাল্লিশ জন, অ্যাঁ? এদের নিয়ে তুমি দেশোদ্ধার করবে আর সমাজ বদলাবে! তোমাদের এই এক মুঠো সমাজ নিয়েই যত নাচানাচি। আসল দেশটাকে তোমরা কেউ এখনো চিনলে না!

পরিদর্শক যে-দিন বন্ধ হয়ে গেল সেদিন নবীন-কুমার বাড়ি ফিরলো মধ্যরাত্রে। নিজের পায়ে ভর দিয়েও ফিরতে পারলো না সে। দুলাল এবং আরও দু' একজন তাকে ধরাধরি করে নিয়ে এলো অন্দর মহলে। নেশার ঘোরে সে সংজ্ঞাহীন। (ক্রমশ)

# স্মৃতি সততই সুখের

## প্রতিভা বসু

**দ্বিতীয় পর্ব**

**॥ ২৫ ॥**

হামবুর্গ থেকে বার্লিন খুবই কাছে। প্লেনে মাত্র পঞ্চাশ মিনিটের রাস্তা। বেলা সাড়ে দশটায় উঠে সাড়ে এগারোটার আগেই পৌঁছে গেলাম। এখানেও বুদ্ধদেব নির্দিষ্ট কোনো কাজের জন্য আমন্ত্রিত নন, শুধুই দেশ দেখার নমন্তন্ন। আসল বক্তৃতা-স্থল মিউনিখ। এও পথের স্টেশন।

বার্লিনকে অবশ্য ঠিক পথের স্টেশন না বলাই ভালো। এখানে কয়েকদিন হাতে নিয়েই এসেছি।

এই প্রথম বন্দর যেখানে কাস্টম আমাদের ভীষণ হয়রান করলো। কিছুতেই তারা সন্তুষ্ট নয়। জিজ্ঞাসা আর ফুরোয় না। পিছনে লাইন করে আরো সবাই দাঁড়িয়ে আছে, তারা অধৈর্য হচ্ছে, তবু।

আমাদের যিনি নিতে এসেছিলেন, ভদ্রমহিলার পদবী কেলনার। বিবাহিত। মধ্যবয়েস, ভারি সুন্দর দেখতে। সবচেয়ে সুন্দর তাঁর চুল। একেবারে পাকা ধান। যেমন ঘন, তেমনি পিঠ-ছাপানো। খুলে রেখেছেন, নরম মুগাসুতোর মতো। বললেন, 'আমার চুল কাটতে ইচ্ছে করে না, তবু মাঝে মাঝে কাটি, আবার বেড়ে যায়। আমার মধ্যযুগের ফ্যাশান খুব ভালো লাগে। তবে চাকরি-বাকরি করলে ওরকম বড়ো বড়ো পোশাকে ভারি অসুবিধে। তারপরেই আমার পোশাক দেখিয়ে বললেন, আপনাদের লম্বা ড্রেস আমার খুব পছন্দ। কিন্তু এই ড্রেস পরে তো কাজকর্ম করা যায় না!'

আমি বললাম, 'আমাদের তো এ পোশাক ছাড়া অন্য পোশাক নেই, সবই করি।'

'কাপড় কাচতে পারেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপিসেও মেয়েরা এই পোশাকে যায়?'

'কী করবে, এই তো পোশাক।'

'আশ্চর্য!'

'এখন অবশ্য পোশাক বদলাচ্ছে। সত্য কথাই, বাসে ট্রামে উঠতে হলে খুব অসুবিধে।'

'আমাকে এ পোশাক পরতে শিখিয়ে দেবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমি নাইলনের ইয়ার্ড মেটিরিয়েল কিনে নেবো। কিন্তু সেলাই করে দেবে কে?'

'এতে তো কোনো সেলাই নেই।'

'এতো বড়ো লম্বা একটা সেলাই ছাড়া কাপড়?'

'হ্যাঁ।'

'ক' গজ লাগে?'

'সাড়ে পাঁচ গজ আমাদের লাগে, আপনি কিনলে ছ' গজই কেনা ভালো।'

'ছ' গজ সেলাই না করা কাপড়! মাই গড! এই পোশাকের নাম কী?'

শাড়ি।'

হ্যাঁ, হ্যাঁ, শাড়ি! আমি শাড়ির কথা শুনেছি।' বুদ্ধদেবের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনাদের জাতীয় পোশাক কি এটাই?'

মাথা নাড়লেন বুদ্ধদেব, 'না, না। এ আমাদের আপনাদের কাছ থেকেই ধার করা। বলতে পারেন এটাই এখন ছেলেদের ইনটারন্যাশানাল পোশাক। সবিশেষ তো!'

এর পরে নানা জাতের নানা দেশের নানা কালের গাত্রাবরণ বিষয়ে কিছুটা আলোচনা চললো। সেটা সমাপ্ত করে অন্য প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হতে না-হতেই পৌঁছে গেলাম নির্দিষ্ট বাসস্থানে।

যে হোটেলটায় নিয়ে এলেন, চারদিক খোলা বড়ো বড়ো ঘরওলা একটি নতুন বাড়ি, নাম স্যাভয় হোটেল। Berlin Charlottenburg-এর উপর অবস্থিত। স্যাভয় হোটেলটি অবশ্য নতুন নয়, কৌলিক মর্যাদা আছে, বাড়িটাও নতুন নয়, নতুন করে সারিয়ে নেওয়া। মিসেস কেলনার বললেন, 'যুদ্ধের দয়ায় শহরটার মধ্যে চেহারা বলতে তো কিছুই আর বাকি ছিলো না, এ বাড়িও নিস্তার পায়নি; তবে সারাই-সুরাই করিয়ে নেবার মতো অবস্থা ছিলো, তাই নতুন দেখাচ্ছে। ক্ষয়ক্ষতি বড়ো বড়ো রাস্তার উপরেই বেশী হয়েছে। উঁচু উঁচু বাড়িগুলো তো নেই-ই বলতে পারা যায়, জানালায় দাঁড়ালেই অনেক রুইন্স্ দেখতে পাবেন। আমরা রোজ দেখি, তবু রোজ কষ্ট হয়। এখন অবশ্য কিছুটা সামলে ওঠা গেছে, নতুন গাছে পাতা গজাচ্ছে।'

আমাদের ঘর দোতলায়। ঘরে এসে বসতেই পট ভরতি কফি এলো, আনুষঙ্গিক টুকটাক কিছু খাদ্যদ্রব্যও এলো। মহিলাটি বেশ আড্ডাবাজ, কথার অভাব হলো না। প্রসঙ্গ বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যেখানেই যাক না কেন, সব ক্ষেত্রেই তাঁর বলবার ভাষা আছে, মতামতের স্পষ্টতা এবং দৃঢ়তা আছে। জ্ঞানেরও অভাব নেই। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, রাজনীতি—সবেতেই সমান উৎসাহ। অল্প-স্বল্প লেখার অভ্যাসও আছে, [illegible] উপরই বেশী আগ্রহ। ভক্তি প্রগাঢ়। বন-এ ছিলেন, সেখানে অধ্যাপনা করতেন। এখন বার্লিনে স্বামীর কর্মস্থলে এসে এই সরকারী কালচারাল সংস্থার কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁর মতে জার্মানীতে মেয়েদের অবস্থা একটুও ভালো নয়। পুরুষদের সঙ্গে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, পারদর্শিতায় দশ পা এগিয়ে থাকলেও কর্মক্ষেত্রে তাদের দশ পা পিছিয়ে রাখা হয়। সমান যোগ্যতা থাকলেও সমান সমান চাকরি পাবার কোনো প্রশ্নই থাকে না।

এ বিষয়ে ভারতবর্ষের মহিলারা যে আরো দুর্গত তাও তিনি জানেন। ভারতবর্ষ বিষয়ে আরো জানেন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ এঁদের বিষয়ে তো বটেই, যামিনী রায়ের নামও তাঁর অজানা নয়। বুদ্ধদেব বসুর দুটি গল্প এবং দু-একটি কবিতাও তিনি অনুবাদে পড়েছেন। ভারতীয় লেখকদের নিয়ে যে একটি সংগ্রহ বেরুবোর প্রস্তাব হয়েছে, সে বইয়ের নাম যে বুদ্ধদেব বসুর গল্পের নামেই বেরুবে সে বিষয়েও তিনি ওয়াকিবহাল। গল্পের নাম 'ওয়ান অর টু রোজেস'। বাংলায় 'একটি কি দুটি গোলাপ'।

আমার নাম জানেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, 'মেয়ে-লেখক হয়ে কেমন সমাদর পাচ্ছেন?'

বুদ্ধদেব হাসতে হাসতে বললেন, 'এঁকে আর তাতিয়ে দেবেন না, ভীষণ ফ্যামিনিস্ট, এক্ষুনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে আপনার সহযোগিতায় পুরুষকুলকে নস্যাৎ করে দেবেন। একা আমি, আমার কথা চিন্তা করুন—'

হাসতে হাসতে উঠলেন মহিলা, বললেন, 'এবার বিশ্রাম করুন, অনেক সময় নষ্ট করে দিয়ে গেলাম। কোথাও বেরুবেন কি? তা হলে আবার আসবো গাড়ি নিয়ে।'

আমরা শহর দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করলাম। সেই সঙ্গে আরো একটি ইচ্ছে, এ কয়দিনের মধ্যে পূর্ব জার্মানীতে যাবার কোনো বন্দোবস্ত করা যায় কিনা। এতো দেশ ঘুরছি, কোনো কমিউনিস্ট দেশ এখনো দেখিনি। বুদ্ধদেবের দু'বার রাশিয়ায় যাবার আমন্ত্রণ এসেছিলো। একবার আমাদের ভারত সরকার পাঠাতে চেয়েছিলেন, যেমন মাঝে মাঝেই পাঠান। দলগত সফরে বুদ্ধদেবের কোনো কৌতূহল বা ইচ্ছে না থাকায় সেটা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আর একবার সরাসরি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে তিন বছরের জন্য অধ্যাপনার আমন্ত্রণ এসেছিলো। সেটা ঠিক প্রত্যাখ্যান না করলেও এই কারণেই হলো না, ওরা তিন বছরের জন্য চান, বুদ্ধদেব এক বছরের বেশী থাকতে রাজী নন।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো, আশা করি পারমিশন পাওয়া যাবে, তবে রাত্রিবাস করতে পারবেন না।'

'রাত্রিবাস আমরা করতেও চাই না।'

নিজেই বললেন, 'অবশ্য তার দরকারও হবে না। এই তো এখান থেকে এখানে। একটা বেলা ঘোরাঘুরি করলেই যথেষ্ট।'

চলে গেলেন। বেশ একটা সৌরভ রেখে গেলেন। সত্যি সত্যিই নীলনয়না স্বর্ণকেশী মহিলাটিকে আমাদের খুব ভালো লেগে গেল! কথা থাকলো, আবার সাড়ে চারটার সময় আসবেন।

আমরা যখন গিয়েছিলাম রাজনৈতিক আবহাওয়া তখন বেশ উত্তপ্ত ছিলো। আমাদের যে এতো হয়রানি করেছে কাস্টম, তারও একটা কারণ বোঝা গেল। কয়েকদিন আগেই একজন বিদেশী এসে নাকি অনেক ঝামেলা করে গেছে। যাবে পূর্ব জার্মানীতে, সেই দলেরই লোক, এখানে এসেছে একটা বিশেষ কূট উদ্দেশ্য নিয়ে। সেটা জানাজানি হয়ে যাবার পর থেকেই বিশেষ সাবধান হয়ে গেছে।

তা ছাড়া দিন সাতেক আগে পর পর দুটি ছেলেকে পূর্ব জার্মানী গুলি করেছে। দুটি ছেলের মধ্যে একটির মা-বাবাকে নিয়ে সমস্ত পরিবার পড়ে গেছে পশ্চিম জার্মানীতে, আবদ্ধ ছিলো বলে সে আসতে পারেনি, তার বয়েস সতেরো। আর একটি ছেলের প্রেমিকা থেকে গেছে এপারে, সে পড়ে গেছে ওপারে। সদুপায়ে আসার কোনো উপায় নেই, সুতরাং দুজনেই দেয়াল টপকাতে চেয়েছিলো, সতর্ক প্রহরীরা সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে। দুজনই অবশ্য আলাদা-আলাদাভাবে আলাদা আলাদা দিনে চেষ্টা করেছিলো, পরিণতি এক। কয়েকদিন আগে আর একটি মেয়েও চেষ্টা করেছিলো পালাতে। তাকেও ধরে ফেলেছে। তারা সন্দেহ করছে, এই মেয়ের মতামত তাদের মতের পরিপন্থী, সুতরাং নিগ্রহ শুরু হয়েছে। কীভাবে লুকিয়ে পালিয়ে চলে এসেছে কে জানে, ফটকের পাশের ফাঁক দিয়ে প্রায় বেরিয়ে পড়েছিলো, তারপরের অত্যাচার বর্ণনাহীন। বিধবা মা এপারে অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেঁদে সারা হচ্ছেন।

অত সাবধানতা সত্ত্বেও কী করে যে এ-সব ঘটে, কে জানে। আবার তার মধ্যে চিঠি চালাচালিও হয়। সকলেই ওপিঠ থেকে পালিয়ে আসতে চায়।

কেন?

এই কেন প্রশ্নটি এখানকার সকলের চোখে-মুখে। তাদের বক্তব্য, অবিশ্রান্ত পালাতে চাইবার মধ্যে যে মনস্তত্ত্ব কাজ করে সেটা হচ্ছে : ইতিহাসবিদ না হয়েও সাধারণ জ্ঞান অনুযায়ী মানুষ যতো পিছনেই তাকিয়ে দেখুক না কেন, বিশ্ব নিয়মে এটাই দেখা গেছে শান্তি বা যুদ্ধ কিছুই নিরবচ্ছিন্ন নয়। সর্বকালেই এর প্রভাব মানুষকে কষ্টও দিয়েছে, শান্তও করেছে। কিন্তু এই মতবাদের মধ্যে কোথাও কোনো মুক্তি নেই, যুদ্ধটাই সব। অর্থাৎ অশান্ত থাকা আর অশান্ত

কিসর্জন দিয়ে, হৃদয়ের সমস্ত কোমলবৃত্তি বাঁধা রেখে তবেই এই নীতিকে ... নিতে হবে।

কমিউনিস্টদের মতে, সোভিয়েত-বিরোধী রাষ্ট্রগুলোকে ধ্বংস না করে শান্তি আসবে না, নিরাপত্তা আসবে না। যদি তাই হয়, তা হলে তাদের শান্তি কোথায়? কোথায় তাদের নিরাপত্তা? যাঁর হাতে তাদের এই অক্ষয় ... চাবিটি রক্ষিত ছিলো এতোকাল, সেই স্টালিনকে নিয়ে আজ তারা কী করছে? কোথায় গেল সেইসব ভক্তি-ভালোবাসার ঢাক-ঢোল? মর্ত্যভূমির সেই ঈশ্বরের মালাচন্দন?

এ-সব নিয়ে যে পশ্চিম বার্লিনবাসীরা সর্বদাই খুব একটা আলোচনা ... বা উল্লেখ করে বা তর্ক করে তা নয়, কিন্তু এই-ই তাদের সর্বক্ষণের অনুভূতি, কথাপ্রসঙ্গে উঠে পড়ে এবং রাজনীতির সঙ্গে এক ফোঁটাও যার সংস্রব নেই, ... ভাবে বিশ্বশান্তির পক্ষে এই মতবাদ অতি বিপজ্জনক। ভারতবর্ষে এর প্রভাব কীরকম তাও জিজ্ঞেস করে।

স্টালিন বিষয়ে মিসেস কেলনার বলেছিলেন, দেখুন, মৃত মানুষের অবমাননা মৃত্যুর বাড়া গাল নেই। জীবনের অনেক উর্ধ্বে মৃত্যুর আসন। সেই মৃত্যু নিয়ে এরা কী নৃশংস ব্যবহারই না করলো! কবর খুঁড়ে বার করলো সেই প্রাণহীন ... শব, পদাঘাত করলো, থুতু ছিটোলো—ছি ছি ছি, ভাবা যায় না। এখন বলা হচ্ছে তাঁর প্রতি এতোদিনের ভক্তি শ্রদ্ধা ভালোবাসা সবই নাকি ছিলো ভয়ের ফসল। কিন্তু জারতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে এই যে তারা একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করলো সেটা তো দেশের জনসাধারণকে আবার একটা ভয়ের শৃঙ্খলেই আবদ্ধ ... রাখা। দেখছি সমস্ত পৃথিবীটাকেই এরা ক্ষতবিক্ষত না করে ছাড়বে না। ... এক আত্মাহীন যান্ত্রিক সমাজ গঠনে বদ্ধপরিকর। দেশদ্রোহিতা, নরহত্যা, ... এই হচ্ছে এদের প্রধান হাতিয়ার। এর জোরেই প্রায় অর্ধেক ইয়োরোপ গ্রাস ... বসেছে। দেশকে যদি আমরা মা বলি আর কারণ তার জলবায়ু, মাটি। সেই জল বায়ু, মাটি আমাদের প্রাণবাহিকা শক্তি। অচেতনভাবেই সেজন্য দেশকে আমরা ভালোবাসতে শিখি। তাই যদি হয়, আমি বলবো, যার যার দেশের কমিউনিস্ট সন্তানরাই তার তার মায়ের গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়েছে। এ বিষয়ে ... অপরিসীম কৃতিত্ব।"

এই কথার পরিপ্রেক্ষিতেই আর একজন পণ্ডিতমান্য ব্যক্তি বললেন ... পর্যন্ত যতোগুলো দেশ তাদের স্বাধীনতা হারিয়ে কমিউনিজমের কবলে ... তার জন্য তাদের দেশের কমিউনিস্টরাই কিন্তু দায়ী। তাদের দেশদ্রোহিতাই ... সর্বনাশের মূল।

চেকোশ্লোভাকিয়ার জনপ্রিয় উদারনৈতিক নেতা শেষ রাষ্ট্রপতি বেনেস ... তাঁর প্রাণতুল্য গণতান্ত্রিক চেকোশ্লোভাকিয়াকে কমিউনিস্ট চক্রান্তের কবলে ... হতে দেখলেন, তখন তিনি চিৎকার করে এ কথা বলেই জগৎবাসীকে সতর্ক ... দিয়ে গেলেন যে, ন্যায় এবং নীতির বশবর্তী হয়ে কেউ যেন কমিউনিস্টদের ... না দেয়। তা হলে তার সর্বনাশ অনিবার্য। শেষ পর্যন্ত তিনি এ ভুল ... বলেই নিজের দেশকে পরের হাতে বিকিয়ে দিয়ে তার খেসারত দিতে হলো ... কখনো বিশ্বাস করেননি, কমিউনিস্ট হোক বা যাই হোক, নিজের দেশের ... আর কিছুকে কেউ বড়ো করে দেখবে। তাই কমিউনিস্টরা তাঁর দেশে ... পুষ্ট হয়েই তলায় তলায় এমন বেড়ে উঠতে পেরেছিলো।

ব্যক্তি বিশেষের ধণপ্রাণ সম্পত্তি স্বাধীনতা কিছুই যদি না থাকলো, এমন ... নাগরিক অধিকার পর্যন্ত স্বীকৃত না হলো, তা হলে বেঁচে থাকার অর্থ রইলো ... একনায়কতন্ত্রের নিরঙ্কুশ আনুগত্য স্বীকার না করলেই যেখানে মৃত্যুদণ্ড ... নিয়ম সেখানে একটা গৃহপালিত জীবের সঙ্গে একজন মানুষের পার্থক্য কোথায়? গরীবের দুঃখমোচনের নমুনা যদি এই হয় তো হলে শয়তানের কাছে আত্মা ... করাও যা, এও তাই। এজন্যই কমিউনিস্ট বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্য এতো লোকগুলো লুকিয়ে পালিয়ে বাঁচতে চায়? শত দারিদ্র্যেও মানুষ ... তাই তারা করেছে। তারা দেশত্যাগী হতে চেয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে, ... মৃত্যুবরণ করেছে তবু বিরত হয়নি।

কথাটা অসত্য নয়। সাহায্যের ছদ্মবেশে অন্যের দেশকে আপন দখলে আনার চেষ্টায় কমিউনিস্টরা যতো বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, অন্য কোন দেশ কারো উপর কখনো সেই চাতুরি খেলেছে বলে জানা যায় না। বস্তুত সাম্রাজ্যবাদ শব্দটা এখন যে-কোনো গণতান্ত্রিক দেশের কাছেই একটি আভিধানিক শব্দমাত্র। তার প্রয়োগ এখন একমাত্র কমিউনিস্ট দেশগুলোরই বৈশিষ্ট্য। আর তাদের সেই সাম্রাজ্যবাদ শুধু দেশ কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত হয় না, দেশের ধনরত্ন আত্মসাৎ করেই তৃপ্ত হয় না, এর ক্ষুধা ভয়ানক। এই ক্ষুধা কোনো জাতের নয়, গোষ্ঠীর নয়, এই ক্ষুধার আহুতি মানুষের হৃৎপিণ্ড। মানুষের হৃদয় মন অন্তঃকরণ। অসাম্য এবং দারিদ্র্যই যদি মার্কসবাদীদের বিদ্রোহের কারণ হয় তা হলে সে কারণ চেকোশ্লোভাকিয়ায় কখনো ছিলো না। ১৯৪৪ সালে এই দেশদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রের ফলেই প্রায় খাঁচাকলে ইঁদুরের মতো আটকে গিয়ে মাত্র দু' মাসে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে পনেরো হাজার পোলাণ্ডবাসীর মৃত্যু ঘটে। নাৎসীদের বিরুদ্ধে সাহায্যের অছিলায় বন্ধু সেজে রুশ মুক্তি ফৌজ তখন ঘরের দরজায় উপস্থিত। আশ্বাসে উৎসাহে তাতিয়ে তাতিয়ে নাৎসী বিতাড়নযজ্ঞে যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ করে চারপাশে এই আগুনের বেড়াজাল তারাই ঘিরে দিয়েছিলো। কিন্তু সত্যিই যখন সাহায্যের অভাবে মরতে লাগলো সব, আঙুলটিও নাড়লো না। শুধু অপেক্ষায় রইলো কোন সুযোগে ঘরে ঢুকবে।

পোল্যান্ডের একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক জেনারেল বোর কোমেহরোস্কিও সেদিন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন ক্ষমতা দখলের জন্য কমিউনিস্ট পৈশাচিকতা কতো দূরে যেতে পারে। বুঝেছিলেন এমন কোনো পাপ নেই যা এদের হৃদয়ে তিলমাত্র ত্রাসের সঞ্চার করতে পারে।

এমন কি, পোল্যান্ডের বিপদের খবর পেয়ে রুজভেল্ট যখন সাহায্য পাঠাবার বন্দোবস্ত করলেন, স্টালিন তাঁর বিমানঘাটিগুলো পর্যন্ত ব্যবহার করতে দিতে অসম্মত হলেন।

লিখে পাঠালেন, জেনারেল বোর কোমেহরোস্কি এখন দেশদ্রোহী, নাৎসী দলভুক্ত। তাঁকে সাহায্য করা মানেই স্বাধীন পোল্যান্ডের সার্বভৌমিকতায় হস্তক্ষেপ করা। এটা কমিউনিস্টদের নীতিবিরুদ্ধ।

আরপর সেই নীতির ধ্বজা ধরেই মৃতের স্তূপে পা রেখে রেখে তারা নগরে প্রবেশ করলো।

কমিউনিস্ট বিচার খুব সংক্ষিপ্ত। বিশেষ আইন-আদালতের দরকার হয় না। যে ব্যক্তি তাদের মতবাদে বিশ্বাস না করে অথবা না করার সম্ভাবনা এক ফোঁটাও আছে বলে মনে হয়, সকলেই তাদের কাছে সমান বধ্য।

সুতরাং ১৯৪৪ সনের অক্টোবর থেকে ১৯৪৫ সনের জুন পর্যন্ত এই নয় মাসে পোল্যান্ডের দেড় লক্ষ থেকে দুই লক্ষ অধিবাসীকে তারা মধ্যরাত্রির বিচারে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে নিশ্চিন্ত হলো। হাঙ্গেরিতে এই নৃশংসতা আরো চরমে উঠেছিলো। অতর্কিত আক্রমণে চারদিক থেকে ছুটে এসেছিলো সব রুশ সাঁজোয়াবাহিনী। ট্যাঙ্কগুলো ঘিরে ফেলেছিলো সমস্ত ঘাঁটি। তারপরে সমস্ত দিন ধরে যা চললো দেশটার উপরে সেই বীভৎসতা ইতিহাসের চরমতম উন্মত্ত হিংসাকেও লজ্জা দিয়েছে। বুডাপেস্টের রাস্তাঘাট অলিগলি সেদিন রক্তের স্রোতে ভেসে গিয়েছিলো।

এগুলো তথ্য। ঐতিহাসিক সত্য। আমি নিজে কোনো ইজমেরই পক্ষপাতী নই। সোজাসুজি গণতন্ত্র এবং পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থায় বিশ্বাসী। আমার ধারণা, মানুষের সব যুদ্ধই স্বাধীনতার জন্য। কিন্তু সেই স্বাধীনতা এরা সত্য সত্যই বিপন্ন করেছে।

কিন্তু এর ভীষণতা যে আরো কতো দূরে যেতে পারে তার উৎকট উদাহরণ বর্তমান চীন। চীনের কমিউন। এই নীতি প্রবর্তন করতে যে কেবলমাত্র দুই লক্ষ জমিদারকে সর্বসমক্ষে হত্যা করে জমির দখল নিতে হয়েছিলো তাই নয়, তার জন্য আরো অনেক দূরে যেতে হয়েছিলো। মানুষ ধাতু নয় যে, পিটোনো মাত্রই সিধে হবে; জন্তু নয় যে, মন নামক একটা পদার্থকে (যেটা একান্তই মানুষের গুণ) বাদ দিয়েও বেঁচে থাকবার কোনো অর্থ খুঁজে পাবে। কাজেই পরিবার প্রথা ভেঙে দিয়ে তাদের কমিউনের খোঁয়াড়ে ঢুকোতে পুরো চার বছর ধস্তাধস্তি করতে হয়েছিলো। অবশেষে দু' কোটি নরহত্যার পরে স্তব্ধ হলো সব। তখন আর তারা কারো মা বাপ ভাই বোন স্বামী আর স্ত্রীর পর্যায়ে রইলো না। তারা রাষ্ট্রের হলো। একটা খাটালে যেমন গয়লার ইচ্ছাধীন কতোগুলো গরু মোষ জাবর কাটে, দুধ দেয়, আর নির্দিষ্ট জায়গায় রাত কাটায়, তেমনি কমিউনের মানুষেরাও কমিউনের দখলে এলো। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত চীনবাসীর এক পোশাক। প্রত্যেকটি মানুষকে ঢেলে এক ছাঁচে তৈরি করবার এটাই হলো বাইরের আবরণ। এবং যেহেতু স্ত্রীলোকেরা ঘাড়ের নিচে চুল নামাতে পারে না (হুকুম নেই), সুতরাং চেহারা দেখে বোঝবার উপায় নেই কে পুরুষ, কে স্ত্রীলোক। দরকারই বা কী। কে কেমন মানুষ, কার কীরকম চেহারা, কে কী ধরনের মন বহন করে, এর তো আর কোনো অর্থ নেই সেখানে! সেখানে তাদের একমাত্র পরিচয় তারা সব কমিউনের সৈনিক। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত 'যেন যুদ্ধক্ষেত্রে আছি', এই স্লোগান অনুযায়ী কেবল মুখ বুজে খেটে যাওয়া। এরই নাম শ্রমিক-দরদ।

প্রায় সত্তর-আশিটা গ্রাম নিয়ে এক-একটা কমিউন তৈরী হয়। আর সেই কমিউনে বারো-চোদ্দো হাজার পরিবারের পঞ্চাশ-ষাট হাজার মানুষ একসঙ্গে বাস করে। জমি, বাড়ি, চাষের সরঞ্জাম, কুটিরশিল্প, রান্নাঘরের জিনিস এবং গৃহপালিত জীবজন্তুর সঙ্গে শিশু এবং বৃদ্ধরাও কমিউনের সম্পত্তি। এক সপ্তাহ বয়স থেকেই বাচ্চারা মায়ের বুক ছেড়ে কমিউনের ক্রেশে ঢুকে যায়। সেখানেই লালনপালন করা হয় তাদের। প্রাকৃতিক আবেগবশত শিশুরা মায়ের জন্য অথবা মায়েরা শিশুর জন্য যদি অত্যধিক বেদনা বোধ করে, তবুও কোনো উপায় নেই কাছে পাবার। একমাত্র অসুখ করলে দেখতে যেতে অনুমতি দেওয়া হয়। তার বেশী আর কোনো ইচ্ছের কোনো পূরণ সম্ভব নয়।

তেমনি যাদের বয়েস হয়েছে, যথেষ্ট পরিশ্রমের যোগ্য বলে বিবেচিত নয়, তাদের জন্যও পিঁজরাপোল আছে। সেগুলো হচ্ছে তাদের মতে বুড়োদের 'সুখের ঘর'। ঐ সুখের ঘরে তোমাকে যেতেই হবে, তাতে তোমার যতোই আপত্তি থাক বা কষ্ট হোক। স্ত্রী ছেড়ে, সন্তান ছেড়ে, সংসার ছেড়ে নিতেই হবে সেই নির্বাসন; কেননা সরকারী মতে এখন পেনসন হয়েছে তোমার। ঘর-ভরা সন্তান-সন্ততি নাতি-নাতনি নিয়ে বেকার বসে থাকা চলবে না। সেই নির্বাসনে দু' বেলা দু' মুঠো খাদ্য মেলে, শীতে কম্বল।

মেয়েদের কেন গৃহকর্ত্রীর ভূমিকা বাদ দিতে বাধ্য করা হলো, তার হিসেবটা অবিশ্যি খুব জটিল নয়। একজন মেয়ে যদি তার নিজের সংসারটুকু নিয়েই ব্যস্ত থাকে তা হলে তার শ্রমের অপচয় ঘটে। কেননা, তার আরো খাটবার ক্ষমতা বাকী থেকে যায়।

চীনের কর্মক্ষম জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মেয়ে। সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তাদের অবশ্যই কাজে লাগানো দরকার। অতএব তার সব অবসরটুকু নিঃশেষে নিংড়ে নিতে হবে। আর সেজন্যই একজন স্ত্রীলোক দিয়ে যদি এক শো জন লোকের রান্না করানো যায় তা হলে বাকী নিরানব্বই জন স্ত্রীলোকের শ্রম অনায়াসেই রাষ্ট্রের কাজে লাগানো যেতে পারে।

যেহেতু জনসাধারণ সম্পূর্ণভাবে সরকারী নির্দেশে চলতে বাধ্য, তাদের হুকুমের বাইরে এক পাও বাড়ানোর কারো সাধ্য নেই, সুতরাং প্রত্যেকটি লোকই জবরদস্তিমূলকভাবে তাদের আয়ত্তাধীন। আয়ত্তাধীন থাকার দরুনই মানুষগুলোকে জন্তুর মতো চব্বিশ ঘণ্টা কাজের চাকায় পিষ্ট করতে এক বিন্দু দ্বিধা নেই।

অবশ্য জন্তুর মতো বলাটাও ঠিক হলো না। কেননা, জন্তুর জন্যও আমাদের গণতান্ত্রিক সরকারী মতে এরকম নির্বিবেক নৃশংস আনুগত্যের নিয়ম নেই। তাদের দেহমনের জন্যও আমরা যথেষ্ট চিন্তা করি।

এমন কি, চীনে জন্তু-জানোয়ারের বদলে লাঙলও মানুষ দিয়েই টানানো হয়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যে শুধু এরা দেহটাকেই খাটায় তাই নয়, প্রতিটি চাষীকেই যে সারা বছর ধরে একইরকম মানসিক সংঘাতপূর্ণ জীবনযাপন করতে হয় তাই নয়, তাদের শ্রবণের উপরও যথেষ্ট পীড়ন চলে সারা দিন ধরে।

হাটে মাঠে ঘাটে বাজারে বাসে গাড়িতে সবত্রই লাউডস্পীকারের চিৎকার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। অবিশ্রান্ত সত্তর কোটি লোককে ঐ লাউডস্পীকারের মাধ্যমে শুনতে হয়, জানতে হয়, মেনে নিতে হয় তারা কতো সুখে আছে। বড়ো ভাই মাও তাদের জন্য কতো কষ্ট করছেন। মর্মে মর্মে গেঁথে নিতে হয় আদর্শ কমিউনিস্ট হতে হলে কী করতে হবে, কীভাবে চলতে হবে।

সকালবেলা ঐ আর্তনাদ শুনতে শুনতেই ঘুম ভাঙবে। আধ ঘণ্টা ব্যায়াম। তারপরে প্রাতরাশের জন্য ক্যান্টিনে গিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়ানো, তারপর মার্চ করে ঐ শুনতে শুনতেই ভাগে ভাগে কাজে যাওয়া।

দুপুরেও সেই শব্দ কানে নিয়ে ফিরে এসে মস্ত ক্যান্টিনের মস্ত 'মেস হলে' জমায়েত হয় সবাই। ষাট হাজার লোকের জন্য এক লঙ্গরখানায় যে খাদ্য প্রত্যহ সেদ্ধ করে এনে পরিবেশন করা হয়, তার মধ্যে আর যাই থাক, রসনার কোনো পরিতৃপ্তি নিশ্চয়ই থাকে না। হয়তো পেট ভরে। নাও ভরতে পারে। ঐ অখাদ্য গলাধঃকরণ করে আবার তাদের ছুটতে হয় কাজে।

সন্ধ্যার সময় ক্লান্ত দেহে ফিরে এসেও নিস্তার নেই। কেননা তখন ক্লাস। সেখানেও সেই রেডিওর চিৎকার। রেডিওর সাহায্যেই সরকার কী চায় শোনানো

হয় সে কথা॥ জানানো হয়। সেটা শেষ করে ধুঁকতে ধুঁকতে আবার দলীয় সভা। এখানে প্রত্যেকটি লোককে উঠে দাঁড়িয়ে তাদের সারা দিনের কর্মতালিকা পেশ করতে হয়, তারপর বড়ো ভাই মাওয়ের নামে শপথ করে বলতে হয় আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ আর জনগণের শত্রুকে তারা ধ্বংস করবেই করবে॥ এই প্রতিজ্ঞার পরে ছুটি। ছুটির বিশ্রামও নিয়মহীন বা ইচ্ছানির্ভর নয়॥ সেখানেও যার যার খোপে গিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে আট ঘণ্টা ঘুমোনো।

শুধু জীবনই নয়, মৃত্যুর পরে শেষকৃত্যের ব্যবস্থাও করে কমিউন॥ শুধু কে কার জন্য ক' ফোঁটা চোখের জল ফেলবে সে ... গুনে দিতে শেখেনি ... বুকের মধ্যে কে কতোটা বেদনাবোধে দগ্ধ হচ্ছে, ... সরিয়ে সেটা দেখে নিয়ে দামিত করতে শেখেনি।

মনে হতে পারে যান্ত্রিক যুগকে ঠাট্টা করে চার্লি চ্যাপলিনের 'মডার্ন টাইমস' ছবির মতো এটাও বুঝি একটা বাড়াবাড়ির কল্পনা নিয়ে প্রহসন। তা নয় ... মানুষের জীবন নিয়ে এই খেলাই খেলছে এই একনায়কতন্ত্রবাদ॥

সেই চীনই যখন তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টায় ভারতবর্ষের ব্যাপক অঞ্চল দখল করে আরো বিরাট অংশ দাবি করছিলো, সেই সময় কোনো কাগজে সেই বিষয়ে কিছু লিখতে অনুরুদ্ধ হয়েছিলাম। সুতরাং তথ্যের প্রয়োজন॥ এক বন্ধু তাঁরা সংগৃহীত কিছু কাটিং দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেন।

১৯৫৮ সালে বিখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ চন্দ্রশেখর দ্বিতীয়বার চীনে গিয়েছিলেন॥ ফিরে এসে তিনি নানা কাগজে—যেমন দিল্লীর 'স্টেটসম্যান', বম্বের 'ইলাসট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়া' ইত্যাদি—ধারাবাহিকভাবে কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন॥ স্টেটসম্যানের লেখাগুলো আমেরিকার অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস মারফত ভারতের বাইরে কয়েক শো দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। বইয়ের কিছু অংশ 'দি নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার রবিবাসরীয়তেও ছাপা হয়েছিলো। সেইসব কাটিংই বন্ধু দিয়েছিলেন আমাকে॥ আমি তা থেকেই ঐসব তথ্য পাই॥

সেই সময়ে আমাদের দেশের কমিউনিস্টরাও তাঁদের চরিত্র অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধামতো পরোক্ষে এবং প্রত্যক্ষে এদের সম্ভাষণে সমুৎসুক ছিলেন॥ ভারতবর্ষ নিরপেক্ষ দেশ, এই অছিলার ধুয়া তুলে যাতে অন্যান্য শক্তিশালী দেশের সাহায্য ও নিজের ক্ষমতায় আমরা প্রতিরক্ষায় পারঙ্গম হয়ে না উঠতে পারি তার অবিশ্রাম চেষ্টায় ক্লান্তিহীনভাবে নিয়োজিতও করেছিলেন নিজেদের। মানে তাঁরা চাইছিলেন ভারতবর্ষ চীনের হাতে বিজিত হোক॥ কেননা, ভারতবর্ষ এবং চীন—এ দুটো নাম তাঁদের কাছে দুটো শব্দ মাত্র॥ যা অর্থবহ তা হচ্ছে গণতন্ত্র এবং কমিউনিজম। গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে স্বদেশী বিদেশী যেই হোক না কেন এসে প্রভুত্ব করুক কোনো আপত্তি নেই। দেশকে বিকিয়ে দেওয়াটা তো বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা ইজম, মতবাদ॥ একনায়কতন্ত্রের জোয়াল।

যদি তাই তাঁরা মনে করে থাকেন তবে আর নিরপেক্ষ থাকার প্রশ্নটা কোথায় প্রযোজ্য! যেসব দেশ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তারা নিশ্চয়ই তার সর্বনাশ ঠেকাতে একপক্ষ হয়ে দাঁড়াবে॥ এবং সেটাই হবে তাদের ধর্মযুদ্ধ। বিশ্বাসের উপর, মনুষ্যত্বের উপর, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর এতো বড়ো জুলুম নিশ্চয়ই তারা অম্লান বদনে মেনে নেবে না!

কিন্তু এই দাবানল কোনো গণতান্ত্রিক দেশই জ্বালাতে উৎসুক নয়। গণতান্ত্রিক দেশগুলো মোটামুটি শান্তিপ্রিয় বলেই ধরে নেওয়া যায়॥ বিশেষ করে ভারতবর্ষ তো বটেই! তার প্রমাণও ভারতবর্ষ খুব ভালোভাবেই দিয়েছে। ১৯৪৯ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত কমিউনিস্ট চীন আমাদের নানাভাবে যতো উৎপাত করেছে, সেই তেরো বছর ধরে ভারত সরকার তার অবিচলিত বন্ধুতা নিয়ে ততোই অধৈর্যহীন হয়ে সেইসব উৎপাত ক্ষমা অথবা উপেক্ষা করে এসেছে ... রাষ্ট্রপুঞ্জে কেন কমিউনিস্ট চীনকে প্রতিনিধিত্ব করতে দেওয়া হচ্ছে না তা ... বছরের পর বছর আমাদের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে ... ন।

১৯৫১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ৪৯টি রাষ্ট্র একত্র হয়ে যখন জাপানের সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর দিল, কমিউনিস্ট চীনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বলে জওহরলাল নেহরু সেখানে যোগ দিলেন না॥ এমন কি, বন্ধুতা রক্ষার্থে ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে তিব্বতের উপর ভারতবর্ষের সমস্ত অধিকার পর্যন্ত উপঢৌকন দেওয়া হলো তাদের।

কিন্তু ঋণ, রোগ, আগুন আর কমিউনিস্ট কখনোই বন্ধু হয় না॥ এদের বিষয়ে কিছু বলতে গেলে সেই চেকোস্লোভাকিয়ার শেষ রাষ্ট্রপতি ডক্টর বেনেসের মৃত্যুকালীন জবানবন্দীই স্মরণ করতে হয়, কেউ যেন ন্যায়নীতির বশবর্তী হয়ে এদের প্রশ্রয় না দেয়। তা হলে দেশের সর্বনাশ অনিবার্য॥ সুতরাং স্বনিয়ন্ত্রই কমিউনিস্ট চীন তিব্বতের খোলা দরজা দিয়ে ভারতমাতার চুলের মুঠি শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরলো।

মোট কথা, প্রাণিকুলে যার দ্বারা মানুষ শ্রেষ্ঠ প্রাণী বলে পরিগণিত সেইসব বৃত্তিগুলো অপহরণ করাই এই মতবাদের একটা শর্ত। চলনে বলনে শয়নে ভোজনে মননে সব মানুষকে একাকার করে দেওয়াই এদের ধর্ম॥ দলীয় শাসনের অঙ্গুলিহেলনেই ঐ যে কমিউনের সব কটি মানুষ উঠছে, বসছে, কথা বলছে, খাটছে, হাঁটছে, অবিশ্রান্ত লাউডস্পীকারের বিজ্ঞাপনে কর্ণপটহ বিদীর্ণ করছে, সাধ আহ্লাদ আশঙ্কা ইচ্ছা বুদ্ধির চর্চা স্বাধীন চিন্তা কিছুরই কোনো প্রশ্ন আসছে না, তার নাম যদি বেঁচে থাকা হয় তা হলে মৃত্যুর ব্যাখ্যাটা কী জানতে ইচ্ছে করে।

চন্দ্রশেখরের মতে গোটা নরকও মানুষের জীবনে এমন ভয়ঙ্কর নয়। (ক্রমশ)

# বিজ্ঞান

## ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যখন ইউরেনাসের বলয় আবিষ্কার করলেন

"একমাত্র ইউরেনাসই ছিল আমাদের লক্ষ্য। দশই মার্চ, ১৯৭৭। ভারতীয় সময় তখন রাত দুটো বেজে তিরিশ মিনিট। ইউরেনাস তার পরিক্রমণ পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। বাঙ্গালোরের প্রায় দুশ কিলোমিটার দূরে কাভালুর মানমন্দির। সেই মানমন্দিরের মাথায় দূরবীন। দূরবীনের উপর চোখ রেখে রুদ্ধশ্বাসে আমরা অপেক্ষা করছি। আমাদের চোখ ইউরেনাস এবং দূরবর্তী একটি ক্ষীণ নক্ষত্রের উপর নিবদ্ধ। ইউরেনাস ক্রমে নক্ষত্রটি বরাবর সরে আসছে। আমরা আশা করছিলাম, নক্ষত্রটি আর কিছুক্ষণ পর ইউরেনাসের একপ্রান্তে অদৃশ্য হয়ে যাবে। যার অর্থ ওই গ্রহ সেই নক্ষত্রটিকে আড়াল করবে তখন, এবং কিছুক্ষণ পর তার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে আবার দৃশ্যমান হবে। নক্ষত্রটি যে মুহূর্তে আড়াল হবে এবং যে মুহূর্তে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসবে, গ্রহটি সম্পর্কে অনেক অজ্ঞাত তথ্য জানার ব্যাপারে ওই দুই মুহূর্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে খুবই মূল্যবান সময়। সেই মূল্যবান সময়ের জন্যে যখন আমরা অপেক্ষা করছি, ঠিক তখনই ঘটলো এক নাটকীয় ঘটনা। ইউরেনাস তখনও অনেক দূরে। হঠাৎ আমাদের ইলেকট্রনিক যন্ত্র জানিয়ে দিল ক্ষীণ সেই নক্ষত্রটিকে আর দেখা যাচ্ছে না। চমকে উঠলাম আমি। কী করে তা সম্ভব? ইউরেনাসই যদি না সামনে পড়লো, ক্ষীণ সেই নক্ষত্রটি আড়াল হলো কী করে?" 'দেশ'-এর জন্যে আয়োজিত এক সাক্ষাৎকারে প্রসঙ্গটি এই ভাবেই উত্থাপন করলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডঃ জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনা এবং তৈরি করে ডঃ ভট্টাচার্য ইতিমধ্যে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন। এশিয়ার বৃহত্তম এবং সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল 'সোলার ম্যাগনেটোগ্রাফ' বা সৌর-চৌম্বকক্ষেত্র পরিমাপক যন্ত্রটি বসানো হয়েছে কোডাইকানাল মানমন্দিরে। যন্ত্রটি তৈরি করেছেন ডঃ ভট্টাচার্য। সম্প্রতি বিরাট একটি দূরবীন তৈরির কাজ চলছে। কাভালুর মানমন্দিরে বসানো হবে এই দূরবীন। যার অভিনেত্রটির ব্যাস হবে ৯৩ ইঞ্চি। ১৯৮২ সালে দূরবীনটির কাজ শুরু করার কথা। এই দূরবীনের যাবতীয় ইলেকট্রনিকস্ যন্ত্রাংশ তৈরির দায়িত্বও ডঃ ভট্টাচার্যের উপর ন্যস্ত।

"কাভালুরে ৯৩ ইঞ্চি ব্যাসের এই দূরবীন বসানোর পর আলোক-জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক পর্যবেক্ষণের জন্যে আমাদের আর বিদেশী দূরবীনের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হবে না।" বললেন ডঃ ভট্টাচার্য।

ইউরেনাসের প্রসঙ্গ তুললাম। বললাম, ডঃ ভট্টাচার্য, আমরা জানি, আমাদের সৌরমণ্ডলে যতগুলি গ্রহ রয়েছে তাদের মধ্যে একমাত্র শনিরই বলয় আছে। আপনারা কি আগে থেকে বুঝতে পেরেছিলেন, ইউরেনাসেরও বলয় থাকা সম্ভব?

ডঃ ভট্টাচার্য বললেন, মিঃ কর, আপনি যে বললেন, একমাত্র শনিরই বলয় আছে—সে সম্পর্কে পরে বলছি। তবে হ্যাঁ, ওই দিন, অর্থাৎ ১১ মার্চ, ১৯৭৭ আমরা যে ইউরেনাসের বলয় আবিষ্কার করতে চলেছি, সে কথা স্বপ্নেও ভাবি নি।

"ব্যাপারটা একটু বিশদ করে বললেই বুঝতে পারবেন।" শুরু করলেন ডঃ ভট্টাচার্য। "আপনারা তো জানেন, পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে একটা পুরু বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডলের বাইরে রয়েছে সূর্য, তার বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহ, উল্কাণু, আরও কত রকম বস্তু। সৌরমণ্ডলের বাইরে বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে অগণিত নক্ষত্র। গ্রহ উপগ্রহ এবং বিভিন্ন নক্ষত্র থেকে বিকীর্ণ হয় নানা রকম রশ্মি। পৃথিবীর বুকে মানমন্দিরে বসে দূরবীনের চোখে ওই সব রশ্মি আমরা ধরার চেষ্টা করি। পরে তাদের বিশ্লেষণ করে আমরা জানতে পারি বিভিন্ন নক্ষত্র এবং নাক্ষত্রবস্তুর অবস্থান এবং তাদের চরিত্র। কিন্তু মুশকিল এই, এ ধরনের পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল একটি বড় রকমের বাধা। বহু জ্যোতির্মণ্ডলের আলোকরশ্মি এই বায়ুমণ্ডলে শোষিত হয়। অথবা বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে আসার সময় তাদের মৌলিক চরিত্রটি হারিয়ে ফেলে। এতে করে বহু বিকিরণেরই মূল উৎস সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না।

"এ ধরনের অনেক বাধাই আছে। তবু তার মধ্যে এমন কিছু কিছু ঘটনাও ঘটে, যা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ। যেমন ধরুন, সূর্যগ্রহণ। এমনিতে সূর্যকে দেখায় একটি উজ্জ্বল আলোকমণ্ডলের মত। তার উজ্জ্বলতম ফটোস্ফিয়ারের চারপাশে যে স্বল্প উজ্জ্বল পরিবেশ তাকে ফটোস্ফিয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথকভাবে পর্যবেক্ষণ করা শক্ত। এ কাজটি একমাত্র সূর্যগ্রহণের সময়ই সম্ভব। বিশেষ করে যখন পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ ঘটে, তখন। ওই সময় চাঁদ সূর্যের ফটোস্ফিয়ারকে পুরোপুরি আড়াল করে রাখে। তখন আমরা সূর্যের বর্ণমণ্ডল বা ক্রোমোস্ফিয়ার এবং করোনার মত স্বল্প উজ্জ্বল পরিবেশকে ভালভাবে দেখতে পারি। এই পর্যবেক্ষণ সূর্য সম্পর্কিত বহু চমকপ্রদ তথ্য জানার ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করেছে।

"আরও এক ধরনের ঘটনার কথা বলি। দেখা গেছে, কখনও কখনও কোন একটি নক্ষত্র হয়ত অপর একটি নক্ষত্রকে আড়াল করলো। অথবা সৌরমণ্ডলের কোন গ্রহ অথবা উপগ্রহ নিজেদের পরিক্রমণ পথে চলতে চলতে আড়াল করে বসলো দূরবর্তী কোন নক্ষত্রকে। এ ধরনের আড়াল করাকেই ইংরেজিতে বলা হয় 'অকালটেশন'। গ্রহগুলির স্বরূপ জানার ব্যাপারে 'অকালটেশন' একটি বড় রকমের সুযোগ।

"যেমন ধরুন, বৃহস্পতির অন্যতম গ্রহ গ্যানিমিডের কথা। ৭ জুন, ১৯৭২ এই উপগ্রহটি সুদূর একটি নক্ষত্রকে কিছুক্ষণের জন্যে আড়াল করে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা করলেন কি, নক্ষত্রটি যে মুহূর্তে গ্যানিমিডের আড়ালে চলে গেল সেই সময়টি জেনে নিলেন। তারপর অপেক্ষা করলেন কিছুক্ষণ। এর পর নক্ষত্রটিকে গ্যানিমিডের অপর প্রান্তে দেখা গেল। অর্থাৎ গ্যানিমিডের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো সেই নক্ষত্র। নক্ষত্রটি কতক্ষণ গ্যানিমিডের আড়ালে ছিল সেই সময়টি হিসেব করে গ্যানিমিডের ব্যাস কত জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সেটা জানতে সমর্থ হন। ওই সময় কাভালুর মানমন্দির থেকেও গ্যানিমিডের উপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম আমরা। সেই সব তথ্য থেকে জানা যায়
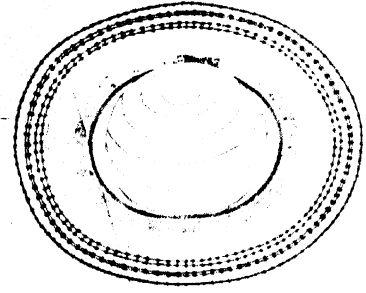
কাভালুর মানমন্দির থেকে সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করে বলয় সহ এই ছবিটি আঁকা হয়।

উপগ্রহটিরও বায়ুমণ্ডল রয়েছে। অন্যান্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীর সংগৃহীত তথ্যেও ব্যাপারটা প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের চাঁদে কোন বায়ুমণ্ডল নেই। সৌর জগতে এ পর্যন্ত দুটি উপগ্রহেই শুধু বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। এই উপগ্রহ দুটির একটি বৃহস্পতির গ্যানিমিড এবং অপরটি শনির টাইটান।

"সাম্প্রতিক খবরে দেখা যায়, বৃহস্পতির আরও একটি উপগ্রহ আইও-র বুকে আগ্নেয়গিরির সন্ধান পেয়েছেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা। সেই আগ্নেয়গিরির ভেতর থেকে বুলেটের মত বেগে বেরিয়ে আসছে নানা রকম গ্যাস। সেই গ্যাস আইও-র চারপাশেও কোন আবহাওয়ামণ্ডল তৈরি করেছে কি না, সে খবর অবশ্য এখনও পর্যন্ত জানা যায় নি।"

প্রশ্ন : কোন গ্রহ বা উপগ্রহে আবহাওয়া মণ্ডল আছে কি না, অকালটেশনের সময় কী ভাবে আপনারা তা বুঝতে পারেন?

উত্তর : খুবই সহজ ব্যাপার। আপনারা জানেন, গ্যাসের মধ্যে দিয়ে চলার সময় আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। এখন মনে করুন, কোন উপগ্রহ ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে কোন নক্ষত্রকে আড়াল করতে। যে মুহূর্তে ওই নক্ষত্রটি উপগ্রহের প্রান্ত বরাবর এসে উপস্থিত হবে, তার আলো ওই প্রান্তীয় অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসবে। প্রান্তীয় অঞ্চলে যদি বাতাস না থাকে এ ক্ষেত্রে আলোর চরিত্রের কোন পরিবর্তন হবে না। কিন্তু বাতাস থাকলে, তার মধ্যে দিয়ে আসার সময় আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হবে। অতএব আলোর বিচ্ছুরণ ঘটলেই বুঝতে হবে সেখানে বাতাস আছে। টর্চের আলো বাতাসকে যেমন উদ্ভাসিত করে, এ ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা দাঁড়ায় সেই রকম।

*

প্রশ্ন : ইউরেনাস যে দূরবর্তী একটি নক্ষত্রকে আড়াল করতে চলেছে কখন জানতে পেরেছিলেন আপনারা?

উত্তর : সেটা ১৯৭৩ সাল। তখন থেকেই আমরা প্রস্তুত হতে থাকি। ঠিক হয় ওই সময় আমরা ইউরেনাসের উপর পর্যবেক্ষণ চালাবো।

যথেষ্ট জটিল কাজ সন্দেহ নেই। ইউরেনাস সূর্যের সুদূরতম গ্রহ। ফলে খুবই অনুজ্জ্বল। সূর্যকে একবার পরিক্রমণ করতে ইউরেনাসের সময় লাগে ৮৪ বছর। পৃথিবীর অক্ষ পৃথিবীর পরিক্রমণ তলের দিকে ঝুঁকে ২৩½ ডিগ্রি কোণ করে অবস্থান করে। কিন্তু ইউরেনাসের অক্ষ ইউরেনাসের পরিক্রমণ তলের দিকে হেলে থাকে প্রায় ৮৫ ডিগ্রি বরাবর। এতে মনে হয় ওই গ্রহটি তার পরিক্রমণ তলের উপর প্রায় শুয়ে থেকে আবর্তন করে চলেছে। এমন অনেক কারণেই ইউরেনাসের উপর পর্যবেক্ষণ চালানো শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

ডঃ ভট্টাচার্য বললেন, প্রাথমিক গণনায় দেখা গেল, ১০ মার্চ, ১৯৭৭ নক্ষত্রটিকে পুরোপুরি আড়াল করার ঘটনাটি ভারত থেকে খুব ভালভাবে দেখা যাবে। মার্চ মাস। ওই সময় কাভালুর অঞ্চলের আকাশও
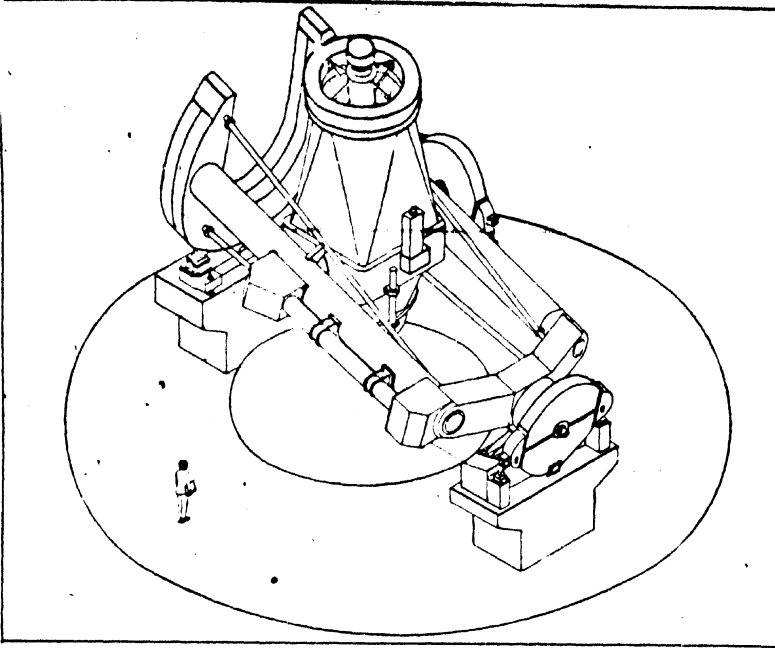
**শিল্পীর তুলিতে কাভালুরের মানমন্দিরের ৯৩ ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীন। দূরবীনটি ১৯৮২ সাল থেকে ব্যবহার করা হবে।**

থাকে খুবই পরিষ্কার। অতএব সোনায় সোহাগা। এটাও জানা গেল, ঘটনাটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকেও প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া থেকেও দেখা যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে একটি অসুবিধেও রয়েছে। নক্ষত্রটি যখন ইউরেনাসের আড়ালে প্রবেশ করবে সেই ক্ষণটির পুরো ছবিটাই সেখান থেকে ধরা পড়বে। কিন্তু আড়াল থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাকে নাও দেখা যেতে পারে। কারণ ওই সময় তখন সেখানে ঘটবে সূর্যোদয়। সূর্যোদয়ের সময় অত ক্ষীণ প্রভা দৃষ্টিগোচর করা সম্ভব নয়। দক্ষিণ আফ্রিকাও পর্যবেক্ষণের পক্ষে আদর্শ জায়গা হিসেবে বিবেচিত হলো না।

কিন্তু ১৯৭৭-এর জানুয়ারি মাসে এল দুঃসংবাদ। গণনা করে জানা গেল, ইউরেনাস কর্তৃক সুদূরতম সেই নক্ষত্রের গ্রহণ ভারত থেকে মোটেই দেখা যাবে না। ভারত থেকে কম করেও ২০০০ কিলোমিটার দূরপথে তার ছায়া-কোণ বিচরণ করবে। ইতিমধ্যে দেশ-বিদেশের বহু মানমন্দিরের কর্তৃপক্ষ ঠিক করেছিলেন এই ঘটনা ভারত থেকে প্রত্যক্ষ করবেন তাঁরা। কিন্তু নতুন এই সংবাদে তাঁদের পুরো পরিকল্পনাটাই পরিত্যক্ত হলো। তাঁরা তাড়াহুড়ো পর্যবেক্ষণের স্থান পরিবর্তন করলেন।

"হ্যাঁ, হতাশ হয়েছিলাম আমরাও। তবু কপাল ঠুকে নেমে পড়লাম। কে বলতে পারে, যদি আগের গণনায় এতটুকু ভুল হয়ে থাকে, ইউরেনাস কর্তৃক সেই নিষ্প্রভ নক্ষত্রটিকে আড়াল করার ঘটনা সে ক্ষেত্রে আমরাও তো প্রত্যক্ষ করতে পারি!

"ঠিক হলো, কাভালুরের ৪০ ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীনের সাহায্যে আমরা পর্যবেক্ষণ চালাবো। যথাসময়ে দূরবীনের সঙ্গে আনুষঙ্গিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিও প্রস্তুত করে নিলাম আমরা। গণনা মত ১১ মার্চ, ভারতীয় সময় রাত ২টো বেজে ৩০ মিনিটে ইউরেনাস এবং সেই নক্ষত্রের পরস্পর নিকটতম দৃষ্টিসীমার মধ্যে আসার কথা।"

১০ মার্চ, ১৯৭৭। ডঃ ভট্টাচার্য এবং তাঁর সহকর্মীরা কাভালুর মানমন্দিরের পর্যবেক্ষণ কক্ষে প্রস্তুত হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন অনেকক্ষণ আগে থেকে। শেষে ইউরেনাসের উদয় ঘটলো রাত ১১টায়। সঙ্গে দূরবীনের মুখটি তাঁরা যথাযথ নিবদ্ধ করলেন ভেতর দিয়ে দেখা গেল এক পাশে ইউরেনাস। আর এক পাশে সেই নক্ষত্র। ইউরেনাস ধীরে ধীরে নক্ষত্রটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

রাত ১টা বেজে ৩০ মিনিটে শুরু হলো বিরতিবিহীন পর্যবেক্ষণের কাজ। চালু হলো রেকর্ডিং যন্ত্র।

"এত আগে থেকে রেকর্ডিং-এর প্রয়োজন ছিল না। কারণ ইউরেনাস কর্তৃক নক্ষত্র-গ্রহণের তো তখনও অনেক দেরি। কিন্তু আগে থেকে রেকর্ড করার ব্যাপারটাই আমাদের কাছে শাপে বর হয়ে দাঁড়ালো।" মন্তব্য করলেন ডঃ ভট্টাচার্য।

"রেকর্ড চালু করার পর প্রায় কুড়ি মিনিট অতিক্রান্ত হয়েছে। আমার এক তরুণ সহকর্মী কুপ্পুস্বামী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল আমার কাছে।"

"কী ব্যাপার?" প্রশ্ন করলাম আমি।

কুপ্পুস্বামী বললো, "রেকর্ডিং যন্ত্রে একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করছি।"

"তার কথা আমার কানে ঢুকলো ঠিকই। কিন্তু ততক্ষণে আমিও অবাক। ৮ ইঞ্চি ব্যাসের গাইড টেলিসকোপের ভেতর দিয়ে ইউরেনাসকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সেই ক্ষীণ রক্তাভ নক্ষত্র? সেই নক্ষত্রটিকে তো দেখতে পাচ্ছি না? আমার মনে হলো, নীল আকাশের বুক থেকে নক্ষত্রটি যেন ভেল্কিবাজির মত অদৃশ্য হয়েছে। পরবর্তী পাঁচ সেকেন্ড আর আমি তাকে দেখতে পাই নি। অবশেষে আবার সে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। বলতে পারেন, চোখের সাহায্যে এটাই ছিল আমার একমাত্র পর্যবেক্ষণ। এবং পৃথিবীতে একমাত্র আমিই এমনটি দেখলাম।"

পরে রেকর্ডিং যন্ত্রে ধরা পড়লো, পাঁচ সেকেন্ড নয়, মোট নয় সেকেন্ডের মত নক্ষত্রটি অদৃশ্য অবস্থায় ছিল।

না, কাভালুর থেকে ইউরেনাস কর্তৃক সেই নক্ষত্রটিকে আড়াল করার ঘটনা শেষ পর্যন্ত দেখা যায় নি। কিন্তু ইউরেনাসের আড়ালে যাওয়ার আগে নয় সেকেন্ড ধরে কে আড়াল করলো তাকে? পরে ফটো ইলেকট্রিক রেকর্ড পরীক্ষা করে দেখা গেল, ওই নয় সেকেন্ড নক্ষত্রটি অদৃশ্য হলেও মাঝে কয়েকবার তাকে ঈষৎ দৃশ্যমান বলে যেন মনে হয়েছে।

প্রশ্ন উঠলো : ওই সময় পর্যবেক্ষণ যন্ত্রে কোন

সময় দূরবীনের দৃশ্যসীমার মধ্যে দিয়ে কোন উল্কাপিণ্ড অথবা মেঘ, কিংবা পাখি উড়ে গেছে। তার আড়াল করার দরুন সাময়িক ভাবে নক্ষত্রটিকে আর দেখা যায় নি। কিন্তু এ সবই তো কল্পনা।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ডঃ ভট্টাচার্য এবং তাঁর দল তাদের রেকর্ডপত্তর নিয়ে ছুটে এলেন বাঙ্গালোরে নিজেদের অ্যাসট্রোফিজিক্যাল ইনস্টিটিউটে। সেখানে ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টার এবং বিশ্বখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডঃ এম কে ভি বাপ্পু, তাঁদের সমস্ত তথ্যাবলী খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন। তাঁর মনে হলো, সম্ভবত ইউরেনাসের কোন অজ্ঞাত উপগ্রহের আড়ালে চলে যাওয়ার দরুনে নক্ষত্রটি সাময়িক ভাবে অদৃশ্য হয়েছিল।

যাই হোক, ঘটনাটি ওই দিনই নথিভুক্ত করার জন্যে সেন্ট্রাল ব্যুরো অভ্ দ্য ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়নকে জানানো হয়।

পরে জানা গেল আরও দুটি পর্যবেক্ষক দলও অনুরূপ তথ্য সংগ্রহ করেছে। একটি দল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের। এটির পরিচালক ছিলেন ডঃ ইলিয়ট। ভারত মহাসাগরের দক্ষিণাঞ্চলে ৪০,০০০ ফুট উঁচু দিয়ে উড়ে 'নাসা'র একটি প্লেন থেকে তিনি পর্যবেক্ষণ চালান। দ্বিতীয় দলটিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। এটি পরিচালনা করেন লাউয়েল মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডঃ রবার্ট মিলিস্। তাঁরা পর্যবেক্ষণ চালান অস্ট্রেলিয়ার পার্থ থেকে। উল্লেখ্য, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে লাউয়েল মানমন্দির থেকে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে প্লুটো গ্রহটির সন্ধান জানিয়েছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা।

কেউ কেউ মনে করলেন, ইউরেনাসের প্রসারিত আবহাওয়ামণ্ডলের আড়ালে পড়ার দরুন নক্ষত্রটি সাময়িক ভাবে অদৃশ্য হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যে অঞ্চলে সে অদৃশ্য হয়েছিল তার দূরত্ব কম করেও পাঁচ হাজার মাইল। কোন গ্রহের আবহাওয়ামণ্ডল এত দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া কি সম্ভব?

বাঙ্গালোরের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাঁদের সংগৃহীত তথ্যাবলী যন্ত্রগণকের সাহায্যে বার বার পরীক্ষা করেছেন। নৈনিতাল মানমন্দির থেকে সংগৃহীত তথ্য নিয়েও পর্যালোচনা করেছেন তাঁরা। ১৯৭৯ সালের অগাস্টে মন্ট্রিলে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়নের এক সভায় তাঁদের ফলাফল বিচার করা হয়। পরে সিদ্ধান্ত করা হয়, ডঃ ভট্টাচার্য এবং তাঁর সহকর্মীরা সেদিন যাদের আড়ালে সেই নক্ষত্রটিকে অদৃশ্য হতে দেখেছেন, সেগুলি ইউরেনাসের বলয় হওয়াই স্বাভাবিক।

শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছে, শনির মত ইউরেনাসেরও বলয় আছে। মোট চারটি বলয়। এই বলয়গুলির মাঝে কিছু ফাঁকা পরিসর। অথবা এমন ধরনের পরিসর যা বলয়গুলির মত অত স্বচ্ছ নয়। ১১ মার্চ সেই নক্ষত্রটি ইউরেনাসের তলে যাওয়ার আগে পর্যায়ক্রমে ওই বলয়গুলির আড়ালে গিয়ে পড়ে এবং অদৃশ্য হয়। বলয়গুলির অন্তর্বর্তী জায়গায় এসে ঈষৎ-দৃশ্য হতে শুরু করে।

ডঃ ভট্টাচার্য বললেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা, শনি এবং ইউরেনাসের মত অন্যান্য গ্রহেরও বলয় আছে। কয়েক বছর আগে মার্কিন মহাকাশযান যে সব ছবি পাঠিয়েছিল, তা থেকে অনেকের মনে হয় বৃহস্পতিরও বলয় আছে। অনেকে মনে করেন সূর্যেরও বলয় থাকা অসম্ভব নয়।

প্রশ্ন করেছিলাম, জ্যোতির্বিজ্ঞানে ভারতের বিজ্ঞানীরা কতটা পারঙ্গম?

আমার প্রশ্ন শুনে কিছুটা যেন বিব্রত হলেন ডঃ ভট্টাচার্য। তাঁর ঠোঁটের কোণে ছড়িয়ে পড়লো সলজ্জ আত্মবিশ্বাসের মৃদু হাসি। বললেন, ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখেন বিদেশী জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। মেঘনাদ সাহা, চন্দ্রশেখর, শিশির মিত্র—ওঁরা তো আছেনই। আমাদের বেশ কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর ভাবনা-চিন্তা যে বিদেশীদের চেয়ে অনেক আগে আগে চলে, তারও প্রমাণ পেয়েছি আমরা।

# মানবজমিন

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

( তেত্রিশ )

নিজের টেবিলে এসে অপেক্ষা করছিল দীপনাথ। একটু বাদেই বোস তার লম্বা মেদবহুল চেহারাটা নিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল। মুখ ভীষণ ভাবালু, গম্ভীর। চোখে অনির্দিষ্ট দৃষ্টি।

বোস একটু ইতস্তত করে দীপনাথের টেবিলের কাছে এসে, চ্যাটার্জি, উঠবেন না?

এই যাবো।

চলুন।

কোথায়?

চলুন, কোথাও যাওয়া যাক।

দীপনাথ মাথা নেড়ে বলে, আজ আমার ছোটো বোনের বাড়িতে যাওয়ার কথা।

আজ ক্যানসেল করুন।

দীপনাথ একটু দম ধরে থেকে বলে, মিস্টার বোস, আমি আপনাকে হেলপ করতে চাই, কিন্তু এখন কার্যত সব ব্যাপারেই আপনাকে হেলপ করা সম্ভব নয়। আই কান্ট হেলপ ইউ টু বি আনহ্যাপী।

বোস একটু হাসে, ইংরিজীটা আপনি মাঝে মাঝে ভালই বলেন। কিন্তু এখন আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। বাসায় চলুন।

খুব জরুরী কথা কি?

খুব জরুরী।

দীপনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফোনটা তুলে বলুদের পাশের ফ্ল্যাটের নম্বর ডায়াল করল। বিলুকে ডাকিয়ে বলে দিল, আজ নয়। কাল যাচ্ছি।

কত কথা জমে আছে তোমার সঙ্গে।

আজ একটু কাজ পড়ে গেল রে।

প্রীতম ঠিকই বলত, ভীষণ কাজের লোক হয়েছো তুমি আজকাল। আমি যে তোমার জন্যই অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে খাবার তৈরি করতে বসেছি।

একটু রাতের দিকে গেলে যেতে পারি। তবে ঠিক নেই।

দূর। থাকগে আজ। কবে আসবে?

কাল।

ঠিক তো?

ঠিক। কাল অফিস থেকে একবার ফোন করিস।

বোস সাহেব নীচে গাড়ির কাছে অপেক্ষা করছে। সামনে ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বসে আছে। দুজনে উঠল। গাড়ি নিউ আলিপুরে রওনা হতেই বোস সাহেব বলে, আপনি আমার ওপর স্পাইং করছিলেন?

ও কথা কেন?

[illegible] আপনার জানার কথা নয়।

খবর নেওয়াটা দোষের, না খবর হওয়াটা?

বোস সাহেব মৃদু হাসে। বুদ্ধদারের মতো খুব সামান্য একটু মাথা নেড়ে বলে, আমি অবশ্য ব্যাপারটা গোপন রেখেছি, কিন্তু সেটা পাপবোধ থেকে নয়। মিসেস বোসের জন্য। সময় হলেই মণিকে জানাতাম।

আমি কিন্তু মিসেস বোসকে খবর দিইনি। উনি আগে থেকেই জানতেন।

কতটা জানে?

খুব বেশী নয়। জানে, একটা মেয়ের সঙ্গে মিশছেন।

মেয়েদের সঙ্গে আমার মেলামেশায় তো বাধা নেই।

কিন্তু এবার একটা উদ্দেশ্য নিয়ে বিশেষ একজনের সঙ্গে মিশছেন।

সেটা দীপা জানতে পারে না। জানলে আমাকে বলত। ছেড়ে দিত না।

ডিভোর্স হবেই ধরে নিয়ে উনি হয় তো ততটা কিছু করতে চাইছেন না।

তা হলে হেডেকটা কার? আপনার?

আমার একটু হেডেক তো আছেই।

বোস হাসল আবার। এবারকার হাসি দেখে বোঝা গেল, বোস নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে। বলল, স্ট্রেঞ্জ। তবু আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব।

হাসি এবং গলার স্বরটা দীপনাথের খুব ভাল লাগল না।

বোস একটু চাপা গলায় বলল, দীপার ওপর আমার আর কোনো ইন্টারেস্ট নেই। তবু আমি ডিভোর্স করতে চাইছিলাম না। আপনাকে বলেছিলাম তো যে, আমি একটা লং-টুরে বাইরে চলে যাচ্ছি।

বলেছেন।

হয় তো তাই যেতাম। তবে শেষ পর্যন্ত আর একটা অ্যাফেয়ার ঘটে যাওয়ায় মনে হল, জীবনটা আর একবার গড়ে তোলা যায়।

বোস বোধ হয় দীপনাথের সমর্থন পাওয়ার জন্যই এ সময়ে একটু চুপ করে রইল। কিন্তু দীপনাথ জবাব দিল না। সে খুব সন্তর্পণে চাল দিচ্ছে। কথা বলার চেয়ে চুপ করে থাকাটাই এখন জরুরী। লেট হিম টক অ্যান্ড টক।

তাই এখন আমি ডিভোর্স চাই।

আবার চুপ করে থাকে বোস। দীপনাথ আবার নীরব।

বোস সাহেব একটু কাৎ হয়ে প্যান্টের পকেট থেকে জিতানি সিগারেটের একটা প্যাকেট বের করে। সিগারেট ধরিয়ে বলে, দীপার অন্য ইন্টারেস্ট থাকলে আমার আপত্তি নেই। অন্য কেউ ওর প্রতি ইন্টারেস্টেড হয়ে থাকলেও বলার কিছু থাকবে না। ইন ফ্যাক্ট—

বোস সাহেব আবার অর্থপূর্ণভাবে দীপনাথের দিকে তাকায়। কিন্তু দীপনাথ নিজেকে সংযত রাখে। অনেক দিন বাদে এই লোকটার ওপর তার রাগ আর অল্প একটু ঘৃণা হচ্ছে।

ইন ফ্যাক্ট, কেউ কেউ দীপা সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড বলেও আমি জানি।

দীপনাথ সামান্য একটু নড়ে বসে। অস্বস্তি বোধ করছে মনে মনে।

বোস সাহেব সিগারেটটা টানছে না। আঙুলে ধরে আছে মাত্র। বাইরের দিকে চেয়ে থেকে খুব আস্তে করে বলে, ইন ফ্যাক্ট, আপনি নিজেই যদি দীপা সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড হয়ে থাকেন তবে আমি আপনাকে দোষ দিই না। দীপা ইজ মডারেটলি গুড লুকিং, ইন্টেলিজেন্ট। তার ওপর নোর্মাল।

দীপনাথের বুকটা ঝাং করে উঠল বটে। কিন্তু তেমন উত্তেজিত হল না। পাথরের মতো মুখ করে বলল, আর আমি?

বোস অবাক হয়ে বলে, আপনি? আপনি কি?

আমি কেমন?

বোস হাসে, এলিজিবল। কোয়াইট এলিজিবল। হ্যান্ডসাম, ওয়েল প্লেসড, ইন্টিগ্রেটেড। কোয়াইট এলিজিবল।

আপনি আপনার স্ত্রীর জন্য কি ঠিক এ রকম পাত্রই খুঁজছেন বোস সাহেব?

কথাটার ভিতরকার মার বোসকে একটু কাহিল করে ফেলে। সিগারেটটা জানালা দিয়ে ময়দানের ফাঁকা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে বলে, পাত্র-পাত্রীরা পরস্পরকে খুঁজে পেয়ে থাকলে আমার আপত্তি নেই, আমি এই কথাটাই বলতে চাইছি।

দীপনাথ মাথা নেড়ে বলে, আমি এখনো পাত্রী খুঁজে পাইনি। তবে পাত্রীর গার্জিয়ানের কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে। তাঁর পরিত্যক্ত স্ত্রীকে আমি বিয়ে করলে অফিসে তাঁর পজিশনটা কী দাঁড়াবে।

জিতানির প্যাকেটটা হাতেই ধরা ছিল, বোস সাহেব আর একটা সিগারেট বের করে প্যাকেটের ওপর ঠুকতে ঠুকতে বলে, দেয়ার ইজ এ পয়েন্ট টু পন্ডার অন। দীপাকে আপনি বিয়ে করলে আমাদের এক অফিসে থাকা বোধ হয় ভাল দেখাবে না। দেয়ার উইল বি এ লট অফ টক।

সেক্ষেত্রে বোধ হয় আমাকেই সরে যেতে হবে।

বোস মাথা নেড়ে বলে, তার কোনো মানে নেই। ব্যাংগালোরের অফারটা এখনো আমার কাছে ওপেন আছে।

দীপনাথ বিজ্ঞের মতো হেসে বলে, আর এবার বোধ হয় আপনি আমাকে ব্যাংগালোরে সঙ্গী করতে চাইবেন না।

না। বোস শ্বাস ফেলে বলে, ইন ফ্যাক্ট দীপাকে যদি আপনি নেন তা হলে আপনার এবং আমার এক শহরেও বসবাস করা উচিত হবে না।

আর মিসেস বোস যদি কাউকে বিয়ে না করতে চান, তা হলে কি হবে?

বোস কাঁধ তুলে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, নাথিং।

কিন্তু উনি কাউকে বিয়ে করলেই তো আপনার সুবিধে।

বোস একবার তাকিয়েই দীপনাথের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে, তা কেন?

দীপনাথ চাপা রুদ্ধ গলায় বলে, তা হলে আপনাকে মাসোহারার টাকাটা গুণতে হবে না।

বোস এ কথায় চুপ করে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে বলে, শুধু তাই নয়।

তা হলে আর কি?

বোস উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে সামনে চেয়ে থেকে বলে, দীপা জেলেমানুষ, ইমম্যাচিওর, রেস্টলেস, একস্ট্রাভ্যাগান্ড। একা থাকলে ও একদম শেষ হয়ে যাবে। আমি ওকে ট্যাকল করতে পারিনি বটে, কিন্তু আমার চেয়ে ইন্টিগ্রেটেড কোনো পুরুষ হয় তো পারবে।

পাত্রীর গার্জিয়ানের মতো কথা বলছেন না মিস্টার বোস। পাত্রপক্ষকে দোষের কথা শোনাতে নেই। শুধু গুণের কথা জানাতে হয়।

জিতানির ধোঁয়া গলায় লেগে বোস কিছুক্ষণ কাশে। কড়া ফরাসী সিগারেট ধোঁয়া লাগতেই পারে

বেশ একটু ধরা গলায় বলে, আপনি বলেন খুব চমৎকার।

আপনি মিসেস বোসের জন্য এত চিন্তা করছেন কেন? ওঁর ভবিষ্যৎ ওঁকে ভাবতে দিন।

তা দিয়েছি। আমি কোনো ব্যাপারে ইন্টারফিয়ার করি না। আপনাকে কথাটা বলছি অন্য কারণে।

*কি কারণ?*

*আমি জানি, ইউ আর ইন লাভ উইথ হার, অ্যান্ড ভাইস ভার্সা।*

*এ কথায় দীপনাথের পায়ের তলায় ভিত* একটু নড়ে যায়। কিন্তু ন্যাটোর নেই বাস্তপাড়ের জন্য। তাই সে সামলে নেয়। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, আপনি হয়তো সত্যি কথাই বলছেন, ইয়েস, উই আর ইন লাভ।

বোস অবাক হয়ে বলে, ইউ অ্যাডমিট! কংগ্র্যাচুলেশনস।

থ্যাংকস। কিন্তু মুশকিল হল—

বোস সাগ্রহে একটু ঝুঁকে বলে, হ্যাঁ, মুশকিল হল—?

মুশকিল হল, আমি মিসেস বোসকে ভালবাসি বলেই তার ভাল চাই।

বটেই তো। তাতে মুশকিল কি?

মুশকিল হল, কিসে মিসেস বোসের ভাল হবে তা আমি এখনো ভেবে পাইনি।

ভালবাসার একটাই এইম থাকে চ্যাটার্জি, ভালবাসার লোকটাকে কব্জা করা।

নিক। তবে যদি তাতে তার ভাল না হয়।

ভাল হবে। তাতেই ওর ভাল হবে।

আপনাকে এ ব্যাপারে বড় বেশী উৎসাহী মনে হচ্ছে বোস সাহেব।

বোস একটু বিরক্ত হয়ে বলে, আমাকে সাহেব সাহেব করেন কেন বলুন তো।

আপনি যে ভীষণ সাহেব বোস সাহেব।

বোস আবার কাঁধ ঝাঁকায়। তারপর বলে, আমিও ওর ভাল চাই। আমি জানি কিসে ওর ভাল হবে।

দীপনাথ মাথা নেড়ে বলে, পাত্রীর ভাল দেখলেই তো হবে না। পাত্রের ভাল হবে কিনা সেটাও ভেবে দেখা দরকার।

আপনারও ভালই হবে। আপনাদের দুজনেই দুজনকে ভালবাসেন, দেয়ার উইল বি নো প্রবলেম।

ভালবাসি বলেই প্রবলেম। ভালবাসা মানে ভালতে বাস করা।

মানছি। কিন্তু আপনার প্রবলেমটা ধরতে পারছি না।

কি করে বুঝবেন? আপনি তো কখনো কাউকে ভালবাসেননি বোস সাহেব। বুঝতে গেলে ভালবাসতে হয়।

বোস একটু গুম হয়ে থাকে।

দীপনাথ দেখে, গাড়ি বাঁক নিয়ে নিউ আলিপুরে ঢুকে যাচ্ছে।

বোস সাহেব একটা শ্বাস ফেলে বলে, ইউ আর বিয়িং এ বিট ডিসেপটিভ। হয়তো দীপার প্রতি আপনার অ্যাটাচমেন্টটা ফিজিক্যাল। মে বি ইউ ওয়ান্ট টু একসপ্লয়েট হার। মে বি ইউ হ্যাভ অলরেডি একসপ্লয়টেড হার।

দীপনাথের ঠোঁট শুকিয়ে গেছে, কান জ্বালা করছে। তবু শুকনো হাসি হেসে সে বলে, যদি তাই করে থাকি তবু আপনার কিছু করার নেই বোস সাহেব। ইউ আর এ ম্যান উইদাউট ব্যাকবোন। আমার যদি স্ত্রী থাকত আর তার যদি পরপুরুষ জুটত, তবে আমি স্ত্রীকে ভালবাসি বা না বাসি সেই পরপুরুষের ঠ্যাং না ভেঙে ছাড়তাম না।

আপনি আমাকে আপনার ঠ্যাং ভাঙার জন্য ইনভাইট করছেন।

করছি। অ্যাট লিস্ট ইউ শুড ট্রাই।

বোস হেসে ওঠে।

গাড়ি এসে থামে ফ্ল্যাটের সামনে। দীপনাথ দেখতে পায় দোতলার বারান্দায় ম্লানমুখী মণিদীপা উদাস চোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুকটা কেঁপে ওঠে তার। ধড়াস ধড়াস করতে থাকে।

(ক্রমশ)

# ভারতবর্ষীয় বুদ্ধিজীবী সমাজের অবস্থা ও কর্তব্য

মিহির সিংহ

**ইন্টেলেক্ট** বা ইন্টেলেকচুয়াল কথা দুটির সার্থক বাংলা প্রতিশব্দ বোধ হয় নেই। তবে কথা দুটি খুবই পরিচিত, বহু আলোচিত। কিন্তু ইন্টেলেক্ট মানে কী? এর অর্থব্যাপ্তি সম্বন্ধে ধারণা অনেকটাই অনেকের থাকলেও ভাষায় তা যথাযথ ও সর্বজনগ্রাহ্য ভাবে ব্যক্ত করতে গেলে বিপদ ঘটে। বহুল প্রচারিত একটি অভিধানে যেমন ইন্টেলেক্ট ও ইন্টেলিজেন্স—এ দুটিকে প্রায় একই জিনিস বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, উপরন্তু ইন্টেলিজেন্সকে বলা হয়েছে প্রগাঢ় ইন্টেলেক্ট। এই রকম অগোছালো ধারণা বহু নামজাদা ও প্রগতিশীল দেশে ও সমাজেও যথেষ্ট। এর দৃঢ় প্রতিবাদ প্রয়োজন। সাধারণভাবে, বিশেষত দৈনন্দিন জীবনে, ইন্টেলিজেন্স বা বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন খুব। সামাজিক ডামাডোলের মধ্যে তো বটেই। কিন্তু ইন্টেলেক্ট বা ধীশক্তির স্থান মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে কি অনেক উপরে নয়?

একটি বিশেষ অর্থে বলা যায় যে কোনো ব্যবহারিক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে, মানুষ যেভাবে তার সমাধান খোঁজে, সেইটিই সাক্ষ্য দেয় তার ইন্টেলিজেন্সের। জীবজন্তু বা মানুষের মনস্তত্ত্ব ও প্রকৃতি নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁরা বলবেন যে বিশেষ পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার বিশেষ রাস্তা কিছু দূর অবধি জীব-মস্তিষ্কে, প্রায় কম্পিউটরের ধাঁচে গেঁথে যেতে পারে, পুরুষানুক্রমিক স্মৃতির (?) আধো আলো-অধো ছায়া ছাপে আঁকা থাকতে পারে। তার দরুন উদ্ভূত যন্ত্রপাতি বা ঘর-বাড়ি গোছের জড় উপকরণগুলিও যুগ হতে যুগান্তরে হস্তান্তরিত হতে পারে। কিন্তু তবুও, সেই অর্থে, ইন্টেলিজেন্স ঠিক কিউমুলেটিভ বা ক্রমসঞ্চয়শীল নয়। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কোনো একটি সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা ক্রমশই বেশি বুদ্ধিমান নাও হতে পারেন, বুদ্ধিমানদের হাতে এমন কিছু উপায়ও থাকে না যার সাহায্যে সন্তানদের জন্যে উত্তরাধিকার সূত্রে বুদ্ধিমত্তার ভাণ্ডার রেখে যেতে পারেন। সন্তানরা কিছু কিছু গুণ নানাভাবে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পেলেও, ব্যক্তিগতভাবে অনুরূপ বুদ্ধিমান নাও হতে পারেন। উত্থান-পতনের ইতিহাসে বহু সমাজের ক্ষেত্রে এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

কিন্তু, ইন্টেলেকচুয়ালদের সন্তানেরাও নিয়ম মাফিক ইন্টেলেকচুয়াল না হলেও, ইন্টেলেক্ট নামক দুর্জ্ঞেয় বস্তুটিকে বহুদূর অবধি মানুষের ট্র্যাডিশনের অন্তর্গত বলে মনে হয়—এক পুরুষেই কি একটি ব্যক্তির জীবনেই ফুরিয়ে যাওয়ার জিনিস বলে মনে হয় না। ভাষা, শ্রুতিধৃত জ্ঞান, লিপিবদ্ধ জ্ঞান—এ সবই, দূর অতীত থেকে আজ অবধি মানুষের ইন্টেলেকচুয়াল পদক্ষেপের ক্রমিক সাক্ষ্যের ধারক বা বাহক। ইন্টেলেকচুয়াল বিকাশও অত্যন্ত বিশেষভাবেই কোনো বিশেষ ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার হলেও, এবং তার আগে ও পরে ইতিহাসের ছেদ বহু সময়েই ঘটলেও, সাধনার পরম্পরা খুবই দেখতে পাওয়া যায়। সে অর্থে ইন্টেলেক্টকে সঞ্চয় করা যায়। যুগধারার সঙ্গে ইন্টেলেক্টের স্রোতস্বিনীও তার আপনার গতিতে বয়ে চলে। মানব সভ্যতার ইতিহাস বহুলাংশে ইন্টেলেক্টের পলিতেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপে, রেনেসাঁস বা সাংস্কৃতিক নবজাগরণ মানেই অনেকাংশে সেই প্রাচীন ইন্টেলেকচুয়াল সম্পদকে পুনরাবিষ্কার করা ও আরো বাড়িয়ে তোলা, যে সম্পদ মধ্যবর্তী অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে হারিয়ে গিয়েছিল।

আর একদিক থেকে দেখতে গেলে, মানুষের ইতিহাস মূলত তার সমাজভিত্তিক অর্থনীতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস। আবার সমাজভিত্তিক অর্থনীতির একটি মূল কথা স্পেশালাইজেশন বা আর্থনীতিক ক্রিয়ার জগতে কোনো একটি সীমাবদ্ধ ও অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ ক্ষেত্রে নিজেকে আবদ্ধ রেখে ঐ বিষয়ে নিজের পারদর্শিতা প্রতিষ্ঠা করা। এর ছাপ নানাভাবে ইন্টেলেক্টের জগতেও পড়েছে: প্রথমত, ইন্টেলেক্টের চর্চা অন্যান্য বহু জাতীয় মানবিক ক্রিয়াকলাপের মতন অল্পবিস্তর আর্থনীতিক তাৎপর্য লাভ করেছে। স্থূল বিচারে, ইন্টেলেক্টের চর্চাও অজস্র বিবিধ উৎপাদন ও বণ্টন-প্রক্রিয়ার মতন অথবা চিত্রাঙ্কন কি অভিনয়ের মতন, এক জাতীয় আর্থনীতিক বৃত্তি বিশেষ। দ্বিতীয়ত, সেই অর্থে এ-যুগের ইন্টেলেকচুয়াল কাজকর্ম ক্রমবর্ধমানভাবে প্রধানত একক ব্যক্তিনির্ভরতা ছেড়ে সংগঠন-আশ্রয়ী। এবং তৃতীয়ত, ক্রমশই ইন্টেলেকচুয়াল কাজকর্মও আর্থনীতিক সংগঠনের ধারা অনুসরণে স্পেশালাইজেশনের পথে এগোচ্ছে।

সমসাময়িক সমাজে এইরকম পেশাদার, সংগঠন-আশ্রয়ী, স্পেশালাইজড ইন্টেলেকচুয়ালদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কগুলি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। বহু ক্ষেত্রেই তাঁরা একে অপরের স্পেশালাইজেশনকে অবজ্ঞা করেন, অন্যের বিদ্যা বা বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞও থাকেন। এবং অত সশব্দে অবজ্ঞা করা মানেই হয়ত বহু ক্ষেত্রে মনে মনে লুকিয়ে লুকিয়ে সমীহা করা, বা নিজের স্পেশালাইজেশন সম্পর্কে হীনম্মন্যতা। এই জটিল অন্তর্দ্বন্দ্বের পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে সমসাময়িক সমাজের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা।

বহুকাল যাবৎ ইন্টেলেক্টের সঙ্গে লেখ্যভাষার একটা মোটামুটি রকমের সম্পর্ক আছে, যদিও সম্পূর্ণ নিরক্ষর মানুষও যে ইন্টেলেক্টচুয়াল হতে পারেন না তা নয়। আগেকার দিনে লিখতে বা পড়তে সমাজের বেশির ভাগ লোকই পারতেন না, সাধারণভাবে পুরোহিত বা শিক্ষকস্থানীয়রাই লেখাপড়ার চর্চা করতেন, ইন্টেলেকচুয়াল ধারারও বাহক ছিলেন তাঁরাই। লিটারেসি বা লেখাপড়ার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। আজকের দিনে ইন্টেলেকচুয়ালরা আর সেদিনকার মতন বৃহত্তর সমাজের থেকে তেটা পৃথকও নন, দূরবর্তীও নন। এবং আগেই লক্ষ করেছি যে তাঁরা আগেকার মতন গোষ্ঠীবদ্ধ না থেকে বরং প্রচুর অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত। বৃত্তিগত প্রতিযোগিতার মতন প্রতিযোগিতারও অভাব নেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা উচিত যে এই যুগের বিবর্তনের ধারায়, সংগীত-শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদি কলা তথা সৃষ্টিমূলক প্রয়াসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা আনুপাতিক হিসেবে কমছেই,—প্রায় যে কোনো আদিবাসী বা 'অনগ্রসর' সমাজের সঙ্গে তুলনা করলেই তা দেখা যাবে। সৃজনশীলদের মধ্যে ঐ একই ধাঁচে স্পেশালাইজেশন প্রভৃতিও বাড়ছে, এবং বেতার কি চলচ্চিত্র কি দূরদর্শন ইত্যাদি যান্ত্রিক উপকরণের প্রাদুর্ভাবে তাঁদের সৃজনশীলতা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমাজের বিপুল থেকে বিপুলতর অংশের কাছে পৌঁছিয়েও যাচ্ছে। সংগীত-শিল্প-সাহিত্যে নিজেরা সৃজনমূলক অংশগ্রহণ করছেন না অথচ তার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত—এমন মানুষের সংখ্যা ও অনুপাত দ্রুত বাড়ছে। অর্থাৎ ভালমন্দ উভয় অর্থেই এগুলিকে মনোরঞ্জন শিল্পের ভূমিকাতেই খুব দেখা যাচ্ছে। এবং বহু ক্ষেত্রে সেই ভূমিকার ছায়া ইন্টেলেকচুয়ালদের উপরেও খুব স্পষ্ট।

বস্তুত, জনচিত্তের দখলদারি নিয়ে প্রতিযোগিতা কেবল শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা বা বিভিন্ন ব্যক্তিগত চর্চাকারীর মধ্যেই নয়, এই প্রতিযোগিতা সামগ্রিকভাবে শিল্প-সাহিত্য-চর্চাকারীদের সঙ্গে বৃত্তিধারী ইন্টেলেকচুয়ালদেরও। দুই পক্ষই চাইছেন জনচিত্ত আকর্ষণ করতে। এবং সেই উদ্দেশ্যে ক্ষেত্র বিশেষে মোহ বিস্তার করতেও তাঁরা পিছপাও নন। কিছুটা তার ফলে, সংগীত-শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদি সমস্ত সৃষ্টিমূলক তথা মনোরঞ্জনমূলক প্রয়াসের প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ যেন ক্রমশই বাড়তির পথে। বিজ্ঞান ও বিবিধ গবেষণার প্রতিও শ্রদ্ধা বা ভক্তি বা নিছক মোহ, উচ্চশিক্ষিত ও ইন্টেলেকচুয়ালদের মহল অতিক্রম করে স্বল্পশিক্ষিত ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। এবং সব মিলিয়ে, ইন্টেলেকচুয়াল কাজকর্ম ও শিল্প বা বিজ্ঞান-সাধনা অস্পষ্টভাবে একাকার হয়েই যায় সাধারণ ধারণায়। এমন ধারণার পর্যন্ত প্রাদুর্ভাব আছে যে ইন্টেলেকচুয়াল কাজকর্ম মানেই হয় শিল্প নতুবা বিজ্ঞানের সাধনা।

এবং সর্বোপরি ঘটেছে নানা কারণে নানাভাবে জনজীবনের সর্বত্র সরকারী অথবা অন্যান্য বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের দোর্দণ্ড প্রতাপ বৃদ্ধি। সরকার মানে তার সর্বোচ্চস্তরবাসী রাজনীতি-বৃত্তিধারী ও তাঁদের দক্ষিণ হস্তস্বরূপে উচ্চপদস্থ আমলারা। আমলারা সাধারণত অনেক সময়ে নিয়ম মাফিক শিক্ষিত হলেও তাঁদের রাজনীতিক মালিকরা অশিক্ষিত—অল্পশিক্ষিত উচ্চশিক্ষিত সর্বপ্রকার। কিন্তু তাঁদের কান পাতা থাকে সমাজের বৃহৎ অংশের আপাত-পছন্দের উদ্দেশে। অন্য প্রতিষ্ঠানের যাঁরা মালিক তাঁরা খোলাখুলিভাবেই ব্যবসায়ী,—শিক্ষা বা সংস্কৃতির কোনো যোগ্যতা তাঁদের মাপকাঠি নয়। এবং সরকারী বেসরকারী সব প্রতিষ্ঠানেরই উচ্চস্থ আমলারা মূলত চাকরি বজায় রাখেন সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষিত কি সংস্কৃতিবান কিনা এ প্রশ্ন প্রায়শ অবান্তর। এঁদের সকলের তদারকে ইন্টেলেকচুয়াল জগতেও বড় বড় রাস্তা কি মস্ত মস্ত বাঁধ বানানোর ধাঁচে প্রচুর কাজ চলেছে। এটা এযুগের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

কর্তাদের যুক্তি অত্যন্ত সরল, কারণ শিক্ষা বা চিন্তার অভাবে মানুষের স্বভাব-জটিল ব্যাপারগুলিকে অতি-সরল করবার একরকম প্রবণতা দেখতেই পাওয়া যায়: ইন্টেলেকচুয়াল কাজ মানে সৃজনমূলক কাজ অর্থাৎ শিল্প বা বিজ্ঞান এই দুটি পথে আছে এর সম্ভাবনা। অতএব, ঢালো অর্থ, যান ও বাড়ি, আনাও উপকরণ, গড়ে তোলো বড় বড় গবেষণা মন্দির, কিম্বা দাও মোটা মোটা বৃত্তি আর ভারি ভারি উপাধি উপকরণ, গড়ে তোলো বড় বড় গবেষণা-মন্দির, কিংবা জগৎকে বুঝিয়ে দাও আমরা ইনটেলেকচুয়াল তথা শিল্প সাধককে কী রকম আদর করতে জানি। এই হাওয়ায় সুযোগ নিয়ে ইন্টেলেকচুয়াল যজ্ঞ করবার জন্যে বহু ব্যক্তিগত প্রয়াসও দেখা গেল, পরিকল্পিত আর্থনীতিক জোয়ারের সুযোগ-সন্ধানী ব্যবসায়িক প্রয়াসের মতন। কিন্তু এত হই হই রই রই সত্ত্বেও এই পথে কি ইন্টেলেকচুয়াল অগ্রগতি তেমন হল?

১৯৪৭ সালের পর থেকে ভারতবর্ষে গবেষণা মন্দির বহু স্থাপিত হয়েছে। জাতীয় গবেষণাগারগুলি থেকে শুরু করে অর্থনীতি, ম্যানেজমেন্ট, হোটেল পরিচালনা কি মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার বা জীবনযাত্রার এমন কোনো শাখা প্রায় নেই যে বিষয়ে অন্তত একটি না একটি গবেষণা-মন্দির তৈরি হল না। ভাল-খারাপ উভয় অর্থেই পরস্পর প্রতিযোগিতায় একাধিক গবেষণাগারও বহু ক্ষেত্রেই আছে। কিছু 'গবেষণাগার' আবার স্থাপিত হয়েই চলেছে পরলোকগত কোনো না কোনো শ্রদ্ধাভাজন মানুষের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁকে বা তাঁর চিন্তা ভাবনাকে কেন্দ্র করে গবেষণা করবার জন্যে। বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষায়তনগুলিতে সংলগ্ন গবেষণা-মন্দির

ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। সরাসরিভাবে উৎপাদনশিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত গবেষণা তো প্রসারিত হয়েছেই। প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগের গবেষণা-প্রতিষ্ঠানগুলিও এযুগে বহুল পরিমাণে ফেঁপে উঠেছে। এই স্ফীতি দেখা যাবে সংখ্যায়, সামাজিক স্বীকৃতিতে, উপকরণে ও আড়ম্বরে, নিয়োজিত মানুষের সংখ্যায় ও বেতনে, ইত্যাদি সর্বভাবে।

বলা বাহুল্য, এর মূল উৎস হচ্ছে অর্থ, এবং অর্থ আসছে দুই দিক থেকে। প্রথমত সরকারী তহবিল থেকে, এবং দ্বিতীয়ত বিভিন্ন ব্যবসায়ী বা পরহিতব্রতীগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অর্থভাণ্ডার থেকে। একদিন যাঁরা ব্যক্তিগত ত্যাগস্বীকার ও উঞ্ছবৃত্তির সাহায্যে প্রাক্‌স্বাধীনতাযুগের গবেষণা-প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা স্বাধীনতার পরে নিশ্চয়ই অত্যন্ত খুশিমনে এই আর্থিক সচ্ছলতাকে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা হয়ত ভেবেছিলেন, এতে যে শুধুই তাঁদের গবেষণার পথ সহজ হবে তাই নয়, সমাজের কাছ থেকে এতদিনে এই স্বীকৃতিও পেলেন যে, আপাতলাভের জন্যে বা জীবিকা নির্বাহের জন্যে কোনো একটি প্রচলিত বা গতানুগতিক বৃত্তি গ্রহণ না করে, গবেষণার পাগলামিতে আত্মনিয়োগেরও নিশ্চয়ই কিছুটা সামাজিক সার্থকতা আছে।

কিন্তু তাঁদের মধ্যে যাঁরা দূরদর্শী তাঁদের এ আনন্দ অবশ্যই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। একদিন যাঁরা বিজ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কারের আশায় অন্ধকার ঘরে লেবরেটরি সাজিয়ে দিনের পর দিন বছরের পর বছর মেতে গিয়েছিলেন গবেষণার কাজে, আজকে তাঁরা কাঁচ-কংক্রীটের সৌধে মূল্যবান আসবাবপত্র ও যন্ত্রসজ্জিত কক্ষে ডাইরেক্টরের পদ অলংকৃত করছেন। তাঁদের আর্থিক দুর্দিনের নিশ্চয়ই অবসান হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান কি বাড়তির পথে না কমতির পথে? অনুরূপ তুলনামূলক চিত্র বৃত্তিভোগী ইন্টেলেকচুয়ালদের প্রায় যে কোনো কিরণক্ষেত্রেই আঁকা যায়। স্বচ্ছ মুহূর্তে তাঁরা যদি নিজেদের প্রথম জীবনের প্রতি অথবা তাঁদের পূর্বগামীদের জীবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তো বুঝতেই পারবেন যে আয়োজনই বেড়েছে, ফললাভ আদৌ সে অনুপাতে হয়নি। কেউ যেন ভুল না বোঝেন; তাঁরা সমাজের অতি মূল্যবান অংশ, যে মূল্যবান কাজ তাঁরা করছেন তার উপযুক্ত আয়োজন দেরি করে হলেও খুবই কাম্য। কিন্তু প্রশ্ন এই যে যখন আয়োজনের সেই মারাত্মক দুর্ভিক্ষ ছিল, তখনো যে অনুপাতে যে দরের কাজ হত তা কেন এখন হচ্ছে না? —না, কেউ বলবেন যে হচ্ছে?

বরং স্পেস রিসার্চের মতন একেবারে নতুন নতুন বিষয়ে, আনকোরা নতুন নতুন গবেষণা কেন্দ্রে, হয়ত আশানুরূপ কাজকর্ম হচ্ছে। তাও, যেসব নতুন বিষয় স্বাধীনতার পরেই গবেষণার কাজ শুরু হয়েছিল সেসব ক্ষেত্রেও, পারমাণবিক বিজ্ঞানের মতন, এর মধ্যেই যেন অকাল বার্ধক্যের মতন শিথিলতা ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। নয় কি? কিন্তু কেন এমন হবে? এমন কি, কৃষিবিজ্ঞানের মতন যেসব ক্ষেত্রে বরাবরই ভারতবর্ষের বেশ নাম-ডাক সেসব ক্ষেত্রেও বহু তিক্ততা, এমন কি পেশাদার গবেষকদের মধ্যে গবেষণার পদ্ধতি ও পরিবেশ নিয়ে গভীর অতৃপ্তির থেকে আত্মহত্যা পর্যন্ত বারে বারে ঘটল। কেন? এই এক জাতীয় অতৃপ্তি থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন গবেষকরাও কেন এদেশের নাগরিকত্ব পর্যন্ত ত্যাগ করলেন? অন্য দেশে, উৎপীড়ন এড়াতে বা কখনো কখনো জীবিকার তাগিদে তা ঘটেছে। এদেশে তেমন উৎপীড়নের পরিচয়ও নেই, নিছক জীবিকার তাগিদকেও অত গুরুত্ব দেবার অভ্যাসও তো ভারতবর্ষীয় ইন্টেলেকচুয়ালদের ছিল না?

বরং স্বীকার করতেই হয় যে, গবেষণা মহলের উপরের দিকে যাঁরা আছেন তাঁরা কেবল উপার্জনেই নয়, সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তির দিক থেকেও তো বেশ ভালই আছেন—অন্তত আপাতদৃষ্টিতে। বিভিন্ন সরকারী কাজে কর্মে তাঁরা মন্ত্রণাদাতা হিসেবে জড়িত তো থাকেনই, দেশের বিবিধ বিষয়ে নীতিনির্ধারণ ও কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রেও তাঁরা খুবই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে থাকেন। আগেকার দিনে শাসকযন্ত্র পরিচালনা করতেন বিদেশী রাজপুরুষেরা, রাজনৈতিক নেতারা ও পেশাদার দেশী শাসকগোষ্ঠী। আজকের দিনে বিশিষ্ট বিজ্ঞান-সাধকের বা গবেষক-অধ্যাপকের বা এমন কি কলাকুশলীর পক্ষেও রাজনীতির আসরে অংশগ্রহণ করা যেমন নতুন কিছু নয়, তাঁদের পক্ষে তেমনই নতুন নয় শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ভিড়ে যাওয়া।

এ তো গেল নেহাতই উপরতলার কথা। অপেক্ষাকৃত নিচের দিকেও এই একই পরিবর্তনের হাওয়া। কোনো উচ্চশিক্ষিত তরুণ বা তরুণী তার সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে আজকে অনেক বেশি নিশ্চিন্ত হতে পারবে যদি সে বলতে পারে যে সে ব্যস্ত আছে কোনো গবেষণার কাজে। যে শিক্ষক সে কেবল ছাত্র ঠেঙায়, যে চিকিৎসক সে শুধু রোগের চিকিৎসাই করে, সব চাইতে উঁচু দরের চাকরিও যে করে সেও নেহাত চাকরিজীবীই, কিন্তু যে রিসার্চ ওয়ার্কার তার হাতে যেন ইন্টেলেকচুয়াল যক্ষপুরীর সোনার চাবিকাঠিটি। এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কিছু শক্ত নয় যে মানুষের মনে অতি গভীরভাবে লুকিয়ে আছে ইন্টেলেক্টের প্রতি ভক্তির ভাব। খুব ভাল কথা। ইন্টেলেক্ট ছাড়া তো মানুষের সভ্যতার বা সংস্কৃতির সম্ভাবনাই থাকত না। কিন্তু বেশি ভক্তিরস যেখানেই প্রকাশ পায় সেখানেই সাধারণত সমস্ত শুভ উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে প্রতিষ্ঠিত হয় মারাত্মক কোনো ভুল। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

আসলে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ই হোন বা সরকারী মহলই হোন, সবাই ভাবছেন যে গবেষণা হল মানুষের সৃজনী প্রতিভার বিকাশক্ষেত্র। তাঁরা খুব স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন না, তবে তাঁরা এটাও বলবেন যে, গবেষণা মানুষের ইন্টেলেকচুয়াল বৃত্তিরই নামান্তর মাত্র। এঁদের মধ্যে যাঁরা বেশি

প্র্যাক্টিক্যাল তাঁরা আশা করেন যে গবেষণা মানেই নতুন নতুন অ্যাপ্লিকেশন, স্ট্যাটেজিক, আর্থনীতিক পরিকল্পনার নতুন নতুন কাঠামো, ইত্যাদি। অর্থাৎ গবেষণার ক্ষেত্রে টাকা ঢাললেই তার পরিবর্তে তাঁরা আশা করবেন হাতে কিছু পেতে,—যার সাহায্যে বাণিজ্য করা যায়, দেশের উন্নতি করা যায়, যুদ্ধ নামলে শত্রু বিনাশ করা যায়, কিছু না হোক বিজ্ঞাপনধর্মী মুনাফা কুড়োনো যায়। যাঁরা আরো বিচক্ষণ বা দূরদর্শী তাঁরা অনেক সময়ে আপাতলাভটিকে উপেক্ষা করতেও রাজি আছেন মৌলিক গবেষণার খাতিরে, যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁরাও কিছু পেতে চান হাতে।

গবেষণার মন্দিরের উদ্যোক্তা ও কর্তারা সাধারণভাবে এই অস্পষ্ট ধারণার সুযোগ নিয়েছেন নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের দিকে তাকিয়ে। আগেকার দিনে পন্ডিত বলে এক ধরনের মানুষ ছিলেন। তাঁদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞান-আহরণ। গুরু পরম্পরায় অথবা পুঁথি পুস্তকের সাহায্যে প্রভূত জ্ঞান তাঁরা সংগ্রহ করতেন। নিরাড়ম্বর জীবনে নিরুদ্বেগ ছন্দে তাঁরা অধীত জ্ঞানকে বাড়িয়ে তুলতেন সাধনার ভিতর দিয়ে। তাঁদের জীবনে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা বিতরণ। রাজ অনুগ্রহ যে তাঁরা পেতেন না তা নয়, তবে স্বাভাবিক সময়ে রাজ্য পরিচালনার কাজে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ সাধারণত তাঁদের কাম্য ছিল না। তাঁদের জীবনের যে সম্মান সেটি প্রধানত আসত শিষ্য ও ছাত্রদের কাছ থেকে। সব চাইতে লক্ষণীয় বিষয় এই যে পন্ডিত-শ্রেণী শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন নিতান্তই তাঁদের জীবন-যাত্রা পদ্ধতি ও পান্ডিত্যের জন্যে, কোনো বিশেষ বৃত্তিতে পারদর্শিতার জন্যে নয়। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন ঘটল এবং পন্ডিতশ্রেণী ও নবোত্থিত বৃত্তি-ভোগী শিক্ষক সমাজ অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পর থেকে তফাতে সরে গেলেন। কিন্তু তবুও সেদিন পর্যন্ত একজন শিক্ষকের সব চাইতে বড় আদর্শ হতেন সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের বাহক পন্ডিত সমাজ।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও শিক্ষক মনে করতেন তিনি সমাজের কাছ থেকে ভরণপোষণ পাওয়ার পরিবর্তে শিশু ও কিশোরদের সাধারণ শিক্ষার জন্যে দায়ী। শিক্ষকেরা শুধু দরিদ্রই থাকতেন না, দরিদ্র থাকাটিকে তাঁদের আদর্শের একটি অংশ হিসাবে গ্রহণ করতেন। নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঠবে এটি ভাল কি না, এবং সেই প্রশ্নের বিচারও আমাদের করতে হবে। তবে এটুকু বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই আদর্শের পরিবর্তন ঘটেছে। কোচিং ক্লাস, প্রাইভেট টুইশন, অর্থ-পুস্তক প্রণয়ন, ইত্যাদি গ্লানির কথা আজকে বোধ হয় পুরানো হয়ে গিয়েছে। এই সব উঞ্ছবৃত্তির মূল কথা হচ্ছে সময় চুরি করে একটু বেশি পরিমাণ ছেলেকে গড়পড়তা একটু কম জ্ঞান বিতরণ করে যতটা সম্ভব বেশি অর্থ উপার্জনের চেষ্টা। এটি বোধ হয় বিদ্যার ক্ষেত্রে এক রকমের ব্ল্যাক মার্কেট। কিন্তু কালোবাজারির আমলে তবু কিছু আদান-প্রদানের ব্যাপার ছিল, হোক তা জল মেশানো বা অন্যায়ের সুড়ঙ্গ পথে। আজকে এসেছে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্ল্যাকমেলের যুগ। প্রাক্তন শিক্ষকেরা বলছেন তাঁরা ছেলে ঠেঙানোর ঝামেলা আর পোয়াতে রাজি নন। তাঁরা বহু পরিশ্রম করে ডেলিকেট ইন্টেলেক্ট তরুটিকে রিসার্চের বারি বর্ষণে দেশের মাটিতে বাঁচিয়ে রাখতে চান। তার জন্যেই তাঁরা দাবী করছেন সমাজ যেন পৃষ্ঠপোষকতার বেড়াটি ভাল করে বেঁধে দেয় যাতে দৈনন্দিন প্রয়োজনের ভাগাড়ের গরু মহিষ এসে (নিষ্ফলা) তরুটিকে মাড়িয়ে না যায়। অর্থাৎ রিসার্চের দোহাই দিয়ে শিক্ষকেরা বেমালুম অস্বীকার করছেন শিক্ষার দায়িত্ব।

খুবই আনন্দের কথা যে সরকারী চাকরি, সওদাগরী আপিস, ঢিলেঢালা কলেজী আবহাওয়া ত্যাগ করে যে সব মানুষ এসেছেন গবেষণার মণি আহরণে, তাঁরা আজকে প্রধানত সরকারী আনুকূল্যে ভাল খেতে ভাল পরতে পারছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা তো করা যেতে পারে যে তার পরিবর্তে সমাজকে তাঁরা কি দিচ্ছেন? ধরা যাক গবেষণার ক্ষেত্রে একটি চলতি মাপকাঠি হল বই অথবা প্রবন্ধের আকারে গবেষণার ফলগুলি প্রকাশ করা। উত্তর সাধকদের প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি বাদে এইটিকেই প্রধানতম মাপ-কাঠি বলা বোধ হয় সমীচীন হবে। রিসার্চ পেপার ছাপানোর এই ব্যগ্রতাকে অবশ্য কোনো এক সময়ে একটু বিচার করে দেখা যায় কতটা যুক্তিসংগত। তবু এই সব গবেষণা ও ইন্টেলেক্ট পুজারীদের নিজেদেরই কাছে যে এটি একটি খুব আকর্ষণীয় জিনিস তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই মাপ-কাঠিতেও দেখা যাবে যে আমাদের গবেষণার মন্দির-গুলি কী রকম দৈন্যগ্রস্ত। সামান্য দু-চারজন আছেন যাঁরা ধীর স্থির ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন এবং সময় মতন তা প্রকাশও করে যাচ্ছেন। আরো কিছু আছেন যাঁরা সাংবাদিকসুলভ প্রবন্ধ ছাপিয়ে থাকেন। তা ছাড়া ডক্টরাল থিসিস বা ছাত্রদের হাত পাকানো গোছের কিংবা মামুলি বিদ্যালয় পাঠ্য রচনা অবশ্য যথেষ্ট বেরোচ্ছে। খিচুড়ি জাতীয় ওয়ার্কিং পেপারের সিরিজও কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করেন, যা প্রধানত নিজেরাই দেখে-টেখে (বা না দেখেই) নিজেদেরই গুদামজাত করে রেখে দেন। কিন্তু এই আন্তর্জাতিক লেনদেনের যুগে, আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছয় বছরে কয়টি কাজ কোন্ বিষয়ে?

তবু এই গবেষণার ও ইন্টেলেকচুয়লরা, এবং তাঁদের দেখাদেখি উপরতলার শিক্ষকেরাও, শিক্ষকতা করতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক। শিক্ষকতা করতে হলেও যতদূর সম্ভব কম সংখ্যক ক্লাস যেন নিতে হয়, ছাত্রদের সম্বন্ধে তাঁদের দায়িত্ব যেন ন্যূনতম হয়। 'প্রফেসর' ইত্যাদি নামে পরিচিত হতে ভাল বাসেন। আবার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ঝামেলা সইতে পারুন বা না পারুন, চাপরাশি, বড় টেবিল, টেলিফোন ইত্যাদির প্রতি প্রীতি আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কর্তাদের মতনই। এঁরা সপ্তম স্বর্গ পেয়ে যান যদি মাঝে মধ্যে দু-চারজন শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপকের সঙ্গে কিছুটা আলাপ আলোচনা করতে পারেন। এবং বছরে দু-একবার সেমিনার কি কনফারেন্স কি খোদ সায়ান্স কংগ্রেস জাতীয় মেলাতে যোগ দিতে পারেন। দেশে হলে, মনোরম কোন পরিবেশই কাম্য, বিদেশে হলে তো কথাই নেই। পৃষ্ঠপোষক দফতর থেকে ফিনান-শিয়াল অডিট করে, কিন্তু পারফর্মান্স অডিট করে কেউ কখনো দেখতে যাবে না যে কত টাকা খরচ করে শেষমেশ সত্যিই কী পাওয়া গেল। এমন কি এক বিষয়ের বা এক সংস্থার কর্মীরা অন্য কোনো বিষয়ের কর্মীদের সম্বন্ধে বা অন্য কোনো সংস্থার সম্বন্ধে অমন কোনো অস্বস্তিকর মূলগত প্রশ্ন তুলবেনই না, নিজেদের মধ্যে যতই রেষারেষি থাকুক। এমন সুখের রাজত্বে কে আগুন লাগাতে চায়?

সরকারী দফতরগুলি বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান-গুলি প্রথম প্রথম পৃষ্ঠপোষকতা করেই ক্ষান্ত হত। কিন্তু মজার ব্যাপার যে ক্রমে ক্রমে এদেরও রিসার্চ-ভূতে পেয়ে বসেছে। পাঁচজন রাজপুরুষ একত্র বসে আজকে নীতিনির্ধারণের বা কাজ চালানোর বৈঠক করার চাইতে পছন্দ করেন পঞ্চাশ জনের সেমিনার। সেখানেও ওয়র্কিং পেপার। সম্ভব হলে জায়গাটি ভাল দেখেই বাছা হয়। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গতি অনেক সময়েই বেশি। তাঁদের আমলারাও রিসার্চ বা সেমিনার বা ওয়ার্কিং পেপারে পেছিয়ে নেই, তাঁদের জাঁকজমক বরং আরো বেশি। সম্প্রতিকালে সরকারী সৌজন্যে পাওয়া এ জাতীয় একটি বৃহত্তম পন্ডশ্রম হল সায়ান্স ও টেকনোলজি সংক্রান্ত পরিকল্পনাটি। তবে, কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যদি কত পরিমাণ দাঁতের মাজন বিক্রি হবে আন্দাজ করতে চেষ্টা করেন তো তাও এক মূল্যবান রিসার্চ বলেই পরি-গণিত হয়। এবং এই রিসার্চের বানে কলা-শিল্পীরাও ভেসে গিয়েছেন বহু ক্ষেত্রেই। সুকুমার কলার ক্ষেত্রেও সৃজনশীল সাধনার পরিবর্তে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে প্রধানত সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট সংস্থা আশ্রয়ী মেকী গবেষণার রেওয়াজ। তার একটি ফলস্বরূপ, কে ইন্টেলেকচুয়ল আর কেই বা কলাকার—এই বহুল প্রচলিত বিভ্রম আরো ঘনিয়ে এসেছে।

ফলে, যদিও বা ধরে নেওয়া যায় যে এই অভাগা দেশে শেষ পর্যন্ত এমন একদল সমাজ নায়কের অভ্যুদয় হল যাঁরা এদেশের প্রাচীন ইন্টে-লেকচুয়ল ট্রাডিশনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে, অথবা সমসাময়িক অগ্রসর সমাজের সঙ্গে তুলনীয় একটি ইন্টেলেকচুয়ল ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সত্যিই মনস্থির করলেন, তো তখন তাঁরা কোন্ পথে এগোবেন? লিখতে খারাপ লাগলেও লিখতেই হয় যে এই সব বিবিধ প্রতিষ্ঠান ও তাদের অবলম্বন করে গজিয়ে ওঠা এই দেশব্যাপী বিচিত্র ব্যাপারকে সেদিন প্রচুর ছাঁটতে হবে, পাল্টাতে হবে। এবং তার চাইতেও বড় কথা, দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবকেই আমূল পরিবর্তিত করতে হবে। তবে হয়ত শুরু হতে পারবে সেই বহু প্রতীক্ষিত ইন্টেলেকচুয়ল নবজাগরণ। কিন্তু সে কি সরকারী উদ্যোগ, সরকারী তত্ত্বাবধানে হওয়ার ব্যাপার? সূত্রপাত যেভাবেই হোক না কেন—বস্তুত, এমন একটা বিশাল ও গভীর ওলট-পালট হয়ত সাধারণত খুব প্রকান্ড বিপর্যয়ের মধ্যে ছাড়া শুরু হয়ই না—শেষ পর্যন্ত তার দায়িত্ব ইন্টেলেকচুয়লদেরই। এবং তাই যদি হয় তো তেমন বিপর্যয়ের জন্যে অপেক্ষা করা কেন? আত্মজিজ্ঞাসা ও সামাজিক মূল্যায়নের কাজটা শুরু হয়ে যাক না? অন্তত কিছু শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানে এবং নেতৃস্থানীয় ইন্টেলেকচুয়লদের মনে?

# ...লিম্পিক হকি-সোনায় ...দ কতখানি

জুলাইয়ের ২৯ তারিখের সন্ধ্যায় সুদূর মস্কো ...নামো স্টেডিয়াম থেকে অলিম্পিক হকি ফাইনাল ...লার ধারা-বর্ণনা ইথার তরঙ্গে ভেসে আসছে। ...ছুক্ষণ পরে পরে ভাষ্যকারদের ভাষা বদল হচ্ছে। ...খনো ইংরাজিতে, কখনো হিন্দিতে। সেই সঙ্গেই ...দল হচ্ছে খেলার অবস্থা। ভারত বিরতির সময়ে ...পেনের বিরুদ্ধে ২—০ গোলে এগিয়ে। দ্বিতীয়ার্ধের ...র মিনিটের মধ্যে এগিয়ে ৩—০ গোলে। রেডিও ...বং ট্রানজিস্টারের সামনে ভিড় করা ভারতীয় ...মর্থকদের মধ্যে তখন উচ্ছ্বাসের বন্যা। ষোলো ...ছর পরে ভারত আবার পাচ্ছে অলিম্পিক হকির ...সানার পদক। কিন্তু হঠাৎই উচ্ছ্বাস কিছুটা ...স্তমিত হয়ে গেল, যখন স্পেন পর পর দুটি গোল ...শাধ করে দিল। খেলার ফল ভারতের অনুকূলে ...খন ৩—২। চিন্তার রেখা ফুটে উঠল অনেকের ...লাটে। সাত বছর আগে আমস্টার্ডামে বিশ্বকাপ ...কির ফাইনালে তো এমনিভাবেই ভারত ২—০ ...গোলে এগিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত হেরে গিয়েছিল ...ল্যান্ডের কাছে টাইব্রেকারে। চিন্তাটা অবশ্য ...সাময়িক। আরও একটি গোল করে ভারত ৪—২ ...গোলে এগিয়ে যাবার পর সোনা জয় সম্পর্কে অনেকেই নিশ্চিত। কিন্তু আবার খেলার রঙ বদলে গেল, স্পেন আর একটি গোল শোধ করায়। ফল তখন ৪—৩ এবং স্পেন মরণ কামড় দিচ্ছে। আক্রমণের ঢেউ তুলে ভারতীয় ডিফেন্সে করছে ত্রাসের সঞ্চার। কী হয় কী হয় অবস্থা। আর কিছু অবশ্য হয়নি। ৪—৩ গোলে স্পেনকে হারিয়ে ষোলো বছর পরে ভারত আবার হয়েছে অলিম্পিক হকি চ্যাম্পিয়ন।

কিন্তু রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার মধ্যে আশা-আশঙ্কার দোলায় দোলানো এমন হকি ফাইনাল কি বেশি হয়েছে? অবশ্য মেলবোর্ন ও টোকিও অলিম্পিকের ফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের জয় ছিল খুবই কষ্টার্জিত। রোম অলিম্পিকের ফাইনালেও পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে জিতেছিল মরণপণ সংগ্রাম করে। কিন্তু কোনো ফাইনাল খেলায় এমন নাটকীয়তা এবং গোলের চমক ছিল না। তাই ত ভারতের প্রাক্তন অলিম্পিক অধিনায়ক বলবীর সিং মস্কোয় বলেছেন, "অলিম্পিকের অনেক হকি খেলা দেখেছি, খেলেছিও অনেক আন্তর্জাতিক হকি। কিন্তু এমন শ্বাসরোধকারী খেলা আর দেখিনি।" উল্লেখ্য, মেলবোর্নে বলবীর সিংই ছিলেন সোনাজয়ী ভারত দলের অধিনায়ক।

জাফর

ফাইনালে পরাজিত স্পেন দলের কোচ হর্স্ট ডেনহুইলে বলেছেন, 'হকি খেলায় দেশের সুমহান ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারত অসাধারণ ম্যাচ খেলেছে। এই দলের কাছে পরাজয়ে আমাদের কোনো আপসোস নেই।'

অলিম্পিকের অপর প্রতিদ্বন্দ্বী পোল্যান্ডের কোচের মতে ভারত-স্পেন ফাইনাল খেলার পুরো সত্তর মিনিটের টেকনিক-ট্যাকটিকস এবং কলা-কৌশল হকির টেক্সট বইয়ে স্থান পাবার যোগ্য।

এর পরও যদি কেউ মন্তব্য করেন, মসকো অলিম্পিকের হকি-সোনা ভারতের ফোকটে পাওয়া তবে বলব, সাম্প্রতিক বিশ্ব হকির আবর্তনের সঙ্গে তাঁরা ওয়াকিবহাল নন।

সত্যি কথা, হকি খেলায় শক্তিশালী কয়েকটি দেশ মসকো অলিম্পিকসে যোগ দেয়নি। যারা যোগ দিয়েছে তারাও আবার হকি দল পাঠায়নি। যেমন অস্ট্রেলিয়া, হল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড এবং গ্রেট-ব্রিটেন। বয়কটকারী দেশের মধ্যে হকিতে সমৃদ্ধ পাকিস্তান এবং পশ্চিম জার্মানি। এও স্বীকার করব, এই দেশগুলি খেললে ভারত সোনা নাও পেতে পারত। কিন্তু পেত না এ কথাই বা জোর দিয়ে বলি কীভাবে? মেক্সিকো এবং মিউনিখ অলিম্পিকে তৃতীয় স্থান পাওয়া সত্ত্বেও ভারত কি পরম শক্তি-শালী পাকিস্তানকে হারিয়ে ১৯৭৫এ কুয়ালালামপুরে বিশ্বকাপ জয় করেনি? মন্ট্রিয়েল অলিম্পিকের রানার্স অস্ট্রেলিয়াকে কি আটাত্তর-এ আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপে ২—০ গোলে হারায়নি? মন্ট্রিয়েলের চ্যাম্পিয়ন নিউজিল্যান্ডকেও তো গত বছর পার্থ আন্তর্জাতিক হকিতে হারিয়েছে ৫—৩ গোলে। ৭৮এ

জেয়ী

পাক-ভারত হকি টেস্টে লাহোরেও ভারত ২—১ গোলে পাকিস্তানকে হারিয়েছিল।

অকপটে স্বীকার করব, সম্প্রতিক কালের হকিতে ভারতের জয়-গৌরবের তুলনায় পরাজয়ের গ্লানি অনেক বেশি। এবং অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম জার্মানী এবং পাকিস্তানের কাছে কয়েকটি খেলায় শোচনীয়ভাবে পরাজয়ও স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু হকি দুনিয়ায় এখন যে ওঠা-পড়া তাতে যে-কোনো দেশই যে-কোনো দেশের কাছে হার স্বীকার করতে পারে। না হলে নিউজিল্যান্ড কীভাবে মন্ট্রিয়েল অলিম্পিকে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পাকিস্তান তৃতীয়, হল্যান্ডকে চতুর্থ ও পশ্চিম জার্মানীকে পঞ্চম স্থানে ঠেলে দিয়ে? নিউজিল্যান্ড আটষট্টিতে মেক্সিকো অলিম্পিকে দখল করেছিল সপ্তম স্থান, বাহাত্তর-এ মিউনিখে নবম স্থান, ছিয়াত্তর-এ চ্যাম্পিয়ন আবার গত বছর পার্থ আন্তর্জাতিক হকিতে পেল ষষ্ঠ স্থান। মেক্সিকো ও মন্ট্রিয়েল অলিম্পিকে রূপোজয়ী অস্ট্রেলিয়া বার্সিলোনা বিশ্বকাপে হল অষ্টম, কুয়ালালামপুরে বিশ্বকাপে পঞ্চম। হল্যান্ড কুয়ালালামপুরে পেয়ে-ছিল নবম স্থান।

চার বছর আগে অনুষ্ঠিত মন্ট্রিয়েল অলি-ম্পিকের ফল যদি খতিয়ে দেখি তবে দেখতে পাব যে অস্ট্রেলিয়া ভারতকে হারিয়েছিল ৬—১ গোলে সেই অস্ট্রেলিয়াই হেরেছিল আর্জেন্টিনার কাছে। আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ভারত জিতেছিল কিন্তু ৪—০ গোলে। মিউনিখ অলিম্পিকের চ্যাম্পিয়ন পশ্চিম জার্মানী ১—৪ গোলে হেরেছিল স্পেনের কাছে, যে স্পেন মন্ট্রিয়েলে পেয়েছিল ষষ্ঠ স্থান। আবার

দাবীন্দার সিং

সোমায়া

**ভবিষ্যতে কোন খরচের পরিকল্পনা আছে ? তার জন্যে ভাবনা কিসের ?**

# ভবিষ্যতে যতই খরচের পরিকল্পনা থাকুক না কেন, কথা দিচ্ছি, কানাড়া ব্যাঙ্ক সেই খরচের অর্ধেক টাকা যোগান দেবে

সময় থাকতে টাকা জমানো শুরু করলে সবকিছুই আপনার সামর্থ্যের মধ্যেই এসে যাবে। ভবিষ্যতের এই সব পরিকল্পনা রূপ দেওয়ার জন্য আপনাকে সাহায্য করতে কানাড়া ব্যাঙ্কের একটি বিশেষ জমা প্রকল্প রয়েছে।

কি চাই বলুন না—গাড়ি ? স্কুটার ? নিজের বাড়ি ? না কি ছেলেমেয়ের উচ্চশিক্ষা কিংবা বিয়ের খরচ ? **কামধেনু** জমা প্রকল্পের সাহায্যে আপনি খুব সহজেই আপনার টাকা দ্বিগুণ করে নিয়ে সবচেয়ে বেশি লাভ ঘরে তুলতে পারেন।

এই প্রকল্পের সবচেয়ে উল্লেখজনক দিক হল যে এতে আপনার প্রয়োজনীয় অর্থের একটা সামান্য অংশ জমা দিতে হবে। আপনি শুধু জমা টাকার অংক এবং মাসের সংখ্যাটা ঠিক করে ফেলুন। ব্যস, এরপর সুদের উপর সুদ জমতে জমতে মাসের পর মাস বেশ মোটা টাকাই আসবে। ফলে আপনার জমা টাকা হয়ে দাঁড়াবে দ্বিগুণেরও বেশি।

বিশদ বিবরণের জন্য কানাড়া ব্যাঙ্কের নিকটবর্তী শাখায় চলে আসুন। আমাদের অন্যান্য আরও বিশেষ প্রকল্পের মধ্যে আছে **বিদ্যানিধি, নিরন্তর** এবং **বালক্ষেম**।

# কামধেনু ডিপোজিট

**কানাড়া ব্যাংক**

(একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক)

সারা দেশে এই ব্যাঙ্কের ১২০০-রও বেশি শাখা আছে

SERVING TO GROW GROWING TO SERVE
CANARA BANK

maa CB 5 Ben A 80

ন্দ্রপাল

কৌশিক

ফার্নানডেজ

রবীন্দার সিং সোধী

সঈদ

জাফর ইকবাল

পেন-পাকিস্তান খেলা হয়েছিল ২—২ গোলে ড্র। ক খেলায় এখন এমন অপ্রত্যাশিত ফল আকছার ট যাচ্ছে। মেক্সিকোয় স্পেন-ভারত খেলা ছিল —১ গোলে ড্র, করাচিতে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে —২ গোলে এবং আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপের সিংয়ের খেলায় ভারতকে ০—২ গোলে হার স্বীকার রতে হয়েছিল স্পেনেরই কাছে। মস্কো অলিম্পিকে াই স্পেনের সঙ্গে রাউন্ড রবিন লীগে ২—২ ালে খেলা ড্র করা এবং প্লে-অফ ফাইনালে ৪—৩ ালে হারিয়ে সোনা জয় নিশ্চয়ই ফোকটে পাওয়া মান নয়। ছয় দেশের প্রতিযোগিতায় অপরাজিত কেই ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। কিছু দেশ গেমস য়কট করলে জয়-গৌরব ষোলো কলায় পূর্ণ না তে পারে কিন্তু খেতাবের মর্যাদা অক্ষুন্নই থাকে। লিম্পিক রেকর্ডেও থেকে যাবে ভারত বাইশতম মসের হকি চ্যাম্পিয়ন। এই যে আফ্রিকার আটাশটি শ মন্ট্রিয়ল অলিম্পিক বয়কট করেছিল। তার ফলে থিওপিয়ার দূরপাল্লার দৌড়বীর মিরাৎস ইফতের ন্ট্রিয়েলে যোগ দিতে পারেননি। এবার যোগ দিয়ে শ হাজার মিটার দৌড়ে সোনা জিতেছেন। কিন্তু ফতার মন্ট্রিয়লে যোগ দেননি বলে কি ল্যাস ভিরেনের দশ হাজার মিটারে সোনা জয়ের গৌরব টো হয়ে গিয়েছিল?

তার চেয়েও বড় কথা, হকি খেলায় সমৃদ্ধ য়েকটি দেশ মস্কোয় না খেলায় ভারতের জয়-গৌরবকে যাঁরা ছোট করে দেখছেন তাঁরা একটু পেছন ফিরে তাকাচ্ছেন না কেন?

১৯৩২-এ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ভারত কাদের হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল? মাত্র দুটি দশকে। তাও এমন দুটি দেশ হকি-স্টিক নিয়ে যারা হাঁটি-হাঁটি পা-পা শুরু করেছিল। অলিম্পিক থেকে হকি উঠে যাবার দাখিল হয়েছিল বলেই আয়োজনকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র হকিতে নাম দিয়েছিল। আর নাম দিয়েছিল জাপান। জাপানকে এগার-এক গোলে এবং যুক্তরাষ্ট্রকে চব্বিশ-এক গোলে হারিয়ে ভারত সোনা জিতেছিল। কই সে সোনায় তো কেউ খাদ খুঁজে পাননি। এবারই বা আমরা খাদ খুঁজব কেন?

বিশ্বহকিতে ভারতের যখন একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল তখন অনেক দেশ হকি নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামাত না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে বহু দেশ আন্তরিকতার সঙ্গে হকিকে আকড়ে ধরে এবং ভারত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন পাকিস্তান হয়ে ওঠে সব চেয়ে শক্তিশালী। অপরদিকে ভারত ক্রীড়াদক্ষতায় যতখানি না পিছিয়ে পড়ে তার চেয়ে বেশি পরিমাণে জড়িয়ে পড়ে প্রশাসনিক টালমাটালে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গোষ্ঠী-কোঁদল অবশ্য আগেও ছিল। কিন্তু তখন, আগেই বলেছি, অন্যান্য দেশ হকি খেলায় তেমন শক্তিশালী ছিল না বলে ভারতের পাক্ষে টানা ছয়টি অলিম্পিকে স্বর্ণপদক জয় করতে বড় বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। ছয়টি কেন, যদি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য দুটি অলিম্পিক গেমস বন্ধ হয়ে না যেত তবে ভারত উপর্যুপরি আটটি অলিম্পিকসেই হকি চ্যাম্পিয়ন হত। পরবর্তীকালে বহু খেলায় পরাজয়ের মূলে আছে মুখ চেয়ে মন রেখে দল গড়া, হকি ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের মধ্যে কলহ, প্রাদেশিকতার প্রশ্ন, অলিম্পিক চলাকালে খেলোয়াড়দের মধ্যে বিদ্রোহ প্রভৃতি নানা ঘটনা। তা ছাড়া অ্যাস্ট্রো-টার্ফ বা পলিগ্রাস—যে সব কৃত্রিম পিচে এখন আন্তর্জাতিক হকি খেলা হচ্ছে তারও ব্যবস্থা হয়নি। পাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশের খেলোয়াড়রা কিন্তু এই কৃত্রিম পিচে অনুশীলন করে পটু হয়ে উঠছে।

মস্কোয় সোনা জয়ের পর একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন ধ্যানচাঁদ ও রূপ সিংয়ের সমসাময়িক খেলোয়াড় মথুরাপ্রসাদ চৌবে। তিনি বলেছেন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সুস্থ পরিবেশ এবং কঠিন নিয়ম-শৃংখলার জন্যই মস্কোয় ভারতের সাফল্য।

সাফল্য হয় তো নাও হতে পারত কিন্তু নিয়মশৃংখলার মূল্য কে অস্বীকার করতে পারে। অতীতে ক্যাম্প থেকে যাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে তাদেরই আবার আদর করে দলে স্থান দেওয়া হয়েছে। এবার সুরজিৎ সিংয়ের মত খেলোয়াড়কেও ক্যাম্প থেকে ফেরত পাঠানো হয় নিয়মশৃংখলা ভাঙার জন্য। এবং যত দূর জানা গেছে ক্যাম্পে খেলোয়াড়রা অনুশীলন করেছে এক মন এক প্রাণ হয়ে। মস্কোতেও মরীয়া হয়ে লড়েছে দেশের সম্মান এবং হকির নষ্ট সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য। সাফল্যের এটাও আংশিক কারণ।

মস্কোয় হকি খেলেছে ছয়টি দেশ—ভারত, স্পেন, পোল্যান্ড, রাশিয়া, তাঞ্জানিয়া ও কিউবা। এদের মধ্যে তাঞ্জানিয়া এবং কিউবা হকি খেলায় খুবই অপটু। ভারত রাউন্ড রবিন লীগে তাঞ্জানিয়াকে ১৮—০ গোলে, কিউবাকে ১৩—০ গোলে এবং রাশিয়াকে ৪—২ গোলে পরাজিত করে। ২—২ গোলে খেলা—ড্র করে পোল্যান্ড ও স্পেনের সঙ্গে। প্লে-অফ ফাইনালে স্পেনের বিরুদ্ধে ৪—৩ গোলে জয়ের কথা তো আগেই বলেছি। পরে অলিম্পিক সমীক্ষায় বিশদ আলোচনা করা যাবে।

মুকুল

আগে যা ঘটেছে.....

লড়াই করতে করতে
তিনি দুর্গের
পরিখায় পড়ে যান...

!
ঠিস্‌ঃ

কিন্তু তিনি ঠিকই
দেওয়াল ধরে
উপরে
উঠে
আসেন .....
ও, মুখোশ-পরা মানুষ!

তিনি লিখেছেন,

যাই সামনের
দিকে .....'

কাপুরুষ!
'...বন্ধ ঘরের প্রহরীরা
আমাকে দেখে
পালিয়ে যায়...'
!!!

ওহে ডাইনি, কোথায় তুমি...?
'ডাইনি কি এই
ঘরের মধ্যে?
লাথি মেরে ভাঙি
ঘরের দরজা!'
এরপর : হেলমেজ ● ৭
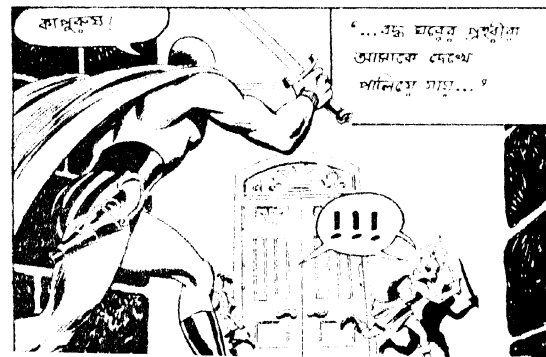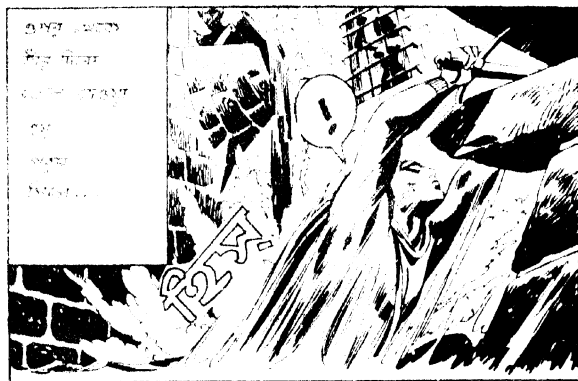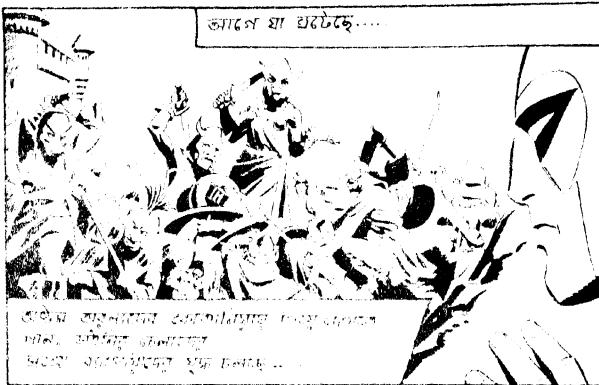
পাঁচটি আলাপনী শ্রীঅরবিন্দের আর পরের তিনটি নির্বেদিতার ইংরেজী রচনার তর্জমা। বাকি তেরোটি নলিনী-কান্তের রচনা। এই রকম পারলৌকিক আলাপনের প্রবর্তক হলেন লুসিয়েন। ফরাসী ষোড়শী'র কয়েকটি ছোট গল্প ফরাসী থেকে অনুবাদ, আর অধিকাংশকে অনুসরণ বলা যেতে পারে। 'মারিয়ানা' ও "শীতস্তাজিলের মৃত্যু" নাটক দুটি ফরাসী থেকে অনূদিত।

'রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ডে আছে শ্রীঅরবিন্দের পঁচিশটি ইংরেজী কবিতার অনুবাদ এবং কোনও কোনও কবিতার ব্যাখ্যা। তা ছাড়া আছে শেকসপীয়র, স্যান্ডবুর্গ, ম্যাকনীশ, লরেন্স, ডাইলান টমাস, মালার্মে, মেটেরলিংক, রিলকে এবং আরও বহু বিশিষ্ট বিদেশী কবির কবিতার অনুবাদ। 'রচনাবলী'র পঞ্চম খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হয়েছে "আদিলেখা", "নারীর কথা", "নটেশের বাণী", "স্মৃতির পাতা" (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়)। "গ্রীসীয় অবদান" প্রসঙ্গে সোফোক্লীজ-এর 'আন্তিগোনি' নাটকের প্রথম লাইনটির সূত্র ধরে নাট্য রহস্য উদ্ঘাটন করার পর প্রাচীন গ্রীসের তিন প্রখ্যাত নাট্যস্রষ্টা এসকিলস, সোফোক্লীজ এবং ইউরিপিদীজ-এর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লেখক যা বলেছেন তা দিগ্দর্শনের সহায়ক। 'নারীর কথা'য় "পঞ্চকন্যাং স্মরেন্নিত্যম্" প্রবন্ধটির মধ্যে লেখকের মননশীলতার স্বাক্ষর আছে। তিনি বলেছেন, পঞ্চ কন্যারা অর্থাৎ অহল্যা, কুন্তী, দ্রৌপদী, তারা ও মন্দোদরী পাতিব্রত্যের দিক থেকে যাই হোন না, তাঁদের মধ্যে মনস্বী শক্তির উর্ধ্বায়ণ হয়েছিল দেবশক্তির সঙ্গে। তাঁর স্মৃতির পাতায় আছে কৌতুকের স্নিগ্ধ দীপ্তি, বিস্ময়কর রসময়তা আর রহস্যের আলেখ্য।

**অজিতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।**

---

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **চিত্রকলা**

## পুতুল ও প্রতিমা এবং কালাপাহাড়

স্বাধীনতার পর থেকে চিত্রভাস্কর্যে নানারকম ফ্যাসন কাজ করেছে। কিন্তু বিমূর্ত ছবির প্লাবনের চূড়ান্ত পর্যায়েও পশ্চিমবঙ্গ ভেসে যায়নি। কোন কোন শিল্পীর সঙ্গে বিমূর্ততার খুব অল্প সময়ের জন্যে একটু ভাব-ভালবাসা হয়েছিল, ভিন দেশী নাবিক যেমন নতুন দেশে একটু ফষ্টিনষ্টি করেন।

পশ্চিম বাঙলায় বিমূর্ত চিত্রকলা কখনোই শিল্পীকে আকর্ষণ করেনি। সুতরাং লিটল ম্যাগাজিনে কেউ যদি লেখেন যে, শিল্পকলায় প্রতিমা প্রত্যা-বর্তন করছে, তিনি নেহাত অজ্ঞ।

বাঙালী শিল্পীরা রূপারোপিত প্রতিমা চিত্রণ করেছেন। পাশাপাশি প্রথাগত বাস্তব ছবির চর্চা চলছে—শশী হেস, অতুল গুপ্ত, হেমেন মজুমদার থেকে প্রহ্লাদ কর্মকার। এঁরা অবনীন্দ্রনাথ থেকে যামিনী রায় পর্যন্ত আমলে স্বদেশীয়ানার চাপে পাত্তা পাননি। 'ক্যালকাটা গ্রুপ' থেকেই কিন্তু শিল্পীরা শুধু ভারতীয় নয়, সর্বযুগের মানব-শিল্পকলার যাবতীয় ঐতিহ্যকে নিজের বলে ভাবতে শিখলেন। ফলে সমস্যাটা যে কঠিন হল এটা নিশ্চিত। শিল্পকলাকে সমকালীন এবং প্রাসঙ্গিক করার কাজটা শক্ত।

কত কঠিন, কনটেম্পোরারি দলের যৌথ প্রদর্শনীই তার প্রমাণ। কারণ চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে করণকৌশল এবং অঙ্কন শেখানো হয়। কিন্তু শৈলী শিল্পীর মুখশ্রী। নিজস্ব শৈলী আবিষ্কারের উথাল-পাথাল যেন গায়নো-কোলজিস্টের গর্ভ যন্ত্রণা দেখার মতো অভিজ্ঞতা। অনেক সময় মৃতবৎস প্রসব হয়। যেমন গোপীনাথ রায়ের ভস্কর্যে যেন ক্লান্ত অবসন্নতার ভাব। তবে তরুণ ঘোষের রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনে কুকুরের পাল দেখানোর টেরাবাঁকা বক্রবাটা, ময়লা রঙ সত্ত্বেও উপভোগ্য। তেমনি আধা বিমূর্ত সমীর মণ্ডলের জলরঙের কাজ-গুলির অন্য মজা আছে। বিকাশ মুখোপাধ্যায় এবং দীপক ঘোষ যেন সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো অগ্ন্যুৎপাতের আয়োজন চালাচ্ছেন। অন্য সবাইয়ের ব্যাপারে তেমন আশ্বস্ত হতে পারলে ভাল হতো। প্রতিমা প্রতীক কেমন যেন নীরক্ত ফ্যাকাশে। ঠিক যেন জমলো না (আকাদমী অব ফাইন আরটস ৪ঠা মে)।

সজল রায়ের একারের প্রদর্শনী (ফাইন আর্টস ১৫—২১ মে) ছাপাই ছবির। বছর পনেরো প্রদর্শনী করছেন তৈলচিত্রে। এবারে পাথরছাপ, কাঠ-খোদাই, লিনো-কাট, ধাতুরপাত খোদাই প্রভৃতি নানা রকম কাজ ছিল। তাঁর অঙ্কনের রূপবন্ধ (ফর্ম)-এর [illegible] বিকৃতিকরণ করে রূপারোপের পদ্ধতি, তা নিয়ে নানা মাধ্যমে খেলা করেছেন। অ্যাসিডে ধাতুর ওপরটা খাইয়ে বা বুলি দিয়ে কেটে তিনি যে কাজ করেছেন, তার মধ্যে রেখার স্নায়বিক কম্পন কম। মানুষের জীবনের যন্ত্রণা, একাকিত্ব অপমানের উপযুক্ত প্রতীক ও প্রতিমা খুঁজেছেন। একটা বিদ্রোহী ভঙ্গী আছে। হাহাকার। আর আশাবাদ। যেমন তাঁর 'ফুল হাতে বালক'। তাঁকে রচনা (কমপোজিশন) সম্বন্ধে আরেকটু ভাবতে হবে। পটভূমির অবসরগুলির সঙ্গে মূল প্রতিমার সমান কখনো কখনো গড়ে ওঠেনি। প্রতীক ও প্রতিমা যেন ব্যবহৃত ব্যবহৃত। তবু কিছু কাজ ছিল ভাল।

অজিত বসু শান্তিনিকেতনের স্নাতক। তাঁর বড় বড় তৈলচিত্রগুলিতে আশার কারণ আছে অনেক। তিনি মানুষ এবং নিসর্গ ব্যবহার করেন পরিষ্কার। কখনো ঈষৎ বিকৃত করে বেশ বড় করে পটের ওপর ছড়িয়ে দেন! কখনো শিশুচিত্রের রূপারোপ কায়দা করে ব্যবহার করেন। তাঁর ছবি কিছুটা সুখী এবং তাতে অস্তিত্বের ক্ষত (দ্রঃ নীরদ মজুমদার) কোনক্রমেই স্পষ্ট নয়। তীব্রতা, তিক্ততা, তীক্ষ্ণতা—জ্বালা-যন্ত্রণা এবং নৈরাশ্য, আধুনিকতার প্রধান না হোক, অন্যতম লক্ষণ। বরং তাঁর ছবি অনেকাংশে মণ্ডনধর্মী এবং [illegible] আলো (ইভেন লুমিনিয়ের) বা পট-ভূমির সমান টান (ইউনিফায়ড সারফেস টেনসানের) অভাব। তাই পটে কোন এক জায়গায় চোখ পড়ে গেলে, ঘাস খাওয়ায় ব্যস্ত ঘোড়ার মতো চাবকালেও নড়তে চড়তে চায় না। যেমন তার 'সাঁতারের তালমান' বা 'নর্তকী ৮০' ছবি দুটিতে নানাভঙ্গ দেহগুলি পটে ভাসমান। কিন্তু ছবির কোন কেন্দ্র নেই। যদিও শেষের ছবির পটভূমিতে হলুদাভ সাদার ব্যবহার ভাল। 'লোড শেডিং' এবং 'বিজ্ঞান এবং প্রকৃতি' ছবি দুটিতে জ্যামিতি ধরেছেন। তৈল ব্যবহার করা আর একটু মকশো করতে হবে। মানুষ আঁকার পর্যবেক্ষণ এবং অনুশীলনের দরকার আছে আরো। এঁর হাতে কিন্তু বর্ণ দ্যুতিময়। নান্দনিক কিছু অভিনব ভাবনাও আছে। বড় বড় পট নিয়ে যুঝেছেন বীরের মত।

### অনুচিত্র আকারে

ললিতকলা আকাদমীকে ধন্যবাদ ইদানীং তাঁদের আয়োজিত নানা প্রদর্শনী কলকাতায় আনা শুরু করেছেন। এ বৎসর ললিতকলার রৌপ্য জয়ন্তী। সুতরাং লক্ষণ যে খুবই শুভ বলাই বাহুল্য। শুধু বলব, এইসব সংকলন পশ্চিম বাঙলার শিল্পীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অনেকেই কোন এক অজ্ঞাত কারণে বাদ পড়ে যান। এবার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, বিকাশ ভট্টাচার্য, সুনীল দাস, রবীন মণ্ডল, চিন্তামণি কর এবং শুভাপ্রসন্ন। বাঙালী শিল্পী আরও আছেন কিন্তু তাঁরা পশ্চিমবঙ্গবাসী নন। তাছাড়া প্রথম তিনজন আবার ললিত-কলার নির্বাচিত শিল্পী সদস্য। অথচ পশ্চিমবঙ্গে অনুচিত্রকর আছেন—যেমন রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল দাস, গণেশ পাইন এবং ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত স্বনামধন্য শিল্পীদের মধ্যে নীরদ মজুমদার, পরিতোষ সেন, বিজন চৌধুরী, গোপাল সান্যাল প্রমুখ অনেকে বাদ গেছেন। তরুণদের মধ্যে যথার্থ অনুচিত্রকর ছিলেন বিশ্বপতি মাইতি, অসিত মণ্ডল, পৃথ্বীশ সেন, সমীর মণ্ডল। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীদের কাজ যাঁরা জানেন ভাল [illegible] তাঁদের

প্রজাপতি—এ রামচন্দ্রন

কটা পরামর্শ নেওয়া দরকার ছিল নে হল।

অনুচিত্র (মিনিয়েচার) বলতে বোঝায় এমন ছবি যা চোখ বরাবর জেলে রেখে আঁকা নয় (নট পেইন্টেড াট আই লেভেল অন দ্য ই.জল)। া বসে কোলে নিয়ে দেখার জিনিস। ই প্রদর্শনীর অধিকাংশ ছবি চোখ রাবর আঁকা ছবির ক্ষুদ্র সংস্করণ। ুতরাং কাচের ফ্রেমে নাক না ঠেকিয়েই বি্যা দেখা যায়।

সমকালীন ভারতীয় চিত্রকরদের াত্মবিস্মৃত একটা রূপ পাওয়া যায়। দিও ভাল ছবি ছিল। কিন্তু সেখানে রিচিত শিল্পীরা তাঁদের ধরনের কাজ দয়েছেন। যেমন গুলাম রসুল সন্তোষ ঁর সুপরিচিত কালীমাতার শিবযোগে পরীত বিহারের চিত্র এঁকেছেন। তীন দাস রঙের মধ্যে একটা উড়ন্ত ানুষকে আরোপ করেছেন। রথীন ন্ডল এঁকেছেন যথারীতি একটা ন্ধকারগ্রস্ত মানুষের মুখ। একমাত্র তিক্রম রামাচন্দন। মেঘমালায় ছাওয়া াকাশের তলায় পাহাড়ী শহরের সামনে কীট মত প্রজাপতির গায়ে পিঁপড়ে াগা দেখিয়েছেন।

বড় শিল্পীর ছোট কাজের প্রদর্শনী ।বং খারাপ আর ভাল ছবি আছে সম রিমাণে। কিন্তু মন ভরে না।

ন্দীপ সরকার

আলোচনা। শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

## পাকাদেখা

গণেশ রক্ষিত (উৎপল দত্ত) এমন ঁদে ওসি যার দাপটে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। তা-ই নয়, চোর-াটপাররা তাদের পেশা ছেড়ে কীর্তন গয়ে বেড়ায়। সুতরাং থানায় কোন কাজ নই। গণেশ রক্ষিত সন্ন্যাসীকে (উজ্জ্বল সনগুপ্ত) দিয়ে হাত দেখায় মেয়ে অপর্ণার (মহুয়া রায়চৌধুরী) বিবাহের যাগ্য সম্পর্কে। সহকারি অফিসার ুখময় কাব্যচর্চা করে। আর থানার নস্টেবলরা নামগান নিয়ে মত্ত থাকে। কন্তু কথায় বলে 'বাঘের ঘরে ঘোগের াসা'। গণেশ রক্ষিতের ক্ষেত্রেই তাই ঘটে গেল। মেয়ের বিয়ের পাকাদেখার দিন-ক্ষণ ঠিক হয়েছে, বরপক্ষকে আপ্যায়নের বন্দোবস্তও সম্পূর্ণ—কিন্তু অপর্ণা হল নিখোঁজ। সেই ব্যাপারকে কেন্দ্র করে অমন দাপটতলা ও-সি এবং তার সাঙ্গপাঙ্গকে নিয়ে পরিহাসময় যে পরিস্থিতি উপস্থাপিত হয়েছে তা দেখতে দেখতে সারা প্রেক্ষাগৃহে হাসির বাণ ডাকে। ইদানীং কালের মধ্যে নির্মল হাসির প্রস্রবণ ছোটানো এমন বাংলা ছবি বড় একটা দেখা যায়নি। যদিও ও-সিকে নিয়ে আগাগোড়া ঠাট্টাই একমাত্র উপজীবী।

বনফুলের ছোট্ট গল্প 'নব সংস্করণ' অবলম্বনে পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ঘটনাবলীর বিন্যাসে নিছক হাসির হুল্লোড় সৃষ্টিতে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। চমক ধরাবার মত শিল্পদৃষ্টি নয়। কিন্তু অনাবিল আমোদ উপভোগের ব্যবস্থায় পরিচালক রণাঙ্গল এমন কতকগুলি মুহূর্ত

উৎপল দত্ত

উদ্ভাবন করেছেন যা দর্শকমণ্ডলীকে হাসিতে মাতিয়ে রাখে। এ প্রচেষ্টায় অত্যন্ত সফল সহযোগিতা তিনি লাভ করেছেন অভিনয়শিল্পীদের কাছ থেকে। তাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য উৎপল দত্তের নাম। এ ছাড়া রবি ঘোষ, তরুণ-কুমার, সন্তোষ দত্ত, উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, রাজকুমার, কৌশিক ব্যানার্জী, গৌতম চক্রবর্তী, শৈলেন মুখার্জী, দুর্গাদাস ব্যানার্জী, বীরেন চ্যাটার্জী, এন বিশ্বনাথন, বনানী চৌধুরী প্রমুখ অনেকেই আছেন যাঁদের অভিনীত চরিত্রগুলি এক-একটি বিশেষ টাইপ সামনে উপস্থিত করে ছবিখানি উপভোগ্য হতে সহায়ক হয়েছে। ঘটনা ও পরিস্থিতির অনুগামী, যাকে বলে এফেক্ট মিউজিক রচনায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্বও উল্লেখ্য। হাসির তথা হালকা রসের মেজাজ গড়ে তুলতে টাইটেলে চণ্ডী লাহিড়ী ও তুলসী লাহিড়ীর কার্টুন ব্যবহার প্রশংসনীয়।

পঙ্কজ দত্ত

আলোচনা। শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

## বিলায়েৎ খাঁর দুটি বৈঠক

গত মে মাসে প্রখ্যাত সেতারী ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ প্রায় এক বছর বাদে কলকাতায় বাজালেন। এই মাসে তিনি বসেছিলেন দুটি আসরে। প্রথমটির আয়োজন করেছিল অঙ্কুর নামক এক সংস্থা কলামন্দিরে পয়লা তারিখে এবং দ্বিতীয়টির আয়োজন করেছিল সঙ্গীত কলামন্দির চার তারিখে একই প্রেক্ষাগৃহে। এই শিল্পী এর আগে শেষ বাজিয়েছিলেন গত বছরের সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে।

প্রথম আসরটি মোটেই ভাল হয়নি এবং সেদিন বাজনার চেয়ে গানই যেন বেশি হয়েছিল। আমি আগে বেশ কয়েকবার বিলায়েৎ খাঁর সেতারের আসরে গান গাওয়া নিয়ে আপত্তি করেছি এবং বলেছি গৎকারি করতে করতে গান ধরলে গৎকারির সাঙ্গীতিক কাঠামো নষ্ট হয়ে যায়, জমাট আবহাওয়া বিচ্ছিন্ন হয় এবং বোদ্ধা শ্রোতা ও শিল্পী দুয়েরই ধ্যান ভঙ্গ হয়। এবার দেখা গেল এই ওস্তাদের গান গাওয়ার স্পৃহা এত বেশি হয়ে পড়েছে যে গৎকারি অবধিও মুখ বুজে বাজানো সম্ভব হল না—আলাপচারিতেই গান আরম্ভ হল। সাঁঝ সরাবলি নামে ঘোষিত একটি রাগের স্বরগুলি (যা ইমন কল্যাণের ঠাটে) নিয়ে অসংলগ্নভাবে আধঘণ্টা নাড়াচাড়া করে বিলায়েৎ খাঁ গান ও গান-বাজনা শুরু করলেন।

এই স্বর নিয়ে নাড়া-চাড়াতে সুর-সৌন্দর্য এবং হস্ত কৌশলের উৎকর্ষতা ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু রাগও ছিল না—প্রথাগত আলাপে রাগের মূর্তি জমাট হয়ে উঠে যে গভীর অনুভূতির জন্ম দেয় তার নাম গন্ধও ছিল না। শিল্পীর ঘোষণা অনুযায়ী রাগটি কল্যাণ, ইমন, ইমনি, বেহাগ ও বিলাবলের মিশ্রণে নির্মিত। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে ইমন কল্যাণের সঙ্গে রাগটির পার্থক্য এই যে এতে বেহাগ অঙ্গের কাজ হয় এবং ইমনির ঢঙে দুই মধ্যমের ক্রমিক ব্যবহার হয়—কারণ কল্যাণ, ইমন ও বিলাবল অঙ্গ ইমন কল্যাণেও আছে। রাগ বা অঙ্গ মিশ্রণে রাগ যখন নির্মিত হয় তখন মিশ্রণটি হয় রাসায়নিক—অর্থাৎ কয়েক রাগের অঙ্গ মিশে এমনই একটি বস্তু তৈরী হয় যা অন্য রাগের বিভিন্ন অঙ্গের সমষ্টিই নয়, অন্য কিছু। পর পর বিভিন্ন রাগের বিশেষ স্বরসমষ্টি বাজিয়ে গেলে রাগের যান্ত্রিক মিশ্রণ অথবা রাগমালা ধরনের কিছু হয়। বিলায়েৎ খাঁর আলাপে দ্বিতীয়টিই হয় : জায়গায় জায়গায় শোনা যাচ্ছিল ইমন, জায়গায় জায়গায় বেহাগ বা ইমন কল্যাণ বা ইমনি বা বিলাবল। আলাপচারি এমনই অসংলগ্ন হয়েছিল যে আরো কয়েকটি রাগও পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছিল—যেমন খেম কল্যাণ ও গৌড় সারং। সাঁঝ সরাবলি রাগ নয় ধুন, কাজেই যেই বাজাক না কেন এই রকমই শোনাবে—এই ধরনের কথা বলে শিল্পীর দোষ রাগের ঘাড়ে চাপানো যায় না : কারণ ১৯৭৭-এর ২৩শে অকটোবরে রবীন্দ্রসদনে আয়োজিত এক আসরে বিলায়েৎ খাঁ এই সাঁঝ সরাবলিরই এক মোটামুটি গ্রহণযোগ্য রূপ পরিবেশন করেছিলেন।

যা হোক এই প্রথম আধঘণ্টার আলাপেও যেটুকু ছিল তা গান এবং গান-বাজনা শুরু হতেই নষ্ট হয়ে গেল। অনিবদ্ধ অংশের বাজনা একটি ভৌলিক দিয়ে শেষ হল—'সবাই তো এখন গায়কি অঙ্গে বাজাচ্ছে তারা এইভাবে গেয়ে আর বাজিয়ে দেখাক গায়কি অঙ্গ কি'—এইরকম একটা কিছু বলে বিলায়েৎ খাঁ একই সঙ্গে গমকতান গাইতে ও বাজাতে শুরু করলেন এবং প্রেক্ষাগৃহ বিবেচনাহীন হাততালিতে ফেটে পড়ল। আলাপের শেষ তের মিনিট জোড় এবং বিলম্বিত তিনতাল গৎ একটি কথা খেয়ালের গীত অস্থায়ী, সেতারে গীত সরসঙ্গতির জবাব এবং সেতার-বাদনের অনিয়ন্ত্রিত অরণ্যের রূপ নিয়েছিল। এতে ঠকল শ্রোতা, বিশেষ করে বোদ্ধা শ্রোতা—সে না শুনতে পেল আলাপ-জোড়ের কাজ, না শুনতে পেল ইমদাদখানি ঘরানার প্রসিদ্ধ ঝালা ও গৎকারি, না শুনতে পেল বিলায়েৎ খাঁর কিংবদন্তকারী তানকারি।

বিরতির পরে ঠুংরী অঙ্গের বাজনাতেও এই গান গাওয়ার ব্যাপারটা বড় বেশি ছিল। তবে এই অংশ গান-টান হলেও তেমন খারাপ লাগে না যদি প্রথম থেকে শেষ ঠুংরী অঙ্গের বাজনা বা গানই শোনা যায়। তার বদলে যা পাওয়া গেল তা হল একটি খাম্বাজ ঠুংরীর মুখ দিয়ে শেষ হওয়া গৌড়মল্লার খেয়ালে অস্থায়ীর অংশ, বাহার মিয়াঁ-মল্লার, হাম্বীর, জয়জয়ন্তী দরবারী কানাড়া, দেশ এবং একটি বাংলা গান। এরপর শিল্পী একটি তিলক কামোদের দ্রুত গৎ ধরেই তাঁর আসরের অনিবার্য 'বিহারি' গতে চলে গেলেন এবং খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে ছেড়ে দিলেন। শেষের ভৈরবী আওচার ও কাহারবা গৎটিতেও বেশ গান শোনা গেল। তবলা সঙ্গতে ছিলেন শঙ্কর ঘোষ।

দ্বিতীয় আসরটিতে বিলায়েৎ খাঁ নিজ মানেই বাজিয়েছিলেন এবং ভীম-

পলশ্রী রাগে আলাপ, জোড় বা গৎ কোনটিতেই গানের আবির্ভাব হয়নি। বিরতির পর পিলুতে আওচার করতে করতে শিল্পী খালি একবার একটি পঙক্তি গেয়েছিলেন বলে মনে পড়ে।

গম্ভীর মেজাজে বাজানো আলাপটিতে স্বরবিস্তার দুইই পাওয়া গেল এক আদর্শ মিশ্রণে এবং বোঝা গেল বড় করে আলাপ করতে গেলে এই দুই পদ্ধতির এমন একটা মিশ্রণের খুব দরকার। স্বর পরিবেশন ও ধ্বনি-মাধুর্যের দিক থেকেও আলাপটি অতি উচ্চাঙ্গের হয়েছিল—এক টোকায় বাজানো প ণ্ স ম-জ্ঞ ঘষিতে তীব্র কোমল গান্ধারের রূপ এবং স ম জ্ঞ মীড়ে মধ্যমের রেশ আস্তে আস্তে গান্ধারে মিলিয়ে যাওয়ার সৌন্দর্য বিশেষ করে মনে পড়ে।

জোড়টিও একই শ্রেণীর হয়েছিল। এতে ছিল উচ্চাঙ্গের বন্তন, গমক, লপেট বোল ও মীড়যুক্ত স্বরসঙ্গতি এবং ঠিক যখন দরকার তখনই ছুটেছিল হরকৎ ও মুড়কীর ফোয়ারা। তান-ঝালা ও মীড়-ঝালার কাজও ভাল হয়েছিল এবং উচ্চাঙ্গের গায়কি অঙ্গের তান ও পর্দার উপর বাজানো

SAA FSL/C/1043 B-N

# আপনার বাচ্চাকে দেখুন

## সেরেল্যাক-এর সাহায্যে

### বাচ্চাদের জন্য পুষ্টিগুণে ভরপুর সিরিয়েল ফুড। দুধ, চিনি...আর আদর ভালবাসায় ভরপুর।

আপনার বাচ্চার বয়স কি ৪ মাস হয়েছে? তাহলে এখন ওর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য দরকার সঠিক মাত্রায় সুষম দানা শস্যের শক্ত আহার।

সেরেল্যাক—শিশুদের জন্য পুষ্টিগুণে ভরপুর শস্য আহার—দানা শস্য, মালাইদার দুধ আর চিনির এক সুস্বাদু মিশ্রণ, যা আপনার বাচ্চার বাড়ের জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম পুষ্টিগুণ যোগায়।

- সঠিক সুষমমাত্রায় ফ্যাট আর কার্বোহাইড্রেট থাকার দরুন আপনার বাচ্চা চলতে পারে।
- যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন থাকার দরুন আপনার বাচ্চা বাড়তে পারে।
- অতিরিক্ত পরিমাণে ভিটামিন ও আয়রণ থাকার দরুন আপনার বাচ্চা খেলতে পারে।

এটি বানানো কত সহজ—
শুধু এটি জলের সাথে মিশিয়ে নিন।

সেরেল্যাক—কৌটান জলে ঢালুন

মিশিয়ে গুলে নিন

এবার খেতে দিন

নকারী দিয়ে অনিবন্ধ অংশ শেষ ।

মধ্যলয় ও মধ্যদ্রুত গৎকারির রঙ্গে ন্ধ বয়ে যাচ্ছিল এক মনোগ্রাহী রাকি মেজাজ এবং এই মেজাজ চারিতে এক আশ্চর্য প্রাণ এনে য়েছিল। বলিষ্ঠ উপজ অঙ্গের কাজ য়ে শেষ হওয়া চৌগুণী তানকারি বোলকারির কাঠামো ও স্বরপ্রগতি ল যেমন উৎকৃষ্ট ধ্বনিমাধুর্যও ল তেমন চমৎকার। এত ভাল ন-তোড়া হালে বিলায়েৎ খাঁর কাছে র শোনা গেছে।

তবলায় ছিলেন মহাপুরুষ মিশ্র ৎ তাঁর সঙ্গত, ও নিজস্ব বোলগুলি ত উৎকৃষ্ট হয়েছিল সেদিন। একবার তিনি একটি ধের-ধের-কেটে বোলের ন্তার বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে লায়েৎ খাঁ সেতারে এই বোল এবং তারের জবাব তুললেন— কেবল কারি-জুড়ির ঝন ঝন শব্দ দিয়েই র উৎকৃষ্ট সুর সংযোজন করে।

বিরতির পর শিল্পী সুরের যাদু রা পিলু-রাগমালা আওচার ও টনটি তিনতালে নিবন্ধ পিলু গৎ জিয়ে শোনান—দুটি দ্রুত এবং কটি অতি দ্রুত। এগুলিতে ছিল চাঙ্গের দুনি তান-তোড়া এবং রেলা দ্রুত ঝালার কাজ।

## রবা মুহুরীর ঠুংরী

দরবারী আয়োজিত এক ঘরোয়া াসরে (১২ এপ্রিল) রেবা মুহুরী ার্বোক ঢঙের ঠুংরী, দাদরা ও চৈত িরিবেশন করেন। আজকালকার ঠুংরী ুনে যাঁরা অভ্যস্ত তাঁরা রেবা মুহুরীর ুরী শুনে যদি একটু হকচকিয়ে যান া হলে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। ারণ, পুরোনো ঠুংরী প্রায় খেয়ালের তনই গম্ভীর এবং যে ঢঙের ঠুংরী রবা মুহুরী গান—অর্থাৎ গণপৎ রাও াইয়া সাহেব ও মৈজুদ্দিন খাঁ প্রচারিত ানারসী ঠুংরী—তা অপেক্ষাকৃত ধীর-িতসম্পন্ন এবং স্বরপ্রধান। স্বরপ্রধান ানে এতে স্বরের একক প্রাধান্য থাকে—আলংকারিক স্বরশব্দের প্রাধান্য দেখা ায় না। কাজেই এতে জমজমা, মুড়কি ও গিটকিরির ব্যবহারও কম।

বড়ে মোতি বাঈ-এর যে ঠুংরীটি িদয়ে রেবা মুহুরী তাঁর আসর শুরু করেন—'পিয়া তোরি তিরছি নজর লাগে মোরে'—তাতে সার্বোক বানারসী ঠুংরীর সব লক্ষণই পরিষ্কারভাবে পাওয়া গেল। এটির বোল-বানাও ছিল ধীর, স্থির এবং খেয়ালের বঢ়তের মতই চুলচেরা। স্বরের বাহক ছিল প্রধানত মীড়। মুড়কি বা জমজমা প্রায় ছিল না। গানের মজা আসছিল মীড় ও কথার ছন্দে গাঁথা বাণীর অংশ বিশেষের বিভিন্ন স্বরের নকশার ভিতর দিয়ে ঘোরাফেরায়। কয়েকটি মধ্যলয়ের বোলতানও শোনা গেল এক অংশে—খেয়াল থেকে সদ্য প্রবর্তিত সার্বোক বানারসী ঠুংরীতে খেয়ালঅঙ্গ কতখানি ছিল তার লক্ষণ হিসেবে এগুলিকে ধরা যেতে পারে।

আসরের শেষের জোগিয়া-কালেংড়া আশ্রিত 'জোবনাঁক সবারাঁস' গানটিতেও সঙ্গে সঙ্গে কিছু আলংকারিক আক্ষরাশ্রিত কাজের বাহারও ছিল। একটি কাহারবা বাঁধা লখনোই হোরি ঠুংরীও ছিল আসরে এবং এই অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতির ও ছন্দপূর্ণ গানটিতে চমৎকার পাঁচানো বোল-বানাও শোনা গেল। দ্রুত তিনতালে নিবদ্ধ একটি খাঁটি ঠুংরী ঢঙের গানও শোনা গেল। 'কাহেকো ডরে আজ তু'। বৈচিত্র্য পূর্ণ সুরের কাজের এক জায়গায় সুন্দরভাবে পুরিয়া-ধানেশ্রী রাগের ব্যবহার হয়েছিল। এর লগ্গি অংশ দাদরায় গাওয়ায় বেশ একটা দোলন সৃষ্টি হয়েছিল এবং শেষাংশে সাহানা ও বাহারের ব্যবহার হয়েছিল নিপুণ-ভাবে।

এগুলি ছাড়া আসরে ছিল একটি যৎ তালে বাঁধা চৈতি, একটি পঞ্চমসে গারা আশ্রিত দাদরা—'কাহে মারে নজরিয়া' ও বলদেভ রচিত এক কাজরি। চৈতিতে পুরানো উত্তর প্রদেশি লোকগীতির কিছু জিনিস ও পুকার কেন্দ্রিক নানা রঙের নকশার এক অতি আনন্দদায়ক মিশ্রণ লক্ষ্য করলাম। রাগের আনাগোনা ছিল অতি সুপরিকল্পিত। এক একটা রাগের থেকে চকিতে এক একটা স্বরসমষ্টি আমদানি করা হয়েছিল—কিন্তু কখনও একটা পুরো রাগ এসে পড়ছিল না। দাদরাটিতে উচ্চাঙ্গের কথার ছন্দ-ভিত্তিক পুকার, পঙক্তি বিস্তার ও আলংকারিক বোলতানের কাজ ছিল। কাজরির বোল বানাওয়ে রাগের শিল্পবোধপূর্ণ মিশ্রণ অতি আনন্দ-দায়ক হয়েছিল। পিলুর পটভূমির উপর শিল্পী কখনও আশ্চর্যভাবে মুলতানি ও ভৈরবী মিশিয়ে গাইলেন আবার কখনও একটু পরজ বসন্ত জুড়ে দিলেন সুন্দরভাবে।

**নীলাক্ষ গুপ্ত**

## রবীন্দ্রসদনে গানের আসর—'প্রেম' পর্যায়

'অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে কবে কখন একটুখানি পাওয়া, সেইটুকুতেই জাগায় দখিন হাওয়া'—তিন দিনের (এগার মে, তিরিশ মে এবং আট জুন) প্রেম পর্যায়ের গানের আসরের প্রায় প্রতিদিনের সামগ্রিক অভি-জ্ঞতাকেই যেন সংহত করা হয়েছে এই কলি দুটিতে, রবীন্দ্রসদনের রবীন্দ্র জন্মোৎসবের শ্রোতৃমণ্ডলীর এ-কথা নিশ্চিত মনে হয়েছে এবার। প্রচুর শিল্পী প্রচুর গান। কিন্তু আবেদনের দিক থেকে অধিকাংশই যেন 'শান্ত পাষাণমুরতি সুন্দরী', ক্বচিৎ দু-চার জন 'দখিন হাওয়া' পেরেছেন জাগাতে। ক্বচিৎ দু-একজনের গান শুনে মনে হয়েছে—'প্রেম এসেছিল, নিঃশব্দ চরণে।'

বস্তুত 'প্রেম' পর্যায়ের প্রথম আসরের সূচনায় প্রথম গানেই সম্মেলক কণ্ঠে 'গীতবিতান' গোষ্ঠী 'অনেক পাওয়ার' নির্বাচিত করে দূরদৃষ্টির পরিচয় রেখেছেন। দ্বিতীয় গানেও ছিল এই অবস্থা কাটিয়ে তোলার প্রার্থনা—'গানের ডালি ভরে দে গো'। কিন্তু নতুন পাতার গান সেভাবে আর শোনা হল কই। রুনু বসুর অমন সুন্দর নৈপুণ্য, কিন্তু 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' যখন গাইলেন, তখন মনে হল, গায়কীর দিক থেকে সুমিত্রা সেনের উদ্দেশেই যেন কলিটি নিবেদন করলেন তিনি। কী অবিকল অনুকরণ। রিংকু করগুপ্ত যত্রতত্র থামেন, 'ওরে যায় না কি জানায়' মনে হল—নয়ন নয়, কণ্ঠই তাঁর খুঁজে বেড়াচ্ছে যথার্থ গায়কী, কিন্তু ঠিকানা পায়নি এখনো। সুমিত্রা সেনের মনের মাঝে কী গান বেজেছিল জানি না, কিন্তু তাঁর নিবেদনে এ-দিন স্বাচ্ছন্দ্য ছিল কম। প্রভাত ভঞ্জর ভঙ্গি আধুনিক। গায়ত্রী চৌধুরীর কম্পিত কণ্ঠের 'বনে যদি ফুটল কুসুম'। আসরকে প্রায় বাসরে রূপান্তরিত করেছিল। গীতা মাইতি এসে প্রথম জানালেন—'পুরোনো জানিয়া' তাঁকে অলস অনা মনে গ্রহণ করা উচিত হবে না। এবং সত্যিই এই উক্তির প্রমাণ রাখলেন তিনি। জীর্ণতাকে জয় করে, পুরাতনকে ত্যাগ করে। 'চির-নূতনের সুর' বড়ো অনায়াসে সঞ্চারিত করলেন এবার গীতা মাইতি।

গীতা মাইতি

আসর ঘন হয়ে এল তাঁর দ্বিতীয় গানে—'কেহ কারো মন বুঝে না'-তে। প্রার্থনা ও বিষাদ, প্রাপ্তি ও সব-হারানোর শঙ্কা ধরা পড়ল অব-লীলায়। সঙ্গে অমল দেবের অগ্র-সানাইও যেন গলা মিলিয়েছে এই গানে। জয়ন্তী পুরকায়স্থ ছিলেন পরের শিল্পী। পরিচ্ছন্ন, কোমল করে গাইতে পারেন। মৃগাঙ্ক সরকারের বলিষ্ঠ কণ্ঠ ও শিক্ষিত গায়কী প্রশংসনীয়, কিন্তু 'প্রেম' পর্যায়ের গানের বিষন্নতাময় আর্তি তাঁর প্রথম নিবেদনে ফুটল না। 'মোর স্বপন-তরীর' বরং বেশি মানানসই লেগেছে। গীতা সেন পরিণত ভঙ্গিতে শোনালেন 'প্রেম এসেছিল' ও 'মনে যে আশা লয়ে'। দ্বিতীয় গানটি তাঁর কণ্ঠে অতিরিক্ত মাত্রা ও ব্যঞ্জনা পায় যেন। রুমা দাশগুপ্তর গানে দমের স্ফূর্তি ছিল না এবার। শিখা বসুও নিজের ভাব-মূর্তির কাছে এবার ম্লান। পরিচ্ছন্ন, কিন্তু নীরক্ত। সুব্রত সেনগুপ্তর পরি-

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

বেশনে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব প্রকট। সুমিত্রা রায় 'অনেক কথা বলে-ছিলেম'-এ যে অভিব্যক্তি তুলে ধরলেন তা তাঁর মতো পরিণত শিল্পীর কাছেই প্রত্যাশিত কিন্তু 'বড়ো বেদনার মতো'-র 'বড়ো' উচ্চারণটি বড়োই সফিস্টিকেটেড। হেনা সেন-এর 'বিরহ মধুর হল' খোলামেলা, 'না চাহিলে যারে'-তে কণ্ঠবিপর্যয় ঘটেছে। তুষার ভঞ্জর যে কণ্ঠস্বর সুন্দর, গায়কী পরিণত, বোঝা যায়। এও বোঝা যায় যে, এদিন তিনি কণ্ঠ নিয়ে বেশ বিব্রত ছিলেন। তবু 'আমার পরান লয়ে'র মুডটিকে ঠিকমতো ধরতে পেরেছিলেন তিনি। মেখলা দাশগুপ্ত এবার নিজের সুনামের প্রতি ... ... ... কাজও ছিল জড়ানো। আসরের শেষ শিল্পী চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় 'নিশি না পোহাতে' গানে প্রমাণ রাখলেন, কাব্য গীতিতে তাঁর দাপট এখনো কত উজ্জ্বল। 'কাছে ছিলে, দূরে গেলে'তে অভিভূত করলেন চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। গানের অন্তর্লীন মুডটিকে খোসা ছাড়িয়ে শাঁসের মতো তুলে ধরলেন তিনি। অনবদ্য ভাব ও মেজাজ ছিল এই গানে। কিন্তু অনুরোধ তাঁকে বিহ্বল করল, করল বিপথগামী, 'তোমার শেষের গানের' গাইলেন, গাইলেন প্রেমের আসরে 'পূজা' পর্যায়ের 'এখন আমার সময় হল'। কথার দিক থেকে মোহ তাঁকে পেয়ে বসেছিল সন্দেহ নেই। এও সন্দেহ নেই যে, গলা নামিয়ে, চড়িয়ে, ফিসফিস করে জনপ্রিয়তার চটুল অস্ত্রগুলিকে শেষ গানে ব্যবহার করলেন তিনি। নিজের পুরনো ভাবমূর্তির হাতে সাম্প্রতিক পরিণত দক্ষতাকে করলেন বিপর্যস্ত।

'প্রেম' পর্যায়ের দ্বিতীয় আসরটি ছিল ৩০ মে সন্ধ্যায়। আগের দিনের মতো এ-দিনেও পিছনে ময়ূর ময়ূরী। ময়ূরীটি আবার সপুচ্ছ। সপুচ্ছ ময়ূরী কোন দেশে পাওয়া যায় রবীন্দ্রসদনের মঞ্চ সজ্জাকারই জানেন। এদিন উদ্বোধন সঙ্গীত গাইবার কথা ছিল গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী-কলাকুশলী সম্মিলনীর। তাঁরা আসেন নি। কেন যে এই অপ্রেম, রবীন্দ্রসদনও জানাননি। একক আসর শুরু করলেন দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মন্দ্রসপ্তকে অশ্রুত থেকেছে তাঁর কণ্ঠ। পরবর্তী শিল্পী মঞ্জুশ্রী ভৌমিক। হারমোনিয়াম কিঞ্চিৎ উচ্চকিত, দুটি গানের মধ্যে 'না বলে যায়' মোটামুটি। চিত্রা রায় 'একদা তুমি প্রিয়ে'তে মনোগ্রাহী, 'কী সুর বাজে'-র স্কেলটি চড়া লেগেছে। শক্তিব্রত দাশের কণ্ঠ ভালো, কিন্তু অভিব্যক্তিহীন। 'চপল তব'র শুরুতে হোঁচট খেলেন। অনুরোধা মুস্তাফির 'আজি গোধূলি-লগনে' চলনসই, দ্বিতীয় গানের, 'শেষ বেলাকার', নির্বাচন ভালো, নিবেদন জমেনি। ঊর্মিলা বসু প্রথম গাইলেন, দুটি গানেই ছিল সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি। কৌশিকী মজুমদার ও তন্ময় চট্টোপাধ্যায় ছাপ রাখতে ব্যর্থ। ছন্দা দাশগুপ্তর নির্বাচন এবং নিবেদন দুইই প্রশংসনীয়। জয়তী ঘোষ-এর 'বড়ো বিস্ময় লাগে' কৃতিত্বপূর্ণ পরিবেশন। অর্ঘ্য সেন খুবই সংযত মাত্রায় পরিবেশন করলেন 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা' এবং 'পুরনো জানিয়া'। অসামান্য 'অর্ঘ্যের অঞ্জলি' হয়ে উঠল দুটি নিবেদনই। সন্তোষ সেনগুপ্তকে বহুকাল বাদে পাওয়া গেল রবীন্দ্র সঙ্গীতের আসরে। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল তাঁর কণ্ঠের 'তুমি কোন ভাঙনের' এবং 'ফিরে এসো বঁধু হে'। বুলবুল সেনগুপ্তের শান্ত লাবণ্যময় কণ্ঠে 'আকাশে আজ' এবং 'ও চাঁদ' তৃপ্তিকর পরিবেশন। স্নিগ্ধা ঘোষ সবল প্রেমের গানের পক্ষে হয়তো বা অতিরিক্তই সবলতা তাঁর কণ্ঠে,

স্বপ্না ঘোষাল

কিন্তু নিখুঁত তাঁর নিবেদন। সুশীল মল্লিক 'আমি কেবলই স্বপন'-তে স্পষ্টতই লক্ষ্যভ্রষ্ট, কথা এবং সুর দুয়েরই গোলমাল ছিল, কিন্তু চমকে দিলেন 'কে যেতেছিস আয়রে হেথায়'। দারুণ জমজমাট নিবেদন দ্বিতীয় গানটি। বিভা সেনগুপ্তর 'আজি দক্ষিণ পবনে' দুরূহ নির্বাচন, কৃতিত্বপূর্ণ পরিবেশন। স্বপন গুপ্তর ছায় অতিথি'তে যে প্রত্যাশা সঞ্চারিত, 'আমায় কী বেদনা'য় তা অপূর্ণ থেকেছে। মায়া সেন-এর 'মরণ রে' এবং 'অনন্ত সাগরমাঝে' পরিণত গায়নভঙ্গির দুর্লভ নিদর্শন। বিশেষত প্রথম গানের উচ্চারণ শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত।

প্রেম পর্যায়ের তৃতীয় ও শেষ আসরটি ছিল ৮ জুন সকালে। 'উত্তর-সারথি' গোষ্ঠীর সম্মেলক সংগীত আরম্ভকে রঙীন করে তুলেছিল। নবনীতা চক্রবর্তী একক আসরের সূচনায় যেটুকু রেশ রেখে গেলেন, তা পুরোপুরি বিপর্যস্ত হল অণিমা মল্লিকের নিবেদনে। 'শিশু মহলে'ও এমন গান অচল। মাধব মিত্রর চিন্ময়চিহ্নিত গায়নভঙ্গিতে 'সোনার মৃগ' ধরার আশা যে দুরাশা। বোঝা গেল। মধুমাধবী ভট্টাচার্যের 'কী রাগিনী' এবং 'আমার প্রাণের পরে' গান দুটিতে শিক্ষিত গায়কীর চিহ্ন ছিল। পূর্বা দাম এসে আসরের মেজাজ প্রতিষ্ঠা করলেন। 'নাই যদি বা' এবং 'কেহ কারো মন বুঝে না' বিশেষ ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও অভিব্যক্তিপূর্ণ নিবেদন তাঁর। বীরেন ঘোষ নতুন, কিন্তু মর্যাদা আদায় করে নিলেন 'মনে যে আশা লয়ে'র সতাল পরিবেশনে। কণ্ঠ এবং গায়কী দুইই সুন্দর তাঁর। দ্বিতীয় গানেও নির্ভুল প্রমাণ ছিল। রত্না বিশ্বাস ভালো গেয়েছেন 'কোন সে ঝড়ের ভুল।' উত্তরা চট্টোপাধ্যায়-এর শিক্ষার ছাপ এবং নার্ভাসনেস-এর ছাপ একই সঙ্গে ফুটে উঠল তাঁর নিবেদনে। অমরেশ দাশ-এর দুটি গানই মোটামুটি। শ্যামশ্রী দাশগুপ্তর নিবেদনও উত্তীর্ণ। মহাশ্বেতা গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আমি রূপে তোমায়' এ এক্সপ্রেশনের পরীক্ষা ছিল, 'সাজাব না ফুলের হারে'—'সাজাব না' অংশে যেন সাসপেনস ফোটালেন তিনি। সমর্থনযোগ্য মনে হয়নি; 'ওহে সুন্দর মম' ভালো লেগেছে। কানাই মুখোপাধ্যায়-এর গান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, ভুলে যাওয়া বসন্ত থেকে অনেক দিনের মনের মানুষ পঙ্কজ মল্লিকের বিশিষ্ট ধরনটির সঙ্গে নতুন করে পরিচয় ঘটালেন তিনি তাঁর ঐতিহ্যময় গায়নভঙ্গিতে। স্মৃতিরোমাঞ্চে উদ্বেল করে দিচ্ছিল তাঁর কণ্ঠের 'আসা যাওয়ার' এবং 'সেই ভালো'। মঞ্জুলিকা ভাদুড়ীর রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসরের জন্য আলাদা শিক্ষা রয়েছে মনে হল না। মণিকা গঙ্গোপাধ্যায় 'ভয় করব না'তে মোটামুটি, 'তুমি একটু কেবল'-এ ছাপ রাখতে পারেননি। অরবিন্দ বিশ্বাস দুটি গানই—'হে নিরুপমা' এবং 'এমন দিনে তারে'—বেছেছিলেন জমাটি, জমিয়ে গেয়েছেনও এবার। বিশেষত, 'এমন দিনে তারে।' স্বপ্না ঘোষাল কোনোদিনই খারাপ গান না। নিজস্ব একটি মান বজায় রাখেন। কিন্তু ক্রমশ যে তিনি পরিণতি পাচ্ছেন, ইদানীং সে প্রমাণও স্পষ্টতর হয়ে ধরা পড়ছে। এবারের নিবেদনের মধ্যে 'কবে তুমি আসবে'তে তিনি যেমন সজীব, 'আজি যে রজনী যায়'তে তেমনই হাহাকারময়। নিখুঁত কাজ, নিপুণ অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল দুটি গানেই। আর অবাক করেছেন এদিনের শেষ শিল্পী শ্রীকুমার চট্টো-

পাধ্যায়। 'প্রকৃতি'র আসরে অনুপস্থিত ছিলেন তিনি, প্রেমের আসর জমিয়ে তুললেন শুরু থেকেই। 'হেলাফেলা সারাবেলা'য় উদাস মেজাজ অপরূপ লাবণ্যে ধরা পড়ল তার কন্ঠের রোমান্টিক উচ্ছ্বাসে। 'আমার মনের কোণের বাইরে'তেও ছিল একই উদাস সুরের চঞ্চলতাময় আভাস। রূপেন ঘোষের সঙ্গতও ছিল দারুণ প্রাণময়। নিজেকে ছাপিয়ে তোলা নিবেদনের জন্যই সেদিন একের পর এক অনুরোধ আসতে লাগল শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছ থেকে। শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় তৃতীয় গানটি ধরলেন 'কেন বাজাও।' কেন-র প্রশ্নটিকে চমৎকার স্ট্রেস দিয়ে প্রার্থিত রসের উন্মোচন ঘটালেন। চতুর্থ গানেরও প্রবল অনুরোধ ছিল। কিন্তু তার আগেই নেমে এল পর্দা। বিস্মিত শ্রোতা এবং শিল্পী একই সঙ্গে যদি ভেবে থাকেন, 'হায় একী সমাপন'— দোষ দেওয়া যায় না।

**প্রণব মুখোপাধ্যায়**

ফটো : সুবীর চট্টোপাধ্যায়

## শুভেন্দ্রম

কালো পর্দার উপর লাল লেখাটি তত স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রসদনে দিলীপ রায় পরিচয় করিয়ে দেবার পর যখন সম্মেলক গান আরম্ভ হল, তখন গানের মধ্য দিয়েই বাংলা গানের একটি শুভ সূচনা ঘটল। প্রচলিত এবং প্রথাসিদ্ধ আধুনিক গানের বন্ধ্যাভূমিতে একটি নতুন আন্দোলনের সূচনা অঙ্কুরিক অর্থে। তাই 'শুভেন্দ্রম' শুভ ইঙ্গিতের আর এক নাম।

সম্মেলক গানগুলির কথা ও সুর জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের। কথা ও সুরের মধ্যে সেই পৌরুষ যা সাম্প্রতিক বাংলা গানে অনাবিষ্কৃত অথবা অস্পষ্ট। 'ছড়িয়ে রয়েছ কেন/কোটি কোটি তারা ছড়িয়ে রয়েছ কেন/এক-বার হলে জড়ো/আলোর প্রতি-যোগিতায়/তোমরা সূর্যের চেয়ে বড়ো' এই গানের আহ্বান বা 'বন্ধু যদি আস/কিছু চৈত্র নিয়ে এসো/মিথ্যে ফাগুন ঝরাতে হবে' গানের বলিষ্ঠ অঙ্গীকার অনেক দিন শোনা যায়নি। গানগুলির কথা ও সুর বিবাহিত (ডিভোর্সের সম্ভাবনাই নেই)। কণ্ঠ-সমাবেশে ত্রুটি আছে—বাস, ব্যারিটোন বা টেনর অবহেলিত। এত সুন্দর গানে হার্মনাইজেশন নেই বললেই চলে। সবচেয়ে বড় কথা গানগুলির জন্য কোরাস অপরিহার্য নয়—একক গাইলেও চলে। যথার্থ কোরাস গান তখনই হয়ে ওঠে যখন কোরাস না থাকলে ফাঁকা লাগে। তবু আমাদের আশা অনেক বেশি, হয়তো এই ব্যবসায়ী যুগে তাঁদের প্রত্যাশা কম।

এই দিনের সুচারু অনুষ্ঠানে কোন সাড়া জাগানো শিল্পী ছিলেন না কিন্তু গান ছিল। অর্থাৎ মন্দিরের উপাসনা ছাপিয়ে নহবৎখানার রাজকীয় দম্ভ প্রকট হয়ে ওঠেনি—একটি বিরল ঘটনা। অনুষ্ঠানের আবৃত্তিকার ছিলেন পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ এবং

জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়

শিল্পী পরিচিত মেজাজের অনুষ্ঠান করলেন। কিন্তু অন্য কয়েকজন শিল্পী যাঁরা তত পরিচিত নন অথবা প্রচার দাক্ষিণ্য যাঁদের প্রতি কৃপণ তাঁরা শ্রোতাদের সন্ধ্যাকে স্মরণীয় করে তুললেন। গোপা কাঞ্জিলালের কণ্ঠ অসম্ভব তৈরী। রাগভিত্তিক গানে তাঁর পারদর্শিতা অনস্বীকার্য। যদিও এই আসরে তাঁর গানের থেকে তানকর্তব প্রাধান্য পেয়েছিল বেশী—প্রতিমার থেকে অলঙ্কার চমক লাগায় বেশী। ঘোষক দিলীপ ঘোষ ঠিকই বলেছেন, বাংলা চলচ্চিত্রে এমন গায়ক অভি-নেতার খুব অভাব। সন্তু মুখো-পাধ্যায় সেই জগতে একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তাঁর ভরাট কণ্ঠস্বরে একটি অদ্ভুত মেজাজ আছে যা শুধু রুপালী মর্যাদার ভারে কাটে না—গায়ন ভঙ্গিতেই স্বমহিম। এইদিন সঙ্গীতানুষঙ্গের জন্য তাঁর কিছু অস্বস্তি ছিল, কিন্তু ক্রমশ তিনি নিজের দাবিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলেন। জানা গেল পরিবেশিত গানের অনেকগুলিই বিভিন্ন সূত্রে তাঁর নিজের গাওয়া। অর্থাৎ গানের জগতে তাঁর পদক্ষেপ আরম্ভ হয়েছে। এই যাত্রারম্ভে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভাল—আশ্চর্য কণ্ঠের অধিকারী সন্তু মুখোপাধ্যায়কে আরও নির্ভয় হতে হবে। নির্ভয়, কিন্তু অকুতোভয় নয়।

মাধুরী চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি রেকড আছে। সবকটি গানই মর্যাদা-বাহী। অথচ অজানা কারণে তিনি ততটা প্রসারিত নন। এই দিনের আসরেও যে কবিতার গীতিরূপ বা গানগুলি তিনি শোনালেন তাতে বোঝা যায় সঙ্গীতের সেই শিক্ষা তাঁর আছে—যাতে শিল্পীকে কোন এক জায়গায় স্থাণু করে রাখে না। সব ধরনের গানেই তাঁর অনায়াস নৈপুণ্য! বাংলা গানের দুর্ভাগ্য সুকুমার মিত্র—তাঁর যথোচিত মর্যাদা পেলেন না। এই আসরে রাধাকান্ত নন্দীর তবলার দাপটের সহযোগিতা (?) সত্ত্বেও যে গজল বা নজরুল-গীতি তিনি গাইলেন তার পাশাপাশি অনেকেই নিষ্প্রভ। তবু সুকুমার মিত্রের রেকর্ডের সংখ্যা আঙুলে গুণতে লজ্জা হয়। এই প্রসঙ্গে আসরে আর এক শিল্পীর কথা মনে আসে—জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কথা ও সুর

অবাক তারায় মত। সুরারোপিত কয়েকটি জনপ্রিয় গানই তার উদাহরণ। কিমাশ্চর্যম! তাঁর নিজের গানও অনেকদিন রেকর্ড হয় না। অথচ রেকর্ড প্রতিষ্ঠানগুলি নাকি নানা ধরনের পরীক্ষার উৎসাহী এবং নানা ঢংয়ের চাপল্যই নাকি সমৃদ্ধির সেতু। এ-কোন সকাল? যা রাতের চেয়েও অন্ধকার? জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় সেদিনের আসরে সবাইকে নাড়া দিয়ে-ছেন গভীরে। তিনি গাইলেন 'আমার স্বপন কিনতে পারে, এমন আমীর কই? /আমার জলছবিতে রঙ মেলাবে এমন আবীর কই?' সত্যিই তাঁর স্বপ্ন কেনার সাহস কোন আমীর বিদেশী কোম্পানী বা জলছবিতে আবীর মেলাবার শিল্পবুদ্ধি কোন দেশী রেকর্ড কোম্পানীর নেই।

**দেবাশিস দাশগুপ্ত**

ফোটো : সুবীর চট্টোপাধ্যায়

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নৃত্য**

## দুটি গীতিনাট্য

রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় : 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম, সে উৎসাহে আর কিছু রচনা করি নাই। ওই দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটি উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে।' এই দুটি গীতিনাট্য সম্পর্কে বলেছেন, 'গানের সূত্রে নাট্যের মালা'। আরো বলেছেন, 'একটা দস্তুরভাঙা গীত-বিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা।' শুধুমাত্র রচনা নয় 'এই দুটি গীতি-নাট্যের অভিনয়ে আমিই প্রধান পদ গ্রহণ করিয়াছিলাম।' সব দিক থেকে এই গীতিনাট্যাভিনয় তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রসদন-আয়োজিত রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানে এই দুখানি গীতিনাট্যের অভিনয় সূচী-ভুক্ত হয়েছিল।

কালমৃগয়া প্রযোজনা করলেন : সুরতীর্থ ২৯ মে সন্ধ্যায়। প্রথমেই গীতিনাট্যটিকে নৃত্যনাট্যরূপে পরি-বেশন করে এঁদের ক্ষমতার দৈন্যকে যেমন প্রকট করে তুললেন তেমন রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সম্পর্কে অকারণ ভুল ধারণার সহায়তায় ব্রতী হলেন। সমস্ত গীতিনাট্যটিকে নৃত্যনাট্যের আঙ্গিকে অর্থাৎ নেপথ্যে সংগীতের মাধ্যমে কাহিনী বর্ণনা এবং মঞ্চে নৃত্যের ছন্দে চরিত্রগুলিকে উপস্থাপিত করায় নিঃসন্দেহে গীতিনাট্যের মূল স্বাদ থেকে বঞ্চিত করা হল। স্পষ্ট উপলব্ধি করা গেল এদিনের প্রযোজনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষায়তনের ছাত্রছাত্রীদের যত সম্ভব সুযোগদান এবং সেই সূত্রে শ্রোতার আসন পূর্ণ করা। হয় তো সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে কিন্তু তাতে প্রযোজনার মান কিছুমাত্রও উন্নত হয় নি। এমন কি নামীদামী কিছু শিল্পীর নাম যুক্ত করেও তা করা যায় নি। প্রায় শিশু থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের অসংখ্য বনদেবীদের [illegible]

বাল্মীকি প্রতিভা

উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত রাজা দশরথের ভূমিকায় সাধন গুহর অভিব্যক্তিহীন নৃত্যাভিনয় নিষ্প্রাণ। বিদূষকের ভূমিকায় রামগোপাল ভট্টাচার্যের অভিনয় আতিশয্য দোষে দুষ্ট। আর অন্ধমুনির ভূমিকাটি তো শম্ভু ভট্টাচার্যের অভিনয়ে করুণ রসের পরিবর্তে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছিল। মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত, সাজ-সজ্জা সবই ছিল অত্যন্ত সাধারণ মানের।

ব্যতিক্রম ছিল সংগীতাংশ। গানে সর্বক্ষেত্রে প্রার্থিত নাটকীয়তা বজায় না থাকলেও অধিকাংশ গান সুখশ্রাব্য হয়েছিল এ কথা অবশ্যস্বীকার্য। গান গেয়েছিলেন দ্বিজেন মুখো-পাধ্যায়, তুষার ভঞ্জ, কমল গুপ্ত, ধ্রুব বিশ্বাস, কন্যা মজুমদার ও স্নিগ্ধা ঘোষ। সংগীত পরিচালনা : স্নিগ্ধা ঘোষ। নৃত্য পরিচালনা : সাধন গুহ। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় ছিলেন ডঃ নীহারকণা মুখোপাধ্যায়।

বাল্মীকি প্রতিভা প্রযোজনা করলেন : শ্রুতি। সাত জুন সন্ধ্যায়। গীতিনাট্যের যথাযথ রূপবিকাশে যে দীর্ঘ অনুশীলন ও প্রস্তুতির একান্ত প্রয়োজন, নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হয় এই প্রযোজনায় তার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়নি। এবং এক্ষেত্রে সংগীত ও অভিনয় উভয় বিষয়ই যে সমান গুরুত্বপূর্ণ তা পরিচালক উপলব্ধি করেছেন বলে বারে বারেই প্রতীয়মান হয়।

দস্যু দলের সম্মিলিত গান ও অভিনয় সমস্ত প্রযোজনাটিকে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় করে তোলে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় বাল্মীকির ভূমিকায় অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীপ্ত অভিনয়। তাঁকে এই ভূমিকায় যেমন মানিয়ে যায় তেমনি অভিনয় ও গানের মাধ্যমে চরিত্রটিতে যথাযথ মর্যাদা আরোপ করতে তিনি সক্ষম হন। কেবল দু-একটি কথা বলতেই হয় : প্রথমাংশে অভিনয়ে বলিষ্ঠতার কিছু অভাব পরিলক্ষিত হয়। বিষয়টি তাঁকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। আর 'শ্যামা এবার ছেড়ে চলেছি মা' গানটির সঙ্গে অভিনয় [illegible] নয়। বালিকার ভূমিকায় শ্রীলেখা চৌধুরী [illegible] [illegible]

তিনটি ক্ষেত্রে নৃত্যভঙ্গিমা অংশ সঞ্চালন অতিরিক্ত মনে হয়। প্রথম দৃশ্যে ভূমিকায় দীপেন মুখোপাধ্যায়ের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি আনন্দদায়ক। একটি কথা ওঁকে কেবল স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—বাল্মীকি প্রতিভার প্রথম দস্যু কাপুরুষোচিত বিদ্যোৎসুক নয়। দ্বিতীয় দস্যুর ভূমিকায় রবীন বসু সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। লক্ষ্মীর কণ্ঠের গান আরো উন্নত মানের হওয়া একান্তই প্রয়োজনীয়। গৌরী ঘোষের লাবণ্যময় কণ্ঠে সরস্বতীর আবৃত্তিটি শ্রুতি সুখকর। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের মঞ্চসজ্জা, তাপস সেনের আলোকসম্পাত এবং ভি বালসারার যন্ত্রসঙ্গীত পরিচালনা এই প্রযোজনায় বিশেষ মাত্রা যোজনা করে।

প্রসঙ্গত কয়েকটি বক্তব্য : বনদেবীর সংখ্যা এবং নাচের সময়সীমা সংক্ষেপ করা যায় কি? বনদেবী, লক্ষ্মী, সরস্বতীকে যথেষ্ট আলো-আঁধারের মধ্যে রাখা যায় না? সরস্বতীর প্রথম আবির্ভাবের সময় সংক্ষেপ করা একান্তই প্রয়োজন—তেমনি লক্ষ্মী সরস্বতীর সাজসজ্জা সম্পর্কে অবহিত হওয়া। আর ক্রৌঞ্চ বধের মুহূর্তেই বাল্মীকির 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং...' শ্লোক উচ্চারিত হওয়া একান্তই আবশ্যিক, বিলম্বে দৃশ্যটি নাটকীয় মুহূর্তের সৌন্দর্য হারায়।

প্রসঙ্গক্রমে যে কয়েকটি কথা বলা তা সবই প্রযোজনার উৎকর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে। এই সব ছোটোখাটো ত্রুটি সত্ত্বেও গীতিনাট্য বাল্মীকি প্রতিভা রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা। নৃত্য পরিচালনা : পিয়ালী রায় মহাশয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়।

## দুটি নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা ও শ্যামা

রবীন্দ্রসদন আয়োজিত রবীন্দ্র জন্মোৎসবে 'চণ্ডালিকা' ও 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হল যথাক্রমে এগারো ও একত্রিশে মে সন্ধ্যায়। সারা বৎসর-ব্যাপী রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য-গুলির প্রযোজনায় যে রীতি এই দুটি প্রযোজনাতেও তার বিশেষ কোনো ব্যতিক্রম ছিল না—অর্থাৎ কিছু নামী দামী গায়ক ও নৃত্যশিল্পীকে একত্রিত করে একটি অথবা দুটি মহড়ার পরই অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই প্রযোজনার কোনো নির্দিষ্ট মান রক্ষিত হয় না। সৌভাগ্যবশত এই দুটি প্রযোজনায় অন্তত মহড়ার সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল বলে মনে হয় না।

চণ্ডালিকা॥ প্রযোজনা : ত্রিবেণী। সমগ্র প্রযোজনা বিশেষ করে নৃত্যাংশ ছিল অত্যন্ত উচ্চমানের। প্রকৃতির ভূমিকাটি রেখা মৈত্র অসামান্য দক্ষতায় মূর্ত করে তোলেন। তাঁর নৃত্যকুশলতায় এবং অভিব্যক্তিতে। চরিত্রটির

শান্তি বসু ও রেখা মৈত্র

মর্ম উপলব্ধির স্বাক্ষর রেখেছেন প্রায় প্রতিটি নাট্যমুহূর্তে। সব শেষে 'ধূলি হতে তুলি লও আমায়/তব পুণ্য-লোকের' নৃত্যাভিনয় যেমন দৃষ্টিনন্দন তেমনই হৃদয়স্পর্শী। সমান যোগ্যতায় নৃত্যের মাধ্যমে মায়ের চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছিলেন আরতি মজুমদার—চরিত্রটিতে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে পেরেছিলেন বলেই চরিত্রচিত্রণ সার্থক হয়ে উঠেছিল। আনন্দের ভূমিকায় শান্তি বসু যথাযথ সংযত ও সংবেদনশীল। সম্মেলক নৃত্যে ছিল সযত্ন প্রস্তুতি। নৃত্য পরিকল্পনায় জাগ্রৎ ছিল সৌন্দর্যবোধ সেজন্য নৃত্য পরিচালক শান্তি বসু অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

সঙ্গীতাংশ নৃত্যাংশের তুলনায় ছিল দুর্বল। প্রকৃতির গানগুলি গেয়েছিলেন ইন্দ্রাণী সেন। তাঁর কণ্ঠ সুরসমৃদ্ধ হলেও প্রকৃতির গানে যে নাটকীয়তা, যে গভীরতা, যে অনুভূতি তা তাঁর কণ্ঠে ছিল অনুপস্থিত। অন্য দিকে সুমিত্রা সেন তাঁর ব্যাপ্তিময় কণ্ঠে মায়ের গানগুলি গেয়েছেন—তাঁর সপ্তক অন্য কণ্ঠের সহায়তা অত্যন্ত প্রকট। অর্ঘ্য সেন তাঁর মধুর গাম্ভীর্য কণ্ঠে আনন্দের গানে সহজেই মন জয় করেছেন। অন্যান্য গানগুলো অনুরূপ। সম্মেলক গানে প্রশিক্ষণ [illegible]। সঙ্গীত পরিচালনা : সুমিত্রা সেন। মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত সবদিক মিলিয়ে সমগ্র অনুষ্ঠান সুষ্ঠু পরিচালনায় অনিল সেনের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

শ্যামা॥ প্রযোজনা : [illegible] [illegible] এই প্রতিষ্ঠান প্রযোজিত নৃত্যনাট্যের প্রযোজনার রীতি-পদ্ধতি [illegible] [illegible] প্রতিষ্ঠানের [illegible]—ব্যতিক্রম [illegible] প্রসূত প্রয়াসে। দলগত নৈপুণ্যের [illegible] নির্দ্বিধায় [illegible] প্রশংসা করতেই হয়, কোনো প্রয়োগে কিছু চমক সৃষ্টির পরিকল্পনা অত্যন্ত [illegible]। একটি উদাহরণ : শ্যামার সহচরীর কণ্ঠে 'নীরবে থাকিস সখী' ও [illegible] নীরবে থাকিস' গানের সঙ্গে

ডল দম্পতির নৃত্য পরিকল্পনা—যেমন অবিশ্বাস্য তেমনই অমার্জিত। মার ভূমিকায় সুমিত্রা মিত্রের নৃত্য মন ছন্দোময় তেমন সমগ্র নৃত্য-ট্যে তিনি একটি গতি সঞ্চারিত করেন অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে। বণিক জ্রসেন-এর ভূমিকায় নরেশকুমার ধিকাংশ সময়ে কেন যে শরীরের ধাঙ্গ উন্মুক্ত করে মঞ্চে অবতরণ রেছিলেন তা বোঝা দুঃসাধ্য তবে তো সুমিত্রা মিত্রের সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে মতা রক্ষা করতে না পারলেও একটি নৃত্যের মান বজায় রাখতে শিল্পী র্দা সচেষ্ট ছিলেন এবং অনেকাংশে ফলও। নৃত্যের যোগ্যতা সত্ত্বেও ত্তীয়ের ভূমিকায় অমল নিয়োগী মানান। এই বিষয়টি—অর্থাৎ নৃত্য-শিল্পীর দেহসৌষ্ঠব যে একান্ত রত্রোপযোগী হওয়া প্রয়োজনীয়—এই প্রাথমিক শর্তটি আমরা অবহেলা করি। বারের রবীন্দ্রসদনে প্রযোজিত নৃত্য-নাট্যগুলিতে এই বক্তব্যের যৌক্তিকতার দর্শন প্রভূত পরিমাণে পাওয়া গেছে।

নৃত্যনাট্যের প্রাণ ছিল শ্যামার গানে—আর সেই গান গেয়েছিলেন র্বা দাম। সুরে তালের শুদ্ধতা বজায় রেখেও গানে কতখানি নাট্যরস সঞ্চারিত করা যায় আর সেইসঙ্গে গানের সৌকুমার্যও ফুটিয়ে তোলা যায় তা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যা যুগপৎ আনন্দদায়ক ও চমৎকৃতিজনক। রাজেন মুখোপাধ্যায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বজ্রসেনের গানগুলি পরিবেশন করেন। সবিতাব্রত দত্তের কণ্ঠে কোটালের গান দৃপ্ত প্রাণবান। উত্তীয়ের গানগুলির প্রতি ধীরেন বসুর পক্ষে তখানি সুবিচার করা সম্ভব তিনি তা করেছেন। সম্মেলক গানগুলি গীত। সংগীত পরিচালনা : সলিল রায়। নৃত্য পরিচালনা : নরেশকুমার।

**সন্তোষ চৌধুরী**

ছবি : সুধীর চ্যাটার্জি

আলোচনা শিল্পসংস্কৃতি **নাটক**

## রবীন্দ্রনাট্যোৎসব '৮০

অতঃপর রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষকে কয়েকটি প্রস্তাব দেওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্র জন্মোৎসবের দীর্ঘ অনুষ্ঠানসূচীতে এবার নাটকের সংখ্যা মাত্র সাত দিনের হলেও, অন্যবারের মত এবারেও আপত্তি থেকে যায়। আগের মত এবারেও হাস্যকর নাট্যপ্রযোজনা দেখা যায়। সঙ্গীতের আসরে কিছু দুর্বল পরিবেশন শোনা যায়, কিছু নৃত্যনাট্যের প্রযোজনাও নিয়মরক্ষা [illegible] গানের ক্ষেত্রে শুনেছি এ বছর অডিশনের ব্যবস্থা ছিল, বাছাই করে নির্বাচন করা হয়েছে। নাটকের ক্ষেত্রে এই রকম অডিশনের ব্যবস্থা করা অসম্ভব। কিন্তু এ রকম নিয়ম করা যেতে পারে, অন্তত তিনটি অভিনয় আগে হয়ে থাকলে তবেই রবীন্দ্র জন্মোৎসবে অংশ গ্রহণ করা যেতে পারে। (সেই তিনটি অনুষ্ঠান সম্পর্কেও খোঁজ নিতে হবে) সাধারণত সকলে উপরি পাওনার মনো-

কর্তার ভূত

নাটক নিয়ে স্টেজ রিহার্সাল দেন। এই নিয়মে হয়ত রবীন্দ্র নাটকের চর্চা বেড়ে যাবে—হয়তো নতুন পথ খুলে যাবে। নির্বাচনের ব্যাপারে খুব খারাপ ভাবে বলতে গেলে পেডিগ্রি বিচার করতে হবে—অর্থাৎ প্রযোজক বা প্রযোজক সংস্থার রবীন্দ্র ভাবনা এবং প্রযোজনা চিন্তা। একজন রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ মাত্রেই নিপুণ প্রযোজক নাও হতে পারেন। আবার একজন নামী প্রযোজক বা সংস্থা রবীন্দ্র ভাবনার মর্মানুসারী হয়ে প্রযোজনাকে বিপথগামী করতে পারেন। আমার এই বক্তব্যে যদি কেউ আপত্তি তোলেন, তবে এই ভাবনার স্বপক্ষে প্রচুর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।—এমনকি এ বছরের অনুষ্ঠান থেকেই।

সাম্প্রতিক কালে যে শিল্পটি সবচেয়ে নতুন ভাবে পরীক্ষিত এবং আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটি আবৃত্তি। আবৃত্তি শিল্পীরা নতুন নতুন পরীক্ষায় তৎপর এবং নিষ্ঠাবান। বিভিন্ন কাব্যের নাটকীয় পাঠের পর দেখা যাচ্ছে গদ্য রচনা পাঠেও তাঁদের কৃতিত্ব কম নয়। শুধু মাত্র ব্যক্তিগত সুনামটাই মূলধন নয়। যে পরিশ্রম এবং অনুভূতিতে রবীন্দ্র ভাবনাকে শিল্প করে তুলতে অংশ গ্রহণকারী নাট্যকর্মীরা ব্যর্থ হয়েছেন—সকলকে অবাক করে দিয়ে সেই অভিপ্রেত নিষ্ঠার ফল আবৃত্তিকারক অর্জন করেছেন। 'সমকাল' প্রযোজনা করলেন 'চার অধ্যায়'। অনেক নাটক থেকে এই নাটকীয় পাঠ বেশি আকর্ষক। 'চার অধ্যায়' রচনা পাঠে অসুবিধা ছিল। গতবার 'শেষের কবিতা' যেমন নজিরবিহীন—সমকালের 'চার অধ্যায়' পাঠের সময় স্বভাবতই এ-কালের স্মরণীয় নাট্য প্রযোজনা চার অধ্যায়-র স্মৃতি তুলনায় প্রসঙ্গ করবেই। কিন্তু সমকাল সযত্নে প্রভাবমুক্ত হতে পেরেছেন। হয়ত এই সচেতনতার জন্য বিচ্যুতিও ঘটে যায়। সূত্রধার-এর অংশে প্রদীপ ঘোষ যেমন নির্লিপ্ত ভাবে দায়িত্ব পালন করে যথার্থ সূত্রধারধর্ম পালন করেন—দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মাস্টারমশাই-এর ভূমিকায় মাঝে মাঝে তাঁর নিজস্ব পরিচিত ভঙ্গির মধ্যে ঘুরপাক খান। আবার অনেক সময় তিনি যথোচিত ব্যক্তিত্ব আরোপ করেন। এই বিষয়ে পার্থ ঘোষ নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙে নতুন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। মুরারি চক্রবর্তীর নাটকের প্রতি আনুগত্য বেশি, যেটা এখানে একটু বেসুরো লাগে। বিপরীত ভাবে অতীন-এর ভূমিকায় অশোক পালিত নাটকীয়তাকে বর্জন করতে গিয়ে গৌরী ঘোষের 'এলার' পাশে নিষ্প্রভ হয়ে ওঠেন। এই রচনা পাঠে অত্যন্ত কৌতূহলী করে রাখেন গৌরী ঘোষ। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা। গৌরী ঘোষ প্রতিটি বাক্য কবিতার সময়ও একটু ঢোক গিলে বলেন—যেটা স্বল্প সময়ের আবৃত্তিতে বিশেষ মাধুর্য আনে। কিন্তু এই দীর্ঘ রচনা পাঠে ঐ ভঙ্গি ম্যানারিজম-এর দায়ভাগী হতে পারে। সম্পাদনায় আর একটু লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল। কণ্ঠগুলি পরিচিত হয়ে যাবার পর সূত্রধারের 'অতীন বলল বা এলা হাসল' বাহুল্য বোধ হয়। এই নাটকের সঙ্গীত সম্পাদনা করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়—এই নতুন ভূমিকায়ও তিনি

নায়কোচিত স্মার্টনেস দেখিয়েছেন। অপরিচয়ের চমক আনতে অনেক ক্ষেত্রে যেমন মুড-এর সঙ্গে মিলে যায়, বহু ক্ষেত্রে জবরদস্তি বলেও বোধ হয়। তার রচনা পাঠের সঙ্গে স্বরূপ মুখোপাধ্যায়ের সাইক্লোরামায় রং বদল, খুব শোভন, সংযত ও সুরুচিপূর্ণ আলোকসম্পাত। দক্ষিণী প্রাক্তনী অভিনয় করলেন 'নটীর পূজা'। গানে তাঁদের উত্তরাধিকার। সুতরাং গান গাইলেই তাঁরা স্বচ্ছন্দ কিন্তু অভিনয়ে কখনই বলা যাবে না, তাঁরা পাঠক্রম শেষ করে প্রাক্তন হয়েছেন। অথচ দক্ষিণী এক সময় নাট্য প্রযোজনায় সচেষ্ট ছিল। লোকেশ্বরীর ভূমিকায় এণাক্ষী রায় গলায় সাম্রাজ্ঞীর দাপট আনেন কিন্তু হাত দুটো নিয়ে খুবই মুশকিলে পড়েন। প্রত্যেকে কথা বলেন একই লাইনে দাঁড়িয়ে কোরাস গাইবার ভঙ্গিতে। প্রবেশ প্রস্থানের কোন যথানির্দিষ্ট বিধি নেই। রচনা গুহঠাকুরতা সঙ্গীত পরিচালনায় নটীর পূজা নাটকের বাইরের অনেক গান জুড়ো করেও নাটকের বিন্দুমাত্র সাহায্য হয় না। দুঃখের সময় এসরাজ যেমন ঘরানার স্বস্তিতে বিস্তার করে—রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় পারকাশন কিম্বা কোলাহল শুধুই জোড়াতালি। উৎপলবর্ণার ভূমিকায় বসুধা গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর আড়ষ্টতার জন্য করুণাই পেতে পারেন—সহানুভূতি নয়। বিশেষত হত্যাকাণ্ডটি যখন ছেলেমানুষীর জন্য হাসির খোরাক হয়। এই নাটকে ব্যতিক্রম নন্দার ভূমিকায় পূর্বাদেব। অদ্ভুত স্বচ্ছন্দ সংলাপ উচ্চারণ। শ্রীমতীর ভূমিকায় শিপ্রা সাহা গানকেই তুরুপের তাস করেন। 'আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো' গানটি সম্পূর্ণ না গেয়ে একই স্তবক বারবার গাওয়ায় চরমক্ষণটি কখনই পরমক্ষণ হয়ে ওঠে না। নাট্যানুষ্ঠানের আগে একটি আসরে দক্ষিণী প্রাক্তনী সভাসভ্যারা গান করেন। প্রত্যেকেই একখানা দুখানা একক ও সম্মেলক গানে অংশ গ্রহণ করেন—খাতা বা কাগজ দেখে। বিদ্যায়তনে হারমোনিয়াম বাজান না হলেও প্রাক্তনীরা হারমোনিয়াম ব্যবহার করেন। দু-একটি একক এবং কয়েকটি সম্মেলক এতদ-সত্ত্বেও বাহবা দেওয়ার মতো।

খুব ভাল লেগেছে শান্তিনিকেতন অয়ন গোষ্ঠীর ডাকঘর। এই নাটকে কোন চরিত্রকে সুরেলা আবৃত্তি (যেটা প্রায়ই রাবীন্দ্রিক বলে মর্যাদা পাওয়ার চেষ্টা করা হয়) প্রলুব্ধ করেনি, আবার কেউ প্রথাগত নাটকীয়তায় আক্রান্ত হননি। এই জন্যই অশোক ঘোষ, বিশ্ববিজয় রায়, মণীশ দেব, মৃদুল চক্রবর্তী আটপৌরে হয়ে দর্শককে অমল ভাবনায় শরিক করে তুলতে পারেন। আবহ এবং [illegible] সঙ্গীত [illegible] পূর্ণ করে। সুধার ভূমিকায় সারস্বতী গুপ্ত চমকে দেওয়ার মতো আর অমলের ভূমিকায় সুনয়জিৎ সিংহ সুন্দর অভিনয় করলেও মাইকের জন্য তার অনেক কথাই দুর্বোধ্য হয় না। শান্তিনিকেতন অয়ন প্রাণভরে শিল্প সৃষ্টি করেছেন কিন্তু যান্ত্রিক অনভিজ্ঞতাই তাঁদের আলো ও [illegible] ক্ষেত্রে [illegible]। কেবল নাটকের আগে ছোট নৃত্যানুষ্ঠানে শ্রীমাওয়াদেককার-এর [illegible]

**এর জন্যে চাই**
**ওয়াটারবেরীজ®**
**ভিটামিন টনিক**

কথায় বলে স্বাস্থ্যই সম্পদ! আর যাঁদের তা আছে—
তাঁদেরই দিনগুলি হাসিখুশিতে ভরে থাকে! আপনিও আপনার
পরিবারের সবাইকে সদা সুস্থসবল রাখুন—এক সহজ উপায়ে!
নিয়মিত ওঁদের ওয়াটারবেরীজ ভিটামিন টনিক খেতে দিন।
কারণ, এ এক সম্পূর্ণ টনিক, আপনার আহারে যে পুষ্টির অভাব
থাকে, তা পুরণ করে! স্বাস্থ্য আর শক্তির জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয়
সমস্ত ভিটামিন আর খনিজপদার্থই এতে আছে। সুস্থ রক্তের
জন্যে আয়রণ, ক্ষিদে বাড়ানোর জন্যে বিশেষ উপাদান আর
নিমেষে শক্তি যোগানোর জন্যে মল্ট! খেতেও দারুণ ভালো!
ওয়াটারবেরীজ ভিটামিন টনিক—আপনার একান্ত প্রয়োজনীয়
যাবতীয় পুষ্টিগুণে ভরপুর!

**সারা পরিবারের জন্যে সম্পূর্ণ টনিক**
**ভিটামিন, খনিজপদার্থ ও আয়রণযুক্ত** লিনটাস-WVT.1-2415 BG

াগ্ন ডাকঘরের নির্দেশক প্রসেনজিৎ
হের সুরেলা আবৃত্তি। কেবল
ধারের 'ল্যাবরেটরি' একমাত্র নিয়মিত
জিত নাটক। এই দুরূহ ছোট
ল্পর নাট্যরূপ নিয়ে নিয়মিত প্রযো-
ার সাহস একটি ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টা।
মল গান্ধার এর আগেও রবীন্দ্র নাটক
াজনা করেছেন নিয়মিত ভাবে:
দবে ল্যাবরেটরি বিশদ ভাবে দেখা
। ওঠেনি—এই নাটকের বিস্তারিত
লাচনা পরে করা হবে। রামধনু
াজিত 'চোখের বালি' একটি সুন্দর
সর নাটক। প্রায় আড়াই তিন ঘণ্টা
ার উপর গম্ভীর ভাবে যে কর্মকাণ্ড
ছে দর্শক তাকে সরবে সহর্ষে উপ-
গ করেছেন। শিল্পীদের অভিনয়
থ হেসেছেন। মঞ্চের ব্যবহার দেখে
সছেন। ঘর বাহির সব একাকার।
ম থেকে শেষ পর্যন্ত গীতবিতান
াড় করে দু-লাইন করে গান ছুঁড়ে
। হয়েছে। একমাত্র শাশুড়ী যখন
্যবধূকে দেখতে পারেন না তখন কোন
। ব্যবহার হয়নি। 'ওর ভাব দেখে যে
হাসি', বা 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের 'কেন
ল কেন এলি', 'কাঁদিতে হবে যে
পিপাঠা', অনায়াসেই ব্যবহার করা যেত।
ির্দেশক বাউল ঠাকুর রবীন্দ্র সদনে প্রায়
ত উৎসবেই আনুকূল্য পেয়ে থাকেন
এর আগেও উৎসব দেখেছি চিত্রনাট্যের
। তিনি নাটক সাজাতে যান—কিন্তু
নৈপুণ্য থাকলে স্মার্টনেস-এর সঙ্গে
। ধরনের নাটক করা যায় সেই
পুণ্য তাঁর অধিগত নয়—তাই শুধু
সর খোরাক—বিরক্তির সূত্র। রবীন্দ্র-
নে অডিশন হয় না—কর্তৃপক্ষ
াতে পারেন আগে থেকে জানা বা
া সম্ভব নয়। অথচ প্রেক্ষাগৃহের
মনে পনেরদিন আগে থেকে অত্যন্ত
চা হাতের একটি শোকার্ড ছিল,
থানে বিজ্ঞাপিত ছিল রবিশদ্রনাথ
রের "চোখের বালি" রবীন্দ্রসদন।
। শোকার্ডের বানান থেকেই গোষ্ঠীর
ল্যায়ন করতে পারতেন।

চার্বাক সম্প্রদায় প্রযোজনা করলেন
তাঁর ভূত"। নাট্যরূপ ও পরিচালনা
ছন দস্তিদারের। এ নাটক ভূত এবং
ষ্যত দুই-ই। রবীন্দ্রনাথ যে ভাবনা
জ আকারে রেখেছিলেন—কোনদিন
ভাবা ছিল ভবিষ্যতে রীতিসিদ্ধ
চনায় তাঁর বাঁজটুকুই থাকবে?
মন্ত হয়ে উঠবে না? রবীন্দ্র-
থের যে হেয়ালী নাট্য আছে
গুলি কোনক্রমেই নাটক নয়,
কের ইশারা। কিন্তু সংলাপের যে
দুৎচমক, সম্প্রসারণে সেই চমক
তে গেলে যে মুন্সীয়ানা দরকার,
ই রচনাশক্তি অনেকেরই অনায়ত্ত।
। নিপুণ প্রযোজকও শেষ পর্যন্ত
তে বাধ্য হন—রবীন্দ্রনাথের নাটক
ালের বাইরে। অনেক ছোটগল্প বা
থকার সম্প্রসারণ লিপিকা কাব্যের
নাট্যরূপ এই বিভ্রান্তির শিকার
। কর্তার ভূত-এর প্রযোজক ততক্ষণ
ন্তি পান না—যতক্ষণ না কাব্যকে
। করে তোলা যায়। এতে সুবিধা
—স্যাটায়ারের অংশ শেষ হলে,
তীয়ার্ধে নায়ের সমকালীন প্রোজ-

নটীর পূজা

নিপীড়িত, নিষ্পেষিত জনতার
পরিচিত ভঙ্গি দিয়েই কাজ সহজ করে
তোলা যায়। জোছন দস্তিদার অভিজ্ঞ
প্রযোজক—তাই প্রথম থেকে কম্পো-
জিশন বা সংলাপে বৈচিত্র্য আনতে
পারেন—তাই প্রথম চমকটা যে মুগ্ধ
করে সে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার
দাক্ষিণ্যে। যেই নিজের এলাকায়
নাটক নিয়ে আসা হয় তখন সুষমা
পথ হারায়। কবিতার অংশগুলি
নেওয়া হয়েছে গীতবিতানের কিছু গান
থেকে এবং সঞ্চয়িতার বহুপাঠ্য কবিতা
থেকে। আবৃত্তিও খুব কাঁচা। অর্থাৎ
হাতের কাছে যা পাওয়া গেছে তাই
দিয়েই দায় মেটানো। মঞ্চ পরিকল্পনা
খুব সুন্দর। আবহ (পার্থ সেন) এমনি
উপদ্রব এবং শব্দ প্রক্ষেপণ আতঙ্ক
বিস্তার করে।

রঙ্গরূপা মঞ্চস্থ করেছেন 'গোরা'।
এই উপন্যাসের নাট্যরূপ নিশ্চিতভাবেই
কষ্টসাধ্য এবং অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু
নাটক তো "অভিধান" রচনা নয়
যেখানে পরিশ্রমেই মর্যাদা। 'গোরা
উপন্যাসের নাটকীয় সমাপ্তি অনেকেরই
বিস্ময়—নাটকে সেই বিস্ময়কে আরও
ঘনীভূত করা দরকার। সম্পাদনায় নির্দয়
না হলে সেই বিরাট ঘটনাপ্রবাহ শ্লথ
হতে বাধ্য এবং শক্তিশালী অভিনয় না
হলে প্রযোজনা পাঙ্গু হতে বাধ্য।
নির্দেশক সুব্রত মুখোপাধ্যায় অনেক
বিস্তারিত পরিশ্রমেও মূল শর্ত

থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। সুব্রত
মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গির
আধুনিকত্ব অনেক জায়গায় প্রযোজনার
বিরুদ্ধাচারণ করেছে। সেটের বদলে
স্লাইড ব্যবহার কোন মাত্রাই যোগ
করেনি। বরঞ্চ ডাক আউটের পর
সামনের আলো জ্বলে ওঠার পর ওই
স্লাইডগুলি যখন নিষ্প্রভ হয় তখন
চোখের পক্ষে বিরক্তিকর। যত্রতত্র
ফ্রিজের ব্যবহার। নাটকের ঘটনা তুঙ্গে
উঠলে কোন কোন সময় ফ্রিজ নাটকের
গতি আনে, কিন্তু 'গোরা' নাটকের
বিভিন্ন অভিব্যক্তির ফ্রিজ চলচ্চিত্রে
কাজে লাগলেও নাটকে বিপরীত ফল
দেয়। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও
নির্দেশক সম্পাদনায় নির্মম হতে
পারেননি। উপন্যাসে বিরাট অজগর
পরিক্রমা, ব্যাপ্তি অবাক করে—নাটক বা
ছোট গল্পে বন-হরিণীর চকিত
চমকেই অভীষ্ট সিদ্ধি। গোরা উপ-
ন্যাসের প্রায় সব ঘটনাই এখানে
সবিস্তারে অভিনীত। অভিনয়েও
সকলে শক্তিমান নন। প্রত্যেকে কথা
বলেন একই লাইনে দাঁড়িয়ে। একজন
আধুনিক প্রযোজকের কম্পোজিশন
সম্পর্কে এত নিষ্ক্রিয়তা অভাবনীয়,
অভিনয়ে কোন ব্যালান্স নেই—অনেকে
ভাল অভিনয় করলেও সহশিল্পীদের
জন্য ক্রমশ মিইয়ে আসেন। উৎসবে
"ডাকঘর" নাটকে শিশুশিল্পী থেকে
সকলেই মঞ্চে গান করেন—অনেক সময়
খালি গলায় নাটককে ভরিয়ে
তোলেন। আর "গোরা" নাটকে
শিল্পীরা মাইক নিয়ে অভিনয় করলেও
গানগুলি প্লেব্যাক—অনেক যন্ত্র নিয়ে।
পুরোন ফিল্মের মত (এবং এখানকার
বায়োস্কোপ জাতীয় চলচ্চিত্রেও)
শিল্পীরা একা থাকলেও গানের সময়
যন্ত্র-দঙ্গল বেজে ওঠে। একজন
আধুনিক প্রযোজক এই পুরোন
ব্যবস্থাকেও সময় বিশেষে স্বাগত
জানান।

**অনন্ত কর্মকার**

ছবি : পি এন ব্যানারজি

## নকশাল আন্দোলন : চারণদলের সমীক্ষণ

রাজনৈতিক নাটকের সংজ্ঞা কি
হওয়া উচিত—এমন একটি প্রশ্নের
এ পর্যন্ত আমরা পাইনি। ফলত,
এর ব্যাখ্যা চলছে পন্থীগতবোধ এবং
ব্যক্তিগত রাজনৈতিক আগ্রহ ও
অনীহার ভিত্তিতে। যত বড় রসবেত্তাই
হোন শিল্পজিজ্ঞাসা বা বিচারে এর
প্রভাব এড়ানো দুষ্কর। এমন অবস্থায়
রাজনীতিতে নির্মোহ শিল্পের শুচি-
বায়ুগ্রস্ত পূজারীও এটা নিশ্চয়ই
স্বীকার করবেন যে, শিল্প নিয়ে রাজ-
নীতির তুলনায়, রাজনীতি নিয়ে
শিল্প করাটা অধিকতর কাম্য। কারণ,
নিশ্চিতভাবে তা কল্যাণমুখী।

'নকশাল আন্দোলন তার
সজীবতা ব্যর্থতা আত্মত্যাগ এবং
আত্মজিজ্ঞাসা' এই শিরোনামায়
'চারণদল' তাঁদের বর্তমান প্রযোজনায়
সে চেষ্টাই করেছেন। এখানে
একটি কথা উল্লেখ করতে হচ্ছে,
প্রাগুক্ত শিরোনামটিকে প্রচলিত
অভিজ্ঞতায় কেউ যেন নাটকের নাম
বলে ভুল না করেন। আসলে বিষয়-
বস্তুকে সামনে রেখে প্রযোজনাটিকে
চিহ্নিত করা হয়েছে মাত্র, নাটকটির
'যথাযথ নামকরণের' দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট
নাট্যকার এক্ষেত্রে দর্শকদের হাতে
অর্পণ করেছেন। এর পেছনে যদি

কোনো মতলবও থাকে তবে তাতে আর
যাই হোক, নাটকটির সংগে দর্শকের
সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয় না, বরং কিছু বেশি
অন্বিত করে। এবং এই অন্বিত হবার
সূত্রেই টের পাওয়া যায়, নাট্যকার
অলক রায়চৌধুরী নাটকটি গুছিয়ে
লিখতে পারেননি।

এই না-পারার কারণ, বাহ্যত,
নাটকের সময়সীমার তুলনায় বিষয়-
বস্তুর বাহুল্য। এছাড়া, বিশেষ একটি
রাজনৈতিক চেতনার সপক্ষে মানস-
বিবর্তনের বিভিন্ন সমস্যাগুলো নাট্য-
কার উপলব্ধি করেও, তার সুষ্ঠু
ব্যাখ্যা করতে পারেন না, কিংবা
(হয়তো) পরিসরের কথা ভেবেই
এড়িয়ে যান। ফলত, শ্রেণীসংগ্রামের
জটিলতাগুলোকে যে সকল বক্তৃতা-
ধর্মী সংলাপ তথা আঙ্গিক সূত্রে
স্বচ্ছ করতে চান তিনি, তাতে
প্রকারান্তরে অনেক বাস্তবিকতাই
সংকুচিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন চরিত্রের
অস্থির বিশ্লেষণে যুক্তির তুলনায়
আবেগটাই প্রাধান্য পায়।

প্রসংগত সন্দীপ চরিত্রটিই স্মরণ
করা যাক। পুলিসের হাতে চরম
নিগৃহীত হয়ে সে যখন বলে ওঠে :
'আমি এই মুহূর্তে আমার নিজের
শক্তি সম্পর্কে বুঝতে পেরেছি' তখন

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই (বীররসে আপ্লুত হয়ে) স্ফূর্ত হাততালি দিয়ে ফেলেন। পরমুহূর্তে সন্দীপ নাটকীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করে। দৃশ্যটি দর্শকদের কি দিল? সন্দীপের এই আত্মজয় কি অনেকটাই মঞ্চে মেরে দেবার মতো ব্যাপার হয়ে রইল না? যেটা আকস্মিক ঘটনামাত্র, এবং যা একজন বিপ্লবীর 'রাজনৈতিক বিশ্বাসে স্থির হবার' পূর্বকালীন মানস প্রস্তুতিটাকে প্রকারান্তরে অনেকটাই লঘু করে দেয়। আমার ধারণা, এখানে দৃশ্যটি ব্যতিক্রম ঘটনার প্রতিভূ মাত্র, যার সংকলনে নাটকটির নাটকীয়তা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু আন্তর শক্তিতে সন্দিহান একজন রাজনৈতিক কর্মীর সমস্যা উত্তরণের সমাধানসূচক আদৌ কোনো দৃষ্টান্ত নয়। অথচ এই প্রযোজনায় সেটাই কাম্য ছিল।

নকশাল আন্দোলনের ব্যাপ্ত কর্মযজ্ঞে যাঁদের অংশগ্রহণ তাঁদের অধিকাংশই তরুণ এবং যুবা। বয়সটি এমন একটি বয়স যখন সহজাত প্রবৃত্তির দাবিতেই বিপরীত আসঙ্গ-লিপ্সা তীব্রতর হয়ে ওঠে। শ্রেণী-সংগ্রামে অংশীদার যে মানুষ তারও কিছু না কিছু প্রেম তথা হৃদয়বৃত্তির সমস্যা থাকতেই পারে। এটা অস্বীকার করা দিনদুপুরের অলোয় সূর্যকে অস্বীকার করার মতোই অপলাপ মাত্র। নাটকের বিন্যাস অনুযায়ী রুদ্র ও জয়ীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে দর্শক হিসেবে আমাদের তেমন কোন মাথাব্যথা ছিল না, কিন্তু সন্দীপ যখন বলে 'আমার জীবনে কোনো বান্ধবী জোটেনি' কিংবা রুদ্রর প্রতি মৃত্যুনের আনুগত্য সম্পর্কে জয়ী প্রশ্ন তুললে মৃত্যুন যখন জানায়, 'যেভাবে তুমি ওকে শ্রদ্ধা কর ভালবাসো সেভাবে নিশ্চয়ই না' তখন আমাদেরকে প্রাসঙ্গিক সমস্যাটি বেশ কিছুটা নাড়া দেয়। এবং এইখানেই নাট্যকারের অখণ্ড জীবনবোধের পরিচয় মেলে যখন দেখি একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপরেখা আঁকতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সদ্যকথিত সমস্যা-টিকে তিনি চেপে দেননি। কিন্তু আক্ষেপ, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই এই সমস্যা সমাধানের জরুরী ইঙ্গিতটুকু পর্যন্ত বর্তমান নাটকে অনুপস্থিত।

নাটকের এইসব ত্রুটি বিচ্যুতি-গুলোতেই নাট্যকার স্বয়ং একাধিক-বার হোঁচট খেয়েছেন নির্দেশকের ভূমিকায়, কিন্তু কোথাও মুখ থুবড়ে পড়েননি, নির্দেশনার যা কিছু বাহাদুরী সেখানেই। অভিনয়ে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি চরিত্রায়ণ (যেমন স্বপ্না মিত্রর স্বর্ণময়ী এবং বিশ্বরঞ্জন বসুর ও সি) সমীহ দাবি করলেও দলগত নৈপুণ্যের প্রশ্নে চারণদল এখনো বিশেষ কোনো উৎ-কর্ষে পৌঁছতে পারেননি। এরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্ণ সেন, অনীতা অধিকারী, সত্য দাশগুপ্ত, অসীম চ্যাটার্জী, অলক রায়চৌধুরী প্রমুখ। তবে হ্যাঁ, রুদ্র চরিত্রে অলকবাবুর ——— ভিলেনী-গাম্ভীর্য অবশ্যই বর্জন করা উচিত। নির্দেশনা যেখানে কিছু দ্বিধাগ্রস্ত সেখানে নির্দেশকের সংগীত পরিকল্পনা বরং অনেক বেশি লক্ষ্যস্থির। পরিবেশিত গানে সুরের ভাবানুষঙ্গ নিঃসন্দেহে মন টানে। তড়িৎ চৌধুরীর মঞ্চ পরিকল্পনায় বাহাদুরী কিছু লক্ষ্য করিনি। চিত্ত সরকারের আলোয় একবারই কল্পনা কুশলতার পরিচয় মেলে, ক্ষিপ্র যুবকদের দ্রুত পোস্টার মারার দৃশ্যটিকে যখন তিনি বাঙ্ময় করে তোলেন।

**রাণা দাস**
ফটো : শীতল দাশ

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **বিবিধ**

## কাজী সব্যসাচী স্মরণে

'রসকলি' সংস্থার উদ্যোগে প্রয়াত কাজী সব্যসাচীর স্মরণে তাঁর নামাঙ্কিত পুরস্কার ও বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম বছরের অনুষ্ঠানটি নিবেদিত হল গত ১৪ জুন, সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে।

আবৃত্তির জন্য পুরস্কার পেলেন পুরুষ ও মহিলা বিভাগে, যথাক্রমে শম্ভু মিত্র এবং গৌরী ঘোষ। শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠিতে খুবই যোগ্য নির্বাচন। বেতার ঘোষক রূপে পুরস্কৃত হলেন অমিয় চট্টোপাধ্যায়। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পেলেন সংবাদ পাঠক হিসেবে প্রথম বছরের পুরস্কার। এ-ছাড়া তরুণ প্রতিভা রূপে বৃত্তি পেলেন কৃষ্ণকলি বসু ও তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁরা পেলেন ২৫১ টাকা করে সেই সঙ্গে অভিজ্ঞান পত্র।

শম্ভু মিত্র অনুপস্থিত ছিলেন সেদিন। সভাপতি সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর ভাষণে কাজী সব্যসাচীর অবদান স্মরণ করলেন, সেই সঙ্গে আবৃত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করলেন অতি মনোগ্রাহী ভঙ্গিতে। রমা চৌধুরী পুরস্কার প্রাপকদের হাতে তুলে দিলেন তাঁদের প্রাপ্য সম্মান ফলক ও স্বীকৃতি পত্র।

অনুষ্ঠানের আরম্ভে ছিল কাজী সব্যসাচীর কণ্ঠের কয়েকটি আবৃত্তি। শিহরণ-জাগানো উদাত্ত কণ্ঠের নিবেদন স্মৃতিভারাতুর করে তুলেছিল শ্রোতৃমণ্ডলীকে। পুরস্কার গ্রহীতারাও অংশ নিলেন এ-দিনের আবৃত্তিতে। গৌরী ঘোষের নির্বাচনে ছিল সূক্ষ্ম অনুভব ও তাৎপর্য। রবীন্দ্রনাথের 'দান' ও বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের 'যোগ্যতার জন্য' বেছে-ছিলেন তিনি। তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে-রকম সুর করে পড়লেন, তা বৈচিত্র্য আনতে পারে, কিন্তু কবিতার রসকে ক্ষুন্ন করেছে। কৃষ্ণকলি বসুর কণ্ঠে জীবনানন্দের 'তিমির হননের গান' ভালো লেগেছে। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিয় চট্টোপাধ্যায়ও ভালো পড়েছেন সেদিন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল 'রসকলি'র ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশিত নৃত্যানুষ্ঠান। রবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নিবেদিত এই অনুষ্ঠানটিও ছিল অতি হৃদয়গ্রাহী।

**প্রণব মুখোপাধ্যায়**

# আপনি কি আপনার পায়খানা সম্বন্ধে সামান্য লজ্জিত?
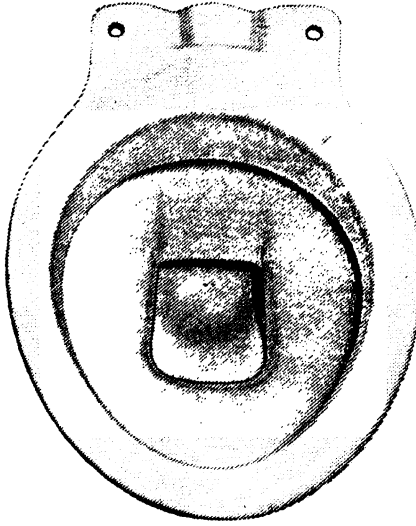
আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই নিজেদের পায়খানার হাল সম্বন্ধে বিব্রত বোধ করেন। বিব্রত বোধ করাই সবটা নয়। তার চেয়েও সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হল:

**নোংরা পায়খানায় রোগের জীবাণু জন্মায় আর সেখান থেকে রোগ সংক্রামিত হয়। ময়লা পায়খানা আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক।**

সেই জন্যে অবহেলা করবেন না। আপনি কি একেবারে নিশ্চিত জানেন যে, আপনার পায়খানা পরিষ্কার? রোজ সকালে মেথর এলেও সে কি তার কাজ পুরোপুরি করছে? কিম্বা তাড়াতাড়ি কাজ সেরে পালাচ্ছে? এসব ব্যাপারে আপনি আপনার বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলে ব্যবহার করুন—স্যানিফ্রেশ।

**স্যানিফ্রেশ—পায়খানা পরিষ্কার করার শক্তিশালী পদার্থ।**

**স্যানিফ্রেশ ৩ ভাবে কাজ করে:**

**১. স্যানিফ্রেশ সব দাগ উঠিয়ে দেয়**

স্যানিফ্রেশ আপনার পায়খানা পুরোপুরি পরিষ্কার করে। এতে রয়েছে এমন জোরালো পরিষ্কার করার পদার্থ যা খুব শক্ত দাগও নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এমনকি মরচের দাগও উঠে যায়। ফলে আপনার পায়খানা পরিষ্কার হয়ে ঝকঝক করে।

**২. স্যানিফ্রেশ রোগজীবাণু দূর করে**

নোংরা পায়খানা সাঙ্ঘাতিক বিপজ্জনক, কারণ সেখানে রোগের জীবাণু জন্মায়। সাধারণ 'ফিনাইল' যা রক্ষা করতে পারে না স্যানিফ্রেশ তা রক্ষা করে—আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।

**৩. স্যানিফ্রেশ দুর্গন্ধ দূর করে।**

বিশেষ ক'রে যে পায়খানায় হাওয়া-বাতাস খেলে না সেখানকার দুর্গন্ধ তো যেতেই চায় না। সেই জন্যে স্যানিফ্রেশে রয়েছে এমন অত্যন্ত কার্যকর দুর্গন্ধনাশক পদার্থ যা হাওয়া নির্মল ক'রে তোলে আর বদ গন্ধ দূর করে।

**স্যানিফ্রেশ ব্যবহার করা খুবই সহজ**

বিশেষ কিছু করতে হয় না বললেই চলে। প্রথমে পায়খানায় জল ঢেলে দিন। তারপর পায়খানার গামলার মধ্যে প্রচুর স্যানিফ্রেশ ছিটিয়ে দিন। ৩-৪ ঘন্টা ওই ভাবে রেখে দিন। আরও ভাল হয় একরাত রেখে দিলে। তারপর জল ঢেলে দিন। তাতে যদি তেমন পরিষ্কার না হয় তাহলে এক বালতি জল জোরে ঢেলে দিন। তারপর দেখুন আপনার পায়খানা কেমন ঝকঝকে পরিষ্কার দেখাচ্ছে।

স্যানিফ্রেশ কতবার ব্যবহার করা দরকার?
নিয়মিত—প্রত্যেক দিন ব্যবহার করুন।

**নকল হইতে সাবধান!**
**প্যাকের ওপর**
**স্যানিফ্রেশ**
নাম দেখে নিন।
এ হলো — বালসারার
সেরা কোয়ালিটির গ্যারান্টী

**স্যানিফ্রেশ সব ময়লা দূর ক'রে আপনার পায়খানা পরিষ্কার রাখে।**

CHAITRA-BLS-85 BEN REV

দেশ
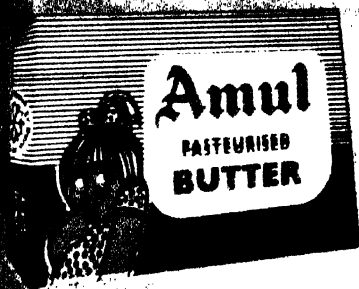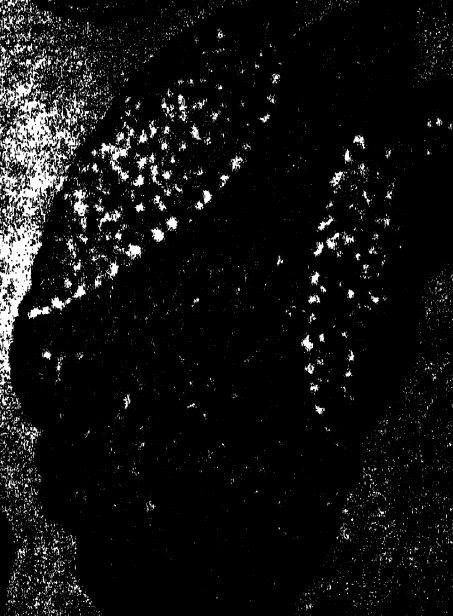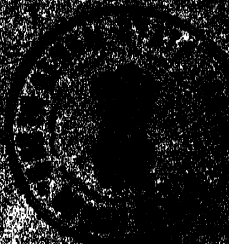
# দেখে এল, মাগো ভোলীটা!

নতুন স্বাদের
এনেছে উপহার,
জেলী আর
কাস্টার্ড মজাদার!
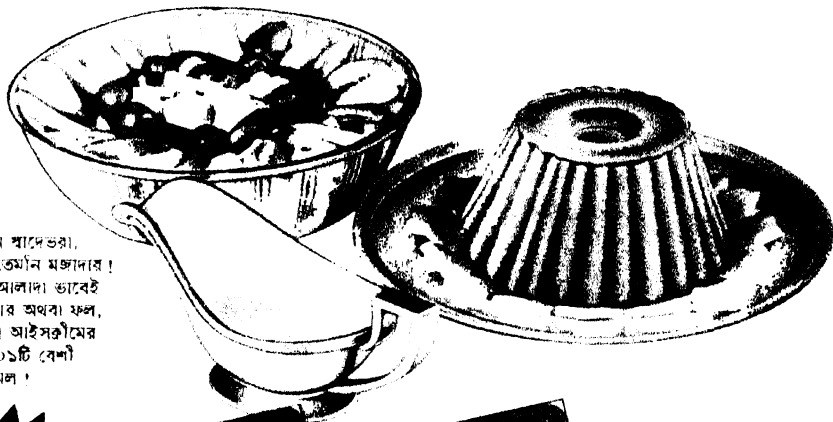
ভোলিটা জেলী হ'ল যেমন স্বাদেভরা,
ভোলিটা কাস্টার্ড আবার তেমনি মজাদার!
এর স্বাদের মজা আলাদা আলাদা ভাবেই
চাখুন বা দুটি একসঙ্গে, আর অথবা ফল,
শুকনো মেওয়া, কেক আর আইসক্রীমের
সঙ্গেই খান... করা যায় ১০১টি বেশী
মুখরোচক স্বাদের জোড়-মিল!

কাস্টার্ড।
ভিটামিন ভরা
৬টি
মনমাতানো স্বাদ!

Volita
CUSTARD POWDER
ARTIFICIALLY FLAVOURED
VANILLA

Volita
JELLY CRYSTALS
ARTIFICIALLY FLAVOURED
PINEAPPLE

জেলী ৪ রকম

ভোলীটা
জেলী আর ক্রিস্ট্যাল্‌স
ও কাস্টার্ড পাউডার

ULKA-VDF-1-BN

## চিঠিপত্র

### কিংকরদা

১৬-৮-৮০-র 'দেশ'এ প্রকাশিত 'কিংকরদা' (শ্রীপ্রভাস সেনের) প্রবন্ধে একটি তথ্যগত ভুল চোখে পড়ল। শ্রীসেন লিখছেন, 'রামকিংকর শান্তিনিকেতনে আসবার পূর্বেই ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে স্টেলা ক্রামরিশ....সুররিয়ালিজম প্রভৃতি ইউরোপীয় শিল্প আন্দোলনের ধারাগুলির সঙ্গে কলাভবনের ছাত্র ও শিক্ষকদের পরিচিতি ঘটে।'

অদ্ভুত কথা।

সুররেআলিজম-এর জন্ম ১৯২৪-এ। অথচ ক্রামরিশ ১৯২১-এ এই আন্দোলনের ওপর বক্তৃতা দিলেন? এ যে রামের আগেই রামায়ণ গান।

আমার বক্তব্যের সপক্ষে হার্বার্ট রীড-এর কটা লাইন উদ্ধৃত করছি—The Surrialistes were preceded by a group known as th: Dadaistes, .. .. It was bourne at Zurich in 1916 and died at Paris in 1924. In 1924 Su rial isme' rose from the a hes — and took definite shape in a ma ifesto issued by the poe' Andre Freton.

— Art Now, Faber, 1968, p. 95

পরেশ মন্ডল
বারুইপুর

### রামকিংকর সম্পর্কে

'দেশ' (৪২ সংখ্যা ১৬ আগস্ট, ১৯৮০)-এ প্রকাশিত রামকিংকর সম্পর্কে প্রভাসদা (সেন) এবং পূর্ণেন্দু পত্রী মহাশয়ের লেখা দুটি আমার ভীষণ ভাল লেগেছে। ওঁদের বলিষ্ঠ লেখনী রামকিংকরের চিত্র ও ভাস্কর্য কলার উপর বিশেষ আলোকপাত করেছে যা সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে।

কিন্তু, পূর্ণেন্দু পত্রী মহাশয়ের লেখায় (রামকিংকর ভূমন্ডল) উনি লিখেছেন "যখন সময় বা ইতিহাস চেতনার শিল্পী তিনি গড়ছেন ভিস্তিওয়ালা, কাঁধের বাঁকে সংসার এবং শিশুকে বয়ে নিয়ে যাওয়া সাঁওতাল দম্পতি...." ইত্যাদি। পূর্ণেন্দুবাবু হয়ত বা ভুলক্রমে ভিস্তিওয়ালা মূর্তিটি কিংকরদা গড়েছেন বলে লিখেছেন। আসলে ভিস্তিওয়ালা মূর্তিটি কিংকরদার গড়া নয়। ভিস্তিওয়ালা গড়েছেন ওঁরই একজন ছাত্র সুরেন দে, বর্তমানে কলাভবনে ভাস্কর্যকলার শিক্ষক।

বিপুলকান্তি সাহা
আগরতলা

### রবীন্দ্র পত্রাবলী

'দেশ'-এর (৬ সেপটেমবর) 'সাহিত্য' পৃষ্ঠায় বিশ্বভারতীর অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যকে তাঁর 'রবীন্দ্র পত্রাবলী : একটি তথ্যপঞ্জী' লেখার জন্য ধন্যবাদ। অমিত্রসূদনবাবুর লেখা থেকেই জানতে পারলাম শ্রীগৌরচন্দ্র সাহা একক প্রয়াসে রবীন্দ্রনাথের মুদ্রিত সমূহ চিঠিপত্রের একটি মূল্যবান কালানুক্রমিক সূচী ও তৎসহ এক বিস্তৃত তথ্যপঞ্জী প্রস্তুত করেছেন। ৬১৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বাংলায় টাইপ করা ওই তথ্যপঞ্জীর একটি কপি গৌরবাবু বিশ্বভারতীর হাতে তুলে দিয়েছেন। পঞ্জীর চিঠির সংখ্যা ৪০৮৮। তাছাড়া 'সংযোজন'-এ আরও কিছু চিঠির সংবাদ সংকলিত হয়েছে। কিন্তু সংবেদনার কথা অক্লান্ত পরিশ্রমে সংগৃহীত রবীন্দ্র পত্রের এই মহৎ অর্ঘ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার জন্য এখনও পর্যন্ত কোন প্রকাশক এগিয়ে আসেননি।

অথচ রবীন্দ্রনাথের একটি বড় পরিচয় রয়েছে তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে। সমগ্র জীবনে কবি সহস্রাধিক মানুষকে যে বিপুল সংখ্যক চিঠি লিখেছেন—তার সঠিক পরিমাণ নিরূপণ করা সহজসাধ্য নয়। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশ করেছেন, তাতে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী মুদ্রিত হয়নি। হিসেব নিয়ে দেখা গেছে, বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে রবীন্দ্রনাথের যে চিঠিপত্র ছাপা হয়েছে, তারই পরিমাণ পাঁচ সহস্রের অধিক। এ ছাড়া আছে তাঁর অপ্রকাশিত চিঠিপত্রের বিপুল সম্ভার। বছর দুয়েক আগে অমিত্রসূদনবাবু আসামের তিনসুকিয়ায় নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে বলেছিলেন, শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনের ঠান্ডা ঘরে রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠিগুলির পান্ডুলিপি সযত্নে রক্ষা করা হচ্ছে। সম্মেলনে তাঁর প্রশ্ন ছিল, রবীন্দ্রনাথ আজও পত্রে অপ্রকাশিত থাকবেন কোন কারণে?

আমার মনে হয়, বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগ একটু সচেষ্ট হলেই গৌরবাবুর সংগৃহীত রবীন্দ্র পত্রাবলী অবিলম্বেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হতে পারে। এজন্য আর তাঁকে বাইরের কোন প্রকাশকের কাছে ধর্না দেবার দরকার হবে না।

রবীন্দ্রনাথের পান্ডুলিপিগুলিও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রতিভার আর এক আশ্চর্য পরিচয়। কী অসাধারণ পরিশ্রমী লেখক ছিলেন তিনি। কোন লেখাই একবার লিখে সন্তুষ্ট হতে পারতেন না। সংশোধন করতেন পরিশোধন পরিবর্ধন করতেন। আরও সুন্দর করে তোলার চেষ্টা করতেন। লেখার খাতায় তিনি নিজেই নিজের মস্ত সমালোচক ছিলেন। পান্ডুলিপির দু-একটি কপিতে চোখ বোলালেই এর সত্যতা ধরা পড়বে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে কঠিন সমালোচক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই। অমিত্রসূদনের সেদিনকার বক্তৃতা থেকে জেনেছি রক্তকরবী নাটকের কবিকৃত দশটি সম্পূর্ণ পান্ডুলিপি আছে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র-সংগ্রহালয়ে। একটি খাতার সঙ্গে আর একটি খাতার অনেক প্রভেদ। নিজের লেখা যতক্ষণ নিজের কাছে পছন্দ না হচ্ছে, ততক্ষণ তাঁর তৃপ্তি নেই, শান্তি নেই। উপন্যাস, নাটক, কবিতা, গান—সব রচনাতেই তাঁর সংশোধন কর্মের পরিমাণ প্রচুর। কৌতূহলী পাঠক মাত্রেরই আগ্রহ হয় রবীন্দ্র রচনার আদিপাঠ কি রকম ছিল। রবীন্দ্র পান্ডুলিপির ফটোস্টাট কপির একটা নির্বাচিত সংগ্রহও বিশ্বভারতীর

# শিশুর খাবারে বৈচিত্র্য আনুন ওকে দিন
# সেরা চাল থেকে তৈরি এমন খাবার যা সহজে হজম হয়

আপনার শিশু ৪ মাসের হলে ওকে কিছু শক্ত খাবার দিতে শুরু করুন। আর ওর পক্ষে সবচেয়ে ভালো শক্ত খাবার হল নেস্টাম বেবি সিরিয়াল

**সহজেই হজম হয়।**

চাল থেকে তৈরি এই খাবার খুব সহজেই হজম হয়ে যায়।

**অসাধারণ**

প্রথমে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে নেস্টাম দিতে শুরু করুন। সেদ্ধ ফল, রান্না করা ও ম্যাশড শাকসব্জী ও চালের সঙ্গে মিশিয়ে নেস্টাম দিন।

# নেস্টাম
## বেবী সিরিয়াল
## রাইস

সহজেই তৈরি করা যায়
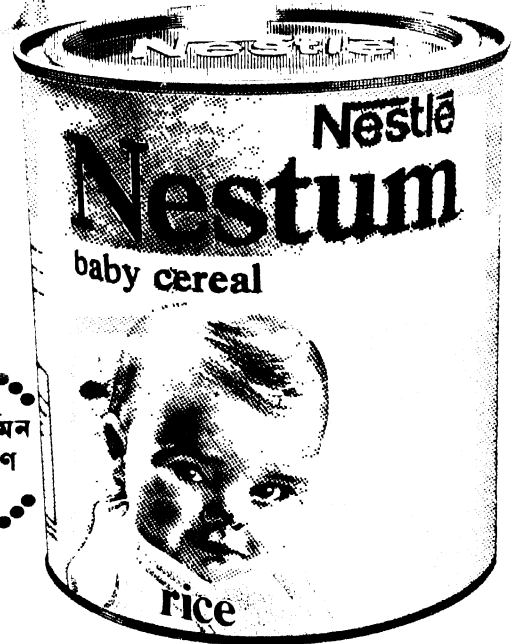
১১টি ভিটামিন ও আয়রণে সমৃদ্ধ

NESTLÉ

SAA/FSL N 1554 BEN

প্রকাশ করা উচিত। রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপির মূল্য দ্বিবিধ। এক, তার সাহিত্যিক মূল্য, আর দ্বিতীয় তার শিল্পমূল্য। শিল্প অর্থে ছবি। তাঁর লেখার খাতাগুলির প্রতিটি পৃষ্ঠা গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করতে হয়। কাটাকুটির বিরাম নেই। কিন্তু সেই কাটাকুটিই কখন যে অলক্ষ্যে এক-একটি সুন্দর সম্পূর্ণ ছবি হয়ে উঠছে তা দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। এসব ছবি তো তিনি কখনও প্রকাশের জন্য আঁকেননি—তাই এ ছবির মূল্য আমাদের কাছে আরও তাৎপর্যপূর্ণ দেখা দরকার, যে পৃষ্ঠায় কয়েকটি ছত্র কেটে একটি ছবি অঙ্কন করলেন, সেই পৃষ্ঠার বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে অঙ্কিত চিত্রটির কোন সম্পর্ক বা যোগসূত্র আছে কিনা। কোথাও কোথাও যে আছে তা সাধারণভাবে দেখলেই বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের এই বিপুল শিল্পকর্ম আজও অপ্রকাশিত। রবীন্দ্র রচনাবলীতে এই সব ছবি কি ইলাস্ট্রেশান হিসাবে ব্যবহার করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ ছবির জন্য ছবি এঁকেছেন পেনসিল এবং রং তুলি দিয়ে হাজার তিনেক। এতগুলি ছবির মধ্যে কটি ছবি পৃথিবীর মানুষ দেখেছে, আমরাই বা কটি দেখতে পেয়েছি? তাঁর আঁকা যে কয়টি রঙীন ছবি ছাপানো হয়েছে, তা হাতে গুনে বলা যায়। বাকি সব আজও সাধারণের চোখের অন্তরালে। কিন্তু কেন?

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'যিনি সুকবি, তিনিই সুগায়ক, ইহা অতি বিরল।'—রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই বিরল দৃষ্টান্তের অধিকারী। তিনি একাধারে সুকবি এবং সুগায়ক। সুকবি রবীন্দ্রনাথকে আমরা সকলেই চিনি জানি; কিন্তু সুগায়ক রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কণ্ঠ জানবার উপায় আজ আর আমাদের কাছে নেই। তাঁর গাওয়া যৎসামান্য কণ্ঠ আমরা ধরে রাখতে পেরেছি। তাও রেকর্ডিংয়ের দোষে সুশ্রাব্য নয়। অথচ রবীন্দ্রনাথের গলা যে কি মধুর ছিল—তা কবি নিজেও স্বীকার করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের গীতবিতানও তো আমার জীবনের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু তিনি যে গানও গেয়েছিলেন—সেই কথাটি মনে রাখবার মত কোন ভাল রেকর্ড বা টেপ আজ আর আমাদের কাছে নেই। কেবল নানা জনের স্মৃতিকথায় জানতে পারি রবীন্দ্রনাথ সুগায়কও ছিলেন। সভা-সমিতিতে বক্তৃতার পর এখন যেমন হেমন্তকুমার মান্না দের মত শিল্পীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাই [illegible] বক্তৃতার পর শ্রোতৃমণ্ডলী দাবি জানাতো—রবিবাবুর একটা গান, রবিবাবুকে একটা গান বলো। [illegible] এই বক্তব্যের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত যে অপ্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ করার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে [illegible] সরকারের উপর [illegible] সরকারকে এ বিষয়ে ভাবাইতে অবিলম্বে এই নতুন বই প্রকাশে [illegible] থেকে কাজে লেগে পড়তে হবে।

সুদেব রায়চৌধুরী

## 'পপ' সাহিত্য

৩০ আগাস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত অরবিন্দ ঘোষের লেখা আমেরিকার 'পপ' সাহিত্য' বেশ আকর্ষণীয় ও উপাদেয় হয়েছে। এই লেখায় একটি বইয়ের নাম দেখলাম না। লেখিকা গ্যাব্রিয়েল ব্রাউন। সংক্ষেপে বইয়ের নাম 'দি নিউ সেলিবেসী'। নাম খুব লম্বা। অনুবাদ করলে দাঁড়ায় অনেকটা এইরকম: নতুন ব্রহ্মচর্য—কেন নারী-পুরুষ সেক্স থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যে আমেরিকায় পপ সাহিত্যে, সিনেমায়, নাটকে সেক্স নিয়ে হইচই, সেখানে এই ধরনের বই হঠাৎ চমক সৃষ্টি করে বসবে এতে আশ্চর্য কি। বইটির বিক্রীর বহর দেখে কিছু প্রকাশক চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এই আশঙ্কা আরও অনেকের। এক বহুল প্রচলিত পত্রিকার সম্পাদিকা তাঁর ১ লক্ষ ৬ হাজার পাঠকের মধ্যে একটা সমীক্ষা করে বলেন যে, উক্ত বইয়ের কোন প্রতিক্রিয়াই নেই পাঠক মহলে। অন্যদিকে লেখিকা দাবি করেছেন যে তাঁর এই প্রেসক্রিপশানে বহু নরনারী কাম-সংযম শুরু করে দিয়ে আরও বেশি জীবনকে উপভোগ করতে পারছেন। সেইসব মানুষের একটা তালিকাও দিয়েছেন তিনি। তার মধ্যে আছে বিখ্যাত চিত্রকর অ্যান্ডি ওয়ার-হোলের নাম।...এই হচ্ছে আমেরিকা। এইসব লেখার সবচেয়ে বড় গুণ হলো গল্প। পপ লেখকের গল্প বলার ক্ষমতা নিঃসন্দেহে ঈর্ষণীয়। তাছাড়া নতুন নতুন বিষয় নিয়ে লেখবার সময় তা নিয়ে পরিশ্রম করারও একটা প্রবণতা এঁদের মধ্যে থাকে। যার জন্য গল্পের বিষয়কে কখনও খেলো ও অবিশ্বাস্য মনে হয় না। অনেকের ভাষাই বেশ আকর্ষণীয়। এই লেখকরা 'হিপোক্রেসী' করে না। সোজাই বলেন—পয়সার জন্য লিখি। এইসব নিয়েই আমেরিকার পপ সাহিত্য।

মোটামুটিভাবে পৃথিবীর সব সাহিত্যেই একদল লেখক থাকেন যাঁরা 'পপ' লেখার দ্বারাই সাহিত্যিক হিসেবে চিহ্নিত। বাংলাতেই কি তাঁরা অনুপস্থিত। 'পপ' সাহিত্য এখানেও চলছে। কেউ আজ পর্যন্ত কোন সংজ্ঞা নির্ধারিত করেননি। আসলে এ বিষয়ে পাঠকরা এগিয়ে না এলে কিছু হবে না।। কিন্তু তা কোনদিনই বোধ করি সম্ভব হবার নয়। জীবনযাত্রার ক্রমশ যে জটিলতা, অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার থেকে মুক্তি পাবার জন্য মানুষ এই ধরনের লেখা, সিনেমা, নাটক খুঁজবেই।

জীবনময় দত্ত

পাটনা-২০

## চিত্রকলা

৬ সেপ্টেম্বর দিনাঙ্কিত দেশ পত্রিকার চিত্রকলা বিষয়ক আলোচনা যেখানে সুন্দরী নারীরা আসে যায় মুখে তাদের যামিনী রায়' এ পত্রের প্রসঙ্গ। অপ্রাসঙ্গিকভাবে বাড়তি কথা বললে বাজে

কথা বলার সম্ভাবনা অযাচিত ভাবে বেড়ে যায়। ঐ লেখায় বর্ণিত এলিয়টের কবিতাটির সঠিক নাম 'দি লাভ সঙ অফ জে অ্যালফ্রেড প্রুফ্রক', 'দ্য লাভ সঙ অফ আলফ্রেড জে জে প্রুফ্রক' নয়। উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তি দুটির যথার্থ পাঠ, 'ইন দি রুম উইমেন কাম এন্ড গো/টকিং অফ মিকেলাঞ্জেলো।' লেখক তাঁর খোয়াব দেখা 'লাভলি' হুরীদের যদি এলিয়ট সাহেবের কাঁধে চাপিয়ে দেন তো সাহেব বেহেস্তেও শান্তি পাবেন না। দ্বিতীয়তঃ লেখকের উল্লেখিত সৈয়দ সুরাবর্দী নামক ব্যক্তিটির যথার্থ নাম শাহেদ সোহরাবর্দী। সোহরাবর্দীরা বোধ হয় সৈয়দ শ্রেণীভুক্ত নন। সৈয়দ লিখলে তেমনই একটা ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে।

**প্রণবরঞ্জন রায়**
**কলকাতা-২৯।**

## পুরুলিয়ার ঝুমুর

'দেশ' পত্রিকায় রাজ্যেশ্বর মিত্রের 'পুরুলিয়ার ঝুমুর ও ঝাড়খণ্ডী কীর্তন' শীর্ষক প্রবন্ধটি কিছুটা অভিনবত্ব দাবী করতে পারে।

ঝুমুর সম্পর্কে আমার আগ্রহের কারণ হলো আমার বাসস্থান অজয় নদের তীরে, নদী পেরোলেই সাঁওতাল পরগণা। স্বাভাবিকতই এতদঞ্চলে ঝুমুর গানের একটা ক্ষীণ স্রোতোধারা এখনও প্রবহমান। আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় নিত্যানন্দ দাস বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে রেডিও মারফত এবং হিজ মাস্টার্স ভয়েস থেকে প্রচুর ঝুমুর গান প্রচার করেছেন।

যাঁরা রাজ্যেশ্বর মিত্র মহাশয়ের প্রবন্ধটি পড়বেন তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন অধুনা প্রচারিত ঝুমুর নামাঙ্কিত রেকর্ডের গানগুলিকে কোনক্রমেই ঝুমুর আখ্যা দেওয়া যায় না, এগুলিকে পুরুলিয়ার লোকগীতি বা বীরভূমের লোকগীতি বলা যেতে পারে। পুরুলিয়ার কুড়মি বা মাহাতো সম্প্রদায়ের মধ্যে একপ্রকার লোকগীতি প্রচলিত যেগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে ঝুমুর বলে মনে হতে পারে—এ ছাড়া বীরভূমের কাহার সম্প্রদায়ের একপ্রকার গানের সুরেও ঝুমুরের প্রভাব আছে। যেহেতু একদা মানভূম, সিংভূম, বরাভূম, শিখরভূম, ধলভূম, বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা বর্ধমানের আসানসোল মহকুমা জুড়ে ঝুমুর গানের ব্যাপক প্রচলন ছিল, সেহেতু ভাদুগান ছাড়া প্রায় সব লোকসংগীতেই ঝুমুরের সুরের প্রভাব পড়েছে। কিন্তু তাই বলে সব গানকেই ঝুমুর গান আখ্যা দেওয়া যায় না। ঝুমুরের একটা পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে।

শ্রীযুক্ত মিত্র মহাশয়ের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করি যে, পুরুলিয়ার ঝুমুরের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ না রেখে তিনি সম্পূর্ণ ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলের ঝুমুর গান নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করতে পারতেন। এছাড়া আজকে যে জেলাটির নাম দেওয়া হয়েছে পুরুলিয়া সেটি ছিল আসলে মানভূম জেলা। মানভূম জেলার একাংশ বর্তমানে ধানবাদ জেলা। বিহার প্রদেশে অবস্থিত হলেও এই জেলার গ্রামাঞ্চলে প্রচুর বাঙালীর বাস এবং এখানে এখনও ঝুমুর গানের চর্চা হয়। মিত্র মহাশয়ের প্রবন্ধে উল্লিখিত ভবপ্রীতানন্দ ওঝার ঝুমুর গান সাঁওতাল পরগণার দুমকা, দেওঘর, মধুপুর, জামতাড়া, গোড্ডা ইত্যাদি মহকুমায় এখনও সমান জনপ্রিয়। বলা বাহুল্য, ধানবাদের মত সাঁওতাল পরগণা জেলা বিহারে অবস্থিত হলেও এ জেলার গ্রামাঞ্চলে বিশেষত জামতাড়া, মধুপুর, দেওঘর ইত্যাদি মহকুমার বেশির ভাগ অধিবাসী বাংলা ভাষাভাষী। সাঁওতাল পরগণা সংলগ্ন আসানসোল মহকুমার গ্রামাঞ্চলে 'চামু রাণার ঝুমুর ব্যাপকভাবে প্রচলিত। কাজী নজরুল ইসলামের ঝুমুর গানগুলির সুর মূলত চামু রাণার সুর অবলম্বনে রচিত। তিনি অবশ্য নাগরিক বিদগ্ধ শ্রোতাদের জন্য কিছুটা আধুনিকীকরণ (সোফিস্টিকেশন) করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর তেপান্তরের মাঠে বঁধু হে' গানটিতে হুবহু চামু রাণার সুর অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। 'ঝুম ঝুম ঝুমরা নাচ' গানটিতে 'আড়বাঁশী বাজায়/আড়চোখে তাকায়' লাইনটিতে চামু রাণার ঝুমুরের সুর অবিকৃত রাখা হয়েছে। সুতরাং এই বিস্তীর্ণ এলাকায় ভবপ্রীতানন্দ ওঝার মত ঝুমুর গানে চামু রাণার প্রভাব অস্বীকার করলে ঝুমুর গানের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

চামু রাণার বাসস্থান ছিল আসানসোল মহকুমার অন্তর্গত চুরুলিয়ার সন্নিকটে আলিগঞ্জ গ্রামে। তিনি নিরক্ষর ছিলেন। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে তিনি বেশীর ভাগ ঝুমুর গান রচনা করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলী অবলম্বনেও তিনি বহু ঝুমুর রচনা করে গেছেন। ভবপ্রীতানন্দ ওঝার গানে যেমন তৎসম শব্দ ও মৈথিলী ভাষার প্রয়োগ বেশী, চামু রাণার গানে আঞ্চলিকশব্দ অর্থাৎ খাঁটি বাংলা শব্দের প্রয়োগ বেশী।

শ্রীযুক্ত রাজ্যেশ্বর মিত্র মহাশয়ের চামু রাণার নাম উল্লেখ থাকলে ভাল হত। যাই হোক, যাঁরা মিত্র মহাশয়ের প্রবন্ধটি পড়বেন, তাঁরা আরও বুঝতে পারবেন যে সাঁওতালী গান ও ঝুমুর গান এক বস্তু নয়। ঝুমুর গানের সুর, তাল বিষয়বস্তু সাঁওতালী গান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত মিত্র মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়ে একটি প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। তিনি বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এর সঙ্গে ঝুমুর গানের সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'রাধা' এবং ঝুমুর গানের রাধার মধ্যে কোন সাদৃশ্য আছে কি? শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দানখণ্ড, বংশীখণ্ড, রাধাবিরহখণ্ড ইত্যাদি অবলম্বনে প্রচুর ঝুমুর গান আছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা বালিকা ও লজ্জাশীলা ও শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাকৃত বয়স্ক পুরুষ। কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগের পদকর্তাদের মত

ঝুমুর গানের শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু বলাই ননী চুরি করে খায়, গোরু চরাতে গিয়ে বনে হারিয়ে যায়। তুলনামূলকভাবে শ্রীরাধা পরিপূর্ণা যুবতী, সুরসিকা এবং রতিনিপুণা। অবশ্য চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদকর্তাদের প্রভাবে ঝুমুর গান প্রভাবান্বিত হওয়া অসম্ভব নয়। আবার, ঝুমুর গানের প্রভাব বিভিন্ন ধারার কীর্তন গান কবিগান বা পাঁচালীতে লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে মিত্র মহাশয় অবশ্য বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

আমরা আশা করব, এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর যদি কোন গবেষক ঝুমুর গান ও ঝুমুর গানের পদকর্তাদের বিষয়ে কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য প্রকাশিত করেন তাহলে পশ্চিমবাংলা ও বিহারের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের এক বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত সম্পর্কে সাধারণ মানুষের তথা অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও শ্রোতাদের অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হবে।

অশোক দাস
দুর্গাপুর-৫

## আরোগ্যের কবিতা, রোগশয্যায়

২রা আগস্ট তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রীর 'আরোগ্যের কবিতা, রোগশয্যায়' শিরোনামার প্রবন্ধটি সম্পর্কে দু-একটা কথা লিখছি। প্রথমেই খুব খুঁটিনাটি একটি জিনিসের উল্লেখ করে নিই। প্রবন্ধটির প্রথমাংশে যে একটি ফরাসী বাক্য উদ্ধৃত হয়েছে (It faudra mourir sevel) তার শেষ শব্দটি ছাপা হয়েছে sevel ছাপার ভুলে seul (এস ই ইউ এল) শব্দের পরিবর্তে। ঐ ফরাসী বাক্যটির অর্থেও কিছু বিভ্রান্তি আছে মনে হয়। বাক্যটির অর্থ দেওয়া হয়েছে—'মানুষটি মারা গেছে একাকী'—কিন্তু বোধ হয় অর্থ হওয়া উচিত—'মরতে হবে একাই' (faudra শব্দটি falloir-এর ভবিষ্যৎ কালের রূপ, অতীত কালের নয়)। দ্বিতীয়ত, পূর্ণেন্দুবাবু লিখেছেন— কবিতার নীচে রচনার স্থান ও তারিখ-এর উল্লেখ তাঁর কবিতার বইয়ের একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। 'সানাই' পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত। 'রোগশয্যায়' থেকে শুরু হল এক নতুন সংযোজন—সময়। সকাল, বিকেল অথবা রাত্রির ঠিক কোন সময়ে কবিতাগুলো লেখা সেই অতিরিক্ত সংবাদটুকুও তিনি জুড়ে দিলেন কবিতার নীচে। (পৃষ্ঠা ১৩) এবং পূর্ণেন্দুবাবু অনুমাণ করেছেন যে কবি হয়ত তাঁর পাঠকদের মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন যে 'এই পর্বের কবিতাগুলো শুধুমাত্র কবিতা নয়, তারও চেয়ে কিছু বেশী তাঁর অস্তিত্বের ভিতরকার তুমুল আলোড়ন-অভিঘাতের দিনপঞ্জী অথবা ক্ষণপঞ্জী এগুলো। এক মন্থিত যন্ত্রণার জর্নাল যেন। (পৃঃ ১৩)

'রোগশয্যায়' থেকে শুরু করে শেষ পর্যায়ের কোন কোন কবিতার শেষে (সব কবিতার নয়) ঠিক কোন ক্ষণে লেখাগুলো লেখা তার উল্লেখ আছে, অন্যগুলিতে শুধু 'সকাল, বিকাল' ইত্যাদি দিনের বিভিন্ন বিভাগের উল্লেখই আছে। রচনার স্থান ও তারিখ ছাড়াও এই ধরনের দিন রাত্রির বিভিন্ন সময়ের উল্লেখ কিন্তু 'রোগশয্যায়' কাব্যের অনেক পূর্বে রচিত কাব্যেও পাওয়া যায় একেবারে, 'মানসী' কাব্য থেকেই যদিও সেসব জায়গায় ঐরকম উল্লেখযুক্ত কবিতার সংখ্যা বেশী নয় এক 'গীতালি' কাব্যগ্রন্থ ছাড়া। 'গীতালি'র যেসব কবিতা বা গানের শেষে 'সকাল বা প্রভাত', 'বিকাল' বা 'অপরাহ্ণ', 'সন্ধ্যা', 'রাত্রি' এই রকম উল্লেখ আছে তার সংখ্যা চল্লিশের ওপরে। অন্যান্য যেসব গ্রন্থের কোন কোন কবিতার (বা গানের) শেষে ঐরকম উল্লেখ আছে সেগুলো হল—মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, বলাকা ও প্রহাসনী। সংখ্যায় কম হলেও কোন কোন কবিতার শেষে দিন রাত্রির উল্লেখ ছাড়াও উপরন্তু কিছু উপভোগ্য তথ্য আছে, যেমন 'মানসী'র 'মেঘদূত' কবিতার শেষে আছে 'অপরাহ্ণ', 'ঘনবর্ষা'য়' 'সোনার তরী'র 'নদীপথে' কবিতার শেষে আছে 'খালপথে/ ঝড়বৃষ্টি/ অপরাহ্ণ'। কোন কোন কবিতায় সরাসরি 'রাত্রি' না লিখে কবি লিখেছেন 'মেঘবৃষ্টি, অমাবস্যা' বা 'মাঘীপূর্ণিমা বা দোলপূর্ণিমা' বা 'রাসপূর্ণিমা' অর্থাৎ কবি শেষ বয়সের আগেই যখন সুস্থ, ভ্রমণরত ছিলেন তখনও অনেক কবিতার শেষেই দিন রাত্রি বা দিনরাত্রির কি পরিবেশে ('ঝড়বৃষ্টি', 'ঘনবর্ষায়') কাব্য রচনা করেছেন তার উল্লেখ করেছেন। সুতরাং 'রোগশয্যায়' থেকে শুরু করে অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে রচনার সময়ের উল্লেখ থেকে ঐ কাব্যগ্রন্থগুলি 'মন্থিত যন্ত্রণার জর্নাল' বলা যায় কিনা আরও ভেবে দেখা দরকার মনে হয়। সাধারণ অবস্থায়ও কবির সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল মনের ওপর দিন রাত্রির আলো আঁধারের প্রত্যেক স্তরের বৈচিত্র্যের রেখাপাত হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং যে কবির মনে ঔপনিষদিক 'মধুময় পার্থিবং রজঃ' মন্ত্র গভীর রেখাপাত করেছিল তাঁর কাব্য ভাবনার প্রাক-অন্তিম পর্যায়ে এবং অন্তিম পর্যায়ে রচনায় শেষে যে সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা, রাত্রির উল্লেখ আছে, সেটা মন্থিত যন্ত্রণার জর্নাল শুধু না হয়ে যেখানে ভাগ জায়গায়ই এই মধুময় পৃথিবীর দিবারাত্রির বিচিত্র সৌন্দর্যের এবং মানব মনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্থির, সার্থক উপলব্ধির স্বাক্ষর হওয়াও সম্ভব মনে হয়।

কল্যাণকুমার দত্ত
কল্যাণী

## অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

হাওয়া-বদলানো রচনা সংগ্রহ

# হাওয়াবদল ও অন্যান্য রচনা

দাম ৮·০০

সেবার তিনি যাচ্ছিলেন কার্সিয়াং। সেই তাঁর শেষ বারের মতো পাহাড়ী অঞ্চলে হাওয়া বদলাতে যাওয়া। সঙ্গে ছিল সরু, লম্বাটে একটি খাতা। *ট্রেনে উঠেই খুলে বসলেন সেই খাতাখানা. চারপাশের দৃশ্যাবলী আর* অনুভব-অভিজ্ঞতাকে টুকরো ছবির মতো ধরে রাখতে শুরু করলেন জাদুময় শব্দের আঁচড়ে।

এ-ভাবেই রচিত 'হাওয়া বদল'—দিনলিপির ধরনে অনন্য শব্দচিত্রাবলী। পরবর্তীকালে এই শব্দচিত্রই বহু সত্যি ছবির উপকরণ হয়ে দেখা গিয়েছে। তেমনই নতুন স্বাদের রচনা 'পাহাড়িয়া'—গদ্য-ছন্দের কবিতার ঐতিহাসিক প্রয়াস। 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই উল্লেখ করেছেন সেই তথ্য। হাওয়া-বদল, পাহাড়িয়া এবং অন্যান্য কিছু টুকরো রচনা নিয়ে প্রকাশিত হল অবনীন্দ্রনাথের নতুন এই গ্রন্থ। ছবি লিখতেন যে অবন ঠাকুর, তাঁর 'হাওয়া-বদল ও অন্যান্য রচনা' বাংলা সাহিত্যেও আনবে নতুন হাওয়ার স্বাস্থ্যকর দীপ্তি। আশ্চর্য স্বাদের এই টুকরো রচনাবলী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল নানা সাময়িকীর ধুলোমলিন পৃষ্ঠায়. এই সংগ্রহে একত্র করে তুলে দেওয়া হল চিরকালের পাঠকদের হাতে। সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ও ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি।

---

যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অন্তরঙ্গ স্মৃতিচারণা

# উপল-ব্যথিত গতি

দাম ৫·০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপন ভ্রাতৃবধূ যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণকে তিনি দেখেছেন অত্যন্ত কাছ থেকে, ঘরোয়াভাবে, অন্তরঙ্গ চেহারায়, পরিবারের গৃহকর্তা হিসেবে। সেই মানুষী পরিচয়টুকুকেই অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও প্রামাণ্যরূপে তুলে ধরেছেন তিনি 'উপল-ব্যথিত গতি'তে।

---

শ্যামলকুমার চক্রবর্তীর

উত্তেজনাকর ইতিহাস

# ছাত্র-যুব কংগ্রেসঃ কীর্তি ও কেলেঙ্কারি ১৫·০০

অতুল্য ঘোষ লিখেছেন ঃ ''সাতাত্তরের লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে কংগ্রেস, কংগ্রেস নেতৃত্ব, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এবং প্রশাসন সম্পর্কে অনেক বই বের হয়েছে—অনেকগুলি বই এমনভাবে লেখা হয়েছে যা পড়ে লোকে উত্তেজিত হয় এবং বিভ্রান্ত হয়—'ছাত্র-যুব কংগ্রেস ঃ কীর্তি ও কেলেঙ্কারি' সে-মালিন্য থেকে মুক্ত।'' সঙ্গে কুট্টির

---

# নানা স্বাদের বই

ভোলা চট্টোপাধ্যায়ের

## জয়প্রকাশ ও সম্পূর্ণ বিপ্লব

দাম ৬·০০

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

## দেখা হয় নাই

দাম ২০·০০

## বঙ্গলক্ষ্মীর ঝাঁপি

দাম ১৫·০০

বিধান সিংহের

## শাহী কেচ্ছা

দাম ১০·০০

জনার্দন ঠাকুরের

## ইন্দিরা এণ্ড কোং

দাম ৮·০০

## জনতা এণ্ড কোং

দাম ১৫·০০

জয়প্রকাশ নারায়ণের

## কারাবাসের কাহিনী

দাম ৫·০০

ডাঃ শিশিরকুমার বসুর

## মহানিষ্ক্রমণ

দাম ৮·০০

শান্তিকুমার মিত্রের

## দর্পণে বাংলা

দাম ৫·০০

সাধনা মুখোপাধ্যায়ের

## রান্না করে দেখুন

দাম ৬·০০

অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের

## সূর্যপথিক শ্রীঅরবিন্দ

দাম ৮·০০

---

প্রকাশিত হয়েছে

মতি নন্দীর নতুন উপন্যাস

# অপরাজিত আনন্দ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

---

## বুদ্ধদেব গুহর

বর্ণময় প্রেমের উপন্যাস

# সুখের কাছে ৭·০০

হঠাৎ গাড়ি খারাপ হওয়ায় এক মোটর মেকানিকের আস্তানায় রাত কাটাতে হয়েছিল মহুয়াকে, সঙ্গে বাবা আর মহুয়ার পাণিপ্রার্থী কুমার। আর সেখানেই ঘটল মহুয়ার জীবনের স্মরণীয়তম ঘটনা। সুখ এল সুখন মিস্তিরর বেশে। এক তীব্র কৌতূহলকর কাহিনীতে শহুরে সভ্যতার নির্লজ্জ মুখোশটিকে সম্পূর্ণ উন্মোচিত করে দেখিয়েছেন বুদ্ধদেব গুহ।
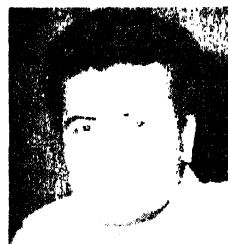
## সমরেশ মজুমদারের

সমাদৃত উপন্যাস

# দৌড় দাম ৭·০০

ঘোড়দৌড়ের মাঠ, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গণিকার ফ্ল্যাট, উঁচু মহলের স্খলিত জীবনযাত্রা, আধুনিক ছেলেমেয়েদের প্রেম-প্রেম খেলা আর এর পাশাপাশি মধ্যবিত্ত জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য আশা-আকাঙ্ক্ষা-হতাশা-যন্ত্রণাভরা দৌড়ের এক অনুপম ছবি এই উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন সমরেশ মজুমদার। চলচ্চিত্রে রূপায়িত।

লেখকের আরেকটি গ্রন্থঃ বড় পাপ হে ১২·০০

---

প্রকাশিত হয়েছে

## সাধনা মুখোপাধ্যায়ের

কৌতূহল মেটানো গ্রন্থ

# জানা অজানা

দাম ৮·০০

এ-বইয়ের ভূমিকায় 'আন... মেলার' সম্পাদক নীরে... চক্রবর্তী লিখেছেন, ''বিজ্ঞানের বিষয়ে বাংলা... কিছু লিখতে হলে দুটো জিনিস জানা দরকার। বিজ্ঞা... জানা দরকার, এবং বাংলাটা... জানা দরকার। শ্রীমতী সাধনা দুটোই অত্যন্ত ভাল জানেন। সত্যি বলতে কী, পৃথিবী ও আকাশের বিচি...
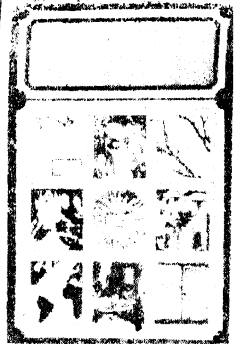
সব রহস্যের কথা এমন সহজ ও সুন্দর বাংলায় এত প্রাঞ্জল করে এ-কালে আর কেউ বুঝিয়ে বলতে পেরেছেন বলে তো আমার মনে হয় না। ছোটরা এ-বই পড়লে একদিকে যেমন তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশকে আরও ভালবাসতে শিখবে, তেমনি অন্যদিকে সেই পরিবেশ সম্পর্কে আরও পরিচ্ছন্ন হবে তাদের ধারণা। মা-বাবারা একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে এ ... তাঁদের ছেলেমেয়েদের ...তে তুলে দিতে পারেন। প্রতিটি বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারেও এ-বই অবশ্যই থাকা উচিত।'' সত্যিই আশ্চর্য একটি বই লিখেছেন সাধনা মুখোপাধ্যায়। বাংলায় এমন স্বাদু ও কৌতূহল-মেটানো প্রকৃতিবিজ্ঞানের বই নেই বললেই চলে। এ-বই পড়ে জানা যাবে, বাংলা বারটি মাসের বৈশিষ্ট্য ও পরিচয়, জানা যাবে ভৌগোলিক বহু বিচিত্র তথ্য। সেই সঙ্গে প্রচুর ফোটো এবং ছবি বইটির আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

দেশ ৪৭ বর্ষ ৫০ সংখ্যা
৮ কার্তিক ১৩৮৭

## সূচীপত্র



### পরবর্তী আকর্ষণ

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প
ধারাবাহিক
সবিতা দাশগুপ্তের প্রবন্ধ
[illegible]

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে
বাদল বসু কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮
সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ এবং
জীবনসত্তা প্রিন্টিং হাউস ১২ প্রফুল্ল সরকার
স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
দাম দেড় টাকা
বিমান মাশুল : ১৫ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা



# শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও রাজনীতি

শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকেই বেশ কিছুকাল যাবৎ এমন এক সন্দেহ জানিয়ে আসছিলেন যে, এই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতাকে হরণ করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে যেভাবে সরকারী কর্তৃত্বের আওতায় আনা হল তা এই ব্যগ্রতার একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তো সব নয়, রয়েছে কলেজ স্কুল। সরকার তাঁদের পরিকল্পনা মাফিক 'শিক্ষা দখল' অভিযানে যে ক্রমশই এগিয়ে যাবেন তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না। সন্দিগ্ধদের বোধ করি এখন বলার সময় এসেছে যে, তাঁরা যেমনটি ভেবেছিলেন—সেইভাবে উচ্চ থেকে নিম্ন সকল শিক্ষাই এখন সরকারী মুঠোয় এসে পড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে তার আভ্যন্তরিক খবর সকলের জানার কথা নয়, এমন কি কয়েক শ' কলেজে কী ঘটে যাচ্ছে তাও প্রকাশ্য নয়। তবে এটা হয়ত বোঝা যায়, গত তিন বছরে আভ্যন্তরিক রদবদল ও প্রশাসনের পরিবর্তন হয়েছে। এটা ভালোর জন্যে এমন কথা কি জোর করে বলা যাবে?

পশ্চিমবঙ্গের অধ্যক্ষ সমিতির সাম্প্রতিক অভিযোগগুলি যদি আমরা অবজ্ঞা করতে না চাই—তা হলে বুঝতে পারব, কলেজগুলিতে কেমন নৈরাজ্য চলেছে। অধ্যক্ষরা কেমন করে রাজনীতির শিকার হচ্ছেন, সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে তাঁদের কীভাবে তফাতে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সরকার মনোনীত প্রশাসকদের সঙ্গে কী ধরনের সম্পর্ক নিয়ে কাজ চালাতে হয়—ইত্যাদি তাঁদের বিবরণে পাওয়া যায়। সে-প্রসঙ্গ এখানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করে লাভ নেই। তবে বোঝা যায়, এক অস্বস্তিকর এবং অস্বাস্থ্যকর রাজনৈতিক আবহাওয়া কলেজের শিক্ষক, কর্মচারী এবং ছাত্রদের মধ্যেকার সকল ভাল সম্পর্ক নষ্ট করে দিচ্ছে। শিক্ষার সঙ্গে কিছুমাত্র সম্পর্ক না রেখে দলীয় রাজনীতির উদ্দেশ্য সাধন যদি মুখ্য হয়ে ওঠে তবে এর বেশি কী হতে পারে?

কলেজে যেমন, মাধ্যমিক স্কুল এবং প্রাথমিক স্কুলগুলিতেও সেই রকম রাজনীতির প্রতাপ। পশ্চিমবঙ্গে মোটামুটি মাধ্যমিক স্কুল ন' হাজারের মতন। এর অন্তত শতকরা পনেরো ভাগ স্কুলের তদারকির ভার অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সরকার পক্ষ অবশ্য এই কাজটির এক কৈফিয়ত দেন। কিন্তু সেই কৈফিয়ত যে যথার্থ তা যে সকলে স্বীকার করে নেবেন এমন না হতেও পারে।

বামফ্রন্ট সরকারের কোনো মন্ত্রীই কখনো স্বীকার করবেন না, করা সম্ভবও নয় যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা কিছু করেন! দুঃখের বিষয়, স্বীকার না করলেই যে তাঁদের কৈফিয়তগুলি সত্য হয়ে যাবে তাও তো নয়। এ-কথা আজ অনেকেই জানেন, কলেজে এবং স্কুলে যে-খেলাটি চালানো হচ্ছে তাকে রাজনৈতিক দখল নেবার প্রচেষ্টাই বলা সঙ্গত।

রাজনীতি যে শিক্ষাক্ষেত্রকে এবং শিক্ষাকে জটিল করে তুলছে তাতে সন্দেহ নেই। সারা ভারত বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান হিসেবে যিনি প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন সেই শিক্ষাবিদ বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেছেন, রাজনৈতিক ব্যক্তিরাই শিক্ষাক্ষেত্রে জট পাকিয়ে তুলেছেন। তিনি যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলেছেন—কিন্তু এটি শিক্ষার সর্ব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতা বন্ধ হয়েছে বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দাবি করেন। এ-বিষয়ে সরকার যাই বলুন ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং সাধারণ মানুষ কী মনে করেন? সংবাদপত্রের পাতায় এমন সংবাদও প্রকাশ পায় যাতে দেখা যায় অসংখ্য কলেজে মাসের পর মাস একাধিক বিষয়ে পড়ানোর মতন শিক্ষক নেই। সার্ভিস কমিশন কি এখনও আধো ঘুমে?

যাঁরা শিক্ষা দেন তাঁদের সম্পর্কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মচারীদের মনোভাব থেকে বোঝা যায় আবহাওয়াটা যথার্থ কেমন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ কলেজ কর্মচারীদের সমিতি একটি ছড়া ছাপিয়ে বিলি করেছেন। তাতে লেখা আছে : 'যাই বা না যাই, পুরো মাইনে পাই/পড়াই বা না পড়াই বলার কেউ নাই।'

মাননীয় শিক্ষকদের প্রতি এমন অশোভন উক্তি অবশ্যই গর্হিত। সম্ভবত আক্রোশবশেই করা হয়েছে। কিন্তু অনুমান করা অসম্ভব হবে না যদি বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে এখন এই ধরনের আবহাওয়াই গড়ে উঠেছে। গত তিন বছরে এই রাজ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে বারো আনা উন্নতি ঘটিয়েছেন বলে যাঁরা দাবী করেন তাঁরা হয়ত এই আবহাওয়ায় তৃপ্ত হতে পারেন—কিন্তু সাধারণে নিশ্চয় হবেন না।
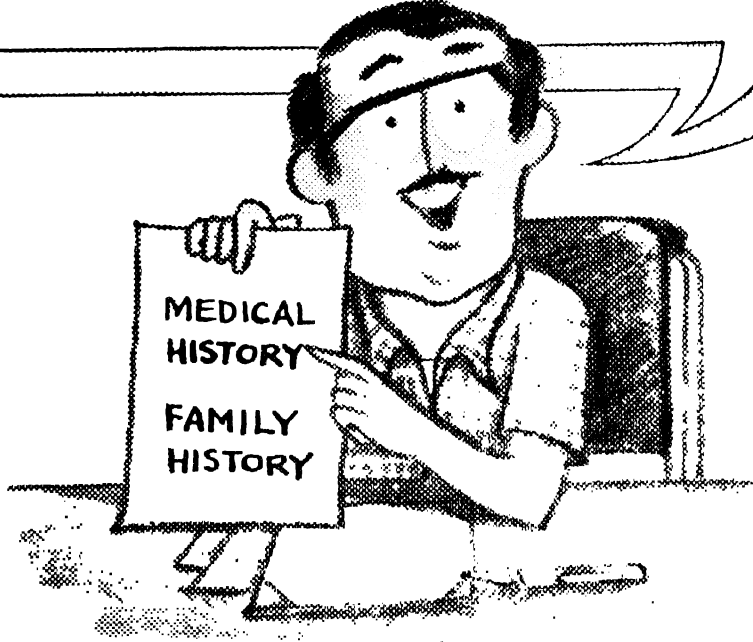
# এতে আমাদের পক্ষে দাবী দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে।

আপনি যখন বীমার পলিসি গ্রহণ করতে যাচ্ছেন, তখন আমাদের এজেন্ট আপনাকে সাহায্য করতে এবং যথাযথ পরামর্শ দিতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকেন; স্বভাবতঃই তিনি আপনার কাছ থেকেও পূর্ণ সহযোগিতা আশা করেন।

**সম্পূর্ণ সরল বিশ্বাস**

বীমা হ'ল সম্পূর্ণ সরল বিশ্বাসের ভিত্তিতে একটি চুক্তি (যে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করা বাধ্যতামূলক)—সুতরাং প্রস্তাবপত্র পূর্ণ করার সময় আপনার পক্ষে আপনার বয়স, ডাক্তারী চিকিৎসার ইতিহাস, পারিবারিক ইতিহাস এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সব তথ্য, সত্য ও সঠিকভাবে প্রকাশ করাটাই ন্যায়সংগত হবে। কেন না, এইসব প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতেই আপনার প্রস্তাবপত্রের মূল্য-নির্ধারণ হয়ে থাকে এবং তা স্বীকৃত হয়।

**সুযোগ সুবিধা**

একথা সত্য নয় যে যদি কেউ বর্তমান বা আগেকার কোন অসুখের কথা প্রকাশ করে ফেলেন সেক্ষেত্রে বীমার দায় গ্রহণ করা হয় না। হাজার হাজার বীমাকারী তাদের ডাক্তারী চিকিৎসার সম্পূর্ণ ও সত্য ইতিহাস প্রকাশ করেছেন এবং তা সত্ত্বেও তাঁদের জীবন বীমার প্রস্তাবপত্র বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রচলিত হারে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে উপযুক্ত অতিরিক্ত প্রিমিয়ামসহ স্বীকৃত হয়েছে।

যদি কোনো ক্ষেত্রে দাবী প্রত্যাখ্যান করা হয়ে থাকে, তবে সেটি প্রতারণার এবং বিশেষ তথ্য গোপন করার দরুন; সেটি অবশ্যই পরে ধরা পড়েছে। মনে রাখবেন, বীমার দাবীর টাকার দ্রুত নিষ্পত্তির সবচেয়ে সহজ পন্থা হ'ল বীমা গ্রহণের সময় আপনার সম্পূর্ণ তথ্য জানানো।

**ভারতীয় জীবন বীমা নিগম**

RADEUS/LIC/AS-31

## আমার বাড়ি

অশোক চট্টোপাধ্যায়

আমার বাড়ি একটা পাহাড়ের চূড়োয়
মানে ২৮ নং কে এল বি রোড
এখানে আসতে কলকাতা মাদ্রাজ বা দিল্লী থেকে
বিমানে প্রায় একই সময় লাগে

আমার বাড়িতে কোন বাগান নেই
কিন্তু দুটো বারান্দা ও একটা ছাদ আছে
আমার বাড়িতে টেলিফোন বা কোন কুকুর নেই
কিন্তু একটা কলিং-বেল আর একটা সিংহ আছে
সিংহটা বহুদিন ধরে থাবা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে দরজার
মাথায়

আমি ইজিচেয়ারে বসে পাহাড়ের চূড়ো থেকে
উপত্যকার দিকে চেয়ে থাকি
সামনের রাস্তাটা পূর্বদিকে একশো গজ গিয়ে একটা নদীতে
ঠেকেছে
দুশো গজ পশ্চিমে গেলে আর একটা বড় রাস্তা পড়ে
সামনের রাস্তা চওড়া তিরিশ ফুট গাছপালা বিশেষ নেই
আমার বাড়ির অবস্থান বেশ আকর্ষণীয়
স্কুল, বাজার, হাসপাতাল, সিনেমাহল ও শ্মশান সন্নিকট

একদিন আকাশে একটা পাখি উড়ে যাচ্ছিল
তাকে ডেকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে আমি অনেক উঁচুতে উড়ে
গেলাম
একদিন রাস্তায় একটা বাচ্চা ছেলে স্নান করতে যাচ্ছিল
তাকে বসিয়ে দিয়ে আমি নদীতে অনেকক্ষণ সাঁতার কাটলাম
একদিন একটা শববাহী গাড়িতে একজন বৃদ্ধলোক যাচ্ছিলেন
তাঁকে আমার চেয়ারে বসিয়ে দিলাম

আমার বাড়ি এখন মসৃন রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে
এখন আমার চারপাশে বাগান, ফুল আর ধূপের গন্ধ
পাহাড়ের চূড়ো থেকে বাড়ির লোকেরা চোখ মুছছে
আর ইজিচেয়ারে বসে শাদা চুলের বুড়ো লোকটা
হাত নাড়ছে---'আমি বেঁচে গেলুম!'

## দৃশ্যের বিরুদ্ধে

অনিরুদ্ধ কর

উচ্চারণেও জুড়ায় না জ্বালা
দিনযাপনেও যায় না,
পেরেকে ঝুলছে বাসী ফুলমালা,
ঝোলে তিনভাঙা আয়না।

আয়না! আয়না! তুমি কার আজ?
কাঁচে ত্রিভঙ্গ কে হে?
চারদিক ঘিরে ছবির সমাজ
যৎকিঞ্চিৎ-ই দেহে।

ছবি! ছবি! আমি ছবির দৃশ্য?
তুমি নবাগত রশ্মি!
কাঁচে ঝলসায় অসীম গ্রীষ্ম—
সত্যি নয় অবশ্যি!

এই ভাবে...তবে এই ভাবে দেখি
রৌদ্র জ্যোৎস্না ঝড়কে—
না থেকেও যা তা থেকেও সে এক-ই
দেখা-অদেখার তর্কে।

## প্রতিশ্রুতি

শিশির রায় নাথ

তোমার বিষাদ-শঙ্খ সমুদ্র-হাওয়ায় বেজেছিলো
একদিন বনান্তের পথে। একদিন বিদিশার হাতে
জলপাই শাখা রেখে কথা দিয়েছিলে—
গভীরে তোমার কোন ব্যথা নেই, নিয়োজিত
বিষণ্নতা নেই

কথা রাখো। জেগে ওঠো চন্দনের বনে

ভ্রূমধ্য শিকারী লাল সিঁদুরের টিপ
রক্ত দ্রোণের মত উজ্জ্বল। বিদিশার নয়নে শ্বেত
কারু রীতি জানে। তোমার বাণিজ্য তাকে
যাত্রা করে। ঋদ্ধিও তোমার

নিসর্গ-নিয়মে এক পল্লবিত জলপাই শাখা
রেখেছিলে। কথা রাখো, অপ্রতিম হাওয়া—
বিদিশাকে ডেকে বল সুখে আছ, সান্ত্বনায় আছ

**২৫ বছর আগে সবচেয়ে কাছের ব্যাঙ্ককেও মনে হত কত দূরে...**

**আজ তো চলে এসেছে অনেক কাছে, নানানভাবে!**

পরোক্ষ — দূর!
কিলোমিটার হিসেবে।
উদাসীন! নাগালের বাইরে।
যত্নের অভাব।
লাভ ছাড়া আর কিছুই
বোঝে না। ব্যাঙ্কের
এই ছিল বর্ণনা—
২৫ বছর আগে।

আজ ব্যাঙ্কিং-এর ধারাই
পালটে গেছে। আর
স্টেট ব্যাঙ্কই প্রথম সেই
প্রাচীন ধারাকে চুরমার করে
দিয়ে গুরুত্ব দিয়েছে—
অর্থের বদলে মানুষকে···
লাভের বদলে জনগণকে!

৪৬৬-টি দপ্তর দিয়ে
শুরু করে আজ আশ্চর্যভাবে
গড়ে উঠেছে আমাদের
৫২০০'রও অধিক দপ্তর—
সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে
বেশী। জালের মত ছড়িয়ে
আছে এক প্রান্ত থেকে
আরেক প্রান্ত পর্যন্ত
সারা দেশ জুড়ে।
সত্যি সত্যিই আমাদের
ব্যাঙ্কিং সেবা পৌঁছে গেছে
পাহাড়, উপত্যকা—
সব জায়গায়।
ধনী সম্প্রদায় থেকে
জনসাধারণের মাঝে!

আজ গ্রামবাসীরা অনায়াসে
আমাদের দপ্তরে চলে
আসে— ঠিক যেমন তাদের
পঞ্চায়েত বা পোস্ট অফিসে
যায়। প্রধানতঃ আমাদের
ব্যাঙ্কই এনেছে মনোভাবের
এই পরিবর্তন — যা মেপে
বা গুণে বোঝা যায় না...
বোঝা যায় শুধু গ্রামাঞ্চলের
উন্নতি দেখে!

**২৫ বর্ষ-ব্যাপী জনগণের উন্নতির সাধনা, আমাদের বিকাশের প্রেরণা** **স্টেট ব্যাঙ্ক**

# কণ্টকবল্লিত
## অতুল্য ঘোষ

**(নবপর্যায়)**

॥ ৫০ ॥

**২৮শে** সেপ্টেম্বর, রবিবার সন্ধেবেলায় **১৯৮০**-র উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হল। পরীক্ষার ফল যেদিন বের হয়, সেদিনকার পরিস্থিতি বর্ণনাতীত। সে অবস্থা মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল যেদিন প্রকাশিত হয়, সেদিনই বোঝা গিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের এমন সুব্যবস্থা (?) যে পরীক্ষার ফল কবে বেরোবে, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা যত রকমে করা যায়, তার সুযোগ কর্তৃপক্ষ করে দেন। মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল যেদিন বেরোয়, পরীক্ষার ফল লেখা কাগজগুলি, যাকে 'গেজেট' বলে, তার পাঁচ টাকা থেকে আট টাকা অব্দি দর উঠেছিল। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ব্যাপারেও তিন-চারদিন ধরে ছাত্র-ছাত্রীদের ও তাদের অভিভাবকদের উৎকণ্ঠার মধ্যে ঝুলিয়ে রেখে রবিবার সন্ধ্যায় ঝুপ্ করে পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেল। পরীক্ষার ফল যাঁরা বার করেছেন, তাঁদের হয় বুদ্ধি নামক কোন বস্তু মস্তিষ্কে নেই, অথবা তাঁরা অত্যন্ত কঠিন হৃদয়—পাষাণের মত। কলকাতায় লোড-শেডিং হয়, সকলেরই জানা। এই লোড-শেডিং-এর সময় সন্ধ্যের পর ফল বেরুলে কি অবস্থা হয় তা কর্তৃপক্ষ একবারও ভেবে দেখেন না। অন্ধকারে লম্বা লম্বা কিউ, তার মধ্যে চেঁচামিচি, হট্টগোল এবং পরীক্ষার ফল ছাপা দুষ্প্রাপ্য কাগজগুলি পাবার জন্য কি প্রচণ্ড চেষ্টা। অন্ধকারের মধ্যে ছেলে মেয়ে এবং তাদের অভিভাবক-অভিভাবিকাদের ইচ্ছে করে বিব্রত করা, এ কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। কেন—জিজ্ঞাসা করার উপায় নেই। যে জিজ্ঞাসা করবে, সে হয় প্রতিক্রিয়াপন্থী, নয় বামফ্রন্ট সরকারের বিরোধী। অনেক ছেলেমেয়ে অন্ধকার রাত্রে এগারোটা/বারোটার সময় বাড়ি ফিরেছে। তাদের দুর্দশার কথা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তারা একবারও ভাবেননি। স্বাভাবিকভাবেই কলকাতার রাস্তায় ছিনতাই, রাহাজানি ও বোমাবাজি লেগেই আছে। সেই অবস্থায় সন্ধ্যার অন্ধকারে বহু প্রতীক্ষিত পরীক্ষার ফল বার করে যে অমানুষিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তা অমার্জনীয় অপরাধ। স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে যে কেন এমনটি হচ্ছে? আর যারা পরীক্ষার্থী, যে অবস্থার সম্মুখীন তাদের হতে হয়, তা ঠিক ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। যে জায়গায় সিট্ পড়েছে বলে লেখা থাকে, দেখা যায় সেখানে সিট্ নেই। আরও নানারকম ঘটনা ঘটে। স্কটিশ চার্চ কলেজের একটি ছাত্রী পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখে তার রোল নম্বর কোন জায়গায় নেই। সে তো হতভম্ব হয়ে কি করবে ভেবেই পাচ্ছিল না। অনেক খুঁজে সে এক চেনা অধ্যাপককে পায়। এই যে পরীক্ষা দিতে গিয়ে রোল নম্বর খুঁজে পাওয়া যায় না, এতে যে মানসিক বিপর্যয় হয়, তারপর কি সুস্থ ও শান্তভাবে পরীক্ষা দেওয়া যায়? এরপর যদি কোন বিপর্যয় হয়, তা হলে দোষ দেওয়া হয় পরীক্ষার্থীকে। আরও আছে। এই মেয়েটির খাতা স্কটিশ চার্চ কলেজের অন্যান্য পরীক্ষার্থীদের খাতার সঙ্গে পরীক্ষকের কাছে যায়নি। কি করে যে রোল নম্বর খুঁজে পাওয়া গেল না, তা সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা খুব শক্ত। আবার এমনও সংবাদ পাওয়া যায়, খাতা হারিয়ে গেছে, খাতা পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। শুরুতেই এমন আঘাত পেতে হয় যে শিক্ষা সম্বন্ধে সব উৎসাহ তাদের চলে যায়। এই সেপ্টেম্বর মাসেই পার্ট টু পরীক্ষার Chemistry Practical-এর দিন পিছিয়ে গেল। কারও কিছু বলার নেই। সব কিছুই খেয়াল খুশী মত।

শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক পর্যায়ে যাঁরা সবকিছু দেখাশোনা করেন, তাঁরাই এই সব বিশৃঙ্খলা করেন, তাঁরা বা তাঁদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আবার যখন Saha Institute বা প্রেসিডেন্সী কলেজের গবেষণা কেন্দ্র বা রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন, তখন লজ্জাও লজ্জিত হয়ে পড়ে।

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল বরাবরই ভাল হয়। এটি একটি সুগঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত, সুপরিচালিত সংস্থা। সেজন্যই বোধ হয় কর্তৃপক্ষের এই প্রতিষ্ঠানের উপর বিরাগ। পশ্চিমবঙ্গে সুনিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয় কেন থাকবে? থাকলে বোধ হয় বিপ্লবী বামফ্রন্ট সরকারের অসম্মান হবে। সেই জন্য সুপরিচালিত কোন বিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গে থাকা উচিত নয়—এটাই নিশ্চয় কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা। এই ধারণার ফলেই বোধ হয় রামকৃষ্ণ মিশনের নামের সঙ্গে যুক্ত বিদ্যালয়ের ক্ষতি করবার জন্য কর্তৃপক্ষ আগুয়ান হয়েছেন। মাঝে মাঝে ভেবে পাই না এই দুঃসাহস এঁদের কেন। যে বিদ্যালয় বছরের পর বছর পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাচ্ছে তা কর্তৃপক্ষের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছে কেন? যে সরকার বিদ্যালয়ের আশেপাশে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারেন না, ল্যাবরেটারির কাজের জন্য বিদ্যুৎ বা গ্যাস দিতে পারেন না, তাঁরা রহড়া বিদ্যালয়ের ক্ষতি করতে চান কেন? কর্তৃপক্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় অপারদর্শিতার কথা নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তবে আর কেন? এবার ক্ষান্তি দিন না।

বামফ্রন্ট দলের দলপতি বিভিন্ন মন্ত্রিত্বের মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই—একথা বলে ফেলেছেন। তিনি একথা আমাদের চেয়ে ভাল বোঝেন, কারণ তাঁর দলই বর্তমান সরকার চালাচ্ছে। মন্ত্রীদের মধ্যে যেখানে কোন যোগাযোগ নেই, সেখানে কোন কাজ সার্থক ও সফল হতে পারে না। এই যাঁদের অবস্থা তাঁরা রামকৃষ্ণ মিশনের মত সুপরিচালিত একটি সংস্থার বিদ্যালয়ের কাজে অনাবশ্যক, অহেতুক ও অসঙ্গত হস্তক্ষেপ করে নিজেদেরই হেয় করেছেন। মিশনের সেবাকার্য যেমন নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচালিত হয়, বিদ্যাশিক্ষার কাজও ঠিক সেইভাবেই পরিচালিত হয়। এঁদের কাজের মূলমন্ত্র হল কর্তব্যনিষ্ঠা, কর্মে পারদর্শিতা ও চারিত্রিক সততা। রামকৃষ্ণ মিশন হঠাৎ গজিয়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান নয়। বহু কর্মীর বহু দিনের ত্যাগ, পরিশ্রম ও সেবার ফলে এই প্রতিষ্ঠান আজ মহা মহীরুহে পরিণত হয়েছে। এঁদের প্রতি এই সরকারের অনীহা অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ। এঁরা বোধ হয় শ্রদ্ধাহীনতায় দেশকে ভরিয়ে দিতে চান। সেইজন্য রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়ের প্রতি এঁদের আক্রোশ। যে মানুষটিকে সরাবার জন্য এঁদের এত আগ্রহ, তিনি ভারতবর্ষের যে কোন শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষের চেয়ে কোন বিষয়েই ছোট নন। পাণ্ডিত্য, বহুদর্শিতা ও জ্ঞানের জন্য তাঁর খ্যাতি আছে। কি ঘটেছে, তা ভালভাবে অনুসন্ধান না করেই একজন সুযোগ্য মানুষকে সরাবার চেষ্টা করা হীনম্মন্যতারই পরিচায়ক। এবং যাঁরা সরাবার চেষ্টা করছেন, তাঁদের কার্যাবলী বার বার প্রমাণ করেছে, তাঁরা যে জায়গায় বসে আছেন, সে জায়গায় বসবার যোগ্যতা তাঁদের নেই। দলের দৌলতে তাঁরা সেই জায়গায় বসে আছেন, নিজেদের কৃতিত্বে নয়। দুঃখ তা নয় যে শিক্ষা অধিকর্তারা এইসব অপকর্ম করছেন, দুঃখ এই যে রামকৃষ্ণ মিশনের হাজার-লক্ষ অনুরাগী আছেন, তাঁরা এসব ব্যবস্থার প্রতিবাদ করা প্রয়োজন মনে করছেন না। ঘরে ছবি রেখে, তাকে ফুল দিয়ে সাজিয়েই কি মিশনের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব শেষ হচ্ছে? সর্বত্যাগী, সংশয়মুক্ত, দৃঢ়চেতা একদল মানুষ মিশনে ও মঠে থেকে তাঁদের কাজ অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যাচ্ছেন। সে কর্মসাধনায় কোন কলুষ নেই, কোন মলিনতা নেই, কোন দ্বিধা নেই। আর যাঁরা গৃহী শিষ্য, তাঁরা তো সবই ভোগ করছেন, তাঁরা একবার বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে হুংকার দিন যে মিশনের কাজে অনাবশ্যক ও অনধিকার হস্তক্ষেপ অমার্জনীয় অপরাধ। স্বামী বিবেকানন্দ পৃথিবীর মধ্যে হিন্দু ধর্মের বাণী প্রচার করে তাকে আরও মহত্তোমহীয়ান

করেছেন। তিনি ফিরে এসেছিলেন তাঁর বৈরাগ্য, তাঁর সাধনা, তাঁর তপস্যার মধ্যে আত্মনিয়োগ করবার জন্য। এল কলকাতার বুকে মহামারী। "তপ, জপ, আর পূজা-আরাধনা" সব শিকেয় তুলে রেখে সেবকের মূর্তি গ্রহণ করেছিলেন। মানুষ পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। সেই মানুষের বিপদে বিবেকানন্দ এগিয়ে গিয়েছিলেন। এর মধ্যে কোন সংশয় বা দ্বিধা ছিল না। সেইরকমই রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এতে যাঁরা বাধা দিচ্ছেন, মনুষ্যোচিত সাহস নিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো প্রয়োজন। শিক্ষাজগতে যে বিশৃঙ্খলা হয়েছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ছাত্রছাত্রীদের জীবন যাতে দুর্বিষহ হয়, তার সব উপায় কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছেন। লিস্ট অনুযায়ী বই পাওয়া যায় না। পাওয়ার সম্ভাবনা হলেও কবে পাওয়া যাবে, কেউ বলতে পারে না। ফলে বিদ্যায়তনে কোর্স শেষ হয় না, অথচ কোর্স শেষ হয়নি এমন প্রশ্নেরও পরীক্ষায় উত্তর দিতে হয়। লেখবার কাগজ ও খাতা এখন আর দুর্মূল্য নয়, দুষ্প্রাপ্য। প্র্যাকটিক্যাল করবার একমাত্র জায়গা হল বিদ্যায়তন। বিদ্যায়তনের কর্তৃপক্ষ সেখানে নিরুপায়। ইলেকট্রিক বা গ্যাস কোনটাই পাওয়া যায় না। বাড়ীতে পাড়ার জন্য কেরোসিন। সেই কেরোসিন তেল পেতে গেলে যে কিউ দিতে হয়, সেই সময়টা একেবারেই নষ্ট হয়। যেটা নষ্ট হয়, সেটা পড়ার সময় থেকেই নষ্ট হয়। কবে কোন পরীক্ষা হবে এবং ফল বেরোবে তা কেউই জানতে পারে না। ফলে পরীক্ষার্থীদের মনে যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়, তার ফলে সবসময়ই প্রশ্নের উত্তর দিতে অনেক গোলমাল এসে যায়। আবার মাঝে মাঝে পরীক্ষার খাতা হারিয়ে যায়। এবং পরীক্ষার হলে গিয়ে admit card এর রোল অনুযায়ী বসবার জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় না। শিক্ষা জগতে এই কৃতিত্ব (?) যাঁরা দেখাচ্ছেন, তাঁরা কোন অধিকারে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যায়তনের দিকে হাত বাড়িয়েছেন! নিজেরা যেটুকু দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালন করতে যাঁরা অক্ষম, তাঁরা কোন সাহসে যাঁরা দায়িত্ব পালন করছেন, তাঁদের কাজে বাধা সৃষ্টি করছেন। পারিপার্শ্বিকের কথা যদি বলা হয়, তা হলে উত্তর মধ্য কলকাতার বহু শিক্ষায়তনের আশেপাশে দিনে এবং রাতে যে বোমাবাজী হয়, তাতেও যে ছেলেমেয়েরা এখনও পড়তে পারে, এটাই পরমাশ্চর্য। যেসব বিদ্যায়তনে পাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ক্লাসে ছাত্রের আধিক্যের জন্য, সেইসব বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা কি কষ্টের মধ্যেই যে ক্লাসের বন্ধ ঘরের মধ্যে কাটায়, তা বর্ণনা করা শক্ত। পাখার ব্যবস্থার জন্য বহু স্কুলের ঘর এমনভাবে তৈরী যে বাইরে থেকে হাওয়া ঢোকার ব্যবস্থা নেই। সেইসব স্কুলের ছেলেমেয়েদের দুরবস্থার সীমা থাকে না। লিখবে না ঘাম মুছবে। স্কুলে যাতায়াতের যে রাস্তা, তা গ্রীষ্ম, বর্ষা সবেতেই অগম্য। রেড রোড, ভি আই পি রোড মেরামতে অর্থের অভাব হয় না। কিন্তু ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেসব রাস্তা দিয়ে স্কুলে যাবে, সে রাস্তা মেরামতের কথা কারো মনেই হয় না। শিক্ষা ব্যাপারে কোন বিষয়ে কর্তৃপক্ষ যোগ্যতা সহকারে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন, তা জানা নেই। গর্হিত কাজ যেসব করেছেন, তার তালিকা দিলে প্রকাণ্ড মহাভারত হয়ে যাবে। সেপ্টেম্বর '৮০-র সবচেয়ে বড় দায়িত্বহীনতার বিষয়টি বহুদিন সকলের স্মরণে থাকবে। রবিবার সন্ধ্যায় লোডশেডিং-এর মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ। এ যে কি অমানুষিক দায়িত্বহীনতা, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কলকাতার রাস্তাঘাটের যে অবস্থা তা সকলেরই জানা। তার উপর সন্ধ্যার পর লোডশেডিং-এর অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতকারীদের অপকার্যের কথা কারও অজানা নয়। সন্ধ্যার পর ফল প্রকাশ করে এই দুষ্কৃতকারীদের সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে আর অভিভাবকদের গভীর দুশ্চিন্তার মধ্যে সময় কাটাতে হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে যাঁরা এই অরাজকতার সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন তাঁদের অন্তত দু' একটা ভুলত্রুটি শোধরাবার চেষ্টা করেন। এবং যতদিন না নিজেদের ঘর ঠিক করতে পারেন, ততদিন যেন সুপরিচালিত বিদ্যালয়গুলির দিকে হাত বাড়ান থেকে বিরত থাকেন।

মিলেমিশে
আনন্দ করার দিন...

# বিজ্ঞান

## যে প্রতিষ্ঠান এখন জাতীয় গর্ব

ভারী বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জামের ব্যাপারে দেশকে স্বনির্ভর করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ১৯৫৬ সালে ভূপালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারত হেভী ইলেকট্রিক্যালস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড। পরে এই প্রতিষ্ঠানটিরই উদ্যোগে তিরুচি, হায়দ্রাবাদ এবং হরিদ্বারে গড়ে উঠল আরও তিনটি কারখানা। ১৯৬৪ সালে এদের নিয়ে তৈরী হয় ভারত হেভী ইলেকট্রিকেলস লিমিটেড কমপ্লেকস বা সংক্ষেপে 'ভেল'। রূপায়ণের মাত্র পনের বছরের মধ্যে সারা পৃথিবীতে এখন এটি একটি শিরোনাম। পৃথিবীর প্রথম দশটি ভারী বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি।

সম্প্রতি বাঙ্গালোরে ভেল-এর ইনডাসট্রিয়াল সিসটেম গ্রুপের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার শ্রী এস কে বসু এবং শ্রী সুলের সঙ্গে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নানা রকম সমস্যা নিয়ে কথা বলেছিলাম। প্রশ্ন করেছি, দেশের কোন কোন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আপনাদের তৈরী বয়লার এবং টারবাইনের যোগ্যতা সম্পর্কে ইদানীং অভিযোগ করছেন। এ ব্যাপারে আপনারা কী বলতে চান ?

শ্রীবসু বললেন, চট করে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত, মিঃ কর। ব্যাপারটা আমরাও খতিয়ে দেখছি। তবে একটা কথা আপনিও স্বীকার করবেন, কোন যন্ত্রে এতটুকু ত্রুটি ঘটবে না, এ কথা পৃথিবীর কোন দেশের উৎপাদনকারীই হলফ করে বলতে পারেন না। এই ত্রুটি প্রযুক্তিগত অথবা উৎপাদনগতও হতে পারে। আবার পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে যথাযথ সতর্কতার অভাবেও হওয়া সম্ভব। আমরা এদিকটাও খতিয়ে দেখছি।

বিতর্ক থাক। ঘটনা এই, গত পনের বছরে বয়লার, টারবাইন থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জাম তৈরির ব্যাপারে ভেল ইতিমধ্যে যে অসামান্য সাফল্যের নজির সৃষ্টি করেছে, সে ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই।

১৯৬৯ সালে ভেলের তৈরী প্রথম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু হয় তামিলনাড়ুর বেসিন ব্রিজ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রটি মাদ্রাজ শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত। বিশেষ কোন রকম গোলযোগ ছাড়াই এই কেন্দ্রটি গত এগার বছর নিয়মিত বিদ্যুৎ উৎপাদন করে চলেছে। মাদ্রাজের পর মাত্র দশ বছরের মধ্যে ওঁদের তৈরী তাপবিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র বসেছে পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালডিহিতে। এটি ওঁদের শততম বিদ্যুৎ উৎপাদক প্রয়াস। শুধু তাই নয়, ১৯৭৮-৭৯ সালে ভারতের যাবতীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ৯৭ শতাংশ যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছে ভেল। ওই একই সময়ের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠান আঠার হাজার মেগাওয়াটেরও বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে যত রকম যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জাম দরকার তারও বড় রকমের একটি অংশ সরবরাহ করেছে। ১৯৮৩-৮৪ সালের মধ্যে যতে আরও আঠার হাজার মেগাওয়াটের মত বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম তৈরি করা যায় সে কাজেও এখন হাত দিয়েছেন ওঁরা।

শুধু ভারতেই নয়। ভেলের কৃতিত্ব এখন বিদেশেও সমাদৃত। পৃথিবীর কম করেও তিরিশটি দেশ এই প্রতিষ্ঠানটির এখন খরিদ্দার। বয়লার, টারবাইন এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ছাড়াও কোন কোন দেশে পুরোপুরি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করে দেওয়ারও বরাত পেয়েছেন তাঁরা। এদের মধ্যে উন্নতিশীল এবং উন্নত দেশগুলিও পড়ে। এই সব দেশের মধ্যে রয়েছে আফগানিস্তান, ভুটান, ঘানা, ইরাক, মালেশিয়া, মরিসাস, সৌদি আরব, তানজানিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাঞ্জিবার, আরব প্রজাতন্ত্র, বার্মা, জর্ডান, কেনিয়া, মালাউই, নেপাল, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, কাম্বোডিয়া,
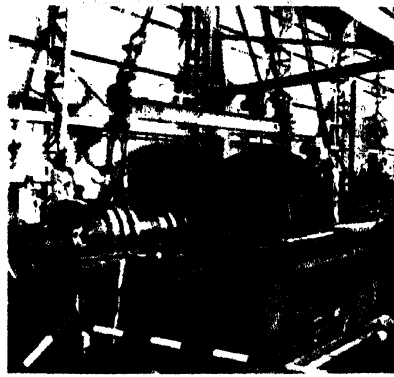
বদরপুর তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ভেলের টারবাইন বসান হচ্ছে

ইন্দোনেশিয়া, কুয়াইৎ, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলংকা, উগান্ডা, ইয়েমেন, বাংলাদেশ, ফ্রান্স, ইরান এবং লিবিয়া।

ভেল বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং পরিবহণের জন্যে যে সব সামগ্রী তৈরি করছে তাদের মধ্যে অন্যতম : তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপযোগী টারবাইন জেনারেটার, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপযোগী টারবাইন জেনারেটার, বাষ্পচালিত জেনারেটার এবং তার আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন ক্ষমতার মোটর, সুইচগিয়ার, ট্রান্সফরমার, ক্যাপাসিটর, নিয়ন্ত্রকগিয়ার, পাম্প, ভাল্ব প্রভৃতি।

শ্রীবসু বললেন, শুধু প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতাই নয়, এই সব সামগ্রী তৈরি করতে গেলে অনেক জটিল কলাকৌশলের উপর নির্ভর করতে হয়। যেমন ধরুন টারবাইন। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের টারবাইন এবং জলবিদ্যুৎ-এর টারবাইনের মধ্যে বেশ কিছুটা পার্থক্য আছে। তাপবিদ্যুতের টারবাইন চলে বাষ্পের চাপে। উচ্চ তাপমাত্রার বাষ্পের সংস্পর্শে টারবাইনের ধাতু সম্প্রসারিত হয়। মরচে পড়ারও সম্ভাবনা থাকে। এ সব যাতে না ঘটে, উৎপাদনের সময় সেদিকে আমাদের লক্ষ রাখতে হয়। জলবিদ্যুতের ক্ষেত্রে আছে আর এক রকম সমস্যা। এক্ষেত্রে জলাধারে সঞ্চিত প্রাকৃতিক জলের তোড়ে টারবাইন ঘোরান হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক জলের মধ্যে থাকে নানা রকম রাসায়নিক যৌগ। থাকে ধূলিকণা এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উদ্ভিদ। এদের সংস্পর্শে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের টারবাইন যাতে মরচে পড়ে অথবা অন্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকটাও দেখতে হয় আমাদের। ইদানীং পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের টারবাইন তৈরির কাজেও হাত দিয়েছি আমরা। শেষোক্ত এই টারবাইন পারমাণবিক বিকিরণে যাতে না ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেদিকেও আমাদের নজর থাকে।
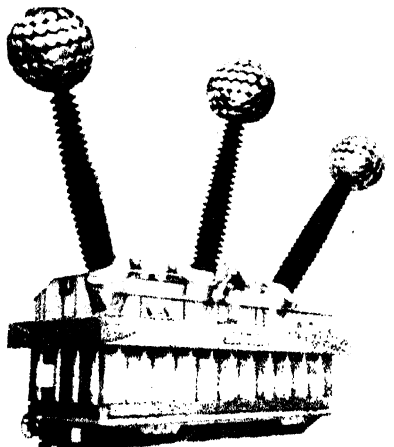
ভেলের তৈরি ২,৪০,০০০ কিলোভোল্ট অ্যামপেয়ার ট্রান্সফরমার এখন বিদেশেও সমাদৃত। থামের মত ইনসুলেটার তৈরি হয়েছে 'এম পি এল'-এ

মাদ্রাজ পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের জন্যে দুশ ছত্রিশ মেগাওয়াট ক্ষমতার টারবাইন তৈরি করেছে ভেল। নরোয়ায় যে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রটি বসছে তারও টারবাইন তৈরি করছেন তাঁরা। রানা প্রতাপ সাগরের দ্বিতীয় ইউনিটটির টারবাইনও তাঁদের তৈরী।

প্রশ্ন : অদূর ভবিষ্যতে আমরা তো আরও বড় রকমের বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা নিচ্ছি। তার জন্যে দরকার আরও শক্তিসম্পন্ন টারবাইন। এ ব্যাপারে কতটা এগিয়েছেন আপনারা ?

উত্তর : আপাতত দু শ দশ মেগাওয়াটের মত ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদক ইউনিটের টারবাইন তৈরির কাজ চলেছে। এই সঙ্গে পাঁচ শ মেগাওয়াট ইউনিটের টারবাইন তৈরির কাজেও হাত দেওয়া হয়েছে। শুনে খুশি হবেন, এক হাজার মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষম ইউনিটের উপযোগী টারবাইন তৈরির মত প্রযুক্তি ক্ষমতাও আমরা অর্জন করেছি।

ভেলের তিরুচিরাপল্লীর কারখানায় তৈরি হচ্ছে আধুনিকতম বয়লার। ম্যাগনেটো হাইড্রোডায়নামিক্স বা 'এম এইচ ডি' নিয়েও উদ্ভাবনার কাজ চলছে এখানে।

শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ভারী যন্ত্রপাতিই নয়, দেশের বড় বড় শিল্পে কারখানার হাজারো যন্ত্রপাতির এখন চাহিদা মেটাচ্ছে ভেল। এদের মধ্যে রয়েছে ইস্পাত, কাগজ, সিমেন্ট এবং বিভিন্ন খনির কাজকর্মের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম। এই সব সাজসরঞ্জামের মধ্যে পড়ে অতিকায় মোটর। শিয়ালদহ, হাওড়া, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই অঞ্চলে যে সব বৈদ্যুতিক ট্রেন চলছে, তাদের বেশির ভাগ মোটরই তৈরি করেছে ভেল। উৎপাদিত বিদ্যুৎ-শক্তি যাতে সুষ্ঠুভাবে বিভিন্ন মাত্রার পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে নিয়মিত প্রবাহিত হয়, তার জন্যে দরকার নানা রকম ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা। কোথাও বিদ্যুৎ-প্রবাহের মাত্রা বাড়াতে হবে। কোথাও কমাতে হবে। উচ্চ মাত্রার বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দিতে গেলে যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন। এই সতর্কতা শুধু যে জীবনের নিরাপত্তার জন্যই দরকার তা নয়, বিদ্যুৎ পরিবহণ করতে গিয়ে জেনারেটারের যাতে না ক্ষতি হয়, বিভিন্ন যন্ত্রপাতির না অনিষ্ট ঘটে, কিংবা বিদ্যুৎশক্তির না অপচয় হয়, এ সবের জন্যেও সতর্কতার প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, ভেল নির্মিত যন্ত্রপাতির ভূমিকা এক্ষেত্রেও এখন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বাঙ্গালোরে বসেছে ভেলের 'ইনডাসট্রিয়াল সিসটেমস গ্রুপ'। এই গ্রুপটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৭ সালে বিপণন থেকে শুরু করে বড় বড় ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে সহায্য করা, রক্ষণাবেক্ষণ, বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রপাতি বসান এবং নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সাহায্য করা, এমন অনেক কিছুই তাঁরা করছেন। এছাড়া স্বনিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং ইলেকট্রনিক সাজসরঞ্জাম নিয়ে আধুনিকতম গবেষণা এবং উদ্ভাবনার কাজেও এঁরা হাত দিয়েছেন।

শ্রীসুলের সঙ্গে ঘুরে ফিরে ওঁদের গবেষণাগারেরও কিছু কাজকর্ম দেখলাম। সম্প্রতি শ্রীসুলের তত্ত্বাবধানে সেখানে একটি বিশেষ ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্র গড়ে তোলার কাজ চলছে। ছোট্ট একটি যন্ত্র। এই যন্ত্রে আছে একটি টেলিভিশন পর্দা। অদূরে ক্যালকুলেটার যন্ত্রের মত একটি ব্যবস্থা। আর আছে যন্ত্রগণক। ইস্পাত কারখানার কর্মীসংখ্যা, প্রতি ঘণ্টা, দিন অথবা সপ্তাহে কতটা উৎপাদন হল, চুল্লির তাপমাত্রা, প্রভৃতি নানা রকম তথ্য পৃথক অথবা সামগ্রিকভাবে বোতাম টিপলেই ওই পর্দার উপর ভেসে ওঠে। পরিচালকদের কাছে এ ধরনের যন্ত্রের চাহিদা এখন অপরিহার্য।

"আমি পরিবারের গৃহলক্ষ্মী,
আমার আরামদায়ক পোশাকের 'শ্রী'তে ঘরের 'লক্ষ্মীশ্রী' ফুটে উঠবে।"

সবার রুচি-মাফিক পোশাকের জন্যে
নানান পছন্দসই মনোলোভা কাপড়!

স্যুটিং, শার্টিং, শাড়ী, ড্রেস মেটিরিয়াল ও ডেনিম।

**মফতলাল ইণ্ডাস্ট্রীজ্‌ নিউ শরুক মিল্‌স মফতলাল ফাইন**

MF-16 BEN
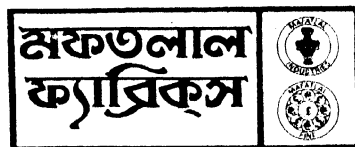
'পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে দেখা যায়, একদিকে যেমন বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, সেই সঙ্গে পাশাপাশি গড়ে উঠেছে হাজারো ছোট ছোট শিল্প-উদ্যোগ। বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিই ওই সব ছোট ছোট শিল্প-উদ্যোগগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে। এ ব্যাপারে ভেল-এর ভূমিকা কতটুকু?' বাংগালোরে তাঁর নিজস্ব অফিসে বসেই প্রশ্ন করেছিলাম শ্রী এস কে বসুকে।

আমার প্রশ্ন প্রায় লুফে নিয়েই উত্তর দিলেন তিনি, দেশের বহু ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে আমরা সাহায্য দিয়ে আসছি। প্রয়োজনে নিজেদের সঙ্গে সরাসরি জড়িয়েও নিয়েছি অনেককে। এতে করে ওই সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্মীরাই যে শুধু লাভবান হয়েছেন তা নয়, আমরাও লাভবান হয়েছি। বাংগালোরেই দুটি উদাহরণ রয়েছে। একটি 'রেমকো' অপরটি 'এম পি এল'।

পাশে ছিলেন 'ভেল'-এর ইনডাসট্রিয়াল সিসটেম গ্রুপের ম্যানেজার শ্রী এ এম বৈদ্য। তিনি বললেন, চলুন না, দুটি মৃতপ্রায় ক্ষুদ্র শিল্প ভেল-এর সহযোগিতায় কেমন জীবন্ত হয়ে উঠেছে, নিজের চোখেই দেখবেন।

শ্রীবৈদ্যের সঙ্গে দুটি প্রতিষ্ঠানই দেখতে গিয়েছিলাম।

প্রথমে 'রেমকো'। যার পুরো নাম এক সময় ছিল রেডিও অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড।

কর্নাটক সরকার পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানটি বাংগালোরের ইনডিয়ান ইনসটিটিউট অভ সায়েন্সের প্রায় দোরগোড়ায় অবস্থিত। এক সময় এখানে তৈরি হত নানা রকম সামগ্রী। যেমন, ইলেকট্রিক মিটার, কেবল, জল-ব্যবহারমাপক যন্ত্র, আকাশের বিদ্যুৎ-গ্রাহী ব্যবস্থা। ইলেকট্রনিক বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি। বিভিন্ন রাজ্য সরকার পরিচালিত শিল্প সংস্থাগুলিতে সচরাচর যা হয়ে থাকে, গোড়া থেকে 'রেমকো'র ভাগ্যেও তাই ঘটল। এক-একজন পরিচালক আসেন আর ধুয়ো তোলেন : এই কর, ওই কর। নতুন নতুন পরিকল্পনা হয়। তৈরি হয় নানা রকম সামগ্রী। যার অনেকই বাজারে অচল। আবার কাজের জিনিস যা তৈরি হয়, অব্যবস্থার দরুন সেগুলি কারখানাতেই জমতে থাকে। ফলে লোকসান আর লোকসান। ১৯৭৬ সালে এই লোকসানের মোট পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় ৪·৫ কোটি টাকায়।

১৯৭৬ সালে কর্ণাটক সরকারের অনুরোধে ভারত সরকারের সংস্থা ভেল মৃতপ্রায় ওই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। গ্রহণ করার পর নতুন ভাবে সংস্থাটিকে সাজিয়ে নেওয়া হয়। যে সব সামগ্রীর বাজার নেই, তাদের উৎপাদন বন্ধ করা হল। সেই সঙ্গে ভেলের তত্ত্বাবধানে এখানে বসান হল নতুন গবেষণা এবং উদ্ভাবনা কেন্দ্র। ঠিক হল এখানে বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্রপাতি তৈরির ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হবে। এর ফলে ১৯৭৮-৭৯ সালে [illegible] এখানকার লোকসানের মাত্রা কমে গিয়ে লাভের [illegible]রিমাণ বাড়তে থাকে। অতঃপর ১৯৮০ সালের একুশে মে এই প্রতিষ্ঠানটি ভেলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত হয়েছে। এখন এর নাম দেওয়া হয়েছে ভেল-এর নিয়ন্ত্রক যন্ত্রপাতি বিভাগ বা 'কনট্রোল ইকুইপমেন্ট ডিভিশন'।

প্রতিষ্ঠানটি ঘুরে দেখেছি। কথা বলেছি এখানকার কর্মীদের সঙ্গে। দেখলাম, সবাই সন্তুষ্ট। সন্তুষ্টির প্রধান কারণ : এক, এতদিনে ওঁরা চাকরির ব্যাপারে নিরাপত্তাবোধ উপলব্ধি করছেন। দুই, এ ছাড়া এই প্রথম তাঁরা এমন ধরনের কাজে ব্রতী হয়েছেন, যা করতে তাঁদের ভাল লাগছে, যা তাঁদের নিজেদের দক্ষতা এবং সৃজনশীলতাকে উজ্জীবিত করতে সাহায্য করছে।

দেখলাম, একদিকে তৈরি হচ্ছে নানা রকম মিটার। বিদ্যুৎশক্তি মাপার জন্যে যে সব মিটার আমরা বাড়িতে ব্যবহার করি সে সব ছাড়াও কল-কারখানায় বসান হয় এমন ধরনের মিটারও এখানে তৈরি হচ্ছে। দেশের প্রাদেশিক বিদ্যুৎ পর্ষৎগুলি এই সব মিটারের ক্রেতা।'

২৫০ মেগাওয়াট মাদ্রাজ পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রের জন্যে এই হিট একসেনজারটি তৈরি করেছেন ভেলের কুশলীরা

'থাইরিস্টার কনভারটার' নামে এক ধরনের যন্ত্র তৈরির কাজে হাত দিয়েছেন এখানকার কর্মীরা। বিদ্যুৎ-প্রবাহকে সঠিক মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করতে এ যন্ত্রটি কাজে লাগান হয়। ইস্পাত কারখানা, কাগজ, তামা প্রভৃতি কারখানার বড় বড় মোটর থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ-প্রবাহে অস্থিরতা বন্ধ করার ব্যাপারে এই যন্ত্রের ভূমিকা এখন অপরিহার্য। এতকাল ঘূর্ণায়মান পাইলট জেনারেটারের সাহায্যে এ কাজটি করা হত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সচল এই যন্ত্রটি মাঝে মাঝে বিগড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। তুলনায় 'থাইরিসটর কনভারটার'-এ কোন সচল অংশ না থাকায় বিগড়ানোর ভয় কম। এ ছাড়া কর্মক্ষমতার দিক দিয়ে শেষোক্ত এই যন্ত্রটি অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। এই থাইরিসটের প্রধানতম অংশ সিলিকনের 'মনো-ক্রিস্ট্যাল'। এ বস্তুটি এতকাল বিদেশ থেকে আমদানি করা হত। এখন এই প্রতিষ্ঠানেই তা উৎপাদন করার ব্যবস্থা চলছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, [illegible] বৃহত্তম কনভারটারটি এখানেই তৈরি হয়েছে। এই কনভারটার ছয় হাজার অ্যাম্পেয়ার বিদ্যুৎ-[illegible] আটশ ভোল্ট তড়িৎ-বিভব মাত্রায় রাখতে সা[illegible] করে। কনভারটারটি রাউরকেল্লা ইস্পাত কারখানায় কাজ করছে।

প্রতি[illegible]টির সিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার ডঃ বি ডি শর্মা [illegible] [illegible]লিকনের মনোক্রিস্টাল তৈরী হয়ে গেলে 'পাওয়া[illegible] [illegible]নিকস'-এর (বিদ্যুৎ সরবরাহ সংশ্লিষ্ট ইলেকট্রনিক য[illegible]) [illegible] আমাদের দেশ স্বনির্ভর হতে পারবে।

ভেলের সাহায্যপুষ্ট আরও একটি প্রতিষ্ঠানও দেখলাম। নাম 'মাইসোর পোর্সিলেন লিমিটেড' বা সংক্ষেপে এম পি এল। ১৯৩২ সালে মহীশূরের মহারাজার আমলে তৈরী হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠান। তৈরির পর প্রতিষ্ঠানটি মূলত যে সব সামগ্রী উৎপাদন করতে থাকে তাদের মধ্যে ছিল কম শক্তি-সম্পন্ন বিদ্যুৎ-প্রবাহের উপযোগী চীনেমাটির তৈরী ইনস্যুলেটার, বাসন-কোসন এবং দেব-দেবীর মূর্তি।

স্বাধীনতার পর এই প্রতিষ্ঠানটিকেও কর্ণাটক সরকার অধিগ্রহণ করেন। এবং বলাই বাহুল্য, শেষ

'এম পি এল'-এর কর্মীরা পোর্সিলেনের ইনস্যুলেটার তৈরি করছেন

পর্যন্ত বড় রকমের একটি লোকসানের বোঝা বহন করতে বাধ্য হন। কর্ণাটক সরকারের অনুরোধে ১৯৭৬ সালের অকটোবর মাসে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনভার গ্রহণ করল ভেল। সেই সঙ্গে ভেল থেকে অনুদান দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হল। পরবর্তী চার বছরে যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে এখানেও।

এখানকার প্রধান শ্রী রাই-এর সঙ্গে কথা হল। শ্রী রাই বললেন, গোড়ায় আমাদের সমস্যা ছিল প্রচুর। এখানকার বেশির ভাগ কর্মীই [illegible]। [illegible] গ্রামীণ পদ্ধতিতেই কাজ করত তারা। কিন্তু মাত্র চার বছরের মধ্যে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দক্ষতা বাড়ান সম্ভব হয়েছে। ভেলের বেতনহার এবং অন্যান্য সুযোগ চালু হওয়ায় কর্মীরাও খুশী। প্রতিষ্ঠানটির এখন নাম দেওয়া হয়েছে 'ভেলের ইলেকট্রো-পোর্সিলেন ডিভিশন'।

যেন এক আধুনিক কুমোরবাড়ির ব্যবস্থা। অতিকায় দুটি বাড়ি। বাড়ি দুটির একপাশে কয়েক একর খোলা জায়গা। সেখানে পাশাপাশি স্তূপ করে রেখে দেওয়া হয়েছে কাঁচামাল। কোয়ার্টজ, ফেলডস্পার, টেটোকাইট, পাইরোফাইলাইট এবং ফেল্ড-সাইট। সবই পাথর। নিয়ে আসা হয়েছে বাঙ্গালোরের অদূরবর্তী পাহাড় অঞ্চল থেকে। হারপ্রাবাদ, চিন্তামণি (বাঙ্গালোর থেকে সত্তর কিলোমিটার দূরে), ঝাঁসি এবং মহীশূর থেকে। এ ছাড়া আছে নানা রকম ক্লে বা মাটি। যেমন, বহ্নেশপুরের চীনেমাটি, বিকানিরের বল ক্লে। [illegible] বল ক্লে, থাপ্পারের বল ক্লে এবং জাপানী বল ক্লে। শেষোক্ত এই মাটি জাপান থেকে আনতে হয়।

দেখলাম পাথরগুলিকে প্রথমে ছোট ছোট টুকরো করে নেওয়া হচ্ছে যন্ত্রের সাহায্যে। টুকরোগুলিকে পরে বল-মিলে গুঁড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে। মাটি এবং পাথরের উপাদান উপযুক্ত মাপ মত মিশিয়ে আর এক জায়গায় জল মিশিয়ে ঝাঁকান হচ্ছে। তাও যন্ত্রের সাহায্যে। এই যন্ত্রে আছে চৌম্বক ব্যবস্থা। চৌম্বকশক্তির সাহায্যে মিশ্রণের মধ্যেকার লোহার কণা সরিয়ে নেওয়া হয়। তারপর জল মিশ্রিত মন্ড থেকে জলকে নিংড়ে বের করে, কুমোররা যেমন মাটির লেই তৈরি করে, সেইভাবে ওই মন্ডকে লেই-এ পরিণত করা হচ্ছে। অবশেষে কিছুটা যন্ত্র এবং বেশির ভাগই কর্মীরা তাঁদের নিজেদের দক্ষতার সাহায্যে তৈরি করছেন নানা রকম ইনস্যুলেটার। এই ইনস্যুলেটারের কোনটি গামলার মত, কোনটি চাকতির মত। আবার কোনটি উঁচু স্তম্ভের মত। যেন অনেকগুলি চাকতি পর পর বসিয়ে ওই স্তম্ভগুলি তৈরি করা হয়েছে।

কাঁচা ইনস্যুলেটারগুলি পোড়ান হয় ভেলের আগুনে। তারপর আছে নানা রকম পরীক্ষা। দেখে নিতে হয়, প্রচন্ড চাপে তারা যাতে না ভাঙে। উচ্চতর বিদ্যুৎশক্তি প্রবাহের সময় তাদের ভেতর দিয়ে বিদ্যুতের এতটুকু ক্ষরণ যেন না হয়। বৈদ্যুতিক ট্রেন, ইঞ্জিন, পরিবহণ-কেন্দ্র, উৎপাদন কেন্দ্র এবং [illegible] সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা বিদ্যুৎবাহী তারের সঙ্গে [illegible] অনেক ইনস্যুলেটারই এখন সরবরাহ করছে [illegible] প্রতিষ্ঠানটি।

শ্রীরাই বললেন, এখন আর লোকসান নয়। বরং পাল্লা এখন লাভের দিকে ঝুঁকেছে।

চীনেমাটির কারখানাটি দেখে ফেরার সময় [illegible] ভাল লাগছিল। সম্পূর্ণ অশিক্ষিত এবং গ্রামীণ মানুষকে আধুনিকতম শিল্প উদ্যোগে কাজ [illegible] মত [illegible] করে তোলা যায়—ভেলের এই [illegible]টিই তার দৃষ্টান্ত। উপযুক্ত সাহায্য পেলে [illegible] প্রযুক্তি যে সরল এবং সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের মধ্যেও আত্মবিশ্বাস যোগাতে পারে সেখানকার কর্মীদের মুখ দেখলেই তা অনুমান করা যায়। [illegible] শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে এইভাবে রক্ষা করে [illegible] একটি [illegible] রকমের জাতীয় কর্তব্য পালনে [illegible]। [illegible] এটা অনুকরণীয় [illegible]উচিত।

সমরজিৎ কর
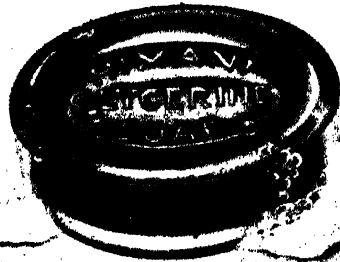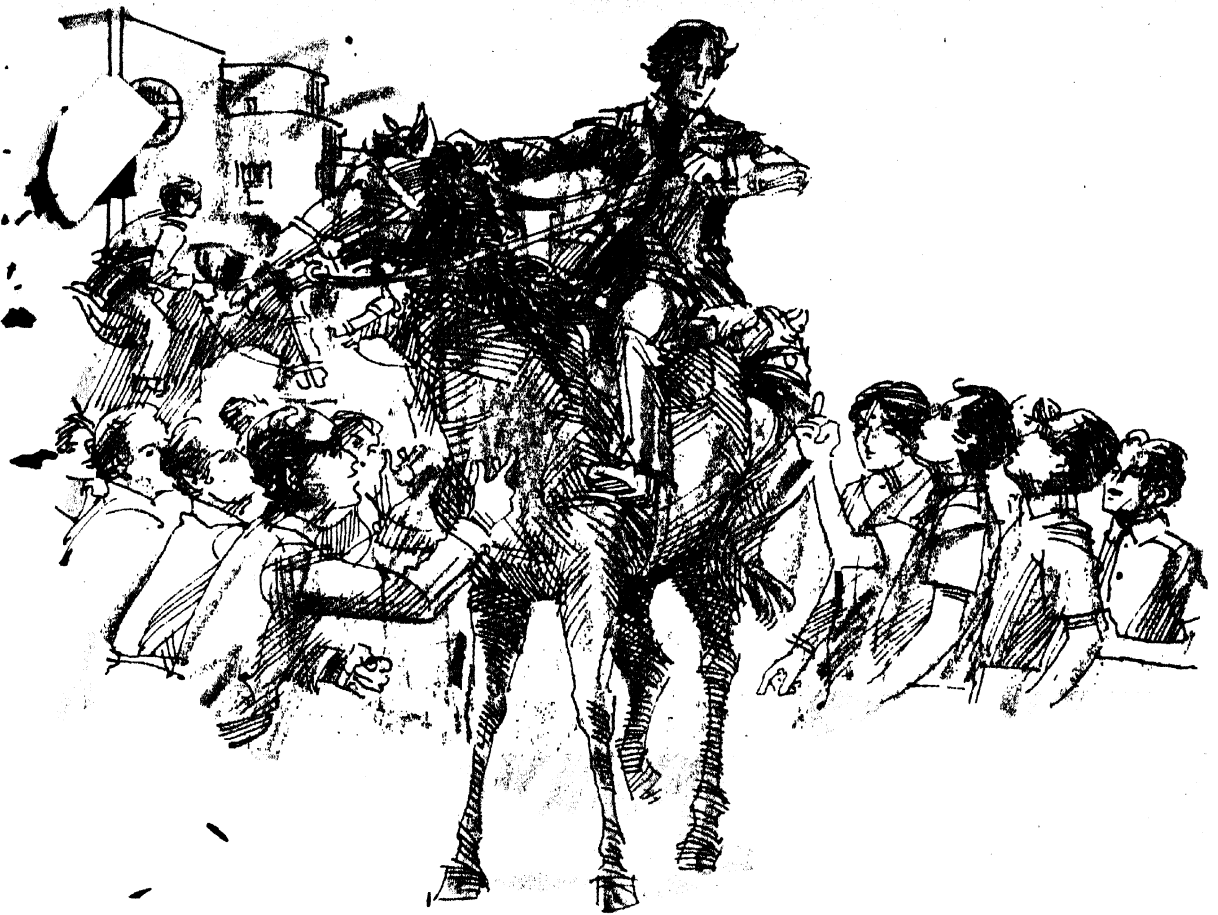
# ঘোড়া থেকে নেমে

রবি সেন

এক গ্রীষ্মের ভোরে বা সেটা বসন্তকাল, পৃথ্বী জেগে উঠে দেখে তার পরিকল্পনা মতো শহরের যানবাহন ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটেছে। তা হলে পৌর কর্তৃপক্ষের লাল ফিতের ফাঁস থেকে তার পরিকল্পনা মুক্তি পেয়ে, এখন অবশেষে, শহরের চলাচলে একটা স্বস্তি ও ছন্দ ফিরিয়ে আনলো। একটা সিগরেট ধরালে বেশ হয়।

সব জানালা খুলে দিল পৃথ্বী, দরজাও। গতি এখন ছন্দোবদ্ধ হয়ে সারা শহরে উৎসবের হাওয়া বইয়ে দিয়েছে—চোখ বুজে উন্মনা ভাবল সে। এবং চোখ খুলে তার পাশে সুমিকে একটিবার আড়ে দেখে নিল।.সিগরেট ধরালে বেশ হয়। যদিও সুমি এখনও জাগে নি, কিন্তু যে কোন সময় জেগে উঠে ভোরের কাকলীর মতো প্রথমে বলবে, "বেড-টিতে চুমুক না দিতেই সিগরেট।" তা ছাড়া দরজা-জানলা খুলে কাকভোরে পৃথিবীকে ঘরের মধ্যে ডাকার বিলাস, বিশেষত স্ত্রী যখন ঘুমিয়ে এবং পোশাকে-আশাকে কিছুটা অপ্রস্তুত, তখন। কাজেই অপরাধের সংখ্যা বাড়াতে পারে না পৃথ্বী। তবু সে ভাবল সুমিকে জাগিয়ে দেওয়া জরুরী এবং একটা সিগরেট। এই ভোরে শহর ক্রমেই সুন্দর হয়ে উঠছে। সুমি জেগে উঠে দেখুক ভোরের শহর অন্য দিনের তুলনায়, অতীতের ধারাবাহিক তুলনায়, গতকালের তুলনায় কত সুন্দর হয়ে ওঠে, ক্রমেই। আর পথ-দুর্ঘটনা স্রেফ অতীতের ব্যাপার হয়ে যাবে। মানুষের মাথা থেকে তেলতেলে ঘিলু আর পথের মেটালে চুঁইয়ে ছড়াবে না। বা দুটো চোখই ফুটপাথে ছিটকে উঠে বলবে না, এই যে 'আমি' চাকার তলায় পিষ্ট। না কি একটা চোখ তখনই স্বর্গের দিকে রওনা দেবে। একটু ঝুঁকে পড়ে স্ত্রীর চিবুকে স্পর্শ করবে সে বা তা করতে গিয়ে সুমির গালে আলতো চিমটি কাটবে ঠিক এই সময় দরজায় এক ঘোড়সওয়ার উঁকি দিল আর ঘোড়া থেকে তার পরিচিত কাবুলীওয়ালা নামতে যাবে, পৃথ্বী তাকে ইশারায় চলে যেতে বলে। কাবুলী মৃদু হেসে, "আগামী মাস পয়লা?"

"হ্যাঁ, অন্তগামী মাস শেষ হলে।"

তা হলে পরিকল্পনার প্রথম ভোরে ঘোড়ায় চেপে দিনের প্রথম আগন্তুক তারই পাওনাদার। বাস্তবিক যে শহরে পেট্রোল-ডিজেলের দিন-রাত খারিজ হয়ে সমস্ত শহর ঘোড়ার পিঠে উঠে বসেছে, সেই শহরের প্রথম ভোরে পাওনাদার বিদেশী সাত-সকালেই পৌঁছে যায় দেনাদার তারই কাছে, যে কি না এই মাস্টার প্ল্যানের স্রষ্টা। একটু বিষণ্ণ হাসলো পৃথ্বী, স্বগত, আপন খেয়ালে। আনমনা হতে গিয়ে সে বরং মনস্ক হয়ে উঠলো। কাক-বকও জানে না সে-ই এই মাস্টার প্ল্যানের ভাবুক, এমন কি সুমিও নয়। শুধু পৌরসভার কর্তাব্যক্তিরা তাকে বিলক্ষণ চেনে। কিন্তু একদিন যখন জানাজানি হয়ে যাবে যে সে ঘাতকের মতো ছুরি চালিয়ে শহরের বুক থেকে পেট্রোলের দিন-রাত উপড়ে ফেলেছে, তখন......

তখন নিশ্চই তার পাড়া-পড়শীদের একজন, সেই তরুণী সবার আগে এসে তার সামনে দাঁড়াবে, কোন কথা বলবে না সে। নীরবে অপেক্ষা করবে সেই জিজ্ঞাসা নিয়ে, "ক'টা দিন আগে হলে..." "ঠিকই, ক'টা দিন আগে হলে আপনার যুবক স্বামী বৃষ্টির সন্ধ্যায় ভিড়ের শহরে বাসের পেছনের চাকায় জড়িয়ে যেত না। কিন্তু ক'টা দিন আগে-পিছের ব্যাপারে আমার কোন হাত ছিল না, বিশ্বাস করুন।"

"বিশ্বাস করুন, আমার কোন হাত ছিল না।"

"বিশ্বাস করুন, আমার কোন হাত..."

কত জনকেই যে বলতে হবে এসব কথা।

শহর ফাঁদ পেতে রাখে। সকাল সন্ধে মাঝরাতে কাগা-বগার প্রাণ যায়। বাপ ছেলের লাশ বয়ে নিয়ে যায়। একে অন্যের। লোকে বলে পথে-ঘাটে চোরা ফাঁদ। লোকে বলে রাক্ষসী শহর। কিন্তু ট্রাফিক-পণ্ডিতেরা বলে, মেট্রোপলিস—অমুক-তমুক। পৃথ্বী এই ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিয়ে...আরও কয়েকটা চেনা-অচেনা মুখ উঁকি মারে। পৃথ্বী মনে মনে বলে, বিশ্বাস করুন।

সে দিন-মাস-বছর পৌর দপ্তরে হাঁটাহাঁটি করেছে। বছর ঘুরে আসে। পরিকল্পনার পাণ্ডুলিপি হলুদ হয়ে আসছিল। এদিকে শহরে রুটির দাম বেড়ে গেল। এদিকে শহরে ভিড় ও যানবাহনের খরচা বেড়ে গেল। একদিন দুপুরবেলা পৌর-কর্তৃপক্ষের সবাইকে একসঙ্গে পাওয়া গেল বা অধিকাংশকে। জরুরী মন্ত্রণা ছিল। তাকে দেখে পৌরপিতা চেঁচিয়ে বললেন, "এই যে সেই লোকটা এসে গেছে। বসুন বসুন। আপনার প্রস্তাব সভার মেমোতে চার নম্বরে আছে।" পরে সহকর্মীদের উদ্দেশে, "ম্যাডম্যানস প্রপোজাল। বাট দেয়ার অ্যান অরডার। দেখা যাক।" তাকে একটা টুল দেওয়া হলো লম্বা হলঘরের এক কোণে।

# ময়লা পরিষ্কারের সেরা হাতিয়ার

নতুন শক্তিশালী
মিগ ব্লু ডিটারজেন্ট বার
আরও সহজে
লুকানো ময়লা পরিষ্কার করে।
আর তার ফলে জামাকাপড় হয়
ঝকঝকে পরিষ্কার।
আর কি সুবিধাজনক দামে!
আজই মিগ ব্লু কিনুন।

# মিগ

## ব্লু ডিটারজেন্ট বার

Mig HI-POWER DETERGENT BAR মিগ

A Kusum Product

কিন্তু প্রথম দফার আলোচনাই মধ্যরাত্রি অব্দি গড়াল। শহর অন্ধকার হয়ে গেল, শহর ঘুমিয়ে পড়ল। ভবঘুরে আর ভিখিরী, কারবারী ও নষ্ট লোকজনদের দখলে শহর বিলকুল চলে গেল। এক কোণে টুলের ওপর ঝিমুনি খেতে খেতে সে শুনলো উত্তপ্ত আলোচনা বা তাকে বচসাই বলা চলে। শহরে ধোপারা আয়কর ফাঁকি দেয়, শহরে ধোপারা ট্রেড লাইসেন্সের টাকা মারে, শহরের ধোপারা...। অথচ ঝিল পুকুর লেক ডোবা মাঠ রেল লাইনের ধার এরা দখল করে আছে। শহরের ধোপারা বড়ই ওস্তাদ, প্রায় সিনেমার অভিনেতাদের মতো। কাজেই কর ফাঁকি দেয়া বন্ধ করতে ধোপাদের গাধাদের গণনার কাজ শুরু করতে হবে। যার যত গাধা তাকে হিসেবের মধ্যে এনে আয়কর বিক্রয়কর নির্ধারণ করতে হবে। সুতরাং গাধাদের গণনার জন্য যাকে বলে রীতিমত একটা আদমসুমারী। এই কাজে লোক দরকার। তাই নতুন নিয়োগ। শহরের বেকারীর খানিকটা হাল্কা হবে। হুররে! এবং ধোপারা জব্দ।

দুমদাম পা ফেলে যে যার মতো মন্ত্রণাসভা ছেড়ে চলে গেল। এক কোণে টুলের ওপর তাকে কেউ দেখতেই পেল না। বাকি রইলো তিন দফা। তার সঙ্গে পরে আরও অনেক দফা যোগ হবে।

আরেক দিন।

এদিন সে ভেবেছিল মন্ত্রণাসভার গোল টেবিলের উপর ব্যাঙের মতো লাফিয়ে উঠবে এবং মাননীয় সদস্যদের সামনে তার পরিকল্পনা সম্পর্কে একটা ঝাড়া বক্তব্য রাখবে। কিন্তু মান্যগণ্য সদস্যদের ভারিক্কী চেহারা ও তাদের সচিব-আমলা-বেয়ারার কেতাদুরস্ত হাবভাবে সে ঘাবড়ে যায়। সেই টুলের ওপর এক কোণে।

গ্যাঙর গ্যাঙ শুরু হলো। যুক্তি তক্কোর ধুলোবালি উঠলো। সংখ্যা-পরিসংখ্যান ফরদাফাই হয়ে তপ্ত কড়াইয়ে খইয়ের মতো ফুটতে থাকে। তার চোখ বড় হয়ে এলো —তবে কি না এতো পাণ্ডিত্য, এতো ধী! তার চোখ ছোট হয়ে এলো। ঘুম এবং ক্লান্তিতে। তার চোখ আবার বড় হয়ে এল দুর্ভিক্ষ ও খাদ্য দাঙ্গার ওপর মনোরম আলোচনায়। মাননীয় সদস্যরা অক্লান্ত আলোচনার তুফান তুলেছেন। এবং সিদ্ধান্তে আসতে চাইছেন।

তার ঠোঁট ঝুলে পড়ল যখন সে এক দুই করে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত নিজের কানে শুনল।

সিদ্ধান্ত এক : অপুষ্টিঘটিত মৃত্যুকে কখনই অনাহারে মৃত্যু বলে দেগে দেয়া চলে না। দু-চার জন লোক এদিক-সেদিক না খেতে পেয়ে মারা যেতে পারে, দু-চারজন অপুষ্টিতে, চার-ছ জন এদের শোকে। বাকিরা লোভে পড়ে ঘাস-পাতা খেয়ে। একে দুর্ভিক্ষ বলা চলে না।

সিদ্ধান্ত দুই : কর্তৃপক্ষ খুবই উদারভাবে লঙ্গরখানা খুলেছে। কিন্তু দেখতে হবে লঙ্গরখানার খিচুড়ী খেয়ে লোভী লোকজন যেন গঙ্গাযাত্রা না করে। কর্তৃপক্ষ যে উদার তার আরও প্রমাণ শহরের রাজপথে ষণ্ড ও গোমাতা এখনও স্বাধীনভাবে মলমূত্র ত্যাগ করে। শহরের ফুটপাথে লোকে রাঁধে-বাড়ে খায়-দায় ও সন্তান পয়দা করে। কোনো কর লাগে না।

সিদ্ধান্ত তিন : এখানে সেখানে দু-একখানা খাদ্যশস্য বোঝাই গাড়ি লুট হতে পারে, কিন্তু তাকে খাদ্য-দাঙ্গা বলা চলে না। এতে বরং প্রমাণ হয় দেশের লোক এখনও শৃঙ্খলাপরায়ণ এবং হাসি মুখে মরতে জানে।

সর্বশেষ সিদ্ধান্ত : এবারে খাদ্যশস্যের ফলন ভাল হওয়া সত্ত্বেও যে আকালের কথা উঠেছে, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখা গেল যে খাদ্যশস্য সম্ভবত সীমান্ত পেরিয়ে চলে গেছে। কোন কোন মহল থেকে যে মজুতদার ও চোরাকারবারীদের শাস্তির দাবি উঠেছে, সে সম্পর্কে কর্তৃপক্ষও মনে করে প্রতিটি অপরাধীকেই ল্যাম্প পোস্টে ঝুলিয়ে ফাঁসী দেওয়া উচিত। কিন্তু সারা দেশে এত ল্যাম্প পোস্ট কোথায়।

মান্যগণ্য সদস্যদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় চলের এক কোণে একবার সে টুলের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছিল এবং স্বপ্নে-পাওয়া মানুষের মতো সে বলে উঠেছিল, "হর্ম্যের মধ্যে দুর্ভিক্ষও রঙিন।" কিন্তু মাননীয় সদস্যরা নিজেদের আলোচনায় এতোই মাথা ডুবিয়েছিলেন যে সে-কথা তাদের কানে যায়নি।

এইভাবে পৃথ্বী ঘোরাঘুরি করছিল। হানা দিচ্ছিল কর্তৃপক্ষের আম-দরবারে। দিন-মাস-বছর ঘুরে যায়। কিন্তু সে হাল ছাড়েনি। বস্তুত দিনে দিনে অনেক টানা-হেঁচড়ার মধ্যে তার পরিকল্পনা গড়ে উঠেছিল।

বাড়ি থেকে বের হলেই যে জনতরঙ্গের ঘূর্ণিতে তাকে পড়তে হতো তা ছিল ছাল-চামড়া ওঠানো বিভীষিকা। ভিড়ের বাসে পা খেঁতলে যাওয়া বা মাথা ঠুকে গেলে রোজকার কলহের মধ্যে বিড়ম্বিত হতে হতো তাকে। সে একসময় ভাবতে শিখেছিল যে শহরের প্রতিটি লোক পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করে বুড়ো হয়ে পড়ছে। একদিন সে পকেটমার হিসাবে সাব্যস্ত হতে গিয়ে কোনক্রমে রেহাই পায়। আরেকদিন কণ্ডাক্টর তাকে অকারণেই বলেছিল, 'টিকিট-ফাঁকি দেওয়া বাবু।' অপমান ও গ্লানি ছিল ক্ষয়ের মতোই নিত্য এবং ক্ষয়ের স্বাদ। বিধ্বস্ত হয়ে ঘরে ফেরার পথে সে নিজেকেই অভিসম্পাত করত, তখন বুকে একটা পুরানো ব্যথা ঝংকার দিয়ে উঠত। উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাকে এ শহরে এনেছিল, না কি রুজি-রোজগার— মনে করতে চাইত সে। বুকের ব্যথাটা উঠলে সে কেমন ভয়ে ভয়ে বুকের ওপর একটা হাত রাখতে চাইত। অন্য হাতে ব্যাগ সমেত বাসের হাতল ধরে দেহের ভারসাম্য [illegible] রাখত। এবং [illegible] অস্পষ্ট আবেগময় কৃতজ্ঞতা দিয়ে একদিন সে এ শহরকে লাথি মেরে ছেড়ে [illegible] না কি কিছুটা মাথা নিচু করেই। সে পারল না আর তখনই জমাট ভিড়ের মধ্যে বেপরোয়া ঝিমুনি সমেত একটা নদীর স্বপ্ন [illegible] সে। বুঝি বা নদীর সঙ্গে সেই জীবনের অনুষঙ্গ তাকে বড় বেশি ব্যাকুল করেছিল।

# নতুন
## লিটলস্‌-এর ফীডিং বট্‌ল, যা ভাঙেও না ফাটেও না!

## সবদিক দিয়ে এটি একেবারে অতুলনীয়!

একবার ভ্রমণে সে দেখে ছোট নদীর পাড়ে এক মাঝবয়সী লোক দাঁড়িয়ে তড়িঘড়ি মাথায়, নাকে, কানে ও নাভিতে তেল দিয়ে নদীতে দুটো ডুব মেরে উঠে এসে পাড়ে দাঁড়িয়েই হাঁক দিল, "বউ, ভাত দে।" স্পষ্টই সে শুনেছিল লোকটার বউ অদূরে দাওয়া থেকে বলছে, "দিয়েছি গো।" সেই থেকে একটা ছোট নদীর স্বপ্ন মাঝেমধ্যে হানা দিত তার মনে। যখন শব্দ করে বাসের গীয়ার পাল্টাতে বা ক্ল্যাচ না টিপেই হঠাৎ ব্রেক কষার জন্য ভিড়ের সবার মাথা ঠোকাঠুকি হলে ছোট নদী তাকে ইশারা পাঠাত। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সে জানে এ শহর তাকে পেরেকে পুতে গেঁথে রেখেছে। সে প্রোথিত। তা ছাড়া ছোট নদীর পাড়ের সেই জীবনের উল্টো পিঠটাও সে দেখেছিল এই শহরেই। সেই অভিজ্ঞতা—

বন্ধুর শয্যার পাশ থেকে বিদায় নিয়ে ক্যানসার হাসপাতালের একতলায় তফাতে দাঁড়িয়ে দেখছিল সে। দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে লোকটা ঘুমিয়ে পড়েছিল, ভঙ্গীতে ঘুমের অধিক কিছু ছিল। তাই তাকে ভাবায় মৃত্যুর দোসর হিসাবে এই ঘুম, না যাকে আমরা ঘুম বলি তার কাছে আত্মনিবেদন, আবার জেগে উঠবে বলে। লোকটার কাছে তার মাঝবয়সী বউ মেঝেতে ঠ্যাং উঁচু করে শুয়ে কাতরাচ্ছিল। মেয়েটার গলা থেকে চাপ চাপ গোঙানি হাসপাতালের ইট-কাঠে বাড়ি খেয়ে কুটো কুটো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রসব বেদনার যন্ত্রণা এ নয়, যার অন্তিমে এক কমলা-রঙের ভোরবেলার কথা ভাবুক কল্পনা করে। নেহাৎই জরায়ুতে ক্যানসার। রোগ ধরা পড়তে বছর অন্ত যায়। গ্রাম থেকে মহকুমায়, সেখান থেকে সদরে অনেক উল্টি-পাল্টির পর ডাক্তারবাবু বিধান দিল, এবারে শহরে যেতে হবে যেখানে আছে এ রোগের হাসপাতাল। তারা রেল গাড়িতে উঠে বসল। আজ সাত দিন তারা এ শহরে। আজ সাত দিন তারা এ হাসপাতালের মেঝেতে মাথা কুটছে। শয্যা মেলেনি। এ সব কথা জানা গেল বউটার ছেলেবয়সী ভাইটার কাছে। আর হাসপাতালের ওয়ার্ড-মাস্টার হাতে চাবির গোছা দুলিয়ে বলছে, কিন্তু এভাবে রোজ রোজ এসে হাস-পাতালের আউটডোরের মেঝেতে পড়ে থাকা চলবে না। এ হাসপাতালের একটা ইজ্জত আছে। কিন্তু ছেলেমানুষ ভাই এ কথা শুনবে না। সে বলে, "আমাদেরও একটা ইজ্জত আছে গা। রোগী লিয়ে কি করে মিছিমিছি ঘরে যাই। যেতে হয় লাশ লিয়ে যাব।" এ সময় লোকটা জেগে উঠে ছেলে মানুষটার গালে চড় কষিয়ে দেয়। সবাই হা হা করে ওঠে।

কে যেন পেছন থেকে পৃথ্বীর পিঠে হাত রাখে। —কি হে পৃথ্বী, ছোট নদীর পাড়ের জীবন যে এখন ইজ্জত বাঁচাতে লাশ নিয়ে ঘরে ফিরতে চায়!

সে মাথা নাড়ে। তাই কি বলা চলে। তা হলে লোকটা তার শালার গালে চড় কষালো কিসের তাড়নায়। না কি বউয়ের লাশ নিয়ে এ শহরেই তারা ঘুরে বেড়াবে। আর কাজিয়াটা তাই নিয়েই, কে জানে!

পৃথ্বী নিঃশব্দে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ফুটপাথে পা রাখে। মাইল মাইল হেঁটে সে বাড়ি পৌঁছাবে। ট্রাফিক-আইল্যাণ্ডের সবুজ আলোর সংকেত তবু তাকে ঘাস-পাতার জীবনের ইশারা দেয়। পৃথিবীতে একদিন বৃষ্টি নামবে। তার আগে এ শহর ছেড়ে ছোট নদীর ধারে ঠাঁই নিলেও কোন না কোন দুঃখের হাত ধরে এ শহরেই আবার ফিরে আসতে হবে তাকে। তাই এই শহরকে সুসহ করার মরীয়া ইচ্ছায় অনেক ক্লান্তি ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে, আতংক ও গ্লানির মধ্যে পৃথ্বীর যানবাহন সংক্রান্ত মাস্টার প্ল্যান অবয়ব পেয়ে যায়। তারপর থেকেই কর্তৃপক্ষের কাছে হাঁটা-হাঁটি। তা ভিন্ন অভিজ্ঞতা বা একই অভিজ্ঞতার ভিন্ন দিক। মাঝরাতে সেই টুলের ওপর বসে থেকে শহরের ওস্তাদ ধোপাদের কর ফাঁকি দেবার গল্প শোনা বা দুর্ভিক্ষের রঙিন আলোচনায় মান্যগণ্য সদস্যদের বাগ্মিতা, এসব কিছুকে ছাপিয়ে শহরের ধূসর মানচিত্র তার চেতনায় গাঢ় কালো ছায়া ফেলে।

কিন্তু এই ভোরে সব কিছু তার বিপরীতে রূপান্তরিত হয়, যেমন রূপকথায়। কেননা তা বেচারা মানুষেরই স্বপ্ন-কল্পনার রঙে জারিত। আর শহরের ভোর ক্রমেই সুন্দর হয়ে ওঠে যা দেখে পৃথ্বীর শরীর-মনে নতুন এক প্যাশানের দোলা লাগে।

ভোরের ছবির মতো ভোর।

বেবাক শহর ঘোড়ার পিঠে। পৃথ্বীও চলেছে মন্থর, অথচ গদ্যছন্দের মতো। তার আগে আগে বোস সাহেবের গিন্নী ও তার পাশের বাড়ির যুবক। পাশাপাশি দুটি ঘোড়া গায়ে গা লাগিয়ে যেন কতকালের ঘনিষ্ঠ।

"খুব থ্রিলিং লাগছে, তাই না!" যুবক বলে।

"কি আমাদের এই পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ ভ্রমণ?" মেমসাহেব অন্তরঙ্গ জিজ্ঞাসা করে। বুঝতে চায় হোয়াট্ হার্ বয়-ফ্রেণ্ড্ রীয়্যালি মিনস।

"না, এই রাইডিং।" যুবক ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়।

পৃথ্বী শোনে, অবাক হয় না। সে একটা সিগরেট ধরিয়ে এক বুক ধোঁয়া ছেড়ে পারিপার্শ্বিক জরিপ করতে চায়।

চলচ্চিত্রে যুদ্ধের মতো রাস্তা জুড়ে ঘোড়সওয়ার। শিশুরাও চলেছে স্কুলে পনির পিঠে। সঙ্গে তাদের অভিভাবকদের দু-একজন।

আজ শুরুর দিন। চৈত্রের বাতাসের মতো নতুন মেজাজ বয়ে আনে। মাথায় পালক গুঁজে একদল যুবা পৃথ্বীর পাশ দিয়ে ছুটে গেল। তাদের মধ্যে একটা মেয়ে। রঙীন জামা গায়ে। তার হাতের লাগাম টালমাটাল। তার ছোটার বেগ বাধা পেয়ে পেয়ে শরীরে ঢেউ তুলেছে। তাই দৃষ্টি কেড়ে নেয়। আর ঐ তো দর্শনের অধ্যাপক চলেছে ফুটপাথের গা ঘেঁষে সন্তর্পণে। এক হাতে তার বাজারের থলে পতাকার মতো উড়ছে। কথা বলছে রহস্যজনক অস্থিরতায়, হয়তো তার বাহনের সঙ্গে। বিপরীত দিক থেকে এক কবি আসে, মাথায়

কাঁবকে সে চেনে না, যেমন দর্শনের অধ্যাপককে চেনে। একই বাজারে কেনা-কাটার সুবাদে।

বাজার বলতে বাজার। ক্রমেই তা জমে উঠছে। কেনা-কাটা, দরদস্তুর আর পথের ভিড় আছড়ে পড়ছে। বেলা বাড়ে। ভোর আর কতসময় থাকে। সকাল-বেলা সকাল সকাল চলে যায় ফিঙে পাখির মতো লেজ নাচিয়ে। শহর কেনা-বেচায় গমগম করতে থাকে। একসময় পৃথ্বী দেখে সেই যুবক আর মেমসাহেব আবার পাশাপাশি চলেছে।

"আপনার কর্তাকে আমার চাকরিটার কথা মনে করিয়ে দেবেন।"

"রীয়্যালি ব্যাড্ লাক্। এই শহরের পিঠে ডানা লাগাবার মেজকর্তা ছিল ও। এখন তো সব লক্-আউট।"

"তার মানে?"

"বুঝলো না ডার্লিং, এখন গোটা প্রজেক্টটাই বাতিল হয়ে যাবে। তাই নতুন চাকরির কোন প্রশ্নই থাকছে না।"

"আপনি আমাকে ডার্লিং-ডার্লিং করবেন না।"

"ওফ্! রাগ-টাগ আই মিন্ অ্যাংগারও কতো সুয়ীট্ হয়।"

"আপনি একটা হোর।" যুবক নিশ্বিধায় বলে।

"ইউ ইউ..."

"শাট্-আপ্!"

"ইউ সান্ অভ্ এ বিচ্।"

একটা মিনি প্রলয় ঘটবে, পৃথ্বী দেখে, এমন সময় আলো কমে আসে। আকাশের দিকে তাকালে মেঘের কালো দেখা যায়। সে ফের মনস্ক হয়ে ওঠে।

সার্বজনীন আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়া বাছাই করে সে বেরিয়ে পড়েছিল। শরীর-মনে এক প্যাশান নিয়ে ভোরের শহরে রাস্তার একজন হতে। সুমি তখনও ঘুমে। তাকে জাগায়নি যে এমন চিন্তায় যে স্ত্রী জেগে উঠে এই পরিবর্তনকে নিজের মধ্যে অনুভব করবে একা একা। এখন পথের মাঝে তার মনে হলো, যখন সুমি জানবে যে তার স্বামীই এই মাস্টার প্ল্যানের স্রষ্টা তখন তার দু' চোখে বিস্ময়ের পরিবর্তে অনুযোগ ঘনিয়ে উঠবে। সে কি সুমিকে বোঝাতে পারবে যে এই বিলম্বিত পরিবর্তনের জন্য তার দায়িত্ব কিছু মাত্র নেই।

"সুমি, বিশ্বাস কর..." সুমি ডাগর চোখে তাকিয়ে থাকবে আর পৃথ্বী দেখবে স্ত্রীর চোখে অন্য এক ইশারার আলো। তার মনে পড়ে ডাক্তার বলেছিল, "এ হলো গিয়ে চাকরি-করা মেয়েদের এক শহুরে ট্রাজিডি।" আজকাল ট্রাজিডি শব্দের ব্যবহার নানা ভাবেই হয়। ডাক্তার আরও বলে, "ওদের সতক করে দিলেও ওরা সতর্ক হয় না। যা বলা চলে প্রাত্যহিকতার চাপে পেটে ভ্রূণ নিয়েই বাস-ট্রামে বেপরোয়া যাতায়াত করে। ফলে যা হবার অনেক ক্ষেত্রে তাই ঘটে। গর্ভপাতের অনুশোচনা।" তার বেশ মনে আছে সুমি এই ঘটনাকে কখনও শীতল অন্তঃকরণে মেনে নিতে পারে নি। শোক ছিল প্রথমের জন্য। এবং বিরক্তি পরিপার্শ্ব সব কিছুর ওপর। তখন সুমির চোখে চোখ রাখা যেত না। আর তখনই চেতন-অবচেতনে অবয়ব পাচ্ছে তার মাস্টার-প্ল্যান। নির্বিঘ্নে মা হওয়ার জন্য কতক সামাজিক শর্তের প্রয়োজন। এই চিন্তাও তাকে ব্যাকুল করেছিল।

হোঁচট খেল পৃথ্বী বা তার ঘোড়া। তার মনস্কতা চুরমার হয়ে গেলে সে দেখলো তাকে একদল যুবক-যুবতী ঘিরে ধরেছে।

"তুমি, তুমি—"

"এই লোকটা—"

সবাই তাকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে। দু' কদম এগিয়ে দু' কদম পিছিয়ে এলো সে।

"তুমি, সেই লোকটা—"

"আমরা বলছি তুমি। আমরা জেনেছি তুমি।"

"কী আমি..." স্পষ্ট জানতে চাইল পৃথ্বী।

সাফা জবাব এলো, "তুমিই এই ঘোড়া-মার্কা মাস্টার প্ল্যানের কারিগর।"

"আমরা জেনেছি তুমিই। তোমার নাম ফাঁস করে দিয়ে পৌর কর্তৃপক্ষ গা ঢাকা দিয়েছে।"

"আরে, দেখছ না ইতিমধ্যেই এলাকার সার্বজনীন আস্তাবলগুলো থেকে দুর্গন্ধ উঠেছে।"

"দু'একদিনের মধ্যেই হয়তো শহরে একটা মহামারী দেখা দেবে।"

"মড়ার ওপর খড়ার আঘাত।"

"পৌর পিতারা এখন কোথায়?" একজন চেঁচিয়ে জানতে চাইল।

"তারা গা ঢাকা দিয়েছে। সাত তাড়াতাড়ি শহরবাসীর উদ্দেশে একটা ইস্তাহার প্রকাশ করবে বলে।"

"কেন তুমি এরকম একটা ঘোড়া-মার্কা..."

"কেন কেন?" সরব প্রশ্নে বেলা উচ্চকিত হয়।

"আমি শহরবাসীর ভাল চেয়েছিলাম।"

পৃথ্বীর কথা শেষ হবার আগেই চারদিকে হাসির হুল্লোড় শোনা যায়।

"আমাদের ভাল সবাই চায়। কিন্তু আমাদের ভাল হয় না।"

সে শুনলো আরেকজন বলছে, "লোকটার ভাব-ভঙ্গী অনেকটা যেন ডন্ কুইকজোটের মতো।" এ কথায় সে ঘাবড়ে যায়। বলে, "না না। আমি নিতান্তই বণিক সভার একজন কনিষ্ঠ কেরানি। যুদ্ধ আমি চাইনি।" তাকে কেমন কাতর দেখায়; কিছু বা ভীত। তার বুকের পুরানো ব্যথাটা মোচড় দিয়ে ওঠে।

"তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। আমরা তোমার বিচার করবো।"

"তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। আমরা ধ্বনি ভোটে তোমার মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছি। শহরবাসীকে নিয়ে কল্পনা-পরিকল্পনায় বিলাসের জন্য চরম দণ্ড।"

সমবেত যুবক-যুবতী ক্রুদ্ধ আবেগে মৃত্যুদণ্ডে সম্মতি জানাল। পৃথ্বী, বণিক সভার কনিষ্ঠ কেরানী, যে শহরবাসীর ভাল চেয়েছিল, তাকে ঘিরে মারমুখী যুবক-যুবতীদের চোখে তার অনিবার্যতাকে দেখলো। অস্ফুট কি যেন বলতে চাইল সে, পারলো না। বুঝলো সময় তার জীবনে শেষ কামড় বসিয়ে দেবে, আর কিছুক্ষণ। অদ্ভুত এক কান্নায় এই প্রথম সে ভেঙে পড়েছিল। এমন সময়—

"আপনারা ওর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে, নিজেদেরকেই শাস্তি দিতে চাইছেন।" এ কথায় রাগী যুবক-যুবতীর দল বিস্ময়ে নতুন আগন্তুককে লক্ষ্য করে।

"কে আপনি? এমন কথা বলছেন কেন?"

"এই গল্পের লেখক।"

"আপনি এই আধ-খেপা লোকটার পরিকল্পনা অনুমোদন করেন?"

"না।"

"তা হলে?"

"পৃথিবীর রক্তাক্ত চোখের দিকে সকলেই তাকাতে পারে না; অথচ পরিত্রাণ চায়। সংকট মোচনের আসল চাবির হদিশ যে জানে না, সে কল্পনার চাবি দিয়ে তা খুলতে চায়। এ হলো সেই ধরনের প্রতিক্রিয়া।"

"প্রতিক্রিয়ার জীবন আমরা চাইছি না।"

"আমিও চেয়েছিলাম আমাদের আছাড় খাওয়া বন্ধ হোক। পথ দুর্ঘটনা বন্ধ হোক। আর বাড়ি ফেরার গ্যারান্টী," পৃথ্বী বলে ওঠে।

"পথ দুর্ঘটনা একদিন কমে আসলেও যার লিঙ্গ কাটা গেছে তার কী হবে?" ভিড়ের মধ্য থেকে এক যুবক ভেতো গলায় প্রশ্ন করে—ঠিক কাকে সেটা ধরা যায় না।

লেখক বলে "এর উত্তর পৃথ্বী জানে না। অ্যানা লুই স্ট্রং জানতেন। তাঁর 'দুরন্ত নদীতে' একজনার লিঙ্গ কাটা গেছিল কিনা।"

এ কথায় রাগী যুবক-যুবতীর দল একে অন্যকে দেখে।

"তাহলে পথদুর্ঘটনার মতো ব্যাপার স্রেফ হাওয়া দেবে একদিন। একজন বলে। অন্যজন,—"সেই সাতবাসী ইউটোপিয়া!"

"এই খেপা লোকটা তাহলে দোষ করলো কী? আহা বেচারা সবার ভাল চেয়েছিল," জিজ্ঞাসার ব-কলমে ব্যঙ্গ ও তাচ্ছিল্য। এবং কোন কিছুকেই বিশ্বাস না করার মরীয়া ভঙ্গী।

তবু লেখক বলে, "পথ দুর্ঘটনাও একটা সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে জুড়ে আছে।"

"আর অসাবধানী অসতর্কতায় যারা চেপ্টে যাবে তাদের উদ্ধার করবে কে, আপনি?"

"তাদের জন্য শোক করবে কে?" মুখ দিয়ে চুক চুক শব্দ করে।

"জীবনানন্দ দাশও ট্রাম চাপা পড়েছিলেন। আপনি তাকে বাঁচাতে পারতেন?" হাসি।

"ঠিকই। আমাদের ভাষার সবচেয়ে ইতিহাস সচেতন কবি কিছুটা অন্যমনস্কও ছিলেন।"

"অর্থাৎ?" সকলে একযোগে এই অন্যমনস্কতার তাৎপর্য দাবী করে।

"অন্যমনস্কতাও একটা সামাজিক লক্ষণ।"

"অতঃপর?" আবার জিজ্ঞাসার কলরোল।

"কবিকেও সুচেতন ভাবে পথ হাঁটতে হবে। অন্যমনস্কতা চলবে না।"

পৃথ্বী ঘোড়া থেকে নেমে চোখ-কান খোলা রেখে ঘরের পথে রওনা হয়। লেখক তাকে সতর্ক করে দিয়েছে।

# নিয়মিত কিছু কিছু জমিয়ে যান—
# দেখবেন, আপনার যত সাধের জিনিস একদিন
# আপনার হাতের মুঠোয় এসে গেছে।
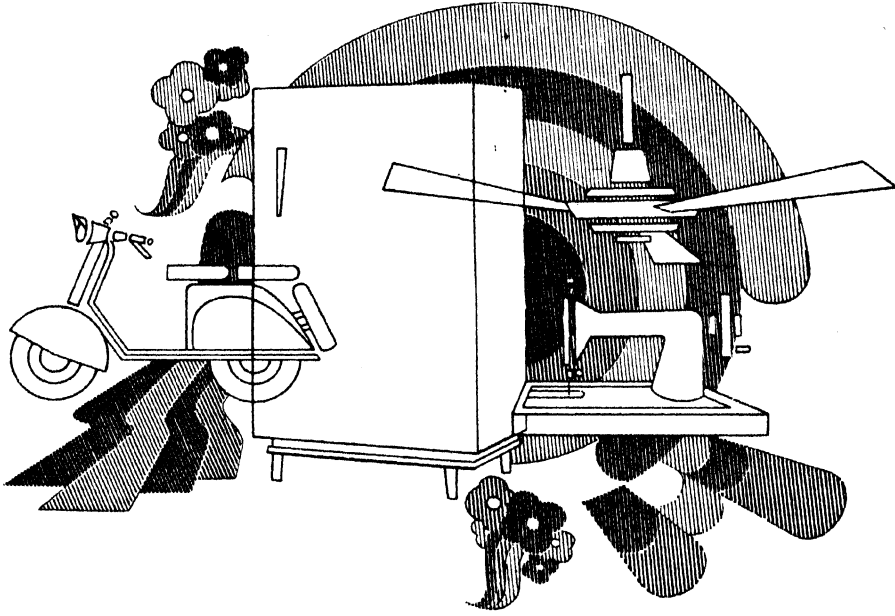
## হ্যাঁ, এই আলাদ্দীনের কাজই করে
## এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের রেকারিং ডিপোজিট স্কীম

সঞ্চয়ের এই পরিকল্পনাটির সবচেয়ে বড়ো সুবিধে হচ্ছে, মাসে মাসে কতো জমাবেন সেটা আপনার পছন্দমতো আপনিই ঠিক ক'রে নিতে পারেন। কমসে-কম ১০ টাকা থেকে সর্বাধিক ১,০০০ টাকা অবধি, আর তা-ও ১ বছর থেকে ১০ বছরের মেয়াদে—যা আপনার খুশি।

এতে সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে সহজেই একটা আয়ও দাঁড়িয়ে যায়। ফলে, মেয়াদ শেষ হলে মোট যা পাবেন তা আপনার জমা টাকা থেকে ৫০ শতাংশ বেশী তো হবেই....তার চেয়েও বেশী হতে পারে। এমনি করেই তখন ইচ্ছেমতো কেনাকাটার সুযোগ আসে, বহুকালের সাধ ও স্বপ্ন সফল হয়।

বিস্তারিত জানতে হলে আপনার কাছাকাছি এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের শাখায় আসুন।

**এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক**

আপনার নিজস্ব ব্যাঙ্ক

হেড অফিস: ১৪ ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-৭০০ ০০১

U-AB-3 BEN

# সেই সময়

## সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৬৬ ॥

প্রলয়ংকর ঝড়ে কলকাতা নগরীর অন্যান্য বহু অট্টালিকার মতন ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা ভবনটিরও প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। রামমোহন প্রতিষ্ঠিত এই ভবনটির একাংশ কাত হয়ে পড়েছে। ছাদ ভেঙে কড়ি-বরগা এমন খুলে ঝুলছে যে উত্তমরূপে মেরামত করার আগে ওখানে প্রবেশ করাই বিপজ্জনক।

ঝড়ে শুধু উপাসনা ভবনটিই ভাঙেনি, সেই ধাক্কায় ব্রাহ্ম সমাজও ভেঙে দু টুকরো হয়ে গেল।

প্রবীণ দেবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে জ্বলন্ত তেজী যুবা কেশবের মিলনে ব্রাহ্ম সমাজ নতুনভাবে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে। গুসকরা গ্রামের এক আম্রকুঞ্জে তাঁদের মধ্যে রাত্রিবাস কালে দেবেন্দ্রবাবুর মনে যে বিদ্যুৎ চমক হয়েছিল তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। কেশব এই ধর্ম আন্দোলনটিকে স্থানীয় গণ্ডি থেকে মুক্তি দিয়ে সর্ব ভারতে ছড়িয়ে দেবার উদ্যম নিয়েছেন। সুদূর বোম্বাই শহরে গিয়ে পর্যন্ত তিনি প্রচার করে এসেছেন এই নতুন ধর্ম মত। এখন সারা ভারতে ব্রাহ্ম সমাজের শাখার সংখ্যা পঞ্চাশ। দীক্ষিত ব্রাহ্মের সংখ্যা দু হাজারের কিছু বেশী। যারা দীক্ষা নেয়নি এমনও অনেকে এই মুক্ত-চিন্তা ও কালোপযোগী ধর্ম-সংস্কারের প্রতি আকৃষ্ট।

পারিবারিক বাধা অগ্রাহ্য করে নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে প্রকাশ্যে মাঘ উৎসবে যোগ দিয়েছেন কেশব, এই উপলক্ষে চিরকালের মতন গৃহত্যাগ করতেও তিনি দ্বিধা করেন নি। তখন দেবেন্দ্রবাবুর সনির্বন্ধ অনুরোধে সস্ত্রীক তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে। সকলের এমন আন্তরিক, আপন-করা ব্যবহার যে এ যে পরের বাড়িতে বাস, তা একদিনের তরেও বোঝা যায় নি। কেশবের স্ত্রী জগন্মোহিনীর কী-ই বা বয়েস। এর আগে কখনো সে থাকে নি কোনো অনাত্মীয়ের গৃহে। কিন্তু দেবেন্দ্রবাবুর কন্যা ও পুত্রবধূরা তাকে একেবারে নিজেদের মধ্যে মিশিয়ে নিয়েছিলেন। সকলে মিলে অন্দরমহলে কত আনন্দ-ফূর্তি। জগন্মোহিনীর তবু মন কেমন করে তার একেবারে ছোট ভাইটির জন্য। সে দুঃখও তিনি ভুলে যান দেবেন্দ্রবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র রবিকে দেখে। রবির মুখে সদ্য আধো আধো বোল ফুটেছে, জগন্মোহিনী প্রায়ই তাকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। রবির বড় ভাই সোম আর দেবেন্দ্রবাবুর এক নাতি সত্যও তার পায়ে পায়ে ঘোরে, এই শিশুরা "মাচি" বলে ডাকে।

কিছুদিন ঠাকুর বাড়িতে থাকার পর কেশবের শরীরে একটি বিষম ফোড়া হলো। কারবাঙ্কল জাতীয়। দেবেন্দ্রবাবু খ্যাতনাম চিকিৎসকদের ডাকিয়ে চিকিৎসার কোনো ত্রুটি রাখলেন না। তবু বেশ কিছুকাল শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন কেশব। তখন কেশবের আত্মীয়-স্বজন অনুতপ্ত হয়ে কাকুতি-মিনতি করে আবার কেশব ও জগন্মোহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল কলুটোলার বাড়িতে।

সেরে ওঠবার পর কেশব আবার বিপুল বিক্রমে লাগলেন ব্রাহ্ম সমাজের কাজে।

প্রথম যৌবনে বিষয়-কার্যের প্রতি দেবেন্দ্রবাবুর মনে একটা খুব বিরাগের ভাব ছিল। তাঁর মনে হতো, নিত্য তিরিশ দিন অর্থ সম্পদের চিন্তা মানুষের নৈতিক উন্নতি ও ধর্ম সাধনার অন্তরায়। বিশেষত তাঁর পিতা, অত্যন্ত বৈষয়িক বিলাস-আড়ম্বর প্রিয় এবং ভোগী দ্বারকানাথকে দেখেই দেবেন্দ্রবাবু আরও বিপরীতমুখী হয়েছিলেন। প্রায়ই সব কিছু ছেড়ে দিয়ে সুদূর, নির্জন শৈলশিখরে সুমহান প্রকৃতির সান্নিধ্যে গিয়ে তিনি বেশী সান্ত্বনা পেতেন।

কিন্তু এখন তিনি মধ্যবয়স্ক এবং একটি সুবৃহৎ পরিবারের অধিপতি। সাংসারিক ব্যয় বিপুল তো বটেই তা ছাড়া ব্রাহ্ম আন্দোলন পরিচালনার জন্যও তাঁকে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করতে হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং ইণ্ডিয়ান মিরার নামে ইংরেজি পাক্ষিকও চলে তাঁর অর্থানুকূল্যে। সুতরাং দেবেন্দ্রবাবু এই সময়ে মন দিয়েছেন জমিদারি দেখাশুনোর কাজে। পিতার ঋণ পরিশোধ করা হয়ে গেছে, জমিদারির আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে যথেষ্ট। এক সময় যিনি প্রায় দেউলিয়া হতে বসেছিলেন, সেই দেবেন্দ্রবাবু এখন আবার দেশের ধনী সমাজের শিরোমণি। এখন তিনি মনে করেন, পুরোপুরি সংসার ধর্ম পালন করেও ধর্মানুশীল এবং আত্মশুদ্ধির প্রয়াস অব্যাহত রাখা যায়। তাঁর পরিমণ্ডলের সকল মানুষের প্রতি তাঁর ব্যবহার সহৃদয় ও উদার। মুক্ত হস্তে তিনি দানশীল। কিন্তু তিনি গোষ্ঠীপতি। সকলকে মেনে চলতে হবে তাঁর বিধান, তাঁর মুখের কথাই আদেশ। যে-কোনো বিষয়ে তাঁর মতই চরম, মত পার্থক্যের কোনো স্থান নেই। আসলে তো তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে পৈতৃক রক্ত!

কেশবকে খুবই পছন্দ করেন দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু একটা ব্যাপারে তাঁর খটকা লাগে। কেশব এত বাইবেল আর যীশুখৃষ্টের জয়গান করে কেন? এর মধ্যে যেন খৃষ্টানী গন্ধ আছে। সাহেব জাতি এবং খৃষ্টানী ভাবকে ঘোর অপছন্দ করেন দেবেন্দ্রনাথ ইংরেজ রাজ-পুরুষদের সংস্পর্শেও তিনি পারতপক্ষে যেতে চান না। ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর বিরাগ নেই। তিনি ফার্সী ভাষা শিক্ষা করেছেন, সুফী তত্ত্বের প্রতি তাঁর ঝোঁক আছে। তবে তাঁর ব্রাহ্ম ধর্মকে তিনি হিন্দু ধর্মেরই পরিশীলিত অঙ্গ মনে করেন, পৌত্তলিকতা যেমন হিন্দু সমাজ ছেয়ে ফেলেছে, সেই রকম একেশ্বরবাদও তো হিন্দু দর্শনের প্রধান কথা, সুতরাং একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মরা হিন্দু ধর্মেরই সংস্কারক। সেই জন্যই পুরুষানুক্রমে প্রচলিত হিন্দু সমাজের পারিবারিক আচার-ব্যবহারগুলি পরিত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। তিনি বিপ্লব পছন্দ করেন না। তিনি ধীরে ধীরে সব কিছু পরিবর্তনের পক্ষপাতী।

কিন্তু তরুণ কেশবের হৃদয় আরও অনেক বেশী উচ্চাকাঙ্ক্ষী। দেবেন্দ্রবাবুর ব্রাহ্মধর্ম শুধু বাঙালী উচ্চ বর্ণের হিন্দুর ধর্ম, কিন্তু কেশব মনে করছেন, তিনি সারা ভারতবর্ষ, এমন কি সারা পৃথিবীর জন্য এক নতুন ধর্মমতের প্রচারক। শুধু বাইবেল নয়, কোরান আবেস্তাও তিনি পাঠ করেন নিয়মিত। তাঁর মতে, পৃথিবীর প্রধান ধর্ম-গুলিতে যে সব পৃথক বিধান আছে, তা আংশিক সত্য, কোনোটাই পূর্ণ সত্য নয়। অতএব এই সব ধর্মের আংশিক সত্যগুলি মেলাতে পারলেই হবে পৃথিবীর সব মানুষের উপযোগী এক আদর্শ ধর্ম এবং ব্রাহ্মরা গ্রহণ করবে সেই দায়িত্ব।

কিন্তু দেবেন্দ্রবাবু আর কেশবের মধ্যে বিভেদটা শুধু তাত্ত্বিক নয়, ভেতরে ভেতরে বিচ্ছেদ ধূমায়িত হতে শুরু করেছে কিছুদিন ধরেই। তরুণ বয়সী ব্রাহ্মরা সকলেই প্রায় কেশবের চ্যালা, তারা নিত্য নতুন এক একটা ব্যাপার নিয়ে মেতে আছে। কেশব যেন ম্যাসিডোনিয়ার সেই তরুণ রাজকুমার, মুষ্টিমেয় একটি দল নিয়ে যে দুনিয়া জয়ের স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু যে-হেতু কেশব বহু শতাব্দী যাবত পরাধীন, যুদ্ধবিমুখ, হিন্দুর সন্তান, তাই তলোয়ার নয় জিহ্বাই তাঁর অস্ত্র।

পৈতেধারী আচার্যদের ব্রাহ্মসমাজ থেকে একেবারে বিদায় করে দেবার জন্য কেশবরা তৎপর। ব্রাহ্মধর্মে জাতিভেদ নেই, শুধু দ্বিজের ঐ চিহ্ন থাকবে কেন? কেশবদের দৃষ্টান্তে দেবেন্দ্রবাবু নিজে উপবীত ত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু যে-সব ব্রাহ্মণ আচার্যরা ব্রাহ্ম সমাজের একেবারে পত্তনের সময় থেকে আছেন, তাঁদের তিনি সমাজ থেকে সরিয়ে দিতে চান না। লোকাচারের জন্য কিংবা পারিবারিক গণ্ডগোল এড়াবার জন্য যদি তাঁরা পৈতেটা রাখতে চান তো রাখুন না! কেশবরা উদ্যোগ নিয়ে ব্রাহ্মণ আর শূদ্রের মধ্যে বিবাহ ঘটাচ্ছেন, এটাই দেবেন্দ্রবাবুর মোটেই পছন্দ নয়। এমন কি বিধবা বিবাহ ব্যাপারটাকেও তিনি মনের খুব গভীরে সায় দিতে পারেন না।

কেশবের উৎসাহদাতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নামে আর এক তরুণ। মেডিক্যাল কলেজের এই প্রাক্তন ছাত্রটি বাঘ আঁচড়া নামে এক গ্রামে গিয়ে দারুণ বিক্রমের সঙ্গে প্রচারের কাজ করছেন। বিজয়কৃষ্ণের মতামত যেন কেশবের চেয়ে উগ্র। পৈতেধারী আচার্যদের ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার বেদী থেকে না সরালে যেন তাঁর কিছুতেই স্বস্তি নেই। শেষ পর্যন্ত দেবেন্দ্রবাবু রাজি হলেন ওঁদের কথায়।

তারপর এলো সেই ঝড়।

ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব গৃহের ভগ্নদশা, কিন্তু সেজন্য তো প্রতি বুধবারের উপাসনা বন্ধ রাখা যায় না! তত্ত্ববোধিনীতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো যে যতদিন না সে গৃহের সংস্কার হয়, ততদিন সমাজের উপাসনা হবে জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্রনাথের বাড়িতে।

নির্দিষ্ট সময়ে কেশবের দলবল সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, উপাসনা এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, আর আচার্যের বেদীতে বসে আছেন অযোধ্যানাথ পাকড়াশী। আর যায় কোথায়! এই পাকড়াশী মশাই শুধু যে পৈতে ধারী তাই-ই নয়, একবার রটেছিল যে তিনি উপবীত ত্যাগ করেছেন, পরে আবার তিনি জানালেন যে না তিনি পৈতে ছাড়তে রাজি নন। সেই লোক আচার্য? অথচ কথা ছিল আজ বিজয়কৃষ্ণ এবং কমলাকান্ত আচার্য হবেন।

উপাসনার মাঝখানেই ছোকরারা উত্তেজিত-ভাবে গোলযোগ শুরু করে দিল। দেবেন্দ্রবাবু এভাবে কথার খেলাপ করলেন কেন।

দেবেন্দ্রবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এটা তো ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান নয়, এটা তাঁর নিজের বাড়ি। এখানে তাঁর ইচ্ছে মতন অনুষ্ঠান পরিচালনার অধিকার তাঁর আছে।

নবীনরা বললো, মোটেই না। সকলের সম্মতি নিয়ে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার স্থান বদল হয়েছে। সে স্থানটি যার বাড়িতেই হোক, সেখানে ব্রাহ্ম-সমাজের বিধি মতই সব কিছু চলতে হবে।

দেবেন্দ্রবাবু তখনও দু দলের মধ্যে আপোস
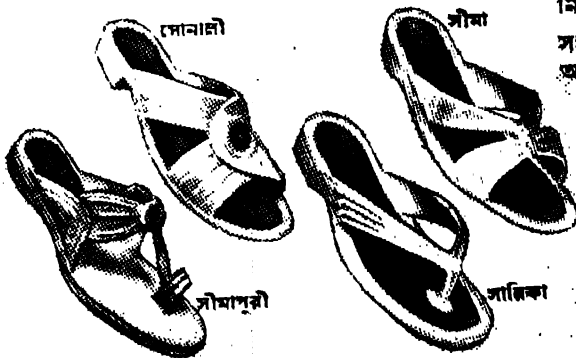
করবার জন্য বললেন, যে তা হলে এক কাজ করা যাক না। পাকড়াশী মশাই বলেছেন বসুন, তাঁর পাশে আর একজন পৈতে ত্যাগী আচার্য আসন নিন। তা হলে আর কারুর কিছু বলার থাকে না। বিজয়কৃষ্ণই হতে পারেন দ্বিতীয় আচার্য।

কিন্তু তরুণদল তা মানতে মোটেও রাজি নয়। উ.পাস কিসের? ... তো ...
একই সঙ্গে পৈতে পরে ব্রাহ্মণ সেজে থাকা, আবার জাতি ভেদ হীন ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী, এ আবার কী রকম কথা।

বাইরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বিজয়কৃষ্ণ চিৎকার করে বলতে লাগলেন, দেবেন্দ্রবাবু কি পোপ নাকি যে তাঁর ইচ্ছে অনিচ্ছে অনুযায়ী আমাদের চলতে হবে?

এবার কঠোর হলেন দেবেন্দ্রবাবু। হ্যাঁ, তাঁর নির্দেশই চূড়ান্ত। পাকড়াশী মশাইকে তিনি আচার্যের বেদী থেকে নেমে আসতে বলতে পারবেন না। যার ইচ্ছে হয় এই উপাসনায় যোগ দিক, যার ইচ্ছে হয় চলে যাক।

সদলবলে কেশব-বিজয়কৃষ্ণরা চলে গেলেন সেই উপাসনা সভা ছেড়ে। অন্য এক ব্রাহ্ম বন্ধুর বাড়ির ছাদে গিয়ে বসলেন তাঁরা।

যে স্বপ্নাদেশ পেয়ে দেবেন্দ্রনাথ তরুণ কেশবকে আর সব প্রবীণ ব্রাহ্মদের ডিঙিয়ে সমাজের আচার্য পদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, বস্তুত কেশবের হাতেই তুলে দিয়েছিলেন সমাজের ভার, আজ দেখা গেল সেই স্বপ্ন ভ্রান্ত। ব্রাহ্মসমাজের ভবন এবং যাবতীয় সম্পত্তির যে ট্রাস্টি বোর্ড ছিল তা থেকে কেশব এবং অন্যদের তিনি বাদ দিলেন কলমের এক খোঁচায়। ওদের কারুকে তাঁর দরকার নেই। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রকে করলেন ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক সেই অযোধ্যানাথ পাকড়াশী এবং নিজের হাতে রাখলেন সর্বময় কর্তৃত্ব।

দেবেন্দ্রনা... ব্যবহারে তরুণেরা প্রথমে একেবারে হতবাক। ব্রাহ্মসমাজের সব সম্পত্তি কি দেবেন্দ্রবাবুর নিজের নাকি? তিনিই বেশী টাকা-পয়সা দিয়েছেন ... এখন তো তা একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠানের অধীনে এবং ব্রাহ্মসমাজের কনস্টিটিউশনও আছে। সে সব অগ্রাহ্য করে দেবেন্দ্রবাবু নিজস্ব হুকুম জারি করলেন। এ যে স্বৈরাচার! রামমোহন রায়ের এই মত ছিল না যে ব্রাহ্মসমাজ ভবনে সব ধর্মের লোকেরই উপাসনার অধিকার থাকবে?

ব্রাহ্মসমাজ ভগ্ন হয়ে যদি দুটি টুকরোই হয়, তা হলে ট্রাস্টের বিষয়ও ভাগ হওয়া উচিত। এমন মনে করলেন কেশব এবং তাঁর সমর্থকরা। কিন্তু সে সব কিছুই হলো না। ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকা সম্পাদনা করছিলেন কেশব, সে পত্রিকারও রাতারাতি অন্য সম্পাদক নিযুক্ত করা হলো। এতটা কেশব কিছুতেই মানতে রাজি নন। যিনি আর্থিক সাহায্য করেন, পত্রিকার ওপরে কি শুধু তাঁরই অধিকার? আর যে সম্পাদক পরিশ্রম করে সম্পূর্ণ পত্রিকাটি বার করছেন, তিনি কেউ না? কেশবের লেখনী গুণেই মিরর-এর খ্যাতি।

কেশব ঠিক করলেন, যদি মিরর নামে দুটি পত্রিকা বেরোয়, তাতেও ক্ষতি নেই, তবু তিনি মিররের সম্পাদকত্ব ছাড়বেন না। পক্ষকালের মধ্যে তিনি স্বাধীনভাবে প্রকাশ করলেন মিরর-এর নতুন সংখ্যা।

নিজের নীতিতে অবিচল থাকলেও কেশবের সঙ্গে বিচ্ছেদে মনে বড় আঘাত পেলেন দেবেন্দ্রনাথ। তারুণ্যের শক্তিকে তিনি ঠিক পথে চালিত করে তাঁর প্রীতি প্রিয় ব্রাহ্ম আন্দোলনকে উজ্জীবিত করে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তরুণেরা যখন তখন আঘাত দেয়। আর তারুণ্যের ধর্মই এই। প্রবীণদের চিন্তাধারা থেকে অন্তত কয়েক পা এগিয়ে থাকা। দল কার্যত দু' ভাগ হবার পর উত্তেজিত যুবকেরা ... এমন কি কটু-কাটব্য করতেও ছাড়লো না। অভিজাত দেবেন্দ্রনাথ একটি প্রতিবাদও না করে নিঃশব্দ রইলেন।

কিন্তু হঠাৎ যেন নিঃসঙ্গ হয়ে গেলেন তিনি। যদিও তাঁর অনুগত ব্রাহ্মের সংখ্যাও কম নয়, বিদ্রোহী তরুণদের চেয়ে অনেক বেশীই হবে বোধ হয়, তবু দেবেন্দ্রনাথ আর আগেকার সেই উদ্দীপনা বোধ করেন না। এমন কি, তিনি যেন অনুভব করছেন, তাঁর দৃষ্টিশক্তি কমে আসছে, শ্রবণ ক্ষমতাও ক্ষীণ হয়ে আসছে, শরীরে আর সেই জোর নেই। সাতচল্লিশ বৎসর বয়েস, এর মধ্যেই যেন তাঁর জীবন সায়াহ্ন এসে গেল।

দ্বিতলের অলিন্দে আরাম কেদারায় তিনি চুপ করে বসে থাকেন। মনকে সব কিছুর ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারেন না। বারবার মনে পড়ে কেশবের প্রজ্বলন্ত মুখখানি। নিজের সন্তানদের চেয়েও ওকে তিনি বেশী প্রীতি করেছিলেন। এখন কেশব দূরে গেছে, তবু তিনি কেশবের ওপর রাগ করতে পারেন না। আপন মনে বলেন, কেশব বিজয়ী হোক, ওর আত্মার প্রভায় আর সকলে আলোকিত হোক, সারা বিশ্ব কেশবকে চিনুক, জানুক। (ক্রমশ)
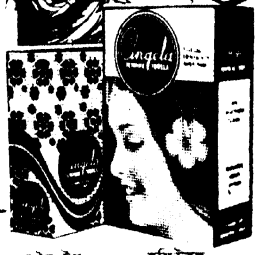
# স্যুইচটি টিপুন আর...

আরো বেশী
গয়নাপত্র বেচুন

আরো বেশী
জিনিসপত্র বেচুন

কম্পটালাক্স-এর ঝলমলে আলো কাপড়ের সুন্দর ডিজাইনগুলিকে এমন দর্শনীয় করে তোলে যে খরিদ্দাররা না কিনে পারেন না।

কম্পটালাক্স-এর উজ্জ্বল আলোয় সোনার এমন ঝলমলে দ্যুতি বেরোয় যে খরিদ্দাররা চোখ ফেরাতে পারেন না।

কম্পটালাক্স-এর উজ্জ্বল আলোয় দোকানের জিনিসপত্র এমন ঝলমল করে যে খরিদ্দারের মিছিল লেগে যায়।

HTB-PEI-620

কম্পটালাক্স এক স্বয়ং-সম্পূর্ণ আলোর উৎস। এটি লাগাতে কোনো শেড বা বিশেষ ফিটিংস-এর দরকার হয় না। ব্যস, এটিকে লাগিয়ে স্যুইচটি টিপুন আর যেদিকে চান, সেইদিকেই উজ্জ্বল আলো ঝলমলান।

PHILIPS
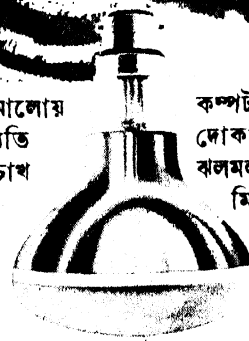
# কম্পটালাক্স

বহুপযোগী অ্যাকসেণ্ট লাইট।

**ফিলিপস**

ভারতে ৫০ তম বর্ষ

# স্মৃতি সততই সুখের

প্রতিভা বসু

॥ ৩৩ ॥

ইগনাৎসিও সিলোনীর বাড়ির পার্টিতে গিয়ে দেখলাম, আরো কয়েকজন গণ্যমান্য শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির সমাবেশ হয়েছে। কিছু পরে একজন বাঙালী ভদ্রলোকও এলেন। ডারিনা সিলোনী বললেন, 'তোমাদের কথা ভেবেই এই ভদ্রলোকটিকে নিমন্ত্রণ করেছি।' আমি খুব খুশী হয়ে উঠলাম। বাঙালী দেখলেই আমার ভালো লাগে। পরিজনেরা বলেন, এটা আমার বদভ্যাস। প্রাদেশিকতা। কিন্তু প্রাদেশিকতা নয়, সেসব কিছু আমার মনে হয় না, মনে থাকে না। আমার খুশির কারণ ভাষা। অবিশ্রান্ত অন্যের ভাষায় কথা বলতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি। মাতৃভাষায় কথা বলার জন্য আমার প্রাণ অস্থির হয়ে ওঠে।

বলাই বাহুল্য, ঐ আসরে সবাই সকলের সঙ্গে ইংরিজীতেই কথাবার্তা বলছিলো। দেখা গেল কবি ইগনার্তসিও সিলোনী সব সময়েই চুপ। মাঝে মাঝে একটু হাসি, একটু ইয়েস নো, অথবা ছোটো ছোটো দু-একটি সেন্‌টেন্‌স্—এর বেশী বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছিলো না। ডারিনা বললেন, 'উনি ইংরিজী বলতে পারেন না ভালো। পড়াশুনো করেন, কিন্তু বলার অভ্যাস নেই। বিদেশী কেউ এলে হয় তাঁরা তাঁর সঙ্গে ইটালিতে কথা বলেন, নয় তো আমিই দোভাষীর কাজ করি।'

ডারিনা স্কচ্ মেয়ে। কিন্তু এখন স্বামীর ভাষাই তার ভাষা। সেই দেশেই থাকেন, স্বামীর সঙ্গেও সেই ভাষাতেই কথা বলেন। বাধ্য না হলে ইংরিজী প্রায় বলেনই না। আর ইটালিতে বসে বাধ্য হবার প্রশ্নও ওঠে না। বললেন, প্রায় পনেরো বছর পিত্রালয়ে যাননি।

ইগনার্তসিওর জীবনযাপন খুব সাদাসিধে। ছোট্টো একটি দোতলা বাড়ির দোতলায় খান তিনেক ঘর, সামনে বারান্দা। বারান্দার নিচে গলির রাস্তা। সন্ধ্যা সাতটার মধ্যেই খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেলে সবাই কফি নিয়ে বারান্দাতে এসেই বসলেন। এই সময়েই আমি বাঙালী ভদ্রলোকটির কাছাকাছি হবার সুযোগ পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি বরাবরই রোমে থাকেন?'

ভদ্রলোক ইংরিজীতে জবাব দিলেন, 'না, বেড়াতে এসেছি।'

'ও। এমনিতে কোথায় থাকেন?'

সংক্ষিপ্ত ভাষণে কোথায় যেন বললেন।

এর পরে আমি আরো দু-একটি প্রশ্ন করে আলাপ জমাবার চেষ্টা করেছিলাম। এবং ভদ্রলোক সব প্রশ্নেরই জবাব অতি সংক্ষেপে ইংরিজীতে দিয়েছিলেন। শেষে বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আপনি আমার সঙ্গে ইংরিজীতেই কথা বলুন।'

অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, 'ক্ষমা করবেন। আমি বুঝতে পারিনি যে আপনি বাংলা জানেন না।'

এই সময়ে বুদ্ধদেব এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনি বরাবরই বিদেশে আছেন? দেশে কখনো যাননি?'

ভদ্রলোক বললেন, 'বরাবর না হলেও অনেক দিন আছি। প্রায় দশ বছর।'

'দশ বছর!' তার আগে?'

'তার আগে কলকাতায় ছিলাম।'

'কলকাতায় ছিলেন তবু বাংলা শেখেননি?'

'তা কেন শিখবো না, এতোকাল বাইরে থেকে ভুলে গেছি।'

এতোক্ষণ অতি সরলভাবেই ইংরিজীতে প্রশ্ন করছিলেন বুদ্ধদেব, এবার হাসিতে ফেটে পড়ে বিশুদ্ধ বাংলায় বললেন, 'কী কাণ্ড, মাত্র দশ বছরে ভুলে গেলেন সব! আপনার বয়স কতো? দশ বছর বাদ দিলেও তো মনে হয় বছর তিরিশ না হোক পঁচিশ বছর তো বাকী থাকবেই! এই পঁচিশটা বছর আপনি মাত্র দশ বছরের ব্যবধানে হারিয়ে ফেললেন? ও ডারিনা, শোনো শোনো, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি—'

ডারিনা সিলোনীর সঙ্গে বুদ্ধদেবের ঘনিষ্ঠতা অতি নিকট আত্মীয়ের মতো। ডারিনা কার সঙ্গে কথা বলছিলেন, ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কী জিজ্ঞেস করবে?'

'ইটালিতে ক'বছর আছো?'

'বছর পনেরো তো হবেই, কুড়িও হতে পারে।'

'মাতৃভাষা ভুলে গেছ?'

'জিজ্ঞেস করছো? ইয়ার্কি না?' হাসতে হাসতে ডারিনা ভেসে ভেসে অন্যত্র চলে গেলেন। ভদ্রলোকও রুমালে মুখ মুছে আর কারো সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এবং কিছুক্ষণ বাদেই বিদায় নিলেন। তারপর অনেক রাত পর্যন্ত চললো সেই পার্টি।

আমাদের হোটেলটি একটি ব্যস্ত রাস্তার ধারে। অনতি দূরেই পিয়াৎসামন্তে-চিতোরিওর চত্বর, পায়রা উড়ছে ঝাঁক বেঁধে বেঁধে, ঐ কোণের দিকে 'ইলটেম্পো' কাগজের আপিস, পথে লোকেদের অবিরল আনাগোনা, জানালায় দাঁড়িয়ে দেখতে খুব ভালো লাগে। আজ ডারিনা ভাটিকান দেখাতে নিয়ে যাবেন। আমি উত্তেজিত বোধ করছিলাম। হয়তো সেজন্যই খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। তখনো নগরী সম্পূর্ণ জাগ্রত নয়, সূর্যের লাল আলো আবীরের মতো ছড়ানো, বাড়ি ঘর সব রঙিন। পরশু রাত্রে এসে পৌঁছেছি, কাল সকালে সিমেট্রিতে গিয়েছি, রাত্তিরে ইগনাৎসিও সিলোনির বাড়িতে খেয়েছি, তারপর আজ এই ভোর। ভোরের রোম শহর। যে রোম নিজেই একটা পৃথিবী। আমার সব স্বপ্নের মতো বোধ হচ্ছিলো। আর এ কথা তো সত্যই, আমার মতো যারা প্রথম এসেছে সেই সব দর্শনার্থীদের

দুর্গপ্রাকার, কতো প্রাসাদ, কতো গির্জা, কতো বেদী, রাজারাণী-পুরোহিতদের কতো ইতিবৃত্ত—আমার চোখের সঙ্গে আমার মন রাস্তা পেরিয়ে উত্থিত সূর্যের রঙে রঙিন রঙিন বাড়ি পেরিয়ে আরো কতো দূরে চলে গেল। বিপুলা পৃথিবী, কাল নিরবধি। এই রোমানদের হাতেই একদিন জেরুজালেমের পতন হয়েছিলো, ধ্বংস-প্রাপ্ত প্রাচীন রাষ্ট্র থেকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিলো ইহুদিরা। রোমান সম্রাট তিবেরিয়সের রাজত্বকালে খ্রীস্টাব্দ ২৬ থেকে ৩৬ সাল পর্যন্ত যিনি জুডিয়া অঞ্চলে রোমান প্রশাসক ছিলেন, তাঁর নাম ছিলো প্যান্তিয়ুস—পিলাসুজ। তাঁর হুকুমেই যীশু প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন, এবং সেই খ্রীষ্টের নামেই খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের জন্ম। খ্রীস্টানরা তখন রোমে ছিলেন একান্তভাবেই এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। চৌষট্টি সালে রোমে যখন আগুন লাগে, সম্রাট নীরো বিরোধী ছিলেন বলে শত্রুতা করেই সেই লঘু সম্প্রদায়ের নামে দোষ চাপিয়েছিলেন। ঘটনাচক্র যে কোন পথে কীভাবে প্রবাহিত হবে কেউ কি জানে সে কথা? যে রোমানরা একদিন যীশুকে অপরাধী সাব্যস্ত করে চোরেদের সঙ্গে ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ করলেন ভবিষ্যতে সেই রোমানরাই হলেন সবচেয়ে বড়ো যীশু-সেবক। আর যাদের মঙ্গলের জন্য যীশু প্রাণ দিলেন তাঁর সেই স্বদেশবাসী স্বজাতিরাই হলেন খ্রীষ্টানদের ঘৃণার পাত্র, কৃপার পাত্র। প্রকৃতির পরিহাস আর কাকে বলে!

বেলা বাড়লে ডারিনা এসে গেলেন। রাজেশ্বরীও এসেছে। চার জনেই বেরিয়ে পড়লাম ভাটিকান দর্শনে। কখনোই সমুদ্র না দেখলে যেমন সমুদ্রকে কোনোভাবেই কল্পনা করা যায় না, তেমনি ভাটিকানে না এলে কোনো আভিধানিক ভাষার দ্বারা তাকে বর্ণনা করাও সম্ভব নয়। মানুষের ক্ষমতা কতো দূরে যেতে পারে, প্রতিভার কী অসীম শক্তি, সে কথা ভেবে কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত স্নায়ু স্তম্ভিত হয়ে থাকে।

সেন্ট পিটার স্কোয়ারে এসে ডোমটির দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ সকলকেই থমকে থাকতে হলো। আকাশকে পটভূমি করে এই বিশাল মহান গম্ভীর রূপোলী নীল রঙের মন্দিরটি যেন স্বর্গের প্রহরী। মাইকেল এঞ্জেলোর অমর অলৌকিক প্রতিভাকে এই সৃষ্টি ঈশ্বরের রূপেই প্রতিভাত করেছে।

প্রথম প্রবেশদ্বারে একটি পোর্টিকো। তার পরেই নিচু থেকে উঁচু পর্যন্ত চোখ চলে না। এমন এক প্রকাণ্ড ব্রোঞ্জের দরজা। ঢোকবার মুখে দুটি পক্ষ বিস্তার করে যেন আলিঙ্গনে উদ্যত এমনিভাবে দাঁড়িয়ে আছে একটি মূর্তি, অভ্যর্থনায় প্লাবিত দৃশ্য। ভিতরে ঢুকলে প্রথমটায় দিশাহারা লাগে, তার পরে ধীরে ধীরে ভাঁজে ভাঁজে যখন যবনিকা উন্মোচিত হতে থাকে তখন সৌন্দর্য তো বটেই, গরিমায়, জ্ঞানের ক্ষমতার ভীষণতা হৃদয়কে অন্তত মুহূর্তের জন্য হলেও এক অতি-মানসে

"ঈগল প্রিন্সেস সম্বন্ধে আর কি বলা যায়?"

"মনলোভা..."
অতিথি সেবিকা!

"অসামান্য..."
ধুলো বাইরে বন্দী...উত্তাপ ভেতরে বন্দী ২৪ ঘণ্টা।
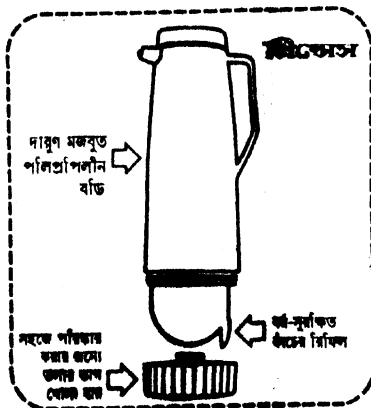
"হুমমম্...হবেই তো,
ঈগল ভ্যাকুয়াম ফ্লাস্ক যে!"

ঈগলের পক্ষতলে...১২৩টি মডেল ঝলমলে

CASE-118-234-BEN

যায়। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে এক বিশুদ্ধ সম্ভ্রমের ঢেউ সাগর হয়ে ওঠে, র সমস্ত প্লানি কোথায় ভেসে যায়।

মানবিক ক্ষমতার এই অভিব্যক্তি বস্তুতই মৃত্যুর মতো মহান, মৃত্যুর মতোই স্যর আধারে আবৃত। মাত্র চারটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত এই ডোম-এর উচ্চতা শো ফুট, প্রবেশদ্বার থেকে মেঝের মাপ সাত শো। লোকেরা সেই মসৃণ পাথরের তে চিৎ হয়ে শুয়ে ডোম-এর কারুকার্য নিরীক্ষণ করছে। সঙ্গে বাইনোকুলার এসেছে। চেনা-অচেনা নেই, সাদা-কালো নেই, জাতিভেদ-দেশভেদ-শ্রেণীভেদ ই নেই কারো মনের মধ্যে, যা আছে তা শুধু একনিষ্ঠতা, একাগ্রতা, ঈশ্বর-নার মতো অলৌকিক প্রতিভার স্বাক্ষর দর্শন। অনেকে উপরে উঠে যাচ্ছে ালো সিঁড়ি বেয়ে। উদ্দেশ্য ঐ একটাই। এই প্রাসাদ বা গির্জার রাফায়েলেরও ক কাজ আছে। পৃথিবীর এই বৃহত্তম গির্জাটি সম্পূর্ণ হতে সময় লেগেছিলো শো ছিয়াত্তর বছর। এখনো আজ পর্যন্তও ভাটিকান ক্যাথলিসিজমের সুপ্রীম তম। পৃথিবীর এক আশ্চর্য সৃষ্টি।

অনেক হাত ঘুরে যখন এই কাজ মাইকেল এঞ্জেলোর কাছে এসে পৌঁছলে, ন তাঁর বয়েস সত্তর। বোঝা গেল প্রতিভার কোনো বয়েস নেই। অন্তত তাঁর তভার। যেন আঠোরো বছরের প্রবল যৌবন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সে কথা াণ করতে। মস্তিষ্কের কোষে কোষে শুধু রং রং আর রং। ছবি, ছবি আর ব। কোথা থেকে কে এতো শক্তি যোগালো তা কি শিল্পী নিজেই জানেন? প্রেম! াদি অনন্ত প্রেম ছবি হয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলো। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর নকশা নুযায়ীই শেষে সম্পন্ন হলো সব কাজ।

ভাটিকান প্যালেসে নাকি এগারো হাজার কক্ষ আছে। হল, মিউজিয়াম, গ্যালারি, ইব্রেরী, চ্যাপেল, করাইডোর, আঙিনা, উদ্যান—সবই শোভায় সমৃদ্ধিতে শ্বর্যের এক আশ্চর্য নমুনা। দু শো ষাট জন পোপ বসে গেছেন এই সিংহাসনে। তো সব দেখা—এক দিন দু দিনের প্রশ্নই ওঠে না। এক বছরেও মানুষ পেরে ওঠে না সন্দেহ।

ভাটিকানে যেখানে সম্রাট নিরোকে ক্রুসিফাইড করা হয়েছিলো, সেখানেই াইণ্ট পিটারের সমাধিস্থল। এমন সুন্দর Basilica পৃথিবীতে আর কোথাও াই। সারিবদ্ধ স্তম্ভের গায়ে গায়ে কী সূক্ষ্ম সব কারুকার্য। ঈস্টার ডে-তে পোপ াথায় মুকুট পরে ঢিলা পোশাকে অট্টালিকার সম্মুখভাগে ব্যালকনিতে ভগবান য়ে তাঁর নির্দিষ্ট সিংহাসনে আসন গ্রহণ করেন। প্রচুর দর্শনার্থীর ভিড় হয় সেই নটিতে। হাঁটু ভেঙে বসে থাকে সব। যেটা ওঁদের Porta Santa, অর্থাৎ হালি ডোর' সেটা পঁচিশ বছর অন্তর এক দিন খোলা হয়। এটা হয় hristmas Eve-এ, বিশেষ মর্যাদায় এবং বিশেষ অধিকারে প্রথমে পোপই প্রবেশ রেন তার অভ্যন্তরে। ধ্বংসাবশেষ থেকে আর একটি আশ্চর্য আবিষ্কার করেছে রা। Titus-এর স্নানাগার। এটা এখন ভাটিকান মিউজিয়ামের এক গর্বের বস্তু।

কতো ঝড়ঝাপটা-গোলমাল, কতো উত্থানপতন তবু বংশানুক্রমে ভাটিকান তমনিই ভাটিকান। ভাটিকান চিরন্তন। এখন ১৯২৯ সাল থেকে ভাটিকান সিটি কটা আলাদা স্টেট হয়েছে।

বেরুতে বেরুতে বেলা হলো অনেক। হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে গিয়েছিলো। ারিনা সিলোনী তাঁর ছোট্টো পাখায় ফুরফুর করে হাওয়া খেতে খেতে বললেন, আবার যদি কখনো আসো, দয়া করে ঘোড়ায় জিন এঁটে এসো না। আসবার মতো রেই এসো। দেখবার মতো করেই দেখো।'

বুদ্ধদেব বললেন, 'তা হলে তো এক বছর থাকতে হয়।'

ডারিনা বললেন, 'মহৎ জিনিসকে মান্য করতে হলে তাই তো উচিত।'

'একটা চাকরি জুটিয়ে দাও।'

'যদি আসো ঠিক দেবো।'

রাজেশ্বরীও সঙ্গে ছিলো আমাদের। বাইরে এসে বললো, 'এবার কী?'

ডারিনা ঘড়ি দেখে ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আজকের মতো এই যথেষ্ট। বাড়ি যাই, সলোনীর খাবার সময় পার হয়ে গেল। তা হলে বুদ্ধদেব, মিসেস বোস, মিসেস ত্ত—'

আমরা রাজেশ্বরীকে নিয়ে একটা ট্যাকসি ধরলাম। কাল দুপুরে ওদের ওখানে অর্থাৎ আই সি এস সুশীল দে-র বাড়িতে খাবার কথা আছে। রাজেশ্বরীকে নামিয়ে সেই সুযোগে বাড়িটাও একটু চিনে যাবো। পথে অবশ্য একটু হেরফের হলো প্রোগ্রামটা। মনে হচ্ছিলো কোথাও নেমে আর না খেয়ে নিলে হচ্ছে না। তিন জনেরই এক অবস্থা। রাজেশ্বরী অবশ্য একটা বাড়িতে যাবে, তার খাবার সেখানেই প্রস্তুত আছে। কিন্তু আমাদের তো বাইরেই খেতে হবে। অতএব তিন জনে মিলে খেয়ে নেওয়াই ভালো। রাজেশ্বরী একটু একটু এদের ভাবাও রপ্ত করেছে। কোনো রেস্তোরাঁয় গিয়ে সেটাও কম সুবিধের নয়।

এই করেই বেলা কেটে গেল। রাজেশ্বরীকে তার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমাদের হোটেলে ফিরতে ফিরতে প্রায় তিনটে।

বিকেলে সামসুর রহমান এলেন। চায়ের পাট সাঙ্গ করে তাঁর সঙ্গে যে শহরের কোথায় কোথায় ঘুরলাম তার কিছুই আর মনে নেই। একসঙ্গে এক দিনে এতো দর্শন আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দিয়েছিলো।

পরের দিন সকালে আর ভাবলামই না বেরুবার কথা। অনেক বেলা অবধি ঘুমিয়ে ধীরে আস্তে স্নানটান করে সুশীল দে-র ওখানে গেলাম। রোমে বেশ গরম। [illegible] না।

# দাড়ি কামানোর পরে
# ত্বককে নির্ম্মল, তাজা ও নরম করতে...

আপনার ত্বক
স্বাভাবিক, শুকনো বা
তৈলাক্ত যে অবস্থাতেই
থাকুক না কেন,
ইরাসমিক এখন
এনেছে এমন এক
শেভিং ক্রীম যা ঠিক আপনার
ত্বকেরই অনুকূল...এর বিশেষ ফর্ম্মুলা
আপনার ত্বককে নির্ম্মল,তাজা ও
নরম ক'রে দেয়। আজই পরীক্ষা করুন—
ইরাসমিক।

- এণ্টিসেপটিক — স্বাভাবিক ত্বকের জন্যে
- ক্রীম রীচ — শুকনো ত্বকের জন্যে
- লাইম ফ্রেশ — তৈলাক্ত ত্বকের জন্যে

## ইরাসমিক হাজির করছে–
## এমন এক ক্রীম–যা সব প্রকার ত্বকের অনুকূল

হিন্দুস্থান লিভারের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-ERS.CR.25-2415 BG

শীল দে এবং তাঁর স্ত্রী কারো সঙ্গেই এর আগে অন্তত আমার আলাপ
না। কিন্তু দু জনকেই নানাভাবে নানা সূত্রে জানতাম। বিশেষ করে সুশীল
কে ব্যক্তিগত ভাবে আমি প্রত্যক্ষ আলাপ না থাকা সত্ত্বেও খুব ভালোভাবে
। ওঁর বাবা ডক্টর ডি এন মৈত্র আমার অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। ভক্তি-
ডক্টর মৈত্র আমাকে মা সম্বোধন করতেন এবং কন্যার মতোই স্নেহ করতেন।
লেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এঁ'র দাদা সুরেন মৈত্র। সুরেন মৈত্র সুরেশ্বর মৈত্র
লখতেন। সেই সময়ের 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষে' এঁ'র একাধিক গল্প-কবিতা
ছে। আমার বিবাহের পরে পরবর্তী কালে 'কবিতা' পত্রিকাতেও এঁ'র কবিতা
। রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন ছিলেন, অর্গান বাজিয়ে গান করতেন। ওঁ'র
আমি প্রথম 'আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে' গানটি শুনি। কথা
র সম্মোহন আমার ঐ পনেরো-ষোলো বছর বয়েসটাকে একেবারে সম্মোহিত
রেছিলো।

কা শহরে রবীন্দ্রনাথের গানের তেমন প্রচলন ছিলো না। ব্রাহ্মবাড়ি বা ব্রাহ্ম-
ছাড়া যে-কোনো লোকের মুখে এ গান শোনা রীতিমত বিশেষ ব্যাপার। আমি
ক্লাসিকাল শিখি, অতুলপ্রসাদ জানি, নজরুল ইসলাম জানি, ডি এল রায়
রায় জানি। রবীন্দ্রনাথ জানি না। আমার হৃদয়-মন উদ্বেল হয়ে ওঠে
-সখনো যার মুখেই রবীন্দ্রনাথের গান শুনি না কেন? সুরেন মৈত্র এবং
ন্যা আমার সেই সময়কার প্রিয়তম বন্ধু নোটন মৈত্রই আমাকে রবীন্দ্রনাথের
প্রথম হাতেখড়ি দিয়েছিলেন।

নাটনদির মা যাঁকে আমি মাসীমা বলতাম, তিনি ছিলেন অতি সুশিক্ষিত এবং
মার্জিত মহিলা। খুব গান-পাগল মানুষ। আমাকে গানের জন্য প্রায়ই এসে
বাড়িতে নিয়ে যেতেন গাড়ি করে। আমার ওস্তাদজি গোলমহম্মদ খাঁকে
তাঁর নিজের কন্যা নোটনের জন্যও রাখলেন। নোটনদি প্রথমে আমার কাছেই
গান তুলে নিতেন। ঠুংরি-জাতীয় সব গানই তাঁর আমার কাছে শেখা।
জী নোটনদিকে খেয়ালে তালিম দিতেন।

ক্টর ডি এন মৈত্র একবার ঢাকা এলেন, বলাই বাহুল্য, দাদা বউদির কাছেই
ন, এবং তাঁরা আমাকে যেরকম ভালোবাসতেন তাতে এ কথাও বলা বাহুল্য
ক্টর মৈত্রকেও সেই ভালোবাসায় অংশীদার হবার জন্য একদিন গান শোনাতে
এলেন আমাদের বাড়িতে। এর পরে ডক্টর মৈত্র নিজেই মাঝে মাঝে আসতেন,
আমাকেও নিয়ে যেতে লাগলেন তাঁদের সঙ্গে দিনযাপন করার জন্য। অতি
সময়ের মধ্যেই নোটনদির কাকা হিসেবে আমারও কাকাবাবু হলেন, আমি তাঁর
লাম। শুধুমাত্র ডাক্তার হিসেবেই নয়, শিক্ষা-সংস্কৃতির বিবিধ ক্ষেত্রেই তিনি
ন একজন দিকপাল। সোস্যাল সার্ভিস লীগের তিনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা।
ট মহলে তাঁকে সকলে চিনতেন, জানতেন, শ্রদ্ধা করতেন।

সুতরাং পরিচয়ের পটভূমিকা আগেই ছিলো। তা ছাড়া নোটনদির বোন—
বা কম কথা কী? নোটনদির কাছে আমি তাঁর এই বোনের কথা অনেক
ছি। ওঁদের কবে বিবাহ হলো তা-ও আমি জেনেছি। কিন্তু দেখা হলো এই
এই দূরে এসে, এতো কাল বাদে এতো বয়সে!

একটি মাঝারি সাইজের দোতলার ফ্ল্যাটে তাদের বসবাস। কিন্তু এমন সুন্দর
ছন্ন বাহুল্যহীন একখানা গুছোনো বাড়ি আমার খুব কম চোখে পড়েছে। যতো
মনে পড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বেশ বড়োসড়ো একখানা বসবার ঘর। ঘরে ঢুকেই
জুড়িয়ে গেল। বাঁ দিকের কোণে নিচু এবং প্রশস্ত ঢালাও ফরাসে দিশী
ভতে বসবার ব্যবস্থা। ফরাসের ভারতীয় ঢাকনাটি যতো সুন্দর ততো উজ্জ্বল,
উপরে ছোটো ছোটো তাকিয়ার বিভিন্ন রঙে গুজরাটী কাজের কাচবসানো
ক ওয়াড়গুলোও রং মিলিয়ে তেমনিই মনোহারী। পিতলের উপর জয়পুরী-
কাজের সেণ্টার টেবিল আছে হাতের কাছে, কিছুটা ব্যবধানে ওপাশে
সেটি।

দরজা-জানালায় শান্তিনিকেতনী অথবা কটকী পর্দা। অনেক সময়েই অনেক
বর্ণনায় খুব সাধারণ মনে হয়, কিন্তু রোমে সুশীল দে-র স্ত্রী বুলবুলের
র ঘরে ঢুকেই যেটা প্রথম অভিব্যক্তি তা হলো, বাঃ, কী সুন্দর ঘরখানা!
সুশীল দে বাড়ি ছিলেন না, খানিক বাদে এলেন। তাঁর স্ত্রীই আমাদের আদর-
য়ন করলো। তার বাবার প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই উঠে পড়লো, তার বোন
নের কথাও উঠলো। নোটন ছিলো বিখ্যাত সুন্দরী। গুণপনায়ও তার জুড়ী
ভার। হয়তো এতো রূপ আর এতো গুণই তার কাল হয়েছিলো। মাসীমা
ত্রিভুবন খুঁজে পাত্র পেলেন না মেয়ের যোগ্য। মেয়ে যাকে যোগ্য ভেবে মাল্য-
উৎসুক ছিলো, তাকেও তাঁরা প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য করলেন মেয়েকে।
সিকভাবে সেই থেকেই হয়তো সে কিছুটা সরে গিয়েছিলো। স্বাভাবিক জীবন-
ন থেকে। আস্তে আস্তে বয়স বাড়লো, মধ্যবয়েসও ছাড়ালো, পিতৃহীন হলো,
হীন হলো, তারপর অসাধারণ রূপগুণ আর নিঃসঙ্গ নির্বান্ধব জীবন নিয়ে
ন যেন মনের ভারসাম্য হারিয়ে এক গভীর অন্ধকারে তলিয়ে গেল।

সুশীল দে মানুষটিও চমৎকার। অতি সজ্জন। স্বামী স্ত্রী দুজনেই খুব ধীর
র শান্ত। কথাবার্তা নরম এবং মার্জিত। বুলবুলের বাবা ডক্টর ডি এন মৈত্র
ছটফটে ছিলেন, আসরে বসলে একাই জমিয়ে রাখতেন। কাকাবাবু এলে বাড়ি
ভর্তি ভরাট হয়ে যেতো। তাঁর কন্যা মনে হলো তার বিপরীত। ওর মাকে আমি
একবারই দেখেছিলাম, আমার ধারণা হয়েছিলো তিনিও খুব শান্ত ছিলেন।
ওঁদের সাজানো খাবার ঘরটিতে গিয়েও মনে হলো, বাঃ, কী সুন্দর! অথচ
খানেও কোনো বাহুল্য ছিলো না। অত্যন্ত পরিচ্ছন্নতাই কি তার বৈশিষ্ট্য? নাকি
হিণীর হাতের গুণ? যা করেন, যতোটুকু করেন, ফুটে ওঠে লাবণ্য? যদি তাই
তা হলে বলবো মিসেস দে-র মতো গৃহিণী বিরল। (ক্রমশ)

**ভবিষ্যতে কোন খরচের পরিকল্পনা আছে ? তার জন্যে ভাবনা কিসের ?**

# ভবিষ্যতে যতই খরচের পরিকল্পনা থাকুক না কেন, কথা দিচ্ছি, কানাড়া ব্যাঙ্ক সেই খরচের অর্ধেক টাকা যোগান দেবে

সময় থাকতে টাকা জমানো শুরু করলে সবকিছুই আপনার সামর্থ্যের মধ্যেই এসে যাবে। ভবিষ্যতের এই সব পরিকল্পনা রূপ দেওয়ার জন্য আপনাকে সাহায্য করতে কানাড়া ব্যাঙ্কের একটি বিশেষ জমা প্রকল্প রয়েছে।

কি চাই বলুন না—গাড়ি ? স্কুটার ? নিজের বাড়ি ? না কি ছেলেমেয়ের উচ্চশিক্ষা কিংবা বিয়ের খরচ ? **কামধেনু** জমা প্রকল্পের সাহায্যে আপনি খুব সহজেই আপনার টাকা দ্বিগুণ করে নিয়ে সবচেয়ে বেশি লাভ ঘরে তুলতে পারেন।

এই প্রকল্পের সবচেয়ে উল্লেখজনক দিক হল যে এতে আপনার প্রয়োজনীয় অর্থের একটা সামান্য অংশ জমা দিতে হবে। আপনি শুধু জমা টাকার অংক এবং মাসের সংখ্যাটা ঠিক করে ফেলুন। বাস, এরপর সুদের উপর সুদ জমতে জমতে মাসের পর মাস বেশ মোটা টাকাই আসবে। ফলে আপনার জমা টাকা হয়ে দাঁড়াবে দ্বিগুণেরও বেশি।

বিশদ বিবরণের জন্য কানাড়া ব্যাঙ্কের নিকটবর্তী শাখায় চলে আসুন। আমাদের অন্যান্য আরও বিশেষ প্রকল্পের মধ্যে আছে **বিদ্যানিধি, নিরন্তর** এবং **বালক্ষেম**।

## কামধেনু ডিপোজিট

# মানবজমিন

## শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

(একাত্তর)

আশ্চর্য এই, টলোমলো সাইকেলটা পড়েও গেল না। চৌপথী ছাড়িয়ে গড়গড়িয়ে চলতে লাগল। চলন্ত সাইকেলে প্যাডল করতে খুব বেশী কষ্ট নেই। কিন্তু কষ্ট হ্যান্ডেল সোজা রাখায়। এ পাড়ায় ক্বচিৎ কদাচিৎ এক আধটা মোটরগাড়ি আসে। রিকশা অবশ্য অনেক। আর সাইকেল। প্রীতমের ভয় করছিল, হয় কোনো সাইকেল বা রিকশার সঙ্গে ধাক্কা খাবে, হয়তো রাস্তা ছেড়ে পাশের নর্দমায় গিয়ে পড়বে।

কিন্তু পড়ছিল না। চৌপথী ছাড়িয়ে মাঠের ধার অবধি চলে এল সে। পিছনে একটা হইচই শোনা যাচ্ছে। আশপাশের লোক অবাক হয়ে দেখছে। আনন্দধামের বারান্দা থেকে পিনুর মা অবাক গলায় চেঁচাচ্ছেন, ওরে শম্ভু! ও তারক! শিগগির গিয়ে প্রীতমকে ধর। দেখ, কী সর্বনেশে কাণ্ড করছে ছেলেটা!

হ্যাঁ, এটা ঠিকই যে, সে একটা সর্বনেশে কাণ্ডই করছে আজ। কিন্তু এই আধখানা বেঁচে থাকার নিরন্তর বন্দিত্ব থেকে মুক্তি আর খুব দূরে নয়। অনেকদিন তার জীবনে মৃত্যুর শাসন বড় গুরুভার হয়ে চেপে বসে আছে। সে তো জানে, মরবেই, তাই মৃত্যুর হাত থেকে এই ছুটি নেওয়া।

ওরা তাকে ধরে ফেলবে। পিছনে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ আসছে। কারা চেঁচিয়ে ডাকছে, প্রীতমদা! প্রীতমদা! থামুন! আমরা আসছি।

প্রীতম তার সর্বস্ব দিয়ে ভর দিল প্যাডলে। তার দুর্বল পায়ে তেমন জোর নেই যে, সাইকেলকে এরোপ্লেনের মতো ছোটাবে। তবু এই অবস্থায় যতখানি জোরে সম্ভব সাইকেল ছুটতে থাকে। হ্যান্ডেলের আঁকাবাঁকা হয়ে যাওয়াটা একটু কমে এল। স্থির হল। সরু রাস্তায় যথাসাধ্য ধার ঘেঁষেই প্রীতম চালিয়ে নিতে পারছে। উল্টো-দিকের চারটি রিকশা অনেকটা তফাত দিয়ে পেরিয়ে গেল তাকে। একটা মোটরগাড়িও। উত্তরাভিমুখী প্রীতমের সাইকেল রইল বহমান। কিন্তু এ পাড়ার শতকরা পঞ্চাশজনই তাকে চেনে। অচেনারাও সাইকেলে রুগ্ণ চেহারার লোকটাকে দেখে অবাক হয়। সুতরাং সে প্রবলভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। পিছন দিক থেকে একটা দুটো স্বাস্থ্যবান ছেলে বেগবান সাইকেলে এসে এক্ষুনি তাকে ধরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, তাও জানে প্রীতম। তাই সে যতদূর সম্ভব চেনা পরিচয়ের গণ্ডী পেরিয়ে যাওয়ার জন্য দুটো বাঁক ফিরল। কিন্তু বুকে হাঁফ ধরে আসছে, গায়ে ঘাম, হাত-পায়ের প্রতিটি সন্ধিতে খিল-ধরার যন্ত্রণা। প্রচণ্ড রোদে তার চোখ ঝলসে যাচ্ছিল। চোখের দৃষ্টিও কিছুটা আবছা এখন।

তবু সব বাধাকে ছাড়িয়ে প্রীতম চলতে থাকে। খানিকটা অন্ধের মতো, খানিকটা যন্ত্রের মতো। রাস্তা খুবই সরু। এত সরু যে একটা রিকশা উল্টোদিক থেকে এলেই সে বিপদে পড়বে। সাইকেলের ওপর তার এত নিয়ন্ত্রণ নেই যে, অল্প জায়গা দিয়ে গলে যেতে পারবে। তবু বেপরোয়া প্রীতম প্রবল শ্বাস ফেলতে ফেলতে হেলে প্যাডলে চাপ দিয়ে সাইকেলটাকে যথাসাধ্য বেগবান রাখছিল।

আর একটা মোড় ঘুরতে গিয়ে প্রীতম পড়ল। পড়বে, প্রীতম জানতও। কিন্তু তার জন্য কোনো প্রস্তুতি নেয়নি সে, সাবধান হয় নি। তাই জানা সত্ত্বেও পড়াটা হল আচমকা।

বাঁ হাতে আর একটা পাথরকুচির রাস্তায় বাঁক নিয়েই সে দেখতে পায় সামনে ইঁট বোঝাই এক টাটা মার্সিডিজ লরি থেকে মাল খালাস হচ্ছে। নীরন্ধ্র অবরোধ। প্রীতমের সাইকেলে ব্রেক ছিল বটে, কিন্তু সেটাকে যথেষ্ট জোরে চেপে ধরার মতো শক্তি ছিল না তার হাতে। সুতরাং শুকনো একটা নর্দমার খাতে সাইকেল শুদ্ধু নেমে খানিকদূর গড়িয়ে গেল সে। তারপর ধাক্কা মারল ইঁটের পাঁজায়। বেঁকে গেল সাইকেল। আরো একটু নিয়ে গেল তাকে। ফাঁকা ঘাসজমির ওপর ঢলে পড়ে গেল প্রীতমকে নিয়ে।

ব্যথা বেদনা টের পেল না প্রীতম। তবে চোখে অন্ধকার নেমে এল। গভীর শ্বাস ফেলে তৃপ্তিতে চোখ বুজল সে। মথিত ঘাস আর ভেজা মাটির গন্ধ, রোদের সুঘ্রাণে ভরে গেল তার শ্বাস। ঘাসপোকাদের শব্দ শুনতে শুনতে সে চেতনা হারাল।

খুব বেশীক্ষণের জন্য অবশ্য নয়। চোখেমুখে প্রথম জলের ঝাপটা পড়তেই চোখ মেলে সে। হাত তুলে ওদের বারণ করে আর জল দিতে। হাসিমুখে ঘাসে শুয়ে থেকে সে উজ্জ্বল আলোর মাখা অনেকখানি আকাশকে চেয়ে দেখে। এতখানি স্বাধীনতা বহুকাল ভোগ করেনি সে।

পাড়ার ছেলেরা তাকে ধরে তোলে, প্রীতমদা, এবার বাড়ি চলুন।

ওরা তাকে একটা রিকশায় তোলে। একজন তার পাশে বসে তাকে ধরে থাকে।

পাড়া ভীড়ে ভীড়াক্কার। ভারী লজ্জা করছিল প্রীতমের। আর তার মুখের ওই লাজুক হাসিটি দেখে অনেকেই অবাক মানল, তাহলে কি প্রীতম ভাল হয়ে উঠছে?

মা প্রীতমকে শোওয়ার ঘরে নিয়ে যেতে চাইছিল, শতম বলল থাক মা। দাদা যা চাইছে তাই করো।

প্রীতম আবার বারান্দায় বসে। কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞেস করে না, অভিযোগ করে না, শাসন করে না। বোধহয় শতম সবাইকে বারণ করেছে।

খুবই ক্লান্ত ছিল প্রীতম। দুপুরে অনেকক্ষণ ঘুমোলো। বিকেলে মনোরম আলোয় বারান্দায় এসে বসল আবার। ছবি চা দিতে এসে সহসা ফিরে গেল না। চেয়ারের পাশটিতে বসে উর্ধ্বমুখে হয়ে একগাল হেসে বলল, তোমার আর কলকাতার জন্য মন খারাপ হয় না, না দাদা?

প্রীতম কথাটা ভেবে দেখল। কলকাতার কথা তার খুব মনে পড়ে। কিন্তু না, প্রথম প্রথম যেমন হত, ফিরে যেতে ইচ্ছে করত, তেমনটা আর হয় না। সে মাথা নাড়ল।

তুমি কলকাতার লোক হয়ে যাওয়ার পর আমরা ধরেই নিয়েছিলাম তুমি আমাদের পর হয়ে গেছ। এভাবে যে অনেকদিন আমাদের কাছে থাকতে পারবে তা কখনো ভাবতে পারিতাম না।

প্রীতম হেসে গভীর শ্বাসও ফেলল সেইসঙ্গে।

ছবি বলল, বউদির চিঠি আজও এসেছে। তোমার নামে। তুমি বউদির চিঠিগুলো কেন পড়েও দেখ না বলো তো! আগের চিঠিটাও আঁটা খামে তোমার টেবিলে পড়ে আছে। জবাব না দিলে, পড়তে দোষ কি?

প্রীতম উদাসমুখে চুপ করে থাকে। কি জবাব দেবে? বিলুর চিঠি আর পড়তে ইচ্ছে করে না। মনে হয়, বিলুর চিঠির মধ্যে অনেক মিথ্যে সাজানো কথা থাকবে। ঐসব কথা তার এখন সহ্য হয় না।

প্রীতম বলে, তোদের কাছে তো চিঠি দেয়ই।

তা দেয়। তবু তোমার কাছে তো আলাদা করে কিছু বলার থাকতে পারে।

থাকলে কি করব? আমার তো এখন আর ওর জন্য কিছু করার নেই।

তুমি ভীষণ অন্যরকম হয়ে গেছ।

কিরকম রে?

কেমন যেন। তোমাকে বাপু আজকাল ভয় করে।

ভয় পাস?

ভয় পাই তোমাকে ঠিক বুঝতে পারি না বলে। লাবুসোনার জন্যও তুমি আজকাল ভাবো না দাদা?

প্রীতম চট করে একথার জবাব দিল না। সারা গায়ে একটু ব্যথার টাটানি রয়েছে এখনো। তার অবশ প্রায় অনুভূতিহীন শরীরে এই ব্যথাটুকু খুব উপভোগ করছিল সে। দূরের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, লাবুকে নিয়ে ভাববার কিছু তো নেই। যদি কোনো অ্যাকসিডেন্ট বা অকালমৃত্যু না ঘটে তাহলে ওর জীবন তো নিরাপদই। ওর মা ভাল চাকরি করে, আমারও কিছু টাকা রয়ে গেছে। তার চেয়ে বরং স্বার্থপরের মতো এখন আমার নিজেকে নিয়েই চিন্তা করতে বেশী ভাল লাগে।

বলে প্রীতম একটু হাসল।

কথাটার অর্থ ছবি খুব ভাল ধরতে পারল না, কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করল না। বলল, কিন্তু বউদি যে আমাদের কথা বিশ্বাস করে না, তার কি করবে? প্রতি চিঠিতেই আমরা লিখি, দাদা ভাল আছে। কিন্তু বউদির সন্দেহ, তুমি ভাল নেই। ভাল থাকলে নিজের হাতেই চিঠি লিখতে।

খুব চিন্তা করে বুঝি?

খুব। লেখে তোমরা আমাকে সব কথা জানাচ্ছো না।

এবার লিখে দিস, দাদার জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। দাদার তো আয়ু বেশী নয়, ফাউ বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি সেকেন্ড সে নিংড়ে নেয়। তার সময় কই যে তোমাকে চিঠি লিখবে?

ছবি হেসে বলে এমন কথা লেখা যায়, বুঝি!

প্রীতমও হাসে, তাহলে কিছুই লিখিস না।

বউদিকে নিজের হাতে তোমার একটু লেখা উচিত। একটিবার লেখো। ওই যা যা সব বললে তাই না হয় লেখো। অত ভাষা তো আর আমাদের কলমে আসবে না।

তোর বউদি যদি আমাকে নিয়ে ভাবনায় পড়ে থাকে তবে একটু ভাবতে দে না। ভাবলে ভালবাসা বাড়ে।

সন্ধেবেলা ঘরে এসে টেবিলের ওপর বিলুর চিঠিটা পড়ে থাকতে দেখল প্রীতম। কিন্তু একবারও খুলে পড়তে ইচ্ছে হল না তার।

আগের মতো প্রীতম এখন ঘরবন্দী থাকে না। সকলের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খায়। অনেক রাত অবধি পারিবারিক আড্ডায় জেগে অংশ নেয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, সে সেই শৈশবের শিলিগুড়িকে পেয়ে গেছে বুঝি। এখন আর তাই বিলুকে মনে পড়ে না, লাবুর জন্য চিন্তা নেই, মন কেমন করে না তেমন।

টেলিগ্রামটা এল বেশ রাতে। অ্যারাইভিং টুয়েলভথ অ্যাটেন্ড। বিলু।

টেলিগ্রামটা পিওনের হাত থেকে নিয়ে ঘরে এসেই মরম চেঁচায়, বউদি কাল আসছে। হুররে।

খবরটা মরমের মুখ থেকে বেরোতে না বেরোতেই বাড়িতে একটা আনন্দের কোলাহল পড়ে যায়। মা খুশি, বাবা খুশি, ছবি খুশি। শুধু প্রীতমই এই খবরে তেমন উত্তেজনা বোধ করে না। বরং তার একটা ভ্রূ একটু উর্ধ্বগামী হয়। বিলু, কে বিলু?

হতে হতে প্রীতমের মনে হয়, তার কোনো অভাব নেই। তার কিছু প্রয়োজন নেই। আর কাউকে ছাড়াও তার চলে যাবে। সকালে বাক্স নিয়ে যে মহিলাটি সামনে এসে দাঁড়াবে সে এই পৃথিবীর

# 1 সেরা টি ভি কেনার একটাই উপায়,

টি ভি দেখুন আর

ECtv কিনুন

# আর পছন্দ করার জন্যে ECtv র দুটো মডেলই অপ্রতিদ্বন্দ্বী: অপ্সরা ও এনকোর। 2
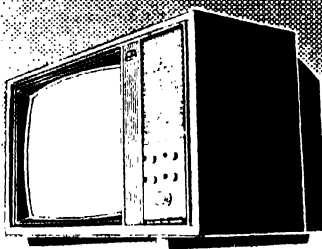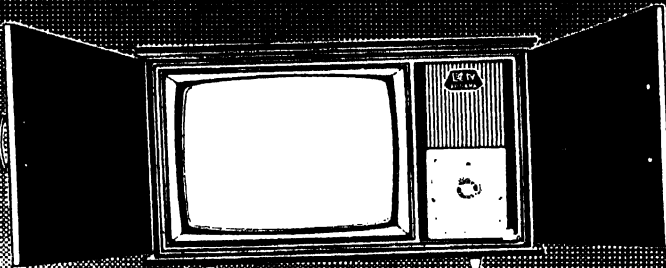
ECtv হ'ল
ECIL-এর অবদান।
যারা ভারতের ইলেকট্রনিক্সের শিল্প জগতে শুরু থেকেই সবার অগ্রণী।
Ecil-এর অসাধারণ প্রযুক্তিবিদ্যার গুণে ECtv কি কোয়ালিটিতে, কি কার্য্যদক্ষতায়, সবদিক থেকেই সেরা। আর সেই কারণেই আজ ঘরে ঘরে ECtv র এত কদর।

## APSARA

অল-সলিড স্টেট, মজাদার গড়ন, দরজা সমেত মাল্টি-চ্যানেল ডিলাক্স টি ভি।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য:

- পরিষ্কার, জীবন্ত ছবি
- ডুয়াল-কোন স্পীকার সহ হাই-ফাই সলিড সিস্টেম
- কম বিজলী খরচ
- বিক্রীর পর সেবার সুনিপুণ ব্যবস্থা
- ৫১ সেন্টিমিটারের বড় স্ক্রীন

## ENCORE

অল-সলিড স্টেট, মাল্টি-চ্যানেল, সাশ্রয়কর দামের টি ভি।

ECtv অসাধারণ প্রযুক্তিবিদ্যার গুণে সবার অগ্রণী।

ECtv EC ইলেকট্রনিক্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
হায়দ্রাবাদ - ৫০০ ৭৬২

Branches at: Bombay, Calcutta, Delhi, Madras, Poona, Lucknow, Hyderabad, Chandigarh, Jaipur, Kanpur, Jullundur, Raipur.

A.. EC/8013

...শী কিছু নয়। কিন্তু লাবু! লাবু তো তার ...য়ে! প্রীতম আধোঘুমেই ভেবে, তাই বা ভাবছি ...ন? লাবু আমারই বা কেন হবে? লাবু এই পৃথিবীতে আসার একটি মাধ্যম খুঁজেছিল। প্রীতম ...ই মাধ্যম মাত্র। সে তো লাবুর সৃষ্টিকর্তা নয়। ...বুর প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা যে, লাবু তারই। প্রীতম ...ধু এক বিভ্রম, এক মায়াবশে ভাবে, লাবু আমার ...য়ে। কিন্তু সত্য ঘটনা তো তা নয়।

খুব সকালেই স্কুটার হাঁকিয়ে বউদিকে আনতে ...উ জলপাইগুড়ি চলে গেল শতম। বাড়িতে ...ছগাছ করতে লাগল ছবি আর মা।

গোছগাছের জনাই সাতসকালে বিছানা ছাড়তে ...য়েছে প্রীতমকে। ছবি তাকে ঠেলে তুলে বিছানা ...নটান করে ভাল বেডকভার দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। টেবিলে পেতেছে নিজের হাতে কাজ করা সবুজ ...কনা। আজ সব জানালায় দরজায় টানটান পর্দা।

একটু বিরক্তমুখে কাচা ধুতি পরতে হয়েছে প্রীতমকে। গায়ে সাদা কটকটে গেঞ্জি। চুল পাট করে সেজেগুজে বসে আছে বারান্দায়। ছবি চা দিতে এসে তেতো মুখে বলল, আজ কি পাত্রীপক্ষ আমাকে দেখতে আসছে রে? তোরা যা শুরু করেছিস।

আসছেই তো দেখতে। যা অগোছালো হয়ে থাকো, বউদি দেখে গিয়ে আমাদের নিন্দে করবে।

এমনিতে বুঝি করে না?

করলে করে। তবু যতদূর পারি মন রাখার চেষ্টা করি।

তোর বউদি হল কলকাত্তাই মাল। কলকাত্তাইরা অত সহজে খুশি হয় না।

কী যে সব বলো না দাদা।

প্রীতম ভ্রু কুঁচকে চা খায়। তারপর হঠাৎ উদাসী এক হাওয়া আসে। প্রীতম চরাচরের দিকে সম্মোহিতের মতো চেয়ে আলো আর ছায়া, সবুজ আর নীল, প্রাণ আর জীবনের খেলা দেখতে থাকে। সামনের মাঠে খোঁটায় বাঁধা গরুর পাশে ছাগল চরছে। ঘাস পতঙ্গ পাখি তুচ্ছ সব ওড়াউড়ি, অস্তিত্ব, শব্দ তাকে এক গভীর প্রাণের রাজ্যে নিয়ে যেতে থাকে। সেখানে নামহীন অস্তিত্ব আর বুদ্ধির জগৎ। বিলু নেই, লাবু নেই, কেউ নেই।

এই গভীর ধ্যানের মধ্যে স্কুটারে পিঁ পিঁ শব্দ হঠাৎ হানা দেয়। স্কুটারের পিছু পিছু গুড়গুড় করে আসে একটি অটোরিকশা। বাড়ির সামনে থামে।

লাবু চেঁচিয়ে ডাকে, বাবা।

ভোরের সুন্দর আলোয় ধোয়া মুখে একটু হাসে প্রীতম। হাত বাড়িয়ে স্নিগ্ধ স্বরে বলে, আয়।

লাবুকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে প্রীতম টের পায়, আজ এরকমই সস্নেহে সে একটি ছাগলছানাকেও কোলে নিতে পারে। তার স্নেহ অনেকটাই নৈর্ব্যক্তিক হয়েছে এখন।

লাবু অনেকটা লম্বা হয়েছে। অনেক বেশী সুন্দরও। তার মুখে এখন নিখুঁতভাবে প্রীতমের মুখের আদল চেপে বসেছে। খুব দামী আর সুন্দর একটা ফ্রক তার পরনে। দুহাতে লাবুর মুখখানা তুলে নিবিষ্ট চোখে দেখছিল প্রীতম।

লাবুও মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে বাবার দিকে। বলল, তুমি ভাল আছ বাবা?

ভালই মা। তুমি?

আমিও ভাল আছি বাবা।

বাড়িসুদ্ধ লোক বেরিয়ে এসেছে বাইরে। মা বাবা ছবি মরম রূপম। ভাইরা সুটকেস, বাসকেট, বিছানা নামাচ্ছে অটোরিকশা থেকে। ছবি গিয়ে বউদির হাত ধরে টেনে আনছে।

ভারী সুন্দর এই দৃশ্য। কিন্তু প্রীতম নড়ল না। এক হাতে মেয়ের হাতটা ধরে নির্বিকার বসে রইল। বিলুর দিকে চেয়ে সে স্পষ্টই বুঝতে পারে, বিলু সেই আগের মতো নেই। সামান্য মেদবৃদ্ধির ফলে তার চেহারাটা পরিপূর্ণ, শ্রীময়ী। মুখে ক্লান্তির আস্তরণের নীচে তৃপ্তির চিহ্ন। বিলু আর তার নেই।

প্রীতমের দীর্ঘশ্বাস এল না। দুঃখ হল না।

...আছে। সে দেখল। মনে মনে ক্ষমা করল। সবাইকে।

ঘণ্টাখানেকেরও বেশী সময় কেটে যাওয়ার পর বিলু শাড়ি পাল্টে, মুখ হাত ধুয়ে বারান্দায় আসে। আর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বলে, আমার একটা চিঠিরও জবাব দাওনি।

আমি ভাল আছি বিলু।

সে কথাটাও তো জানাতে পারতে।

তুমি কেন এত জানতে চাও?

চাইব না। বিলু অবাক হয়, রোগা মানুষটাকে এতদূরে ফেলে রেখে কলকাতায় থাকি জানতে চাইব না?

প্রীতম বিরক্ত হয় না, কিন্তু গভীর বিষণ্ণতায় গলায় বলে, বেশ তো আছি।

বেশ আছো জানি। মাঝে মাঝে অ্যাডভেঞ্চার করতে বেরিয়ে পড়ো, তাও শুনেছি। কিন্তু আমি কেমন ছটফট করি, তা জানো?

প্রীতম কৌতূহলভরে বিলুর দিকে তাকায়। সন্দেহ নেই প্রীতমের জন্য বিলুর উদ্বেগ আছে, দায়িত্ববোধ আছে, দুঃখ আছে। কিন্তু এও জানে প্রীতম, বিলুর জীবনের ঠিক কেন্দ্রস্থলে সে নেই। বিলুকে চাকরির ঘানিতে ঘোরাচ্ছে কে? বিলুকে কলকাতার জলে আটকে রেখেছে কে? সে কি এক শূন্যগর্ভ নিরাপত্তার বোধ? বিলু কি জানে না, কেউই কোথাও কখনোই নিরাপদ নয়?

প্রীতম বলল চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে না।

পড়তেও নয়? শুনলাম আমার চিঠি এলে তুমি নাকি তা খুলে পড়তেও চাও না।

ছবি বলেছে বুঝি। আসলে ভুলে যাই। মনে রাখলে কষ্ট পাবো বলে জোর করে ভুলে যাই। নইলে তোমার চিঠি পড়তে লোভ হয় খুব। কিন্তু পড়লেই দুর্বল হয়ে যাবো যে।

এ কথায় বিলু বোধহয় একটু ভিজে যায়। তবু বলে, ও কথার মানে হয় না। চিঠিতে কত জরুরী কথাও থাকতে পারে তো।

জরুরী। কি আর এমন জরুরী থাকতে পারে বলো তো জীবনে! ঘর সংসার সম্পর্ক সবই তো ছেলেখেলা বিলু।

সন্নিসি ঠাকুর, আমার মুখ চেয়ে না হয় একটু ছেলেখেলাই করলে। তোমার অসুখটা তো আমার কাছে ছেলেখেলা নয়। মেয়েটাও দিনের মধ্যে দশবার বাবার চিঠি এসেছে কিনা জানতে চায়। ওকে কী বলি বলো তো!

তুমি বেশ সুন্দরী হয়েছো বিলু।

আচমকা এই প্রশংসায় একটু কুঁকড়ে গিয়ে বিলু বলে, যাক বাবা আমাকে দেখেছো তাহলে! আমি তো ভাবলাম, সন্নিসির বুঝি বউয়ের মুখ দেখাও বারণ।

প্রীতম ক্ষীণ একটু হাসে। তারপর বলে, বেশ লাগে এখন তোমাকে দেখতে।

থাক, আর বলতে হবে না। নিজের দোষ ঢাকতে এখন এরকম অনেক মিথ্যে কথা তোমাকে বলতে হবে।

প্রীতম গম্ভীর মুখে হঠাৎ বলে, একটা কথা বলব বিলু?

বলো।

তোমার এখনো সব শেষ হয়ে যায়নি। আমার গেছে। কেন আমার স্মৃতি নিয়ে তোমার নিজের জীবনকে নষ্ট করছো?

বিলু নড়ে বসল। তারপর বলল, ওরকম একটা কথা তুমি আগেও বলেছো। আর বোলো না।

শোনো, আমি অভিমান থেকে বলছি না। আমার একটুও ঈর্ষা হবে না, অধিকারবোধেও লাগবে না। আমি তোমাকে সুখী দেখতে চাই।

যদি সুখী না হই? তুমি চাইলেই কি সুখের পাখি এসে আমার কোলে বসবে?

তবু আমি চাইছি।

বোলো না। আমি এখনো অত আত্মকেন্দ্রিক নই।

বিলু, তুমি বড় পাপবোধে কষ্ট পাচ্ছো। কিন্তু যাকে পাপ বলে ভাবছ তা পাপ নাও হতে পারে।

(ক্রমশ)

ল্যাভেণ্ডার-ডিউ সাবান আর ট্যালক—ভারতের বিলাস প্রসাধন সামগ্রী

ক্যালকেমিকোর সামগ্রী, সেরা জিনিসের সমঝদারদের জন্য

# লক্ষ্মী-সরস্বতীর মিলন

## দীপক ভট্টাচার্য

কবিগুরুর সুবিখ্যাত কবিতা 'পুরস্কার'-এর কথা প্রসঙ্গের শুরুতেই সবারই হয়তো মনে পড়বে। 'ভারতীরে ছাড়ি ধরো এই বেলা লক্ষ্মীর উপাসনা'—কবিপত্নীর এই উপদেশে উৎসাহিত হয়ে কবি যে উদ্যোগ করেছিলেন তার ফলস্বরূপ কিভাবে অবশেষে 'বাঁধা পেল এক মালা-বাঁধনে লক্ষ্মী-সরস্বতী' তা পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। লক্ষ্মী-সরস্বতীর এই তথাকথিত মিলনের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা যা-ই হোক না কেন, আমাদের আজন্ম সংস্কারলব্ধ বিশ্বাস এই যে, ধনদৌলতের আকাঙ্ক্ষা বা বাসনা থাকলে বিদ্যা বা জ্ঞানার্জন সম্ভব নয় এবং সেই মত বিদ্যার্জনে ব্রতী হতে হলে ধনসম্পদের আকর্ষণকে ভুলতে হবে। আমাদের আজন্ম ধারণা, বিদ্যার্জনের সঙ্গে ধনার্জনের সদ্ভাব নেই। পাণ্ডিত্য এবং ধনাঢ্যতা একাধারে খুবই বিরল। সুতরাং যে ধনী হতে চায় সে জ্ঞানী হবার বৃথা চেষ্টা করবে না—জ্ঞান অর্জন করতে হলে দারিদ্র্যকে ভয় পেলে চলবে না। এইরকম একটা সংস্কারগত মানসিক প্রস্তুতি থেকেই বোধ হয় সৃষ্ট হয়েছে আমাদের ধারণা—বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে তুষ্ট করতে হলে সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর কৃপালাভ থেকে বঞ্চিত হতে হবে, এবং লক্ষ্মীর . তুষ্টি সারস্বত প্রসাদের অন্তরায়। একের আরাধনা অপরের অসন্তুষ্টির কারণ না হলেও আমাদের ধারণায় এ কথা মোটামুটি স্পষ্ট যে, এই দুই দেবীর একত্র কৃপালাভ প্রায় অসম্ভব। খুব কম লোকই, আমাদের ধারণায়, সরস্বতীর বরপুত্র হয়েও লক্ষ্মীবান্ হতে পারেন।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিদ্যাকে আমরা শুধু যে এক বিশেষ রত্ন হিসেবেই স্বীকৃতি দিয়েছি তা নয়, একে আমরা এমন এক মহাধন (বিদ্যারত্নং মহাধনম্) বলে গণ্য করি যা 'দানেন ন ক্ষয়ং যাতি'—অর্থাৎ দান করলেও কমে না (বরং বেড়ে যায়!)। তবু এই 'মহাধন' প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের আর্থিক অর্থে সম্পদ বলে পরিগণিত হতে পারেনি তার কারণ হয়তো এই যে, টাকা পয়সা ধনদৌলত মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রে বা অন্য সূত্রে পেতে পারে বা যখন খুশি বংশধরদের দিয়ে যেতে পারে। কিন্তু বিদ্যা-ধন 'জ্ঞাতিভির্বণ্ট্যতে নৈব চৌরেণাপি ন

বরোদা মিউজিয়াম-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত

নীয়তে'—অর্থাৎ ইচ্ছে হলেই বিদ্যা জ্ঞাতিদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া চলে না; তেমনি এ সম্পদ চোরেও হরণ করতে পারে না। বিদ্যাসম্পদ এবং অর্থ সম্পদের চরিত্রগত এই স্বাতন্ত্র্য বিদ্যার দেবী এবং ধনদৌলতের দেবীর মিলনের অন্তরায় কিনা কে জানে।

আমাদের প্রাচীন প্রবচনে এবং মর্মকথায় বিদ্যা এবং ধনের পারস্পারিক সম্পর্কের যে চিত্র পাওয়া যায় তা খুব পরিষ্কার নয়। 'বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে'—এ কথা ছোটবেলা থেকেই আমাদের শেখানো হয়। আবার 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ' কথাটার সঙ্গেও আমাদের প্রায় আবাল্য পরিচয়। ধন বা সম্পদ লাভের উপায় হিসেবে বাণিজ্য, কৃষিকর্ম এবং এমন কি রাজসেবার উল্লেখ আমরা পাই—বিদ্যাচর্চার কথা সেখানে স্থান পায়নি। অথচ বিদ্যা থেকে বিনয়, বিনয় থেকে পাত্রত্ব, পাত্রত্ব থেকে ধন, ধন থেকে ধর্ম এবং ধর্ম থেকে সুখ—এই সমীকরণের মধ্যে বিদ্যা এবং ধনের কী অকুণ্ঠ আত্মীয়তার পরিচয় রয়েছে! এর মধ্যে ধন এবং বিদ্যার পারস্পরিক মূল্যবোধের বিবর্তনের কোনও সূত্র লুকিয়ে আছে কি না তার সঠিক খবর দিতে পারবেন তাঁরা, যাঁরা আমাদের সামাজিক ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য এবং তত্ত্বের সন্ধান রাখেন। বিদ্যা এবং ধনের মূল্যবোধের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা এবং ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিষয়ক চিরন্তন এবং ভাবনাতেও বিবর্তন আসা খুব অসম্ভব হয়তো নয়।

এই দুই দেবীর—অর্থাৎ লক্ষ্মী-সরস্বতীর—পারস্পরিক সম্পর্কের খোঁজ নিতে গেলে দেখা যাবে বিভিন্ন গল্প-গাথায় এবং লোকপ্রবাদে এঁদের দ্বন্দ্ব বা বিবাদের কাহিনীর সংখ্যাই যেন বেশী। এই দ্বন্দ্ব বা বিবাদের কল্পনা কবে এবং কিভাবে প্রথম শুরু হয়েছিল তার খোঁজ পণ্ডিত লোকেরা দিতে পারবেন। বর্তমান প্রসঙ্গে যে কথা জরুরী তা হল—এই দুই দেবীর বিবাদের কল্পনা পুরাণ-রচয়িতাদের ভাষ্যে অন্য এক রূপ পরিগ্রহ করেছে—লক্ষ্মী এবং সরস্বতী হয়েছেন বিষ্ণুর দুই পত্নী। সপত্নী-বিরোধ খুব বেমানান মনে হয় না। তাই হয়তো লক্ষ্মী-সরস্বতীর দ্বন্দ্ব বিষয়টিকে আমরা খুব স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছি। অবশ্য এ প্রসঙ্গে একটা কথা ভাবার আছে। এই দুই দেবীর দ্বন্দ্ব বিষয়টিই এঁদের বিষ্ণুর দুই পত্নী হিসেবে কল্পনা করতে সাহায্য করেছে, নাকি বিষ্ণুর দুই পত্নী হওয়ার দরুনই [illegible]—এ কথার মীমাংসার ভার আবার

আমাদের ছেড়ে দিতে হবে পণ্ডিতদের বিচারের উপর।

বিষ্ণুর দুই পত্নীর উল্লেখে কবি বলেছেন—'একা ভার্যা প্রকৃতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া'। অর্থাৎ সরস্বতী মুখরা, লক্ষ্মী চঞ্চলা। প্রকৃতপক্ষে, দুজনেরই এখানে নিন্দাসূচক উল্লেখ। দুই গৃহিণীর স্বভাবের জ্বালায় বিষ্ণু 'দারুভূত' হয়ে (অর্থাৎ যাকে বলে কাঠ হয়ে) রয়েছেন—কবির এরকমই কল্পনা। আমরা বিষ্ণুর অন্দর-মহলের খবর জানি না। তবে অনুমান করতে পারি যে, বিষ্ণু নিজেও তাঁর দুই পত্নীকে সখিত্বে বাঁধতে পারেননি। পারলে তাঁর গৃহে অশান্তি থাকতো না—তাঁকেও ঘর বাড়ি ছেড়ে 'জলশয্যা'য় নিদ্রা দিতে হত না। বিষ্ণু স্বয়ং পারেননি এই দুই দেবীকে একত্রে তুষ্ট রাখতে, আমরা তো কোন্ ছার!

লক্ষ্মী-সরস্বতীকে বিষ্ণুর দুই পত্নী হিসেবে যেমন আমরা জানি, তেমনি এঁদের জানি দু'বোন হিসেবে, যদিও একের কল্পনার সঙ্গে অপরের বিরোধ তেমন নেই—দু' বোনের সপত্নী হতে বাধা নেই' এই দু বোনের কল্পনার মধ্যে আমরা যে চিত্রটি দেখি তা হল এই রকম : সরস্বতী লেখাপড়া এবং গানবাজনা নিয়ে থাকেন, লক্ষ্মী করেন গৃহকর্ম। দু'য়ের মধ্যে যোগসূত্রটা পরোক্ষ হলেও বিবাদের নয়। বরং এর মধ্যে যেন আমরা কর্মভাগজনিত বোঝাপড়ার একটা ইঙ্গিত পাই। সূক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে এই দুই ভগিনী বা দেবীর কর্মগুলো পরস্পরবিরোধী নয়—বরং একে অন্যের পরিপূরক। সত্যি কথা বলতে গেলে সমস্ত দেবীই একে অন্যের পরিপূরক। কেননা, সবাই তো আসলে সেই আদ্যাশক্তিরই কার্যকারণ জনিত বিভিন্ন প্রকাশ। মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য অংশে ব্রহ্মীশক্তি (সরস্বতী), বৈষ্ণবীশক্তি (লক্ষ্মী) এবং শৈবীশক্তি (দুর্গা বা পার্বতী)-কে পরমা দেবীর বিভিন্ন প্রকাশ রূপে কল্পনা করা হয়েছে বার বার। কাজে কাজেই লক্ষ্মী-সরস্বতীর মধ্যে যে বিভেদ বা বিবাদের কল্পনা সেটা খুব সম্ভবত অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালের সৃষ্টি।

আমাদের ইদানীন্তন ধারণায়, সরস্বতী বিদ্যা বা জ্ঞানের দেবী—লক্ষ্মী সম্পদের বা ঐশ্বর্যের। কিন্তু খোঁজ নিলে দেখা যাবে, লক্ষ্মীকে বিদ্যার দেবী এবং সরস্বতীকে সম্পদের দেবী হিসেবে কল্পনার নজিরও খুব কম নেই। বিষ্ণুপুরাণে লক্ষ্মীকে জ্ঞানের দেবী হিসেবে সবিশেষ উল্লেখ আছে। শিল্পরত্ন এবং তন্ত্রসারে লক্ষ্মী-প্রতিমার হাতে জ্ঞানের প্রতীক হিসেবে পুস্তক ন্যস্ত করার নির্দেশ আছে। তন্ত্রসারে উল্লিখিত 'লক্ষ্মী-কবচ' অংশে স্পষ্ট বলা আছে যে, এই কবচ ধারণে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সম্যক্ দখল জন্মে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত একটি প্রাচীন লক্ষ্মী-প্রতিমার হাতে পুস্তক দেখা যায়। নেপাল থেকে প্রাপ্ত বাসুদেব-লক্ষ্মীর 'অর্ধনারী' মূর্তির একাধিক নজির আমাদের জানা আছে, যার নারী অংশের (অর্থাৎ লক্ষ্মী অংশের) হস্তলাঞ্ছন হিসেবে পুস্তক আছেই আছে। অনুরূপভাবে ঋগ্বেদে নদী-দেবতা সরস্বতীকে রত্নদাত্রী হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। শতপথব্রাহ্মণেও সরস্বতী আরাধিত হয়েছেন সৌভাগ্য ও সম্পদের দেবী হিসেবে। এমন কি, বিক্রম সংবৎ ১১১১ (অর্থাৎ ১০৫৪ খ্রীষ্টাব্দ)তেও আমরা একটি লেখ-এ সরস্বতী সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ পাই—"সরস্বতী তোমাকে সর্ব সম্পদ দান করুন।"

উপরের আলোচনা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সরস্বতী ও লক্ষ্মীর কল্পনা প্রাচীনকালে বেশ কিছু দিন হয়তো সমান্তরালভাবে চলেছিল। দুয়ের মধ্যে একটা সমতা বজায় ছিল। তাই এক দেবীর কাছে যা পাওয়া যাবে তা অন্য জনের কাছেও পাওয়ার কথা লোকে অনায়াসে ভাবতে পারতো। এই ভাবনা লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর মধ্যে প্রকৃতি ও আকৃতিগত বৈসাদৃশ্য প্রায়শই ঘুচিয়ে দিত। দুয়ের বৈসাদৃশ্যের অবসানের সঠিক উৎস কোথায় তা না জানা গেলেও উপরিউল্লিখিত মার্কণ্ডেয় পুরাণের 'দেবীমাহাত্ম্য' অংশ আমাদের এই প্রসঙ্গে পুনরায় স্মরণ করা প্রয়োজন। কেননা, ওখানে বিভিন্ন দেবদেবীর প্রকৃতি ও আকৃতিকে আদ্যাশক্তির কার্যকরণ জনিত বিন্যাসরূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই রূপবিন্যাস যুগে যুগে কতভাবে যে প্রয়োজন হয়েছে এবং সে সবের সামাজিক পটভূমিকাই বা কি তা সঠিক জানার উপায় আজ আর খুব একটা নেই—সমগ্র চিত্রটি আজ বহু যুগের বিবর্তনে ধূসর এবং অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

এই বিবর্তনের মাঝেই হয়তো কোনও সময়ে আমরা লক্ষ্মী-সরস্বতীকে দুই বোন হিসেবে এবং বিষ্ণুর দুই স্ত্রী হিসেবে কল্পনা করতে আরম্ভ করেছি। কোন্ কল্পনা আগে এসেছে এবং কোনটা পরে তার সঠিক বিচারও এখন আর সম্ভব নয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, সংবৎসরপ্রদীপ নামক স্মৃতিগ্রন্থে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী এই উভয় দেবীর উপাসনাতেই বিদ্যার উপকরণ—মস্যাধার (দোয়াত) এবং লেখনী (কলম)—পূজার আবশ্যিক প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে। এই গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে যে, এই উপাসনা মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে করা উচিত। কেননা, ওই তিথি শ্রী বা লক্ষ্মীর অতি প্রিয় তিথি—'যা শ্রিয়ঃ প্রিয়া'। আমরা জানি, এই তিথিতে—যাকে শ্রীপঞ্চমী বলে উল্লেখ করা হয়—ইদানীং আমাদের দেশে (বিশেষ করে বঙ্গদেশে) সরস্বতীর পুজো হয় ঘরে ঘরে। আচার্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁর 'পূজাপার্বণ' গ্রন্থে বলেছেন যে, হয়তো প্রাচীন কালে এই শ্রীপঞ্চমী তিথিতেই লক্ষ্মী এবং সরস্বতী উভয়েরই পুজো হত। কালক্রমে কোজাগর পূর্ণিমার দিনে—অর্থাৎ আশ্বিন-কার্তিকের পূর্ণিমায়—লক্ষ্মী পুজোর প্রচলন শুরু হয়—সরস্বতী পুজো পূর্বপ্রথা অনুসারে শ্রীপঞ্চমীর দিনেই থেকে যায়। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতপ্রবর ডঃ সুকুমার সেনের সুচিন্তিত মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"নদী দেবতা হইতে সরস্বতী বৈদিক ভাবনায় পুষ্টি, আরোগ্য, শ্রী ও ধনের দেবতায় পরিণত হইয়াছিল। সেই অর্থে ইহা ইলার সমার্থক। পরে এই জলস্রোত ও দেবতা দুইটি রূপ লইয়াছিল। এক রূপে বাগ্দেবতা, অপর রূপে শ্রীদেবতা। বৈদিক ব্রাহ্মণগ্রন্থে বাগ্দেবতা সুন্দরী নারীরূপে অসুরদের মোহিত করিয়া দেবতাদের অমৃত আহরণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইনিই আমাদের পরিচিত দেবী সরস্বতীর পূর্বরূপ।

"মেধা ও বিদ্যার দেবতারূপে সরস্বতী স্বতন্ত্রভাবে আগে পূজা পাইতেন না। শুধু দুর্গার সহচরী (বা কন্যা)রূপে দশভূজা প্রতিমার অঙ্গরূপে পূজা পাইতেন। এ-দেশে পড়ুয়ারা বসন্তপঞ্চমী দিনে যে বিদ্যাদেবীর পূজা করিতেন, তিনি শ্রীদেবীর সহিত অভিন্ন। শ্রীপঞ্চমী নামেই ইহার প্রকাশ। পূজায় যবশীর্ষ ইত্যাদির নৈবেদ্যও তাহা প্রমাণ করে।"

একই দিনে লক্ষ্মী-সরস্বতীর একদা উপাসনার বিষয়টি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, বঙ্গদেশের গৃহবধূরা প্রতি বৃহস্পতিবার ঘরে ঘরে লক্ষ্মীব্রত করেন। এদিকে 'বিদ্যারম্ভে গুরুশ্রেষ্ঠ' কথাটাও আমাদের মধ্যে খুব প্রচলিত। অর্থাৎ বিদ্যার চর্চায় বা সারস্বত সাধনার জন্যও এই গুরুবার বা বৃহস্পতিবারকেই প্রশস্ত বলে চিহ্নিত হতে দেখি!

লক্ষ্মী এবং সরস্বতী শুধু যে একই দিনে পূজিত হতেন তাই নয়, সম্ভবত এই দুই দেবীর একত্র উপাসনাও প্রচলিত ছিল। ১১৬১ বিক্রম সবৎ ('১১০৪ খ্রীষ্টাব্দ) তারিখযুক্ত পরমার রাজাদের নাগপুর প্রশস্তিতে "বাগদেব্যো" বলে যাঁর উদ্দেশে প্রণাম জানানো হয়েছে তিনি যে এক দেবী নন তার ইঙ্গিত বাগদেবী শব্দটার দ্বিবচনে উল্লেখেই রয়ে গেছে। এই দুই বাগ্দেবীর নাম কি কি তা আমরা জানি না। তবে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী এই উভয় দেবীকেই আমরা উপরে উল্লিখিত অংশে বিদ্যার (বা বাক্-এর) দেবী হিসেবে পেয়েছি। তাই অনুমান করা সম্ভব যে, এই "বাগ্দেব্যো" কথাটার মধ্যে লক্ষ্মী-সরস্বতীর একত্র উপাসনার ইঙ্গিত রয়েছে। এই অনুমান যুক্তি-তর্কের চাপে কতটা টিকবে তা বলা না গেলেও শুধু অনুমান হিসেবেও এর একটা বিশেষ মূল্য আছে। পরবর্তী কালে আমরা ভাবতে শিখেছি যে, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর একত্র আরাধনা সম্ভব নয়। প্রবন্ধের শুরুতেই সে কথার উল্লেখ করেছি। কিন্তু এই ভাগাভাগির উৎস কোথায়, জানি না। দুয়ের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের কথাই বরং আমরা প্রাচীন গ্রন্থে বেশী পাই। মহাউম্মগগ্ জাতকে বুদ্ধ বলেছেন, সম্পদ অর্জন এবং রক্ষণের জন্য মানুষকে জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান হতে হবে। অর্থাৎ তিনি যেন বলতে চাইছেন, যেমন সরস্বতীর বরপুত্র না হলে লক্ষ্মীবান্ হওয়া যায় না, তেমনি লক্ষ্মীর কৃপালাভ তাঁরাই করেন যাঁরা সারস্বত-প্রসাদে ধন্য। লক্ষ্মী-সরস্বতীর পারস্পরিক পরিপূরকের এই যে ভূমিকা, এটা খুবই অর্থবহ। উল্লিখিত নাগপুর প্রশস্তির "বাগ্দেব্যো" কথাটা অনুরূপ অর্থদ্যোতনার কাব্যরূপ হওয়া তাই খুব অসম্ভব হয়তো নয়।

# বাথরুমকে ঝলমলে বাহারে করুন প্যারীওয়্যার দিয়ে সাজিয়ে তুলুন!

ভেনেশিয়ান লাল, এমারেল্ডের সবুজ রঙ, আকাশী নীল, প্রিমরোজ, প্রবালের গোলাপী বাহার কিংবা শুধু ঝকঝকে সাদা, যাই হোক না কেন, প্যারীওয়্যারের কদর দেশে-বিদেশে সর্বত্রই লক্ষ-লক্ষ ঘরে-ঘরে। প্যারীওয়্যারের

না। চমৎকার স্টাইল আর নিখুঁত ফিনিশ, অসাধারণ টেঁকসই আর দারুণ দেখতে। তাই অবাকের কিছুই নয়, যেখানেই তাকান সর্বত্রই স্যানিটারিওয়্যারের আর এক নাম প্যারীওয়্যার।

*Parryware* VITREOUS

আই. ডি. প্যারী ঃ, ডেয়ার হাউস, মাদ্রাজ-৬০০ ০০১

লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে কখনও যে অভিন্ন বলে মনে করা হয়েছে তাই শুধু নয়, দুই দেবীকে একাসনে আনার নজিরও আমাদের জানা আছে। বিষ্ণুর দুই পত্নী যে এঁদের আমরা বিষ্ণুমূর্তির দুই পার্শ্বে প্রায়শই দেখি—বিশেষ করে দশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত পূর্ব ভারতীয় ভাস্কর্যশিল্পের একাধিক নমুনায় নং ১)। এই সব ভাস্কর্যে সাধারণত বিষ্ণুর ডান পাশে লক্ষ্মীকে এবং বাম সরস্বতীকে দেখতে পাই—প্রথমজন পদ্ম বা চামর হাতে, দ্বিতীয় জন বীণা-রতা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, আমরা তো বীণাপাণি হিসেবে তাঁকেই জানি, অথচ স্কন্দপুরাণে একাধিকবার লক্ষ্মীকে বীণাবাদনরতা যে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানেও হয়তো এই দুই দেবী-কল্পনায় পারস্পরিক দনের স্বীকৃতিই আমরা পাই।

বিষ্ণুমূর্তির দুই পাশে লক্ষ্মী-সরস্বতীর অবস্থিতির ব্যাখ্যা হিসেবে বলা থাকে—এঁরা বিষ্ণুর দুই পত্নী। সমুদ্র মন্থনের পর বিষ্ণু লক্ষ্মীকে লাভ ন, আমরা পুরাণপাঠে অবগত আছি। সুতরাং লক্ষ্মীকে বিষ্ণুর পত্নী বা ভার্যা বে ভাবার পটভূমিটা আমাদের বোধগম্য কিন্তু সরস্বতীর অনুরূপ চিন্তনের ক ব্যাখ্যা খুব স্পষ্ট এবং জনপ্রিয় নয়। পুরাণপাঠে আমরা জানি, লক্ষ্মী, বতী এবং গঙ্গা—এই তিন জনই বিষ্ণুর পত্নী ছিলেন। কালক্রমে বিষ্ণু শুধু ীকে আপন ভার্যা হিসেবে রেখে ব্রহ্মা এবং শিবকে যথাক্রমে সরস্বতী ও কে দিয়ে দেন তাঁদের স্ত্রী করে নেবার জন্য (1)। এসব কাহিনীর ব্যাখ্যা বা ত্য খুঁজতে গেলে কোথায় হারিয়ে যেতে হবে কে জানে। তবে মনে আমাদের য় থেকে যায়। কেননা, সরস্বতী বিষ্ণুপত্নী কেমন করে হলেন, এবং একই সঙ্গে র পত্নী হিসেবেও কি করে স্বীকৃতি পেলেন, তার সূত্রটি আমাদের নাগালের র থেকে গেল।

যাই হোক, বিষ্ণুমূর্তির দুই পাশে তাঁর দুই পত্নী লক্ষ্মী ও সরস্বতীর স্থিতির নিদর্শনের কথা আমরা উল্লেখ করেছি। একাসনে এই দুই দেবীর স্থিতি আমরা পুনরায় দেখতে পাই বেশ কিছু পরবর্তী কালে দুর্গার দুই শ। বঙ্গদেশে এখনও শারদোৎসবের সময়ে দুর্গার যে মূর্তি পূজিত হয় তাতে রা শুধু মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গাকেই যে দেখি তা নয়; তাঁর দুই পাশে দেখি ্মী-সরস্বতী এবং কার্তিক-গণেশকেও। দুর্গার দুই পাশে লক্ষ্মী-সরস্বতীর অবস্থিতি এখানে দুই ভগিনী বা দুর্গার দুই কন্যা হিসাবে বঙ্গদেশের প্রচলিত লোকবিশ্বাস এইরূপ। দুর্গার বা বিষ্ণুর দুই পাশে লক্ষ্মী-সরস্বতীর এই স্থিতি—দুই ভগিনী বা দুই সপত্নী হিসেবে—বঙ্গদেশের লৌকিক এবং ধার্মিক বাসে বেশ জনপ্রিয়ভাবে দেখা দিয়েছিল। পাল-সেন যুগের অসংখ্য বিষ্ণুমূর্তিতে ং পরবর্তী কালের দুর্গামূর্তিতে এর প্রতিফলন পাই। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে এই দুই রূপেই লক্ষ্মী-সরস্বতীর স্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর অননুকরণীয় ভাষায়।

দেখা যাচ্ছে—বৈষ্ণবরা, এবং পরবর্তী কালে শাক্তরা, তাঁদের মূল উপাস্য বতার দুই পাশে লক্ষ্মী-সরস্বতীর একত্র অবস্থিতির স্বীকৃতি দিয়েছেন প্রতিমা-বর্ণনের মাধ্যমে। এই স্বীকৃতির পেছনে একটি সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য থাকাই ভাবিক মনে হয়। সে উদ্দেশ্য কি হতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা পরে করা বে। আপাতত যে কথাটা আমাদের কাছে মুখ্য তা হল এই যে, লক্ষ্মী-সরস্বতীকে স উপাস্য দেবতার দুই পাশে একাসনে যদিও আমরা এখানে পাচ্ছি, তবুও এই ই দেবীকে এক রূপে (অর্থাৎ এক দেহে) সমন্বিত করার কোনও প্রচেষ্টার শিল্প-দর্শন পাই না। এই সমন্বয়-প্রচেষ্টা একেবারে যে হয়নি তা-ও বলা যায় না। কারা ভাবে এ বিষয়ে এগিয়ে এসেছিল সে প্রসঙ্গে এবার আসছি।

বজ্রযান-তন্ত্রযান বৌদ্ধরা অসংখ্য দেবদেবীর আরাধনায় ব্রতী ছিলেন। এই বদেবীর অনেকেই হিন্দু দেবদেবীর সরাসরি বা সামান্য পরিবর্তিত রূপ, এ কথা াজ অনেকেই সবিশেষ অবগত আছেন। বৌদ্ধদের এক অতি লোকপ্রিয় দেবীর ম বসুধারা। বলাই বাহুল্য, ইনি পৃথিবী বা ধরিত্রীদেবী ছাড়া আর কিছুই নন। ন্দুরাও বসুধারা দেবীর উপাসনা করেন। তবে বৌদ্ধরা এই বসুধারা দেবীর কাধিক রূপ কল্পনা করেছেন। এই রূপগুলো দেবীর বিভিন্ন কর্মানুসারে ল্পিত। বসুধারা পৃথিবী-দেবী হিসেবে মারধর্ষণের সময় গৌতম বুদ্ধের পক্ষে াক্ষ্য দিয়েছেন। তাই তিনি পৃথিবী-দেবী রূপে পূজিতা। পৃথিবী-দেবী হিসেবে তিনি রত্ন এবং সম্পদদাত্রীও বটেন। উপরন্তু তাঁকে কল্পনা করা হয়েছে জ্ঞান-রূপিণী হিসেবেও। কেননা, দশভূমির ধরিত্রী হিসেবে তিনি শুধু ভূমিপারমিতাই ন, তিনি প্রজ্ঞাপারমিতাস্বরূপা। এই দেবী-কল্পনায় আমরা একাধারে হিন্দুদের ক্ষ্মী এবং সরস্বতী—এই উভয় দেবীর সুস্পষ্ট ছায়া দেখতে পাচ্ছি। [illegible] ঃ এবং সম্পদদায়িনী অর্থাৎ লক্ষ্মী-স্বরূপা, আবার তিনি সরস্বতীর [illegible] বং জ্ঞানদায়িনীও বটেন। লক্ষ্মী-[illegible] এই যৌথ ভূমিকাই আমরা [illegible] সুধারার মধ্যে পাই। শুধু তা [illegible] এই যৌথ [illegible] সমন্বিত [illegible] খতে পাই এই দেবীর এক [illegible] প্রতিমা-নিদর্শনে।

বসুধারা দেবীর যে প্রতিমা-রূপ [illegible] সব চাইতে জনপ্রিয় ছিল বলে [illegible] তাঁর ষড়ভুজ রূপ। এরূপ মূর্তি [illegible] নেক পাওয়া যায়—বিশেষত নেপালের [illegible] নে। দেবী সব মূর্তিতে [illegible] ললিতাসনে উপবিষ্টা। তাঁর [illegible] দেখা যায় পুস্তক, ধান্যমঞ্জরী ও ভদ্রঘট; তিন দক্ষিণ হস্তে রত্নবর্ষণকারী রদমুদ্রা, রত্নমঞ্জরী এবং তথাগতবন্দনা-মুদ্রা। এই রূপের বর্ণনা 'বসুন্ধরোদ্দেশ্য' া ধর্মকোষ সংগ্রহ' জাতীয় [illegible] হস্তলিখিত কিছু পুঁথিতে পাওয়া গেলেও শ্চর্যের বিষয় এই যে, বৌদ্ধ প্রতিমা বিষয়ক প্রামাণ্য দুই গ্রন্থে—সাধনমালা ও নিষ্পন্নযোগাবলীতে—বসুধারার এই জনপ্রিয় ষড়ভুজ রূপের কোনও উল্লেখ নেই।

: এই রূপটির প্রাচীনতম আমরা ১০১৫ খ্রীস্টাব্দে (নেওয়ারী সংবং ১৩৫) ত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' নামক পুঁথিতে (Cambridge Univer- Library Manuscript No .Add. 1643), পাই। এ থেকে বোঝা যে, বসুধারার এই ষড়ভুজ রূপের কল্পনা সম্ভবত একাদশ শতাব্দীর ত্তেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল।

বসুধারার এই ষড়ভুজ রূপের মধ্যে আমরা হিন্দু দেবী লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মা-রূপের একত্র সমাবেশ দেখি। দেবীর হাতের পুস্তক যেমন সরস্বতীর রিচিত লাঞ্ছন, তেমনি ভদ্রঘট ও ধান্যমঞ্জরী আমাদের লক্ষ্মীপ্রতিমার অতি চিত রূপটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, বসুধারার ভুজ রূপটি লক্ষ্মী-সরস্বতীর সমন্বিত রূপ হিসেবেই কল্পিত হয়েছিল। ধ প্রতিমাশাস্ত্রে তাই আমরা অসম্ভবকে সম্ভব হতে দেখি—লক্ষ্মী-সরস্বতী দেহে লীন হয়ে ভক্তের দু হাত ভরে যেমন সর্ব সম্পদ দান করছেন, তেমনি ক দিচ্ছেন জ্ঞান ও বিদ্যার অকুণ্ঠ অধিকার।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাবে, লক্ষ্মী-সরস্বতীকে একাসনে বিষ্ণুর দুই শ দেখানোর প্রচেষ্টা বৈষ্ণবরা সেই প্রাচীনকালেই করেছিলেন—একাদশ-দ্বাদশ কের শিল্পে তো এর বহু নজির আছে, এমন কি ইতিপূর্বেকার নিদর্শনও ানা নয়। বৌদ্ধরাও এ বিষয়ে পিছিয়ে থাকেননি। অন্তত একাদশ শতকের রূতে তাঁরা এই দুই দেবীর সমন্বিত রূপ প্রকাশ করেছেন ষড়ভুজা বসুধারা তির একাধিক শিল্প-নিদর্শনের মাধ্যমে।

আমরা সবাই অর্থ সম্পদ যেমন আকাঙ্ক্ষা করি, বিদ্যাসম্পদও তেমনি যাচ্ঞা র। দুটোই আমাদের চাই। অথচ কিভাবে যেন আমাদের ধারণায় এসে গেছে যে, দুটো জিনিস, অর্থাৎ অর্থ এবং বিদ্যা, একত্রে পাওয়া দুরূহ। বৈষ্ণবরা এই রূহতার কিছু সমাধা করতে উদ্যোগী হয়ে কল্পনা করলেন লক্ষ্মী-সরস্বতীকে ষ্ণুর দুই সহধর্মিণীরূপে। এঁদের বিষ্ণুর দুই পাশে সহাবস্থানের মাধ্যমে ভক্তমনে তীতি জন্মালো যে, লক্ষ্মী-সরস্বতীর কৃপালাভ একই সঙ্গে সম্ভব যদি তাঁদের দেবতা বিষ্ণুর আরাধনা করা যায়। বলাই বাহুল্য, এতে বৈষ্ণব পূজাপদ্ধতির তি জনমানসের আকর্ষণ স্বভাবতই বেড়ে গিয়ে থাকবে। কিন্তু বৌদ্ধরা তাঁদের তযোগিতামূলক সৃজনী প্রতিভার পরিচয়স্বরূপ কল্পনা করলেন ষড়ভুজরূপা বী বসুধারার যিনি প্রকৃতপক্ষে একাধারে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী দুই-ই! জন- য়তার নিরিখে বোধ হয় এতে বৌদ্ধপূজাশাস্ত্রের আকর্ষণ কিছুটা বেড়ে গেল। ই প্রতিযোগিতায় শাক্তরাও পিছিয়ে থাকা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। তাঁরা রবর্তী কালে দুর্গার দু পাশে লক্ষ্মী-সরস্বতীকে এনে বসালেন। অবশ্য দুর্গার ঙ্গে লক্ষ্মী-সরস্বতীর সমীকরণ বহু আগেই যে তাঁরা করেছিলেন তার কথা তো মরা মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য অংশের প্রসঙ্গেই উল্লেখ করেছি।

লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিবাদ বা পরস্পরবিরোধিতার কল্পনা কবে এবং কেমন করে নমানসে প্রথম এসেছিল তা সঠিক বলা হয়তো সম্ভব নয়। কাঃ নাঃ সুব্রহ্মনিয়ম হাশয় তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছেন—

"The popular belief is that Saraswati, the goddess of learning, would not co-exist with Lakshmi, the goddess of worldly wealth. It might have only a mere trick to keep the learned of the ancient lore poor, perpetuated by those who had the affairs of the state at heart".

অনুরূপ বা প্রতিরূপ যুক্তি বা মতামত হয়তো আরও অনেকে দিতে পারেন। তবে সেসবই মতামত-সর্বস্ব—ইতিহাসের প্রমাণ বা নিদর্শনের দ্বারা তাকে সমর্থন করা সম্ভব নয়। লক্ষ্মীর উপাসক যাঁরা, তাঁরা সরস্বতীর কৃপা পান না, বা এর উল্টো ধারণার মূল উৎস খুঁজে না পাওয়া গেলেও হয়তো এর কোনও-না-কোনও একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়, যদিও সেটাও অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের শাস্ত্রে ভক্তির সব চাইতে বড় লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে একনিষ্ঠতাকে। যাঁরা জাগতিক অর্থ-সম্পদ চান তাঁরা একনিষ্ঠভাবে লক্ষ্মী দেবীর আরাধনায় ব্রতী থাকুন, আর যাঁরা পারমার্থিক জ্ঞান বা বিদ্যা-পিপাসু তাঁরা সারস্বত-সাধনাতেই শুধু মন দিন—এমত অনুচ্চারিত শাস্ত্র নির্দেশ থেকেই হয়তো কালক্রমে আমাদের মনে ধারণা এসেছে—বলাই বাহুল্য, প্রমাদ-দোষে—যে, অর্থার্জন ও জ্ঞানার্জন পরস্পরবিরোধী কর্ম। তাই "ভারতীরে ছাড়ি ধরো এই বেলা লক্ষ্মীর উপাসনা"— দুজনের একত্র উপাসনা নৈব নৈব চ।


স্বীকৃতি—

১ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'বসুধারা', বসুধারা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ১৩৬৭ সাল।

২ P, Pal, Two Buddhist Paintings from Nepal, Amsterdam 1967.

৩ D. C. Bhattacharyya, Tantric Buddhist Iconographic Sources, Studies in Buddhist Iconography, Iconology of Composite Images, New Delhi, 1974, 1978, 1980.

৪ ভারতকোষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ৫ম খণ্ড, ১৩৮০ সাল।

৫ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, পূজা-পার্বণ, বিশ্বভারতী ১৩৫৮ সাল।

৬ Ka Naa Subrahmanyam, 'Puja in South India', The Sunday Statesman (Delhi), Puja Supplement, October 8,

## অরণ্যদেব

আপনি যদি কখনও গভীর অরণ্যে যাবার আমন্ত্রণ পান.....
... বিনা আমন্ত্রণে যাবেন না। কেননা সেটা বড্ডই বিপজ্জনক।

... তাহলে দেখবেন, অরণ্যদেব তাঁর খুলি-সিংহাসনে উপবিষ্ট...
আসুন.....

কল্পনা করুন, আপনি অরণ্যদেবের অতিথি। তিনি আপনাকে তাঁর খুলি-গুহা দেখাচ্ছেন.....
আসুন.....
12/18

মন্ত্রগুপ্তির শপথ নেবার পরে আপনাকে দেখানো হবে বিভিন্ন অরণ্যদেবের সমাধি-কক্ষ.....
1621 - 1662
1709
1550 - 1598
1647
1733 - 1781
1840

এই ঐশ্বর্য ব্যয় করা হয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে.....

এ হল বিভিন্ন অরণ্যদেবের লেখা ইতিহাস.....
আমার পূর্বপুরুষরা এ-সব লিখে রেখেছেন.....

রত্ন-কক্ষে আছে অদ্ভুত সব ঐতিহাসিক সামগ্রী.....
রাজা আর্থারের তলোয়ার... আলেকজান্ডারের হীরক-পানপাত্র...

কিন্তু... কী আছে এই বন্ধ দরজার পিছনে?
... বাস্, এর পরে আর যাওয়া যাবে না...
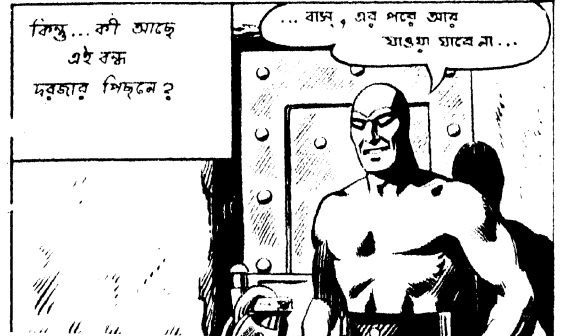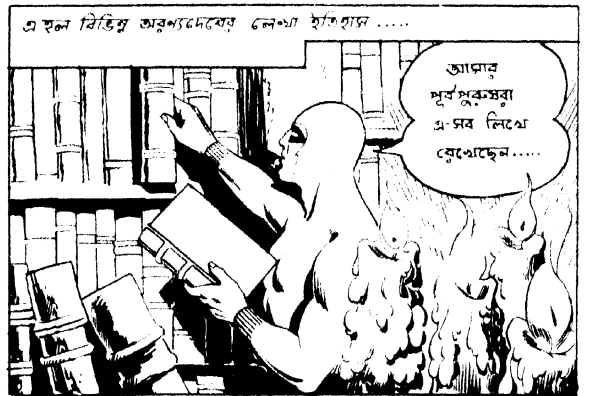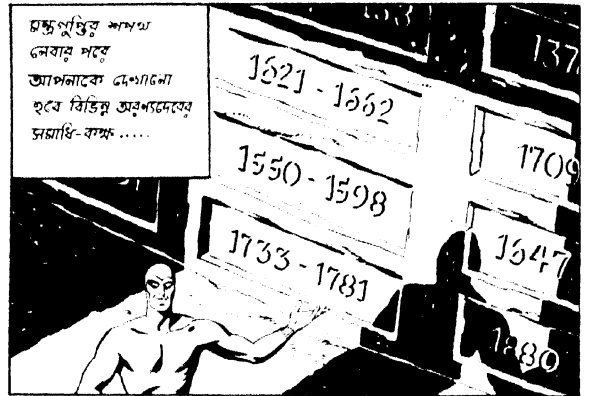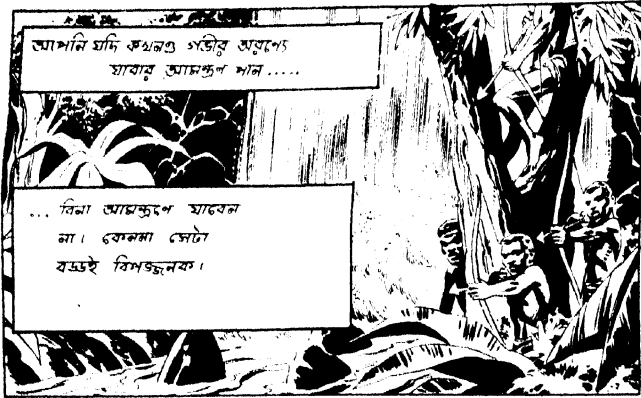
প্রতিটি মুহূর্তই
খুশী আনন্দে ভরা
সঙ্গে যদি থাকে
আগফা-ক্লিক
ক্যামেরা!
পিকনিক, পার্টি, জন্মদিন, ছুটিতে ভ্রমণ, সবেরই আনন্দঘন মুহূর্তগুলি আগফা-ক্লিক ক্যামেরায় ধরে রাখুন। এত কম দামে এত অপার আনন্দ, আপনি কল্পনা করতেও পারবেন না। এই আনন্দদায়ক সুবিধেজনক 'ক্লিক' সর্বদা সঙ্গে রাখুন। আপনার নিকটতম আগফা-গেভার্ট ডীলারের কাছে এখনই চলে আসুন।
CLICK III
CLICK IV
ACHROMAT
দেখামাত্রই ছবি তোলা যায়
ক্লিক III
ক্লিক IV
ফটোগ্রাফীর জগতে সবার সেরা
Agfa®
AGIL
আগফা-গেভার্ট ইণ্ডিয়া লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস :
মার্কেন্টাইল চেম্বার, ৪১ নিউ মেরীন লাইন্‌স, বোম্বাই ৪০০ ০২০
শাখা : বোম্বাই ● নিউ দিল্লী ● কলকাতা ● মাদ্রাজ
® ফোটোগ্রাফ সম্বন্ধীয় যাবতীয় উৎপাদনের প্রস্তুতকর্তা
আগফা-গেভার্ট, অ্যান্টওয়ার্প/লিভারকুসেন -এর
রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।
SIMOES/AG/1A/80 BEN
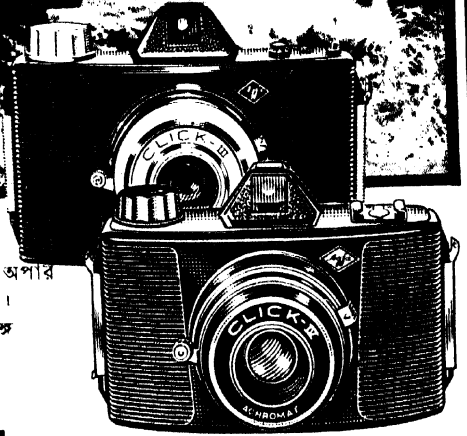
# সাহিত্য

## প্রজ্ঞানানন্দ পাঠগৃহ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়কাল একটা বিরাট সময় জুড়ে। বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে সারা ভারত ব্যেপে ১৮৫৭ সালে যে দাবানল জ্বলে উঠেছিল তারও বহু পূর্ব থেকেই এই তুষানলের বহিঃপ্রকাশ বারবার ঘটেছে। মুণ্ডা বিরোধ (১৮৫৭), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫), বা তারও আগে অন্যান্য উপজাতি-আদিবাসীদের বিক্ষোভ প্রকাশিত হচ্ছিল খোন্দ জাতি (১৮৪৬), নাগা জাতি (১৮৩৯), খন্দেশ জাতি (১৮০৮) বা চুয়ার জাতিদের (১৭৭০ এবং ১৭৭৯) বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। ১৮৫৭-পরবর্তী কালের আন্দোলনের গুরুত্ব ও ব্যাপ্তি আরও বিরাট।

এই সমস্ত বিক্ষোভ-বিদ্রোহ-বিপ্লব সম্পর্কে রচিত হয়েছে প্রচুর বই এবং এখনও হচ্ছে। এ ছাড়া, রয়েছে এই সম্পর্কীয় স্মৃতিকথা জাতীয় বহু বই। আমাদের দেশের গবেষকদের কাজে অন্যতম অন্তরায় প্রয়োজনীয় পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করা—কারণ, বই যা আছে তা বিভিন্ন লাইব্রেরী বা প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে; এক জায়গায় তা একত্রে পাওয়া যায় না। কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞানানন্দ পাঠগৃহ একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কীয় বইয়ের একটি সর্বাংগীণ ব্যাপক সংগ্রহ গড়ে তোলা। কেবল গ্রন্থরাজই নয়, তদানীন্তন যুগের বিভিন্ন সংবাদপত্র-সাময়িকপত্র থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য গুরুত্বপূর্ণ সংবাদসমূহের মাইক্রো-ফিল্ম সংগ্রহও পাঠগৃহ কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য। বর্তমানে এই জাতীয় বইয়ের সংখ্যা প্রায় আট শত। খুবই উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ। গবেষকরা একই স্থানে মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কিত এতগুলি গ্রন্থ প্রয়োজনে হাতের কাছে পাচ্ছেন, তার জন্য পাঠগৃহের কর্তৃপক্ষ সাধুবাদ নিশ্চয়ই পাবেন। মাইক্রোফিল্মের সংগ্রহ সেরকম উল্লেখযোগ্য না হলেও, সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে।

প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এই সংগ্রহ প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়। ১৯৭৭ সাল থেকে এই বাৎসরিক প্রদর্শনী নিয়মিত হয়ে আসছে। এবারের প্রদর্শনী (৪র্থ বর্ষ) অনুষ্ঠিত হল প্রজ্ঞানানন্দ ভবনের "কিরণচন্দ্র হল"-এ ৯ই অগাস্ট থেকে ১৮ই অগাস্ট পর্যন্ত। নানা প্রতিকূলতার জন্য কর্তৃপক্ষ এবারের প্রদর্শনীতে সমগ্র সংগ্রহ উপস্থিত করতে পারেননি—প্রদর্শিত হয়েছিল এর একটি অংশ মাত্র। এই প্রদর্শনীর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল দর্শকরা নিজেদের খুশিমত এই সব বই নাড়াচাড়া করে দেখতে পারছিলেন—কোন বাধা-নিষেধ ছিল না। এটা দর্শকদের উপরিলাভ। কারণ এর বহু বই-ই বর্তমানে কিনতে পাওয়া যায় না। যুগান্তর দলের ডিক্টেটর ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়-এর সেই বিখ্যাত বইটি "ভারতে সমরসংকট" রয়েছে এঁদের সংগ্রহে। বইটি ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ১৯২৫ সালে মেদিনীপুর জেলে থাকাকালীন রচনা করেন এবং তা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৮ সালে। সেই সময়ে তিনি চীনের ভবিষ্যৎ মতিগতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখছেন : "চীন একটু সুস্থির হতে পারলেই যে তিব্বত-সমস্যা জটিল হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এখনও তিব্বত ও লাসার উপর চীনের চক্ষু আছে। চীন যদি একবার তিব্বতে কর্তৃত্ব করতে পারে, তা হলে টোয়াং প্রদেশে সহজে ও গোপনে ভারত প্রবেশের আড্ডা বানিয়ে ফেলবে।" পড়তে পড়তে গা সিরসির করে। সত্যিই কি অদ্ভুত দূরদৃষ্টি! "হিন্দু পেট্রিয়ট"-এ প্রকাশিত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রচনার একটা সংকলনও রয়েছে। এরকম আরও অনেক উল্লেখযোগ্য ও বর্তমানে দুর্লভ গ্রন্থ পাঠগৃহের সংগ্রহে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি দুর্লভ সংগ্রহের উল্লেখ করতে হয়। নেতাজীর ছাত্রাবস্থার একটি পাঠ্যবই (মেকানিকস)—নেতাজীর স্বাক্ষর সহ—এই সংগ্রহে

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী

রয়েছে। সংবাদপত্রের কিছু ফটোস্ট্যাটও প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল।

যাঁর স্মৃতি এই পাঠগৃহ বহন করছে সেই স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী (১৮৮৪-১৯২১)-র অন্যতম পরিচয় যে, তিনি বিপ্লবী যুগান্তর দলের বরিশাল শাখার সংগঠক এবং নেতা। বারীন ঘোষ যখন তাঁদের গুপ্ত বিপ্লবী দলের কার্যকলাপ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৯০৬ সালে বরিশালে যান তখন তিনি এই ব্যাপারে সাহায্যের জন্য অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অশ্বিনীকুমার দত্ত সে সময়ে বারীন ঘোষকে জানান যে, এই বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তি হলেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—তখন তিনি অবশ্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে পরিচিত। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্তের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং স্বদেশ বান্ধব সমিতির (যার প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত স্বয়ং) সহ-সম্পাদক। সামাজিক সংস্কার ও আর্থিক উন্নয়ন করা এই সমিতির উদ্দেশ্য হলেও পুলিস এই প্রতিষ্ঠানটিকে সুনজরে দেখত না। তাই ১৯০৯ সালে কর্তৃপক্ষ এই প্রতিষ্ঠানটিকে বেআইনী ঘোষণা করে, ফলে সমিতির কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে কিন্তু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৯০৬ সাল থেকে, স্বদেশ বান্ধব সমিতির সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন, গোপনে বিপ্লবী সংগঠন গড়ার কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন। সমিতি বেআইনী ঘোষণা করার পর সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিজেকে পুরোপুরি বিপ্লবী সমিতি গড়ার কাজে নিয়োজিত করলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শংকর মঠই ছিল বরিশালে যুগান্তর দলের কেন্দ্র। কিন্তু পুলিসও নিশ্চুপ থাকে নি। তাঁকে বারবার অন্তরীণে আবদ্ধ করে রেখেছে; শেষবার ১৯১৬ সালে তাঁকে মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলে অন্তরীণ অবস্থায় থাকতে হয়। প্রসঙ্গত শ্রীসতীশচন্দ্র সামন্ত এখানেই তাঁর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁরই
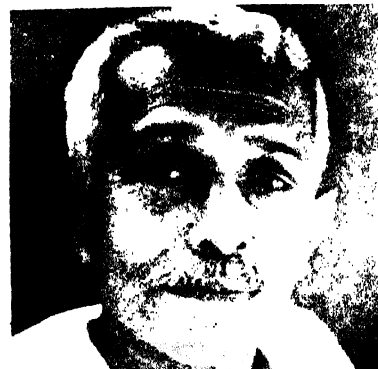
কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রেরণায় স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত হন। ইতিমধ্যে ১৯১৩ সালে গয়ায় তিনি সন্ন্যাস নেন এবং তখন তাঁর নাম হয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী।

মহিষাদলে অন্তরীণ অবস্থায় থাকাকালীন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ চারটি গ্রন্থ রচনা করেন; তার মধ্যে অন্যতম হল তিন খণ্ডে সমাপ্ত সুবৃহৎ "বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস" এবং "রাজনীতি"। প্রথম বইটি বেদান্ত দর্শনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ধারাবাহিক ইতিহাস এবং শেষেরটি ভারতীয় ও ইউরোপীয় রাজনীতির তুলনামূলক আলোচনা। তিনি কেবল সংগঠকই ছিলেন না, অগাধ পাণ্ডিত্যেরও যে অধিকারী ছিলেন পুস্তকগুলি তারই সাক্ষ্য দেয়। মহিষাদলে অবস্থানকালীন ম্যালেরিয়ায় বার বার আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর শরীর সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। ১৯২০ সালে তিনি মুক্তি পান এবং পরের বছর মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

প্রজ্ঞানানন্দ পাঠগৃহ ছাড়াও তাঁর স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সমাজসেবামূলক কাজ করে চলেছে। শ্রীসতীশচন্দ্র সামন্ত স্থাপন করেছেন প্রজ্ঞানানন্দ স্মৃতিরক্ষা সমিতি। এই সমিতির উদ্যোগে বেশ কয়েকটি বিদ্যালয় ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। হাওড়াতে তাঁর এক গৃহী শিষ্য (যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) প্রতিষ্ঠা করেছেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বিদ্যালয়। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহের পরিচালনায় প্রজ্ঞানানন্দ জনসেবা সঙ্ঘ বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে বেশ কয়েকটি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। এইসব সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ছাড়াও কলকাতায় শ্রীসরস্বতী প্রেসও তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত।

প্রজ্ঞানানন্দ পাঠগৃহের প্রতিষ্ঠাতা কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৮৩—১৯৫৪) দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। বছর কুড়ি বয়সে তিনি গৃহত্যাগ (ভুগিলহাট, যশোহর) করে কলকাতায় চলে আসেন। এখানে দেবব্রত বসুর সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী দলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। বিপ্লবী জীবনের প্রায় অর্ধেক সময় তাঁকে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে থাকতে হয়েছে।

শেষবার জেল থেকে মুক্তি পান ১৯৪৫ সালে। দেশের আবহাওয়ায় তখন নতুন আমেজ—মুক্তি আসন্ন, দেশ স্বাধীন হচ্ছে; যদিও স্বাধীনতার অন্তিম মূল্য হিসেবে দেশ বিভাগ তিনি অন্তর থেকে মেনে নিতে পারেননি। সে যা হোক, জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর তিনি বুঝলেন সংগ্রাম পর্ব শেষ হয়েছে কিন্তু কর্তব্য শেষ হয় নি, সামনে রয়েছে আর এক বড় কাজ—দেশ গঠন। তাই ষাট পেরিয়ে এসেও অবসর নিলেন না, স্বাধীন দেশের উপযুক্ত নাগরিক তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে স্থাপন করলেন প্রজ্ঞানানন্দ পাঠগৃহ।

সাধারণ মামুলী লাইব্রেরী নয়, ছাত্র ও যুবকরা নিজেদেরকে যাতে প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত করে বর্তমান যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলতে পারে, সে জন্য তাঁর পুস্তক সংগ্রহে বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, রাজনীতি—এই জাতীয় গ্রন্থের একটি প্রামাণ্য সংগ্রহ গড়ে তুলতে গোড়া থেকেই তিনি সচেষ্ট ছিলেন এবং আশানুরূপ সফলও হয়েছিলেন। "প্রজ্ঞানানন্দ পাঠগৃহ সাধারণের শিক্ষার জন্য নয়। সাধারণকে যাহারা শিক্ষিত করিয়া সুপথে চালনা করিবেন তাঁহাদের শিক্ষাদানের নিমিত্তই প্রজ্ঞানানন্দ পাঠগৃহ।" (যোগেশচন্দ্র বাগল—'বরণীয়') কয়েক বছর হল মৌলালীর মোড়ে 'প্রজ্ঞানানন্দ ভবনে' এই পাঠগৃহ স্থানান্তরিত হয়েছে।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী এবং কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যে কেবল বড় মাপের মানুষ ছিলেন তাই নয়, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁদের উভয়েরই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। মুক্তি সংগ্রামের উপর এই সংগ্রহের মাধ্যমে তাঁদের যোগ্য তর্পণের ব্যবস্থা করে পাঠগৃহের কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত কাজ করেছেন।

অশোক দাস

# ংয়ে আলি হেরেছেন
# তেছেন
# কার বাজিতে

অক্টোবরের দুই তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসে
জাগানো হেভিওয়েট বক্সিং লড়াইয়ে মহম্মদ আলি
গেছেন লারি হোমস-এর কাছে। হোমস জিতেছেন
আটটি লড়াই।

মুষ্টিযুদ্ধ জগতের প্রবাদ, তিনবারের বিশ্ব
পয়ন মহম্মদ আলির পেশাদার জীবনের ৬০টি
াইয়ের মধ্যে এই প্রথম বিষাদময় পরাভব এবং নক-
ট হয়ে প্রথম পরাভব।

হ্যাঁ, ওয়ার্ল্ড বক্সিং কাউন্সিলের কানুন অনুযায়ী
ক্লান্ত হওয়া নক-আউটেরই নামান্তর। চুক্তিমত
রাউন্ডব্যাপী লড়াইয়ের ১০ রাউন্ড পর্যন্ত প্রতি
ণ্ডেই আলি হেরেছেন পয়েন্টের হিসাবে। হোমসের
াঘাতে কাহিল হতে হতে একাদশ রাউন্ডে আর
য়ে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করতে পারেননি। তখন আলির
ার অ্যাঞ্জেলো ডান্ডি হার মেনে নেন। রেফারী
াড গ্রীন লড়াই বন্ধ করে দিয়ে হোমসকে নকআউটে
জয়ী ঘোষণা করেন। বক্সিং বিশ্বের পরাজিত
ট তখন রিংয়ের কোণে তাঁর টুলের উপর বসে
তমস্তকে ও নির্বাক বিস্ময়ে প্রহর গুনছিলেন।
ক্তাংগন রিংয়ের ২৭ হাজার দর্শক এবং দেশ-
াদেশে টেলিভিসন পর্দার সামনে বসা লক্ষ লক্ষ
ক দেখছিলেন শেষ হয়ে যাচ্ছে মুষ্টিযুদ্ধ
তহাসের সবচেয়ে বর্ণময় মহাবলীর জীবনের শেষ
প্ন। শেষ স্বপ্ন কথাটি কিন্তু আলির ক্ষেত্রে
যোজ্য নয়। বহুবারই রিং থেকে অবসর নেবার
দ্ধান্ত নিয়েছেন, আবার রিংয়ে ফিরে এসে মহা-
ীর্তির অধিকারী হয়েছেন। এই যে হোমসের
াছে অমর্যাদাকর পরাজয় তবু বলেছেন—
আমাকে খরচের খাতায় ফেলে দিও না। আমি
াবার ফিরে আসব। তবে কখন ফিরব সে সম্পর্কে
খনই মন স্থির করতে পারছি না।"

সত্যিই অতীতে অত্যাশ্চর্যভাবে আলি ফিরে
সেছেন। বক্সিং ইতিহাসে এমন গৌরবজনক
ত্যাবর্তনের নজির নেই। বক্সিং জগতে জ্যাক
নসন, জ্যাক ডেমপ্সি, জো লুই, জো ওয়ালকট,
জার্ড চার্লস, রকি মার্সিয়ানো, ফ্লয়েড প্যাটার্সন,
নী লিস্টন, ম্যাক্স স্মেলিং, ইনগেমার জোহানসন,
ে ফ্রেজিয়ার প্রভৃতি কত স্মরণীয় নাম। এঁদের
ধ্যে একমাত্র বক্সার ফ্লয়েড প্যাটার্সন যিনি খেতাব
রিয়ে আবার খেতাব ফিরে পেয়েছিলেন। সবচেয়ে
ম বয়সে—মাত্র একুশ বছরে প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন
য়েছিলেন। সবচেয়ে বেশি বয়সে (৩৭ বছরে)
শ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন জো ওয়ালকট। জীবনে
টি লড়াইতেও না হেরে—৪৯টির মধ্যে ৪৯টি
ড়াইয়ে জিতে খেতাব সহ অবসর নিয়েছিলেন
কমাত্র রকি মার্সিয়ানো। জো লুইও খেতাব সহ
বসর নিয়েছিলেন। কিন্তু অর্থের প্রয়োজনে
আবার চ্যাম্পিয়নশিপ লড়াইয়ে ফিরে এসে হেরে
ান এজার্ড চার্লস ও রকি মার্সিয়ানোর কাছে।

কিন্তু এঁদের সকলের কীর্তি ম্লান করে
দিয়েছেন মহম্মদ আলি। একবার নয়—তিনবার হেরে
িনবার বিশ্ব খেতাব পুনরুদ্ধার কল্পনাতীত
ীর্তি। তিনবার কেন, চারবারও বলা যায়। প্রথম-
ার খেতাবচ্যুত হবার কারণ কোনো মুষ্টিযোদ্ধার
ুষ্টাঘাত নয়—যুক্তরাষ্ট্র সরকারের খামখেয়ালীপনা।
১৯৬৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি মিয়ামি বিচে সোনি
লিস্টনকে সপ্তম রাউন্ডে নক-আউট করে প্রথম
বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবার পর আলির মুখোমুখি হবার
মতো কোনো বক্সারকে খুঁজে পাওয়া যায় নি।
ভিয়েৎনাম যুদ্ধের জন্য সৈন্য দলে নাম লেখাতে
অস্বীকার করায় যুক্তরাষ্ট্র সরকার আলির খেতাব
কেড়ে নেন। '৬৭-র এপ্রিল থেকে '৭০-এর
সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন বছর শুধু
খেতাবহীই ছিলেন না, মামলা মোকদ্দমায়ও
জড়িয়ে পড়েছিলেন রাষ্ট্রের সঙ্গে। মামলা জিতে
আবার তিনি খেতাব ফিরে পান। আবার টাইটেল
ফাইটে জো ফ্রেজিয়ারের কাছে হেরে সেই ফ্রেজিয়ার-
কেই হারিয়ে খেতাব ফিরে পান। আর এক টাইটেল
ফাইটে হারান জর্জ ফোরম্যানকে। আবার খেতাব
হারান কেন নর্টনের কাছে। ওই লড়াইয়ে আলির
চোয়ালও ভেঙে দেন নর্টন। কিন্তু পরে দুবার
নর্টনকে হার স্বীকার করতে হয় আলিরই কাছে।
'৭৬-এর ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে নিউ ইয়র্কের ইয়াংকি
স্টেডিয়ামে নর্টনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার জয়ের
পর আলি মুষ্টিযুদ্ধ থেকে অবসর নেবার সিদ্ধান্ত
ঘোষণা করেন। কিন্তু অর্থের প্রলোভনে এবং বক্সিং
প্রোমোটারদের ব্যবস্থাপনায় আলি-ফ্রেজিয়ার আর এক
লড়াইয়ের ব্যবস্থা হয় ম্যানিলায়। বলা হয়েছিল—
মাল্টি মিলিয়ন ডলারের লড়াই। দর্শনী থেকে
সংগৃহীত হয়েছিল প্রায় কুড়ি কোটি টাকা। জিতে
আলি পেয়েছিলেন চার কোটি টাকা। পরাজিত
ফ্রেজিয়ার পেয়েছিলেন দু কোটি।

আবার আলির ঘোষণা: "আর মুষ্টিযুদ্ধ
নয়। এবার আল্লার ইচ্ছায় কাজ করব। পুরোপুরি
ধর্মযাজকের জীবন বেছে নেব।"

কিন্তু পেশাদার মুষ্টিযুদ্ধ এমন এক খেলা
যার মধ্যে আছে সোনার খনির হাতছানি। ফলে
আলি আবার বক্সিংয়ের মধ্যে ফিরে এলেন এবং
'৭৮-এর ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে লাস ভেগাসে হেরে
গেলেন লিওন স্পিংকস-এর কাছে। কিন্তু যেভাবে
নর্টন ও ফ্রেজিয়ারকে হারিয়ে খেতাব পুনরুদ্ধার
করেছিলেন ঠিক সেইভাবে মাত্র ৬ মাসের মধ্যে বদলা
নিলেন স্পিংকস-এর বিরুদ্ধে। '৭৮-এর ১৫
সেপ্টেম্বর নিউ অর্লিয়ন্সে স্পিংকসকে হারিয়ে
তৃতীয়বার পুনরুদ্ধার করলেন হেভিওয়েট
বক্সিংয়ের বিশ্ব খেতাব।

সবাই ধরে নিল ৩৬ বছর বয়সী আলির
এটাই শেষ লড়াই এবং মহাগৌরবের সঙ্গে অবসর
গ্রহণ। আলি নিজেও সেকথা ঘোষণা করলেন।
কিন্তু আবার সেই সোনার খনির হাতছানি এবং
প্রোমোটারদের উস্কানি। তাই দীর্ঘ ২৫ মাস পরে
লারি হোমসের সঙ্গে এই লড়াইয়ের ব্যবস্থা হয়,
যে লারি হোমস ছিলেন আলিরই অনুশীলন
সংগী।

বক্সিং জগৎ বেশীদিন খেতাবশূন্য থাকতে
পারে না। আলির অবর্তমানে লারি ছিলেন
স্বীকৃত চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু লোকে বলত—ফালতু
চ্যাম্পিয়ন। কারণ আলিকে তো লারি কোনদিন
হারাতে পারেন নি।

সেই জন্যই কি লারি হোমস আলির সঙ্গে
লড়াইয়ে রাজি হয়েছিলেন? কিংবা বড় মুখ করে
আলি যে কথাটা বলেছিলেন—"আই অ্যাম দি
গ্রেটেস্ট সবাই জানে, এবার চারবার খেতাব জিতে
এমন এক কীর্তি গড়ব যা কোনকালে কেউ ম্লান
করতে পারবে না"—সেই কারণেই লড়তে রাজি
হয়েছিলেন কি আলি?

অর্থই আসল কারণ। প্রেস কনফারেন্সে সে
কথাটা খোলাখুলি কবুল করেছেন লারি হোমস।
হোমস যখন গুরুর প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ হয়ে
বলছিলেন—"এমন চ্যাম্পিয়ন হয় না, এমন মানুষ
বিশ্বে বিরল"। —তখন সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন
তা হলে এমন মানুষের সঙ্গে এবং তোমার প্রাক্তন
গুরুর সঙ্গে লড়তে গেলে কেন? হোমস বলেন,
আমি জানতাম আমি জিতবই এবং এ-ও জানতাম
আলির লড়াইয়ে ফিরে আসা উচিত হয় নি। তাঁর
ভাবমূর্তি ম্লান হয়ে যাবে। কিন্তু আমি না লড়ে
পারি নি। একজন পেশাদার বক্সার কি ষাট লাখ
ডলার ছেড়ে দিতে পারে?"

আলিও নিশ্চয়ই লড়াইয়ে নেমেছিলেন আশি
লাখ বা এক কোটি ডলারের প্রলোভনে। হারজিৎ
যাই হোক আর আলির ভাবমূর্তি যতই ম্লান হোক
ডলারের বাজিতে দুজনের মনোবাসনাই কিন্তু পূর্ণ
হয়েছে।

মুকুল

## আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

### আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি বই

**ঘন ছন্দ মৃত্তির নিবিড়।** সিদ্ধেশ্বর সেন। সারস্বত লাইব্রেরী। ২০৬ বিধান সরণি। কলকাতা-৭। টাকা।

**অনন্ত উদ্ভিদ রক্তে।** সুনীল কুমার নন্দী। অন্বেষা। ৮৯এ এন কে পাল রোড। কলকাতা-৪২। পাঁচ টাকা।

**সুখরঞ্জনের কবিতা।** সুখরঞ্জন চক্রবর্তী। দীপ প্রকাশন। ৩৭৩ যাদবপুর পার্ক। কলকাতা-৬৮। পাঁচ টাকা।

কোনো কিছুর স্পর্শে বা ...বিত সান্নিধ্যে রসিক মন যখন ...ভীরে নামে, মনের আঁচন তারে ...না ঘা লাগে তখন মানুষ অন্য সুরে ...বলে ওঠে। সেই বলা কখনো কবিতা, গান, ছবি, শিল্প হয়ে দেখা দেয়। গভীর অনুভব, তীব্র উপলব্ধির ...য়েও হয়ত কখনো কাব্য-ভাবনার ...লিক ঠিকরে বেরোয়। এখখানে তিন-... ক্ষীণতনু কাব্যগ্রন্থে সেই ভাব-...চ্ছুরণের কিছু আভাস পাওয়া যাবে।

সিদ্ধেশ্বর সেন অনেককাল ...লিখে লেখেন নি। এককালে, বা ...বেশ লিখতেন। লোক সমক্ষে ...নাম ছিল। খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু বিগত ...কোনো একসময় কেন যে তিনি ...চর্চা ছেড়ে দিয়ে একটু যবনিকার অন্তরালে চলে গিয়েছিলেন তার অন্তর্নিহিত কোনো তত্ত্ব আমাদের জানা নেই। অবশ্য কবিতার হাত যাঁর আছে—সরস্বতী তাঁকে মুক্তি দেন না। ...নি ঝোলা নিয়ে রসের আসরে ...কে আবার অবতীর্ণ হতে দেখা ...। এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হয় নি। সিদ্ধেশ্বর সেন দীর্ঘ মেয়াদের ...একগুচ্ছের অত্যন্ত সুন্দর ...কবিতা কবিতার ভক্তদের উপহার ...ছেন। কবিতাগুলি তাজা, ...মধ্যে রোদ্দুরের মত আকর্ষণ ...কখনো তার মধ্যে তেজী আগুন ...ঝিয়ে ঝকঝকিয়ে ওঠে কাক-চোখ ...জলের মধ্যে দোল খাওয়া ...চাঁদমালা বা চিত্রমালা হয়ে যায়। ...যোজনায় তিনি সংযমী। কিন্তু ...বক্তব্য চিকচিকনো তীরের ফলার ...মনের মোলায়েম মখমলে বিঁধে ...তিনি সংকেতে বিশ্বাসী। কম ...অনেক কিছু বলা হয়ে যায়— ...স্বভাব-কৌশলে কুশলী। রপ্ত। ...ছোট বই। কিন্তু কবিতাগুলির ...কাটা টুকরো টুকরো উচ্চারণে ...চিত্তে যে সুর বাজিয়ে তোলেন ...সুরেলা পাখির পেঞ্জা ধ্বনির মত ...আত্মক এবং কাল-স্থায়ী। তাঁর ...কাব্য গ্রন্থের জন্য উৎসুক ...রইলাম।

সুনীলকুমার নন্দীও নির্জনতা ...বিলাসী এক স্বল্প-বাক সৎ কবি। ...ইদানীং পত্র-পত্রিকায় খুব কমই ...লেখেন। কবিতা জিনিসটা খই-...মুড়কির মত ছড়ালে ছিটোলে কাকের হয়ত এই মতবাদে তাঁর আস্থা নেই। মনীষাও বিদ্যমান। তাঁর কাব্যগ্রন্থ সংখ্যায় কম। কিন্তু মাঝে মাঝেই তারা প্রকাশিত হয়েছে। যাঁরা সে কবিতা-রাজ্যের মধ্যে ঢুকেছেন অন্তত একটু চোখ বুলোবার অবকাশ পেয়েছেন তাঁরা জানেন যে তাঁর মেজাজের একটি নিজস্ব পরিমণ্ডল আছে, জলজ, জংলা বনরাজিনীল প্রকৃতির মধ্যে একটি মায়াবী মন চুরি করে নিয়ে যায় পথ দেখিয়ে দেখিয়ে অন্য একটি বিশ্বাসী নিবিড় পাঠক-মনকে। তাঁর কাব্যচর্চার আদল ও আদর বিফল হয় নি। হাটে তাঁর কণ্ঠ না শোনা গেলেও হাটের বাইরে মেঠো রাস্তায় তার মদির আহ্বান কানে পৌঁছয়, আচ্ছন্ন করে—দূরে দেখা যায় কালো অন্ধকারে এক প্রস্থ জোনাকির ঝলমলে ঝাড়-লণ্ঠন। ধুলো ধুলো গন্ধ লাগা ছন্দ দোলা। খোঁচা খোঁচা জল বিঁধে থাকা অজস্র নালা-ডোবা-খাল-বিল-বাওড়—সুনীলকুমার নন্দীর কবিতার এই-ই দুঃখী-নিবিড়-বাউল-উচ্ছন্ন স্বভাব। বাংলা কবিতার ইদানীং-কালের আলোচনায় তাঁর সৃষ্টি উল্লেখের দাবি রাখে।

এই আলোচনার শেষতম কবি সুখরঞ্জনের জীবনদীপ অকালে নির্বাপিত হয়েছে। মরণোত্তর এই কাব্যগ্রন্থ পাঠে মন এক বিষণ্ণ বেদনায় ভরে যায়। তাঁর কবিতার কণ্ঠস্বরে এমন এক নিশ্চিন্ত অভ্রান্ত কবিত্বের আভাস আছে—যা থেকে ভেবে নেওয়া যায় তিনি প্রতিপত্তি এবং খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন। অনেক কবিতায় আবেগের তোড় এতটাই যার ফলে সার বস্তুটুকু ফেনাটুকু বাদ দিয়েই গ্রহণ করতে হয়। নিশ্চয়ই কোনো একসময় চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে স্রষ্টা নিশ্চয় বুঝতে পারতেন বেশীটুকু বাদ দিয়ে কমটুকু রাখলে ছাঁকা জিনিসটুকু পাওয়া যায়। সাহিত্য ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, চলমান জীবন—এতোগুলি বিষয়ের আধার হিসাবে তিনি কবিতার মাধ্যমকে ব্যবহার করেছেন—হয়ত এতোগুলি বিষয়ের প্রতিই তাঁর প্রবণতা ছিল, কিন্তু কবিতায় তারা কতখানি কার্যকর সে বিষয়ে ভাববার বা চিন্তা করবার সুযোগ তিনি পান নি। একথা নিশ্চিত কবিতার রসজ্ঞ পাঠক, অবশ্য যদি তিনি খুব সূক্ষ্ম খুঁতখুঁতে পাঠক না হন, চুলচেরা বিচার নিয়ে তর্কবিতর্ক না করেন, সুখরঞ্জনের কাব্য-প্রচেষ্টা তাঁকে কিছুক্ষণ এক অনাবিল আনন্দে ডুবিয়ে রাখবে। হয়ত বা কিছু কবিত্বের পাথেয়ও জুটিয়ে দেবে।

**সুনীল বসু**

### আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি চিত্রকলা

## আত্মলগ্ন বিচ্ছিন্নতা কিংবা মাঠ ভাঙে কালপুরুষ

ডেকর সার্ভিস গ্যালারী—সেপটেম্বর ২০-এইমাত্র সপ্তাহখানেকের জন্য একটি প্রদর্শনী শুরু, বরফ-ঠাণ্ডা লেমনেড দিয়ে। চারজন শিল্পীর যৌথ প্রদর্শনী। এঁদের তিনজনের কাজ "দেশ" প্রচ্ছদে

"আমি গোদরেজ
পছন্দ করেছি কেন?
—আমি নিজে
ইঞ্জিনীয়ার—
রেফ্রিজারেটরের
খুঁটিনাটি সবকিছুই
আমি জানি!"
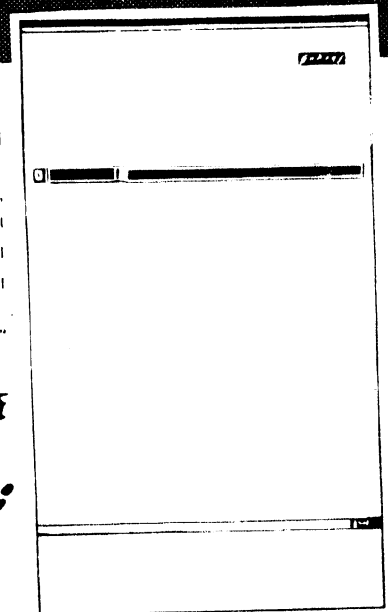
মিতাভ বড়ুজ্জে, শ্যামল দত্তরায়, কাশ ভট্টাচার্য। চতুর্থজন গণেশ লুই।

গণেশ হালুই অপেক্ষাকৃত পরিচিত "দেশের" পাঠকের কাছে। জণ্তার দেওয়ালচিত্র নকল করার কাজ রেছেন বহুদিন। অজণ্তার ওপর ন্তর্জাতিক স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ। খানে সরকারী চারুকলা মহা-বদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। গণেশের খ্যাতি তাঁর জলরঙের জন্য। তৈলচিত্রের দ্ধতিপ্রকরণে নৈপুণ্য অর্জন করে থাকলেও, স্মরণীয় ছবি আঁকেননি। জলরঙ—স্বচ্ছ এবং অস্বচ্ছ উভয়ে—তাঁর নে রাখার মত কাজ আছে। এবারে জলচিত্র এঁকেছেন তিনি। বর্ণাঢ্য রঙের চোখ ধাঁধানো খেলা। শ্যাওলার ত গালিচার মতো মখমল সবুজ। কিংবা কচিকলাপাতার মত সুখপিচ্ছল সবুজ। এসেছে নীচু জলাজমির মধ্যে বাড়িঘরের আভাস। ফেরীঘাট পেরুনোর শ্য বাদা অঞ্চলে। কালো ঝোপের মধ্যে কছু গাছ। পুকুরের পাশে নারিকেল গাছ আর কিছু বকের চরে বেড়ানোর দৃশ্য। পাহাড় আর বহুড়-শুকনো সোপানপ্রপাত যেন। যদি রঙের কৌশল এবং স্বচ্ছতা বিচার হয় তবে ছবিগুলি প্রথম শ্রেণীর। তবু মন ভরে না। ছবির জোর তার নির্মাণে। রচনার দৃঢ়তায়। এ সব যেন গোলপাতার অস্থায়ী ঘর। ফেরীঘাট ছবিতে খেয়া নৌকা সাদা দিয়ে যেভাবে এঁকেছেন তাতে বর্ণ যে মায়া সৃষ্টি করেছে তার সব কেটে যায়। অন্য কয়েকটিতে কাটা কাগজ সেঁটে সাঁটা ছবি (কোলাজ)-এর ভাব এসেছে।

অমিতাভ ধাতুরপাত খোদাইতে ক্রমে উন্নতর কারুকার্য দেখাচ্ছেন। বিশেষত বিমূর্ত বুনোটের মধ্যে মায়া তৈরি হচ্ছে। যেমন দেওয়ালের ফাটাফুটোয় করে যেসব নকশা তৈরি হয়। "মেয়েরা" নামী এসেছে। কেউ ফুল, কেউ ফল প্তু মিশরী। নতোন্নতের খেলা। তিনি মূল প্রতিমাকে মাঝখানে চারপাশে মণ্ডনধর্মী কাটেন। রচনা এবং অবসরের সমস্যার মুখোমুখি না হয়ে পাশ কাটান। বর্কাসিংয়ের স্পারিং দেখার লড়ালড়ি দেখা হয না শেষ।

শ্যামল দত্তরায়ের একটা

একটা চায়ের দোকান—দুই বুড়ো বসে খাচ্ছে। ভাঙাচোরা স্বাস্থ্য। ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়জামা। উনুনে সসপ্যান। ডিম ঝোলানো তারের ঝুড়ি। খুঁটিনাটি মিলিয়ে সুন্দর। রচনাসৌকর্য এবং ভূমিবিন্যাসে ভাল। অন্য ছবিগুলির মধ্যে পার্টিসানের ভাঁজে ভাঁজে বাড়িঘর আঁকাটা মন্দ লাগেনি। সামনে লোহার পাতের গোল ঘেরার মধ্যে একটা গাছের দিকে তাকিয়ে হাড্ডিসার গরুর আঁকু-পাঁকুর ব্যাপারটা জমেছে। শ্যামলের গল্প বলা, রূপকথা বলা এবং সচিত্রকরণ করার একটা ঝোঁক আছে। রোমাণ্টি-সিজমের তবক মোড়া। কিন্তু বস্তির চায়ের দোকান দেখে মনে হল, তিনি নতুন রাস্তা পেয়েছেন।

বিকাশ ভট্টাচার্যের ছবি যেন নতুন দেশে আসার মতো। তৈলচিত্র। বড়। মেজাজে করা। ইদানীং বুঝেছি বিকাশ আসলে সাত্ত্বিক। মানুষের দেহের মেদ মাংস, জরা আর বার্ধক্য সম্বন্ধে তিনি বীতস্পৃহ। এই জীর্ণবসন, এই মোহ। দেহ এবং আত্মার মধ্যে স্বচ্ছ কাচের দেওয়াল। "বিকালের অধিবেশন"-এ কয়েক জন মেয়ে সেজেগুজে মাংসের দোকান সাজিয়ে বসে আছে। এদের পাশে শান্ত "জলকে চল" মেয়ে আছে। সাধারণ মেয়েদের বিকালের প্রসাধনে কি তাঁর আপত্তি আছে? এই ছবির গঠন এবং বিন্যাস ফুলের মতো বৃত্তাকার। বুড়ো রিকশাওয়ালা এক মধ্যবয়সী মহিলাকে টেনে নিয়ে চলে। তার ব্লাউজের ওপর দিয়ে বুকের আভাস যেন নতছাঁচ কুমড়ো। চরণ সিংয়ের ক্রূর মুখের পেছনে এলিয়ে পড়া ধর্ষিতা মেয়ের ছবি আছে। ইনি কি ভারতবর্ষ? আর এক বিধবা মহিলা। যার গলার কাছটা কুমোরের চাকে মাটির মত পেঁচানো। হাতে একটা লোকের মুখ মুখোশের মত কাটা। কেবল একটা ছবি আমার ভাল লাগেনি। হলুদ দেওয়ালের ওপর রাস্তার বাচ্চা মেয়েটি অকসফামের বিজ্ঞাপনচিত্রের মতো মনে হয়। বস্তুত বিকাশের ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকতে পারে না। বিকাশ ক্ষমতায়, কল্পনায় সহজে চিহ্নিত হয়ে যান। সকলে সমালোচনা করেন, কিন্তু সকলে সমালোচক নন। তেমনি শিল্পীদের মধ্যে ক্ষমতার তারতম্য থাকবেই। বিকাশের রচনা হয়তো ঢিলে ঢালা, বর্ণে আলো-ছায়ার বিভ্রম, এবং টাটকার চেয়ে মিশ্রিত রঙকে তৈলধৌত করার দিকে ঝোঁক, এবং অংকনে প্রথাসিদ্ধ বাস্তবের প্রতি আসক্তি, তবু মনে হয় মৃতলোকের ঠাণ্ডা হাওয়া যেন গায়ে লাগছে। ছবি ধাক্কা মারে। সহজে ভোলা যায় না।

সমালোচনা করা সত্ত্বেও বলব, কলকাতার আর দশটা প্রদর্শনীর চেয়ে এঁদের কাজের মান অনেক উন্নত। এঁদের কাছে দাবীও অনেক বেশি।

**সন্দীপ সরকার**

আলোচনা শিল্প সংস্কৃতি সংগীত

## সবরঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন

বড়ে গুলাম আলী খাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আয়োজিত সবরঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন এ বছর রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত

এত ভাল যে এটি ছাড়তে
কখনো আপনার মন চাইবে না!
শ্রীঃ
শ্রীনিবাস নিবেদন করছেন অপরূপ বস্ত্র-মেলা
মিল্‌স
নানান ধরনের ডিজাইন, সুপার কটন ও ব্রোগেড ড্রেস মেটিরিয়াল, শার্টিং, স্যুটিং ও শাড়ী।
Interpub S/1 80

# সবচেয়ে বেশী বিক্রীর দুই রেডিও ক্যাসেট রেকর্ডার
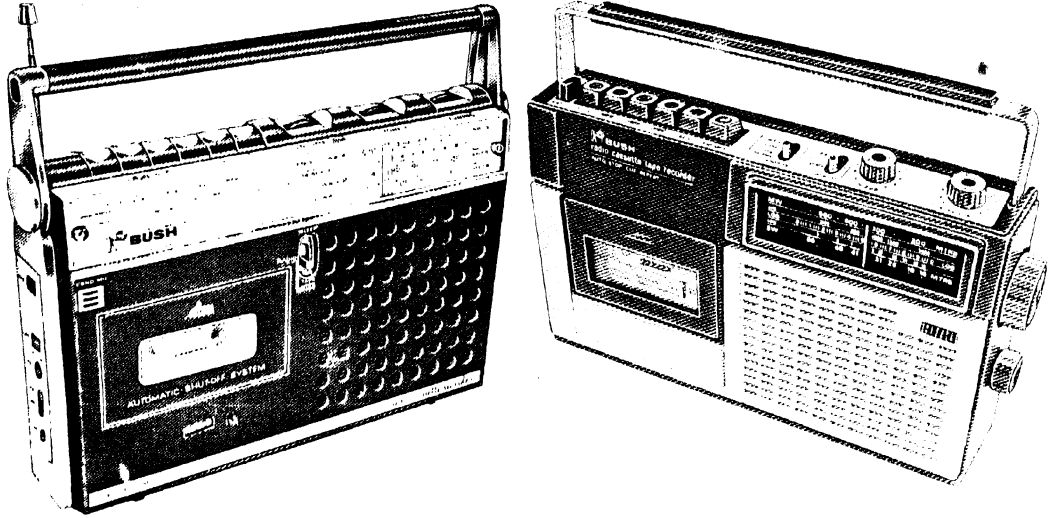
## এই দুই রেডিও ক্যাসেট রেকর্ডারের বিক্রী অন্য সব রেডিও ক্যাসেট রেকর্ডারের বিক্রীর চেয়েও বেশী।

দুটোর মধ্যে কোন রেডিও ক্যাসেট রেকর্ডারের মধ্যে কোনটি কিনবেন — এইটাই আপনার একমাত্র বিবেচ্য বিষয়।

সেরা জিনিসের মধ্যে বেছে নেওয়ার সুযোগ পাওয়াতে এক আনন্দ আছে, নয় কি ?

## সবার সেরা দুই রেডিও ক্যাসেট রেকর্ডার

Rediffusion/B/1175d BG

সবে এলো। ছোট্ট করে বাজানো লাপটি সুরেলা এবং মীড়-আশে া ছিল। এর চেয়ে খানিকটা লম্বা ড়টির মতই এতে পুরানো ঢঙের ছু স্বরসমষ্টি ছিল যা আজকাল শষ শোনা যায় না. যথা—প ক্ষ ধ র্স প ক্ষ প র স এবং গ প ধ প। াড়ে গমক লপেট, মীড়খণ্ড এবং ় সপ্তক মেশানো স্বরপ্রগতি বাজানো র্দ্বিল একটি সুপরিকল্পিত কাঠা- *অংশ হিসাবে। ঝালার কাজে সুরের মজা এবং তেজ সবই*

বিলম্বিত তিনতাল গতের তানের কাজ বেশ ঘড়ো করে য়েছিলেন শিল্পী এবং বোলের ও হরকৎ দিয়ে অলঙ্করণ করে- লেন শিল্পবোধের সঙ্গে। শেষ উচ্চাঙ্গের চৌগুণ একহারা ন ও গমক তান ছিল। দ্রুত গতের কারিও উচ্চাঙ্গের হয়েছিল অতি দ্রুত গৎকারিতে বলিষ্ঠ ল অঙ্গের কাজ ও দ্রুত ঝালা না গিয়েছিল। অতিদ্রুত গৎটি র পিতামহ ওস্তাদ নান্নে খাঁর একটি নায় নিজস্ব কিছু সংযোজনা করে র্মাণ করেছেন বলে শিল্পী ঘোষণা রন।

কিরওয়ানি রাগে আওচার ও টি গৎ ছিল আমজাদ আলীর শেষ বেদন। রূপক তালে নিবন্ধ গৎটি বেগপূর্ণ বিস্তারের কাজ দিয়ে রু হয় এবং তারপর রং-বেরঙের শে ভরপুর কর্ড-আশ্রিত নকশার বির্ভাব হয়। শেষের দিকে অতি উচ্চাঙ্গের দ্রুত তান শোনা যায়—এর মধ্যে ছিল বেশ কয়েকটি আশ্চর্য খাদের একহারা তান। দ্রুত একতাল গতের তান. তেহাই ও ঝালার কাজও খুব ভালো হয়েছিল।

শিল্পীর সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেছিলেন অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়। ইনি সাথ ও ঝালা অংশে ভাল বাজালেও ঠিক তৃপ্তি দিতে পারেননি। একটু বেশি জোরে বাজানোর প্রবণতা এবং *বোল-বিস্তারে বৈচিত্র্যের অভাব তো ছিলই, আমজাদ আলীর বাজনার* সঙ্গে খাপ খাইয়ে বোলে রচনার চেষ্টাও বিশেষ দেখা গেল না।

শান্তি মুখোপাধ্যায়ের খেয়াল ও ঠুংরী দিয়ে আসরটি শুরু হয়েছিল। খেয়াল দুটি ছিল আনন্দি কল্যাণে। বিস্তার বা তান বা সরগম কিছুতেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু পাওয়া গেল না। শিল্পী মোটামুটি সুরে গেয়েছিলেন এবং মোটামুটি গুছিয়ে—এইটুকুই বলা যায়।

**নীলাক্ষ গুপ্ত**

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **নৃত্য**

## 'প্রাঙ্গণ' এর চণ্ডালিকা

দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে 'প্রাঙ্গণ'-এর শিল্পীরা সম্প্রতি মহাজাতি সদনে 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যটি মঞ্চস্থ করলেন। এই প্রযোজনার পেছনে যতটা আয়োজন ছিল ঠিক ততটাই নিষ্ঠা ছিল এমন বলা যাচ্ছে না। নৃত্যাংশে শিল্পী নির্বাচন থেকে শুরু করে অভিনয়-বিন্যাসের নানান ত্রুটি সঙ্গত কারণেই প্রযোজনার সাফল্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রস্তুতির অভাবে নৃত্যাভিনয়ে অধিকাংশ শিল্পীই দেহের ভারসাম্য হারান, ক্লান্ত বোধ করেন, গানের ভাবানুষঙ্গে প্রায় ক্ষেত্রেই অভিব্যক্তির কোনো সঙ্গতি থাকে না। তদুপরি দু-একটি দৃশ্যে আক্ষরিক অর্থে শিশুশিল্পীদের সংযোজনে সংস্থার সঙ্গে জড়িত সকল শিক্ষার্থীকেই হয়তো খুশি করা গেছে, কিন্তু তাতে প্রযোজনার প্রতি দায়িত্ব *প্রকাশ করা হয়নি। চণ্ডালিকাকে অদ্ভুত বোঝাতে দইওয়ালা ও চুড়িওয়ালার* অঙ্গ-বিক্ষেপ দৃষ্টিকটু। কৃষ্ণা গাঙ্গুলীর পরিচালনায় নৃত্যাংশে বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন জয়ন্তী চ্যাটারজি. শ্রেয়সী ঘোষ, সঙ্গালী বসু, রূপা চক্রবর্তী, মধুমিতা দাশগুপ্ত প্রভৃতি। সুচিত্রা মিত্র সংগীত পরিচালনায় সংগীতাংশ কিন্তু বেশ ভালো। গানের মধ্য দিয়ে চণ্ডালিকার প্রতিটি চরিত্রই শ্রোতাদের মর্মে প্রতিষ্ঠা পায়। বিভিন্ন চরিত্রে গেয়েছেন শান্তা মুস্তাফী সুবর্ণা মুখারজি, সীমা চ্যাটারজি, পবিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। চণ্ডালিকা ছাড়া এদিনের উৎসব সূচীতে ছিল ছোটদের ছড়ার নাচ ও সুচিত্রা মিত্রর একক সঙ্গীত॥

## মুক্তধারার অনুষ্ঠান

রবীন্দ্রনাথ শ্যামা নৃত্যনাট্যের কোনো শিশুসংস্করণ করে যাননি। 'মুক্তধারা' তাঁদের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে সম্প্রতি রথীন্দ্রমঞ্চে সেই দুরূহ কাজটিই সম্পন্ন করলেন। কেন করলেন জানি না, তবে নাটকে অংশগ্রহণকারী বিশেষ করে নৃত্যাংশে যখন দেখি অধিকাংশ শিল্পীই বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতায় যথেষ্ট অপরিণত তখন এই ধরনের দুঃসাহসিক প্রয়াস প্রকারান্তরে একটি সংস্থার চিন্তা-ভাবনার দুরবস্থাকেই প্রকট করে। ভিন্নধর্মী নৃত্যের সুষম সহাবস্থানেই যে রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের বৈশিষ্ট্য, প্রতিটি নৃত্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই যে নিহিত এক *একটি চরিত্রের আবেদন মুক্তধারা প্রযোজিত 'শ্যামা'র নৃত্যাংশে তা কোনো-*ভাবেই লক্ষ করা যায়নি। নৃত্যের তুলনায় সংগীতাংশে বরং কিছুটা পরিণতির আভাস। অমর গাঙ্গুলীর বজ্রসেন, রীনা বসুর শ্যামা কিংবা তপন চ্যাটারজির উত্তীয় সেখানে নাট্যরসের শর্তেই প্রস্তুতির প্রমাণ দিয়েছে।

শ্যামা নৃত্যনাট্যের আগে শিশুদের 'লোকনৃত্য' একটি দায়সারা অনুষ্ঠান। অরুণ বসুমল্লিক ও সুকুমার কোলের সহযোগিতায় লীনা করাটীর কত্থক এই আয়োজনের সবচাইতে সনিষ্ঠ নিবেদন। ঠাট ও গৎ-ভাও-এ ইতিমধ্যেই শিল্পীর অধিকার সুস্পষ্ট।

**রানা দাস**

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

## বধূ নায়িকা

একটা পরীক্ষা চলছিল। একটা নামী কে জি স্কুলের অ্যাডমিশন টেস্ট। একটি শিশুকে বলা হল, 'এ' দিয়ে একটি শব্দ লিখে ছবি এঁকে দেখাও।

...টি লিখলে 'আডাল্টস ওনলি' ...গ ছবি দিল রোজকার কাগজে ছাপা ... পরিচিত ছবি—যা কাগজে নাটকের ...াপনের সঙ্গে বেরোয়। ঐ ধরনের ...র পত্রিকা বা ছোট কাগজে ও দেয়ালে ...া থাকে—'যৌনশক্তি বর্ধক সালসা' ...াবে। ছেলেটি নির্দোষ কারণ ...তূহলী আহরণই শিশুর ধর্ম।

চতুর্মুখ-এর অসীম চক্রবর্তীর নাম ... সময় 'জনৈকের মৃত্যু' প্রযোজনার ... এদেশের নাট্যচর্চায় শ্রদ্ধার সঙ্গে ...চারিত হত। চতুর্মুখ ব্রহ্ম এক সময় ...হ, আসক্তির জন্য কামদেবের সৃষ্টি ...রন। চতুর্মুখ-এর অসীম চক্রবর্তী ...বর্তী সময়ের মানুষের আদিম ...নাকেই মূলধন করলেন। প্রতাপ ...ও ব্লো হট নাটক দীর্ঘদিন চলল। ...বোর থিয়েটারের ব্যবসা যাঁরা করেন, ...দের মহলে ঐ 'এ' মার্কা নাটকের ...ভৎস লীলার অনুপ্রেরণা হিসাবে ...সীম চক্রবর্তীর নাম ঘোষিত হল।

প্রতাপ মঞ্চে চলতি নাটক 'বধূ ...য়িকা'—এই ধরনের নাটকের প্রথা-...হিত হয়েই এসেছে। অর্থাৎ ...দাম্পত্য জীবনের জন্য সমাজই ...রী, সুতরাং সেই কামনা-বাসনা ...াসীর দেখিয়ে শাপমোচনের ভণিতা। ...ভিনয়, নাটক, থিয়েটারী কোন ...য়োগের দরকার নেই—মানুষকে ...ত্তেজিত করতে পারলেই উদ্দেশ্য-...সিদ্ধি।

'বধূ নায়িকা'-তে প্রথম থেকেই ...কলে উচ্চগ্রামে অভিনয় করে চলেন। ...াছে 'লাউডার প্লীজ' বলে দর্শকদের ...অভিযোগ ওঠে—সেই জন্য চুম্বনগুলিও

প্রচণ্ড শব্দে হয়—পিছনের সারির লোকের শ্রবণেও পরিষ্কার। আর একটি দৃশ্যে সঙ্গম বা ধর্ষণের কতকগুলি অস্ফুট সংলাপ 'মাইক' বাহিত হয়ে আসে। উদ্দেশ্য প্রশ্নাতীত। অসীম চক্রবর্তী মাঝে মাঝে গেলাস হাতে নিয়েছেন—কিন্তু কোন সময় যে তিনি মাতালের অভিনয় করছেন, কোন সময় স্বাভাবিক—অবুঝ দর্শক সেটা বুঝতে পারে না। গীতা কর্মকার-এর প্রতিটি বাক্যের পিছনে একটি সুর থাকে। কিছুক্ষণ পরেই সেই অভিনয়, নাটকের মতই একঘেয়ে হয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে তিনি অবশ্য অনেকখানি গুছিয়ে নিতে পেরেছেন—অর্থাৎ বধূ হিসাবে তাঁর যে আড়ষ্টতা ছিল, নায়িকা হিসাবে সেই লজ্জা, ভয় কেটে গিয়ে অনেক স্বতঃস্ফূর্ত হয়। একটি নাচ, তিনি মোটামুটি আলো আঁধারির সাহায্য নিয়ে উতরে গেছেন। নাচটি অজন্তা নৃত্য। ঐ নাম দিয়ে মর্যাদা পাওয়া যায়, ক্যাবারেতে অনেক ঝামেলা। মণ্টু ব্যানার্জি আদ্যন্ত চিৎকৃত অভিনয় করে গেছেন। প্রেম, আক্রোশ, ঘৃণা, ক্ষোভ সব কিছুই এক পর্দায় এবং এক চংয়ে বাঁধা। অসীম মুখার্জি সেই চিহ্নিত কমেডিয়ান, যিনি নাটকের কোন দায় বহন করেন না—ভাঁড়ামিতেই তাঁর সিদ্ধি। অবশ্যই তিনি ভাল অভিনেতা—কিন্তু কি সব সংলাপ! একবার তিনি 'চিকেন স্টু' খাব বলার বদলে 'চিকেন স্টুল' খাব বলেন। নায়ক অন্তত দশবার মুদ্রা সহযোগে ব্যাখ্যা করে 'স্টু' এবং 'স্টুলে'র পার্থক্য বুঝিয়ে দেন। আশুতোষ দর্শকও ঐ বীভৎস রসিকতায় বিরক্তি বোধ করেন

... লোকনাথ চন্দ্র। নাটকে বহু কবিতার অংশ ব্যবহার করা হয়েছে, সব কয়টি কবিতাই আবৃত্তির দোষে নাকি নিদারুণ হতে পারে, তার উদাহরণ হয়ে রইল। জানকী শর্মার মঞ্চসজ্জায় প্রফেসারের ঘরের যে রং সেটা প্রথমে চমক আনলেও পরে বোঝা যায়, অজন্তা নৃত্যের জন্য ঐ রংয়ের উপযোগিতা। অসীম চক্রবর্তী এক সময় গ্রুপ থিয়েটার করেছেন, মাঝে মাঝেই তিনি শ্যাম এবং কুল দুই-ই বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। সিংহের মুখে হরিণের মূর্তি তুলে। তিনি একবার 'পুরানো সেই দিনের কথা' মনে আনার চেষ্টা করেন। পরমুহূর্তেই ব্যাপারটা আর সামলাতে রাখতে পারেন না, সম্ভবত ব্যবসার কারণে। নাচের মিউজিকটি 'ক্যাসেটে' বাজানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। খুবই যুক্তিসহ প্রয়োগ যদিও অযৌক্তিক নাচটা তাঁকে রাখতেই হয়। গোপাল দাসের আলো মাঝে মাঝেই এরকম ভাবনার সহযোগী হতে চেয়েছে। সঙ্গীত পরিচালক প্রবীর মজুমদার নানা রকম বাজিয়ে গেছেন প্রায়শই যা পুনরুক্তি এবং অতিশয়োক্তি ভারে আক্রান্ত। এই নাটকে একটি বোবার চরিত্রে সবচেয়ে ভাল অভিনয় করেছেন তরুণ দাস। তাঁর কোন কথা নেই—তাই অসাড়তার দায়ও নেই। হয়ত তিনি এই অর্থহীন প্রযোজনার নীরব সাক্ষী!

**দেবাশিস দাশগুপ্ত**

ফটো : অজয় দত্তগুপ্ত

## প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

### অমিতাভ দাস (১৯৪৭— )

সমকালীন ভারতীয় শিল্পকলার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে পাঠকদের কিছু ধারণা নিশ্চয় প্রচ্ছদ দেখতে দেখতে হচ্ছে। অনেক কিছুই নতুন লাগছে। চিত্রভাস্কর্য সম্বন্ধে অনেক ধারণাই পাল্টাতে হচ্ছে। আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসের রূপরেখাও বেশ খানিকটা স্পষ্ট হয়েছে।

মোটামুটি আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাস যেভাবে দেখা যায় তা অনেকটা এইরকম। প্রথম যুগকে বলা যায় (১৯০০—১৯৩০) আত্মানুসন্ধানের যুগ। পশ্চিমী ধাক্কায় টালমাটাল অবস্থায় একটা অপ্রকৃতিস্থ আত্ম-বিস্মৃতির অবস্থা ঘটেছিল। যাঁরা আমাদের সেবাযত্ন করলেন সেই অবস্থায়, তাঁদের কাছে শুনলাম, আমরা আসলে রাজার ছেলে কিন্তু বড় দুর্দশায় পড়েছি। এইসব ভারততত্ত্ববিদদের গবেষণার ফলে আমাদের মনে জন্ম নিল জাতীয়তা। সেই নতুন চেতনার শেষ ফুল শিল্পকলা। অবনীন্দ্রনাথ আসার আগেই ভারতীয় শিল্পকলা প্রায় অন্তসলিল। জাতীয়তাবাদের জন্য সশিষ্য অবনীন্দ্রনাথ সেই ফল্গুকে খনন করতে চাইলেন। তাতে হয়তো সগর-রাজার সমস্ত পুত্রের কেউ কেউ বাঁচলেও, বেশিরভাগই ডুবে মরে ভূত হল। কিন্তু অবনীন্দ্র-নন্দলাল আধুনিক ভারতীয় চিত্রের ভিত্তি স্থাপন করে-ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় যুগ (১৯৩০-৪০) বলা যায় লোকায়ন পর্ব যার নায়ক যামিনী রায়। তৃতীয় যুগ (১৯৪০-৪৭) বলা যায় সমন্বয় পর্ব — বিনোদবিহারী, রামকিংকর, অমৃত শেরগিল এবং "ক্যালকাটা গ্রুপের" পরীক্ষণ যে পর্বে জীবন এবং শিল্পকলার মূল্যবোধ সম্বন্ধে নতুন প্রশ্ন তুলল।

স্বাধীনতা পরবর্তী শিল্পকলার ইতিহাস অনেকটাই জটিল। জট পাকানো ভারতীয় সমাজ মানস এবং অধ্যাত্ম সংকটের ছায়া তাতে পুরামাত্রায়। মিথ্যা খ্যাতির জন্য শৌখিন মজদুরী চলছে। বিশ্ব শিল্পকলায় নৈরাজ্য ভারতীয় শিল্পীদের বিচলিত করছে। তাবিজ মাদুলি টোটকা তন্ত্রমন্ত্র এবং ভূতপ্রেত অপদেবতার পূজা চলেছে। কেউ কেউ সাহেবী তন্ত্রের নামাবলী গায়ে দিয়ে ঝাড়ফুঁক চালাচ্ছেন — সাহেবধনীরা বিলাতী ওঝার কীর্তি দেখে তার শিষ্য তৈরী হয়। ধ্বনি উঠছে জয়গুরু, জয় ডালি, জয় ব্রেতো!

আমাদের আশা ভরসা এখন শুভা-প্রসন্ন থেকে অমিতাভ দাস পর্যন্ত যাঁরা জন্মেছেন স্বাধীনতার পরে। বড় হয়েছেন।

অমিতাভর জন্ম কর্ম দিল্লিতে। সেখানকার আর্ট কলেজের স্নাতক। এ'র বিষয় অনেকের মুখেই অবিমিশ্র প্রশংসা শুনেছি। বিমল দাশগুপ্ত, ধীরাজ চৌধুরী, নীরেন সেনগুপ্তের মুখে ওঁর বিষয় পঞ্চমুখে সুখ্যাতি।

দিকে লক্ষ্য রাখুন। তারপর যে বছর (১৯৭৬) অমিতাভ জাতীয় পুরস্কার পেলেন, সে-বছর ওঁর শুভানুধ্যায়ীদের খুশি ধরে না। অথচ একক প্রদর্শনীর সংখ্যা এক (১৯৭৮ ধূমিমল)। তার আগের বছর [illegible] বাওয়ার [illegible] যুগলবন্দী প্রদর্শনী করেছিলেন [illegible] পার্টরিজ)।

এছাড়া তিনি যা করেছেন তা [illegible] বড় বড় সব ভারতীয় প্রদর্শনীতে যোগ দান। আইফেকস বার্ষিকী ১৯৬৮। "তরুণ চিত্রকর", ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা আয়োজিত প্রদর্শনী, ১৯৬৯। "আজকের চিত্রকর", কুনিকা কেমোল্ড ১৯৬৯। "আজকের শিল্পকলা", কুনিকা কেমোলড এবং রোটারী ক্লাব আয়োজিত প্রদর্শনী ১৯৭০। "আজকের শিল্প-কলা—২" অশোকা গ্যালারী, ১৯৭০। "আজকের শিল্পকলা—৩" ১৯৭১। নিউ গ্রুপ, দিল্লি ১৯৭৪, ৭৬, বোম্বাই ১৯৭৫, ৭৭। "বিশজন চিত্রকর"—শ্রীধরণী, দিল্লি, ১৯৭৬। গ্যালারী ২৬-এর বার্ষিকী। "আর্টিস্টস ফোরাম"—১৯৭৭। মূকবধিরদের সাহায্যার্থে ১৯৭৭। "ছবির দেশ" গীতা কাপুরের প্রযোজনায়, দিল্লি ১৯৭৭। এছাড়া সর্ব-

ভারতীয় ছাপাই ছবির প্রদর্শনী (পুরস্কৃত) চণ্ডীগড় ১৯৭৯। "অনুচিত্র ধরণে", ললিতকলা আয়োজিত প্রদর্শনী, দিল্লি, কলকাতা, মাদ্রাজ হায়দ্রাবাদ ১৯৮০। ভারতীয় বাণিজ্য মেলা, দুবাই ১৯৮০।

প্রচ্ছদচিত্রের নাম "নীল মেঘ"। যেন বা মেঘের স্তম্ভ। শ্যাওলা ধরা প্রাচীরে বা স্যাঁতসেঁতে দেওয়ালে কত অদ্ভুত ছবি ফুটে ওঠে। মেঘে মেঘে বেলা অবেলায় নানা খেলা হয়। বজ্ররথ চলে আকাশের সড়কে। আগুন ঠিকরে ওঠে। আবার কখনো শান্ত মেঘ। ধ্যান-স্তব্ধ সেই রূপ ধরেছেন অমিতাভ।

অমিতাভর কাজ আছে বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে, দিল্লি, সোসাইটি অব কন্টেমপোরারী আর্টস, লণ্ডন, ললিত-কলা আকাদমী, দিল্লি, পাঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যাদুঘর, চণ্ডীগড় প্রভৃতি নানা সংগ্রহে।

অমিতাভ রূপবন্ধের সরলীকরণে বিশ্বাসী। প্রকৃতি, মানুষজন, জৈব এবং অজৈব জগৎ তাঁকে বিমুগ্ধ করে। কিন্তু পটকে তিনি মনে করেন স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ। বাইরের রূপকে তিনি নিজের [illegible]

# পেট্রল গ্যাস কেরোসিন ব্যবহারকারী প্রত্যেক পরিবারের জন্যে...

## বুদ্ধিমান চালকের "জ্বালানী-সাশ্রয়ের" এগারোটি সহজ উপায় ঃ

**1 আপনার গাড়ীর আদর্শ গতি—ঘণ্টায় 40–50 কি.মি.**

ধীর-স্থির যারা, তারা সত্যিই জেতেন— এই সৎ অভ্যাসে আপনার সবচেয়ে কম পেট্রল খরচ। যতো জোরে আপনি গাড়ী চালাবেন, হাওয়ার প্রতিরোধ ততো বাড়বে— ফলে ততোই বেশী পেট্রল পুড়বে। ভারতীয় যান-বাহনের ওপর পরীক্ষা প্রমাণ করেছে যে ঘণ্টায় 80 কি.মি.'র বদলে 40 কি.মি. গতিতে গাড়ী চালালে একই পরিমাণ পেট্রলে আপনার গাড়ী 40% অতিরিক্ত দূরত্ব যেতে পারে।

**2 আপনার গাড়ী কি পেট্রল খাওয়ার দানব ?**

অসুস্থ ইঞ্জিনই সমস্ত উপদ্রবের মূল। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে আপনার গাড়ীর ইঞ্জিন নিয়মিত টিউনিং করিয়ে নিলে গড়পরতা 6% জ্বালানীর সাশ্রয় হয়। মনে রাখবেন, ইঞ্জিনের যন্ত্রপাতির দ্রুত ক্ষয়ক্ষতি হয় ধূলোবালি থেকেই। সুতরাং প্রত্যেক টিউনিং এর সময় যাতে গাড়ীর এয়ার-ফিল্টারটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। স্কুটার, মোটর- সাইকেলের সাইলেন্সর এবং এক্সহস্ট পোর্টের জ্বলা-পোড়া কার্বনও মাঝে মাঝে পরিষ্কার করা প্রয়োজন। যদি আপনার গাড়ী থেকে কালো ধোঁয়া বেরোয় অথবা তার বহনশক্তি দুর্বল মনে হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে কোনো ভালো গ্যারেজে/মিস্ত্রির কাছে নিয়ে যান। পেট্রলের অপচয়ের চেয়ে এতে অনেক কম খরচ।

**3 চাকায় হাওয়া কম থাকলে পেট্রলের অপচয় !**

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে চাকায় হাওয়া কম থাকলে আবর্তনের প্রতিরোধ বাড়ে, ফলে বাড়ায় পেট্রল খরচ। চাকায় হাওয়ার চাপ যদি 25% কম হয় তাহলে পেট্রল খরচ হয় 5 থেকে 10% বেশী এবং টায়ারের আয়ু 25% কমে যায়।

**4 গীয়ারের বিষয়ে এই তথ্যগুলো কি আপনার জানা ?**

ভুল গীয়ার বদলের ফলে এমনকি 20% বেশী জ্বালানী ব্যয় হতে পারে। গাড়ী শুধুমাত্র প্রথম গীয়ারেই চালু করবেন। যদি কাদার মধ্যে পড়ে গিয়ে থাকে অথবা ঢালু পাহাড়ী রাস্তায় চালু করতে হয় তবেই কেবল গাড়ী ওপরের গীয়ারে ছাড়তে পারেন। শহরে চালাবার সময় যেই বুঝবেন ইঞ্জিনের সহ্য হবে তৎক্ষণাৎ ওপরের গীয়ারে ঠেলে দিন। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব উচ্চতম গীয়ার দিয়ে দিন। ঢালু রাস্তায় নামবার সময় সেইটাই যথার্থ গীয়ার যা আপনি সেই রাস্তা ওঠবার সময় ব্যবহার করবেন।

**5 ভীড়ের সময় এবং ভীড়ের রাস্তা এড়িয়ে চলুন।**

একটু ফাঁকা রাস্তায় সামান্য ঘুরে গেলেও আপনার জ্বালানী কম পুড়তে পারে। বস্তুতঃ, শহরের মধ্যে গাড়ী চালানোয় পেট্রলের ব্যবহার আপনার যাত্রার সময়ের সঙ্গেই সম্পর্কিত, দূরত্বের সঙ্গে ততোটা নয়। খুব বেশী ভীড়ের রাস্তায় আপনার গাড়ীর জ্বালানী- ব্যয় দ্বিগুণ হয়ে যায়।

**6 বিচক্ষণ চালকেরা থামবার অনেক আগেই বুঝতে পারেন—আপনি ?**

হঠাৎ ব্রেক কষলে অনেক উপযোগী শক্তি উত্তাপ হিসেবে নষ্ট হয়ে যায়। ব্রেক বেশী শক্ত থাকলে অথবা ব্রেকের ওপর পা রেখে গাড়ী চালালে আপনার 5% বেশী জ্বালানী খরচ হতে পারে।

**7 ক্লাচকে মুক্তি দিন।**

অপ্রয়োজনে ক্লাচের ব্যবহার শক্তি এবং পেট্রল অপচয় করে। ক্লাচ-লাইনার ক্ষয়ে গিয়ে থাকলে সঙ্গে সঙ্গে বদলে ফেলুন। ঢালু রাস্তায় স্থির হয়ে থাকার জন্য ক্লাচ বা অ্যাক্সেলারেটর নিয়ে নাড়াচাড়া করা এক খারাপ অভ্যাস, এতে প্রচুর জ্বালানী নষ্ট হয়।

**8 গাড়ী থামালেই ইঞ্জিন বন্ধ করে দিন।**

গাড়ী থামিয়ে ইঞ্জিন চালু রাখায় অনেক পেট্রল অযথা পুড়ে নষ্ট হয়। যদি আপনার গাড়ীর ব্যাটারী, ডায়নামো, সেল্ফ স্টার্টার আর ফ্যানবেল্ট ঠিক থাকে তাহলে এক মিনিটের বেশী থামতে হলে অনায়াসেই আপনি ইঞ্জিন বন্ধ করে আবার চালু করতে পারেন। এইভাবে আপনি প্রচুর জ্বালানী বাঁচাতে পারেন।

**9 অতিরিক্ত ওজন কমিয়ে ফেলুন।**

আপনার গাড়ীর মাথায় মালপত্র রাখার তাকটা কি সত্যিই সবসময় বয়ে বেড়ানো প্রয়োজন ? অথবা গাড়ীর পেছনে রাখা একশোটা ছোট-বড়ো জিনিসের ? 45 কিলো ওজন কমালে শহরে চালাবার সময়েই 2% জ্বালানীর সাশ্রয় হয়।

**10 ইঞ্জিন গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবার প্রয়োজন নেই।**

বরং নীচু গীয়ারে গাড়ী চালান ইঞ্জিন গরম না হওয়া পর্যন্ত। প্রয়োজনের বেশী চোক একদম ব্যবহার করবেন না। এবং কখনই এমন জায়গায় গাড়ী রাখবেন না যেখান থেকে শীতল ইঞ্জিনে গাড়ী পেছুতে হতে পারে। এর ফলে এক অদ্ভুত পরিমাণ পেট্রল খরচ হতে পারে।

**11 পরিকল্পিত যাত্রা—সাশ্রয়ের শ্রেষ্ঠ উপায়।**

যাত্রা করার আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন ঃ এটা কি নিতান্তই আবশ্যক ? অথবা এই পথে কি অন্য কোনো কাজও সেরে আসা সম্ভব ?

সাশ্রয়ের আরেকটি দারুন উপায়—"যাত্রাসঙ্গী দল" গঠন করুন। যাতে অন্যরাও আপনার গাড়ীতে যাত্রায় ভাগ নেবে। এবং স্বভাবতঃই, খরচেরও।

সাফারী—
কারণ আপনি নিজে আরামে সফর করেন
আর আপনার মালপত্র তা করেনা !
প্রতি সফরের সাথী